কিশোর কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

১

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নীনা সিরাজ ও
সিরাজুল ইসলামকে
সস্নেহে—

লেখকের অন্যান্য বই

কর্নেল সমগ্র (১-১২)
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
ভয়-ভুতুড়ে
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
নিঝুমরাতের আতঙ্ক

কিছু কথা

কর্নেলের রহস্য কাহিনি লিখতে শুরু করেছিলাম বড়দের জন্য। তখন আমি আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। হঠাৎ তাঁরা আনন্দমেলা নামে ছোটদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলেন। সাইজ ছিল চটি বইয়ের মতো। শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একদিন আমায় ফরমাশ করলেন, ছোটদের জন্য একটা গল্প লিখে দে। ততদিনে আমার মাথায় কর্নেল ঢুকে বসে আছেন। নীরেনদা মুখে কিছু না-বললেও পত্রিকার সাইজ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম গল্পটা বড় করা চলবে না। লিখতে বসে কলম দিয়ে বেরিয়ে এলেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। গল্পের নাম ছিল 'টুপির কারচুপি'। ওই টুকু গল্পে জমজমাট রহস্য আর কর্নেলকে নিয়ে প্রায় একটা অসাধ্য সাধন করেছিলাম। মনে পড়ছে না কোনও একটা হিন্দি পত্রিকায় সেই গল্পটি 'টোপি কী করতুত' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসাহ গেল বেড়ে। এর পর কর্নেল আমার ছোটদের জন্য লেখা অনেক গল্পেই ক্রমে জাঁকিয়ে বসলেন। শুকতারা, চিল্ড্রেন্স ডিটেকটিভ, পক্ষীরাজ ইত্যাদি পত্রিকায় ক্রমশ কর্নেল ছোটদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। একবার কর্নেলের ফোন নম্বর দিতে আমার নিজের ফোন নম্বর দিয়ে প্রচণ্ড ঝামেলায় পড়েছিলাম। যখন তখন ছোটরা টেলিফোনে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। তারা সবাই রহস্যের কথা কর্নেলকে জানাতে চায়। আমার ফোন নম্বর অনেক তদ্বিরে বদল করে রেহাই পেয়েছিলাম এ বিপদ থেকে। এর পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে ছোটদের জন্য লেখায় কর্নেল অনিবার্য হয়ে উঠলেন। ততদিনে আনন্দমেলার সাইজ গেছে বেড়ে। দু'সংখ্যায় একটা করে উপন্যাস ছাপা হচ্ছে। নীরেনদার ফরমাশে একটা উপন্যাস লিখতে হল। তারপর একদিন নীরেনদা জানালেন, সত্যজিৎ রায় নাকি আমার লেখার দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছেন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন পরে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের লেখা একটি চিঠি আমার কাছে পৌঁছল। তিনি আমার লেখার প্রশংসা করে শারদীয় 'সন্দেশ'-এর জন্য গল্প চেয়েছেন। কপাল ঠুকে লিখে ফেললাম 'কাক ও ছড়ি রহস্য'। শারদীয় সন্দেশ হাতে পেয়ে দেখি সত্যজিৎ রায় নিজেই গল্পের ছবি এঁকেছেন এবং তাঁর ছবিতে কর্নেলকে দেখে খুব খুশি হয়েছিলাম।

সত্যি বলতে কী, নীরেনদা এবং সত্যজিৎ রায়ই আমার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই এই পরিণত বয়সেও ছোটদের জন্য লিখতে হলে কর্নেলই লেখায় এসে যান। এত বছর ধরে ছোটদের জন্য কর্নেলের যত রহস্য কাহিনি লিখেছি, দে'জ পাবলিশিং-এর কর্ণধার সুধাংশুশেখর দে তাকে এক মলাটের মধ্যে আনতে চেয়েছেন। সায় আমারও ছিল প্রবল। বড়দের জন্য লেখাগুলি নিয়ে 'কর্নেল সমগ্র' বারোটি খণ্ড প্রকাশের পর এবার 'কিশোর কর্নেল সমগ্র' খণ্ডে খণ্ডে ছোটদের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি। আমার ভরসা আছে বড়দের মতো ছোটরাও তাদের প্রিয় কর্নেলকে একত্রে পেয়ে খুশি হবে।

নভেম্বর ২০০৫
৩৭/১ গোরাচাঁদ রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

এতে আছে

কোকোদ্বীপের বিভীষিকা/৯
ঘড়ি রহস্য/৩০
প্যান্থার রহস্য/৩৬
মানুষখেকোর ফাঁদ/৪৩
অরুণাচলের ইয়েতি/৪৮
ডমরুডিহির ভূত/৫৯
কালো ছাতার উৎপাত/৭৪
অকালকুষ্মাণ্ড/৮৪
প্রতাপগড়ের মানুষখেকো/৯১
গুর্গিন খাঁর দেয়াল/৯৬
টুপির কারচুপি/১০৩
টোরাদ্বীপের ভয়ংকর/১০৭
হাট্টিমরহস্য/১৩২
কালোকুকুর/১৪২
ঘটোৎকচের জাগরণ/১৪৬
দুঃস্বপ্নের দ্বীপ/১৫২
চিরামবুরুর গুপ্তধন/১৬৩
কিংবদন্তির শঙ্খচূড়/১৭০
তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা/১৭৭
লোহাগড়ার দুর্বাসামুনি/১৮৪
তুরুপের তাস/১৮৯
ভূত্রাক্ষস/১৯৮
যেখানে কর্নেল/২০২
সবুজ বনের ভয়ংকর/২০৭
কালো বাক্সের রহস্য/২৬৫
কোদণ্ডের টঙ্কার/৩০২
ওজরাকের পাঞ্জা/৩২৩

SATYAJIT RAY

শ্রীযুক্ত সুধাময়কে সত্যজিৎ রায়ের —

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু আপনার লেখার সঙ্গে আমি অনেকদিন পরিচিত — বিশেষত কিশোর সাহিত্যে। আপনার এবং পুত্রের সাক্ষাতের জন্য কিছু বলতে গেলে আমি অপ্রস্তুত হই। সম্ভব হলে কি? পুজোর-ও পর যেন আসবে চিঠিটি

শুভেচ্ছান্তে

গুণমুগ্ধ

সত্যজিৎ রায়

৭/৭/৮৬

কোকোদ্বীপের বিভীষিকা

প্রজাপতি এবং হয়গ্রীব

ডঃ আলবের্তো ভাস্কোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে। ওঁর মাতৃভাষা পর্তুগিজ। কিন্তু ভাল ইংরেজি জানেন। কর্মসূত্রে থাকেন প্রশান্ত মহাসাগরের তাহিতি দ্বীপে। সেখানকার প্রকৃতি-পরিবেশ দফতরের অধিকর্তা। বাঙ্গালোরে এশিয়া পরিবেশ সংরক্ষণ সম্মেলনে এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন, "ডঃ ভাস্কো আমার মতোই একজন লেপিডপ্টারিস্ট।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই আমি যাওয়ার আগেই সেখানে হাজির। তিনি অবাক চোখে সম্ভবত 'সায়েব-দর্শন' করছিলেন। বলে উঠলেন, "কী কইলেন খ্যান?"

হালদারমশাইয়ের মুখ থেকে মাঝে-মাঝে দেশোয়ালি ভাষা বেরিয়ে আসে। কর্নেল বললেন, "লেডিপপ্টারিস্ট। যাঁরা প্রজাপতি নিয়ে গবেষণা করেন।"

গোয়েন্দা-ভদ্রলোক যেন হতাশ হলেন। একটিপ নস্যি নিয়ে খবরের কাগজে চোখ রাখলেন। বুঝলাম, ডঃ ভাস্কো সম্পর্কে ওঁর আগ্রহ উবে গেছে।

কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে বললেন, "আপনি 'নেচার' পত্রিকায় আউল বাটারফ্লাই সম্পর্কে আমার যে প্রবন্ধ পড়েছেন, তা কিছুটা স্মৃতিচারণা। কারণ আমি তখন বয়সে তরুণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রশান্ত মহাসাগরের ফাতু হিভা দ্বীপের সামরিক ঘাঁটি থেকে যুদ্ধজাহাজে দেশে ফিরছিলাম। কোকো দ্বীপের পাশ দিয়ে আসার সময় বাইনোকুলারে জনমানবহীন দ্বীপটিতে ঝাঁকে-ঝাঁকে আউল বাটারফ্লাই দেখেছিলাম। 'কালিগো আপ্রেউস' প্রজাতির এই প্রজাপতি আকারে বিশাল। এক-একটা ডানা ছ' ইঞ্চি চওড়া। ডানায় দুটো করে গোল চোখের মতো ছোপ। হঠাৎ দেখলে প্যাঁচা মনে হয়। তাই ওই নাম। তবে সেই প্রথম এবং শেষ দেখা।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "কোকো দ্বীপ সম্পর্কে আপনি একটা সাংঘাতিক গুজবের উল্লেখ করেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "গুজব এখনও চালু আছে নাকি?"

"আছে। এবং গুজবটা যে মিথ্যা নয়, সেই কথাটা ফেরার পথে আপনাকে জানিয়ে যাওয়া উচিত মনে করলাম।" ডঃ ভাস্কো গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানুয়ারিতে আপনার প্রবন্ধ পড়ার পর ছোট একটা টিম নিয়ে কোকো দ্বীপে গিয়েছিলাম। দ্বীপটি এখনও নির্জন। টিমে ছিলাম আমি, আমার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান, রাঁধুনি আউ তিউ, দু'জন গার্ড তিয়া এবং জুয়া। এরা তিনজন তাহিতির লোক। গিলম্যান মার্কিন। তো পরদিন রাঁধুনি আর দু'জন গার্ড নিখোঁজ হয়ে গেল। ভাবলাম, ভূতুড়ে দ্বীপে আসতে ওদের খুব আপত্তি ছিল। তাই পালিয়ে গেছে। মোটরবোটটা বিচ থেকে টেনে এনে ক্যাম্পের সামনে রাখা ছিল। সেটা আছে। তবে ফাতু হিভা থেকে নারকোলছোবড়া আর শুঁটকি মাছ আনতে অনেক ছোট জাহাজ কোকোর পাশ দিয়ে যায়। কাজেই ওদের পালানোর সুযোগ আছে। কিন্তু বিকেলে ফার্নের ঘন জঙ্গলে তিনজনের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ আবিষ্কার করে চমকে গেলাম। গার্ডদের রাইফেল কোনও হিংস্র জন্তু যেন দাঁতে চিবিয়ে ভেঙেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, জন্তুটা মৃতদেহ থেকে মাংস খায়নি।"

হালদার মশাই নড়ে উঠলেন। "কন কী" বলেই শুধরে নিলেন, "ভেরি মিস্‌টিরিয়াস!"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "আমাদের সঙ্গে পেট্রোম্যাক্স বাতি আর টর্চ ছিল। তখন আমরা নিরস্ত্র। দুটো ক্যাম্প গুটিয়ে জিনিসপত্র মোটরবোটে বোঝাই করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সবে জ্যোৎস্না উঠেছে। গিলম্যান এবং আমি মোটরবোট ঠেলতে-ঠেলতে বিচে নামাচ্ছি। হঠাৎ ঘোড়ার মতো বিকট চিঁ-হি-হি ডাক শুনে টর্চের আলো ফেললাম। আশ্চর্য, কর্নেল সরকার। ঘোড়ার মতো মুখ, মানুষের মতো শরীর একটা জন্তুকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেলাম। জন্তুটা সম্ভবত আলো সহ্য করতে পারে না।"

কর্নেল হাসলেন,"কোকো দ্বীপে ঘোড়া-মানুষের গুজব তা হলে সত্যি?"

"নিজের চোখকে অবিশ্বাস করা যেত। কিন্তু গিলম্যানও দেখেছে।"

"আপনি আর কোকো দ্বীপে যাননি?

"কোকো দ্বীপের মালিকানা নিয়ে ফরাসি এবং মার্কিন সরকারের মধ্যে বিতর্ক আছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ওখানে কোনও দেশ সশস্ত্র বাহিনী পাঠাতে পারে না। এমনকী, কেউ সেখানে যেতে পারে না। আমরা গোপনে গিয়েছিলাম প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে। নইলে তো সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়ে হিংস্র ঘোড়া-মানুষটাকে খুঁজে বের করা যেত। যাই হোক, ঘটনাটা আমরা চেপে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন,"আবার একটা টিম নিয়ে গোপনে কোকো যাওয়া উচিত। আপনি আপনার দপ্তরকে বলে ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডঃ ভাস্কো একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "তা করা যায়। আপনি যেতে চান?"

"হ্যাঁ। আমি এবং আমার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি..."

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "কর্নেলসার, আমাকে বাদ দেবেন না। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি।" তারপর ইংরেজিতে ডঃ ভাস্কোকে বললেন,"সার, ইউ নিড অলসো এ প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

ডঃ ভাস্কো ঘড়ি দেখে বললেন,"হোটেলে ফিরে ট্রাঙ্ক-কলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব। তারপর জানাব। আমার ফ্লাইট বেলা একটা তিরিশে। এবার চলি, কর্নেল সরকার! সবকিছু ঠিকঠাক করতে পারলে আবার দেখা হবে।"

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর বললাম, "আজগুবি ব্যাপার! ওঁরা কী দেখতে কী দেখেছেন।"

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "ঘোড়া-মানুষ! হয়গ্রীব বলা চলে। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে হয়গ্রীবের কথা আছে। মহাভারতে আছে, বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করে বেদ-চোর দৈত্য মধুকৈটভকে নিধন করেছিলেন। দেবীভাগবত পুরাণ আর শ্রীমদ্ভাগবতে আছে হয়গ্রীব দৈত্যকে বধ করতে বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপ ধারণ করেছিলেন। বিষে-বিষে বিষক্ষয়!"

হালদারমশাই বললেন, "শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় না জয়ন্তবাবু!"

বললাম,"ঠিক, কিন্তু হয়গ্রীব বলুন কি ঘোড়া-মানুষ বলুন, তার সঙ্গে দেখছি মার্ডার জড়িয়ে আছে!"

"তা হলে গুপ্তধনও আছে?"

"থাকতেই পারে।"

"কোকো দ্বীপে আলবাত আছে। কোনও পর্তুগিজ জলদস্যুসর্দার মরে ভূত হয়ে তা পাহারা দিচ্ছে। কেউ গেলেই ঘোড়া-মানুষের রূপ ধরে তার ঘাড় মটকে মারছে।"

হালদারমশাই খি-খি করে হেসে উঠলেন,"কী যে কন!"

কর্নেলও এবার অট্টহাসি হাসলেন। তারপর হাঁকলেন, "ষষ্ঠী! কফি।"

লোকটা কে?

ডঃ ভাস্কো টেলিফোনে কর্নেলকে জানিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দফতর কর্নেল সরকারের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবেন। কথাটা শুনে হতাশ হয়েছিলাম। কিন্তু দিন বিশেক পরে মার্চের মাঝামাঝি কলকাতার ফরাসি কনসুলেটের মারফত সরকারি আমন্ত্রণপত্র এসে গেল।

সেই চিঠিতে হালদারমশাইয়ের নামও ছিল। খবর পেয়ে গোয়েন্দপ্রবর কর্নেলের ডেরায় এসে উত্তেজিত ভাবে ঘন-ঘন নস্যি নিচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে চমকে দিয়ে বললেন, "আমার এবং জয়ন্তের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট আছে। আপনার পাসপোর্ট আছে কি?"

"পাসপোর্ট? খাইছে! পাসপোর্ট পামু কই?"

হালদারমশাই করুণ মুখে তাকালে কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, "ভাববেন না। ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু মনে রাখবেন, ফর্মে পেশার জায়গায় লিখতে হবে অর্নিথোলজিস্ট। পক্ষিবিজ্ঞানী।"

"সর্বনাশ! পক্ষীর আমি কী জানি?"

"দুটো ডানা আছে, এটুকু তো জানেন? ডানা মেলেই পাখি ওড়ে, তা-ও জানেন।"

"হঃ।"

"পাখিদের নামও জানেন!"

"কাক, চড়ুই, টিয়া, শালিখ, ময়না, বক, কাদাখোঁচা..."

"বাহ্! তবে এগুলো বাংলা নাম। আপনাকে আমি পাখি বিষয়ে সচিত্র একটা বই দিচ্ছি। মুখস্থ করে নেবেন। এতে দেশ-বিদেশের পাখির ইংরেজি নাম এবং প্রজাতির আন্তর্জাতিক নাম আছে।"

হালদারমশাই চিন্তিত মুখে বললেন, "ক্রিমিনোলজিস্ট লিখলে চলবে না?"

"না। আর-এক কাজ করুন। আজই চৌরঙ্গিতে গিয়ে একটা বাইনোকুলার কিনে নিন।"

"আপনার গলায় যে যন্তরটা ঝোলে?"

"হ্যাঁ। তবে একটা অসুবিধে হবে। পুলিশমহল আপনাকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে চেনে। পাসপোর্টের ব্যাপারে তদন্ত করবে। ভাববেন না। আমি বলে রাখব কর্তৃপক্ষকে। পুলিশকে এ-যাবৎ অনেক সাহায্য করেছি। ওঁরা আশা করি আমার কথা রাখবেন।"

কর্নেলের তদ্বিরে হালদারমশাইয়ের পাসপোর্ট খুব শিগগির হয়ে গেল। ফরাসি কনসুলেট থেকে পনেরো দিনের ভিসাও মঞ্জুর হল। আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে তিনজনের প্লেনের টিকিট ছিল। আমরা যাচ্ছি তাহিতির 'প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবস্থা' পরিদর্শনে।

তাহিতি ফ্রান্সের উপনিবেশ। ফরাসি গভর্নরের অধীনে লোকদেখানো স্বায়ত্তশাসন আছে। কর্নেলের কাছে তাহিতির লম্বা-চওড়া যে ইতিহাস শুনলাম, তা আমার মাথায় ঢুকল না। হালদারমশাই পাখির বইটি বিড়বিড় করে মুখস্থ করেছিলেন। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেন তখন সপ্তাহে একদিন লন্ডন থেকে দমদম হয়ে হংকং যায়। আমরা সেই প্লেনের যাত্রী। তারপর হংকং থেকে প্যান অ্যামের লস অ্যাঞ্জেলিসগামী প্লেনে তাহিতির রাজধানী পাপিতির 'ফা-আ-আ' এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ডঃ ভাস্কো গাড়ি নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "সুস্বাগতম।"

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, "খালি ফুল দেখি। পাখি কই?"

কর্নেল বললেন, "তাহিতিকে স্বর্গদ্বীপ বলা হয়। জানেন তো? এখানকার আদি বাসিন্দারা সবসময় ফুলের সাজ পরে থাকে।"

হালদারমশাই হঠাৎ দুই কানে আঙুল গুঁজে গুঁতোগুঁতি করতে করতে বললেন, "কান কটকট করে। ব্যথা।"

"উঁচু আকাশপথে প্লেনযাত্রায় এটা অনেকের হয়।"

ডঃ ভাস্কো গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর পাশে কর্নেল। পেছনের সিটে আমি এবং হালদারমশাই। মসৃণ কালো রাস্তা, ঘন ঘাসে ঢাকা ঢেউখেলানো মাটি। নিবিড় ফার্নের জঙ্গল। নির্জন রঙিন বাড়ি। আর শুধু ফুল। যেন ছবির দেশে ঢুকেছি। হালদার-মশাই হঠাৎ আমার হাত খামচে ধরে উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "বুগেনভিলিয়া। বুগেনভিলিয়া।"

বুঝলাম, এতক্ষণে এখানকার একটা ফুল চিনতে পেরেছেন। কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে তাঁকে বললেন, "জানেন তো? এই ফুলের আদি বাসস্থান এখানে। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি অভিযাত্রী বুগেনভিলে এই দ্বীপে এসেছিলেন। তিনিই এই ফুলের চারা স্বদেশে নিয়ে যান। সেখান থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর অন্যত্র। তাঁর নামেই ফুলের নাম।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "ফরাসি উচ্চারণে তাঁর নাম দ বুগেঁভিল।"

হালদারমশাই মুগ্ধভাবে বললেন, "গাড়িটা যেন ফ্লাইং বার্ড। নো সাউন্ড। মাখন বাটার!"

কর্নেল বললাম, "আচ্ছা কর্নেল, বাটারের সঙ্গে কি বাটারফ্লাইয়ের কোনও সম্পর্ক আছে?"

কর্নেল বললেন,"অবশ্যই আছে। একই গ্রিক শব্দ থেকে..."

ডঃ ভাস্কোর কথায় উনি থেমে গেলেন। "এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র চার মাইল দূরে রাজধানী পাপিতি। তবে আমরা পাপিতিতে ঢুকব না। তাহিতির গড়ন ইংরেজি আটের মতো। দুটো গোলাকার বড়-ছোট ভূখণ্ড জোড়া দিলে যেমন দেখায়। আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জোড়ের কাছে। সমুদ্রের ধারে আমাদের দফতরের গেস্ট হাউস। আশা করি আপনাদের ভালই লাগবে। ওখানে বিচটা অসাধারণ।"

আমরা একটা ছোট্ট নদী পেরিয়ে গেলাম। ডঃ ভাস্কো গাইডের ভঙ্গিতে বিবরণ দিচ্ছিলেন। নদীটার নাম পাপেনু। ওই নারকোলবাগানের ওধারে গেলে তাহিতির শেষ স্বাধীন রাজা পঞ্চম পোমারির কবর দেখা যাবে। আরও উত্তরে পয়েন্ট ভেনাস। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযাত্রী জেম্‌স কুক সূর্যের সামনে দিয়ে শুক্রগ্রহের পরিক্রমা পর্যবেক্ষণের জন্য এসেছিলেন।

কর্নেল আস্তে বললেন, "কুক ট্রানজিট অফ ভেনাস দেখতে এসেছিলেন।"

ডঃ ভাস্কো আওড়াচ্ছিলেন, জোড়ের পর দ্বিতীয় ভূখণ্ডের নাম তাহিতি ইতি। প্রকৃতিপরিবেশ দফতরের বাংলার কাছে মা-উ-উ গ্রাম। সেখানে একটা ছোট বাংলো আছে। বিখ্যাত ব্রিটিশ লেখক সমারসেট মম সেই বাংলোয় বসে বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর গগ্যাঁকে নিয়ে 'মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' নামে বই লিখেছিলেন। গগ্যাঁ থাকতেন পুনা-আ-উ-ই- আ বসতি এলাকায় ভিলা ভেঁতুরা নামে একটা বাড়িতে। তাহিতির একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মমের বাংলো এবং গগ্যাঁর বাড়ি কাল মঙ্গলবার আমাদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হালদারমশাই নড়ে উঠলেন। "অ্যাঁঃ, কাইল মঙ্গলবার হইলে আইজ সোমবার। আমরা দমদমে প্লেনে উঠছি শুক্রবার মর্নিংয়ে। দুইটা দিন গেছে। আইজ রবিবার। সানডে!"

কর্নেল হাসলেন। "হালদারমশাই! আমরা অন্তর্জাতিক তারিখরেখার পূর্বে চলে এসেছি। ওই রেখার পশ্চিমে যখন রবিবার, তখন পূর্বে সোমবার।"

"কন কী? একই দিনে দুই তারিখ।"

"হ্যাঁ। পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব।"

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। সরকারি বাংলোয় পৌঁছতে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। লনে ফুল-বাগিচা, রঙিন টালির ঢালু ছাদ এবং দেওয়ালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাহারি লতা—বাংলোটা সত্যিই অতুলনীয়। দু'জন সশস্ত্র রক্ষী সেলাম দিল গেটে। তাদের তাহিতির লোক বলে মনে হল। একজন উর্দিপরা দৈত্যাকৃতি লোক এসে আমাদের লাগেজ নিয়ে গেল।

এয়ারকন্ডিশনড বাংলোয় ঢুকে ডঃ ভাস্কো বললেন, "ওর নাম হুয়া, একসময় আমেরিকায় ছিল। তাই ইংরেজি জানে। খুব বিশ্বস্ত লোক। এখন স্থানীয় সময় বিকেল তিনটে। আপনারা ঘড়ি মিলিয়ে নিন। সাড়ে চারটেয় সূর্যাস্ত। আমরা পাঁচটায় ডিনার খাই। আপনারা কখন খাবেন বলে দেবেন। হুয়া আপাতত কফি আর হালকা কিছু খাবার আনো!"

হুয়া চলে গেল। হালদারমশাই বললেন, "বেডরুম কই? হোয়্যার ইজ দি বেডরুম?"

ডঃ ভাস্কো ওঁকে বেডরুম দেখিয়ে দিলেন। উনি তখনই ঢুকে গেলেন। বললাম, "হালদারমশাইয়ের খিদে পাওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ বেডরুমে ছুটলেন কেন?"

আমরা ড্রয়িংরুমে বসে ছিলাম। চারদিকে র‍্যাকভর্তি বই এবং সুদৃশ্য টবে রকমারি খুদে উদ্ভিদ। একটু পরে হুয়া কফি এবং খাবার ভর্তি ট্রে আনল। ডঃ ভাস্কো সেই বেডরুমের দরজা খুলে হালদারমশাইকে ডাকতে গেলেন। তারপর ফিরে এসে মুচকি হেসে বললেন, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "ডিটেকটিভ নন। উনি অর্নিথোলজিস্ট।"

ডঃ ভাস্কো হাসলেন, "ঠিক। ঠিক। ভুলে গিয়েছিলাম। এবার আমাদের প্রোগ্রামের কথা বলি। কাল বিকেলে পাপিতি-ইতির আহি বন্দর থেকে একটা প্রাইভেট কোম্পানির জাহাজ যাবে ফাতু হিভা দ্বীপে। ওরা যাবে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। পাতু হিভা মার্কিন তদারকে আছে। কিন্তু দ্বীপবাসীরা মার্কিন খাদ্য পছন্দ করে না। তা ছাড়া ওরা ডলারে দাম মেটাতে পারে না। তাই পণ্যবিনিময় প্রথা এখনও চালু আছে। খাদ্যের বদলে নারকোলছোবড়া, শুঁটকি মাছ, এক ধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা দেয়। সেই শ্যাওলা কিন্তু সুস্বাদু। খাবেন নাকি?"

"খাব।"

"হুয়াকে বলে দিচ্ছি। তো কাল ওই জাহাজে আমাদের দুটো মোটরবোট থাকবে। আমরা সূর্যাস্তের আগেই কোকো পৌঁছে যাব। এবার তৈরি হয়েই যাচ্ছি। সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র থাকবে।"

ডঃ ভাস্কো চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই ঘুমিয়ে নিন। চলো, আমরা বিচ থেকে একবার ঘুরে আসি। এখানে খুব শিগগির সন্ধ্যা হয়ে যায়।"

হুয়াকে বলে আমরা বাংলোর পূর্ব গেট দিয়ে বিচে নেমে গেলাম। ওদিকে কোনও রক্ষী নেই। কিন্তু কে বলে প্রশান্ত মহাসাগর প্রশান্ত? গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। আর হাওয়া নয়, যেন সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত সরকারি সংরক্ষিত এলাকা বলে ছোট্ট বিচ জনশূন্য। কর্নেল বাইনোকুলারে সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক দেখছিলেন। তারপর যেন বিশেষ কোনও পাখিকে অনুসরণ করার মতো বাঁ দিকে ঘুরলেন। অদূরে উঁচু টিলা। একটা হোটেল দেখা যাচ্ছিল সেখানে। বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন, "অদ্ভুত!"

চমকে উঠে বললাম, "কী অদ্ভুত?"

"ওই লোকটা!"

"কোন লোকটা?"

"দমদমে ওকে দেখেছি। হংকংয়ে দেখেছি। ফা-আ-আ এয়ারপোর্টেও দেখেছি। গোয়ার পর্তুগিজ বংশোদ্ভূতদের মতো দেখতে। তো ওই হোটেলটার নাম দেখলাম,'ফারাতিয়া'। লোকটা বাইনোকুলারে আমাদের দেখছিল।"

"দেখতেই পারে। আপনি যেমন দেখছিলেন। নিছক কৌতূহল।"

"লোকটা জাহাজের নাবিক ছিল। কিংবা এখনও নাবিক। কারণ ওর বাহুতে উল্কি দেখেছি। নাবিকদের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে। ওর গায়ে ছিল নেভিব্লু স্পোর্টিং গেঞ্জি। হংকং এয়ারপোর্টে ট্রানজিট লাউঞ্জে চোখাচোখি হতেই সে সরে যাচ্ছিল, সেই সময় ওঁর বাঁ বাহুতে উল্কিটা আমার চোখে পড়ে। আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল। এক পলকের দেখা। উল্কিটা ঘোড়া-মানুষের।"

মনে-মনে একটু ভড়কে গিয়ে বললাম, "খোঁজ নিলে হয়তো দেখবেন লোকটা এই তল্লাটে কোনও জাহাজে চাকরি করে। এখানকার নাবিকদের হয়তো কিংবদন্তিখ্যাত ঘোড়া মানুষের উল্কি এঁকে নেওয়ার হবি আছে।"

"কিন্তু একজন সাধারণ নাবিক তাহিতির সেরা অভিজাত হোটেল ফারাতিয়ায় উঠেছে এবং আমাদের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। ব্যাপারটা গোলমেলে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে গেস্টহাউসে ফিরলেন। ড্রয়িংরুমে টেলিফোন ছিল। ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে উনি চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়নি। তাই সেই বেডরুমে ঢুকে পড়লাম। দেখি, গোয়েন্দা ভদ্রলোক চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। বাইনোকুলার খাট থেকে ঝুলছে। ফিতে গলায় আটকানো। জুতোও খোলেননি। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়ে ডাকলাম,"হালদারমশাই! হালদারমশাই!"

তিনি তড়াক করে উঠে বসলেন সঙ্গে-সঙ্গে। "এয়ারপোর্ট আইয়া পড়ল?"

"নাহ্। ঘোড়া-মানুষ।"

"কই? কই?"

"ফারাতিয়া হোটেলে।"

"অ্যাঁ?" বলে হালদারমশাই চোখ রগড়ে খি খি করে হেসে উঠলেন। "ও! জয়ন্তবাবু! আমি ভাবছিলাম—"

কী ভাবছিলেন, তা আর বললেন না। প্রশস্ত এবং সুন্দর করে সাজানো ঘরের সৌন্দর্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন। এই ঘরে দুটো বিছানা। হালদারমশাই হঠাৎ উঠে দ্বিতীয় বিছানার গদি টিপে দেখে যেটায় শুয়ে ছিলেন, সেটার গদি টিপলেন, তারপর বললেন, "মাখন, বাটার, কিন্তু হেভি ক্ষুধা পাইছে।"

"ড্রয়িংরুমে চলুন।"

কর্নেল তখন হুয়াকে আবার কফি আনতে বলছিলেন। হালদারমশাইকে দেখে ওঁর জন্য হালকা খাবার আনতে বললেন। হালদারমশাই হাসলেন। "প্যাসিফিক ওশেন এখান থেকে কত দূরে কর্নেলসার?"

"বাংলোর নিচেই। ওই দরজা খুলে বেরোলে বারান্দা। তারপর লন। লন থেকে নামলে বিচ।"

"বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছিলাম। এবার ছুঁয়ে দেখব।"

"সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কাল ভোরে বরং দেখতে যাবেন।"

"এত কাছে-প্যাসিফিক ওশেন! আর তাকে ছোঁব না?"

হুয়া কফি আর স্ন্যাক্স আনল। হালদারমশাই গোগ্রাসে খেলেন। তারপর পুবের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। বিচ পর্যন্ত অবশ্য উজ্জ্বল আলো পড়েছে ল্যাম্পপোস্ট থেকে। কর্নেল এবং আমি বেরিয়ে ওদিকের বারান্দায় বসলাম। দেখলাম, হালদারমশাই বিচে নেমে থমকে দাঁড়িয়েছেন। রাতের সমুদ্র দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ উনি গুঁড়ি মেরে বসলেন এবং বাঁ দিকে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে অদৃশ্য হলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো তো, দেখি কী ব্যাপার!"

বিচে নেমে দেখলাম, হালদারমশাই কার সঙ্গে বালির ওপর জড়াজড়ি কিংবা কুস্তি করছেন। আমরা দৌড়ে যেতেই লোকটা বিচের শেষ প্রান্তে পাথরের চাঁইয়ে উঠে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে পালিয়ে গেল। হালদারমশাই ফোঁস-ফোঁস শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "ঘুঘু দ্যাখছে, ফাঁদ দ্যাখে নাই। চুপিচুপি কাঁটাতাঁরের বেড়া গলিয়ে ব্যাটা যেই নিচে জাম্প করেছে। পড়েছে আমার কোলে।" বলে গোয়েন্দাপ্রবর খি খি করে হাসতে লাগলেন।

অদ্ভুত চিঠি এবং হত্যাকাণ্ড

কর্নেল ঘটনাটা হুয়াকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন। হালদারমশাইয়ের মতে, "লোকটা চোর। সামনে দু-দুটো গার্ড রেখেছে। এদিকে পেছনে চোর আসার রাস্তা পরিষ্কার। চোর কি সামনের দিক দিয়ে আসে? গভর্নমেন্টের কাজ-কারবার সব দেশেই এক।"

বুঝলাম, প্রাক্তন দুঁদে দারোগা হাত ফসকে চোর পালানোর জন্য খাপ্পা হয়ে গেছেন। কিন্তু এবার আমার মনে আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল। কর্নেল আবার টেলিফোনে ডঃ ভাস্কোর সঙ্গে কথা বললেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে র‍্যাক থেকে একটা প্রকাণ্ড বই টেনে নিয়ে বসলেন। আমি পোশাক বদলে এলাম। দেখাদেখি হালদারমশাইও বদলে এলেন। সময় কাটছিল না। হালদারমশাই ক্রমাগত গোঁফে তা দিচ্ছিলেন এবং দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে গুঁতোগুঁতি করছিলেন। কতক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো এলেন। হুয়া আর-এক প্রস্থ কফি দিয়ে গেল।

ডঃ ভাস্কো বললেন, "ফারাতিয়া হোটেলে কোনও ভারতীয় নাগরিক ওঠেননি। আজ প্যান অ্যাম ফ্লাইটে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কারও বাহুতে ঘোড়া-মানুষের উল্কি নেই। আমার ভয় হচ্ছে কর্নেল সরকার, এই তল্লাশির জন্য পর্যটন দফতর চটে যাবে। পর্যটন থেকেই তাহিতির মোট রাজস্বের ৭৫ শতাংশ আসে।"

কর্নেল বললেন, "তা হলে লোকটা অন্য কোথাও উঠেছে। সে ফারাতিয়ার পূর্ব লনে ঢুকেছিল আমাদের ওপর নজর রাখতে। তারপর সে খাড়ি বেয়ে নেমে বেড়া গলিয়ে বিচে লাফ দিয়ে পড়েছিল।"

"ঠিক।" সায় দিলেন ডঃ ভাস্কো। "সে কোন উদ্দেশ্যে আসছিল কে জানে? বিচের দিকে আমরা গার্ড রাখি না। কারণ বিচটা মাত্র পঞ্চাশ মিটার লম্বা। সারারাত আলো জ্বলে। দু'ধারে খাড়া পাহাড়। বিচটা প্রাচীন যুগে একটা খাড়িই ছিল। যাই হোক, আরও দু'জন গার্ড বিচের দিকে রাখা হচ্ছে। তারা এখনই এসে যাবে। আর একটা কথা, সতর্কতার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম বদলেছি। জাঁ ব্লাঁকের জাহাজে যাচ্ছি না। একটা ট্রলার কোকো দ্বীপের ওদিকে মাছ ধরতে যায়। ট্রলারের একটা সুবিধে আছে। দ্বীপের খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পারে। কাজেই আমাদের মোটরবোটের দরকার হবে না। দুটো রবারের ভেলাই যথেষ্ট।"

হালদারমশাই উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "হঠাৎ দরকার হলে আমরা কি ভেলায় চেপে ফিরতে পারব?"

কর্নেল বললেন, "ভয় নেই হালদারমশাই। ভেলা অকূলে ভেসে যাবে না। হাজার-হাজার দ্বীপের মধ্যে যে-কোনও দ্বীপে পৌঁছে দেবে। অবশ্য সেখানে ঘোড়া-মানুষের চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণীও থাকতে পারে।"

হালদারমশাই দেশোয়ালি ভাষায় বললেন, "না, না। তা কইতাছি না।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "আমাদের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত রেডিয়োট্রান্সমিটার থাকবে। সিগন্যাল রিসিভিং সেট থাকবে ট্রলারের মালিক আইউংয়ের কাছে। সে কাছাকাছি দ্বীপগুলোর মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। সিগন্যাল পেলেই হাজির হবে। আইউং চিনা জেলে। তাহিতিতে যৌবনে পালিয়ে এসেছিল। সে আমাদের সরকারের বিশ্বস্ত লোক। মাছ ধরতে গিয়ে অন্য দেশের যুদ্ধজাহাজের গতিবিধির খবর এনে দেয়। এদিকে জাঁ ব্লাঁক কোম্পানি ফরাসি হলে কী হবে। তাদের নাবিকরা মাতাল হলেই বেফাঁস কথা উগরে দিয়ে নিজের সরকারকেই বেইজ্জত করে।"

হুয়া এসে জানাল, দু'জন গার্ড এসেছে।

ডঃ ভাস্কো উঠে দাঁড়ালেন, "তা হলে চলি কর্নেল করকার! আমি গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে নিরাপত্তাবাহিনীর গাড়ির সঙ্গে ফিরে যাব।" শুকনো হাসি হাসলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। "সত্যি বলতে কী, আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি।"

কর্নেল বললেন, "চিয়ার আপ ডঃ ভাস্কো! ঘোড়া-মানুষের চেয়ে স্বাভাবিক মানুষ কম বিপজ্জনক। তাকে এঁটে ওঠা সহজ। মিঃ হালদার তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলেন! বোঝা যাচ্ছে, তার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র বা ছুরিও ছিল না। কাজেই তাকে পাত্তা দেওয়ার মানে হয় না।"

হালদারমশাই বললেন, "চোর! চোর! ছিঁচকে চোরের ইংরেজি কী জয়ন্তবাবু?"

বললাম, "ডিকশনারি দেখতে হবে।"

"পেটি থিফ!" গোয়েন্দাপ্রবর সহাস্যে বললেন, "কী কন কর্নেল সার?"

কর্নেলসার ডঃ ভাস্কোকে বিদায় দিতে গেলেন। হালদারমশাই প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছিলেন। "নস্যির কৌটা গেল কই?" বলে শার্টের বুক পকেটে হাত গুঁজলেন। "এই তো, আরে! এটা আবার কী?"

উনি একটা দলাপাকানো কাগজ বের করে ফেলে দিলেন। কাগজটা আমি তুলে নিলাম কার্পেট থেকে। কাগজটার ভাঁজ সিধে করে দেখি ইংরেজিতে লেখা একটা অদ্ভুত চিঠি।

মাননীয় কর্নেল সরকার, আপনারা কোথায় যাবেন, আমি জানি। তাই আপনার সাহায্যপ্রার্থী। যদি আজ রাত ১০টা নাগাদ একা বিচে যান, মুখোমুখি সব কথা খুলে বলব। আমি সামান্য মানুষ। আমাকে ভয়ের কারণ নেই।

পি. জি.

হালদারমশাই নস্যি নিয়ে নাক মুছছিলেন। বললেন, "ও জয়ন্তবাবু, আমার পকেটে ওটা আইল ক্যামনে?"

বললাম, "মনে হচ্ছে, চোর বেগতিক দেখে এটা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে পালিয়েছে।"

"সে কী!" বলে হালদারমশাই হাত বাড়ালেন। "দেখি, দেখি!"

"চিঠিটা কর্নেলকে লেখা। চুপিচুপি বিচ দিয়ে এসে ওই বাংলোয় পৌঁছে দিতে চেয়েছিল। আপনার পাল্লায় পড়ে সেটা হয়নি। অগত্যা আপনার পকেটে গুঁজে দিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু আজ রাতে কর্নেল বিচে গার্ড মোতায়েনের ব্যবস্থা করে ফেললেন। আহা রে! বেচারা!" বলে হালদারমশাইকে চিঠিটা দিলাম।

এই সময় কর্নেল ফিরে গেলেন। হালদারমশাইয়ের হাত থেকে নিয়ে ওঁকে চিঠিটা দিলাম। উনি গম্ভীরমুখে পড়ার পর বুক-পকেটে ঢোকালেন। তারপর অন্য বুকপকেট থেকে একটা টাইপকরা লিস্ট বের করে বললেন, "প্যান অ্যামে আজ যারা তাহিতি এসেছে, তাদের নাম-ঠিকানা। ডঃ ভাস্কো এয়ারপোর্ট থেকে জোগাড় করেছেন একটা কপি। পি জি—"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "আমাগো নাম নাই?"

কর্নেল কান দিলেন না। বললেন, "পদ্রো গার্সিয়া। পর্তুগিজ নাম মনে হচ্ছে। আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে প্লেনযাত্রীদের নাম, ঠিকানা, পরিচয়, গন্তব্য ইত্যাদি সব তথ্য পাসপোর্ট থেকে নিয়ে এয়ারপোর্ট টু এয়ারপোর্ট কম্পিউটার-ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়। পেদ্রো গার্সিয়া ভারতীয় নাগরিক। ঠিকানা, রিপন লেন, কলকাতা। বয়স, ৩৫ বছর। পেশায় শিক্ষক। বিশেষ শনাক্তকরণ চিহ্ন, নাকের ডান পাশে জড়ুল। উদ্দেশ্য, পর্যটন।" কর্নেল চুরুট ধরালেন ব্যস্তভাবে। চোখ বুজে বললেন ফের, "হ্যাঁ। এরই হাতে হয়গ্রীবের উল্কি দেখেছিলাম। অথচ সে শিক্ষক। পথে সে আমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। বলেনি কেন? এদিকে ডঃ ভাস্কো এর নামের পাশে লিখে রেখেছেন, মা-আ-উ-আ-ইন। রুম নম্বর ৩১। বাহুতে উল্কি দেখতে পায়নি সরকারি গোয়েন্দরা, আশ্চর্য তো!"

হালদারমশাই বলেন, "একটা কথা বুঝি না। সরকারি বাংলোয় এরা গার্ড রেখেছে কেন? কর্নেলসার বলেছিলেন স্বর্গদ্বীপ। স্বর্গদ্বীপে গার্ড কেন?"

কর্নেল চোখ বুজে আছেন। আমি বললাম, "নরকের পাপী-তাপীরা যাতে স্বর্গে হানা দিতে না পারে।"

"ঠিক। ঠিক।" সায় দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "আচ্ছা হালদারমশাই, আপনি যেদিন পাসপোর্ট অফিসে ফর্ম আনতে গিয়েছিলেন, সেদিন কোনও লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল?"

চমকে উঠলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। "হ্যাঁ। লম্বা লাইন ছিল। আমার পেছনে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক ছিলেন। লাইন নড়ে না দেখে উনি বললেন—"

"তার সঙ্গে আপনার আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কি?"

"হ্যাঁঃ। আমিই জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় যাওয়া হবে বললেন, তাহিতি। তখন আমিও বললাম, আরে, আমিও তাহিতি যাব। এই করে আলাপ হয়ে গেল। তাহিতিতে একটা জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করেন ওঁর দাদা। উনি জানতে চাইলেন আমি কেন যাচ্ছি। তখন বললাম, গভর্নমেন্ট ইনভিটেশন। আমি একজন অর্নিথোলজিস্ট। উনি বললেন, সেটা আবার কী? তখন—"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে ফের ওঁর কথার ওপর বললেন, "তখন সব কথা ফাঁস করে দিলেন আপনি?"

বিব্রত মুখে হালদারমশাই বললেন, "না, না। ঘোড়া-মানুষের কথা বলিনি। প্যাঁচা-প্রজাপতির কথা বলেছিলাম।"

"মানে—লাইনে দাঁড়িয়ে সময় কাটছিল না।" করুণ মুখে নস্যি নিলেন হালদারমশাই, "আমি আপনার প্রশংসা করেছিলাম কর্নেলসার। মা-কালীর দিব্যি, খারাপ কিছু বলিনি। তাই শুনেই না উনি বললেন, আপনারা কবে, কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

কর্নেল অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হাসলেন। "সব বোঝা গেল। কিন্তু শুধু এটাই বোঝা গেল না, কেন পেদ্রো গার্সিয়া আমাকে এড়িয়ে চলল সারা পথ? কেন সে এভাবে গোপনে দেখা করতে চাইল? কী সাহায্য সে চায় আমার কাছে?"

কর্নেল টেলিফোনের কাছে গিয়ে ফোন গাইড বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন, তারপর ডায়াল করলেন। "মা-আ-উ-আ-ইন? আমাকে রুম নম্বর একত্রিশে মিঃ পেদ্রো গার্সিয়াকে দিন।" কিছুক্ষণ পরে ফোন রেখে কর্নেল বললেন, "ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

বললাম,"হয়তো বেরিয়েছে। পরে রিং করে দেখবেন। কিন্তু একটা কথা। তার যখন আপনাকে এত দরকার, সে এখানে আপনাকে রিং করছে না কেন?"

"এ-প্রশ্নের জবাবও পেদ্রো গার্সিয়াই দিতে পারে।" বলে কর্নেল বোতাম টিপে হুয়াকে ডেকে ডিনার রেডি করতে নির্দেশ দিলেন।

ডিনারে ডঃ ভাস্কো বর্ণিত সামুদ্রিক শ্যাওলা ছিল। আমার খারাপ লাগল। কিন্তু হালদারমশাই এবং কর্নেল খেতে-খেতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। খাওয়া শেষ করে সবে ড্রেসিংরুমে ঢুকেছি, টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিলেন। "ডঃ ভাস্কো?...সে কী! কোথায়?... আপনি দয়া করে আসুন। আমি যেতে চাই। বডি যেন না নড়ানো হয়।... না, না ডঃ ভাস্কো! এটা গুরুত্বপূর্ণ।"

কর্নেল ফোন রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "পেদ্রো গার্সিয়াকে তার ঘরে কেউ খুন করে গেছে।"

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কোর গাড়ি এল। মা-আ-উ-আ ইনের দিকে ছুটে চলল গাড়ি। পাপেনু নদীর ধারে নিরিবিলি জায়গায় একতলা হোটেল। কেন 'ইন' বা 'সরাইখানা' নাম দেওয়া হয়েছে কে জানে! গিয়ে দেখি, বন্দুকবাজ নিরাপত্তাবাহিনী আর পুলিশ হোটেল ঘিরে রেখেছে। ৩১নং রুম দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এবং তার নিচেই নদী। নদীর ওপারে উঁচু গাছের জঙ্গলে চোখে পড়ল।

পেদ্রো বাথরুমের দরজায় খুন হয়েছে। দরজাটা খোলা। মাথা বাথরুমের ভেতর এবং ধড় বাইরে। উপুড় হয়ে আছে মৃতদেহ। বোঝা যায়, বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিল, সেই সময় আততায়ী মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করেছে। রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। ডঃ ভাস্কো বললেন, "ডাক্তার ফ্লোরোয়াঁর মতে, আপাতদৃষ্টে এই ভদ্রলোক খুন হয়েছেন রাত আটটার আগে। পেছনের দরজা খোলা ছিল। দরজার বাইরে ব্যালকনি। ব্যালকনির নিচে নদী। কাজেই আততায়ীর পালানো সহজ ছিল। রাত সাড়ে আটটায় ডিনার দিতে এসে পরিচারক দরজায় নক করে। বারবার নক করে সাড়া না পেয়ে ম্যানেজারকে খবর দেয়। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ম্যানেজার দরজা খুলেই আঁতকে ওঠেন। পুলিশে খবর দেন। আপনার নির্দেশে মিঃ পেদ্রোর দিকে ম্যানেজারকে নজর রাখতে বলেছিলাম। ম্যানেজার আমাকেও খবর দেন। টেলিফোন অপারেটর বলেছে, রাত আটটা পঞ্চাশে কেউ মিঃ পেদ্রোকে রিং করেছিল।"

"আমি। অপারেটর বলল, ঘরে রিং হয়ে যাচ্ছে।" বলে কর্নেল পেছনের ব্যালকনিতে গেলেন। ফিরে এসে ঘরের ভেতরে চোখ বুলিয়ে বললেন, "পেদ্রোর লাগেজ সার্চ করা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বই, ট্রাভেলগাইড আর জামাকাপড় আছে। একটা ব্যাগে পাসপোর্ট আছে। ক্যামেরা আর ভিউফাইন্ডার আছে—ওই দেখুন।"

কর্নেল লাশের দিকে ঝুঁকলেন। পেদ্রোর গায়ে চকরবকরা রঙিন গেঞ্জি। বাঁ বাহুর ওপর কর্নেল টর্চের আলো ফেলে আতস কাচ দিয়ে সম্ভবত হয়গ্রীবের উল্কি খুঁজলেন। দেখলাম, একটা মোটা জড়ুল আছে। হঠাৎ কর্নেল জড়ুলটা একটানে উপড়ে ফেললেন। একটা হয়গ্রীবের উল্কি দেখে চমকে উঠলাম। ডঃ ভাস্কো বললেন, "কী আশ্চর্য!"

জড়ুলটা নকল। ইঞ্চিটাক চৌকো স্বচ্ছ সেলোফেনজাতীয় জিনিসের ওপর বসানো। কর্নেল বললেন, "লাশটা চিত করতে হবে।"

ডঃ ভাস্কো একজন পুলিশ চিফকে ফরাসিতে কথাটা বললেন, পুলিশ চিফের মুখ বেজায় গোমড়া। বুঝলাম বিদেশির নাক গলানোতে খচে গেছেন। তাঁর নির্দেশে দু'জন পুলিশ লাশ চিত করে শোওয়াল। কর্নেল মৃত পেদ্রোর জিন্‌সের প্যান্ট তল্লাশ করে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরে উজ্জ্বল আলো, তবু কর্নেল মেঝের কার্পেটে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে বিছানার কাছে ঝুঁকে পড়লেন। কী একটা তুলে নিয়ে পেদ্রোর লাশের কাছে গেলেন। পেদ্রোর ডান হাতের আঙুল আতস কাচে পরীক্ষা করে সটান উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমার কাজ শেষ। ডঃ ভাস্কো! আমরা বাংলোয় ফিরে যাব।"

বাংলোয় ফেরার পথে কর্নেল বললেন, "ডঃ ভাস্কো, আপনি ফিরে গিয়ে মাছধরা ট্রলারের মালিক আইউংয়ের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা আজ রাতেই কোকো দ্বীপের দিকে পাড়ি জমাতে চাই। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। পেদ্রোর খুনি কোকোর দিকে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। সব কথা যথাসময়ে খুলে বলব।"

ডঃ ভাস্কো চিন্তিত মুখে বললেন, "কিন্তু আমার সহকারী পিটার গিলম্যান যে হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে দু'সপ্তাহের ছুটি কাটাতে গেছে। কাল সকালের প্লেনে সে ফিরবে। তাকে সঙ্গে না নিয়ে—"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "তাঁকে দরকার হবে না।"

হালদারমশাই এতক্ষণ উসখুস করছিলেন। নিজস্ব ভাষায় বললেন, "কর্নেলসার, ওনারে কইয়া আমারে একখান রিভলভার দেওনের ব্যবস্থা করতে পারেন না?"

পাখিরা ভয় পেল কেন?

রাত বারোটায় মৎস্যবন্দর হোয়ালাহা থেকে গোপনে চিনা জেলে আইউংয়ের ট্রলারে আমরা পাড়ি জমিয়েছিলাম। পেদ্রো গার্সিয়ার খুনি ভয়ঙ্কর দ্বীপ কোকোর দিকে কোন আক্কেলে ছুটে যাবে বুঝতে পারছিলাম না। সেখানে নাকি সাংঘাতিক হিংস্র ঘোড়া-মুখো মানুষের ডেরা! আমার বৃদ্ধ বন্ধু তখনও মৌনীবাবা। মুখে চুরুট। চোখ বন্ধ। সাদা দাড়িতে একটুকরো ছাই।

আইউংয়ের মাছধরা ট্রলারের নিচের খোলটা মাছের গুদাম। ওপরে এঞ্জিনঘর সংলগ্ন একটা কেবিন। দু'পাশে রেলিংয়ের খোলা ডেক। আমাদের দলে দু'জন সশস্ত্র রক্ষী কোয়া এবং তিকি। তারা তাহিতির আদিবাসিন্দাদের বংশধর। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই এঞ্জিনঘরে উঁকি মেরে সম্ভবত ট্রলার চালানো দেখছিলেন। চালকের নাম চিচিন। সে বুড়ো জেলে আইউংয়ের ছেলে। বাবা-ছেলে মাত্র দু'জনে মিলে প্রশান্ত মহাসাগরে মাছ ধরে বেড়ায়। তাদের সাহস আছে বটে।

কেবিনটা ছোট্ট। দু'ধারে দুটো শোওয়ার বাঙ্ক। মধ্যিখানে একটা ডাইনিং টেবিল। টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কোকো দ্বীপের অবস্থান দেখছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, "দ্বীপের এই ম্যাপটা রাষ্ট্রপুঞ্জের লোকেরা হেলিকপ্টার থেকে দেখে তৈরি করেছিলেন। দ্বীপের গড়ন লক্ষ করুন। প্রায় একফালি চাঁদের মতো। ইংরেজিতে ক্রেসেন্ট বলা চলে। তো পলিনেশীয় অঞ্চলের ভাষায় চন্দ্রকলাকে বলে 'কোকো'। মোটামুটি দৈর্ঘ্য তিন মাইল। মাঝখানে চওড়া অংশ মাত্র এক মাইল। পিঠের দিকটা খাড়া পাথুরে পাহাড়। উলটো দিকটা ঢালু এবং অজস্র খাড়ি আছে। এই জায়গাটুকু বালির বিচ। আমরা বিচ দিয়ে দ্বীপে পৌঁছেছিলাম।"

কর্নেল বললেন, "মনে হচ্ছে বিচের উত্তর অংশে ঘাস আর ফুলের জঙ্গলে প্যাঁচা-প্রজাপতির ঝাঁক দেখেছিলাম।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "এখন ওদিকটায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আমরা ক্যাম্প করেছিলাম বিচের ওপরে এইখানে। কিছুটা জঙ্গল সাফ করতে হয়েছিল।"

কর্নেল আইউংকে বললেন, "ভাই আইউং! আপনার ট্রলার কতক্ষণে পৌঁছতে পারবে?"

আমুদে বুড়ো জেলে কুতকুতে চোখে হেসে বলল, "ঘন্টাতিনেক লেগে যাবে। আমরা সাপের লেজ ধরে এগোচ্ছি। মুরিয়া, রাইয়াতিয়া, তারপর বোরাবোরা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে সাপ ব্যাটাচ্ছেলে দৌড়চ্ছে কোকোর বুক ঘেঁষে।"

ডঃ ভাস্কো একটু হাসলেন। "সাপ বলতে ও সমুদ্রস্রোতের কথা বলছে।"

আইউং বলল, "লেজ ছাড়লেই কিন্তু বিপদ। তবে ভাববেন না। চিচিনের মুঠোর জোর প্রচণ্ড।"

কর্নেল বললেন, আপনি কি কখনও কোকোর কাছাকাছি মাছ ধরেছেন?"

"ওখানে হাঙরগুলো রাক্ষুসে।"

কখন হালদারমশাই আমাদের কাছে এসেছেন, লক্ষ করিনি। বলে উঠলেন, "হাঙর ভেলা উলটে দেবে না তো?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "দিতেও পারে। তখন সাঁতার দিতে হবে কিন্তু।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক সহাস্যে মাতৃভাষায় বলে উঠলেন, "রিভলভার পাইছি। গুলি করুম। আর কারে ডর? তবে ভেলা উলটাইলে সাঁতারের কথা কইলেন। কর্নেলসার, আমি জলপোকা।"

কর্নেল আইউংকে বললেন, "আচ্ছা ভাই আইউং, কোকো দ্বীপের ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

আমুদে আইউংয়ের মুখ সঙ্গে-সঙ্গে কেমন যেন পাংশু হয়ে গেল। চাপা স্বরে বলল, "আমার ছেলে চিচিন একদিন দূরবিনে একপলকের জন্য ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে দেখতে পেয়েছিল। তারপর থেকে আমারা কোকো দ্বীপ এড়িয়ে চলি। তবে এই যে আপনাদের পৌঁছে দিতে কোকো দ্বীপের কাছে যাচ্ছি, সেটা মাননীয় আলবের্তো ভাস্কোমশাইয়ের খাতিরে। ওঁর সাহায্য ছাড়া তাহিতিতে আমি 'রাজনৈতিক আশ্রয়' পেতাম না। আমি ওঁর কাছে ঋণী।"

"কোকো দ্বীপে আপনি বা চিচিন সন্দেহজনক আর কিছু কখনও লক্ষ করেছেন কি?"

আইউং একটু চুপ করে থেকে বলল, "দ্বীপটা সত্যিই ভূতুড়ে। ক'মাস আগে একরাত্রে ওখানে একটা আলো দেখেছিলাম। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে নিভে গেল।"

ডেকে প্রচণ্ড হাওয়া আর জলের ঝাপটানি। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ফুটেছে। কিন্তু গাঢ় কুয়াশার সঙ্গে জ্যোৎস্না মিশে সবকিছু অস্পষ্ট। ট্রলারের আলোর ছটায় কালো জলের আলোড়ন দেখা যাচ্ছে। আইউং এঞ্জিনঘরে গিয়ে কম্পাসের ওপর ঝুঁকে ছেলেকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পরে ডঃ ভাস্কো ডেকে গেলেন। তিনি রক্ষিদ্বয় কোয়া এবং তিকির সাহায্যে রবারের ভেলা পাম্প করে ফুলিয়ে তাতে জিনিসপত্র বোঝাই করতে ব্যস্ত হলেন। দেখলাম ভেলায় দুটো করে ছোট্ট বৈঠা আটকানো আছে। হালদারমশাই তাঁর বাইনোকুলার নিয়ে ডেকে পা বাড়িয়েই পিছিয়ে এলেন। কর্নেল ডেকের রেলিংয়ে ভর দিয়ে বাইনোকুলারে সমুদ্র দর্শন করতে থাকলেন। হালদারমশাই বাঁকা মুখে বললেন, "গা গুলোচ্ছে। কী বিচ্ছিরি গন্ধ! বাথরুম কই?"

দেখিয়ে দিতেই গোয়েন্দপ্রবর সবেগে ঢুকে গেলেন। সমুদ্রে ভাসলে 'সি সিকনেস' হয় তাই আমাকে এবং ওঁকে কর্নেল ওষুধ খাইয়েছিলেন। বুঝলাম, হালদারমশাইয়ের ওষুধ খাওয়া ব্যর্থ হয়েছে। ঢেউয়ের নাগরদোলায় এই রোগটার প্রাদুর্ভাব ঘটে। মানুষকে কাহিল করে ছাড়ে। আমারও অবশ্য বমিভাব আসছিল। কিন্তু তার চেয়ে কাবু করেছিল মাথার যন্ত্রণা। বেগতিক দেখে অ্যাসপিরিনের বড়ি গিলব ভাবছি, সেই সময় ডঃ ভাস্কো কেবিনে ঢুকলেন। আমার হাতে অ্যাসপিরিনের বড়ি দেখে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হবে মিঃ চাউদ্রি। সহ্য করুন। আর আধঘন্টা পরে আমরা ডাঙায় পৌঁছে যাব। দেখবেন, মাথায় আর যন্ত্রণা হচ্ছে না।"

হালদারমশাই করুণ মুখে বেরিয়ে এসে বাঙ্কে চিত হলেন। পরক্ষণেই বাঙ্ক থেকে গড়িয়ে পড়ে মাতৃভাষায় কিছু একটা গালমন্দ করে উঠলেন।

ডঃ ভাস্কো তাঁকে উঠতে সাহায্য করে বললেন, "উপকূলের কাছাকাছি বলেই ঢেউটা বেশি।"

কর্নেলের ডাক ভেসে এল, "ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো, ডঃ ভাস্কো!"

ডঃ ভাস্কো কেবিনের দরজা দিয়ে ডেকে ফিরে গেলেন। আমি টলতে-টলতে দরজায় উঁকি দিলাম। সমুদ্রের গর্জন আর এঞ্জিনের শব্দে ওঁদের কথা শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু ওঁদের হাবভাব দেখে মনে হল দু'জনেই উত্তেজিত। ততক্ষণে হালদারমশাই আবার বাথরুমে ঢুকেছেন।

কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো কেবিনে ফিরে এলেন একটু পরে। দেখলাম, কর্নেলের দাড়ি ভিজে একাকার। দাড়ি থেকে জল ঝেড়ে তুম্বো মুখে বললেন, "তা হলে যা ভেবেছিলাম, তা-ই ঠিক হল ডঃ ভাস্কো!"

ডঃ ভাস্কো উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "কিন্তু আপনার দেখতে ভুল হয়নি তো?"

"নাহ! আলোটা টর্চেরই।"

"কে এমন দুঃসাহসী যে কোকো দ্বীপে টর্চ জ্বেলে ঘুরে বেড়ায়?"

"সঙ্গে দলবল এবং অস্ত্রশস্ত্র থাকলে দুঃসাহসী হওয়া মানুষের স্বভাব, ডঃ ভাস্কো!" কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "ওই বিচ দিয়ে দ্বীপে ওঠা উচিত হবে না। আইউংকে ডেকে পরামর্শ করা যাক।"

ডঃ ভাস্কোর ডাকে আইউং এল এঞ্জিনঘর থেকে। কর্নেল সেই ম্যাপটা বের করে টেবিলে বিছিয়ে বললেন, "ভাই আইউং, এই বিচ ছাড়া অন্য কোথাও কি কোকো দ্বীপে ওঠা যায় না?"

আইউং বলল, "বিচের উত্তরে একটা খাড়ি আছে। খাড়িটা বড়-বড় পাথরে ভর্তি। পাথরগুলো এড়িয়ে আপনাদের ভেলা যদি কিনারায় পৌঁছতে পারে, খানিকটা ঢালু জায়গা পাবেন। কিন্তু ঢালু জমিটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। তা ছাড়া পাশেই একটা ছোট্ট প্রপাত দেখেছি। প্রপাতের জল সমুদ্রে পড়ে হুলা-হুলা নাচছে। এই মুলুকেরই নাচ কিন্তু!"

ডঃ ভাস্কো ম্যাপে আঙুল রেখে বললেন, "এই সে প্রপাত। আসলে দ্বীপে একটা মিঠে জলের প্রস্রবণ আছে। সেটা সরু ঝরনার মতো নেমে এসেছে। আমরা জানুয়ারি মাসে গিয়ে সেখান থেকেই পানীয় জল আনতাম। তো এই খাড়ি দিয়ে পৌঁছতে পারলে বরং ঝরনার ধারেই জঙ্গল কেটে ক্যাম্প করা যাবে। সেবার শুধু একটাই সমস্যা ছিল। নারকোলবনের ভেতর দিয়ে মাথা বাঁচিয়ে জল আনতে হত। কারণ ক্রমাগত শুকনো নারকোল বোমার মতো মাথায় পড়ত। মাথায় হেলমেট পরে যেতেই হত। নইলে খুলি ফেটে মরার আশঙ্কা ছিল। আর সে কী বিচ্ছিরি ফট ফট শব্দ! জানেন কর্নেল সরকার? পাথরে নারকোল পড়ে ফেটে যায়। সেই নারকোল-শাঁস খেতে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাক্ষুসে সামুদ্রিক কাঁকড়া, সে-ও আর এক উপদ্রব!"

আইউং প্রায় নেচে উঠল। "বাহ, আমারও আপনাদের সঙ্গী হতে ইচ্ছে করছে। ওই কাঁকড়ার নাম নারকোল-কাঁকড়া। খুব সুস্বাদু! এক বস্তা ধরতে পারলে রাজা হয়ে যাব। তবে বেজায় ধূর্ত ব্যাটাচ্ছেলেরা! দেখি, চিচিনের সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।"

বুড়ো এঞ্জিনঘরে চলে গেল। হালদারমশাই ততক্ষণে বাথরুম থেকে বেরিয়ে মেঝেয় কম্বল পেতে চিত হয়েছেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে ডঃ ভাস্কো তাঁকে ওষুধ খাইয়ে দিলেন।

কর্নেল ম্যাপের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। আইউং ফিরে এসে বলল, "চিচিন রাজি হচ্ছিল না। ওকে অনেক বুঝিয়ে একটা শর্তে রাজি করালাম। বললাম, সরকারি বড়কর্তারা এবং সশস্ত্র রক্ষী আছে। সাংঘাতিক জন্তুটাকে মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। তো ওই খাড়িতে ট্রলার ঢোকানো যাবে না। পাশের একটা খাড়িতে চিচিন ট্রলার নোঙর করে রাখবে। কিন্তু চিচিনের একটা রাইফেল আর ডজনচারেক গুলি দরকার। এই হল ওর শর্ত।"

ডঃ ভাস্কো বললেন, "এখনই দিচ্ছি। আমরা অনেক অস্ত্র এনেছি।"

আবার প্রোগ্রাম বদলানোর দরুন আধঘন্টা দেরি হল। ট্রলারের এঞ্জিন যখন বন্ধ হল এবং ঘড়ঘড় শব্দে নোঙর পড়ল, তখন রাত সাড়ে তিনটে বাজে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে রবারের দুলন্ত ভেলায় নামা এক বিপজ্জনক কসরত। অবাক হয়ে দেখলাম, সি-সিকনেস-এ কাহিল হালদারমশাই অক্লেশে ভেলায় অবতরণ করলেন। পুলিশ-ট্রেনিং সম্ভবত এর কারণ। তারপর বৈঠা টানতেও তিনি দক্ষ। তার কারণ সম্ভবত তাঁর অতীত জীবন, যা নদ-নদীর দেশ পূর্ববঙ্গে কেটেছে।

আইউং নিজের পেলিনেশীয় ক্যানো নামিয়েছিল। ছিপনৌকোর গড়ন সেই ক্যানোতে মাছধরা জাল ছিল। বড়-বড় পাথর এড়িয়ে ঢেউয়ের নাগরদোলায় কীভাবে কিনারায় পৌঁছেছিলাম, বলতে পারব না। আমি সারাক্ষণ চোখ বন্ধ করেছিলাম। লোনা জলে পোশাক ভিজে জবুথবু অবস্থা।

হালদারমশাইকে বলতে শুনলাম, "হাঙর গেল কই? বুড়া কইছিল হাঙর আছে। হঃ!"

তারপরই যেন একটা হুলস্থূল বেধে গেল। সমুদ্র আর প্রপাতের গর্জন ছাপিয়ে হঠাৎ হাজার-হাজার সামুদ্রিক পাখির চিৎকার শুরু হল। আবছা জ্যোৎস্নায় তাদের ওড়াউড়ি দেখতে পেলাম। আইউং ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "ওরা তো এখন ঘুমিয়ে থাকে। কেন ওরা জেগে উঠল? মশাইরা, সাবধান হোন। সাংঘাতিক দানোটা নিশ্চয় আমাদের সাড়া পেয়েছে। আমি শুনেছি, সে যেখানে যায়, সেখানকার ঘুমন্ত পাখিরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকে।"

ডঃ ভাস্কো ব্যস্তভাবে বললেন, "কোয়া! তিমি! হ্যান্ডগ্রেনেড হাতে নাও।"

কর্নেল খাড়ির দিকে ঘুরে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছিলেন। বললেন, "আশ্চর্য তো! হঠাৎ ভয় পেল কেন ওরা? পাখিগুলো সি-গাল। সারারাত ওরা ঘুমিয়ে থাকে।"

ফিকে জ্যোৎস্নায় লক্ষ করলাম, পাখির ঝাঁক। খাড়ি থেকে দ্বীপের ওপর কিছু অংশ জুড়ে চক্কর দিচ্ছে, হাজার-হাজার পাখি মিলে যেন একটা বিশাল কালো চাকা অদ্ভুত শব্দে ঘুরপাক খাচ্ছে।

কর্নেলের পাল্লায় পড়ে জীবনে অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় কাটিয়েছি, যখন সব সাহস উবে গিয়ে আতঙ্কে রক্ত ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। কিন্তু কোকো দ্বীপে পা দিয়েই যে আতঙ্কের মধ্যে কিছু সময় কাটিয়েছিলাম, জীবনে তা ভুলব না।

আমরা কর্নেলের নির্দেশে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম। উনি টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছিলেন। আমরা আছি ঢালু জমির নিচে এবং ওপরে ঘন ঝোপঝাড়। কোয়া এবং তিকির এক হাতে দুর্ধর্ষ কালাশকিভ রাইফেল, অন্য হাতে গ্রেনেড। তারা আমাদের সামনে একটা পাথরের দু'পাশে হাঁটু দুমড়ে বসেছে। প্রতি মুহূর্তে ঘোড়া-মুখো দানবটার আবির্ভাব আশঙ্কা করছিলাম।

কতক্ষণ পরে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সি-গালগুলো চুপ করেছে। ওরা ডেরায় ফিরে গেছে কিন্তু আমাদের আপাতত এখানেই অপেক্ষা করা উচিত। ভোরের আলো ফুটলে আমরা রওনা হব। তবে সত্যিই এ একটা রহস্যময় ঘটনা। হঠাৎ ওরা ভয় পেল কেন?"

রহস্যের বেড়াজালে

দিনের আলো সত্যিই মানুষকে হারানো সাহস ফিরিয়ে দেয়। হাতিঘাস, ফার্ন, রঙিন পাতাওয়ালা মানকচুজাতীয় গাছের ঝোপ, বুগেনভিলিয়া আর রংবেরঙের নাম-না-জানা ফুলের জঙ্গল পেরিয়ে সেই ঝরনাধারার পাশে আমাদের দুটো ক্যাম্প পাতা হয়েছিল। উত্তরে ছটফটিয়ে চলা ঝরনাধারার ওপারে এবং ক্যাম্পের পশ্চিমে নিবিড় নারকোলবন। সামনে দক্ষিণে রবারগাছের জঙ্গল। ব্রেকফাস্ট করে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো গার্ড তিকিকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। এঁদের হাতে প্রজাপতিধরা জাল দেখে বুঝলাম, প্যাঁচা প্রজাপতির খোঁজে যাচ্ছেন।

কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে ক্যাম্প ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। না করলেও অন্তত আমি এক পা বাড়াতে রাজি নই। আইউং কিছুক্ষণ দোনামনা করার পর একটা সাঁড়াশি এবং বস্তা হাতে নারকোলবনের দিকে চলল। ওর পিঠে গোঁজা লম্বাটে একটা দা। কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। কিন্তু আইউং যেন নারকোলখেকো কাঁকড়ার নেশায় আচ্ছন্ন। কোয়ার কথা গ্রাহ্য করল না।

হালদারমশাই বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। হঠাৎ বললেন, "ওগুলি কী ফল? বাতাবি লেবু নাকি?" বলেই কোয়াকে জিজ্ঞেস করেলেন, "হোয়াট ইজ দ্যাট ফ্রুট! বিগ ট্রি অ্যান্ড বিগ ফ্রুট!"

কোয়া জিভে একটা শব্দ করে বলল, "ব্রেডফ্রুট! ডেলিশাস মিস্টার!"

"ক'য় কী জয়ন্তবাবু? রুটিফল? গাছে রুটি ধরে নাকি? রূপকথায় যা শুনেছিলাম, তা দেখি সত্যি। সেই যে একটা রাখাল পিঠে পুঁতেছিল। তা থেকে পিঠেগাছ হল। পড়েননি?"

বললাম, "পড়েছি। তারপর এক রাক্ষসী বুড়ি সেজে এসে পিঠে চাইল। রাখাল যেই তার হাতে পিঠে দিয়েছে, বুড়ি তাকে খপ করে ধরে ঝুলিতে পুরেছে। কাজেই সাবধান!"

হালদারমশাই খি খি করে একচোট হাসলেন। তারপর ফের বাইনেকুলারে রবারগাছের জঙ্গলের পাশে ব্রেডফ্রুট গাছটা দেখতে লাগলেন। একটু পরে দেখি, উনি বাইনোকুলার নামিয়ে পকেট থেকে রিভলভার বের করে এগিয়ে যাচ্ছেন। বললাম, "হালদারমশাই, হালদারমশাই, কোথায় যাচ্ছেন?"

"একখান পিঠা না খাইয়া ছাড়ুম না!"

"যাবেন না। হয়গ্রীব ওত পেতে আছে।"

কোয়া চেঁচিয়ে উঠল, "ডোন্ট গো মিস্টার!"

গোয়েন্দাপ্রবর কানে নিলেন না। লম্বা পায়ে এগিয়ে গেলেন। গাছটা অন্তত পঞ্চাশ মিটার দূরে। হঠাৎ ওঁকে একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়তে দেখলাম। তারপর গুঁড়ি মেরে রবারগাছের জঙ্গলে ঢুকললেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কোয়া, দেখো তো উনি কোথায় গেলেন।"

কোয়া নির্বিকার মুখে বলল, "আমি ক্যাম্প ছেড়ে নড়ব না। আমার চাকরি যাবে।"

কী করব ভাবছি, সেইসময় ঝরনার দিক থেকে আইউং ছুটে এল। তার হাতে সেই ধারালো দা। ভয়ার্ত মুখে সে কোয়াকে কিছু বলল। কোয়া রাইফেল বাগিয়ে ঝরনার দিক করে দাঁড়াল। বললাম,"কী হয়েছে মিঃ আইউং?"

"ঘোড়া-মুখো দানো। ঝরনার ওপারে ঝোপের ভেতর মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছিল।"

"বলেন কী।"

"হ্যাঁ মশাই! আমি স্পষ্ট দেখেছি। চারটে কাঁকড়া ধরেছিলাম। বস্তা আর সাঁড়াশি ফেলে পালিয়ে এসেছি।"

আমি হালদারমশাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন। বললাম, "কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ফিরে আসুন। তারপর আপনার সাঁড়াশি ও বস্তা উদ্ধার করা যাবে। কিন্তু এদিকে এক কাণ্ড!"

কোয়া তাহিতি ভাষায় ওকে কিছু বলল। আইউং আমার দিকে ঘুরে বলল, "দানোটা ঝরনার ওপারে আছে। কাজেই আপনাদের সঙ্গী ভদ্রলোকের কোনও ভয় নেই। উনি হয়তো খরগোশ দেখেছেন। খরগোশের মাংস সুস্বাদু!"

মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেলাম। রবারবনের কছে গিয়ে ডাকলাম, "হালদারমশাই, হালদারমশাই!"

কোনও সাড়া এল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে ক্যাম্পে ফিরলাম। বরাবর দেখে আসছি, অত্যুৎসাহী এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কেলেঙ্কারি না বাধিয়ে ছাড়েন না। কোয়া তার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'ইটিং ব্রেডফ্রুট। শিওর!"

বললাম, "কিন্তু ডাকাডাকি করে কোনও সাড়া পেলাম না। হয় তো—"

আমার কথার ওপর আইউং বলল, "পাকা ব্রেডফ্রুট খেলে ভীষণ ঘুম পায়।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এবং ডঃ ভাস্কো ঝরনার দিক থেকে ফিরে এলেন। আইউং হাউমাউ করে ঘোড়া-মুখো দানোর খবর দিল এবং তার সাঁড়াশি-বস্তা উদ্ধারের জন্য কাকুতিমিনতি শুরু করল। ডঃ ভাস্কো বললেন,"কোয়া, তুমি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর জিনিসগুলো উদ্ধার করো।"

ইতিমধ্যে কর্নেলকে আমি হালদারমশাইয়ের দুঃসংবাদ দিয়েছি। কর্নেল ডঃ ভাস্কোকে ঘটনাটা জানিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, "মিঃ হালদার সম্ভবত পেদ্রোর খুনি কিংবা তার দলের কাউকে অনুসরণ করেছেন। আমাদের এখনই ওঁর খোঁজে যেতে হবে।"

ডঃ ভাস্কো ক্যাম্পে ঢুকে একটা রাইফেল নিয়ে এলেন। বললেন, "তিকি তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। কোয়া এখনই ফিরে আসবে।"

রবারগাছের জঙ্গল এমন নিবিড় আর দুর্ভেদ্য যে, কয়েকগজ এগিয়ে ডাইনে ব্রেডফ্রুট গাছের জঙ্গলে ঢুকতে হল। কর্নেল বাইনোকুলারে গাছপালার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখার পর বললেন, "একটা পাথরের শৈলশিরা দেখতে পাচ্ছি। ওই শৈলশিরার নিচেই কি সমুদ্র?"

ডঃ ভাস্কো সায় দিলেন। "দ্বীপের শেষ সীমানা ওটা।"

কর্নেল সতর্ক দৃষ্টিতে হালদারমশাইয়ের গতিবিধির সূত্র খুঁজতে-খুঁজতে হাঁটছিলেন। পাশে একটা নারকোল বনে অনবরত পটকা ফাটার শব্দে চমকে উঠেছিলাম। তারপর বুঝলাম, শুকনো নারকোল খসে পড়ছে। এবার ফার্ন আর বুগেনভিলিয়ার জঙ্গল পেরিয়ে ঢালু হয়ে ওপরে ওঠা মোটামুটি খোলামেলা বিস্তীর্ণ জায়গা। নানা গড়নের পাথর, ঘাস আর ফলের হাসিতে ঝলমলে ঝোপঝাড়। কর্নেল হঠাৎ একখানে থেমে বললেন, "ওই দেখুন ডঃ ভাস্কো! প্যাঁচা প্রজাপতির ঝাঁক!"

ডঃ ভাস্কো আস্তে বললেন, "হ্যাঁ।"

"ডঃ ভাস্কো, বুঝতে পেরেছি, আপনার মন প্রজাপতিতে নেই। আগেও ছিল না। তবে এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।"

উনি চমকে উঠে কর্নেলের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

কর্নেল একটু হাসলেন। "পেদ্রো গার্সিয়া একসময়ে ছিল তাহিতির জাঁ ব্লাঁক জাহাজ কোম্পানির নাবিক। সম্ভবত কারও হুমকিতে চাকরি ছেড়ে কলকাতা পালিয়েছিল। মা-আ-উ-আ ইন থেকে ফিরে গতরাত্রে আমি জাঁ ব্লাঁক কোম্পানিতে ফোন করে এ-কথা জেনেছি। তার আগেই অবশ্য আমার একটু সন্দেহ জেগেছিল। বাংলোয় আপনার লেখা প্রজাপতির বইয়ে আপনার পুরো নাম দেখেছিলাম। ডঃ ভাস্কো বিরক্ত মুখে বললেন, "গার্সিয়া একটা সাধারণ নাম। আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না!"

"পেদ্রো খুন হওয়ার খবর গতরাত্রে আপনিই যেচে পড়ে আমাকে দিয়েছিলেন। তার মানে, পেদ্রোর দিকে আপনার নজর ছিল। আমি খুব কৌতূহলী চরিত্রের লোক ডঃ গার্সিয়া! এখানে আসার আগে কোকো দ্বীপ সম্পর্কে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে পুরনো সামরিক নথিপত্র ঘেঁটেছিলাম। ১৭৬০ সালে পর্তুগিজ জলদস্যু ওস্‌ভালদো দে মেলো দে গার্সিয়ার ঘাঁটি ছিল কোকো দ্বীপ। পরে জেনেছি, পেদ্রো গার্সিয়া ছিল তার বংশধর। জাঁ ব্লাঁক কোম্পানিতে ফোন করে এ-ও জেনেছি আপনারই সুপারিশে পেদ্রোর চাকরি হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত সে কারও হুমকি চাকরি ছেড়ে পালায়।"

"এক কথা বারবার শুনতে চাইনে। আপনার বক্তব্য কী?"

"আপনি বাঙ্গালোর সম্মেলন থেকে কলকাতা হয়ে ফেরার সময় পেদ্রোর সঙ্গে রিপন লেনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সতর্কতার দরুন আপনি কাছেই ইলিয়ট রোডে আমার সঙ্গে দেখা করেন। যাই হোক, পেদ্রো আপনার কথায় আবার তাহিতি এসেছিল। তারপর সম্ভবত সে টের পায় আপনি তাকে ফাঁদে ফেলেছেন। কলকাতার পাসপোর্ট অফিসে মিঃ হালদার তাকে আমার কীর্তিকলাপ জানিয়েছিলেন। তাই সে আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে। আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে সাহস পায়নি, তার কারণ অনুমান করা যায়। ফোনে আপনার আড়িপাতার ভয় ছিল পেদ্রোর।"

ডঃ ভাস্কো ফুঁসে উঠলেন, "কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি।"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "না হয় আপনি ওকে খুন করেননি। তবে পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের ম্যাপ হাতাতে দরকার হলে তা করতেন আপনি। আপনার দুর্ভাগ্য। তার আগেই আপনার প্রতিপক্ষ পেদ্রোকে খতম করে ম্যাপ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। পেদ্রোর সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক ছিল ডঃ গার্সিয়া!"

"প্রমাণ দিতে পারেন?"

"পারি। নিহত পেদ্রোর পকেট থেকে পকেটমারদের কৌশলে এই চিঠিটা আমি হাতিয়েছিলাম। চিঠিটা পর্তুগিজ ভাষায় লেখা। পর্তুগিজ ভাষা রোমান হরফে লেখা হয়। তবে আপনার দফতরের

বাংলোর পরিচারক হুয়া পর্তুগিজ জানে। সে আমাকে সাহায্য করেছে। এটা আপনার লেখা চিঠি।" বলে কর্নেল ওঁকে চিঠিটা দিলেন।

ডঃ ভাস্কো চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "ঈশ্বরের দোহাই কর্নেল সরকার। আর এ-সব কথা নয়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনাকে আমি..."

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "গুপ্তধনের ভাগ দেবেন তো? গুপ্তধনে অমার মাথাব্যথা নেই ডঃ গার্সিয়া! আমি সাংঘাতিক ঘোড়া-মুখো মানুষ সম্পর্কেই আগ্রহী!"

এতক্ষণে বললাম, "কর্নেল আপনি হালদারমশাইয়ের কথা ভুলে গেছেন! তিনি হয়তো বিপন্ন।"

কর্নেল হাসলেন। "না ডার্লিং, বাইনোকুলারে দেখে নিয়েছি হালদারমশাই ওই শৈলশিরার নিচে একটা পাথরের আড়ালে ঘাপটি পেতে বসে আছেন!" বলে তিনি ডঃ ভাস্কোর দিকে ঘুরলেন। "হিংস্র দানবটির ভয়ে আপনি আর কোকো দ্বীপে আসার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। তা ছাড়া এই বিতর্কিত দ্বীপে বরবার আসতে দেওয়ার অনুমতি তাহিতি সরকার দিতে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রকৃতি পরিবেশবিজ্ঞানী মহলে সুপরিচিত এই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনার আবার কোকো দ্বীপে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে সতর্কতার জন্য আপনি পেদ্রোকে কি আমার ছায়া না মাড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?"

ডঃ ভাস্কো গলার ভেতর থেকে বললেন, "হ্যাঁ।"

"নিহত পেদ্রোর আঙুলে এবং খাটের নিচে আতসকাচে আমি জীর্ণ প্রাচীন কাগজের আঁশ দেখেছি। ওটাই সম্ভবত গুপ্তধনের ম্যাপ। কিন্তু আপনি শুনলে দুঃখিত হবেন ডঃ গার্সিয়া, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে সামরিক নথিপত্রে দেখেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা কোকো দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি গড়ার সময় ডিনামাইটে ওই শৈলশিরার একটা অংশ ধসিয়েছিল। ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার সূত্রে খবর পাওয়া যায়, জাপানিরা সেখানে প্রচুর সোনাদানা, হিরে, জহরত আবিষ্কার করে।"

ডঃ ভাস্কো প্রায় আর্তনাদ করলেন, "হায় ঈশ্বর!"

এই সময় তিকি বলে উঠল, "কর্নেল সরকারের সঙ্গী ভদ্রলোক পালিয়ে আসছেন।"

দেখলাম, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে ওঁর গতি বেড়ে গেল। কাছে এসে হাঁসফাঁস করে বলেন, "পলাইয়া যান, পলাইয়া যান। হয়গ্রীব ইজ কামিং!"

কর্নেল কিছু বলার আগেই উনি পাশ কাটিয়ে গিয়ে পেছনে একটা নারকোল গাছে তরতর করে উঠে গেলেন। আমরা দৌড়ে গেলাম। কর্নেল বললেন, "মাথায় নারকোল পড়বে হালদারমশাই! খুলি ফেটে যাবে।"

তখনই একটা নারকোল নিচের পাথরে পড়ে ফটাস শব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়েন্দপ্রবর নেমে এলেন। ডঃ ভাস্কোকে উত্তেজিতভাবে ইংরেজিতে বললেন, "এ কী রিভলভার মশাই! দু'নম্বরি জিনিস! ট্রিগার টেনে গুলি বেরোল না!"

কর্নেল বাংলায় বললেন, "ডঃ ভাস্কো আমাদের তিনজনকে তিনটে খেলনা রিভলভার দিয়েছেন হালদারমশাই!"

"ক্যান?"

"উনি চাননি আমরা আত্মরক্ষা করতে পারি।"

"ক্যান? ক্যান?"

"গুপ্তধনের অভিযাত্রীদের এই স্বভাব। তবে পরে বুঝিয়ে বলব।" বলে কর্নেল ডঃ ভাস্কোর হাত ধরে টানলেন। "দুঃখ করে লাভ নেই ডঃ গার্সিয়া! এবার পেদ্রোর খুনি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের একটি বিহিত না করে দ্বীপ থেকে চলে যাওয়া উচিত হবে না। সেইসঙ্গে ঘোড়া-মুখো মানুষটাকে পাকড়াও করা দরকার। চলুন। আপাতত ক্যাম্পে ফেরা যাক।"

কিন্তু ক্যাম্পে ফিরে হকচকিয়ে গেলাম। দুটো ক্যাম্প মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো। ভাঙচুর অবস্থা। কোয়া এবং আইউংয়ের কোনও পাত্তা নেই।

হয়গ্রীবের মুখোমুখি

ডঃ ভাস্কোকে এখন কাকতাড়ুয়া দেখাচ্ছিল। ভাঙা গলায় অতিকষ্টে বললেন, "আমাদের এখনই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে। সাংঘাতিক জন্তুটা কোয়া এবং আইউং বেচারাকে নিশ্চয় মেরে ফেলেছে। এ আমারই পাপের ফল!"

তিনি হতাশ মুখে বলল, "আমাদের ভেলা দুটো ছিঁড়ে ফেলেছে। আইউংখুড়োর ক্যানোটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আমরা চিচিনের ট্রলারে ফিরব কী করে? হায়! হায়! এবার বেঘোরে প্রাণটা যাবে! শুনেছি, ঘোড়া-মুখো দানোটার গায়ে গুলি বেঁধে না?"

কর্নেল বাইনোকুলারে ঝরনার দিকটা দেখছিলেন। বললেন, "আচ্ছা হালদারমশাই, হয়গ্রীবকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন?"

হালদারমশাই উত্তেজনার উপশমে নস্যি নিচ্ছিলেন। বললেন, "একটা লোক উঁকি দিচ্ছিল দেখে তাকে ফলো করে যাচ্ছিলাম। ওদিকে পাহাড়ের একটা চাতালে হঠাৎ দেখি হয়গ্রীব। রিভলভারে গুলি বেরোল না। কী করব? পালিয়ে এলাম। আমাকে দেখে বিকট চিঁহিঁ করে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসছিল।"

কর্নেল বললেন, "একটা খটকা লাগছে। ক্যাম্প থেকে ওই শৈলশিরার দূরত্ব সিধে অন্তত দু' মাইল। কাজেই এই ক্যাম্পে জন্তুটা হামা দিয়ে অতদূর পৌঁছতে হলে তার ডানা থাকা দরকার। হালদারমশাই! জন্তুটা দেখতে কেমন?"

ভয়পাওয়া গলায় গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, "ধড় গোরিলার মতো। মুখ ঘোড়ার মতো। কালো কুচকুচে রং। লোমে ভর্তি।"

ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ক্যাম্প টেনে সরাচ্ছিলেন। ডঃ ভাস্কো বললেন, "সর্বনাশ! রেডিয়ো ট্রান্সমিটারটা আছড়ে ভেঙেছে। খাবারের প্যাকেট বোঝাই পেটি দুটো দেখছি না। এ কী! অস্ত্রের বাক্সটাও নেই। এ কখনও জন্তুটার কাজ নয়।"

"নাহ।" বলে কর্নেল হঠাৎ ঝরনার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হাঁক দিলেন, "মিঃ আইউং, ভয় নেই। গাছ থেকে নেমে আসুন।"

দেখলাম, ঝরনার ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছ থেকে আইউং নেমে এল। আমি এবং হালদারমশাই দৌড়ে গেলাম। আইউং বেজারমুখে বলল, "ছ্যা ছ্যা, কোয়া এত ভীতু জানতাম না! হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে গেল। আমি ভাবলুম, ও দানোটাকে দেখেছে। তাই গাছে উঠে প্রাণ বাঁচালাম।" তারপর তার চোখ গেল ক্যাম্পের দিকে। "দানোটা তা হলে সত্যিই হানা দিয়েছিল ক্যাম্পে। সর্বনাশ! আমার ক্যানোটাকে ব্যাটা আস্ত রাখেনি দেখছি!"

কর্নেল বললেন, "আপনি ক্যাম্পের দিকে তাকাননি? কোনও শব্দ পাননি?"

"নাহ্। ভয়ে চোখ বুজে ছিলাম। আর ঝরনার যা বিচ্ছিরি শব্দ! কিছু শোনা যায় না!"

কর্নেল ক্যাম্পের কাছে ফিরে এসে বললেন, "ডঃ ভাস্কো! ক্যাম্প দুটো খাটাতে হবে। খাদ্যের

অভাব হবে না। দ্বীপে নারকোল আর ব্রেডফ্রুট আছে। ঝরনার জলে মাছের অভাব হবে না। নারকোল-খেকো কাঁকড়াও আছে। কী বলুন ভাই আইউং?"

আইউং দোনামনা করে সায় দিল। কিন্তু ডঃ ভাস্কো রুষ্ট হয়ে বললেন, "আপনারা থাকুন। আমরা আর এক মুহূর্ত এখানে থাকছি না। কোয়া নিশ্চয় হিংস্র জন্তুটার পাল্লায় পড়েছে। আবার আমাকে সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। চলো তিকি, আইউং এসো।"

আইউং বেজার মুখে বলল, "কিন্তু যাবেন কী করে কর্তা? ওদিকের খাড়িতে চিচিন আমাদের জন্য ট্রলার নিয়ে অপেক্ষা করছে। ট্রলারে পৌঁছতে হলে সাঁতার কাটতে হবে। জলে নামলেই হাঙর গিলে খাবে যে!"

এইসময় তিকি তাহিতি ভাষায় ডঃ ভাস্কোকে কিছু বলল। শুনেই উনি চমকে উঠলেন। আইউংয়ের মুখেও বিস্ময় লক্ষ করলাম। তারপর ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলে ডঃ ভাস্কো বললেন, "ঠিক আছে কর্নেল সরকার! আমরা থাকছি।"

কর্নেল হাসলেন, "কোয়ার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেওয়ার জন্য আপনার থাকা দরকার।"

বললাম, "তার মানে?"

"মানে যথাসময়ে বুঝবে ডার্লিং!" কর্নেল ক্যাম্পের তেরপলে হাত লাগালেন। "এসো তোমরাও হাত লাগাও!"

ক্যাম্প দুটো খাটানো হল। তিকি আইউংয়ের সঙ্গে গিয়ে ওর থলে এবং সাঁড়াশি নিয়ে এল। অনেক নারকোল আর কাঁকড়া ছিল থলেয়। খুশি হয়ে দেখলাম, ওরা এককাঁদি কলাও এনেছে। ঝরনার ধারে একটা কলাবনের খবর পাওয়া গেল। কর্নেল বললেন, "পলিনেশিয়ার সব দ্বীপে অজস্র কলাগাছ আছে। আমরা এগুলোকে বলি সিঙ্গাপুরি কলা। আসলে এ-সবই প্রকৃতির দান।"

ডঃ ভাস্কো কর্নেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাদের রিভলভার তিনটে ফেরত নিলেন। তিনটেই খেলনা মাত্র। ভাবতে বুক কেঁপে উঠল, হয়গ্রীবের কথা আলাদা—কিন্তু পেদ্রোর খুনির দলের হাত থেকে খেলনা অস্ত্র দিয়ে কি আত্মরক্ষাও করা যেত?

এবার ডঃ ভাস্কোর সত্যিকার রিভলভার কর্নেলের পাতলুনের পকেটে ঢুকল। তিকির কোমরে বেল্টে আটকানো হ্যান্ডগ্রেনেড ভর্তি ছোট্ট হ্যাভারস্যাক। সে তার রাইফেলটা আমাকে দিতে এলে হালদারমশাই ছিনিয়ে নিলেন। "জয়ন্তবাবুর কাম না। আমি চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। মিঃ টিকি, গিভ মি ওয়ান এক্সট্রা বুলেটকেস।"

অগত্যা কর্নেলের পরামর্শে আইউং তার দা দিয়ে একটা গাছের ডাল কেটে লাঠি বানাল। সেটা আমাকে দিয়ে আমুদে লোকটি বলল, "নাকে ঘা মারলে সব পালোয়ান জব্দ। এ আমাদের চিনা প্রবাদ কর্তা!"

কাঁকড়ার রোস্ট, রুটিফল, নারকোলের শাঁস আর কলা দিয়ে সুস্বাদু লাঞ্চ খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "আমরা ঝরনার ধার দিয়ে শৈলশিরার দিকে যাব। আমার ধারণা, প্রতিপক্ষ প্রস্রবণের কাছাকাছি কোথাও আছে। কারণ, ওখানেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা ঘাঁটি করেছিল।"

ক্যাম্প-লুঠেরারা ভাগ্যিস টর্চগুলো নিয়ে যায়নি। আসলে প্রত্যেকের টর্চ ছিল ক্যাম্পখাটে বিছানার তলায়। ওরা বিছানা খাটসুদ্ধু উলটে ফেলেছে। টর্চগুলো বিছানার তলায় চাপা পড়েছিল।

নারকোলবনগুলো এড়িয়ে ফার্ন আর ফুলেঢাকা ঝোপের আড়াল দিয়ে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। একখানে আইউং একটা সাপকে দু' টুকরো করল। এবার প্রতিমুহূর্তে সাপের আতঙ্ক। কোথাও-কোথাও ঘাসে ঢাকা খোলা জমি আর পাথর। সেখানে আমরা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। তারপর চড়াই শুরু হল। বাঁ পাশে ঝরনাধারার ছলছল শব্দ। উঁচু গাছের অরণ্যের ঢুকে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, "একে বলে রেনফরেস্ট।"

প্রতিটি গাছ থেকে ঘন লতাপাতার ঝালর নেমে এসেছে। আইউং দা দিয়ে সাবধানে ঝালরগুলো কেটে পথ করে দিচ্ছিল। আবছা আঁধার। কিন্তু কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করেছেন। সাপের আতঙ্কে লতা দেখলেই শিউরে উঠছিলাম। একবার আঁতকে উঠে লাঠির ঘা মেরে একটা লতাকে ছেতরে দিলাম।

সামনে খোলা পাথুরে জমি দেখা গেল। কর্নেলের ইশারায় আমরা থমকে দাঁড়ালাম। বাঁ দিকে পাথরের একটা প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক চৌবাচ্চা দেখা যাচ্ছিল। ওটাই তা হলে প্রস্রবণ। সামনে ন্যাড়া পাথরের পাহাড়ের নিচে কয়েকটা ভাঙাচোরা পাথরের ঘর। কর্নেল বললেন, "জাপানিদের ঘাঁটির ধ্বংসাবশেষ। ওই পাঁচিলগুলো বাঙ্কার ছিল সম্ভবত। পাঁচিলে কামান এবং মেশিনগানের নল ঢোকানোর গর্তগুলো এখনও টিকে আছে।"

উনি বাইনোকুলারে দেখতে থাকলেন। হালদারমশাইও বাইনোকুলার চোখে রেখে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লেন। একটু পরে একটা বাঙ্কারের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে চারদিক দেখে নিল। তার হাতে রাইফেল। শৈলশিরার ফাঁক দিয়ে আসা রোদের কাছে আসতেই চিনতে পারলাম তাকে। আমাদের গার্ড কোয়া!

ডঃ ভাস্কো রাইফেল তাক করতেই কর্নেল বাধা দিলেন। ডঃ ভাস্কো চাপা স্বরে বললেন, "বিশ্বাসঘাতক কোয়া তিকিকে গোপনে তার সঙ্গে পালাতে বলেছিল। গুপ্তধনের লোভ দেখিয়েছিল।"

কর্নেল বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন।"

কোয়া প্রস্রবণের ধারে গিয়ে রাইফেল রেখে আঁজলা ভরে জল খেল। তারপর পায়ের জুতো খুলে পা চুবিয়ে বসে রইল। আইউং ফিসফিস করে বলল, "তাহিতির লোকের এই বিচ্ছিরি অভ্যাস! ঘন্টার পর ঘন্টা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকবে।"

কর্নেলের ইশারায় আমরা ডাইনে ঘুরে জাপানি ঘাঁটির কাছাকাছি চলে গেলাম। মাত্র বিশ মিটার দূরত্ব। বাঙ্কারের পেছনে দু'জন লোক শাবল দিয়ে খুঁড়ছে। একজন পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। ডঃ ভাস্কো শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলে উঠলেন, "এ কী? এ যে দেখছি গিলম্যান।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। আপনার সহকারী বিজ্ঞানী পিটার গিলম্যান।"

কর্নেল বাধা দেওয়ার আগেই ডঃ ভাস্কো একলাফে বেরিয়ে গর্জন করলেন, "নড়লেই খুলি উড়িয়ে দেব গিলম্যান!"

পিটার গিলম্যান একলাফে ওপরে একটা ভাঙা ঘরে ঢুকে গেল। ওর সঙ্গী দু'জনও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওকে অনুসরণ করল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। ততক্ষণে ডঃ ভাস্কো এবং তিকি সেখানে পৌঁছে গেছে। আইউং এবং আমি দিয়ে দেখি দুটো রাইফেল পড়ে আছে। ভাঙা ঘরের ভেতর কয়েকটা ক্যাম্পখাট এবং আরও কিছু জিনিস। আমাদের ক্যাম্প থেকে লুঠ করে আনা জিনিসপত্রও নিশ্চয় ওর মধ্যে আছে। ডঃ ভাস্কো এবং তিকি ঘরে ঢুকে উধাও হয়ে গেল।

ঘরগুলো শৈলশিরার গায়ে। বারকতক গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু হালদারমশাই কোথায় গেলেন? কর্নেল বাঙ্কারের শেষপ্রান্তে গিয়ে বললে, "বাঃ, হালদারমশাই, এই তো চাই!"

গিয়ে দেখি, হালদারমশাই সবে প্রস্রবণ থেকে উঠছেন। একেবারে বেড়ালভেজা অবস্থা। তবে ওঁর হাতে এখন দুটো রাইফেল। মুখের জল মুছে বললেন, "ব্যাটা বানর। পলাইয়া গেল।"

বুঝলাম, কোয়ার রাইফেল বাগাতে পারলেও তাকে বাগাতে পারেননি। গুঁড়ি মেরে গিয়ে আগে তার রাইফেল হাতিয়ে ছিলেন। ভাগ্যিস কোয়া এদিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। কর্নেল উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "ডঃ ভাস্কো ওদের তাড়া করে গেছেন। চলো তো দেখি।"

বাঙ্কারের রাইফেল দুটোতে গুলি ভরা ছিল। কর্নেল এবং আমি সে-দুটো নিলাম। হালদারমশাই ধপাস করে বসে পড়লেন। আমরা একটার পর একটা ঘর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, শৈলশিরার প্রকাণ্ড ফাটলের পাশে একটা চাতালে দাঁড়িয়ে আছেন ডাঃ ভাস্কো এবং তিকি। ডঃ ভাস্কো হতাশ মুখে বললেন, "নিচের খাড়িতে ওদের মোটরবোট ছিল। পালিয়ে গেল। এখানে একটা মোটা শেকল ঝুলছে। এটা বেয়ে ওরা উঠে এসেছিল। এটা বেয়েই নেমে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "জাপানি সেনাদের কীর্তি। তবে আশ্চর্য, শেকলটা এখনও ছিঁড়ে যায়নি!"

আমরা নিচে সেই বাঙ্কারে ফিরে এলাম। তারপর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠলাম। হালদারমশাই বাঙ্কারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। ভিজে রাইফেল দুটো তবু ছাড়েননি। মুখে আতঙ্কের ছাপ। তবু কাকে ধমক দিচ্ছেন,"আর আউগ্নাইলেই খুলি উড়াইয়া দিমু! আবার আউগ্নায়? শ্রীবিষ্ণুরে ডাকুম নাকি? দ্বাপরে ব্যাদ চুরি করছিলা। শ্রীবিষ্ণু তোমার ঘাড় মটকাইয়া মারছিলেন। মনে নাই!"

হ্যাঁ, সেই সাংঘাতিক হয়গ্রীবই বটে। কালো লোমে ঢাকা দু'পেয়ে প্রাণীটির মুখ অবিকল ঘোড়ার মতো। মোটাসোটা, হিংস্র দাঁত বেরিয়ে আছে। সে বিকট চিঁহিঁ করে উঠতেই কর্নেল আমাদের অবাক করে আচমকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। প্রাণীটি অমনই ধরাশায়ী হল। ডঃ ভাস্কো, তিকি এবং আমি রাইফেল বাগিয়ে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল একটানে ঘোড়ার মুখটা উপড়ে নিতেই এক সায়েবের মুখ দেখা গেল।

কর্নেল তার পিঠের বোতাম পটাপট ছাড়িয়ে ফেলে কালো লোমে ঢাকা খোলসটি খুলে ফেললেন। ডঃ ভাস্কো কিছু বলার আগেই তিকি বলে উঠল, "আরে। এ তো দেখছি সেই ফেরারি জলদস্যু জন হফগ্রিব!"

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হাঁ। হয়গ্রীব।"

ডঃ ভাস্কো সহাস্যে বললেন,"মার্কিন সরকার এর মাথার দাম ঘোষণা করেছে পঞ্চাশ হাজার ডলার! যাক। পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের কিছুটা উসুল হবে। আইউং! তিকি! হফ্‌গ্রিবকে বেঁধে ফেলো। ওই ঘরে দড়ি আছে দেখলাম।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "এর ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। সেখানে একালের এই জলদস্যুর গুপ্তধন থাকতে পারে।"

হফগ্রিব মিঁউমিঁউ করে বলল, "আমার কোনও ডেরা নেই। গুপ্তধনও নেই! আমি প্রাণ বাঁচাতে এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন মশাইরা!"

ডঃ ভাস্কো ধমক দিলেন, "চুপ, তুমি খুনি। অমার তিনটে লোককে খুন করেছ।"

জন হফগ্রিবকে বন্দি করে ক্যাম্পে ফেরার পথে কর্নেল বললেন, "এই লোকটা কোকো দ্বীপের ভয়ঙ্কর কিংবদন্তির সুযোগ নিয়েছিল, যাতে কেউ সাহস করে দ্বীপে পা না দেয়। ওকে দেখেই সি-গাল পাখিরা ভয় পেয়েছিল। তবে ওর ডেরা নিশ্চয় আছে কোনও গুহায়। বাঘনখ জাতীয় অস্ত্রও আছে। ও গুলির শব্দ শুনে দেখতে এসেছিল কী ব্যাপার।"

হালদারমশাই হঠাৎ করুণ মুখে বললেন, "কিন্তু ফিরে যাব কেমন করে?"

আইউং হাসতে হাসতে বলল, "ভাববেন না। কলাগাছের ভেলা তৈরি করব। হাঙর কলাগাছের গন্ধ সহ্য করতে পারে না।"

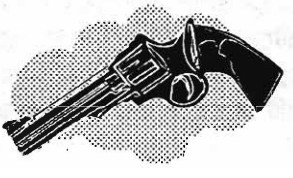

ঘড়ি রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি?"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, "প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন?"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন, "কেন? কেন?"

"ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "আমার ক্ষেত্রেও তা-ই। কিছু কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওঁর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, "আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।"

"জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।"

মনে পড়ে গেল। বললাম, "কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।"

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব। রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল?

কর্নেল বললেন, "সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মী প্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক, নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুণ্ডপাত করছে।"

তারকডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোসো জয়ন্ত! দেখি, কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।"

বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি।"

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পর্দার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাঁচুমাচু মুখে তিনি বললেন, "কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—"

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।"

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।"

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "বারবার বলছেন টাইম ইজ মানি! অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।"

কর্নেল হেসে ফেললেন। "ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরি। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?"

কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ, টাইম ইজ মানি।"

বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। "আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভূতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে, দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি

না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।"

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, "আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?"

"নাহ্। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতে বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।"

"আপনার দাদার নাম কী?"

"আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।"

"তিনি বেঁচে নেই?"

"আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউণ্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, "পানু! টইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!" ব্যস! ওই শেষ কথা।"

"কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?"

"দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে, বুঝলেন তো?"

"বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল?"

"আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।"

"ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল?"

"ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ার টেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি—এইসব।"

"আর কিছু?"

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর তেমন কিছু—হ্যাঁ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।"

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।"

"আমাকেও।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "আপনার ঘরের ভূতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন?"

"প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।"

"উনি কী বলেছিলেন?"

"উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।"

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, "ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পরদিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।"

"ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।"

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত?"

"ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।"

"তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন?"

"তা হলে কোনও বোর্ডার—ধরুন, এই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং!"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "নিচের ফ্ল্যাটের লিন্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।"

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নিচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষপ্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

"টাইম ইজ মানি!" বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, "একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।"

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতস কাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, "ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।"

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, "সত্যিই এটা নাড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।"

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, "আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এই আলমারিটা খুলুন।"

"খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।"

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন, "আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।"

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, "আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেট ব্রোকার ছিলেন!"

"তাই বুঝি? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি।"

"আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।"

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?

"আপনি ওঁকে ডাকুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়েছিলেন। কর্নেল বললেন, "আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "চোরাই জিনিস। তার মানে?"

"মানে আপনারা ভালোই জানেন! তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, 'খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।' আমি ওকে পাত্তা দিইনি।"

"কিন্তু জিনিসটা কী?"

"খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, 'ওই লোকটাকে তাড়াও।' কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুণ্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।"

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—"

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।"

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বলেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?"

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, "এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।"

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, "তেমন কিচ্ছু এ ঘরে নেই।"

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?"

"সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?"

"আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।"

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, "দিনসাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত দিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।"

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, "সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?"

কর্নেল হাসলেন, "কারণ টাইম ইজ মানি।"

"কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।"

ডায়ালের কাচ খুলে আতস কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, "এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যান্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরি'স সেভেনটি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি...."

চমকে উঠলাম। "কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার। এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?"

"ডার্লিং! হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।' পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেটে মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে-মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, "টাইম ইজ মানি! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?"

সায় দিয়ে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।"

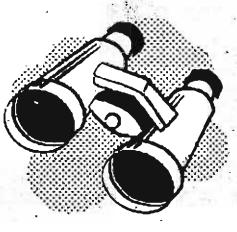

ব্ল্যাক প্যান্থার রহস্য

সেবার অক্টোবরে ধরমতাল হ্রদ দেখে লোহাগড় ফেরার পথে বিকেল হয়ে গেল।

ওটা আসলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে মৃত একটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। হাজার-হাজার বছর ধরে বর্ষার জল জমে বিশাল হ্রদ হয়েছে। মধ্যিখানে ক্ষুদে দ্বীপের মতো কয়েকটা জঙ্গুলে জলটুঙি।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু বাইনোকুলারে কোনও জলটুঙির শীর্ষে কবে নাকি সেক্রেটারি বার্ড আবিষ্কার করে গিয়েছিলেন। এবারকার অভিযান তার ছবি তুলতে। দুঃখের বিষয়, সেবার তাঁর ক্যামেরায় টেলিলেন্স ছিল না। এবার তাই টেলিলেন্স এনেছিলেন।

সেক্রেটারি বার্ডকে বাংলায় 'কেরানি পাখি বলা হয়। কারণ সারসজাতীয় এই পাখিকে দেখলে মনে হয় কানে কলম গোঁজা আছে। কিন্তু ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদের চেয়ে পাখিটা আরও ধুরন্ধর। কয়েক ঘন্টা ছুটোছুটি, বাইনোকুলারে খোঁজাখুঁজি এবং ক্যামেরার টেলিলেন্স তাক করা ব্যর্থ হল। কতবার টুপি খসে গিয়ে ওঁর টাক চকমক করল। সাদা সান্তাক্লজ দাড়িতে মাকড়সা জালসমেত আটকে গেল। অবশেষে লোহাগড় খনিজ সম্পদ দফতরের পাবলিক রিলেশন অফিসার (পি আর ও) ইকবাল আমেদ তাড়া দিলেন, "কর্নেল, এবার ফেরা যাক। এলাকার পরিস্থিতি ভাল নয়। কয়েকটা জঙ্গি গেরিলা গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়েছে। হাইওয়েতে প্রায়ই হামলা চালায় ওরা। আমার আগের পি. আর. ও—"

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল তুম্বোমুখে বললেন, "শুনেছি। তবে আলো কমে আসছে। চলো, ফেরা যাক।"

আমাদের জিপে প্রায় তিন কিলোমিটার সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিরিরকমের উতরাই পথ দিয়ে নেমে হাইওয়েতে পৌঁছলাম। সেই সময় হঠাৎ কর্নেল বললেন, "আমেদ, চা খাব।"

আমেদ জিপ থামিয়ে বললেন, "এখানে চা খাবেন কী! পাবেন কোথায়?"

প্রকৃতিবিদ জিপ থেকে নেমে অমায়িক হাসলেন। "পাহাড়ি রাস্তার ধারে নিরিবিলি চায়ের আড্ডায় একটু বসলে ক্লান্তি দূর হয়। চলে এসো!"

পাশেই শালপাতার ছাউনি-দেওয়া একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল। চাওয়ালার চেহারা আদিবাসীর। একা বসে ঝিমোচ্ছিল সে। আমাদের দেখে ব্যস্তভাবে উনুনে লকড়ি গুঁজে দিল। গাছের ডাল দিয়ে তৈরি বেঞ্চে আমরা বসলাম। উদ্বিগ্ন আর বিরক্ত মুখে তরুণ পি. আর. ও ঘনঘন ঘড়ি দেখছিলেন। কর্নেল চাওয়ালার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। ওঁর গল্প মানে পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজখবর। তবে চাওয়ালা হাইওয়ের ওধারে পাহাড় দেখিয়ে শুধু একটা শম্বর হরিণের খবর দিচ্ছিল, যার শিং নাকি গোনা যায় না।

হাইওয়েতে দিনশেষে যানবাহনের আনাগোনা এখন সত্যিই কম। আমরা চা খেতে-খেতে একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডার বাঁক ঘুরে এসে গতি কমাল। তারপর চায়ের দোকানের সামনে থেমে গেল। পেছনের সিটে দু'জন প্রৌঢ় ছিলেন। একজন মুখ বাড়িয়ে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "বরমদেও থান আর কতদূর?"

চাওয়ালা ভাঙা হিন্দিতে বলে দিল, "সামনে ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে ডাইনে জঙ্গলের ভেতর বটের ডগায় লাল কাপড় উড়ছে দেখবেন।"

গাড়িটা চলে গেল। আমেদ বাঁকা মুখে হাসলেন। "বাইরের লোক। নইলে ঝুঁকি নিত না।"

কর্নেল বললেন, "বাঙালি। বাঙালির হিন্দিটা সহজে রপ্ত হয় না। তা ছাড়া বাঙালি সম্ভবত বাতিকগ্রস্ত জাত। আমাকে একটা সেরা নমুনা বলতে পারো। কাজেই অবেলায় বরমদেও নামে কোনও দেবতার থান দর্শনে যাত্রা বাঙালির পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু খটকা খটকা লাগছে।" বলে উনি বাইনোকুলারে গাড়িটা দেখতে থাকলেন।

আমেদ বললেন, "কিসের খটকা?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে চায়ে চুমুক দিলেন। "অপূর্ব"! বলে আমাদের দিকে ঘুরলেন। "গাড়ির পেছনে কাচে লেখা আছে আলফা ট্রেডিং কোম্পানি, তারাপুর।"

আমেদ বললেন, "তারাপুর প্রায় উনিশ-কুড়ি কিলোমিটার আপে। সেখানে অনেক বাঙালি আছে। কিন্তু খটকাটা কিসের?"

"ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙালি আজকাল পিছিয়ে পড়েছে। সিদ্ধি-দাতা গণেশ যেন কোনও কারণে অপ্রসন্ন। বরমদেও কি ঠেকাতে পারবেন?"

আমেদ চা শেষ না করেই উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখে বললেন "আমাদের এখনও তিরিশ কিলোমিটার যেতে হবে। পৌনে পাঁচটা বাজে।"

তাঁর তাড়ায় উঠে পড়তে হল। জিপ চালানোয় তাঁর দক্ষতা ধরমতাল রোডে দেখছি। নদীর ব্রিজে পৌঁছে দূরে উতরাইয়ের নিচে সেই সবুজ অ্যাম্বাসাডার চোখে পড়ল। দু'ধারে ঘন জঙ্গল আর বড়-বড় পাথর। আমেদ সম্ভবত জঙ্গি গেরিলাদের আতঙ্কে জিপ ছোটাচ্ছিলেন। সবুজ গাড়িটার কাছে যাওয়ার আগেই কর্নেল বলে উঠলেন, "রোখো, রোখো, জাস্ট আ মিনিট।"

আমেদ অগত্যা ব্রেক কষলেন। কর্নেল নেমে গিয়ে বললেন, "বরমদেও নিশ্চয় ব্রহ্মদেব। সম্ভবত ব্রহ্মা, ব্রহ্মার মন্দির এ-যাবৎ একটিই আবিষ্কৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টি আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমারই হোক—চান্স ছাড়তে চাই না।"

উনি হন্তদন্ত ডাইনের জঙ্গলে ঢুকলেন। একফালি পায়ে-চলা পথ দেখা যাচ্ছিল। সবুজ গাড়িটার মুখ এখন উলটো দিকে ঘোরানো। ড্রাইভার হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে। নাইট ডিউটির পর ঘুমনোর সময় পায়নি নাকি? জিপের শব্দেও চোখ খুলল না।

আমেদ নামলেন না। আমি নেমে গেলাম। ব্রহ্মামন্দির দর্শনের কৌতূহল জেগেছিল। পায়ে-চলা পথে এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে বড়-বড় পাথরও পড়ে আছে। সামনে বিশাল বটগাছের তলায় পাথরের বেদির কাছে কর্নেল বাঁ দিকে ঘাসের ওপর ঝুঁকে কিছু দেখছিলেন। এতক্ষণে সোজা হলেন। তারপর ক্যামেরা তাক করলেন। ফ্লাশগান কয়েকবার ঝিলিক দিল। কাছে গিয়ে বললাম, "শুধু বেদি দেখছি! মূর্তি নেই?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে শান্তভাবে বললেন, "শিগগির আল্‌ফা কোম্পানির ড্রাইভার আর আমেদকে ডাকো।"

"কেন?"

"সদ্য একটা মার্ডার হয়েছে। ওই দ্যাখো।"

প্রায় ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে দেখি, ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা একটা লোক বেদির নিচে বাঁ-পাশে ঘাসের ভেতর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথার পেছনে টাটকা রক্ত। রক্ত তখনও গড়িয়ে পিঠে আর ঘাসে পড়ছে। আমার মাথা ঘুরে গেল। কর্নেলের সঙ্গদোষে এ-যাবৎ অনেক খুনখারাপি দেখেছি। তাই হয়তো ভিরমি খেয়ে পড়ে গেলাম না। কর্নেল বললেন, "হাঁ করে কী দেখছ? ওদের খবর দাও।"

দৌড়ে গিয়ে আমেদকে বললাম, "মার্ডার! মার্ডার! কর্নেল ডাকছেন!"

আমেদ প্রলাপ বকতে থাকলেন, "কর্নেলকে চলে আসতে বলুন, কর্নেলকে ডাকুন!"

সবুজ গাড়ির ড্রাইভার আমার ডাকাডাকিতে চোখ খুলে প্রথমে বলল, "নেহি! কৈ টেরাক

পাকাড় লিজিয়ে।" তারপর আমার বিদঘুটে হিন্দিতে ঘটনা শুনে সে কী বুঝল জানি না, আস্তেসুস্থে বেরিয়ে গদাইলশকরি চালে থানের পথে পা বাড়াল। আমেদ তখনও প্রলাপ বকছেন।

পরে শুনেছিলাম, আগের পিআরও-র মুক্তিপণের টাকা সরকারি লালফিতের ফাঁসে আটকে পড়ার দরুন জঙ্গিরা তাঁর মৃতদেহ ফেরত পাঠিয়েছিল।

তো আমেদকে কিছুতেই ধাতস্থ করা যাচ্ছিল না। তখন আবার থানের দিকে ছুটে গেলাম। আলফা কোম্পানির ড্রাইভার আচমকা আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে গাড়ির দিকে চলে এল। তারপর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কর্নেল অকুস্থলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তেজিতভাবে বললাম, "ড্রাইভারটা পালিয়ে গেল যে!"

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, "পালায়নি। কুঁয়ারডি থানায় খবর দিতে গেল।"

"এঁর সঙ্গী ভদ্রলোক কোথায় গেলেন?"

বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল বললেন,"যাচ্ছেতাই জঙ্গল আর পাথর। জঙ্গিদের দেখতে পাওয়া অসম্ভব।"

বুক ধড়াস করে উঠল। "জঙ্গি মানে?"

"আমেদ ঠিকই বলেছিল।" বলে কর্নেল পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ দিলেন। "ডেডবডির পাশেই একটুকরো পাথর চাপিয়ে রাখা ছিল এটা।"

কাগজটা খুলে দেখি একটা লেটারহেড। ওপরে ছুটন্ত একটা কালো চিতাবাঘের ছবি। হিংস্র মুখটা এদিকে ঘুরে আছে। তার নিচে ইংরেজিতে ছাপানো 'ব্ল্যাক প্যান্থার লিবারেশন ফ্রন্ট'। তারপর লাল কালিতে যে কথাগুলো ছাপানো, বাংলায় মোটামুটি তা এরকম :

> নিপীড়িত মানবতার স্বার্থে একটি ছারপোকা আটক করা হয়েছে। এর মুক্তিপণ তিন লক্ষ টাকা। কান্‌হো প্রপাতের মাথায় যে গুহা আছে, তার মধ্যে টাকা রেখে রেখে এলে এর মুক্তি। পুলিশ নাক গলালে মৃতদেহ ফেরত যাবে। ৪৮ ঘন্টা সময় দেওয়া হল।....

আমার হাত কাঁপছিল। কাগজটা কর্নেলকে ফেরত দিলাম। কর্নেল বললেন, "তুমি গিয়ে আমেদের কাছে থাকো। বেচারার নার্ভাস হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তুমি থাকলে ও সাহস পাবে।" ...

কুঁয়ারডি থানায় বসে ওসি. রামলগন সিংহের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তখন রাত প্রায় ন'টা। কর্নেলকে উনি চেনেন, এতে অবাক হইনি। বললেন, "কেন্দ্র সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য নিরাপত্তাবাহিনী পাঠিয়েছে। কোনও ঘটনা ঘটলেই পাহাড়-জঙ্গলে চিরুনি-তল্লাশ চালায়। আমরা সঙ্গে থাকি। কিন্তু এ-পর্যন্ত অবস্থা যা ছিল, তা-ই। নাহ্, ভুল বলছি। ক্রমশ বাড়ছে বলাই উচিত। কিন্তু আমার ধারণা, জঙ্গিদের লক্ষ্য ছিলেন অবনী মুখার্জি। সুভাষ সিংহ বাধা দিতে গিয়েই মারা পড়েছেন। কেন বলছি, শুনুন। সারা জেলায় সুভাষবাবু ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিশেষ করে আদিবাসীদের জন্য উনি অনেক করেছেন। আপনি তারাপুরে গেলে সব জানতে পারবেন। তাই বলছি, জঙ্গিরা বাধ্য হয়ে ওঁকে মেরেছে। চ্যাঁচামেচি করেছিলেন কিংবা বাধা দিয়েছিলেন। এও সম্ভব, জঙ্গিদের মধ্যে চেনা মুখ ছিল। আমি তারাপুরে যখন ছিলাম, তখন আইবি-র গোপন রিপোর্টে আভাস ছিল, সুভাষবাবু নাকি জঙ্গিদের ফান্ডে টাকা দেন। কিন্তু শক্ত প্রমাণ ছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে হইহই শুরু হয়ে যাবে। বিধানসভা থেকে সংসদ পর্যন্ত নড়ে উঠবে। এই দেখুন না, সুভাষবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কী ঘটে। আমার তো বুক ঢিপ-ঢিপ করছে!"

সিংহ অট্টহাসি হাসলেন। কর্নেল বললেন, "ড্রাইভার কিষেনচাঁদ কোনও শব্দ বা চ্যাঁচামেচি শুনতে পায়নি। অথচ বাতাস বইছিল থানের দিক থেকে।"

"বলছে নাইট ডিউটি করে আজ দিনে ঘুমনোর সময় পায়নি।"

"কান্‌হো প্রপাত কোথায়?"

"এখান থেকে কম করে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল এলাকায়। তারাপুর থেকে অবশ্য বিশ-পঁচিশের মধ্যে। রিজার্ভ ফরেস্টের কোর এরিয়ার পড়ে। জন্তু-জানোয়ার আছে। আমি ভাবছি, অবনীবাবুর পক্ষ থেকে ওখানে টাকা পৌঁছে দেবে কী করে?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলেছেন মিঃ সিংহ!"

মিঃ সিংহ ঘড়ি দেখে বললেন, "ব্ল্যাক প্যান্থার বলেছে, আমরা যেন নাক না গলাই। ঠিক আছে। আগে অবনীবাবুর ফ্যামিলির লোকেরা কী বলে জানা যাক। আমারা রিস্ক নেব না। ওরা যদি টাকা দেয়, বরং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের মারফত পাঠানো যাবে। অবনীবাবু বহাল-তবিয়তে ফেরত এলে তখন ওঁর স্টেটমেন্ট নিয়ে তার ভিত্তিতে চিরুনি-তল্লাশে নামব। কর্নেলসায়েব কী বলেন?"

"মর্গের প্রাথমিক রিপোর্ট কখন আশা করছেন?"

"তারাপুর এখান থেকে চব্বিশ কিলোমিটার। কাজেই আজ রাত্রে পাওয়ার আশা নেই। তবে আপাতদৃষ্টে রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরেছে মনে হল। খুলি লম্বালম্বি ফেটে গেছে। আপনিও তো পরীক্ষা করলেন।"

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, বললেন না। ইকবাল আমেদ ব্যস্তভাবে বললেন, "কর্নেল, পৌনে দশটা বাজে।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মিঃ সিংহ একটু হেসে বললেন, "সঙ্গে পুলিশভ্যান এসকর্ট করবে। পিআরও সায়েবের মাথার দাম আমরা বুঝি।"

লোহাগড়ে নদীর ধারে খনিজ সম্পদ দফতরের সুদৃশ্য বাংলোয় আমরা উঠেছিলাম। একবাল আমেদ গেটে আমাদের নামিয়ে দিয়ে কোয়ার্টারে চলে গেলেন। পেছনে পুলিশভ্যান।

লনে হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল হঠাৎ হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার?"

"তিনটে পটকা।"

"তার মানে?"

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে সত্যি তিনটে পটকা বের করে দেখালেন। "বরমদেও থানে এই তিনটে টাটকা পটকা ঘাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। মশলায় ভেজাল থাকলে বা দৈবাৎ ভিজে গেলে কিংবা ঠিকঠাক আছাড় না মারলে পটকা ফাটে না। তা ছাড়া ঘন ঘাসের ওপরও পটকাবাজি নিষ্ফল।"

"জঙ্গিরা পটকা ফাটাতে চাইবে কেন? ওদের তো এ-কে-৪৭ রাইফেল থাকে।"

"হুঁ। কালাশনিকভ! এই নামের এক সামরিক অফিসার এই দুর্ধর্ষ আগ্নেয়াস্ত্র অনেক দুঃখে মাথা খাটিয়ে তৈরি করেছিলেন। তবে এক্ষেত্রে একটা যুক্তি আছে। চ্যাঁচামেচি শুনে কিষেনচাঁদ কিংবা রাস্তা থেকে কেউ ছুটে এলে তাদের ভাগিয়ে দিতে পটকা যথেষ্ট। কালাশনিকভের গুলি খামোখা খরচ করে লাভ কী? হাতে রাইফেল দেখবে এবং পটকার শব্দ শুনবে। দুয়ে-দুয়ে চার হবে এবং লেজ তুলে পালাবে।"

কর্নেল আবার হেসে উঠলেন। বললাম, "কিষেনচাঁদের ঘুমনোটা আশ্চর্য! নাইট ডিউটি বাজে কথা। জঙ্গিদের সঙ্গে ওর নিশ্চয় যোগসাজশ আছে।"

"অনেক ড্রাইভার সুযোগ পেলেই ঘুমোয় দেখছি। কিন্তু কথা হল, আলফা কোম্পানির দুই মালিক বরমদেও থানে আসবেন, জঙ্গিরা জানত তা হলে?"

সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিষেনচাঁদের কাছেই জেনেছিল। আর দেখুন, ওরা আগে থেকেই অপহরণপত্র ছাপিয়ে রেখেছে।"

কর্নেল হঠাৎ হললেন, "সকালে তারাপুর যাচ্ছি কিন্তু!"

আঁতকে বললাম, "কর্নেল, ওরা সাধারণ খুনে নয়, জঙ্গি গেরিলা গ্রুপ। এতবড় একটা দেশের সরকার ওদের জব্দ করতে পারছে না।"

এই সময় কেয়ারটেকার ভদ্রলোক এসে পড়লেন। "পি আর ও সায়েব এইমাত্র ফোন করেছিলেন। ডিনার রেডি সার।"

এই বাতিকগ্রস্ত বৃদ্ধের পাল্লায় পড়ে অনেক দুর্ভোগে ভুগেছি। এবার নির্ঘাত জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণটা যাবে। ওঁর অবশ্য কিচ্ছু হবে না। ব্ল্যাক প্যান্থারদের গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শেখাতে চাইবেন। ওটা নাকি ওঁর সামরিক জীবনের সেরা লাভ।

সকাল সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট করে বাসস্টেশনে গেলাম। আমেদ তখনও ওঠেননি। তাঁর জন্য কর্নেল চিরকুটে বার্তা রেখে এসেছিলেন। আটটায় তারাপুরগামী বাস ছাড়ল। কুঁয়ারডি পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ দীর্ঘ জ্যাম। কন্ডাক্টর খোঁজ নিয়ে এসে ঘোষণা করল, বরমদেও থানের সামনে দশ-বিশ হাজার লোক রাস্তা আটকেছে।

এক বাঙালি যাত্রী মাতৃভাষায় ফুঁসে উঠলেন,"রোজ এই অবরোধ। কথায়-কথায় রাস্তা আটকানো চাই।" বলে রাষ্ট্রভাষায় কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ হুয়া ক্যা? কিস্‌কা বিল্লি মর গেয়ি?"

কন্ডাক্টর হাসল। "বহুত্ বড়ি বিল্লি বাবুজি! সুভাষজিকো মার ডালা।"

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। "ওরে বাবা! কৌন মারা?"

"মালুম নেহি।"

ভদ্রলোক বোঁচকা-বুঁচকি গুছিয়ে নেমে গেলেন। কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ এঁটে বললেন, "ওঠ জয়ন্ত! নেমে পড়া যাক।"

নেমে দেখি, সেই ভদ্রলোক এবং আরও কিছু বাসযাত্রী একটা টিলার নিচে পায়ে-চলা পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে সঙ্গ ধরলেন। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, "ওদিকে কোনও বাসরুট আছে নাকি?"

ভদ্রলোক থমকে দাঁড়ালেন। "কী আশ্চর্য! আপনাকে সায়েব ভেবেছিলাম। এরিয়ার মিশনারি সায়েবরা আছেন। তা ..."

কর্নেল পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দিলেন। উনি বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন, "কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারিস্ট।" তারপর মুখ তুলে বললেন, "নমস্কার! নমস্কার! আপনি মিলিটারির লোক। তা নেচারিস্ট মানে?"

"প্রকৃতিপ্রেমিক বলতে পারেন। আপনি কোথায় থাকেন? এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"তারাপুরে আমার বাড়ি। ছোটখাটো ব্যবসা করি। আমার নাম সদানন্দ রায়। এই পথে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে নদীর ব্রিজে পৌঁছনো যাবে। তারপর ধরমতাল রোডের মোড়ে একটা কিছু পেয়ে যাব—জিপ কিংবা অটোরিকশা।"

"চলুন, আমরাও তারাপুর যাব। গল্প করতে-করতে হাঁটলে ক্লান্তি আসে না।"

"আজ্ঞে, কথাটা ঠিকই বলেছেন।"

"কে এমন মারা গেলেন যে, লোকে রাস্তা আটকাল?"

"সুভাষ সিঙ্গির কথা আর বলবেন না সার! বিয়েটিয়ে করেনি। সমাজসেবা করে বেড়াত। কোম্পানি লাটে তুলে দিয়েছিল। এবার অবনী হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। অবনী ওর পার্টনার স্যার! বুঝলেন তো?"

"ওঁদের ব্যবসা কিসের?"

"রকমারি অর্ডার সাপ্লাইয়ের। ধরুন, এরিয়ার মিশনারি স্কুল-কলেজ অর্ডার দিল, এত খাতা চাই, কি কালি-কলম চাই কি চেয়ার-টেবিল চাই—আবার গভমেন্ট অফিস যদি অর্ডার দিল—"

কর্নেল বললেন, "বুঝেছি। বাঘের দুধের অর্ডার দিলেও সাপ্লাই দেয়।"

অদ্ভুত শব্দে হাসতে লাগলেন সদানন্দবাবু। "ঠিক ধরেছেন। তবে ওই যে বলছিলাম, সিঙ্গি ব্যবসা লাটে তুলেছে দান-খয়রাত করে। ইদানীং বাতিক উঠেছিল বরমদেওয়ের থানে মন্দির গড়ে দেবে। অবনী মুখুজ্যে বেগতিক দেখে কলকাতায় ব্রাঞ্চ করেছে। ওর ছেলে মৃণাল দেখাশোনা করছে। এবার পাড়াতাড়ি গুটিয়ে অবনী কাটবে। ফ্যামিলি অলরেডি পাঠিয়ে দিয়েছে, জানেন?"

"তারাপুরের বাড়িতে অবনীবাবু এখন একা থাকেন বুঝি?"

"হ্যাঁ। সুভাষ সিঙ্গিও থাকত। নিজে কোনও বাড়ি করেনি।"

জঙ্গলের গাঢ় ছায়ায় যেতে-যেতে কানে এল, ডাইনে দূরে মানুষ-জনের কোলাহল। কর্নেল বললেন, "বরমদেওয়ের থান কি কাছাকাছি?"

সদানন্দবাবু বললেন, "আজ্ঞে! ডান দিকে ওই যে বটগাছ দেখছেন। তবে এবার একটু পা চালিয়ে আসুন সার! অবরোধ হটাতে পুলিশ গুলি ছুড়তে পারে।"

"ছুড়ুক না! আমরা দমাদ্দম পটকা ফাটাব।"

সদানন্দবাবু গুলি-গুলি চোখে তাকালেন। "পটকা ফাটাবেন? ওরে বাবা! টেররিস্ট ভেবে সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে আসবে।"

"আপনার ওই ব্যাগে তারাকাঠির প্যাকেট দেখছি। আসন্ন দেওয়ালি উপলক্ষে বাজি, পটকা, হাওয়াই, তুবড়ি কিনতে নিশ্চয় কলকাতা গিয়েছিলেন?"

"আজ্ঞে। তা—"

"দিন না কয়েকটা পটকা। দাম দেব।"

"কী বলছেন সার?"

কর্নেল পকেট থেকে একটা পটকা বের করে বললেন, "তা হলে আমারটা ফাটাই।" উনি একটা পাথরে জোরে পটকাটা ছুড়ে মারলেন। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল এবং কানে তালা ধরে গেল।

সদানন্দবাবু অমনই প্রায় দৌড়তে শুরু করলেন। বললাম, "কোনও মানে হয়? যদি সত্যি সিকিউরিটি ফোর্স ছুটে আসে?"

কর্নেল একচোট হেসে বলেন, "কষ্ট করে আর তারাপুর যেতে হল না। সদানন্দবাবুর কাছেই সব হদিশ পাওয়া গেল। এবার ওঁকে সঙ্গছাড়া করার দরকার ছিল। দ্বিতীয়ত, একাগ্রচিত্ত এক বালক ব্যাধের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।"

একটি বনচর ছেলে গুলতি আর মুঠোয় বাঁটুল নিয়ে বাঁ দিকের ঝোপ থেকে কখন বেরিয়ে এসেছে, লক্ষ করিনি। কর্নেল তাকে ইশারায় ডাকলেন। তার মুখে ক্ষোভের চিহ্ন স্পষ্ট। কর্নেল হিন্দিতে বললেন, "পাখিটা উড়ে গেছে। সেজন্য দুঃখ কোরো না। বখশিশ দিচ্ছি।"

তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন কর্নেল। সে অবাক চোখে নোটটা দেখতে থাকল।

কর্নেল বললেন, "ওটা লুকিয়ে রাখো। তুমি থাকো কোথায়?"

সে আঙুল তুলে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দেখাল। তারপর ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা হাফপেন্টুলের পকেটে নোটটা ঢোকাল।

"এখানে কাছাকাছি কোথাও জল আছে?"

সে ইশারায় আমাদের অনুসরণ করতে বলল। ঝোপঝাড়, পাথর আর উঁচু গাছের ভেতর দিয়ে কিছুদূর চলার পর একটা ছোট্ট ডোবা দেখা গেল। ডোবার জলটা গাঢ় হলুদ। কর্নেল আমাকে

অবাক করে ডোবার চারদিকে ঘুরতে শুরু করলেন। কখনও ঝুঁকে বা হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে একখানে থামলেন। তারপর ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন, "আরও বখশিশ পাবে। জলে মাছ আছে মনে হচ্ছে। পাঁক হাতড়ে একটা মাছ ধরতে পারলে মাছটা তোমার। পাঁকে অন্য কিছু পেলে আমার।"

ছেলেটি একটু দোনামনা করছিল। কর্নেল আবার একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। তখন সে নোটটা পেন্টুলের পকেটে ভরে ফেলল এবং নিঃসঙ্কোচে পেন্টুল খুলে রেখে জলে নামল! জল তত গভীর নয়। তার কোমর অবধি ডুবল মাত্র। কমবয়সীদের যা স্বভাব। জল তার সরল আদিম মনকে ভূতের মতো পেয়েছিল। কর্নেল বারবার বলছিলেন, "পাঁক হাতড়াও! পাঁকে মাছ পাবে।"

আমি থ হয়ে বসে ব্যাপারটা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে হাত-খানেক লম্বা কী একটা জিনিস তুলে ধরল। কর্নেল শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "ওটা আমার! ছুড়ে দাও।"

এতক্ষণে দেখলাম জিনিসটা ইঞ্চিদেড়েক মোটা একটা লোহার রড। কর্নেল রডটা কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, "কুইক জয়ন্ত, কুঁয়ারডি থানায় মার্ডার-উইপনটা জমা দিয়ে লোহাগড় ফিরতে হবে। ধরমতালের সেক্রেটারি বার্ডের ছবি না তুলে কলকাতা ফিরছি না।"

বললাম, "জঙ্গিরা তা হলে এই রডটা দিয়েই—"

"জঙ্গিরা না। অবনী মুখুজ্যে।"

"অ্যাঁ? সে কী!"

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "তিনটে পটকা দেখেই খটকা বেধেছিল। সদানন্দবাবুর কথাগুলো স্মরণ করো। ওইখানে সুভাষবাবু মন্দির গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কাজেই তাঁকে ডেকে এনে আচমকা পেছন থেকে মাথায় রডের ঘা মারা সো ইজি। জঙ্গিদের লেটারহেড? সুভাষবাবুর সঙ্গে ওদের যোগাযোগ ছিল, আই বি রিপোর্টে তার আভাস আছে। অর্ডার সাপ্লায়ার কোম্পানির পার্টনার সুভাষবাবুর পক্ষে লেটারহেড সাপ্লাই করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অবনীবাবুর অগোচরে এ কাজ অসম্ভব। কাজেই অবনীবাবু একটা লেটারহেড আত্মসাৎ করেছিলেন। তবে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি বলে কথা আছে। পটকা ফাটিয়ে কিডন্যাপিং কেসকে আরও মজবুত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন অবনীবাবু। ঘাসে পটকা ফাটেনি। কাজেই আমার খটকা ...কালাশনিকভ হাতে থাকলে পটকার কথা মাথায় আসবে কেন? হ্যান্ডগ্রেনেডের অভাব নেই জঙ্গিদের।" কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "নিজেকে নিজে কিডন্যাপ করলে ঘরের টাকা ঘরেই ফিরবে। তবে আমার ধারণা, অবনীবাবু অত ঝুঁকি নেবেন না। কান্‌হো প্রপাত এলাকায় অবশ্যই জঙ্গিদের ঘাঁটি আছে। তার প্রমাণ ওই লেটারহেড। অবনীবাবু ধুলো-কাদা মেখে থানায় হাজির হয়ে বলবেন, পালিয়ে এসেছি।"

বৃদ্ধ রহস্যভেদী সত্যি অন্তর্যামী। কুঁয়ারডি থানায় ছেঁড়া শার্ট এবং ধুলো-কাদামাখা অবনী মুখুজ্যে করুণ মুখে বসেছিলেন। কয়েক মিনিট পরেই অবশ্য তাঁকে হাজতে ঢোকানো হয়েছিল ...।

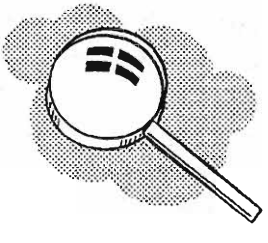

মানুষখেকোর ফাঁদ

খ্যাতনামা বেসরকারি ঘুঘু অর্থাৎ গোয়েন্দা কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ডাকলে এই রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরি নরকে যেতেও রাজি। কিন্তু নরকে নয়, সেবারে ডাক এল রাজস্থান থেকে। জায়গাটার নাম মাধোপুর। জয়পুর থেকে অনেক দূরে একটা জঙ্গুলে জায়গা। কীভাবে যেতে হবে, সব পথনির্দেশ ছিল টেলিগ্রামে। তাই পৌঁছতে কোনও অসুবিধে হল না।

মাধোপুরে গিয়ে দেখলুম, আমার জন্যে একটা জিপ অপেক্ষা করছে। জিপের ড্রাইভারের কাছে জানলুম, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি এখন বাঘ শিকারের নেশায় মেতেছেন। জয়পুরের মহারাজার এক সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে মাধোপুরের মাইল পাঁচেক দূরে। এখন অবশ্য তার মালিক ভারত সরকার। সেখানে বনবিভাগের বাংলোয় কর্নেল সায়েব মহামান্য অতিথির সম্মানে বাস করেছেন। সম্প্রতি ওই এলাকায় একটি মানুষখেকো বাঘের ভীষণ উপদ্রব দেখা দিয়েছে। কর্নেলের মাথায় বাঘটা নিকেশ করার ঝোঁক চেপে গেছে বিলক্ষণ।

শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। আফসোস হল, খুলে জানালে আমার হেভি এক্সপ্রেস রাইফেলটা আনতুম! তারপর মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কর্নেলকে কথায় কথায় বলেছিলুম, মানুষখেকো বাঘ মারার সুযোগ আজ অব্দি পাইনি। পেলে একবার চেষ্টা করে দেখতুম। তার জবাবে কর্নেল ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আদতে সাধারণ বাঘ কি তুমি কখনও মেরেছ, জয়ন্ত? হাজারটা সাধারণ বাঘ যে না মেরেছে, তার পক্ষে মানুষখেকো বাঘ মারার স্বপ্ন দেখা উচিত নয়।

বুড়ো কথাগুলো মনে রেখেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। কারণ, আমি জোর তর্কাতর্কি করেছিলাম, ওঁর বক্তব্য মেনে নিতে পারিনি। তাই কি এই ডাক? কিন্তু তাহলে আমাকে রাইফেল আনতে বলেননি কেন? এইসব ভেবে খুব রাগও হল। উনি আমাকে নিয়ে বরাবর এমন পরিহাস করেন কেন?

পৌঁছে দেখি, একটা ছোট্ট টিলার গায়ে সুন্দর বাংলোর বারান্দায় কর্নেল আর আমার অচেনা এক ভদ্রলোক বসে রয়েছেন। কর্নেল আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—হ্যাল্লো ডার্লিং! কনগ্রাচুলেশনস! গুড লাক ফর ইউ!

বললুম—আগাম ওটা নিতে চাইলেন কর্নেল!

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। ওঁর নাম রাজাধিরাজ আচরল। পুলিশ সুপার। একজন জবরদস্ত শিকারি উনি।

কর্নেলের সঙ্গে সর্বময় পুলিশকর্তাদের যোগাযোগ ঘটে যায়—এটা অবাক লাগে আমার। ঠাট্টা করে বললুম—ম্যান ইটার পাকড়াও করতেও প্রাইভেট গোয়েন্দা আর পুলিশ দরকার হয় আজকাল! বাঃ!

মিঃ আচরল কিন্তু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—না না! জাস্ট আকস্মিক যোগাযোগ!

গল্পগুজব বন্ধ করে কর্নেল আমাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে বললেন। পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করার জন্য স্নান করলুম। তারপর তিনজনে একসঙ্গে বসে লাঞ্চটা সেরে নেওয়া হল।

সেই ফাঁকে মানুষখেকো বাঘটার খবরাখবর দিলেন কর্নেল। ক'দিন আগে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে হাইওয়ে গেছে, তিনজন লোক সাইকেল চেপে আসছিল একের পর এক—কেউ পাশাপাশি ছিল না। প্রথম সাইকেলটা বাঁকের দশগজ দূরে যখন, তখন হঠাৎ বাঁদিকের পাথরের পাঁচিলে

একটা বাঘ উঠে আসে। ব্রেক কষবার আগেই সে রাস্তার মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে। তার ফলে সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে। অমনি সে গর্জন করে ওঠে। এদিকে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে ছিটকে সরে আসে, সাইকেলটা পড়ে যায় এবং চাকা ঘুরতে থাকে। পিছনের লোক-দুটো কিছু লক্ষ্য করেনি। তাই তারাও এসে প্রথম সাইকেলটার ওপর একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সামনে বাঘ দেখে লাফ দিয়ে সরে আসে। তিনটে সাইকেলের চাকা বোঁ বোঁ করে তখন ঘুরছে এবং একটা বাঘ ক্ষেপে গিয়ে থাবা মারছে একবার এটায়, একবার অন্যটায়। আর প্রচণ্ড গর্জাচ্ছে। অন্যদিকে পাথরের গায়ে সেঁটে তিনটে ভয়পাওয়া মানুষ কাঠ হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তাদের পালানোর ক্ষমতাও নেই।

বাঘটা কিছুক্ষণ সাইকেল তিনটের সঙ্গে লড়াই করার পর বিরক্ত হয়েই যেন শেষ ডাক ছেড়ে ডানদিকের পাঁচিলে লাফিয়ে ওঠে এবং অদৃশ্য হয়। তখন লোক তিনটে ধীরে সুস্থে সাইকেলের কাছে আসে। আশ্চর্য, সাইকেলের কোনও ক্ষতিই হয়নি।

তারা এরপর কী করেছিল বোঝাই যায়। ঘন্টায় কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট মাইল জোরে পালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। প্রথমেই যে বসতিতে তারা পৌঁছয়, সেখানে হুলুস্থূলু শুরু হয়েছিল। কারণ লোকেরা দেখে, তিনটে সাইকেলওয়ালা আচমকা ঝড়ের মতো এসে সাইকেল থেকে লাফ দিয়ে পনে অজ্ঞান হয়ে যায়। সাইকেলগুলো আবার চারদিকে ছিটকে পড়ে।

জ্ঞান হলে তাদের মুখে সব জানা যায়। কিন্তু ঘটনার শেষ এখানে নয়। পরদিন সকালে দেখা গেল, সেই বসতির এক বুড়ি উঠোনে পড়ে আছে। ক্ষতবিক্ষত শরীর। বোঝা যায় বাঘটা টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল বুড়িকে—পারেনি। কেন পারেনি কে জানে। কিন্তু পায়ের খানিকটা মাংস খুবলে খেয়ে গেছে।

এরপর দ্বিতীয় শিকারের খবর পাওয়া গেল মাঠের খেতে। একটা বুড়ো ঘাস কাটতে গিয়েছিল বিকেলে। কিন্তু রাতেও ফিরল না। ব্যাপারটা অনুমান করে গাঁয়ের লোক পরামর্শে বসল। কিন্তু রাতের বেলায় সাহস করে কেউ খুঁজতে বের হল না। পরদিন সকালে দেখা গেল একই দৃশ্য। এবারেও বাঘটা বুকের কিছুটা খেয়েছে—টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। পারেনি।

আজ সকালে ঘটেছে আরেক বীভৎস কাণ্ড। সেই গাঁয়ের মোড়লকে বাঘটা একইভাবে মেরে রেখে গেছে। মোড়লের বাড়ির পিছনে জঙ্গল আছে। তার নিচে ধাপবন্দি পাহাড়ি খেত। মোড়লকে সম্ভবত শেষ রাতে আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এবার বাঘটা ঘরে ঢুকেছিল। ঘর থেকে তাকে টেনে উঠোন পার করে খেতে নিয়ে যায়। তারপর একইভাবে বুকের খনিকটা খেয়ে রেখে যায়। লাশটা এখনও রয়েছে। কাছেই দুটো গাছে দুটো মাচান বাঁধা হয়েছে। কর্নেল এবং মিঃ আচরল সেখানে বাঘটার আশায় বন্দুক হাতে অপেক্ষা করবেন।

কর্নেল আরও জানালেন, প্রথম ঘটনার পরই সরকারি শিকারিরা লাশের কাছে ওত পেতে রাত জাগেন। কিন্তু বাঘটা আর আসেনি। দ্বিতীয় লাশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। এ থেকে মনে হচ্ছে, মোড়লের লাশের কাছেও সে আসবে কি না সন্দেহ। তবে...

ওঁকে চুপ করতে দেখে মিঃ আচরল বললেন—তবে কী কর্নেল?

কর্নেল কেমন হেসে বললেন—আমার ধারণা এবার বাঘটার আসার চান্স আছে। অন্ততঃ যদি বুদ্ধিমান বাঘ হয়, তাহলে তো আসা একান্ত উচিত। না এলে যে সে প্রাণে মারা পড়বে!

আমরা দু'জনেই হতভম্ব হয়ে গেলুম। বলেন কী! বাঘটা মড়ির কাছে না এলে মারা পড়বে! এ কী উদ্ভট কথা; মড়ির কাছে এলে তবে না গুলি খেয়ে বাঘ মারা পড়ে। মিঃ আচরল অবাক হয়ে বললেন—এ হেঁয়ালির মানে কী কর্নেল?

—হেঁয়ালি? মোটেও না! বলে কর্নেল ঘনঘন মাথা নাড়তে থাকলেন। একটু পরে বললেন—বুঝলেন না?

বাঘ মানুষখেকো হয় কেন? যখন শিকার ধরার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখন বাঘ সবচেয়ে সহজে ধরার মতো শিকার মানুষের ওপর হামলা করে। এই বাঘটার ব্যাপারস্যাপারগুলো দেখুন। প্রথম ঘটনা সেই সাইকেল পর্ব। ওই অবস্থায় বাঘ বিরক্ত হয়ে ওদের আক্রমণ করাটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা করেনি। বোঝা যায়, বাঘটার মধ্যে সুস্থতার লেশমাত্র নেই। অর্থাৎ সে ভীতু, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিজাত ক্ষমতা তার মধ্যে নেই। এ অবস্থা বাঘের কখন হয়? যখন কোনও কারণে সে শারীরিক কিছু দরকারি ক্ষমতা হারায়। এটা নিছক বার্ধক্যের দরুন না হতেও পারে। বরং কোনও শিকারির গুলিতে সে স্বাভাবিক তৎপরতা হারিয়ে অক্ষম হয়ে গেছে, কিংবা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধে তা হারিয়েছে। এই বাঘটার প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য দেখুন—সে তার মড়ি টেনে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় লুকোতে পারে না। অর্থাৎ তার শিকার বওয়ার ক্ষমতা নেই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—সে আর মড়ির কাছে ফেরে না। তার মানে, নিশ্চয় কোথাও মড়ির ওপর বসা অবস্থায় গুলি খেয়েছিল।

মিঃ আচরল বললেন—তাহলে বলছেন কেন সে মোড়লের মড়ির কাছে এবার ফিরবেই?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—না এলে যে ক্ষিধের জ্বালায় মরতে হবে ওকে! প্রতিবার মড়ি পেট পুরে না খেয়ে পালাবে নাকি? ক্ষিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এবার হয়তো সে একটা রিস্ক নেবে।

এই ব্যাখ্যায় মিঃ আচরল সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আমি হলুম না। এই বুড়ো ঘুঘুকে তো হাড়ে হাড়ে চিনি। ওঁর হেঁয়ালি বোঝার ক্ষমতা কারও নেই।

কথা হল, আমরা ঠিক সূর্যাস্তের আগে সেই গাঁয়ে যাব এবং মড়ির কাছে মাচানে উঠব। তখনও ঘন্টা দুই দেরি। আমি গড়িয়ে নিতে গেলুম ততক্ষণ। মিঃ আচরল সেই ফাঁকে তাঁর জরুরি কয়েকটা ফাইল নিয়ে বসলেন—থানা থেকে লোক এসেছিল। আর কর্নেল বেরোলেন। বলে গেলেন—গ্রামেই অপেক্ষা করব আপনাদের জন্যে। আপনারা টাইমলি চলে যাবেন।

রাইফেল হাতে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। এটা ওঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সব কাজ ভালভাবে খুঁটিয়ে না দেখে এগোবেন না। গ্রামে গিয়ে হয়তো বাঘটার সম্পর্কে আরও খবর জেনে নেবেন।

সূর্য ডুবতে ডুবতে আমি আর মিঃ আচরল জিপে করে যথাস্থানে গেলুম। জিপটা গাঁয়ের কাছারির সামনে রেখে পায়ে হেঁটে আমরা ধাপবন্দি পাহাড়ি খেত ধরে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি কর্নেল একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে গেলে বললেন—আসুন মিঃ আচরল। এস জয়ন্ত ডার্লিং। গুড ইভনিং!

মিঃ আচরল বললেন—এখানে কী করছেন কর্নেল?

কর্নেল ঝোপে আটকানো একটা কাপড় দেখিয়ে বললেন—এটা পরীক্ষা করছিলুম। মোড়লের জামাটা আটকে আছে। চলুন, মাচানে ওঠার সময় হয়ে গেছে।

লাশটা দেখে আমি শিউরে উঠলুম। আর দ্বিতীয়বার তাকানোর সাহস হল না। দশ গজ চড়া পনেরো গজ লম্বা ছোট্ট খেতের মধ্যিখানে সেটা পড়ে আছে একপাশে কাত হয়ে। বীভৎস! তার পশ্চিমে একটা মস্ত নিম গাছ—সেখানে বিশফুট উঁচুতে মাচান দেখলুম। কর্নেল বললেন—মিঃ আচরল, আপনি ওই মাচানে উঠুন। একটা কথা বলে রাখি। আমি শিস না দিলে কিন্তু কোন প্রলোভনেও গুলি করবেন না—প্লিজ, কথা দিন।

মিঃ আচরল বললেন—অবশ্যই। কথা দিচ্ছি।

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন—ডার্লিং, তোমাকেই গুলি করার সুযোগটা দিতে চাই! এই নাও রাইফেল। এবার দেখব, তোমার হাতের টিপ কেমন! কিন্তু মনে রেখো, আমি শিস না দিলে তুমিও গুলি ছুড়বে না। কথা দাও।

এর পরে বুড়োর সঙ্গে আমি পুবদিকের একটা গাছের মাচানে উঠলুম।

কোনওরকম নড়াচড়া চলবে না। চুপচাপ বসে রইলুম। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল। সময় কাটতেই চায় না। তারপর আমাদের পিছনে চাঁদ উঠলে স্বস্তি পেলুম। হাল্কা জ্যোৎস্না গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মড়ির ওপর পড়ল। আরও কিছুক্ষণ পরে মড়িটা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কিন্তু বাঘের কোনও লক্ষণ নেই। ঝিঁঝি ডাকছে একটানা। অনেক দূরে একবার শেয়াল ডাকল। তারপর আবার সব স্তব্ধ হয়ে গেল। গ্রামের দিকে শেষ আলোটিও নিভে গেল। চোখ জ্বালা করতে লাগল—একদৃষ্টে কতক্ষণ আর তাকিয়ে থাকা যায়। আস্তে আস্তে উত্তেজনা থিতিয়ে একটা ঝিমধরা ভাব জাগল শরীরে। রাইফেলটা অসম্ভব ভারী লাগছিল। এবার হাত পা ছড়াতে পারলে আরাম পাওয়া যেত। কিন্তু নড়াচড়া করা বারণ।

গ্রামের দিকে সেই সময় কুকুরের ডাক শোনা গেল। কুকুরগুলোর বোকামি রেখে রাগ হচ্ছিল—কারণ ওরা ডাকতে ডাকতে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছিল—সাবধানে কর্নেলের দিকে ঘুরলুম। দেখি, বুড়োর চোখদুটো যেন জ্বলছে এবং কখন হুমড়ি খেয়ে বসে কিছু দেখছেন, লক্ষ্য করিনি।

কুকুরের ডাক থেমে গেলে কর্নেল নড়ে বসলেন। এটা কি ঠিক হল? বাঘের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া সে টের পেয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমাকে আরও অবাক করে কর্নেল দেখলুম পা বাড়াচ্ছেন। এক পা নামিয়েছেন, যেন নামতে যাচ্ছেন। ফিসফিস করে ওঠার আগেই উনি আমার হাঁটুতে চাপ দিয়ে চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন। তখন হতভম্ব হয়ে বসে ওঁর কাণ্ড দেখতে থাকলুম।

কর্নেল নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে গেলেন। তারপর আর ওঁকে তন্ন তন্ন খুঁজেও দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা কী? যেচে বিপদের মুখে পড়তে গেলেন কেন?

হঠাৎ আমার চোখ গেল মড়ির দিকে। কী একটা কালো বস্তু নড়াচড়া করছে ওখানে? তাহলে বাঘটা এসে গেছে! কিন্তু কর্নেলের শিস না শুনলে গুলি করা করা বারণ। হাত নিশপিশ করতে থাকল। কালো জন্তুটা কিন্তু মড়িতে বসল না! আশেপাশে ঘুরঘুর করছে। তখন মনে হল, ওটা তাহলে বাঘ নয়—সম্ভবত হায়েনা অথবা ভালুক। তা যদি হয়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে বাঘটার আসা এখন অনিশ্চিত হয়ে গেল।

আমার চোখ ছিল জন্তুটার দিকে। একটু পরে সেটা মড়ির কাছে স্থির হয়ে বসতেই দেখলুম, আমাদের মাচানের তলা থেকে আরেকটা জন্তু হামাগুড়ি দেওয়া মানুষের মতো এগোচ্ছে। চাঁদের আলো এই জায়গায় স্পষ্ট নয়—ছায়া আছে। কিন্তু জন্তুটা যে মড়ির দিকেই এগোচ্ছে, তা ঠিক। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে দেখতে থাকলুম।

দ্বিতীয় জন্তুটা মড়ির কাছাকাছি যেতেই প্রথম জন্তুটা যে লাফ দিয়ে উঠল। সে পালিয়ে যাওয়ার তালে—তার ভঙ্গি দেখেই সেটা বোঝা গেল। কিন্তু অমনি দ্বিতীয় জন্তুটা তার ওপর ঝাঁপ দিল। নির্ঘাৎ মড়ি নিয়ে হায়েনা আর ভালুকে লড়াই বাধল।

কিন্তু সেই মুহূর্তে কর্নেলের চিৎকার শুনলাম, আর টর্চও জ্বলে উঠল। কর্নেল ডাকছিলেন—মিঃ আচরল! জয়ন্ত! চলে এস। বাঘ ধরেছি!

বাঘ ধরেছেন! আমি মাচান থেকে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নেমে গেলুম। মিঃ আচরলও ততক্ষণে এসে পড়েছেন। হাতে টর্চ। গিয়ে দেখি, যে দুটো কালো জিনিসকে জন্তু ভেবেছিলুম—তা মানুষ এবং প্রথম জন্তুটা একজন অচেনা মানুষ, দ্বিতীয় জন্তুটা স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। লোকটাকে উনি জাপটে ধরে আছেন— লোকটার হাতে একটা বড় ছোরা। হাতদুটোসুদ্ধ ধরে কর্নেল ওকে রেকায়দায় ফেলেছেন।

মিঃ আচরল ছোরাটা কেড়ে নিয়ে হুইসিল বাজিয়ে দিলেন। অমনি গাঁয়ের দিক থেকে টর্চ জ্বেলে কারা সব দৌড়ে এল। ধুপধুপ শব্দ শুনে বুঝলুম, সবাই পুলিশ!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কোথায় ম্যান-ইটার? এ যে নিতান্ত মানুষ!

বাংলোয় ফিরতে রাত একটা বেজেছে। ফেরার পর কর্নেল বললেন—জয়ন্ত কি খুব হতাশ হলে? বাঘের বদলে মানুষ! আই অ্যাসিওর ডার্লিং, এরপর তোমাকে সত্যিকার মানুষখেকো বাঘ মারার চান্স দেব। প্লিজ, রাগ কোরো না।

আমি গুম হয়ে থেকেছি সারাক্ষণ। এবার বললুম—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন—সামান্য। এ আমার বরাত জয়ন্ত। যেখানে যাব, খুন আর খুনি এসে আমার ঘাড়ে পড়বেই! এই দেখো না—ম্যান-ইটার মারব বলে আসর জাঁকিয়ে বসলুম এখানে। অথচ এখানেও সেই খুন আর খুনি!

এই বলে কর্নেল সব হেঁয়ালির সমাধান করলেন। সংক্ষেপে তা বর্ণনা করছি। তিনটি সাইকেলের সঙ্গে একটা খেয়ালী বাঘের সংঘর্ষ থেকেই এই খুনি লোকটার মাথায় মতলব খেলেছিল। সে হতভাগ্য মোড়লের একজন পুরনো শত্রু। জমিজমা নিয়ে বিবাদ ছিল। মামলায় হেরে সে ভূত হয়েছিল। কিন্তু মোড়লকে খুন করার সুযোগ পাচ্ছিল না। কারণ, মোড়ল খুন হলেই তার ওপর স্বাভাবিক দায় পড়বে খুনের। সবাই জানে এই শত্রুতার কথা। অতএব সে সাইকেল ও বাঘের সংঘর্ষ থেকে মতলব আঁটল। কিন্তু প্রমেই মোড়লকে খুন করলে পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে বসে—তাই সে অন্য রাস্তা নিল। এই ধূর্ততার কোনও তুলনা হয় না।

প্রথমে খুন করল এক নিরীহ বুড়িকে। ঠিক বাঘে ধরার মতো চিহ্ন রাখল। ছুরি দিয়ে এমনভাবে খুনটা করল যে বাঘের নখ ও দাঁতের দাগ বলে সবার মনে হবে। মড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও রাখল। দ্বিতীয়বার খুন করল একই ভঙ্গিতে। তারপর তার নির্দিষ্ট লক্ষ্য মোড়লকে খুন করতে আর অসুবিধে হল না। কারণ ততদিনে মানুষখেকো বাঘের খবর রটে গেছে। শিকারিরা এসেছে। মাচানে বসেছে। আবহাওয়া তৈরি হয়ে গেছে। অতবে মোড়লকে মারতে আর অসুবিধা নেই।

কিন্তু কর্নেলের চোখ তীক্ষ্ণ। প্রথমেই তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হলেন। কোনও মড়ির আশেপাশে বাঘের পায়ের দাগ নেই কেন? মোড়লের মড়িটা তিনি হাতেনাতে দেখলেন—অন্যদুটো দেখার সুযোগ পাননি। মড়ি পরীক্ষা করেই ওঁর সন্দেহ বেড়ে গেল। মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়েছে। এটা বাঘের থাবায় হতে পারে। চুলে রক্ত নেই। তার মানে মড়ার ওপর ছুরি চালানো হয়েছে। আর জামা বা ধুতি যেভাবে ঝোপে আটকানো আছে, বাঘ টেনে নিয়ে গেলে অমনভাবে থাকতেই পারে না। সবচেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড, মোড়লের লাশের নিচে মাটিতে একটা ফাটল আছে—ফাটলের মধ্যে একটা মোটা হাতুড়ির মাথা কর্নেলের চোখে পড়েছিল। হাতল থেকে খুলে গিয়েছিল মাথাটা। সম্ভবত খুনির হাতে হাতুড়িটা ছিল। ওই অবস্থায় টেনে এনেছিল মড়িটা—তারপর কীভাবে খুলে ওখানে ঢুকে যায়। বাঘের মড়ি বলে লাশ কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেনি। তাই চোখে পড়েনি। কিন্তু কর্নেল তা দেখেছিলেন। তারপর কৌশলে গাঁয়ে রটিয়ে দিয়েছিলেন যে গাঁয়ের কারও একটা হাতুড়ির মাথা হারিয়ে গেছে কি না। এর ফলে খুনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে এবং ফাঁদে পা দেয়। সে এসেছিল হাতুড়ির মাথাটা নিয়ে যেতে।...

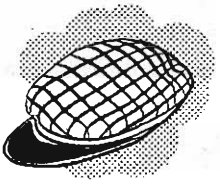

অরুণাচলের ইয়েতি

কর্নেলের মাথায় কখন কোন মতলব গজিয়ে ওঠে, আগে থেকে তার আঁচ পাওয়া ভারি কঠিন। এক উৎকট গ্রীষ্মের সকালে তাই যখন তাঁর তলব পেলুম, আজই দুপুরের ফ্লাইটে গৌহাটি রওনা হতে হবে এবং আমি যেন তৈরি হয়েই বেরোই—একটুও অবাক হইনি।

এই বুড়ো দাড়িওলা টেকো লোকটিকে প্রশ্ন করলে সব সময় জবাব মেলে না। তাই গৌহাটি পৌঁছনো অব্দি কোনও প্রশ্ন করিনি। দেখেছি, প্লেনে ওঁর হাতে একটা মোটা ইংরেজি কেতাব এবং তার পাতায় বুঁদ হয়ে আছেন। বইটার নাম : দি প্রি-হিসটোরিক অ্যানিম্যালস অফ ইন্ডিয়া।'

গৌহাটিতে আমরা একটা প্রাইভেট লজে উঠলুম। বুড়ো আগে থেকেই দেখলুম ব্যবস্থা করে রেখেছেন। লজের মালিক হংসধ্বজ সান্যাল। পঞ্চাশের এদিকেই বয়স। শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। একটু গম্ভীর চালচলন। পোড়খাওয়া চামড়া গায়ে। তিনটে চা বাগিচার মালিক নাকি উনি। বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের গাড়ি করে নিয়ে গেছেন।

কর্নেল চমৎকার সাজানো বসার ঘরে একটা ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে বসে অস্ফুট একটা আরামের আওয়াজ তুললেন—আঃ! তারপর বললেন—মিঃ সান্যাল, আপনার পার্টনার ভদ্রলোক কি এখনও আসেননি?

হংসধ্বজ বললেন—আগরওয়াল? এসে পড়বে নেক্সট ফ্লাইটে। তারপর আশেপাশের অবস্থা দেখে নিয়ে একটু হেসে আবার বললেন—সন্ধ্যা ছ'টায় ল্যান্ড করবে। ঝড়জলের সম্ভাবনা দেখছি না আজ। আগরওয়ালের পয় আছে।

ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটে। আমরা লাঞ্চ সেরেই কলকাতা থেকে বেরিয়েছি। তবু সান্যাল সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অতিথি সৎকারে। সেই ফাঁকে কর্নেলকে এতক্ষণে প্রশ্ন করে ফেললুম—হ্যালো ওল্ড বস! ব্যাপারটা কী?

কর্নেল চোখ বুজে কী যেন ভাবছিলেন। চোখ খুলে বললেন—তুমি কি কিছু বলছ ডার্লিং?

খচে গিয়ে বললুম—না।

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর আমার চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন— জয়ন্ত তুমি তো খবরের কাগজের লোক। একজন ক্রাইম রিপোর্টার। দৈনিক সত্যসেবক তোমাকে...

বাধা দিয়ে বললুম—আমাকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা মাইনে দিয়ে পুষছে। তাতে আপনার কী? আপনিও তো মিলিটারি সার্ভিসে কম পেতেন না!

কর্নেল একইভাবে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্ত, ইয়েতি কাকে বলে জানো নিশ্চয়? হিমালয় পর্বতমালার এই রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক দানবের খবর মাঝে মাঝে তোমাদের কাগজেও বেরিয়েছে। সম্প্রতিও বেরিয়েছে। আশা করি তা লক্ষ্য করেছ। জয়ন্ত, রিপোর্টার হিসেবে এবার একটা দারুণ রকমের সুযোগ তুমি পেয়ে যাচ্ছ। ইয়েতির ওপর একটা অনবদ্য কভারেজ দৈনিক সত্যসেবকে এক্সক্লুসিভলি বেরোলে কী ব্যাপার ঘটবে, টের পাচ্ছ কি? তোমার মাইনে তো বাড়বেই—উপরন্তু ম্যাগসেস পুরস্কার প্রাপ্তিও ঘটতে পারে। সুতরাং বৎস, দয়া করে মাথাটা ঠাণ্ডা করো।

আমি থ ততক্ষণে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলুম বুড়োর দিকে।

কর্নেল বললেন—সম্প্রতি এই পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশের চৌখাম আদিবাসীরা দুটো অদ্ভুত প্রাণীকে পাকড়াও করেছে। এই জঙ্গল লোহিত জেলার পাহাড়ি এলাকার খামতি উপত্যকায় রয়েছে।

এবার মুখ খুললুম।—হ্যাঁ। আমরা বক্স করে সে খবর ছেপেছি। দশ ফুট উঁচু দুটো জানোয়ার–দেখতে অবিকল নাকি মানুষের মতো। একটা পুরুষ অন্যটা স্ত্রী। বিশেষজ্ঞরা তাদের পরীক্ষা করে দেখছেন। কেউ বলছেন, এক জাতের গেরিলা—কেউ বলছেন, একরকম ভালুক। কারও মতে এরাই হচ্ছে সেই ইয়েতি বা তুষার দানব। কোনও কারণে তুষার এলাকা থেকে চলে এসেছিল।....

—দ্যাটস রাইট, জয়ন্ত। বলে কর্নেল তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজের কাটিং বের করলেন। পড়তে থাকলেন সেটা।..... '১৯৫৭ সালে জুগন হিমল থেকে টম স্লিক এভারেস্টের পূর্বে তিনশো মাইল এলাকা ইয়েতির খোঁজে তোলপাড় করেন। ককেশাস অঞ্চলে ১৯৪৬ সালে এক রুশ অভিযাত্রীদল ইয়েতির খোঁজে বেরিয়ে একটা একশো বছরের পুরনো বিশাল কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। রুশ বিশেষজ্ঞদের মতে ককেশাসে এখনও ইয়েতি আছে। ১৯৬৯ সালের জুনে থাই-বর্মা-লাওস সীমান্তে মেকং নদীর ধারে দুটো অতিকায় মনুষ্যাকৃতি প্রাণী দেখা গিয়েছিল। দর্শক ছিল অনেক। প্রাণীরা তাদের দিকে পাথর ছুড়েছিল। রেঙ্গুনের এক দৈনিক পত্রিকায় খবরটি বেরোয়।'

বাধা পড়ল সান্যাল সায়েবের কথায়—কর্নেল, ও তো কাগজের খবর। আমার পার্টনার বন্ধু আগরওয়ালসায়েব কী বিবরণ দিয়েছেন আপনাকে জানি না। তবে...

পাল্টা বাধা দিয়ে কর্নেল গম্ভীর হয়েই বললেন—হ্যাঁ। সেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলা যায়। তাই শুনেই আমি উৎসাহ দেখিয়েছি। সত্যি বলতে কী, ওঁর কথায় এতটুকু গরমিল অথবা সন্দেহ করার মতো কিছু খুঁজে পাইনি মিঃ সান্যাল।

হংসধ্বজ হেসে উঠলেন। বললেন—এবার আমার দিক থেকে ব্যাপারটা শুনুন কর্নেল। গত ২৫শে মে অরুণাচলের উপজাতি অধ্যুষিত খামতি এলাকার জঙ্গলে আমি ও আগরওয়াল ক্যাম্প করে দিন-রাত্রিটা কাটাই। আমাদের সার্ভেয়ার টিম পাহাড়ের তলায় খোঁড়া-খুঁড়ি করছিল। ওখানে সাতশো একর মতো জায়গা আমরা সরকারের কাছে লিজ নিয়েছি। সেখানে সীসের খনি আছে বলে আমাদের ধারণা। যাই হোক, হঠাৎ অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যায়। নাকে কেমন একটা বিকট গন্ধ লাগে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। সার্ভেয়ার কুলিকামিনরা আশেপাশে তাঁবুতে ঘুমোচ্ছিল। আমাদের তাঁবুতে পাশাপাশি দুটো ক্যাম্পখাটে আমি ও আগরওয়াল। গন্ধটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তাঁবুটার ওপর কোনও জন্তু চাপ দিচ্ছে। টর্চ নেব এবং আগরওয়ালকে ডাকব ভাবছি, কিন্তু কোন ফুরসত পেলুম না। আচমকা কী একটা জন্তু আমার ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার বুকে বসে সেটা মানুষের মতো দুহাতে আমার গলা টিপে ধরল। দম আটকে গেল। কিন্তু ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়েছিলুম একটুখানি, সেটা পাশের ক্যাম্পে কেউ কেউ শুনতে পায়। তার ফলে তক্ষুনি হল্লা শুরু হয়। বন্দুকের আওয়াজ করা হয়। ওরা তো জানে না, আমার তাঁবুতেই কী ঘটেছে। আগরওয়াল বোকার মতো দৌড়ে বেরিয়ে যায়। তার পাশেই আমি আক্রান্ত ও বুঝতে পারেনি। আমার ধারণা ওই, হল্লা ও আওয়াজে ভয় পেয়ে জন্তুটা আমাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে সবার বীরত্ব উবে যায়। আন্দাজ সাতফুট উঁচু—বরফের মতো সাদা উলঙ্গ প্রকাণ্ড ওই মূর্তি দেখলে তা অস্বাভাবিক মনে হয়। যাই হোক, সে যখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, তখন একজন সার্ভেয়ার গুলি ছোড়ে। আশ্চর্য! দানবটা ঘুরেও তাকায় না। জঙ্গলে উধাও হয়ে যায়। তখন দুঃসাহসী আগরওয়াল তার পিছনে দৌড়ে যায়।

কর্নেল বললেন—দানবটা বাইরে যাওয়ার পর আপনি কি দেখেছিলেন ওটাকে?

হংসধ্বজ বললেন—না। কারণ, আমি বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারিনি। অজ্ঞান হয়ে গেছলুম।

—তবে কেমন করে জানলেন যে ওটা প্রকাণ্ড এবং বরফের মতো সাদা?

—আমার লোকেরা বর্ণনা করেছে।

—হুম! আগরওয়াল সায়েব আমাকে যা বলেছেন—তা আপনার বর্ণনার সঙ্গে এক। উনি কিছুদূর তাড়া করে ফিরে আসেন। পাহাড়ের আড়ালে ওটা অদৃশ্য হয়।

বলে কর্নেল চুরুট বের করে জ্বেলে নিলেন। তারপর ফের বললেন—আগরওয়াল সাহেব ফিরে এসে আপনাকে অজ্ঞান দেখেন। তখন লোকজনকে খুব বকাবাকি করেন। তাদের অবশ্য দোষ ছিল না। ওই বিস্ময়কর প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটা প্রত্যক্ষ দেখে সবাই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা মিঃ সান্যাল, যে সার্ভেয়ার ভদ্রলোক গুলি ছুড়েছিলেন, তিনি কি এখনও আছেন ওখানে?

হংসধ্বজ মাথা নাড়ালেন।—সে একটা দুঃখের ব্যাপার কর্নেল। ভদ্রলোক ওই ভয়ানক প্রাণীটা দেখার পর থেকে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর চাকরি ছেড়ে চলে যান। খুব অভিজ্ঞ খনিতত্ত্ববিদ ছিলেন। ধাতুবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ বটে। কী করি? থাকলেনই না যখন, আটকালুম না। আর শুধু উনি একা নন—সার্ভেয়ার গ্রুপের বাকি সবাই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছে। এলাকার কুলিকামিনারও পালিয়েছে। অবশেষে নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং কুলিকামিন সংগ্রহ করেছি আমরা।

আমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলুম ভেতরে ভেতরে। তাহলে সেই রহস্যময় ভয়ঙ্কর দানবের খোঁজেই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে চলে এসেছেন? উত্তেজনা দমন করলুম। 'অরুণাচলে ইয়েতি' নামে একটা সম্ভাব্য রিপোর্টাজ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দৈনিক 'সত্যসেবকে'র বিক্রিসংখ্যা আবার একদফা বেড়ে যাবে।...

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছলেন হরিহর আগরওয়াল। বয়সে হংসধ্বজেরই কাছাকাছি। আয়তনে একটু মোটা এই যা। রংটা ধবধবে ফর্সা। খুব হাসিখুশি মানুষ। দু'জনে ছাত্রজীবন থেকেই বন্ধু। চা বাগিচা ও একটা খনিতে দু'জনের অংশীদারীত্ব সমান সমান। চমৎকার বাংলা বলতে পারেন আগরওয়াল। অবাঙালি বলে চেনা কঠিন। এসে জানালেন—নতুন সার্ভেয়ার গ্রুপ এবং লোকজন অলরেডি চলে গেছে। কাজ শুরু হয়েছে। শীগ্‌গির পৌঁছনো দরকার। নয়তো তারাও পালাবে।

পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হল। ট্রেনে লামডিং, ডিমাপুর হয়ে তিনসুকিয়া এবং তারপর ডিব্রুগড়। সেখান থেকে আবার ট্রেনে ডাঙ্গোরি। ডাঙ্গোরি থেকে জিপের ব্যবস্থা করা ছিল। লোহিত নদী পেরিয়ে মদিয়া নামে একটা জায়গায় পৌঁছলুম—সেখানেই সভ্যজগতের সীমানা শেষ হয়েছে। দুটো দিন দুটো রাত কেটে গেল রাস্তায়। মদিয়া থেকে দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গল শুরু। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। আমাদের জিপ কিন্তু হেলেদুলে নির্ভয়ে চলতে থাকল।

খামতি পৌঁছলুম সন্ধ্যা নাগাদ। তখন শরীর একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। নার্ভও বিপর্যস্ত। কর্নেল বুড়ো কিন্তু আশ্চর্য নির্বিকার। সারাপথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছেন। এই সব অঞ্চলেই নাকি উনি ছিলেন এবং সব নখদর্পণে। এমনকি অনেক পাহাড়ি সর্দারের সঙ্গে ভাব হয়েছিল—কর্নেলের বিশ্বাস, দেখলে তারা এখনও চিনতে পারবে।

একটা সুদৃশ্য উপত্যকায় সান্যালসায়েবদের লোকেরা কাজ করছে। ছোট নদী আছে। তার দু'ধারে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলের একদিকে খনি খোঁড়ার এবং মাটি পরীক্ষার কাজ চলছে। তাঁবুগুলো একটা টিলার গায়ে। কাজের চেয়ে হল্লাটা খুব বেশি মনে হল। সম্ভবত ইয়েতির আতঙ্কে সবাই

জড়োসড়ো। এখানে ওখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। তার ওপর এখন নিজেদের জেনারেটর থেকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোয় জায়গাটা দিনের মতো ফর্সা হয়ে রয়েছে। মনে হল, ইয়েতির কর্তাবাবার সাহস হবে না, আবার এখানে এসে ঢুঁ মারে। কর্নেল জায়গাটা দেখতে দেখতে একটু হেসে ঠিক তাই বলে উঠলেন।

খাওয়ার পর ক্যাম্পচেয়ারে বসে সবাই যখন গল্পগুজব শুরু করেছে, আমি তখন তাঁবুর ভেতরে গড়িয়ে পড়েছি। শরীর একেবারে অচল। ঘুম পাচ্ছে প্রচণ্ড। আতঙ্কও হচ্ছে—যদি ইয়েতি এসে আমারও গলা চেপে ধরে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে অব্দি বাইরে ওদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম। কর্নেল বলছিলেন—ইয়েতির চামড়া কেমন মনে হয়েছিল বললেন মিঃ সান্যাল? খসখসে—শক্ত, তাই না? দ্যাটস পসিবিল্।

হংসধ্বজবাবুর গলা শুনলুম।—হ্যাঁ, খসখসে, শক্ত! কেমন যেন প্লাস্টার আঁটা মানুষের মতো।...

তারপর ঘুমিয়ে গেছি। এমন গভীর ঘুম জীবনে ঘুমোইনি। ইয়েতি এলে দিব্যি আমাকে মেরে যেতে পারত। ঘুম যখন ভাঙল, অভ্যাসমতো হাতঘড়ির দিকে তাকালুম—ছ'টা। কিন্তু প্রচুর রোদ ফুটেছে বাইরে। অরুণাচল কি না। তখন নিজের ঘুমের প্রতি ব্যাজার হলুম। এমন ঘুম তো কলকাতায় দেখি না আসতে! এই ইয়েতির জঙ্গলে এত ঘুম!

পাশের ক্যাম্পখাটের দিকে তাকিয়ে দেখি বুড়ো নেই। উঠে পড়লুম। বাইরে যেতেই দেখা হল হংসধ্বজের সঙ্গে। বললেন—গুড মর্নিং মিঃ চৌধুরি!

—গুড মর্নিং! কর্নেল কোথায়?

—উনি তো পাঁচটায় বেরিয়েছেন। ওরা নিষেধ করেছিল—শোনেননি। এখন আগরওয়াল ওঁর খোঁজে গেল। ... উদ্বিগ্ন মুখে হংসধ্বজ একথা বললেন।

আমি হেসে বললুম—ভাববেন না। ওঁর নানান বাতিক। সঙ্গে অদ্ভুত ক্যামেরা দেখেছেন? বাইনাকুলারটাও আশা করি দেখেছেন? হয়তো দেখবেন, ইয়েতির ছবি তুলে নিয়েই ফিরে আসবেন।

হংসধ্বজ তবু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। বললেন—এলাকার উপজাতীয় কোনও কোনও গোষ্ঠী এখনও খানিকটা বন্য স্বভাবের এবং হিংস্র। সভ্য মানুষ দেখলে মেরে ফেলে। তাছাড়া বৈরী নাগারাও থাকতে পারে! বেশিদূর গিয়ে পড়লে.....

বাধা দিয়ে বললুম— কর্নেল তো বলেছিলেন, এলাকা ওঁর চেনা। ভাববেন না। ওই বুড়োকে তো আমি চিনি।

চা-ব্রেকফাস্টের পর আমাকে হংসধ্বজ ওঁদের খনির কাজ দেখাতে নিয়ে গেলেন। সব ঘুরে দেখতে দশটা বেজে গেল। তারপর কর্নেল ফিরলেন। সঙ্গে আগরওয়ালও আছেন। আগরওয়াল এসেই বললেন—সান্যাল! ইউরেকা! এইজন্যেই তো আমি তোমাকে বলেছিলুম—কর্নেল সায়েব ছাড়া এই ইয়েতি রহস্য ফাঁস করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লু পাওয়া গেছে।

হংসধ্বজ অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

—কর্নেল এই ইয়েতির পায়ের ছাপ খুঁজে পেয়েছেন। আমিও গিয়ে স্বচক্ষে দেখলুম। একেবারে মানুষের মতো!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—না, কতকটা মানুষের মতো!

হংসধ্বজ উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করলেন—কোথায় দেখলেন? কত দূরে? কাছাকাছি নাকি?

—খুব বেশি দূরে নয়। ওই নদীর বালিতে—মাত্র তিনশো গজ দূরে।

হংসধ্বজের মুখ সাদা হয়ে গেল।—সর্বনাশ! বলেন কী!

আগরওয়ালকে দেখে মনে হল, ভয় পাননি। বললেন—শুধু তাই নয়। ওই পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমরা ওপারের পাহাড়ের একটা গুহার সামনে পৌঁছলুম। গুহায় অবশ্য ঢুকতে সাহস পাইনি। পরে লোকজন নিয়ে ঢুকব বলে দু'জনে বড় একটা পাথর ঠেলাঠেলি করে মুখটা বন্ধ করে লেুম। সান্যাল, অবিকল সেই রাতের মতো বিটকেল গন্ধও আমি টের পেয়েছি সেখানে।

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন—আমি অবশ্য পাইনি।

আমি বললুম—ইয়েতির কাছে ওই পাথরটা কি বাধা হবে মনে করেন কর্নেল?

ও তো এক ধাক্কায় গুহার দরজা ফাঁক করে বেরিয়ে আসবে!

কর্নেল মাথা নাড়লেন আবার।—ইউ আর রাইট, জয়ন্ত।

—তাহলে পাথর ঠেলাঠেলি করতে গেলেন কেন, শুনি?

—আগরওয়াল সায়েব জেদ করলেন, তাই।

আগরওয়াল ব্যস্তভাবে বললেন—কর্নেল! পাথরটা কিন্তু এমনভাবে খাঁজে আটকে দিয়েছি আমরা যে গুহার ভেতর থেকে ঠেলে সরানো অসম্ভব।

কর্নেল তাঁর দিকে ঘুরে বললেন—ইউ আর রাইট।

আমি হতভম্ব। আমাকেও রাইট বললেন, আবার আগরয়ালকেও রাইট বলেন? অর্থাৎ ইয়েতিটা গুহার মুখের পাথর ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং পারবে না—এমন পরস্পরবিরোধী কথা কেন বললেন কর্নেল? বুড়িয়ে বাহাত্তুরে ধরেছে নির্ঘাৎ। মনে মনে হাসলুম—আবার উদ্বিগ্নও হলুম।

হংসধ্বজ ভয়ে ভয়ে বললেন—আপনি কি মনে করেন, সত্যি গুহার মধ্যে ইয়েতি আছে?

কর্নেল আবার মাথা নাড়লেন।—জানি না। তবে পায়ের ছাপ আমরা গুহার ভেতর অব্দি দেখেছি। এটুকুই বলতে পারি। যাইহোক, আপনারা লোক জোগাড় করুন। দু'ঘন্টার মধ্যে আমরা বেরোব....

একটু পরেই দেখি, খবরটা কীভাবে পাচার হয়ে গেছে। ইতস্তত জটলা এবং আলোচনা চলছে। কুলিকামিন, সার্ভেয়ার গ্রুপ সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। হংসধ্বজ এবং আগরওয়াল বেগতিক দেখে সবাইকে সাহস দিয়ে বেড়াচ্ছেন। সেই ফাঁকে কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। তারপর একটা গাছের তলায় গিয়ে চাপা এবং গম্ভীরস্বরে বললেন—জয়ন্ত! এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছি এখানে এসে। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু এখানে এসে যা বুঝতে পারছি তাতে....

বাধা দিয়ে বললুম— পুরো ব্যাপারটা গুল?

— স্রেফ গুলই বা বলি কী করে? আগের লোক যারা জনাকতক এখনও দলে রয়েছে, সকালে তাদের প্রত্যেকের কাছে ঘটনাটা জেনেছি। সবাই ইয়েতিকে দেখেছে। বিরাট সাদা মূর্তি। দু'হাত সামনে ঝুলিয়ে হেঁটে গেছে। সে-রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল। দেখতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। অথচ আমার ইনটুইশন বলছে—জয়ন্ত,আমার সেই বিস্ময়কর ইনটুইশনের কথা স্মরণ করো—যা থেকে আমি আবহাওয়ায় কোনও হত্যাকাণ্ডের গন্ধ টের পাই।

ভয় পেয়ে বললুম—সে কী; আপনার মনে হচ্ছে এখানেও কোনও হত্যাকাণ্ড হবে?

—হবে, জয়ন্ত। আই জাস্ট স্মেল ইট। কিন্তু কীভাবে হবে—কে খুন করবে, কেই বা খুন হবে—কিচ্ছু জানি না। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি নিজেকে এক অসহায় দেখছি—কহতব্য নয়।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—হংসধ্বজ আর আগরওয়ালের মধ্যে পার্টনারশিপের ব্যাপারে কোনও রেষারেষি নেই তো?

—কোনও প্রমাণ পাইনি। কলকাতায় আগে ওঁদের কনসার্ন সম্পর্কে খোঁজখবর স্বাভাবিক কৌতূহলবশতই নিয়ে এসেছি। দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললে ভুল হয়—একেবারে একাত্মা। একসঙ্গে খায় ও ঘুমোয়। দুজনেই বাবার ত্যাজ্যপুত্র—ঘরপালানো দুঃসাহসী ছেলে। যা কিছু সম্পত্তি করেছে সব নিজের উদ্যমে। তাছাড়া, যা বুঝেছি—এইসব সম্পত্তি অর্জন, ওদের কাছে নেশার মতো। উদ্দেশ্যহীন। জীবনে এমন অনেক মানুষ আছে জয়ন্ত—যারা নেশার ঘোরে নানা কাজ করে বেড়ায়। টাকার মালিক হওয়াটাই তাদের সুখ নয়—সুখ বিচিত্র সব কাজে। এমন মানুষ এই দুই বন্ধু। এদের মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে, আমি জানি না—যাতে কেউ কাউকে খুন করতে চাইবে?

আমি চুপ করে থাকলুম। বুড়োর এ স্বভাবের কথা জানি। কেউ কোনও ব্যাপারে ডাকলেই উনি তার সম্পর্কে বিশদ হালহদিশ না জেনে এগোবেন না। ইয়েতিই হোক, আর বাড়িতে ভূতের ঢিল পড়ুক কিংবা চুরি-ডাকাতিই হোক—মক্কেলের আতিপাতি জানা চা-ই।

কর্নেল টুপি খুলে টাকে বাতাস লাগাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন—এস জয়ন্ত, আমরা সার্ভেয়ার গ্রুপের হেড ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করি। উনি শুনেছি ভারতের শ্রেষ্ঠ ভূতত্ত্ববিদদের অন্যতম। অনেক চড়া দামে ওকে হংসধ্বজবাবুরা ক'মাসের জন্য এনেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আজকাল এসব ব্যাপারে এক্সপার্টদের সহায়তা পাইয়ে দিচ্ছে—তাই ওঁকে পেতে অসুবিধে হয়নি। তুমিও কোথাও খনিটনির সম্ভাবনা খুঁজে বের করো না! সরকার তোমাকে সবরকম টেকনিক্যাল নো-হাউ দিয়ে সাহায্য করবে। করবে নাকি জয়ন্ত?

কথাটা বলে কর্নেল হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। কিন্তু হাসিটা কেমন শুকনো মনে হল।...

দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যেই হংসধ্বজ আর আগরওয়াল প্রায় একশো লোকের একটা অভিযাত্রী বাহিনী গড়ে তুললেন। অধিকাংশই ওই অঞ্চলের অধিবাসী। তারা যেমন দুঃসাহসী, তেমনি গোঁয়ার মানুষ। অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যেকের হাতেই রয়েছে। বন্দুকও মোট পাঁচটি। আমি ও কর্নেল সঙ্গে এনেছিলুম শিকারের রাইফেল। হংসধ্বজ ও আগরওয়ালেরও শিকারের রাইফেল আছে। হেড সার্ভেয়ার মিঃ পরেশ পুরকায়স্থের নিজস্ব রাইফেল রয়েছে। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকের একটা করে রিভলবারও আছে। কাজেই আয়োজন খুব সাংঘাতিক হল। দেখলুম স্থানীয় লোকেরা ঢাকও নিয়েছে কয়েকটা। শিঙাও আছে গোটা দুই।

এছাড়া কয়েক টিন পেট্রোল আর ফার্স্ট এডের সরঞ্জামও নেওয়া হল। সার্ভেয়ার গ্রুপের সঙ্গে একজন ডাক্তারও ছিলেন এখানে। ব্রজবিলাস বর্মন আমাদের লোক। তিনি বড় ভীত মনে হল। মুখ পাংশু। ভিড়ের ভিতর ঢুকে অনিচ্ছায় পা বাড়ালেন।

রীতিমতো ইয়েতি অভিযান। সব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম। জব্বর রকমের রিপোর্টাজ লিখতে হবে কাগজের জন্যে।

একঘন্টা কষ্টকর যাত্রার পর প্রায় দুর্গম এক পাহাড়ের গুহার সামনে আমরা পৌঁছলুম। কর্নেলকে দেখলুম, যেন মোটেও নেতৃত্ব নিতে রাজি নন। সব আগরওয়ালের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক জল্পনার পর ব্যূহ সাজানো হল কয়েকটা। গুহামুখ থেকে তিরিশ গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে হংসধ্বজের নেতৃত্বে একদল ওত পেতে বসল। দুটো দল যথাক্রমে হেড সার্ভেয়ার পরেশবাবু ও ভীতু ডাক্তারের নেতৃত্বে ডাইনে ও বাঁয়ে পাথরের আড়ালে বসল। চতুর্থ দল গুহামুখের উপরে পাহাড়ে গেল। সেখানে গাছ ও পাথরের আড়ালে তারাও বসল। চতুর্থ দল গুহামুখের উপরে পাহাড়ে গেল। সেখানে গাছ ও পাথরের আড়ালে তারাও বসল। তাদের নেতাকে আমি চিনি না—মনে হল সার্ভেয়াদের কেউ। পঞ্চম দলে আমি ও কর্নেল—সঙ্গে কুড়িজন উপজাতীয় কুলিকামিন। আমরা চলে গেলুম পাহাড়ের পিছনের দিকে—একটা ফাটলে গিয়ে

ঠাসাঠাসি বসে পড়লুম। ফাটলটা ভূমিকম্পের ফলে হয়েছে। আন্দাজ হাত ছয়েক চওড়া। অনেক ছোট বড় পাথরে ভর্তি। ইয়েতি তাড়া করলে নির্ঘাত মারা পড়তে হবে। এখানে বসার কারণ, গুহার অন্যমুখে ইয়েতি বেরোলে আমরা তাকে আক্রমণ করব। কিন্তু তাকে প্রাণে মারা চলবে না। ঠ্যাং খোঁড়া করে কাবু করতে হবে, অর্থাৎ জ্যান্ত ধরারই প্ল্যান করা হয়েছে।

কথা হয়েছে, গুহার মুখে শুকনো লকড়ি ঠেসে দিয়ে পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন ধরানো হবে। ধোঁয়া দেখলেই আমরা প্রত্যেকটি দল সতর্ক হব।

হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দলের একজনকে ডেকে হিন্দিতে বললেন—নাতানুক! তুমি ওদের লিডার হও। আমি আর এই জয়ন্তবাবু নীচের দিকে গিয়ে বসি। না না—আমরা দু'জনই যথেষ্ট। মনে রেখো, তুমিই লিডার নাতানুক?

নাতানুক নামে লোকটা প্রৌঢ়। দারুণ শক্ত সমর্থ চেহারা—বেঁটে খাটো, থ্যাবড়া নাক, কুতকুত চোখে হাসি। বুঝলুম ও খুশি হয়েছে। কুলিদের সর্দার সে। সায় দিয়ে একটা ধারালো প্রকাণ্ড দায়ের মুঠো যেভাবে চেপে ধরল, মনে হল ইয়েতির একটা ঠ্যাং সে কাটবেই। আমরা পিছনের দিকে দ্রুত এগোলুম। অবশ্য আমি কর্নেলের মতলব একটুও টের পাচ্ছি না। পাথরের বাধা পেরিয়ে অনেক কষ্টে ওঁকে অনুসরণ করছি। মনে প্রচণ্ড উত্তেজনা। তাহলে সেই কিংবদন্তিখ্যাত রহস্যময় তুষারদানব সত্যি কি স্বচক্ষে দেখার অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছি? আমার সঙ্গে ক্যামেরাও আছে। ফিল্ম রেডি। শুধু শাটার টেপার ওয়াস্তা। এই প্রথম দৈনিক সত্যসেবকের পাতায় সত্যিকার ইয়েতির ছবি দেখা যাবে। হে ঈশ্বর, সদয় হও!

কিন্তু কর্নেল থামবার তালে নেই। কোথায় যাচ্ছেন উনি? ফাটলের শেষে একটা খোলা জায়গায় পড়লুম। অমনি পাহাড়ের অন্যদিক থেকে ভেসে এল তুমুল চিৎকার ও বন্দুকের শব্দ। তারপর ধোঁয়া দেখতে পেলুম। কর্নেল বলে উঠলেন—জয়ন্ত! কুইক, ওই পাথরের আড়ালে চলো।

প্রকাণ্ড পাথরের পিছনে গিয়ে বসলুম দুজনে। চেঁচামেচির সঙ্গে ঢাকের আওয়াজ ও বন্দুকের শব্দ বাড়তে থাকল। রুদ্ধশ্বাসে মুহূর্ত গুনছি। জানি না ইয়েতিটা কোনদিকে বেরোবে। পাহাড়ের উপর আকাশে মেঘের মতো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি।

তারপর আমার পাঁজরে খোঁচা দিলেন কর্নেল। তাকিয়েই আমি হতবাক, চোখ নিষ্পলক। ক্যামেরার কথা ভুলেই গেলুম। দিন দুপুরের ঝলমলে রোদে এদিকটা ভরে আছে। পাহাড়ের এ-পিঠ সম্পূর্ণ ন্যাড়া। উপরের একটা খাঁজের তলায় দাঁড়িয়ে আছে ...

হ্যাঁ, সেই কিংবদন্তিখ্যাত প্রাগৈতিহাসিক তুষার মানব অথবা দানব। সেই রহস্যময় ইয়েতি! বিশাল উঁচু ও চওড়া দেহ। উলঙ্গ। সম্পূর্ণ সাদা। চামড়া যেন ভাঁজবহুল। হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। স্বপ্ন দেখছি না তো? আমাদের মাথার উপর পাথরের চাতালে আন্দাজ কুড়িফুট দূরত্বে প্রাণীটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে। লাফ দিলেই আমাদের উপর এসে পড়বে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর কর্নেল আচমকা হাততালি দিলেন। আর অমনি ইয়েতিটা আমাদের দেখতে পেল। তারপর চাতালের অন্যদিকে সরে গেল। আমি রাইফেল তুললেই কর্নেল বললেন—ক্যামেরা জয়ন্ত, ক্যামেরা!

তখন রাইফেল নামিয়ে ক্যামেরা তুলে পটাপট কয়েকটা ছবি নিলুম। ততক্ষণে ইয়েতি লাফ দিয়েছে। চাতাল আছে ধাপে ধাপে। কয়েকটি লাফে আমাদের পাথরটার আড়ালে যেতেই কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠলুম। দেখলুম, ইয়েতিটা সমতলে পড়ে দৌড়চ্ছে। একেবারে মানুষের মতো দৌড়চ্ছে। কর্নেল দৌড়তে শুরু করলেন তার পিছনে। আমি একটু ইতস্তত করে তাঁকে অনুসরণ করলুম। চেঁচিয়ে উঠলুম—সাবধান কর্নেল।

গাছপালার মধ্যে তখন ঢুকে পড়েছে জন্তুটা। কর্নেল কি পাগল? তিনি পিছনে দৌড়চ্ছেন—আমিও বোকার মতো দৌড়চ্ছি। হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম, গুলি করুন। কর্নেল, গুলি!

কর্নেল আমাকে বোকা বানিয়ে জোরে হেসে উঠলেন এবং চাপা গলায় ইয়েতিটার উদ্দেশে বললেন—আমরা আপনার বন্ধু মিঃ সান্যাল! প্লিজ, একটু দাঁড়ান। আপনার কোনও ভয় নেই।

আমাদের চারপাশে ঘন জঙ্গল। ছায়া আছে। ইয়েতিটা তক্ষুণি দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরে মানুষের কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—কে আপনারা?

কর্নেল অকুতোভয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইনি কলকাতার দৈনিক সত্যসেবকের প্রখ্যাত রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আর জয়ন্ত, ইনিই হলেন আদি ও অকৃত্রিম মিঃ হংসধ্বজ সান্যাল।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলুম। কর্নেল বললেন—আপাতত মিঃ সান্যাল, আপনার গায়ের প্লাস্টারগুলো আগে ছাড়িয়ে ফেলা দরকার। আপনার আর ইয়েতি সাজবার কোনও কারণ নেই। আমি সব টের পেয়েছি।

ইয়েতি ক্লান্তস্বরে বললেন—কিন্তু আগরওয়াল আর ওই শয়তান প্রতারকটার কী হবে? ওদের যে আমি শাস্তি দিতে পারলুম না! বরং আমাকেই ওরা পুড়িয়ে মারার ষড়যন্ত্র করল।

কর্নেল হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে বললেন—সেজন্যে আইন আছে, মিঃ সান্যাল। এসব ব্যাপারে আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে আপনি যে অভিনব পন্থা নিয়েছেন, তা মোটেও কাজের নয়; উল্টে আপনিই পুড়ে মরতেন।

এখন চলুন কোনও ঝরনায় গিয়ে সেখানে গায়ের প্লাস্টার খুলে আমরা তিনজনে কোনও উপজাতীয়দের গ্রামে যাব। সেখানে আপনাকে নিরাপদে রেখে আমরা দু'জনে ফিরব। কথা দিচ্ছি, আগামিকাল যে কোনও সময় আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। ততক্ষণে আপনার পার্টনার আগরওয়াল এবং তার সহকারী জাল হংসধ্বজ সান্যালকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানবেন।...

তখন বিকেল হয়েছে।

দাফাং নামে একটা গ্রামের মোড়লের বাড়ি সত্যিকার হংসধ্বজবাবুকে রেখে আমরা ফিরলুম ক্যাম্পে। দেখি, সবাই কখন ফিরেছে। আমাদের দেখে আগরওয়াল ও জাল হংসধ্বজ দৌড়ে এলেন। কর্নেল ক্লান্ত স্বরে বললেন—ইয়েতিটার পিছনে অনেকদূর গিয়েছিলুম। গুলিও করলুম। কিন্তু আমাদের বরাত। পালিয়ে গেল।

কথামতো আমি ইনিয়ে বিনিয়ে সব ব্যাপারটা বানিয়ে শোনালুম। শুনে ওঁরা খুব নিরাশ হলেন। তারপর কর্নেলের পরামর্শমতো আমি কলকাতায় আমার কাগজে খবর পাঠাতে তক্ষুণি মদিয়া যেতে চাইলুম। জিপের ব্যবস্থা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনেক রাতে সেখানে সরকারি বাংলোর চৌকিদারকে ঘুম থেকে তুলিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম। জিপের ড্রাইভারকে বললুম—আপাতত এখানেই রাত কাটাতে চাই। কাল সকালে আমরা ফিরব। সে রাজি হল। রাস্তা দুর্গম—তাতে বৈরী নাগাদের ভয় আছে। রাতে ফেরা নিরাপদ নয়।

সেই রাতেই কর্নেলের চিঠি নিয়ে থানায় যোগাযোগ করলুম। তারপর রাতটা বাংলোয় কাটিয়ে পরদিন সকালে ক্যাম্পে পৌঁছলুম। পুলিশ আসবে কথামতো দুপুরের মধ্যেই।

কিন্তু তখনও রহস্যের চাবিকাঠি কর্নেলের হাতে। এই ওঁর অভ্যাস।

কর্নেল কিছুক্ষণের জন্যে একবার একা জঙ্গলে ঘুরে এলেন। বিরল জাতের পাখি দেখতেই বেরিয়েছিলেন। আমি আগরওয়ালদের নানা কথায় ভুলিয়ে রাখলুম। তারপরে সবে লাঞ্চ সেরে কর্নেল ও আমি তাঁবুতে গড়াচ্ছি—পুলিশের জিপের আওয়াজ কখন শোনা যাবে সেই প্রতীক্ষা

করছি—হঠাৎ আগরওয়ালের তাঁবু থেকে চাপা ধস্তাধস্তির শব্দ কানে এল। কর্নেল অমনি লাফিয়ে উঠে বললেন—কুইক জয়ন্ত! রিভলভার লোড করে নাও। চলে এস। দেখলুম উনিও রিভলভার হতে নিলেন! দু'জনে দৌড়ে আগরওয়ালের তাঁবুতে গেলুম। কর্নেল পর্দা তুলেই গর্জে উঠলেন—মিঃ আগরওয়াল, দাঁড়ান!

উঁকি মেরে একপলকেই দেখলুম দৃশ্যটা। দুটো ক্যাম্প খাটের মাঝে মেঝেয় জাল হংসধ্বজকে ফেলে তার বুকে বসে আছেন আগরওয়াল। দু'হাতে গলা টিপে ধরেছেন।

আগরওয়াল তখুনি উঠে কাঠ হয়ে দাঁড়লেন। কর্নেল বললেন—কাজে নেমে ঝগড়া মারামারি কাজের কথা নয় মিঃ আগরওয়াল। বখরা নিয়ে এসব ক্ষেত্রে খুনোখুনি হয়েই থাকে। তবে খুন করে ইয়েতির ঘাড়ে চাপানোর আর উপায় নেই মশাই!

আগরওয়াল ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন—কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—নিশ্চয় পারছেন। বিশেষ করে যখন সত্যি সত্যি ইয়েতির আবির্ভাব ঘটেছে। তখন সবাই টের পেয়ে গেছেন বই কি। নিশ্চয় আঁচ করেছেন, এই ইয়েতিটা আসলে কে!...কর্নেল একটু হাসলেন।—অবশ্য, আপনি যখন আমার কাছে ইয়েতির খবর নিয়ে যান, তখন একটুও ভাবেননি যে ওই ইয়েতিটা আপনার পার্টনার ও আজীবন বন্ধু হতভাগ্য হংসধ্বজ সান্যাল। তখন সত্যিকার ইয়েতির আতঙ্কেই আমার সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যখন কথায় কথায় আমি এই জাল হংসধ্বজের কাছে জেনে নিলুম যে ইয়েতির গায়ের চামড়া খসখসে শক্ত এবং ভাঁজবহুল—কতকটা প্লাস্টারের মতো, তখনই আপনি সন্দেহ করতে শুরু করেন। তারপর ওই গুহার দরজায় গতকাল সকালে আমার সঙ্গে গিয়ে ঠিক আমারই মতো এমন কিছু চিহ্ন আপনার চোখে পড়েছিল, যাতে ইয়েতিটা যে কে চিনতে আপনার দেরি হয়নি। তাই তাকে পুড়িয়ে মারতে ব্যবস্থা করলেন। সবই ঠিক ছিল। বাদ সাধলুম আমি। গুহার পেছন দিকটায় আমি থাকতে চাইলুম। তাতে আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ ইয়েতি বেরোলে নাতানুক সর্দাররা ঝোঁকের বশে তাকে মেরেই ফেলত। আপনি কৌশলে ইয়েতির লাশটা নিশ্চয় আমার অগোচরে নষ্ট করার ব্যবস্থা করতেন। কিংবা একটা গল্প রটাতেন। যাই হোক, এবার আপনি দ্বিতীয় খুনের উদ্যোগে ব্যস্ত ছিলেন। কারণ, এই জাল হংসধ্বজ সব টের পেয়ে আপনাকে ব্ল্যাকমেল শুরু করেছিলেন। গত রাতে সুবিধে হয়নি—কারণ জয়ন্ত ছিল না বলে আমি জাল হংসধ্বজকে শুতে ডাকলুম। তাই মরিয়া হয়ে আজ কাজে নেমেছিলেন।

জাল হংসধ্বজ উঠে বসেছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—সবে ঘুম এসেছে। হঠাৎ দেখি ব্যাটা আমার বুকে চেপে গলা টিপে ধরেছে। উঃ! আগে যদি জানতুম ওর মতলবটা কী!

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। ওর তর সইছিল না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এরপর আগরওয়াল চাদর মুড়ি দিয়ে লাশ ঢেকে রাখতেন। আমাদের বলতেন— সান্যাল অসুস্থ, বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারপর রাতে হইচই করে রটাতেন যে ইয়েতিটা এসেছিল। সেই গলা টিপে মেরে গেছে। বাঃ! চমৎকার সুযোগ! কারণ, গুহায় তখন ইয়েতিটা মারা পড়েনি। অতএব কি না প্রতিশোধ নিয়ে গেছে। অপূর্ব, মিঃ আগরওয়াল!

পুলিশের জিপের আওয়াজ শোনা গেল এতক্ষণে!...

আমরা মদিয়ার ডাকবাংলোয় রাত কাটাচ্ছিলুম। কলকাতা ফিরে আসছি। 'অরুণাচলের ইয়েতি' নিয়ে ভাবছি, কর্নেল বললেন—বৎস জয়ন্ত কি হতাশায় ভুগছ?

—অবশ্যই! ইয়েতি যে গুল, সাতকাহন লেখার মানে হয় না।

—কিন্তু তার বদলে 'সীমান্তে গুপ্তচর চক্র উচ্ছেদের' কী চমৎকার একটা খবর তোমরা এবার ছাপাবার সুযোগ পেলে দেখ!

অবাক হয়ে বললুম—গুপ্তচর চক্র! তার মানে? কোথায় গুপ্তচর?

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন—ও, আই অ্যাম সরি। তোমাকে মূল ব্যাপারটা তো বলাই হয়নি।

—কিছু বলা হয়নি। কেনই বা জাল হংসধ্বজ—কেন এসব ঘটল...

—এক মিনিট। বলছি সব। বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। আরামে হাত পা ছড়িয়ে বসলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন : হংসধ্বজ সান্যাল লোকটি সৎ—কিন্তু নির্বোধ। তাছাড়া তাঁর মাথায় কিঞ্চিৎ পাগলামিও আছে। নানান অদ্ভুত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাও করেন না। দুর্গম এলাকায় খনি খোঁজা তাঁর বাতিক। নেফা এলাকায় তিনি সেই উদ্দেশ্যেই যাতায়াত করতেন। আর তাঁর বন্ধু হরিহর আগরওয়াল তাঁর উল্টো—অসম্ভব ধূর্ত। যেভাবে হোক, এই এলাকায় এসে আগরওয়াল হংসধ্বজের অগোচরে এক বিদেশি রাষ্ট্র ও বৈরী নাগাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হয়ে ওঠে। হংসধ্বজ আগে জানলে তাঁকে বাধা দিতেন। জানলেন সীসের খনি খুঁজতে এসে যখন ক্যাম্প করা হল, তখন। বিস্ময়ে দুঃখে হতচকিত হলেন হংসধ্বজ। বোঝানোর চেষ্টা করলেন বন্ধুকে। কিন্তু তখন আর আগরওয়ালেরও ফেরার পথ নেই। বৈরী নাগাদের যে গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ, তখন উল্টো গাইলে তারা তাকে মেরে ফেলবে—আবার হংসধ্বজকেও খুন করবে।

এদিকে হংসধ্বজ তাঁকে শাসাচ্ছেন—নাগাদের সঙ্গে আর এতটুকু যোগাযোগ রাখলে পুলিশকে জানাতে বাধ্য হবেন। অবশ্য সেটা নিছক হুমকি। এই সীসের খনি আর বন্ধুত্ব দুই-ই হংসধ্বজের কাছে মূল্যবান। আগরওয়াল দেখলেন, যেদিকে পা বাড়াবেন, সেদিকেই বিপদ। যদি চিরদিনের নির্বোধ ও ছিটগ্রস্ত এই বন্ধুটি সত্যি সত্যি ঝোঁকের বশে টহলদার পুলিশ বা সেনাবাহিনীর কানে কথাটা তুলে দেন, সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। শেষ অবধি আগরওয়ালের মাথায় খুন চড়ে গেল। ক্যাম্পে তখনও সার্ভেয়াররা পৌঁছায়নি। কেবল একদল কুলি জোগাড় করা হয়েছে। তারা স্থানীয় লোক। এসে হাজিরা দিয়েই নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়। একরাতে আগরওয়াল ঘুমন্ত বন্ধুর বুকে বসে গলা টিপে ধরলেন। যখন দেহটা নেতিয়ে পড়ল, চুপিচুপি সেটা নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে ফেলে দিলেন। রান্না ও অন্যান্য কাজের লোক জনা পাঁচ ছিল। তারা কেউ টের পেল না। সকালে রটিয়ে দিলেন, হংসধ্বজ রাতে মদিয়া গেছেন। ফিরতে দু' একদিন দেরি হবে। ওদিকে একটা পাহাড়ের খাদে যেখানে দেহটা ফেলেছেন, তার নিচেই নদী। নদীতে গভীর বালি আছে। আশ্চর্য শক্ত প্রাণ হংসধ্বজের! পরদিন একদল উপজাতীয় শিকারি তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে যায় নিজেদের গাঁয়ে। সেবাশুশ্রূষা করে। তারপর সাত মাইল দূরে বাংলা মিশনারি হাসপাতালে রেখে আসে। এ ঘটনা ২০শে মে ঘটেছিল। ২৩শে মে ক্যাম্পে সার্ভেয়াররা আসে। কাজ শুরু হয়। কিন্তু রাঁধুনি চাকরবাকর সবাইকে রাতারাতি তখন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই ভূতুড়ে বন-বাদাড় থেকে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। সব ছিল সমতলের বাসিন্দা। নতুন রাঁধুনি ও চাকর-বাকর এনেছে আগরওয়াল। আর এনেছে ওই জাল হংসধ্বজকে। হংসধ্বজের উদ্যোগে এবং তাঁর পার্টপারশিপেই খনির লাইসেন্স, সরকারি লোন ও টেকনিক্যাল সহায়তার ব্যবস্থা। অতএব হংসধ্বজ একজন থাকা চাই পাশে। পরে যখন দরকার বুঝত, তখন সে জালটাকেও খতম করে দিত এবং ইয়েতির নামেই সেটা রটাত। এই জঙ্গলে মানুষ খুন করা এমন কিছু কঠিন নয়। যাই হোক, জাল হংসধ্বজকে নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ চলছিল। ২৫শে মে রাতে হঠাৎ ক্যাম্পে ইয়েতির আবির্ভাব ঘটল। ভয় পেয়ে গেল আগরওয়াল।

ইয়েতিটা সেও স্বচক্ষে দেখল। একেবারে সত্যিকার আতঙ্ক। সার্ভেয়াররা পালিয়েছে। কুলিরা ভেগে গেছে। তাই সে কলকাতায় গিয়ে আমার শরণাপন্ন হল। কোন এক সূত্রে আমার সঙ্গে তার অল্পস্বল্প চেনা ছিল। আমি ইয়েতিটা ধরতে বা হত্যা করতে পারলে তার সীসের খনি এবং গুপ্তচরচক্র দুটোই বজায় থাকে।

এবার প্রশ্ন করলুম—ইয়েতির প্ল্যান হংসধ্বজবাবুর মাথায় এল কীভাবে?

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন—মে মাসের মাঝামাঝি এই এলাকায় একজোড়া দশফুট উঁচু মানুষের মতো প্রাণী ধরা পড়ে উপজাতীয়দের হতে। সে খবর তোমরাও বক্স করে ছেপেছিলে। আসলে আমার ধারণা ও দুটো একজাতের ভালুক।

বললুম—হংসধ্বজবাবুর মাথায় তাহলে ওই থেকেই ইয়েতি সেজে প্রতিশোধের বাসনা গজায়?

কর্নেল আরও জোরে হাসলেন—ভদ্রলোক রীতিমতো পাগল। অনায়াসে কোনও সেনাবাহিনীর কাছে বা টহলদার পুলিশকে জানাতে পারতেন। তা না করে শত মাইল দূরের বাংলা মিশনারি হাসপাতাল থেকে সারা গায়ে প্লাস্টার জড়ানো অবস্থায় রাতারাতি উধাও হন। জঙ্গলে এসে সাদা কাপড়ে বাকি অংশও জড়ান। ওই বিকটমূর্তিতে হানা দেন ২৫ মে রাতে। ভাগ্যিস, গুলি ফসকেছিল ওদের। অথচ কাণ্ড দেখ, তবু দমে যাননি ভদ্রলোক। পাগল আর বলে কাকে? অবিবাহিত লোকেরা যত বয়স বাড়ে, তত অদ্ভুত হয়ে ওঠে। তুমি ভাগ্যিস বিয়েটা সেরে নিয়েছ জয়ন্ত।

হেসে বললুম—ওই পাহাড়ের গুহায় থাকতেন হংসধ্বজ। কিন্তু খেতেন কী?

—হ্যাঁ। গুহাটা থাকার উপযোগী। আর খেতেন চুরি করে।

—চুরি করে? সে কী?

—হ্যাঁ। রাতে উপজাতিদের গ্রামে হানা দিতেন চুপি চুপি। ওই বিকটমূর্তি দেখে অমন হিংস্র লোকেরাও গর্তে সেঁধিয়ে যেত কিনা। কুকুরগুলোও ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। গোটা এলাকা জুড়ে এখন ইয়েতির খবর শুনতে পাবে। ভাগ্যিস সভ্য জগতের বাইরে পাহাড় জঙ্গল এলাকা। নয়তো ধুন্ধুমার পড়ে যেত। হ্যাঁ—জয়ন্ত শোন! এই এলাকায় ইয়েতিকে বলে 'বুরু'। মনে রেখো, বুরু। এই উপজাতীয়রা এত সাহসী ও হিংস্র মানুষ, অথচ তারা বুরুর নাম শুনলে কেঁচো হয়ে যায়।

একটু চুপ করে থেকে বললুম—গৌহাটিতে আমাদের জাল হংসধ্বজই রিসিভ করেছিলেন। এতটুকু টের পাইনি কিন্তু।

কর্নেল বললেন—না। আমার কেমন একটু লেগেছিল। গেটে নেমপ্লেটটা যেন সদ্য বসানো হয়েছে। টাটকা চকচকে পালিশ। তাছাড়া বাড়ির চাকরগুলোও মনে হল নতুন এসেছে। মনে একটা খটকা লেগেছিল বইকি। তখন থেকেই আমার তদন্ত শুরু।

—ওর আসল নাম কী?

—চন্দ্রনাথ সিং। পাঞ্জাবি।

লাফিয়ে উঠলুম—বলেন কী! এতটুকু ধরতে পারিনি কথাবার্তায়।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—আমি পেরেছিলুম। তবে যা জাল তা সহজেই যদি জাল বলে লোকে ধরতে পারে, তাহলে জাল হতে যাবে কোন দুঃখে? এটি খাঁটি জাল। তাই ধরা কঠিন ছিল।

একটু পরে আমি বললুম—আমার রিপোর্টাজের নাম তাহলে হওয়া উচিত ছিল 'অরুণাচলের বুরু'। কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। চোখ বুজে কী ভাবছেন কে জানে।...

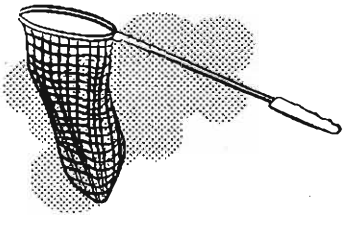

ডমরুডিহির ভূত

এক

বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রাণ সৃষ্টির জন্য হন্যে হচ্ছেন। অথচ প্রকৃতিতে কী অনায়াসে সবসময় প্রাণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে।—বলে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরালেন। তারপর সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। এটা ওঁর চিন্তা-ভাবনার লক্ষণ। আর মুখটাও বেশ গম্ভীর।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—হঠাৎ প্রাণ নিয়ে মাথাব্যথার কারণ কী জানতে পারি?

—একটুকরো কাঠ জয়ন্ত! ছোট্ট একটুকরো কাঠ!

সোফার শেষপ্রান্তে হেলান দিয়ে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার—আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তড়াক করে সোজা হয়ে বললেন, কাঠ দিয়া মার্ডার? কে কারে মারল?

বুঝলুম ডিটেকটিভ ভদ্রলোক প্রাণ এবং একটুকরো কাঠ এই দুটি কথা শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। চৌত্রিশ বছর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরির পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলা এবং রহস্যের খোঁজে ছোঁকছোঁক করে বেড়ানো তাঁর পক্ষে অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। আজ সকালে কর্নেলের ড্রয়িং রুমে তাঁর আবির্ভাব দেখে আশা করেছিলুম নিশ্চয়ই কোনও রহস্যময় কেস হাতে পেয়েছেন এবং শলাপরামর্শের জন্য কর্নেলের সাহায্য নিতে এসেছেন।

কিন্তু প্রায় একঘণ্টা কেটে গেছে এবং ষষ্ঠীচরণের তৈরি স্পেশাল কফি শেষ করে খবরের কাগজে ডুবে গেছেন। তত বেশি নস্যিও নেননি। কাজেই বুঝতে পেরেছিলুম, ওঁর হাতে কোনও কেস নেই।

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ ওঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন, আমার ছাদের বাগানে অনেকদিন থেকে ওই কাঠের টুকরোটা পড়ে ছিল। বর্ষা এবং এই শরৎকালের সব বৃষ্টি খেয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। কাল ভোরে গিয়ে দেখি, ওতে কয়েকটা খুদে ছত্রাক গজিয়েছে। আশ্চর্য! আজ গিয়ে দেখলুম, ছত্রাকগুলো ইঞ্চিটাক চওড়া হয়েছে। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রজাপতি এসে ছত্রাকে বসে পড়ল। প্রাণ টেনে এনেছে প্রাণকে। সত্যি জয়ন্ত! প্রকৃতিতে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। খুবই রহস্যময়। হালদারমশাই হেসে উঠলেন,—গ্রামাঞ্চলে ওগুলিরে ব্যাঙের ছাতা কয়।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন,—কথাটা লাগসই। কুনো ব্যাঙেরা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। কারণ বেচারারা গরম সহ্য করতে পারে না। তবে প্রজাপতিরাও ছত্রাক ভালবাসে। ছত্রাক তাদের খাদ্যও বটে।

বললুম,—কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনার এত চিন্তার কারণ কী?

হালদারমশাই কাঠ দিয়ে মার্ডার করার কথা বললেন, এটাও চিন্তাযোগ্য। এক টুকরো কাঠ প্রাণকে যেমন ধ্বংস করতে পারে, তেমনই প্রাণ সৃষ্টি করতেও পারে। ধন্যবাদ হালদারমশাই! আপনি একটা চমৎকার খেই ধরিয়ে দিয়েছেন।—বলে কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

প্রাইভেটে ডিটেকটিভ কর্নেলের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর আমার দিকে ঘুরলেন। তাঁর চোখে প্রশ্ন ছিল। আমি তাঁকে 'কিছুই জানি না' বোঝাতে একটা ভঙ্গি করলুম। কিন্তু

তাঁর দৃষ্টিতে সন্দেহের চিহ্ন থেকেই গেল। একটিপ নস্যি নিয়ে তিনি একটু ইতস্তত করে আস্তে ডাকলেন,—কর্নেলসার!

—বলুন হালদারমশাই!

—আমার একটু খটকা বাধছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, এমনসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল,—যমের দিঘি থেকে একটা লোক এয়েছে বাবামশাই!

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—যমের দিঘি?

ষষ্ঠী কাঁচুমাচু মুখে বলল,—শুনে তা-ই তো মনে হল। পেল্লায় লোক বাবামশাই! কালো কুচকুচে গায়ের রং। চুল গোঁফ বেজায় সাদা।

—নিয়ে আয়।.....

ষষ্ঠী ঠিকই বলেছিল। পেল্লায় লোকের বদলে কালো দৈত্য বললেই ঠিক হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা মূর্তির মতো। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফহাতা ফতুয়া। পায়ে যেমনতেমন চপ্পল। কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। কর্নেলকে করজোড়ে প্রণাম করে সে বলল, —চিনতে পারছেন তো সার? আমি ডমরুডিহি রাজবাড়ির সেই রাঘব।

কর্নেল বললেন,—তোমাকে না চেনার কোনও কারণ নেই রাঘব! বোসো। তারপর বল কী খবর। কুমারসায়েব কেমন আছেন?

রাঘব বলল,—বসব না সার, ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। কুমারসায়েবের শরীর ভাল না। ভবানীপুরে মেয়েকে খবর পাঠিয়েছিলেন। সেখান থেকেই আসছি। কুমারসায়েব আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে আসতে বলেছেন।

বলে সে ফতুয়ার ভেতরপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিল। কর্নেল খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। তারপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—তোমার ট্রেন ক'টায়?

—আজ্ঞে সওয়া বারোটায় ছাড়ার কথা। কিন্তু কলকাতার যা অবস্থা দেখলাম! ট্রাম-বাসের ভরসা না করে হেঁটেই যাব।

—কুমারসায়েবের মেয়ে-জামাই কি ডমরুডিহি যাচ্ছেন?

—জামাইবাবু খুব ব্যস্ত। আজ দিল্লি তো কাল বোম্বাই। পরে যাবেন বললেন। আর দিদিমণি যাবেন কাল ভোরের ট্রেনে। আমাকে থাকতে বলছিলেন। কিন্তু আমি থাকি কী করে বলুন? কাল সন্ধেবেলায় এসেছি। কুমারসাবের দেখাশুনোর ভার দিয়ে এসেছি গদাইকে। তাকে তো ভালই চেনেন সার। গাঁজাগুলি খেয়ে সবসময় ঢুলে বেড়ায়। তবে ওর বউটাই যা ভরসা। রান্নাবান্না সেবাযত্ন—আচ্ছা, চলি সার।

আবার একটু ঝুঁকে করজোড়ে কর্নেলকে প্রণাম করে কালো দৈত্যটি বেরিয়ে গেল।

হালদারমশাই হাসলেন,—ষষ্ঠী ঠিক কইছিল। যমের দিঘির যমই বটে।

বললুম,—ডমরুডিহি! অদ্ভুত নাম তো!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—ওখানে অবিকল ডমরুর মতো গড়নের একটা পাহাড় আছে। তবে ডমরুর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক থাকায় রাজবাড়ির শিবমন্দিরের খুব নামডাক। পাহাড়টার নামও ডমরুপাহাড়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, ডমরুপাহাড়ে শিবের চেলাদের বাস। তাই পারতপক্ষে দিনদুপুরেও কেউ একা ওদিকে পা বাড়ায় না।

—শিবের চেলা মানে ভূতপ্রেত?

—তা ছাড়া আর কী?

হালদারমশাই বললেন,—আপনি দেখছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—দেখিনি। তবে ডমরুপাহাড় থেকে সন্ধ্যাবেলায় নেমে আসার সময় অদ্ভুত একটা কান্না শুনেছিলুম। কারা যেন আহা-উহু করে কেঁদে বেড়াচ্ছিল।

ভূতেরা কান্দে ক্যান?—বলে অন্যমনস্কভাবে হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন,—ডমরুপাহাড়ে ভূতের ওই অদ্ভুত কান্না প্রথমে কুমারসায়েব শুনেছিলেন। গত অক্টোবরে আমি তাঁর ডাকেই ডমরুডিহি গিয়েছিলুম। কিন্তু প্রায় একসপ্তাহ কাটিয়ে সেই রহস্যের সমাধান করতে পারিনি। কুমারসায়েব এই চিঠিতে লিখেছেন, সম্প্রতি সেই ভূতেরা রাজবাড়িতে এসে রাতবিরেতে কান্নাকাটি করে বেড়াচ্ছে। তার মানে পাহাড় থেকে ওরা এবার নেমে এসেছে। এই উৎপাতে নাকি কুমারসায়েব ঘুমোতে পারছেন না। অস্থির হয়ে উঠেছেন। চিন্তা করুন হালদারমশাই! কুমারসায়েবের বয়স আমার চেয়ে দু-তিন বছর বেশি। অবশ্য এখনও শক্তসমর্থ মানুষ। কিন্তু রাতের পর রাত ওইরকম উৎপাত হলে কী অবস্থা হয়!

লক্ষ করলুম উত্তেজনায় প্রাইভেট ডিটেকটিভের গোঁফ তিরতির করে কাঁপছে। বললেন, —আপনি কইলে আমি ভূতগুলিরে জব্দ করতে পারি।

হাসতে হাসতে বললুম,—আপনি ভূত জব্দ করার মন্ত্র জানেন তাহলে?

কী যে কন?—হালদারমশাই চটে গেলেন। চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। রাত্রে কত শ্মশান-মশান বনবাদাড়ে—হঃ! ভূত না। বজ্জাত লোকের কাজ। কর্নেলসার! আপনি যদি যান আমারে সঙ্গে লইবেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখেই বললেন,—আপনি বরং আগেই চলে যান। হাওড়া-গয়া প্যাসেঞ্জারে আসানসোল হয়ে ডমরুডিহি। ওখানে অনেক হোটেল আছে। একটা সুন্দর লেক আছে। চমৎকার টুরিস্ট স্পট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন,—ওই কালো লোকটা—কী য্যান নাম?

—রাঘব।

—রাঘবেরে ফলো করব।

—হালদারমশাই! রাঘবের সঙ্গে যেন ঝামেলা বাধাবেন না। ওই তল্লাটে ওকে সবাই সমীহ করে চলে। ওর গায়ে সত্যিই দৈত্যের মতো জোর।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথাগুলি শুনলেন। তারপর সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম,—হালদারমশাইকে লড়িয়ে দিলেন। দেখবেন, ঠিকই ঝামেলা বাড়বে।

কর্নেল হাসলেন,—তুমি ওঁকে বরাবর তুচ্ছ কর জয়ন্ত! কিন্তু কত সময় ওঁর পুলিশ জীবনের অভিজ্ঞতা আমাকে কতটা সাহায্য করেছে, তা তোমার মনে রাখা উচিত। প্রয়োজনে উনি যে সব কাজ করতে পারেন, আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়।

হেসে ফেললুম,—যেমন ছদ্মবেশ ধরা।

—হ্যাঁঃ। পুলিশের গোয়েন্দারা ছদ্মবেশ ধরতে পটু। হালদারমশাইয়ের এ ব্যাপারে রীতিমতো ট্রেনিং আছে। বিশেষ করে সাধুসন্ন্যাসীদের খুব সম্মান করে লোকে।

—ঠিক বলেছেন। তা আপনি কবে যমের দিঘি—সরি! ডমরুডিহি যাচ্ছেন?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন,—তুমি আমাকে যমের দিঘিতে একা পাঠাতে চাও? না জয়ন্ত! তোমাকেও নিয়ে যাব।

কর্নেল ইজিচেয়ারে আবার হেলান দিলেন। আমি ওঁর দিকে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে রইলুম। ভূতপ্রেত থাক বা না থাক, ওঁর সঙ্গে কোথাও যাওয়া মানেই পাহাড়জঙ্গলে ঘোরাঘুরি। এ বয়সে পারেনও বটে!...

দুই

ডমরুডিহির রাজবাড়ি দেখে হতাশ হয়েছিলুম। দু'ধারে ধ্বংস্তূপ আর যাচ্ছেতাই রকমের জঙ্গল। মধ্যিখানে একফালি সংকীর্ণ পাথরের ইটে বাঁধানো পথ। পথের শেষপ্রান্তে কোনও রকমে টিকে থাকা একটা দোতলা পুরনো বাড়ি। একপাশে তেমনই পুরনো একটা শিবমন্দির। পেছনে উঁচু পাহাড়। পাহাড়টার গড়ন কতকটা ডমরুর মতো। মাঝখানে উচ্চতা কম এবং দু'দিকে ভাগ করা বোঝা যাচ্ছিল, অতীতে এই বাড়িটা রীতিমতো একটা দুর্গপ্রাসাদ ছিল।

রাঘব আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলা থেকে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এসেছিল। সে চাপা গলায় বলেছিল,—দিদিমণি কাল সন্ধ্যায় এসেছেন। কুমারসায়েবকে কলকাতা নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু উনি এখান থেকে নড়বেন না। এই নিয়ে বাবা-মেয়ের মধ্যে খুব তর্কাতর্কি হচ্ছে।

সে আমাদের নিচের একটা ঘরে বসিয়ে রেখে কুমারসায়েবকে খবর দিতে গিয়েছিল। ঘরটার আসবাব পুরনো হলেও আভিজাত্যের চিহ্ন প্রকট। দেয়ালে ঝোলানো পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র, কিছু ব্রোঞ্জ আর পাথরের ভাস্কর্য, চিনেমাটির কারুকার্য-করা প্রকাণ্ড ফুলদানি এবং একটা ঝাড়বাতিও চোখে পড়ল। মাথার ওপর সিলিংফ্যান দেখে বুঝলুম, এ বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে।

একটু পরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কুমারসায়েব নেমে এলেন। শক্তসমর্থ গড়নের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পরনে সাদাসিধে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা মোটাসোটা ছড়ি। চেহারায় বনেদি ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার পর আমার দিকে হাত বাড়ালেন।

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন,—কুমারসায়েব! আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরির কথা আপনাকে বলেছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।.... আর জয়ন্ত! ইনি ডমরুডিহি রাজপরিবারের একমাত্র বংশধর কুমার ধ্রুবনারায়ণ রায়।

রাঘব এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কুমারসায়েব তাকে বললেন,—কর্নেলসায়েবের থাকার জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করেছ?

রাঘব বলল,—গতবার যে ঘরে উনি ছিলেন।

—চলুন কর্নেলসায়েব। আর রাঘব! তুমি গিয়ে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো।

কর্নেল বললেন,—আমরা স্টেশনেই ওটা সেরে নিয়েছি কুমারসায়েব! আপাতত শুধু কফি!

পূর্ব-দক্ষিণ কোণের একটা ঘরে গিয়ে বুঝলুম, এই বাড়িটা উঁচু জায়গায় অবস্থিত। দক্ষিণে ভাঙাচোরা পাঁচিলের নিচে বিশাল জলাশয়। ওটাই তা হলে সেই লেক। পূর্বদিকে সানবাঁধানো একটা প্রশস্ত চত্বরের পর শিবমন্দির। মন্দিরের তিনদিকে ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ।

আমাদের বসতে বলে কুমারসায়েব দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। উঁকি মেরে কিছু দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন,—কাল থেকে একটা সন্দেহজনক ব্যাপার লক্ষ্য করছি। একজন জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এদিকটায় উকিঝুঁকি মেরে বেড়াচ্ছে। রাঘবকে পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু তেমন কাউকে খুঁজে পায়নি। অথচ আমি স্পষ্ট দেখেছি।

কর্নেল বললেন,—ও নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই। আপনি বরং রাতবিরেতে ভূতুড়ে কান্নার ঘটনাটা বলুন।

কুমারসায়েব একটা চেয়ারে বসে বললেন,—আট-দশদিন ধরে এটা ঘটছে। আপনি জানেন, আমি দোতলায় দক্ষিণে-পশ্চিম কোণের ঘরে থাকি। প্রতি রাত্রে যখন-তখন জানালার নিচে ওই

অদ্ভুত কান্নার উৎপাত। খেপে গিয়ে বন্দক ছুড়েছি। রাঘব টর্চ-বল্লম নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

কালও সারারাত মাঝেমাঝে ওই উপদ্রব। রাঘব প্রথম প্রথম রাত জেগে টহল দিত। আমিই বারণ করলুম। কর্নেলসায়েবকে খবর দেওয়া যাক। কারণ আমার ধারণা, এর পেছনে একটা দুষ্টচক্র আছে। আপনি ভালই জানেন, ভূতপ্রেত আমি মানি না।

—আপনার মেয়ের আসার কথা ছিল। সে কি এসেছে?

—রানু কাল বিকেলের ট্রেনে এসেছে। সে-ও বলেছে, কোনও বজ্জাত দলবল নিয়ে ভূতের ভয় দেখিয়ে আমাকে এ বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়। কিন্তু পূর্বপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে কোথাও গিয়ে তো আমি শান্তি পাব না। তা ছাড়া আমি এখান থেকে চলে গেলে জয়গোপালের পোয়াবারো। বাড়ি দখল করে ফেলবে।

—জয়গোপালবাবু তো কলকাতায় থাকেন।

কুমারসায়েব বাঁকা হেসে বললেন,—ওটা ওর চালাকি। এখানকার বাড়িতে একজন কেয়ারটেকার রেখেছে। লোকদেখানো ব্যাপার মাত্র। প্রায়ই সে এখানে এসে থাকে। আপনাকে বলেছিলুম, এই এলাকার যত খুনে ডাকু গুণ্ডা বদমাশ সব্বাই ওর চেলা।

রাঘব একটা ট্রেতে কফি স্ন্যাক্স এনে টেবিলে রাখল। একটু হেসে সে বলল,—গদাই সেই সাধুবাবাকে দেখে এসেছে কুমারসায়েব! ঝিলের ধারে শ্মশানতলায় ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। ক'জন চেলাও জুটে গেছে। গদাইয়ের কথা শুনে মনে হল সে-ও চেলা হয়ে গেছে।

কুমারসায়েব হাসলেন,—যতসব গাঁজাখোরের কাণ্ড! তুমি রাণুকে পাঠিয়ে দাও। কর্নেল সায়েবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুর সঙ্গে আপনার মামলা চলছিল, কী হল শেষ পর্যন্ত?

—হাইকোর্টে হেরে ভূত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে যাবে শুনেছিলুম। যায়নি। গিয়ে লাভ হত না। আমরা ভাইবোন দু'জনেই সেই পঁচিশ একর পোড়ো জমি একটা আশ্রমকে দান করেছিলুম। জয়গোপালের যুক্তি হল,সে তখন নাবালক ছিল। তার মাকে আমি নাকি বোকা বানিয়ে—হুঁ! এ যুক্তি ধোপে টেঁকে?

এতক্ষণে বুঝতে পারলুম, জয়গোপাল নামে এক ভদ্রলোক কুমারসায়েবের ভাগ্নে। তার মানে, মামা-ভাগ্নের বিবাদ। বললুম,—আচ্ছা কুমারসায়েব, ভূতুড়ে উৎপাতের কথা পুলিশকে জানিয়েছেন কি?

আপনার মাথাখারাপ? —কুমারসায়েব বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনি জয়গোপালকে চেনেন না। পুলিসের তা-বড় তা-বড় কর্তা থেকে শুরু করে নেতা, এমনকী মন্ত্রীদের সঙ্গে ওর খুব খাতির। ডমরুডিহি এলাকায় অনেক খনি আছে। জয়গোপাল একসময় খনিশ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হয়েছিল। শেষে ইউনিয়নের মধ্যে দলাদলি মারপিট শুরু হয়ে গেল। ফণীশ্বর সিং নামে আরেক নেতা জয়গোপালকে টিট করে দিল। ফণীশ্বরের ভয়ে সে আর ডমরুপাহাড়ের পশ্চিমে পা বাড়ায় না।

—ওদিকেই খনি এলাকা?

—হ্যাঁ। কর্নেলসায়েব গতবারে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। এবার কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আপনি যেতে পারেন। কাগজে লেখার মতো অনেক কিছু পেয়ে যাবেন।

রাঘব এসে বলল,—দিদিমণি ঝিলের ঘাটে চান করতে গেছে।

কুমারসায়েব আঁতকে উঠে বললেন,—সর্বনাশ! ঝিলের জল এখন বেজায় ঠাণ্ডা। জ্বরজ্বালা হতে পারে। চামেলী ওকে বারণ করেনি?

—ছোটবেলার অভ্যেস। যখনই আসে, তখনই তো ঝিলে সাঁতার কাটতে নামে দিদিমণি!

কুমারসায়েব হাসলেন,—কলকাতার লেক পেয়েছে! ও রাঘব! তুমি একটু লক্ষ্য রেখ। বেশিক্ষণ যেন জলে না থাকে।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল বললেন,—তা হলে ভূতুড়ে কান্নাটা ডমরুপাহাড় থেকে নেমে এসেছে?

কুমারসায়েব গম্ভীর হয়ে বললেন,—কান্নার সুরটাও বদলেছে। আগে ছিল শুধু আহা হা হা! উ হু হু হু। এখন ঘনঘন আহাঃ উহুঃ! শুনলে সত্যি বুক ধড়াস করে ওঠে। গতবার আপনি নিজের কানে শুনতে পেয়েছিলেন। এবার শুনলে তফাতটা বুঝতে পারবেন। যাই হোক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আজকাল ট্রেনজার্নির যা অবস্থা!

কর্নেল বললেন,—আমরা দিব্যি ঘুমিয়ে এসেছি। এখন একটু বেরোতে চাই।

প্রজাপতি ধরতে নাকি পাখি দেখতে?—কুমারসায়েব সকৌতুকে বললেন, বেশি দেরি করবেন না যেন। একসঙ্গে খেতে বসব। আপনারা না ফিরলে আমি উপোস করে থাকব।

এখন প্রায় দশটা বাজে। সাড়ে বারোটার মধ্যেই ফিরে আসব।—বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওঁকে অনুসরণ করতে হল। ট্রেনে আমার ভাল ঘুম হয়নি। তা ছাড়া এই খামখেয়ালি সঙ্গীর পাল্লায় পড়ে পাহাড়-পর্বত বনবাদাড়ে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে হবে কে জানে?

বেরিয়ে গিয়ে বললুম,—পাখি-প্রজাপতির পেছনে আমি কিন্তু ছুটছি না কর্নেল!

—নাহ জয়ন্ত! আমরা আপাতত শ্মশানতলায় যাচ্ছি।

—তার মানে সেই সাধুবাবার কাছে? কিন্তু কর্নেল উনি যদি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—উনি হালদারমশাই ছাড়া আর কে?

—যদি হালদারমশাই না হয়ে সত্যি-সত্যি কোনও সাধুবাবা হন?

কনেল হাসলেন,—তাতে কোনও অসুবিধে নেই। সাধুসঙ্গ করলে পুণ্য হয়।

—আচ্ছা কর্নেল, কুমারসায়েবের মধ্যে সায়েবি কিছু তো দেখলুম না। একেবারে দিশি ভদ্রলোক।

—একসময় পুরোদস্তুর সায়েব ছিলেন। ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। শিকারে যেতেন। সেইজন্য ওঁকে সবাই কুমারসায়েব বলত।

কর্নেল হঠাৎ-হঠাৎ থেমে গিয়ে অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চোখ রেখে সম্ভবত পাখি-টাখি দেখছিলেন। রাজবাড়ির ভেঙেপড়া ফটকের কাছে পৌঁছেছি, সেইসময় ডানদিকে ধ্বংসস্তূপ-ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে কেউ চাপাগলায় ডাকল,—কর্নেল সার! জয়ন্তবাবু!

চমকে উঠেছিলাম। ঘুরে দেখি, ছদ্মবেশী প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঁকি দিচ্ছেন। মাথায় প্রকাণ্ড জটাজুট, মুখে তেমনই দাড়ি-গোঁফ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কর্নেল দ্রুত চারপাশ দেখে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। বললেন,—আপনার কাছে শ্মশানতলায় যাচ্ছিলুম।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন,—থাকতে দিল না। খালি ঢিল ছোড়ে। শেষে একখান পাথর আইয়া পড়ল।

—তাহলে বোঝা যাচ্ছে, শ্মশানতলায় আপনি থাকুন এটা কেউ বা কারা চায় না।

—নাকি আমারে চিনছে?

কর্নেল হাসলেন,—আপনাকে চিনবে কী ভাবে? যাই হোক, কাল রাতের খবর বলুন!

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—ব্যাটম্যান! এক্কেরে ব্যাটম্যান। শিবমন্দিরের পিছনে লুকাইয়া গেল। মুখে আহাঃ উহুঃ সাউন্ড। মানুষ না কর্নেলসার। কোনও জন্তু।

কর্নেল বললেন,—আপনি ছদ্মবেশ ছেড়ে লেকে স্নান করে ফেলুন। তারপর পোশাক বদলে নিন। আমরা ততক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছি এখানে।.....

তিন

হালদারমশাইয়ের বগলদাবা গেরুয়া কাপড়ের পুঁটুলি দেখছিলুম। সম্ভবত ওটার ভেতরে একপ্রস্থ পোশাক ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই উনি প্যান্টশার্ট জুতো পরে এসে গেলেন। কাঁধে ঝোলানো মোটাসোটা কিট ব্যাগ দেখে বুঝলুম, নকল জটাজুট গোঁফদাড়ি কৌপিন ইত্যাদি এখন ওর ভেতর ঢুকে গেছে। তিনি কাঁচুমাচু হেসে বলেন,—ত্রিশূল ফ্যালাইয়া আইছি।

কর্নেল বললেন,—আপনার ত্রিশূল কেউ নেবে বলে মনে হয় না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি এত নিশ্চিত হলেন কী ভাবে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। হালদারমশাইকে গতরাতের ঘটনা সম্পর্কে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে ব্যস্ত হলেন। হালদারমশাইয়ের কথা থেকে জানা গেল, উনি গত পরশু রাত আটটা নাগাদ এখানে পৌঁছন। স্টেশনের ভিড়ে রাঘবকে হারিয়ে ফেলেন। অগত্যা স্টেশনের কাছাকাছি একটা হোটেলে ওঠেন। সেখানে খাওয়াদাওয়া করে উনি একটা সাইকেলরিকশা ভাড়া করে রাজবাড়ির কাছে আসেন। রিকশাওয়ালারা রাতবিরেতে রাজবাড়ি এলাকায় আসতে চায় না। কিন্তু ডবল ভাড়ার লোভে এক রিকশাওয়ালা এসেছিল। সাততাড়াতাড়ি ভাড়া নিয়ে সে কেটে পড়েছিল। সে সাবধান করে দিয়েছিল, ডমরুপাহাড়ের সব ভূত নাকি রাজবাড়ির আনাচেকানাচে নেমে এসেছে।

এর পর হালদারমশাই রাজবাড়ির ভেতরে ঢোকেন। এই রাস্তাটা রাত্রে অন্ধকার ছিল। সাবধানে এগিয়ে শিবমন্দিরের কাছে পৌঁছে উনি আলো দেখতে পান। তখন মন্দিরের পেছনে গিয়ে দোতলা বাড়িটার দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কালো একটা জন্তুকে উল্টোদিক থেকে বাড়ির দক্ষিণ দিকে গুটিগুটি আসতে দেখেন। প্রথমে তিনি ওটাকে ভালুক ভেবেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ জন্তুটা দুই ঠ্যাঙে ভর করে দাঁড়ায় এবং মানুষের মতো হেঁটে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। তারপর অদ্ভুত নাকিস্বরে আঁহাঃ উঁহুঃ শব্দ করতে থাকে। চাপা গোঙানির মতো সেই শব্দ।

তারপরই দোতলা থেকে কেউ বন্দুকের গুলি ছোড়ে। হাঁকডাক শুরু হয়। রাঘব বল্লম আর টর্চ হাতে বেরিয়ে আসে। অমনি কালো বিদঘুটে জন্তুটা ওদিকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যায় হালদারমশাই ওটাকে কোনও জন্তু বলেই ধরে নেন। তাই রিভলভার তাক করে আরও ঘন্টা দুই বসে থাকেন। জন্তুটা আবার এলে তিনি ছুটে গিয়ে গুলি করে মারবেন। কিন্তু আর ওটা আসেনি। তা ছাড়া ততক্ষণে এই পাহাড়ি এলাকায় বেশ হিম পড়ছিল। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশাও জমছিল। অগত্যা তিনি হোটেলে ফিরে যান।

কাল সকালে হালদারমশাই লেকের ধারে ঘুরতে বেরিয়েছিনে। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য ঝিল বলে। ঝিলের দক্ষিণে-পশ্চিম কোণে ডমরুপাহাড়ের নিচে পুরনো একটা শ্মশান আছে। এখন আর ওখানে মড়া পোড়ানো হয় না। আদ্যিকালে ওখানে একটা মন্দির ছিল। তার ধ্বংসাবশেষের ওপর প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। সেখান থেকে রাজবাড়ির ওপর নজর রাখার সুবিধে হয়। তাই হালদারমশাই ঠিক করেন, শ্মশানতলায় সাধুবাবা সেজে বসে থাকবেন।

হোটেলে ফিরে দুপুরের খাওয়া সেরে হালদারমশাই শ্মশানতলায় চলে যান। ঝোপের আড়ালে সাধুবাবা সেজে গিয়ে বটতলায় একটা পাথরের ওপর বসে থাকেন। শুকনো কাঠ কুড়িয়ে ধুনি জ্বালানোর অসুবিধে হয়নি। গাঁজার লোভে একজন-দু'জন করে গাঁজাখোর জুটেছিল। কিন্তু সাধুবাবর ধ্যানভঙ্গ হচ্ছে না, বা গাঁজার কোনও আয়োজন না দেখে তারা চলে যায়।

বুদ্ধি করে সঙ্গে চাপাটি আর আলুরদম নিয়ে গিয়েছিলেন হালদারমশাই। রাতের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েন। গত রাতে তিনি যে দিক থেকে জন্তুটা এসেছিল, সেদিকে এগিয়ে রাজবাড়ির ভাঙা পাঁচিলের আড়ালে ওত পেতে বসেন। কিন্তু আশ্চর্য, কালো বিদঘুটে জন্তুটা যেন টের পেয়েছিল। এ রাতে তাকে শিবমন্দিরের দিক থেকে আসতে দেখা যায়। তারপর সেই একই ঘটনা। জন্তুটা শিবমন্দিরের দিকে পালিয়ে যায়। কোনও সাধুসন্ন্যাসী রিভলভার হাতে তাকে তাড়া করেছেন দেখে কী প্রতিক্রিয়া হবে—হয়তো হিতে বিপরীত হয়ে যাবে, এই ভেবে হালদারমশাই সেখান থেকে কেটে পড়েন। তাঁর পুলিশজীবনে যেখানে-সেখানে বসে বা শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা ছিল। কাজেই শ্মশানতলায় রাত কাটাতে অসুবিধে হয়নি। ধুনিটা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। ধুনির তাপে হিম জব্দ হয়েছিল।

তাঁর বিশ্বাস জন্তুটা রাজবাড়ির কোনও ধ্বংসস্তূপে, গুহা বা গর্তের মধ্যে বাস করে। তাই আজ সকালে আনাচে-কানাচে খুঁজতে এসেছিলেন। কিন্তু কুমারসায়েবের চোখে পড়ে যাওয়ায় বেকায়দায় পড়েছিলেন। খামোকা ঝামেলা বাধিয়ে লাভ কী? ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে তিনি আবার শ্মশানতলায় চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ঢিল পড়তে শুরু করল। তর্জনগর্জন শাপমন্যি করেও লাভ হল না। উপরন্তু একটা বড় পাথরের টুকরো এসে পড়ল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন। তারপর পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে এসেছেন।...

কর্নেল বললেন,—তাহলে আপনার ব্রেকফাস্ট হয়নি এখনও। চলুন। আগে কিছু খেয়ে নেবেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সহাস্যে বললেন,—একডজন বিস্কুট খাইছি। বোতলে জল ছিল। খাইছি।

কথা বলতে বলতে আমরা রাজবাড়ির খণ্ডহর পেরিয়ে নিচের রাস্তায় পৌঁছুলুম। কর্নেল বললেন,—আপনার ওপর অনেক ধকল গেছে হালদারমশাই! আপনি হোটেলে ফিরে খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে নিন। তারপর চারটে নাগাদ রাজবাড়িতে আসবেন।

—কিন্তু এখন আপনারা যান কোথায়?

—ডমরুপাহাড়ে অর্কিড খুঁজতে যাচ্ছি।

—রাজবাড়ির পেছনেই তো ডমরুপাহাড়। উল্টোদিকে আইলেন ক্যান?

—ওদিক থেকে পাহাড়ে ওঠা যায় না। আপনি হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম নিন।

হালদারমশাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর হনহন করে এগিয়ে গেলেন। তারপর একটা সাইকেলরিকশা দাঁড় করিয়ে একলাফে উঠে বসলেন।

বললাম,—সত্যিই পাহাড়ে চড়তে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন—নাহ্। কুমারসায়েবের ভাগ্নের বাড়ি যাচ্ছি। দেখি, ভাগ্নেবাবাজি এ বিষয়ে কী বলেন?

—ব্যাটম্যান বিষয়ে?

তুমিও হালদারমশাইয়ের মতো ব্যাটম্যান বলছ?—কর্নেল বাঁদিকের রাস্তায় পা বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে। ব্যাটম্যান বলতে আমারও আপত্তি নেই। অন্তত যতক্ষণ না তার চাক্ষুষ দর্শন পাচ্ছি। তবে ব্যাটম্যানের ডানা থাকা দরকার।

এই রাস্তাটা রাজবাড়ির সমান্তরালে এগিয়ে গেছে। টানা পাঁচিলঘেরা একটা করে বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। পুরনো আমলের বাগানবাড়ির মতো দেখতে। কয়েকটা বাড়ির পর একটা বাড়ির গেটে গিয়ে কর্নেল ডাকলেন,—মিঃ মজুমদার আছেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া এল—কে?

—এসেই দেখুন না আমি কে!

একটু পরে গেট খুলে গেল। একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক, পরনে প্যান্ট, স্পোর্টিং গেঞ্জি, হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন,—এসে গেছেন তাহলে? আসুন ভেতরে আসুন।

লনের শেষে পোর্টিকোর তলায় একটা গাড়ি দেখলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি কখন এসেছেন?

কাল বিকেলে।—বলে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, ইনিই কি সেই—

—হ্যাঁ জয়ন্ত চৌধুরি। জয়ন্ত, ইনি মিঃ জয়গোপাল মজুমদার।

সাজানো গোছানো সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমে আমাদের বসিয়ে জয়গোপাল বললেন,—কেয়ারটেকার গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়েছি। এখনই ফিরে আসবে। তারপর আপনার কফি।

—ধন্যবাদ মিঃ মজুমদার!

—মামার খবর কী বলুন?

—একই কথা ওঁর। আপনিই নাকি তাঁর পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন।

জয়গোপাল গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—মামাও যে আমার পেছনে ভূত লেলিয়ে দিয়েছেন কর্নেলসায়েব।

—একটু খুলে বলুন!

—কাল রাতে আমার বাড়ির পেছনে ভূতের কান্না শুনেছি।

—আহাঃ উহুঃ?

জয়গোপাল নড়ে বসলেন,—হ্যাঁ। টর্চ জেলে আমি আর গোবিন্দ বাড়ির চারদিক তন্ন তন্ন খুঁজেছি। তারপর যেই আবার শুয়ে পড়েছি, আবার সেই একই উৎপাত।

—বলেন কী! আপনার মামাবাড়িতেও একই ঘটনা।

—গোবিন্দ এক পলকের জন্য নাকি দেখেছে, কালো কুচকুচে একটা জন্তু পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বলনে,—আপনার মামাতো বোন রাণু এসেছে।

—তাই বুঝি? জামাইবাবু আসেনি?

—না। আচ্ছা মিঃ মজুমদার, আপনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন। গন্ধর্বমূর্তির কথা।

জয়গোপাল জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—হ্যাঁ। মায়ের কাছে শোনা কথা। রাজবাড়িতে নাকি দুটো গন্ধর্বমূর্তি ছিল। যুগ্মবিগ্রহ বলতে পারেন। দামি ধাতুর তৈরি। মায়ের ছোটবেলায় রাজবাড়ির তখন খুব দাপট। বাড়ির কুমারী মেয়েরা গন্ধর্বপুজো করত। এখন তো রাজবংশের কে কোথায় কেটে পড়েছে। মামা একা খণ্ডহর পাহারা দিচ্ছেন যখের মতো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মামা জানেন কোথায় সেই যুগ্মবিগ্রহ লুকানো আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—রহস্যটা তা হলে কিছুটা ফাঁস হল।

—তার মানে?

—মিঃ মজুমদার! আপনি এবং কুমারসায়েব ছাড়া তৃতীয় কোনও লোক ওই বিগ্রহের কথা জানে। কিন্তু সে এখনও জানে না, বিগ্রহ আপনার মামার কাছে আছে, নাকি আপনার মা ওটা আপনাকে গোপনে দিয়ে গেছেন। তাই কুমার সায়েব এবং আপনার প্রতিক্রিয়া বুঝতেই এই

ভূতুড়ে কাণ্ড করছে। তার ধারণা আপনাদের দুজনের মধ্যে যাঁর ওই বিগ্রহ থাকবে, তিনিই ভয় পেয়ে ওটা ফেলে দেবেন এবং সে তা কুড়িয়ে নিয়ে পালাবে।

জয়গোপাল মাথা নেড়ে বললেন, মা আমাকে কোনও গন্ধর্ব মূর্তি দিয়ে যাননি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু সে যাই হোক, আহা কেন?

—মিঃ মজুমদার! আহাঃ উহুঃ নয়। কথাটা হল হাহা হুহু। রামায়ণে হাহা হুহু নামে দুই গন্ধর্বের কথা আছে। এই যুগ্মবিগ্রহ তাদেরই। আচ্ছা, চলি।

জয়গোপাল হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।....

চার

কুমারসায়েবের মেয়ে রাণুকে আমার দাম্ভিক প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। কুমারসায়েব আমাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে নেহাত সৌজন্যমূলক নমস্কার এবং কথাবর্তা বলে চলে গিয়েছিল। পরে কুমারসায়েব কৈফিয়ত দিয়েছিলেন,—রাণুর মনমেজাজ ভাল নেই। কারণ আমি ওর কথায় কান দিচ্ছি না। পিতৃপুরুষের এই ভিটে ছেড়ে আমি অন্য কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না।

খাওয়ার পর কুমারসায়েব বললেন,—আপনারা বিশ্রাম নিন। আমিও একটু দিবানিদ্রার চেষ্টা করব।

কর্নেল বললেন,—তার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে। চলুন, ও ঘরে বসে কথা হবে।

আমাদের থাকার ঘরে গিয়ে কুমারসায়েব একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টে কর্নেলের দিকে তাকালেন।

কর্নেল বললেন,—গতবার এসে শিবমন্দিরের যে সেবায়েতকে দেখেছিলুম, তিনি এখনও আছেন কি?

কুমারসায়েব একটু অবাক হয়ে বললেন,—থাকবে না কেন?

পাঁচু ঠাকুর বংশানুক্রমে রাজবাড়ির সেবায়েত। রোজ ভোরবেলা এসে পুজোআচ্চা করে কলে যায়। ও থাকে বাঙালিটোলায়। তবে বয়স হয়েছে। ওর শরীরটা তত ভাল যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে এসে বলে ওর ছেলে নকুলকে বহাল করতে। কিন্তু নকুলের বদনাম শুনেছি। নেশাভাঙ করে। যাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তার হাড়-বজ্জাত বখাটে। রাঘবের কাছে শুনেছি, জয়গোপালের সঙ্গে নকুলের যোগাযোগ আছে। কাজেই ওকে বহাল করার প্রশ্নই ওঠে না। ওর ভাই মুকুল অবশ্য ভাল ছেলে। কিন্তু সে পড়াশুনা করছে। পুজোআচ্চার কাজ তার পছন্দ নয়।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনার কাছে গন্ধর্ব মূর্তি আছে। যুগ্মবিগ্রহ। দামি ধাতুতে তৈরি। তাই না?

কুমারসায়েব চমকে উঠেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন,—হ্যাঁ। আছে। কিন্তু হঠাৎ এ কথা কেন? তাছাড়া আপনি কোন সূত্রে জেনেছেন?

—যেভাবে হোক, জেনেছি। আপনি কি ওই মূর্তিদুটোর নাম জানেন?

কুমারসায়েবকে বিব্রত দেখাচ্ছিল। মাথা নেড়ে বললেন,—নাম জানি না। তবে ওটা আছে।

—মূর্তিদুটি রামায়ণে বর্নিত হাহা-হুহু গন্ধর্বের। রাতবিরেতে আপনি যে ভূতুড়ে আহাঃ উহুঃ শোনেন, তা আসলে হাহা-হুহু।

কুমারসায়েব কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—খুব সোজা অঙ্ক কুমারসায়েব! কেউ হাহা-হুহু গন্ধর্ব বিগ্রহের কথা জানে। তাই সে ভেবেছে রাতবিরেতে নামদুটো ভূতুড়ে গলায় উচ্চারণ করলে আপনি ভয় পাবেন এবং ভাববেন, স্বয়ং দুই গন্ধর্বের আত্মা এসে মূর্তি ফেরত চাইছে তখন মূর্তিদুটি তাদের উদেশে ছুড়ে ফেলে নিষ্কৃতি চাইবেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপন গন্ধর্বমূর্তির নাম জানেন না।

কুমারসায়েব ফুঁসে উঠলেন, এ তাহলে জয়গোপালেরই বদমাইশি!

কর্নেল হাসলেন, না কুমারসায়েব। জয়গোপালবাবুর বাড়িতেও এবার একই কাণ্ড শুরু হয়েছে।

—কে বলল আপনাকে?

—আমি দুপুরে ওঁর কাছে গিয়েছিলুম।

—ও মিথ্যুক!

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—জয়গোপালবাবুও যে মূর্তিদুটির নাম জানেন না এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। যাই হোক, আপনি এখনই গিয়ে দেখে আসুন, গন্ধর্বমূর্তি যথাস্থানে আছে কি না।

কুমারসায়েব বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, তুমি কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিতে পার জয়ন্ত। হালদারমশাই এলে আমরা বেরুব।

বলে উনি দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে বাইনোকুলারে লেক বা ঝিলটা দেখতে থাকলেন। একটু পরে কুমারসায়েব ফিরে এসে ধপাস করে বসে বলেন, আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেলসায়েব! বিগ্রহ উধাও।

কর্নেল বললেন, কোথায় রেখেছিলেন?

—আমার ঘরে রাণুর মায়ের একটা প্রকাণ্ড ছবি টাঙানো আছে। তার পেছনের কুলুঙ্গিতে ওটা লুকোনো ছিল। কাউকে জানতে দিইনি! রাণুকে পর্যন্ত না।

ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনার চিন্তার কারণ নেই।—বলে কর্নেল বললেন, বিগ্রহের কথা আপাতত ভুলে যান। গতবার এসে ঝিলে ছিপ ফেলে মাছ ধরেছিলুম। আপনারও ছিপ ফেলার অভ্যাস ছিল। এখন নেই?

কুমারসায়েবকে উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। অন্যমনস্কভাবে বললেন, আছে। আপনি ছিপ ফেলতে চাইলে অসুবিধে নেই। রাঘবকে চার তৈরি করতে বলছি। কিন্তু এ কী সর্বনাশ হল দেখুন!

—আপনি রাণুকে জিজ্ঞেস করেছেন কিছু?

—নাহ্। রাণু ওর ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে। ওর এই অভ্যাস। এখানে এলেই—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, ঠিক আছে। আপনি রাঘবকে চার তৈরি করে ঠিক জায়গায় ফেলতে বলুন। ছিপ টোপ সবকিছু যেন তৈরি রাখে। আমি একটু জিরিয়ে নিয়ে ঘাটে যাব। আপনি বিশ্রাম করুন গিয়ে। আশা করি বিগ্রহ উদ্ধার করতে পারব।

কুমারসায়েব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে এসেছিল। কতক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। কর্নেল বললেন, উঠে পড় জয়ন্ত! তুমি-আমি পালাক্রমে ছিপ নিয়ে বসব। ঝিলের জলে মাছ আছে ঠিকই। তবে খুব ধূর্ত ওরা। দেখা যাক।

ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে তিনটে বাজে। ঝিলের উত্তর-পশ্চিম কোণে রাজবাড়ির সানবাঁধানো ঘাট। টুটাফাটা হয়ে আছে। রাঘব ছিপ আর টোপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেল তাকে বললেন, তুমি একটু লক্ষ্য রাখবে রাঘব। এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। এলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে।

রাঘব চলে গেল। কর্নেল ছিপ ফেলে বাইনোকুলারে দূরে কী দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম—কোনও বিরল প্রজাতির পাখি খুঁজছেন নাকি?

—নাহ্। শ্মশানতলা দেখছি।

—শ্মশানতলায় সন্দেহজনক কিছু ঘটছে বুঝি?

—হ্যাঁ। হালদারমশাই রিভলবার খুলে কাকে তাড়া করে এদিকেই আসছেন।

—সে কী! কাকে তাড়া করছেন উনি?

—তাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওদিকটায় ঘন জঙ্গল। শুধু হালদারমশাইকে দেখতে পাচ্ছি।

পাহাড়ের নিচে বলে এখনই ওদিকে ছায়া ঘন হয়েছে। খালি চোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এদিকে কর্নেল ঘাটের নিচের ধাপে গুঁড়ি মেরে নেমে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, শেষ ধাপের বাঁদিকে জলের তলায় গুঁজে রাখা একটা ডাল ইঞ্চি ছয়েক উঁচু হয়ে আছে। ঢেউয়ে ওটা বারবার ডুবে যাচ্ছে আর মাথা তুলছে। কর্নেল ডালটা উপড়ে তুললে দেখলুম, ওতে একটা নাইলনের দড়ি বাঁধা আছে। দড়িটা টানতে থাকলেন কর্নেল।

একটু পরে অবাক হয়ে দেখলুম দড়ির শেষ প্রান্তে ইঞ্চি ছয়েক উঁচু এবং ইঞ্চি চারেক চওড়া হলদে রঙের ধাতব প্লেটে সাঁটা দুটো কারুকার্যচিত মূর্তি। কর্নেল দ্রুত ওটা রুমালে জড়িয়ে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করলেন। তারপর ঘাটের পাশে ভেঙেপড়া একটুকরো পাথর সেই দড়িতে বেঁধে জলে ছুড়ে ফেললেন এবং সেই ডালে আগের মতো দড়িটা বেঁধে ঠিক জায়গায় পুঁতে দিলেন।

ওটা যে সেই গন্ধর্ববিগ্রহ তা বুঝতে পেরেছিলুম। ঘাটটা খুব নিচুতে। তাছাড়া পাঁচিল থাকায় পেছন থেকে কারও এ ব্যাপারটা চোখে পড়ার কথা নয়।

কর্নেল উঠে এসে ছিপ হাতে নিয়ে হাসলেন, এটাই অনুমান করেছিলুম। এবার দেখা যাক, হালদারমশাই কী করেন।

একটু পরে ঘাটের ডানদিকে ঝোপঝাড়ের ভেতর হালদারমশাইকে দেখা গেল। উনি সে ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, বজ্জাতটা পলাইয়া গেল। শ্মশানতলায় কী একটা করছিল। আমি গেছি আর দৌড় দিছে। আমারে ঢিল ছুড়ছিল ওই ব্যাটাই।

কর্নেল বাইনোকুলারটা একহাতে তুলে ফের শ্মশানতলা দেখতে দেখতে বললেন, সে আবার শ্মশানতলায় গিয়ে একটা কিছু করছে হালদারমশাই ! স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু থাক—আপনি আর ওর কাজে বাগড়া দেবেন না। এখানে বসুন। আশা করছি, রাঘব কফি নিয়ে আসবে। ঘাটে বসে কফি খাবার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে?

ঝিলের মাছগুলো মহা ধূর্ত, টোপ খেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বঁড়শিতে, বেঁধানোর সুযোগ দিচ্ছে না। হালদারমশাই ঘাটের ধাপের পাশে বসে শ্মশানতলার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। কর্নেলের বাইনোকুলারের মহিমা সম্ভবত এতদিনে বুঝতে পারছিলেন। কিন্তু কর্নেলের দু'হাতে ছিপ এবং একাগ্র দৃষ্টি ফাতনার দিকে। তাই হালদারমশাই বাইনোকুলার চাওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। কতবার তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছি,—আপনিও একটা বাইনোকুলার কিনে ফেলুন হালদারমশাই! গোয়েন্দগিরিতে খুব কাজে লাগবে।

তিনি বলেছিন, ধুর! ধুর! ওই যন্তর কী কাজে লাগবে? ক্রিমিন্যালরা কি পক্ষী?

কিছুক্ষণ পরে রাঘব এল কফির পট আর পেয়ালা নিয়ে। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে নমস্কার করে বলল, সারকে কোথায় যেন দেখেছি?

কর্নেল বললেন, হালদারমশাইকে কলকাতায় আমার ঘরে দেখেছিলে। তোমাকে ওঁর আসবার কথাই তখন বলেছিলুম। তুমি ওঁর জন্য আর একটা পেয়ালা আন।

রাঘব যাচ্ছিল। কর্নেল তাকে পিছু ডেকে ফের বললেন, কুমারসায়েব কী করছেন রাঘব?

কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। আবার বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছে। বলে রাঘব চলে গেল।

চাপা গলায় বললুম, কর্নেল! আমার মনে হচ্ছে, বাবা-মেয়ের মধ্যে তর্কাতর্কিটা আসলে গন্ধর্ববিগ্রহ নিয়েই। তাই না।

হালদারমশাই নড়ে বললেন—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল বললেন, পরে সব বলব হালদারমশাই! তবে জয়ন্তের অনুমান ঠিক। গন্ধর্ববিগ্রহ তো এই রাজবংশের রীতি অনুসারে মেয়েদেরই প্রাপ্য। এতদিনে রাণু বিগ্রহের খোঁজ পেয়ে স্নানের ছলে ঝিলের জলে লুকিয়ে রাখতে এসেছিল। আমার এই যন্ত্রটি দূরকে নিকট করে। তখন শিবমন্দিরের কাছ থেকে পাঁচিলের ভাঙা অংশ দিয়ে এই ঘাটটা দেখতে পাচ্ছিলুম। আসলে একটা কৌতূহল ছিল। রাণু কলকাতায় থাকে। ঝিলের জলে স্নানের বয়স তার পেরিয়ে গেছে। যাই হোক, লক্ষ্য করলুম নাইলনের দড়ি নিয়ে এখানে সে কিছু করেছে। তাই ছিপ ফেলার প্ল্যান করেছিলুম।...

পাঁচ

দিনের আলো দ্রুত কমে যাচ্ছিল। অবশেষে কর্নেল ছিপ গুটিয়ে ফেললেন। ঘাটের ওপর দিকে পাঁচিল কবে মুখ থুবড়ে পড়েছে। দু'ধারে ঝোপঝাড় গজিয়েছে। আমরা রাজবাড়িতে ঢুকলাম। সেই সময় কুমারসায়েবের মেয়ে রাণু আমাদের পাশ কাটিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। কোনও কথা বলল না। মেয়েটা দাম্ভিক, নাকি মাথায় ছিট আছে?

কর্নেল ঘুরে তাকে একবার দেখে নিয়ে চুপচাপ পা বাড়ালেন। হালদারমশাই চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে গেল জয়ন্তবাবু?

একটু হেসে বললুম,—রাজকন্যা।

অ্যাঁঃ? কন কী? বলেই হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। কুমারসায়েবের ডটার! কিন্তু এই সন্ধেবেলা একা ঘাটে গেল ক্যান?

খোলা বারান্দায় কুমারবাহাদুর একা বসেছিলেন। এতক্ষণে আলো জ্বলে উঠল। আমাদের দেখে তিনি হাঁক দিলেন, রাঘব! চেয়ার নিয়ে এস।

কর্নেল বললেন, আমরা ঘরেই বসব কুমারসায়েব।

ঘরে ঢুকে কর্নেল কুমারসায়েবের সঙ্গে হালদারমশাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারসায়েব বললেন, রাঘব এঁর কথা বলছিল। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ? ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো?

কর্নেল বললেন, অনেকক্ষেত্রে আমি এঁর সাহায্য নিয়ে থাকি। ইনি রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ছিলেন।

বাহ্! খুব ভাল!—কুমারসায়েব খুশি হয়ে ফের ডাকলেন, রাখব! কফি-টফি নিয়ে এস।

ঝিলের জলের মাছ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর কর্নেল হঠাৎ বললেন, এক মিনিট! আমি আসছি। আপনারা গল্প করুন।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে রাঘব কফি আনল। সেই সময় মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার শোনা গেল, রাঘবদা! রাঘবদা!

রাঘব দৌড়ে গেল। হালদারমশাইও একলাফে বারান্দার নিচে গিয়ে পড়লেন। তারপর উধাও হয়ে গেলেন। আমিও বেরিয়ে গেলুম। কুমারসায়েব বারান্দায় বেরিয়ে "কী হয়েছে, কী হয়েছে" বলে হাঁকডাক জুড়ে দিলেন। মাত্র দু-তিন সেকেন্ডের ব্যাপার।

ঘাটের দিকে ছুটে যাওয়ার সময় হালদারমশাইয়ের গলা শুনতে পেলুম,—তবে রে হালার বান্দর!

তারপর ঝিলের জলে অদ্ভুত সব শব্দ।

কর্নেল ঘাটের ধাপ থেকে রাণুকে টেনে তুললেন। আবছা আলোয় দেখলুম, হালদারমশাই জলে একটা কালো জন্তুকে বগলদাবা করে ফেলেছেন এবং তাঁর একহাতে রিভলভার জলের ওপর নাচানাচি করছে। রাঘব ঝটপট জলে নেমে গিয়ে জন্তুটাকে কাবু করে ফেলল। হালদারমশাই আর রাঘব ওটাকে টেনে ঘাটের ধারে ওঠাল।

ইতিমধ্যে গদাই আর চামেলী এসে গেছে। চামেলী রাণুকে ধরে নিয়ে গেল। রাণু ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

কদাকার জন্তুটাকে হালদারমশাই আর রাঘব শূন্যে তুলে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। কুমারবাহাদুর বোবাধরা গলায় বলে উঠলেন,—কী ওটা কী?

কর্নেল বললেন, এই সেই ভূত কুমারসায়েব! রাঘব! হালদারমশাই! ভূতটাকে এবার দু'ঠ্যাঙে দাঁড় করিয়ে দিন।

ভূতটাকে দাঁড় করানো গেল না। সে হাত-পা ছুড়তে শুরু করল। কর্নেল ওটার দুই কান ধরে টান দিতেই চামড়া খুলে যাওয়ার ব্যাপার হল। বেরিয়ে পড়ল একটা মানুষের মাথা। তারপর পিঠের অংশ খুলে ফেললেন কর্নেল। কী অবাক! পিঠের দিকে জিপ আঁটা ছিল। এবার বেরিয়ে পড়ল হাফপ্যান্টপরা একটা রোগা লিকলিকে লোক।

কুমারসায়েব বলে উঠলেন, এ কী! এ যে দেখছি নকুল! পাঁচু ঠাকুরের গুণধর পুত্র! অ্যাই হারামজাদা ভূত! তোমার হাড়ে-হাড়ে এত বুদ্ধি?

নকুল হাঁউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল কর্নেল বললেন, আমার যেতে আর একটু দেরি হলেই রাণুকে শয়তানটা মেরে ফেলত। রাণুর মাথায় আঘাত করার জন্য একটা বেঁটে কাঠের টুকরো তুলেছিল। ওটা ঘাটে পড়ে আছে। রাঘব! তুমি থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। গদাই! একটা দড়ি এনে একে বেঁধে রাখো।

গদাই দড়ি নিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় নকুলকে পিঠমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে বারান্দায় ওঠালেন।

কুমারসায়েব বললেন, নকুল হারামজাদা রাণুকে মারতে গেল কেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বললেন, ঘরে চলুন। কফি খেতে খেতে সব বলছি।

হালদার মশাই বললেন—আমি আসামিরে পাহারা দিচ্ছি। একখান চেয়ার চাই। চেয়ারে বসে কফি খাব আর পাহারা দেব।

গদাই তাঁকে একটা চেয়ার এনে দিল। তারপর একপেয়ালা কফি দিয়ে এল। হালদারমশাই পুলিশি কায়দায় আসামিকে উপুড় করে দিয়ে তার পিঠে জলে ভেজা দুই পা চাপিয়ে রাখলেন। তাঁর প্যান্টশার্টও ভেজা। কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে কফির পেয়ালা।

কর্নেল বললেন—রাণু আজ গন্ধর্বমূর্তি চুরি করে ঝিলের জলে ডুবিয়ে রেখেছিল। তার দোষ নেই। প্রথমত, আপনাদের বংশের রীতি অনুসারে এ বিগ্রহ বাড়ির মেয়েদেরই পূজ্য। দ্বিতীয়ত, রাণু বুঝতে পেরেছিল, কেউ বা কারা ওটার জন্যই আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে। ভয় পেয়ে আপনি যদি দৈবাৎ বিগ্রহ কোথাও ফেলে দেন, এমন আশঙ্কাও অমূলক ছিল না।

যাই হোক, ব্যাপারটা দৈবাৎ আমার চোখে পড়ে যায়। ছিপে মাছ ধরার ছলে ঘাটে গিয়ে মূর্তিটা খুঁজে বের করেছিলুম। এই নিন সেই বিগ্রহ। এই যুগ্ম গন্ধর্ব আর পেছনকার প্লেট নিরেট সোনার বলে মনে হচ্ছে।

কুমারসায়েব হাত বাড়িয়ে বিগ্রহ নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিরেট সোনা।

—নকুল নিশ্চয় কোথাও ওত পেতে ছিল। রাণু জলে কিছু লুকিয়ে রাখছে এটা ওর চোখে পড়েছিল। কিন্তু দিনের বেলা ঘাটের দিকে আসতে সাহস পায়নি। এদিকে ঘাট থেকে আমরা উঠে আসার পর রাণু গিয়েছিল। আমি বিগ্রহের বদলে দড়িতে একটুকরো পাথর বেঁধে জলে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। রাণু সেটা টেনে তুলে নিশ্চয় হতবাক হয়ে বসেছিল। সেই সময় মওকা বুঝে শ্রীমান নকুল গিয়ে হানা দেয়। রাণু অবশ্য ভূত দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল। আমি গিয়ে দেখি, বজ্জাতটা একটা কাঠ তুলে ওকে মারতে যাচ্ছে। আমি ওকে ধরে ফেলার আগেই হালদারমশাই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে দু'জনেই জলে পড়ে মল্লযুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

কর্নেল হেসে উঠলেন।

বাইরে থেকে হালদারমশাই বললেন, বান্দরটা আমারে শ্মশান থেকে তাড়াইয়া দিছিল ক্যান?..... এই ভূত! ক্যান ঢিল ছুড়ছিলি?

কর্নেল বললেন, ওখানে ওর এই ভূতের পোশাক লুকোনো থাকত। কাজেই আপনাকে তাড়ানোর দরকার ছিল ওর। বিকেলে সে পোশাকটা অন্য নিরাপদ জায়গায় রাখতে গিয়েছিল। আপনি গিয়ে না পড়লে কী সাংঘাতিক কাণ্ড হত!

বারান্দা থেকে নকুল চিঁ চিঁ করে বলল, আর কক্ষনও এমন হবে না কুমারসায়েব!

কুমারসায়েব লাঠি তুলে গর্জন করলেন, শাট্ আপ ভূত কোথাকার!

তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

হালদারমশাই!—কর্নেল বারান্দায় গেলেন। আপনি এক কাজ করুন। জয়ন্তের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ভেজা প্যান্টশার্ট ছেড়ে ফেলুন। ঠাণ্ডায় কতক্ষণ বসে থাকবেন? পুলিশ আসতে একটু দেরি হবে। থানা প্রায় দু'-কিলোমিটার দূরে।

আসামিকে কর্নেলের জিম্মায় রেখে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঘরে ঢুকলেন। করুণ হেসে বললেন, বড্ড হিম জয়ন্তবাবু!.....

কালো ছাতার উৎপাত

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্ত কুমার হালদার, সংক্ষেপে কে কে হালদার ওরফে আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' মন দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ খি খি করে হেসে বললেন, খাইছে।

কোনও মজার খবর পড়লেই উনি এই কথাটি নিজের দেশোয়ালি ভাষায় সহাস্যে উচ্চারণ করেন। এবং আমিও ওঁর সঙ্গে মজা করার জন্য বলে থাকি, কে কাকে খেল হালদারমশাই?

এদিন আমার কৌতুকের মেজাজ ছিল না। সল্টলেক থেকে আসার পথে ইস্টার্ন বাইপাসে একটা পাজির পাঝাড়া ট্রাক আমার ঝকমকে গাড়িটার গা ঘষে দিয়ে গেছে। বেশ কিছু টাকা খরচের ধাক্কা। তাই হালদারমশাইয়ের দিকে মন ছিল না।

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, জয়ন্তবাবু কিছু জিগাইলেন না?

এতএব জিজ্ঞেস করতেই হল, খবরটা কী হালদার মশাই?

ছাতা।—বলে তিনি তাঁর লম্বা তর্জনী দিয়ে বিজ্ঞাপনের পাতায় একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। লিখেছে : কার্জন পার্কে একটি কালো ছাতা কুড়াইয়া পাইয়াছি। মালিক উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া লইয়া যান। গোবর্ধন সর্বাধিকারী। ৩৩/১ নস্কর লেন। কলিকাতা—৬১।

—এতে তো মজার কিছু দেখছি না হালদার মশাই। তা ছাড়া এটা তো বিজ্ঞাপন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ আবার একচোট হেসে বললেন, ছাতার উপযুক্ত প্রমাণ মানে কী? ছাতা নানা সাইজের হয়। একই সাইজের ছাতা অসংখ্য লোকের আছে। আবার সেই অসংখ্য লোকের মধ্যে অনেকেরই কালো ছাতা হারাইতে পারে।.... কী কন কর্নেলসার?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চুরুট কামড়ে কয়েকটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবি নাড়াচাড়া করছিলেন। ওঁর এই জাদুঘর সদৃশ ড্রয়িংরুমে ঢোকার সময়ই দেখে নিয়েছি, ছবিগুলো রংবেরঙের প্রজাপতির। হালদারমশাইয়ের কথা শুনে উনি বললেন, হালদারমশাই কি সুকুমার রায়ের বিখ্যাত সেই 'গোঁফচুরি' পদ্যটা পড়েছেন?

গোঁফচুরি? হালদারমশাই খুব অবাক হয়ে বললেন, গোঁফ চুরি যায় ক্যামনে?

—বলেছিলেন, 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' কাজেই ছাতা দিয়েও মানুষ চেনা যায়। ছাতার আমি, ছাতার তুমি, ছাতা দিয়ে যায় চেনা।

হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, বুঝলাম না।

বুঝতে হলে আপনি এখনই গোবর্ধন সর্বাধিকারীর কাছে গিয়ে কালো ছাতাটি দাবি করুন।

অ্যাঁ? আমার তো ছাতা হারায় নাই।

—ধরুন, হারিয়েছে। এমন লোক নেই, জীবনে যে কখনও ছাতা হারায়নি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ?

—ধরুন, বেঁটে কালো একটা ফোল্ডিং ছাতা, মেড ইন জাপান এবং কোম্পানির নাম তাকামিও আকামা। ...বিখ্যাত কোম্পানি হালদারমশাই।

হালদারমশাই কেন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁর গোঁফ তিরতির করে কাঁপতে লাগল। বললেন, কী কোম্পানি কইলেন য্যান? তাকাচ্ছি না—

—তাকামিও আকামা।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বিড়বিড় করে আওড়ে নামটা মুখস্থ করে ফেললেন। তারপর তাঁর মুখে কৌতুক ফুটে উঠল। বললেন, তবে যাই গিয়া!

—হ্যাঁ। এখনই চলে যান। গিয়ে হয়তো দেখবেন নস্কর লেনে লম্বা লাইন পড়ে গেছে।

হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সবেগে বেরিয়ে গেলেন। দরজার পর্দা বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুলতে থাকল।

আমি অবাক হয়ে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর কাণ্ডকারখানা লক্ষ্য করছিলাম। এতক্ষণে বললাম, হালদারমশাইকে এভাবে একটা কালো ছাতার পেছনে লেলিয়ে দিলেন যে? খামোকা বেচারা—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, খামোকা নয় ডার্লিং। ইদানীং হালদার মশাইয়ের ডিটেকটিভ এজিন্সির ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে। না—কথাটা আমার নয়, ওঁরই। তুমি আসার আগে উনি তাই নিয়ে দুঃখ করেছিলেন। কোনও রহস্যময় ঘটনা কোথাও ঘটছে না। উনিও তাই হাতে কেস পাচ্ছেন না।

শুনে চমকে উঠেছিলাম। বললাম, এই কালো ছাতার বিজ্ঞাপনে কি আপনি কোনও রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন?

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ তাঁর সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, জয়ন্ত! তোমাকে একবার বলেছিলাম, কালো জিনিস সবসময় রহস্যময় বলে মনে করা হয়। কালো বেড়াল, কালো কুকুর, কালো—

হঠাৎ থেমে উনি টাকে হাত বুলোতে থাকলেন—হুঁ। কালো জিনিসকে মানুষ ভয় পায়। গোবর্ধনবাবুর ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

এইসময় ভেতরের ঘরের পর্দা তুলে ষষ্ঠীচরণ বলল,—বাবামশাই। আর কফি খাবেন নাকি? আমাকে এখনই বাজারের জন্য বেরুতে হবে।

—কফি দিয়ে তুই গোল্লায় গেলেও আপত্তি করব না।

বলে উনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অভ্যাসমতো চোখ বুজলেন। বললাম, কর্নেল। তা হলে মনে হচ্ছে, বিজ্ঞাপনদাতা গোবর্ধন সর্বাধিকারী আপনার কাছে এসেছিলেন এবং আপনার পরামর্শেই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

কর্নেল মাথা নাড়লেন, নাহ, সশরীরে আসেননি। কদিন আগে উনি টেলিফোন করেছিলেন। একটা কালো ছাতা কুড়িয়ে পেয়ে ভদ্রলোক নাকি সমস্যায় পড়েছেন।

—কী সমস্যা?

কর্নেল চোখ খুলে একটু হাসলেন, সমস্যাটা ভৌতিক।

—তার মানে?

—ছাতাটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে।

অস্থির হয়ে বললাম, আহা! খুলে বলুন না শুনি।

ষষ্ঠী যে কেটলিতে জল চাপিয়েই পর্দা তুলে কফি খাওয়ার কথা জানতে চাইছিল, সেটা বুঝলাম কারণ সে খুব শিগ্‌গির কফি নিয়ে হাজির হল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, কোনও বাড়িতে ভূতের উপদ্রবের কতকগুলো ধরাবাঁধা লক্ষণ আছে। রাতদুপুরে ছাদে ধুপধুপ পায়ের শব্দ, কিংবা দরজায় নক করা, কখনও কিছু অদ্ভুত শব্দ—তুমি ভূতের ব্যাপারে নতুন কিছু আশা কোরো না ডার্লিং! এই মহাকাশযুগেও ভূতেদের চরিত্র বদলায়নি।

—হ্যাঁ। আপনি হালদারমশাইকে দেখছি আসলে ভূতের পেছনেই ছোটালেন?

—কী আর করা যাবে? উনি চৌত্রিশ বছর গোয়েন্দা পুলিশে চাকরি করেছেন। অবসর নিয়েও গোয়েন্দগিরির অভ্যাস ছাড়তে পারেননি! তাই আজও অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন মনে হচ্ছিল। দেখা যাক, উনি ভূতকে জব্দ করতে পারেন কি না।

হেসে ফেললাম, বরাবর দেখে আসছি, হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে বিভ্রাট বাধিয়ে ফেলেন। নিজেও কম নাকাল হন না। এবারও দেখব, উনি ফেঁসে গেছেন।

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে আবার প্রজাপতির ফোটোতে মন দিলেন। এবার ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে ফোটোগুলো দেখতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী বেরিয়ে গেছে। দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম আছে। ভেতর থেকে নব ঘুরিয়ে খুলে বেরুনো যায়। কিন্তু বাইরে থেকে ঢুকতে হলে চাবির দরকার হয় কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। দেখ তো কে এল?

ড্রয়িংরুমের পর ছোট্ট ওয়েটিংরুম। তারপর বাইরের দরজা। সেটা খুলে দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে সাদাসিধে ধুতিপাঞ্জাবি, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। নমস্কার করে বললেন, আমি একটু কর্নেলসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। জরুরি দরকার আছে।

ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না। উনি আমাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়লেন। তারপর ড্রয়িং রুমের পর্দা তুলে বললেন, বড় বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি সার। আমাকে বাঁচান।

ওঁর পেছন পেছন গিয়ে আমি সোফার কোনার দিকে বসলাম। কর্নেল ওঁকে না দেখেই বললেন, বসুন গোবর্ধনবাবু তারপর কথা হবে।

ভদ্রলোক ধপাস করে বসেই বললেন, আপনি আমাকে কী করে চিনলেন সার?

—আপনার কণ্ঠস্বর শুনে। আপনার কণ্ঠস্বরের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সম্ভবত এর কারণ আপনার টনসিলের অসুখ। কিন্তু আপনি অপারেশন করাতে ভয় পাচ্ছেন।

—আপনি সাক্ষাৎ অন্তর্যামী সার।

নাহ্।—কর্নেল এবার ওঁর দিকে ঘুরে বসলেন। বলুন, আবার আপনার কী বিপদ হয়েছে? এই বিপদটা নিশ্চয় ভূতের নয়?

—আজ্ঞে না। মানুষের।

—যেমন?

—আমার বাড়ির সামনে সকাল থেকে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। আপনার কথায় বিজ্ঞাপন দিয়ে এই বিপদে পড়েছি সার। কী ভাবে এতলোকের সঙ্গে কথা বলব বলুন? একে তো আমার টনসিলে ব্যথা। তাই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে তালা এঁটে চলে এসেছি। এতক্ষণ হয় তো ওরা হুলস্থূল বাধিয়েছে। আজকাল লোকেদের মতিগতি তো জানেন সার। একটুতেই ভাঙচুর শুরু করে দেয়।

—ছাতাটা আপনি নিয়ে এসেছেন দেখতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ সার। ব্যাগে ভরে কী সাবধানে না নিয়ে এসেছি, বলার নয়। এই নিন— বলে গোবর্ধন সর্বাধিকারী ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কালো ফোল্ডিং ছাতা বের করে কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল ছাতাটা টেবিল রেখে বললেন, এবার আপনি কয়েকটা দিন গা ঢাকা দিন।

গোবর্ধনবাবু অবাক হয়ে গেলেন,—আজ্ঞে?

—গা ঢাকা দিন। যদি প্রাণে বাঁচতে চান, অন্যত্র আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে গিয়ে থাকুন। বাইরে বেরুবেন না কিন্তু। হ্যাঁ—দেরি নয় এখনই। কুইক।

গোবর্ধন সর্বাধিকারী হতবাক হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমিও তোমনই হতবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালাম।

কর্নেল এবার ছাতাটা খুলে উল্টোপাল্টে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন। ভেতরটা আতস কাচ দিয়ে দেখে নিলেন। তারপর ওটা গুটিয়ে ভাঁজ করে বললেন,—গোবর্ধনবাবুর মতো এই ছাতাটারও টনসিলের অসুখ আছে বলে মনে হচ্ছে।

—ছাতার আবার টনসিল থাকে নাকি?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—ছাতা খুললে শিকগুলো বাঁটের ওপরদিকে উঠে আটকে দিয়ে সেখান থেকে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে, তার ওপরের অংশটাকে টনসিল বললে মহাভারত অশুদ্ধ

হয় না জয়ন্ত। তাকামিও আকামা কোম্পামির এই ছাতার টনসিল যে অসুস্থ, তার কারণ ওটা বেজায় মোটা। ঠাণ্ডা লেগে ফুলে গেছে যেন।

কিছু জিজ্ঞেস করলে আবার হেঁয়ালি শুনতে হবে। তাই চুপ করে গেলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে পুলিশসূত্রে পাওয়া একটা ডাকাতির খবর জম্পেশ করে লিখছি, সেই সময় কর্নেলের টেলিফোন এল।

—জয়ন্ত! যত শিগগির পারো, চলে এসো।

—তাকামিও আকামা?

—না, হালদারমশাই।

হাসতে হাসতে বললাম, ভূতের হতে জব্দ হয়ে ফিরেছেন তো?

—জব্দ হয়েছেন এবং ভূতেরা ওঁকে ফিরতে দিচ্ছে না।

—সে কী!

—ফোনে সব কথা বলা যাবে না। চলে এস কুইক।...

খবরটা দ্রুত লিখে চিফ রিপোর্টারের কাছে জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারা রাস্তায় যেখান-সেখানে যানজট। কর্নেলের বাড়ি পৌঁছতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখি কর্নেল তৈরি হয়েই আছেন। বললেন, আগে এক পেয়ালা কফি খাও। নার্ভ চাঙ্গা করো। তারপর বেরুব। ষষ্ঠী—।

বললাম, হালদারমশাইয়ের কথা বলুন আগে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে নিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, তোমাকে ফোন করার একটু আগে হালদারমশাই ফোন করেছিলেন। উনি গোবর্ধনবাবুর ঘরে বন্দি।

—কে ওঁকে বন্দি করল?

নস্কর লেনের পেছনেই একটা কবরখানা। কাজেই ভূতের অভাব নেই।

—ওঃ কর্নেল। প্লিজ। ভূত-টুত বোগাস।

—ভূত ছাড়া কী বলা যাবে? নস্কর লেনে গোবর্ধনবাবুর বাড়ির সামনে থেকে লাইন পড়েছিল। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। পাড়ার বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পুলিসকে খবর দেয়। পুলিস এসে লাঠি চার্জ করে সবাইকে ভাগিয়ে দেয়। হালদারমশাই পুলিশের তাড়া খেয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে গোবর্ধনবাবুর বাড়িতেই ঢুকে পড়েন। তারপর ওঁর যা স্বভাব!

ষষ্ঠী কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললাম, তারপর?

—কর্নেল হাসলেন, গোবর্ধনবাবু পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর সময় বেডরুমের তালা দিতে সম্ভবত ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ দরজায় তালা আটকানো ছিল না। হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে সেই ঘরে ঢুকে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে—ভূত ছাড়া আর কী বলা যাবে, আচমকা বাইরে থেকে দরজা কেউ বন্ধ করে দেয়। এবার অবস্থাটা বোঝো! হালদারমশাই যে কাউকে ডাকবেন, তার উপায় নেই। কারণ অন্যের ঘরে বেআইনিভাবে ঢুকে বসে আছেন। জানলাগুলোও বন্ধ। সুইচ টিপে আলো জ্বলেনি। উনি সিগারেট খান না যে সঙ্গে দেশলাই বা লাইটার থাকবে। ওই অবস্থায় বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাকি মশার কামড়। ওঃ! মর্মান্তিক অবস্থা যাকে বলে!

কর্নেল চুপ করলে বললাম, তারপর কী হল বলুন?

—জানলার ফাঁকে বাইরের আলোর ছটা দেখে হালদারমশাই টের পান সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। তখন একটা জানলা একটু ফাঁক করেন। সেই সময় বিছানার পাশে টেলিফোনটা চোখে পড়ে। তারপর আমাকে টেলিফোন করেন। চলো। গিয়ে ওঁকে আগে উদ্ধার করা থাক।

তিনতলা থেকে নেমে কর্নেল বললেন, তোমার গাড়ি এখানেই থাক। আমরা ট্যাক্সি করে যাব। তারপর হাঁটতে হবে একটুখানি।

বরাবর দেখে আসছি, কলকাতার কোনও ট্যাক্সিচালক কর্নেলকে না করেন না। সম্ভবত ওঁর দাড়ি আর লম্বাচওড়া সায়েবি চেহারা দেখেই তাঁরা ওঁকে সমীহ করেন। ট্যাক্সিচালক শর্টকাটে আমাদের মোটামুটি চওড়া একটা রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। এলাকাটা পূর্ব কলকাতায় গোবরা কবরখানার কাছাকাছি। নস্কর লেন একটা আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলি। দূরে-দূরে এক-একটা ল্যাম্পপোস্ট। একে তাকে জিজ্ঞেস করে ৩৩ নম্বরটা যদি বা পাওয়া গেল, ৩৩/১ খুঁজতে বেশ দেরি হল। ৩৩ নম্বরে একটা কারখানা। তার পাশে এঁদো পুকুর। পুকুরের খানিকটা ভরাট করে বাড়ি উঠেছে। গোবর্ধনবাবুর একতলা ছোট্ট পুরনো বাড়িটা সেই পুকুরের একধারে গাছপালার ভেতর লুকিয়ে ছিল। সদর দরজা নস্কর লেন থেকে বেরুনো একটা কানাগলির মুখে। সেখানে অন্ধকার ঘন হয়ে আছে। সম্ভবত ল্যাম্পপোস্টের আলোর ছটা চোখে পড়েই হালদারমশাই সাহস করে জানলা ফাঁক করেছিলেন।

কর্নেল টর্চের আলো ফেলে একটু কাসলেন। কোনও সাড়া এল না। তখন এদিকের জানালার কাছে গিয়ে চুপি চুপি ডাকলেন,'হালদারমশাই'!

তারপর সত্যিই ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। আমাদের আশেপাশে কয়েকটা ছোট-ছোট ঢিল পড়ল। ছাদের ওপর কী একটা শব্দ হল। কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন। কিন্তু কিছু দেখা গেল না। পাশেই একটা খাটাল। সেখানে চালাঘরে মিটমিটে একটা ল্যাম্প জ্বলছিল। খাটালের লোকেরা ছায়ামূর্তির মতো বসে চাপা গলায় গল্প করছিল। তাই বললাম,—কর্নেল, বরং চলুন, ওদের ডেকে হালদারমশাইকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করি।

আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কয়েকটা ঢিল পড়ল। কর্নেল বললেন, চলো! পুকুরের পাড় ঘুরে পেছনের দরজায় যাই। গোবর্ধনবাবুর বাড়িটা এমন জায়গায়, তা ভাবিনি। অথচ বাড়িতে টেলিফোন আছে।

কারখানার পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে পুকুরপাড়ে গেলাম। পাড় বলতে একমিটার চওড়া জায়গা। সেখানে আগাছার জঙ্গল। পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলে দু'জনে সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পেছনের দরজায় গেলাম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, ভূত এত ভীতু হয় জানতাম না। এই দরজা দিয়ে কেটে পড়েছে দেখছি।

তারপর তিনি দরজায় টর্চের আলো ফেললেন। এ দরজায় তালা থাকার কথা। কিন্তু তালা নেই!

ভেতরে ঢুকে কর্নেল দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টর্চের আলোয় অপরিচ্ছন্ন ছোট্ট উঠোন, একটা টিউবেল আর পাশাপাশি দুটো ঘর দেখা গেল। দুটো ঘরেই তালা আটকানো আছে। কর্নেল প্রথমে ডানদিকের ঘরের কড়া নাড়লেন। কোনও সাড়া না পেয়ে বাঁদিকের ঘরের দরজার কড়া নাড়তে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভেতর একটা নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চাপা গলায় ডাকলেন, হালদারমশাই!

এবার হালদারমশাইয়ের সাড়া পেলাম। ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, আবার ডিসটার্ব করে! গুলি করব কইয়া দিলাম। কর্নেল বললেন, হালদারমশাই! অন্যের বিছানায় ঘুমুনো উচিত নয়। উঠে পড়ুন।

—অ্যাঃ! আমি ঘুমাইতাছি?

—হ্যাঁঃ। জেগে উঠুন। শিগগির।

আমি টর্চের আলোয় বারান্দার এক কোণে দেয়ালের গায়ে ইলেকট্রিক মিটারবক্স আর মেইন সুইচ দেখছিলাম। সুইচটা অফ করা আছে। তখনই অন করে দিলাম। ততক্ষণে হালদারমশাই ঘরের ভেতরে দরজার কাছে এসে শাসাচ্ছেন, পরিচয় না দিলে গুলি করব!

বললাম, হালদারমশাই! আমি জয়ন্ত। আমার সঙ্গে কর্নেল আছেন।

ঘরের দরজা টানাটানির শব্দ হল। হালদারমশাই বললেন, সুইচ গেল কই?

খুঁজে দেখুন। সুইচ কোথায় তা আপনি নিশ্চয় দেখেছিলেন।—বলে কর্নেল পাশের ঘরের দরজায় চলে গেলেন।

সেই সময় ঘরের ভেতর এবং বরান্দায় আলো জ্বলে উঠল। কর্নেল পাশের ঘরের তালাটা পরীক্ষা করে ফিরে এলেন। তারপর পকেট থেকে একগোছা নানা সাইজের চাবি বের করে অনেক চেষ্টার পর এই ঘরের তালাটা খুলে ফেললেন। দরজা খুলে দুজনে ঘরে ঢুকলাম। হালদারমশাই দু'হাতে চোখ মুছে বললেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখতাছি?

বললাম, না হালদারমশাই! স্বপ্ন নয়।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা দেখতে ব্যস্ত হয়েছেন। হালদারমশাই "বড্ড মশা!" বলে বেরিয়ে বারান্দায় গেলেন। দেখলাম, উনি মশার কামড় থেকে বাঁচতে মশারি মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। অন্ধকারে মশারি খুঁজে পেলেও তা খাটাতে পারেননি। ঘরে একটা খাটে সাদাসিধে বিছানা, একটা কাঠের আলমারি, দুটো চেয়ার আর একটা ছোট্ট টেবিল। দেওয়ালের তাকে খানকতক পুরনো ধর্মগ্রন্থ, ওষুধের শিশি, এইসব নানা জিনিস।

কর্নেল, বিছানার পাশে টুলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলেই বললেন, ডেড! বোঝা যাচ্ছে, আমরা আসার পরই টেলিফোনের তার ছেঁড়া হয়েছে। খুব চালাক ভূত! জয়ন্ত! বাইরে গিয়ে লক্ষ্য রাখো। হালদারমশাইকে বলো, দরকার হলে ভূতকে ভয় দেখানোর জন্য উনি যেন ওঁর ফায়ার আর্মস রেডি রাখেন। কিন্তু না—গুলি ছোড়া চলবে না।

বেরিয়ে গিয়ে হালদারমশাইকে কথাটা বলতেই উনি পকেট থেকে খুদে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বললেন, আই অ্যাম অলওয়েজ রেডি।

একটু পরে কর্নেল বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে সেই 'মাস্টার কি'-র সাহায্যে আগের মতো তালাটা এঁটে দিলেন। তারপর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে বলে পাশের ঘরের তালা খুললেন এবং ভেতরে ঢুকে গেলেন।

আর ঢিল পড়ল না। ছাদেও কোনও শব্দ শোনা গেল না। মিনিট দু-তিন পরে কর্নেল পাশের ঘর থেকে বেরুলেন, এবং দরজা বন্ধ করে তালাটা দিব্যি আগের মতো এঁটে দিলেন। তারপর বললেন, আর নয়। এবার কেটে পড়া যাক।

কিন্তু অবাক কাণ্ড বাড়ির পেছনের দরজা কখন কে বাইরে থেকে আটকে দিয়ে গেছে। হালদারমশাই পাঁচিল টপকে ওধারে গিয়ে চাপা হুঙ্কার দিয়ে একটা কিছু করলেন এবং দরজাটা খুলে গেল। তিনি খি খি করে হেসে বললেন,—পুরানো কড়া। এক টানেই ব্রেকডাউন।

কর্নেল বললেন, কুইক! ভূতের মুখে খবর পেয়ে যে কোনও সময় পুলিশ এসে পড়তে পারে। পুলিশ অনধিকার প্রবেশের দায়ে আমাদের অ্যারেস্ট করলে একটু ঝামেলা হবে।

আমরা পুকুরপাড়ের ভেতর দিয়ে কারখানার পাঁচিলের কাছে গিয়ে আবার নস্কর লেনে পৌছলাম।

সে-রাতে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কাজুবাদাম পটাটোচিপসের সঙ্গে কফি খেতে খেতে ক্ষুধার্ত হালদারমশাই শুধু মশা নিয়ে বকবক করছিলেন। বোঝা গেল, পাশে খাটাল এবং এঁদো পুকুর থাকার দরুন ওখানে মশার বড় উপদ্রব আছে। এক ফাঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, মশার উপদ্রব তো থাকারই কথা। কিন্তু ভূতের উপদ্রব টের পাননি?

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন, কী কইলেন? ভূতের উপদ্রব?

কর্নেল বললেন, হালদারমশাই! গোবর্ধন সর্বাধিকারী কালো ছাতাটা কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে ওঁর বাড়িতে ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছিল।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, কর্নেলসার! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। কিন্তু এমন সাংঘাতিক এক্সপিরিয়েন্স হয় নাই। হঃ! ছাদের উপর ধুপধুপ শব্দ শুনছি। দরজার কড়া নড়ছিল—একবার নয়, অনেকবার। তারপর

পাশের ঘরে কী সব খুট্‌খাট্‌ নাড়াচাড়া। কিন্তু তখন কান দিই নাই। এখন মনে খটকা বাধল। আপনারা ভূতের উপদ্রব কইলেন!

—গোবরা কবরখানা কিন্তু বাড়িটার কাছাকাছি হালদারমশাই!

আমিও না বলে পারলাম না, কর্নেল! আমরা গিয়েও কিন্তু ভূতুড়ে উৎপাত দেখেছি। ঢিল পড়ছিল। ছাদের ওপর কী একটা অদ্ভুত শব্দ শুনেছি। সে-কথা হালদারমশাইকে বলা উচিত।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, হেভি মিস্ট্রি! তবে আমার নামও কে.কে. হালদার। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ যদি করতে না পারি, আমার কান কাইট্যা কুত্তার গলায় লটকাইয়া দিমু।

বলেই উনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। বরাবর দেখে আসছি, প্রচণ্ড উত্তেজনায় ওঁর মুখে দেশোয়ালি ভাষা বেরিয়ে যায়। আমি হেসে ফেললাম, কর্নেল! হালদারমশাই আবার ওবাড়িতে হানা দিতে গেলেন না তো?

কর্নেল সে-কথায় কান না দিয়ে বললেন, তুমি কী বুঝলে বলো জয়ন্ত?

বললাম, অনেক আগেই বুঝে গেছি।

—বাহ্‌। বলো শুনি!

—পুকুর বুজিয়ে যে-প্রোমোটার ওখানে বাড়ি তুলছে, এটা তারই চক্রান্ত। ভূতের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে গোবর্ধনবাবু বাড়ি বেচে অন্য কোথাও চলে যেতে চাইবেন এবং প্রোমোটার ওঁর বাড়িটা কিনে নিয়ে বহুতল বাড়ি তুলবে।

—কিন্তু তাকামিও আকামা কোম্পনির তৈরি ছাতার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

—হঠাৎ ভূতের উৎপাতের সঙ্গে ওই কালো ছাতাটা তো জড়িয়েই গেছে। গোবর্ধনবাবু ওটা কুড়িয়ে পাওয়ার পর থেকে ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছে। প্রোমোটারের লোক কার্জন পার্কে গোবর্ধনবাবুর চোখে পড়া জায়গায় ছাতাটা ফেলে রেখেছিল।

—হুঁ। গোবর্ধনবাবু কার্জন পার্কে ঘাসের ওপর বসেছিলেন। হঠাৎ পাশেই ওই ছাতাটা পড়ে থাকতে দেখেছিলেন বটে!

ঘড়ি দেখে বললাম, আমি উঠি। এগারোটা বাজতে চলল।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, এত রাতে সল্টলেকে একা ফিরবে! ইস্টর্ন বাইপাসে তোমার গাড়ির ভেতর ভূত ঢুকে গেলেই বিপদ। নস্কর লেন থেকে বাইপাস বেশি দূরে নয়। হ্যাঁ—এমনও হতে পারে, নস্কর লেন থেকে আমাদের ফলো করে এস, ভূত তোমার গাড়ির তলায় ঘাপটি পেতে বসে আছে।

—ভূত-টুত বোগাস!

—টুত আরও সাংঘাতিক, ডার্লিং! কাজেই আমার বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যাও। ষষ্ঠী! আমরা এবার খেতে যাচ্ছি।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটানো নতুন কিছু নয়। তবে আমি বিছানা থেকে দেরি করে উঠি। এদিন ঘুম ভাঙল পৌনে আটটায়। তা-ও ষষ্ঠী না ডাকলে আরও কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকতাম।

আটটা নাগাদ ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই কর্নেলের সম্ভাষণ শুনলাম, মর্নিং জয়ন্ত! আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং! আপনার দেখছি সত্যিই পেছনে একটা চোখ আছে!

প্রাজ্ঞ রহস্যভেদী একটা আলমারির কাচের দিকে তর্জনি তুলে বললেন,—ওখানে তোমার প্রতিবিম্ব পড়েছিল। ডার্লিং! সবসময় সচেতন থাকলে অনেককিছু জানা এবং দেখা হয়ে যায়। তো বসো! হালদারমশাইকে টেলিফোন করে আসতে বলেছি। না, উনি গতরাতে আর নস্কর লেনে

ওত পাততে যাননি। আজ রাতে যেতেন। আমি বললাম, আর ওখানে যাওয়ার দরকার হবে না। বরং এখানে চলে আসুন।

—কী ব্যাপার?

—সাতটায় ছাদের বাগানে ছিলাম। তখন ষষ্ঠী গিয়ে খবর দিল, গোবর্ধনবাবু নামে এক ভদ্রলোক টেলিফোন করেছেন। জরুরি দরকার। অগত্যা নেমে এসে কথা বলতে হল। গোবর্ধনবাবু আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। জরুরি দরকার আছে।

—কিন্তু আপনি তো ওঁকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে বলেছেন!

—বলেছি। অথচ উনি দেখা করতে চান। তাই ওঁকে নটার মধ্যেই আসতে বলেছি।

ষষ্ঠী ট্রেতে কফি-দুধ-চিনি-পেয়ালা আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। তারপর হঠাৎ উঠে ভেতরে চলে গেলেন। সেই কালো ছাতাটা নিয়ে ফিরে এলেন। ছাতাটা টেবিলে রেখে কর্নেল বললেন, তাকামিও আকামা কোম্পানির এই ছাতাটার গলায় টনসিলের অসুখ ছিল। কাল দুপুরে অসুখটা সারিয়ে দিয়েছি।

—ওঃ কর্নেল! আবার হেঁয়ালি করছেন।

—হেঁয়ালি? মোটেও না। ছাতাটার গলায় প্রায় এক ইঞ্চি ব্যাস এবং তিন ইঞ্চি লম্বা গোল শক্ত জিনিস আটকে ছিল। ছাতার মাথার টুপি খুলে সেটা বের করে ফেলেছি। ছাতাটা এখন সুস্থ।

—জিনিসটা কী?

—জানি না। যথাস্থানে পরীক্ষা করাতে হবে। তবে এখন ওসব কথা নয়।

মুখটি বুজে থাকো।

বলেই কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন।

দোতলায় লিন্ডাদের কুকুরটা চ্যাঁচামেচি করছে। হালদারমশাই আসছেন। কেন জানি না, কুকুরটা ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে সহ্য করতে পারে না।—ষষ্ঠী! দরজা খুলে দে।

তখনই ডোরবেল বাজল। এবং একটু পরে হালদারমশাই সবেগে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে বললেন, মিস্ট্রি সল্‌ভ্‌ড্‌ হইল ক্যামনে?

কর্নেল বললেন, কফি খান। নার্ভ চাঙ্গা করুন। খবরের কাগজ পড়ুন। তারপর সে-সব কথা হবে।

ষষ্ঠী হালদারমশাইয়ের জন্য বেশি দুধ-মেশানো স্পেশাল কফি নিয়ে এল। উনি গম্ভীর মুখে কফিতে চুমুক দিয়ে খবরের কাগজ টেনে নিলেন। অন্যদিনের মতো একটা 'খাইছে' শোনার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে নিরাশ করলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী দেখে এসে বলল—কালকের সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

কর্নেল ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ওঁকে নিয়ে আয় হতভাগা। এরপর আস্তে পর্দা তুলে গোবর্ধন সর্বাধিকারী ঘরে ঢুকে বিনীতভাবে নমস্কার করে বললেন, কর্নেলসাহেবকে বিরক্ত করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু—

কর্নেল বললেন, আপনি বসুন।

গোবর্ধনবাবু বসলেন। তারপর আমাকে এবং হালদারমশাইকে একবার দেখে নিলেন। হালদারমশাই তাঁকে দেখছিলেন। কর্নেল বললেন, আলাপ করিয়ে দিই! উনি হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির মিঃ কে কে হালদার। হালদারমশাই! ইনিই মিঃ গোবর্ধন সর্বাধিকারী।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ নড়ে বসলেন, আপনার ছাতা? আপনিই বিজ্ঞাপন দিছিলেন পেপারে?

গোবর্ধনবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওই ছাতা নিয়ে কী বিপদে পড়েছিলাম বলার নয়।

কর্নেল বললেন, বলুন গোবর্ধনবাবু!

—আজ্ঞে, ছাতাটার আসল মালিকের খোঁজ পেয়ে গেছি। আমার এক ভাগনে ভবানীপুরে থাকে। সে আমাকে কথায়-কথায় কাল সন্ধ্যাবেলা—

—এক মিনিট! আপনি তা হলে কলকাতাতেই ছিলেন?

—থাকব না তো কোথায় যাব? আমার কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে?

—বেশ। আপনি ছাতা ফেরত নিতে এসেছেন তো?

—আজ্ঞে!

কর্নেল টেবিল থেকে ছাতাটা তুলে ওঁকে দিলেন। উনি ছাতাটা বগলদাবা করে উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার টনসিল সেরে গেছে দেখছি!

গোবর্ধনবাবু কেমন একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, আজ্ঞে তা—

—আপনার ছাতারও টনসিলের অসুখ ছিল গোবর্ধনবাবু! সারিয়ে দিয়েছি।

—ছাতার টনসিলের অসুখ। কী বলছেন কর্নেলসাহেব!

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ফেলে বললেন, আপনার টনসিলের অসুখ সেরেছে বটে, কিন্তু আপনি একটু রোগা হয়ে গেছেন।

গোবর্ধনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, ভয়ে কর্নেলসাহেব! ভয়ে আর দুশ্চিন্তায়। আচ্ছা চলি।

—একটু কফি অন্তত খেয়ে যান!

—আরেকদিন এসে খাব। একটু তাড়া আছে।

—আচ্ছা গোবর্ধনবাবু! আপনি কি রোজই কার্জন পার্কে বেড়াতে যান?

—যাই কর্নেলসাহেব। অফিস থেকে বেরিয়ে কার্জন পার্কে কিছুক্ষণ বসে থাকি।

—আপনি এত সকালে চুল ছেঁটেছেন দেখছি! গোঁফটাও ছেঁটেছেন!

গোবর্ধনবাবু আবার একটু ভড়কে গেলেন। যাওয়ারই কথা। আমিও কর্নেলের প্রশ্নের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না। হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় তাঁর গোঁফ তরতর করে কাঁপছে। গোবর্ধনবাবু কাঁচুমাচু হেসে বললেন, আসার পথে ফুটপাতে ছেঁটে নিলাম।

—আপনার বাড়ি টেলিফোন আছে। আপনি ফুটপাতে চুল আর গোঁফ ছাঁটলেন? এটা আপনাকে মানায় না। যাই হোক, কাল আপনি বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় ঘরে তালা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই আপনার ঘরে ঢুকতে পেরেছিলেন। তাই না হালদারমশাই?

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে শুধু বললেন,—হঃ!

সর্বনাশ! তা হলে তো এতক্ষণ আমার সব চুরি হয়ে গেছে।—বলে গোবর্ধনবাবু পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, না। আপনার ঘরের দরজায় একটা তালা আমরা কাল রাতে দেখে এসেছি। তাই না হালদারমশাই?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, হঃ! কোন ব্যাটা তালা আটকাইয়া দিছিল। তখন আমি ওনার ঘরে ভরা। ওঃ। সে কী মশা! ও বাড়িতে থাকেন কী কইরা বুঝি না।

কর্নেল বললেন, তাকামিও আকামা কোম্পানির ছাতাটা নিয়ে যাচ্ছেন, ভাল। কিন্তু মনে রাখবেন, ছাতাটার টনসিলের অসুখ আমি সারিয়ে দিয়েছি।

গোবর্ধনবাবু কেমন চোখে তাকিয়ে থাকার পর আবার ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

কর্নেল এবার খুব গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, আপনাকে একটু বসতে হবে জনার্দনবাবু!

ঘরে যেন বিনামেঘে বাজ পড়ল। আমি ও হালদারমশাই পরস্পর তাকাতাকি করলাম। কর্নেল পকেট থেকে সেই ছোট্ট গোল ফিল্মরোলের মতো জিনিস বের করে বললেন, জনার্দনবাবু! এই জিনিসটা আপনার কাছে পৌঁছুনোর কথা। এটাই ছাতার টনসিলের মধ্যে ছিল। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য! আপনি কোনও কারণে সেদিন কার্জন পার্কে সময়মতো পৌঁছুতে পারেননি। এদিকে আপনার যমজভাই গোবর্ধনবাবু সেখানে নেহাত খেয়ালে গিয়ে পড়েছিলেন। তাই এই ছাতাটা তাঁরই সামনে ফেলে রেখে চলে যায় আপনার স্মাগলিং গ্যাংয়ের কোনও লোক... না-না। পালানোর চেষ্টা করবেন না।

হালদারমশাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। একলাফে এগিয়ে গিয়ে জনার্দন সর্বাধিকারীকে ধরে ফেললেন, এই ব্যাটা আমারে ঘরে আটকাইয়া রাখছিল! এই সে ভূত। এই ভূতের জন্য—ওঃ! সে কী মশা!

কর্নেল বললেন,—জনার্দনবাবু! কাল রাতে আপনার ঘরে ঢুকে সব দেখেছি। আপনার নামও জানতে পেরেছি। খাটের তলায় বিদেশি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম থেকে শুরু করে নানা দামি জিনিস ঠাসা আছে। আপনি আপনার যমজ ভাই গোবর্ধনবাবুর টেলিফোন ট্যাপ করে রেখেছিলেন, তা-ও দেখেছি। আমরা যাওয়ার পর বেগতিক বুঝে ওঁর টেলিফোনের তার ছিঁড়ে ফেলেছিলেন আপনি।

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী!

একটু পরে আমার পরিচিত কাস্টমস অফিসার রথীন মৈত্র এবং তাঁর দুজন অনুচর ঘরে ঢুকলেন। রথীন মৈত্র বললেন, ৩৩/১ নস্কর লেনের একটা ঘরে রেইড করে প্রচুর ড্রাগ ক্যাপসুল পেয়েছি কর্নেল সরকার! তো এই বুঝি সেই জনার্দন সর্বাধিকারী? একবার ভুল করে এঁর যমজ ভাইকে অকারণ হ্যারাস করেছিলাম আমরা। এই জনার্দনরা ড্রাগ পাচার করে এনে দেশটার সর্বনাশ করছে।

কর্নেল সেই ফিল্মরোলের মতো জিনিসটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন,—এতেও নিষিদ্ধ ড্রাগ ভরা আছে। আপনারা পরীক্ষা করলে বলতে পারবেন, এর কত দাম। আর জনার্দনবাবুর ছাতাটাও নিয়ে যান।

রথীন মৈত্র জনার্দনবাবুকে ছাতাসহ পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন। হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, কী কাণ্ড! যমজ ভাই, তা বুঝলেন ক্যামনে কর্নেলসার?

কর্নেল বললেন, গতরাতে যখন জনার্দনবাবুর ঘরে ঢুকি, তখন কিছু বুঝতে পারিনি। জনার্দন সর্বাধিকারীর বিজনেস কার্ড ওই ঘরে দেখতে পেলেও ওঁকে তো তখনও চর্মচক্ষে দেখিনি! এদিকে গোবর্ধনবাবুও বলেননি তাঁর কথা। হাজার হলেও সহোদর ভাই। তাই আমার কাছে কথাটা গোপন রাখা স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ—এটা সুস্পষ্ট যে, উনি টের পেয়েছিলেন ভূতের উৎপাত কে বাধিয়েছে। আসলে উনি ভাইটিকে বাঁচানোর জন্যই শেষ পর্যন্ত ছাতাটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ সকালে যখন ওঁর ফোন এল, তখন প্রথমে একটু খটকা লাগল। কণ্ঠস্বর কতকটা এক হলেও টনসিলের রোগীর মতো নয়। তারপর কিছুক্ষণ আগে যখন ষষ্ঠী এসে বলল, কালকের সেই ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন খটকাটা বেড়ে গেল। গোবর্ধনবাবুর তো সোজা এ ঘরে ঢুকে পড়া উচিত ছিল। তারপর আমার প্রশ্নগুলো স্মরণ করুন। চুলের ছাঁট, গোঁফ, একটু রোগাটে গড়ন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে স্পষ্ট বুঝলাম, ইনি কখনই গোবর্ধনবাবু নন। এঁকে যমজভাই বলে সাব্যস্ত করতেই হল।

যমজদের বিষয়ে আমি কিছু পড়াশুনা করেছি। দেখতে একইরকম হলেও যমজদের মধ্যে আচরণগত কিছু তফাত থাকে। দু'জনের আঙুলের ছাপও আলাদা। তার চেয়ে বড় কথা, কাল গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল ইনি তা জানেন না।

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন। আমি বললাম, এ তা হলে সুকুমার রায়ের সেই গোঁফচুরি পদ্যটার ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াল। ছাতার আমি, ছাতার তুমি, ছাতা দিয়ে যায় চেনা! কিন্তু গোবর্ধনবাবুকে আপনি গা-ঢাকা দিতে বলেছিলেন কেন?

কর্নেল হাঁকলেন, ষষ্ঠী! আরেক রাউন্ড কফি!

তারপর বললেন, আমার সন্দেহ হয়েছিল, ছাতার মধ্যে এমন কিছু লুকোনো আছে, যার জন্য গোবর্ধনবাবু আরও সাংঘাতিক বিপদে পড়তে পারেন।

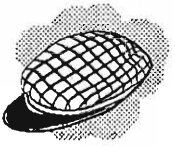

অকালকুষ্মাণ্ড

স্টেশন তখনও অন্তত আধকিলোমিটার দূরে, ট্যাক্সিটা বিগড়ে গেল। ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে। ট্যাক্সির সামনে ও পিছনে গাদাগাদি করে প্রায় এক ডজন যাত্রী ঠাসা ছিল। এ-মুল্লুকে নাকি এটাই রেওয়াজ। তবে শীতের দাপটে অবস্থাটা খুব একটা অসহনীয় মনে হচ্ছিল না। তো ট্যাক্সিওয়ালা দশ কিলোমিটার পথ আসতে ইতিমধ্যে তিনবার ভাড়া বাড়িয়েছে। এবার এই কলকব্জা বিগড়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে চতুর্থ দফা ভাড়া বাড়ানোর ফন্দি ভেবেই আমরা যাত্রীরা ঝটপট নেমে এলুম। এবং যাঁদের ঠ্যাংগুলো লম্বা তাঁরা সবার আগে দেখতে-দেখতে উধাও হয়ে গেলেন।

একটু পরে দেখি, আমি আর ট্যাক্সিওয়ালা ছাড়া আর জনপ্রাণীটি নেই। ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে কোনও ফন্দিফিকির বা ধূর্তামির চিহ্ন খুঁজে পাচ্ছিলুম না। লোকটা করুণ মুখে এঞ্জিনের কলকব্জার দিকে তাকিয়ে আছে। বললুম, "কী দাদা, কী বুঝছেন?"

লোকটা হতাশভাবে মাথা নেড়ে বল,"নেহি সাব। আপ পাঁয়দল চলা যাইয়ে।"

হুঁ, ভেবেছে আমি ওর হাড়জিরজিরে গাড়িটার মূর্ছাভাঙার অপেক্ষায় আছি। আসলে এতক্ষণ ঠাসাঠাসিতে আমার শরীর আগাগোড়া ঝিম মেরে গেছে। পা দুটোতে কোনও সাড় নেই। তাই সেই ঝিমুনি কাটিয়ে নিচ্ছি। এবং সেটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যেই রাস্তার উপরে পা দুটো ঘোড়ার মতো ঠুকতে-ঠুকতে কয়েক পা এগিয়ে গেলুম। কাছেই একটা ব্রিজ রয়েছে। নদীটা বেশ চওড়া। তবে আদ্ধেকের বেশি বালিতে ভরা, বাকিটায় কালো জল। স্রোত বইছে বলে মনে হচ্ছিল না।

বিকেল হয়ে গেছে। শীতের দিন ঝটপট ফুরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখলুম, ট্রেনের এখনও মিনিট কুড়ি দেরি। স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে গেলেও ট্রেন ধরা যাবে। সঙ্গে একটা কিটব্যাগ ছাড়া কোনও বোঝা নেই। তাছাড়া জায়গাটা কেন যেন খুব ভাল লাগছিল। একধারে ছোটবড় পাহাড়। তার উপত্যকা শীতের শস্যে সবুজ হয়ে আছে। অন্যধারেও পাহাড় আছে। আর আছে ঝোপঝাড় আর মাঝে-মাঝে ঘন জঙ্গল। সামনে ওই স্টেশনের কাছে যা একটা বসতি—তাছাড়া কাছাকাছি কোনও বসতির চিহ্ন চোখে পড়ছিল না। মনে হল, জায়গাটা ভ্রমণবিলাসীদের পক্ষে মোটামুটি পছন্দসই।

হঠাৎ আমার চোখ গেল ডাইনে নদীর পাড়ে জঙ্গলের দিকটায়। ঝোপের মধ্যে কী একটা বসে আছে যেন। বাঘ-ভালুক নাকি? বলা যায় না, এই জঙ্গলে জনহীন জায়গায় বিশেষ করে শীতকালে জন্তু-জানোয়ার বেরিয়ে পড়তেও পারে।

ধূসর রঙের প্রাণীটি আমার দিকে পিঠ রেখে ওত পেতে আছে। একবার ভাবছি, ট্যাক্সিওয়ালাকে ডেকে সাবধান করে দিই। আবার ভাবছি, আমার ডাকাডাকি শুনে যদি দাঁত-নখ বাগিয়ে তেড়ে আসে! অবশ্য রাস্তাটা যথেষ্ট উঁচু এবং আন্দাজ দেড়শো মিটার দূরত্বে রয়েছে ওটা।

কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে ওটা উঠে দাঁড়াল এবং তক্ষুনি বুঝলুম, চোখের ভুল হয়েছে। ওটা ধূসর রঙের কোট-প্যান্ট পরা একজন মানুষই বটে। হাতে কী একটা রয়েছে। গা ছমছম করে উঠল এবার অন্যরকম ভয়ে। হাতে কি ওটা পিস্তল? কাউকে খুন করার জন্যে ওত পেতে আছে লোকটা? কিন্তু কোটপ্যান্ট এবং দস্তুরমতো সায়েবি টুপিপরা কোনও লোক কাউকে খুন করার জন্যে ওভাবে ওত পেতেছে, এটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে হল না।

অথচ ওর গতিবিধি সন্দেহজনক। সন্দেহ আরও বাড়ল, যখন দেখলুম, লোকটা হাতের কালোরঙের জিনিসটা তুলে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিতে একটু কুঁজো হল এবং ওইভাবে পা টিপে টিপে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল।

তারপর দেখি, সে দৌড়তে শুরু করেছে। গুরুতর দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আমার বুক ঢিপঢিপ করছে এবার। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, গুলির শব্দ আর মানুষের আর্তনাদ শুনব। ওর হাতের জিনিসটা যদি বন্দুক হত, তাহলে তো শিকারিই ভাবতুম। পিস্তল দিয়ে কি কেউ পাখি বা জন্তুজানোয়ার শিকার করে?

দৌড়ে সে যেখানে ঢুকলে, সেখানে কিছু উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে। ছায়ায় অস্পষ্টভাবে তাকে দেখতে পাচ্ছি। তারপর সে অন্তত একমিনিটের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা ব্যাপারটা দেখেছে নাকি জানার জন্যে ওদিকে ঘুরলুম। না, ও এখনও এঞ্জিনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আবার যখন সেই লোকটাকে দেখতে পেলুম, তখন সে নদীর পাড়ে হাঁটু দুমড়ে বসেছে এবং পিস্তল তাক করে রেখেছে। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। দৌড়ে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে ব্যাপারটা দ্রুত জানিয়ে দিলুম। দু-দু'জন মানুষ এখানে থাকতে একটা খুনখারাপি হবে। যে ট্যাক্সিওয়ালা তিন-তিনবার যাত্রীদের চাপ দিয়ে ভাড়া বাড়িয়েছে, তার বিবেকও এবার নড়ে উঠল। "এইসা?" বলে সে তার ট্যাক্সি থেকে একটা লোহার রড বের করল। তারপর চোখ কটমট করে আমাকে ডাক দিল। আমারও একটা কিছু হাতে নেওয়া দরকার। অগত্যা ওর এঞ্জিনের মধ্যে রাখা একটা রেঞ্জ তুলে নিয়েই রওনা দিলুম। উত্তেজনায় মাথার ঠিক নেই।

ট্যাক্সিওয়ালা উঁচু রাস্তা থেকে নামতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ল। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় চাপা স্বরে কী বলতে বলতে ঝোপঝাড় ভেঙে এগুতে থাকল। আমি ওর পিছু-পিছু চলেছি। দু'জনেই সতর্ক। আচমকা ধরে ফেলব ওকে।

আমাদের দিকে পিঠ রেখে লোকটা এখনও তেমনি বসে আছে। টুপিপরা মাথাটা সামনে ঝুঁকেছে, হাতের পিস্তল একেবারে নাকের ওপর তুলে তাক করে রেখেছে। সম্ভবত হতভাগ্য মানুষটি অর্থাৎ যাকে খুন করবে, সে নিচে নদীতে নিশ্চিন্তে কিছু করছে-টরছে। কিছু টের পাচ্ছে না। খুনে লোকটির হাতে পিস্তল আছে বলেই আমরা এ সাবধানী হয়েছি। পা টিপে এগিয়ে কয়েক মিটার দূর থেকে ট্যাক্সিওয়ালা রড তুলল এবং আমিও রেঞ্জটা বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "খুন করলে! খুন করলে! পাকড়ো পাকড়ো!" ভুলেই গেলুম যে, ওর হাতে পিস্তল আছে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গুপ্তঘাতক ঘুরে ব্যাপারটা দেখেই হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপ দিল। ট্যাক্সিওয়ালা রড নাচিয়ে পাড় থেকে শাসাতে শুরু করল। "পিস্তল ফেক দো! নেহি তো ডাণ্ডা মারেগা হাম!"

আমি তখন হতভম্ব দাঁড়িয়ে গেছি। কী বলব, ভেবে পাচ্ছি না। নাকি এখনও লিটনগঞ্জের সেই সরকারি অতিথিশালায় শুয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখছি।

কালো এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে বুক-অব্দি ডুবিয়ে হতভাগ্য গুপ্তঘাতক এখন ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তার টুপিটাও খুলে পড়ে কাগজের নৌকোর মতো ভেসে যাচ্ছে অল্প অল্প স্রোতে, এবং তার ফলে মাথাজোড়া যে টাকটি এই গোলাপি রোদ্দুরে চিকমিক করছে, সেটি অতি প্রসিদ্ধ এবং আমার সুপরিচিত। তার সান্টা ক্লজ-সদৃশ সাদা অনবদ্য গোঁফ- দাড়িতে এখন বিস্তর জলকাদা লেগেছে।

এবং তার হাতের সেই পিস্তলটা পরিণত হয়েছে বাইনোকুলারে। হয়েছে বলেই আমাদের বোকামির শাস্তি পাইনি। কিন্তু ততক্ষণে আমার পেটে হাসি ঘুলিয়ে উঠছে। হায় বুড়ো ঘুঘু। এ কী

দশা তোমার! ট্যাক্সিওয়ালা লোহার রডটা ফের তুলতেই করুণ আওয়াজ এল, "জয়ন্ত! ওকে একটু বুঝিয়ে বলো যে, এটা পিস্তল-টিস্তল নয়, সামান্য একটা দূরবীন।"

এতক্ষণে আমি হাসতে পারলুম। হো-হো করে হেসে উঠলুম। ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, "ক্যা জি? কোই জান-পহচান্ আদমি? কৌন হ্যায় উও?"

বললুম, "থোড়া গলতি হুয়া দাদা! মাফ কিজিয়ে। উও দেখিয়ে আপকা ট্যাক্সিমে বাচ্চালোগ ক্যা গড়বড় কর রহা।"

সত্যি-সত্যি কাচ্চাবাচ্চারা ওই জনহীন রাস্তায় ওর ট্যাক্সিতে হামলা করেনি, কিন্তু উপায় নেই। ওই নিমজ্জিত বৃদ্ধ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে হবে। শীতের বিকেলে নদীর জল ওঁর পক্ষে নিশ্চয় আরামদায়ক হচ্ছে না। যাইহোক, আমার মিথ্যে কথায় কাজ হলো। ট্যাক্সিওয়ালা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ওর হাতে সেই ছোট্ট রেঞ্জটা গুঁজে দিতেই সে জঙ্গল ভেঙে রাস্তায় ট্যাক্সির দিকে দৌড় দিল!

নিমজ্জিত বৃদ্ধের দিকে ঘুরে সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললাম, "জলটা কি খুবই ঠাণ্ডা?"

উনি করুণ হেসে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, "ধন্যবাদ! আমি এবার উঠতে পারব। তবে দয়া করে তুমি আমার টুপিটা উদ্ধার করো।"

হাসতে-হাসতে একটা গাছের ডাল ভেঙে ধীরে ধীরে ভাসমান টুপিটা উদ্ধার করে দেখি, উনি পাড়ে উঠেছেন এবং কী আশ্চর্য আবার চোখে বাইনোকুলার রেখে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন! ভিজে পোশাক থেকে জল ঝরছে সমানে। কিন্তু এতক্ষণে সব রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে ওঁর প্রচলিত নাম বা বদনাম ধরে ডেকে ফেললুম, "হাই ওল্ড ঘুঘু! নিমুনি হবে যে!"

উনি কানই দিনেল না। দৌড়ে গিয়ে ওঁর কাঁধ খামচে ধরলুম। তখন হতাশ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। "মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান! তুমি জানো না, কী সাংঘাতিক ক্ষতি করেছ আমার! অনেক কষ্টের পর বিরল প্রজাতির একটা উড-ডাকের দেখা পেয়েছিলুম! আর কি তাকে খুঁজে পাব?"

ওঁর কথায় এবার অনুতাপ জাগল। বললুম, "এই দুর্ঘটনার জন্যে আমি যথেষ্ট লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্ষমা করুন এবং চলুন, যেখানে উঠেছেন, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলাবেন।"

"এক মিনিট, জয়ন্ত! আমি প্রজাপতিধরা জালটা নিয়ে আসি। "

বলে উনি সামনের দিকে পা বাড়ালেন। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, গাছপালার ফাঁকে একটা কাঠের বেড়া দেখা যাচ্ছে। বুড়ো দেখতে দেখতে কী কৌশলে সেই বেড়ার ফাঁক গলিয়ে অদৃশ্য হলেন। তখন ব্যাপারটা ভাল করে দেখার জন্য বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলুম।

একটা কৃষিফার্ম বলে মনে হল। নদীর ধারে চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কেউ চাষবাস করছে। অঢেল শীতের ফসল ফলে রয়েছে। তরিতরকারিও লাগানো আছে। বুড়ো এখন হামাগুড়ি দিয়ে কুমড়োখেতের দিকে এগোচ্ছেন। দুর্লভ প্রজাতির কতকগুলো প্রজাপতি ওঁর জালে ধরা পড়েছে জানি না, তবে আমার চোখ পড়ল কুমড়োগুলোর দিকে। কিন্তু ওগুলো কি সত্যি কুমড়ো, না পাথর? চতুর্দিকে অজস্র ছোটবড় পাথর পড়ে আছে। অনেকরকম গড়ন, নানান রঙের। কিন্তু কুমড়োখেতের ওগুলোর মসৃণ নিটোল গড়ন আর সোনালি রং দেখেই বুঝতে পারলুম, পাথর নয়। অতএব কুমড়ো ছাড়া আর কী?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু ওখানে হাঁটু মুড়ে সাবধানে জাল গুটোচ্ছিলেন। হঠাৎ কোত্থেকে বাজখাঁই গলায় কে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই! অ্যাই! অ্যাই!" তারপর দেখি, গমবুটপরা, বেঁটে, নাদুনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক হাতে খুরপি নিয়ে দৌড়ে আসছেন! এই রে! এবার আর বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। আমি বেড়ার ফাঁক গলিয়ে ঢোকার জন্যে সাধ্যসাধনা করছি। তার মধ্যে শুনি, উভয়পক্ষই হা-হা- হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"জয়ন্ত! চলে এসো। আলাপ করিয়ে দিই।"

ডাক শুনে বেড়া গলিয়ে ঢুকে পড়লুম। খামারের মালিক অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন। বেড়ার ফাঁকটা বেড়ে গেছে। সম্ভবত সেদিকেই ওঁর নজর। ...

খামারের মালিকের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক্। ভদ্রলোক আসলে একজন কৃষিবিজ্ঞানী। নাম ডঃ রঘুনাথ গিন্‌তিওয়ালা। সংক্ষেপে ডঃ গিন্‌তি। অনেককাল পশ্চিমবঙ্গে ছিলেন। ভাল বাংলা বলেন। এই খামার তাঁর ল্যাবরেটরি। গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাছাড়া এক ঋতুর ফসল কীভাবে অন্য ঋতুতে ফলানো যায়, তা নিয়েও মাথা ঘামান। আমার কৌতূহল ওঁর ফলানো কুমড়ো সম্পর্কে। প্রশ্ন শুনে হাসতে-হাসতে বলনে, "আপনার বাঙালিরা কুমড়োর ছক্কা খেতে খুব ভালবাসেন। ওদিকে লিটনগঞ্জের কলকারখানা এলাকায় অজস্র বাঙালি আছেন। বলতে পারেন, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি এই উৎকৃষ্ট জাতের কুমড়ো ফলিয়েছি। ওখানকার অফিস ক্যান্টিনগুলোতে তরিতরকারি জোগায় একটা এজেন্সি। তারা আমার খেতের কুমড়ো ট্রাকবোঝাই করে কিনে নিয়ে যায়। আপনার বন্ধু কর্নেলসাহেবকেই জিজ্ঞেস করুন, সত্যি না মিথ্যে।"

কর্নেলসায়েব অথাৎ 'বুড়ো ঘুঘু' বলে পরিচত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এই খামারবাড়ির পাশের ঘর থেকে ভিজে পোশাক ছেড়ে ডঃ গিন্‌তি বেঁটে পাজামা-পানজাবি এবং একখানা আস্ত কম্বল জড়িয়ে এতক্ষণ এলেন। ফায়ারপ্লেসের সামনে আরাম করে বসে বললেন, "জয়ন্ত, ডঃ গিন্‌তির ওই কুমড়োগুলো কিন্তু অকাল-কুষ্মাণ্ড!"

ডঃ গিন্‌তি হো-হো করে হেসে উঠলেন। "কী বললেন? অকাল-কুষ্মাণ্ড?"

কর্নেল বলেন, "তাছাড়া আর কী বলব? সচরাচর কুমড়ো পরিণত আকার পেতে এবং পাকাপোক্ত হতে অনেক দিন লেগে যায়। আপনার এই কুমড়ো মাত্র তিনমাসেই প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে। ভেতরটা লাল টুকটুকে।"

ডঃ গিন্‌তি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যেন। বললেন, "না, না। লাল বলা ঠিক নয়, হলদে। আপনি তো ভেতরটা দেখার সুযোগ পাননি এখনও। বরং কাল সকালে আপনার ফরেস্টবাংলোয় খানিকটা পাঠিয়ে দেব। তখন..."

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, "সরি! ভেতরটা তো এখনও দেখিইনি। তবে যেন মনে হচ্ছে, ভেতরটা লাল হওয়াই উচিত।"

"কেন বলুন তো?"

"বুঝলেন ডঃ গিন্‌তি, আমার ইদানীং উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দিকেও ঝোঁক চেপেছে। সেদিন একটা পত্রিকায় দেখছিলুম, অবিকল এই জাতের কুমড়ো পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফলে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সব দ্বীপে দু'শো বছর আগে কুমড়ো কী তা কেউ জানই না। ১৭৩৯ সালে বিখ্যাত অভিযাত্রী টমাস কুক প্রথম তাহিতি দ্বীপে বিলিতি কুমড়োর কিছু বীজ পুঁতে এসেছিলেন। তার প্রায় একশো বছর পরে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন গিয়ে দেখেন, মাটির গুণে বিশাল আকারের কুমড়ো ফলেছে। তো তখনও দ্বীপের লোকেরা ভয়ে কুমড়ো ছোঁয় না। ওখানকার একটা দ্বীপের নাম ইস্টার দ্বীপ। সেখানে লোকেরা যে পক্ষিদেবতার পুজো করে এ বুঝি তারই ডিম। বুঝুন অবস্থা!"

আমি ও ডঃ গিন্‌তি হেসে উঠলুম। এই সময় কফি এল। আমরা আরাম করে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেলবুড়ো কোনও ব্যাপারে একবার মুখ খুললে তো থামতে চান না। আবার পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে ফিরেছেন। গতিক দেখে ডঃ গিন্‌তি আমার দিকে চোখ ইশারা করে বললেন, "ইয়ে, এবার জয়ন্তবাবুর ব্যাপারটা শোনা যাক। বলুন জয়ন্তবাবু, কী দেখে এলেন লিটনগঞ্জে?"

কর্নেল চিমটেয় অগ্নিকুণ্ড থেকে এক টুকরো অঙ্গার তুলে চুরুট ধরাতে ব্যস্ত হলেন। আমি বললুম, "ব্যাপার সত্যি সাংঘাতিক। হেভি ওয়াটার প্ল্যান্টের প্রায় অর্ধেকটা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হয়ে

গেছে। সরকারি গোয়েন্দারা এখনও তদন্ত করছেন। কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। কিন্তু আঁচ করা যাচ্ছে না যে, অত কড়াকড়ি নিরাপত্তা ব্যবস্থা সত্ত্বেও কীভাবে অন্তর্ঘাত ঘটল!"

ডঃ গিন্‌তি শিউরে উঠলেন। "বলেন কী! অন্তর্ঘাত? তাহলে ফিরে গিয়ে আপনাদের পত্রিকায় কড়া করে লিখবেন জয়ন্তবাবু।"

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে দুষ্টু হেসে বললেন, "রিপোর্টার হিসেবে জয়ন্তের খুব সুনাম আছে ডঃ গিন্‌তি। ওর কলমের জোরে সরকারি অফিসের চেয়ারগুলো কেঁপে ওঠে শুনেছি।"

পালটা খোঁচা মেরে বললুম, "আর আপনার? আপনারও তো বুড়ো ঘুঘু বলে যথেষ্ট নাম আছে।"

কর্নেল আচমকা কাশতে শুরু করলেন। সর্বনাশ! জলে নাকানিচোবানি খাওয়ার ফলাফল। ডঃ গিন্‌তি আমাকে কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, উদ্বিগ্ন হয়ে থেমে গেলেন। কিন্তু না, কর্নেল সামলে নিয়েছেন। বুড়ো হাড়ে ভেল্কি দেখানোর ক্ষমতা আছে ওঁর। রুমালে নাক মুছে বললে, "এবার ওঠা যাক। বাংলোয় ফিরতে রাত হয়ে যাবে।"

ডঃ গিন্‌তি বললেন, "সঙ্গে লোক দেব। আলো দেব। কিছু ভাববেন না। তা জয়ন্তবাবু, ওই হেভিওয়াটার প্ল্যান্ট ব্যাপারটা আদতে কী বলুন তো? বুঝতেই পারছেন, আমি নিছক কৃষিবিদ্যার চর্চা করি।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "এবার উঠি ডঃ গিন্‌তি। আপনার আতিথ্য এবং সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কাল সকালে আপনার এই কাপড়-চোপড় আর কম্বল ফেরত পাঠাব! এসো জয়ন্ত।"

বলে উনি সটান বেরিয়ে গেলেন। বাইরে এতক্ষণে চাঁদ উঠেছে। কিন্তু কুয়াশাও ঘন হয়ে জমেছে, আর কনকনে ঠাণ্ডার কথা না তোলাই ভাল। মনে হচ্ছিল, কর্নেলবুড়োর পাল্লায় পড়াটা ঠিক হয়নি। সোজা ভারুণ্ডি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলে ভাল করতুম।

এই জঙ্গলের পথে হাড়কাঁপানো শীতে ফরেস্ট বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে এবার বাঘভালুকের ভয় হচ্ছিল। শুনলুম বারুণ্ড জঙ্গলে বুনো হাতিরও উৎপাত আছে। তবে ডঃ গিন্‌তির লোকটির হাতে আলো আছে।

ফরেস্ট বাংলোয় আরাম করে বসে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সবার সামনে আমাকে বুড়ো ঘুঘু বলাটা তোমার বদ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। না—আমি রাগ করিনি। কিন্তু কথাটা তোমার তলিয়ে দেখা উচিত। তুমি কি এলিয়ট রোডে আমার ফ্ল্যাটের নতুন নেমপ্লেটটা লক্ষ্য করোনি?"

একটু হেসে বললুম, "করেছি। লেখা আছে : 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রকৃতিবিদ'। বুড়ো-ঘুঘুর বাসা বলে পরিচিত ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন কাচের জার-ভর্তি। তাতে প্রজাপতি-পোকামাকড়েরা ডিম পাড়ছে। হরেক পাখপাখালির মমি সাজানো রয়েছে। দুর্লভ এবং বিরল প্রজাতির নমুনা। কিন্তু হে বৃদ্ধ, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তাছাড়া অভ্যাস যায় না মলে। দশ কিলোমিটার দূরে লিটনগঞ্জে হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের রহস্যময় দুর্ঘটনা আর ভারুণ্ডি ফরেস্ট বাংলোয় এক প্রাক্তন গোয়েন্দার অবস্থিতি কি নেহাত কাকতালীয় ব্যাপার? দুয়ের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই? আমি মোটেও বিশ্বাস করি না।"

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন, "একেবারে কাকতালীয়। আমাকে সরকার ওসব ব্যাপারে কোনও অনুরোধ করেনি। আমি এসেছি, উড-ডাকের খবর পেয়ে। খবরের কাগজের লোক হলেও ওসব খবরে তোমার মাথাব্যথা থাকে না। নইলে সম্প্রতি ভারুণ্ডির জঙ্গলে উড-ডাকের আবির্ভাবের খবর তোমার চোখে পড়ত। যাক গে, এবার খাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেছেছে। আমি চৌকিদারকে দেখি। ততক্ষণ তুমি ফায়ারপ্লেসের অগ্নিকুণ্ডটার দায়িত্ব নাও। কাঠ গুঁজে দিতে ভুলো না।"

উনি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি বসে আছি তো আছি। আর ওঁর পাত্তা নেই। বাংলো গোরস্থানের মতো স্তব্ধ। একা বসে থাকতে গা ছমছম করছে। প্রায় দু'ঘন্টা পরে কর্নেল ফিরলেন। বললুম, "এত দেরি যে?"

কর্নেল বললেন, "রাতের কাজটুকুও সেরে এলুম। আশা করি, আমার সে অত্যদ্ভুত ক্যামেরার কথা তুমি ভোলোনি।"

হ্যাঁ, অত্যদ্ভুত ক্যামেরাই বটে। প্রতাপগড় জঙ্গলে ওটা পেতে রাখতে দেখেছিলুম সেবার। জন্তুদের জল খেতে যাওয়ার পথে গাছের ডালে বেঁধে রেখেছিলেন। একটা তার নিচে মাটিতে পোঁতা ছিল। ক্যামেরার লেন্সের সামনে দিয়ে পঞ্চাশ গজ অব্দি মাটিতে কেউ হেঁটে গেলেই অতিসূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক সিস্টেমে সেই স্পন্দন ধরা পড়বে এবং আপনাআপনি শাটারটা ক্লিক করবে। ফ্লাশ বাল্ব জ্বলবে এবং ছবি উঠে যাবে। কর্নেলের মতে, জন্তুদের স্বাভাবিক চেহারার ছবি এভাবেই তোলা সহজ।

বললুম,"কোথায় ক্যামেরা পেতে এলেন।"

চাপা হেসে কর্নেল বললেন, "ডঃ গিন্‌তির কুমড়োখেতে। কারণ, তখন ওখানে কয়েকটি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখছিলুম। ওটা কী প্রাণী দেখা দরকার।"

বুড়োর বাতিকের কোনও তুলনা নেই। ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন একমাত্র ভাবনা, সকাল হলেই আমাকে কেটে পড়তে হবে। লিটনগঞ্জ হেভিওয়াটার প্লান্টের রিপোর্ট কীভাবে লিখব, তাই ভাবতে থাকলুম। কর্নেলও অবশ্য আর মুখ খুললেন না। কেমন গম্ভীর হয়ে চুরুট টানতে থাকলেন।

খেয়েদেয়ে শুতে রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। ক্লান্তির ফলে কখন ঘুমিয়ে গেছি! সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। দেখি, সকাল হয়ে গেছে। কর্নেল অভ্যাসমতো কখন এই প্রচণ্ড শীতের ভোরে বাইরে ঘুরে এসেছেন। গায়ে ওভারকোট, মাথায় হনুমান টুপি, হাতে ছড়ি। বললেন, "গুড মর্নিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে। এখন উঠে পড়ো এবং দ্রুত চোখমুখ ধুয়ে এসো।"

বললুম, "দ্রুত কেন? কোথাও বেরুবেন বুঝি?"

"বেরুব। অবশ্য তাতে তোমার লাভই হবে। কথা দিচ্ছি।"

"লাভের দরকার নেই। আমি সোজা গিয়ে ট্রেন ধরব।" বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে দেখি কর্নেল বিছানায় গুচ্ছের ফোটোর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "জয়ন্ত, আমার রাতের ফসল! দেখে যাও, তোমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।"

একটা ফোটো তুলে নিয়ে সত্যি সত্যি চক্ষু চড়কগাছ আমার। এ কী দৃশ্য! কুমড়োখেতে একটা বিশাল কুমড়োর ওপর ঝুঁকে ডঃ গিন্‌তি কী যেন করছেন, এক হাতে ক্ষুদে টর্চ রয়েছে। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল হাসলেন। ডঃ গিন্‌তি নিশ্চয় রাতদুপুরে নিজের কুমড়ো নিজে চুরি করছেন না।"

"তাহলে কী করছেন? নিশ্চয় কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-টরীক্ষা করছেন।

"ঠিক তাই। অসাধারণ ওঁর গবেষণা।" কর্নেল তারিফ করে বললেন। "খুব অধ্যবসায়ী লোক ও বলব, জয়ন্ত। যাগগে। সেই অদ্ভুত পায়ের ছাপের রহস্যই থেকে গেল। সম্ভবত জন্তুটা ওঁকে দেখে আর ওখানে পা বাড়ায়নি।"

চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খাওয়ার পর কর্নেল ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "জয়ন্ত, দেরি হয়ে যাচ্ছে।" বলে আমাকে আপত্তির সুযোগ না দিয়ে হাত ধরে টানতে-টানতে বেরুলেন। কুয়াশার ফাঁকে হাল্কা রোদ ফুটেছে। কিন্তু ঠাণ্ডার কথা না বলাই ভাল। বাংলো থেকে উতরাই রাস্তায় আমরা নেমে গেলুম কিছুদূর। তারপর সমতলে আরও কিছুটা এগিয়ে চমকে উঠলুম! গাছপালার আড়ালে

একটা জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিপে কারা বসে আছে। কর্নেল তাদের দিকে হাত ইশারা করে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে ঝোপে ঢুকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "এবার হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হবে জয়ন্ত। একটু কষ্ট করো।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

"স্বচক্ষে দেখবে। চলো।

পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে, উপায় কী! ঝোপঝাড় পাথরের আড়ালে এগোচ্ছি। ঠাণ্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছে। গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনছি। কতক্ষণ পরে কর্নেল একটু উঁচু হয়ে চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, "এসে গেছে! দেখবে নাকি জয়ন্ত? দেখই না।"

বাইনোকুলারে চোখ রাখতেই ডঃ গিন্‌তির খামারবাড়ির গেট নজরে পড়ল। একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকের গায়ে যা লেখা আছে, স্পষ্ট পড়তে পাছি। উম্মর সিং ক্যাটারিং কোম্পানি। ট্রাকে তরিতরকারি বোঝাই হচ্ছে। ডঃ গিন্‌তি এবং তাঁর লোকেরা তদারক করছেন। আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলুম না। এই স্বাভাবিক ব্যাপারে এত লুকোচুরি বা ওত পেতে বেড়ানোর কারণ কী?

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "চলে এসো জয়ন্ত। পাখি ফাঁদে পড়েছে।"

তারপর আমার প্রায় বাঘের লেজে-বাঁধা শেয়ালের অবস্থা হল। খামারবাড়ির গেটে পৌঁছে ফের চমকে উঠলুম। ট্রাক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বন্দুকধারী একদঙ্গল পুলিশ। ডঃ গিন্‌তি দু'হাত তুলে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন। কর্নেলকে দেখে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "দেখছেন, দেখছেন কর্নেল, কী জঘন্য অত্যাচার।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে কোনও কথা না বলে ট্রাকের কাছে গেলেন এবং কাঠবেড়ালির মতো উঠে পড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে একটা বিশাল কুমড়ো তুলে বললেন, "আসুন মিঃ শর্মা। খুব সাবধানে ধরবেন কিন্তু। এর মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ আছে। বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।"

একজন পুলিস অফিসার হাত বাড়িয়ে কুমড়োটা নিলেন। সাবধানে ধরে রইলেন। কর্নেল নেমে এসে তাঁর হাত থেকে কুমড়োটা নিলেন। তারপর মাটিতে রেখে বোঁটার কাছে চাপ দিলেন। একটা লম্বা-চওড়া ফালি উঠে এল। উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে একটা ধূসর রঙের মস্ত গোল জিনিস ভরা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি খুলে গেল। থরথর করে কাঁপতে থাকলুম।

কর্নেল বললেন, "তাহলে বুঝতে পারছ জয়ন্ত, তোমার কাজের জন্যে কেমন একখানা স্টোরি পেয়ে গেলে। আশাকরি, এবার এও বুঝেছ যে, লিটনগঞ্জের হেভিওয়াটার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় টাওয়ারকেও ধ্বংস করার ব্যবস্থা হচ্ছিল। ক্যান্টিনে এই বিশেষ চিহ্নিত কুমড়োটি যেত এবং সেখান থেকে পাচার হত টাওয়ারের মধ্যে। যাকগে, আমার কাজ শেষ। বাকি যা কিছু, মিঃ শর্মার হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। এসো জয়ন্ত। আমরা বাংলোয় ফিরি। তোমার ট্রেন সেই এগারোটায়। ততক্ষণ তুমি এই অকালকুষ্মাণ্ডের রহস্যময় কাহিনীর একটা খসড়া করে নিতে পারবে। তবে মনে রেখো, কুমড়োরহস্য আমি দৈবাৎ টের পেয়েছিলুম, প্রজাপতি ধরা জাল পাততে গিয়েই।"

আসতে আসতে শুনলুম, পেছনে ডঃ গিন্‌তি গর্জে বলছেন, "নেমক-হারাম! আমার পাজামা-পাঞ্জাবি-কম্বলটা পর্যন্ত এখনও ফেরত দিল না।"

প্রতাপগড়ের মানুষখেকো

আগে জানলে এ বুড়োর পাল্লায় কিছুতেই পড়তুম না। ঢের ঢের বুড়ো মানুষ দেখেছি, গ্রীষ্মকালে তাঁরা নাতির হাত ধরে পার্কে গিয়ে বসে থাকেন এবং শীতের সময় ঘরের কোণে আলোয়ান মুড়ি দিয়ে কাগজ পড়েন। দু-চারজন বুড়োমানুষ অবশ্যি নেতা হয়ে দেশ শাসনও করেন। খবরের কাগজের খবর জোগাড় করতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চেনাজানাও হয়েছে অল্পস্বল্প। কিন্তু তাঁরা কেউ এঁর মতো পাহাড়-জঙ্গলে বুনো ঘোড়ার দাপটে ছোটাছুটি করে বেড়ান না—স্রেফ দু'খানা ঠ্যাঙের জোরেই। কিংবা প্রজাপতি বা পাখির পেছনে বাচ্চা ছেলের মতো হন্যে হয়ে ঘোরেন না তাঁরা!

এ-বুড়োর কাণ্ডকারখানাই অদ্ভুত। নইলে এই জানুয়ারির হাড়কাঁপানো শীতে কেউ প্রতাপগড়ের জঙ্গলে ক্যামেরা নিয়ে রাতবিরেতে টো-টো করে ঘুরবে কোন সাহসে? বিশেষ করে যে জঙ্গলে সম্প্রতি একটা মানুষখেকো বাঘের দৌরাত্ম্য চলছে।

জঙ্গলে রাতবিরেতে ক্যামেরার কথা শুনে কেউ যদি ভাবে নিশ্চয় ফ্লাশ বাল্বের সাহায্যে জন্তুজানোয়ারের ছবি তোলা হচ্ছে—তাহলে সে মস্ত ভুল করবে। ক্যামেরাটাও বিষম বিদঘুটে। ভূতুড়ে বলতেও আমার আপত্তি নেই। কারণ, ওতে ফ্লাশ বাল্বের দরকার হয় না। অথচ অন্ধকারে লেন্সের সামনে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশ মিটার দূরত্বে ১৮০ ডিগ্রির মধ্যে যা কিছু থাকে সবেরই ছবি উঠে যায়। শাটার টেপার জন্যে কারও বসে থাকার দরকার নেই। ওটার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা এত সূক্ষ্ম আর স্পর্শকাতর যে, শুধু দরকার লেন্সের সামনে ওই দূরত্বের মধ্যে মাটিতে একটুখানি কাঁপন। কোনও জন্তু মাটিতে হাঁটলেই কিছু-না-কিছু কাঁপন জাগে। সেই যথেষ্ট শাটার ক্লিক করবে।

প্রতাপগড় জঙ্গলের বাংলোয় রাত দশটায় উনি যখন ফিরে এলেন ক্যামেরার ফাঁদ পেতে, আমি তখন ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে বসে কড়া কফি খাচ্ছি আর পরদিন সকালে কেটেপড়ার মতলব ভাঁজছি। কী শীত, কী শীত! বিহারের শীতের নামডাক আছে জানতুম। কিন্তু প্রতাপগড় এলাকা যে উত্তর-মেরুরই ছোট ভাই, সেটা জানতে বাকি ছিল।

"হ্যালো ডার্লিং!" যথারীতি সম্ভাষণ করে উনি টুপি ও ওভারকোট খুললেন এবং আমার পাশে বসে মৃদু হেসে বললেন, "জয়ন্ত কি আমার ওপর রাগ করেছ?"

আমার কাঁধে একটা হাত রেখে অন্য হাতে কফির মগ ধরে উনি হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন "ডার্লিং! আশা করছি, কাল সকালের মধ্যে তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠার মতো এক অত্যদ্ভুত ছবি তোমায় দেখাতে পারব। অতএব ধৈর্যসহকারে অন্তত আর একটা দিন অপেক্ষা করো। এবং জয়ন্ত এমনও হতে পারে, তুমি এবার প্রতাপগড় থেকে তোমার দৈনিক সত্যসেবকের জন্য একটি রোমাঞ্চকর সংবাদও সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে।"

ওঁর লোভ-দেখানো কথায় একটুও না গলে বললুম, "কিসের ছবি দেখাবেন আর? গত রাতে তো ঝরনার জল খেতে আসা এক পাল হরিণের ছবি উঠেছিল আপনার ক্যামেরায়। কাল বড় জোর দেখব হয়তো একটা রোগা বাঘ!"

"ঠিক বলেছ ডার্লিং!" বুড়ো সাদা দাড়ি খামচে ধরে—হাসলেন। তারপর অভ্যাসমতো টাকে সেই হাতটা বুলিয়ে কী একটা ফেলে দিলেন। দেখলুম লাল রঙের একটা পোকা, অনেক সময় টাকে মাকড়সার জাল বা পাখির বিষ্ঠাও দেখেছি। বুড়ো পোকাটার গতিবিধিতে নজর রেখে বললেন, "বাঘের ছবিই দেখাব। তবে এটা যে সে বাঘ নয়, সেই কুখ্যাত মানুষখেকো বাঘ! সরকার যাকে মারার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে।"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "ধরুন তাই না হয় হল। মানুষখেকো বাঘটার ছবি আপনার ক্যামেরার সামনে এসে হাজির হবে, তাহলে ওই শিকারি ভদ্রলোকদের বললেন না কেন? ওঁরা তো বাঘটাকে মারার জন্য হন্যে হচ্ছেন। আজ বিকেলে আপনার সামনেই ওঁরা দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় মোষের বাচ্চা বেঁধে রেখে গাছের ওপর মাচান করে বসে থাকবেন সারা রাত। খামোকা ওঁরা কষ্ট পাবেন ঠাণ্ডায়!"

আমার কথার জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, এমন সময় চৌকিদার দরজায় উঁকি মেরে একটু কেশে বলল, "হুজুর কর্নেলসাব! খানা তৈয়ার হ্যায়। হুকুম হোগা তো আভি লাবে গা।"

"জরুর।" বলে হুজুর কর্নেলসাব অর্থাৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ওরফে 'বুড়ো ঘুঘু' অভ্যাসমতো বুকে ক্রস এঁকে যথার্থ ধার্মিকের মতো খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হলেন।

বাংলোটা একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। তাই সতর্কতার জন্য বারান্দা জুড়ে গ্রিল এবং এই শীতে গোটাটা রেলে ঢাকা রয়েছে। বারান্দার একদিকে কিচেন। চৌকিদার কিচেনের সামনে খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সম্প্রতি মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হওয়াতে সে আরও সতর্কতার জন্য পাশে একটা টর্চ আর বল্লমও রাখে। কর্নেলবুড়ো মানুষখেকোর ভয় তুচ্ছ করে এত রাত অব্দি জঙ্গলে ঘোরেন এবং নিরাপদে ফিরে আসেন। বারান্দায় গ্রিলের একটা অংশ খুলে সে হুজুর কর্নেলসাবকে ভেতরে আসতে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ফের সেই ফাঁকটা অর্থাৎ দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে সন্দিগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। আমার ধারণা, সে ভূত দেখছে, না মানুষ, তার দৃষ্টিতে এরকম একটা চাঞ্চল্য থাকে। কর্নেলের ওপর তার ভক্তি ক্রমশ বেড়ে গেছে।

জেলিমাখানো মোটা মোটা চাপাটির সঙ্গে বুনো মুরগির মাংস বেশ জমিয়ে খাওয়া গেল। খেতে খেতে কর্নেল আমার সেই কথাটার জবাব দিলেন। "ঠিকই জয়ন্ত! মিঃ সেন এবং মিঃ দত্তকে আমার বলা উচিত ছিল, আপনারা ঝরনার ভাটিতে টোপ না বেঁধে আরও একটু উজানে এসে বাঁধুন। কারণ আমার ধারণা, বাঘটা ওখানেই টিলার ওপর একটা গুহায় থাকে। তার পায়ের দাগও খুঁটিয়ে দেখেছি। জঙ্গলবিদ্যায় আমারও কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে।"

"তাহলে বললেন না কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "যেচে পড়ে বলাটা সঙ্গত মনে করিনি। তাছাড়া লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়, বিশেষ করে মিঃ দত্ত কেমন যেন অভদ্র প্রকৃতির লোক। এসেই আমাদের এখানে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন না? মিঃ সেনও কেমন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দু-দুটো মানুষ-টোপ থাকতে আর মোষের বাচ্চা কিনতে খামোকা পয়সা খরচ কেন? ব্যাপারটা আমার গায়ে লেগেছে জয়ন্ত!"

ওঁর দুঃখ দেখে ঠাট্টা করে বললুম, "আহা! ওঁরা তো কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নামক প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘুকে' চেনেন না! চিনলে নিশ্চয় সমীহ করে কথা বলতেন। তাছাড়া যে জঙ্গলে মানুষখেকো বাঘ রয়েছে, সেখানে যারা বেড়াতে এসেছে শখের বশে, তারা নিছক টোপ হতেই এসেছে বৈ-কি!"

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গোমড়ামুখে গ্লাসের কনকনে ঠাণ্ডা জলটা পুরো গিলে ফেললেন।

শেষ রাতে কী একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। জেগে কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে কর্নেল ব্যস্তভাবে ডাকছেন, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" বাইরে চৌকিদার দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচামেচি করছে। আর কেউ হাউমাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

কম্বল ছেড়ে বেরুনো সহজ কথা নয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সহজাত বোধ কাজ করে। হুড়মুড় করে উঠে পড়লুম। তারপর দেখি, কর্নেল লণ্ঠন হাতে এগিয়ে দরজা খুললেন। তাঁর পিছন-পিছন দৌড়ে গেলুম। বারান্দায় বেরিয়ে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য চোখে পড়ল। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে আছেন সেই শিকারি মিঃ দত্ত এবং দু-হাতে মুখ ঢেকে ছেলেমানুষের মতো কাঁদছেন। তাঁর পোশাকে

চাপ-চাপ টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। পাশে দুটো রাইফেল পড়ে রয়েছে। আর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চৌকিদার বেচারা জড়ানো গলায় ক্রমাগত কী বলছে, বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল মিঃ দত্তের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "মিঃ দত্ত শান্ত হোন, বলুন কী হয়েছে।" কর্নেলের কথা শুনে মিঃ দত্ত একটু শান্ত হলেন। তারপর ফ্যাচ করে নাক ঝেড়ে বললেন, "ও হো হো হো! আমি কী করব? কী করব আমি? আমার সারাজীবনের সঙ্গী আমার প্রাণের বন্ধু অমল.....ও!"

কর্নেল বললেন, "প্লিজ মিঃ দত্ত! শান্ত হোন, শান্ত হোন। কী হয়েছে বলুন তো?"

মেজাজি মিঃ দত্ত বিকৃত মুখে বললেন, "বুঝতে পারছেন না মশাই কী হয়েছে? অমলকে বাঘে মেরে ফেলেছে। ও হো হো! কেমন করে ওর স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সামনে এ-মুখ দেখাব?"

এটাই অনুমান করেছি ততক্ষণে। কর্নেল ওঁর কাঁধ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "সর্বনাশ! মিঃ সেনকে মানুষখেকো বাঘটা মেরে ফেলেছে! কিন্তু কীভাবে ব্যাপারটা ঘটল বলুন তো মিঃ দত্ত? আপনারা কি একই মাচানে ছিলেন?"

দত্ত সাহেব রুমালে চোখ নাক মুছে বললেন, "একই মাচানে তো ছিলুম। কখন বাঘটা চুপিচুপি গাছে উঠেছিল টের পাইনি। আমার একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ অমলের আর্তনাদে জেগে গেলুম। টর্চ জ্বালতেই দেখি, ওঃ! সে এক বীভৎস দৃশ্য। বাঘটা অমলের গলা কামড়ে ধরে ঝাঁপ দিল।"

কর্নেল বললেন, "আপনি নিশ্চয় গুলি করেননি? ওঁর রাইফেলটাও তো নিয়ে এসেছেন দেখছি।"

দত্তসায়েব শ্বাস টেনে বললেন, "আমার গায়ে ধাক্কা লেগেছিল। টর্চ আর রাইফেল নিচে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। ওঃ! ও হো হো হো! অমল!"

"তারপর? তারপর?" আমি দম-আটকানো গলায় প্রশ্ন করলুম।

মিঃ দত্ত বললেন, "তারপর কীভাবে যে পালিয়ে এসেছি আমিই জানি। এই দেখুন, কত জায়গায় ছড়ে গেছে! আর এই দেখুন, কত রক্ত। অমলের রক্ত! ও হো হো হো!"

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বাঘটা শিকার নিয়ে সরে পড়েছে। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই... "

বাকি রাত আর ঘুমোনো গেল না। পাশের ঘরে দত্তসায়েব সমানে বিড়বিড় করে শোকপ্রকাশ করছেন শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল ও আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে রইলুম। কর্নেলবুড়ো একেবারে চুপচাপ। কোনও প্রশ্ন করেও জবাব পেলুম না। অভ্যাসমতো দাড়ি বা টাকে হাত বুলোচ্ছেন, কখনও চোখ বুজে বুকে ক্রস আঁকছেন।

জঙ্গল ও পাহাড় জুড়ে ঘন কুয়াশা। রোদ বাড়লে সেটা কাটল। তখন কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরুলেন। দত্তসায়েবকে দেখলুম লনে রোদে বসে আছেন। হাতে রাইফেল। হিংস্র চেহারা। লাল চোখ। কর্নেল ডাকলেন, "আসুন মিঃ দত্ত। দেখি, আপনার বন্ধুর ডেডবডি খুঁজে পাই নাকি।"

দত্তসায়েব উঠলেন। "ওই শয়তানটাকে খতম না করে আর আমি কলকাতা ফিরছি না। এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

যেতে যেতে কর্নেল বললেন, "প্রথমে আমাদের মাচানের ওখানে যাওয়াই উচিত।"

মিঃ দত্ত শুধু বললেন, "হুঁ!"

বাংলো থেকে ঝোপজঙ্গলে ভরা ঢাল বেয়ে নেমে আমরা ছোট্ট একটা সোঁতার ধারে পৌঁছলুম, যেটা একটু দূরে ঝরনা থেকে বয়ে এসেছে। পাথরের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বইছে। ধারে ধারে কিছুটা যাওয়ার পর মিঃ দত্ত বললেন, "ওই যে ওখানে।"

চারপাশে ঘন গাছপালা, মধ্যিখানে এক টুকরো ফাঁকা ঘাসজমি। একটা বাচ্চা মোষ মনের সুখে

এখন ঘাস খাচ্ছে। বুঝলুম, ওটাই টোপ। জমিটায় পৌঁছেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। মাচানের ঠিক নিচেই একটা ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মিঃ দত্ত ছুটে গিয়ে মৃতদেহটার কাছে হাঁটু মুড়ে বসলেন এবং রাতের মতোই বুকফাটা কান্না জুড়ে দিলেন।

কর্নেল ও আমি এগিয়ে গেলুম। শিকারি মিঃ সেনের গলায় গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং বুকে ওপরটা তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে ফালাফালা। পুরু পুলওভার ফেঁড়েফুঁড়ে গেছে। জমাট কালচে রক্তের ছোপ সবখানে। কর্নেল মুখ তুলে মাচানের দিকে তাকালেন। তারপর বেমক্কা গাছে চড়তে শুরু করলেন। গাছটার গুঁড়ি ও ডালে রক্তের ছোপ দেখতে পাচ্ছিলুম।

একটু পরে কর্নেল মাচান থেকে নেমে এসে বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ দত্ত। বাঘটা ওঁকে আচমকা মাচানের ওপরেই আক্রমণ করেছিল। উনি আত্মরক্ষার ফুরসত পাননি। তো ইয়ে ডেডবডিটা....."

দত্তসায়েব শান্তভাবে বললেন, "চৌকিদারকে বলেছি কজন লোক ডেকে আনতে। জিপে করে কলকাতা নিয়ে যাব। কিন্তু জানি না, অমলের স্ত্রীর সামনে দাঁড়াব কোন মুখে। ওঃ!"

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে মাচানের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঘুরে বললেন, "দেখুন মিঃ দত্ত, আমার মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু মিঃ সেনকে যে বাঘটা মেরে ফেলেছে, সেটা মানুষখেকোটা নয়।"

মিঃ দত্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনি কি শিকারি? কীভাবে বুঝলেন যে মানুষখেকোটা নয়? মানুষখেকো না হলে ওভাবে কোনও বাঘ চুপিচুপি গাছে উঠে শিকারির ওপর হামলা করে না।"

কর্নেল বললেন, "তা ঠিক। তবে এ-জঙ্গলে আরও বাঘ থাকাও তো সম্ভব।"

ধমকের সুরে দত্তসায়েব বললেন, "যা জানেন না, তা নিয়ে বাজে বকবেন না।"

কর্নেল ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। "চলো জয়ন্ত, ডেডবডি তো পাওয়া গেছে। আমরা নিজের কাজে যাই।"

ঝরনার ধারে এসে বললুম, "লোকটা অভদ্র। গোঁয়ার। একটা হামবাগ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "শিকারিদের একটু রাগ হওয়া স্বাভাবিক। যাক গে, জয়ন্ত! তুমি বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করো গে! এ-বুড়োর পিছনে ছোটাছুটি করা তোমার পোষায় না জানি।"

"সে আর বলতে? কিন্তু আপনি যাবেনটা কোথায়?"

"আপাতত ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।" বলে কর্নেল হনহন করে এগিয়ে গেলেন। আমি বাংলোয় ফিরলুম।....

কর্নেল ফিরলেন একেবারে দুপুর গড়িয়ে। তারপর খেয়েদেয়ে ফিল্ম ডেভলপ করতে বাথরুমে ঢুকলেন। ওটাই ওঁর ডার্করুম। রাতে ঘুম হয়নি। তাই আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকাডাকিতে। "জয়ন্ত জয়ন্ত! শিগগির সব গুছিয়ে নাও। আমরা এক্ষুনি রওনা দেব। জিপ এসে গেছে।"

বললুম, সে কী! অরণ্যপিপাসা এরই মধ্যে মিটে গেল? না কি মানুষখেকো বাঘের আতঙ্কে? আর জিপ কোথায় পেলেন? আমরা এই অবেলায় যাবই বা কোন চুলোয়?"

বুড়ো ঘুঘু রহস্যময় হেসে বললেন, "ওয়েট, ওয়েট ডার্লিং। সব প্রশ্নের জবাবে আপাতত আমার রাতের ফসল তোমাকে উপহার দিতে চাই। নাও।"

হাত বাড়িয়ে যা পেলুম, তা একটা ছোট্ট ফটোগ্রাফ। কিন্তু দেখামাত্র চমকে উঠলুম। এ! কী এ যে দেখছি মিঃ দত্ত হাঁটু দুমড়ে পাথরের খাঁজে হাত পুরে কী একটা করছেন! অবাক হয়ে বললুম, "এর মানে? কাল রাতে তো ওঁরা দু'জনে মাচানে ছিলেন?—মানে মিঃ দত্ত এবং মিঃ সেন! অথচ মিঃ দত্ত দেখছি একা এখানে কী যেন করছেন।"

কর্নেল বিদঘুটে ভঙ্গিতে ফের হাসলেন। "রেডি হয়ে নাও ঝটপট। তোমায় যা দেখাব বলেছিলুম, তা দেখালুম। বাকিটা প্রতাপগড় টাউনশিপে গিয়ে দেখাব।"

"কিন্তু আপনি মানুষখেকো বাঘটা দেখাবেন বলেছিলেন!"

"তাই তো দেখালুম।" বলে বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর নিজেই আমার কম্বল বেডিং পত্তর গোছাতে শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পরে জিপে ওঠার সময় কর্নেল বললেন, "আসলে যে বুড়ো এবং রোগা বাঘটা তল্লাটে পাঁচটা মানুষ মেরে খেয়েছে, সে তার পাহাড়ি গুহায় স্বাভাবিকভাবে মরে পড়ে আছে। তাকে গতকাল আবিষ্কার করে এসেছিলুম। কবে কোন শিকারির গুলি খেয়ে বাঘটার অবস্থা এমনিতে শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। যাক গে, উঠে পড়ো বৎস, যথাস্থানে পৌঁছে সব টের পাবে। "

প্রতাপগড় টাউনশিপে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হল। অবাক হয়ে দেখি, জিপ থানায় ঢুকছে। বুক কাঁপল। তাহলে কি মিঃ সেন বাঘের হাতে মারা পড়েননি? নিছক খুনখারাপির ঘটনা?

হুঁ, ঠিক তাই। লাল চোখে হিংস্র মুখভঙ্গিতে বসে আছেন মিঃ দত্ত। তাঁর হাতে হাতকড়া। টেবিলের চারপাশ ঘিরে কয়েকজন পুলিশ অফিসার রয়েছেন। আমাদের দেখে একজন পুলিশ অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন, "হ্যাল্লো কর্নেল!"

কর্নেল কোটের পকেট থেকে একগাদা ছবি এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আমার অত্যদ্ভুত ক্যামেরার রাতের ফসল মিঃ শর্মা। একটা ছবিতে দেখবেন দত্তসায়েব দুটো বাঘনখ লুকিয়ে রাখছেন। সময়ও ফিল্মে সাঙ্কেতিকভাবে লেখা হয়ে যায়। রাত দু'টো তেত্রিশ মিনিট। এই দেখুন!"

মিঃ শর্মা একগাল হেসে বলনে, "আপনার নির্দেশমতো জায়গায় মার্ডার উইপন দুটো উদ্ধার করা হয়েছে। ডেডবডি মর্গে পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট আসতে দেরি নেই।" বলে উনি ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া দুটো বাঘের থাবার মতো নখওলা সাংঘাতিক অস্ত্র বের করলেন। রক্তের ছোপ কালো হয়ে আছে।

মিঃ দত্ত মুখ নিচু করে বসে আছেন পাথরের মতো।

অনেক রাতে সার্কিট হাউসের একটা ঘরে কর্নেলের মুখোমুখি হলুম। বললুম, দত্তসায়েব বন্ধুকে খুন করলেন কেন?

কর্নেল জবাব দিলেন, "কলকাতার প্রখ্যাত হোসিয়ারি দত্ত অ্যান্ড সেনের নাম শোননি জয়ন্ত? সেই যে বাঘমার্কা গেঞ্জি ইত্যাদি যাদের। যেটুকু অনুমান করছি, তাতে মনে হয় দত্তসায়েব ভেতর ভেতর পার্টনার বন্ধু সেনাসায়েবকে ঠকিয়ে একা মালিক হওয়ার চক্রান্ত করছিলেন। কারণ ওঁদের চাপা গলায় আগের রাতে কী সব তর্ক করতে শুনেছিলুম। যাইহোক, সেই চক্রান্তের চরম অবস্থা এই হত্যাকাণ্ড। বুঝে দ্যাখো জয়ন্ত, কী চমৎকার ফন্দি এঁটেছিলেন মিঃ দত্ত! মানুষখেকো বাঘ শিকার করতে এসে তার পাল্লায় একজনের মারা পড়াটা কত স্বাভাবিক দেখাত। শুধু বাদ সাধল এই বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ এবং তার অত্যদ্ভুত ক্যামেরা। তবে ডার্লিং জয়ন্ত, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি—যদি তুমি এই বৃদ্ধকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ না করে যাও, তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে তোমায় সত্যিকার বাঘ দেখাবই দেখাব।"

দাড়ি ও টাকওয়ালা 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নিজের বিশাল বুকে খাঁটি পাদ্রির মতো একবার ক্রস আঁকলেন। তারপর অস্ফুট স্বরে আওড়ালেন, "আমেন! আমেন!"

গুর্গিন খাঁর দেয়াল

জিপ থেকে নেমেই আমরা মাঠের দিকে তাকালুম। চোখে পড়ল সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক দেয়াল—যেটা দেখতেই চলে এসেছি এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। ওই সেই রহস্যময় দেয়াল—যেখানে অদ্ভুত সব আলো আর ছায়ামূর্তি দেখা যায় নিশুতি রাতে। কারা চেরা গলায় বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। শুনলে মহাদুঃসাহসীরও বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

আমার একা আসার ক্ষমতা ছিল না। প্রাণ গেলেও আসতুম না। অথচ চাকরি করি খবরের কাগজে। রিপোর্টার আমি। তাই আর সব কাগজে যখন খবরটা বেরিয়ে গিয়েছিল, আমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক তেড়েমেড়ে আমাকেই বললেন—জয়ন্ত কি বেঁচে আছ, না তুমিও ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? সবাই এমন একটা সাংঘাতিক খবর ছাপিয়ে তাক লাগিয়ে দিল, আর আমরা বসে গাল চুলকোতে থাকলুম? আজই বেরিয়ে পড়ো। সবাই শুধু খবরটাই ছেপেছে, আমরা ছাপব এর পেছনের রহস্যটা আসলে কী। বুঝেছ তো?

প্রথমে যা খবর বেরিয়েছিল, তা অনেকেই গাঁজাখুরি বলে মেনেছিলেন। কিন্তু পরে যখন আজমগড়ের পুলিশ সুপার স্বচক্ষে দেখে এসে সাংবাদিকদের কাছে বর্ণনা দিলেন, তখন আর উড়িয়ে দেওয়া গেল না। পুলিশকে ভূতপ্রেতও ভয় পায়। সেই পুলিশের লোক যখন বলছে, তখন ঘটনা নিখাদ সত্যি।

পুলিশ সুপার মিঃ দীক্ষিত স্থানীয় লোকের কাছে যা শুনেছিলেন, তা গুজব ভেবেছিলেন। তবু একটা তদন্ত করা তো দরকার। তিনি সেই জনমানুষহীন মাঠে তাঁবু ফেলে পরপর তিনটে রাত জেগে কাটান। তারপরেই রাতে সেই ভূতুড়ে কাণ্ড দেখতে পান। দেয়ালের ওপর দুটো জ্বলজ্বলে লাল চোখের মতো আলো দেখা যায়। টর্চ জ্বেলে তিনি চমকে ওঠেন। একটা কঙ্কাল নাকি নাচছে। তারপর বিকট আর্তনাদ শোনেন। অসংখ্য ছায়ামূর্তি ছুটোছুটি করতে থাকে পাঁচিলের কাছে। বন্দুক ছুড়তেই অবশ্য সব থেমে যায়। আলো নিভে যায়। ভৌতিক কাণ্ডটা আর ঘটে না। খুঁটিয়ে দিনের আলোয় সব দেখেছেন মিঃ দীক্ষিত। কিন্তু কোনও হদিশ পাননি। উঁচু পাঁচিলে অবশ্য ওঠেননি—ওঠা সম্ভব ছিল না।

তারপর যথারীতি সরকার একদল বিজ্ঞানী পাঠিয়েছিলেন সেখানে। তাঁদের বরাত—পরপর সাত রাত জেগেও কিছু দেখতে পাননি। তখন তাঁরা পুলিশ সুপারকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে রিপোর্ট পাঠান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মিঃ দীক্ষিতের অবস্থা তখন শোচনীয়। চাকরি যায়-যায় আর কী!

সত্যসেবক পত্রিকার বার্তা-সম্পাদকের তাড়া খেয়ে আমি যখন আজমগড় যাওয়া ঠিক করে ফেলেছি, তখন হঠাৎ ইলিয়ট রোড থেকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফোন পেলুম।—হ্যাল্লো জয়ন্ত! জরুরি দরকার। এক্ষুনি চলে এস।

অমনি আমার মাথা খুলে গেল। আরে তাই তো! কর্নেলের কথা তো ভুলেই গিয়েছিলুম ! এসব ব্যাপারে এই ধূর্ত বুড়ো ঘুঘুর সাহায্য নেওয়া যায়। উনি সামরিক বিভাগে একসময় চাকরি করতেন। যুদ্ধে গেছেন। কত সব রোমাঞ্চকর কীর্তি করেছেন। এখন অবসর জীবনে নানান হবি নিয়ে থাকেন। যেমন—দুর্লভ জাতের পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় খুঁজে বেড়ানো, পাহাড়ে-

জঙ্গলে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি। তবে এখন ওঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় উনি প্রাইভেট গোয়েন্দা। নিতান্ত শৌখিন গোয়েন্দা আর কী! ধুরন্ধর কর্নেল এ অব্দি যে কত খুনি আর চোরডাকাত ধরতে সরকারকে সাহায্য করেছেন, তার সংখ্যা নেই। যেখানে রহস্যের গন্ধ, সেখানেই ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো যেচে পড়ে নাক গলাবেন—এই ওঁর অভ্যাস। এই দাড়ি ও টাকওয়ালা বুড়োর খ্যাতি পুলিশমহলে অসাধারণ।

এমন মানুষ থাকতে আমি ভেবে মরছিলুম! তক্ষুনি ওর বাসায় চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, এক অবাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে উনি কথা বলছেন। ভদ্রলোকটির বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হবে। খুব স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ চেহারা। সিভিল পোশাকে ছিলেন বলে জানতেও পারিনি যে, উনিই আজমগড়ের সেই পুলিশ সুপার মিঃ রামধন দীক্ষিত!

ব্যস। তারপর আর কী! আকস্মিক যোগাযোগ এমনটি আর দেখা যায় না। আমরা পরদিন সকালেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছোটনাগপুর অঞ্চলের আজমগড়ে পৌঁছতে আমাদের দুপুর লেগেছে। সেখানে মিঃ দীক্ষিতে কুঠিতে বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া সেরে অকুস্থলে পৌঁছেছি, তখন বিকেল চারটে।

সময়টা শীতের। বাপ্‌স্। কী শীত কী শীত! বিহারের মাঠে দিনে হাঁড়কাপানো এমন শীত যখন, তখন রাতে কী অবস্থা হবে ভেবে ঘাবড়ে গেলুম। জিপে তাঁবু ও রান্নার সরঞ্জাম আনা হয়েছে। একজন রান্নার লোক রয়েছে—তার নাম মাধোরাম। আর আছে জনা চার সশস্ত্র সেপাই।

ওভারকোটটা কেন আনিনি তাই ভাবছি, দেখি কর্নেলবুড়ো দিব্যি বাদামি রঙের বুশ শার্ট প্যান্ট পরে ঘুরছেন। মাথায় শুধু লাল রঙের টুপি। শীতের বাতাস বইছে প্রচণ্ড। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে উনি চোখে বাইনোকুলার রেখে দেয়ালটা দেখছেন। আশ্চর্য বুড়ো!

একটা শুকনো নদীর তলায় আমাদের তাঁবু খাটানো হচ্ছে। জিপটা ঢালু পাড় গড়িয়ে নামাতে অসুবিধা হয়নি। ওপারে উঠে উঁচু জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। দেয়ালটা দেখছি। আন্দাজ ছ'সাতশো মিটার দূরে একটা বিশাল স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালটা। গুর্গিন খাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কে এই গুর্গিন খাঁ? কর্নেল তাও জানেন। মোঘল আমলের এক দুর্ধর্ষ শাসনকর্তা। তাঁর ছেলের নাম ছিল আজম খাঁ। যার নামে ছ'মাইল দূরের ওই শহর আজমগড়। দুর্গের সব ভেঙেচুরে গেছে। শুধু এই ষাট ফুট লম্বা বিশ ফুট উঁচু একটামাত্র পাথুরে দেয়াল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে অবাক লাগে।

আশেপাশে অনেক ঢিবি আছে। ধ্বংসাবশেষ আছে। ঝোপঝাড়ও প্রচুর। কিছু ক্ষয়াখর্বুটে গাছও চোখে পড়ল। তার ওধারে ধু ধু মাঠ। দূরে কিছু পাহাড়। কাছাকাছি কোনও বসতি দেখতে পেলুম না শুনলুম একদল রাখাল গোরু-মোষ চরাতে একটা বাথান করেছিল ওখানে। তারাই প্রথমে ভূতুড়ে কাণ্ডটা দেখে এবং পালিয়ে যায়। তারপর থেকে দিনদুপুরেও কেউ এদিকে পা বাড়ায় না। কোন্ কোম্পানি সীসের খনির খোঁজে এসেছিল। রাতারাতি তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে বাঁচে।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেয়ালটাই হয়তো দেখছিলেন। মিঃ দীক্ষিত ও আমি কথা বলছিলুম! শীতের বেলা হু-হু করে পড়ে যাচ্ছে। শীগ্‌গির অন্ধকার এসে যাবে। আজ বরং অপেক্ষা করা যাক। কাল সকালে ওখানে গিয়ে সবকিছু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। আমরা দু'জনে এসব কথাই আলোচনা করছিলুম। হঠাৎ দেখি কর্নেল এগোচ্ছেন। মিঃ দীক্ষিত বললেন—এখনই—যাচ্ছেন নাকি? উনি কোনও জবাব দিলেন না। যেন সম্মোহিতের মতো চোখে দূরবীনটা রেখে হেঁটে যাচ্ছেন। আমি একটু হেসে চাপা গলায় বললুম—যাক না বুড়ো। ভূতে ঘাড় মটকে

দেবে। মিঃ দীক্ষিত হাসলেন। কিন্তু মুখটা কেমন করুণ দেখাল। বললেন—আসুন জয়ন্তবাবু। আমরাও যাই!

অগত্যা আমরা দু'জনেও পা বাড়ালুম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, বুড়ো দৌড়তে শুরু করেছেন। আমরা পরস্পর তাকাতাকি করলুম। আমরাও দৌড়ব নাকি? কিন্তু দেখতে দেখতে ততক্ষণে কর্নেল ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য। তখন আমরা হন্তদন্ত ছুটলুম।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। বড় বড় পাথর পড়ে আছে। কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। বেমালুম উবে গেলেন যে! মিঃ দীক্ষিত ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সাহেব! কোনও সাড়া এল না। বললুম—ছেড়ে দিন। বুড়োর স্বভাবই এরকম। ঠিক এসে পড়বেন'খন।

তখন সূর্য ডুবেছে। শীতও ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গেলুম সেই দেয়ালটার কাছে। উঁচু ঢিবির কাছে রয়েছে। তাকাতেই আমার গা শিউরে উঠল। মনে হল দেয়ালটা যেন হিংস্র চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়। ঢিবির ওপর ওঠা শুরু করলুম। সেই সময় মিঃ দীক্ষিত মনে পড়িয়ে দিলেন—আমাদের সঙ্গে টর্চ নেই।

অতএব বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। ঢিবিতে উঠে দেখলুম একটা প্রশস্ত পাথরের মেঝে। ফাটলে ঘাস গজিয়ে আছে। সামনে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা দেয়ালটা আন্দাজ বিশ ফুট উঁচু। মনে হল, ওটা কমপক্ষে দু'গজ চওড়া। সুতরাং ওর ওপর দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব বইকি। এক জায়গায় একটা মস্ত ফাটল দেখছিলুম। সেখানে একটা শুকনো কোনও গাছের গুঁড়ি ও শেকড় মেঝে অবধি নেমে এসেছে। গাছটা যেভাবেই হোক, মারা গেছে কবে এবং ডগার দিকটা ক্ষয়ে ভেঙে গেছে সম্ভবত। দীক্ষিত বললেন—দেখুন জয়ন্তবাবু, মনে হচ্ছে—কেউ ইচ্ছে করলে ওই গাছটা বেয়ে দেয়ালের ওপর উঠতে পারে। তাতে সায় দিলুম।

কিন্তু কর্নেল গেলেন কোথায়? দীক্ষিত আবার ডাকলেন—কর্নেল! কর্নেল সায়েব! অমনি ডাকটা দ্বিগুণ জোরে প্রতিধ্বনি তুলল। উনি বললেন—দেখছেন জয়ন্তবাবু? দেয়ালটা কেমন প্রতিধ্বনি তোলে?

বললুম—হ্যাঁ। ঐতিহাসিক দালানগুলো দেখছি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। সবখানে এটা লক্ষ্য করছি। আমার ধারণা, সেকালের স্থপতিরা কোনও কৌশল জানতেন। তুঘলকাবাদে...

আমার মুখের কথা শেষ না হতেই কর্নেলের চিৎকার শুনলুম— মিঃ দীক্ষিত! জয়ন্ত! হেল্প! হেল্প! বাঁচাও! বাঁচাও!

চকিতে আমরা আওয়াজ লক্ষ্য করে দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি ঢিবির উত্তর দিকের ঝোপ-ঝাড়ের ওপর কর্নেল একটা কাঁটা গাছের ডগায় চড়ে রয়েছেন এবং মাথার টুপিটা জোরে নাড়ছেন। ব্যাপার কী? চেঁচিয়ে উঠলুম—কী হয়েছে কর্নেল?

কর্নেল পাল্টা চেঁচিয়ে বললেন—সাবধান জয়ন্ত! এগিও না। যাচ্ছে—তোমাদের দিকে যাচ্ছে!

আমরা হতভম্ব। কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখি, ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড কালো ষাঁড় শিং নাড়তে নাড়তে ঝোপঝাড় ভেঙে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় লাগালুম। আছাড় খেলুম বারকতক। হাত-পা ছড়ে গেল নিশ্চয়। ঢিবি থেকে নেমে আর পিছন ফিরেও তাকালুম না। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লুম। সেই সময় কানে এল গুলির আওয়াজ। ঘুরে দেখার সাহসও হল না। একেবারে নদীর তলায় গিয়ে পড়লুম। সেপাইরা ব্যস্ত হয়ে বলল—ক্যা হুয়া? বাবুজি?

আঙুল তুলে দেয়ালের দিকটা দেখালুম শুধু। ওরা বন্দুক বাগিয়ে তক্ষুনি দৌড়ে চলে গেল।

কিন্তু অমন ষাঁড় ওখানে এল কোত্থেকে? এতো ভারি বিদঘুটে ব্যাপার। নাকি আসলে ওটা

একটা ভূতপ্রেত! রাঁধুনি লোকটা স্টোভ জ্বেলে কেটলিতে জল গরম করছিল। সভয়ে বললে—কুছ দেখা বাবুজি? কৈ পেরেত বা?

জোরে মাথা নাড়লুম। শীত চলে গিয়ে ঘাম দিচ্ছে যেন। হাঁপানি থামছে না। একটু পরে কথাবার্তার আওয়াজ পেলুম। তখন দিনের আলো আর নেই। টর্চ জ্বালতে-জ্বালতে দীক্ষিত, কর্নেল ও সেপাইরা আসছিল। দীক্ষিতের কথা শুনতে পেলুম—হ্যাঁ, আমার ধারণা, আপনার লাল টুপিটাই ষাঁড়টাকে রাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য! ওখানে ষাঁড় এল কোত্থেকে? রাখালরা তো এক মাস আগে গোরু-মোষ নিয়ে পালিয়ে গেছে। কর্নেল বললেন—সম্ভবত, ওদের দলের একটা ষাঁড় দলছুট হয়ে থেকে গেছে ওখানে। দীক্ষিত বললেন—তাও বটে।

আমার কাছে কর্নেল এসে বললেন—হ্যাল্লো জয়ন্ত! আশা করি, হাড়গোড় ভাঙেনি?

তখন হেসে উঠলুম।—আশা করি, আপনিও অক্ষত আছেন।

—আছি বৎস! কিন্তু—ওঃ! হরিবল, জয়ন্ত! আশ্চর্য বটে!

—হঠাৎ ষাঁড়ের পাল্লায় পড়তে গেলেন কেন? দৌড়েই গেলেন দেখছিলুম!

কর্নেল বিমর্ষ মুখে বললেন—দূর থেকে ওটাকে চিনতে পারিনি। যেই দৌড়ে গেছি—ব্যস।

দীক্ষিত বললেন—লাল টুপি! ওতেই ষাঁড়টা ক্ষেপে যায়। যাক গে, গুলির আওয়াজে ব্যাটা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় বলেই রক্ষে। কিন্তু কর্নেল, এ তো এক সমস্যায় পড়া গেল। ওখানে গেলেই তো ব্যাটা আবার তেড়ে আসবে।

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন—হ্যাঁ। তা তো আসবেই। তবে যা বোঝা গেল, গুলির আওয়াজে বড্ড ভয় পায় ব্যাটা। তেমন দেখলে বরং আমরা তাই করব।

হ্যাসাগ জ্বালা হল। ক্যাম্পচেয়ার পেতে বসে আমরা কফি খেতে থাকলুম। রাত জাগতে হবে। কত রাত জাগতে হবে, জানি না। ভূতগুলোর মর্জি তো! কোন রাতে তাদের খেলা শুরু হবে, তার ঠিক তো নেই।

কিন্তু ব্যাপারটা ভাবতেই আমার এত ভয় হল যে অন্য কথা ভাবতে থাকলুম।...

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবুর সামনে যে আগুন জ্বালা হয়েছিল, কিছুক্ষণ আমরা তার উত্তাপ নিলুম। তিনটে তাঁবু খাটানো হয়েছে। একটা তাঁবুতে মিঃ দীক্ষিত ও রাঁধুনি মাধোরাম, অন্য একটায় সেপাই চারজন, অরেকটায় আমি ও কর্নেল শোব। শোব বলা ভুল হল। শোওয়ার ভাগ্য আর মাত্র ঘন্টা তিনেক। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি ঠিক রাত একটার পর ঘটতে থাকে। অতএব তখন আমাদের সেই প্রচণ্ড শীতেই বেরোতে হবে। নদীর পাড়ে যেতে হবে। জায়গা দেখে রাখা হয়েছে আগেই। তারপর কী করতে হবে, সে নির্দেশ কর্নেল দেবেন।

দুটো ক্যাম্প খাটে পাশাপাশি শুয়েছি কর্নেল ও আমি। তিনটে কম্বলেও শীত যাচ্ছে না। তাই ঘন্টা তিনেক ঘুমোবার সুযোগ হল না। দেওয়ালটা আমাদের উত্তরে— সেদিকেই নদীর পাড়। এখান থেকে দেখা যায় না। আর তাঁবুর দরজা স্বভাবত দক্ষিণে। দরজায় পর্দা ঝুলছে। একদিকে সামান্য ফাঁক। তাকিয়ে আছে সেদিকে। আকাশের দু-একটা নক্ষত্র চোখে পড়ছে। কর্নেলের রীতিমতো নাক ডাকছে! হঠাৎ দরজার ফাঁকের নক্ষত্র ঢেকে গেল। তারপর চাপা খসখস শব্দ কানে এল। শব্দটা ভাল করে শোনার জন্যে কম্বল থেকে কান বের করলুম এবং মাফলার খুলে ফেললুম মাথা থেকে। হ্যাঁ—ঠিকই শুনেছি। তাছাড়া দরজার ফাঁকে নক্ষত্র আর দেখা যাচ্ছে না। ভয়ে বুক ঢিব ঢিব করে উঠল। বালিশের পাশ থেকে টর্চটা যেই টেনেছি, আবার সেই ফাঁকে নক্ষত্র দেখলুম। এর মানে কেউ কি এসেছে? কেউ কি কোনও দুষ্টু মতলবে তাঁবুতে উঁকি দিচ্ছিল? কে সে? কী

তার উদ্দেশ্য? ভাবলুম টর্চ জ্বালার আগে কর্নেলকে চুপি চুপি জাগিয়ে দিই। অমনি নাকে একটা বোঁটকা গন্ধ এসে লাগল। নাড়িভুঁড়ি উগরে পড়ার জোগাড় সেই পচা গন্ধে। নাক ঢেকে চোখ খুলে ভয়ে কাঁপতে থাকলুম। আর কর্নেলকে ডাকারও সাহস হচ্ছে না। যদি ওই নিশুতি রাতের আগন্তুক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?

দম বন্ধ করে শুয়ে আছি। সেই সময় কর্নেলের নাক ডাকা বন্ধ হল। একটু সাহস পেলুম। বুড়ো জাগুক, হে ভগবান! বুড়ো ঘুঘুকে জাগিয়ে দাও। এ সব ব্যাপারে ওঁর মাথা খেলে ভাল। এ বয়সে গায়ের জোরও অসাধারণ। যোদ্ধা লোক। যুযুৎসু জানেন কতরকম। শত্রুকে টিট করতে জুড়ি নেই ওঁর।

হঠাৎ আবার চমকে উঠলুম। আমার পাশেই তাঁবুর গয়ে খসখস শব্দ! সেই গন্ধটা আরও বিকট এবার। তারপরই কী একটা আমার কপালে এসে পড়ল। ঠাণ্ডা অতি ঠাণ্ডা কিছু শক্ত জিনিস। ওমনি আঁতকে উঠে চেঁচালুম—কর্নেল! কর্নেল! আর যন্ত্রের হাতে টর্চের বোতামও টিপে দিলুম। ওদিক কর্নেলের টর্চও জ্বলে উঠেছে। এক মুহূর্তের জন্য দেখলুম, আমার মাথার উপর দিয়ে একটা—অবিশ্বাস্য! রীতিমতো অবিশ্বাস্য! একটা কঙ্কালের হাত সাঁৎ করে সরে গেল। তাঁবুটা জোরে নড়ে উঠল। পরক্ষণে বাইরে দূরে—অনেক দূরে কারা মিহি খনখানে গলায় হেসে উঠল—হি হি হি হি .....হি হি হি হি... হি হি হি হি!

তারপর কী হল মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। । যখন জ্ঞান ফিরল, দেখি হ্যাসাগটা কখন জ্বালা হয়েছে। রাতে শুটা নিভিয়ে রাখা হয়েছিল—কারণ আলো থাকলে পাছে দেওয়ালের আলৌকিক শক্তির লীলাখেলায় বাধা পড়ে।

কর্নেল ও দীক্ষিত বললেন—জয়ন্ত! জয়ন্তবাবু!

উঠে বসলুম। অমনি সব মনে পড়ে গেল। রুদ্ধশ্বাসে বলুম—ওরা কি পালিয়েছে? ওরা কারা এসেছিল কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। বললেন—জানি না। সত্যি জয়ন্ত, আমি অবাক। হতভম্ব। বিস্তর ঘটনা ঘটতে দেখেছি জীবনে। কিন্তু এর কোনও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিনে! একটা জীবন্ত কঙ্কাল! সত্যিকারের কঙ্কাল। বালিতে এইমাত্র তার পায়ের ছাপ আমরা দেখে এলাম। ও ছাপ কোনও মানুষ বা প্রাণীর নয়, তা হলফ করে বলতে পারি। আর ওই বিকট হাসিই বা কারা হাসছিল কে জানে?

দীক্ষিত বললেন—হাসিগুলো গুর্গিন খাঁর দেয়াল থেকে আসছে মনে হচ্ছিল কর্নেল। আমিও সেবার এসে ওই হাসি শুনেছিলুম। তখন বুঝতে পারিনি।

কর্নেল ঘড়ি দেখ বললেন—সাড়ে বারোটা প্রায়। আর কী? আলোটা আবার নিভিয়ে দেওয়া যাক। আধ ঘন্টা পরে আমরা বেরোব! জয়ন্ত, আর ঘুমিও না।

বেরোতে হবে? কাঁচুমাচু মুখে তাকালুম। তা লক্ষ্য করে কর্নেল চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বললেন—এই রকম ভয় পেলে তো চলবে না, জয়ন্ত। তুমি না খবরের কাগজের রিপোর্টার!... ..

ঠিক একাটায় আমরা বেরিয়েছি। প্রচণ্ড শীত। আমার তো সবসময় বুক ঢিব ঢিব করছে। কিন্তু উপায় নেই। কর্নেল আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছেন। নদীর উত্তর পাড়ে অন্ধকারে চুপি চুপি আমরা তিনজন এবং তিনজন সেপাই একটা পাথরের আড়ালে ওত পেতে বসেছি। একজন সেপাই রয়ে গেল তাঁবুর পাহারায়। রয়ে গেল মাধোরাম বাবুর্চিও।

বসে আছি তো আছি। আমাদর তিরিশ গজ সামনে গুর্গিন খাঁর দেয়াল অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওই কালো দেয়ালটা! মনে হচ্ছে হাজার হাজার অদৃশ্য চোখ দিয়ে সে

আমাদের দেখছে আর দেখছে। শয়তানি মতলব ভাঁজছে। যেন উত্তুরে হাওয়ার ভাষায় শনশন করে বলছে—চলে আয়! আয় রে আয়! এই সময় দূরে প্লেনের শব্দ শুনলুম। দেয়ালের আড়ালে পড়ে গেল বলে প্লেনটা দেখতে পেলুম না।

কতক্ষণ পরে হঠাৎ কর্নেল ফিসফিস করে উঠলেন—ও কী?

তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ—যা শুনেছিলুম, তাই। দুটো লাল জ্বলজ্বলে চোখ যেন দেয়ালের ওপর স্থির হয়ে আছে। একটু পরে চোখ দুটো দুলতে শুরু করল। ওপরে-নিচে। কখনও দ'পাশে। দুলছে আর মাঝে মাঝে যেন চলে বেড়াচ্ছে।

অন্তত দীর্ঘ পাঁচ মিনিট ব্যাপারটা ঘটল। তারপর এক ঝলক আলো আকাশের দিকে ছুটে গেল ধূমকেতুর মতো। কয়েক সেকেন্ড ওই আলোর ঝাঁটাটা স্থির হয়ে থাকার পর ডাইনে বাঁয়ে দু'বার নড়ে উঠল। তারপর আবার স্থির।

ঠিক এই সময় কানে এল বিকট এক চিৎকার। ও কি মানুষের না দানবের? মাথায় পুরু করে মাফলার কান অব্দি জড়ানো। তবু মনে হল কানে তালা ধরে যাচ্ছে। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! অদ্ভুত সেই আওয়াজ যেন আর্তনাদ, যেন প্রচণ্ড ক্রোধ। আমরা শক্ত হয়ে বসলুম। দীক্ষিত কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ দেখি কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চাপা স্বরে 'চলে এস তোমরা' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন।

কী সর্বনাশ! এ যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করার শামিল। কিন্তু উপায় নেই। একা এখানে পড়ে থাকার সাহস আমার নেই। এমনকী দৌড়ে নদীর তলায় তাঁবুর কাছেও যেতে পারব না—যদি ফের জ্যান্ত কঙ্কালের পাল্লায় পড়ে যাই!

পিছনে অন্ধের মতো মরিয়া হয়ে চললুম। কয়েক পা যেতেই দেওয়ালের অশরীরীরা আওয়াজ আরও বাড়িয়ে দিল। সে বিকট চেঁচামেচির বর্ণনা ভাষায় দেওয়া দুঃসাধ্য। যেন হাজার হাজার প্রাগৈতিহাসিক দত্যি-দানো হঠাৎ নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে হইচই বাধিয়েছে। কখনও মনে হচ্ছে তারা আর্তনাদ করছে, কখনও হি হি হি করে তখনকার মতো বিকট ভূতুড়ে অট্টহাসি হাসছে।

টিবির কাছে আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল টর্চ জ্বেলে দেয়ালে আলো ফেললেন। অমনি আমার পিলে চমকে উঠল। পাঁচিলের সেই ফাটলে মরা গাছটার ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে সেই জ্যান্ত কংকালটা। এই দৃশ্য দেখামাত্র সেপাইরা হুকুম পাওয়ার আগেই দুমদাম বন্দুক ছুড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি উঠল। সবাই দৌড়ে টিবিতে উঠলুম। কর্নেলের টর্চ সামনে কঙ্কালটার ওপর পড়ে রয়েছে। কঙ্কালটা নড়ছে এবার। কর্নেল জ্বলন্ত টর্চ ও রিভলভার হাতে নিয়ে সেদিকে দৌড়ে গেলেন। অমনি সব বিকট আওয়াজ থেমে গেল। অস্বাভাবিক স্তব্ধতা জাগল।

কর্নেলের চিৎকার শুনলুম—মিঃ দীক্ষিত! এখানে আসুন।

আমি পা বাড়িয়েছি সবে, সেপাইরা সবাই একসঙ্গে টর্চ জ্বলেছে—দেখি পাশের ঝোপ ঠেলে সেই ষাঁড়টা বেরিয়ে আসছে—হ্যাঁ, আমার দিকেই।

অমনি ভূতের ভয়, এই ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা, সব কিছু মুহূর্তে ভুলে তক্ষুনি দৌড় দিলুম। সন্ধ্যাবেলায় যেভাবে দৌড়েছিলুম, ঠিক সেভাবেই।

ঠাহর করে নদীর ধারে পৌঁছে তখন টর্চ জ্বালালুম। ষাঁড়টাকে পিছনে দেখতে পেলুম না। কিন্তু দূরে দেয়ালের ওখানে আবার মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ শুনতে শুনলুম। টর্চের আলোও ঝলকে উঠল বারবার। তারপর প্লেনের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম না প্লেনটা।

বোবাধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম—মাধোরাম! মাধোরাম!

সাড়া এল—বাবুজি বাবুজি! আপ কিধার হ্যায়?

সে রাতে কর্নেল, দীক্ষিত এবং সেপাই তিনজন ফিরে এলেন যখন, তখন রাত প্রায় তিনটে। হ্যাসাগ জ্বালা হল। সেই আলোয় দেখি, ওঁরা একগাদা তার, প্রকাণ্ড ব্যাটারি সেট, বাল্ব, টেপরেকর্ডার মাইক্রোফান এনেছেন সঙ্গে। ব্যাপার কী? তারপর আমার পিলে চমকাল আবার। কর্নেল দস্তানা পরা হাতে সেই কঙ্কালটার হাত ধরে আছেন এবং সেটা মাটিতে আধখানা গড়াচ্ছে গড়াচ্ছে—অর্থাৎ আসামিকে টানতে টানতেই এনেছেন, যেন আসতে চায়নি—মাটিতে লুটিয়ে আনতে হয়েছে ব্যাটাকে। আমি ফ্যলফাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, আশা করি রহস্যটা টের পেয়ে গেছ এখন।

জোরে মাথা দোলালুম।—পাইনি।

—পাওনি? তোমার ভয়টা আসলে এখনও কাটেনি। বলে কর্নেল তাঁবুর সামনেকার নিভন্ত আগুনে কয়েকটা কাঠ ফেলে দিলেন। আগুন জ্বলে উঠল। ক্যাম্পচেয়ার বের করে তার সামনে বসে চুরুট ধরালেন।

দীক্ষিত বললেন—তাহলে গাড়ি নিয়ে অর্জুন চলে যাক, কর্নেল। রেডিওমেসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করুক।

কর্নেল বললেন—অবশ্যই। হেলিকপ্টারটা পাকড়াও করা যাবে অন্তত। মালগুলো হয়তো পাচার হয়ে যাবে।

হতভম্ব হয়ে বললুম—মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান, ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি?

কর্নেল হাসলেন।—এখনও খুলে বলতে হবে? এ স্মাগলিংয়ের কারবার, জয়ন্ত। স্রেফ চোরাচালানী মালের ব্যাপার। গাঁজা আফিং চরস কোকেন এসব মাদকদ্রব্য এই অখাদ্য এলাকায় চোরাচালানীরা এনে ওই গুর্গিন খাঁর দেয়ালে একটা গুপ্ত জায়গায় মজুত করে। ব্যাটারি থেকে বিদ্যুতের সাহায্যে দেয়ালের মাথায় লাল বাল্ব জেলে হেলিকপ্টারকে সংকেত দেয়। কখনও স্রেফ হলদে আলোও দেখায়। এই হেলিকপ্টার তখন মাঠে নেমে পড়ে। এরা মালগুলো ওতে পৌঁছে দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য শয়তানগুলোকে তাড়া করতেই ব্যস্ত ছিলুম, হেলিকপ্টারটা গতিক বুঝে উড়ে পালাল।

বললুম—এই কঙ্কালটা? আর ওই অট্টহাসি?

কর্নেল বললেন—কঙ্কালটা নকল। এতে দুর্গন্ধ এমিনো অ্যাসিড মাখানো আছে। চোরাচালানীদের কেউ এটা নিয়ে এসেছিল আমাদের তাঁবুতে। ভয় দেখাতে চেয়েছিল। আর আওয়াজ হত একটা টেপরেকর্ডারে। মাইক্রোফোন ফিট করা ছিল দেয়ালে। নির্বিঘ্নে চোরাচালানী লেনদেনের ঘাঁটি গড়ার জন্য ব্যাটাদের এতসব আয়োজন। যাক গে! মাধোরাম কফি বানাও!

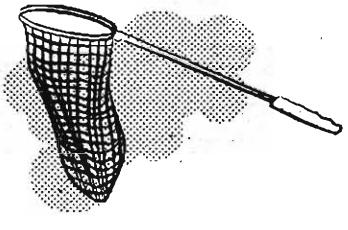

টুপির কারচুপি

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়েছিলুম। কর্নেল ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো। মাথায় টাক ও মুখে দাড়ি আছে। একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। ভারি অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ। একা থাকেন।

কিন্তু বুড়ো হলে কী হবে!

এখনও ওঁর গায়ে পালোয়ানের মতো জোর আছে। দৌড়ে পাহাড়ে চড়তে পারেন। বাঁ হতে রাইফেল ছুড়ে বাঘ মারতে পারেন। পারেন না কী, তাই-ই বলা কঠিন। সারাজীবন নানা দেশে বিদঘুটে অ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—জঙ্গলে, সমুদ্রে, দ্বীপে, বরফের দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা আর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। অবসর নেওয়ার পর ওঁর হবি হচ্ছে দুর্লভ জাতের পাখি, পোকামাকড় ও প্রজাপতি খুঁজে বেড়ানো। এজন্যে প্রায়ই উনি পাহাড়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বলতে আমি—এই জয়ন্ত চৌধুরি। আমার মতো একজন যুবকের সঙ্গে ওই বুড়োর গলাগলি ভাব যে কতটা, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

এই কর্নেলবুড়োর আরেক বাতিক গোয়েন্দাগিরি। অনেক বড় বড় ডাকাতি আর খুনের হিল্লে করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শুধু পুলিশ মহলের নয়, সবখানেই ওর নামটা বিলক্ষণ চেনা। কেউ যদি বলে 'বুড়ো ঘুঘু' তাহলে বুঝতে হবে সে নির্ঘাৎ কর্নেলের কথাই বলছে।

সেই রোববারের সকালে ওঁর বাসায় গেলুম, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার এক রিপোর্টার। আমাদের কাগজেই একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছিল। জানতুম, অদ্ভুত যা কিছু—তাতেই কর্নেলের কৌতূহল। উনি নাক না গলিয়ে থাকতে পারবেন না। আর এই খবরটা শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য।

তো, আমাকে দেখেই বুড়ো হাসতে হাসতে বললেন—এস জয়ন্ত; এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলুম। নিশ্চয় তুমি সেই ভূতুড়ে টুপির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।

বললুম—ভূতুড়ে টুপি, না জ্যান্ত টুপি?

—একই কথা। বলে কর্নেল খবরের কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না জয়ন্ত? চোঙার মতো সূঁচলো ডগাওয়ালা এই ধরনের টুপি ক্রিস্টমাসের পরবে পরা হয়। আবার সার্কাসের ক্লাউনরাও এমন টুপি পরে ভাঁড়ামি করে। সেই টুপি কি না ইচ্ছেমতো চলে বেড়ায়। লাফায়। নাচে। বিছানায় ঘুমোয়। খাবার টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। ইজিচেয়ারে আরামে গড়ায়। খাসা! ভাবা যায় না! টুপির মালিক যে ঘাবড়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ কী!

বললুম—শুধু তাই নয় কর্নেল। বাগানে গিয়ে গোলাপগাছে চড়ে চমৎকার দোল খায় ব্যাটা।

কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বলন—বোসো। এক্ষুনি টুপির মালিক মিঃ গজেন্দ্রকিশোর সিংহরায় এসে পড়বেন। একটু আগে আমায় ফোন করেছিলেন।

কর্নেলের পরিচারিকা মিস অ্যারাথুন একটা ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফির পেয়ালায় সবে মুখ দিয়েছি, দরজায় ঘন্টা বাজল। তারপর এক প্রকাণ্ড দশাসই চেহারার স্যুট পরা ভদ্রলোক ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা কিটব্যাগ। আমাকে নমস্কার করলেন, আর কর্নেলের সঙ্গে করলেন

হ্যান্ডশেক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। সোফায় গম্ভীর মুখে উনি বসলে কর্নেল বললেন—মিং সিংহরায়, বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?

সিংহরায় বললেন—আপনাকে ফোনে তো সবই বলেছি, কর্নেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা আজ তিনদিন ধরে সত্যি সত্যি ঘটছে। খবরের কাগজে তো দূরের কথা, বাড়ির কাউকে আমি বলিনি। অথচ কীভাবে ফাঁস হয়ে গেল, কে জানে! খবরের কাগজেই বা কে, খবরটা দিল—কিছু বুঝতে পারছিনে! সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

কর্নেল মুখ খোলার আগে আমি অবাক হয়ে বললুম—খবরটা নিশ্চয় কোনও রিপোর্টারকে কেউ দিয়েছে! না দিলে কাগজে বেরোতেই পারে না।

সিংহরায় উদ্বিগ্নমুখে বললেন—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কী ভাবছিলেন। বলেন—হুম। কিন্তু টুপিটা যে ওইসব অদ্ভুত কাণ্ড করছে, তা তো সত্যি?

সিংহরায় জবাব দিলেন—একেবারে হুবহু সত্যি। টুপিটা কিনেছি গত বিষ্যুৎবার চৌরঙ্গির একটা নিলামের দোকানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখা আমার বাতিক। টুপিটা দেখতে অদ্ভুত লাগল। পঁচিশ টাকা থেকে দর হাঁকাহাঁকি শুরু হল। তিরিশে উঠেই অন্যরা ছেড়ে দিল। শুধু একজন...

—হুম! বলুন।

—একজন অবাঙালি ভদ্রলোক ছাড়ল না। দর চড়াতে থাকল। তাই আমারও জেদ চড়ে গেল। শেষ অব্দি রোখের মাথায় তেরোশো টাকা হাঁকলুম। তখন লোকটা সরে গেল। টুপি নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলুম। এবং তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকেই টুপি খেল দেখানো শুরু করল। ড্রয়িংরুমের কোনায় একটা ছোট্ট টেবিলে ওটা রেখেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখি টুপিটা টেবিলের ওপরে চলতে চলতে নিচে পড়ে গেল। তখনও সন্দেহ হয়নি। ওটা সেখানেই তুলে রেখে ওপরের ঘরে গেছি, খাওয়াদাওয়া করেছি। শুতে গিয়ে দেখি, আশ্চর্য। টুপিটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সব্বাইকে জিগ্যেস করলুম—কেউ কিছু জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল শুক্রবার রাতে। টুপিটা শোওয়ার ঘরেই রেখেছিলুম। রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে খসখস শব্দ শুনে সুইচ টিপে টেবিলল্যাম্প জ্বালালুম। দেখি—টুপিটা মেঝেতে দিব্যি হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে জানলার দিকে যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে সেটা জানলা গলিয়ে লাফ দিল। বিশ্বাস করুন কর্নেল, যা বলছি—এর মধ্যে এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।

—হুম! বলুন, বলুন!

মিঃ সিংহরায়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। দম নিয়ে বললেন—তক্ষুণি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম, টুপিটা বুগনভিলিয়ার গাছে কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল গত রাতে। টুপিটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা গোলাপ গাছে চড়ে বসেছে। আজ ভোরবেলা মালি দেখতে পেয়ে...

কর্নেল বাধা দিয়ে বলেন—হুম, বুঝেছি। টুপিটা কি এনেছেন?

—এনেছি! এই বিদঘুটে জিনিস আর কাছে রাখতে একটুও ইচ্ছে নেই কর্নেল।...বলে সিংহরায় কিটব্যাগ খুলে একটা চোঙার মতো টুপি বের করলেন। প্রকাণ্ড টুপি। কালোরং। সূঁচলো ডগায় একটা রেশমি টুপি আছে। দুপাশে দুটো দুষ্টুহাসিভরা মুখ—একদিকেরটা ছেলের, অন্যদিকেরটা মেয়ের। আমার নাকে কড়া গন্ধ লাগল। নিশ্চয় টুপির গন্ধ।

কর্নেল টুপিটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন—হুম, বেশ ওজন আছে দেখছি।

শক্ত-সমর্থ মাথা না হলে ঘাড় ব্যথা করবে। কিন্তু এ টুপি তো প্রশান্ত মহাসাগরের মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা পরে। বুনো বেড়ালজাতীয় পশুর চামড়ায় তৈরি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—কর্নেল কর্নেল! গত বছর মাকাসিকোতে রাজাকে হটিয়ে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করেছিল না? রাজা অনুহিটিক পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন! খুব খুনোখুনি আর লুটপাট হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অপুর্ব জয়ন্ত, অপুর্ব! তাই-ই তো বটে। হাজার হলেও তুমি খবরের কাগজের লোক! ইয়ে মিঃ সিংহরায়, তাহলে টুপিটা আমার কাছে আপাতত থাক। আপত্তি আছে?

সিংহরায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—মোটেও না! বরং বেঁচে গেলুম, কর্নেল! বাপ্‌স! এখনও আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে! ওই ভূতুড়ে টুপি এবার হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবে মশাই!

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। জয়ন্তও যাবে আমার সঙ্গে। কেমন!

সিংহরায় মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।

কথামতো সাড়ে পাঁচটায় আবার কর্নেলের ফ্ল্যাটে গেলুম। দেখি, আমারই অপেক্ষা করছেন উনি। একটু হেসে বললুম—টুপিটা নিশ্চয় আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্ত। এবং সেটাই আশ্চর্য!

—কেন, কেন?

—টুপিটা যদি সত্যি ভূতুড়ে হবে, তাহলে সবখানেই ভূতুড়ে কাণ্ড করবে! অথচ আমার ঘরে এসে একেবারে শান্ত খোকাবাবুটি বনে গেল! কোনও মানে হয় না জয়ন্ত!

—তাহলে কি সিংহরায় মিথ্যে বলছেন? খবরের কাগজেও কি উনি নিজেই খবরটা দিয়েছেন? কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কী কর্নেল? সিংহরায় কেন এমন আজগুবি ঘটনা রটাচ্ছেন?

—সব কিছু জানতেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি আমরা। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।...

নিউ আলিপুরে সিংহরায়ের ইভনিং লজে যখন আমরা পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা ছ'টা। বিশাল বাড়ি। চওড়া লন। ফলবাগিচা, টেনিস কোর্ট আছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টুপিটা কর্নেলের হাতে ছিল। সোফার এককোণে রেখে পাশেই বসলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। দেখলুম, কর্নেল টুপির কথা মোটেও তুললেন না। ঘরের নানান শিল্পসামগ্রী নিয়ে পুরাতত্ত্বে চলে গেলেন। ওসব পণ্ডিতি ব্যাপার আমি বুঝিনে। চুপচাপ বসে রইলুম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল টুপিটা নড়ছে। নড়তে নড়তে সোফার পিছনে চলে যাচ্ছে। ঘরে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হাল্কা ধূসর আলো জ্বলছে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। এত অবাক, আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। টুপিটা সোফার পিছন দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এগোচ্ছে। ডগার থুপিটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওটার গতি বাড়ল। দরজার কাছে যেতেই আমি এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! টুপি! টুপিটা পালাচ্ছে!

সিংহরায় হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলকে দেখলুম, মিটিমিটি হেসে এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন টুপিটা দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়েছে!

কর্নেল দেখলুম দরজার কাছে গিয়েই আচমকা লাফ দিলেন। তারপর উনিও অদৃশ্য। এতক্ষণে আমার হুঁশ হল যেন। দৌড়ে বেরিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

অমনি লনের ওদিকে গেটের কাছে দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ হল। নিশ্চয় কেউ গুলি ছুড়ল। দারোয়ান চাকর-বাকর চেঁচিয়ে উঠল। দৌড়াদৌড়ি শুরু হল! গেটে গিয়ে দেখি, কর্নেল একহাতে টুপি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। রুদ্ধশ্বাসে বললুম—কী ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেলের সামনে নুড়িবিছানো রাস্তায় একটা ছোট্ট বিলিতি কুকুর মরে পড়ে আছে। বুকের কাছে রক্তের ছোপ। সিংহরায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—জিমি। জিমি! কে তোকে খুন করল?

কর্নেল ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন—মিঃ সিংহরায়, জিমিকে ওর আসল মালিকরা এইমাত্র গুলি করে মেরে গেল। জিমিকে আপনি নিশ্চয় সদ্য কিনেছেন! তাই না?

সিংহরায় উঠে দাঁড়ালেন। —হ্যাঁ। যেদিন টুপিটা কিনি সেদিনই বিকেলে একটা লোক বেচতে এসেছিল। কিন্তু আমি তো এসব কিছু বুঝতে পারছি না!

দেখুন, এই টুপির মধ্যে নিশ্চয় কিছু দামি মণিমুক্তো লুকোনো আছে। টুপিটা হাতানোর জন্যেই জিমিকে ওরা আপনার কাছে বেচেছিল। টুপিতে একরকম গন্ধ মাখানো আছে। মাকাসিকো দ্বীপের একজাতের ফুলের গন্ধ। বহুকাল টিকে থাকে এই গন্ধ। ওরা এই গন্ধ জোগাড় করে জিমিকে শুঁকিয়ে খুব ট্রেনিং দিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। তবে ট্রেনিং জিমির তেমন রপ্ত হয়নি। সময় যথেষ্ট পায়নি। তাই টুপিটা ওদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওরা এই ক'দিন রাস্তায় ওত পেতে অপেক্ষা করেছে বেচারা জিমির!

সিংহরায় হতভম্ব হয়ে বললেন—তাহলে টুপির তলায় জিমিটাই ঘুরে বেড়াত?

—অবশ্যই। ভুতুড়ে টুপির রহস্য হচ্ছে এই। আর খবরের কাগজে খবর দিয়েছিল ওরাই—যাতে টুপিটা হারালে ভূতের ঘাড়েই দোষটা চাপানো যায়। বুঝলেন তো? অট্টুকুন কুকুর—খাড়াই মোট ছ'ইঞ্চি। টুপির তলায় ঢুকলে তো ওকে দেখা যাবে না।

এর পর আমরা ড্রইংরুমে ফিরে গেলুম। ছুরি দিয়ে টুপির ভেতরটা চিরে দিতেই গুচ্ছের রঙিন পাথর ঠিকরে পড়ল। চোখ-ধাঁধানো রং সব। আমি লাফিয়ে উঠলুম—কর্নেল! রাজা অনুহিটিক পালানোর সময় অনেক ধনরত্ন নিয়ে যান। পথে অনেক খোওয়া গিয়েছিল নাকি। এই টুপিটার মধ্যেও কিছু ছিল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চুরুট জ্বেলে শুধু বললেন—হুম!

মনে মনে বললুম—ওহে বুড়োঘুঘু! সত্যি, তোমার তুলনা নেই।...

টোরাদ্বীপের ভয়ংকর

ফোনে দশাবতার

কাজের সময় কোনও ফোন বাজলে বড্ড বিরক্ত লাগে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে বসে খুব মন দিয়ে বিদ্যুৎমন্ত্রীর ভাষণ লিখছি, কাল সকালের কাগজে যেটা পড়ে লোকেরা এই ভয়াবহ বিদ্যুৎ সঙ্কটের অন্ধকারে অন্তত আশার আলোটি দেখতে পাবে—এমন সময় ফোন বাজল ক্রিরিরিরিরিং...

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলেই বললুম—স্পেশাল রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরীকে চাই তো? নেই। ছুটিতে গেছে।

—ডার্লিং, অবতার কাকে বলে জানো কি?

অপ্রস্তুত ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তারপর বললুম—খুব জানি। পাপীতাপী উদ্ধারে ভগবান নানারূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। সেই রূপের নাম অবতার। ইদানীংকালে যেমন এক অবতার কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। রাজ্যের চোর ডাকাত খুনির হাত থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তো হে গোয়েন্দারূপী অবতার মশাই! হঠাৎ এই সন্ধ্যাবেলায় অবতার নিয়ে জ্বালাতন কেন?

—মাইডিয়ার ইয়ংম্যান! কারণ ছাড়া কার্য হয় না।

—ভাল কথা। বেশি বকবক না করে সোজা সেই কারণটা জানিয়ে দিন। আমার হাতে জরুরি কাজ রয়েছে। তাছাড়া আপনার জানা উচিত, এই সন্ধ্যাবেলাটাই হল গিয়ে খবরের কাগজের পিক আওয়ার্স। সারাদিনের সব ঘটনার খবর এখন বন্যার মতো এসে টেবিল ডুবিয়ে দিয়েছে। অতএব...

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! এ বৃদ্ধ সবই অবগত।

—তাহলে কাজে বাগড়া দিচ্ছেন কেন?

—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো।

—শুনছি, বলুন।

—তোমার কলম চালনার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কলম থামিয়ে মন দিয়ে শোনো।

জ্বালাতন! কাগজ থেকে ফোনের দূরত্ব অন্তত হাফ মিটার। আপনার কি পাঁচটা কান আছে?

—না। কিন্তু তুমি লেখার সময় কাগজের ওপর মুখটা ঝুঁকিয়ে রাখো দেখছি। এখনও তাই রেখেছ। লেখা বন্ধ করে হাসতে হাসতে বললুম—বেশ। এবার বলুন আপনার অবতার তত্ত্বটা কী?

—ডার্লিং, অবতারের সংখ্যা কত এবং কী তাদের নাম নিশ্চয় জানো?

—হুঁউ। দশ অবতার। যথা : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ...

—এনাফ জয়ন্ত, এনাফ! আমার বক্তব্য শুধু নৃসিংহ সম্পর্কে। তুমি কাহিনিটা নিশ্চয়ই জানো?

—খুউব জানি। দৈত্যরাজ হিরণকশিপু কৃষ্ণভক্ত বালক প্রহ্লাদকে বললেন, কোথায় থাকে তোমার কৃষ্ণ? প্রহ্লাদ বলল, সর্বত্র। দৈত্যরাজ বললেন, তাহলে এই স্তম্ভেও আছে সে? প্রহ্লাদ বলল, নিশ্চয় আছেন। তখন দৈত্যরাজ স্তম্ভের গয়ে মুদ্গারের আঘাত করলেন, আর স্তম্ভ বিদীর্ণ হয়ে নৃসিংহ মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। বড় ভয়ঙ্কর সেই মূর্তি। অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ।

—খাসা! অর্ধেক সিংহ, অর্ধেক মানুষ!

—কর্নেল, আসলে এই অবতারের ব্যাপারটা ডারউইন সাহেবের সেই থিওরি অফ এভোলশান, অভিব্যক্তিবাদ। নানান প্রাণী থেকে আকার বদলাতে বদলাতে শেষে বাঁদর জাতীয় প্রাণী থেকে মানুষের উৎপত্তি। আমাদের ভারতীয় ঋষিরা কিন্তু সায়েবদের চেয়ে চার হাজার বছর আগেই ব্যাপারটা জানতেন। সেটাই অবতারতত্ত্বের মধ্যে ঠারে-ঠোরে বলেছেন। দেখুন না—গোড়ার অবতাররা নিছক প্রাণী। তারপর আদ্ধেক প্রাণী, আদ্ধেক মানুষ। শেষের অবতাররা খাঁটি মানুষ।

—এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলুম, বৎস! কিন্তু কিন্তু ব্যাখ্যাটি তোমার নিজস্ব কি?

—মোটেও না। প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ হরিহর গড়গড়ির কাছে শুনেছি।

—কী অপূর্ব যোগাযোগ! ডার্লিং ডঃ গড়গড়ি এখন আমার পাশেই বসে আছেন।

—তাই বলুন। সেই তো ভাবছিলুম, আপনার মাথায় খুলির ভেতরকার নরম বস্তুটিতে হঠাৎ মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামনরা হঠাৎ কিলবিল করে ঢুকে পড়ল কী ভাবে? হাই ওল্ড ম্যান! যদি মঙ্গল চান, ওঁকে বিদেয় করুন। নইলে শীগগির আপনাকে লুম্বিনী পার্ক, কিংবা গোবরা, কিংবা সেই রাঁচি দৌড়ুতে হবে। খবর এসেছে, সব বেডে পেশেন্ট ভর্তি। সাবধান!

—হাঃ হাঃ হাঃ!

—হাসবেন না। একবার আমি ডঃ গড়গড়ির বক্তৃতা শোনার পর সত্যি হাফ পাগল হয়ে গিয়েছিলুম!

—চুপ, চুপ! আমার ফোন খুব সেন্সিটিভ। অন্যেরাও শুনতে পায়।

—যাক্ গে। যথেষ্ট হল। এবার ছাড়ি। এক্ষুনি প্রেসে কপি পাঠাতে হবে।

—জয়ন্ত, তুমি ইউনির্কন নামে কোনও প্রাণীর কথা শুনেছ?

—হে বৃদ্ধ ঘুঘু! সত্যি আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

—প্রাচীন গ্রিক ও রোমান পুঁথিতে ইউনিকর্নের কথা আছে। এ প্রাণী একটা-শিংওলা ঘোড়ার মতো। এই প্রাণী নাকি ভারতে ছিল। তাছাড়া বাইবেলেও এমনি সব বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা আছে। কিন্তু নৃসিংহ সত্যি অভিনব। আদিম পৃথিবীতে টেরাডাকটিল, ডাইনোসরাস ইত্যাদি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন। তারা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে, নৃসিংহরূপী কোনও প্রাণী যদি নিছক কল্পনা না হয়, তাহলে বলতে হবে যে এই প্রাণী ডাইনোসরাসদের পরবর্তী যুগে দেখা দিয়েছিল। এমনকী, মানুষ অর্থাৎ হোমোসেপিয়েন প্রাণীদের আবির্ভাবের পরেও দু'চারটে নৃসিংহ টিকে গিয়েছিল। নৃসিংহ অবতারের গল্পে তারই আভাস রয়েছে।

—সর্বনাশ! ডঃ গড়গড়ি আপনার মাথাটি খেয়েছেন।

—জয়ন্ত, ধর যদি এমন হয়, বর্তমান যুগেও কোথাও কোনও দুর্গম জায়গায় নৃসিংহ নামক জীব টিকে রয়েছে?

—থাকলে খুব ভাল হয় নিশ্চয়। দৈনিক সত্যসেবক সে-খবর ছেপে হই-চই ফেলে দেয়। তবে ফোটো চাই। নইলে লোকে গুলতাপ্পি বলে উড়িয়ে দেবে। ইয়েতি-টিয়েতি নিয়ে অনেক দেখা গেল না?

—ডার্লিং, তবে শোন! আমার কাছে নৃসিংহের ফোটো রয়েছে।

—অ্যাঁ!

—অ্যাঁ নয় বৎস, হ্যাঁ।

—নিশ্চয় ডঃ গড়গড়ি এনেছেন আপনার কাছে?

—দ্যাটস রাইট।

—ফোটোটা যে ক্যামেরার কারিকুরি নয়, তার প্রমাণ কী? ডঃ গড়গড়ি কোথায় দেখলেন নৃসিংহ?

—টোরা আইল্যান্ডে। আন্দামান থেকে একশো সাঁইত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণে একটা ছোট্ট দ্বীপে গিয়েছিলেন সম্প্রতি।

—একা?

—মোটেই না। পাঁচজনের একটা বিজ্ঞানী টিম ভারত সরকার ওই এলাকায় পাঠিয়েছিল। একজন পুরাতত্ত্ববিদ—ডঃ গড়গড়ি, একজন ভূতত্ত্ববিদ—ডঃ গজরাজ মালহোত্র, একজন প্রাণীবিজ্ঞানী—ডঃ মুজফফর আমেদ, একজন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত—ডঃ রঘুনাথ সিং এবং প্রখ্যাত জার্মান উদ্ভিদ বিজ্ঞানী—ডঃ গুটেনবার্গ।

—কর্নেল, কর্নেল! আমি এখনই যাচ্ছি। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ফোন নামিয়ে রাখলুম।

নৃসিংহাবতারের অন্তর্ধান

ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটটি যেন দিনে দিনে একটি ল্যাবরেটরি হয়ে উঠেছে। কর্নেল বুড়ো রাজ্যের পোকামাকড় নিয়ে কী সব গবেষণা করেন এবং মাঝে মাঝে মাঝে বিদেশি পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। ইদানীং গোয়েন্দাগিরির দিকে আর তত মনোযোগ নেই।

সেই শীতের সন্ধ্যায় 'বুড়ো ঘুঘুর বাসায়' ঢোকার আগে টের পাইনি যে টোরাদ্বীপে নৃসিংহ নামক প্রাণীর খবর শুধু নয়, আরও সাংঘাতিক খবর আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ভারত সরকার টোরাদ্বীপে নানা ষিয়ে খোঁজ-খবরের জন্য যে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিল, নৃসিংহের কবলে পড়ে তাঁদের তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বেঁচে অক্ষত দেহে ফিরতে পেরেছেন শুধু ডঃ হরিহর গড়গড়ি এবং গুটেনবার্গ। তবে ডঃ গুটেনবার্গের শরীর একেবারে অক্ষত নেই। কিছু আঁচড়ের দাগ নিয়ে ফিরেছেন। নার্সিং হোমে চিকিৎসার পর সেরে উঠেছেন তিনি।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনা এখনও গোপন রাখা হয়েছে 'জাতীয় স্বার্থে'। তাই শেষ পর্যন্ত নিরাশ হলুম। কর্নেল বললেন—দু' একটা দিন ধৈর্য ধরো, জয়ন্ত। এমন সাংঘাতিক খবর চেপে রাখা যাবে না, সেটা সরকার ভালই জানে। যথাসময়ে সাংবাদিকদের দিল্লিতে ডেকে কর্তৃপক্ষ ঘটনাটা জানাবে। তখন তোমাদের সত্যসেবক পত্রিকাও তা বিশদ ছাপতে পারবে। তবে কথা দিচ্ছি, ঠিক তার আগের দিন তুমি স্কুপ নিউজ হিসেবে 'বিশ্বস্তসূত্রে' একটুখানি যাতে ছেপে দিতে পার, তার ব্যবস্থা করব। সংক্ষিপ্তভাবে কিন্তু! নইলে আমি ঝামেলায় পড়ব।

খুশি হয়ে বললুম—তাতেই চলবে। কিন্তু তার সঙ্গে ছবিটা ছাপলে ক্ষতি কী?

কর্নেল হেসে বললুম—তাহলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ডঃ গড়গড়ি বিপদে পড়বেন।

ডঃ গড়গড়ি জোরে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্তবাবু, ছবিটবি আমি ছাপতে দিতে পারব না।

ছবিটা দেখে শিউরে উঠতে হয়। ক্লোজ শটে তোলা ফোটো। ডঃ গুটেনবার্গ প্রাণের তোয়াক্কা না করে কী দুঃসাহসে যে জন্তুটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্যামেরার শাটার টিপে পালিয়ে গিয়েছিলেন, শুনে রক্ত হিম হয়ে যায়।

ডঃ গড়গড়ি আগাগোড়া খুলে কিছু বললেন না। কর্নেলও যেন ওঁর মুখ চেয়ে বেশি কিছু জানালেন না। তখন ভাবলুম, ডঃ গড়গড়ি চলে গেলে কর্নেলের কাছে আদ্যোপান্ত জেনে নেব।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ডঃ গড়গড়ি চলে গেলেন। তখন কর্নেলকে বাগে পেয়ে বললুম—হাই ওল্ডম্যান! ডঃ গড়গড়ি আপনার দ্বারস্থ হলেন কেন খুলে বলুন তো?

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার রিং পাকিয়ে রইলেন সেদিকে। এক মিনিট পরে টাকে হাত বুলোলেন। তার এক মিনিট পরে সাদা দাড়ি খামচে ধরলেন। তারপর একটু হেসে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন—টোরা আইল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, জয়ন্ত?

চমকে উঠলুম।—ওরে বাবা! নৃসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন ভাবছেন নাকি?

—ক্ষতি কী?

—কর্নেল, ভুলে যাবেন না, আপনি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ। আর দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলেন রীতিমতো পালোয়ান। নৃসিংহের পাল্লায় পড়ে তাঁর প্রাণটি বেঘোরে গিয়েছিল।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—তবে সে-নৃসিংহ ছিল সত্যযুগে স্বয়ং ভগবানের অবতার। আর এ নৃসিংহ কলিযুগের নিছক প্রাণী বলেই অনুমান করছি। নইলে জনপ্রাণীহীন টোরাদ্বীপে তার আবির্ভাবের অর্থ কী? কাদের উদ্ধারে সেখানে ভগবান অবতীর্ণ হবে বলো?

—সত্যি কি টোরাদ্বীপে যাবেন ভাবছেন?

—যাব। ডঃ গড়গড়ি সেইজন্যেই এসেছিলেন। তবে এবার উনি যাবেন গোপনে, বেসরকারি ভাবে। আমার সাহায্য চান।

—কেন?

—ওঁর মনে একটা ধাঁধা ঢুকছে।

—খুলে বলুন।

—টোরাদ্বীপ আসলে একটা তিনকোনা পাহাড়। সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠেছে টুপির মতো। চারধার অবশ্যি ততকিছু খাড়া নয়, অনেকটা গড়ানে বা ঢালু। জায়গায়-জায়গায় সমতল চত্বরও আছে। আগাগোড়া জঙ্গলে-ঢাকা। পাথর তো আছেই। খাড়ি বলতে মাত্র শ'তিনেক ফুট উঁচু এবং শ'খানেক ফুট চওড়া একটা অংশ। সেখানটা দেয়ালের মতো সোজা উঠেছে সমুদ্র থেকে। প্রচণ্ড বেগে জল আছড়ে পড়ে আর দেয়ালের মাথা অবধি ছিটকে ছড়িয়ে যায়। কানে তালা ধরে যায় তার শব্দে। তো ডঃ গড়গড়ির ধারণা ওইখানে কোথাও বিদ্‌ঘুটে সিংহ-মানুষটা থাকে এবং কিছু পাহারা দেয়।

—পাহারা দেয়? কী পাহারা দেয়? গুপ্তধন বুঝি?

—কে জানে! তবে ডঃ গড়গড়ির মাথায় আরও একটা আজব ধারণা ঢুকেছে যে নৃসিংহটা হয়তো একালেরই বিজ্ঞানীর তৈরি একটা রোবো অর্থাৎ নিছক যন্ত্রমানুষ।

কর্নেলের পাশে সোফার ওপর খামে ছবিটা রয়েছে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিলুম। খুলে ছবিটা দেখতে দেখতে বললুম—অসম্ভব। লোমওয়ালা একটা মানুষের মাথা সিংহের মতো। একরাশ কেশর আছে। বড় বড় হিংসুটে দাঁত বের করে আছে। এ কখনও যন্ত্র হতে পারে না।

কর্নেল আনমনে বললেন—ঠিক বলেছ। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। যন্ত্র বলে মনে হয় না।

আমরা কথা বলতে বলতে ফোন বাজল। কর্নেল ফোন ধরে কার সঙ্গে চাপা গলায় কিছুক্ষণ কথা বললেন। তারপর ফোন নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে টাকে মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগলেন। দেখলে মনে হবে, ওস্তাদ তবলচী তবলায় হাতুড়ির ঘা মেরে সুর লাগাচ্ছেন। অবশ্য ব্যাপারটা কতকটা সেরকমই। কর্নেল বলেন, ডার্লিং! মাঝে মাঝে মাথার ঘিলু নানারকম চিন্তার চাঁটি খেয়ে বেসুরো হয়ে যায়। তখন ঠিক সুরে বাঁধতে হলে এই কাজটি জরুরি।

মগজের সুর বেঁধে কর্নেল হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বললেন, জয়ন্ত। এইমাত্র এক ভদ্রলোক ফোনে বললেন, তাঁর বাড়িতে সম্প্রতি এক বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার ঘটেছে, তিনি আমার সাহায্য চান।

বললুম—তা কে না চায়? আপনি প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু। সেখানে বিদ্‌ঘুটে কিছু ঘটে, সেখানেই আপনার ডাক পড়ে। এতে এমন গোমড়া মুখে ঘিলু নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার কী আছে?

কর্নেল একটু হাসলেন।—আছে মনে হচ্ছে। কারণ মাস তিনেক আগে ভদ্রলোকের ঠাকুরঘর থেকে পুরনো আমলের একটি দশাবতার মূর্তি চুরি গিয়েছিল। কষ্টিপাথরের একটা চওড়া ফলকের ওপড়া খোদাই করা দশটি মুর্তি। অদ্ভুত ব্যাপার, গতকাল ফলকটা উনি বাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু ফলকের একটা মূর্তি খুবলে নিয়েছে চোর। বাকি ন'টা মূর্তি যেমন ছিল, তেমনি আছে। কোন মূর্তিটা নিয়েছে জানো? নৃসিংহের।

—অ্যাঁ! আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন—টোরাদ্বীপের ঘটনার সঙ্গে এ ঘটনার যোগাযোগ-আছে কি না বলা কঠিন। নিছক আকস্মিক যোগাযোগও হতে পারে। অর্থাৎ কাকতালীয় যোগ।

—তাই হবে, কর্নেল! কাক এসে তালগাছে বসল, আর একটা পাকা তাল পড়ল দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসল বলেই তালটা পড়ল—তাতে কোনও যুক্তি নেই। কাক না বসলেও তালটা পড়ত। কাজেই টোরাদ্বীপের জ্যান্ত নৃসিংহ, আর আপনার ওই ভদ্রলোকের চুরি যাওয়া পাথুরে নৃসিংহের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকতেই পারে না।

কর্নেল বললেন—কিন্তু এটাও অদ্ভুত যে এই ভদ্রলোক একজন নামকরা চিকিৎসাবিজ্ঞানী। শল্যচিকিৎসা বা সার্জারিতে এঁর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি আছে।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী নাম বলুন তো?

—ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ।

—নাম শুনেছি। কিন্তু এতে অদ্ভুত কী দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। নিভে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—জয়ন্ত, হাতে যদি সময় থাকে তো এস আমার সঙ্গে।

—কোথায় বলুন তো?

—ডঃ পুরকায়স্থের বাড়ি। উনি সল্টলেকে বাড়ি করেছেন বছর দুই আগে। ঠিকানা ফোন গাইডে পেয়ে যাব বললেন।

—আপনার মাথা খারাপ? এই রাত্রিবেলা জনমানুষহীন ওই ভূতুড়ে এলাকায় আপনি ওঁর বাড়ি খুঁজে বের করতে পারবেন, ভেবেছেন? গেছেন কখনও ওই এলাকায়?

কর্নেল হাসলেন।—তুমি ঠিকই বলেছ বৎস! একবার রাত্রিবেলা সল্টলেকে আমার এক বন্ধুর বাড়ি গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নে গিয়ে ফেরার সময় তিন ঘন্টা ঘুরে মরেছিলুম। সব রাস্তা একরকম—দূরে দূরে একটা করে বাড়ি। লোকজন নেই রাস্তায়। গোলকধাঁধা!

—তাহলে কোন সাহসে যেতে চাইছেন এখন?

কর্নেল ফোন গাইডের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন —ডার্লিং! কলকাতার লোকেরা নীরস একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে থেকে যখন হাঁপিয়ে ওঠেন, আমি তাঁদের পরামর্শ দিতে চাই—যদি বৈচিত্র চান, রোমাঞ্চ চান, বুক ঢিপঢিপ-করা আতঙ্ক আর তার সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চারের দুঃসাহসী আনন্দও পেতে চান, তাহলে আপনারা রাত্রিবেলা সল্টলেকে চলে যান। সারারাত ঘুরুন। মনে হবে সে এক অজানা রহস্যময় দেশ। মাথার ওপর ঝলমল নক্ষত্র, কিংবা ভূতুড়ে চাঁদ—প্রান্তরব্যাপী ধূসর কুয়াশা আর হলুদ জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা করে বাড়ি—নিঃশব্দ নির্জন বাড়ি—কী তাদের রহস্য! কী আশ্চর্য রূপমহল! সেখানে আরব্য উপন্যাসের দৈত্য আর পরীরা সারারাত ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় এবং...

আমি আবাক হয়ে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারি সংলাপ বা প্রলাপ শুনছিলুম, সেই সময় ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ কফির পেয়ালা সাজানো ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল—স্যার! আমাদের পেরজাপতিগুলো ডিম পেড়েছে আজ। সেদিনকে বললেন না আপনি—ষষ্ঠী, পেরজাপতির ডিম দেখিও। এবার দেখবেন আসুন।

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে লাফিয়ে উঠলেন।—অ্যাঁ! ডিম পেড়েছে, ডিম? ও হো, কী সুখের কথা! জয়ন্ত! বুঝতে পারছ কি, কী প্রকাণ্ড অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি? শীতকালে প্রজাপতিদের ডিম পাড়িয়েছি। দৈনিক সত্যসেবকের জন্যে এই অত্যাশ্চর্য খবর তুমি নিয়ে যেতে পার, বৎস!...বলেই উনি ওঁর পরীক্ষাগারের দিকে দৌড়লেন। ফোন গাইড পড়ে রইল।

ঠাকুরমশাইয়ের নতুন যজমান

প্রজাপতিগুলোকে অশেষ ধন্যবাদ। তারা জানুয়ারি মাসের ঠাণ্ডা কনকনে রাতে সল্টলেকে অ্যাডভেঞ্চারের হাত থেকে রক্ষা করল। কল্পনা করে শিউরে উঠেছিলুম, কুয়াশায় ঢাকা সল্টলেকের জনহীন রাস্তায় আমাদের গাড়ি সারারাত পেট্রল পুড়িয়ে হন্যে হচ্ছে—কিন্তু বেরুনোর পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সে রাতে, আন্দাজ দশটায় যখন 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' থেকে বেরুচ্ছি, তখনও ঘুঘুমশাই প্রজাপতির খাঁচার সামনে ঝুঁকে ধ্যানে মৌনীবাবা হয়ে রয়েছেন। আমার বিদায় সম্ভাষণ কানে শুনলেন বলে মনে হল না। দরজা আটকাতে এসে বেচারা ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল—আজ রাতে আর আমার খাওয়া-শোওয়া হবে না স্যার।...

পরদিন সকালে উনি হঠাৎ আমার ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে বললেন—এস জয়ন্ত, বেরিয়ে পড়া যাক।

অতএব বেরুতে হল। হ্যাঁ, সেই সল্টলেকে পরমেশ ডাক্তারের বাড়ি। সারা পথ কর্নেল প্রজাপতি বিষয়ে সমানে বকবক করলেন। কান পাতলুম না। বাড়ি খুঁজে বের করতে পারায় মিনিট কুড়ি লাগল। গেটের মুখে প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর আমাদের দেখে আপত্তি জানাল। তারপর যিনি হাসিমুখে এসে কুকুরটার বকলেস ধরে আমাদের সম্ভাষণ জানালেন, তিনি প্রখ্যাত শল্যবিদ ডঃ পুরকায়স্থ।

প্রথমে কর্নেল গেলেন বাগানে, যেখানে দশাবতার ফলক ফেরত পাওয়া গেছে। বাগান বলতে আমি যা ভেবেছিলুম, তেমন কিছু নয়। অল্প একটুখানি জায়গায় নানারকম ফুলের গাছ আর ক্যাকটাস। এটা বাড়ির পেছন দিক। তার ওপাশে অনেকটা খোলা পোড়ো জায়গা। কাশকুশের বনে ভরা। কর্নেল বেড়ার ওধারে গিয়ে সেই ঘাসের জঙ্গলে কী সব খুঁজে-টুজে এসে বললেন—হুম! চলুন পরমেশবাবু, আপনার দশাবতার দর্শন করা যাক!

পরমেশ ম্লান হেসে বললেন—নবমাবতার বলুন কর্নেল!

কর্নেল হাসলেন । ঠিক বলেছেন। নবমাবতার।

বসার ঘরে আমাদের রেখে পরমেশ ভেতরে গেলেন এবং একটু পরে পেতলের সুদৃশ্য রেকাবে একটা কষ্টিপাথরের ফলক নিয়ে এলেন। ফলকটা মোটে ইঞ্চি নয় লম্বা এবং ইঞ্চি ছয়েক চওড়া। দশটা ভাগে ভাগ করা আছে। প্রত্যেক ভাগে একটা করে অবতারের মূর্তি খোদাই করা। ঠিক মধ্যিখানে একটা এবড়ো-খেবড়ো খোঁদল। বুঝলুম ওখানেই নৃসিংহ মূর্তিটা ছিল।

কর্নেল কোটের পকেট থেকে আতস কাচ বের করে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন ফলকটা। পরমেশ বললেন—একটা ব্যাপার লক্ষ্য করুন। ফলকটার চারটে ভাগ। প্রথম সারি ও দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে তিনটে করে ছ'টা মূর্তি। পদ্মফুল দেখতে পাচ্ছেন। চোর শুধু ওই মূর্তিটাই খুবলে তুলে নিয়েছে। চতুর্থ সারিতে তিনটে মূর্তিও অক্ষত আছে।

কর্নেল মুখ তুলে বলেলেন—এই ফলকটা ঠাকুরঘরে ছিল বলছেন। ঘরটা একবার দেখতে পারি?

পরমেশ বললেন—নিশ্চয়! তবে একটু অপেক্ষা করুন। আমার স্ত্রী এখন ও-ঘরে পুজো দিচ্ছেন। ঠাকুরমশাই রয়েছেন। পুজোটা শেষ হোক।

ভেতর থেকে আবছা ক্ষীণ ঘণ্টার শব্দ শুনছিলুম। কর্নেল বললেন—হুম! ফলকটার গায়ে সিঁদুরের ছোপ দেখছি পরমেশবাবু! তার মানে দশাবতারেরও পুজো হত। এই তো?

পরমেশ বললেন—হ্যাঁ। তবে আমাদের গৃহদেবতা কিন্তু রাধাকৃষ্ণ। আমাদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব।

কর্নেল হঠাৎ হেসে উঠলেন। সর্বনাশ! বৈষ্ণব হয়ে আপনি ছুরি চালিয়ে প্রাণীদের কাটাকুটি করেন এবং রক্তপাত ঘটান?

পরমেশও হো হো করে হেসে উঠলেন।—আমি মশাই ধর্মটর্মের ধার ধারিনে। পাষণ্ড নাস্তিক বলতে পারেন। আমার বাবাও তাই ছিলেন। আপনি শুনে থাকবেন বাবার নাম—কারণ আপনি মিলিটারিতে ছিলেন। আমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন। বাবার নাম ডাঃ অজিতেশ পুরকায়স্থ। মেজর পুরকায়স্থ নামে সবাই তাঁকে চিনতেন।

কর্নেল নড়ে বসলেন।—মাই গুডনেস! মেজর পুরকায়স্থকে আমি ভীষণ চিনতুম। সিঙ্গাপুর পুনর্দখলের সময় আমার উরুতে সামান্য জখম হয়েছিল। টুকরো একটা শার্পনেল লেগেছিল। আপনার বাবা অপারেশন করেছিলেন। আমার চেয়ে বয়সে বেশ বড় ছিলেন। তাহলেও আমাদের বন্ধুত্বে আটকায়নি।

পরমেশ খুশি হয়ে বললেন—এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, যেন বাবার আত্মাই আমাকে আপনার পরামর্শ নিতে প্রেরণা দিয়েছে। নইলে পুলিশের কাছে না গিয়ে আপনাকে জানাতে গেলুম কেন?

কর্নেল বললেন—যাক গে। এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকুন।

—বেশ তো, বলুন।

—দশাবতার ফলকটা দেখে আমার মনে হচ্ছে, এ ধরনের মূর্তি এদেশে কখনও দেখিনি। এই ফলক আপনাদের পরিবারে কীভাবে এল?

—বাবা ওটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে মালয়েশিয়া এলাকায় উনি ছিলেন। সেই সময় ওঁকে একবার টোরাদ্বীপে যেতে হয়েছিল। যেখানে...

কর্নেল ও আমি মুখ তাকাতাকি করলুম। আমি চমকে উঠেছি। কিন্তু কর্নেল শান্তভাবে বললেন—হুম! বলুন!

—টোরাদ্বীপে আমেরিকান সৈন্যদের একটা গোপন ঘাঁটি ছিল। জাপানিরা পালানোর সময় ঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করে যায়। কয়েকজন সৈন্য সাংঘাতিক আহত হয়। তাই বাবাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখানে। যাই হোক, উনি ওই দ্বীপেই ফলকটা কুড়িয়ে পান। উনি রিটায়ার করার পর ফলকটা ঠাকুরঘরে রাখা হয়। তারপর তো বাবা মারা গেলেন। আমি সল্টলেকে বাড়ি করে চলে এলুম। ফলকটা যথারীতি এ বাড়িতেও ঠাকুরঘরে রাখা হয়েছিল।

—বেশ। ফলকটা চুরি গেল কবে এবং কীভাবে?

—গত পুজোয় আমরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলুম। দারোয়ান রেখে গিয়েছিলুম। বাড়িতে আসবাবপত্র ছাড়া খুব দামি জিনিস আমি রাখিনে। সব ব্যাংকের লকারে থাকে। অবশ্যি চোরের কাছে সবই দামি। তো কাশ্মীর থেকে ফিরে দেখি কিছু খোওয়া যায়নি। দারোয়ান খুব বিশ্বাসী। ঠাকুরঘরের চাবি অবশ্যি তার কাছে রেখে গিয়েছিলুম। ঠাকুরমশাই এসে পুজো করে যেতেন রোজ। আমার স্ত্রীর আবার ধর্মকর্মের প্রচণ্ড বাতিক। যাই হোক, বাড়ি ফেরার কয়েকদিন পরে হঠাৎ ঠাকুরমশাই জানালেন, দশাবতার নেই। আসলে আমরা কেউ লক্ষ্য রাখিনি ব্যাপারটা। কাজেই ঠিক কবে বা কখন চুরি গেল, বলা খুব কঠিন।

—ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি কি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। পুজোটা হয়ে যাক।

এতক্ষণে চা সন্দেশ ইত্যাদি এল। অতিথি সৎকারে ব্যস্ত হলেন পরমেশবাবু। চা খেতে খেতে কর্নেল হঠাৎ বললেন—আচ্ছা পরমেশবাবু, যদি আপনাকে অনুরোধ করি—আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে চলুন, আপনি যাবেন?

পরমেশ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—কেন বলুন তো?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—আপনার যাওয়া দরকার। আপনিই টোরাদ্বীপের নৃসিংহ রহস্য ভেদ করতে পারবেন। কারণ আপনি একজন কুশলী শল্যবিদ। তবে তার আগে আপনাকে আগাগোড়া সব কথা জানানো দরকার। আমার বিশ্বাস, আপনার নৃসিংহ মূর্তি চুরির পেছনে একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে।

এরপর কর্নেল চাপা গলায় সম্প্রতি টোরাদ্বীপে সরকারি সমীক্ষকদলের ভীষণ পরিণতির ঘটনা বলতে শুরু করলেন। শুনতে শুনতে ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থ যে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, তা ওঁর মুখের ভাবে টের পাচ্ছিলুম। সবটা শোনার পর উনি বললেন—এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! টোরাদ্বীপে সত্যিসত্যি নৃসিংহ রয়েছে—এবং আমার বাবা সেখানেই এক ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, দুটোতেই কেমন যেন যোগসূত্র আছে মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ঠাকুরঘরে গেলুম। দরজার পাশে একটা টিকিওয়ালা লোক বসে আছে দেখলুম। গায়ে একটুকরো উত্তরীয় এবং পরনে কোরা ধুতি। কাঁধে একটা থলে। বুঝলুম, ইনিই ঠাকুরমশাই।

কর্নেল খুব ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে উঁকি মারার পর ঠাকুমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। দু'জনে যে কথাবার্তা হল, তা এই :

—নমস্কার ঠাকুরমশাই।

—নমস্কার স্যার, নমস্কার।

—এতদূরে পুজোআচ্চা করতে আসেন কি পায়ে হেঁটে। নাকি সাইকেলে?

—না স্যার, সাইকেল। সল্টলেকে তো মাঠ ময়দান জায়গা। পায়ে হেঁটে কি অতগুলো বাড়ির পুজো সারা যায়? এক যজমানের বাড়ি টালা, তো আরেক যজমানের বাড়ি বাঙ্গুরে। বুঝলেন না ঝামেলাটা?

—বুঝলুম বইকি। তা এতসব পুজো না করে বড়সড় দুতিনটে যজমান ধরলেই তো হয়।

—মাথা খারাপ স্যার! এ কি সে সত্যযুগ আছে? ঘোর কলি। লোকের ধর্মবোধই নেই। ধর্মকর্মে এক পয়সা খরচ করতে হলেই মুখ ভার।

—আচ্ছা ঠাকুরমশাই, যদি—ধরুন বড়সড়ো যজমান পেয়ে যান, আপনাকে ভাল মাইনে-কড়ি দেবে, জামাকাপড় মায়-খোরাকিও দেবে, আপনি যাবেন?

—এক্ষুনি যাব স্যার, এক্ষুনি। কাঁহাতক আর বাড়ি-বাড়ি দু'চার পয়সা কুড়িয়ে ঘোরা যায়?

—ভাল! তাহলে ঠিকানা দিন। কথা বলে আপনাকে জানাব।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলুম। এরপর দেখলুম, কর্নেল নোটবই বের করে নাম-ঠিকানা টুকে নিলেন। ঠাকুরমশাই গদগদ হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরমেশবাবুর স্ত্রী কড়া চোখে ব্যাজার মুখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আরও কিছুক্ষণ ডঃ পুরকায়স্থের বাড়িতে কাটিয়ে আমরা যখন রাস্তায় পৌঁছলুম, তখন দেখি ঠাকুরমশাই সাইকেলে চেপে সোজা কাশকুশের জঙ্গল ভেঙে চলেছেন। মনে হল, সাইকেলে চাপার ব্যাপারে ভারি দক্ষ লোক। পথ-বিপথ মানেন না। পাখির মতো ডানা মেলে দিয়েছেন যেন।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম—হাই ওল্ড ঘুঘু! ব্যাপারটা কী?

অন্যমনস্ক জবাব এল—উঁ?

—আপনি তো সয়েব মানুষ। হঠাৎ ঠাকুরমশাইয়ের বড়লোক যজমান খুঁজে দিতে এত উৎসাহ কেন?

—ডার্লিং। যজমানটি কে হবেন জানো? স্বয়ং লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের ডেপুটি কমিশনার আনোয়ার খান।

ঘ্যাঁচ করে গাড়ির ব্রেক কষে দিলুম। নইলে পাথরের ওপর দিয়ে চাকা গড়িয়ে গর্তে পড়ত। এবং আকাশ থেকে পড়ে বললুম—মুসলমান যজমানের বাড়ি পুজোআচ্চার কাজ? কী বলছেন আবোল-তাবোল। এর অর্থ কী?

কর্নেল হাসলেন।—লোকটা দাগি। দেখেই চিনেছি। আনোয়ার খানের সামনে ওকে পৌঁছে দিতে পারলেই জানতে পারবে, নৃসিংহ রহস্যের পেছনে কে বা কার রয়েছে। যাই হোক, স্টার্ট দাও বৎস। আমাদের এখন অনেক জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে।...

ডঃ গড়গড়ির চমকপ্রদ আবিষ্কার

জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডঃ গুটেনবার্গের সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল। খুব আমুদে মানুষ। ইংরেজির চেয়ে বরং হিন্দিই রপ্ত করছেন বেশি। কথায় কথায় হেসে বলেন—ম্যায় হিন্দি সমঝ্‌তে হেঁ। কর্নেলের বয়সী এই জার্মান বিজ্ঞানী চেহারায় অবিকল কর্নেলের মতো। দূর থেকে দেখলে বোঝা কঠিন, কর্নেল, না ডঃ গুটেনবার্গ।

তাঁর কাছেই জানা গেছে টোরা আইল্যান্ড একটা বেওয়ারিশ দ্বীপ। পুবে ইন্দোনেশিয়া, উত্তরে আন্দামান নিকোবর এবং পশ্চিম ও দক্ষিণে ফাঁকা অনন্ত অথই ভারত মহাসাগর। টোরাদ্বীপের মালিকানা নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের আদালতে তিন দেশের মধ্যে বহুকাল ধরে মামলা চলছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া তিন দেশেরই দাবি, টোরা আমাদের। এখনও ফয়সালা হয়নি। ক'বছর আগে পর্যন্ত ওখানে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রহরীবাহিনী টহল দিত। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য তাদের সরিয়ে নিতে হয়। সেই অসুবিধেগুলো কী, খুলে বলা হয়নি। কিন্তু এখন আমরা সবাই আঁচ করেছি। তবে ভারত সরকার যে ওখানে সমীক্ষক দল পাঠিয়েছিল, সেটা খুব গোপন ব্যাপার। কারণ যে দ্বীপ নিয়ে মামলা চলছে, সেখানে সমীক্ষক দল পাঠানো চলে না। তাই নৃসিংহের হাতে বিজ্ঞানীদের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে এত লুকোচুরি।

এই যে জার্মান বিজ্ঞানীরও সাহায্য নিয়েছে ভারত, তাও গোপনে। আসলে ডঃ গুটেনবার্গ ভারত-জার্মান বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা- চুক্তি অনুসারে ভারতে আছেন। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর টোরা অভিযানে যাওয়ার ব্যাপারটা বেসরকারি ভাবে। অর্থাৎ নিজের দেশের সরকারকেও উনি এটা জানাননি। সবসময় সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনে চললে কোনওকালে কি বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানকে এতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন? এক সময় রাষ্ট্র তো বিজ্ঞানীকে শত্রু ভাবত।

কাজেই পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপন। অথচ সরকারি গোপনীয়তার পাঁচিল ডিঙিয়ে ব্যাপারটা কর্নেলের হাতে এসে পড়ল এবং আমিও তার সঙ্গে জড়িয়ে গেলুম। সেই সঙ্গে এও বুঝতে পারলুম যে কর্নেল যথাসময়ে দিল্লিতে সাংবাদিকদের ডেকে কর্তৃপক্ষ যে বিবৃতি দেবে বলেছেন—সে নিতান্ত ধোঁকা। সরকার অত বোকামি করবেই না। তাহলে যে ইন্দোনেশিয়া আর মালয়েশিয়া হইচই জুড়ে দেবে। কেন বিচারাধীন এলাকায় ভারত নাক গলাতে গেল?

আমাদের একটা বড় সুবিধে, পাসপোর্ট-ভিসা কিছু লাগছে না। আমরাও গোপনে যাচ্ছি। প্রথমে আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারে বিমান থেকে নামলুম। পাঁচজন স্রেফ পর্যটক বেড়াতে এসেছি অন্যদের মতো।

ওদিকে কলকাতা থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছে, গভীর সমুদ্রে মাছধরা জাহাজ 'শার্ক' অর্থাৎ হাঙর আমাদের নিয়ে গিয়ে টোরাদ্বীপের কাছাকাছি নামিয়ে দেবে।

না, জলে নামিয়ে দেবে না। কর্নেলের এ বাহাদুরির তুলনা নেই। নৌ-বাহিনীতে তাঁর পরিচিত এক কর্তাব্যক্তির সাহায্য জোগাড় করেছেন। টোরাদ্বীপের একমাইল দূরে রাত তিনটে নাগাদ চুপি চুপি একটা মিলিটারি মোটরবোট এসে অপেক্ষা করবে। আমরা 'শার্ক' থেকে তাতেই নামব এবং দ্বীপে পৌঁছব।

পোর্টব্লেয়ারের একটা হোটেলে আড্ডা দিলুম আমরা। সত্যি বলতে কী, এবার আমার মনে রীতিমতো আতঙ্ক ছমছম করে উঠেছে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যে এক অজানা ছোট্ট দ্বীপ। তার বিভীষিকা মনে এখনই ছায়া ফেলেছে। আমি খুব মনমরা হয়ে গেলুম। পৈতৃক প্রাণটি এবার বেঘোরে না হারাতে হয়।

কর্নেল তো সারাক্ষণ সমুদ্রের ধারে ধারে নানা জাতের কাঁকড়া শামুক সংগ্রহে ব্যস্ত। ডঃ গুটেনবার্গ গাছপালার জঙ্গল ঢুঁড়ে কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ডঃ হরিহর গড়গড়ির শরীর ভাল নয়। সামুদ্রিক হাওয়া বাতাস নাকি সয় না। ঘরে চুপচাপ বসে প্রকাণ্ড বই পড়ছেন। ভাগ্যিস পরমেশবাবু এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ঘুরছি। দু'জনে মতলব আঁটছি, শার্ক এসে পৌঁছনোর আগেই একবার জারোয়াদের এলাকায় ঘুরে আসতে পারলে মন্দ হত না। জারোয়ারা আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এক জংলি উপজাতি। ভারি হিংস্র আর বুনো মানুষ। গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। সভ্য মানুষ দেখলেই নাকি বিষাক্ত তির ছোড়ে। তবে আমরা বেশি কাছে যাব না। ওই এলাকাটা একটু দূর থেকে দেখেই চলে আসব।

পরমেশ এখানকার এক বাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে নৌকার ব্যবস্থা করে ফেললেন। পরদিন সকালে আমরা দু-জন যাব। কর্নেল বা আর কাউকে জানাব না, পাছে বাগড়া দেন ওঁরা।

কিন্তু আমাদের ভাগ্যে জারোয়া যাওয়া আর হলো না। সেই রাতেই দেড়টার সময় ঘুম থেকে তুলিয়ে কর্নেল বললেন, শার্ক এসে গেছে। এক্ষুনি বেরুতে হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পিঠে বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে পায়ে হেঁটে আমরা চারজনে প্রথমে ডক এলাকায় গেলুম। শার্কের একজন লোক আমাদের নিয়ে যাচ্ছিল। ডক এলাকার ধারে-ধারে মাইলটাক গিয়ে মেছো জেটির কাছে পৌঁছলুম। ওদিকটায় আলো খুব কম। মাছের আঁশটে গন্ধে গা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল। জায়গায়-জায়গায় কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল। তারপর একবারে অন্ধকার চারিদিক। খালি গর্জন শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের। পাথরে খাড়ির মধ্যে শার্ক অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু মাস্তুলের মাথায় একটু আলো জুগ জুগ করছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক এবার টর্চ জ্বেলে আমাদের একটা ছোট্ট বোটে ওঠাল। খাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড ঢেউ। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, আমরা জলে তলিয়ে যাব। ঢেউয়ের ঝাপটায় প্রায় ভিজে গেলুম সবাই। নোনা জলের কুচ্ছিত গন্ধ আর মাঝে মাঝে মুখে ঝাপটা মারা জল এসে ঢুকছে। ব্যাপারটা বড্ড বিরক্তিকর।

তবে মিনিট দশেক এই লাঞ্ছনা পোহাতে হল। আমরা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে শার্কে উঠে পড়লুম।

শার্কেই গোপনে কলকাতা থেকে আমাদের রাইফেলের বাক্সটা এসেছে। মোটমাট চারটে রাইফেল আর অজস্র গুলি আনা হয়েছে। ডিনামাইট, গ্রেনেডও আনা হয়েছে। তাছাড়া চারটে রিভলভার আমাদের কাছেই আছে, শুধু গড়গড়ি সায়েবের কোনও অস্ত্র নেই। উনি বেজায় অহিংস মানুষ। নিরামিষ খান। অস্ত্রশস্ত্র দেখে আঁতকে উঠে বললেন—ওরে বাবা! এ যে যুদ্ধের আয়োজন!

পরমেশবাবু মুচকি হেসে বললেন— বরং নৃসিংহবধ পালা বলতে পারেন।

ডঃ গড়গড়ি মনমরা হয়ে গেলেন। বললেন—রক্ষে করুন মশাই। গোলাগুলির মধ্যে আমি নেই।

আমি বললুম—কিন্তু নৃসিংহ ঠেকাবেন কী দিয়ে?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—এই বিদ্‌ঘুটে জন্তুটাকে ঘাঁটানোর কী দরকার? জানেন? আমি ওবারেও পইপই করে বলেছিলুম, ওটাকে এড়িয়ে যে যা কাজ করতে এসেছেন করুন। আমি পুরাতাত্ত্বিক জিনিস কিছু পাই নাকি খুঁজি। ডঃ গুটেনবার্গ উদ্ভিদের খবরাখবর জোগাড় করুন। প্রত্যেককে বলেছি এমন কথা। কেউ কান দিলেন না। জন্তুটার গুহার কাছে গিয়ে বেমক্কা গণ্ডগোল বাধিয়ে ছাড়লেন। প্রাণ তো গেলই, কাজ ভণ্ডুল হল—সেটাই বড় কথা কি না বলুন?

কর্নেল বললেন—কিন্তু ডঃ গড়গড়ি, নৃসিংহকে না ঘাঁটালে তার রহস্য কীভাবে ভেদ করতেন বলুন? ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটাই খুঁজে বের করুন। ওকে না ঘাঁটিয়ে...

বাধা দিয়ে ডঃ গুটেনবার্গ ইংরেজিতে বললেন—ভাববেন না ডঃ গড়গড়ি। প্রাণীটাকে এবার আমরা বন্দি করে ফেলব কৌশলে। সে আক্রমণের কোনও সুযোগই পাবে না।

—তা পারলে ভালই হয় কিন্তু আমার বিশ্বাস, ও কাজ মানুষের সাধ্য নয়। বলে ডঃ গড়গড়ি হঠাৎ মাতালের মতো টলতে টলতে আর্তনাদ করে উঠলেন—এ কী! এ কী! সমুদ্রে ভূমিকম্প হচ্ছে যে।

আমরা হেসে উঠলুম। কর্নেল বললেন—না ডঃ গড়গড়ি! জাহাজ চলতে শুরু করেছে।

আমরা খোলের মধ্যে একটা সুন্দর আরামদায়ক ঘরে আছি। শার্কের পাঞ্জাবি মালিক জগদীপ সিং এতক্ষণে আলাপ করতে এলেন। তারপর কফি এল। কফি খেতে খেতে হঠাৎ ডঃ গড়গড়ি বলে উঠলেন—আপনাদের একটা কথা এবার বলা কর্তব্য, যা এ যাবৎ বলিনি। টোরাদ্বীপে গিয়ে আমি প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছি। তাই আমার উদ্দেশ্য নৃসিংহ রহস্য ভেদ নয়, সেই সভ্যতার আরও নিদর্শন সংগ্রহ। পৃথিবীকে আমি চমকে দিতে চাই—সুমের মিশর বা মহেনজোদারোর প্রাচীন সভ্যতার চেয়ে আরও পুরনো এক সভ্যতা আমি আবিষ্কার করেছি, যা থেকে প্রমাণিত হবে যে স্থলচর মানুষরা নয়, জলচর মানুষই প্রথম সভ্যতার জনক। রথ নয়, জলযানই প্রথম সভ্যতা বহনকারী।...

মনে মনে বললুম—তাই করুন। সেজন্যেই আপনার মতো রোগা-পটকা লোকের এত উৎসাহ।

ঘটনার ঘোরপ্যাঁচে

আমাদের খোলের মধ্যে প্রায় বন্দির মতো রেখে শার্ক পরদিন মাছ ধরে বেড়াল এখানে ওখানে। তারপর যেন মাছ ধরার উদ্দেশ্যেই চলেছে, এমন ভাব দেখিয়ে জাহাজটা সন্ধ্যানাগাদ টোরাদ্বীপ থেকে তিন মাইলের মধ্যে পৌঁছুল। সেখানে দ্বীপের মতো সমুদ্র থেকে কয়েকটা পাহাড় যেন আচমকা মাথা তুলেই রয়ে গেছে, আর ডোবেনি। ওই এলাকায় কোনও জাহাজ যায় না। খুব বিপজ্জনক এলাকা। প্রচুর ডুবোপাহাড় রয়েছে। একটা পুরনো আমলের পোড়ো লাইটহাউসও দেখা যাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় একটা মাথা তোলা পাহাড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে শার্ক নোঙর ফেলল। এখানে প্রচুর মাছ আছে নাকি। তবে হাঙরও বড় কম নেই।

সারারাত এখানে কাটল। ভোরবেলা ঘন কুয়াশায় সমুদ্র ও আকাশ একাকার। তার মধ্যে আমাদের ছোট্ট বোট রওনা দিল টোরাদ্বীপের দিকে। শার্কের নাবিকরা খুব অভিজ্ঞ এবং দক্ষ মানুষ। কেরলের লোক। কুয়াশার মধ্যে ডুবোপাহাড় বাঁচিয়ে কীভাবে যে আমাদের টোরাদ্বীপে পৌঁছে দিল, আশ্চর্য ব্যাপার। তবে সমুদ্র এখন শান্ত। তাই বিশেষ নাকানি চোবানি খেতে হল না।

ভারত মহাসাগরের এই এলাকাটা নিরক্ষরেখার কাছাকাছি। তাই শীত ক্রমশ কমে গেছে। আরও দক্ষিণে নিরক্ষরেখা ছাড়িয়ে গেলে আবহাওয়া একেবারে উল্টো। উত্তর গোলার্ধে যখন শীত, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। কাজেই টোরাদ্বীপে যেন চিরবসন্ত বিরাজ করছে।

টোরাদ্বীপের ত্রিভুজের মতো অর্থাৎ পিরামিড-গড়ন দেখে অবাক হলুম। দু'দিকে ঢালু ও খাড়া পাথুরে দেওয়াল, একদিকে—পশ্চিমে খানিকটা বেলাভূমি আছে। সেখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বোট চলে গেল। কথা থাকল, আমরা উঁচু জায়গা থেকে সাংকেতিক আলো দেখালে শার্ক থেকে আবার বোটটা এখানে চলে আসবে। শার্ক আমাদের জন্যে বাহাত্তর ঘন্টা অপেক্ষা করবে।

কুয়াশা মুছে গেলে দ্বীপের জঙ্গল এবং থমথমে চেহারা দেখে এতক্ষণে আমার গা ছমছম করে উঠল। বালির বিচে দাঁড়িয়ে কর্নেলরা চাপাগলায় কিছু আলোচনা করছিলেন। আমি ও পরমেশবাবু বিচের একটু তফাতে ঘন নারকেলগাছের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিলুম। হঠাৎ যদি নৃসিংহটা বেরিয়ে এসে হামলা করে, রিভলভার দিয়ে ঠেকানো যাবে কি? রাইফেলগুলো তো এখনও বাক্সতে ভরা।

বোধকরি, সেকথা ভেবেই ডঃ গড়গড়ি গুটেনবার্গ সায়েবের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে কর্নেল বললেন—চলুন ডঃ গুটেনবার্গ। তাহলে সেখানেই যাওয়া যাক।

রাইফেলের বাক্সটা খোলা হল। গুলি ভরে যে-যার রাইফেল হাতে নিয়ে আশ্বস্ত হলুম। কর্নেল ডিনামাইট-গ্রেনেডের বাক্সটা একহাতে ঝোলালেন। তারপর ডঃ গড়গড়িকে বললেন—ডঃ গড়গড়ি! কিছু যদি মনে না করেন, রাইফেলের খালি বাক্সটা আপনাকে নিতেই অনুরোধ জানাব।

রোগাপটকা মানুষটি যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেটা কাঁধে নিলেন। আমরা কেউ কেউ লুকিয়ে হাসলেও বুঝলুম, বেচারার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কর্নেল এখন দলের নেতা। তাঁর কথা মেনে চলতেই হবে। আমি দেখেছি, এ সব অভিযানের ক্ষেত্রে কর্নেল একবারে রাশভারি মিলিটারি লোক হয়ে ওঠেন। সেই আমুদে চেহারাটি আর থাকে না।

নারকেল বনটাকে দুর্ভেদ্য মনে হল। অজস্র নারকেল পড়ে আছে এবং দু' এক মিনিট অন্তর দুমদাম করে নারকেল পড়ছে। মাথা বাঁচিয়ে আমরা সাবধানে চলেছি। তারপর অন্যরকম গাছপালার ঘন জঙ্গল শুরু হল। কিন্তু মোটেও সমতল জায়গা নয়। ক্রমশ চড়াই হয়ে উঠে গেছে ওপরের দিকে। মধ্যে মধ্যে বিরাট ন্যাড়া পাথর রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল।

এখন পথপ্রদর্শক ডঃ গুটেনবার্গ। সেবারকার জায়গায় তিনি ক্যাম্প করতে চান না। নতুন জায়গায় নিয়ে গেলেন। ওপরে একটা পাহাড়ি প্রস্রবণ থেকে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে এবং একটা খাদে জমা সেই জল আরও নিচে গড়িয়ে আবার একটা খাদে পড়ছে। সেখানে সমতল পাথরের ওপর আমরা জিনিসপত্র নামিয়ে হাঁফ ছাড়লুম। কাছে মিঠে জল থাকায় জলের অভাবে অন্তত তেষ্টায় মরতে হবে না। অবশ্য নারকেলগাছ রয়েছে নিচের দিকে। ডাবের জলে তেষ্টা মেটানো যায় কিন্তু গাছগুলোর গায়ে ঘন লতাপাতার বেড়া। তাছাড়া অনেক লতা নাকি বিষাক্ত এবং তলায় পড়ে থাকা নারকেল কুড়োতে গিয়ে সেবারে নাকি ডঃ গড়গড়ি সাপের পাল্লায় পড়েছিলেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁবু পাতা হল তিনটে। ডঃ গড়গড়ি একা একটা তাঁবুতেই থাকতে চান। সঙ্গীর নাকডাকার শব্দে নাকি ওঁর বড্ড বিরক্তি জাগে। তাছাড়া সারাক্ষণ বই পড়ার স্বভাব। কেতাব সঙ্গে আনতে ছাড়েননি।

সঙ্গে আনা টিনের খাবারে আমরা খিদে মেটালুম এবং প্রকাণ্ড ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে আনন্দে পান করলুম। ক্লান্তি চলে গেল। তারপর কর্নেল নির্দেশ দিলেন—এবার বেরিয়ে পড়া যাক।

সবাই তৈরি। ডঃ গড়গড়ি বললেন—কিন্তু ক্যাম্পে তো একজন থাকা দরকার। অন্তত টিনের খাবারগুলো পাহারা না দিলে দ্বীপের রাক্ষুসে ইঁদুরগুলো সব শেষ করে ফেলবে। তাই না ডঃ গুটেনবার্গ?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তাও বটে। সেবারে আমাদের পঞ্চাশটা টিনের কৌটো খালি করে ফেলেছিল ইঁদুরগুলো। একেকটা বেড়ালের মতো প্রকাণ্ড। দাঁত নয় যেন ইস্পাতকাটা করাত!

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তাহলে জয়ন্ত বরং পাহারা দাও।

আমি তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললুম—কক্ষনও না। এমন কথা তো ছিল না কর্নেল!

ডঃ গড়গড়ি বললেন—আপত্তি করবেন না জয়ন্তবাবু! বরং আপনি আর আমি ক্যাম্পে থাকি। নৃসিংহ বিজয়ে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বরং আমরা ক্যাম্পে পাহারাও দেব, আবার ধারেকাছে প্রত্নদ্রব্যও খোঁজাখুজি করব। সারা দ্বীপে ভাঙা মৃৎপাত্রের টুকরো ছড়ানো। বিশ্বাস না হয় এই দেখুন!

উনি সত্যিসত্যি পাথরের একটা খাঁজ থেকে একটা খোলামকুচি কুড়িয়ে দেখালেন। আমার দিকে জনান্তিকে চোখ টিপলেন। কর্নেল বললেন—দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশ, তাই হোক। আপনারা দু'জনেই থাকুন। আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আসুন পরমেশবাবু!

ওঁরা পাহাড়ের ওপর দিকে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হলে ডঃ গড়গড়ি একটু হেসে বললেন—খুব বেঁচে গেলেন মশাই! দেখবেন, এক্ষুনি ভিরমি খেতে খেতে পালিয়ে আসবে। ওসব ঝুটঝামেলায় যাওয়ার কী দরকার বলুন না? বরং আসুন, আমরা পটারি কুড়োই। ওই দেখুন কত সব টুকরো পড়ে আছে।

বলে উনি ছেলেমানুষের মতো লাফালাফি করে পাথরের চত্বরে ফাটলগুলো থেকে খোলামকুচি কুড়োতে শুরু করলেন। আমি চুপচাপ মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ঘুরে বললেন—কুড়োন! কুড়োন! দৈনিক সত্যসেবকে ছেপে দেবেন। এসব পটারি অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগেকার। হিড়িক পড়ে যাবে মশাই!

একটা ভাঙা খোলামকুচি কুড়িয়ে পরখ করে দেখলুম, সুন্দর নকশার চিহ্ন রয়েছে কিন্তু একটু চাপ দিতেই গুঁড়ো হয়ে গেল। ডঃ গড়গড়ি যা বলেছেন, তাতে সম্ভবত কোনও ভুল নেই। এই মাটির পাত্রগুলো খুবই প্রাচীনকালের। আর এই দ্বীপে যে মানুষ বাস করত তাও জানা যাচ্ছে। বললুম—আচ্ছা ডঃ গড়গড়ি, তাহলে কি নৃসিংহজাতীয় প্রাণীর হাতেই এখানকার অধিবাসীরা কোনও একসময়ে সবংশে মারা পড়েছিল?

ডঃ গড়গড়ি বললেন—সেটা খুবই সম্ভব। তবে আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। সেই প্রমাণ সংগ্রহ করতেই আমি এত আগ্রহী। নইলে যে বীভৎস ঘটনা চোখের সামনে দেখেছি তারপর কস্মিনকালে এই ভূতুড়ে দ্বীপে কি আর পা বাড়াতে চাইতুম জয়ন্তবাবু? যাক গে, আসুন না। আমরা কাছাকাছি আরও কিছুটা খোঁজাখুঁজি করে দেখি—যদি দৈবাৎ কোনও শিলালিপি কিংবা কোনও মূর্তি বা পুতুল কুড়িয়ে পাই।

আমার আগ্রহ বেড়ে গেছে। তাই পাথরের চাতাল থেকে নেমে গেলুম ওঁর সঙ্গে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে চাপা গলায় ডঃ গড়গড়ি বলেন—চারদিকে নজর রাখবেন মশাই। রাইফেলে গুলি পোরা আছে তো?

বললুম—আছে। আপনার উদ্বেগের কারণ নেই ডঃ গড়গড়ি!

—হুঁ। রাইফেল সব সময় তাক করে রাখবেন। বলে উনি ঝোপের ধারে একটা পাথরের ওপর যেই পা রাখলেন, অমনি পা পিছলে গড়াতে গড়াতে নিচের দিকে চললেন। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বলের মতো গড়িয়ে নামছেন। দেখে আমি আর হাসি থামাতে পারলুম না।

কিন্তু সর্বনাশ; কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মধ্যেই গড়গড়ি পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন তলিয়ে গেলেন।

আমিও লাফ দিয়ে সেই পাথরে পড়লুম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলুম ডঃ গড়গড়ি! ডঃ গড়গড়ি!

মনে হল, অনেক নিচে থেকে যেন ক্ষীণ স্বরে সাড়া এল। কিংবা আমার কানের ভুল হতেও পারে। ভাবলুম, নিশ্চয় উনি এভাবে পড়ে গিয়ে ভাল রকমের জখম হয়েছেন। অজ্ঞান হয়েই গেছেন হয়তো। তাই যত দ্রুত পারা যায়, নামতে শুরু করলুম।

এবার বোঝা গেল, পাথরগুলো খুব পিছল এবং ওপাশে সেই ঝরনা থাকায় ফার্ন জাতীয় গাছগাছড়া আর শ্যাওলা গজিয়ে আছে। তার ফাঁকে ফাঁকে যত রাজ্যের গাছপালা ও ঝোপঝাড় মাথা তুলেছে। তাই নিচের দিকে কিছু দেখা যাচ্ছে না।

নামতে নামতে ফের চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়িকে দেখতে পেলুম না। যেখানে পৌঁছেছি, সেখানে মোটামুটি সমতল জায়গা এবং সেই নারকেল বনটা শুরু হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। আবছা তার গর্জন কানে আসছে। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে তার ফলে নারকেল পড়ছে। ক্রমাগত বোম্ পটকার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এখানে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয় আমার পক্ষে। কখন মাথার ওপর নারকেল পড়ে কুপোকাত হয়ে যাব ঠিক নেই।

আমি ফের ওপরে উঠে দু'পাশে চোখ বুলিয়ে ডঃ গড়গড়িকে খুঁজতে থাকলুম। কিন্তু আশ্চর্য, ভদ্রলোক যেন বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

আমার বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে। মনে হলো, দ্বীপের গাছপালা ঝোপজঙ্গল পাথরের আড়াল থেকে কে বা কারা যেন চুপি চুপি আমাকে দেখছে। কাঁপা-কাঁপা হাতে রাইফেলটা শক্ত করে বাগিয়ে আবার চেঁচিয়ে ডাকলুম—ডঃ গড়গড়ি!

আমার ডাক পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে গেল। কোনও সাড়া এল না। তখন ক্যাম্পের দিকে উঠতে শুরু করলুম।

উঠে এসে পাথরের চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে হাঁফ সামলাচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল এক বিদ্‌ঘুটে দৃশ্য।

প্রথমে ভাবলুম খরগোশের পাল। তারপর মনে হল, বেড়াল। কিন্তু বেড়ালের মুখ এমন লম্বাটে হবে কেন? হঠাৎ মনে পড়ে গেল, এই দ্বীপে প্রকাণ্ড ইঁদুরের কথা শুনেছি। এরা সেই রাক্ষুসে ইঁদুরই বটে।

ইঁদুরগুলো ঠিক মানুষের ভঙ্গিতে তাঁবুর ভেতর থেকে টিনের কৌটো পিঠে নিয়ে বেরিয়ে আসছে এবং একটা ফাটল দিয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। দুধের কৌটো, জেলির কৌটো, রান্না করা মাংসের কৌটো আর পাউরুটির পকেট—সব একত্রে লুঠ হয়ে যাচ্ছে।

দৌড়ে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়তেই বেয়াদপ ইঁদুরগুলো চারপাশ থেকে আমাকে ঘিরে ধরে হাঁটু অবধি লাফ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল আর কামড় দিল।

ভাগ্যিস পায়ে হান্টিং বুট ছিল। হাঁটু অবধি শক্ত চামড়ার বর্ম এবং প্যান্টের কাপড়টাও বেশ শক্ত। দাঁত বসল না। কিন্তু ওদের বেয়াদপিতে মাথা খারাপ হয়ে গেল। আমি লাথি ছুড়তে থাকলুম। লাফালাফি করে বেজায় চেঁচামেচিও শুরু করলুম। কিন্তু তাতে ওরা আরও খাপ্পা হয়ে আমার পা আঁকড়ে গায়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন পাজি হতচ্ছাড়া ইঁদুর তো দেখা যায় না ভূ-ভারতে। এরা আমাকে নাকাল করে ছাড়বে দেখছি। বড় জন্তু হলে রাইফেল ছোড়া যায়। অগত্যা পাথরে গড়াগড়ি দিয়ে ওদের কাবু করার জেষ্টা করলুম। রাইফেল পড়ে রইল। চোখ বুজে রইলুম। পাছে ওরা চোখের ভেতর নখ বসিয়ে দেয়।

তারপর কী ঘটল কে জানে, চোখ বুজে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টের পেলুম ইঁদুরগুলো চলে যাচ্ছে। আপনি চোখ খুলে তাকালুম। সামনে ফাটলের মুখে সম্ভবত ইদুরটি কাঁধে একটা প্যাকেট নিয়ে লাফ দেওয়ার তাক করছে—কিন্তু প্যাকেটটা ফাটলের তুলনায় বড় বলে আটকে যাচ্ছে।

ইচ্ছে হল, বলি—ওরে নির্বোধ! ওরে হতচ্ছাড়া গবেট! ওটা খাবার নয়, ওটা চুরুটের প্যাকেট। ওই চুরুটের মালিক কে জানিস? প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! অতএব, যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, ওটা রেখে যা। ওরে মূর্খ! তুই কোথায় ওটা লুকিয়ে রাখবি? লুকিয়েও পার পাবি? বুড়ো গোয়েন্দপ্রবর পাতাল হাতড়ে ঠিকই উদ্ধার করে তোকে হাতকড়া পরিয়ে ছাড়বেন! সাবধান! সাবধান!

ইঁদুরটা কি আমার মনের কথা টের পেল? চুরুটের বাক্সটা রেখে ফাটল গলিয়ে চলে গেল। আমি উপুড় হয়ে আছি। এবার উঠে বসার জন্য যেই ঘুরেছি কোমরে একটা ভারী জিনিস পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে দেখি, একটা বেঁটে খ্যাঁদানেকো মোটাসোটা লোক আমার কোমরে একটা ঠ্যাং চাপিয়ে আমার রাইফেলটা তুলে নিল।

তার চেহারা চিনাদের মতো। কিন্তু সে চিনা কি না বোঝা কঠিন। কারণ সারা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লোকেদের এমনি চেহারা ও গড়ন। তার হাতে একটা স্টেনগান, পরনে সবজে মিলিটারি পোশাক এবং চোখে সানগ্লাস।

আমি আপত্তি করে ইংরেজিতে বললুম—এটা কী হচ্ছে? অ্যাঁ? পা সরাও বলছি।

লোকটা দাঁত বের করে হেসে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল এবং পা তুলে নিয়ে আমাকে দাঁড়াতে ইশারা করল।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, সে একা নয়। আরও একজন অমনি চেহারা ও পোশাকপরা সশস্ত্র লোক ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং চোখে বাইনোকুলার রেখে সমুদ্রের দিকে কী দেখছে।....

নৃসিংহের গর্জন

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। এটা আমার বোকামিরই খেসারত। যদি সতর্কভাবে চারদিকে নজর রাখতুম এবং ইঁদুরের দলে ঢুকে না পড়তুম, এই কাণ্ডটি হত না। এখন একমাত্র ভরসা কর্নেলরা যদি এখনই ফিরে আসেন।

তবে জানি না, কীভাবে এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবেন। আমি প্রাণের আশা ছেড়ে দিলুম।

বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে দ্বিতীয় লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে বলল—গুড মর্নিং! আপনার নাম কী?

তার কথায় ভদ্রতার সুর আছে। জবাব দিলুম—আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি। আমি কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক। আপনারা কে? কেনই বা এভাবে হামলা করছেন?

লোকটি বলল—সেকথা পরে। যা জিজ্ঞেস করছি, অনুগ্রহ করে তার জবাব দিন। আপনাদের সঙ্গে একজন মেডিকেল সার্জন এসেছেন, তিনি কোথায়?

বুঝলুম, ডঃ পরমেশ পুরকায়স্থের কথা বলছে। বললুম—তিনি একটু আগে বেরিয়েছেন।

ওরা দু'জনে পরস্পর দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলাবলি করল। তারপর বাইনোকুলারধারী এগিয়ে এসে আমার হাতটা নিয়ে হ্যান্ডশেক করে বলল—যদি কোনও ত্রুটি ঘটে থাকে, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

বলে সে তার সঙ্গীকে ইশারা করল। সঙ্গীটি কিন্তু আমার রাইফেলটা ফেরত না দিয়ে চলতে শুরু করল। তখন বলে উঠলুম—এ কি! আমার রাইফেল নিয়ে যাচ্ছেন কেন?

দু'জনেই ঘুরে একটু হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। ক্যাম্পের ওপাশে গিয়ে চড়াইয়ে উঠল। তখন আমি পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে চেঁচিয়ে বললুম—রাইফেল না দিলে গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি।

বাইনোকুলারধারী তার হাতের স্টেনগান বাগিয়ে রূঢ়কণ্ঠে বলল—মরতে সাধ থাকলে তাই কর বোকারাম!

হুঁ, ঠিকই বলেছে, ওরা দু'জন, আমি একা। দু'জনেরই হাতে স্টেনগান। একজনকে বড়জোর গুলি ছুড়ে কাবু করতে পারি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন স্টেনগানের গুলিতে আমার শরীর ঝাঁঝরা করে ফেলবে। অতএব চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম।

লোকটা স্টেনগান আমার দিকে তাক করে বলল—রিভলভার পকেটে ঢোকাও। ভদ্রলোকদের প্রতি ভদ্রব্যবহার করাই আমার রীতি।

ভাল ছেলের মতো রিভলভার ঢুকিয়ে দেখি, ওরা পাহাড়ের গায়ে একটা খোঁদলে আমার রাইফেলটা রাখল। তারপর বাইনোকুলারধারী হাসতে হাসতে বলল—তোমার মতো নির্বোধের হাতে রাইফেল থাকলে নিজেরই বিপদ ঘটবে। তাই ওটা নিরাপদ দূরত্বে রেখে গেলাম। আমরা চলে যাওয়ার পর তুমি এসে নিয়ে যেও। কেমন?

রাগ হলেও বুঝলুম, কথাটা ঠিকই বলেছে, রাইফেলটা তখনই ফেরত দিলে হয়তো আমি ঝোঁকের বশে কী করে বসতুম, বলা যায় না।

ওরা পাহাড়ের ওপাশে অদৃশ্য হলে রাইফেলটা নিয়ে এলুম। তারপর ভাবতে বসলুম এতক্ষণ কি একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলুম? কে ওরা? কেন পরমেশবাবু এসেছেন কি না জানতে এসেছিল? অজ্ঞাত আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল।

আর ডঃ গড়গড়িই বা কোথায় গেলেন?

এতক্ষণ পরে মনে পড়ল, কিছু ঘটলে তিনবার বাঁশি বাজিয়ে সংকেত জানানোর কথা আছে। তাই পকেট থেকে হুইসলটা বের করে ফুঁ দিলুম। পরপর দিনবার।

তারপর দেখি, পাহাড়ের ওপর দিকে একটা চাতালের ওপর কর্নেল উঁকি দিচ্ছেন এদিকে। চোখে বাইনোকুলার। আমি ওঁকে দেখামাত্র বাজখাঁই চেঁচিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল! শিগগির আসুন আপনারা! ভীষণ বিপদ!

আমার কথাগুলো বিকট প্রতিধ্বনি তুলল।

কিন্তু মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। ওঁদের আর পাত্তা নেই। কর্নেল সেই যে উঁকি মেরে অদৃশ্য হলেন তো হলেন। রাগে দুঃখে ছটফট করতে থাকলুম। অস্থিরভাবে পায়চারি করে সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখলুম। এখান থেকে নারকেল বনের মাথার ওপর দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। অনন্ত বিশাল জলের ফেনায় ওপর সূর্যের আলো ঝকমক করে উঠছে। 'শার্ক' কোথায় অপেক্ষা করছে, দেখতে পাচ্ছি না। দিগন্তে দু' একটা কালো ঢিবির মতো পাহাড় মাঝে মাঝে ঢেউয়ের ফাঁকে ডুবছে আর ভেসে উঠেছে। আর ডাইনে দূরে এই দ্বীপের খাড়ির ওপর অজস্র সামুদ্রিক পাখি ওড়াউড়ি করছে, তাদের তীক্ষ্ণ চিৎকার হাওয়ায় ভেসে আসছে।

সবচেয়ে খারাপ লাগছে, আমাদের খাদ্য ভাণ্ডারটি লুঠপাট হওয়ার কথা ভেবে। কপালে কর্নেলের বকুনি তো আছেই। আমি দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারিনি। অতএব ওপর রাগ করা আমার সাজে না।

প্রায় একটি অস্থির ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর কর্নেলরা ফিরলেন।

আমি প্রায় এক নিঃশ্বাসে পুরো ঘটনা জানিয়ে দিলুম। ওঁরা তিনজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কর্নেল বললেন—হুম্! তাহলে ডঃ গুটেনবার্গ, বোঝা যাচ্ছে আমার ধারণায় কোনও ভুল নেই। এ নিশ্চয় টংকু আরেগোনার দল না হয়ে যায় না। কিন্তু ওরা পরমেশবাবুর সম্পর্কে এত আগ্রহী কেন?

পরমেশবাবু ভয় পেয়েছেন মনে হল। মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডঃ গুটেনবার্গ

বললেন—আচ্ছা ডঃ পুরকায়স্থ, আপনি তো একবার ভিয়েনায় বিশ্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানী সম্মেলনে বলেছিলেন হৃদ্‌যন্ত্র যেমন বদল করা যায় শরীরে, তেমনি মাথাও বদল করা যায়।

পরমেশবাবু বললেন—হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কিছুটা পরীক্ষা করে দেখার পরই ওই সিদ্ধান্তে এসেছিলুম। ধরুন, দুর্ঘটনার ফলে কারও মাথায় আঘাত লাগল এবং পরিণামে মস্তিষ্কের রোগ দেখা দিল। কিংবা মনে করুন, আগের সব কথা সে ভুলে গেল। সেক্ষেত্রে তার মস্তিষ্ক বদল সম্ভব। তবে মানুষের বেলায় কিন্তু মুশকিলটা কী হবে জানেন? সুস্থ মস্তিষ্ক পাওয়া যাবে কোথায়? রামের মাথায় আঘাত লেগে মগজ বিগড়েছে বলে শ্যাম তো নিজের মগজ দান করতে যাবে না। কারণ তার মানে তাকে মরতে হবে! অবশ্য একটা উপায় আছে। কোনও সদ্যমৃত মানুষের মস্তিষ্ক ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তাই বা তার আত্মীয়রা দিতে চাইবেন কেন?

কর্নেল একটু হেসে বলেন—এই মগজ বদল নিয়ে উপভোগ্য গল্পের বই আছে। যাক্‌গে, পরমেশবাবু, আপনার পরীক্ষার কথা বলুন।

পরমেশবাবু বললেন—আমি একটা কুকুরের মগজ বদল করেছিলুম। দুটো কুকুরই দুর্ঘটনায় মারা পড়েছিল। একটার মাথা অক্ষত ছিল, অন্যটার মাথা ট্রাকের চাকার ধাক্কায় জখম হয়েছিল। আমি দ্বিতীয় কুকুরটার মাথা অপারেশন করে প্রথম কুকুরটার মগজ বসিয়ে দিয়েছিলুম।

কর্নেল আগ্রহে বললেন—তারপর, তারপর?

—কুকুরটা ঘণ্টা দশেক বেঁচে ছিল। তারপর মারা যায় ফের। তবে দেখুন, শুধু মগজ কেন, মানুষ হয়তো একদিন পুরো মাথাই বদলাতে পারবে। উদোর মাথা বুধোর ঘাড়ে বসিয়ে দেবে! কেন? আমাদের পৌরাণিক গল্পে গণেশের মাথার আশ্চর্য কাহিনী ভুলে যাচ্ছেন? শনির দৃষ্টি লেগে গণেশের মাথাটি উড়ে গেল। তখন ঐরাবতের মাথা কেটে এনে জোড়া দেওয়া হল! গণেশের মাথাটি তাই হাতির। আমার কেমন যেন সন্দেহ, প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসকরা সম্ভবত এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। তা না হলে এমন কাহিনীর অর্থ কী?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আমি কিন্তু ওটা কাহিনী বলে মনে করিনে। ওটা একটা প্রকৃত ঘটনা!

কর্নেল বললেন—কেন বলুন তো?

ডঃ পুরকায়স্থের বাবা এই দ্বীপে দশাবতার ফলক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। এই দ্বীপেই আমরা নৃসিংহের মতো বিচিত্র প্রাণীর দেখা পেয়েছি—যার মূর্তি ওই ফলকে ছিল এবং সম্প্রতি চুরি গেছে।

—আপনি কী বলতে চান ডঃ গুটেনবার্গ?

—ধরুন, এই প্রাচীন অধিবাসীরা শল্যবিদ্যায় এত দক্ষ ছিল যে তারা মানুষের ধড়ে সিংহের মুণ্ডু বসিয়ে এই নৃসিংহ নামক প্রাণী সৃষ্টি করতে পেরেছিল এবং সেই নৃসিংহের বংশধরকে আমরা দেখতে পেয়েছি।

—বেশ। তাই মানলুম। তারপর?

—কে বলতে পারে, ওই দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তিটির মধ্যেই শল্যবিদ্যার সেই রহস্যময় পদ্ধতি সাংকেতিক ভাষায় দ্বীপবাসীরা রেখে গেছে কি না!

—আপনার কথায় যুক্তি আছে! বলে যান ডঃ গুটেনবার্গ!

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে কুখ্যাত টংকু আরেগোনার দলের কথা বললেন—যারা দেশবিদেশের চোরাই প্রত্নদ্রব্যের কারবার করে—তারা কোনও সূত্রে দশাবতার ফলকে নৃসিংহ মূর্তির মধ্যে সাংকেতিক লেখাগুলোর রহস্য টের পেয়েছে এবং তাই সেই পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব আপনি ওদের জন্য নৃসিংহ সৃষ্টি করে দেবেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম—ওরা নৃসিংহ নিয়ে করবেটা কী?

জবাবটা দিলেন কর্নেল। হাসতে হাসতে বললেন—জয়ন্ত, নৃসিংহের চেয়েও বিচিত্র প্রাণী এই মানুষ। সবাইকে তাক লাগিয়ে কিছু করতে পারলে সে আর কিছু চায় না। বিশেষ করে টংকু

আরেগোনা শুনেছি খুব খামখেয়ালি লোক। সে হয়তো ভেবেছে, এরপর নৃসিংহ-চালানী কারবার ফেঁদে বসবে।

—কী কাণ্ড! কিনবেটা কে?

—কেন? সার্কাস কোম্পানিগুলো কিনবে। আর কিনবে সারা বিশ্বের সব চিড়িয়াখানা।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন— আপনার কথায় তামাশার সুর থাকলেও সত্যি হতে পারে।

কর্নেল বললেন—আলবাৎ পারে। টংকু আরেগোনা খুব খামখেয়ালি লোক। একবার তার মাথায় কিছু ঢুকলে তাই নিয়ে পাগল হয়ে যায়। সিঙ্গাপুরে তার কিউরিও শপে একবার আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আরেগোনা কথাটা যে আসলে অর্জুন, তার কাছেই শুনেছি। সে খুব গর্ব করে বলেছিল—জানেন কর্নেল? আমার পূর্ব-পুরুষরা ভারতেরই লোক।

এবার আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল, আপনার তো দিব্যি গপ্পগাছা চালাচ্ছেন—এদিকে ডঃ গড়গড়ি বেচারার কী হল, খুঁজে দেখা উচিত নয় কি?

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি তো অবাক।

ডঃ গুটেনবার্গ বলনে—জয়ন্তবাবু, ডঃ গড়গড়ির জন্য ভাববেন না।

—সে কী?

—উনি আপনাকে বোকা বানিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন আসলে। ওঁর পদস্খলন এবং পতন একটা চালাকি।

—তার মানে?

—কর্নেল বললেন—ডার্লিং! ডঃ হরিহর গড়গড়ি বহাল তবিয়তে কলকাতায় রয়েছেন। ডঃ গড়গড়ি আমার কাছে গিয়েছিলেন নৃসিংহের ছবি নিয়ে তিনি—অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন স্রেফ নকল ডঃ গড়গড়ি। আমারই পরামর্শে ডঃ গুটেনবার্গ ওঁকে জাল জেনেও অভিনয় চালিয়ে যান।

—অসম্ভব! ডঃ গড়গড়িকে আমি চিনি! আমার ভুল হতে পারে না। আমি ওঁকে একবার...

—বৎস জয়ন্ত, কবে একবার দেখেছ এবং সম্ভবত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় দূর থেকে বক্তৃতা নোট করেছে—তাই দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না।

—কিন্তু চেহারা তো মনে আছে। ধরে নিচ্ছি, মাইক্রোফোনে আসল কণ্ঠস্বর না হয় ধরা যায়নি।

—হুঁ, এই নকল লোকটি আসল লোকের মতো দেখতে, এই যা।

—ওরে বাবা! বলেন কী! এই জাল গড়গড়ি লোকটা কে তাহলে?

—লালবাজারের গোয়েন্দাকর্তা আনোয়ার খানের কাছে পরমেশবাবুর সেই ঠ্যাকুরমশাই সব কবুল করেছেন। ফলক চুরি ঠাকুরমশাই করেছিলেন জাল গড়গড়ি অর্থৎ শ্রীযুক্ত বনবিহারী রায়ের টাকা খেয়ে। এই রায়মশাই একজন কুখ্যাত চোরাচালানী পাণ্ডা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও হংকং থেকে প্রচুর জিনিস চোরাচালানে ভারতে যায়। সেই সূত্রে টংকু আরেগোনার সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল।

—যাক গে। প্রচুর জ্ঞান হল। কিন্তু বনবিহারী নৃসিংহের ছবি পেল কোথায়?

—ডঃ গুটেনবার্গ যখন নার্সিং হোমে ছিলেন, ওঁর পার্ক স্ট্রিটের ফ্ল্যাট থেকে ছবিটা চুরি গিয়েছিল। পরে যখন সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাদের দলে ভিড়ল, ডঃ গুটেনবার্গ তাকে দেখে অবাক। আমি ওঁকে পরামর্শ দিলুম, চেপে যান। তবে বনবিহারী এ রিস্ক নিয়েছিল, কারণ তার চেহারা অবিকল ডঃ গড়গড়ির মতো। তাছাড়া সে ভেবেছিল, সাহেবদের এ ব্যাপারে ঠকানো সোজা।

একটু রাগ দেখিয়ে বললুম—তাহলে গোড়া থেকেই সব জানতেন অথচ আমাকে কিছু বলেননি। বললে আমি নজর রাখতুম ওর দিকে। অন্তত ডঃ গুটেনবার্গও যদি একটু আভাস দিতেন।

কর্নেল আমার একটা হাত নিয়ে আদর করে বললেন—বৎস জয়ন্ত! বেশি জানলে মাথার ঠিক থাকে না। মাঝে মাঝে মানুষের যত কম জানা হয়, তত মঙ্গল। যাক গে, তুমি অনেক হেনস্থা হয়েছ মানুষ ও ইঁদুরের হাতে। এবার একটু বিশ্রাম করো। আর আসুন পরমেশবাবু, আসুন ডঃ গুটেনবার্গ! আমরা শাবল গাঁইতিতে হাত লাগাই। বদমাশ লুঠেরা ইঁদুরদের গর্ত থেকে লুঠের মালগুলো উদ্ধার করা যাক। নইলে কিছু খেতে পাব না।

তিনজনে শাবল ও গাঁইতি নিয়ে পাথরের চাতালে সেই ফাটলটার কাছে গেলেন। এবং হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে বড় বড় পাথরের টুকরো ওপড়াতে শুরু করলেন।

তারপরই তখনকার মতো বিদঘুটে দৃশ্য দেখা গেল। ইঁদুরগুলোর সঙ্গে তিনটি মানুষের জব্বর লড়াই বেধে গেল। তিনজনেই শাবল ও গাঁইতি চালিয়ে প্রচণ্ড পরাক্রমে ইঁদুরদের নিধনযজ্ঞে মেতে উঠলেন। বেগতিক দেখে বেচারারা কোথায় গা ঢাকা দিলে শেষমেশ।

সাতটা ইঁদুর হত। লেজ ধরে নিচে ছুড়ে ফেলা হল। আহতগুলো কোনওরকমে পালিয়ে গেল। আমি ক্যাম্পখাটে শুয়ে ব্যাপারটা খুব উপভোগ করলুম। কিছুক্ষণ পরে উদ্ধারকরা টিনগুলোর মুখ কেটে সবে সবাই খেতে বসেছি, হঠাৎ পাহাড়ের ওপর দিকে অমানুষিক জান্তব গর্জন শুনে চারজনে আঁতকে উঠলুম।

সেই ভয়ঙ্কর গর্জনের কোনও তুলনা হয় না। যেন একশোটা সিংহ একসঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে পাহাড় কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বললেন—চলে আসুন সবাই। নৃসিংহ ফাঁদে পড়েছে।

নৃসিংহ না গরিলা?

আগেই বলেছি, দ্বীপটা সমুদ্র থেকে পিরামিডের মতো মাথা তুলেছে এবং তার গায়ে আগাগোড়া ঘন জঙ্গল—কোথাও কোথাও ন্যাড়াপাথর আছে এই যা।

নৃসিংহের ফাঁদের কাছে পৌঁছতে প্রায় পাঁচশো ফুট চড়তে হল। ঢালু বলে তত কষ্ট হল না। সমুদ্রতল থেকে আন্দাজ আটশো ফুট উঁচুতে বলে সবসময় প্রচণ্ড জোরে হাওয়া বইছে। কিন্তু এখানে উঁচু উঁচু গাছের জঙ্গল রয়েছে। ফাঁদটা পাতা হয়েছে সেই জলপ্রপাতের দিকে। ফাঁদ মানে একটা গভীর গর্তের মধ্যে শক্ত স্প্রিং দেওয়া জাঁতাকল। গর্তের ভেতরটা অন্ধকার। সেখান থেকে মুহুর্মুহু গর্জন করছে প্রাণীটা। কানে তালা ধরানো সেই গর্জন। হৃদপিণ্ডে খিল ধরে যাওয়ার জোগাড় হচ্ছে আমার। গোটা পাহাড়টা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন—ডঃ গুটেনবার্গ! এবার আর দেরি না করে আপনার ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ুন।

ডঃ গুটেনবার্গ ওঁর রিভলভারের নলের মুখে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ এঁটে ট্রিগার টিপলেন। হিস্ করে একটা শব্দ হল।

প্রায় পাঁচমিনিট কেটে গেল। তারপর প্রাণীটার আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কর্নেল বললেন—আসুন, এবার গর্তে নেমে প্রাণীটাকে ভাল করে দেখা যাক। জয়ন্ত, তুমি চারদিকে নজর রেখে পাহারা দাও। সাবধান, এবার আর বোকামি কোরো না।

আমি বেজার মুখে বললুম—নৃসিংহ দেখার ইচ্ছে বুঝি আমার নেই?

কর্নেল হেসে বললেন—দেখবে বৎস, দেখবে। প্রাণভরে দেখতে পাবে। কীভাবে ওকে টেনে তুলব, আগে দেখে আসতে দাও।

ওঁরা তিনজনে গর্তের ধারের পাথর আঁকড়ে নামতে থাকলেন। গর্তটা খুব গভীর এবং প্রকাণ্ড।

এ গর্ত কোন আদিম যুগে ভূমিকম্পের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। চারধারে ঘন ঝোপ ও গাছ থাকায় হঠাৎ কারও নজরে পড়া সম্ভব নয়। গর্তের মুখের উপর অনেকটা জায়গা জুড়ে ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। তাই বেচারা নৃসিংহ আচমকা...

আমার ভাবনা বাধা পেল। না—আচমকা নয়। গর্তের এধারে অনেকগুলো সেই রাক্ষুসে ইঁদুরের টোপ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেখতে পেলুম। ও হরি! তাহলে নৃসিংহ এইসব ইঁদুর কড়মড়িয়ে খেয়েই বেঁচে আছে। একেকটা ইঁদুরের ওজন কমপক্ষে দু' আড়াই কিলোর কম নয়। কটা খেলে ওর পেট ভরে কে জানে।

ইঁদুরের লোভেই বেচারা হুড়মুড় করে এসে ফাঁদে পড়েছে। নিশ্চয় ওর এই খাদ্যের ব্যাপারটা ডঃ গুটেনবার্গ জানতেন।...

এই সময় হঠাৎ আমার চোখ গেল এই দ্বীপ পাহাড়ের পূর্বে—সমুদ্রের দিকে।

দেখি, একটা ছোট্ট স্টিমবোট ঢেউয়ে দুলছে। স্টিমবোটের গড়ন একটা লম্বাটে মাকুর মতো। ওতেই কি টংকু আরেগোনা বা অর্জুনের লোকেরা এসেছে? দেখে মনে হল, বোটটা অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

আমি বোটের দিকে নজর রেখেছি, এমন সময় আমার পিছনে কোথাও একটা শব্দ হল। সম্ভবত একটা পাথর গড়াতে গড়াতে পড়ল। অমনি ঘুরে দাঁড়ালুম।

এক পলকের জন্য দেখলুম, ওপারে গাছপালার মধ্যে একটা বড় পাথরের আড়ালে ডঃ গড়গড়ির মুখটা স্যাঁৎ করে সরে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—হ্যালো বনবিহারীবাবু!

অমনি আমার দুপাশে দুমদাম আওয়াজ করে কেউ গুলি ছুড়ল। একলাফে গর্তের ধারে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ডাকতে থাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

ভেতর থেকে গমগমে আওয়াজে কর্নেলের সাড়া এল—কী হয়েছে জয়ন্ত?

—বনবিহারী গুলি ছুড়ছে।

—তুমি গুলি ছুড়ে বোসো না তাই বলে। সাবধান।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—ভাল বলেছেন বটে! আমি...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাথার ওপরকার পাথরের চটা ছাড়িয়ে ফের বনবিহারীর গুলি কুচ্ছিত আওয়াজ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঝাঁপ দিলুম।

তারপর পড়েছি একটা নরম বা শক্ত জান্তব কিছুর ওপর। নাকি ঘাসের জঙ্গলে? টর্চ জ্বলে উঠল। কর্নেল বললেন—সরে এস জয়ন্ত। তুমি বেচারার পেটের ওপর পড়ে আছ!

তাকিয়ে দেখেই আঁতকে সরে গেলুম।

গর্তটা ভেতরে খুব চওড়া। মধ্যিখানে দু'পা ছড়িয়ে ফাঁদের স্প্রিংয়ে মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে আছে একটা দানবাকৃতি প্রাণী। শরীরটা বিশাল গরিলার মতো—কিংবা লোমওয়ালা মানুষেরই মতো—কিন্তু মাথাটা সিংহের মতো। বড় বড় দাঁত ছরকুটে চোখ বুজে কাঠ হয়ে আছে। মাথাটা ঢাকের মতো বড়। ঘন ধূসর রঙের কেশরে ঢাকা। দুই পায়ের গোড়ার স্প্রিংয়ের দাঁত আটকে রয়েছে স্পিংয়ের পাতের সঙ্গে একটা মোটা লোহার শেকল কোণের দিকে লোহার গোঁজে আটকানো আছে। ফাঁদটা চমৎকার পাতা হয়েছিল বটে।

টর্চের আলো নিভিয়ে কর্নেল বললেন—নৃসিংহ দর্শন হল তো জয়ন্ত?

—হল। কিন্তু ওপরে বনবিহারী যে ওত পেতে আছে!

—থাক। আমরা ওপরে আর উঠছি না।... বলে কর্নেল পরমেশবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে আপনি বলতে চান, যাকে আমরা নৃসিংহ বলছি—তা আসলে মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধুনালুপ্ত একজাতের গরিলা ছাড়া কিছু নয়?

পরেমেশবাবু বললেন—আমার তাই অনুমান। প্রাণীবিজ্ঞান আমাকে পড়তে হয়েছে। সেই জ্ঞানমতেই একথা বলছি। অবশ্য সিংহের মাথা মানুষের শরীরে জোড়া দেওয়া বিজ্ঞানের তত্ত্বর দিক থেকে সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু এ প্রাণী গরিলা ছাড়া আর কিছু নয়। যেটা আপনারা সিংহের কেশর ভাবছেন, ওটা গরিলারই চুল। মালয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকার গরিলাদের মাথায় মানুষের মতো চুল ছিল। আর ওর চোয়াল লক্ষ্য করুন। সিংহের চোয়ালের সঙ্গে কোনও মিল নেই। দাঁতের গড়ন দেখুন। প্রত্যেকটা দাঁত সমান। মানুষের মতো চোয়ালের দাঁতগুলো ভোঁতা। এ একটা গরিলাই বটে।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—তা হোক। তবে এও একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার বই কি।

কর্নেল বললেন—তা আর বলতে! যাক গে, এর ঘুম অন্তত পাঁচ ঘন্টা ভাঙবে না। এর মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তারপর...

আমি বাধা দিয়ে বললুম—বেরুবেন কীভাবে? ওপরে বনবিহারীরা তাক করে আছে।

কর্নেল বললেন—এস তো আমার সঙ্গে। ঠিক বেরিয়ে যেতে পারবে নিরাপদে। ততক্ষণে ভেতরের অন্ধকার অতটা মালুম হচ্ছে না। এর কারণ আবিষ্কার করে খুশিতে নেচে উঠলুম। সামনে দেওয়ালের প্রকাণ্ড ফাটল দিয়ে আবছা আলো আসছে। সে পথে আমরা সার বেঁধে এগিয়ে চললুম। কিছুক্ষণ পরে সুড়ঙ্গপথ থেকে বেরিয়ে দেখি, জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছেছি, কর্নেল বললেন—তখন ফাঁদ পাততে এসে এই পথটা দেখে গিয়েছিলুম। তবে এদিক দিয়ে সেই বিচে পৌঁছতে অনেক মেহনত হবে এই যা মুশকিল।

দুর্ভাবনায় মুষড়ে গিয়ে বললুম—অন্যপথ জানা আছে তো?

কর্নেল বললেন—এস তো, দেখা যাক। ডঃ গুটেনবার্গ যখন পথপ্রদর্শক, চিন্তার কারণ নেই।

ডঃ গুটেনবার্গ দাড়ি চুলকে বললেন—আমি এদিকটা বিশেষ চিনি না। সেবার এই উত্তর দিকটায় ঘোরাঘুরির ফুরসত পাইনি।

এই সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, পুবের খাড়িতে সেই মোটরবোটটার কথা। বললুম—কর্নেল! ভুলে গিয়েছি বলতে। ওদিকে একটা মোটরবোট দেখেছিলাম তখন। মাকুর মতো লম্বাটে গড়ন।

কর্নেল বললেন—টর্পেডোবোট? তারপর ঘুরে চোখে বাইনোকুলার রাখলেন।

সবাই ঘুরে দাঁড়ালুম। কর্নেল বোটটা দেখার পর বললেন—তাহলে কি টংকু আরেগোনা স্বয়ং দ্বীপে এসে জুটেছে? ব্যাপারটা কী?

পরমেশবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—আর তার লোক আমার কথাই বা কেন জিগ্যেস করে গেল জয়ন্তবাবুকে?

কর্নেল বললেন—একটা সূত্র আমার মাথায় এসেছে।

আমরা সবাই একসঙ্গে বললুম—কী, কী?

কর্নেল বললেন—বনবিহারীর বাসায় আনোয়ার খান, মানে লালবাজার গোয়েন্দা দফতরের সেই কর্তা ভদ্রলোক হামলা করেছিলেন। কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। তাতে দেখা যায়, বনবিহারী সিঙ্গাপুরের একটা লোককে খুব পুরনো একটা দুষ্প্রাপ্য মূর্তি বেচতে চেয়েছিল—তার জবাবে সিঙ্গাপুরের লোকটি লিখেছে, ওসব বিশ্বাস করি না। হাতেনাতে দেবেন, তাতে আমি রাজি আছি। প্রমাণ পেলে মূর্তিটা পাঁচলক্ষ ডলারে কিনব। আপনি টোরাদ্বীপে আসুন—যে ভাবে পারুন।

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—অতএব বোঝা গেল, ডঃ গড়গড়ি সেজে পরমেশবাবুর ফলকের নৃসিংহ ছবিটা নিয়ে সে আমাদের সঙ্গে টোরাদ্বীপে কেন এসেছে!

আমি বললুম—একা আসতে পারত না? এত রিস্ক নিয়ে এল কেন? বিশেষ করে ডঃ গুটেনবার্গের কাছে ধরা পড়া সম্ভব ছিল।

কর্নেল বললেন—একা তার পক্ষে আসা অসম্ভব। আরেগোনা বিরাট লোক। সে পারে বলে কি অন্য কেউ এই দুর্গম দ্বীপে আসতে পারে? তাই সে ডঃ গড়গড়ি সেজে আমাকে উৎসাহিত করে দ্বীপে আসার সুযোগ নিয়েছে। তাছাড়া ওই যে 'হাতেনাতে' প্রমাণ কথার অর্থও বোঝা যাচ্ছে। সত্যি সত্যি নৃসিংহ-জাতীয় প্রাণী এখানে আছে। কাজেই আমার ধারণা, কোনও সূত্রে ভারতীয় সরকারি সমীক্ষকদলের অভিযান ও নৃসিংহের হাতে মর্মান্তিক পরিণতির কথা বনবিহারী জানতে পেরেছিল। জেনে সে আরও লোভে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সত্যি সত্যি নৃসিংহ দেখাতে পারলে আরেগোনা বিশ্বাস করবে যে সত্যি নৃসিংহমূর্তিতে সেই প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির কথা সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে।

বললুম—তাহলে পুরো দশাবতার হাতালেই পারত বনবিহারী। কেন শুধু নৃসিংহ মূর্তির অংশটা খুবলে তুলে নিয়েছে?

কর্নেল বললেন—আরেগোনা ধূর্ত। সে দশাবতার চেনে। পুরো ফলকটা দেখলে তার সন্দেহ হবে যে এটা সাধারণ একটা দশাবতার ফলক। নৃসিংহ মূর্তিটা আলাদা থাকলে অন্য অর্থ দাঁড়ায় না কি? তখন একটা নৃসিংহের পুরাতাত্ত্বিক তাৎপর্য আরও গভীর হয়ে ওঠে। বুঝেছ?

বললুম—তাহলে প্রাচীন শল্য চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাপারটা বনবিহারীর গুল?

কর্নেল জবাব দিলেন—স্রেফ গুল। পরমেশবাবু প্রাণীটাকে গরিলা বললেন। হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে, ওইরকম একটা প্রাণীর কথা আমি একটা বইয়ে পড়েছিলুম বটে।

কথা বলতে বলতে আমরা সেই নারকেল বনটার কাছে নেমে গেলুম। আর পথ চিনতে কোনও ভুল হল না।

ক্যাম্পে গিয়ে একেবারে সটান গড়িয়ে পড়লুম ক্যাম্পখাটের ওপর। শরীর ভীষণ ক্লান্ত।...

বনবিহারী বনাম আরেগোনা

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, তখন প্রায় দুটো বাজে, কর্নেল ও ডঃ গুটেনবার্গ ইয়া মোটা নাইলনের রশিটা গোছাতে শুরু করলেন। ব্যাপার কী? গরিলাটাকে বেঁধে ফেলা হবে বুঝি? কিন্তু আনা হবে কীভাবে, বুঝতে পারলুম না। পরমেশবাবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন—ওর গায়ে অসম্ভব জোর আছে।

কর্নেল বললেন—গায়ের জোরে কিছু হয় না, ডঃ পুরকায়স্থ! আপনি তো প্রাণী বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। আপনি তো জানেন, আসল জোরটা মস্তিষ্কের। সেই জোর আছে বলেই মানুষ টিকে থেকে সব জোরওয়ালা প্রাণীর ওপর প্রভুত্ব করছে।

কিন্তু ওকে আনবেন কেমন করে?

ডঃ গুটেনবার্গ বললেন—আষ্টেপৃষ্ঠে এই দড়ি জড়িয়ে ওকে মমির মতো লম্বা করে ফেলব এবং তার আগে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশন অবশ্যই দেব।

তারপর? ওটার ওজন তো কমপক্ষে দুই কুইন্টালের কম নয়।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—চারজনের ভাগে কত ওজন পড়বে? মাথা পিছু পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। কি জয়ন্ত? খুব বেশি ওজন কি? তবে ভেব না। স্ট্রেচার বানিয়ে নেব। জঙ্গলে প্রচুর কাঠ আছে।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে এই প্রকাণ্ড প্রাণী মড়ার মতো খাটে বয়ে আনার কথা ভেবে মোটেও স্বস্তি পেলুম না।

আমার মনের কথা যেন আঁচ করে কর্নেল আরও হেসে বললেন—জয়ন্ত! পাহাড়ে চড়ার চেয়ে নামা সোজা। ভাবনার কারণ নেই ডার্লিং। স্ট্রেচারে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নামানো অতি সরল ব্যাপার। না, না—সত্যি সত্যি তোমায় কাঁধে করে বইতে হবে না। টোরাদ্বীপের এটাই মজা।

একটু পরে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লুম আগের পথে। চড়াই ভেঙে পিঠে রোদ নিয়ে উঠতে কষ্ট যা হওয়ার হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। ক্যাম্পে আর একা থাকার সাহস আমার নেই—নইলে বরং একটা ঘুম দিয়ে নিতুম।

ফাঁদের গর্ত যেখানে, তার কাছাকাছি একটা পাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে।

দেয়ালের নিচে ঝোপ জঙ্গল ঘন হয়ে আছে। যেই সেখানে পৌঁছেছি, হঠাৎ ঝোপ থেকে চারটে বেঁটে মিলিটারি পোশাকপরা লোক সামনে লাফ দিয়ে দাঁড়াল।

প্রত্যেকের হাতে স্টেনগান বা রাইফেল। চোখে সানগ্লাস। মাথায় গোল টুপি। সেই লোকদুটোও রয়েছে ওদের মধ্যে—যারা আমাকে হেনস্থা করেছিল।

আমাদের সঙ্গে রাইফেল আছে। কিন্তু কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় বললেন—বাধা দিও না।

সেই বাইনোকুলারধারী একটু হেসে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল—ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশ কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—আমি।

লোকটা এগিয়ে এসে বলল—আমরা বন্ধু। কারও কোন ক্ষতি করতে চাইনে। আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের সঙ্গে আসুন। দলপতি আপনাদের সাক্ষাৎপ্রার্থী। বিশেষ করে ডঃ পরমেশের সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান।

আমরা ওকে অনুসরণ করলুম। পিছনে তিনজন অস্ত্র তাক করে আসতে থাকল। খুব অপমানজনক অবস্থা। কিন্তু এখন লড়াই করা মানে অকারণ প্রাণটি খোয়ানো।

কিছুটা যাওয়ার পর একটা সুড়ঙ্গপথে আমাদের ঢুকতে হল। ঘন অন্ধকার। ওরা সামনে ও পেছনে টর্চ জ্বেলে আমাদের নিয়ে চলল।

এই সময় অবাক হয়ে দেখলুম, আমরা একটা সুড়ঙ্গপথে সেই ফাঁদের গর্তের তলায় এসে গেছি। ফাঁদে আটকানো গরিলাটা এখনও তেমনি ঘুমিয়ে আছে।

আর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা মোটা গব্দা-গোব্দা লোক। তার চুল সাদা। কিন্তু মুখে দাড়ি গোঁফ নেই। থ্যাবড়া নাক। সে আমাদের দেখে চমৎকার হিন্দিতে বলে উঠল— আইয়ে, আইয়ে! হাম আপলোগোঁকা ইন্তেজার কর রাহা। লেকিন হেঁয়াপর বইঠনেকা জায়গা নেহি হ্যায়। মাপ কিজিয়ে!

অন্য পাশে কাঁচুমাচু মুখে বসে আছে সেই জাল্ ডঃ গড়গড়ি—ওরফে বনবিহারী।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন—হ্যালো মিঃ টংকু আরেগোনা!

আরেগোনা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হাত বাড়াল—হ্যালো কর্নেল-সাহাব! কেতনা বরষ বাদ আপকা সাথ মিল্‌তা হ্যায়।

কিছুক্ষণ এইসব সম্ভাষণ ও আলাপ হল। তারপর আরেগোনা বলল— ডঃ পরমেশ কে?

পরমেশবাবু বললেন—আমি।

আরেগোনা তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল—আরে পুরকায়স্থ সাহেব। আপনার বাবা মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার দোস্তি ছিল। উনি যখন সিঙ্গাপুরে ছিলেন, তখন খুব ভাব ছিল আমাদের। তো এবার কাজের কথাটা সেরে নিই।

বলে আরেগোনা বনবিহারীর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শুরু করল—এই লোকটা আমাকে ধাপ্পা দিচ্ছে, না সত্যি কথা বলছে আমি এখনও জানি না। ও আমাকে একটা পাঁচ হাজার বছরের পুরনো মূর্তি বেচতে চায়। সেই মূর্তির গায়ে নাকি সাংকেতিক ভাষায় লেখা আছে...

পরমেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন—স্রেফ মিথ্যে কথা। ওটা একটা দশাবতার ফলক থেকে খুবলে নেওয়া মূর্তি। আমার বাবা ফলকটা এই দ্বীপে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

আরেগোনা দ্রুত বলে উঠল—সেই কথাই আমার মাথায় এসেছিল। মেজর সাহেব আমাকে দশাবতার ফলকটা দেখিয়েছিলেন। তাই যখন বনবিহারি আমাকে নৃসিংহ মূর্তির ফোটো পাঠিয়ে দিল, আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তাই খোঁজখবর নিতে শুরু করলুম। পরে আমার কলকাতার এজেন্ট খবর দিল, মেজর সাহেব বেঁচে নেই। তাঁর ছেলেও বড় ডাক্তার। এবং দশাবতার ফলকটা চুরি গেছে ওদের বাড়ি থেকে। তখন এই বনবিহারীর ওপর সন্দেহ বেড়ে গেল। এই সময় জানতে পারলুম, টোরা আইল্যান্ডে নাকি নৃসিংহের হাতে কয়েজন ভারতীয় বিজ্ঞানী মারা পড়েছেন। তারপর বনবিহারীও লিখে পাঠাল যে টোরা আইল্যান্ডে সত্যি নৃসিংহ আছে এবং সে আমাকে স্বচক্ষে দেখাতে পারবে, তখন ভাবলুম, তাহলে বনবিহারী হয়তো কোনওভাবে টের পেয়েছে। নৃসিংহ মূর্তির গায়ে সাংকেতিক ভাষায় প্রাচীন শল্য চিকিৎসার ফরমুলা লেখা আছে। হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করে ফেললুম সব কিন্তু...

বনবিহারী বলে উঠল—তাহলে আর অবিশ্বাসের কারণ কী? ওই তো নৃসিংহ পড়ে আছে আপনার সামনে। এই দ্বীপের লোকেরাই মানুষের মাথায় সিংহের মাথা কেটে বসিয়ে নৃসিংহ তৈরি করেছিল। তাই দশাবতার ফলক এখানেই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পরমেশবাবুর বাবা।

আরে গোনা বলল—কিন্তু প্রাণীটাকে দেখে আমার যে সন্দেহ হচ্ছে ব্রাদার!

—কী সন্দেহ?

—ওটা কি সত্যি নৃসিংহ?

নৃসিংহ মূর্তিটা বনবিহারী কোটের পকেট থেকে বের করে বলল—মিলিয়ে দেখুন।

—মিলছে না ব্রাদার। একটু গোলমাল ঠেকছে।

—হুবহু কীভাবে মিলবে? এটা কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তি, আর ওটা হল সত্যিকার নৃসিংহ। শিল্পীর হাতে কি অবিকল নকল সম্ভব? একটু আধটু খুঁত থাকবেই।

পরমেশবাবু এতক্ষণে বলে উঠলেন—ওটা আসলে একটা গরিলা।

আরেগোনা লাফিয়ে উঠে বলল—আলবৎ তাই! আমি মালয়েশিয়ার বাসিন্দা। আমি জানি, আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেও মালয়ের জঙ্গলে গরিলা ছিল। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপেও ছিল। ব্রাদার বনবিহারী! তাহলে এবার তৈরি হও। তুমি আমাকে প্রতারণা করে পাঁচ লাখ ডলার হাতাতে চেয়েছ—এ তো কম অপরাধ নয়।

আমার বুক কাঁপল। হতভাগা বনবিহারীর কী পরিণতি ঘটবে কে জানে!

বনবিহারী গ্রাহ্য করল না। ফুঁসে উঠে বলল—ভুল বলছেন পরমেশবাবু!—উনি কিস্যু জানেন না! আলবাৎ এটা নৃসিংহ।

আরেগোনা বলল—বেশ। ধরে নিচ্ছি, এটা নৃসিংহ। কিন্তু তোমার ওই মূর্তির গায়ে ওগুলো সাংকেতিক ভাষায় লেখা ফরমুলা, তার প্রমাণ কী?

—প্রমাণ? এই দ্বীপে নৃসিংহ স্বচক্ষে দেখেও প্রমাণ চাই? বনবিহারী কুৎসিত হেসে উঠল।

—বাঃ! ওই ফরমুলা উদ্ধার করবে কে?

—আপনাকে তো বলেইছি, ডঃ হরিহর গড়গড়ি ওর পাঠোদ্ধার করতে পারবেন, তাঁকে ধরে নিয়ে আসুন। আমি সাহায্য করব।

আমি শিউরে উঠলুম। লোকটা কী শয়তান!

আরেগোনা বলল—বেশ। ফরমুলা উদ্ধার হল। তারপর সেটা কাজে পরিণত করবে কে?

—কেন? ওই তো পরমেশবাবু আছে। ওকে আটকে রাখুন।

পরমেশ রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন—মুখ সামলে কথা বলবে বনবিহারী!

আরেগোনার মুখের ভাব দেখে তার মতলব আঁচ করা কঠিন কিন্তু সে হেসে উঠল। বলল—বনবিহারী, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি। আমার সঙ্গে ধূর্তামি করে পার পাবে না ব্রাদার। বিশেষ করে আমার এক পুরনো বন্ধু মেজর সাহেবের পাওয়া ফলক চুরি করে আমার সঙ্গে তঞ্চকতা করেছ—তোমার শাস্তি পাওনা হয়েছে। বোঙা! এদিকে আয় তো!

কয়েকটা জ্বলন্ত টর্চের আড়াল থেকে হিংস্র চেহারার একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল।

—এই শয়তানটাকে পুবের পাহাড়ের ওপর থেকে নিচের খাড়িতে ছুড়ে ফেলে দিবি। এই বদমাশ আমাকে হাজার কাজ পণ্ড করে নৃসিংহ দেখাবে বলে, গরিলা দেখিয়ে আমার মাথা খারাপ করেছে। যা—নিয়ে যা!

আমরা চারজনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি একপাশে অন্যপাশে টংকু আরেগোনা। সামনে কিছুটা তফাতে বনবিহারী। আর যে সুড়ঙ্গপথে এসেছি, সেখানে চারজোড়া টর্চ জ্বলে দাঁড়িয়ে আছে আরেগোনার সশস্ত্র লোকেরা।

বোঙা যেই বনবিহারীর দিকে এগিয়েছে, অমনি বনবিহারী বিদঘুটে হেসে বলে উঠল—ওরে খ্যাঁদা শয়তান! আমায় শাস্তি দিবি—এত বুকের পাটা তোর?

তারপর এক ধুন্ধুমার ঘটে গেল আচম্বিতে।

প্রচণ্ড আওয়াজে গর্তের মধ্যে যেন বোমা ফাটল। তারপরই জন্তুটার ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। কটু বারুদের গন্ধে নিঃশ্বাস আটকে গেল। জানলুম, বনবিহারী গ্রেনেড ছুড়ছে বারবার।

তারপর কর্নেলের চিৎকার শুনলাম—এদিকে! এদিকে!

মনে হল কর্নেল আমাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এলেন।

আবার কর্নেলের গলা শুনলুম—এই পথে এস! আমাকে ছুঁয়ে থাক সবাই!

একটু পরে বুঝলুম, দুপুরের সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে আমরা দৌড়ে যাচ্ছি। কর্নেল পিছন থেকে আমাদের ঠেলে নিয়ে চলেছেন।

পিছনে সেই গর্তের মধ্যে মুহুর্মুহু বোমা ফাটার আওয়াজ আর গরিলাটার হুংকার শোনা যাচ্ছে।

* *

নারকেল বনের শেষে বালির বিচে গিয়ে কর্নেল বললেন—সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সন্ধ্যায় আমরা আলো জ্বেলে সাংকেতিক চিহ্ন দেখালে শার্ক থেকে বোট আসবে। ততক্ষণ ওপাশে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

রহস্যময় টোরাদ্বীপের মাথার দিকে ঘন জঙ্গল শেষবেলার রোদে ম্লান দেখাচ্ছে। ধোঁয়া উড়তেও দেখলুম। কী পোড়াচ্ছে ওরা? বনবিহারী, না আরোগানার মড়া? নাকি গরিলাটার?

আমি মনে মনে কামনা করলুম—ওই বদমাশগুলো মারা পড়ুক। কিন্তু গরিলাটা যেন বেঁচে থাকে।

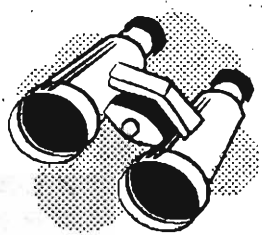

হাট্টিম রহস্য

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুব মন দিয়ে একটা চিঠি পড়ছিলেন। পড়া শেষ হলে আমার দিকে ঘুরে মৃদু হেসে এই ছড়াটা খুব ধীরে আওড়ালেন ঃ

হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।।

অবাক হয়ে বললুম, "হঠাৎ ছড়া আওড়াতে শুরু করলেন যে?"

কর্নেল তাঁর সাদা দাড়ি থেকে কী একটা বের করে ফেলে দিলেন। পোকা হওয়াও বিচিত্র নয়। সেই ভোরবেলা থেকে আটটা পর্যন্ত ছাদের বাগানে হরেকজাতের উদ্ভিদের সেবা করেছেন। দাড়িতে পোকা ঢুকে থাকা খুবই সম্ভব। হাসতে হাসতে বললেন, "জয়ন্ত, ঠিক হাট্টিমাটিম টিমের মতোই পৃথিবীতে কিছুকিছু আজব মানুষ আছে। না, না—তাদের সকলেরই শিং আছে বা তারা মাঠে ডিম পাড়ে, সেকথা বলছি নে। কিন্তু তাদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব লাগে। যেমন ধরো, এই ভদ্রলোক—কালোবরণ মুখুয্যে।'

"চিঠিটা বুঝি তাঁরই?"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চিঠিটা টেবিলে চাপা দিয়ে পায়চারি করতে করতে বললেন, "না—চিঠিটা তাঁর নয়। তাঁর নাতনি অনামিকার। সে আবার কিনা বিজ্ঞানের ছাত্রী। ঠাকুর্দার রকম-সকম দেখে ভড়কে গেছে। শেষে আমরাই শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমি কি ভূতের ওঝা?"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বললুম, "কালোবরণ মুখুয্যেকে কি ভূতে ধরেছে?"

"তাই তো লিখেছে।" বলে কর্নেল হঠাৎ মাথার টুপি খুলে প্রশস্ত টাক থেকে এবারও সম্ভবত একটা পোকা ঝেঁটিয়ে ফেললেন। "তবে কথাটা হল, মানুষ বুড়ো হলে কিছুটা ভীমরতি ধরতেই পারে। যেমন আমারও মাঝে মাঝে ধরে। সেটা বিলক্ষণ বুঝতেও পারি। কিন্তু তাই বলে কি আমি রাতদুপুরে কোনও উদ্ভুট্টে কাণ্ড করি?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, আসল কথাটা বলুন না! এসবের সঙ্গে হাট্টিমাটিমের কী সম্পর্ক?"

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ পায়চারি করার পর আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার কি সময় আছে হাতে? চলো না একবার ঘুঘুডাঙা থেকে বেড়িয়ে আসি। কলকাতা থেকে কাছেই।"

এদিন আমার ছুটি। তবে বলা যায় না কিছু। কাগজের আপিসে সাংবাদিকের চাকরি পুলিশের চাকরির মতোই। বিশেষ করে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বড় বেশি সুনজর তাঁদের এই স্পেশাল রিপোর্টারটির ওপর। ছুটির দিনেও তলব পাঠিয়ে হুকুম দিতে পারেন, "ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে সাংঘাতিক খুনোখুনি হয়েছে। এক্ষুনি গিয়ে সরজমিন খোঁজখবর নিয়ে এস।" তার মানে ওটাই পরদিন সকালে পাবলিককে খাওয়াতে হবে। পাবলিকও এমন হয়েছে আজকাল যে রোজ সক্কালবেলা রক্ত-গরমকরা খবর ছাড়া আর কিছু মুখে রোচে না।

আমার মুখে নিশ্চয় এইসব দোনামনার ছাপ ফুটে উঠেছিল। কর্নেল একটু হেসে বললেন ফের, "ডার্লিং! চিন্তা কোরো না। ঘুঘুডাঙার হাট্টিমরহস্য ফাঁস হলে তোমার কাগজের প্রচারসংখ্যা দশগুণ বেড়ে যাবে। কর্তৃপক্ষকে বরং ফোনে এখনই তার ইশারা দিয়ে রাখো।"

এরপর আর না করা চলে না। ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কফি খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার ফিয়াট গাড়িটা মাঝে মাঝে একটু গণ্ডগোল বাধায়। কিন্তু এদিন দিব্যি খুশমেজাজে ছুটে যেতে আপত্তি করছিল না।

হাট্রিম রহস্যটা কী, রাস্তায় বারতিনেক জিগ্যেস করেও জবাব পেলুম না। কর্নেল চোখবুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন তো হয়েছেনই। আশ্চর্য ব্যাপার, অভ্যাসমতো গাড়ির জানালা দিয়ে পাখি দেখার কথাও যেন ভুলে গেছেন। অথচ বুকের ওপর দিব্যি বাইনোকুলারটি ঝুলছে।

চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ঘন্টাখানেকের মধ্যে আমরা ঘুঘুডাঙা পৌঁছে গেলুম। শহর ও গ্রামে জটপাকানো মাঝারি সাইজের একটা জনপদ। কালোবরণ মুখুয্যের বাড়িটা একেবারে শেষদিকে মাঠের ধারে। একে-ওকে জিগ্যেস করে পৌঁছুতে অসুবিধে হল না।

পরিবেশটা কেমন নির্জীব, খাঁ খাঁ। এদিকে ওদিকে কিছু ভিটে, ভাঙাচোরা দালানকোঠা, কদাচিৎ দু-একটা নতুন বাড়ি, আর ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি। কালোবাবুর বাড়ির গেটে মান্ধাতা আমলের ফলকে লেখা আছে ঃ "স্বর্গপুরী।"

স্বর্গপুরীর দশা বড় করুণ। প্রকাণ্ড সেকেলে দোতলা বাড়িটার গায়ে ছালচামড়া খুব কমই আছে। গেটের কাছে গাড়ি থামতে থামতে একটি ফুটফুটে ফর্সা তরুণী দৌড়ে এল। বছর কুড়ি-একুশের মধ্যে তার বয়স। বেশ স্মার্ট বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখে চশমা আছে। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, এই সেই নাতনি—শ্রীমতী অনামিকা।

কর্নেল বললেন,"তোমার দাদুর খবর কী, অনি?"

অনামিকা তক্ষুনি গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "দাদু এখন ঘুমুচ্ছেন। কাল রাতে সে কী কাণ্ড, কল্পনা করতে পারবেন না। সবে একটু চোখের পাতা টেনে ধরেছে, আমার দরজায় ধাক্কা। দাদুর গলা শুনে দরজা খুলে দিলুম। দাদু ভেতরে ঢুকে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তারা এসেছে! আমাকে লুকিয়ে রাখ শিগগির! আমি টর্চ নিয়ে বেরুলুম। তখন লোডশেডিং চলছিল। কানাইদা নিচে থেকে ব্যস্তভাবে লণ্ঠন নিয়ে এল। দাদুকে ঘরে রেখে আমরা প্রথমে গেলুম দাদুর ঘরে। তন্নতন্ন খুঁজে কাউকে দেখতে পেলুম না শুধু মেঝেয় এই চিরকুটটা পড়ে থাকতে দেখলুম। এই দেখুন। আবার সেই ছড়াটা লেখা রয়েছে।"

কর্নেল ভাঁজ করা কাগজটা মেলে ধরলেন। পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি, কর্নেলের মুখে শোনা সেই হাট্রিমাটিম ছড়াটা লেখা আছে গোটাগোটা সুন্দর হরফে। আর পাশে আঁকা আছে একটা ছবি। ছোটদের ছড়ার বইয়ে হাট্রিমাটিম নামে আজব প্রাণীর যে ছবি দেখা যায়, সেই ছবি, পেঁচার মতো মুখ, মানুষের মতো দু'পায়ে দাঁড়ানো, বড়-বড় চোখওয়ালা পাখি এবং তাদের মাথায় দুটো খোঁচাখোঁচা শিংও আছে। গা ভর্তি পালক।

কর্নেল কাগজটা পকেটে রেখে বললেন, "এই নিয়ে তাহলে চারবার ছড়াটা পাওয়া গেল?"

অনামিকা মাথা নাড়ল। তারপর পা বাড়িয়ে বলল, "ভেতরে আসুন।"

সে সিঁড়ি বেয়ে আমাদের ওপরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে নিয়ে গেল। এই ঘরে সে থাকে। সে সোফায় আমাদের বসিয়ে বেরিয়ে গেল। বললুম, "এই তাহলে হাট্রিমরহস্য?"

কর্নেল হাসলেন। "শুধু এটুকু হলেও কথা ছিল জয়ন্ত। আরও কিছু ব্যাপার আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি সেগুলো জানতে পারবে।"

অনামিকা ফিরে এল চায়ের ট্রে আর দু' প্লেট সন্দেশ নিয়ে। তারপর একপাশে বসে আগের জের টেনে বলল, "তারপর কানাইদা আর আমি বাড়ির চারপাশে ঘুরে খোঁজাখুঁজি করলুম। কাউকে দেখতে পেলুম না। আমরা ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি কখন দাদু ওপর থেকে নেমে এসেছেন। কিছু বলার আগেই দৌড়ুতে শুরু করলেন। পেছন-পেছন কানাইদা দৌড়ুল। কিন্তু দাদু যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কানাইদা ফিরে এসে বলল, ছেড়ে দাও। ফিরে আসবেন'খন। এ তো আজ প্রথম নয়।"

কর্নেল বললেন, "কখন ফিরলেন উনি?"

"প্রায় ঘন্টাখানেক পরে। বাগানের দিক থেকে এলেন। আমরা এত জিগ্যেস করলুম, জবাবই দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে দশটা বাজে। এখনও উনি ঘুমুচ্ছেন?"

"না। সকাল সাতটায় দরজা খুলে চা খেয়েছিলেন। চা দিতেই ফের দরজা আটকে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে কানাইদা জানালার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে এসে বলল, ঘুমুচ্ছেন।"

"ব্রেকফাস্ট করেননি তাহলে?"

"না।" অনামিকা দুঃখিতভাবে বলল। "একটু আগে আমি দরজা নক করলুম। সাড়া পেলুম না।"

"তুমি আরেকবার গিয়ে জোরে দরজায় ধাক্কা দাও তো!"

অনামিকা অনিচ্ছুকভাবে বেরিয়ে গেল। বুঝতে পারছিলুম, দাদুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে যত দুঃখিত, তার চেয়ে বেশি বিরক্ত।

কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম, "বাড়িতে কে কে থাকে?"

কর্নেল বললেন, "কালোবরণবাবু, অনামিকা, আর কানাই নামে একজন চাকর। কানাই ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে আছে। তাকে বাড়ির লোকই বলা নয়। অবশ্য তাকে আমরা এখনও দেখিনি। অনামিকার মুখে আমি যেটুকু শুনেছি, তা হল, কালোবাবু রেলে স্টেশনমাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করে পৈতৃক এই বাড়িতে ফিরে আসেন বছর পনেরো আগে। এখন ওঁর বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তবু শক্তসমর্থ মানুষ। ওঁর একমাত্র ছেলে দেবনাথ ছিলেন কাস্টম্‌স্ অফিসার। বছর দুই আগে খিদিরপুর ডক এলাকার স্মাগলাররা তাঁকে খুন করে। তাঁর স্ত্রী শ্বশুরের কাছে চলে আসেন মেয়েকে নিয়ে। স্বামীর শোকে এবং নানা অসুখে ভুগে মাস ছ'সাত আগে তিনি মারা গেছেন।"

"হুঁ—মেয়েটা বড় দুর্ভাগা! তা এই হাট্টিমরহস্যের শুরু কবে থেকে?"

"মাসখানেক হয়ে এল প্রায়। অনামিকা আমার কাছে দিয়েছিল ১৫ই সেপ্টেম্বর। আজ ১৪ই অক্টোবর। হ্যাঁ—মাসখানেক হল। এর মধ্যে সে আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখে যা যা ঘটেছে, সব জানিয়েছে। আজ যে চিঠিটা পেলুম, তাতে গত সপ্তাহের ঘটনার বিবরণ ছিল। মোটামুটি কাল রাতে যা হয়েছে শুনলে, প্রায় তাই। শুধু একটা বাড়তি ঘটনা ছিল, তা হল : অনামিকা সে-রাতে নিচের বাগানে সত্যি একটা বিদঘুটে প্রাণীকে এক ঝলক টর্চের আলোয় দেখেছে—সেটা নাকি অবিকল হাট্টিমাটিমের যে ছবি দেখলে সেটারই মতো।"

ভড়কে গিয়ে বললুম, "বলেন কী!"

কর্নেল একটু হাসলেন। "তবে তার চেয়ে অদ্ভুত কথা, সকালে বাগানে গিয়ে অনামিকা কয়েকটা পালক কুড়িয়ে পেয়েছিল। পালকগুলো নাকি প্রকাণ্ড। ভেবে দেখো জয়ন্ত, অনামিকা জীববিজ্ঞানের ছাত্রী—বিশেষ করে ওরিন্থোলজি বা পক্ষিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণাও করছে। কিন্তু ওই পালকগুলো দেখে সেও ভীষণ অবাক হয়েছে। এমন পালক যার, সে কোন প্রজাপতি পাখি বা প্রাণী, বিজ্ঞানে তার হদিস নেই।"

এইসময় অনামিকা ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বলল, "দাদু সাড়া দিচ্ছেন না।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, " কৈ, চলো তো দেখি।"

অনামিকার দাদুর ঘর দোতলার উত্তর প্রান্তে। কর্নেল দরজার কাছে গিয়ে আমাদের ভীষণ অবাক করে দিয়ে সুর ধরে আওড়ালেন :

'হাট্টিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমাটিম টিম।।

অমনি ঘরের ভেতর মচমচ ধুপধুপ হল এবং দরজা খুলে গেল। শ্যামবর্ণ, কিন্তু ঘাসচাপা পাতার মতো ফ্যাকাসে গায়ের রং, ঢ্যাঙা গড়নের এক বৃদ্ধ পর্দা তুলেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর কর্নেল ও আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে রাগী গলায় বললেন, "কে মশাই আপনারা আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছেন।"

অনামিকা খিলখিল করে হেসে উঠল। কালোবাবু তার দিকে তেড়ে গিয়ে বললেন, "সব তোরই চক্রান্ত অনি! তুই-ই এই লোকদুটোর সাহায্যে আমাকে ভয় দেখাস। এতদিনে সব ফাঁস হয়ে গেল।"

কর্নেল বললেন, "না, মুখুয্যেমশাই! কিছুই ফাঁস হয়নি।"

কালোবাবু বললেন, "কে আপনি?"

অনামিকা কর্নেল ও আমার পরিচয় দিল। তবু সন্দিগ্ধ দৃষ্টে আমাদের দেখতে দেখতে কালোবাবু বললেন, "ঠিক আছে। আমার খিদে পেয়েছে। অনি, আগে আমাকে খেতে দে। তারপর কথাবার্তা হবে।"

দুই

কালোবাবুর হাবভাবে মোটেও তাঁকে অপ্রকৃতিস্থ বলে মনে হচ্ছিল না। রীতিমতো রাশভারি প্রকৃতির মানুষ উনি। নিজের ঘরে আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেন, তা হল এই—

মাস দেড়েক হবে, এক রাত্রে হঠাৎ কিসের শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়। বাগানের দিকের জানালা দুটো খোলা ছিল। একটা জানালার দিকে চোখ পড়তেই চমকে ওঠেন। কারা যেন উঁকি দিচ্ছে। লোডশেডিংয়ের যুগ বলে রাতে বিছানার পাশে টর্চ রেখে শোন। ঝটপট টর্চ জ্বালতেই দেখেন, দুটো বিদঘুটে মুখ। পেঁচার মতো অবিকল। কিন্তু মানুষের মুখের সাইজ মুখটা। মাথায় দুটো ছোট্ট শিং আছে। ভূতুড়ে গলায় ওরা বলে, "ডিঁম কৈঁ? ডিঁম দেঁ।"

আতঙ্কে টর্চের সুইচ থেকে আঙুল সরে গিয়েছিল। ফের সুইচ টিপে দেখেন, বিদঘুটে মুখটি আর নেই। সাহস করে জানালায় দিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখেন। কিন্তু তাদের কোনও পাত্তা পাননি। শেষে ব্যাপারটা স্বপ্ন ভেবে আর বিশেষ গা করেননি। কিন্তু সকালে ঘরের মেঝেয় ওই ছড়ালেখা একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে পান।

তারপর থেকে কিছুদিন অন্তর-অন্তর ওই বিদঘুটে জীবদুটি দুপুররাতে ঘরের জানালায় আবির্ভূত হচ্ছে। ভূতুড়ে গলায় ডিম চাইছে। অনামিকা ভয় পাবে ভেবে তাকে সবটা খুলে বলেননি। শুধু এটুকুই বুঝতে পেরেছেন যে, জীবদুটির ডানা আছে। তা না হলে দোতলায় জানালায় কীভাবে তারা উঁকি দিতে পারে?

এইসময় অনামিকা বলল, "গত সপ্তাহে ওদের আমি বাগানে দেখেছি, দাদু। তুমি আরও ভয় পাবে বলে বলিনি। তিনটে পালকও কুড়িয়ে পেয়েছি বাগানে।"

কালোবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ! বলিস কী রে?"

বুঝলুম দাদু ভেবেছেন নাতনিকে সব খুলে বললে ভয় পাবে এবং নাতনিও ভেবেছে, দাদুকে সব খুলে বললে দাদু ভয় পাবেন।

কর্নেল বললেন, "কিন্তু আপনি বাগানের দিকে দৌড়ে যান কেন বলুন তো মুখুয্যেমশাই? কোথায় যান?"

কালোবাবু বিকৃত মুখে বললেন, "যাব না কেন? ব্যাটারা আমাকে ভয় দেখাবে, আর আমি তাদের ছেড়ে দেব? প্রথমে ভয় পাই বটে, কিন্তু তারপর মাথায় খুন চেপে যায়। তাই লাঠি নিয়ে খুঁজতে যাই ওদের। পেলে এক্কেবারে হাড় গুঁড়ো করে দেব না বুঝি?"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একটু হেসে বললেন, "তাহলে বললে চাইছেন, অত্যন্ত মরিয়া হয়েই বেরিয়ে পড়েন। তাই না?"

"আলবাত। মরিয়া হব না? রোজ অমনি করে জ্বালাতে আসবে, আর মুখ বুজে সয়ে যাব?"

"কিন্তু প্রথমে ভীষণ আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন তো?"

কালোবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তা পড়ি। আপনি হলে আপনিও পড়তেন।"

কালোবাবুর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। তারপর নিজেকে শান্ত করে বললেন, "হঠাৎ ওকথা আসছে কেন? আপনার মশাই দেখছি, খালি লোকের মনে খোঁচা দেওয়ার অভ্যেস!"

কর্নেল বললেন "সরি। কিছু মনে করবেন না মুখুয্যেমশাই। আচ্ছা, আমরা উঠি।"

কালোবাবু গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। কোনও কথা বললেন না। আমরা বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। সিঁড়ির কাছে এসে কর্নেল অনামিকাকে বললেন, "অনি, সেই পালকগুলো কাগজে মুড়ে আমাকে এনে দাও। পরীক্ষা করা দরকার।"

অনামিকা তার ঘর থেকে একটা মোড়ক এনে কর্নেলকে দিল। আমরা ওর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতা ফিরে চললুম। কর্নেল ওকে প্রচুর আশ্বাস দিতে ভুললেন না অবশ্য।

পথে কর্নেল পালকগুলো বের করে দেখতে দেখতে বললেন, "পাখিটাখি নিয়ে আমিও বিস্তর ঘাঁটি। কিন্তু এ পালক যে কোন পাখির হতে পারে, মাথায় আসছে না।"

বললুম, "আবার কোন পাখির? হাট্টিম পাখির। আপনি দেখেননি বলে কি হাট্টিম পাখি থাকতে পারে না? পৃথিবীতে বিস্তর আজগুবি জীব থাকতে পারে।"

কর্নেল হাসলেন। "পারে। কিন্তু লিখতেও পারে কি? কিংবা নিজের ছবি আঁকতে? নিজের নামে ছড়া বানাতে?"

হ্যাঁ-সেও একটা কথা। অর্থাৎ পেছনে মানুষ আছে। ধরুন, মানুষটা হাট্টিম দুটোর মালিক।"

"বেশ তো। কিন্তু কালোবাবুকে সে ভয় দেখাবে কেন?"

"ভয় কোথায় দেখাল? রসিকতা করছে। আর কালোবাবু রসিকতায় ভয় পাচ্ছেন।"

"কিন্তু কেন রসিকতা করছে?"

"এমনি। মানুষের স্বভাব রসিকতা করা। বুড়ো মানুষ—তাতে হয়তো বদরাগী। তাই—"

আমার কথায় বাধা পড়ল। পাশ দিয়ে হঠাৎ একটা কালোরঙের মোটর গাড়ি এগিয়ে সামনে চলে এল এবং আমি দুর্ঘটনার আতঙ্কে ব্রেক কষে গাড়ি থামালুম। সামনের গাড়িটাও থেমে গেল। তারপর দু'দিক থেকে দু'জন মুখোশপরা লোক বেরিয়ে একজন আমার পাশে এবং অন্যজন কর্নেলের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের দুজনের হাতেই রিভলভার। কর্নেলের দিকের লোকটা হিসহিস করে বলল, "এই বুড়ো ঘুঘু! শিগগির মোড়কটা দে। নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কর্নেল নিরীহ মুখ করে বললেন, "কিসের মোড়ক চাইছ বাবা?"

মুখোশপরা লোকটা গাড়ির জানালা দিয়ে কর্নেলের কানে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বলল, "ন্যাকা!" তখনও কর্নেলের হাতে হাট্টিম পাখির পালকের মোড়কটা রয়েছে। সে সেটা খপ করে অন্য হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। তারপর শাসিয়ে বলল, "ফের যদি স্বর্গপুরীতে নাক গলাতে গেছ তো দেখবে কী হয়!"

মোড়কটা হাতিয়ে লোকটা করল কী, আমার গাড়ির সামনের টায়ারে রিভলভারের গুলি ছুড়ল। হিস করে শব্দ হল। বুঝলুম, রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো আছে। আমার পাশের লোকটাও আরেকটা টায়ার ফাঁসিয়ে দিল গুলি ছুড়ে। তারপর কালো গাড়িটাতে চেপে চলে গেল। রাগে দুঃখে অস্থির হয়ে ওই গাড়ির নম্বর টুকতে যাচ্ছি, কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "ডার্লিং! ওটা আসল নম্বর নয়। গাড়িতে আসল নম্বর ঝুলিয়ে কেউ এসব কাজ করতে আসে না!"

গনগনে রোদে রাস্তার মধ্যে গাড়িটা নিয়ে বিপদে পড়লুম দেখছি। দুধারে ফাঁকা মাঠ। বেরিয়ে টায়ারের অবস্থা দেখতে দেখতে বললুম, "কর্নেল! হাট্রিমাটিম টিমের পাল্লায় পড়ে দুটো নতুন টায়ার গচ্চা যাবে জানতুম না। ওঃ! হাত নিসপিস করছে—সঙ্গে আমারও রিভলভার আছে। অথচ টায়ার দুটো ফেঁসে গেল!"

"যাবে না।" কর্নেল বললেন। "তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কিনে দেবে। কারণ এই হাট্রিমরহস্য কাগজের প্রচার আরও বিশহাজার বাড়িয়ে দেবে। কলম বাগিয়ে তৈরি হও বৎস!"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "আপনার কাছেও তো রিভলভার আছে নিশ্চয়। আমি না হয় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলুম। আপনি কেন রিভলভার বের করলেন না? ওরা গুলি ছোড়ার আগেই....."

কর্নেল গাড়ির ভেতর ঝুঁকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "তাতে আমাদের প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে যাই হোক, একটা পালক সময়মতো সরিয়ে ফেলেছিলুম। ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। এই দেখো।"

কর্নেলের হাতে একটা পালক দেখতে পেলুম। বললুম, "কিন্তু ওরা পালকগুলো হাতাতে এসেছিল কেন বলুন তো? এগুলো কী এমন জরুরি ওদের কাছে?"

কর্নেল হাসলেন। "ওরা আমাকে চেনে। শুনলে না আদর করে বুড়ো ঘুঘু বলে সম্ভাষণ করল?" এই পালকেই সম্ভবত কোনও সূত্র লুকিয়ে আছে।".....

ঘুঘুডাঙার মাঠ থেকে দু'মাইল দূরের একটা গ্যারাজে খবর দিয়ে ব্রেকভ্যানে করে গাড়ি টেনে এনে এবং ফাঁসা টায়ার কোনওরকমে মেরামত করে কলকাতা ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে কর্নেলের বাড়ি গিয়ে দেখি, উনি একগাদা পুরনো বিলিতি খবরের কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। আমাকে দেখে বললেন, "বোসো ডার্লিং! খবর আছে।"

বললুম, "সে তো দেখতেই পাচ্ছি। লন্ডনের ইভনিং স্টার পত্রিকা ঘাঁটছেন!"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ১৮৫৭ সালে ভারতের সিপাহি বিদ্রেহের খবর পড়ছিলুম।"

"কিন্তু হাট্রিমরহস্যের কী হল?"

কর্নেল আরও জোরে হেসে বললেন, "বুঝতে পারছি, টায়ার ফাঁসিয়ে দেওয়াতে তুমি ওদের ওপর ভীষণ রেগে গেছ। তবে তোমার টায়ার ফাঁসানোর ঘটনার সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্ক আছে, জয়ন্ত?"

সোজা হয়ে বসে বললুম, "তার মানে?"

কর্নেল জরাজীর্ণ ইভনিং স্টারের পাতায় লাল চিহ্ন দেওয়া একটা খবর দেখিয়ে বললেন, "পড়ে দেখো। এই কাগজগুলো আমি সেবার লন্ডনে গিয়ে সংগ্রহ করেছিলুম একটা নিলামের দোকানে।"

খবরটা হল এই : বারাকপুর সেনানিবাসের ক্যাপ্টেন বার্ট জনসনের প্রিয় পাখি দুটি গতকাল লন্ডনে পৌঁছেই মারা পড়েছে। বারাকপুরে সিপাহিরা বিদ্রোহ করায় নিরাপত্তার জন্য ক্যাপ্টেন বার্ট পাখি দুটিকে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাখিদুটি অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির। জানা গেছে, ক্যাপ্টেন বার্ট এদের সংগ্রহ করেছিলেন আফ্রিকা থেকে। প্যাঁচার মতো মুখের গড়ন, মাথায় শিং আছে এবং দু'পায়ে দাঁড়ানো মতো লাগে। এরা প্রায় তিনফুট উঁচু। পিয়ানোর শব্দের মতো টিং টিং করে এরা নাকি ডাকে। পাখি দুটিকে মর্যাদার সঙ্গে ক্লিভল্যান্ড কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে।....

কর্নেলের মুখের দিকে তাকালে উনি আরেকটা কাগজ এগিয়ে দিলেন। লাল চিহ্ন দেওয়া আরেকটা খবরে চোখ দেল। এবার খুব অবাক হয়ে গেলুম।

"...গতরাতে ক্লিভল্যান্ড কবরখানায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। কে বা কারা ক্যাপ্টেন বার্টের দুটি পাখির কবর খুঁড়েছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে দেখে, দুটি পাখিরই পেট ধারালো অস্ত্রে চিরে রেখে গেছে তারা। মৃত পাখির পেট চেরার কারণ নিয়ে পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের খবর দেওয়া হয়েছে।"...

কর্নেল আরও একটা 'ইভনিং স্টার' এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার আশা করি রহস্য অনেক স্পষ্ট হবে।"

"..স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ক্যাপ্টেন বার্ট পাখিদুটিকে দুটি বহুমূল্য রত্ন গিলিয়েছিলেন। চোরেরা যেভাবেই হোক সেই খবর জানত। ক্যাপ্টেন বার্টের কাছে এ সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পাঠানো হয়েছিল। তিনি কবুল করেছেন। বিদ্রোহের সময় রত্নদুটি লুঠ হওয়ার ভয়ে তিনি একাজ করেছিলেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এখন সেই রত্নদুটি উদ্ধারের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আরও জানা গেছে, রত্নদুটি অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন বার্ট উপহার পেয়েছিলেন।"...

পড়ার পর বললুম, "এতকাল পরে ওইসব ঘটনার সঙ্গে হাট্টিম রহস্যের কী সম্পর্ক আছে, আমার মাথায় আসছে না।"

কর্নেল হাসলেন। "কালোবাবুর জানালায় রাতবিরেতে সেই পাখিদুটোরই ভূত এসে ভয় দেখাচ্ছে, জয়ন্ত।"

"কেন?"

"সেই নবাবি রত্নদুটো তারা ফেরত চায়।"

আমি নড়ে বসলুম। "অ্যাঁ! বলেন কী? কালোবাবুর কাছে ও জিনিস কীভাবে এল? সে তো সেই লন্ডনের কবরখানা থেকে চোরেরা হাতিয়ে নিয়েছিল। একশো পঁচিশ বছর পরে ঘুঘুডাঙার কালোবরণ মুখুয্যের কাছে.... ধ্যাৎ! আমি এর একবর্ণ বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে একটা যোগসূত্র আছেই।"

"হ্যাঁ—সেটা ওই বিদঘুটে আফ্রিকান পাখি দুটোর ব্যাপারে।"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "আজ সন্ধ্যায় আমরা আবার ঘুঘুডাঙা যাব, জয়ন্ত। তৈরি থেকো। তবে না—গাড়ি করে নয়। বাসে যাব এবং অন্ধকারে মাঠ ঘুরে স্বর্গপুরীতে ঢুকব।"

তিন

দিনটা খুব উত্তেজনার মধ্যে কেটে গেল। পাঁচটায় খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়ে কর্নেলের কথামতো লালবাজারের পুলিশ দপ্তরের সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে গেট দিয়ে বেরুতে দেখলুম কর্নেলকে। কাছে এলে বললুম, "পুলিশের দফতরে ঢুকেছিলেন দেখছি। আমি ভেবেছিলুম এখান থেকে বুঝি ঘুঘুডাঙার বাস ধরা যায়।"

কর্নেল বললেন, "বাস ধরব এসপ্ল্যানেডে। এল-২০ নম্বরে বারাকপুর যাব। সেখান থেকে ঘুঘুডাঙার বাস পাব।"

"লালবাজারে কি কোনও সূত্র পেলেন?"

কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "রোখকে! রোখকে!" তারপর আমাকে হ্যাঁচকা টানে সঙ্গে নিয়ে একটা মিনিবাসের দিকে দৌড়ুলেন। পরে বুঝলুম, এই মিনিবাসটা বারাকপুর যাচ্ছে। ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা।

বারাকপুরে একটা বাসস্ট্যান্ডে নামলুম যখন, তখন সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। সেখানে ঘুঘুডাঙার বাস পাওয়া গেল। ঘুঘুডাঙার স্টপে নেমে দেখি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লোডশেডিং। কর্নেল বললেন, "পেছনে চর লেগেছিল, ডার্লিং! লালবাজারের উল্টোদিকে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, মনে হচ্ছে তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছি।"

আমরা মাঠ ঘুরে স্বর্গপুরীর পেছনে গেলুম। দুজনের সঙ্গেই টর্চ আছে। কর্নেল গতকাল এসেই বাড়ির চৌহদ্দি মুখস্থ করে ফেলেছেন দেখছি। অবশ্য বরাবর তাঁর এসব ব্যাপারে খুব দক্ষতা দেখে আসছি। এবার আর টর্চ জ্বালতে নিষেধ করলেন। আমাকে ইশারা করলেন পেছনে আসতে। এদিকে নিচু পাঁচিল আছে। দোতলায় অনামিকার ঘরে লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। ওর দাদুর ঘরেও আলোর আভাস পেলুম বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে।

উত্তর পূর্ব কোণে গিয়ে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, "এখানে একটা মন্দির আছে। এস আমরা মন্দিরের কাছে যাই।"

অন্ধকারে ততক্ষণে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। মন্দিরটা পুরনো মনে হল। সামনের চত্বরে একটা আটচালার ওদিকে একটা ঝোপের আড়ালে দু'জনে বসে রইলুম।

বসে আছি তো আছি। বাতাস বইছে। কিন্তু মশার উৎপাত প্রচণ্ড। একসময় ফিসফিস করে বললুম,"এখানে আমরা বসে আছি কেন? মশার কামড়ে যে ঢোল হয়ে গেলুম ফুলে!"

কর্নেল বললেন, "চুপ!"

অমনি দেখলুম, স্বর্গপুরীর দিক থেকে মাটির ওপর টর্চের আলো ফেলে কেউ এগিয়ে আসছে। সে মন্দির চত্বরে এসে একটু দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর সটান গিয়ে মন্দিরে ঢুকল।

কর্নেল আমাকে খোঁচা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে মন্দিরের দরজায় গিয়েই টর্চ জ্বেলে বললেন, "ডিমদুটো আছে তো মুখুয্যে মশাই?"

দেখলুম, বোঁ-ও করে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন অনামিকার দাদু। মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। আর ওঁর একটা হাতে একটা কালো চোঙ যেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "এই শিবলিঙ্গের নকলটা চমৎকার বানিয়েছেন কিন্তু। এবার দয়া করে ঘর থেকে আসল পাথরের শিবলিঙ্গটা এনে যথাস্থানে বসিয়ে দেবেন। আর এক কাজ করুন, হাট্টিম পাখির ডিম দুটো আমাকে দিন। তাহলে আর আপনাকে উদ্বেগ পোয়াতে হবে না। কেউ ভয় দেখাতেও আসবে না। ডিম দুটো সরকারের শুল্ক দফতরের প্রাপ্য নয় কি মুখুয্যে মশাই? হ্যাঁ—দিন, দিন। ও দুটো কাস্টমসকে ফেরত দিতে হবে।"

নকল শিবলিঙ্গটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে দিলেন কালোবাবু। একেবারে হতবাক দশা ওঁর। পা দুটো কাঁপছে।

কর্নেল নকল কাঠের তৈরি শিবলিঙ্গ থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে বললেন, "আপাতত এই নকল শিবলিঙ্গ আগের মতো বসানো থাক। পরে আসলটা এনে বসিয়ে দেবেন। আসুন। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়।"

কালোবাবু গলার ভেতর থেকে বললেন, "চলুন।"

খিড়কি দিয়ে বাগানে ঢুকে আমরা সোজা বাড়ির দোতলায় ওঁর ঘরে গেলুম। অনামিকা সাড়া পেয়ে বেরিয়েছিল। প্রথমে অবাক হয়ে পরে একটু হেসে ফেলল। ওর দাদুর অবস্থা দেখেই।

কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কালোবাবু বললেন, "অনি! আমাদের চা এনে দে! গলা শুকিয়ে গেছে।" তারপর কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, "আপনি কেমন করে জানলেন কে জানে! ব্যাপারটা জানতাম শুধু অনির মা আর আমি। আপনার তো জানার কথা নয়!"

কর্নেল বললেন, "তা ঠিক। তবে ব্যাপারটা অনুমান করতে আমাকে বিশেষ মাথা ঘামাতে হয়নি। ওই ছড়ার ভেতর ডিমের কথা আছে এবং আপনার ছেলে কাস্টমস অফিসার ছিলেন।

তাঁকে স্মাগলাররা খুন করেছিল। দামি রত্নকে সাংকেতিক ভাষায় স্মাগলাররা ডিম বলে। কাজেই...”

বাধা দিয়ে কালোবাবু বললেন, “হ্যাঁ—দেবুর কাছে শুনেছি কথাটা। দেবুকে ওর নিউ আলিপুরের বসায় ফলো করে এসে গুলি করে পালায় ওরা। দেবুর বুকে গুলি লেগেছিল। বউমাকে সে মৃত্যুর আগে শুধু বলতে পেরেছিল, পকেটে দুটো জিনিস আছে। সামলে রাখো। আর কোনও কথা বলতে পারেনি। স্মাগলিং ঘাঁটি থেকে এই রত্ন দুটো উদ্ধার করে বাসায় আসছিল। তখন রাত প্রায় বারোটা।”

“তাহলে আপনার বউমা আপনাকে এ দুটো রাখতে দিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ। কিন্তু আমার মাথায় আসেনি, এ জিনিস সরকারের ঘরে জমা দেওয়া উচিত।”

“আজ রাতে যদি ওরা আপনাকে ভয় দেখাতে না আসে, আর কোনওদিনই আসবে না। কারণ কাল সকালেই জয়ন্তদের কাগজে খবর বেরুবে। ওরা দেখবে পাচার করা রত্ন দুটো সরকারের ঘরে জমা পড়েছে। আর ফিরে পাওয়ার আশা নেই।”

অনামিকা চা নিয়ে এল ট্রেতে, সবাইকে চা দিয়ে একপাশে বসল সে। তারপর বলল, “পালকগুলো পরীক্ষা করেছেন কর্নেল?”

কর্নেল বললেন, “হ্যাঁ। ওগুলো সিন্থেটিক ফাইবার দিয়ে তৈরি নকল পালক।”

“তাহলে ওই বিদঘুটে পাখিদুটোও নকল পাখি?”

“তা আর বলতে? ওরা ভেবেছিল, বুড়োমানুষ—তাঁকে এভাবে ভূতের ভয় দেখালে ডিম দুটো ফেরত পেতে অসুবিধে হবে না।”

কালোবাবু রাগ দেখিয়ে বললেন, “আমি ন্যাকা, না বুদ্ধু? এদুটো দামি জিনিসকে সত্যি সত্যি হাট্টিমাটিমের ডিম ভেবে ফেরত দিতে চাইব?”

“ওরা তাই ভেবেছিল। রিটায়ার্ড স্টেশনমাস্টার। ৭৫ বছর বয়স। তিনি কি আর রত্ন চিনতে পারবেন? তাছাড়া রত্ন দুটো দেখুন, অবিকল সাদা ডিম যেন।”

আমি বললুম, “সব বুঝলুম। কিন্তু দোতলার ওই জানালায় অত উঁচুতে নকল পাখি নিয়ে কীভাবে উঠত ব্যাটাচ্ছেলেরা?”

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, “আমার নাক গলানোতে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—আজ তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে। আমার ধারণা, ওরা মরিয়া হয়ে সম্ভবত আজ রাতেই শেষ চেষ্টা করবে।”

কালোবাবু লাঠি ঠুকে বললেন, “আসুক না! ছাতু করে দেব। দেবুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব।”

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। “জয়ন্ত তুমি থাকো। আমি একবার চুপিচুপি থানা থেকে আসছি। দেখি, লালবাজারের ওঁরা থানায় এসে গেছেন নাকি। আমি খিড়কি দিয়ে বেরুব। অনি, তুমি তোমাদের কানাইকে বলো, খিড়কির দরজাটা আটকে দিয়ে আসবে।”...

চার

ঢং ঢং করে দেয়ালঘড়িতে রাত বারোটা বাজল। কালোবাবুর ঘরে আলো নিভিয়ে আমরা বসে আছি। কর্নেল থানা থেকে ফিরে এসেছেন। আমরা ওত পেতে আছি হাট্টিমাটিমের অপেক্ষায়।

হঠাৎ পুবের সেই জানালার খুটখাট শব্দ হল। তারপর ভুতড়ে গলায় হিঁ হিঁ শব্দ করে কেউ বলে উঠল, “আঁমাদের ডিঁমদুটো দেঁ! এঁক্ষুনি দেঁ! কী? দিঁবিনে? ঠুঁকরে চোঁখ উঁপড়ে নেব।”

বারণ ছিল কথা বলতে! কিন্তু কালোবাবু টর্চ জ্বেলে লাঠি উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, “তবে রে হারামজাদার দল! দিচ্ছি তোদের ডিম!”

টর্চের আলোয় দেখলুম, জানালায় দুটো প্রকাণ্ড পেঁচার মতো মুখ, মাথায় দুটো শিং, ভয়ংকর বিদঘুটে হাট্রিমাটিম টিম। চোখ দুটো যেন জ্বলছে!

আর তারপরই ওপাশে নিচের বাগানে যেন হুলস্থূল শুরু হয়েছে। গুলির শব্দ। পাকড়ো পাকড়ো চিৎকার। হাট্রিম দুটোও সাঁৎ করে সরে গেল জানালা থেকে। কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত! শিগগির!"

নিচে নেমে বাড়ি ঘুরে পেছনের বাগানে গিয়ে দেখি, একদঙ্গল পুলিশ, দুটো লোককে পাকড়াও করে ফেলেছে। ঘাসের ওপর পড়ে আছে হাট্রিমদুটো। তাদের পায়ের সঙ্গে দুটো লম্বা বাঁশ বাঁধা। বুঝলুম ওই বাঁশের সাহায্যেই ওদের দোতলার জানালায় তুলে ধরত এরা।

আরও মজা আবিষ্কৃত হল। একটির মুখের ভেতর ছোট্ট মাইক বাসানো। একটা তার পালকের ভেতর দিয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে নেমে এসেছে। ঘাসের ওপর পড়ে আছে একটা স্পিকার। স্পিকারের সঙ্গে ব্যাটারি ফিট করা আছে। খুব ফন্দি তো এদের! স্পিকারে ভূতুড়ে স্বরে ডিম ফেরত চাওয়া হচ্ছিল তাহলে।

এখন মুখোশ পরে না থাকলেও লোকদুটোর গড়ন দেখেই চিনতে পারছিলুম, এরাই কাল আমার গাড়ির টায়ার ফাঁসিয়েছিল।

লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার সাবির আমেদ হাসতে হাসতে বললেন, "যাক। বহুদিন ফেরারি হয়ে বেড়াচ্ছিল দুই কুখ্যাত ডাকু। কর্নেল, এরাই সেই জগু আর হায়দার। পোর্ট এলাকায় এদের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়েছিলুম তিনটে বছর। বিদেশ থেকে জাহাজে দামি মাল এলেই এদের দলবল সেগুলো সরিয়ে ফেলত।"

কালোবাবু ডাকু দু'জনের সামনে মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "ডিম চাঁই? অ্যাঁ?" তারপর ভেংচি কেটে সুর করে ছড়া আওড়ালেন :

"হাট্রিমাটিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্রিমাটিম টিম।"

অনামিকা দাদুর কাণ্ড দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।...

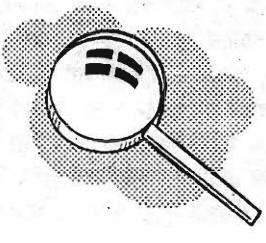

কালো কুকুর

সেবার শরৎকালে একদিন গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একথা-ওকথার পর হঠাৎ বললেন, "ডার্লিং! তোমার কি ছিপে মাছধরার নেশা আছে?"

শুনে একটু মনমরা হয়ে বললুম, "হুঁ, ছিল। ভীষণ ছিল। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবকে ঢোকার পর সারাক্ষণ খবরের পেছনে দৌড়ুব, নাকি ছিপ ফেলে জলের ধারে বসে থাকব?"

"থাকবে—যদি ছিপ ফেলে জলের ধারে বসে থেকেও তোমার কাগজের জন্য তোফা কোনও খবর জোটে।" বলে ধুরন্ধর বৃদ্ধ মুচকি হেসে সাদা দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানতে থাকলেন।

অবাক হয়ে বললুম, "ব্যাপারটা কী বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "মুর্শিদাবাদে রোশনিবাগ নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ঝিলে নাকি পুরনো আমলের বিশাল সব মাছের আড্ডা। কিন্তু সম্প্রতি ওই ঝিলে নাকি পিশাচের উপদ্রব হয়েছে। যে ছিপ ফেলতে একলা যায়, সে আর বাড়ি ফেরে না।"

"বলেন কী?"

"একটা ব্যাপার বোঝা যায়! ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বড় একাগ্রতার দরকার। ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে থাকতে হয়। আর সেই সুযোগে পিশাচ পেছন থেকে পা টিপে-টিপে এসে তাকে ধরে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন এ-কথা?" হাসতে হাসতে বললুম, "পিশাচ বলে সত্যি কিছু আছে নাকি?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, "জানি না। তবে ওখানকার লোকে নাকি পিশাচটাকে দেখেছে।"

"কেমন চেহারা তার?"

"কুকুরের মতো। কালো একটা কুকুরের বেশে সে আসে। তারপর আচমকা পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা কামড়ে ধরে! টানতে টানতে নিয়ে যায়।"

জেদ চড়ে গেল মাথায়। বললুম, "ঠিক আছে। তাহলে কালই আমাকে নিয়ে চলুন সেখানে। যতসব আজগুবি গল্প!"

পরদিন ভোরে জিপে রওনা হয়ে দুপুরের মধ্যে আমরা রোশনিবাগ পৌঁছে গেলুম। নবাবি আমলের সমৃদ্ধ আধাশহুরে গ্রাম। আমরা উঠলুম সেচ দফতরের বাংলোয়। ঝিলটা বাংলো থেকে দু-কিলোমিটার দূরে জঙ্গুলে পরিবেশে রয়েছে। আসলে এটা গঙ্গারই পুরনো একটা খাত। ঝটপট খাওয়া সেরে ছিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আসার সময় চৌকিদার পইপই করে বারণ করল, যেন দু'জনে সবসময় কাছাকাছি থাকি। নইলে পিশাচের পাল্লায় পড়ব।

কিন্তু একলা না হলে পিশাচটা আসবে না। তাই হাসতে হাসতে কর্নেলকে বললুম, "আপনি বরং পাখি-প্রজাপতির খোঁজে ঘুরতে থাকুন। আমি পিশাচটার প্রতীক্ষা করি।"

কর্নেলও হেসে বললেন, "তুমি না বললেও আমি জলের ধারে বসে থাকতে রাজি হতুম না জয়ন্ত!" তারপর বাইনোকুলারটা চোখে রেখে গাছপালায় পাখি খুঁজতে থাকলেন। যখন চার এবং ছিপ ফেলে জলের ধারে বসেছি, তখন উনি জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এবার কিন্তু একটু গা-ছমছম করতে থাকল। বারবার পিছনে ঘুরে দেখে নিচ্ছি। বুদ্ধি করে সঙ্গে একটা লোহার রড এনেছিলুম। সেটা পাশে রেখে ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে আছি। বুজকুড়ি উঠতে শুরু করেছে। চারে মাছ আসার লক্ষণ এটা। ফাতনা নড়লেই খ্যাঁচ মারব। কিন্তু তারপরই পেছনে গরগর গর্জন শুনে চমকে উঠলুম। ঝটপট ঘুরে দেখি, সত্যি একটা কালো কুকুর—বীভৎস হাঁ করে

চাপা গর্জন করছে সে। তার লাল মুখের দাঁতগুলো ঝকমক করছে হিংস্রতায়। ক্রূর কুতকুতে চোখে হিংসা ঠিকরে পড়ছে। লকলকে জিভ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কি রক্ত ঝরছে? একলাফে রডটা বাগিয়ে ছুটে গেলুম মরিয়া হয়ে।

কুকুরটা পিছিয়ে গেল। তারপর পালাতে থাকল। কিন্তু রাগে আমার তখন মাথার ঠিক নেই। ওর মাথাটা রডের বাড়ি মেরে দু ফাঁক না করে ফিরছি না—যা থাকে বরাতে। উঁচু-নিচু গাছপালা, কাঁটাঝোপ, তারপর চষা খেত, ঘাসে ঢাকা খোলামেলা পোড়ো জমি পেরিয়ে প্রাণীটা ছুটে চলেছে। আমিও ছুটে যাচ্ছি। মাঝে-মাঝে সে পেছনে ঘুরে যেন আমাকে দেখে নিচ্ছে ক্রূর এবং মুখভঙ্গি করে গর্জাচ্ছে। কাঁটায় আমার প্যান্টশার্ট ততক্ষণে ফর্দাফাঁই অবস্থা। জুতোয় জলকাদা লেগেছে প্রচুর। একখানে শুকনো লতাপাতায় জড়িয়ে আছাড়ও খেলুম। তারপর মনে হল, কে আমার নাম ধরে ডাকছে, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!" সম্ভবত কর্নেল ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছেন। আমি কান করলুম না। কালো কুকুরটা মিটার-পঁচিশেক দূরত্বে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি রক্তমাখা মুখ। কুতকুতে জ্বলন্ত চোখ। জিভ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা যেন রক্ত ঝরছে। আবার হুংকার দিয়ে দৌড়লুম। পিশাচ হোক, আর যাই হোক, আজ ওর একদিন কি আমার একদিন।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে রেললাইন দেখা যাচ্ছিল। সামনে ভাঙাচোরা একটা বাড়িও দেখতে পেলুম। তাহলে বোধ করি রোশনিবাগ স্টেশন-বাজারের পেছনদিকটায় এসে পড়েছি।

কালো কুকুরটা বাড়িটার কাছে গিয়ে অদৃশ্য হল। বাড়িটার কাছে যেই এসেছি, এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হল। আচমকা চারদিক থেকে কারা আমাকে খুদে হাতে যাচ্ছেতাই চিমটি কাটতে থাকল। চোখ বুজে কুঁজো হয়েছিলুম, তারপর রডটা তুলে বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে-ঘোরাতে চোখ খুলে দেখি, একঝাঁক চামচিকের পাল্লায় পড়েছি। চামচিকে যে এমন চিমটি কাটতে জানে, কে জানত! দ্বিগুণ জোরে রডটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চামচিকেগুলো ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম। কিন্তু খুদে জীবগুলো সমানে হামলা চালিয়ে যেতে থাকল। তখন হার মেনে দৌড়ে গিয়ে সামনের ভাঙা ঘরটার ভেতর ঢুকে পড়লুম।

চামচিকের ঝাঁকটা সেখানেও ঢুকে হামলা করল। বাড়িটার কোনও ঘরে দরজা-জানলা বলতে কিছু নেই। সব কারা হয়তো খুলে নিয়ে গেছে। এঘর থেকে ওঘর, তারপর আরেকটা ঘর—কোনও ঘরের ভেতর জঙ্গল গজিয়েছে এবং ছাদ ভাঙা, কড়িকাঠ ঝুলে রয়েছে। শেষে যে ঘরটার সামনে গেলুম, তার দরজা আস্ত আছে। দরজাটা খোলা। ভেতরে আসবাবপত্র দেখা যাচ্ছিল। হাঁফাতে হাঁফাতে সে-ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিলুম।

তারপর ঘুরে দেখি, ঢ্যাঙা-শুঁটকো চেহারার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন খাটের পাশে এবং আমার দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আছেন, ঠোঁটের কোনায় হাসিটাও যেন অস্বস্তিকর। ভদ্রলোকের পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, হাতের আঙুলে কয়েকটা পলাবসানো আংটি। একমাথা সাদা চুল।

কিন্তু তার চেয়ে অস্বস্তিকর, ওঁর হাতে একটা চকচকে ছুরি।

আমি কিছু বলার আগেই উনি ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন "রডটা দেখি।" তারপর আমার কাছে এসে হাত থেকে রডটা প্রায় ছিনিয়ে নিলেন। পাগল নয় তো? আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলুম। উনি রডটা জানলা গলিয়ে ছুড়ে ফেললেন। কিন্তু ঠোঁটের কোনায় সেই হাসিটা লেগে আছে। চেহারায় কেমন ঠাণ্ডা হিংসার ছাপ। ভয়ে-ভয়ে এবং অপ্রস্তুত মুখে বললুম, "আপনার ঘরে ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা করবেন। চামচিকের পাল্লায় পড়ে..."

কথা কেড়ে ভদ্রলোক খিকখিক করে হেসে বললেন, "খুব জ্বালিয়েছে বুঝি? তা ওদের পাল্লায় পড়লেন কীভাবে?"

"একটা কালো কুকুর তাড়া করে আনছিলুম। ঝিলে ছিপ ফেলে বসে ছিলুম। কোত্থেকে ওই কুকুরটা গিয়ে ঝামেলা করছিল।"

ভদ্রলোক ওপাশে ঘুরে বললেন, "দেখুন তো এই কুকুরটা নাকি।"

দেখেই চমকে উঠলুম। এতক্ষণে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। ঘরটা বেশ বড়। কোনার দিকে একটা বেদির-মতো উঁচু জায়গায় সেই সাংঘাতিক চেহারার কালো কুকুরটা দাঁড়িয়ে আছে চারপায়ে। সেই হিংস্র মুখভঙ্গি। রক্তলাল হাঁ-করা মুখ। ধারালো দাঁত আর লকলকে জিভ।

কিন্তু আশ্চর্য, কুকুরটা মমির মতো স্থির। শুধু তার হিংসুটে চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর।

ভদ্রলোক হাসলেন আবার। চোখ নাচিয়ে বললেন, "কী মনে হচ্ছে? সেই কুকুরটা না!"

গলা শুকিয়ে গেছে আতঙ্কে। বললুম, "কিন্তু ওটা তো মনে হচ্ছে স্টাফ-করা একটা কুকুর!'

"হ্যাঁ। আমার প্রিয় কুকুর জনি। মৃত্যুর পর ওর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছিলুম। তারপর কাঠের গুঁড়ো, তুলো, স্পঞ্জ এসব জিনিস স্টাফ করে ওর চেহারাটা ফিরিয়ে এনেছি। দারুণ জ্যান্ত দেখাচ্ছে, না?"

সায় দিয়ে বললুম, "দেখাচ্ছে। কিন্তু ..."

"কিন্তু কিসের এতে?" ভদ্রলোক এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার পিঠে হাত রাখলেন। "আমি ট্যাক্সিডার্মি অর্থৎ চামড়াবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেছি। এ তার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা। আপনি চামচিকের কথা বলছিলেন। দেখুন তো, ওই চামচিকেগুলো নাকি?"

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আবার আমায় চমক জাগল। সাদা দেয়ালের গায়ে একঝাঁক চামচিকে সেঁটে রয়েছে। জ্বলজ্বলে নীল চোখ তাদের। দেখতে দেতে শরীর হিম হয়ে গেল।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে একটা চামচিকে তুলে হাতের তালুতে রেখে বললেন, "ভীষণ জ্যান্ত দেখাচ্ছে, তাই না? যদি ছুরি দিয়ে কাটি, রক্ত বেরুতেও পারে, বলা যায় না।"

বললুম, "ট্যাক্সিডার্মিতে সত্যি আপনার অসাধারণ দক্ষতা। কিন্তু ওরা তো মৃত!"

"হ্যাঁ—আপাতদৃষ্টে মৃত।" বৃদ্ধ আবার মুচকি হেসে চোখ নাচিয়ে বললেন, "কিন্তু ওরা জীবিত হতে পারে। সেটাই আমার ট্যাক্সিডার্মির নতুন দিক। আশা করি, তার পরিচয় চমৎকারভাবে পেয়েছেন। এবার আসুন, আপনাকে আরেকটা জিনিস দেখাই।"

কালো কুকুরটার পাশ দিয়ে ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। পাশের ঘরে ঢুকলে উনি দরজাটা এঁটে দিলেন। অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। বৃদ্ধ এ-ঘরের জানালা দুটো খুলে দিয়ে বললেন, "এবার একে দেখুন।"

যা দেখলুম, আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরে উঠল। তেমনি বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক—পরনে প্যান্ট-শার্ট, পায়ে জাঙ্গলবুট আমারই মতো, হাতে একটা মাছধরা ছিপ এবং কাঁধে কিটব্যাগ। একেবারে জ্যান্ত দেখাচ্ছে তাকে। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটে একটু হাসি। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশ কিসের?" বৃদ্ধ চোখ কটমট করে বললেন। "মানুষ মরণশীল। তার শরীর একদিন গলে পচে নষ্ট হয়ে যায় প্রাকৃতিক নিয়মে। হিন্দুরা অবশ্য চিতার আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। এই লোকটার শরীরও ধ্বংস হয়ে যেত। অথচ ওকে আমি অমরত্ব দিয়েছি। কখনও-সখনও ওর ছিপ ফেলা নেশার কথা বিবেচনা করে ওকে ঝিলে ছিপ ফেলতে যেতেও অনুমতি দিই। যাই ভাবো আমাকে, আমি কিন্তু এসব ব্যাপারে খুব উদার।"

ভয়ে-ভয়ে সায় দিলুম। "আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো বটেই।"

বৃদ্ধ হঠাৎ হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার হাত ধরে চাপা গলায় বললেন,"তুমি অমরত্ব চাও না?"

আঁতকে উঠে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললুম, "না, না! হাত ছাড়ুন আপনি।"

বৃদ্ধের গায়ে প্রচণ্ড জোর। আর হাতটাও কী ভীষণ ঠাণ্ডাহিম! রক্ত জমে যাচ্ছিল। খিকখিক করে হাসতে হাসতে বললেন, "তেমন কিছু যন্ত্রণা হবে না। জাস্ট একটু মাথা ঘুরবে। গয়ে মলম

মাখিয়ে দিয়ে চামড়াটা ছাড়িয়ে নেব। তারপর তোমার চামড়ার ভেতরে কাঠের গুঁড়ো, তুলো, স্পঞ্জ ঠেসে দেব। ব্যস! অমর হয়ে যাবে।"

বলে কী! আমার জ্যান্ত শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে আর তেমন কিছু যন্ত্রণা হবে না! প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়ে বললুম, "আমি অমর হতে চাইনে। হাত ছেড়ে দিন।"

বৃদ্ধের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। "দেখো বাপু, তোমার এমন সুন্দর চামড়ায় খুঁত হবে বলে ছুরির খোঁচা মারছিনে। এর আগে এমনি করে গোটাতিনেক চামড়া নষ্ট করেছি। বরবাদ হয়ে গেছে এক্সপেরিমেন্ট। জনার্দন বক্সির এক কথা। নড়লেই খোঁচা খাবে। যাও, টেবিলে শুয়ে পড়ো লক্ষ্মী ছেলের মতো।"

তাহলে এই পাগলা ট্যাক্সিডার্মিস্টের নাম জনার্দন বক্সি? কাকুতি-মিনতি করে বললুম, "প্লিজ জনার্দনবাবু! আমাকে ছেড়ে দিন। আপনার এক্সপেরিমেন্ট তো সফল হয়েছে। আর কেন?"

জনার্দন বক্সি খিকখিক করে হেসে বললেন, "আহা ভয় নেই। ভয় নেই। টেরই পাবে না।" তারপর সম্ভবত মলমের বোতল আনতে যেই ঘুরেছেন এবং হাতটা একটু আলগাও হয়েছে, এক ধাক্কায় ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা খুলে একলাফে পাশের ঘরে গিয়ে পড়লুম। তারপর একেবারে বাইরে।

ভূতুড়ে চামচিকেগুলো হামলা করল আবার। পেছনে সেই কালো কুকুরটাও গর্জে তেড়ে এল কোত্থেকে। আমি চোখ বুজে নাক-বরাবর দৌড় দিলুম। কিছুটা এগিয়ে একটা গাছের শেকড়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়তেই কুকুরটা আমাকে বাগে পেল। বিকট গর্জন করে ঝাঁপ দিল সে। সেই সঙ্গে যেন আকাশ ফাটানো একটা শব্দও কানে এল।

ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেলুম সেই মুহূর্তে!...

যখন জ্ঞান হল, তাকিয়ে দেখি বাংলোয় শুয়ে আছি। আলো জ্বলছে। বিছানার পাশে বসে আছেন আমার বৃদ্ধ বন্ধু। একটু হেসে বললেন, "আশা করি সুস্থ হয়েছ ডার্লিং! না—না, অমন করে চারপাশে তাকিয়ে দেখার কিছু নেই। জনার্দন বক্সির কালো অ্যালসেশিয়ানটাকে বাধ্য হয়ে গুলি করে মেরেছি।"

অবাক হয়ে বললুম, "কিন্তু ওটা তো সত্যিসত্যি ভূত অথবা পিশাচ! কারণ বক্সিবাবু ওর মরা দেহটা স্টাফ করে রেখেছেন দেখেছি।"

"বক্সির দুটো কুকুর ছিল। দেখতে একই রকম। কোনও কারণে একটা কুকুর মারা পড়লে তাকে সে স্টাফ করে রেখেছিল। আর দ্বিতীয় কুকুরটাকে সে মানুষের মাংস খাওয়ানো শিখিয়েছিল। চামড়া ছাড়িয়ে মাংসগুলো খেতে দিত।"

"কিন্তু চামচিকেগুলো?"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "কিছু চামচিকে মেরে বক্সিবাবু স্টাফ করে রেখেছিল বটে। তবে তোমার ওপর হামলা করেছিল যারা, তার ভূত নয়। জ্যান্ত চামচিকে। তাদেরও সে মানুষের মাংস খাওয়ানো শেখাত। যাই হোক, তোমার মাংস খুবলে নিতে পারেনি ওরা । খুব লাফালাফি করেছিলে কি না।"

"ওই পাগলা খুনিটাকে ধরিয়ে দিন এবার পুলিশের হাতে!"

"দিয়েছি। এতক্ষণ সে থানার লক-আপে।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। টেবিল থেকে এক গ্লাস গরম দুধ এনে বললেন, "খেয়ে নাও ডার্লিং! গায়ে জোর পাবে। কাল সকালে আবার গিয়ে ঝিলে ছিপ ফেলতে আশা করি আর ভয় পাবে না। আমার ধারণা, ঝিলের মাছগুলো বেশ বড়োই।"

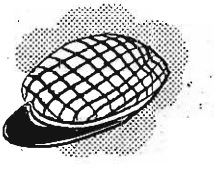

ঘটোৎকচের জাগরণ

সেহরাগড় ফরেস্ট বাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ডক্টর আর পি গুন্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ!

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য! অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতেও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ডাঃ গুন্টা হাসতে হাসতে বলেন, "কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরুলে সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যাই, পেছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনও বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতি মুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকে না কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে।"

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। বললাম, "আপনার এই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত, তাহলে লোকেরা আপনাকে ভয়ও পেত।"

ডঃ গুন্টা বললেন, "রক্ষে করুন মশাই। তাহলে লোকেরা আমাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলে কর্নেল?"

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন। বললেন, "আচ্ছা ডঃ গুন্টা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?"

ডঃ গুন্টা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন। "তা তো লক্ষ্য করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনেক আগে একদিন ভোরবেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন...মাই গুডনেস!"

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, "কী ব্যাপার?"

"আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতে নেই।" ডঃ গুন্টা মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন, "কী আশ্চর্য! সত্যি তো ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল আমার। ওই প্রথম মাথায় ঠোক্কর খাওয়ার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল। ...হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল কারণ তার আগে তো বাথরুম কেন, কোনও ঘরের দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।"

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বাস্ত করতে চেয়েই বললে, "পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের একটা হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচণ্ড শক্তিও এসে যায়।"

ডঃ গুন্টা আস্তে বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়সে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কেন এ খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলাম ছেলেবেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি শত ফুট উঁচু হলাম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলাম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।"

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব নিচু করে বেরিয়ে গেলেন! কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক চোখে। আমিও।

ডঃ গুন্টা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলাম। বললাম, "কর্নেল, ডঃ গুন্টা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি!"

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে! নিচে ছোট্ট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বন-জঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌঁছুতে ঘন্টাখানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেয়ালের ওপর বসে আমি নিচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলাম।

কতক্ষণ পরে পেছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ডঃ গুন্টা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ গুন্টা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দু'হাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নিচে ছুড়ে ফেললেন। নিচে বিকটা শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে গড়াতে চলল। ডঃ গুন্টা হাত নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে আমার অস্বস্তি হল। বললাম, "ডঃ গুন্টা। আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে!"

ডঃ গুন্টা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, "মিঃ চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলি!"

আঁতকে উঠে বললাম, "সে কী! না—না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন মশাই!"

"আমাকে ঘটোৎকচই মনে হচ্ছে না আপনার?"

"হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে।"

ডঃ গুন্টা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, "খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?"

"পেয়েছি বৈকি! আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুড়ে ফেললেন!"

"আরও শক্তি দেখবেন নাকি?" বলে ডঃ গুন্টা দুর্গের উঁচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দু'হাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে পালিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ডঃ গুন্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন— আগের মতো দুহাতের ধুলো ময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনি আমি নিচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলাম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। ভাগ্যিস নিচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, "ডঃ গুন্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন! কী সব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবে!"

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, "এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি ডার্লিং! তবে ডঃ গুন্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই!"

"নেই মানে? আমাকে ছুড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে বলেছিলেন!"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "সেই গল্পটা জানো তো? এক এক পাগল যাচ্ছেতাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই বলেছে, ওরে! দেখিস যেন ঢিল ছোড়ে না— অমনি পাগল বলে উঠল, বাঃ! মনে পড়িয়ে দিয়েছে রে! বলে সে তখন ঢিল ছুড়তে লাগল। ডঃ গুন্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাই হোক, এস—বাংলোয় ফেরা যাক।"...

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ডঃ গুন্টাকে ফিরতে দেখলাম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, 'সেহরাগড় ফরেস্টকে জব্দ করে এলাম, কর্নেল! শ'খানেক শালগাছ

উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর ফোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেওয়ালও আস্ত নেই!"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলাম। দেখুন তো।"

ডঃ গুন্টা বললেন, "আরে তাই তো! আমার খিদে পেয়েছে যে! আমি খাব—প্রচুর।"

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়ুলেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললে, "মাথায় ঠোক্কর লাগবে ডঃ গুন্টা!"

ডঃ গুন্টা তক্ষুণি নিচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে, পর্দা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, "হুজুর"।

"এটুকু খানা তুমি আমার জন্য রেখেছ? আমি কি মাছি, না পিঁপড়ে?"

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, "আর তো কিছু নেই হুজুর।"

"চলো দেখি, তোমার কিচেনে কী আছে।"

ডঃ গুন্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটিসুটি পেছনে পেছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে।

"হুজুর! হুজুর! উনি আদমি না রাক্ষস? বাপরে বাপ! চাল ময়দা সবজি যা ছিল—সব আস্ত গিলে খাচ্ছেন! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুন হুজুর!"

ডঃ গুন্টার হাঁক শোনা গেল, "চৌকিদার! চৌকিদার!"

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, "দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখনি ওপরয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।"

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়ুনোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর কিচেনের দিক থেকে ডঃ গুন্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, "এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি!"

কর্নেল সহাস্যে বললেন, "জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিণ ধরে খান ডঃ গুন্টা। কী আর করবেন!"

ডঃ গুন্টা সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন। "আরে তাই তো বটে!" বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কর্নেল! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে! চলুন এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কাণ্ড বেধে গেল।"

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না।

ঘণ্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ডঃ গুন্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলাম, "এতক্ষণে হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেল।" এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দু'জন ফরেস্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত এসে গেলেন। রেঞ্জার সায়েব আমার চেনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "কর্নেল। এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক...."

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, "বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।"

রেঞ্জার বললেন, "দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।"

"সে কি!"

"গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেস্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য কর্নেল! লোকটা একেবারে নরদানব কিংকং বললেই চলে।"

কর্নেল আস্তে বললেন "ঠিকই করেছেন! তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতর একটা ভয়ঙ্কর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতি এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।"

কথা থামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটাকে দেখে আসি।"

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। মাইল দুই এগিয়ে বাঁদিক একখানে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, "ওই যে ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দু'জনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

কাঠকুটো জ্বেলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরেরই কর্মী। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্যজনের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচণ্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে। একটু তফাতে দলাপাকানো রক্তাক্ত একটা লাশ পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললে, "এটা ফরেস্টগার্ড মনি সিংয়ের ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।"

কর্নেল বললেন, "ডঃ গুন্টার ডেডবডি কোথায়?"

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, "আসুন, দেখাচ্ছি।"

জায়গাটা খোলামেলা। একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোট্ট নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভর্তি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বলেন, "সর্বনাশ! ডেডবডিটা কোথায় গেল? জানোয়ারে নিয়ে গেল না তো?"

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বলেন, "নাঃ। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু....আশ্চর্য তো।"

"কী কর্নেল?"

"মনে হচ্ছে, ডঃ গুন্টা মারা যাননি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।"

"অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। দুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।"

যে দুটি লোক পাহারায় ছিল, তাদের একজন বলল, "কী একটা শব্দ শুনেছিলুম কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জ্বেলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।"

অন্য লোকটি বলল, "আমি ভেবেছিলুম কোনও জানোয়ার।"

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারারা ভয়ে আধমরা হয়ে বসে ছিল। যদি দেখত, ডঃ গুন্টার মড়া হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনও ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, "সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।"...

ফরেস্ট বংলোয় ফিরে এ রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তাছাড়া মশার খুব উৎপাত সে কথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাকছিল যথারীতি! এক সময় হঠাৎ বাইরে কী একটা ধাক্কার শব্দ হল। অমনি কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর

এমনি পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপিচুপি তালা খুলছে। তারপর টেবিল বাতিটা জ্বলে উঠল। ফিসফিস করে বললুম, "কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।"

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, "চুপ!"

উনি বারান্দার দিকের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং ডঃ আর পি গুন্টা। হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধুলো-ময়লা আর চাপচাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

কর্নেল বললেন, "যাক গে। এবার নিশ্চিতে ঘুমোনো যাবে।"

বললুম, "রহস্যটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্নেল!"

কর্নেল একটু হাসলেন। 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্রাংকেনস্টাইনের সেই দানব শেষ পর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ডঃ গুন্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।"...

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপে ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ। কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ। একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল হঠাৎ বললেন, "চলো জয়ন্ত, ডঃ গুন্টার খোঁজখবর নিয়ে আসি!" অবাক হয়ে বললুম, "সর্বনাশ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি?"

"বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।"

"কিন্তু..."

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, আমার ধারণা, ডঃ গুন্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই। আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশাকরি মনে আছে। কোনও কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভবিকতা এলে তাকে উত্যক্ত করা উচিত নয়।

রাত তখন প্রায় ন'টা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর! ডঃ গুন্টাকে সবাই চেনে—সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই! শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদের। লন পেরিয়ে যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ, অমায়িক হেসে বললেন, "কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

আমি তো অবাক। কর্নেল নমস্কার করে বললেন, "আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ডঃ গুন্টা।"

ডঃ গুন্টা ভুরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, "সেহরাগড়? সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাক্ গে, ভেতরে আসুন।"

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলুম! ডঃ গুন্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ্য করছিলুম! কর্নেল বললেন, "ডঃ গুন্টা, আপনার প্রোজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই কথাটা বলতে এসেছি—যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন!"

ডঃ গুন্টা চমকে উঠলেন। "কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেস্ট গার্ডকে আপনার ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে! সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমনকী, একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।"

ডঃ গুন্টা দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, "কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।"

"কিন্তু আপনি একজন বায়ো-ফিজিসিস্ট। আপনি জানতেন আপনার ফ্যান্টমপ্রোজেক্টের পরিণতি সাংঘাতিক হতে পারে।"

ডঃ গুন্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, "বিশ্বাস করুন, মাসতিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে, এখন একটুও মনে নেই।"

"আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না ডঃ গুন্টা।"

ডঃ গুন্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, "কী ব্যাপার কর্নেল?"

কর্নেল হাসলেন, "ল্যাবরেটরি ভাঙছেন! প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাই হোক, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।"

স্টেশনে পৌঁছে বললুম, "ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয় শুনেছ, মানুষের ব্যক্তিসত্তার তেমনি কোনও প্রতিরূপ আছে কি না, এ নিয়ে বায়োফিজিসিস্ট গবেষণা করেছেন। কতকটা ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই প্রতিরূপ ফ্যান্টম অস্তিত্ব কোনও মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রে একেবারে উল্টো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভাল কাজ করানো যায়, তেমনি খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যান্টম প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পারো। ভুলে যেও না মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভাল বা মন্দ, দুই-ই ঘটতে পারে।"

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না! তাই বললুম, "নিকুচি করেছে ফ্যান্টম ব্যাটার। তাকে জাগিয়ে কাজ নেই।"...

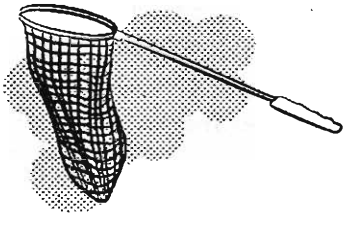

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ

আমার কুকুর জিমকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি দেখছি। এমন নয় যে তাকে কখনও বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতে আনিনি। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ি মুল্লুকে ঘুরছি। কিন্তু জিমের এমন পালাই-পালাই ভাবভঙ্গি তো কখনও দেখি না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, একেবারে বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় এসে ওর বুঝি অসুখ-বিসুখ করেছে। আমাদের সঙ্গে আছেন ভাগ্যক্রমে প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর মুরলীধর প্রসাদ। নৈনিতালের লোক। তিনি জিমকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, জিম ইজ অলরাইট। ওর কিস্যু হয়নি। তবে কী জানেন জয়ন্তবাবু? মানুষের যেমন, তেমনি সব প্রাণীরই এই একটা ব্যাপার আছে। সব জায়গায় মন টেকে না।

ভেবে পাইনি, এমন সুন্দর জায়গায় মন না টেকার কারণ কী থাকতে পারে? চারদিকে নীল সাগরে ঘেরা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। আমাদের ক্যাম্পের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা সমতল মাঠ। সেখানে নির্ভয়ে হরিণের পাল চরে বেড়ায়। কখনও লুকোচুরি খেলতে আসে সাদা রঙের দু'-একটা খরগোশ। পাখিও কম নেই। ঝাঁক বেঁধে মাঠে নেমে তারা পোকামাকড় খুঁজে খায়। কিন্তু আশ্চর্য, জিমকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি, সে অভ্যাসমতো পশুপাখিদের মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে বা তাড়া করে মজা লুটতে ছোটে না।

এমন কী, তার প্রায় নাকের ডগায় কোন পাখি বা খরগোশ বেয়াদপি করতে গেলেও জিম মুখেও ধমকায় না। খালি মুখ তুলে বোবার মতো তাকিয়ে থাকে। তার শরীর কেমন যেন থরথর করে কাঁপে।

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ, সন্ধের দিকে। ক্যাম্পের সামনে খোলামেলায় আগুন জ্বেলে আমরা যখন বসে গল্পসল্প করি, জিম আমার কোলে বসে মুখের ভেতর কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। মাঝে মাঝে যেন সে ভীষণ চমকে ওঠে।

সারারাত যতবার ঘুম ভাঙে, শুনতে পাই জিমের ওই বোবার মতো চাপা অদ্ভুত আওয়াজ। রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা বলে তার গায়ে একটুকরো কম্বল জড়ানো থাকে। দেখেছি, জিম কম্বলের ভেতর মুখটাও ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো শরীরে পুঁটিলির মতো গুটিয়ে রয়েছে। ভয়েই কি? কিসের ভয়? এখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু দেখছি না তো!

আজ তিন দিন হল আমরা এই দ্বীপে এসেছি। আমরা মানে, ওই ডঃ মুরলীধর প্রসাদ, আমি এবং আমাদের প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয়। আর একজন সঙ্গীও অবশ্য আছে। সে কর্নেলের 'পুরাতন ভৃত্য' শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। তাকে না আনলে এ অখাদ্য দ্বীপে না খেয়ে মরতে হত। তবে শুধু রান্নাবান্না নয়, ষষ্ঠীচরণ প্রহরী হিসেবেও বড় কড়া লোক। খুব চালাকচতুর এবং এই প্রৌঢ় বয়সে তার গায়ের জোরের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি।

আজও কর্নেল ভোরবেলা ডঃ প্রসাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সামনের মাঠের ওপারে উঁচু পাঁচিলের মতো বিশাল পাহাড় দ্বীপের একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বীপটাকে নাকি দু'ভাগে ভাগ করেছে পাহাড়টা। কর্নেলরা যান ওই পাহাড়ে।

এ দ্বীপের নাম ভেগা আইল্যান্ড। আর ওই পাহাড়টার নাম ওয়াকিমো মাউন্টেন। ওয়াকিমো কথাটার মানে নাকি 'বদরাগী'। পাহাড়টার এমন বিশ্রী নাম কেন? শুনেছি এ সমুদ্রে যারা মাছ

ধরতে আসে, তাদের বিশ্বাস; ওখানে একটা বেজায় বদরাগী দানো বাস করে। তাই মাছধরা জাহাজ এই দ্বীপের ছায়া মাড়ায় না।

কর্নেল কি দানোটাকে জব্দ করতে এসেছেন তাহলে? মোটেও না। কর্নেল যা বলেছেন, শুনে তাক লেগে যায়। ওয়াকিমো পাহাড়ে এক বিচিত্র প্রাণীর বাস। প্রাণীটা নেকড়ে এবং কুকুরের মাঝামাঝি। পনেরো হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানুষেরা জন্তু শিকার করে এনে গুহার ভেতর বসে মহানন্দে খেত। আর হাড়গোড় ফেলে দিত বাইরে। নেকড়েরা সেই লোভে গুহার কাছে জড়ো হত। কালক্রমে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে খেতে তারা শিকার করাই ভুলে গেল। মানুষ-ঘেঁষা হয়ে পড়ল। তারপর মানুষ তাদের বশ করে ফেলল। তারাই গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু মানুষের ভেতর যেমন, তেমনি জন্তুদের ভেতরও কিছু বেয়াড়া জীব থাকে। তেমন কিছু বেয়াড়া নেকড়ে মানুষের পোষ মানল না, অথচ শিকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা কী করল তখন? তারা অগত্যা পেটের জ্বালায় বাঁদর-হনুমানদের মতো উদ্ভিদভোজী—যাকে ইংরেজিতে বলে 'ভেজেটারিয়্যান' হয়ে গেল। গাছের পাতা, ফলমূল—এসব খেয়েই বেঁচে রইল।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, এইসব জাত-খোয়ানো নেকড়ের বংশধর এখনও কোথাও টিকে থাকতে পারে। কর্নেল কোন সূত্রে খবর পেয়েছেন, ভেগা দ্বীপের পাহাড়ে নাকি সেই আজব নেকড়ে-কুকুর এখনও আছে। তাই প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদকে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

আর আমি তো কর্নেল বুড়োর ছায়াসঙ্গী। যাকে বলে ন্যাওটা। তাই আমাকেও আসতে হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে হেলিকপ্টারে আসতে ঘন্টা পাঁচেক লেগেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগেনি। জিমকে সঙ্গে আনার কারণ, সেই আজব নেকড়ে-কুকুর বা কর্নেলের ভাষায় 'নেকুর' যদি একটা পাকড়াও করতে পারেন, পোষা কুকুরের সামনে তার আচরণ কেমনধারা হবে, পরীক্ষা করে দেখবেন। তাছাড়া জিমের জন্য একটা জরুরি কাজও আছে। জিমকে দেখিয়ে নেকুরদের ফাঁদে ফেলার মতলব ছিল কর্নেলের। পোষা ঘুঘু পাখির সাহায্যে ব্যাধরা যেভাবে বুনো ঘুঘু পাখি ডেকে এনে ফাঁদে ফেলে, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু দ্বীপে এসে জিমের হাবভাব দেখে কর্নেল আপাতত সে মতলব কাজে লাগাচ্ছেন না। লাগাতে চাইলে আমিও আপত্তি করতুম।

আজ তিন দিনের দিন একটা সন্দেহ জেগেছে। জিম কি তাহলে 'নেকুরের' ভয়ে এমন অস্থির?

কর্নেলের কাছে কথাটা তুলতে হবে। তবে জিম শক্তিমান অ্যালসেশিয়ান। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। দশাসই গতর। একবার একজন খুনে গুণ্ডাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। জিমের মতো সাহসী দুর্দান্ত কুকুর শাকপাতা খেকো নেকুরকে ভয় পাবে বলে মনে তো হয় না।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। গরিলাও তো মাংসাশী প্রাণী নয়। অথচ গরিলাকে সিংহও ভয় পায়।

দুই

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সকালে ক্যাম্পের সামনে চেয়ার পেতে বসে কফি খাচ্ছি। ষষ্ঠীচরণ তার কিচেন-তাঁবুর সামনে খোলামেলায় পিকনিকের উনুনের মতো উনুন বানাতে ব্যস্ত রয়েছে, কারণ কেরোসিন তত বেশি সঙ্গে আনা হয়নি এবং কতদিন এখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। জিম আমার চেয়ারের পায়া ঘেঁষে বসে আছে—মুখটা বেজায় বিষণ্ণ। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণ কাজ ফেলে আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে একটু হেসে বলল, ছোট সাহেব যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

বললুম, অত বিনয়ের অবতার তো তোমায় কোনওদিন দেখিনি ষষ্ঠী। ব্যাপারটা কী?

ষষ্ঠীচরণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমার বড্ড গা বাজছে।

অবাক হয়ে বললুম, সে কী হে ষষ্ঠী! তুমি অমন ডানপিটে সাহসী মানুষ। তোমার গা বাজছে মানে?

ষষ্ঠীচরণ আরও গলা চেপে বলল, এ দ্বীপটায় অমানুষ থাকে আজ্ঞে।

অমানুষ মানে? হাসতে হাসতে বললুম। । ও ষষ্ঠী। তুমি কি ভূতের ভয় পেয়েছ?

ষষ্ঠীচরণ এবার বসল। চারদিকটা দেখে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, এইমাত্তর আমার ওপর টুপটুপ করে ঢিল পড়ছিল। আপনার দিব্যি ছোটসাহেব। মিথ্যে কথা আমায় কখনও বলতে শুনেছেন?

মার্চ মাসের উজ্জ্বল সকালবেলা। আকাশে মেঘের কুটোটিও নেই। তাঁবুর পেছনে অবশ্য একটু তফাতে ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। কিন্তু সামনেটা ফাঁকা। সবুজ ঘাসের মাঠ ওয়াকিমো পাহাড় পর্যন্ত ছড়ানো। এই ফাঁকা জায়গায় দিনদুপুরে ষষ্ঠীকে ভূতেরা ঢিল ছুড়ে নাকাল করেছে, ভাবতেই হাসি পায়। আমি হো-হো করে হেসে বললুম, কই, চলো তো দেখি—ভূতের কেমন সাহস!

ষষ্ঠীচরণ বলল, বন্দুকটাও সঙ্গে নিন স্যার।

পা বাড়িয়ে বললুম, ভূতের গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধে না। কই, চলো দেখি। আয় জিম!

জিম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই আমার সঙ্গে এগোল। মাত্র তিরিশ হাত তফাতে ষষ্ঠীচরণের কিচেন তাঁবু। ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার গায়ে টুপটুপ করে কী যেন পড়ল কয়েকবার। ঠাহর করে দেখি, সেগুলো খুদে মার্বেলের মতো গড়নের গোল ঢিল। চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না। দৌড়ে ওই তাঁবুর পেছনে গেলুম। কেউ কোথাও নেই। ওদিকটা প্রায় পঁচিশ গজ অব্দি ফাঁকা। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঢিল ছুড়েছে কি? তারা কারা?

জিম আমার পেছন-পেছন এসে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে তাকে ইশারা করলুম। কিন্তু জিম কথা মানল না। শুধু লেজটা গুটিয়ে কেমন চাপা শব্দ করতে লাগল।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে বলল, ঢিলটা পরখ করে দেখুন তো স্যার! এ তো ঢিল বলে মনে হচ্ছে না।

হাতের তালুতে রেখে দেখলুম, খুব হালকা ধূসর রঙের ঘুটি। ঘুটিটা শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি। সাধুবাবারা গাঁজা খাওয়ার জন্য নারকোল ছোবড়ার যেমন খুদে ঘুলতি বানায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু এগুলো আরও ছোট। ওজনে হালকা হলেও দৈবাৎ চোখে লাগলে বিপদ হতে পারে।

ততক্ষণে ষষ্ঠীচরণ আরও কয়েকটা ভূতের ঢিল খুঁজে পেয়েছে। সেগুলো সে একটা কাগজের মোড়কে রেখে বলল, বড় সাহেবকে দেখাতে হবে। কী বলেন স্যার?

ভূত-পেরেতে আমার বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় এভাবে ভূতুড়ে ঢিল ছুড়ে কারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কোনও উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

দৌড়ে আমার তাঁবু থেকে রাইফেল নিয়ে বেরলুম। জিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুসরণ করল। ষষ্ঠীচরণ ব্যাপার দেখে আরও ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! আমার কী হবে?

কিছু হবে না। ভুতেরা ছুঁড়লে, তুমিও ঢিল ছুঁড়বে। বলে যেদিক থেকে ঢিলগুলো এসেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু আর ঢিল ছুড়ল না কেউ। ঝোপজঙ্গল দুর্ভেদ্য বললেই হয়। ভেতরে ঢোকার কোনও উপায় নেই! চোখে পড়ল, বড় বড় পাথরও রয়েছে জঙ্গল জুড়ে। প্রকাণ্ড একটা পাথর জঙ্গলের

বাইরে অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে দেখে সেখানে গেলুম। প্রথমে জিমকে তুলে দিলুম পাথরটার ওপর। তারপর আমি উঠলুম।

জঙ্গলের মাটিটা ক্রমশ ওদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি হল। ওই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন আমাকে দেখছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তারা আমাকে দেখছে—অস্বস্তিটার কারণ এই।

কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেও কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়ছিল না।

তবু হলফ করে বলতে পারি, একদল অদৃশ্য আজব প্রাণী যেন আড়াল থেকে আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। কিছুতেই এ অনুভূতি মন থেকে তাড়াতে পারলুম না।

তারপর জিম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমাকে ফেলে রেখে লাফ দিয়ে পাথর থেকে নামল। তারপর লেজ গুটিয়ে গলার ভেতর অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে খোলা ঘাসজমির উপর দিয়ে তাঁবুর দিকে দৌড়ল। আমি রেগেমেগে চিৎকার করে ডাকলুম, জিম! জিম! কী হচ্ছে!

জিম কান করল না। কিচেন-তাঁবুর পাশে ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তার হাতে একটা বল্লম কিংবা লাঠি। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। জিম সটান গিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে ঘুরেছিলুম জিমের জন্য। এবার জঙ্গলের দিকে ঘুরেই চমকে উঠলুম। আন্দাজ গজ বিশেক দূরে নিচে এমনি একটা পাথরের পাশে তিনটে বিদঘুটে প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর রোদ্দুর পড়েছে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তারা মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রং কালো কুচকুচে। গলা কাঠির মতো। মাথা তেকোনা এবং প্রকাণ্ড। নিচের ধড়টা ঝোপের ভেতর বলে বোঝা যাচ্ছে না কেমন। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের চোখ। তেকোনা মাথায় দুটো গোল রঙিন কাচের মতো মস্ত চোখের রং কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে উঠছে।

আমার মাথায় পলকে ভেসে এল, ওরা যেন অতিকায় পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েরা কি অমন খাড়া দাঁড়াতে পারে মানুষের মতো?

ভয় হল, ওরা আমাকে আক্রমণ করবে না তো? তাই রাইফেল তাক করলুম।

অমনি প্রাণীগুলো গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে। বুঝলুম, জিম কেন ভয় পেয়েছে এও বুঝলুম, ঘাসের গুলতিগুলোও কারা ছুড়ছিল।

তিন

বেলা দুটোয় কর্নেল এবং ডঃ প্রসাদ ঘেমে-তেতে ফিরলেন। নেকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাননি। তবে ওয়াকিমো পাহাড়ের অনেকটা চিনে ফেলেছেন। পাহাড়টা যত দুর্গম দেখায়, তত কিছু নয়। সহজে ওঠা যায়, এবং যতদূর খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়।

ঘাসের গুলতি আর পিঁপড়ে-মানুষের কথা শুনে প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ তো ভীষণ উত্তেজিত। কর্নেল বললেন, বোঝা গেল, কেন ভেগা দ্বীপ ভূতুড়ে দ্বীপ বলে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছে। ক'বছর আগে এক জাহাজের কাপ্তেন আমাকে এখানকার পিঁপড়ে-মানুষের কথা বলেছিলেন, বিশ্বাস করিনি। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা সত্যি।

ডঃ প্রসাদ বললেন, কর্নেল! নেকুর থাক। বরং আমরা পিঁপড়ে-মানুষের দিকে মন দিই।

আমি বললুম, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। এই ঘাসের গুলতির রহস্যটা কী?

কর্নেল বললেন, এগুলো পিঁপড়ে- মানুষদের অস্ত্র। পোকামাকড় ওদের খাদ্য। এই গুলতি ছুঁড়ে ওরা পোকামাকড়কে কাবু করে। বুঝলে?

হাসতে হাসতে বললুম, ব্যাটারা আমাদেরও গুলতি ছুঁড়ে কাবু করবে ভেবেছে। একটা মানুষের মাংসে ওদের বছর চলে যাবে কি না!

ষষ্ঠীচরণ্ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কথা শুনছিল। আতঙ্কে সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, ষষ্ঠী! তোমার গা-গতর দেখে ওদের বেজায় লোভ হয়েছে মনে হচ্ছে। নইলে প্রথম তোমার ওপর গুলতি ছুড়ল কেন ওরা?

ষষ্ঠীচরণ আরও ভয় পেয়ে করুণ স্বরে শুধু বলল, ওরে বাবা।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আর ডঃ প্রসাদ একটা ফাঁদ নিয়ে বেরুলেন। যেখানে আমি পিঁপড়ে-মানুষদের দেখেছি, সেখানে কোথাও ফাঁদটা পেতে রাখবেন। সঙ্গে ষষ্ঠীচরণকেও নিয়ে গেলেন। সে দা দিয়ে কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলার রাস্তা বানাবে। যা দুর্গম জঙ্গল!

আমি রইলুম তাঁবুর পাহারায়। জিম সেই যে তাঁবুর ভেতর খাটের তলায় ঢুকেছে, আর বেরুনোর নাম করে না। তার ওপর রাগ হচ্ছিল। খুব বকাবকি করলুম তাকে ভীতু বলে। শাসালুম, কলকাতায় ফিরে বেচে দেব ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিম গ্রাহ্য করল না। শুধু গলার ভেতর সেই চাপা কান্নার মতো আওয়াজ করল।

বিকেল নেমেছে। গুলিভরা রাইফেল কাঁধে রেখে সতর্ক দৃষ্টে চারপাশে লক্ষ্য রেখে সান্ত্রীর মতো পায়চারি করছিলুম।

দূরে একপাল হরিণ চরছিল! মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একসময় উত্তরদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড বেলুন দেখতে পেলুম। হলুদ রঙের বেলুনটা নিঃশব্দে ওদিকে কোথাও আস্তে আস্তে নামছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। বেলুনটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। এই নির্জন আজব দ্বীপে বেলুন নামাটা বড় রহস্যময়।

তাঁবুর দরজায় পর্দা শক্ত করে বেঁধে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটা দেখতে। যেদিকে পিঁপড়ে-মানুষ দেখেছিলুম, এটা তার উল্টো দিক। ওদিক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে ঢুকেছি। আমাদের হেলিকপ্টার ওদিকে সমুদ্রতীরে বালির বিচে নেমেছিল। যখন আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় হবে, তাঁবুর ভেতর রাখা বেতার যন্ত্রে খবর পাঠাবেন কর্নেল। তাহলে ওঁর বন্ধু এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসবেন দ্বীপে।

জিমকে নাড়ানো যাবে না। তা না হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে চললুম। একটু পরেই জঙ্গলের ওধারে ঢালু পাহাড়ি জমি নিচে সমুদ্রের বিচে গিয়ে মিশেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনটা চুপসে বালির ওপর পড়ে রয়েছে। বেলুনের তলায় দড়িদড়া থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বাস্কেটের মতো আসন। একটা বেঁটে গাব্দা মোটা লোক সবে বেরুচ্ছে। তার চেহারা চিনাদের মতো। কোমরে বাঁধা একটা লম্বাটে রিভলভার। লোকটাকে দেখে পছন্দ হল না। কেমন খুনেমার্কা চেহারা।

বেলুন সেভাবেই পড়ে রইল। লোকটা এদিকে ঘুরে ঢালু জমিটা বেয়ে উঠতে থাকল। তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

সে জঙ্গলে ঢুকে পশ্চিমে এসে গেল। তাকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ফাঁকা মাঠের দিকে না গিয়ে সে সমুদ্রের সমান্তরালে জঙ্গলের ভেতরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাথরের ওপর উঠল। তারপর তিনবার হাততালি দিল।

জঙ্গলের ভেতর ছায়া ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক্রিয়াকলাপ। মিনিটখানেক পরে যা দেখলুম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্ন না সত্যি সত্যি ঘটছে!

পাথরের ওপাশ থেকে একদঙ্গল পিঁপড়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো কী সব জিনিস ছড়িয়ে দিল। আর পিঁপড়ে-মানুষগুলো কাড়াকাড়ি করে তা কুড়িয়ে খেতে থাকল। একটু পরে লোকটাকে দেখলুম ওদের সঙ্গে চলেছে। আমি আড়ালে-আড়ালে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পাথরের কাছে এসে ওদের হারিয়ে ফেললুম। ওরা যেন বেমালুম উবে গেছে।

এদিক-ওদিক সাবধানে খোঁজাখুঁজি করেও ওদের পাত্তা পেলুম না। ততক্ষণে পশ্চিমে ওয়াকিমো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। জঙ্গল থেকে দক্ষিণে এগিয়ে ফাঁকা মাঠটায় পৌঁছলুম। তাঁবুর দিকে প্রায় দৌড়ে চললুম। জিমের জন্য ভাবনা হচ্ছিল।

আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দরজার পর্দা ছেঁড়া। শুধু ছেঁড়া নয়, কুটিকুটি করে কেটে কেউ বা কারা ছড়িয়ে রেখেছে।

ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলুম, জিম! জিম!

জিমের সাড়া নেই। ক্যাম্প-খাটের তলা ফাঁকা; টর্চ জ্বেলে তাঁবুর ভেতরটা ভাল করে দেখে নিলুম। জিম নেই।

রাগে দুঃখে বাইরে বেরিয়েছি। কর্নেলদের সাড়া পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ওঁদের দেখা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন তাঁবুর দিকে।

চার

কর্নেল তাঁর ধুরন্ধর গোয়েন্দাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পিঁপড়ে-মানুষরাই জিমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে পিঁপড়ে-মানুষদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেলের ধারণা, জিমকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

এ রাতেও জ্যোৎস্না ছিল। আমরা চুপিচুপি একটা কাজ সেরে ফেললুম। সমুদ্রতীরের সেই বেলুনটা গুটিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এলুম তাঁবুতে। তারপর পালাক্রমে রাইফেল হাতে পাহারা দিলুম। কিন্তু রাতে কোনো ঘটনা ঘটল না।

ভোরবেলা কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন, ব্যাটাচ্ছেলেরা ফাঁদটাকে কুটিকুটি করে কেটেছে। তবে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় ছবিগুলো উঠেছে। কর্নেলের ক্যামেরার কীর্তিকলাপ আমার জানা। অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখালেন। পিঁপড়ে-মানুষেরা ফাঁদ কীভাবে দাঁত দিয়ে কাটছে, তার পরিষ্কার ছবি উঠেছে।

ব্রেকফাস্ট সেরে আমি, কর্নেল ও ডঃ প্রসাদ বেরিয়ে পড়লুম উত্তরদিকের জঙ্গলে—যেখানে কাল সন্ধ্যায় বেলুনের লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

সেই পাথরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয় একটা ব্যাপার দেখতে পেলুম। পাথরের গায়ে সাদা আঁকিবুকি রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষদের ছবি আঁকার শখ? নাকি ওতে কিছু লেখা রয়েছে? তাহলে স্বীকার করতে হয়, ওরা মানুষের মতো লেখাপড়াও করে।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্নেল হাঁটু গেড়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে ও ঘাসে কিছু খুঁজছিলেন। ওই অবস্থায় বাঁ দিকে এগিয়ে আরও একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, পেয়েছি! পেয়েছি!

ডঃ প্রসাদ বললেন, কী পেয়েছেন কর্নেল?

কর্নেল কোনও জবাব না দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে শুরু করলেন। তারপর দেখি, উনি হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কী দেখার পর ইশারায় আমাদের ডাকলেন, ডঃ প্রসাদ আর আমি পাথরে উঠে ওঁর মতো উপুড় হতেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পাথরের ওদিকে ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গেছে এবং একটা বিশাল গর্তের মতো সমতল জায়গায় অসংখ্য প্রকাণ্ড উইঢিবির মতো রয়েছে। ঢিবির দরজা আছে এবং জানালায় মতো ফোকরও আছে কয়েকটা, একখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল পিঁপড়ে-মানুষ। মধ্যিখানে একটা বেদিমতো উঁচু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। ওর মাথায় ঘাসের মুকুট। মুকুটে রঙিন পালক গোঁজা এবং একটা উজ্জ্বল মণির মতো কী জিনিস—তা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, বেদির নীচে ঘাসের মোটা দাঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেলুনের লোকটা।

আমরা দম আটকানো ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই আজব দৃশ্য দেখতে থাকলুম। তারপর কানে এল, পিঁপড়ে-মানুষেরা পোকামাকড়ের ডাকের মতো চাপা ক্ষীণ শব্দে কথাবার্তা বলছে। সে শব্দ এত চাপা যে মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও হাজার হাজার পোকামাকড় ডাকছে।

তারপর যা দেখলুম, আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী—কর্নেল টেনে ধরে ফের শুইয়ে দিলেন।

সামনেকার একটা ঢিবিঘর বেশ বড়ো—প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু এবং ফুট তিনেক চওড়া। সেটার রং [illegible] কালো। সেটা নিশ্চয় রাজার বাড়ি। সেখান থেকে চ্যাংদোলা করে পিঁপড়ে-রক্ষীরা আমার জিমকে বের করে আনছিল।

পেছনে আরেকটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় রানি। কিন্তু জিম যেন মরা। টুকটুক করে তাকাচ্ছে। নির্জীব অবস্থা।

রানি বেদিতে উঠে রাজার পাশে দাঁড়াল। জিমকে পিঁপড়ে রক্ষীরা তাদের পায়ের কাছে বেদির ওপর শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, জিম ছাড়া পেয়েও তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

এবার রানিকে দেখলুম দু'হাত তুলে জোরে নাড়ছে। তারপর ঢিবি রাজ-বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত প্রাণী। ধূসর-রঙের হায়েনার মতো দেখতে। কিন্তু অত কুৎসিত নয়। বরং নেকড়ে বলে মনে হল। পিঁপড়ে রানির মাথাতেও মুকুট আছে। মুকুটে ফুল গোঁজা। রানি একটা ফুল মুকুট থেকে নিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রাণীটা বেদিতে উঠে খপ করে ফুলটা মুখে পুরল। চিবুতে থাকল। তারপর জিমের গা শুঁকতে শুরু করল।

ডঃ প্রসাদ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, নেকুর! নেকুর!

নেকুর তাহলে পিঁপড়ে-মানুষদের কাছে পোষ মেনেছে! আবাক হয়ে নেকুর দেখতে থাকলুম। জন্তুটা জিমকে যেন আদর করছে। জিম তেমনি নিঃসাড়।

জিমের চারপাশে ঘুরে নেকুরটা খেলা করতে থাকল। সবাই এবার ভিড় করে খেলা দেখছিল। ঢিবিঘরগুলো থেকে ছোটবড় সব পিঁপড়ে-মানুষ ভিড় জমিয়েছে ততক্ষণে। এইসময় কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, সাবধানে নেমে এস তোমরা। ঢিবিঘরগুলোর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তারপর কী করতে হবে, বলে দেব'খন।

সাবধানে তিনজনে পাথরের টুকরো আর খাঁজের অড়ালে নিচে নেমে গেলুম। বুঝলাম এই সমতল বিশাল গর্তমতো জায়গাটা কোনও যুগের আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। ঢিবিঘরের পেছনে ঝোপের আড়ালে তিনজনে বসে পড়লুম।

তারপর দেখি, কখন ওদের অজান্তে বেলুনের লোকটা দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাক করে বেমক্কা রিভলভার থেকে গুলি ছুড়ল পরপর দু'বার।

পলকের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। পিঁপড়ে মানুষেরা পিলপিল করে এদিকে ওদিকে ক্রেটারের কিনারায় ঢালু পাড়া বেয়ে উঠল এবং পালিয়ে গেল। রাজা ও রানি যেন হতভম্ব! স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা বেদির ওপর লাফ দিয়ে উঠল এবং রাজার মুকুট ধরে টানাটানি শুরু করল।

নেকুরটা জিমকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার আকমকা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রিভলভার ছিটকে পড়ল নীচে। নেকুরটা ওর গলা কামড়ে ধরেছে! লোকটা বিকট আর্তনাদ করে হাত-পা ছুড়ছে।

কর্নেল বলে উঠলেন—চলে এস সবাই!

আমরা যেই দৌড়ে গেছি, রাজা-রানি তীরের মতো ছুটল উল্টোদিকে। বেদির কাছাকাছি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে নেকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল বেলুনের লোকটার কাছে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। ওর গলাটা ফাঁক হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ওকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। এক মিনিটের মধ্যে হাত-পা খিঁচিয়ে ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

জিম আমাকে দেখে এতক্ষণে ওঠার চেষ্টা করল। পারল না। ওকে দু'হাতে বুকের কাছে তুলে নিলুম। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কর্নেল লোকটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেলেন। চিনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। নোটবইটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে কর্নেল বললেন, আসুন ডঃ প্রসাদ, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। বেচারি পিঁপড়ে-মানুষদের বিব্রত করে লাভ কী? ওদের কচি বাচ্চারা নিশ্চয় ঘরে আছে। ওরা না ফিরলে না খেয়ে মারা পড়বে।

ঠিক তাই। ঢিবিঘরের দরজায় খুদে পিঁপড়ে-মানুষেরা উঁকি দিচ্ছিল। দেখে মায়া হয়। আমরা চলে এলে ওদের মা-বাবা ফিরে এসে খেতে দেবে। এ-বেলা হয়তো বেলুনের লোকটার মাংস দিয়েই পিঁপড়েপুরীতে বড়রকমের একটা ভোজ হবে।

পাঁচ

তাঁবুতে ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড। ষষ্ঠীচরণ বন্দী। কিচেন-তাঁবুর ভেতর তার ক্যাম্পখাটে ওকে কারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যা দিয়ে বেঁধেছে, তা শক্ত ঘাসের দড়ি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকচ্ছে। মুখে কথা নেই।

কর্নেল একটা ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জব্বর একটা হাই তুলল।

বললুম, ব্যাপার কী ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ বলল, খুব ঘুম পেয়েছিল স্যার!

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে বললুম, কিন্তু তোমায় এমন করে বেঁধেছিল কারা?

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণের যেন খেয়াল হল। কাটা দড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল, তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা? আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছিলুন। ওরে বাবা! এ কী বিদঘুটে জায়গায় এসে পড়েছি।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, তুমি নিশ্চয় আরাম করে খাটে শুয়েছিলে?

ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন। আপনারা যাওয়ার পর ঢুলুনি পেয়েছিল। ভাবলুম একটু শুয়ে নিই। রাত্তিরে তরাসে ঘুম হয় না কিনা!

কর্নেল বললেন, ভাগ্যিস, তোমাকে পিঁপড়ে-মানুষেরা ধরাধরি করে জিমের মতো বয়ে নিয়ে যায়নি! তাহলে আজ দুপুরের খাওয়া-দাওয়া আর জুটত না আমাদের।

ষষ্ঠীচরণ ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! তারপর সে ব্যস্তভাবে উনুন ধরাতে গেল।

আমরা কর্নেলের তাঁবুতে গেলুম। ডঃ প্রসাদ বললেন, লোকটার নোটবইয়ে নিশ্চয় সব কথা লেখা আছে। চিনা ভাষা জানলে ভাল হত। কিন্তু .....

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, আমি অল্পস্বল্প জানি চিনাভাষা। দেখি, কী লেখা আছে।

কর্নেল মিনিট দশেক ধরে নোটবইটা নিয়ে মেতে রইলেন। আমরা দু'জনে চুপচাপ কৌতূহল নিয়ে বসে রইলুম। তারপর কর্নেল বললেন, লোকটার নাম সান ওয়ানসু। হংকং-এ বাড়ি। কীভাবে ভেগা দ্বীপের পিঁপড়ে-মানুষদের কথা জেনেছিল, লেখা নেই। তবে এটুকু লেখা আছে, মোট তিনবার এসেছে এর আগে। পিঁপড়ে-মানুষদের রাজার মুকুটে যে বহুমূল্য মণি দেখেছি, আমরা, সান ওয়ান-সু ওটা হাতাতে চেয়েছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, ওদের সঙ্গে ভাব করল কীভাবে, লেখা নেই?

কর্নেল বললেন, আছে। প্রথমবার এসে ওদের গতিবিধি জেনে গিয়েছিল আড়াল থেকে। দ্বিতীয়বার সঙ্গে এনেছিল একটা প্রকাণ্ড কেক।

বললুম, কেক দিয়ে পিঁপড়ে-মানুষদের সঙ্গে ভাব করেছিল? ভারি বুদ্ধিমান তো।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয়বার সঙ্গে এনেছিল এক বস্তা চিনি।

বললুম, কিন্তু এবার তার সঙ্গে কিছু ছিল না। আমি দেখছি!

কর্নেল হাসলেন। বললেন, এই চতুর্থবার সে যা এনেছিল, তা বেলুনের বাস্কেটে এখন আছে। ওই যে দেখছ প্যাকেট বাঁধা জিনিসটা, ওটা লজেঞ্চুস।

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। কর্নেল ফের বললেন, প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেন যায়নি, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছে, পিঁপড়ে-মানুষদের রাজাকে সে সমুদ্রের ধারে তার বেলুনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হয়তো বলেছিল, ওখানে গেলেই রাজাকে উপহারটা দেবে। তার মতলব ছিল, ওইভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণিটা কেড়ে নিয়ে বেলুনে চড়ে পালাবে। কিন্তু পিঁপড়ে-মানুষেরা বুদ্ধিমান। ওর মতলব টের পেয়েছিল।

আমার বুদ্ধি খেলল এবার। বললুম, উঁহু। তা নয়। বেলুনটা আমরা নিয়ে এসেছিলুম বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন পিঁপড়ে-মানুষরা কিছু পায়নি, তখন রেগে গিয়ে ওকে বন্দি করেছিল।

কর্নেল সায় দিলে বললেন, মন্দ বলোনি জয়ন্ত। সম্ভবত ...

কর্নেলের কথা হঠাৎ বন্ধ হল। উনি কোণের দিকে গুটিয়ে রাখা বেলুনটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, সর্বনাশ! বেলুনের অবস্থাটা কী করেছে! কুটিকুটি করে রেখে গেছে যে!

আমি ও ডঃ প্রসাদ হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলুম। বেলুনের ভাঁজকরা রবারটা আর আস্ত নেই। ঝাঁঝরা হয়ে রয়েছে। তার মানে বেলুনটা আর ওড়ানো যাবে না। দোলনার মতো বাস্কেটটা টিকে আছে। তার মধ্যে বসার আসন, লজেন্সের প্যাকেট, অল্পস্বল্প কলকব্জা রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা সে সব ছোঁয়নি। লজেন্সের প্যাকেটটা অন্তত নিয়ে পালানো উচিত ছিল। কেন নেয়নি?

ডঃ প্রসাদ একটু হেসে বললেন, আমরা লজেন্সগুলো দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করব। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ওই লজেন্সে তীব্র বিষ মেশানো আছে, ডঃ প্রসাদ।

আমরা দু'জনে আঁতকে উঠলুম, সে কী! কীভাবে বুঝলেন?

কর্নেল বললেন, ওই দেখ, কত খুদে পিঁপড়ে আর পোকামাকড় মরে পড়ে রয়েছে। তাই দেখে পিঁপড়ে-মানুষেরা প্যাকেটটা ছোঁয়নি। এবার আশা করি বুঝতে পারছ, লোকটাকে কেন ওরা অমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিচ্ছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, সর্বনাশ! পিঁপড়ে-মানুষেরা দেখছি ভারি ধূর্ত। আমরা বেরিয়ে গেছি, আর ওরা সেই ফাঁকে এতসব কাণ্ড করেছে। তার মানে, ওরা সারাক্ষণ আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। কিন্তু ওদের আস্তানা থেকে আমরা এতদূরে রয়েছি। আমরা ওদের অস্তানায় পৌঁছনোর আগেই অত তাড়াতাড়ি কীভাবে ওরা এখানে এল এবং ফিরে গেল?

কর্নেল বললেন, সেটা একটা রহস্য বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে কোথাও একটা সিধে পথ আছে, মাটির তলায়-তলায়। অর্থাৎ পিঁপড়ে-মানুষদের বসতি এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম কোণে মাইলটাক দূরে। ওদিকটা জঙ্গল আর পাহাড়ে বড় দুর্গম দেখাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ জিম একটা চাপা-গরগর আওয়াজ করল। আগের আতঙ্ক মেশানো আওয়াজ। তারপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলুম।

আমাদের সামনে খোলামেলা ঘাসের মাঠে আচম্বিতে পিলপিল করে কালো রঙের পিঁপড়ে-মানুষ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। অসংখ্য জায়গা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে মানুষ আর তাদের সঙ্গে সেই নেকুরের পাল।

বুঝলুম অজস্র গর্ত ছিল। ঘাসের আড়ালে। ওগুলো সুড়ঙ্গপথ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মোটা কালো রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা সামনে একটা করে নেকুর নিয়ে একজন করে পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় ওরা সেনাবাহিনী।

তারপর দীর্ঘ সেই কালো রেখা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে। কতক্ষণ হতবাক হয়েছিলুম কে জানে! হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, সমুদ্রের কাছে চলো সবাই! সমুদ্রের কাছে! তারপর দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

কখন ষষ্ঠীচরণ রান্না ফেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, রাইফেল এনে গুলি ছুড়ি কর্নেল!

কর্নেল তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, না জয়ন্ত; গুলি করে ওদের শেষ করে যাবে না। সারা দ্বীপের মাটির তলায়-তলায় দুর্গের মতো কোটি কোটি পিঁপড়ে-মানুষ রয়েছে মনে হচ্ছে; এস, সবাই সমুদ্রের দিকে পালাই।

আমরা চারজনে সব কিছু ফেলে পুবে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললুম। কর্নেল শুধু বেতার যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছেন দেখা গেল।

যখন বিচে পৌঁছলুম, তখন আমাদের দম আটকানো অবস্থা। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে কীভাবে ওদের হাত থেকে বাঁচব। এদিকে সমুদ্র অনেকটা শান্ত! কর্নেল সোজা জলে নেমে গিয়ে ডাকলেন, এস জয়ন্ত। আসুন ডঃ প্রসাদ। আমরা এখন নিরাপদ।

ষষ্ঠীচরণ কর্নেলের দিকেই জলে নেমেছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় কোমর অব্দি ভিজে যাচ্ছে ওদের। আমি ডঃ প্রসাদও ওদের কাছে গেলুম। বললুম, কর্নেল! আমরা এখানে কীভাবে নিরাপদ? ওই তো ওরা এগিয়ে আসছে!

কর্নেল বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে কোন বেতার ধরে রেখেছিলেন। বললেন, ওরা জলকে বড় ভয় পায়।

জিমকে আমি দু'হাতে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। সে থরথর করে কাঁপছে। বিচের ওধারে উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নেমে আসছে পালে পালে নেকুর। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি। জিভ

লকলক করছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে নাচতে আসছে ওদের পেছন-পেছন!

বিচের বালিতে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

কর্নেল বেতার যন্ত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলুম উনি বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভেগা আইল্যান্ড। শীগগির হেলিকপ্টার নিয়ে আসুন। আমরা বিপন্ন।

ষষ্ঠীচরণ চোখ বুজে ঠকঠক করে কাঁপছে একহাঁটু জলে। জিম আমার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ডঃ প্রসাদ বিড়বিড় করে বলেছেন, আহা! ক্যামেরাটা আনলে কত ভাল হত! কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?

কথাটা কানে যেতেই কর্নেল প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, ওই যাঃ! আমার ক্যামেরাটা আর কি ফিরে পাবো? কী ভুলো মন আমার!

উজ্জ্বল রোদে সোনালি বিচের ওপর পালে পালে জিভ বের করা নেকুর আর অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ একইভাবে দাঁড়িয়ে।

ঘরের ছেলে বেঁচে-বর্তে ভেগা আইল্যান্ড থেকে ঘরে ফিরতে পেরেছিলুম, এই যথেষ্ট! দিন সাতেক পরে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর্নেল তাঁর বন্ধু, বিমানবাহিনীর সেই জাঁদরেল অফিসারের সাহায্যে হেলিকপ্টারে চেপে ভেগা দ্বীপে তাঁর অত্যদ্ভুত ক্যামেরা আর আমার রাইফেলের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় ভেগা দ্বীপ? দ্বীপটা যেন বেমালুম তলিয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। অনেক ওড়াউড়ি করে তাঁরা ফিরে আসেন।

এখন কর্নেল বলেন, তাহলে কি আমরা চারজনেই একইরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম?

ষষ্ঠীচরণ বলে, তা আর বলতে?

আমিও সায় দিয়ে বলি, ঠিক ঠিক। স্বপ্নই বটে। তবে যদি ক্যামেরা বা রাইফেল হারায়, তাহলে তো বড় রহস্যের ব্যাপার। ও কর্নেল, জীবনে এত রহস্যের সমাধান করেছেন, এটা করবেন না?

কর্নেল উদাসভাবে শুধু বলেন, তাই তো!

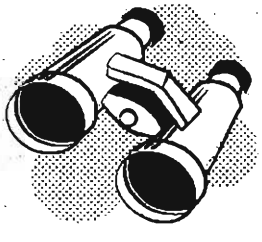

চিরামবুরুর গুপ্তধন

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। হঠাৎ দেখি, ইয়া এক বড় কেঁদো বাঘ হালুম করে সামনে দাঁড়াল। পা দুটো মাটিতে সেঁটে গেছে ভয়ের চোটে। তারপর দেখি, বাঘটা আদতে বাঘই নয়, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি কেন বাঘ হয়ে গেছেন বুঝলুম না। খুশি হয়ে বললুম, "বললুম, মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান। হাউ ডু ইউ ডু?" কর্নেল হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, "ভাল না ডার্লিং। আমার লেজ হারিয়ে গেছে।" এ বয়সে লেজ হারানোর চেয়ে অপমানজনক কিছু নেই। কর্নেলের লেজ হারানোর কথা শুনে আমিও দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম।.....

তারপরই টের পেলুম আমি মশারির ভেতরে শুয়ে আছে আছি। আশ্চর্য, আমার চোখ দুটো যেন ভিজে স্যাঁতসেতে। ধড়মড় করে তক্ষুণি উঠে বসলুম এবং খিক-খিক করে হাসতে থাকলুম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কী-সব নাড়াচাড়া করছিলেন যিনি, তাঁর মাথায় তখনও প্রাতঃভ্রমণের নীলচে টুপি। সেই টুপি ও তাঁর সাদা গোঁফ দাড়িতে তখনও জঙ্গলের শুকনো পাতার কুচি, কাঠকুটো, পাখির বিষ্ঠা, মাকড়সার জালের ছেঁড়া অংশ, এমনকী দু-একটা পোকামাকড়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। না ঘুরেই সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।"

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম, "হাসছি কেন, জিজ্ঞেস করলেন না?"

"হাসছিলে নাকি? তুমি তো খুঁঃ খুঁঃ করে কাঁদছিলে মনে হল।"

"কাঁদছিলুম আপনার দুঃখে।" একটু চটে গিয়ে বললুম। "আপনার লেজ হারানোর কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আমায় জাগিয়ে দেননি। লেজটা আপনারই ছিল।"

"আমার লেজ!" বলে কর্নেল নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বলনে, "ডার্লিং। সত্যি যদি মানুষের লেজ থাকত, ব্যাপারটা কত সুখের হত বল তো! লেজ দিয়ে পিঠ চুলকানো, মাছি তাড়ানো, আবার দরকার হলে কাউকে লেজের বাড়ি মারা-কত কাজ হত! তাছাড়া, কারও ওপর রাগ হলে মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও চলত। লেজ খাড়া হলেই টের পেত আমি রেগেছি। ব্যাপারটা কি সভ্য মানুষের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত হত না ডার্লিং? আরও ভেবে দ্যাখো, লেজ থাকলেও তারও পোশাক দরকার হত। নিত্যনতুন ডিজাইনের লেজ-ঢাকা তৈরি করত টেলাররা। নাম দিত টেলেক্স। আর মহিলাদের বেলায় টেলেক্সি। ম্যাক্সির মতো।"

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু একবার মুখ খুললে সহজে বন্ধ করেন না। বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘণ্টা পরে বেরিয়ে দেখি, তখনও তেমনি বসে আছেন। পাশে অবশ্য ব্রেকফাস্টের ট্রে রেখে গেছে বাংলোর চৌকিদার। বললুম,"লেজ সম্পর্কে আরও কথা থাকলে এবার বলতে পারেন। এখন আমি ফ্রি।"

কর্নেল কতকগুলো ছবি দেখছিলেন। ছবিগুলো সদ্য প্রিন্ট করা। এখনও ভিজে রয়েছে। বললেন, "লেজ মুখের শ্রম কমিয়ে দিত, জয়ন্ত! তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলেই তিনি খুশি হতেন। রিপোর্টিংয়ে ভুল বেরুলে লেজটা শিথিল করে মেঝেয় ফেলে রাখতে। তারপর লেজটা গুটিয়ে সম্পাদকের চেম্বার থেকে বেরুতে। সাতখুন মাফ!"

"হ্যাঁ লেজ। আমার জাদু-ক্যামেরার রাতের ফসল, জয়ন্ত!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন।

"অবিশ্বাস্য! মানুষের কখনও লেজ হয়?" ছবিটা ভাল করে দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। "কর্নেল! এ নিশ্চয় কোনও প্রাণী, মানুষের মতো দেখতে এই যা।"

কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিয়ে আওড়ালেন, "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! জয়ন্ত, পাশের ঘরের ভদ্রলোক—নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র আমায় এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কানে নিইনি। কাল সন্ধ্যায় গোপনে একখানা ক্যামেরা পেতে এসেছিলুম। উদ্দেশ্য তো জানো। জন্তুদের জল খাওয়ার সময় ছবি তোলা। ভোরে ক্যামেরা আনতে গিয়ে জলার ধারে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। অবাক লাগল। খুব বদনাম আছে জলাটার। বাগাদা আদিবাসীদের ওটা তীর্থক্ষেত্র ছিল প্রাচীন যুগে। কিন্তু গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ওখানে তার যায় না। অভিশাপ লেগেছে নাকি। তো পায়ের ছাপ কাদের তা দেখতেই পাচ্ছ।"

এই সময় দরজার বাইরে ডঃ মহাপাত্রের সাড়া পাওয়া গেল। "আসতে পারি কর্নেল?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "আসুন, আসুন!" তারপর ট্রেটা তুলে ছবিগুলোর ওপর রাখলেন। বুঝলুম, কোনও কারণে ব্যাপারটা নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে জানাতে চান না কর্নেল। কাজেই আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে।.....

বিবর্তনবাদ ও কার্টুন

ডঃ মহাপাত্র কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল আপনাকে বাগাদা ট্রাইবের কথা বলছিলুম। বাংলার বাগদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চেহারা ও পেশায় কী আশ্চর্য মিল! এরাও মাছ ধরে। আবার একসময় এরাও সেকালের বাঙালি বাগদি গোষ্ঠীর মতো লাঠিয়ালি, ডাকাতিতেও পটু। এখনও তারা শক্ত গাছের ডাল থেকে তৈরি লাঠি ব্যবহার করে। ধাতুর ব্যবহার এদের মধ্যে অচল। কাজেই একই ট্রাইবের দুটি গোষ্ঠী দু জায়গায় বাস করছে। আরও মজার কথা এই, মধ্যপ্রদেশ এবং মহরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বাউরি ট্রাইব রয়েছে। মোটামুটি ফর্সা বা তামাটে গায়ের রং। আশা করি, বাঙালি বাউরি সম্প্রদায়ের কথা আপনি জানেন কর্নেল। তো কথা হল—এরা ভারতের আদিম বাসিন্দা। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখা।"

বনজঙ্গল বেড়াতে এসে এসব কচকচি কার বা ভাল লাগে? রাগ হল দেখে যে, গোয়েন্দাপ্রবর দাড়ি নেড়ে সায় দিচ্ছেন এবং প্রশংসাসূচক উক্তিও করছেন। 'এক্সকিউজ মি' বলে সোজা বাইরে চলে গেলুম। এপ্রিলে চিরামবুরু পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য টিলা ও পাহাড়। সবুজ, খয়েরি, লাল, সাদা কত রঙের বাহার! একটি টিলার গায়ে এই বাংলো। লনের ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দেখি, কথা বলতে বলতে দুই পণ্ডিত বেরুচ্ছেন।

"হ্যাঁ, মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপে লেজওয়ালা মানুষ দেখার কথা বলেছেন। পনেরো শতকের কথা। তো লেজ নিয়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কর্নেল! আমাদের শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্ত যেটা ককসিক্স বা পিকচঞ্চু বলা হয়— কোকিলের ঠোঁট আর কী—সেটাই লেজের প্রমাণ। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লেজ খসে গিয়েছিল। কারণ হল ভাষা। মানুষের ভাষাই যখন ভাবপ্রকাশে সমর্থ তখন লেজের দরকারটা কী?"

কর্নেল বললেন,"ঠিক, ঠিক। তবে ধরুন, হাতের নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ক্ষমতাও বেড়েছিল! লেজের কাজ হাতে আরও ভালভাবে করা যায়। কাজেই ..."

হঠাৎ কথা থামিয়ে কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনলেন। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ মহাপাত্র হকচকিয়ে গেছেন দেখলুম। একটা পরে কর্নেল বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দৌড়ে বাংলোর গেট পেরিয়ে ঢালুতে বন বড় পাথর আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কোথায় একটা পাখি ডাকছিল টু টু টুইক!

ডঃ মহাপাত্রর কাছে গিয়ে বললুম, "ওঁর ওই বাতিক। পাখি প্রজাপতি ঘাসফড়িং পোকামাকড় নিয়ে থাকেন।"

"ও! উনি একজন ন্যাচারালিস্ট তাহলে! আমি ভেবেছিলুম শিকারি।"

একটু হেসে বললুম, "প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তো ডঃ মহাপাত্র, কর্নেলের কাছে কি লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা দেখলেন?"

ডঃ মহাপাত্র চোখ বড় করে বললেন, "অ্যাঁ! ছবি! কোথায় ছবি! কিসের ছবি?"

অমনি বুঝলুম, ভুল করেছি। ঝটপট বললুম, "মানে একটা কার্টুন আর কী! বিলিতি পাঞ্চ পত্রিকার।"

ডঃ মহাপাত্র একটু হেসে বলনে, "তাই বলুন। তবে কর্নেল কার্টুন দেখাননি আমায়। প্লিজ, আপনি নিয়ে আসুন না ওটা, দেখি। পাঞ্চের কার্টুনের কোনও তুলনা হয় না। নিশ্চয় ডারউইন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছে।"

বেগতিক দেখে বললুম, "দুঃখিত ডঃ মহাপাত্র। কর্নেলের জিনিসপত্রে আমাদের হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না। "

"তাও ঠিক।" বলে ডঃ মহাপাত্র মুখ গোমড়া করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কিন্তু ওঁকে কর্নেল ওই অদ্ভুত ছবিটা কেন দেখাতে চাইছেন না কে জানে! নাকি কর্নেল নিজেই মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে লেজওয়ালা মানুষ আবিষ্কারের গৌরব পেতে চান?....

জঙ্গলের বিপদ আপদ

কর্নেল সেই যে পাখির পেছনে দৌড়ুলেন, তো আর ফেরার নাম নেই। দুপুর পর্যন্ত বনজঙ্গলে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ডাকব নাকি?

কিন্তু উনি নিশ্চয় চটে আছেন আমার ওপর। অগত্যা একা বেরিয়ে পড়লুম। জঙ্গলে রাস্তা না-হারানোর সহজ উপায় হয়, চলার সময় কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখা। আমি অবশ্য রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম না। কখনও পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, কখনও ঝোপঝাড়ের ভেতর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কখনও বা উঁচু গাছপালার ভেতর দিয়ে। খেয়ালখুশি মতো হেঁটে যাওয়া। একটা করে গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন রাখছিলুম। ফেরার সময় চিহ্নগুলো কাজে লাগবে।

একসময় থমকে দাঁড়ালুম। হাতি-বাঘ-ভালুকের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে কেন যে রাইফেলটা নিতে ভুলে গেলুম! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। একখানা বেশ উঁচু জায়গা । ঘন ঘাস আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা একরকম গাছ গজিয়ে রয়েছে। তারপর ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গিয়ে একটা গভীর শালবনে ঢুকেছে। ডাইনে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর, তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা রুনিগাছ। পাথরটা ঢেকে লতার ঝালর। ঝালরে চোখ ঝলসানো ফুলের সাজ। ফুলগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। রুনিগাছটার তলায় গিয়ে সেই দাঁড়িয়েছি, কালো পাথরটা থেকে কালো কুচকুচে একটা প্রাণী ঝুপ করে গড়িয়ে হাত-দশেক তফাতে মানুষের মতো দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কানে তালা-ধরানো এক ডাক ছাড়ল "আঁ-আঁ-ক্!"

সর্বনাশ! এ তো দেখছি একটা ভালুক। ইংরেজিতে এদের বলা হয় শ্লথ বিয়ার। মারাত্মক হিংস্র জানোয়ার। দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে থাকলুম। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ভালুকটার তীক্ষ্ণ নখে আমার পিঠ ফালাফালা হয়ে যাবে।

শালবনের ভেতর দিয়ে বহু দূর দৌড়ে যাওয়ার পর ফাঁকা ঘাসজমিতে পৌঁছলুম। জমিটাতে অসংখ্য পাথর ছড়ানো। কতবার যে আছাড় খেলুম, প্যান্টশার্ট ছিঁড়ে গেল কাঁটাঝোপে, তারপর সামনে পড়ল নলখাগড়ার জঙল। জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে জলে পড়লুম। ভালুকটাকে এতক্ষণ একবারও ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। এবার জলাটার মাঝ-অবধি একবুক জলে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। কোথায় ভালুক?

ভালুকটার সঙ্গে নিশ্চয় রেসে জিতে গেছি। জলাটা তত বেশি বড় নয়। ওপারে বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে জলের ভিতর পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। কাদার মধ্যে পাথর রয়েছে প্রচুর। জল কোথাও এককোমর, কোথাও একবুক। বালির তটে পৌঁছে দু-পা ছড়িয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। নিজের বোকামির জন্য রাগ হচ্ছিল খুব। তেষ্টাও পেয়েছিল। কিন্তু জলটা খাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তি চলে গেল। তখন উঠে দাঁড়ালুম। তারপর চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে চমকে উঠলুম। কর্নেল কি এই জলার ধারেই কোথাও ক্যামেরা পেতে রেখেছিলেন? সেই লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা এখানকার বলেই তো মনে হচ্ছে। ভালুকের চেয়ে লেজওয়ালা মানুষ কতটা বিপজ্জনক কে জানে! এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়াই ভাল।

বালিয়াড়ির পর প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সার-সার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক গলিয়ে যাব কি না ভাবছি, হঠাৎ বাঁ দিকের স্তূপটার আড়াল থেকে একটা বিদঘুটে চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। কোমরে এক টুকরো লাল ন্যাকড়া জড়ানো। গলায় একগুচ্ছের লাল পাথরের মালা। দু'হাতে ওই রকম লাল পাথরের মালা জড়ানো। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। থ্যাবড়া নাক। কপালে লাল রঙের কয়েকটা আঁকিবুকি। তার মাথায় একরাশ জটাচুল। তার হাতে বেঁটে কাঠের লাঠি। লাঠিটায় বিকট সব মুখ খোদাই করা আছে। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে চেঁচিয়ে উঠল, "কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

এবার আরও চমকে উঠলুম তার লেজ দেখে। হ্যাঁ, লেজ। ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখেছি—কতকটা হনুমানের লেজের মতো দেখতে, কিন্তু বেশ মোটা। তত লম্বা নয় অবশ্য। তাছাড়া ঠিক এই লোকটাকেই তো ছবিতে দেখেছি।

সেই ভোরবেলা থেকে টানা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালুম। তারপর দেখলুম, ওর লেজটা খাড়া হচ্ছে। তারপর সেই লেজওয়ালা লোকটা আচমকা কাঠের লাঠিটা তুলে আমার মাথায় মারল। টের পেলুম, ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার।

ডঃ মহাপাত্রের দুরবস্থা

চোখ মেলে দেখি, আলো জ্বলছে এবং আমি বাংলোর খাটে শুয়ে আছি। তাহলে আগাগোড়া সবটাই লেজঘটিত দুঃস্বপ্ন। ওঠার চেষ্টা করতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, "উঁহু, নোড়ো না, নোড়ো না!"

একটু তফাতে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। একটা কিছু করছেন। মাথাটা চিনচিন করছিল। হাত দিয়ে টের পেলুম ব্যান্ডেজ রয়েছে। কর্নেল একটু হেসে পাশে এসে বসলেন। বললেন, "বনেজঙ্গলে গোঁয়ার্তুমি ভাল না ডার্লিং! তোমার কতবার পইপই করে বলেছি। ভাগ্যিস, আজ একটু সকাল-সকাল জলাটার ধারে ক্যামেরা পাততে গিয়েছিলুম। ধরেই নিয়েছিলুম তুমি ডঃ মহাপাত্রর সঙ্গে বরমডির আদিবাসী মেলায় গেছ। চৌকিদার সঠিক কিছু বলতে পারল না। তাকে তুমি বা ডঃ মহাপাত্র কিছু বলে যাওনি।"

আমার শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরম দুধ নিয়ে ফিরলেন। বললেন, "দুধটা খেয়ে নাও। রাত মোটে সাড়ে-আটটা। সাতটার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল তোমার। তখন ব্রান্ডি খাইয়ে দিয়েছি। কী-সব ভুল বকছিলে—লেজওয়ালা মানুষের কথা বলছিলে।" কর্নেল হাসতে লাগলেন।

জোর করে উঠে বসলুম। "ভুল বকিনি। আমি ঠিক আছি। জলার ধারে একটা লেজওয়ালা বিদুঘুটে মানুষ আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল। আপনার ছবির কিম্ভূত প্রাণীটাই।"

"বলো কী! আমি ভেবেছিলুম পাথরের স্তূপে উঠে পা হড়কে গেছে এবং মাথায় চোট লেগেছে।

"না।" বলে আগাগোড়া যা ঘটেছিল, সব বললুম কর্নেলকে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে একবার টাকে একবার দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, "হুম! কিন্তু আমাদের নৃবিজ্ঞানী গেলেন কোথায়? বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

এ-রাতে ঘুমটা স্বভাবত গভীর হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। দেখিনি লেজ-ঘটিত কোনও দৃশ্যও। মশারির ভেতর থেকে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে কালকের মতোই আপন কাজে মগ্ন দেখলুম। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে রইল। কাল ওই বিপদসঙ্কুল জলার ধার থেকে এই শক্তিমান বুড়োমানুষটি আমায় কাঁধে করে অতটা পথ বয়ে এনেছেন। ছেঁড়া নোংরা পোশাক বদলে দিয়েছেন। স্নেহশীল পিতার মতো আচরণ করেছেন। আস্তে বললুম, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান!"

কর্নেল 'মর্নিং' বলে উঠে এসে মশারি তুলতে থাকলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললুম "থাক্ আর শোবার দরকার নেই। আপনার রাতের ক্যামেরায় কী ফসল তুললেন দেখি।"

টেবিলের একটা ছবি তুলে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। জলার ধারে সেই পাথরের স্তূপ বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্তূপের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র। হাতে শাবলজাতীয় কিছু।

"কী কাণ্ড!" অবাক হয়ে বললুম। নৃবিজ্ঞানী দেখছি প্রত্নবিজ্ঞানীর মতো খননকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কর্নেল, ওখানে কি প্রাচীন সভ্যতা লুকিয়ে আছে নাকি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে রাতদুপুরে লুকিয়ে কেউ করে না, ডার্লিং—যদি না তুতান-খামেনের মতো কোনও সম্রাটের গুপ্তধন পোঁতা থাকে।"

"মাই গুডনেস! ডঃ মহাপাত্র কি গুপ্তধন খুঁজছেন ওখানে?"

"জানি না।" বলে কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিলেন। বললেন, "শিগগির বাথরুম সেরে এসো। বেরুব।"

বাথরুম থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডঃ মহাপাত্র রাতের খাটুনির পর নিশ্চয় এখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন? গুপ্তধন পেলেন কি না ওঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য মন ছটফট করছে।"

"উনি ফেরেননি।"

"সে কী!"

কর্নেল কোনও কথা না বলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। আমি কফিটুকু ঝটপট গিলে নিলুম। এই সময় বাইরে মোটর-গাড়ির গর গর শব্দ শোনা গেল। দু'জনে বেরিয়ে দেখি, বন দফতরের অফিসার সূর্যপ্রসাদ রাও জিপ থেকে গেটের কাছে নামছেন। হন্তদন্ত এসে বললেন, "কর্নেল! সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগদা আদিবাসীরা ডঃ মহাপাত্রকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। ভ্যাগ্যিস ফরেস্ট গার্ডরা ভোরবেলা ওদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওঁকে উদ্ধার করে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওঁকে বরমডি হাসপাতালে রেখে এলুম। বাঁচবেন কি না বলা কঠিন।"

কর্নেল বললেন, "বাগাদা বস্তিতে কেন গিয়েছিলেন ডঃ মহাপাত্র?" মিঃ রাও বললেন, "ওদের দেবতার থান আছে জঙ্গলের ভেতর একটি ছোট্ট লেকের ধারে। ওখানে বাইরের কোনও লোকের

যাওয়া বারণ। ওরা বলল, এই লোকটা তাদের পবিত্র থানের অপমান করেছে। ওদের বোঝানো বৃথা। তাছাড়া গভর্নমেন্ট এখন ট্রাইবালদের ব্যাপারে খুব সতর্ক। বস্তার এলাকার বিদ্রোহের কথা তো জানেন।"

"হুম। তাহলে ডঃ মহাপাত্রকে ওরা দেবতার থান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলুন!"

"ঠিক বলেছেন।" বলে মিঃ রাও ডঃ মহাপাত্রের ঘরের তালা খুললেন। বললেন, "ওঁর পকেটে চাবিটা ছিল। ওঁর জিনিসপত্র কী-সব আছে, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।

লেজ তুলে পলায়ন

মিঃ রাও চলে গেলে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সঙ্গে রাইফেল নাও তোমার। সেই ভালুকটার মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ সেই লেজওয়ালা মানুষটা এসে পড়ল ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে তাকে ভয় দেখাবে।"

কর্নেল হাসছিলেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে পা বাড়িয়ে বললুম,"আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"গুপ্তধন খুঁজতে।"

সারা পথ আর মুখ খুললেন না গোয়েন্দপ্রবর। সতর্কভাবে সেই জলার ধারে পৌঁছে স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "খোঁড়ার জায়গাটা বাগাদারা বুজিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আগের মতো। যাই হোক, তুমি চারিদিকে লক্ষ্য রাখো। বাগাদারা যে-কোনো সময় এসে হামলা করতে পারে। আমি এমন কিছু অনুমানই করিনি। নইলে কোন সাহসে এখানে ক্যামেরা পাততে আসব?"

একটা পাথরের স্তূপের গায়ে খাঁজে কী একটা তোলা রয়েছে। কর্নেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, "আরে! এটা দেখছি ডঃ মহাপাত্রর নোটবই। এখানে রেখে গুপ্তধন খুঁজছিলেন নাকি?"

নোটবইটা ছোট। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্তূপগুলোর গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি চোখে পড়ছিল। কর্নেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইসময় হঠাৎ আমার পিছনে চাপা শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কালকের সেই লেজওয়ালা। লাঠিটা যেই তুলেছে, আমিও রাইফেল তাক করেছি। ধমক দিয়ে বললুম, "ফ্যাল হতচ্ছাড়া হনুমান! ফেলে দে লাঠিটা! নইলে গুলি করে মারব।"

লাঠিটা ফেলে সে পিঠটান দেওয়ার জন্য ঘোরা মাত্র কর্নেল তীরের মতো এসে ওর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। লেজটা খুলে এল। সে অজানা ভাষায় চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পড়ি-কি মরি করে পালিয়ে গেল।

কর্নেল লেজটা দেখতে দেখতে বললেন, "একটা চমৎকার ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন! যাই হোক জয়ন্ত! আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেটে পড়ি। বাংলোতে পৌঁছেই ঝটপট সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে হবে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগোলেন। আমি পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললুম, "আমিই বা ট্রাইবাল আর্টের এ-নিদর্শন হাতছাড়া করব কেন? বিশেষ করে এটা আমার একটা স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে—মার খাওয়ার!"

বিদঘুটে বেঁটে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে কর্নেলের সঙ্গ ধরলুম।...

বাদশাহি সোনাদানা

চিরামবুরু-বরমডি রোডে একটা কাঠ বোঝাই ট্রাক পেয়ে গিয়েছিলুম। বরমডিতে কর্নেলের সামরিক জীবনের বন্ধু মেজর অর্জুন সিংয়ের বাড়ি। ওখান থেকেই আমরা চিরামবুরু জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মেজর অর্জুন সিং আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন, "কী ব্যাপার? এত শিগগির চলে এলেন যে জঙ্গল থেকে।"

কর্নেল বললেন, "পরে বলছি সব! এখন ভীষণ খিদে-তেষ্টায় ভুগছি।"

মেজর অর্জুন সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাদ্য এল টেবিলে। খেতে-খেতে কর্নেল চিরামবুরুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

মেজরসাহেব বললেন, "আপনাকে তো বলেইছিলুম মশাই, বাগাদা ট্রাইবের ওঝা সবসময় লেজ পরে থাকে। ওদের বিশ্বাস, রামায়ণের হনুমানজির অবতার ওদের ওঝা।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আসার সময় ট্রাকে বসে ডঃ মহাপাত্রের নোটবইটা পড়ে ফেলেছি। ওতে মোগল আমলের এক ঐতিহাসিক মির্জা মেহেদি খানের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি আছে। পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোটবইটা বের করে কর্নেল পড়তে যা বলেন।...দাক্ষিণাত্য থেকে বাদশাহ আলমগিরের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ বিদ্রোহ দমন করে ফিরে আসার সময় বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে যান। পথিমধ্যে সিরামবোরাত নামক ভীষণ অরণ্যে শাহজাদার পশ্চাদ্‌বর্তী দলটি জংলিদের কবলে পড়ে। জংলিরা রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। পরে অগ্রবর্তী দলের নায়ক মর্দান খাঁ জংলিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। আমি মর্দান খাঁয়ের জামাতা সেহাবুদ্দিনের কাছে শুনেছি, জংলিদের অস্ত্র বলতে শুধু কাঠের লাঠি ছিল। তাদের দলপতির নাকি বানরের মতো লেজ ছিল। মর্দান খাঁ জংলিদের বন্দি করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্নের সন্ধান পাননি। জংলিরা বলে, সব জিনিস তাদের লেজওয়ালা দলপতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মর্দান খাঁ জঙ্গল তল্লাশ করে তার সন্ধান পাননি। ফলে ক্রোধের বশে তিনি জংলিদের হত্যা করেন।"

কর্নেল বললেন, "এর তলায় ডঃ মহাপাত্রের নোট রয়েছে। লিখেছেন, বাগাদাদের নিয়ে গবেষণার সময় ওদের একটি লোক-কথায় মির্জা মেহেদি খানের বর্ণিত ঘটনার সূত্র রয়েছে। বাগাদা ওঝারা নাকি বংশপরম্পরায় সেই ধনরত্নের সন্ধান জানে। ওই ওঝাদের কিন্তু কৃত্রিম লেজ থাকে।"

ডঃ অর্জুন সিং অভ্যাসমতো হো হো করে হেসে বললে, "লোক-কথা? লোক-কথা মানেই গালগল্প!"

কিংবদন্তির শঙ্খচূড়

শেয়ালের ফাঁদ

জয়রামবাবু বললেন, 'মানুষের মতো মানুষের মুখের ভাষাকেও রোগে ধরে। ষট্‌গর্ভ কথাটা রোগে ভুগে দাঁড়িয়েছে সাতগড়ায়। এ যেন সুকুমার রায়ের গল্পের মতো ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! ছিল ষট্‌গর্ভ হয়ে গেল সাতগড়া!'

খিকখিক করে হাসতে হাসতে লাগলেন আমাদের গৃহস্বামী জয়রাম সিঙ্গিমশাই। এখন আমরা অবশ্য ওঁর গৃহে নেই। ওঁর ফার্ম চক্কর দিয়ে অধিক ফলনশীল ভুট্টাক্ষেতের পাশে একটা নালার ধারে প্রকাণ্ড পাথরে বসে আছি। ডাইনে টিলার মাথায় সূর্য কাত হয়ে গড়াচ্ছে। শেষবেলার নরম রোদে সবুজ শস্য এবং গাছগাছালি ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে! বাতাস বইছে না। কিন্তু গরমটা কমে গেছে। বাপ্‌স! এখানে জুনমাসে কী প্রচণ্ড গরম, কল্পনা করা যায় না। এই গরমে কর্নেলের মাথায় বিদঘুটে বাতিক গজিয়ে উঠল। সাতগড়া নিয়ে এলেন টানতে টানতে। এসে থেকে মনটা খালি পালাই পালাই করছে।

সিঙ্গি মশাইয়ের বয়স বোধ করি বাহান্ন-পঞ্চান্নর মাঝামাঝি হবে। চেহারায় পোড় খাওয়া ভাব আছে। স্বাস্থ্যও চমৎকার। গায়ে ছাইরঙা স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে গামবুট, মাথায় নীলচে রোদ-টুপি। একটা গাঁট্টা মারকুটে চেহারার কালো অ্যালসেশিয়ানের চেন ওর ডান হাতের মুঠোয়। বাঁহাতে একটা ছড়ি। কুকুরটা মাঝে মাঝে মুখ তুলে কী যেন দেখছে আর ছুটে যেতে চেষ্টা করছে। আতঙ্কে তার দিকে নজর রেখেছি। কুকুরটা আমার দু'চক্ষের বিষ। হতচ্ছাড়া প্রাণীটা যেন তা টের পেয়েছে এবং দু'-একবার মনিবের পায়ের কাছ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে লাল চোখে আমাকে গরগর করে শাসাচ্ছে।

আশ্চর্য, কুকুরটা কর্নেলের হাঁটুর কাছটা শুঁকছে। বুড়োকে কেন ওর অত পছন্দ হয়ে গেল ভেবেই পাচ্ছি না। সে কি ওঁর সায়েবি চামড়া আর সাদা দাড়ির জন্য? শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

জয়রামবাবু ষট্‌গর্ভের কাহিনী বলছেন। আমার চোখ-কান-মন কুকুরটার দিকে। একটু পরে কী ভাবে কুকুরটা ছাড়া পেয়ে গেল কে জানে! চেনসুদ্ধু দৌড়ে গেল বেঁটে চওড়া পাতাওয়ালা গাছগুলোর দিকে। জায়গাটা ঘন ঘাস, ঝোপঝাড় আর শুকনো পাতায় ঢাকা। জয়রামবাবু একবার ধমক দিলেন, 'জনি! কাম ব্যাক'। তারপর একটু হেসে বললেন, 'দেখুন না মজাটা! চেন কোথাও আটকে গিয়ে জব্দ হবে।'

কুকুরটা ততক্ষণে গতি কমিয়ে একখানে গিয়ে থেমেছে এবং জিভ বের করে সামনে তাকিয়ে। জয়রামবাবু, বললেন, 'হ্যাঁ—যা বলছিলুম। ষটগর্ভ। তার মানে ছ'টা গুহা। ওই যে প্রায় ন্যাড়া পাহাড়টা দেখছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ওখানেই আছে পাশাপাশি ছটা গুহা। পাঁচটা গুহাই ভেতরে ধস ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেছে কোন যুগে। একটা অক্ষত আছে।'

জিজ্ঞেস করলুম। 'ভেতরে ঢুকেছেন নাকি?'

সিঙ্গিমশাই বললেন, 'যতবার ঢোকার চেষ্টা কেউ করেছে, ততবারই সাপের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। আমাকে তো তাড়া করে আমার ফার্ম অবধি এসেছিল। সে কে মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

'কী সাপ?'

'শঙ্খচূড়।' জয়রামবাবু একটু হাসলেন। বললেন, গুলি করে মেরে ফেলিনি কেন? আপনারা তো দেখেছেন, বিষধর সাপ আমি মারি না, ধরি। এক্সপেরিমেন্ট করি। বিশেষ করে ওই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার জন্য কত যে চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি। সাপটা মশাই মানুষের চেয়ে ধূর্ত। কর্নেল সায়েবি এবার যদি কিছু করতে পারেন।'

বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। আমিও ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালাম। ওহে ধুরন্ধর ঘুঘু বুড়ো, তাই তোমার এই ভয়ঙ্কর জুন মাসে সাতগড়া আগমন। চোখে চোখ পড়লে প্রকৃতিবিদ বৃদ্ধ কাঁচুমাচু হাসলেন। তারপর একটু কেশে বললেন, 'ইয়ে—মিঃ সিংহ, আপনারা গল্প করুন। আমি নালার ধারটা ঘুরে আসি।'

পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোজা নালার ধারে কর্নেল কিছুটা এগোলেন। তারপর হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর ওঁর চিরাচরিত খেলা শুরু হয়ে গেল। একবার এদিকে একবার ওদিকে গুড়ি মেরে এগোচ্ছেন, কখনও কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছেন ঘাসের ভেতর—এবং চোখে বাইনোকুলার। অ্যালসেশিয়ানটা হকচকিয়ে গেছে যেন বুড়োর কাণ্ড দেখে। গরগর করে দু'ঠ্যাঙে বসে দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে কুকুরী পদ্ধতিতে।

সিঙ্গিমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

মুচকি হেসে বললুম 'আবার কী? কোনও বিরল প্রজাতির পাখি-টাখি দেখেছেন।'

'তাই বলুন।' বলে জয়রামবাবু প্যান্টের পকেট থেকে পাইপ বের করলেন।

আমার চোখ কর্নেলের দিকে যতটা না, ততটা কুকুরটার দিকে। একটু পরে দেখি, কর্নেল বেঁটে গাছগুলোর দিকে দৌড়ুচ্ছেন। ফাঁকা ঘাসজমিটায় গিয়েই কর্নেল আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! চারদিকে অনেকটা ফাঁকা ওখানে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে জাদুকর যেমন স্টেজে অদৃশ্য করে দেয়, এও যেন তেমনি।

জয়রামবাবুও পাইপ সাফ করতে করতে দেখেছিলেন ব্যাপারটা। ওঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলুম। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ!'

অ্যালসেশিয়ান ততক্ষণে কর্নেলের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেছে এবং গরগর করে ঘাস শুঁকছে। জয়রামবাবু পাথর থেকে লাফ দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।

ঘাসজমিটায় প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে। দুপুরের গরম হাওয়াই গাছগুলো থেকে শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জড়ো করে সম্ভবত! একখানা দেখি, পাতার স্তূপ বেজায় নড়ছে। জয়রামবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কর্নেল! কর্নেল!'

সেই স্তূপের ভেতর থেকে নাকিস্বরে আওয়াজ এল, 'এই যে এখানে'।

জয়রামবাবু ছড়ির ডগা দিয়ে পাতাগুলো সরালে নিচে একটা টাকওয়ালা মাথা দেখা গেল—নিঃসন্দেহে সেই প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর এবং অধুনা যিনি প্রকৃতিবিদ, তাঁরই বহুমূল্য ঘিলু ওই মাথার ভেতরই রয়েছে। একটা গভীর গর্ত থেকে যখন ওকে টেনে তুললুম, তখন ওর রূপ বদলে গেছে। আপাদমস্তক কাদার সঙ্গে শুকনো পাতা আর ঘাসের কুটো মেখে সে এক আজব মূর্তি।

কুকুরটাও গরগর করে হেসে উঠল। আমিও হাসি চাপতে পারলুম না কিন্তু জয়রামবাবু দুঃখিত মুখে বলতে থাকলেন, 'আমারই ভুল হয়ে গেছে! ছি ছি! আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল—ওখানে শেয়ালের ফাঁদ পেতে রেখেছি। শেয়ালগুলো বড্ড জ্বালাতন করে কিনা। কচি আখ নষ্ট করে। ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকে খামোকা ভুট্টাগুলো দাঁতে কেটে পয়মাল করে দেয়।'

কর্নেল দাড়ি থেকে শুকনো পাতা সাফ করতে করতে গোমড়ামুখে বললেন, 'চলুন ফেরা যাক।' তারপর কয়েক পা এগিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো হি হি করে হেসে উঠলেন। হাসিটা ক্রমশ বদলাতে থাকল। হা হা হা হা .....তারপর হো হো হো হো.....সে কী বিকট হাসি। এমন হাসি কস্মিনকালে এই রাশভারি লোকটিকে হাসতে দেখিনি। দমফাটানো হাসিটা বেড়ে চলেছে। জয়রামবাবু এবং আমি এবার একটু চমকে গেছি। কর্নেলের কি সেই বিদঘুটে হাসিরোগে ধরল? শেয়ালের ফাঁদে পড়ে কি সেই মারাত্মক অসুখের জীবাণু ঢুকে গেছে কর্নেলের শরীরে? কিছুক্ষণ পরে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করে কর্নেল হাসি থামালেন। তারপর বললেন 'স্নান করব।'...

সাপের মাথার মণি

রাতে খাওয়ার টেবিলে জয়রামবাবু কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়ের গুহার সেই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার ফন্দিফিকির নিয়ে আলোচনা করছিলেন। কর্নেলের মতে, সাপটাকে আহত না করে ধরার একমাত্র উপায় হচ্ছে আঠা ব্যবহার। গুহার কাছাকাছি কোথাও অনেকটা আঠা ছড়িয়ে রাখলে কাজ হতে পারে। মানুষের পায়ের শব্দে সাপটি যদি বেরিয়ে আসে, আঠায় আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তখন একটা দড়ির ফাঁস পরাতে পারলে আর অসুবিধে হবে না।

জয়রামবাবুর মনে ধরল কথাটা। বললেন, 'তাহলে কাল সকালেই সম্বলপুর গিয়ে আঠা আনব। ওখানে আঠা তৈরির কারখানা আছে।'

কর্নেল বললেন, 'আমিও বরং সঙ্গে যাব। সম্বলপুরে আমার এক বন্ধু আছেন দেখা করে আসা যাবে।' তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'জয়ন্ত ততক্ষণ নদীর ধারে গিয়ে সিনারি দেখবে। মহানদীর বুকে অনেক আশ্চর্য গড়নের পাথর দেখতে পাবে ডার্লিং। ওড়িশার বহু ভাস্কর্য সেইসব পাথর দিয়ে গড়া।'

মনে মনে খাপ্পা আমি। একা এই ফার্মহাউসে সময় কাটানোর কথা ভাবা যায় না। মহানদীর ধারে যাব কী। আটটা বাজতে না বাজতে রোদ একেবারে আগুন হয়ে উঠবে। গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

বললুম, 'আচ্ছা জয়রামবাবু, শঙ্খচূড় সাপটা নিয়ে কী এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলুন তো?'

জয়রামবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'প্রমাণ করব যে, সাপের মাথায় সত্যি মণি জন্মায়। লোকে বলে, অজগরের মাথায় নাকি মণি জ্বলে। বিলকুল মিথ্যে। অজগর হল পাইথনই। নির্বিষ পাইথনের মাথায় মণি হবে কোন দুঃখে? কয়লা থেকে যেমন হীরের জন্ম, তেমনি প্রচণ্ড বিষ থেকে মণির জন্ম। যে-সে মণি নয়, নীলকান্ত মণি। হীরের মতোই মণি দারুণ বিষাক্ত।'

'কিন্তু কী করে বুঝলেন শঙ্খচূড়টার মাথায় মণি আছে?'

রহস্যময় ভঙ্গিতে কর্নেলের দিকে চেয়ে চাপা হেসে জয়রাম সিঙ্গি বললেন, 'দেখেছি। ইচ্ছে করলে আপনিও দেখতে পারেন, যদি রাতবিরেতে ফার্মের শেষ দিকটায় গিয়ে ওত পাতেন। পাহাড়ের গায়ে নীল ছটা ঝিকমিক করছে দেখতে পাবেন। মশাই, ঝিনুকের পেটে মুক্তো হয়। হাতির মাথার ভেতরে গজমোতি হয়। সাপের মাথাতেও মণি হয়। সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। এতে অবাক হওয়ার কী আছে?'....

অনেক রাতে কর্নেলের ডাকে ঘুমের আমেজ কেটে গেল। ফ্যানের হাওয়া ভ্যাপসা গরম ছড়াচ্ছে ঘরে। সাড়া দিয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'সাপের মাথার মণি দেখবে কি ডার্লিং? তাহলে আমার সঙ্গে চুপচাপ বেরিয়ে এস।'

দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আমরা বেরোলুম। এদিকটায় ফার্মহাউসের ফুল-ফলের বাগান। একেবারে অন্ধকার। কর্নেলের এত লুকোচুরির কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাগানে ঢোকার পর

বাড়ির ভেতর অ্যালসেশিয়ানটার গজরানি শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে থেমে গেল। ততক্ষণে অন্ধকারে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। দেখলুম আমরা একটা পুকুরের ধারে এসে গেছি। দিনে পুকুরপাড়ে কলা আর পেঁপের গাছ দেখেছিলাম। তার ভেতর ঢুকে কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে এস পেছনে। সাবধান, শুকনো পাতা আছে। আস্তে পা ফেলবে।'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'শেয়ালের ফাঁদ নেই তো?'

কর্নেল নিশ্চয় হাসছিলেন নিঃশব্দে। কিছুটা চলার পর ফাঁকায় পৌঁছে দেখি, একটু তফাতে আলো জ্বলছে কোনও বাড়িতে। সর্বনাশ! ওটাই তো সিঙ্গিমশাইয়ের সাপ-ঘর। সকালে কিছুক্ষণ সর্পদর্শন করে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল আমার। অসংখ্য সাপ কাচের বড়-বড় কফিনের মতো বাক্সে কিলবিল করছে। ওখানেই কি সাপের মণি দেখতে নিয়ে যাচ্ছেন কর্নেল?

আলোটা আসছিল জানালার ফাঁক দিয়ে। কর্নেল সেই ফাঁকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে। তারপর কর্নেল সরে এসে কানে কনে বললেন, 'যাও, দেখে এসো!' পা টিপে টিপে এগিয়ে ফাঁকটায় চোখ রেখে দেখি, জয়রামবাবু একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাঁর গলায় একটা সাপ জড়ানো। সাপটা ফণা তুলছে মাঝে মাঝে এবং কাঁধ ঘুরে পিঠে, আবার পিঠ থেকে বুকের দিকে নেমে আসছে। দেখে গা শিরশির করছিল আতঙ্কে। টেবিলের অন্যদিকে বসে আছে একটা রোগা এবং একটা বেঁটে মোটাসোটা লোক। তাদের দেখে মোটেও ভালমানুষ মনে হল না। চাপাগলায় জয়রামবাবু কী সব বলছেন বুঝতে পারলুম না। লোকদুটো চুপ করে আছে। টেবিলের ওপর দুটো প্যাকেট রয়েছে। একটা প্যাকেট থেকে জয়রামবাবু কয়েকটা ক্যাপসুল বের করলেন। সেই সময় কর্নেল এসে আমাকে সরিয়ে ফাঁকটা দখল করলেন। আমি ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলুম না ব্যাপারটা।

জয়রামবাবু কি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের চোরাকারবার করেন? মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। তাছাড়া রাত দুপুরে এভাবে দুটো লোকের সঙ্গে ক্যাপসুলের প্যাকেট নিয়ে কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে?

সাতপাঁচ ভাবছি এবং ততক্ষণে উত্তেজনার ফলে ক্লান্তিও বোধ করছি, এমন কময় কর্নেল সরে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর কানে কানে বললেন, 'পেছন-পেছন এস।'

এবার পুকুরপাড়ে না গিয়ে সোজা বাঁহাতি এগিয়ে একফালি সরু রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা নক্ষত্রের আলোয় সাদা দেখাচ্ছিল। রাস্তার ওপাশে গাছ-পালা ঝোপঝাড় কালো হয়ে আছে। একটুও বাতাস বইছে না। রাস্তাটা ফার্ম এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে ঘুরে পশ্চিমে চলেছে। কতক্ষণ পর সেই নালার কাঠের সাঁকোয় গিয়ে কর্নেল বললেন, 'কিছু বুঝলে?'

'ভদ্রলোক নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাকারবার করেন মনে হচ্ছে।'

'ওগুলো মাদক নয়।' কর্নেল আস্তে বললেন। 'ওই ক্যাপসুলের মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর ভাইরাস। সাপের বিষের সঙ্গে শেয়ালের ক্ষত থেকে একরকম জীবাণু নিয়ে মিশিয়ে জয়রাম সিঙ্গি ওই মারাত্মক ভাইরাস বা জীবাণু সৃষ্টি করতে পেরেছে। লোকটার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। কেসময় বিদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা করত শুনেছি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ওই ভাইরাস দিয়ে কী করবেন সিঙ্গি মশাই?'

'কোনও দেশের ফসলের মাঠে কয়েকটা ক্যাপসুল ভেঙে ছড়িয়ে দিলে সব ফসলে রোগ ধরে যাবে। ইচ্ছে করলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যাবে। মাঠের পর মাঠ যদি ফসলে রোগ ধরে যায়, তাহলে কী সাংঘাতিক অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? তাছাড়া জল সংক্রামিত হয়ে মহামারীও হওয়া বিচিত্র নয়। বুঝতেই পারছ, কোনও শত্রুদেশের সরকার এমন সাংঘাতিক অস্ত্রের জন্য প্রচুর টাকা দিতে রাজি হবে।'

সর্বনাশ! এর কোনও প্রতিষেধক নেই?'

'জানি না। থাকলে জয়রাম সিঙ্গির কাছেই তার ফরমুলা থাকতে পারে।'

আপনি কেমন করে জানলেন?'

'বিশ্বস্তসূত্রে।' বলে কর্নেল হঠাৎ ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাত তুললেন। 'ওই দেখো, জয়ন্ত। সাপের মাথার মণি জ্বলছে ষট্‌গর্ভ পাহাড়ের গায়ে।'

তাকিয়ে দেখি, দূরে উঁচুতে একটা নীল আলোর বিন্দু ঝিকমিক করছে। ওটা নক্ষত্র নয়, তা ঠিকই। কিন্তু ওটা সত্যি যে শঙ্খচূড় সাপের মাথার মণি, তার প্রমাণ কী?

আমাদের মনের কথাটা বুঝি টের পেলেন ধুরন্ধর গোয়েন্দপ্রবর। কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'ডার্লিং। এই পৃথিবীতেই বহু রহস্যময় জিনিস আছে, যা হঠাৎ চোখে পড়লে মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। যাক্‌গে, এস। এবার গিয়ে ঘুমোনো যাক।.....

হায়েনার কান্না

সকালে কর্নেল জয়রামবাবুর সঙ্গে সম্বলপুর গেলেন জিপে চড়ে। মাইল ছ'য়েক দূরত্ব। আমি বেরোলুম না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ভাবলুম সকালটা ঘুমিয়ে কাটানো যাবে। কিন্তু মনের ভেতর অস্বস্তি। এই ভয়ঙ্কর লোকের আতিথ্যে আর এক মুহূর্ত কাটাতে ইচ্ছা করছে না। উঠে গিয়ে বারান্দায় বসলুম। সামনে ফার্মের সবুজ শস্যক্ষেত। হঠাৎ দেখি, ভুট্টাক্ষেত থেকে রাতে দেখা সেই বেঁটে মোটা লোকটা বেরিয়ে আসছে। তার হাতে অ্যালসেশিয়ানের চেন। কুকুরটা লাল জিভ বের করে পেছনে-পেছন আসছে। তাহলে রাত সাপঘরে দেখা দুটো লোকই সিঙ্গিমশাইয়ের কর্মচারী। রোগা লোটাকে একপলক দেখেছিলুম সকালে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল।

ডোরাকাটা গেঞ্জি আর জিনসের প্যান্টপরা বেঁটে লোকটা আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। অ্যালসেশিয়ানটা লাফ দিয়ে ঘুরল। লোকটাও ঘুরে কান খাড়া করে কী শুনল। কুকুরটা এবার তাকে টানতে টানতে ফের ভুট্টাক্ষেতের ভেতর নিয়ে গেল। জয়রামবাবু বলেছিলেন, ফার্মের ফসলে মাঝেমাঝে দিনদুপুরে বুনো, শুয়োর, কখনও হরিণের পাল, এমনকী সংরক্ষিত বনজঙ্গল থেকে হাতির দলও এসে হানা দেয়। শেয়ালের ভুট্টা নষ্ট করার কথাও বলছিলেন তাই ভুট্টাক্ষেতের শেষ দিকটায় উঁচু মাচানে পাহারার ব্যবস্থা আছে। মাচানটা গাছের আড়ালে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এবার কানে এল ঢং ঢং ঢং করে ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ হচ্ছে। ফার্মহাউস থেকে কয়েকজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখলুম। তারা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ভুট্টাক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে লাঠি বল্লম টাঙ্গি। খুব উত্তেজনার ব্যাপার, আমি বারান্দা থেকে নেমে গাছতলায় দাঁড়ালুম। হাতির পাল নিশ্চয় নয়, হরিণ কি শুয়োর হতে পারে।

এমন সময় সেই রোগা লোকটা এল। রাতে লোকটাকে কেমন বদমাশ দেখাচ্ছিল। এখন দেখি, ভারি অমায়িক চেহারা। মুখে বিনয়ের হাসি। বলল, 'শেয়ালের ফাঁদে কোনও জন্তু পড়েছে। দেখতে যাবেন নাকি স্যার?'

ব্যাপারটা দেখতেই হয়। ওর সঙ্গে যেতে যেতে জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কি ফার্মের কর্মচারী?'

সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমার নাম রতনকুমার পাত্র। আমি সিঙ্গি সায়েবের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট।'

রতনকুমার আমাকে ভুট্টাক্ষেতে ঢোকাল না। পাশ দিয়ে এগিয়ে নালার ধারে নিয়ে গেল। এখানেও একটা কাঠের সাঁকো আছে। সাঁকোতে একটু থেমে সে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে কর্নেল সায়েব অনেকদিন থেকে চেনেন। তবে এ কথাটা দয়া করে এখানে কাউকে যেন মুখ ফসকে বলবেন না।'

খুব অবাক হয়ে গেলুম। তাহলে কি সেই ভয়ঙ্কর ভাইরাস রহস্যের বিশ্বস্ত সূত্র এই লোকটিই?

কাল যেখানে কর্নেল ফাঁদে পড়েছিলেন, সেখান গোল হয়ে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বল্লম দিয়ে কোনও প্রাণীকে ফাঁদের গর্তে খোঁচাচ্ছে এবং হতভাগ্য প্রাণীটা কোঁ-কোঁ করে আর্তনাদ করে উঠছে। দৃশ্যটা বীভৎস। অ্যালসেশিয়ানটা গর্তের দিকে ঝুঁকে ক্রমাগত গর্জন করছে। বেঁটে লোকটা তাকে আটকে রেখেছে কোনওরকমে। বললুম, 'থাক'। আর যাব না। জন্তুটা কী দেখে আসুন তো রতনবাবু।'

রতনকুমার দৌড়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, 'হায়েনা। সিঙ্গিসায়েব এবার হায়েনা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ পাবেন?'

'হায়েনাটা ওরা মেরে ফেললে কী করে সুযোগ পাবেন?'

রতনকুমার হাসল। 'মারবে না। তবে হায়েনাটার গায়ে দগদগে ঘা করে দেওয়া হবে। তাই এমন করে বল্লম দিয়ে খোঁচাচ্ছে দেখছেন না?'

'ওই বেঁটে ভদ্রলোক কে বলুন তো?

'ওর নাম জগদীশ। এলাকায় সবাই জগাগুণ্ডা বলে। এখন সিঙ্গিসায়েবের ডান হাত।'

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে এলুম ফার্মহাউসে। রতনকুমার সাপ ঘরটার দিকে চলে গেল। ওকে ষষ্ঠগর্ভ পাহাড়ের সাপ আর আলোটার কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। ও এমন হঠাৎ করে চলে গেল যে সে সুযোগই পেলুম না। সাপঘরের দিকে প্রাণ গেলেও যাব না। সাপ দেখলেই আমার গা গুলোয়।

দুর্ভাগা হায়েনাটার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। হায়েনাকে নিরীহ প্রাণী বলা যায়, যদিও তার নামে শিশুচুরির বদনাম রটে। বনে জঙ্গলে বহুবার হায়েনার ডাক শুনেছি। মানুষের পৈশাচিক হাসির মতো কতকটা। কিন্তু এবার হায়েনার কান্না শুনতে পেলুম!.....

শঙ্খচূড়ের আবির্ভাব

দুপুরের আগেই কর্নেল ও জয়রামবাবু ফিরে এলেন। প্রচুর আঠা এনেছেন। খাওয়া-দাওয়ার পর কর্নেল, জয়রামবাবু জগদীশ আর রতন সেই পাহাড়ের দিকে রওনা হল। আমিও সঙ্গ ধরলুম। প্রচণ্ড রোদ তখনও। তবে গাছপালার ভেতর দিয়ে যেতে তত কষ্ট হচ্ছিল না। দুটো টিনভর্তি তরল আঠা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জগদীশ আর রতন।

পাহাড়টা দূর থেকে যত ন্যাড়া ভেবেছিলুম, ততটা নয়। বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা কিছু গাছও আছে। তবে পাহাড়ের গায়ে নানা আকারের সব পাথর। তার আড়ালে শঙ্খচূড় থাকা খুবই সম্ভব। জয়রামবাবু সবার আগে। বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন। আমি পেছনে। সবসময় মাটিতে এপাশ-ওপাশে নজর রেখে উঠছি।

কিছুটা নিচে দাঁড়িয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে অনেকক্ষণ গুহার মুখটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে বরং এই ভদ্রলোক আসুন টিন নিয়ে।' রতনকে দেখালেন কর্নেল।

জয়রামবাবু কেমন হেসে বললেন, 'রতন কেন, জগদীশকে নিন আপনি। জগদীশ খুব সাহসী লোক। রতন ভীতু। আর আমিও বারবার শঙ্খচূড়টার তাড়া খেয়েছি, আমার বুক টিপটিপ করছে। ও জয়ন্তবাবু, আপনি বরং এখানেই থাকুন। কাজ নেই মশাই গুহার কাছে গিয়ে।

কর্নেল জগদীশকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেলেন গুহার দিকে। আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। জয়রামবাবু ডাকলেন, 'এস রতন, আমরা বরং গুহার ওপাশটায় আঠাটা ছড়িয়ে আসি।'

একটা উঁচু পাথরে ঝটপট উঠে দাঁড়ালুম। রতন ও জয়রামবাবু বাঁ-পাশ দিয়ে উঠে বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কিন্তু কর্নেল ও জগদীশকে দেখতে পাচ্ছিলুম। জগদীশ আঠার

টিনটি নামিয়ে রেখেই প্রায় দৌড়ে আমার কাছে চলে এল। কর্নেল আঠাটা ছড়াচ্ছেন না। বাঁ দিকে তাকিয়ে আছেন কেন বুঝতে পারলুম না। একটু পরে হঠাৎ জয়রামবাবুর বিকট চিৎকার শোনা গেল, 'সাপ! সাপ!' তাপরই কর্নেলকে দেখলুম পকেট থেকে রিভলভার বের করে বাঁদিকে ছুটে গেলেন। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলুম।

জগদীশ এক লাফে নিচে নামল। তারপর প্রায় গড়াতে গড়াতে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকল।

এবার যা দেখলুম, চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। গুহার ভেতর থেকে একদঙ্গল পুলিশ বেরিয়ে এল। তারা বন্দুক পিস্তল উঁচিয়ে বাঁদিকে দৌড়ে গেল।

এতো দেখছি 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়ালের' মতো ব্যপার। ছিল শঙ্খচূড় সাপ, হয়ে গেল পুলিশ।

আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ভয় পাওয়াও চলে না। হাঁপাতে হাঁপাতে গুহার কাছে উঠে গেলুম। ডাইনে ঘুরে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। জয়রাম সিঙ্গির হাতে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের দল নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে।

কর্নেল আমাকেই খুঁজছিলেন সম্ভবত। দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন।

কাছে গিয়ে বললুম, 'এ কি ভেলকির খেলা কর্নেল!'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আর একটু দেরি হলে রতন বেচারাকে বাঁচাতে পারতুম না! সিঙ্গি ওর গায়ে সাপের বিষের ইন্‌জেকশান দিতে যাচ্ছিল।'

কর্নেল নামতে থাকলেন পাহাড় থেকে। বললুম, 'কী সাংঘাতিক লোক!'

কর্নেল বললেন, 'সিঙ্গি টের পেয়েছিল রতন আমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে। অতি-চালাক এবং শয়তান কি না! তাই শঙ্খচূড় ফাঁদ পেতেছিল। আমার উপস্থিতিতেই রতনকে খুন করত এবং আমাকে বোকা বানাত। ওর সিরিঞ্জে জোড়া সুচ আছে। বিষাক্ত সাপের দাঁতের চিহ্ন এবং পোস্টমর্টেমে রক্তে সাপের বিষও পাওয়া যেত। আসলে নৃশংস ক্রূর জয়রাম সিঙ্গি এভাবে আমার ওপরও প্রতিশোধ নিতে মতলব করেছিল। তাই আমাকে একটা মিথ্যা শঙ্খচূড় সাপ ধরার অনুরোধ করে এসেছিল কলকাতা গিয়ে। হ্যাঁ, সাপের মাথার মণিটা আসলে একটা নীল ক্ষুদে বাল্ব্। কাল সকালে পাখি দেখতে বেরিয়ে ওটা আবিষ্কার করেছিলুম।'

ফার্মহাউসে ফিরে দেখি, পুলিশে ছয়লাপ। সাপঘরে তল্লাশি করে সেই ক্যাপসুলগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আর্যশংকর শর্মার জিপে আমরা সম্বলপুর রওনা হলুম। পথে হঠাৎ শেয়ালের ফাঁদটার কথা মনে পড়ল। জিগ্যেস করলুম,'শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর আপনার অত হাসির কারণ কী কর্নেল?'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কেউ কেউ আমাকে আড়ালে বুড়োঘুঘু বলে ডাকে। শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর মনে হয়েছিল এবার কি তাহলে পুরনো খেতাব বাদ দিয়ে বুড়ো শিয়াল বলে ডাকবে? তবে শেয়াল খেতাব মন্দ না। শেয়াল অতিশয় ধূর্ত প্রাণী। এই ভেবেই হাসি এসে গিয়েছিল।' বলে কর্নেল কালকের মতো আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন।

হাসি সংক্রামক। সুতরাং আমরা জিপসুদ্ধ লোক হো হো করে হাসছিলুম। অবশ্য ড্রাইভার বাদে।

গাড়ি চালানোর সময় তার হাসতে মানা। তাছাড়া তার চেহারাও ছিল বেজায় বদরাগী।....

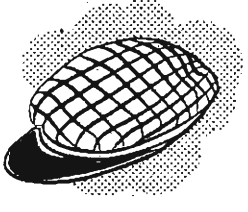

তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা

মাদাম ব্লাভাৎস্কির গুপ্তবিদ্যা

'গুম্ফার ভেতর গা ছমছম করা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরেই টের পেলুম, বাইরের উজ্জ্বল রোদ থেকে এসেছি বলেই এমন মনে হচ্ছে। অন্ধকারটা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল। তারপর চোখের দৃষ্টি যত পরিষ্কার হচ্ছিল, তত ভয় পাচ্ছিলুম। চৌকো বিশাল ঘরের ভেতর দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে যত সব ভয়ঙ্কর চেহারার মূর্তি।...

'বিদঘুটে মূর্তিগুলো চোখ কটমট করে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আর এক পা বাড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। চোখের দৃষ্টি যখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন মূর্তিগুলোকে জীবন্ত মনে হল। এমনকী, যেন তাদের ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা শব্দও কানে শুনতে পেলুম।....

'এই নির্জন পাহাড়ি গুম্ফায় খেয়ালবশে একা ঢুকে পড়াটা ঠিক হয়নি। সত্যের খাতিরে বলব, আমি ভীতু লোক নই। ভূতপ্রেত বিশ্বাস করি না। জীবনে কত সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছি, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে ফেলিনি। আজ ওই গুম্ফার ভেতর আমার জ্ঞানবুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকে পড়েছি এবং একদল সাংঘাতিক জীবের পাল্লায় পড়ে গেছি। শুধু সাংঘাতিক হলেও কথা ছিল, এরা বুঝি বাস্তব পৃথিবীর কেউ নয়—রূপকথার এক ভূতুড়ে এলাকার বাসিন্দা। হয়তো মানুষ দেখলেই এদের জিব লকলক করে ওঠে।.....

'কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। না, ভয়ে পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আমার কোমরে রীতিমতো একটা অটোমেটিক রিভলভার আছে। কিম্ভূত প্রাণীগুলো যদি আমার ওপর হামলা করে, যা থাকে বরাতে, গুলি আমি ছুঁড়বই। তাতে এদের গায়ে গুলি বিঁধবে কিংবা এরা ভড়কে যাবে কি না সেটা কোনও কথা নয়, কথা হল যে অন্তর আমার সাহস বাড়বে গুলির শব্দে।

'হুঁ ভয়ের সময় শব্দ একটা শক্তিশালী ব্যাপার। রাতবিরেতে একা কোথাও ভয় পেলে নিজের কাশির শব্দ কিংবা চেঁচিয়ে কথা বলা, অথবা গান করা মোক্ষম কাজ দেয়। সাহস ফিরে আসে। তাই না?'

মেজর হরগোবিন্দ সিংহ আমাদের দু'জনের কাছে সায় চেয়ে একটু হাসলেন। আমি সায় দিয়ে বললুম, 'ঠিকই বলেছেন। তা আপনি কি সত্যি সত্যি রিভলভার করে গুলি ছুড়লেন?'

মেজর বললেন, 'আপানার মাথা খারাপ? ব্যাপারটা আসলে যাকে বলে হ্যালুসিনেশন—মনের ভুল থেকেই চোখের ভুল আর কানের ভুল। তিব্বতের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলোর নতুন লোককে এভাবে ভড়কে দেয়। ওসব গুম্ফা মহাযানী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের প্রার্থনাঘর। মহাযানীরা তন্ত্রমন্ত্র, গুপ্তাবিদ্যা বা অকাল্টের চর্চা করে। এসবের সাহায্যে নাকি তার অলৌকিক শক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কর্নেল সরকার, আপনি নিশ্চয় মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা জানেন?

আমার 'ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড' স্বনামধন্য বুড়ো ঘুঘুমশাই চোখ বুজে ইজিচেয়ারে আরামে বসে চুরুট টানছেন। গলার ভেতর শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন।

মেজর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম ব্লাভাৎস্কি উনিশ শতকে সারা পৃথিবীতে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। মাদ্রাজের কাছে তিনি প্রেত-চর্চার একটা আখড়াও বানিয়েছিলেন। মাদাম বলতেন, তিব্বতের রহস্যময় সাধুরা তাঁর গুরু। এক গুরুর নাম ছিল কুট হুর্মি। অদ্ভুত নাম। এই গুরু দিব্যশরীরে চোখের পলকে তাঁর কাছে নাকি হাজির হতেন। কখনও মাদামের প্রেত-চর্চার আসরে শূন্য থেকে ছিটকে পড়ত গুরুদেবের চিঠি। এসব চিঠিকে উনি বলতেন মাস্টার লেটারস। তবে ভারতে স্বাধীনতাবোধক, স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মমর্যাদার জ্ঞান সঞ্চার মাদামের প্রেরণা অনেক। সেজন্যেই তিনি ভারতে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া। এই রুশ মহিলার কাছে সত্যি আমরা ঋণী।

এবার ঘুঘুমশায় শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা শোনা গেল। চোখ বন্ধ। ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। সাদা দাড়ি চুলকে বললেন, হুঁম! মাদাম ব্লাভাৎস্কি রাশিয়া থেকে ভাগ্যের খোঁজে মার্কিনমুলুকে পাড়ি জামান। যখন নিউইয়র্কে গুছিয়ে বসেন, তখন বয়স ছিল বিয়াল্লিশ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়িতে এক ভদ্রলোক মিশরের মমিভূত হাজির করেন। তখনই থিওজফিক্যাল সোসাইটি নামে সর্বপ্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সেই সন্ধ্যাতেই। তবে যাই রটুক, মাদাম কদাচ তিব্বতে যাননি।

মেজর বললেন, বলেন কী! আপনি তাহলে এসব মানেন?

কী সব?

অলৌকিক শক্তি—ভূতপ্রেত?

মানি বৈকি।

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। জানি সর্ববিষয়ে, প্রাজ্ঞ এবং সবকিছুতে নাক গলানো এই ধুরন্ধর গোয়েন্দা ভদ্রলোকের জুড়ি নেই কোথাও। কিন্তু উনি নিজেও ভূত-প্রেত-ট্রেত বিশ্বাস করেন, জানা ছিল না তো! বললুম, কর্নেল নিশ্চয় রসিকতা করছেন?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন, ডার্লিং। তুমি নিশ্চয় শেক্সপিয়র পড়েছ। শেক্সপিয়রের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক ব্যাপার আছে যাতে মানুষের অক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। জয়ন্ত, রবি ঠাকুরও বলেছেন, বিপুলা এ পৃথিবীতে কথটুকু জানি।

মেজরসায়েব হতাশ ও বিরক্ত হয়ে বাঁকা মুখে বললেন, আপানাকে আমি যুক্তিবাদী মানুষ ভেবেছিলুম। বোঝা যাচ্ছে মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা আপনি সত্যি বলে মানেন। অথচ দেখুন, লন্ডনের আত্মা-সংক্রান্ত গবেষণা সমিতির পক্ষ থেকে মাদামের ক্রিয়াকলাপের তদন্ত করে বলা রয়েছিল সব জোচ্চুরি। ইতিহাসে এই মহিলার মতো ধূর্ত ঠগ আর দেখা যায়নি।

কর্নেল মৃদুহাস্যে বললেন, হুঁম। লন্ডনের এই সমিতির সদস্য ছিলেন ববি টেনিসন, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তি। আর ওঁদের পক্ষ থেকে যিনি তদন্ত করেন, তাঁর নাম রিচার্ড হজসন। মাদ্রাজের কাছে বঙ্গোপসাগরের তীরে আডিয়ারে মাদারের আখড়ায় তিনি এসেছিলেন। এটা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

মেজর হরগোবিন্দ বললেন, এত জেনেও আপনি অকাল্টে বিশ্বাস করেন? আশ্চর্য!

তারপর যেন ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে দাঁড়ালেন। টুপিটি মাথায় চাপিয়ে এবং ছড়িটি তুলে নিয়ে ভদ্রতাসূচক বিদায় সম্ভাষণ না করেই ঘর থেকে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! দরজাটা বন্ধ করে এস। শুয়ে পড়া যাক।

আদেশ পালন করে এসে বললুম, লোকটা ভারি অভদ্র তো!

হুঁম। সেজন্যে হরগোবিন্দের বদলে ওঁকে বলা যায় মেজর গোঁয়ারগোবিন্দ। বলে কর্নেল হাসতে হাসতে বিছানার দিকে পা বাড়ালেন।

বাথরুম থেকে ফিরে পোশাক বদলানোর সময় লক্ষ্য করলুম, কর্নেল নাক ডাকছেন।

গ্যাংটক থেকে প্রয় একশো মাইল দূরে তিব্বত-সীমান্তে হিমালয়ের বুকে এই বাংলোটা সড়ক দফতরের। পেছনে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে লাচেন চু নদীতে। তার ওপারে ঢালু হয়ে উঠে গেছে আরও পাহাড়। চিরতুষারের এলাকা ওদিকে।

বিকেলে নদীর ওপারের পাহাড়ে একটা গুম্ফা দেখছিলুম। সেই নিয়ে কথা শুরু। মেজর হরগোবিন্দ আমাদের সঙ্গী নন। তিনি আগেই এসেছেন। যেচে পড়ে আলাপ করেছেন। কর্নেল এবং উনি দু'জনেই সমরবিভাগের লোক। দু'জনেই রিটায়ার করেছেন। অতএব দু'জনের মধ্যে ভাব হতে দেরি হয়নি।

কিন্তু যেভাবে চটমটে চলে গেলেন, আমার বিশ্বাস, কাল সকাল থেকে উনি আর কর্নেলের মুখদর্শনও করবেন না। কাল সকালে তিনজনে মিলে নদী পেরিয়ে ওই গুম্ফা দেখতে যাওয়ার কথা। মনে হচ্ছে, মেজর যদি যান, অন্যসময় একা একা যাবেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর দেখি, এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। একটা রাক্ষুসে চেহারার প্রাণী, কতকটা মানুষের মতো দেখতে, হাঁ করে আমার দিকে তেড়ে আসছে। ভয় পেয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম। গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না। প্রাণীটা অদ্ভুত গর্জন করতে লাগল। কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।...

তারপর ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলুম, দুঃস্বপ্ন নিছক। কিন্তু বাইরে কিছু ঘটছে। একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে যেন। হুঁ, ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য। সত্যি সত্যি কোথায় একটা ঘণ্টা বেজে চলেছে ঢং ঢং করে। ঘণ্টার শব্দটা বাড়ছে এবং কমছে। কখনও মনে হচ্ছে, বাইরে নয়, আমার মাথার ভেতরই বাজছে ঘণ্টাটা।

অতিষ্ঠ হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের সাড়া এল ওপাশের বিছানা থেকে। ....কী জয়ন্ত? ভয় পেলে নাকি?

ভয় পাওয়ার কী আছে? ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে শুনছেন না?

হুঁম, শুনছি।

ঘন্টা বাজছে কোথায় বলুন তো?

নদীর ওপারে সেই গুম্ফায়।

কিন্তু ওখানে তো শুনেছি কেউ থাকে না।

ঠিকই শুনেছ, ডার্লিং।

তাহলে ওখানে এ দুর্যোগে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে? কেনই বা বাজাচ্ছে?

জয়ন্ত, তখন বলছিলুম, পৃথিবীতে এখনও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এবং আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, তাহলে ভূতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে বলতে চান?

কর্নেল যেন আপন মনে বললেন, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের রাতেই ওরা জেগে ওঠে। যত অশরীরী অতৃপ্ত আত্মারা এই গুম্ফায় গিয়ে প্রার্থনা করে। ওরা মুক্তি চায়। নিছক মুক্তি নয়, বৌদ্ধধর্ম যাকে বলে মহাপরিনির্বাণ। তারপর তার জন্ম নেই, জরা ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই। আহা! সে কী খাসা অবস্থা।

তারপর আচমকা ওঁর নাকডাকা শুরু হল ফের। আমার আর ঘুম হল না। ঝড়ের দাপটে বাংলোটা কেঁপে উঠছিল। ভয় হচ্ছিল, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হাজার ফুট গভীর নদীতে ফেলে দেবে।

আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছিল। কখনও মৃদু কখনও তীব্র। এমন অস্বস্তিকর রাত জীবনে আসেনি।

মেজরের অন্তর্ধান রহস্য

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাইরে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। বিশ্বাস হয় না, রাতে অমন ঝড়জল হয়েছে। তবে গাছপালা ঝোপঝাড়ের রং খুলে গেছে। একটু পরেই কর্নেল ফিরলেন। বললেন, দুঃসংবাদ ডার্লিং! লাচেন চু নদীতে রাতারাতি জল বেড়ে গেছে। জল না কমলে ওপারের গুম্ফা দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে তার চেয়েও দুঃসংবাদ, আমাদের মেজরসায়েবের পাত্তা নেই। চৌকিদার যা বলল, তা ভারি অদ্ভুত। বেড-টি দিতে গিয়ে দেখে, ওঁর ঘরের দরজা খোলা। বিছানা লণ্ডভণ্ড। মেঝেয় একপাটি আর দরজার কাছে একপাটি স্লিপার পড়ে আছে। কেউ বা কারা তাঁকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

সে কী! বলে হন্তদন্ত হয়ে পা বাড়ালুম।

কর্নেল আমার হতে ধরে বাধা দিয়ে বললেন, ঝুটঝামেলায় গিয়ে লাভ কী জয়ন্ত? চৌকিদার থানায় গেছে। পুলিশে এসে ও নিয়ে মাথা ঘামাক। বরং চলো, বাজারের দিকে গিয়ে কোথাও ব্রেকফাস্ট করা যাক। খিদে পেয়েছে।

পুলিশ তো আমাদেরও জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে!

যখন করবে, যা জানি বলব। এখন চলো, খালি পেটে কেবল ভাবনা বাড়ে।

পা বাড়িয়ে বললুম, কিন্তু আমরা তো কিছু জানি নে এ ব্যাপারে।

কর্নেল দরজায় তালা এঁটে বললেন, নদীর ধারে এক জায়গায় দেখলুম পাথরের গা বেয়ে অজস্র অর্কিড গজিয়েছে। এসব অর্কিডের এখন ফুল ফোটে। অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য ডার্লিং! ফলের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ছে। নীল পাখনায় কালো ফুটকিওলা একজাতের প্রজাপতি দেখলুম। আমার সংগ্রহে এ প্রজাপতি নেই। আঁতকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! আমি আপনার পেছন পেছন ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারব না বলে দিচ্ছি।

মেজরের ঘরটা বাংলোর পেছন দিকে। গেট থেকে দেখা যায় না। খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু কর্নেল যেন তা টের পেয়েই আমার কাঁধ ধরে একরকম ঠেলে নিয়ে চললেন। ঘোরালো পথ ধীরে ধীরে নেমেছে উপত্যকার সমতলে। পিচের রাস্তায় কিছুটা হেঁটে বাজারে পৌঁছলুম। ছোট বাজার ভিড়ভাট্টা নেই। একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলুম আমরা। তারপর ডাইনে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে অজস্র পাথর এলোমেলো পড়ে আছে। যেন কোনও ঐতিহাসিক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়েচলা পথ। নদীর ধারে পৌঁছে কর্নেল এদিক ওদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ চাপাগলায় বললেন, বসে পড়ো, বসে পড়ো!

একটা পাথরের আড়ালে আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে উনি গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলারটা চোখে রেখে নদীর ওপারে কিছু দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল মুচকি হেসে বাইনোকুলারটা আমাকে দিলেন। চোখে রেখে যা দেখলুম, তাতে আমি হতভম্ব। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে একটা চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক। তাদের একজন স্বয়ং মেজর হরগোবিন্দ। মুখের চেহারা অস্পষ্ট বলে দ্বিতীয় লোকটিকে চিনতে পারলুম না। দু'জনে কী যেন পরামর্শ চলেছে।

কর্নেল বললেন, মেজরসায়েব কার সঙ্গে কথা বলছেন, চিনতে পারছ তো জয়ন্ত?

বললুম, না তো। কে ও? একে কি কোথাও দেখেছি?

দেখেছ ডার্লিং! আশাকরি, গ্যাংটকের সেই ম্যাজিশিয়ানটিকে তোমার মনে আছে। আশ্চর্য কিছু ম্যাজিক দেখেছিলুম। চারধারে লোকের চোখের পাহারা। তার মধ্যে সেই জাদুকর তাক লাগানো খেলা দেখাচ্ছিল। খেলা ভাঙলে কর্নেল তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। বুড়ো মাঝে মাঝে যেন

কেমন শিশু হয়ে ওঠেন। ম্যাজিক দেখে সে কী খুশি! ম্যাজিশিয়ানকে দশ টাকা বখশিস পর্যন্ত দিয়ে বসলেন।

লোকটা এখন মেজর হরগোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছে নদীর ওপারে এক দুর্গম জায়গায়। আর মেজর ভদ্রলোক নাকি নিখোঁজ হয়েছেন। ঘরের বিছানা লণ্ডভণ্ড। পায়ের চটি ছিটকে পড়েছে। কারা জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। গুম হয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, কিছু বুঝলে জয়ন্ত?

একটুও না। আপনি বুঝেছেন কি?

নাঃ, অতএব ব্যাপারটা বোঝা দরকার। চলো জয়ন্ত, ওপারে যাই।

যাবেন কীভাবে? নদীতে এখন বান যে।

কর্নেল বললেন, মাইলটাক উজানে একটা দড়ির সাঁকো আছে এস। কিন্তু সাবধান! পাথরের আড়ালে আড়ালে আমাদের যেতে হবে।

যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে ওপাশের পাহাড়ের চাতালে দুটি ছোট্ট আবছা মূর্তি।

গুম্ফায় 'মারে'র আবির্ভাব

আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির শারীরিক দক্ষতা দেখলে তাক লেগে যাবে। ভাগ্যিস ছাত্রজীবনে মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ভাল ট্রেনিং নিয়েছিলুম এবং বার দুই পর্বত অভিযানে দৈনিক সত্যসেবকের পক্ষ থেকে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলুম। প্রাণান্তকর রজ্জুসেতু পেরিয়ে বিস্তর পাহাড়ি গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে যখন চাতালের কাছে পৌঁছলুম, তখন অবস্থা শোচনীয়।

মেজর এবং ম্যাজিশিয়ান আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকার পাত্র নন। বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছেন ততক্ষণে। হবেন, এ তো জানা কথা। কর্নেলও কম গোঁয়ার নন দেখা যাচ্ছে।

আমার মনের কথা আঁচ করে গোয়েন্দপ্রবর বললেন, ডার্লিং! এ বৃদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ো না। আমরা খুব পবিত্র জায়গায় এসে পৌঁছেছি। হেরোর বৎস, ওই সেই রহস্যময় গুম্ফা—যেখানে ঝড়ের রাতে ঘণ্টা বাজে।

ঘুরে দেখি, আরে তাই তো! ডাইনে একফালি রাস্তার মাথায় গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। আমরা উত্তর ঘুরে পূর্বে এসেছি। ওপারে পশ্চিমে আমাদের বাংলোটাও দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চাতাল মতো জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, চলো। আমরা গুম্ফার দিকে যাই। এবেলা আমরা গুম্ফার লামা মহোদয়ের আতিথ্য নেব। ভেবো না, ওঁরা খুব অতিথিবৎসল।

এদিকটায় গাছপালা নেই বললেই হয়। কিছু ঝোপঝাড় আছে। গুম্ফার সামনে প্রকাণ্ড একটা রঙিন প্রার্থনাচক্র। মন্ত্র খোদাই করা আছে। দেখে মনে হল, হাজার বছরের পুরনো। কাঠের বারান্দায় উঠতেই এক প্রৌঢ় লামা হাসিমুখে হিন্দিতে বললেন, আইয়ে! আইয়ে! কাঁহাসে আতে হ্যায় আপলোক?

আলাপ-পরিচয়ের পর ভেতরে নিয়ে গেলেন। চৌকো প্রশস্ত ঘর। সামনে বেদির ওপর বিশাল বুদ্ধমূর্তি। কিন্তু দু'ধারে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড় করানো মূর্তিগুলো দেখে চমকে উঠলুম। মেজরসায়েব ঠিক এমনি বর্ণনা দিয়েছিলেন মনে পড়ল। বিকট সব মূর্তি সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের ওপর দিক থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। নইলে অন্ধকার জমে থাকত।

পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন লামা। আমরা মেঝেয় বসলুম। উনি কাঠের আসনে বসে বললেন, আমি সকালে আসি। সন্ধ্যার আগে চলে যাই। ওপর দিকে নতুন গুম্ফায় আমরা অনেকে মিলে থাকি। এই গুম্ফাটা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর। তাই রোজ আসতে হয়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি, এ গুম্ফায় রাতে থাকলে বিপদ ঘটে। তা কি সত্যি?

লামা একটু হেসে, বললেন, এমনকী দিনেও 'মার' কখনও কখনও দেখা দেয় এ গুম্ফায়। খুব সাহসী না হলে এখানে দিনেও থাকা কঠিন। এই তো, আজ সকালে যখন দরজা খুলে ঢুকলুম, স্পষ্ট দেখলুম 'মার' দাঁড়িয়ে আছে। বিকট তার মূর্তি। জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলুম, তখন অদৃশ্য হয়ে গেল। আসলে গুম্ফার ছাদের মাথায় ওই যে দেখলাম সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা, ওটাই 'মার' কে দিনে দুর্বল করে রাখে। মার অন্ধকারের শক্তি কিনা! যাক্‌গে, আপনারা ক্ষুধার্ত। আপনাদের সেবার অনুমতি দিন।

লামা একটা বেতের ঝুড়ি থেকে চাপাটি, দুধ আর ফল বের করলেন। ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। গোগ্রাসে খেলুম। কোনার দিকে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে। সেখানে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে চা তৈরি করলেন লামা। চা খেয়ে ক্লান্তিটা চলে গেল। কর্নেল বললেন, আমরা প্রার্থনাঘরটা এবার দেখতে চাই।

লামা বললেন, নিশ্চয়। চলুন। আমি এখন ওঘরে প্রর্থনায় বসব।

প্রার্থনাঘরে ঢুকেই লামা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় মন্ত্র পড়তে থাকলেন। কর্নেল আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত?

সূর্য নিশ্চয়ই পশ্চিমে একটু ঢলেছে। ছাদের সেই জায়গাটা দিয়ে রোদ সোজাসুজি ঢুকছে না। তার ফলে ঘরের ভেতরটা এখন অস্পষ্ট। আবছায়ার মতো কী একটা দাঁড়িয়ে আছে বেদির তলার দিকে। অবিকল মানুষের মতো একটা কালো মূর্তি। দেখামাত্র আমার হৃদপিণ্ডে রক্ত চলকে উঠল। যা দেখছি তা কি সত্যি? কারণ মূর্তিটা আসলে মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচুতে শূন্যে ভাসছে এবং দুলছে।

তারপরই বাইরে একটা শনশন শব্দ উঠল প্রার্থনাঘরের দরজাগুলো মচমচ করে উঠল এবং বাইরে থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। ছাদের ঘুলঘুলিতে যেটুকু আলো আসছিল, হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরটা ভরে গেল। তারপর কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কোথায়। মেঘ ডাকতে থাকল। দরজা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক ঢুকল ঘরে মুহুর্মুহু। তাই দেখলুম, শূন্যে দাঁড়ানো মূর্তিটা ভীষণ দুলছে। তারপর শুরু হয়ে গেল বুক হিম করা সেই ঘন্টাধ্বনি—কাল রাতের মতো। ঢং ঢং ঢং ঢং.....কখনও তীব্র, কখনও মৃদু। তার তালে তালে রহস্যময় ছায়ামূর্তি দুলতে থাকল।

লামার চিৎকার শুনলুম, পালিয়ে আসুন!

কর্নেল আমার কাঁধ আঁকড়ে বলে উঠলেন, নোড়ো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।

লামাকে ছিটকে বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলুম। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল, বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলেছে। কাঠের তৈরি প্রাচীন গুম্ফা মচমচ করে কাঁপছে।

বেদির ওখানে 'মার'কে আর দেখতে পেলুম না। সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিকে ঘনঘন বাজ হাঁকড়াচ্ছে। কানে তালা ধরে যাচ্ছে মেঘের গর্জনে। বিদ্যুতের তীব্র ছটা এসে ঢুকছে ঘরের ভেতরে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলছি। বিকট মূর্তিগুলো যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

কতক্ষণ মারের সেই উপদ্রব চলল বলা কঠিন। যখন সব শান্ত হল, তখন কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, এস জয়ন্ত! লামার ঘরে একটা হ্যারিকেন দেখেছি। সেটা জ্বেলে নিয়ে আসি।

হ্যারিকেনটা জ্বেলে দু'জনে প্রার্থনাঘরে ফিরে এলুম। বিকট মূর্তিগুলোকে সেই আলোয় বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কর্নেল কী করতে চান, বুঝতে পারছিলুম না। বুদ্ধমূর্তির কাছে গিয়ে উনি হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, সর্বনাশ! মার বেচারা এখানে পড়ে আছে দেখছি!

বেদির নিচে বাঁদিকে একটা মূর্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে কেউ পড়ে আছে। কর্নেল গুম হয়ে বললেন, বেচারা মারা পড়েছেন জয়ন্ত।

তাহলে যাকে দেখে মার ভেবে লামা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন এবং আমারও হৃৎকম্প হচ্ছিল, তিনি আসলে মেজরসাহেব! কিন্তু আশ্চর্য, ওঁকে শূন্যে দাঁড়ানো দেখছিলুম কেন?

কর্নেল হ্যারিকেন তুলে ছাদের দিকটা দেখছিলেন। বললেন, হুঁম। এই দেখ জয়ন্ত। কড়িকাঠের আঁটা আংটা থেকে একটা ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। আমরা যখন ওপাশের ঘরে লামার কাছে ছিলুম, তখনই ওঁকে কেউ বা কারা খুন করে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এখানে। দড়িটা ছিঁড়ে মেজরসায়েবের মড়া পড়ে গেছে। আমরা যাতে ভয় পেয়ে গুম্ফা থেকে পালিয়ে যাই, তার জন্যে এই কাণ্ড করা হয়েছিল।

কর্নেল বিশাল বেদির ওপর উঠে গেলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে ডাকলেন, দেখে যাও জয়ন্ত।

গিয়ে দেখি, বুদ্ধমূর্তির পিঠের দিকটা ভাঙা এবং মুর্তির খোলের মধ্যে কতকালের পুরনো একগাদা পুঁথি তছনছ অবস্থায় রয়েছে। কেউ বা কারা মরিয়া হয়ে কিছু হাতড়েছে। গুপ্তধন ছিল নাকি?

বললুম, কর্নেল, মেজরকে খুন করে সেই ম্যাজিশিয়ান ব্যাটা গুপ্তধন হাতিয়ে পালিয়েছে। তাছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা হয় না। আমার মনে হচ্ছে.....

বুটের শব্দ তুলে একদঙ্গল পুলিশ ঢুকছিল গুম্ফায়। কর্নেল ভারী গলায় বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য মিস্টার শর্মা! যা ঘটবার ঘটে গেছে।

শেষ চমক

পরদিন সকালে বাংলোর বারান্দায় বসে কর্নেলের কাছে রহস্যকথা শুনছি, পুলিশ অফিসার মিঃ প্রভুদয়াল শর্মা এলেন। বললেন, এইমাত্র মর্গ থেকে আসছি। আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল, ডেডবডির মুখে.....

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, নকল দাড়ি। অর্থাৎ মরাটা মেজরের নয়। ম্যাজিশিয়ান তোতিরামের।

মিঃ শর্মা আবাক হয়ে বললেন, জানতেন নাকি? তখন তো বলেননি!

বললে পুশিমহলে রটত। হরগোবিন্দ সাবধান হয়ে যেত। তাকে ধরতে পারতেন না সহজে। বলে কর্নেল চুরুট ধরাতে মন দিলেন,।

শর্মা বললেন, হরগোবিন্দ ধরা পড়েছে গ্যাংটকে। সে মোটেই মিলিটারির লোক নয়। খুব পুরনো দাগি। তোতিরামের কাছে তিব্বতী গুপ্তবিদ্যার পুঁথি ছিল একটা। তাতে এই গুম্ফার বুদ্ধমূর্তির ভেতরে একটি পদ্মরাগ মণির হদিশ ছিল। তোতিরামের একা সাহস হয়নি। তাই হরগোবিন্দের সাহায্যে নিয়েছিল। তবে হরগোবিন্দ চালটা চেলেছিল ভাল। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে, এই ব্যাপারটা তাকে আত্মগোপনের সময় দিত অনেকখানি। ভাগ্যিস, আপনি টের পেয়েছিলেন!

কর্নেল বলেন, পরশু রাতে ঝড়ের আগে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখি, 'মেজরসায়েব' এবং তোতিরাম বাংলো থেকে নেমে যাচ্ছে। বারান্দার আলো পড়েছিল লনে। তা না হলে কিছু টের পেতুম না।

বললুম, কিন্তু ঝড়ের সময় ঘণ্টা কোথায় বাজে?

কর্নেল বললে, গুম্ফার ভেতর ছাদে ঝুলন্ত ঘণ্টাটা ঝড়ের ধাক্কায় দোলে।...

লোহাগড়ার দুর্বাসা মুনি

এপ্রিলের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি আবহাওয়া বেজায় গুরুগম্ভীর। ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ কাঁচুমাচু মুখে মেঝে থেকে কাচের টুকরো কুড়োচ্ছে। কর্নেলের মুখে বিরক্তি ও চাপা রাগ থমথমে করছে। আমি ঢুকলেও দু'মিনিট কথা বললেন না যখন, তখন আমার একটু রাগ হল। ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালুম।

সেই সময় কর্নেল গলায় ভেতর গমগম করে বললেন, জয়ন্ত, আমার এ সর্বনাশ দেখেও তুমি চলে যাচ্ছ? আশ্চর্য, আশ্চর্য! আজ দেখছি পৃথিবী শুদ্ধ আমার শত্রু হয়ে উঠেছে।

অগত্যা ফিরে এসে সোফায় বসলুম। বললুম সর্বনাশটা কী আর এমন করেছে? ষষ্ঠীচরণ একটা গেলাস-টেলাস ভেঙে ফেলেছে। এই তো? সব বাড়িতেই ঝি -চাকরেরা এমন ভাঙে। তার জন্যে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, গেলাস নয়, জয়ন্ত। সেদিন লোহাগড়া থেকে যে আশ্চর্য সুন্দর ঘাসফড়িংটা এনেছিলাম, জার ভেঙে, সেটা উড়ে গেছে। আর জারটা ভেঙেছে কে জানো? ওই গবেট, বুদ্ধু হাঁদারাম, হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীচরণটা।

ষষ্ঠীচরণ কাচ কুড়িয়ে চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেল। আমি বললুম, একটা ঘাসফড়িং, নিয়ে এত উত্তেজনার কী আছে?

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, ওটা সেই সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া। অর্থোপ্‌টেরা প্রজাতির ঘাসফড়িং, যাকে বলা হয় পঙ্গপাল। এসব ঘাসফড়িং মরুভূমিতে বাস করে।

হাসতে হাসতে বললুম, লোহাগড়া নিশ্চয় মরুভূমি নয়। শুনেছি জায়গাটা জঙ্গল। সেখানেও মরুভূমির পঙ্গপাল পেয়ে গেলেন? আপনার বাহাদুরি আছে।

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন জয়ন্ত! সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া হল মাইগ্রেটরি পতঙ্গ। অর্থাৎ সাইবেরিয়ার হাঁসের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঝাঁক বেঁধে যাতায়াত করে। অনেক সময় হয় কী, দু'চারটে পঙ্গপাল বা ঘাসফড়িং কেন কে জানে, ঝাঁকের সঙ্গে মরুভূমিতে ফিরে যায় না। দলছুট হয়ে থেকে যায়। হাঁসের বেলাতেও তাই। এখন কথা হল, এরকম দলছুট ঘাসফড়িং দস্তুরমতো গবেষণার বিষয়। কেন তারা দলের সঙ্গে ফেরে না? তারা কি ইচ্ছে করেই আলাদা হয়ে থেকে যায় দলের চোখ এড়িয়ে? কেন থাকে? কী তাদের উদ্দেশ্য?

কর্নেল মাঝে মাঝে কান ঝালাপালা করে দেন। বললুম বুঝেছি, বুঝেছি! তাহলে ষষ্ঠীচরণ সত্যি বড্ড দোষ করে ফেলেছে। কিন্তু ঘাসফড়িংটা যাবে কোথায়? দাঁড়ান—খুঁজে দেখি।

কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, খুঁজলেও আর পাবে না জয়ন্ত! ষষ্ঠীচরণকে কি শুধু জার ভাঙার জন্যে বকাবকি করছিলুম ভাবছ? করছিলুম ওর বেড়াল পোষার জন্য।

বেড়াল? অবাক হয়ে বললুম। বেড়াল পুষলে দোষ কী? ইঁদুর হবে না ঘরে। ভালই তো।

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, আহা ওর বেড়ালটাই যে ঘাসফড়িংটাকে গপ করে গিলে ফেলল। তুমি আসল কথাটা শুনবে না, খালি স্তব্ধ করবে। জারটা ষষ্ঠীচরণের কনুইয়ের গুঁতো লেগে যেই পড়ে গিয়ে ভেঙেছ, ঘাসফড়িংটা উড়ছে। এদিকে ষষ্ঠীচরণের পায়ে পায়ে ঘোরে নচ্ছার কালোকুচ্ছিত বেড়ালটা। চোখের পলকে গপ করে গিলে ফেলল ফড়িংটা। উঃ! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! বেড়ালটাকে আমি গুলি করে মারতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে গেল।

জানালা দিয়ে পাশেই একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ দেখা যায়। সেই গাছে কাকের চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখলুম, কালো একটা বেড়াল নিমগাছের ডাকে কুঁকড়ে বসে আছে এবং কাকগুলো

মহা খাপ্পা হয়ে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। পঙ্গপাল ফড়িং খেয়ে কি বেড়ালটার বদহজম হয়েছে যে কাকদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে ? বললুম, কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন নচ্ছার খুনি ওখানে বসে আছে।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে দেখতে দেখতে বললেন, রিভলভারের রেঞ্জের বাইরে। ঠিক আছে। দেখি, কতক্ষণ পালিয়ে বেড়ায়।

আমার ইদানীং বড্ড অবাক লাগে এই কর্নেলবুড়োর আচরণ। একসময় মানুষ খুন বা রহস্যময় চুরি ডাকাতি নিয়ে মাথা ঘামাতেন! পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অফিসাররা গণ্ডগোলে পড়লেই তাঁর সাহায্য চাইতে ছুটে আসতেন। এখনও আদর করে কর্নেলকে ওরা বলেন বুড়ো ঘুঘু। ওঁর এই ফ্ল্যাটটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুড়োঘুঘুর বাসা।' সেই ঘুঘু অর্থাৎ গোয়েন্দাপ্রবর এখন প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠেছেন দিনে দিনে। দেশবিদেশের প্রকৃতিবিষয়ক পত্রিকায় পাখি প্রজাপতি-ফড়িং কিংবা অর্কিড-ক্যাকটাস ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রকৃতি-টকৃতি নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী? এ কি বার্ধক্যজনিত বৈরাগ্যেরই রকমফের? অথচ জানি, এখনও গায়ে অসুরের শক্তি। পাহাড় বনজঙ্গল চষে বেড়ানোর সময় আমার মতো যুবকও ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠি।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে খেতে বললুম, হতভাগ্য বিড়ালকে ক্ষমা করে দিয়ে বরং ফের লোহাগড়া গিয়ে ওই পতঙ্গটিকে খুঁজে আনুন।

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, আর কি পাওয়া যাবে?

বললুম, আহা! খুঁজে দেখতে দোষ কী? আমিও না হয় যাব আপনার সঙ্গে।

এবার কর্নেল একটু হাসলেন। তুমি বুঝি ছুটিতে আছ?

আছি। এই বসন্তকালে কলকাতায় পচে মরার মানে হয় না তাই ভাবছিলুম, কোথাও বেড়াতে যাওয়া যায় কি না। আসল কথাটা এতক্ষণে খুলে বললুম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই সাতসকালে আপনার কাছে হাজির হয়েছি।

কর্নেল ফোনের কাছে গেলেন। একমিনিট জয়ন্ত, রেলদফতরে আমার বন্ধু মিঃ রামস্বামীকে ফোন করে দেখি দুটো বার্থ আজ রাতে পাওয়া যায় নাকি।...

লোহাগড়া মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি সংরক্ষিত জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর একটা সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গ আছে। এখন ভাঙাচোরা অবস্থা। খয়েরি রঙের পাথরে তৈরি এই দুর্গকে লোহার পুরী বলে মনে হত বলেই এর নাম ছিল লৌহগড়। তাই থেকে লোহাগড়া হয়েছে।

ফরেস্ট বাংলো জঙ্গলে ঢোকার মুখে। সেই বাংলোর চৌকিদার বলল, সাবধানে থাকবেন স্যার। ইদানীং ওখানে একটা মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হয়েছে। সরকার থেকে দু'জন শিকারি পাঠানো হয়েছিল। তাদেরও বাঘটা খেয়ে ফেলেছে, তাই কোনও শিকারি আর আসতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রামে দিনের বেলাতেও বাইরে বেরুচ্ছে না লোকে। ঢোকা তা দূরের কথা।

কর্নেল ওর কথা গ্রাহ্য করেছেন বলে মনে হল না। আমার শিকারের শখ আছে এবং বনে-জঙ্গলে এলে তাই রাইফেলটা আনতে ভুলি না। তাই কথা শুনেও তত দমে গেলুম না।

কর্নেল একটা ছোট্ট জাল, বাইনোকুলার আর ক্যামেরা নিয়ে বেরুলেন। আমি রাইফেলটায় গুলি ভরে সঙ্গে নিলুম। তারপর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম লোহাগড়া দুর্গের দিকে।

পাহাড়ি ঢালের নিচে একটা নদী আছে। নদী পেরিয়ে যেতেই অবাক হয়ে দেখি, এক সাধু, হনহন করে এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এসে সে চোখ কটমটিয়ে হিন্দিতে বলল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? মরার সাধ যদি না থাকে, আর এক পাও এগিও না। আমার বাহনকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমাদের মুণ্ডু কড়মড়িয়ে খাবে, ওই শোনো!

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর কোথাও বাঘের গর্জন শোনা গেল পরপর দু'বার। কর্নেল সাধুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিলেন। আমি রাইফেলটা শক্ত করে ধরলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, সাধুজি! আপনার বাহনকে দয়া করে একটু সামলে রাখুন। আমরা লোহাগড়ায় গিয়ে মাত্র দুটো ঘাসফড়িং ধরব। ধয়া করে তার অনুমতি দিন। আর যদি অনুমতি না দেন, আমরা বিনা অনুমতিতেই দুর্গে যাব।

কর্নেল তামাশা করছেন কি না বুঝতে পারলুম না। সাধু তাঁর কথায় প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল কেন কে জানে। তিড়িংবিড়িং করে কতকটা নাচের ভঙ্গিতে লাফালাফি করে বলল, অভিশাপ দেব বলে দিচ্ছি, সাবধান। আমি কে জানো? ঋষি দুর্বাসা!

কর্নেল বললেন, দুর্বাসার বাহন মানুষখেকো বাঘ—এমন কথা তো শুনিনি সাধুজি।

সাধু লম্ফঝম্ফ করে বলল, আবার তামাশা হচ্ছে আমার সঙ্গে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা!

বলে সে তিনবার হাততালি দিল। অমনি বাঘের ডাক শোনা গেল আবার! এবার মনে হল ডাকটা আরও কাছে। তারপর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা ঝোপের ভেতর আবছা ডোরাকাটা প্রাণীটাকে নড়াচড়া করতে দেখতে পেলুম। আমি গুলি করতে যাচ্ছি, কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, আহা! করো কী জয়ন্ত! ঋষি দুর্বাসার বাহনকে মেরে কাজ নেই। চলো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাই।

সাধু দাঁত কড়মড় করে বলল, মরবে। প্রাণে মারা পড়বে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না। হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। ঝোপের আড়ালে বাঘটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো! বারবার সে গর্জন করছে।

সাধু চোখ কটমট করে আমাদের যাওয়া দেখছিল। যতদূর গেলুম পিছু ফিরে দেখলুম, সে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, বাঘটা যদি হামলা করে?

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! বাঘটা হামলা করবে না, তুমি নিশ্চিন্তে চলো।

অবাক হয়ে বললুম, কী বলছেন! মানুষখেকো, বাঘ বড় ভয়ংকর প্রাণী!

কর্নেল বললেন, আমার ধারণা, তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী ওই সাধু।

বলেই আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়লেন। তারপর গুঁড়ি মেরে হাঁটতে শুরু করলেন। দেখাদেখি আমিও সেই ভঙ্গিতে ওতে অনুসরণ করলুম। কর্নেলের এমন বিদঘুটে আচরণ আমার অজানা নয়। এসব সময় কোনও প্রশ্ন করে জবাবও পাব না, তাও জানি।

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, ওই দেখো জয়ন্ত। বাঘটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানেই।

আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতেই ফের বাধা দিলেন। তারপর গুঁড়ি মেরে দৌড়ে গেলেন। বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে তাকিয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য, বাঘের কান খুব প্রখর। মৃদুতম শব্দ বা নড়াচড়া টের পাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বাঘের। বিশেষ করে এটা যদি সত্যি মানুখেকো বাঘ হয়, তাহলে এখনও ঘুরে দেখে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে না কেন?

এরপর কর্নেল যা করলেন, দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কাছে গিয়ে বাঘটার কান ধরে মাথায় দুই চাঁটি মারলেন। বাঘটা একটুও নড়ল না।

কাছে গিয়ে সব বুঝতে পারলুম। এটা আদতে বাঘের চামড়া পরানো একটা খড়ের বাঘ। কিন্তু তারপর আরেক কাণ্ড করলেন কর্নেল। ঝোপের ওপরে একটা ঝাঁকড়া গাছ রয়েছে। গাছের দিকে মুখ তুলে চাপা গলায় কাকে বললেন, ওহে। এবার সুড়সুড় করে নেমে এস তো! উঁহু উঁহু! পালানোর চেষ্টা কোরো না। গুলি খেয়ে প্রাণটি যাবে।

গাছের ডাল থেকে কৌপিনপরা কমবয়েসী আরেক সাধু ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল। কর্নেল তার জটা ধরে ফেললেন। জটা উপড়ে এল। ন্যাড়া মাথা নিয়ে নকল সাধু গুলতির বেগে পালিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে। কর্নেল হো হো করে হেসে ফেললেন।

বললুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, নকলবাঘের পিঠে এই যে দড়িটা বাঁধা রয়েছে দেখছ, এইটা হাতে নিয়ে লোকটা চড়ে বসে ছিল। এ একরকমের পুতুলনাচ বলতে পারো। তুমি গুলি করলেও এ বাঘকে আর খুঁজে পেতে না।

কিন্তু কেন?

আমাদের জঙ্গলে ঢুকতে দেওয়ার ইচ্ছে নয় দুর্বাসা মুনির।

কেন তাই বলুন না?

সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে যেন মগজকে চাঙ্গা করতে থাকলেন। তারপর সাদা দাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে পোকাটা পরখ করে দেখে ফেলে দিলেন।

বললুম, কিন্তু বাঘের গর্জন?

কর্নেল বললেন, গর্জনটাও নকল। অভ্যাস করলে মানুষ বাঘের ডাক অবিকল নকল করতে পারে। তুমি কি জিম করবেটের শিকার কাহিনী পড়োনি? করবেট বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে কাছে এনে গুলি করতেন। আরও অনেক শিকারির বইতেও এ ঘটনা পাওয়া যায়। শিকারি কেনেথ অ্যানডারসনও এভাবে অনেক বাঘ মেরেছিলেন। কিন্তু অবাক লাগছে জয়ন্ত, তুমি গর্জন শুনে বুঝতে পারলে না যে ওটা নকল বাঘের গর্জন? তুমি শিকার-টিকার তো অনেক করেছ!

একটু হেসে বললুম, তাই বলে কি কখনও বাঘ শিকার করেছি? বড় জোর পাখি কিংবা দু-একটা খরগোশ! অবশ্য একবার একটা শম্বর মেরেছিলাম ওড়িশার জঙ্গলে।

কর্নেল বললেন, যাক্‌গে। চলো, আমরা দুর্গের ওখানে যাই...

দুর্গের ভেতরকার চত্বরে ঘন ঘাসের জঙ্গল। কর্নেল বললেন, এখানেই সেই ঘাসফড়িং দেখতে পেয়েছিলাম। জয়ন্ত, তুমিও খুঁজে দেখ। ফড়িংয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছি যখন, তখন দু-একটা নিশ্চয় খুঁজে পাব।

যে ফড়িং ধরি, দেখে কর্নেল বলেন, নয়। সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া এত সবুজ নয়! ধূসর রং। আরও মোটা। এদিকে মাথার ভেতর চৌকিদারের কাছে শোনা মানুষখেকো বাঘের কথাটা আছে। তাই বারবার চঞ্চল চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। বলা যায় না, দুর্গের এইসব ভাঙাচোরা ঘরে সত্যিকারের বাঘটা হয়তো এখন ঘুমোচ্ছিল। সাড়া পেয়ে জিভ চাটছে ওত পেতে। হালুম করে এখুনি ঝাঁপ দেবে।

কর্নেল টের পেয়ে বললেন, মানুষখেকো বাঘের ভয় কোরো না জয়ন্ত। বরং তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী সম্ভবত সেই সাধু—দুর্বাসা মুনি!

বলেই একলাফে সরে গেলেন। আঁতকে উঠে দেখলুম, সাঁই করে একটা তীর এসে কর্নেল যেখানে হাঁটু দুমুড়ে ঘাসে বসেছিলেন, সেখানে বিঁধে গেল। কর্নেল একটা পাথরের আড়ালে সরে গেছেন। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আরেকটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছি।

শোঁ শোঁ করে কয়েকটা তীর এসে বিঁধে গেল-এপাশ-ওপাশে। তারপর দৃষ্টি গেল বাঁদিকে একটা ভাঙা ঘরের দেওয়ালে ওপর। একটা লোক তীর-ধনুক নিয়ে দেওয়ালের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে। আরে! এ তো দেখছি, ফরেস্টবাংলোর সেই চৌকিদার! আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম কয়েক মিনিট। তারপর মরিয়া হয়ে উঠলুম। দুর্গের প্রাঙ্গণে ধ্বংসস্তূপের আড়ালে প্রায় বুকে হেঁটে সেই ভাঙা ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। কর্নেলকে কোথাও পেলুম না। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে দেখি ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের মাথায় চৌকিদার ধনুকে তীর জুড়ে উঁকি মেরে

আমাদের খুঁজছে। তার পশ্চাদ্দেশে রাইফেলের নল ঠেকাতেই চমকে উঠে ঘুরল। চাপা গর্জন করে বললুম, তীর-ধনুক ফেলে দাও। নইলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে গুলিতে!

চৌকিদার তীরধনুক ফেলে দিল। তারপর কাকুতি-মিনতি করে বলল, দোহাই হুজুর। গুলি করবেন না। নামছি।

সে নেমে এল! তার পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল! বদমাশটাকে ধরেছি। ওদিকের ঘর থেকে কর্নেলের সাড়া এল।

....এখানে নিয়ে এস ওকে!

চত্বর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, বারান্দায় সেই সাধুর সামনে রিভলভার হাতে কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন। সাধু কাকুতি মিনতি করছে। .... হুজুর! গরিব মানুষ পেটের দায়ে এ কাজ করছি। ছেড়ে দিন পুলিশে দিলে জেল হয়ে যাবে।

কর্নেল তার জটা আর দাড়ি উপড়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছ জয়ন্ত, এ দুর্বাসা বাবাজিও তার চেলার মতো নকল সাধু।

বললুম, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, ব্যাপার খুব সামান্য। ওই ঘরে চোলাই মদের পিপে বোঝাই করে রেখেছে। এরা মনে হচ্ছে, এ কারবারের মালিক নয়, নিতান্ত পাহারাদার। এখানে রাখা পিপেগুলো সম্ভবত আজকালের মধ্যে চালান যাবে। আমরা এসে পড়ায় এবং লোহাগড়া দুর্গে যাব বলায় এরা বেগতিক দেখেছিল। তাই মানুষখেকো বাঘের ভয় দেখিয়েছিল। শেষে যখন দেখল, তাতেও ভয় পেলুম না এবং ওদের চালাকি ধরে পেলুম, তখন তীর ছুড়ে প্রাণে মারতে চেয়েছিল। তবে জয়ন্ত, মাঝখান থেকে লাভটা তোমারই হল! তোমার কাগজ দৈনিক সত্যসেবকে বড় করে খবর ছাপা হবে।

'মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চোলাই মদের গুদাম আবিষ্কার!'

বললুম, সম্প্রতি প্রায়ই বিষাক্ত চোলাই খেয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে এই এলাকায়। কর্নেল, আমার ধারণা, এসব সেই বিষাক্ত চোলাই মদ!

কর্নেল বললেন, পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে। তবে চলো, আসামিদের পুলিশের জিম্মায় দিয়ে আসি। ওবেলা বরং এসে সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া খুঁজে বের করব। আমার বিশ্বাস, ওই ঘাসফড়িংগুলো এখনও দু'চারটে ঘাসে লুকিয়ে আছে।

চৌকিদার ও দুর্বাসা মুনিকে নিয়ে আমরা ফিরে চললুম জঙ্গলের পথে। যেতে যেতে কর্নেল ফের বললেন, চোলাই মদের তিন নম্বর পাহারাদারটাকেও ধরতে পারলে ভাল হত। লোকটা কিন্তু চমৎকার বাঘের ডাক ডাকতে পারে। কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবার বাঘের ডাক শোনা গেল

—আউংঘ্। আউংঘ্। বললুম, ওই শুনুন তিন নম্বর আসামি এখন ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে।

কর্নেল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন, না জয়ন্ত! এ ডাক সত্যিকার বাঘের। এখন বাঘের সঙ্গী খোঁজার ঋতু। লোহারগড়ার জঙ্গলে এতক্ষণে একটা সত্যিকারের বাঘ সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়েছে। এসময় ওদের মেজাজ বড্ড চড়া থাকে। ওবেলা সাবধানে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।....

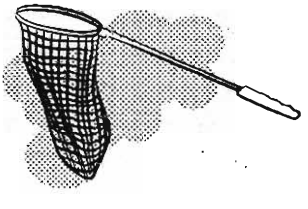

তুরুপের তাস

এক

কাগজের খবর

অক্টোবর মাসের এক অত্যুজ্জ্বল রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারে ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ একপ্রকার কিম্ভূত আকৃতির ক্যাকটাসের সামনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ রয়েছেন এবং তাঁর কানে হেডফোন চাপানো। হেডফোনের তার গিয়ে ক্যাকটাসটার গায়ে বেঁধানো একটা আলপিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছিলুম, বুড়োকে একটু চমকে দেওয়ার আশায়। কিন্তু উল্টে আমাকেই ভীষণ চমকে উঠতে হল, যখন উনি হঠাৎ ঠকঠক করে কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাঁপতে শুরু করলেন।

আমি ভাবলুম, ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন কর্নেল। তাই শশব্যস্তে কাছে গিয়ে প্রথমে দেয়ালের সুইচবোর্ডের সঙ্গে হেডফোনের সংযোগ খুঁজলুম। না দেখতে পেয়ে ধারণা হল, হয়তো ওই উদ্ভুট্টে উদ্ভিদটা থেকেই কোনও মারাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নির্গত হয়ে ওঁকে মুহুর্মুহু শকে জর্জরিত করছে।

অতএব তক্ষুণি ক্যাকটাসের গা থেকে পিনটা উপড়ে ফেললুম।

অমনি কর্নেল 'আহা হা' করে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়ে করুণ স্বরে বললেন, করলে কী জয়ন্ত! আমার বাইশ ঘণ্টার রক্ত জল করা পরিশ্রম বরবাদ করে ফেললে?

আমি তো অপ্রস্তুত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, আমি ভেবেছি আপনার ইলেকট্রিক শক লেগেছে।

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেডফোনের মতো যন্ত্রটা মাথা থেকে খুলে বললেন, তুমি কী ক্ষতি যে করলে জয়ন্ত, তোমায় বোঝাতে পারব না। এই যে যন্ত্রটা দেখছ, এটা উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশ বসুর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এক রুশবিজ্ঞানী সম্প্রতি তৈরি করেছেন। উদ্ভিদের যে ভাষা আছে, তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং সে যা বলছে, তার জবাবও তার ভাষায় দেওয়া যায়।

অবাক হয়ে বললুম, আপনি ম্যালেরিয়ায় পাওয়া লোকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলেন—তা কি ওই হতচ্ছাড়া ক্যাকটাসটার সঙ্গে বাতচিত?

ঠিকই ধরেছ। বলে ঘুঘুমশাই কোণের দিকে আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন। তারপর চুরুট ধরালেন।

পাশের ডিভানে বসে বললুম, না জেনে দোষ করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

কর্নেল সন্দেহে হাসলেন। জয়ন্ত! তোমায় একটা বই দেব। 'দি সিক্রেটস অফ প্ল্যান্ট লাইফ।' পড়লে বুঝতে পারবে, উদ্ভিদ কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। যাক্ গে, বসো। কফি-টফি খাও। ষষ্ঠীকে বলি।

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে হাঁক দেওয়ার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। একগাল হেসে বলল, কাগজের দাদাবাবু! প্রতাপগড়ের পেত্নীর খবরটা কি সত্যি গো?

ষষ্ঠী ইদানিং আমায় কাগজের দাদাবাবু বলে সম্ভাষণ করে। তবে দুঃখের বিষয় কাগজের লোক বলেই কাগজের খবরে আমার রুচি নেই। ময়রা কি সন্দেশ খেতে ভালবাসে? তাই বললুম, ষষ্ঠী!

পেত্নীর খবরের চেয়ে তোমার কর্তামশাইয়ের যে কীর্তি এইমাত্রার দেখলুম, সেটাই আজকের বড় খবর।

ষষ্ঠীচরণ বেজার মুখে চলে গেল। কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললে, হুম! ষষ্ঠীকে অবহেলা কোরো না ডার্লিং। আজকাল আমি বিবিধ বিষয়ে ওর পরামর্শ নিই। জয়ন্ত, ইনটুইশান বলে একটা ব্যাপার আছে—যা প্রকৃতি অনেক মানুষকে দিয়েছেন এবং এতে শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদাভেদ রাখেননি। তাছাড়া তুমি তো জানো, প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন নাটক লিখে আগে তাঁর পরিচারিকাকে শোনাতেন।

বললুম, আপনার ভাষণের লক্ষ্য কী কর্নেল? প্রতাপগড়ের পেত্নী?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, ষষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সেই সূক্ষ্মবোধ আছে জয়ন্ত। আজ ওই খবরটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে বারবার। আমি ক্যাকটাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মন দিতে পারিনি। তবে আমার ধারণা, খবরটা নিশ্চয় সামান্য খবর নয়।

পাশে টেবিলের ওপর সেদিনের কয়েকটা কাগজ ছিল। আমাদের কাগজ দৈনিক সত্যসেবককে আমি তত গুরুত্ব দিই না। তাই অন্য একটি বাংলা দৈনিক তুলে নিলুম। প্রথম পাতার নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলুম।

ডাকুরানি লছমীর প্রেতাত্মা?

প্রতাপগড়, ১২ অক্টোবর—সম্প্রতি এ অঞ্চলে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি ডাকাতির খবর পাওয়া গেছে। শেষ ডাকাতি ঘটেছে একটি পেট্রল পাম্পে। গতকাল এই পাহাড়ী শহরের প্রান্তে রাত নটার সময় ডাকুরানি লছমী আচমকা হাজির হয়। তাকে দেখামাত্র পাম্পের কর্মচারীরা হতবাক হয়ে যায়। কারণ লছমী গতমাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ তার মৃতদেহ দেখেছে। অবিকল সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ জীবিত মানুষের মতো পেট্রল পাম্পে উপস্থিত হয়েছে এবং তার হাতে যথারীতি রিভলভারও রয়েছে দেখে কর্মচারীরা আতঙ্কে কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কেউ দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। পাম্পের মালিক পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর ক্যাশে তখন সতেরো হাজার টাকা ছিল। সে টাকা আর পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা, কেউ লছমী সেজে একাজ করে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে ঠিক এমনি ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে।

উল্লেখ করা যায়, এই পেট্রল পাম্পের মালিকের বাড়িতেও ক'দিন আগে মৃতা লছমী একইভাবে হানা দেয়। তখন তিনি তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালান। আশ্চর্য, লছমীর গায়ে একটা গুলিও লাগেনি। পুলিশ অবশ্য এ ঘটনার ব্যখ্যা দিয়ে বলেছে যে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

কাগজটা মুড়ে রেখে দিলুম। কর্নেল বললেন, তোমার ইনটুইশন কি জয়ন্ত?

পুলিশ যা বলেছে।

অর্থাৎ লছমী সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হ্যাঁ, আবার কী?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ষষ্ঠীর ইনটুইশন অন্য কথা বলেছে। লছমীর পেত্নী ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

না। ওই খবরের কিছু গোলমেলে ব্যাপার সে ধরিয়ে দিয়েছে।

কর্নেল মুখে সেই হাসি রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে রহস্যের ভঙ্গি—যা দেখে আমি বরাবর উত্তেজনা অনুভব করি। বললুম সংস্কৃত শ্লোকে আছে—সংসর্গজা দেশগুণাঃ ভবন্তি। তা ষষ্ঠীচরণ আপনার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার সংসর্গে থেকে বুঝি পাতিগোয়েন্দা হয়ে উঠেছে? দেখুন কর্নেল, খবরের কাগজের প্রত্যেকটা খবরে গোলমাল থাকবেই থাকবে। সেটাই নিয়ম। কারণ খবর যিনি পাঠান এবং যিনি তা অনুবাদ করেন...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমার কথাটা আগে শোনো।

বলুন।

বরং এক কাজ করা যাক, ষষ্ঠীচরণের মুখেই তার ধারণার কথা শোনা ভাল।

বলে কর্নেল ডাকলেন, ষষ্ঠী! ও ষষ্ঠী এদিকে একবার আসবে কি?

ষষ্ঠীচরণ যেন ওৎ পেতেই ছিল। পর্দা তুলে গম্ভীর মুখে বললল, বলুন স্যার!

কর্নেল বললেন, পেত্নীর খবরের কী যে খটকা আছে বলছিলে তখন?

অভিমান দেখিয়ে ষষ্ঠী বলল, আছে। শুনলেন না তো!

এবার বলো, শুনব। তোমার কাগজের দাদাবাবুও শুনবেন। ষষ্ঠী ফিক করে হাসল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, মজাটা দেখুন। প্রতাপগড় তো স্যারের সঙ্গে কতবার আমি গেছি। কাগজের দাদাবাবুও গেছেন। টাউনের শেষে বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্প। কেমন তো? রাত ন'টায় সেই পাম্পে সতেরো হাজার নগদ টাকা মজুত রেখেছে মালিক! বিশ্বাস হয় বলুন?

বললুম, চুরি-ডাকাতির পর লোকে পুলিশকে বাড়িয়েই বলে।

বলুক না! কিন্তু একই লোকের ওপর পেত্নী দু'বার হামলা করল? সতেরো হাজার টাকা এবং গুলি গায়ে লাগেনি—দুটোতে খটকা বাধছে কাগজের দাদাবাবু!

কিসের খটকা বুঝলুম না ষষ্ঠী?

ষষ্ঠী ক্ষুব্ধভাবে বলল, বেশি লেখাপড়া জানিনে কাগজের দাদাবাবু! কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছে। মনে হচ্ছে, বড় কিছু ঘটবে, এগুলো তারই গোড়াপত্তন। তাছাড়া ডাকাতি শুধু একজনই করল? দলবল সঙ্গে নেই, একা? আর তার চেয়ে বড় কথা, পেত্নী-ডাকাত? দেখবেন, নির্ঘাৎ বড় কিছু ঘটবেই।

ষষ্ঠীর হাবভাবে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু বেচারাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয় ভেবে মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে বললম তুমি যা আঁচ করছ, সত্যি হতে পারে বৈকি।

আমার কথা শুনে সে কর্নেলের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকাল। কর্নেল সেটা টের পেয়ে বললেন, ক্যাকটাসটা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে ব্যাপারটা দেখে আসা যেত। তাছাড়া এ শরৎকালে প্রতাপগড়ের তুলনা হয় না। প্রকৃতি তাকে এ সময়টা দারুণ সাজিয়ে তোলে, না? হুম্ জয়ন্ত, রথদেখা কলা-বেচার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল! ষষ্ঠী হতাশভাবে ঘর থেকে পেয়ালা দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ষষ্ঠীর কথাটা তখনও ভাবছিলুম। লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। ওকে গোয়েন্দারোগে ধরেছে এবং সব তাতেই ওর খটকা লাগতে শুরু করেছে। প্রতাপগড়ের কে ভদ্রলোকের পেট্রল পাম্পে ও বাড়িতে দু'বার ভূত সেজে কেউ ডাকাতি করেছে, তাই নিয়ে ও রীতিমতো একটা গোয়েন্দা-থিসিস খাড়া করে ফেলেছে।

বললুম, কর্নেল! আপনার এই অনুচরটিকে সামলান! এর ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি।

কিন্তু কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। চেয়ারে তখনকার মতো বসে হেডফোন জাতীয় যন্ত্রটা পরতে ব্যস্ত রয়েছেন।

গতিক দেখে আমি উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, আসি কর্নেল।

তবু কর্নেলের কোনও সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে গেলুম। ওঁর এমন অদ্ভুত আচরণ এতদিনে গা সওয়া হয়ে গেছে। আজকাল আর একটুও গায়ে মাখিনে।

সেদিন কাগজের অফিসে আমার বিরতির দিন। দুপুরে ঘুমিয়ে গেছি খেয়েদেয়ে, একসময় ফোন বাজল। কানে তুলতেই চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—ডার্লিং জয়ন্ত! তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? দিনদুপুরে ঘুমই বাঙালির পতনের কারণ। তো শোন কাল ভোরে সাড়ে পাঁচটায় আমরা প্রতাপগড় রওনা হচ্ছি। তৈরি থেকো!

চমকে উঠেছিলুম। ডাক এসেছে নাকি সেখান থেকে?

হুম্। ঠিকই ধরেছ।

পুলিশের ডাক বুঝি?

কখনও না, কখনো না। মোহনপ্রসাদ সিং—মানে যাঁর পাম্পে লছমীরানির ভূত হামলা করেছিল, তিনিই আমাকে ডেকেছেন।

বলেন কী! যে কেউ ডাকলেই আজকাল বুঝি আপনি চাকরের মতো...

না, না। মোহনজি আমার সুপরিচিত জয়ন্ত। একবার ওঁর আতিথ্যে কাটিয়ে এসেছিলুম। অমায়িক সজ্জন মানুষ। সকালে তুমি চলে যাওয়ার পর উনি ট্রাঙ্ককল করেছিলেন।

তাহলে ষষ্ঠীচরণের গোয়েন্দাগিরি আর ঠেকানো গেল না।

না। হাসতে হাসতে কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। তৈরি থেকো...

দুই

রক্তাক্ত মৃতদেহ

মোহনপ্রসাদ সিং প্রতাপগড়ে সেসময়ে নাকি দামি মানুষ ছিলেন। কারণ, তখন উনি রাজনীতি করতেন। পরে রাজনীতি ছেড়ে বাণিজ্যে মন দেন। খুব একটা বড় ব্যবসায়ী হতে পারেননি। একটা পেট্রল পাম্প, একটা ট্রাক এবং একটা জিপগাড়ি, আর একটা কাঠগোলার মালিক হয়েছেন। মাইল পাঁচেক দূরে প্রতাপগড় রিজার্ভ ফরেস্ট। মরসুমে সেখানে সরকার বন এলাকায় গাছ বিক্রি করে। টেন্ডার ডাকা হয়। মোহনজি তদ্বির করে টেন্ডার জোগাড় করেন। তবে চোরাই কাঠ চালানকারীরাও কম নেই তল্লাটে। যারা কাঠগোলার ব্যবসা করে, তার তাদের মা-বাবা।

মোহনজির বাড়িতে থাকাটা ঠিক মনে করেনি কর্নেল। আমরা উঠেছি সেচ-দফতরের বাংলোয়। মোহনজি তাঁর জিপটা আমাদের সেবায় দিয়েছেন। ড্রাইভারের নাম মহাবীর। গট্টাগোট্টা চেহারা। লছমী ডাকুরানির অসংখ্য গল্প সে জানে। কীভাবে লছমী নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। লছমীর রক্তাক্ত লাশের একটা ভয়ংকর বিবরণ তার কাছে শুনেছি আমরা। তাছাড়া মোহনজির পাম্পে ডাকাতির সময় সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সেই রক্তাক্ত লাশকে জীবিত মানুষের মতো হানা দিতে দেখে আঁতকে সে পালিয়ে গিয়েছিল!

শুধু তাই নয়, যে রাতে মোহনজির বাড়িতে লছমীর ভূত হামলা করে, সে রাতেও সে খাটিয়া পেতে বারান্দায় শুয়েছিল। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে লছমীর আবির্ভাব হয়। মহাবীর কিরে কেটে বলেছে, সেই রক্তাক্ত মড়া হয়ে মছমী বাড়ি ঢুকেছিল। মোহনজির রাইফেল আছে। মাঝে মাঝে কাঠ আনতে জঙ্গলে যান বলে রাইফেল কিনেছেন। তো লছমীর দিকে পরপর চারটে গুলি ছোঁড়েন তবু লছমীর গায়ে আঁচড় লাগেনি। কিন্তু বাড়িসুদ্ধু লোক জেগে গেছে। হইহল্লা করেছে। তাই শেষপর্যন্ত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি, কর্নেল সবে প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসেছেন, এমন সময় আমাদের পরিচিত পুলিশ অফিসার শর্মাজি এসে হাজির হলেন।

শর্মাজি হাসতে হাসতে বললেন, মোহনপ্রসাদ আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই আপনাকে টেনে এনে এনেছেন। তাতে অবশ্য আমি খুশিই।

কর্নেল যেন অপ্রস্তুত হওয়ার ভান করে বললেন, না, না মিঃ শর্মা! আপনি তো বিলক্ষণ জানেন, প্রতাপগড় আমার কত প্রিয় জায়গা!

শর্মা চোখ নামিয়ে বললেন, লুকিয়ে লাভ নেই কর্নেল। স্বয়ং মোহনজি কথাটা আমাকে জানিয়ে এসেছেন। ওঁকে তো জানেন বড্ড খামখেয়ালী মানুষ, তবে একথা ঠিক, ইদানীং পরপর পাঁচটা এ ধরনের ডাকাতি হয়েছে প্রতাপগড়ে। পাঁচটাই লছমীর ভূতের কীর্তি বলে ভিকটিমরা স্টেটমেন্ট

দিয়েছে। সময় রাত ন'টা থেকে দশটা, শুধু—একটি কেসে সন্ধেবেলা। আমার ধরণা, কেউ লছমী সেজে এসব করছে। কিন্তু কোনও সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে।

কর্নেল বললেন, দুটো কেস তো মোহনজির। বাকি তিনটে কোথায়—কোথায়, কীভাবে ঘটল, বলবেন কি মিঃ শর্মা?

শর্মাজি বললেন, তিনটেই নেহাত পেটি কেস। একটি স্লাম এরিয়ায়। এক বুড়ির ওপর হামলা করে তার অল্পসল্প টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি-বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে পয়সা জমিয়েছিল। আর একটা এই রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে। লোকজন বিশেষ ছিল না তখন। রাত প্রায় দশটা। চা-ওলা ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছে, লছমীর ভূত হাজির।... বাকি কেসটা রাহাজানির মতো। এক দেহাতী ছোট ব্যবসায়ী সাইকেলে চেপে সন্ধেবেলা ফিরে যাচ্ছিল। হাইওয়েতে হঠাৎ তার সামনে লছমীর ভূত এসে দাঁড়ায়। মজার কথা, দেহাতী লোকটির যে গ্রামে বাড়ি, লছমী সে-গাঁয়েরই মেয়ে। লোকটি ভয়ে ভির্মি খায়। জ্ঞান হলে দেখে টাকাকড়ি সব খোয়া গেছে।

আরও কিছুক্ষণ একথা নিয়ে আলোচনার পর শর্মাজি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, আপনাকে মোহনজি এনেছেন বলে অবশ্যই আমি এতটুকু ক্ষুব্ধ হইনি কর্নেল। বরং আপনার সাহায্য আমিও চাই। প্রতাপগড়ে কয়েকটা কেসে আপনার সাহয্যের জন্য পুলিশ এখনও কৃতজ্ঞ। নতুন অফিসাররা আপনার কথা জানেন না। আমি জানিয়ে দেব বরং।

শর্মাজি চলে গেলে কর্নেল বললেন, মোহনপ্রসাদ পুলিশের কানে আমার আসার খবর তুলতে গেলেন কেন? অদ্ভুত লোক তো!

বললুম, আপনার প্রতি মোহনজির প্রবল আস্থা। তাই আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে বাজি ধরেছেন।

অর্থাৎ আমি ওঁর তুরুপের তাস। বলে কর্নেল কী যেন ভাবতে থাকলেন।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নিচে নদী। তার ওপারে একটা টিলার মাথায় লাল রঙের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়িটা আগে এসেও দেখেছি এবং কেন কে জানে, কেমন রহস্যের গন্ধ টের পেয়েছি। বাড়ির একতলাটা দেখতে কতকটা দুর্গের মতো। বহুকালের পুরনো দেওয়ালের ফাটলে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। বাড়িটা নিশ্চয় হানাবাড়ি।

মহাবীর লনের ওপাশে মালির সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, ওই বাড়িটায় কে থাকে? কার বাড়ি বলতে পারো?

মহাবীর বলল, বাড়িটা স্যার প্রতাপগড়ের এমএলএ রঘুনন্দনজির। ওঁর বাবা এক সায়েবের কাছে কিনেছিলেন শুনেছি। তাই কেউ কাছে যেতেও ভয় পায়।

মহবীরের সঙ্গে প্রতাপগড়ের হালচাল নিয়ে কথা বলছি, কর্নেল বেরিয়ে এসে বললেন, জয়ন্ত! আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি বরং মহাবীরকে নিয়ে জিপে করে ঘুরে এস কোথাও।

মহাবীর বলল, আপনাকে পৌঁছে দিই স্যার, যেখানে যাবেন। তারপর ছোট সায়েবকে নিয়ে বেরুব।

কর্নেল বললেন, না না। দরকার হবে না। আমি বেশিদূর যাব না।

কর্নেল আমাকে ফেলে যাওয়ার মনে অভিমান জেগেছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেরুনোর ঝক্কি কী, মনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত খুশিই হলুম। কোথায় কোথায় টো টো ঘুরবেন কে জানে! তার চেয়ে চুপচাপ প্রকৃতি দেখা আনন্দজনক।

মহাবীর বলল, যাবেন নাকি স্যার কোথাও ঘুরতে?

বললুম, বরং এক কাজ করা যাক। চলো, এই পোড়োবাড়িটা দেখে আসি। আঁতকে উঠল মহাবীর। না স্যার। ভুলেও ওখানে পা বাড়াবেন না। তাছাড়া জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই ওদিকে। বরং চলুন, ওয়াটার ড্যাম দেখিয়ে আনি।

দেখেছি তোমাদের ওয়াটার ড্যাম। তুমি যাও মহাবীর, গল্প করো গে মালীর সঙ্গে। আমি পায়দল ঘুরে আসি।

আমার কথা শুনে মহাবীর টের পেল আমি রাগ করেছি। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওখানে শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা। মালীকে জিগ্যেস করুন!

মালি শুনছিল। সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার। বড্ড সাপ ওখানে।

এরপর আর ওই হানাবাড়িতে যাওয়ার সাহস হল না। অগত্যা ঘরে গিয়ে জানলার ধারে একটা বই নিয়ে বসলুম।

একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, হানাবাড়িটা নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে। আর তার ছাদে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদের ওপর একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝুঁকে পড়ায় তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না। কর্নেলের বাইনোকুলারটা খুঁজলুম। সঙ্গে নিয়ে গেছেন যথারীতি। অগত্যা বারান্দায় গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলুম।

এবার অবাক হয়ে গেলুম। মূর্তিটা স্ত্রীলোকের।

ওই পোড়ো বাড়িতে সাপের ভয় তুচ্ছ করে কোনও স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মহাবীরকে ডাকলুম। মহাবীর আমার কথা শুনে ওদিকে তাকাল। তারপর দু'হাতে চোখ ঢেকে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, স্যার, স্যার! ওই সেই লছমী ডাকুনী!

শোনামাত্র আমার মাথায় জেদ চাপল। দ্রুত ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে আমার পয়েন্ট ৩৮ ক্ষুদে রিভলভারটায় গুলি ভরে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু তখন আর মূর্তিটা নেই।

মহাবীর বলল, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আসছি। বলে গেট পেরিয়ে রাস্তা থেকে বাঁদিকে নেমে বড় বড় পাথর আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই টিলার কাছে পৌঁছলুম। এবার ভয় জাগল। সাপের ভয়। সাবধানে নজর রেখে টিলায় উঠতে শুরু করলুম।

বাড়িটা কোনওক্রমে টিকে আছে। আগাছার জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছে তাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে প্রাঙ্গণে ঠুকলুম। তারপর মনে হল, বাড়িতে যেন মানুষ থাকার গন্ধ পাচ্ছি। এটা বুঝিয়ে বলা কঠিন, ষষ্ঠীর মতো একটা ইনটুইশন হতে পারে—কোনও স্পষ্ট চিহ্ন না থাকলেও মনে হচ্ছিল, এখানে মানুষ বাস করে।

ঘরগুলোর কপাটে মরচেধরা তালা আটকানো রয়েছে। বারান্দার শেষেপ্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলুম। কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো ক্লিপ। চুল আঁটার মেয়েলি ক্লিপ। ক্লিপে চুল লেগে রয়েছে। শুঁকে সস্তা গন্ধতেলও টের পেলুম।

বাড়িটার আনাচে কানাচে তন্নতন্ন খুঁজেও সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলুম না। উঠানে দাঁড়িয়ে ভাবছি, দরজার তালা ভেঙে দেখব নাকি ভেতরে কী আছে, হঠাৎ আমার বাঁ-দিকে কয়েক গজ তফাতে আগাছার মধ্যে কী পড়ে আছে দেখতে পেলুম।

ঘাসে পা ফেলতে ভয় করছিল। শঙ্খচূড় থাকলে অবশ্য পায়ের শব্দে অনেক আগে ফণা তুলবে। লড়াই করার সময় পাব, অন্য বিষাক্ত সাপ থাকলে মুশকিল। গায়ে পা না পড়া পর্যন্ত অনেক বিষাক্ত সাপও ফোঁস করে না।

যা দেখলুম, আমার শরীরে রক্ত চলাচল থেমে গেল যেন।

একটি দেহাতী যুবতী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার গলা, কপাল ও বুকের ক্ষতচিহ্নে টাটকা রক্ত দলা বেঁধে রয়েছে। কাপড় রক্তে মাখামাখি। নিস্পন্দ মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়। মুখটা অবশ্য তত বিকৃত নয়।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখে আর তাকাতে পারছিলুম না। এমন খুন-খারাপি দেখিনি, এমন নয়। কিন্তু একটু আগে এ বাড়ির ছাদে যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি, সেই যে এইমাত্র খুন হয়েছে—আমি হয়তো যখন নদীর ব্রিজে ছিলুম তখনই—একথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। তার আর্তনাদ কেন শুনতে পাইনি, সেটাই আশ্চর্য!

এখন দরকার খবর দেওয়া। সাপের কথা ভুলে হনহন করে এগিয়ে গেলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি, কর্নেলের টুপি দেখলুম ঝোপের আড়ালে। বুড়ো হাসিমুখে চাপা গলায় বললেন, জয়ন্ত যে!

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, শিগগির আসুন! ওখানে একটা খুন হয়েছে।

বুড়ো একটুও চমকালেন না। বললেন, তাই নাকি? চলো তো দেখি।

ভেতরে যেতে যেতে ব্যাপারটা বললুম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। কিন্তু প্রাঙ্গণে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়েই আমি আবার থ। লাশটা নেই।

বললুম, সর্বনাশ! এখানেই তো ছিল! গেল কোথায়?

কর্নেল হাঁটু দুমড়ে ঘাসের ভেতর থেকে কী একটা তুলে নিলেন। চমকে উঠে দেখি, রক্তের দলা ঘাঁটছেন আঙুলে। ছ্যা ছ্যা। ঘেন্না হচ্ছে না একটুও?

তিন

সম্ভাব্য ছয় নম্বর

না বলে পারলুম না আর। কর্নেল! করছেন কী! ওই নোংরা রক্ত ঘাঁটছেন কেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দুটো আগাছার পাতায় মুছতে মুছতে বললেন, জিনিসটা ততকিছু নোংরা নয়, ডার্লিং!

তারপর এগিয়ে গেলেন বারান্দর কোনায় সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। পেছন পেছন গেলুম। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে এদিকে-ওদিকে কী খুঁজছিলেন। একটু পরে একদিকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন! ডাকলেন, জয়ন্ত! ওই দেখো তোমার শ্রীমতী মৃতদেহ স্নান করছেন। অর্থাৎ তেল-সিঁদুর ধুয়ে ফেলছেন।

বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রেখে দেখি, হ্যাঁ—সেই দেহাতী যুবতীই বটে! নদীর বাঁকে মস্ত পাথরের আড়ালে ডোবামতো জায়গায় রগড়ে রং ধুচ্ছে।

বললুম, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ব্যাপারটা যৎকিঞ্চিৎ। ওখানে একজন পুরুষ মানুষও রয়েছে, যদি তুমি খুঁজে তাকে বের করতে পারো। সে আছে গাছের তলায় বসে।

দেখতে পেয়েছি কর্নেল! উত্তেজিতভাবে বললুম।

চিনতে পারছ তাকে?

আশ্চর্য! ওকে মহাবীর ড্রাইভার বলে মনে হচ্ছে।

দ্যাটস রাইট, ডার্লিং! এবারে চলে এস। কেটে পড়া যাক। সাবধান, আমরা এবার উল্টো দিকে বড় ব্রিজ পেরিয়ে বাংলোয় ফিরব।

কিছুক্ষণ পরে দুর্গম জায়গায় অশেষ কষ্ট করে হেঁটে হাইওয়ের বড় ব্রিজে পৌঁছলুম দু'জনে। তারপর বললুম, আপনি ওখানে জুটলেন কীভাবে?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজ সকাল থেকে টোপ খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলোর উল্টোদিকে নদীর পারে রঘুনন্দনজির ওই পোড়ো বাড়ির ছাদে আমাদের লছমীর প্রেতাত্মা দর্শনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল কেউ। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েই আমার নজরে

পড়েছিল! কিন্তু আমল দিইনি। তখন সঙ্গে দূরদর্শন যন্ত্রটা ছিল না। ফিরে এসে, তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, বস্তুটা চোখে রেখে দেখলুম—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। তখন ঘুরপথে বেরিয়ে পড়লুম। এগোতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, তুমি আসছ। বুঝতে পারলুম কেন আসছ অমন হন্তদন্ত হয়ে। তবে তুমি আমার সঙ্গী এবং কলকাতার লোক। ভূত বিশ্বাস করবে না এবং অনর্থ ঘটাবে জেনে মহাবীরের বউ...

অবাক হয়ে বললুম, মহাবীরের বউ? বলেন কী!

হ্যাঁ জয়ন্ত!

কাল মোহনজির বাড়িতে মেয়েটাকে দেখছি আমরা।

তাই বলুন! কিন্তু হঠাৎ অমন লাশ হয়ে পড়েছিল কেন?

তোমাকে ধোঁকা দিতে। মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলে প্রায়। হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে ও লাশ হয়ে পড়ে রইল। তুমি ধাঁধায় পড়ে গেলে। পুলিশকে খবর দিতে ছুটবে, এ তো জানা কথা! সেই ফাঁকে নিরাপদে পালানোর সুযোগ করে নিল।

তাহলে মহাবীরের বউ লছমীর ভূত সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হুম্। বলে কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন! তারপর ফের বললেন, তখন বললুম না? আমায় মোহনজি তুরুপের তাস করতে ডেকে এনেছেন!

ঠিক বুঝলুম না।

বুঝবে সময়মতো। এস আপাতত আমরা কিছুক্ষণ প্রকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।...

দুপুরে আজ মোহনজির বাড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলো থেকে নিয়ে যেতে এলেন মোহনজি নিজে। মহাবীরকে আর দেখতে পাইনি ত্রিসীমানায়! মোহনজিকে সকালের ঘটনা জানাতে নিষেধ করেছিলেন কর্নেল। বলেছিলেন, যা বলার আমি বলব। তাই চুপ করে থাকলুম।

মোহনজি বললেন, দেরি হয়ে গেল কর্নেল সাব! অনুগ্রহ করে এবার আসুন!

কিন্তু কর্নেল গোমড়ামুখে বললেন, ক্ষমা চাচ্ছি মোহনজি! রাত থেকে প্রচণ্ড পেটের অসুখে ভুগছি। কিছু মুখে দেওয়ার উপায় নেই! জয়ন্তকে নিয়ে যান!

মোহনজি অবাক হয়ে বললেন, সে কী! এতসব আয়োজন করেছি!

কর্নেল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, উপায় নেই মোহনজি! আমি মহাবীরকে বলে পাঠাব ভেবেছিলাম, খুঁজে পেলাম না।

মেহনজি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এটা কেমন কথা! আমি কত আশা করে...

বাধা দিয়ে কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার আশা না মেটাতে পারায় আমি দুঃখিত। আর মোহনজি, আমার এই এক বেয়াড়া স্বভাব—আমায় কেউ প্রতারণা করছে জানতে পারলে তার ছায়া আমি মাড়াইনে।

মোহনপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আমি আপনাকে প্রতারণা করেছি! কী বলছেন?

হ্যাঁ। কর্নেল দৃঢ় স্বরে বললেন। আপনার ড্রাইভার মহাবীরের বউকে আপনি লছমীর ভূত সাজিয়ে এত কাণ্ড করেছেন। আবার সেই রহস্য ফাঁস করতে আমাকে ডেকে এসেছেন। উদ্দেশ্যটা কী?

মোহনপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঝুট। বিলকুল ঝুট! এ আপনি কী বলছেন?

কর্নেল অন্যদিকে ঘুরে বললেন, যা বলার আমি বলেছি। এখন আপনি আসতে পারেন।

মোহনপ্রসাদ রাঙা মুখে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর জিপের অওয়াজ শোনা গেল। তারপর আমি বললুম, ওঁকে খামোকা রাগিয়ে দিলেন কেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন, সাবধান করার জন্য। জানিয়ে দিলুম, ওঁর চালাকি ধরে ফেলেছি। আশাকরি তুমি আগাথা ক্রিস্টির এ বি সি মার্ডার পড়েছে। খুনির উদ্দেশ্য সি-কে খুন করা। পুলিশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সে এ এবং বি-কে খুন করেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচটি কেস তো ডাকাতি। খুন নয়!

কর্নেল হাসলেন। ... প্রথম দুটো কেস মোহনপ্রসাদের পাম্প এবং বাড়িতে হামলার। ওটা ওঁর সাজানো গল্প। বাকি তিনটে ঠিক। কিন্তু দুটোর উদ্দেশ্য লছমীর ভূতের কথা প্রচার করা। বাকি তিনটে সেই প্রচারের ভিত্তি মজবুত করতে। আমার ধারণা এবার ছ'নম্বর কেস আমার উপস্থিতিতে করার প্ল্যান ছিল মোহনজির। যেহেতু উনি আমাকে এনেছেন এই রহস্যের পর্দা তুলতে এবং সে কথা পুলিশকে জানিয়েও দিয়েছেন, সেইহেতু এই পরিকল্পিত এবং সম্ভাব্য ছ'নম্বর কেসেও তার প্রতি এতটুকু নজর পড়ার কথা নয় পুলিশের।

সেজন্য আপনি তুরুপের তাস কথাটা বারবার বলছিলেন?

ঠিক ধরেছ ডার্লিং।

ছ'নম্বর কেসে কী ঘটতে পারে ভেবেছিলেন?

একটা বড় কিছু। কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন। ষষ্ঠীর ইনটুইশন খুব খাঁটি। কিন্তু সেই বড়টা কী মাথায় আসছে না। তবে সেটা থেকে মোহনপ্রসাদ যাতে নিবৃত্ত হন, তাই মুখের ওপর জানিয়ে দিলুম সব কথা। আশাকরি আর উনি এগোবেন না।

বলে কর্নেল পায়চারি শুরু করলেন। বিড়বিড় করে বলতে শুনলুম, কী হতে পারত ছনম্বর ঘটনাটা? কী সেটা?

তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জয়ন্ত! মনে হচ্ছে, এ বি সি মার্ডারের অন্তিম লক্ষ্যের মতো ওঁর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওঁর জীবনে। পূর্বপ্রতিহিংসা চরিতার্থ করা—নাকি কোনও আর্থিক লাভালাভের ব্যাপার?

হাসতে হাসতে বললুম, যা ঘটেনি এবং আশা করি আর ঘটবে না—আপনি যেহেতু ওঁর কীর্তিকলাপ জেনে গেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এদিকে আমদের খিদেও পেয়ে গিয়েছে। চলুন, কোনও হোটেলের দিকে পা বাড়াই।

কর্নেল বললেন, হুঁ, ছ'নম্বর ঘটনা আমি আটকে দিয়েছি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে, কী ঘটতে যাচ্ছিল! সম্ভবত সেটা শুধু ডাকাতি নয়, খুন-খারাপি। হ্যাঁ, লছমীর ভূতের হাতে একটি মৃত্যু।

করুণ মুখে বললুম, কর্নেল! আপনার সত্যি খিদে পেয়েছে।

বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর বিচলিত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, চলো, চলো।...

প্রতাপগড় থেকে ফেরার দিন পনেরো পরে কর্নেল একদিন ফোন করলেন। জয়ন্ত, প্রতাপগড়ের এমএলএ রঘুনন্দন সিংয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে নদীর ধারে। লছমীর ভূতের হাতেই খুন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি, স্রেফ খুন। শর্মাজি ট্রাংককলে জানালেন এইমাত্র। রঘুনন্দনের কাছে টিট হয়ে মোহনজি রাজনীতি ছেড়েছিলেন। অবশ্য আমি শর্মাজিকে লছমীর ভূত রহস্য ফাঁস করে না এলে মোহনজিকে সন্দেহ করতেন না ওঁরা। যাই হোক, মোহনজিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লছমী আর মহাবীর তো আমরা চলে আসার পরই গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখনও পুলিশ তাদের খুঁজছে। তাহলে দেখলে তো? ছ'নম্বর শিকার কে ছিল? ষষ্ঠীচরণের মাইনে বাড়িয়ে দিলুম, জয়ন্ত। সময় করে চলে এসো।...

ভূত্রাক্ষস

কিরিবুরু পাহাড়ি উপত্যকায় একসময় ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে শিকার করার জন্য রামগড়ের রাজা একটা টিলার মাথায় 'হান্টিং লজ' বা শিকার ভবন তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে শিকারে গিয়ে সেখানে তিনি থাকতেন। বাড়িটা কাঠের এবং ওপরে টালির চাল। তার লাগোয়া একটা উঁচু মঞ্চও তৈরি করেছিলেন। মঞ্চে উঠে দূরবীনে চোখ রেখে জন্তুজানোয়ার দেখতেন।

গতবছর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কিরিবুরু গিয়ে দেখি, কোথায় জঙ্গল? সারা উপত্যকা জুড়ে চাষবাস হয়েছে। চারিদিকে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ন্যাড়া হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের কয়েকটা ছোট্ট বসতি ছড়িয়ে রয়েছে। উপত্যকা দুভাগ করে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তার ওধারে টিলার মাথায় রামগড়ের রাজার হান্টিং লজ আর মঞ্চটা অবশ্য আছে। কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন হানা বাড়ি।

নদীর এপারে সেচ দফতরের ডাকবাংলোয় আমরা উঠলুম আগের ব্যবস্থা মতো। তারপর চারদিকে দেখে নিয়ে কর্নেলকে বললুম, 'এ কোথায় এলুম আমরা? জঙ্গলের টিকিটিও তো দেখা যাচ্ছে না। মিছিমিছি রাইফেল বয়ে এনেই বা কী লাভ হল?' কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো জয়ন্ত। তোমার রাইফেলের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ অবশ্যই পাবে।'

সেচ দফতরের জিপে আমরা এসেছি। জিপের ড্রাইভারের নাম বদ্রীপ্রসাদ। সে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল আর বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কর্নিল সাহাব। কর্নিল সাহাব। তুরন্ত্ আইয়ে, ঢুণ্ডু নিক্‌লা!'

কর্নেল তখুনি বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে হতচকিতভাবে তাকে অনুসরণ করলুম। এপ্রিলের বিকেল পড়ে এসেছে। ফিকে লালচে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে নদীর উপরে কিছু দেখতে থাকলেন। বদ্রীপ্রসাদ এবং চৌকিদারের মুখ উত্তেজনায় থমথমে। তারাও ওদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপরই শুনলুম নদীর এপারে ওপারে ছোট্ট বসতিগুলো থেকে হইহই করে লোকেরা বেরুচ্ছে। ঢোল আর ক্যানাস্তারা পেটাতে পেটাতে তারা শোরগোল তুলেছে। কিন্তু কাউকে বসতি ছেড়ে নড়তে দেখছি না। মনে হচ্ছে ওরা কোন সাংঘাতিক জন্তু দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

একটু পরে সব উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, 'হুম! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী?'

'হয়তো কোনও জন্তু—কিংবা জন্তু নয়।'

'তার মানে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'এদের ভাষায় ঢুণ্ডুর মানে হল ভূত-রাক্ষস। সন্ধি করে তুমি ভূত্রাক্ষস বলতে পারো।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ভূত আবার রাক্ষস হয় কী করে? রাক্ষসই বা ভূত হয় কি ভাবে?'

কর্নেল বাংলোয় ঢুকে তাঁর অত্যদ্ভুত সেই ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এই ইলেকট্রনিক ক্যামেরা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ। তারপর বললেন, 'রাক্ষস মানুষ খায় এবং ভূতের ক্ষমতা কিংবা স্বভাব-চরিত্র তো তুমি বিলক্ষণ জানো। ঢুণ্ডুর দু'রকম ব্যাপারটা আছে। কিরিবুরু উপত্যকা থেকে

গত তিনমাসে সাতজন লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে নদীর চড়ায়। আশ্চর্য ব্যাপার, কঙ্কালে একবিন্দু মাংস নেই—ঢুণ্ডু মাংস চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছে। শুধু হাড়গুলো নিখুঁত রয়েছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, আমার ধুরন্দর বৃদ্ধ বন্ধু কেন কিরিবুরু উপত্যকায় এসেছেন। এ তো দস্তুরমতো অ্যাডভেঞ্চার। আমার গা শিউরে উঠল অজানা আতঙ্কে। বললুম, 'একটু আগে ঢুণ্ডুকে কি সত্যি দেখলেন আপনি?'

'এক পলকের জন্যে দেখলুম।' কর্নেল গম্ভীরভাবে বললেন। 'রাজাবাহাদুরের হান্টিং লজের নিচে একটা লোক ঘাস কাটছিল। তার দিকেই লক্ষ্য ছিল ওর। লোকটা কীভাবে টের পেয়ে পালিয়ে আসছিল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। আমি দেখলুম কাঠের বাড়িটার কাছে একটা পাথরের আড়ালে কালো কি একটা অদৃশ্য হল। মানুষের মতো দেখতে কতকটা। যাই হোক, ডার্লিং, এবার তোমার রাইফেলের শক্তি পরীক্ষা হবে। চলে এস।...'

টিলাটা ঘন ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা। কার মধ্যে ছোট বন নানা সাইজের পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। হান্টিং লজের অবস্থা জরাজীর্ণ। তবে দরজায় মরচে ধরা তালা ঝুলছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে চলে গেছে। ধূসর আলোয় নীচের সবুজ শস্যে ঢাকা উপত্যকা যেন উত্তেজনায় শিউরে উঠছে মনে হচ্ছিল। কর্নেল কাঠের মঞ্চের পেছনে একটা গাছের ডালে ক্যামেরাটাকে যতক্ষণ মজবুত করে বেঁধে আটকে দিলেন, ততক্ষণে আমি গুলিভরা রাইফেল তাক করে চারদিকে সতর্ক নজর রাখলুম। ক্যামেরার শাটার থেকে একটা কালো সুতো টেনে এনে কর্নেল সামনে ঘাসভরা মাটির ওপর টানটান করে অন্যপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় আটকে দিলেন। এই সুতোয় যার পা লাগবে, তার অজান্তে ক্যামেরায় তারই ছবি উঠবে।

এরপর আমরা লজের বারান্দায় উঠলুম। কর্নেল টর্চ আর রিভলভার বের করে দরজার তলায় টান দিতেই খুলে গেল। কর্নেল বললেন, 'আশ্চর্য তো তালাটা যেন খোলাই ছিল।'

জংধরা দরজা ঠেলতে বিশ্রি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একধারে শুধু একটা লোহার খাট-ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝেয় ধুলো জমেছে। পেছনে একটা জানালা খোলা এবং গরাদ ভেঙে রয়েছে। নিশ্চয় চোরের কীর্তি। আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস করে চুরি করে নিয়ে গেছে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'ডার্লিং আজ রাতে এটাই আমাদের আস্তানা। কিটব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আছে। আর এই ফ্ল্যাস্কে কফি আছে। হুম্। রোসো। মোমবাতিগুলো বের করি।'

এই হানাবাড়িতে রাত কাটানোর কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। কর্নেল একটা মোম জ্বেলে লোহার খাটের কোনায় বসিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর কেমন একটা চিমসে গন্ধ। তার মধ্যে কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কর্নেলের তাগিদে খেতেই হল। উনি চুরুট ধরিয়ে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি মোমের আলোয় ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

পাশের ঘরের দরজাটা ভেঙে পড়েছে। টর্চ জ্বেলে উঁকি মেরে দেখলুম, মেঝে জুড়ে ইঁদুরের গর্ত, কাঁকুরে মাটির স্তূপ। একখানি সাপের খোলস দেখে চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! সাপ বেরিয়ে যদি এ ঘরে হানা দেয়?

কর্নেল আমার কাছে এসে উঁকি মেরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'হুম,! সাপের আড্ডা মনে হচ্ছে। তবে আমাদের পায়ে হান্টিং বুট আছে। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।' বলে আর একটা মোম জ্বেলে এনে এ ঘরের দরজার মাঝামাঝি রাখলেন। 'ব্যস্! আর চিন্তার কারণ নেই। সাপ এই আলো পেরিয়ে এ ঘরে ঢুকবে না। কারণ, আলোর সামনে সাপ নিজেকে অসহায় বোধ করে। বড় জোর ফণা তুলে আলোকে হিস হিস শব্দে ধমক দেবে।

আমরা লোহার খাটে বসে পড়লুম। বাইরে এতক্ষণে একটা জোরালো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কাঠের বাড়িটা অদ্ভুত শব্দ করছে। বারবার চমকে উঠছি। একবার খোলা জানালা, একবার মেঝের দিকে, আর একবার পাশের ঘরের দরজার জ্বলন্ত মোমের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি। কর্নেলের সঙ্গে অনেক ভয়ঙ্কর রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক রাত কখনও বুঝি কাটাইনি। কিছুক্ষণ পরে বাইরের দরজার দিকে তাকাতে বললেন। তাকিয়ে দেখি, দরজাটা একটু একটু কাঁপছে। কেউ যেন নিঃশব্দে চাপ দিচ্ছে।

আমার পিলে চমকে উঠল তাই দেখে। নির্ঘাৎ সেই আজব ভূত্রাক্ষস ঢুণ্ডু ব্যাটাচ্ছেলে! রাইফেল বাগিয়ে ধরলুম। কর্নেল একহাতে টর্চ অন্যহাতে রিভলভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজার চাপটা বাড়ছে ক্রমশ। মচমচ করছে জীর্ণ কাঠের কপাট। এবার আমিও উঠে দাঁড়ালুম। দরজাটা আমাদের ফুট দশেক দূরে। হঠাৎ কপাট দড়াম করে ভেঙে পড়ল। পরমুহূর্তে টর্চের আলোয় দেখলুম...

কিন্তু ওকি মানুষ, না ভয়ঙ্কর জন্তু? শরীরের গড়ন অবিকল মানুষের। কিন্তু একটুও লোম নেই—মাথাটাও ন্যাড়া। কালচে রঙের ভৌতিক প্রাণী যেন। তার নাক মুখ-চোখ সবই মানুষের। কিন্তু কিন্তু চোখদুটো জ্বলন্ত নীল টুনি বাল্ব যেন। তার মুখ থেকে অদ্ভুত চাপা একটা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে তাও শুনলুম।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। আমি রাইফেলের ট্রিগারে চাপ দিলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে গুলি বেরল। অটোমেটিক রাইফেল। ছটা গুলি শেষ করে ফেললুম। তারপর দেখি, আজব প্রাণীটা অদৃশ্য। কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'পালিয়েছে! যাগ কে, আপাতত আমাদের কাজ শেষ। চলো, বাংলোয় ফেরা যাক। ঢুণ্ডুবাবাজিকে স্বচক্ষে দর্শনের ইচ্ছা ছিল। দেখলুম, আবার কী?'

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—এখন টেবিলে ওঁর ছোট্ট ট্রেতে কয়েকটা ভেজা ফোটো। সদ্য প্রিন্ট করেছেন। আমাকে উঠতে দেখে বললেন, 'ঢুণ্ডুবাবাজিকে দেখে যাও ডার্লিং! আমাদের চোখ অনেক সময় ভুল করে। কিন্তু ক্যামেরার চোখ নির্ভুল।'

ছবিগুলো দেখে বললুম, 'রাতে যাকে দেখেছি, সেই বেটা।'

'কোনও তফাত চোখে ঠেকছে না?'

'না তো।'

'ভাল করে দেখে বলো, জয়ন্ত।' কর্নেল আরেকটা ছবি দিলেন।

দেখে বললুম, 'টাওয়ারের পাশে একটা পাথরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা উলঙ্গ পাগল—মাথাটা ন্যাড়া।... হুঁ, পাথরের গায়ে কালোমতো একটা চিহ্ন।'

ঘণ্টাখানেক পরে দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হান্টিং লজে পৌঁছলুম। রাতের সেই আতঙ্ক আর টের পাচ্ছি না। টাওয়ারের কাছে খুঁজে খুঁজে সেই পাথরটা আবিষ্কার করলেন কর্নেল। তারপর দেখি, পাথরটার মাথায় কালো গোলাকার একটা ইঞ্চিখানেক উঁচু কী একটা জিনিস। কর্নেল সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ পাথরটা নড়ে উঠল একটু কাত হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, হাতচারেক চওড়া একটা কুয়োর মতো সুড়ঙ্গ ধাপে-ধাপে নেমে গেছে।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে কর্নেল বললেন, 'এস জয়ন্ত, ঢুণ্ডুর ডেরায় ঢুকি।'

কর্নেল সবে প্রথম ধাপে পা রেখেছেন, হাতে টর্চ—কারণ ভেতরটা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, আচমকা ভেতরে চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল। তারপর বিদ্যুৎবেগে সেই ঢুণ্ডুর আবির্ভাব ঘটল এবং কর্নেলের গলা দু'হাতে চেপে ধড়ল। কর্নেল জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'মাথা! মাথা'!

কর্নেলকে নিয়ে ঢুণ্ডু তখন সিঁড়ির ধাপে পড়েছে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে। 'মাথা' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কর্নেল। বুঝতে দেরি হল একটু। তারপর লক্ষ্য করলুম কর্নেল একটা হাত বাড়িয়ে ঢুণ্ডুর মাথা ধরার চেষ্টা করছেন। আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতে দেরি করিনি। কিন্তু গুলি করে লাভ নেই, তা দেখেছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঢুণ্ডু ব্যাটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলুম।

ঠঙাস করে শব্দ হল। ব্যাটার মাথা না লোহার পিণ্ড! ফের ওর মাথার পেছনে এক ঘা দিতেই রাইফেলের বাঁট ভেঙে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।

ঢুণ্ডুর মাথাটা ছিটকে গিয়ে দমাস করে নিচে কোথাও পড়ল এবং ধাপে ধাপে ঢঙ ঢঙ শব্দ করতে করতে পাতালে গড়াতে থাকল। তারপর, দেখলুম, ওটা মাথা নয় আদতে—একটা নিছক হেলমেটের মতো জিনিস। ঢুণ্ডুর মুণ্ডু ঠিকই আছে এবং তা একটা জলজ্যান্ত মানুষেরই। কারণ তাতে চুল আছে।

ভাঙা রাইফেল দিয়ে দু'হাতে ওর চুল খামচে ধরতেই ঢুণ্ডুবাবাজি বেকায়দায় পড়ে মানুষের গলায় আর্তনাদ করল, 'উঃ! উহু-হু! গেছিরে! গেছিরে! ছাড়, ছাড়! মরে গেলুম রে!'

কর্নেলের সাদা দাড়ি এবং টাক ধুলোয় ধূসর। টুপি আর টর্চ কুড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, 'ঢুণ্ডু বাবাজিকে নিয়ে এস ডার্লিং! মহা ত্যাঁদোড় ব্যাটাচ্ছেলে।'

ঢুণ্ডু লক্ষ্মীছেলের মতো বলল, 'আহা টানে না এত। চলো না, যাচ্ছি। আমার চুল টানলে বেজায় লাগে যে!'

ভূত্রাক্ষস বা ঢুণ্ডুর পরিচয় পাওয়া গেল রামগড় থানায়। কর্নেল বললেন, 'কলকাতার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ভবরঞ্জন বক্সীর অন্তর্ধান রহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিরিবুরু হান্টিং লজে রামগড়ের রাজা একটা পাতাল-কক্ষ বানিয়েছিলেন শুনেছিলুম। বক্সী তার খোঁজ পেয়ে সেখানে গুপ্ত ল্যাবরেটরি করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। মানুষের মাংস থেকে উন্নতজাতের মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাগল আর কাকে বলে? মাঝখান থেকে সাতটা লোকের প্রাণ গেল। ইস্পাতের পোশাক পরে মানুষ চুরি করতেন। গুলি বিঁধবে কেমন করে? তবে ওই চেহারা দেখেই হতভাগা লোকগুলো ভিরমি খেত।'

বিকেলে কর্নেল পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কিরিবুরু গেলেন পাতাল-ল্যাবরেটরি দেখতে। বক্সীমশাই আইনের চোখে খুনি। তাঁর বিচার হবে। সে যাই হোক, আমি সার্কিট হাউসেই থেকে গেলুম। মানুষের পচা-গলা মাংস দেখতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না।...

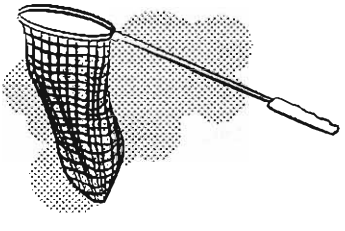

যেখানে কর্নেল

হরিচরণ এবং হরদয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাদ্রাজ মেলের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন বটে! সারাটা রাত্তির গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন।

ট্রেন জার্নিতে ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর ওই বকবকানি আর মাঝে-মাঝে কর্নেলের হা-হা-হা-হা- বিকট অট্টহাসি। কেন হাসছেন, গল্পটাই বা কী, ওপরের বার্থে শুয়ে একটুও ঠাহর হচ্ছিল না আমার। তার চেয়ে বিকট হাসি হরদয়াল নামে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটির! বিকটই বলছি। কারণ, নাদুসনুদুস গড়নের মধ্যবয়সী এবং প্রচণ্ড গুঁফো কোনও লোকের কণ্ঠস্বর যে অমন মেয়েলি আর ভূতুড়ে হতে পারে, কস্মিনকালে শুনিনি। ভূতুড়ে বলারও কারণ আছে। ভূত-পেরেত নাকি খোনা গলায় কথাবর্তা বলে। হরদয়ালবাবু যদি আড়াল থেকে কথাবার্তা বলেন, দিন-দুপুরে রীতিমতো সাহসী লোককেও আঁতকে উঠতে হবে।

হরিচরণবাবু দেখছিলুম একেবারে উলটো। কথাবার্তা বলছিলেন কম। গড়ন বা চেহারায়, তা ছাড়া পোশাকেও তাঁর সঙ্গীর একেবারে উলটো। লম্বাটে শক্তসমর্থ গড়নের লোক। চিবুকে কুচকুচে কালো দাড়ি এবং দু'পাশে জাঁকালো জুলপি। পরনে প্যান্ট শার্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও বেশ গম্ভীর।

প্রথম আলাপেই জানতে পেরেছিলুম আমাদের মতো ওঁদেরও গন্তব্য গোপালপুর অন-সি। কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকার 'হরিহর এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে দু'জনে মিলে একটি কোম্পানি গড়েছেন। আমদানি-রপ্তানি কারবার করেন। কারবারি জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে-মাঝে কয়েক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাদ্রাজ মেল চিল্কা স্টেশনে পৌঁছতে সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। তখন কর্নেলের তাড়ায় আপার বার্থ থেকে নেমে এলুম। হরিচরণবাবুও ওপাশের আপার বার্থ থেকে নামলেন। একটু পরে চা খেতে-খেতে হরিচরণবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা উঠছেন কোথায়?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু ঠিক করে আসিনি। শুনেছি গোপালপুর-অন-সি'তে ট্যুরিস্টদের চেয়ে নাকি হোটেল বা লজের সংখ্যা বেশি। এও শুনেছি, ওখানে সমুদ্রতীরও নাকি বেশ নির্জন আর খোলামেলা।"

হরদয়ালবাবু তাঁর ভূতুড়ে গলায় হিঁ হিঁ করে হেসে বললেন, "অপূর্ব। অপূর্ব! আমরা তো মশাই প্রতি বছর পুজোর ঠিক পরেই ওখানে যাই। বুঝলেন না? কারবারি মগজ ঠাণ্ডা করার জন্য এমন সি-বিচ আর পাব কোথায়?

হরিচরণবাবু বললেন, "সি-ভিউ হোটেলে উঠতে পারেন। আমাদের সঙ্গে মালিকের খুব চেনাজানা আছে। তা ছাড়া এখন নভেম্বরে সব হোটেল তো খালিই পড়ে থাকে। ট্যুরিস্ট সিজন শুরু হবে ডিসেম্বর থেকে।"

হরদয়ালবাবু মাথা দোলালেন। "হ্যাঁ, সি-ভিউ নতুন হোটেল। একেবার মডার্ন ব্যবস্থা। সায়েব-টুরিস্টরা এলে দেখেছি ওখানেই ওঠেন।"

বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছতে আটটা বেজে গেল। ট্রেন বেশ খানিকটা লেট করেছে। চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি'তে পৌঁছতে মাত্র আধঘণ্টা লাগল। মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরত্ব। সি-ভিউ হোটেলটি সত্যিই সুন্দর। ম্যানেজার ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক

আর হরদয়ালবাবুর সঙ্গে ওঁর ভালরকম চেনা-জানা। চারতলা হোটেলের চারতলাতেই একটি স্যুইট পেয়ে গেলুম আমরা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের স্যুইটটির নম্বর চার। তারই উল্টো দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন নম্বর স্যুইটটি হরিচরণবাবু তদ্বিরেই আমাদের ভাগ্যে জুটল। এক মন্ত্রীমশাই নাকি হঠাৎ এসে পড়ার আভাস পাওয়া গেছে। তাই ম্যানেজার একটু ইতস্তত করছিলেন শেষে হরিচরণবাবু রফা করে দিলেন, যদি সত্যিই মন্ত্রীমশাই এসে পড়েন, আমরা অন্য একটি স্যুইটে চলে যাব। হোটেল তো এখন প্রায় ফাঁকা। চারতলার মোট বারোটা স্যুইটের মধ্যে গোটা পাঁচেক স্যুইট ভর্তি আছে।

চারতলার চার নম্বর স্যুইটটি হরিচরণ-হরদয়ালের কলকাতা থেকে বুক করা ছিল। দুই বন্ধু মিলে সেটিতে ঢুকলেন। তিন নম্বরে ঢুকলাম আমরা। ব্যালকনিতে গিয়ে অভ্যাসমতো কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে সম্ভবত সামুদ্রিক পাখপাখালি খুঁজতে থাকলেন। আমি দেখতে থাকলুম সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড সব কালো-কালো পাথর মাথা তুলে আছে। সেইসব পাথরের সঙ্গে সমুদ্র যেন খেলা করছে। মাঝে-মাঝে সেগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে। কর্নেলের মতোই হা-হা করে সমুদ্র হেসে উঠছে আর ফেনাগুলো যেন কর্নেলেরই সাদা দাড়ি।

ভাবলুম, এই লাগসই উপমাটি ওঁকে শুনিয়ে দিই। কিন্তু উনি বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে বললে, "জয়ন্ত, তুমি তো একজন সাংবাদিক। ওদের সম্পর্কে তোমার কাগজে কিছু লেখা উচিত।"

অবাক হয়ে বললুম, "কাদের সম্পর্কে?"

"এখানকার মৎস্যজীবীদের", কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, "দূরের সমুদ্রে জলটা তত অশান্ত নয়। সেখানে মাছও প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করো, বিচের কাছাকাছি অনেকটা দূর পর্যন্ত সমুদ্রের কী সাংঘাতিক অবস্থা! ভেবে দ্যাখো, জয়ন্ত, ছোট্ট সব নৌকো নিয়ে এই অংশটা পেরোতে বেচারাদের কী লড়াই না করতে হয়! প্রতিদিন ওরা এই লড়াই করে তবে সামান্য কিছু মাছ ধরতে পারে। ফেরার সময় আবার সেই লড়াই। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছ, সমুদ্রে কতসব পাথরও মাথা উঁচিয়ে আছে। দৈবাৎ ধাক্কা লাগলে নৌকো ভেঙে গুঁড়িয়ে তো যাবেই, ওরাও বাঁচবে না! ওদের এই প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের কথা তোমার লেখা উচিত ডার্লিং। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে যখন বিশেষ-বিশেষ সামুদ্রিক মাছের সুস্বাদ নিয়ে প্রশংসা করি, তখন কি চিন্তা করে দেখি যে..."

আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সারগর্ভ ভাষণে বাধা পড়ল দরজার কলিং-বেলের বাজনায়। গিয়ে দরজা খুলে দেখি, হরিচরণবাবু, একেবারে সমুদ্রস্নানের জন্য তৈরি হয়ে আমাদের ডাকতে এসেছেন। বললেন, "আসুন কর্নেল, সমুদ্রস্নান করে খিদে চাঙ্গা করা দরকার, নইলে ব্রেকফাস্ট জমবে না। জয়ন্তবাবু দেরি করবেন না! পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বাই দা বাই আপনারা বাথ-স্যুট সঙ্গে এনেছেন তো? এখানে সমুদ্র কিন্তু বিপজ্জনক।"

কর্নেল একটু হাসলেন, "বাথ-স্যুটের দরকার হবে না হরিচরণবাবু! কারণ, এ-বেলা আমি সমুদ্রে নামছি না। তবে জয়ন্তের কথা আলাদা। ইয়াংম্যানরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না। কী বলো ডার্লিং?"

ঝটপট বললুম, "আমার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।"

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, "সমুদ্রের জলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। আসুন না, নুলিয়া পাওয়া যাবে। পুরীর সমুদ্রে কি কখনও স্নান করেননি?"

আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করলেন হরিচরণবাবু। টের পেলুম, ভদ্রলোকের গায়ের জোর আছে বটে! কর্নেলও বেরোলেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হরদয়ালবাবু স্নান করতে যাবেন না? নাকি আমার মতোই জলকাতুরে মানুষ?"

হরিচরণবাবু বললেন, "যা বলছেন! ওকে টেনে ওঠাতে পারলুম না বিছানা থেকে। দাঁড়ান, আবার চেষ্টা করে দেখি।"

উল্টোদিকে চার নম্বর স্যুইটের দরজা উনি ফাঁক করে ডাকলেন, "হর, ও হর, স্নান না-ই বা করলে। অন্তত বিচে বসে আমাদের স্নান করা দেখবে। সমুদ্র দেখলে খিদে বাড়বে হে, রাক্ষসের মতো খেতে পারবে!"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, খাটে হরদয়ালবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা হাত। এই অবস্থায় শুয়ে থেকেই সেই ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে বললেন, "আরে ট্রেন-জার্নির ধকল সামলে নিতে দাও আগে। বরং দুপুরের দিকে দেখব।"

হরিচরণ সহাস্যে বললেন, "তুমি তো বরাবর এখানে এসে আগে স্নান না করে ব্রেকফাস্ট করতে না! এবার হলটা কী?" বলে কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। "আমার ফ্রেন্ড, বুঝলেন তো, বড্ড খামখেয়ালি! গত বছর ও আমাকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ছেড়েছিল। সত্যি বলতে কী, এখানকার সমুদ্রকে আমারও বড্ড ভয় করত। ওর পল্লায় পড়েই সে-ভয়টা কেটে যায়।"

কর্নেল ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু কি অসুস্থ বোধ করছেন? ও হরদয়ালবাবু!"

হরদয়াল সেইরকম মেয়েলি এবং খোনা গলায় জবাব দিলেন, "আরে না, না, আপনারা যান না, আমি দুপুরে স্নান করব'খন।"

হরিচরণ রাগ করে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "ছেড়ে দিন। ও বরাবর ওইরকম একগুঁয়ে!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে সি-বিচে নামার সময় কর্নেল বললেন, "হরদয়ালবাবুর টনসিলের গণ্ডগোল আছে। কাল রাত্রে সে নিয়ে আলোচনা করছিলুম। উনি বললেন, দু'বার অপারেশন করিয়েও কিছু হয়নি।"

হরিচরণ বললেন, "আসল গণ্ডগোল থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে। ডাক্তারদের মতে, ওই গ্ল্যান্ডে অপারেশন না করলে গলার স্বর বদলাবে না, তাছাড়া ক্রমশ বডিটাও আরও মোটা হয়ে যাবে। কিন্তু সার্জারিতে হর-র বড্ড আতঙ্ক। দুবার যে টনসিল অপারেশন করিয়েছিল, সে একরকম আমারই চেষ্টায়। বড্ড জেদি ও।"

সমুদ্রের বিচ ভাটার সময়ও তত কিছু চওড়া নয়। খানিকটা ঢালুও। আমাকে টানাটানি করে হরিচরণ সমুদ্রে নামাতে পারলেন না। কর্নেল বিচে বসে বাইনোকুলারে লাইটহাউস কিংবা অন্য কিছু দেখতে থাকলেন। হরিচরণ ভাল সাঁতারু নিঃসন্দেহে। একদল কাচ্চাবাচ্চাও ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল। ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো মৎস্যজীবী বস্তির। এখন থেকেই ওরা এমনি করে এই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। ভবিষ্যতের বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। কর্নেল ঠিকই বলেছেন, এদের কথা 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আমার লেখা উচিত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বিচের ওপরদিকের বালিয়াড়ি থেকে প্রায় আছাড় খেতে নেমে এলেন সি-ভিউ হোটেলের সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে স্যার! হরদয়ালবাবু খুন হয়েছেন।" বলে সাঁতারু হরিচরণের উদ্দেশে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মতো হাত ছোড়াছুড়ি এবং লম্ফঝম্ফ করে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কর্নেল তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বালিয়াড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর টুপি খসে পড়ল। প্রশস্ত টাকটি ঝকঝক করে উঠল। কিন্তু টুপির দিকে মনই দিলেন না। অদৃশ্য হয়ে গেলেন বালিয়াড়ির ওধারে।

এতক্ষণে আমায় ঘিলু চাঙ্গা হল এবং আমিও দৌড়ে চললুম। বালিয়াড়ির খাঁজ থেকে কর্নেলের টুপিটি কুড়িয়ে নিয়ে গেলুম।

হরদয়ালবাবুর মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলের পরিচারক গোবিন্দরাম আমরা বেরিয়ে আসার আন্দাজ মিনিট পনেরো পরে জিজ্ঞেস করতে যায়, ব্রেকফাস্টে কী কী খাবেন বাবুরা। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। প্রথমে সে কলিং বেলের বোতাম টেপে। তারপর সাড়া না পেয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। সে হরিচরণকে বেরোতে দেখেছিল। কাজেই সে জানত, হরদয়ালবাবু ভেতরে আছেন। বাথরুমে আছেন ভেবেই সে অপেক্ষা করেছিল। শেষে অধৈর্য হয়ে দরজা খোলে এবং হরদয়ালবাবুকে চিত হয়ে শুতে থাকতে দ্যাখে। বাবুর সাড়াশব্দ না পেয়ে তার সন্দেহ হয়। তখন সে ওঁর দিকে ঝুঁকে কপালে হাত রাখে। কপাল ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল। তারপর তার চোখে পড়ে বালিশের ওপর রক্তের ছোপ। মাথার পেছন দিকটা থেকে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসে বালিশে ছোপ ফেলেছিল।

পুলিশ এসে যথারীতি মৃতদেহ বহরমপুর শহরের মর্গে নিয়ে গেল। সবাইকে তন্নতন্ন জেরা করে বিবৃতিও লিখে নিয়ে গেল। হরিচরণ বন্ধুর শোকে কাঁদতে-কাঁদতে পুলিশের গাড়িতে বহরমপুর চলে গেলেন। সেখান থেকে ট্রাংকল করে হরদয়ালের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেবেন।

হরিচরণের মুখেই আমরা জানতে পেরেছিলুম, হরদয়ালের অ্যাটাচিকেসে প্রচুর টাকা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশের গাড়িতে উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের স্যুইটে ফিরে কর্নেলকে বললুম, "আপনার সঙ্গে আর কোথাও যাচ্ছি না। যেখানে আপনি, সেখানেই খুনখারাপি। ব্যাপারটা কী?"

কর্নেল একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ব্যাপার তত কিছু গুরুতর নয়।"

অবাক হয়ে বললুম, "গুরুতর নয়? কী বলছেন! যে-হোটেলে এভাবে খুনে চোর-ডাকাত ঢোকে, সেই হোটেলে আমার আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না!"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে-এগারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। চলো, দেখি, ক্যান্টিনে একটু সকাল-সকাল লাঞ্চ পাওয়া যায় কি না।"

সূর্যাস্তের পরও কর্নেল ও আমি সি-বিচে গিয়ে বসে আছি, সেই সময় পিছনের বালিয়াড়িতে কয়েকটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। ডান দিকে বিচের মাথায় কতকগুলো পাথরের ভাঙাচোরা বাড়ি। খুব পুরনো আমলের বাড়ি। ছায়ামূর্তিগুলো বালিয়াড়ি থেকে সোজা না নেমে সেই ভাঙা বাড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ল। অমনি ভয় পেয়ে চাপাস্বরে বলে উঠলুম, "কর্নেল, নির্ঘাত চোর ডাকাতের দল!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা তো ব্যবসায়ী নই। টাকাকড়ি-ওয়ালাও নই। চোর-ডাকাত লোক চেনে ডার্লিং!

"তাহলে ওরা কারা?"

"যারাই হোক, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

একটু পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠল ঝলমলে এক বিশাল লাল-হলুদ রঙের গোলা। ওটা যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। তারপর পিছন থেকে কে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "কর্নেলসায়েব নাকি?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "হরিচরণবাবু? আসুন, আসুন। কখন ফিরলেন বহরমপুর থেকে?"

"এইমাত্র," বলে হরিচরণ এসে আমাদের পাশে বসলেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙাগলায় বললেন,

"আপনি কী বলবেন বলছিলেন, তাই চলে যাওয়ার আগে দেখা করতে এলুম।"

কর্নেল আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা হরিচরণবাবু, আপনি কি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন?"

হরিচরণও চমক-খাওয়া গলায় বললেন, "কেন বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "আমি অনেকদিন যাবৎ তন্ত্রসাধনা করেছি। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আপনার বন্ধু হরদয়ালবাবুর আত্মার সঙ্গে যদি আপনি বাক্যালাপ করতে চান করতে পারেন। ডাকব তাঁকে?"

হরিচরণ বললেন, "এ-কথা বলতেই ডেকেছিলেন কি?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু, আপনার বন্ধু এখানে উপস্থিত আছেন। কিছু বলার থাকলে বলুন ওঁকে।"

সামনে সমুদ্রের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং সেই আলোড়নের মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার রং দুলছে। ঝকমক করছে। যেন এক বিশাল অলৌকিক দৃশ্যের সামনে বসে আছি। আর সেই অলৌকিকতাকেও তুচ্ছ করে দিয়ে ভেসে এল হরদয়ালবাবুর ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর, "কী হরি, এখনও কী করছ এখানে? শিগগির কলকাতা চলে যাও। আমার তো ছেলেপুলে নেই। এখন তোমারই সব। হরিহর এন্টারপ্রাইজের একচ্ছত্র মালিক হতে অসুবিধেও নেই।"

হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই চালাকির অর্থ কী?"

কথাটা বললেন কর্নেলকে। জবাল এল হরদয়ালের প্রেতাত্মার কাছ থেকে। "চালাকি তুমিও কম জানো না হরি, ও কী পালাচ্ছ কেন? আরে শোনো, শোনো।"

হরিচরণ সত্যি পালাচ্ছিলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ ডান দিকের সেই ভাঙা পাথুরে বাড়িগুলো থেকে একঝাঁক টর্চের আলো এসে পড়ল এবং একদল ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরল হরিচরণকে। তখন বুঝতে পারলুম, সেই ছায়ামূর্তিগুলো পুলিশ। হরিচরণকে গ্রেফতার করছে।

কর্নেল বললেন, "কী ডার্লিং, বোবা হয়ে গেলে যে?"

বললম, "কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না।"

কর্নেল হাসলেন, "স্রেফ ভেন্ট্রিলোকুইজিম! আমি এই স্বর-জাদু বিদ্যাটি সম্প্রতি শিখেছি। যাই হোক, হরদয়ালের মাথার পিছনে সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে হরিচরণ ওঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। আমরা ওঁদের স্যুইটের দরজার ফাঁক দিয়ে ওঁকে দেখেছিলুম ঠিকই। তখন আসলে উনি মৃত। কিন্তু এই হরিচরণ ভেন্ট্রিলোকুইজিমে খুব পাকা। বিশেষ করে হরদয়ালবাবুর টলসিলের ত্রুটি থাকায় হরিচরণের সুবিধে হয়েছিল। আমাদের সাক্ষী রাখতে চেয়েছিল যে, হোটেল থেকে বিচে আসার সময় আমরা হরদয়ালকে জীবিত দেখেছি, কারণ, ওঁর কথাবার্তা শুনেছি।"

সবকিছু আমি দেরিতে বুঝি। ঝটপট বললুম "বুঝেছি, বুঝেছি।"

কর্নেল বললেন, "এখনও সবটা বোঝোনি। গতরাত্রে ট্রেনে হরদয়ালবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জানতে পেরেছিলুম হরিচরণ একসময় ম্যাজিসিয়ান ছিল। আর আজ সকালে সমুদ্রস্নানে সে এসেছিল পিস্তলটা সমুদ্রে ফেলতে।"

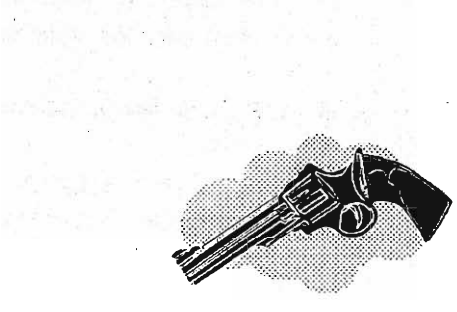

সবুজ বনের ভয়ংকর

কথা বলা বন

মার্চের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে অভ্যাসমতো আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই অফিসের বড়কর্তার মতো একটা ফাইল খুলে গোমড়ামুখে বসে আছেন। কাছাকাছি বসে ফাইলের বিষয়বস্তু আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু ঠাহর করা গেল না। আমার উপস্থিতিও যেন উনি টের পেলেন না।

একটু পরে ওঁর মুখ দিয়ে কী একটা কথা বেরুল। মনে হল 'বঙ্গভঙ্গ' কিংবা এরকম কিছু। কথাটা উনি বিড়বিড় করে আওড়াতে শুরু করলে আর চুপ করে থাকা গেল না। বললাম, 'বঙ্গভঙ্গ তো ১৯৪৭ সালে হয়ে গেছে। এতকাল বাদে ও নিয়ে দুঃখ করার কী আছে?'

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন এবার। 'ও তুমি এসে গেছ দেখছি ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলাম। একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণের মধ্যে এক ভদ্রলোক আসবেন এবং তোমার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কিছু মালমশলা তাঁর কাছে পেয়ে যাবে।'

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আজ আমার ছুটির দিন। খবরের কাগজের জন্য আজ আমার এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আপনি হঠাৎ বঙ্গভঙ্গ নিয়ে বিড়বিড় করে মরাকান্নার মতো শোকপ্রকাশ করছিলেন কেন?'

'বঙ্গভঙ্গ?' কর্নেল ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড। তারপর জোরে হেসে বললেন, 'না জয়ন্ত। রঙ্গো রঙ্গো। কোহাও রঙ্গো রঙ্গো।'

'তার মানে?'

'স্পিকিং উডস। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ডের লুপ্ত ভাষায় কোহাও রঙ্গো রঙ্গো মানে যে বন কথা বলতে পারত।'

এই সময় ষষ্ঠীচরণ এসে খবর দিল, এক সায়েব এসেছেন। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন কর্নেল। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। সায়েবের নাম কাপ্তেন জর্জ ব্যুগেনভিলি। সওদাগরী জাহাজে সারা পৃথিবী চক্কর মেরেছেন। নামটা শুনে বললাম, 'আপনার নামের সঙ্গে কি বুগানভিলিয়া ফুলের কোনও সম্পর্ক আছে?'

সায়েব আমুদে স্বভাবের মানুষ। গড়ন প্রকাণ্ড কুমড়োর মতো। ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'আলবৎ আছে। বুগানভিলিয়া ফুল আসলে পলিনেশীয়। ১৭৬৮ সালে আমার মতো এক কাপ্তেন আঁতোয়াঁ দ্য বুগ্যেঁভিলি ওই এলাকার একটা দ্বীপে এ ফুল আবিষ্কার করেন। ইউরোপে নিয়ে যান। তাঁর নামেই ফুলের নাম চালু হয়।'

কর্নেল যোগান দিলেন, 'উষ্ণ নিরক্ষরেখা অঞ্চলের উদ্ভিদ। নিস্টাজিনিসিয়া গোত্রের প্রজাতি।'

মুচকি হেসে বললাম, 'কর্নেল, আপনার কোহাও রঙ্গো রঙ্গোর সঙ্গে বুগানভিলিয়া ফুল এবং মাননীয় অতিথি কাপ্তেন সায়েবের নামের এই যোগাযোগ সম্ভবত আকস্মিক নয়। তাই না?'

কর্নেল সেই ফাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। কাপ্তেন ব্যুগেনভিলি সেটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'রাতারাতি জেরক্স কপি তৈরি দেখছি! কর্নেল, আপনার এই উৎসাহ দেখে আমার আশা হচ্ছে, এতদিনে কিওটা দ্বীপের বৃক্ষরহস্য ফাঁস করাটা আর কঠিন হবে না।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি রেখে গেল। ওঁরা কফি খেতে খেতে কথা বলছিলেন। আমি ফাইলে চোখ রাখলাম। তারপর যত পাতা ওল্টাই, তত চমক জাগে। একি সত্যি, না নিছক গালগল্প?

"...তিন বছর আগে তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া হয়ে ফেরার সময় ইচ্ছা ছিল কিওটা দ্বীপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। কিন্তু কোকোস দ্বীপপুঞ্জ এলাকা যেন গোলকধাঁধা। তার ওপর উল্টো বাতাস। এগোনো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ভারত মহাসাগরে। অক্ষাংশ ২০ ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ ৮০ ডিগ্রি। পঞ্চাশ নটিকাল মাইল দূরত্বে পৌঁছতেই হঠাৎ প্রবল দক্ষিণগামী বাতাস আমার জাহাজ 'এনডেভার' কে ঠেলে দিল বিপরীত পথে। চাগোস দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মরিশাস হয়ে কেপটাউন। তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলাম। লন্ডনে পৌঁছে কিছুকাল মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরি ঢুঁড়ে কিওটা দ্বীপের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামালাম...

"সিঙ্গি ট্রিজ! সঙ্গীতকারী বৃক্ষ! কী অদ্ভুত কথা! অসংখ্য নাবিক এই উদ্ভট গল্পে বিশ্বাস করে। নিশ্চয় কানের ভুল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাতাস বইলে অনেক সময় গানের সুর বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিলপত্রে দেখলাম, কিওটার গাছগুলো নাকি কথাও বলতে পারে।

"আমার এবারকার অভিযান আন্টার্কটিকায়। নাবিকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাগোস থেকে দক্ষিণে না এগিয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে কোকোসের দিকে এগিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যায় কিওটার একমাইল দূরে নোঙ্গর বেঁধেছি আমার 'রেজিলিউশান' জাহাজকে। ২৪ নভেম্বর কেপটাউন ছেড়েছি। আজ ১২ ডিসেম্বর। আবহাওয়া চমৎকার নাতিশীতোষ্ণ এখানে। সকালে একটা বোট নিয়ে তিনজন দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেলাম। চমৎকার বেলাভূমি। ডাঙায় পৌঁছেই আমার যা অভ্যাস—বন্দুক ছুড়লাম একবার। তারপর ইউনিয়ন জ্যাক পুঁতে দিলাম। সমুদ্রপাখিরা কলরব করে উড়ে গেল। নিশ্চয় দ্বীপটাতে মানুষ বাস করে না। তাহলে বন্দুকের শব্দ শুনে তারা ছুটে এসে ভিড় করত। ডাক্তার স্মিথকে বললাম, 'চলুন তা হলে।' ডাঃ স্মিথ কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, 'কে যেন চিৎকার করে কিছু বলল।' হাসতে হাসতে উঁচু জায়গাটাতে উঠে গেলাম। আমার পেছনে ডাঃ স্মিথ আর দু'জন সশস্ত্র নাবিক। সামনে ঘন জঙ্গল। বিশাল উঁচু সব অপরিচিত গাছ। স্বীকার করছি, গাছগুলো দেখে কেমন গা ছমছম করছিল। যেন তারা প্রাণীর মতো সচেতন এবং আমাদের নিঃশব্দে লক্ষ্য করছে। সেই গাছপালার ভেতর দিয়ে কয়েক পা এগিয়েছি, ঠিক যেন বাতাসের শব্দে শনশন করে কোথায় একদল মানুষ ইংরেজি ভাষায় গর্জন করে উঠল 'স্টপ ইট!... স্টপ ইট।'

"নিশ্চয় কানের ভুল। তারপর আর কোনও ভূতুড়ে আওয়াজ আমি শুনিনি। কিন্তু নাবিকরা আর এক পা বাড়াতে রাজি নয়। তারা আমাকে অগ্রাহ্য করে বোটে গিয়ে বসে রইল। ডাঃ স্মিথ আর আমি সতর্কভাবে ছোট্ট দ্বীপটা দুপুর পর্যন্ত ঘুরলাম। জনপ্রাণীটি নেই। ফেরার সময় ডাঃ স্মিথ বললেন, একবার যেন কাদের অস্পষ্ট ফিসফিস কথাবার্তা শুনেছেন। ভদ্রলোক বড় কল্পনাপ্রবণ।...

"এখন রাত দশটা। রেজিলিউশন দক্ষিণ মহসাগরে ভেসে চলেছে আন্টার্কটিকার দিকে। কিওটা দ্বীপের ব্যাপারটা গাছপালার মর্মরধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। আমার ধারণা, 'স্টপ ইট' কথাটা কানের ভুল, সম্ভবত কাঠঠোকরা জাতীয় পাখি শুকনো কাঠে ঠোকরাচ্ছিল এবং তা থেকেই ওই আওয়াজ। বিদ্রোহী নাবিক দু'জনকে শাস্তি দিয়েছি। পাঁচ ঘা বেত এবং ২৪ ঘন্টা অনাহারের শাস্তি। ডাঃ স্মিথ একটু আগে বলে গেলেন, ওদের গায়ে নাকি সবুজ রঙের অদ্ভুত অ্যালার্জি বেরিয়েছে। সবকাজেই ওঁর বাড়াবাড়ি।—" —ক্যাপ্টেন টমাস কুকের লগবুক। 12. 12. 1772

* * *

"কীলিং (Keeling) দ্বীপপুঞ্জে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ফসিল খুঁজতে যাওয়ার সময় দ্বীপের এক বৃদ্ধ আমাকে কিওটা নামে অদ্ভুত একটা দ্বীপের কথা বলে। সেটা নাকি মাইল ষাটেক দক্ষিণে। সেই দ্বীপের গাছগুলো নাকি কথা বলে। অবান্তর ব্যাপার। সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু 'বিগল' জাহাজের ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিট্‌জরয় বদরাগী মানুষ। এমনিতেই আমার কাণ্ডকারখানা দেখে ক্রুদ্ধ

হয়ে আছেন। তাঁকে যদি বা রাজি করাতে পারি, নাবিকদের পারব না। কিওটার কথা শুনেই তারা বলেছে, ওই ভূতের দ্বীপ অসম্ভব।' শেষ পর্যন্ত তাই কিওটা যাওয়া হল না। মনে ক্ষোভ রয়ে গেল।"

—চার্লস ডারউইন, এইচ এম এস বিগল 23. 2. 1835

* * *

"উদ্ধারপ্রাপ্ত নাবিকের নাম জন হিক্স। তাকে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে ভারত মহাসাগরে জাহাজ ডুবি হয়ে একটা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে গাছপালা কথা বলে। তাকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল একটা গাছ। হিক্সের বিবৃতির সময় প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড হোম উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোনও মন্তব্য করেননি। হিক্স আরও একটা অদ্ভুত কথা বলে। একটা গাছের সঙ্গে তার নাকি বিয়েও হয়েছিল। ডাক্তারদের মতে লোকটি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তবে ব্রিটিশ জাদুঘরের কিউরেটারে ডঃ ফক্স বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব একহাজার অব্দে ফিনিসীয় নাবিকদের প্যাপিরাসে লেখা যে লগবুক আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে গর্জনকারী গাছের কথা আছে। কোনও সমুদ্রে একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা সেই ভৌতিক গর্জন শুনতে পেত। তাই দ্বীপে নামার সাহস পেত না। ডঃ ফক্স আরও বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে লেখা গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা বলেছেন। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো লিখেছেন, ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গভীর রাত্রে তাঁরা সেখানে কোলাহল শুনতে পান। জাহাজ দ্বীপের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সারারাত আশ্চর্য সব শব্দ শোনেন। সকালে পোলো বোটে করে দ্বীপটিতে পৌঁছন। কিন্তু আর একপা এগোতে পারেননি। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং হাজার হাজার মানুষ যেন তাঁকে গর্জন করে এগোতে নিষেধ করে। পোলো লিখেছেন, গাছগুলো থেকেই ওই গর্জন ভেসে আসছিল। বোটে ফিরে গেলে, আশ্চর্য ব্যাপার ঝড়টা তক্ষুনি থেমে যায়।..."

—দি ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড, লন্ডন 7. 9. 1981

* * *

"...কোহাও রঙ্গো রঙ্গো। কথা বলা বন। প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় এলাকার ছোট্ট দ্বীপ ইস্টার আইল্যান্ডে বিশপ জোসেন নামে এক খ্রিস্টীয় যাজক গত শতকে একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। তাঁর লিপির সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার লিপির আশ্চর্য মিল। মেতোরো নামে তাঁর স্থানীয় এক ভৃত্য পুঁথিটি পড়ে অনুবাদ করে দেয়। এই পুঁথির নাম 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো'। এটি ইস্টার দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের ধর্মীয় পুরাণ। এতে আছে এক অদ্ভুত বনের কাহিনী—যার গাছগুলো কথা বলতে পারত। তাদের উপাস্য দেবতার নাম ছিল রাঙ্গেতিয়া। তিনি আকাশের দেবতা। তাঁর আশীর্বাদে গাছপালা কথা বলত মানুষের ভাষায়। বিশপ জোসেনের ধারণা, সেই কথা বলা বন বহু বছর আগে নির্মূল হয়ে গেছে কোনো কারণে।"

—ইস্টার আইল্যান্ডের রহস্য : ই ডলফার, পৃষ্ঠা 5

"প্যারিস ২০ জানুয়ারি—সম্প্রতি প্রখ্যাত অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জর্জ ব্যুগেনভিলি তাঁর সপ্তদশ নৌ অভিযানে আন্টার্কটিকা যাওয়ার সময় ঝড়ের মুখে পড়েন। জাহাজ ডুবে যায়। লাইফবোটের সাহায্যে ভাসতে ভাসতে সাত দিন পরে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে ওঠেন। ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি জনহীন দ্বীপ থেকে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে সমুদ্র পাড়ি দেন। একমাস পরে কীলার দ্বীপে পৌঁছন। তিনি সেই নির্জন দ্বীপ সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিবরণ দিয়েছেন। সেখানে নাকি গাছপালা মানুষের মতো কথা বলতে পারে।..."

—রয়টার

ফাইল থেকে মুখ তুলে জর্জ ব্যুগেনভিলির দিকে তাকালাম। স্যায়েব মিটিমিটি হাসছিলেন।

উদ্ভিদের গোপনকথা

আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে ইদানীং ক্যাকটাস এবং অর্কিড-জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে কী সব বিদঘুটে ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেখতাম। একদিন গিয়ে দেখি, হেড-ফোন মাথায় এঁটে বসে আছেন এবং একটা অ্যামপ্লিফায়ার যন্ত্রের নব ঘোরাচ্ছেন। একটা অদ্ভুত আকৃতির নধর ক্যাকটাসের গায়ে পিন ফুটিয়ে রেখেছেন। পিনের মাথায় সূক্ষ্ম তামার তার বাঁধা। তারটা আরও একটা ক্ষুদে যন্ত্রের ভেতর দিয়ে এসে অ্যামপ্লিফায়ারে পৌঁছেছে। ক্ষুদে যন্ত্রটা জারে তরলপদার্থের ওপর ভাসছে। তারপর অবাক হয়ে দেখি, উনি চোখ বুজে থিরথির করে কাঁপতে লাগলেন। অমনি ভাবলাম, এই রে! বুড়ো নির্ঘাৎ তড়িতাহত হয়ে পড়েছেন।

যেই না মনে হওয়া, দৌড়ে গিয়ে মেন সুইচ অফ করে দিলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এসে রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'কর্নেল! কর্নেল! আপনি সুস্থ তো?'

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গর্জন করে উঠলেন, 'শাট আপ ইউ ফুল!'

কস্মিনকালে ওঁর কাছে এমন ধমক খাইনি। আমি তো থ! একটু পরে অভিমান দেখিয়ে বললাম, 'বা! এই আপনার কৃতজ্ঞতাবোধের নমুনা! ইলেকট্রিক শক খেয়ে থিরথির করে কাঁপছিলেন। এতক্ষণে অক্কা পেয়ে যেতেন। বাঁচিয়ে দেওয়াটা বুঝি অন্যায় হল? ঠিক আছে এবার খাবি খেতে দেখলেও মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব—তবে না আমার নাম জয়ন্ত!'

কর্নেল তখন ফিক করে হেসে ফেললেন। 'উত্তেজিত হয়ো না ডার্লিং! তোমার কোনও দোষ নেই। ষষ্ঠীচরণ! ও ষষ্ঠি!' ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ পর্দা তুলে মুখ বের করলে বললেন, মেন সুইচটা অন করে দাও। আর শোনো, ঝটপট আমার তরুণ বন্ধুর জন্যে কড়া করে কফি বানাও। আমিও খাব।'

শান্ত হয়ে বসলে বললেন, 'জয়ন্ত! ওই মেক্সিকান ক্যাকটাসের সঙ্গে আমি একটু বাতচিত করছিলাম।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কী!'

'হ্যাঁ ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বোসের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর অনেকগুলো দশক কেটে গেল। এখন বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন,—উদ্ভিদের শুধু সুখদুঃখের অনুভূতি নয়, সাড়া দেওয়ার শক্তি আছে। সেই সাড়া দেওয়াটাকেই বলব উদ্ভিদের ভাষা। ভাষাটা কিন্তু শব্দ দিয়ে নয়, কম্পন দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন স্তরে সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম কম্পনে তার কথা প্রকাশ পায়। এই ক্যাকটাসটা সবে কথা বলতে শুরু করেছিল এবং আমিও তার ভাষায় জবাব দিচ্ছিলাম—হঠাৎ তুমি এসে সবটাই ভেস্তে দিলে।'

হাসতে হাসতে বললাম, 'আপনাকে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কাঁপতে দেখছিলাম। কী আশ্চর্য! ওভাবেই বুঝি গাছপালার সঙ্গে কথা বলতে হয়?'

কর্নেল জারে ভাসমান ক্ষুদে যন্ত্রটা দেখিয়ে বললেন 'এটা একটা গ্যালভানোমিটার। তুমি লাই-ডিটেক্টর যন্ত্রের কথা জানো—যা অপরাধী সত্য বলছে, না মিথ্যে বলছে, ধরিয়ে দিতে পারে। এটা তারই একটা অংশ। এর ভেতর একটুকরো গ্র্যাফ-পেপার আছে এবং একটা সূক্ষ্ম পেন্সিলের শিস আছে। গত শতকের শেষভাগে ভিয়েনার এক ধর্মযাজক ফাদার ম্যাক্সিলিয়ান হেল এর উদ্ভাবক। পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী লুইজি গ্যালভানি প্রাণীজ বিদ্যুৎ আবিষ্কার করে যন্ত্রটা আরও উন্নত করেন। তাঁর নামে যন্ত্রটার নাম দেওয়া হয় গ্যালভানোমিটার। আরও পরে ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার চার্লস হুইটস্টোনের আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ সার্কিট হুইটস্টোন ব্রিজ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। তবে...'

বাধা দিয়ে বললাম, 'কিচ্ছু বুঝব না। আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না।'

'তা হলে গাছের পাতা নিয়ে ব্যাকস্টার নামে এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষার কথা শোনো! তিনি অসংখ্য পরীক্ষার পর বলেছিলেন, উদ্ভিদেরা চক্ষু ছাড়াই দেখতে পায়—মানুষ যতটা দেখতে পায়,

তারও বেশি। উদ্ভিদের যেন মন আছে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে এই বিশাল প্রাণীজগতের অন্যতম শরিক এবং সে সব প্রাণীর মনের কথা টের পায়।'

'সেই ব্যাকস্টার সায়েব বলেছেন এ কথা?' আমি হাঁদারামের মতো তাকিয়ে বললাম। 'সর্বনাশ! যখন আপনার বাসায় আসি, ওইসব বিদঘুটে গড়নের উদ্ভিদগুলোকে দেখে মনে মনে কত হাসি এমনকী, একদিন আপনার পরীক্ষিত ওই অষ্টাবক্র ক্ষুদে উদ্ভিদটিকে দেখিয়ে যেদিন ষষ্ঠীচরণকে বলছিলাম, ব্যাটা যেন সার্কাসের ক্লাউন! ওরে বাবা! তা হলে তো ও বেজায় রাগ করছিল আমায় ওপর।'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'এই যে এখন তুমি এসেছ এবং তার কথাবার্তায় বাধা দিয়েছ, এতে ও কি ক্রুদ্ধ না হয়ে পারে?

'কাছে গেলে প্যাঁক করে কাঁটা ফুটিয়ে দেবে বুঝি?

'তা হয়তো দেবে না। কিন্তু তুমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোড থেকে বিকিরণ বেড়ে গিয়েছিল এবং গ্যালভানোমিটার কাঁপছিল। একমিনিট। গ্রাফটা বের করি।'

কর্নেল ক্ষুদে যন্ত্র থেকে একটুকরো কাজ বের করে দেখালেন। অসংখ্য আঁকাবাঁকা রেখা জটিল হয়ে আছে দেখলাম। বললাম, 'এই বুঝি ওর রাগের ভাষা?"

কর্নেল আমার তামাশায় কান না দিয়ে বললেন, 'এই কাগজটার নাম পলিগ্রাফ। বিখ্যাত ব্যাকিস্টার এক্সপেরিমেন্টের সূত্র ধরে আমি এই জটিল রেখাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এগুলো কোড ল্যাঙ্গেয়েজ অর্থাৎ সাংকেতিক ভাষা। কোডগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করে অর্থোদ্ধার করা সম্ভব। যাই হোক, আপাতত কফি খাও। তারপর দুই বিজ্ঞানী স্যাক্স রোমার এবং বুলওয়ার লিটনের পরীক্ষার গল্প বলব। সে আরও বিচিত্র ঘটনা। তাঁরা আমেরিকার নিউ জার্সিতে একটা কারখানার কাছে খুন হওয়া একটি মেয়ের খুনিকে ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন!'

'আপনার মতো তাঁরা শখের গোয়েন্দাও ছিলেন বুঝি?'

'না, জয়ন্ত। ওঁরা নিছক বিজ্ঞানী। পদার্থ এবং জীববিদ্যার চর্চা করতেন। যেখানে মেয়েটি খুন হয়েছিল সেখানে ছিল একটা বুনো আপেল গাছ। গাছটাই ধরিয়ে দিয়েছিল খুনিকে।'

'চেঁচিয়ে বলেছিল পাকড়ো! পাকড়ো!'

'তামাশা নয়, ডার্লিং! এটা বাস্তব ঘটনা। একটুকরো পলিগ্রাফ আর একটা গ্যালভানোমিটার, একটা ইলেকট্রোড—ব্যস! এ তিনটি জিনিস গাছটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে লোক জড়ো করা হয়েছিল গাছটার সামনে। একবার করে পাতা ছুঁয়ে যেতে বলা হয়েছিল প্রত্যেককে। তারপর দেখা গেল, একজনের ছোঁয়ার পর পলিগ্রাফে গাছটা তীব্রভাবে সাড়া দিয়েছে। কম্পনরেখা বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল, সেই লোকটাই খুনি।'

সেদিন কর্নেল সারাবেলা এইসব উদ্ভুট্টে কথাবর্তা বলেছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'জয়ন্ত, তুমি ই এস পি কথাটা কি শুনেছ?'

'শুনেছি। এক্সট্রা সেনসরি পার্সেপসন। অর্থাৎ অতিরিন্দ্রিয় অনুভূতি।'

'উদ্ভিদের মধ্যে ই এস পি অধুনা সুপ্রমাণিত। তারা এমন জিনিস দেখতে পায় এবং বুঝতে বা জানতে পারে—যা আমরা দেখতে পাই না ও জানি না। ডার্লিং! আচার্য জগদীশ বসু যেখানে শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে একালের সব উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর হাতেখড়ি। তোমার এত বেশি অবাক হওয়ার কারণ নেই। তামাশা করাও শোভা পায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র এই কলকাতারই মানুষ ছিলেন। তুমি কি তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা শোনোনি?'

এই সব শোনার পর থেকে কর্নেলের বাসায় যখনই গেছি, ওঁর লালিত-পালিত উদ্ভিদ মশাইদের প্রতি সসম্ভ্রমে দৃষ্টিপাত করেছি। এমনকী একটা ক্যাকটাসকেও বলেছি, 'হ্যাল্লো লিটলবয়! হাউ ডু ইউ ডু!'

কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ চোখ গেছে ড্রয়িং রুমের কোনায় রাখা কয়েকটা টবের গাছের দিকে। অমনি বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, যেন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আমাকে দেখছে—

মনের ভেতর কী যেন পেঁচানো মতলব পোষা!

স্বীকার করছি, গাছপালা অর্থাৎ উদ্ভিদ সম্পর্কে বুড়ো ভদ্রলোকটি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে দিয়েছিলেন যেন। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ি থামিয়ে কোনও বিশাল গাছের দিকে তাকিয়ে থেকেছি অবাক চোখে। তারপর মনে মনে বলেছি, 'হ্যাল্লো জেন্টলম্যান! ভাল আছেন তো?' যেন মনে হত, বৃক্ষভদ্রলোক একটু করুণ হেসে বলছেন, 'খুব ভাল নয় মশাই! সি এম ডি এর হালচাল দেখে বড় তটস্থ আছি। কিছু বলা যায় না।'

ঠিক এমনি করে চৌরঙ্গীতে টাটা বিল্ডিংয়ের সামনে একটা সুন্দর নাদুসনুদুস গড়নের বৃক্ষভদ্রলোক আমাকে ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন, 'দিনকাল ভাল না। আজ আছি, কাল নেই অবস্থা।'

'সে কী! কেন বলুন তো?'

'ওরা আসছে। পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হাতে হাতে কুড়ুল। পেছনে পেল্লায় আর্থ এক্সক্যাভেটার গাড়ি!'

'কারা? কারা?'

'আবার কারা? পাতাল রেলের লোকেরা। আপনাদের মানুষ জাতটার ঠেলায় আমরা মশাই চিরকাল অস্থির। কোণঠাসা করতে করতে আমাদের শেষ করে ফেললেন প্রায়। বুঝবেন শেষে ঠ্যালাটা—যখন দেশটা মরুভূমি হয়ে যাবে।'

সেই রবিবার কর্নেলের ঘরে জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর এই সব কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদরহস্য আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো'—কথা বলা বন তা হলে সত্যি আছে পৃথিবীতে?

তা হলে সেখানে যেতে এতদিন বাধা কী ছিল বিজ্ঞানীদের? দ্বীপটা যখন সবাই চেনে তখন যায়নি কেন কেউ? আমার এসব প্রশ্ন শুনে ব্যুগেনভিলি বলেছিলেন, 'সমস্যা হল দ্বীপটা ঠিক কোথায় কেউ জানে না। কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ বলা হয় বটে, কিন্তু যতবারই ওখানে অভিযাত্রীদল গেছে, দুই দ্বীপপুঞ্জে তেমন কোনও অদ্ভুত দ্বীপ দেখতে পায়নি।'

'কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন!'

'হ্যাঁ। কিন্তু সে তো ভাসতে-ভাসতে দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলাম। উদ্ধার পাওয়ার পর জাহাজ নিয়ে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে সেটাকে আর আবিষ্কার করতে পারিনি। এটাই আসল রহস্য।'

'তা হলে কোকোস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বলা হয় কেন?'

'ওখানকার আদিম অধিবাসীরা দাবি করে, কিওটা তাদেরই প্রতিবেশী। প্রাচীন যুগে তাদের রাজার রাজধানী ছিল ওই দ্বীপে। কিন্তু মুশকিল হল, ৮০° দ্রাঘিমাংশ এবং ২০° অক্ষাংশে ছোটবড় দ্বীপের সংখ্যা প্রায় এক হাজারেরও বেশি। বারো হাজার বর্গমাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে তারা। মাত্র দুটো দ্বীপে বসতি আছে—বাকিগুলো জনহীন। কারণ সব দ্বীপই মানুষের বসবাসের অযোগ্য। অস্বাস্থ্যকর এবং মারাত্মক পোকামাকড়ের ডিপো। সে সব দ্বীপে যে যাবে, সাংঘাতিক ভাইরাসে সে সংক্রামিত হয়ে জটিল অসুখে মারা যাবে।'

'আপনি কি কর্নেলকে নিয়ে কিওটা দ্বীপ খুঁজতে বেরুনোর উদ্দেশ্যেই এসেছেন?'

জয়ঢাক সায়েব হাসির মাঝে ঘর কাঁপিয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আর কী? কর্নেল সরকার আমার পুরনো বন্ধু! 'উদ্ভিদের গোপন কথা' নামে ওঁর একটা প্রবন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছি কলকাতায়।'

কাত্তি ! কাত্তি!

এপ্রিলের এক ঝরঝরে বৃষ্টিধোয়া বিকেলে কোকোসের ৭২নং দ্বীপ রুবি আইল্যান্ডে পৌঁছে মনে হচ্ছিল একি স্বর্গে এলাম? এ দ্বীপ যেন প্রকৃতি নিজের হাতে যত্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। কত ফুল কত পাখি কত প্রজাপতি!

কর্নেলের আবার প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটির বাতিক আছে। কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে লক্ষ্য করলাম, উনি জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে ব্যস্ত। 'সামোয়া' এই দোতলা হোটেলের নাম। দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। অদূরে সাদা বালিতে ঢাকা বেলাভূমি। ভারত মহাসাগরের ব্যাকওয়াটার এখানে বেশ শান্ত ও ভদ্র। কারণ মাইলখানেক দূরে দ্বীপটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোরাল রিফ বা প্রবাল-পাঁচিল। পাঁচিলে জায়গায় জায়গায় ভাঙন আছে। সেই ভাঙন দিয়ে সমুদ্রের জল গর্জন করতে করতে ব্যাকওয়াটারে ঢোকামাত্র শান্ত হয়ে যাচ্ছে।

দীর্ঘ জার্নিতে আমি ক্লান্ত। কলকাতা থেকে বিমানে জাকার্তা। জাকার্তা থেকে সামরিক বাহিনীর ছোট্ট একটা বিমানে এই রুবি দ্বীপে পৌঁছেছি। সরকার কিওটা-রহস্য নিয়ে বরাবর মাথা ঘামান। তাই সবরকম সাহায্য তাঁদের কাছে পাওয়া যাবে।

কফি এবং একজাতীয় সামুদ্রিক মাছের কেক খাওয়ার পর কর্নেল জয়ঢাক সায়েবকে নিয়ে কোথায় যেন বেরুলেন। বলে গেলেন, ঘন্টা দুই পরে ফিরব। তুমি ইচ্ছে করলে বিচে ঘোরাঘুরি করতে পারো—কোনও ভয় নেই। রুবি খুব নিরাপদ জায়গা।'

আমার আঁতে লাগল। আমি বুঝি ভীতু মানুষ? ওঁরা সরকারি স্টেশনওয়াগন গাড়িতে রওনা হয়ে গেলে আমিও বেরিয়ে পড়লাম। উঁচু-নিচু সুন্দর পাহাড়ি রাস্তায় ওঁদের গাড়িটা গাছপালার আড়ালে চলে গেল। একানড়ের মতো নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বিচে মানুষজন খুবই কম। নারকেল বীথির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর দেখি, একটা বোর্ডে কয়েকটি ভাষায় লেখা আছে, 'সাবধান! সামনে বিপদ। আর এগোবেন না।'

আমি তো হকচকিয়ে গেছি। বিপদ! কিসের বিপদ? হঠাৎ আমার কয়েক ইঞ্চি তফাতে গদাম করে একটা নারকেল পড়ল। ওমনি বিপদটা টের পেয়ে গেলাম। ওই প্রকাণ্ড ঝুনো নারকেল আমার মাথায় পড়লে এখনই অক্কা পেতে হত!

রাগ হল। কর্নেল যে বলে গেলেন, খুব নিরাপদ জায়গা! নারকেল গাছগুলো থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে বিচে বসে পড়লাম। সামনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূরের প্রবাল-পাঁচিলটা ঝলমল করছে। আদিবাসীদের নৌকা কালো হয়ে ভেসে আছে কোথাও। ওরা হয়তো বেলা শেষে মাছ ধরতে বেরিয়েছে!

পায়ের শব্দে ঘুরে দেখি, একজন বুড়োমানুষ। তোবড়ানো গাল, চিনাদের মতো মুখ বেঁটে—কিন্তু কাঠামোটি চওড়া। তার মাথায় নীল টুপি দেখেই বুঝলাম, লোকটা জাহাজি। একটু হেসে সে বলল, 'স্পিক ইংলিশ?'

কিছুক্ষণের মধ্যে আলাপ হয়ে গেল। বুড়ো একজন প্রাক্তন তিমিশিকারি। নাম রাজাকো। বাড়ি ছিল একসময় বান্দুং-এর ওদিকে একটা ছোট্ট শহরে। এখানে এখন সে স্থায়ী বাসিন্দা। বুড়ো হয়ে আর তিমিশিকারে যেতে পারে না। কাছাকাছি সমুদ্রে আজকাল তিমি মেলে না এবং শিকারেও কড়াকড়ি আছে। তিমি শিকারে যেতে হলে সুদূর দক্ষিণে আন্টার্কটিকার তুষার অঞ্চলে পাড়ি জমাতে হবে। অগত্যা সে মাছের কারবারে মন দিয়েছে।

রাজাকো বুড়োকে আমার খুব ভাল লাগছিল। আলাপী মানুষ। তিমিশিকারের মারাত্মক সব গল্প বলল। শেষে বলল, 'তুমি বুঝি বেড়াতে এসেছ এদেশে?'

বললাম, হ্যাঁ। কতকটা তাই তবে...'

আমাকে হঠাৎ থামতে দেখে রাজাকো বলল, 'ব্যবসা-ট্যবসা করারও ইচ্ছে আছে বুঝি? সে তো ভালই। তোমার মতো জোয়ান ছেলের কি শুধু টো টো করে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়ালে চলে?

এই দেখো না! আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত, তাকে আমি এক্ষুনি আমার মাছধরা জাহাজে চাপিয়ে দক্ষিণ সাগরে তিমি মারতে পাঠাতাম। একটা ছোটখাটো তিমি মারতে পারলেই রাজা। প্রচুর চর্বি আর হাড় বেচে একদিনেই সে ধনী হয়ে যেত।'

রাজাকোর বেশি কথা বলার বাতিক আছে। বললাম, 'না না। ব্যবসা আমার পোষাবে না। আমি এসেছি সরকারের একটা কাজে।'

রাজাকো ভড়কে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা। তুমি সরকারি লোক? তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমার বনবে না। সরকারি লোকেরা বড্ড বাজে।'

বলেই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর হনহন করে চলতে শুরু করল! অদ্ভুত বেয়াড়া লোক তো!

সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে ততক্ষণে! একটু-একটু করে শীত করছে। প্রবাল-পাঁচিল ঘিরে কুয়াশা জমে উঠেছে। নারকেল বনটার পাশ দিয়ে রাজাকো হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, ওর ভুলটা ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার।

কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। নারকেল বনের ভেতর থেকে দুটো লোক এসে রাজাকোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর দেখলাম রাজাকো পড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম মাতৃভাষায় 'এই! এই! খবর্দার!'

লোক দুটো আমাকে দেখামাত্র নারকেল গাছের ভেতর দিয়ে পালিয়ে গেল। দৌড়ে রাজাকোর কাছে গিয়ে দেখি, সে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। তাকে চিত করে দিতেই আমার সারা শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে গেল। তার পেটে ছোরা মেরেছে আততায়ীরা। রক্তে জামাপ্যান্ট ভেসে যাচ্ছে।

বিচ এখন একেবারে জনহীন। আমার সবচেয়ে আতঙ্ক হল এই ভেবে যে, এখন এ অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে আমাকেই খুনি ঠাওরাবে। পুলিশের হাঙ্গামায় পড়তে হবে। অতএব এখনই কেটে পড়া দরকার। বরং হোটেলে গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দেওয়া ভাল যে বিচে একটা রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর ওরা যা হয় করবে।

উঠে দাঁড়িয়েছি, সেই সময় রাজাকো ঘড়ঘড়ে গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কাত্তি! কাত্তি!' তারপর একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ওর শরীরটা স্থির হয়ে গেল।

কী বলল কে জানে! কাত্তি! কী? আমি আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালাম না। এমন হতে পারে, ওর দুই খুনিই এতক্ষণে খবর দিয়েছে যে একজন বিদেশি টাকা ছিনতাইয়ের লোভে রাজাকোকে খুন করেছে!

আমি পা বাড়াতেই শক্ত কিছুতে পা পড়ল। দেখি রাজাকোবুড়োর সেই নীল টুপিটা ছিটকে পড়ে রয়েছে। কিন্তু টুপিটা এত শক্ত ঠেকল কেন? হেঁট হয়ে টুপিটা তুলে নিলাম। তারপর অবাক হয়ে গেলাম। এতটুকু একটা চুপির ওজন এত। নিশ্চয় এর ভেতর কোনও ভারী ধাতব জিনিস আছে।

টুপিটা সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। তারপর অনেকটা ঘুরে বিচ এলাকা পেরিয়ে হোটেলে পৌঁছলাম। রিসেপশনের ইন্দোনেশীয় মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'কেমন লাগল আমাদের মিস রুবিকে?'

সে এই রুবি দ্বীপের প্রশংসা শুনতে চাইছিল। কিন্তু এ অবস্থায় হাসিতামাশা করা অসম্ভব। বললাম, 'দেখুন, এইমাত্র বিচ থেকে আসছি। বিচে একটা লোক পড়ে আছে দেখলাম। ডাকলাম সাড়া দিল না। অন্ধকারে কিছু বোঝা গেল না। মনে হল...'

'নিশ্চয় কোনও মাতাল ট্যুরিস্ট।'

'তবু একটু খোঁজ নেওয়া দরকার নয় কি?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, আপনি ভাববেন না মিস্টার! বিচে এমন মাতাল পড়ে থাকা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমাদের গা সওয়া। লোকটা যদি ট্যুরিস্ট না হয় তা হলে নিশ্চয় কোনও নাবিক। নাবিক যদি হয়, তা হলে আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে ওর নেশা কাটবে না। ওকে ওঠানোও যাবে না।'

আমার বিবেকে বাধছিল। বললাম, 'বরং পুলিশে খবর দিন না মিস...'

'আমার নাম তোতিলাবতী ত্রিসত্যজায়া।'

'এ যে ভারতীয় নাম!'

'ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে আপনাদের সংস্কৃত ভাষার ছড়াছড়ি মিস্টার।...'

'আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি।'

'মিঃ চৌড্রি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অদ্ভুত ব্যাপার তো! তোতিলাবতী ধরেই নিয়েছে আমি একটা বেহুঁশ মাতালকে দেখেছি। অগত্যা আর না বলে পারলাম না। 'মিস তোতিলাবতী...'

'আমায় তোতি বলে ডাকলে খুশি হব।'

'মিস তোতি! লোকটার গায়ে রক্ত আছে মনে হল। ওকে কেউ ছুরি মেরেছে!'

তোতি এবার চোখ বন্ধ করে বলল, 'তাই বুঝি! তা হলে তো আগে কাউকে দেখতে পাঠাতে হয় ; তা না হলে পুলিশে খবর দিয়ে ঝামেলা হবে।' বলে সে হোটেলের একজন লোককে ডেকে নিজের ভাষায় কিছু বলল। লোকটা আর একজনকে ডেকে নিয়ে টর্চ হাতে বেরিয়ে গেল।

ওপরে আমাদের ঘরে এসে টুপিটা বের করলাম। তারপর একটা ব্লেড দিয়ে চিরতেই বেরিয়ে পড়ল একটুকরো স্যাঁতলাধরা তামার ফলক। ফলকটা চাপরাসের মতো গোলাকার! তার ওপর আঁকাবাঁকা আঁচড় কেটে দুর্বোধ্য অক্ষরে কী সব লেখা রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে আকৃষ্ট করল ফলকের ঠিক মাঝখানে একটা অদ্ভুত গড়নের গাছ। গাছটার ডালে-ডালে ইংরেজিতে এ বি সি ডি এইসব অক্ষর আঁকা।

মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। কতক্ষণ পরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। তারপর কর্নেল ও ব্যুগেনভিলি ফিরলেন। ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, 'বিচে একটা রক্তাক্ত লাশ পেয়েছে পুলিশ। জয়ন্তকে আমি বলেছিলাম দ্বীপটা নিরাপদ। কথাটা খাটল না দেখছি।' বলেই কর্নেলের চোখ পড়ল আমার হাতের ফলকটার দিকে। শ্বাসরুদ্ধ গলায় বললেন, 'এ তো দেখছি কাত্তি। কাত্তি তুমি কোথায় পেলে জয়ন্ত?'

ব্যুগেনভিলি লাফিয়ে উঠলেন। 'কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা কাত্তি!'

রাজাকোর মেয়ে রোমিলা

কর্নেলের এই স্বভাব বরাবর দেখে আসছি। একসময় ঝানু শখের গোয়েন্দা হিসেবে নামডাক ছিল। খুনি আর অপরাধীর পেছন পেছন ছুটতে পেলে আর কোনওদিকে ফিরে তাকাতেন না। পরিচিত মহলে ওঁকে জনান্তিকে বলা হত 'বুড়ো ঘুঘু।' ইদানীংকালে পোকামাকড়-গাছপালা অর্থাৎ প্রকৃতিচর্চায় মেতে থাকলেও গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজি নন।

রাজাকো-হত্যার রহস্য নিয়ে যে মেতে উঠবেন, জানাই ছিল। আমার কাছে ঘটনাটা জেনে নিয়ে সেই যে বেরিয়ে গেলেন, রাত দশটা বাজতে চলল—ফেরার নাম নেই। বৃষ্টিটা হঠাৎ এসে হঠাৎ চলে গেছে। এ তল্লাটের আবহাওয়াই এরকম।

জর্জ ব্যুগেনভিলির সঙ্গে কথা বলছিলাম। তার কাছে জানা গেল, 'কাত্তি' কথাটার মানে ফলক। পর্তুগিজ ভাষার শব্দ এটা। কিন্তু কাত্তি কথাটার মানে ফলক বোঝায় না। এর পেছনে আছে একটা খুব পুরনো রোমাঞ্চকর ইতিহাস। প্রাচীন যুগে যে-সব পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা একশোটা বাণিজ্য জাহাজ লুঠের গৌরব অর্জন করত, তারা এই তামার গোলাকার ফলকে নিজের নাম লিখে ঝুলিয়ে রাখত। কিন্তু তার রোমাঞ্চকর অংশটা হল এই :

দস্যুনেতা লুণ্ঠিত ধনরত্নের যে মোটা ভাগ পেত, তা গোপনে কোথাও লুকিয়ে রাখত। সেই গুপ্তধনের সন্ধান সাংকেতিক চিহ্নে খোদাই করে রাখত ফলকে। মৃত্যুর সময় সে ফলকটা দলের পরবর্তী নেতার হাতে তুলে দিত। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নের অর্থ ফাঁস করত না। তার মানে তুমি যখন নতুন নেতা হচ্ছ, তখন তুমিই ওর অর্থ উদ্ধার করে গুপ্তধনের মালিক হও।

জলদস্যুদের অনেকরকম কুসংস্কার ছিল। ফলকটাকে তারা খুব পবিত্র মনে করত। একশোটি জাহাজ যে লুঠ করতে পারেনি, তার সাহস হত না ওটা গলায় পরতে। তাদের বিশ্বাস ছিল, অনধিকারী ওই পবিত্র ফলক পরলে তার সর্বনাশ হবে।

দেখা যাচ্ছে, রাজাকোবুড়ো কোথাও এই রহস্যময় ফলক পেয়ে গিয়েছিল। তাকে খুন করার পিছনে ফলকঘটিত কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না কে জানে। এর মধ্যে নাকি সতেরো শতকের দুর্ধর্ষ এক পর্তুগিজ জলদস্যুনেতা আর্ভেলার নাম রয়েছে। ব্যুগেনভিলি পর্তুগিজ ভাষা জানেন। কিন্তু সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারেননি।

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইন এই কোকোস দ্বীপপুঞ্জের উৎপত্তি সম্পর্কে ভারি অদ্ভুত কথা লিখে গেছেন। এটা নাকি লক্ষ বছর আগে ছিল আগ্নেয়গিরি। কালক্রমে জলের তলায় বসে যায়। তারপর অসংখ্য ক্রেটার বা জ্বালামুখ ঘিরে জলের তলায় জমতে থাকে প্রবালকীট। মরা প্রবালকীট আরও লক্ষ বছরে গড়ে তোলে এই সব দ্বীপ। এগুলো আসলে প্রবালদ্বীপ। যাই হোক, এখন সমস্যা হল আদিবাসীদের কিংবদন্তিখ্যাত সেই কিওটা দ্বীপটা কোথায়? হাজারটা ছোট-বড় দ্বীপের সবই কোনও না কোনও সময় অভিযাত্রীরা খুঁজে হন্যে হয়েছেন। শেষে আমিও দৈবাৎ তার সন্ধান পেয়ে হারিয়ে ফেললাম। এই ফলকটা পেয়ে এখন মনে হচ্ছে, তা হলে রাজাকো কি ওটার খোঁজ রাখত?

ব্যুগেনভিলি তুম্বো মুখে পাইপ ধরালেন। আমার মনটা বেজায় খারাপ। কী চমৎকার একজন আলাপী মানুষের সঙ্গে চেনাজানা হল এবং নিজের বুদ্ধির দোষেই হয়তো তাকে এভাবে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেললাম। যদি আমার সঙ্গেই সে থাকত, তা হলে তাকে আততায়ীরা আক্রমণের সাহসই পেত না। তা ছাড়া পকেটে আমার গুলিভরা রিভলভারও ছিল।

ব্যুগেনভিলি পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'কাত্তিটার মাঝখানে একটা গাছ আঁকা আছে। কিওটা দ্বীপে অবিকল এইরকম গাছের জঙ্গল দেখেছিলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই গাছগুলোই কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল?'

'না, না! আমি কি কখনও বলেছি যে আমার সঙ্গে কিওটা দ্বীপের গাছপালার কোনও কথাবার্তা হয়েছে? আসলে আমি তখন একনাগাড়ে জলের ঝাপটা খেয়ে ভীষণ ক্লান্ত। গাছগুলো কথা বললেও জবাব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। গলার স্বর ভেঙে গিয়েছিল। সে এক সাংঘাতিক অবস্থা।

'তা হলে কি করে বুঝেছিলেন যে সেটাই কিওটা দ্বীপ?' জর্জ ব্যুগেনভিলি একটু হাসলেন। 'সাতরাত্রি দ্বীপে ছিলাম। বেলাভূমির ওপরে একটা পাহাড়ি গুহায় ছিল আমার ডেরা। অনেক রাত্রে হঠাৎ কানে আসত আশেপাশের জঙ্গলে অদ্ভুত সব শনশন শব্দ হচ্ছে। প্রথমে ভাবতাম ঝড়। পরে টের পেলাম, ঝড় নয়—যেন গাছপালা থেকে বাতাসের গলায় কারা কথা বলছে। গিয়ে পরীক্ষা করার সাহস হত না।'

'আপনার কানের ভুলও তো হতে পারে।'

'ভুল নয়। কেন তা বলি শুনুন।' নিভে যাওয়া পাইপ আবার লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে ব্যুগেনভিলি বললেন, 'কিওটাও এমনি প্রবালপাঁচিলে ঘেরা। তা ছাড়া ওটার মাঝখানে একটা ছোট্ট লেক আছে। লেকটা কিন্তু মিঠে জলের। একদিন ব্রেডফুড বা পিঠে-ফল খেয়েছিলাম পেট ভরে। অনেক রাতে জলতেষ্টা পেল প্রচণ্ড। তখন লেকে জল খেতে গেলাম। জল খেয়ে অন্ধকারে ফিরে আসছি, হঠাৎ কেউ কোত্থেকে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'অ্যানজেলো! অ্যানজেলো!' আমি হকচকিয়ে গেলাম। তারপর শুনি একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর! অ্যানজেলো! অ্যানজেলো! অ্যানজেলো!'

'তারপর?'

'সাড়া দিয়ে বললাম, কে তোমরা? অ্যানজেলো বলে কাকে ডাকছ? আমার নাম জর্জ ব্যুগেনভিলি! বেশ চেঁচিয়ে কথাটা বলেছিলাম। অমনি সব চুপ করে গেল, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। এ নিশ্চয় ভূতপ্রেতের কাণ্ড! এই অভিশপ্ত দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে। সারা রাত আর ঘুম হল না। পরদিন দ্বীপের প্রায় সবটাই খুঁজলাম যদি কেউ আমার সঙ্গে রসিকতা করে থাকে। কিন্তু কোথাও কোনও জনপ্রাণীটি নেই। পাখি বলতে হাঁস আর সারসজাতীয় পাখি আছে। কিন্তু তারা রাত্রিবেলা অমন শব্দ করবে কেন? করলে তো দিনেও করবে—তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন।'

ব্যুগেনভিলি একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'প্রবালপাঁচিলে ঘিরে থাকায় সমুদ্রে কোনও জাহাজ গেলেও দেখতে পেতাম না। ধরে নিয়েছিলাম ওখানেই রবিসন ক্রুশোর মতো নির্বাসিত জীবন কাটাতে হবে। লাইফবোটটা ফেঁসে গিয়েছিল। একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একখানে একটা মরচেধরা কুড়ুল কুড়িয়ে পেলাম। এসব কুড়ুলকে বলে, সেলার্স এক্স। এগুলি নিরাপত্তার জন্য সব জাহাজে থাকে। জাহাজডুবির সময় দৈবাৎ কোনও কামরায় কেউ আটকে পড়লে দরজা বা দেওয়াল কেটে তাকে বের করতে এই কুড়ুল কাজে লাগে। কুড়ুলটা পেয়ে বুঝলাম দ্বীপে কোনও নাবিক আশ্রয় নিয়েছিল কোনওকালে। যাই হোক, কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ভেলা তৈরি করে পাড়ি দিয়েছিলাম।'

'কিওটার গাছপালার যদি মানুষের মতো চেতনা থাকে, তাহলে কুড়ুল হাতে দেখামাত্র আপত্তি করা উচিত ছিল।'

আমার মন্তব্য শুনে ব্যুগেনভিলি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'তা করেনি। কিন্তু একটা ব্যাপার সত্যি ঘটেছিল। গাছের গায়ে কোপ দেওয়ামাত্র প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল। কিন্তু আমি তো তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। একটা গাছ কুড়ুলের ঘায়ে ধরাশায়ী হওয়ার পর ঝড়টা থেমে গিয়েছিল। তারপর জানেন? যতক্ষণ ধরে ভেলা তৈরি করলাম, মনে হচ্ছিল—সারা বন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে এবং যেন মাঝেমাঝে শোকসঙ্গীত গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝি পোকাদের ডাকও হতে পারে। একজন মরিয়া মানুষের পক্ষে ও ব্যাপারে কোনও কৌতূহল থাকে কি?'

আমরা কথা বলতে বলতে কর্নেল ফিরে এলেন। রেনকোট খুলে রেখে বললেন, 'এখানকার পুলিশের কাজকর্ম ভারি অদ্ভুত! বলে কী এরকম হয়েই থাকে জুয়াড়িদের মধ্যে। রাজাকো লোকটা ছিল পাকা জুয়াড়ি। তা ছাড়া এ বৃষ্টির মধ্যে খুনির খোঁজে বেরিয়ে পড়তে তারা রাজি নয়। সকালে দেখা যাবে।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'এতক্ষণ কি থানায় বসেছিলেন আপনি?'

'মোটেই না। ড্রাইভারকে বললাম, চলো তো বাছা, আবার একবার ডক্টর বিকর্ণের বাড়ি।'

নাম শুনে বললাম, 'ভারতীয় নাম মনে হচ্ছে। এখানে তা হলে ভারতের লোকও বাস করে?'

'মোটেই না। উনি ইন্দোনেশীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। তবে তুমি ঠিকই ধরেছ। নামটা সংস্কৃত ভাষায়। ইন্দোনেশীর উচ্চারণে বিয়েকার্নো। প্রাচীনযুগে হিন্দু-সংস্কৃতি সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে প্রভুত্ব করত। একথা তোমার জানা উচিত ছিল, জয়ন্ত।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'ডঃ বিকর্ণের বক্তব্য কী?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'রাজাকোকে উনি চেনেন। কাত্তির কথা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক্ষুনি আসতে চান আমার সঙ্গে। বললাম, 'এই বৃষ্টির মধ্যে কষ্ট করা কেন। সকালে আমরা কাত্তি নিয়ে আপনার কাছে আসছি।'

রাতের খাবার টেবিলে ঢাকা দেওয়া ছিল। তিনজনে খেতে বসলাম। প্রকাণ্ড সামুদ্রিক চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে কর্নেল বললেন, 'বলো তো জয়ন্ত, ভেতরের এই সাদা জিনিসটা কী?'

একটু খেয়ে দেখে বললাম, 'নারকেলের দেশ। ভেতরে নারকেলের পুর ভরে দিয়েছে।'

'হল না ডার্লিং। এগুলো চিংড়িরই মাংস!'

'বাজি রাখছি। এ হচ্ছে খাঁটি নারকেল শাঁস।'

কর্নেল হাসতে লাগলেন। ব্যুগেনভিলি বললেন, 'বিচের ধারে গাছ থেকে নারকেল পড়ে অনেক সময় ভেঙে যায়। জোয়ারে সমুদ্র সেগুলো টেনে নেয়। তখন চিংড়িগুলো নারকেল শাঁস খেয়ে ফেলে। তাই এসব চিংড়ির মাংসে নারকেলের স্বাদ।'

সেই অপূর্ব চিংড়ি-নারকেলের স্বাদের তুলনা নেই। তারিয়ে তারিয়ে খেতে দেখে কর্নেল মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, 'শোওয়ার সময় কিন্তু হজমি ট্যাবলেট খাওয়া দরকার'...

উপদেশ কানে না নেওয়ার ফলটা এ রাতে ভালই ভুগতে হল। শেষ রাতে ব্যুগেনভিলি একটা জব্বর ফরাসি ট্যাবলেট না খাওয়ালে কী ঘটত বলা কঠিন। সকালে যখন ওঁরা দু'জনে ডঃ বিকর্নের বাড়ি গেলেন, তখন আমি শয্যাশায়ী। মন খারাপ হয়ে গেল। ন'টা নাগাদ উঠে দেখি, শরীর একেবারে ঘায়েল। এমন সময় নিচে থেকে মিস তোতি ফোন করে জানাল, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুব অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, 'পাঠিয়ে দিন।'

একটু পরে বছর কুড়ি-বাইশের টুকটুকে ফর্সা একটি মেয়ে এসে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করে বলল, 'আমি রোমিলা। মিঃ রাজাকোর মেয়ে।'...

রাজাকোর ঘরে হানা

রোমিলার পোশাকও একেবারে ভারতীয় মেয়েদের মতো। শাড়ি ও ব্লাউজপরা। শুধু খোঁপাটা মাথার মাঝখানে চুড়ো করে বসানো প্রাচীন যুগের মুনিকন্যাদের মতো। গলায় সেইরকম রুদ্রাক্ষের মালা।

আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে ইংরাজিতে সে বলল, 'আপনি নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। আমার হতভাগ্য বাবার নাম রাজাকো বার্দান, কাল যাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে আপনারই সামনে!'

দুঃখিতভাবে বললাম, 'কথাটা ঠিকই মিস রোমিলা! কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। দু'জনের মধ্যে তখন প্রায় অড়াইশো গজ দূরত্ব। তা ছাড়া সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। আমি দৌড়ে যেতে যেতে খুনিরা পালিয়ে যায়।'

রোমিলা বলল, 'না মিঃ চৌড্রি! আমি কোনও অভিযোগ নিয়ে আপনার কাছে আসিনি। এ সামোয়া হোটেলের রিসেপশনিস্ট তোতিলাবতী আমার বন্ধু। তার কাছেই আপনার কথা কাল রাতে শুনেছি। তোতিও খুব পস্তাচ্ছে। সে প্রথমে নাকি আপনার কথায় গুরুত্ব দেয়নি। আসলে বাবার খুবই বদনাম ছিল এখানে।'

'আগে আপনি বসুন প্লিজ।'

রোমিলা বসে বলল, 'আপনার সঙ্গী ভদ্রলোকেরা নিশ্চয় ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গেছেন?

'আপনি কীভাবে জানলেন?'

রোমিলা একটু হাসল। 'ডঃ বিকর্ণ যখন জাকার্তার বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমি তাঁর ছাত্রী ছিলাম। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সত্যি বলতে কী, আমারই তাগিদে উনি কোকোসে এসে স্থায়ীভাবে বাড়ি করে বাস করছেন। ওঁকে বলেছিলাম, আমাদের এসব দ্বীপে উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার প্রচুর সুযোগ আছে। আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি।'

খুব আগ্রহ জাগল রোমিলা সম্পর্কে। বললাম, 'আপনি এখন কী করেন?'

রোমিলা বলল, 'আমার দুর্ভাগ্য মিঃ চৌড্রি! জাকার্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মা মারা যান। বাবা অসহায় হয়ে পড়েন। তাই বাধ্য হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে ফিরে আসি এখানে। বাবার একমাত্র সন্তান আমি। ওঁর মাছের কারবার দেখাশোনা করছি এই একটা বছর। এর মধ্যে ডঃ বিকর্ণ রিটায়ার করে চলে আসেন আমার কথামতো। কিন্তু আমি ওঁর কোনও কাজে লাগবার সময়ই আর পাইনি। বাবা উড়নচণ্ডী মানুষ। খালি টো টো করে ঘুরে বেড়াতেন। তাই আমাকে সব দেখাশুনো করতে হয়েছে।'

রোমিলার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এবং আচরণ খুব নম্র। বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল রোমিলা! বিশ্বাস করুন, আপনার বাবার ব্যাপারটাতে...'

কথা কেড়ে রোমিলা বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু কীভাবে বাবাকে ওরা খুন করল, আপনার মুখ থেকে জানার জন্যেই এসেছি মিঃ চৌড্রি। রুবি দ্বীপের পুলিশ মাথা ঘামাবে না জানি। বিশেষ করে আমার বাবার জুয়াড়ি মাতাল বলে ভীষণ বদনাম ছিল। আপনি কি দয়া করে কী ঘটেছিল বলবেন?'

পুরো ঘটনা সবিস্তারে বললাম। শোনার পর রোমিলা চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুঁ—কাত্তি শব্দটা বাবার মুখে শুনেছি। ঘুমের ঘোরে উচ্চারণ করতেন। পরে জিজ্ঞেস করলে বলতেন ও কিছু না। তা হলে দেখছি, মৃত্যুর মুহূর্তে বাবা কাত্তি শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন! আচ্ছা মিঃ চৌড্রি, কাত্তি জিনিসটা কী?'

ওকে বলিনি যে, রাজাকোর টুপি আমি কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং টুপির ভেতরে সত্যি কাত্তি পেয়েছি। বললাম, 'শুনেছি কাত্তি হল প্রাচীন পর্তুগিজ জলদস্যুনেতার তামার পদক। ফলকও বলতে পারেন। যে দস্যুনেতা একশো জাহাজ লুঠ করতে পারত, সে ওই পদক গলায় ঝুলিয়ে রাখত।'

রোমিলার জন্যে ফোনে নিচের ক্যান্টিনে কফির অর্ডার দিলাম। রোমিলা অন্যমনস্ক রইল কিছুক্ষণ তারপর ফের চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা মারা গেছেন। তাই আপনাকে জানাতে বাধা নেই। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছি, বাবা জলদস্যুদের দলে ছিলেন একসময়।'

উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, 'তাই বুঝি? আমাকে বলছিলেন, তিমিশিকার করে বেড়াতেন আন্টার্কটিকায়।'

'সে অনেক পরে।' রোমিলা হঠাৎ আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'মিঃ চৌড্রি কি বলবেন আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য নিছক বেড়ানো—নাকি অন্য কিছু?'

'কেন এ প্রশ্ন?'

'আপনার সঙ্গীরা কাল বিকেলে ডঃ বিকর্ণের বাড়ি গিয়েছিলেন মিলিটারি গাড়িতে। সকালেও ফের গেলেন দেখলাম। তাই সন্দেহ জাগছে।'

'কিসের সন্দেহ?'

'আমাদের সরকার ডঃ বিকর্ণকে বহুদিন আগে কিওটা নামে এক ভূতুড়ে দ্বীপের স্পিকিং উডস অর্থাৎ কথা বলা বনের রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন। ডঃ বিকর্ণ নিজেই আমাকে বলেছেন একথা। উনি সরকারি অর্থসাহায্যে এ নিয়ে রিসার্চ করছেন। আমাকে ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়ার কথা

দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম কথা, আমার যোগ্যতা কম। দ্বিতীয় কথা, বাবার মাছের কারবার নিয়ে আমি ভীষণ জড়িয়ে আছি।'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'আপনি বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে রোমিলা। আপনাকে বলতে দ্বিধার কারণ দেখি না, আমরা এসেছি কিওটা দ্বীপের খোঁজে।'

রোমিলা ম্লান হাসল। 'কিওটা রূপকথা বা নিছক কিংবদন্তি হতেও তো পারে। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি এই ভূতুড়ে দ্বীপের কথা। এখানকার আদিবাসীদের লোককথায় কিওট্য দ্বীপের গল্প আছে। ওরা তা বিশ্বাসও করে। দু'দিন পরে শুক্লপক্ষ আসছে। চাঁদ দেখা গেলেই ওরা ফুলের পোশাক পরে বন-দেবতার পূজায় মেতে উঠবে। নিছক ধর্মীয় সংস্কার মিঃ চৌড্রি!'

'কিন্তু আপনাদের সরকার তা হলে কেন ডঃ বিকর্ণকে কিওটার রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব দিয়েছেন—যদি এর মধ্যে কোনও সত্য নাই থাকবে?'

'সত্যটুকু কী, বলি শুনুন। বছর দুই আগে একদল জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল! তারা যখন ফিরে এল, তখন দেখা গেল, তারা এক অদ্ভুত রোগে ভুগছে। গায়ের চামড়ার জায়গায় জায়গায় সবুজ অ্যালার্জির মতো চিহ্ন। অবিকল গাছের পাতা আঁকা যেন। হাসপাতালে তাদের ভর্তি করা হল। কিন্তু একে একে সবাই মারা পড়ল। মৃত্যুর পর দেখা গেল প্রত্যেকটি লাশ ঘন সবুজ হয়ে গেছে। সেই থেকে আমাদের সরকার ব্যাপারটা নিয়ে উদ্বিগ্ন।'

'আশ্চর্য! আঠারো শতকে টমাস কুকের জাহাজি লগবুকে সবুজ অ্যালার্জির কথা আছে।'

পরিচারক ট্রেতে কফি রেখে গেল। দু'জনে কফি খেতে থাকলাম। তারপর রোমিলা বলল, বাবা ওদের দেখতে গিয়েছিলেন। বাবার কাছে শুনেছি, কখনও-কখনও এ অঞ্চলে জেলেদের এই অদ্ভুত অসুখ হয়। কেউ বাঁচে না। বাবাও খুব কুসংস্কারগ্রস্ত মানুষ ছিলেন। বলতেন ওরা নিশ্চয় কিওটা দ্বীপে গিয়ে পড়েছিল।'

'তা হলে আপনার বাবাও বিশ্বাস করতেন একথা?'

'বাবার কথা ছেড়ে দিন। নিরলস মানুষ ছিলেন। চিরজীবন সমুদ্রচর। সমুদ্রে যারা ঘোরে, তারা অসংখ্য আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করে।'

'আচ্ছা রোমিলা, আপনার বাবা কি কখনও কিওটা দ্বীপ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন?

'হ্যাঁ। বললাম তো, বাবা ছিলেন বেয়াড়া আর বাতিকগ্রস্ত মানুষ। একবার আমাদের জেলেরা মাছ ধরে আনল ট্রলারে। বাবা সেবার সঙ্গে যাননি। হঠাৎ দেখা গেল, একটা মাছের রং সবুজ। বাবার অমনি বাতিক চাড়া দিল। বেরিয়ে পড়লেন ট্রলার নিয়ে সেই এলাকায়। ক'দিন পরে হন্যে হয়ে ফিরে এলেন। সেই সবুজ মাছটা আমি ডঃ বিকর্ণকে দিয়ে এসেছিলাম। ওটা এখনও ওঁর জারে জিয়ানো আছে।'

রোমিলার সঙ্গে গল্প করতে করতে দশটা বেজে গেল। রোমিলাকে বিদায় দিতে দরজার বাইরে গেছি, হঠাৎ সে বলল, 'সময় থাকলে আসুন না আমার ওখানে। না-না। মাছের আড়তে যেতে বলছি না আপনাকে।' সে একটু হাসল। 'আড়তে মাছের গন্ধে টিকতে পারবেন না এক মুহূর্ত। আমার বাড়িতে আসুন। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে!'

'কোনও আপত্তি নেই।' বলে তাকে নিচে রিসেপশনে অপেক্ষা করতে বলে ঝটপট সেজে নিলাম। পকেটে রিভলভার নিতে ভুললাম না।

রোমিলা হাল্কা নীল রঙের একটা টুসিটার ছোট্ট মোটরগাড়ি এনেছিল। হোটেল এলাকা ছাড়িয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা দিয়ে এগোল গাড়িটা। যেদিকে তাকাই, রংবেরঙের ফুল! বড় বড় ব্রেডফুডের গাছে তরমুজের মতো ফল ঝুলছে। পামগাছে বাহারি অর্কিডের ঝালর। সমুদ্র ডাইনে রেখে অনেক সবুজ টিলার গা ঘেঁষে এবং চড়াইউতরাই ভেঙে রোমিলাদের বাড়ি পৌঁছলাম। বাড়ি একটা টিলার মাথায়। রাজাকো যে পয়সাওলা লোক ছিল, বোঝা যাচ্ছিল এবার। বাড়িটা ছোট

হলেও বড় সুন্দর। ফলবাগান আর বিচিত্র সব গাছপালার ভেতর ছবির মতো রঙিন বাড়িটা দেখে মনে হল, এর পেছনে যেন শিল্পীর স্বপ্ন রয়ে গেছে। কে সেই শিল্পী—রাজাকো, না তার মেয়ে?

গেটের কাছে গিয়েই রোমিলা বলে উঠল, 'বাড়িতে অতিথি এসেছেন মনে হচ্ছে!'

দেখি, সেই মিলিটারি স্টেশনওয়াগনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে লনের পাশে। ড্রইং রুমে ঢুকে রোমিলা বলল, 'কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! আমার ঘরে এত সব গণ্যমান্য অতিথি। আর আমি কি না বাইরে কাটাচ্ছিলাম!'

কর্নেল, ব্যুগেনভিলি এবং একজন অতিবৃদ্ধ ভদ্রলোক কফির পেয়ালা হাতে বসে রয়েছেন। রোমিলা বলল, 'মিঃ চৌধ্রি, ইনিই আমার প্রফেসর ডঃ বিকর্ণ, আর এঁরা নিশ্চয় আপনার সঙ্গী!'

ডঃ বিকর্ণ কর্নেল ও ব্যুগেনভিলির পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরস্পর আনুষ্ঠানিক পরিচয়পর্ব শেষ হলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, রোমি! এঁদের তোমার কাছে নিয়ে এলাম একটা জরুরি দরকারে। তা ছাড়া তোমার বাবার শেষকৃত্যে পৌঁছতে পারিনি—একটা কৈফিয়ত দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল।'

রোমিলা মৃদু স্বরে বলল, 'আপনাকে আসতে তো নিষেধ করেছিলাম রাত্রে!'

বললাম, 'শেষকৃত্য কি রাতেই হয়ে গেছে?'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'হ্যাঁ। একানকার পুলিশের ব্যাপার এরকম। মর্গে পর্যন্ত নেয়নি বডি।'

'সে কী!'

কর্নেল বললেন, 'যস্মিন দেশে যদাচার। তো জয়ন্ত, তোমার শরীর নিশ্চয় যথেষ্ট সুস্থ?'

রোমিলা ভেতরে চলে গেল। বললাম, 'সুস্থ না হলে এলাম কী করে? মিস রোমিলা গিয়েছিলেন ওঁর বাবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে। তারপর ওঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

একটু পরে রোমিলা ব্যস্তভাবে এসে বলল, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। এইমাত্র হঠাৎ চোখে পড়ল—পেছনের একটা ছোট্ট ঘরে পুরনো আমলের কিছু জিনিসপত্র বাবা রাখতেন। সেই ঘরের দরজার সেফটি লক ভাঙা। আমার পরিচারিকা এবং অন্য কর্মচারী দু'জন আছে, তারা কেউ কিছু বলতে পারছে না। তাছাড়া বাইরে থেকে বোঝাও যায় না দরজার লক ভাঙা হয়েছে। আমার কুকুর পাঞ্চো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কপাটে আঁচড় কাটছিল। তাই সন্দেহ হল। তখন ঠেলে দেখি, খুলে গেল দরজা। কিছু হারিয়েছে কি না তাও বুঝতে পারছি না।'

ডঃ বিকর্ণ, কর্নেল এবং ব্যুগেনভিলি উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। কর্নেল বললেন, 'চলুন তো দেখি।'...

শত্রুদলের কবলে

ঘরের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। একটা ছোট্ট মেরিন মিউজিয়াম! রোমিলা সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলে মনে হল এই জাদুঘর বহুকাল খোলা হয়নি। ঘরে কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। একটা মোটা জানালা আছে। সেটা জাহাজের পোর্টহোলের মতো গোলাকার। কিন্তু আকারে বড়। মোটাসোটা লোহার গারদ আছে। সমুদ্রের মানুষের জীবনের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। জংধরা নোঙর, কাছির বান্ডিল, নাবিকদের কুঠার, হালের টুকরো, এইরকম সব জিনিস। দেয়ালে পুরনো আমলের জলদস্যুদের ব্যবহৃত বন্দুক পিস্তল তলোয়ার ছুরি আর তিমিশিকারের হারপুন হুকে আটকানো রয়েছে। আর আছে সমুদ্রপ্রাণীদের অসংখ্য স্টাফকরা নমুনা। কতরকমের শঙ্খ, ঝিনুক, কাছিম, হাঙর, বারাকুদা মাছ, তিমির দাঁত এবং আরও কত প্রাণী। সমুদ্র অঞ্চলের কিছু পাখিও স্টাফ করা হয়েছে। দেখে মনে হয় ওরা জীবিত।

কর্নেল বললেন, 'মিঃ রাজাকো দেখছি ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ চামড়াবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিলেন।'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'এই অ্যালবাট্রস পাখিটাকে দেখুন। যেন ডানা মেলে এখুনি উড়ে যাবে।'

রোমিলার কুকুর পাঞ্চো দেখতে কতকটা বেড়ালের মতো। গায়ে ঘন সাদা লোম। এমন ক্ষুদে কুকুর কস্মিন্‌কালে দেখিনি। সে হঠাৎ রোমিলার কোল থেকে নেমে হাঙরটার কাছে দৌড়ে গেল। এবার দেখলুম, হাঙরটার মুখে একটুকরো ব্যুমেরাং আকৃতির কাঠ আটকানো আছে। পাঞ্চো গিয়েই সেই বাঁকা ছোট্ট কাঠটা কামড়ে ধরে বের করল। রোমিলা বলল, 'আঃ! কী হচ্ছে পাঞ্চো? দুষ্টুমি করে না এখন।'

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। ব্যুমেরাং কাঠটা পাঞ্চোর মুখ থেকে প্রকাণ্ড পোকার মতো নড়াচড়া করতে করতে ছিটকে চলে গেল। পাঞ্চো ভয় পেয়ে রোমিলার পায়ের কাছে গুটিসুটি বসে পড়ল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে কাঠটা তুলেছেন, আবার ওটা কিলবিল করে নড়ে ছিটকে পড়ল। তারপর লাফাতে লাফাতে হাঙরটার মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল। আমরা হাঁ করে দেখছিলুম ব্যাপারটা।

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'সর্বনাশ! এ আবার কী প্রাণী?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'এ যে দেখছি কেঠো পোকা। দেখতে কাঠ, আসলে পোকা।'

ব্যুগেনভিলি কী যেন ভাবছিলেন। এতক্ষণে ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী আশ্চর্য! কিওটা দ্বীপে ঠিক এই আজব পোকাই দেখেছিলুম। ঘাসের মধ্যে পড়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল ব্যুমেরাং। কিন্তু যেই কুড়িয়ে নিয়েছি, অমনি হাত থেকে ছিটকে চলে গেল। কর্নেল, ডঃ বিকর্ণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ রাজাকো কিওটা দ্বীপের সন্ধান জানতেন।'

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। র‍্যাক থেকে একটা বাঁধানো মোটা খাতা নামিয়ে পাতা ওল্টালেন। তারপর বললেন, 'জাহাজের লগবুক দেখছি। 1912 সালের লগবুক। সান্টা মারিয়া জাহাজ! ডু ক্যাপ্টেনের নাম জিয়োভিল্লো সার্ভেন্টিস! পর্তুগিজ মনে হচ্ছে। রোমিলা, তুমি কি কখনও এ ঘরে ঢুকেছ?'

রোমিলা বলল, 'না কর্নেল, বাবা বেঁচে থাকতে কাউকে এঘরে ঢুকতে দিতেন না।'

র‍্যাকের একটা জায়গা দেখিয়ে কর্নেল বললেন,'এখানে ধুলোময়লা নেই—এই চারকোনা অংশটাতে। অথচ র‍্যাকের সবখানে ধুলোময়লা প্রচুর। তার মানে এখানে চৌকো কোনও জিনিস—সম্ভবত আর একটি লগবুক ছিল। চোর সেটাই নিয়ে গেছে।'

রোমিলা ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'কে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে একটা লগবুক নিয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। আমার লোকেরা তো সবাই বিশ্বাসী!'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তবু ওদের জিগ্যেস করা দরকার।'

কর্নেল বললেন, 'রোমিলা এই লগবুকটা আমি নিয়ে যেতে চাই। দেখা শেষ হলে ফেরত দেব।'

রোমিলা বলল, 'কোনও আপত্তি নেই কর্নেল। ব্যাপারটা আমারও জানা দরকার। কেন বাবাকে খুন করা হল, এ ঘরের তালা ভেঙে কেন চোর ঢুকল—সব রহস্য না জানলে শান্তি পাব না।'

ড্রয়িংরুমে ফিরে গেলুম আমরা। রোমিলা তার পরিচারিকাকে ডেকে জাদুঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলল। বুঝলুম, কর্মচারীদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

একজন কর্মচারীর নাম বেনিয়া। সে রোমিলার প্রাইভেট সেক্রেটারি। অন্যজনের নাম পিওবের্দেনে। সম্ভবত প্রিয়বর্ধন। বেনিয়া বলল, সে অনেকগুলি চিঠি টাইপ করতে ব্যস্ত ছিল। কিছু লক্ষ্য করেনি। পিওবের্দেনে বা প্রিয়বর্ধন বলল, সে কিচেনে খাবার তৈরি করছিল। সেও কিছু লক্ষ্য করেনি।

লক্ষ্য করার কথাও নয়। ঘরটা পেছনের দিকে। ওপাশে ফুলবাগান ঝোপঝাড়, গাছপালা। কর্মচারীরা চলে গেলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তোমার পরিচারিকাকে ডাকো এবার।'

পরিচারিকাটি রোমিলার বয়সী। সে ছেলেবেলা থেকে রোমিলার সঙ্গিনী। নাম মিত্রামা। দেখতে চিনাদের মতো। সে বলল কিচেনে প্রিয়বর্ধনের সঙ্গে কাজ করছিল। তবে পাঞ্চো একবার বসে

তার পায়ে মুখ ঘষেছিল। এটা পাঞ্চোর ভয় পাওয়ার লক্ষণ। মিত্রামা ভেবেছিল, আজও বুঝি সাপটাপ দেখে ভয়ে পেয়েছে পাঞ্চো। এই টিলায় খুব সাপের উৎপাত আছে। মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে, মারাও পড়ে। মিঃ রাজাকো ছিলেন খেয়ালি মানুষ। না হলে এমন জংলা পাহাড়ে কেউ বাড়ি বানাতে চায়?

কর্নেল লগবুক নিয়ে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রোমিলা আমি আরেকবার জাদুঘরে যেতে চাই।'

রোমিলা বলল, 'আসুন'।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে তার সঙ্গে চলে গেলেন। ডঃ বিকর্ণ মুচকি হেসে বললেন, 'ওঁর যাওয়া দেখে মনে হল যেন শিকারের গন্ধ পেয়েছেন।'

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর প্রশংসার সূত্র পেলেই আমার মুখ খুলে যায়। বললুম, 'ওঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, ডঃ বিকর্ণ। হয়তো দেখবেন, এখনই এসে বলবেন কিওটা দ্বীপের সন্ধান পেয়ে গেছেন।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'এবং মিঃ রাজাকোর হত্যারহস্যেরও।'

ডঃ বিকর্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'রাজাকোর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিওটা দ্বীপের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য ওই কাত্তির ব্যাপারটা একটা গোল বাধাচ্ছে। তা হলেও বলব কাপ্টেন ব্যুগেনভিলি, রাজাকোর অনেক শত্রু ছিল। যেমন ধরুন ওঁর মাছের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়াং। একসময় দু'জনে একই সঙ্গে কারবার করেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রে তিমিশিকারেও গেছেন দু'জনে। পরে কী নিয়ে বিবাদ হয়েছিল যেন। তারপর থেকে সুবিধে পেলে প্রায়ই দুজনের সাঙ্গপাঙ্গরা খুনোখুনি করত পরস্পর। পুলিশ হিমশিম খেত দাঙ্গা থামাতে।'

ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি বললেন, 'কিয়াং এখন কী করেন?'

কিয়াং তো এ তল্লাটের সেরা ডুবুরি। ওর একটা স্কুনার (ছোট জাহাজ) আছে! মুক্তো খুঁজে বেড়ায় সমুদ্রের তলায়। সে এখন কোটিপতি লোক। থাকে পাশের দ্বীপে কারো আইল্যান্ডে।'

এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে কর্নেল এসে গেলেন রোমিলার সঙ্গে। খুব প্রত্যাশা নিয়ে ধুরন্ধর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। এই বুঝি বলে ইউরেকা!

কিন্তু কোথায় কী! আরও তুম্বো মুখে চুপচাপ বসে বড়লেন। রোমিলা বলল, 'আরেকপ্রস্থ কফি বলে আসি।'

সে চলে গেলে কর্নেল বললেন, কিওটার রহস্যময় স্পিকিং উডদের একটুকরো সেরা নমুনা ছিল ও ঘরে। ক্যাপ্টেন সার্ভেন্টিসের এই লগবুকে তার উল্লেখ আছে। ডঃ বিকর্ণ যে জিনিসটা ওঘর থেকে চোর নিয়ে গেছে, সেটা আরেকটা লগবুক নয়। কাঠের তৈরি একটা চমৎকার ভাস্কর্য। আর সে কাঠ কিওটা দ্বীপের গাছের। এই দেখুন, লগবুকে ক্যাপ্টেন সার্ভেন্টিস সেটা এঁকেও রেখেছেন।'

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক অপূর্ব ছবি আঁকতে পারতেন বটে! তবে ভাস্কর্যটি অসাধারণ! সুন্দর এক দেবীমূর্তি। হাতে বীণা কতকটা আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো দেখতে। শুধু বাহন হিসেবে কোনও হাঁস নেই, এই যা তফাত। মূর্তিটা চৌকো একটা বেদিতে বসানো ছিল।

কল্পনা করলুম, জনহীন কিওটা দ্বীপে জ্যোৎস্নার ওই রাতে দেবী আপন মনে বীণা বাজাচ্ছেন। তাঁর পায়ের নিচে সমুদ্র সব উচ্ছ্বাস থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে।

এই সময় ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! আমার যেন মনে পড়ছে! অচ্ছন্নতার ঘোরে কিওটার বেলাভূমিতে শুয়ে মধুর বাজনা শুনেছিলুম। তা হলে কি স্বপ্ন নয়?'

'সঙ্গীতকারী বৃক্ষ!' ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'এ এলাকায় লোকেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করে আসছে সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা। কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় দ্বীপ?'...

রোমিলার কাছ থেকে এক সময় বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলুম। ডঃ বিকর্ণ আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

লাঞ্চের পর কর্নেল ব্যালকনিতে গিয়ে সেই লগবুক খুলে বসলেন। আমার বরাবর ভেতো বাঙালি-স্বভাবে খাওয়ার পর ঝিমুনি কেটে গেল ফোনের আওয়াজে। অপারেটর বলল, 'কথা বলুন!'

রোমিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল। 'কর্নেল? আমি রোমিলা। শুনুন কর্নেল...'

'না, আমি জয়ন্ত বলছি। ডেকে দেব কর্নেলকে?'

'দিন না প্লিজ!'

কর্নেলের কানে গিয়েছিল। এসে ফোন ধরলেন। একটু পরে ফোন রেখে হাসলেন। 'ডার্লিং! রোমিলার পরিচারক-কাম-বাবুর্চি সেই প্রিয়বর্ধন বা পিওবের্দেনে হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় সে-ব্যাটাই চোর!'

'তা আর বলতে?' বলে কর্নেল ব্যালকনিতে ফিরে গেলেন।

আমার ফের ঝিমুনি চাপল। অভ্যাস যাবে কোথায়? কখন ঘুমিয়ে গেছি—অথচ কর্নেল পই পই করে দিনে ঘুমোতে নিষেধ করেন। সামুদ্রিক নোনা আবহাওয়ায় দিনে ঘুমুলে নাকি শরীর ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম। যেন অথৈ সমুদ্রে পড়ে গেছি আর হাঙর হাঁ করে গিলতে অসছে। ভাগ্যিস ঘুমটা ভেঙে গেল। বহাল তবিয়তে আছি দেখে আশ্বস্ত হলুম।

কর্নেল বেরিয়েছেন কোথায়। একটু রাগ হল। এক সঙ্গে এসেছি। অথচ এমন করে কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছেন, আমি একা মনমরা হয়ে ফুলো মুখে বসে থাকছি। কোনও মানে হয়?

নিচের রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আজ বন্দর এলাকা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বাজার ছাড়িয়ে একটু পুবে এগিয়ে গেলে ডক। অসংখ্য জেটি। তেমনি ছোট বড় জাহাজ। কোনও-কোনও জেটিতে সার সার মোটরবোট, লঞ্চ, স্টিমারও রয়েছে। লোকজন সে-তুলনায় কমই।

আজ বিকেলে আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রের জল রাঙা। নীল টুপিপরা নাবিকরা হল্লা করছে। একটা জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেখানে একটা ছোট্ট জাহাজ—যাকে স্কুনার বলা হয়, ভিড়ে রয়েছে। সংকীর্ণ ডেকে চেয়ার পেতে বসে বেশ লম্বা চওড়া একটা লোক বই পড়ছিল। সে হঠাৎ ঘুরে আমাকে দেখতে পেল। একটু হেলে মাথাটা সম্ভাষণ সূচকভঙ্গিতে দোলাল। তখন ভদ্রতা করে আমি বললুম, গুড আফ্‌টারনুন মিস্টার!' লোকটা রাজাকোর মতোই দেখছি গায়ে পড়া। সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে সে রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। বলল, 'মশাই স্থানীয় লোক নন নিশ্চয়?'

'না। আমি ভারতীয়।'

'নিশ্চয় ব্যবসায়ী?'

'না। পর্যটক।'

'আমার নাম ক্যারিবো। মশায়ের নাম?'

ছোট্ট ডেকে বসে চা খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প করছি, পেছনের কেবিন থেকে কেউ বেরিয়েই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। প্রচণ্ড চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই রোমিলার কর্মচারী প্রিয়বর্ধন!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আপনি প্রিয়বর্ধন না? রোমিলার বাড়িতে আপনাকে দেখেছি।'

প্রিয়বর্ধন খিকখিক করে হাসল। 'কে প্রিয়বর্ধন? আমার নাম অ্যানথুপা পিদ্রু।'

ক্যারিবো ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বললুম, 'আশ্চর্য তো?'

ক্যারিবো একটু হাসল। 'চেহারার এমন মিল হতেই পারে। একবার চিনে গিয়ে সব চীনাকে আমার একই লোক মনে হত।'

কিন্তু এ ভুল আমার হতেই পারে না। জেদ করে বললুম, 'না মিঃ ক্যারিবো! ইনি তিনিই বটে। কারণ মিঃ রাজাকোর বাড়িতে আজ সকালে এঁকে দেখেছি। একটু আগে শুনলুম, উনি নিপাত্তা হয়েছেন...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রিয়বর্ধন আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি এর জন্য তৈরি ছিলুম না! শক্ত ডেকের ওপর বেকায়দায় পড়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন আমার বুকে বসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যারিবো! এ ব্যাটা সরকারি গুপ্তচর। এর মুখ বন্ধ করতে হবে। শিগগির!'

ক্যারিবো চাপা গলায় কাদের ডাকল। আমি যথাসাধ্য লড়ে যাচ্ছি, কিন্তু আরও দু'জন বেঁটে হিংস্র চেহারার লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ক্যারিবো বিকৃত মুখে বলল, 'একে বেঁধে নিচে নিয়ে এস।'

নাইলনের মজবুত দড়িতে আমাকে ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তারপর ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলে নিয়ে গেল। নিচের কেবিনে পাটাতনের ওপর আমাকে ফেলে ক্যারিবো আমার পেটে জুতোসুদ্ধ একটা পা চাপিয়ে নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'তা হলে তুমি সরকারি ঘুঘু? বোসো, দেখাচ্ছি মজা।'

তারপর সে পকেট থেকে কী একটা বের করল। দেখেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম। ক্যারিবোর হাতে একটা চকচকে বাঁকা ছুরি।...

অন্ধকার সমুদ্রে

জীবনে ভুলেও ঈশ্বরকে ডাকিনি। এখন মনে হল ঈশ্বরকে ডেকে দেখলে হয়। নইলে আমার মৃত্যুটা ঠেকানোর কোনও উপায় দেখছি না। অবস্থাটাও বড় বেকায়দা যে! ব্যাটারা নাইলনের দড়িতে আমাকে এমন করে বেঁধেছে, একটুও নড়াচড়া করা যাচ্ছে না, এদিকে শয়তান ক্যারিবো বাঁকা চকচকে ছুরিটা বাগিয়ে আমার বুকে তার থ্যাবড়া জুতোসুদ্ধু পা চাপিয়ে কুতকুতে চোখে তাকিয়ে আছে আর শাসাচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে কী ভদ্র আর অমায়িক চেহারা দেখেছিলুম লোকটার! এখন মনে হচ্ছে, বাস্তবিক যদি শয়তান বলে কেউ থাকে, তাহলে এই ব্যাটাই সে। এদিকে পিওবের্দেনে ওরফে অ্যানথুপা পিদ্রু পাশে দাঁড়িয়ে শিগগির আমার শ্বাসনালী কেটে ফেলার প্ররোচনা দিচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, এখনই বুঝি ক্যারিবো আমার গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে।

মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করে বললুম, "দেখুন মিঃ ক্যারিবো, আপনারা ভুল করছেন। আমি সত্যি সরকারি গুপ্তচর নই। আমার বুক পকেটে একটা কার্ড আছে। ওটা দেখলেই আমার পরিচয় পেয়ে যাবেন।"

ক্যারিবো ক্রূর হেসে বলল, "পিওবের্দেনে যখন বলেছে, তখন তার কথাই ঠিক। তুমি সরকারি ঘুঘু।"

"না মিঃ ক্যারিবো আমি একজন সাংবাদিক মাত্র। আপনি ওর কথায় ভুল করবেন না।"

পিওবের্দেনে বলল, "তাহলে প্রফেসর বিকর্ণ আর ওই দাড়িওয়ালা বুড়ো কর্নেলের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক তোমার?"

"কোনও সম্পর্ক নেই। আমি কিওটা দ্বীপে ওঁদের অভিযানের খবর নিতে এসেছি। সেই খবর কলকাতায় আমার কাগজে পাঠাতে হবে। বিশ্বাস না হলে আমা বুকপকেটের কার্ডটা আপনারা দেখুন।"

পিওবের্দেনে আমার বুকপকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডটা বের করে নেড়েচেড়ে দেখল তারপর ক্যারিবোকে কার্ডটা দিল সে। ক্যারিবো পড়ে দেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল "এটা যে জাল নয় তার প্রমাণ? আমি জানি, সরকারি ঘুঘুদের জাল পরিচয়পত্র থাকে।"

পিওবের্দেনে বলল, "আর দেরি কোরো না ক্যারিবো আমাদের রওনা দেওয়ার সময় হয়ে এল।"

ক্যারিবো কার্ডটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, "পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে সরকারি ঘুঘু জাহান্নামে যাক। তবে পিওবের্দেনে, আমার মনে হয় কাজটা মাঝদরিয়ায় সেরে ফেলাই ভাল। কারণ জল পুলিশ নজর রেখেছে। রক্তমাখা মড়া সমস্যা বাধাবে।"

পিওবের্দেনে ভেবেচিন্তে বলল, "ঠিক বলেছ। মাঝদরিয়ায় পৌঁছে ওর শ্বাসনালী কেটে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেব। আর কেউ খুঁজে পাবে না।"

ক্যারিবো পা তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "তারপর ওর সদগতির কোনও অসুবিধে হবে না। হাঙরেরা খিদেয় ছটফট করে বেড়াচ্ছে।"

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছিল। ডেকে বললুম, "মিঃ ক্যারিবো, মেরেই যখন ফেলবেন, তখন দয়া করে দড়ির ফাঁসগুলো একটু আলগা করে দিন না। বড্ড ব্যথা করছে যে!"

পিওবের্দেনে। মুখ ভেংচে বলল, "ব্যথা করছে! করবেই তো! ঘুঘু দেখেছ বাছাধন, ফাঁদ তো দেখোনি!"

"মিঃ পিওবের্দেনে! রোমিলার বাবার জাদুঘর থেকে যে দেবী মূর্তিটা নিয়ে এসেছেন, ওর ভেতর কিন্তু কিওটা দ্বীপের সন্ধান পাবেন না—যদিও ওটা কিওটা দ্বীপের কাঠ দিয়ে তৈরি।"

আমার এই চালে কাজ কাজ হল। ওদের দুজনের মুখেই চমক জাগল। ক্যারিবো বলল, "হুঁ, তুমি তাহলে দেখছি অনেক খবর রাখো?"

"রাখি বৈকি! আমি সাংবাদিক যে!"

পিওবের্দেনে আমার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, "যদি সত্যি তুমি কিওটা দ্বীপের সন্ধান জানো, তাহলে তোমার শ্বাসনালী কাটা যাবে না।"

ক্যারিবো বলল, "চালাকিতে ভুলো না পিওবের্দেনে। গুপ্তচররা বড় ধূর্ত।"

বললুম, "রাজাকো কিন্তু তার চেয়েও ধূর্ত ছিলেন। তাই কিওটা দ্বীপে যাওয়ার ম্যাপখানা কাত্তির গায়ে এঁকে রেখে গেছেন।"

দু'জনে আবার চমকে উঠল। এক গলায় বলল, "কাত্তি! কাত্তি!"

"হ্যাঁ, কাত্তি।"

ক্যারিবো ব্যস্তভাবে বলল, "কোথায় আছে সেই কাত্তি?"

"মিঃ কিয়াং তা হাতিয়ে নিয়েছেন রাজাকোকে খুন করে।"

এই কথাটা বলার সময় আমি আদৌ জানতুম না এরা কিয়াং নামে সেই ধনী মৎস্যব্যবসায়ী ও রাজাকোর প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুচর কি না। আন্দাজে ঢিলটা লেগে গেল। ক্যারিবো লাফিয়ে উঠে দাঁত কিনমিড় করে বলল, "কিয়াং হাতিয়েছে তাহলে? সর্বনাশ!"

পিওবের্দেনে মুখ চুন করে বলল, "দেখলে তো ক্যারিবো? আমি তোমাকে বলেছিলুম রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংসায়েবের লোক। তুমি বিশ্বাস করোনি! তাছাড়া এও বলেছিলুম, রাজাকোর কাছে একটা কাত্তি আছে আমি জানি।"

বললুম, "হ্যাঁ, টুপির মধ্যে লুকোনো ছিল শুনেছি।"

ক্যারিবো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুমদুম শব্দে কাঠের সিঁড়ি কাঁপিয়ে একটা বেঁটে লোক এসে দরজায় উঁকি মেরে বলল, "গতিক সুবিধের নয় কর্তা! হাঙরের ঝাঁক এসে পড়েছে।"

ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্যারিবো বলল, "পিওবের্দেনে, ওর কাছে থাকো! ৭০৩ নম্বরের দিকে রওনা দিচ্ছি।"

সবাই ওপরের ডেকে চলে গেল। পিওবের্দেনে দরজা বন্ধ করে পোর্টহোলে চোখ রেখে কিছু দেখতে লাগল। তারপর নোঙর তোলার ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর স্কুনার দুলতে শুরু করল। যান্ত্রিক গর্জন কানে এল। বুঝলুম স্টার্ট দিয়েছে। আবছা জলের শব্দ, স্কুনারের প্রচণ্ড দুলুনি আর গর্জন মিলে একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

কেবিনের ভেতর ততক্ষণে আলো কমে গেছে। একটু পরে আলো জ্বলে উঠল। পিওবের্দেনে পোর্টহোল থেকে হঠাৎ ছিটকে সরে এল। তারপর দুমদাম্ ফট্ ফট্রাস্ এরকম অদ্ভুত সব শব্দ হতে থাকল। বললুম, "ব্যাপার কী মিঃ পিওবের্দেনে?"

সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "চুপ ব্যাটা কলকাত্তাই ভূত!"

গ্রাহ্য না করে বললুম, "কারও সঙ্গে লড়াই বাধল বুঝি?" পিওবের্দেনে আমার কথার জবাব না দিয়ে কোনার দিকে কাঠের দেয়ালের একটা হুকে হ্যাঁচকা টান মারল। দেখি, ওটা একটা প্রকাণ্ড দেরাজ। দেরাজ থেকে সে যা বের করল, তা একটা স্টেনগান আর একটা কার্তুজের বেল্ট। সে পোর্টহোলের কাচটা সরিয়ে স্টেনগানের নল ঢুকিয়ে দিল। তারপর গুলি ছুড়তে শুরু করল।

বুঝলুম কাদের সঙ্গে জোর লড়াই বেধেছে। ছোট্ট জাহাজটা বেজায় দুলছে। মাঝে মাঝে ভীষণভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে। আর আমি কাঠের মেঝেয় অসহায়ভাবে একবার এদিক একবার ওদিকে গড়িয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু তাতে একটা লাভ হল। বাঁধনগুলো অনেকটা ঢিলে হয়ে গেল। একটু পরে পোর্টহোলের কাচটা ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। পিওবের্দেনে মুখ বিকৃত করে লাফ দিয়ে সরে এল। তারপর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। কেবিনে ঘরঘুট্টি অন্ধকার এবার। সেই সুযোগে বাঁধন খুলতে থাকলুম। পিওবের্দেনে পোর্টহোলের কাছে আছে তা বুঝতে পারছি। খোলা পোর্টহোল গুলিগোলার আওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। এদিকে কেবিনে জল ঢুকে মেঝে জলময় হয়ে যাচ্ছে। বাঁধন খুলে সাবধানে উঠে বসলুম যখন, তখন কেবিনের ভেতর কয়েক ইঞ্চি জল। যখনই স্কুনার কাত হচ্ছে, তখনই বেশি করে জল ঢুকছে। আমার ভয় হল, এই লোনা জলে শেষ পর্যন্ত ডুবে মরব না তো?

তার আগেই একটা কিছু করা দরকার। পিওবের্দেনের চেহারা আবছা দেখা যাচ্ছিল। সে পোর্টহোলে কী একটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছি, সেইসময় দরজায় ধাক্কা পড়ল। জলের শব্দের মধ্যে কে চেঁচিয়ে ডেকে বলল, "পিওবের্দেনে! বেরিয়ে এস! স্কুনারে জল ঢুকছে।"

পিওবের্দনে ঝটপট দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। ভাগ্যিস আলো জ্বালাল না। বিপদের মুখে তার এটাই স্বাভাবিক। খোলা দরজা দিয়ে এবার জলের প্রবল ছাঁট এসে ঢুকতে লাগল। মেঝেয় এখন প্রায় হাঁটু জল জমে উঠেছে। বুঝতে পারলুম স্কুনার ডুবতে চলেছে। প্রতিপক্ষের গুলিগোলায় নিশ্চয় ঝাঁঝরা হয়ে গেছে স্কুনারটার শরীর।

এতক্ষণে আমার সত্যিকার মৃত্যুভয় জেগে উঠল। ক্যারিবোর ছুরির মুখে তত বেশি ভয় পাই নি, কারণ জীবনে এমন অবস্থায় অনেকবার পড়েছি। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ যম স্বয়ং সমুদ্র।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঁকি দিলুম। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো বৃষ্টিও শুরু হয়েছে। অন্ধকার সমুদ্র ভয়ঙ্কর গর্জন করছে। স্কুনারে কোথাও আলো নেই। কোনও সাড়া শব্দ নেই। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে আছে। স্কুনারটা অসহায়ভাবে মোচার মতো প্রচণ্ড দুলছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে ছিটকে সমুদ্রে গিয়ে পড়ব। তার ওপর মুহুর্মুহু জলের ঝাপটানি। ভিজে নাকাল হয়ে গেছি। কাঁপুনি শুরু হয়েছে ঠাণ্ডায়।

তাহলে কি এই সমুদ্রসমাধিই বরাতে ছিল আমার? অতিকষ্টে ওপরের ডেকে হাঁটু দুমড়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে গেলুম। সমুদ্রের গর্জনে কান পাতা দায়। বৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে সূচ বেঁধাচ্ছে শরীরে। ওপরের কেবিনের কাছে যেতেই বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। সেই আলোয় দেখলুম, একটা ছায়ামূর্তি কী একটা টানাটানি করছে।

আবার বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। লোকটাকে চিনতে পারলুম। পিওবের্দেনে।

আসন্ন মৃত্যুর মুখে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না।

ঝাঁপিয়ে পড়লুম তার ওপর। "তবে রে হতচ্ছাড়া বদমাস। এবার তোর কী হয়?"

পিওবের্দেনে বেকায়দায় পড়ে মাতৃভাষায় কী সব আওড়াতে থাকল। তাকে জাপটে ধরে ভিজে ডেকের ওপর ফেলে হাঁকতে হাঁকতে বললুম, "কীরে ব্যাটা? আমার শ্বাসনলী কাটবি বলেছিলি যে বড়? এবার দ্যাখ, কে কার শ্বাসনালী কাটে!"

পিওবের্দেনে গোঙাতে গোঙাতে বলল, "কিন্তু তুমিও কি রক্ষা পাবে ভাবছ? সমুদ্র তোমাকে গিলে খাবে। বরং তার চেয়ে আমাকে সাহায্য করো। তাহলে দুজনেই প্রাণে বাঁচব।"

"কেবিনের কার্নিশে একটা রবারের নৌকো আটকানো আছে। ওটা টেনে বের করতে পারছি না।"

"তোর বন্ধুরা কোথায় গেল?"

"ওরা আমাকে ফেলে বোটে চেপে কেটে পড়েছে। ওরা আমার বন্ধু নয়, শত্রু!" বলে সে কেঁদে ফেলল। "উঃ! ক্যারিবো এমন করবে আমি ভাবতেও পারিনি!"

ওর কান্না দেখে মনটা নরম হল। সমুদ্রের গ্রাস থেকে বাঁচতে হলে এখন ওর সহযোগিতাও দরকার। বললুম, "তোমার স্টেনগানটা কোথায়, আগে দাও। তারপর কথা হবে।"

"বিশ্বাস করো, ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয়, যদি প্রাণে বাঁচতে হয়। স্কুনারটা আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই ডুবে যাবে হয়তো। চলো, আমরা রবারের নৌকোটা বের করি।"

ওকে ছেড়ে সতর্কভাবে উঠে দাঁড়ালুম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে রিভলভার আছে। জলে ভিজে গেলেও ওটার সাহায্যে পিওবের্দেনেকে শায়েস্তা করতে অসুবিধে হবে না।

রিভলভারটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললাম, "চলো! কোথায় নৌকো আছে দেখি।"

পিওবের্দেনে কাকুতি-মিনতি করে বলল, "বিশ্বাস করো! আমি ক্যারিবোর মতো দুষ্টু লোক নই। ওর প্ররোচনায় পড়ে রোমিলার সঙ্গে নেমকহারামি করেছি। জানতুম না, নচ্ছার ঠগ আসলে মূর্তিটা হাতানোর জন্য আমার সঙ্গে ভাব জমাবে।"

"ঠিক আছে। চলো, নৌকো কোথায় আছে দেখি।"

স্কুনার একপাশে কাত হয়ে গেছে। বৃষ্টিটা ধরে এল। কিন্তু ঝোড়ো বাতাস থামল না। টলতে টলতে অনেক কষ্টে রবারের নৌকোটা টেনে বের করলুম দু'জনে। তারপর পালাক্রমে ফুঁ দিয়ে ওটাকে ফোলাতে শুরু করলুম। ততক্ষণে স্কুনার আরও কাত হয়েছে। দু'জনেরই দম ফুরিয়ে মারা পড়ার দাখিল। নৌকাটা আসলে গোল মোটরের টায়ারের মতো প্রকাণ্ড একটা চাকা এবং মধ্যিখানে আন্দাজ এক বর্গমিটার একটা রবারের বালিশ আটকানো। সেটাও দম দিয়ে ফোলানো হল। তারপর পিওবের্দেনে বলল, "তুমি আগে উঠে বোসো। আমি ঠেলে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর উঠব।"

স্কুনারের যেদিকটা কাত হয়ে সমুদ্রের ঢেউ ঢুকছে, সেদিকে ঠেলে দিল পিওবের্দেনে। তারপর নিজে এক লাফে উঠে বসল। সে যেন নাগরদোলায় চড়া। স্কুনারের রেলিং হাত বাড়িয়ে ধরে সে রবারের এই অদ্ভুত ভেলাটাকে শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। লোকটার বুদ্ধি আছে বটে! শেষ দিকটায় না নিয়ে গেলে ঢেউয়ের ঝাপটায় ভেলাসমেত আমরা আবার ডেকে গিয়ে পড়তুম।

সমুদ্র এবার আমাদের লুফে নিল। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছিল তলিয়ে যাব, কিন্তু এই আশ্চর্য ভেলা দিব্যি ভেসে রইল ঢেউয়ের মাথায় একপার ওপরে একবার নিচে নাগরদোলার মতো।

ঢেউয়ের মাথায় পৌঁছুলে দিগন্তে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোর ঝাঁক দেখতে পাচ্ছিলুম। আবার হারিয়ে যাচ্ছিল কালো জলের দেয়ালের পেছনে।

চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলুম, "পিওবের্দেনে! ওটা কোন্ দ্বীপ?"

জলের গর্জনের ভেতর পিওবের্দেনে কী বলল, শুনতে পেলুম না। যদিও সে আমার মাত্র একহাত দূরে ফুলন্ত টায়ারের মতো ভেলার কিনারা আঁকড়ে বসে আছে।

মাথার ওপর এতক্ষণে নক্ষত্র ঝিকমিক করতে দেখা গেল। বাতাসটাও কমে এল ক্রমশ। কিছুক্ষণ আগে যে লোকটি ছিল আমার জঘন্য শত্রু, সে এখন বন্ধু হয়ে গেছে। কারণ প্রাণের দায় বড় দায়। রবারের ভেলায় দু'জনেই ঠান্ডাহিম শরীরে ভেসে চললুম। কোথায় পৌঁছুব কে জানে!

ও কিসের আলো?

চোখ খুলে কয়েক সেকেন্ড কিছু বুঝতে পারলুম না। তারপর মনে হল, রুবি দ্বীপে আমাদের হোটেলেই শুয়ে আছি। কিন্তু এত আলো কেন? না—আলো নয়, রোদ। ঝলমল করছে উজ্জ্বল রোদ। আমার পিঠের নিচে বালি। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। আমি এখানে শুয়ে আছি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নিশ্চয় একা টানা অদ্ভুত ধরনের স্বপ্নের মধ্যে কাটাচ্ছি। বাঁদিকে নারকেল বন আর ঘন আগাছার জঙ্গল। ডানদিকে উঁচু বাঁধের মতো ন্যাড়া টিলা। সামনে ছোট্ট একটা হ্রদ। তারপর পেছনে তাকিয়ে প্রিয়বর্ধনকে দেখামাত্র আগাগোড়া সবটাই মনে পড়ে গেল।

প্রিয়বর্ধন একটা গাছের তলায় আগুন জ্বেলে কী একটা করছিল আমাকে উঠতে দেখে সে মুখ ফেরাল। তার মুখে কেমন একটা মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। 'হ্যালো মিস্টার! শরীর ঠিক তো?'

জবাব দিলাম না। এই লোকটা আমার জঘন্য শত্রু। সে ক্যারিবোর স্কুনারে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। অথচ তারই সঙ্গে একই বেলায় অথৈ সমুদ্রে আমাকে ভাসতে হয়েছিল। ভাগ্যের তামাশা আর কাকে বলে? আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছিলুম। ভাবছিলুম, ইচ্ছে করলেই সে আমাকে সমুদ্রে ফেলে দিতে পারত। কেন তা করেনি?

প্রিয়বর্ধন আমার হাবভাব দেখে হয়তো অবাক হল। বলল, 'কী হল? চলে এস এখানে। তোমার জন্য কিছু ব্রেকফাস্টের আয়োজন করেছি।'

বলে সে হাসতে হাসতে একটা পোড়া মাছ দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে আমার খিদে চনমন করে উঠল। তার সম্পর্কে রাগ আর শত্রুতার ভাবটাও কেটে গেল। তার কাছে গিয়ে বসে পড়লুম। সে একরাশ কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বেলেছে। আগুনের কুণ্ডের পাশে কয়েকটা পোড়া আর কয়েকটা তাজা মাছ। মাছগুলো দেখতে বাচ্চা ইলিশের মতো। আমার হাতে একটা পোড়া মাছ গুঁজে দিয়ে প্রিয়বর্ধন নিজেও একটা চিবুতে শুরু করল। চিবোতে চিবোতে বলল, 'তুমি অবাক হচ্ছ না মিস্টার?'

বললুম, 'নিশ্চয় হচ্ছি। কারণ এতক্ষণে আমাদের হাঙরের পেটে থাকার কথা।'

প্রিয়বর্ধন আরও জোরে হেসে বলল, 'বরাত জোরে এ যাত্রা জোর বেঁচে গেছি। আসলে কী জানো? ওই রবারের ভেলাগুলো খুব মজবুত এবং বিশেষ ধরনে তৈরি। যত ঢেউ থাক, কিছুতেই ওল্টাবে না। তাছাড়া আমি হলুম সমুদ্রের বাচ্চা। আজীবন সমুদ্রের মানুষ হয়েছি।'

বাধা দিয়ে বললুম, 'কিন্তু এখানে এলুম কী ভাবে?'

'যেভাবে আসা উচিত।' প্রিয়বর্ধন আগুনে আরেকটা মাছ রেখে বলল। 'সারা রাত আমরা ভেলায় কাটিয়েছি। তুমি তো ভিরমি খেয়ে পড়ে ছিলে ভয়ের চোটে। অগত্যা তুমি যাতে ভেলা থেকে ছিটকে হাঙরের পেটে ঢুকে না যাও, আমি তোমার পেটের ওপর পা চাপিয়ে ঠেসে রেখেছিলুম।'

নচ্ছার লোকটা আমার পেটের ওপর পা চাপিয়েছিল ক্যারিবোর মতো, ভাবতেই গা জ্বালা করে। কিন্তু লোকটাকে যতটা খারাপ মনে করেছিলুম, ততটা খারাপ নয়। বললুম, 'তারপর এখানে কীভাবে এলুম?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'ভোর নাগাদ ভেলামশাই নিজের ইচ্ছে মতো এনে ফেলল এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে। আমি কি নিজের ইচ্ছেয় এসেছি? ওই যে বাঁধের মতো টিলা পাহাড় দেখছ, তার নিচে সমুদ্র। বাপস! কিনারা জুড়ে ডুবো পাথরে ভর্তি—ভেলাটার সঙ্গে ঠোক্কর লাগলে দু'জনেই গুঁড়ো হয়ে যেতুম। বুঝলে মিস্টার? ভেলাটাকে পুজো করা উচিত। ওই দেখ, ওকে গাছে টাঙিয়ে রেখেছি।"

গাছের গুঁড়ির মাথায় চুপসে যাওয়া প্রকাণ্ড টায়ারের মতো ভেলাটাকে দেখতে পেলুম। বললুম, "আমি তাহলে সারারাত অজ্ঞান ছিলুম?"

"হুঁ, ছিলে। কাজেই তোমার ঠ্যাং দুটো ধরে টানতে টানতে বিচে নামাতে হল। তারপর একবার ভাবলুম, তোমাকে বিচেই ফেলে রাখি। কিন্তু এই জঘন্য দ্বীপে যা শকুনের উপদ্রব! তোমাকে একা ফেলে যে ক্ষিদে মেটাতে আসব, উপায় নেই। তবে তার চেয়ে বড় কথা, আমি নারকোল গাছে চড়তে পারিনে। সমুদ্রের বাচ্চা তো! তাই ভাবলাম, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তুমি নিশ্চয় নারকোল গাছে চড়তে পারো?

'মোটেও পারি না।'

প্রিয়বর্ধন লাফিয়ে উঠল। 'পারো না? তাহলে কেন তোমাকে কাঁধে করে এই নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এলুম?'

বুঝতে পারছিলুম, লোকটি খুব আমুদে প্রকৃতির। সে আমাকে বয়ে এনে এখানে শুইয়ে রেখেছে। তারপর হ্রদের জলে পাথর ছুড়ে একগাদা মাছ মেরে এনেছে। কিন্তু আগুন কোথায় পেল? জিগ্যেস করলে তার বুদ্ধির পরিচয়ও পেলুম। দুটো শুকনো কাঠে ঘষাঘষি করে শুকনো পাতা ডলাই করে গুলতি বানিয়ে ফুঁ দিতেই আগুন জ্বলে উঠেছে। ব্যাপারটা ভারি সোজা। প্রথমে কাঠ দুটো জ্বলে উঠবে। তখন গুঁড়ো পাতার গুলতিটা ধরিয়ে নিলেই হল।

রোদে শুয়ে থাকার ফলে আমার ভিজে পোশাক যেমন শুকিয়ে গেছে তেমনি সারা রাতের সমুদ্র জলের হিমটাও গেছে ঘুচে। সূর্য মানুষের শরীরকে শক্তি জোগায়। আমি এখন সম্পূর্ণ ফিট হয়ে গেছি। একটুও দুর্বলতা টের পাচ্ছি না।

হ্রদটা ছোট। সমুদ্রের সঙ্গে তার যোগ নেই; বৃষ্টিজলের হ্রদ। তাই জলটা পান করা যায়। খুব স্বচ্ছ সেই জলে মাছের ঝাঁক দেখে তাক লেগে গেল।

জল খেয়ে সেই গাছের তলায় ফিরে প্রিয়বর্ধন বলল, 'একেই বলে বরাত। কাল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত আমরা ছিলুম শত্রু। এখন হয়েছি বন্ধু। যাক্ গে, তোমার নামটা কী বলছিলে যেন কাল?'

'জয়ন্ত চৌধুরি।'

'জয়ন্ত, আমরা কোথায় এসে পড়েছি জানো?' বলে সে ভয়ের চোখে চারদিক দেখে নিল। 'আমার খালি সন্দেহ হচ্ছে, এ যেন সেই ডাইনির দ্বীপ।'

'ডাইনির দ্বীপ মানে?'

'ছেলেবেলা থেকে নাবিকদের কাছে ডাইনির দ্বীপের ভয়ঙ্কর সব গল্প শুনেছি। থাক্‌গে, ওসব বলতে নেই। বললেই বিপদ হবে শুনেছি। আমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্রও নেই। তোমার পকেটে একটা

রিভলভার ছিল। সেটা কাছে রেখেছি। কিন্তু জলে ভিজে অকেজো হয়ে গেছে। গুলিগুলো পর্যন্ত বের করা গেল না।'

'আমার রিভলভার নিয়েছ কেন? ফেরত দাও।'

মুচকি হেসে প্রিয়বর্ধন পকেট থেকে আমার অস্ত্রটা বের করে দিল। পরীক্ষা করে দেখলুম, সত্যি ওটা অকেজো হয়ে গেছে। প্রিয়বর্ধন বলল, 'আমার স্টেনগানটা কখন সমুদ্রে ছিটকে পড়েছে টের পাইনি। যাক দুটো লাঠি ভেঙে নিই গাছের ডাল থেকে। তারপর সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসব—যদি দৈবাৎ কোন জাহাজ চোখে পড়ে। নিদেনপক্ষে ভেলাটা তো রইলই। গায়ে জোর ফিরে পেলেই ভেসে পড়া যাবে।'

সমুদ্রতীরে যাওয়ার সময় নারকোল বনের ভেতর অসংখ্য শুকনো নারকোল পড়ে থাকতে দেখলুম। কিন্তু প্রিয়বর্ধনের শুকনো নারকোল নাকি মুখে রোচে না। গাছের ডগায় ঝুলন্ত নরম নারকোল শাঁসের কথা বলতে তার জিভে জল এসে গেল। আমাকে গাছে চড়ানোর জন্য সাধাসাধি করেও যখন রাজি হলুম না, তখন তার মুখটা বেজার হয়ে উঠল। কিন্তু আমি জানি, এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার না পেলে শুকনো নারকোলই খেতে হবে। কাহাঁতক মাছ পোড়া খেতে ভাল লাগবে ওর? আমি পাথরে আছাড় মেরে কয়েকটা নারকোল ভেঙে ফেললুম। তারপর টুকরো শাঁসগুলো জামা ও প্যান্টের পকেটে বোঝাই করলুম। ন্যাড়া পাথরের বাঁটে বসে যখন সেগুলো চিবোচ্ছি, তখন প্রিয়বর্ধন হাত বাড়িয়ে বলল, 'দেখি একটুখানি!'

কিছু চিবিয়েই সে ফেলে দিল। তবে একথাও সত্যি এমন স্বাদ গন্ধহীন নারকোল জীবনে কখনও খাইনি। রুবিদ্বীপের নারকোল খেকো চিংড়িগুলোর কথা মনে পড়ছিল। আহা, সেই সুস্বাদু চিংড়ি সমুদ্র থেকে যদি ধরা যায়। লোভী চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

ডুবো পাথরে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের নীল জলে কালো কালো ছোপ পড়ে আছে। যেন অসংখ্য দানবের মাথা। কোনওটা হাতির মতো দেখাচ্ছে। পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। সাদা ফেনার পুঞ্জ জমছে। জলের শব্দও প্রচণ্ড। ওই সব পাথরের ভেতর দিয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে রবারের ভেলাটা ভদ্রলোকের মতো আমাদের তীরে পৌঁছে দিয়েছে। সত্যি, ভেলাবাবাজির পুজো দেওয়া উচিত।

দিগন্তে মাঝে মাঝে কালো রেখা ভেসে উঠেছিল। নিশ্চয় আর একটা দ্বীপ। কিন্তু দূরের দিকে কোনো জাহাজ বা নৌকো চোখে পড়ছিল না। প্রিয়বর্ধন ঠোঁট কামড়ে ধরে সমুদ্র দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'শয়তান ক্যারিবোকে যদি এখন পেতুম! ওর মুণ্ডুটা কচকচ করে খেয়ে খিদে মেটাতুম!'

'ক্যারিবো তোমাকে ফেলে পালিয়ে গেল কেন প্রিয়বর্ধন?'

আমার প্রশ্ন শুনে প্রিয়বর্ধন চুপচাপ পাথরে লাঠিটা দিয়ে আঁচড় কাটবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'কিয়াংকে ও ভীষণ ভয় পায়। কিয়াং কোটিপতি লোক। ওর দলবল বিরাট। ক্যারিবো তো এক সময় কিয়াংয়েরই ডান হাত ছিল।'

'দু'জনের বিবাদের কারণ কী?'

'রোমিলার বাবা রাজাকোর ঘর থেকে যে দেবীমূর্তিটা চুরি করে এনে ক্যারিবোকে দিয়েছি, বিবাদ ওইটে নিয়ে। জিনিসটার আসল মালিক হল কিয়াং। ক্যারিবো ওটা কিয়াংয়ের বাড়ি থেকে চুরি করে রাজাকোকে বেচেছিল। কিয়াং ক্যারিবোকেই সন্দেহ করেছিল। তাই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। ক্যারিবো রাজাকোর সেই টাকায় স্কুনার কিনেছিল। তারপর যেভাবেই হোক, সে জানতে পেরেছিল, মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপের সন্ধান লেখা আছে।'

চমকে উঠলুম। 'কিওটা দ্বীপের? মানে—যে দ্বীপে গাছপালা কথা বলে?'

প্রিয়বর্ধন হাসল। আমার ভুল শুধরে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'উহু—গান গায়।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর আর কী? ক্যারিবো আমাকে টাকার লোভ দেখাল। তাছাড়া প্রতিজ্ঞা করে বলল, আমাকে ও কিওটা দ্বীপে নিয়ে যাবে। আমি শয়তানটার কথায় পড়ে রোমিলার মতো ভাল মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেললুম। ওঃ! নরকে আমার জায়গা হবে না জয়ন্ত।'

অনুতাপে সে চুল আঁকড়ে ধরল। বললুম, 'যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন আর বলে লাভ নেই। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় কিয়াংয়ের দলই কি ক্যারিবোর স্কুনারে হামলা করেছিল? কেন?'

'কিয়াং নিশ্চয় টের পেয়েছে, মূর্তিটা এতদিন রাজাকোর কাছে ছিল এবং আবার সেটা ক্যারিবোর কাছে ফিরে এসেছে। কিয়াংয়ের চারদিকে চর।'

'তাহলে কি রাজাকোকে খুন করেছে কিয়াংয়েরই লোক?'

'তা আর বলতে?'

এসব কথা শুনে মনমরা হয়ে বললুম, 'তাহলে এতক্ষণে ক্যারিবো কিওটা দ্বীপের দিকে রওনা হয়েছে। হয়তো পৌঁছেও গেছে।'

প্রিয়বর্ধন জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'অত সহজ নয়। মোটরবোট নিয়ে কিওটা যাবে! আমার মনিব রাজাকো একদিন নেশার ঘোরে আমাকে বলেছিলেন, কিওটা নামে একটা দ্বীপ আছে—তার চারদিকে পাহারা দেয় জলের ডাইনিরা। কাজেই বুঝতে পারছ, এতক্ষণে ক্যারিবোর মাংস ডাইনিরা ছিঁড়ে খাচ্ছে।'

'কিন্তু প্রিয়বর্ধন, গান করে এমন সব গাছ দেখাতেই বা এত আগ্রহ কেন ক্যারিবোর? কেন সেখানে কিয়াংই বা যেতে চায়?'

প্রিয়বর্ধন চাপা গলায় বলল, 'ওই দ্বীপে নাকি প্রাচীন যুগের জলদস্যুদের বিস্তর ধনরত্ন লুকানো আছে।'

হেসে ফেললুম। 'সেই চিরকেলে গল্প! গুপ্তধন আর গুপ্তধন! প্রিয়বর্ধন, গুপ্তধনের গল্প কখনও সত্য হয় না।'

প্রিয়বর্ধন আমার পরিহাসে কান করল না। বলল, 'তুমি জানো না জয়ন্ত, কোকেস আইল্যান্ড কেন, সারা তল্লাটে যেখানে যাবে, তুমি কিওটা দ্বীপের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতে পাবে। সেখানকার গাছপালা গান গেয়ে সেই গুপ্তধনের খোঁজ দেয়। গানের সুরে বলে, আয়, তোকে রাজা করে দিই!'

প্রিয়বর্ধন কিওটা দ্বীপের বিচিত্র সব গল্প বলতে থাকল।

আমি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছিলুম। এতদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কত অ্যাডভেঞ্চারে গিয়ে কত না বিপদে পড়েছি। কিন্তু চরম মুহূর্তে উনি ত্রাণকর্তার মতো আমার উদ্ধারে হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়ে সহাস্যে সম্ভাষণ করেছেন, 'হ্যাল্লো ডার্লিং!' এই দ্বীপে নির্বাসিত হয়েও তাঁর আশা করতে দোষ কী?...

কিন্তু দিনটাই বৃথা কেটে গেল। উদ্ধার হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখলুম না। দুপুরে দু'জনে হ্রদের জলে স্নান করলুম। আবার সেই পোড়ামাছের লাঞ্চ। আবার জাহাজের আশায় সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকা। তারপর দিন ফুরিয়ে আসছে দেখে রাতের আশ্রয়ের কথা ভাবতে হল দুজনকে। কাল সকালে বরং ভেলায় ভেসে পাড়ি জমানোর কথা ভাবা যাবে।

এই দ্বীপটা খুবই ছোট। উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সেটা বুঝতে পেরেছিলুম। হ্রদের অন্যদিকটায় জঙ্গলের ভেতর কালো পাথরের কয়েকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ওখানে আমরা আরামে রাত কাটানোর মতো একটা গুহা আবিষ্কার করে ফেললাম।

সারাদিন কোনও জনমানুষ দেখিনি। প্রাণী বলতে কয়েকটা গিরগিটি দেখেছি আর এক দঙ্গল শকুন! তারা কী খেয়ে বেঁচে থাকে কে জানে! গুহার ভেতর ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচা গেল। এখানকার শুকনো কাঠগুলোর আশ্চর্য গুণ। একটু ঘষলেই ধোঁয়া উড়তে থাকে। সহজে আগুন ধরে যায়।

গুহার ভেতরটা বেশ মসৃণ। দরজাটা বড়। দরজার কাছে বসে প্রিয়বর্ধন লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছিল। একরাশ কাঁচা পাতা আর ঘাস ছিঁড়ে এনে বিছানা করেছে। ক্লান্তিতে ঘুম এসে গিয়েছিল। আমার ঘড়িটা ভাগ্যিস অক্ষত আছে। প্রিয়বর্ধনের ঘড়িটাও অটুট, দিব্যি সময় দিচ্ছে। পালাক্রমে দুজনে ঘুমোব এবং পাহারা দেব।

সবে চোখ বুজেছি। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়েছে। গুহার ভেতর আগুনটা ধিকিধিকি জ্বলছে এবং প্রিয়বর্ধন গুনগুন করে কী গান গাইছে অজানা ভাষায়। হঠাৎ তার গান থেমে গেল। চাপা গলায় সে বলে উঠল 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! ঘুমলে নাকি?'

চমক খেয়ে উঠে বসে বললম, 'কী হয়েছে?'

'ঝটপট আগুনটা নিভিয়ে ফেলো। এদিকে একটা আলো এগিয়ে আসছে।'

প্রিয়বর্ধনের গলার স্বর কাঁপছিল। আমি আগুনের কুণ্ডে একরাশ কাঁচা পাতা চাপিয়ে দিয়ে দরজায় উঁকি দিলুম। নিচে হ্রদের ধারে সত্যি একটা আলো। তবে আলোটা এগিয়ে আসছে না। থেমে আছে।

স্টপ ইট! স্টপ ইট!

একটু পরেই বুঝতে পারলুম ওটা এক স্পটলাইট। প্রিয়বর্ধনকে সেকথা বললে সে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'ডাইনির দ্বীপে এমন আলো দেখা যায় শুনেছি। জয়ন্ত, চলো আমরা এ গুহা থেকে পালিয়ে পাহাড়ের পেছনে কোথাও লুকিয়ে পড়ি। ডাইনিটা ঠিকই আমাদের গন্ধ পেয়ে যাবে। শুনেছি, সে নাকি জলজ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে খায়।'

সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। আমার কোনও কথা আমল দিল না। বরং সে পালিয়ে নিরাপদ জায়গায় যাওয়ার জন্য আমার হাত ধরে টানাটানি শুরু করল!

লোকটা এত কুসংস্কারের ডিপো, ভাবা যায় না! আলোটা যখন বৈদ্যুতিক, তখন আলোর মালিক অবশ্যই সভ্য জগতের মানুষ। শত্রুমিত্র যেই হোক, মানুষ তো বটে। তাছাড়া এমনও হতে পারে, কোনও মোটরবোট অথবা জাহাজ এসে এই দ্বীপের কাছে ভিড়েছে। উদ্ধার পাওয়ার এমন সুযোগ ছাড়া নয়।

নিজেকে ওর হাত থেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে থাকলুম। প্রিয়বর্ধন পেছনে চাপা গলায় আমাকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ দিতে লাগল। আতঙ্কে লোকটার মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে হয়তো।

অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে পারত, কিন্তু স্পটলাইটটা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। তাই বারবার হোঁচট খাচ্ছিলুম পাথরে। আছাড় খেতেও হল বারকতক। শেষে এমন আছাড় খেলুম যে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচের ঝোপঝাড়ে পড়ে পোশাক ছিঁড়ে ফর্দাফাই হল। কাঁটায় শরীরের অনেক জায়গা ছেড়ে গেল। জ্বালা করছিল ভীষণ।

কিন্তু আমি মরিয়া। ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে দেখি, আলোটা যত কাছে ভেবেছিলুম, তত কাছে নয়। একটা পাথরের ওপর আলোটা রাখা আছে। কিন্তু জনমানুষ নেই। থমকে দাঁড়াতে হল। ওটা কি সত্যি স্পটলাইট?

হ্যাঁ, তাতে তো কোনও ভুল নেই। কারণ আলোর ছটা একটা দিকেই পড়েছে—যেদিক থেকে যাচ্ছি, সেদিকে। আমি এখন কিছুটা বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছি বলে আলোর নাগালে নেই। এবার সাড়া দেওয়া উচিত ভেবে যেই ঠোঁট ফাঁক করেছি, সেই মুহূর্তে হেঁড়ে গলায় কেউ গান গেয়ে উঠল।

তারপর গানটা দুকলি গাওয়া হয়েছে, কেউ তেমনি দুর্বোধ্য ভাষায় তেড়ে ধমক দিল। সঙ্গে সঙ্গে গানটা থেমে গেল। তারপর অনেকগুলো গলায় কারা হেসে উঠল।

তাহলে আলোটার ওপাশে পাথরের পেছনে একদঙ্গল মানুষ আছে। কারা তারা? একটু দোনামোনা হচ্ছিল আমার। ক্যারিবো কিংবা কিয়াংয়ের দলবল নয় তো? গিয়ে ওদের পাল্লায় পড়লে আমার ভাগ্য আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

প্রায় বুকে ভর করে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে পাথরটার পেছনে গেলুম। তারপর কান পেতে রইলুম। ওরা চাপা গলায় কথা বলছে। একবর্ণও বুঝতে পারছি না। পাথরের ফাঁক দিয়ে ওদের আবছা মূর্তিগুলো চোখে পড়ল। ওরা ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে কেউ বসে বা শুয়ে আছে। কী করা উচিত ভাবছি, আর দরদর করে ঘামছি উত্তেজনায়।

হঠাৎ পেছনে অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। ঝটপট ঘুরে বসতেই প্রিয়বর্ধন ফিসফিস করে বলল, 'চুপ!'

লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ভেবেছিলুম ডাইনির ভয়ে লেজ তুলে পালিয়ে গেছে গুহা থেকে। অথচ সে দিব্যি আমার পেছন পেছন চুপিচুপি এসে হাজির। ঘাপটি মেরে বসে কিছুক্ষণ কান পেতে কথাবার্তা শোনার পর আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'শয়তান ক্যারিবো!'

তাহলে ঠিকই অনুমান করেছিলুম। ভাগ্যিস, হুড়মুড় করে ওদের সামনে গিয়ে হাজির হইনি। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পর প্রিয়বর্ধন আমাকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেল। হ্রদের ধারে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বলল, শাপে বর হয়েছে, জয়ন্ত! ক্যারিবো মোটরবোট নিয়ে এখানে হাজির হয়েছে! ঠিক বুঝতে পারলুম না কী একটা গণ্ডগোল ঘটেছে। যতদূর মনে হল, ওরা কিওটা দ্বীপের হদিশ করতে পারছে না। তাই হতাশ হয়ে ঢকঢক করে মদ গিলে মাতাল হচ্ছে।'

বললুম, 'কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টেনগানটা থাকলে ক্যারিবো আর তার তিনজন সঙ্গীকে ওখানেই যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিতুম। তারপর দেবী মূর্তিটা উদ্ধার করে ওর মোটরবোট নিয়ে কিওটা অভিযানে পাড়ি জমাতুম! যাক্ গে, চুপচাপ এস। কী করি দেখো না।'

হ্রদ ঘুরে পুবদিকে গিয়ে ক্যারিবো তার দলবলকে এড়িয়ে প্রিয়বর্ধন আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেল। তখনও টের পাইনি ওর উদ্দেশ্য। একটু পরে সেটা জানলুম।

এদিকটায় সমুদ্রের খাড়ি। খাড়ির এককোণে মোটরবোটটা আবিষ্কার করতে দেরি হল না। মোটরবোটে কেউ পাহারা দিচ্ছে না। প্রিয়বর্ধন বলল, 'স্টার্ট দেওয়ার উপায় নেই। ক্যারিবোর পকেটে চাবি। কাজেই এসো, এটাকে আমরা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। ওটার মধ্যে বৈঠা আছে। অসুবিধে হবে না। শিগগির!'

খাড়ির জলটা অপেক্ষাকৃত শান্ত। দক্ষিণ ঘুরে আমরা মোটরবোটটা সেই গুহাওয়ালা পাহাড়ের পেছন দিকে নিয়ে গেলুম। তারপর সংকীর্ণ আরেকটা খাড়ির ভেতর পাহাড়ের তলার দিকে চওড়া ফাটলের ভেতর লুকিয়ে রাখলুম। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের অন্ধিসন্ধি খুঁজে নিরাশ হয়ে বলল,

'ব্যাটারা বৈঠাগুলো বাদে কিচ্ছু রেখে যায়নি। না অস্ত্রশস্ত্র না খাবার-দাবার! মহাধড়িবাজ লোক ওই ক্যারিবো।'

অন্ধকারে এবার আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। বাঁদিকে পাহাড় ভাঙা চাঙড়ের ওপর দিয়ে উঠে যেতে অসুবিধা হল না। পাহাড়টা শ'দুয়েক ফুটের বেশি উঁচু নয়। এখানে পেছন দিকটা চমৎকার গড়ানে আবার হ্রদের দিকে পৌঁছে প্রিয়বর্ধন একটা প্ল্যান বাতলে দিল।

প্ল্যানটা মারাত্মক। কিন্তু প্রিয়বর্ধনের বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর এখন আমার প্রচুর আস্থা জন্মে গেছে। স্পটলাইটটা তেমনি জ্বলছে। আমি চুপিচুপি তখনকার মতো ওটার কাছে এগিয়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন গেল বাঁদিকে হ্রদের কিনারা দিয়ে ঘুরে।

যে পাথরে আলোটা রাখা আছে, তার আড়ালে বসে রইলুম। ক্যারিবোরা এখন চুপচাপ। তাদের নাক ডাকা শুরু হতে আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হল। তারপর হাত বাড়িয়ে আলোর সুইচ অফ করে দিলুম এবং স্পটলাইটটা বাগিয়ে ফেললুম।

তারপর গুঁড়ি মেরে অন্য পাশে গিয়ে প্রিয়বর্ধনের শিসের অপেক্ষা করতে হল। একটু পরেই সেই শিস কানে এল। পাল্টা শিস দিলুম। তখন প্রিয়বর্ধন এসে হাজির হল। ফিসফিস করে বলল, 'মদের নেশায় কাহিল ব্যাটারা। আগে এই মালপত্রগুলো ধরো। তারপর অন্য কথা।'

জিগ্যেস করলুম, 'চাবি হাতাতে পেরেছ তো?'

'হুঁউ। অনেক কিছুই। আমরা এখন রাজা হতে চলেছি!'.....

তখন রাত এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। আমাদের মোটরবোট ছুটেছে অকূল সমুদ্রে। প্রিয়বর্ধন যা সব হাতিয়ে এনেছে, তা হল : একটা স্টেনগান, একটা কিটব্যাগ, কিটব্যাগের ভেতর শ'তিনেক প্যাকেট করা কার্তুজ আর সেই চুরি যাওয়া দেবীমূর্তি। হ্যাঁ, আরও একটা জিনিস হাতিয়ে এনেছে প্রিয়বর্ধন। একটা খাদ্যদ্রব্যের প্রকাণ্ড প্যাকেট। তার ভেতর জ্যাম, জেলি, সসেজ, ফ্রায়েড ফিশের টুকরো, পাঁউরুটি পর্যন্ত। প্রিয়বর্ধন তবু পস্তাচ্ছিল। 'কেন যে ছাই ওদের কফির ফ্লাস্কটা নিয়ে এলুম না। আহা, সমুদ্রের বুকে কফি খাওয়ার চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে নেই।'

এক সময় জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়? একসময় জ্বালানি ফুরিয়ে যাবে, তখন মোটরবোট অচল হয়ে যাবে না?'

প্রিয়বর্ধনের আনন্দের ঘোরটা এককথায় যেন কেটে গেল। ঝুঁকে পড়ে মোটরবোটের কম্পাস দেখে নিয়ে বলল, 'সর্বনাশ! উত্তরে যেতে গিয়ে যে দক্ষিণে চলেছি। জ্বালানি যা আছে, আর অন্তত ঘন্টা তিনেক চলবে।'

সে মোটরবোটের মুখ ঘুরিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সমুদ্রের এই এলাকায় তীব্র স্রোত আর ঢেউগুলোও রুখে দাঁড়াচ্ছে। যতবার মোড় নেওয়ার চেষ্টা করে মোটরবোট উল্টে যাওয়ার তালে থাকে। তাই হাল ছেড়ে দিয়ে প্রিয়বর্ধন বলল, 'যেখানে খুশি যাক্। আর কিছু করার নেই।'

আসন্ন বিপদের মুখে আমার বুদ্ধি খুলে গেল। স্পটলাইটটা জ্বেলে দিয়ে বললুম, 'প্রিয়বর্ধন, তুমি বলছিলে মূর্তিটার ভেতর কিওটা দ্বীপে যাওয়ার নক্সা আছে। একবার সেটা দেখলে হত না? যদি জ্বালানি থাকতে-থাকতেই আমরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারতুম।'

প্রিয়বর্ধন মুখ বেজার করে বলল, 'দেখতে পারো। তবে ক্যারিবোর মতো ঘুঘু যখন হদিশ করতে পারেনি, তুমি পারবে বলে মনে হয় না।'

মূর্তিটা সত্যি অপরূপ। অবিকল আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো। হাতে বীণাও রয়েছে। মূর্তিটা পরীক্ষা করে উলটে পালটে দেখেও বুঝতে পারছিলুম না, ওর ভেতরে কিছু থাকতে পারে কি না। সাবধানে মোচড় দিয়ে দেখলুমও প্যাঁচ থাকলে যদি খোলা যায়। কিন্তু মূর্তিটা নিরেট।

হঠাৎ চোখ পড়ল ওটার মাথার পেছনে। একটা পেরেকের মতো। ওটাতে যেই চাপ দিয়েছি, তলার দিকের একটা জায়গা ঢাকনার মতো খুলে গেল। আর ঠকাস করে কী একটা পড়ল নিচের পাটাতনে। কুড়িয়ে দেখি, একটা কাত্তি!

অবিকল একই কাত্তি—যেমনটি রাজাকোর টুপির ভেতর পেয়েছিলুম। একই নকশা। প্রিয়বর্ধন বাঁ হাত বাড়িয়ে কাত্তিটা নিয়ে উলটেপালটে দেখে ফেরত দিল। বুঝলুম, কাত্তি জিনিসটা কী ও জানে না।

কাত্তিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আবিষ্কার করলুম, নকশাগুলো একদিকে নেমে গিয়ে যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে বেখাপচাভাবে। মাঝখানে একটা তেমনি গাছ আছে, কিন্তু শেকড়গুলো কিনারায় হঠাৎ শেষ হওয়ায় মনে হল, জায়গার অভাবে পুরোটা আঁকা হয়নি, নাকি এটা আঁকিয়ের খেয়াল? ইংরেজি এ বি সি ডি ই এফের পর জি'য়ের আধখানা কাটা।

তাহলে কি এটা অন্য একটা কাত্তির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার জন্য? অর্থাৎ রাজাকোর টুপির ভেতর পাওয়া কাত্তিটা না পেলে এটার রহস্য উদ্ধার করা যাবে না?

উলটো পিঠটা দেখামাত্র আমার সংশয় ঘুচে গেল। উলটো পিঠে গাছটা নেই শেকড়গুলো আছে। এ বি সি ডি ই এফ নেই, জি এইচ আই জে কে এল আছে। রাজাকোর কাত্তির উলটো পিঠটা ভাল করে লক্ষ্য করিনি। এর মানে দাঁড়াল : দুটো কাত্তি পরপর মিলিয়ে রাখলে দু'পিঠে দুটো শেকড়ওলা গাছ দেখা যাবে এবং বারোটা রোমান হরফ দেখা যাবে চক্রকারে সাজানো।

প্রিয়বর্ধনকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে আরও হতাশ হয়ে পড়ল!...

ভোর চারটেয় আমাদের মোটবোটের জ্বালানি ফুরিয়ে গেল। বৈঠা টানা নিরর্থক। তীব্র সমুদ্রস্রোত আর পেছনের ঢেউয়ের ধাক্কায় বোট গতিহারা হতে পারছে না।

দেখতে দেখতে দিনের আলো ফুটে উঠেছিল। সেই ধূসর আলোয় আমাদের এতক্ষণে চোখে পড়ল সামনে দীর্ঘ একটা কালো রেখা যেন। প্রিয়বর্ধন চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে, মাটি! মাটি! আমরা মাটির দিকে চলেছি!'

সমুদ্রের চারদিকে চাপচাপ লাল রং। প্রথম সূর্যের আভা ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রিয়বর্ধন মোটরবোটের সামনের ড্রয়ার খুঁজে একটা বাইনোকুলার পেয়ে গেল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাতে চোখ রেখে সেই কালো রেখাটা দেখার পর সে গম্ভীর মুখে বলল, 'আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মৃত্যু হবে জয়ন্ত! ঈশ্বরের নাম জপ করো! ওই মাটি কবরের মাটি।'

ঝটপট ওর হাত থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রাখলুম। দীর্ঘ আলো রেখাটা প্রবাল বলয়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের ওপর। ডানদিকে অনেকটা জায়গা ভাঙা। আর ভেতর দিয়ে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। দ্বীপের বুকে ঘন জঙ্গল। প্রথম আলোয় সবুজের জেল্লাও চোখে পড়ছিল।

প্রিয়বর্ধন করুণ মুখে বলল, 'আমদের বোট কোরাল রিফে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। কী তীব্র স্রোত দেখতে পাচ্ছ না জয়ন্ত?'

বললুম, 'ওই ভাঙা জায়গায় বোট নিয়ে গেলে বেঁচে যাব। এস প্রিয়বর্ধন, বৈঠা নাও!'

প্রিয়বর্ধন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৈঠা নিল। দু'জনে প্রাণপণে বৈঠা টেনে বোটের মুখ প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলুম। যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত প্রবাল পাঁচিলটা উঁচু মনে হচ্ছে। আন্দাজ শ'দুই মিটার দূরত্বে পৌঁছে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। ছিটকে গিয়ে সমুদ্রে পড়লুম। জলে না পড়লে গুঁড়ো হয়ে যেত এই মরদেহ।

সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলুম ভাঙা অংশটার দিকে। ভেসে থেকে প্রিয়বর্ধনকে খুঁজছিলুম। দেখি, সেও আমার মতো সাঁতার কাটছে। বুঝলুম ডুবো পাথরে ধাক্কা লেগে বোটটা ভেঙে-চুরে গেছে। ওলটপালট খেতে কাঠের বড় বড় ফালি ফেনার ভেতর মাছের মতো ভেসে

চলেছে প্রবাল পাঁচিলের দিকে। ঢেউ ভাঙার গর্জন, ফেনা, জলোচ্ছ্বাস—চারদিকে যেন প্রলয় চলছে।

তারপর পায়ে শক্ত পাথর ঠেকল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে প্রিবর্ধনকে আর দেখতে পেলুম না। কিন্তু তার কথা ভাবতে গেলে নিজের প্রাণ বাঁচানো সংশয়—তাছাড়া যাকে দেখতে পাচ্ছি না, তাকে উদ্ধার করব কী ভাবে? জলের ধাক্কায় পিছলে যাচ্ছি বারবার। হাঁচড়-পাঁচড় করে জল ভাঙা অংশটা পেরিয়ে গেলুম। এবার জলটা শান্ত—নিস্তরঙ্গ। সাঁতার কেটে বিচের দিকে এগিয়ে যেতে আর অসুবিধা হল না। মাথা ঘুরছিল। তখন পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে রইলুম।

আচ্ছন্ন অবস্থায় কতক্ষণ শুয়ে ছিলুম জানি না, এক সময় মনে হল কোথায় যেন অনেক দূরে চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রা বাজছে। নিশ্চয় এই দ্বীপে কোনও গির্জা আছে। সেখানে এক প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন বুঝি। আশ্রয় পাব। খাদ্য পাব। দেশে ফিরে যাব। আনন্দে মন ভরে গেল।

খুব আশা ও উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালুম। বেলাভূমির ওপর দিকে ঘন বনের ভেতর থেকে সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু যেই কয়েক পা এগিয়ে গেছি, কেউ খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!'

অলীক আর্তনাদ

'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!'

একবার নয়, বারবার কেউ ভূতুড়ে গলায় ধমক দিতে থাকল। সেই কণ্ঠস্বর যে মানুষের নয়, আমি হলফ করে বলতে পারতুম। থমকে দাঁড়িয়ে গেছি এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট'—ঝাঁকুনি খেতে খেতে শব্দগুলো ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাদের তীব্রতা ক্ষয়ে যাচ্ছে। হেঁপো রোগীর মতো শ্বাস-প্রশ্বাস জড়ানো গলায় মাথাকুটে নিষেধ করার ভঙ্গিতে কেউ কাউকে কিছু করতে বারণ করছে। তারপর শব্দগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে যেতে থাকল। 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' তারপর যেন বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনার দিকে কান গেল এবার। বাজনাটাও ততক্ষণে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। মনে হল, যেন আমার মাথার ভেতরই সেই আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত শুনছি...অসংখ্য ঝিল্লির ডাকের মতো, অতি মৃদু, শ্রুতিপারের সেই ধ্বনি।

তারপর তাও একইভাবে মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে কী এক অনুভূতি ঝিলিক দিল। এ আমি কোথায় এসে পড়েছি তাহলে? আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সকাল-বেলার শান্ত নরম রোদে সবুজ বনভূমি ঝলমল করছে। উঁচু ও নিচু, ছোট এবং বড়, স্থূল এবং শীর্ণ নানা আকৃতির উদ্ভিদ। তাদের অনেকেই থরে থরে ফুলে ফুলে সাজানো। মাটির ঘাসে ফলের গয়না পরে পরীদের মতো পা ছড়িয়ে বসে আছে কেউ কেউ। সুগন্ধে বাতাস মউমউ করছে। চারদিকে এখন যেন শব্দহীন হাসি, যেদিকে তাকাই সেদিকেই বালক-বালিকারা খুশিখুশি মুখে এক বিদেশি অতিথিকে বরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বলে ভুল হয়। কোথাও দেখি সারবদ্ধ ঋজু বৃক্ষ প্রাজ্ঞ মানুষের গাম্ভীর্য নিয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। কোনও-কোনও বৃক্ষ যেন ভ্রু কুঞ্চিত করেছে—সন্দেহকুটিল সংশয়ান্বিত ভঙ্গি। ফলভারে নুয়ে পড়া এক বৃক্ষ বুঝি জননীর স্নেহে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তরুণ বৃক্ষেরা তাদের বলিষ্ঠ পেশল বাহু বাড়িয়ে হয়তো আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। এ আমি কোথায় এলুম? প্রতিটি ঝোপঝাড়, গাছ, ঘাসের শব্দহীন ভাষা যেন আমার বোধের ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ কথা নিঃশব্দে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আমার মস্তিষ্কে—মস্তিষ্ক থেকে মনে সেই সব দুর্জ্ঞেয় কথা স্পন্দনের হ্রস্ব-দীর্ঘ তরঙ্গিত রেখায় বিচিত্র

কোডের মতো জমে উঠছে আমার মস্তিষ্ককোষে। এ বুঝি এক অদৃশ্য বেতার তরঙ্গ। কিন্তু ডি-কোডিং পদ্ধতি আমার জানা নেই বলে অর্থ নিষ্কাশন করতে পারছি না। অসহায় ব্যর্থ বিষণ্ণ এক মানুষ ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি এক বিরাট মৌন চেতনার দরজায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি আর তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ আমার তন্ময়তা কেটে গেল। স্বপ্নবৎ আচ্ছন্নতা ঘুচে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা জ্ঞান—যা এতক্ষণ আমার নাগালেই ছিল, অথচ গ্রাহ্য করিনি। আর সেই জ্ঞান আমাকে কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনায় আনন্দে বদ্ধ উন্মাদে পরিণত করে ফেলল। আমি বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ইউরেকা বলে চিৎকার করে ছোটাছুটি করার ভঙ্গিতে 'কিওটা! কিওটা!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এবং দু'হাত তুলে লম্ফঝম্ফ করতে করতে দৌড়ে গেলুম। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা অংশ দিয়ে ঢুকে একটা খোলামেলা সবুজ মাঠের ওপর ধপাস করে পড়ে বারকতক গড়াগড়ি খেলুম। তারপর আবার দৌড়ুতে শুরু করলুম। আমি সত্যি সত্যি বদ্ধ পাগলের মতো চিৎকার করছিলুম, 'কিওটা! কিওটা! কিওটা!'

হ্যাঁ, এই সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা। কোথাও রঙ্গো-রঙ্গো পুঁথিতে বর্ণিত 'স্পিকিং উডস'—কথা বলা বনের দেশ। এই সেই প্রাচীনযুগের নাবিকদের কিংবদন্তির দ্বীপ 'সঙ্গীতকারী বৃক্ষের বাসস্থান কিওটা!'

ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ছিটকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদনাটা কেটে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালুম। নিজের পাগলামির কথা ভেবে খারাপ লাগল। এবার আমার সবচেয়ে জরুরি জিনিস হল মানসিক সুস্থতা।

ঘাসের মাঠটা বিশাল। এখানে-ওখানে উজ্জ্বল নানা রঙের পাথর ছড়িয়ে আছে। কোথাও একলা কোনও গাছ বা ঝোপ, কোথাও নিবিড় উঁচু ঘাস। একটা নিচু ঝাঁকড়া গাছে আপেলের মতো ফল ধরে আছে দেখে সেদিকেই এগিয়ে গেলুম। ওগুলো ব্রেডফ্রুট বলে মনে হচ্ছিল। কয়েক পা যেতেই এক অবাক কাণ্ড ঘটল। রুবিদ্বীপে রাজাকোর জাদুঘরে ব্যুমেরাং-আকৃতির যে জ্যান্ত জিনিসটা দেখেছিলুম, কর্নেলকথিত সেই 'কাঠকার'-এর একটা ঝাঁক ঘাসের ভেতর থেকে লাফিয়ে উঠল। তারপর দল বেঁধে লাফাতে লাফাতে উঁচু ঘাসবনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

ফলের গাছটার তলায় চওড়া বেদির মতো পাথর। সেটাতে চড়ে একটা ফল ভাঙতে হাত বাড়িয়েছি, একটা হাতে ডাল ধরে নুইয়ে রেখেছি, অমনি ডালটা আমার হাত ছাড়িয়ে সটান সোজা হয়ে গেল। নাগাল পেলুম না। তারপর যে ডালটা ধরতে যাই, একই কাণ্ড। গাছটা প্রাণীর মতো জ্যান্ত এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনে সক্ষম দেখে হতবাক হয়ে গেলুম। একটু পরে গাছটার সবগুলো ডাল সোজা হয়ে গেল। প্রকাণ্ড এবং বেঁটে তালগাছের মতো দেখাল গাছটাকে। আমি তার দিকে চেয়ে কাকুতিমিনতি করে বললুম, 'লক্ষ্মী ভাইটি! বড্ড খিদে পেয়েছে। অমন কোরো না।'

আমার দুর্ভাগ্য, মানুষের ভাষা ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। ইশারা-ইঙ্গিত করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে সত্যি আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। কিন্তু হতচ্ছাড়া গাছটা তেমনি সাধুর মতো ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লোভনীয় রঙিন ফলগুলি আমার নাগালের বাইরে উঁচুতে দুলতে থাকল।

এতক্ষণে আমার মাথায় এল, এর মধ্যে হয়তো আজগুবি ব্যাপার নেই। লজ্জাবতী লতার মতো কোনও প্রকৃতিক নিয়মেই গাছটার মধ্যে সংকোচন ঘটেছে আমার ছোঁয়ায়। গাছটার গুঁড়িতে খোঁচাখোঁচা কাঁটাও রয়েছে। একটু তফাতে সরে গিয়ে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলুম। পাথরটা ছুঁড়তে যাচ্ছি, হাতের তালু ছ্যাক করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা ফেলে দিলুম। তারপর দেখি, ও হরি! ওটা আদতে পাথরই নয়—ধূসর রঙের একটা প্রজাপতি। ডানা গুটিয়ে পড়েছিল ঘাসের ফাঁকে। ভারি অদ্ভুত প্রজাপতি তো!

এবার কালো রঙের সত্যিকার একটা পাথর কুড়িয়ে নিলুম। পাথরটা ফল লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলুম। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ফলগুলোও যেন অসম্ভব ধূর্ত। পাথরের লক্ষ্যপথ থেকে কেমন ঝটপট সরে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে আবিষ্কার করা গেল, এই দ্বীপে নারকোল গাছ নেই। শুধু তাই নয়, এখানকার সব গাছ—সমস্ত উদ্ভিদ যেন অন্যরকমের। কোনওটাই আমি এর আগে দেখিনি কোথাও এমনকী যে ঘাসগুলো আমি মাড়িয়ে এলুম, সেগুলোও আমার অচেনা। যত রকমের ঘাস আজীবন দেখেছি, তার সঙ্গে কোনও মিল নেই এ ঘাসের। ভেলভেটে বোনা পুরু এবং নকশাদার এই ঘাসের সৌন্দর্য বিস্ময়কর। লক্ষ্য করে দেখলাম, কোথাও রুগ্ণ, হাড়জিরজিরে কোনও গাছ নেই। প্রত্যেকটি সবল, নিটোল, বর্ণাঢ্য—যেন ছবিতে যত্ন করে আঁকা।

একটা প্রকাণ্ড গাছের গায়ে হাত রেখেই চমকে উঠলুম। কোনো প্রাণীর গায়ে হাত রাখলে যে অনুভূতি অবিকল। বৃক্ষের প্রাণ আছে সে তো জানি! কিন্তু এত প্রাণ! এত তীব্র চেতনা! আমার দিকে তাকিয়ে আছে তীব্র চেতনাসম্পন্ন উদ্ভিদরূপী প্রাণীযূথ যেন।

একটা ঝোপে আঙুরের গুচ্ছ গুচ্ছ ফল দেখে সেদিকে ব্যস্তভাবে ছুটে গেলুম। গোলাপি রঙের সুন্দর ফলগুলি রসে টলটল করছিল। কিন্তু হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, কে যেন নিষেধ করছে।

কোনও কণ্ঠস্বর শুনিনি অস্বাভাবিক নির্জনতা ছমছম করছে চারদিকে। অথচ আমার মনে হল, আমার মাথার ভেতর ঝিঁঝি পোকার মতো শ্রুতিপারে এক অনুভূতিময় সুর একটা নিষেধাজ্ঞা শোনা যাচ্ছে। কে যেন বলছে, ওই সুন্দর ফলগুলো বিষাক্ত।

মন থেকে ধারণাটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলুম না। একি আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের বোধ? সঠিক বলা কঠিন। যে বোধ মানুষকে অনেক সময় বিপদের পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে চায়, এ কি সেই বোধ? প্রাণীদের মধ্যে এই বোধ এখনও লুপ্ত হয়নি — প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও হয়তো এই ক্ষমতার অধিকারী ছিল। কিন্তু সেই বোধ আমার মতো একজন সভ্য জগতের আধুনিক মানুষের মধ্যে টিঁকে আছে—নাকি কিওটা দ্বীপে পৌঁছনোর পর কোনও প্রকৃতিক নিয়মে তা ফিরে এসেছে আমার মধ্যে?

ব্যাপারটা যাই হোক, ফলের ঝোপটার সঙ্গে আমার যেন একটা টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ ঘটছিল। আমি সেখান থেকে হতাশ হয়ে সরে গেলুম অন্যখানে।

খাদ্যের সন্ধান আমাকে করতেই হবে। বরং সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি, যদি মাছ মারতে পারি।

গাছপালার ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। এদিকটায় জঙ্গল খুব ঘন। অসংখ্য গাছ বুড়ো হয়ে ভেঙে পড়েছে কালক্রমে। তার ওপর আবার গাছের চারা গজিয়েছে। এতক্ষণে পাখির ডাক কানে এল। তাহলে কিওটাতে প্রাণীও আছে! মনে হল, দ্বীপের পাখিরা আমার মতো এক আগন্তুককে দেখে যেন ভয় পেয়ে এতক্ষণ আড়ালে সরে গিয়েছিল। ক্রমশ সাহস পেয়ে তারা একে একে বেরিয়ে আসছে এবং মন খুলে গান গাইতে শুরু করেছে। কিন্তু চেষ্টা করেও একটা পাখি আমার চোখে পড়ল না।

তারপর একটা ময়াল জাতীয় প্রকাণ্ড সাপকে একটা গাছের ডালে ঝুলতে দেখলুম! হ্যাঁ—সাপও আছে। কিওটা তাহলে মানুষের পক্ষে একটা নিরাপদ জায়গা নয়। এক দৌড়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে হাজির হলুম। এবার সাপের কথা ভেবে বুক টিপটিপ করছিল।

সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলুম এদিকটা উত্তর দিক। আমি দ্বীপে এসেছি পূর্বদিক থেকে। সামনে বিস্তীর্ণ জলের পর প্রবাল পাঁচিল কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁদিকে টানা বিচ ক্রমশ ঘুরে গেছে দক্ষিণে। বিচের বাঁকের মুখে পাহাড়ি খাড়ি। এখানে জলটা তত পরিষ্কার নয়।

ঢেউয়ের চোটে বালি ভেসে উঠেছে। চাপচাপ শ্যাওলা জাতীয় গাছ আছে জলের ভেতর। তাই ভাবলুম, খাড়ির জলটা পরিষ্কার হতে পারে। ওখানে পাথরের ফাঁকে নিশ্চয় মাছের ঝাঁক চোখে পড়বে।

যেতে যেতে বাঁদিকে জঙ্গলের ভেতর বেহালার বাজনা শুনে থমকে দাঁড়ালুম। সত্যি বাজছে, নাকি কানের ভুল, ঠিক করতে পারলুম না। কিন্তু বড় করুণ সুর সেই অলীক বেহালার। এ এক আশ্চর্য মায়াজগৎ যেন, যেখানে যখন তখন বেজে ওঠে গম্ভীর অর্কেস্ট্রাধ্বনি কিংবা বেহালা সুর। বিচিত্র অনুভূতি জেগে ওঠে মনে। আবেগে হৃদয় দুলতে থাকে। সুরটা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল।

কিন্তু সব মিথ্যা পেট সত্য। বহুকাল আগেই পথের ধারে এক দেহাতী ম্যাজিশিয়ানের মুখে খেলার শেষে শুনেছিলুম এই পরম সত্য কথাটা। খিদে আর তেষ্টার কথা সম্ভবত যত ভাবা যায়, তত বেড়ে ওঠে। ক্যারিবোর রুটি-জ্যাম-সসেজ সেই মধ্যরাতে সমুদ্রের বুকে সাবাড় করেছি। এখন সেকথা ভেবে জিভে জল আসছিল। অদৃশ্য বেহালাবাদক সেটা টের পেয়েই যেন হঠাৎ বাজনা বন্ধ করে দিল।

বাঁকের মুখে খাড়ির ধারে এসেই মন নেচে উঠল। পাহাড়ের মাথায় একখানে সাদা একটা রেখা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম। না—চোখের ভুল নয়। ওটা একটা ঝরনা। সরু ফিতের মতো নেমে এসে লোনা খাড়ির জলে ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে।

এরপর নিজের তৎপরতায় নিজেরই অবাক লাগছিল। খাড়িতে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। তার ফাঁকে অতি স্বচ্ছ জলে ম্যাকারেল জাতীয় মাছের ঝাঁক খেলা করছিল। পাথর মেরে একটাকে বধ করতে দেরি হল না। মাছটার ওজন কমপক্ষে শ'দুই আড়াই গ্রাম না হয়ে যায় না।

প্রিয়বর্ধনের পদ্ধতিতে দু- টুকরো শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বেলে মাছটা পুড়িয়ে রাক্ষসের মতো খেলুম বিচে বসে। তারপর পাহাড়ে চড়া শুরু হল। মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নেওয়াটা এভাবে কত জায়গায় কাজে লেগেছে বলার নয়। ঝরনার কাছ ঘেঁষে একটা চাতাল মতো জায়গা দেখতে পেলুম। সেখানে পৌঁছে প্রাণ ভরে জল খেয়ে দ্বীপের দিকে ঘুরে দাঁড়ালুম।

আগের দ্বীপটার চেয়ে এই দ্বীপটা বহুগুণে বড়। উঁচু থেকে ভূ-প্রকৃতি ঠাহর হচ্ছিল। মাঝে মাঝে খোলা মাঠ, আবার বিস্তীর্ণ সবুজ ঘাসের জমি। পাখির ঝাঁক চোখে পড়ছিল। এই তাহলে সেই আশ্চর্য দ্বীপ কিওটা।

এবার একটু ভাবনায় পড়ে গেলুম। আমি হয়তো চেষ্টা করলে জর্জ ব্যুগেনভিলির মতো ভেলা তৈরি করে সমুদ্রে ভাসতে পারি—কোনও জাহাজ দৈবাৎ আমাকে দেখে উদ্ধার করলেও করতে পারে, নয়তো হাঙারের পেটে হজম হয়ে যেতে পারি। এই আশ্চর্য আবিষ্কার আমি লাগাতে পারব না। আমি বিজ্ঞানী নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো সাধারণ বিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার তত বোধবুদ্ধি নেই। তাহলে এই অবিষ্কার মানুষের অতীতকালের এক কিংবদন্তিকে পুষ্ট করা ছাড়া আর কী কাজে লাগবে?

হতাশা পেয়ে বসল ক্রমশ। কর্নেলের কথা ভাবতে থাকলুম। ধুরন্ধর প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এখন কোথায়? আমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে হয়তো সূত্র ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছেন রুবিদ্বীপে। কিওটা পৌঁছনোর যত চেষ্টা করুন, দ্বিতীয় কাস্তিটার অভাবে পথ খুঁজে পাবেন না—এটা নিশ্চিত।

শুধু একটাই আশা। কর্নেল চিরদিন রহস্যময় অজানার সন্ধানে পাড়ি জমাতে পিছপা হননি। অসাধারণ তাঁর বুদ্ধির চাতুর্য। তাঁর মেধা তুলনাহীন।

ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কখন সেই চাতালে। ঘুম ভেঙে দেখি, বিকেল হয়ে গেছে। কী লম্বা ঘুম না ঘুমিয়েছি তাহলে। মাছটা দেখছি খিদে মেটাতে অদ্বিতীয়। কী মাছ কে জানে, মনে হচ্ছে খিদে জিনিসটা চিরকালের মতো শেষ হয়ে গেছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে। স্ফূর্তিতে পেশি

চনমন করছে। চাতাল বেয়ে সমুদ্রের বিচে নামতে থাকলুম। কেউ আমাকে দেখলে পাগল ভাবতে পারত। ফর্দাফাই পোশাক, খালি পা, রুক্ষ চিটচিটে চুল।

নিচে বড় বড় পাথরের টুকরোর ভেতর গাছপালা আর ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। সেখানে যেই পৌঁছেছি, ডান দিকে জঙ্গলের ভেতর কেউ চেরা গলায় আর্তনাদ করে উঠল—'ও ডোন্ট কিল মি!' তারপরই কেউ গর্জন করে বলল, 'মাস্ট কিল ইউ! কিল ইউ...কিল ইউ...এবং আর্তনাদের পর আর্তনাদ—'হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

সারা বনভূমি জুড়ে 'কিল' এবং 'হেল্প' কথা দুটো জড়িয়ে যেতে যেতে প্রতিধ্বনিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তেজনায় আবার সেই উন্মাদনা আমাকে পেয়ে বসল। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে জঙ্গলের ভেতর দৌড়ুতে শুরু করলুম। লোকটাকে বাঁচানোর জন্য আমি মরিয়া।...

স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়

ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়তেই হত্যাকারীর অমানুষিক গর্জন আর আক্রান্তের আর্তনাদ ক্রমশ মিলিয়ে গেল। অমনি আমার সম্বিৎ ফিরে এল। মনে পড়ে গেল সকালের সেই 'স্টপ ইট' বলে ধমকের কথা। কিওটা দ্বীপে এইসব অদ্ভুত চিৎকার-চেঁচামেচি যে নিছক অতীতের কিছু ঘটনার অলীক প্রতিধ্বনি, তাতে ভুল নেই। হাতের পাথরটা ফেলে দিলাম।

কিন্তু অবাক লাগল নিজের এই উত্তেজনা আর উন্মাদনা দেখে। আমি কি খুব শিগরির পাগল হয়ে যাব? এই অত্যাশ্চর্য দ্বীপ আমাকে বদ্ধ পাগলে পরিণত করে ফেলবে, যদি না আমি সচেতন থাকি প্রতিমুহূর্তে। খাড়ির ধারে যেতে যেতে সকালে করুণ বেহালার সুর শুনে আমি তো কেঁদে ফেলেছিলুম! ভাগ্যিস প্রচণ্ড খিদে আমার মানসিক সুস্থতা ফিরিয়ে দিয়েছিল।

শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ভাবছিলুম, আমি জয়ন্ত চৌধুরি। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। ঘটনাচক্রে এই ভূতুড়ে দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। আমার মাথাটা ঠিক রাখতেই হবে। এইসব বিচিত্র, প্রাণবন্ত ও সচেতন উদ্ভিদের ব্যাপার-স্যাপার খুঁটিয়ে জানতে এবং বুঝতে হবে। ভড়কে যাওয়া চলবে না।

আমার খুব কাছেই একটা ফুট চারেক উঁচু চওড়া পাতাওয়ালা ঝোপ ছিল। তার ডগায় বেগুনি রঙের থোকা থোকা ফুল। ফুলের ডাঁটিগুলো শুঁড়ের মতো দেখতে। হঠাৎ সুড়সুড়ি খেয়ে চমকে উঠে দেখি, কয়েকটা ফুলওয়ালা শুঁড় আমার ছেঁড়া শার্টের ভেতর দিয়ে পাঁজরে ঘষা খাচ্ছে। একটু সরে গেলুম। শুঁড়গুলোও আমার নাগাল পেতে ঘুরে এল। কী করে দেখার জন্য আমি হাত বাড়িয়ে দিলুম। আমার হাতটা পেঁচিয়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িয়ে নিলুম এক ঝটকায়। তারপর দেখি ঝোপটা ভীষণ কাঁপতে কাঁপতে এপাশে ওপাশে লুটোপুটি খাওয়ার তাল করছে।

সঙ্গে সঙ্গে টের পেলুম, ঝোপটা তার নিঃশব্দ ভাষায় খিলখিল করে হাসছে। আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছিল বুঝি—আমার ভয় পাওয়া দেখে এখন হেসে বাঁচে না। আমি ভেংচি কেটে বললুম, 'লজ্জা করে না হাসতে? আমার মতো দুর্ভাগার সঙ্গে রসিকতা করতে একটুও বাধছে না?'

রাগ করে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা তফাতে চলে গেলুম। এখানে পায়ের তলায় ঘাস যেন ঘাস নয়। মখমলে মোড়া ফোম। কয়েক টুকরো পাথরের ভেতর থেকে একটা লিকলিকে গাছ উঠেছে—আমার মাথার সমান উঁচু। পাতাগুলো দেবদারুর মতো দেখতে। গাছটায় পিচফলের মতো অজস্র ফল ধরে আছে। দেখা যাক, এই গাছটা আমাকে একটা ফল দেয় নাকি।

ভাবা মাত্র গাছটা আমার দিকে ঝুঁকে এল এমনকি একটা ফলে ভর্তি ডাল এগিয়ে এসে আমার ঠোঁট স্পর্শ করল। মুখ সরিয়ে নিতে গিয়ে মনে হল, এই দয়ালু বৃক্ষ মশায় আমাকে যখন তার ফল

খাওয়াতেই চাচ্ছে, তখন প্রত্যাখ্যান করাটা উচিত হবে না। তাকে আরও পরীক্ষা করার জন্য আমি হাঁ করলুম। একটা থোকা এসে আমার মুখের ভেতর ঢুকে গেল।

আহা, কী অপূর্ব স্বাদ ফলগুলোর। কয়েক থোকা ফল সাবাড় করে গাছটাকে সাষ্টাঙ্গে একেবার প্রণিপাত করে ফেললুম। তারপর দারুণ স্ফূর্তি লাগল। খোলা বিরাট মাঠটায় দৌড়তে শুরু করলাম। কখনও ডিগবাজি খেয়ে, কখনও ছুটোছুটি করে একটি ধেড়ে শিশু হয়ে পাখির ঝাঁকের পেছনে তাড়া করে সে এক উদ্দাম স্ফূর্তি।

তারপর গান গাইতে ইচ্ছে করল। তার পরে গান ধরলুম—মাথায় যা এল, সেই কথা দিয়ে অগড়ুম-বাগড়ুম একখানা বিকট গান।

'স্বগ্‌গে এসে গেছি ভাইরে
স্বগ্‌গে এসে গেছি হো হো স্বগ্‌গে এসে গেছি।'

কতক্ষণ পরে আমার সম্বিৎ ফিরল। থমকে দাঁড়ালুম। এ আমি কী করছি। সর্বনাশ পাগলামির লক্ষণ যে ফুটে বেরুচ্ছে আমার আচরণ! ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। কখন বিকেলে গাঢ় পাট্‌কিলে রঙের রোদ ফুরিয়ে ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। চারপাশে নীলাভ কুয়াশা জমে উঠেছে। আমার পায়ের কাছে ঠাহর করে দেখি, ব্যুমেরাং গড়নের কাঠপোকাদের দল ঘাসে মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে। আঁতকে উঠে সরে গেলুম।

তারপর সোজা পুবের বিচের দিকে হনহন করে চলতে থাকলুম। ওদিকটা ফাঁকা। সমুদ্র জুড়ে আবছা লালচে আভা মিলিয়ে গেল। প্রবাল পাঁচিলের ভাঙা অংশটার ওপারে দিগন্ত রেখা আর চেনা যাচ্ছিল না। কিন্তু বাতাসটা কেমন যেন ঈষদুষ্ণ ফুলের সুন্দর গন্ধ সন্ধ্যার মুখে আরও ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। ওপর দিকটায় পাথরের চওড়া চাতাল মতো একটা জায়গায় বসে পড়লুম।

শুঁড়ের মতো শিসওয়ালা সেই বেগুনি ফুলের আচরণের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল ফলদাতা শীর্ণ গাছটার কথাও। এর একটা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকা উচিত বৈকি। কোনও লতানে গাছ কোনও জিনিসকে আঁকড়ে ধরে পেঁচিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করে। এতে তার বহুক্ষণ সময় লাগে। এমন যদি হয়, লতানে গাছটার এই গতিকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? ওই বেগুনি ফুলের শিসের মতোই আচরণ করবে না কি? তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছিলুম মনে পড়ছে। একটা ব্যাখ্যা এ থেকে মেলে। আমার শরীর থেকে খানিকটা গতিশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল গাছটার মধ্যে। তার সঙ্গে যদি তার নিজের গতিশক্তি যোগ করা হয়, তাহলে দ্বিগুণ গতির চাপে সে কাঁপবে, কিছুক্ষণ ধরে আন্দোলিত হবে। এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

আর ওই ফলের গাছটার মধ্যে এমন কোনও উপাদান আছে, আমার শরীরের কোনও উপাদান যাকে আকর্ষণ করতে পারে। হয়তো আমার মুখের ভেতর সেই আকর্ষণ জিনিসটা আছে—চুম্বকের মতো তার টান।

আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে ফেললুম। সেই চিৎকার-চেঁচামেচির একটা ব্যাখ্যা আগেই এসেছে। এ বিশ্বের স্পেস বলতে যা বোঝায়, তা কিন্তু আদতে শূন্য নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীর মতে, শূন্যস্থান বলে কিছু নেই। আর স্পেসে সব ধ্বনি আসলে স্পন্দনের তরঙ্গরেখা হয়ে অনন্তকাল আঁকা থেকে যায়। তেমনি সব দৃশ্যের চিত্ররূপও হয়তো স্থানকালব্যাপী অক্ষয় হয়ে থাকে। হিরোশিমায় অ্যাটম বোমা পড়ার সময়কার দৃশ্যগুলি পরবর্তী সময়ে বহুরাত্রে ভেসে উঠতে দেখা গেছে। ঠিক তেমনি করে বহু বছর আগের কোনও চিৎকার এই কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদের কোষে কোষে তরঙ্গরেখা হয়ে গ্রামোফোন রেকর্ড বা ক্যাসেট টেপের মতো আঁকা হয়ে গেছে। কোনও কোনও সময় প্রাকৃতিক কারণেই রেকর্ডগুলি বেজে ওঠে। প্রকৃতিতে তো সত্যি করে ধ্বংস বলে কিছু নেই। একদিক থেকে যা ধ্বংস, অন্যদিক থেকে তাই সৃষ্টি। কোনও কিছু শূন্যে নিঃশেষিত হওয়ার নয়। সবকিছুর রূপান্তর আছে, ধ্বংস নেই।

কিন্তু কবে কতবছর আগে কে কাকে নিষেধ করেছিল 'স্টপ ইট' বলে? কী করছিল অন্য লোকটি যে, তাকে থামতে বলতে হয়েছিল? আর কেই বা 'আই মাস্ট কিল ইউ' বলে হিংসায় গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কার ওপর? তারা কারা? ভাষা শুনে মনে হয় তারা ইংরেজ। নিশ্চয় দ্বীপের কোথাও তাদের কোনও চিহ্ন এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রিয়বর্ধন বলেছিল, এই দ্বীপে নাকি জলদস্যুদের গুপ্তধন লুকানো আছে। তারা কি একদল জলদস্যু? প্রবাল পাঁচিলে ধাক্কা লেগেই কি জাহাজ ডুবি হয়ে তারা এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল?

হঠাৎ কোথায় ক্ষীণ সুরে মাউথ অর্গান বেজে উঠল। আমি আর বসে থাকতে পারলুম না। সুর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম আবছা অন্ধকারে। সুরটা আসছে সোজাসুজি দক্ষিণ দিক থেকে। বিচ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে তাকালাম। তারপর চেঁচিয়ে বললুম, 'কে তুমি?'

বাজনা থেমে গেল। কয়েকবার অকারণে ডাকাডাকি করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলুম। জলের ধারে পৌঁছতেই কালো একটা জিনিস চোখে পড়ল। একটু ঝুঁকে দেখেই চমকে উঠলুম। মানুষই বটে। অমনি মনে হল, প্রিয়বর্ধন নয় তো? প্রিয়বর্ধন হতেও পারে, নাও পারে। কিওটা দ্বীপে সব কিছু উলটোপালটা ব্যাপার।

কিন্তু আজ সারাটা দিন একটা অদ্ভুত মানসিকতা নিয়ে কাটিয়েছি। প্রিয়বর্ধনের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলুম। কদাচিৎ তার কথা মনে পড়লেও আমল দিইনি। আসলে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। ইশ! কী অকৃতজ্ঞ আমি! আমি দিব্যি তীরে পৌঁছুতে পারলুম আর সে-বেচারা কোথায় অসহায় হয়ে ভেসে গেল—তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দূরে থাক, তাকে খুঁজে দেখার চেষ্টাও করলুম না।

নিজের ওপর খাপ্পা হতে নিঃসাড় দেহটার গায়ে হাত রাখলুম। বুকে স্পন্দন অনুভব করে বোঝা গেল, যাই হোক, লোকটা মরেনি। কিন্তু এই অন্ধকারে যে প্রিয়বর্ধন কি না বোঝার উপায় নেই। লোকটিকে কিছুক্ষণ উত্তাপ দিতে পারলে তার জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু অন্ধকারে শুকনো কাঠ খুঁজে আনাই সমস্যা। পা দুটো জলে এবং শরীর ডাঙায় পড়ে আছে লোকটার। ঢেউ এসে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। তবে অনুমান, জোয়ার ও ভাঁটার মাছামাঝি সময়ে লোকটা এখানে পৌঁছেছে। কিংবা এমনও হতে পারে ঢেউয়ে ভেসে এসেছে। আবার ভেসে যেতে পারে জোয়ারের টানে।

বালির ওপর তাকে টানতে টানতে উঁচু জায়গায় নিয়ে গেলুম। তারপর কী করা যায় ভাবছি, হঠাৎ লোকটা অস্পষ্ট শব্দ করল।

তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে চেতনা ফেরানোর চেষ্টা করলুম। কিন্তু আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

তাকে ফেলে চলে যেতে পারি না—আর যাবই বা কোথায়? একটু তফাতে আমি বালির ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। অচেতন হোক, কিংবা মরাই হোক, জনমাবনহীন দ্বীপে মাঝে মাঝে ওইসব ভৌতিক চিৎকার আর বাজনার মধ্যে অন্তত একজন মানুষের কাছে শুয়ে থাকাটা অনেক ভাল। মনে জোর পাওয়া যায়।

ঘুম ভাঙল রোদের তাপ লেগে। সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গীর কথা মনে পড়ল। ধুড়মুড় করে উঠে দেখি, তার পাত্তা নেই।

এ-তো ভারি ভয়ের কথা! কোনও জন্তুজানোয়ারে তুলে নিয়ে যায়নি তো? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে তাকে খুঁজছি, সেই সময় অজানা ভাষায় একটা চেঁচামেচি কানে এল! ঝটপট উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, ঘাসের মাঠে দু-হাত ওপরে তুলে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে এদিকেই দৌড়ে আসছে আমার মতো ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা এক পাগলাটে মূর্তি এবং সে আর কেউ নয়, শ্রীমান প্রিয়বর্ধন!

আমাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল আগেকার মতো ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে—'পালাও, পালাও।'

দৌড়ে আমার পাশ কাটিয়ে সে জলে ঝাঁপ দেওয়ার উপক্রম করলে আমি তাকে ধরে ফেললুম। প্রিয়বর্ধন হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ভূত! ভূত! এ দ্বীপে ভূতের আস্তানা আছে, জয়ন্ত!'

তাকে ধাতস্ত করতে বেগ পেতে হল। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করার পর আগাগোড়া মোটামুটি সব ঘটনা বললাম। সে কানখাড়া করে শুনে একটু হাসল। 'তোমার সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে। তবে তুমি ওই যে বললে, সারা রাত আমাকে চিনতে পারনি—এটা তোমার উচিত হয়নি, জয়ন্ত। আমি হলে ঘোর অন্ধকারেও তোমাকে ছুঁয়েই টের পেতুম। সূর্যের তাপ পেয়ে আমার জ্ঞান ফিরে দেখি, পাশে তুমি। আমি তো হতভম্ব একেবারে। ঘুমোচ্ছ দেখে আর জাগালুম না। জলটা যা ঘোলা, একটাও মাছ দেখা গেল না। তখন ওদিকে গেলুম, দেখি কিছু খাদ্য জোগাড় করা যায় নাকি। অন্তত শুকনো নারকোল গোটাকতক। কিন্তু এমন অখাদ্য দ্বীপ কে কবে দেখেছে, সেখানে নারকোল গাছের বালাই নেই। খানিকটা গিয়ে চোখে পড়ল একটা আপেল গাছ! যেই হাত বাড়িয়েছি, বললে বিশ্বাস করবে না, গাছের একটা ছিপছিপে ডাল সাঁই করে চাবুকের মতো আমার ওপর পড়ল। তারপর আবার একটা—আবার! লোক নেই, জন নেই—অথচ আমাকে ছিপটি মারছে... বাপ্‌স!'

হাসতে হাসতে বললুম, 'আপেল গাছটার তোমাকে পছন্দ হয়নি। এস, আমি তোমাকে আমার বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাই। ফল খাইয়ে আনি।'

সন্দিগ্ধ মুখে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। বলল, 'এ দ্বীপে তোমার বন্ধু জুটেছে বুঝি? কিন্তু ঘর-বাড়ি বা মানুষজন তো চোখে পড়ল না।'

'এসোই না।' বলে কয়েক পা এগিয়ে গেছি, সেই সময় ডান দিকের উঁচু উঁচু গাছগুলোর ভেতর থেকে সেই খ্যান খ্যান চিৎকার জেগে উঠল—'স্টপ ইট! স্টপ্ ইট! আই সে—স্টপ ইট!' প্রিয়বর্ধন দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'ওরে বাবা! ওই শোনো কারা ঝগড়া করছে।'

তাকে তখনও খুলে বলিনি, আমরা কিংবদন্তিখ্যাত কিওটা দ্বীপে আছি। বললে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে, বুঝতে পারছিলুম না। কারণ, এ দ্বীপে নাকি গুপ্তধন আছে বলে তার বিশ্বাস আছে। ভেবেছিলুম, গুপ্তধনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আমার সঙ্গে তার বন্ধুতা চটে যেতে পারে।

একটু পরে মাঠের মাঝামাঝি গেলে বাঁ দিকের জঙ্গলের ভেতর আজও সেই চাপা গম্ভীর অর্কেস্ট্রার বাজনা বেজে উঠল। প্রিয়বর্ধন খুশিতে নেচে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'গির্জায় প্রার্থনাসঙ্গীত হচ্ছে জয়ন্ত! চলো, চলো—আমরা আগে ওখানে যাই!'

প্রার্থনাসঙ্গীত শুনে প্রিয়বর্ধনের কেমন যেন ঘোর লেগেছে। অস্থির হয়ে বলল, 'আমি একজন খ্রিস্টান, জয়ন্ত। তুমি হিন্দু। ওই প্রার্থনা-সঙ্গীতের মর্ম তুমি বুঝবে না। তুমি আমার সঙ্গে যাবে তো এস, আমি চললুম। প্রার্থনায় যোগ না দিলে আমার পাপ হবে।'

এই বলে সে দৌড়ুতে শুরু করল। আমি ওকে ডাকাডাকি করেও ফেরাতে পারলুম না। দেখতে দেখতে সে বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

অগত্যা সেই দয়ালু গাছটার উদ্দেশে এগিয়ে গেলুম। এখনই প্রিয়বর্ধন হন্যে হয়ে ফিরে আসবে।

তাই এল—যখন আমি রসালো পিচ জাতীয় ফল খাচ্ছি। খাচ্ছি মানে ঘাসের ওপর বসে হাঁ করছি, আর একটা করে থোকা আমার মুখে ঢুকছে।

প্রিয়বর্ধনকে দেখে বললুম, 'কী? খুঁজে পেলে গির্জা!'

প্রিয়বর্ধন সে কথার জবাব দিল না। আমার কাণ্ডটা তার চোখে পড়েছিল। সে অবাক হয়ে একটুখানি দেখার পর ধুপ করে বসে পড়ল এবং প্রকাণ্ড হাঁ করল।

মনে হচ্ছিল, আমার দাতা ভদ্রলোকের ভাঁড়ার এবেলাতেই সে উজাড় করে ছাড়বে। এক গাদা ফল গিলে পেটটা ঢাকের মতো ফুলিয়ে বিকট এক ঢেকুর ছেড়ে সে ফিক করে হাসল। বলল, 'জয়ন্ত! আমি স্বপ্ন দেখছি। তাই না?'...

আবার শয়তানের কবলে

সেদিন দুপুর অব্দি প্রিয়বর্ধন স্বপ্ন স্বপ্ন করেই কাটাল! তার পাগলামি দেখে হাসি পাচ্ছিল। সে এই উৎকট স্বপ্ন ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে তার গায়ে চিমটি কাটতে বলেছিল। নিজেও চেষ্টা করছিল স্বপ্নটা যাতে ভাঙে। নিজের মাথায় চাঁটি মেরে, কখনও ডিগবাজি খেয়ে, কখনও বা গাছের গুঁড়িতে ঢু মেরে সে একসময় বাচ্চা ছেলের মতো ভ্যাঁ করে কেঁদেও ফেলল।

তখন আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। হাসতে হাসতে বললাম, "প্রিয়বর্ধন, তুমি কি এখনও টের পাচ্ছ না যে ব্যাপারটা স্বপ্ন নয় বাস্তব।"

প্রিয়বর্ধন চোখ মুছে নাক ঝেড়ে বলল, "অসম্ভব! জয়ন্ত, আমরা হয়তো আসলে কোনও ডাইনির দ্বীপে এসে পড়েছি। এসবই তার জাদুর খেলা। এরপর মন্ত্রবলে ডাইনিটা হয়তো আমাদের ওইরকম গাছপালা করে ফেলবে। আমাদের আর মানুষ হয়ে দেশে ফেরা হবে না।"

"প্রিয়বর্ধন, তুমি কান করে শোনো তো! বেহালার মতো সুর শুনতে পাচ্ছ না?"

প্রিয়বর্ধন শুনতে শুনতে বলল, "তা তো পাচ্ছি! ওই তো ডাইনির জাদু।"

"সকালে বনের ভেতর অর্কেস্ট্রার সুর শুনে তুমি গির্জা খুঁজতে গিয়েছিলে।" গম্ভীরভাবে বললুম—"বোকা কোথাকার! এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না এটা কোন্ দ্বীপ?"

প্রিয়বর্ধন আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নড়ে বসল। তার মুখটা কেমন যেন জ্বলে উঠল কী আভায়। দম আটকানো গলায় সে বলে উঠল, "জয়ন্ত, জয়ন্ত! তবে কি এই সেই কোহাও রঙ্গো-রঙ্গো? আমরা কি তাহলে সত্যি কিওটা দ্বীপে বসে আছি?"

"হ্যাঁ, প্রিয়বর্ধন।"

প্রিয়বর্ধনের পাগলামি ঘুচে গেল সঙ্গে সঙ্গে। উত্তেজনা দমন করে সে আমার হাত ধরে টানল। চাপা গলায় বলল, "তাহলে আর দেরি না করে এস, আমারা রোজারিওর গুপ্তধন খুঁজে বের করি। চুপচাপ বসে থাকার মানে হয় না, জয়ন্ত। তাছাড়া যা শুনেছি, এই ভূতুড়ে দ্বীপে বেশিদিন মানুষ বাঁচতে পারে না। সবুজ রোগে মারা যায়।"

"সবুজ রোগ কী?"

"সে এক সাংঘাতিক অসুখ। সারা শরীর সবুজ হয়ে যায়।"

অমনি আমার মনে পড়ে গেল, রুবিদ্বীপের জেলেদের গায়ে সবুজ অ্যালার্জি হওয়ার কথা শুনেছিলুম। এবার বুক কেঁপে উঠল। প্রিয়বর্ধন আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। বললুম, "কোথায় যাচ্ছ এমন করে?"

প্রিয়বর্ধন তেমনি চাপা স্বরে বলল, "এবেলা থেকেই কাজ শুরু করা যাক। প্রথমে সারা দ্বীপের চৌহদ্দি দেখে নিই এস। চারদিক ঘুরে একটা ম্যাপ তৈরি করা দরকার। তারপর..."

বাধা দিয়ে বললুম, "ম্যাপ আঁকবে কিসে? কাগজ কলম তো নেই।"

"মাটির ওপর বা বালিতে আঁকব। সে তুমি ভেবো না।" প্রিয়বর্ধন উৎসাহের সঙ্গে বলল। "তারপর শুরু হবে তন্নতন্ন খোঁজা। এক ইঞ্চি জায়গা বাদ রাখব না।"

আমার অবাক লাগছিল ভেবে, পৃথিবীতে কতরকম মানুষ আছে তাহলে! এই এক আশ্চর্য জনমানুষহীন দ্বীপ, যেখানে গাছপালা গান গায়, যেখানে গাছপালা প্রাণীদের মতো সজাগ, মানুষের

মতোই তার দয়ালু এবং ফল তুলে দেয় ক্ষুধার্তের ঠোঁটে—এমন বিচিত্র এক ভূখণ্ডের বিস্ময়কর ঘটনাবলীর দিকে প্রিয়বর্ধনের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে লুকানো সোনাদানার প্রচণ্ড লোভে অস্থির হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করছে, 'রোজারিওর গুপ্তধন! রোজারিওর গুপ্তধন!'

ঝাঁকে ঝাঁকে ব্যুমেরাং গড়নের কাঠপোকা বা কেঠো পোকা সবুজ ঘাসের মাঠে বসে ছিল। আমরা তাদের মধ্যে গিয়ে পড়তেই তারা লাফাতে লাফাতে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। প্রিয়বর্ধনের চোখ সেদিকে নেই। মুখেচোখে ধূর্ততা ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বলছে, 'আমরা রাজা হয়ে যাব, জয়ন্ত! রোজারিওর ধনরত্ন পেলে আর পরোয়া নেই।'

রোজারিও কে, সেকথা কয়েকবার জিগ্যেস করেও জবাব পেলুম না। তখন ভাবলুম, নিশ্চয় কোনও প্রাচীন জলদস্যু হবে। রাজাকো, ক্যারিবো, কিয়াং—সবাই তাহলে এই জলদস্যু পুঁতে রাখা গুপ্তধনের জন্য হন্যে হয়ে পরস্পর লড়াই করেছে। রাজাকোর প্রাণ গেছে। ক্যারিবো আর কিয়াং এখনও জীবিত। এখন কোথায় তারা কে জানে? ক্যারিবোর সঙ্গে ডাইনির দ্বীপে আমাদের দেখা হয়েছে। তার মোটরবোট চুরি করে আমরা পালিয়ে এসেছি। ক্যারিবোর দশা কী হয়েছে, তাও বলা কঠিন।

তারপর মনে পড়ল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা। ডঃ বিকর্ণ, কাপ্তেন ব্যুগেনভিলি, আর রোমিলার কথা। মন অমনি খারাপ হয়ে গেল। নৌবাহিনীর সাহায্যে তাঁরা কি রুবি দ্বীপের চারপাশের সমুদ্রে আমার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখনও? আচ্ছা, কাপ্তেন ব্যুগনভিলি তো এ-দ্বীপে এসে পড়েছিলেন। তাঁর কি পথের কথা মনে নেই একটুও?

কিওটো যে ছোট্ট দ্বীপ, সেটা ক্রমশ বুঝতে পারছিলুম। উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণে দু'-মাইল গিয়েই আবার সমুদ্র দেখা গেল। তারপর পশ্চিমে এগিয়ে গেলুম আমরা। পশ্চিম এলাকাটা ছোট-বড় পাহাড়ে দুর্গম হয়ে আছে। একেবারে ন্যাড়া পাথুরে পাহাড়। কিন্তু কী বিচিত্র রঙ তাদের। কোনওটা কালো, কোনওটা লাল, হলুদ, নীল। একটা সবুজ রঙের পাহাড়ও দেখতে পেলুম। এদিকে গাছপালা নেই বললেই চলে। একটা লাল টিলার ওপর পৌঁছে দ্বীপটা পুরো চোখে পড়ল।

দ্বীপটার গড়ন তিনকোনা। মধ্যিখানে বিরাট সবুজ ফাঁকা মাঠ। মাঠ জুড়ে টুকরো পাথর পড়ে আছে। উত্তর ও দক্ষিণে ঘন বন। পুবে কিছুটা ফাঁকা। কিন্তু তিনকোনা দ্বীপটাকে ঘিরে রেখেছে প্রায় গোলাকার প্রবাল পাঁচিল। এটাকে বলয় দ্বীপ বলা যায়। প্রবাল পাঁচিলটা শুধু পুবের দিকে এক জায়গায় ভাঙা এবং সেটাই এই দ্বীপে ঢোকার গেট যেন। ওই গেট দিয়ে আমরা আসতে পেরেছি। বাকি সমস্ত বলয় উঁচু হয়ে ঘিরে রেখেছে পাঁচিলের মতো। তার গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে মহাসাগরের প্রচণ্ড সব ঢেউ। আছড়ে পড়ে ধুয়ে দিচ্ছে পাঁচিলকে। এতক্ষণে সামুদ্রিক পাখির ওড়াউড়ি চোখে পড়ল প্রবাল বলয়ের কাছে।

প্রিয়বর্ধন বলল, "হুঁ—তাহলে মোটামুটি একটা ম্যাপ পাওয়া গেল। এবার জয়ন্ত, আমরা কিছু সূত্র খুঁজব।"

"কিসের সূত্র?"

প্রিয়বর্ধন হাসল। "রোজারিও যখন এ দ্বীপে ধনরত্ন পুঁততে এসেছিল, তখন নিশ্চয় কিছু চিহ্ন রেখেছিল। ধরো, জাহাজের একটুকরো কাঠ, কিংবা পেরেক। অথবা একটা হাতুড়ি।..... যাই হোক, খুঁজলে নিশ্চয় পেয়ে যাব কিছু। এখান থেকেই খুঁজতে শুরু করি।"

"প্রিয়বর্ধন, এ-দ্বীপে যেই এসেছে, তাকে আসতে হয়েছে পুবের ওই ভাঙা জায়গাটা দিয়ে। কাজেই...."

আমার কথা কেড়ে প্রিয়বর্ধন বলল, "ওহে বোকারাম! যেখান দিয়েই আসুক, গুপ্তধন লুকানোর জন্য দুর্গম জায়গা সে বেছে নেবে কি না?"

"তা ঠিক।"

"দুর্গম জায়গা বলতে দেখছি, এই পাহাড়ি এলাকা আর ওই ঘন জঙ্গল। এখান থেকেই শুরু করি। এস। বলে প্রবল উৎসাহে সে টিলা থেকে নামতে থাকল।

তাকে অনুসরণ করলুম। দুপুর গড়িয়ে গেছে। এত ঘোরাঘুরি করছি, অথচ একটুও ক্লান্তি লাগছে না। নিশ্চয় সেই ফলের গুণ। টিলার নিচে পৌঁছে একটা পাহাড়ি খাদের দিকে পা বাড়াল প্রিয়বর্ধন। ডান দিকে এক ছিপছিপে চেহারার গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই গাছটা হঠাৎ পিয়ানোর বাজনা বাজাতে শুরু করল। কী মনমাতানো সে সুর! আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। "প্রিয়বর্ধন! শোনো, শোনো!" বলে ডাকলুম। কিন্তু সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, "কী শুনব? আমার এক খুড়ো ওর চেয়ে ভাল পিয়ানো বাজাতে পারে! দেখছ না? বাতাস বইছে বলেই গাছটা এমন বিচ্ছিরি ভূতুড়ে শব্দ করছে। চলে এস।"

বেরসিক প্রিয়বর্ধনের টানে এগিয়ে যেতে হল। খাদটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। খাদের দু'ধারে রঙিন পাহাড় দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক পা এগিয়ে প্রিয়বর্ধন হঠাৎ বসে পড়ল। তারপর উত্তেজিতভাবে বলল, "পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!"

গিয়ে দেখি, একটা মরচে ধরা লোহার রড মাটির ভেতর কাত হয়ে ঢুকে রয়েছে। সেটা টানাটানি করতেই খানিকটা চাবড়া উঠে গেল মাটির। তারপর যা দেখলুম, ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠলুম। ওটা রড নয় আসলে একটা তলোয়ারের বাঁট। আর চাবড়ার তলায় একটা মানুষের কঙ্কাল দেখা যাচ্ছে। তালোয়ারটা কঙ্কালের ভেতর বিঁধে রয়েছে। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "প্রিয়বর্ধন! কেউ এই মানুষটাকে তালোয়ার বিঁধিয়ে খুন করেছিল। সেই অবস্থায় পড়ে ছিল মৃতদেহটা। বছরের পর বছর বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে ঢালু খাদে এসে জমেছে আর ওকে ঢেকে ফেলেছে।"

প্রিয়বর্ধন বলল, "এ তাহলে নিশ্চয় রোজারিওর দলের লোক। এস, এগিয়ে গেলে আমরা আরও সূত্র পাব।"

আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। খাদে বিকেলের গাঢ় ছায়া জমে আছে। আর এখানে ওখানে পড়ে আছে আরও কয়েকটা নরকঙ্কাল। কোনওটা মুণ্ডুহীন। মুণ্ডটা পড়ে আছে আলাদা হয়ে। কালো ছায়ায় কঙ্কাল আর খুলিগুলো ধপধপে সাদা দেখাচ্ছে। দেখলে আতঙ্কে শরীর হিম হয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ আগে শোনা সেই চিৎকার বা গর্জন শুনতে পেলুম। "স্টপ ইট! "স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট!" দু-ধারের পাহাড়ে গম গম করে প্রতিধ্বনি উঠল। কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। সেই সময় দেখলুম প্রিয়বর্ধন আতঙ্কে পাগলের মতো যে পথে এসেছি, সেই পথে দৌড়তে শুরু করেছে। আমি তাকে অনুসরণ করলুম।

শব্দগুলো যেন সারা দ্বীপ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে। তারপর শোনা গেল, "আই মাস্ট কিল ইউ!"..."কিল ইউ... কিল...কিল!" তারপর আর্তনাদ! "হেল্প! হেল্প! হেল্প!" সেই সঙ্গে অন্তিম আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

প্রিয়বর্ধন জঙ্গলের ভেতর উদ্‌ভ্রান্তের মতো দৌড়ুচ্ছিল। তার ধরে ফেললুম। বললুম, "ও কিছু নয়, প্রিয়বর্ধন! অতীতের প্রতিধ্বনি মাত্র। অত ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

প্রিয়বর্ধন ধুপ করে ঘাসে বসে পড়ল। তারপর ভয়ার্ত মুখে বলল, 'রোজারিওর ভূত, জয়ন্ত! শুধু একা নয় ওর দলের সবাই ভূত হয়ে গেছে। আমাদের বরাত বড় মন্দ। তুমি বুঝতে পারছ না? ভূত হয়ে গেছে। ওরা ভূত হয়ে গুপ্তধন পাহারা দিচ্ছে।"

ওকে টেনে ওঠালুম। "কাল সকাল থেকে খোঁজা যাবে। আমরা পুব দিকের বিচে যাই। বেলা পড়ে আসছে। অচেনা জায়গার চেয়ে চেনা জায়গায় রাত কাটানোই ভালো।"

দু'জনে বাঁ দিকে ঘুরে ফাঁকা মাঠের দিকে এগিয়ে গেলুম। বনের ভেতর কোথাও ক্ষীণ সুরে বাঁশি বাজছিল। ক্রমশ সেই সুর চাপা দিয়ে গম্ভীর অর্কেস্ট্রা শুরু হল। প্রিয়বর্ধন ভয় পেয়ে লম্বা পায়ে হাঁটতে থাকল।

কিন্তু ফাঁকা মাঠের ধারে পৌঁছতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

ক্যাকটাস জাতীয় একটা অদ্ভুত গড়নের প্রাণী কিংবা নিছক গাছ আস্তেসুস্থে হেঁটে যাচ্ছে। প্রিয়বর্ধন বলে উঠল, "ও কী জয়ন্ত! ওটা গাছ, না কোনও জন্তু?"

অবাক হয়ে বললুম, "আশ্চর্য! ওটা যে দেখছি একটা ক্যাকটাস! চলো, তো দেখি।"

প্রিয়বর্ধন আমার পিছনে কুণ্ঠিতভাবে এগুলো। সেই বিচিত্র চলমান ক্যাকটাসের হাত দশেক দূরে পৌঁছলে সেটা থেমে গেল। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলুম, ওটার নিচের দিক থেকে একরাশ শেকড় কেঁচোর মতো নেমে মাটিতে ঢুকে গেল।

সাহস করে কাছে গেলুম। সত্যি ক্যাকটাসই বটে। এমন বিদ্‌ঘুটে চলমান ক্যাকটাস দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ।

প্রিয়বর্ধনের তাড়ায় এগিয়ে যেতে হল। কিছু দূরে গিয়ে একবার পিছু ফিরে দেখলুম, অদ্ভুত ক্যাকটাস জীবটি আবার চলতে শুরু করেছে। বললুম, 'প্রিয়বর্ধন! তাহলে দেখা যাচ্ছে চলমান উদ্ভিদও পৃথিবীতে আছে। কে জানে এই সৃষ্টিছাড়া দ্বীপে আরও কত বিচিত্র উদ্ভিদ দেখতে পাব।"

প্রিয়বর্ধন সে কথায় কান না করে একটু হেসে বলল, "আবার কিন্তু খিদে পেয়েছে!"

মাঠের ভেলভেটের মতো নরম সবুজ ঘাসের ওপর সেই পিচ জাতীয় ফলের গাছ আরও অনেক আছে। একটা গাছের দিকে পা বাড়িয়েছি, সেই সময় প্রিয়বর্ধন বলে উঠল, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওটা কী দেখ তো?"

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, শেষ বিকেলের সমুদ্রের প্রবাল পাঁচিলের সেই ভাঙা অংশটার কাছে সাদা কী একটা ঢেউয়ে ভেসে উঠছে আবার যেন তলিয়ে যাচ্ছে। ভাল করে দেখে বুঝলুম, ওটা একটা মোটরবোটই বটে!

আনন্দে চিৎকার করে দৌড়ুতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাঁ পাশে পড়ে থাকা কয়েকটা পাথরের আড়াল থেকে তিনটে মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "হ্যান্ডস্ আপ!"

মূর্তিত্রয় এ-দ্বীপের কোনও আজব গাছ-মানুষ, না আমাদের মতো মানুষ লক্ষ্য করতে গিয়ে চোখে পড়ল, তাদের হাতে রিভলভার আর বন্দুকও আছে। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলুম।

তারপর প্রিয়বর্ধন দু'হাত তুলে ফিসফিস করে উঠল, "শয়তান ক্যারিবো!"

এবার চিনতে পারলুম ক্যারিবোকে। সে এগিয়ে এসেই প্রিয়বর্ধনের চোয়ালে রিভলভারের বাঁট দিয়ে মারল। প্রিয়বর্ধন পড়ে গেল। তারপর ক্যারিবো আমার দিকে ঘুরে কুৎসিত হেসে বলল, "এই যে কলকাতাওয়ালা বাঙালিবাবু। মোটর বোট চুরির শাস্তি কত ভয়ঙ্কর, একটু-একটু করে টের পাবে এবার। ফুতাং! একে বিচে নিয়ে চল্! আর উঁচু, তুই ওই দোআঁশলা বদমাশটাকে তুলে নিয়ে আয়।"

গরিলার মতো চেহারা—সম্ভবত মালয়ের লোক, সেই ফুতাং এসে আমার ঘাড় ধরল। ওর অন্য হাতে বন্দুক। কিছু করার নেই। উংচু নামে বেঁটে হিংস্র চেহারার লোকটার গায়ে যেন দৈত্যের বল। সে প্রিয়বর্ধনকে পুতুলের মতো কাঁধে তুলে নিয়ে চলল পুবের বিচের দিকে। প্রিয়বর্ধন অজ্ঞান হয়ে গেছে। কষায় রক্ত গড়াচ্ছে।

বিচের বালিতে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল ফুতাং। ক্যারিবো বিকট হেসে বলল, 'তারপর বাঙালিবাবু! প্রথমে বলো তো গুপ্তধনের হদিশ কতটা পেলে? তারপর অন্যকথা।"

ক্যাকটাস-মাকড়সা ও বেতারযন্ত্র

ক্যারিবোর চোখের ভেতর হিংসা যেমন, তেমনি লোভও ঝকমক করতে দেখছিলুম। সে আমাদের মেরে ফেলবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে জেনে নিতে চায়, আমারা গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি কি না। পেয়ে থাকলে ওকে আর কষ্ট করতে হবে না এবং আমরা সেখানে তাকে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

তাই একটু হেসে বললুম, "ক্যারিবো রোজারিওর গুপ্তধন যেখানে পোঁতা আছে, সেখানে যাওয়ার অনেক বিপদ।"

ক্যারিবো আমার পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে হিস হিস করে বলল, "বাজে কথা রাখো। খোঁজ পেয়েছ কি না জানতে চাই। যদি পেয়ে থাকো, তোমার অন্তত বাঁচার আশা আছে। তবে ওই নচ্ছার বিশ্বাসঘাতকটাকে মেরে ফেলব। ডাইনির দ্বীপের একটা গাছে রবারের ভেলা টাঙানো আছে দেখেই বুঝেছিলুম, কে আমাদের মোটরবোট চুরি করে পালিয়েছে। যাই হোক, সে-সব কথায় লাভ নেই। বলো, গুপ্তধনের খবর কী?"

"বললুম তো! সেখানে কোনও মানুষ যেতে পারে না।"

"কেন?"

রোজারিও আর তার স্যাঙাতদের আত্মা সেই ধন পাহারা দিচ্ছে। তুমি কি এই দ্বীপে পৌঁছে তাদের চিৎকার শোনোনি?"

ক্যারিবো একবার ভয়ের চোখে বিচের ওপরদিকটা দেখে নিয়ে বলল, "শুনেছি। কিন্তু ভয় পাইনি। কারণ তখনই দেখতে পেলুম, তোমরা দুজনে দিব্যি আস্তেসুস্থে হেঁটে আসছ। তোমাদের যখন বিপদ হচ্ছে না, তখন আমাদেরও হবে না ভাবলুম।"

"তারপর আমাদের টিট করার জন্য পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলে!"

ক্যারিবো ধমক দিয়ে বলল, "ন্যাকামি ছাড়ো। চলো কোথায় আছে রোজারিওর সোনাদানা?"

হাসতে হাসতে বললুম,"কিন্তু এখন তো দিন ফুরিয়ে গেল। রাতে সেখানে যাবে কেমন করে? সকাল হতে দাও, তবে তো।"

ক্যারিবো কথাটা তলিয়ে দেখে বলল, "ঠিক আছে। সকালেই যাব। কিন্তু জায়গাটা কতদূর?"

"পশ্চিম প্রান্তে। পাহাড়ি খাদের ভেতর। সেখানে অজস্র নরকঙ্কাল আর খুলি পড়ে আছে। তারা কিন্তু জীবন্ত মানুষ দেখলেই—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই উংচু ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল, "কর্তা! কর্তা! ওই শুনুন কে বাজনা বাজাচ্ছে আবার!"

ক্যারিবো তাকে ধমক দিয়ে বলল, "তুই জানিস না ব্যাটা, কিওটা দ্বীপের গাছপালা গান গায় আর বাজনা বাজায়?"

ফুতাং ফিক করে হেসে বলল, "শুনেছি, ওরা ধেই ধেই করে নাচেও।"

ক্যারিবো আমাকে বলল, "কী হে বাঙালিবাবু? গাছের নাচ দেখতে পাওনি?"

বললুম, "দেখিনি। তবে অসম্ভব নয়। একটা ক্যাকটাসকে তখন হেঁটে বেড়াতে দেখেছিলুম। কাজেই নাচতেও অসুবিধে কিসের? যাই হোক, ক্যারিবো! গুপ্তধনের জায়গায় তোমাকে নিয়ে যাব বলেছি—ঠিকই নিয়ে যাব। কিন্তু তার বদলে এই কি তোমার অতিথি সৎকারের নমুনা? আমাদের অন্তত এককাপ করে কফি খাওয়াও।"

ক্যারিবো অচৈতন্য প্রিয়বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বলল, "হতচ্ছাড়াটা তো দেখছি ভিরমি খেয়ে পড়ে রইল। ওহে ফুতাং বেঁচে আছে তো?"

ফুতাং বলল, "আছে কর্তা। পিট পিট করে তাকাচ্ছে!"

ক্যারিবো উঠে দাঁড়াল। "উংচু, ফুতাং! তোরা এবার বোটটা এখানে টেনে নিয়ে আয়। খাবার দাবার, তাঁবু সব কিছু ওতে রয়ে গেছে। এখানে না আনলে মেরামত করব কেমন করে?"

ওরা দু'জনে পোশাক খুলে সাঁতারু সেজে জলে নামল। গোধূলির আলো তখনও ফুরিয়ে যায়নি। প্রবাল পাঁচিলের দিকে ওরা সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল।

ক্যারিবো প্রিয়বর্ধনের ঘাড় ধরে টেনে বসিয়ে দিল। প্রিয়বর্ধন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার ও ক্যারিবোর দিকে। ওর কাছে গিয়ে বললুম, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। ক্যারিবোর সঙ্গে মিটমাট করে নাও। তোমাকে গুপ্তধনের জায়গায় পৌঁছে দিলে আমাদের ছেড়ে দেবে ক্যারিবো?"

প্রিয়বর্ধনকে চোখের ইশারা করতেই সে বুঝে নিল ব্যাপারটা। বলল, "ঠিক আছে।"

ক্যারিবো খুশির ভাব দেখিয়ে বলল, "হ্যাঁ—পৌঁছে দিলেই তোমাদের ছুটি। শুধু তাই নয়, কিছু ভাগও পাবে। এমনকী, রুবি দ্বীপে পৌঁছেও দেব।"

আমি যেমন জানি, তেমনি প্রিয়বর্ধনও টের পেল, ক্যারিবো আমাদের কী দশা করবে শেষ পর্যন্ত। বুদ্ধিমান প্রিয়বর্ধন মাতৃভাষায় কথা বলতে শুরু করল ক্যারিবোর সঙ্গে। বুঝতে পারছিলুম, সে অনুনয়-বিনয় করে ক্ষমা চাইছে।

অনেক দেরি করে ফিরল ফুতাং ও উংচু। ততক্ষণে এক ফালি চাঁদ উঠেছে। সমুদ্রে ওপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না খেলছে। বিচের ওপর সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা মাঝে মাঝে যেন বেহালার ছড়া টেনে করুণ সুর বাজাচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। মোটরবোটটা টেনে বালিতে তুলল ওরা। ক্যারিবো রিভলভার হাতে নিয়ে আমাদের পাহারা দিচ্ছে। জিনিসপত্র নামিয়ে আনতে হুকুম দিল সে।

একটু পরে বিচের মাথায় উঁচু জায়গায় একটা তাঁবু খাটানো হল। তারপর স্টোভ জ্বেলে কফি বানাল ওরা। ফুতাং রাতের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত হল। বুঝলুম, রীতিমতো তৈরি হয়েই এসেছে। কিন্তু কিওটা দ্বীপের সন্ধান কীভাবে পেল, বুঝতে পারলুম না।

তাই বললুম, "ক্যারিবো, কফির জন্য ধন্যবাদ। এবার বলো, কেমন করে তোমরা এ-দ্বীপের খোঁজ পেলে?"

ক্যারিবো ধূর্তের হাসি হেসে বলল, "তোমরা যেভাবে পেয়েছিলে!"

"আমরা দৈবাৎ এখানে ভেসে এসেছি, ক্যারিবো। বিশ্বাস করো।"

"করছি না। কারণ আমি জানি, তোমরা সেই ছোট্ট মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা কাত্তির সংকেত সূত্র উদ্ধার করতে পেরেছ। ওতে কিওটা দ্বীপের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ লেখা আছে। তোমরা ভেবেছিলে আমি ভীষণ বোকা। জানো না যে আমি আগেই কাত্তিটার সব চিহ্ন কাগজে কপি করে রেখেছিলুম। "

"কিন্তু সংকেত সূত্রগুলো তো অর্ধেক মনে হয়েছিল। অন্য কাত্তিটা না পেলে..."

আমার কথা কেড়ে ক্যারিবো বলল, "না হে বোকারাম! তা নয়। রাজাকো আসল কাত্তিটার একটা নকল বানিয়েছিল। যদি দৈবাৎ একটা খোয়া যায়, অন্যটা থাকবে। ওর টুপির ভেতরকার কাত্তিটা নকল। আসলটা ছিল মূর্তিটার ভেতরে। কাত্তিতে যে চিহ্নগুলো আছে, তার অর্থ কেবলমাত্র জানে অভিজ্ঞ নাবিকরা। কিয়াংয়ের মতো অভিজ্ঞ সমুদ্রচর লোক, কিংবা এই দেখছ আমাকে—আমার মতোও যারা সমুদ্রে ঘোরে এবং অভিজ্ঞ নাবিকদের শাগরেদি করে বড় হয়েছে, তারা সবাই ওইসব চিহ্নের অর্থ বোঝে। কিন্তু বরাত মন্দ, পৌঁছুলুম বটে কিওটায়, মোটরবোটটা কোরাল রিবে (Coral Reeb) ধাক্কা খেয়ে বিগড়ে গেল। দেখা যাক, সারাতে পারি নাকি। তবে তার আগে রোজারিওর গুপ্তধন তো আগে হাতাই। তারপর দেখা যাবে।..."

রোজারিওর গুপ্তধনের লোভে ক্যারিবো আমাদের এ-রাতে এত খাতির করছিল কহতব্য নয়। খাবারের ভাগ দিয়ে তো বটেই, আরও খিদে আছে কি না জিগ্যেস করে আতিথেয়তার চূড়ান্ত করল।

আমাকে ও প্রিয়বর্ধনকে দক্ষিণী মহাসাগর এলাকার নাবিকদের প্রিয় কড়া সিগারেটের প্যাকেট পর্যন্ত উপহার দিল। কিন্তু আমরা দু'জনেই জানি, শয়তানটার মনে কী ক্রূর মতলব খেলা করছে।

প্রবাল বলয়ের দিকটা জ্যোৎস্নায় কালো পাঁচিলের মতো দেখাচ্ছিল। দূর থেকে আছড়ে পড়া জলের চাপা গর্জন কানে আসছিল। আমাদের পেছনে কোথায় সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা ঘুমঘুম সুরে বেহালা বাজাচ্ছিল। ক্যারিবো আমাদের দু'জনকে ফুতাং ও উংচুর কড়া পাহারায় রেখে ছোট্ট তাঁবুর ভেতর ক্যাম্পখাটে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার চোখে ঘুম নেই। প্রিয়বর্ধনেরও নেই। দুজনে পাশাপাশি চিত হয়ে তাঁবুটার সামনে বালির ওপর শুয়েছিলুম। আমাদের দু'পাশে দুই প্রহরী বসে সেই বিচ্ছিরি কড়া সিগারেট টানছিল আর চাপা গলায় নিজেদের মাতৃভাষায় কথা বলছিল।

এমন সময় কী একটা শব্দ হল। খসখস শব্দ। মুখটা সাবধানে ঘুরিয়ে দেখি, ক্যারিবোর তাঁবুর পাশে কালো ঝোপ মতো—কোনও জন্তু নয় তো? কিওটায় এ পর্যন্ত ময়াল সাপ ছাড়া কোনও জন্তু দেখিনি। নাকি সত্যি একটা ঝোপ?

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও ঝোপও তো দেখিনি। জায়গাটা অনেকটা খোলামেলা। তাহলে ওটা কী হতে পারে! নিশ্চয় কোনও জন্তু। প্রহরীরা আপন কথায় ডুবে আছে। একটু পরে দেখলুম, কালো জিনিসটা নড়ে উঠল এবং এগিয়ে আসতে থাকল। জ্যোৎস্না এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে। এবার স্পষ্ট দেখতে পেলুম, দিনে যে ক্যাকটাসকে হেঁটে বেড়াতে দেখেছি, এটা সেই চলমান উদ্ভিদই বটে। খসখস শব্দে প্রহরীদের চমক জাগল। তারা যেই ঘুরেছে, অমনি সেই ক্যাকটাস-জন্তু (!) অক্টোপাসের অথবা মাকড়সার মতো একগুচ্ছের শুঁড় বাড়িয়ে উঁচু ও ফুতাংকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনেই বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। ক্যারিবোর ঘুম ভেঙে গেল। সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল। তার হাতে টর্চ ছিল। টর্চের আলোয় দেখল, অদ্ভুত ক্যাকটাস-মাকড়সা উংচু ও ফুতাংকে নিয়ে খসখস আওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। ক্যারিবো বিস্ময়ে আতঙ্কে এমন হকচকিয়ে গেল যে টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই।

আমি ও প্রিয়বর্ধন উঠে বসেছিলুম। প্রিয়বর্ধন কী বলে চেঁচিয়ে উঠল। নিশ্চয় গুলি ছুড়তে বলল ক্যারিবোকে। কারণ তারপরই ক্যারিবো রিভলভার উঁচিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে তাড়া করল।

কিন্তু আশ্চর্য, ক্যাকটাস-মাকড়সার গায়ে যেন গুলি বিঁধছে না। ক্যারিবোর টর্চটা উত্তেজনার ফলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে নিবে গেছে। প্রিয়বর্ধন দৌড়ে গিয়ে টর্চটা তুলে নিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোথা থেকে আরও কয়েকটা ক্যাকটাস-মাকড়সা খসখস শব্দ করতে করতে ক্যারিবোকে ঘিরে ফেলল। তারপর আর ক্যারিবোকে দেখতে পেলুম না। বিচিত্র উদ্ভিদ-প্রাণীর দল ব্যূহের ভেতর ঘিরে ওকে নিয়ে চলেছে। সেই দৃশ্য দেখে প্রিয়বর্ধনের হাতে টর্চ নিভে গেল এবং সে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "জয়ন্ত! জয়ন্ত! ডাইনিরা ওদের ধরে নিয়ে গেল।"

বললুম, "তাহলে এবার আশা করি, তুমি বুঝতে পেরেছ, গুপ্তধনের লোভের শাস্তি পেল ওরা।"

প্রিয়বর্ধন দিব্যি কেটে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত! আমার আর গুপ্তধনের লোভ করা উচিত নয়।"

তাঁবুর কাছে ফিরে এসে বললুম, 'যাক গে। কিওটা থেকে ফেরার আর চিন্তা রইল না। মোটরবোটটা যদি তুমি মেরামত করতে পারো, আমরা সমুদ্র পাড়ি দেব।'

তাঁবুর সামনে স্টোভ জ্বেলে আমরা আবার কফি তৈরি করলুম। কফি খেতে খেতে জ্যোৎস্নাভরা বনভূমির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটু আগের সেই বিভীষিকার কোনও আভাস নেই। বেহালা বাজিয়ে গাছটা একলা দাঁড়িয়ে কোথায় আপন মনে বেহালা বাজাচ্ছে। চারদিকে ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা। কফি খেয়ে প্রিয়বর্ধন ভয়মাখানো গলায় বলল, 'জয়ন্ত, আমরা বরং পালা করে পাহারা দিই। যদি ওই ভূতুড়ে ক্যাকটাসগুলো আমাদেরও বন্দি করে নিয়ে যায়?'

ওকে অশ্বাস দিয়ে বললুম, "প্রিয়বর্ধন, কিওটার উদ্ভিদেরা মানুষের মনের কথা যেন টের পায়। আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তাতরঙ্গ হয়তো ওদের স্নায়ুতে প্রতিধ্বনি তোলে। আমরা যদি এ-দ্বীপে কোনও খারাপ মতলব না আঁটি, ওরা আমাদের ক্ষতি করবে না। এস, আমরা আরাম করে ঘুমোই।...

এরাতে কোনও বিপদ ঘটল না। কখন একবার কিছুক্ষণের জন্য ঘুম ভেঙে কানে এসেছিল, কারা যেন দূরে মধুর সুরে গান গাইছে। এমন অপার্থিব সঙ্গীত পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠে শোনা অসম্ভব। জ্যোৎস্নরাতে কিওটার বনভূমিতে বিশ্বপ্রকৃতি নিজের হৃদয় খুলে দিয়েছে যেন।

শেষ রাতে একবার যেন শুনলুম, কে কোথায় খিলখিল করে হেসে উঠল—যেন মেয়েদেরই হাসি। স্বপ্নও হতে পারে। বাস্তবও হতে পারে। পুরুষ উদ্ভিদের মতো মেয়ে উদ্ভিদও তো আছে।

সকালে ক্যারিবোরা প্রচুর খাদ্যদ্রব্য, দড়িদড়া, শাবল, হাতুড়ি, এমনকী একটা বেতার ট্রান্সমিশন সেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল। প্রিয়বর্ধন যতক্ষণ ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিল, ততক্ষণ আমি ওই বেতার যন্ত্রটাকে চালু করার চেষ্টা করছিলুম। চালু হতেই রিসিভিং কেন্দ্রে অস্পষ্টভাবে দুর্বোধ্য ভাষায় কোন কেন্দ্রের ব্রডকাস্টিং ভেসে এল। প্রিয়বর্ধন নেচে উঠল তার মাতৃভাষা শুনে। বলল, "সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে খবর হচ্ছে।" নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা করে কেন্দ্রের সাড়া পায় আর সে চেঁচিয়ে ওঠে উত্তেজনায়। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা দক্ষিণ এশিয়ার বহু ভাষা সে জানে। কিছুক্ষণ পরে সে কোন্ কেন্দ্র থেকে কান করে কিছু শোনার পর দম আটকানো গলায় বলে উঠল, "জয়ন্ত জয়ন্ত! তোমার খবর হচ্ছে। রুবি আইল্যান্ডের নৌবাহিনীর ব্রডকাস্টিং সেন্টার থেকে জাহাজগুলোকে জানিয়ে দিচ্ছে তোমার নিরুদ্দেশের খবর। কিন্তু আমার কথা তো কেউ বলছে না!"

এই বলে সে ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে কেঁদে ফেলল। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, "ভেবো না প্রিয়বর্ধন। আমার উদ্ধার হলে তোমারও হবে। তাছাড়া মোটরবোটটা তো আছেই। বরং এবারে ট্রান্সমিশন চালু করে আমরা খবর পাঠাই বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে। কোনও-না-কোনও কেন্দ্রে তা ধরা পড়বেই।"

এদিন দুপুর পর্যন্ত ওই নিয়ে ব্যস্ত থাকলুম দু'জনে। কখনও আমি ইংরেজিতে, কখনও প্রিয়বর্ধন বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে জানাতে থাকলুম, "আমরা জয়ন্ত চৌধুরি আর পিওবের্দেনে এই দু'জন লোক কিওটা দ্বীপে আছি। অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জানা নেই। তবে ডাইনির দ্বীপ থেকে আন্দাজ সাতশো নটিক্যাল মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এটা একটা বলয়দ্বীপ। আমাদের উদ্ধার করো।"

কোনও জবাব পাচ্ছিলুম না। মাত্র একবার সম্ভবত কোনও এমেচার বা শৌখিন বেতার ট্রান্সমিশন যন্ত্রের মালিক বলে উঠল, "কিওটা? ফক্কুরি করা হচ্ছে? শোনো, ওই রসিকতা আমিও করে ভীষণ বিপদে পড়েছিলুম। নৌবাহিনীর গোয়েন্দারা এসে আমাকে ধরে বেদম ঠেঙিয়েছিল। সাবধান!"

তাকে ব্যাকুলভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কাজ হল না। সরকারি কেন্দ্রের ওয়েভলেন্থে আমরা ধরতে পারছিলুম না। কিন্তু ধরতে পারলে তারাও হয়তো মস্করা ভেবে উড়িয়ে দেবে। শেষে হতাশ হয়ে বললুম, "যাক গে। চলো প্রিয়বর্ধন, ক্যারিবো বেচারাদের খোঁজে বেরোই। হাজার হোক, ওরা মানুষ তো!"

এনজেলো! এনজেলো!

প্রিয়বর্ধন আমার সঙ্গে এল না। বলল, 'শয়তান ক্যারিবো আর ওই দুই ওরাংওটাংকে উদ্ধারের একটুও ইচ্ছা আমার নেই জয়ন্ত! ওরা উচিত শাস্তি পেয়েছে! বরং ততক্ষণ আমি মোটরবোটটা মেরামত করতে থাকি।'

আমার মন বলছিল, এ দ্বীপে আমি নিরাপদ। এই বিচিত্র সুন্দর বনভূমি আমার অসংখ্য বন্ধুতে ভরা। তারা মানুষের মতো করে কথা না বলতে পারলেও নিজেদের মতো করে কথা বলে। আমার চেতনায় অনুরণিত হচ্ছে তাদের মনের কথা। প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছি, ওরা বলতে চাইছে, 'তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের প্রিয় অতিথি।'

এক বিশাল গাছের সামনে দাঁড়িয়ে তার পায়ে হাত রাখলুম। আবার চমকে উঠলুম। যেন কোনও প্রাণীর শরীর। মনে মনে বললুম, 'আমি কোনও ক্ষতি করতে আসিনি তোমাদের। আমার মনে রোজারিওর গুপ্তধনের বিন্দুমাত্র লোভ নেই।'

আশ্চর্য, আমার চেতনায় কী একটা বোধ সঞ্চারিত হল তখনই। যেন এই বৃদ্ধ প্রপিতামহ বৃক্ষের সস্নেহ কিছু আশীর্বাদ বাক্য অস্পষ্টভাবে অনুভব করলুম। তারপর গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললুম বনের ভেতর দিয়ে। আমার সাহস চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কেউ সামনের দিক থেকে হঠাৎ খুব চাপা গলায় ফিসফিস করে বলে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো' অমনি থমকে দাঁড়ালুম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলুম না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, কাপ্তেন জর্জ ব্যুগেনভিলিও ঠিক এই ডাক শুনেছিলেন কিওটা দ্বীপে। তাহলে এও প্রাচীন যুগের সম্ভবত কোনও নাবিকেরই কণ্ঠস্বরের ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি। একটু হাসিও পেল। এক রাজার কান দুটো দেবতার অভিশাপে গাধার কানে পরিণত হয়েছিল। নাপিত ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। কিন্তু কাউকে বললেই তো গর্দান যাবে। শেষে মাঠের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ফিসফিস করে বলেছিল, 'রাজার কান দুটো গাধার!' কিছুকাল পরে সেখানে গজালো একটা নলখাগড়ার ঝোপ। আর বাতাস বইলেই সেই ঝোপ থেকে ফিসফিস করে উচ্চারিত হত, 'রাজার কান দুটো গাধার!' প্রাচীন এশিয়া মাইনরের হিটাইট দেশের মিতান্নি গোষ্ঠীর রাজা মিদাসের গল্প এটা। 'কিং মিদাস হ্যাজ অ্যাসেস ইয়ারস!' নলখাগড়ার ঝোপটা ফিসফিস করে বাতাসের সুরে ঘোষণা করত।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে, উদ্ভিদের এই বেয়াড়া স্বভাবের কথা যেন প্রাচীন যুগের মানুষরাও অন্তত আঁচ করতে পেরেছিল।

কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে আবার সামনে থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এনজেলো! এনজেলো। কাম অন! কাম অন!'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'কে তুমি ডাকছ এনজেলো বলে? আমি এনজেলো নই।'

'এনজেলো! ফলো মি।'

কেউ এনজেলোকে বলছে, 'আমাকে অনুসরণ করো।' আমি অবাক হয়ে হাঁটতে থাকলুম। কথাগুলো ক্রমশ আমার আগে-আগে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চলেছি। একটু পরে টিলা পাহাড়ের কাছে পৌঁছলুম। সামনে একটা ফাটল। ফাটলের দু'ধারে কেয়াগাছের মতো দেখতে একরকম গাছ সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, ওই গাছগুলোর ভেতর থেকে 'এনজেলো' বলে ডাক ভেসে আসছে। এবার গা ছমছম করতে থাকল। এ যেন শেষ পর্যন্ত ভৌতিক ঘটনা হয়ে যাচ্ছে। কোনও অশরীরী মানুষ যেন আমাকে এনজেলো ভেবে কোথায় ডেকে নিয়ে চলেছে।

আবার ইংরেজিতে সেই অশরীরী ফিসফিসিয়ে বলে উঠল : 'এনজেলো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। চলে এসো!'

পেছন ফিরে বনভূমির দিকে তাকালুম। মনে বললুম, 'খাব কী?' আগের মতোই আমার চেতনার ভেতর সূক্ষ্ম তরঙ্গের মতো এক বোধ সঞ্চারিত হল। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না,

শুধু বুঝলুম, আমাকে যেতে হবে! তখন হনহন করে সেই ফাটলের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করলুম।

আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ মিটার পরে দেখি একটা গুহার মুখ। মুখের ওপর ঘন লাতাপাতার ঝালর পর্দার মতো ঝুলছে। অসংখ্য ফুল ফুটে রয়েছে নানা রঙের। সুগন্ধে মউ মউ করছে। এ জায়গাটা বেশ চওড়া। একটা ঝাঁকড়া গাছ যেন ভ্রূকুটি-কুটিল অজস্র চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। সাবধানে

এগিয়ে ঝালরগুলো দু'হাতে সারালুম। গুহার ভেতর ঘন অন্ধকার থমথম করছে। ভূতগ্রস্তের মতো আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'আমি এসেছি—আমি এনজেলো দস সান্তোস!'

পরক্ষণে চমকে উঠলুম। এ আমি কী বলছি? আমার মুখ দিয়ে কার হয়তো পুরো নাম বেরিয়ে গেল—যাকে আমি চিনি না। জানি না। তার সঙ্গে আমার যুগের ব্যবধানও বিরাট। অথচ এনজেলো দস সান্তোস নামে সম্ভবত কোনও পর্তুগিজ নাবিকের নাম আমি উচ্চারণ করে ফেলেছি। কিন্তু এও বুঝতে পারছি যে এনজেলোকে ডেকে এখানে আনতে চাইছিল, সে ইংরেজ। কে সে?

এরপর আমার চেতনা যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেল। একই শরীরে জয়ন্ত এবং এনজেলো কী করছে। ঠিক এভাবেই ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায়।

হলফ করে বলতে পারি। ওই অন্ধকার গুহায় আমি কিছুতেই ঢুকতে পারতুম না। কিন্তু আমার আত্মায় এনজেলোর আত্মা ভর করেছে। আমি ঢুকে গেলুম ভেতরে। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। ওদিকে কোনও ফাটল দিয়ে আলো আসছিল। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটো গাছের ডাল আড়াআড়ি বেঁধে ক্রস গড়া হয়েছে এবং সেটা পোঁতা আছে গুহার মেঝেতে। নিশ্চয় একটা কবর। কবরের ওপর আবছা আলো এসে পড়েছে সরু ফাটল থেকে। তাই এক টুকরো তক্তা নজরে পড়ছিল। সেটা কবরে ক্রসের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় কারানো আছে। তাতে খোদাই করা আছে বড় বড় আঁকাবাঁকা হরফে :

'ক্যাপ্টেন রোজারিও এনড্রুস স্মিথ'
মৃত্যু ১৬ জুন, ১৫৯১

ফলকটা তুলে ধরে পড়ছিলুম। সেই সময়, গুহায় যে দিক থেকে ঢুকেছি, তার উল্টোদিকে ফাটল থেকে আসা আলোয় একঝাঁক ব্যুমেরাং গড়নের সেই কাঠপোকাগুলোকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে দেখলুম। আমার পায়ের কাছ দিয়ে ওরা লাফাতে লাফাতে গুহার দরজার দিকে চলে গেল। তারপর টের পেলুম ওদের পালিয়ে আসার কারণ। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

হনহন করে এগিয়ে আসছিল কেউ। ফাটলের আলোর কাছে সেও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু ও কি মানুষ?

হ্যাঁ, মানুষই বটে। কারণ, আমার মতোই তার একটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা আছে। কিন্তু পরনে মাছের প্রকাণ্ড আঁশের মতো পাতার পোশাক যেন—পাতাবাহারের লাল-হলুদ চকরাবকরা রং ওই পাতাগুলোর। গলার কাছ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত এই বিচিত্র পোশাক। দুটো বাহু এবং পা খালি। সবচেয়ে অদ্ভুত ওর গায়ের রং। খসখসে সবুজ।

মুখটাও সবুজ। ভুরু ও চোখের পাতা খয়েরি রঙের। চোখের তারা লালচে , বাকি অংশ ছাই রঙের। তার মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলো অবিকল উদ্ভিদের গুচ্ছ মূল যেন,—চুলের রং মেটে।

সেই অদ্ভুত মানুষটা নিষ্পলক তাকিয়ে আমাকে দেখছে।

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে সম্ভাষণের ভঙ্গিতে একটু হাসলুম। তখন তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। সেও মাথাটা একটু দোলাল।

এবার আমি আমার জানা কয়েকটা ভাষায় তাকে জিগ্যেস করলুম, 'কে তুমি?' কিন্তু মনে হল, আমার কথা সে বুঝতে পারছে না। অথবা সে বোবা।

তারপর সে আমাকে হাতের ইশারায় তার সঙ্গে যেতে বলে যেদিক থেকে এসেছে, সেইদিকে পা বাড়াল। মনে অস্বস্তি নিয়ে তাকে অনুসরণ করলুম। একটু এগিয়ে গুহার অন্য মুখে পৌঁছলুম। এ মুখটা বেশ বড়। দেখলুম, মুখের ওপর যে লতার ঝালর ছিল, তা দু'পাশে সরিয়ে আটকে রাখা

হয়েছে! হয়তো এই সবুজ মানুষটাই এ কাজ করেছে। বাইরে বেরিয়ে জায়গাটা চিনতে পারলুম। কাল আমি ও প্রিয়বর্ধন এই পাহাড়ি-খাতেই এসেছিলুম। অনেক নরকঙ্কাল পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কিন্তু কালকের মতো কোনও চেঁচামেচি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল না। ভীষণ স্তব্ধ হয়ে আছে পরিবেশ। সবুজ মানুষ আমাকে ইশারা করল ডাইনে খুব সংকীর্ণ একটা খাতের ভেতর যেতে।

সেই খাতের ভেতর কিছুটা যাওয়ার পর এক অভাবিত দৃশ্য চোখে পড়ল।

আমাদের সামনে নিচে চওড়া অর্ধবৃত্তাকার একটা বেলাভূমি। সেখানে একদল এমনি রঙিন পাতার পোশাকপরা সবুজ মানুষ কী যেন করছে। তাদের হাতে গাছের ডাল। একটা প্রকাণ্ড পাতাশূন্য ডাল মাঝখানে পোঁতা আছে।

তারপরেই চোখে পড়ল জলের ধারে চার-পাঁচখানা ছিপ নৌকা।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝতে পারলুম, এই সবুজ মানুষরা আসলে আমার মতোই মানুষ। তারা গায়ে রং মেখে চোখ-ভুরু এঁকে এই দ্বীপে এসেছে কোনও উৎসব বা পুজোআচ্চা করতে। এরা কোনও দ্বীপের অধিবাসী তাতে সন্দেহ নেই। ওই নৌকায় চেপেই ওরা এসেছে।

এটা কিওটার উত্তর-পশ্চিম দিক। দূরে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে প্রবাল পাঁচিল। তাহলে এরা ঢুকল কোন্ পথে? পুবদিকের প্রবাল বলয়ের ভাঙা জায়গাটা ছাড়া এ-দ্বীপে আসার পথ তো নেই।

আমার প্রশ্নের জবাব তখনই মিলে গেল। ঢোলের শব্দ ভেসে এল এবং তারপর আতঙ্কে চেয়ে দেখলুম, ডানদিকের পাহাড়ে সেই ঝরনার পাশ দিয়ে ধাপে ধাপে আরও একদল সবুজ রং মাখা মানুষ কাকে বেঁধে কাঁধে বয়ে আনছে। বিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলুম বেচারা প্রিয়বর্ধনকে।

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল পালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমার সঙ্গী সেটা আঁচ করেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। কিন্তু উৎকট দুর্গন্ধেই কাবু হয়ে গেলুম। ওর গায়ের দুর্গন্ধটা নিশ্চয় রঙের কড়া ঝাঁঝ। সে আমাকে মাটিতে পেড়ে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। অমনি নিচের বিচ থেকে কয়েকজন ছুটে এল। অসহায় হয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিলুম।

প্রিয়বর্ধন চোখ বুজে পড়েছিল পোঁতা ডালটার সামনে। লতা দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ততক্ষণে বেঁধে ফেলেছে এরা। সে চোখ খুলে আমাকেও একই দশায় দেখে ভীষণ বিপদের মধ্যে করুণ হাসল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'অন্যদিকে ঘুরে বোট সারাচ্ছি, ব্যাটাচ্ছেলেরা কখন পেছন থেকে এসে...'

একটা লোকের মাথায় ফুলের মুকুট। তার হাতে একটা চওড়া কাস্তের মতো বাঁকানো চকচকে অস্ত্র। সে হুমহাম করে গর্জন করে অস্ত্রটা নাড়তেই প্রিয়বর্ধন চুপ করে গেল।

বালির ওপর অসংখ্য ফুল ছড়ানো আছে। সবুজ রং মাখা লোকগুলো বিকট নাচতে লাগল তার ওপর। ঢোল বাজছিল। সেটা দ্বিগুণ জোরে বাজতে লাগল। তারপর ওরা দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাইতে শুরু করল।

মাথার ওপর সূর্য। বালি তেতে উঠছিল ক্রমশ। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল—লতা দিয়ে এমন শক্ত করে আমাদের বেঁধেছে যে রক্তস্রোত বন্ধ হয়ে গেছে যেন।

তাদের নাচগানবাজনা ক্রমশ চরমে পৌঁছল। মাঝেমাঝে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলুম। এইভাবে কতক্ষণ কাটল জানি না, একসময় দেখি, ওরা আমাকে আর প্রিয়বর্ধনকে বয়ে নিয়ে চলেছে। ঠাহর করে বুঝলুম, সেই পাহাড়ি খাতের ভেতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সেই গুহার প্রকাণ্ড মুখের সামনে ওরা আমাদের নামিয়ে দিল। তারপর দু'জনকেই উপুড় করে শোওয়াল। বেশ বুঝলুম, এবার আমাদের মাথাটা কাটা হবে। আমরা কিওটা দ্বীপের বৃক্ষদেবতার বলি হব। ভাবলুম, প্রিয়বর্ধনকে মৃত্যুর মুহূর্তে শেষ বিদায় জানাই। কিন্তু কথা বেরুল না। তালু শুকিয়ে গেছে। কথা বলার শক্তিটুকুও আর নেই। তখন চিন্তা করলুম,

ওই কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা দিয়ে নিশ্চয় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গলাটা কাটবে ওরা, যন্ত্রণাটা কতখানি হতে পারে।

এখন কিন্তু ঢাক বাজছে না। কেউ কথা বলছে না। আড়চোখে যতটা দেখা যায়, লোকগুলোর হাবভাবে চঞ্চলতা আঁচ করা যাচ্ছিল। একজন আমার এবং আরেকজন প্রিয়বর্ধনের পাশে বসে পড়ল।

হঠাৎ আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের গতিতে একটা বোধ দেখা দিল। এ-দ্বীপের কৃষকবন্ধুদের এ বিপদে ডাকছি না কেন? সেই মুহূর্তে তখনকার মতোই আমার আচ্ছন্ন চেতনা থেকেই যেন সাড়া এল। অনেক কষ্টে ফিসফিস করে বলে উঠলুম, 'আমি এনজেলো দস সান্তোস! আমাকে বাঁচাও!'

অমনি গুহার দিক থেকে ঝড়বাতাসের শব্দের মতো শব্দে উচ্চারিত হল : 'এনজেলো! এনজেলো! এনজেলো!'

আমাদের পাশে বসে থাকা লোকদুটো তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। 'এনজেলো' শব্দটা ক্রমশ বাড়ছিল। মনে হচ্ছিল ঝড় বইতে শুরু করেছে 'এনজেলো' শব্দের।

তারপর শোনা গেল সেই প্রতিধ্বনি : 'স্টপ ইট! স্টপ ইট! আই সে স্টপ ইট!' উঁচু পাহাড়ের দেওয়ালে সেই ভীষণ চিৎকার বিকট প্রতিধ্বনি তুলল। 'আই কিল ইউ। কিল...কিল...কিল!' তারপর হেল্প! হেল্প! হেল্প!'

দড়বড় দড়বড় শব্দ করে সবুজ রং মাখা পাতার পোশাক-পরা আদিম লোকগুলো ততক্ষণে উধাও। চেঁচামেচি থামলে মুখ অতিকষ্টে ঘুরিয়ে দেখি, জনপ্রাণীটি নেই। আর সামান্য তফাতে সেই কাস্তের মতো বাঁকা অস্ত্রটা পড়ে আছে। বুঝলুম, দেবতা বলি খেতে চায়নি বলে কিংবা ঘাতকের চোটে ব্যাটাচ্ছেলেরা অস্ত্রটা ফেলেই পালিয়ে গেছে। আমার গলায় এতক্ষণে জোর ফিরে এল। শরীরেও।

কিন্তু প্রিয়বর্ধনকে ডেকে সাড়া পেলুম না। গড়াতে গড়াতে অস্ত্রটার কাছে গেলাম। তারপর ওটার বাঁট কামড়ে চিত করে দুটো পাথরের মাঝখানে বসালুম। ঠোঁট কেটে গেল একটু। এবার কাত হয়ে অস্ত্রটার ডগায় হাতের বাঁধনটা ঘষতে থাকলুম। বাঁধন কেটে গেল। এবার আর অসুবিধে হল না।

একটু পরে প্রিয়বর্ধনের বাঁধন কেটে তাকে চিত করে দিলুম। সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, 'আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি?'

'বেঁচে আছো। ওঠো।'

প্রিয়বর্ধন তবু সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'আমার ধড়টা কোথায়?'

'যথাস্থানে আছে। উঠে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।'

ওকে টেনে ওঠালুম। ও কিছুক্ষণ হাত-পা ছোড়াছুড়ি করে এবং লাফালাফি করে রক্ত চলাচল ঠিক করে নিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি তো জয়ন্ত। কেন বলছিলে আই অ্যাম এনজেলো দস সান্তোস? এনজেলো শুনেছি কাপ্তেন রোজারিওর ছেলের নাম ছিল। ওর বউ ছিল পর্তুগিজ।'

বললুম, 'ওসব পরে শুনব। এখন চলো, খিদে পেয়েছে।'

কিয়াংয়ের আবির্ভাব

অচল মোটরবোটটা হয়ে উঠেছে আমাদের উদ্ধারের আশায় প্রতীক। অথচ বুঝতে পারছিলুম, প্রিয়বর্ধন যত পাকা মিস্তিরির ভান করুক, ওটা সচল করার মতো জ্ঞানবুদ্ধি ওর নেই। তবু সময়টা বেশ কেটে যায় আশায় আশায়। প্রিয়বর্ধন নানা ভঙ্গিতে চিত-উপুড়-কাত হয়ে কিংবা হাঁটু দুমড়ে গম্ভীরমুখে খুটখাট করে এবং কোনও এক জলদস্যু কাপ্তেন রোজারিও, তার পর্তুগিজ বউ আর ছেলে এনজেলোর গল্প শোনায়। রোজারিও নাকি তার বউ আর ছেলেকে নিয়ে এই দ্বীপে বাস করতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল সারাজীবনের লুণ্ঠিত ধনরত্ন। কিন্তু ওর চেলারা কীভাবে খোঁজ পেয়ে সারারাত এখানে হানা দেয়। ওদের হত্যা করে। তারপর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নিজেরাও খুন হয়ে যায়।

এই কাহিনী শুনে আমার মনে হচ্ছিল, কিওটা দ্বীপের উদ্ভিদ রহস্যের কিছুটা যেন আঁচ করতে পেরেছি। খুব উত্তেজনার সময় মানুষের স্নায়ুতন্ত্রে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়, দ্বীপের গাছপালার কোষে কোষে যেন তা সাড়া তুলতে সমর্থ। সেই উত্তেজনার সময়কার সব কথাবার্তা তাই রেকর্ড হয়ে যায় কোষগুলিতে। তারপর সম্ভবত আবহাওয়ার তাপমাত্রার হেরফের ঘটলে সেটাই হয়ে ওঠে রেকর্ডগুলি বেজে ওঠার কারণ। লক্ষ্য করেছি, 'স্টপ ইট' চিৎকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর বেজে ওঠে না। বেজে ওঠে হঠাৎই। কাজেই আবহাওয়ার হেরফেরের মধ্যেই রহস্যটা লুকিয়ে আছে।

মানুষের চিন্তাতরঙ্গের চাপ যে উদ্ভিদের ভেতরও সাড়া জাগায়, তা আধুনিক বিজ্ঞানীরা তো প্রমাণ করেছেনই। কর্নেলের কাছে মার্কিন বিজ্ঞানী ক্লি ব্যাকস্টারের গবেষণার কথা শুনেছিলুম। ব্যাকস্টার প্রথমে ছিলেন অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং লাই-ডিটেকটর পরীক্ষক। 1966 সালে একটি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে গাছের সাহায্যে হত্যাকারীকে ধরে ফেলেন। ব্যাকস্টার গ্যালভানোমিটার যন্ত্র সেই গাছের সঙ্গে যুক্ত করে সন্দেহযোগ্য লোকদের একে একে যন্ত্রটার সামনে দাঁড় করান। তারপর একটা লোক সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকস্টার দেখলেন, গ্যালভানো মিটারের সংকেত কাঁটা প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। অর্থাৎ সেই গাছটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সেই লোকটাকেই এই গাছটা খুন করতে দেখেছিল। পরে সে সব স্বীকার করে। তারপর জগতে সাড়া পড়ে যায়।

প্রিয়বর্ধনকে কিওটা দ্বীপের গাছপালার রহস্য বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। প্রাণের বিবর্তনের একটা স্তরে যখন উদ্ভিদ আর প্রাণী পৃথক হয়ে গিয়েছিল, সম্ভবত তখনই প্রকৃতির কী খেয়ালে এই দ্বীপে মাঝামাঝি একটা প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল, যারা প্রাণী এবং উদ্ভিদ দুই-ই! তাই তারা স্বাভাবিক উদ্ভিদের চেয়ে বেশিমাত্রায় চেতনাসম্পন্ন। তাদের বোধশক্তি প্রাণীদের মতোই, অথচ তাদের দেহ উদ্ভিদের মতো। আবার কোনও কোনও উদ্ভিদ প্রাণীদের মতোই চলাফেরা করতেও সমর্থ। যেমন ওই অদ্ভুত ক্যাকটাসগুলো—যারা ক্যারিবো, উংচু আর ফুতাংকে ধরে নিয়ে গেছে।

তিনদিন ধরে আমরা সারা দ্বীপ তন্নতন্ন খুঁজেও হতভাগ্য লোক তিনটিকে দেখতে পাইনি। কখনও মাকড়সা ক্যাকটাসগুলোকে একলা বা দলবেঁধে ঘুরতে দেখেছি। কিন্তু সাহস করে কাছে গেলেই তারা ঝটপট একগুচ্ছের শিকড় মাটিতে ঢুকিয়ে বকধার্মিক সেজে দাঁড়িয়ে থেকেছে—যেন কিছু জানে না। ক্যাকটাস না ক্যাকটাস। প্রিয়বর্ধন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেছে, 'ন্যাকা! কোথায় গুম করেছ বদমাশগুলোকে, বলো শিগ্‌গির! নইলে ঘ্যাচাং করে গোড়াটা কেটে ফেলব।'

মাকড়সা-ক্যাকটাস নিশ্চয় বুঝতে পারে, প্রিয়বর্ধনের যত তড়পানি শুধু মুখেই। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তবে আজ সকালে ভারি মজা হয়েছিল। যেই প্রিবর্ধন বকাবকি করতে গেছে, একটা মাকড়সা ক্যাকটাস আচমকা একটা শুঁড় বের করে ওকে জড়িয়ে ধরেছে। আর বেচারার সে কী ত্রাহি চিৎকার! শেষে আমি অনেক তোষামোদ অনেক কাকুতিমিনতি করলুম। তখন শুঁড়টা খসে গিয়ে ছোট হতে হতে স্প্রিংয়ের মতো গুটিয়ে মাকড়সা-ক্যাকটাসটার ভেতর লুকিয়ে পড়ল। প্রিয়বর্ধন ল্যাজ তুলে

দৌড়ে ক্যাম্পে চলে গেল। সেই থেকে আর নড়তেও চায় না। আবার মোটরবোটটা নিয়ে খুটখাট করে যাচ্ছে।

এদিকে ক্যারিবোদের আনা খাবারদাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমরা একবেলা গাছের ফলে বা বলয়সাগরের মাছ ধরে খিদে মেটাচ্ছি। অবশ্য খিদেয় মারা পড়ার আশঙ্কা নেই। দ্বীপে অসংখ্য ফলের গাছ আছে এবং অনেক গাছই দয়ালুদাতা।

আরেকটা কাজ দু'জনে নিয়মিত করে যাচ্ছি। তা হল রেডিও ট্রান্সমিশন যন্ত্রের নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন ওয়েভলেন্থে মেসেজ পাঠানো। কোনও কোনও কেন্দ্রে মেসেজ গণ্ডগোল ঘটাচ্ছে। দু পক্ষের কথাবার্তা জড়িয়ে-মড়িয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রটা বিকট ঘড়ঘড় শব্দ তুলছে। বিগড়ে যাওয়ার ভয়ে বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কখনও দৈবাৎ কোনও কেন্দ্রে যদি আমাদের মেসেজ ধরা পড়ছে, কড়া ধমক অথবা ঠাট্টাতামাশা করা হচ্ছে। কিওটা নামে দ্বীপটা সরকারি মতে রূপকথা। এটাই হয়েছে সমস্যা। রুবি আইল্যান্ডে নৌবাহিনীর বেতারকেন্দ্র যদি দৈবাৎ ধরতে পারি, আমাদের আশা আছে তারা আমাদের মেসেজকে উড়িয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু কিছুতেই ওই কেন্দ্র ধরতে পারি না।

একদিন দুপুরে বহুদূরে একটা হেলিকপ্টারকে উড়তে দেখলুম। দুজনে আনন্দ নেচে উঠলুম। নিচে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলুম ওটার দিকে। কিন্তু নচ্ছার হেলিকপ্টারটা দূর দিয়েই চলে গেল। প্রিয়বর্ধন রেগে গাল দিতে শুরু করল। ওকে বুঝিয়ে বললুম, 'ভেবে দেখ প্রিবর্ধন, কোকোস দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় হাজার-হাজার এমন দ্বীপ আছে। কোন দ্বীপটা যে কিওটা, সেটা খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজা একই কথা। ধৈর্য ধরো। ওই হেলিকপ্টার আবার হয়তো আসবে এবং এই দ্বীপের ওপর দিয়েও উড়ে যাবে। তখন আমাদের দেখতে পাবে।'

এরপর আমরা ঠিক করলুম, হেলিকপ্টারের শব্দ পেলেই আমরা শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বালাব। ধোঁয়ায় আকৃষ্ট হয়ে এদিকে ওদের চোখ পড়বেই।

কিন্তু আরও দুদিন কেটে গেল বৃথা। হেলিকপ্টারটা আর এমুখো হল না।

তিনদিনের দিন দক্ষিণের বনভূমি পেরিয়ে খাড়ির মাথায় আমি একা দাঁড়িয়ে আছি, প্রিয়বর্ধন ক্যাম্পে আছে, সেই সময় নিচের একটা চাতালমতো জায়গায় চোখ পড়তেই চমকে উঠলুম। তিনটি সবুজ রঙের মানুষের মতো কারা পড়ে আছে। একেবারে উলঙ্গ তারা। ঝুঁকে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখি, হতভাগ্য ক্যারিবো, ফুতাং আর উংচু!

দ্রুত তাদের কাছে নেমে গেলুম। উপুড় হয়ে পড়ে আছে তারা। সারা গায়ে সবুজ দাগড়া-দাগড়া ছোপ। তাদের দেহে প্রাণ নেই। তিনটি লোভী মানুষের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে শিউরে উঠেছিলুম। সেই মারাত্মক ক্যাকটাস-প্রাণীর পাল্লায় পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে সম্ভবত এরা মারা পড়েছে। কিন্তু ওই বিকটা সবুজ ক্ষতচিহ্নগুলি কি রুবিদ্বীপে শোনা সেই সবুজ এলার্জি রোগের চিহ্ন?

হতভাগ্য মানুষ তিনটির জন্য দুঃখ হচ্ছিল। ক্যাকটাস-প্রাণীরা তাদের এখানে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরা মানুষ এদের মরা পড়ে থাকবে, এটা খারাপ লাগল। তক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে প্রিয়বর্ধনকে ডেকে আনলুম।

প্রিয়বর্ধন সব দেখে বলল, 'কীভাবে এদের সদগতি করবে ভাবছ? এখান থেকে ওঠানো অসম্ভব। ক্যারিবো খ্রিস্টান, ফুতাং আর উংচু বৌদ্ধ। বরং এক কাজ করা যাক। এদের ঠেলে নিচের জলে ফেলে দিই। জয়ন্ত, সব শাস্ত্রেই বলেছে জল জিনিসটা শুদ্ধ। এদের আত্মার মুক্তি হবে। তাছাড়া নাবিকদের মৃত্যু হলে সমুদ্রের জলেই তাদের ফেলে দেওয়া চিরকাল সবদেশেরই রীতি।'

দু'জনে মৃতদেহ তিনটি ঠেলে নিচে খাড়ির জলে ফেলে দিলাম।

কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে আমরা আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলুম। বলয়-সাগরের জল থেকে ভোঁস করে একটা লম্বাটে বিরাট মাথা বেরিয়ে এল। মুখটা কতকটা উটের মতো, কিন্তু সুচালো। লম্বা গলা। ছোট মাথা। কিন্তু শরীরটা তিমির মতো বিশাল। স্বচ্ছ জলে তার চারটে পাখনার মতো পা দেখা যাচ্ছিল। সেই বিকটাকৃতি সামুদ্রিক প্রাণীটি মহানন্দে মরা তিনটিকে পাখনা-পায়ে আটকে নিয়ে ভোঁস করে তলিয়ে গেল।

ওমনি আমার মনে পড়ে গেল ব্রিটেনের লক নেস (Loch Ness) হ্রদের কিংবদন্তিখ্যাত জলচর প্রাণী নেসি (Nessie) এর কথা। এই রহস্যময় প্রাগৈতিহাসিক জলচর প্রাণীটির ছবি পর্যন্ত ক্যামেরায় তুলেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু বহু খোঁজ করেও তার পাত্তা পাওয়া যায়নি আজও। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওই হ্রদের ভেতর কোনও গভীর সুড়ঙ্গে তার বসবাস।

এ কি তাহলে সেই নেসি?

বিকটাকার প্রাণীটির গলা এত লম্বা যে সে ইচ্ছে করলে অনায়াসে খাড়ির ওপর থেকে আমাদেরও টুপ করে মুখে তুলে নিতে পারে।

হয়তো সেই ভয়েই প্রিয়বর্ধন জঙ্গলের আড়ালে লুকোতে গেল। তারপর তাকে 'মাই গড' বলে ছিটকে সরে আসতে দেখলুম। সরে এসে আবার চেঁচিয়ে উঠল সে। বললুম, 'কী হল প্রিয়বর্ধন?'

প্রিয়বর্ধন একটা ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলল, 'সাবধান জয়ন্ত, এই বিচ্ছু গাছগুলোকে চিনে রাখো। ব্যাটারা ইলেক্‌ট্রিক শক দিচ্ছে সামুদ্রিক ঈল মাছের মতো। জোর বেঁচে গেছি।'

ঝোপগুলোকে এড়িয়ে আমরা খোলা মাঠ ধরে ক্যাম্পে ফিরে গেলুম।...

সেদিন রাতে পূর্ণিমা। কিওটা বনভূমি যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে উঠেছে। যেদিকে কান পাতি, সঙ্গীত শুনতে পাই। অপার্থিব যেন সেই সঙ্গীত। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে আর মনে হচ্ছে, আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে যেন পরীরা নেমে এসে নাচ-গানে জমিয়ে তুলেছে দ্বীপটাকে। প্রিয়বর্ধনের ওদিকে লক্ষ্য নেই। সে ক্যাম্পখাটে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমার পাহারা দেওয়ার পালা। কিন্তু কিসের জন্য এই সতর্ক পাহারা কে জানে? তবু মন মানে না বলেই ক্যারিবোদের ফেলে-যাওয়া একটা রাইফেল হাতে রেখেছি।

একসময় রাইফেলটা রেখে উঠে দাঁড়ালুম। পূর্ণিমারাতের বনভূমির মধুর অর্কেস্ট্রা প্রাণভরে উপভোগ করার জন্য কিছুটা এগিয়ে গেলুম।

তাহলে এমনি সব রাতেই প্রাচীন যুগে নাবিকরা কিওটা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সঙ্গীত শুনতে পেত। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপে আদিম অদিবাসীরা এই দ্বীপের কথা শুনে হয়তো 'কোহাও রঙ্গো রঙ্গো' পুঁথি রচনা করেছিল। কিন্তু এ-দ্বীপ এখনও সবাই খুঁজে পায় না—শুধু আমাদের মতো দৈবাৎ কেউ এখানে এসে পড়ে। তল্লাটের কোনও-কোনও দ্বীপে আদিম অধিবাসীরা অবশ্য এ-দ্বীপ কোথায়, তা ভালই জানে। তারা এখানে পুজো দিতে আসে। কিন্তু সভ্য মানুষের কাছে এর খোঁজ দিতে চায় না। আমরা সেদিন তাদের পাল্লায় পড়েছিলুম। আমার খোঁজে বেরিয়ে কর্নেল যদি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, তবেই এখান থেকে উদ্ধার হওয়ার আশা। নইলে বাকি জীবন এখানেই কাটাতে হবে।

আজ রাতে মনে হচ্ছিল, তা যদি হয়, তো হোক। কিওটার বৃক্ষরা আমার পরম বন্ধু হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যেই আমি আমৃত্যু বরং থেকে যেতে রাজি।

জ্যোৎস্নায় খোলা মাঠ ঝলমল করছে। আবছাকালো দু'ধারের অরণ্যে অর্কেস্ট্রা বাজছে আর বাজছে। কত বিচিত্র সুর। গম্ভীর, সূক্ষ্ম। চড়া বা খাদে। ডাইনে এগিয়ে উঁচু উঁচু গাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। এলোমেলো হওয়া বইছে আর ডালপালা নড়ছে—ওই বুঝি তাদের নাচ। বৃক্ষমর্মরধ্বনির কথা কবিতায় পড়েছি। কিন্তু এতো তা নয়—এ এক আশ্চর্য মধুর ঐকতান। কে শেখাল এই সঙ্গীতের ভাষা। তা কানের ভেতর দিয়ে মর্মে গিয়ে আমাকে আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, একসময় প্রিয়বর্ধনের চিৎকারে আচ্ছন্নতা কেটে গেল। সে উত্তেজিতভাবে ডাকডাকি করছিল, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! তুমি কোথায়?'

কোনও বিপদ ঘটেছে ভেবে দৌড়ে ক্যাম্পে ফিরে গেলুম। প্রিয়বর্ধন পুবের দিকে হাত তুলে বলল, 'একটা আলো দেখতে পাচ্ছ, জয়ন্ত? নিশ্চয় কোনও জাহাজ নোঙর করেছে। আলোটা একজায়গায় রয়েছে তখন থেকে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে তোমাকে ডাকলুম। সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে আসতেই চোখে পড়ছিল আলোটা'।

আলোটা এক জায়গায় আছে। তবে মাঝে মাঝে ঢেউয়ে আড়াল হচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। প্রবাল-পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বহুদূরের ওই আলো। আমরা তাকিয়ে রইলুম সেদিকে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে অবাক হচ্ছিলুম। হাওয়াটা ক্রমশ বাড়ছে। অথচ আকাশ পরিষ্কার। এদিকে সারা দ্বীপ জুড়ে অর্কেস্ট্রার বাজনাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কিওটার বনভূমি যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। একসময় হওয়ার ঝাপটানি এমন প্রবল হল যে ক্যাম্পের দড়ি ছিঁড়ে খুঁটি উপড়ে কোথায় উড়ে গেল। আমরা বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়লুম ঝড়ের ধাক্কায়। দু'হাতে কানও ঢাকতে হল। প্রচণ্ড ঝড়ের শব্দ আর অর্কেস্ট্রার শব্দ মিলে কানে তালা ধরে যাচ্ছিল। বলয়সাগরের জল উপচে এসে আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিল। একসময় ওই প্রলয় আলোড়ন যখন ধীরে ধীরে কমে গেল, তখন চাঁদ পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

শেষ রাতে সব শান্ত হয়ে গেল। তখন ক্ষীণ সুরে শুধু বেহালার বাজনা কানে আসছিল। বড় করুণ সেই সুর। এ যেন শোকসঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি। কার হৃদয়ের গভীর শোক কান্নার সুরে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারিদিকে। দূরে থমথম করছে আবছাকালো বনভূমি। মৃত্যুশোকের স্তব্ধতা রূপ নিয়েছে বুঝি।

তখনও জানতুম না, জানার উপায় ছিল না, একই শোকসঙ্গীত কেন। কেনই বা এত আলোড়ন।

একটু বেলা হলে দূরের সমুদ্র থেকে কুয়াশা কেটে গেল। তখন জাহাজটা দেখতে পেলুম। আমরা শুকনো পাতা ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বেলে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলুম। কিন্তু ততক্ষণে তিনটে মোটর বোট প্রাবাল পাঁচিলের কাছে এসে পৌঁছে গেছে। তিনটে বোটেই একদল করে মানুষ। বোটগুলো যেভাবে ওরা ভাঙন পার করল, তাতে বুঝলুম ওরা এর আগেও দ্বীপে সম্ভবত এসেছে। ওরা তাহলে কারা?

প্রিয়বর্ধন নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে ফিসফিস করে বলল, 'কিয়াং এসে গেছে! জয়ন্ত, একশোটা ক্যারিবো একটা কিয়াংয়ের সমান। তবে মাকড়সা-ক্যাকটাসের পাল্লায় পড়ে ওদেরও কী হয় দেখে নিও। আর একটা কথা। কিয়াংয়ের সঙ্গে আমরা ভাব জমাবো। ওরা যখন মারা পড়বে মাকড়সা-ক্যাকটাসের হাতে, তখন আমরা ওদের বোট নিয়ে ওদের জাহাজে চলে যাব।'

কিয়াংয়ের চেহারা বেঁটে হলেও প্রকাণ্ড। সে নিচে লাফিয়ে পড়ে হা-হা করে হেসে বলল, 'আরে? রাজবংশের প্রাইভেট সেক্রেটারিমশাই যে! আর এই ছোকরা বুঝি সেই টেকো দাড়িয়ালা ঘুঘু বুড়োর শাগরেদ? কী? রোজারিওর গুপ্তধন হাতাতে পেরেছো তোমরা?

প্রিয়বর্ধন একগাল হেসে বলল, 'না স্যার! তবে গুহার ভেতর রোজারিওর কবর দেখতে পেয়েছি।'

মহাশ্মশানের বেহালাবাদক

কিয়াং প্রিয়বর্ধনের কথা শুনে আরও হেসে বলল, 'রোজারিওর কবর আবিষ্কার করেছে, আর তার গুপ্তধন আবিষ্কার করতে পারোনি? আমি জানি, ওর কবরের তলায় সব ধনরত্ন পোঁতা আছে। চলো, সেই গুহাটা দেখিয়ে দাও।'

প্রিয়বর্ধন আমাকে চোখের ইশারায় কী যেন বলে খুব উৎসাহ দেখিয়ে পা বাড়াল। কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভাল মনে হল না। মাকড়সা ক্যাকটাসের হাতে খামোকা আবার এতগুলো লোকের মৃত্যু হওয়াটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলুম না। তাই বললুম, 'মিঃ কিয়াং, শুনুন। ক্যারিবো আর তার দুই সঙ্গী এই দ্বীপে এসেছিল। তারা...'

কথা কেড়ে কিয়াং বলল, 'সর্বনাশ! তাহলে তারাই সব হাতিয়ে কেটে পড়েছে।'

বললুম, 'না। তারা এই দ্বীপের সাংঘাতিক মাকড়সা-ক্যাকটাসের পাল্লায় পড়ে মারা গেছে।'

কিয়াং হাসল। 'জানি, জানি। সেবার ওদের পাল্লায় পড়ে আমার দলেরও পাঁচটা লোকের প্রাণ গেছে। তাই এবার আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

'মিঃ কিয়াং! ওদের গায়ে গুলি বেঁধে না!'

কিয়াং তার কাঁধের ব্যাগ খুলে রিভলভারের মতো একটা জিনিস বের করে বলল, 'এটা কি জিনিস বুঝেছ? লেসার অস্ত্র। যে-কোনও সজীব পদার্থকে এক সেকেন্ডে ছাই করে ফেলবে। শুধু তাই নয়; পাথরের মতো নির্জীব পদার্থকেও গুঁড়ো করে দেবে। এর নল থেকে সাংঘাতিক লেসার রশ্মি বেরোয়। শুধু তাই নয়, ওই যে কামানের মতো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ, ওটা আরও শক্তিশালী লেসার বিম ছুড়ে মারে। কি, চলো প্রিয়বর্ধন! রুবি আইল্যান্ডের ঘুঘুগুলো হেলিকপ্টার নিয়ে সবসময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার জাহাজ দেখে তাদের সন্দেহ হতে পারে। ঝটপট কাজ সেরে ফিরে যাব। তার আগে অবশ্য ভূতুড়ে গাছপালাগুলোকে জ্বালিয়ে খতম করে দিয়ে যাব।'

আমি দম আটকানো গলায় বলে উঠলুম, 'দোহাই মিঃ কিয়াং! কথা শুনুন—এই দ্বীপ বিজ্ঞানের এক ল্যাবরেটরি!'

'রাখো তোমার ল্যাবরেটরি!' কিয়াং বিকট হাসল। 'আমি এবার এসেছি কিওটার ভূতগুলোকে খতম করতে। ওরা আমাকে খুব ভুগিয়েছে। আমার অনেক লোক মারা পড়েছে ওদের হাতে। আমি প্রতিশোধ নেবই।'

বলে সে তার দলবল নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। প্রিয়বর্ধনকে ঠেলে নিয়ে চলল সে। কিন্তু আমার দিকে ঘুরেও তাকাল না।

একটু পরে শুরু হল কিয়াংয়ের পৈশাচিক কীর্তিকলাপ। যথারীতি 'স্টপ ইট! স্টপ্ ইট' চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতেই দেখলুম, তার এক সঙ্গী যেদিক থেকে চিৎকারটা আসছিল, সেইদিক লক্ষ্য করে লেসার কামান বসাল। তারপর দেখলুম, ডানদিকের জঙ্গল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। আমি দৌড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম, 'স্টপ ইট!' 'স্টপ্ ইট!' ওর এক অনুচর আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল।

কিয়াংয়ের মুখে পৈশাচিক হাসি। সে হুকুম দিল, 'এক চিলতে ঘাস পর্যন্ত আস্ত রাখবে না। ডাইনে-বাঁয়ে সব দিকের ওই ভূতুড়ে গাছপালাগুলোকে খতম করে দাও।

অসহায় চোখে দেখতে থাকলুম সে হত্যাকাণ্ড। লেসার কামানের মারাত্মক রশ্মিপুঞ্জ দেখতে পাচ্ছি না—শুধু হিস হিস শব্দ হচ্ছে কামানটা থেকে আর ক্রমাগত আগুন ধরে যাচ্ছে গাছপালায়, ঝোপঝাড়ে। প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছরের সাজানো সুন্দর উদ্যান জ্বলে ছাই হয়ে যাচ্ছে। খোলা মাঠের সামনের দিকে সেই প্রাণী ক্যাকটাসের ঝাঁক পাঁচিলের মতো এগিয়ে আসছিল। তারাও দাউদাউ জ্বলে কালো ছাই হয়ে ঘাসে মিশে গেল। ঘাসেও আগুন ধরে গেল। কালো চাপ-চাপ ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে গেল। বাতাসে কটু গন্ধ ছড়াল। সভ্যতার ভয়ঙ্কর মারণশক্তি চারপাশে তাজা সুন্দর সবুজ জীবনকে ধ্বংস করে চলল। লেসারকামান ঘুরে-ঘুরে হিস হিস শব্দে বিষের আগুন ওগরাচ্ছে। আর চোখের পলকে উজ্জ্বল আগুনের চোখ ধাঁধানো শিখা ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। চোখের সামনে এই বিরাট ধ্বংসলীলা দেখেও আমার কিছু করার নেই। পাশে একটা ছিপছিপে তরুণ গাছ বুঝি দুঃখে কাতর হয়ে করুণ সুর বাজাতে শুরু করেছিল, নিষ্ঠুর কিয়াং তাকে লক্ষ্য করে লেসার পিস্তলের ট্রিগার টিপল। চোখের পলকে গাছটা কালো হয়ে গুঁড়িয়ে পড়ল এবং বাতাসে কয়েক মুঠো ছাই উড়ে যেতে দেখলুম। ধ্বংসের নেশায় কিয়াং মাতাল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে যেদিকে তাকাই, সেদিকেই শুধু কালো ছাই। ছোট্ট দ্বীপের সব সবুজ, কালো ভস্মস্তূপে পরিণত। এক বিশাল শ্মশানভূমিতে একদল নিষ্ঠুর পিশাচের কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

এতক্ষণে প্রিয়বর্ধন ধরা গলায় বলে উঠল, 'কাজটা কি ঠিক হল স্যার?'

কিয়াং তার মাথায় গাঁট্টা মেরে বলল, 'চল ব্যাটা ছুঁচো, কোথায় রোজারিওর কবর, দেখি।'

প্রিয়বর্ধন কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, 'ছাইগুলোতে পা পুড়ে যাচ্ছে স্যার!'

'তোর পায়ে জুতো নেই দেখছি। ওহে রিংপো, ওকে তোমার জুতোজোড়া দাও বরং। আর তুমি বোটের কাছে গিয়ে পাহারা দাও।'

প্রিয়বর্ধনের পায়ে জুতো দুটো ফিট করছিল না। বেঢপ রকমের প্রকাণ্ড জুতো পরে বেচারা থপ থপ করে এগিয়ে গেল ওদের সঙ্গে। রিংপো নামে লোকটা মুচকি হেসে বলল, 'এখানে একলা কান্নাকাটি করে কী হবে স্যাঙাত? এস—আমরা বরং বিচে গিয়ে গল্পসল্প করি।'

বিচের ধারে একলা সেই বেহালা বাজিয়ে গাছটা করুণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, শুধু এই ছোট গাছটাই বেঁচে আছে। পেছনদিকে পাথরের আড়ালে বিচের মাথায় আছে বলেই তার দিক চোখ পড়েনি কিয়াংয়ের। কিন্তু কেন সে বেহালা বাজাচ্ছে না? শোকে মূক হয়ে গেছে কি?

কাল রাতে তাহলে কিয়াংয়ের জাহাজ এসে পৌঁছনোর পর কিওটার উদ্ভিদ চেতনায় ওই উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছিল। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহলে আমি শোকসঙ্গীতই শুনেছিলুম।

রিংপো লোকটির মেজাজ ভাল। সে আমাকে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিয়ে বলল, 'নাও, খেয়ে ফেলো। দুঃখ করে কী হবে? গাছপালা বৈ তো নয়! তবে কি জানো। আমাদের কর্তাটি একেবারে শয়তানের অবতার। রোখ চাপলে আর ভালমন্দ জ্ঞানগম্যি থাকে না।'

কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। তবু খেতে হল। ওর সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করলুম। রিংপো রুবি দ্বীপেরই লোক। বউ ছেলেপুলে আছে। কিয়াংয়ের মাছের আর শুঁটকির মস্ত কারবার আছে। রিংপো অবশ্য মাছ ধরার কাজেই থাকে। তবে সে জানে, কর্তা বহুদিন আগে থেকে কিওটা দ্বীপের খোঁজ রাখে। রাজাকোর সঙ্গে একসময় তার খুব বন্ধুতা ছিল। রাজাকোও জানত সব। কিন্তু যতবারই ওরা কিওটা এসেছে, ভয়ঙ্কর কী বিপদ ঘটেছে। কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে গেছে। তাই এবার সেজেগুজে মারাত্মক অস্ত্র সংগ্রহ করে এ-দ্বীপে পাড়ি জমিয়েছে।

কথায়-কথায় রিংপো বলল, 'এবার তোমার আর প্রিয়বর্ধনের ব্যাপারটা বলো, শুনি। কীভাবে তোমরা এ-দ্বীপের খোঁজ পেয়েছিলে?

একে সংক্ষেপে সব কাহিনী শোনালুম। তারপর বললুম, 'রোমিলার খবর কিছু জানো?

রিংপো বলল, 'জানি না। তবে শুনেছি, তুমি যাদের সঙ্গে রুবি দ্বীপে এসেছিলে, তারা তোমার মরা খুঁজে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে।'

বলে সে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় ফের বলল, 'তোমার কথাবার্তা শুনে ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে। তাই বলছি শোনো। বাইরের কেউ রোজারিওর গুপ্তধনের সাক্ষী থাক, সেটা সম্ভবত পছন্দ করবেন না কর্তামশাই। কাজেই তোমাকেও বাঁচিয়ে রাখবেন বলে মনে হয় না। অবশ্য প্রিয়বর্ধনের কথা আলাদা। সে রুবি দ্বীপেরই বাসিন্দা। তাকে দলে ভিড়িয়ে নিতেও পারেন। কিন্তু তোমার বাঁচোয়া নেই।'

তার কথা শুনে শিউরে উঠে বললুম, 'তাহলে কী করতে বলছ আমাকে?'

রিংপো একটু ভেবে বলল, 'জঙ্গলগুলো থাকলে লুকিয়ে থাকতে। কিন্তু কর্তামশাই তো সব ছাই করে ফেলেছেন। তুমি বরং এই সুযোগে সাঁতার কেটে দক্ষিণের প্রবাল পাঁচিলের কাছে চলে যাও। ওই পাঁচিলে অনেক গুহা আছে। লুকিয়ে থাকো গে। রুবি দ্বীপে ফিরে গিয়ে গোপনে আমি রোমিলাকে তোমার খবর দেব। সে তোমাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে।'

'দক্ষিণের প্রবল পাঁচিলে পৌঁছনো অসম্ভব রিংপো।'

'কেন? সাঁতার কাটতে পারো না?'

'পারি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখেছি, ওদিকে বলয়সাগরের জলে ভয়ঙ্কর একটা জন্তু আছে।'

'তাহলে উত্তরের পাঁচিলে চলে যাও।'

'তার চেয়ে এ-দ্বীপের পশ্চিমে ওই পাহাড়গুলোর ভেতর গিয়ে লুকিয়ে পড়ছি বরং।'

রিংপো লাফিয়ে উঠে বলল, 'কখনো না। কর্তার নজরে পড়ে যাবে। রোজারিওর কবরের তলায় যদি গুপ্তধন সত্যি সত্যি না থাকে, কর্তা সব জায়গা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে খুঁজবে। কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে? আমার ধারণা, উত্তরের দিকটায় জল কম। আমি সারা জীবন জলে ঘুরছি। জল দেখে তার গভীরতা বলে দিতে পারি। তুমি কেটে পড়ো।'

'আমার জন্য তোমার ক্ষতি হবে না তো রিংপো?'

রিংপো চটে গিয়ে বলল, 'নিজে বাঁচলে বাপের নাম। সাধুগিরি ফলিও না তো বাপু। কর্তা কি আমাকে বলে গেছে তোমাকে পাহারা দিতে? সোজা বলে দেব, কেটে পড়েছে। কিংবা জঙ্গলদানবের পেটে গেছে।'

একটু ইতস্তত করে বললুম, 'উপকার যদি করতে চাও, একটু বেশি করেই না হয় করলে ভাই রিংপো। তিনটে মোটরবোট এনেছ। একটায় চাপিয়ে আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে এস।'

রিংপো পশ্চিম দিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে বলল,'পারতুম। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে কর্তা এসে পড়বে। তখন আমার প্রাণটাও যাবে।'

অগত্যা জলে গিয়ে নামলুম। পুবের ভাঙন দিয়ে মহাসাগরের ঢেউ এসে ঢুকছে। তাই এদিকটায় ঢেউ আছে। কিন্তু উত্তরদিকটায় তত ঢেউ নেই। বাতাস বইছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। পোড়া দ্বীপের ছাই এসে পড়ছে জলে। কটু গন্ধ ঝাপটা মারছে নাকে। কোনাকুনি মাইলটাক সাঁতার কেটে কখনও ডুবো পাথরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, এখনই জলদানব ভোঁস করে মাথা তুলে আমাকে তেড়ে আসবে। কিন্তু প্রবাল পাঁচিলে পৌঁছনো পর্যন্ত নিরাপদ রইলুম।

একটা চাতালে উঠে আবার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলুম। তারপর অনেক কষ্টে পাঁচিলের মাথা পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে আরেকটা চাতাল পাওয়া গেল। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এখানে বসে আছে। উড়ে বেড়াচ্ছে। আমাকে দেখে ওরা গ্রাহ্য করল না। চাতালের একপাশে একটা ছোট্ট গুহাও পাওয়া গেল। এতক্ষণে ভাবনা হল, কবে ওদের জাহাজ ফিরে যাবে রুবি দ্বীপে, তারপর রিংপো খবর দেবে রোমিলাকে। ততদিন আমি বেঁচে থাকব তো? কী খেয়ে বাঁচব?

হ্যাঁ, এখানে পাখির ডিম প্রচুর। সমুদ্রের স্বচ্ছ জলে মাছও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাঁচা খাব কেমন করে? একটু পরে ভাবলুম, বরং ওদের জাহাজ চলে গেল আবার সাঁতার কেটে দ্বীপে ফিরে যাব। ক্যারিবোদের জিনিসপত্র কাল রাতের ঝড়ে উড়ে কোথাও পড়ে আছে। ওর ভেতর যদি একটা সিগারেট লাইটার পেয়ে যাই, তাহলে অন্তত মাছের রোস্ট খেয়েও বেঁচে থাকতে পারব।

কিন্তু দ্বীপে তো সব পুড়ে ছাই। আগুন জ্বালাব কিসে? আমার মনটা দমে গেল। এদিকে খিদেও পেয়েছে। একটা ডিম ভেঙে চোখ বুজে চোঁ-চোঁ করে গিলে ফেললুম। খিদের মুখে অমৃত লাগল। আরও গোটা তিনেক ডিম গিলে খিদেটা যদি বা দূর হল জলের তেষ্টা মেটাব কেমন করে? ঝরনা আছে কিওটা দ্বীপের পাহাড়ে। এখানে প্রবাল বলয়ের দু'ধারে নোনা জল।

চাতালের ওপর ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ মনে হল, কোনও গর্তে বৃষ্টির জল কি জমে নেই? মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেওয়াটা এতকাল পরে দারুণ কাজে লাগল। অনেক খুঁজে একখানে গর্তের ভেতর জল পাওয়া গেল। জলটা চেখে একটু ঝাঁঝালো স্বাদ পেলুম। বিষাক্ত নয় তো? ভয় পেয়ে মুখে দিলুম না। প্রবাল অশোধিত অবস্থায় বিষাক্ত বলে শুনেছি। তবে এই পাঁচিল প্রবালকীট জমে তৈরি হলেও এর বয়স হাজার-হাজার বছর। এখন পাথরে পরিণত হয়েছে। কাজেই এখানে প্রবালের বিষ না থাকাই সম্ভব। তবু মনে সন্দেহ এসেছে যখন না খাওয়াই ভাল। অগত্যা বৃষ্টি-মেঘের আশায় তাকিয়ে রইলুম।

বৃষ্টি এল বিকেল নাগাদ। তুমুল বৃষ্টি। ছেঁড়া জামা নিংড়ে জল খেলুম। সেই গুহার ভেতর কাটিয়ে দিলুম একটা রাত। পরদিন সকালে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, দ্বীপের বিচে মোটরবোটগুলো নেই। দূরের সমুদ্রে কিয়াংয়ের জাহাজটাকেও দেখতে পেলুম না। ওরা তাহলে গুপ্তধন উদ্ধার করে কখন ফিরে গেছে।

সাঁতার কেটে দ্বীপে ফিরে এলুম আবার।

দ্বীপ নয়, শ্মশান। ক্লান্ত, দুঃখিতভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় বেহালা বেজে উঠল। সেই একলা বেহালা-বাজিয়ে গাছটা বেঁচে আছে শুধু। করুণ সুরে একলা বেহালা বাজাচ্ছে। তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিওটার শ্মশানে দাঁড়িয়ে সে শোকসঙ্গীত বাজিয়ে চলেছে একা। তার কাছে বসে রইলুম।

আরও দুটো দিন কেটে গেল এই শ্মশানভূমিতে। ক্যারিবোর কোনও জিনিস খুঁজে পাইনি। হয় ওরা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে, নয়তো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাই হাতড়ে আমার চেহারা হয়েছিল ভূতের মতো। নোনা জলে ছাইগুলো ধুয়ে যাওয়া দূরের কথা, আরও চটচটে হয়ে এঁটে গিয়েছিল। পাথর ছুড়ে মাছ মেরেছি আর কাঁচা চিবিয়ে খেয়েছি। তৃতীয় দিনে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম। একেবার চলচ্ছক্তিহীন অবস্থা। অতি কষ্টে সেই বেহালাবাদকের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লুম, বুঝতে পারছিলুম, মৃত্যুর দেরি নেই। আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে পরম বন্ধুর মতো বেহালাবাদক গাছটি করুণ সুরে বেহালা বাজাচ্ছিল। তারপর আর বিশেষ কিছু মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, আমার চেতনার সঙ্গে ওই সুর একাকার হয়ে যখন গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন কে যেন ডাকছিল, 'এনজেলো! এনজেলো! মাই সন!' আমার সাড়া দিতে ইচ্ছে করছিল, 'এই তো আমি'।...

চোখ মেলে কিছুক্ষণ বুঝতে পারলুম না কিছু। তারপর ভেসে উঠল পরিচিত একটা মুখ। সেই মুখে একরাশ সাদা দাড়ি আর স্নেহ। 'জয়ন্ত! ডার্লিং!'

'কর্নেল!' আমি চমকে উঠে সাড়া দিলুম। 'আমি কোথায়?' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'রুকি আইল্যান্ডের মেরিন হসপিটালে। আশা করি, শিগ্‌গির শরীর সেরে যাবে। ভেবো না।'

রোমিলাকে দেখতে পেলুম এতক্ষণে। সে একটু হেসে বলল, রিংপোর কাছে সব খবর পেয়ে কর্নেলকে জানিয়েছিলুম। আমরা ধরেই নিয়েছিলুম তোমাকে ওরা মেরে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। যাই হোক, কর্নেল তক্ষুণি মিলিটারি হেলিকপ্টারে রওনা দিলেন। ওদিকে কিয়াংয়ের জাহাজকেও নেভির লোকেরা আটক করল। কিয়াং এখন জেলে।'

কর্নেল বললে, 'কিওটার কালো রং দেখে আর চিনতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বেহালার সুর শুনে যদি না ওদিকে এগিয়ে যেতাম, তোমাকে দেখতেই পেতুম না। যাই হোক, অন্তত একটা গাছ বেঁচে আচে ওখানে। ডঃ বিকর্ণ আর ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি ওখানে ক্যাম্প করে আছেন। ডঃ বিকর্ণের গবেষণার সুবিধে হবে।'...

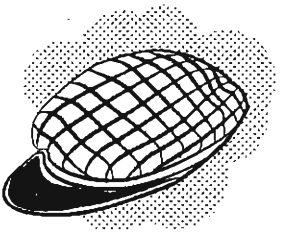

কালো বাকসের রহস্য

ছেঁড়া ঘুড়ির পেছনে

আচায্যিপাড়ার স্বপন কবে তার জ্যাঠামশায়ের শ্রাদ্ধে ন্যাড়া হয়েছিল সেই থেকে ওর নাম ন্যাড়া হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ন্যাড়া বললে ভারি রেগে যেত। আজকাল সয়ে গেছে। বাড়িতেও সবাই তাকে ন্যাড়া বলে।

তা ন্যাড়াই ব্যাপারটা দেখেছিল।

এই মহকুমা শহরের পাশ ঘেঁষে গেছে রেললাইন। স্টেশনের ওধারে রেলইয়ার্ড হবে বলে প্রায় এক বর্গকিলোমিটার জায়গা রেলদফতর দখল করে রেখেছেন। সেখানে আগাছার জঙ্গল, হাজামজা একটা ঝিল আর ঘাসেভরা মাঠ আছে। সেই মাঠে অনেক ছেলে গিয়ে ঘুড়ি ওড়ায় কিংবা খেলাধুলো করে। ন্যাড়া গিয়েছিল ঘুড়ি ওড়াতে।

শীতের বিকেল। কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছিল। ন্যাড়ার ঘুড়ি একটা গোত্তা খেয়ে গাছের ডগায় সুতো জড়িয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছিল। ন্যাড়া গাছে চড়তে তত পটু নয়। আর গাছটাও মস্তো ঝাঁকড়া বট। অগুনতি ঝুরি। তলাটা ততক্ষণে বেশ আঁধার দেখাচ্ছিল।

ন্যাড়া এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখেছিল, কেউ কোথাও নেই। যেসব ছেলে তার মতো ঘুড়ি ওড়াতে এসেছিল বা ক্রিকেট খেলছিল, কখন একে একে চলে গেছে।

ন্যাড়ার মনে শুধু ভূতের ভয়। এমন নিরিবিলি জায়গা, তার ওপর আসন্ন সন্ধ্যা আর এমন বটগাছের মতো আশ্রয়। ভূতেরা কি এমন জায়গা ছেড়ে থাকতে চায়?

কিন্তু অমন সুন্দর ঘুড়িটাও এখন একটুও ফেঁসে যায়নি। শান্তভাবে আটকে আছে। অনেকখানি সুতোও রয়েছে। ন্যাড়া শেষ পর্যন্ত সাহস করে বটগাছে উঠেছিল। মোটা ছড়ানো একটা ডালে কয়েক-পা এগোলেই মাথার ওপর হাত বাড়িয়ে ঘুড়িটা ছাড়ানো যায়।

সে সবে ঘুড়িটা ছাড়িয়েছে, হঠাৎ নিচে কোথাও শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ হল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে সে দেখল, দুজন লোক সবে এসে দাঁড়িয়েছে এবং চাপা গলায় কী বলাবলি করছে। একজনের চেহারা একেবারে জল্লাদের মতো। গোঁফ, গালপাট্টা তো আছেই। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। পরনে কালো পাতলুন আর কালো গেঞ্জি। একজনের হাতে বন্দুক, অন্যজনের হাতে পিস্তল। তার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। গায়ে চাদর। তাদের পায়ের কাছে একটা কালো রঙের ছোট্ট বাকসো রয়েছে। বাকসোটা তারা বয়ে এনেছে বোঝাই যায়। কিন্তু লোক দুটোকে যেন এর আগে কোথাও দেখেছে। পিস্তলধারী মুখটা চাদরে ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

ন্যাড়া বিশেষ করে বন্দুক-পিস্তল দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। লোকদুটো নিশ্চয় ডাকাত-গুন্ডা না হয়ে যায় না। পাছে ন্যাড়াকে তারা মেরে ফেলে, ন্যাড়া টুঁ শব্দটি করেনি। সে চুপচাপ গিরগিটির মতো ডালের সঙ্গে নিজেকে আটকে রেখে ব্যাপারটি দেখছিল।

আলো ক্রমে মরে যাচ্ছিল। আবছা আঁধারে লোক দুটো তারপর অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করেছিল। তারা বটতলায় জুতোর ঠোক্কর মেরে যেন একটা অদৃশ্য ফুটবল নিয়ে খেলা করছিল। খানিক পরে একজন বলে উঠেছিল—'এসো, হাত লাগাও।'

তারপর দুজনে হাঁটু দুমড়ে বসে মস্তো দুটো ছোরা বের করেছিল। সেই ছোরা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা আংটা বেরুতেই সেটা দুজনে মিলে জোর টানাটানি করেছিল। ততক্ষণে বটতলায় আঁধার

ঘন হয়েছে। ন্যাড়া স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু টের পেয়েছিল। কালো বাকসোটা দুজনে বয়ে এনে তারপর কিছুক্ষণ যেন বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল। আর কোনও সাড়া-শব্দই নেই।

সেই শীতে ন্যাড়া তো জমে হিম হয়ে গেছে। অথচ সাহস করে নেমে আসতে পারছে না। ঘুড়ির মায়া আর নেই তখন। প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসাটাই বড় কথা। কিন্তু নামলেই যদি গুন্ডা দুটোর সামনে পড়ে?

অথচ ওরা গেল কোথায়? বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি?

না। একটু পরে টর্চের আলো জ্বলল নিচে। সেই আলোয় ন্যাড়া যা দেখল, তাতে হতবাক হয়ে বসে রইল। একটা চৌকো গর্তের ধারে একজন বসে গর্তের ভেতর আলো ফেলেছে। আরেকজন সেই গর্তে নেমে কী একটা টানাটানি করছে। কালো বাকসোটা তার পায়ের কাছে গর্তের মধ্যেই রয়েছে। গর্তটা কিন্তু নিছক গর্ত নয়, চৌকো পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চা যেন।

গর্তের লোকটা হঠাৎ বলে উঠল—'পাওয়া গেছে।'

ওপরকার লোকটা বলল—'খুলে ফ্যালো।'

'ফের বিষাক্ত গ্যাস বেরুতে পারে আগের মতো।'

'পরীক্ষা করে দ্যাখো তাহলে। আগের বার নিশ্চয় সব বেরিয়ে গেছে।'

ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ। গর্তের লোকটা কী একটা যন্ত্র বের করে নাড়াচাড়া করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—'নেই।'

'তাহলে ভেতরে ঢুকে যাও। আমি টর্চ নেভাচ্ছি। কেউ দেখে ফেলতে পারে।'

'ঠিক আছে! আমার কাছে টর্চ আছে।'

গর্তের ওপরকার টর্চ নিভে গেল। গর্তের ভেতর টর্চ জ্বলল। লোকটা সেই কালো বাকসোটা নিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসল। তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

বটতলার নিচে তখন ঘন অন্ধকার। এত শীতেও ন্যাড়ার গায়ে যেন ঘাম জমছিল। সে বুঝতে পারছিল না, এটা একটা স্বপ্ন না বাস্তব ঘটনা। কে ওরা? ওই বাকসোতে কী আছে? আর এই পোড়ো জঙ্গুলে জায়গায় কি তাহলে মাটির নিচে কোনও গোপন ঘর আছে—যেখানে লোকটা বাকসোটা লুকোতে নিয়ে গেল।

সময় কাটতে চায় না। ঝিলের ওদিকে শেয়াল ডাকছিল। মাথার ওপর প্যাঁচা ডেকে উঠছিল। ভাগ্যিস নিচের লোকটা প্যাঁচাটা দেখার জন্য টর্চ জ্বালেনি। তাহলেই ন্যাড়াকে দেখতে পেত এবং নিশ্চয় গুলি করে মারত। কিন্তু সেই সময় হঠাৎ ন্যাড়ার মনে হল, ওদের গলার স্বর যেন চেনা।

কতক্ষণ পরে নিচে ফের আলোর ঝলক। তারপর দুজনের কথাবার্তা শোনা গিয়েছিল।

'সব ঠিক আছে।'

'হুম। উঠে এসো ঝটপট। সব ঢাকাঢুকি দেওয়া যাক।'

'অলো জ্বালার দরকার নেই। এসো, হাত লাগাও।'

নিচে অস্পষ্ট একটা ভারী শব্দ হল। তারপর অনেক রকম বিদঘুটে খসখস, ধুপধাপ শব্দ হতে থাকল। তারপর ন্যাড়া টের পেল, ওরা চলে গেল। বটতলায় তখন ঘন আঁধার আর নীরবতা। আর হিম।

একটু পরে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘুড়ির মায়া ছেড়ে ন্যাড়া গাছ থেকে নেমে এসেছিল। তারপর এক দৌড়ে স্টেশন। স্টেশন থেকে সটান বাড়ি।

সে-রাতে ভালো ঘুম হয়নি তার। কিন্তু ঘটনাটা বাবা-মা কিংবা আর কাউকে বলেনি—পাছে ওঁরা ওকে গাছে ওঠার জন্য বকাবকি করেন। তাছাড়া এই বিদঘুটে ব্যাপারটা তাঁরা যে বিশ্বাস করবেন না, ন্যাড়া তা জানত। উলটে মিথ্যে বলার জন্য তাকে মার খেতে হবে বরং।

রহস্যময় কালো বাকসো

ন্যাড়া স্বভাবে যাকে বলে আপনভোলা ছেলে। খানিকটা খেয়ালিও বটে। তারপর কতদিন স্টেশনের ওপারে সেই মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে বা বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেও গেছে। কিন্তু বটতলার সেই রহস্যময় ঘটনার কথা নিয়ে আর গা করেনি। বন্ধুরাও হয়তো তাকে মিথ্যুক বলে বসবে।

তাছাড়া বটগাছটার এমন ভুতুড়ে চেহারা যে দিনদুপুরে ওখানে যেতেই বুক কাঁপে।

ঘুড়িটা কয়েকদিনের মধ্যেই বাতাসের চোটে ফাটাফুটি হয়ে শুধু কঙ্কালটুকু আটকে রয়েছে।

কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে ন্যাড়ার ছোটমামা শংকরবাবু এলেন বেড়াতে। বড়দিনের ছুটি কাটাতে ফি বছর তিনি লিটনগঞ্জে দিদির বাড়িই আসেন। এ শহরটা ভারি ছিমছাম আর সুন্দর। একটা নদীও বয়ে গেছে পাশ দিয়ে। জলবায়ু মোটামুটি স্বাস্থ্যকর।

শংকরবাবু নানা দেশ ঘুরেছেন। চমৎকার গল্প করতে পারেন। ছোটমামা এলে ন্যাড়া তো আহ্লাদে আটখানা হয়। সব সময় ছায়ার মতো ওঁর সঙ্গে ঘোরে।

বিকেলে শংকরবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে শ্রীমান ন্যাড়া।

শংকরবাবু সম্প্রতি আফ্রিকার চাঁদ রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা বিশাল হ্রদ আছে। তার ওপর আছে ভাসমান দ্বীপ। সেইসব দ্বীপে একটা করে বসতি রয়েছে। মজার কথা, দ্বীপগুলো সারাদিন হ্রদে একখান থেকে আরেকখানে ভেসে বেড়ায়। আর বসতিগুলো যেন জাহাজ। সেইসব গল্প বলছিলেন শংকরবাবু।

শেষে কথায়-কথায় বললেন—'তবে সব দেশের চেহারাই দিনে-দিনে বদলে যাচ্ছে। খালি তোদের লিটনগঞ্জ দেখছি, বরাবর একইরকম রয়ে গেল!'

ন্যাড়া বলল—'আচ্ছা ছোটমামা, সেবার কোথায় যেন গিয়েছিলে—সেই যে সুড়ঙ্গের মধ্যে লোকেরা বাস করে। বাইরে বেরুবার দরকার হয় না! সেটা কী দেশ ছোটমামা?'

'ও। সে তো দক্ষিণ মেরুতে। আন্টার্কটিকায়।' বলে শংকরবাবু একচোট হাসলেন। 'কিন্তু তাঁরা তো বিজ্ঞানী। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে গিয়ে আন্টার্কটিকায় বরফ খুঁড়ে পাতালনগরী বানিয়ে বাস করছেন। কতরকম পরীক্ষা করছেন। সে আসলে তাঁদের গবেষণাকেন্দ্র। বুঝলি?'

ন্যাড়া লাজুক হেসে বলল—'আমার বড্ড ভুলো মন, ছোটমামা। তুমি তাই বলেছিলে বটে। এই দ্যাখো না, সুড়ঙ্গ বলতেই মনে পড়ে গেল ....'

বলে হঠাৎ চুপ করে গেল সে। শংকরবাবু বললেন—'কী রে? থামলি যে?'

ন্যাড়া ওঁর একটা হাত চেপে ধরে বলল—'ছোটমামা, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?'

শংকরবাবু অবাক হয়ে বললেন—'কোথায় রে?'

'আহা। এসো না! তোমাকে আমি সুড়ঙ্গ দেখাব।'

বলে ন্যাড়া শংকরবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। শংকরবাবু জানেন, তাঁর এই ভাগনেবাবাজি বরাবর বড্ড খামখেয়ালি ছেলে। অদ্ভুত স্বভাবচরিত্র। মাঝে মাঝে যা সব করে, পাগলামি বলেই মনে হয়। তার ওপর বড্ড জেদিও বটে।

তাই চুপচাপ হাসিমুখে ওর সঙ্গে চললেন। চলা তো নয়, যেন গাড়িতে যাওয়া। ন্যাড়া তাঁকে প্রায় দৌড় করিয়ে নিয়ে চলেছে। স্টেশনে গিয়েও থামল না! ওভারব্রিজ পেরিয়ে একেবারে সেই পোড়ো মাঠে হাজির করল। সেখান থেকে জঙ্গলের মধ্যে বটতলায়।

বটতলায় ন্যাড়া হাত ছেড়ে দিয়ে কী যেন খুঁজছে দেখে শংকরবাবু বললেন—'ব্যাপারটা কী বলবি তো বাঁদর ছেলে। এতখানি পথ আমায় দৌড় করালি। বাপ্‌স। এবয়সে এত ধকল বরদাস্ত হয়? দম বেরিয়ে গেছে একেবারে।'

ন্যাড়া একবার ওপর দিকে বটগাছের ডালপালার দিকে তাকাল। তারপর নিচের দিকে তাকাল। দৌড়ে গিয়ে শুকনো পাতা সরাতে আরম্ভ করল।

শংকরবাবু বললেন—'ও কী রে! ও কী করছিস?'

ন্যাড়া ব্যস্তভাবে বলল—'সুড়ঙ্গের কথা বললুম না। সেই সুড়ঙ্গটা এখানেই আছে।'

'অ্যাঁ। বলিস কী!' বলে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শংকরবাবু।

শুকনো পাতার তলায় মাটির চাঙড় সরাচ্ছিল ন্যাড়া। একটু পরেই সে চেঁচিয়ে উঠল—'ছোটমামা! ছোটমামা! কাম অন! পেয়ে গেছি।'

শংকরবাবু হেঁট হয়ে দেখলেন, একটা চৌকো পাথর রয়েছে এবং তার মধ্যিখানে একটা লোহার মজবুত আংটা। বললেন—'তাজ্জব ব্যাপার! এ কী রে ন্যাড়া!'

'সুড়ঙ্গের দরজা ছোটমামা।'

'তুই টের পেলি কীভাবে?'

'পরে বলব। আগে এটা ওঠাও না!'

দুজনে আংটা ধরে পাথরটা তুলে একপাশে রাখল। নিচে কবরের মতো একটা গর্ত দেখা গেল। এখনও দিনের আলো প্রচুর। শংকরবাবু গর্তে লাফ দিয়ে নামলেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—'এ কী!'

ন্যাড়া হাঁটু গেড়ে গর্তের মাথার দিকে বসে রয়েছে। বলল—'সুড়ঙ্গের ভেতরে একটা কালো বাকসো দেখতে পাবে। ওর মধ্যে গুপ্তধন আছে।'

'বলিস কী!' বলে শংকরবাবু সুড়ঙ্গের দরজাটা টেনে খুললেন। ভেতরে ঘন অন্ধকার। পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বের করে জ্বাললেন। তারপর ভেতরে ঢুকে গেলেন। কয়েক পা এগিয়ে টের পেলেন, এটা একটা ছোট ঘর। মাটির নিচে পাথরের দেয়াল ও ওপরে ছাদ রয়েছে। আর ঘরের মধ্যিখানে একটা কালো পাথরের ছোট্ট কবর। কবরের গায়ে ফারসি ভাষায় লেখা একটা ফলক আছে। এটা সম্ভবত কোনো শিশুর কবর। শংকরবাবুর মনে পড়ল, কয়েকশো বছর আগে এখানে বাংলার তুর্কি সুলতানদের রাজধানী ছিল। এই মাটির তলায় গোপন কবর নিশ্চয় কোনা সুলতানবংশীয় শিশুর। পাছে শত্রুপক্ষ সুলতানবংশীয় শিশুর মৃতদেহের অসম্মান করে, তাই হয়তো গোপনে এভাবে ভূগর্ভে কবর দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, কবরের ওপর সত্যি একটা কালো বাকসো রয়েছে। বাকসোটা ছোট্ট। শংকরবাবু সেটা তুলে নিলেন। বিশেষ ভারী নয়।

ওপর থেকে ন্যাড়ার চাপা গলার আওয়াজ ভেসে এল—'শিগগির ছোটমামা! শিগগির! বাকসো নিয়ে চলে এসো। কারা যেন আসছে!'

শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে বেরিয়ে বললেন—'ন্যাড়া, ধর এটা। আমি দরজা এঁটে দিই।'

ন্যাড়া কালো বাকসোটা নিয়ে বলল—'মনে হচ্ছে, সেই লোকদুটো আসছে ছোটমামা! শিগগির!'

শংকরবাবু ঝটপট গর্ত থেকে উঠলেন। তারপর আংটা লাগানো পাথরটা আগের মতো চাপা দিয়ে তার ওপর মাটির চাঙড়গুলো বসিয়ে দিলেন। শুকনো পাতা ছড়ালেন। একেবারে আগের মতো স্বাভাবিক দেখাল জায়গাটা।

ন্যাড়া আঙুল তুলে ওপাশের মাঠে দুজন লোককে দেখিয়ে বলল—'ওরা আসছে। কেটে পড়া যাক ছোটমামা! ওদের কাছে বন্দুক আছে কিন্তু।'

লোকদুটো ওদের দেখতে পাচ্ছিল না। কারণ বটগাছটার ঝুরি আছে অজস্র। তা ছাড়া ওপাশে ঝোপঝাড়ও রয়েছে। শংকরবাবু বাকসোটা বগলদাবা করে বললেন—'চলে আয় ন্যাড়া।'

দুজনে উলটো দিকের জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

তারপর অনেকখানি জঙ্গলের আড়ালে এগিয়ে ঘুরপথে নদীর ব্রিজে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে রেললাইন ডিঙিয়ে একেবারে সোজা বাড়ির পথে।...

শ্রীমান ন্যাড়ার অন্তর্ধান

কলকাতার ইলিয়ট রোডে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটটি 'বুড়ো ঘুঘুর বাসা' বলে পরিচিত। বুড়ো ঘুঘু বলতে কর্নেলকেই বোঝায়। ধুরন্ধর লোককেই ঘুঘু বলা হয়। তবে কদর্থে। কিন্তু কর্নেলের বেলায় এই ঘুঘু-নাম সদর্থে। এই বুড়োর মতো বিচক্ষণ ও ক্ষুরধার বুদ্ধির গোয়েন্দা কদাচিৎ দেখা যায়। লোকে বলে, তাঁর টাক পড়ার কারণ বুদ্ধির তেজে চুল উঠে গেছে। আর সেইসব চুলই নাকি সাদা দাড়ি হয়ে গজিয়েছে।

যাই হোক, সেদিন শীতের সকালে কর্নেল তাঁর ড্রইং রুমে বসে খুব মনোযোগ দিয়ে এক ভদ্রলোকের কথা শুনছিলেন।

এই ভদ্রলোক আর কেউ নন, শংকরবাবু। লিটনগঞ্জের শ্রীমান ন্যাড়ার সেই ছোটমামা।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন—'হুম। তারপর কী হল বলুন।'

শংকরবাবু বললেন—'বাকসোটা খোলার বহু চেষ্টা করেও খুলতে পারলুম না, বাকসোটা ইস্পাতের পাতে তৈরি মনে হল। তাই পরদিন ওটা গোপনে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চলে এলুম। আমার এক বন্ধুর ছোট্ট মেশিনটুলসের কারখানা আছে। তার ওখানেই খোলার ব্যবস্থা করব ভেবেছিলুম। কিন্তু বন্ধুও হার মানলেন। বললেন, এটা কোনওভাবে খোলা সম্ভব নয়। বিদেশে একরকম ইলেকট্রনিক করাত আছে, তা দিয়ে কাটা যেতে পারে। শুনে তো ভারি দমে গেলুম। বাকসোটা ফেরত নিয়ে সবে বাড়ি ফিরেছি, দেখি লিটনগঞ্জ থেকে আমার জামাইবাবু অর্থাৎ শ্রীমান ন্যাড়ার বাবা অসীমবাবু হাজির। ব্যাপার কী? না—ন্যাড়ার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার কাছে আসেনি শুনে তো উনি ভেঙে পড়লেন। তখন ...

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—'অসীমবাবু বাকসোর ব্যাপার জানেন?'

'না। কাকেও বলিনি। আমার বন্ধু জগন্ময়কেও বলিনি, কীভাবে কোথায় ওটা পাওয়া গেছে।'

'হুম। তারপর?'

'তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে জামাইবাবুকে তো লিটনগঞ্জ পাঠালুম। লালবাজার মিসিং স্কোয়াডে ন্যাড়ার ছবি দিয়ে নিখোঁজের খবরও দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে যা আঁচ করেছিলুম, তাই ঘটেছে। আমার কাছে কাল হঠাৎ একটা বেনামী চিঠি এসে হাজির। তাতে লেখা আছে : তোমার ভাগনেবাবাজি শ্রীমান ন্যাড়া আমাদের হাতে। যদি ওকে ফেরত চাও, তাহলে পত্রপাঠ আমাদের বাকসোটি এই ঠিকানায় রেখে এসো। মনে রেখো, দু-দিনের বেশি অপেক্ষা করতে রাজি নই।'...

'কোনও নাম নেই চিঠিতে?'

'আজ্ঞে না।'

'চিঠিটা সঙ্গে এনেছেন?'

'হ্যাঁ। এই যে।' শংকরবাবু একটা খাম বার করে এগিয়ে দিলেন।

কর্নেল চিঠিটা খুলে পড়ার পর বললেন—'হুম! বি টি রোডের ধারে জায়গাটা। একটা বাগানবাড়ি আছে ওখানে। পেছনে গঙ্গার ধারে সায়েবি আমলের কবরখানা। বাকসোটা ওখানে পৌঁছে দিতে হবে! আচ্ছা শংকরবাবু, বাকসোটা এখন কোথায় রেখেছেন?'

শংকরবাবু চাপা গলায় বললেন—'আমার বেডরুমে। তবে এমনভাবে রেখেছি, কেউ টের পাবে না।'

'কীভাবে, শুনি?'

'আমরা বনেদি পরিবার কলকাতার। আমার ঠাকুরদা স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষের নাম শুনে থাকবেন। উনি প্রখ্যাত শিকারি ছিলেন। আমার বাবা বারীন্দ্রনাথ নামকরা শিকারি ছিলেন। তিনি কবছর আগে মারা গেছেন। আমাদের বাড়িটা পুরোনো আমলের। দেয়ালে অনেক জায়গায় গুপ্ত আলমারি রয়েছে। বাইরে থেকে এতটুকু ধরা যাবে না। আমার বেডরুমে একপাশের দেয়ালে ওইরকম একটা গুপ্ত আলমারি আছে। তার মধ্যে রেখেছি বাকসোটা।'

কর্নেল চিঠিটা মুড়ে খামে ঢুকিয়ে বললেন—'এটা আমার কাছে রইল। আপত্তি নেই তো?'

শংকরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—'মোটেও না, মোটেও না। এমনকি, বাকসোটাও আপনার জিম্মায় রাখবার কথা ভেবেছি, কর্নেল! এতকাল ধরে আপনার কত সব কীর্তির কথা কাগজে পড়েছি। মনে মনে কতবার ভেবেছি, আপনার সঙ্গে আলাপ করে আসব। সময় হয় না। বিশেষ করে শুনেছি, একসময় আপনারও আমার মতো দেশ-বিদেশে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল!'

'এখনও আছে।' বলে কর্নেল হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। 'যাকগে চলুন শংকরবাবু, আগে সেই বাকসোটা দেখে আসি। তারপর শ্রীমান ন্যাড়ার উদ্ধারের কথা ভাবা যাবে।'

একটু পরে শংকরবাবুর নীল রঙের মোটরগাড়িটি ছুটে চলল উত্তর কলকাতার দিকে। শ্যামবাজার ছাড়িয়ে গিয়ে বি টি রোডে পৌঁছে শংকরবাবু বললেন—'এটাই আশ্চর্য লাগছে। যেখানে ওরা বাকসোটা ফেরত দিতে বলেছে, সে জায়গাটা আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে।'

কর্নেল চোখ বুজে কী ভাবছিলেন। শুধু বললেন—'হুম!'

ডানলপ ব্রিজ ছাড়িয়ে আরও দু-কিলোমিটার এগিয়ে বাঁদিকে একটা ছোট রাস্তায় গাড়ি মোড় নিল। তারপর সামনে একটা গেট দেখা গেল। ওটা শংকরবাবুর পৈতৃক বাড়ি, 'অমর নিকেতন।'

গঙ্গার ধারে বিশাল এলাকা জুড়ে এই বাড়ি। বাগান রয়েছে। ফুল বাগিচা আছে। আগের আমলে বনেদি বড়লোকের বাড়ি যেমন ছিল তেমনি। গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াল।

রহস্য আরও ঘনীভূত

শংকরবাবুর বেডরুম দোতলার পুব-দক্ষিণ কোণে। অবিবাহিত মানুষ। বাড়িতে লোক বলতে উনি, ওঁর দূর সম্পর্কের এক পিসিমা যোগমায়াদেবী, আর রাঁধুনি সিধু ঠাকুর, বাজার সরকার মদনবাবু, চাকর হারাধন। হারাধন বুড়ো হয়ে গেছে। শংকরবাবুকে একরকম কোলেপিঠে করে সেই মানুষ করেছে। বাইরের কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না ওঁদের মধ্যে মনিব-চাকর সম্পর্ক।

কর্নেল ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—'আপনিও কি শিকারি?'

শংকরবাবু হেসে জবাব দিলেন—'হ্যাঁ। ওটা তিন-পুরুষের নেশা বলতে পারেন। তবে আজকাল তো দেশ থেকে বনজঙ্গল প্রায় উজাড়! জন্তুজানোয়ারও বিশেষ নেই-টেই। যা কিছু আছে, তা সরকারি অভয়ারণ্যে বাস করছে। কাজেই আজকাল শিকারে যাওয়া হয় না।'

কর্নেল বললেন—'যাক্ গে। এবার সেই বাকসোটা বের করুন।'

শংকরবাবু ঘরের দরজা-জানলাগুলো বন্ধ করে দিলেন আগে। তারপর সুইচ টিপে বাতি জ্বাললেন। একপাশের দেয়ালে লম্বা-চওড়া একটা ছবি টাঙানো আছে। বিলিতি চিত্রকরের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি। ছবিটা একটু ঠেলে একটা খুদে বোতাম টিপলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের প্রায় দু-ফুট লম্বা এক ফুট চওড়া একটা অংশ ছোট্ট কপাটের পাল্লার মতো খুলে গেল। তখন ভেতরে হাত ভরে কালো একটা বাকসো বের করে আনলেন।

ফের বোতাম টিপে দেওয়ালের গুপ্ত খোঁদলটা আগের মতো ছবিচাপা দিলেন। বাকসোটা টেবিলে এনে রাখতেই কর্নেল ঝুঁকে পড়লেন সেটার দিকে। বললেন—'এই সেই বাকসো?'

'হ্যাঁ কর্নেল। এই সেই আজগুবি বাকসো।'

কর্নেল টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপে বাকসোটা দেখতে দেখতে তাঁর মুখে প্রচণ্ড বিস্ময় ফুটে উঠল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—'আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

শংকরবাবু বললেন—'কী আশ্চর্য কর্নেল?'

'শংকরবাবু, মনে হচ্ছে এটা একটা ঐতিহাসিক বাকসো। এর গায়ে খুব ছোট হরফে ফারসিভাষায় কী সব লেখা আছে। আমি ফারসিভাষাটা মোটামুটি জানি। একসময়ে ইরানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদ্রোহী একদল কুর্দ উপজাতির হাতে বন্দি হয়েছিলাম। কুর্দদের মাতৃভাষা ফারসির অপভ্রংশ কুর্দিস্তানি। কিন্তু তারা ফারসিও ভালো জানে। যাই হোক, পরে ব্রিটিশ সেনারা আমাকে উদ্ধার করেছিল। কিন্তু মাঝখান থেকে কুর্দিস্তানি আর ইরানি অর্থাৎ ফারসি আমার শেখা হয়ে যায়। প্রসঙ্গত বলছি শংকরবাবু, সংস্কৃত ও ফারসি কিন্তু আর্যজাতির ভাষার গোষ্ঠীতে যমজ ভাই-বোন বলতে পারেন। এ দু-ভাষায় বিস্তর শব্দ একরকম। তাদের মানেও এক।'

কর্নেলের এই বকবক করা বদ অভ্যাস। শংকরবাবু শুনেছিলেন, এ বুড়ো না জানে এমন কোনো বিষয় নেই। যাই হোক, শংকরবাবু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন—'তাহলে ওতে কী লেখা আছে, বলুন তো কর্নেল?'

কর্নেল আতস কাচের সাহায্যে বাকসের লেখাগুলো পড়তে পড়তে বললেন—'আমি অনুবাদ করে যাচ্ছি বাংলায়। আপনি লিখে নিন।'

শংকরবাবু একটা প্যাডে লিখতে শুরু করলেন।

"১০০০ হিজরি সনে পরম প্রতাপশালী জায়গিরদার মইনুদ্দিন শাহ আল-তামাসের একমাত্র পুত্র আজিমুদ্দিন করুণাময় ঈশ্বরের আহ্বানে মাত্র দ্বাদশ বর্ষ বয়সে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার শোকগ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা মিশর হইতে এক সাধকের আশীর্বাদস্বরূপ যে অগণিত রত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা এই কৃষ্ণবর্ণ ধাতুনির্মিত পেটিকায় রাখিয়া স্বর্গীয় বালকের সমাধিতে স্থাপন করিলেন।

"কিন্তু এই পেটিকা এক মহাতপস্বী অলৌকিক শক্তিধর ফকিরের মন্ত্রপূত। যে ইহা হরণ করিবে, তাহারই সর্বনাশ ঘটিবে। অতএব হে ঘৃণ্য তস্করবৃন্দ! হুঁশিয়ার। ইহা স্পর্শ করিও না।...

"সুকৌশলে নির্মিত এই পেটিকা এমন এক ধাতুতে নির্মিত যে ইহা কোনোভাবেই খোলা যাইবে না। ইহা ভাঙাও অসম্ভব। অতএব, হে লোভী মানুষ! বৃথা সে-চেষ্টা করিও না।...

"এই পেটিকার একস্থলে প্রায় অদৃশ্যে ছুঁচের ন্যায় একটি ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রপথে ইহার চাবি প্রবেশ করাইলে তবেই ইহা খোলা সম্ভব। চাবিটি স্বর্গীয় বালকের কেশের মধ্যে লুকোনো রহিল।

"কিন্তু হুঁশিয়ার! পুণ্যাত্মা বালকের মৃতদেহ স্পর্শ করিও না। ফকিরের অভিশাপ হইতে রক্ষা পাইবে না।"..

লেখা শেষ করে শংকরবাবু কর্নেলের মুখের দিকে তাকালেন। কর্নেল তখনও বাকসের দিকে তাকিয়ে আছেন। শংকরবাবু বললেন—'১০০০ হিজরি সন কত খ্রিস্টাব্দ কর্নেল?'

কর্নেল আনমনে জবাব দিলেন—'১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ। বাংলায় তখন তুর্কি সুলতানের রাজত্ব।'

'কিন্তু লিটনগঞ্জের ওই পোড়ো মাঠে জঙ্গলের মধ্যে মাটির তলায় কবরের হদিস পেল কে? কীভাবে পেল?'

'হুম! সেটাই ভাববার কথা। শুধু তাই নয়, আজিমুদ্দিনের কবরে যে এমন গুপ্তধন আছে, তার খবরই বা সে কেমন করে জোগাড় করল?'

'ন্যাড়া বলছিল, একা নয়—দুজন ছিল।'

'হুম' বলে কর্নেল কী যেন ভাবতে থাকলেন। তারপর হঠাৎ নড়ে উঠলেন। বললেন—'আচ্ছা শংকরবাবু, লিটনগঞ্জ তো আপনার চেনা জায়গা। ওখানে কি কোনও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা আছে?'

শংকরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—'আছে, আছে। তবে সেটা তো বেসরকারি সংগ্রহশালা। কমলাক্ষ বাঁড়ুয্যে নামে এক ভদ্রলোকের বেজায় ঐতিহাসিক বাতিক আছে। বলতে গেলে সংগ্রহশালাটা ওঁর চেষ্টাতেই হয়েছে। এলাকা খুঁজে নানারকম প্রাচীন মূর্তি, দলিল-দস্তাবেজ জোগাড় করেন উনি।'

কর্নেল বললেন—'হুম! চলুন, আজই আমরা লিটনগঞ্জ রওনা দিই। কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে আলাপ করা খুব দরকার।'

শংকরবাবু অবাক হয়ে বললেন—'কিন্তু ন্যাড়ার উদ্ধারের কী হবে? ওরা যে আজ আর আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিয়েছে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'ভাববেন না। ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য বাকসো পাওয়া। ন্যাড়াবাবাজিকে মেরে ফেলাটা তো উদ্দেশ্য নয়। ওরা ভালোই জানে, ছেলেটাকে মেরে ফেললে আপনারা বাকসোটা সোজা পুলিশের হাতে দেবেন। আমি অপরাধীদের চরিত্র নিয়ে বহুকাল ঘাঁটাঘাঁটি করছি, শংকরবাবু। ওরা যদি নিছক টাকা দাবি করত, তাহলে ভাবনার কথা ছিল। আসল কথা, ওরা চায় বাকসোটা। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকুন। তাছাড়া আগামীকাল বিকেলের মধ্যে আমরা ফিরে আসছি।'

কথা বলতে বলতে কর্নেল এগিয়ে পশ্চিমের একটা জানলা একটু খুলে উঁকি দিলেন। তারপর চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন—'হুম! ওরা আপনার বাড়ির দিকে নজর রেখেছে।'

'সে কী!' বলে শংকরবাবু কাছে গেলেন। কর্নেল তাঁকে বাইনোকুলারটা দিলে তাতে চোখ রেখে শংকরবাবু বললেন—'গঙ্গার ঘাটে যে লোকটা ছিপ ফেলে বসে আছে, সেই কি?'

'ঠিক ধরেছেন!' কর্নেল সরে এলেন। তারপর বললেন—'বাকসোটা যথাস্থানে লুকিয়ে ফেলুন। তারপর চলুন, এখনই বেরিয়ে পড়া যাক!'

বাকসোটা আগের জায়গায় রেখে ছবিটা ঠিকঠাক করে আলো নিভিয়ে শংকরবাবু জানালাগুলো খুলে দিলেন। পশ্চিমে একবার উঁকি মেরে বললেন— 'ছিপ নিয়ে লোকটা চলে যাচ্ছে, কর্নেল।'

'যাক গে। আপনি রেডি হয়ে নিন শিগগির। আর হ্যাঁ, অনুবাদের কাগজটা আমাকে দিন। ওটা পুড়িয়ে ফেলা দরকার।'

শংকরবাবু বেরিয়ে গেলেন কাগজটা দিয়ে। হারাধনকে খাওয়ার আয়োজন করতে বলবেন। এদিকে কর্নেল কাগজটা পুড়িয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিলেন।

একটু পরে হারাধন ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। শংকরবাবু এসে বললেন— 'পৌঁছোতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। কাজেই পেটপুরে খেয়ে নিন কর্নেল!'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—'আমি তত ভোজনবিলাসী নই। আপনার হারাধন দেখছি দশজন পালোয়ানের খাবার এনেছে!'

হারাধন একগাল হেসে বলল—'তা আজ্ঞে, আপনার যা পালোয়ানি চেহারা, ওটুকুন আপনার এক গেরাস মাত্তর।'

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন ...

কমলাক্ষের শয়তানি

ন্যাড়া মোটামুটি বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু সে ভারি সরল। সেটাই তার বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরদিন সকালে ছোটমামু শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। ন্যাড়া স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছে, পথে কমলাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা। উনি হন হন করে আসছিলেন। পাড়াসম্পর্কে কাকা বলে ন্যাড়া। তাই বলেছিল—'ও কাকু। ট্রেন যে এইমাত্তর ছেড়ে গেল!'

কমলাক্ষ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—'যাঃ! তাহলে আর কী হবে? ওবেলা যাব'খন। আয় বাবা নেড়ু তোর সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই।'

সেই সময় হঠাৎ ন্যাড়ার মনে চমক খেলেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় যে দুটো লোক মাটির তলার ওই কবর খুঁড়তে গিয়েছিল তাদের একজনের গলার স্বর অবিকল কমলাক্ষের মতো না? ন্যাড়া বলেছিল—'হ্যাঁ কাকু, তোমার জাদুঘরে যেসব জিনিস রেখেছ, সেসব কোথায় পেয়েছ গো?'

কমলাক্ষ বলেছিলেন—'ওসব খুঁজে বের করতে হয় রে। অনেক মেহনতের কাজ। ধর্, অনেক সময় মাটির তলাতেও পাওয়া যায়।'

ন্যাড়া বলে উঠেছিল—'ও কাকু, তাহলে সেদিন সন্ধেবেলা স্টেশনের ওপারে বটতলায়...'

অমনি কমলাক্ষ তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলেছিলেন—'চুপ, চুপ। কাকেও বলিস নে। তা হ্যাঁ রে, তুই কীভাবে জানলি?'

ন্যাড়া ফিক করে হেসে বলেছিল—'বা রে! তখন আমি গাছের ডালে আটকানো ঘুড়ি পাড়ছিলুম না? তোমাদের কাছে বন্দুক ছিল। তাছাড়া চিনতেও পারিনি। তাই সাড়া দিইনি!'

'সর্বনাশ!' কমলাক্ষ বলেছিলেন। 'তা এখন চিনলি কী করে?'

'তোমার গলার স্বরে।'

'তুই ভারি বুদ্ধিমান ছেলে, নেড়ু। তা হ্যাঁ রে, কাকেও বলেছিলি নাকি কথাটা?'

'হুঁউ। ছোটমামাকে।'

'তারপর, তারপর?'

সরলমনা খামখেয়ালি ছেলে ন্যাড়া ছোটমামার নিষেধ ভুলে সব কথা বলে ফেলল।

কিন্তু ধূর্ত কমলাক্ষের এটা নিতান্ত ছল। আগের দিন সন্ধেবেলা জঙ্গলে বাকসো নিয়ে পালানোর সময় আবছা একপলক তিনি দেখেছিলেন, দুটো লোক জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের একজন বয়সে বাচ্চা। কিন্তু সে যে ন্যাড়া হতে পারে, ভাবেননি তখন। পরে, ওই মাঠে যেসব ছেলে খেলা করতে যায়, তাদের প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন, একটা বয়স্ক লোক আর একটা কমবয়সি ছেলেকে কাল সন্ধ্যার আগে ওখানে কেউ দেখেছিল নাকি। হরিহর উকিলের ছেলে সতু বলেছিল, ন্যাড়া হতে পারে। ন্যাড়ার ঘুড়ি প্রায় আটকে যায় বটগাছটায়। আর হ্যাঁ, কাল তার সঙ্গে কে একজন অচেনা লোকও ছিল।

কমলাক্ষের সঙ্গীর নাম মাধব। লিটনগঞ্জে লোকে তাকে বলে মেধোগুন্ডা। কমলাক্ষ তাঁর সংগ্রহশালা বা জাদুঘরের অছিলায় প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক মূর্তি সংগ্রহ করেন এবং মাধবের সাহায্যে তা বিদেশে বিক্রি করেন। আজকাল ওসব পুরনো মূর্তি বা জিনিসের চোরাচালানি কারবার চলছে দেশ বিদেশে। কাজটা বেআইনি। হংকং শহরে এক ব্যবসায়ী এই কারবার করে। তার এজেন্ট আছে কলকাতায়। মাধবের সঙ্গে সেই এজেন্টের যোগাযোগ আছে। এভাবে কমলাক্ষ কত প্রত্নদ্রব্য যে মাধবের সাহায্যে পাচার করেছেন, ইয়ত্তা নেই। কমলাক্ষ ও মাধব সেই টাকা আধাআধি ভাগ করে নেন। পুলিশ টের পায় না। কারণ ওই সংগ্রহশালা! সারা দেশের পণ্ডিতরা কমলাক্ষের ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে তোলা জাদুঘরের কত প্রশংসা করেন। মন্ত্রীরাও কতবার দেখে যান। কিন্তু তাঁর জাদুঘরে নেহাত মামুলি কিছু পুরোনো দলিলপত্তর, কিছু

পোড়ামাটির মূর্তি বা মুদ্রা ছাড়া তত দামি কিছু নেই। যা দামি, তা তো পাচার হয়ে যায়। আসলে কমলাক্ষের চোরাচালানি কারবারের একটা অজুহাত হল ওই জাদুঘর।

যাই হোক, কমলাক্ষ ও মাধব আগের দিন সন্ধ্যায় মাটির তলার কবরে কালো বাকসোটা আর দেখতে পাননি। এখন ন্যাড়ার মুখে সব জেনে তিনি তো মনে মনে রেগে আগুন। কিন্তু সেটা প্রকাশ করলেন না।

ন্যাড়া বলেছিল—'হ্যাঁ কাকু, কালো বাকসোটা তোমরা ওখানে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন গো?'

কমলাক্ষ চেপে গেলেন। আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল এই : লিটনগঞ্জে পিরের দরবারে ফকিরের কাছে কিছু টাকার বিনিময়ে এমন ঘটনার আভাস পেয়েছিলেন কমলাক্ষ। সেই সূত্র ধরে আজিমুদ্দিনের কবর খুঁজে বের করেছিলেন। বাকসোটাও পেয়েছিলেন, কিন্তু বাকসোটা কিছুতেই খুলতে বা ভাঙতে পারেননি। মাধবও অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষে দুজনে ঠিক করেছিলেন, আপাতত যেখানে বাকসোটা ছিল সেখানে থাক। ইতিমধ্যে বিদেশি কোনও ধাতুবিদ্যা বিশারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাক। তারপর একদিন বাকসোটা তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ন্যাড়ার ছোটমামার পাল্লায় পড়ে সেটা বেহাত হয়ে গেল।

সেদিন ন্যাড়া তাদের বাড়ি ঢুকলে কমলাক্ষ গেলেন মাধবের কাছে। মাধব সব শুনে খেপে গেল। সে বলল—'এক কাজ করা যাক্ কমলদা। ওই ক্ষুদে বজ্জাতটাকে আমরা চুরি করে লুকিয়ে রাখি। তারপর বেনামী চিঠি দিই হারামজাদা শংকরচন্দ্রটাকে।'

বাধা দিয়ে কমলাক্ষ বলেছিলেন—'উঁহু ন্যাড়ার বাবাকেই উড়ো চিঠি দিতে হবে। ছেলের জন্য মমতা বাবারই বেশি হবে। বুঝলে না?'

এরপর দুজনে চক্রান্ত করে ন্যাড়াকে চুরির ফিকিরে বেরিয়েছিল।

আপনভোলা ছেলে ন্যাড়া সন্ধ্যার আগে ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে আসছে, তার সামনে একটা জিপগাড়ি দাঁড়াল। মাধবের চোখে কালো চশমা। শীতের সময় বলে টুপিতে মুখের ও মাথার অনেকটা ঢাকা। সে ড্রাইভ করছিল। কমলাক্ষ ডাকলেন—'নেড়ু! বাড়ি চললি বুঝি? আয়, জিপে করে পৌঁছে দিই।'

ন্যাড়া জিপে উঠতেই কমলাক্ষ তার নাকের সামনে রুমাল চেপে ধরল। উগ্র কী এক ঝাঁঝালো গন্ধ টের পেল ন্যাড়া। তারপর তার আর কিছু মনে নেই।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, সে দেখল একটা অচেনা ঘরে শুয়ে আছে। পাশে বসে আছেন কমলাক্ষ। মুখে অমায়িক হাসি।

ন্যাড়া ওঠার চেষ্টা করতেই বললেন—'উঁহু, উঠো না! উঠো না!'

ন্যাড়া বলল—'কেন? আমার কী হয়েছে?'

'অ্যাকসিডেন্ট!' কমলাক্ষ বললেন। 'তোমাকে জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলুম, মনে পড়ছে?'

ন্যাড়া বলল—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'পথে আমাদের জিপ উলটে যায়। ভাগ্যিস, আমি ছিটকে পড়েছিলুম। বেঁচে গেছি। তুমিও বেঁচে গেছ। তবে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে!'

'আমি তো ভালো আছি। আমার কিছু হয়নি!'

'হয়েছে। চুপ করে শুয়ে থাকো।'

ন্যাড়া উঠে বসে বলল—'না। আমি বাড়ি যাব।'

অমনি কমলাক্ষ আচমকা একটা ছুরি বের করে বললেন—'চুপ্। টুঁ শব্দ করলে মুণ্ডু কেটে ফেলব। চুপ করে শুয়ে থাকো।'

কমলাক্ষের হিংস্র চেহারা দেখে ন্যাড়া ভয়ে অবশ হয়ে গেল। এই সময় মাধব ঘরে ঢুকে বলল—'কথা না শুনলে ওর হাত-পা বেঁধে রাখতে হবে কমলদা।'

কমলাক্ষ নিষ্ঠুর হেসে বললেন—'দরকার হবে না। নেড়ু বড় ভালো ছেলে। আর নড়াচড়া করলে ওকে শ্রীমান ডালকুত্তার জিম্মায় রেখে দেব। কই হে মাধব, তোমার প্রিয় ডালকুত্তা জনকে একবার নিয়ে এস।'

ন্যাড়া আতঙ্কে তাকিয়ে দেখল, মাধব কোনার দিক থেকে একটা ভয়ংকর চেহারার ডালকুত্তাকে এনে তার বিছানার খাটের একটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল। ডালকুত্তাটা কুৎসিত জিভ বের করে কুতকুতে হিংস্র চোখে ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

মাধব বলল—'একটু নড়তে চেষ্টা করলে জন তোমার গলায় দাঁত বসাবে। সাবধান।'

কমলাক্ষ বললেন—'ঠিক আছে। এবার আমরা নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ি, চলো মাধব!'

দুজনে বেরিয়ে গেল। বাইরে দরজায় তালা আটকানোর শব্দ শুনল ন্যাড়া। সে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইল। পায়ের দিকে রাক্ষুসে প্রাণীটা নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন একটু নড়লেই গর্জন করে টুঁটি কামড়ে ধরবে।

কমলাক্ষকাকু যে এমন শয়তান, ন্যাড়া কোনওদিন কল্পনাও করেনি।...

ফকিরের বুজরুকি

লিটনগঞ্জে পৌঁছে কর্নেল কিন্তু শংকরবাবুর সঙ্গে ন্যাড়াদের বাড়ি গেলেন না। বললেন—'এখানকার পুলিশ সুপার অজিতেশ আমার পরিচিত। আমি ওঁর সাহায্যে সরকারি ডাকবাংলোতেই থাকার জায়গা করে নেব। আপনি ভাববেন না শংকরবাবু।'

সরকারি আপিস এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলো। শংকরবাবুর গাড়ি তার গেটে দাঁড়াল। কর্নেল গেট খুলে ভেতরে গেলেন।

একটু পরে শংকরবাবু দেখলেন, পুলিশ সুপার আর কর্নেল কথা বলতে বলতে আসছেন গেটের দিকে।

কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই পুলিশ সুপার অজিতেশ বলে উঠলেন—'আরে তুমি শংকর না?'

শংকরবাবুও লাফিয়ে উঠলেন—'অজু! তুমি! কী আশ্চর্য! তুমি যে আমার জামাইবাবুর এলাকায় পুলিশের বড়কর্তা সেজে বসে আছ, স্বপ্নেও ভাবিনি! তুমি সেই বালুরঘাটে না কোথায় ছিলে না। এখানে বদলি হলে কবে?'

অজিতেশ বললেন—'সবে দু সপ্তাহ। যাক্ গে চলে এস। এ বেলা আর জামাইবাবুর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। কী বলেন কর্নেল?'

কর্নেল এতক্ষণ হাঁ করে চেয়েছিলেন। এবার বললেন—'ডার্লিং অজিতেশ। শংকরবাবু—থুড়ি, শ্রীমান শংকর নিশ্চয় তোমার সহপাঠী ছিল ছাত্রজীবনে?'

অজিতেশ বললেন—'হ্যাঁ কর্নেল। আমরা দুজনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তুম।'

'যাক্ গে। তাহলে শংকরকে তুমি বললে, দোষ হবে না।' কর্নেল সকৌতুকে বললেন। তারপর অভ্যাসবশে দাড়িতে ও টাকে একবার করে হাত বুলিয়ে নিলেন।

গাড়ি বাংলোর গেটের পাশে রেখে তিনজনে সুরকি-বিছানো লন পেরিয়ে বাংলোর বারান্দায় উঠলেন। সেখানে বসে কর্নেল ও শংকর মোটামুটি ঘটনাটা পুলিশ সুপার অজিতেশের কাছে বর্ণনা করলেন।

সবটা শুনে অজিতেশ বললেন—'আমার ধারণা, শংকরের ভাগনেকে চুরি করে ওরা কলকাতাতেই কোথাও রেখেছে। কাজেই ওকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সেখানকার পুলিশ দফতরেই যোগাযোগ করা দরকার। আর কর্নেল সাহেব তো এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। লালবাজারের পুলিশকর্তাদের সঙ্গে ওঁর প্রচণ্ড খাতির। তাছাড়া ওঁর নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিও সামান্য নয়। তবে স্টেশনের ওপারে পোড়ো মাঠের জঙ্গলে মাটির তলায় যে কবরের কথা শুনলাম, তা পাহারার দায়িত্ব আমার রইল।

'একদল সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ ওখানে আনাচে-কানাচে চব্বিশঘণ্টা ওত পেতে থাকবে। কাকেও বটতলায় গিয়ে কিছু করতে দেখলেই পাকড়াও করবে।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—'কিন্তু আমি আর শংকর যে ওখানে গিয়ে হানা দিতে চাই। আমাদের ওপর তোমার লোকেরা, হামলা করলেই তো মুশকিল।'

অজিতেশ বললেন—'সে ব্যবস্থা করে রাখব। কর্নেল, আপনার চেহারা তো একেবারে সাহেবের মতো। আর শংকর আপনার সঙ্গে থাকবে। আমার লোকেদের সেটা বলে রাখব। কর্নেলকে চিনতে তাদের ভুল হবে না। তার উপর মাথায় টাক, মুখে দাড়ি।'

আবার তিনজনে হেসে উঠলেন। ততক্ষণে ট্রে ভর্তি খাবার ও কফি এল। দুপুরে খাওয়া পথেই সেরে নিয়েছিলেন। কথা বলতে-বলতে বিকেল হয়েছে। শীতও বেড়েছে। কফি খেয়ে চাঙ্গা হবার পর শংকর বিদায় নিলেন। উনি জামাইবাবুর বাড়ি থাকবেন। ইতিমধ্যে ফোন করে অজিতেশ কর্নেলের জন্য নদীর ধারে সুদৃশ্য বাংলোর ব্যবস্থা করে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পরে অজিতেশ তাঁর জিপে করে কর্নেলকে সেই বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে এলেন।

বাংলোয় দুটো ঘর। পাশের ঘরে এক সরকারি অফিসার এসেছেন। কর্নেলের ঘরটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। নিচে নদী। নদীর ওপারে ঘন বাঁশবনে ঢাকা একটা গ্রাম। রেললাইনটা বাংলোর পূর্বে। পুবের বারান্দায় দাঁড়ালে স্টেশনের ওধারে সেই পোড়ো মাঠের শেষে জঙ্গল ও বটগাছটা দেখা যায়।

শীতের দিন শিগগির ফুরিয়ে এল। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে সেই দূরের বটগাছটা দেখছিলেন। কুয়াশা ও আঁধারে সেটা ঢাকা পড়লে বাইনোকুলার রেখে এলেন ঘরে। শংকরের এখনই এসে পড়ার কথা।

আনমনে লনে পায়চারি করতে করতে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল। মাথায় টুপি, পরনে ওভারকোট এবং হাতে ছড়ি নিয়েছেন। লিটনগঞ্জে শীতটা বড্ড বেশি পড়েছে এবার।

শংকর আসতে দেরি করছেন কেন? কর্নেল উদ্‌বিগ্ন হয়ে ঘড়ি দেখলেন। সওয়া ছটা বেজে গেল। ছটায় আসার কথা।

গেট খুলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই সময় একটু তফাতে কে চিৎকার উঠল—'ইয়া পির মুশকিল আসান। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।' তারপরই এক ঝলক আলো জ্বলে উঠল।

কর্নেল চমকে উঠেছিলেন। পকেটে টর্চ আছে। কিন্তু জ্বাললেন না। দ্রুত আলো লক্ষ করে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু আলোটা রাস্তার ধারে জ্বলছে না। রাস্তার পাশে ঘন ঝোপঝাড়। তার ভেতর দেখা যাচ্ছে। তখন পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলে সাবধানে এগিয়ে গেলেন।

যেখানে আলোটা জ্বলছে, সেখানটা একটা পিরের মাজার বলেই মনে হল। উঁচু চৌকানো পাথরে বাঁধানো বেদির মতো একটা চত্বর রয়েছে। তার পাশে একটা প্রকাণ্ড কাঠমল্লিকা গাছ। গাছের তলায় আগুনের কুণ্ড জ্বেলে বসে আছে এক ফকির।

ফকিরের পরনে কালো আলখেল্লা। গলায় অজস্র পাথরের মালা। মাথায় কালো পাগড়ি। তার কোলে একটা প্রকাণ্ড লোহার চিমটে রয়েছে। ফকির চোখ বুজে বসে বিড়বিড় করে কী মন্তর আওড়াচ্ছে আর আগুনে ধুনো ছড়াচ্ছে। তখন আগুনটা হু হু করে জ্বলে উঠছে।

কর্নেল গিয়ে সামনে দাঁড়ালে ফকির চোখ খুলল। তারপর নিষ্পলক চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তখন কর্নেল বললেন—'সেলাম ফকিরসায়েব।'

ফকির এবার মৃদু হেসে সামনে বসতে ইশারা করল।

কর্নেল বললেন—'ফকিরসায়েব কি এই পিরের মাজারের (সমাধির) সেবক?'

ফকির জবাব দিল, 'হ্যাঁ বেটা। লেকিন তুম কাঁহাসে আয়া? চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে কি, তুমলোক আংরেজ সাহাব আছ। লেকিন বাংলায় বাত ভি বলছ। তাজ্জব!'

'আমি ইংরেজ পুরো নই, ফকিরসাহেব। অর্থেক ইংরেজ, অর্ধেক বাঙালি।'

'তাজ্জব! ক্যায়সে?'

'আমার বাবা বাঙালি ছিলেন। মা ইংরেজ ছিলেন।'

ফকির হেসে উঠল। 'তব্ বেটা, তুম অ্যাংলো-ইন্ডিয়েন আছে, তো ঠিক হ্যায়! বোলো, ক্যা মাংতা মেরা পাস? হামার কাছে কী চাও?'

কর্নেল পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফকিরের পায়ের কাছে রাখলেন। ফকির অমনি খপ করে সেটা তুলে নিয়ে আলখাল্লার ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল। তার চোখে লোভের আনন্দ চকচক করছিল। ফিসফিস করে বলল—'বোলো বেটা, ক্যা মাংতা তুম?'

কর্নেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন—'ফকিরসায়েব, আপনি তো সিদ্ধপুরুষ। বলুন তো জায়গিরদার মুইনুদ্দিন শাহ-আল-তামাসের ছেলে আজিমুদ্দিনের কবর কোথায় আছে।'

অমনি ফকির নড়ে উঠল। তার চোখে আগুন ঠিকরে বেরুতে থাকল যেন। সেই দশ টাকার নোটটা বের করে বলল—'ইয়ে লো তুমহারা রূপেয়া! নিকাল যাও হিঁয়াসে! আভি নিকাল যাও!'

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'সে কী ফকিরসায়েব! চটে যাচ্ছেন কেন?'

ফকির ক্রুদ্ধস্বরে বলল—'দেখো, ইয়ে টাউনকা কমলাখ্‌বাবুনে বহত দফে হামার কাছে এসেছে ঔর এহি বাত পুছেছে। হামি বোলে নাই। কিসিকো হাম ইয়ে ছুপা বাত (গুপ্ত) বলবে না। কমলাখ্‌বাবু হামাকে খুন করতে ভি এসেছিল। তো হামি এইসা জাদুকা খেল জানে, কমলাখ্ জান লিয়ে ভেগে গিয়েছিল।' বলে ফকির হিংস্র মুখে ক্রূর হাসি হাসল।

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু কমলাক্ষবাবু তো আজিমুদ্দিনের কবরের খোঁজ পেয়ে গেছে। তা জানেন?'

ফকির চমকে উঠে বলল—'সাচ্ বাত?'

'হাঁ ফকিরসায়েব। এমনকী সে আজিমুদ্দিনের কবরের সেই কালো বাকসোটাও হাতিয়ে নিয়েছে।'

ফকির ফের ক্রূর হেসে বলল—'ফয়েদা হবে না। ও বাকসের চাবি কাঁহা সে মিলেগা?'

'কেন? আজিমুদ্দিনের মমিকরা লাশে—মানে তার চুলের মধ্যে লুকোনো আছে।'

ফকির জোরে মাথা নেড়ে বলল—'কবর ঢুঁড়ে আমি দেখেছে। আজিমুদ্দিনের লাশের মাথা নেই। কৌন ডাকু কাট লিয়া।'

কর্নেল চমকে উঠলেন। 'বলেন কী ফকিরসায়েব!'

ফকির এবার শান্তভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'আজিমুদ্দিনকা শির যিসকা পাস হ্যায়, চাবিভি উসকা পাস হ্যায়।'

বলে ফকির ফের চোখ বুজল। তার ঠোঁট কাঁপতে থাকল। তারপর সে আলখেল্লার ভেতর থেকে একমুঠো ধুনো বের করে আগুনে ছড়ালে। আগুনটা দপকে উঠল। তখন ফকির হঠাৎ গর্জে বলে উঠল—'চলা যাও হিঁয়াসে! আভি নিকাল যাও!'

কর্নেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, ফকির ফের আরেক মুঠো ধুনোর মতো কী জিনিস আগুনে ফেলল। কিন্তু এবার এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল।

আগুনের কুণ্ড থেকে মুহূর্তে হু হু করে সাদা ঘন একরাশ ধোঁয়া উঠতে শুরু করল। তার উৎকট গন্ধে কর্নেল তক্ষুনি পিছিয়ে এলেন। ওদিকে সেই ধোঁয়া বেশ কিছুক্ষণ হু-হু করে আকাশে ওঠার পর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। আগুনটাও নিভে গেছে ইতিমধ্যে। কর্নেল টর্চ জ্বেলে দেখলেন, ফকির অদৃশ্য।

এখানে ওখানে টর্চ জ্বেলে সমাধি এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজে আর ফকিরকে দেখতে পেলেন না কর্নেল। তখন বিস্মিত মনে ফিরে এলেন রাস্তায়।

বাংলোয় ফিরে দেখলেন, গেটে শংকরবাবুর গাড়ি রয়েছে। শংকর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কর্নেলকে দেখে শংকর একটু অবাক হয়ে বললেন— 'আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'বলছি। আগে চৌকিদারকে কফি করতে বলো, শংকর।' বলে ঘরের দরজা খুলে আরামকেদারায় এলিয়ে পড়লেন। তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।...

মুণ্ডহীন মমি

কিছুক্ষণ পরে কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তখন শংকর বললেন—'কী হয়েছিল, বলবেন কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'বিষাক্ত গ্যাসের ঝাঁঝে মাথা ঘুরছিল।'

শংকর অবাক হয়ে বললেন—'বিষাক্ত গ্যাস। কোথায় ছিল?'

তখন কর্নেল এক ফকিরের সঙ্গে আচমকা দেখা হওয়া এবং যা যা ঘটেছে, সব বললেন। শেষে বললেন—'বলতে পারো, ফকিরের সঙ্গে আজিমুদ্দিনের কবরের সম্পর্ক আছে, জানলুম কী করে? ওটা নেহাত আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো। কারণ কী জানো শংকর? আমি বরাবর দেখেছি, পিরের দরগার ফকিররা বংশানুক্রমেই ফকির এবং এলাকার প্রাচীন মুসলমান শাসকদের ইতিহাস তাঁদের মুখস্থ থাকে। তাই ওখানে জঙ্গলের মধ্যে পিরের দরগায় ওই ফকিরকে দেখে আমি আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো আজিমুদ্দিনের কবরের কথা জিগ্যেস করলুম। ফলও পেলুম হাতে নাতে। তবে এই ফকিরবাবাজি দেখছি সাংঘাতিক লোক। ওর কাছে একরকম পাউডার আছে। তা আগুনে ছুঁড়লে মারাত্মক গ্যাস সৃষ্টি হয়। প্রাচীন হেকিমি শাস্ত্রে এই অদ্ভুত জিনিসটার কথা পড়েছিলুম! এবার স্বচক্ষে দেখলুম।'

শংকর বললেন—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ যে মমি করা, তা জানলেন কী ভাবে?'

'অতি সাধারণ বুদ্ধিতে।' কর্নেল একটু হাসলেন। দ্যাখো শংকর, মানুষের মৃত্যুর পর কয়েকদিনের মধ্যে চুল খসে যায়। কাজেই চুলের মধ্যে চাবি লুকিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন কি না চুল খসে পড়ার উপায় থাকে না। অর্থাৎ চুলসুদ্ধ মৃতদেহ মমি করা হলে, তবেই চুলের মধ্যে চিরকালের জন্যে চাবি লুকিয়ে রাখা যায়।'

শংকর বিস্মিতভাবে বললেন—'কিন্তু মমি করার প্রথা তো সেই মিশরের লোকেরা তিন-চার হাজার বছর আগে জানত! ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে মমি করার কথা তো শুনিনি!'

কর্নেল বললেন—'না শংকর। ওই প্রচলিত ধারণা একেবারে ভুল। আমাদের দেশে হিন্দুরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু মুসলমান ও খ্রিস্টানরা কবরে রাখে। প্রাচীন আমল থেকেই অনেক অভিজাতবংশীয় মুসলমান কিংবা রাজাবাদশাদের মৃতদেহ কবরে দেওয়ার আগে একরকম মশলা মাখানো হত। এক শ্রেণির লোক এই বিদ্যা জানত। তবে মিশরের মমির মতো এসব মমি হাজার

হাজার বছর টিকত না। সচরাচর দুই থেকে পাঁচশো বছর অন্তত অক্ষত থাকত। কাজেই আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ যে মমি করা হয়েছিল, তা স্বাভাবিক।'

শংকর বললেন—'পুলিশ সুপার অজিতেশের সাহায্যে আমরা প্রকাশ্যে ওই কবর খুঁড়ে দেখতে পারি, ফকিরের কথা সত্যি কি না। কর্নেল, কালই ব্যাপারটা দেখা যাক্।'

কর্নেল জোরে মাথা দুলিয়ে বললেন—'না শংকর। কবর প্রকাশ্যে খুঁড়তে গেলে এলাকার মুসলমানরা তাতে প্রবল আপত্তি করবেন। স্বধর্মীয়ের মৃতদেহ তাঁরা অন্যধর্মের লোকেদের হাত ছোঁয়াতে দেবেন না। কাজেই ব্যাপারটা আজ রাতেই গোপনে সেরে ফেলতে হবে।'

বাংলোয় ফোন রয়েছে। কর্নেল পুলিশ সুপারকে ফোনে কথাটা জানালেন। তারপর ফোন রেখে শংকরকে বললেন—'অজিতেশ ঘণ্টাখানেক পরেই এসে পড়বে। তা শংকর, শ্রীমান ন্যাড়ার বাবা-মা নিশ্চয় ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।'

শংকর বললেন—'তা আর বলতে!'

'তুমি কি ওদের সব কথা বলেছ?'

'না। তাহলে তো দিদি-জামাইবাবুকে সামলানো কঠিন হবে। কেউ ন্যাড়াকে আটকে রেখেছে কিংবা আমি সেই উড়ো চিঠি পেয়েছি—এসব কোনও কথা ঘুণাক্ষরে ওঁদের বলিনি। বলেছি—নিশ্চয় কলকাতা বেড়াতে গেছে একা। ও যা খেয়ালি ছেলে। একবার কিন্তু একা কলকাতা পালিয়েছিল, জানেন?'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তবে বড় বুদ্ধিমান ছেলে। খুঁজে খুঁজে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিল। অথচ কবে সেই দু বছরের বাচ্চা যখন, তখন মায়ের কোলে চেপে এসেছিল।'

কর্নেলের কান ছিল শংকরের কথায়, কিন্তু দৃষ্টি ছিল সামনে ফুলবাগিচার দিকে। হঠাৎ তিনি এক ধাক্কায় শংকরকে চেয়ার থেকে ফেলে দিলেন এবং নিজেও শুয়ে পড়লেন। পরক্ষণে প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল গুলি ছোঁড়ার। ঘরের দেয়ালে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির কাচ ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল। বারুদের কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। বাইরে চৌকিদার চিৎকার করে উঠল—'ডাকাত পড়েছে! ডাকাত পড়েছে!'

এক লাফে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন এবং জানালার পাশে নিজেকে আড়াল করে টর্চ জ্বাললেন। তাঁর অন্য হাতে গুলিভরা রিভলভার দেখা গেল।

কিন্তু তখনই ফের স্তব্ধতা ঘনিয়ে এসেছে। ফুলবাগিচার ওদিকে কেউ নেই। চৌকিদার বোধ করি চেঁচিয়ে ওঠার পরই আতঙ্কে চুপ করে গেছে।

শংকর মেঝে থেকে উঠে বললেন—'আমি কৃতজ্ঞ, কর্নেল। আপনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে না দিলে গুলিটা আমার মাথায় লাগত। পেছনের ছবিটা চূর্ণ হওয়া দেখেই তা টের পাচ্ছি। কিন্তু ওদের এত সাহস হল কীভাবে?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন—'দুর্বৃত্তদের পক্ষে এমনটা স্বাভাবিক শংকর। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। আততায়ীর গুলির লক্ষ্য ছিলে তুমি। অথচ ন্যাড়াকে যারা চুরি করেছে, তারা তোমাকে খুন করতে চাইবে কেন? তোমাকে মেরে ফেললে তো বাকসোটা পাবার আশাই আর থাকবে না। কাজেই মনে হচ্ছে, এই বাকসো-রহস্যের পেছনে আরও একটা দল রয়েছে।'

শংকর অবাক হয়ে বললেন—'তারা আবার কারা।'

'শিগগির সেটা খুঁজে বের করব। এখন বরং ওই খোলা জানলাটা বন্ধ করে দিই। এই শীতে ওটা খুলে রেখেছিলুম, বাইরের দিকটায় লক্ষ রাখার জন্য। এখন বুঝতে পারছি, কাজটা ঠিক করিনি। তাছাড়া এখন থেকে আমাদের পদে পদে আরও সতর্ক থাকতে হবে।'

বলে জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে কর্নেল আরাম কেদারায় বসলেন। শংকর বারবার ভয়ে ভয়ে খোলা দরজার পর্দার দিকে তাকাচ্ছিলেন। তা দেখে কর্নেল একটু হেসে বললেন—'না শংকর। আততায়ী যেই হোক, দরজা দিয়ে হামলা করার সাহস তার নেই। থাকলে সে দূর থেকে গুলি না ছুঁড়ে সোজা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই হামলা করত।'

কিছুক্ষণ পরে পুলিশ সুপার অজিতেশ তাঁর দলবল নিয়ে এসে পড়লেন। সব শুনে বললেন—'আমারই ভুল হয়েছে। বাংলোটা পাহারার ব্যবস্থা করা জরুরি ছিল। যাই হোক, সে-ব্যবস্থা করছি। এখন চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

রাতের অন্ধকারে সবাই মিলে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশদল সতর্কভাবে চলল।

রেললাইন পেরিয়ে সেই পোড়ো মাঠে কিছুটা এগিয়ে ওঁরা জঙ্গলে ঢুকলেন। তখনও কেউ টর্চ জ্বালেননি। কৃষ্ণপক্ষের রাত। তাতে প্রচণ্ড শীত। কুয়াশার মধ্যে আকাশের নক্ষত্র মিটমিট করে জ্বলছে। স্টেশনের দিকটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা। বাতিগুলো আবছা জ্বলছে।

বটতলার কাছে গিয়ে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। দেখাদেখি সবাই দাঁড়িয়ে গেলেন। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন—'কী একটা শব্দ হচ্ছে যেন।'

শংকর ও অজিতেশ কান পেতে শুনে বললেন—'হ্যাঁ।'

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তেমনি চাপা গলায় বললেন—একসঙ্গে সবগুলো টর্চ জ্বালতে হবে। রেডি। ওয়ান—টু—থ্রি।'

একসঙ্গে প্রায় একডজন টর্চের আলো জ্বলে উঠল। সামনে দেখা গেল তিনটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে একমুহূর্ত হতচকিত হয়ে গিয়েছিল তারা। তারপর দৌড়ে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল।

গুপ্ত কবরের পাথরের ঢাকনা সরানো হয়েছে। এবার গর্তের ভিতর থেকে এক লাফে একটা লোক প্রায় ডিগবাজি খেয়ে অন্ধকার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

অজিতেশের নির্দেশে সেপাইরা সেই মুহূর্তেই তাদের পিছনে ধাওয়া করেছে।

ওদিকে জঙ্গলে বারবার টর্চের ঝলক, বন্দুকের আওয়াজ কয়েকবার, তারপর পাকড়ো পাকড়ো চেঁচামেচি শোনা গেল।

কর্নেলরা কবরের কাছে দৌড়ে এলেন। এসে টর্চের আলোয় দেখলেন, গর্তের মধ্যে মৃতদেহের কফিনটা টেনে এনে রেখেছে। কফিনের ঢাকনা খোলা! তার ভেতরে একটা পোশাকপরা মৃতদেহ রয়েছে। বালকেরই মৃতদেহ। কিন্তু তার মুণ্ড নেই। কবন্ধ মৃতদেহটা মমি করা।

কর্নেল, শংকর আর অজিতেশ তিনজনেই কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'তাই তো।'

তারপর কর্নেল গর্তে নামলেন। বহুক্ষণ ধরে মমিটা পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর বললেন—'ফকির ঠিকই বলেছিল দেখছি। কে বা কারা মুণ্ডু কেটে নিয়ে গেছে, কিন্তু একথা ঠিক যে মুণ্ডুটা কাটা হয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যেই।'

অজিতেশ বললেন—'কীভাবে বুঝলেন?'

কর্নেল হাসলেন। বললেন—'খুব সোজা যুক্তি। শংকরবাবু বাকসোটা নিয়ে যাবার আগে মুণ্ডু কাটা হয়নি। তাহলে যে মুণ্ডু কেটেছে, সে কি বাকসোটা ফেলে রেখে যেত? কাজেই শংকরবাবু বাকসো নিয়ে যাবার পরই কাজটা করা হয়েছে।'

অজিতেশ ও শংকর সায় দিয়ে বললেন—'ঠিক, ঠিক।'

কর্নেল বললেন—'মুণ্ডু যে কেটেছে সে জানে বাকসো যেই হাতাক্, চাবি এই মুণ্ডের চুলের মধ্যে আছে। কাজেই তার উদ্দেশ্য হল, কাটা মুণ্ডুর চুল খুঁজে চাবি বের করা এবং বাকসোটা উদ্ধার করা।'

শংকর বললেন—তাহলে একাজ কমলাক্ষেরই।'

কর্নেল আনমনে বললেন—'বলা কঠিন। দেখা যাক। তবে এস, মৃতদেহটা আমরা যথাস্থানে রেখে আগের মতো সমাধিস্থ করি। আর অজিতেশ, তুমি তোমার কথামতো আপাতত কিছুদিন এখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করো।'

অজিতেশ বললেন—'তা আর বলতে। তবে আমারই ভুল। ভেবেছিলুম, কাল সকাল থেকে পাহারার ব্যবস্থা করব। বুঝতে পারিনি, আজ রাতেই কেউ কবরে হামলা করবে।'

গুপ্ত কবর আগের মতো ঢেকে দেওয়ার একটু পরে সেপাইরা ফিরে এসে জানাল—'ওদের পাকড়াও করা যায়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন।...'

ন্যাড়ার কারসাজি

নেহাত খিদে সইতে পারে না বলে ন্যাড়া ওদের দেওয়া খাবার খেয়েছে। খাবার সময় অবশ্য হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছিল মাধব। তবে খুনে ডালকুত্তাটা সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে রয়েছে। কুতকুতে চোখে ন্যাড়াকে দেখছে তো দেখছেই।

এভাবে একটা দিন একটা রাত কেটে গেল। পরদিন সকালে কমলাক্ষ ঘরে ঢুকে একগাল হেসে বললেন—'বাবা নেড়ু, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তুমি ছাড়া পাবে। তবে সেটা নির্ভর করছে তোমার ছোটমামার ওপর। সে যদি জায়গামতো বাকসোটা রেখে যায়, তবেই। নৈলে ....'

ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করল—'নৈলে কী হবে?'

কমলাক্ষ তার প্যান্টের পকেট থেকে সেই ছুরিটা বের করে বললেন—'স্রেফ জবাই হয়ে যাবে। বুঝলে তো?'

ন্যাড়া আঁতকে উঠে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—'কেন কমলকাকু? আমার কী দোষ?'

কমলাক্ষ নিষ্ঠুর হেসে বলল—'তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া। তুমি না বললে তো শংকর ব্যাটা বাকসোর হদিশ পেত না।'

ন্যাড়া মনে-মনে বুদ্ধি এঁটে বলল—'আচ্ছা কমলকাকু, আমি যদি নিজের হাতে ছোটমামাকে চিঠি লিখে দিই যে বাকসোটা ফেরত দাও, নৈলে এরা আমাকে মেরে ফেলবে?'

কমলাক্ষ খুশি হয়ে বলল—'খুব ভালো কথা। এই তো চাই।'

বলে সে একটুকরো কাগজ আর ডটপেন এনে দিল। ন্যাড়ার হাতের বাঁধনও খুলে দিয়ে বলল—'হুঁ, ঝটপট লিখে ফেল দিকি তাহলে!'

এই সময় মাধব ঘরে ঢুকে ব্যস্তভাবে বলল—'সর্বনাশ হয়েছে কমলদা!'

কমলাক্ষ চমকে উঠে বলল—'কী? কী হয়েছে মাধব?'

'এইমাত্র লিটনগঞ্জ থেকে আমার লোক ট্রাঙ্ককল করে খবর দিল।' মাধব ব্যস্তভাবে বলতে থাকল। 'বটতলার কবরে কড়া পাহারা বসিয়েছে পুলিশ। আর তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, আজিমুদ্দিনের মমিকরা মড়ার মুণ্ডুটা নাকি কে কেটে নিয়ে গেছে। আমার লোকেরা কবর খুঁড়ে সেটা আবিষ্কার করেছে, হঠাৎ পুলিশ হাজির।'

কমলাক্ষ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল—'বলো কী মাধব! এই তো সেদিনই কফিন খুলে দেখলুম, মুণ্ডু রয়েছে। হঠাৎ মুণ্ডুটা কাটল কে? কেনই বা কেটে নিয়ে গেল?'

মাধব চাপা গলায় বলল— 'এ নিশ্চয় ব্যাটা হাসান ফকিরের কীর্তি। শেষবার ব্যাটা বলেছিল না? কালো বাকসোর চাবি মমিকরা লাশের মধ্যেই কোথাও আছে!'

'হ্যাঁ। বলেছিল বটে। কিন্তু আমরা তো হাতড়ে দেখেছিলুম। পাইনি!'

'এখন মনে হচ্ছে চাবিটা মুণ্ডুর মধ্যেই ছিল।'

'হুম্! কিন্তু কে তাহলে মুণ্ডু কেটে নিয়ে গেল?'

মাধব একটু ভেবে বলল— 'সেটা জানতে হলে ব্যাটা হাসান ফকিরকে ধরে আনা দরকার। ওর পাগলামির নিকুচি করেছে। আমি এখনই আমার লোককে ট্রাঙ্ককল করে হুকুম দিচ্ছি, ফকিরকে যেভাবে হোক এখানে নিয়ে আসতে হবে।'

চিন্তিতমুখে কমলাক্ষ বললেন—'যা করার শিগগির করো!'

মাধব বেরিয়ে গেল। তখন ন্যাড়া বলল—'তাহলে চিঠি লিখি কমলকাকু?'

'হ্যাঁ, লেখো।' বলে কমলাক্ষ কাগজ-কলম এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—'যা বলি, লেখো।'

ন্যাড়া গোটাগোটা হরফে লিখতে থাকল :

'ছোটমামা, আজ রাত বারোটায় গঙ্গার ধারে খ্রিস্টান কবরখানায় অর্জুন গাছের তলায় কালো বাকসোটা রেখে যাবে। তাহলে আধঘণ্টা পরে এরা আমাকে তোমার বাড়ির গেটে পৌঁছে দেবে। যদি একথা না শোনো, তাহলে এরা আমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে। ইতি ন্যাড়া।'

চিঠিটা কমলাক্ষ কয়েকবার পড়ার পর ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন। তারপর আগের মতো ন্যাড়ার হাত দুটো খাটের দুপাশে পায়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে বেরিয়ে গেলেন। ভয়ংকর ডালকুত্তাটা পাহারায় রইল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ন্যাড়ার চোখে পড়ল খাটে তার মাথার পাশে বালিশের একধারে যেখানে কমলাক্ষ বসেছিলেন, সেখানে কমলাক্ষের সেই ছুরিটা পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাড়ার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কমলাক্ষ তখন ন্যাড়াকে ভয় দেখাতে ছুরিটা বের করেছিলেন। কিন্তু ন্যাড়া নিজের হাতে শংকরবাবুকে চিঠি লিখতে চাইলে খুশির চোটে ছুরিটা পকেটে না ঢুকিয়ে ওখানেই রেখে কাগজ কলম আনতে গিয়েছিলেন টেবিলে। তারপর ভুলেই গেছেন ছুরিটার কথা।

ন্যাড়া ছুরিটার দিকে তাকিয়ে ফন্দি আঁটতে থাকল।

ভয় শুধু ডালকুত্তাটাকে। নড়লেই সে নাকি ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

শীত বলে দয়া করে ওরা ন্যাড়াকে একটা কম্বল দিয়ে গেছে। ন্যাড়া ভাবল, কম্বলটা হয়তো কাজে লাগানো যায়। সে খুব আস্তে কাত হয়ে শোবার ভান করল। ওইটুকু নড়াচড়াতেই ডালকুত্তাটা গরগর করে উঠল। কিন্তু সে ন্যাড়ার পায়ের কাছে খাটের পায়ার সঙ্গে শেকলে বাঁধা রয়েছে। চেনটা অবশ্য যথেষ্ট লম্বা। ন্যাড়া কম্বলমুড়ি দিল এবার। কিন্তু এতে ডালকুত্তাটা আপত্তি করল না।

এবার সে কম্বলের খানিকটা অংশ কৌশলে বালিশের পাশে রাখা ছুরির ওপর চাপাল। তারপর মুখটা বাড়িয়ে কম্বলের ভেতর ছুরির বাঁটটা কামড়ে ধরল। এখন আর অসুবিধে হল না। ছুরিটা খুব ধারালো। দাঁতে বাঁট কামড়ে ডান হাতের দড়ির বাঁধনে ফলাটা সাবধানে কয়েকবার ঘষতেই বাঁধন কেটে গেল।

ডালকুত্তাটা মাঝে মাঝে গরগর করছে বটে, তবে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতলব নেই বলেই মনে হচ্ছে।

বাঁ হাতের বাঁধন কাটতে দেরি হল না ন্যাড়ার। এবার সে কম্বলের ফাঁক দিয়ে ডালকুত্তাটার দিকে তাকাল। ডালকুত্তাটা তার দিকে তাকিয়েছিল। এই সময় হঠাৎ ঘুলঘুলি থেকে একটা চামচিকে উড়ে এসে ডালকুত্তাটার কাছে পড়ল। অমনি সে গরগর করে ঝাঁপিয়ে গেল চামচিকেটার দিকে।

এই মোক্ষম সুযোগ। ন্যাড়ার দু হাত খোলা। শুধু পা দুটো তখনও বাঁধা। ডালকুত্তাটা চামচিকের দিকে ঝাঁপ দেওয়া মাত্র সে কম্বলটা তার ওপর ফেলে দিল। কম্বলে জড়িয়ে-মড়িয়ে ডালকুত্তার তখন ভীষণ রাগ হয়েছে। সে গরগর গোঁ গোঁ গর্জন করতে করতে যত লাফালাফি করে কম্বল তত জড়িয়ে যায়।

সেই সুযোগে ন্যাড়া ঝটপট দু পায়ের বাঁধন কেটে ফেলেছে। তারপর এক লাফে খাট থেকে নেমে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে।

বেচারা ডালকুত্তা তখন কম্বল জড়ানো অবস্থায় গড়াতে গড়াতে কেন কে জানে—হয়তো জীবনে এমন বিদঘুটে ব্যাপার কখনও ঘটেনি তার; সেই আতঙ্কে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল।

ন্যাড়া এতক্ষণে নিশ্চিন্তে ঘরের ভেতরটা দেখতে থাকল।

ঘরটায় আলো খুব কম। ঘুলঘুলি থেকে একটুখানি রোদের ছটা এসে ঢুকেছে মাত্র। সে একটা জানলা খুলে দিল। একতলাতেই রয়েছে। জানালার ওপাশে জঙ্গুলে জায়গা। তার ওদিকে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। ডাইনে-বাঁয়ে একটু তফাতে কলকারখানা রয়েছে।

এদিকে ঘরের ভেতরে কতকালের পুরোনো আসবাবপত্র আর ছেঁড়া তোষক, নারকেল ছোবড়ার গদি আর একদঙ্গল বালিশ পড়ে রয়েছে! মনে হল, এটা কোনও পোড়ো বাগানবাড়ির পেছনের দিক।

ন্যাড়া দরজা টেনে দেখল বাইরে থেকে আটকানো আছে। অমনি সে নিরাশ হয়ে গেল। জানালার রড খুব পুরু আর শক্ত। সে বেরুবে কেমন করে?

সে ভাবতে থাকল। একটু পরে তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। কোনা থেকে কয়েকটা ছেঁড়া বালিশ এনে সে বিছানায় লম্বালম্বি রাখল। এখন একটা কম্বল দরকার। ডালকুত্তাটা কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের তলায় ঢুকে রয়েছে এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত চাপা শব্দ করছে! অন্যসময় হলে ন্যাড়া হেসে কুটিকুটি হত।

কোনা খুঁজতে গিয়ে ন্যাড়া একটা ছেঁড়া তুলো বেরকরা লেপ পেয়ে গেল। সে সেটা এনে বালিশের ওপর ঢাকা দিল। দেখলে মনে হবে, শ্রীমান ন্যাড়াই যেন আগের মতো শুয়ে আছে। মাথাঅবদি ঢেকে রেখেছে। জানালা বন্ধ করেছে বলে হঠাৎ বাইরে থেকে ঢুকে ওরা ব্যাপারটা টের পাবে না সম্ভবত। অন্তত টের পেতে একটু দেরি তো হবেই। ততক্ষণে ন্যাড়া ...

হ্যাঁ, এবার তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে।

কোনার দিকে তোশক আর গদির আড়ালে ন্যাড়া গিয়ে লুকিয়ে বসে রইল।

তারপরে বসে আছে তো আছেই। কেউ আসে না। না কমলাক্ষ, না মাধব—কিংবা ওদের সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা—যে ন্যাড়াকে খাবার দিতে আসে।

ডালকুত্তাটা কি আরামে ঘুমোচ্ছে এবার?

ঠিক তাই। কম্বলের মজাটা টের পেয়ে গেছে সে। তাই আর সাড়াশব্দ নেই।

কতক্ষণ কেটে গেল তারপর তালা খোলার শব্দ হল। ন্যাড়া সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল।

দরজা খুলে সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা ঢুকল। তার হাতে যথারীতি একটা থালা। তাতে ভাত-তরকারি রয়েছে। ন্যাড়াকে খাওয়াতে এসেছে।

সে খাটের কাছে এসে ডাকল—কই খোকাবাবু, ওঠ। খেয়ে নাও।'

অমনি ন্যাড়া ঠিক খরগোশের মতো একলাফে উঠেই দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। লোকটার হাত থেকে ভাতের থালা পড়ে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল চাপা গলায়—'পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! ধর্, ধর্!'

ন্যাড়া পাশের ঘর থেকে ততক্ষণে বারান্দায়, বারান্দা থেকে একটা উঠোনে—তারপর উঠোনের ওপাশে ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে ছোট্ট একটা গলিতে পৌঁছে গেছে।

সেখান থেকে সে সোজা দৌড় লাগাল। তারপর একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে পড়ল। ঘন আগাছার জঙ্গল ওখানটা। তার নিচে অথৈ জল। ন্যাড়া বুঝতে পারল না, কোনদিকে যাবে।

জঙ্গলটার শেষে একটা কারখানার পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। সে মরিয়া হয়ে সেদিকেই দৌড়ুল। এইসময় তার কানে এল, পেছনে কোথাও গরগর গর্জন করছে বুঝি সেই হিংস্র ডালকুত্তাটাই।

সে ঝোপের আড়ালে উঁকি মেরে যা দেখল, তাতে তার আতঙ্ক বেড়ে গেল। সেই কুৎসিত চেহারার লোকটা ডালকুত্তাটা নিয়ে জঙ্গলে তাকে ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে।

ন্যাড়া কারখানার পাঁচিলের কাছে এসে বাঁদিকে তাকাল। একটা বটগাছের তলায় নৌকা বাঁধা রয়েছে।

সে দৌড়ে গিয়ে নৌকোয় উঠল। দুজন লোক—বুড়ো জেলে ও তার ছেলে সব খাওয়াদাওয়া সেরে বিড়ি টানছিল। অবাক হয়ে ন্যাড়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

ন্যাড়া ব্যাকুলভাবে বলল—'আমাকে বাঁচাও। ডালকুত্তা নিয়ে ওরা আমাকে ধরতে আসছে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!'

বুড়ো জেলে তীরের আগাছার জঙ্গলটা দেখে নিয়ে ব্যস্তভাবে বলল—'খোকাবাবু, তুমি ছইয়ের ভেতর লুকিয়ে পড়ো। আমি দেখছি!'

ন্যাড়া ছইয়ের ভেতর গিয়ে লুকিয়ে রইল।

একটু পরে তীরের দিকে আওয়াজ এল—'ও বুড়ো! এদিকে একটা ছেলেকে দেখেছ?'

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল—'না কর্তা! দেখিনি তো!' তারপর সে তার ছেলেকে ইশারা করল নৌকোর কাছি খুলতে।

নৌকোটা মাঝগাঙের দিকে এগিয়ে চলল। বুড়োর ছেলেটা একটু হেসে ন্যাড়াকে জিগ্যেস করল—'কী হয়েছে বলো তো খোকাবাবু?'

ন্যাড়া বলল—'বলব। আগে আমাকে দূরে কোনও ঘাটে পৌঁছে দাও।'

বুড়ো জেলে হাল ধরে বসেছিল। বলল—'বুঝেছি। ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছিলে। আজকাল ছেলেধরার উৎপাত হয়েছে।'

ন্যাড়া ছইয়ের ভেতর নিরাপদে বসে দেখতে পাচ্ছিল, কমলাক্ষর লোকটা তখনও আগাছার জঙ্গল ঢুঁড়ে হন্যে হচ্ছে।...

ফকিরের পুনরাবির্ভাব

লিটনগঞ্জের ডাকবাংলোয় তখন কর্নেল, শংকর, অজিতেশ গম্ভীর মুখে আলোচনা করছিলেন। ন্যাড়াকে বাঁচাতে হলে আজই রাতে বি. টি. রোডের ধারে খ্রিস্টান কবরখানার কাছে কালো বাকসোটা রেখে আসতে হবে। একটু আগে শংকরের কাছে কলকাতা থেকে হারাধন ট্রাঙ্ককল করেছে। শংকর তাকে জানিয়েছিলেন, কোনও নতুন ঘটনা ঘটলে যেন তক্ষুনি লিটনগঞ্জের ডাকবাংলোয় ফোন করে। হারাধন জানিয়েছে, কিছুক্ষণ আগে একটা উড়ো চিঠি কেউ গেটের লেটারবক্সে রেখে গেছে। চিঠিটা শ্রীমান ন্যাড়াই লিখেছে।

অজিতেশ পরামর্শ দিলেন, লালবাজার থেকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে কবরখানাটা ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ফোন করে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগে সে কথা জানাবেন। তাছাড়া কর্নেলেরও প্রভাব আছে পুলিশ মহলে।

কিন্তু শংকরের তাতে ঘোর আপত্তি। কারণ ওরা অতি ধূর্ত। পুলিশ ওত পেতেছে টের পেলে ন্যাড়াকে খুন করে ফেলতে পারে।

কর্নেল গুম হয়ে বসে কী ভাবছিলেন। কতক্ষণ পরে বললেন—'হুম্! এক কাজ করা যাক্। শংকর, তুমি এখনই কলকাতা ফিরে যাও।'

শংকর বললেন—'আর আপনি?'

'আমি বরং বিকেলের ট্রেনে ফিরব। ততক্ষণে একটা কাজ সেরে নিতে চাই এখানে।'

'কিন্তু ...'

কর্নেল বাধা দিয়ে একটা হাত তুলে শংকরকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন—'আশঙ্কার কারণ নেই। আমার এখনও ধারণা, ন্যাড়াবাবাজিকে ওরা প্রাণে মারবে না। কারণ তাহলে বাকসো পাবার কোনও আশাই থাকবে না। তাই বলছি, তুমি ফিরে গিয়ে তোমার শোবার ঘরে ওই রহস্যময় জিনিসটি পাহারা দাও। আমি ঠিক সময়ে ফিরব এবং তোমাকে দর্শন দেব।'

শংকর একটু চমকে উঠে বললেন—'তাহলে আপনি কি সন্দেহ করছেন, আমার বেডরুমে ওরা হানা দিতে পারে?'

'বিচিত্র নয়।'

শংকর একটু হেসে বললেন—'ওই গুপ্তস্থানের হদিশ আমি ছাড়া কেউ জানে না।'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—'তবু সাবধানের মার নেই। ওরা ক্রমশ মরিয়া হয়ে উঠবে। তোমার লোকেদের হাত করার চেষ্টা করবে হয়তো।'

'কর্নেল! আমার লোকেরা খুবই বিশ্বাসী।'

'শংকর! টাকা এমন জিনিস অসম্ভবকে সম্ভব করে। তাছাড়া আজকাল মানুষের নৈতিক চরিত্র ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে। লোভ মানুষের আত্মাকে গ্রাস করছে। তাই বলছি, তোমার এখনই বাড়ি ফেরা উচিত।'

অজিতেশ সায় দিয়ে বললেন—'কর্নেল ঠিকই বলেছেন শংকর। বরং তুমি চাইলে কলকাতায় লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগকে তোমার বাড়ির দিকে নজর রাখতেও অনুরোধ করতে পারি।'

শংকর কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন—'ঠিক, ঠিক। অজিতেশ, তুমি এখনই সে ব্যবস্থা করো বরং। শংকর পৌঁছোবার আগেই গোয়েন্দা পুলিশ ছদ্মবেশে শংকরের বাড়ি পাহারা দিক। তুমি ওদের বলে দাও, সন্দেহজনক কোনও জিনিস বাড়ি থেকে কেউ নিয়ে বেরুলেই যেন তাকে পাকড়াও করা হয়।'

শংকর তক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। ন্যাড়াদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের আশ্বাস দিয়ে কলকাতা রওনা হবেন। মোটর গাড়িতে পৌঁছোতে ঘণ্টা চারেক লাগবে বড়জোর।

একটু পরে অজিতেশও চলে গেলেন।

কর্নেল বারান্দায় এসে বসলেন একা। আজিমুদ্দিনের মমির কথা ভাবছিলেন তিনি। হতভাগ্য বালক! তার নির্বোধ জায়গিরদার পিতা ভদ্রলোক যদি না অত্যাশ্চর্য বহুমূল্য রত্ন তার কবরে রাখতেন, তার মৃতদেহের এই অসম্মান ঘটত না! না জানি কত স্নেহে লালিত হয়েছিল ওই বালক! জীবিত অবস্থায় তার গায়ে এতটুকু আঘাত করার ক্ষমতা কারও ছিল না। মৃত্যুর পর তার মাথাটাই কাটা গেল! মানুষের লোভ এত পৈশাচিক হতে পারে যে মৃতদেহেও আঘাতে তার হাত কাঁপে না।

কর্নেল মনশ্চক্ষে বালক আজিমুদ্দিনকে দেখছিলেন। মন মমতায় কোমল হয়ে উঠছিল। কে জানে, কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে পাঁচশো বছর আগে ছেলেটি অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। বয়স কত হতে পারে তার? কর্নেল মমিটা দেখে অনুমান করেছেন, দশ থেকে বারো বছরের বেশি নয়। বাকসোর গায়ে সে কথা লেখাও আছে বটে।

হ্যাঁ, ঠিক এমনি এক বালকের মমিকরা মৃতদেহ নিয়ে গত শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে হইচই উঠেছিল। মিশরের কিশোর ফারাও তুতেনখামেনের মমি। আশ্চর্য, তুতেনখামেনের মমির

অভিশাপের কথা ইতিহাসে লেখা আছে। যাঁরা তুতেনখামেনের কবর খুঁড়ে তার মমি আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁরা একে একে সবাই রহস্যময়ভাবে মারা পড়েন।

আজিমুদ্দিনের মমির কি তেমন কোনও অভিশাপ আছে?

'জরুর!'

কর্নেল চমকে উঠে তাকালেন। সবিস্ময়ে দেখলেন, কখন সেই কালো আলখেল্লা পরা ফকির এসে বাংলোর বারান্দায় তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফকির কি অলৌকিক শক্তিধর? জাদুকর সে? সে কি অদৃশ্য থেকে দৃশ্য হতে পারে?

আর কর্নেলের মনের কথাই বা জানতে পারল কী ভাবে? কর্নেল অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন—'আসুন ফকির সাহেব! আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই আমি এখনও এখানে রয়ে গেছি।'

ফকির মৃদু হেসে বলল—'বেটা তুমি শোচ করছিলে কী, আজিমুদ্দিনের লাশে কোন লানৎ (অভিশাপ) আছে কি না। তাই তো?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কি মনের কথা বুঝতে পারেন ফকির সায়েব?'

'বেটা! মানুষের মনের কথা তার মুখে ফুটে ওঠে।'

'বসুন ফকির সায়েব। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'কথা আমারও আছে। তবে এখানে নয়, ঘরে চলো। গোপনে বলব।'

দুজনে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ফকির কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন ভাবতে থাকল। কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফকির চোখ খুলল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল—'আমি সংসারবিরাগী ফকির। ধনের লোভ আমার নেই, বেটা। যারা আজিমুদ্দিনের লাশের মাথা কেটেছে, তাদের শাস্তি খোদা দেবেন। বললুম না? আজিমুদ্দিনের আত্মার অভিশাপ লাগবেই তাদের। তাই তোমাদের বলি, যদি অভিশাপ থেকে বাঁচতে চাও, বাকসোটা ফেরত দাও। কবরের মধ্যে রেখে এস।'

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—'বাকসোটা আমাদের কাছে আছে, কে বলল আপনাকে?'

ফকির হাসল। 'আমি জানি। মিথ্যা বলে লাভ নেই বেটা।'

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন—'ঠিক আছে। বাকসো ফের কবরে রাখা হবে। কিন্তু আজিমুদ্দিনের কাটা মাথার হদিশ জানতে চাই। আপনি আমার সাহায্য করুন তাহলে।'

ফকির বলল—'জরুর। বলো, কী সাহায্য চাও?'

'আপনি কোন কোন লোককে এ পর্যন্ত আজিমুদ্দিনের কবরের ওই বাকসো এবং তার চাবির কথা বলেছেন? আগে এসব কথা জানতে চাই।'

ফকির অনুশোচনার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল একটুখানি। তারপর উর্দুমেশানো বাংলায় যা বলল, তা হল এই :

কমলাক্ষবাবু কোনও ইংরেজি কেতাবে জায়গিরদার ও তার অকালমৃত ছেলের কাহিনি পড়েছিলেন। এই ফকির বংশানুক্রমে এলাকার ইতিহাস জানে। তাই কমলাক্ষ বারবার তার কাছে এসে কবরের হদিশ জানতে চাইতেন। তিনি বলতেন—এলাকার পুরাকীর্তি এবং প্রত্নদ্রব্য সংরক্ষণ করাই তাঁর ব্রত—যাতে ওগুলো ধ্বংস না হয়ে যায়। ফকিরের পা ছুঁয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাও করেছিলেন, গুপ্ত কবরের খোঁজ দিলে সেখানে সরকারি সাহায্যে একটা দরগা বানিয়ে দেবেন এবং ফকিরকেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেবেন।

শেষপর্যন্ত ফকির তাঁর কথায় রাজি হয়ে গুপ্ত কবরের হদিশ দিয়েছিল। কিন্তু কমলাক্ষের মনে যে এমন শয়তানি লোভ আছে, ভাবেনি।

একথা শোনার পর কর্নেল জিগ্যেস করলেন—'কমলাক্ষবাবু ছাড়া আর কাকেও কি গুপ্ত কবরের কথা বলেননি ফকিরসায়েব? মনে করে দেখুন তো?'

ফকির চোখ বুজে ভাবতে থাকল। তারপর সে নড়ে বসল। বলল—'না, আর কাকেও বলিনি। তবে ...'

'তবে?' বলে কর্নেল আগ্রহের সঙ্গে তার দিকে তাকালেন।

ফকির বলল—'আমার মনে হচ্ছে, আরেকজনের পক্ষে ব্যাপারটা জানা সম্ভব।'

'কে? কে সে?'

'সেই জায়গিদারের বংশধর বলে দাবি করে একটা লোক। তার নাম লতিফ খাঁ।'

'কোথায় থাকে সে?'

'লিটনগঞ্জেই। লোকটা হেকিমি চিকিৎসা করে। তোপখানার কাছে তার হেকিমি দাওয়াখানা আছে। লোকটা কিন্তু পাজির পাঝাড়া। যেমনি তিরিক্ষি মেজাজ, তেমনি কুচুটে। আমার সঙ্গে তার বনিবনা নেই।'

কর্নেল বললেন—'ঠিক আছে। আপনি ভাববেন না ফকির সাহেব। বাকসোটা আমরা কবরেই ফেরত দেব এবং ওখনে যাতে স্থায়ী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পুরাতত্ত্ব দফতরকে সেজন্য অনুরোধ জানাব। তবে তার আগে আমি মমিমুণ্ডটা উদ্ধার করতে চাই।'

ফকির হাত তুলে বলল—'খোদার দয়ায় তুমি সফল হও বেটা।'

তারপর সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল এবং বেরিয়ে গেল। কর্নেল তার পিছনে-পিছনে বেরুলেন। কিন্তু বেরিয়েই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফকিরকে দেখতে পেলেন না। এ ফকির কি সত্যি অলৌকিক শক্তিধর কোনও সিদ্ধপুরুষ? কর্নেল ভারী একটা নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন—মানুষ এই বিস্ময়কর বিশ্বের কতটুকুই বা জানতে পেরেছে? কত আশ্চর্য শক্তি বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে তো এখনও রয়ে গেছে! ...

কলকাতা থেকে দুঃসংবাদ

কর্নেলের গোয়েন্দাগিরি ছাড়াও এক বিচিত্র নেশা আছে। পাখি, প্রজাপতি বা পোকামাকড়ের জীবন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অসামান্য। দুপুরে খাওয়ার পর রোদ্দুরে লনে চেয়ার পেতে বসেছিলেন, হঠাৎ নদীর ধারে কোনও গাছ থেকে কী একটা পাখির ডাক শুনে নড়ে বসলেন।

তারপর ঘর থেকে তক্ষুনি বাইনোকুলারটা এনে চোখে রেখে পাখিটাকে খুঁজতে থাকলেন।

হ্যাঁ, ওই তো গাবগাছের ডালে ছোট্ট রঙিন পাখিটা মনের সুখে গান গাইছে।

কর্নেল একটু অবাক হলেন। এমন পাখি তো এর আগে কখনও দেখেননি। কেতাবে পড়েছিলেন বটে। এই দুর্লভ প্রজাতির পাখির একটা ছবি তুলে রাখা দরকার। দৌড়ে ঘরে গেলেন ফের ক্যামেরা আনতে।

কিন্তু সেই সময় ফোন বেজে উঠল ক্রিরিরিরিরিং! ক্রিরিরিরিরিং।

কী আপদ! বিরক্ত হয়ে ফোন তুলে বললেন—'হ্যালো! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।'

এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে সাড়া এল—'ধরুন। কলকাতা থেকে ট্রাঙ্ককল আছে।'

কর্নেল সঙ্গে সঙ্গে পাখির কথা ভুলে গেলেন। শংকর ছাড়া আর কে ফোন করবে কলকাতা থেকে? কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো?

একটু পরে শংকরের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'কর্নেল! কর্নেল! যা বলছিলেন, তাই হয়েছে! বাকসো উধাও!'

কর্নেল চমকে উঠে বললেন—'সে কী!'

'হ্যাঁ কর্নেল! এইমাত্র পৌঁছে আবিষ্কার করলুম, দেয়ালের ছবিটা সরিয়ে কে গুপ্ত আলমারি থেকে বাকসোটা হাতিয়েছে। হারাধন কান্নাকাটি করছে। সে কিছু জানে না।'

'হুম্। বাড়ি থেকে তোমার কোনও লোক উধাও হয়নি তো?'

'হ্যাঁ হয়েছে। বাজার সরকার মদনবাবু থলে হাতে সকালে বাজার করতে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি। এখন বেলা প্রায় দুটো বাজে।'

'পুলিশকে জানিয়েছ নাকি?'

'না। এই তো সবে ঘরে ঢুকে সব দেখে তারপর আপনাকে ফোন করছি।'

'ঠিক আছে।' তুমি লোকাল থানায় খবর দাও। তবে বাকসোর কথা বলো না। বলো যে টাকাকড়ি চুরি করে ভদ্রলোক কেটে পড়েছেন। একটা ফোটো আছে কি মদনবাবুর?'

'আছে। বাবার মৃত্যুর সময় গ্রুপ ফোটো তোলা হয়েছিল। তার মধ্যে...'

'ভালো। ফোটোটা পুলিশকে দাও।'

'কিন্তু ন্যাড়াকে তাহলে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না কর্নেল!'

'ভেব না শংকর। বরং বাকসোটা যখন ওরা মদনবাবুর সাহায্যে হাতিয়েছে, তখন ন্যাড়াকে ধরে রাখার দরকার হবে না। দেখবে, ওকে ওরা ছেড়ে দেবে। এসব ক্ষেত্রে খুনখারাপি করলে ওদেরই বিপদের ঝুঁকি আছে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকো।'

'আপনি শিগগির চলে আসুন, কর্নেল! বাকসোটা ...'

'বাকসো যদি কমলাক্ষ হাতিয়ে থাকেন, আমার কলকাতা ফেরার দরকার দেখি না। বরং তুমিই চলে এস লিটনগঞ্জে।'

'বাপ্স্। আবার একশো কিলোমিটার মোটরজার্নি?'

'পারবে না?'

এক মুহূর্ত পরে শংকর বললেন—'ঠিক আছে। পারব।'

'পেটপুরে খেয়ে তবে বেরিও কিন্তু। তার আগে থানায় খবরটা দাও।'

'আচ্ছা। ছাড়ছি!'

'আচ্ছা।'

কর্নেল ফোন রেখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল পাখিটার কথা। অমনি ক্যামেরা আর বাইনোকুলার নিয়ে দৌড়ে বেরুলেন।

চৌকিদার তার ঘরের বারান্দা থেকে বুড়ো কর্নেলকে ওইভাবে দৌড়তে দেখে হকচকিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কর্নেল নদীর ধারে গাবগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করছেন দেখে সে আপন মনে হাসতে লাগল। এই বুড়োসাহেব বড্ড খামখেয়ালি মানুষ!

ওদিকে শাটার টেপার আগেই পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে চোখের আড়ালে কোথায় উধাও। কর্নেল অপ্রস্তুত।

বাইনোকুলার চোখে রেখে তন্নতন্ন খুঁজেও আর দেখতে পেলেন না। দুঃখিত মনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আনমনে একটা চুরুট ধরালেন।

তারপর গাছের তলায় বসে চুরুটটা টানতে থাকলেন। নিচে নদীর বুকে কোথাও সোনালি বালির চড়া পড়েছে। কোথাও স্বচ্ছ নীল জল তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে। জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। কর্নেলের চোখ প্রকৃতির দিকে, কিন্তু কান পাখপাখালির ডাক শুনছে। তন্ময় হয়ে রয়েছে। মনে ক্ষীণ আশা, সেই ছোট্ট সুন্দর পাখিটা আবার যদি ডেকে ওঠে!

হেকিমি দাওয়াই ও খুনখারাপি

হ্যাঁ, আবার পাখিটা ডেকে উঠল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে। প্রকৃতি যাকে কণ্ঠস্বর দিয়েছে, সে কি গান না গেয়ে পারে? কর্নেল কান পাতলেন। এবার কিন্তু ডাকটা ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে।

কতক্ষণ ঠাহর করার পর বুঝলেন, কখন পাখিটা নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গেছে। ওপারে ঘন বাঁশবন। বাঁশবনের ভেতর সে নিরিবিলিতে মনের সুখে গান ধরেছে।

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে নদীতে নামলেন। এসব সময় তাঁর পা কোথায় পড়ছে, খেয়াল থাকে না। জায়গায় জায়গায় সোনালি বালির চড়া, আবার কোথাও ঝিরঝিরে কাজল জলের স্রোত। কোথাও আবার ডোবার মতো জল জমে রয়েছে। আচমকা কর্নেল তেমনি একটি ডোবামতো জায়গায় হুড়মুড় করে পড়লেন। কোমর অব্দি ডুবে গেল।

এই শীতের ঋতুতে ব্যাপারটা আরামদায়ক নয় মোটেও। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়লেন বটে, কিন্তু চোখে বাইনোকুলারটা রয়ে গেল।

এমনি করে ওপারে পৌঁছে কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে বাঁশবনে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ক্যামেরা তাক করে পাখিটার ছবি তুললেন। পরপর কয়েকটা।

তারপরই পাখিটা যেন টের পেল, তার ছবি তোলা হচ্ছে। অমনি সে ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল বাঁশবনের ওপর দিয়ে। তাকে লক্ষ করতে গিয়ে কর্নেলের চোখে পড়ল, একটু তফাতে ঝোপের মধ্যে এইমাত্র কেউ হেঁট হল। তার মাথার একটা কিম্ভুত গড়নের ছুঁচলো টুপি রয়েছে। টুপি পরে ঝোপের মধ্যে হেঁট হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার মোটেও নয়। তাই কর্নেল পা টিপে টিপে বাঁশবনের ভেতর ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলতে থাকলেন।

ভেজা প্যান্ট শার্ট কোর্টে কোমর অব্দি হিমে জমে অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু কর্নেল এ বয়সেও হাড়ে প্রচুর তাকত রাখেন। গ্রাহ্য করলেন না।

বাঁশবনের শেষে একটা আগাছার জঙ্গল। তার ওপাশটা মুসলিমদের গোরস্থান বলে মনে হল। একটা উঁচু ও চওড়া ঝোপের পাশে উঁকি মেরে বসে পড়ে কর্নেল।

একটা ঢ্যাঙা রোগা গড়নের লোক হাঁটু দুমড়ে বসে একটা কিছু করছে। তার মাথার ছুঁচোলো টুপিটার মতোই চেহারাও বিদঘুটে। যেন হাড়গিলে শকুন। নাকটা বেজায় লম্বা! গাল বলতে কিছু নেই। চিবুক থেকে লম্বা এক চিলতে ছাগল দাড়ি এসে বুকে নেমেছে। তার পরনে ময়লা জোকারের মতো জামা আর চুস্ত পাজামা। পায়ে নাগরা জুতো। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে।

দু হাতে একটা খুরপি ধরে সে মাটি কোপাচ্ছে।

কর্নেল সামান্য একটু মাথা উঁচু করে যা দেখলেন, তাতে যত অবাক হলেন, তত আতঙ্কে শিউরেও উঠলেন।

লোকটা যেখানটায় কোপাচ্ছে, সেখানটা একটা মাটির কবরের অংশ। কবরটা গ্রামের কোনও সাধারণ মানুষেরই কবর। তত বেশি পুরোনো নয়। কবর খুঁড়ছে কেন লোকটা? ও কি কঙ্কালটা চুরি করতে চায়? কঙ্কাল বিক্রি হয় গোপনে। চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োজনে কঙ্কাল লাগে। চোরাবাজারে তাই দেশবিদেশের কঙ্কাল বিক্রি হয় মোটা টাকায়।

এরপর লোকটা বসে পড়ল। কর্নেল শুধু তার মাথার পেছনটা আর কাঁধের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছিলেন। সে কী করছে পুরোটা দেখতে গেলে অনেকটা ঘুরে ওপাশে যেতে হয়। কিন্তু তা করতে গেলে তার চোখে পড়ার সম্ভাবনা।

একটু পরে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

তার হাতে একটা বাঁকাচোরা শেকড় দেখতে পেলেন কর্নেল। তখন কর্নেল মনে মনে হেসে ফেললেন।

না, লোকটা কঙ্কাল চুরি করছিল না। নেহাত একটা গাছের শেকড় সংগ্রহ করছিল। গাছটা কবরে গজিয়েছিল নিশ্চয়।

হুম্, এই লোকটাই তাহলে লিটনগঞ্জের সেই হেকিম লতিফ খাঁ নয় তো? কর্নেল চমকে উঠে দেখলেন, সর্বনাশ! লোকটা হন হন করে তার ঝোপটার দিকেই এগিয়ে আসছে যে!

সরে পড়ার ফুরসত পেলেন না কর্নেল। সে ঝোপ ঠেলে হুড়মুড় করে এসে একেবারে তার গায়ের ওপর পড়ল এবং ভয়ে কিংবা রাগে চেঁচিয়ে উঠল—'অ্যাই বাপ!'

কর্নেল অপ্রস্তুত হেসে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আদাব ঠুকে সসম্ভ্রমে বললেন—'সেলাম হেকিমসাহেব! সেলাম, বহুৎ সেলাম!'

হ্যাঁ লোকটা হেকিম লতিফ খাঁ-ই বটে। ভুরু কুঁচকে বলল—'আপনি কে আছেন? এই জঙ্গলে কী করছেন?'

কর্নেল বাইনোকুলার ও ক্যামেরা দেখিয়ে বিনীতভাবে বললেন—আমি পাখপাখালির ছবি তুলতে বেরিয়েছি হেকিমসাহেব। ওই ডালে একটা পাখি বসে ছিল। তার ছবি তুলছিলাম। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, পাখির ছবি তুলতে হলে চুপিচুপি এইভাবে গা ঢাকা দিয়ে বসতে হয়।'

হেকিম এবার দাঁত বের করে হাসল। 'হাঁ, হাঁ। আপনারা ইউরোপিয়ান সাহাব আদমির এইসা খ্যাল আছে বটে। একবার এক সাহাবলোক এসে ঠিক এমনি করে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। হামি দেখেছে। তবে আপকা মাফিক বাংলা বোলি সে বলতে পারত না।'

কর্নেল বুঝলেন, তাঁর চেহারা দেখে হেকিম খাঁটি ইউরোপবাসী বলে ভুল করেছে। এটা স্বাভাবিক। এ ভুল তাকে দেখে সবাই করে। যাই হোক, এ সুযোগে তিনি ইউরোপীয় হয়ে গেলেই মঙ্গল। বললেন—'জি হাঁ হেকিমসায়েব। আমি বাংলা মুল্লুকে অনেক বছর আছি কিনা। তবে উর্দুও বলতে পারি।'

এরপর দুর্জন উর্দুভাষায় কথা বলতে বলতে নদীতে নামলেন। সে-সব কথাবার্তা হল এই :

'আমি যে হেকিম, তা কীভাবে বুঝলেন?'

'কেন? আপনার হাতে গাছের শেকড় আর ওই খুরপি।'

'ঠিক, ঠিক।'

'তাছাড়া এখানে এসে আপনার কত নাম শুনেছি। আপনার দাওয়াই খেলে মড়াও নাকি উঠে বসে।'

'তা মা বাবা আর খোদার দয়ায় ওকাজটা আমি ভালোই পারি।'

'দেখুন হেকিমসায়েব, আমার কোমরে প্রায়ই খুব ব্যথা হয়। দাওয়াই দেবেন?'

'নিশ্চয় দেব। ওই তো আমার কাজ। তবে আমার দাওয়া-খানায় যেতে হবে।'

'তাই যাব। তবে দয়া করে আসুন, ওই বাংলোয় আমি যাচ্ছি। একটু চা খেয়ে যাবেন।'

'বেশ তো চলুন।'

নদী পেরিয়ে দুজনে বাংলোয় পৌঁছলেন। কর্নেল চৌকিদারকে চায়ের আদেশ দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে মুখোমুখি বসলেন।

ফকির বলেছিল, হেকিম লতিফ খাঁ বদমেজাজি লোক। কিন্তু তাকে মোটেও তেমন মনে হল না কর্নেলের। লোকটি যে ভদ্রবংশীয় ত তার আদবকায়দা আর কথার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে।

কথায়-কথায় কর্নেল একসময় বলল—'আচ্ছা হেকিমসায়েব, শুনেছি এখানে নাকি এক মস্তো জায়গিরদার ছিলেন। আপনি তারই বংশধর?'

লতিফ খাঁ মাথা উঁচু করে বলল—'আপনি ঠিকই শুনেছেন।'

'আচ্ছা খাঁ-সাহেব, ইতিহাসের কেতাবে পড়েছিলাম এখানে আপনার পূর্বপুরুষদের আমলে কেউ মারা গেলে তার মৃতদেহ মমি করা হত। তা কি সত্যি?'

হেকিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—'কিছুটা সত্যি। আপনি বিদেশি। আজ আছেন, কাল নেই। তাই সে গোপন কাহিনি আপনাকে বলছি।'

বলে হেকিম লতিফ খাঁ এই কাহিনি শোনাল :

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। জায়গিরদার মুইনুদ্দিন শাহ আল-তমাসের মনে সুখ ছিল না। কারণ তাঁর কোনও পুত্রসন্তান নেই। তাই তিনি আরব ও পারস্যের নানা মুসলিম তীর্থে ফকির ও অলৌকিক শক্তিধর সাধকের কাছে পুত্র কামনায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। অবশেষে খোঁজ পেলেন, মিশরদেশের এক সাধক আজম শাহের কাছে গেলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হতে পারে।

মুইনুদ্দিন তখনই মিশরে গিয়ে সেই সাধকের শরণাপন্ন হলেন। অনেক কাকুতি-মিনতির পর আজম শাহ বললেন—'ঠিক আছে। আজ রাতদুপুরে তুমি আমার আস্তানায় একা এসো। তোমাকে আমি একটা অত্যাশ্চর্য জিনিস দেব। সেটা নিয়ে গিয়ে তুমি ও তোমার স্ত্রী ধুয়ে জল খাবে। তাহলে তোমাদের পুত্রলাভ হবে। কিন্তু সাবধান, এই জিনিসটি অপার্থিব একটি রত্নবিশেষ। একটি কৃষ্ণবর্ণ ধাতুনির্মিত ছোট পেটিকার মধ্যে এটা রেখে দেবে। আর দেখ মানুষ মরণশীল প্রাণী। তোমার পুত্রও একদিন মারা যাবে। তার যখনই মৃত্যু হোক, তার কবরের মধ্যে ওই রত্নসমন্বিত পেটিকাটিও অবশ্য সমাহিত করতে হবে। নতুবা সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে।'

মুইনুদ্দিন সেই অত্যাশ্চর্য কৃষ্ণবর্ণ রত্নপেটিকা নিয়ে দেশে ফিরলেন। সাধক তাকে পেটিকার চাবি দিয়েছিলেন। চাবির সাহায্যে পেটিকা খুলে রত্নটি বের করে ধুয়ে স্বামী-স্ত্রী মিলে সেই জল পান করলেন।

পরবৎসর তাঁর পুত্রলাভ হল। সাধকের নাম অনুসারে তার নাম রাখলেন আজিমুদ্দিন।

কিন্তু দুঃখের কথা, বারো বছর বয়সে সেই সুন্দর ছেলেটি এক অজ্ঞাত ব্যাধিতে মারা পড়ল। শোকে ভেঙে পড়লেন মুইনুদ্দিন।

তিনি মিশরে গিয়ে ওইসময় একজন কারিগরের খোঁজ পেয়েছিলেন—যে মৃতদেহ মমি করতে জানত। তাকে তিনি খেয়ালবশে সঙ্গে করে এনেছিলেন।

আজিমুদ্দিনের মৃতদেহ মমি করার ইচ্ছা হল হতভাগ্য পিতার। মিশরবাসী সেই লোকটি তাঁর আদেশ পালন করল। কিন্তু সাধক আজমশাহের নির্দেশে সেই রত্নপেটিকা কবরে রাখতে হবে। সাধারণ কবরে রাখলে তা চুরি যাবার আশঙ্কা ছিল! কারণ এই আজব পেটিকা ও রত্নের কথা ততদিনে রটে গিয়েছিল।

তাই ভূগর্ভে গোপন কবর দেওয়া হল আজিমুদ্দিনকে। রত্নপেটিকাটিও তার কবরের মধ্যে রাখা হল।....

হেকিম লতিফ খাঁ চুপ করলে কর্নেল বললেন—'তারপর?'

'আর কী?'

'সেই গুপ্ত কবরের সন্ধান। নিশ্চয় আপনি রাখেন?'

মুহূর্তে হেকিমের মেজাজ বদলে গেল। বিকৃতমুখে বললেন—'না। আপনাকে যে কাহিনি বললুম, তা আমার বাবার কাছে শোনা। কিন্তু এই গাঁজাখুরি গল্পে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।'

চৌকিদার ইতিমধ্যে চা এনে দিয়েছিল। হেকিম চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে তেমনি বিকৃতমুখে হেসে ফের বলল—'দয়া করে এ সম্পর্কে আমায় আর কোনও প্রশ্ন করবেন না সায়েব! যদি কোমরের বেমারির দাওয়াই চান, আমার সঙ্গে আসতে পারেন।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—'এক ভদ্রলোক দেখা করতে আসবেন। তাই এখন যাওয়ার অসুবিধা আছে। সন্ধ্যায় যাবখন।'

'আচ্ছা আদাব।' বলে হেকিম লতিফ খাঁ বেরিয়ে গেল।

কর্নেল অবাক হয়ে বসে রইলেন। মমি করার ব্যাপারটা হেকিম কিছুটা সত্যি বলে স্বীকার করল। কিন্তু বাকিটা গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিল কেন?

অথচ আজিমুদ্দিনের কবরে সত্যি একটা অদ্ভুত ধাতুতে তৈরি কালো পেটিকা পাওয়া গেছে এবং সেটা কর্নেল স্বচক্ষে দেখেছেন। কর্নেল আগাগোড়া ব্যাপারটা ভাবতে থাকলেন। ঘণ্টা দুই পরে ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে বললেন—'হ্যালো। কর্নেল বলছি।'

'কর্নেল, আমি অজিতেশ।'

'কী খবর ডার্লিং?'

'খবর সাংঘাতিক! একটু আগে তোপখানার কাছে পোড়ো একটা বাড়িতে একটা লাশ পাওয়া গেছে। টাটকা খুন। তাকে ছোরা মেরে পালিয়েছে কেউ। নিহত লোকটা...'

'কে, কে অজিতেশ?'

'শংকরবাবুর সেই বাজার সরকার। কারণ তার পকেটে তার নাম ঠিকানা লেখা একটা পোস্টকার্ড পাওয়া গেছে। ঠিকানায় কেয়ার অফ শংকরবাবুর নাম রয়েছে।'

'আমি যাচ্ছি!' বলে কর্নেল ফোন রেখে দিলেন।

গোরস্তানে অভিযান

তোপখানার এদিকটায় মুসলমানপাড়া। এলাকা জুড়ে প্রাচীন ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। সেইসব ধ্বংসস্তূপে আগাছার জঙ্গলও গজিয়েছে। একপাশে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা আর কয়েকটা ল্যাম্পপোস্ট দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতের বেলা ফুরিয়ে গেছে। বাতি জ্বলেছে সবে। কর্নেল ওই রাস্তায় ভিড় দেখতে পাচ্ছিলেন। একদঙ্গল পুলিশ সেই ভিড় ঠেকিয়ে রেখেছে। পুলিশের জিপ, ভ্যান আর একটা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অজিতেশ কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন—'লাশ কোথায়?'

'ওই যে, ওখানে পোড়োবাড়ির মধ্যে।'

বলে অজিতেশ কর্নেলকে নিয়ে রাস্তার পাশে আগাছার জঙ্গল ঠেলে ঢুকলেন। পোড়ো বাড়িটা আসলে কোনও একটা নবাবি অতিথিশালার একটা অংশ। ভেঙেচুরে একাকার। শুধু একটা ঘর কোনওক্রমে টিকে আছে। একটা হ্যাসাগ রাখা হয়েছে লাশের কাছে। লাশটা সেই ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পিঠে কাঁধের কাছে একটা ছোরা তখনও বিঁধে রয়েছে। তাই বেশি রক্ত বেরুতে পারেনি।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবু পুলিশ সুপারের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। ইশারা পেয়ে ছোরাটা টেনে বের করলেন। এক ঝলক জমাট রক্ত বেরিয়ে এল। কর্নেল মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

আরও সব পুলিশ অফিসার লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারা ততক্ষণে মোটামুটি তদন্ত করে ফেলেছেন ঘটনাটার। কিন্তু কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার অন্যরকম।

কর্নেল হেঁট হয়ে ঘরের মেঝে পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দা থেকে উঠোনে টর্চের আলো ফেলে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেন। পুলিশ অফিসাররা তাই দেখে বাঁকা মুখে হেসে পরস্পর তাকাতাকি করছিলেন। এ বুড়ো আবার কে—বেমক্কা নাক গলাতে এসেছে এবং পুলিশ সুপার তাকে এত খাতির করছেন!

কর্নেল উঠোনের কোনা থেকে কী একটা কুড়িয়ে পকেটে রাখলেন।

ওদিকে লাশ ধরাধরি করে হাসপাতালের লোকেরা অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। মর্গে নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেম করা হবে। ডাক্তারবাবুও চলে গেলেন।

অজিতেশ এতক্ষণে কর্নেলের কাছে এসে বললেন—'কী বুঝলেন কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মদনবাবু কারুর কথামতো সেই কালো বাকসোটা কলকাতা থেকে এনে এই পোড়ো বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। আচমকা তাঁকে পিছন থেকে ছোরা মেরে খুনি বাকসোটা নিয়ে ভেগেছে। ছোরাটা তুলে নেওয়ার সময় পায়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

'কেন সময় পায়নি, অনুমান করতে পারছেন?'

'সম্ভবত কেউ এসে পড়েছিল।'

'কোনও সূত্র খুঁজে পেলেন কি কর্নেল?'

'কিছু পেয়েছি বইকি।' বলে কর্নেল একটু হাসলেন।

'বলতে আপত্তি আছে?'

কর্নেল বললেন—'তোমায় বলতে আপত্তি কীসের? প্রথম সূত্র—ঘরের ভেতর ভাঙা কড়িকাঠ স্তূপের আড়ালে সুরকির গুঁড়োয় জুতোর ছাপ আছে দেখলুম। কেউ মদনবাবুর জন্যে আগে থেকেই ওখানে লুকিয়ে অপেক্ষা করছিল। তবে সে ছোরা মারেনি। যে মেরেছে, সে বাইরে থেকে আচমকা ঢুকে মেরেছে এবং সম্ভবত এক-ঝটকায় মদনবাবুর ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে পালিয়েছে।'

বলে কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো বাঁকাচোরা শেকড় বের করলেন।

অজিতেশ অবাক হয়ে বললেন—'ওটা কী? কোথায় পেলেন?'

'উঠোনের কোনায়। খুনি পালাবার সময় এটা তার হাত থেকে পড়ে গেছে।'

'ওটা একটা শেকড় না?'

'হ্যাঁ শেকড়। আর এই দ্যাখো, এতে একটু রক্ত লেগে রয়েছে।'

অজিতেশ অবাক হয়ে বলল—'খুনির হাতে এই শেকড় ছিল? কেন?'

কর্নেল একটু হেসে বলল—'অজিতেশ! খুনি কে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাকে সম্ভবত এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?'

অজিতেশ ব্যস্তভাবে বললেন—'দোহাই কর্নেল! দয়া করে আর হেঁয়ালি করবেন না। বলুন, কে সে? এখনই তাকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশবাহিনী পাঠাব।'

কর্নেল আনমনে বললেন—'আমারই বুদ্ধির ভুল! আঃ তখনই যদি....'

'কর্নেল! আবার হেঁয়ালি করছেন আপনি।'

কর্নেল স্থিরদৃষ্টে পুলিশ সুপারের দিকে তাকিয়ে বললেন—অজিতেশ! জনা চার-পাঁচ বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ অফিসার নিয়ে তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস। আমার ধারণা, বড্ড দেরি হয়ে গেছে! তবু চেষ্টা করতে দোষ কী?'

অজিতেশ তক্ষুনি পুলিশ অফিসারদের ডেকে জিপে উঠতে বললেন। তারপর কর্নেলকে ডেকে বললেন—'আমরা রেডি। চলে আসুন কর্নেল।'

কর্নেল জিপের সামনে অজিতেশের পাশে বসে বললেন—'সোজা আমার বাংলোয় চলো। ওখানে জিপ রেখে আমরা যথাস্থানে রওনা দেব।'

জিপ প্রচণ্ড বেগে ছুটল। আলো আর ভিড়েভরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে জিপ নদীর ধারে সরকারি বাংলোয় পৌঁছোল। কর্নেল বললেন—'সবাই আমার সঙ্গে আসুন। কোনও শব্দ করবেন না। টর্চ রেডি রাখুন। কেউ যেন গুলি ছুঁড়বেন না। সাবধান! যদি কেউ আক্রমণ করে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। তবে কেউ আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না!'

অজিতেশ ও পুলিশ অফিসাররা কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।

কর্নেল অন্ধকারে নদীর দিকে হাঁটছিলেন। সেই গাবতলায় পৌঁছে একটু দাঁড়ালেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন—'নদীর ওপারে যেতে হবে আমাদের। দেখবেন, কেউ যেন জলে না পড়েন।'

কুয়াশার মধ্যে মিটমিটে নক্ষত্রের আলো নদীর জলে কোথাও কোথাও ঝিকমিক করছে। সাবধানে বালির চড়া পেরিয়ে সবাই ওপারে পৌঁছলেন।

সামনে বাঁশবন নিঃঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। বাঁশের পাতা থেকে শিশির পড়ার টুপটাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে। একবার প্যাঁচা ডেকে উঠল বিশ্রী শব্দে। তারপর গোরস্থানের ওদিকে শেয়াল ডাকতে লাগল!

কর্নেল আগে, পুলিশ অফিসাররা পেছনে। কাঁটাঝোপে বারবার কাপড় আটকে যাচ্ছে। আছাড় খেতে হচ্ছে। শুকনো পাতা শিশিরে ভিজে গেছে বলে জুতোর শব্দ হচ্ছে না। কিছুটা চলার পর কর্নেল দাঁড়ালেন। কান পেতে কী যেন শোনার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। আবার কিছুটা এগিয়ে কর্নেল ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন—'রেডি! টর্চ জ্বালাতে হবে। ওয়ান টু থ্রি...'

সঙ্গে সঙ্গে সাতটা টর্চ জ্বলে উঠল।

সেই উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, জায়গাটা একটা গোরস্থান। আর সেখানে একদঙ্গল শেয়াল মাটি শুঁকছে একটা সদ্যখোঁড়া কবরের কাছে। তাদের চোখগুলো নীল।

হঠাৎ আলোয় তারা ভড়কে গিয়ে চোখের পলকে গা ঢাকা দিল। কর্নেল সদ্যখোঁড়া কবরটার কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

অজিতেশ বলে উঠল—'কী ব্যাপার কর্নেল? এর মাথামুণ্ডু কিছু যে বুঝতে পারছি না।'

কর্নেল মাটির কবরের গর্তে আলো ফেলে হতাশস্বরে বললেন—'দেরি হয়ে গেছে! আজিমুদ্দিনের মমি-মুণ্ডু এখানেই লুকিয়ে রেখেছিল সে। মদনবাবুকে খুন করে বাকসোটা হাতিয়ে সোজা এখানে এসেছিল। তারপর মমি-মুণ্ডুটা তুলে নিয়ে গোপন জায়গায় চলে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয় সে মুণ্ডু থেকে চাবি খুঁজে বের করেছে এবং বাকসো খুলে রত্নটিও পেয়ে গেছে।'

অজিতেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন—'কর্নেল! কর্নেল! কী সব বলছেন আপনি? কার কথা বলছেন?'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ গোরস্থানের অন্যপ্রান্ত থেকে কার বিকট চিৎকার শোনা গেল—'ইয়া পির মুশকিল আসান! যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান!'

টর্চের আলো গিয়ে পড়ল ওদিকে। দেখা গেল সেই কালো আলখেল্লা ও কালো টুপিপরা ফকির হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

অজিতেশ অবাক হয়ে বললেন, 'আরে! এ তো দেখছি পিরের মাজারের সেই পাগলা ফকির! এ আবার এখানে জুটল কেন?'

কর্নেল বললেন—'চুপ্‌। ফকির কী বলে আগে শোনা যাক্‌।'

ফকির নির্ভয়ে গটগট করে চলে এল সামনে। তারপর বলল—'বাবালোক! সরকারের টর্চের ব্যাটারি কি খুব সস্তা হয়ে গেছে? না কি কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল! কর্নেলসাহাব! ওনাদের বলুন, বেফায়দা আলো জ্বেলে লাভ কী? এটা গোরস্থান। এখানে পিদিমের আলোই মানায়।'

বলে সে তার হাতের লণ্ঠনটি রেখে আলখেল্লার ভেতর থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল। কর্নেল বললেন—'টর্চ নিভিয়ে ফেলুন আপনারা!'

তারপর ফকিরকে বললেন—'ফকির সায়েব! আপনার কথাই সত্যি হল। হেকিম লতিফ খাঁ সত্যি আজিমুদ্দিনের মুণ্ডু চুরি করে এনে এই কবরে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর ...'

বাধা দিয়ে ফকির বলল—'তারপর বাকসো চোরকে খুন করে বাকসোও হাতিয়েছে। এই তো?'

কর্নেল বললেন—'আপনি তাহলে সবই জানেন দেখছি!'

"বেটা আমি সর্বচর। সব জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তো সেলাম পুলিশসায়েব! আপনিও এসেছেন দেখছি। লেকিন লতিফ খাঁকে আর ঢুঁড়ে বের করতে পারবেন? সে এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে!

অজিতেশ কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন— 'ফকিরসায়েব! আপনার অজানা কিছুই নেই। লতিফ খাঁ এখন কোথায়, আপনি নিশ্চয় জানেন!'

ফকিরের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সে বলল—'তাকে ধরে ফেলব বলে আমিও তার পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু ব্যাটা খুব ধূর্ত। অন্ধকারে ঘুরপথে এগিয়ে আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। তবে যেখানেই লুকিয়ে বাকসো খুলে আজব মণি বের করুক, তাকে আমি পাকড়ে ফেলব।'

বলেই ফকির গতকাল সন্ধ্যার মতো আলখেল্লার ভেতর থেকে কী একটা বের করে লণ্ঠনের ওপর ছড়িয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ সাদা একরাশ ধোঁয়ায় সারা গোরস্থান ঢেকে গেল। কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন—'সরে আসুন! সরে আসুন সবাই। বিষাক্ত গ্যাসে মারা পড়বেন।'

সবাই এক দৌড়ে অনেকটা তফাতে সরে গেলেন। একটু পরে ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে টর্চের আলোয় দেখা গেল, গোরস্থান নির্জন। ফকির অদৃশ্য হয়েছে।

অজিতেশ গম্ভীর মুখে বললেন—'তাহলে কী করা যাবে কর্নেল?'

কর্নেল বললেন—'কিছু মাথায় আসছে না। লতিফ খাঁ হেকিমকে খুঁজে বের করা আর খড়ের গাদা থেকে হারানো ছুঁচ উদ্ধার করা একই ব্যাপার। বিশেষ করে এই রাত্রিবেলার অন্ধকারে এ কাজ অসম্ভব!'

'আমার অসহ্য লাগছে কর্নেল! ব্যাটা খুনি তো বটেই, তার ওপর আজিমুদ্দিনের কবরের বহুমূল্য রত্ন নিয়ে নির্বিবাদে ভেগে পড়বে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—'সকাল হোক তারপর দেখা যাবে। বরং তুমি এ রাতে তোমার গোয়েন্দাবাহিনীকে কাজে লাগাও, অজিতেশ! যদি তারা কোনও হদিশ দৈবাৎ পেয়ে যায়, ভালোই।'

সবাই মিলে নদীর দিকে পা বাড়ালেন। নদী পেরিয়ে বাংলোয় পৌঁছে কর্নেল বললেন—'তাহলে এসো অজিতেশ। আমি বড্ড ক্লান্ত। বিশ্রাম করতে চাই।'

পুলিশ সুপার সদলবলে জিপে চেপে গেলেন।

কর্নেল গেট পেরিয়ে লনে পা বাড়াতেই দেখলেন, বারান্দায় শংকর বসে আছেন। কর্নেল বললেন—'শংকর যে! কখন এলে!'

'এইমাত্র। এসে তো সব শুনে ভীষণ ঘাবড়ে গেছি!'

'হ্যাঁ, তোমার বাজার সরকার ভদ্রলোক বেঘোরে খুন হয়ে গেছেন।'

'পাপের প্রতিফল, কী বলব? কিন্তু কর্নেল, শ্রীমান ন্যাড়ার জন্যে আর যে মন মানছে না! খালি মনে হচ্ছে, তাকে ওরা মেরে ফেলেছে। ওদিকে ওর বাবা-মার অবস্থা শোচনীয়। সব কথা খুলে বলিনি বটে, কিন্তু কতক্ষণ চেপে রাখব আর?'

কর্নেল চেয়ারে ধুপ করে বসে বললেন—'হ্যাঁ, বাকসো হাতছাড়া হয়ে গিয়ে কমলাক্ষ খেপে গেছে নিশ্চয়। কিন্তু না—আমার বিশ্বাস, ন্যাড়াবাবাজীবনকে সে মেরে ফেলবে না। কারণ তাতে তার আর এখন কোনও লাভই হবে না। তুমি ভেব না শংকর। বরং আমাকে ভাবতে দাও।...' বলে কর্নেল চোখ বুজে কী যেন ভাবতে থাকলেন।

ন্যাড়ার বাড়ি ফেরা

ন্যাড়া দুপুরবেলায় মাঝগাঙে বুড়ো জেলের নৌকোয় ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে মনের সুখে পেট ভরে ভাত খেয়েছে। বন্দিদশায় কি খেতে ভালো লাগে? তাই খিদেয় নাড়ি চোঁ চোঁ করছিল। তার ওপর টাটকা ধরা গঙ্গার ইলিশ।

ন্যাড়াকে দেখে বুড়ো জেলে আর তার জোয়ান ছেলের খুব মায়ামমতা জেগেছিল মনে। আহা, ভদ্দর লোকের সুন্দর ছেলেটা—বয়স কতই বা হয়েছে? দশ বারো বই নয়। তাকে কিনা ছেলে ধরা ডাকুরা চুরি করে এনেছিল। তবে বুড়ো জেলে হেসে খুন হয়েছিল।—খুব নবডংকাটি দেখিয়ে কেটে পড়েছে বাবা। ওরা যেমন বুনো ওল, তুমি তেমনি বাঘা তেঁতুল! এবারে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। চলো, তোমায় আমরা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসি। রেলগাড়ি করে চলে যাবে।

বুড়ো বিকেলে তাই করেছে। বাপ-ব্যাটা মিলে ইছাপুর রেল-স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে ন্যাড়াকে। ঘাটে নৌকো বেঁধে রেখে এসেছে।

তারপর লিটনগঞ্জের টিকিট কেটে দিয়েছে। ন্যাড়া তার সঙ্গে দাদু পাতিয়েছে। বলেছে—ও দাদু! তোমার ঠিকানা বলো লিখে নিচ্ছি। টিকিটের টাকাটা পাঠিয়ে দিতে বলব বাবাকে।

জেলেবুড়ো জিভ কেটে বলেছে—ছি, ছি! ও কী কথা নাতি ভাই! ও টাকা ফেরত নেব না। বরং বাপ বেটা মিলে নৌকো নিয়ে আমরা উজানে যাব যখন, তখন তোমাদের লিটনগঞ্জে গিয়ে উঠবখন। তখন তোমার মায়ের কাছে দু-মুঠো খেয়ে আসব। ওতেই সব শোধ!

ন্যাড়া বলেছে—কবে যাবে জেলেদাদু!

—এখন তো শীত। বর্ষায় যাব। ঠিক যাব। আমরা তো জলচরা মানুষ ভাই।

ট্রেন এসে গেছে। তখন ন্যাড়াকে তুলে নিয়ে বুড়ো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় সাবধান করে দিয়েছে। আর যেন বদমাশদের পাল্লায় না পড়ে ন্যাড়া! ট্রেন ছেড়ে দিলে কয়েক পা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েছে জেলে বুড়ো। তারপর হঠাৎ তার খেয়াল হয়েছে—এই গো, সারাদিন সঙ্গে রইলে। নামটা তো জানা হল না ছেলের।

ন্যাড়া চলন্ত ট্রেনের জানালায় মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলেছে—স্বপনকুমার রায়। ওখানে সবাই আমায় ন্যাড়া বলে ডাকে—এ-এ-এ!

ট্রেনে বড্ড ভিড় ছিল। দিনটা শনিবার। তাই শহুরে বাবুর দল রবিবারের ছুটি কাটাতে যে-যার দেশের বাড়ি চলেছে।

তবু ন্যাড়া খুব সাবধানে নজর রেখে বসে রইল। কমলাক্ষ বা মেধো গুন্ডা যদি তার খোঁজে দৈবাৎ এ ট্রেনে উঠে থাকে!

প্রতি স্টেশনে লোকেরা উঠল-নামল। কিন্তু ওদের দেখা না পেয়ে ন্যাড়া আশ্বস্ত হল। লিটনগঞ্জ প্রায় চার ঘণ্টা লেগে গেল পৌঁছতে। চেনা স্টেশনে নামল যখন, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে আটটা বাজে। বেশ শীত করছে। গায়ে মোটে একটা শার্ট, পরনে হাফ প্যান্ট। পায়ের জুতো সেই ঘরে পড়ে আছে।

প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে ফের চারদিকে তাকিয়ে কমলাক্ষদের খুঁজল। তারপর গেটে টিকিট দিয়ে রাস্তায় হনহন করে এগোল। স্টেশন রোডে ল্যাম্পপোস্ট থেকে যে আলো ছড়াচ্ছে, তা কুয়াশায় ম্লান। ন্যাড়া শীতে ঠকঠক করে কেঁপে প্রায় দৌড়ুচ্ছিল। বাস রিকশো আর পায়েচলা লোকের সঙ্গে দেখা অবশ্য হচ্ছে। কিন্তু একটু পরে বাঁদিকে মোড় নিয়ে যে রাস্তায় তাদের পাড়ায় ঢুকতে হবে, সেটা বেশ নির্জন। নাকি বাজার ঘুরে অন্যপথে বাড়ি ঢুকবে?

এই লিটনগঞ্জেই ন্যাড়ার জন্ম। এর নাড়িনক্ষত্র এ বয়সেই তার জানা। অথচ তার জীবনে এমন একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে যে, এখন এই রাতেরবেলা চিরচেনা লিটনগঞ্জ তার কাছে অজানা এক রহস্যময় আর বিভীষিকায় ভরা শহর হয়ে উঠেছে।

খালি মনে হচ্ছে, সামনের ওই লোকটাই বদমাশ কমলকাকু কিংবা মেধো গুন্ডা। কখনও মনে হচ্ছে, অন্ধকার জায়গাগুলো থেকে ওরা তার দিকে নজর রেখেছে। এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আবার তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখবে।

মোড়ে এসে ন্যাড়া একটু দাঁড়াল। বাজার ঘুরে অন্য রাস্তায় বাড়ি যাবে, নাকি এই রাস্তায় শর্টকাটে পৌঁছুবে? এ রাস্তার দুধারে ফাঁকায় একটা করে বাড়ি আর মাঝেমাঝে ফুলফলের বাগিচা। এ পাড়াটা খুব নির্জন। এটা হাউসিং কলোনি একটা। সবখানে এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়নি। আগাছার জঙ্গল বা গাছপালাও রয়ে গেছে।

মোড়ে যেখানে ন্যাড়া দাঁড়িয়েছে, সেখানে শহরের জলের ট্যাংক। উঁচু লোহার ফ্রেমের মাথায় বসানো। হঠাৎ ন্যাড়া দেখল, ওই উঁচুতে রাখা বিশাল ট্যাংকের পেছন দিকে ঘন ছায়ায় ভেতর থেকে একটা লোক সাঁৎ করে বেরিয়ে এল।

লোকটা বেজায় ঢ্যাঙা। মাথায় ছুঁচলো একটা টুপি রয়েছে। তাঁর কাঁধে একটা ভারী ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগটা এক হাতে চেপে সে কুঁজো হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে-চাইতে উলটোদিকের ইট ও টালিভাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ন্যাড়া লোকটিকে তক্ষুনি চিনতে পেরেছে। আরে। এ তো সেই মুসলমান পাড়ার হেকিমসায়েব!

রাস্তায় ওকে দেখলেই ন্যাড়া তার বন্ধুরা পেছনে লাগে। সুর ধরে চেঁচায়— 'ও খাঁ-সায়েব! ও খাঁ-সায়েব! একটু দাওয়াই দেবে?'

হেকিম বড় বদমেজাজি আর পাগলাটে স্বভাবের লোক। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে তাড়া করে ওদের। ন্যাড়ারা তখন হাসতে হাসতে পিছু হটে।

হেকিমসায়েব এমন করে চুপিচুপি ভাটার দিকে কোথায় গেল? ন্যাড়া হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বাড়ি যাবার কথা, কমলাক্ষ বা মেধো গুন্ডার কথা—সব ভুলে গেল।

ইট ও টালিভাটাটা এখন পোড়ো হয়ে গেছে। বিশাল এলাকা জুড়ে বড় বড় পুকুরের মতো গর্ত বা খাল আর ঢিবি রয়েছে। ঢিবিতে জঙ্গল গজিয়েছে। সতুবাবুরা একসময় রোডস ডিপার্টমেন্টের জন্য ইট ও টালি সাপ্লাই দিতে ওখানে ভাটা বানিয়েছিলেন। দুটো মস্তো চিমনি রয়ে গেছে।

হেকিমসায়েব ওখানে ঢুকল কেন? আর ওর ব্যাগে কী এমন ভারী জিনিস আছে যে অমন করে কুঁজো হয়ে পা ফেলছিল সে?

ন্যাড়ার মাথায় এই এক রোগ। তার খেয়াল চড়লে আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। সে দৌড়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে দেখার চেষ্টা করল, হেকিমসায়েব যাচ্ছেটা কোথায়? কিন্তু ওদিকটা ঘন অন্ধকার। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ হতাশভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ন্যাড়ার সম্বিৎ ফিরল। এদিকটা শীতটাও বেজায় বেড়ে গেছে। দাঁতে দাঁত ঠেকে কাঁপুনিতে অস্থির। ন্যাড়া ওখান থেকে মোড়ে ফিরে এল। তারপর প্রায় চোখ বুজে নির্জন রাস্তা দিয়ে দৌড় লাগাল।

এক দৌড়ে পরের মোড়ে এসে সে ডান দিকে ঘুরল। তারপর গলিরাস্তায়, আরেক দৌড়ে একেবারে বাড়ির দরজায় পৌঁছোল।

রোয়াকে উঠেই সে চেঁচিয়ে উঠল—'মা! ওমা!'

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে তার মায়ের গলা ভেসে এল—'কে রে?'

ন্যাড়া ভয়ে-ভয়ে বলল—'আমি।'

সুনন্দা দরজা খুলেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ওগো! ন্যাড়া এসেছে! ন্যাড়া!' তারপর ছেলেকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ভেতরে রমেনবাবু—ন্যাড়ার বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। শুনতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে গর্জে বললেন—'ওরে হতভাগা! আয়, মজা দেখাচ্ছি তোর!'

ন্যাড়া মায়ের বুকে মিশে আছে। নির্ঘাত বাবা একচোট চড়থাপ্পড় আগে মেরে বসবেন—ব্যাপারটা কত সাংঘাতিক তা বুঝতেই চাইবেন না হয়তো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রমেনবাবুরও চোখে জল। ধরা গলায় বললেন—'অমন করে বাড়িপালানো অভ্যাস করলে তুই কি মানুষ হতে পারবি খোকা? দেখো দিকি কাণ্ড। আজ দুদিন ধরে বাড়িতে রান্নাখাওয়া বন্ধ!'

যাক্, বাবাও কেঁদে ফেলেছেন। ন্যাড়া নিশ্চিন্ত। বাড়িতে খুব সাড়া পড়ে গেছে। দিদি অমিতা ওর গালে চিমটি কেটে গরম জল করতে গেল। বাবা একটা গরম চাদরে ন্যাড়াকে জড়িয়ে ফেললেন। সুনন্দা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন বাড়িময়।

সেই হট্টগোলের সময় হঠাৎ কোত্থেকে শংকরবাবু হাজির।

বাড়ি ঢুকে ন্যাড়াকে দেখে তিনি কয়েকমুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ন্যাড়া মিটিমিটি হাসছিল।

শংকরবাবুর মুখে কথা ফুটল অবশেষে। বলে ফেললেন—'তোকে ওরা ছেড়ে দিল তাহলে?'

ন্যাড়া বলল—'হুঁ, তাই বুঝি? আমি বুদ্ধি করে পালিয়ে এসেছি।'

রমেনবাবু ও সুনন্দা অবাক হয়ে বললেন—'অ্যাঁ! সে কী কথা!'

শংকরবাবু বললেন—'সব বলছি। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। ন্যাড়া যে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসতে পেরেছে, এজন্যে ওকে পুরস্কার দেওয়া দরকার।'

রমেনবাবু বললেন—'আহা! বলবে তো কী হয়েছিল?'

শংকরবাবু জবাব দিতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ন্যাড়া বলে উঠল—'ছোটমামা! একটা কথা শোনো। আমি স্টেশন থেকে আসছি, তখন সতুবাবুদের ভাটার মধ্যে মুসলমানপাড়ার হেকিম লোকটা ভারী ঝোলা কাঁধে নিয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ল। তারপর...'

শংকরবাবু সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিলেন। বললেন—'জামাইবাবু! আমি একটু পরে আসছি।' বলে সবাইকে অবাক করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর....

নক্ষত্রলোকে প্রত্যাবর্তন

লিটনগঞ্জের বাজার এলাকা বাদে রাত নটা না বাজতে বাজতেই এই শীতে সবগুলো পাড়া নিশুতি নিঃঝুম হয়ে পড়ে। বাজারেও অবশ্যি খাঁ খাঁ অবস্থা। কিছু-কিছু দোকান খোলা এবং লোকেরা আড্ডা দিচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে বাতি কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। এই নির্জন নিঃঝুম রাস্তায় পুলিশ সুপারের জিপ এগিয়ে চলেছে স্টেশনরোডের দিকে। একটু পেছনে চলেছে একটা মস্তো পুলিশভ্যান। তাতে বসে রয়েছেন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর কয়েকজন অফিসার।

জিপে আছেন পুলিশ সুপার অজিতেশ, কর্নেল আর শংকর।

শংকরের মুখে খবর পেয়েই এই অভিযান। সতুবাবুদের পোড়ো ইটভাটার দিকে ঘুরপথে এগিয়ে চলেছেন ওঁরা।

জলের ট্যাংকের কাছে পৌঁছে কথামতো পুলিশভ্যান থামল। সশস্ত্র সেপাইরা আর অফিসাররা নিঃশব্দে ইটভাটার চারদিক ঘিরে ফেলতে এগিয়ে গেলেন অন্ধকারে। ঝোপে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে শিকারি বাঘের মতো ওরা পা বাড়ালেন।

জিপটা একটু তফাতে রেখে কর্নেল, শংকর আর অজিতেশ দ্রুত এগিয়ে চললেন ভাটার দিকে।

বিশাল পোড়োভাটায় খানাখন্দ, টিবি, আর চিমনির কথা আগেই বলা হয়েছে। পুরো এলাকা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। তার ওপর কুয়াশা।

ভাটায় ঢোকার জন্য সরু একফালি পথ আছে। সে-পথে ইতিমধ্যে ঘাস ও জঙ্গল গজিয়েছে। কিন্তু পথটায় খোয়া বিছানো থাকায় চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। কিছুটা এগিয়ে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন।

ফিসফিস করে বললেন—'এই ভাটার নিশ্চয় একটা অফিসঘর ছিল। সেটা কাছাকাছি থাকা উচিত।'

অজিতেশ বললেন—'হ্যাঁ। দিনে এখান দিয়ে যেতে চোখে পড়েছে বটে। মনে হচ্ছে সামনে ঢিবিমতো জায়গায় দরমার বেড়ার কয়েকটা ঘর আছে।'

শংকর বললেন—'টর্চ জ্বেলে দেখে নিলে হত।'

কর্নেল বললেন—'মাথা খারাপ? অন্ধকারেই এগুতে হবে। এ ব্যাপারে আমার অবশ্যি অসুবিধে হয় না। কেন না, বনেজঙ্গলে বহুবার রাতবিরেতে জন্তু জানোয়ারের ছবি তুলতে যাওয়ার অভ্যাস আছে আমার। তোমরা আমার পেছনে-পেছনে এস।'

এসব কথা ফিসফিস করেই বলাবলি করছিলেন তিনজনে। খানিকটা এগিয়ে অন্ধকারে আবছা একটা উঁচু জায়গা নজরে এল। খোয়াবসানো পথটা সোজা সেখানে উঠে গেছে। হ্যাঁ, ওই তো ভাটার সেই অফিসগুলো সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ তিনজনেই থমকে দাঁড়ালেন। একটা আলো জ্বলে উঠল কোথাও। হয়তো ওই ঘরের মধ্যেই দরমাবেড়ার দেয়ালের কোনও ফাটল দিয়েই আলোটা দেখা যাচ্ছে বুঝি।

পা টিপে টিপে তিনজনে আলোটা লক্ষ করে এগুতে থাকলেন। সেই সময় কী একটা জন্তু দৌড়ে পালিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে। শেয়াল-টেয়াল হেবে। দরমাবেড়ার ঘরগুলোর পেছনে ঘন ঝোপ গজিয়েছে। সেই ঝোপে ঢুকে একটা ফাটলে কর্নেল উঁকি মারতে যাচ্ছেন, এমন সময় ঘরের ভেতর চাপা গলায় কে কথা বলে উঠল—'লতিফ খাঁ! তোমায় এখনও সাবধান করে দিচ্ছি, পবিত্র ওই মণি তোমার পাপের হাতে ছোঁবার চেষ্টা কোরো না। সর্বনাশ হবে!'

কী অবাক! এ তো সেই পিরের মাজারের জাদুকর ফকিরের গলা!

দরমাবেড়ার দেয়ালের অবস্থা ঝাঁঝরা। এখন তিনজনে তিনটে ফাটলে চোখ রেখেছেন। ভেতরে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন।

কালো আলখাল্লাধারী ফকির দাঁড়িয়ে আছে মেঝেয়। তার সামনে উবু হয়ে বসে আছে হেকিম লতিফ খাঁ। তার চোখেমুখে একটা ক্রূর ভঙ্গি। তার হাতের কাছে সেই ঐতিহাসিক কালো পেটিকা বা ছোট্ট বাকসোটা রয়েছে।

আর তার চেয়েও সাংঘাতিক, পেটিকার পাশে আজিমুদ্দিনের মমি-মুণ্ডুটা রয়েছে।

হেকিমের হাতে একটা সুচের মতো সূক্ষ্ম মিহি জিনিস। সে ফকিরের কথার জবাবে অদ্ভুত ভঙ্গিতে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল। —'এ আমার বংশের সম্পদ। আমারই প্রাপ্য; ওসব ভয় আমায় দেখিও না। তাছাড়া তুমি তো বাপু সংসারত্যাগী ফকির, তোমার এসব বাজে ব্যাপারে নাক গলানোর দরকারটা কী? যাও! এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও! নৈলে তোমাকেও জবাই করে ফেলব!'

বলে লতিফ খাঁ বাঁ হাতে একটা মস্ত ছোরা বের করে উঁচিয়ে ধরল।

ফকির এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল—'আমি জানি তুমি তা পারবে। তুমি ছদ্মবেশী শয়তান! জায়গিরদার বংশের কলঙ্ক তুমি! কিন্তু এখনও সাবধান করে দিচ্ছি লতিফ খাঁ, ওই মণি স্বর্গের বস্তু। মিশরের সাধক আজমশাহ কঠোর সাধনায় ওই রত্ন আশীর্বাদ স্বরূপ পেয়েছিলেন এক দেবদূতের কাছে। দোহাই তোমার, যদি বাঁচতে চাও—পেটিকা খুলো না!'

লতিফ খাঁ বাঁকা হেসে বলল—'এটার মধ্যে নিছক একটা নীলকান্ত মণি আছে—পুরুষানুক্রমে আমরা শুনে আসছি। কিন্তু কেউ আজিমুদ্দিনের কবরের খোঁজ পায়নি বলেই মণিটা হাতাতে পারেনি! এতদিনে আমার পূর্বপুরুষের সম্পদ আমি হাতিয়েছি। তুমি...'

বাধা দিয়ে ফকির বলল—কিন্তু কবরের সন্ধান আমিই তোমায় দিয়েছিলুম লতিফ খাঁ! ওঃ! কী ভুলই না করেছিলুম!'

লতিফ খাঁ বলল—'কীসের ভুল? তুমি ঠিকই করেছিলে! কিন্তু মাঝখানে ব্যাটা কমলাক্ষ কী ভাবে টের পেয়ে বাগড়া দিয়েছিল। তাকে তো এবার পুলিশ ধরবেই! ইতিমধ্যে মণিটা নিয়ে আমি ইরানে পালিয়ে যাব। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও, বলো। হ্যাঁ—তোমাকে আমি এই মণিবেচার টাকার কিছু ভাগ দিতে রাজি আছি।'

ফকির বলল—'লতিফ খাঁ! বাচালতা কোরো না। আবার বলছি, তুমি ওই মমি-মুণ্ডু আর বাকসো কবরে রেখে এস গে। ওঠো, আমি তোমাকে সাহায্য করব। কবরের ওখানে পুলিশ সারাক্ষণ—পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তুমি তো জানো, আমি এরকম বিষাক্ত ধোঁয়া তৈরি করতে জানি। সেই ধোঁয়ার দাপটে পুলিশ দূরে সরে যাবে। সেই সুযোগে ঝটপট দুজনে কবরের মধ্যে এগুলো রেখে আসব।'

লতিফ খাঁ তেমনি বিদঘুটে খ্যাঁক খ্যাঁক হাসি হেসে হেসে বলল—'চুপ্! এই দেখো, তোমার সামনেই আমি পেটিকা খুলছি। আমার পূর্বপুরুষের ঐশ্বর্য দেখে চোখ দুটো সার্থক করো, ফকিরসায়েব।'

বলে সে সূচের মতো চাবিটা বাকসের একস্থানে চেপে ধরল। ফকির দু হাত তুলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল—'লতিফ খাঁ! সাবধান!'

কর্নেল, অজিতেশ ও শংকর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন। অবাক হয়ে এবার দেখলেন, কালো পেটিকার ওপরের অংশ আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছে। তার এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটতে থাকল।

পেটিকার ফাঁক দিয়ে অত্যুজ্জ্বল নীল আভা ঠিকরে বেরুতে লাগল। ঘরের ভেতর নীল তীব্র আলো পড়তে থাকল।

আবার ফকিরের চিৎকার শোনা গেল—'হুঁশিয়ার লতিফ খাঁ! পালিয়ে এস! পালিয়ে এস!'

তারপর ফকির এক লাফে বাইরে গিয়ে পড়ল। আর পেটিকার ওপরের অংশ খাড়া হয়ে ওঠার পর দেখা গেল, গোলাকার একটুকরো নীল উজ্জ্বল বস্তু রয়েছে ভেতরে এবং ঘরের ভেতরে সুতীব্র নীল আলোর ঝলকানি। লতিফ খাঁ দুচোখে আতঙ্ক ঠিকরে পড়ছে। সে স্থির হয়ে গেছে।

তারপর ঘটল এক বিস্ময়কর ঘটনা। নীল মণিটা একটু করে শূন্যে ভেসে উঠতে থাকল। কিন্তু লতিফ খাঁ তেমনি স্থির। যেন নীলরঙের একটা মমি হয়ে গেছে সে।

নীল মণিটা এবার শূন্যে ভেসে দরজার দিকে চলল। বাইরে ফকিরের চিৎকার শোনা গেল ফের—'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!'

কর্নেল, অজিতেশ আর শংকর একলাফে ঘরের সামনের দিকটায় চলে গেলেন। তারপর দেখলেন, নীলবর্ণ উজ্জ্বল সেই মণি নক্ষত্রের মতো ভেসে চলেছে ভাটার ওপর। সারা এলাকা তীব্র নীল বৈদ্যুতিক আলোয় ভরে গেছে।

তারপর হঠাৎ মণির গতিবেগ বাড়ল। হু হু করে আকাশে উঠে পড়ল। তারপর প্রচণ্ড বেগে নক্ষত্রের দিকে উড়ে চলল। দেখতে দেখতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সেটা আকাশের নক্ষত্রলোকে মিলিয়ে গেল। আবার অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক।

তিনজনে হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এবার কর্নেল বলে উঠলেন— 'লতিফ খাঁর সাড়া নেই কেন?' বলে টর্চ জ্বেলে ঘরের ভেতর আলো ফেললেন।

লতিফ খাঁ তেমনি হাঁটু দুমড়ে স্থির হয়ে বসে আছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন—'লতিফ খাঁ! লতিফ খাঁ!' তাঁর দুপাশে শংকর ও অজিতেশ এসে দাঁড়ালেন।

পেছন থেকে ফকিরের গলা শোনা গেল—'লতিফ খাঁ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কর্নেল সায়েব!'

ফকির দৌড়ে এসে তার লম্বা চিমটেটা লতিফ খাঁয়ের গায়ে ঠেকাতেই সবাই স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন গুঁড়ো গুঁড়ো একরাশ জমাট ছাই ছাড়া ওই দেহটা আর কিছুই নয়। ফকির কালো পেটিকা আর মমি-মুণ্ডটা দু হাতে তুলে নিয়ে বলল—'আর কী? চলুন সবাই এগুলোকে আজিমুদ্দিনের কবরে রেখে আসি।'...

দরমাবেড়ার ঘরের মধ্যে লোভী লতিফ খাঁয়ের ভস্মীভূত মৃতদেহ পড়ে রইল। ওঁরা সবাই ভাটা থেকে রাস্তায় গিয়ে পৌঁছলেন।

অজিতেশ এবার হুইসল বাজিয়ে পুলিশ বাহিনীকে ফেরার সংকেত দিলেন। ভাটার চারদিক ঝোপের আড়ালে বসে সেই বিস্ময়কর দৃশ্য সবাই দেখেছে! এবার নিঃশব্দে একে একে ফিরে আসছিল।

এবার জিপ ও ভ্যান এগিয়ে চলল স্টেশনের ওধারে সেই পোড়ো জমিতে বটতলার দিকে—যেখানে বালক আজিমুদ্দিনের কবর আছে। ফকির জিপের সামনে কর্নেলের পাশে বসে আছে। তার কোলের ওপর মমি-মুণ্ড আর কালো পেটিকা।

যেতে-যেতে কর্নেল একবার শুধু বলে উঠলেন—'এই বিরাট পৃথিবীতে এখনও কত রহস্য রয়েছে, বিজ্ঞান তার সীমানায় যেতে পারেনি। তবে যাই বলি না কেন, এত রহস্য আছে বলেই জীবনটা এত লোভনীয় এবং বরণীয়।

ফকির অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে কী মন্ত্রপাঠ করতে থাকল। আর কেউ কোনও কথা বললেন না।....

তখন ন্যাড়া মায়ের পাশে শুয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে সে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখছিল।

আকাশ থেকে একটা নীলরঙের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল। স্টেশনের ওপাশের মাঠে দাঁড়িয়ে আছে সে। দৌড়ে যেই নক্ষত্রটা কুড়োতে গেছে, অমনি ফের সেটা উড়ে চলেছে। দুঃখিত মনে ন্যাড়া দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীল নক্ষত্রটা আকাশে ভেসে গিয়ে একস্থানে আটকে যেতেই ন্যাড়া ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

সুনন্দা ডাকছিলেন—'ন্যাড়া! ও নেড়ু! কাঁদছিস কেন? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি!'

ন্যাড়া জেগে উঠেছে! জবাব না দিয়ে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে দিল। আজ রাতে শীতটাও বড্ড পড়েছে। কুঁকড়ে আরামে শুয়ে রইল। কিন্তু স্বপ্নটা তার মন খারাপ করে দিয়েছে।

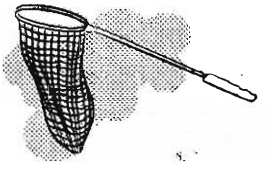

কোদণ্ডের টঙ্কার

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘরসদৃশ বিশাল ড্রয়িংরুমে ইদানীং রবিবারের আড্ডাটা দারুণ জমজমাট হয়ে ওঠে। পুলিশের গোয়েন্দা ও অপরাধ দফতরের হোমরাচোমরা লোকেরা তো আসেনই, কর্নেলের মতো রিটায়ার-করা সামরিক অফিসাররাও কেউ কেউ এসে জোটেন। নিজের-নিজের লাইনে সবাই তাঁরা অভিজ্ঞ লোক এবং রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা কারুর কম নেই। কাজেই প্রত্যেকেরই যেন চেষ্টা থাকে, কে কত সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা বলে অন্যদের টিট করতে পারবেন।

এ রবিবারে কথার সূত্রপাত সম্প্রতি গঙ্গাসাগর মেলায় সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী এক স্মাগলারকে গ্রেফতার নিয়ে। ডিটেকটিভ দফতরের রণবীর মণ্ডল ঘটনার রোমাঞ্চকর জায়গায় সবে পৌঁছেছেন, ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বেমক্কা বলে উঠলেন, 'ওয়েট, ওয়েট। এভাবে বাধা দেওয়ার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু মণ্ডলসায়েব তো ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কথা বলছেন। নেপাল বর্ডারে আমি সীমান্ত বাহিনীতে থাকার সময় এক সত্যিকার সন্ন্যাসীকে স্মাগলিংয়ের কারবারে জড়িত থাকার জন্য পাকড়াও করেছিলুম।'

ক্রাইম ব্রাঞ্চের মণি চ্যাটার্জি মুচকি হেসে বললেন, 'সত্যিকার সন্ন্যাসী? সাধু-সন্ন্যাসী-ফকির এঁরা তো মশাই সংসারত্যাগী পুরুষ! এঁরা স্মাগলিং করতে যাবেন কোন্ দুঃখে?'

ব্রিগেডিয়ার ইকবাল সিং বললেন, 'তা বলতে পারব না। যা দেখেছি, তাই বলছি। সন্ন্যাসীর বোঁচকার ভেতর পাওয়া গিয়েছিল একগাদা কোকেন, মারিজুয়ানা, এলএসডি, কয়েকরকম নার্কোটিক্স।'

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের রঘুবীর শর্মা তাঁকে সমর্থন করে বললেন, 'চ্যাটার্জিসায়েব! সত্যি বলতে কী, সাধু বলুন, সন্ন্যাসী বলুন, ফকির বলুন, কেউ সংসারত্যাগী নন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কেন নন?'

শর্মা হাসলেন। 'মশাই, কোনও মানুষের পক্ষে কি সত্যিই সংসার ত্যাগ করা সম্ভব? একটু ভেবে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝবেন। ওঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত সংসার ত্যাগ করেছেন, তার মানে পরিবার বা আত্মীয়স্বজনকে ছেড়েছেন। কিন্তু তার বদলে অন্যান্য মানুষকে নিয়েই তাঁদের চলতে হয়। আমাদের মতোই তাঁদের ট্রেনে-বাসে চাপতে হয়।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়ি চুলকে মন্তব্য করলেন, 'প্লেনেও।'

'হ্যাঁ, প্লেনেও,' শর্মা জোর দিয়ে বললেন। 'তাছাড়া তাঁদের পেটে খেতেও হয়। না খেলে তো বাঁচা যায় না।'

মণ্ডল বললেন, 'শুনেছি, কোনও-কোনও সাধু নাকি স্রেফ বাতাস খেয়ে থাকেন।'

কর্নেল এক কোণায় বসে আপনমনে আতশকাচ দিয়ে এক টুকরো হাড়ের মতো দেখখে কী একটা জিনিস পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে ফোড়ন কাটালেন, 'সাপকে বায়ুভুক বলা হত প্রাচীনকালে। কথাটা ভুল।'

'ভুল তো বটেই,' শর্মা দাপটের সঙ্গে বললেন। 'শুধু বাতাস খেয়ে কোনও প্রাণীর পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। কাজেই যা বলছিলুম, নিছক খাদ্যের জন্যও সাধু-সন্ন্যাসী-ফকিরদের সংসারের নাগালে থাকতেই হয়।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'কী বলছেন! হিমালয়ের দুর্গম স্থানে কত সাধু থাকেন।'

ইকবাল সিং হাসতে-হাসতে বললেন, 'আপনার কথায় লজিক নেই। যদি দুর্গম স্থানে সত্যি কেউ থাকেন, তাঁকে দেখল কে? তাছাড়া হিমালয় বাস্তবিক তত দুর্গম নয়। প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষের পা তার সবখানেই পড়েছে। আমি দেখেছি, হিমালয়ে যত সাধু থাকেন, সকলের ডেরা কোনও-না-কোনও তীর্থে অথবা তীর্থপথের ধারে। তীর্থপথের আনাচে-কানাচেও কাউকে থাকতে দেখেছি। শর্মাসায়েব ঠিকই বলেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসারত্যাগী বলা হয় বটে, কিন্তু সংসারী মানুষদের ছাড়া তাঁদের চলে না। অবশ্য বলতে পারেন, ছোট সংসার ছেড়ে বড় সংসারে ঢোকেন তাঁরা।'

মণ্ডল বললেন, 'তা না হয় মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সাধুদের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে আপনার কী বক্তব্য?'

'মানুষের সমস্ত ক্ষমতা লৌকিক,' শর্মা বললেন, 'সাধুরা কেউ কেউ ম্যাজিক দেখান আসলে।'

ইকবাল সিং তাঁকে সমর্থন করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি বলে উঠলেন, 'ম্যাজিক কী বলছেন মশাই! কোনারকের ওখানে এক সাধুকে এক হাত উঁচুতে, স্রেফ শূন্যে বসে ধ্যানস্থ দেখেছি।'

শর্মা এবং সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। মণ্ডল বললেন, 'বলেন কী! হঠযোগীরা এমন করেন শুনেছি।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'নিজের চোখকে তো মশাই অবিশ্বাস করতে পারব না, সে আপনারা যাই বলুন। সমুদ্রের ধারে পরিষ্কার জ্যোৎস্না ছিল। সাধুবাবা মিনিট-দুয়েক ওইভাবে শূন্যে থাকার পর মাটিতে নামলেন।'

একটু তফাতে আমার পাশে বসে ছিলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার। কে কে হালদার নামে ইদানীং পরিচিত। ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। পেল্লায় গোঁফ। পুলিশের সিআই ছিলেন মফস্বলে। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন গণেশ অ্যাভেনিউতে, তিনতলা একটা বাড়ির ছাদে অ্যাসবেস্টসের চাল চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। রাস্তা থেকে সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ে : হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি। তলায় ইংরেজিতে লেখা : রহস্যের ধাঁধায় পড়লে, চলে আসুন।

হালদারমশাই আজ কর্নেলের আড্ডায় কেন এসেছেন জানি না। কর্নেলের কাছে বোধ করি কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতেই এসে থাকবেন। হোমরা-চোমরাদের কথার মধ্যে এতক্ষণ নাক গলাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না হয়তো। কিছুক্ষণ থেকে ওঁকে উসখুস করতে এবং ঘন ঘন নস্যি নিতে দেখছিলুম। বাথরুমে বারবার হাঁচতে যাচ্ছিলেন, সে অবশ্য হলফ করে বলতে পারি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন স্যার—'

ব্রিগেডিয়ার সিং বললেন, 'না, না। বলুন কী বলতে চান।'

হালদারমশাই বললেন, 'চ্যাটার্জিসায়েব তো শূন্যে সাধুবাবাকে ধ্যান করতে দেখেছেন। আমি সম্প্রতি কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে গিয়েছিলুম বেড়াতে। সেখানে আমার এক ভাগ্নে ফরেস্ট অফিসার। খুব তেজি আর সাহসী—'

শর্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আহা! কী দেখেছেন, তাই বলুন।'

হালদারমশাই মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, 'স্বচক্ষে দেখে এলুম স্যার, এক সাধুবাবা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন, আবার দৃশ্য হচ্ছেন। এক্ষুনি অদৃশ্য হচ্ছেন, আর তক্ষুনি দৃশ্য হচ্ছেন। এই অশরীরী, এই শরীরী। একবার দেখছি নেই, একবার দেখছি আছেন।'

বলার ভঙ্গিতেই ঘরে অট্টহাসির ঘুম পড়ে গেল। তারপর শর্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আপনাকে চেনা-চেনা লাগছে যেন? আপনি?'

'অধমের নাম কে কে হালদার,' হালদারমশাই কাঁচুমাচু মুখে বললেন। 'তবে চিনবেন বইকী স্যার! আপনিই তো আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্সের দরখাস্তে কাউন্টারসাইন করেছিলেন। নইলে লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত।'

শর্মা হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই বলুন! আপনিই সেই গোয়েন্দা হালদার? বুঝেছি। এবার এইসব গুলতাপ্পি ঝেড়ে মক্কেলের সংখ্যা বৃদ্ধির মতলব করেছেন বুঝি?'

বিব্রত হালদারমশাই জিভ কেটে বললেন, 'ছি, ছি! এ কী বলছেন স্যার! এই জয়ন্তবাবুকে জিজ্ঞেস করুন, ওঁদের দৈনিক সত্যসেবকে এ-খবর বেরিয়েছে কি না।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে।'

শর্মা আমার দিকে চোখের ঝিলিক তুলে বললেন, 'বাঃ! তাহলে জয়ন্তকে ম্যানেজ করে ফেলেছেন! সত্যি, আপনার কোনও তুলনা হয় না হালদারমশাই!'

আমি ঝটপট বললুম, 'কখনও না। খবরটা নিউজ এজেন্সি থেকে পাওয়া। তাছাড়া হালদারমশাইও ব্যাপারটা যে দেখে এসেছেন, এ আমি এইমাত্র শুনছি।'

ব্রিগেডিয়ার সিং দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'নিউজ এজেন্সির যে রিপোর্টার এই খবর জোগাড় করেছে, তার সঙ্গে হালদারমশাইয়ের যোগাযোগ ঘটেছিল কি না আমরা অবশ্য জানি না।'

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, চ্যাটার্জি ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেলেন। 'মাই গুডনেস! সাড়ে দশটা বাজে। করছি কী আমি? সিপি-র সঙ্গে জরুরি কনফারেন্স! মিঃ শর্মা, মিঃ মণ্ডল, কী ব্যাপার? আপনাদের তাড়া দেখছি না যে!'

দু'জনেই 'তাই তো' বলে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিন পুলিশ-জাঁদরেল কর্নেলের উদ্দেশে 'বাই' হেঁকে বেরিয়ে গেলেন। ব্রিগেডিয়ার সিংও হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। তিনিও কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

ষষ্ঠী ডাইনিং ঘরের দরজায় পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছিল। বলল, 'যা বাব্বা! আবার যে কোফি করলুম একগাদা। খাবে কে এত?'

কর্নেল হাড়ের মতো জিনিসটা আর আতশকাচ রেখে বললেন, 'কোফি করেছিস?'

'আজ্ঞে বাবামশাই।'

কর্নেল হালদারমশায়ের উদ্দেশে বললেন, 'কী হালদারমশাই, সাধুকে তো অদৃশ্য হতে দেখেছেন। কিন্তু কখনও কোফি খেয়েছেন কি? এ বস্তু একমাত্র ষষ্ঠীই বানাতে পারে।'

ষষ্ঠী ট্রে নিয়ে আসছিল। জিভ কেটে বলল, 'কঁফি! কঁফি!'

'ঠিক আছে। কঁফিই খাওয়া যাক।' কর্নেল উঠে আমাদের কাছে এসে বসলেন।

কর্নেলের এ পরিহাসে মন নেই হালদারমশাইয়ের। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কীরকম অপমানিত হলুম দেখুন কর্নেল! আপনার মতো বহুদর্শী জ্ঞানী লোক আমার কথাটা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। আর এই সব পুঁচকে ছোকরা অফিসার—আমার ছেলের বয়সী সব!'

'দুঃখ করবেন না হালদারমশাই,' কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললেন। তারপর নিজের হাতে কফি ঢেলে প্রচুর দুধ মিশিয়ে পেয়ালা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে। 'বাস্তব কিছু-কিছু ঘটনা অনেককে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। জানেন তো, ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন?

বললুম, 'কোদণ্ডগিরির সাধুর ব্যাপারটা আপনি বাস্তব ঘটনা বলছেন নাকি?'

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হালদারমশাই সড়াক শব্দে গরম কফি টেনে ব্যস্তভাবে গিলতে গিলতে বললেন, 'বাস্তব মানে? স্বচক্ষে দেখে এসেছি আমি। মাত্র একটা ঝরনার এধার-ওধার। ওধারে পাথরের উপর সাধুবাবা, এধারে পাথরের আড়ালে আমি।'

'দিনে, না রাত্তিরে?'

'রাত্তিরে। তবে জ্যোৎস্না ছিল। পরিষ্কার ঝলমলে আলো। তাছাড়া শুধু ওখানে নয়, পরে ট্রেনেও।'

ফোন বাজলে ওঁর কথায় বাধা পড়ল। কর্নেল হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, 'কে? কে কে হালদার? হুঁ, আছেন। ধরুন, দিচ্ছি।'

হালদারমশাই খপ করে ফোন কেড়ে নিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'দুলাল নাকি?...কী? পালিয়ে গেছে? হতভাগা বাঁদর ছেলে! তোকে পইপই করে বলা আছে...না, না। কোনও কথা শুনতে চাইনে তোর। যেমন করে পারিস, খুঁজে ধরে নিয়ে আয়। নইলে...হ্যাঁ, হ্যাঁ। আশেপাশে....কাছাকাছি...যত্ত সব!'

শব্দ করে ফোন রেখে হালদারমশাই গোঁজ হয়ে বসলেন কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন, 'পাখি নাকি?'

'হুঁঃ!'

'কথা-বলা পাখি?'

'হুঁঃ!'

বুঝতে পারছিলুম, হালদারমশাই রেগে আগুন হয়ে আছেন এবং আনমনে হুঁঃ দিচ্ছেন শুধু। এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কথা-বলা পাখিটা কি কোদণ্ডগিরির জঙ্গল থেকে এনেছিলেন হালদারমশাই?'

কৃতান্ত হালদার তড়াক করে ঘুরে বললেন, 'আরে, ওটার ব্যাপারেই তো আসা আপনার কাছে। এখন দেখুন তো কী করি! আমার ভাগ্নে দুলালকে নজর রাখতে বলে এসেছিলুম। পর-পর দু'রাত্তির বাড়িতে চোর আসছে। অদ্ভুত ব্যাপার, চোর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে শিস দেয়। তখন পাখিটাও শিস দেয়। বড় রহস্যময় ব্যাপার নয়, কর্নেল?'

'রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে। তা পাখিটা পালাল কীভাবে?'

'দুলাল বলল, বাইরে কে ডাকছিল। গিয়ে দ্যাখে, কেউ না। তারপর ফিরে এসে দ্যাখে, বারান্দার খাঁচা খোলা। অথচ দেখুন, বারান্দায় গ্রিল আছে।'

'বাড়িতে আর কোনও লোক নেই?'

'আজ্ঞে না।' হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে অনেকটা নস্যি নাকে গুঁজে হাঁ করে রইলেন। কিন্তু হাঁচি এল না।

কর্নেল বললেন, 'পাখিটা কি কাকাতুয়া, না ময়না?'

'ময়না', হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন। 'ওটার ব্যাপারেই আপনার সঙ্গে কনসাল্ট করতে আসা কর্নেলস্যার! আপনি ঠিকই ধরেছেন। কোদণ্ডগিরির জঙ্গলে একটা আদিবাসী ছেলে ফাঁদ পেতে পাখিটা ধরেছিল। কথা বলতে পারে দেখে কিনে নিয়েছিলুম।'

'তাহলে নিশ্চয় কারুর পোষা পাখি। উড়ে গিয়ে জঙ্গলে বেড়াচ্ছিল।'

'ঠিক বলেছেন। কিন্তু সেটা কোনও রহস্য নয়। রহস্য হল পাখিটার বুলি। প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম, বলছে : মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম। গঙ্গারাম কেন গঙ্গারামকে কিল করবে, এটা একটা রহস্য নয় স্যার?'

'অবশ্যই।' কর্নেল পর্যায়ক্রমে টাক এবং সাদা দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে থাকলেন।

বুঝলুম, রহস্যটা মনে ধরেছে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর। তাতে আরও একটু জোগান দেওয়ার ইচ্ছেয় বললুম, 'রাত্তিরে চোর এসে শিস দিচ্ছিল বললেন হালদারমশাই!'

হালদারমশাই বললেন, 'আর পাখিটাও পালটা শিস দিচ্ছিল! মজাটা বুঝুন একবার।'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'সুতরাং রহস্য ঘনীভূত হল বলা যায়।'

আমি বললুম, 'হালদারমশাই, এর সঙ্গে সেই অদৃশ্য হতে পারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধুর ব্যাপারটার কোনও যোগাযোগ নেই তো?'

হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'আছে বলেই তো কর্নেলস্যারের কাছে আসা। ট্রেনে পাখিটাকে লুকিয়ে আনছিলুম। নইলে রেলবাবুরা আপত্তি করতেন। তো মাঝরাত্তিরে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, এক সাধু আমার বাংকের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারছে। তড়াক করে উঠে বসেছি। আর অবাক কাণ্ড, সাধু অদৃশ্য। বেমালুম হাওয়া।'

কর্নেল বললেন, 'আশা করি, স্বপ্ন দেখছিলেন না?'

'কখনও না। ট্রেন জার্নিতে আদপে আমার ঘুম হয় না।'

আবার ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়েই কৃতান্ত হালদারকে দিলেন। হালদারমশাই আগের মতো চড়া গলায় বললেন, 'দুলাল?...কী? লোম? সাদা লোম? বলিস কী?...যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি।'

ফোন ছেড়ে উত্তেজিতভাবে হালদারমশাই বললেন, 'কর্নেল, এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন দয়া করে। খাঁচায় আর বারান্দা জুড়ে একগাদা সাদা লোম দেখতে পেয়েছে দুলাল। কী সাংঘাতিক রহস্য বুঝুন।'

দুই

'এই লোমরহস্য আমার তত সাংঘাতিক মনে হচ্ছে না হালদারমশাই', কর্নেল সাদা লোমগুলো পরীক্ষা করতে করতে বললেন। 'এগুলো নিছক বাঁদরের লোম। তবে সাধারণ বাঁদর নয়, খুদে বাঁদর। স্কুইরেল মাংকি বলে যাদের।'

কৃতান্ত হালদার অবাক হয়ে বললেন, 'স্কুইরেল মানে তো কাঠবেড়ালি।'

'হ্যাঁ। কাঠবেড়ালির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে বটে। বাঁদরটা দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা। দিব্যি পকেটে রাখা যায়।'

'কিন্তু এখানে কোত্থেকে এল অমন উদ্ভুট্টে জীব? কিছু যে বোঝা যাচ্ছে না স্যার!'

কর্নেল গ্রিল-দেওয়া বারান্দায় একটু ঘোরাঘুরি করে এদিকে-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'পাখিটার কিছু পালক পড়ে আছে দেখেও বুঝতে পারছেন না?'

'আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, কর্নেল!' বারান্দায় একটা চেয়ারে হতাশভাবে বসে পড়লেন হালদারমশাই। 'ডাক্তার পরের রোগ ধরে চিকিৎসা করেন! কিন্তু নিজের রোগ হলে অন্য ডাক্তার ডাকেন। কেন ডাকেন, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছি। উরেব্বাস! বিস্তর রহস্য ঘেঁটেছি, এবার আমাকেই রহস্য-রোগ এসে জাপটে ধরেছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'স্কুইরেল মাংকির লোম আর ময়নাপাখির পালক পড়ে থাকাটা মুল রহস্যরোগ নয়, হালদারমশাই! নেহাত উপসর্গ।'

কখন থেকে মুখ খোলার জন্য উসখুস করছিলুম। এবার বললুম, 'ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি মনে হচ্ছে।'

কর্নেল বললেন, 'বলো ডার্লিং!'

'কেউ একটা ট্রেন্ড খুদে বাঁদর পাঠিয়ে পাখিটা খাঁচা থেকে হাতিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা করে বাইরের দরজায় কলিং বেল টিপেছে। দুলাল দেখতে গেছে কে ডাকছে, আর এদিকে তার বাঁদর গ্রিলের ভেতর দিকে ঢুকে খাঁচা খুলে পাখিটা ধরেছে। পাখি আর বাঁদরে একটু ধস্তাধস্তি হওয়া স্বাভাবিক। তাই এসব লোম আর পালক।'

কৃতান্ত হালদার লাফিয়ে এসে আমাকে জাড়িয়ে ধরলেন। 'শাবাশ জয়ন্তবাবু! শাবাশ! দেখছেন? এই সামান্য ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না।'

কর্নেল ততক্ষণে বাইরে চলে গেছেন। বাড়িটা একতলা এবং পুরনো পূর্ব শহরতলি এলাকার

নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত। আশেপাশে পোড়ো জঙ্গলে জমি, একটা পুকুর আর প্রচুর গাছপালাও রয়েছে। কিছু নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে এখানে-ওখানে। তার ওপরে একটা বিস্তীর্ণ মুসলিম গোরস্থান। এমন জায়গায় শুধু চোর কেন, ভূতপেরেতদেরও দিনদুপুরে হানা দেওয়া স্বাভাবিক।

হালদারমশাইয়ের ভাগ্নে শ্রীমান দুলালের বয়স পনেরো-ষোলোর বেশি নয়। সবে স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। এখনও রেজাল্ট বেরোয়নি। মামার মতোই লম্বাটে ছিপছিপে গড়ন। মুখচোরা ছেলে বলে মনে হচ্ছিল। এই কাণ্ডের পর বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে খালি। আমার কথা শোনার পর সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাইরের দরজা খুলে কাউকে দেখতে না পেয়ে যখন রাস্তা দেখছি, পাখিটার চ্যাঁচামেচি কানে এসেছিল যেন। এতক্ষণে মনে পড়ল।'

ভাগ্নেকে ভেংচি কেটে হালদারমশাই বললেন, 'অ্যাঁতক্ষণে মনে পড়ল! স্কুলে তুই স্ট্যান্ড করিস না হাতি করিস! মুখস্থ বিদ্যের শিরোমণি! রিয়্যাল লাইফে তুই স্ট্যান্ড করতে পারবি ভেবেছিস? সে-গুড়ে বালি।'

দুলালকে কাছে টেনে নিয়ে বললুম, 'আহা! মিছিমিছি ওকে বকবেন না হালদারমশাই! আপনি বাড়িতে একা থাকলেও একই ব্যাপার ঘটত না কি?

বুঝতে পেরে হালদারমশাই ধাতস্থ হলেন। গোঁফ চুলকে বললেন, 'কিন্তু মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড বাই গঙ্গারাম। ব্যাপারটা কী বলুন তো? পাখিটা এমন উদ্ভুট্টে কথা শিখল কী করে? ধরে নিচ্ছি, কেউ শিখিয়েছে। কিন্তু গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করে কীভাবে? সুইসাইড মনে হয় না আপনার?'

বললুম, 'হ্যাঁ, সুইসাইড ধরে নিলে একটা অর্থ দাঁড়ায়।'

কর্নেল বাইরে থেকে ঘুরে এসে বললেন, 'এখানে আর কোনও সূত্র মিলবে না, হালদারমশাই! কোদণ্ডগিরিতে গেলে কিছু সূত্র মিলতেও পারে। পাখিটা যখন সেখানেই পেয়েছিলেন!'

হালদারমশাই বললেন, 'তা না হয় যাওয়া গেল। কিন্তু গঙ্গারাম ইজ কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা, তাতে জয়ন্তবাবু আর আমি একমত হয়েছি কর্নেল স্যার!'

কর্নেল আনমনে বললেন, 'পাখির কথা ঠিকমতো বুঝতেও ভুল হতে পারে। আমি একবার শুনতে পেলে হয়তো বুঝতে পারতুম, ঠিক কী বলছে।'

দুলাল নড়ে উঠল। 'আমি টেপ করে রেখেছি। শুনবেন?' বলে দৌড়ে সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর একটা টেপরেকর্ডার নিয়ে এল।

কৃতান্ত হালদার খি-খি করে হেসে বললেন, 'ওর জন্মদিনে আমার ছোটবোন—মানে ওর মাসি প্রেজেন্ট করেছে। দেখছেন কাণ্ড? পাখির কথা টেপ করে বসে আছে।'

টেপ চালিয়ে দিল দুলাল। প্রথমে কিছুক্ষণ কাক আর চড়ুইদের ডাক শোনা গেল। তারপর শোনা গেল দুলালের গলা। 'নাও বিগিন মিঃ ব্ল্যাকি! বিগিন!....ও নো নো! প্লিজ মিঃ ব্ল্যাকি!' তারপর শিসের শব্দ। ময়নাপাখির গায়ের রং কালো। ঠোঁট টুকটুকে হলুদ। দুলাল ওকে মিঃ ব্ল্যাকি নাম দিয়েছিল তাহলে। একটু পরেই ব্ল্যাকির কথা শোনা গেল : 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম।' একবার নয়। বার পাঁচ-ছয় একই কথা।

কর্নেল বললেন, 'আরেকবার টেপটা চালাও তো দুলাল।'

দুলাল টেপটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে নিল রিভার্স বোতাম টিপে। তারপর প্লে বোতামটা টিপল। আবার সেইসব শব্দ। দুলালের কথা। তারপর পাখির গলা।

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। দুলাল টেপ বন্ধ করে বলল, 'আবার চালাব কর্নেলদাদু?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'না। হালদারমশাই, আপনি ভুল শুনেছেন।'

'ভুল?' হালদারমশাই বললেন। 'সে কী! গঙ্গারামই তো বলল। তাই না জয়ন্তবাবু?'

সায় দিয়ে বললুম, 'তাই তো মনে হল।'

কর্নেল বললেন, 'পাখিটা বলছে, মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্‌ বাই বংকারাম।'

'বংকারাম! এমন নাম আবার হয় নাকি? গঙ্গারাম নাম শুনেছি বটে।'

'হয় ডার্লিং!' কর্নেল একটু হাসলেন। 'কোদণ্ডগিরি তো ওড়িশায়। ওড়িশায় বংকাবিহারী, বংকারাম এসব নাম খুব কমন।'

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন, 'তাহলে তো আর দেরি করা উচিত নয়, স্যার! এখনই কোদণ্ডগিরি রওনা দিতে হয়।'

একটু পরে হালদারমশাইয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম আমরা। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। আমার সাদা ফিয়াট গাড়িটা আস্তেসুস্থে চালিয়ে আনছিলুম। দু'দিন থেকে গণ্ডগোল করছে গাড়িটা। যখন-তখন অদ্ভুত শব্দ করতে করতে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একটু ঠেলে দিলে আবার স্টার্ট নিচ্ছে অবশ্য। ওবেলা গ্যারেজে না দিলেই নয়।

আজ হালদারমশাইয়ের বাড়ি আসার সময় কোনও গণ্ডগোল করেনি। কিন্তু ফেরার পথে সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে পৌঁছেই ঘড়ঘড় করতে করতে থেমে গেল। একটু হেসে বললুম, 'কর্নেল। ঠেলতে হবে।'

কর্নেল গুম হয়ে বসে ছিলেন। চোখ বন্ধ এবং দাড়িতে আঙুলের চিরুনি। বুঝতে পারছিলুম, গোয়েন্দাপ্রবর গঙ্গারাম বনাম বংকারাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। আমার কথায় চোখ খুলে বেজায় চমকানো গলায় বললেন, 'কী বললে?'

'ঠেলতে হবে।' বলে দরজা খুলে সবে নেমেছি, অবাক হয়ে দেখলুম কর্নেলও হন্তদন্ত নামলেন বটে, কিন্তু নেমেই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হঠাৎ দৌড়তে শুরু করেছেন। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর দেখি উনি সামনের বাসস্টপে সদ্য-এসে-দাঁড়ানো একটা বাসের পাদানিতে উঠে পড়লেন। তারপর বাসটা ছেড়ে গেল।

এতকাল ধরে ওঁর বিস্তর উদ্ভুটে আচরণ দেখে আসছি। কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। রাগ করার মানে হয় না, বিশেষ করে এমন একটা ক্ষেত্রে। ফুটপাথের বাসিন্দা একদঙ্গল ছেলে আমার অবস্থা দেখে দৌড়ে এল। তাদের কিছু বলতে হল না। তারা গাড়িটা ঠেলতে শুরু করল। গাড়ি স্টার্ট নিলে তাদের বখশিশ দিয়ে নিজের ডেরায় ফিরে চললুম।

ছুটির দিন আজ। কাগজের আপিসে যাওয়ার তাড়া নেই। খেয়েদেয়ে অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিয়ে যখন উঠে পড়লুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। মার্চের মাঝামাঝি বেশ গরম পড়েছে। লোডশেডিং না হয়ে গেলে ছ'টা অব্দি বিছানায় পড়ে থাকতুম।

ব্যালকনিতে বসে তারিয়ে-তারিয়ে চা খাচ্ছি, আমার রাঁধুনি-কাম-কাজের ছেলে ফটিক এসে বলল, 'সেই দাড়িওলা সায়েব এসেছেন দাদাবাবু!'

তারপর কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম 'ডার্লিং, আশা করি এ বুড়োর ওপর থেকে রাগটা এতক্ষণে পড়ে গেছে। হুঁ, মুখের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছি, প্রিয় ভাতঘুমখানা চমৎকারই হয়েছে। রাগের পক্ষে নিরেট একখানা ঘুমই যথেষ্ট। যাই হোক, ঝটপট তৈরি হয়ে নাও। কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস ট্রেন সওয়া ছ'টায় ছাড়বে হাওড়া থেকে। ভাগ্যিস মিঃ রাঘবনকে ফোনে পেয়েছিলুম। আস্ত একখানা ক্যুপের ব্যবস্থা করা গেছে।' কর্নেল আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো! হালদারমশাই এতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছে হাপিত্যেশ করছেন আমাদের জন্য।'

কিছুক্ষণ পরে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে ভাবলুম, তখন অমন করে হঠাৎ আমাকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইব। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর তখনকার মতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের

চিরুনি চালাচ্ছেন এবং বলা যায় না, তখনকার মতোই যদি হঠাৎ 'রোখ্‌কে' বলে ট্যাক্সি থামিয়ে আবার বেমক্কা অদৃশ্য হয়ে যান। ওঁকে বিশ্বাস নেই। অতএব চেপে গেলুম।

দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে কৃতান্ত হালদার দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন, 'পাখি বাঁদর সাধু! সব একত্র, সব!'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একবার শরীরী, একবার অশরীরী? এই আছে, এই নেই!'

হাত প্রচণ্ড নেড়ে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, 'আপন্ গড। একটু আগে এক সাধু আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকাতে তাকাতে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। তার কাঁধের ঝোলায় স্পষ্ট দেখলুম একটুকু একটা বাঁদরের মুণ্ডু উঁকি মেরে আছে।'

বললুম, 'আর পাখি?'

কর্নেলের পিছন-পিছন হালদারমশাই প্ল্যাটফর্মে ঢুকে তেমনি ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পাখিটা নির্ঘাত ঝোলার ভিতর আছে। এটা অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন না? সাধু আর বাঁদর যেখানে, পাখি সেখানে থাকতে বাধ্য। আর জানেন? সাধু একা নয়, তার সঙ্গে একজন চেলাও আছে দেখলুম।'

কোদণ্ডগিরি এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে ছিল প্ল্যাটফর্মে। আমাদের ক্যুপেটা পিছনে গার্ডের কামরার লাগোয়া। সামনে একটা গুডস কম্পার্টমেন্ট। ছোট্ট ক্যুপে মাত্র তিনটে বাংক। জিনিসপত্র রেখে আমি ও কর্নেল বসে পড়লুম। হালদারমশাই সাধুবাবাকে খুঁজতে গেলেন। গাড়ি ছাড়ার এখনও মিনিট-দশেক দেরি আছে। ভাবলুম, ট্রেন ছাড়লে তবে কর্নেলের অমন করে ছুটে গিয়ে বাসে ওঠার ব্যাপারটা তুলব। কর্নেল আর যাই করুন চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেবেন না নিশ্চয়।

কর্নেল চুরুটের বাক্স বের করে পছন্দসই একটা চুরুট বেছে নিলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে চুরুটটা ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে হঠাৎ বললেন, 'ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের কথা তোমার মনে থাকা উচিত, ডার্লিং।'

একটু অবাক হয়ে বললুম, 'খুব মনে আছে। ফরেনসিক এক্সপার্ট সেই ওড়িয়া ভদ্রলোক তো?'

'শুধু ফরেনসিক এক্সপার্ট নন উনি, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও ওঁর অগাধ জ্ঞান। যেমন ধরো, আণবিক জীববিজ্ঞান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান। এমনকী, সম্প্রতি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর ওঁর একটা গবেষণাপত্র বিদেশে খুব হইচই সৃষ্টি করেছে। এমন অল-রাউন্ডার জিনিয়াস সচরাচর দেখা যায় না—বিশেষ করে যুগটা যখন স্পেশালিস্টদেরই, তখন এতগুলো বিদ্যায় যিনি সমান স্পেশালিস্ট তাঁকে এতদিন কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়নি, জানি না।'

কর্নেলের বক্তব্যের উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললুম, দেবে'খন। কিন্তু হঠাৎ ডঃ পট্টনায়কের কথা কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'সম্প্রতি ডঃ পট্টনায়ক কলকাতা এসেছেন। সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউতে ফরেনসিক ল্যাবরেটরি এবং ডিটেকটিভ ট্রেনিং সেন্টারটা তুমি দেখে থাকবে, জয়ন্ত। আজ রবিবার বারোটায় ওঁর সেখানে একটা লেকচার দেওয়ার কথা ছিল।'

'কী কাণ্ড!' হাসতে হাসতে বললুম। 'তাই হঠাৎ অমন করে দৌড়ে গেলেন—'

আমার কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'তুমি যেই বললে 'ঠেলতে হবে' অমনি প্রাচীন গ্রিক বিজ্ঞানী আর্কিমেডিসের মতো আমার মাথা খুলে গিয়েছিল। সেই ইউরেকা ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছিল আর কি! তক্ষুনি ফরেনসিক ল্যাবরেটরির হলে পৌঁছে ডঃ পট্টনায়কের কানে কানে বললুম, রহস্য ফাঁস করেছি ডঃ পট্টনায়ক! PUSHPA শব্দটা আসলে PUSH PANEL A অর্থাৎ এ-মার্কা প্যানেলটা ঠেলতে হবে। খামোখা পুষ্প বা ফুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম।'

'কিন্তু জিনিসটা কী?'

'জিনিসটা আজ সকালে তুমি আমার হাতে দেখেছ, ডার্লিং!'

'ভ্যাট! ওটা তো একটুকরো হাড় বলে মনে হচ্ছিল, কিংবা পাথুরে ফসিল!'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'মোটেও না জয়ন্ত। ছোট্ট মাউথ অর্গানের মতো জিনিসটা আসলে একটা রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র। দুটো প্যানেলে ভাগ করা, এ এবং বি। এ-কে ঠেলে দিতেই ওটা চালু হয়ে গেল। কিন্তু আমার বা ডঃ পট্টনায়কের তো জানা নেই মূল কোন যন্ত্রকে এটা চালিত করে দূর থেকে। তাই সঙ্গে সঙ্গে বি প্যানেলটা ঠেলে নিষ্ক্রিয় করে দিলুম। হ্যাঁ তোমাকে বলা উচিত, এই অদ্ভুত যন্ত্রটা মাস দুই আগে পট্টনায়কই কুড়িয়ে পেয়েছিলেন পার্বতী নদীর বালির চড়ায়। বালিতে প্রায় পুরোটা ঢাকা অবস্থায় ছিল। কিন্তু সিলিকন ধাতুর পাতে মোড়া। তাই ময়লা হয়ে গেলেও নষ্ট হয়ে যায়নি।'

'পার্বতী নদীর নাম তো কখনও শুনিনি! সেটা আবার কোথায়?'

'কোদণ্ডগিরি এলাকায়।'

'কী?' আমি নড়ে বসলুম এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'সুতরাং হালদারমশাই আসার আগেই কোদণ্ডগিরি যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছিলুম ভেতর-ভেতর। যথাসময়ে জানতে পারতে। আশা করি, কাল সকালের মধ্যে ডঃ পট্টনায়কও প্লেনে ভুবনেশ্বর পৌঁছে যাবেন। কোদণ্ডগিরি টাউনশিপে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তারপর কাজে নামব আমরা।'

এই সময় হালদারমশাই হাঁফাতে হাঁফাতে এসে পড়লেন। চাপা গলায় বললেন, 'সাধু, পাখি, বাঁদর—সব একত্র। সামনে দুটো কম্পার্টমেন্টের পরেরটায় উঠেছে। কর্নেলস্যার। রহস্য একেবারে জমজমাট।'

তিন

হালদারমশাই বলেছিলেন, ট্রেন জার্নিতে তাঁর নাকি আদপে ঘুমই হয় না। অথচ সারা পথ দেখলুম, দিব্যি নাক ডাকিয়ে ওপরের বাংকে ঘুমোচ্ছেন। ভোর সাড়ে-ছ'টায় কোদণ্ডগিরি স্টেশনে যখন ট্রেন ঢুকছে, তখন উনি ঘুমে কাঠ। ওঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়ামাত্র তড়াক করে উঠে বসলেন এবং বললেন, 'খড়গপুর এল মনে হচ্ছে।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'না হালদারমশাই, কোদণ্ডগিরি এসে গেছি। নিন, উঠে পড়ুন।'

হালদারমশাই 'অ্যাঁ' বলে দমাস করে বাংক থেকে লাফ দিলেন। ট্রেন তখনও থেমে যায়নি। সে অবস্থায় দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে আর একটা ঝাঁপ দিলেন। আছাড়ও খেলেন দেখলুম। তারপর আর ওঁকে দেখতে পেলুম না। বুঝলুম সাধু, পাখি ও বাঁদরের খোঁজেই উধাও হলেন।

সত্যিই উধাও। প্ল্যাটফর্মে বিস্তর ঢোঁড়াঢুঁড়ি করেও আর ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ওঁর বোঁচকা আমাকেই বইতে হল। কর্নেলকে কিন্তু একটুও উদ্বিগ্ন মনে হল না। নির্বিকার মুখে বললেন, 'চলো জয়ন্ত, আমাদের এখন প্রায় বারো কিলোমিটার পাড়ি জমাতে হবে। হালদারমশাইয়েরই ভাগ্নেবাড়ি। কাজেই যথাসময়ে উনি পৌঁছে যাবেন।'

একটা অটো-রিকশো ভাড়া করে আমরা রওনা দিলুম। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মোটেও ভাল ঠেকছিল না। হালদারমশাই কোনও বিপদে পড়েননি তো? কর্নেল সেটা আঁচ করে মৃদু হেসে বললেন, 'ভেবো না জয়ন্ত! হালদারমশাই সারা জীবন পুলিশে চাকরি করেছেন। তত নিরীহ মানুষ নন।'

তবু আমার উদ্বেগ রয়ে গেল। স্টেশনের আশেপাশে খনি এলাকা। চারদিকে রুক্ষ টিলা পাহাড় আর কলকারখানা। অনেকটা গিয়ে তারপর সবুজের ছোপ চোখে পড়ল। পুরনো কোদণ্ডগিরি আসলে একটা গ্রাম। তার পাশে দিয়ে হাইওয়ে চলে গেছে। পার্বতী নদীর ব্রিজ পেরিয়ে টাউনশিপ

শুরু। এটাই নতুন কোদণ্ডগিরি এবং চেহারা-চরিত্রে আধুনিক শহর। এবার উঁচু পাহাড় চোখে পড়ছিল। টাউনশিপটা সেই সব পাহাড়ের মাঝখানে এক উপত্যকায় গড়ে উঠেছে।

টাউনশিপ ছাড়িয়ে আবার পার্বতী নদী চোখে পড়ল। একেবারে নদীর ধারেই একটা টিলার গায়ে সুন্দর ছবির মতো একটা বাংলোবাড়ি দেখিয়ে কর্নেল বললেন, 'ওই দ্যাখো জয়ন্ত, ওটাই কোদণ্ডগিরি ফরেস্ট কনজারভেটর প্রদীপ রায়ের বাংলো। আমাদের হালদারমশাইয়ের অসংখ্য ভাগ্নের একজন।'

বলে উনি বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন। হাইওয়ে ছেড়ে আমাদের অটো-রিকশো প্রাইভেট রোডে ঢুকল। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে টিলায় উঠেছে। গেটের কাছে একজন শক্তসামর্থ গড়নের এবং সাদা স্পোর্টিং শার্ট, শর্টস ও টেনিস জুতো পরা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মাথার টুপিটাও সাদা। আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। ইনিই প্রদীপ রায়।

প্রদীপবাবু একটু হেসে বললেন, 'একটু আগে মামাবাবু ফোন করছিলেন স্টেশন থেকে। একটা কাজে আটকে গেছেন। পৌঁছুতে সামান্য দেরি হতে পারে। অবশ্য আপনাদের খবরও মামাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন। আমি দুঃখিত, কাল থেকে আমার জিপটা গ্যারাজে। নইলে আপনাদের আনার জন্য পাঠিয়ে দিতুম।'

তাহলে গোয়েন্দাগিরিতে পুরোপুরি নেমে পড়েছেন হালদারমশাই। হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। বাংলোর দক্ষিণ-পূর্ব কোনার সবচেয়ে সুন্দর ঘরখানায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন প্রদীপবাবু। দ্রুত ব্রেকফাস্ট খাইয়ে দিলেন আমাদের। তারপর কফির পেয়ালা হাতে গল্প করতে থাকলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের আসার কথা গতকাল বিকেলেই ট্রাঙ্ককল করে জানিয়ে দিয়েছেন হালদারমশাই। ভুবনেশ্বর থেকে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়কের আসার কথাও বলেছেন।

আমরা দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছিলুম। পার্বতী নদী এই টিলার পূর্ব ও দক্ষিণ দিয়ে বইছে। কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। নদীটা মাঝারি গড়নের। বিশেষ জল নেই,খালি বালি আর পাথরে ভর্তি। ওপারে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। কাছে এবং দূরে প্রায় সব পাহাড়ই জঙ্গলে ঢাকা। এই জঙ্গল পুরোটাই সংরক্ষিত এবং পশুপাখিদের অভয়ারণ্য। তাই গাছ কাটতে দেওয়া হয় না। প্রদীপবাবু বলছিলেন, তবু লুকিয়ে গাছ কেটে নিয়ে যায় লোক। চোরাশিকারিদেরও খুব উপদ্রব। কালই একটা শম্বর মেরেছিল। নিয়ে যেতে পারেনি ফরেস্ট গার্ডদের তাড়া খেয়ে। শেষে শম্বরের মাংসটা আদিবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হল। এই জঙ্গলকে ওরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। তাই চোরাশিকারি বা গাছ চোরদের দেখলে ওরা নিজেরাই তাড়া করে, আবার খবরও দিয়ে যায় চুপিচুপি।

কর্নেল হঠাৎ বললেন, 'আপনার মামাবাবু একটা ময়নাপাখি কিনেছিলেন এখানে। পাখিটা নাকি অদ্ভুত কথা বলে!'

প্রদীপবাবু বললেন, 'হ্যাঁ—পাখিটা চুরি গেছে শুনলুম। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত, জানেন? দিন-পনেরো আগে মামাবাবু এসেছিলেন বেড়াতে। যাওয়ার দিন জঙ্গলে কোথায় একটা আদিবাসী ছেলের কাছে পাখিটা কেনেন। পাখিটা আর কোনও কথা বলে না। খালি বলে, 'মাই নেম ইজ গঙ্গারাম। আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই গঙ্গারাম'। গঙ্গারাম কে, কে জানে! আর গঙ্গারাম গঙ্গারামকে খুন করল, এর মানেই বা কী?'

কর্নেল বললেন, 'উঁহু ভুল শুনেছেন। কথাটা হবে 'আই অ্যাম কিল্‌ড্ বাই বংকারাম।' গঙ্গারাম নয়।

চার

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন, 'বংকারাম! কী আশ্চর্য!'

কর্নেল বললেন, 'চেনেন নাকি বংকারামকে?'

'চিনতুম—খুবই চিনতুম,' প্রদীপবাবু অবাক হয়ে বললেন। 'ওঁকে এখানকার লোকে বাবু বংকারাম সেনাপতি বলে জানত। রাজাগজা লোক বললেই চলে। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে ওঁর বাড়ি। ওঁর পূর্বপুরুষেরা নাকি এই কোদণ্ডগিরি পরগনার শাসক ছিলেন। পরে রাজত্ব ঘুচে গিয়েছিল ইংরেজের কোপে পড়ে। সেটা ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা। যাই হোক, বাবু বংকারাম ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। পুলিশের খাতায় খুনে ডাকাত বলে নাম লেখা ছিল। কিন্তু পুলিশ ওঁকে কিছুতেই ধরতে পারছিল না। গত বছর মার্চ মাসে জঙ্গলের ভেতর একটা ঝরনার কাছে দেখি, একটা খাকি পোশাক পরা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে বসে আছে। এ জঙ্গলে শিকারের পারমিশন দেওয়া হয় না। তাই সোজা গিয়ে চার্জ করলুম। লোকটা আমাকে গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'আমি কে জানো? বাবু বংকারাম সেনাপতির নাম শুনেছ? আমি সেই!' শুনে তো ভয় পেয়ে গেলুম। ওঁকে ঘাঁটাতে সাহস হল না। তাছাড়া আমি নিরস্ত্র এবং একা ছিলুম। তাই চুপচাপ চলে এলুম। দিন দুই পরে হঠাৎ বাবু বংকারাম সন্ধ্যার সময় আমার এই বাংলোয় হাজির। তাঁকে খাতির করে বসালুম। বাবু বংকারাম বললেন, আমার উপর খুব খুশি হয়েছেন। কারণ পুলিশের কানে তুলিনি যে, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এখন আসল কথাটা হল, জঙ্গলের ভেতর ওঁর কিছু গোপন কাজকর্ম আছে। জঙ্গলের রেঞ্জার বা গার্ডদের যেন আমি সাবধান করে দিই, ওঁকে দেখতে পেলেও যেন না ঘাঁটায় এবং পুলিশের কানে না তোলে। আদিবাসীরা ওঁর ভক্ত। কাজেই তারা ওঁর বিরুদ্ধে কিছু করবে না।'

প্রদীপবাবু দম নিয়ে ফের বললেন, 'তার কিছুদিন পরে সেই ঝরনার ধারে বাবু বংকারামের ডেডবডি পাওয়া গেল।'

কর্নেল নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'ডেডবডি?'

'হ্যাঁ। গলায় একটা মিহি নাইলনের দড়ির ফাঁস অটকানো। জিভ বেরিয়ে রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, দড়িটা অন্তত সাত-আট মিটার লম্বা। কেউ যেন অতটা দূর থেকে হ্যাঁচকা টানে শ্বাস রুদ্ধ করে ওঁকে মেরে ফেলেছে।'

আমি বললুম, 'আত্মহত্যা নয় তো?'

প্রদীপবাবু জোর গলায় বললেন, কক্ষনো নয়। অমন মিহি দড়ি—প্রায় সুতোই বলতে পারেন, তা দিয়ে আত্মহত্যা করা যাবে কীভাবে? গাছের ডালে বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো ছিঁড়ে যাবে। তাছাড়া জায়গাটা ফাঁকা। ঝোপঝাড় অবশ্য আছে প্রচুর। কিন্তু কাছাকাছি দশ-বারো বর্গমিটারের মধ্যে কোনও উঁচু গাছই নেই।'

কর্নেল বললেন, 'রাইফেলটা?'

'ওঁর রাইফেলটার কথা বলছেন কি? নাঃ, ওটা পাওয়া যায়নি। যে ওঁকে ফাঁস আটকে মেরেছিল, সম্ভবত সেই নিয়ে পালিয়েছিল। পুলিশের সন্দেহ, কাজটা গোপেশ্বর নামে ওঁর এক স্যাঙাতের। সে-ও সাংঘাতিক লোক।'

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাখিটার কথা যদি সত্যি হয়, গঙ্গারামকে বংকারাম খুন করেছিল এবং শেষে বংকারামকেও কেউ খুন করল।'

আমি বললুম, 'গঙ্গারামের অনুগত গোপেশ্বর প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে।'

প্রদীপবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'মামাবাবু যদি পাখিটার কথা বুঝতে ভুল না করতেন, তাহলে বাবু বংকারামের হত্যা-রহস্য নিয়ে উঠে-পড়ে লাগতেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপাতত আপনার মামাবাবু গঙ্গারামের হত্যারহস্য নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কত দূর এগোতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি, শেষ পর্যন্ত বংকারামের হত্যারহস্যেই জড়িয়ে পড়বেন হালদারমশাই—বিশেষ করে সাধু, পাখি, আর বাঁদরের নাগাল যখন পেয়ে গেছেন।'

'সাধু, পাখি আর বাঁদর? সে আবার কী?'

কর্নেল সংক্ষেপে ঘটনাটা বললেন। শোনার পর প্রদীপবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ,—সাধুর ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি আশ্চর্য, জানেন? ইদানীং সারা এলাকা জুড়ে খালি ওই নিয়ে আলোচনা। যাকে জিজ্ঞেস করবেন, সে-ই বলবে, সে স্বচক্ষে দেখেছে এক সাধুবাবা হঠাৎ তার সামনে দেখা দিয়েই নাকি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপনার মামাবাবুও নাকি দেখেছেন স্বচক্ষে!'

'হ্যাঁ—মামাবাবু নাকি জঙ্গলের ভেতর সেই ঝরনার কাছে দেখেছেন। আর লোকেরা দেখেছে রাস্তাঘাটে, বাড়ির দরজায়, কিংবা নিরিবিলি গাছতলায়। এমনকী, আমার রাঁধুনি হলধর ঠাকুর দেখেছে কিচেনের জানালার বাইরে। ডাকব নাকি ওকে?' প্রদীপবাবু হাসতে লাগলেন।

'না, থাক,' কর্নেল বললেন। 'ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

প্রদীপবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'সমস্যা হচ্ছে, মামাবাবুকে অবিশ্বাস করতে বাধছে। নইলে নিছক গুজব বলেই উড়িয়ে দিতে পারতুম। মামাবাবু অবশ্য ভুল দেখতে পারেন, তাও ঠিক। তবে ঝরনার ওখানে পাহাড়ের ওপর এক সাধুকে নাকি আমাদের গার্ডরা কয়েকবার দেখেছিল। অদৃশ্য হতে দেখেনি যদিও। কিন্তু—'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু?'

প্রদীপবাবু একটু হাসলেন। 'ওই ঝরনা সম্পর্কে এখানে খুব ভয়ঙ্কর সব গল্প আছে। জায়গাটা নাকি ভূতের বাথান। রাতবিরেতে আলো-টালো দেখা যায়। হ্যাঁ, আলো আমি নিজেও দেখেছি কয়েকবার। কিন্তু কাল দিনদুপুরে একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে গেছি।'

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন, 'বলুন।'

'কালকের ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, জানেন?' প্রদীপবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন। 'তখন প্রায় একটা বাজে। সবে খাওয়া-দাওয়া করে এই বারান্দায় এসে বসেছি, হঠাৎ দেখি কী—' বলে উনি হাত বাড়িয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আঙুল নির্দেশ করলেন। 'ওই যে ছুঁচলো অদ্ভুত গড়নের পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন—নিচের দিকটা কতকটা পিরামিডের মতো আর মাথাটা গির্জার চূড়া বা মিনারের মতো উঠে গেছে?'

দেখতে দেখতে বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি তো ওটা পাহাড়ের ওপর বাদশাহি আমলের কোনও মসজিদের মিনার বলে ভাবছিলুম। আগ্রার কাছে ঠিক এমনি একটি স্থাপত্য দেখেছি।'

প্রদীপবাবু বললেন, 'না। ওটা একটা প্রাকৃতিক স্থাপত্যই বলতে পারেন। লক্ষ্য করে দেখুন, পাহাড়টা যেন বাণ-লাগানো বিশাল এটা ধনুক। কোদণ্ড মানে ধনুক। স্বয়ং শিবের ধনুক। আর গিরি হল পাহাড়। ওই পাহাড়টারই নাম তাই কোদণ্ডগিরি। তাই থেকে এলাকা এবং জনপদটার নামও হয়েছে কোদণ্ডগিরি। তা গতকাল বেলা একটা নাগাদ হঠাৎ দেখি কী, ওই ছুঁচলো চুড়ো থেকে একটা গোলমতো প্রকাণ্ড জিনিস আকাশে ছিটকে গেল। ছাইরঙা মস্ত বড় একটা গোলা যেন। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সেটা ভেসে রইল আকাশে। তারপর নেমে এল চুড়োর মাথায়। তারপর আর দেখতে পেলুম না। ভাবলুম চোখের ভুল নাকি!'

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, 'একটা বাজে তখন?'

'হ্যাঁ! প্রায় একটা।'

'জিনিসটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছিলেন!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ছাইরঙের গোলাকার জিনিস?'

'হ্যাঁ, প্রকাণ্ড। এখান থেকে ওই পাহাড়টার দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। ঝরনাটা আছে ঠিক তার নিচেই।'

'মিঃ রায়, আপনি নিশ্চয় চন্দ্র-অভিযানের লুনার মডিউলের ছবি দেখেছেন, কিংবা আমাদের দেশ মহাকাশে যেসব কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে, তাদেরও ছবি দেখেছেন?'

প্রদীপবাবু চোখ বড় করে বললেন, 'মাই গুডনেস! আপনি—'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আপনি সম্ভবত ওই ধরনেরই কোনও জিনিস দেখে থাকবেন। এমনও হতে পারে, জিনিসটা আধুনিক কোনও আকাশযান। তথাকথিত উড়ন্ত চাকি বা ফ্লাইং সসারের মডেলে তৈরি।'

'সে কী!' প্রদীপবাবু নড়ে বসলেন।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'কাল বেলা একটা নাগাদ কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছেন তো?' বলে পা বাড়ালেন ঘরের দিকে। 'আমার ধারণা, আমি আপনাদের হয়তো একটা বিস্ময়কর ম্যাজিক দেখাতে পারব। অন্তত নিরানব্বুই শতাংশ চান্স আছে।' কর্নেল পরদা তুলে ঘরে ঢুকে গেলেন।

একটু পরে বেরিয়ে এলেন। হাতে গতকাল সকালে দেখা সেই হাড়ের টুকরো অথবা মাউথ অর্গান অথবা 'রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র' নিয়ে। চেয়ারে বসে বললেন, 'দেখা যাক, কী ঘটে। মিঃ রায়, জয়ন্ত! তোমরা ওই ছুঁচলো পাহাড়টার দিকে লক্ষ্য রাখো। রেডি—ওয়ান, টু, থ্রি!'

আমাদের চোখের সামনে সকালবেলার উজ্জ্বল রোদে পাঁচ কিলোমিটার দূরের ওই পাহাড়ের ছুঁচলো ডগা থেকে একটা গোলাকার ধূসর রঙের প্রকাণ্ড জিনিস ছিটকে গেল আকাশে। স্থির ভেসে রইল। কর্নেল বললেন, 'বেশিক্ষণ এই ম্যাজিক দেখানো ঠিক নয়। আরও কারুর চোখে পড়তে পারে। অতএব ম্যাজিকের খেলা সাঙ্গ হল। জয়ন্ত, এই খেলাটার নাম দিলাম, কোদণ্ডের টঙ্কার।'

গোলাটা নেমে এসে যেন চূড়ায় মিশে গেল। শ্বাস ছেড়ে বললুম, 'হুঁ—PUSH PANEL A এবং PUSH PANEL B-এর জাদু। কোদণ্ডের টঙ্কার।'

'ঠিক বলেছে ডার্লিং!' বলে কর্নেল প্রদীপবাবুর দিকে ঘুরলেন। প্রদীপবাবু হতবাক হয়ে বসে আছেন।

উনি মুখ খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময় ওঁর মালি এসে সেলাম দিয়ে বলল, 'গেটের কাছে এই চিঠ্ঠি লটকানো ছিল, স্যার।' প্রদীপবাবু চিঠিটা খুলে পড়ে ভীষণ গম্ভীর মুখে কর্নেলকে এগিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দিখে, ইংরেজিতে যা লেখা আছে, তার মানে হল : 'তোমার আঙ্কেলকে আমরা আটকে রেখেছি। রাত দশটায় ঝরনার কাছে একা দেখা করবে। তখন কথা হবে। সাবধান, গণ্ডগোল বাধানোর মতলব করলে আঙ্কেলের মুণ্ডু উপহার পাবে।'

পাঁচ

বেনামী চিঠিটা পেয়ে প্রদীপবাবু খুব মুষড়ে পড়েচিলেন। কর্নেল ওঁকে আশ্বাস দিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক দুপুরের আগে এসে পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না। ততক্ষণ একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে হয়েছিল কর্নেলের। রাস্তায় একটা খালি অটো-রিকশো পাওয়া গিয়েছিল। পুরনো কোদণ্ডগিরিতে পৌঁছে কর্নেল হিন্দিতে রাস্তার একটা লোককে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবু বংকারাম সেনাপতির বাড়িটা কোথায়?'

লোকটা অবাক হয়ে আমাদের দেখতে দেখতে বলল, 'বাবু বংকারাম তো মারা গেছেন গত বছর।'

'জানি। তাঁর বাড়িতে তো লোকজন আছে।'

লোকটা আরও অবাক হয়ে বলল, 'কেউ নেই। আর বাড়ি তো শুধু নামেই। চলে যান সিধে রাস্তা ধরে। জঙ্গলের ভেতরে ভাঙা দালানবাড়ি দেখতে পাবেন।'

গ্রামটা এক সময় হয়তো সমৃদ্ধ ছিল। এখন প্রায় জনহীন ছন্নছাড়া বসতি। যারা বাস করছে, তাদের বোধহয় অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই। আগাছার জঙ্গল, ধ্বংসস্তূপ তার মধ্যে একটা করে কুঁড়েঘর। কিছুটা যাওয়ার পর ডান দিকে গাছপালা আর ঝোপের ভেতর একটা ভাঙা দেউড়ি দেখা গেল। লতাপাতায় ঢাকা দেউড়ির পাশ দিয়ে সাবধানে এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলুম আমরা। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা ঘরগুলোর বুকে ঘন আগাছা গজিয়ে উঠেছে। কর্নেল চারিদিক দেখতে দেখতে আনমনে বললেন, 'আশ্চর্য তো!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আশ্চর্যটা কী?'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'ডাকাত হওয়ার আগে বাবু বংকারাম নিশ্চয় এই বাড়িতে বাস করতেন। কিন্তু থাকার মতো আস্ত কোনও ঘর তো দেখতে পাচ্ছি না। লক্ষ্য করে দ্যাখো জয়ন্ত, এসব ঘর অন্তত পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ভেঙে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'তাই হচ্ছে বটে, কিন্তু এই ভূতের আস্তানায় আপনার হানা দেওয়ার উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছি না।'

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে পা বাড়ালেন। একটু তফাতে একটা ফোকর দেখা যাচ্ছিল। ফোকরটা লতাপাতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে। আমি বারণ করার আগেই কর্নেল গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়লেন। অগত্যা আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটা সুড়ঙ্গ পথই বলা যায়। দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে। একটু পরে সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল। একটা ছোট চত্বরে পৌঁছলুম আমরা। কর্নেল বললেন, 'এদিকটাই ছিল বাড়ির অন্দরমহল।'

এখানেও একই অবস্থা। উঁচু সব ধ্বংসস্তূপ চারপাশে আগাছা আর লতাপাতার ঝালরে ঢাকা। বুনো ফুলের কড়া গন্ধ মউমউ করছে এই ধ্বংসপুরীতে। পাখপাখালির ডাকাও শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কর্নেলের এখন পাখি দেখার মন নেই। এমনকী ওঁর দাড়ি ঘেঁসে প্রজাপতিও আনাগোনা করছে, যেন দেখতেও পাচ্ছেন না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে ওপাশ থেকে একটা বটগাছের ডালপালা ঝুঁকে এসেছে আমার মাথার উপর। হঠাৎ উপর থেকে কী-একটা জিনিস ধুপ করে আমার ঘাড়ে পড়ল। আঁতকে উঠে লাফ দিতেই গলায় হ্যাঁচকা টান এবং সঙ্গে সঙ্গে দম আটকে এল। গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেলুম ঘাসের উপর।

তারপর কানে এল গুলির শব্দ। তারপর মাথার কাছে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত!'

আস্তে আস্তে উঠে বসলুম। তাকিয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে কতকটা কাঠবেড়ালির মতো দেখতে একটা খুদে বাঁদর। পিটপিট করে তাকাচ্ছে বাঁদরটা। কর্নেল তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে রেখেছেন। তাই বাঁদরটার নড়াচড়ার সাধ্য নেই। আমাকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কর্নেল বললেন, 'জোর বেঁচে গেছ ডার্লিং! আর একটু দেরি হলে বাবু বংকারামের অবস্থা হত তোমার। যাই হোক, গলার ফাঁসটা এবার খুলে ফেলো।'

এবার শিউরে উঠে দেখলুম, আমার গলায় মিহি নাইলনের সুতো জড়ানো। ব্যাপারটা বুঝতে এক সেকেন্ডও দেরি হল না। কাঁপা কাঁপা হাতে গলা থেকে সুতোটা খুলে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, 'ভ্যাগ্যিস বাঁদরটাকে আগে দেখতে পেয়েছিলুম। তোমার মাথায় উপর ওই ডাল বেয়ে এগিয়ে আসছিল। ফাঁসটা নিয়ে যেই তোমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে, আমিও এক লাফে এগিয়ে ওকে ধরে ফেলেছি। তবে ফাঁস ধরে যে টান দিয়েছিল, তাকে দেখতে পাইনি। আন্দাজে রিভলভারের গুলি ছুড়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। লোকটা সম্ভবত বটগাছের গুঁড়ির উপর কোথাও বসে ছিল। কারণ তার লাফিয়ে পড়া আর দৌড়ে যাওয়ায় ধুপধুপ শব্দ শুনতে পেয়েছি।'

উঠে দাঁড়ালুম। মাথা ঝিমঝিম করছে। কুৎসিত বাঁদরটার দিকে তাকাতেও আতঙ্ক হচ্ছে। ওই ব্যাটা আমার ঘাড়ে লাফিয়ে ফাঁসটা আটকে দিয়েছিল আর ওর শয়তান মনিব নাইলনের শক্ত এই

সুতোটার অন্য প্রান্ত থেকে ছিপে খ্যাঁচ মেরে মাছ বেঁধানোর মতো হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। মানুষ মারার বিদঘুটে ফন্দি বটে। এমনি করেই তাহলে বাবু বংকারামকে দম আটকে খুন করা হয়েছিল।

সুতোটা প্রায় দশ-বারো মিটার লম্বা। ল্যাসোর কে খুদে সংস্করণ আর কি! গুটিয়ে পকেটে রাখলুম, কর্নেলের জাদুঘরে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে উপহার দেব এটা। সঙ্গে একটা চিত্রকুটে লেখা থাকবে : এই নিরীহ সুতোটি প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরিকে যমের বাড়ির দরজা অব্দি টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'এই সেই ময়নাচোর স্কুইরেল মাংকি, ডার্লিং! হালদারমশাইয়ের সাধু, পাখি আর বাঁদরের মধ্যে বাঁদরটা হাতে এল। বাকি রইল পাখি আর সাধু। একটুর জন্য সাধু ফসকে গেছে। তবে আশা করি, আবার তার দেখা আমরা শিগ্‌গির পাব। শুধু পাখিটার জন্য ভাবনা হচ্ছে।'

বললুম, 'আমার আর এক সেকেন্ডও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না কর্নেল। তাছাড়া শ্বাসনালিতে ব্যথা করছে।'

কর্নেল বললেন, 'ঠিক আছে। চলো, ফেরা যাক। পরে আবার এসে বাবু বংকারামের ডেরা খোঁজা যাবে।' তারপর খুদে প্রাণীটাকে জ্যাকেটের ভিতরকার পকেটে ঢুকিয়ে বোতাম আঁটলেন। বাঁদরটা নড়ল না একটুও।

গ্রামের রাস্তায় ফিরে যাওয়ার সময় একটা ভিড় চোখে পড়ল। একটা কুঁড়েঘরের সামনে পুরুষ, স্ত্রীলোক, কাচ্চাবাচ্চা ভিড় করে কী যেন দেখছে। উঁকি মেরে দেখি, একটা কালো মরা পাখি পড়ে আছে মাটিতে। সেটাই সবাই ভিড় করে দেখছে। কর্নেলের দিকে তাকালুম। খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গোয়ন্দাপ্রবর। একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, মরা পাখি দেখার জন্যে এত ভিড় কেন?'

সে বলল, 'সায়েব, এটা একটা ময়নাপাখি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাখিটা মরল কী করে?'

একজন বুড়ো বলল, 'হুজুর, পাখিটা আমার নাতনি কুড়িয়ে পেয়েছে মাঠে। তখনও ধুঁকছিল। এনে মুখে জল দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করল। বাঁচল না। এ পাখিটা আমরা চিনতে পেরেছি। সেজন্য এই ভিড়।'

'পাখিটা কার?'

'বাবু গঙ্গারাম দাস বলে একটা লোক ছিল, এ তারই পাখি। পাখিটা ভাল বুলি বলতে পারত, হুজুর! ওড়িয়া, হিন্দি আবার ইংরেজিতেও নাকি বুলি বলত। বাবু গঙ্গারাম দাস ছিল লেখা-পড়াজানা লোক। বড্ড খেয়ালি আর দিলদরিয়া ছিল তার মেজাজ। গরিব লোকদের জন্য খুব দয়া ছিল তার।'

আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি এখন কোথায় আছেন?'

বুড়ো বলল, 'জানি না হুজুর! বাবু গঙ্গারাম থাকত বাবু বংকারামের বাড়িতে। শুনেছি ওরা নাকি ছিল মাসতুতো ভাই। বছরখানেক আগে বাবু বংকারাম জঙ্গলে ঝরনার ধারে খুন হয়েছে। বাবু গঙ্গারাম তারপর থেকে নিপাত্তা। পুলিশ তাকে আর গোপেশ্বর নামে একটা লোককে খুনি বলে সন্দেহ করেছিল বটে, কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করি না; অমন নিরীহ আর দয়ালু লোক গঙ্গারাম মানুষ খুন করতে পারে! খুনোখুনির কাজ গোপেশ্বর পারত বটে। সেও ছিল এক সাংঘাতিক ডাকাত। বাবু বংকারামের স্যাঙাত।'

কর্নেল পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ পাখি যে বাবু গঙ্গারামের, তোমরা চিনলে কেমন করে?'

সবাই হইচই করে উঠল জবাব দেওয়ার জন্য। সবাইকে থামিয়ে বুড়ো বলল, 'ওই যে দেখছেন পাখিটার একটা পায়ে রুপোর আংটা। বাবু গঙ্গারাম সবসময় পাখিটাকে কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত।

ওই আংটার সঙ্গে ছিল সরু চেন। চেনটা থাকত বাবু গঙ্গারামের গলায় জড়ানো। মনে হচ্ছে, আংটা থেকে চেন ছিঁড়ে কী ভাবে পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন।'

কর্নেল হাঁটু ভাঁজ করে ঝুঁকে পাখিটাকে ভাল করে দেখতে গেছেন, অমনি তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে দুটো বোতামের মাঝখান দিয়ে বজ্জাত খুদে বাঁদরটা সুড়ুত করে পিছলে পড়ল। তারপর লোকগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চোখের পলকে কুঁড়েঘরের চালে চড়ে বসল। এবার তাজ্জব হয়ে দেখলুম, বাঁদরটা মরা পাখিটাকে হাতিয়ে নিয়েছে।

সবাই হকচকিয়ে গিয়েছিল। কর্নেলও হতভম্ব। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাই, তারপর লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল, 'ভুণ্ডুরাম! ভুণ্ডুরাম!'

চ্যাঁচামেচিতে হয়তো ভয় পেয়েই বাঁদরটা পাখিটা নিয়ে এক লাফে কুঁড়েঘরের পেছনের দিকে উধাও হয়ে গেল। ওর গতি আর ভঙ্গি অবিকল কাঠবেড়ালির মতো। কর্নেল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে বললেন, 'পাকড়ো। পাকড়ো! বখ্‌শিশ মিলেগা!'

বখশিশের লোভে হইচই করতে করতে অনেকেই ছুটে গেল। বুড়ো কর্নেলকে আশ্বস্ত করে বলল, 'চুপ করে বসে থাকুন হুজুর! খাটিয়া এনে দিচ্ছি। ভুণ্ডুরামকে ওরা এক্ষুনি ধরে ফেলবে। ওটা তো একটা পোষা বাঁদর।'

সে ঘর থেকে দুটো খাটিয়া এনে দিল। আমরা বসলুম। তারপর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঁদরটাও তোমাদের চেনা দেখছি!'

বুড়ো হাসতে হাসতে বলল, 'হুজুর কি ভুণ্ডুরামকে কিনে আনলেন ভগিয়ার কাছ থেকে?'

কর্নেল বললেন, 'বাঁদরটা আমি ভগিয়ার কাছে কিনিনি। অন্য একজনের কাছে কিনেছি।'

বুড়ো অবাক হয়ে বলল, 'সে কী! ভগিয়া ভুণ্ডুরামকে তাহলে বেচে দিয়েছিল! কার কাছে বলুন তো হুজুর?'

কর্নেল বললেন, 'নাম জানি না। বাবু বংকারামের বাড়ির ওখানে একটা লোক—'

বুড়ো কথা কেড়ে বলল, 'বুঝেছি। বেঁটেমতো, মাথায় টাক আছে তো? নব।'

'ভগিয়া কে?'

'নবর ভাই। ভগিয়া যে সারাদিন ভুণ্ডুরামকে নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তাই নব বলত বটে, বাঁদরটাকে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসবে, নয়তো কাউকে বেচে দেবে।'

'ভগিয়া এমন জাতের বাঁদর পেল কোথায়?'

'জঙ্গল থেকে নাকি ধরে এনেছিল। খেলা শিখিয়েছিল। যা বলত, তাই শুনত ভুণ্ডুরাম।'

'ভগিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'বলা কঠিন। শুনেছি সে নাকি এক সাধুবাবার চেলা হয়েছে। কোথায়-কোথায় ঘোরে সাধুবাবার সঙ্গে।'

'এক সাধুবাবা নাকি অদৃশ্য হতে পারেন—তাঁরই চেলা হয়নি তো ভগিয়া?'

বুড়ো মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'সে সাধুবাবা স্বয়ং শিব। ভগিয়া তার চেলা হবে? তাহলে পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে না? হুজুর, ভগিয়ার সাধুবাবা আর কেমন হবে? ভগিয়ার মতোই হবে। কেউ কেউ বলে, সাধুটা নাকি গোপেশ্বর। পুলিশের ভয়ে সাধু সেজে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

লোকগুলো হইচই করে ফিরে এল। ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরামকে ধরে এনেছে ওরা। মরা পাখিটাকে এখনও বজ্জাতটা আঁকড়ে ধরে রয়েছে। কর্নেল বাঁদরটাকে আগের মতোই জ্যাকেটের ভিতর পকেটে চালান করলেন এবং একটা হাত চেপে রাখলেন, যাতে আর না পালাতে পারে। মরা পাখিটাকে আমি রুমালে জড়িয়ে নিলুম কর্নেলের আদেশে।

ওদের বখ্‌শিশ দিয়ে বুড়োর কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল হঠাৎ আমাকে চাপা গলায় ইংরেজিতে বললেন, 'জয়ন্ত, দূরে একটা লোককে দৌড়ে আসতে দেখছি। মনে হচ্ছে, লোকটা ভগিয়ার দাদা

নব। ওই দ্যাখো, সামনে বড় রাস্তার মোড়ে একটা অটোরিকশো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৌড়নোর জন্য তৈরি হও। ওয়ান, টু, থ্রি—রান!'

পিছনের লোকগুলো নিশ্চয় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে আছে। জীবনে এমন দৌড় কখনও দৌড়ইনি, কিংবা পঁয়ষট্টি বছরের খ্রিসমাস সান্টা ক্লজ চেহারার এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও দৌড়তে দেখিনি।

অটো-রিকশোয় চেপেই কর্নেল বললেন, 'ডবল ভাড়া সর্দারজি! তুরন্ত্ চালিয়ে, ইধার টাউনশিপ হোকে সিধা।'

ড্রাইভার কী বুঝল কে জানে, তক্ষুনি, স্টার্ট দিয়ে বাহনটাকে রকেটের বেগে ছুটিয়ে দিল পার্বতী নদীর ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সে মুচকি হেসে বলল, 'ইধার গোপেশ্বর ডাকু রহতা হ্যায়! কভি ইধার মাত আইয়ে জি।'

প্রদীপবাবুর বাংলোবাড়িতে পৌঁছে দেখি, সবে ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক ভুবনেশ্বর থেকে নিজেই জিপ চালিয়ে হাজির। কর্নেল পকেট থেকে ভুণ্ডুরামকে বের করলে উনি চমকে গিয়ে বললেন, 'স্কুইরেল মাংকি মনে হচ্ছে? কোথায় পেলেন?'

কর্নেল হালদারমশাইয়ের প্রসঙ্গ থেকে শুরু করলেন। কথা শেষ হলে পট্টনায়ক বললেন 'কী আশ্চর্য! কাল দুপুরে কলকাতার ফরেনসিক ল্যাবরেটরি হলে যখন আপনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন যদি গঙ্গারামের ব্যাপারটা বলতেন, তখনই সব জানিয়ে দিতুম আপনাকে।'

কর্নেল বললেন, 'চেনেন নাকি গঙ্গারামকে?'

'ভীষণ চিনি', ডঃ পট্টনায়ক উত্তেজিতভাবে বললেন। 'ভদ্রলোক ছিলেন বাঙ্গালোর স্পেস রিসার্চ সেন্টারের জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। খুব খেয়ালি স্বভাবের মানুষ। হঠাৎ চাকরি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওল্ড কোদগুগিরিতে বাবু বংকারামের বাড়িতে এসে জুটেছিলেন।'

'বাবু বংকারামের নাকি মাসতুতো ভাই উনি।'

'হতে পারে,' ডঃ পট্টনায়ক বললেন। 'কেন এখানে এসেছিলেন, তাও আঁচ করতে পারছি। জঙ্গলের ভেতর কোদগুগিরি পাহাড়ে নিশ্চয় গোপনে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা করছিলেন। একটু আগে মিঃ রায়ের কাছে যা শুনলুম তাতে ওঁর সাফল্যের প্রমাণও পেয়েছি। এমন একটা রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি।

'হ্যাঁ। রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা সত্যি বিস্ময়কর।'

'কিন্তু এসব কাজের জন্য প্রচুর টাকা দরকার। এত টাকা কোথায় পেলেন জি আর ডি?' ডঃ পট্টনায়ক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ,—ডঃ গঙ্গারাম দাস জি আর ডি নামেই বিজ্ঞানীমহলে পরিচিত ছিলেন।'

কর্নেল বাঁদরটার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'তাহলে কি বাবু বংকারামকে ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করার জন্য উনিই প্ররোচিত করেছিলেন? হয়তো বাবু বংকারামকে কোনও লোভ দেখিয়েছিলেন।'

প্রদীপবাবু এসে বললেন, 'লাঞ্চ রেডি। দেড়টা বাজতে চলল। এবার দয়া করে উঠে পড়ুন।'

ছয়

খাওয়াদাওয়ার পর মরা ময়নাপাখিটা নিয়ে কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়ক কী-সব পরীক্ষায় বসলেন। ডঃ পট্টনায়কের সঙ্গে সবসময় একটা খুদে পোর্টেবল ল্যাবরেটরি থাকে। দেখতে সেটা একটা প্রকাণ্ড স্যুটকেসের মতো। টেবিলে সেটা খুলে বসেছেন।

ফাঁসুড়ে ভুণ্ডুরাম এখন প্রদীপবাবুর জিম্মায়। ওকে বন্য প্রাণী গবেষণাগারের হেফাজতে দেওয়া হবে। রাত জেগে ট্রেন জার্নি, তার ওপর যমের দুয়ার থেকে ফেরার ধাক্কায় আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে

পড়েছিলুম। শ্বাসনালির ব্যথাটা গরম জলের গার্গলে অনেকটা কমেছে। সবে চোখ বুজে আসছে ভাতঘুমে, এমন সময় কর্নেল এবং ডঃ পট্টনায়কের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কর্নেল বললেন, 'কী আশ্চর্য! এ যে দেখছি একটা নকশা!'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হ্যাঁ—ব্লুপ্রিন্ট বলতে পারেন। নিশ্চয় গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্লুপ্রিন্ট। তা না হলে পাখির পায়ে রুপোর আংটার মধ্যে রোল করে লুকিয়ে রাখা হবে কেন? এটা কিন্তু সাধারণ কাগজ নয়। গুপ্তচররা ব্যবহার করে এগুলো। এক বর্গফুট কাগজও রোল করে নখের মধ্যে লুকিয়ে রাখা যায়। এবার বোঝা গেল, পাখিটা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। ফাঁদে আটকে আদিবাসী ছেলেরা ওকে ধরে। হালদারমশাই কিনে নিয়ে যান। তাঁর বাড়ি থেকে পাখিটা উদ্ধার করে আনার সময় আবার হাত ফসকে পালিয়েছিল। পালাতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়ে শেষে মারা পড়ে।'

কর্নেল বললেন, মাঠে পড়ে ছিল নাকি পাখিটা। ওখানে বিদ্যুতের তার গেছে দেখছি।'

'ডি সি বিদ্যুতের শকে ছিটকে পড়াই সম্ভব। এ সি হলে তারে আটকে থাকত।'

'বুঝেছি। হালদারমশাইয়ের সঙ্গে সাধু আর তার চেলা যখন ধস্তাধস্তি করছিল, তখনই পাখিটা পালিয়ে থাকবে।'

'হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি?' কর্নেল হাসলেন। 'বেনামী চিঠিতে বলা হয়েছে, ওঁকে ওরা আটকে রেখেছে। তার মানে ধস্তাধস্তিটা খুব সাংঘাতিকই হয়েছে। হালদারমশাই তো সহজে বন্দি হবার পাত্র নন। ওঁকে কায়দা করতে হাত ফসকে পাখির পালানোই স্বাভাবিক।'

ডঃ পট্টনায়ক আবার নকশাটার উপর আতশকাচ নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর চাপা গলায় বললেন, 'কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে, এটা কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে জি আর ডির ল্যাবরেটরি এবং স্পেস রিসার্চ সেন্টারের ব্লুপ্রিন্ট। ওই গোপন জায়গায় যাওয়ার হদিশও এতে আছে যেন। এই চিরুনির মতো চিহ্নটা দেখুন। এটা সম্ভবত ঝরনা। আর তার উলটোদিকে এই লাল ফুটকিটা কি সেই লাল রঙের প্রকাণ্ড পাথরটাই—যেটা আমি দেখে গিয়েছিলুম জানুয়ারিতে এসে?'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। আড়াইটে বাজাতে চলল। দিনের আলো থাকতে থাকতে বেরিয়ে পড়াই ভাল। জয়ন্ত, তুমি যাবে নাকি?'

তড়াক করে উঠে বসলুম। বললুম, 'যাব না মানে? দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার লক্ষ-লক্ষ পাঠক হা-পিত্যেশ করে বসে আছে না?'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হাঁটা-পথেই যাব। অবশ্য পথ বলা ভুল। জানুয়ারিতে এসে কোদণ্ডগিরি পৌঁছতে খুব হন্যে হয়েছিলুম। একবার হাতির পালের সামনে, আর একবার চিতাবাঘের সামনেও পড়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশনের এক বিশেষজ্ঞ। তিনি তো আতঙ্কে মারা পড়ার দাখিল।'

প্রদীপবাবু এসে ওঁর কথা কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন, 'জানুয়ারিতে এসেছিলেন আপনারা? জঙ্গলে বেড়াতে নাকি?'

'না মিঃ রায়। নিছক বেড়াতে এলে তো আপনি জানতে পারতেন। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না। আমরা এসেছিলুম একটা সরকারি তদন্তে। কোদণ্ডগিরি পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত সব আলো দেখা যায়। আগুনের গোলাও দেখা যায়। আমার ধারণা ছিল, ওখানে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস আছে ভূগর্ভে। কিন্তু এসে কিছুই হদিশ করতে পারিনি। আর পাহাড়টায় চড়াও একেবারে অসম্ভব। পুরোটা গ্রানাইট শিলায় তৈরি। যাই হোক, ফেরার পথে পার্বতী নদীর ধারে বালির চড়ায় ওই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম।'

প্রদীপবাবু বললেন, 'আগুনের গোলার কথা আমিও শুনেছিলুম।'

কর্নেল বললেন, 'আজ সকালে দেখতেও পেলেন।'

প্রদীপবাবু চমকে উঠে বললেন 'কিন্তু ওটা তো আগুনের গোলা নয়। ছাই-রঙের একটা গোলক।'

'রাতে ওটা থেকে রশ্মি ঠিকরে পড়ে। তাছাড়া মহাকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ রাতের আকাশে আগুনের গোলার মতো দেখাতে পারে।'

প্রদীপবাবুও আমাদের সঙ্গ ধরলেন। এতে খুশিই হলেন কর্নেল এবং ডাঃ পট্টনায়ক। প্রদীপবাবু কোদণ্ডগিরি জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র জানেন। রাস্তা ভুল হওয়ার চান্স থাকবে না।

পাহাড়ি জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। তাছাড়া এখন বসন্তকাল। কত রকম ফুল ফুটেছে চারিদিকে। মিঠে গন্ধে মউ-মউ করছে বনপথ। পাখ-পাখালি গান ধরেছে মনের সুখে। কিন্তু এসব দিকে আমাদের কারুর মন নেই। প্রদীপবাবু সতর্কতার জন্য একটা শটগান হাতে নিয়েছেন। বুনো জন্তুর পাল্লায় পড়লে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্যই। এ জঙ্গলে পশুপাখি হত্যা নিষিদ্ধ।

একবার হাতির চিৎকার কানে এল। প্রদীপবাবু বললেন, 'পার্বতী নদীতে দিনের শেষে খেলতে নেমেছে হাতির পাল। বাতাস ওদিক থেকে বইছে। কাজেই আমাদের গন্ধ পাবে না ওরা।' একখানে টিলার উপর মহুয়া গাছে ভালুক দেখিয়ে দিলেন। বহু দূরে একবার যেন বাঘের গর্জনও শুনলুম।

পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পেরুতে ঘণ্টা-দেড়েক লেগে গেল। এর কারণ রাস্তা বেশ দুর্গমই। চড়াই-উতরাই বিস্তর। ঝরনা এড়িয়ে আমরা কোদণ্ডগিরির পশ্চিমে গিয়ে দাঁড়ালুম। পাহাড়টা অন্তত হাজার-দশেক ফুট উঁচু। দূর থেকে শর লাগানো ধনুক বা পিরামিডের মতো মনে হয় বটে, কাছ থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মিনারের মতো খাড়া ছুঁচালো চূড়াটা চোখে পড়ছিল। পাহাড়ের নিচে বিশাল-বিশাল পাথর পড়ে আছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে পাথর আর ঝোপ। তারপর উঁচু গাছের জঙ্গল। তাই এখানে বিকেলের গোলাপি রোদ ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল ও ডঃ পট্টনায়ক সেই নকশা আঁকা চিরকুট খুলে পরামর্শ করছিলেন। হঠাৎ কর্নেল বললেন, 'লাল ফুটকি? হুঁ, দেখুন তো ডঃ পট্টনায়ক! ওই লাল পাথরটাই তো?'

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'হ্যাঁ, ওটাই। চলুন, দেখা যাক।'

কর্নেল বললেন, 'সাবধান! সবাই গুঁড়ি মেরে পাথরের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে চলুন।'

লাল পাথরটার কাছে পৌঁছে আবার দু'জনে নকশা দেখে নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় পরামর্শ করলেন। তারপর কর্নেল বললেন, 'সবাই হাত লাগান। দেখা যাক, পাথরটা সরানো যায় কি-না।'

লালপাথরটা কিন্তু তত ওজনদার নয়। একটু ঠেলতেই সরে গেল। ওটা যত সরল, তত নিচের দিকে একটা গর্ত দেখা যেতে থাকল। কর্নেল বললেন, 'এই তো দেখছি সুড়ঙ্গের মুখ। একে একে নামা যাক। টর্চ জ্বালতে হবে মনে হচ্ছে।'

প্রথমে কর্নেল, তারপর ডঃ পট্টনায়ক, তারপর আমি এবং সব শেষে প্রদীপবাবু গর্তে নামলেন। ধাপে ধাপে সিঁড়ি একটু নেমে যাওয়ার পরে উপরের দিকে উঠে গেছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ টের পাচ্ছি। টর্চের আলোয় কালো পাথরের ধাপ ক্রমশ উঠছে তো উঠছেই। আমরাও উঠছি। অনেকখানি ওঠার পর কিছুটা করিডোরের মতো সমতল জায়গা। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, সামনে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার পা বাড়ালেন। করিডোরের মতো জায়গাটা প্রায় দু'মিটার চওড়া। আলোটা আসছে বাঁদিক থেকে। করিডোর বেঁকে গিয়ে আবার সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। সিঁড়ির মাথায় হলুদ একবিন্দু আলো। ঠিক আলো নয়। অদ্ভুত একটা রশ্মি যেন। কর্নেল ধাপে পা রেখেছেন, অমনি গমগমে গলায় কেউ বলে উঠল, 'সাবধান গোপেশ্বর! আর এক পা এগোনোর চেষ্টা কোরো না। বুঝতে পেরেছি, তুমি এতদিনে আমার ল্যাবরেটরিতে ঢোকার নকশা পেয়েছ। আমার দুর্ভাগ্য গোপেশ্বর, পাখিটা শয়তান বংকারাম চুরি করে নিয়ে পালিয়েছিল। তাছাড়া আমার আরসিএস যন্ত্রটাও চুরি করেছিল ডাকাত হতচ্ছাড়া। ওকে খুন করে তুমি সব হাতিয়েছ আমি জানতুম। কাল দুপুরে এবং আজ সকালে আমার স্পেসশিপ দু-দুবার ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি জানি, তুমি আরসিএস তো হাতিয়েছ। উপরন্তু ওটা ব্যবহার করার কৌশলও জেনে গেছ। শোনো গোপেশ্বর, আমি তোমাকে ঢুকতে দেব একটা শর্তে।

কর্নেল বলে উঠলেন, 'বলো গঙ্গারাম!'

'তোমার বাঁ দিকে একটা ঘুলঘুলি দেখতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি।'

'নকশা আর, আরসিএস যন্ত্রটা ওখানে দিয়ে ঢুকিয়ে দাও।'

'তাহলে ঢুকতে দেবে তো গঙ্গারাম?'

'দেব।'

দেখলুম ডঃ পট্টনায়ক কর্নেলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না ওঁকে। নকশা আর সেই রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্র ঘুলঘুলির ভিতর ফেলে দিলেন। অমনি হা-হা হাসির শব্দ এসে আমাদের কানে ধাক্কা দিল। হলদে আলোর ফুটকিটা নিভে গেল। নেপথ্য থেকে নিষ্ঠুর কথা গমগম করে ভেসে এল, 'গোপেশ্বর, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।'

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, 'ডঃ দাস, আমি গোপেশ্বর নই। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! আমার সঙ্গে আছেন আপনার পুরনো বন্ধু ডঃ সীতাকান্ত পট্টনায়ক, সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি এবং এই জঙ্গলের কনজারভেটর প্রদীপ রায়। আপনি আগে দেখুন, আমরা কারা। তারপর শাস্তি দেবেন।'

ডঃ পট্টনায়কও জোরে চেঁচিয়ে বললেন, 'জি আর ডি! আমি পট্টনায়ক।'

অন্তত এক মিনিট পরে কথা ভেসে এল, 'গোপেশ্বর কোথায়?'

'আমরা জানি না ডঃ দাস,' কর্নেল বললেন। 'দয়া করে আমাদের ঢুকতে দিন। সব বলব।'

'আপনারা আসুন।'

আবার হলুদ আলোর ফুটকি দেখতে পেলুম। সিঁড়ি বেয়ে আমরা উঠতে থাকলুম। শেষ ধাপের পর আবার একটা করিডোর। বাঁ দিকে একটা কালো দরজা খুলে গেল। একে একে ভিতরে ঢুকলুম। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিশাল এক ল্যাবরেটরি। একপাশে রকেটের মতো দেখতে এটা প্রকাণ্ড সাদা চোঙা ছাদ ফুঁড়ে চলে গেছে। সেখানে রেলিং ঘেরা। অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে নানারকম। শোঁ শোঁ....ব্লপ্ ব্লিপ্....কিটকিট....বিচিত্র সব শব্দ। কিন্তু কোনও লোক দেখতে পাচ্ছি না।

ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'জি আর ডি, কোথায় তুমি?'

অমনি সামনে একটু তাকাতে চোখ-ধাঁধানো নীল আলো খেলে গেল এক সেকেন্ডের জন্য। তারপর দেখি, সেখানে লম্বা রোগা ফর্সা, একমাথা সাদা চুল, গেরুয়া আলখাল্লার মতো পোশাক পরা এক সৌম্য চেহারা প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'কী পট্টনায়ক, অলৌকিক কীর্তি ভাবছ নাকি? তোমাকে বলেছিলুম পট্টনায়ক, যে-কোনও পদার্থকে ভরহীন ফোটনে পরিণত করা যায় এবং তা চর্মচক্ষে অদৃশ্য মনে হবে। তুমি বলেছিলে, ফোটনে পরিণত হলে তা আলোর সমান গতিবেগ পাবে এবং তাই বিশ্বজগতে ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক ঠিক। কিন্তু লেসার রশ্মি দিয়ে ফ্রেমের মতো ঘিরে রাখতে পারলে তা ছড়াবে না এবং ফোটনগুলোকে আবার আগের মতো ভরযুক্ত পদার্থ-কণিকায় রূপান্তরিত করা যাবে। এখন স্বচক্ষে দেখলে তো পট্টনায়ক, সেই অসম্ভব আমি সম্ভব করেছি?'

'দেখলুম ভাই! তোমার কোনও তুলনা হয় না।'

বিজ্ঞানী গঙ্গারাম দাস কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একসময় খবরের কাগজ পড়তুম। তখন আপনার অনেক কীর্তিকলাপ কাগজে পড়েছি। বসুন, বসুন। আপনারা আমার সম্মানিত অতিথি।'

আমরা বসলুম। ডঃ দাস বিশাল টেবিলের ওধারে বসলেন। তারপর বোতাম টিপলেন। তক্ষুনি খটখট শব্দে একটা ছোট্ট মানুষের গড়নের রোবট এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ডাঃ দাস বললেন, 'চা কফি কোল্ড ড্রিংক্স—যা খেতে চান, সেই বোতাম টিপুন। পেয়ে যাবেন।'

কর্নেল কফির বোতাম টিপলেন। খট করে একটা কাগুজে পেয়ালা পড়ল রোবটের পেটের নিচের খোঁদলে। তারপর গড়গড় করে কফি বেরিয়ে পেয়ালা ভর্তি হয়ে গেল।

আমরা সবাই কফিই নিলুম। তারপর রোবটটা চলে গেল। ডঃ পট্টনায়ক বললেন, 'পাহাড় কেটে এই ল্যাবরেটরি বানিয়েছ দেখে অবাক লাগছে জি আর ডি! এ যে দৈত্যের কীর্তি! কী করে বানালে?'

জি আর ডি বললেন, 'আমি তো বানাইনি, ভাই। এটা বংকারামের পূর্বপুরুষের তৈরি গোপন দুর্গ। এটার জন্যই ওর সঙ্গে ভাব করেছিলুম। ওকে মিথ্যা লোভ দেখিয়েছিলুম, দুর্গের ভিতর ওর পূর্বপুরুষের গুপ্তধন আছে। উদ্ধার করে দেব। কিন্তু ও চিরকালের বজ্জাত। যখন বুঝল আমি ল্যাবরেটরি বানাচ্ছি, তখন থেকে বদমাইশি শুরু করল। গোপেশ্বর নামে ওর এক ডাকাত-স্যাঙাত আছে। তাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করল শয়তানটা। যাকগে, গোপেশ্বর ওকে খুন করেছে। তবু আরসিএস এবং নকশাটা হাতাতে পারেনি।'

কর্নেল সংক্ষেপে আগাগোড়া সব ঘটনা বললেন। ডাঃ পট্টনায়ক আরসিএস যন্ত্রটা কোথায় পেয়েছিলেন, তাও বললেন। ডঃ দাস খুব হাসতে লাগলেন শুনে। শেষে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু মিঃ রায়ের মামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। গোপেশ্বর ডাকু সাংঘাতিক লোক। ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, ঝরনার ধারে রাত দশটায় ব্যাটা আসবে বলেছে তো? তখনই আমি ওকে ধরতে রোবট পাঠিয়ে দেব। রোবটের টিপুনি খেয়ে সে কবুল করবে মিঃ হালদারকে কোথায় আটকে রেখেছে। তারপর ব্যাটাকে পুলিশের কাছে জিম্মা দেবেন মিঃ রায়।'

কর্নেল বললেন, 'একটা কথা ডঃ দাস। পাখিটাকে অমন কথা কেন শিখিয়েছিলেন?'

বিজ্ঞানী মুচকি হেসে বললেন, 'বংকারাম যদি আমাকে সত্যি খুন করে, তাহলে পাখিটা সাক্ষ্য দিতে পারবে, এই ভেবেই। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং ল্যাবরেটরি দেখে আমরা বিদায় নিলুম। এবার আমাদের উল্টো দিকে ঝরনার ধারের গোপন দরজা খুলে বের করে দিলেন ডঃ দাস। তারপর আমাকে চমকে দেওয়ার জন্য আবার হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন, বুঝলুম হালদারমশাই তাহলে ঠিকই দেখেছিলেন।

বাংলোয় ফিরে আমরা আবার অবাক। হালদারমশাই জলজ্যান্ত বসে রয়েছেন। শুধু মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। বললেন, 'আমার নাম কে. কে. হালদার। আমাকে আটকে রাখবে ওই পুঁচকে দুটো লোক? রেলইয়ার্ডে সাধু আর তার চেলাকে ফলো করছিলুম। হঠাৎ ওরা মালগাড়ির আড়ালে লুকিয়ে গেল। আসলে ওত পেতে বসেছিল, বুঝলেন? যেই গেছি, লাফিয়ে পড়েছে। শেষে মাথায় ডাণ্ডার বাড়ি। জ্ঞান হলে দেখি, মালগাড়ির ওয়াগনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। গায়ে জোর আসতে দেরি হচ্ছিল, তাই। নইলে কখন বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসতুম। যাক গে, এবার আপনাদের খবর বলুন, কর্নেল স্যার?' হালদারমশাই মাথার ব্যান্ডেজে হাত বুলোতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন, 'আপাতত খবর হল, আজ রাত দশটায় আপনার সেই সাধু ওরফে গোপেশ্বর আর চেলা ভগিয়া ঝরনার ধারে রোবটের হাতে বন্দি হবে।'

হালদারমশাই বললেন, 'রোবট? যাঃ!' খি-খি করে বেজায় হাসতে লাগলেন গোয়েন্দা কৃতান্ত হালদার।

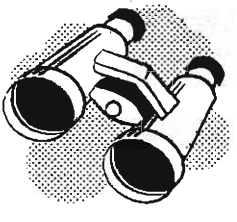

ওজরাকের পাঞ্জা

কালো পাথরের মতো দেখতে জিনিসটাকে...আলো পড়লেই ঠিকরে পড়ত হরেক রশ্মি...চর্কির মতো ঘুরত রশ্মিগুলো...ধাতু বিজ্ঞানীও বলতে পারেননি ধাতুটা কী! রহস্যময় এই বস্তুটাই চুরি গেল আরও রহস্যজনকভাবে রাতদুপুরে কান্দ্রা উপত্যকায়...পাহাড় থেকে নেমে এল ঝোড়ো হাওয়া...শোনা গেল ঘুঙুরের শব্দ...নিভে গেল সব আলো! তারপর?

বেহালা রোগ

সেদিন সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় গিয়ে তাঁর প্রিয় ভৃত্য ষষ্ঠীচরণকে কেমন যেন মনমরা লক্ষ্য করছিলুম। কর্নেল তখনও ছাদে ক্যাকটাস এবং অর্কিডের সেবায় মশগুল। এসব সময় অবস্থা মৌনীবাবাদের মতো। তাই নিচের ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলুম। ষষ্ঠী যথারীতি কফি দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুখটা বেজায় গম্ভীর। চেহারা উস্কোখুস্কো। চোখের তলায় যেন কালি। জিগ্যেস করেছিলুম, অসুখ-বিসুখ নাকি?

ষষ্ঠী শুধু মাথা নেড়েছিল। এরকম মাথা নাড়ার মানে হ্যাঁ বা না যে কোনওটাই হতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে কফির পেয়ালা নিতে এল সে। তখন বললুম, তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। তারপর গলার ভিতর বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না দাদাবাবু!

—আহা! তোমার হয়েছে কী বলবে তো?

এবার ষষ্ঠী নিজের মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলল, আমি হয়তো আর বাঁচব না দাদাবাবু। আমার মাথার ভিতর কী একটা হয়েছে দু'দিন থেকে। বাবামশাইকে বললুম তো হেসে উড়িয়ে দিলেন। ইদিকে আমার মাথার ভিতর খালি বেহালা বাজছে!

অবাক হয়ে বললুম, বেহালা বাজছে? সে আবার কী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই তো এখনও বাজছে।—ষষ্ঠী করুণ মুখে বলল।—মাঝে মাঝে বাজছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলুম কেউ কোথাও বেহালার বাজনা শিখছে। এ বাড়ির সব ফেলাট, আশেপাশের বাড়ির সব ফেলাট, খুব খোঁজাখুঁজি করেছি। শেষে বুঝতে পেরেছি আমার খুলির ভিতর বাজছে। আমার বড় কষ্ট দাদাবাবু!

হঠাৎ চমকে উঠলুম। এ কী! আমার মাথার ভিতরও যেন বেহালা বাজছে। এতক্ষণ খেয়াল করিনি। এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি, অত্যন্ত ক্ষীণ সুরে ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো কোঁ কোঁ করে বেহালা বাজছে। ষষ্ঠী আমার মুখের অবস্থা দেখে কী বুঝল কে জানে, ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে কফির পাত্র নিয়ে চলে গেল।

বড় ভাবনায় পড়ে গেলুম। কলকাতায় একেক সময় একেক রকম উদ্ভুট্টে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই বেহালা-রোগ নিশ্চয় সংক্রামক। ষষ্ঠীর হাতে কফি খাওয়ামাত্র আমাকে ধরেছে। দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলুম। মাথায় বারকয়েক গাঁট্টা মারলুম। তখন হঠাৎ অতিসূক্ষ্ম বেহালার সুরটা থেমে গেল।

কিন্তু একটু পরেই ফের শুরু হয়ে গেল মারাত্মক সেই বাজনা। কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ—অস্বস্তিকর হতচ্ছাড়া একটা সুর। আতঙ্কে আমার গলা শুকিয়ে গেল। এই সময় কোনার দিকে সিঁড়িতে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর্তনাদের সুরে চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের পরনে গার্ডেনিংয়ের পোশাক। হাতে খুরপি এবং সাদা দাড়িতে শুকনো পাতা। আমার দিকে দৃকপাত না করে সটান বাথরুমে ঢুকলেন। আমি মরিয়া হয়ে আবার মাথায় গাঁট্টা মারতে থাকলুম। বাজনাটা যেন কর্নেল আসার পরই বেড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য বেহালার ছড় ধারালো করাতের মতো আমার ঘিলুকে ফালা-ফালা করছে।

তারপর কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম।—জয়ন্ত কি ইদানীং বক্সিং শিখতে শুরু করেছ? আমার মনে হয়, নিজের মাথার চেয়ে এ ব্যাপারে বালি ভর্তি একটা বস্তাই উপযুক্ত জিনিস।

বোবা ধরা গলায় বললুম, বক্সিং নয়, বক্সিং নয়। মাথার ভিতর কী একটা কেলেঙ্কারি।

—অ্যাসপিরিন বড়ি খাও!

—না, না। বেহালার বাজনা। ওঃ! আমার মাথার ভিতর কেউ বেহালা বাজাচ্ছে!

কর্নেল আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। পর্দার ফাঁকে ষষ্ঠীচরণের মুণ্ডু দেখা যাচ্ছিল। সে বলে উঠল, বাবামশাইকেও ধরবে বেহালা রোগে। পেথমে আমাকে ধরল। তা'পরে কাগুজে দাদাবাবুকে ধরল। প্রিতিকার না করলে আপনাকেও ধরবে। তখন বুঝবেন কী কষ্ট!

কর্নেল ঘুরে চোখ কটমটিয়ে তাকালেন ওর দিকে। ষষ্ঠী মুণ্ডু সরিয়ে নিল পর্দার আড়ালে। তারপর কর্নেল আমার দিকে ঘুরে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, আপনি হাসছেন! পারছেন হাসতে? কোথায় ডাক্তার ডাকার ব্যবস্থা করবেন, তা নয়, মজা দেখছেন। ঠিক আছে। আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।

উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল এগিয়ে এসে আমার কাঁধে থাবা হাঁকড়ালেন। তারপর হিড়হিড় করে টেনে একটা একোয়ারিয়ামের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, ওটা কী?

হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। একোয়ারিয়ামের ভিতর একটি কালচে বাদামি রঙের জলচর জীব রয়েছে। দেখতে দেখতে বললুম, কাঁকড়া বলে মনে হচ্ছে।

—এই কাঁকড়াটির সঙ্গে তোমার এবং ষষ্ঠীর বেহালা-রোগের সম্পর্ক আছে।

—তার মানে?

কর্নেল আবার অট্টহাসি হেসে বললেন, দেখতে পাচ্ছ? কাঁকড়ার সামনে একটা লম্বাটে ঠ্যাং মুখের কাছে বেঁকে তিরতির করে কাঁপছে। জলে বুজকুড়ি ওঠাও তো দেখতে পাচ্ছ।

—পাচ্ছি। কিন্তু—

—একে বলে ফিডলার ক্র্যাব। বেহালা-বাজিয়ে কাঁকড়া।

সঙ্গে সঙ্গে ঘিলু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমিও হো হো করে হাসতে লাগলুম। পর্দার আড়ালে ষষ্ঠীরও খিক খিক হাসি শোনা গেল। ওই হতচ্ছাড়া কাঁকড়াটাই তাহলে বেহালা বাজাচ্ছে এমন সুরে!

কর্নেল একোয়ারিয়ামের দিকে ঝুঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, লক্ষ্য করো ডার্লিং, ফিডলার কাঁকড়ার দু'পাশের দুটো সাঁড়াশির মতো হাত কিন্তু একই গড়নের নয়। একটা ছোট্ট, অন্যটা বড়। এ এক সৃষ্টিছাড়া জীব। জীবজগতে যেসব প্রাণীর হাত আছে, তাদের দুটো হাতের গড়ন ও আয়তন একইরকম। শুধু ফিলডার কাঁকড়া ব্যতিক্রম। এক অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক।

আমরা সোফায় এসে বসলুম। কর্নেলের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। কর্নেল আমাকে হাত লাগাতে ইশারা করলেন। বললুম, ধন্যবাদ। জব্বর ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়েছি।

খেতে খেতে কর্নেল আবার ফিডলার কাঁকড়া নিয়ে পড়লেন।—ফিডলার কাঁকড়াকে অদ্ভুত বৈষম্যের প্রতীক বলেছি। কেন বলেছি, তার ব্যাখ্যা করতে হলে পদার্থ বিজ্ঞানের ল অফ প্যারিটি বা সাদৃশ্যের নিয়ম সম্পর্কে মোটামুটি কিছু ধারণা দরকার।

বেগতিক দেখে বললুম, কী দরকার আর? বেহালা-রোগ তো সেরে গেছে!

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না আমার কথা। বললেন, জয়ন্ত, পদার্থবিজ্ঞানীরা দেখছেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি যা কিছু সৃষ্টি করেছে, সবই যেন জোড়ায়-জোড়ায় করেছে। একটা অপরটার

ঠিক উল্টো। উপমা দিয়ে বলছি—যেমন কিনা, তোমার ডানহাত আর বাঁহাত। সাদৃশ্যের নিয়ম অনুসারে বলা যায়, প্রকৃতি কিছু জিনিস যেন ডানহাতের পাকে—তকলিতে পাক ঘুরিয়ে সুতো কাটার মতো আর কি, এবং কিছু জিনিস বাঁহাতের পাকে তৈরি করেছে। ইংরেজিতে একে বলে, নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট অ্যান্ড লেফটহ্যান্ড টুইস্ট। একটা অন্যটার উল্টো—যেমন দর্পণবিম্ব। দেখা যাবে, সব অসমানুপাতিক গড়নের জিনিসের দর্পণবিম্ব একেবারে উল্টো। যেমন আয়নার সামনে দাঁড়াও। দেখবে তোমার ডানহাত বাঁহাত হয়ে গেছে এবং বাঁহাত হয়ে গেছে ডানহাত। কিন্তু সমানুপাতিক গড়নের জিনিস—ধর একটা গ্লাস, আয়নার ভিতর একই রকম দেখাবে। উল্টো দেখাবে না। মজাটা হল, মানুষের হাত বা জলের গ্লাস এসব উদাহরণ নেহাত স্থূল উপমা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনেক অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের জিনিস পরীক্ষা করে দেখা গেছে এরকম দুটো জিনিস বাইরে-বাইরে দেখতে একই রকম, অথচ আণবিক গড়নে পরস্পর উল্টো। একটা যেন অপরটার দর্পণবিম্ব। ইংরেজিতে বলা হয়, মিরর ইমেজ। কিন্তু এখানেই বিপদ। কোনও জিনিস যদি তার ওই মিরর-ইমেজের মতো জিনিসের—তার মানে উল্টোসত্তার সংস্পর্শে আসে, সঙ্গে সঙ্গে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। ধ্বংসটা কী রকম তারাও উপমা দিই। ধর, একটা লাঠির গায়ে একটা দড়ি ডানপাকে ঘুরিয়ে জড়িয়ে রেখেছ। কিন্তু দড়িটা বাঁপাকে ঘোরালেই কী ঘটবে? দড়ি ও ছড়ি আলাদা হয়ে যাবে। এই হল নেচারস রাইটহ্যান্ড টুইস্ট আর লেফটহ্যান্ড টুইস্টের রহস্য।

কান ভোঁ ভোঁ করছিল। কর্নেল জলের গ্লাস তুলে নিয়ে জল খেতে গিয়ে হঠাৎ থামলে আবার শুরু করবেন ভেবে দ্রুত বললুম, বুঝেছি আপনি আসলে ম্যাটার অ্যান্টিম্যাটারের কথা বলছেন।

কর্নেল জল খেয়ে গ্লাসটা রেখেছেন, এমন সময় কলিং বেল বাজল। তারপর ষষ্ঠী এসে ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ডটাতে চোখ বুলিয়ে কর্নেল যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

কর্নেলের সঙ্গে যিনি ঢুকলেন, তাঁকে দেখে আমিও চঞ্চল হয়ে উঠলুম। কান্দ্রার নবাব মির্জা আজমল খানের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গত ডিসেম্বরে দিল্লিতে ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ প্রোকেটশন সোসাইটির সম্মেলনে। ভদ্রলোক একজন প্রখ্যাত ওরিন্থোলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষিবিজ্ঞানী। বোম্বের সালিম আলির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সালিমসায়েবও সেই সম্মেলনে এসেছিলেন।

মির্জাসায়েব অমায়িক এবং খেয়ালি প্রকৃতির মানুষ। কর্নেলের মতোই তাগড়াই ফর্সা, চেহারা। তবে কর্নেলের মুখে সাদা দাড়ি এবং এবং মাথায় প্রশস্ত টাক, মির্জাসাহেবের মুখে শুধু বিশাল গোঁফ, মাথা ভর্তি ঝাকড়া মাকড়া চুল। বয়সে দু'জনেই অবশ্য ষাটের ওধারে।

মির্জাসায়েব সোফায় বসেই ঘোষণা করলেন, আপনাদের নিতে এলুম।—বলে আমার দিকে ঘুরলেন।—হ্যাঁ, আপনাকেও। কারণ ভেবে দেখলুম, একজন সাংবাদিকেরও এসব বিষয়ে জড়িত থাকা উচিত।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, কীসব বিষয়ে বলুন তো?

—বলছি। বলে হঠাৎ মির্জাসাহেব মাথাটা জোরে নাড়া দিলেন। বললেন, আরে কী মুশকিল!

—কী হল মির্জাসাহেব?

—হঠাৎ মাথার ভিতর কী যেন—

—বেহালার বাজনা নয় তো?—বলে উঠলুম সঙ্গে সঙ্গে।

মির্জাসাহেব মাথাটা আবার ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! বেহালার বাজনার মতো মাথার ভিতর এ কী বিশ্রী উপদ্রব শুরু হল!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ফিডলার ক্র্যাব। ওই একোয়ারিয়ামে বসে বেহালা বাজাচ্ছে।

তাই বলুন! —কান্দ্রার নবাব হা হা করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন।...

ঘুঙুরপরা চোর!

কফিতে চুমুক দিয়ে মির্জাসাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, এখনও লোকে আমাকে মির্জানবাব বলে ডাকে। খাতিরও করে। কিন্তু নবাবি তো কবে ঘুচে গেছে। প্রিভিপার্স বাবদ বার্ষিক বৃত্তিও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। সেজন্য অবশ্য আমি মোটেই দুঃখিত নই। ধনসম্পদে আমার কোনওদিনও রুচি ছিল না। কিন্তু জিনিসটা আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত সম্পদ। বাজারে নিশ্চয় ওটার অনেক টাকা দাম। দামের জন্য নয়, একটা পারিবারিক ও বংশানুক্রম পবিত্র স্মৃতির প্রতীক বলেই আমার কষ্ট হচ্ছে।

কর্নেল বললেন, জিনিসটা বলতে কোনও রত্নের কথাই হয়তো বলছেন। সেটা কি চুরি হয়ে গেছে?

কান্দ্রার নবাব নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ। খুব রহস্যময় চুরি।

—কবে চুরি গেছে?

—গত ২৫ মার্চ রাত্রে। আমি তখন কান্দ্রা লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম। খবর পেয়েছিলুম হিন্দুকুশ থেকে এক ঝাঁক ভরত পাখি এসেছে। দু'দিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম। ২৬ মার্চ সকালে খবর পেলুম 'নুরে আলম' চুরি গেছে। নুরে আলম কথাটার মানে ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতি। এমন নামের কারণও ছিল। ওটা একটা অত্যাশ্চর্য রত্ন। বিস্তর জহুরিকে দেখানো হয়েছে। কেউ বলতে পারেনি ওটা কী। কালো রঙের পাথরের মতো দেখতে। অথচ আলো পড়লেই নীল লাল সাদা সবুজ হরেক রঙের রশ্মি ঠিকরে পড়ত আর সেই রশ্মিগুলো চর্কির মতো ঘুরত। একবার এক ধাতুবিজ্ঞানীকে দেখিয়েছিলুম। তিনিও চিনতে পারেননি ওটা কী ধাতু।

—হুঁ। কীভাবে চুরি গেছে?

—কান্দ্রা উপত্যকায় এই সময়টা মাঝরাতে পাহাড় থেকে একটা ঝোড়ো হাওয়া নেমে আসে। গ্রীষ্ম অব্দি এটা দেখা যায়। ২৫ মার্চ রাতে ঝড়টা যখন আসে, হঠাৎ বাড়ির সব আলো নিভে গিয়েছিল। ঝড়টা মিনিট কুড়ি ছিল। ওই সময় দারোয়ান একটা অদ্ভুত শব্দ শোনে। শব্দটা কতকটা ঘুঙুরের মতো। কেউ যেন পায়ে অসংখ্য ঘুঙুর বেঁধে ঝমঝম করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। বাবুর্চি কিসমত খাঁ বলেছে, সে অন্যরকম শব্দ শুনেছে। শিসের শব্দের মতো। তারপর—

—আগে বলুন, নুরে আলম ছিল কোথায়?

—আমার বেডরুমে দেয়ালে আঁটা আয়রনচেস্টের ভিতর। চোর সেটার একটা পাল্লা সম্ভবত গ্যাসের আগুনে—তার মানে, অ্যাসিটিলিনে গলিয়ে তরল করেছে। তারপর জিনিসটা হাতিয়েছে।

—দরজা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে?

—নিশ্চয় ছিল। তালা গলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল, দরজার বাইরে আমার এক পরিচারক কুদরত খাঁয়ের লাশ পড়ে ছিল। নিশ্চয় সে টের পেয়ে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, তার লাশ একেবারে পুড়ে ছাই! একদলা ছাই তুলে কবর দেওয়া হয়েছে।

—ছাই! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন।—পোস্টমর্টেম হয়নি?

—কীভাবে হবে? তবে একমুঠো ছাই পুলিশ দিল্লির ফরেন্সিক এক্সপার্টদের কাছে পাঠিয়েছিল, তাঁদের মতে, প্রচণ্ড ভোল্টের বিদ্যুৎ বয়ে গেছে কুদরত খাঁর শরীরে।

—বাজ পড়ে মারা গেলেও কিন্তু লাশ পুড়ে ছাই হয় না।

—হ্যাঁ। তাছাড়া ঘরের ভিতর বাজ ঢুকবে কীভাবে? বাজের তো ঠ্যাং গজায়নি।

আমি বললুম, শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মড়া পুড়িয়ে ছাই করা হয়। নিশ্চয় অতটা ভোল্টেজ না হলে কুদরত খাঁর দেহ ছাই হত না!

মির্জানবাব কফি শেষ করে বললেন, তাহলেই বুঝুন কেমন চোর!

কর্নেল একটু হেসে বললেন, বৈদ্যুতিক চোর!

মির্জাসায়েবের মুখে অবশ্য হাসি ফুটল না। উনি জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে কিছু বের করেছিলেন। ভাবলুম সিগারেটের প্যাকেট বের করছেন। কিন্তু তার বদলে বের করলেন কাগজে জড়ানো একটা চাকতির মতো জিনিস। মোড়ক খুললে দেখলুম, জিনিসটা একটা কালো রঙের চাকতি। আয়তনে রুপোর টাকার চেয়ে সামান্য বড়। চাকতিটার দু'পিঠেই সাদা আঁকজোক।

সেটা কর্নেলের হাতে দিয়ে কান্দ্রার নবাব বললেন, এই জিনিসটা কুদরত খাঁয়ের লাশের কাছে পড়েছিল। ফরেন্সিক টেস্ট করানো হয়েছে। ওঁরা বলতে পারেননি এটা কোনও ধাতু না পাথর। কোনও জৈব পদার্থও নয়। মোট কথা, এটা বিজ্ঞানীদের এ পর্যন্ত জানা কোনও পদার্থের মধ্যে পড়ে না।

কর্নেল উঠে গিয়ে তাঁর আতস কাচ নিয়ে এলেন। তারপর পরীক্ষা করতে করতে বললেন, উঁহু—এই আঁকজোকগুলো ফার্সি নয়। কী ভাষা কে জানে।

মির্জাসায়েব বললেন, কর্নেল, এই জিনিসটাকে কান্দ্রার লোকেরা বলে ওজরাকের পাঞ্জা।

কর্নেল মুখ তুললেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, ওজরাকের পাঞ্জা!

আমি অবাক হয়ে বললুম, ওজরাক। সে আবার কে?

কান্দ্রার নবাব বললেন, ওখানকার লোকে—বিশেষ করে পশুপালক গুজর উপজাতির লোকেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করে, কান্দ্রা উপত্যকার পশ্চিমের পাহাড়ে বাস করে ওজরাক নামে এক মায়াবী জাদুকর। তার নাকি উড়ান-খাটোলা বা উড়ন্ত খাটিয়া আছে। তাতে চেপে মাঝে মাঝে ওজরাক বেড়াতে যায় নক্ষত্রের দেশে।

হাসতে হাসতে বললুম, রীতিমতো রূপকথা!

কে কানে!—মির্জাসায়েব বললেন।—ওজরাক নাকি খেয়াল বশে কখনও তার পাহাড়পুরী থেকে নেমে আসে কান্দ্রা উপত্যকায়। যখনই আসে, এই পাঞ্জা ফেলে রেখে যায়। যেন জানিয়ে যায়, আমি এসেছিলুম।

—আপনি বিশ্বাস করেন এসব কথা?

মোটেও করি না। কিন্তু ২৫ মার্চ রাত্রে যখন লেকের ধারে তাঁবুতে ছিলুম, ঝড় ওঠার সময় দূর আকাশ থেকে একটা আলো নেমে আসতে দেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, উল্কা কিংবা কান্দ্রা অবজারভেটরির আবহাওয়া বেলুন। কে জানে কী!

—আর কারুর কাছে ওজরাকের পাঞ্জা আছে জানেন? দেখেছেন এমন পাঞ্জা?

—দেখেছি। গুজরদের সর্দার হালাকু একটা পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছিল। সেটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। দেখিয়েছিল আমাকে।

কর্নেল চাকতিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কান করে শুনি, বিড়বিড় করে বলছেন, ওজরাকের পাঞ্জা....ওজরাকের পাঞ্জা...ওজরাক...ওজরাক...

তারপর সোজা হয়ে বসলেন।—মির্জাসাহেব! এগুলো হরফ নয়। প্রতীক চিহ্ন। পাঁচটা করে আঁকা-বাঁকা সাদা রেখে আসলে বজ্রচিহ্ন।

এই বলে উনি হন্তদন্ত উঠে গেলেন বুকশেলফের কাছে। একটা প্রকাণ্ড বই টেনে পাতা ওল্টাতে থাকলেন। তারপর উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সোফায় ফিরলেন। বললেন, আমার স্মৃতিশক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত। প্রকৃত বার্ধক্যের লক্ষণ চুলদাড়ি সাদা হওয়া বা বয়স বেশি হওয়াতে নেই। যাই হোক, এই বইটা হল রিচার্ড কেলির লেখা 'এ শর্ট ওয়াক ইন দি কারাকোরাম অ্যান্ড হিন্দুকুশ।' পর্যটক কেলি ১৮৭৯ সালে কাশ্মীর, আফগানিস্তান আর পামির অঞ্চলে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ওই সময় তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে ওজরাকের পাঞ্জার কথা শোনেন। তবে তিনি জিনিসটা দেখেননি।

মির্জাসায়েব জিগ্যেস করলেন, ওজরাকের গল্পও তাহলে শুনে থাকবেন কেলি। লিখেছেন কিছু?

কর্নেল জবাব দিলেন, হ্যাঁ। কেলির মতে, ওটা স্রেফ রূপকথা।

কর্নেলের হাত থেকে পাঞ্জাটা চেয়ে নিলুম। দেখতে দেখতে বললুম, এটাকে পাঞ্জা বলার কারণ কী?

মির্জাসায়েব বললেন, পাঞ্জা এসেছে পাঞ্জ শব্দ থেকে। ফার্সি পাঞ্জ আর সংস্কৃত পঞ্চ একই শব্দ। কিন্তু পাঞ্জা বলতে বোঝায় হাতের পাঁচটা আঙুলের ছাপ। আগের দিনে বাদশারা কোনও হুকুমজারি করলে কিংবা সরকারি চিঠিপত্তর পাঠালে তাতে পাঁচটা আঙুলের টিপছাপ মেরে দিতেন। সই জাল করা যায়। কিন্তু আঙুলের ছাপ জাল করলে ধরা পড়বেই। কারণ প্রত্যেকটি মানুষের আঙুলের ছাপ আলাদা। এই কালো চাকতির পাঁচটা বজ্রচিহ্নকে কান্দ্রার লোকেরা ওজরাকের পাঁচ আঙুলের ছাপ বলে বিশ্বাস করে।

কর্নেল মন্তব্য করলেন, ওজরাকের পাঞ্জায় বজ্রচিহ্ন থাকার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ওজরাক বজ্রদেবতা।

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম, কর্নেল! ওজরাক শব্দটা বজ্রের অপভ্রংশ নয় তো?

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। কর্নেল বইটা রাখতে গেলেন শেলফে। রেখে এসে ফের বললেন, ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, ওইসব অঞ্চলের সব ভাষা ও উপভাষার উদ্ভব ঘটেছে একটা পুরনো ভাষা থেকে, যাকে বলা যায় ইন্দো-ইরানি মূল ভাষা। তাই ভারতীয় প্রধান ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে ওদের মিল দেখা যায় এত।

মির্জাসায়েব একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাষাতত্ত্ব থাক, কর্নেলসায়েব! আমার নুরে আলম চুরির ব্যাপারে কী করছেন বলুন!

কর্নেল অভ্যাসমতো চোখ বুজে দাড়িতে আঙুলের চিরুনি টানছিলেন। সেই অবস্থায় বললেন, ইদানীং দেশের বিভিন্ন জাদুঘর বা প্রত্নশালা থেকে বেশ কিছু ঐতিহাসিক রত্ন এবং মূর্তি চুরির হিড়িক পড়ে গেছে। না—কোথাও ওজরাকের পাঞ্জা পড়ে থাকতে দেখা যায়নি। তবে চুরির পদ্ধতি অনেকটা একরকম। অ্যাসিটিলিন প্রায়োগ করেছে চোর। সেই সঙ্গে আরও একটা মিল এখন দেখতে পাচ্ছি। চুরি হয়েছে দুপুর রাতে এবং....

হঠাৎ নড়ে বসলেন কর্নেল। চোখ খুলে বললেন, কী আশ্চর্য!

মির্জাসায়েব বললেন, কী ব্যাপার?

—ঝড় বা ঝোড়ো হাওয়া!

—তার মানে?

—প্রত্যেকটি চুরি হয়েছে গভীর রাতে এবং সেই সময় ঝড় বইছিল।

আমি বললুম, ঝড়ের সময় মওকা বুঝেই চোর এসেছিল হয়তো!

কর্নেল উঠে পায়চারি করতে করতে উত্তেজিতভাবে বললেন, শুধু ঝড় নয়, অদ্ভুত সব শব্দ। মির্জাসায়েব বলছিলেন, দারোয়ান যেন ঘুঙুরের শব্দ শুনেছে। প্রত্যেকটি চুরির রিপোর্টে এর উল্লেখ আছে। রক্ষীরা বলছে, যেন কোথায় ঝমর ঝম শব্দে ঘুঙুর বেঁধে কেউ নাচছিল।

আমি ও কান্দ্রার নবাব নিঃশব্দে দেখাদেখি করছিলুম পরস্পরের দিকে। বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

ওজরাকের ইন্দ্রজাল

কান্দ্রা উপত্যকার চারিদিকেই উঁচু সব পাহাড়। পূর্বদিকে একটা গিরিবর্ত্ম আছে, যার নাম 'হায়দার পাস', কান্দ্রার নবাবের পূর্বপুরুষের নামে। স্থলপথে কান্দ্রায় ঢুকতে হলে হায়দার পাস হয়ে যেতে হয়। কিন্তু শীতের দু-তিনটে মাস ওই গিরিবর্ত্ম বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ যুগে বিমানের দৌলতে কান্দ্রা যাতায়াতে আগের মতো বাধাবিপত্তি নেই। বারোমাসই যাতায়াত চলে শীতের সময়টা বিমানে বাকি সময় মোটর গাড়িতে।

এখন এপ্রিলে হায়দার পাস খুলে গেছে। কান্দ্রায় বসন্ত ঋতুর সমারোহ। তবে এই ভূস্বর্গ ভ্রমণে খুব কড়াকড়ি আছে সরকার থেকে। প্রতিরক্ষা দফতরের কড়া নজর পর্যটকদের দিকে। অবজারভেটরি, রেডার কেন্দ্র, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরি, বিমানবাহিনীর ব্যারাক এবং একটি বিমানক্ষেত্র—কান্দ্রা ভ্যালিতে এতসব ব্যাপার। কাজেই কড়াকড়ি থাকা স্বাভাবিক।

সম্প্রতি কান্দ্রা অবজারভেটরিতে যে টেলিস্কোপটি বসানো হয়েছে, সেটা এশিয়ার বৃহত্তম। অবজারভেটরির ডিরেক্টর ডঃ শীলভদ্র সোম কর্নেল এবং আমাকে ঘুরে-ফিরে সব দেখাচ্ছিলেন। কর্নেলের সঙ্গে ওয় পরিচয় আছে দেখে অবাক হইনি। আজকাল কর্নেলের কোনও ব্যাপারে অবাক হই না।

দেখাশোনা শেষ হলে ডঃ সোম আমাদের নিয়ে গেলেন তাঁর অফিস ঘরে। এখান থেকে কান্দ্রা উপত্যকার বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়ে। কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার ভিতর থেকে বললেন, ডঃ সোম ২৫ এবং ২৬ মার্চের অবজার্ভেশন্ রিপোর্টটা এবার দেখতে চাই।

কর্নেল ফাইলে মনোনিবেশ করলেন। ততক্ষণে কফি আর স্ন্যাক্স এসে গেল। নবাববাড়ি লাঞ্চ সেরে আমরা বেরিয়েছি। এখন প্রায় তিনটে বাজে।

কফি খেতে খেতে রিপোর্ট পাঠ শেষ করে কর্নেল মুখ তুলে একটু হাসলেন।—মাঝরাতের ঝড়টার কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল তাহলে!

ডঃ সোম বললেন, ছিল। ১০ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের ঝড়। সারা কান্দ্রা ভ্যালির পাওয়ার ফেল করেছিল অতক্ষণ। আমাদের অবজার্ভেটরির সব যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সূক্ষ্ম কিছু যন্ত্র একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। সেগুলো রিপ্লেস করতে হয়েছে। মেরামত করেও চালু করা যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, কসমিক ডাস্ট পাওয়া গেছে ছাদের ফুলগাছের পাতায় এবং খোলা ট্যাংকের জলে।

কসমিক ডাস্ট মহাজাগতিক ধূলিকণা!—কর্নেল সোজা হয়ে বললেন।

ডঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, যেন মহাজাগতিক ঝড়ের একটা বিক্ষিপ্ত প্রবাহ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে পড়েছিল সে রাতে!

কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, এখানকার রেডার স্টেশন কী বলে?

ডঃ সোম একটা ফাইল নিয়ে এলেন। চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ—রেডারে দশ সেকেন্ডের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে অজানা কোনও বিমানের সংকেত পাওয়া গিয়েছিল। তারপর সেটা রেডার-স্ক্রিন থেকে সরে যায় ডানদিকে—নিচে। এই দেখুন, গতিটা ধনুকের মতো বাঁকা দেখানো হয়েছে।

কর্নেল ফাইলটা নিয়ে কিছুক্ষণ চোখে বুলিয়ে বললেন, বিমানক্ষেত্রে ওইসময় কোনও বিমান নামেনি তাহলে?

—না। ওঁরা বলেছেন, প্রায়ই চীনা বিমান ভারতীয় এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং পালিয়ে যায়। এও কোনও উন্নতধরনের চীনা বিমান হওয়া সম্ভব। কারণ ম্যাগনেটিক ফিল্ডে প্রচণ্ড অভিঘাত ধরা পড়েছিল।

আমি বললুম, নবাব মির্জাসায়েব লেকের ধারে তাঁবু থেকে ওদিকে একটা আলো নামতে দেখেছিলেন!

ডঃ সোম চমকে উঠলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, উফো! আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট!

ডঃ সোম হাসতে লাগলেন।—ঠিক তাই! শুধু মির্জাসায়েব কেন, কান্দ্রা এলাকার লোকে প্রায়ই উফো দেখে। এসআরএল থেকে তদন্ত করে দেখা গেছে, কোনওটা আমাদের আবহাওয়াবেলুন, কোনওটা উল্কা, আবার কোনওটা চীনা গুপ্তচর বিমান অথবা কোনও স্পাইং ডিভাইস।

কর্নেল আবার ফাইলে চোখ রেখেছিলেন। বললেন, কান্দ্রা ভ্যালির পশ্চিম পাহাড় কি সত্যি দুর্গম, ডঃ সোম?

—ভীষণ দুর্গম। কোনও মানুষের পক্ষে ওই খাড়া গ্রানাইট দেয়াল বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়।

—প্লেনে?

—প্লেনের পক্ষে আজকাল অসম্ভব তো কিছুই নেই। কিন্তু তার ওধারে চীনের অসংখ্য ঘাঁটি আছে। তাই প্লেনে ওদিকে ঘোরাঘুরি নিরাপদ নয়।

—আপনি ওজরাকের কথা শুনেছেন, ডঃ সোম?

ডঃ সোম হাসতে হাসতে বললেন, ছেলে ভুলোনো রূপকথা!

—মির্জাসায়েবের পরিচারকের মৃতদেহ ছাই হওয়ার ব্যাপারে কী বক্তব্য?

ডঃ সোম গম্ভীর হয়ে বললেন, নবাববাড়িতে চুরি হওয়ার কথা শুনেছি। ওসব ব্যাপার পুলিশের এক্তিয়ারে পড়ে। তবে এটুকু বলতে পারি, চুরির সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাও জড়িত।

—কিন্তু সেজন্য যে প্রচণ্ড ভোল্টেজ দরকার, তা নবাববাড়ির ডোমেস্টিক লাইনে নেই।

—দেখুন কর্নেল, কোনওভাবে যদি আর্থ লাইন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অনেকক্ষেত্রে হেভি ভোল্টেজ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। আবার ট্রান্সফর্মার যে সাপ্লাই লাইনে এসেছে, তার আর্থ লাইন নষ্ট হলে ট্রান্সফর্মারও জ্বলে যায়। নবাববাড়ির পিছনেই একটা ট্রান্সফর্মার আছে। সেটা জ্বলে গিয়েছিল শুনেছি। কাজেই ডেডবডি ছাই হওয়ার মধ্যে অলৌকিক কিছু থাকতে পারে না। অনেক সময় সাপ্লাই লাইনে আর্থ লাইনের গণ্ডগোলের জন্য আলো প্রচণ্ড বাড়ে ও কমে—যাকে বলে ফ্লাকচুয়েশন! একবার আমার কোয়ার্টারেই এমন হয়েছিল। ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছিল। বাল্ব কেটে গিয়েছিল। টি. ভি. ফ্রিজ ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল উঠলেন।—চলি ডঃ সোম! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রয়োজনে আবার আপনাকে বিরক্ত করতে আসব।

অবশ্যই আসবেন।—ডঃ সোম করমর্দন করলেন কর্নেলের সঙ্গে তারপর আমার করমর্দন করে বললেন, জয়ন্তবাবু! আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আশা করি কাগজে লিখবেন।

ডঃ সোমের কাছে বিদায় নিয়ে যখন বেরুলুম, তখন কান্দ্রা উপত্যকায় বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর নেমেছে। পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা নেমেছে ঘুরে-ঘুরে। মির্জাসায়েবের গাড়িতে আমরা এসেছিলুম। ড্রাইভারের নাম বদর খাঁ। একখানে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে সে হিন্দিতে বলল, দেখুন সায়েব! ওজরাকের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—ওই দেখুন ওজরাকের দেশ! আজব জাদু দেখুন!

কর্নেল মুখ বাড়ালেন। আমি বললুম কই জাদু, বদর খাঁ?

বদর খাঁ বলল, পশ্চিমদিকে নজর দিন, সায়েব!

আমাকে গাড়ি থেকে নামতে হল। কারণ গাড়ির মুখ উত্তরে এবং কর্নেল বসেছেন বাঁদিকে, আমি ডাইনে। নেমে গিয়ে হতবাক হয়ে পড়লুম।

ওই পার্থিব সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর চুড়ো কোনওটা গির্জার মতো ছুঁচলো, কোনওটা পিরামিডের মতো ভিন্নকোনা। আর তাদের ফাঁকে গলিয়ে পিচকিরির মত রংবেরঙের আলোর দীর্ঘ দীর্ঘ ফালি উপত্যকার সবুজ সমভূমিতে নেমে আসছে। পাহাড়গুলোর কাঁধে ঘন নীল কুয়াশার আলোয়ান চাপানো যেন। কিন্তু বড় মায়াময় ওই রামধনুর মতো অথবা প্রিজমের মতো বিচ্ছুরিতবর্ণালী! এমন আশ্চর্য রঙের খেলা আর কখনও দেখিনি।

দেখতে দেখতে ওজরাকের ওপর যেন বিশ্বাস এসে গেল। ওখানে কোনও মায়াবী জাদুকর বাস করে, তা মিথ্যা নয়। তার খেয়ালি হাতের অপরূপ ওই ইন্দ্রজাল দেখে তারিফ করবে না সে কোন মূর্খ! আমি ভাবে গদ গদ হয়ে বললুম, অপূর্ব খাসা! কর্নেল, ওজরাককে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখেই নামিয়ে ফেললেন।—নাঃ! খালি চোখেই রঙের খেলাটা দেখা যাচ্ছে। তবে ডার্লিং। তুমি যতই বলো, এর মধ্যে কোন জাদু আমি দেখতে পাচ্ছি না। আশা করি, দার্জিলিঙের টাইগার হিল থেকে তুমি সূর্যোদয় দেখেছ!

আপত্তি করে বললুম, এটা সূর্যাস্ত। তাছাড়া কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা! কর্নেল, শুধু রঙিন আলো হলেও কথা ছিল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ওজরাকের জাদুপুরীও ক্রমশ ভেসে উঠেছে! ওই দেখুন, যেন রংবেরঙের সাতমহলা প্রাসাদ ভাসছে শূন্যে।

বদর খাঁ বিড়বিড় করে কী আওড়াচ্ছিল চোখ বুজে। এবার দু'হাতে মুখ ঘষে তাকে গাড়িতে ঢুকতে দেখলুম। বলল, চলে আসুন সায়েব! বেশিক্ষণ দেখলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। ওজরাক হল গিয়ে শয়তানের চেলা। শয়তানের কাছে জাদু শিখে মানুষকে ভোলায় সে। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হালাকুর মেয়ে ভেড়া চরাতে গিয়ে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল! জোর বেঁচে পালিয়ে এসেছে।

গাড়ি আবার এগোল। কর্নেল বললেন, বদর খাঁ! হালাকু থাকে কোথায়?

বদর খাঁ বলল, লেকের দক্ষিণে এখান থেকে ছ-সাত মাইল দূরে ওদের তাঁবু।

—সেখান গাড়ি করে যাওয়া যায় না বদর খাঁ?

—লেক অব্দি গাড়ি যাবে। তারপর আধামাইল পায়দল যেতে হবে।

—নিয়ে যাবে আমাদের?

বদর খাঁ হাসল।—হজুর নবাবসায়েবের হুকুম আছে। যেখানে যেতে চাইবেন, এ বান্দা সেখানেই নিয়ে যাবে। তবে গুজরদের তাঁবুর এলাকায় সাবধানে যেতে হবে, সায়েব! ওদের কুকুরগুলো বড্ড বেতমিজ।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, কুকুর বশ করার ব্যাপারে আমিও এক ওজরাক, বদর খাঁ!

রিয়া ও তার প্রতিবিম্ব

কান্দ্রা ও লেকের কাছে গাড়ি থামিয়ে বদর খাঁ বলল, একটু অপেক্ষা করুন আপনারা। গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখে আসি। আজকাল এ তল্লাটে খুব গাড়ি চুরি হচ্ছে।

সে একটু তফাতে উইলোঝোপের আড়ালে গাড়িটাকে এমনভাবে রেখে এল, রাস্তা থেকে ঠাহর হচ্ছিল না ওখানে কোনও গাড়ি আছে। গাড়িটার রংও অবশ্য ঘন সবুজ।

ফিরে এসে বদর খাঁ বলল, আপনাদের সঙ্গে টর্চ আছে তো? ফিরতে আঁধার হয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন, আছে। এমনকী কুকুর-বশ করা যন্ত্রও আছে!

বদর খাঁ খুব অবাক হয়ে পা বাড়াল। অবাক হলুম আমিও। নিশ্চয় রসিকতা করছেন কর্নেল। পাইনবনের ভিতর এখনই আবছা আঁধার জমেছে। পায়ে চলা রাস্তা ধরে বনটা পেরুলে খোলামেলায় পৌঁছলুম। এবার আর রাস্তার চিহ্ন নেই। এখানে-ওখানে পাথরের বোল্ডার পড়ে আছে। ঘন ঘাসের জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সবখানে। তার মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা। এটা মোটামুটি একটা সমতলভূমি বলা যায়। পশ্চিমে পাহাড়ের সেই আলোর জাদু আর চোখে পড়ছে না। সূর্য একটা তিনকোনা চূড়ার আড়ালে নেমে গেছে। তাই সারা তৃণভূমির উপর পাহাড়ের বিশাল ছায়া নেমেছে। ঘাসের জঙ্গলের ভিতর গুজরদের তাঁবু চোখে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের খোঁয়াড় দেখা গেল। বেড়ায় ঘেরা বিশাল খোঁয়াড়ে অসংখ্য ভেড়া-ছাগল-দুম্বা জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কর্নেল আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছিলেন।—ওই দেখছ—ওটা ওক। ওইটে হল বুনো আখরোট। ওগুলো পপলার। আর ওই গাছটা লক্ষ্য কর—মালবেরি। যাকে বলে তুঁতফলের গাছ।

হঠাৎ বদর খাঁ থমকে দাঁড়াল। আঁতকে ওঠা গলায় বলল, কুকুর সায়েব! কুকুর আসছে!

চমকে উঠে দেখি, খোঁয়াড়ের দিক থেকে তিনটে তাগড়াই কুকুর জিভ বের করে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে। আমি পকেট থেকে ঝটপট রিভলভার বের করতেই কর্নেল বললেন, আঃ! কী করছ জয়ন্ত! রিভলভার লুকিয়ে ফেলো শিগগির।

বলে উনি সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে একটা কাচের টিউব বের করলেন। কুকুর তিনটে যখন প্রায় হাত দশেক তফাতে এসে গেছে, তখন সেই টিউব বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে এবং ছিপি খুলে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে কুকুরই থেমে গেল। মুখ নিচু করে কেঁউ কেঁউ শব্দ করতে থাকল। কর্নেল হাসতে হাসতে একটুখানি এগিয়েছেন, আর তিনটে, কুকুরই লেজ গুটিয়ে কুঁকড়ে পিঠটানা দিল। বদর খাঁ খ্যা খ্যা করে হেসে কুকুর তিনটেকে দুয়ো দিতে থাকল।

অবাক হয়ে বললুম, ব্যাপারটা কী কর্নেল?

কর্নেল মুচকি হসে পা বাড়িয়ে বললেন, আমার সাম্প্রতিক উদ্ভাবন। এর নাম দিয়েছি ফরমুলা-ডগ। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে উনিশরকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে এটা তৈরি করেছি। এর এমনই উৎকট গন্ধ যে কুকুর কেন, কেঁদো বাঘও কেঁচো হয়ে পালিয়ে যাবে। অবশ্য মানুষের উপর এখনও পরীক্ষা করিনি। এখনই করা যেতে পারে।—বলে টিউবটা আমার দিকে ঘোরালেন।

গন্ধ পেলুম কি না জানি না, আঁতকে উঠে নাক বন্ধ করে পিছিয়ে এলুম। —দোহাই কর্নেল! এই কুকুর তাড়ানো ফরমুলা-ডগ প্রয়োগের জন্য আরও মানুষ পাবেন।

কর্নেল ছিপি এঁটে টিউবটা প্যাকেটের ভিতর চালান করলেন। বদর খাঁ নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে বলল, বহৎ বদ বু নিকালতা।

গুজরদের তাঁবুতে ততক্ষণে কুকুরের ব্যাপারটা ওরা টের পেয়ে গেছে হয়তো। একদঙ্গল লোক বেরিয়ে আমাদের দেখছে। বদর খাঁ চেঁচিয়ে ডাকল, হালাকু! হালাকু! জলদি ইধর আও। কলকাত্তাসে সাবলোগ তুমহারা মুলাকাত মাংতা।

একজন প্রৌঢ় তাগড়াই গড়নের লোক ভিড় থেকে আমাদের দিকে দৌড়ে এল। তার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, পরনে ঢিলে কোর্তা আর শালোয়ার। পা অবশ্য খালি। সেলাম দিয়ে বদর খাঁ-র দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বদর খাঁ বলল, নবাববাহাদুর এঁদের পাঠিয়েছেন। এঁরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

গুজর সর্দার আমাদের খুব খাতির দেখিয়ে তাঁবুতে নিয়ে গেল। তাঁবুগুলো চামড়া সেলাই করে তৈরি। কোনওটার উপর তেরপলও চাপানো হয়েছে। খোলা জায়গায় উনুন পেতে মেয়েরা রাতের রান্নায় ব্যস্ত। কেউ চাপাটি বানাচ্ছে। কেউ প্রকাণ্ড পাত্রে দুধ জাল দিচ্ছে। ভিড় হটিয়ে হালাকু চামড়ার আসন পেতে আমাদের বসাল। আশেপাশে কোথাও কুকুরের লেজের ডগটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে ওস্তাদ। হালাকু সর্দারের সঙ্গে খোশগল্প জুড়ে দিয়েছেন। হালাকু ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছে। আমরা নবাববাহাদুরের মেহমান শুনে সে একেবারে ভক্তিতে গদগদ। বলল, এবার শীতকালটা কান্দ্রায় এসে ভালই কাটল। যেখানেই ঘুরে বেড়াই, কান্দ্রার জন্য মন পড়ে থাকে আমাদের। পুরুষানুক্রমে কান্দ্রার নবাব আমাদের মা-বাপের মতো। এই যে ঘাসের জঙ্গল দেখছেন, তার মালিক ওঁরা। কোনও খাজনা কখনও দাবি করেননি। আমরা এসে তাই ভেট দিই। ছাগল ভেড়া, কখনও মাখন দুধ চর্বি—যা পারি দিই। তো নবাববাহাদুর কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, মিলিটারিদের দিয়ে এস। ওরাই নাকি এখন এই ঘাসের জঙ্গলের মালিক। আমি বিশ্বাস করি না, হুজুর।

কর্নেল বললেন, এবার গ্রীষ্মে কোথায় যাবে, সর্দার?

হালাকু বলল, পামির এলাকায় যাব। সেখানে চীনাদের রাজত্ব। সেখান থেকে যাব কাশগড়,

তারপর উত্তরে মাকরান। সেখানে হুজুর, রুশ মুল্লুক। সেখান থেকে আবার কান্দ্রায় ফিরে আসব। ওসব মুল্লুকে শীতের সময় খালি বরফ আর বরফ। জানোয়ার কী খেয়ে বাঁচবে?

কর্নেল বললেন, আমি তোমার কাছে এসেছি ওজরাকের কথা শুনতে। তোমার কাছে নাকি ওজরাকের পাঞ্জা আছে।

হালাকু চোখ বড় করে তাকাল। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দুর্বোধ্য ভাষায় কাউকে কী বলল, তারপর উঠে তার তাঁবুতে ঢুকল। একটা লোক ব্যস্তভাবে আমাদের সামনে একপাঁজা কাঠ এনে আগুন ধরাল। বেশ ঠাণ্ডা টের পাচ্ছিলুম। আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসলুম আমরা। তারপর হালাকু বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

তার হাতে সেই ওজরাকের পাঞ্জা। কর্নেলের হাত দিয়ে সে বলল, আমি খুব ভাবনায় পড়ে গেছি হুজুর। আজই ভাবছিলুম, পাঞ্জাটা যেখানে পেয়েছিলুম, ফেলে দিয়ে আসব নাকি। এটা আর কাছে রাখতে সাহস হচ্ছে না।

—কেন সর্দার?

হালাকু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, আমার মেয়ে রিয়া দু'দিন আগে ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল। খুব বেঁচে গেছে।

কথাটা বদর খাঁ বলেছিল। তখন অতটা গ্রাহ্য করিনি। তাই বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তো সর্দার!

হালাকু বলল, পশ্চিমপাহাড়ের নিচে একটা নহর আছে। লেক থেকে নহরটা বেরিয়ে পশ্চিমপাহাড়ের নিচে দিয়ে চলে গেছে। এখন নহরে অল্প একটু জল আছে। আমরা নহরের ওপারে কখনও যাই না। রিয়া সেটা জানে। তবে ওর দোষ নেই। আমায় একটা মদ্দা ভেড়া খুব বদমাশ। পাল থেকে প্রায়ই পালিয়ে যায়। সেটা নহরের ওপরে চলে গিয়েছিল। রিয়া সেটাকে ধরে আনতে গিয়েই ওজরাকের পাল্লায় পড়েছিল।

কর্নেল বললেন, তোমার মেয়ের মুখেই ব্যাপারটা শুনতে চাই সর্দার। তাকে ডাকো।

হালাকুর ডাকে একটি কিশোরী এগিয়ে এল। ছিপছিপে গড়ন, পাকা আপেলের মতো গায়ের রং। পরনে সালোয়ার-কামিজ। চুলে লাল একটা রুমাল বাঁধা। হালাকু তাদের ভাষায় কিছু বলল।

রিয়া কাঁচুমাচু হাসছিল। কর্নেল পকেট থেকে একটা চকোলেটের প্যাকেট বের করে বললেন, নাও রিয়া! এটা তোমার জন্য এনেছি।

হালাকুর ইশারায় রিয়া সেটা নিল। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে যা বলল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমাঞ্চকর। আমার তো বিশ্বাস করতেই বাধছিল। ঘটনাটা এই :

সেদিন বিকেলে বাধ্য হয়ে গাড়োলটার (মদ্দা ভেড়া) জন্য সে নহর (খাল) পেরিয়ে ওপারে গিয়েছিল। হঠাৎ সে দেখল কী, অবিকল তার মতো একটি মেয়ে একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। একই পোশাক, একই গড়ন। ভাল করে দেখার জন্য সে এগিয়ে গেল। তারপর ভীষণ অবাক হল। মেয়েটি হুবহু তার মতো দেখতে। আয়নার ভিতর নিজের মুখ তো সে দেখেছে। রিয়া গুজর মেয়ে। ভীতু নয় সে। রেগে গিয়ে বলল, তুমি কে?

মেয়েটিও গুজর ভাষায় বলল, তুমি কে?

রিয়া বল, আমি রিয়া।

মেয়েটিও বলল, আমি রিয়া।

—মিথ্যে বোলো না। তোমার বাবার নাম কী?

রিয়া পাথর তুলে তেড়ে যেতেই মেয়েটা যেন শূন্যে ছিটকে গেল। আকাশে ভেসে সে রিয়াকে যেন ভেংচি কাটতে লাগল। রিয়া পাথর ছুড়ল। মেয়েটি অমনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তখন রিয়া ভয় পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে এল নহর পেরিয়ে।...

রিয়ার মুখে আদিম সরলতা। তবু কথাগুলো সে বানিয়ে বলছে কি না বোঝা কঠিন। কর্নেল বললেন, হুঁ—আর গাড়োলটার কী হল?

জবাব দিল হালাকু।—রিয়ার মুখে এসব শুনে আর গাড়োলটার খোঁজে যেতে আমরা সাহস পাইনি! সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। পরদিন সকালে দলবেঁধে শিঙ্গা, ঢোল এসব নিয়ে সেখানে গেলুম। নহরের ধারে ওজরাকের পুজো দিলুম। আগুনে ঘি আর ভেড়ার রক্ত দিয়ে পুজো দেওয়ার নিয়ম। পুজো দিয়ে সাহস করে নহরের ওপারে গেলুম। বেশিদূর যেতে হয়নি। গাড়োলটা ঘাসের ভিতর মরে পড়েছিল। কিন্তু হুজুর, তাজ্জব ব্যাপার—যেই মরা জানোয়ারটাকে ওঠাতে গেছি, দেখি কী, পুরোটাই ছাই!

কর্নেল, আমি ও বদর খাঁ একসঙ্গে বলে উঠলুম, ছাই!

—হ্যাঁ—একদলা ছাই। অথচ দেখে বোঝার উপায় ছিল না। যেমনকার চেহারা, লোমের রং তেমনি ছিল। কিন্তু হাত ঠেকাতেই ছাই হয়ে গেল। আমরা ভয় পেয়ে পালিয়ে এলুম। গুজরাক বড় জাদুকর, হুজুর! সে তো মানুষ নয়, সে হল পরীদের রাজা। পশ্চিম-পাহাড়ে আছে পরীস্তান। তার বাস সেখানেই। চিরকাল তার কথা শুনে আসছি আমরা।

বদর খাঁ মন্তব্য করল, ওজরাক তাহলে একজন জিন। কেতাবে জিনের কথা আছে বটে।

ওজরাকের আবির্ভাব

নবাবপ্রাসাদের ডাইনিং হলে ডিনার খেতে খেতে কর্নেল হালাকুর মেয়ে রিয়ার ঘটনাটা মির্জাসায়েবকে শোনাচ্ছিলেন। মির্জাসায়েব বললেন, এবার মনে হচ্ছে ওজরাকের ব্যাপারটা হয়তো রূপকথা নয়। একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই আমি জিন বিশ্বাস করতে বাধ্য। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, খোদাতালা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের মতো জিনকেও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য জিনের সৃষ্টি আগুন থেকে। তারা আকাশের অন্য একটা স্তরে বাস করে। আমার ধারণা, এর মধ্যে একটা তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আধুনিক বিজ্ঞান অন্য গ্যালাক্সিতে পৃথিবীর মতো গ্রহ এবং প্রাণী থাকার সম্ভাবনা অস্বীকার করে না। ইসলামি শাস্ত্রে উল্লিখিত আগুনের দেহধারী জিন কি তাহলে অন্য কোনও গ্রহের উন্নত কোন জীব? মুসলিম লোকশাস্ত্রে বলা হয়েছে, জিনরা পুরুষ। পরীরা হল তাদেরই স্ত্রীজাতি। জিন-পরীর ছটা লেগে নাকি মানুষের মারাত্মক অসুখ হয়। তার মানে, বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও অজ্ঞাত গ্রহের ওইসব প্রাণীদের শরীর আলোর কণিকা দিয়ে হয়তো তৈরি। তা থেকে যে রশ্মি ঠিকরে পড়ে, পৃথিবীর মানুষের পক্ষে তা ক্ষতিকর। তাই তাদের সংস্পর্শে গেলে মানুষ দুরারোগ্য অসুখ-বিসুখে ভুগে মারা পড়ে। আপনার কি মনে হয় কর্নেল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, পবিত্র কোরান আমিও পড়েছি মির্জাসায়েব! অবশ্য ইংরেজি অনুবাদে। কোরানে ঈশ্বর বলেছেন : আমি মানুষ ও জিন সৃষ্টি করেছি। তাছাড়া ১৮টি ব্রহ্মাণ্ড বা গ্যালাক্সির কথাও কোরানে বলা হয়েছে।

মির্জাসায়েব উৎসাহে চঞ্চল হয়ে বললেন, তাহলে দেখুন, আধুনিক বিজ্ঞানেও—

আমি ওঁর কথা কেড়ে বললুম, মহাভারত এবং রামায়ণেও বিস্তর ব্যাপার আছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যায়। যেমন, সৌরভ নগরী—যা মহাকাশে ভাসমান এক পুরী। কৃত্রিম উপগ্রহ নয়? তারপর নারদের বাহন ঢেঁকি। রকেট ছাড়া আর কি হতে পারে? ঢেঁকির সঙ্গে রকেটের গড়নের আশ্চর্য মিল! তারপর পুষ্পক রথ হল বিমান। মহাভারতের যুদ্ধের বর্ণনা পড়লে তো মনে হয় পারমাণবিক অস্ত্রের লড়াই।

কর্নেল বলে উঠলেন, ডার্লিং, আমরা হয়তো দানিকেনের আজগুবি তত্ত্বের দিকে এগোচ্ছি। মির্জাসাহেব, বরং শাস্ত্র-পুরাণ থাক আপাতত। আপনার হতভাগা পরিচারক কিংবা হালাকুর পালছাড়া গাড়োল জিনের বাদশা ওজরাকের সংস্পর্শে এসে ছাই হয়ে গেছে কি না এখনও প্রমাণ

পাইনি। ক্রমশ আমার মাথায় একটা চিন্তা ভেসে আসছে। কেউ কি লেসার রশ্মি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে? কে জানে!

মির্জাসাহেব বললেন, কিন্তু, ঝড়, পাওয়ার ফেল, আকাশ থেকে অদ্ভুত আলো নেমে আসা, ঘুঙুরের মতো শব্দ, তীব্র শিস—

—ওজরাক যদি জিনই হয়, সে আপনার এবং দেশের পাঁচটা প্রত্নশালার ধাতুরত্ন ও মূর্তি চুরি কেন করবে, ভেবে পাচ্ছি না মির্জাসাহেব। জিন যদি সত্যি থাকে, তার বাস সম্ভবত বহু আলোকবর্ষ দূরের কোন ব্রহ্মাণ্ডে। ধরে নিচ্ছি, সে কান্দ্রার পশ্চিম পাহাড়ে এসে ঘাঁটি করেছে। কিন্তু প্রত্নদ্রব্য আর মূল্যবান রত্নে তার লোভ কেন হবে? এসব তো নেহাত পৃথিবীর জিনিস। এসবের চেয়ে মূল্যবান আর বিস্ময়কর জিনিস আশা করি অন্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহে বিস্তর আছে।

শুনেছি, জিনেরা খুব খেয়ালি। ওজরাকও নাকি খেয়ালি জাদুকর।

মির্জাসায়েব আনমনে বললেন।—তবে আমার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত নুরে আলম রত্নের কথা ভাবুন। এ রত্ন নিশ্চয় অন্য কোনও গ্রহের জিনিস। ধাতু-বিজ্ঞানীদের অজানা এ রত্ন। আমার মনে হচ্ছে ওজরাক এতদিনে হয়তো তা টের পেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। কে বলতে পারে, আমার পূর্বপুরুষদের কেউ এ রত্ন পশ্চিমের পাহাড়ে কুড়িয়ে পাননি। রত্নটা হয়তো ছিল ওজরাকেরই।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ওজরাক যদি জিন এবং মায়াবি জাদুকর, তাহলে রাত-দুপুরে তাকে চুরি করতে হয় কেন? মির্জাসায়েব, ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় যোগ বলে একটা ব্যাপার আছে। কাক এসে তালগাছে বসল এবং অমনি একটা তাল পড়ল এই দেখে কেউ যদি ভাবে, কাক এসে বসাই তাল পড়ার কারণ, তাহলে সে ভুল করবে। যোগাযোগটা আকস্মিক।

মির্জাসায়েব ভুরু কুঁচকে বললেন, তার মানে?

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, একটা কাজ আপনাকে করতে হবে। আপনি কালই প্লেনে দিল্লি চলে যান এবং খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিন : 'নুরে আলম' চুরি গিয়ে আপনি আপনার পূর্বপুরুষের সংগৃহীত বিখ্যাত কয়েকটি রত্ন আর রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। তাই নিলামে বেচে দিতে চান। নিলামে যাঁরা কিনতে চান, তাঁরা যেন এক সপ্তাহের মধ্যে যোগাযোগ করেন।

—সে কী! আর তেমন রত্ন কীই বা আছে? আমার পরলোকগতা স্ত্রীর কিছু জড়োয়া অলঙ্কার ছাড়া আর কিছু তো নেই! বলেছিলুম না? আমি এখন নামেই নবাব!

—সত্যি কিছু বেচতে হবে না মির্জাসাহেব। শুধু বিজ্ঞাপন দিতে বলছি।

আমি মুখ খুলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল এমন চোখ কটমট করে তাকালেন যে ঢোক গিলে থেমে গেলুম। মির্জাসায়েব বললেন, ঠিক আছে। তাই হবে।

কর্নেল বললেন, কাল সকালে আমরা হালাকুর অতিথি হয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসেই আপনি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমার ইচ্ছা দুটো দিন অন্তত গুজরদের সঙ্গে কাটাব।...

কিছুক্ষণ পরে অতিথিশালায় শুতে এসে কর্নেলকে বললুম, আপনি যাই বলুন, ওজরাক অন্য গ্রহের কোনও উন্নত স্তরের প্রাণী। মানুষেরই উন্নত সংস্করণ—সুপারম্যান।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর বললেন, কেন ডার্লিং?

—রিয়ার প্রতিবিম্বের কী ব্যাখ্যা হতে পারে? আপনি আমাকে ল অফ প্যারিটি এবং মিরর-ইমেজতত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন সেদিন। ওজরাক মিরর-ইমেজ সৃষ্টি করতে জানে। ওই ঘটনা শোনার পর আমার অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের গল্পটা মনে পড়ছে। অ্যালিস যেমন আয়নার ভিতরকার দেশে গিয়েছিল, রিয়াও হয়তো তেমনি—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, উল্টো মানুষদের দেশ, বলো জয়ন্ত। আয়নার ভিতরকার মানুষে একেবারে উল্টো নয় কি? তার পিলে ডাইনে, লিভার বাঁয়ে, হার্ট ডানদিকে এবং তার চোখ, নাকের ফুটো, হাত, পা সবই উল্টো। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবিকল

উল্টো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আছে কোথাও—হুবহু প্রতিবিম্ব যেন। সেই এলাকায় গিয়ে পড়লে মহাকাশচারী তার মহাকাশযান সমেত উল্টো হয়ে যাবে, অথচ সে তা টের পাবে না। তারপর সে যখন তার নিজের বিশ্বে ফিরে আসবে, অমনি হবে সাংঘাতিক কাণ্ড। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সে তার যান-সমেত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোমাকে দড়ি ও ছড়ির উপমা দিয়েছিলুম। আশা করি মনে আছে!

বললুম, হ্যাঁ—ম্যাটার এবং অ্যান্টিম্যাটার পরস্পরের সংস্পর্শে এলে ধ্বংস হবে। কর্নেল! রিয়া বেচারি জোর বেঁচে গেছে বলা যায়। উল্টো-রিয়ার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই কী হত ভেবে দেখুন!

হুঁ, ঠিক তাই ঘটত। ওজরাক যেই হোক, খুব সাবধানী এবং কৌতুকপ্রিয়।—কর্নেল রাতের পোশাক পরতে ব্যস্ত হলেন। ফায়ারপ্লেসে আগুনের সামনে গিয়ে বসে ডাকলেন, এখানে এস ডার্লিং!

আরাম করে বসলুম আগুনের সামনে। বললুম, আচ্ছা কর্নেল, মিরর-ইমেজ বলুন বা উল্টো বস্তুই বলুন, বুঝলুম তার আণবিক গড়ন আপনার তত্ত্ব অনুসারে অসমানুপাতিক। কিন্তু তা অ্যান্টিম্যাটার কেন?

—কোনও অসমানুপাতিক আণবিক গড়নের বস্তুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ করা ইলেকট্রন অর্থাৎ পজিট্রনের সঙ্গে নেগেটিভ চার্জ করা প্রোটনের সন্নিবেশ ঘটলে সেটি অ্যান্টিম্যাটার হয়ে যায়।

—তাহলে তো ম্যাটারকে অ্যান্টিম্যাটারে পরিণত করা সম্ভব?

—হ্যাঁ—তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভব।

—বাস্তবেও সম্ভব হয়েছে বৈকি। রিয়ার প্রতিবিম্বের আর কী ব্যাখ্যা হয়? প্রকৃতির ডান হাত বাঁ হাতের লেখার কথা বলছিলেন। মানুষ তো প্রকৃতির বহু নিয়ম জেনে বিস্তর খেলা খেলতে পেরেছে। প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেনি কি মানুষ?

—হুঁ—তা তো হয়েইছে।

প্রকৃতির লেফট হ্যান্ড টুইস্টের নিয়ম ওজরাক জানে।

কর্নেল হাসলেন।—ওজরাকের প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি দেখে আশঙ্কা হচ্ছে, ডার্লিং! ওজরাক তোমাকে তুলে নিয়ে না যায়! সাবধান!

হাসতে হাসতে বললুম, নিয়ে গেলে খুশিই হব। পৃথিবীটা গলে পচে গেছে। এখানে আর থাকতেই ইচ্ছে করে না।

কর্নেল আগুনে আবার একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে হেলান দিলেন। চোখ বুজে রইলেন। আমি হাই তুলে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

নতুন জায়াগায় গিয়ে সহজে ঘুম আসে না। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। এ রাতেও তাই। চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করছিলুম। ঘুম আসছিল না। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখছিলুম, কর্নেল তখনও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছেন হেলান দিয়ে। চোখ বন্ধ। ওখানেই ঘুমচ্ছেন নাকি? অবশ্য ওঁর ঘুমের লক্ষণ হল নাক ডাকা। নাক যখন ডাকছে না, তখন ঘুমচ্ছেন না। চিন্তাভাবনা করছেন নিশ্চয়।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সেটা টের পেলুম। বাইরে চাপা শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ঝড় হচ্ছে নাকি? কান্দ্রা উপত্যকায় মাঝরাতে ঝড় আসে শুনেছি। তাহলে সেই ঝড়! কিন্তু ঘরের ভিতর এত অন্ধকার কেন? জানালার পর্দার মাথায় কাচের খানিকটা অংশ বাইরের আলো এসে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। তার ফলে ঘরের আলো নেভালেও ঘরের ভিতর আবছা সবকিছু দেখা যায়। কিন্তু বাইরে আলো নিভে গেছে। ঝড়ের শব্দটা বাড়ছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনও নিভে গেছে। টেবিলল্যাম্পের সুইচ টিপলেও আলো জ্বলল না। কর্নেলের নাক ডাকছিল। ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাক ডাকা থেমে গেল ওঁর। জড়ানো গলায় বললেন, কিছু না। ঘুমোও!

বললুম, ঝড় বইছে। পাওয়ার ফেল! আলো জ্বলছে না।

তারপর চমকে উঠলুম চাপা ঝমর-ঝম ঘুঙুরের শব্দে। এক লাফে কর্নেলের বিছানার কাছে গিয়ে ওঁকে ধাক্কা দিতে দিতে বললুম, ঘুঙুরের শব্দ হচ্ছে, ওই শুনুন!

এবার কর্নেল উঠে বসলেন। অন্ধকারে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। ব্যস্তভাবে বললেন, কী আশ্চর্য! টর্চটাও জ্বলছে না দেখি। জয়ন্ত, তোমার টর্চটা দেখো তো?

আমার বিছানা হাতড়ে টর্চ পেলুম। কিন্তু জ্বলল না। বললুম, আমার টর্চটাও যে জ্বলছে না!

কর্নেল বললেন, বেরিও না। জানালা খুলে দেখা যাক, ব্যাপারটা কী?

ঘুঙুরের শব্দটা সমানে শোনা যাচ্ছে। ঝমর ঝম ঝমর ঝম ঝমর ঝম...একজন নয়, যেন অসংখ্য নর্তক-নর্তকী স্টেজে উদ্দাম নাচ জুড়েছে। ঘুঙুরের আওয়াজ অবশ্য চাপা, যেন বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছে। কর্নেলকে জানালা ফাঁক করতে দেখলুম। তখন তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকাশ পরিষ্কার। ঝকমক করছে নক্ষত্র। অথচ জোরালো একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে শোঁ শোঁ শন-শন শব্দে। ঘুঙুরের শব্দটা কিন্তু বদ্ধ-ঘরের ভিতর যেমনটি শুনছিলুম, বাইরেও তেমনটি। ফিডলার কাঁকড়ার বেহালার বাজনা যেমন মাথার ভিতর বাজছে মনে হচ্ছিল, এও কতকটা তেমনি।

হঠাৎ অনেক দূরে একটা আলোর মতো জিনিস চোখে পড়ল। বললুম, ওটা কী কর্নেল?

কর্নেল জবাব দিলেন না।

আলোটা ভারি অদ্ভুত। মাটি থেকে সামান্য উঁচুতে ভাসছে। একটু পরে বুঝতে পারলুম, ওটা নিজেই আলোকিত। কিন্তু অন্য কোনও জিনিসকে আলোকিত করছে না। তাহলে ওটা নিশ্চয় আলো নয়।

অথচ ওটা যেন ঘুরছে। দেখতে কতকটা সিলিং ফ্যানের গোলাকার অংশটার মতো। ঘুরছে বলছি, কারণ ওটার গায়ে কিছু লাল নীল সবুজ হলুদ ফুটকি দেখতে পাচ্ছি এবং ফুটকিগুলো স্থান বদল করছে।

মিনিট তিনেক পরে অদ্ভুত আলোর মতো জিনিসটা উপরের দিকে উঠতে শুরু করল। অনেক উঁচুতে পৌঁছে স্থির হয়ে রইল আধ মিনিট। তারপর হঠাৎ একটা ছুড়ে মারা ডিসকাসের মতো কাত হয়ে বিদ্যুৎবেগে দূরে চলে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল নক্ষত্রের মধ্যে।

খেয়াল করে দেখি, ঝড়টা থেমে গেছে। ঘুঙুরের শব্দও নেই। তারপর প্লেনের শব্দ শুনতে পেলুম। কর্নেল বললেন, মনে হচ্ছে বিমানবাহিনীর বিমান এতক্ষণে ওটার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। যাই হোক, জয়ন্ত! তাহলে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হল আমাদের। অবশ্য উফো-দর্শনও বলা যায়। তুমি কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে দারুণ জাঁকালো একটি রিপোর্ট লিখবে, আশা করি।—বলে কর্নেল জানালা বন্ধ করলেন। অমনি বাইরে আলো জ্বলে উঠল।

বললুম, নিশ্চয় লিখব।—তারপর টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপলুম। আলো জ্বলল।

কর্নেল তাঁর বিছানায় গিয়ে চিত হলেন। বললেন, ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি। আমাকে আবার গোড়া থেকে সাজাতে হবে।

জিগ্যেস করলুম, কী?

—ওজরাক এবং ওইসব চুরিচামারি নিয়ে একটা থিওরি দাঁড় করিয়েছিলুম।

দরজায় টোকার শব্দ এবং মির্জাসায়েবের উত্তেজিত ডাকাডাকি শুনে দরজা খুলে দিলুম। মির্জাসায়েব হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, কর্নেল! কর্নেল! বড় তাজ্জব ঘটনা—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, সব দেখলুম, মির্জাসায়েব! বড় রহস্যময় ব্যাপার।

—আমার বড় ভয় ভয় করছে, কর্নেল! ওজরাক আবার কেন এসেছিল?

—এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে দুটো বা তিনটে দিন সময় দিন।

মির্জাসায়েবের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উনি আশ্বস্ত হতে পারছেন না।...

উল্টো-কর্নেলের পাল্লায়

সকালের ফ্লাইটে মির্জা নবাব দিল্লি গেলেন কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। আমরা বিমানঘাঁটিতে ওঁকে বিদায় দিয়ে ডঃ সোমের কোয়ার্টারে গেলুম। বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকল। সে আমাদের কান্দ্রা লেকে পৌঁছে দেবে।

ডঃ সোম বললেন, সাংঘাতিক ব্যাপার, কর্নেল। কাল রাতে উফো নেমেছিল। তাকে তাড়া করে যাচ্ছিল এয়ারফোর্সের একটা মিগ বিমান। সেটা পশ্চিমের পাহাড়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সম্ভবত কোথাও ভেঙে পড়েছে। আজ সকালে দুটো হেলিকপ্টার গেছে খুঁজতে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনি উফো বলছেন!

ডঃ সোমও হাসলেন।—প্রতিরক্ষাবিজ্ঞানী রামস্বরূপ ব্রহ্মের মতে নাকি অত্যন্ত উন্নত ধরনের চীনা বিমান। চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন আরোহীবিহীন বিমান। বহু দূরের ঘাঁটিতে বসে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে চালানো যায় এই ম্যাগনেটিক প্লেনকে। ডঃ ব্রহ্মের ধারণা, ভূপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের সংস্পর্শে এলেই স্বাভাবিক নিয়মে চুম্বকে চুম্বকে বিকর্ষণ ঘটে এবং বিপজ্জনক ঝড় সৃষ্টি হয়। পাওয়ার ফেল করে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

—আপনার মতামত কী?

ডঃ সোম দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলেন আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট। কারণ নিঃসংশয়ে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। অবশ্য 'উফো' বললেই সেটা অন্য গ্রহের মহাকাশযান বোঝায় না। শুধু বোঝায়, অজানা উড়ন্ত জিনিস।

কফি না খাইয়ে ছাড়বেন না ডঃ সোম। কথাবার্তার ফাঁকে কফি এল। কফি খেতে খেতে ফোন বাজল। ডঃ সোম ফোনে কিছুক্ষণ কথা বলে গম্ভীর মুখে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। বললেন, স্পেস রিসার্চ ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডঃ হোসেন ওজরাকের পাঞ্জা কুড়িয়ে পেয়েছেন।

কর্নেল ও আমি চমকে উঠলুম। কর্নেল বললেন, কোনও ডেডবডি?

—তা তো বললেন না! ছাদের সোলার প্যানেলের ভিতর পড়ে ছিল বজ্রচিহ্ন আঁকা চাকতি।

—কিছু চুরি গেছে কি?

ডঃ সোম আস্তে বললেন, এ এম ডি এস যন্ত্রটা কম্পিউটারসুদ্ধ উপড়ে নিয়ে গেছে চোর।

—জিনিসটা কী?

—অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশন সিস্টেম।

কর্নেল নড়ে বসলেন। আমি হকচকিয়ে গেলুম। কর্নেল বললেন, যন্ত্রটা আয়তনে নিশ্চয় ছোট ছিল? নইলে চোরের অসুবিধে হওয়ার কথা।

—খুবই ছোট। একটা পকেট-রেডিওর মতো দেখতে। তার কম্পিউটারের আয়তন আরও ছোট। একটা মাউথ-অর্গানের সাইজ।

ডঃ সোম উঠে দাঁড়ালেন।—ডঃ হোসেনের ওখানে যেতে হচ্ছে এখনই। আপনারা ইচ্ছে করলে আসতে পারেন আমার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, থাক্। বরং পরে একদিন গিয়ে আলাপ করব ওঁর সঙ্গে। আমার একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।...

বদর খাঁ কাল রাতের ঘটনা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে গাড়ি চালাচ্ছিল। জিনের বাদশা ওজরাকের ভয়ে সে তটস্থ। রাতে ওজরাকের উড়ন-খাটোলা নামতে দেখেছে অনেকে। তাই নিয়ে সারা এলাকা জুড়ে নাকি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ কেউ কান্দ্রা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাও নাকি ভাবছে।

লেকের কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে বদর খাঁ বলল, আপনারা কখন ফিরবেন সায়েব?

কর্নেল বললেন, পরশু সকালে ঠিক এই সময় তুমি গাড়ি নিয়ে চলে আসবে এখানে। আমরা এই চেনার গাছের তলায় তোমার অপেক্ষা করব।

বদর খাঁ গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমাদের দু'জনের পিঠেই ছোটখাট দুটো বোঁচকা। বিস্তর টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি। পাইন বনটা পেরিয়ে তৃণভূমিতে পৌঁছে গুজরদের কুকুরগুলোর কথা মনে পড়ল। কিন্তু দূর থেকে নজর রেখেও তাদের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পাচ্ছিলুম না।

ঘাসের মাঠে কয়েকটা ঘোড়া চরছে। খোঁয়াড়টা শূন্য। ভেড়া-ছাগল-দুম্বার পাল চরাতে নিয়ে গেছে গুজর রাখালেরা। তাঁবুর সামনে বুনো আখরোট গাছের তলায় কিছু মেয়ে মাখন তৈরি করছে। মাটির মাত্রে দুধ জ্বাল দিচ্ছে কেউ। বুড়োরা চামড়ায় নুন মাখিয়ে রোদে দিচ্ছে। হালাকু সর্দার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এগিয়ে এসে আমাদের সে অভ্যর্থনা করল।

হালাকু একটু তফাতে ওক গাছের তলায় একটা নতুন তাঁবু দেখিয়ে বলল, ওই আপনাদের ডেরা হুজুর। আশা করি, কোনও তকলিফ হবে না। যে নহরের কথা বলেছিলুম, সেটা পিছনেই। খুব পরিষ্কার জল পাবেন। আর পাখির কথা বলেছিলেন, নহরের ওখানে হরেকরকম হাড়ি পাখি দেখতে পাবেন। যত খুশি, ফোটো খিঁচুন—ওরা ভয় পায় না। নবাববাহাদুরও ওখানে এসে ডেরা পাতেন। গত মাসেও এসে কিছুদিন ছিলেন ওখানে।

তাঁবুটা ছাগলের চামড়া সেলাই করে তৈরি। কেমন একটা আঁশ গন্ধ। কর্নেল আমার মুখের ভাবে সেটা টের পেয়ে বললেন, ডার্লিং, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সয়ে যাবে।

সন্ধ্যার মতো দু-পাত্র টাটকা ছাগলের দুধ নিয়ে এল হালাকু। সঙ্গে মেয়ে রিয়া। হালাকু বলল, সায়েবদের খাতিরযত্নের ভার রিয়ার উপর। যা দরকার, একে বলবেন।

হালাকু কাল রাতের উড়ন-খাটোলা নামার গল্প করতে লাগল। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক কোন জায়গায় নেমেছিল বলতে পার সর্দার?

জবাব দিল রিয়া।—আমি জানি। আগের বারও সেখানে নেমেছিল।—বলে সে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

হালাকু অবাক হয়ে বলল, তুই কেমন করে জানলি?

রিয়া বলল, সেদিন সকালে পাল চরাতে গিয়ে পোড়া ঘাস দেখেছিলুম। তুমি আজকাল সব কথা ভুলে যাও। তাই শুনে তুমি বকাবকি করেছিলে না?

কর্নেল পাশে পড়ে থাকা একটা পাথরের উপর উঠে চোখে বাইনোকুলার রাখলেন। দেখতে দেখতে বললেন, হুঁ, রিয়া ঠিকই দেখিয়েছে। ওখানে মিলিটারি ভ্যান নিয়ে একদল অফিসার তদন্ত করতে এসেছে। আরে! ডঃ সোমও এসে গেছেন দেখছি। জোরালো তদন্ত হচ্ছে তাহলে।

নেমে এসে ফের বললেন, তাহলে এবেলা আর ওখানে যাওয়া হল না। সর্দার, বিকেলে তোমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে জায়গাটা দেখতে গেলে আপত্তি করবে না তো?

হালাকু একগাল হেসে বলল, হুজুর! মা-হারা একটি মোটে মেয়ে। তাকে আপনার জিম্মায় দিয়েছি! ইচ্ছে করলে টাউনে নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া শেখান, মেমসাব বানিয়ে দিন!

সে খুব হাসতে লাগল।

রিয়া গাল ফুলিয়ে বলল, আমি লেখাপড়া শিখব না। মেমসায়েবও হব না।

কর্নেল বললেন, তাহলে কী হতে চাও তুমি?

—কিছু না।

—বুঝেছি, মাঠে মাঠে জানোয়ারের পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াতেই তোমার ভাল লাগে।

রিয়া আস্তে বলল, খুব ভাল লাগে।

হালাকু বলল, ওর জন্ম হয়েছিল পামির এলাকার রিয়ায়। তাই ওর নাম রেখেছিলুম রিয়া। সেখানে এমনি ঘাসের মাঠ, হুজুর। ওই মুল্লুকে রিয়া কথার মানে ঝরনা।

রিয়ার সঙ্গে কর্নেলের খুব ভাব হয়ে গেল। আমার প্রতি তার লক্ষ্য কম। বুঝতে পারছিলুম, কর্নেলের দাড়িই ওকে বশ করে নিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লুম।

পিছনের নালাটা প্রায় ফুট তিরিশেক চওড়া। পাথরে ভর্তি। তার ফাঁকে ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জল বয়ে যাচ্ছে। একখানে ডোবার মতো গর্ত করে জল জমানো হয়েছে। কর্নেল কিছুক্ষণ পাখি দেখায় মন দিলেন। টেলিলেন্স লাগানো ক্যামেরায় ছবিও তুললেন প্রচুর। নালার দু'ধারে রংবেরঙের ফুলের ঝোপ। মনে হচ্ছিল, স্বর্গে চলে এসেছি। পাখির গান, ফুলের রং, গাছপালার সবুজ জেল্লা আর স্নিগ্ধ রোদ নিয়ে চারদিকে আশ্চর্য এক পবিত্র সরলতা। একঝাঁক পপলারের ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে যেতে যেতে যেন অর্কেস্ট্রার বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে।

তুঁতগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। কর্নেলকে দেখলুম নহরের বুকে পাথরে পা রেখে রেখে ওপারে চলে গেলেন। তারপর চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ঝোপের আড়ালে উধাও হলেন।

উধাও তো উধাও! ওপারে ঘাসের জঙ্গল প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু হয়ে দূরে পাহাড়ের গায়ে মিশে গেছে। যেন এক সবুজ সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ধূসর-নীল কঠিন শিলার উপর। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো উঁচু গাছের জটলা এবং কোথাও গ্রানাইট শিলার ঢিপি।

কর্নেলের ছাইরঙা টুপি একবারের জন্য চোখে পড়ল। বুঝলুম কোনও বিরল প্রজাতির পাখির পিছনে ধেয়ে চলেছেন। তার মানে এবেলার মতো ওঁর আশা বৃথা।

সিগারেট ধরিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মন দিলাম। কর্নেলের এমন বাতিকগ্রস্ত আচরণ নতুন দেখছি না। পপলারশ্রেণীর ভিতর বাতাসের অর্কেস্ট্রা বেড়ে গেছে ততক্ষণে। রঙিন ফুলগাছগুলো তালে তালে নাচ জুড়েছে। একসময় হঠাৎ আমার মাথায় উপর তুঁতগাছের ডালপালা থেকে একঝাঁক টিয়াপাখি বেসুরে চেঁচিয়ে উঠল এবং ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে গেল।

তারপরই বাঁদিকে কয়েক হাত তফাতে কর্নেলকে দেখতে পেলুম। কিন্তু এমন কেন দেখাচ্ছে ওঁকে? মুখে কেমন পাগলাটে হাসি। চোখ দুটো রাঙা। বললুম, অমন করে তাকাচ্ছেন কেন? কী হয়েছে?

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তেমনি পাগলাটে হাসি ঠোঁটে রেখে একটু এগিয়ে এলেন। অবাক হয়ে বললুম, কথা বলবেন তো? অমন করছেন কেন?

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে চুরুট বের করলেন। দৃষ্টি কিন্তু আমার দিকেই। চুরুটটা ঠোঁটে রেখে লাইটার ধরাচ্ছেন, সেই সময় লক্ষ্য করলুম, চুরুটটা বাঁহাতে বের করেছেন এবং লাইটার ধরাচ্ছেন, ডানহাতে।

এতকাল ওঁর অভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত আমি। ডানহাতে চুরুট নিয়ে বাঁহাতে লাইটার জ্বালেন। দ্বিতীয়বার খটকা লাগল ওঁর কপালের দিকে তাকিয়ে। ওঁর কপালে বাঁদিকে একটু কাটা দাগ আছে। কিন্তু এখন দেখছি দাগটা ডানদিকে।

দেখামাত্র আঁতকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলুম, কর্নেল! আপনি উল্টো মানুষ!

সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল অদৃশ্য। আমিও ঝোপজঙ্গল ভেঙে পাথরে আছাড় খেতে খেতে একেবারে তাঁবুর সামনে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়লুম। হালাকু দৌড়ে এসে বলল, কী হয়েছে হুজুর?

বললুম। কিছু না।...

আবার এক মৃতদেহ

ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় লাগল। বার বার মনে হচ্ছিল, ব্যাপারটা হয়তো আমি চোখ দিয়ে দেখিনি, মন দিয়ে দেখেছি। অর্থাৎ নিতান্তই দিবাস্বপ্ন! তুঁতগাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ বাতাসে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে অকারণ দিনদুপুরে ভূত দেখার মতোই উল্টো-কর্নেল দর্শনের কোনও মানে হয় না।

হালাকু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। একটু ধাতস্থ হওয়ার পর বললুম, তেমন কিছু না সর্দার! নহরের ওপারের জঙ্গলে বাঘের মতো কী যেন দেখলুম।

হালাকু হাসতে হাসতে বলল, এ মুল্লুকে শের কোথায় হুজুর? নিশ্চয় তাহলে বোজি কুহি দেখেছেন।

—বোজি কুহি? সে আবার কী জানোয়ার?

—বুনো পাহাড়ি ছাগল।

হালাকু নিশ্চয় আইবেক্সের কথা বলছে। সে কিছু ক্ষণ 'বোজি কুহি' নিয়ে বকবক করল। তারপর চলে গেল তাদের তাঁবুর দিকে। একটা গাছের তলায় ভেড়ার মাংস কাটা হচ্ছে। আমাদের সম্মানে গুজরদের ডেরায় আজ ভোজ দেওয়া হবে। রান্নাবান্নার আয়োজন চলেছে ওখানে। একটু পরে রিয়া এল সুন্দর নকশা আঁকা চীনা মাটির পাত্রে একগাদা শুকনো ফল নিয়ে বলল, ছোটসায়েব, বাবা এই ফলগুলো দিয়ে পাঠাল। বড়সায়েব এলে দু'জনে মিলে খাবেন আপনারা। রান্না হতে আজ বিকেল হয়ে যাবে কিনা!

থালাটা সে বাঁহাতে নামিয়ে রাখতেই আঁতকে উঠে বললুম, ও কী রিয়া! তুমি বাঁহাতে থালা রাখছ যে?

অপ্রস্তুত হয়ে সে ডানহাত ঠেকাল থালায়। মুখে কাঁচুমাচু হাসি।

তবু সন্দেহ গেল না। মায়াবি ওজরাক রিয়ার প্রতিবিম্বকে পাঠিয়েছে কি না বোঝা দরকার। বললুম, আচ্ছা রিয়া, তুমি কোন হাতে খাবার খাও?

রিয়া খুব অবাক হয়ে ডানহাতটা দেখাল। তখন সন্দেহটা চলে গেল। শুকনো ফলের থালাটা তাঁবুর ভিতর রেখে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। দৃষ্টি পশ্চিমে নহরের ওদিকে। কিছুক্ষণ পরে দূরে ঘাসের জঙ্গলে চলমান একটা ছাইরঙা টুপি দেখতে পেলুম। অমনি সতর্ক হয়ে উঠলুম।

টুপিপরা লোকটি ঘাসের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নহরের পাড়ে এল। হ্যাঁ, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তো বটেই। কিন্তু আসল, না জাল? প্রকৃত কর্নেল, না দর্পণবিম্ব কর্নেল? সিধে কর্নেল, না, উল্টো কর্নেল? ওজরাকের দেশের সীমান্তে এসে এবার থেকে পদে পদে সতর্ক থাকা দরকার।

নহর পেরিয়ে সিধে বা উল্টো কর্নেল হনহন করে এগিয়ে আসছেন। বুকে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার তেমনি ঝুলছে। প্রজাপতি-ধরা লাঠি ও জাল অবশ্য নিয়ে বেরোননি। ওকতলায় পৌঁছে হাসিমুখে যেই সম্ভাষণ করেছেন, হ্যালো ডার্লিং, অমনি পকেট থেকে রিভলভার বের করে গর্জে উঠেছি, হ্যান্ডস আপ!

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দু'হাত তুলে।

বললুম, একটু নড়লেই গুলি ছুড়ব। দাঁড়ান, আগে পরীক্ষা করি। তারপর—

—জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী আশ্চর্য!

সতর্কভাবে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে কপালের দাগটা দেখলুম। ঠিক বাঁদিকেই আছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। বললুম, চুরুট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিন।

কর্নেল হো হো হেসে হাত নামিয়ে বললেন, ডার্লিং, আমি উল্টো-টুল্টো নই। একেবারে সিধে। হুঁ, বুঝেছি। কিছুক্ষণ আগে ওই ঘাসের জঙ্গলে আমিও একজন উল্টো-জয়ন্তকে দেখে এলুম।

হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, বলেন কী!

—তুমি কোথায় উল্টো-কর্নেলকে দেখলে?

—ওই তো ওখানে!

কর্নেল পাথরটাতে বসে বললেন, উল্টো-তুমি একেবারে রাশিয়ান ব্যালে নাচ দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছ! ওঃ! সে কী নাচ তোমার। বলশয়ের স্টেজে অমন হংসনৃত্য নাচলে রুশ-নাচিয়েদের মাথা হেঁটে হয়ে যেত।

—উল্টো-আপনি কিন্তু বদ্ধপাগল!

—তা স্বাভাবিক। সিধে-আমির মধ্যে কিছু পাগলামি থাকা যখন সম্ভব!

—বাপস! মুখে পাগলাটে হাসি, চোখে পাগলাটে চাউনি!

ওজরাক যেই হোক, আমাদের নিয়ে তামাশা শুরু করেছে দেখছি। —কর্নেল চুরুট বের করে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে জ্বেলে নিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে ফের বললেন, আমার সব থিওরি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, জয়ন্ত! এতকাল অসংখ্য রহস্যের মোকাবিলা করেছি এবং অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে পেরেছি। কিন্তু এবার যে রহস্যের সামনে এসে পড়েছি, তার সম্ভবত কোনও পার্থিব ব্যাখ্যা নেই।

অবাক হয়ে বললুম, আপনি কি তাহলে জিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হলেন, কর্নেল?

—জানি না। সত্যি কিছু জানি না।

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুকে এমন হতাশাগ্রস্ত কখনও দেখিনি। সারা দুপুর তাঁকে ভীষণ গম্ভীর ও চিন্তাকুল দেখছিলুম। গুজরদের সামাজিক ভোজে গিয়ে উনি নামমাত্র আহার করলেন। প্রকাণ্ড চাপাটি, ভেড়ার মাংস, মধু, ছাগলের দুধ, শুকনো ফল—আয়োজনে কোনও ত্রুটি ছিল না। খাওয়ার পর উদ্দাম নাচগান শুরু করল ওরা। রিয়াও খুব নাচল। একফাঁকে আমরা দু'জনে কেটে পড়েছিলুম। তাঁবুতে একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর কর্নেল বললেন, ইচ্ছে ছিল রিয়াকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করব। কিন্তু আর সাহস করে ঝুঁকি নিতে পারছি না। চলো, দু'জনেই রওনা হই।

কথাটা বুঝতে পারলুম না। জিগ্যেস করেও কোনও জবাব পেলুম না কর্নেলের। শুধু মনে পড়ল, হালাকুকে কর্নেল সকালে বলছিলেন, রিয়াকে নিয়ে সেই 'উফো' নামার জায়গায় যাবেন।

মাইলতিনেক পাথুরে মাটি আর ঘাসের জঙ্গল ভেঙে যেখানে পৌঁছলুম, সেখান থেকে পূর্বে কান্দ্রা শহর এবং এসআরএল অবজারভেটরি ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যায়। পশ্চিমের পাহাড়ে আজও সেই আলোর অপরূপ নানা রঙের খেলা দেখা যাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, কালরাত্রে মনে হচ্ছিল উফো নামার জায়গাটা এতদূরে নয়। নেহাত চোখের ভুল। দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত, কতখানি জায়গায় ঘাস পুড়ে ছাই হয়ে গেছে?

প্রায় তিরিশ বর্গমিটার জায়গা কালো হয়ে আছে। কর্নেল সাবধান করে না দিলেও ওই ছাইয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতুম না। কর্নেল হাঁটু মুড়ে একপ্রান্তে বসে ছাই দেখতে দেখতে বললেন, সকালে ডঃ সোম এবং আর যাঁরা এসেছিলেন, অনেক ছাই তুলে নিয়ে গেছেন দেখছি। তেজস্ক্রিয়তা থাকাও হয়তো সম্ভব ছাইয়ের মধ্যে।

—তাহলে অত কাছে বসে আছেন কেন? উঠে আসুন।

কর্নেল একটু হাসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, থাকলেও সে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুব সামান্যই হবে। ক্ষতি করার ক্ষমতা হয়তো খুবই কম।

চারদিকে চক্কর দিয়ে এলেন কর্নেল। মনে মনে হিসেব কষে বললেন, উফোটা যদি চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন বিমানই হয়, আয়তনে খুবই ছোট। ব্যাস বড় জোর দশফুট—তার বেশি কিছুতেই নয়। তিনটে ঠ্যাং ছিল। ওই দেখ, তিনটে গর্ত। আকার কাল রাত্রে যা দেখেছি, কিছুটা কমলালেবুর মতো—ওপর ও নিচেটা চাপা।

—আমার তো মনে হচ্ছিল, ফ্যানের বডি-অংশটার মতো।

কতকটা তাই বটে।—কর্নেল ঘুরে পিছনে কী দেখছিলেন।—কী ওটা?—বলে এগিয়ে গেলেন। তারপর হেঁট হয়ে যে জিনিসটা কুড়িয়ে নিলেন, সেটা আমার পরিচিত। ওজরাকের পাঞ্জা!

কর্নেল পাঞ্জাটা দেখতে দেখতে বললেন, ডঃ সোমদের এটা চোখে পড়া উচিত ছিল।

পড়েনি কেন?

বললুম, ওঁরা চলে যাওয়ার পর ওজরাক হয়তো পাঞ্জাটা আপনার জন্য রেখে গেছে।

কর্নেল আমার রসিকতায় মন দিলেন না। পাঞ্জাটা পকেটস্থ করে বললেন, চলো তো, ওদিকটা দেখে আসি।

আমরা সিধে নাকবরাবর পশ্চিমদিকে হেঁটে চললুম। চূড়ায়-চূড়ায় সেই বিচিত্র বর্ণালী এখনও বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পিচকিরির ধারার মতো নেমে আসছে সবুজ তৃণভূমিতে। চোখ-ধাঁধানো ওই অপার্থিব ইন্দ্রজাল মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। মাইলটাক এগিয়ে সেই নহর দেখতে পেলুম। একটু দ্বিধা হচ্ছিল। অস্বস্তি জাগছিল। কিন্তু কর্নেলকে অনুসরণ করতেই হল।

নহরের ওপারে কিছুদূরে গিয়ে পাহাড়ের ছায়ার মধ্যে পৌঁছেলুম আমরা। আরও কিছুটা যাওয়ার পর চূড়ার বর্ণালী আর দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের সামনে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে কঠিন গ্র্যানাইট শিলার আকাশভেদী দেয়াল। নিচে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই পড়ে আছে। যুগ যুগ ধরে ভেঙে পড়েছে ওই দেয়ালের চাবড়া। সেগুলোর ভিতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল একখানে দাঁড়ালেন। তারপর বাইনোকুলারের সাধারণ লেন্সে আরও একটা লেন্স এঁটে দিলেন।

কিছুক্ষণ চূড়াগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, আশ্চর্য তো! এই পাহাড়ের কোনও চূড়াতেই একচিলতে বরফ জমেনি। এ তো অসম্ভব ব্যাপার! চারদিকের সব পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। শুধু এই অংশটায় বরফ নেই। অবাক লাগছে, ডঃ সোম এই বৈশিষ্ট্যের কথা তো বলেননি!

সূর্য কালো পাহাড়ের পিছনে নেমেছে। তাই চূড়াগুলোর শীর্ষরেখা রঙিন দেখাচ্ছে এবং আকাশেও খানিকটা জায়গা জুড়ে ছোপ পড়েছে।

সেদিকে তাকিয়েছিলুম তন্ময় হয়ে। হঠাৎ কোথাও গুলির শব্দ শোনা গেল কয়েকবার এবং কর্নেলের চাপা গলার ডাকে সম্বিৎ ফিরল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি আসছি। তুমি বরং বাঁদিকে—

দ্রুত বললুম, কোথায় যাবেন? চলুন, আমি যাচ্ছি।

—না। তুমি এখানে পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখো। কাউকে দেখতে পেলে কি না আমাকে বলো। ওদিকে লক্ষ রাখার জন্য তোমাকে এখানে থাকতে হবে।

মাথামুণ্ড বুঝলুম না। একা থাকতে আমার অস্বস্তিও হচ্ছিল। কিন্তু বরাবর ওঁর কথা মেনে চলেছি, এখনও মেনে নিলুম। ভেবে পেলুম না, কে এমন জায়গায় এসে গুলি ছুড়ছে? কেনই বা ছুড়ছে?

কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে পাথর ও ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ওঁর কথামতো একটা পাথরের আড়ালে বসে বাঁদিকে লক্ষ রাখলুম।

বসে আছি তো আছি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ জ্বালা করছে। দিন শেষের আবছায়া ক্রমে ঘন হয়ে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বইতে শুরু করেছে। কিন্তু কর্নেলের যেমন ফেরার নাম নেই, তেমনি বাঁদিকে তাকিয়ে এতক্ষণ কারুর টিকিটি পর্যন্ত চোখে পড়েনি। আঁধার জমে এলে অসহ্য লাগল। অস্বস্তিটাও বেড়ে গেল। এখন কর্নেল ফিরে এলে তিনি সিধে না উল্টো কর্নেল তাও বোঝা কঠিন হবে যে।

তাছাড়া একেবারে ওজরাকের এলাকায় এসে পড়েছি। খপ করে ধরে মহাকাশে কোনও অজানা গ্রহে নিয়ে গিয়ে ফেললে আর এর চিরচেনা পৃথিবীতে ফেরার চান্স নেই।

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। টর্চ জ্বেলে নাড়তে নাড়তে গলা ফাটিয়ে ডাকাতে লাগলুম, কর্নেল! কর্নেল।—সত্যি বলতে কী, এ ডাকাডাকি নেহাত আতঙ্কের চোটেই।

কোনও সাড়া এল না। আরও বারকতক ডেকে হঠাৎ মাথায় এল, কর্নেলের নিশ্চয় কোনও বিপদ ঘটেছে। এতকাল কত সাংঘাতিক বিপদ থেকে, এমনকী মৃত্যুর মুখ থেকে ওই বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন! আর আমি ওঁর বিপদের সময় আতঙ্কে পাগলের মতো কাণ্ড করছি।

পকেট থেকে গুলিভরা রিভলভার বের করে উনি যেদিকে গেছেন, সেদিকে এগিয়ে চললুম। এবার আমার মনে সাহস আর জেদ ফিরে এসেছে। ওজরাক হোক আর যেই হোক, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে ছাড়ব না।

কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের দেয়ালের ঠিক নিচে একখানে টর্চের আলো ফেলে চমকে উঠলুম। কেউ চিত হয়ে পড়ে আছে পাথরের উপর। বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি কর্নেল নন। অচেনা একজন লোক! চোখ বুজে নিস্পন্দ পড়ে আছে। পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট। মুখের গড়নে কাশ্মীরি বলেই মনে হচ্ছিল।

বেঁচে আছে কি না হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখার জন্য ওর ডান হাতটা যেই তুলতে গেছি, একমুঠো ছাই উঠে এল হাতে। ওমনি হাত ঝেড়ে পিছিয়ে এলুম। টর্চের আলো কমে এসেছে ততক্ষণে। ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে তাহলে। ভীষণ অসহায় বোধ করলুম। সেই সঙ্গে আতঙ্কটা আবার টেনে ধরল আগের মতো। এই হতভাগ্য লোকটিও নির্ঘাত ওজরাকের বলি! এখানে কেন এসেছিল সে? কর্নেলও কি এমনি ছাই হয়ে পড়ে আছেন কোথাও?

টর্চের আলো নিভিয়ে দিলুম। তারপরই একটু দূরে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলুম।—জয়ন্ত নাকি?

আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। বোবাধরা গলায় বললুম, আপনি কর্নেল তো?

—হ্যাঁ, ডার্লিং! তুমি যা ভাবছ, তা নই।

টর্চ নিভে গেল। তখন আমার টর্চ জ্বেলে দেখি, কর্নেল এবং একজন লোক এগিয়ে আসছে। কপালের কাটা দাগটা দেখে নিতে ভুল করলুম না। প্রকৃত কর্নেলই বটে। উত্তেজিতভাবে বললুম, এখানে একটা ডেডবডি পড়ে আছে। একেবারে ছাই হয়ে গেছে পুড়ে। অথচ চেহারা অবিকৃত, পোশাকও!

কর্নেল বললেন, দেখেছি। কিন্তু তোমার ভয় পেয়ে ছুটোছুটি চ্যাঁচামেচি করা উচিত ছিল না। জোর বেঁচে গেছ। তোমাকে ওখানে বসে থাকতে বলেছিলুম।

আঁধারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না যে! তাছাড়া আপনার দেরি দেখে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে। কাশিমসায়েব, আর এখানে নয়, চলুন। যেতে যেতে কথা হবে। হতভাগ্য বশির খাঁয়ের ডেডবডি ফেলে রেখে যেতে হচ্ছে, এটাই দুঃখ।

লাল আপেলের খপ্পরে

কাশিম খাঁ প্রতিরক্ষা দফতরের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন অফিসার। আর যে লোকটা পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে আছে, সেই বশির খাঁ তাঁরই একজন স্থানীয় এজেন্ট। বশির তাঁকে গোপনে খবর দিয়েছিল, পশ্চিম পাহাড়ের ওখানে কিছুদিন থেকে সন্দেহজনক লোকের গতিবিধি তার নজরে পড়েছে।

আসলে বশির ছিল 'ডাবল-এজেন্ট'। চীন ও পাকিস্তানের সাহায্যে একটি দেশদ্রোহী গোষ্ঠী কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র করার জন্য বহুদিন থেকে চক্রান্ত করছে। সেই গোষ্ঠীর সাংকেতিক নাম 'লাল আপেল'। বশির এদের কাছেও টাকা খেত।

গত রাত্রে 'উফো' নামের ফলে কান্দ্রা এলাকায় প্রতিরক্ষা দফতরের লোকেদের মধ্যে খুব উত্তেজনা ছিল। বশির এই সুযোগে কাশিম খাঁকে পশ্চিম পাহাড়তলিতে যেতে বলেছিল মিথ্যা খবর দিয়ে। সেখানে ওত পেতে বসে ছিল 'লাল আপেলে'র একজন ঘাতক।

কিন্তু তারপরই ঘটেছিল ভারি অদ্ভুত ঘটনা।

কাশিম খাঁ যখন বশিরের কথামতো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছেন, দেখলেন বশির পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁকে ইশারায় ডাকছে। এই রকমই অবশ্য কথা ছিল। কিন্তু কাশিম খাঁ ওর কাছে যাওয়ার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ দেয়াল ফুঁড়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বশির পড়ে গেল নিঃশব্দে। বিদ্যুতের ঝলকটা বড়জোর এক সেকেন্ডের জন্য।

কাশিম খাঁ থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর দেখলেন, বশিরের বাঁদিকে একটা পাথরের আড়াল থেকে একজন লোক পড়ি-কী-মরি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। তার মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে কাশিম খাঁ বুঝতে পেরেছিলেন লোকটা 'লাল আপেল'। তাই রিভলভার তাক করে গুলি ছুড়েছিলেন।

কাশিম খাঁর তাড়া খেয়ে সে লুকিয়ে পড়েছিল। এই সময় কাশিম খাঁ কর্নেলকে ছুটে আসতে দেখেন। দিন-শেষের আবছা আলোয় কর্নেলকে দেখে তিনি ভ্যাগিস চিনতে পেরেছিলেন। নইলে কর্নেলকে গুলি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

ততক্ষণে কাশিম খাঁ বশিরের মতলব বুঝতে পেরেছেন। কর্নেল এবং তিনি সেই 'লাল আপেলে'র ঘাতককে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু লোকটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি কর্নেলের খোঁজে সেখানে গিয়ে পড়ি।

কাশিম খাঁর রিভলভারের গুলি খেয়ে আমাকেও চিত হয়ে পড়ে থাকতে হত। ভাগ্যিস কর্নেল তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।...

গুজরদের তাঁবুতে ফিরে আসার পথে কর্নেল এই কাহিনি আমাকে শুনিয়ে বললেন, জয়ন্ত! ওজরাক যেই হোক, মারাত্মক লেসার রশ্মিকে অস্ত্র হিসাবে সে ব্যবহার করছে। তবে আমরা লেসার অস্ত্র বলতে যা বুঝি, তার চেয়ে উন্নতমানের এবং সাংঘাতিক তার অস্ত্র।

—কিন্তু বশিরের উপর তার রাগের কারণ কী?

কাশিম খাঁ হাসতে হাসতে বললেন, বশির কোনও বেয়াদপি করে থাকবে তার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন, আপনার জিপ তো লেকের কাছে। তাহলে কিছুক্ষণ আমাদের তাঁবুতে কাটিয়ে যান!

কাশিম খাঁ বললেন, আজ থাক, কর্নেল! দেরি হয়ে যাবে। এখনই ফিরে গিয়ে আমাকে এই ঘটনার রিপোর্ট দিতে হবে। তাছাড়া গুজরদের তাঁবুতে আমার যাওয়া ঠিক নয়। ওদের মধ্যেও 'লাল আপেলে'র চর আছে।

—বলেন কী!

—সেইরকমই খবর আছে আমাদের হাতে। আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।

একটু দূরে গুজরদের তাঁবুতে আলো দেখা যাচ্ছিল। কাশিম খাঁ বিদায় নিয়ে অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন। ভদ্রলোকের সাহসের প্রশংসা করতে হয়। এমন কাণ্ডের পর নার্ভ ঠিক রেখেছেন এবং অন্ধকারে ঘাসের জঙ্গল আর পাথরের দুর্গমতা পেরিয়ে অকুতোভয়ে কেমন হেঁটে গেলেন।

ওকগাছটা ফাঁকা জায়গায় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তলায় একটা কাঠ পুঁতে মশাল জ্বেলে বেঁধে রেখেছে হালাকু। পাথরটাতে বসে বোধ হয় আমাদের তাঁবু পাহারা দিচ্ছে সে। হাতে বল্লম।

আমাদের দেখে সেলাম দিয়ে বলল, খুব ভাবনায় ছিলুম হুজুর। যাকগে, দেওতাজির কৃপায় ভালয় ভালয় ফিরতে পেরেছেন।...

রাত এগারোটা অব্দি ওদের তাঁবুর ওদিকে নাচগান চলল। শুকনো ঘাসের উপর চামড়ার বিছানা আর বালিশে শুয়ে অনভ্যাসের দরুন ঘুম অসম্ভব ব্যাপার। কর্নেলের রীতিনীতি আলাদা; উনি গাছের ডালে শুয়েও নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারেন দেখেছি।

শুয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, খামোকা মির্জাসায়েবকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে পাঠালুম। একগাদা টাকা গচ্চা যাবে। নিশুতি রাতে নবাবী রত্নালঙ্কারের লোভে কোনও চোর আসবে না। আসলে আমি ওজরাককে ভুল বুঝেছিলুম।—ল অফ প্যারিটি....নেচারস লেফট হ্যান্ড টুইস্টের পদ্ধতি...

নাক ডাকার মধ্যে কর্নেল যেন ঘুমের দেশে যেতে যেতে প্রলাপ বকছেন। বিরক্ত হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

নাক ডাকা থামাল। বললেন, বলো ডার্লিং!

—কী শুধু ল অফ প্যারিটি-প্যারিটি করছেন! আসল ব্যাপারটা কী?

—মিরর-ইমেজ তৈরির কৌশল ওজরাক জানে।

—তা তো জানেই। সেটা আমি আর আপনি স্বচক্ষে দেখেছি দু'জনে। রিয়াও দেখেছিল।

আবার নাক ডাকতে থাকল কর্নেলের। আমার খোঁচা খেয়ে জড়ানো গলায় শুধু বললেন, জেরক্স মেশিনের মতো একটা ডুপ্লিকেটিং মেশিনই যথেষ্ট। তার সঙ্গে আই আর প্রোজেক্টর।

—কী বলছেন?

—ইমেজ রিফ্লেকশন প্রোজেক্টর।

—কর্নেল! প্লিজ! খুলে বলুন।

তালে তালে নাক ডাকতে থাকল। আর হাত বাড়িয়ে খোঁচা-খুঁচি করেও জাগাতে পারলুন না। শরীর তো নয়, পাথর।

তাঁবুর সামনে হালাকু আগুনের কুণ্ড জ্বেলে দিয়েছিল। এখনও আগুন জুগজুগ করছে। ওদের নাচগান থেমে গেছে। নিঃসাড় স্তব্ধ তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে রাতপাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কখনও ঘুম জড়ানো গলায় কুকুরগুলো ডেকেই চুপ করে যাচ্ছে। হালাকু যে কম্বল দিয়েছে, সেটা খুবই কর্কশ। ভেড়ার লোম দড়ির মতো পাকিয়ে তৈরি। তার উপর আঠা দিয়ে একরাশ পশম এঁটেছে। কিন্তু যত নরম হোক কিংবা গরম হোক, অস্বস্তিকর।

রাত বারোটার পর সেই পাহাড়ি ঝোড়ো হাওয়াটা শনশনিয়ে এসে গেল। ঘাসের জঙ্গলে ভূতুড়ে শব্দ হতে থাকল। আমাদের তাঁবুর মুখ পুর্বদিকে। ঝড়টা বইছে পশ্চিম থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁবুর তলা দিয়ে কনকনে বিচ্ছিরি হাওয়া ঢুকে তোলপাড় জুড়ে দিল। তাঁবুটাই মাঝে মাঝে উড়ে যাওার ভঙ্গি করছে। চুপচাপ কম্বলের ভিতর সেঁটে থাকলুম।

হঠাৎ খেয়াল হল, হালাকু বলে গেছে, কুণ্ডের আগুনটা যেন শোওয়ার আগে নিভিয়ে ফেলি। কারণ, রাতের ঝড়টা এলে অঙ্গার উড়ে ঘাসের জঙ্গলে পড়বে এবং আগুন ধরে যাবে।

পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখি, ঝড়ের ধাক্কায় প্রায় নিভে যাওয়া আগুন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এবং ফুলকি ছড়াচ্ছে চিড়বিড়িয়ে।

দেখামাত্র বেরিয়ে গেলুম। পাশেই জলভরা মাটির পাত্র আছে। পাত্র থেকে জল ঢেলে আগুনের কুণ্ডটা নিভিয়ে দিলুম। তারপর হেঁট হয়ে তাঁবুতে ঢুকতে যাচ্ছি, মাথার পিছনে খটাস করে আঘাত লাগল। প্রচণ্ড আঘাত। মাথা ঘুরে গেল। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল, তাঁবুর কাঠেই হয়তো ধাক্কা লেগেছে।

তারপর কী হয়েছে, জানি না।....

চোখ খুলে কিছু বুঝতে পারছিলুম না। একটা বদ্ধ পাথরের ঘর, ঢালুমতো এবড়ো-খেবড়ো তার ছাদ এবং একটা গোল ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। দু'জন লোক একপাশে

বসে ফ্লাস্ক থেকে চা বা কফি ঢেলে খাচ্ছে। তাদের মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পাশে দুটো স্টেনগান পড়ে আছে।

অমনি মনে পড়ে গেল 'লাল আপেল'-এর কথা। উঠে বসার চেষ্টা করলুম। কিন্তু মাথায় যন্ত্রণা। অনেক কষ্টে অবশ্য উঠতে পারলুম। লোক দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পাত্রে চুমুক দিচ্ছিল। একজন দুর্বোধ্য ভাষায় অপরজনকে কিছু বলল। অপরজন মাথা নাড়ল। তখন প্রথমজন ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে আমাকে বলল, এই বাঙালি বুড়বাক! তুই কি খবরের কাগজের লোক?

বললাম, হ্যাঁ। তোমরা আমাকে ধরে এনেছ কেন?

—তোকে আমাদের লড়াইয়ের কথা লিখে তোর কলকাতার কাগজে পাঠাতে হবে।

—কী লড়াই তোমাদের?

—কাশ্মীরের লোক চাই স্বাধীন কাশ্মীর। তাই তারা লড়াই করছে।

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, কাশ্মীরের লোক ভারতে থাকতেই চায়। কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। তাই স্বাধীনতার পর এতকাল ধরে তারা ভোট দিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো সরকার গড়ছে। স্বাধীন কাশ্মীর চাইলে তারা কেউ ভোট দিত না। ভোট বয়কট করত।

দ্বিতীয় লোকটি দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ভোট দিচ্ছে তারা বাধ্য হয়ে।

—তোমাদের সঙ্গে তর্ক কথার ইচ্ছে নেই। কারণ তোমরা মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয় লোকটি আমার চোয়ালে ঘুষি মারল। প্রথম লোকটি তাকে বাধা দিয়ে বলল, মেজাজ ঠিক রাখো দোস্ত। এই বুড়বাক। শোন। কাশ্মীরি বুড়বাকরাই ভোট দিচ্ছে। তুই আমাদের নায্য লড়াইয়ের কথা লিখে দস্তখস্ত করে দিবি। আমাদের লোক কলকাতায় তোর কাগজের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবে।

—আমি লিখলেও তা ছাপা হবে না।

দু'জনেই একটু অবাক হল। প্রথমজন বলল, কেন ছাপা হবে না? তুই তো তোর কাগজের রিপোর্টার! যা পাঠাবি, তাই ছাপা হবে।

—না হবে না। খবরের কাগজ যা খুশি ছাপতে পারে না।

দ্বিতীয় লোকটি খাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলেছিলুম দোস্ত, এভাবে কাজ হবে না! ওকে পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিই, চল। ওকে ছেড়ে দিলে উল্টে আমাদের বিরুদ্ধে লিখে সরকারকে খেপিয়ে দেবে।

প্রথম লোকটি কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ বের করে আমাকে দিল। ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজ। পড়ে আমার চক্ষুস্থির। আমি দৈনিক সত্যসেবকে খবর পাঠাচ্ছি : কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছি, তারা স্বাধীন কাশ্মীর চায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বুঝলুম, 'লাল আপেলের' উগ্রপন্থীরা রীতিমতো শিক্ষিত এবং চতুর লোক। সব খবর ওদের নখদর্পণে। প্রথম লোকটি বলল, দস্তখত করে দে!

কাগজটা ছিঁড়ে ওর মুখে ছুড়ে মারলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেও উঠে দাঁড়াল। সঙ্গীকে কিছু বলল। তারপর দু'জনে আমাকে হ্যাঁচকা টানে ওঠাল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

দরজার সামনে একটা চাতাল মতো। সেখানে গিয়েই আমার বুক কেঁপে উঠল। মাথা ঘুরতে থাকল। চারদিকে খাড়া সব পাহাড় এবং সামনে অতল খাদ। সেই খাদের নিচে অন্ধকার থমথম করছে।

তাহলে এবার নরকে গিয়ে রিপোর্টারি কর!—বলে দু'জনেই আমাকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল। গড়িয়ে পড়লুম শূন্যে। আর্তনাদ করলুম কি? জানি না। শুধু টের পাচ্ছিলুম অনন্তকাল ধরে শূন্য তলিয়ে যাচ্ছি এবং নিচে থমথমে অন্ধকার হাঁ করে আছে।...

স্বপ্ন কিংবা স্বপ্ন নয়

হঠাৎ কিসের ছোঁয়া লাগল। খুব আরামদায়ক নরম জিনিসে আটকে গেলুম, অথবা কোনও অলৌকিক বিশাল করতল আমাকে লুফে নিল। কোনও ঝাঁকুনি পর্যন্ত লাগল না।

আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালুম। একটা বিস্ময়কর পরিবেশ! এটা একটা ঘরই বটে। কিন্তু চারপাশের দেয়াল ও ছাদ অনুজ্জ্বল নানা রঙের আলো দিয়ে যেন তৈরি। এত রং, অথচ চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শূন্যে চিত হয়ে ভাসছি। পিঠের নিচে কিছু নেই।

আমার সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মানুষের গড়নের পুতুল। হ্যাঁ, পুতুলই বটে। সাদা কাচের পুতুল। তার সারা দেহে নানা রঙের আলোর স্রোত বইছে। তার পরনে কোনও পোশাক নেই, অথবা ওই হরেক-রঙা চঞ্চল আলোই তার পোশাক।

বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তার মুখটা পুতুলের মুখের মতো আঁকানো। চুলগুলো লাল। চোখ দুটো নীল। ঠোঁট দুটোও লাল। তার চোখের উপর ভুরু বলতে কিছু নেই। অথচ কী সুন্দর তার চেহারা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি ছবি।

সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলুম। পারলুম না। যতবার পা দুটো নিচের মেঝের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, আবার ভেসে উঠছি। এবার মনে হল, আমি ভরশূন্য অবস্থায় আছি সম্ভবত। মহাকাশযানের ভিতর মহাকাশচারীদের এমনি অবস্থা টিভিতে কতবার দেখেছি।

তারপর টের পেলুম, ওই রঙিন পুতুলের মতো প্রাণীটা আমাকে কিছু বলছে। তার ঠোঁট দুটো কিন্তু নড়ছে না। অথচ আমার মাথার ভিতর তার কথা ভেসে উঠছে অনুভূতিমালার মধ্যে দিয়ে। সে বলছে, তোমার কোনও ক্ষতি করব না। ভয় পেও না। আর দেখো, আমি তোমার সঙ্গে স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষায় কথা বলছি। তুমিও বলার চেষ্টা করো। আমি বুঝতে পারব। নাও, চেষ্টা করো।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। স্নায়বিক তরঙ্গের ভাষাটা আবার কেমন?

—বন্ধু! ব্রেনওয়েভের কথাই আমি বলছি। মনকে তোমার বক্তব্যের দিকে একাগ্র করতে হবে। তুমি যা বলতে চাইবে, তার সঙ্গে অন্য চিন্তাকে এনে ফেলো না। চেষ্টা করে দেখো, পারবে।

মনকে একাগ্র করে চিন্তার মধ্যে বললুম, তুমি কে, বন্ধু?

—ওজরাক।

চমকে উঠলুম।—তুমিই তাহলে ওজরাক!

আমার স্নায়ুতরঙ্গে ওজরাকের হাসি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। চিন্তা দিয়ে বললুম, আমাকে কোথায় এনেছ?

—আমার পৃথিবীর ঘাঁটিতে। কান্দ্রার পশ্চিম পাহাড়ে।

—আর কোথায় আছে তোমার ঘাঁটি?

—তোমাদের জানা গ্রহ বৃহস্পতিতে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—আলফা সেন্টোরির একটি গ্রহে। এখানে থেকে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরে। এ অবশ্য তোমাদের হিসাব। তোমাদের সময়ের মাপের সঙ্গে আমাদের সময়ের মাপের কোনও মিল নেই।

—তুমিই কি পাঞ্জা ফেলে রাখো যেখানে সেখানে?

—হ্যাঁ। তোমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টির জন্য। যদি কেউ যোগাযোগ করে, সেই ভেবে।

—কান্দ্রার নবাবের 'নুরে আলম' কি তুমিই নিয়ে এসেছ?

—হ্যাঁ, জিনিসটা আমারই। অসাবধানে পড়ে গিয়েছিল। একটা লোক কুড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের সময়ের হিসাবে এ ঘটনা দুশো বছর আগেকার। যাই হোক, পরে জানতে পেরে রোবট পাঠিয়ে নিয়ে এসেছি।

—আমাদের বিভিন্ন জাদুঘর থেকে যেসব রত্ন আর মূর্তি চুরি গেছে, তাও কী তোমার কীর্তি?

—আমারই।

—কেন এসব করেছ?

—ওগুলোর বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করব বলে। কাজ হয়ে গেলেই ওগুলো ফেরত পাঠাব।

—প্রতিবিম্ব কেন সৃষ্টি করবে?

—দেশে ফিরে গিয়ে সবাইকে দেখাব। কিছু নিদর্শন নিয়ে যাওয়া তো উচিত।

—কিন্তু এসআরএল থেকে অ্যান্টিম্যাটার ডিটেকশন যন্ত্র কেন নিয়ে এসেছে?

—দরকার হয়েছে। এ ধরনের জিনিস আজও আমরা তৈরি করতে পারিনি। তাই বহুবার অ্যান্টিম্যাটার গ্যালাক্সি—যাকে বলা যায় প্রতিবিম্ব সেখানে দৈবাৎ গিয়ে পড়ে আমাদের অনেকে ধ্বংস হয়েছে। আমাদের শরীর আলো-কণিকায় গড়া। কিন্তু অ্যান্টি-পার্টিকল নয়। আলফা-সেন্টোরি এলাকা এই গ্যালাক্সিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে তোমাদের যন্ত্রটার বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে ফেরত পাঠাব রোবটের হাতে। অন্যের জিনিস আমরা নিই না। নিলে তা ফেরত দিই। রোবট এনেছি সেইজন্যই।

তোমরাও তাহলে রোবট তৈরি করেছ?

—বন্ধু! আমার একই গ্যালাক্সির প্রাণী। পরিবেশের দরুন আমাদের দেহের উপাদানে যতই তফাত থাক, একই গ্যালাক্সিতে একই ধরনের সভ্যতার বিকাশ ঘটবে, এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তবে তোমরা এখনও পিছনে পড়ে আছে। আমাদের যন্ত্র-প্রাণী তোমাদের চেয়ে বহু উন্নত।

—তোমাদের খাদ্য কী?

—এনার্জি। নক্ষত্র থেকে এনার্জি সংগ্রহ করে আমাদের খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে।...তুমি হাসছ কেন বন্ধু?

—রিয়ার, আমার আর আমার বৃদ্ধ বন্ধুর প্রতিবিম্ব পাঠিয়েছিলে কেন?

—কৌতুক ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না।

—বশির খাঁকে মারলে কেন?

—আমার রোবটের পাল্লায় পড়েছিল। ওর নাম বুরাখ। বুরাখ এই ঘাঁটি পাহারা দেয়। ও যাকে ছোঁয়, সে মারা পড়ে। পৃথিবীতে এসে বুরাখ বড় নিষ্ঠুর আর বদরাগী হয়ে গেছে। ওকে সামলানো যাচ্ছে না।

—রিয়াদের মদ্দা ভেড়াটা কী দোষ করেছিল?

—বুরাখ গাড়োলটা দেখে অবাক হয়েছিল। তাই ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল।

—বুরাখের পায়ে কি ঘুঙুর বেঁধে রেখেছ?

—সে আবার কী জিনিস? ওটা যন্ত্রের শব্দ। আমার স্পেসশিপের মতো বুরাখও ম্যাগ্নেটিক এলিমেন্টে তৈরি।

—আমাকে উদ্ধার করল কে?

—বুরাখ। আমার হুকুমে।

—আমি পুড়ে ছাই হইনি যে?

—আমি ওর ধ্বংস-ক্ষমতা নিউট্রাল করে দিয়েছিলুম।

—আমাকে কী বন্দি করে রাখবে, বন্ধু?

—না। তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর তোমাকে রেখে আসব।

বলে ওজরাক পিছনের আলোর দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। এতক্ষণে আমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে থাকল। আবার চোখ বুজে এল। চেষ্টা করেও চোখ খুলতে পারলুম না। শূন্যে ভাসার আরামদায়ক অনুভূতি আমাকে ঘুমের দিকে টানছিল।...

বিদায় বন্ধু ওজরাক!

কেউ যেন দূর থেকে ডাকছিল। চোখ খুলে দেখি, ওজরাক দাঁড়িয়ে আছে। আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুতে তার স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষা প্রতিধ্বনিত হল : বন্ধু! বন্ধু! তোমার বস্তু-প্রতিবিম্ব দেখো। কেমন হয়েছে বল?

ভরহীন অবস্থায় ভেসে থেকে দেখলুম, অবিকল 'আরেক আমি' দাঁড়িয়ে আছে ওজরাকের পাশে। মুখ দিয়ে মানুষের ভাষায় বলার চেষ্টা করলুম, হাই জয়ন্ত চৌধুরি! কোনও শব্দই বেরুল না। তখন হাত নাড়লুম। আমার প্রতিবিম্ব বাঁ হাত নেড়ে একটু হাসল।

ওজরাক জানিয়ে দিল, বাতাস না থাকায় শব্দ হবে না। বাতাসের বদলে আমরা আলোকতরঙ্গ থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিই। আমরা কথা বলি স্নায়ুতরঙ্গের মাধ্যমে।

—বন্ধু ওজরাক! আমার প্রতিবিম্ব তো অ্যান্টিম্যাটার। তবু বিস্ফোরণ ঘটছে না কেন?

—শক্তিশালী কণিকা ট্যাকিওনের ফ্রেমে ঘিরে রেখেছি।

—ওই স্কেলের মতো জিনিসটা কী?

—ডুপ্লিকেটিং মেশিন। ওটা বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

—রিয়ার, আমার বা কর্নেলের প্রতিবিম্ব তৈরি করেছিলে ওতে?

—হ্যাঁ। তবে ওটার সঙ্গে আই আর প্রোজেক্টর জুড়ে তবেই তোমাদের প্রতিবিম্ব পাঠাতে পেরেছিলুম।

—ইমেজ রিফ্লেকশন প্রোজেক্টর! আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এই যন্ত্রটার কথা বলছিলেন বটে!

—বুড়ো লোকটিকে আমার খুব পছন্দ।

—ওঁকে ধরে আনতে বুরাখকে পাঠিয়ে দাও না কেন?

—হাতে সময় নেই। ডাক এসে গেছে। আমাকে রওনা দিতে হবে।

ওজরাকের চাঞ্চল্য অনুভব করছিলুম। আমার স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ লাগছিল। সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। এবার দেখতে পেলুম ওর হাতের তালু থেকে আঙুল পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পাঁচটা সাদা রেখা ঝিকমিক করছে। বজ্রের প্রতীক। ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে দিলুম। কোনও অনুভূতি জাগল না। মনে হল না কিছু আঁকড়ে ধরেছি বা স্পর্শ করেছি। যেন শূন্যে করমর্দন করছি। কিন্তু চোখে দেখতে পাচ্ছি। তার হাতে আমার হাত। দুটে হাতই পরস্পর ঝাঁকুনি দিচ্ছি। স্নায়ুতরঙ্গের প্রতীকী ভাষায় বিদায় জানাচ্ছি পরস্পরকে।

তারপর ওজরাক আলোর দেয়ালের দিকে ঘুরল। অমনি একটা বেঁটে মূর্তি বেরিয়ে এল। সঠিক বর্ণনা অসম্ভব। বড় জোর বলা যায়, জল দিয়ে একটা বেঁটে ও চ্যাপ্টা পুতুল বানানো সম্ভব যদি হত, এইরকমই দেখাত। ওজরাক চিন্তার ভাষায় আদেশ দিল, বুরাখ! আমার পৃথিবীর বন্ধুকে রেখে এস।

বুরাখ আমাকে ধরল। তার শরীর তুলতুলে স্পঞ্জের মতো। আমার প্রতিবিম্ব মমির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে হাত নেড়ে চিন্তার ভাষায় বললুম, বিদায় জয়ন্ত চৌধুরি।

হতচ্ছাড়া দ্বিতীয় জয়ন্ত কেন জানি না, গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে রইল। নির্বাসনের দুঃখেই কি? ওজরাক হাত তুলল। বিদায় বন্ধু!

ওজরাক, না মুসা!!

কেউ ডাকছিল। চোখ খুলেই ভড়কে গেলুম। আমার উপর ঝুঁকে আছে চিরচেনা দাড়িওয়ালা একটা মুখ। মুখে সস্নেহ হাসি—কেমন বোধ করছ, ডার্লিং? একটু অপেক্ষা করো। কাশিম খাঁ অ্যামবুল্যান্স আনতে গেছেন।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, শরীর প্রায় নিঃসাড়। মাথার পিছনে যন্ত্রণা। আস্তে বললুম, আমি কোথায়?

—কান্দ্রার তৃণভূমিতে।

—বুঝেছি! ওজরাকের রোবট বুরাখ আমাকে এখানে রেখে গেছে।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ওজরাকের রোবট নয় জয়ন্ত, গুজর রাখাল ছেলেরা।

—অসম্ভব!

—উঁহু। দক্ষিণে পাহাড়ের ধারে গভীর খাদে একটা ডোবা আছে। জলের ধারে তুমি পড়েছিলে। রাখাল ছেলেরা এতদূরে বয়ে এনে আমাকে খবর দিতে গিয়েছিল।

এবার দেখলুম, চারপাশে ভিড় করে গুজররা দাঁড়িয়ে আছে। হালাকু এবং রিয়াও আছে। হালাকু ভয় পাওয়া গলায় বলল, হুজুর! উনি ওজরাকের চেলা বুরাখের নাম করছেন! ওঝা ডাকাই উচিত ছিল।

রাগ করে বললুম, ওজরাক আমার বন্ধু। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে আলফা-সেন্টোরি নক্ষত্রজগতের বাসিন্দা। সে এক আলোর মানুষ।

কর্নেল নির্বিকারভাবে বললেন, আলোর নয়, নেহাতই রক্তমাংসের। তার নাম মুসা।

—কী বলছেন! কে মুসা?

—একসময়কার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী। কাশ্মীরের লোক। ল অফ প্যারিটি নিয়ে গবেষণায় সুনাম ছিল। দুঃখের বিষয়, তিনি পরে কট্টর ভারতবিরোধী হয়ে পড়েন। লাল আপেল দল তাঁরই গড়া।

বললুম, আমি বিশ্বাস করি না। ওজরাকের সঙ্গে আমার কত কথা হয়েছে। সে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, তুমি পাহাড় থেকে ডোবার জলে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে ডার্লিং! অজ্ঞান অবস্থায় বোধ করি একটি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছ। আমরা আজ দুপুরে পশ্চিম পাহাড়ের ভিতর লাল আপেল-নেতা মুসার গোপন ঘাঁটি আবিষ্কার করেছি। মুসা তাঁর ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপে চেপে আকসাই চীনের দিকে পালিয়ে গেছেন। সঙ্গে রোবটটিকেও নিয়ে গেছেন। তবে তাঁর আবিষ্কৃত ম্যাটার ডুপ্লিকেটিং মেশিন, ইমেজ রিফ্লেক্টর, কিছু লেসার অস্ত্র আর চুরি যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পেরেছি।

অবাক হয়ে বললুম, রত্ন আর মূর্তি চুরি কেন করতেন মুসা?

—ডুপ্লিকেটরে ওগুলোর অসংখ্য বস্তু-প্রতিবিম্ব তৈরি করে বিদেশে বেচে দলের জন্য অর্থ সংগ্রহই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু মুসা প্রথমে খেয়াল করেননি, বস্তু-প্রতিবিম্বের অ্যান্টি-ম্যাটার হওয়ার চান্স আছে। ওতে হাত দিলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। পরে ব্যাপারটা খেয়াল হওয়ায় স্পেস রিসার্চ ল্যাব থেকে অ্যান্টি-ম্যাটার ডিটেকশন সিস্টেম চুরি করেন।

—কীভাবে চুরি করতেন?

—ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ রেডার স্ক্রিনের পাল্লার বাইরে কোথাও রেখে মিসাইল সিস্টেমের সাহায্যে রোবটটিকে নির্দিষ্ট টার্গেটের দিকে পাঠাতেন। ধরো, কোনও জাদুঘরে রত্ন বা মূর্তি হাতাতে চান। আগে থেকে লাল-আপেলের চররা দর্শকদের ভিড় সেই জাদুঘরে গিয়ে জিনিসটা কোথায় আছে এবং কীভাবে সে ঘরে পৌঁছনো যাবে, সবকিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। নকশা তৈরি করেছে। মুসা সেইসব তথ্য ও নকশার ডাটা কোড-ল্যাংগুয়েজে রূপান্তরিত করে রোবটের মাথায়

ভিতরকার কম্পিউটারে ফিড করিয়েছেন। রোবটের বুকে টিভি ক্যামেরা ফিট করে দিয়েছেন। এবার রোবটটি কম্পিউটারের সাহায্যে টার্গেটে পৌঁছে কাজ করবে। লেসার বিমের তাপে ঘরের তালা গলাবে। লকারে রত্ন থাকলে লকার গলিয়ে ফেলবে। মূর্তির বেলায় অবশ্য কাজটা সহজ। যদি রোবট ভুল করে, সেজন্য সাবধানী মুসা ফ্লাইং শিপে বসে টিভি স্ক্রিনে লক্ষ রাখতেন। বেগতিক দেখলে রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেমে রোবটকে সাহায্য করতেন। রোবটের সামনে মানুষ পড়লে রোবট লেসার বিম প্রয়োগ করে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আশা করি, পদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছ?

—কিন্তু ঘুঙুরের শব্দ, শিস, ঝড়?

—ডঃ সোম ঠিক বলেছিলেন। মুসার ম্যাগ্নেটিক ফ্লাইং শিপ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের চৌম্বক প্রবাহের মধ্যে বিকর্ষণঘটিত এবং বিকর্ষণজনিত অভিঘাত বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গ সৃষ্টি করত। ঝড় এবং ওইসব অদ্ভুত শব্দ তারই ফলাফল।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, রিয়ার প্রতিবিম্ব, আমার বা আপনার প্রতিবিম্ব নিয়ে কি তামাশা করতেন মুসা?

কর্নেল হাসলেন। তামাশা নয়। ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্বের মরীচিকা প্রতিফলিত করে ভয় দেখানোই ছিল উদ্দেশ্য, যাতে কেউ পশ্চিম পাহাড় তল্লাটে পা না বাড়াই! ওজরাকের কিংবদন্তিকে কাজ লাগাতে চেষ্টা করেছেন মুসা।

—ওজরাকের পাঞ্জাও কি ওঁর তৈরি?

—না জয়ন্ত! ওগুলো ন্যাচারাল রক ফর্মেশন। হাজার হাজার বছর আগে এই এলাকায় উল্কা পড়েছিল। উল্কার উপাদান আর ভূ-পৃষ্ঠের শিলা-উপাদানে বহু রাসায়নিক পদার্থ আছে। উভয়ের মিশ্রণে বিক্রিয়ার ফলে ওই চাকতিগুলো ব্যাঙের ছাতার মতো সৃষ্টি হয়েছিল। শিলাছত্রাক বলতে পার। তবে মুসা এগুলো ওজরাক-রহস্যের নিদর্শন হিসাবে কাজে লাগাতেন। চোখে ধুলো দেওয়ার প্রচেষ্টা আর কী!

সামরিক বাহিনীর অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল। গুজরদের ভিড় হটিয়ে কাশিম খাঁ এলেন। সঙ্গে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন স্বাস্থ্যকর্মী। স্ট্রেচারে যখন আমাকে ওঠানো হয়েছে, চোখ গেল পশ্চিম পাহাড়ের দিকে। অমনি ওজরাকের ইন্দ্রজাল দেখতে পেলুম। কী অপরূপ বর্ণবিচ্ছুরণ! ধারায়-ধারায় নেমে আসছে অজস্র রঙের ঝরনা। কান্দ্রার তৃণভূমিকে স্বর্গের সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলেছে। কে বলে ওজরাক নিছক স্বপ্ন? ওই তো দেখছে পাচ্ছি, আঁকাবাঁকা বর্ণালীরেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার ছাপ। যে আলোর আঙুল আমি দেখেছি, ওই তো তার বিস্ময়কর প্রতীক!

তারপরই আমার হাসি পেল। স্বপ্নের ওজরাক আমার প্রতিবিম্ব নিয়ে চলে গেছে ৪.৩ আলোকবর্ষ দূরের আলফা সেন্টোরি নক্ষত্রলোকে। এতক্ষণ কি সেখানে ওজরাকের ডাইনিংরুমে বসে দ্বিতীয় জয়ন্ত চৌধুরি খিদের চোটে গপগপ করে এনার্জি খাচ্ছে? সে কি বুঝতে পারছে, সে বাঁহাতে খাচ্ছে এবং তার পিলে পেটের ডানদিকে, যকৃৎ বাঁদিকে, হার্ট ডানদিকে—সে এক উল্টো-মানুষ?

তা না বুঝলে সে বড্ড বোকা। স্নায়ুতরঙ্গের ভাষায় ওজরাকের উদ্দেশে বললুম, বন্ধু! জয়ন্তের ঘিলুতে অন্তত এক চামচ কসমিক ইনটেলিজেন্স মিশিয়ে দিও। সে বরাবর বড্ড বোকা।...

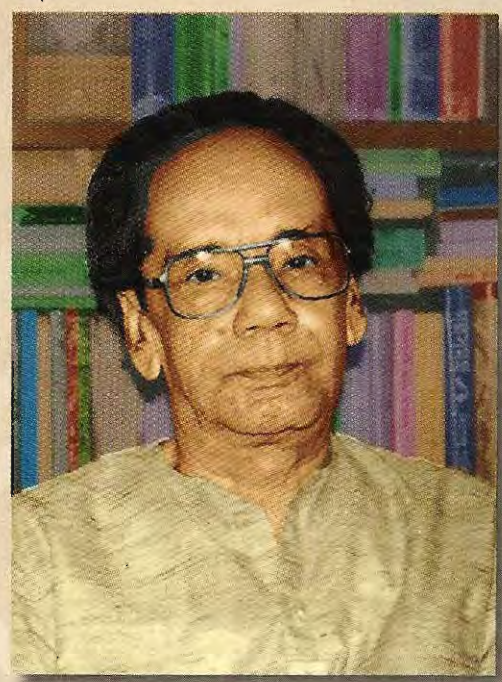

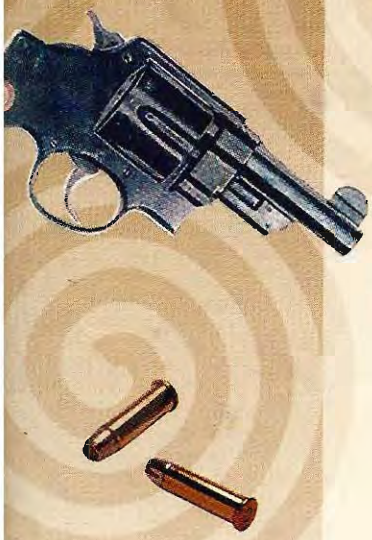

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।

কিশোর

কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

২

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KISHORE COLONEL SAMAGRA (Vol-II)
A Collection of Bengali Detective Stories for Juvenile
by SYED MUSTAFA SIRAJ
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
email : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 160.00

ISBN 81-295-0669-6

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা
জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

১৬০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শ্রীমান সঞ্জীব জানাকে

সস্নেহে—

লেখকের অন্যান্য বই

কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১)
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভূতুড়ে

এতে আছে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল/৯
ইয়াজদগির্দের হিরে/৩৫
রামগরুড়ের ছানা/৬৫
ধূমগড়ের পিশাচরহস্য/৯১
টাক ও ছড়ি রহস্য/১০৪
শ্মশান রহস্য/১০৯
কা-কা-কা রহস্য/১২১
অশ্বডিম্ব রহস্য/১২৭
কঙ্ককড়ের রহস্য/১৪২
তিতলিপুরের জঙ্গলে/১৫৩
জুতো রহস্য/২১৫
কালো গোখরো/২২২
কর্নেলর জার্নাল থেকে—১/২৪৩
কর্নেলের জার্নাল থেকে—২/২৫২
আফগান হাউন্ড রহস্য/২৫৯
হিকরি ডিকরি ডক রহস্য/২৭৯
অলক্ষ্মীর গয়না/৩১১

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার খুব মন দিয়ে কী একটা বই পড়ছিলেন। ছেঁড়াখোঁড়া মলাট। পোকায় কাটা হলদে পাতা। নিশ্চয় কোনও পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই। কিন্তু শেষ মার্চের এই সুন্দর সকালবেলাটা গম্ভীর মুখে বই পড়ে নষ্ট করার মানে হয়? দাঁতে কামড়ানো চুরুট কখন নিভে গেছে এবং সাদা দাড়িতে ছাইয়ের টুকরো আটকে আছে। একটু কেশে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলাম। ধ্যান ভাঙল না। আমার উলটো দিকে সোফায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই উশখুশ করছিলেন। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে আনমনে বললেন, "যাই গিয়া!"

এতক্ষণে কর্নেল বই বন্ধ করে বলে উঠলেন, "হালদারমশাই কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেন?"

হালদারমশাইয়ের দুই চোখ গুলি-গুলি হয়ে উঠল। জোরে মাথা নেড়ে বললেন, নাহ্। "ক্যান?"

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। "জয়ন্ত তুমি?"

"নাহ্।"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি একবার জ্বেলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সমস্যা হল, আমাকেও কেউ এই প্রশ্ন করলে আমিও সোজা নাহ্ বলে দিতাম। কিন্তু অসংখ্য মানুষ প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করে। তাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশি। কাজেই তারা এই বিশ্বাসের বশে এমন সাংঘাতিক - সাংঘাতিক সব কাণ্ড করে বসে কহতব্য নয়।"

হালদারমশাই উত্তেজিত ভাবে বললেন, "কেডা কী করল?"

কর্নেল হাসলেন। "করল নয়, করেছিল। ভেবে দেখুন হালদারমশাই। ১০৮টা নরবলি।"

"কন কী। পুলিশ তারে ধরে নাই?"

"পুলিশ এ-রহস্য ভেদ করতে পারেনি। যিনি পেরেছিলেন, তিনিই এই বইটা লিখে গেছেন।" কর্নেল বইটার পাতা খুলে দেখালেন। "তান্ত্রিক আদিনাথের জীবন এবং সাধনা। নামটা আমার পছন্দ। লেখকের নাম হরনাথ শাস্ত্রী। প্রায় নব্বই বছর আগে লেখা এবং ছাপা বই। আদিনাথ ছিলেন হরনাথের জ্যাঠামশাই।"

বলাম, "ওই তান্ত্রিক ভদ্রলোক ১০৮টা নরবলি দিয়েছিলেন?"

"তা-ই তো লিখেছেন হরনাথ। তান্ত্রিক ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল, ওই ১০৮টা প্রেতাত্মা তাঁর চ্যালা হবে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। একদিন ভোরবেলা স্বয়ং তান্ত্রিককেই মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। মুণ্ডহীন ধড়। রক্তে-রক্তে ছয়লাপ! নিজেই বলি হয়ে গেলেন।"

হালদারমশাইয়ের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন, "মুণ্ড গেল কই?"

কর্নেল হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, "মুণ্ডু পাওয়া যায়নি। অগত্যা ধড়টা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হরনাথ লিখেছেন, দেড় মণ ঘি আর আট মণ কাঠের আগুনেও তান্ত্রিকের ধড় একটুও পোড়েনি। শেষে লোক জানাজানি এবং পুলিশের ভয়ে মুণ্ডকাটা ধড়ে পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, পরদিন ধড়টা জলে ভেসে ওঠে। নদীতে স্রোত ছিল অথচ ধড়টা দিব্যি স্থির ভাসছে।

বললাম, "হরনাথবাবু দেখেছিলেন এসব ঘটনা?"

"তখন ওঁর বয়স মাত্র পনেরো বছর। কাজেই স্মৃতি থেকে লেখা। কিন্তু তারপর উনি যা লিখেছেন, তা আরও অদ্ভুত। বছর কুড়ি পরে হরনাথবাবু নাকি স্বপ্নে তান্ত্রিক জ্যাঠামশাইকে দেখতে

পান। তান্ত্রিক ভদ্রলোক ভাইপোকে বলেন, 'কেউ যদি আমার মুন্ডুটা ধড়ের সঙ্গে জোড়া দেয়, আমি আবার সশরীরে ফিরে আসব।"

"ততদিনে দুটোই তো কঙ্কাল। নিছক হাড় আর খুলি।"

হালদারমশাই সায় দিয়ে বলেন, "হঃ! স্কেলিটন অ্যান্ড স্কাল!"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "কিন্তু খুলি কোথায় পোঁতা আছে হরনাথ জানতেন না। কেউই জানত না। উনি কবন্ধ মড়াটা এনে সিন্দুকে রেখে দিয়েছিলেন। তারপর খুলির খোঁজে হন্যে হচ্ছিলেন। হঠাৎ আবার একদিন আদিনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে একটা মজার ধাঁধা বললেন। ওতেই নাকি খুলির সূত্র লুকনো আছে।

"আটঘাট বাঁধা
বার পনেরো চাঁদা
বুড়ো শিবের শূলে
আমার মাথা ছুঁলে
ও হ্রীং ক্লীং ফট
কে ছাড়াবে জট।।"

অবাক হয়ে বললাম, "আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে দেখছি!"

কর্নেল হাসলেন। "সহজে মুখস্থ হবে বলেই তো আগের দিনের লোকেরা ছড়া বাঁধত। মাস্টারমশাইরা অনেক ফরমুলা ছড়ার আকারে ছাত্রদের শেখাতেন।"

হালদারমশাই উৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন, "হঃ। একখান শিখছিলাম :

ইফ যদি ইজ হয়
বাট কিন্তু নট নয়..."

গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ওঁকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, "তা এই উদ্ভট বই নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে দাড়ির ছাই ঝাড়লেন। তারপর অভ্যাসমতো চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "হরনাথ এই ধাঁধার জট ছাড়াতে পারেননি। ওঁর বংশধররাও পারেননি। কিন্তু সম্প্রতি যা সব ঘটছে বা ঘটেছে, তা থেকে এলাকার লোকদের বিশ্বাস জন্মেছে, তান্ত্রিক আদিনাথের সশরীরে পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমত, সিন্দুকের কঙ্কালটা কে বা কারা চুরি করেছে। দ্বিতীয়ত, দেবী চণ্ডিকার পোড়ো মন্দিরের সামনে পর-পর দুটো নরবলি দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, রামু ধোপা সন্ধ্যার মুখে ঝিল থেকে কাপড়ের বোঁচকা গাধার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সবে চাঁদের আলো ফুটেছে, একটা কঙ্কাল ওর সামনে দাঁড়িয়ে হুংকার দিয়ে বলেন, 'আমি সেই আদিনাথ।' রামু গোঁ গোঁ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "তারপর? তারপর?"

"রামু এখন পাগল হয়ে গেছে। কীসব অদ্ভুত কথাবার্তা বলছে। অবশ্য মাঝে-মাঝে ওর আচরণ কিছুক্ষণ সুস্থ মানুষের মতো।" কর্নেল বইটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে বললেন, "গাধাটাও পাগল হয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধরা দেয় না।"

হালদারমশাই বললেন, "বাট হোয়ার ইজ দ্যাট প্লেস কর্নেলস্যার?"

"কঙ্কগড়। আপনি কি যেতে চান সেখানে?"

"নাহ্। এমনি জিগাই।" গোয়েন্দা ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে হাসলেন। "কিন্তু কঙ্কগড় নামটা চেনা চেনা লাগছে। কঙ্কগড়... কঙ্কগড়"

কর্নেল বললেন, "কঙ্কগড় বর্ধমান-বিহার সীমান্তে। দুর্গাপুর থেকেও যাওয়া যায়।"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে একটিপ নস্যি নিলেন। "ছড়াটা কী কইলেন য্যান কর্নেলস্যার?"

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটুকরো কাগজে ছড়াটা লিখে ওঁকে দিলেন। মুখে দুষ্টু-দুষ্টু হাসি। হালদারমশাই ছড়াটা মুখস্থ করার চেষ্টায় ছিলেন। আমাদের চোখে-চোখে কৌতুক লক্ষ্য করলেন না।

ষষ্ঠীচরণ আর এক প্রস্থ কফি আনল। কফির পেয়ালা তুলে বললাম, "হালদারমশাই! বোঝা যাচ্ছে এই রহস্যের কেস কর্নেল নিজের হাতে নিয়েছেন। আপনি বরং ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে পারেন।"

হালদারমশাই বাড়তি দুধমেশানো ওঁর স্পেশাল কফিতে চুমুক দিয়ে খি-খি করে হেসে উঠলেন। ওঁর এই হাসিটি একেবারে শিশুসুলভ। কে বলে উনি একসময় দুঁদে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন এবং ওঁর দাপটে যত দাগি অপরাধী তটস্থ হয়ে থাকত? চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে কর্নেলের কাছে আড্ডা দিতে, আবার কখন কোনও কেস পেলে ওঁর ভাষায় 'কর্নেলস্যারের লগে কনসাল্ট' করতেও আসেন।

বললাম, "হাসছেন কেন হালদারমশাই?"

হালদারমশাই আরও হেসে বললেন, "কর্নেলস্যার কইলেন গাধাটা পাগল হইয়া গেছে। গাধা...খি খি খি... গাধা ইজ গাধা। অ্যাস! দুইখান এস।"

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল মুচকি হেসে বলেন, "সম্ভবত দুইখান এস এলেন। নাহ্। অ্যাস নয়। শশিনাথ শাস্ত্রী।"

বললাম, "নাম শুনে মনে হচ্ছে যজমেনে বামুন। পাণ্ডাপুরুতঠাকুর সম্ভবত। নাকি সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই?"

কিন্তু ষষ্ঠীচরণ যাকে নিয়ে এল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার বয়সি একজন যুবক। স্মার্ট, ঝকঝকে চেহারা। পরনে জিনস, ব্যাগি শার্ট, কাঁধে ঝোলানো কিট্‌ব্যাগ। কর্নেলকেও একটু অবাক দেখাচ্ছিল। বললেন, "এসো দিপু! তোমার বাবা এলেন না যে?"

যুবকটি বসে কবজি তুলে ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, "মর্নিংয়ে হঠাৎ ট্রাংককল এল। একটা মিসহ্যাপ হয়েছে বাড়িতে। বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলে চলে গেলেন। ন-টা পাঁচে একটা ট্রেন আছে।"

"কী মিসহ্যাপ?"

"আবার কী? একটা ডেডবডি। ভজুয়া নামে আমাদের একজন কাজের লোক ছিল। মন্দিরের সামনে তার বডি পাওয়া গেছে আজ ভোরে। একই অবস্থায়।"

হালদারমশাই নড়ে বসেছিলেন। ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন, "নরবলি?"

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, "তোমার সঙ্গে এঁদের আলাপ করিয়ে দিই দিপু। হালদারমশাই! এর নাম দীপক ভট্টাচার্য। হরনাথবাবুর কথা আপনাদের বলেছি। তাঁর পৌত্র। দিপু, ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আর— জয়ন্ত চৌধুরী। 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার রিপোর্টার।"

দীপক আমাদের নমস্কার করল। তারপর হালদারমশাইকে বলল, "আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

হালদারমশাই খুশিমুখে বললেন, "ইয়েস।"

কর্নেল বললেন, "দিপু। বরং এক কাজ করো। তুমি হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি যথাসময়ে পৌঁছোব।"

দীপক বলল, "দুপুরে সাড়ে বারোটায় একটা ট্রেন আছে। বাবা আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

"চিন্তার কিছু নেই। আমি যাব'খন। আর শোনো, আমার থাকার ব্যবস্থা তোমাদের করতে হবে না।"

" সে কী! বাবা আমাকে—"

"নাহ্। আমি সরাসরি তোমাদের ওখানে উঠলে আমার কাজের অসুবিধে হবে। তুমি বরং হালদারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তবে উনি যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এটা যেন কাউকে বোলো না।"

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, "আমারে মামা কইবেন।"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "দিপুরা রাঢ়ের ঘটি। ওর মামা পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বললে লোকের সন্দেহ হবে। আপনি তো দিব্যি স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় কথা বলতে পারেন।"

"তা পারি।" বলে হালদারমশাই আর একটিপ নস্যি নিলেন।

বললাম, "আসলে উত্তেজনার সময় হালদারমশাইয়ের মাতৃভাষা এসে যায়।"

কর্নেল বললেন, "তা যা-ই বলো জয়ন্ত, পূর্ববঙ্গীয় ভাষার ওজন আছে। উত্তেজনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা একেবারে অটল। তাই দ্যাখো না, উত্তেজনার সময় যাঁরা পূর্ববঙ্গীয় ভাষা জানেন না, তাঁরা হিন্দি বা ইংরেজি বলেন।"

হালদারমশাই সটান উঠে দাঁড়ালেন। "ইউ আর হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট কর্নেলস্যার!" বলে পকেট থেকে নেমকার্ড বের করে দীপককে দিলেন। "আমি হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারির সামনে ওয়েট করব। চিন্তা করবেন না।"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পা বাড়িয়েছেন, কর্নেল বললেন, "একটা কথা হালদারমশাই। আপনার একটা ছদ্মনাম দরকার।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

ষষ্ঠীচরণ দীপকের জন্য কফি আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, "ভজুয়ার বয়স কত? কতদিন তোমাদের বাড়িতে ছিল সে?"

দীপক বলল, "বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। ওরা পুরুষানুক্রমে আমাদের ফ্যামিলিতে ছিল। জমিদার ফ্যামিলিতে যেমন হয়। একগাদা লোকজন থাকে। অবশ্য এখন আর নেই। ভজুয়া কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী লোক ছিল। ভূতপ্রেতের গল্প বলত বটে, বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না। আমার ছেলেবেলায় ওর বউ মারা যায়। কিন্তু ও আর বিয়ে করেনি। আমার অবাক লাগছে, ওর মতো সাহসী আর বলবান লোককে কী করে বলি দিতে পারল?"

"তুমি কি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করো?"

"নাহ্। ওসব স্রেফ গুলতাপ্পি। ঠাকুরদা কী সব বোগাস গপ্প ফেঁদে গেছেন, আমি একটুও বিশ্বাস করি না। বাবাও বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু হঠাৎ দু-দুটো নরবলির ঘটনা। তারপর পাতালঘর থেকে সিন্দুকের তালা ভেঙে কে কঙ্কাল সরাল। তাই বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কর্নেল। পাতালঘরের কথা আমি ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম। কিন্তু সিন্দুকে যে কঙ্কাল আছে, তা আমি জানতাম না। নরবলির ঘটনার পর একরাত্রে বাবা আমাকে আর ভজুয়াকে ডেকে চুপিচুপি পাতালঘরে ঢুকলেন। পাতাল ঘরের দরজার তালা কিন্তু ভাঙা ছিল না। গতকাল সন্ধ্যায় বাবা আপনার কাছে সব কথা খুলে বলেননি।"

"হয়তো কঙ্কগড়ে গেলে বলবেন ভেবেছিলেন।

দীপক চাপা গলায় বলল, "সিন্দুকের ভিতর কঙ্কাল সত্যিই ছিল কি? আমার বিশ্বাস হয় না। অতকালের পুরোনো কঙ্কাল। আস্ত থাকার কথা নয়। অথচ সিন্দুকে একটুকরো হাড়ও পড়ে নেই।"

"ভজুয়াকে কেউ ওভাবে খুন করবে কেন? তোমার কী ধারণা?"

দীপক একটু চুপ করে থাকার পর বলল, "সম্ভবত ভজুয়া কিছু জানত। তার মানে, শচীনদা আর জগাইকে কে বা কারা ওভাবে খুন করেছে, সে জানতে পেরেছিল। কারণ জগাই খুন হওয়ার পর ভজুয়া আমাকে বলেছিল, খামোখা একজন সাধুসন্ন্যাসী মানুষের বদনাম রটাচ্ছে লোকে। তাঁর আত্মা স্বর্গে বাস করছেন ভগবানের কাছে। ভজুয়া বলেছিল, শিগগির সে এর বিহিত করবে।'

"ভজুয়া বলেছিল?"

"হ্যাঁ। দাদুর জ্যাঠামশাই সম্পর্কে ভজুয়ার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তার ঠাকুরদার বাবা নাকি ওঁর সেবা করত।" দীপক হঠাৎ একটু নড়ে বসল। "মনে পড়ে গেল! গত মাসে দোতলা থেকে অনেক রাতে আমি ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর আলো দেখেছিলাম। ছেলেবেলা থেকে আমি তো আসানসোলে পড়াশোনা করেছি। কঙ্কগড়ে সবসময় থাকিনি। তো সকালে মাকে কথাটা বললাম। মা বললেন, ওই জঙ্গলে আলো নতুন কিছু নয়। মা-ও নাকি অনেকবার দেখেছেন। আমি কিন্তু এতকাল পরে ওই একবার।"

বললাম, "কিসের আলো? মানে — টর্চ না হারিকেন?"

"না। মশালের আলো বলে মনে হয়েছিল।"

কর্নেল চোখে হেসে বললেন, "প্রেতাত্মারা টর্চ বা হারিকেন জ্বালে না জয়ন্ত!"

দীপক বলল, "আপনি কি ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন?"

"প্রকৃতিতে রহস্যের শেষ নেই দিপু!"

দীপক যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল! বলল, "আমি চলি তা হলে।"

"আচ্ছা এসো।"

দীপক বেরিয়ে গেলে বললাম, "কঙ্কগড়ের সাংঘাতিক ভূতটা আপনাকে পেয়ে বসেছে মনে হচ্ছে। ভূত বা প্রেতাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির কী সম্পর্ক?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "আছে। প্রকৃতি চির-আদিম। ভূতপ্রেতও আদিম শক্তি, ডার্লিং!"

২

কঙ্কগড়ে আমরা উঠেছিলাম সরকারি ডাকবাংলোয়। বাংলোটি পুরনো ব্রিটিশ আমলে তৈরি। গড়নে বিলিতি ধাঁচ। কিন্তু অযত্নের ছাপ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। লনের ফুলবাগান আর চারপাশের দেশি-বিদেশি গাছপালা একেবারে জঙ্গুলে হয়ে গেছে। চৌকিদার রঘুলাল দুঃখ করে বলছিল, নতুন সার্কিট হাউস হওয়ার পর সরকারি কর্তারা এলে সেখানেই ওঠেন। সেখানে জায়গা না পেলে তবে কদাচিৎ কেউ এখানে জোটেন। আসলে বসতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে বলেই এই দুরবস্থা।

তবে নীচেই সেই বিশাল ঝিল এবং পাশে জঙ্গলের শুরু। তার ওধারে একটা নদী আছে। তার মানে, একসময় ঝিলটি নদীর অববাহিকার একটা স্বাভাবিক জলা ছিল। ইদানীং অনেকে একে 'লেক' বলতে শুরু করেছে। খনি অঞ্চলের শিল্পনগরী থেকে দল বেঁধে অনেকে পিকনিক করতেও আসে। রঘুলাল বলছিল, নরবলির পর পিকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার অনেক আগে এদিকটা জনহীন হয়ে পড়ে। রঘুলালও সূর্যাস্তের আগে বাড়ি চলে যায়। তবে 'কর্নেলস্যার' যখন এসেছেন, তখন রাত্তিরটা এখানে কাটাতে তার ভয় নেই। এই সায়েবকে সে ভালোই চেনে। এর আগে কতবার উনি এখানে এসেছেন।

আমরা পৌঁছেছিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। আমাকে বিশ্রাম করতে বলে কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। বাংলোর বারান্দা থেকে লক্ষ করছিলাম, উনি বাইনোকুলারে পাখি টাখি দেখতে-দেখতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেলেন। রঘুলাল একটা থামে হেলান দিয়ে বসে কঙ্কগড়ের গল্প করেছিল। তান্ত্রিক আদিনাথের অলৌকিক কীর্তিকলাপের কথাও বলছিল। আদিনাথের কঙ্কালের ধড় ও মুণ্ডের কাহিনিও তার জানা। ধড় ও মুণ্ড জোড়া লাগলে তান্ত্রিক আদিনাথ যে সশরীরে আবার আবির্ভূত হবেন, এটা সে বিশ্বাসও করে এবং তবে ধারণা, এই কাজটা কেউ করতে পেরেছে এতদিনে। তাই তান্ত্রিকবাবা নিজের কাজে নেমে পড়েছেন।

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিকবাবা তো শুনেছি ১০৮টা নরবলি দিয়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আবার কেন উনি নরবলি দিচ্ছেন?"

রঘুলাল বাংলা বলতে পারে বাঙালির মতোই। মাথা নেড়ে বলল, "না স্যার! ১০৮টা নরবলির আগে উনি নিজেই বলি হয়েছিলেন। শুনেছি, তিনটে নরবলি বাকি ছিল। এতদিনে হয়ে গেল।"

"এই লোক তিনটিকে তুমি চিনতে?"

"চিনব না কেন স্যার? প্রথমে বলি হলেন শচীনবাবু। উনি ম্যাজিক দেখাতেন।"

"ম্যাজিশিয়ান ছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-দেশ ও-দেশ ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতেন। তো তারপর গেল জগাই। জগাই শ্মশানে মড়া পোড়াত। শেষে গেল ভজুয়া। জমিদারবাড়ির কাজের লোক। জমিদারি আমাদের ছোটোবেলায় উঠে গেছে। তা হলেও জমিদারবাড়ি নামটা টিকে আছে। তবে দেখলে বোঝা যায় কী অবস্থা ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বুঝুন, তান্ত্রিকবাবা ছিলেন ওই জমিদারবাড়ির লোক। শুনেছি, বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে জপতপ নিয়েই পড়ে থাকতেন।"

এরপর রঘুলাল রামু ধোপা আর তার গাধার গল্পে চলে এল। একঘেয়ে উদ্ভট গল্প শোনার চেয়ে ঝিলের ধারে কিছুক্ষণ বেড়ানো ভালো। লনে নামলে রঘুলাল চাপা গলায় সাবধান করে দিল, "আঁধার হওয়ার আগেই চলে আসবেন স্যার! কর্নেলস্যারের কথা আলাদা। উনি মিলিটারির লোক।"

গেট পেরিয়ে ধাপবন্দি পাথরের সিঁড়ি। ফাটলে ঝোপ আর আগাছা গজিয়ে আছে। নীচের রাস্তা এবড়োখেবড়ো। রাস্তাটা এসেছে বাঁ দিক থেকে এবং এখানেই তার শেষ। ডান দিকে ছোটো-বড়ো নানা গড়নের পাথর এবং ঝোপঝাড়, গাছপালা। সামনে একফালি পায়েচলা পথ নেমে গেছে ঝিলের ধারে। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট। ঝিলের জলটা স্বচ্ছ। সূর্য পেছনে গাছপালার আড়ালে নেমে গেছে। তাই ঝিলে ছায়া পড়েছে। সামনে-দূরে ধূসর কুয়াশা। একটা পানকৌড়ি আপনমনে ডুবসাঁতার খেলছে। একটু দূরে থামের আড়ালে কোথাও জলপিপির ডাক শোনা গেল পি-পি-পি!

ঘাটের মাথায় বসে ছিলাম। কর্নেলের সংসর্গে মাথার ভেতর হয়তো প্রকৃতিপ্রেম ঢুকে গেছে। দিনশেষের এই ধূসর সময়টা সত্যি অনুভব করার মতো। জলমাকড়সার অবিশ্বাস্য গতিতে ছোটাছুটি, জলজ ফুলের ওপর টুকটুকে প্রজাপতি ও গাঙফড়িংয়ের ওড়াউড়ি, পাখপাখালির ডাক। সব মিলিয়ে জীবজগতের একটা আশ্চর্য স্পন্দন।

হঠাৎ পাশে খুট করে একটা শব্দ। চমকে উঠে দেখি, এক টুকরো ঢিল সদ্য গড়িয়ে পড়ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তন্নতন্ন খুঁজলাম। কাউকেও দেখতে পেলাম না। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। গাড়ার দিয়ে ভাঁজ করা একটুকরো কাগজ বাঁধা আছে। কাঁপা কাঁপা হাতে কুড়িয়ে নিলাম। কাগজটার ভাঁজ খুলে দেখি ডটপেনের লাল কালিতে লেখা আছে।

ওঁ

ওহে টিকটিকির চ্যালা! কাল সকালেই কঙ্কগড় ছেড়ে না গেলে মা চণ্ডিকার পায়ে
বলি হয়ে যাবে? বুড়ো টিকটিকিকে জানিয়ে দিয়ো!
আজ রাতে প্রেতাত্মা পাঠিয়ে আগাম সংকেত দেব। সাবধান!

হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, খুদে হরফ। খুব ব্যস্তভাবে লেখা। চিরকুটটা পকেটে ভরে আবার কিছুক্ষণ চারপাশে খুঁটিয়ে দেখলাম। কেউ কোথাও নেই। ঝিলের পশ্চিম পাড় এটা। উত্তর-পূর্ব কোণে কঙ্কগড় বসতি এলাকা শুরু। প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে এদিকে ওদিকে নজর রেখে বাংলোর নীচে পৌঁছোলাম। গা ছমছম করছিল আজানা ত্রাসে। লোকটা কি আড়াল

থেকে নজর রেখেছে? আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রিভলভার পকেটে ঢুকিয়ে দ্রুত বাংলোয় উঠে গেলাম। রঘুলাল আমাকে দেখে সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আপনি কি কিছু দেখে ভয় পেয়েছেন স্যার?"

রুক্ষ মেজাজে বললাম, "নাহ্। কেন?"

রঘুলাল বিনীতস্বরে বলল, "আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে।"

"কিছুই দেখাচ্ছে না। তুমি শিগগির এক কাপ চা করো।"

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। সহাস্যে বললেন, "রামুর গাধাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ডার্লিং! গাধাটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ওকে বুঝিয়ে বললাম, দ্যাখো বাপু, এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়! গাধাবলির বিধান শাস্ত্রে আছে বলে শুনিনি। তবে বলা যায় না।"

আস্তে বললাম, "ব্যাপারটা রসিকতা করার মতো নয়। রীতিমতো বিপজ্জনক। এই দেখুন।"

কর্নেল চিঠিটা পড়ে নিয়ে বললেন, "কোথায় পেলে?"

ঘটনাটা বলালম। শোনার পর কর্নেল একটু ব্যাজার মুখে বললেন, "লোকটা আমাকে টিকটিকি বলেছে, এটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট অপমানজনক। তুমি তো জানো জয়ন্ত, টিকটিকি কথাটা এসেছে ডিটেকটিভ থেকে। আমি লোকদের বোঝাতে পারি না, আমি ডিটেকটিভ নই এবং কথাটা আদতে গালাগাল।"

"আজ রাতে ভূত পাঠাবে বলে শাসিয়েছেও।"

"তা একটা কেন, একশোটা পাঠাক। কিন্তু টিকটিকি... ছি!" বলে কর্নেল হাঁকলেন, "রঘুলাল!"

রঘুলাল কিচেন থেকে ট্রেতে কফির পট, পেয়ালা সাজিয়ে এনে টেবিলে রাখল। সেলাম দিয়ে বলল, "কর্নেলসারকে আসতে দেখেই আমি কফি বানাতে গিয়েছিলাম।"

কর্নেল চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন, "খবর পেয়েছি, আজ রাতে এ বাংলোয় ভূত এসে হানা দেবে। তৈরি থেকো রঘুলাল।"

রঘুলাল কাঁচুমাচু হাসল। "কর্নেলস্যার থাকতে ভূতপেরেত ডাকবাংলোর কাছ ঘেঁষতে সাহস পাবে না। কিন্তু স্যার, একটু আগে আমার মেয়ে দুলারি এসেছিল। বলল, ওর মায়ের খুব জ্বর। আমি ওকে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতে বললাম। তো..."

কর্নেল হাত তুলে বললেন, "না, না! তুমি বাড়ি চলে যেয়ো। রাতের খাবারটা বরং এখনই তৈরি করে রাখো। আমরা খেয়ে নেব'খন।"

রঘুলাল হন্তদন্ত কিচেনের দিকে চলে গেল। বললাম, "রঘুলাল আসলে কেটে পড়তে চাইছে। ওর মেয়ের এসে মায়ের জ্বরের খবর দেওয়াটা স্রেফ মিথ্যা।"

"কেন বলো তো?"

"ওর মেয়ে এলে টের পেতাম।"

"তুমি কিছুই টের পাও না, জয়ন্ত!" কর্নেল হাসলেন। তারপর টেবিলে রাখা বাইনোকুলারটি দেখিয়ে বললেন, "এই যন্ত্রচোখ দিয়ে ফ্রকপরা একটা বাচ্চা মেয়েকে বাংলোর লনে আমি দেখেছি। অবশ্য তোমাকে দেখতে পাইনি। কারণ বাংলোটা উঁচুতে। তুমি নীচে ঝিলের ধারে ছিলে। ওখানে যথেষ্ট ঝোপঝাড়। তবে তোমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তান্ত্রিক হরনাথের প্রেতাত্মা ধারালো খাঁড়া হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

কর্নেল কফি শেষ করে ঘরে ঢুকলেন। সত্যি বলতে কি, একা বারান্দায় বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল টেবিলবাতির আলোয় একগোছা অর্কিড খুঁটিয়ে দেখচেন। বোঝা গেল, জঙ্গলে কোথাও সংগ্রহ করেছেন। আমাকে সেই অর্কিডটার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে শুরু করলে বললাম, "ওসব পরে শুনব। রঘুলালের কাছে কিছু তথ্য জোগাড় করেছি। অর্কিডের চেয়ে সেগুলো দামি।"

"কী তথ্য?"

"শচীনবাবু ছিলেন ম্যাজিশিয়ান। আর জগাই ছিল শ্মশানের...।"

"হুঁ, ম্যাজিশিয়ানদের বলা হয় জাদুকর। জাদুর সঙ্গে নাকি তন্ত্রমন্ত্রের সম্পর্ক আছে। আবার তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্গে তান্ত্রিক এবং তান্ত্রিকের সঙ্গে শ্মশানের সম্পর্ক আছে। কাজেই তোমার তথ্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শাস্ত্রীমশাই, মানে দিপুর বাবার কাছে সে-খবর কলকাতায় বসেই পেয়ে গেছি।"

চাপা গলায় বললাম, "যা-ই বলুন, এই রঘুলাল লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছে না। খুব ধূর্ত! আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল। তাছাড়া ঝিলের ঘাট থেকে বাংলোয় ফেরার সময় কী করে ও টের পেল অমি সত্যি সত্যিই ভয় পেয়েছি? বলল, আপনি কি ভয় পেয়েছেন? আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে....।"

"তোমাকে এখনও কেমন যেন দেখাচ্ছে, ডার্লিং!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন। "ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে না যারা, ভূতপ্রেতের ভয় তাদেরই বেশি। বিশেষ করে ভূতের চিঠি ভূতের চেয়ে সাংঘাতিক।"

চটে গিয়ে বললাম, "ভূতপ্রেত হুমকি দিয়ে চিঠিটা লেখেনি। লিখেছে কোনো মানুষ।"

"হুঁ, মানুষ। সেই মানুষকে সম্ভবত তান্ত্রিক আদিনাথের ভূত ভর করেছে।"

রসিকতা শোনার মেজাজ ছিল না। তবে বরাবর এটা লক্ষ্য করেছি, রহস্য যত জটিল এবং সাংঘাতিক হয়, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে রসিকতা তত বেশি ভূতের মতো ভর করে। বিছানায় গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলাম। ট্রেন আর বাসজার্নির ধকল এতক্ষণে পেয়ে বসেছিল। একটু পরে লক্ষ করলাম, কর্নেল পকেট থেকে একটুকরো ভাঙা চাকতির মতো কী একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। তারপর কিটব্যাগ থেকে খুদে একটা ব্রাশ আর লোশনের শিশিও বেরোতে দেখলাম। চাকতিটার আধখানা চাঁদের মতো গড়ন। লোশনে ব্রাশ চুবিয়ে ঘষতে থাকলেন কর্নেল! জিজ্ঞেস করলাম, "জঙ্গলে মোহর কুড়িয়ে পেয়েছেন বুঝি?"

কর্নেল আনমনে বললেন, "মোহরের ভাঙা টুকরো বলতেও পারো! তবে সোনার নয়। সেকেলে মুদ্রাও নয়। কী সব খোদাই কার সিলের টুকরো। কাদা ধুয়ে ফেলেও কিছু বুঝতে পারিনি। দেখা যাক।"

কিছুক্ষণ পরে রঘুলালের সাড়া পাওয়া গেল। ওর হাতে টর্চ আর লাঠি দেখলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, "সব রেডি রইল স্যার! কিচেনঘরের চাবিটা দিয়ে যাচ্ছি। আমি ভোর ছ-টায় এসে যাব।"

কর্নেলের ইশারায় ওর হাত থেকে কিচেনের চাবি নিয়ে এলাম। ও চলে গেল। কর্নেল ভাঙা সিলটা আতশ কাচে দেখতে থাকলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "গুপ্তযুগের সিল নাকি?"

"কী? গুপ্তযুগ? কর্নেল নিঝুম সন্ধ্যারাতের পুরোনো ডাকবাংলোর স্তব্ধতা ভাঙচুর করে অট্টহাসি হাসলেন। "হুঁ, ওই এক পুরাতাত্ত্বিক বাতিক জয়ন্ত! মাটির তলায় কিছু পাওয়া গেলেই সটান গুপ্তযুগ। তার আগে বা পরে নয়! তবে এটাই আশ্চর্য! এটা পুরো একটা সিলের আধখানা মাত্র। সিলটা আধখানা কেন, এটাই প্রশ্ন।"

এই সময় আচমকা বাংলোর আলো নিভে গেল। কর্নেল তখনই টর্চ জ্বেলে বললেন, "ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে হারিকেনটা এনে জ্বেলে দাও জয়ন্ত! লোডশেডিং প্রেতাত্মাকে বাংলোয় আসার সুযোগ করে দিতে পারে, কুইক!" তাঁর কণ্ঠস্বরে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক। কিন্তু আমার গা ছমছম করতে লাগল।

ইংরেজ আমলের বাংলো। কাজেই ফায়ারপ্লেস আছে। ঝটপট হারিকেন জ্বেলে এনে টেবিলে রাখলাম। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল বললেন, "চলো! বরং বারান্দায় বসে জ্যোৎস্নায় প্রকৃতিদর্শন করা যাক।"

বেরিয়ে গিয়ে দেখি সুন্দর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। ঝিলের জল ঝিলমিল করছে। গাছপালা তোলপাড় করে বাতাস বইছে। সেই অস্বস্তিকর অনুভূতি আবার ফিরে এল। ভয়ের চোখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলাম। হাতে টর্চ এবং পকেটে রিভলবার তৈরি। আস্তে বললাম, 'সত্যি লোডশেডিং, নাকি কেউ মেইন সুইচ অফ করেছে দেখে আসা উচিত। কারণ ওই তো দূরে আলা দেখা যাচ্ছে।"

কর্নেল বললেন, "ছেড়ে দাও! জ্যোৎস্নায় পুরোনো পৃথিবীকে ফিরে পাওয়া যায়। তাছাড়া জ্যোৎস্নায় একটা নিজস্ব সৌন্দর্যও আছে। কোন কবি যেন লিখেছিলেন, "এমন চাঁদের আলো/মরি যদি সেও ভালো/ সে মরণ স্বরগ সমান।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "মৃত্যুটা প্রেতাত্মার হাতে হওয়া বড্ড অপমানজনক। আমরা মানুষ।"

"ডার্লিং! তা হলে দেখছি এই আদিম পরিবেশ তোমাকে প্রেতাত্মায় বিশ্বাসী করতে পেরেছে।"

"বোগাস! আসলে আমি বলতে চাইছি..."

"বলার আগে দেখে নাও। ওই দ্যাখো, ডান দিকে ঝোপের আড়ালে প্রেতাত্মা উঁকি দিচ্ছে!"

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেইদিকে টর্চের আলো ফেললাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বোধবুদ্ধি হারিয়ে গেল। দক্ষিণ-পশ্চিমের ঢালের মাথায় উঁচু ঝোপজঙ্গল। একখানে ঝোপ থেকে মুখ বের করে আছে সত্যিই একটা কঙ্কাল। খুলি থেকে কাঁধ অবধি দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ টেবিলে রেখে রিভলবার বের করে ছুঁড়লাম। কর্নেল আমার কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন। "জয়ন্ত! জয়ন্ত! করছ কী?"

এবার টর্চ জ্বেলে দেখি কঙ্কাল অদৃশ্য। উত্তেজিতভাবে বললাম, "অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, "সব ভেস্তে দিলে তুমি! আমাদের কাছে ফায়ার আর্মস আছে জেনে গেল প্রেতাত্মাটা। এবার ও খুব সাবধান হয়ে যাবে।"

বলে কর্নেল টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে ঝোপটার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢুকে কিছুক্ষণ চারদিকে আলো ফেলে তন্নতন্ন খুঁজে ফিরে এলেন। একটু হেসে বললেন, "যা ভেবেছি তাই। একটা কথা বলি, ডার্লিং! এখানে কোথাও যা কিছু ঘটুক, কখনও মাথা খারাপ করে ফেলবে না। বিশেষ করে গুলি ছোঁড়াটা চলবে না।"

চটে গিয়ে বললাম, "বলি দিলেও চুপচাপ থাকব?"

"তোমাকে বলি দিয়ে ওর লাভ হবে না।"

"আপনাকে যদি চোখের সামনে বলি দেয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব?"

কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট জ্বেলে বললেন, "আমাকে বলি দেওয়ার সাহস ওর হবে না। কারণ আমার মনে হচ্ছে, ও আমাকে ভালোই চেনে। কঙ্কগড়ে আমি তো এই প্রথম আসছি না।"

হেঁয়ালি করা কর্নেলের এক বিরক্তিকর অভ্যাস। তাই চুপ করে গেলাম। একটু পরে নীচের দিকে মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা গেল! আলোর ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। গেটের নীচের রাস্তায় এসে মোটরসাইকেলটা থামল। তারপর টর্চের আলোয় দীপককে আসতে দেখলাম।

তার হাতেও টর্চ ছিল। বারান্দায় এসে বলল, "আলো নেই কেন কর্নেল? সার্কিট হাউসে আলো দেখে এলাম। ওখানে আলো থাকলে এখানেও থাকার কথা।"

"সম্ভবত প্রেতাত্মা মেইন সুইচ অফ করে দিয়ে গেছে।" কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন। "দিক না। জ্যোৎস্না আজকাল দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যাই হোক, আমরা এখানে উঠেছি কী করে জানলে?"

দীপক হাসল। "কিছুক্ষণ আগে রামু পাগলা— মানে সেই রামু বাবার কাছে গিয়েছিল। বিকেলে ঝিলের জঙ্গলে ওর গাধার খোঁজে গিয়ে নাকি আড়াল থেকে দেখেছে, এক দাড়িওয়ালা সায়েব ভূত ওর গাধার সঙ্গে কথা বলছেন। দেখেই সে পালিয়ে এসেছে। আপনি তো শুনেছেন, বাবার কোবরেজি বাতিক আছে। রামুকে রোজ সাংঘাতিক-সাংঘাতিক কী সব পাচন গেলাচ্ছেন। রামু

লক্ষ্মীছেলের মতো রোজ তিনবেলা বাবার কাছে পাচন গিলতে যায়। তো বাবা আমাকে খোঁজ নিতে বললেন, আপনি এই ডাকবাংলোয় উঠেছেন কি না। কারণ এই বাংলোটা ঝিল আর জঙ্গলের কাছেই।"

"আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

"ওঁকে নিয়ে প্রবলেম। সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেননি। গতকালও তা-ই। রাত দুপুরে ফিরেছিলেন। আজ কখন ফেরেন কে জানে?"

"কতদূর এগোলেন, কিছু বলেছেন তোমাকে?"

"ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের খুলি কোথায় পোঁতা ছিল, সেই জায়গাটা নাকি খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আপাতত আমাকে জায়গাটা দেখাতে চান না। যথাসময়ে দেখাবেন। দ্যাটস মাচ।" দীপক উঠে দাঁড়াল। "মেইন সুইচটা দেখে আসি। এভাবে বসে থাকার মানে হয় না!"

"থাক দিপু! পরে আলো জ্বালা হবে। তুমি গিয়ে দ্যাখো, হালদারমশাই ফিরলেন কিনা। ওঁর জন্য একটু চিন্তা হচ্ছে। গোয়েন্দা হিসাবে পাকা। পুলিশের প্রাক্তন দারোগা। দুর্দান্ত সাহসী। তবে বড্ড হঠকারী মানুষ। আর শোনো, আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগাযোগ কোরো না। দরকার হলে আমিই করব। বাবাকে বোলো, আমরা খাসা আছি। প্রেতাত্মা-দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়েছে।"

দীপক চমকে উঠল, "মাই গুডনেস! প্রেতাত্মা মানে?"

"ভূত। দিপু, তুমি এখনই কেটে পড়ো।"

দীপক হেসে ফেলল। তারপর, "ঠিক আছে, চলি।" বলে চলে গেল।

৩

কিচেনের পাশে মেইন সুইচ সত্যি নামানো ছিল। আমার সন্দেহ রঘুলালই কাজটা করেছে। কিন্তু কর্নেল তা মানতে রাজি নন। রঘুলাল তাঁর চেনা লোক। অমন বিশ্বাসী লোক নাকি তিনি জীবনে দেখেননি। দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে বহুবার কঙ্কগড়ে এসেছেন। রঘুলাল তাঁর সেবাযত্নের ত্রুটি করেনি। তাঁর সঙ্গী হয়েও ঘুরেছে।

তবে লোকটি পাকা রাঁধুনি, স্বীকার না করে পারলাম না। খাওয়ার পর বারান্দায় কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে যখন শুয়ে পড়লাম, তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। আমার ঘুম আসছিল না। কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। জানালার দিকে তাকাতে আমার ভয় করছে। এই বুঝি তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল এসে উঁকি দেবে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চাপা স্বরে বললেন, "উঠে পড়ো ডার্লিং! শিগগির!"

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম "সকাল হয়ে গেলে নাকি?"

"নাহ্। রাত দেড়টা বাজে! এখনই বেরিয়ে পড়া দরকার। ওঠো, ওঠো!"

"কোথায়?"

"বাইরে গিয়ে দ্যাখো। তা হলেই বুঝতে পারবে।"

দরজা কর্নেলই খুলে রেখেছেন। বাংলোর লনে আলো পড়েছে! তার ওধারে আদিম প্রকৃতি। ঝিলের দক্ষিণে জঙ্গলের ভেতর একটা আলো চোখে পড়ল। আলোটা নড়াচড়া করছে। বললাম, 'দীপক এই আলোর কথাই বলেছিল তা হলে!"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ সেই আলো। ঝটপট রেডি হয়ে নাও। টর্চ, ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে। কিন্তু সাবধান! আলো জ্বালবে না বা মাথা খারাপ করে গুলি ছুঁড়বে না।"

কর্নেল তৈরি হয়েই ছিলেন। আমি তৈরি হয়ে বেরোলে দরজায় তালা এঁটে দিলেন। তারপর দুজনে গেট পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে রাস্তায় নামলাম। এবার কর্নেল আগে, আমি পেছনে।

জ্যোৎস্নার জন্য জঙ্গলের ভেতরটা মোটামুটি স্পষ্ট। কোথাও চকরাবকরা, কোথাও ঘন ছায়া। শনশন করে বাতাস বইছে। কর্নেল যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন, বুঝতে পারলাম, এই জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি ওঁর পরিচিত। সেই আলোটা কখনো-কখনো আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। আলোটা জ্বলছে ঝিলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।

প্রায় মিনিট পনেরো পরে আমরা যেখানে পৌঁছেছিলাম, সেখানে এখটা ধ্বংসস্তূপ। কর্নেল গুঁড়ি মেরে জঙ্গলে ঢাকা স্তূপের মাঝখান দিয়ে এগোলেন। ফিশফিশ করে বললেন, "চুপচাপ এসো। টুঁ শব্দটি নয়।"

খানিকটা এগিয়ে একটা উঁচু প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় গেলাম দুজনে। প্রকাণ্ড সব ঝুরি নেমেছে বটগাছটার। একটা ঝুরির আড়ালে কর্নেল বসে পড়লেন। আমিও বসলাম। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানেই একটা মশাল মাটিতে পোঁতা আছে। দাউদাউ জ্বলছে।

আর মশালের পাশে দাঁড়িয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করছে সেই নরকঙ্কালটা। মশালের পেছনে একটা পাথুরে দেওয়াল। দেওয়ালে কঙ্কালটার ছায়াও নড়ছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা কঠিন, এ এমন একটা দৃশ্য।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কঙ্কালের দুহাতের মুঠোয় একটা চকচকে খাঁড়া। একটু তফাতে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা আছে। তার পাশে একটা লোক আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। কঙ্কালটা খাঁড়া নাচিয়ে খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "এখনও বলছি ওটা কোথায় আছে বল। না বললেই বলি হয়ে যাবি।"

বন্দি লোকটা গোঁ-গোঁ করে কী বলার চেষ্টা করল। পারল না।

কঙ্কালটা হুংকার দিল। "ন্যাকামি হচ্ছে? তুই আমার খুলির সমাধি খুঁড়েছিস। তুই, তুই ওটা পেয়েছিস। দে বলছি!"

বন্দি লোকটা আবার গোঁ-গোঁ করে উঠল। তখন কঙ্কালটা এক পা বাড়িয়ে খাঁড়া তুলে তেমনই খ্যানখেনে গলায় বলে উঠল, "তবে মর!"

এরপর আমার মাথার ঠিক রইল না। কর্নেলের নিষেধ ভুলে গেলাম। চোখের সামনে নরবলি হবে! আস্ত একটা ভূত মানুষের গলায় কোপ বসাবে। এ সহ্য করা যায়? একলাফে বেরিয়ে গিয়ে রিভলবার তুলে গর্জে উঠলাম, "নিকুচি করেছে ব্যাটাচ্ছেলে ভুতের!"

অমনই কঙ্কালটা শূন্যে ভেসে পেছনের পাঁচিলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়া করতে যাচ্ছি, কর্নেল ডাকলেন, 'জয়ন্ত! জয়ন্ত! কী পাগলামি করছ?" খাপ্পা হয়ে বললাম "পাগলামি আমি করছি না আপনি? চোখের সামনে একটা মানুষকে একটা ভূত ব্যাটাচ্ছেলে বলি দেবে..."

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "প্রেতাত্মার পেছনে তাড়া করে লাভ নেই, ডার্লিং! বরং এসো হলদারমশাইয়ের বাঁধন খুলে দিই।"

আকাশ থেকে পড়ে বললাম, "উনি হালদারমশাই? কী সর্বনাশ!"

কর্নেল মশালটা উপড়ে এনে বন্দি হালদারমশাইয়ের কাছে পুঁতলেন। মশালটা তৈরি করা হয়েছে একটা ত্রিশূলে। টর্চের আলোয় গোয়েন্দা ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখে কষ্ট হল। দড়ির বাঁধন খুলে দেওয়ার পর উনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। খি-খি করে একচোট হেসে বললেন, "বলি দিত না। ভয় দ্যাখাইতাছিল।"

কর্নেল টর্চের আলো জ্বেলে সেই ভাঙা দেওয়ালের কাছে কিছু তদন্ত করতে গেলেন। আমি বললাম, "হালদারমশাই! কঙ্কালটার হাতে খাঁড়া ছিল। সে সত্যি আপনার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল।"

"কী? কঙ্কাল? হালদারমশাই পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন। "কই কঙ্কাল? কোথায় কঙ্কাল? কোথায় দেখলেন?"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, 'নাহ্। একজন সাধুবাবা। ক্যাপালিক কইতে পারেন। তারে ফলো করে আসছিলাম। হঠাৎ সে গাছের উপর থেকে জাম্প দিল। ওঃ! কী সাংঘাতিক জোর তার গায়ে মশাই!"

"কিন্তু আমরা দেখলাম একটা কঙ্কাল খাঁড়া হাতে আপনাকে শাসাচ্ছে।"

"ভুল দ্যাখছেন!" বলে হালদারমশাই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালেন। আবার একচোট হেসে বললেন, "আমার ফায়ার আর্মস আছে টের পায় নাই।"

"তা হলে কোনো কঙ্কাল আপনি দেখেননি?"

"নাহ্।"

"কিন্তু সে আপনার সঙ্গে কথা বলছিল। শাসাচ্ছিল।"

"কাপালিক! কাপালিক!"

কর্নেল এসে বললেন, "কঙ্কালটাকে হালদারমশাই দেখতে পাননি। কারণ ওঁকে ওপাশে কাত করে ফেলে রেখেছিল। উনি ভাবছিলেন, যে কাপালিক ওঁকে ধরেছে, সে-ই কথা বলছে।"

হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, "কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবু কঙ্কালের কথা বলছেন। কিছু বুঝতে পারতাছি না। আপনি বুঝাইয়া দেন, এখানে স্কেলিটন আইল ক্যামনে?"

"পরে বুঝিয়ে দেব। এদিকটায় ঝিলের একটা ঘাট আছে। চলুন ঝিলের জলে, ঘাড়ে আর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেবেন। ব্রেন ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

কর্নেল মশালটা মাটিতে ঘষটে নেভালেন। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন। এখানেও একটা ভাঙাচোরা পাথুরে ঘাট।

হালদারমশাই রগড়ে হাত-মুখ ধুলেন। কাঁধে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর বললেন, "ওই যাঃ! হোয়ার আর মাই গুজ? অ্যান্ড মাই টর্চ?"

কর্নেল হাসলেন। "দেখলেন তো? জল আপনার ব্রেন কেমন চাঙ্গা করে দিয়েছে।"

হালদারমশাইয়ের জুতো দুটো ওপাশে একটি ভাঙা মন্দিরের তলায় অনেক খোঁজার পর পাওয়া গেল। কিন্তু টর্চটা পাওয়া গেল না। এদিকটায় একসময় দালানকোঠা ছিল বোঝা যাচ্ছে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে বললেন, "হ্যাঁ। এখানেই কঙ্কগড়ের রাজধানী ছিল। এখন জঙ্গল। মুঘল আমলের একটা গড়ও ছিল। সেটা এই জঙ্গলের দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখন একটা ঢিবিমাত্র। যাই হোক, আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "টর্চটা গেল। কাপালিকেরই কাজ!"

কর্নেল বললেন, "কাপালিক আপনার টর্চ কুড়োনোর সময় পায়নি। কাল সকালে এসে বরং ভালো করে খুঁজবেন।"

আমরা কয়েক পা এগিয়েছি, হঠাৎ পেছন থেকে একঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। তারপর দীপকের সাড়া পেলাম। "কর্নেল! আমি দিপু।"

হালদারমশাই ঘুরে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন, "এসো ভাগনে! এসো, মামা ভাগনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরব।"

দীপক প্রায় দৌড়ে এল। উত্তেজিতভাবে বলল "জঙ্গলে আলো দেখতে পেয়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে। তাই বেরিয়ে পড়েছিলাম. জঙ্গলে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ একটা বিকট হাসি শুনলাম। টর্চ জ্বেলে দেখি..."

কর্নেল বলে উঠলেন, "কঙ্কাল?"

"হ্যাঁ! আস্ত কঙ্কাল।" দীপকের হাতে একটা বল্লম দেখা গেল। সেটা তুলে সে বলল, "বল্লমটা তাক করতেই কঙ্কালটা ভ্যানিশ! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না কর্নেল! তবে আমি

মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কী করা উচিত ভাবছি, সেই সময় ঝিলের ঘাটে টর্চের আলো চোখে পড়ল। আপনাদের কথাবার্তা শুনতে পেলাম। আলোটা দেখেই কি আপনারাও এখানে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল বললেন। "এবং আমরাও কঙ্কালটাকে দেখেছি।"

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমি দেখি নাই। আমি একজন কাপালিক দেখেছি। তারে ফলে করেছিলাম।"

দীপক বলল, "কাপালিক! বলেন কী মামাবাবু?"

"হঃ! কাল রাত্রেও তারে ফলো করেছিলাম। চণ্ডীর মন্দিরে ওখানে ত্রিশূল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। আমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল। আবার আজও বহুক্ষণ ওত পেতে থেকে তারে দেখলাম। আজ আর মাটি খুঁড়ছিল না। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা ছিল। বোঁচকা লইয়া দৌড়ানো সহজ নয়। বোঁচকায় কী থাকতে পারে বলুন তো কর্নেলসাব?"

কর্নেল বললেন, "কঙ্কাল থাকতেও পারে।"

দীপক বলল, "তা হলে ওটা কি ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইয়ের সেই কঙ্কাল?"

কর্নেল বললেন, "কিছু বলা যায় না।! তবে আর এখানে নয়। বাংলোয় ফেরা যাক। দিপু তুমিও এসো। মামাবাবুর সঙ্গে বাড়ি ফিরবে।"

দীপক পা বাড়িয়ে নার্ভাস হেসে বলল, "ঠাকুরদার লেখা বইটার কথা তা হলে সত্যি? কিন্তু কে ওই কাপালিক?"

আমি বললাম, "সে-যে-ই হোক, আপনাদের পাতালঘর থেকে সে কঙ্কাল চুরি করেছে। এবং কোথায় খুলি পোঁতা ছিল তাও আবিষ্কার করেছে। তারপর ধড়ের সঙ্গে মুণ্ড জুড়েছে। প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি বা না করি, এই ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।"

হালদারমশাই আনমনে বললেন, "আমি কঙ্কাল দেখলাম না ক্যান?"

বললাম, "চোখে দেখেননি। তার বিদঘুটে কথাবার্তা কানে তো শুনেছেন।"

"হঃ।" বলে গুম হয়ে গেলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক।

ডাকবাংলোয় আবার আলো নেই। তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, আমাদের ঘরের দরজার তালা ভাঙা। কিচেনের দিকে গিয়ে দেখি, মেন সুইচ আগের মতো অফ করা আছে। অন করে দিলাম। আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ফিরে এসে দেখলাম, লন্ডভন্ড অবস্থা। কর্নেল তাঁর কিট্‌ব্যাগ গোছাচ্ছেন। হালদারমশাই বিড়বিড় করছেন, "চোর! চোর! কাপালিক না, চোর!"

দীপক আর আমি ওলট-পালট বিছানা দুটো ঠিকঠাক করে ফেললাম। আমার ব্যাগের জিনিসপত্র মেঝেয় ছত্রখান হয়ে পড়েছিল। গুছিয়ে নিলাম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "চোর বড্ড বোকা। তার এটুকু বোঝা উচিত ছিল, যা সে খুঁজতে এসেছে, তা বাংলোয় রেখে যাওয়ার পাত্র আমি নই। আসলে প্রথমে সে ধরেই নিয়েছিল জিনিসটা হালদারমশাইয়ের কাছে আছে। তাই তাঁকে বলিদানের ভয় দেখাচ্ছিল। আমরা গিয়ে পড়ার পর সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার মাথায় তখন খটকা বেধেছে। বলিদানের হুমকিতেও যখন জিনিসটা পাওয়া গেল না তখন ওটা নিশ্চয় হালদারমশাইয়ের কাছে নেই। সম্ভবত আমার কাছেই আছে। অতএব আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সে বাংলোয় এসে হানা দিয়েছিল।"

কর্নেল মেঝের দিকে তাকালেন। "খালি পায়ে এসেছিল চোর। লাল সুরকির স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। হুঁ, একটুখানি জলকাদা ভেঙেই— মানে শর্টকাটে এসেছিল সে। যাইহোক, রাত তিনটে বাজে প্রায়। জয়ন্ত, তুমি কিচেনে গিয়ে কেরোসিন কুকার জ্বেলে, প্লিজ, একপট কফি করে ফেলো! কফি! কফি এখন খুবই দরকার!

দীপক বলল, "চলুন জয়ন্তদা! আমি আপনাকে হেল্‌প করছি।"

রঘুলাল কাজের লোক। কিচেনে সব কিছু ঠিকঠাক রেখে গিয়েছিল। কফি তৈরির কাজটা আমিই করলাম। দীপক প্রহরীর মতো বল্লম আর টর্চ হাতে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল, যে ভীষণ ভয় পেয়েছে। পাওয়ারই কথা। ভয় কি আমিও পাইনি? এই চর্মচক্ষে জ্যান্ত কঙ্কাল দর্শন আর তার বিকট খ্যানখেনে গলায় কথাবার্তা শোনা জীবনে একটা সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। কর্নেল ঠিকই বলেন, 'প্রকৃতির রহস্যের শেষ নেই সভ্যতার আলোর তলায় আদিম রহস্যে ভরা অন্ধকার থেকে গেছে।'

কফি করতে করতে হালদারমশাইয়ের দুর্দশার বিবরণ দিলাম দীপকবাবুকে। দীপক হাসবার চেষ্টা করে বলল, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে।"

বললাম, "কর্নেলের মাথাতেও কম ছিট নেই।"

ট্রেতে কফির পট আর পেয়ালা সাজিয়ে নিয়ে এলাম। দীপক কিচেনে তালা এঁটে দিল। ঘরে ঢুকে দেখি হালদারমশাই চাপা গলায় কর্নেলকে তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিচ্ছেন।

কফি খেতে-খেতে ক্রমশ চাঙ্গা হচ্ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। প্যান্ট শার্টে লালচে দাগড়া-দাগড়া ছোপ। খি-খি করে হেসে বললেন, "কর্নেলস্যার কইলেন, যে দড়ি দিয়া আমারে বাঁধছিল, তা নাকি রামু ধোপার গাধা বাঁধার দড়ি। ঠিক, ঠিক। তাই তো ভাবছিলাম, কাপালিক দড়ি পাইল কই?"

রামু এবং তার গাধাকে নিয়ে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ রসিকতার পর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "নাহ্ দিপু এবার শুয়ে পড়া উচিত। তোমার মামাবাবুর ওপর বড্ড ধকল গেছে। ওঁর বিশ্রাম দরকার।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন।

ওঁরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে আমরা শুয়ে পড়লাম। কর্নেল বললেন, "তা হলে ডার্লিং, তোমাকে যা বলেছিলাম..."

ওঁর কথার ওপর বললাম, হ্যাঁ। রহস্য ঘনীভূত। কিন্তু কঙ্কাল যে জিনিসটা চাইছিল, সেটা কি ওই চাকতি?"

"হ্যাঁ। ব্রোঞ্জের সিল।"

"কী আছে ওতে?"

কর্নেল সেই ছড়াটা আওড়ালেন ঘুমঘুম কণ্ঠস্বরে :

আটঘাট বাঁধা
বার পনেরো চাঁদা
বুড়ো শিবের শূলে
আমার মাথা ছুঁলে
ওঁ হ্রীং ক্লীং ফট
কে ছাড়াবে জট।।

তারপর ওঁর নাক-ডাকা শুরু হল। কয়েকবার ডেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এমন সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার পর ঘুমোনো যায় না। বারবার সেই দৃশ্যটা চোখে ভাসছিল। মশালের আলোয় ভাঙা দেওয়ালের ধারে একটা নরকঙ্কাল। দুহাতে চকচকে খাঁড়া; তার ওই খ্যানখেনে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর।

কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল। তড়াক করে উঠে বসলাম। কর্নেলকে দেখতে পেলাম। মাথার টুপিতে শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল, খড়কুটো আটকে আছে। হাতে প্রজাপতি ধরা নেট-স্টিক। গলায় কামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছে। বললেন, "দশটা বাজে প্রায়। ব্রেকফাস্ট রেডি। রঘুলালকে বলে গিয়েছিলাম, তোমাকে যেন যথেচ্ছ ঘুমোতে দেয়।"

উনি পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হলেন। বুঝলাম, যথারীতি ভোরবেলা প্রকৃতিজগতে চলে গিয়েছিলেন। তবে অনেক দেরি করেই ফিরেছেন আজ।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্টে বসে বললাম, "কঙ্কালের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যিই কি ওটা তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল?" কর্নেল দাড়ি থেকে এটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, "কাল রাতেই একটা বোঝাপড়া হয়ে যেত। কিন্তু তোমার হঠকারিতার জন্যই সব ভেস্তে গেল। তুমি যদি আমার কথা মেনে চুপচাপ থাকতে, আমাকে আর বেশি পরিশ্রম করতে হত না।"

"কী মুশকিল! ব্যাটাচ্ছেলে হালদারমশাইয়ের গলায় খাঁড়ার কোপ চালাতে যাচ্ছিল যে।" কর্নেল আনমনে বললেন, "যা হওয়ার হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে বেরোনো যাক।"

"ওই ভূতুড়ে জঙ্গলে?"

"নাহ্। শ্মশানে।"

৪

কঙ্কাল দর্শনের পর শ্মশানযাত্রা। যদিও দিনদুপুর, ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। কর্নেলের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে বনবাদাড় ভেঙে যেখানে পৌঁছোলাম, সেখানে একটা নদী। নামেই নদী। বালি আর পাথরে ঠাসা অগভীর একটা সোঁতা। এঁকেবেঁকে ঝিরঝিরে একফালি কালো জল অবশ্য বয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় জীর্ণ কুঁড়েঘর। নদীর বালিতে গর্ত খুঁড়ে তিনটে কাচ্চাবাচ্চা হুল্লোড় করে কী খেলা খেলছে।

কর্নেল কুঁড়েঘরের কাছে গেলেন। এতক্ষণে ওপাশে একটা বাঁশের মাচা দেখতে পেলাম। মাচায় বসে আছে একটা পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে। কষ্টিপাথরে খোদাই করা চেহারা যেন। পরনে হাফপ্যান্ট আর ছেঁড়া লাল গেঞ্জি। আমাদের দেখে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্নেল মিঠে গলায় বললেন, "কী মনাই? আমাকে চিনতে পারছ না? গত বছর তুমি আমাকে জঙ্গলের গাছ থেকে কত অর্কিড পেড়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ছে।"

মনাই নামে ছেলেটির মুখে একই হাসি ফুটল। মাচা থেকে নেমে সেলাম দিয়ে বলল "নদীর ওপারে একটা গাছে দেখেছি স্যার! লাল-লাল পাতা।"

"তোমার বাবার খবর শুনে মন খারাপ হয়ে গেছে মনাই!"

মনাইয়ে মুখের খুশি চলে গেল। চোখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। বুঝলাম, মনাই সেই জগাইয়ের ছেলে। তার চোখ ছলছল করছিল।

কর্নেল বললেন, "তোমার মা কোথায়?"

মনাই আস্তে বলল, "ঘাটোয়ারিবাবুর অফিসে গেছে। বাবার মাইনের টাকা বাকি। বাবু রোজ ঘোরাচ্ছে মাকে।"

কর্নেল বাঁশের মাচায় সাবধানে বসলেন। পুরোনো মাচা ওঁর ভার সইতে পারবে না মনে হচ্ছিল। উনি ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। ভয়ে ভয়ে একপাশে বসলাম। কর্নেল বললেন, "জগাইয়ের এটা আড্ডা-দেওয়ার আখড়া ছিল জয়ন্ত! সন্ধেবেলা ওর কাছে কত লোক আড্ডা দিতে আসত। তাই না মনাই?"

মনাই মাথা নাড়ল।

"মাঝে মাঝে সাধুসন্ন্যাসীরাও এসে এখানে ধুনি জ্বালিয়ে বসতেন শুনেছি। জগাই বলছিল। তো তোমার বাবা খুন হওয়ার আগেও নিশ্চয় কোনো সাধুসন্ন্যাসী এসেছিলেন। ওই যে! ধুনির ছাই দেখছি।"

মনাই একটু ইতস্তত করে বলল, "ম্যাজিকবাবুর সঙ্গে এক সাধু আসত স্যার! চেহারা দেখলে ভয় করে। মাথায় জটা। লাল চোখ। মা বলছিল, ওই সাধুই প্রথমে ম্যাজিকবাবুকে চণ্ডীর থানে বলি দিয়েছে। তারপর বাবাকে।"

"ম্যাজিকবাবু মানে শচীন হাজরা?"

মনাই মাথা দোলাল। বলল, "মা বলছিল, ওই সাধুই অজ্ঞান করে বাবাকে বলি দিয়েছে। বাবাকে যে রাত্তিরে বলি দেয়, খুব ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি জেগেই ছিলাম। মা বারবার ঘরের দোর ফাঁক করে বাবাকে ডাকছিল। বাবা এল না। শেষে জলঝড় থামলে মা লণ্ঠন হাতে এখানে এল। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এল। বলল, দুজনে ঠ্যাং ধরে টানতে-টানতে ঘরে ঢোকাব।"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "বলো কী! তারপর?"

"এসে দেখি বাবা নেই। সাধু বসে আছে। মা সাধুবাবাকে ডাকাডাকি করল। সাধুবাবা চোখ বুজে মন্তর পড়ছিল। তাকালই না। তখন মা সাধুবাবাকে বকাঝকা করল। অনেকক্ষণ পরে সাধুবাবা চোখ কটমট করে বলল, "জগাইকে একটা কাজে পাঠিয়েছি। তোরা ঘুমোগে যা।"

"তোমরা ঘুমোতে গেলে?"

মনাই ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে বলল, "হুঁ। তারপর আর বাবার পাত্তা নেই। সক্কালে একটা মড়া এল। ঘাটোয়ারিবাবুর লোক এক পাঁজা কাঠ মাথায় করে এল। বাবা নেই দেখে সে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করল। সেই সময় রামু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল চণ্ডীর থানে।"

মনাই ঢোক গিলে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "পুলিশ আসেনি তারপর?"

"এসেছিল স্যার! মা সব বলেছে পুলিশকে।"

"আচ্ছা মনাই, সেই সাধুবাবাকে আগে কখনও দেখেছ? ভালো করে ভেবে বলো।"

"দেখিনি। তবে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল।"

"ভজুয়াকে নিশ্চয় চিনতে তুমি? সে-ও তো বলি হয়ে গেছে শুনেছি।"

"হ্যাঁ স্যার! মা বলছিল এ-ও সাধুবাবার কাজ। সাধুবাবা নাকি মানুষ না। মানুষের রূপ ধরে এসেছিল।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন। "ঠিক বলেছ মনাই! শুনেছি সাধুবাবা আসলে একটা নরকঙ্কাল।"

মনাই চমকে উঠল। ভয়-পাওয়া মুখে বলল, "স্যার! মা বলছিল, সাধুবাবার কাছে যেন একটা কঙ্কাল দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে পাইনি। মা নাকি দেখেছিল।"

"সেই ঝড়বৃষ্টির রাতে?"

মনাই জোরে মাথা দোলাল। কর্নেল ওর হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে টাকাটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল। বলল, "চলুন স্যার! সেই গাছ থেকে লালপাতার ঝুরি পেড়ে দেব।"

"ওবেলা আসব'খন। তো, ভজুয়া তোমার বাবার কাছে আড্ডা দিতে আসত না?"

"আসত। আসত স্যার!"

"সাধুবাবা থাকার সময় ভজুয়া এসেছিল?"

"হুঁউ!"

কর্নেল উঠলেন। বললেন, "ওবেলা আসব। তখন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। চলি!"

শ্মশানতলা থেকে একফালি পায়ে-চলা পথে পৌঁছে বললাম, "ছেলেটা বেশ স্মার্ট। এবং অত্যন্ত সরল।"

"প্রকৃতির মধ্যে যারা থাকে, তারা স্বভাবত সরল হয়। আর ওকে স্মার্ট বললে। সে-ও ঠিক। কারণ এখনই ওকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই দিতে হবে। সম্ভবত এই বয়সেই ঘাটোয়ারিবাবু ওকে

কাজে বহাল করবেন। তবে মড়াপোড়ানো কাজটা ওর পক্ষে কঠিন হবে না। বাবার সঙ্গে এই কাজটা ওকে করতে হয়েছে। আমি দেখেছি।"

"এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"ম্যাজিকবাবুর বাড়ি।"

কঙ্কগড়ের এদিকটা চেহারায় একেবারে পাড়াগাঁ। গা ঘেঁষাঘেঁষি মাটির বাড়ি, টালি বা খড়ের চাল। কিন্তু কয়েকটা বাড়ির মাথায় টিভির অ্যান্টেনা দেখে অবাক হলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা পিচের রাস্তায় উঠলাম। এরপর মফস্‌সল শহরের চেহারা। নতুন-পুরোনো একতলা বা দোতলা বাড়ি। পিচ রাস্তায় ট্রাক, টেম্পো, জিপ, প্রাইভেট কার এবং সাইকেল রিকশার বিরক্তিকর আনাগোনা। মোড়ে একটা খালি সাইকেল রিকশার কাছে গেলেন কর্নেল। বললেন, "ওহে রিকশাওলা, এখানে ম্যাজিকবাবুর বাড়িটা কোথায় জানো?"

রিকশাওলা চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বলল, "ম্যাজিকবাবু? সে তো মা চণ্ডীর থানে নরবলি হয়ে গেছে স্যার!"

"বলো কী!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড। কথায় বলে, বেদের মরণ সাপের হাতে। যে ভূতটাকে নিয়ে খেলা দেখাত, সেই ভূতটাই নাকি বলি দিয়েছে!"

"ভূত নিয়ে খেলা দেখাত ম্যাজিকবাবু? কেমন ভূত? তুমি দেখেছিলে ভূতের খেলা?"

রিকশাওলা দুঃখিত মুখে একটু হাসল। "দেখেছিলাম স্যার! নরকঙ্কাল ইস্টেজে এসে নাচত। ম্যাজিকবাবু বলত, ওঠ। উঠে দাঁড়াত। বোস, বললে বসত। নাচ, বললে নাচত। সে কী নাচ স্যার!"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "ওর বাড়িটা কোথায়? নিয়ে চলো আমাদের।"

রিকশাওলা বলল, "ম্যাজিকবাবুর নিজের বাড়ি তো ছিল না স্যার! বাউন্ডুলে লোক। মাঝে-মাঝে এসে থাকত। আবার চলে যেত কোথায়।"

"কিন্তু কার বাড়িতে এসে থাকত?"

"মোহনবাবুর বাড়িতে। ইস্কুলের মাস্টার উনি।"

"চলো। মোহনবাবুর কাছে যাওয়া যাক।" বলে কর্নেল রিকশায় উঠে বসলেন। ওঁর ইশারায় আমিও উঠে বসলাম।

রিকশাওলা বলল, "কিন্তু মাস্টারমশাই তো এখন ইস্কুলে আছেন।"

"ওঁর বাড়ি গিয়ে খবর দেব'খন। তুমি ওঁর বাড়িতেই নিয়ে চলো।"

"বাড়ি অবধি রিকশা যাবে না।"

"যতদূর যায়, নিয়ে চলো।"

রিকশাওলা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে প্যাডেলে চাপ দিল। যেতে-যেতে বলল, "মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে কাউকে পাবেন না। মিছিমিছি হয়রান হবেন, স্যার!"

কর্নেল বললেন, "কেন? বাড়িতে লোক নেই?"

"নাহ্। মাস্টারমশাই একা থাকেন। বিয়ে-টিয়ে করেননি। বিধবা দিদিকে এনে রেখেছিলেন। তিনিও স্বগ্‌গে গেছেন।"

"ম্যাজিকবাবু সঙ্গে নিশ্চয় কোনও সম্পর্ক ছিল মাস্টারমশাইয়ের?"

"শুনেছি, পিসতুতো না মাসতুতো ভাই ওঁরা!"

পিচরাস্তা ছেড়ে খোয়াঢাকা এবড়োখেবড়ো ঘিঞ্জি গলি রাস্তায় এগোচ্ছিল রিকশা। একসময় নিরিবিলি একটা জায়গায় পৌঁছোলাম। কাছাকাছি বাড়ি নেই। শুধু জরাজীর্ণ ছোটো ছোটো মন্দির আর পোড়ো ভিটে। জঙ্গল গজিয়ে আছে চারদিকে। সংকীর্ণ রাস্তাটা সোজা এগিয়ে গেছে। একধারে

রিকশা দাঁড় করিয়ে রিকশাওলা বলল, "আর যাওয়া যাবে না স্যার। এই যে পায়ে চলা রাস্তা দেখছেন, সিধে গিয়ে বাঁ দিকে তাকাবেন। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি দেখতে পাবেন!"

আমরা নামলে সে রিকশা ঘুরিয়ে একটু হেসে বলল, "মাস্টারমশাইকে খবর দেওয়ার লোক পাবেন কি? দেখুন। বরঞ্চ আমাকে দুটো টাকা বাড়তি দিলে ইস্কুলে খবর দেব। আপনাদের ফেরত নিয়েও যাব।"

"কর্নেল ওকে পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বললেন, "দরকার নেই। আমি লোক খুঁজে নেব।"

রিকশাওলা এতক্ষণে সন্দিগ্ধমুখে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে রিকশার সিটে উঠল। তারপর কে জানে কেন, খুব জোরে রিকশা চালিয়ে চলে গেল। কর্নেল অভ্যাসমতো বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে বললেন, "এসো জয়ন্ত। কুইক। আমার ধারণা, রিকশাওলা মোহনবাবুকে যেচে পড়েই খবর দেবে, দুজন উটকো লোক ওঁর বাড়িতে গেছেন।"

পায়ে চলা পথে শুকনো পাতা পড়ে আছে। দু-ধারে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা শিবমন্দির। ঘন ঝোপঝাড় আর উঁচু গাছপালা পাখিদের তুমুল চ্যাঁচামেচি চলেছে। এলোমেলো জোরালো হাওয়া দিচ্ছে। বাঁ দিকে প্রায় হানাবাড়ির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ি দেখা গেল। সদর দরজায় তালা আঁটা। কনেল বাড়ির পেছন দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ওদিকটায় একটা হজামজা পুকুর দেখা গেল। কর্নেল আবার চারপাশটা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, "তুমি এই ঝোপের আড়াল থেকে ওই রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখো। কাউকে এদিকে আসতে দেখলে তিনবার শিস দেবে। বোকামি কোরো না কিন্তু। সাবধান।"

বাড়ির পেছনের পাঁচিল জায়গায় -জায়গায় ধসে গেছে কবে। সেখানে ডালপালার বেড়া দেওয়া হয়েছে। একখানে বেড়া ঠেলে সরিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাগিয়ে ধরলাম এবং গুঁড়ি মেরে বসলাম। রাস্তাটার দিকে নজর রাখলাম।

তারপর কর্নেলের আর পাত্তা নেই। বসে আছি তো আছিই। অস্বস্তি যত, বিরক্তিও তত। কতক্ষণ পরে পেছনে কোথাও শুকনো পাতার মচমচ শব্দ এল। দ্রুত পিছু ফিরে দেখি, পুকুরের দিকে নেমে যাচ্ছে একটা গাধা। তার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা। রামুর গাধাটা নয় তো?

গাধাটা অদৃশ্য হলে আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে দেখি কর্নেল যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই। সেই রিকশাটা এসে থামল। রিকশা থেকে রোগা চেহারার ধুতিপাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত নামলেন। অমনই তিনবার শিস দিলাম।

এতক্ষণে কর্নেল বেড়া গলে বেরিয়ে এলেন। চাপা স্বরে বললেন, "কেটে পড়া যাক। চলে এসো।"

আমরা গুঁড়ি মেরে পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পুকুরের চারপাড়ে ঘন জঙ্গল। তলায় দামে ঢাকা খানিকটা জল। গাধাটা পিঠে বোঁচকা নিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে জলজ ঘাস খাচ্ছে। কর্নেল গাধাটার দিকে প্রায় দৌড়ে গেলেন। ওঁর এই পাগলামি দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

উনি কাছে যেতেই গাধাটা এক লাফে পুকুরের ধারে - ধারে নড়বড় করে দৌড়োতে থাকল। কর্নেল তাড়া করলেন। গাধাটা পাড়ের জঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল।

এবং কর্নেলও।

অগত্যা আমাকে দৌড়োতে হল। পাশের জঙ্গলে ঢুকেছি, পেছন থেকে চেরা গলায় হাঁকডাক ভেসে এল, "চোর! চোর! ধর! ধর!"

একবার ঘুরে দেখে নিলাম, সেই রিকশাওলা আর সম্ভবত মোহন মাস্টারমশাই দৌড়ে আসছেন। কেলেঙ্কারিতে পড়া গেল দেখছি। জঙ্গল পেরিয়ে গিয়ে দেখলাম কর্নেল বা গাধা নেই। হলুদ ফুলে ঢাকা সরষে আর সবুজ ধানখেত এদিকটায়। ডানদিকে পোড়ো ভিটে আর ভাঙাচোরা

মন্দির। লুকিয়ে পড়ার জন্য সেদিকটায় দৌড়ে গেলাম। পেছনের চ্যাঁচামেচি ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের আড়ালে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলাম। তারপরে দেখতে পেলাম কর্নেলকে। চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা উঁচু গাছের ডগায় কিছু দেখছেন। কাছে গিয়ে বললাম, "কী অদ্ভুত কাণ্ড আপনার।"

"ডার্লিং। আমার চেয়ে অদ্ভুত কাণ্ড করল রামুর গাধাটা। রামু পাগল হয়েছে। গাধাটার তো পাগল হওয়ার কথা নয়।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "আর একটু হলেই কেলেঙ্কারি হত। সেই রিকশাওলা আর মোহনবাবু আমার পেছনে চোর-চোর, ধর-ধর বলে তাড়া করেছিলেন।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "তোমাকে দেখে ফেলেছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা তোমারই বোকামি। আমার পেছন-পেছন তোমারও দৌড়োনো উচিত ছিল।" বলে কর্নেল চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। "কুইক জয়ন্ত। আর এখানে নয়। গাধাটা এতক্ষণে ঝিলের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছে।"

"নাহ্। আপাতত গাধার পেছনে ছোটা নিরর্থক।"

সোজা এগিয়ে সেই পিচের রাস্তায় পৌঁছোলাম দুজনে! তারপর একটা খালি সাইকেল রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "জমিদারবাড়ি। তাড়াতাড়ি চলো ভাই।"

আকার - প্রকারে মনে হচ্ছিল, এসব বাড়িকেই হয়তো একসময় বলা হত সাতমহলা পুরী। কিন্তু এখন হতশ্রী অবস্থা। দেউড়ি আছে এবং মাথায় দুটো সিংহও আছে। কিন্তু সিংহের পেট ফুঁড়ে অশ্বত্থচারা গজিয়েছে। দারোয়ান থাকার কথা নয়। দু-ধারে পামগাছ এবং এবড়োখেবড়ো একফালি রাস্তা। পোর্টিকোর তলায় গিয়ে রিকশা থেকে দুজনে নামলাম। তারপর হলঘরের দরজায় দীপককে দেখলাম। বলল, "আসুন, আসুন। ওপর থেকে আপনাদের দেখতে পেলাম। আবার কোনও গন্ডগোল হয়নি তো?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্। তোমার বাবা আছেন?"

"বাবা স্কুলে গেলেন একটু আগে। ম্যানেজিং কমিটির মিটিং আছে। উনি তো কমিটির সেক্রেটারি। ভেতরে আসুন।"

হলঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন, "হালদারমশাইয়ের খবর কী?"

দীপক হাসল, "ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন! অদ্ভুত মানুষ!"

"আচ্ছা দিপু, তোমাদের পাতালঘরের চাবি কার কাছে থাকে?"

দীপক একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ভজুয়ার কাছে নীচে কিছু ঘরের চাবি থাকত। কারণ সেই-ই এসব ঘর দেখাশোনা করত। আসলে ভজুয়া যে ঘরে থাকত, তার পাশে একটা ঘরে পুরোনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ঠাসা আছে। ওই ঘরের কোনাতেই পাতালঘরে নামার গোপন সিঁড়ি আছে।"

"ঘরটা একটু দেখতে চাই। মানে সেই সিন্দুকটা।"

"এক মিনিট! মায়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে আসছি।"

একটু পরে সে চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এল। গোলাকধাঁধার মতো কয়েকটা ঘরের ভেতর দিয়ে সেই ঘরটাতে নিয়ে গেল সে। দরজা খুলে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। আবর্জনার মতো পুরোনো চেয়ার-টেবিল-খাট ইত্যাদির স্তূপে ঘরটা ভর্তি। এক কোণে কাঠের আলমারি দাঁড় করানো আছে। দীপক সেটা ঠেলে সরাতেই একটা ছোট্ট দরজা দেখা গেল। সে দরজা খুলে গোপন সুইচ টিপে আলো জ্বালল। বলল, "আসুন।"

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছোট্ট একটা ঘরে পৌঁছোলাম। কেমন ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দেওয়ালে সিঁদুরের ছোপে একটা স্বস্তিকা আঁকা। তার নীচেই কালো কাঠের সিন্দুকটা খুলল দীপক। কর্নেলের পকেটে সব সময় টর্চ থাকে দেখছি। টর্চের আলোয় ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে দুর্গন্ধে আমি অস্থির। কর্নেল হঠাৎ ঝুঁকে একটা কালচে ছোট্ট জিনিস সিন্দুকের ভেতর থেকে তুলে নিলেন। উজ্জ্বল মুখে বললেন, "হুঁ! পাওয়া গেল তা হলে।"

দীপক বলল, "কী পাওয়া গেল কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "যা পাওয়া উচিত ছিল। চলো, বেরোনো যাক এখান থেকে।"

৫

হলঘরে ফিরে কর্নেল বললেন, "এই জিনিসটার খোঁজে ম্যাজিকবাবুর ডেরায় হানা দিয়েছিলাম। তার ম্যাজিকের বাকসো-প্যাঁটরা তন্নতন্ন খুঁজে যখন পেলাম না, তখন বুঝলাম এটা হয়তো সিন্দুকের ভেতর থেকে গেছে। কাপালিকবেশী লোকটি যে-ই হোক, তাকে ম্যাজিকবাবু এটা দিলে প্রাণে মারা পড়ত না। ম্যাজিকবাবু ভজুয়ার সাহায্যে সিন্দুক থেকে তান্ত্রিক আদিনাথের কবন্ধ লাশের হাড়গোড় নিয়ে গিয়েছিল..."

দীপক চমকে উঠে বলল, "ভজুয়ার সাহায্যে? অসম্ভব।"

"সম্ভব ডার্লিং!" কর্নেল সোফায় বসে চুরুট ধরালেন। "যখের ধনের লোভ সবচেয়ে সাংঘাতিক লোভ। চিন্তা করে দ্যাখো। ওই পাতালঘর থেকে ভজুয়ার সাহায্য ছাড়া কারও পক্ষে কাজটা সম্ভব ছিল না। তোমার ঠাকুরদার বইয়ে লেখা আছে, কবন্ধ লাশ দুমড়ো-মুচড়ে কাপড়ে বেঁধে সিন্দুকে ঢোকানো হয়েছিল। এতকাল পরে কাপড় আস্ত থাকার কথা নয়। কাজেই হাড়গোড়গুলো আবার একটা কাপড়ে বা চটের থলেয় ভরে নিয়ে গিয়েছিল দুজনে। এদিকে মাংস গলে পচে কাপড় গুঁড়ো হয়ে এই জিনিসটা সিন্দুকের তলায় খসে পড়েছে এবং সেঁটে গেছে।"

জিনিসটা কর্নেল দেখলেন। বাংলোয় দেখা আধখানা চাঁদের গড়ন সেই সিলের বাকি টুকরো বলে মনে হল। বললাম, "একটা গোটা সিল দু-টুকরো করার কারণ কী?"

কর্নেলের দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "বইয়ে তান্ত্রিক আদিনাথের ছবি আছে। শিবের জটায় চন্দ্রকলার ছবি দেখেছ তো? ওঁর জটাতেও তেমনই আধখানা খুদে চাঁদের মতো জিনিস আছে। প্রথমে গ্রাহ্য করিনি। পরে দেখলাম ওঁর ডান বাহুতে তাগার মতো অবিকল একই জিনিস বাঁধা আছে। আতশ কাচে দুটোই পরীক্ষা করে বুঝলাম একটা খুদে সিলের দুটো টুকরো। কী সব খোদাই করা আছে ওতে! তখনই বুঝলাম তান্ত্রিক আদিনাথ যত বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁর ভাইপো হরনাথ মানে, দিপুর ঠাকুরদাও তত বুদ্ধিমান ছিলেন। হরনাথ লিখেছিলেন, দেবী চণ্ডিকার ধনে লোভ করা উচিত নয়। বইয়ে 'ধ' হরফ এবং 'লো' হরফ পোকায় কেটেছে। তাই দিপুর বাবা ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। দু-দুটো নরবলির পর ওঁর সন্দেহ হয়। তাই আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন!"

দিপু বলল, "বাপস্! মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সেকালের লোকেরা কী অদ্ভুত ছিল!"

"হ্যাঁ। এখন তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু হরনাথ ধর্মপ্রাণ মানুষ। দেবী চণ্ডিকার ধনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বংশধরদের হাতে দিতে চেয়েছিলেন। ওই ছড়াটা উনি তাই নিজেই রচনা করে লিখে গেছেন। ওর মধ্যে একটা সূত্র লুকানো আছে। সিলের আধখানা তো সিন্দুকে নিরাপদে রইল। বাকি আধখানা খুঁজে বের করার জন্য ওই ছড়া! কিন্তু ছড়াটা কাজে লাগেনি। জগাই জানত, মুন্তু কোথায় পোঁতা আছে।"

বললাম, "কিন্তু তান্ত্রিক আদিনাথকে বলি দিল কে?" কর্নেল হাসলেন। "ওটা গপ্পো। আমার থিয়োরি হল, আসলে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর পর দেবী চণ্ডিকার লুকিয়ে রাখা ধন যাতে সহজে

কেউ খুঁজে না পায় তাই হরনাথ একটা সাংঘাতিক কাজ করেছিলেন। মৃতদেহের মুন্ডু কেটে কোথাও পুঁতে রাখার জন্য...."

বাধা দিয়ে বললাম, "বোগাস। আপনার থিয়োরির মাথামুন্ডু নেই। সিলের টুকরো দুটো লুকিয়ে রেখে গেলেই পারতেন! কোনও বদ্ধ পাগল ছাড়া মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে পারে না।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "সাড়ে বারোটা বাজে। চলি দিপু! ওবেলা এসে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব।"

দীপক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইরে গিয়ে বললাম, "জগাই কী করে জানল কোথায় মুন্ডু পোঁতা আছে?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'তুমি তো কথাটা শেষ করতেই দিলে না। আমি কি বলেছি হরনাথ নিজের হাতে তান্ত্রিক জ্যাঠার লাশের মুন্ডু কেটে ছিলেন? মড়া কাটার জন্য ওঁর একজন লোকের দরকার ছিল। জগাইরা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করে। হরনাথের বইয়ে একজনের উল্লেখ আছে। তার নাম গদাই। নিশ্চয় জগাইয়ের ঠাকুরদা বা তার বাবা। নামে নামে মিল। এদিকে তো পূর্বপুরুষের কোনও গোপন কথা বংশানুক্রমে পরিবারে চালু থাকে। এই পরিবারেও ছিল। আমার থিয়োরি নিখুঁত, ডার্লিং!"

"কী করে অত নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"জগাই একইভাবে খুন হয়ছে বলে!" কর্নেল গেট পেরিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ডাকলেন। তারপর বললেন, "বাংলোয় ফিরে বুঝিয়ে দেব।"

বাংলোয় পৌঁছে দেখি, হালদারমশাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এসে চাপা স্বরে বললেন, "কাপালিকের ডেরা ডিসকভার করেছি কর্নেল! গড়খাইয়ের ওপারে একটা গুহার মতো গম্বুজঘরে সে থাকে। কম্বলের তলায় ভাঁজকরা এই চিঠি ছিল।"

কর্নেল ওঁর হাত থেকে ইনল্যান্ড লেটার নিয়ে বললেন, "দিপু আপনার জন্য ভেবে সারা। শিগগির গিয়ে ওকে দেখা দিন। আর শুনুন! একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। রামুর গাধার পিঠে একটা বোঁচকা বাঁধা আছে। গাধাটা নয়, বোঁচকাটা খুব দরকার।"

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। "কই? কই সে?"

"খেয়েদেয়ে খুঁজতে বোরোবেন। ঝিলের জঙ্গলেই দেখা পেতে পারেন। কিছুক্ষণ আগে ওকে তাড়া করে ওদিকেই পাঠিয়ে দিয়েছি।"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে উধাও হয়ে গেলেন।

খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল ইনল্যান্ড লেটার পড়ে আমাকে দিলেন। চিঠিতে লেখা আছে :

শঙ্করদা,

পত্রপাঠ চলে আসুন জগাই রাজি হয়েছে। ভজুয়াও রাজি। গতবারের মতো সেজে আসবেন। শ্মশানতলায় থাকবেন। মা চণ্ডীর কৃপায় এবার আর ব্যর্থ হব না। প্রণাম রইল। ইতি—

নাম ঠিকানা ইংরেজিতে লেখা! 'শ্রী এস. এন. ভট্টাচার্য। কেয়ার অব জয়চণ্ডি অপেরা। ৩৩/১, ঠাকুরপাড়া লেন, কলকাতা-৫।

বললাম, "যাত্রাদলের লোক?"

কর্নেল হাসলেন। "তাই তো মনে হচ্ছে। তার পক্ষে কাপালিক সাজা সহজ। এবার এই চিরকুটটা দ্যাখো। ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরার বাকসে পেয়েছি।"

চিরকুটটা দেখেই বললাম, "আমাকে যে চিরকুটটা ছুঁড়ে কাল বিকেলে ভয় দেখিয়েছিল, তারই লেখা। ম্যাজিকবাবুকে শ্মশানতলায় ডেকেছিল দেখছি। তলায় ইংরেজিতে 'এস' লেখা, সেই শঙ্করদা!"

"হ্যাঁ। জগাইকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিল, 'এসে গেছি।' যাই হোক, এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। বলে কর্নেল তাঁর কিট্‌ব্যাগ থেকে প্যাড বের করে আঁকজোক শুরু করলেন। তারপর বললেন, "এটা একটা ওলটানো ত্রিভুজ।"

...'এ' বিন্দু ভজুয়া, 'বি' বিন্দু জগাই এবং 'সি' বিন্দু ম্যাজিকবাবু শচীন হাজরা, মাঝখানে 'ডি' বিন্দু হল শঙ্কর নামে একটা লোক। যে কোনো কারণেই হোক শঙ্কর প্রকাশ্যে কঙ্কগড়ে আসতে পারে না। অথচ সে দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন-রহস্য জানে। সে তিজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল।

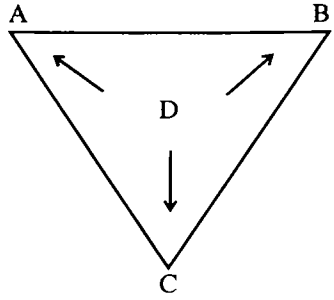

এতদিন পরে সে ম্যাজিকবাবুর সাহায্যে প্রথমে তান্ত্রিক আদিনাথের ধড় হাতাল। কিন্তু সিলের অর্ধাংশ পেল না। তখন ম্যাজিকবাবু ওটা হাতিয়েছে সন্দেহ করে তাকে খতম করল। তারপর জগাই মুন্ডু উদ্ধার করে দিলে। কিন্তু মুন্ডুতেও সিলের বাকি আধখানা নেই। থাকবে কী করে? মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। সন্দেহক্রমে খাপ্পা হয়ে সে জগাইকে খতম করল। কারণ সে ধরেই নিয়েছিল গুপ্তধনের লোভে তাকে ওরা ফাঁকি দিচ্ছে। বাকি রইল ভজুয়া। আমার ধারণা, ভজুয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিল শঙ্কর। নিশ্চয় ওকে লোভ দেখিয়ে বাগে এনেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকেও সন্দেহক্রমে খতম করেছে। গুপ্তধনের লোভ পেয়ে বসলে মানুষ হিংস্র হয়ে ওঠে। তিন-তিনজনকে সে অবশ করে দেবী চণ্ডিকার থানে এনে বলি দিয়েছে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। কিন্তু সে আশা ছাড়েনি। দিপুর বাবা গোয়েন্দা এনেছেন কলকাতা থেকে, সে জেনে গিয়েছে। তাই ভেবেছে, গোয়েন্দার ওপর বাটপাড়ি করবে। আসলে আমাদের হালদারমশাই অতি-উৎসাহে— ঠিক তোমার মতোই..."

বাধা দিয়ে বললাম, "জ্যান্ত কঙ্কাল চোখের সামনে নাচতে দেখলে মাথার ঠিক থাকে না।"

কর্নেল সেই কালো আধখানা সিলটা লোশন দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকলেন। বললেন, "আজ পূর্ণিমা। আজ রাতে আবার কঙ্কালের নাচ দেখাব তোমাকে। শিয়োর!"

দুপুরে আমার ভাতঘুমের অভ্যাস আছে। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। কর্নেল সিলের টুকরো দুটো জোড়া দিয়েছেন। বললেন, "একপিঠে দেবী চণ্ডিকার রণমূর্তি। অন্যপিঠে শুধু স্বস্তিকাচিহ্ন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। গুপ্তধনের সূত্র কোথায়? দেবী চন্ডিকা আর স্বস্তিকা।" কর্নেল টাকে হাত বোলাতে থাকলেন। চোখ বুজে গেল।

একটু পরে চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। বললাম, "গুপ্তধনটা গুলতাপ্পি নয় তো?"

"কিছু বলা যায় না। যাকগে চলো। বেরোনো যাক।"

"গুপ্তধনের খোঁজে?"

"নাহ্। থানায়।"

"থানায় যেতে আমার ভালো লাগে না। আপনি যান।"

কর্নেল উঠে দরজার কাছে গিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বরং তুমি রামুর গাধাটা ধরতে হালদারমশাইকে সাহায্য করতে পারো। ওই দ্যাখো, ঝিলের দক্ষিণের ঘাটে হালদারমশাই ওত পেতে বসে আছেন।"

বারান্দায় গিয়ে দেখি, সত্যি তাই। হালদারমশাই ঘাটের পাশে একটা ঝোপের ধারে বসে আছেন! গাধাটা দেখতে পেলাম না। কর্নেল চলে যাওয়ার পর রঘুলালকে ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলে বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তায় নেমেছি, হালদারমশাইয়ের চিৎকার শোনা গেল।

"জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! গাধা! গাধা!"

পিঠে বোঁচকাবাঁধা গাধাটা জঙ্গল ফুঁড়ে ছুটে আসছিল। আমি দু-হাত তুলে এগিয়ে যেতেই ঝিলের ঢালে নেমে গেল। তারপর দিব্যি জলজঘাসের দিকে মুখ বাড়াল। আমি রঘুলালকে ডাকলাম। সে দৌড়ে এল। বললাম, "গাধাটা ধরতে হবে। বকশিশ পাবে রঘুলাল।"

হালদারমশাই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "গাধা কয় আর কারে!"

রঘুলাল একটা মজার কাজ পেয়ে গেল যেন। সে বলল, "চ্যাঁচামেচি না করে তিনজনে তিনদিক থেকে ঘিরে ধরতে হবে স্যার। রামুর গাধাটা খুব বদমাশ! লাথি ছুঁড়তে পারে।

হালদারমশাই বললেন, "দড়ি লও রঘুলাল! আমার কাছে দড়ি আছে।"

রঘুলাল দড়ি নিয়ে পা টিপে-টিপে এগোলো। বললাম, "দড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন নাকি?"

হালদারমশাই হাসলেন। "নাহ্। কাইল রাত্রে কাপালিক আমারে এই দড়ি দিয়া বাঁন্ধছিল না?"

রঘুলাল চাপা গলায় বলল, "আপনারা দু-দিকে রেডি থাকুন সার!"

সে কাছাকাছি যেতেই গাধাটা ঘুরল। অমনই রঘুলাল তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকে দিল। হালদারমশাই এবং আমি গিয়ে দড়ি ধরে ফেললাম। টাগ অব ওয়ারে শেষ পর্যন্ত গাধাটা পরাস্ত হয়ে ঘাসে পড়ে গেল। হালদারমশাই তার পিঠ থেকে বোঁচকাটা খুলে নিয়ে বললেন, "খুব জব্দ এবার। রঘুলাল! ওকে ছেড়ে দাও! কিন্তু ইস্‌স্! বোঁচকাটায় কী বিটকেল গন্ধ!"

গাধা বেচারা গলায় দড়ির ফাঁস নিয়ে নড়বড় করে দৌড়ে রাস্তায় উঠল। বুঝলাম, বুদ্ধিমান গাধা। জঙ্গলে ঢুকলে দড়িটা কোথাও আটকে গিয়ে বিপদে পড়ত।

হালদারমশাই বাংলোয় এলেন আমার সঙ্গে। কর্নেল নেই শুনে নিরাশ হলেন। বোঁচকা থেকে সত্যি বিকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। সেটা এনে ফেলে রেখে বারান্দায় বসলাম আমরা। রঘুলাল কফি করতে গেল। হালদারমশাই সন্দিগ্ধভাবে বললেন, "বোঁচকায় কী আছে যে, এমন দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। গাধার পিঠে এটা বাঁধলই বা কে?"

হাসতে - হাসতে বললাম, "খুলে দেখুন না! গুপ্তধন থাকতেও পারে।"

হালদারমশাইয়ের ধৈর্য রইল না আর। উঠে গিয়ে নোংরা কাপড়ের বোঁচকাটা খুলে ফেললেন। তারপর লাফিয়ে উঠে বললেন, "সর্বনাশ! মড়ার খুলি আর হাড়গোড়ে ভর্তি।

চমকে উঠেছিলাম। বুক ধড়াস করে উঠেছিল। বললাম, "এই সেই তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল।"

বোঁচকাটা ঝটপট বেঁধে হালদারমশাই বললেন, "আপনি কাইল রাত্তিরে দেখছিলেন, একটা কঙ্কাল আমারে বলি দিতে চাইছিল? হেই ব্যাটাই! কিন্তু খড়্গ গেল কই?"

বললাম, "কাপালিকের কাছে।"

"হঃ। ঠিক কইছেন।" বলে হালদারমশাই বারান্দায় এলেন। ধপাস করে বসে জোরে শ্বাস ছাড়লেন। বোঝা গেল, এতক্ষণে উনি বেজায় উত্তেজিত।

একটু করে কফি খেতে খেতে আমরা গুপ্তধন রহস্য নিয়ে আলোচনা করছি, রঘুলাল ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং লনে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে ঝিলের দিকে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ বলল, "কর্নেলসাব আসছেন। ওই দেখুন।"

ঝিলের ধারে জঙ্গলের ভেতর কর্নেলকে হন্তদন্ত আসতে দেখলাম। হালদারমশাই হন্তদন্ত গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে গেটের নীচে কর্নেলের টুপি দেখা গেল। হালদারমশাই জয়ের উল্লাসে বলে উঠলেন, "বোঁচকার ভেতর স্কেলিটন অ্যান্ড স্কাল!"

সাড়ম্বরে ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে হালদারমশাই কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর বারান্দায় ফিরে এলেন। রঘুলাল আবার কফি করতে গেল। বললাম, "গেলেন তো থানায়। ফিরলেন জঙ্গল থেকে। নিশ্চয় অর্কিড খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন না জঙ্গলে?"

কর্নেল হাসলেন। মুখে ক্লান্তির ছাপ। বললেন, "ফাঁদ পাততে গিয়েছিলাম।"

"কিসের ফাঁদ?"

"কাপালিক ধরার। হালদারমশাই ওর ডেরার খোঁজ দিয়েছেন। সেই ডেরায় ঢুকে গুপ্তধনের সূত্র অর্থাৎ সিলটা রেখে এলাম। সঙ্গে একটা চিঠি। সন্ধ্যা সাতটায় ঝিলের পুবের ঘাটে বুড়ো শিবের মন্দিরের সামনে দেখা করতে লিখেছি। শর্ত দিয়েছি, গুপ্তধনের আধাআধি বখরা চাই। দেখা যাক টোপ গেলে কি না। গুপ্তধনের লোভ অবশ্য সাংঘাতিক।"

অবাক হয়ে বললাম, "সিলটা রেখে এসেছেন! করেছেন কী!"

কর্নেল চাপা স্বরে সকৌতুকে বললেন, "বলেছি ডার্লিং, আজ রাতে কঙ্কালের নাচ দেখব। আর হালদারমশাই স্বচক্ষে দেখবেন তাঁকে কে বলি দেবে বলে শাসাচ্ছিল।"

হালদারমশাই বললেন, "সে - ব্যাটা তো ওই বোঁচকার ভেতর বাঁধা আছে।"

"হালদারমশাই! প্রেতাত্মা তার কঙ্কালসুদ্ধু বোঁচকা থেকে বেরিয়ে পড়বে। যাইহোক, রঘুলালকে দিয়ে ওটা আপাতত বাথরুমে রাখতে হবে। এখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। পৌনে সাতটায় আমরা বুড়ো শিবমন্দিরের ওখানে পৌঁছোব।"

একটা চূড়ান্ত মুহূর্তের দিকে পৌঁছোতে গেলে যা হয়। সময় যেন কাটতে চায় না। সাড়ে ছ-টায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। নীচের রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঝিলের উত্তর পাড় ধরে কর্নেল এগোলেন। স্তূপ, খানাখন্দ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে মোটামুটি ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সবে চাঁদ পুবের গাছপালার মাথা আলো করে উঁকি দিচ্ছে। হালদারমশাই ফিশফিশ করে বললেন, "আরে! এখানেই তো কাপালিক মাটি খুঁড়ছিল।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। খুলি পোঁতা ছিল এখানেই। ওই দেখুন, বুড়ো শিবের মন্দির। চূড়োয় একটা ত্রিশূল পোঁতা আছে।"

এই সময় কাছাকাছি কেউ বলে উঠল, "এসে গেছি কর্নেল!"

"চলে এসো দিপু!"

দীপক একটা স্তূপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হাতে সেই বল্লম আর টর্চ। কর্নেল আমাদের নিয়ে ফাঁকা জমিটায় গেলেন। তারপর বললেন "সবাই মন্দিরের আড়ালে যাও। কুইক! দিপু, এদের নিয়ে যাও। সাবধান! টুঁ শব্দটি করবে না।"

কতকালের পুরোনো মন্দির। তার একপাশে ঘন ছায়ায় আমরা তিনজনে বসে রইলাম। কর্নেল ফাঁকা জমিটায় পায়চারি করছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, একটু পরে ওঁকে সেই ছড়াটা আওড়াতে শুনলাম। ছড়াটা বার-দুই আউড়েছেন, কেউ খ্যানখ্যানে গলায় বলে উঠল, "ওঁ; হ্রীং ক্লীং ফট!"

তারপর দপ করে একটা মশাল জ্বলে উঠল। পেছনে ঘন ঝোপ। ঝোপের মাথায় মশালটা আটকানো মনে হল।

হঠাৎ ঝোপ ডিঙিয়ে একটা আস্ত নরকঙ্কাল লাফ দিয়ে এসে দাঁড়াল। তার দু-হাতে ধরা একটা চকচকে খাঁড়া নেড়ে তেমনই ভুতুড়ে গলায় বলল, "এসেছিস? আয়, আয়! কাছে আয়!"

কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দেবী চণ্ডিকার গুপ্তধন কি উদ্ধার হয়নি?"

"কাছে আয়! কথা হবে।"

"আর কিসের কথা মশাই? সিল তো পেয়ে গেছেন।"

কঙ্কাল খাঁড়া নামিয়ে বলল, "চালাকি? আমি কে জানিস? আমি তান্ত্রিক আদিনাথ। আমার দেবীর ধন। আমার সঙ্গে ফক্কুড়ি? তবে রে ব্যাটা বুড়ো টিকটিকি!"

এবার যেন কর্নেলেরই আমার মতো মাথা খারাপ হয়ে গেল। টিকটিকি বলার জন্যই কি খেপে গেলেন? রিভলভার বের করে দৌড়ে গেলেন। কঙ্কালটা তড়াক করে ঝোপ ডিঙিয়ে পালাতে যাচ্ছিল। ঝোপে আটকে গেল। তারপর হঠাৎ ঝোপের ওপাশে অনেক টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ধুপধাপ, দুদ্দাড়, ছুটোছুটি শব্দ। আমরা দৌড়ে কর্নেলের কাছে গেলাম। কর্নেল সেই কঙ্কালটা ঝোপের ডগা থেকে নামিয়ে এনে বললেন, "ম্যাজিকবাবুর ম্যাজিক কঙ্কাল! ম্যাজিকের স্টেজে পুতুলনাচের কৌশল পেছন থেকে প্লাস্টিকে তৈরি কঙ্কালটাকে দড়ির সাহায্যে কনট্রোল করা হত। হুঁ, খাঁড়াটা দেখছি পিসবোর্ডে মোড়া রাংতার। বলে হাঁক ছাড়লেন, "কই মি. ধাড়া! আপনার আসামি কোথায়?"

ঝোপের পেছন থেকে সাড়া এল, "বড্ড বেয়াড়া আসামি! এক মিনিট কর্নেল!"

তারপর সদলবলে বেরিয়ে এলেন সত্যিকার খাঁড়া হাতে এক দারোগাবাবু। তাঁর পেছনে কনস্টেবলরা লাল কাপড়পরা এক কাপালিককে বেঁধে নিয়ে এল। দারোগাবাবু বললেন, "খাঁড়াটা দেখেছেন? হাতে এটা ছিল বলেই অ্যারেস্ট করতে একটু দেরি হল।"

কর্নেল কাপালিকের জটাজুট এবং গোঁফদাড়ি হ্যাঁচকা টানে খুলে দিয়ে টর্চ জ্বেলে বললেন, "দ্যাখো তো দিপু, লোকটাকে চিনতে পারো কি না?"

দীপু অবাক হয়ে বলল, "এ কী! শঙ্করকাকা না?"

"হ্যাঁ। তোমার বাবার জ্ঞাতিভাই শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য। তোমাদের বাড়ি থেকে পাঁচ হাজার টাকা চুরি করে পালিয়েছিল। তুমি তখন আসানসোলে কলেজ-স্টুডেন্ট। তোমার বাবার কাছে জেনে নিয়ো কী সাংঘাতিক আর জঘন্য চরিত্রের লোক এই শঙ্করনাথ। মি. ধাড়া! আসামি নিয়ে থানায় চলুন। আমি পরে দেখা করব।"

দারোগাবাবু এবং কনস্টেবলরা আসামি নিয়ে চলে গেলেন। হালদারমশাই কঙ্কালটা পরীক্ষা করছিলেন। খি-খি করে হেসে বললেন, "কী কাণ্ড! আমি ভাবছিলাম বোঁচকা থেকে বেরিয়ে — খি-খি-খি!"

বললাম, "কিন্তু ওই অদ্ভুত ছড়াটার মানে কী?"

কর্নেল, বললেন, "ওই দ্যাখো, 'বার-পনেরো-চাঁদা' উঠেছে। বুড়ো শিবের ত্রিশূলের ছায়া কোথায় পড়েছে লক্ষ্য করো! ওখানে খুলিটা পোতা ছিল। হুঁ, গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিই। 'আঁটঘাট বাঁধা' নয়, কথাটা হল আটঘাট বাঁধা। এই ঝিলের চারদিকে বাঁধানো ঘাট আছে। বুড়ো শিবের মন্দির তো দেখতেই পাচ্ছ। 'বার পনেরো চাঁদ' মানে বারো নম্বর মাস অর্থাৎ চৈত্র মাস। 'পনেরো' হচ্ছে চাঁদে পঞ্চদশী তিথি। তার মানে চৈত্র মাসে পূর্ণিমার চাঁদ যখন বুড়ো শিবের ত্রিশূলের মাথায় দেখা যাবে, ত্রিশূলের ছায়া যেখানে পড়বে, সেখানেই খুলি পোঁতা আছে। তাই ছড়ায় আছে : 'বুড়ো শিবের শূলে। আমার মাথায় ছুঁলে।' কিন্তু চূড়ার জট ছাড়ানোর আগেই জগাই খুলির খোঁজ দিয়েছিল শঙ্করনাথকে।

"গুপ্তধনের কী হল?"

"তুমি ভুলে গেছ জয়ন্ত, পাতালঘরের দেওয়ালে আমরা সিঁদুরে আঁকা স্বস্তিকাচিহ্ন দেখেছি। সিলের একপিঠে স্বস্তিকা আছে। অন্যপিঠে দেবী চণ্ডিকার মূর্তি। ওই মূর্তিটাই গুপ্তধন। প্রায় এক কেজি ওজনের সোনার দেবীমূর্তি। থানায় খবর দিয়ে দিপুদের বাড়ি গিয়ে গুপ্তধন উদ্ধার করেছি। স্বস্তিকা আঁকা ছিল যেখানে, সেখানে খুঁড়তেই সোনার মূর্তি পাওয়া গেল। কাজেই সিলটা শঙ্করনাথের ডেরায় রেখে এসেছিলাম। ওটাই ফাঁদ। বুঝলে তো?

হালদারমশাই উদাস চোখে চাঁদ দেখছিলেন। বললেন, "চলেন কর্নেলস্যার। বাংলোয় গিয়া বোঁচকাটা দেখা দরকার।"

কর্নেল কঙ্কালটা দিব্যি ভাঁজ করে গুটিয়ে বললেন, "বোঁচকা আছে। শঙ্করনাথ-তান্ত্রিক আদিনাথের কঙ্কাল আর খুলিতে সিল না পেয়ে খাপ্পা হয়ে ওটা রামুর গাধার পিঠে বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু গাধাটাকে এই কাজে লাগাতে হলে রামুকে ভয় দেখিয়ে ঘাট থেকে তাড়ানো দরকার ছিল। তাই ম্যাজিকবাবুর কঙ্কাল দেখিয়ে বেচারাকে ভাগিয়ে দেয়। আস্ত কঙ্কালের নাচ দেখে রামুর পাগল হওয়া স্বাভাবিক। তবে এবার ওকে সুস্থ করা যাবে।"

আমরা বাংলোয় ফিরে চললাম।

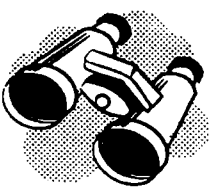

ইয়াজ্‌দার্গিদের হিরে

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' সবেগে ঘরে ঢুকে সশব্দে সোফায় বসে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলেন, "অসম্ভব!" অবিশ্বাস্য! অদ্ভু-উ-ত!

তাঁর চোখ দুটো গুলি-গুলি এবং গোঁফের ডগা তির তির করে কাঁপছিল। এ-পকেট ও-পকেট খোঁজাখুঁজি করে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ফ্যালাইয়া আইছি।"

বুঝলাম জিনিসটা নস্যির কৌটো। উত্তেজনার সময় ওঁর মুখে মাতৃভাষা বেরিয়ে আসে। তাছাড়া খানিক নাটুকে স্বভাবের মানুষও বটে। সামান্য ব্যাপারে তিলকে তাল করে ফেলেন। পেশাদার গোয়েন্দা হওয়ার দরুন সবসময় সবকিছুতে সন্দিগ্ধ হয়ে রহস্য খোঁজেন।

বিশালদেহী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সম্ভবত কোনও দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি দেখছিলেন এবং সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সেটির জৈব গোত্র বিচার করছিলেন। জানালা দিয়ে ছিটকে পড়া রোদ্দুরে ওঁর চওড়া টাক ঝকমক করছিল। বললেন, "অদ্ভুতের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে হালদারমশাই!"

"হঃ! ঠিক কইছেন, হালদারমশাই সোজা হয়ে বসলেন। ভূত। ভূত!"

হাসি চেপে বললাম, "কোথায় দেখলেন হালদারমশাই?"

হালদারমশাইয়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। চাপা গলায় বললেন, "চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে সার্ভিস করছি। রিটায়ার্ড লাইফে প্রাইভেট ডিটেকটিভ অ্যাজেন্সি খুলছি। ড্যাঞ্জারাস-ড্যাঞ্জারাস ক্যাস হাতে লইছি। কখনও ভূত দেখি নাই। কাইলই রাত্রে স্বচক্ষে দ্যাখলাম।"

"ভূত দেখলেন?"

"হঃ! ভূত ছাড়া কী? নিজের একখান চক্ষু খুইলা বেসিনে রাখল। জলে ধুইয়া ফের পইরা লইল।"

হাসতে-হাসতে বললাম, "নকল চোখ বা নকল দাঁত অনেকেই পরেন।"

হালদারমশাই চটে গিয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবু! আমি পোলাপান না। বেসিনের জলে রক্ত দেখছি।"

ভূতের শরীরে রক্ত থাকে নাকি?

হালদারমশাই আরও খাপ্পা হয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। ওঁর জন্য স্পেশাল কফি অর্থাৎ তিনভাগ দুধ একভাগ লিকার। উনি কফির দিকে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বন্ধু এতক্ষণে চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। অভ্যাসমতো আওড়ালেনও "কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ডারউইনসায়েবের বিবর্তনবাদ ভূতের ক্ষেত্রেও খাটে ডার্লিং! নিয়ানডারথ্যাল মানুষ থেকে ক্রোম্যাগনন মানুষ। তা থেকে হোমো-সাপিয়েন্স, আমরা যে-মানুষ। সেইরকম আদিম ভূত থেকে বর্তমান ভূত। এ-ভূতের রক্তও থাকতে পারে। হলিউডে তৈরি সায়েবভূতের ছবি দেখেছে। ড্রাকুলার ভূত রক্তচোষা ভূত ছিল। দিশি ভূত ঘাড় মটকাত। কিন্তু রক্ত খেত না। বিলিতি ভূতের চরিত্রই অন্যরকম। তারা যেমন রক্ত খায়, তেমনই তাদের শরীরে রক্তও থাকে। আধুনিক সায়েবভূত কীরকম, চিন্তা করো!"

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে কফি খাচ্ছিলেন। বললেন, "কর্নেলস্যার! ঠিক ধরেছেন। লোকটার চেহারা সাহেবগো মতো।"

এবার একটু আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, "ব্যাপারটা খুলে বলুন তো হালদারমশাই!"

কফি শেষ করে হালদারমশাই যা বললেন তা মোটামুটি এই :

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দমদম এলাকায় এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে গিয়েছিলেন। ফিরতে রাত প্রায় দশটা হয়ে যায়। যশোর রোডের মোড়ে ট্যাক্সি বা বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। শীতের রাত। ঘন কুয়াশা। রাস্তাঘাট সুনসান নিঝুম। হঠাৎ দেখলেন, তাঁর পাশ দিয়ে একটা লোক রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার মধ্যিখানের আইল্যান্ডে বাগান করেছে পুরসভা। ঝোপঝাড়ে কালো হয়ে আছে। লোকটা সেখানে যেতেই কেউ সেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে গুলি ছুঁড়ল। অমনই লোকটা তাকে দু-হাতে ধরে ওপরে তুলে আছাড় মারল। তারপর হনহন করে এগিয়ে ওপারের একটা বাড়ির গেটে ঢুকে গেল। কয়েক সেকেন্ডের ঘটনা।

পর-পর কয়েকটা গাড়ি চলে যাওয়ার পর হালদারমশাই দৌড়ে গেলেন। আবছা আলোয় দেখলেন, দলপাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ফুটপাত ঘেঁষে পড়ে আছে। এক্ষেত্রে অন্য কেউ হলে চ্যাঁচামেচি করে লোক ডাকত। কিন্তু হালদারমশাই স্বভাব-গোয়েন্দা। তাই সেই শক্তিমান লোকটার খোঁজেই ছুটে গেলেন।

গেটটা জরাজীর্ণ এবং ভেতরে প্রায় একটা জঙ্গল। তার ভেতর হানাবাড়ির মতো একটা দোতলা বাড়ি। ছায়ার আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে হালদারমশাই পাঁচিল ডিঙোলেন। আগাছার জঙ্গলে ঢুকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ নীচের একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠল।

সাহস করে এগিয়ে একটা খোলা জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, সেই লোকটা বাথরুমে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। একটা চোখ রক্তাক্ত। হালদারমশাই বুঝলেন, আততায়ীর গুলি তার চোখেই লেগেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সে সেই চোখটা উপড়ে নিয়ে বেসিনে ট্যাপ খুলে ধুল। চোখের গর্ত থেকে সম্ভবত খুদে গুলিটাও টেনে বের করে ফেলল। তারপর চোখটা আবার পরে নিল।

দৃশ্যটা শুধু ভয়ংকর নয়, বীভৎসও। এই পর্যন্ত দেখে হালদারমশাইয়ের নার্ভের অবস্থা শোচনীয়। তিনি আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপতে - কাঁপতে পালিয়ে এলেন। ততক্ষণে রাস্তায় কিছু লোক জড়ো হয়েছে। গাড়ি চাপা পড়ে দুর্ঘটনা ধরে নিয়েই তারা উত্তেজিত। কিন্তু গোয়েন্দার স্বভ্যব। হালদারমশাই গুলির শব্দ শুনেছেন। তাই আগ্নেয়াস্ত্রটি খুঁজছিলেন। একটু পরে তা দেখতেও পেলেন। পয়েন্ট ২২ ক্যালিবারের কালচে রঙের রিভলভারটা পড়ে আছে হাত তিরিশেক দূরে ফুটপাতের ওপর। লোকের চোখ এড়িয়ে সেটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর গ্যারাজগামী একটি বাস দৈবাৎ পেয়ে গেলেন।

সারারাত ঘুমোতে পারেননি হালদারমশাই। পুলিশকে জানাতে ভরসা পাননি। কারণ তাঁকে নিয়ে পুলিশ মহলে প্রচুর ঠাট্টাবিদ্রূপ চালু আছে। তাছাড়া নিজেই এই রহস্যের সমাধান করার লোভ রয়েছে। তাই ভেবেচিন্তে 'কর্নেলস্যারের' লগে কনসাল্ট করতে এসেছেন।....

কর্নেল চোখ বুজে শুনছিলেন। দাঁতের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট। বললেন, "সাহেবের মতো চেহারা?"

হালদারমশাই বললেন, "কতকটা মানে, মড়ার মতো দেখতে। মাথায় ঝাঁকড়া চুলগুলি কেমন লালচে। গড়নে আমার মতো লম্বা। তবে রোগাও না, মোটাও না।"

"বয়স অনুমান করতে পারেন?"

হালদারমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবুর কাছাকাছি হইব।"

"তা হলে যুবক বলা চলে।"

"হঃ! জয়ন্তবাবুর মতোই গোঁফদাড়ি কিছু নাই।"

"পোশাক?"

"প্যান্ট সোয়েটার। সোয়েটারের রং ব্লু— সরি! নেভি-ব্লু।" বলে হালদারমশাই জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে খুদে একটি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল রিভলভারটি কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে দেখার পর বললেন, "সিক্স রাউন্ডার চিনে অস্ত্র। কাজেই চোরা বেআইনি জিনিস। এটা আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে হালদারমশাই?"

হালদারমশাই জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। তবে কর্নেলস্যার, এখনই সেই বাড়িটা চেক করনের দরকার। চলেন, যাই গিয়া।"

উৎসাহের সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই সময় ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী একটু পরে একটা নেমকার্ড এনে বলল, "এক সায়েব বাবামশাই! বেরৎ নাক।"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, "নিয়ে আয়।" তারপর অস্ত্রটি টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকালেন।

হালদারমশাই ধপাস করে বসে পড়েছিলেন। আমিও একটু চমকে উঠেছিলাম। সায়েবভূতের কথা শোনার পর 'বেরৎ' অর্থাৎ কিনা বৃহৎ নাকওয়ালা সায়েবের আবির্ভাবে বুক ধড়াস করে ওঠারই কথা। হালদারমশাই গুলি-গুলি নিষ্পলক চোখে বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল কার্ডটা টেবিলে রেখে বললেন, "পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত ম্যাডান জুয়েলার্সের মালিক এফ এস ম্যাডান।"

হালদারমশাই আশ্বস্ত হয়ে শ্বাস ছাড়লেন। আমিও।

সুটপরা ঢ্যাঙা রোগাটে গড়নের এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করে ইংরেজিতে বললেন, "আমি কর্নেলসায়েবের সঙ্গে গোপনে কিছু কথা বলতে চাই।"

"হিরেচুরি সম্পর্কেই কি?"

ম্যাডান একটু হেসে বললেন, "তা হলে আমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।"

"আপনি বসুন। তবে কী অর্থে আমাকে ঠিক লোক বললেন, জানি না। আপনার বাড়ির গোপন বেসমেন্টে রাখা ইস্পাতের ভল্ট থেকে ১৮২ ক্যারেটের একটা হিরে চুরির খবর গত মাসে কাগজে সবিস্তার বেরিয়েছিল। আপনার দাবি, হিরেটি নাকি ঐতিহাসিক।"

ম্যাডান আমাদের দেখে নিয়ে বললেন, "আমার কিছু গোপন কথা আছে।"

কর্নেল আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "আপনার গোপন কথা এঁদের কাছে আমি গোপন রাখতে পারব না, মি. মাদান। কাজেই—"

ম্যাডান ওঁর কথার ওপর বললেন, "কী বললেন? মাদান? আপনি তা হলে পারসি ভাষা জানেন?"

"সামান্যই। ম্যাডান স্ট্রিট যাঁর নামে, তিনিও আপনাদের জোরাস্তারি ধর্মের লোক ছিলেন। বাঙালি বসু যেমন ইংরেজিতে বোস হয়েছেন, মাদানও তেমনি ম্যাডান। যাইহোক, বলুন আপনার গোপন কথা।"

ম্যাডান একটু ইতস্তত করে বললেন, "একমাস হয়ে গেল, পুলিশ কিছু করতে পারল না। ফরেন্সিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, লেসার রশ্মি দিয়ে ইস্পাতে ভল্টের একটা অংশ গলিয়েছে চোর। বেসমেন্টে ঢোকার গোপন দরজার লকও গলিয়েছে। এই পর্যন্তই।"

"আপনি বলেছেন, হিরেটা ঐতিহাসিক। একটু বুঝিয়ে বলুন।"

"পারসিক সাসানীয় বংশের শেষ সম্রাট ইয়াজ্‌দাগির্দের মকুটে এই হিরে বসানো ছিল। তিনিও আমাদের জোরাস্তারি ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্তমান বাগদাদের কিছু দূরে হিরার যুদ্ধে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকে তিনি আরবদের হাতে পরাজিত হন। তাঁর মুকুট থেকে পবিত্র হিরেটি খুলে নিয়ে পালায় তাঁর এক অনুচর। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। প্রায় সাড়ে তেরশো বছর এ-হাত ও-হাত ঘুরে হিরেটি যায় এক ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের হাতে। তাঁর বংশধর গত জুন মাসে নিউইয়র্কের নিলামঘরে সেটি বেচতে দেন। ১২ লক্ষ ডলারে আমার এজেন্ট কিনে নেন। বিশ্বের সব বড়ো নিলামকেন্দ্রে

আমার এজেন্ট আছেন।" ম্যাডান একটু দম নিয়ে বললেন, "দুঃখের কথা কী জানেন কর্নেল সরকার? এই অধম ফিরুজ শাহ মাদানেরই পূর্বপুরুষ সম্রাট ইয়াজ্‌দার্গিদের সেই অনুচর। প্রামাণিক ঐতিহাসিক তথ্যও আপনাকে দেখাতে পারি।"

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন, "পবিত্র হিরে আপনি উদ্ধার করে দিন। এর জন্য যত টাকা লাগে আমি দিতে রাজি। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, পুলিশের পক্ষে এ কাজ দুঃসাধ্য।"

"নিউ ইয়র্কের নিলামঘরে আপনার এজেন্টের নাম কী?"

"টেডি পিগার্ড। খুব বিশ্বস্ত লোক। জমিজমা-সম্পত্তির কারবারি। আবার অন্যের হয়ে নিলামঘরে হরেকরকম জিনিস নিলামেও ডাকেন। বলা দরকার কর্নেলসায়েব, আমার মতো ওঁর অনেক মক্কেল আছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মক্কেলের সঙ্গে ওঁর বোঝাপড়া আছে। কোন্ জিনিস কোন্ মক্কেলের হয়ে নিলামে কিনতে চাইছেন বা কেনেন, তা পিগার্ড এবং সেই মক্কেল ছাড়া ঘুণাক্ষরে আর কেউ জানতে পারবে না। পিগার্ড তা জানাবেন না। আপনি তো জানেন, ব্যবসাবাণিজ্যে কিছু নীতি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।"

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বলে উঠলেন, "হঃ! ট্রেড সিক্রেট।"

"ট্রেড সিক্রেট!" সায় দিলেন ম্যাডান। "এভাবে বহু রত্ন আমি পিগার্ডের মারফত কিনেছি। প্রায় কুড়ি বছরের যোগাযোগ তাঁর সঙ্গে। এই পবিত্র হিরে যে নিলামে বিক্রি হবে, তা পিগার্ডই আমাকে জানিয়েছিলেন। তার কারণ বুঝতেই পারছেন। জোরাস্তারি সম্রাটের মুকুটের হিরে এবং আমিও একজন জোরাস্তারি। তো শুনেই আমি আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। আমাদের পরিবারে বংশপরম্পরা এই হারানো হিরের কাহিনি চালু আছে। আমার ঠাকুরদার হাতে লেখা বৃত্তান্তে এর উল্লেখ আছে। খবর পেয়েই চলে গেলাম নিউইয়র্ক। পিগার্ডকে বললাম, এই হিরে আমার চাই। চিন্তা করুন কর্নেলসায়েব, এ-যাবৎকাল সর্বোচ্চ দরে ওই নিলামঘরে একটুকরো হিরে বিক্রি হল। রেকর্ড দর!"

কর্নেল বললেন, "পিগার্ডকে আপনি বলেছিলেন হিরেটার সঙ্গে আপনাদের পরিবারের সম্পর্ক আছে?"

"নাহ্। ম্যাডানসায়েব চাপা গলায় বললেন, "বলিনি। তার কারণ পিগার্ড তা হলে বেশি কমিশন দাবি করতেন।"

"আপনার বাড়িতে আর কে আছেন?"

"আমার মেয়ে খুরশিদ আর জামাই কুসরো। আমার স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মারা গেছেন।"

"আর কেউ আছেন?"

"আয়া, খানসামা, বাবুর্চি, আমার ড্রাইভার, দারোয়ান— এরা আছে। কিন্তু পবিত্র হিরের ব্যাপারটা তাদের জানার কথা নয়।"

"আপনার মেয়ে-জামাইয়ের?"

"তারা জানত।"

"আপনার জামাই কী করেন?"

"আমার দোকানের দায়িত্ব তারই হাতে।"

"কলকাতায় আপনার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয় আছেন?"

"অবশ্যই আছেন।"

হালদারমশাই ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন, "ইয়োর ডটার বাই সিলিপ্ অব টাং—"

ম্যাডান রুষ্টভাবে বলেন, "নো!"

হালদারমশাই দমে গিয়ে আবার ফেলে আসা নস্যির কৌটো খুঁজতে থাকলেন। কর্নেল বললেন, "যাইহোক। সম্রাট ইয়াজদার্গিদের হিরে যে আপনার বাড়িতে আছে এবং কোথায়

লুকোনো আছে, সে কথা কেউ জানতে পেরেছিল। সে যদি সত্যি লেসার রশ্মি ব্যবহার করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, সে একজন বিজ্ঞানী। কারণ এখও বিজ্ঞানী ছাড়া লেসার রশ্মি ব্যবহার কেউ করতে জানে না। করার ঝুঁকি সাংঘাতিক।"

"পুলিশও তাই বলছে।"

বলে ম্যাডানসায়েব কৌটোর ভেতর পকেট থেকে একটা ব্যাংকের চেকবই বের করলেন। "ফি -বাবদ আপনাকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে চাই কর্নেল সরকার। আমি আজ বিকেলের প্লেনে ক'দিনের জন্য বাইরে যাব। দরকার হলে আমার বাড়ি বা দোকানে টেলিফোনে কুসরোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তাকেও বলে যাব আপনার কথা।"

ম্যাডান চেকবই খুললে কর্নেল বললেম, "দুঃখিত মি. ম্যাডান। আমি ফি নিই না।"

"সে কি! এই কেসে আপনাকে—"

"মি. ম্যাডান, আমি ডিটেকটিভ নই। বলে কর্নেল হালদারমশাইকে দেখিয়ে দিলেন। "উনি ডিটেকটিভ। কী হালদারমশাই, কেস নেবেন নাকি?"

হালদারমশাই হাসতে গিয়ে গম্ভীর হলেন। ম্যাডান বললেন, "কর্নেলসায়েব! আমি কিন্তু আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আপনি কেসটা নিন। আমার বিশ্বাস, আপনিই পবিত্র হিরে উদ্ধার করে দিতে পারবেন।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। কোনও কথা বললেন না।

ম্যাডানসায়েব দ্বিধার সঙ্গে বললেন, "দয়া করে যদি আমার সঙ্গে আসেন, আমার বাড়ির গোপন বেসমেন্ট এবং ভল্ট দেখাতে পারি। আমার মনে হচ্ছে, আপনার দেখা দরকার।"

কর্নেল বললেন, "আপাতত দরকার দেখছি না।"

"তা হলে আপনি কেস নিচ্ছেন না?"

"আপনি কবে ফিরছেন বাইরে থেকে?"

"আগামী রবিবার।"

"ফিরে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

ম্যাডানসায়েব গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন। "ক্যাসটা লইলেন না কর্নেলসার? প্রচুর রহস্য! প্রচুর।"

"তার চেয়ে সাংঘাতিক রহস্যের খবর আপনি এনেছেন। বলে কর্নেল টেলিফোন তুলে ডায়াল করতে লাগলেন। একটু পরে কাকে বললেন, সোমা নাকি? আমি কর্নেল— না! না! শোনো! গত রাত্রে যশোর রোডে একটা অ্যাকসিডেন্ট— হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি ইনটারেস্টেড। পরিচয় পাওয়া গেছে? এক সেকেন্ড। লিখে নিচ্ছি।" কর্নেল টেবিলে রাখা প্যাড টেনে কী সব লিখে নিলেন। চাপা দুর্বোধ্য কিছু কথাবার্তাও বললেন।

হালদারমশাই বললেন, "ক্কী? ক্কী?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "ম্যাডানসায়েবের হঠাৎ এতদিন পরে আমার কাছে আসার কারণ খুঁজছিলাম, হালদারমশাই! আমার যখনই সন্দেহ হয়, কেউ কোনও তথ্য গোপন করে আমার সাহায্য চাইছে, তখন তার কেস নেওয়া আমি পছন্দ করি না। গত রাত্রে আপনার দেখা ভূতটা যাকে আছাড়ে মেরেছে, তার নাম জামসিদ নওরোজি।"

চমকে উঠে বললাম, "পারসি নাম!"

"হ্যাঁ। তার চেয়ে বড়ো কথা, ভদ্রলোকের একটা কিউরিয়ো শপ আছে। প্রত্নদ্রব্যের দোকান।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "আবার তাঁর দোকানটাও ম্যাডান জুয়েলার্সের ওপরতলায়। কাজেই চলুন হালদারমশাই, সেই ভূতের আখড়াটি দেখে আসা যাক। জয়ন্ত! তুমিও চলো তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য কয়েক কিস্তি লোভনীয় খাদ্য পেয়ে যাবে।"

২

প্রথমে চোখে পড়ল জংধরা ছোট্ট গেটের পাশে সাঁটা একটুকরো চৌকো ফলক। তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'Human Genome Research Centre.'

দোতলা বাড়িটা সত্যিই হানাবাড়ি। গেটে তালা বন্ধ। ভেতরে আগাছার জঙ্গল। চারদিকে দেওয়ালঘেরা এই বাড়ির অবস্থাও জরাজীর্ণ। পলেস্তারা খসে গেছে কোথাও-কোথাও। কার্নিসে গাছ গজিয়ে আছে। পুরোনো আমলের বাগানবাড়ি হতে পারে। ডাইনে বিশাল এলাকা জুড়ে কী কারখানা গড়া হচ্ছে। বাঁ দিকে একফালি খোয়াবিছানো রাস্তা এবং নতুন পুরোনোয় ঘেঁষাঘেঁষি অনেক বাড়ি। একটাতে ঘন গাছপালা। হঠাৎ করে মনে হয় গ্রাম শহরে মেশানো কোনও মফস্‌সল জনপদ।

কর্নেল বাইনোকুলারে গেট থেকে ভেতরটা দেখছিলেন। বললাম, "এ কিসের গবেষণাকেন্দ্র?"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "জেনেটিক্‌সের।"

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন, "কী? কী"

জবাব না দিয়ে কর্নেল ফুটপাত ধরে এগিয়ে গেলেন একটা পান-সিগারেটের দোকানের দিকে। হালদারমশাই আমার দিকে তাকালেন। বললাম, "জেনেটিক ব্যাপারটা আমিও বুঝি না হালদারমশাই। শুধু একটুকু বলতে পারি, এখানে সম্ভবত কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র গড়া হবে। তাই আগেভাগেই ফলক সেঁটে দিয়েছে।"

"গভমেন্টের কারবার! দেখি, নস্য পাই নাকি।" বলে হালদারমশাইও সেই দোকানটার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন।

আমি আমার ক্রিমরঙা মারুতি গাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। এভাবে একানড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। পড়েছি দু-দুজন ছিটগ্রস্তের পাল্লায়। বরাতে কী আছে কে জানে। বসে থাকতে থাকতে গেটের ভেতর দিয়ে বাড়িটার দিকে তাকালাম। সেইসময় হঠাৎ দোতলার একটা জানালা খুলে গেল এবং একটা মুখ দেখলাম।

নাহ্। ভূতের মুখ বলে মনে হল না। গোলগাল অমায়িক এবং বেশ সভ্যভব্য মানুষের মুখ। আপনমনে হাসছেন তিনি। উৎসাহে গাড়ি থেকে নেমে ওঁকে ডাকব ভাবছি, হঠাৎ জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল। তা হলে বাড়িটাতে এখন কেউ আছেন। কিন্তু বাইরের থেকে গেটে তালা কেন? খটকা লাগল।

কর্নেল এবং হালদারমশাই ফিরে এলে কথাটা বললাম। কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ, তুমি বসন্তবাবুকে দেখেছ। শুনলাম ভদ্রলোক বদ্ধ পাগল। তাই ওঁর ছোটোভাই রাজেনবাবু ওঁকে বাড়িতে আটকে রেখে বাইরে যান। রাজেন অধিকারী নাকি বাঙ্গালোরে কী চাকরি করতেন। সম্প্রতি এই পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছেন।"

হালদারমশাই ততক্ষণে গেটের কাছে হেঁড়ে গলায় ডাকাডাকি শুরু করেছেন, "বসন্তবাবু! বসন্তবাবু! মি. অধিকারী।"

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই, বসন্তবাবুকে ডেকে লাভ নেই, তা ছাড়া পাগলের পাল্লায় পড়া কাজের কথা নয়। আসুন আমরা একবার এক জায়গায় যাব।"

হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন, "কর্নেলসাব, এই চান্স। ছাড়া ঠিক নয়। কাল রাত্তিরে যা স্বচক্ষে দেখেছি, তার তদন্ত করা দরকার।"

"আপনি তা হলে তদন্ত করুন। আমরা চলি।"

হালদারমশাই কান করলেন না। গেটের গ্রিলের খাঁজে পা রেখে উঠে গেট পেরিয়ে গেলেন। বললাম, "সর্বনাশ। হালদারমশাই করছেন কী।"

কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন, "ওঁর কাজ উনি করুন। গাড়ি ঘোরাও। আমরা এবার যাব চন্দ্রকান্তবাবুর বাড়ি।"

"বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত?"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ ডার্লিং। এই হিউম্যান জেনোম ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করা দরকার।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সঙ্গে আমাদের অনেক বছরের পরিচয়। উনি থাকেন এখান থেকে এক কিমি উত্তরে একটা প্রত্যন্ত এলাকায়। সদর রাস্তা থেকে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তায় ঢুকে আরও জঙ্গুলে এলাকায় ওঁর ডেরা। নিরিবিলি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত জায়গা। ওঁর একটি রোবট আছে। তার নাম 'ধুন্ধুমার'। ডাকনাম 'ধুন্ধু'। এই বিকট নামের কারণ আছে। শব্দটি উচ্চারণ করলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তা রোবটটিকে নাকি সক্রিয় করে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মনুষ্যাকৃতি রোবটটিকে সোনিক রোবট বলা চলে।

তবে ধুন্ধুকে আমার বড্ড ভয় করে। যন্ত্রমানুষ আর পোষা বাঘ প্রায় একই জিনিস।

গাড়ির হর্ন দিতেই অটোমেটিক গেট খুলে গেল। বিজ্ঞানী প্রবরকে সহাস্যে এগিয়ে আসতে দেখলাম। চিবুকে তেকোনা দাড়ি, একরাশ আইনস্টাইনি চুল। বেঁটেখাটো মানুষটি বড়োই সদালাপী। কর্নেল এবং আমার সঙ্গে কড়া হ্যান্ডশেক করে ড্রইংরুমে ঢোকালেন। ধুন্ধুকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম।

আরও নিশ্চিন্ত হলাম শুনে যে, ধুন্ধুর কী ভাইরাসঘটিত অসুখ হয়েছে। ল্যাবে তার চিকিৎসা চলছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আজকাল আর সিন্থেটিক কফি খাই না। ন্যাচারাল কফি খাওয়াচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "কফি পরে হবে। আগে কাজের কথা সেরে নিই।"

"বলুন! এ বেলা আমার হাতে অঢেল সময়।"

"হিউম্যান জেনোম সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।"

বিজ্ঞানী ভুরু কুঁচকে তাকালেন। "জেনোম? আপনি কি জেমস ডি ওয়াটসনের তত্ত্বের কথা বলেছেন? নোবেল - লরিয়েট ওয়াটসন?"

"হ্যাঁ। ওঁর হিউম্যান জেনোম প্রজেক্টের কথা শুনেছি।"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "আমি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের কারবারি। তবে ইদানীং কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমার লাইন জেনেটিক্সের কাছাকাছি এসে পড়ছে। তো জেনোম প্রজেক্ট! মানুষের প্রতি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে। ক্রোমোজোমের মধ্যে আছে মালার মতো সাজানো অসংখ্য জিন। সঠিক হিসাব এখনও করা যায়নি। ওয়াটসনের মতে, একজন মানুষের দেহে ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ জিন আছে। প্রতিটি জিনে আছে তিনশো কোটি ডি এন এ। এই ডি এন এ-র মধ্যে সংকেতে লুকনো আছে মানুষের বংশগত বহু লক্ষণ বা চরিত্র। ওয়াটসন ডি এন এ-র গঠন খুঁজে সেই সংকেতগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন। সেটাই ওঁর জেনোম প্রকল্প।"

"জেনোমতত্ত্ব কেউ কি এ পর্যন্ত বাস্তবে কাজে লাগাতে পেরেছেন?"

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। স্রেফ তত্ত্ব। তবে স্বয় ওয়াটসনেরই মতে, একে কাজে লাগিয়ে বড়োজোর বংশানুক্রমিক আদিব্যাধি নির্মূল করা যায়। এই পর্যন্তই।"

"এর অপব্যবহার করা কি সম্ভব?"

"বাস্তবে কাজে লাগাতে পারলে অপব্যবহার সম্ভব বইকী।"

"কী ধরনের অপব্যবহার?"

চন্দ্রকান্ত খিক - খিক করে খুব হাসলেন। "সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করা যায়। শরীরের গড়ন বদলে দেওয়া যায়। তবে তার জন্য জেনোমের দরকার কী? সেটা স্রেফ কিছু খাইয়ে বা অপারেশন করেও করা যায়! মোট কথা, তত্ত্বটা এখনও নিছক তত্ত্বই।

"এ-শতকের গোড়ার দিকে ব্রিটেন-আমেরিকায় জাতিগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য জেনেটিক্সের 'ইউজেনিক' তত্ত্ব নিয়ে খুব হইচই বেধেছিল। নাৎসি জার্মানিতে ইউজেনিক তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ ইহুদি

হত্যার কারণ হয়েছিল। বিজ্ঞানের চেয়ে বিজ্ঞানীরা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। ইদানীং দেখছি, জেনেটিক্সের নানা তত্ত্বের উদ্ভট-উদ্ভট ব্যাখা শুরু হয়েছে।"

কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন, "জেনোম প্রকল্পের সাহায্যে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করা সম্ভব?"

চন্দ্রকান্ত আবার ভুরু কুঁচকে তাকালেন। তারপর ফিক করে হাসলেন। "বহুবছর আগে নোবেলজয়ী আণবিক জীববিজ্ঞানী জাক মোদে বলেছিলেন, ল্যাবে মানুষ গড়ে ফেলবেন। ফুঃ! মানুষ ইজ মানুষ।"

"কৃত্রিম ডি এন এ অণু তৈরি কি সম্ভব?"

চন্দ্রকান্ত অবাক হয়ে বললেন, "আপনার পয়েন্টটা কী?"

"এই এলাকায় একটি হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার খোলা হয়েছে বা হবে জানেন?"

চন্দ্রকান্ত ভুঁড়ি নাচিয়ে আর এক দফা হাসলেন। "আপনি নিশ্চয় রাজেন অধিকারীর কথা বলছেন? আমেরিকার কোনও ইউনিভার্সিটিতে জেনেটিক্স বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক। শুনেছি মাত্র। আলাপ হয়নি। এ-ও শুনেছি, ভালমানুষ দাদার ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তাঁকে পাগল করে ফেলেছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী?"

কর্নেল আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, "আমি আপনার সাহায্য চাই চন্দ্রকান্তবাবু!"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চিবুকের তেকোনা দাড়ি চুলকোচ্ছিলেন। এটা ওঁর চিন্তাভাবনার লক্ষণ। একটু পরে বললেন, "হালদারমশাইয়ের দেখা প্রথম ঘটনাটা, মানে পারসি ভদ্রলোককে তুলে আছাড় মারাটা চিন্তাযোগ্য বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটা ওঁর দেখার ভুল হতেও পারে। মানে, চোখ উপড়ে বেসিনে ধোওয়া এবং রক্ত! তারপর সেই চোখ থেকে গুলি বের করা। হালদারমশাইকে তো বিলক্ষণ জানি!"

বলে চন্দ্রকান্ত হেসে উঠলেন। বললাম, "গুলির শব্দ শুনেছিলেন হালদারমশাই! ঘটনাস্থলে পাওয়া রিভলভারটা তার প্রমাণ।"

"গুলিটা নকল পাথুরে চোখে লেগেছিল।" চন্দ্রকান্ত আবার দাড়ি চুলকোতে থাকলেন। "যাইহোক, লোকটার গায়ের জোরই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। কোনও কথা বললেন না। আমি বললাম, "আপনি বিজ্ঞানী। এ-যুগে ফ্র্যাংকেনস্টাইন কাহিনি কি বাস্তবে সম্ভব নয়? আপনিই বললেন, জেনোমতত্ত্ব কাজে লাগিয়ে শরীরের গড়ন বদলানো যায়। শারীরিক শক্তিও তা হলে বদলানো যায়?"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "তা যায়। তবে—"

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, "আপনার ধুন্ধুমার যন্ত্রমানুষ মাত্র। কিন্তু কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম পেশি-শিরা-উপশিরা, কৃত্রিম হৃৎপিন্ড-ফুসফুস এবং কৃত্রিম রক্ত তো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এ যুগে। বাকি রইল কৃত্রিম মগজ। কোনও বিজ্ঞানী কি এইসব জুড়ে কৃত্রিম মানুষ তৈরি করতে পারেন না?"

"পারেন, স্বীকার করছি। কিন্তু সেই কৃত্রিম মানুষও আসলে রোবট ছাড়া কিছু নয়। কারণ, তার কৃত্রিম মগজ মানুষের মগজের মতো স্বাধীন চিন্তা করতে পারবে না। যে তাকে তৈরি করছে, তারই চিন্তাভাবনা বা ইচ্ছা তাকে কনট্রোল করবে।"

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। "তা হলে তাকে রিমোট কনেট্রোল সিস্টেমে চালানো যাবে।"

"ঠিক। একশোভাগ ঠিক।" চন্দ্রকান্ত চাপাস্বরে বললেন, "এখন কথা হচ্ছে, রাজেন অধিকারী তা করতে পেরেছেন কি না।"

আমি না বলে পারলাম না, "ম্যাডানসায়েবের হিরে চুরি তা হলে রাজেনবাবুরই কীর্তি। জেনোম রিসার্চের জন্য প্রচুর টাকার দরকার। হিরেটার দাম এ-বাজারে প্রায় দেড় কোটি টাকা।"

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। "জয়ন্ত খাঁটি সাংবাদিক হতে পারল না বলে ওর সমালোচনা করি

বটে, তবে ওর মধ্যে সাংবাদিক সুলভ চটজলদি সিদ্ধান্ত করার স্বভাব আছে। ডার্লিং! তোমাকে বারবার বলেছি, বাইরে থেকে যা যেমনটি দেখাচ্ছে, ভেতরে তা তেমনটি নয়।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। "চলুন না, রাজেন অধিকারীর সঙ্গে আলাপ করে আসি। যদি উনি এতক্ষণ না ফিরে থাকেন, আমি এম পি ডি দিয়ে বাইরে থেকে কিছু ডেটা সংগ্রহ করে নেব।"

বললাম, "এম পি ডি মানে?"

"মাল্টিপারপাস ডিটেক্টর। আমারই আবিষ্কার।" চন্দ্রকান্ত সগর্বে বললেন। ওঁর বাড়ির ভেতর কী কাজকর্ম হয়, তার হদিস পেয়ে যাব।"

কর্নেলও উঠলেন। বললেন, "আমার ভয় হচ্ছে, হালদারমশাই কোনও কেলেঙ্কারি না বাধান। একগুঁয়ে মানুষ। আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড। আবার ওই জিনিসটা তাঁকে বিপদে ফেলে। অন্তত তাঁর অবস্থা জানার জন্যও আমাদের ওখানে আবার যাওয়া দরকার মনে হচ্ছে।"

বিজ্ঞানী নিজের গাড়ি বের করলেন। ওঁর গাড়ি আগে, আমাদেরটা পেছনে। বিজ্ঞানীর গাড়ি বলে কথা! সদর রাস্তায় পৌঁছে রকেটের বেগে উধাও হয়ে গেল। বললাম, "কী অদ্ভুত মানুষ!"

কর্নেল হেসে বললেন, "সম্ভবত আমরাও আরও অদ্ভুত মানুষের পাল্লায় পড়তে চলেছি ডার্লিং।"

"আপনি কি কৃত্রিম মানুষের কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন— মনে যাকে গত রাতে হালদারমশাই দেখেছেন?"

"নিছক একটা থিয়োরি, জয়ন্ত।" বলে কর্নেল বাইনোকুলার তুলে রাস্তার ধারের গাছে হয়তো পাখি খুঁজতে থাকলেন।

সেই বাড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড় করালাম। বিজ্ঞানী প্রবরের গাড়িটা খুঁজে পেলাম না। বললাম, "সর্বনাশ। চন্দ্রকান্তবাবুকে কৃত্রিম মানুষ হাপিস করে দেয়নি তো?"

কর্নেল গাড়ি থেকে বেরিয়ে বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবুর অভ্যাস খোদার ওপর খোদকারী করা। ন্যাচারাল কফির বদলে সিন্থেটিক কফি খান। খিদে পেলে নাকি এনার্জি ক্যাপসুল খান। কৃত্রিম অর্থাৎ ওঁর ভাষায় সিন্থেটিক মানুষের প্রতি আসক্তি স্বাভাবিক। যাই হোক, গেটের দরজায় আর তালা আঁটা নেই। হুঁ ওই দ্যাখো ওঁর গাড়ি!"

বলে কর্নেল গেট ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে গেলন! আমি গাড়ি ঢোকাতে সাহস পেলাম না। বেরিয়ে গিয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।

এবড়োখেবড়ো খোয়া-ঢাকা রাস্তা। দু-ধারে বিচ্ছিরি জঙ্গল। বাড়িটার সামনে চন্দ্রকান্তের গাড়ি দাঁড় করানো। আমরা সেখানে যেতেই তাঁর সাড়া পাওয়া গেল ঘরের ভেতর থেকে। "চলে আসুন কর্নেল!"

সেকেলে হলঘর বললেই চলে। ঝাড়বাতিও আছে। পুরোনো আসবাবপত্রে সাজানো বনেদি পরিবারের বৈঠকখানা। চন্দ্রকান্ত আলাপ করিয়ে দিলেন রাজেন অধিকারীর সঙ্গে। রাজেনবাবুর বয়স আন্দাজ ষাটের কাছাকাছি। রোগা হাড়গিলে চেহারা। পরনে গলাবন্ধ কোট আর ঢোলা পাতলুন। মাথায় কাঁচাপাকা সন্নেসিচুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। কেমন ভুতুড়ে চেহারা যেন।

তবে হাসিটা অমায়িক এবং হাবভাবেও বড়ো বিনয়ী। শশব্যস্তে অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন। বললেন, "হিউম্যান জেনোম রিসার্চ সেন্টার সম্পর্কে ক্রমশ আপনাদের মতো বিশিষ্ট মানুষদের আগ্রহ জাগাতে পেরেছি, এ আমার সৌভাগ্য। দেশে ফিরে আসার পর বিজ্ঞানী মহলে শুধু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠেছিলাম। এখন দেখছি, সমঝদার বিজ্ঞ মানুষেরও অভাব নেই। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিঃপদার্থবিদ মি. চন্দ্রকান্ত চৌধুরীকেও আমি আকর্ষণ করতে পেরেছি।"

চন্দ্রকান্ত সহাস্যে বললেন, "এবং একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীকেও! উনি কর্নেলের দিকে আঙুল তুললেন।

কর্নেল বললেন, "এবং একজন নামকরা সাংবাদিককেও!" কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। ঠোঁটের কোনায় দুষ্টু হাসি।

রাজেনবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু! আমার এই প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু লিখুন। এদেশে এই প্রথম বেসরকারি উদ্যোগে জেনোম প্রজেক্ট। গভর্নমেন্ট মানেই আমলাতন্ত্র। কিন্তু সরকারি বিজ্ঞানীদের আমলাতন্ত্র আরও সাংঘাতিক। বলে, টাকা দিচ্ছি। তবে বোর্ড গড়তে হবে। তাতে ওঁরা থাকবেন। বুঝুন ব্যাপার! লাল ফিতের ফাঁসে দম আটকে শেষে আমিই মারা পড়ব।"

কর্নেল বললেন, "আপনার ল্যাব আছে নিশ্চয়?"

"আছে— মানে, সবে গড়তে শুরু করেছি।"

"জয়ন্তকে আপনার ল্যাব দেখিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলুন। তা হলে ও সেইভাবে কাগজে লিখবে। আর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লেখা মানেই প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি।"

"জানি, জানি।" বলে উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন রাজেন অধিকারী। "আসুন আপনারাও আসুন!"

ল্যাবরেটরি মানেই বিদ্‌ঘুটে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক জিনিসপত্র, নানারকম গন্ধ। তার সঙ্গে একালে হরেক সাইজের কম্পিউটার এবং ভিশনস্ক্রিন যুক্ত হয়েছে। তা চন্দ্রকান্তের ল্যাব এবং রাজেনবাবুর ল্যাবের মধ্যে একটাই ফারাক চোখে পড়ল। জারে রঙিন তরল পদার্থে চুবানো ইঁদুর, আরশোলা টিকটিকি ইত্যাদি সরীসৃপ-পোকামাকড়। তারপর আঁতকে উঠলাম দেখে, কবজি থেকে কাটা একটা হাত। মানুষের হাত। আমার চমক লক্ষ্য করে রাজেনবাবু বললেন, "হাসপাতালের মর্গ থেকে জোগাড় করেছি। এবার জেনোম ব্যাপার বুঝিয়ে বলি।"

আমার পকেটে রিপোর্টারস নোটবই সবসময় থাকে। উনি বকবক শুরু করলে আমি নোট নেওয়ার ভান করে যা খুশি লিখতে থাকলাম। চন্দ্রকান্ত একটা কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকে আছেন দেখলাম। কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন?

প্রায় আধ ঘন্টা টানা বকবক করে এবং এটা ওটা দেখিয়ে রাজেন অধিকারী যখন থামলেন, তখন আড়চোখে তাকিয়ে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলাম।

একটু পরে আমাদের বিদায় দিতে গেট পর্যন্ত এলেন রাজেন অধিকারী বললেন, "আপনাদের জন্য সব সময় দরজা খোলা।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত কেন কে জানে, একটি কথাও না বলে তাঁর গাড়ি নিয়ে আগের মতোই উধাও হয়ে গেলেন। আমরা এগোলাম ভি আই পি রোডের দিকে। যেতে যেতে বললাম "গোপন তদন্তের ফল বলতে আপত্তি আছে?"

কর্নেল হাসলেন, "বন্দি হালদারমশাইকে উদ্ধার করতে পেরেছি। তিনি ভোঁ-কাট করেছেন।"

চমকে উঠে বললাম, "অ্যাঁ?"

কর্নেল শুধু বললেন, "হ্যাঁ।"

৩

কোনও গুরুতর চিন্তাভাবনার সময় আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির চোখ বুজে যায়। ডাকলেও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা তখনকার মতো জানা গেল না। শুধু ভাবছিলাম, জারে চুবোনো সেই কাটা হাতটার কথা এবং শিউরে উঠছিলাম। হালদারমশাই জোর বাঁচা বেঁচেছেন তা হলে। আমরা পৌঁছোতে দেরি করলে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে নিশ্চয় কুচিকুচি করে কেটে 'জেনোমবিজ্ঞানী' রাজেন অধিকারী জারে চুবিয়ে রাখতেন।

"কর্নেলের বাড়ির লনে গাড়ি ঢুকিয়ে দেখি, উনি তখনও ধ্যানস্থ। বললাম, "এসে গেছি বস।"

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, "কখনও কানমলা খেয়েছ, ডার্লিং?"

হঠাৎ এই অদ্ভুত প্রশ্নে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, "কানমলা? তার মানে?"

"নিশ্চয় খেয়েছ। বিশেষ করে তোমার ছেলেবেলা পাড়াগাঁয়ে কেটেছে যখন।" কর্নেল আস্তে-সুস্থে গড়ি থেকে বেরোলেন। একটু হেসে বললেন, "কানমলা খাওয়া খুব অপমানজনক ব্যাপার। কাউকে চূড়ান্ত অপমান করতে হলে কানমলে দেওয়াই যথেষ্ট। কারও কান ধরলেই সে জব্দ হয়। শুধু মানুষ নয় জয়ন্ত! জন্তুজানোয়ারও কান ধরলে জব্দ।"

"ব্যাপারটা কী?"

"তুমি কি গাড়িতেই বসে থাকবে, না কি বেরোবে?"

ঘড়ি দেখে বললাম, "বারোটা বাজে। প্রেস ক্লাবে লাঞ্চের নেমতন্ন আছে। এক মন্ত্রী ভাষণ দিতে আসবেন।"

"ঠিক আছে। তা হলে তুমি এসো।" বলে কর্নেল চলে গেলেন।

একটু অভিমান নিশ্চয় হল। হালদারমশাইয়ের 'বন্দি হওয়া' এবং 'কানমলা' ব্যাপারটা জানার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই খেয়ালি বৃদ্ধের রকমসকম বরাবর দেখে আসছি। যথাসময়ে নিজে থেকেই জানাতে ব্যস্ত হয়ে উঠবেন। কাজেই গাড়ি ঘুরিয়েই তখন স্থানত্যাগ করলাম।

সন্ধের দিকে একবার ভেবেছিলাম কর্নেলের বাড়ি যাব! কিন্তু উনি যখনতখন হুট করে বেরিয়ে নিপাত্তা হয়ে যান। তাই টেলিফোন করলাম। ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। এককথায় জানিয়ে দিল, "বাবামশাই বেইরেছেন।"

হালদারমশাইয়ের ফ্ল্যাটে রিং করলাম। কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে রিং করলাম। ফোনে তখনই সাড়া এল, "জয়ন্তবাবু নাকি?"

অবাক হয়ে বললাম, "গলা শুনেই লোক চেনার যন্ত্র তৈরি করেছেন বোঝা যাচ্ছে।"

"ঠিক তা-ই।" বিজ্ঞানীর হাসি ভেসে এল। "আমার সোনিম থিয়োরি—"

ঝটপট বললাম, "জেনোম থিয়োরির পর সোনিম থিয়োরি এলে আমার বারোটা বেজে যাবে চন্দ্রকান্তবাবু! প্লিজ! থিয়োরি থাক।"

"সহজ ব্যাপার জয়ন্তবাবু! ইংরেজিতে এস ও এন আই এম সোনিম। শব্দ! ধ্বনি! বুঝলেন তো?"

"চন্দ্রকান্তবাবু—"

"ল্যাবে বসে আছি, জয়ন্তবাবু! আমার ঘরে যাঁরা আসেন, তাঁদের গলার স্বর, শব্দ উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি ইত্যাদি সব রেকর্ড করে রাখি। কম্পিউটারে সেই ডেটা অ্যানালিসিস করে নিই। তারপর টেলিফোনের সঙ্গে কম্পিউটারের কানেকশন! ব্যস! সো ইজি।"

"প্লিজ! আমি জানতে চাইছি আপনার সেই মাল্টিপারপাস ডিটেক্টর যন্ত্রে রাজেনবাবুর বাড়ি সম্পর্কে কী তথ্য পেলেন?"

"ডেটা অ্যানালিসিস চলছে। এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। আরও দু-একটা দিন লেগে যাবে হয়তো।"

"কৃত্রিম মানুষের কোনও হদিস পেলেন কি?"

"নাহ্। তবে একটা অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ ধরা পড়েছে। কোনও পার্থিব বস্তু বা প্রাণী এই ধ্বনিতরঙ্গের কারণ নয়, এটুকু বলতে পারি।"

"চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি তো হালদারমশাইকে ভালোই চেনেন।"

"খুউব চিনি।"

"রাজেনবাবুর বাড়ি ঢুকে উনি বিপদে পড়েছিলেন। আমরা যখন ওঁর ল্যাবে ছিলাম, তখন কর্নেল ওঁকে দেখতে পান। বন্দি অবস্থায় ছিলেন। কর্নেল ওঁকে উদ্ধার করেন।"

"হাঃ হাঃ হাঃ! কর্নেল আমার পাশে বসে আছেন। কথা বলুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "ডার্লিং! তখন যে কথাটা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম, আবার বুঝতে চেষ্টা করো। কানমলা! প্রতিপক্ষকে জব্দ করতে হলে তার কান ধরে ফেলবে। কেমন? যখনই কেউ তোমার ওপর হামলা করবে, তোমার লক্ষ্য হবে তার কান। ভুলো না কিন্তু।"

চটে গিয়ে বললাম, "এই নাক-কান মলে প্রতিজ্ঞা করছি—"

"নাক নয়, কান। তুমি কান মলে প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারটা লক্ষ্য করো, জয়ন্ত। তা হলেই বুঝতে পারবে, কান একটা ভাইটাল প্রত্যঙ্গ। মানুষ শুধু নাকমলে প্রতিজ্ঞা করে না, কানও মলতে হয়। তবে নাহ্। নিজের কান নিজে মলে নিজেকে জব্দ করার অর্থ হয় না।"

"ছাড়ছি।"

"কান ধরে আছ নাকি?"

"নাহ্। ফোন।"

"ফোনের সঙ্গে কানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ডার্লিং! ফোন মানে ধ্বনি। ধ্বনি আমরা কান দিয়েই শুনি।"

খাপ্পা হয়ে টেলিফোন রেখে দিলাম। ঠিক করলাম, এসব উদ্ভুটে ব্যাপারে কিছুতেই নাক গলাব না। এমনকী, ওই 'বৃদ্ধ ঘুঘু'র মুখদর্শনও আর করব না।

পরদিন বিকেলে পত্রিকা-অফিসে রাজেন অধিকারীর টেলিফোন পেলাম। রাজেনবাবু বললেন, "মি. জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"জয়ন্ত চৌধুরী বলছি।"

"মি. চৌধুরী! খবরটা তো বেরোল না আপনাদের কাগজে? খুব আশা করে ছিলাম।"

"বেরোবে। আসলে আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের চাপ খুব বেশি তো! সবসময় সব খবরকে জায়গা দেওয়া যায় না।"

"শুনুন! ব্যাপারটা সায়েন্টিফিক কিনা! কাজেই জটিল। আপনার লেখার সুবিধে হবে বলে আমি একটা আর্টিকল-আকারে লিখে লোক দিয়ে পাঠাব কি?"

"পাঠাতে পারেন। কিন্তু এখনই আমাকে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে যেতে হবে। ফিরতে দেরি হতে পারে। নীচের রিসেপশনে দিয়ে যেতে বলবেন আপনার লোককে।"

"না জয়ন্তবাবু! ওটা আপনার হাতে সরাসরি পৌঁছোনো দরকার। কারণ এর আগে আমি সব কাগজে রাইট-আপ পাঠিয়েছি। ছাপা হয়নি। প্রেস কনফারেন্স ডেকেছি। কেউ আসেনি। আমাকে আসলে কেউ পাত্তা দিতে চায় না। হ্যাঁ, ছোটোখাটো কাগজ ছেপেছে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। হয় না। বড়ো কাগজে বেরোলে লক্ষ লক্ষ লোকের নজরে পড়ে।"

"বুঝেছি। আপনি এক কাজ করুন। খামে আমার নাম লিখে পাঠান। তা হলেই আমি পেয়ে যাব।"

"ঠিক আছে। আসলে আমি আজই ক'দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি। তাই এত তাড়া।"

"এক মিনিট মি. অধিকারী! কাল সকালে কি আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল? হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!"

একটু পরে সাড়া এল। "ঢুকেছিল। কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"রিপোর্টারদের খবরের সোর্স বলা বারণ। হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!"

লাইন কেটে গেল। বুঝলাম, বোকামি করে ফেলেছি। কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাইকে ফোন করলাম। রিং হতে থাকল। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। টেলিফোনের গন্ডগোল অথবা হালদারমশাই কোথাও পাড়ি জমিয়েছেন। ভদ্রলোক রহস্য-অন্ত-প্রাণ যাকে বলে। হয়তো ইয়াজ্‌দার্গিদের হিরের খোঁজেই হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাত দশটায় অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম প্রতিদিনের মতো। রাজেন অধিকারীর কোনও রাইট-আপ বা আর্টিকল কেউ রিসেপশনে জমা দিয়ে যায়নি। সত্যি, মুখ ফসকে কথাটা বলা বোকামি হয়েছে। লোকটা সতর্ক হয়ে গেছে।

সল্টলেকে নতুন কেনা ফ্ল্যাটে মাসখানেক হল উঠেছি। রাস্তা খাঁ খাঁ জনহীন। শীতের রাতে কুয়াশা জমে আছে গাছপালায়। হঠাৎ দেখি প্রায় তিরিশ মিটার দূরে একটা লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে আসছে। হর্ন দিয়েও তাকে সরানো গেল না। পাগল-টাগল হবে। তাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে আবার সামনে এসে দাঁড়াল। দুটো ল্যাম্পপোস্টের মধ্যবর্তী জায়গা। দু-ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। ব্রেক কষেই দেখি তার গায়ে নেভিব্লু সোয়েটার।

তারপর তার চেহারার দিকে চোখ গেল। ও কি মানুষ? ও কী মানুষ?

হালদারমশাইয়ের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে আমার গাড়ির সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, গাড়িটা সে দুহাতে উলটে ফেলে দেওয়ার মতলব করছে।

এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। অমনই সে আমার দিকে এগিয়ে এল। অদ্ভুত জ্বলজ্বল নীলচে চোখে হিংস্রতার ছাপ।

মুহূর্তে কর্নেলের কথাটা মনে পড়ে গেল। আমাকে ধরার আগেই মরিয়া হয়ে আমি তার ওপর ঝাঁপ দিয়ে তার কান দুটো ধরে মোচড় দিলাম। অমনই সে ধড়াস করে নেতিয়ে পড়ল। একেবারে চিৎপাত।

এরপর আর নার্ভ ঠিক রইল না আমার। সটান গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

ফ্ল্যাটে ফিরে প্রতিজ্ঞা ভুলে কর্নেলকে রিং করলাম। আমার হাত তখন কাঁপছিল। কর্নেলের সাড়া পেয়েই বললাম, "এইমাত্র দানোটার পাল্লায় পড়েছিলাম। আপনার কথামতো।—"

"কানমলে জব্দ করেছ তো?"

"হ্যাঁ। সাংঘাতিক ব্যাপার। ভাগ্যিস আপনার পরামর্শটা মনে পড়েছিল। নইলে জামসিজ নওরোজির মতো হাড়গোড় - ভাঙা দলাপাকানো মাংসপিণ্ড হয়ে পড়ে থাকতাম। শীতের রাতে সল্টলেকের ব্যাপার তো জানেন। চেঁচিয়ে মাথা ভাঙলেও কেউ বেরিয়ে আসত না।"

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। বললেন, "ডার্লিং! তোমার ওপর তো রাজেনবাবুর রাগ হওয়ার কথা নয়। উনি কাগজে প্রচার চান।"

"আমারই বোকামি। উনি বিকেলে ফোন করেছিলেন।" বলে ঘটনাটা সবিস্তার জানিয়ে দিলাম।

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বরাবরই বন্দি হন, সে তো জানো! এবারও মুখে টেপ-সাঁটা অবস্থায় বাথরুমে বন্দি ছিলেন। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা ছিল। দরজায় পাহারা দিচ্ছিল তোমার দেখা দানো আমার ভাষায় কৃত্রিম মানুষ। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের সিন্থেটিক কফির মতো সিন্থেটিক ম্যানও বলতে পারো। তো তার পাল্লায় পড়ে আমারও বাঁচার কথা ছিল না। দৃশ্যটা কল্পনা করো জয়ন্ত! বাথরুম খোলা। হালদারমশাই পড়ে আছেন। দানোটা দরজার সামনে আমাকে দেখেই দু-হাত বাড়াল। জায়গাটা করিডরমতো। কয়েক হাত দূরে দোতলার সিঁড়ি। হঠাৎ দেখি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন এক ভদ্রলোক। মুখে শিশুর হাসি। দেখামাত্র বুঝলাম রাজেনবাবুর দাদা সেই পাগল ভদ্রলোক। মিটিমিটি হেসে চোখ নাচিয়ে চাপা গলায় বললেন, "কান মলে দিন ব্যাটাচ্ছেলের! জব্দ হবে।" ব্যস! দানোটা হাত বাড়াতেই আমি তার কান দুটো ধরে জোরে মলে দিলাম। কাজেই তোমাকে কান মলে দেওয়ার কথা বলে আসলে সতর্ক করেই দিয়েছিলাম।"

"থ্যাংকস বস্! কিন্তু কালই পুলিশকে জানিয়ে দেননি কেন?"

"হালদারমশাই জানিয়েছিলেন। পুলিশ গিয়ে কোনও হদিস পায়নি। মাঝখান থেকে হালদারমশাই পুলিশের জেরায় জেরবার হয়েছেন।"

"উনি কোথায় আছেন? ফোনে পাচ্ছি না কাল থেকে।"

"দমদমে ওঁর সেই আত্মীয়ের বাড়িতে আছেন। আসলে রাজেনবাবুর বাড়ির দিকে সারাক্ষণ নজর রাখার জন্য ওখানে ডেরা পেতেছেন।"

"আমার নার্ভ বিগড়ে গেছে, বস! রাখছি।"

"সকালে চলে এসো। চন্দ্রকান্তবাবুর আসার কথা আছে।"

"যাব।"

ফোন রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন অবস্থায় বসে রইলাম। কলকাতা মহানগরে এমন একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক দানো ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ কি বিশ্বাস করতে চাইবে?

সারাটা রাত প্রায় জেগেই কাটিয়েছিলাম। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠি। ওই ভয়ংকর দানোকে কোনও অস্ত্রেই জব্দ করা যাবে না। শুধু কান মললেই ব্যাটাচ্ছেলে কাত। কাজেই যদি সে রাতবিরেতে হানা দেয়, তার কান মলে দেওয়ার জন্যই জেগে থাকা দরকার।

শেষ রাতে কখন একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেটা জেগে ওঠার পর বুঝলাম। নিজের ওপর চটে গেলাম। ভাগ্যিস দানোটা ওত পাততে আসেনি।

যখন কর্নেলের তেতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোলাম, তখন প্রায় সাড়ে ন-টা বাজে। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ভাষণ দিচ্ছেন এবং কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ইশারায় আমাকে বসতে বললেন কর্নেল। ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল।

চন্দ্রকান্ত বলছিলেন, "ক্লোনিং আর জেনোম এক জিনিস নয়। ক্লোনিং বলতে সাদা বাংলায় কলম করা। হাজার বছর আগেও মানুষ জেনেটিকস না জেনেও ক্লোনিং করেছে। এক জাতের উদ্ভিদের সঙ্গে আর এক জাতের উদ্ভিদ কিংবা এক জাতের প্রাণীর সঙ্গে আর এক জাতের প্রাণীর ক্লোনিং করেছে। কিন্তু আধুনিক জেনেটিকসের থিয়োরির অপব্যাখ্যা করে কেউ কেউ বলছেন, দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কারচুপি করে মানুষকে গাধা করা যায়। কিংবা ধরুন, একই মানুষের অসংখ্য আদল গড়া যায়। হুবহু তারা এক। এভাবে অসংখ্য কর্নেল কিংবা এই চন্দ্রকান্ত চৌধুরী বাজারে ছাড়া যায়। কিন্তু আমি বলব, এটা বাড়াবাড়ি। এটা স্রেফ গুল। বিজ্ঞানের নামে অপবিজ্ঞান। মশাই, মানুষ ইজ মানুষ! জেনোম থিয়োরি কখনও দাবি করছে না, মানুষকে গাধা কিংবা দানো বানানো যায়।"

কর্নেল বললেন, "সিন্থেটিক ম্যানের ব্যাপারটা বলুন চন্দ্রকান্তবাবু!"

চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "রাজেন অধিকারীর বাড়িতে অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গ অ্যানালিলিস করে বুঝেছি, আমার তৈরি শ্রীমান ধুন্ধুর মতোই কোনও রোবোট আছে। কিন্তু সে রোবোট ধুন্ধুর চেয়ে বহুগুণে উন্নত। তার দেহ ধাতু দিয়ে তৈরি নয়।"

"কৃত্রিম হাড়-মাংস-চামড়া দিয়ে তৈরি!"

"ঠিক, ঠিক।" চন্দ্রকান্ত নড়ে বসলেন। "কিন্তু ওইসব জিনিসকে একেবারে কৃত্রিম বলতে দ্বিধা হচ্ছে। সম্ভবত মৃত মানুষের দেহকোষের ডি এন এ অণুতে কোনও প্রক্রিয়ায় কারচুপি করে হাড়-মাংস-রক্ত-চামড়া ইত্যাদি তৈরি করেছেন রাজেন অধিকারী। তারপর জোড়া দিয়ে একটা মানুষ গড়েছেন।"

"জেনোম প্রজেক্ট তা হলে সফল করতে পেরেছেন রাজেনবাবু?"

বিজ্ঞানী চিবুকের দাড়ি চুলকে বললেন, "সম্ভবত।"

আমি চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, "কাল রাতে দানোটা আমাকে—"

হাত তুলে চন্দ্রকান্ত বললেন, "শুনেছি। কিন্তু কান ধরলে কেন ও জব্দ হয় জানেন কি? আমার কাছে শুনুন। আপনাকে আমার 'সোনিম' থিয়োরির কথা বলেছি। রাজেনবাবুর এই রোবটটিও ধ্বনিতরঙ্গের সাহায্যে চালিত হয়। কানই ধ্বনিতরঙ্গের একমাত্র গমনপথ। কাজেই ওর কান চেপে

ধরলে রাজেনবাবুর রিমোট কনট্রোল থেকে পাঠানো ধ্বনিতরঙ্গ ওর ব্রেনে ঢুকতে বাধা পায়। তখন স্বভাবত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।"

কর্নেল বললেন "আমার ধারণা, ওর কানের সঙ্গে কোনো সূক্ষ্ম রিসিভিং যন্ত্র ফিট করা আছে। কানে চাপ পড়লে কিছুক্ষণের জন্য সেটা অকেজো হয়ে যায়।"

বললাম, "রাজেনবাবুর দাদা বসন্তবাবু সেটা জানেন?"

"যেভাবে হোক, জানতে পেরেছেন।" বলে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজলেন।

"কিন্তু সম্রাট ইয়াজ্‌দার্গিদের হিরের কোনও খোঁজ পেলেন না চন্দ্রকান্তবাবু? আপনার ডিটেক্টরে কোনও খোঁজ মেলেনি?"

চন্দ্রকান্ত মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ্। রাজেনবাবুর বাড়িতে কোনও হিরেটিরে নেই মশাই!"

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! আপনার ওই যন্ত্রটি কতটা দূরত্বের পরিধি খুঁজতে পারে?"

"চারদিকে একশো মিটার পরিধির দূরত্ব খুঁজতে পারে।"

"ওপরের দিকে?"

"ভার্টিক্যালি?" চন্দ্রকান্ত একটু হাসলেন। "আমি হাত তুললে যতটা উঁচু হয়, ততদূর পর্যন্ত।"

"তার মানে দোতলার কিছু ডিটেক্ট করা যায় না আপনার যন্ত্রে?"

"নাহ্। হাতে ওটা দেখলে ওঁর সন্দেহ হত কি না বলুন?"

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে বললেন, "হ্যাঁ। কে? হালদারমশাই নাকি? কোথা থেকে বলছেন? ... কী আশ্চর্য! ওখানে কেন গেলেন? ... বলেন কী! কাকে দেখেছেন? বসন্তবাবুকে? ...হ্যাঁ, প্রচুর রহস্য।... হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক আছে। ওয়েট অ্যান্ড সি। ...উইশ ইউ গুড লাক। রাখছি।"

কর্নেল ফোন রেখে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপরে বললেন, "হালদারমশাই গোপালপুর-অন-সি থেকে ট্রাংককল করে জানালেন, গত রাতে রাজেনবাবু এবং তাঁর দানোটিকে ফলো করে হাওড়া স্টেশনে যান। তখন রাত প্রায় এগারোটা। মাদ্রাজ মেল ছাড়ার কথা রাত আটটা ৪৫ মিনিটে। আড়াই ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। ওঁর ধারণা, রাজেনবাবু সে খবর জেনেই দেরি করে স্টেশনে যান। যাইহোক, গোয়েন্দামশাই ওঁদের ফলো করে গোপালপুর অন-সি-তে পৌঁছেছেন। উঠেছেন আমার বন্ধু স্মিথসায়েবের ওশান হাউসে। দোতলার বারান্দা থেকে এক পলকের জন্য নাকি সামনে বালিয়াড়িতে একটা ভাঙা ঘরের ভেতর বসন্তবাবুকে দেখেছেন। নেমে গিয়ে তাঁর আর পাত্তা পাননি। এদিকে রাজেনবাবু উঠেছেন লাইটহাউসের ওদিকে ওবেরয় গ্র্যান্ডে। কাজেই—"

ওঁর কথার ওপর বললাম, "প্রচুর রহস্য।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চোখ নাচিয়ে বললেন, "চলুন কর্নেল! গোপালপুর অন-সি নিরিবিলি জায়গা। রাজেনবাবুর রোবটটিকে জব্দ করে জেনেটিক্‌সের মিস্ট্রি সল্‌ভ করা যাবে। এই চান্স ছাড়া উচিত নয়।"

কর্নেল চোখবুজে দাড়িতে হাত বললেন, "গেলে আপনাকে খবর দেব।"

আমি উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, "নওরোজি জানতে পেরেছিলেন, কে হিরে চুরি করেছে। তাই তাঁকে মরতে হল। এবার হালদারমশাইয়ের বরাতে সাংঘাতিক বিপদ ঘটে না যায়। আমাদের যাওয়া উচিত, কর্নেল!"

"হালদারমশাইকে কানমলার পরামর্শ দিয়েছি ডার্লিং! ভেবো না।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি কিন্তু যাচ্ছি। বিজ্ঞানের এমন রহস্যময় আবিষ্কার হাতে-নাতে যাচাইয়ের চান্স ছাড়তে রাজি নই কর্নেল! গোপালপুর উপকূলের মতো

সুনসান নির্জন জায়গা ভারতের কোনও সমুদ্র তীরে নেই। আমি রাজেনবাবুর অজ্ঞাতসারে রোবটটির ওপর পরীক্ষা চালাব।"

উনি খুব জোরে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ধ্যানস্থ। বললাম, "চলি বস। আপনি ধ্যান করুন।"

তবু কর্নেলের সাড়া নেই। অগত্যা মনে-মনে চটে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবং বেরিয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে একটা কাজে বেরোতে যাচ্ছি, কর্নেলের ফোন এল। "জয়ন্ত! তৈরি হয়ে থাকো। আমি আধঘণ্টর মধ্যে যাচ্ছি।"

"কী ব্যাপার?"

"আমরা গোপালপুর-অন-সি রওনা হব।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ। এইমাত্র ম্যাডানসায়েবের জামাই কুসরো এসেছিলেন। আজ ভোরবেলায় গোপালপুরে -অন-সি বিচে তাঁর শ্বশুর ম্যাডানসায়েবকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। পুলিশ ট্রাংককলে লালবাজারের থ্রু দিয়ে খবর দিয়েছে।"

"মার্ডার নাকি?"

"তা আর বলতে? তবে ঘাড় মটকে মারা হয়েছে।"

"সেই শয়তান রোবটটা! সেই দানো ব্যাটাচ্ছেলে!"

"তৈরি থেকো ডার্লিং! যাচ্ছি।"

ফোন নামিয়ে রেখে দেখি, এই শীতে ঘাম দিচ্ছে। শরীর কাঁপছে। আবার সেই বিভীষিকার মুখোমুখি হওয়া কি ঠিক হবে? জীববিজ্ঞানী রাজেন অধিকারী যদি তাঁদের দানোর কানের বদলে এবার অন্য কোনও প্রত্যঙ্গে গোপনে রিসিভারযন্ত্র ফিট করে রাখেন?

৪

বাসে চেপে পুরী। পুরী থেকে ফের বাসে চিল্কা রেলস্টেশন। তারপর ট্রেনে গঞ্জাম জেলার বহরমপুর স্টেশন। সেখান থেকে প্রাইভেট কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি-তে যখন পৌঁছোলাম, তখন রাত প্রায় দশটা। সমুদ্রের ব্যাকওয়াটারের দিকে স্মিথসায়েবের 'ওয়াশ হাউস'। স্মিথসায়েব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। অত্যন্ত অমায়িক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। একসময় কলকাতার বন্দর অফিসে চাকরি করতেন। কর্নেলের পুরোনো বন্ধু।

বাড়ির নীচের তলায় উনি থাকেন। ওপরতলায় দুটো স্যুট। একটাতে হালদারমশায় আছেন।

আছেন, মানে ভাড়া নিয়েছেন। কিন্তু এ মুহূর্তে নেই। দরজায় তালা আঁটা। স্মিথসায়েব তাঁর গেস্টদের ব্যাপারে নাক গলান না। তবে স্মিথসায়েবের মতে, এই গেস্ট ভদ্রলোক ছিটগ্রস্ত। কারণ আজই বিকেলে তাঁক বিচের মাথায় মুঘল আমলের ভাঙাচোরা পাথুরে বাড়িগুলির ভেতর সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছেন। সন্ধের দিকে একবার তাঁকে বিচে জগিং করতেও দেখেছেন। স্মিথসায়েব ওঁর প্রতি বেজায় অখুশি।

স্মিথসায়েব গেস্টদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ওঁর পরিচারিকা মারিয়াম্মা আমাদের খাবার দিয়ে গেল। দেখলাম কর্নেল তার সুপরিচিত।

কর্নেল তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "পাশের ভদ্রলোক কি খেয়ে বেরিয়েছেন?"

মারিয়াম্মা বলল, "উনি বাইরে খান। কখন আসেন কখন যান, জানি না।"

সে এঁটো থালাবাটি গুছিয়ে চলে যাচ্ছে, কর্নেল ডাকলেন, "একটা কথা, মারিয়াম্মা!"

"বলুন স্যার!"

"আসার পথে শুনলাম নীচে নাকি কে খুন হয়ে পড়ে ছিল আজ?"

মারিয়াম্মা বুকে ক্রস এঁকে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "সে এক বীভৎস দৃশ্য স্যার! শয়তান ছাড়া এ কাজ কার হতে পারে? মাথাটা মুচড়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।" সে এদিক-ওদিক দেখে

নিয়ে গলার স্বর চাপা করল। "জেলেবস্তিতে শুনেছি, গতকাল সন্ধ্যায় ওরা একটা অদ্ভুত পাখিকে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসতে দেখেছে। পাখিটার ডানা নাকি বিশাল। দক্ষিণে লাইটহাউসের ওধারে উঁচু বালির টিলা আছে। সেদিকেই পাখিটা এসে নেমেছিল। শয়তান ছাড়া আর কিছু নয়।"

মারিয়াম্মা চলে গেলে বললাম, "মারিয়াম্মার গল্পটা বিশ্বাস করলেন?"

কর্নেল দাড়ি নেড়ে চুরুটের ধোঁয়ার ভিতর বললেন, "হ্যাঁ!"

"আমি পাখিটার কথা বলছি!"

"আমিও তা-ই বলছি।"

"গুল!" বলে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলাম! কর্নেল এসবে বিশ্বাস করেন ভাবা যায় না।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে বললেন, "হালদারমশাই পাখিটার পাল্লায় পড়লেন কিনা ভাবছি। এখনও ফিরলেন না। যাইহোক, একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরোব।"

এত রাতে কোথায় বেরোবেন?

কর্নেল হাসলেন! "গোপালপুর অন-সি-তে শীতের তত উপদ্রব নেই। সমুদ্রতীরের আবহাওয়া সবসময় নাতিশীতোষ্ণ।"

বাইরে খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এই দোতলা থেকে সামনে বালিয়াড়ির নীচে সমুদ্র দেখা যায়। কুয়াশার আড়ালে সমুদ্র ঢাকা পড়েছে। ছেঁড়া ঘুড়ির মতো চাঁদটাকে অসহায় দেখাচ্ছে। মুঘল আমলের ভাঙচুর বাড়িগুলো কুয়াশামাখানো আবছা জ্যোৎস্নায় বড্ড বেশি ভূতুড়ে। বিচে ক্রমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ার গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা নেই। কিন্তু বিরক্তিকর।

বাঁদিকে বালিয়াড়িতে কালো লম্বাটে জিনিসগুলো দেখেই বুঝলাম জেলেদের ভেলানৌকো। সেখানে আবছা একটা মূর্তি দেখতে পেলাম। এত রাতে সামুদ্রিক শীতের হাওয়া খেতে কে বেরোল কে জানে!

একটু পরে মূর্তিটা সটান এসে এই বাড়ির নীচের রাস্তায় দাঁড়াল। চেঁচিয়ে বললাম, "হালদারমশাই নাকি?"

তখনই ছায়ামূর্তিটা বাঁ দিকের রাস্তায় চলে গেল। তারপর একেবারে নিপাত্তা। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। ঘরে ঢুকে দেখি, কর্নেল উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি কিছু বলার আগেই বললেন, "চলো বেরোনো যাক।"

দরজায় তালা এঁটে আমরা নেমে এলাম। রাস্তায় পৌঁছে সন্দেহজনক লোকটার কথা বললাম। কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। খুব ভয়ে ভয়ে হাঁটছিলাম। কখন কোথায় দানোটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বলা যায় না। রাস্তা খাঁ খাঁ, জনহীন। ল্যাম্পপোস্টগুলো দূরে - দূরে। তাই কোথাও কোথাও জ্যোৎস্না-কুয়াশা-আঁধার মিলেমিশে আছে।

প্রায় মিনিট কুড়ি হাঁটার পর বললাম, "আমরা যাচ্ছিটা কোথায়?"

কর্নেল সামনে আঙুল তুলে বললেন, "ওই যে আলো জুগজুগ করেছ, ওখানে।"

যেখানে পৌঁছেছি, সেখানটা কাঁচা রাস্তা। বালিতে ভর্তি। দু-ধারে ঝোপঝাড়। কিছু উঁচু গাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলের হাতে টর্চ আছে। কখনও পায়ের সামনে আলো ফেলছেন। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল এসে আমার গায়ে লাগল। ভীষণ চমকে উঠে বললাম, "কর্নেল! কে ঢিল ছুঁড়ছে।"

কর্নেল বললেন, "ভূত! চলে এসো।"

"কী আশ্চর্য! সত্যি ঢিল ছুঁড়ল যে!"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার পর-পর কয়েকটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলো ফেলামাত্র ঢিল ছোঁড়া বন্ধ হল। কেউ কোথাও নেই। অথচ কে ঢিল ছুঁড়ছে রাতদুপুরে? কর্নেল চারদিকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "দৌড়োতে হবে। কুইক!"

কর্নেল সত্যি দৌড়োতে শুরু করলেন। আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়েও ওঁকে অনুসরণ করলাম। এই সময় পেছনে কোথাও খিখিখিখি... হিহিহিহি... হোহোহোহো...এই ধরনের বিকট হাসি শোনা গেল।

কিছুদূর দৌড়ে গিয়ে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেলেন। বললাম, "কী অদ্ভুত—"

"ভূত!" কর্নেল হাঁসফাঁস করে বললেন, "রোসো! মিনিট দু-তিন জিরিয়ে নিই। বাপস! বালিতে দৌড়োনো সহজ নয়।"

কিছুক্ষণ পরে সেই আলোর কাছে পৌঁছে দেখি, গাছপালার আড়ালে একটা বাড়ি এবং গেটে সঙিনধারী পুলিশ। বুঝলাম থানায় এসেছি।

দুজন অফিসার একটা ঘরে বসেছিলেন। কর্নেলকে দেখেই এক গলায় সম্ভাষণ করলেন, "হাই ওল্ড বস!"

আলাপ-পরিচয় হওয়ার পর জানলাম একজন সি আই ডি ইন্‌স্পেকটার সুখরঞ্জন দাস, অন্যজন অফিসার-ইন-চার্জ জগপতি রাউত। দুজনেই চমৎকার বাংলা বলেন। সুরঞ্জনবাবু বললেন, "দেরি দেখে ভাবছিলাম ওশান হউসে গিয়ে খোঁজ নিই! কোনও অসুবিধে হয়নি তো?"

কর্নেল বললেন, "নাহ্, চমৎকার এসেছি।"

জগপতিবাবু বললেন, "আমি বহরমপুর-গঞ্জাম স্টেশনে জিপ পাঠাতে চেয়েছিলাম। মি. দাস নিষেধ করলেন। আপনি নাকি পুলিশের জিপে চাপা পছন্দ করেন না!"

জগপতিবাবু হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন, "কখনও কখনও করি না। ওতে আমার কাজের অসুবিধে হয়। যাইহোক, মি. দাস, সেই চিঠিটা দেখতে চাই।"

সুখরঞ্জনের ইশারায় জগপতিবাবু দেওয়ালে আঁটা আয়রনচেস্ট থেকে একটা ফাইল বের করলেন। ফাইলের ভেতর একটা কাগজে সাঁটা অজস্র কুচি এবং কুচিগুলোতে কিছু লেখা আছে। কর্নেল ঝুঁকে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর হাতে আতশকাচ বেরিয়ে এসেছে।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, "কুচিগুলো ওবেরয় গ্র্যান্ড হোটেলের ওদিকে নীচু জমিতে পড়ে ছিল। শিশিরে অধিকাংশ চুপসে গেছে। আর পড়ার উপায় নেই। আমি যেভাবে জোড়াতালি দিয়েছি, তা ভুল হতেই পারে। তবে মোটামুটি এটুকু বোঝা যায়, কেউ ম্যাডানসায়েবকে এখানে আসতে বলেছিল। হাতের লেখা হিজিবিজি। তাছাড়া ইংরেজি বানানও ভুল।"

জগপতি বললেন, "ঠিক তাই। ভদ্রলোককে মার্ডার করার জন্যই ডেকেছিল। জুয়েল ফেরত দেওয়াটা ছল।"

বুঝলাম, এঁরা সম্ভবত কেসটা জানেন। বললাম, "কিন্তু ঘাড় মটকে খুন সম্পর্কে আপনাদের ধারণী কী?"

জগপতি হাসলেন। "ভূতের কীর্তি বলে রটেছে। তাছাড়া আগের রাতে নাকি প্রকাণ্ড একটা পাখি সমুদ্র থেকে উড়ে আসতে দেখেছে জেলেরা। তবে মর্গের রিপোর্টে বলছে, সত্যি কতকটা ঘাড় মটকে — মানে মুন্ডুটা মুচড়ে ঘুরিয়ে খুন করেছে। প্রকাণ্ড জোর আছে খুনির গায়ে।"

বললাম, "তা হলে—"

এবার বাধা দিলেন কর্নেল! রুষ্টভাবে বললেন, "প্লিজ জয়ন্ত! এখন কোনও প্রশ্ন নয়।"

চুপ করে গেলাম। একটু পরে কর্নেল ফাইলটা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। "মি. দাস। কাল সকালে, ধরুন আটটা নাগাদ আমি সি-বিচে অপেক্ষা করব। আপনি আমাকে দেখিয়ে দেবেন, কোথায় ম্যাডানসায়েবের বডি পড়ে ছিল।"

সুখরঞ্জনবাবু বললেন, "অবশ্যই। আর আপনি বলেছিলেন গ্র্যান্ডে গত তিনদিনের আবাসিকদের লিস্ট দিতে। এই নিন। এতে আপনার বলা নামের কেউ নেই। একুশ নম্বর ডাবলস্যুটে দুজন ভারতীয় আছেন। একজন অবাঙালি মুসলিম মইনুদ্দিন আমেদ এবং অন্যজন তাঁর গোয়ানিজ বন্ধু পিটার নাজারেথ। দুজনেই চামড়াব্যবসায়ী। নাজারেথ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শয্যাশায়ী অবস্থা।"

"আমেদের মুখে দাড়ি আছে কি?"

"আছে। ধর্মপ্রাণ মুসলিম। মাথায় টুপি। পরনে শেরোয়ানি-চুস্ত।" সুখরঞ্জনবাবু আমাদের বিদায় দিতে এলেন। গেটের কাছে এসে বললেন, "আপনার সন্দেহভাজন লোক দুটো এখানকার কোনও হোটেলে ওঠেনি।" তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে! তবে কারও বাংলো বা বাড়িতে খুঁজতে সময় লাগবে! আবার এমনও হতে পারে, তারা ম্যাডানসায়েবকে খুন করেই চলে গেছে।"

"আমাদের হালদারমশাইয়ের খবর নিয়েছেন?"

"আজ দুপুরে থানায় এসেছিলেন। আপনি আসছেন কি না জানতেই এসেছিলেন। কিন্তু উনি তো ওশান হাউসেই আছেন?"

"আছেন। তবে দেখা হয়নি। ওঁর সম্পর্কে আমার দুর্ভাবনা আছে, মি. দাস! খুব অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানুষ। কোনও বিপদে না পড়েন!"

সুখরঞ্জনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "কথাবার্তা হাবভাবেই সেটা বুঝেছি। আমাকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, রিটায়ার করেই যেন কলকাতা চলে যাই এবং ওঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে ঢুকি।"

সুখরঞ্জনবাবু চলে গেলেন। এবার কর্নেল অন্য রাস্তায় এগোলেন। এটা পিচমোড়া সুন্দর রাস্তা। দু-ধারে ল্যাম্পপোস্ট। কর্নেল বললেন, "ওই রাস্তাটা শর্টকাট ছিল। এই রাস্তায় ওশান হাউস অনেকটা দূর। কিন্তু উপায় নেই ডার্লিং! এই শীতের রাতে ভূতের ঢিল খেতে আমার আপত্তি আছে।"

বললাম, "ভূত-টুত নয়। রাজেনবাবু সেই দানোকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন! আমাদের ছাই করে দিতে পারেন।"

আঁতকে উঠে বললাম, "সর্বনাশ! তা হলে বড্ড বেশি ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে যে?"

কর্নেল হাসলেন। "তা হচ্ছে। চিন্তা করো, ম্যাডানসায়েবের বাড়ির মাটির তলার ঘরে লুকোনো ইস্পাতের ভল্ট গলিয়ে হিরে চুরি! তাছাড়া লেসারঅস্ত্র দূর থেকে প্রয়োগ করা যায়। দানোটা তোমাকে কানমলার সুযোগই দেবে না।"

হেসে ফেললাম। "ভ্যাট! হেঁয়ালি করা আর ভয় দেখানো আপনার স্বভাব।"

হঠাৎ কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে বললেন, "স্বভাব কী বলছ জয়ন্ত! ওউ দ্যাখো, গাছের আড়ালে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। কুইক! আমরাও লুকিয়ে পড়ি।"

রাস্তার দু-ধারে গাছ এবং ঝোপঝাড়। মাঝে-মাঝে একটা করে বাংলোবাড়ি। কর্নেল আমাকে টেনে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। গুঁড়ি মেরে কিছুক্ষণ বসে রইলাম দুজনে। আমি কিন্তু কাউকে দেখতে পাইনি।

এক সময় কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তেমনই চাপা স্বরে বললেন, "চলো!" রাস্তায় গিয়ে বললাম, "কোথায় লোক দেখলেন?"

কর্নেল বললেন, "ওই দ্যাখো, চলে যাচ্ছে!"

আন্দাজ তিরিশ মিটার দূরে রাস্তার বাঁকে একটা আবছা মূর্তি সদ্য মিলিয়ে যাচ্ছে। হন্তদন্ত হেঁটে বাঁকে পৌঁছে দেখি, আবছা মূর্তিটা যেন হাঁটছে না। রাস্তার ওপর ভেসে যাচ্ছে।

সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেলে কর্নেল বললেন, "কপালে দুর্ভোগ আছে ডার্লিং! আবার বালি আর জঙ্গল ভাঙতে হবে। একটা বালির টিলা ডিঙোতেও হবে। এসো।"

পা বাড়িয়ে বললাম, "ও কে?"

"সেই দানোটা বলেই মনে হল। হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছিলে। বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়েছিলাম। তবে ঝুঁকি নেওয়ার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ম্যাডানসায়েবকে মেরে রাজেন অধিকারী গোপালপুর-অন-সি ছেড়ে চলে যায়নি এটা জানা গেল। কিন্তু কেন যায়নি, সেটাই রহস্য। এটা

জানা গেলেই রহস্যের সমাধান হবে। এমনকী, ইয়াজদার্গিদের হিরেও সম্ভবত উদ্ধার করতে পারব।"

বালিয়াড়ি, জঙ্গল এবং একটা আস্ত বালির পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্রের বিচে পৌঁছোতে ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। তারপর ওশান হাউসে যখন পৌঁছোলাম, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়। পা নাড়তেই যন্ত্রণা কটকট করে উঠছে।

হালদারমশাইয়ের স্যুটে তেমনই তালা আঁটা। ফেরেননি। কোনওরকমে জুতো খুলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। অভ্যাসমতো প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। মুচকি হেসে বললেন, "যেভাবে ঘুমোচ্ছিলে, দানোটা এসে তোমার ঘাড় মটকাবার চমৎকার সুযোগ পেত।"

বললাম, "আপনি যেভাবে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলেন, আপনারও ঘাড় মটকানোর সুযোগ ছিল।"

"দেখা যাচ্ছে, সে এসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে না।"

"কিন্তু গত রাতে সে গাছের আড়ালে ওত পেতে দাঁড়িয়েছিল!"

কর্নেল প্রজাপতি ধরা জাল ঝেড়েমুছে গুটিয়ে রাখছিলেন। বললেন, "আমাদের জন্য ওত পাততে যায়নি। জায়গাটা দেখে এলাম। ওড়িশার এক প্রাক্তন মন্ত্রীর বাংলোবাড়ির কাছে সে দাঁড়িয়েছিল। ওই বাড়িতে এমনই কেউ আছে, যার ঘাড় মটকাতে গিয়ে থাকবে। কোনও কারণে সে সুযোগ পায়নি। তাই তাকে রাজেন অধিকারী সরিয়ে নিয়েছে, কিংবা সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। হ্যাঁ— রিমোট কনট্রোলের সাহায্যেই।"

সায় দিয়ে বললাম, "ঠিক বলেছেন। দানোটা গুলতির বেগে যেন ভেসে যাচ্ছিল।"

বাথরুম সেরে এসে দেখি, মারিয়াম্মা ব্রেকফাস্ট এনেছে। খেতে বসে কর্নেল বললেন, "বাংলোবাড়িটার দরজায় তালা। পরে খোঁজ নেব, কে আছে ওখানে। প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কদাচিৎ আসেন শুনলাম। এলে ওঁর লোকজনও সঙ্গে থাকে। কেউ নেই। সম্ভবত ওঁর কোনও পরিচিত লোক এসে থাকবে। তবে সে যে-ই হোক, তাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।"

হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল এতক্ষণে। বললাম, "হালদারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন। তখনই উঠে গিয়ে দেখে এলাম, ওঁর স্যুটের দরজায় তেমনই তালা আঁটা। অজ্ঞাত ত্রাসে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে সি আই ডি ইন্‌স্পেকটার সুরঞ্জনবাবু এসে গেলেন। আমরা সামনের বালিয়াড়ি পেরিয়ে গেলাম। বিচে তত কিছু ভিড় নেই। বিচ ধরে প্রায় আধ কিমিটাক হাঁটার পর লাইটহাউসে ছাড়িয়ে গিয়ে বালির একটা টিলার কাছে পৌঁছোলাম। সুরঞ্জনবাবু দেখিয়ে দিলেন, কোথায় ম্যাডানসায়েবের মৃতদেহ পড়ে ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে বালির বিশাল টিলাগুলো দেখছিলেন। হঠাৎ হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। আমরা ওঁকে অনুসরণ করলাম। টিলার মাথায় উঠে কর্নেল বললেন, "ম্যাডানসায়েবের জুতোর ছাপ কিনা জানি না। তবে ছাপগুলো লক্ষ্য করুন মি. দাস! পশ্চিমদিকের ঢাল থেকেই ছাপগুলো উঠে এসেছে। ওই দেখুন। স্বাভাবিক চড়াইয়ে ওঠার ছাপ। ওদিকে বালিটা জমাট। এই টিলার মাথায় আসার পর বিচের দিকে নেমে যাওয়া ছাপগুলো দেখুন। বিচের দিকটা ঢালু। বালি নরম। ক্রমশ স্টেপিংয়ের দূরত্ব বেড়েছে। ছাপও গভীর হয়েছে। বাঁ দিকে কোনাকুনি নেমে গেছে ছাপগুলো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোক দৌড়ে নেমেছিলেন। কিন্তু বাঁ দিকে কোনাকুনি কেন? চুড়োয় এসে নীচে বাঁদিকে কি কাউকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন?"

কর্নেল বাইনোকুলারে ডান দিকটা দেখে এগিয়ে গেলেন। বললেন, "এই যে! এখানে কেউ দাঁড়িয়েছিল। মাই গুডনেস! সে একলাফে প্রায় তিরিশ ফুট নীচে পড়েছে। ওই দেখুন গভীর দুটো ছাপ" কর্নেল নেমে গেলেন হন্তদন্ত। আবার খুঁটিয়ে দেখে বললেন, "ডেডবডির দূরত্ব এখান থেকে আরও তিরিশ ফুট। জোয়ারের জল ওখান পর্যন্ত আসে না। তার মানে, সে দ্বিতীয় লাফে ম্যাডানসায়েবকে ধরে ফেলেছে। অস্বাভাবিক লং জাম্প!"

সুখরঞ্জনবাবু ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, "অসম্ভব! একেবারে অসম্ভব।"

৫

রাজেন অধিকারীর দানোটার কথা বলার জন্য উশখুশ করছিলাম। কিন্তু কর্নেলের হাবভাব আঁচ করেছি, পুলিশকে তিনি হাতের তাস দেখাতে চান না। অবশ্য বরাবর তাঁর এই স্বভাব।

সুখরঞ্জনবাবু বললেন, "কর্নেল! আপনার এই থিয়োরিটা কিন্তু মানতে পারছি না। যে তিরিশ ফুট লং জাম্প দিতে পারে, সে অলিম্পিকের মেডেল জেতা খেলোয়াড়। আপনি কি বলতে চাইছেন খুনি কোনও খেলোয়াড়?"

কর্নেল বাইনোকুলারে দূরে বিচের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন দেখছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "চলুন ফেরা যাক।" তারপরে হাঁটতে-হাঁটতে ফের বললেন, "খেলোয়াড় বইকি। মি. দাস, আমরা এক সাংঘাতিক খেলোয়াড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী।"

সুখরঞ্জনবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু পরে ঘড়ি দেখে বললেন, "আমাকে এখনই এক জায়গায় যেতে হবে। পরে যোগাযোগ করব'খন।"

উনি চলে যাওয়ার পর আমরা বিচ ধরে হাঁটছিলাম। ডাইনে সমুদ্রে এখানে-ওখানে কালো-কালো ছোটোবড়ো পাথর দেখা যাচ্ছে। ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। মুহুর্মুহু ব্রেকারের গর্জনে কানে তালা ধরে যাচ্ছে। চাপ চাপ ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে। বিচের মাথার পাথরে তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ। প্রকাণ্ড সব পাথরের চাঙড় বিচে এসে পড়েছে। একটা ভাঙা ঘরে জানালায় কাউকে উঁকি মারতে দেখলাম। গোলগাল মুখ। মুখে কেমন একটা হাসি। হঠাৎ মুখটা চেনা মনে হল। তখনই মনে পড়ে গেল, রাজেনবাবু বাড়ির দোতলার জানালায় এই মুখটাই দেখছিলাম। দ্রুত বললাম, "কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন সেই বসন্তবাবু। রাজেনবাবুর দাদা।"

কর্নেল বললেন, "দেখেছি। ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে চাও কি?"

"ওঁর কাছে জানা দরকার, উনি এখানে কেন এসেছেন।"

"চলে যাও তা হলে।"

"আপনিও চলুন!"

কর্নেল হাসলেন। "ডার্লিং! আমি পাগলকে বড্ড ভয় করি, সে তো তুমি জানো! তুমি ইচ্ছে করলে ওঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারো। যাও, চলে যাও!"

তীব্র কৌতূহলের চাপে পড়েই পাথরের চাঙড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। ওপরে উঠে সেই ভাঙা পাথুরে ঘরটার দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলাম। কিন্তু জানলায় দেখা সেই মুখটা নেই।

ভেতরে উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ঘরগুলো বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজে আর বসন্তবাবুর পাত্তা পেলাম না। সবখানে বালির স্তূপ। পোড়ো পোড়ো ঘরগুলোর মেঝেও বালিতে ভর্তি। দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে ওধারে পিচ-রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় গিয়ে একপলকের জন্য দেখলাম, বসন্তবাবু ওপাশের একটা পোড়ো জমির পাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে গেলেন। পাগলের পেছনে দৌড়োনোর মানে হয় না।

বিচে ফিরে গিয়ে কর্নেলকেও দেখতে পেলাম না। অদ্ভুত মানুষ তো!

খানিকটা হেঁটে জেলেদের ভেলানৌকোর কাছে পৌঁছোলাম। উঠে গিয়ে ওশান হাউস চোখে পড়ল। সেখানে গিয়ে দেখি নীচের বারান্দায় বসে স্মিথসায়েব হোমিয়োপ্যাথির ওষুধ বিলোচ্ছেন। একতঙ্গল গরিবগুরবো চেহারার রুগি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে স্মিথসায়েব সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং!"

"মর্নিং মি. স্মিথ! কর্নেলসায়েব কি ফিরেছেন?"

"ফিরলে দেখতে পেতাম।"

"মি. হালদার?"

স্মিথ উদ্বিগ্নমুখে বললেন, "না। আমি চিন্তিত মি. চৌধুরী। পুলিশকে খবর দিয়েছি।"

আমার ঘরের চাবি কর্নেলের কাছে। ডুপ্লিকেট চাবি নিশ্চয় স্মিথসায়েবের কাছে আছে। কিন্তু ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। আবার বিচে ফিরে গেলাম। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চমৎকার সময় কাটানো যায়। এদিকটা একেবারে খাঁ খাঁ জনহীন। জেলেবস্তির ছোট্ট ছেলেমেয়ের দঙ্গল খানিকটা দূরে সমুদ্রে নেমেছে। ওটাই ওদের খেলা। কেউ - কেউ জলের ভেতর উঁচিয়ে থাকা পাথরেও উঠেছে। ওদের ভয় করছে না?

নিশ্চয় করছে না। সমুদ্র ওদের আপনজন। সমুদ্র ওদের লড়াই করে বেঁচে থাকতে শেখায়। ওরা যেন সমুদ্রের পাঠশালার পড়ুয়া।

কতক্ষণ পরে আনমনে ডানদিকে মুঘল আমলের ভাঙা কুঠিবাড়িগুলোর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল একটা মাথা উঁকি মেরে এগোচ্ছে। স্তূপের আড়াল দিয়ে কেউ গুঁড়ি মেরে কোথাও চলেছে। একটু পরে আর তাকে দেখা গেল না। মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বসন্তবাবু নন তো?

বালি ও ধ্বংসস্তূপ এবং ভাঙা ঘরের ফোকর গলিয়ে সাবধানে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা ঘরের বালিতে পড়ে থাকা একটা কাগজের চিরকুট দেখতে পেলাম। চিরকুটটা পড়ে নেই আসলে। একটুকরো পাথর চাপা দেওয়া আছে এক কোনায়।

চিরকুটটা তুলে দেখি, আঁকাবাঁকা ইংরেজি হরফে যা লেখা আছে, তার মানে দাঁড়ায় :

"আজ রাত দশটায় এখানে আসুন। দেখা হবে।"

হালদারমশাইয়ের ভাষায় প্রচুর রহস্য। ঝটপট ভেবে নিয়ে চিঠিটা সেই অবস্থায় রেখে দিলাম। তারপর তেমনই গুঁড়ি মেরে এগিয়ে খানিকটা তফাতে একটা ভাঙা দেওয়ালের আড়ালে বসে রইলাম। এখান থেকে ওই ঘর এবং নীচের বিচ মোটামুটি চোখে পড়ে।

এমন ভঙ্গিতে বসেছিলাম, কেউ দেখলে ভাববে, নিছক সমুদ্রদর্শন করছি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বিচের দিক থেকে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলাম। প্রথমে তাকে সায়েব ভেবেছিলাম। পরে দেখি খাঁটি সায়েব নয়। তবে কতকটা সায়েব-সায়েব গড়ন। লম্বা নাকটা দেখার মতো। পরনে জিনস-জ্যাকেট। মাথায় রোদ-বাঁচানো টুপি। বয়স আন্দাজ ত্রিশ-বত্রিশ মনে হল।

লোকটা সেই ঘরের কাছে এসে চাপা গলায় কাকে ডাকল, "হ্যালো।"

বারকতক ডাকার পর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে ঘরের ভেতর উঁকি দিল। তারপর ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ল।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। হন্তদন্ত ছুটে গিয়ে সেই ঘরের ফোকরের সামনে দাঁড়ালাম। লোকটা চমকে উঠেছিল। সামলে নিয়ে ইংরেজিতে বলল, "এই পাথরের বাড়িগুলো ভারি অদ্ভুত। কে তৈরি করেছিল জানেন কি?"

চার্জ করার ভঙ্গিতে বললাম, "কে আপনি?"

"ট্যুরিস্ট আশা করি, আপনিও ট্যুরিস্ট?"

তার কথায় কান না করে বললাম, "ওখানে একটা চিঠি ছিল, চিঠিটা নিতেই কি আপনি এসেছেন?"

"চিঠি! কী বলছেন আপনি?"

"ঠিক বলছি। চিঠিটা আমি দেখেছি। আপনি সেটা নিয়েছেন। এবার বলুন কে আপনি?"

পেছন থেকে কর্নেলের কথা ভেসে এল। "সাবধান ডার্লিং! সেই দানোর কথা ভুলো যেয়ো না।"

শোনামাত্র ভ্যাবাচাকা খেয়ে একলাফে লোকটার কান ধরতে গেলাম। লোকটাও একলাফে সরে গেল। কর্নেল এসে অট্টহাসি হেসে বললেন, "সেমসাইড হয়ে যাচ্ছে জয়ন্ত! আলাপ করিয়ে দিই, ইনি ম্যাডানসায়েবের জামাই মি. কুসরো! আর মি. কুসরো! আমার স্নেহভাজন বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী মাঝে - মাঝে অতুৎসাহী হয়ে পড়ে। আসলে এটা ওর ভয় পাওয়ারই প্রতিক্রিয়া!"

কুসরো হেসে ফেললেন। "সত্যি বলতে কি, আমি ভয় পেয়েছিলাম। যাই হোক, সেই ভদ্রলোক আমার জন্য একটি চিঠি রেখে গেছেন। এই দেখুন।"

কর্নেল চিঠিটা নিয়ে চোখ বুলিয়ে বললেন, "এটা আমার কাছে থাক। রাত নটা নাগাদ ওশান হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর সব ব্যবস্থা হবে। আপনি বরং নীচের দিকে না গিয়ে সদর রাস্তা ধরে বাংলোয় যান। সাবধানে যাবেন।"

কুসরো তখনই ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। বললাম, "শ্বশুর চিঠির ফাঁদে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। এবার জামাইকেও চিঠির ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। ব্যাপারটা এই তো?"

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, "তখন বসন্তবাবুকে কোথায় হারিয়ে ফেললে?"

"রাস্তার ওধারে। তো মি. কুসরো কি শ্বশুরের ডেডবডি নিতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। ওঁর বাবার বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রীমশাই। তাঁর সাহায্যে আর্মির হেলিকপ্টারে ম্যাডানসায়েবের বডি সকালেই কলকাতা পাঠনো হয়েছে। কুসরো যাননি। মানে, কলকাতায় উনি যখন আমাকে ফোন করেন, তখন আমি ওঁকে একটা দিন থেকে যেতে বলেছিলাম। তবে জানতাম না, কুসরো মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলোয় উঠেছেন। উঠে অবশ্য ভালোই করেছেন। কারণ আমাদের প্রিয় বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরীর সান্নিধ্যে থাকলে উনি নিরাপদ।"

অবাক হয়ে বললাম, "ওই বাংলোতে চন্দ্রকান্তবাবুও উঠেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ। চলো, চন্দ্রকান্তবাবুকে ওশান হাউসে বসিয়ে রেখে এসেছি।"

বুঝলাম, আমি যখন বসন্তবাবুর পেছনে ছুটছিলাম, তখন কর্নেল আমাকে ফেলে সেই বাংলোয় চলে গিয়েছিলেন। তাই ওঁকে আর দেখতে পাইনি। কিন্তু হঠাৎ ওভাবে চলে না গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। কেন করেন নি? এমনকী ঘটেছিল যে, প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের বাংলোর দিকে ছুটে গিয়েছিলেন?

যেতে-যেতে কথাটা তুললাম। কর্নেল বললেন, "বাইনোকুলারে দেখেছিলাম, বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ওঁর ডিটেক্টর যন্ত্র নিয়ে ব্যাকওয়াটারের ওদিকে ঘুরঘুর করছেন। কাজেই ওঁর কাছে না গিয়ে পারলাম না। হ্যাঁ, গত রাতে দানোটা বাংলোয় ঢুকতে পারেনি। বিজ্ঞানীর কারবার! মারাত্মক কী অদৃশ্য রশ্মি দিয়ে নাকি বাংলোটা ঘিরে রেখেছিলেন।"

"কিন্তু হালদারমশাইয়ের কী হল?"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "জানি না।"

ওশান হাউসের দোতলায় আমাদের স্যুটে ঢুকে দেখি, বিজ্ঞানীপ্রবর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছেন। কারণ ওঁর নাক ডাকছে। আমি যেই 'চন্দ্রকান্তবাবু' বলে ডেকেছি, আমনিই তড়াক করে সোজা হলেন এবং বললেন, "হিরে আছে! শিয়োর!"

হাসতে-হাসতে বললাম, "স্বপ্ন দেখছিলেন বুঝি?"

চন্দ্রকান্ত চোখ কচলে বললেন, "সরি! সারারাত ঘুমোইনি। ঘুমোনো দরকার।" বলে আমার দিকে তাকালেন। "হ্যালো জয়ন্তবাবু! আসুন, আসুন। আপনার কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!"

"কেন বলুন তো?"

"হিরেটা উদ্ধার হয়ে গেলে আপনাকে একটা রোমহর্ষক স্টোরি দেব। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরোলে হইচই পড়ে যাবে। আমার মাথা তো গুলিয়ে গেছে মশাই। ভাবা যায়? হিরেতে এক ধরনের রশ্মি আছে, যা প্রাণীর দেহকোষের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। হিরে ঠিক যেভাবে কাচ কাটতে পারে, সেইভাবে হিরের সেই বিস্ময়কর রশ্মিপ্রবাহ ডি এন এ অণুতে কেটেকুটে—" চন্দ্রকান্ত হঠাৎ কথা থামিয়ে ফিক করে হাসলেন।

কর্নেল আতশকাচ দিয়ে চিঠিটা দেখতে ব্যস্ত। আমাদের কথা দিকে ওঁর কান নেই।

বললাম, "চন্দ্রকান্তবাবু! আপনি বললেন, হিরে আছে। কোথায় আছে?"

চন্দ্রকান্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখানেই।"

"এখানেই মানে? গোপালপুর-অন-সি'-তে?"

"শিয়োর। ওই ব্যাকওয়াটারের কাছাকাছি কোথাও লুকোনো আছে। ডিটেক্টরে সাড়া পেয়েছি কিন্তু ঠিক জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারছি না, এটাই সমস্যা।"

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে বললাম, "হিরেটা এখানে এল কী করে? আনল কে? কেনই বা আনল?"

চন্দ্রকান্ত চিবুকের দাড়ি খুঁটতে-খুঁটতে বললেন, "তা জানি না মশাই! কর্নেল ওসব রহস্য জানেন বলেই আমার ধারণা।"

কর্নেল চিঠিটা পকেটস্থ করে বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! মি. কুসরো বাংলোয় ফিরে গেছেন। লাঞ্চের সময় হয়ে এল। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

বিজ্ঞানী তখনই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "হ্যাঁ চলি! আমার একটা লম্বা ঘুমও দরকার।"

উনি চলে গেলে বললাম, "প্রাক্তন মন্ত্রী ভদ্রলোক কি চন্দ্রকান্তবাবুর পরিচিত?"

"পরিচিত না হলে চন্দ্রকান্তবাবু ওখানে উঠবেন কেন? বাংলোটা বেশ বড়ো। অনেক ঘর। কাজেই প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের পক্ষে তাঁর একাধিক প্রিয়জনকে ঠাঁই দেওয়ার অসুবিধে নেই। কেয়ারটেকার গোমস তাঁর প্রিয়জনদের সেবার জন্য বহাল রয়েছে।" বলে কর্নেল উঠলেন। "তুমি কি স্নান করবে? আমি বলি, বরং সমুদ্রে স্নান করে এসো। স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।"

আঁতকে উঠে বললাম, "মাথাখারাপ? এখানকার সমুদ্র মানুষখেকো। সবসময় হাউমাউখাঁউ করে চ্যাঁচাচ্ছে। জলের ভেতর পাথরগুলো যেন সমুদ্রের দাঁত। বুঝলেন তো? পেলেই পাথরের দাঁতে চিবিয়ে গিলে ফেলবে।"

"তা হলে সুইচ টিপে মারিয়াম্মাকে ডাকো। গরম জল করে দেবে। আমি তো সপ্তাহে একদিন স্নান করি। আজ আমার স্নানের দিন নয়।"

দুপুরের খাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া আমার অভ্যাস। পুরোনো বাংলায় একে বলে 'ভাতঘুম'। কিন্তু কর্নেল বাদ সাধলেন। বললেন, "এখনই মিলিটারির জিপ আসবে। তৈরি থাকো।"

মনে পড়ে গেল, এখানে সেনাবহিনীর একটা ঘাঁটি আছে। ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এখানে এসেছেন একটা রহস্যের সমাধনে। কিন্তু এসেই কখন সেনাবাহিনীর কোনও স্নেহভাজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে মিলিটারি জিপে আমরা যেখানে পৌঁছোলাম, সেটা উঁচুতলার অফিসারদের কোয়ার্টার এলাকা। বাংলোবাড়ি এবং সুদৃশ্য লন, ফুলবাগিচা। একটা বাংলোর লনে ঘাসের ওপর চেয়ারটেবিল পেতে একজন শিক সামরিক অফিসার পাইপ টানছিলেন। কর্নেলকে দেখে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইনিও এক কর্নেল। কর্নেল পরমজিৎ সিং।

পরমজিৎ বললেন, "পুরোনো ক্যানটিং - রেকর্ডে আপনার দেওয়া নামটা পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সোলজার্স ক্যানটিনে ফুড সাপ্লায়ার ছিলেন।"

কর্নেল বললেন, "ওশান হাউসের মি. মিথের কাছে কথায়-কথায় জানতে পারি, এই নামের ভদ্রলোক একসময় এখানে ছিলেন। ফুড কনট্রাক্টরি করতেন। ধন্যবাদ কর্নেল সিং। অসংখ্য ধন্যবাদ!"

বেয়ারা কফি রেখে গেল। কফি খেতে-খেতে পরমজিৎ একটু হেসে বললেন, "কিন্তু এবার যে রহস্যটা জানতে ইচ্ছা করছে কর্নেল সরকার? বুঝতে পেরেছি আপনার এবারকার গোপালপুর -অন-সি-তে আসার উদ্দেশ্য সেই বিরল প্রজাতির 'জগন্নাথ প্রজাপতি' ধরা নয়, আমাদের একজন প্রাক্তন ফুড সাপ্লায়ারকে ধরা। কিন্তু রেকর্ডে ওঁর বিরুদ্ধে তো কিছুই নেই। অসুস্থতার জন্য কারবার গুটিয়ে কলকাতা ফিরে যান। উনি কি সেই জুয়েলার ম্যাডানসায়েবের মার্ডার কেসে জড়িয়ে পড়েছেন?"

কর্নেল জোরে মাথা নাড়লেন। "না, না! উনি অত্যন্ত সদাশয় পরোপকারী মানুষ।"

"তা হলে ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, শুনি।"

"যথাসময়ে জানাব।"

এরপর দু জনে সামরিক বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। আলাপ এবং কফি খাওয়া শেষ হলে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলি কর্নেল সিং! পরে দেখা হবে। একটু তাড়া আছে।"

কর্নেলের নির্দেশে এবার মিলিটারি জিপ আমাদের লাইট হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। আমরা বস্তি এলাকার ভেতর দিয়ে একটা নীচু জায়গায় নেমে গেলাম। বললাম, "কোথায় যাচ্ছি?"

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বালির টিলাগুলো দেখে নিয়ে বললেন, "চলো তো!"

যেতে-যেতে বললাম, "সেই ফুট সাপ্লায়ার ভদ্রলোক কে?"

"বসন্ত অধিকারী।"

চমকে উঠে বললাম, "অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।" কর্নেল হাসলেন। "বসন্তবাবুকে ঠিক বদ্ধ পাগল বলা চলে না। তবে মাথায় একটু গন্ডগোল ঘটেছে, সেটা ঠিকই। এই গোপালপুর-অন-সির প্রত্যেকটি ইঞ্চি ওঁর নখদর্পণে। ডার্লিং! কাল রাত্তিরে উনিই ভূত হয়ে আমাদের টিল ছুঁড়ছিলেন। আমুদে চরিত্রের মানুষ। মজা করার সুযোগ পেলে ছাড়তে চান না।"

বালির টিলার কাছে পৌঁছে বললাম, "কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোন চুলোয়?"

"ধৈর্য ধরো জয়ন্ত!" বলে কর্নেল টিলায় উঠতে থাকলেন। ক্রমশ সমুদ্রের গর্জন স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র চোখে পড়ল। চুড়োয় ওঠার পর বাইনোকুলারের বাঁ দিকে কিছু দেখে কর্নেল বললেন, "ওই যে দেখছ একটা হোটেল। তুমি এখানে বসে লক্ষ রাখো। যদি দ্যাখো, শেরোয়ানিচুস্ত-টুপিপরা কোনও মুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী বিচে নামছেন, তুমি গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ভাব জমাবে। যেভাবে হোক, কথায়-কথায় ওঁদের আটকে রাখবে। আমি সেই সুযোগে হোটেলে ঢুকে স্যুটে হানা দেব।"

কর্নেল হনহন করে সোজা এগিয়ে গেলেন। তারপর অদৃশ্য হলেন। হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইলাম। শীতের বেলা পড়ে আসছিল। বসে আছি তো আছি। কতক্ষণ পরে দেখি, সেই মুসলিম ভদ্রলোক এবং তাঁর সঙ্গী কখন আমার ঠিক নীচে বিচের ওপর চলে এসেছেন। দু জনে বিচ ধরে দক্ষিণে এগোচ্ছেন। তবে হাঁটার গতি বেশ দ্রুত।

গতরাতে থানায় ওঁদের কথা শুনেছি। নাম দুটি মনে পড়ল। মইনুদ্দিন আমেদ এবং পিটার ন্যাজারেথ। দু জনেই নাকি চামড়া ব্যবসায়ী। কিন্তু কর্নেলের দৃষ্টি ওঁদের ওপর পড়ল কেন?

একটু ইতস্তত করে বিচে নেমে গেলাম। ওঁরা ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ওদিকটা একেবারে নির্জন খাঁ খাঁ। বাঁ দিকে সমুদ্র সামনে গজরাচ্ছে। হন্তদন্ত এগিয়ে "হ্যাঁলো" বলে সম্ভাষণ

করলাম। কিন্তু সমুদ্রের গর্জনে কথাটা হারিয়ে গেল। দুটো বালির টিলার মধ্যিখানে খাড়ির মতো একটা সঙ্কীর্ণ জায়গা দেখা যাচ্ছিল। সমুদ্রের জল সেখানে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। জলটা পিছিয়ে সমুদ্রে সরে গেলে ওঁরা দুজনে খাড়িটা পেরিয়ে ডাইনে অদৃশ্য হলেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

আবার সমুদ্রের জল এসে খাড়িতে ঢুকল। তারপর জলটা পিছিয়ে যেতেই খাড়ি পেরিয়ে গেলাম। ডাইনে ঘুরে দেখি, বালিয়াড়িতে একটা পাথরের ঘর অর্ধেকটা ডুবে আছে। ফাটলধরা পোড়ো ঘর। ছাদ ধসে পড়েছে। এ-ও নিশ্চয় মুঘল আমলের কোনও বাড়ি। মইনুদ্দিন এবং ন্যাজারেথ সেখানে ঢুকে গেলেন।

সাবধানে এগিয়ে সেই ঘরের কাছে গেলাম। গুঁড়ি মেরে বসলাম। হঠাৎ একটা আর্তনাদ ভেসে এল। তারপর কেউ চিৎকার করে উঠল খ্যানখেনে গলায়, "শাট আপ।"

গুঁড়ি মেরে পাথরের চাঙড়ের আড়ালে গিয়ে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম তা সাংঘাতিক ব্যাপার। দিনশেষের আবছা আলোয় ঘরের মেঝেতে বালিতে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখা হয়েছে একটা লোককে। তার হাত দুটো পিঠের দিকে বাঁধা। এবং লোকটা আর কেউ নয়, আমাদের হালদারমশাই!

ন্যাজারেথ তাঁর পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে চুল খামচে ধরে আছে। মইনুদ্দিন সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে, "স্পিক দ্য ট্রুথ!"

আর সহ্য করতে পারলাম না। একলাফে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। তারপর ঝাঁপ দিলাম মইনুদ্দিনের ওপর। তার টুপি খসে পড়ল। সে হুংকার দিয়ে কিছু বলল। ন্যাজারেথ অমনই বালিতে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল। ততক্ষণে মইনুদ্দিনের সঙ্গে আমার ধস্তাধস্তি বেধে গেছে। তার দাড়ি খামচে ধরেছিলাম। উপড়ে এল। তখনই চিনতে পারলাম তাকে। কী আশ্চর্য, এ তো সেই রাজেন অধিকারী!

চেনামাত্র তাকে ছেড়ে ন্যাজারেথের কান ধরতে লাফ দিলাম। ন্যাজারেথ যে সেই দানো অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ, এ-ও মুহূর্তে বুঝে গেছি। কিন্তু তার কান মলে দেওয়ার সুযোগ পেলাম না। সে আমাকে ঠেলে বালির ওপর ফেলে দিল। রাজেন অধিকারীও আমার বুকের ওপর এসে বসল। মুখে নিষ্ঠুর হাসি।

আমি তার দিকে হাত ওঠানোর সুযোগ পেলাম না। আমার দুই বাহুতে সে দুই পা চাপিয়ে দিল। তারপর পকেট থেকে কী একটা খুদে কালো বোতামের মতো জিনিস আমার কপালে সেঁটে দিল। মনে হল, অতল শূন্যে তলিয়ে যাচ্ছি।

৬

প্রথমে ভেবেছিলাম একটা বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছি। চাঁদের আলোয় জায়গাটা মোটামুটি স্পষ্ট। আমার নিম্নাঙ্গ নিঃসাড়। ঠান্ডায় জমে গেছে। তারপর বুঝলাম আমার কোমর পর্যন্ত বালিতে পোঁতা এবং হাত দুটো পেছনে বাঁধা। যন্ত্রণা টের পেলাম। তখন সব কথা মনে পড়ে গেল। ডাকলাম, "হালদারমশাই! হালদারমশাই!"

কোনার দিকে ছায়া। সেখান থেকে হালদারমশাইয়ের করুণ সাড়া এল, "আছি।"

"একটা কিছু করা দরকার, হালদারমশাই।"

হালদারমশাই রুগির গলায় অতি কষ্টে বললেন, "চব্বিশ ঘণ্টা পোঁতা আছি জয়ন্তবাবু। পায়ে একটুও শক্তি নাই।"

"আপনাকে কোথায় ধরেছিল?"

"সি বিচে কাইল রাত্তিরে অগো ফলো কইরা কইরা বিপদ বাধাইছি।"

এই সময় বাইরে ধুপধুপ শব্দ কানে এল। হালদারমশাই চাপা গলায় বললেন। "চুপ কইরা থাকেন। চক্ষু খুলবেন না।"

চোখ বোজার আগে দেখে নিলাম, দুটো লোক আসছে। একজনের কাঁধে মড়ার মতো কেউ ঝুলছে। তারা ঘরে ঢুকলে চিনতে পারলাম। রাজেন অধিকারী এবং তার দানো। দানোর কাঁধে আর একজন মড়ার মতো লোক। রাজেন অধিকারী হুংকার দিল তখনকার মতো। অমনই দানোটা 'মড়া' নামিয়ে বালিতে গর্ত খুঁড়তে থাকল। গর্তটা সে হাত দিয়েই খুঁড়ছিল। বুঝলাম, রাজেন অধিকারীর হুংকার সম্ভবত বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের ভাষায় 'সোনিম'। বিশেষ ধ্বনিতরঙ্গের সাহায্যে হুকুম জারি।

দানোটা যাকে আমাদের মতো কোমর পর্যন্ত পুঁতে হাত দুটো পেছনে বাঁধল, সে যে মড়া নয় তা একটু পরে বুঝলাম। রাজেন অধিকারী তাকে বলল, "হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, না বলা পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকো।"

সে হি হি করে হেসে উঠল।

"শাট আপ। পাগলামি ঘুচিয়ে দেব। বলো হিরে কোথায়?"

"বলব না!"

"না বললে দাদা বলে খাতির করব না আর।"

"ইস! আমি তোর সত্যিকার দাদা নাকি? বেশি জাঁক দেখাসনে রাজু। সব ফাঁস করে দেব। যখন বাপ-মা মরে ফ্যা - ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি, তোকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছিলাম। তুই নেমকহারাম!"

"চুপ! টাম্বোকে হুকুম দিলে এখনই তোমার মুন্ডু মুচড়ে দেবে।"

"তাই দে না। মলে তো বেঁচে যাই। ওরে হতভাগা তোর বাবার আত্মার সঙ্গে আমার সবসময় দেখা হয় জানিস! দাঁড়া! ডাকছি তাকে। "প্রমথ! প্রমথ! কাম অন! তোমার হারামজাদা পুত্রটিকে এসে শায়েস্তা করো দিকি।"

"শাট আপ! বলো হিরে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?"

"হিরে তোর বাপের? নওরোজিসায়েবের সঙ্গে চক্রান্ত করে ম্যাডানসায়েবের হিরে চুরি করেছিলি। ওই ভূতটাকে দিয়ে নওরোজিকে মারলি। শেষে ম্যাডানসায়েবকে মারলি। পাপের ভয় নেই তোর?"

রাজেন অধিকারী ফুঁসে উঠল। "তুমিও কম পাপী নও। আমার ল্যাব থেকে হিরে চুরি করে ম্যাডানসায়েবকে চিঠি লিখেছিলে এখানে আসতে। তুমি থাকো ডালে-ডালে, আমি থাকি পাতায়-পাতায়। এবার ম্যাডানসায়েবের জামাইকে হিরে ফেরত দেওয়ার চক্রান্ত করেছ। সে-খবরও আমি রাখি, যাক গে বলো-— হিরে কোথায় রেখেছ?"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "বসন্তবাবু! আপনি ভুল করছেন! হিরে কলকাতায় ম্যাডানসায়েবেরে দিয়া দিলেই পারতেন। এই ট্রাবল হইত না!"

রাজেন অধিকারী ঘুরে দাঁড়াল। "তবে রে ব্যাটা টিকটিকি! বলে তেমনই হুংকার দিতেই 'টাম্বো' গিয়ে হালদারমশাইয়ের চুল খামচে ধরল। হালদারমশাই আর্তনাদ করলেন।

বসন্তবাবু বললেন, "আপনি ভালো বলেছেন মশাই! কলকাতায় হিরে দিলে এই রাজু ব্যাটাচ্ছেলে ঠিক টের পেয়ে যেত। ওর যন্তরমন্তরে সব ধরা পড়ে যেত। সেজন্যেই গোপালপুরে আসতে লিখেছিলাম। আমার চেনা জায়গা। তা আপনাকে দেখছি জ্যান্ত পুঁতেছে?" হিহি-হোহো করে একচোট হাসার পর বসন্তবাবু এতক্ষণে আমাকে দেখতে পেলেন। বললেন, "মলো ছ্যাই। এ আবার কে? ও রাজু! একে কেন পুঁতলি?"

রাজেন অধিকারী তেড়ে এল। "চুপ! এই শেষবারের মতো বলছি, বলো হিরে কোথায়?"

বসন্তবাবু ভেংচি কেটে বললেন, "তোর বাপের হিরে? দাঁড়া তোর বাপের আত্মাকে ডাকি। সে

নিজে এসে বলুক, হিরে কার?" বলে ঘাড় ঘুরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালেন। চাপা গলায় বললেন, "রাতবিরেতে তোর বাপ পাখি হয়ে সমুদ্রের ওপর চক্কর দিয়ে বেড়ায়। আমি নিজের চোখে দেখছি। তা জানিস?"

রাজেন অধিকারী বলল, "তাহলে মরো! টাম্বো! টাম্বো! টাম্বো!"

তার হাতে টর্চের মতো একটা জিনিস থেকে নীলচে আলো জ্বলে উঠল। তারপর যা দেখলাম, শিউরে উঠলাম। দানোটা হালদারমশাইয়ের চুল ছেড়ে দিয়ে বসন্তবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে কী একটা বের করল। সেটা আর কিছু নয়, একটা কালো রঙের ছোটো সাপ। সাপটার লিকলিকে জিভ। বসন্তবাবুর মুখের কাছাকাছি সে সাপটাকে নিয়ে গেল। বসন্তবাবু আর্তনাদ করলেন, "প্রমথ! প্রমথ! বাঁচাও!"

তিনি সম্ভবত রাজেন অধিকারীর বাবার প্রেতাত্মাকে ডাকার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ ঘোরালেন। তারপরই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওই সে আসছে! ওই দ্যাখ রাজু। পাখি হয়ে তোর বাপ উঠে আসছে।"

অতিকষ্টে মুখ ঘুরিয়ে দেখি, কী অদ্ভুত। সমুদ্রের আকাশে বিশাল লম্বা ডানাওলা একটা পাখি উঠে আসছে এই বালিয়াড়ির দিকে।

রাজেন অধিকারী পাখিটাকে দেখামাত্র হুংকার দিল। তখন দানোটা এক লাফে বাইরে চলে গেল। নীলচে আলোটা নিভিয়ে রাজেন অধিকারীও বেরোল। বাইরে এক পলকের জন্য চোখ ঝলসানো আলো দেখলাম। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, কেউ রাজেন অধিকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর ধস্তাধস্তি, হাঁকডাক, বালিতে ধুপধুপ শব্দ। জ্যোৎস্নায় অনেক ছায়ামূর্তির ছুটোছুটি।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বলে উঠলেন, "খাইছে!"

সেই সময় বাইরে কর্নেলের সাড়া পেলাম। "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

চেঁচিয়ে বললাম, "এখানে! এখানে!"

টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর কর্নেলকে দেখতে পেলাম। বললেন, "কী সর্বনাশ! হালদারমশাইকেও পুঁতেছে দেখছি।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "হঃ!"

কয়েকজন পুলিশ ঘরে ঢুকে বাঁধন খুলে দিয়ে বালি সরিয়ে আমাদের ওঠাল। আমি পা ছড়িয়ে বসলাম। হালদারমশাই কিন্তু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পা ছোড়াছুড়ি করে বললেন, "আই অ্যাম অলরাইট। বাট হেভি ক্ষুধা পাইছে।"

বসন্তবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাই। প্রমথের আত্মাকে দেখা করে আসি।"

কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু! প্রমথ কে?"

"ওই শয়তানটা রাজুর বাবা। বড্ড ভাল লোক ছিল মশাই। না, না! যাই দেখা করে আসি। পর-পর দু'বার পাখি হয়ে উড়ে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

বসন্তবাবু বেরিয়ে গেলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। পা বাড়াতে গেছি, হঠাৎ পায়ের কাছে কর্নেলের টর্চের আলোয় সেই সাপটাকে দেখতে পেলাম। চমকে উঠে সরে গেলাম। কর্নেল সাপটাকে কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "এ-ও কিন্তু কৃত্রিম সাপ জয়ন্ত! তবে টাম্বোর মতো নয়। জেনোম থিয়োরির সঙ্গে এটার সম্পর্ক নেই। এটা নেহাত খেলনা সাপ। চলো, বেরোনো যাক।"

বাইরে গিয়ে দেখি, পুলিশের দঙ্গল ছায়ামূর্তির মতো বিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একটা দেওয়ালের আড়াল থেকে সি আই ডি অফিসার সুরঞ্জনবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন, "সায়েন্টিস্ট

ভদ্রলোকের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম কর্নেল। দিনে-দিনে পৃথিবীটা ওঁরা একেবারে অন্যরকম করে দিচ্ছেন। মাথা ঠিক রাখা কঠিন।"

কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবুর চেয়ে সেরা বিজ্ঞানী এখন আপনাদের হাতে মি. দাস! শিগগির গিয়ে ওঁকে আর্মির কর্নেল সিংহের জিম্মায় রাখার ব্যবস্থা করুন। কিছু বলা যায় না। পুলিশের হাজত ওকে আটকে রাখার মতো শক্ত জায়গা নয়। রাজেন অধিকারী এ-যুগের এক জাদুকর বিজ্ঞানী।"

সুরঞ্জনবাবু হন্তদন্ত চলে গেলেন। আমরা সামনে বালির টিলার দিকে যাচ্ছিলাম। টিলার মাথায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নায় আবছা দেখা যাচ্ছে তাকে। কর্নেল ডাকলেন, "বসন্তবাবু!"

কোনও সাড়া এল না। কাছে গিয়ে আবার কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু। দেখা হল প্রমথবাবুর আত্মার সঙ্গে?"

বসন্তবাবু গলার ভেতর বললেন, "নাহ। দেরি দেখে প্রমথ উঠে গেল। ওই দেখুন যাচ্ছে।"

জ্যোৎস্নার সমুদ্রের আকাশে সেই বিশাল পাখিটাকে ক্রমশ দূরে কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে দেখলাম। হালদারমশাই চমকানো গলায় বলে উঠলেন, "কী? কী?"

কর্নেল হাসলেন। "পাখি নয়, হালদারমশাই। হ্যাং গ্লাইডার।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের যে একটা হ্যাং গ্লাইডার আছে। কী ভুলো মন আমার। বললাম, "কর্নেল, তা হলে মারিয়াম্মা যে ভূতুড়ে পাখির কথা বলছিল—"

আমার কথার ওপর কর্নেল বললেন, "ডার্লিং! তুমি সবই বোঝো। তবে দেরিতে। চন্দ্রকান্তবাবু কলকাতা থেকে হ্যাং গ্লাইডারে চেপে এসেছিলেন। এখন ফিরে যাচ্ছেন।"

বসন্তবাবু পা বাড়িয়ে বললেন, "যাই। ম্যাডানসায়েবের জামাই আমার জন্য অপেক্ষা করছে। ওকে ওর শ্বশুরের হিরে ফেরত দিই গে।"

কর্নেল বললেন, "হিরে উনি ফেরত পেয়েছেন বসন্তবাবু।"

"কী বললেন?" বসন্তবাবু হি-হি হো-হো করে বেজায় হাসতে লাগলেন। "হিরে ফেরত পেয়েছে? কী করে পাবে মশাই? এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি, কার সাধ্যি খুঁজে বের করে?"

"যাকে আপনি প্রমথবাবুর আত্মা বললেন, তিনিই খুঁজে বের করেছেন। ব্যাকওয়াটারের ওখানে একটা মন্দিরের ভেতর আপনি পুঁতে রেখেছিলেন। কালো রঙের একটা ছোট্ট কৌটোতে। তাই না?"

"সর্বনাশ।" বলে বসন্তবাবু দৌড়ে বিচে নামতে থাকলেন।

কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, "বরং ম্যাডানসায়েবের জামাই যে-বাংলোতে উঠেছেন, সেখানে চলে যান বসন্তবাবু।"

হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "এখানে থাকা ঠিক না, কর্নেল সার। হেভি ক্ষুধা পাইছে। তাছাড়া আমার সন্দেহ হয়। রাজেন অধিকারীর ভূতটা কোথাও ঘাপটি পাইত্যা-বইয়্যা রইছে। পুলিশ অরে ধরতে পারে নাই।"

"টাম্বোকে চন্দ্রকান্তবাবু লেজার পিস্তলের একটা শটেই ছাই করে দিয়েছেন হালদারমশাই।"

"অ্যাঁ? কই? কই?"

"কাল সকালে এসে দেখবেন। চলুন, এবার ফেরা যাক।"

কর্নেল আমাদের সোজা নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রীমশাইয়ের সেই বাংলোতে। কুসরো অপেক্ষা করছিলেন কর্নেলের জন্য। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি, বসন্তবাবু খুশি-খুশি মুখে বসে পা দোলাচ্ছেন এবং মিটিমিটি হাসছেন। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা ছিল। ডিনার টেবিলে বসে হালদারমশাই খাদ্যে মন দিলেন। কর্নেল বললেন, "বসন্তবাবু আমাদের গতরাতে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাচ্ছিলেন কেন বলুন তো?"

বসন্তবাবু মুরগির ঠ্যাং কামড়ে ধরে বললেন, "ঢিল নয়। ছোটো-ছোটো বালির গোটা।"

"কিন্তু কেন?"

"আপনারা আমার কাজে বাগড়া দেবেন ভেবেছিলাম। বুঝলেন না? পুলিশ এতে নাক গলাক, এটা আমার পছন্দ নয়। পুলিশ যদি জানতে পারত, আমার কাছে হিরে আছে, কেলেঙ্কারি হত না? আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেদম পিটিয়ে কথা বের করে ছাড়ত। ওরে বাবা! আমি পুলিশ দেখলেই কেটে পড়ি।"

"আর একটা কথা বসন্তবাবু!"

"বলুন। আমার মন খুব ভালো হয়ে গেছে। সব কথার জবাব দেব।"

"আপনি হিরের কথা কী জানতে পেরেছিলেন?"

"রাজুর কাছে প্রায়ই একটা লোক আসত। দুজনে চুপিচুপি কথা হত। আড়াল থেকে শুনতাম। পরে বুঝলাম, কী সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে। লোকটা নাকি আমেরিকার কোন সায়েবের কাছে জানতে পেরেছে, কুসরোসায়েবের শ্বশুর কোনও সম্রাটের হিরে কিনেছেন। সেই হিরে চুরির মতলব করেছে ওরা। কী যেন নাম লোকটার? নও... নও... দুচ্ছাই!"

কুসরো বললেন, "নওরোজিসায়েবের কিউরিয়ো শপ আছে। বিদেশে তার অনেক চর আছে। তাদেরই কেউ খবরটা দিয়ে থাকবে— ভদ্রলোক আমার শ্বশুরের চেনা লোক ছিলেন। এদিকে আমার শ্বশুরও তত চতুর মানুষ ছিলেন না। মনে হচ্ছে, কোনও কথায় মুখ ফসকে হিরের কথা তিনিও বলে থাকবেন। এমনকী, হিরেটা দেখিয়েও থাকবেন।"

বললাম, "নওরোজির সঙ্গে কীভাবে রাজেনবাবুর পরিচয় হল?"

কর্নেল বললেন, "নওরোজির এক ভাই আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিক্সের অধ্যাপক। সেখানেই রাজেনবাবু রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন। গত মাসে সেই অধ্যাপক কলকাতা এসেছিলেন। নওরোজি সেই উপলক্ষে পার্টি দেন। রাজেনবাবুও পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এসব খবর নিয়ে তবে গোপালপুরে ছুটে এসেছিলাম।

বসন্তবাবু বললেন, "রাজু বরাবর এইরকম স্বার্থপর।"

কর্নেল বললেন, "নওরোজি নিশ্চয় জানতেন না, টাম্বো কৃত্রিম মানুষ। টাম্বোকে তাহলে গুলি করতেন না।"

বসন্তবাবু বললেন, "শয়তান রাজু নও.. নও, দুচ্ছাই! রাজু সেই লোকটাকে একদিন বলেছিল, হিরে চুরি গেছে। কে চুরি করেছে? না— ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ওই ভূল্টা। কাজেই মারো গুলি! দে বডি ফেলে। হি হি হি হি। বডি ফেলতে গিয়ে নিজেরই বডি পড়ে গেল। হো হো হো হো..."।

হালদারমশাই এতক্ষণে বললেন, "হঃ। বডি পড়া স্বচক্ষে দেখছিলাম। সে কী পড়া।"

কর্নেল বললেন, "আপনার বডিও পড়ে যেত। জোর বেঁচে গেছেন।"

"হঃ।" বলে হালদারমশাই জলের গ্লাস তুলে নিলেন।

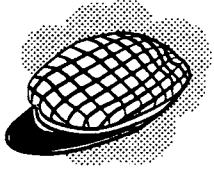

রামগরুড়ের ছানা

কলকাতা থেকে যাত্রা করার আগেই খবরটা পড়া ছিল। বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের এক দুঃসাহসী বিমান শিক্ষার্থী ইন্দ্রনীল রায়ের গ্লাইডার কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা একটানা উড়ে পৌঁছোনো অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

বিদেশে হ্যাং গ্লাইডারে ওড়াউড়ি এখন রীতিমতো স্পোর্টস। বিশ থেকে তিরিশ ফুট পর্যন্ত একটা করে লম্বাটে ডানা— কতকটা দেখতে গঙ্গাফড়িংয়ের মতো। প্যারাসুট কাপড়ে তৈরি। মধ্যখানে হালকা ধাতুর রড দিয়ে তৈরি একটা সামান্য ফ্রেম। সেটা আঁকড়ে একটানা অতখানি দূরত্ব অতিক্রম করা কি সম্ভব? পথে বেশ কয়েকটা বায়ুস্রোত আড়াআড়ি পেরুতে হবে। তার ওপর ওই বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণি। গ্লাইডার তত বেশি উঁচুতে উড়তেও পারে না। অবশ্য ইন্দ্রনীল তাঁর গ্লাইডারে একটা ছোট্ট ইঞ্জিন ও কনট্রোল ব্যবস্থা ফিট করে নিয়েছেন।

তাহলেও এ পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ড বলতে ইংলিশ চ্যানেল আকাশপথে হ্যাং গ্লাইডারে পেরুনোর কীর্তি রবিনসন গ্রিফিথের। কিন্তু এই বাঙালি যুবকটি যা করতে গেলেন, সেটা যেন আত্মহত্যার ব্যাপার। কয়েক হাজার মাইলের দূরত্ব যে!

রাজস্থানের জয়পুর থেকে যোধপুরে ট্রেনে আসার পথে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার পাতায় আবার ইন্দ্রনীলের খবর পড়ে চমকে উঠলুম। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটেছে। ইন্দ্রনীল তাঁর গ্লাইডার সহ নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর হলুদ রঙের গ্লাইডার শেষ দেখা গেছে পাঞ্জাবের দক্ষিণ সীমানায় ভাতিণ্ডার কাছে বিমানবাহিনীর অভজারভেটারি থেকে।

খবরটার দিকে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম। উনি চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করে ট্রেনের জানলা দিয়ে মরু অঞ্চলের পাখপাখালি খুঁজছিলেন সম্ভবত। শুধু বললেন— তাই নাকি? তারপর আবার বাইনোকুলারে চোখ দিলেন। মাঝে মাঝে অভ্যাস মতো একরাশ সাদা দাড়িয়ে হাত বুলোতে ভুললেন না।

আমাদের— ঠিক আমার নয়, কর্নেলের গন্তব্য বারমের স্টেশনে নেমে জালোরের পথে লুনি নদীর তীরে একটি গ্রাম সিহৌরা। বরাবরের মতো এবারও আমি তাঁর সঙ্গী। ভারত সরকারের লোকাস্ট কনট্রোল বোর্ড অর্থাৎ পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাঁকে পঙ্গপালের প্রজননক্ষেত্রে সন্ধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় আর উদ্ভিদের রহস্য নিয়ে ক্রমশ যেভাবে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক মেতে উঠেছেন, আমার কেমন একটা অস্বস্তি হয় আজকাল।

ওঁর কাছেই জেনেছি, পরিযায়ী বা মাইগ্রেটরি পাখিদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে মরশুমি অভিযাত্রার মতো পঙ্গপালের ঝাঁকেরও নাকি একই স্বভাব। আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি থেকে শরৎকালের শেষে ওরা আকাশ কালো করে উড়ে আসে। পশ্চিম এশিয়া থেকে ভারতের রাজস্থান মরু অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ওরা আসে প্রজননক্ষেত্রের খোঁজে। সেখানে ডিম পাড়বে। ছানাপোনাগুলো পনেরো দিনের মধ্যেই লায়েক হয়ে যাবে। তখন খারিফ শস্যের মরসুম। শস্যের খেতে গিয়ে হানা দেবে। অকাশ কালো হয়ে যাবে। শস্যের ক্ষেত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে শূন্য করে চলে যাবে অন্য এলাকায়। হেলিকপ্টারে করে বিষ স্প্রে করেও ওদের সংখ্যা কমানো যায় না। নিরক্ষর গ্রামের মানুষ পুজো দিয়ে দেবতার কাছে মাথা ভাঙে। আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করে এবং অনেকে ঢাকঢোল কাঁসি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে শোরগোল তুলেও পঙ্গপালের ঝাঁক তাড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরিণামে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দেয়।

পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বারমেরে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানে পঙ্গপাল নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলেছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশেষে সুপারিশ করেছেন, ওদের প্রজননক্ষেত্রটি খুঁজে যদি যথাসময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলে উৎপাত ক্রমশ বন্ধ হবে। বয়স্ক পঙ্গপালেরা ডিম পেড়েই অথর্ব হয়ে ক্রমশ সেখানেই মারা যায়। কাজেই ওদের ব্রিডিং ফিল্ডটি খোঁজা দরকার।

কিন্তু কাজটা সহজ নয়। রাজস্থানের বিশাল থর মরুভূমি এখনও দুর্গম। সারা রাজস্থানের বসতি এবং পাহাড় এলাকাতেও কোথাও ব্রিডিং ফিল্ডের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায়নি। লুনি নদীর অববাহিকায় গতবছর একটি ব্রিডিং ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়েছিল। কর্নেল প্রথমে সেখানেই যেতে চান। তাঁর গোয়েন্দাস্বভাব অনুসারে সেখান থেকে সূত্র ধরে এগোতে চান।

যোধপুরে আমাদের জন্য জিপ অপেক্ষা করছিল। ঊষর ধূধূ মাটি আর ন্যাড়া টিলাপাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। মাঝে মাঝে বালিয়াড়িও চোখে পড়ছিল। ফেব্রুয়ারি মাসের বিকেল। ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটানিতেও বেশ শীত করছিল। বারমের পৌঁছুতে রাত আটটা বেজে গেল।

গবেষণাকেন্দ্রের অতিথিভবনে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে এবার যাত্রা শুরু হল উটের পিঠে। আর গাড়ি চলার রাস্তা নেই। সাতটা উটের পিঠে। কর্নেল, আমি গবেষণাকেন্দ্রের দুই বিজ্ঞানী বিনায়ক শর্মা ও রাজকুমার রানা, তাঁবু এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। দুটো বাড়তি উট নেওয়া হয়েছে, সঙ্গে যদি কোনো উট অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার জন্য।

পাথুরে মাঠে, বালিয়াড়ি, মাঝমাঝে ন্যাড়া পাহাড়, কাঁটাগুল্ম বা কদাচিৎ বাবলাজাতীয় গাছ— সারাপথ এই একঘেয়ে দৃশ্য। কোথাও ছাগল ও ভেড়ার পাল চরাচ্ছে ছেলে-মেয়েরা। ওরা যাযাবর। লুনি নদীর যত কাছাকাছি যাচ্ছি তত কিছু গাছপালা, টুকরো সবুজ তৃণাঞ্চল চোখে পড়ছে।

তিরিশ মাইল উত্তর-পূর্বে এগিয়ে বিকেল নাগাদ আমরা সিহৌরি পৌঁছোলুম। রুক্ষ লাল পাথরের টিলার ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম। অধিবাসীরা ভীষণ গরিব। পশুপালনই ওদের জীবিকা। একটু দূরে লুনি নদীর চেহারা দেখে হতাশ হলুম। বালি আর পাথরে ভর্তি নদীর খাত। এক ফাঁকে সামান্য একফালি স্রোত এখনও তিরতির করে বইছে। মার্চেই নাকি তা শুকিয়ে যাবে। তখন সিহৌরার একটিমাত্র কুয়োর জলও যাবে শুকিয়ে। নদীর বালিতে গর্ত করে যেটুকু জল জমবে, গ্রামের খেত এবং তাদের পালিত পশুর দল তাই ভরসা করে বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে দেবে। এমন ভয়ংকর জীবনযাত্রা এখানে!

কুয়োর কাছাকাছি রুক্ষ পাথুরে মাটির ওপর আমাদের ছ-টা তাঁবু খাটানা হল। এক সপ্তাহের খাদ্যদ্রব্য, কয়েক রকমের যন্ত্রপাতি, ওষুধ, রাসায়নিক দ্রব্য পেস্টিসাইডসের স্টক তিনটে তাঁবুতে ঢোকানো হল। একটা তাঁবুতে কর্নেল ও আমি, অন্যটায় বিনায়ক ও রাজকুমার, বাকি তাঁবুতে গবেষণাকেন্দ্রের দুজন কর্মী। উটচালক রক্ষীরা থাকবে খোলা আকাশের নিচে। ওরা বারমের অঞ্চলেরই লোক।

সূর্য অস্ত গেল সিহৌরার পেছনে লাল পাথরের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে। কর্নেল কফি খেয়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন—এসো ডার্লিং! ওঁরা দেখছি খুব ক্লান্ত হয়ে জিরোচ্ছেন। ওঁদের আর ডেকে কাজ নেই। নদীটা একবার দর্শন করে আসি।

বিনায়ক শর্মার বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি। রোগা লম্বাটে গড়নের মানুষ। রাজকুমার আমার বয়সী যুবক। বেশ স্বাস্থ্যবান সুদর্শন। অভিজাত রাণাবংশের ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। রাজকুমার বলল— কর্নেল, কোথায় যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন— লুনিদর্শনে, তুমি ক্লান্ত বলে ভাবছিলুম ডাকব না। বিশ্রাম নাও।

— কী যে বলেন! বলে রাজকুমার উঠে এল। উঠের পিঠে আমার জন্ম বলতে পারেন।

বিনায়ক বললেন— আপনারা নদীতে যাচ্ছেন? ঠিক আছে। কিন্তু ওপারে যাবেন না— সন্ধের মুখে ওপারে যাওয়াটা ঠিক নয়।

কর্নেল অবাক হয়ে বলললেন— কেন বলুন তো?

—রাজকুমার জানে। বলবে আপনাকে। বলে বিনায়ক শর্মা ওরফে শর্মাজি ক্যাম্পচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে দুলতে শুরু করলেন।

পা বাড়িয়ে রাজকুমার হাসতে হাসতে চাপা গলায় বললেন— শর্মাখুড়োকে দেখছেন। উনি বিজ্ঞানী হলে কী হবে? কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ। কবে এখানে এসে শুনে গেছেন, লুনি নদীর ওপারে ভূতের রাজত্ব।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে ওপারটা দেখতে দেখতে বললেন— ওটা কি কোনো কেল্লা নাকি রাজকুমার?

রাজকুমার বলল— হ্যাঁ। ব্রিটিশ যুগে এই এলাকা ছিল আমার দাদু রানা উদয়ভানুজির রাজ্য। করদ রাজ্য আর কী! ওই কেল্লাটা আমাদেরই পূর্বপুরুষের। কয়েক পুরুষ আগেই ভেঙেচুরে গেছে। বালির ভেতরটা অনেকটা ঢাকা পড়েছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর বালিতে নেমে গেলুম। অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। তার ওধারে গিয়ে দেখি একজন লোক একপাল ছাগলকে জল খাওয়াচ্ছে। আমাদের দেখে সে খুব অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। জলটায় জুতোর তলা পর্যন্ত ডোবে না। পেরিয়ে যাচ্ছি যখন, তখন সে আমাদের ডাকল— শুনিয়ে শুনিয়ে!

আমরা ঘুরে দাঁড়ালুম। কর্নেল বললেন— কিছু বলছ ভাই?

লোকটা বলল— সায়েব! আপনারা এখন ওপারে যাবেন না। একটু আগে আমি কেল্লার ওপাশে কাঁটার জঙ্গলে ছাগল চরাতে চরাতে হলদে রঙের একটা দানো দেখতে পেয়ে পালিয়ে এসেছি। দানোটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাই আমাকে দেখতে পায়নি। নইলে বচ্চন সিংয়ের দশা হত আমার!

কর্নেল হাসি চেপে বললেন— কী দশা হয়েছিল বচ্চন সিংয়ের?

— সে খুব ভয়ংকর ঘটনা সায়েব! লোকটা চোখ বড়ো করে বলল—বচ্চন তো বটেই, তার তিরিশটা ছাগলও মারা পড়েছিল দানোটার নিশ্বাসের বিষে। আর সায়েব, দানোর নিশ্বাস মানে কী? প্রচণ্ড গরম ঝড়। সিঁহৌরাতক এসে ধাক্কা মেরেছিল! সব বাড়ি উড়ে গিয়েছিল। আর সে কী তাপ! খরার সময় দুপুরবেলাতেও এমন তাপ দেখা যায় না!

রাজকুমার বলল— যত্তোসব! এ অঞ্চলে এরকম আকস্মিক ঘূর্ণিঝড় কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে। আবহবিজ্ঞান সম্পর্কেও আমার কিছু জানাশোনা আছে। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পঞ্চাশ-ষাট মাইল গেলেই কচ্ছের রান অঞ্চল শুরু। ওখানে লুনি নদী মিশেছে জলাভূমিতে। জলাভূমির সঙ্গে আরবসাগরের যোগাযোগ আছে। মধ্য রাজস্থানের মরুতে প্রচণ্ড তাপের ফলে যখন বাতাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায়। তখন সেই ফাঁক পূরণ করার জন্য আরবসাগর থেকে কচ্ছ পেরিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাতাস ছুটে আসে। ভূপৃষ্ঠে তাপের হেরফেরের জন্য ঝড়টা কয়েকটা কেন্দ্রে বৃত্ত হয়ে ওঠে। সেগুলোকে বলব একেকটা ঘূর্ণাবর্ত।

কথা বলতে বলতে আমরা পাথরের ওপর দিয়ে ওপারে পৌঁছে গেছি। তখনও দিনের শেষ আলো লালচে রঙে ছড়িয়ে আছে আদিগন্ত। বাঁদিকে উত্তরে বহুদূরে বালিয়াড়ি, সমুদ্রের মতো ঢেউখেলানো অবস্থায় চলে গেছে। ডানদিকে পাথুরে লাল মাটির প্রান্তর এবং কাঁটাগুল্মের জঙ্গল— তারপর পাহাড়। পূর্বে কেল্লার ওদিকে ন্যাড়া চটান জমি পাথরে ভর্তি— বহুদূর বিস্তৃত।

কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন— সর্বনাশ! সত্যিই তো একটা হলুদ দানো দেখতে পাচ্ছি!

প্রথমে রাজকুমার, তারপর আমি বাইনোকুলারটা নিয়ে জিনিসটা দেখলুম। কিছু বুঝতে পারলুম না। পাথরের আড়ালে লম্বাটে হলুদ রঙের একটা জিনিস সত্যি দেখা যাচ্ছে। কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, এসো তো। দেখি।

কেল্লা বাঁদিকে রেখে কিছুদূর এগিয়ে আমার মাথার ভেতর কী একটা ঝিলিক দিল। বললুম— কর্নেল! ওটা সেই ইন্দ্রনীল রায়ের গ্লাইডার নয় তো? ইন্দ্রনীল গ্লাইডারসহ নিখোঁজ হয়েছে বলে কাগজে পড়ছিলুম না?

কর্নেল হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো মানুষ এমন হাঁটতে পারেন ভাবা যায় না! কাছাকাছি গিয়েই বলে উঠলেন — হ্যাঁ জয়ন্ত! হ্যাং গ্লাইডার!

গ্লাইডার পড়ে আছে পরিষ্কার জমিতে। সেখানে কোনো পাথর বা কাঁটা গুল্ম নেই। মাটিটাও বালি থাকায় যথেষ্ট নরম। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, গ্লাইডারটার একটুও ক্ষতি হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে, যেন ইন্দ্রনীল এখানে ইচ্ছে করেই আস্তেসুস্থে নেমেছে। দুজনের মধ্যিখানে এনামেল রঙের ফ্রেমে কোনো রকমে বসার মতো ছোট্ট একটুখানি আসন এবং তার তলায় ইঞ্জিন ও কনট্রোল বক্স অটুট আছে। কিন্তু তাহলে ইন্দ্রনীল কোথায় গেল?

কর্নেল বালিমাটিতে পায়ের চিহ্ন খুঁজছিলেন। আমরাও খুঁজতে শুরু করলুম। রাজকুমার তো অনেকটা চক্কর মেরে এল। এসে বলল— আশ্চর্য তো! কোথাও পায়ের ছাপ নেই। তাহলে কি ভদ্রলোক আকাশ ভেসে থাকার সময়ই দৈবাৎ কোথাও পড়ে গেছেন— তারপর গ্লাইডারটা এসে পড়ে গেছে?

বললুম— পড়লে তো ভেঙেচুরে যেত!

—হুঁ, তা ঠিক। রাজকুমার উদ্বিগ্নমুখে কর্নেলের দিকে তাকাল।

কর্নেল তখনও মাটিতে চোখ রেখে ঘুরছেন। হঠাৎ একখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কোটের পকেট থেকে আতশ কাচ বের করলেন। ওটা কি পকেটে নিয়েই ঘোরেন সবসময়।

আলো কমে এসেছে। এত কম আলোয় কী সব দেখছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে কে জানে! একটু পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মাটির ওপর সূক্ষ্ম টানা-টানা অনেকগুলো আঁচড় দেখলুম।

বললুম— মাকড়সার চলাফেরার দাগ তাহলে।

রাজকুমার বললেন— ঠিক বলেছেন। মরু মাকড়সাগুলো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড হয়। ঠ্যাংগুলো অন্তত ফুটখানেক করে লম্বা।

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে চারদিক দেখছেন। আমি আর রাজকুমার দুঃসাহসী অভিযাত্রী ইন্দ্রনীলের অন্তর্ধানরহস্য নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু করলুম। গ্লাইডার থেকে নেমে কোথায় যেতে পারে সে? কাছাকাছি বসতি বলতে সিহৌরা। অন্যদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আর জনবসতি নেই। তাহলে?

দিনের শেষ আলো থেকে লালচে রংটা মুছে গেছে। ধূসর হয়ে গেছে আলো। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া বইছে। কর্নেল বললেন— গ্লাইডারটা এখানে যেমন আছে থাক। রাতেই বরং আমরা রেডিয়ো - মেসেজ পাঠিয়ে খবরটা জানিয়ে দেব পুলিশ স্টেশনে। চলো এবার কেল্লাটা একটু দেখে যাই ফেরার পথে।...

এ কীসের ডিম?

রানা ভানুপ্রতাপের তৈরি লাল পাথরের কেল্লাটার দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণ বালিতে ডুবে গেছে। উত্তর অংশটা ভাঙাচোরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ফটক মুখ থুবড়ে পড়েছে। পাথর ডিঙিয়ে ঘোরালো ফুট পনেরো চওড়া পথ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে। পথটা পাথরের ইটে বাঁধানো।

ভেঙেচুরে গেছে। বালি ঢুকছে ফাটলে। কর্নেল টর্চ বের করে বললেন— ভেবো না ডার্লিং! ফেরার সময় যাতে ঠ্যাং না ভাঙে, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা আছে!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু যেন চলমান গেরস্থালি। ওপরে কেল্লার চত্বরে পৌঁছে সারবন্দি ঘর দেখা গেল। কোনোটারই কপাট জানালা বলতে কিছু নেই। কবে কারা খুলে নিয়ে গেছে — হয়তো সিহৌরার বর্তমান অধিবাসীদের পূর্বপুরুষেরাই। প্রাকারের ধারে গিয়ে কর্নেল বাইনোকুলার দিয়ে আবার দেখতে শুরু করলেন। আমি কল্পনা করছিলুম, একদা এই প্রাকারে সশস্ত্র প্রহরীরা টহল দিয়ে বেড়াত—কেল্লার ভেতর কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে বাস করতেন রানা ভানুপ্রতাপ। রাজকুমার আমার মনোভাব আঁচ করে সেইসব গল্প শোনাতে থাকল। মোগলদের অত্যাচারেই রানা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আলোর ধূসরতা এখন ক্রমশ কালো রঙে পরিণত হচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন— আচ্ছা রাজকুমার, ওদিকে কিছুদূরে একটা স্তম্ভ দেখলুম বালিতে মাথা উঁচু করে আছে। ওটা কীসের?

রাজকুমার বললেন— শুনেছি ওটা ছিল একটা অবজারভেটরি। রানা ভানুপ্রতাপের জ্যোতিষী শিবশংকর রাওজি গ্রহনক্ষত্র দেখতেন। ওটা পঞ্চাশ ফুট উঁচু টাওয়ারের টুকরো বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে অবজারভেটরি।

সেদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ কী একটা ঝিকমিক করে উঠল। বললুম— কর্নেল! ও কীসের আলো?

কর্নেলের চোখ পড়েছিল আমার বলার আগেই। বললেন— প্রথমে ভাবলুম বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে বুঝি! কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। তাছাড়া স্তম্ভটার কাছে বালির ওপর বিদ্যুতের ঝিলিক! আরে! লক্ষ্য করছ? রং বদলাচ্ছে যেন মুহুর্মুহু!

হ্যাঁ— সূক্ষ্ম আলোর ঝিলিকটা নীল সবুজ লাল হলুদ সাদা হচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। রাজকুমার হতবাক হয়ে দেখছিলেন। বললেন— আশ্চর্য তো! এমন কোনো ব্যাপার সিহৌরার লোকে দেখে থাকলে নিশ্চয় জানতে পারতুম! ওটা কী হতে পারে, বলুন তো কর্নেল?

কর্নেল বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না। চলো তো দেখে আসি।

টর্চের আলো ফেলে উনি আগে, আমরা দুজনে পেছনে এবড়োখেবড়ো রাস্তাটা দিয়ে কেল্লা থেকে নেমে গেলুম। ভাঙা ফটকের পাথরগুলো ডিঙিয়ে চলতে চলতে রাজকুমার বলল— কর্নেল! শুনেছি এই কেল্লায় গুপ্তধন ছিল। রানা ভানুপ্রতাপের কোনো দামি রত্ন ওখানে পড়ে নেই তো? হয়তো কোন যুগে কারা গুপ্তধন আবিষ্কার করে নিয়ে পালাচ্ছিল! সেই সময় ওখানে কীভাবে একটা রত্ন পড়ে গিয়েছিল। বাতাসের দাপটে এতদিনে বালি সরে গিয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—তুমি যে অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তাতে সন্দেহ নেই রাজকুমার। বিজ্ঞানীদের কাছে সবসময় সব ঘটনার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাই আশা করব। ড. শর্মা হলে হয়তো ব্যাপারটা ভূতুড়ে বলেই ব্যাখ্যা করতেন। অথচ উনি একজন প্রবীণ বিজ্ঞানী। আসার পথেও আমাকে বলেছিলেন, সিহৌরা এলাকায় নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত ফেনোমেনা দেখা যায়। ওঁর বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেগুলো বোঝা সম্ভব নয়। কারণ—

হঠাৎ উনি থেমে গেলেন। আমরাও থমকে দাঁড়ালুম। রংবেরংয়ের আলোর ঝিলিক আর দেখা যাচ্ছে না।

কর্নেল কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন— কী কাণ্ড! এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অথচ আর একটু এগোলে আর দেখা যাচ্ছে না, তার মানে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে চোখের রেটিনায় ওই বিচ্ছুরণটা ক্রিয়াশীল। ভাববার কথা। এক কাজ করা যাক। রাজকুমার। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি আর জয়ন্ত এগিয়ে যাই; তুমি চেঁচিয়ে বলে দেবে ঠিক জায়গায় যাচ্ছি কি না।

রাজকুমার দাঁড়িয়ে রইল। আমরা দুজনে এগিয়ে গেলুম। রাজকুমার চেঁচিয়ে নির্দেশ দিতে থাকল ডাইনে— এবার সোজা! হ্যাঁ, এগিয়ে যান। বাঁদিকে। না—একটু ডাইনে। হ্যাঁ— এবার সোজা। ঠিক আছে।...

টর্চের আলোয় পাথরের কারুকার্যখচিত ফুট পাঁচেক উঁচু স্তরের পাশে বালির ভেতর একটা সাদা জিনিস চকচক করছিল। বালি সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা প্রকাণ্ড ডিম্বাকৃতি সাদা জিনিস! কর্নেল বললেন— দুহাতে তুলে দ্যাখো ওঠাতে পারছ নাকি।

জিনিসটা তত কিছু ভারী নয়। সহজে দুহাতে তুলে ধরলুম। কর্নেল টোকা দিয়ে দেখে হাসতে হাসতে বললেন— এ কোন পাখির ডিম জয়ন্ত? আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ নাবিকের দেখা সেই রক পাখির ডিম? যদি এটা সত্যি ডিম হয়, তাহলে পাখিটার গড়ন কল্পনা করো তো!

বললুম— পাখিটা হবে অন্তত একটা ডাকোটা প্লেনের মতো। কিন্তু এটা থেকেই যে আলো ঠিকরোচ্ছে, তার প্রমাণ?

কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন— রাজকুমার! জিনিসটা কি দেখতে পাচ্ছ?

রাজকুমার সাড়া দিয়ে বলল— পাচ্ছি! উঁচুতে উঠে গেছে।

আমি অতিকায় ডিমটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। অতএব এটাই সেই রশ্মি বিকিরণকারী জিনিসটা। কর্নেল বললেন— চলো ডার্লিং! তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করা যাবে। শর্মাজি প্রাণীবিজ্ঞানী। নিশ্চয় তিনি একটা কিছু হদিস দিতে পারবেন।

ডিম হোক, যাই হোক, জিনিসটার তাপ আছে। মরুভূমির শীতের কনকনে ঠান্ডায় আমাকে আরাম দিচ্ছিল যথেষ্ট।...

মাস্টার ব্লিকের জন্ম

প্রাথমিক পরীক্ষা করে শর্মাজি আমাদের চমকে দিয়ে বলেছেন, ডিম্বাকৃতি বস্তুটির বহিরাবরণ সিলিকন ধাতুতে তৈরি। প্রকৃতিতে এভাবে সিলিকন পাওয়া যায় না। অতএব এটি মানুষেরই তৈরি কোনো যন্ত্র।

কিন্তু কী যন্ত্র? আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। সূর্যোদয়ের পর ওটা তাপনিরপেক্ষ অবস্থায় থাকে। কিন্তু ক্রমশ সন্ধ্যার দিকে তাপ বাড়তে থাকে। মধ্যরাতে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছোয়। তারপর আবার কমতে কমতে ভোরবেলা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সূর্য ওয়ার পর ক্রমশ তাপ ও শীতলতার মাঝামাঝি অবস্থা। রামধনুরশ্মি বিকিরণ করে সূর্যাস্তকাল থেকেই এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে তা চোখে পড়ে। কিন্তু রাত বারোটায় খুব কাছ থেকেই তা দেখা যায়। আমাদের তাঁবুর ভেতর ওই সময় রীতিমতো রামধনুর খেলা। বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা। কিন্তু তাঁবুর ভেতরে বেশ গরম। আমার সমস্যা হল, রাতের শয্যা আরামপ্রদ হলেও পাশে রামধনু নিয়ে শোয়া বড়ো অস্বস্তিকর।

শর্মাজির বিশেষ ইচ্ছা, এই 'যন্তরমন্তর'টি দিল্লিতে প্রতিরক্ষা গবেষণাগারে পাঠানো হোক। কর্নেলের তাতে আপত্তি। শর্মাজির বক্তব্য হল, পাকিস্তান সীমান্ত এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সম্ভবত এটা তাদেরই কোনো 'যন্তরমন্তর'। অর্থাৎ শোনা কথায় স্পাইং ডিভাইস। যান্ত্রিক গুপ্তচর।

রেডিয়ো ট্রান্সমিশান যন্ত্রে বারমের থানায় খবর পাঠানোর তিনদিন পরে সেনাবাহিনীর একটা হেলিকপ্টার হ্যাং গ্লাইডারটা ভাঁজ করে গুটিয়ে নিয়ে গেল। ওঁরা সারা তল্লাট তন্নতন্ন খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন। ইন্দ্রনীলকে জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থায় দেখতে পাননি।

আজগুবি ডিমটার কথা কর্নেলের অনুরোধে শর্মাজি ওঁদের ফাঁস করলেন না। কিন্তু সারাক্ষণ মুখ ব্যাজার করে আছেন। পঞ্চম দিনে রোজকার কর্মসূচি অনুসারে কর্নেলকে নিয়ে শর্মাজি গেলেন

ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত পঙ্গপাল প্রজননক্ষেত্র দেখতে। রাজকুমার তাঁবুর সামনে টেবিল পেতে এলাকার মানচিত্রের একটা চার্ট নিয়ে বসে কী সব মাপজোখ করছেন আর মানচিত্রে ফুটকি দিয়ে চলেছেন। আমি ব্যাপারটার মাথামুন্ডু বুঝতে না পেরে নিজের তঁবুতে ঢুকে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস নিয়ে বসেছি। হঠাৎ কোনায় রাখা প্রকাণ্ড ডিমটা থেকে ব্লিক ব্লিক শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। শব্দটা খুবই চাপা। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড অন্তর অন্তর হতে থাকল। রাজকুমারকে ডাকব কিনা না ভাবছি, এই সময় ডিমটা একটু নড়ে উঠল।

তারপর সরু দিকটা নিঃশব্দে ফেটে গিয়ে টুকটুকে লালরঙের একটা মাথা দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ আর দুটো শুঁড়ের মতো কী বেরিয়ে এল। আমি ছিটকে বেরিয়ে চ্যাঁচাতে থাকলুম— রাজকুমার! রাজকুমার! শিগগির এসো।

রাজকুমার দৌড়ে এলে তাঁবুর ভেতরে ওই কাণ্ডটা দেখিয়ে দিলুম। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডিমটা পুরোটাই মাঝামাঝি ফেটে বেরিয়ে এসেছে এক অদ্ভুত প্রাণী। কিংবা পাখি। অথবা পাখি ও স্থলচর প্রাণীর মাঝামাঝি জীব। না—হলফ করে বলতে পারি, এ কদাচ উটপাখির বাচ্চা নয়। নড়বড় করতে করতে দু ঠ্যাংয়ে ওটা দাঁড়িয়ে গেল। পা দুটো পাখির মতো, দুপাশে দুটো ডানার মতো জিনিসও আছে। কিন্তু মুখের গড়ন কতকটা মানুষ ও প্যাঁচার মাঝামাঝি। চোখদুটো কপালের ওপর। টানাটানা চোখ। মাথাটা গোল ও চ্যাপ্টা। মাথায় লাল চুল অথবা রোঁয়া। ধড়ের রং কালো, পা গাঢ় হলুদ।

চঞ্চু দুটো লাল এবং চঞ্চুর গড়ন দেখেই প্যাঁচার কথা মাথায় এসেছিল। দুপায়ে দাঁড়িয়ে কিম্ভূত জীবটি প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে।

গার্ড ও কর্মীরা দৌড়ে এসে তাজ্জব হয়ে দেখছে। রাজকুমার একজন কর্মীকে তক্ষুনি কর্নেলদের ডাকতে পাঠালেন।

এবার জীবটি এক-পা এক-পা করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াল। অমনি তার শরীর ঝলমল করে উঠল।

সিহৌরা থেকে দুজন নদীতে যাচ্ছিল। তারা দৌড়ে এসে জীবটাকে দেখা মাত্র ধপাস করে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল বিকটভাবে— জয়! গরুড় মহারাজ কী জয়!

তারপর তারা গ্রামের দিকে দৌড়ে গেল। একটু পরেই দেখি, গ্রাম থেকে ঢাকঢোল শিঙা কাঁসি বাজাতে বাজাতে বুড়োবুড়ি জওয়ান-জওয়ানি আন্ডাবাচ্চাসুদ্ধ দৌড়ে আসছে আর গরুড় মহারাজের জয়ধ্বনি হাঁকছে। কাছে এসে তারা মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর যে তুমুল কাণ্ড জুড়ে দিল, কান একেবারে ঝালাপালা। গরুড় মহারাজ যেন এই প্রচণ্ড জগঝম্বে তিষ্ঠোতে না পেরে নড়বড়ে ঠ্যাং ফেলে বিরক্ত হয়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

রাজকুমার অনেক চেষ্টায় ভক্তদের থামিয়ে বলল— ব্যাপারটা কী তোমাদের বলো তো শুনি?

গ্রামের মুখিয়া সেলাম দিয়ে বলল— হুজুর রানাজি! ইনি হলেন বিনতা মাইজির সন্তান গরুড় মহারাজ। আপনারা তো লিখাপড়া আদমি হুজুর। শাস্ত্রপুরাণ পড়েছেন। গরুড়জির কথা অবশ্যই জানেন।

রাজকুমার অবাক হয়ে বলল— বুঝলুম। কিন্তু এই জীবটিকে গরুড় বলছ কেন?

বাঃ! কী বলেন রানাজি? মুখিয়া বলল। গত বছরেও একবার গরুড় মহারাজের কৃপা হয়েছিল। সেবারও উনি কেল্লার মাঠে দর্শন দিয়েছিলেন। দু ঘণ্টা ছিলেন। তারপর উড়ে গেলেন। অন্য একজন বলল— সেবার তিনি আরও বড়ো হয়ে দর্শন দিয়েছিলেন। এবার উনি যে এত ছোটো চেহারায় দর্শন দিয়েছেন, তার কারণ আমাদেরই কেউ পাপ করেছে।

মুখিয়া গর্জন করে বলল—কে কী পাপ করেছ, এখনই মহারাজের সামনে কবুল করো।

এক বুড়ি কাঁদতে কাঁদতে বলল— হাঁ মহারাজ! ধনসিংয়ের ছাগলটা এমনি এমনি পাহাড় থেকে পড়ে মরেনি। আমি পাথর ছুঁড়ে তাড়া করেছিলুম। ছাগলটা ঢুঁ মেরে আমার গাগরি ভেঙে দিয়েছিল। গাগরিতে জল ছিল মহারাজ! তখন শুখার মাস!

মুখিয়া এখানেই পঞ্চায়েত ডাকার হুকুম দেয় আর কী! রাজকুমারের ইশারায় গার্ড দুজন বন্দুক উঠিয়ে তাদের হটিয়ে দিল। লোকগুলো বন্দুককে খুব পায় মনে হচ্ছিল। কোলাহল করতে করতে তারা গ্রামের দিকে চলে গেল। রাজকুমার বলল— বোঝা যাচ্ছে এ কোনো বিরল প্রজাতির পাখি। অরিন্থোলজি (পক্ষিতত্ত্ব) এর খোঁজ রাখে না। যাইহোক, আমরা একে আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেছি।

তাঁবুর ভেতর গরুড়জি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর কোনায় রাখা বিস্কুটের টিনের দিকে নজর যেতেই চঞ্চুতে কামড়ে তুলে নিলেন এবং পায়ের নখ দিয়ে ঢাকনা খুলে বিস্কুটগুলো সাবাড় করতে থাকলেন।

আমাদের উটওয়ালারা ভোরবেলা নদীর ওপারে কাঁটাবনে উঠ চরাতে গিয়েছিল। কীভাবে খবর পেয়ে উটগুলো চরতে দিয়ে ওরা দৌড়ে এল ক্যাম্পে। তারপর গরুড় মহারাজকে দর্শন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করল। তার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ও শর্মাজি হন্তদন্ত ফিরে এলেন।

শর্মাজি যে জিনিসটাকে গুপ্তচর সাব্যস্ত করেছিলেন, তা থেকে এই 'রামগরুড়ের ছানা' বেরুতে দেখে থ বনে গেলেন। তারপর নিরাপদ দূরত্বে পরীক্ষা করার পর হতাশভাবে বললেন— প্রাণী বিজ্ঞানে এমন কোনো জীবের কথা নেই। তাছাড়া ডিমের খোলাটা সিলিকন পাত দিয়ে তৈরি, এও বিস্ময়কর। কারণ সিলিকন প্রকৃতিতে এমন বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া অসম্ভব। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কর্নেল!

কর্নেল একটু করে এগিয়ে খাটের কোনায় চলে গেলেন। গরুড়জির বিস্কুট খাবার শেষ হয়ে গেছে। এখন জেলির টিন খুলে চঞ্চু ডুবিয়েছেন। চটচটে আঠালো লালরঙের খাদ্যটা ওঁকে একটু বিপাকে ফেলেছে। কর্নেলকে কাছে দেখে তাঁর সাদা একরাশ দাড়িতে হঠাৎ প্রকাণ্ড চঞ্চু ঘষে নিলে। সাদা দাড়ি লাল হয়ে গেল জেলির রঙে। আমরা হাসতে থাকলুম। কর্নেল একটুও বিব্রত না হয়ে গরুড়জির কাঁধে হাত রাখলেন। মহারাজ আপত্তি করলেন না। তখন কর্নেল ওঁকে কাছে টেনে ওঁর মুখে জেলি পুরে দিতে থাকলেন।

একটু পরে কর্নেল বললেন— ড. শর্মা! ডিমের খোলা সিলিকনের। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, আমার মনে হচ্ছে এই পাখির শরীরটাও সম্ভবত কোনো জৈব পদার্থে গড়ে ওঠেনি।

শর্মাজি চমকে উঠে বললেন— বলেন কী!

— হ্যাঁ মনে হচ্ছে, এর শরীরও কোনো ধাতু দিয়ে গড়া!

—অসম্ভব! বলে শর্মাজি হাত বাড়িয়ে পরীক্ষা করতে গেলেন। তখননি 'ব্লিক ব্লিক' শব্দ করে গরুড়জি চঞ্চুর ঠোক্কর মারতে এলেন তাঁকে। শর্মাজি আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেলেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন— কোনো কারণে আপনাকে পছন্দ করছে না!

শর্মাজি বললেন—ভূতের বাচ্চা কোথাকার! যাই হোক, ওটা নরম না কঠিন?

— কোথাও কোথাও নরম, আবার কোথাও কঠিন।

— ডাকটা শুনছেন ব্যাটাচ্ছেলের? ব্লিক ব্লিক! যেন রেডিয়ো ওয়েভ!

— সেটাও আশ্চর্য! শুনুন! যেন কোড ল্যাংগুয়েজ। ব্লিক ব্লিক... ব্লিক ব্লিক ব্লিক...ব্লিক!

শর্মাজি গোমড়ামুখে বললেন—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নচ্ছার পাখিটা এবেলার প্রোগ্রাম ভেস্তে দিল। পাঁচটা দিন তো প্রাথমিক প্রস্তুতিতেই কেটে গেল। হাতে আর মাত্র দুটো দিন! দেখি, কী করা যায়।

বলে উনি নিজেদের তাঁবুতে চলে গেলেন। আমি সাহস করে গরুড়জির কাছে গেলুম। কিন্তু যেই ছুঁতে হাত বাড়িয়েছি, গরুড়জি আমাকেও শর্মাজির মতো চঞ্চু তুলে তেড়ে এলেন। ঝটপট সরে গিয়ে বললুম— কর্নেল! আপনাকে তো কিছু বলছে না। দিব্যি আদর খাচ্ছে চুপচাপ।

কর্নেল হাসলেন শুধু। রাজকুমার বলল—আমাকে পছন্দ করে কিনা দেখা যাক। বলে সে যেই এগিয়েছে, গরুড়জি জোরালো ব্লিক ব্লিক আওয়াজ দিয়ে তেড়ে এলেন। রাজকুমার হাসতে হাসতে সরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল তিনফুট উঁচু গরুড় মহারাজকে দুহাতে তুলে নিয়ে বললেন— শ্রীমানকে স্নান করানো দরকার। চলো জয়ন্ত, নদীতে যাই। ফিরে এসে ডিমের খোলাটা প্যাক করে রাখতে হবে।

রাজকুমার শর্মাজির তাঁবুতে গেছে। আমরা দুজনে চললুম নদীর দিকে। দেখলুম, স্নানে মহারাজের আপত্তি নেই। জল ছিটিয়ে কর্নেল তাকে স্নান করালেন। তারপর একটা পাথরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন— রোদ্দুরে শুকিয়ে নাও মাস্টার ব্লিক! ততক্ষণ আমি প্রকৃতিদর্শন করি। বলে বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন।

পঙ্গপাল রহস্যের সূত্রপাত

পঙ্গপালের প্রজননক্ষেত্র অনুসন্ধান কর্মসূচির (ইংরেজিতে সংক্ষেপে L B F I P) মেয়াদ আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। এদিকে মাস্টার ব্লিক মাত্র দুদিনের বয়সেই পেল্লায় হয়ে উঠেছেন। মাথাটি তাঁবুতে ঠেকছে। দুদিকের চোয়াল থেকে গজানো লাল শুঁড় দুটো ফুটদুয়েক লম্বা হয়ে ঝুলছে। দাড়ি নাকি?

তার খাদ্য নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। শর্মাজি বিরক্ত! তবে কর্নেল ভেড়ার মাংস সেদ্ধ খাইয়ে দেখেছেন, আপত্তি করে না মাস্টার ব্লিক। প্রজনন ক্ষেত্রের খোঁজে বেরুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। এ অঞ্চলের পাহাড়ি খাদকে বলে বেহড়। বেহড়ের ভেতর আবিষ্কৃত প্রজননক্ষেত্রের মাটি পরীক্ষা করার পর যেখানে-সেখানে ওই রকম মাটি আছে, সেখানে যাচ্ছেন ওঁরা। কিন্তু পঙ্গপালের টিকিটিও দেখতে পাচ্ছেন না কোথাও।

একদিন রাজকুমার ও আমি সঙ্গী হলুম কর্নেলদের। মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক আওয়াজ দিতে দিতে মানুষের ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে কর্নেলের পাশে। কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে চলেছেন। এদিন একটা বেহড় থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠে বালিয়াড়িতে গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড উঁচু সব বালির পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিকে আর না এগিয়ে ডাইনে ঘুরতেই লুনি নদী চোখে পড়ল। নদীর পাড়ে পাথুরে মাটিতে শর্মাজির হাতের অনুসন্ধান যন্ত্রটি রাখতেই ব্লিক করে শব্দ হল। শর্মাজি উত্তেজিতভাবে বললেন— পাওয়া গেছে! রাজকুমার, স্প্রে মেশিনটা দেখি।

মাটিটা ওখানে ফেটে আছে। প্রকান্ড সব ফাটলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে রয়েছে দিনদুপুরেই। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে দূরে কেল্লাটা দেখছিলেন। রাজকুমার স্প্রে মেশিনটা শর্মাজিকে দিল। শর্মাজি যেই বিষাক্ত তরল পদার্থ স্প্রে করতে গেছেন ফাটলের ভেতরে, মাস্টার ব্লিক ঝাঁপিয়ে গেল তাঁর দিকে। স্প্রে ফেলে শর্মাজি মাই গড বলে ছিটকে সরে গেলেন। তাঁকে তাড়া করল মাস্টার ব্লিক। শর্মাজি চেঁচিয়ে উঠলেন— কর্নেল! আপনার বাঁদরটাকে সামলান! এ কী!

'বাঁদর' রাজকুমার আমার দিকেও তেড়ে এল। আমরা দৌড়ে তফাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে ধমক দিলেন— কি হচ্ছে মাস্টার ব্লিক? এমন করছ কেন?

মাস্টার ব্লিক বলল— ব্লিক ব্লিক ব্লিক... ব্লিক... ব্লিক... ব্লিক...ব্লিক!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন তার দিকে! তার শুঁড়দুটো টানটান হয়ে খাড়া। যেন এরিয়েল বা অ্যান্টেনা। ক্রমাগত ব্লিক ব্লিক আওয়াজ করছে সে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন— চলো ডার্লিং! তোমাকে তাঁবুতে রেখে আসি। রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করে কাজ নেই। জয়ন্ত, তোমরা অপেক্ষা করো। আমি এখুনি আসছি।

কর্নেল মাস্টার ব্লিককে নিয়ে বেহড়ের পথে নেমে যাওয়ার পর শর্মাজি গোমড়ামুখে ফাটলগুলোর কাছে এলেন। তারপর বললেন— কোনো কাজ হচ্ছে না! কর্নেলের সায়েবকে গভর্নমেন্ট যে কাজে সাহায্য করতে পাঠালেন, ওঁর সে দিকে মন নেই। কাজটা যখন আমাদের দ্বারাই হবে, তখন আর কেন ওঁকে পাঠানো? নাও রাজকুমার। তুমি পাম্প করো, আমি স্প্রে করি।

রাজকুমার স্প্রে মেসিনে বার কতক পাম্প করেছেন এবং শর্মাজি নলটা ফাটলে ঢুকিয়েছেন, অমনি ফাটলের ভেতর থেকে চাপা শিসের শব্দ শোনা গেল। শর্মাজি চমকে উঠলেন। রাজকুমারও থেমে গেল। তারপরে শিসের শব্দটা বাড়তে বাড়তে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যা ঘটল, তা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণেরই মতো। ফাটলগুলো দিয়ে শনশন আওয়াজ করে বেরুতে থাকল পঙ্গপালের ঝাঁক। মুহূর্তে আমরা ঢাকা পড়ে গেলুম। কোটি কোটি—অসংখ্য পঙ্গপাল শনশন শব্দে—এবং সেই তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ তো আছেই, চারপাশ ওপর-নিচ কালো করে আমাদের কবরে দেবার উপক্রম করল। শর্মাজি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—পালাও! পালাও! এবার তিনি পাগলের মতো মাথা-মুখ ঝাড়তে ঝাড়তে দিশেহারা হয়ে দৌড়োলেন। আমরাও দিশেহারা হয়ে দৌড় দিলুম। কিছুদূর যাওয়ার পর রেহাই পাওয়া গেল। শর্মাজি তখনও দৌড়োচ্ছেন। সেই ফাটলগুলোর ওপর যেন কালো মেঘ শনশন করছে— আর সেই শিসের শব্দ।

ক্যাম্পের একটু আগে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেছেন। মাস্টার ব্লিক ওদিকে তাকিয়ে ব্লিক ব্লিক করছে। তাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। শর্মাজি এলে কর্নেল বললেন—ভারি অদ্ভুত তো!

শর্মাজি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন— অর্থপেডেইরা গোত্রের পঙ্গপাল এগুলো। এই দেখুন একটা ধরে এনেছি। প্রজাতি হল সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া। ডেজার্ট লোকাস্ট বলা হয়। কিন্তু এদের এমন অদ্ভুত আচরণের কথা জানা নেই।

কর্নেল ফড়িংটা ওঁর হাত থেকে নিয়ে বললেন— মাই গুডনেস! ড. শর্মা! দেখুন ভালো করে, এটার দেহে যেন কোনো জৈবিক পদার্থ নেই। ধাতব উপাদানে তৈরি বলে মনে হচ্ছে।

শর্মাজি পরীক্ষা করে বললেন— তাই তো দেখছি, কর্নেল। এই ঠ্যাংটা দেখুন। ভাঙা যাচ্ছে না। ইস্পাতের তারের মতো। দেখুন কেমন বেঁকে রইল। অথচ ভাঙল না। আরে! এটা দেখছি ইলেকট্রিক শক দিচ্ছে।

কর্নেল বললেন— এখনই বারমেরে রেডিয়ো মেসেজ পাঠান ড. শর্মা। কোনো বিশেষজ্ঞকে আসতে বলুন। এমন কাউকে পাঠাতে বলুন, যিনি একাধারে পদার্থবিদ, ধাতুবিজ্ঞানী এবং বিশেষ করে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সেও যাঁর জ্ঞানগম্যি আছে।

রাজকুমার বলল— অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কেন কর্নেল?

কর্নেল চিন্তিত মুখে বললেন— ডার্লিং! তুমি তো একজন বিজ্ঞানী। তুমি তো জানোই যে আমাদের এ ছোট্ট মরজগতের সবকিছুই মহাকাশ এবং সমগ্র গ্যালাক্সির সঙ্গে সম্পর্কিত। আলাদাভাবে বিচ্ছিন্ন করে কোনো জিনিস সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করব। পৃথিবীতে যে প্রাণ নিয়ে আমদের অস্তিত্ব, তারও মৌলিক উপাদান মহাকাশ থেকে মহাজাগতিক ধূলিকণার সঙ্গে একদা ভেসে এসেছিল—এমন কথাও বলছেন আধুনিক অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা। এ যুগে আমরা আর শুধু পৃথিবীর সন্তান নই। মহাজাগতিক এক বিশাল সংসারের অন্তর্ভুক্ত।...

মাস্টার ব্লিকের অন্তর্ধান

বিকেলের মধ্যেই হেলিকপ্টারে চেপে এলেন বিশেষজ্ঞমশাই। দেখলুম, কর্নেলের পূর্বপরিচিত তিনি। নাম পৃথ্বীজিৎ সিং। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। বারমেরে প্রতিরক্ষা দপ্তরের কাজে এসেছিলেন। খবর পেয়ে নিজেই উৎসাহী হয়ে চলে এসেছেন। হেলিকপ্টারটা তাঁকে রেখে চলে গেল। সঙ্গে অনেক যন্ত্রপাতি এনেছেন ড. সিং। ঘণ্টাখানেক ফড়িংটাকে পরীক্ষা করে বললেন— আপনারা এটাকে রোবট ভেবেছিলেন। তা নয়। ঝাঁকে ঝাঁকে এমন রোবট তৈরি করতে হলে ধনী দেশকেও ফতুর হতে হবে তিনদিনে। আসলে এটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তৈরি।

শর্মাজি বললেন— কী কাণ্ড! আমার মাথায় কথাটা একবার এসেছিল বটে!

— হ্যাঁ। ক্লোনিং আণবিক জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত জেনেটিক্স বা প্রজনন বিদ্যার একটি আধুনিক তত্ত্বমূলক প্রক্রিয়া। ড. সিং একটু হাসলেন। ড. শর্মা তো এসব জানেন। কর্নেলের কাছেও বিষয়টা আশাকরি অপরিচিত নয়। মনে আছে? দিল্লিতে গত বছর আপনি আমার সঙ্গে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন— আচ্ছা ড. সিং, ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তো একটিমাত্র জৈব কোষকে কৃত্রিম উপায়ে বিকাশ ঘটিয়ে প্রয়োজন সংখ্যক ক্রোমোজোমের জোড়াকে সাজিয়ে একটা ফর্মে আনা যায়।

— হ্যাঁ। তবে ব্যাপারটা তত্ত্বের আকারেই ছিল। অথচ এক্ষেত্রে দেখছি কোনো কুশলী মস্তিষ্ক সেই তত্ত্বকে বাস্তবে সফল করেছেন। কে এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী?

শর্মাজি বললেন— নিশ্চয় কোনো শত্রুদেশের বিজ্ঞানী তিনি। ভারতের শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল নামিয়ে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চক্রান্ত এটা। তিনি বিজ্ঞানী হলেও তাঁকে বলব ঘৃণ্য অমানুষ। তাঁর ফাঁসি হওয়া উচিত।

ড. সিং বললেন— তা তো উচিতই। কিন্তু তাঁর প্রতিভা অস্বীকার করা যায় না। সিস্টেসার্কা গ্রেগরিয়া প্রজাতির ফড়িংয়ের একটিমাত্র দেহকোষ থেকে তিনি ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় একটি ফড়িং সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এই ফড়িংটি অতিপ্রজননশীল। তার বংশধররাও তাই অতিপ্রজননশীল হয়েছে। আমার ভাবতে আতঙ্ক হয়, এভাবে হিটলারের একটিমাত্র দেহকোষ থেকে কত অসংখ্য হিটলার তৈরি করতে পারতেন— যদি এই বিজ্ঞানী সে সময় জার্মানিতে আবির্ভূত হতেন।

কর্নেল বললেন— এবার তাহলে আমাদের মাস্টার ব্লিককে নিয়ে আসি। তাকেও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে কি না দেখা যাক।

শীতের বিকেল দ্রুত পড়ে এসেছে। সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়েছে চারদিকে। আমরা শর্মাজির তাঁবুর সামনে বসে কথা শুনছিলুম। মাস্টার ব্লিক কর্নেলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। একটু পরে তাকে আমাদের তাঁবুর দিকে যেতে দেখেছি।

কর্নেল তাঁবুর সামনে গিয়ে ডাকলেন— মাস্টার ব্লিক! এসো ডার্লিং।

কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে ভেতরে গেলেন। তারপর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এদিকে-ওদিকে ঘুরে ডাকতে থাকলেন। কোনো সাড়া নেই ছোকরার। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন— এই তো ছিল! গেল কোথায় সে? তারপর বাইনোকুলারে চোখে রেখে চারদিকে তন্নতন্ন খুঁজলেন।

এইসময় সিহৌরার একদল মেয়ে নদীর থেকে আসছিল। তারা খুব উত্তেজিতভাবে আসছিল। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন— তোমরা কি গরুড় মহারাজকে দেখেছ?

তারা একসঙ্গে হইচই করে উঠল। একজন সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল— গরুড় মহারাজকে এইমাত্র আমরা নদীর ওপর দিয়ে উড়ে কেল্লার দিকে যেতে দেখলুম হুজুর! তবে তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখে আমরা পালিয়ে আসছি। জল ভরতে পারিনি। খালি গাগরি নিয়ে পালিয়ে অসছি হুজুর!

—কী ব্যাপার দেখেছ তোমরা!

—কেল্লার মধ্যে দানো থাকে, তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম আমরা। হলদে রঙের একটা 'এত্তা বড়া' মাকড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল, হুজুর!

কর্নেল বললেন, ব্যাপারটা দেখতে হয়। জয়ন্ত, যাবে নাকি?

আমি এগিয়ে গেলুম। রাজকুমার ও পৃথ্বীজিৎ সিংও ব্যস্তভাবে সঙ্গ ধরলেন। কী ভেবে রাজকুমার একজন বন্দুকধারী গার্ডকেও ডেকে নিল। আমরা দলবেঁধে লুনি নদীর দিকে ছুটে চললুম।

নদীর কাছে আমাদের উটওয়ালাদের সঙ্গে দেখা হল। তারা উটের পাল ডাকিয়ে ব্যস্তভাবে আসছিল। ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল— ওদিকে যাবেন না স্যার! কেল্লাবাড়িতে হলদে রঙের কী একটা দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছে। আমরা তাই এদের ডাকিয়ে নিয়ে আসছি।

কেল্লায় গিয়ে টর্চের আলোয় তন্নতন্ন খুঁজে কোনো জনপ্রাণীটি দেখা গেল না। 'এত্তা বড়া' মাকড়সা কিংবা কোনো হলদে রঙের জিনিসও না। তবে কর্নেল টর্চের আলো কেল্লার চত্বরে ফেলে একখানে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর সেদিনকার মতো পরীক্ষা করে বললেন— কয়েকটা লম্বা আঁচড়ের দাগ। কীসের দাগ?

কেল্লা থেকে নেমে সেই স্তম্ভটা পর্যন্ত আমরা গেলুম। সেইসময় আমি যেন কোথাও ব্লিক শুনলুম একবার। হয়তো কানের ভুল। তাই কথাটা বললুম না কর্নেলকে।

অনেকক্ষণ আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে আমরা ক্যাম্পে ফিরে চললুম।...

মধ্যরাতের প্রলয়কাণ্ড

ক্যাম্পে এ রাতে জরুরি কনফারেন্স। গরুড় মহারাজ ওরফে মাস্টার ব্লিকের সেই প্রজনন কথা অর্থাৎ ডিমের ভাঙা খোলস পরীক্ষা করে পৃথ্বীজিৎ সিং সিলিকনই সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর মতে, ওই কিম্ভূত বৃহৎ পক্ষীটিও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। সিলিকন ধাতু কম্পিউটার বা রোবোটের প্রধান উপাদান। জাপানে এ ধাতুর সাহায্যে অসম্ভব-অসম্ভব কাজ চালানোর উপযোগী যন্ত্র তৈরি সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগকে সিলিকন ধাতুর যুগই বলা হয়।

ড. সিংয়ের বক্তব্য শুনে কর্নেল বললেন— ইতিমধ্যে যদি ডিমগুলো ফুটে গরুড় পক্ষীর ছানা বেরিয়ে থাকে তো কেলেঙ্কারি!

রাজকুমার মুচকি হেসে বলল, খুড়োমশাইকে তাহলে বারমের থেকে পালিয়ে মাথা বাঁচাতে হবে।

শর্মাজি চটে গেলেন—বেশি বোকো না। তোমারও একই অবস্থা হবে। বলে আমার দিকে কটাক্ষ করলেন।—এই সাংবাদিক ভদ্রলোককেও হতচ্ছাড়া পাখিটা পছন্দ করে না দেখেছি।

কর্নেল এসব কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন—এবার বলুন ড. সিং, আপাতত ওই পঙ্গপালের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শিগগির একটা কিছু না করলে তো মার্চ-এপ্রিলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে কোথাও চাষিরা ফসল ঘরে তুলতে পারবে না। সব খেয়ে শেষ করে ফেলবে এই শক্তিশালী পঙ্গপাল।

পৃথ্বীজিৎ একটু ভেবে বললেন— প্রতিরক্ষা দফতরে কেমিক্যাল রিসার্চ সেন্টার থেকে সদ্য আবিষ্কৃত মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ RRO-27 পরীক্ষার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। প্রয়োগ করে দেখা যাক না কী হয়। তবে—

উনি গম্ভীরভাবে চুপ করলে কর্নেল বললেন— তবে!

— ফাটলগুলোর সঙ্গে যদি নদীর যোগাযোগ থাকে, জল বিষাক্ত হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ— এখন তত জল নেই নদীতে। কিন্তু আগামী বর্ষায় জলস্রোত এসে ফাটলে ঢুকবে।

শর্মাজি উত্তেজিতভাবে বললেন— পরের কথা পরে। আগে পঙ্গপাল নিধন।...

চিন্তাভাবনার মধ্যে কনফারেন্স শেষ হল রাত বারোটা নাগাদ। তারপর আমরা শুয়ে পড়লুম ক্যাম্পখাটে। সবে একটু তন্দ্রামতো এসেছে, বাইরে শনশন শব্দে ঘোর কেটে গেল। শব্দটা ঝড়ের বলে মনে হচ্ছিল। ডাকলুম— কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের নাক ডাকছিল। বন্ধ হয়ে গেল। বললেন— কী হয়েছে?

— ঝড় আসছে।

হুঁ, শীতের সময় আরবসাগর থেকে কচ্ছপ্রদেশ পেরিয়ে একটু আধটু ঝড়বৃষ্টি এ তল্লাটে এসে থাকে শুনেছি। তোমার চিন্তার কারণ নেই। ক্যাম্পের খুঁটি যথেষ্ট মজবুত।

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল এবং চাপা গুরুগুরু গর্জন শোনা গেল। গর্জনটা একটানা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে যে বহুদূরপ্রসারী চাপা গরগর আওয়াজ শোনা যায়, ঠিক তাই। তারপরই ঝড়টা এসে ক্যাম্পের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

তারপর কী একটা ঘটল যেন! তীব্র নীল বিদ্যুতের ঝলকানি, কান ফাটানো বজ্রগর্জন— পরক্ষণ দেখি খোলা আকাশের তলায় বসে আছি। ক্যাম্পখাটটা আমাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। — কর্নেল! কর্নেল! বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর ঝড়ের ধাক্কায় উবুড় হয়ে পড়ে গেলুম। টের পেলুম, ক্যাম্পখাট এবং তাঁবুর ভেতরকার সব জিনিসপত্র উড়ে বেরিয়ে গেল। মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। ওপরে প্রলয়কাণ্ড চলতে থাকল। সেই ব্যাপক গরগর চাপা গর্জন এখন আমার চারদিকে।

কিন্তু এই ভয়ংকর প্রলয়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ একটা শিসের শব্দ— যেমন শিসের শব্দ পঙ্গপালের ব্রিডিং গ্রাউন্ডে ফাটলের ভেতর শুনেছি, তার লক্ষগুণ বেশি জোরালো শব্দটা কানের ভেতর দিয়ে সুঁচের মতো মস্তিষ্কে ঢুকে যাচ্ছিল। অসহ্য লাগাতে দু কানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে পড়ে রইলুম।

পরে শুনলুম, এই সর্বনাশা ঝড়ের স্থিতিকাল ছিল মাত্র তিন মিনিট।

ঝড় থামলে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে ডাকলুম— কর্নেল! আপনি কোথায়?

কর্নেলের সাড়া পেলুম আমার পাশ থেকে। — আছি, জয়ন্ত! এবার উঠে পড়ো! ঝড় থেমে গেছে।

এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। চারদিকে কেমন একটা নীলচে রঙের আলো। অথচ আকাশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপক্ষের এক টুকরো চাঁদ লুনি নদীর ওপর দক্ষিণপূর্ব আকাশে ঝুলে আছে। আবহাওয়া শীতের বলে মনে হচ্ছে না— যেন গ্রীষ্মরাতের। ফলে গরম সোয়েটারের ভেতর দরদর করে ঘামছি।

মিনিট খানেকের মধ্যে নীলচে আভাটা মিলিয়ে গেল। তাপটাও কমতে কমতে আবার মরুভূমির শীতে এসে হাজির হল। কর্নেল টর্চ জ্বেলে শর্মাজিদের খুঁজছিলেন। দেখলুম, একে একে ওঁরা হামাগুড়ি দিতে দিতে দুপায়ে সোজা হচ্ছেন এতক্ষণে। ওদিকে উটওয়ালাদেরও কথাবার্তা শোনা গেল। লণ্ঠন জ্বলতে দেখলুম।

জেনারেটরটা নষ্ট হয়ে গেছে কোনো অজ্ঞাত কারণে। কিছুতেই আর সেটা চালু করা গেল না। পেট্রম্যাক্স বাতি জ্বালা হল। তারপর পেছনের পাথরের স্তূপে আটকে থাকা তাঁবু, ক্যাম্পখাট এবং জিনিসপত্র সবাই মিলে বয়ে আনলুম।

সিহৌরা থেকে কান্নাকাটি ও কোলাহলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে। আলো নিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল গ্রামবাসীরা। আমাদের ক্যাম্পগুলো আবার সাজিয়ে নিতে নিতে ভোর চারটে বেজে গেল। উত্তর থেকে এখন প্রচণ্ড হিম মরুবাতাস এসে হাড় কাঁপিয়ে তুলছে।

মাস্টার ব্লিকের খোঁজ মিলল

ক্যাম্পের সব যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। রেডিয়ো ট্রান্সমিশন অচল। ব্যাপারটা বিস্ময়কর। একালে ক্ষয়ক্ষতি লক্ষ্য করতে গিয়ে সবারই চোখে পড়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ বা বস্তুর কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু মানুষের তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট যা কিছু, তাকেই বিশৃঙ্খল করে গেছে ওই অদ্ভুত ঝড়। সিহৌরা গ্রামের ঘরগুলো পাথরের। বিশেষ ক্ষতি হয়নি। কিন্তু গৃহপালিত পশুরা অক্ষত নেই। অনেক মারা পড়েছে। অনেক পশু জখম হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, যে বুড়ি ধন সিং নামে একটা লোকের ছাগলের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, শুধু সে বেচারি মারা পড়েছে ঘর ধসে। ঢাকঢোল শিঙা কাঁসি বাজিয়ে গ্রামবাসীরা গরুড় মহারাজের পুজো দিচ্ছিল শ্মশান থেকে ফিরে।

শর্মাজি খুব ভয় পেয়ে গেছেন। ভোরবেলা স্নান করে চলে গিয়েছিলেন সিহৌরা গ্রামে মন্দিরে প্রণাম করতে। তারপর গ্রামবাসীর দলে ভিড়ে গেছেন। পৃথ্বীজিৎ সিং অচল রেডিয়ো ট্রান্সমিশন নিয়ে বসে গেছেন। তাঁকে সাহায্য করছে রাজকুমার।

কর্নেল আমাকে ডেকে নিয়ে নদী পেরিয়ে কেল্লার দিকে চললেন। পথে যেতে যেতে বললেন— তিনটে ব্যাপার লক্ষ্য করার মতো। এক : ঝড়টা ছিল শুকনো— বৃষ্টিহীন। অথচ এমন হওয়ার কথা নয়। দুই : ঝড়ের সময় প্রথমে চাপা গরগর শব্দ, তারপর তীক্ষ্ণ হুইসিলের শব্দ। তিন : ঝড়ের পর কিছুক্ষণ নীলচে আভা। আমি ওই সময় চাঁদের দিকেও লক্ষ্য করছিলুম। চাঁদটা পর্যন্ত নীলচে দেখাচ্ছিল।

ওঁকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, কাল সন্ধ্যায় কী একটা হলদে জিনিস দেখে উটগুলো ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া গ্রামের মেয়েরা নাকি কেল্লার ওপর দানোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল— দানোটা দাঁড়িয়ে ছিল হলদে রঙের মাকড়সার পিঠে।

কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন— মাকড়সা! প্রথমদিন বিকেলে ওখানে মাটির ওপর সূক্ষ্ম লম্বাটে আঁচড় দেখেছি আতশকাচের সাহায্যে। রাজকুমার বলছিল এ এলাকায় সরু মাকড়সাগুলো প্রকাণ্ড হয়। আঁচড়গুলো যদি মাকড়সার পায়ের হয়, তাহলে বলব, মাকড়সাটা একটা মোটরগাড়ির মতো বড়ো। কিন্তু গোলাকার।

আমার মাথার ভেতর ঝিলিক দিল একটা কথা। বললুম— কর্নেল। জিনিসটা স্পেসশিপ নয় তো?

কর্নেল হাসলেন।—ডার্লিং! স্পেসশিপ বলতে কি তুমি অন্য কোনো গ্যালাক্সির প্রাণীদের দিকে ইঙ্গিত করছ?

— কেন? অসম্ভব কীসে?

— অন্য গ্যালাক্সির চেয়ে আমাদের গ্যালাক্সিতেই এমন অসংখ্য রহস্য আছে জয়ন্ত, যা আমাদের চক্ষু ছানাবড়া করার পক্ষে যথেষ্ট। তাছাড়া এখনও এই গ্যালাক্সি ছাড়া অন্যত্র প্রাণ আছে কিনা আমরা জানি না। বৃথা কল্পনায় লাভ নেই। তার চেয়ে—

হঠাৎ থেমে উনি বাইনোকুলারে কী দেখতে থাকলেন কেল্লার দিকে। তারপর হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। জিজ্ঞেস করেও কোনো জবাব পেলুম না। কেল্লার কাছাকাছি পৌঁছে কানে এল ব্লিক ব্লিক শব্দ। চমকে উঠলুম। কর্নেল এখন দৌড়ুতে শুরু করেছেন। বুড়োর নাগাল পেতে আমার মতো জোয়ানের হাঁফ ধরে যাচ্ছিল।

কেল্লায় উঠে চত্বরে ঢুকেই দেখি, মাস্টার ব্লিক কাত হয়ে পড়ে আছে। কর্নেলকে দেখে সে ডানাদুটো নেড়ে কাতরভাবে ব্লিক ব্লিক করতে থাকল। কর্নেল তাকে দুহাতে তুলে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলেন। মাস্টার ব্লিক অনেক কষ্টে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলের বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে প্রকাণ্ড চঞ্চু ফাঁক করল। কর্নেল পকেটে হাত ভরে একগাদা বিস্কুট বের করে ওকে খাওয়াতে থাকলেন।

বললেন— ঠিক এমন কিছু অনুমান করেই বিস্কুটগুলো এনেছিলুম। জয়ন্ত আমার কোটের পকেটে জেলির টিন এনেছি। বের করে দাও।

তা করতে গেলে হতচ্ছাড়া ব্লিক চোখ ট্যারা করে তাকাল আমার দিকে। কিন্তু ওর চঞ্চুর ভেতর বিস্কুট। তাই ঠোক্কর মারবার চেষ্টা করল না। রাগ করে বললুম— আমাকে কেন দেখতে পারে না বলুন তো? অথচ ও যখন ডিমের ভেতর ছিল, তখন আমিই ওকে এতটা পথ বয়ে নিয়ে গেছি। নেমকহারাম কোথাকার!

কর্নেল একটু হেসে বললেন— ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় জন্ম হলেও মাস্টার ব্লিকের মধ্যে স্বাভাবিক জৈব সহজাত বোধ রয়েছে। মানবেতর জীবরা সেই বোধের সাহায্যে ঠিকই টের পায়, কে তাদের পছন্দ বা অপছন্দ করছে। তুমি নিশ্চয় ওকে অপছন্দ করো, ডার্লিং।

— ঠিক অপছন্দ নয়। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওর গায়ের গন্ধে।

— মাস্টার ব্লিক কাল রাতের ঝড়ে আহত হয়েছে। ওকে একটু আদর করো। দেখবে আর তোমাকে ঠোক্কর মারতে চাইবে না! নাও, জেলিটা খাইয়ে দাও ওকে।

ভয়ে ভয়ে কৌটো থেকে খানিকটা জেলি নিয়ে ওর চঞ্চুর ভেতর গুঁজে দিলুম। ডানায় ও লাল টুকটুকে চ্যাপটা মাথায় হাত বুলিয়েও দিলুম, কর্নেল ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে চত্বরে কী সব তদন্ত শুরু করলেন। কয়েক গ্রাস খেয়ে মাস্টার ব্লিক হঠাৎ এঁটো চঞ্চুটা আমার সোয়েটারে ঘষতে থাকল। জেলিতে মাখামাখি হয়ে গেল। ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললুম— তবে রে রামগরুড়ের ছানা!

মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক করে যেন হাসল। নড়বড়ে ঠ্যাংয়ে এবার টাল সামলে খাড়া হতে পারল সে। কর্নেল বললেন— জয়ন্ত, তোমার অনুমান আংশিক সত্যি হতেও পারে। যে হলদে রঙের মাকড়সার কথা আমরা শুনেছি এবং তুমি যাকে স্পেসশিপ বলেছ, সেটা সত্যিই স্পেসশিপ। এখানেই ওটা নেমেছিল। তবে অন্য গ্যালাক্সির নয়, এ আমি হলফ করে বলতে পারি যে সেই উড়ুক্কু গাড়িটি গত রাতে ইচ্ছে করেই আমাদের ক্যাম্পের ওপর ঝড়সৃষ্টি করে গেছে। সব রহস্য ওতেই কেন্দ্রীভূত।

— বলেন কী! কী করে বুঝলেন?

তথ্য থেকে ডিডাকশান করে। কর্নেল চুরুট ধরালেন। — কাল সন্ধ্যার মুখে উড়ুক্কু গাড়িটাকে এখানে গ্রামের মেয়েরা দেখেছিল। কিন্তু তার আগে কোনো ঝড় হয়নি।

মাস্টার ব্লিক নড়বড় করে হেঁটে প্রাকারের ধারে গেল। তারপর বারবার ব্লিক ব্লিক করে করে ডাকতে থাকল! কর্নেল এগিয়ে বললেন— কী হয়েছে মাস্টার ব্লিক?

বলে তিনি চোখে বাইনোকুলার রেখে পূর্ব-উত্তর দিকের মরুভূমির বালিয়াড়ি দেখতে থাকেন। একটু পরে অস্ফুটস্বরে বললেন— কাকে যেন দেখলুম বালিয়াড়ির আড়ালে।

বালিয়াড়ির মাথায় এখনও ধূসর কুয়াশা আলোয়ানের মতো জড়ানো রয়েছে। আমি কিছু দেখতে পেলাম না। ওদিকটা দিগন্ত অব্দি ধূসর হয়ে আছে— মাইলের পর মাইল বালির সমুদ্র। থর মরুভূমির দক্ষিণ অংশটা বেঁকে পুবে ঘুরে আবার দক্ষিণে পঞ্চাশ মাইল চওড়া একটা ফালির মতো এগিয়ে কচ্ছ প্রদেশের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। মানচিত্রেই দেখেছি এটা। ক্রমশ না কি আরও ছড়িয়ে যাচ্ছে মরুভূমি। প্রতিরোধের জন্য সরকার অজস্র প্রকল্প করেছেন। কচ্ছের অন্তর্গত রানের জলাভূমি এলাকা থেকে এই সিহোরা পর্যন্ত কোনো জনপদ নেই। কাজেই ওদিকে কোনো মানুষ বাস করে না। গাছপালা দূরের কথা একটা ঘাস পর্যন্ত গজায় না।

শুধু লুনি নদীর দুধারে কিছু সবুজের চিহ্ন। ক্ষয়াটে রুক্ষ গাছ আর কাঁটাগুল্ম গজায়। নদীটা গিয়ে রান জলাভূমিতে পড়েছে।

কর্নেল অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন— নাঃ। চোখের ভুল। চলো, ক্যাম্পে ফেরা যাক। মাস্টার ব্লিকের শুশ্রূষা করা দরকার। কাল রাতের ঝড়ে বেচারা ঘায়েল হয়ে পড়েছে।...

বন্দী অথবা অতিথি

মাস্টার ব্লিকের পুনরাবির্ভাবে শর্মাজি এত খচে গেলেন যে কিচেন ক্যাম্পে গিয়ে বসে রইলেন সারা বেলা। পৃথ্বীজিৎ তার কাছ ঘেঁষতে সাহস পেলেন না। একটু দূর থেকে দেখে রায় দিলেন— এও ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। তবে এটুকু বলা যায়, প্যাঁচা এবং ইগলের দেহকোষ মিশ্রণে এই বিদঘুটে পাখিটির উদ্ভব ঘটেছে। বিশেষ সংখ্যক ক্রোমোজোম জোড় সাজিয়ে একটা ফর্মে আনা হয়েছিল মিশ্রিত কোষটিকে। তারপর সিলিকনের পাত দিয়ে ডিম তৈরি করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সিহৌরাবাসীদের পুজোর ঘটায় আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। মাস্টার ব্লিককে বাইরে একটা খুঁটি পুঁতে ঠ্যাংয়ে নাইনলের দড়ি বেঁধে রাখতে হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবিতে আর তাকে ক্যাম্পের ভেতর ঢোকানো যায়নি। নির্বিকার ভঙ্গিতে 'গরুড় মহারাজ' পুজোর প্রসাদ খেয়ে চলেছেন। তারপর দুটো ভেড়াও বলি দেওয়া হল। আতঙ্কে দেখলুম, মাস্টার ব্লিক চঞ্চু এবং পায়ের সাহায্যে কাঁচা মাংস শকুনের মতো ভক্ষণ করছে। কর্নেল ওকে সেদ্ধ মাংস খাওয়াতেন। রাজকুমার অবাক হয়ে বলল— এরকম পেটুক কখনও দেখিনি। দুটো ভেড়া হজম করতে পারবে তো?

বিকেল নাগাদ পুজোর ধুমধাড়াক্কা শেষ হল। স্বস্তি পেয়ে ক্যাম্পে ঢুকে সবে একটু গড়াতে গেছি, বাইরে কর্নেলের চিৎকার শুনলুম— মাস্টার ব্লিক! মাস্টার ব্লিক!

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, নাইলনের মজবুত রশি ছিঁড়ে মাস্টার ব্লিক দৌড়ে চলেছে। কর্নেলও দৌড়ুচ্ছেন পেছনে পেছনে। তারপর ডানা মেলল পাখিটা। নদীর ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল কেল্লার দিকে। দুটো ভেড়া খেয়ে ওর গায়ে জোর ফিরে এসেছে। বেড়েও গেছে সন্দেহ নেই।

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন। তারপর ঘুরে ইশারা করলেন আমাকে যেতে। কাছে গেলে বললেন— কেল্লায় থাকার মতলব ওর। এসো তো দেখি, আবার ধরে আনতে পারি নাকি।

কেল্লার কাছাকাছি গিয়ে সকালের মতো ওর ব্লিক শুনতে পেলুম। চত্বরে পৌঁছে দেখলুম, ডানা খুঁটছে— একটা ঠ্যাং অন্য ঠ্যাংয়ের হাঁটুতে আঁকড়ানো। অবিকল বকের ভঙ্গিতে।

কর্নেল ডাকলেন— মাস্টার ব্লিক!

পাখিটা হঠাৎ হাঁটু ভাঁজ করে মুরগির মতো মাটিতে বসে পড়ল। তারপর চাপা হুইসিলের শব্দ শোনা গেল। কর্নেল চমকে উঠলেন— সর্বনাশ! আবার সেই ঝড় আসছে নাকি?

শনশন শব্দ হল। বিদ্যুৎগতিতে পূর্বদিক থেকে পাঁচিলের ওপর দিয়ে হলুদ রঙের বিশাল মাকড়সার মতো একটা জিনিস এসে চত্বরে আমাদের সামনেই নামল। মুহূর্তে বুঝলুম, এটা স্পেসশিপ— কর্নেলের বর্ণিত উড়ুক্কু গাড়ি। শিস ও শনশন শব্দ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওপরের ঢাকনাটা নিঃশব্দে খুলে ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল আপাদমস্তক আঁটা কালো পোশাকপরা একটা মূর্তি। তার চোখে কালো চশমা।

সে একলাফে নেমে আমাদের সামনে এসে ইশারা করল উড়ুক্কু গাড়িটাতে চাপতে। তার হাতে একটা পিস্তলের মতো জিনিস। নলের মুখ দিয়ে রংবেরংয়ের ঝিলিক বেরুচ্ছে।

কর্নেল আস্তে বললেন— চলো জয়ন্ত। বাধা দিলে লেসার পিস্তল ছুঁড়তে পারে।

রহস্যময় আগন্তুক হলুদ গোলাকার গাড়ির ওপর একটা বোতাম টিপতেই একটা সিঁড়ি নেমে এল নিঃশব্দে। আমরা উঠে গিয়ে ওপরকার সুড়ঙ্গের মতো দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকে গেলুম।

ভেতরে চারজন বসার মতো বৃত্তাকারে সাজানো আসন রয়েছে। আমরা বসলে লোকটা মাস্টার ব্লিককে তুলে নিয়ে এল। তাকে মেঝেয় চেপে বসিয়ে দিল। তারপর চশমা খুলে আমাদের দিকে ঘুরে একটু হেসে বলল— আদেশ পালনের জন্য ধন্যবাদ। এবার কোমরে সিটবেল্ট বেঁধে নিন। কর্নেল কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। কিন্তু তখন লোকটা আবার চশমা পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তারপর হিশ করে একটা শব্দ হল। তারপর শিস এবং শনশন আওয়াজ। পাশের ছোট্ট বৃত্তাকার জানালা দিয়ে দেখলুম আমরা আকাশে চলে এসেছি। অজ্ঞাত ভয়ে বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে।

মাত্র মিনিট তিনেক হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেষ বেলার আলোর নিচে সমুদ্রের মতো বিস্তীর্ণ জল চোখে পড়ল। তারপর আবার শিসের শব্দ, শনশন আওয়াজ— তারপর দেখি আমরা জলে নেমেছি। তরতর করে জল ছুঁয়ে ছুটে চলেছে একটা জলমাকড়সার মতো এই অদ্ভুত গাড়িটা। একটুও জল ছিটকে পড়ছে না। জলে দাগ কাটছে না। মনে হল, এটার যেন কোনো ওজনই নেই। তাই মাটিতে কোনো চিহ্ন খালিচোখে দেখা যায়নি। কর্নেলকে আতশকাচ ব্যবহার করতে হয়েছিল। ওজন নেই বলে মাকড়সার ঠ্যাঙের মতো আঁকশি বের করে মাটি আঁকড়ে ধরে থাকে।

সামনে সবুজ রেখা ফুটে উঠল। দ্বীপ সম্ভবত। বেলাভূমির বালির ওপর পিছলে উঠে পড়ল গাড়িটা। তারপর এগিয়ে চলল তেমনি তরতরিয়ে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম, গাড়িটার ঠ্যাং আছে মাকড়সার মতো। পথ বলতে কিছু নেই। চড়াইয়ে উঠে গেছে সমতল মাটি। দুধারে জংলা উঁচু সব গাছ। এখানে থেমে গেল গাড়ি। লোকটা বলল— আসুন গরিবের পর্ণকুটিরে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি বনের ভেতর একটা জীর্ণ পাথরের বাড়ি — দেখতে কেল্লার মতো। মাথার ওপর গাছপালা বলে আবছা আঁধার ছমছম করছে। লোকটার আঙুলের ডগায় আলো ফিট করা আছে। সেই আলোয় ওর পেছনে পেছনে হেঁটে চললুম। ওর কোলে মাস্টার ব্লিক চুপচাপ বসে আছে। ঠ্যাং ঝুলছে।

অপরাধীর শাস্তি মৃত্যু

জীর্ণ বাড়িটা পাথরের। ভেতরে ঢুকে এক জায়গায় নেমে লোকটা জুতোর ডগা দিয়ে কীসের ওপর চাপ দিল। টুং করে শব্দ হল কোথাও। তারপর দেখলুম, ঘরটা আলো হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে একটা রেলিংঘেরা চৌকোনা ইঁদারার মতো গর্ত রয়েছে। একটু পরে সেই গর্ত থেকে উঠে এল লিফট। লিফটের দরজা খুলে লোকটা বলল— আসুন।

লিফটে চেপে আমরা এবার যেখানে নামলুম, সেটা একটা সাজানো গোছানো সুন্দর হলঘর। উজ্জ্বল আলোয় ভরা। একদিকে বসার চেয়ার টেবিল, শোবার খাট, বইয়ের র‍্যাক অনেকগুলো। অন্যদিকটায় বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি, টিভি পর্দাসমন্বিত কম্পিউটার কয়েকটা, তার ওপাশে ল্যাবরেটরি। একটা লম্বা টেবিলের ওপর কাচের কফিন। কফিনের ভেতর একটা আস্ত মড়া। ভয়ে ভয়ে সেইদিকে তাকিয়ে আছি, লোকটা একটু হেসে বলল— ওটা মৃত মানুষ নয়। সম্পূর্ণ জীবিত। তবে অজ্ঞান অবস্থায় রাখা হয়েছে। আপনারা বসুন দয়া করে।

সে মাস্টার ব্লিককে দাঁড় করিয়ে আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল... যাও হে! কুটুম্বদের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করো। আর শুনুন, আপনাদের সেবার কোনো ত্রুটি হবে না। কিন্তু সাবধান, আসন ছেড়ে নড়বেন না। তাহলে আপনাদের বিপদ হবে। আমি আমার স্পাইডারশিপের ব্যবস্থা করে এখনই ফিরে আসছি।

স্পাইডারশিপ! মাকড়সাযান। ঠিক তাই বটে। গাড়িটার চাকা নেই। ঠ্যাং বাড়িয়ে ঠিক মাকড়সার মতো দৌড়ে যায় এবং জলের ওপর জলমাকড়সার মতোই বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যেতে

পারে। আবার আকাশেও রকেটের মতো অবিশ্বাস্য গতিতে উড়ে চলে। খেলোয়াড়দের ডিসকাস থ্রোয়িংয়ের মতো ব্যাপারটা।

কর্নেল গম্ভীর মুখে চারদিক লক্ষ্য করছিলেন। মাস্টার ব্লিক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও আর ব্লিক করছে না। কোথায় যেন খুবই চাপা শোঁ শোঁ শব্দ, মাঝে মাঝে ব্লিক ব্লিক, কখনও খুটখাট যান্ত্রিক শব্দ। বুঝতে পারছিলুম এক আধুনিক বিজ্ঞানীর গোপন আখড়ায় এসে পড়েছি।

ব্লিক...ঠুং ... খুটখুট শব্দ। তারপর দেখি ওপাশের দরজা খুলে গেল এবং একটা আস্ত খুদে রোবট গদাইলস্করি চালে হেঁটে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার বুকে ছোট্ট টিভি পর্দায় নীল-লাল রেখা কাঁপতে কাঁপতে ফুটে উঠল : 'পেটের নীল বোতাম ছুঁলে কফি, লাল বোতাম ছুঁলে চায়ের লিকার। চিনি এবং দুধের প্যাকেট আমার বাঁ পকেটে।'

বলা বাহুল্য, সবই ইংরেজিতে লেখা। কর্নেল নীল বোতাম ছুঁতেই তার তলপেটের নীচে একটা ট্রে বেরিয়ে এল। তাতে একটা পেপার কাপ ভর্তি কফির লিকার। কর্নেল আবার বোতাম ছুঁলেন। আরেক কাপ কপি ট্রেতে পড়ল ঠকাস করে। তারপর রোবটের পকেট থেকে দুটো ছোট্ট দুধ আর দুটো চিনির কিউব ভরা প্যাকেটে তুলে নিলেন। একটু হেসে বললেন— মাস্টার ব্লিক, তোমার খাদ্য আমার পকেটে আছে। দিচ্ছি।

রোবটের বুকের পর্দায় ফুটে উঠল লাল হরফে : 'শাস্তিস্বরূপ পাখিটাকে কিছু খেতে দেওয়া হবে না।'

রোবটটা চলে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন— মাস্টার ব্লিক, আমি নাচার ডার্লিং!

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল বিরসবদনে। একটু পরে সেই লোকটাই ফিরে এসে টেবিলের সামনের আসনে বসল। তারপর কালো চশমা খুলে একটু হেসে বলল— আশাকরি কোনো অসুবিধে হয়নি?

কর্নেল বললেন— না। কিন্তু আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে মাননীয় গৃহকর্তার পরিচয় কী?

— আমি একজন বিজ্ঞানী।

নিশ্চয় তাই। কিন্তু তার বাইরেও আপনার একটা পরিচয় আছে!

— তার আগে কি আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না কেন আপনাদের নিয়ে এলুম?

— করছে। কিন্তু প্রথমে জানতে ইচ্ছে করছে আমরা কোথায় আছি?

— কচ্ছের রান জলাভূমির এক দুর্গম দ্বীপে। লোকটা একটু হাসল আবার।

— আপনাদের নিয়ে আসার কারণ, আপনারা একটা ডিম চুরি করেছিলেন!

কর্নেল আপত্তি করলেন— চুরি কেন? ডিমটা আমরা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম সিহৌরা কেল্লার কাছে।

— কিন্তু একথা নিশ্চয় জানেন, না বলে অন্যের জিনিস নিলে সেটাই চুরি?

— আসলে আমরা ওটা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু ভেবেছিলুম!

লোকটা চটে গেল। — প্রাকৃতিক বস্তুর জিনিস? বাজে কথা বলবেন না। কর্নেল বিনীতভাবে বললেন— অজ্ঞতার জন্য এ অপরাধ করে ফেলেছি। ক্ষমা চাইছি।

লোকটার মুখে গর্ব ফুটে উঠল। — যাই হোক, আমার দ্বিতীয় পরীক্ষাও সফল হয়েছে। পৌরাণিক গরুড়ের জন্ম সম্ভব হয়েছে। গতবছর যে গরুড় পাখির উদ্ভব ঘটেছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে কসমিক ঝড়ের তাণ্ডবে সে মারা পড়েছিল। এবার—

কর্নেল চমকে উঠে দ্রুত বললেন— পৃথিবীতে কসমিক ঝড়? সে তো মহাকাশের ঘটনা।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল— হ্যাঁ। সূর্যের কেন্দ্রে ওই ঝড় কোথা থেকে এসে ধাক্কা মারে। সূর্যের আয়তন বেড়ে যায়। কিন্তু গত একটা বছর ধরে লক্ষ্য করছি, এক বর্গমাইল আয়তনের একটা কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আগের রাতেও ঝড়টা এসেছিল। তাই

আমি এই দ্বিতীয় গরুড় পাখিটির জন্য খুব উদ্বিগ্ন ছিলুম। তবে এ যে বেঁচে আছে, তার প্রমাণ অবশ্য পাচ্ছিলুম। এর জন্মের আগে থেকে ভ্রূণকোষে ধ্বনিসংকেত পাঠানোর ব্যবস্থা করা ছিল এবারে।

— হুঁ, ওই ব্লিক ব্লিক ডাকটা।

— ঠিক ধরেছেন। আপনাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে।

— ওই শুনেই ওর নাম রেখেছি মাস্টার ব্লিক।

লোকটা হাসতে লাগল—আপনি মশাই বড়ো রসিক দেখছি। মাস্টার ব্লিক!

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন— কিন্তু কেন কসমিক ঝড় এসে পৃথিবীতে আঘাত হানছে — এবং বেছে-বেছে ঠিক সিহৌরা এলাকায়? এ সম্পর্কে কি কিছু ভেবে দেখেছেন? আমাদের লোকাস্ট প্রজেক্টের ক্যাম্পে সব যন্ত্রপাতি অচল করে দিয়েছে ওই ঝড়। তাছাড়া তীক্ষ্ণ হুইসিল আর একটা নীল আভা!

লোকটা গুম হয়ে কী ভাবল। তারপর বলল— আপনি লক্ষ্য করেছেন তাহলে। ঝড়টা মাঝে মাঝে এই দ্বীপেও হানা দেয়। ভাগ্যিস মাটির তলায় এবং বিশেষ নিরোধক ব্যবস্থা থাকায় আমার ল্যাবোরেটরি এখনও অক্ষত রয়েছে। এটা আসলে ষোলো শতকে তৈরি পোর্তুগিজ জলদস্যুদের ঘাঁটি। মাটির তলায় এই ঘরটায় ওরা আরবসাগর থেকে বাণিজ্য জাহাজ লুঠ করে এনে সব দামি জিনিস লুকিয়ে রাখত।

কর্নেল হঠাৎ বললেন— আপনি জেনেটিক্স বিজ্ঞানী। ক্লোনিংতত্ত্বকে বাস্তবে সফল করতে পেরেছেন। তার প্রমাণ লুনি নদীর ধারে বেহড় এলাকায় ফাটলের ভেতর ওই পঙ্গপাল! আরও প্রমাণ এই মাস্টার ব্লিক। কিন্তু কেন আপনি গোপনে গোপনে এসব করছেন?

— কেন? বিজ্ঞানীর চোখদুটো জ্বলে উঠল। —আপনাদের আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। মৃত্যুর আগে সব কথা জেনে যেতে পারবেন।

শুনে আমার মাথার খুলির ভেতরটা শূন্য হয়ে গেল এবং একটা ঠান্ডা ঢিল গড়িয়ে গেল যেন। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম। কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন লোকটার দিকে।

সে নিষ্ঠুর মুখে আবার বলল— আর মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টা আপনাদের আয়ু। কারণ আমার আরও একটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ার সাফল্য আপনাদের দেখিয়ে তাক লাগাতে চাই। সেই বিস্ময় নিয়েই আপনাদের মৃত্যু হোক।...

ধ্বংসের পরিকল্পনা

লোকটা প্রতিভার বিজ্ঞানী। কিন্তু উন্মাদ বলে মনে হচ্ছিল তাকে। তার হাবভাবে ক্রমশ অপ্রকৃতিস্থ মানুষের আচরণ ফুটে বেরুচ্ছিল। সে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে চোখ কটমট করে আমাদের দিকে একবার তাকাল। তারপর চলে গেল কফিনটার কাছে। কাচের কফিনটার ঢাকনা খুলে সে ঝুঁকে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পাশের একটা প্রকাণ্ড কম্পিউটারের বোর্ডে আটকানো একটা স্প্রিংয়ের মতো কুণ্ডলী পাকানো তার টেনে কফিনের ভেতর ঢোকাল। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল না কী সে করছে। একটু পরে সে ঢাকনা খোলা রেখেই অন্য একটি কম্পিউটারের সামনে গেল। পর্দায় লাল-নীল আলোর রেখা জ্বলে উঠছে, নিভে যাচ্ছে। বিচিত্র আঁকিবুকি ফুটে উঠছে। সে খুব মন দিয়ে সেগুলো লক্ষ্য করতে থাকল।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। এই বৃদ্ধও কম প্রতিভাধর নন। বহু সাংঘাতিক বিপদের মুখে ওঁর বুদ্ধি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে অবাক হয়েছি। কিন্তু তাঁকেও এখন অসহায় মনে হচ্ছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখতে পাচ্ছিলুম। মাস্টার ব্লিক কখন থেকে ছবির মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চোয়াল থেকে বেরুনো শুঁড় দুটো খাড়া হয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা ফিরে এসে চেয়ারে বসল। ঘড়ি দেখে গম্ভীরভাবে বলল... আপনাদের মৃত্যুর ঘড়ি চালু করে দিয়ে এলুম। আর একাত্তর ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড বাকি।

কর্নেল শান্তভাবে বললেন— আপনার এ ক্লোনিংয়ের উদ্দেশ্য কী?

— প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল সৃজনমূলক। এখন ধ্বংসমূলক।

—আপনি কি কারুর ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন?

—অবশ্যই। আমাদের প্রতিশোধের পরিকল্পনা ত্রিমুখী। বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে এক শিট কাগজ বের করল। কলম টেনে নিল সুদৃশ্য কলমদানি থেকে। কাগজে আঁক কেটে বলল— এই দেখুন আমার ধ্বংসের অভিযান কী ভাবে শুরু হবে। প্রথম পয়েন্ট হল ডেজার্ট লোকাস্ট— মরু পঙ্গপাল। এদের কোনো পেস্টিসাইডস প্রয়োগ করেও মারা যাবে না। কারণ এদের শরীরে প্রতিরোধ শক্তি প্রচণ্ড। মার্চ-এপ্রিলের প্রথমে এরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের শস্যক্ষেত্রে গিয়ে হানা দেবে। খারিফ শস্য আর ঘরে উঠবে না। দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সরকারের উদ্বৃত্ত খাদ্যভাণ্ডার খালি হয়ে যাবে রিলিফের কাজে। তারপর আবার পঙ্গপালের ব্রিডিং এবং আরও শক্তিশালী পঙ্গপাল আগামী শরতকালে পূর্বভারতে গিয়ে হানা দেবে। একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। বিদেশের কাছে খাদ্যের জন্য হাত পাততে হবে।

নিষ্ঠুর হেসে আবার কাগজে আঁক কেটে বলল— এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট গরুড়পাখির অভিযান। এই পাখির নখের ভেতরে জৈব বিষের থলি রয়েছে। ঠিক একমাস বয়স হলে এ পাখির নখের ভেতরকার বিষের থলিদুটো ফেটে যাবে এবং যেদিকে উড়ে যাবে সে সেদিকেই বিষ ছড়িয়ে পড়বে বাতাসে। বিষের কণা মাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নেবে এক প্রজাতির সাংঘাতিক ভাইরাস। সেই ভাইরাস ব্যাপক রোগ ছড়াবে— যার কোনো ওষুধ এখনও অনাবিষ্কৃত।

এরপর কাগজে একটা গোল্লা আঁকল বিজ্ঞানী। বলল — এটা ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট একজন মানুষ। একজন জীবিত মানুষ থেকে— ওই যে দেখছেন কফিনে শুয়ে আছে- তার দেহকোষ থেকে— তৈরি হবে পৃথক প্রজাতির এক মানুষ, যার সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের যত মিল, অমিলও তত। এই কফিনের লোকটা এদেশের একজন ঝানু রাজনীতিক। তাকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি। জনসভায় গরম গরম বক্তৃতা করে এসে সে তার বাড়ির ছাদের ফুলবাগানে একলা বসে মদ্যপান করছিল। রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার।

খিকখিক করে হাসতে লাগল বিজ্ঞানী। কর্নেল বললেন— এই রাজনীতিকের দেহকোষ থেকে কি পৃথক প্রজাতির রাজনীতিক সৃষ্টি করতে চাইছেন?

— ঠিকই ধরেছেন। আপনি বুদ্ধিমান বলেই তো আপনার মৃত্যুর আগে ব্যাপারটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত মনে করেছি। আমার সৃষ্ট নতুন প্রজাতির রাজনীতিক মানুষ হবে সব স্বাভাবিক রাজনীতিকের এক মূর্তিমান সমবায়। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির পর যারা বেঁচে থাকবে, তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার জন্যই এমন একজন রাজনীতিওয়ালা দরকার কি না বলুন? আসলে যে প্রজাতির রাজনীতিওয়ালা পৃথিবীতে অগামী যুগে স্বাভাবিক নিয়মে আবিষ্কৃত হবে। আমি জেনেটিক্সের ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় তাদের একজন অগ্রগামীকে এখনই সৃষ্টি করতে চাই। কারণ নিউক্লিয়ার যুদ্ধের আগেই পৃথিবী থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে যাক— এই আমি চাই।

— মানুষের ওপর এত ক্রোধ কেন আপনার?

একটু চুপ করে থাকার পর লোকটা বলল— প্রথমে মানুষের ওপর ক্রোধ ছিল না, ছিল দেশের সরকারের ওপর। পরে ভেবে দেখলুম, মানুষই তো সরকার গড়ে কোথাও প্রকাশ্যে ভোট দিয়ে কোথাও নীরব সমর্থনে কিংবা নিষ্ক্রিয় নিরপেক্ষ থেকে। দেশের মানুষের যেমন প্রকৃতি, তাদের সরকারও হয় তেমন প্রকৃতির।

— সরকারের ওপর আপনি ক্রুদ্ধ কেন?

— তাহলে গোড়ার কথাটা বলতে হয়।

— বলুন। আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।

— আমি ছিলুম প্রতিরক্ষা গবেষণা দফতরের একজন সহকারী বিজ্ঞানী। রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলুম। সে আজ পনেরো বছর আগের কথা। আমি যার অধীনে কাজ করছিলুম, সেই লোকটার বিজ্ঞানে একটা ডক্টরেট ছিল বটে, আদতে সে ছিল হাড়ে হাড়ে একজন ব্যুরোক্রাট স্বভাবের লোক। অকর্মার ধাড়ি। এক মন্ত্রী আত্মীয়ের জোরে আমার মাথার ওপর বসেছিল। আমি রাসায়নিক যুদ্ধের প্রতিরোধ হিসেবে জেনেটিক্স নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম। ক্লোনিংতত্ত্বকে বাস্তবে সফল করার কথা ভাবছিলুম। বিভিন্ন প্রতিরোধস্বভাবী ভাইরাসের কোষ থেকে ক্লোনিং করে এক নতুন প্রজাতির ভাইরাস সৃষ্টি করতে পারলে রাসায়নিক যুদ্ধে শত্রুপক্ষের ব্যবহৃত বিষাক্ত পদার্থ তাকে দিয়ে হজম করানো যায়। আপনি নিশ্চয় খবরে পড়েছেন, সমুদ্রের জলে পেট্রল ট্যাংকার থেকে পেট্রল পড়ে জলদূষণ ঘটে এবং সেই পেট্রল নিঃশেষে খেয়ে ফেলে সমুদ্রকে দূষণমুক্ত করবে, এমন একরকম ভাইরাস আমেরিকার এক বাঙালি বিজ্ঞানী সৃষ্টি করেছেন?

— হ্যাঁ। পড়েছি।

— ঠিক তেমনি। কিন্তু আমার বস ভদ্রলোক আমার সমগ্র গবেষণা ও ফলাফল নিজের নামে প্রচার করলেন। আমি প্রতিবাদ করায় আমাকে সাসপেন্ড করলেন, তাই নয়— গুন্ডা দিয়ে শাসালেন যে যদি এ নিয়ে আমি হইচই করি, আমার প্রাণ যাবে। আমি জেদি মানুষ। প্রধানমন্ত্রীকে সব লিখে জানাব ঠিক করলুম। কিন্তু কীভাবে খবর পেয়ে শয়তানটা অন্য চক্রান্ত করল। আমি পাকিস্তান সরকারকে নাকি কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার রেজিস্ট্যান্স প্রজেক্টের মূল্যবান নথি পাচার করে দিয়েছি! আনি নাকি গুপ্তচর! বেগতিক দেখে অমি গা-ঢাকা দিলুম! কারণ আমি জানি, এই সাংঘাতিক অপরাধে আমার চরমদণ্ডও হতে পারে!

— কিন্তু আপনি সে অপরাধ করেননি।

— না। তারপর আমাকে না পেয়ে আমার বৃদ্ধ বাবা-মাকে ধরে নিয়ে গেল। আমাদের ঘরদোর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। তবু আমি ধরা দিলুম না। কারণ আমার গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য বাকি তখনও। তারপর গত পনেরোটা বছর ধরে আমি লড়াই করে গেছি বাকি কাজ শেষ করার জন্য। অর্থসংগ্রহ করেছি চম্বলের ডাকাতদের দলে ভিড়ে। ছদ্মবেশে ছদ্মনামে বিদেশে গেছি। কচ্ছ উপকূলের স্মাগলারদের সাহায্যে বিদেশি যন্ত্রপাতি আনিয়েছি। পোর্তুগিজ জলদস্যুদের এই গোপন ডেরার কথা আমি নানা সূত্রে জেছিলুম। আমার একটা গোপন গবেষণাগারের দরকার ছিল। পেয়ে গেলুম এখানে, তারপর—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন— আপনার বাবা-মা কি এখনও বন্দি?

গলার ভেতর বলল— না। দু বছর আগে তাঁরা জেলেই মারা গেছেন।

— আপনার জীবন আশ্চর্য রোমাঞ্চকর। আপনার কৃত্বিত্বও বিস্ময়কর। কর্নেল প্রশংসা করে বলতে থাকলেন। — বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় আপনার প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পাচ্ছি। ওই স্পাইডারশিপও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি!

— আমি ফ্লাইং সসারের অনুকরণে ওটা তৈরি করেছি। খেলায় ডিসকাস থ্রোয়িং নিশ্চয় দেখেছেন। এই গাড়িটা ডিসকাসের গড়নে তৈরি। তাই সামান্য স্পিড দিলে স্পিড বহুগুণ বেড়ে যায়। আকাশে, জলে বা স্থলে সমান বেগে ছুটতে পারে ছুঁড়ে মারা ডিসকাসের মতো।

— কিন্তু এবার আপনি কেন প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করছেন না? যদি বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনার পক্ষ থেকে গিয়ে সব কথা খুলে বলব।

হাত তুলে বলল— কোনো দরকার নেই। বাবা-মায়ের মৃত্যুর খবর যেদিন কাগজে পড়েছি, সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছি— আমি দেশটাকে ধ্বংস করে দেব। দেশটা গলেপচে গেছে। এর মৃত্যু হওয়া দরকার।

শ্বাস ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর— আসছি বলে লিফটের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে লিফটের দরজা খুলল এবং ভেতরে ঢুকে ফের সুইচ টিপল। লিফটা বিদ্যুৎগতিতে ওপরে উঠে গেল।...

ইন্দ্রনীলের আবির্ভাব

মাস্টার ব্লিক একটু আগে থেকে উশখুশ করছিল। এতক্ষণে দুবার ব্লিক ব্লিক করে উঠল। কর্নেল তার কাঁধে হাত রেখে বললেন— কী হয়েছে মাস্টার ব্লিক?

পাখিটা হঠাৎ ট্যাঙস ট্যাঙস করে এগিয়ে গেল। তারপর প্রথম কম্পিউটারের কাছে গিয়ে টিভি পর্দার দিকে তাকিয়ে ফের ব্লিক ব্লিক করতে থাকল। এবার পর্দার দিকে চোখ গেল আমাদের। কর্নেল বললেন— বুঝেছি! মাস্টার ব্লিক তার স্রষ্টাকে পর্দায় দেখতে পেয়েছিল।

পর্দায় আবছা জঙ্গলের দৃশ্য ফুটে উঠেছে এবং বিজ্ঞানীপ্রবরের আঙুলের ডগায় আলো জ্বলছে। সেই আলোতেই রাতের জঙ্গল একটু-একটু আভাসিত হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে? বুঝতে পারছি, ওপরকার জঙ্গল তথা দ্বীপের দৃশ্য এখানে বসেই দেখা যায় এবং বিজ্ঞানী লোকটা এভাবেই নজর রাখে, কেউ এ দ্বীপে এসে পড়েছে কিনা। সে ঢালু পথ ধরে বেলাভূমিতে নামল। তারপর জলের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁ হাতের তর্জনী তুলে কী ইশারা করতে থাকল। একটু পরে জল থেকে ভেসে উঠল সেই হলুদরঙের স্পাইডারশিপ। কর্নেল বললেন— বুঝতে পারছ জয়ন্ত? বাঁ-হাতের আঙুলে রিমোট কনট্রোল সিস্টেম রয়েছে। তার সাহায্যে গাড়িটা ডেকে আনলেন ভদ্রলোক।

রাগ করে বললুম— ভদ্রলোক বলবেন না। সিহৌরার লোকে ওকে দানা বলে। লোকটা সত্যি একটা দানো।

স্পাইডারশিপে ঢুকে গেল সে। তারপর মুহূর্তেই গাড়িটা জলমাকড়সার মতো বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হল অন্ধকারে।

হঠাৎ কর্নেল বললেন— আরে। এ আবার কে?

স্ক্রিনে আবছা কালো একটা মূর্তি ফুটে উঠেছে। মূর্তিটা পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে কেল্লাবাড়ির দিকে। একটু পরে ওপরকার ঘরের মেঝেয় তার সিল্যুট মূর্তি দেখা গেল। বুঝলুম, এই কম্পিউটারাইজড টিভির স্বয়ংচালিত অ্যান্টেনা সবরকম মুভিং অবজেক্টকে কেন্দ্র করে ছবি পাঠায়। মূর্তিটা বসে পড়েছে এবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পর্দা থেকে মূর্তিটা মুছে গেল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর লিফটের সুড়ঙ্গের কাছে গেলেন। তখনি ব্লিক খুট খুট শব্দে একটা রোবট কোত্থেকে এসে কর্নেলের কোট খামচে ধরল যান্ত্রিক হাতে। আমি আঁতকে উঠলুম। মাস্টার ব্লিক এসে রোবটটার পিঠে জোরে ঠোক্কর মারল। ঠনাত করে শব্দ হল। কর্নেল রোবটটাকে দেখছিলেন। হাত বাড়িয়ে তার মাথার দিকে আনতেই রোবটটা অন্য হাতে কর্নেলের হাতটা চেপে ধরল। কর্নেল বললেন— জয়ন্ত! জয়ন্ত! ওর মাথার লাল বোতামটা জোরে টিপে দাও।

দৌড়ে গিয়ে লাল বোতামে চাপ দিলুম। তখনি রোবটের দুটো হাত ঝুলে পড়ল। কর্নেল একটু হেসে বললেন— জাপানি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রোবট গার্ড। টোকিয়োর একটা কারখানায় এই প্রহরীরোবট গতবছর দেখে এসেছিলুম। ভাগ্যিস, কনট্রোলসিস্টেমটা জেনে নিয়েছিলুম। কাজে লাগল। যাইহোক, দেখি লিফটটা নামানো যায় নাকি।

বললুম— ওপরে গিয়ে চাবি এঁটে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে গেছে হয়তো।

— দেখা যাক। বলে কর্নেল খুঁটিয়ে সুড়ঙ্গের ফ্রেমটা লক্ষ্য করতে থাকলেন। এটা-ওটা টেপাটেপি করেও কোনো কাজ হল না।

তখন কর্নেল বললেন— নিশ্চয় কোনো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে কোথাও। একটা মাদার কনট্রোল সিস্টেম না থেকে পারে না। চলো তো, খুঁজে দেখি শিগগির।

খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হলুম দুজনে। মাস্টার ব্লিক নিষ্ক্রিয় রোবটটার গায়ে ঠোক্কর মারছে, কামড়ে ধরছে। হঠাৎ কর্নেল বললেন— নিশ্চয় সেটা ওর চেয়ারে বা টেবিলের কোথাও থাকা উচিত।

বলে টেবিলের কাছে গেলেন। খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে টেবিলের তলায় পয়ের কাছে একটা ছোট্ট বাকসো পেয়ে গেলেন। বাকসোটার সঙ্গে তার পরানো আছে একগুচ্ছের। টেবিলে রেখে সংকেত চিহ্ন দেখতে দেখতে একটা খুদে সুইচে চাপ দিলেন। ঘস করে একটা শব্দ হল। তারপর আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, লিফটটা নেমে এল। কর্নেল বললেন— আপাতত এখনই এখান থেকে বেরুনো দরকার।

লিফটে মাস্টার ব্লিককেও চাপানো হল। রোবটটা দাঁড়িয়েই রইল তেমনি। আমরা ওপরে উঠে গেলুম। লিফটের আলোয় দেখলুম সেই মূর্তিটা ওকজন মানুষের। পরনে শতচ্ছিন্ন পোশাক। ক্লান্ত চেহারা। চমকে উঠে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

আমাদের দেখে সে ভীষণ অবাক হয়ে গেছে সন্দেহ নেই। কর্নেল তার সামনে গিয়ে বলে উঠলেন— আপনি কি ইন্দ্রনীল রায়? মাথা নেড়ে একটু হাসবার চেষ্টা করল সে।

— শিগগির আমাদের সঙ্গে আসুন। জয়ন্ত, ওঁকে একটু সাহায্য করো। আমাদের এখনই কোথাও লুকিয়ে পড়া দরকার।

তিনজনে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে বেলাভূমিতে নামলুম। এখন দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে। আকাশে নক্ষত্র ঝিকমিক করছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। বেলাভূমি ধরে আমরা দূরের দিকে হেঁটে চললুম। সেইসময় কর্নেল বলে উঠলেন— ওই যাঃ। সেই টিভিটা বন্ধ করে আসা উচিত ছিল। ওটার স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টেনা আমাদের গতিবিধি দেখিয়ে দেবে।

বললুম— আমরা যদি না নড়াচড়া করে কোথাও বসে থাকি, তাহলে বোধ করি টিভি পর্দায় আমাদের ছবি ফুটে উঠবে না। আমি লক্ষ্য করেছি, ওই লোকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকছিল, তখনই পর্দায় কোনো ছবি উঠছিল না। মুভিং অবজেক্টের ছবিই ওতে ফোটে।

কর্নেল বললেন— শুধু মুভিং অবজেক্ট নয় জয়ন্ত। অবজেক্ট কোনো প্রাণীর হওয়া চাই। মাস্টার ব্লিক, সাবধান! এখনকার মতো নড়বে না। ব্লিক ব্লিক করবে না। কেমন?

মাস্টার ব্লিক বলল— ব্লিক!

— চুপ! কর্নেল থাপ্পড় তুলে বললেন। — স্পিকটি নট। তারপর তাকে কোলে তুলে নিলেন।

ডাইনে পাথরের স্তূপ আবছা নজরে আসছিল। আমরা সেদিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে ইন্দ্রনীল বলল— এটা কী পাখি?

কর্নেল বললেন— পৌরাণিক গরুড়পক্ষী। আর কথা নয়। নড়াচড়া নয়। এখানে চুপচাপ বসা যাক।

রহস্যময় নীল কুয়াশাবৃত্ত

মাথার ওপরে রাতের আকাশের নক্ষত্র ঢেকে একটা নীলচে রঙের বিশাল বৃত্ত নেমে আসতে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম— কর্নেল! কর্নেল! ওটা কী?

কর্নেল দেখে বললেন— মুখ গুঁজে থাকে সবাই। চোখ বন্ধ রাখো। সাবধান!

শনশন শব্দে তীক্ষ্ণ হুইসিল। তারপর চারদিক হালকা নীল আলোয় ভরে গেল। সেই সঙ্গে শুরু হল প্রলয় কাণ্ড। প্রচণ্ড ঝড় আমাদের ধাক্কা মেরে নিচের বেলাভূমিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের গায় ঝুঁকে আমরা বসে রইলুম।

কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন— মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার সিহৌরা গ্রামে দেখেছি মানুষের তৈরি যা কিছু জিনিসের ওপরই এই অদ্ভুত ঝড়ের হামলা। পালিত পশুও অবশ্য মারা পড়েছিল দেখেছি। সম্ভবত মানুষের সংসর্গে বাস করে বলে তাদের ওপরও হামলা হয়েছে। কিন্তু তত বেশি ক্ষতি করা যেন এ ঝড়ের উদ্দেশ্য নয়। জয়ন্ত, মহাজাগতিক কোনো বুদ্ধিমান সত্তা যেন কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই হামলা করছে।

বললুম— আমারও তাই মনে হচ্ছে! কিন্তু বেছে বেছে শুধু সিহৌরা এলাকা। আর রানের এই দ্বীপে কেন?

ইন্দ্রনীল বলল— এবার আমার কথা শুনুন। পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে হ্যাং গ্লাইডারে উড়ে আসতে হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় রাজস্থানের থর মরুভূমির আকাশে চলে গিয়েছিলুম। গ্লাইডারে কনট্রোল সিস্টেম ছিল। বাতাসের জোর কমলে আবার দক্ষিণে ঘুরিয়ে দিলুম গ্লাইডার। বেলা পড়ে এসেছিল। একসময় ম্যাপ এবং চার্ট মিলিয়ে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করে দেখি, আমি গুজরাটের দিকে চলেছি। তারপর অবিষ্কার করলুম কনট্রোল সিস্টেম অকেজো হয়ে গেছে। কিছুতেই গ্লাইডারর গতিপথ বদলাতে পারলুম না। ব্যাটারি পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আলো নিভে গেছে। অসহায় হয়ে ভেসে চলেছি আকাশে। যে কোনো মুহূর্তে আশঙ্কা করছি, পাহাড়ে ধাক্কা লেগে গুঁড়ো হয়ে যাব। হঠাৎই দেখি গ্লাইডার নেমে চলেছে। ডানা দুটো নব্বই ডিগ্রি বরাবর কাত হয়েছে। পালকের মতো নেমে পড়ল আমার হ্যাং গ্লাইডার। বেল্ট খুলে নেমে এলুম। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না। কম্পাসও অচল। তাই দিক নির্ণয়ের জন্য আকাশে ধ্রুবতারা খুঁজতে লাগলুম। তারপর অবাক হয়ে দেখি, আমার ওপর— একটু আগে যে নীল কুয়াশাবৃত্ত নেমে এসেছিল, ঠিক তেমনি একটা জিনিস ভেসে আছে। তারপর আমি ভীষণ চমকে গেলুম। বলতে পারেন, আমি একটা গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছি। বিশ্বাস করুন, আমার প্রতিটি কথা সত্য।

কর্নেল বললেন— না, না! বলুন আপনি!

— আমি দেখলুম যেন চুম্বকের টানে সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছি। একটুও ওজন নেই শরীরের। মাধ্যাকর্ষণ টের পাচ্ছি না। নীল কুয়াশাবৃত্তটার কাছাকাছি পৌঁছে টের পেলুম ওটা আমাকে যেন ঝুলন্ত অবস্থায় নিয়ে চলেছে। আঁতকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। যখন জ্ঞান হল, চোখ খুলে দেখি জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। অন্ধকার হলেও এটা জঙ্গল, তা বুঝতে পারছিলুম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর আশ্রয়ের খোঁজে হাঁটতে থাকলুম। কতবার আছাড় খেয়ে কাঁটায় পোশাক ছিঁড়ে ফালাফালা হল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লালবাতি উঁচুতে জ্বলে উঠে তক্ষুনি নিভে গেল। অনুমান করে সেই দিকে ওই ভাঙা বাড়িটায় হাজির হয়েছিলুম। তারপর আপনারা—

কর্নেল বললেন— চুপ।

পশ্চিমের জলাভূমিতে লাল নীল হলুদ আলোর বিন্দু পর্যায়ক্রমে জ্বলেত জ্বলতে কী একটা এগিয়ে আসছিল। সেটা তীরে এসে পৌঁছুলে দেখলুম স্পাইডারশিপ এতক্ষণে ফিরল। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন— বিজ্ঞানী ভদ্রলোক ফিরে এলেন। ল্যাবরেটরির দশা দেখে আশাকরি রাগের চোটে আরও পাগল হবেন। এসো জয়ন্ত, আসুন ইন্দ্রনীলবাবু! আড়াল থেকে ব্যাপারটা দেখা দরকার। সুড়ঙ্গপথ আমরা খুলে রেখেছিলুম। কাজেই মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড় ওঁর ল্যাবরেটরির সব যন্ত্র নিষ্ক্রিয় করে রেখে গেছে।

বেলাভূমির ধারে পাথরের আড়ালে আমরা চুপিচুপি এগিয়ে চললুম। স্পাইডারশিপটা মাকড়সার মতো দুদিকে ঠ্যাং বের করে তরতরিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা

ক্ষীণ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। সেই হালকা হলুদ আলোয় হলুদ রঙের স্পাইডারশিপকে থামতে দেখলুম জঙ্গলের ভেতরে। কর্নেল ফিশফিশ করে বললেন— জয়ন্ত, মাস্টার ব্লিককে ধরো, আশা করি আর তোমাকে ঠোকরাবে না।

শ্রীমান রামগরুড়ের ছানা আমার বুকে সেঁটে রইল। কর্নেল পা টিপে টিপে এগিয়ে চলেছেন। একটু পরে দেখি, উনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর ঝোপের আড়ালে গিয়ে ওত পেতে বসলেন। আমরাও একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে বসে আছি। চাঁদের আলোটা আবছা হলেও ওই জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীকে গাছপালার ভেতরে থেকে দৌড়ে বেরুতে দেখা গেল। স্পাইডারশিপের কাছে আসতেই কর্নেল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে বলল— কী ব্যাপার?

কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম— জয়ন্ত! তোমরা এখানে চলে এসো।

গিয়ে দেখি কর্নেল লোকটার পিঠে বসে আছেন। মাস্টার ব্লিক ব্লিক ব্লিক করতে করতে আমার কোল থেকে নেমে কর্নেলের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন— জয়ন্ত, ওখানে ওই কালো জিনিসটা পড়ে আছে। সাবধানে তুলে আমাকে দাও। ওটা লেসার পিস্তল।

মারাত্মক অস্ত্রটা কুড়িয়ে কর্নেলকে দিলাম। তখন কর্নেল ওর পিঠ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— মি. এক্স! এবার ভালোমানুষের মতো উঠে দাঁড়ান। দুঃখ করে লাভ নেই। যা বলছি, লক্ষ্মী ছেলের মতো শুনুন!

সে দুহাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। কর্নেল তাকে টেনে ওঠালেন! ফের বললেন— মি. এক্স। আমাদের সিহৌরা নিয়ে চলুন।

— আমি মি. এক্স নই। সজ্জন সিং রচপাল।

— মি. রচপাল! চলুন আমরা সিহৌরা যাই। আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ স্খালনের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সরকার যাতে আপনার বিস্ময়কর গবেষণায় সাহায্যে করেন, সে চেষ্টাও আমি করব। দেখলেন তো মি. রচপাল, আপনার ধ্বংস পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য যেন প্রকৃতিই পালটা ব্যবস্থা রেখেছেন? আপনি প্রতিভাধর বিজ্ঞানী। আপনি আশাকরি বুঝতে পেরেছেন, ঈশ্বর কিনা জানি না— তাকে আমি ঈশ্বরও বলব না— কী এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি এখনও যেন সারা সৃষ্টিকে নজরে রেখেছে। মহাজাগতিক চৌম্বকপ্রবাহ তারই এক প্রহরী হয়তো।

সজ্জন সিং রচপাল রুমালে চোখ মুছে বললেন— ও কে। এক মিনিট, স্পাইডারশিপের ইউরেনিয়াম জ্বালানি কতটুকু আছে দেখে নিই।

বলে স্পাইডারশিপের ওপরকার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর আমাদের বোকা বানিয়ে চোখের পলকে প্রকাণ্ড চাকতির মতো হলুদ মাকড়সা গাড়িটা সাঁই করে আকাশে উড়ে গেল।

তারপর ঘটল ভয়ংকর ঘটনা। আকাশে একটা প্রচণ্ড লাল আগুনের ভাটার মতো ওটা পাক খেতে থাকল। তারপর তীব্র সাদা আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। কর্নেল বললেন— সর্বনাশ! প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা ধরে গেল। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর আর কিছু দেখতে পেলুম না। তেমনি সোনালি জ্যোৎস্না বুকে নিয়ে আকাশ নির্বিকার। নক্ষত্র ঝিলমিল করছে। টুকরো চাঁদটাও তেমনি নিস্পন্দভাবে ঝুলে আছে। কোথাও রাতপাখি ডাকল।

মাস্টার ব্লিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ তিনবার ব্লিক করে ডেকে সে দৌড়ুনো শুরু করল জলের দিকে। কর্নেল চেঁচিয়ে তাকে ডাকলেন— মাস্টার ব্লিক! মাস্টার ব্লিক!

হতচ্ছাড়া পাখিটা জ্যোৎস্নাভরা আকাশে ডানা মেলে উড়ে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।...

উপসংহার

রান এলাকা পাকিস্তানের সীমান্তে। তাই দুর্গম জলাভূমি হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় প্রতিরক্ষা ঘাঁটি রয়েছে। দুদিন দুরাত্রি পরে প্রতিরক্ষা উপকূল বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার দৈবাৎ ওই এলাকায় গিয়ে আমাদের দেখতে পায়। আমরা তিনটি মানুষ তখন ক্ষুৎপীড়িত এবং দুর্বল। হেলিকপ্টারটি আমাদের সিহৌরা পৌঁছে দেয়। গিয়ে দেখি, বুদ্ধিমান পৃথ্বীজিৎ সিং সেই পঙ্গপালের আস্তানার ফাটলগুলোকে কংক্রিট দিয়ে সিল করে দিয়েছেন। শুধু ভাবনা ছিল রামগরুড়ের ছানাটার জন্য। তার দুপায়ের তলায় মারাত্মক বিষাক্ত ভাইরাসের থলি আছে। রান এলাকায় তার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে কর্নেল ইন্দ্রনীল ও আমাকে নিয়ে কলকাতা ফিরেছিলেন। কিছুদিন পরে কাগজে খবর বেরুল, রানের একটি দ্বীপে মাস্টার ব্লিককে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে থর মরুভূমির এক দুর্গম এলাকায় গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয়েছে।

আর মহাজাগতিক চৌম্বক ঝড়ের রহস্যমোচন হয়েছিল আরও দুমাস পরে। ভানুপ্রতাপের কেল্লার ওখানে সেই প্রাচীন স্তম্ভের কাছে খুঁড়ে মাটির তলায় শক্তিশালী চুম্বক পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি আরেকটি চুম্বক পাওয়া যায় সজ্জন সিং রচপালের ভূগর্ভস্থ ল্যাবরেটরিতে। সজ্জন সিং রচপাল সম্ভবত চুম্বকটি সিহৌরার ওই প্রাচীন অবজারভেটরি এলাকায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। দুটি চুম্বককে অজস্র টুকরো করে দেশের বিভিন্ন জায়গার জাদুঘরে রাখা হয়েছে। রাজনীতিক ভদ্রলোককে বাঁচানো যায়নি। তবে তাঁর বয়সও ছিল ৮২ বছর। শুধু ইন্দ্রনীলের ব্যাপারটা বোঝা যায় না। কর্নেলের মতে, মহাজাগতিক কোনো দুর্জ্ঞেয় শক্তি বেচারিকে নিয়ে একটু কৌতুক করেছিল। এ সেই ডোবার ব্যাং আর দুষ্টু ছেলেদের ঢিল ছোড়ার গল্পের মতো। ওদের কাছে যা খেলা, ব্যাংদের কাছে তা প্রাণান্তকর। পৃথিবীর মানুষ তো মহাজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙের চেয়ে অকিঞ্চিৎকর প্রাণী।

সে যাই হোক, মাস্টার ব্লিক অর্থাৎ সেই রামগরুড়ের ছানাটির জন্য এখনও আমার খুব দুঃখ হয়। ওর লাল মাথাটিতে যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি থাকত।...

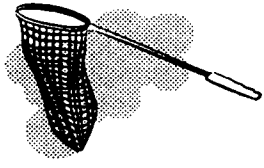

ধূমগড়ের পিশাচ রহস্য

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হাতে নস্যির কৌটো। হঠাৎ বলে উঠলেন, — অ্যাঃ! পিচাশ!

হাসি চেপে বললাম, — কথাটা পিশাচ হালদারমশাই!

উত্তেজিত হলেই ঢ্যাঙা গড়নের এই গোয়েন্দা ভদ্রলোক আরও ঢ্যাঙা হয়ে ওঠেন যেন। গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপে। বললেন, — মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে সার্ভিস করছি। অন্ধকারে বনবাদাড়ে শ্মশানেমশানে ঘুরছি। কখনও পিচাশ দেখি নাই। কর্নেলস্যার, দেখছেন নাকি?

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একটা গাবদা পুরোনো বই পড়ছিলেন। দাঁতের ফাঁকে আটকানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তাঁর চকচকে টাকের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে খেলা করছিল। ঋষিসুলভ সাদা দাড়িতে একটুকরো চুরুটের ছাই আটকে ছিল। মুখ তুলতেই তা খসে পড়ল। বললেন, — কী হালদারমশাই?

—পিচাশ!

— নাহ্। দেখিনি। তবে শুনেছি পিশাচ নাকি শ্মশানের আশেপাশে থাকে। মড়া খায়।

ধূমগড়ের পিচাশ ব্যাবাক একটা মড়া খাইয়া ফ্যালাইছে। — হালদারমশাই আবার একটিপ নস্যি নিলেন। উত্তেজনার সময় দেশোয়ালি ভাষায় কথা বলাও ওঁর অভ্যাস। বললেন : জয়ন্তবাবুগো পেপার না লিখলে কথা ছিল। ছয় লক্ষ সার্কুলেশন। তাই না জয়ন্তবাবু?

বললাম, — আজ রোববারে ছ লাখ। অন্যদিন চার লাখ। কিন্তু দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ওই খবরটা মোটেও এক্সক্লুসিভ নয়। নিউজ এজেন্সির পাঠানো খবর। কাজেই এ খবরকে গুরুত্ব দেওয়া ঠিক নয়। আসলে পাতা ভরানোর জন্য অনেক সময় বাজে খবরও ঢোকাতে হয়। আবার সাংবাদিকরাও মাঝে মাঝে রাজনীতির কচকচি থেকে পাঠকদের রিলিফ দিতে মজার-মজার খবর তৈরি করেন। বিশেষ করে আজ রোববার ছুটির দিন পাঠকদের একটু আনন্দ দেওয়া মন্দ কী?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন— জয়ন্তের কথায় কান দেবেন না হালদারমশাই! ধূমগড়ের শ্মশানে সত্যিই পিশাচের ডেরা আছে। পিশাচটা একটা মড়ার পেট চিরে নাড়িভুঁড়িও খেয়েছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি 'যাই গিয়া' বলে জোরে বেরিয়ে গেলেন।

বললাম, — সর্বনাশ! হালদারমশাই সত্যিই ধূমগড়ে গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছেন নাকি?

কর্নেল বললেন, — গেলে একটা রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। তুমিও ওঁর সঙ্গ ধরলে পারতে।

—কী আশ্চর্য! আপনি এই গাঁজাখুরি খবরে বিশ্বাস করেন?

—করি বইকী। বিশ্বপ্রকৃতিতে রহস্যের কোনো শেষ নেই ডার্লিং!

—কর্নেল! আপনি কী বলছেন? পিশাচ-টিশাচ মানুষের আদিম বিশ্বাস। কুসংস্কার মাত্র।

আমার বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ্ বন্ধু একটু হেসে বললেন, — তুমি ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! ক্রোম্যাগনন মানুষ এবং হোমো স্যাপিয়েন—স্যাপিয়েন অর্থাৎ আধুনিক মানুষের মধ্যেকার পর্যায়ে অবস্থা কী ছিল, এখনও বিশেষ জানা যায়নি। তাই মিসিং লিংক কথাটা বলা হয়। কে বলতে পারে পিশাচ সেই মিসিং লিংক নয়? বিশেষ করে ধূমগড় জায়গাটা আমি দেখেছি।

পাহাড় জঙ্গল নদী আর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রহস্যময় অনেক কিছুই থাকতে পারে। ওখানকার শ্মশানটাও ঐতিহাসিক।

কর্নেল বইটা টেবিলে রাখলেন। এতক্ষণে চোখে পড়ল, মলাটে সোনালি হরফে লেখা আছে : 'ধূমগড়ের রাজকাহিনি।' বললাম, — তা হলে বোঝা যাচ্ছে, পিশাচের গল্প এই বইটাতেও আছে।

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্। এটা ধূমগড়ের প্রাচীন রাজবংশের কাহিনি। ১৮৯০ সালে রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের লেখা পারিবারিক ইতিহাস।

—ব্যাপারটা সন্দেহজনক কিন্তু।

—কেন?

—কাগজে ধূমগড়ে পিশাচের খবর বেরুল, আর বইটাও আপনার হাতে চলে এল।

ষষ্ঠীচরণ আরেক দফা কফি আনল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, — বইটা আমার হাতে উড়ে আসেনি। গত মাসে ধূমগড় গিয়েছিলাম অর্কিডের খোঁজে। ওই সময় ওখানকার রাজাদের বংশধর রণজয় সিংহের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথায়-কথায় বংশের লম্বাচওড়া গল্প শোনালেন। গল্পগুলো যে সত্যি, তা প্রমাণের জন্য এই বইটা আমাকে পড়তে দিলেন। আমি উঠেছিলাম নদীর ধারে ফরেস্ট-বাংলোয়। সেখানে বিদ্যুৎ নেই। হ্যারিকেনের আলোয় বইটা পড়তে শুরু করলাম। সকালে ফেরত দেবার কথা ছিল। হঠাৎ রণজয় সিংহ রাতদুপুরে গিয়ে হাজির। ভেবেছিলাম পারিবারিক ইতিহাসের বইটা নিয়ে কেটে পড়েছি কিনা দেখতে এসেছেন। কিন্তু তা নয়। ভদ্রলোক চুপিচুপি একটা অদ্ভুত কথা বললেন। বইয়ের ভেতর একটা ধাঁধা আছে। ওটার জট ছাড়াতে পারলে আমাকে সাধ্যমতো পুরস্কৃত করবেন। ধাঁধাটা হল :

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা।।

কর্নেল কফিতে আবার চুমুক দিলেন। বললাম, — সেকেলে লোকেরা শুনেছি কথায়-কথায় ধাঁধা আওড়াতেন। কিন্তু এ ধাঁধাটা একেবারে গোলকধাঁধা।

আমি হেসে উঠলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, — কী বললে? কী বললে? গোলকধাঁধা?

—হ্যাঁ। গোলকধাঁধাই বলা চলে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। তারপর টেলিফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল করে সাড়া পেয়ে বললেন, — সঞ্জয়বাবু! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। আপনার জ্যাঠামশাই, ... চলে গেছেন? ... ঠিক আছে। রাখছি।

টেলিফোন রেখে উজ্জ্বল হেসে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললেন, — ব্রিলিয়ান্ট, ডার্লিং ব্রিলিয়ান্ট! এ বেলা আমার ঘরে তোমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন।

অবাক হয়ে বললাম— ব্যাপার কী? হঠাৎ আমার এত প্রশংসার কী হল?

একটি জটিল রহস্যের সমাধান তোমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। — বৃদ্ধ রহস্যভেদী বাকি কফিটুকু শেষ করে চুরুট ধরালেন। বললেন : আসলে অনেকসময় আমরা জানি না যে আমরা কী জানি। অবশ্য তফাত শুধু একটা ও-কারের। ও-কার জুড়লেই তো সব জল হয়ে গেল।

আরও অবাক হয়ে বললাম, — কী অদ্ভুত!

অদ্ভুত তো বটেই। — কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন : তবে এবার পিশাচটাকে খুঁজে বের করা দরকার। সেজন্যই ধূমগড়ে ছুটতে হবে। আমার ভয় হচ্ছে জয়ন্ত, হালদারমশাই পিশাচটার পাল্লায়

পড়লে আর জ্যান্ত ফিরে আসতে পারবেন না। কথাটা যদি দৈবাৎ কিছুক্ষণ আগে তোমার মুখ দিয়ে বেরুত!...

ও-কার রহস্য

রাত এগারোটা নাগাদ ট্রেন থেকে নেমে দেখি ছোট্ট স্টেশন। নিরিবিলি সুনসান চারদিক। আমি ভেবেছিলাম ধূমগড় নাম এবং রাজারাজড়ার রাজধানী ছিল যখন, তখন স্টেশনটা বেশ বড়োসড়োই হবে। কর্নেল আমার মনের খবর কী করে টের পেয়ে বললেন, — আমরা ওল্ড ধূমগড়ে নেমেছি। নিউ ধূমগড় পরের স্টেশন। দূরত্ব তিন কিলোমিটার। ওটা বড়ো স্টেশন।

বললাম,—তা হলে এখানে নামলেন কেন?

আমাদের টিকিট ওল্ড ধূমগড় অব্দি।

—কিন্তু এখানে তো লোকজন দোকানপাট দেখছি না। যানবাহনও চোখে পড়ছে না।

সেটাই তো সুবিধে। — বলে কর্নেল পা বাড়ালেন!

গেটে টিকিট নেওয়ারও লোক নেই। স্টেশনঘরের ভেতর স্টেশনমাস্টার একলা বসে টরে-টক্কা করছেন। উর্দিপরা এক রেলকর্মী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সম্ভবত আকাশের তারা গুনছিল। সে আমাদের কথা শুনতে পেয়ে হনহন করে এগিয়ে এল। ভেবেছিলাম টিকিট চাইবে। কিন্তু সে টিকিট চাইল না। চাপা স্বরে বলল,— এত্তা রাতমে আপলোগ টিশনকে বাহার মাত্ যাইয়ে সাব। খতরনাক হো যায়ে গা।

কর্নেল বললেন, — হাম শুনা ইধার এক পিশাচ নিকলা। সাচ?

—সাচ বাত সাব! দেখিয়ে না, ইয়ে টিসনমে কোই প্যাসিঞ্জার নেহি উতরা। সব আগলে টিসনমে উতরেগা।

—হামলোগ পিশাচ পাকাড়নে আয়া।

—তামাশা মাত কিজিয়ে সাব। মেরা বাত শুনিয়ে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, — গভমেন্ট হামকো পিশাচ পাকড়নেকে লিয়ে ভেজা। ইয়ে দেখো, ক্যায়সে হাম উনকো পাকড়ায়েগা!

কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক বের করে কর্নেল বেতাম টিপলেন। স্টিকের ডগায় সূক্ষ্ম সবুজ রঙের জাল ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ল। রেলকর্মী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কর্নেল জাল গুটিয়ে স্টিক কিটব্যাগে গুঁজে গেট দিয়ে বেরুলেন।

স্টেশনের পেছনে একটা খাঁ-খাঁ চত্বর। তার ওধারে সংকীর্ণ একটা পিচের রাস্তা অব্দি আলো পৌঁছেছে। তারপর গাঢ় অন্ধকার। কর্নেল টর্চ ফেলে বললেন, — তোমার টর্চও রেডি রেখো।

ততক্ষণে আমি টর্চ বের করেছি। বললাম, — কিন্তু এভাবে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—বনবাংলোয়।

—সেটা কতদূরে?

—কাছেই।

অস্বস্তি হচ্ছিল। টর্চের আলোয় দুধারে ঘন জঙ্গল আর বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই দেখা যাচ্ছিল। কিছুদূর উতরাইয়ের পর চড়াই শুরু হল। বারবার পিছনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছিলাম। কলকাতার কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে যে পিশাচের অস্তিত্ব অবাস্তব মনে হয়েছিল, এখানে এখন তা একেবারে বাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—টর্চের ব্যাটারি খরচ কোরো না জয়ন্ত! আমার ধারণা, পিশাচ শ্মশানের কাছাকাছিই আছে। শ্মশান এখান থেকে দূরে।

একখানে পিচরাস্তাটা ছেড়ে খোয়াঢাকা একফালি পথ ধরলেন কর্নেল। পথটা চড়াইয়ে উঠেছে। ওপরে খানিকটা দূরে আলো জুগজুগ করছিল। এবার দেখলাম, আমরা একটা টিলার ঢাল বেয়ে উঠছি।

একটু পরে সেই আলোটার দিক থেকে কেউ বলে উঠল, — কৌন বা?

কর্নেল গলা চড়িয়ে বললেন, — চতুর্মুখ নাকি?

জোরালো টর্চের আলো এসে পড়ল আমাদের ওপর। তারপর দৌড়ে এল একজন খাঁকি প্যান্টশার্ট পরা লোক। তার একহাতে বন্দুক। বুঝলাম ফরেস্ট গার্ড। সে স্যালুট ঠুকে বলল, — কর্নিলসাব! আপ?

— হ্যাঁ চতুর্মুখ। দয়ারাম আছে তো? নাকি পিশাচের ভয়ে বাড়ি পালিয়েছে?

চতুর্মুখ হাসল, — জি, হাঁ কর্নিলসাব। তবে আপনার কিছু অসুবিধা হবে না। আমি আছি। মানিকলালভি আছে।

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। চতুর্মুখ লোকটি সাহসী বোঝা গেল। তার মতে, পিশাচের সত্যিমিথ্যা সে জানে না। তবে এমনও হতে পারে, গুজব রটিয়ে চোরা শিকারি বা কাঠ পাচারকারীরা এই মওকায় জঙ্গল লুঠবে! তাই রেঞ্জারসায়েব তাদের দুজনকে রাত জেগে নজর রাখতে বলেছেন। উঁচু কাঠের টাওয়ারের দিকে ঘুরে চতুর্মুখ চেঁচিয়ে বলল, — মানিকলাল! কলকত্তাসে কর্নিলসাব আয়া!

সেখান থেকে সাড়া এল, — সেলাম কর্নিলসাব!

বাংলোটা কাঠের তৈরি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। লণ্ঠনের আলোয় দেখলাম, বেশ ছিমছাম সাজানো-গোছানো। জানালাগুলো খুলে দিলে হাওয়া খেলতে লাগল। পেছনে নদীর জলের কলকল ছলছল শব্দ। খাওয়া আমরা ট্রেনেই সেরে নিয়েছিলাম। কর্নেল তাঁর প্রিয় পানীয় কফি চিনি, টিনের দুধ এবং কিছু স্ন্যাক্স এনেছেন সঙ্গে। চতুর্মুখ ঝটপট কিচেনে কেরোসিন কুকার জ্বেলে কফি করে আনল।

পিশাচের গল্পটা চতুর্মুখ সবিস্তারে শোনাল এবং আগেই বলে দিল, সবই তার শোনা কথা। দিন চারেক আগে রাজবাড়ির একজন বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মারা পড়ে। তখন রাত প্রায় নটা-দশটা। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার নাকি বলেছিলেন, হার্টফেল। রাজবাড়ি এখন নামেই। অবস্থা পড়ে এসেছে। দালানকোঠা দিনেদিনে মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়েছে। তো লোকটাকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গেছে, এমন সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। সব কাঠ ভিজে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। তাই দুজনকে বসিয়ে রেখে বাকি লোকেরা শুকনো কাঠ আনতে গিয়েছিল। তখন বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু বিজলি চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। হঠাৎ লোকদুটো নাকি বিজলির ছটায় দেখে, কালো কী একটা জন্তু দুই পায়ে হেঁটে মড়ার খাটিয়ার কাছে এল। মুখের দু-পাশে দুটো বড়োবড়ো দাঁত। বীভৎস মুখ। লোকদুটো পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে লাঠিসোঁটা বন্দুক বল্লম টর্চ নিয়ে অনেক লোক শ্মশানে ছুটে আসে। দেখে, খাটিয়ার মড়া নেই। খুঁজতে খুঁজতে একটু তফাতে জঙ্গলের ভেতর মড়া পাওয়া যায়। কিন্তু পেটের নাড়িভুঁড়ি সবটাই খুবলে তুলে সেই দুপেয়ে জন্তুটা খেয়ে ফেলেছে। এবার সবাই ধরে নেয়, জন্তুটা পিশাচ। মড়াটা অবশ্য দাহ করা হয়।

পরদিন রাতে রাজবাড়ির বড়োতরফ রণজয় সিংহের কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। জানলার ধারে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল। টর্চের আলো জ্বালতেই নাকি পিশাচটাকে দেখতে পান। ভিতু মানুষ। হাত থেকে টর্চ পড়ে যায়। পরে চ্যাঁচামেচি করেন। ততক্ষণে পিশাচ উধাও। গুজব এত বেশি রটেছে যে, ধুমগড়ের অনেকেই নাকি পিশাচটা দেখেছে। তাই সন্ধ্যার পর বাজার দোকানপাট রাস্তাঘাট সুনসান ফাঁকা হয়ে যায়। কেউ নাকি সন্ধ্যার পর পারতপক্ষে একা বেরোয় না।

ঘটনাটা শুনিয়ে চতুর্মুখ হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তবে সে বলে গেল, পিশাচ না আসুক, নদী পেরিয়ে জঙ্গল থেকে বাঘ-ভালুক আসতেও পারে। কাজেই আমরা যেন দরজা ভালো করে এঁটে শুই।

খবরের কাগজে মোটামুটি ওইরকম বিবরণই বেরিয়েছে। তবে রণজয়বাবুর জানলায় পিশাচের আবির্ভাবের কথা বেরোয়নি। সন্ধ্যার পর সব নিরিবিলি হওয়ার কথাও বেরোয়নি।

কর্নেল দরজা এঁটে জানলা ধারে বসে চুরুট ধরালেন। বললেন, — শুয়ে পড়ো জয়ন্ত!

—আপনি কি পিশাচের জন্য রাত জাগবেন নাকি?

—নাহ্। ধূম্রগড়ের রাজকাহিনির শেষ কয়েকটা পাতা পড়ে নিয়ে ঘুমোব।

—আর পড়ে কী লাভ? আপনি তো বলছিলেন, একটা জটিল রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেন, — তোমারই সাহায্যে হয়ে গেছে।

—গোলকধাঁধা শুনে?

—একটা ওকার জুড়েই সব জল হয়ে গেছে।

—প্লিজ কর্নেল! হেঁয়ালি করবেন না। ও-কারের চোটে মাথা ভোঁ ভোঁ করছে।

—গোলকধাঁধার গোলকের একটা ও-কার দরকার ছিল। অর্থাৎ গোলোক।

রাজবাড়ির যে বয়স্ক চাকর হঠাৎ ধড়ফড় করে মারা গেছে, তার নাম ছিল গোলোক।

—বুঝলুম। গোলোক থেকে কী করে রহস্য ফাঁস হল?

—রাতবিরেতে হঠাৎ ধড়ফড় করতে করতে মরে গিয়ে গোলোকই রহস্য ফাঁস করেছে।

—তার মানে?

—ওই শোনো! ফেউ ডাকছে। কাছাকাছি কোথাও বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে চুপ করলাম। সত্যিই ফেউ ডাকছে।...

ধাঁধার জট ছাড়ল

কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে আমার ঘুম ভাঙালেন। বললেন, — দয়ারামকে সাহস দিয়ে নিয়ে এলাম। চতুর্মুখ আর মানিকলাল রাত জেগে ডিউটি করে। ওদের ঘুমোনো দরকার।

দয়ারাম বাংলোয় চৌকিদার। সেও খুব ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে পিশাচকাহিনি শোনাল। সে জনৈক ফোটোগ্রাফার রামবাবুর কথা বলল। রামবাবু নাকি পিশাচটার ফোটো তুলেছেন। রাতে ওঁর জানালায় পিশাচটা গিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে রামবাবু ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবালবের সাহায্যে ছবি তোলেন।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গে বেরোলাম। প্রায় এক কিলোমিটার যাওয়ার পর বসতি এলাকা চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে নদী। নদীর ধারে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। টিলার গায়ে একটা কেল্লাও দেখতে পেলাম। কেল্লা আর আস্ত নেই। কেল্লার নীচে দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর বিশাল প্রাচীন একটা শিবমন্দির দেখলাম। মন্দিরের ওপাশে ভাঙাচোরা দোতলা বাড়িটাই রাজবাড়ি।

গেট ধসে পড়েছে। দুধারে পামগাছের সারি পুরোনো আভিজাত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দেখতে পেয়ে রোগা এবং পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাশে গায়ের রং এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজবংশের বড়োতরফ রণজয় সিংহ।

রণজয়বাবু বললেন, — আপনি দুদিন পরে আসবেন বললেন। তাই চলে এলাম কলকাতা থেকে।

কর্নেল বললেন,—হঠাৎই চলে এলাম। আমার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধু রাজাবাহাদুর জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়াতে সাহায্য করেছে।

রণজয়বাবুর মুখে বিস্ময় এবং আনন্দ ফুটে উঠল, — কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, খুঁজে পাচ্ছি না কর্নেলসায়েব! চলুন, ঘরে গিয়ে বসা যাক।

—পরে বসা যাবে। প্রথমে আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—বৃহস্পতিবার রাতে গোলোক কি মন্দির চত্বরে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। মন্দির চত্বরে।

—আপনার চোখের সামনেই তো ধড়ফড় করতে করতে মারা গিয়েছিল?

—হ্যাঁ। আমি ওকে ভোরে কলকাতায় আমার ভাইপো সঞ্জয়ের কাছে পাঠাব ভেবেছিলাম। তাই ওকে খুঁজছিলাম। ইদানীং প্রায় দেখতাম সন্ধ্যার পর গোলোক মন্দির চত্বরে গিয়ে বসে থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, মনে সুখ নেই বড়োবাবু দেবতার কাছে শান্তি খুঁজছি।

—গোলোক বলত?

—বলত বলেই মন্দিরে খুঁজতে গিয়েছিলাম। যেই গোলোক বলে ডেকেছি, অমনি কেন যেন চমকে উঠল। মন্দির চত্বরের ওপর বাড়ির দোতলার ঘরের আলো পড়ে। সব স্পষ্ট দেখা যায়। ওকে চমকে উঠতে দেখে বললাম, কী হয়েছে রে? সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বুক চেপে ধরে পড়ে গেল। তারপর কাটা পাঁঠার মতো ধড়ফড় করতে করতে স্থির হয়ে গেল।

—ডাক্তার এসে কী বললেন?

—হার্টফেল।

—রণজয়বাবু! সত্যিই কি ডাক্তার এসে বললেন হার্টফেল? আমার ধারণা, ডাক্তার বলেছিলেন আত্মহত্যা করেছে গোলোক। পুলিশের ঝামেলার ভয়ে আপনি ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন হার্টফেলের উল্লেখ করে ডেথ সার্টিফিকেট দিতে।

রণজয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন— হ্যাঁ। গোলোক সায়ানায়েড জাতীয় কিছু খেয়েছিল। কোনও কারণে ইদানীং ওর চালচলনে কেমন যেন অস্থিরতা লক্ষ্য করতাম। গত বছর ওর বউ মারা যায়। ছেলেপুলে ছিল না। কাজেই মানসিক অশান্তিই ওর আত্মহত্যার কারণ।

—রণজয়বাবু! আপনারা তো দু'ভাই?

—আমি আর সঞ্জয়ের বাবা ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় ক্যানসারে মারা যায়।

—আপনার কাছে আপনার শ্যালক থাকেন বলছিলেন। কী যেন নাম?

—চণ্ডী।

—চণ্ডীবাবু আছেন?

রণজয়বাবু বাঁকা মুখে বললেন, — চণ্ডী কখন আছে, কখন নেই বলা কঠিন। বাউন্ডুলে স্বভাব। সামান্য যা জমিজমা আছে দেখাশোনা করার দায়িত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু খায়দায় আর টো-টো করে ঘোরে। বয়সের তো লেখাজোখা নেই। অথচ নাবালক থেকে গেল এখনও। ধর্মের ষাঁড় আর কী!

কর্নেল পা বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন, — চলুন তাহলে। ধর্মের ষাঁড়টিকে দেখে আসি।

—ওকে পাচ্ছেন কোথায়?

—মন্দিরেই পাব। শিবের বাহন শিবমন্দিরেই থাকা উচিত।

—মন্দিরে তো ওকে—

—চলুন তো!

যে বিশাল মন্দিরটার পাশ দিয়ে এসেছি, এবার রাজবাড়ির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সেখানে ঢুকলাম। চত্বরে গিয়ে কর্নেল বললেন— গোলোক কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল?

উঁচু মন্দিরের সিঁড়ির নীচেটা দেখিয়ে দিলেন রণজয়বাবু, — এই সিঁড়ির ধাপেই বসে থাকত গোলোক।

কর্নেল সিঁড়ির শেষ ধাপে খোলা একটুকরো বারান্দার দিকে আঙুল তুলে বললেন, — ওই তো ধর্মের ষাঁড়। শিবের বাহন।

কথাটা বলেই সিঁড়িতে কয়েক ধাপ উঠে গেলেন। তারপর সেই ধাঁধাটা আওড়ালেন :

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা।।

রণজয়বাবু অবাক হয়ে বললেন, — কী ব্যাপার কর্নেলসায়েব?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, — ষাঁড়ের মাথা কে ভাঙল রণজয়বাবু?

রণজয়বাবু উঠে গেলেন, — সে কী। মাথাটা ভাঙা লক্ষ্য করিনি তো!

কর্নেল বললেন, — ধাঁধার জট ছাড়াতে বলেছিলেন। ছাড়িয়েছি। কিন্তু কোনো লাভ হল না।

রণজয়বাবু চমকে উঠে বললেন, — লাভ হল না?

না। — কর্নেল মাথা নাড়লেন : পাষণ্ডের পা কভু ধরিস না। এর মানে হচ্ছে, পাষণ্ড শব্দের পা ধরা হবে না। পা না ধরলে বাকি রইল ষণ্ড। অর্থাৎ কি না ষাঁড়। এবার মস্তকে ঘা। তার মানে, ষাঁড়ের মাথায় ঘা মারতে হবে। ঘা মারলে মাথা ভেঙে যাবে। তারপর বলা হয়েছে, কী জ্বলে রে বাবা! এই জ্বলে শব্দে বোঝায় জ্বলজ্বল করছে। উজ্জ্বলতা। কীসের এই উজ্জ্বলতা? হিরের! মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করার জন্য আপনাদের পূর্বপুরুষকে বাদশাহ্ আকবর যে হিরে উপহার দিয়েছিলেন, সেই হিরে। জন্মেজয় সিংহ বংশধরদের জন্য এই হিরেটা এই ষাঁড়ের মাথার ভেতরে লুকিয়ে রেখে ধাঁধা তৈরি করেছিলেন। ধূম্রগড়ের রাজকাহিনি বইয়ে বাদশাহের দেওয়া হিরের কথা আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তা ধাঁধায় বলা হয়েছে।

রণজয়বাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন— কে ষাঁড়ের মাথা ভাঙল?

—গোলোক ভেঙেছিল।

—কিন্তু হিরে কোথায় গেল?

—গোলোকের পেটে।

—কী সর্বনাশ!

—হ্যাঁ, সর্বনাশ!

—হ্যাঁ, সর্বনাশ তো বটেই। হিরে সাংঘাতিক বিষ। আপনাকে আসতে দেখে হিরের টুকরোটা গোলোক গিলে ফেলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষক্রিয়ায় ওর মৃত্যু হয়।

—কিন্তু গিলল কেন হতভাগা? লুকিয়ে ফেলতে পারত জামা কাপড়ের তলায়।

—বোকা গোলোক কারও হুকুম পালন করেছিল টাকার লোভে। ওকে বলা হয়েছিল, ধরা পড়ার উপক্রম হলে যেন সে ওটা গিলে ফেলে। গোলোক জানত না হিরে মারাত্মক বিষ।

রণজয়বাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন— আপাতত এই পর্যন্ত। তবে আশাকরি, আপনাদের বংশের ঐতিহাসিক হিরে উদ্ধার করে দিতে পারব।...

পিশাচ দর্শন

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বললাম— তা হলে কলকাতায় বসে ঠিকই রহস্যের জট ছাড়াতে পেরেছিলেন! কিন্তু পিশাচ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

বোঝা যাবে। আগে সেই রামবাবু ফোটোগ্রাফারের দোকানে যেতে হবে।

— বলে কর্নেল রাস্তায় একটা সাইকেল-রিকশ ডাকলেন।

বাজার এলাকায় গিয়ে রামবাবুর দোকানের খোঁজ পাওয়া গেল। দোকানের নাম 'জয় মা কালী স্টুডিয়ো'। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিতে লেখা সাইনবোর্ড। কর্নেলকে দেখেই বেঁটে নাদুসনুদুস চেহারার এক ভদ্রলোক সহাস্যে অভ্যর্থনা জানালেন, — কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! কর্নেলসায়েব যে! আসুন। পায়ের ধুলে দিন। এবার কতগুলো প্রজাপতি আর অর্কিডের ছবি তুললেন? গত মাসে তো অনেক তুলেছিলেন।

বুঝলাম রামবাবুর স্টুডিয়োতে কর্নেল ছবি প্রিন্ট করিয়েছিলেন। কর্নেল ভেতরে ঢুকে বললেন, ছবি এখনও তুলিনি। তুলব। তবে আগে পিশাচ দর্শন করতে চাই। আপনি নাকি পিশাচের ছবি তুলেছেন।

রামবাবুর মুখে ভয়ের ছবি ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন, — ভয়ের ঘটনা কর্নেলসায়েব! তবে আমার পেশার লোকদের এই একটা অভ্যাস আছে। আসলে ক্যামেরায় ফিল্‌ম লোড করা ছিল। ফ্ল্যাশ ফিট করা ছিল না।

— তাহলে পিশাচ যেন আপনার কাছে ছবি ওঠাতেই এসেছিল!

রামবাবু হেসে ফেললেন,— তা যা বলেছেন স্যার। ফ্ল্যাশ ফিট করে ছবি তুললাম। তখন জানালার ধার থেকে থপথপ করে চলে গেল। বাগানে ঢুকে পড়ল।

পিশাচটা পাবলিসিটি চাইছে আর কী!—কর্নেল হাসলেন : যাই হোক, কই দেখি পিশাচের ছবি।

রামবাবু ড্রয়ার টেনে বললেন,—পুলিশ এসে নেগেটিভটা সিজ করেছে। মোট তিরিশখানা প্রিন্ট বেচেছি। দু-খানা প্রিন্ট পুলিশ নিয়েছে। একখানা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই থেকে নেগেটিভ করব। মনে হচ্ছে প্রচুর বিক্রি হবে।

রঙিন ছবিটা দেখে শিউরে উঠলাম। জানলার গরাদের বাইরে একখানা ভয়ংকর মুখ উঁকি মেরে আছে। দুখান সুচালো কষধাঁত বেরিয়ে আছে। লাল ঠোঁটে চাপচাপ রক্ত। গোরিলা নয়। কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, ক্রোম্যাগননের পরবর্তী কোনও পর্যায়ের নরবানর। বীভৎস ছবি।

কর্নেল আতশ কাচে খুঁটিয়ে দেখে বললেন, — রেখে দিন।

রামবাবু চাপা স্বরে বললেন, — কদিন আছেন তো? একটা কপি আপনার জন্য রাখব।

রাখতে পারেন। — বলে কর্নেল বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় গিয়ে বললাম,—হালদারমশায়ের জন্য ভয় হচ্ছে। ওঁকে খুঁজে বের করা উচিত কর্নেল!

কর্নেল বললেন,—চলো! এবার শ্মশানতলায় যাওয়া যাক। একটু দূর হবে। রিকশ ডাকি।

কিন্তু কোনো রিকশই শ্মশানতলায় যেতে রাজি হল না। শুধু একজন বলল, সে রাস্তার মোড় অব্দি যাবে। দশ টাকা লাগবে। কর্নেল রাজি হলেন।

রাজবাড়ি এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তার মোড় এল। রিকশওয়ালা বলল,—ইধার সিধা চলা যাইয়ে।

এবড়োখেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তার দুধারে জঙ্গল আর টিলা। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে হাঁটছিলেন। আমার ভয় হচ্ছিল, বিরল প্রজাতির কোনও পাখির পিছনে উধাও হয়ে না যান। গেলে পরে আমাকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই পিশাচটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলতে দেরি করবে না।

কর্নেল উধাও হলেন না। কিছুক্ষণ পরে আমরা শ্মশানে পৌঁছোলাম। চারদিকে ডালপালা ছড়ানো ঝুরি নামানো আদ্যিকালের বটগাছ। তারওধারে শরৎকালের ভরা নদী। এখানে-ওখানে চিতার ছাই আর ভাঙা মাটির কলসি পড়ে আছে। একপাশে কয়েকটা পাথরের ঘর মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার কাছে একটা পাথরের মন্দির। কতকটা বৌদ্ধস্তূপের গড়ন। খানিকটা ফোকর দেখা যাচ্ছে স্তূপে। ওটাই সম্ভবত দরজা ছিল। মাটিতে বসে গেছে। ঝোপেও ঢাকা পড়েছে। বললাম, কর্নেল! পিশাচটা ওই স্তূপের ভেতর থাকে না তো?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে বটতলায় একটা ঝুরির কাছে গেলেন। তারপর বললেন— এখানে কোনও সন্ন্যাসী ধুনি জ্বালিয়েছিল দেখছি। ছাইটা টাটকা। গত ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়নি, মাটি দেখে বোঝা যাচ্ছে। একটা ছোট্ট ত্রিশূল আর—মড়ার খুলি!

কর্নেল খুলিটা কুড়িয়ে নিয়েই ফেলে দিলেন। ঠকাস করে শব্দ হল। হাসতে হাসতে বললেন, প্লাস্টিকে তৈরি নকল খুলি। কাজেই হালদারমশাই ছদ্মবেশী সাধু সেজে এখানে ধুনি জ্বেলেছিলেন, এতে আমি নিঃসন্দেহ।

বললাম, — উনি গেলেন কোথায়?

কর্নেল মাটিতে দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে থমকে দাঁড়ালেন। কী একটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, — একটুকরো জটা! মেড ইন চিতপুর। পাটের তৈরি জটা! জয়ন্ত, হালদারমশাইয়ের নকল জটা ছিঁড়ে পড়ার একটাই অর্থ হয়। ওঁকে কেউ আক্রমণ করেছিল।

— সর্বনাশ! তাহলে পিশাচের পাল্লায় পড়েছিলেন গোয়েন্দা ভদ্রলোক। কিন্তু ওঁর কাছে তো রিভলভার থাকে।

কর্নেল স্তূপটার কাছে এগিয়ে গেলেন। পিঠের কিটব্যাগ থেকে টর্চ বের করে সেই ফোকরের কাছে গুঁড়ি মেরে বসলেন। টর্চ জ্বেলে ভেতরটা দেখেই বলে উঠলেন, — জয়ন্ত। দেখে যাও!

দৌড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, খটখটে পাথুরে মেঝেয় চামচিকের নাদির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছেন আমাদের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হাত এবং পা বাঁধা। মুখে টেপ সাঁটা ছিল। খুলে গেছে। তার চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার, টর্চের আলোয় চামচিকের ঝাঁক ছত্রভঙ্গ হয়ে ওড়াউড়ি করছে। হালদারমশাইয়ের ওপর আছড়ে পড়ছে। কিন্তু ওঁর সাড়া নেই। অজ্ঞান হয়ে আছেন নাকি?

কর্নেল ডাকলেন— হালদারমশাই! হালদারমশাই!

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পিটপিট করে তাকালেন। বললেন,—জ্বালাতন! তোরা আমারে মারস ক্যান! যা! যা! আবার মারে! চামচিক্যা কি আর সাধে কয়?

— হালদারমশাই! হালদারমশাই!

অ্যাঁ? হালদারমশাই মাথা ঘোরালেন : হালার পিচাশ? আবার আইছ? একখান দাঁত উপড়্যা ফ্যালাইছি। আরেক খান রাখুম না! কাম অন!

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! এই ছুরি নিয়ে ভেতরে ঢোকো। বাঁধন খুলে ওঁকে বের করে আনো। আমার এই প্রকাণ্ড শরীর ভেতরে ঢোকানো যাবে না।

আঁতকে উঠে বললাম, — বড্ড চামচিকে যে!

— দেরি কোরো না। চামচিকের চাঁটিতে মাথা খুলে যাবে। ঢোকো।

চোখ বুজে ঢুকে পড়লাম। চামচিকের ঝাঁকের চাঁটির পর চাঁটি খেতে খেতে বাঁধন কেটে গোয়েন্দাকে টেনে বের করলাম। তখনও উনি গর্জাচ্ছেন! শাসাচ্ছেন 'পিচাশের' বাকি দাঁতটাকে উপড়ে দেবেন বলে। আধখানা নকলদাড়ি মুখের পাশে ঝুলছে। জটার খানিকটা আটকে আছে। পরনে লাল খাটো লুঙি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে ঝুলছে। গোঁফের কোনায় সেলোটেপও ঝুলছে। বাইরে বেরিয়ে ওঁর হুঁশ হল। চোখ মুছে বললেন,—হালার পিচাশটা গেল কই?

কর্নেল বললেন,—নদীর জলে মুখ-কাঁধ রগড়ে ধুয়ে নিন হালদারমশাই!

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর খিকখিক করে হেসে বললেন,— কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবু! আপনারা আইয়া পড়ছেন? পিচাশটারে আমি জব্দ করছি! একখান দাঁত—

— নদীতে চলুন হালদারমশাই! গোঁফের পাশে টেপ ঝুলছে। জল না দিলে আটকে থাকবে।

কর্নেল ওঁকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে গেলেন!...

হিরের খোঁজে

হালদারমশাইয়ের মুখে জানা গেল, কলকাতা থেকে এসে তিনি নিউ ধূমগড়ে একটা হোটেলে উঠেছিলেন। তারপর কাল রাত নটায় শ্মশানতলায় এসে ধুনি জ্বেলে সাধু সেজে বসেন। শেষ রাতে ঘুমের ঢুলুনি চেপেছিল। হঠাৎ পেছনে থেকে 'পিচাশের' গায়ে জোর বলেও নয়, বেকায়দায় পড়ে হালদারমশাই বন্দি হন। তাঁকে টানতে টানতে স্তূপের ভেতর ঢোকায় 'হালার পিচাশ'। মুখে টেপ সেঁটে দিয়েছে। চ্যাঁচানোরও জো ছিল না।

কর্নেল বললেন, — জয়ন্ত! এই অবস্থায় হালদারমশাই হোটেলে ফিরতে গেলে পাগল ভেবে লোক জমে যাবে। এখান থেকে সোজা নাকবরাবর হেঁটে গেলে ফরেস্টবাংলো দেখতে পাবে। ওঁকে নিয়ে গিয়ে তোমার একপ্রস্ত পোশাক পরতে দাও। ওঁর কিছু খাওয়াদাওয়াও দরকার। দেরি কোরো না। আমি অন্যদিকে যাচ্ছি।

হালদারমশাই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন,—আমার রিভলবার গেল কই? আসনের তলায় রাখছিলাম।

'মেড ইন চিতপুর' নকল বাঘছালের আসনটা খুঁজে পাওয়া গেল না। কর্নেল বললেন, — পিশাচ আপনার রিভলভারের লোভ ছাড়তে পারেনি।

হালদারমশাই চিন্তিতমুখে বললেন— ফায়ার আর্মস পিচাশের কোন্ কামে লাগব?

কর্নেল আর কোনও কথা না বলে চলে গেলেন। এর পর হালদারমশাইকে নিয়ে আমি কীভাবে যে বাংলোয় পৌঁছুলাম কহতব্য নয়। সারা পথ বুক ঢিপঢিপ করছিল। এই বুঝি পিশাচটা ঝোপের আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

চৌকিদার দয়ারাম হাঁ করে তাকিয়ে গোয়েন্দা ভদ্রলোককে দেখছিল। বললাম, — শিগগির ওঁকে কিছু খাইয়ে দাও, দয়ারাম। হালদারমশাই আপনি বরং স্নান করে নিন। ওই দেখুন কুয়ো আছে!

দয়ারামের কাছে জানা গেল, কুয়োটা আসলে এই টিলার মাথায় একটা প্রস্রবণ। ওটা ছিল বলেই বনদফতর এখানে বাংলো তৈরি করেছিল।

স্নান করে আমার পাঞ্জাবি-পাজামা পরে হালদারমশাই শুধু দুখানা টোস্ট আর এক কাপ কফি খেলেন। তারপর আমার বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন।

কর্নেল এলেন বেলা দুটো নাগাদ। হালদারমশাইকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বললেন, — আপনার রিভলভারটা উদ্ধার করেছি। এই নিন। উনি কিটব্যাগ থেকে রিভলভার বার করে দিলেন।

অবাক হয়ে বললাম, — কোথায় পেলেন ওটা?

— পিশাচের ডেরায়। সিন্থেটিক বাঘছালে মোড়া ছিল। বাঘছালটা একই অবস্থায় রেখেছি।

— জায়গাটা আপনি খুঁজে বের করেছেন?

— হ্যাঁ। পশুপাশি কীটপতঙ্গ সব প্রাণীরই ডেরা থাকে। কাজেই পিশাচেরও একটা ডেরা থাকা উচিত। যাইহোক, এখন আর কোনও কথা নয়। হিরে উদ্ধার বাকি আছে। লাঞ্চ খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বেরুব।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা বেরোলাম বাংলো থেকে। কর্নেল বললেন— হালদারমশাই! একটা কথা। দৈবাৎ যদি আমরা পিশাচটাকে জঙ্গলে দেখতে পাই, সাবধান! যেন গুলি ছুঁড়বেন না।

তবে রিভলভার বের করে ওকে ভয় দেখাতে পারেন। কিন্তু কক্ষনো গুলি ছুড়ে বসবেন না। পিচাশটাকে আমরা অক্ষত অবস্থায় ধরতে চাই।

অজানা আশঙ্কায় আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

কর্নেল বনবাদাড় ভেঙে হাঁটছিলেন। মাঝে মাঝে পাথরে উঠে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন। বললাম, — কর্নেল! আপনি কি পিচাশের ডেরায় যাচ্ছেন?

কর্নেল বললেন, — নাহ্, শ্মশানতলায়।

—শ্মশানতলায় কেন?

কর্নেল হাসলেন, — আপত্তি আছে তোমার? আমাদের সবাইকে তো একদিন শ্মশানে যেতেই হবে। কী বলেন হালদারমশাই?

হালদারমশাই গম্ভীরমুখে বললেন, — হঃ!

বললাম, জায়গাটা অস্বস্তিকর। মড়াপোড়ানো ছাইয়ের গাদা। বিশেষ করে চিতার ছাই দেখলেই আমার গা ছমছম করে।

কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন, — কী বললে? চিতার ছাই?

— হ্যাঁ। কিন্তু এতে চমকে ওঠার কী আছে?

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। হালদারমশাই লম্বা পা ফেলে ওঁকে অনুসরণ করলেন। পিছিয়ে পড়ার ভয়ে আমিও প্রায় জগিং শুরু করলাম।

শ্মশানতলায় পৌঁছে কর্নেল বললেন, — হালদারমশাই, দেখুন তো! এলোমেলো অনেক চিতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে টাটকা চিতা কোন্‌টা হতে পারে? যতদূর জানি, বৃহস্পতিবার রাতে গোলোকের মড়া পোড়ানোর পর পিশাচের ভয়ে এ শ্মশানে আর কোনও মড়া পোড়ানো হয়নি। নিউ ধূমগড়ের নতুন শ্মশানে সবাই মড়া পোড়াচ্ছে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক ঘোরাঘুরি করে দেখতে দেখতে বললেন, — বৃষ্টিবাদলায় সবগুলি হেভি ধুইয়া গেছে। তবে আপনি কার চিতা কইলেন য্যান?

— রাজবাড়ির স্যারভ্যান্ট গোলোকের। মানে যার মড়ার নাড়িভুঁড়ি খেয়ে ফেলেছিল পিশাচ।

— তবে তো ওনার চিতার ছাই হেভি হইব। বলে হালদারমশাই লাফ দিয়ে এগোলেন।

— লাস্ট বার্নিং কর্নেল স্যার! হেভি অ্যাশ! এই যে।

কর্নেল গিয়ে বৃষ্টির জল থিকথিকে পাঁকের মতো ছাইগুলো ঘাটতে শুরু কলেন। বললাম, — ও কী করছেন?

কর্নেল আওড়ালেন, — যেখানে দেখিবে ছাই/উড়াইয়া দেখ তাই/ পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

হালদারমশাইও হাত লাগাতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁকে নিষেধ করলেন! একটু পরে ছাইগাদার তলা থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে কর্নেল নদীর ধারে দৌড়ে গেলেন। জলে সেটা ধুয়ে পকেটে ঢুকিয়ে হাসলেন, — জয়ন্ত! শ্মশানতলায় আসছিলাম পিশাচটার জন্য ওত পাততে। কারণটা পরে বলছি। তবে এবারও তুমি রহস্যের দ্বিতীয় পর্ব ফাঁস করেছ! ধন্যবাদ ডার্লিং! অসংখ্য ধন্যবাদ! হিরে উদ্ধার হয়ে গেল।

—বলেন কী! ওই জিনিসটা হিরে? গোলোকের চিতার ছাইয়ে কে লুকিয়ে রেখেছিল?

—কেউ না। হিরেটা গিলে গোলোক মারা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাকস্থলীতে হিরে পৌঁছোনোর কথা নয়। গলার নলিতেই আটকে যাওয়া উচিত। কারণ হিরে খাঁজকাটা ধাতু।

হালদারমশাই বললেন, কই দেখি!

— পরে দেখাব। এবার পিশাচের জন্য ওত পাততে হবে। বটগাছের আড়ালে চলুন।

বটগাছের ঝুরির ভেতর দিয়ে এগিয়ে গুঁড়ির আড়ালে তিনজনে বসে পড়লাম। সামনে ঝোপজঙ্গলে ঢাকা ঢালু মাটি নদীতে নেমেছে। এখানে-ওখানে বড়ো বড়ো পাথর পড়ে আছে। হঠাৎ দমকা বাতাসে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। নাক ঢাকলাম। চাপা স্বরে বললাম, — এ কিসের দুর্গন্ধ?

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। বেলা পড়ে এসেছে। পাখিরা তুমুল হল্লা জুড়েছে। সামনে একটা পাথরের আড়ালে একটা শেয়াল এসে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দেখতে পেয়েই থমকে দাঁড়াল। তারপর প্রায় জান্তব গলায় কার গর্জন শোনা গেল, — যাঁ! যাঁঃ! যাঁঃ!

হালদারমশাই উত্তেজনায় ফিশফিশ করে বললেন, পিচাশ! পিচাশ!

এবার পিশাচের শরীরের খানিকটা দেখতে পেলাম। কালো লোমশ শরীর। মুখ এদিকে ঘোরাতেই শিউরে উঠলাম। একটা কষদাঁত সুচোলো হয়ে বেরিয়ে আছে। অন্যটা হালদারমশাই ভেঙে দিয়েছেন বলছিলেন। ভাঁটার মতো চোখ। ভয়ঙ্কর মুখ। পাথরটার পাশে সে বসে পড়ল। তারপর বুঝলাম, সে খন্তাজাতীয় কিছু দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। দুর্গন্ধটা বাড়ছে।

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, — তিনজন তিনদিক থেকে ঘিরে ফ্যালো।

আগে হালদারমশাই, তারপরে কর্নেল, শেষে আমি গিয়ে পিশাচটাকে ঘিরে ধরলাম। কর্নেল এবং হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার। পিশাচটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অবাক হয়ে দেখলাম, সে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল।

পিশাচটা গর্জন করতেই কর্নেল বললেন,—এক পা নড়লেই খুলি ফুটো হয়ে যাবে।

পিশাচটা নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই হালদারমশাই এক লাফে তার সামনে গেলেন, — হালার পিচাশ! ঘুঘু দ্যাখছ, ফান্দ্ দ্যাখো নাই!

কর্নেল গিয়ে পিশাচের মুখে চাটি মারার মতো বাঁ-হাত চালালেন এবং হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ যে দেখছি পিশাচের মুখোশপরা একটা লোক।

কর্নেল বললেন, — চণ্ডীবাবু! গোলোকের পাকস্থলীতে খাঁজকাটা হিরে পৌঁছোনোর কথা নয়। কাজেই ওর নাড়িভুঁড়ি কেটে তুলে এনে এখানে পুঁতে রোজ একবার করে তা কাটাকুটি করে হিরে হাতড়ানোর মানে হয় না। খামোখা রোজ ওই পচা দুর্গন্ধ জিনিসগুলো ঘাঁটা পণ্ডশ্রম।

হালদারমশাই একটানে কালো লোমশ আবরণ খুলে রণজয়বাবুর শ্যালক চণ্ডীবাবুকে বের করলেন। চকাস করে একটা ছুরিও পড়ল। হালদারমশাই বললেন,—চিতপুরে কিনছিল। তবে ছুরিখানা রিয়্যাল ছুরি। শৃগালটা গেল কই? পচা নাড়িভুঁড়িগুলো শৃগালের প্রাপ্য।

কর্নেল চণ্ডীবাবুর জামার কলার খামচে ধরে বললেন,—চলুন চণ্ডীবাবু! এবার অন্য শ্বশুররালয়ে আপনার থাকার ব্যবস্থা হবে।

চণ্ডীবাবু হাউমাউ করে কেঁদে বললেন,—মাইরি, মা কালীর দিব্যি স্যার! আমি হিরে চুরি করিনি।

— না, না। হিরে নিজের হাতে চুরি করেননি। ষাঁড়ের মাথা ভাঙার ঝুঁকি নিতে চাননি। গোলোকের হাত দিয়ে কাজটা সারতে চেয়েছিলেন। আপনি ধুরন্ধর চণ্ডীবাবু! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করা উচিত। জন্মেজয় সিংহের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিলেন আপনি। তারপর অনবদ্য আপনার পরিকল্পনা। গোলোক হাতেনাতে ধরা পড়লে পাছে আপনার কারচুপি ফাঁস করে দেয়, তাই আপনি ওকে হিরেটা গিলে ফেলতে বলেছিলেন। তারপর পিশাচ সেজে শ্মশানে ভয় দেখিয়ে লোকগুলোকে তাড়িয়ে গোলোকের নাড়িভুঁড়ি কেটে এনে এখানে পুঁতেছিলেন। পিশাচ যে সত্যিই গোলোকের নাড়িভুঁড়ি খেয়েছে এবং বিশেষ করে সত্যিই এখানে পিশাচের আবির্ভাব ঘটেছে, তা এস্টাব্লিশ করার জন্য শুধু রণজয়বাবুর জানালায় নয়, ফোটোগ্রাফার রামবাবুর জানলাতেও হাজির হয়েছিলেন। আপনি জানতেন, রামবাবু ফোটো না তুলে ছাড়বেন না। তাই অতক্ষণ দাঁড়িয়ে

ছিলেন। এতে আপনার পাবলিসিটি হবে। তবে রামবাবুর কাছে আপনার পিশাচমূর্তির ফোটো আতশকাচে খুঁটিয়ে দেখেই বুঝেছিলাম, এটা মুখোশ মাত্র! তারপর এখানে এসে দুর্গন্ধ টের পেয়েছিলাম।

কথা বলতে বলতে কর্নেল আসামিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এবার একটা পুলিশের জিপ আসতে দেখা গেল এবড়োখেবড়ো রাস্তায়। জিপ এসে থামল। একদঙ্গল পুলিশ বেরিয়ে পড়ল। একজন অফিসার সহাস্যে বললেন— তাহলে আমরা আসার আগেই পিশাচ ধরে ফেললেন কর্নেলসায়েব! শেষ দৃশ্য দেখার সুযোগ দিলেন না।

কর্নেল আসামিকে কনস্টেবলদের হাতে সঁপে দিয়ে বললেন, — বেলা থাকতে থাকতে পিশাচ এসে মাটি খুঁড়বে জানতাম না। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যা না হলে আসবে না। কিন্তু ওর তর সইছিল না। আপনারা থানায় চলুন। আমরা রাজবাড়ি হয়ে থানায় যাব।

পুলিশের গাড়ি চলে গেল।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, কর্নেলস্যার! হালপিচাশের ডেরা— হোয়্যার ইজ দ্যাট প্লেস?

কর্নেল হাসলেন, — রাজবাড়িতেই রাজবাড়ির শ্যালকের ডেরা থাকা কি স্বাভাবিক নয়? রণজয়বাবুর কাছে ওঁর শ্যালকের ঘরের চাবি ছিল না। আমার কাছে সবসময় মাস্টার-কি থাকে। তাই দিয়ে খুললাম। আপনার বাঘছালে মোড়া রিভলভার পেলাম। কয়েকটা চিঠি পেলাম। কলকাতার এক জুয়েলার কোম্পানি হিরে কিনতে চেয়েছিল। তাদের গতকাল এখানে পৌঁছুনোর কথা। নিউ ধূমগড়ে হোটেল প্যারাডাইসে তারা অপেক্ষা করবে। দুপুরে সেখানে গিয়ে খোঁজ নিলাম। তাদের সঙ্গে চণ্ডীবাবু লাঞ্চ খাচ্ছিল ডাইনিং হলে। সেখান থেকে ভাগ্যিস বাড়ি ফেরেনি। তাহলে ঘরে ঢুকে সব টের পেয়ে সাবধান হয়ে যেত। যাক গে। রণজয়বাবু অপেক্ষা করছেন। হিরেটা তাঁর হাতে পৌঁছে দিয়ে আমার ছুটি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন, — হিরেখানা একবার দ্যাখাইবেন না কর্নেলস্যার?

কর্নেল কপট গাম্ভীর্যে বললেন, — চোখ জ্বলে যাবে। ধূম্রগড়ের রাজকাহিনির ধাঁধায় বলা আছে :

পাষণ্ডের পা
কভু ধরিস না
মস্তকে ঘা
কী জ্বলে রে বাবা

হালদারমশাই আনমনে বললেন, — হঃ! বুঝছি।

কী বুঝলেন তা অবশ্য বললেন না...

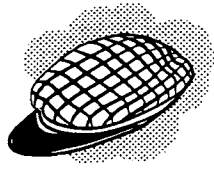

টাক এবং ছড়ি রহস্য

কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপর তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এসো ডার্লিং। তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললুম, 'টাকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্নেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কারণ একটি বিজ্ঞাপন। যেটি তোমাদেরই দৈনিক পত্রিকায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। পড়ে দেখতে পারো।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক! টাক!! টাক!!!
ট্রাই ইওর লাক
যদি থাকে দাড়ি
সুফল তাড়াতাড়ি
ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়,
১১১/১ পি. খাঁদু মিস্তিরি লেন,
কলিকাতা ১৩।

বি. দ্র.—আগে টাক পরীক্ষা করিয়া তবে ভর্তি। ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। দরাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্নেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কালো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

'কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকদের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আউড়িয়েছেন! আজ আবার—'

'কাক।' কর্নেল বিমর্ষমুখে বললেন। 'কাকের অত্যাচারে, জয়ন্ত! টাকের সঙ্গে কাকেরও গূঢ় সম্পর্ক আছে।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, 'এতবার করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবামশাই তবু কথা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদের বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোকর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভালো। যতরাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্টে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাতির ঝোপঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে ওঠা বুড়ো নিমগাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্য একবার পটকা ছুড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথাও চালু আছে।'

কর্নেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতরে বললেন, 'বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।'

ঝটপট বললুম, 'জানি। কাকতালীয় যোগ। কাক এসে তালগাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোকে যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে সেটা বোকামি।'

'ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।' কর্নেল সায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন। 'যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অব্দি মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!'

'যদি থাকে দাড়ি/সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে। অতএব ট্রাই ইয়োর লাক।'

'তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিংবেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দুহাতে মাথায় চুল—কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, 'ওঃ টাক। হায় রে টাক।'

কর্নেল হাঁ! আমিও হাঁ। তবে এটুকু বুঝলুম, এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতেনাতে আর কী।...

টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় লম্বা নাক। মুখে গোঁফ দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো—উজ্জ্বল কালো, মাঝখানে সিঁথি। পরনে ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন তেমন একটা চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোনো ব্যবসায়ীর গুদাম ঘর বলেই মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইন-বোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা-মোটা, গোলগাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে'। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারিবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়িগোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবুর চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভর্তি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করেন। সাড়াসাড়ি না পেয়ে অবাক হন। ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতা লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন-পাঁচেক আগে সেখানে জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথায় চুল গজানোর পর নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা এবং গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা এসে পড়ে। একবাক্যে রায় দেয়

এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমনকী ওপরতলা থেকে বাড়ির মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্নেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই, থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁরা চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আরও একটু রহস্য আছে। কর্নেলের কাছে আসার পথে 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' গিয়েছিলেন টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই কিন্তু গিয়ে দেখেন, ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্নেলের কীর্তিকাহিনি মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।.....

ছড়ি-বদল পর্ব

ঘটনাটি শোনার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ টাকের আমি টাকের তুমি টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললাম, 'উঁহু, গোঁফ। সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' পদ্যে আছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'যাই হোক,'এক্ষেত্রে টাক-চুরি গিয়েই সমস্যা বেধেছে।' বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। 'মুরারিবাবুর, সেল্‌ফ-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো-কোনো সময়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।'

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম-ট্রাংককল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব। কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যে যে সর্বনাশ হবার, তা ঘটতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল, এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা।'

'কেন?' কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপা স্বরে বললেন, 'হিরে। একটা-দুটো নয়, তিন-তিনটে হিরে। দাম এ বাজারে কমপক্ষে দেড়লাখ টাকা।'

কর্নেল নড়ে বসলেন। 'কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?'

মুরারিবাবু তাঁর কালোরঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো বেরুতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টাতামাশা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা! আপনার টাক অবশ্য মানানসই। তো—'

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, 'এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন—আসার পথে।'

'ঠিক ধরেছেন। নিউমার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।' মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিশফিশ করে বললেন, 'ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে—তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন! আপনার

হাতে ধরে বলছি কর্নেলস্যার! আপনি সব পারেন। কোনও ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।'

মুরারিবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বললেন, 'তাই বলুন! কাগজে কর্নেলের কীর্তিকলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত, মশাই!' বলে ফের ফিশফিশিয়ে উঠলেন। 'তাহলে তো আরও চান্স! রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্তদন্ত করা খুব স্বাভাবিক। কর্নেলস্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তক্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্নেলস্যার দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।'

ছড়িটা কর্নেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, 'আলবাত দেখবেন। দেখুন! মিরাক্‌ল বলা যায়।'

কর্নেল একটুখানি হেসেই বললেন, 'সত্যিই মিরাক্‌ল। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়। প্রকৃতই চুল ঠিক আছে, আপনি সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্নেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কী জিজ্ঞেস করার জন্য উশখুশ করেছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্‌কি হবে না? যদি দৈবাৎ—'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'রিস্‌ক না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না, ডার্লিং!'

'কখন বেরুবেন ভাবছেন?'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেব'খন।'...

হুঁকো বিষয়ক প্রবাদ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার আপিসে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি, কর্নেলের পাত্তা নেই। দুটোয় ফোন করলাম। ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই তো লাঞ্চো খেয়েই বেইরেছেন। তিনটে বাজল। চারটে বাজল। পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে আবার ফোন করলুম। ষষ্ঠী ফোন ধরে বলল, 'বাবামশাই এই মাত্তর ফিরেছেন। ছাদে গেছেন। কেপ পরেই গেছেন। বুঝিলেন না কাণ্ডজে দাদাবাবু? কাক—কাক!' রাগে অভিমানে ফোন রেখে ভাবলুম, এর অর্থ কী? আমাকে নিয়ে বেরুনোর কথা। অথচ একা বেরিয়েছিলেন। হলটা কী?

যখন কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছোলুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তায় যা জ্যাম। সটান ছাদে ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে' চলে গেলুম। দেখলুম, একটা বিদঘুটে ক্যাকটাসের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রকৃতিবিদ। মাথায় সত্যিই 'কেপ'। কাছে গিয়ে বললুম, আশ্চর্য মানুষ আপনি!'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ বিস্তর আছে, ডার্লিং! চলো, নিচে যাই। মুরারিবাবুর আসার সময় হয়েছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটে? কী দেখলেন? ছড়িটা বদলাতে পারলেন?'

'হুঁউ। আসলে জয়ন্ত, টাক ও দাড়ির সঙ্গে টাক ও দাড়ির বন্ধুত্ব খুব ঝটপট গড়ে ওঠে। এটা বরাবর দেখে আসছি।'

নিচের ড্রইংরুমে ঢুকে কর্নেল বাথরুমে গেলেন গার্ডেনিং-এর জোব্বা বদলে হাত ধুতে। শুনলুম, গলা চড়িয়ে ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম জারি করছেন। এই সময় কলিংবেল বাজল। দরজা খুলে দিলুম। হন্তদন্ত ঢুকে পড়লেন মুরারিমোহন ধাড়া। দম-আটকানো গলায় বললেন, 'গিয়েছিলেন? কাজ হয়েছে তো?'

কর্নেল পর্দা তুলে বললেন, 'বসুন, আসছি।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবুর সোফায় বসে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'আমার ঠাকুরদার কেনা হিরে, জয়ন্তবাবু! এক সায়েব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল মাইনিং বিজনেসে। ঠাকুরদাকে মাত্র দেড় হাজারে বেচেছিল। তা সেসব কথা পরে বলব'খন। বলুন, খবর কী, আমার হার্ট ধুকুপুকু করছে খালি।' বুকে হাত দিলেন মুরারিবাবু।

কর্নেল সেইরকম একটি ছড়ি হাতে ফিরে এলেন। মুরারিবাবু খপ করে সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বাঁটের প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করলেন। খি খি করে হেসে বললেন, 'জ্যাম হয়ে গেছে প্যাঁচ। বহুকাল খোলা হয়নি কিনা।'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'আগে একটু কফি খান পাঁচুবাবু? তারপর কথা হবে।'

মুরারিবাবু চমকে উঠলেন। 'পাঁচুবাবু! ও কী বলছেন কর্নেলস্যার? আমার নাম—'

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন, 'প্যাঁচ খুলবে না পাঁচুবাবু! কারণ ওটা আপনার কেনা সেই ছড়িটাই।'

মুরারিবাবু কিংবা পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী অদ্ভুত রসিকতা!'

'রসিকতা আপনার কম নয়, পাঁচুবাবু!' কর্নেল চোখ খুলে ফিক করে হাসলেন। 'আপনি আমার হাত দিয়ে আপনার মনিব মুরারিবাবুর হিরে চুরি করতে চেয়েছিলেন। একেই গ্রাম্য প্রবাদে বলে, 'অন্যের হাতে হুঁকো খাওয়া।'

'মুরারিবাবু' কিংবা 'পাঁচুবাবু' দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পাশের ঘরের অন্য দরজার পর্দা তুলে এক ধুতিপাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক বেরুলেন। ঢ্যাঙা, মাথায় টাক, মুখে দাড়ি, তিনি 'তবে রে ব্যাটা পেঁচো' বলে গর্জন করে ঝাঁপ দিলেন এবং 'পাঁচুবাবু'র পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলেন। তারপর একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার এবং দুজন সেপাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি হাঁ। তক্ষুনি দলটা বেরিয়ে গেলে ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। স্বপ্ন, না সত্যি?'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে শুরু করেছেন ফের। বললেন, 'হুঁ, একেই বলে পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। মাঝখান থেকে পাঁচুবাবুর বিজ্ঞাপন-খরচটা গচ্চা গেল। লম্বাচওড়া একটা গুলগল্পও কাজে আসল না। ডার্লিং তোমার অবশ্য একটা বড়ো লাভ হল। বড়োবাজারের শিশি-বোতলের কারবারি মুরারিমোহন ধাড়ার কর্মচারী পাঁচু বা পঞ্চানন্দকে নিয়ে কাগজে দারুণ খবর হবে।'...

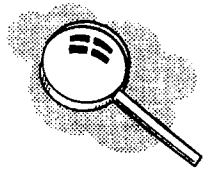

শ্মশান রহস্য

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললেন, 'আমি আসছি মেদিগঞ্জ থেকে। আমার নাম স্যার বটুক রায়। খুব গন্ডগোলে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রকাণ্ড একটা ইংরেজি বই খুলে বসেছিলেন। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। মুখ তুলে দেখে বললেন, 'আপনি বসুন আগে।'

ভদ্রলোকের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিলুম। সত্যি বলতে কী, ইনি যেন নরদানব। গর্দানে মাংস ঠেলে উঠেছে। বাহুতে দাগড়া দাগড়া পেশি ঠেলে বেরিয়ে আছে। গায়ের রং কুচকুচে কালো। মাথার চুল কদমফুলি! অর্থাৎ ন্যাড়া হবার পর যেমন চুল গজায়। দেখার মতো গোঁফখানাও বটে। গায়ে স্পোর্টিং গেঞ্জি, পরনে আঁটো প্যান্ট। পায়ের বিশাল চম্পল যে অর্ডার দিয়ে বানাতে হয়েছে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। কবজিতে চাঁদির বালা এবং গলায় মিহি সোনার চেন ঝিকমিক করছিল। ভদ্রলোক সাবধানেই বসলেন সোফায়। তবু মনে হল, সোফাটা যে কোনো মুহূর্তে মড়াত করে ভেঙে পড়বে।

ষষ্ঠীচরণ পর্দার ফাঁকে মুণ্ডু বাড়িয়েছিল। তার চোখও ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। কর্নেল বললেন, 'ষষ্ঠী, কফি নিয়ে আয়।' তখন সে নরদানব দেখছে। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই সে অদৃশ্য হল।

কর্নেল বললেন, 'আপনি শরীরচর্চা করেন বুঝি?'

ব্যায়ামবীর সলজ্জ হাসলেন। 'এক সময় করতুম স্যার! বার তিনেক দেহশ্রী খেতাব পেয়েছিলুম। তবে এখন বয়স হয়েছে। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। আর ওসব হয়ে ওঠে না।'

'আপনার গণ্ডগোলটা কী, বলুন এবার।'

ব্যায়ামবীর বটুক রায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তারপর উনি যে কাহিনি শোনালেন, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি রোমাঞ্চকর।

মেদিগঞ্জ বহরমপুর থেকে সামান্য দূরে গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো গঞ্জ ছোটোখাটো একটা শহরই বলা যায়। বটুকবাবু সম্প্রতি কিছুকাল আগে একটা ক্লাব করেছেন। ক্লাবটার নাম শ্মশানবন্ধু ক্লাব। মেদিগঞ্জের সব মড়া এই ক্লাবের ছেলেরাই বটুকবাবুর নেতৃত্বে শ্মশানে নিয়ে যায়। সৎকারের সব দায়িত্ব তারা নেয়। গরিব মানুষের মড়া কিংবা রাস্তাঘাটের বেওয়ারিশ মড়া, এখন আর আগের মতো গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয় না। শাস্ত্রমতে চিতায় পোড়ে এবং সৎকারাদি হয়। সব খরচ ক্লাবের।

কিন্তু রোজই তো আলো লোক মরে না। তাছাড়া আজকাল কত সব ওষুধ বেরিয়েছে। সহজে লোক মরে না। এদিকে বটুকবাবু এবং ক্লাবের ছেলেদের যেন নেশা ধরে গেছে মড়া বয়ে। মড়া না পেলে মন ভালো থাকে না। সবই অভ্যাস!

তাই কারুর গুরুতর অসুখবিসুখ হলেই ওরা তক্কে তক্কে থাকেন। বাড়ির আনাচেকানাচে ওত পেতে বেড়ান। তারপর যেই কান্নাকাটি শোনেন, অমনি বটুকবাবু একলাফে বাড়িতে ঢুকে হাঁক দেন, 'কোথায় লাশ?' 'পেছনে তাঁর চ্যালারা বাড়ি কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'বলো হরি হরি বোল।'

গণ্ডগোল ঘটেছে দুদিন আগে। সেদিন ছিল শুক্রবার।

মেদিগঞ্জে দুজন প্রমথবাবু আছেন। একজন হলেন প্রমথ মিত্তির তিনি স্কুলমাস্টার। অন্যজন হলেন প্রমথ বোস—তিনি পোস্টমাস্টার। দুজনকেই লোকে প্রমথমাস্টার বলে। দুজনেরই বয়স

পঞ্চাশের ওধারে। দুজনেই রোগা, খেঁকুটে চেহারার মানুষ। একজন ভোগেন অম্বলে, অন্যজনের লিভার খারাপ।

শুক্রবার সন্ধ্যার একটু আগে সতু নামে ক্লাবের একটি ছেলে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে খবর দিল, প্রমথমাস্টার টেঁসে গেছে। বাজারে গিয়ে এইমাত্র শুনে এসেছে সে। কিন্তু কোন প্রমথমাস্টার, সেটার হদিস করতে পারেনি।

বটুকবাবু, বললেন, 'চল তবে। আগে কাছেরটাই দেখি।'

কাছেরটা মানে স্কুলমাস্টার প্রমথবাবু—প্রমথ মিত্তির। তিনি যদি না টেঁসে থাকেন, তাহলে পোস্টমাস্টার প্রমথবাবু অর্থাৎ প্রমথ বোসের টেঁসে যাওয়া অবধারিত। মৃত্যুর খবর তো আর মিথ্যা রটতে পারে না। বিশেষ করে দুজনেই ওঁরা নিরীহ সজ্জন মানুষ বলে পরিচিত।

প্রমথ মিত্তিরের বাড়ির কাছে যেতেই কান্নাকাটি শোনা গেল। অমনি বটুকবাবু গামছাখানা একটানে কোমরে বেঁধে বাড়ি ঢুকে পড়লেন। তারপর যথারীতি হাঁক চাড়লেন, 'লাশ কোথায়?'

এদিকে ওঁর চ্যালারাও পেছন-পেছন ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'বলো হরি, হরি বোল।'

অমনি কান্নাকাটি গেল থেমে। তারপর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মাস্টার-গিন্নি। রণরঙ্গিণী চেহারা, বাঁ হাতে খ্যাংরা ঝাঁটা। ডান হাত কোমরে আঁচল জড়াতে জড়াতে 'হুংকার দিলেন, 'তবে রে মড়াখেকো শকুনের পাল! তোদের জ্বালায় একটু কাঁদবারও জো নেই রে হতচ্ছাড়ারা!'

মাস্টার-গিন্নি দজ্জাল মহিলা। ব্যায়ামবীরেরও তোয়াক্কা করেন না। বেগতিক দেখে বটুকবাবু তাঁর দলবল নিয়ে কেটে পড়লেন। কিন্তু খামোখা কান্নাকাটির কী মানে হয়! বটুকবাবু বললেন, আয়রে পোস্টমাস্টার প্রমথ বোসের বাড়ি যাই।'

শ্মশানবন্ধু ক্লাব দৌড়ে চলল পোস্টমাস্টারের বাড়ির দিকে।

প্রমথ বোসের বাড়িটা একেবারে গঙ্গার ধারে নিরিবিলি জায়গায়। চারদিকে গাছপালা, তার মধ্যে একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। কাছাকাছি গিয়ে ভল্টু বলল, 'কই? কান্নাকাটি তো শোনা যাচ্ছে না।'

বটুকবাবু বললে, 'ধুর বোকা! পোস্টমাস্টার বাবুর কে আছে যে কাঁদবে? উনি একা থাকেন না?

তপু বলল, "কেন—ওঁর চাকর ভোলা তো আছে। তার কাঁদা উচিত!"

কিন্তু বাড়ি একেবারে চুপচাপ। সদর দরজা হাট করে খোলা। বেলা পড়ে এসেছে। দিনের আলো কমে গেছে। ডেকে ভোলার সাড়া পাওয়া গেল না। একটা ঘরে আলো জ্বলছে। বটুকবাবু বললেন, 'তোরা চুপচাপ উঠোনে দাঁড়িয়ে থাক। আমি দেখে আসি ব্যাপারটা।'

বটুকবাবু বারান্দায় উঠে দেখলেন ঘরের দরজা ফাঁক হয়ে আছে। চল্লিশ পাওয়ারের বাল্বের আলো তাতে পুরো দেওয়ালে আলো খেলে না একেবারে। উঁকি মারতেই চোখে পড়ল, খাটে পোস্টমাস্টার চিত হয়ে শুয়ে আছেন। বটুকবাবু কাশলেন। ডাকলেন। তবু সাড়া নেই। তখন ভেতরে ঢুকে গেলেন।

প্রমথবাবুর চোখ খোলা। কিন্তু চোখের পাতা স্থির। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ। কপালে হাত রেখে বটুকবাবুর মনে হল, ভীষণ ঠান্ডা হিম। অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'লাশ পাওয়া গেছে ডোমপাড়া থেকে খাটুলি নিয়ে আয় শিগগির!'

চ্যালারা চেঁচিয়ে উঠল, 'বলো হরি, হরি বোল' সতু আর ভল্টু দৌড়োল ডোমপাড়া খাটুলি কিনতে। খরচ ক্লাবের।

খাটুলি চলে এল মিনিট দশেকের মধ্যে। এদিকে বালিশের নিচে থেকে চাবি নিয়ে ঘরে তালা এঁটে প্রমথ বোসের মড়া খাটুলিতে চাপিয়ে হরিধ্বনি দিতে দিতে শ্মশানবন্ধু ক্লাব ছুটে চলেছে শ্মশানের দিকে। ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

শ্মশানের নীচেই গঙ্গা। একটা তেচালা ঘরে ঘাটোয়ারি বাবুর অফিস। লণ্ঠন জ্বেলে বসেছিলেন ঘাটোয়ারি বাবু। মেঝেয় বসে বিড়ি ফুঁকছিল মধু ডোম। সবে তেচালার সামনে মড়া নামিয়েছেন, এসে গেল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। খাটুলি তুলে তেচালায় ঢোকানো হল!

ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, 'কার মড়া বটুকবাবু?' বটুকবাবু বললেন, 'পোস্টমাস্টার প্রমথবাবুর।'

'কিসে গেলেন?'

'তা বলতে পারব না মশাই।' বটুকবাবু বললেন, 'নিশ্চয় অসুখ হয়েছিল। বিছানায় মরে পড়েছিলেন। শ্মশানে নিয়ে এলুম।'

ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, 'তাহলে যে একটা ডেথ সার্টিফিকেট চাই বটুকবাবু।'

'কেন কেন? বটুকবাবু খচে গেলেন। 'এত মড়া এনেছি, কারুর তো চাননি মশাই!'

'আহা ইনি যে সরকারি লোক। পাবলিকের মড়া নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। বুঝলেন না? আইনের ব্যাপার!'

'ধুর মশাই, এতকাল আইন দেখাননি। এখন আইন দেখাচ্ছেন।'

ঘাটোয়ারিবাবু গোঁ ধরে বললেন, 'না মশাই। বিনা ডেথ সার্টিফিকেটে আমি মড়া পোড়াতে দেব না এখানে।'

বটুকবাবু ওঁকে তুলে গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলবেন কিনা ভাবছেন, সতু বলল, 'ঠিক আছে বটুকদা, কুঞ্জ ডাক্তারের কাছ থেকে এক্ষুনি সার্টিফিকেট এনে দিচ্ছি।'

বলেই ডানপিটে সতু বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টিটা কমে এল। ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, 'ততক্ষণে আমি খেয়ে আসি।' মধু ডোমও বলল, আমিও খেয়ে আসি তাহলে।' তারপর দুজনে চলে গেল। যাবার সময় ঘাটোয়ারিবাবু লণ্ঠনটা নিয়ে গেলেন। তপু বারণ করতে যাচ্ছিল, বটুকবাবু বললেন 'ছেড়ে দে! আসলে উনি ভীষণ রেগে গেছেন ঘাটোয়ারিবাবুর ওপর।'

অন্ধকারে বসে রইলেন ওঁরা। বৃষ্টিটা একটু পরে আবার বেড়ে গেল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল মাঝে মাঝে। মেঘও ডাকছিল। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছিলেন বলে বটুকবাবুর টর্চ নিতে মনে ছিল না। ছেলেগুলোরও খেয়াল হয়নি। এখন মনে হচ্ছিল একটা আলো থাকলে ভালো হত।

তেচালার একটা পাশে খাটুলিতে পোস্টমাস্টার-বাবুর মড়া অন্যপাশে মেঝেয় বসে আছেন বটুকবাবুরা। হঠাৎ একটা খশখশে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কানে এল। তারপর বিদ্যুৎ চমকাতেই বটুকবাবু দেখলেন, কে একজন তেচালা থেকে নেমে গেল। বটুকবাবু বললেন, 'কে কে!' কোন সাড়া এল না।

স্বপন বলল, 'দেশলাই জ্বেলে কী হবে?'

স্বপন বলল, 'আমার কেমন যেন খটকা লাগছে। ভল্টু, আয় তো!'

দুজনে খাটুলির কাছে গেল। ভল্টু দেশলাই জ্বালল। অমনি চমকে উঠল ওরা। চমকালেন বটুকবাবুও। খাটুলি শূন্য। মড়া নেই।

ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে। পোস্টমাস্টারবাবু মরে ভূত হতেই পারেন। কিন্তু ভূত হয়ে নিজের মড়া নিয়ে যাবেনটা কোথায়? কেনই বা যাবেন?

সবাই বৃষ্টির মধ্যে ডাকাডাকি এবং খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু প্রমথ বোসের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন স্বপন বলল, 'বটুকদা চলুন তো পোস্টমাস্টার বাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি।' সবাই তাতে সায়

দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের কথায় বটুকবাবু রাজি হলেন। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ফের হাজির হলেন প্রমথ বোসের বাড়িতে।

নাঃ। যেমন তালা দিয়ে এসেছিলেন, তেমনি তালা ঝুলছে সদর দরজায়। চাবি পোস্টমাস্টারের বালিশের তলায় পেয়েছিলেন। তাই বটুকবাবুর কাছে চাবি ছিল। ভেতরে ঢুকে দেখেন, ঘরের দরজাতে তালা তেমনি ঝুলছে। সে-তালা খুলে ঘরের ভেতরও দেখলেন। কেউ নেই।

ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে এক টুকরো চাঁদও উঠেছে। হতবাক হয়ে বটুকবাবুরা বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল সতুর সঙ্গে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কী ব্যাপার? আপনারা চলে এসেছেন যে শ্মশান থেকে। কুঞ্জবাবু কিছুতেই মুখের কথা শুনবেন না। মড়া পরীক্ষা করে তবে সার্টিফিকেট দেবেন। তাই ওঁকে শ্মশানে বসিয়ে রেখে আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছি।' ঘাটোয়ারিবাবু বললেন, ফিরে এসে আপনাদের দেখতে পাননি।'

বটুকবাবু বললেন, কিন্তু মড়া? মড়া যে নেই!'

'নেই মানে? সতু হাসল। মড়া থাকবে না কেন? দিব্যি আছে।'

সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললেন শ্মশানের দিকে। যেতে যেতে ব্যাপারটা সংক্ষেপে স্বপন জানিয়ে দিল সতুকে। সতু বিশ্বাসই করল না কথাটা। মড়া পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিল এবং আবার কখন ফিরে এসে খাটুলিতে শুয়েছে এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

কিন্তু বটুকবাবু গিয়ে দেখেন হ্যাঁ, সত্যি খাটুলিতে মড়া রয়েছে। কিন্তু কাপড় ঢাকা দেওয়া কেন? টেবিলে লণ্ঠন রেখে ঘাটোয়ারিবাবু বসে আছেন। পাশে একটা টুলে বসে আছেন কুঞ্জবাবু ডাক্তার। মধু ডোম বসে বসে ঢুলছে। কুঞ্জডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'বটুক না এলে মড়া হাত দেব না বলে ওয়েট করছি। নাও বটুক কাপড় ওঠাও। দেখি, সত্যি মরেছে মাস্টারবাবু—নাকি কি জ্যান্ত আছে এখনও?'

হাসতে হাসতে মস্ত টর্চ জেলে খাটুলির দিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। বটুকবাবু কাপড় ওঠালেন তারপর ভীষণ চমকে গেলেন। চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ক্লাবের ছেলেরাও হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুঞ্জ ডাক্তার বলে উঠলেন, 'এ কী হে বটুক এ তো পোস্টমাস্টার নয় দেখছি।'

মড়াটা স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের।

কুঞ্জ ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখেই বললেন 'মড়া তাতে সন্দেহ নেই। তবে বটুক, তোমায় একটা কথা বলি শোনো! বেশি উৎসাহ ভালো নয়। এক প্রমথের মড়া শুনে এলুম। এসে দেখি অন্য প্রমথ। প্রমথ মিত্তিরের সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না বাপু, সে তুমি যাই বলো। মিত্তির বউ বড়ো দজ্জাল মহিলা। আমার মুণ্ডু মুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।'

কুঞ্জ ডাক্তার গোঁ ধরে চলে গেলেন। বটুকবাবু ব্যায়ামবীরের শরীরে তখন আর একফোঁটা জোর নেই। ধপাস করে বসে পড়ে বললেন, 'তোরা যা হয় কর সতু! আমার মাথা ঘুরছে।'

সতু আর ভল্টু দৌড়ে খবর দিতে গেল স্কুলমাস্টারের বাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দজ্জাল মহিলা এবং আরও সব লোক এসে পড়ল। এতক্ষণে দেখা গেল প্রমথ মিত্তিরের মাথার পেছনে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে আছে। শক্ত কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল। সবাই শিউরে উঠল। এ তো হত্যাকাণ্ড।

কাজেই মড়া পুড়ল না। পুলিশ এল রাতদুপুরে। মড়া চালান গেল সদরের মর্গে।

এদিকে পোস্টমাস্টার প্রমথ বোসের পাত্তা নেই। তাঁর চাকর ভোলারও নেই। বাড়িতে এখন তালা ঝুলছে।

দুই

ট্রেনে মেদিগঞ্জ পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। বটুকবাবুরা আগে এখানকার বনেদি বড়োলোক ছিলেন। এখন অবস্থা কিছুটা পড়ে এসেছে। গঙ্গার ধারে সেকেলে গড়নের প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ি। আমাদের যত্নআত্তির ত্রুটি হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পেয়ে শ্মশানবন্ধু ক্লাবের ছেলেরা এসে ভিড় করল। কর্নেল তাদের সঙ্গে কৌতুকে মেতে উঠলেন! বৃদ্ধ গোয়েন্দা প্রবরের যা স্বভাব।

হাস্য পরিহাসের বিষয় হল মড়া। খাটুলিতে করে শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যদি মড়া জ্যান্ত হয়ে লাফ দিয়ে পালাতে থাকে, তাহলে কেমন হবে? ছেলেগুলো হাসতে থাকল। মজার ব্যাপার তো হবে! তবে এ যাবৎ তেমনি হয়নি শুধু শ্মশানের তেচালা থেকে পোস্টমাস্টারের মড়াটা নিয়ে যাওয়া ছাড়া।

একসময় বটুকবাবু এসে ঘোষণা করলেন 'থানার পুলিশ অফিসার হেমাঙ্গ নন্দী এসেছেন। সতু ভল্টু তোরা সব এখন যা। ক্লাবে গিয়ে বোস আমি যাচ্ছি।'

ওরা বিমর্ষভাবে চলে গেল। কর্নেলের সঙ্গে খুব জমে উঠেছিল। পুলিশ অফিসার হেমাঙ্গবাবু ঘরে ঢুকলেন। সহাস্যে নমস্কার করে বললেন, 'কর্নেল! আপনার ট্রাংকলের পরই আমি পোস্ট অফিসে গিয়েছিলাম। নতুন পোস্টমাস্টার আজ সকালে জয়েন করেছেন।' খোঁজ নিয়ে জানলুম প্রমথ মিত্তির মারা যাওয়ার পরদিন অর্থাৎ শনিবার তাঁর নামে একটা পার্সেল এসে পৌঁছোয়। পোস্টম্যান মোটে দুজন। হরিপদবাবু আর মাখনবাবু। মিত্তিরমশাইয়ের বাড়িটা হরিপদবাবুর বিটের মধ্যে পড়ে। যাই হোক, সেদিন পোস্টামাস্টার না থাকায় ওরা দুজনেই সব কাজকর্ম করেন। দুপুরে হরিপদবাবু পার্সেলটা দিয়ে আসেন মিত্তিরমশাইয়ের স্ত্রীকে। সাধারণ পার্সেল ডেলিভারি দেন।'

কর্নেল বললেন, 'রেজিস্ট্রি পার্সেল নয়?'

'না।' হেমাঙ্গবাবু বললেন, 'পার্সেলের প্যাকেটের ভেতরে অম্বলের ওষুধ পাওয়া গেছে। কলকাতার একটা আয়ুর্বেদিক ওষুধ কোম্পানি থেকে বিনামূল্যে পাঠানো নমুনা ওষুধ। মিত্তিরমশাইয়ের অম্বলের অসুখ ছিল। বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখে থাকবেন।'

'শুক্রবার সন্ধ্যায় মিত্তিরমশাই কোথায় ছিলেন তদন্ত করেছেন কি?'

'হ্যাঁ। উনি বাসুদেববাবুর মেয়েকে সাতটা পর্যন্ত পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হারানবাবুর কাছে শোনেন পোস্টমাস্টারমশাই মারা গেছেন। তাঁর বড়ি শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই শুনে মিত্তিরমশাই শ্মশানের দিকে চলে যান। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুতা ছিল শুনলুম।'

'তাহলে ওঁকে পথেই খুন করা হয়েছিল?'

'ঠিক তাই। আচমকা ওর মাথার পেছনে শক্ত কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়। নিশ্চয় পড়ে গিয়েছিলেন মাটিতে। রক্তও পড়া উচিত। কিন্তু বৃষ্টির জন্য ধুয়ে গেছে। কাজেই জায়গাটা আমরা খুঁজে বের করতে পারিনি।'

বটুকবাবু কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন 'বুঝতে পেরেছি মিত্তির মশাইকে খুন করে তাঁর বডিটা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল খুনি। হয়তো গঙ্গায় ফেলে দেবার মতলব ছিল। আমরা থাকায় পারেনি।'

হেমাঙ্গবাবু বললেন 'হয়তো তাই। আপনারা যেমন শ্মশান থেকে পোস্টমাস্টারবাবুর খোঁজে তাঁর বাড়ির দিকে দৌড়ে গেছেন, তেমনি সে মিত্তিরমশাইয়ের বডি শূন্য খাটুলিতে রাখতে সুযোগ পেয়েছে। ভেবেছিল পোস্টমাস্টারের বডি বলেই চিতায় উঠবে। রাতবিরেতে অত কে লক্ষ্য করবে—তাছাড়া ওই বৃষ্টি।'

'তাহলে পোস্টমাস্টারকে সে তেচালা থেকে নিশ্চয় বেরিয়ে যেতে দেখেছিল এবং বিদ্যুতের আলোয় চিনতেও পেরেছিল।'

বটুকবাবুর কথা শুনে কর্নেল বললেন, 'তাই সম্ভব। কিন্তু পোস্টমাস্টার গেলেন কোথায়? তাঁর চাকর ভোলাই বা গেল কোথায়?

হেমাঙ্গবাবু বললেন, 'ভোলাকে পাওয়া গেছে। দু মাইল দূরে গ্রামে তার বাড়ি। তার বক্তব্য হল সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল। তারপর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারেনি। সেটা সত্যি বলেই মনে হয়েছে আমাদের। কারণ এখনও সে প্রবল জ্বরে ভুগছে। ডাক্তারের মতে ম্যালেরিয়া।'

কর্নেল বললেন, 'আপনারা কাকে খুনি বলে সন্দেহ করেছেন?'

পোস্টমাস্টারকে প্রথমে সন্দেহ করেছিলুম। মনে হয়েছিল আগাগোড়া ব্যাপারটা তাঁরই প্ল্যান। পড়ার ভান করে পড়ে থাকা, শ্মশান থেকে সুযোগ পেয়ে কেটে পড়া এবং মিত্তির মশাইকে খুন করা। কিন্তু শেষে ভেবে দেখলুম এতে অনেক হিসেবের গণ্ডগোল হচ্ছে প্রথম কথা শ্মশান থেকে কেটে পড়ার পর মিত্তিরমশাইকে খুব করার জন্য উপযুক্ত জায়গায় পেয়ে যাবেন এটা খুবই আকস্মিক ব্যাপার। এক হতে পারে আগেই খুন করে লুকিয়ে রেখে বাড়ি ফিরে মড়া সেজেছিলেন। কিন্তু হারানবাবুর সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে পোস্টমাস্টারকে শ্মশানে নিয়ে যাবার পরও মিত্তিরমশাই জীবিত ছিলেন অতএব এ ব্যাপারটা ঠিক নয়। দ্বিতীয় কথা রোগা টিঙটিঙে দুর্বল মানুষ তিনি। মিত্তিরমশাইকে খুন করা সম্ভব হলেও তাঁর বডি বয়ে নিয়ে শ্মশানের তেচালায় ঢোকা একেবারে অসম্ভব! তাছাড়া উনি নাকি রোজ সন্ধ্যায় আফিং খেতেন। ভোলা বলেছে।'

'আফিং খেতেন?' কর্নেল চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ। তাছাড়া ওঁর ঘর খুঁজে আমরা আফিংয়ের কৌটোও পেয়েছি।'

কর্নেল একটু হাসলেন। 'যাক তাহলে খাটুলি থেকে উঠে ওঁর মড়া চলে যাওয়ার রহস্য ফাঁস হল।'

বটুকবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ফাঁস হল কীভাবে?'

'পোস্টমাস্টার আফিং খেয়ে মড়ার মতো পড়ে ছিলেন। আপনারা ওকে মড়া ভেবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর গঙ্গার ধারে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটানিতে ওঁর মউতাত কেটে যায় এবং খাপ্পা হয়ে চলে আসেন। আফিংখোরদের মউতাত হঠাৎ গেলে তারা ভীষণ খাপ্পা হয়ে যায়।

'কিন্তু উনি গেলেন কোথায় তাহলে?'

'সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।'

হেমাঙ্গবাবু বললেন, 'কর্নেল, গত বছর আমি নদিয়ার রামনগর থানায় থাকার সময় চৌধুরীবাবুদের মন্দিরের বিগ্রহ চুরির রহস্য আপনি যেভাবে ফাঁস করেছিলেন, এবারও তাই করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে। সেবারকার মতোই সব রকম সাহায্য আপনি পাবেন। মিত্তিরমশাইয়ের হত্যারহস্য নিয়ে আমরা হিমশিম খাচ্ছিলুম। আজ সকালে আপনার ট্রাংকল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছি।'

'দেখা যাক।' গোয়েন্দাপ্রবর দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন। 'হুঁ-একটা কথা। পোস্টমাস্টার বাবুর ঘরের চাবিটা কি আপনার কাছে? চাবিটা আমি চাই।'

হেমাঙ্গবাবু ব্রিফকেস খুলে চাবিটা বের করে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এবং চা-টা খেয়ে উনি বিদায় নিলেন। বটুকবাবু বললেন, 'তাহলে বিশ্রাম করুন কর্নেল! আমি একবার ক্লাব থেকে ঘুরে আসি।'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'রাতে কি একটা মড়া পাবার আশা করছেন বটুকবাবু?'

বটুকবাবু হো হো করে হাসলেন। 'পেলে খুশিই হব। তবে সে-মড়া আবার জ্যান্ত হয়ে না পালিয়ে যায়।'

বটুকবাবু চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্নেল ডাকলেন, 'বটুকবাবু শুনুন!'

বটুকবাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। তখন কর্নেল বললেন, 'আপনি তো শরীরচর্চা করেছেন একসময়। ব্যায়ামবিদ ছিলেন। কখনও কুস্তি লড়েছেন?

বটুকবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, 'হুঁউ, লড়েছি বইকি। মেদিগঞ্জেই একসময় প্রতি বছর কুস্তি প্রতিযোগিতা হত। তখন।'

'আপনার সঙ্গে কুস্তি লড়ার মতো পালোয়ান আছে এ তল্লাটে?'

'আছে বইকি। মেদিগঞ্জেই আছে।'

'নাম কী তাঁর?'

'বেণীমাধব কুণ্ডু। বাজারের ওদিকে বাড়ি।'

'কী করেন ভদ্রলোক?'

বটুকবাবু বাঁকা মুখ করে বললেন, 'বেণী একটা জুয়াড়ি। একসময় ওদের মস্ত ব্যবসা ছিল। জুয়ো খেলে সব লড়িয়ে দিয়েছে। এখন ওর কাজ হল এলাকার মেলায় গিয়ে জুয়োর আসর পাতা। সারা বছর এখানে-ওখানে মেলা বসে নানা উপলক্ষে। মেলায়-মেলায় জুয়োর ছক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কার্বাইড ল্যাম্প জ্বেলে বসে থাকে। চামড়ার কৌটোর হরতন ইস্কাপন চিড়িতন রুইতন ড্রাগন আর মুকুট আঁকা ছ-টা চৌকো গুটি ভরে নাড়ে। তারপর ছকের ওপর ছড়িয়ে দেয়। ছকেও ওইসব চিহ্ন আঁকা। লোকে একেকটা চিহ্নে পয়সা ফেলে দান ধরে। প্রতি গুটির ছ-পিঠে ওই ছ-টা চিহ্ন আছে। গুটির ওপর পিঠে যে চিহ্ন, ছকের সেই চিহ্নের ঘরে পয়সা থাকলে খেলুড়ে ডবল পয়সা পাবে। যার না মিলবে, সে হারবে।'

কর্নেল বললেন, 'জানি। দেখেছি।'

বটুকবাবু বললেন, 'হঠাৎ একথা কেন কর্নেল?'

'এমনি।' বলে কর্নেল চোখ বুঝলেন। বটুকবাবু মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

রাত দশটা বাজল দেয়ালঘড়িতে। খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল, বটুকবাবু আর আমি বারান্দায় বসে কথা বলছিলুম। ততক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা উঠেছে গাছপালার ফাঁকে। আকাশে টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। বারবার চাঁদটাকে ঢেকে দিচ্ছে। হঠাৎ কর্নেল বললেন, 'চলুন বটুকবাবু, পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়িতে হানা দেওয়া যাক।'

বটুকবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'যাবেন? বেশ তো, চলুন! এখান থেকে শর্টকাটে চুপিচুপি নিয়ে যাব।'

ওঁদের বাড়ির পেছনে বাগান। বাগানের গেটে দিয়ে আমরা আগাছার জঙ্গলে পড়লুম। টর্চ জ্বালা মানা। তবে চাঁদের আলোয় হেঁটে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল না। পোস্টমাস্টারের নিরিবিলি বাড়িটা দেখে গা ছমছম করল অজানা ভয়ে। গাছপালার ভেতর বাড়িটা যেন হানাবাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পেছন দিকে একটা বন্ধ জানালার কাছে কর্নেল দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঠিক তখনই কানে এল শব্দটা। ঠক ঠক ঠক....ঠক ঠক ঠক।

বটুকবাবু ফিশফিশ করে বললেন, 'কাঠঠোকরা পাখি না?'

কর্নেল ইশারায় চুপ করতে বললেন। রাতের বেলা কাঠঠোকরা পাখি শব্দ করবে কেন বুঝলুম না। তাছাড়া শব্দটা শোনা যাচ্ছে যেন পোস্টমাস্টারবাবুর ঘরের ভিতর থেকে।

তারপর ঝর ঝর করে কি ঝরে পড়ল। বটুকবাবু এবার ফিশফিশ করে বললেন, 'সিঁদেল চোর!' কর্নেল ওঁকে চুপ করতে ইশারা করলেন। কিন্তু ঠক ঠক শব্দটা যেই একটু জোরে হয়েছে এবং ঝর ঝর করে সম্ভবত চুনবালি খসে পড়েছে, অমনি ব্যায়ামবীরকে বাগ মানানো গেল না।

'তবে রে ব্যাটা চোর' বলে আচমকা পেল্লায় হাঁক ছেড়ে উনি সামনে ছিটকে গেলেন। চাঁদের আলোয় দেখলুম, ওর বিশাল শরীর বাড়ির অন্যদিকে মিলিয়ে গেল। ধুপ ধুপ শব্দে মাটি কাঁপল। তারপর ধপাস শব্দ হলে কোথায়।

তারপর নরদানবের হুংকার এবং 'বাপরে' বলে আর্তনাদও শুনতে পেলুম। দৌড়ে বাড়ির সামনে সদর দরজায় পৌঁছোলুম দুজনে। দরজা খোলা। উঠোনে দাঁড়িয়ে বটুকবাবু নিজের প্রকাণ্ড বাহুতে হাত বুলোচ্ছেন। আমাদের দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বিছুটি বিছুটি।'

টর্চর আলো জ্বেলে কর্নেল বললেন, 'সিঁদেল চোর বিছুটি ঘা মেরে পালিয়েছে দেখছি বটুকবাবু।'

বটুকবাবু বললেন, 'আলকুশিও হতে পারে। ইশ! জ্বালা করছে প্রচণ্ড।'

'চোরকে দেখতে পেয়েছেন কি?'

বটুকবাবু করুণমুখে বললেন, না। পেলে তো এক আছাড়ে ফুটিফাটা করে দিতুম। বারান্দার থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিল। যেই গেছি আর বিছুটি না আলকুশি ঘষে দিয়েছে।'

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে তালা ঝুলছে। অন্যটার তালা ভাঙা। সে ঘরটাই পোস্টমাস্টারের শোবার ঘর। বটুকবাবু সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিলেন। দেখলুম, একখানে দেয়ালের অনেকটা ধস ছাড়িয়ে দিয়ে গেছে চোর। পরীক্ষা করে কর্নেল বললেন, 'দেয়ালে কিছু পোঁতা আছে কিনা খুঁজছিল।'

বললুম 'গুপ্তধন নয় তো?'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন তাও হতে পারে। দেখছ না সারা ঘর ওলট-পালট করে খুঁজেছে! না পেয়ে শেষে দেয়ালে—বলে দেয়ালের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মেঝে থেকে হাতখানেক উঁচুতে খোঁড়া হচ্ছিল। সেখানে কী পরীক্ষা করে কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। 'হুঁ, এখানে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা ছিল বলে সন্দেহ হয়েছিল চোরের।'

বটুকবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খুঁজছিল বলুন তো?'

'ওই তো' জয়ন্ত বলল, 'গুপ্তধন!'

বটুকবাবু বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপরটায় হাত বুলোতে বুলোতে হেসে ফেললেন, 'যাঃ! প্রমথ মাস্টারের ঘরে গুপ্তধন? অসম্ভব ব্যাপার।'

কর্নেল টর্চের আলো ফেলে খসে পড়া চুনবালিগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'চোর ঠিকই ধরেছিল। এখানে সদ্য নতুন পলেস্তারা করা হয়েছিল দেখছি। বটুকবাবু দেখুন তো একটা শক্ত খুন্তি বা শাবল পান নাকি। রান্নাঘরে খুঁজে দেখুন। টর্চ নিয়ে যান।'

বটুকবাবু কর্নেলের টর্চ নিয়ে চলে গেলেন। তক্ষুনি ফিরে এলেন একটা কালিমাখা ছোট্ট লোহার গোঁজ নিয়ে। বুঝলুম। ওটা দিয়ে ভোলা কয়লা ভাঙত। কর্নেল বললেন। 'বটুকবাবু জায়গাটা খুঁড়ুন।

বটুকবাবু অবাক হয়ে খুঁড়তে শুরু করলেন। নরদানবের হাতের ঘা। বাড়ি ভেঙে পড়বে মনে হচ্ছিল। গোঁজ মেরে চাপ দিচ্ছেন, আর পুরোনো ইটের টুকরো সুদ্ধ চাবড়া উঠে আসছে। একটু পরেই চাবড়ার সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা সাদা প্যাকেটের মতো জিনিস। দেখামাত্র আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'এ কী! এ যে দেখছি একটা পার্সেল।'

কর্নেল প্যাকেটটা কুড়িয়ে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'হ্যাঁ, পার্সেল। রেজিস্টার্ড পার্সেল। গালার সিল ঠিকঠাক আছে। পুলিশ অফিসার হেমাঙ্গবাবুকে আমি এই পার্সেলটারই খোঁজ নিতে বলেছিলুম। আমার অনুমান ঠিক দেখছি। স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের নামেই এসেছে। অথচ ওঁকে ডেলিভারি না দিয়ে পোস্টমাস্টারবাবু এটা এখানে গুপ্তধনের মতো পুঁতে রেখেছিলেন।'

বটুকবাবু বললেন, 'কী আছে ওতে? অম্বলের ওষুধ নাকি?'

কর্নেল হাসলেন। 'ওষুধ কোম্পানির নামেই পাঠানো হয়েছিল প্রমথ মিত্তিরের কাছে। যাই হোক, আপাতত আর এখানে নয়। চলুন ফেরা যাক।'

রহস্যময় পার্সেলটার ভেতর কী এমন দামি ওষুধ আছে যে প্রমথ বোস ওটা প্রথম মিত্তিরকে ডেলিভারি না দিয়ে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন তা আমার মাথায় ঢুকছিল না। পার্সেলটা খুলে দেখার কথাও বারকতক কর্নেলকে বললুম। গোয়েন্দাপ্রবরের কানেই যেন ঢুকল না। উপরন্তু সেই রাত্রেই থানায় গিয়ে হেমাঙ্গ নন্দীর কাছে জমা দিয়ে এলেন।

সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্নেল বললেন, 'বটুকবাবু, মিত্তিরমশাইয়ের স্ত্রী নাকি দজ্জাল মহিলা, সবসময় হাতে খ্যাংরা ঝাঁটা নিয়ে থাকেন?

বটুকবাবু গাল চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মেদিগঞ্জের ওই একজনকেই একটু ভয় করে চলি।'

'চলুন না একবার আমাকে নিয়ে!'

'সর্বনাশ!' বটুকবাবু আঁতকে উঠলেন। 'সামনে আমি যাব না কর্নেলস্যার! বরং আপনাকে বাড়িটা দেখিয়ে দেব দূর থেকে। সেদিন সত্যি সত্যি প্রমথমাস্টারের লাশ পুড়ে গেল শেষ পর্যন্ত নইলে আমাকে নাকি উনি দুবেলা অভিশাপ দিচ্ছেন আর ঝাঁটা নিয়ে শাসাচ্ছেন।'

কাজেই দূর থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে কেটে পড়লেন বটুকবাবু। কর্নেল দরজার কড়া নাড়তেই 'কে র‍্যা' বলে ভেতর থেকে এমন চিলচ্যাঁচানি ভেসে এল যে আমার পিলে চমকে উঠল। তারপর দরজা খুলে গেল। রণচণ্ডী বটে চেহারাখানা। কিন্তু কর্নেলের তো বটেই, আমারও সৌভাগ্য যে হাতে ঝাঁটা নেই। দরজায় শান্ত সৌম্য ঋষিতুল্য, সাদা দাড়ি এবং মাথায় সায়েবি টুপি তাছাড়া চোহারাও সায়েবি, গলায় ঝুলন্ত ক্যামেরা আর বাইনোকুলার এমন এক মূর্তি দেখেই বোধ করি ভদ্রমহিলা থ' বনে গেছেন।

কর্নেল গলায় মধু মাখিয়ে বললেন, 'প্রণাম দিদিভাই।' অমনি মিত্তিরগিন্নি গলে জল হয়ে গেলেন।

বাইরের ঘরে খাতির করে বসালেন। কর্নেল নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনার স্বামীর হত্যারহস্যের কিনারা করতেই এসেছি দিদিভাই।'

মিত্তিরগিন্নি চোখ মুছতে মুছতে হুংকার দিয়ে বললেন, 'ওই ড্যাকরা হতচ্ছাড়া ডাকবাবুই ওকে খুন করেছে। ওকেই আপনারা ধরুন! ও পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনারা না ধরতে পারেন, দেখবেন আমিই ওকে ধরব। গর্তে লুকিয়ে থাকলে চুলের ঝুঁটি ধরে বের করব। তারপর মুড়ো খ্যাংরা ঝাড়ব ওর পিঠে।'

কর্নেল হাত তুলে আশ্বস্ত করে বললেন, 'দয়া করে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন দিদিভাই।'

মিত্তিরগিন্নি শান্ত হয়ে বললেন, 'বলুন।'

'আপনার স্বামীর নামে কি মাঝে মাঝে পার্সেল আসত ডাকে?

'আসত। পরশুই তো একটা এসেছে। থানার বটুবাবু জানতে এসেছিলেন। ওঁকে দেখিয়েছি।'

'এর আগেও এসেছে তো?'

'হুঁউ। এসেছে।'

'আপনার সামনে কখনও সে-সব পার্সেল খুলেছেন মিত্তিরমশাই? কী থাকত ওতে?'

'ওর অম্বলের অসুখ ছিল। তারই ওষুধ।'

'আমার প্রশ্নের জবাব হল না দিদিভাই! আপনি কখনও দেখেছেন পার্সেল খুলতে?

মিত্তিরগিন্নি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'না তো!' পার্সেল আসত, শুধু তাই দেখেছি। পিয়োন দিয়ে যেত।'

দরজার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছিল একটা কিশোরী। সে বলে উঠল, 'কেন মা, পার্সেল এলে বাবা সেটা কুণ্ডুকাকাকে দিয়ে আসতেন না? আমি দেখেছি। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, কুণ্ডুর ওষুধ। আমার নামে আসে।'

মিত্তিরগিন্নি মাথা নাড়লেন। 'তা আমি বলতে পারব না বাপু! নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সবসময়। তার ওপর হাঁটুর বাত বছরভর কটকট করে কামড়াচ্ছে। যন্ত্রণায় কেঁদেকেটে অস্থির!' বলেই আবার রণচণ্ডী হলেন। ওই কান্না শুনেই হতচ্ছাড়া বটুক এসে বলেছিল, লাশ কোথায়? ওর পোড়ামুখের কথাই ফলে গেল রাত না পোহাতেই! একবার ওকে পেলে হয়। ঝেঁটিয়ে পালোয়ানগিরি ঘুচিয়ে দেব।'

কর্নেল কিশোরীর দিকে তাকিয়েছিলেন। বললেন, 'কাকে দিয়ে আসতেন পার্সেল?'

মেয়েটি বলল, 'কুণ্ডুকাকাকে।'

তার মা বললেন, ওই যে গো বেণীকুণ্ডু! সেও এক পালোয়ান। মেদিগঞ্জে তো পালোয়ানের অভাব নেই। এক পালোয়ান বেড়াচ্ছে বাড়ি বাড়ি মড়া খুঁজে—আরেক পালোয়ান বেড়াচ্ছে দেশে দেশে জুয়া খেলে। মার মার! মুড়ো ঝাঁটা মার হতচ্ছাড়াদের মুখে।'

ভদ্রমহিলা সমানে তর্জনগর্জন করতে থাকলেন। কর্নেলের উঠে আসা গ্রাহ্যই করলেন না! রাস্তায় কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন। কিছু জিজ্ঞেস করব ভাবলুম। কিন্তু মুখের অবস্থা দেখে সাহস হল না।

একটা খালি সাইকেল রিকশ আসছিল. সেটা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, 'থানায় যাব।'

হেমাঙ্গ নন্দী আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আসুন আসুন। পার্সেল থেকে কী বেরিয়েছে দেখুন।'

কর্নেল জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বললেন, 'হুঁ—কোকেন, মারিজুয়ানা, এল. এস. ডি। নিষিদ্ধ মাদকের কারবার দেখছি। নিরীহ সজ্জন ভদ্রলোক এবং স্কুলমাস্টার প্রমথ মিত্তিরের নামে পাঠানো হত, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। উনিও কিছু তলিয়ে না বুঝে এবং সম্ভবত পয়সাকড়ির লোভে পার্সেল পৌঁছে দিতেন আসল প্রাপকের কাছে। এখন দেখা যাচ্ছে, এই পার্সেলটা স্কুলমাস্টারের কাছে ডেলিভারি দেওয়া হয়নি। কেন হয়নি? ধূর্ত পোস্টমাস্টারের সন্দেহ হয়ে থাকবে এবং কোনভাবে টের পেয়েও থাকবেন তাই ডেলিভারি দেননি। পিয়োনদেরও জানাননি। নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

আমি হেসে ফেললুম। নিশ্চয় 'আফিং আছে ভেবেছিলেন?'

কর্নেল সায় দিলেন। 'আফিং ভাবাই স্বাভাবিক। আফিংখোর মানুষ তো। যাই হোক, পার্সেলটা না পেয়ে মূল প্রাপক খেপে উঠেছিল। সন্দেহ করেছিল মিত্তিরমশাই ওটা আত্মসাৎ করেছেন। তাই তাঁকে খুন করে বসল প্রতিহিংসাবশে। সুযোগও ছিল চমৎকার। পোস্টমাস্টার মারা গেছেন এবং তাঁর লাশ শ্মশানে আছে। নেহাত আকস্মিক ঘটনা-পরম্পরায় সে একটা চমৎকার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পালটা ঘটনা পরম্পরায় সব উলটে গিয়েছিল!'

হেমাঙ্গবাবু বললেন, 'খুনিটা তাহলে কে? তাকে ধরতে হবে এখনই।'

কর্নেল দাড়ি চুলকে বললেন, 'এখনি ধরা কঠিন হবে। কাল রাতের ঘটনার পর সে সতর্ক হয়ে গেছে। তাকে ফাঁদ পেতে ধরতে হবে। তবে সেজন্যই আমাদের দরকার পোস্টমাস্টারমশাইকে।'

'উনি তো নিখোঁজ! ওঁকেও খুন করে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে কিনা কে জানে!'

কর্নেল হাসলেন। 'প্রথম বোস আফিং খান বটে, ভীষণ ধূর্ত বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক।' বলে উনি উঠলেন।

হেমাঙ্গবাবু অস্থির হয়ে বললেন, 'কিন্তু খুনির নাম কী!'

কর্নেল বলার আগেই আমি মুখ ফসকে বলে ফেললুম, 'পালোয়ান এবং জুয়াড়ি বেণীমাধব কুণ্ডু!'

হেমাঙ্গবাবু লাফিয়ে উঠলেন। কর্নেল বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তাকে সহজে খুঁজে পাবেন না আর। আমার ফাঁদ পাতা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন হেমাঙ্গবাবু!'

তিন

কর্নেল গঙ্গার ধারে-ধারে হাঁটছেন আমার সঙ্গে কথা বলছেন না। বুঝলুম, হেমাঙ্গ নন্দীকে খুনির নাম বলে দিয়ে ওঁর রাগের কারণ হয়েছি। একেবারে ওস্তাদের মার শেষ মুহূর্তে দেখানো স্বভাব ওঁর। হেমাঙ্গবাবুদের তাক লাগাবেন ভেবেছিলেন। হল না।

বাইনোকুলারে মাঝে মাঝে পাখি দেখছিলেন কর্নেল। গঙ্গার ধারে ঘন ঝোপঝাড় গাছপালার জঙ্গল। কিছুটা এগিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। খানিকটা দূরে বিশাল এক বটগাছ। ডালপালা আর অসংখ্য ঝুরিতে যেন নিজেই এক দণ্ডকারণ্য হয়ে রয়েছে। তার ভেতর একটা পুরোনো মন্দির দেখতে পাচ্ছিলুম। কর্নেল বাইনোকুলারে মন্দির অথবা বটগাছে কোনও দুর্লভ পাখি দেখতে থাকলেন। তারপর কিছু বলাকওয়া নেই, আচমকা দৌড়ুতে শুরু করলেন মন্দিরটার দিকে। হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। ওঁর সঙ্গে দৌড়োনোর মানে হয় না। কারণ এরপর ওই দুর্লভ পাখির পেছনে সারাটা দিন ঘুরবেন। আমার অত ধকল সইবে না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর আমারও রাগ হল। শরৎকালের তীব্র রোদ। যদিও মাথা বাঁচানোর মতো ছায়া আছে। গরমে ঘামছি দরদর করে। আধঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে চললুম বটুকবাবুর বাড়ির দিকে।

কর্নেল ফিরলেন একেবারে বেলা গড়িয়ে। হাতভর্তি লাল-হলুদ একগাদা অর্কিড। ওঁর বাড়ির ছাদের প্ল্যান্টওয়ার্ল্ডে আশ্রয় পাবে ওগুলো, তাতে সন্দেহ নেই। আমার রাগ এবং নিজের রাগ সব জল করে একগাল হেসে বললেন, 'ডার্লিং! আজ আমার রথ দেখা আর কলাবেচা দুই-ই হল।'

'তার মানে?'

বৃদ্ধ ঘুঘুপ্রবর রহস্যময় হেসে বললেন, 'আজ রাত দশটায় দেখবে। ধৈর্য ধরো! তুমি সম্ভবত বটুকবাবুর সংসর্গে এসে তাঁর মতোই অতি উৎসাহী এবং অধীর হয়ে পড়েছ। সাবধান।'

লম্বা ঘুমে কাটিয়ে দিলুম বিকেল অব্দি। উঠে দেখলুম, কর্নেল আবার বেরিয়েছেন। বটুকবাবুর সঙ্গে শ্মশানবন্ধু ক্লাবে গেলুম আড্ডা দিতে। আজ লাশ পড়েনি। ওরা বিমর্ষ। লাশ বওয়ার জন্য নাকি ওদের কাঁধ সুড়সুড় করে। ক্লাব থেকে ফিরে দেখা পেলুম কর্নেলের। হেমাঙ্গ নন্দী ইউনিফর্ম পরে কোমরে রিভলবার বেঁধে হাতে বেটন নিয়ে হাজির। বুঝলুম ফাঁদ পাতা হয়েছে।

কিন্তু রোগা শুটকো চেহারার এক ভদ্রলোক একপাশে চুপ করে বেজার মুখে বসে আছেন। উনি কে? বটুকবাবু ঘরে ঠুকেই থমকে দাঁড়িয়ে চোখ পিটপিট করছিলেন। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'মাস্টারমশাই! আপনি!'

চমকে উঠলুম। ইনিই তাহলে সেই মাস্টার প্রমথ বোস? কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, 'প্রাণের ভয়ে ভদ্রলোক জঙ্গলের ভেতর মন্দিরে লুকিয়ে ছিলেন সেদিন থেকে। তোমার বউ খাবার দিয়ে গেছে দুবেলা। কাজেই অসুবিধা হয়নি।'

হুঁ, তাহলে বাইনোকুলারে দূর থেকে মন্দিরের ওখানে ওঁকে দেখতে পেয়েই সন্দেহবশে ছুটে গিয়েছিলেন কর্নেল?

ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল। ততক্ষণে আমাদের খাওয়াদাওয়া সারা। পোস্টমাস্টার খেলেন সামান্যই। রাতে এক গুলি আফিং পেলেই বরং সন্তুষ্ট হতেন।

কর্নেল, হেমাঙ্গবাবু, বটুকবাবু, প্রমথবাবু আর আমি বাগানের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আগাছার জঙ্গলে গেলুম। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা সবে উঁকি দিচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। আকাশ আজ পরিষ্কার। খানিকটা যাওয়ার পর কাল রাতে দেখা পোস্টমাস্টারের বাড়ির ভিতর ঢুকে আমরা ওত পেতে বসলুম বারান্দার থামের আড়ালে। পোস্টমাস্টার উঠোনে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর অবাক হয়ে শুনি, উনি কেত্তন গাইছেন। 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব। কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব...'

বারকতক গেয়েছেন, হঠাৎ সদর দরজায় ঠিক বটুকবাবুর মতো এক নরদানবের আবির্ভাব ঘটল। একেবারে বটুকবাবুর প্রতিরূপ তেমনি কদমফুলি চুল, স্পোর্টিং গেঞ্জি, আঁটো প্যান্ট, হাতে বালা। শরতকালের চাঁদের আলো খুব পরিষ্কার। তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম বেণী কুণ্ডুকে।

ঢুকেই বললেন, 'খুব দেখালে মাইরি ডাকবাবু। কই—আমার পার্সেল দাও?'

পোস্টমাস্টার খি খি করে হাসলেন। 'যা ভয় পেয়েছিলুম। তোমায় তো বিশ্বাস নেই হে! শেষে ভেবে দেখলুম, আপস করে মিটিয়ে নেওয়া যাক। তাই চিঠি লিখে তোমায় ডাকলুম।'

পালোয়ান বিশাল হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেরি কোরো না। মাল দাও!'

পোস্টমাস্টার তেমনি ভুতুড়ে হেসে বললেন, 'মাইরি বেণী! তুমি আমার চোখের সামনে মিত্তিরকে ঠকাস করে মারলে আর নেতিয়ে পড়ল! উঃ! দেখে যা ভয় পেয়েছিলুম।'

'তুমি দেখেছিলে তাহলে? ঠিক আছে। মাল দাও!'

'দিচ্ছি রে বাবা, দিচ্ছি!' পোস্টমাস্টার বললেন। 'উঃ! চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছি।' বৃষ্টির মধ্যে মিত্তির আমার মড়া দেখতে আসছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল। দেখি, তুমি ওর মাথায় ঠকাস করে—বাপ্‌স! দেখেই আমার বাকি নেশার ঘোর কেটে গেল। তখন দিশেহারা হয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলুম। বাড়ি ঢোকার সাহসই হল না।'

পালোয়ান দু হাতে ওকে আচমকা শূন্যে তুললেন পুতুলের মতো। পোস্টমাস্টার হাত-পা ছুড়তে থাকলেন। বুঝলুম স্কুলমাস্টারের লাশ তুলে নিয়ে যেতে ওই পালোয়ানের একটুও অসুবিধে হয়নি।

কিন্তু তখনই এক কাণ্ড ঘটে গেল। আচমকা বটুকবাবু লাফ মেরে উঠোনে পড়লেন। তারপর 'তবে রে ব্যাটা। কাল রাতে আমাকে বিছুটি না আলকুশি মেরে পালিয়েছিলে তাহলে তুমিই?' বলেই জাপটে ধরলেন বেণী কুণ্ডুকে। পোস্টমাস্টার ছাড়া পেয়ে হাততালি দিয়ে কুস্তি দেখতে থাকলেন। দুই পালোয়ানে জাপটাজাপটি, মাটিতে গড়াগড়ি শুরু হল। ধুন্ধুমার সেই তুলকালামে ভূমিকম্প হচ্ছিল যেন। মাটি কাঁপছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ এই কুস্তি দেখতে দিলেন না কর্নেল। টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'খুব হয়েছে বটুকবাবু। বেণীবাবু এবার উঠে পড়ুন।' বেণী কুণ্ডু হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রতিপক্ষকে ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হেমাঙ্গবাবু দৌড়ে গিয়ে ওর হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। দরজা দিয়ে একদঙ্গল কনস্টেবলও হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। পোস্টমাস্টার তখনও খি খি করে হেসে হাততালি দিচ্ছেন।....

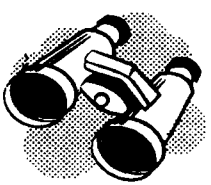

কা-কা-কা রহস্য

'সাতচল্লিশ লক্ষ বীজকণিকা!' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার 'নেচার' পত্রিকার পাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কল্পনা করো, জয়ন্ত! একটা অর্কিডের ফুল শুকিয়ে যাওয়ার পর বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে যায় সাতচল্লিশ লক্ষ বীজ, যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায় না। এমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিস। তাই আমি বলে, যদি সত্যিকার কোনও রহস্য থাকে, তা আছে প্রকৃতিজগতেই।'

কর্নেলের মুখে বিস্ময় মেশানো একটা দিব্য ভাব লক্ষ করলাম। বললাম, 'অর্কিড নিয়ে এই সক্কালবেলায় মাথাখারাপ করার কারণ কী?'

'ও! তোমাকে আসল কথাটা বলাই হয়নি।' কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'এগুলোকে বলা হয় ক্রাউন অর্কিড। দুটো কারণ আছে এর। একটা হল, এই অর্কিডের ফুল সোনালি রঙের ক্রাউন বা রাজমুকুটের মতো দেখতে। দ্বিতীয়টা হল, এগুলো খুব উঁচু গাছের ডগার দিকের ডালে থাকে। কাজেই ফুল ফুটলে সেই গাছটাকে মনে হয় মুকুটপরা রাজা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচু হওয়া চাই গাছটা। গতবার ক্যালিফোর্নিয়ার ইয়োসোমিটি ন্যাশনাল পার্ক এলাকার রেডউড গাছের ডগায় ক্রাউন অর্কিড দেখে এসেছি। জায়গাটার নাম মারিপোসা গ্রোভ। তো আজকের কাগজে—

ডোরবেল বাজল। কর্নেল বিরক্ত হয়ে হাঁকলেন, 'ষষ্ঠী!'

একটু পরে ষষ্ঠী এক ভদ্রলোককে নিয়ে এল কর্নেলের ড্রয়িংরুমে। ভদ্রলোকের পরনে যেমন-তেমন প্যান্টশার্ট, পায়ে সাধারণ চপ্পল। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। মুখে পোড়খাওয়া ভাব। বিষণ্ণ এবং উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। নমস্কার করে বললেন, 'আমিই গতরাতে আপনাকে ট্রাংকেল করেছিলাম ভীমগড় থেকে।'

কর্নেল বললেন, 'আপনিই কাত্যায়ন সিংহ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে অকারণ পুলিশ অ্যারেস্ট করে দুর্ভোগে ফেলেছে। গতকাল জেলা জজের কোর্টে জামিনে ছাড়া পেয়েছি। আমার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই স্যার! ছোটো কুমারবাহাদুর মরার সময় নাকি আমার নাম করে গেছেন। অথচ আমি তখন ধারেকাছে ছিলাম না।'

কাত্যায়নবাবু বললেন, 'আমাকে বাঁচান স্যার! কাগজে আপনার কত কীর্তিকলাপ পড়েছি। একমাত্র আপনিই আমাকে বাঁচাতে পারবেন।'

'আপনি আগে কফি খেয়ে চাঙ্গা হোন। তারপর বলুন কী হয়েছে।'

কর্নেলের হাঁকে ষষ্ঠীচরণ ঝটপট কফি তৈরি করে আনল। কাত্যায়নবাবু কফিটা ফুঁ দিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললেন। তারপর রুমালে মুখের ঘাম মুছে ঘটনাটি শোনালেন। সংক্ষেপে তা হল এই :

'ভীমগড় এস্টেটের রাজা খেতাবধারী হর্ষবর্ধন রায়ের দুই পুত্র জয়বর্ধন এবং আনন্দবর্ধন। তাঁরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। প্রায় সমবয়সি দুই সৎ ভাইয়ের মধ্যে ছোটোবেলা থেকেই খুব একটা বনিবনা ছিল না। ভারতসরকারের কাছে রাজাবাহাদুর হর্ষবর্ধন বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে সেই ভাতা বা 'প্রিভি পার্স' আইন করে বন্ধ হয়। রাজাবাহাদুর মারা যান। দুই ভাইয়ের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগবণ্টন করা হয়। কিন্তু বিবাদ বাধে একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার মুকুট নিয়ে। মুকুটটি মুঘল আমলের। রাজাবাহাদুর মুকুটটি

বাড়ির একাংশে শিবমন্দিরের কোনও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখেন। কারণ প্রিভি পার্স আইনের ফলে রাজভাণ্ডারের সব সোনাদানাও সরকার আটক করেছিলেন।

মৃত্যুর আগে রাজাবাহাদুর সেই গোপন সিন্দুকের একটি অদ্ভুত তালাচাবি তৈরি করিয়ে এনেছিলেন। তালাটি দুটি চাবি ছাড়া খোলা যাবে না। একটি চাবি জয়ের কাছে এবং দ্বিতীয় চাবিটি আনন্দের কাছে আছে। তার ফলে, সিন্দুক খুলে রাজমুকুট বের করতে হলে দুই ভাইকেই একসঙ্গে খুলতে যেতে হবে।

এক সপ্তাহ আগে ভোরবেলা মন্দিরের পুরোহিত কানু ভট্টাচার্য মন্দিরের ভেতর ছোটো কুমারবাহাদুর আনন্দকে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর মাথার পেছনে ভোঁতা কোনও জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। কিন্তু তখনও তাঁর মৃত্যু হয়নি। কানু ভটচাজ তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে মুখে জল দিয়ে ওঠানোর চেষ্টা করেন। তখন নাকি আনন্দবর্ধন অতিকষ্টে উচ্চারণ করেন, 'কা-কা-কা—' তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে পুরোহিতের মুখে 'কা-কা-কা' শুনে রাজপরিবারের ম্যানেজার এই কাত্যায়ন সিংহকে গ্রেফতার করেন।...'

এ পর্যন্ত শোনার পর কর্নেল বললেন, 'কা-কা-কা বলে মারা যান আনন্দবর্ধন?'

কাত্যায়নবাবু বললেন, 'হ্যাঁ স্যার।'

'কিন্তু পুরোহিতের নামের আদ্যক্ষরও তো কা?'

'আমি বললাম পুলিশকে। কিন্তু পুলিশের মতে, কানু ভটচাজ রোগা বেঁটে হাড়জিরজিরে লোক। বাঁ হাত জন্ম থেকে সরু এবং প্যাঁকাটি। ডান হাতেও জোর নেই। তাঁর পক্ষে শক্তিমান যুবক আনন্দকে এক আঘাতে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঘটনাস্থলে একটা লোহার মুগুর পড়ে আছে। তাতে রক্ত লেগে ছিল। কাজেই ওটা মার্ডার ওয়েপন। ওই পনেরো কিলো ওজনের মুগুর তোলা কানু ভটচাজের পক্ষে সম্ভব নয়।'

'বড়ো কুমারবাহাদুর জয়বর্ধনের বক্তব্য কী?'

'উনি স্যার খোঁড়া মানুষ। বছর দুই আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ওর এক পায়ের হাড় ভেঙে যায়। পা কেটে বাদ দিতে হয় কলকাতার একটা নার্সিং হোমে। তাই উনি কাঠের পায়ে কষ্টে চলাফেলা করেন। তা-ও দু-বগলে ক্রাচে ভর করে কোনওরকমে হাঁটাচলা করেন। উনি আমাকে সমর্থন করছেন। তা ছাড়া ওঁদের বাড়ি তিরিশ বিঘে জমি নিয়ে। চারদিকে পাঁচিল। বাড়ি থেকে মন্দির অন্তত সাতশো মিটার দূরে।'

'লোহার মুগুরটা কার?'

'মন্দিরের পাশে ছোট কুমারবাহাদুর আনন্দবর্ধনের ব্যায়ামের আখড়া। উনি মুগুর ভাঁজতেন। তাগড়াই মানুষ, স্যার। ওঁকে আমি ওই মুগুর তুলে মারতে পারি?' কাত্যায়নবাবু নিজের হাতে দেখালেন। ফের বললেন, 'খুব শক্তিমান খুনির কাজ স্যার।'

'ছোটো কুমারবাহাদুরের কাছে সেই গোপন সিন্দুকের চাবি ছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঁর হাতের মুঠোয় ছিল। মুকুট চুরি গেছে কি না দেখার জন্য বড়ো কুমারবাহাদুরকে ডাকা হয়েছিল। ওঁর চাবি প্রথমে তালায় ঢোকাতে হবে। তারপর ছোটর চাবি ঢোকালে তবে সিন্দুক খুলবে। সিন্দুক বলছি, বটে, তবে ওটা শিবলিঙ্গের বেদি স্যার! বেদিটাই সিন্দুকের গড়ন। কালো পাথরে তৈরি। চাবির ছিদ্র, মানে তালার ওপর সিঁদুরের গাঢ় ছাপ। তাই তালার ছিদ্র দেখা যায় না।'

'সিন্দুক-বেদি খোলা হল?'

'পুলিশের সামনে খুললেন জয়বর্ধন।'

'ভেতরে মুকুট ছিল?'

'ছিল স্যার। ওটা পুলিশ আটকে করেছে। আইনের বলে নাকি পুরোনো জিনিস সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারেন।'

হ্যাঁ। প্রিভি পার্স বাতিলের আইনেও পারেন। আবার ঐতিহাসিক বা পুরাদ্রব্য-সংক্রান্ত আইনেও সরকার এটা পারেন।'

বলে কর্নেল সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলানও দিলেন।

বুঝলাম, প্রাজ্ঞ, রহস্যভেদী ঘটনার তথ্য থেকে থিয়োরি গড়ে তুলেছেন এবার।

কাত্যায়নবাবু আবার করজোড়ে বললেন, 'আমি রাজপরিবারের দুশো টাকা মাইনের কর্মচারী স্যার। আমি বড়ো বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। বড়ো কুমারবাহাদুরই আপনার কাছে যেতে বলেছিলেন।'

কর্নেল মাথার টাকে এবার হাত বুলোচ্ছিলেন। চোখ বুজে বললেন, 'আনন্দবর্ধন মৃত্যুর সময় কা-কা-কা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'রাজমুকুট পুলিশের কাছে আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পুলিশের সামনে জয়বর্ধন সিন্দুক-বেদির তালা খুললেন?'

'আজ্ঞে। প্রথমে নিজের চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালেন। তারপর ভাইয়ের চাবি দিয়ে।'

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। 'ঘটনাস্থলে না গিয়ে কিছু করার নেই। যথাসময়ে আমি ভীমগড় যাব।'

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভীমগড় রাজপরিবারের ম্যানেজারবাবু চলে গেলেন।

পরদিন আমরা দুজনে ভীমগড়ে গেলাম। রাজবাড়ির চারদিকে গভীর গড়খাই। তার ওপর একটা ব্রিজ আছে। গড়খাই এখন গ্রীষ্মে শুকনো। তিরিশ বিঘে মাটির চারদিকের পাঁচিল জেলখানার পাঁচিলের মতো উঁচু। তাই ব্রিজের ওপর দিয়ে ঢুকতে হয়। বিশাল ফটকে দরোয়ান আছে। কর্নেলের গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝুলছে। হাতে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক, যা দেখতে গুটোনো ছাতার মতো। দরোয়ানকে দশটা টাকা দিয়ে রাজমন্দির দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কর্নেল। দারোয়ানের কাছেই জানা গেল, মন্দিরে জাগ্রত দেবতার দর্শনে মাঝে-মাঝে ট্যুরিস্ট আসে। তাতে দরোয়ানের কিছু রোজগার হওয়া স্বাভাবিক।

ভেতরে ঢুকে দেখি, একটেরে বিশাল প্রাচীন মন্দির ঘন গাছপালার ভেতর মাথা তুলেছে। রাজপ্রাসাদ একটু তফাতে। তার ওদিকে একটা চৌকো পুকুর।

মন্দিরদর্শনে পুরুতঠাকুর কানুহরি ভটচাজকেও কিছু দক্ষিণা বা প্রণামি দিতে হল। কানুঠাকুর আমাদের গাইড হলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে দেখলাম, কালো বেদিতে বসানো আছে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ। কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ। কথায় কথায় কর্নেল আনন্দবর্ধন কুমারবাহাদুরের মৃত্যুর ঘটনা জেনে নিলেন। কাত্যায়নবাবুর বর্ণনায় সঙ্গে মিলে গেল। পেছন দিকে ব্যায়ামাগারটিও দেখলাম আমরা। ঘাসের ওপর মরচেধরা একটা পেল্লায় লোহার মুগুর পড়ে আছে। যে মুগুরটা পড়ে আছে সে মুগুরটা মার্ডার ওয়েপন, সেটা পুলিশ নিয়ে গেছে। কানু ভটচাজের একটা হাত জন্মাবধি পঙ্গু। অন্য হাতে কোথায় আনন্দবর্ধনের লাশ পড়েছিল দেখিয়ে দিলেন।

কর্নেল সব দেখেশুনে বেরিয়ে এলেন। কানু ভটচাজ এসে বললেন, 'দুধ দিয়ে সাপ পুষেছিলেন রাজপরিবার। সেই সাপ দংশেছে। ওই ম্যানেজারবাবুই মুকুট চুরির লোভে মেরেছে ছোটো কুমারবাহাদুরকে।'

কর্নেল বললেন, 'মৃত্যুর সময় কোনও কথা বলেননি উনি?'

'ওই তো বললাম, কা-কা-কা বলেই হেঁচকি উঠল। তারপর সব শেষ।'

'আমি একটু বড়ো কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ভাইয়ের শোক সামলাতে পারেননি। বনিবনা না থাকলেও ভাই তো বটে।' কানু ভটচাজ বললেন, 'চলুন তো দেখি।'

হলঘরে আমাদের বসিয়ে পুরুতঠাকুর ভেতরে গেলেন। একটু পরে ক্রাচে ভর দিয়ে জয়বর্ধন এলেন। কর্নেল নিজের পরিচয় দিতেই তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বললেন ভটচাজমশাইকে। তারপর বললেন, 'আমিই কাত্যায়নকে আপনার কথা বলেছিলাম। ও সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমার ধারণা আনন্দ মৃত্যুর সময় যন্ত্রণা প্রকাশ করেছিল। বোকা ভটচাজ শুনেছে কা-কা-কা। আর পুলিশ তো সবসময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে ওস্তাদ! কর্নেলসায়েব! আমিও চাই আনন্দের মৃত্যুরহস্যের কিনারা হোক।'

কর্নেল বললেন, 'সিন্দুক-বেদির দুটো চাবিই তো এখন আপনার কাছে আছে?'

'আছে। দেখাচ্ছি।' বলে জয়বর্ধন পকেট থেকে দুটো রিঙে ভরা দুটো চাবি বের করে দিলেন।

কর্নেল চাবি দুটো খুঁটিয়ে দেখে বললেন, 'কোনটা আপনার চাবি?'

জয়বর্ধন দেখালেন। বললেন, 'আমার চাবি আগে তালায় ঢুকিয়ে তিনবার ঘোরাতে হবে। তবেই আনন্দের চাবি তালায় ঢুকবে। অথচ বুঝতে পারছি না কেন আনন্দ ব্যর্থ-চেষ্টা করতে গেল?'

আমি বললাম, 'উনি আপনার চাবির নকল তৈরি করে নিতেও পারেন।'

জয়বর্ধন একটু হাসলেন। 'সেটাই আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু...'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু ওঁর কাছে সেই নকল চাবি পাওয়া যায়নি।'

জয়বর্ধন বললেন, 'যে ওকে মেরেছে, সে-ই ওটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। কানুঠাকুর দমাস করে একটা শব্দ শুনেই মন্দিরে গিয়ে ঢুকেছিল। বেগতিক দেখে মন্দিরের পেছনের দরজা দিয়ে খুনি পালিয়ে যায়। আমি গিয়ে দেখেছিলাম পেছনের দরজা খোলা ছিল।'

'কাত্যায়নবাবু কোথায় আছেন এখন?'

'ওর বাড়িতে থাকতে পারে। বেচারা লজ্জায় কাউকেও মুখ দেখাতে পারছে না। বাজার এরিয়ায় ওর বাড়ি।'

কর্নেল জয়বর্ধনের চাবিটা দেখিয়ে বললেন, 'এতে ইংরিজি 'ভি' লেখা আছে কেন?'

'বাবার খেয়াল। আমার চাবিতে 'ভি' এবং আনন্দের চাবিতে 'পি' লেখা আছে দেখুন।'

'রায়সায়েব! আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। সঠিক জবাব পেলে কাত্যায়নবাবুকে বাঁচানো যাবে।'

জয়বর্ধন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বলুন!'

'আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনার চাবিটা সে রাতে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে বেদির তালায় ঢুকিয়ে রেখে আসেনি, যাতে আনন্দবর্ধনের মুকুট চুরিতে সুবিধে হয়?'

'কর্নেলসায়েব? ঠিক এটা আমারও সন্দেহ। আমার চাবি শোবার ঘরের আলমারিতে লকারে ভরা ছিল। আমার স্ত্রী ঘটনার দিন কলকাতায় ছিলেন। সেই সুযোগে আমার কাজের লোক কাল্লু আনন্দের প্ররোচনায় টাকার লোভে এই কাজটা করতেও পারে। আমি তো সবসময় শোবার ঘরে থাকি না।'

'কাল্লুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

জয়বর্ধন তেতোমুখে বললেন, 'শয়তানটাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তবে পরে সন্দেহ হয়েছে, কা-কা-কা বলে আনন্দ কাল্লুর কথা বলতে চায়নি তো?'

জয়বর্ধন আমাদের চা-সন্দেশ খেতে পীড়াপীড়ি করছিলেন। কর্নেল খেলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলি মি. রায়। পরে আবার দেখা হবে।'

একটা সাইকেল রিকশ নিয়ে আমরা এবার থানায় গেলাম। ও সি দিলীপ ব্রহ্ম কর্নেলকে দেখে অবাক হয়ে হাসতে-হাসতে বললেন, কী কাণ্ড। আপনি ভীমগড়ে। আশা করি পাখি-প্রজাপতির খোঁজে আসেননি?'

'নাহ্ মি. ব্রহ্ম?'

দিলীপবাবু চোখ বড়ো করে বললেন, 'মাই গুডনেস। রাজবাড়ির মার্ডার কেস—'

হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'আমি রাজমুকুটটা একবার দেখতে চাই মি. ব্রহ্ম।'

একটু পরে দিলীপবাবু রাজমুকুটটা নিয়ে এলেন থানার মহাফেজখানা থেকে। কর্নেল সেটা দেখার পর একটু হাসলেন, 'মি. ব্রহ্ম, এটা নকল রাজমুকুট। সোনাটা রোলগোল্ড এবং পাথরগুলোও নকল।'

'বলেন কী।'

'হ্যাঁ। স্বর্ণকার দিয়ে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।'

'তা হলে আসলটা কাত্যায়ন হাতিয়ে নিয়েছে।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'নাহ্। আমার থিওরি অনুসারে আসল রাজমুকুট বড়ো কুমারবাহাদুরের ঘরে আছে। এখনই গিয়ে সার্চ করুন। পেয়ে যাবেন। দেরি করবেন না। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।'

ও সি দিলীপবাবু সদলবলে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেলকে বললাম, 'আপনি সিয়োর হলেন কী করে? যদি সত্যিই আসল রাজমুকুট জয়বর্ধন রায়ের ঘরে না পাওয়া যায়?'

কর্নেল হাসলেন। 'পাওয়া যাবে। আমার থিয়োরি, ডার্লিং।'

'থিয়োরিটা কী?'

'খুব সহজ ব্যাপার। আনন্দবর্ধন জানতেন, তাঁর চাবি তালায় ঢুকবে না। কাজেই একা তিনি মুকুট হাতাতে যাবেন কেন? জয়বর্ধন কাল্লুর কথা বললেন। সেটা কি বিশ্বাসযোগ্য? আলমারির চাবি—বিশেষ করে যার ভেতরে কিনা সিন্দুক-বেদির চাবি লুকোনো আছে, সেই চাবি জয়বর্ধন হেলাফেলায় রাখবার লোক? আসলে সে-রাতে দুই ভাই-ই গিয়েছিলেন মুকুট বের করতে। কানুঠাকুরের চেহারায় আফিমখোরের ছাপ আছে। নেশার ঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। ভোরবেলা নেশা কাটার পর মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে আনন্দবর্ধনকে পড়ে থাকতে দেখেন। উনি কিন্তু দমাস শব্দের কথা বলেননি, তুমি নিশ্চয় শুনেছ।'

'হ্যাঁ। উনি বললেন, পুজো দিতে গিয়ে লাশ দেখতে পান।'

'কিন্তু জয়বর্ধন দমাস শব্দের কথা বললেন। তখনই বুঝলাম, কী ঘটেছে। বৈমাত্রেয় ভাইকে সম্ভবত ভুলিয়ে-ভালিয়ে মুকুট দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর...'

কর্নেলের কথার ওপর বললাম, 'তা হলে জয়বর্ধন খুনি শাব্যস্ত হচ্ছেন। কিন্তু ওঁকে লোহার মুগুর আনতে দেখে আনন্দবর্ধনের ভয় পাওয়ার কথা।'

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'ভাইকে খুন করে পরে মুগুর এনে রক্ত মাখিয়ে ফেলে রেখেছিলেন।'

'কী করে বুঝলেন?'

'কা-কা-কা শব্দে।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সোজা, জয়ন্ত। জয়বর্ধনের কাঠের পা দেখে মাথায় এল, ওটা মার্ডার ওয়েপন করা যায়। কানুঠাকুর কা-কা-কা শুনেছেন। আসলে আনন্দবর্ধন বলতে চেয়েছিলেন 'কাঠের পা'। উনি শুনেছেন কা-কা-কা! এদিকে তিনি 'কা' হল কাল্লু, কাত্যায়ন এবং কানু ভটচার্য। বড়ো জটিল কেস সাজিয়েছিলেন জয়বর্ধনবাবু।'

'তা হলে কাঠের পা খুলতে হয়েছিল জয়বর্ধনকে।'

কর্নেল হাসলেন, 'কাঠের পা হঠাৎ খুলতে দেখেই সম্ভবত আনন্দবর্ধন ভয় পেয়েছিলেন। তাই মৃত্যুর সময় কাঠের পা কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন।'

তখনই পুলিশের দলটি এসে গেল। দিলীপ ব্রহ্ম ভেলভেটের একটি চৌকো বাকশো টেবিলে রাখলেন। ঢাকনা খুলতেই একটা কারুকার্যখচিত মুকুট দেখা গেল। জয়বর্ধনকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তিনি ক্রুর দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল বললেন, 'এই কালো ভেলভেট বাকশের মধ্যেই সোনাদানা রাখার নিয়ম। মি. ব্রহ্ম খালি মুকুট পেয়েছেন, বাকশো পাননি—এই দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটা নকল রাজমুকুট। জয়বর্ধনবাবু! একটু বোকামির জন্য ধরা পড়লেন। বুদ্ধি করে ভেলভেটের বাকশোর মধ্যে নকল মুকুট রাখলে আপনার কীর্তি ধরতে পারতাম না সম্ভবত।'

জয়বর্ধন মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে তাঁকে হাজতে নিয়ে যাওয়া হল।

বলল, 'চাবিতে 'ভি' এবং 'পি' কেন খোদাই করা, বলুন কর্নেল?'

'ভি ফর ভিকটরি অর্থাৎ জয়। পি ফর প্লেজার অর্থাৎ আনন্দ। জয়বর্ধন এবং আনন্দবর্ধন।'

দিলীপবাবু হাসলেন। 'ঘরে খাল কেটে কুমির আনার মতো জয়বর্ধনবাবু আপনাকে আনিয়েছেন!'

কর্নেল বললেন, 'আসলে উনি আমাকে দিয়ে যাচাই করতে চেয়েছিলেন, ওঁর মোডাস অপারেন্ডিতে কোনও খুঁত আছে কি না, যাতে উনি ধরা না পড়েন।'

সবাই হেসে উঠল। আমি ভাবছিলাম, ক্রাউন অর্কিডের কথা বলতে-বলতে ক্রাউন নিয়ে খুনের খবর আনা কি নেহাত আকস্মিক যোগাযোগ? স্টেশনে ফেরার পথে কথাটি তুললে আমার রহস্যভেদী বন্ধু বললেন, 'তোমাদের দৈনিক সত্যসেবকেই খবরটা বেরিয়েছিল। হেডিং ছিল, 'রাজমুকুট নিয়ে খুন'। ডার্লিং! কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ পড়ো না, এটা একটা বদ অভ্যাস।'

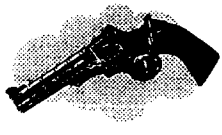

অশ্বডিম্ব রহস্য

ঘোড়া ডিম পেড়েছে—মানে ঘোড়ার ডিম? খি খি করে হাসতে লাগলেন কৃতান্তবাবু। প্রাইভেট গোয়েন্দা কে. কে. হালদার। গণেশ অ্যাভিনিউতে যাঁর রীতিমতো 'হালদার ডিটেকটিভ এজেন্সি' আছে।

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, এতে হাসির কী আছে? যা সত্যি তা সত্যি। গিয়ে দেখে আসুন না আমার গ্যারাজে!

কৃতান্তবাবু আরও খি খি করে বললেন, আপনার গ্যারাজে মোটর গাড়ির বদলে ঘোড়া থাকে বুঝি?

থাকে।—ভদ্রলোক রুষ্টভাবে বললেন, কারণ তেলের খরচ প্রচণ্ড বেড়েছে। একটা গাড়ি রাখার খরচ আপনি নিশ্চয় জানেন। কলকাতার রাস্তাঘাটের যা অবস্থা, হরদম পার্টস বদলাতে হয়। সেই সব খরচ হিসেব করে দেখেছিলুম, এর চেয়ে ঘোড়া পোষার খরচ অনেক কম। ছোটাতে পারলে ছোটেও গাড়ির মত জোরে।

কথা হচ্ছিল কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ড্রইংরুমে বসে। কর্নেল বুরুশ দিয়ে একটা তামার ফলক ঘষে সাফ করছিলেন। সম্প্রতি লোহাগড়ার জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছেন ফলকটি। অজানা হরফে কি সব লেখা আছে ওতে। মন্তব্য করলেন, গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গে হর্সপাওয়ার অর্থাৎ অশ্বশক্তি কথাটার যোগ আছে, হালদারমশাই। আধুনিক যুগেও গতিশীল কোনও যন্ত্রের গতিশক্তি বোঝাতে হর্সপাওয়ার কথা চালু।

কৃতান্তবাবু হাসি চেপে বললেন, জানি। কিন্তু ইনি যা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে, কবে শুনব মোটরগাড়িও ডিম পেড়েছে।

—পাড়লেও অবাক হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু থাকাটাই অসম্ভব।

কর্নেলের কথায় কৃতান্তবাবু খুব অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, তাহলে আপনি বলছেন ঘোড়ার ডিম কথাটা সত্যি?

কর্নেল কোনো জবাব দিলেন না আর। আমি বললুম, ইনি এমন করে বলছেন যখন, তখন হয়তো সত্যি।

ভদ্রলোক জোর গলায় বলে উঠলেন, জলজ্যান্ত সত্যি। সত্যি বলেই তো ছুটে এসেছি কর্নেল-সায়েবের কাছে।...

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে ধোপদুরস্ত সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। মোটাসোটা নাদুসনুদুস গড়ন। চাঁছাছোলা মুখ। আঙুলে অনেকগুলো দামি পাথরবসানো আংটি। কারবারি বড়োলোক বলেই মনে হয়। নাম যদুগোপাল চৌধুরী। থাকেন ব্যারাকপুর এলাকায়।

তিনি হন্তদন্ত ঘরে ঢুকেই নিজের নামধাম বলে এক নিশ্বাসে তাঁর গ্যারাজের অশ্বডিম্বটির বিবরণ দিয়েছেন। আমার বা কৃতান্তবাবুর উপস্থিতি গ্রাহ্য করেননি। কাজেই আমার মনে হয়েছে, ভদ্রলোক কর্নেলের কীর্তিকলাপ ভালোই জানেন। তাই তাঁর সাহায্য নিতে ছুটে এসেছেন।

কৃতান্তবাবু অর্থাৎ প্রাইভেট গোয়েন্দা কে. কে. হালদারকে এতক্ষণে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলুম কেসটি হাতে পেলে উনি কোমর বেঁধে রহস্যভেদে নামতে রাজি। কর্নেলের কথাটা শোনার পর বেশ গম্ভীর হয়ে গোঁফের ডগা পাকাচ্ছেন আর আড়চোখে যাদুগোপালবাবুকে দেখছেন।

কর্নেল তামার ফলকটি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে সোফায় এসে বসলেন। ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে করে কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, কি হালদারমশাই, অশ্বডিম্ব-রহস্যের কেসটা নেবেন নাকি?

কৃতান্তবাবু কিছু বলার আগে যাদুগোপালবাবু বললেন, সায়েব আমি কিন্তু আপনার কাছেই এসেছি।

কৃতান্তবাবু আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন, ইনি প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আগে জাঁদরেল পুলিশ অফিসার ছিলেন। রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। আমার মনে হয়, এসব রহস্যের মীমাংসা উনিই ভালো করতে পারবেন।

কী মুশকিল!—যাদুগোপালবাবু ক্ষুব্ধভাবে বললেন রহস্যটা তো কোনও চুরি-ডাকাতি বা খুনখারাপি সংক্রান্ত নয়। নেহাত সায়েন্টিফিক রহস্য। আপনি শুনেছি, সায়েন্স-টায়েন্সেরও চর্চা করেন। তাই—

কথা কেড়ে ক্রুদ্ধ কৃতান্তবাবু বললেন, তা আপনি সায়েন্টিস্টদের কাছেই যান না কেন?

গিয়েছিলুম তো—যাদুগোপালবাবু বললেন, কেউ কোনও কিনারা করতে পারেননি।

কর্নেল বললেন, ডিমটি কত বড়ো?

পেল্লায়।—যাদুগোপালবাবু বললেন, তারপর সেটির সাইজ দেখালেন হাতের মাপে। মনে হল, ডিমটি অন্তত হাত দেড়েক উঁচু। কর্নেল বললেন, সেটি এখন আছে কোথায়?

আমার ঘোড়ার পেটের তলায়। যেন তা দিচ্ছে।—যাদুগোপালবাবু মুখে রহস্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে বললেন, ঘোড়াটার স্বভাবও রাতারাতি বদলে গেছে। খুব হিংস্র হয়ে উঠেছে. ডিমটাকে সরাতে গেলেই ঠ্যাং ছুঁড়ছে। চিঁহি চিঁহি করে চ্যাঁচ্যাচ্ছে।

—তাহলে সায়েন্টিস্টরা পরীক্ষা করলেন কীভাবে?

একটু দূর থেকে কি সব হাবিজাবি মেশিনের নল ডিমটার গায়ে ঠেকিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।—যাদুগোপালবাবু হতাশভাবে বললেন, এদিকে খবরটা গেছে রটে। বাড়ির গেটে রোজ হাজার হাজার লোক জড়ো হচ্ছে। পুলিশে খবর দিতে হয়েছে পর্যন্ত। আপনি দয়া করে এখনই একবার চলুন, কর্নেল।

কৃতান্তবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। হাই তুলে বললেন, চলি কর্নেল। জয়ন্তবাবু আসি।—তারপর মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললুম, আচ্ছা যাদুগোপালবাবু, ডিমটি কবে দেখতে পেলেন বলেননি কিন্তু।

যাদুগোপাল গুম হয়ে বললেন, গতকাল ভোরবেলা। গ্যারাজে রোজকারমতো ঘোড়াটাকে দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি, পেটের তলায় একটা ডিম। যেই সরাতে গেছি সেটা, মুখ ঘুরিয়ে চিঁহিহি করে কামড়াতে এল। রাতারাতি একেবারে বদলে গেছে ঘোড়াটা। বিশেষ করে আমাকে দেখলেই চিঁহিহি করে দাঁত বের করছে। বুঝুন অবস্থা।

—ঘোড়াটা দেখাশোনার জন্য নিশ্চয় সহিস রেখেছেন?

—না। আমি নিজেই ওর দেখাশোনা করি। খাওয়াদাওয়া, স্নান করানো সবকিছুই। কর্নেল সাদা দাড়িতে অভ্যাসমতো আঁচড় কাটছিলেন। মাঝে মাঝে বিশাল টাকেও হাত বুলোচ্ছিলেন। চোখ দুটো বন্ধ। সেই অবস্থায় বলে উঠলেন, আচ্ছা চৌধুরীমশাই, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

যাদুগোপালবাবু বললেন, আমরা দুভাই। আমি ছোটো। দাদার নাম প্রাণগোপাল। গত বছর থেকে মাথার একটু গন্ডগোল হয়েছে। তবে পুরোপুরি পাগল বলা চলে না। শুধু কথাটথা কম বলেন। যদি-বা বলেন, তার মানে সবসময় বোঝা যায় না।

—আর কে আছেন বাড়িতে?

আমরা দুভাই বিয়ে করিনি—চিরকুমার।—ম্লান হাসলেন যাদুগোপাল, দাদা বরাবর সাধু-সন্ন্যাসী টাইপ মানুষ। শিশি-বোতলের পৈতৃক ফ্যাক্টরি ছিল। ইদানীং কাচের চেয়ে প্ল্যাস্টিকের পাত্রের চাহিদা বেশি। তাই প্ল্যাস্টিক গুডস তৈরির কারখানাও করেছি। গতবছর প্রচণ্ড লোকসান হবার পর দাদা প্রচণ্ড শক খেয়েই হয়তো ওইরকম হয়ে যায়। তারপর থেকে আমি একা বিজনেস দেখাশোনা করি। আর দাদা যখন বিয়ে করেনি, তখন আমিও আর ওদিকে মন দিলাম না। হাঁ, বাড়িতে আমরা দুভাই বাদে আর আছে জগন নামে একজন কাজের লোক। রান্নাবান্নার জন্য আছে হবু ঠাকুর। একজন ঠিকে-ঝি আছে।

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যার দিকেই যাব'খন। বাই দা বাই যে বিজ্ঞানীরা ডিমটি পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। আপনি তাঁদের নাম ঠিকানা লিখে দিন।

যাদুগোপালবাবুকে আমি একটা প্যাড এগিয়ে দিলুম। উনি তিনজন বিজ্ঞানীর নাম-ঠিকানা লিখে দিলেন। কর্নেল কাগজটা নিয়ে চোখ বুলোচ্ছেন, এমন সময় ফোন বাজল। কর্নেলের ইশারায়, আমি ফোন তুলে সাড়া দিলুম। খুব ব্যস্তভাবে কাকে জিজ্ঞেস করতে শুনলুম, হ্যালো! এটা কি ২৯-৬৩৯৫?

বললুম, হ্যাঁ কাকে চান?

—আচ্ছা, ওখানে কি যাদুগোপাল চৌধুরীমশাই আছেন?

—আছেন। আপনি কে বলছেন?

—আজ্ঞে, দয়া করে ওঁকে একটু ফোনটা দিন।

যাদুগোপালবাবুকে ফোন দিয়ে বললুম, আপনার।

উনি খুব অবাক হয়ে ফোন নিয়ে বললেন, কে? জগন? কী হয়েছে?....অ্যাঁ! সে কী...কী আশ্চর্য! হতভাগা, তোকে না নজর রাখতে বলেছিলুম? খালি খাবিদাবি আর গাঁজা টেনে...! ফোন রেখে যাদুগোপলবাবু ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, কী অদ্ভুত কাণ্ড!

কর্নেল বললেন, ডিমটা উধাও হয়েছে কি?

যাদুগোপালবাবু চমকে উঠে বললেন, টের পেয়েছেন আপনি? এজন্যই আপনার কাছে আসা। শুনেছিলুম আপনার আশ্চর্য দিব্যশক্তি আছে।

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন, মোটেও না চৌধুরীমশাই। নিছক অনুমান।

আমি বললুম, আপনার জগনবাবুর কথা আমিও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম। খুব জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন। কাজেই কর্নেলেরও শুনতে পাওয়া স্বাভাবিক।

যাদুগোপালবাবু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন, কর্নেল দেখছেন তো কী রহস্যময় ব্যাপার। এজন্যই তো আপনাকে এখনই যেতে অনুরোধ করছিলুম। যাই হোক, তা যখন যাবেন না, সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ আসবেন, প্লিজ।

কর্নেল বললেন, যাব।

যাদুগোপালবাবু বেরিয়ে গেলে বললুম, ব্যাপারটা কী মনে হচ্ছে কর্নেল।

কর্নেল একটু হাসলেন।—ডার্লিং! ঘোড়ার ডিম সত্যিই একটা রহস্যময় ব্যাপার। একটু আগে বললুম না, পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু না থাকাটাই অসম্ভব।

—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কিছুই বুঝতে পারছি না।

কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন, অর্থাৎ তুমি ঘোড়ার ডিম বুঝেছ!...

যাদুগোপালবাবুদের বাড়িটা একেবারে গঙ্গার ধারে। মাঝখানে সেকেলে গড়নের দোতলা দালান। চারদিকে অনেকটা জায়গা ঘিরে পাঁচিল। গ্যারাজটা উত্তর-পূর্ব কোনার পাঁচিল ঘেঁসে। গেটে ঢুকেই চোখে পড়েছিল, ওই গ্যারাজে একটা কালচে রঙের ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মিটমিটে

বাতি জ্বলছে সেখানে। দালান-বাড়ির বাকি তিন দিকটায় ঝোপজঙ্গল, কিছু গাছ। বুঝলুম, একসময় এগুলো ফুলফলের বাগানই ছিল। অযত্নে এখন জঙ্গুলে হয়ে গেছে।

কর্নেল প্রথমেই গ্যারাজে যেতে চাইলেন ঘোড়াটাকে দেখতে। যাদুগোপালবাবু ব্যস্তভাবে সেদিকে নিয়ে চললেন আমাদের। তাঁর হাতে টর্চ। গ্যারাজের সামনে গিয়ে বললেন, ওই দেখুন! ঘোড়াটার পেটের তলায় ওইখানে ডিমটা ছিল। জগন, হরু ঠাকুর, কাজের মেয়ে লক্ষ্মী—প্রত্যেকে দেখেছে ডিমটাকে। তিনজন সায়েন্টিস্ট দেখেছেন। পুলিশও দেখে গেছে। আজ সকালে যখন আপনার কাছে যাব বলে বেরুচ্ছি, তখনও আমি দেখে গেছি। অথচ তারপর ডিমটা হঠাৎ উধাও। জগন বলছে, বাজারে গিয়েছিল একটা কাজে। ফিরে এসে দেখে, ডিমটা নেই।

কর্নেল আমাকে অবাক হয়ে ঘোড়াটার কাছে গেলেন এবং তার চোয়ালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। ঘোড়াটা যেন ঝিমুচ্ছে। তেমনি স্থির দাঁড়িয়ে রইল। শুধু ওর কালো চামড়াটা একবার তিরতির করে কেঁপে উঠল।

যাদুগোপাল বললেন, ডিমটা চুরি যাওয়ার পর ও আগের মতো শান্ত হয়ে গেছে। এও এক রহস্য!

হুঁ—রহস্য।—কর্নেল চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, তো চলুন যাদুগোপালবাবু, আপনার দাদার সঙ্গে আলাপ করা যাক।

যাদুগোপালবাবু একটু বিব্রত হলেন যেন। বললেন, তা যাবেন তো চলুন। তবে দাদার মুডটা আজ বড্ড খারাপ দেখছি সকাল থেকে। হরু ঠাকুর ব্রেকফাস্ট দিতে গিয়েছিল। ছুড়ে ফেলে দিলেন। দুপুরেও কিছু খেতে চাননি। জগন অনুরোধ করতে গিয়েছিল। তাকে থাপ্পড় মেরেছেন। আর আমাকে তো ইদানীং কেন যেন দেখলেই খেপে ওঠেন। চ্যাঁচামেচি করে বলেন, তোর মুখদর্শন করব না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন একথা বলেন জানতে চাননি?

খোয়াঢাকা সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুধারে বর্মী বাঁশ, ফণিমনসা, ঝাউ, আগাছা। বাড়ির দোতলায় একটা ঘরের জানলা থেকে একটু আলো এসে পড়েছে। পা বাড়িয়ে যাদুগোপল ম্লান হেসে বললেন, বিয়ে করিনি, হয়তো তাই। দাদা আমার জন্য পাত্রী ঠিক করেছিলেন—সে বছর কয়েক আগের কথা। তখন উনি সুস্থ মানুষ। ওঁর কথা রাখিনি—এটা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না।

কর্নেল বললেন, আজ সকাল থেকে আপনার দাদার মুড খারাপ বললেন। একটু বুঝিয়ে বলুন তো?

যাদুগোপাল চাপা স্বরে বললেন, বললুম না? কিছু খাননি—

—না। মানে, পাগলামির নতুন কোন লক্ষণ দেখছেন কি?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।—প্রায় লাফিয়ে উঠলেন যাদুগোপাল, দেখেছেন? আপনি না বললে খেয়ালই হত না। এজন্যই আপনার শরণাপন্ন হওয়া। দাদার গলার স্বর কেমন বদলে গেছে। ভাঙা—খনখনে—কেমন যেন...., উপযুক্ত শব্দ হাতড়াচ্ছিলেন যাদুগোপাল। শেষে বললেন, মানে মানুষ প্রচণ্ড রাগে চ্যাঁচামেচি করে শেষে ক্লান্ত হয়ে গেলে যেমন গলায় গজরাতে থাকে, ঠিক তেমনি।

—কিংবা অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন করে গাইয়ের গলার অবস্থা যেমন হয়!

কর্নেলের এই মন্তব্যে আমি হো হো করে হেসে ফেললুম। যাদুগোপালও দুঃখের মধ্যে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, তাও বলতে পারেন অবশ্য। মোট কথা, দাদার মুড ভালো নেই।

দোতলা বাড়িটাতে ঢুকেই প্রশস্ত হলঘর। দামি সোফাসেট, বুক সেলফ আর হরেক ভাস্কর্যে সাজানো। কর্নেল কিছু বলার আগেই যাদুগোপাল বললেন, সবই দাদার নিজের হাতে সাজানো।

কারবারি লোক হলে কী হবে, দাদার বইপত্তর পড়ার খুব ঝোঁক ছিল। রুচিশীল মানুষ। এখন মাথার গন্ডগোল হলেও সবসময় বই পড়ার অভ্যাস যায়নি। গিয়েই দেখবেন আশা করি।

দেয়ালে বড়ো বড়ো সব পোর্ট্রেট ঝোলানো। কর্নেল ছবিগুলো দেখছিলেন। তখন যাদুগোপাল একে একে এইগুলোর সঙ্গে কর্নেলের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন, এইটে আমার ঠাকুরদা গোপাল চৌধুরীর। নিঃসম্বল অবস্থায় বর্ধমান থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। পুরোনো শিশিবোতল কেনার কারবার খোলেন। শেষে—তো এইটে আমার পিতৃদেব নবগোপাল চৌধুরীর ছবি। আর এটা হল আমার মাতৃদেবী ভবসুন্দরীর।

কর্নেল আরেকটি পোর্ট্রেটের দিকে আঙুল তুলে বললেন, উনি কে? বলেই কর্নেল ছবির নিচে গিয়ে ছবির তলায় নামটা পড়তে থাকলেন—

নিস্তারিণী দেবী।

জন্ম : ১৯১২ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ জুন।

মৃত্যু : ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০ ডিসেম্বর।

যাদুগোপাল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অসুখ হয়ে মারা যান।

—ওঁর সন্তানাদি ছিল না?

যাদুগোপাল কুণ্ঠিতভাবে হাসলেন, একটু, পারিবারিক সব কথা তো খুঁটিয়ে বাইরের লোককে বলা যায় না। তাছাড়া দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। আমরা কখনও নিজেদের সৎ ভাই বলে চিন্তা করিনি। তাই কাউকে সেকথা বলতেও চাইনি।

কর্নেল ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে প্রাণগোপালবাবু আপনার সহোদর ভাই নন?

যাদুগোপাল ব্যস্তভাবে জিভ কেটে বললেন, না-না। আমরা দুই মায়ের ছেলে বটে, কিন্তু কক্ষনো ওসব ভাবিনি। আজও ভাবি না। ভাবতেও খারাপ লাগে। আমার মা, দাদাকে নিজের পেটের ছেলের মতোই মানুষ করেছিলেন। বরং আমিই যেন মায়ের কাছে সৎ ছেলে ছিলুম। যত আদর যত্ন সব দাদার প্রতি ছিল মায়ের। মরার সময়ও—

ঢোক গিলে চোখ মুছলেন যাদুগোপাল। কর্নেলের ওপর আমার রাগ হল। ওসব পারিবারিক আবেগপ্রবণ জায়গায় কী দরকার ছিল নাক গলানোর?

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, বুঝেছি। চলুন, আপনার দাদার সঙ্গে আলাপ করা যাক। কীভাবে আমাকে নেন, দেখি।

যাদুগোপাল বললেন, চলুন, চলুন। দাদার মাথায় গন্ডগোল থাকলেও এমনিতে খুব ভদ্র। কথাবার্তা একটু কম বলেন এই যা। তবে আজকের ব্যাপার যা দেখছি, বুঝতে পারছি না কীভাবে আপনাকে নেবেন। শুধু একটা অনুরোধ—তেমন কিছু দেখলে যেন ওঁকে আর ঘাঁটাবেন না। নইলে ভাঙচুর শুরু করে দেবেন। সামলাতে পারব না আমরা।

ঘরের ভেতর থেকে ঘোরানো চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের তলায়। লম্বা বারান্দার মুখে একটা তাগড়াই চেহারার গুঁফো লোককে দেখা গেল। যাদুগোপাল চাপা স্বরে তাকে বললেন, কি রে জগন? বড়োবাবুর কী অবস্থা?

এই তাহলে জগন। সে গম্ভীর মুখে তেমনি চাপা স্বরে বলল, প্রায় একই রকম। ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছেন। টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে রাখতে বললেন শুধু। মনে হচ্ছে, খিদে পেয়েছে তাহলে। যাই, হরু ঠাকুরকে বলি গে সকাল-সকাল খাবার পাঠিয়ে দিতে।

সবে জগন ঘুরে পা বাড়িয়েছে হঠাৎ আলো নিভে গেল বাড়ির। যাদুগোপাল ব্যস্ত হয়ে বললেন, ওই যাঃ। লোডশেডিং-এর আর সময় ছিল না! ও জগন, বড়োবাবুর ঘরে মোম জ্বেলে দিয়ে আয় এক্ষুনি। নইলে হুলস্থুলু বাধাবেন।

বলে জগনের হাতে টর্চটা দিলেন। জগন টর্চ জ্বেলে টানা লম্বা বারান্দা ধরে হন্তদন্ত এগিয়ে গেল। সেই সময় ওদিক থেকে খনখনে গলায় কার চ্যাঁচামেচি শোনা গেল, অ্যাই জগনা! তারপর দুমদাম শব্দ ভেসে এল। যাদুগোপাল বললেন, দেখলেন? শুনলেন তো কর্নেল? জগনটা এত বোকা। ওকে সবসময় কাছাকাছি থাকতে বলি এজন্যই।

টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে উত্তর-পূর্ব কোনার ঘরের দরজার সামনে পৌঁছে দেখলুম, জগন একটা নিচু টেবিলে মোমটা ইতিমধ্যে জ্বেলে দিয়েছে। উত্তরের জানালার কাছে আমাদের দিকে পেছন ফিরে ইজিচেয়ারে এক ভদ্রলোক হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মাথায় একরাশ সাদাকালো বড়ো বড়ো চুল। পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, ওঁর দুহাতে ধরা একটা খোলা বই। জগন মোমটা আরও একটু সরিয়ে এনে বলল, এবার পড়তে পারছেন তো বড়োবাবু?

খনখনে ভাঙা গলায় উনি বললেন, ঠিক আছে, তুই যা।

জগন দরজার সামনে এসে আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলল, দুজন বাবুমশাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বড়োবাবু।

—আমার সময় নেই। যেতে বল।

যাদুগোপাল বললেন, দাদা! ইনি বিখ্যাত লোক—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তুমি তো কাগজ পড়ে এঁর কত গল্প করতে!

—এখন না। পরে আসতে বল। আমি ব্যস্ত।

যাদুগোপাল হতাশ মুখে কর্নেলের দিকে ঘুরেছেন, ঠিক সেইসময় কেউ হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, চোর! চোর! পাকড়ো! অমনি জগন কিরকম যেন হয়ে গেল। যাদুগোপাল বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকে চ্যাঁচাতে থাকলেন, পাকড়ো!

কর্নেল ও আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। দুজনেই বারান্দার রেলিঙে যাদুগোপালের পাশে গিয়ে ঝুঁকে পড়লুম, নিচে কী ঘটছে দেখার জন্যই। কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে পশ্চিম দিকে—যেদিকে গঙ্গা। তাই যাদুগোপালের টর্চের আলোয় কিছু দেখা যাচ্ছে না। জগন আমাদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে গেল সিঁড়ির দিকে। কিছুক্ষণ পরেই জগনের চিৎকার ভেসে এল, ডিমচোর! ডিমচোর!

যাদুগোপাল ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, চলুন কর্নেল! শিগগির চলুন। জগন ডিমচোরকে ধরেছে মনে হচ্ছে।

বলে কর্নেলের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

নিচে গিয়ে শুনি চ্যাঁচামেচিটা উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ভেসে আসছে। সেদিকে ছুটে গেলুম তিনজনে। টর্চের আলোও দেখা যাচ্ছে সেখানে। ঝোপঝাড় লতাকুঞ্জে জায়গাটা একেবারে ঠাসা জঙ্গল। সেখানে পৌঁছে দেখলুম, সদ্য একটা গর্ত খোড়া হয়েছে। যাদুগোপাল বললেন, কি ঠাকুর, ও কিসের গর্ত?

এই লোকটা তাহলে হরুঠাকুর। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ঘোড়ার ডিমের গর্ত, ছোটোবাবু। সাইজটা দেখুন না গর্তের। চোর আজ সকালেই ডিমটা চুরি করে এনে এখানে পুঁতে রেখেছিল। এখন সুযোগ বুঝে সেটা নিয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন, তুমি কীভাবে টের পেলে ঠাকুরমশাই?

হরু ঠাকুর বলল, আমার কান খুব খাড়া স্যার। রাতবিরেতে পাতাটি ঝরলেও শুনতে পাই। কিচেন থেকে খসখস শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। ওই দেখছেন কিচেন। জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখি, কে এখানে কী একটা করছে. অমনি দৌড়ে এলুম। লোকটা ঘোড়ার ডিমটা নিয়ে পালিয়ে গেল।

—তাকে দেখেছ তাহলে? কেমন চেহারা?

—আজ্ঞে, আবছা দেখেছি। যা জঙ্গল ওই দেখুন না জুতোর ছাপ।

লোকটা বুদ্ধিমান। গুঁড়ো এবং চাপ চাপ নরম মাটিতে জুতোর সোলের ছাপ আছে বটে। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, কী বয়সি লোক মনে হল ঠাকুরমশাই?

হরুঠাকুর একটু ভেবে বলল, তা আমার বয়সিই মনে হল। হ্যাঁ—নাকটা বেজায় লম্বা স্যার।

—হ্যাঁ, তোমার বয়স কত হল, ঠাকুরমশাই?

—তা স্যার, ষাট-বাষট্টি হয়ে এল প্রায়।

এই সময় জগন এসে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল চোর। গঙ্গার ঘাটের দরজা খুলে পালিয়ে গেছে।

কর্নেল ঝুঁকে সদ্য খোঁড়া গর্তটা দেখছিলেন। আমিও দেখতে থাকলুম। হুঁ ঘোড়ার ডিমটার যা সাইজ বলেছিলেন যাদুগোপাল, সেই সাইজের গর্তই বটে।

একটু পরে কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন চলুন যাদুগোপালবাবু! ব্যাপারটা দেখছি সত্যি রহস্যময়!

যাদুগোপাল পা বাড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, রীতিমতো রহস্যময়। অ্যাই জগন—ঘাটের দরজায় খিল দিয়েছিস? দিসনি তো? যা—যা—খিল দিয়ে দে...চলুন কর্নেল।

হলঘরের বারান্দায় পৌঁছেছি, তখন আলো জ্বলে উঠল। লোডশেডিং বাবুদের মতিগতি বোঝা দায়। দেখেটেখে মনে হয়, কে যেন কলকাতাবাসীদের সঙ্গে মজার খেলা খেলছে। আলো-আঁধারি খেলা। হলঘরে ঢুকে কর্নেল হঠাৎ বললেন, আচ্ছা যাদুগোপালবাবু, আপনাদের প্লাস্টিক গুডসের কারবারের দেখাশোনা করার জন্য কোনো ম্যানেজার রেখেছেন নিশ্চয়?

এই প্রশ্নে যাদুগোপাল একটু অবাক হয়ে বললেন, রেখেছি। কিন্তু—

কর্নেল বললেন, না—এমনি জানতে ইচ্ছে হল। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এই ঘোড়ার ডিমের রহস্যের পেছনে অন্য কারও হাত আছে।

যাদুগোপাল চাপা স্বরে বললেন, ঠিক বলেছেন। আমারও তাই সন্দেহ। সে জন্যই দাদার সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হওয়া দরকার। চলুন আরেকবার দাদার মুডটা ট্রাই করা যাক। চলুন। এ রহস্য ভেদ করতেই হবে।

এখন আলো জ্বলছে। আমরা টানা বারান্দা হয়ে দোতলায় প্রাণগোপালবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছোলুম। দরজা তেমনি খোলা। নিচু টেবিলে মোমটা তেমনি জ্বলছে। কিন্তু ঘরে এখন বিদ্যুতের আলো। সেই আলোয় শিউরে উঠে দেখলুম, প্রাণগোপালবাবু ইজিচেয়ারের পাশে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। পিঠে পাঞ্জাবি ছাপিয়ে চাপ চাপ রক্ত। যাদুগোপাল দৃশ্যটা দেখামাত্র দুহাতে মুখ ঢেকে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠলেন, দাদা!...

কর্নেলের ন্যাওটা এবং সঙ্গী হওয়ায় এযাবৎ বিস্তর খুনখারাপি আর রহস্যময় কাণ্ডকারখানা দেখেছি। কিন্তু এই অশ্বডিম্ব-রহস্য এবং প্রাণগোপালবাবুর হত্যা-রহস্যের মতো যুগল রহস্যের ঘোরপ্যাঁচ কখনও দেখিনি। মনে মনে বলছিলুম, ওহে বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর! এবার দেখি তোমার টেকো মাথার ঘিলুর শক্তি কতখানি! এবার তোমার ঋষিসুলভ সাদা দাড়ি ছিঁড়েও কুল পাবে না!

সক্কালে আমাকে ওঁর ড্রয়িংরুমে দেখে গোয়েন্দাপ্রবর মুচকি হেসে বললেন, কী জয়ন্ত? তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক তো এইমাত্র পড়লুম, এক জব্বর অন্তর্তদন্তের সূত্রপাত করেছ। কিন্তু তুমিও যে পুলিশের থিয়োরি মেনে জগনকে হত্যাকারী শাব্যস্ত করবে, ভাবতেও পারিনি।

ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, ঘটনাস্থলে আমিও ছিলুম। প্রাণগোপালবাবুকে যখন জীবিত দেখেছি তখন জগন সেখানে ছিল। ডিমচোরের ব্যাপারটা নিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু হলে আমরা নিচে গেলুম। তারপর একমাত্র জগন ছাড়া আর সবাই—মানে, যাদুগোপালবাবু আর হরুঠাকুর আমাদের সামনে উপস্থিত ছিল। জগন এল অন্তত মিনিট কুড়ি পরে। এসে বলল, চোর খুঁজতে গিয়েছিল। তারপর আমরা ওপরে গিয়ে দেখলুম প্রাণগোপালবাবু

খুন হয়ে পড়ে আছেন। কাজেই জগন ছাড়া ওই সময় আর কারুর পক্ষে খুন করার সুযোগ ছিল না।

কর্নেল সেই তামার ফলক সাফ করতে করতে বললেন, প্রত্যেকটি খুনের পেছনে মোটিভ বা উদ্দেশ্য থাকে। জগনের মোটিভ কী?

—জানা যাবে। অশ্বডিম্ব-রহস্য ভেদ করতে পারলেই জানা যাবে।

কর্নেল হাসলেন, একটু অপেক্ষা করো। অশ্বডিম্ব এসে পৌঁছোবে।

ভীষণ চমকে গিয়ে বললুম, তার মানে? ঘোড়ার ডিমের কি ঠ্যাং গজিয়েছে—নাকি ডিম ফুটে ঘোড়ার বাচ্চা বেরিয়েছে যে আপনার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হবে?

এই সময় কলিংবেল বাজল। কর্নেল চাপা গলায় বললেন, সম্ভবত ঘোড়ার ডিমটি এসে গেল।

ষষ্ঠী দরজা খুলে দিচ্ছে শুনতে পেলুম। তারপর দেখলুম, ঘোড়ার ডিম-টিম নয়—প্রাইভেট গোয়েন্দা কে. কে. হালদারমশাই সহাস্যে ঢুকে 'গুড মর্নিং' জানালেন। তাঁর কাঁধে আজ একটা—প্রায় সিমেন্টের বস্তার সাইজ কাপড়ের ব্যাগ। ধপাস করে সোফায় বসে বললেন, কফি! কফি দরকার! বাপস!

কর্নেল ষষ্ঠীকে ডেকে আরেক কাপ কফি আনতে বলে মুচকি হাসলেন, কী ডার্লিং! কী বুঝছ?

বললুম, বুঝছি, আপনার নাকি একটা তৃতীয় চোখ থাকার কথা শোনা যায়, সেটা নিছক গুজব।

—কেন, কেন?

—আপনি বললেন অশ্বডিম্বের আগমন ঘটছে। কিন্তু এলেন আমাদের হালদারমশাই।

গোয়েন্দা কৃতান্ত হালদার খি খি করে হেসে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বললেন, কী কাণ্ড! হ—আমি আইছি, অশ্বডিম্ব আইছে। বড্ড টায়ার্ড। জয়ন্তবাবু, খুইল্যা দ্যাহেন।

বলে প্রকাণ্ড ঝোলাটি দুহাতে তুলে আমার দুই উরুর ওপর স্থাপন করলেন। চমকে উঠে ঝোলা খুলতেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। প্রকাণ্ড সাদা একটা ডিম! অন্তত হাত দেড়েক উঁচু তো বটেই। হালদারমশাই খি খি করে হাসতে থাকলেন। কর্নেলও অট্টহাস্য করলেন। আমি হতবাক। তাজ্জব একেবারে।

ডিমটি শোলার মতো হালকা। হাওয়াঠাসা প্রকাণ্ড ফুটবল বললেও চলে। যদিও এটা ঝকঝকে সাদা এবং নিতান্তই ডিম। কারণ এর গড়ন ডিমের মতো। কর্নেল চোখ নাচিয়ে বললেন, কি ডার্লিং, তাহলে ঘোড়ার ডিম যে সত্যি সত্যিই আছে, হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলে তো?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, কিন্তু এটা হালদারমশাই পেলেন কোথায়?—বলেই নড়ে বসলুম। কৃতান্তবাবুর দিকে ঘুরে দেখি, উনি মিটিমিটি হাসছেন। বললুম, তাহলে কি কাল সন্ধ্যায় যাদুগোপালবাবুর বাড়ি থেকে আপনিই—

আমার কথা কেড়ে কৃতান্তবাবু বললেন, আবার কে? আমিই গঙ্গার দিক থেকে পাঁচিল বেয়ে উঠে বাড়ির ভেতর ঢুকেছিলুম। এই দেখুন, মাটি খোঁড়ার জন্য খুরপি নিয়ে গিয়েছিলুম।

উনি জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে রিভলবার বের করার ভঙ্গিতে একটা হাতুড়ি সাইজ খুরপি বের করে কফি টেবিলে রাখলেন। খুরপিতে একটু-আধটু মাটিও লেগে আছে। বললুম, বুঝলুম। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে যে কোথায় এটা পোঁতা আছে?

খি খি করে অভ্যাসমতো হাসলেন প্রাইভেট গোয়েন্দা কে. কে. হালদার, মশায়! ছত্তিরিশ বৎসর যাবৎ পুলিশে চাকরি করছি। গত সনে রিটায়ার কইর‍্যা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলছি। ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চে কাম করছি নয় বৎসর। তো হইল গিয়া—

কথা কেড়ে বিরক্ত হয়ে বললুম, আহা! সে তো সবই জানি। কিন্তু ডিমটা ওখানে পোঁতা আছে, কী করে টের পেলেন?

হালদারমশাই এক চুমুকে কফি সাবাড় করে চাপা স্বরে বললেন, যাদুগোপালবাবুর বাড়ির পেছনে গঙ্গা। গঙ্গার ধারে জঙ্গলে ভর্তি। তো গতকাল সকালে এখান থেকে বেরিয়ে গেলুম যখন, তখন মাথায় ওই একটাই চিন্তা, ঘোড়ার ডিম তো একটা অসম্ভব ব্যাপার। এদিকে যাদুগোপালবাবু এখানে কর্নেলের কাছে কথা বলছেন। এই সুযোগে জিনিসটা দেখে আসি আগে। কিন্তু গিয়ে দেখি গেট বন্ধ। কোনো পুলিশ-টুলিশ কিচ্ছু নেই। ডাকাডাকি করলে একটা লোক—মানে ওই জগন ব্যাটাচ্ছেলে, আমাকে ভাগিয়ে দিল। তখন গলিরাস্তায় ঘুরে বাড়ির পেছনে চলে গেলুম। ডাইনে ঘুরে ঝোপজঙ্গলে ঢুকে পড়লুম। তারপর পাঁচিলের কাছে একটা ঝাঁকড়া গাছে উঠে বসলুম।

কর্নেল ফোড়ন কাটলেন, পুলিশের চাকরিতে গাছে চড়ার ট্রেনিংও নিতে হয়। আসামী ধরতে পাঁচিলও ডিঙোতে হয়।

হয়!—কৃতান্তবাবু উৎসাহে সায় দিলেন, কতবার কত গাছে চড়েছি। কত পেল্লায় পাঁচিল ডিঙিয়েছি!

বিরক্ত হয়ে বললুম, আহা, তারপর কী হল বলুন।

কৃতান্তবাবু খিক করে হেসে বললেন, পাঁচিলের ধারে গাছের ডালে হনুমানের মতো বসে আছি—ডালপালা আর পাতার আড়ালে লুকিয়েই বসে আছি। হঠাৎ দেখি, সেই ব্যাটাচ্ছেলে জঙ্গুলে বাগানের ভেতর দিয়ে এই জিনিসটা চুপিচুপি নিয়ে আসছে। এনে করল কি, ঝোপের ভেতর একটা ছোট্ট শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল। গর্ত করে জিনিসটা—মানে এই ডিমটা পুঁতে মাটি ঢাকা দিল। দিয়ে একটু তফাত থেকে ঘাসের চাপড়া এনে বসিয়ে জায়গাটা স্বাভাবিক করে দিল। তারপর চলে গেল। আমি চিন্তায় পড়ে গেলুম। এ তো ভারি রহস্যময় ব্যাপার। কিন্তু এখন যদি ভেতরে ঢুকি, তাহলে ওর নজরে পড়ার চান্স আছে। কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে? তাই সন্ধ্যাবেলা এসে ডিমটা চুরি করার মতলব করলুম।

এ পর্যন্ত শুনেই হাসতে হাসতে বললুম, বুঝেছি। কাল সন্ধেবেলা তাহলে আপনিই এটা চুরি করে এনেছেন। কী কাণ্ড!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, মনে পড়ছে তো জয়ন্ত? হালদারমশাই কিন্তু জগনের ফোন করার আগেই এঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। উনি ডিম চুরি যাওয়ার কথা শুনে যাননি।

জোরগলায় বললুম, কাজেই শেষ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে, আমার থিয়োরি কারেক্ট। পুলিশ ঠিক লোককেই অ্যারেস্ট করেছে। তার মানে জগন নিজে ডিমটা লুকিয়ে ফেলে যাদুগোপালবাবুকে মিথ্যে কথা বলছিল ফোনে। অতএব—

কর্নেল ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হেসে বললেন, অতএব?

বললুম, ডিমটার ভেতর কিছু রহস্য আছে।

—তার আগে বলো, তুমি ওটা সত্যি সত্যি ঘোড়ার ডিম বলে মনে করছ কি না?

হাসতে হাসতে বললুম, মোটেও না।

—তাহলে জিনিসটা কী?

ডিম্বাকৃতি হালকা জিনিসটা নাড়াচাড়া করে বললুম, তিনজন বিজ্ঞানী নাকি এটা পরীক্ষা করেছেন। তাঁরাও এর হদিস করতে পারেননি। আমি নিতান্ত এক সাংবাদিক। আমি বড়োজোর ওই তিন বিজ্ঞানীর কাছে সাক্ষাৎকার নেব। নাম ঠিকানা আপনাকে তো যাদুগোপালবাবু দিয়ে গেছেন। কই লিখে দিন আমাকে।

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে নোটবুক বের করে পাতা উলটে বললেন, লেখো—

ড. বি. এ. অধিকারী, ১৭/২ হরি দত্ত, স্ট্রিট, কলকাতা-৬

ড. এন. কে. খড়াই, ৩৩২/এ, সাউথ অরবিন্দ লেন, কলকাতা-৭৬

ড. আর. পি. শর্মা, ১০১/৩/ই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১২।

ডিমটা এখন কৃতান্তবাবুর হাতে। নোটবইতে নাম-ঠিকানাগুলো টুকে নিয়ে দেখলুম, উনি ডিমটা নাকে ঠেকিয়ে শুঁকছেন। বললেন, কেমন একটা গন্ধ বুঝলেন কর্নেল। কতবার রগড়ে ধুয়েও দুর্গন্ধটা যাচ্ছে না।

কর্নেল এতক্ষণে ওঁর কাছ থেকে ডিমটা নিয়ে শুঁকে বললেন, হুঁ অ্যামোনিয়ার সঙ্গে থাইরামাইন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ মেশালে এইরকম কটু গন্ধ ছড়ায়। ঘোড়া কেন, যে কোনও জন্তুর কাছে ওই দুটো জিনিস মাখিয়ে কিছু রাখলে সে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলেও হিংস্র হয়ে ওঠে সে। কাছে শব্দ হলেই চমকে ওঠে এবং কামড়াতে আসে। যাই হোক, জয়ন্ত, তুমি ওই তিন বিজ্ঞানীর কাছে আমার এই অভিমতও জানাতে পারো। তাঁরা কী বলেন শোনো।

বলেই হঠাৎ অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললুম, হাসছেন কেন? কর্নেল। হঠাৎ হাসবার কারণ কী?

কর্নেল সমানে হাসতে থাকলেন। কৃতান্তবাবু হাঁ করে আছেন। হঠাৎ আমার সন্দেহ জাগল, কর্নেল ওই রাসায়নিক দ্রব্যের সংক্রমণে প্রাণীর মতোই নেশাগ্রস্ত কিংবা পাগল-প্রায় হিংস্র হয়ে পড়েননি তো?

আমি কাছে যেতে সাহস না পেয়ে ডাকতে থাকলুম, কর্নেল! কর্নেল! প্লিজ! ষষ্ঠীও ভেতরের দরজার পর্দা তুলে তার 'বাবা-মশাইকে' এমন বিকট হাসতে দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেছে।

হাসির চোটে কর্নেলের হাত থেকে প্রকাণ্ড ডিমটি মেঝেয় পড়ে গেল। পড়েই চৌচির। অমনি কর্নেল হাসি থামিয়ে বলে উঠলেন, এই রে! তারপর টুকরোগুলো কুড়োতে ব্যস্ত হলেন।

নাঃ। দিব্যি সুস্থ মানুষ মনে হচ্ছে এখন। টুকরোগুলো কুড়িয়ে হাঁক দিলেন, ষষ্ঠী। এগুলো আমার ল্যাবে রেখে আয় তো বাবা। হুঁ। কাগজে মুড়ে যত্ন করে রাখবি কিন্তু।

কৃতান্ত হালদারমশাইয়ের জোরালো ফোঁস শব্দ কানে এল। বললেন, এমন হাসছিলেন যে আমরা বড্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। কেন হাসছিলেন কর্নেলস্যার?

কর্নেল নিভন্ত চুরুট লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে বললেন, ডিমটা নিছক প্লাস্টিকে তৈরি।

ষষ্ঠীচরণ কাগজে মুড়ে খোলসগুলো নিয়ে গেল। ভেতরে কিচ্ছু নেই। ফাঁপা একটা নিশ্ছিদ্র ডিম্বাকৃতি খোল মাত্র এবং কর্নেল তো বলেই দিলেন, ওটা প্লাস্টিক তৈরি।

এবার কৃতান্তবাবু নড়ে বসলেন। বললেন, হ হ। আমারও হেই ডাউট হইছিল। সাহস কইর‍্যা কইতে পারি নাই। হ—ঠিক কইছেন। প্লাস্টিক। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, যাদুগোপালবাবুর প্লাস্টিক গুডস তৈরির কারখানা আছে না?

আছে।—কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, যাই হোক, তবু আমিই যে ঠিক বলছি, তারও প্রমাণ নেই—যতক্ষণ না ল্যাবরেটরিতে জিনিসটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ডার্লিং! তুমি বরং তোমার কাজটা আজই সেরে ফ্যালো। ওই তিন বিজ্ঞানীর কাছে গিয়ে ওঁদের মতামত জেনে নাও। দেরি কোরো না। বেরিয়ে পড়ো।

সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ কর্নেলের ফ্ল্যাটে হাজির হলুম, তখন আমি ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ। ধপাস করে ওঁর যাদুঘর-সদৃশ ড্রয়িংরুমের ভেতর সোফায় বসে পড়ে সকালের কৃতান্তবাবুর গলায় বললুম, 'কফি! শুধু কফি!'

দেখলুম, প্রাইভেট গোয়েন্দা হালদারমশাইও বসে রয়েছেন। মুখটা গম্ভীর। কর্নেল ষষ্ঠীকে ডেকে ঝটপট কফির ফরমাশ করে আমার দিকে ঘুরলেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। বললেন, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে।

—হুঁ ভীষণ ক্লান্ত।

—এবং ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমি ক্ষুব্ধ খামোখা ছুটোছুটি করে—

তিন বিজ্ঞানীকে খুঁজে পাওনি।—বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর সহাস্যে বললেন, পাওনি, কারণ সত্যি সত্যি ও নামে কোনো বিজ্ঞানী নেই।

খাপ্পা হয়ে বললুম, এমনকী ঠিকানাও ভুয়ো।

কর্নেল তাঁর সাদা দাড়িতে আঙুলের চিরুনিতে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, অবশ্য ব্যারাকপুর থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর বারীন মণ্ডল—

ওঁর কথার ওপর বললুম, ওই থানাতেও গিয়েছিলুম। বারীনবাবুর ইন্টারভিউ নিয়েছি। উনি জগনের কাছে খবর পেয়ে ব্যাপারটা দেখতে গিয়েছিলেন মাত্র। অফিসিয়াল তদন্তের প্রশ্নই ওঠে না। বললেন, হ্যাঁ—একটা প্রকাণ্ড ডিম দেখেছেন বটে। তবে ঘোড়াটার পেটের তলায় নয়। একটু তফাতে—গ্যার‍্যাজের কোনায়, ঘোড়াটার মুখের দিকে।

—এবং ঘোড়াটা ঝিমোচ্ছিল।

—হ্যাঁ!

—এবং বারীনবাবুর ডিমটার দিকে এগোলে চিঁহি ডাক ডেকে ওঁকে কামড়াতে এসেছিল।

এবার অবাক হয়ে বললুম, তাহলে আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

ষষ্ঠী কফি আনল। চুমুক দিলুম। ষষ্ঠী কফিটা দারুণ করে। ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল। কর্নেল একটু হেসে বললেন, জানি—মানে, কাল সকালে যাদুগোপালবাবু চলে যাওয়ার পর বিজ্ঞানীত্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলুম। পাত্তা না পেয়ে ব্যাপাকপুর থানায় গিয়েছিলুম। এসবের জন্যই যাদুগোপালবাবু সঙ্গে যেতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সঙ্গে যাইনি। সন্ধ্যায় যাব বলেছিলুম। ডার্লিং! তুমি তো জানো, আমি আগে ভালো করে চারদিক না দেখেশুনে কোনো কাজে পা বাড়াইনে।

কৃতান্তবাবু বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। বললেন, সাড়ে ছ-টা বেজে গেল। এখনও তো লালবাজার থেকে ডি. সি. ডি. ডি. সায়েব এলেন না।

বললুম, ডি. সি. ডি. ডি—মানে গোয়েন্দা দফতরের কর্তা অরিজিৎ লাহিড়ী?

কর্নেল শুধু মাথা দোলালেন।

কৃতান্তবাবু একটু অস্থিরভাবে বললেন, পুলিশের আর সে ডিসিপ্লিন নাই। সব ভাইঙ্গা তছনছ হইয়া পড়ছে। রেগুলারিটি নাই। কিচ্ছু নাই। কথা দিয়া, কথা রাখেন না কেউ। আমাগো আমলে কী অবস্থা আছিল কহন যায় না। একবার হইল কি—

বাধা পড়ল ওঁর কথায়। কলিংবেল বাজল। অমনি কৃতান্তবাবু নড়েচড়ে এবং হাসিমুখে ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন, সায়েব আইয়া পড়েছেন!

প্রাক্তন ইন্‌স্পেক্টর কৃতান্ত হালদার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার সায়েবকে স্যালুট ঠোকার জন্য 'অ্যাটেনশান' ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু তার বরাত! লাহিড়ীসায়েবের বদলে যিনি এলেন, তিনি যাদুগোপাল।

মুখে গভীর শোকের ছাপ। কর্নেল আস্তে বললেন, বসুন যাদুগোপালবাবু।

যাদুগোপালবাবু ক্লান্তভাবে বসলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে ভাঙা গলায় বললেন, জগন যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, কল্পনাও করিনি। দুধ দিয়ে সাপ পুষেছিলুম, কর্নেল!

কৃতান্তবাবু বসে পড়েছেন। মুখটা গম্ভীর। কর্নেল বললেন, আচ্ছা যাদুগোপালবাবু, জগন কেন আপনার দাদাকে খুন করল? এ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

যাদুগোপালবাবু বললেন, একটা সন্দেহ হচ্ছে—

—হুঁ, বলুন।

—মায়ের কাছে শুনেছিলুম, বাবা নাকি একবার নিলামে বহু টাকা দামের হিরে মুক্তোর অলংকার কিনেছিলেন। কিন্তু সেগুলো বাবা কোথায় রেখে গেছেন, হদিস পাওয়া যায়নি। এখন আমার মনে হচ্ছে, দাদার কাছেই সেগুলো লুকোনো ছিল। গত বছর কারবারে প্রচণ্ড লোকসানের শকে দাদার মাথায় গণ্ডগোল দেখা যায়। আমাদের প্লাস্টিক গুডস তৈরির কারখানা আছে। এখন মনে হচ্ছে, দাদা গোপনে একটা প্লাস্টিকের খোল তৈরি করে—

কৃতান্তবাবু বলে উঠলেন, ঘোড়ার ডিম বলুন। অশ্বডিম্ব।

যাদুগোপাল একটু বিরক্ত হলেন বোঝা গেল। বললেন, আঃ! কথাটা শুনুন আগে। ওটাই দাদার পাগলামি। জিনিসগুলো ওই ডিমের গড়ন খোলের ভেতর ঢুকিয়ে মুখটা সিল করে দিয়েছিলেন। তারপর পাগলামির ঝোঁকে আমার ঘোড়াটার কাছে রেখে এসেছিলেন। স্রেফ পাগলামি ছাড়া কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। যাই হোক ধূর্ত জগন কীভাবে তা টের পেয়ে জিনিসটা চুরি করে বাগানে পুঁতে রেখে আমাকে কাল সকালে এখানে মিথ্যে ফোন করেছিল।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন, ঠিক, ঠিক!

যাদুগোপাল শ্বাস ফেলে বললেন, কাল সন্ধ্যেয় ওটা...

আমি বাধা দিয়ে বললুম, কিন্তু হরু ঠাকুর যখন চোর চোর বলে চ্যাঁচায়, তখন তো জগন আমাদের সঙ্গে ছিল।

যাদুগোপালবাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না না। ওর কোনো লোককে বলা ছিল। সেই লোকই ওর কথামতো বাগানে ঢুকে জিনিসটা ঠিক জায়গা থেকে তুলে নিয়ে পালায়। জগনকে তো জানেন না। পাড়ায় ওর চ্যালার অভাব নেই।

কর্নেল বললেন, তা সম্ভব বটে।

যাদুগোপালবাবু জোর দিয়ে বললেন, ঠিক তাই। চোর তাড়ানোর ছলে শয়তানটা ওপরে গিয়ে দাদাকে খুন করে। তারপর ভালোমানুষ সেজে গঙ্গার দিকের দরজা খুলে আমাদের কাছে আসে। আমরা তখন বাগানে।

—ঠিক, ঠিক। আপনার কথায় যুক্তি আছে।

এবার যে জন্য আপনার কাছে ছুটে এলুম, বলি।—যাদুগোপালবাবু কান্না জড়ানো স্বরে বললেন, ব্যাটাচ্ছেলে আমার নামে পুলিশকে কিসব বলেছে। পুলিশ আমাকে জেরায় জেরায় জেরবার করে দিচ্ছে। আমিই নাকি ষড়যন্ত্র করেছিলুম দাদাকে খুন করার জন্য। অথচ দেখুন, আপনি আর জয়ন্তবাবু সাক্ষী। দাদাকে আমরা তিনজন জীবিত অবস্থায় বই পড়তে আর কথাবার্তা বলতে শুনেছি।

কর্নেল জোরগলায় বললেন, হ্যাঁ—শুনেছি। আপনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন সারাক্ষণ।

—এবারে দয়া করে পুলিশকে সেই কথাটা বলুন, স্যার।

—কাল রাত্রে তো পুলিশকে আমরা বলেছি সেকথা।

—আজ আবার পুলিশ উলটো গাইছে। জগন নাকি কিসব কবুল করেছে। আমাকে যে কোনো সময় পুলিশ অ্যারেস্ট করবে মনে হচ্ছে। তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম কর্নেল স্যার! আপনারা আমার সাক্ষী।

আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার 'অন্তর্তদন্তে'র দ্বিতীয় দফা হিসেবে যাদুগোপালবাবুর বক্তব্য নোট করছিলুম। সায় দিয়ে বললুম, আলবাত সাক্ষী আমরা। কিন্তু তিন বি—

'বিজ্ঞানী' টা আর বলা হল না। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, থামো তো তুমি! এই কাগজের লোকগুলো তিলকে তাল করতে ওস্তাদ।

তারপর যাদুগোপালবাবুর দিকে মিঠে গলায় বললেন, একটু বসুন। কফি খান। লালবাজার থেকে ডি. সি. ডি. ডি. সায়েব এসে যাবেন। আমরা তাঁকে বলব—হ্যাঁ, সুস্পষ্ট ভাষায় বলব, আপনার দাদাকে আমরা জীবিত অবস্থায় দেখেছি এবং তখন আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঘরে পর্যন্ত ঢোকেননি। এমনকী, হরুঠাকুরের চ্যাঁচামেচি শুনে যখন নিচের বাগানে যাই, তখনও আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আমরা বাগান থেকে ফিরে ফের যখন ওপরে আপনার দাদার ঘরে যাই, তখন ওঁকে নিহত অবস্থায় দেখি। কাজেই আপনাকে খুনি শাব্যস্ত করার কোনো উপায় নেই—পুলিশ যাই বলুক। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।

যাদুগোপালবাবু ধাতস্থ হয়ে বসলেন। রুমালে চোখ মুছতে থাকলেন। বললেন, দাদাকে চিরদিন সহোদর বলেই জেনেছি। আমাকে মানুষ করেছেন দাদা। আর তাঁকে আমি—ওঃ!

কৃতান্তবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, কলিংবেল বাজাল। কিন্তু এবার আর উঠে দাঁড়ালেন না সেলাম ঠোকার জন্য। মুখটা কেমন বাঁকা।

ডি. সি. ডি. ডি. অরিজিৎ লাহিড়ী ঘরে ঢুকেই বললেন, মাই ওল্ড ম্যান! ইউ আর রাইট—একেবারে কাঁটায় কাঁটায় রাইট। ওটা পাওয়া গেছে। কৃতান্তবাবু এতক্ষণে উঠে খট করে সেলাম ঠুকলেন। অরিজিৎ তাঁর দিকে তাকালেন না।

যাদুগোপালবাবুকে দেখে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন। অমনি যাদুগোপালবাবু হাউমাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন, এঁরা সাক্ষী স্যার! এঁদের জিজ্ঞেস করুন, আমি—

লাহিড়ীসায়েব বললেন, কর্নেল! একবার ফোন করব।

স্বচ্ছন্দে।—কর্নেল কোনার দিকে তুলে রাখা ফোনটা দেখিয়ে দিলেন।

লাহিড়ীসাহেব ফোনে কার সঙ্গে চাপা গলায় কিসব কথাবার্তা বলে সোফায় এসে বসলেন। যাদুগোপালবাবুর পাশেই বসলেন। লাহিড়ীসায়েবের হাতে একটা ব্রিফকেস। নিচু টেবিলটাতে রেখে মৃদু হেসে কর্নেলকে বললেন, মর্গের রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

কর্নেল বললেন, কী আছে রিপোর্টে?

লাহিড়ীসায়েব ব্রিফকেস সামান্য খুলে একটা কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। যাদুগোপালবাবু চাপা উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে বললেন, কী লিখেছে রিপোর্টে, কর্নেলস্যার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, বলছি। কাল আমি ও জয়ন্ত ঠিক কটা নাগাদ আপনার বাড়ি গিয়েছিলুম, যাদুগোপালবাবু?

যাদুগোপাল হকচকিয়ে বললেন, টাইম তো দেখিনি স্যার। সন্ধ্যাবেলায় গিয়েছিলেন।

ঠিক সাড়ে ছটায়।—কর্নেল বললেন, গিয়ে দরজার বাইরে থেকে আপনার দাদাকে বই পড়তে দেখলুম। কথাও বললেন—

—কর্নেলস্যার! তার আগে সিঁড়িতে ওঠার সময় লোডশেডিং হয়েছিল। তখন দাদাকে—অ্যাই জগনা বলে চ্যাঁচাতেও শুনেছিলেন।

কর্নেল নির্বিকার মুখে বললেন, হ্যাঁ আপনার মুখস্থ আছে দেখছি। যাই হোক, মর্গের রিপোর্ট বলছে, আপনার দাদার মৃত্যু হয়েছে বিকেল চারটে থেকে ছ-টার মধ্যে। তার মানে, সাড়ে ছ-টার পর আমরা যখন প্রাণগোপালবাবুর ঘরের সামনে যাই, তখন উনি মৃত—অন্তত মর্গের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতে। খটকা আমারও লেগেছিল রক্তের চেহারা এবং ছড়িয়ে পড়ার ধরন দেখে। আঁচ করেছিলাম, খুনটা সেই মুহূর্তে হয়নি—বিশেষজ্ঞের রিপোর্টে তা যাচাই হয়ে গেল।

যাদুগোপাল ভাঙা গলায় বললেন, ভুল, ভুল রিপোর্ট। ডাক্তার ঘুষ খেয়েছে জগনার কাছে। দাদা জগনের সঙ্গে কথা বলছে, তাও শুনেছেন। জগন মোমের আলো ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিল। তখন দাদা বললেন, ঠিক আছে। তুই যা। তারপর জগন আপনাদের কথা বলল। তখন দাদা—

বাধা দিয়ে কর্নেল লাহিড়ীসায়েবের দিকে একটা চোখ রেখে বললেন, যাদুগোপালবাবু, টেপরেকর্ডার নামে একটা যন্ত্র আছে, জানেন তো?

যাদুগোপালবাবু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই কৃতান্তবাবু তাঁকে টেনে বসিয়ে দিলেন। আর সেই মুহূর্তে লাহিড়ীসায়েব একটি ছোট্ট টেপরেকর্ডার বের করলেন ব্রিফকেস থেকে। যন্ত্রটায় ধুলো-কাদা মাখা। লাহিড়ীসায়েব একটু হেসে কর্নেলকে বললেন, আপনি গ্যারাজে ঘোড়ার জাবনা খাওয়া পাত্রের তলায় খুঁজতে বলেছিলেন। ঠিক সেখানেই পাওয়া গেছে। তবে মেঝেয় পোঁতা ছিল।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ—ওটাই সম্ভাব্য জায়গা বলে মনে হয়েছিল।

লাহিড়ীসায়েব টেপটা চালিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে খ্যানখেনে গলায়—গতকাল সন্ধ্যায় শোনা সেই চ্যাঁচামেচি শোনা গেল : অ্যাই জগনা!...তার আন্দাজ দুমিনিট পরে : ঠিক আছে, তুই যা।...আমার সময় নেই। যেতে বল।...এখন না। এখন না। পরে আসতে বল। আমি ব্যস্ত।

টেপ বন্ধ করে দিলেন লাহিড়ীসায়েব। কর্নেল বললেন, আমাকে নিজের নির্দোষিতার সাক্ষী রাখতে চেয়েছিলেন যাদুগোপালবাবু। এই বিকৃত স্বরে কথাবার্তা ওঁরই। দারুণ হত্যা পরিকল্পনা! জগন ওঁর সহকারী হয়েছিল টাকার লোভে।

লাহিড়ীসায়েব বললেন, জগন সব কবুল করেছে। হিরে-মুক্তোর ব্যাপারটা সত্যি। তাই নিয়েই দুই ভাইয়ে ইদানীং ঝগড়াঝাঁটি চলছিল।

কর্নেল বললেন, জগনকেও সন্দেহ করা যেত না। অ্যারেস্ট করার কারণ খুঁজে পেত না পুলিশ। কারণ সে আমাদের সঙ্গে থাকত। কিন্তু আমাদের হালদারমশাই নাক গলাতে গিয়ে গণ্ডগোল করে ফেলেছিলেন। উনি অশ্বডিম্ব চুরি না করতে গেলে জগন অমন করে দৌড়ে যেত না। কিছুক্ষণের জন্য সে আমাদের সঙ্গছাড়া হয়েছিল। তাই তার ওপর সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। নইলে পুলিশ বাইরের অজ্ঞাত পরিচয় খুনির পেছনে হন্যে হত। ঘোড়ার ডিম খুঁজে বেড়াত।—কর্নেল হাসতে থাকলেন।

বললুম, কিন্তু দ্বিতীয়বার গিয়ে প্রাণগোপালবাবুকে উপুড় হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

কর্নেল বললেন, নিচে 'চোর চোর' চ্যাঁচামেচি শুনে জগন, ঘর থেকে দৌড়ে বেরুনোর সময় বুদ্ধি করে আগেই মৃত প্রাণগোপালকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। ভুলে যেয়ো না, তখন চোর চোর শুনে আমাদের চোখ অন্যদিকে ঘুরে গেছে। সেই সুযোগ সে নিয়েছে। এমনকী লোডশেডিংও সাজানো ব্যাপার। কারণ আমার চোখ এড়ায়নি, পাড়ায় আলো ছিল। শুধু ওই বাড়িটাই অন্ধকার হয়ে গেল। জগনই সিঁড়ির মাথায় দ্বিতীয় একটা মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার গঙ্গার ঘাটের দরজা বন্ধ করার অছিলায় তাকে সরিয়ে দেওয়ার মানেই হল আমাদের অসাক্ষাতে যেন সে আবার মেইন সুইচ অন করে দেয়। করেও ছিল তাই।

লাহিড়ীসায়েব হাসলেন, কারেক্ট। নিচেই মেন সুইচ থাকে। কিন্তু আমাদের এক অফিসারের চোখে পড়ে, দ্বিতীয় একটা মেইন সুইচ সিঁড়ির মাথায় ডানদিকের দেয়ালে বসানো হয়েছে। সেটা আনকোরা নতুন।

কর্নেল বললেন, যাদুগোপালবাবুই দ্বিতীয়বার তাঁর দাদার ঘরে যাবার জন্য তাগিদ দেন মনে পড়ছে, জয়ন্ত? কারণ, এবার তাঁকে দেখাতে হবে, প্রাণগোপালবাবু নিহত হয়েছেন!

কৃতান্তবাবু মুখ খুললেন এতক্ষণে, কিন্তু অশ্বডিম্বটার ব্যাপার বুঝলুম না!

কর্নেল বললেন, খুব প্রাঞ্জল। আমি রহস্যটহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই—যাদুগোপালবাবু বিলক্ষণ জানেন। তাই প্লাস্টিক কারখানার আজগুবি অশ্বডিম্ব বানিয়ে পুলিশ অফিসার বারীন মণ্ডলকেও সেটা দেখিয়ে সাক্ষী রেখেছিলেন—সত্যি যেন ডিম্ব প্রসব করেছে তাঁর ঘোড়া। তারপর আমার পক্ষে অশ্বডিম্বের প্লাস্টিক বডি টের পেতে দেরি হবে না ভেবে সেটা জগনকে বলে এসেছিলেন লুকিয়ে ফেলতে। ওটা আমাকে নিয়ে যাওয়ার একটা অছিলা। তাছাড়া পুলিশ এই খুনের সঙ্গে অশ্বডিম্ব রহস্য জড়িয়ে ধাঁধায় পড়ুক এই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য। যাই হোক, সিঁড়িতে বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে. অরিজিৎ, তোমার বাহিনী আসছে।

যাদুগোপালবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, খড়ের কাকতাড়ুয়া হয়ে বসে আছেন।...

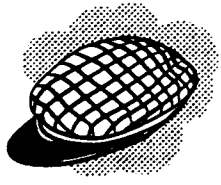

কঙ্কগড়ের রহস্য

অনেক রাতে কোথায় একটা চ্যাঁচামেচির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

বালিশের পাশে টর্চ এবং মাথার দিকে গুলিভরা রাইফেল ছিল। টর্চ ও রাইফেল নিয়ে মশারি থেকে বেরিয়ে দরজা খুলতে যাচ্ছি, পাশের খাট থেকে আমার সঙ্গী ভদ্রলোকের গলা শোনা গেল—রাতদুপুরে কোথায় চললে জয়ন্ত?

ব্যস্তভাবে বললুম—বাইরে গণ্ডগোল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন না?

—হুঁ, পাচ্ছি। চৌকিদার আর তার বউ ভালুক ভালুক বলে চ্যাঁচাচ্ছে।

এবার কান করে শুনি, সত্যি তাই। এই বনবাংলোর উঠোনে একটা প্রকাণ্ড মহুয়া গাছ আছে। এখন মার্চের শেষ থেকে এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যন্ত গাছটায় প্রচুর মহুয়া ফল পাকে। ভালুকের প্রিয় খাদ্য তো। কাজেই ভালুক আসাটা অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু চৌকিদার বা তার বউয়ের এত ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচির কী আছে! ওরা এই বনজঙ্গল এলাকারই লোক। ভালুক দেখতে অভ্যস্ত। অথচ এমন গণ্ডগোল জুড়ে দিয়েছে, যেন ডাকাত পড়েছে বাড়িতে।

বললুম—মনে হচ্ছে, ওরা বেজায় ভয় পেয়ে গেছে। ওদের সাহস দেওয়া উচিত, কী বলেন?

—তা দিতে পারো। তবে সাবধান, বেরিয়ো না। বুঝতে পারছ না, ওরাও ঘরের ভেতর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে!

এবার খুব অবাক হয়ে বললুম—ভালুককে এত ভয় পাওয়ার কী আছে!

—আছে ডার্লিং, আছে। ওই শোনো, ওরা এবার চুপ করে গেল। অতএব তুমি চুপচাপ শুয়ে পড়ো। সারাদিন ট্রেন আর জিপগাড়িতে যে ধকল গেছে, তা সামলাতে আমাদের লম্বা একটা ঘুম দরকার।

আমার এই সঙ্গী ভদ্রলোকের হরেকরকম বিদঘুটে আচরণ আমার দেখা আছে বহুদিন থেকে। কিন্তু কঙ্কগড় বনবাংলোয় এসে অবধি যা বলছেন, তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে নির্ঘাত ওঁর খুলির ভেতরকার নরম জিনিসটি এতদিনে টেঁসে গেছে!

অর্থাৎ যাকে বলে বাহত্তুরে দশা! আরও সোজাসুজি বললে ভীমরতি ধরা।

সেটাও খুব স্বাভাবিক। বয়স পঁয়ষট্টি পূর্ণ হয়েছে। গত ক্রিসমাসে নিজের পঁয়ষট্টিতম জন্মদিন [illegible]মারোহে পালন করেছেন। বলেছেন—ডার্লিং জয়ন্ত, আমার টাক এই শীতে রাতারাতি আরও [illegible] ইঞ্চি বেড়ে গেছে লক্ষ্য করেছে কি? এবং দাড়ির সর্বশেষ গোপনতম অংশও সাদা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ কি? জয়ন্ত, এতদিনে আমি প্রকৃত বুড়োমানুষ হলুম। এবার আমার সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করা উচিত।

ডিসেম্বরের শীতে একথা বলার পর মার্চের শেষ দিকে মনোরম এই বসন্তকালে হঠাৎ যখন আমাকে টেনে নিয়ে কঙ্কগড় জঙ্গলে এলেন, আমার ভয় হচ্ছিল—সত্যি সন্ন্যাসী হয়ে দুর্গম বনের ভেতর একটা পাহাড়ি গুহায় বুঝি ঢুকে পড়বেন তপস্যা করতে এবং আমাকে বিষণ্ণভাবে কলকাতা ফিরে যেতে হবে একা।

কিন্তু বিকেলে এখানে পৌঁছোনো অবধি তেমন কোনও সন্ন্যাসীভাব তো দেখছিই না, বরং চপলমতি ছেলেপুলের মতো প্রজাপতির পেছনে দৌড়ুচ্ছেন—কিংবা চোখে বাইনোকুলার রেখে

পাখপাখালি দেখছেন। কখনও বা হঠাৎ মাটির দিকে ঝুঁকে হেঁটমুণ্ডে কী সব খুঁজছেন! ওঁর উদ্ভুটে কাণ্ডকারখানা দেখলে তাক লেগে যায়। যাই হোক, আমি সত্যি ক্লান্ত। টর্চ ও রাইফেল যথাস্থানে রেখে মশারির ভেতর শুয়ে পড়লুম। তারপর বললুম—হেঁয়ালি না করে আসল কথাটা বলুন তো কর্নেল!

আশ্চর্য! আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাক ডাকছে! বিরক্ত হয়ে বললুম—কর্নেল! আপনি কি আজকাল আফিং খাওয়া ধরেছেন?

নাকডাকা থামল।—জয়ন্ত, আফিংখোরদের নাক ডাকে না।

—জেনে খুশি হলুম। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য, ভালুককে এত ভয় পাবার কী আছে—বিশেষ করে সঙ্গে যখন গুলিভরা রাইফেল রয়েছে?

—এ ভালুক সে-ভালুক নয়।

—তার মানে!

—ওটা ভালুক কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, জয়ন্ত।

—বাঃ! যে-ভালুক এইমাত্র এসেছিল এবং যাকে দেখে চৌকিদার ও তার বউ চ্যাঁচাচ্ছিল, তাকে আপনি বুঝি মশারির ভেতর শুয়ে মনশ্চক্ষে দেখলেন?

—না ডার্লিং! ওই আজব প্রাণীটিকে আমি সন্ধ্যায় দেখেছি একবার। আমি যখন ঝরনার ধারে ক্যামেরা পেতে রেখে ফিরে আসছিলুম, সে আমার পিছু নিয়েছিল। সে মানুষের মতো দুপায়ে হাঁটতে পারে।

অবাক তো বটেই, অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে বললুম—সে কী! কই তোমায় তো বলেননি!

—বললে তুমি ভয় পেতে।

—কেন?

আবার নাক ডাকা শুরু হল হঠাৎ। কয়েকবার ডেকেও সাড়া পেলুম না। জানি, বুড়োর এই হেঁয়ালির স্বভাব বরাবর। এখন মাথা ভাঙলেও প্রশ্নের জবাব পাব না। তাই চুপচাপ শুয়ে রইলুম। কিন্তু কী এক অজানা ভয়ে বুক টিপটিপ করতে থাকল।

বাইরে জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। জানলাগুলোর ওপরকার পাল্লা খোলা। এলোমেলো বাতাস বইছে শুনতে পাচ্ছি। বারবার জানলার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, হঠাৎ দেখতে পাব কালো এক রস্যময় প্রাণীকে—যে সন্ধ্যাবেলায় কর্নেলের পিছু নিয়েছিল এবং মানুষের মতো দু-পায়ে হাঁটে।

অবশ্য ভালুকেরও এখন দু-পায়ে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে। কিন্তু কর্নেল বললেন ওটা ভালুকই নয়! তাহলে ওটা কী? তাকে ভয় পাবারই বা কী আছে?

আতঙ্ক বেড়ে গেল। কিন্তু উঠে গিয়ে যে জানালা বন্ধ করব, সে সাহসও নেই। তাছাড়া জানলা বন্ধ করলে বন্ধ ঘরে আমার শ্বাসকষ্ট শুরু হতে পারে, এমন অভ্যাস।

সে-রাতে রাইফেলের বাঁটে হাতে রেখে সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ঘুম ভাঙল চৌকিদারের ডাকে। সে বেড-টি এনেছে।

বাইরে কুয়াশা জমে আছে তখনও। কিন্তু পাখপাখালির ডাক শোনা যাচ্ছে। উঠে বসে হাত বাড়িয়ে চা নিলুম। তারপর ডাকলুম—কর্নেল! উঠলেন নাকি?

চৌকিদার বলল—বড়াসাব অনেক আগে উঠেছেন স্যার। উঠে জঙ্গলে গেছেন। আমি বারণ করলুম, শুনলেন না।

হুঁ, ঝরনার ধারে ওঁর আজব ক্যামেরাটি আনতে গেছেন নিশ্চয়। ক্যামেরাটি এমন আজব যে ওতে অদৃশ্য আলোয় ছবি ওঠে। ক্যামেরা গাছের ডালে ঝুলিয়ে শাটারের সঙ্গে আটকানো একটা তার মাটিতে নিচে পুঁতে রাখাই যথেষ্ট। লেন্সের সামনে ১৮০ ডিগ্রি এবং তিরিশ মিটার অবধি মাটিতে কিছু চলাফেরা করলেই সেই সূক্ষ্ম স্পন্দন তার বেয়ে শাটারে চলে যাবে এবং শাটার ক্লিক

করবে। ছবি উঠে যাবে। তারপর ফিল্মের রিলও অটোমেটিক পদ্ধতিতে গুটিয়ে পরবর্তী ছবি ওঠার ব্যবস্থা করবে।

বললুম—ওহে চৌকিদার, রাতে তোমরা এত চ্যাঁচামেচি করছিলে কেন?

চৌকিদার ভয় পাওয়া গলায় বলল—স্যার, রাতে বাংলোয় ফের টোনাবাবা এসেছিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে খুব চ্যাঁচামেচি করে ওকে তাড়িয়ে দিলুম।

—টোনাবাবা মানে? তোমরা তো বারবার ভালুক ভালুক বলে চ্যাঁচাচ্ছিলে!

চৌকিদার চাপা গলায় বলল—স্যার, ভালুকের নাম না করলে টোনাবাবা পালিয়ে যেত না। ও ভালুককে খুব ভয় পায়।

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে মশারি তুলে বেরুলুম। চৌকিদার এবার মশারিটা খাটের মাথার ওপর গুঁজে দিতে ব্যস্ত হল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললুম—ওহে, তোমাদের এই টোনাবাবাটি কী জিনিস বলো তো!

চৌকিদার মাথা নেড়ে বলল—তা তো আমি জানি না হুজুর। সবাই ওকে টোনাবাবা বলে। তবে এই পরপর দু-রাত্তির হল সে বাংলোয় কেন হানা দিচ্ছে বুঝতে পারছি না!

—টোনাবাবা মানুষ, না জন্তু?

—তাও জানি না হুজুর।

—দেখতে কেমন?

চৌকিদার ভয় পাওয়া চোখে তাকিয়ে বলল—দেখতে কতকটা ভালুকের মতো বটে, তবে দু-পায়ে হাঁটে। ধুকুর পুকুর করে ওকে দৌড়ে যেতেও দেখেছে এলাকার লোকে। একবার কাঠুরেরা ওকে তাড়া করেছিল। তাদের কাছে শুনেছি, টোনাবাবার গায়ে কুড়ুলের কোপ বসে না—যেন পাথর! ঝাঁপডিহির সাঁওতালরা নাকি তীর ছুঁড়ে দেখেছে, সব তীর ডকাস করে পড়ে যাচ্ছে গা থেকে আর ভেঙে দুমড়ে যাচ্ছে।

চৌকিদার নিশ্চয় বাড়াবাড়ি করছে ভেবে বললুম—যতসব গাঁজাখুরি গল্প। ঠিক আছে, আজ রাতে তোমাদের টোনাবাবা হানা দিক, তখন দেখব তার গায়ে রাইফেলের গুলি বেঁধে নাকি?

চৌকিদার বড়োসড়ো চোখে তাকিয়ে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল—খবরদার স্যার, খবরদার! কক্ষনো গুলি ছুঁড়বেন না। গত শীতে এক শিকারিবাবু এসেছিলেন এই বাংলোয়। তিনি জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেননি। কাঠুরেদের কাছে পরে জানা গেল, তিনি টোনাবাবাকে গুলি করেছিলেন। আর টোনাবাবা তাঁর বন্দুক কেড়ে টুকরো করে ফেলেছিল। তাঁকেও এক থাপ্পড় মেরেছিল। তাতে উনি একেবারে দলাপাকানো লাশ হয়ে জঙ্গলে পড়েছিলেন। বরং টোনাবাবাকে দেখতে পেলে ভালুক বলে চ্যাঁচাবেন—দেখবেন তক্ষুনি পালিয়ে যাবে।

জংলি এলাকার লোকেদের কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপারটা আমার জানা আছে। তাই চৌকিদারের কথায় অবাক হলুম না। কিন্তু স্বয়ং বিচক্ষণ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারও এমন কিছুর ইশারা দিচ্ছিলেন গতরাতে। সেটাই আমার ভাবনার কথা! একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চৌকিদার এরপর টোনাবাবার এককাহন গল্প শুনিয়ে ছাড়ল। গল্পগুলো প্রায় একই রকম। কিন্তু একটা অদ্ভুত মিল সব গল্পেই রয়েছে। টোনাবাবার আবির্ভাব দিনে হয় না। সে আসে অন্ধকারে। আরও মজার কথা, কেউ সাড়া পাবার আগে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা যেন তার আসাটা টের পায়। কারণ তারা আচমকা ঘুম ভেঙে বেজায় কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। গতরাতে চৌকিদারের বাচ্চাটা আচমকা কেঁদে উঠেছিল বলেই না ওরা টের পেয়ে গিয়েছিল টোনাবাবা আসছে।

গল্প শুনতে শুনতে দেখি, এতক্ষণে আমার বৃদ্ধ বন্ধুবর ফিরে আসছেন। টুপিতে শুকনো পাতা, মাকড়সার জাল আটকে আছে। কাঁধে সেই বিদঘুটে ক্যামেরা আর দূরবিন যন্ত্রটি ঝুলছে। পিঠে

রাইফেল বাঁধা আছে। বারান্দায় উঠে টুপিটা ঝেড়ে সাফ করে বললেন—সুপ্রভাত জয়ন্ত। আশা করি, ক্লান্তি দূর করার মতো সুনিদ্রা হয়েছে।

—হয়েছে। কিন্তু, হাই ওল্ড ম্যান! আপনার ক্যামেরার রাতের ফসল টোনাবাবার একটি ছবি নয় তো!

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—তুমি কি টোনাবাবার কাহিনি শুনছিলে চৌকিদারের কাছে? জয়ন্ত, এ-কাহিনি যতই অবিশ্বাস্য হোক, তোমার দৈনিক 'সত্যসেবক' পত্রিকায় সত্যি ছাপার যোগ্য। অতএব, একজন রিপোর্টার হিসেবে তোমার কর্তব্য, টোনাবাবা সম্পর্কে আরও খবর জোগাড় করে কলকাতায় তোমার কাগজের অফিসে পাঠানো। হিড়িক পড়ে যাবে ডার্লিং! 'সত্যসেবকের' বিক্রি ঝটপট বেড়ে যাবে।

—তাতে আর সন্দেহী কী? তবে বুঝতেই পারছেন, একালের পাঠক টোনাবাবার চেয়ে রাজনীতিবাবার খবরেই বেশি আসক্ত। বরং যদি টোনাবাবার ছবি দিতে পারেন, চেষ্টা করব খবর পাঠাতে। ছবিসহ খবর ছাপলে তবে লোকে বিশ্বাস করবে।

কর্নেল ঘরে ঢুকে ক্যামেরা নিয়ে সটান বাথরুমে ঢুকলেন। বুঝলাম, আপাতত ওটাই ওঁর ডার্করুম। ক্যামেরা খুলে ফোটো রিল বের করে ডেভেলপ এবং প্রিন্টের কাজে ব্যস্ত হবেন। কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই ওঁর রাতের ফসলের নমুনা চাক্ষুষ করতে পারব।

চৌকিদার চলে গেল। আমি বারান্দায় গিয়ে কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলুম। পাহাড় ও জঙ্গল জুড়ে শেষরাতের কুয়াশা সবে মিলিয়ে যাচ্ছে এবং ঝকমকে রোদ ফুটেছে। এই বাংলোটা একটা টিলার ওপর। উত্তরে আবাদি এলাকা বাংলোর নীচেই শেষ হয়েছে। দক্ষিণ থেকে শুরু হয়েছে কঙ্কগড় ফরেস্ট ব্লক। পঞ্চাশ বর্গমাইল জুড়ে ঘন জঙ্গল। কদাচিৎ ফাঁকা এলাকায় একটা করে আদিবাসী গ্রাম।

নিচে গাছপালার ফাঁকে ঝরনা সরু সাদা ফিতের মতো যেন বাতাসে তিরতির করে কেঁপে উঠছে। তার ওপাশে একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় সেকালের কঙ্কগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে। শুনেছি, কয়েকটা ঘর এখনও নাকি টিকে আছে। কিন্তু শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে কেউ ওদিকে পা বাড়ায় না।

আমি টোনাবাবার কথা ভাবছিলুম। ব্যাপারটা সত্যি রহস্যজনক। কিন্তু...

আমার ভাবনায় বাধা পড়ল কর্নেলের চাপা উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে।—জয়ন্ত, জয়ন্ত! চলে এসো!

ঘরে ঢুকে দেখি, টেকো দাড়িয়াল বুড়ো প্রায় ধেই ধেই নাচার ভঙ্গিতে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দুই ঠ্যাং ফেলছেন। পাশে গিয়ে উঁকি মেরে আঁতকে উঠলুম।

প্রিন্টগুলো ছোট্ট সাইজের। কিন্তু এ যে সেই প্রখ্যাত সিনেমা 'কিং কং'-এর একটা রিল!

ঝরনার ধারে অবিকল কিং কং-এর মতো একটা বিদঘুটে গোরিলা জাতীয় প্রাণী হাত-পা ছড়িয়ে বসে যেন স্নান করছে জল ছড়িয়ে। আশপাশের গাছ, ঝোপ বা পাথরের সঙ্গে তুলনা করে মনে হল, প্রাণীটা অন্তত ফুট ছয়েকের বেশি উঁচু নয় এবং ছাতির মাপ প্রায় পঞ্চশ ইঞ্চি! হাত দুটো গোরিলার মতোই লম্বাটে।

হতভম্ব হয়ে বললুম—সর্বনাশ! এ যে দেখছি একটা গোরিলার ছবি!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কঙ্কগড়ে গোরিলা! অসম্ভব জয়ন্ত। গোরিলা আফ্রিকার প্রাণী। অবশ্য একসময় মালয়ের জঙ্গলে একধরনের গোরিলা বাস করত শুনেছি। কিন্তু তারা ওরাংওটাং-এরই একটা শ্রেণি। আশা করি, তুমি জানো ওরাংওটাং ওই এলাকারই প্রাণী।

—তাহলে কী এটা!

কর্নেল রহস্যময় হেসে বললেন—বড়োজোর এটুকুই বলতে পারি যে ইনিই হলেন কঙ্কগড়ের আতঙ্ক সেই টোনাবাবা এবং যার খোঁজে আমি তোমাকে নিয়ে এখানে পাড়ি জমিয়েছি।

অবাক হয়ে বললুম—সে কী! আপনি তো এসব কিছু বলেননি! শুধু বলেছেন, জঙ্গলে বেড়াতে যাচ্ছি। বেড়াব এবং সুযোগ পেলে দু-চারটে শিকারটিকারও করব।

—ডার্লিং, সব কথা খুলে বললে তুমি এমন হুট করে এ বুড়োর সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে না।

—কেন? আমাকে অত ভিতু ভাবছেন কেন?

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—জয়ন্ত, আগেই যদি সব কথা তোমাকে জানিয়ে দিতুম, তাহলে তুমি আসার আগেই তোমার দৈনিক 'সত্যসেবকে' ফলাও করে ছেপে দিতে এবং হইচই পড়ে যেত। তাতে আমার তদন্তের প্রচুর অসুবিধা ঘটত।

—বুঝলুম। কিন্তু আপনি কীভাবে টোনাবাবার কথা জানলেন?

—আমার এক বন্ধুর ছেলে অসীম ছিল দুরন্ত প্রকৃতির শিকারি। ফরেস্ট দফতরের অনুমতির তোয়াক্কা করত না। লুকিয়ে চোরা শিকারিদের সাহায্যে জঙ্গলে ঢুকে শিকার করত. সম্প্রতি কঙ্কগড়ে সে লুকিয়ে শিকার করতে ঢুকেছিল। তারপর আর ফেরেনি। আমার বন্ধু রিটায়ার্ড ডাক্তার মেজর শঙ্করনাথের অনুরোধেই আমি তাই খোঁজখবর নিতে শুরু করেছিলুম। তারপর হঠাৎ টোনাবাবার কথাটা জানতে পারি। যাই হোক, বাকিটা বুঝতেই পারছ! এবার এসো, আমরা ব্রেকফাস্টে বসি। ডার্লিং, সবার আগে সবসময় উদরটা পূর্ণ করা দরকার। শূন্য উদরে কোনও কাজ করা যায় না।

ঘুরে দেখলুম, চৌকিদার ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। হুঁ, বুড়োর নাকের বাহাদুরি! আগেই টের পেয়ে গেছেন। এজন্যেই সবাই ওঁকে বলে 'বুড়ো ঘুঘু'...

দুই

চৌকিদার টোনাবাবার হাতে খুন হওয়া এক শিকারির কথা বলেছিল। কর্নেলকে কথাটা জানিয়ে য়েছিলুম। কিন্তু উনি তেমন কান করে শুনলেনই না। শুধু বললেন—এমন ঘটনা আরও ঘটেছে নছি।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ঝরনার ধারে গেলুম। ছবিতে জায়গাটা যেমন দুর্গম দেখাচ্ছিল আদতে অতটা নয়। কর্নেল সেখানে হেঁটমুণ্ডে ঘুরে কী যেন খুঁজে বেড়ালেন কতক্ষণ। আমি গুলিভরা রাইফেল হাতে চারদিকে কড়া নজর রাখলুম। ঘন ঝোপজঙ্গল আর গাছপালার মধ্যে ছোটোবড়ো অজস্র পাথর পড়ে আছে। পাথরের আড়ালে টোনাবাবা ওত পেতে বসলে দেখা যাবে না। সেই সময় হঠাৎ চোখ পড়ল, ওপর দিকে একটা সাদা পাথরের খাঁজে কালো কী একটা পড়ে আছে! জিনিসটা চৌকো মতো এবং কালো।

এখানে ঝরনার ধার থেকে ধাপেধাপে পাথরের সিঁড়ির মতো যে ন্যাড়া টিলাটা আকাশে মাথা তুলেছে, সেখান দিয়ে উঠলে জিনিসটা কুড়িয়ে আনা যায়। কিন্তু টোনাবাবার ভয়ে আমার এক পা বাড়ানোর সাহস নেই। মুখে তো একথা স্বীকার করা যায় না! বললুম—কর্নেল! মনে হচ্ছে একটা কিছু পড়ে আছে ওখানে। চলুন না, দেখে আসা যাক কী ওটা।

কর্নেল তখন হাঁটু দুমড়ে বসে মাটি থেকে কী খুঁটিয়ে হাতের চেটোয় তুলে রাখছেন। মুখ না ঘুরিয়ে বললেন—তুমিই দেখে এসো।

আমি দ্বিধায় পড়ে গেলুম—কালো চৌকো মতো জিনিসটা পাথর হতেও পারে। কর্নেল অমনি মুচকি হেসে বললেন—ভয় নেই জয়ন্ত, টোনাবাবার আবির্ভাব দিনের বেলা হয় না। তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।

রাগ দেখিয়ে বললুম—আমি ভিতু নই, তার প্রমাণ কতবার পেয়েছেন।

—বিলক্ষণ পেয়েছি। তাই তো বলছি ডার্লিং, কালো মতো যে জিনিসটা দেখেছ, নিয়ে এসো।

বলে কর্নেল নিজের কাজে মন দিলেন। আমি রাইফেল বাগিয়ে পা বাড়ালুম। কয়েকটা ঝোপ ঠেলে এগিয়ে ন্যাড়া টিলার পাথুরে ধাপে যেই উঠতে শুরু করেছি, হঠাৎ ওপর দিকে খুট করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে মুখ তুলে যা দেখলুম, আমার তাজ্জব লাগল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেল সাড়া দিলেন—কী হল জয়ন্ত?

—বেড়াল! একটা বেড়াল!

—বেড়াল দেখে চ্যাঁচামেচির কী আছে ডার্লিং? বেড়াল বাঘের মাসি হলেও অতি নিরীহ প্রাণী।

—আহা, বেড়ালটা সেই কালো জিনিসটা নিয়ে পালাচ্ছে। দেখুন, দেখুন।

—তাড়া করো জয়ন্ত, তাড়া করো।

পাথরের ধাপ বেয়ে যত জোরে পারি উঠতে শুরু করলুম। কালো রঙের বেড়ালটা কিন্তু আস্তে সুস্থে পাথরের ওপর বা রেখে ওপর দিকে উঠছে। আমার দিকে ঘুরে যেন একবার বাঁকা হাসলও। তার মুখে অবশ্য সেই কালো জিনিসটা রয়েছে। তাই হয়তো পুরো হাসি হাসতে পারল না।

এই বনজঙ্গলে বনবেড়াল থাকতে পারে। কিন্তু এ বেড়াল সে বেড়াল নয়। আমি বেড়াল চিনি। আমার মাসিমার ছেলেপুলে ছিল না। এক দঙ্গল বেড়াল নিয়ে জীবন কাটাতেন। সত্যি বলতে কী, সেই মাসির বাড়ি থেকেই আমি লেখাপড়া শিখেছি। বড়ো হয়েছি। কাজেই বেড়ালের খবর আমার নখদর্পণে। কালো জিনিসটা নিয়ে যে বেড়ালটা গদাইলশকরি চালে পাহাড়ে চড়ছে, সে যে গৃহপালিত বেড়াল তাতে কোনও ভুল নেই।

ন্যাড়া টিলার চুড়োয় উঠে বেড়ালটা অদৃশ্য হল। টিলাটা বড়োজোর একশো ফুট উঁচু। হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে পৌঁছে দেখি বেড়ালটা ওপাশে নেমে যাচ্ছে। তখন মরিয়া হয়ে ভাবলুম, গুলি ছুঁড়ে ওকে ভয় দেখালে নিশ্চয় জিনিসটা মুখ থেকে ফেলে দেবে।

কিন্তু আমার বরাত, বেড়ালটাকে আর দেখা গেল না। আমারই বুদ্ধির ভুল! তখনই যদি গুলি ছুঁড়তুম, নিশ্চয় কাজ হত।

নিচের দিকে ঝোপজঙ্গল তো আছেই, অজস্র পাথরও পড়ে আছে ধ্বংসাবশেষের মতো। বেড়ালটা খুঁজতে খুঁজতে চোখের ব্যথা হয়ে গেল। তারপর এতক্ষণে ঠাহর করলুম, যা ঘটেছে ভারী বিস্ময়কর! ওই কালো চৌকো জিনিসটা কী হতে পারে! আর এই দুর্গম জঙ্গলে একটা কালো বেড়ালই বা তা মুখে করে নিয়ে গেল কেন?

জিনিসটা যে প্রাণীর খাদ্য নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

নিচের জঙ্গলটা একটা ছোট্ট উপত্যকা। তার ওধারে সেই ঐতিহাসিক কঙ্কগড় দুর্গ পাহাড়। সেদিকে তাকিয়ে আমার ফের চমক লাগল।

দুর্গের ওখানে একটা লোক চুপচাপ বসে আছে। শঙ্খচূড় সাপের ভয় তুচ্ছ করে ওখানে কেউ গিয়ে বসে আছে, কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু তারপর আরও যা দেখলুম, আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল।

সেই কালো বেড়ালটা দুর্গ-পাহাড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে এবং সেই লোকটার কাছে পৌঁছেছে। আর লোকটা তার মুখ থেকে কালো জিনিসটা নিয়ে তাকে আদর করছে।

আমি চাপা গলায় ডাকতে থাকলুম—কর্নেল! কর্নেল! শিগগির আসুন!

সাড়া এল আমার পিছন থেকে।—দেখতে পাচ্ছি, জয়ন্ত।

ঘুরে দেখি, বুড়ো ঘুঘুমশাই কখন চুপিচুপি ঝরনার ধার থেকে উঠে এসেছেন এবং একটা পাথরে ঠেস দিয়ে বসে চোখে বাইনোকুলার রেখে কঙ্কগড় দুর্গের ওই বিচিত্র দৃশ্য মন দিয়ে উপভোগ করছেন।

কাছে গিয়ে বললুম—এ তো ভারি তাজ্জব ব্যাপার!

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে বললেন—হুঁ, তাজ্জব তাতে সন্দেহ কী! লোকটা আমাদের দেখতে পেয়েই আড়ালে লুকিয়ে গেল। জয়ন্ত, আমারই বুদ্ধির ভুল। ওই কালো বেড়ালটার কথা আমিও শুনেছিলুম। কঙ্কগড় জঙ্গলে অনেকেই নাকি ওকে দেখেছে। কিন্তু তাতে অবাক হবার কিছু ছিল না। অনেক সময় গৃহপালিত প্রাণী জঙ্গলে এসে বুনো হয়ে স্থায়ী ডেরা গাড়তে পারে সেখানে। অথচ যা দেখলুম, তাতে মনে হল—বেড়ালটা দস্তুরমতো ট্রেন্ড এবং তার মালিকও রয়েছে!

—কালো চৌকো জিনিসটা কী হতে পারে অনুমান করতে পারছেন কর্নেল?

—অনুমান হয়। বাইনোকুলারে জিনিসটা দেখলুম, জয়ন্ত। ওটা একটা নোটবই ছাড়া কিছু নয়।

—বলেন কী!

—তোমার কথার গুরুত্ব না দিয়ে ভুল করেছি ডার্লিং! যাই হোক, এখন আর পস্তিয়ে লাভ নেই। চলো, আমরা ওই দুর্গ হানা দিই। মনে হচ্ছে, ওই রহস্যময় লোকটা যেভাবেই হোক এখানে একটা নোটবই ফেলে গিয়েছিল কখন। পোষা বেড়ালকে সেটা খুঁজতে পাঠিয়েছিল।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। দুজনে নিচের উপত্যকায় নামতে থাকলুম।

খুব সাবধানে আমরা এগোচ্ছিলুম। কখনও ঝোপের আড়ালে কখনও পাথরের পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে কতক্ষণ পরে কঙ্কগড় দুর্গ-পাহাড়ের ধারে পৌঁছোলুম। তারপর পাহাড়ে চড়া শুরু হল।

পাহাড়ের এদিকটা ঢালু। কাজেই তত বেশি কষ্ট করতে হল না। কিন্তু শেষ পঁচিশ ফুট একেবারে খাড়া দেয়াল। সমস্যায় পড়া গেল দেখছি। বেড়ালটা তখন কোন পথে উঠেছিল, চিনতে পারছি না আমরা।

কর্নেল বললেন—এক কাজ করা যাক। পাঁচিলের ধারে-ধারে এগিয়ে ঝরনার মাথার দিকে যাই, এসো। কাল সন্ধ্যার একটু আগে দেখে গেছি ওদিকটা। পাঁচিলটা ওদিকে ভেঙে গেছে। নিশ্চয় ওঠার রাস্তা পেয়ে যাব।

পাঁচিলের নিচে পা ফেলার জায়গা খুব সামান্যই। অতি কষ্টে এবং সাবধানে এগোতে হল। কিছুক্ষণ পরে আমরা ঝরনার মাথায় গিয়ে পৌঁছোলুম। এখানে একটা চওড়া চত্বর থেকে প্রস্রবণ জলপ্রপাতের মতো পাঁচশো ফুট নিচে সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জলের গর্জনে কান পাতা দায়!

হঠাৎ কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ফিশফিশ করে বললেন—সাপ! নোড়ো না।

দেখেই আঁতকে উঠলুম। মাত্র পনেরো-কুড়ি ফুট দূরে একটা পাথরের খাঁজে লম্বা হয়ে বিশাল একটা সাপ মনের সুখে জল খাচ্ছে। তার জিভটা লকলক করছে। সাপটা যে শঙ্খচূড়, তাতে ভুল নেই।

একটু পরে সাপটা ঘুরে পাথর বেয়ে উঠতে থাকল।

তারপর হঠাৎ বিকট হিসহিস শব্দ করে মাথা তুলল। তার প্রকাণ্ড ফণা অন্তত পাঁচ ফুট খাড়া হয়ে রইল। কর্নেল ফিশফিশ করে বললেন—কিছু দেখেছে সাপটা!

কী দেখেছে, সেটা আমাদেরও চোখে পড়ল। সেই কালো বেড়ালটা! একটা পাথরের ফাটল থেকে রুক্ষ একটা গাছ মাথা তুলেছে। মনে হল গাছে পাখির বাসা আছে। বেড়ালটা নিশ্চয় ছানাগুলো চুরি করে খেতে এসেছে। সাপটার গর্জন শুনেই সে থমকে গেছে এবং জুলজুলে চোখে তাকিয়ে আছে। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে তার।

সাপের সঙ্গে বেজির লড়াই দেখেছি। কিন্তু বেড়ালের সঙ্গে সাপের লড়াই কল্পনা করে দম আটকে এল উত্তেজনায়। আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরলুম। হতচ্ছাড়া শঙ্খচূড় যদি বেড়ালটাকে মেরে ফেলে আমার কষ্ট হবে। অমন শিক্ষিত বেড়াল সচরাচর দেখা যায় না!

শঙ্খচূড় কয়েকফুট এগিয়ে হিস করে ফণা ঝাড়ল। আর বেড়ালটা এক লাফে পিছিয়ে গিয়ে গর্‌র্‌র্ গ্যাঁও করে উঠল। মনে হল, বেড়ালটা খুব ফিচেল। সাপটার সঙ্গে সে তামাশা করছে। সাপটা এইতে বেজায় রেগে গেল। সে ফের চক্কর তুলে লাফ দেবার ভঙ্গিতে আরও কয়েক ফুট

এগিয়ে গেল। তার চক্করটা এখন প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু। এপাশ-ওপাশে দুলছে। বেয়াদব প্রাণীটাকে চরম দণ্ড দেবার জন্যে সে যেন অস্থির! রাগে অপমানে ক্রমাগত ফুঁসছে।

কিন্তু ব্যাপারটা আর এগোল না। হঠাৎ ওপারে কোথাও কার গলা শোনা গেল—মহারাজ! মহারাজ! পালিয়ে আয়!

কর্নেল এক ঝটকায় আমাকে টেনে প্রকাণ্ড একটা পাথরের আড়ালে নিয়ে গেলেন। আমরা লুকিয়ে পড়লুম। সেখান থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, সেই লোকটা দুর্গের ওপর থেকে ঝুঁকে হাত নেড়ে বেড়ালটাকে ডাকছে।— মহারাজ! অ্যাই হতভাগা! মারা পড়বি যে! পালিয়ে আয় বলছি!

বেড়ালটার নাম তাহলে মহারাজ! সে মুখ তুলে লোকটাকে দেখল। তারপর দ্বিধার সঙ্গে আস্তে আস্তে রণস্থল ত্যাগ করল। তবে যাবার আগে সাপটাকে ধমক দিতে ভুলল না। পাথরের ধাপে লাফ দিতে দিতে ওপরে অদৃশ্য হলে সাপটা ফণা গুটিয়ে চলতে শুরু করল।

কর্নেল লোকটাকে দেখছিলেন। ফিশফিশ করে বললেন—সাবধান জয়ন্ত, নড়ো না। দেখতে পাবে!

মহারাজ লোকটার কাঁধে গিয়ে চড়েছে। সে ওকে আদর করতে করতে সরে গেল ধ্বংসাবশেষের আড়ালে। আমরা উঠলুম।

কর্নেল বললেন—থাক জয়ন্ত। এখন আর ওপরে গিয়ে কাজ নেই। লোকটাকে ভালোভাবে দেখে নিয়েছি। মুখটা চেনা মনে হল! কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছি না। এসো ফেরা যাক।

বললুম—এমন দুর্গম জায়গায় ও কী করে? ভারি আশ্চর্য তো!

কর্নেল কোনও কথা না বলে আমার হাত ধরে টানলেন। আমরা আগের পথে নামতে শুরু করলুম....

তিন

দুপুরে খাওয়ার পর বিছানায় গড়াচ্ছি। সেই সময় দেখি, কর্নেল টেবিলে একটুকরো কাগজে কীসব রেখে আতশ কাচ দিয়ে দেখছেন। জিজ্ঞেস করলুম—ওগুলো কী?

কর্নেল একটু হেসে জবাব দিলেন—টোনাবাবার লোম।

—তাই বলুন! আসা অবধি দেখছি, মাটির ওপর ঝুঁকে হামাগুড়ি দিয়ে কী খুঁজছেন। তাহলে টোনাবাবার লোম খুঁজতেই হন্যে হচ্ছিলেন কাল থেকে?

—হ্যাঁ ডার্লিং।

—লোম ইজ লোম। আতশ কাচ দিয়ে অত খুঁটিয়ে দেখার কী আছে!

—আছে বৎস। একসময় ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ চামড়াবিদ্যায় কিছু জ্ঞানগম্যি ছিল। তখন শিকারের নেশা ছিল। তাই শিকার-করা জন্তুর চামড়া কীভাবে অবিকৃত রাখা যায়, তার হদিস পেতে ওই বিদ্যার চর্চা করেছিলুম! দেখা যাক, সেই জ্ঞান কাজে লাগাতে পারি নাকি!

—কী কাজে লাগাতে চান, শুনি?

—প্রথম কথা, এ লোম কোন্ জন্তুর জানতে চাইছিলুম। জানলুম। দ্বিতীয় কথা, এ লোম যে-জন্তুর গা থেকে খসে পড়েছে, সে জীবিত—না মৃত, সেটা জানার দরকার ছিল। জেনে গেলুম।

—বাঃ! তাহলে ওই জ্ঞান দুটো আমাকেও বিতরণ করুন। জ্ঞানী হই আপনার মতো।

কর্নেল আমার তামাশায় কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন—আশ্চর্য, বড়ো আশ্চর্য জয়ন্ত! এ লোম নিতান্ত ভালুকের। অথচ আমি জানি, টোনাবাবা মোটেও ভালুক নয়। তাছাড়া সে ভালুক ভালুক বলে চ্যাঁচালে ভয় পেয়ে পালায়। আর তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার এ লোম মরা ভালুকের।

হতভম্ব হয়ে বললুম—ওরে বাবা! তাহলে কি ওটা একটা ভালুকের প্রেতাত্মা?

—তাহলে ভালুক বলে চ্যাঁচালে ভয় পাবে কেন ডার্লিং?

—পাবে এজন্যে যে সে একটা ভূত। মানুষের ভূত শুনেছি জ্যান্ত মানুষকে ভয় পায় অনেক সময়। ভালুকের ভূত জ্যান্ত ভালুকের কথায় ভয় পাবে, এতে অবিশ্বাসের কী আছে!

—হুম! কিন্তু এ লোম ভালুকের—অথচ টোনাবাবা ভালুক নয়, গোরিলা জাতীয় প্রাণী। তুমি তো ওর ফোটো দেখেছে। ভালুক বলে মনে হয়? অবিকল যেন সেই সিনেমায় দেখা কিংকং!

এ রহস্যের মাথামুণ্ডু নেই! অগত্যা আমি ঘুমোবার তালে থাকলুম। দুপুরে খেয়ে ভাতঘুমের বাঙালি অভ্যেস আমার বরাবর।

সেই ঘুম ভাঙার পর দেখি, ঘরে আমি একা। আলো ধূসর হয়ে গেছে। কঙ্কগড় দুর্গপাহাড়ের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথা লাল হয়ে গেছে। বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে বৃদ্ধ সঙ্গীটির কথা ভাবলুম। নিশ্চয় কোথাও সেই বিদঘুটে ক্যামেরার ফাঁদ পাততে গেছেন। এ বয়সে অমন সাহসের বাড়াবাড়ি না দেখালেই পারতেন!

চৌকিদারকে ডেকে একটা চেয়ার আনতে বললুম। চায়েরও ফরমাশ দিলুম। একটু পরে চেয়ারে বসে চা খেতে-খেতে চমকে দেখি, সেই মহারাজ অর্থাৎ কালো বিড়ালটা চৌকিদারের ঘরের বারান্দায় পা টিপে টিপে উঠছে। বারান্দায় একটা দোলনা টাঙানো। তাতে চৌকিদারের বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। মহারাজ করল কী, একলাফে দোলনায় উঠে পড়ল। অমনি বাচ্চাটা বেজায় চ্যাঁচামেচি করে কান্নাকাটি জুড়ে দিল। চৌকিদারের বউ রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল খুন্তি হাতে। চৌকিদারও দৌড়ে গেল।

তারপর যা দেখলুম, কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল।

ঘরের পেছনদিক থেকে দুলতে দুলতে মূর্তিমান কিংকং বেরুল যেন! হ্যাঁ, এই সেই টোনাবাবা তাতে কোনও ভুল নেই। সে দু—ঠ্যাঙে হেঁটে বারান্দায় পা দিতেই চৌকিদার ভিরমি খেয়ে গোঁ গোঁ করে পড়ে গেল। তার বউ দুর্বোধ্যভাষায় চিৎকার করে উঠেছিল। কিন্তু তার মায়ের মন। প্রথমেই সে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে। কালো বেড়ালটা দোলনার কিনারায় আরামে বসে দুলছে। আর টোনাবাবা দরজায় ঘুষি মারছে দমাদম।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এসব ঘটে গেল। তারপর আমার সংবিৎ ফিরে এল। কিন্তু রাইফেলের জন্যে দৌড়ে বাংলোয় ঢুকতে গেলে যদি টোনাবাবা আক্রমণ করে? আমি অসহায় হয়ে পড়লুম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ভালুক! ভালুক!

অমনি টোনাবাবা থমকে দাঁড়াল। আমি আরও বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলুম—ভালুক! ভালুক!

টোনাবাবা দুলতে দুলতে নামল বারান্দা থেকে। তারপর যেই ঘরের পিছন দিকে জঙ্গলে ঢুকতে গেছে, হঠাৎ কোত্থেকে তার সামনে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। টোনাবাবা তাঁকে যেন ঘুষি মারবার জন্যে মুঠো তুলল। আমি আঁতকে চোখ বন্ধ করলুম।

তারপর শুনলুম কর্নেল হাসতে হাসতে বলছেন—গুড ইভনিং টোনাবাবা! গুড ইভনিং!

টোনাবাবা থেমে গেছে।

কর্নেল বললেন—হাঁ করে কী দেখছেন মশাই! আসুন, চা খাওয়া যাক। তারপর অন্য কথা।

টোনাবাবা চুপ। দোলনা থেকে বেড়ালটা দৌড়ে গিয়ে তার কাঁধে চাপল।

এবার কর্নেল খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেললেন। টোনাবাবা ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কর্নেলের গায়ে এমন দানবের জোর আছে কখনও দেখিনি। এমন একটা কিংকংকে হিড়হিড় করে টেনে আনছেন!

লনের মাঝামাঝি এসে টোনাবাবা মানুষের ভাষায় এবং খাঁটি বাংলায় বলে উঠল—আঃ! ছাড়ুন না মশাই! এ হাতের হাড় ভাঙা যে! হারামজাদা ভালুক আমার ডানহাতটা অকেজো করে দিয়েছে ছেলেবেলায়।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত, চৌকিদারের জ্ঞান ফেরাও। ওর বউকে বেরুতে বলো। আমাদের অতিথির জন্যে চা-ফা দরকার। তাছাড়া রাতেও ইনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। বলে দিয়ো।

যেতে যেতে ঘুরে দেখি, টোনাবাবা আমার খালি চেয়ারটাতে বসে পড়ল।...

ভালুকের চামড়া খুলে রেখে টোনাবাবা আমাদের সঙ্গে পরম আনন্দে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন—আহা, কতকাল পরে এমন সুস্বাদু চা খাচ্ছি। তবে শুনুন মশাই, আমি কিন্তু স্রেফ নিরিমিষ খাই। চৌকিদারকে বলে দেবেন। তবে আমার মহারাজের জন্যে বিশেষ ভাবতে হবে না। একবাটি দুধ হলেই চলবে। বেচারা বহুকাল দুধ খেতে পায় না। সেই লোভেই তো ও বাচ্চাদের বিছানায় গিয়ে দুধের শিশি হাতড়ায়। বাচ্চাগুলো এমন হিংসুটে! চ্যাঁচামেচি করে হইচই বাধায়।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—মহারাজ না হয় দুধ চুরি করতে হানা দেয়, আপনি কী চুরি করতে চান টোনাবাবা?

টোনাবাবা লাজুক হেসে বললেন—আমি বাচ্চাদের খুব ভালোবাসি। একটু আদর করতে সাধ যায়। কিন্তু আমার এমনি কপাল! আজ অবধি একটা বাচ্চাও হাতাতে পারলুম না। যেমনি চুপি চুপি হানা দিই, আমার মহারাজ হারামজাদা ঘুম ভাঙিয়ে দেয় ওদের। তারপর লোকেরা ভালুক ভালুক বলে ভয় দেখায়। আমার মশাই ওই একটা আতঙ্ক। ছেলেবেলায় সেই যে ভালুকের পাল্লায় পড়েছিলুম, উঃ! সে আতঙ্ক আর কাটল না বুড়ো বয়সেও।

—হুম। কিন্তু বাচ্চা চুরি করার ইচ্ছে কেন আপনার?

টোনাবাবা খিকখিক করে হাসলেন। চোখ নাচিয়ে বললেন—পুষব। মহারাজকে যেমন পুষেছি, তেমনি পুষব, তো দিনদুপুরে বাচ্চা চুরি করা কি সহজ কাজ! লোকেরা বেদম ঠ্যাঙানি দেবে যে! তাই টোনাবাবা সেজে রাতবিরেতে হানা দিই! হি হি হি হি!

আমি এসব কথাবার্তার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। চুপচাপ শুনে যাচ্ছি। শুধু টের পাচ্ছি, এই টোনাবাবা ভদ্রলোকের খুলির ভেতরকার নরম বস্তুটিতে নিশ্চয় কোনও গণ্ডগোল ঘটেছে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হবার পর ফের লনে গিয়ে বসে আছি, এমন সময় একটা জিপ এসে উপস্থিত হল। কয়েকজন অফিসার গোছের ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন—নমস্তে কর্নেলসাব! কই, আমাদের পেশেন্ট ভদ্রলোক কোথায়?

অবাক হয়ে দেখি, টোনাবাবা কখন চেয়ার থেকে ছিটকে গেছেন এবং আলোছায়ায় ভরা লনে ফুলগাছের আড়ালে হামাগুড়ি দিচ্ছেন এবং কাঁধে মহারাজও রয়েছে।

টর্চের আলো পড়তেই উঠে দাঁড়িয়ে বিকট চেঁচিয়ে বললেন—যাব না। কিছুতেই যাব না।

অফিসাররা তাঁকে ধরে ফেললেন। তারপর টানতে টানতে জিপের দিকে নিয়ে গেলেন। বেড়ালটা ওঁর কাঁধ আঁকড়ে বসে রইল।

টোনাবাবাকে নিয়ে জিপ চলে গেলে এতক্ষণে বললুম—হে বৃদ্ধ ঘুঘুপাখি! এসবের অর্থ কী?

কর্নেল হোহো করে হেসে বললেন—এখনও বোঝোনি জয়ন্ত! টোনাবাবা কিছুদিন আগে রাঁচির পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছেন। আজ দুপুরে আমি প্রতাপগড়ে গিয়ে ট্রাংক কল করে এসেছিলুম।

—এবার বুঝলুম। তবে অর্ধেক বুঝিনি। কে টোনাবাবা?

—ভদ্রলোকের নাম দিবাকর মুখুজ্জে। নামকরা উকিল ছিলেন রাঁচি আদালতে। একমাত্র পুত্র ট্রাক দুর্ঘটনায় মারা যাবার পর ক্রমশ মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল। তারপর...বাধা দিয়ে বললুম—ভালুকের চামড়া পেলেন কোথায় উনি?

—তোমাকে আমার বন্ধু মেজর শংকরনাথের কথা বলেছি। তাঁর ছেলে অসীম বিনা লাইসেন্সে কঙ্কগড় জঙ্গলে শিকারে এসে বাড়ি ফেরেনি, তাও বলেছি। কাল সন্ধ্যাবেলা ঝরনার ওখানে হঠাৎ অসীমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে একটা বাঘ না মেরে কিছুতেই বাড়ি ফিরবে না। কোন পাহাড়ি গুহায় সে লুকিয়ে আছে বলল।

যাই হোক, কথায়-কথায় অসীম বলল, সে একটা প্রকাণ্ড ভালুক মেরে চামড়া ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে শুকোতে দিয়েছিল। সেই চামড়াটা হারিয়ে গেছে। তা এই শুনেই আমার কেমন সন্দেহ হল। তারপর অসীমের কাছেই শুনলুম, ভাঙা দুর্গে বেড়াল কাঁধে নিয়ে একটা লোককে বেড়াতে দেখেছে। লোকটা গুনগুন করে গানও গাইছিল। গানটা শোনো।

বলে কর্নেল সুর ধরে গাইতে লাগলেন :

টানা বাবা টানা, ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা, টান টোন টানা...

বললুম—এ আবার কিসের গান?

কর্নেল বললেন—১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে যাত্রা নামে একজন ওরাওঁ 'টানা ভগত' নামে এক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ওরাওঁ জাতির কুসংস্কার দূর করা। অথচ আশ্চর্য, সেই 'টানা ভগত' আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। টোনাবাবা নামে এক ভূতের সৃষ্টি হয়। কুসংস্কারের শক্তি এমনি! এক ভূত তাড়ালে আরেক ভূত এসে জোটে। যাই হোক, সম্ভবত কাঠুরেরা ওই গান শুনেই ভেবেছিল জঙ্গলে টোনাবাবার আবির্ভাব ঘটেছে। দিবাকরবাবুও সুযোগ বুঝে নিজেকে টোনাবাবা করে তুলেছিলেন।

এসব শোনার পর কঙ্কগড়ের রহস্য আমার কাছে মুছে গেল। তাই বললুম—আর কী হবে এখানে থেকে? যেখানে রহস্য নেই, সেখানে তো আপনারও মন বসে না।

কর্নেল হাসলেন—রহস্য নেই কে বলল! জঙ্গল, পাহাড়, দুর্গের ধ্বংসাবশেষ—এ সবে রহস্যের শেষ নেই। এক রহস্যের পর্দা তুলে দেখি সামনে আরেক রহস্যের পর্দা দাঁড় করানো। তুমি জানো, আমি ওই ঝরনার ধারে একটা শিলালিপি আবিষ্কার করেছি। আমার ধারণা ওই দুর্গে খুঁজলে অনেক বিস্মৃত ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব হবে। ডার্লিং! আগামী প্রত্যুষে আমরা দুর্গে অভিযান করব।

আঁতকে উঠে বললুম—রক্ষে করুন! শঙ্খচূড় সাপের কথা ভেবে এখনও বুক কাঁপছে।

কর্নেল আমার একটা হাত নিয়ে সস্নেহে বললেন—বৎস জয়ন্ত, কঙ্কগড়ের ওই আতঙ্ক আছে বলেই আমাদের অভিযান রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠবে। চলো, শুয়ে পড়া যাক। সকাল-সকাল উঠতে হবে।...

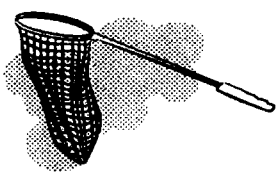

তিতলিপুরের জঙ্গলে

এক

সময়টা ছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কর্নেল কোন সূত্রে খবর পেয়েছিলেন, তা জানি না। দোমোহানি নামে কোন অজ পাড়াগাঁ এলাকার জলাধারে নাকি একঝাঁক নীল সারস এসেছে। কর্নেলের মতে, এই সারস নাকি অতিশয় দুর্লভ প্রজাতির। অতএব তাঁকে আমার ফিয়াট গাড়িতে চাপিয়ে দোমোহানি যাচ্ছিলাম।

চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে পঞ্চাশ কিলোমিটার এগিয়ে একটা ছোট্ট বাজারে পৌঁছে কর্নেলের নির্দেশে গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলাম। সেখানে একটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাটির ভাঁড়ে দুজনে চা খেলাম। কর্নেল চা পছন্দ করেন না। তিনি কফি খান, আমার হিসেবে ঘণ্টায় কমপক্ষে দু-বার। কিন্তু সেখানে কফি পাওয়া যায় না।

চায়ের দাম মিটিয়ে কর্নেল চাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন — তিতলিপুর আর কতদূরে?

চাওয়ালা একগাল হেসে বলল—স্যার! এটাই তো তিতলিপুর।

—এখান থেকেই তো দোমোহানি যাওয়া যায়?

—আজ্ঞে স্যার। চাওয়ালা আঙুল তুলে অদূরে একটা বিশাল বটগাছ আর জীর্ণ মন্দির দেখাল।— ওই যে দেখছেন কাত্যায়নীতলা। ডাইনে ঘুরে চলে যান। পিচরাস্তা যেন ছাড়বেন না। তা মোটরগাড়িতে ধরুন বিশ-তিরিশ মিনিটে পৌঁছে যাবেন।

আমি কর্নেলের এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু বলতে শুধু জানি দুটো কথা। জলাধার আর নীল সারস। তাই নিছক কৌতূহলে কর্নেলকে এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলাম—দোমোহানি গ্রামে বিদ্যুৎ আছে কি?

চাওয়ালা হেসে উঠল।— দোমোহানি গ্রাম নয় স্যার। দুটো নদী উত্তর আর পুবদিক থেকে এসে মিশেছে। সেখানে আগের দিন ছিল অথই জলের বিল। গরমেন্ট বছর দশেক আগে সেই বিলের চারদিকে বাঁধ দিয়ে ড্যাম করেছে। আর স্যার, ওই পথের ওপাশে যে জঙ্গল ছিল, সেটাকে করেছে ফরেস্ট।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—নটা পনেরো। জয়ন্ত! আর তাড়াহুড়ো নয়। আস্তে ড্রাইভ করো।

গাড়িতে উঠে বললাম— জঙ্গলে প্রজাপতি, অর্কিড, আর পাখি-টাখি দেখতে দেখতে যাবেন।

কর্নেল তাঁর প্রকাণ্ড শরীর আমার বাঁপাশে ঢুকিয়ে বললেন—তুমি পাখির সঙ্গে টাখি বললে। বলা যায় না, আমরা টাখিরও দর্শন পেতে পারি।

বলে তিনি চুরুট ধরালেন। কাত্যায়নীতলায় ডাইনে ঘুরে পূর্বমুখী একটা সংকীর্ণ পিচরাস্তায় আস্তে এগিয়ে গেলাম। কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই এই স্পিডে আমাকে গাড়ি চালিয়ে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে পৌঁছুতে হয়।

রাস্তাটা মসৃণ নয়। এবড়োখেবড়ো। আমাদের ডাইনে আমবাগান, ঝোপ-জঙ্গল, কোথাও পুরোনো কালের দালানকোঠার ধ্বংসস্তূপ এবং এসবের ফাঁকে তিতলিপুরের ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছিল। মাঝে মাঝে ডাইনে একটা করে মাটির রাস্তা, একটা মোরামবিছানো রাস্তা আর পায়ে চলা রাস্তা তিতলিপুরের ভিতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু বাঁদিকে টানা জঙ্গল। ঝোপঝাড় যত, তত উঁচু গাছ এবং শালবন। এই শীতে শালবনের চেহারা রুক্ষ, হতশ্রী। পাতা ঝরে গেছে। তবে চিরহরিৎ গাছপালা যেন তাদের দারিদ্র্য ঢেকে রেখেছে।

কর্নেল বাইনোকুলারে অর্কিড প্রজাপতি বা পাখি—আমি বলেছি পাখি-টাখি, অভ্যাসমতো খুঁজছেন। কিছুদূর চলার পর রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিল। বাঁদিকে একটানা জঙ্গল, চাওয়ালার 'ফরেস্ট'। ডানদিকে সিঙ্গাপুরি কলাবাগান। কখনও আমবাগান। হঠাৎ কর্নেল বললেন — ডার্লিং! তুমি টাখির কথা বলছিলে। এবার সত্যিই টাখি দেখতে পাবে। স্পিড বাড়াও।

কিছুটা এগিয়েই দৃশ্যটা চোখে পড়ল।

দুজন ভদ্রলোক রাস্তার উপর মল্লযুদ্ধ করছেন। একজনের পরনে প্যান্ট, ফুলহাতা সোয়েটার। অন্যজনের পরনে ধুতি আর গলাবন্ধ লম্বাকোট। দুজনে পরস্পরকে ধরে জাপটাজাপটি করছিলেন। তারপর ওই অবস্থায় রাস্তার পাশে ঘাসে গিয়ে পড়লেন। আশ্চর্য ব্যাপার, দুই যোদ্ধাই প্রবীণ। দুজনেরই মাথার চুল সাদা।

আমাদের গাড়ির প্রতি তাঁদের দৃকপাত নেই। কর্নেল সত্যিই বলেন, হিংসাজনিত ক্রোধ মানুষকে অন্ধ করে। কর্নেলের ইশারায় আমি যতটা সম্ভব নিঃশব্দে দুই মল্লযোদ্ধার প্রায় হাতবিশেক দূরে গাড়ি দাঁড় করালাম। আমি হাসছিলাম না। কারণ তাঁদের হুম হাম হুঙ্কার, ফোঁস ফোঁস শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এবং পরস্পরের পোশাক টানাটানি দেখে মনে হচ্ছিল, এবার একজন অপরজনের বুকে বসে গলাটিপে মেরে ফেলবেন।

আবার তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বিকট হুঙ্কার দিয়ে পরস্পর মল্লযুদ্ধে রত হতেই কর্নেল গাড়ি থেকে নামলেন। তারপর ক্যামেরা তাক করে এগিয়ে গেলেন। শাটার টেপার শব্দ কানে আসছিল।

এতক্ষণে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। দুই যোদ্ধারই চোখ পড়ল কর্নেলের দিকে। অমনই প্যান্ট-সোয়েটারপরা শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক যেন দিশাহারার মতো বাঁদিকের জঙ্গলের ভিতরে সবেগে উধাও হয়ে গেলেন। ধুতি-লংকোটপরা ফরসা ভদ্রলোকও ডানদিকে আমবাগানের ভিতরে একই বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে বললেন —তা হলে জয়ন্ত! আমরা সত্যিই একটা 'টাখি' দেখলাম। তাই না?

গাড়ি থেকে নেমে বললাম—কিন্তু কর্নেল, ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

— কেন অস্বাভাবিক?

— আমাদের দেখে ওঁরা অমন করে পালিয়ে গেলেন কেন?

— বরং বলো আমাকে দেখে। কারণ আমি রাস্তায় নেমে ওঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

— তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তা হলেও ওঁরা দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেলেন। এর কারণ কী?

— তোমার কী ধারণা? একটু ভেবে বলো জয়ন্ত!

একটু ভেবে নিয়ে বাঁ হাতের ওপর ডান হাতের থাপ্পড় মেরে হাসতে হাসতে বললাম—বুঝেছি। দুজনেই দস্তুরমতো ভদ্রলোক। তাই লজ্জায় অপ্রস্তুত হয়ে কেটে পড়লেন আর কী!

কর্নেল তাঁর সাদা দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে কী যেন ভাবছিলেন। বললেন — না জয়ন্ত! ক্যামেরা। আমার এই ক্যামেরাই ওঁদের পালানোর কারণ।

কথাটা এবার মনে ধরল। বললাম—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক তা-ই। দুজনেই ভদ্রলোক। বুড়োবয়সে ওইভাবে মল্লযুদ্ধ করছেন। আর আপনি ক্যামেরায় সেই অদ্ভুত ঘটনার ছবি তুলতে যাচ্ছেন। সেই ছবি এলাকার পরিচিত লোকে দেখলে হাসাহাসি করবে। সেই ভেবেই ওঁরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি আপনার ক্যামেরার কয়েকটা ক্লিক শুনতে পেয়েছি।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আমার হাতে ক্যামেরা এবং আমার উদ্দেশ্য টের পেয়েই ওঁরা পালিয়েছেন। তো—তুমি রণক্ষেত্র বললে। রণক্ষেত্রে ওটা কী পড়ে আছে?

বলে তিনি পিচরাস্তার ডানদিকে পিচ আর পাথরকুচির টুকরো উঠে গিয়ে যে ছোট্ট গর্ত হয়েছে, সেখান থেকে কী একটা জিনিস তুলে নিলেন। জিজ্ঞেস করলুম—পকেট থেকে কয়েন পড়ে গেছে নিশ্চয়— যা যুদ্ধ চলছিল!

কর্নেল জিনিসটা তাঁর জ্যাকেটের ভিতর-পকেটে ঢুকিয়ে রেখে গাড়িতে উঠলেন। আমিও উঠে পড়লাম। স্টার্ট দিয়ে লক্ষ্য করলাম, আমার বৃদ্ধ বন্ধুর মুখ হঠাৎ বেজায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন—এবার স্পিডে চলো, জয়ন্ত! দশটার মধ্যেই আমার সেচবাংলোয় পৌঁছুনোর কথা।

কিছুদূর চলার পর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে রাস্তা সোজা এগিয়ে গেছে। এবার ডানদিকে সবুজ মাঠ এবং বাঁদিকে একই জঙ্গল—সেই 'ফরেস্ট' টানা চলেছে। প্রায় দু কিলোমিটার পরে বাঁদিকে জঙ্গলের শেষ প্রান্তে অর্থাৎ পূর্বদিকে পুরোনো আমলের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। তার নিচে স্বচ্ছজলের ঝিল। ঝিলের ওপাশে উঁচু বাঁধ। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম—ওটা কি কোনও রাজারাজড়ার বাড়ি ছিল?

—হ্যাঁ। তবে বাড়ি নয়। কেল্লা। মোগল আমলের এক ফৌজদার জাহান খাঁর কেল্লাবাড়ি। ইচ্ছে হলে ওটা দেখে নিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে দরকারি বই খুঁজে দৈনিক সত্যসেবকে একটা রিপোর্টাজ লিখে ফেলবে।

—এবার কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার লক্ষ্য দুর্লভ প্রজাতির নীল সারস, নাকি অন্য কিছু?

কর্নেল হাসলেন।—তাই বলুন! গত রবিবার ড. জয়ন্ত ঘোষাল আপনার কাছে এসেছিলেন।

—তুমি জানো না, ড. ঘোষাল একজন প্রখ্যাত ওর্নিথোলজিস্ট!

—সেটা কী?

—ওঃ জয়ন্ত! এযুগে সাংবাদিকদের সবজান্তা হওয়া দরকার। গ্রিক ভাষায় ওর্নিথো মানে পাখি।

— তার মানে ড. ঘোষাল এক পক্ষীতত্ত্ববিশারদ। মুম্বাইয়ের সালিম আলির নাম জানি!

— বাঃ! তিনি তো আর বেঁচে নেই। একজন বঙ্গসন্তান তাঁর মতো কৃতিত্ব অর্জন করলে খুশি হব।

এবার সামনে উঁচু জমির ওপর সুদৃশ্য বাংলো ধাঁচের বাড়ি এবং উঁচু বাঁধের ওপর সারিবদ্ধ ইউক্যালিপটাস গাছের ফাঁকে বিস্তীর্ণ জল চোখে পড়ল। জলে উত্তরের বাতাসে সমুদ্রের মতো ঢেউ দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা আমার ভালো লাগল।

পিচরাস্তাটা বাংলোর দক্ষিণের নিচু পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে ডাইনে ঘুরে বাঁধের রাস্তায় মিশেছে। সেখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল, একটা পুরো পরিবার 'সাইট-সিইং'য়ে এসেছে। হয়তো বাঁধের ওপর পিকনিকও করবে।

দারোয়ান গেট খুলে দিল। গাড়ি সুদৃশ্য লনে নুড়ির ওপর অদ্ভুত শব্দ করছিল। কর্নেলের নির্দেশে ডানদিকের পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করালাম। কর্নেলকে দেখে একজন রোগা মধ্যবয়সি ভদ্রলোক হন্তদন্ত এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন।—আমি স্যার বাংলোর কেয়ারটেকার রমেন বিশ্বাস। তিনি উর্দিপরা একটা লোককে বললেন—ভৈরব! তুমি সায়েবদের লাগেজ নিয়ে এসো। আসুন কর্নেলসায়েব! আমি আপনাদের রুমে পৌঁছে দিই।

পার্কিং জোনে একটা জিপগাড়ি দেখিয়ে কর্নেল বললেন—কোনও অফিসার এসেছেন বুঝি?

রমেনবাবু চাপাস্বরে বললেন—চন্দ্রপুরের বড়োবাবু—মানে, থানার অফিসার-ইন-চার্জ রাজেন হাটি। দোমোহানির উত্তরে সরকারি জমি দখল করে কিছু উটকো লোকবসতি করেছে। তাই নিয়ে এলাকার দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যে রেষারেষি চলেছে। বড়োবাবু কয়েকজন আর্মড কনস্টেবল নিয়ে সেখানে গেছেন। বাংলোর চারটে ঘরের দুটো ঘর—বলতে গেলে উনি নিজেই জবরদখল করেছেন। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের বাংলো। এখন হঠাৎ আমার ওপরওয়ালা কেউ এসে পড়লে আমাকেই কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু পুলিশ বলে কথা! আমি স্যার কী করি বলুন! রামে মারলে মারবে, আবার রাবণে মারলেও মারবে...!

বাংলোর চারদিকে চওড়া বারান্দা। পূর্ব-দক্ষিণের ডাবলবেড ঘরটি কর্নেলের জন্য রাখা ছিল। পূর্ব এবং দক্ষিণের বারান্দায় বসলে বিস্তীর্ণ জলাধার চোখে পড়ে। কিন্তু পূর্বদিকে উত্তরের উদ্দাম বাতাস। আমরা দুজনে দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে ব্রেকফাস্ট করার পর কফি পান করছিলাম। বারান্দার নিচে রংবেরংয়ের ফুলের গাছ। তার মধ্যিখানে নুড়িবিছানো একফালি পথ। পথের শেষে গেট। উঁচু থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, গেটের ওধারে শানবাঁধানো ঘাটের নিচে একটা সাদারঙের বোট।

কেয়ারটেকার রমেন বিশ্বাসের বাড়ি তিতলিপুর। অনর্গল বকবক করা ভদ্রলোকের অভ্যাস। কর্নেলকে সারা এলাকার খুঁটিনাটি খবরাখবর দিচ্ছিলেন। একবার আমি রমেনবাবুকে তিতলিপুরের কাছে রাস্তার ওপর দুই মল্লযোদ্ধা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম। কর্নেল তা টের পেয়েই চোখ কটমটিয়ে আমাকে বললেন— নীল সারস কি অত সহজে দেখা যায় জয়ন্ত? ড. ঘোষাল সাত-সাতটা দিন ঘোরাঘুরি করার পর দৈবাৎ দেখতে পেয়েছিলেন!

আমি চুপ করে গেলাম। রমেনবাবু বললেন—কী নাম বললেন কর্নেলসায়েব? ড. ঘোষাল?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ, ড. জয়ন্ত ঘোষাল। আপনার তাঁকে চেনার কথা। উনি এই বাংলোয় ছিলেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চিনতে পেরেছি। ঘোষালসায়েব এ মাসের গোড়ার দিকে এসেছিলেন। দিন ছ-সাত ছিলেন। কিন্তু রাত্রিটুকুই যা বাংলোয় কাটাতেন। ভোরবেলা বেরিয়ে যেতেন। আপনার মতো ক্যামেরা আর দুরবিন ছিল। বনবাদাড়ে আর এই ড্যামের জলে জেলেদের নৌকোয় চেপে পাখিদের ছবি তুলতে যেতেন। সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিলাম। চন্দ্রপুরে তার বাড়ি। পাখিধরা তার পেশা স্যার! ফাঁদ পেতে পাখি ধরে কলকাতায় বেচে আসে। পুলিশের চোখে পড়লে তাকে জেল খাটতে হবে। কিন্তু পেটের জ্বালা স্যার সাংঘাতিক জ্বালা।

বললাম—কর্নেল! লোকটাকে সঙ্গী করতে পারেন! নীল সারসের খোঁজ সে নিশ্চয় রাখে।

কর্নেল কিছু বলার আগে রমেনবাবু বললেন—স্যার বললেই আমি রমজান পাখাড়ুকে খবর দেব।

—পাখাড়ু! অদ্ভুত পদবি তো!

রমেনবাবু হাসলেন।—হ্যাঁ স্যার। পাখি ধরে। তাই পাখাড়ু।

কর্নেল বললেন—তাকে দরকার হলে আমি আপনাকে বলব।

এই সময় বাংলোর 'কুক' নরুঠাকুর এসে আমাদের সেলাম দিল। তারপর ট্রে-তে সাজিয়ে প্লেট, কফির পট আর কাপগুলো নিয়ে গেল। রমেনবাবুকে মুচকি হেসে চাপা স্বরে বললেন—একেই বলে ভাগ্য স্যার! তখন তিতলিপুরের জমিদারদের কথা বলছিলাম, নরু—মানে নরেন সেই বংশের ছোটোতরফের বংশধর। ওর পূর্বপুরুষের দাপটে এক সময় বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত! পূর্বজন্মের কাজের ফল। আর কী বলব?

কর্নেল অ্যাশট্রেতে চুরুট ঘষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথায় টুপি চাপালেন। টাকে ইতিমধ্যে যথেষ্ট হিম লেগেছে মনে হল। তারপর ঘরে ঢুকে ওঁর কিটব্যাগ পিঠে এঁটে বেরিয়ে এলেন। গলায় ক্যামেরা, বাইনোকুলার ঝুলিয়ে বললেন—জয়ন্ত! তুমি বিশ্রাম করো। আমি একবার ড্যামের ওদিকে ঘুরে আসি।

তারপর তিনি পশ্চিমে সদর গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে বাংলোর নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ওপাশে তাঁকে দেখা গেল। বুঝলাম ড্যামের বাঁধের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাবেন। কতদূর যাবেন, তা তিনিই জানেন।

রমেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কর্নেলসায়েবেরও কি ঘোষালসায়েবের মতো পাখির নেশা আছে?

বললাম—নীল সারসের খোঁজে চললেন। এতক্ষণ কথা বলে বোঝেননি?

—তাই বটে! আপনি রেস্ট নিন স্যার! আমি নিজের কাজে যাই।

—এক মিনিট! আচ্ছা রমেনবাবু, তিতলিপুরের পাশ দিয়ে আসবার সময় রাস্তায় এক ভদ্রলোককে দেখলাম। ফরসা ঢ্যাঙা গড়ন। ধুতি আর ছাইরঙা লংকোট পরে আছেন! মাথার চুল সাদা। গোঁফদাড়ি কামানো। চেহারায় আভিজাত্য আছে। ষাটের বেশি বয়স বলে মনে হল। আর—

রমেনবাবু হাসলেন।—বুঝেছি। আপনি যাঁকে দেখেছেন, তিনি তিতলিপুরের জমিদারদের বড়োতরফের বংশধর। দীপনারায়ণ রায়। কলকাতায় কী চাকরি করতেন শুনেছি। এখন রিটায়ার্ড। তবে মাঝে মাঝে তিতলিপুরে এসে বোনের বাড়িতে থাকেন। কিন্তু উনি কবে এসেছেন, জানি না।

—উনি অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এ ভদ্রলোকের পরনে প্যান্ট আর সোয়েটার ছিল। শ্যামবর্ণ, একই বয়সের লোক। মাথার চুল সাদা। কিন্তু কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। কী দুজনে তর্কাতর্কি হচ্ছিল মনে হল।

রমেনবাবু নড়ে উঠলেন।—বুঝেছি! বুঝেছি! চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবু।

—জাহাজিবাবু মানে?

—জাহাজে চাকরি করতেন। শম্ভুনাথ চৌধুরি। শম্ভুবাবুকে এ তল্লাটের লোকে জাহাজিবাবু বলে। সত্যি বলতে কি, শম্ভুবাবুর সঙ্গে দীপনারায়ণবাবুর আত্মীয়তা আছে। সঠিক খবর জানি না। তবে চন্দ্রপুরে শম্ভুবাবুর পূর্বপুরুষও জমিদার ছিলেন।

—ওঁরা তর্কাতর্কি করলেও মনে হল, দুজনের মধ্যে বন্ধুতা আছে।

—আছে। ছোটোবেলায় দেখেছি শম্ভুবাবু ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে ফিরলেই প্রায় প্রতিদিন দীপনারায়ণবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিতে আসতেন। তবে তর্কাতর্কি হচ্ছে দেখেছেন, ওটা স্যার স্বাভাবিক। আজকাল দেশে যা ঘটছে, তা নিয়ে মানুষে-মানুষে মতান্তর হতেই পারে। একেক গ্রামে দুটো-তিনটে করে দল হয়েছে। ওই যে বললাম মতান্তর! মতান্তর থেকে মনান্তর। তা থেকে মারামারি। খুনোখুনি! 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়' ছোটোবেলায় পদ্যে পড়েছি। চলি স্যার!

বলে রমেনবাবু হন্তদন্ত বাংলোর সামনের দিকে গেলেন। দেখলাম, দারোগাবাবু সদলবলে ফিরে আসছেন। আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এখানে জলাধারের আবহাওয়ায় শীতটা বড্ড জোরালো। কম্বল টেনে নিলাম।...

কর্নেলের ডাকে উঠে বসলাম। ঘড়ি দেখে নিলাম। একটা পাঁচ। কর্নেল বললেন—স্নান করে ঘুমোতে পারতে। বাথরুমে গিজার আছে। গরম জল পেতে।

বললাম—আপনি কতদূর ঘুরলেন?

—অনেক দূর।

—নীল সারসের খোঁজ পেলেন?

—নাঃ। তবে ফিল্‌মের রোলটা শেষ করেছি। আজ রাত্রেই বাথরুমকে ডার্করুম বানিয়ে ফিল্‌মগুলো ডেভেলাপ, ওয়াশ আর প্রিন্ট করে ফেলব।

বলে কর্নেল অর্থপূর্ণ হাসলেন। আমি বললাম—আমি দুই মল্লযোদ্ধার পরিচয় পেয়ে গেছি। চেহারার বর্ণনা দিতেই রমেনবাবু বললেন, ধুতিপরা লোকটি দীপনারায়ণ রায়। আর প্যান্টপরা লোকটি—

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—জয়ন্ত! তুমি বড্ড বোকামি করে ফেলেছ। রমেনবাবুর বাড়ি তিতলিপুরে। তুমি ওঁকে কি প্রকৃত ঘটনাটা বলেছ?

—আমার মথাখারাপ? আমি দুজনকে রাস্তায় তর্কাতর্কি করতে দেখেছি। এই বলেছি।

কর্নেল বললেন—তাহলেও তুমি ঠিক করোনি। রমেনবাবু কী বললেন বলো!

রমেনবাবুর কাছে যা শুনেছিলাম, চাপা স্বরে তা জানিয়ে দিলাম। কর্নেলের মুখের গাম্ভীর্য তবু কাটল না। গলার ভিতরে বললেন—সমস্যা হল, রমেনবাবু আমরা এখানে থাকার সময় দৈবাৎ তাঁর গ্রামে গিয়ে যদি দীপনারায়ণ রায়কে আমাদের পরিচয় দেন, কী ঘটবে বুঝতে পারছি না।

চমকে উঠে বললাম—কেন?

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—যে জিনিসটা নিয়ে দুজনের মধ্যে কাড়াকাড়ি এবং শেষে ধস্তাধস্তি বেধেছিল, ওদের দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে, সেটা আমিই কুড়িয়ে পেয়েছি। কারণ আমিই গাড়ি থেকে নেমে ওদের ছবি তুলতে এগোচ্ছিলাম। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা কয়েন নয়।

—জিনিসটা তাহলে কী?

—ডিমালো গড়নের একটা ব্রোঞ্জের সিল। নাকি ওটা সিল নয়। ওতে একটা সারসের মূর্তি আছে। তা ছাড়া কয়েকটা চিহ্ন আছে। আমার মনে হয়েছে, ওটা মিশর থেকে কেউ চুরি করে এনেছে। মিশরের প্রাচীন চিত্রলিপিতে কিছু কথা লেখা আছে ওতে। জয়ন্ত! হয়তো আমরা না জেনে বিষধর সাপের ল্যাজে পা দিয়েছি।...

দুই

খাওয়ার পর দক্ষিণের বারান্দায় কর্নেল ও আমি রোদে বসে আছি। এমন সময় পশ্চিমের বারান্দা ঘুরে দানবের মতো অতিকায় একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন। তাঁর গায়ের রং কালো। কিন্তু পাকানো গোঁফের নিচে সাদা দাঁতের হাসি ঝকমক করছিল। কর্নেলের কাছে এসে তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন — আমার সৌভাগ্য! এখানে কর্নেলসায়েবের মতো বিখ্যাত মানুষের দর্শন পাব কল্পনাও করিনি। আপনার কত নাম শুনেছি আমাদের পুলিশ মহলে। রমেন বলছিল, একজন কর্নেলসায়েব এসেছেন। জিজ্ঞেস করতে বলল, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

কর্নেল বললেন—আপনার কথাও শুনেছি। আপনি চন্দ্রপুর থানার ও সি মি. রাজেন্দ্র কুমার হাটি।

'বড়োবাবু' খাকি পোশাকে ঢাকা তাঁর প্রকাণ্ড ভুঁড়ি কাঁপিয়ে অট্টহাসি হাসলেন।—কর্নেলসাহেব! আপনার নাকি পিছনেও একটা চোখ আছে। যাই হোক, আমাকে এখনই থানায় ফিরতে হবে। কিংবদন্তির নায়ককে একবার চোখের দেখা দেখতে এলাম। এই অধম যদি আপনার কোনও উপকারে লাগে, প্লিজ স্মরণ করবেন। কদিন থাকছেন স্যার?

—কিছু ঠিক নেই। আমি এসেছি দুর্লভ প্রজাতির নীল সারসের খোঁজে!

দারোগবাবু আবার হাসলেন।—আপনার এসব হবির কথাও শুনেছি। কলকাতার লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে সাব-ইন্সপেকটর নরেশ ধর আমার মাসতুতো ভাই স্যার।

—বাঃ! নরেশবাবুকে বলব আপনার কথা।...

আরও কিছু কথাবার্তার পর পুলিশ অফিসার রাজেন হাটি চলে গেলেন। একটু পরে গেটের ভিতর দিয়ে সেই পুলিশ জিপটা বেরিয়ে গেল। পিছনে বন্দুক হাতে কনস্টেবলদের দেখা যাচ্ছিল।

বললাম—তখন বলছিলেন না জেনে বিষধর সাপের ল্যাজে পা দিয়েছি। এবার রাজেন হাটির মতো জাঁদরেল পুলিশ অফিসার বেদে হয়ে সাপটার বিষদাঁত ভেঙে—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ও কথা নয়। চলো। বেরুনো যাক।

—কোথায় যাবেন?

—প্রশ্ন নয়। শিগগির রেডি হয়ে বেরিয়ে এসো। সঙ্গে তোমার ফায়ার আর্মস নিয়ো।

কথাটা শুনে একটা অস্বস্তিতে শরীরে যেন শিহরন ঘটে গিয়েছিল। একটু পরে কর্নেলের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সদর গেট পেরিয়ে কর্নেল পিচের রাস্তায় যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে

হাঁটছিলেন। ডাইনে ঝিল পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল সোজা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। ঝরাপাতার স্তূপে জুতোর চাপ অদ্ভুত শব্দ করছিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা জাহান খাঁর কেল্লাবাড়ি এলাকায় ঢুকেছিলাম। শীতের বিকেলে সেখানে এখনই গাঢ় ছায়া। ধ্বংসস্তূপে জঙ্গল গজিয়ে আছে। মাঝে মাঝে একটা ভাঙা পাঁচিল, গম্বুজ ঘর এবং গম্বুজে ফাটল, একটা দেউড়ি, তারপর মুখ থুবড়ে পড়া মসজিদ চোখে পড়েছিল। কর্নেল কখনও একটু থেমে বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিচ্ছিলেন। একবার আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—নীল সারসের দলটা খুঁজছেন নাকি? কর্নেল শুধু বলেছিলেন—হুঁ।

দ্রুত দিনের আলো কমে যাচ্ছিল। ফাঁকা জায়গা থেকে অদূরে কুয়াশার পর্দা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আমার কাঁধে হাত চেপে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর কানে এল, সামনের দিকে ঝরাপাতার ওপর পা ফেলে কে যেন হেঁটে আসছে।

একসময় শব্দটা থেমে গেল। আমরা একটা ভাঙা গম্বুজের আড়ালে ছিলাম। মাটিতে বসে-যাওয়া গম্বুজের চারপাশে ঝোপঝাড়। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এল। এখন শীতের হাওয়াটা বন্ধ। মাঝে মাঝে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। কে সিগারেট টানছে, দেখার জন্য একটু সরে যাচ্ছিলাম। কর্নেল আমাকে টেনে ধরে বাধা দিলেন। সময় কাটছিল না। কতক্ষণ পরে আবার শুকনো পাতার ওপর শব্দ শোনা গেল। লোকটা চলে যাচ্ছে ভেবেছিলাম। কিন্তু তখনই কেউ চাপা স্বরে বলে উঠল—এত দেরি করলে কেন? অন্ধকার হয়ে যাবে শিগগির। খামোখা—

তার কথার ওপর অন্যজন বলল—টর্চ আনোনি?

—এনেছি।

—আমিও এনেছি।

—তাহলে অসুবিধে কীসের? তুমি খুঁড়বে। আমি আলো দেখাব। আমি খুঁড়ব। তুমি আলো দেখাবে।

—বাবু দাগ দিয়ে রেখে গেছেন। কই সেই দাগ?

—এই যে। কিন্তু আমি একটা কথা ভাবছি।

—ভাবছটা কী? সামান্য কাজ।

—সামান্য নয় হে! পাথরের স্ল্যাব। তলায় কতটা পোঁতা আছে কে জানে। তাছাড়া স্ল্যাবের তলায় যদি পেতলের নলটা না থাকে?

—থাকবেই। বাবু গতবছর স্ল্যাবের তলায় ওটা পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। তখন আমিই স্ল্যাবটার এখানে সুড়ঙ্গ মতো করেছিলাম।

—তাহলে তো তুমি সেই জায়গাটা চেনো। আমি আলো জ্বালি। তুমি সেখানটা খোঁড়ো।

এবার টর্চের আলোর একটু ঝলকানি দেখতে পেলাম। তারপর খোঁড়ার শব্দ। একটু পরে একজন বলল—আচ্ছা, ফরেস্ট গার্ডটা যদি হঠাৎ এসে পড়ে?

—তোমার মাথাখারাপ? এই শীতের সন্ধ্যায় ব্যাটারা ফরেস্টবাংলোর কাছাকাছি কোথাও থাকবে। আমরা তো গাছ কাটছি না যে সেই শব্দ শুনে দৌড়ে আসবে।

আবার মাটি খোঁড়ার শব্দ হতে থাকল। এবার কর্নেল আমাকে টেনে নিয়ে একটু পিছনে একটা ঝোপের আড়ালে। তারপর গুঁড়ি মেরে বসে শুকনো পাতার ওপর জুতোর চাপা শব্দ করতে থাকলেন।

অমনই লোকদুটো একসঙ্গে বলে উঠল—কীসের শব্দ?

—এই! কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সেবার বাঘ এসেছিল। বাঘ নয় তো?

—কিছু বলা যায় না। সঙ্গে মেশিন আছে। আন্দাজে গুলি ছুঁড়ব? যদি ভয় পেয়ে পালায়।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু তোমার দিশি পিস্তলের শব্দ শুনে বাঘ যদি উলটে খেপে ওঠে?

তখনই কর্নেল আমাকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলেন। আবছা আঁধার এখন ঘন হয়েছে। কর্নেল টর্চের আলো ফেলে তাঁর রিভলভারের নল সেই আলোতে দেখিয়ে গর্জন করে উঠলেন—কোন ব্যাটা রে?

তাঁর দেখাদেখি আমিও টর্চ জ্বেলে উৎসাহের আতিশয্যে রিভলভার থেকে তাদের মাথার উপর দিয়ে এক রাউন্ড ফায়ার করে ফেললাম।

দুটো লোক একলাফে একটা ধ্বংসস্তূপের আড়ালে চলে গেল। কর্নেল সেদিকে টর্চ জ্বেলে আবার বিকট গর্জন করে এগিয়ে গেলেন। আমি পায়ের কাছে আলো ফেলে দেখলাম, একটা পাথরের স্ল্যাব কোনাকুনি মাটির তলায় ডুবে আছে। একটা ছোট্ট শাবল পড়ে আছে। পাথরের পাশে গর্ত খুঁড়ে একগাদা মাটি তোলা হয়েছে।

কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। শুধু একবার করে টর্চের আলোর ঝলকানি দেখতে পাচ্ছি। কর্নেল ওদের তাড়া করে যাচ্ছেন সম্ভবত। এটা কি ঠিক হচ্ছে? আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরেই কর্নেলের সাড়া পেলাম। চাপা স্বরে ডাকলেন—জয়ন্ত!

সাড়া দিলাম।—এখানে আছি।

কাছে এসে কর্নেল হাসিমুখে বললেন —ওরা আর এখানে আসছে না। তুমি টর্চ জ্বেলে রাখো জয়ন্ত! আমি দেখি, পেতলের নলটা পাই নাকি!

এখানকার মাটি নরম। একটু খুঁড়তেই শাবলের ঘা কোনও ধাতব জিনিসে লেগে ঠং করে শব্দ হল। তারপর কর্নেল পাথরটার তলা থেকে ফুটখানেক লম্বা একটা নল বের করলেন। নলটার ব্যাসার্ধ প্রায় দু ইঞ্চি। নলটা থেকে মাটি পরিষ্কার করে কর্নেল তাঁর পিঠের কিটব্যাগে চালান করে বললেন—কুইক। কেটে পড়া যাক। সোজা একেবারে বাংলোতে। ...

বাংলোর বারান্দায় বড্ড হিম। ঘরে বসে কফি পান করতে করতে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলাম — সকালে মল্লযুদ্ধ দর্শনের মতো এই ঘটনাও কি আকস্মিক?

কর্নেল হাসলেন। —নাঃ! দুপুরে ড্যামের রাস্তা দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটেছিলাম। প্রচুর হাঁস, সারস, একজোড়া গগনভেড় পাখিরও ছবি তুলেছিলাম। ফিল্‌মের রোলটা শেষ করে ফেলার ইচ্ছে ছিল। কেন ছিল তা আশা করি বুঝতে পারছ।

—মল্লযুদ্ধের যোদ্ধাদের ছবি প্রিন্ট করা।

—ঠিক। অবশ্য তুমি তার আগেই কুকীর্তি করে বসে আছ।

—কুকীর্তি কী বলছেন? আপনার কোনও উদ্দেশ্য থাকলে কাজটা একধাপ এগিয়ে দিয়েছি।

—নাঃ। আমি এখানে নীল সারসের ছবি তুলতেই এসেছি। কিন্তু আমার বরাত জয়ন্ত! যেখানে যাই, এই রকম গোলমেলে ঘটনায় জড়িয়ে পড়ি।

—আপনি যা বলছিলেন, তাই বলুন। মানে, জাহান খাঁর কেল্লাবাড়িতে অভিযানের ব্যাপারটা।

কর্নেল উঠে গিয়ে পর্দা তুলে বারান্দার দু-দিক দেখে এলেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়ে বললেন — ফেরার পথে ড্যামের রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। কয়েকটা জেলে-নৌকো সেখানে বাঁধা ছিল। ওরা রান্না চাপিয়ে গল্প করছিল। এমন সময় দুটো লোক এসে জেলেদের কাছে মাছ কিনতে চাইল। ওরা, বলল, সব মাছ ভোরবেলা চালান গেছে। মাছ কিনতে হলে ভোরবেলা এসো। কথায় কথায় লোকদুটো যে চন্দ্রপুরের বাসিন্দা, তা জানতে পারলাম। তারা জেলেদের বলল—জাহাজিবাবু পাঠিয়েছেন। জেলেরা গ্রাহ্য করল না। যে-বাবুই পাঠান, এখন মাছ কোথায়? লোকদুটো হুমকি দিল—জাহাজিবাবুকে চেনো না? ইচ্ছে করলে উনি সব নৌকো ডুবিয়ে দেবেন। জেলেদের সঙ্গে এইসব তর্কাতর্কি চলছে, আমি তখনও তো

জাহাজিবাবুকে চিনি না। বাইনোকুলারে আকাশ থেকে ধনুকের মতো বেঁকে নেমে আসা হিমালয়ের হাঁস দেখছি। প্যান্ট-সোয়েটার পরা লোকদুটো সিগারেট ধরিয়ে কথা বলতে বলতে চলে গেল। আমাকে তারা গ্রাহ্য করেনি। কারণ আমার মতো অনেক ট্যুরিস্ট এ সময় ড্যামের জলে পাখি দেখতে বা বোটে রোয়িং করতে আসে।

কর্নেল একদমে কথাগুলো বলে চুপ করলেন। বললাম—তারপর?

— আমার পিছন দিয়ে যাবার সময় কানে এল ওদের টুকরো - টুকরো কথা। এখন নয় ... কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সাঁওতালরা আসে। ... রমজান পাখাড়ু? হ্যাঁ, ও ব্যাটা বড্ড বেশি সেয়ানা। ...দেউড়ির কাছাকাছি..হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবু ঢ্যারা দেগে রেখেছে। আমি চিনি চিনি।... শাবল চাই বইকি।...পাঁচটার মধ্যেই আসবে কিন্তু। আমি থাকব। ...ওদের এইসব কথা আমার কানে ঢুকিয়ে দিচ্ছিল উত্তরের বাতাস। আমি দক্ষিণে। ওরা চলেছে উত্তরে। এই বাংলোর দিকে।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। আমি সেই পিতলের নলটা দেখার জন্য উশখুশ করছিলাম। বললাম—কিন্তু পেতলের নলে কী আছে দেখছেন না কেন?

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন—বাংলোয় ফিরে তোমার কাছে জাহাজিবাবুর নামধাম পরিচয় পেলাম। কাজেই কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে না গিয়ে পারিনি। এবং আমার অভিযান সফলও হয়েছে !

—আহা, নলটা!

—এখন নয়। ডিনারের পর।

—ঠিক আছে। কিন্তু সেই লোকদুটোই কি পাথরের স্ল্যাব খুঁড়ছিল?

—বোকার মতো প্রশ্ন হল, ডার্লিং।

—মানে, আপনি শিয়োর কি না জানতে চাইছিলাম।

—আজ রাতে ক্যামেরা থেকে ফিল্‌ম রোলটা বের করে প্রিন্ট করে ফেলব। তুমি লক্ষ্য করোনি, টর্চের আলো জ্বালবার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরার শাটার অটোমেটিক করে রেখেছিলাম। তিন মিনিট সময় দেওয়া ছিল। কাজেই ওরা খুঁড়ে নলটা বের করার আগেই আমাকে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের চার্জ করতে হয়েছিল।

—বলেন কী! ওদের ফোটোও তাহলে উঠেছে!

—ওঠার কথা। দেখা যাক।

—কিন্তু কর্নেল, আপনার গলা থেকে পেটের কাছে যে ক্যামেরা ঝুলছে, উঠে দাঁড়ানোর সময় তার লেন্স অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে এবার তাকালেন।—তুমি সংবাদিক হলে কী করে জানি না। এতকাল ধরে তুমি আমার সঙ্গী। ক্যামেরাটা লক্ষ্য করোনি। এই দ্যাখো ক্যামেরার পিছনে একটা ক্লিপ। ওটা আমার প্যান্টের বেলটের সঙ্গে আটকে দিলেই ক্যামেরার লেন্স সোজা থাকবে।

হাসতে হাসতে বললাম—এও কি আপনার সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া?

কর্নেলও হাসলেন।—নাঃ! যে প্রজাপতি জাল দিয়ে ধরতে যাচ্ছি, এক হাতে তার দিকে ক্যামেরা তাকে করে শাটার টেপার অসুবিধে আছে। তার চেয়ে কোমরে ক্যামেরা আঁটা থাকলে প্রজাপতিটা জালে না ধরা পড়ুক, তার ছবিটা পেয়ে যাব।...

ঠান্ডা ক্রমশ বাড়ছিল। তাই নিয়মভঙ্গ করে কর্নেল রাত্রি সাড়ে নটায় এই ঘরেই ডিনার পাঠাতে বলেছিলেন। নরুঠাকুর আর ভৈরব দুটো ট্রেতে গরম লুচি, আলুর দম আর মুরগির মাংস রেখে গেল। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—রমেনবাবু কী করছেন?

ভৈরব বলল—ম্যানেজারবাবুর স্যার ঠান্ডার ধাত। তাই এত রাতে বাইরে বেরোন না।

নরুঠাকুর বলল—ওতেই হবে তো স্যার? নাকি আরও একডজন লুচি ভেজে আনব?

কর্নেল হাসলেন।—আমার চেহারা দেখে ঠাকুরমশাই ভাবছেন, আমি লুচির পাহাড় গিলতে পারি? এই যথেষ্ট। আপনারা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। এঁটো থালাবাটি সকালে নিয়ে গেলেই চলবে।

নরু ঠাকুর চলে গেল। ভৈরবকে ডেকে কর্নেল বললেন—তোমাদের বাংলোয় গার্ড নেই?

ভৈরব বলল—দুজন দারোয়ান আছে। পালা করে ডিউটি দেয়। গার্ডের দরকার হয় না স্যার। এ তল্লাটে চোর-ডাকাতের ভয় নেই। যারা ড্যামে বোট চালাতে বা পাখি দেখতে আসে, তারা দিনে এসে সন্ধ্যার আগে চলে যায়।

—দুপুরে যে মাছ খেয়েছি, তা কি এই ওয়াটারড্যামের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বাংলোয় গেস্ট এলে জেলেদের বলে আসি।

—আচ্ছা ভৈরব, তোমার বাড়ি কোথায়?

—চন্দ্রপুর স্যার।

—রমেনবাবু চন্দ্রপুরের এক জাহাজিবাবুর কথা বলছিলেন। চেনো তাঁকে?

ভৈরব বাঁকা মুখে বলল—শম্ভু চৌধুরি সাংঘাতিক লোক স্যার। বছরে একবার বাড়ি আসে। কখন আসবে, তার ঠিক নেই। শুনলাম সে এ মাসে এসেছে। যখনই আসে, একটা করে মানুষ খুন হয়।

চমকে উঠেছিলাম। বললাম—সে কী! পুলিশ তাকে ধরে না?

ভৈরব বাঁকা মুখেই হাসবার চেষ্টা করল।—পুলিশ জানতে পারলে তবে তো তাকে ধরবে!

কর্নেল হাসলেন।—পুলিশ জানে না! তুমি কী করে জানতে পারো?

—আমার সন্দেহ হত আগে। পরে দেখে আসছি, যতবার জাহাজিবাবু বাড়ি আসে ততবার এলাকার কেউ না কেউ খুন হয়। গত বছর জাহাজিবাবু এসেছিল খরার মাসে। তারপর তিতলিপুরের সন্টুবাবুর লাশ পাওয়া গিয়েছিল ড্যামের জলে। জেলেরা লাশের খবর দিয়েছিল থানায়। পুলিশ এসে লাশ তুলল। মাথার পিছনে গুলির দাগ ছিল। সন্টুবাবুও অবশ্যি ভালো লোক ছিল না। বর্ডারে চোরাচালানির কারবার করত। জোরে শ্বাস ছেড়ে ভৈরব চাপা স্বরে ফের বলল—পুলিশ স্যার দেখেও দেখে না। এ পর্যন্ত আমার হিসেবে পাঁচটা খুন হয়েছে। প্রত্যেকটা লাশের মাথার পিছনে গুলির দাগ। আমার স্যার সামান্য মাথা। ক্লাস ফোর পর্যন্ত বিদ্যা। কিন্তু কারও মাথায় কেন এই সোজা ব্যাপারটা ঢোকে না জানি না।

—তুমি কি এ কথা আর কাকেও বলেছ?

—না স্যার! আমার ঘাড়ে কটা মাথা?

—তবে আমাদের কাছে বলে ফেললে যে?

ভৈরব আড়ষ্ট মুখে হাসবার চেষ্টা করল।—ম্যানেজারবাবু বলছিল, আপনি স্যার মিলিটারি অফিসার। এতদিন পেটের ভিতরে কথাটা ঢুকে ছিল। আপনাকে বলে শান্তি পেলাম। মিলিটারি আমি কম বয়সে এই তল্লাটে কতবার দেখেছি স্যার! এখান থেকে পাকিস্তানের বর্ডার বেশি দূরে নয়। দুদেশে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হলেই এই এলাকা মিলিটারিতে ভরে যেত। মিলিটারির পাওয়ার কত! স্যার এবার যদি আবার লাশ পড়ে, আপনি দয়া করে মিলিটারি ডেকে আনবেন। জাহাজিবাবুকে জব্দ করতে আপনারাই পারবেন।

কথাগুলো শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলেই ভৈরব চলে গেল। কর্নেলের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি নির্বিকার মুখে মুরগির ঠ্যাংয়ে কামড় দিচ্ছেন।...

রাত দশটায় চুরুট ধরিয়ে কর্নেল দরজা বন্ধ করলেন। তারপর কিটব্যাগ থেকে প্রথমে ব্রোঞ্জের ডিমালো ফলকটা বের করলেন। ওটা কখন কী লোশনের সাহায্যে ব্রাশ দিয়ে ঘষে চকচকে করে

ফেলেছেন। ওঁর কিটব্যাগে কি নেই? ফলকটার একপিঠে সারস এবং কয়েকরকম পাখি, তার ফাঁকে কতরকম রেখা দেখতে পেলাম। উলটো পিঠে অন্যরকম চিহ্ন। কর্নেলের ড্রয়িং রুমে একটা বইয়ে পেরেকের মতো লিপি দেখেছিলাম। কর্নেল বলেছিলেন, এর নাম কিউনিফর্ম লিপি। কীলকাকার লিপি বলতে পারো। তবে ও লিপি তিনহাজার বছর আগে চালু ছিল। ফলকটার মাথার দিকে একটা ফুটো আছে। এটা কি গলায় ঝুলিয়ে রাখার জন্য?

কর্নেল ততক্ষণে পিতলের নলের একটা মুখ ছুরির ডগা দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলেছেন। একটু পরে তিনি নলের ভিতরটা আতশ কাচ দিয়ে দেখে নিলেন। তারপর একটা চিমটে দিয়ে টেনে বিবর্ণ এবং গুটিয়ে রাখা লম্বা একটা জিনিস বের করলেন। বললাম—কী ওটা?

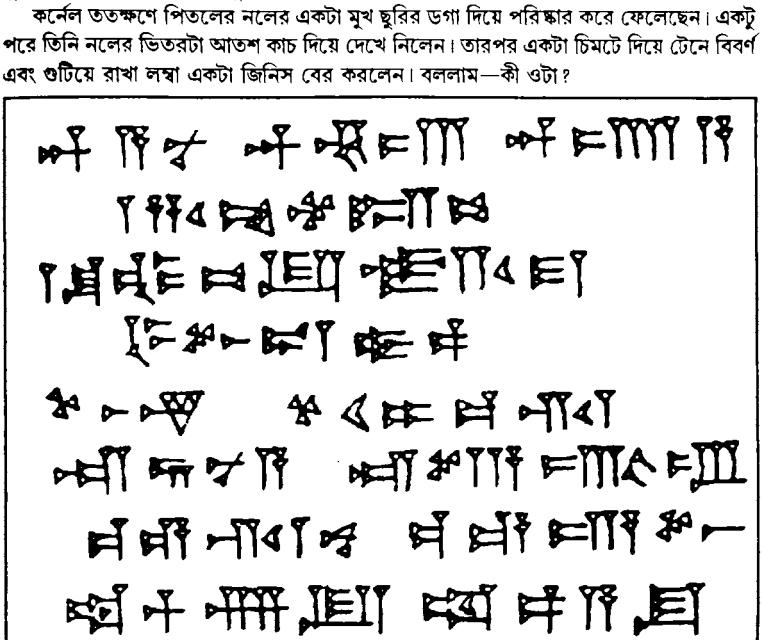

হিটাইট কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা নেকারতিতির চিঠি

—এটাকে বলে স্ক্রোল। প্রাচীন যুগে ভেড়া বা ছাগল জাতীয় প্রাণীর ভুঁড়ির চামড়া শুকিয়ে একরকম কাগজ তৈরি করা হত। এতে কালো কালিতে কিছু লেখার পর গুটিয়ে রাখা হত। তাই ইংরেজিতে একে বলা হয় স্ক্রোল।

তিনি স্ক্রোলটা সাবধানে মেলে ধরে বললেন—কিউনিফর্ম লিপিতে কিছু লেখা আছে। কলকাতা না গেলে এর পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়।

এই সময় বাইরে নাইটগার্ডের চিৎকার শোনা গেল।—চোর! চোর! ভৈরবদা! ভৈরবদা! চোর! চোর!

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। আমিও দরজার কাছে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালাম। চিৎকারটা উত্তরে বাউন্ডারি পাঁচিলের দিকে শোনা যাচ্ছিল। পাঁচিলে কাঁটাতারের বেড়া বসানো আছে। ভৈরবের হাসি শুনতে পেলাম। সে বলছে—ছিঁচকে চোর। টর্চের আলোয় মুখটা চেনাচেনা লাগল। ব্যাটা ড্যামের ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দিলে মজাটা টের পেত।...

তিন

সকালে ভৈরবের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে সাতটা বাজে। দরজা খোলা এবং ভৈরব চা এনেছে, এতেই বোঝা গেল কর্নেল যথারীতি প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বিছানায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কাল রাত্রে বাংলোয় চোর ঢুকেছিল নাকি?

ভৈরব হাসল।—ভিতরে ঢোকেনি স্যার। উঁকি দিচ্ছিল। ও দিকে ঝিলের মাথায় বাঁধ আছে। সেই পথে সে এসেছিল। মাধু দারোয়ানের চোখে পড়েছিল।

—তুমি বলছিলে এলাকায় চোরডাকাত নেই!

—ছিঁচকে চোর স্যার। মুখটা এক পলক দেখেছি। কেন যেন চেনাচেনা লাগল। তবে আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, এই বাংলোয় কোনওদিন চোরের উপদ্রব হয়নি।

—কর্নেলসায়েব কোনদিকে গেছেন দেখেছ?

—না স্যার। এবেলা হাটু দারোয়ানের ডিউটি। সে জানে।

—আচ্ছা। ঠিক আছে।

ভৈরব সেলাম দিয়ে চলে গেল। বেডটি খেয়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে বারান্দায় বসলাম। আজ ঘন কুয়াশা। বিস্তীর্ণ জলাধার কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বারান্দায় বসে কুয়াশা দেখার মানে হয় না। বাংলোর সামনে পার্কিং জোনে আমার গাড়িটা দেখার ইচ্ছে হল। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। গাড়িটা নেই। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সেই সময় দারোয়ান গেটের পাশে তার ঘর থেকে কম্বলমুড়ি দিয়ে বেরিয়ে বলল—স্যার কি ওখানে কিছু খুঁজছেন?

বললাম—আমার গাড়িটা নেই।

—আপনার গাড়ি কর্নেলসায়েব নিয়ে গেছেন। আমাকে বলে গেছেন, আপনি খোঁজ করলে আমি যেন বলি।

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। ঘরে ফিরে গিয়ে ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ঝোলানো প্যান্টটা দেখলাম। ওই প্যান্টের পকেটে চাবি ছিল। অতএব বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই আমার পকেট মেরেছেন।

কিন্তু হঠাৎ ওঁর গাড়ি দরকার হল কেন? উনি না ফিরলে এ প্রশ্নের উত্তর পাব না...।

কর্নেল ফিরলেন সাড়ে নটায়। গাড়ির শব্দ শুনে বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। একটু পরে তাঁকে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখে হাসি ঝলমল করছে। ততক্ষণে কুয়াশা খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। কাছে এসে কর্নেল যথারীতি সম্ভাষণ করলেন—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং বস। হাসতে হাসতে বললাম।—আপনি দুটো অপরাধ করেছেন। প্রথমটা পকেটমারি। দ্বিতীয়টা আমার গাড়ি চুরি। গাড়ি নেই দেখে আমি তো ভড়কে গিয়েছিলাম। রাত্রে আমাকে জানাননি আপনার গাড়ির দরকার আছে।

কর্নেল বারান্দায় বসে টুপি খুললেন। তারপর বাঁ হাতে প্রশস্ত টাকে হাত বুলিয়ে ডান হাতে আমার গাড়ির চাবির গোছা আমাকে দিলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন—তোমার গাড়ি চুরি করতে হয়েছিল, তার কারণ আছে। রাত্রে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সত্যি নীল সারসের একটা দল এসে জুটেছে কিনা দেখতে যাব। কিন্তু রাত্রে চোর এসেছিল বাংলায়। ভোরে বেরুতে গিয়ে উত্তরে পাঁচিলটা একবার দেখার ইচ্ছে হল। কাঁটাতারের বেড়ায় কোনও ফাঁক আছে কিনা। নেই। অথচ চোর এসেছিল! পাঁচিলের ধারে ঝাউ আর ক্যাকটাসের টব আছে। একটা করবী আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ভাঁজকরা কাগজ করবী গাছটার পিছনে কাঁটাতারে গোঁজা আছে। সেই কাগজটা শিশিরে ভিজে গেছে। বারান্দায় এসে সাবধানে খুলে দেখলাম, একটা হুমকি। এতে আমি ভয় পাইনি। কিন্তু এখান থেকে নির্বিঘ্নে কলকাতা ফিরতে হবে। কাজেই তোমার গাড়ি নিয়ে চন্দ্রপুর থানায় গিয়েছিলাম। ও.সি. মি. রাজেন হাটির সাহায্য দরকার হবে।

নরুঠাকুর কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল টেবিলে। তারপর বললাম—চিঠিটা দেখতে পারি?

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। কাগজটা ভিজে ছিল, তা স্পষ্ট। সাবধানে খুলে দেখলাম, লাল ডটপেনের লেখাগুলো ভিজে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বোঝা যাচ্ছিল।

"পেতলের নলটা যেখানে ছিল, সেখানে আজ সকালে রেখে না এলে খুলি ছেঁদা হয়ে যাবে। তুই কি ভেবেছিস তোর পরিচয় আমি পাইনি? কলকাতায় আমার লোক আছে। বুড়ো টিকটিকিকে লেজসুদ্ধ হাপিস করে দেব।"

কর্নেলকে চিঠিটা আবার তেমনই ভাঁজ করে ফেরত দিয়ে বললাম—ল্যাজ সম্ভবত আমি।

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন—তুমি তো জানো জয়ন্ত! কেউ আমাকে টিকটিকি বললে আমার টাক থেকে গরম বাষ্প বেরিয়ে যায়। ওটা অশ্লীল শব্দ। কারণ ডিটেকটিভ থেকে বাংলায় টিকটিকি শব্দটা এসেছে। টিকটিকি আমি? প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার টিকটিকি?

কর্নেলের গাম্ভীর্য আর ক্ষোভ দেখে তাঁকে নিয়ে রসিকতার সাহস পেলাম না। কফি দ্রুত শেষ করে উনি চুরুট ধরালেন। তারপর হেসে উঠলেন। বললাম— হাসছেন যে! হঠাৎ গরম বাষ্পে বরফ পড়া শুরু হল নাকি?

কর্নেল কিটব্যাগ ঘরে রেখে এসে বারান্দায় বসলেন। তারপর জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ফোটো বের করে বললেন—কাল সন্ধ্যায় আমার ক্যামেরা আমাকে বঞ্চিত করেনি। ছবিটার দুটো প্রিন্ট করেছিলাম। অত কিছু ভেবে করিনি। মনে হয়েছিল, ভৈরবকে দিয়ে লোক দুটোকে শনাক্ত করাব। ভৈরব চন্দ্রপুরের লোক। আর দরকার হলে পুলিশকে দিয়ে যাব।

ওঁর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখলাম, পাথরের স্ল্যাবটা দেখা না গেলেও আঁতকে ওঠা দুটো লোকের ছবি স্পষ্ট উঠেছে। একজন সবে ঘুরতে যাচ্ছে। অন্যজন ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো শূন্যে লাফ দিয়েছে। ছবিটা দেখে হাসি এল। বললাম—চন্দ্রপুর থানার বড়োবাবুকে ছবির অন্য কপিটা দিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।

—তুমি বুদ্ধিমান। যে শূন্যে লাফ দিয়েছে, তার নাম পঞ্চানন দাশ। ডাকনাম পাঁচু। অন্যজন কালোবরণ খটিক। ডাকনাম 'গলাকাটা' কেলো। দাগি ডাকাত। পুলিশ ওদের খুঁজে পাচ্ছে না। এবার খুঁজে পাওয়ার চান্স আছে।

—কী ভাবে?

—জাহাজিবাবু ওদের কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে ওত পাততে পাঠাবে। আমি পেতলের নলটা যথাস্থানে রেখে আসব।

—কী আশ্চর্য! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কোনো এক জাহাজিবাবুর হুমকিতে ভয় পেয়ে ওটা ফেরত দিতে যাবেন—এটা কল্পনা করা যায় না।

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—হ্যাঁ। রেখে আসব. তবে ভয় পেয়ে নয়। লোক দুটোকে ফাঁদে ফেলার জন্য। পুলিশ উলটোদিক থেকে জঙ্গলে ঢুকে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবে। না—থাকবে না। এখনই তারা লুকিয়ে আছে। তোমার গাড়িতে একজন সাবইন্সপেকটার আর দুজন ভোজপুরি কনস্টেবলকে এনে কেল্লাবাড়ি জঙ্গলের কাছে নামিয়ে দিয়ে এলাম। কাজেই ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে শিগগির বেরুতে হবে।

দশটা বাজে প্রায়। নরুঠাকুর ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে দরজায় তালা এঁটে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগটা আঁটা ছিল। গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। প্রজাপতিধরা জালের স্টিকটা পিঠের কিটব্যাগের কোনা দিয়ে বেরিয়ে ছিল।

রমেনবাবু সাইকেলে চেপে সবে ফিরছিলেন। নমস্কার করে তিনি বললেন — জেলেদের কাছে টাটকা পাবদা মাছ পেয়েছি কর্নেলসায়েব। যেন শিগগির ফিরে আসবেন।

কর্নেল বললেন—সুখবর পেলাম যাত্রার সময়। তা হলে আজ নীল সারসের দেখা পাবই।...

ডাইনে কেল্লাবাড়ির জঙ্গল আর বাঁদিকে তিতলিপুর আবছা কুয়াশায় তখনও ঢাকা। ঝিলের ধারে ঘাসে শিশির তখনও শুকোয়নি। আমরা কালকের মতো সাবধানে পা ফেলে জঙ্গলে ঢুকলাম। ধ্বংসস্তূপ আর ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়ে কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে বাইনোকুলার। নব ঘুরিয়ে দূরত্ব অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন—জয়ন্ত! তুমি ওই লাইমকংক্রিটের ওপর বসে থাকো। আমি শিগগির ফিরে আসছি।

বলে তিনি আমাকে অবাক করে ডানদিকে অদৃশ্য হলেন। অস্বস্তি হচ্ছিল। লাইমকংক্রিটের একটা চাঙড়ে বসে আমি রিভলভারটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলাম। কর্নেলের পাগলামি মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে। বহুবার দেখেছি, এইভাবে আমাকে প্রতীক্ষায় রেখে উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথায় কোনও বিরল প্রজাতির পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়ান। কিন্তু এখন তো তেমন সময় নয়। বদমাশ দুটোকে ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যেই আমরা বেরিয়েছি।

আমার বিরক্তি পনেরো মিনিটের মধ্যে কেটে গেল। একটা ঝোপের ফাঁকে কর্নেলের টুপি দেখতে পেলাম। অমনি অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখলাম। তিনি কাছে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে চাপা উল্লাসে বললেন—পাবদা মাছের খবরটা সত্যি সুখবর ডার্লিং। ওদিকে একটা উঁচু দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম শকুন। তারপর দেখলাম, তিনজোড়া নীল সারস দেওয়ালের ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছে। ক্যামেরার টেলিলেন্স ফিট করে চারটে ছবি তুলেছি। ওঃ! আজকের মতো শুভদিন জীবনে কখনও আসেনি। চিয়ার আপ জয়ন্ত! কুইক মার্চ, তবে নিঃশব্দে।

আমাকে ভাঙা দেউড়ির ওপাশে অপেক্ষা করতে বলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। কাল শেষ বেলায় ঘন ছায়া এবং তারপর দ্রুত আঁধার এসে পড়ায় কেল্লাবাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার দেখতে পাইনি। এখন পাচ্ছিলাম। মিনিট দশেক পরে তিনি একটা ঝোপের আড়াল থেকে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে চাপা স্বরে বললেন—ফায়ার আর্মস হাতে নাও। কিন্তু সাবধান! গুলি ছুঁড়ো না। এখন গুলি ছোঁড়ার দরকার হবে না।

তারপর ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, সেই লোক দুটো এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে। তারপর দুজন এককোণে দাঁড়িয়ে গেল। একজন বলল—তুমি গিয়ে মালটা নিয়ে এসো। আমি 'মেশিন' হাতে পাহারা দিচ্ছি। বুড়ো মাইরি এমন ভয় পেয়েছে যে—

তারপরই দেখলাম, বাঁদিক, ডানদিক এবং সামনের দিক থেকে একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন দৈত্যাকৃতি কনস্টেবল বেরিয়ে এল। পুলিশ অফিসার রিভলভার তাক করে গর্জালেন—হাত ওঠাও। পিস্তলসুদ্ধু একজোড়া হাত ওপরে উঠল। দ্বিতীয় জন পালাতে যাচ্ছিল। ভোজপুরী কনস্টেবলের ছোট্ট লাঠি তার এক হাঁটুর পেছনে গিয়ে ঘা মরাতেই সে 'বাপ রে' বলে পড়ে গেল। পুলিশ ইন্সপেকটারের হুকুমে অন্য ভোজপুরী দৈত্যটি পিস্তল কেড়ে নিয়ে তার গলার কাছে সোয়েটারের একটা অংশ খামচে ধরে পিঠে লাঠির গুঁতো মারল। সে-ও 'বাপ রে' বলে ককিয়ে উঠল। তার সঙ্গী ততক্ষণে অন্য ভোজপুরী দৈত্যের কবলে বেড়ালছানার মতো মিউ মিউ করছে।

কর্নেল আমাকে ইশারা করে নিঃশব্দে কেটে পড়লেন। কেল্লার জঙ্গল পেরিয়ে ঝিলের ধারে এসে বললাম—একেই বলে "ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দ্যাখোনি'।

কর্নেল হাসলেন।—দোমোহানির বিখ্যাত পাবদা মাছের ঝোল খাব এবেলা। কী সৌভাগ্য!

—কিন্তু পেতলের নলটা যে পড়ে রইল।

—নলটা এস আই রথীশ চক্রবর্তী নিয়ে যাবেন। ওটা শুধু নল। ভিতরের জিনিস আমার কাছে আছে। শুধু নল নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাক। চলো! আমরা এবেলা ড্যামের জলে রোয়িং করি।

—কী সর্বনাশ! এখন সবে বাতাস উঠেছে। একটু পরে জলাধার সমুদ্র হয়ে উঠবে যে!

—ওঃ জয়ন্ত! তুমি কলকাতার রোয়িং ক্লাবের মেম্বার না? তা ছাড়া তুমি সেবার প্রশান্ত মহাসাগরে একজনের সঙ্গে বোটে চেপে কিয়োতো দ্বীপে গিয়ে উঠেছিলে। আমি আর্মি হেলিকপ্টারে গিয়ে তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম। সেই তুমি একরত্তি দোমোহানিকে ভয় পাচ্ছ?

—সেটা ছিল প্রাণের দায়ে। এটা তো নেহাত শখে।

—নেহাত শখ নয় জয়ন্ত! ড্যামের পূর্ব দিকটায় কয়েকটা জলটুঙ্গি আছে। সেখানে সেক্রেটারি বার্ড অর্থাৎ কেরানি পাখির থাকার সম্ভাবনা আছে। তুমি ছবিতে এই পাখি দেখেছ। কিন্তু কানে কলমগোঁজা কেরানিবাবুদের মতো লম্বাঠেঙো এই পাখি জ্যান্ত দ্যাখোনি।

আমরা পিচরাস্তায় উঠেছি, এমন সময় দেখলাম বাংলোর 'কুক' নরুঠাকুর বাংলো থেকে একটা সাইকেলে চেপে আসছে। আমাদের কাছাকাছি হলে কর্নেল বললেন—ঠাকুরমশাই কি পাবদা মাছের জন্য মশলা কিনতে যাচ্ছ?

নরুঠাকুর সাইকেল থামিয়ে এক পা মাটিতে রেখে বলল—সাংঘাতিক খবর স্যার!

তার মুখচোখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করলাম। কর্নেল বললেন—কী হয়েছে নরেন?

—দীপনারায়ণদাকে গতরাতে কে খুন করেছে। ওঁর বোন সুনয়নী সম্পর্কে আমার দিদি হয়। বড়দি বলে তাকে ডাকি। বড়দি একটা লোক পাঠিয়ে এইমাত্র খবর দিল। শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে স্যার। হাজার হলেও রক্তের সম্পর্ক। কিছু পারি না-পারি, একবার গিয়ে বড়দির পাশে দাঁড়ানো উচিত।

বলেই সে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। কর্নেল নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—জয়ন্ত! এই আমার বরাত। আর কী বলব? চলো! আগে বাংলোয় ফেরা যাক।

যেতে যেতে বললাম—ভৈরব আমাকে বলছিল যখন জাহাজিবাবু শম্ভু চৌধুরি বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে আসে, তখনই নাকি একটা করে লাশ পড়ে। সব লাশের মাথার পিছনে নাকি গুলির চিহ্ন খুঁজে পায় পুলিশ। ভৈরব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে বলল। পুলিশের মাথায় ব্যাপারটা কেন আসে না বলে সে দুঃখ করছিল।

কর্নেল হনহন করে হাঁটছিলেন। ওঁর নাগাল পেতে আমাকে প্রায় 'জগিং' করতে হচ্ছিল। সামরিক জীবনের অনেক অভ্যাস আমার বৃদ্ধ বন্ধুর জীবনে এখনও থেকে গেছে। বহুবার এটা লক্ষ্য করেছি। তাই আর অবাক হই না।

গেটের একটা অংশ খুলে দিয়ে দারোয়ান সেলাম দিল। ভৈরব রমেনবাবুর সঙ্গে লনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল। আমরা ভিতরে গেলে ভৈরব আমাকে বলল—যা বলছিলাম, তা-ই ঘটে গেল স্যার!

রমেনবাবু বললেন—তিতলিপুরের বড়োবাবুর ভাগ্যে এমন একটা কিছু ঘটবে, গ্রামের লোকেরা সবাই জানে। হাড়বজ্জাত লোক। জমিজমা সম্পত্তি প্রায় সবই কবে বেচে দিয়েছিল। তার বোন বিধবা হয়ে বাবার বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। বাকি যেটুকু সম্পত্তি ছিল ওই মহিলাই দু'হাতে আগলে রেখেছিল। বড়োবাবু বোনকে সমীহ করে চলত।

ভৈরব বলল—ম্যানেজারবাবুকে বলছিলাম, এ কাজ জাহাজিবাবুর।

—ছাড়ো। আমরা ওসব সাতে-পাঁচে নেই। বড়োবাবুর বোন সত্যিকার রায়বাঘিনি। সে যা করার করবে। বলে রমেনবাবু কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।—নরেনকে যেতে দিতে হল। জ্ঞাতি বলে কথা। কর্নেলসায়েবদের পাবদামাছ খাওয়ানোর জন্য আমি আছি। একবেলা আমার হাতের রান্না খেয়ে দেখুন।

আমাদের রুমের সামনে গিয়ে কর্নেল বললেন—আপনি যখন রাঁধতে পারেন, তখন কফিও তৈরি করতে পারেন। তাই না?

রমেনবাবু সহাস্যে বললেন—এখনই কফি করে আনছি স্যার।...

তিনি দ্রুত চলে গেলেন। আমার মনে হল, কোনও কারণে রমেনবাবু দীপনারায়ণবাবুকে পছন্দ করতেন না। গ্রাম্য দলাদলির ব্যাপারও থাকতে পারে।

কর্নেল দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। আমি দক্ষিণের বারান্দায় দরজার পাশে বেতের চেয়ারে বসলাম। জলাধারের কুয়াশা দিগন্তে সরে গেছে। আকাশ আর জল একাকার হয়ে আছে। একটা জেলেডিঙি কালো হয়ে ভেসে আছে।

কর্নেল বাইরে এসে বসলেন। বললেন—নীল সারসের ছবি তুলতে এসেছিলাম। ছবি তুলেছি। ভেবেছিলাম লাঞ্চ খেয়েই কলকাতা ফিরব। কিন্তু—

উনি চুপ করলে বললাম—কিন্তু কী?

—আমার সামনে একটা লাশ।

—কেউ তো আপনার কাছে এসে অনুরোধ করেনি, এই হত্যারহস্যের সমাধান করুন!

—জয়ন্ত! আমার ক্যামেরা বলছে, শম্ভু চৌধুরি আর দীপনারায়ণ রায় নিজেদের ছবিকে অত ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন? ওঁরা দুজনেই চাননি ওঁরা ছবিতে থাকুন। কথাটা শুনতে তোমার হেঁয়ালি মনে হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখবে, ওঁরা চাননি কেউ ওঁদের ছবি তুলুক।

—ও.সি রাজেন্দ্র হাটি জাহাজিবাবু সম্পর্কে কী বললেন?

—এই এলাকার সীমান্তে চোরাচালানের সঙ্গে জাহাজিবাবুর যোগাযোগ আছে বলে তাঁরা জানেন। কিন্তু প্রমাণ পাননি। তাছাড়া জাহাজিবাবু সারা বছর এখানে থাকেনও না। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে চন্দ্রপুর থানা এবার যোগাযোগ করবে। শম্ভু চৌধুরি কোথায় থাকে, কী করে ইত্যাদি খবর জানতে চাইবে। জাহাজে আর চাকরি করে না সে, তা তার বয়স থেকে বলা যায়।

—কিন্তু প্রাক্তন জাহাজি হিসেবে খিদিরপুর ডকের চোরাকারবারি দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু ব্রোঞ্জের ফলক আর কিউনিফর্ম লিপিভর্তি পার্চমেন্ট—নাঃ জয়ন্ত! আমার সামনে একটা গভীর রহস্য এসে দাঁড়িয়েছে। দীপনারায়ণ রায়ের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে এই রহস্য জটিল।

ভৈরব কফির ট্রে নিয়ে এল। সে কিছু বলার জন্য ইতস্তত করছিল। কিন্তু কর্নেল তাকে বললেন—ঠিক আছে ভৈরব। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।

ভৈরব চলে গেল। বললাম—আপনার রোয়িং প্রোগ্রামের কী হল?

কর্নেল আস্তে বললেন—থাক। সারাজীবন নরহত্যা দেখে আসছি। আমার সামরিক জীবনের কথাও চিন্তা করো। কিন্তু আশ্চর্য জয়ন্ত! এখনও নরহত্যা আমাকে বিব্রত করে।

—তা হলে চলুন। তিতলিপুরের জমিদারবাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসা যাক। আমিও একটা হাতে-গরম খবর পেয়ে যাব। দৈনিক সত্যসবেক পত্রিকার জন্য অন্তত একটা কিছু নিয়ে যাই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। খালি হাতে তোমার কলকাতা ফেরার চেয়ে এটা মন্দ কী! তা ছাড়া প্রাচীন মিশরের ফলক আর কোনো দেশের পার্চমেন্টে লেখা কিউনিফর্ম লিপির সঙ্গে তিতলিপুরের এই হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র তো স্পষ্ট।

রমেনবাবু কিচেনে ছিলেন। ভৈরব তাঁকে সাহায্য করছিল। কর্নেল শুধু বলে এলেন — একটু বেরুচ্ছি।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পিচরাস্তায় পৌঁছুলাম। তারপর তিতলিপুর গ্রামে ঢোকার জন্য যে মোরাম বিছানো রাস্তা দেখেছিলাম, বাঁ দিকে ঘুরে সেই রাস্তায় কিছুটা এগোতেই পুলিশের ভ্যান, একটা জিপ আর অ্যামবুল্যান্স দেখা গেল। সেখানে গাড়ি থামিয়ে দুজনে নামলাম। কর্নেলকে দেখে ও.সি মি. হাটি এগিয়ে এলেন। সহাস্যে বললেন—এখানে তো নীল সারস নেই কর্নেলসায়েব। এখানে

লাল সারসের কারবার। লাল সারসটা দীপনারায়ণবাবুর মাথার পিছনে ঠোঁট দিয়ে একটা ফুটো করে ফেলেছে।

শুনেই চমকে উঠলাম। তাহলে ভৈরব একটা খাঁটি ক্লু দিয়েছে।...

চার

মোরাম বিছানো রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। পুলিশের একটা বেতার-ভ্যান থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কথা শোনা যাচ্ছে। একদল সশস্ত্র কনস্টেবল এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে বেটন হাতে কয়েকজন কনস্টেবল ভিড় হটাতে ব্যস্ত। অ্যামবুল্যান্স হর্ন দিচ্ছিল। মি. হাটি একজন পুলিশ অফিসারকে বললেন— চ্যাটার্জিবাবু! আপনি দুজন আর্মড সেপাইকে নিয়ে অ্যামবুল্যান্সের সঙ্গে যান। দেরি করা ঠিক নয়।

অ্যামবুল্যান্স তাঁদের নিয়ে এবার হুটার বাজাতে বাজাতে শীতের দিনের নিঝুম গ্রামকে সচকিত করে চলে গেল। কর্নেল বললেন—চন্দ্রপুরে কি মর্গ আছে?

মি. হাটি বললেন—না। কৃষ্ণনগরে আছে। সেখান থেকে অ্যামবুল্যান্স আসতে দেরি করছিল। তাই এখনও আছি।

—বডি কোথায় পড়েছিল?

—দেখাচ্ছি। আসুন।

বাঁদিকে একটা ভেঙেপড়া দেউড়ি। সেখানে গেটের বদলে বাঁশের বেড়া। তার ওধারে উঠোন এবং একটা পুরোনো জীর্ণ দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। মি. হাটি কর্নেলকে নিয়ে ভাঙা দেউড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি ওঁদের অনুসরণ করলাম। বাউন্ডারি পাঁচিল কোনওরকমে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে বসতি নেই। পোড়ো জমি। ঝোপঝাড়। আগাছার জঙ্গল। একটা আমবাগান। পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে মি. হাটি যেখানে দাঁড়ালেন, সেখানে বাড়িটার পিছনের দরজা। কপাট দুটোর অবস্থা করুণ। দরজাটা খোলা ছিল। মি. হাটি বললেন—দীপনারায়ণবাবু এই দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় প্রায় পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে খুনি তাঁর মাথার পিছনে গুলি করেছে। এই দেখুন, বডির পজিশন দাগ দিয়ে রেখেছি। বডি উপুড় হয়ে পড়েছিল।

ছোট্ট দরজাটার সামনে কিছু হলুদ রঙের ঘাস আর গাছপালার ঝরাপাতা। তার ওপর চাপচাপ রক্তের ছোপ দেখতে পেলাম। রক্তটা তত লাল নয়।

মি. হাটি বললেন—দীপনারায়ণবাবু রাত্রে কোথায় আড্ডা দিতে যেতেন, তাঁর বোন জানেন না। তাঁর ঘরে খাবার ঢাকা-দেওয়া থাকত। উনি কোনও গুলির শব্দ শোনেনি। এই দরজা দিয়ে রাত্রে বাড়ি ফেরেন দীপনারায়ণবাবু। তাই দরজাটা ভেজানো থাকে। ভোরে ভদ্রমহিলা তাঁর দাদার ঘরের সামনে গিয়ে দেখেন, দরজা তেমনি বাইরে থেকে আটকানো আছে। দরজা খুলে দেখেন, খাবার তেমনি ঢাকা দেওয়া আছে। দাদা তাহলে কোনও বন্ধুর বাড়িতে থেকে গেছেন ভেবে উনি নিচে নামেন। তারপর দেখেন, পিছনের দরজাটা হাট করে খোলা। কাছে এসে দাদাকে উনি উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। মাথার পিছনে রক্ত।

কর্নেল বললেন—তার মানে, দীপনারায়ণবাবু দরজা ঠেলে খুলেছেন, সেই সময় আততায়ী তাঁর পিছন থেকে গুলি করেছে।

—আমার ধারণা খুনি তাঁর চেনাজানা লোক। রাতবিরেতে এই দরজা দিয়ে বাড়ি ফেরেন, তা তার জানা ছিল।

—সামনের দরজা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন না কেন, জিজ্ঞেস করেছেন ওঁর বোনকে?

—ওই দেখুন। উলটোদিকে সাহাবাবুদের বাড়ি। তিতলিপুরে এখন গণেশ সাহা সবচেয়ে ধনী। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। দীপনারায়ণবাবুর বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু সাহাবাবুর দোতলার কার্নিশে

উজ্জ্বল আলোর বাল্‌ব ফিট করা আছে। সারা রাত জ্বলে। শীতকালে লোডশেডিং হয় না শুনলাম। গ্রীষ্মকালে হয়। মাতাল অবস্থায় ওখান দিয়ে বাড়ি ঢোকা তাঁর পক্ষে লজ্জার ব্যাপার।

কর্নেল দরজার বাঁদিকে একটা ঝোপের কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসলেন। মি. হাটি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন—কী ব্যাপার?

কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে আতশ কাচ বের করে মাটিটা পরীক্ষা করতে থাকলেন। মি. হাটি ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা দেখছিলেন। একটু হেসে বললেন— আপনি আতশ কাচ সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন। আশ্চর্য তো!

কর্নেল বললেন—খুনি এখানে ওত পেতে বসে ছিল। তার জুতোর ছাপ পড়েছে। শক্ত শুকনো মাটি বলে ছাপ তত স্পষ্ট নয়। তা হলেও আমার ধারণা, তার পায়ে যে জুতো ছিল, তার সোল রবারের। আমি এইরকম জুতো পরি। এই যে দেখছেন। পাখি-প্রজাতির কাছে যেতে হলে এই সোল জুতোয় থাকা দরকার।

—আজকাল অবশ্য এই সোলের জুতো সবাই পরে।

—মি. হাটি! দীপনারায়ণবাবুর মাথার পিছনে কোথায় গুলি লেগেছিল? আমার মাথায় জায়গাটা দেখিয়ে দিন। টুপি খুলছি।

ব্যাপারটা হাস্যকর। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ফের টুপি পরে বললেন—দীপনারায়ণবাবু সম্ভবত লম্বা মানুষ ছিলেন?

—হ্যাঁ। আমার চেয়ে লম্বা। তার মানে, প্রায় আপনার মতো লম্বা। তবে উনি ছিলেন রোগা।

—ওঁর পরনে কি লংকোট আর ধুতি ছিল?

মি. হাটি হাসিমুখে ভুরু কুঁচকে বললেন—আপনার সম্পর্কে যা সব শুনেছি, সত্যি মনে হচ্ছে।

কর্নেল তাঁর কথায় কান না দিয়ে সেই দরজাটার কাছে গেলেন। তারপর বললেন—দীপনারায়ণবাবুকে মাথা নিচু করে ঢুকতে হত। কাজেই মাথার পিছনে নিচের দিকে গুলি করেছিল আততায়ী। সে ছিল ভিকটিমের তুলনায় বেঁটে। আর একটা কথা। সে এই নির্জন জায়গায় দীপনারায়ণের বাড়ি থেকে একটু তফাতে সামনে থেকে গুলি করতে পারত। তা করেনি। কেন করেনি?

কর্নেল স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করলেন। মি. হাটি বললেন—হয়তো আচমকা সামনে কাউকে দেখে দীপনারায়ণ চেঁচিয়ে উঠতে পারতেন। তাই খুনি ঝুঁকি নেয়নি।

—অতর্কিতে পিছন থেকে গুলি করে মারতে পারত। পিঠের বাঁদিকে অতর্কিতে কাছ থেকে গুলি করলেও পারত সে। কিন্তু আপনার কথাতেই আসছি। সে কোনও ঝুঁকি নেয়নি।

বলে কর্নেল আঙুল তুললেন সাহাবাবুদের বাড়ির দিকে। মি. হাটি বলে উঠলেন—ঠিক! ঠিক! মোরামরাস্তা থেকে এই পিছনের দরজায় আসতে হলে সাহাবাবুদের বাড়ির আলোর ছটা এই জায়গা অবধি পৌঁছুবে। লক্ষ্য করে দেখুন।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। এই দরজার কাছে আলো পৌঁছোয় না। প্রথমত এই পাঁচিল। দ্বিতীয় ওই ছাতিম গাছটা। তাই আততায়ী আগেই এসে ওখানে অপেক্ষা করছিল। সে জানত, এক গুলিতে কাউকে চিরকালের মতো চুপ করাতে হলে মাথার পিছনে গুলি করা দরকার। মি. হাটি! সামরিক জীবনে আমি শিখেছিলাম, পিছন থেকে চুপিচুপি এগিয়ে শত্রুকে গুলি করার চেয়ে রাইফেলের নল আর বাঁট দুদিক থেকে দুহাতে ধরে মাথার পিছনে আঘাত করলে সে নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়বে। রাইফেল কেন? একটা বেঁটে শক্ত লাঠিই যথেষ্ট।

মি. হাটি বললেন—এবার চলুন! দীপনারায়ণবাবুর বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

দরজা দিয়ে ঢুকে বাড়ির সামনে গেলাম। বারান্দায় এক বিধবা ফরসারঙের প্রৌঢ়া মহিলা থামে ঠেসে বসে ছিলেন। তাঁকে ঘিরে প্রতিবেশী মহিলাদের ভিড় ছিল। একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক মোড়ায়

বসে কথা বলছিলেন। আমাদের দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন। বললেন—সুনয়নী! পুলিশ-সায়েবরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলো। যা-যা জানো, সব খুলে বলো।

মি. হাটি গম্ভীর মুখে বললেন—আপনারা বাইরে যান। আমরা ওঁর সঙ্গে কথা বলব।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং মহিলারা উঠোনে নেমে গেলেন। তারপর সদর দরজার বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি বেড়ার একটা দিক খুলে কয়েকজন মহিলা বেরিয়ে গেলেন। উঠোনের প্রান্তে একটা পেয়ারাগাছের তলায় সেই বৃদ্ধ এবং দুজন প্রৌঢ়া চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন।

নরুঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার সাইকেলটাও নেই।

মি. হাটি বললেন—মিসেস রায়! ইনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

সুনয়নী বারান্দায় মেঝেয় তেমনিভাবে বসে ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন—এই ঘরে আসুন আপনারা।

সামনের ঘরের দরজা খুলে দিলেন তিনি। পিছনের জানালা দুটো খুলে দিলেন। অবাক হয়ে দেখলাম, ঘরে তিনটে পুরোনো আলমারিতে বই ভর্তি। দেওয়ালে পুরোনো আমলের কয়েকটা বড়-বড় পোর্ট্রেট। সম্ভবত পূর্বপুরুষ জমিদারদের ছবি। একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর মারবেলের আঁটা আছে। কয়েকটা চেয়ার আছে। আমরা বসলে সুনয়নী দরজার কপাটে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। কর্নেল বললেন—দীপনারায়ণবাবু কাল কখন বেরিয়েছিলেন?

সুনয়নী বললেন—পুলিশসায়েবকে সব বলেছি। কাল বিকেলে বেরিয়েছিল বড়দা। কিছু বলে যায়নি। কখন ফিরবে, তা জিজ্ঞেস করলে রাগ করত।

—উনি কোথায় যেতেন আপনি জানেন?

—চন্দ্রপুরে জাহাজিদার বাড়ি। নয়তো গ্রামেরই ক্লাবে দাবা খেলতে যেত। একটা কথা বলতে ভুলেছি। পরশুদিন সকালে বড়দা হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকেছিল। জিজ্ঞেস করলাম। শুধু বলল, শম্ভুকে আমি গুলি করে মারব। নেমকহারাম। বিশ্বাসঘাতক।

—ওঁর কি বন্দুক আছে?

—ছিল। কবে বেচে দিয়েছে সাহাবাবুকে। ওই আলমারিতে বই দেখছেন। তিনপুরুষ আগের দামি দামি সব বই। টাকার দরকার হলে কলকাতায় গিয়ে বেচে আসত। এই ঘরে পূর্বপুরুষের রাখা কতরকম জিনিস ছিল। একটা করে কখন কোথায় কাকে বেচে দিত বড়দা।

—পরশু অপনার দাদা আর কী বলেছিলেন মনে আছে?

সুনয়নী একটু ভেবে নিয়ে বললেন— শীতের গরম পোশাক-আশাক যা ছিল, কবে তা-ও বেচে দিয়েছিল। সম্বল ছিল একটা ছেঁড়া সোয়েটার আর পুরোনো আমলের লম্বা কোট। বড়দা পরশু কোটের পকেট, পাঞ্জাবির পকেট—সব পকেটে হাত ভরে কী খুঁজছিল। জিজ্ঞেস করলাম, জবাব দিল না। কোটের ভেতর-পকেটে ছেঁদা ছিল। শুধু সেই কথাটা বলে দৌড়ে ওই খিড়কির দোর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল বললেন—কখন ফিরেছিলেন উনি?

—দুপুরবেলা। জিজ্ঞেস করলাম, কত টাকা হারিয়েছে? বড়দা শুধু বলল, তোর শুনে কাজ নেই। আমার শেষ সম্বল কোথায় ফুটো পকেট দিয়ে পড়ে গেছে। তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও পেলাম না।

—এবার বলুন, আপনার দাদাকে কে খুন করেছে বলে আপনার সন্দেহ হয়?

—কার কথা বলব স্যার? বড়দা কত লোককে খামোখা চটিয়ে রেখেছে। মাতাল হলে মানুষের তো জ্ঞানগম্যি থাকে না।

কর্নেল তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—জাহাজিবাবুকে সন্দেহ হয় না?

সুনয়নী আস্তে বললেন—হয়। শম্ভুদা আমাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু লোকের কাছে শুনেছি, খুব বজ্জাত লোক। বর্ডারে চোরাচালানিদের দল পুষেছে।

—কিন্তু শম্ভুবাবু তো চন্দ্রপুরে স্থায়ীভাবে বাস করেন না শুনেছি। বছরে নাকি একবার আসেন।

—হ্যাঁ বড়দার কাছে শুনেছি, সে কলকাতায় থাকে। বড়দা যে বাসায় থাকত, সেই বাসা সে ভাড়া নিয়েছে। দুজনের মধ্যে ছোটোবেলা থেকে বন্ধুতা। বিদেশ থেকে ফিরলেই জাহাজিদা আমার জন্যও কতকিছু আনত। আমি ওগুলো কী করব? পাড়াপড়শিদের বিলিয়ে দিতাম।

—আপনার বড়দা কলকাতায় কী করতেন?

—সে দশ-বারো বছর আগের কথা। এখানকার অনেকটা জমি বিক্রি করে কীসের ব্যবসা করত। আমি তা জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। বিধবা হওয়ার পর এ বাড়িতে বছর সাতেক আগে বড়দা আমাকে নিয়ে এসেছিল। হাত পুড়িয়ে তাকে রান্না করে খেতে হয়। বাড়িতে একা একা থাকে। লোক রাখতে হলে মাইনে দিতে হবে। এদিকে আমারও সন্তানাদি নেই।

—আপনার বড়দা বিয়ে করেননি?

—না। সংসারে তত মন ছিল না। বিয়ে করলে আমি জানতে পারতাম। ছোটবেলা থেকে উড়নচণ্ডী স্বভাব। আর ওই নেশাভাং!

কর্নেল বললেন—শম্ভুবাবুকে আপনার সন্দেহ হয় বললেন। এর নিশ্চয় কোনও কারণ আছে?

সুনয়নী একটু চুপ করে থাকার পর চাপা স্বরে বললেন—গত সপ্তাহে একদিন শম্ভুদা সকালবেলা এল। বড়দা দোতলার ঘরে তাকে নিয়ে গেল। আমাকে চা পাঠাতে বলল। চা দিয়ে আসার কিছুক্ষণ পরে কানে এল, দুজনের কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে। শম্ভুদা বলছে, অ্যাডভান্স খেয়ে হজম করবে তুমি? বড়দা বলছে, আমি দরদামে ঠকেছি। একজন আমাকে ডবল দাম দিতে চেয়েছে। এইসব কথা বুঝতে পারিনি প্রথমে। পরে মনে হল, আমাদের পূর্বপুরুষের কোনও দামি জিনিস বড়দা ওকে বিক্রির জন্য অ্যাডভান্স টাকাকড়ি নিয়েছে। তারপর শম্ভুদা চলে গেল। বড়দা তার পিছনে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

—কিন্তু আপনার সন্দেহের কারণ কী?

—ওই যে বললাম পরশু বড়দা হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এসে পকেট হাতড়াচ্ছিল। কোটের ভিতর-পকেটে ফুটো আছে। জিনিসটা পড়ে গেছে বলে পাগলের মতো বেরিয়ে গেল।

—বুঝেছি। অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে শম্ভুবাবু জিনিসটা পাননি। সেটা হারিয়ে গেছে, এ কথায় বিশ্বাস করেননি। তাই রাগের বশে আপনার বড়দাকে খুন করেছেন। এই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি মেয়েমানুষ। আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে, বললাম। পুলিশ-সায়েবকেও বলেছি।

—কলকাতায় আপনার বড়দা যেখানে থাকতেন, সেখান থেকে আপনার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় নিশ্চয় চিঠি লিখতেন। তেমন চিঠি কি আপনার কাছে আছে?

সুনয়নী চোখ মুছে বললেন—আছে হয়তো। একটু খুঁজতে হবে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমরা বারান্দায় যাচ্ছি, আপনি খুঁজে আনুন।

সুনয়নী বললেন—না, না। আপনারা বসুন।

উনি বেরিয়ে গেলে কর্নেল আলমারির বইগুলো খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন—আমার ধারণা, এই প্রাক্তন জমিদার পরিবারের কেউ প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন।

মি. হাটি বললেন—ওগুলো ইতিহাসের বই নাকি?

—হ্যাঁ। তবে প্রত্ন-ইতিহাস আর প্রাচীন ইতিহাসের দুর্লভ সব বই।

—সুনয়নী দেবীর কাছে জানা যাবে সে-কথা।

মিনিট পাঁচেক পরে সুনয়নী একটা পোস্টকার্ড নিয়ে এলেন। বললেন—একটা চিঠি পেলাম।

কর্নেল আতশ কাচে চিঠিটা দেখে বললেন—ঠিকানা দিয়ে দীপনারায়ণবাবু আপনাকে শিগগির জবাব দিতে বলেছিলেন।

সুনয়নী বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমবাগানে আমার একটা অংশ আছে। তাই বড়দা আমাকে চিঠি দিতে বলেছিল। ব্যবসাতে লোকসান হয়েছে। তাই আমবাগানটা তাকে বেচতে হবে।

কর্নেল খুদে নোটবই বের করে ঠিকানাটা লিখে নিলে। ও সি মি. হাটি বললেন—দেখি! দেখি পোস্টকার্ডটা।

কর্নেল তাঁকে বিবর্ণ পোস্টকার্ডটা দিয়ে সুনয়নীকে বললেন—শম্ভু চৌধুরি আপনার বড়দাকে টাকা দিয়ে থাকলে আপনি কি বড়দার কাছে এবিষয়ে কিছু শুনেছিলেন?

সুনয়নী বললেন—কত টাকা দিয়েছিল শম্ভুদা, তা জানি না। তবে হাতে যে-ভাবে হোক, টাকা এলে বড়দা আমাকে কিছু টাকা দিত। শেষবারে দিয়েছিল দু হাজার টাকা।

—ঠিক আছে। এবার চলি। আপনি পিছনের দরজাটা ভিতর থেকে এবার বন্ধ করে দিন।...

সদর দরজা অর্থাৎ বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি আগড় খোলা ছিল। আমরা সেখানে দিয়ে বেরিয়ে গেলাম। মি. হাটি আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি চাপা স্বরে বললেন—জাহাজিবাবু ভোরের বাসে নাকি কলকাতা গেছে। এই খুনের খবর পাওয়ার আগে আপনার কথামতো তার বাড়িতে আমাদের লোকজন পাঠিয়েছিলাম। তার বাড়ির কেয়ারটেকার বলেছে, সায়েব—হ্যাঁ, সায়েব...অট্টহাসি হেসে মি. হাটি ফের বললেন—ব্যাটাচ্ছেলেকে একবার টাই-স্যুট পরতে দেখেছিলাম। বর্ডারে দুজন চোরাচালানিকে ব-মাল ধরেছিলাম। জাহাজিবাবু সায়েব সেজে তাদের হয়ে কথা বলতে এসেছিল। ধমক দিয়ে বের করে দিয়েছিলাম।

কর্নেল বললেন—পোস্টকার্ডের ঠিকানা আপনি টুকে নিয়েছেন কি?

—হ্যাঁ। আপনি যে জন্য ঠিকানাটা নিলেন, আমি সেজন্য টুকিনি। ওই ঠিকানায় আশেপাশে লোকজন রেখে তাকে পাকড়াও করতে হবে। গিয়েই কলকাতা পুলিশকে খবর দেব।

গাড়িতে উঠে কর্নেল বললেন—চলি মি. হাটি!

—আপনারা আর কদিন আছেন সেচবাংলোতে?

—নীল সারসের কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছি। কাজেই আজ লাঞ্চের পরই কলকাতা ফিরব। আমার নেমকার্ড তো আপনাকে দিয়েছি। দরকার হলে স্মরণ করবেন। আমিও আপনার ফোনের জন্য অপেক্ষা করব।

বাংলোয় ফিরে নরুঠাকুরকে দেখতে পেয়েছিলাম। সে বলেছিল—বড়দির কাছে গিয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে রাগ হল। নিজের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে শর্টকাটে ফিরে এসেছি।

দুপুর একটা-পনেরোতে পাবদার ঝোলসহ লাঞ্চ সেরে আমরা কলকাতা ফিরে এসেছিলাম। ইলিয়ট রোড এলাকায় কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে চারটে বেজে গিয়েছিল। দেরির কারণ হাইওয়েতে একটা ট্রাক উলটে গিয়ে প্রচণ্ড জ্যাম ছিল।

দরজা খুলেই কর্নেলের পরিচারক ষষ্ঠীচরণ একগাল হেসে বলল— টিকটিকিবাবু দুপুরে ফোন করেছিলেন। বলেছি, বাবামশাই আর কাগজের দাদাবাবু কোথায় পাখি দেখতে গেছেন। কবে ফিরবেন জানি না।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—কফি!

ষষ্ঠী হাসিমুখে চলে গেল। কর্নেলের জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে সোফায় বসে বললাম—ষষ্ঠী 'হালদারমশাই'কে আড়ালে টিকটিকিবাবু বলে। ওঁর কানে গেলে দুঃখ পাবেন।

প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদারকে কর্নেলের দেখাদেখি আমিও 'হালদারমশাই' বলি। ঢ্যাঙা শ্যামবর্ণ এই প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের চুল খুঁটিয়ে

ছাঁটা। সুচালো গোঁফ আছে। উত্তেজিত হলে উনি দাঁতে দাঁত ঘষেন বলে গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপে। তাঁর চেয়ে বড়ো কথা, উনি পূর্ববাংলার ভাষায় কথা বলা ছাড়েননি। প্রশ্ন তুললে বলেন—মাই মাদার টাং! ছাড়ুম ক্যান?

কর্নেলের নির্দেশে গণেশ অ্যাভিনিউয়ে তাঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির অফিসে ফোন করতেই সাড়া এল—ইয়েস?

বললাম—হালদারমশাই! আমরা এইমাত্র ফিরেছি। ষষ্ঠী বলল, আপনি কর্নেলকে ফোন করেছিলেন।

—জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেল স্যার ফিরছেন? এখনই যাইতাছি। একখান জব্বর ক্যাস পাইছি। কর্নেল স্যারের লগে কনসাল্ট করনের দরকার আছে।...

পাঁচ

কফি খেতে খেতে কর্নেলের সঙ্গে দীপনারায়ণবাবুর মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কর্নেলের মতে, মিশরীয় তক্তিটার জন্য উনি খুন হননি। তক্তিটা হাতাতে চাইলে জাহাজিবাবু সেদিনই খুন করে ওটা পেয়ে যেত, যেদিন সকালে ওঁরা দুজনে ধস্তাধস্তি করছিলেন। রাস্তা ছিল জনহীন। তাছড়া সুনয়নী বলেছেন, তাঁর বড়দার অনেক শত্রু আছে।

বললাম—কিন্তু পেতলের নলটা জাহাজিবাবু প্রায় এক বছর কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল কেন, বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন—এর একশো একটা কারণ থাকতে পারে। হয়তো খদ্দের পাচ্ছিল না। কিংবা খদ্দের আসতে কোনও কারণে দেরি করছিল। এইসব প্রাচীন পার্চমেন্ট বা চামড়ায় লেখা কিউনিফর্ম লিপির একটা নিদর্শনের দাম কোটি কোটি টাকা। আমেরিকার মতো ধনী দেশের কোটিপতিরাই এসব জিনিস নানা দেশ থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত জাদুঘরে রাখে। মার্কিন ধনীদের এই বাতিকটা আমি দেখেছি।

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী!

একটু পরে সবেগে প্রবেশ করলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। তিনি ধপাস করে সোফায় বসে আগে এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর নোংরা রুমালে নাক মুখে বললেন—হেভি মিস্ট্রি কর্নেলস্যার! জব্বর একখানা ক্যাস পাইছি।

কর্নেল বললেন—বলুন। শোনা যাক কেমন কেস।

গোয়েন্দাপ্রবর চাপা স্বরে বললেন—আমার মক্কেলের পুরা নাম ক্যাপটেন সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ। উনি ক্যাপটেন এস. এন. সিংহ নামে পরিচিত। সাউদার্ন অ্যাভিনিউয়ে ওনার দোতলা পৈতৃক বাড়ি। ওপরে তিনখান ঘরে নিজের জন্য রাখছেন। নিচের তিনখান ঘর ভাড়া দিছেন। সেখানে তিনখান ঘরে মুদির দোকান, স্টেশনারি স্টোর্স আর মিষ্টির দোকান। ওনার বাড়ি এখনও দেখি না। যা শুনছি, কইলাম।

—কিন্তু কেসটা কী?

—ভদ্রলোক প্রাইভেট জাহাজ কোম্পানিতে ক্যাপটেন ছিলেন। নয় বৎসর আগে রিটায়ার করছেন। তো গত সপ্তাহে হঠাৎ ওনার সন্দেহ হইছিল, উনি যেখানে যান, ওনারে একজন লোক একটু দূর থেইক্যা ফলো করে। ওনার গাড়ি ছিল। বেইচ্যা দিছেন। তো যে তাঁরে ফলো করে, তারে চিইন্যা রাখছেন। তাড়া করলে লোকটা পলাইয়া যায়। কিন্তু তারপর আবার ওনারে ফলো করে। উনি থানায় গিছলেন। পুলিশ কইছিল, মাইনষে বুড়া হইলে চক্ষে ভুল দ্যাখে। অরা ক্যাস লয় নাই। হাসহাসি করছিল। তো আপনি জানেন কর্নেলস্যার আমি মাসে একখান-দুইখান বিজ্ঞাপন দিই।

হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেইখ্যা উনি আইজ আমার অফিসে গেছিলেন। কইলেন, ফোনে কিছু জানাই নাই। ক্যান কী, ফোন ট্যাপ করতে পারে কেউ।

আমি চমকে উঠেছিলাম। চন্দ্রপুরের শম্ভু চৌধুরিও জাহাজে চাকরি করত। আর হালদারমশাইয়ের মক্কেলও জাহাজের ক্যাপটেন ছিলেন। কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন—জয়ন্ত! চুপচাপ শোনো।

বললাম—শুনছি তো।

—না। তোমার মুখের লেখা পড়ে টের পাচ্ছি, তুমি হালদারমশাইকে ডিসটার্ব করতে চাও।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ খিখি করে হেসে বললেন—জয়ন্তবাবু তাঁর নিউজপেপারের জন্য একখান স্টোরির আশা করতেই পারেন। কিন্তু এখন না।

কর্নেল বললেন—এই আপনার কেস?

—হ্যাঁ কর্নেল স্যার! তবে আমার অফিসে আসবার সময় ক্যাপটেন সিংহ ট্যাক্সি ধরছিলেন। কইলেন, অনেক অলিগলি দিয়া আসছেন। কেউ তাঁরে ফলো করে নাই। কিংবা করছিল। কিন্তু কইলকাতার রাস্তায় কারেও গাড়ি লইয়া ফলো করা কঠিন।

—কিন্তু কেউ ক্যাপটেন সিংহকে কেন ফলো করবে? তার পিছনে নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। আপনি ওঁকে জিজ্ঞেস করেননি?

—হঃ! করছি। উনি কইলেন, কিছু বুঝতে পারেন না। আর কইলেন, লোকটা হয়তো অনেকদিন ওনারে ফলো করছে। উনি লইক্ষ্য করেন নাই। কে ওনারে ফলো করছে আর তার উদ্দেশ্য কী, আমারে তা যেভাবে হোক, জানতে হবে।

—ক্যাপটেন সিংহের সন্দেহ তাঁর ফোন কেউ ট্যাপ করেছে। কাজেই ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে না। এখন সাড়ে সাতটা বাজে। শীতকাল বলে বেশি রাত্রি মনে হবে। আমি বলি কী, আপনি এখনই ক্যাপটেন সিংহের বাড়ি চলে যান। ওঁর বাড়িতে কে থাকে, ওঁর ঘরের বিশেষ কোনও জিনিসপত্র যদি চোখে পড়ে, এইসব জেনে নিন। তারপর কাল সকাল ন-টার মধ্যে এসে আমাকে জানাবেন। জাহাজের ক্যাপটেন কত-কত দেশ ঘুরে বেড়ান। তাঁর অভিজ্ঞতাও বিচিত্র নয়।

ষষ্ঠী হালদারমশাইয়ের জন্য বেশি দুধ মেশানো 'স্পেশাল কফি' আনল। গোয়েন্দাপ্রবর কফির পেয়ালা তুলে ফুঁ দিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। লক্ষ্য করলাম, উত্তেজনায় ওঁর গোঁফের দুই ডগা মাঝেমাঝে তিরতির করে কেঁপে উঠছে।

কফি শিগগির শেষ করে তিনি বললেন—লোকটারে যে অন্য কেউ ক্যাপটেন সিংহের পিছনে ফলো করতে কইছে, এমনও হইতে পারে।

কর্নেল বললেন—এটা কি আপনার ধারণা, নাকি ক্যাপটেন সিংহ আপনাকে এ কথা বলেছেন?

—উনি কইছিলেন। যে লোকটা ওনারে ফলো করে, তার চেহারা সাধারণ লোকের মতো। রোগা। পরনে যেমন-তেমন পোশাক। তবে কখনও প্যান্ট-সোয়েটার পরে। কখনও ধুতি-পাঞ্জাবির ওপর চাদর থাকে। কখনও পাজামা-পাঞ্জাবি-জহরকোট আর মাথায় টুপি। কিন্তু একই লোক।

—ক্যাপটেন সিংহ আপনাকে কী করতে বলেছেন?

—লোকটা কে, তার নাম-ঠিকানা খুঁইজ্যা বার করতে হইব। ক্যান যে ওনারে ফলো করে তা-ও যেভাবে হোক, তার কাছ থেইক্যা আদায় করতে হইব। তার পিছনে যে আছে, তারও নাম-ঠিকানা ওনার চাই। হেভি কেস!

কর্নেল হাসলেন।—এবং আপনি বলছিলেন হেভি মিস্ট্রি! তা কত টাকার কন্ট্রাক্ট হয়েছে এই কাজে?

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন—মক্কেল নিজেই পাঁচহাজার টাকা দেবেন। অ্যাডভান্স পাঁচশো। কন্ট্রাক্ট পেপারে সই করছেন। যে ফলো করে, তারে আমি কাইলই ধরুম।

—তাড়াহুড়ো করবেন না হালদারমশাই! রাস্তায় যেন গণ্ডগোল বাধাবেন না। আমার মনে হচ্ছে, কেউ ক্যাপটেন সিংহের গতিবিধির ওপর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে নজর রেখেছে।

ঘড়ি দেখে গোয়েন্দাপ্রবর 'যাই গিয়া' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।...

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—জয়ন্ত! এবার বলো তুমি কী বলার জন্য উশখুশ করছিলেন!

বললাম—চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবু আর হালদারমশাইয়ের মক্কেল ক্যাপটেন সিংহ—এই দুজনের মধ্যে জাহাজের ব্যাপারে সম্পর্ক আছে। দুজনেই জাহাজে নানা দেশে ঘুরেছেন।

—হ্যাঁ চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবু শম্ভুনাথ চৌধুরি যে বহুমূল্য প্রত্নসম্পদ হাতিয়ে কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল, তার প্রমাণ আমাদের হাতে এসে গেছে।

—আচ্ছা কর্নেল, ওই ব্রোঞ্জের তক্তিটাও তো একটা বহুমূল্য প্রত্নসম্পদ। কিন্তু ওটা দীপনারায়ণবাবু পেলেন কোথায়? আমার অনুমান, শম্ভু চৌধুরিই ওটা দীপনারায়ণবাবুকে কোনও কারণে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিল। রাস্তায় হাতাহাতি সম্ভবত ওই নিয়েই।

—অনুমান নিছক থিয়োরি। যতক্ষণ না তার প্রমাণ পাচ্ছি, তা নিয়ে জল্পনা নিরর্থক।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ব্যাগ থেকে একটা গাবদাগোবদা পুরোনো বই নিয়ে এলেন। বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে তিনি বললেন—বইটা বিভিন্ন দেশে লিপির উদ্ভব এবং বিকাশের ইতিহাস। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, প্রাচীন মিশরীয় তক্তিটার ছবি আমার পরিচিত। দেখি খুঁজে পাই নাকি।

এইসব বই দেখলেই আমার অস্বস্তি হয়। তার ওপর কর্নেল ওর মধ্যে ঢুকে গেলে কখন যে বেরোবেন, তার কোনও ঠিক নেই। ধৈর্য ধরে প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়ে বললাম—কর্নেল! আমি এবার উঠি।

কর্নেল বইয়ের পাতায় চোখ রেখে বললেন—বাহুতে বাঁধা তাগার ছবি পাচ্ছি। রামেসিসের তাগা। এতে শেয়ালঠাকুর আনুবিসের ছবি এক পিঠে। অন্য পিঠে সাপ! এটা আমেনহোতেপের বাহুর তাগা। তেমন কিছু না। 'রা' অর্থাৎ, সূর্যঠাকুরের ছবি আর হিজবিজবিজ—বাঃ! এটা তুতাংক-আমন অর্থাৎ তুতানখামেনের ছবি আর হিজবিজবিজ—বাঃ! এটা তুতাংক-আমন অর্থাৎ তুতানখামেনের তাগা। বেচারা কিশোর বয়সে মিশরের রাজা হয়ে যক্ষ্মারোগে মারা পড়েছিল। তার মমি এখন কায়েরোর জাদুঘরে আছে।

—প্লিজ কর্নেল! আমি বাড়ি ফিরতে চাই।

—কী আশ্চর্য! এটা তুতাংক-আমনের বালিকা বিধবা নেকারতিতির তাগা। জয়ন্ত! জয়ন্ত! পেয়ে গেছি। নেকারতিতির গলার তক্তি। দ্যাখো, দ্যাখো!

বলে তিনি জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে তিতলিপুরের রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ব্রোঞ্জের তক্তিটা বের করলেন। এবার আমি কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিলাম। তক্তিটার দুই পিঠে যা খোদাই করা আছে, বইয়ের ছবিতেও হুবহু তা-ই আছে। অতএব আমাকে সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে ফেরার কথা ভুলতে হল। বললাম—কী সব লেখা আছে, বইয়ে তা পাচ্ছেন?

কর্নেল কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে হতাশ ভঙ্গিতে বললেন—নাঃ! নেকারতিতির তক্তি ছিল সোনার। এটা ব্রোঞ্জের। তার মানে এটা নকল জিনিস। বিদেশের কিউরিয়ো শপে এরকম নকল জিনিস বা রেপ্লিকা বিক্রি হয়। তুমি দিল্লির লালকেল্লায় নিশ্চয় দেখেছ, মিনি তাজমহল বিক্রি হয়। জয়ন্ত! এটা নিছক রেপ্লিকা। মূল সোনার তক্তিতে কী লেখা ছিল, পণ্ডিতেরা তার পাঠোদ্ধার করেছেন।

বললাম—কী লেখা আছে, তা নিয়ে মাথাব্যথা করে কী লাভ? আপনি পার্চমেন্টে লেখা কিউনিফর্ম লিপির পাতা খুঁজে দেখুন!

কর্নেল বললেন—কিউনিফর্ম লিপি পশ্চিম এশিয়া, ইরাক আর পারস্যে প্রচলিত ছিল। নানা ভাষা নানারকমের পেরেক চিহ্নের সমাবেশ। কাজেই এক্ষেত্রে আমাকে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হবে।

—মূল পার্চমেন্টটা দেখাবেন নাকি?

—মোটেও না। ওটার একটা ফোটোকপি করে নিয়ে যাব। বলব, একটা বইয়ে পেয়েছি। তবে বলা যায় না, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুতে পারে।

—সাপ মানে?

—তুমি জানো, আমি ইনট্যুশনের কথা বলি। ওটা একটা বিস্ময়কর বোধ। অনেক মানুষের মধ্যে এটা লক্ষ্য করেছি। তবে আমার সামরিক জীবনে গেরিলাযুদ্ধ শেখার সময় আমার এই বোধটা জন্মেছিল। বহুবার দেখেছি, কোনও বিপদ আসন্ন, তা হঠাৎ আমি টের পেয়েছি। চামড়ায় লেখা কথাগুলো অর্থাৎ, প্রাচীন পার্চমেন্ট পেতলের নল থেকে বের করেই গতরাতে দোমোহানির বাংলোতে মনে হয়েছিল, এটা বিপজ্জনক।

হাসতে হাসতে বললাম—ওটাও ব্রোঞ্জের তক্তির মতো নকল নয় তো?

—পার্চমেন্টটা আতশকাচে পরীক্ষা করে মনে হয়েছে খুব পুরোনো। অনেক জায়গায় পোকায় কেটেছে। ওতে কীটনাশক পাউডার মাখিয়ে রাখতে হবে।

বলে কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ড. মুখার্জি আছেন কি?...ড. মুখার্জি! নমস্কার! আশা করি সুস্থ শরীরে আছেন?...এ বয়সে ওরকম একটু-আধটু অসুখ-বিসুখ হয়েই থাকে। আমারও হয়।...মিলিটারি বডি? বাঃ! বলেছেন ভালো। কিন্তু এবার বডি ছেড়ে মিলিটারি অংশটা পালিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, কাল বিকেল চারটে নাগাদ আপনার একটু সময় হবে?...ব্যাপার আপনার কাছে সামান্য। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত আপনি।...না, না! শুনুন! একটা গুরুতর সমস্যায় পড়েছি। আপনার সাহায্য চাই।...ওকে ওকে ড. মুখার্জি! ধন্যবাদ।

কর্নেল রিসিভার রেখে বললেন—ড. রথীশ মুখার্জির নাম শুনেছ?

বললাম—না। কে উনি?

—এটাই হয়, জয়ন্ত! প্রকৃত বিদ্বানরা প্রচারবিমুখ। তাঁরা কাজ করেন আড়ালে। আর তাঁদের কাজের ফল ভোগ করে অন্য সব মানুষ।

—আমি এবার উঠি, কর্নেল! বরং সকালে আসব।

কর্নেল হাসলেন।—তুমি সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে ফিরেই হয়তো দেখবে, তোমার কাগজের কর্তৃপক্ষ তোমাকে কোথাও কোনও হাঙ্গামার খবর আনতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব এই বৃদ্ধের ডেরায় লুকিয়ে থাকো!

—আমার চাকরি এবার যাবে!

—যাবে কী বলছ? তোমাদের চিফ রিপোর্টারকে আমি জানিয়ে দেব, একটা রোমাঞ্চকর স্টোরির পিছনে তোমাকে লড়িয়ে দিয়েছি।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে এ ধরনের ঘটনার সময় রাত কাটাতে হয়। তাই এখানে আমার এক প্রস্থ পোশাক-আশাক আর দরকারি জিনিসপত্র রাখা আছে। কর্নেল প্রায়ই আমাকে সল্ট লেকের ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিয়ে তাঁর ডেরায় থাকতে বলেন। এ যাবৎ রাজি হইনি। কারণ, কখন নিছক কোনও বিরল প্রজাতির অর্কিডের জন্য ওঁর পিছনে পাহাড়-জঙ্গলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হবে।...

সকালে ষষ্ঠীচরণের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল আমার। বাসিমুখে চা অর্থাৎ বেডটি খাওয়ার অভ্যাস আছে। বেডটি দিয়ে ষষ্ঠী হাসল।—বাবামশাই এখনও ছাদের বাগানে কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। একটা হতভাগা কাক ক্যাকটাসের মধ্যে আটকে গিয়ে কেলেঙ্কারি। হাজার-হাজার কাক এসে

বাবামশাইকে চাদ্দিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। আমি ছুটে গিয়ে পটকা ফাটালুম। তারপর আধমরা কাকটা বের করে দত্তবাড়ির নিমগাছে ছুঁড়ে দিলাম। আপনি তখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছেন। বাবামশাইয়ের দু-হাত তুলে নাচন-কোঁদন দেখলে—ওঃ! কুরুক্ষেত্তর!

বলে সে চলে গেল। ছাদের বাগানে কর্নেল একটা কাকতাড়ুয়া বসিয়েছিলেন। সেটা কি নেই?

প্রাতঃকৃত্যের পর পোশাক বদলে ড্রয়িংরুমে গেলাম। একটু পরে কর্নেল এলেন।—মর্নিং জয়ন্ত!

—মর্নিং বস! শুনলাম, আপনি কাকেদের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বযদ্ধে নেমেছিলেন?

কর্নেল অট্টহাসি হেসে ইজিচেয়ারে বসলেন।—ষষ্ঠীর খবর! ষষ্ঠী তিনটে হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়েছে। অতএব যোদ্ধা সে-ই।

একটু পরে ষষ্ঠী গম্ভীর মুখে কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। কর্নেলের হাতে এদিনের ইংরেজি-বাংলা একগাদা খবরের কাগজ ছিল। সোফার কোণে ছুড়ে ফেলে কফিপানে মন দিলেন। আমি কাগজগুলোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে তিতলিপুরের খুনের খবর খুঁজলাম। মফস্সলের সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর ছাপানোর জায়গা থাকলে ছাপা হবে। নয়তো দুমড়ে টেবিলের তলায় ফেলা হবে। নেতাগোছের কেউ খুন হলে অবশ্য অন্য কথা। দীপনারায়ণবাবুর পূর্বপুরুষ জমিদার ছিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত সাধারণ মানুষ ছিলেন।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—তুমি কী খুঁজছিলে, জানি। ধৈর্য ধরো ডার্লিং! তুমিই ওই খুনের খবর অদূর ভবিষ্যতে জমিয়ে লিখবে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এক লাফে বেড়ে যাবে।

বললাম—কিন্তু আপনি তো খুনের জায়গা থেকে চলে এলেন! আপনিই বলেন, খুনির পিছনে দৌড়ুনোর আগে যে খুন হয়েছে, তার পিছনে দৌড়ুনো উচিত।

কর্নেল হাসলেন—দৌড়ুনোর জন্যই তো কলকাতা ফিরে এসেছি।

—দীপনারায়ণবাবুর খুনের সূত্র এই বিশাল শহর কলকাতায় খুঁজে পাবেন? খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার ব্যাপার হবে না?

কর্নেল চুপচাপ কফি শেষ করে বললেন—সওয়া আটটা বাজে। এখনই একবার বেরিয়ে পড়া যাক। শিগগির ঘুরে আসব। হালদারমশাইয়ের ন-টা নাগাদ আসবার কথা। কুইক জয়ন্ত!

কর্নেলকে এসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা বৃথা। শুধু বলবেন—চলো তো! আমি পথ দেখাব।

নিচে কর্নেলের একটা খালি গ্যারাজ ঘর আছে। একসময় ওঁর একটা লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়ি ছিল। পুরোনো গাড়ি। বারবার ঝামেলা বাধাত। তাই বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সেই গ্যারাজে আমার ফিয়াট গাড়িটা থাকে।

কর্নেল গ্যারাজের তালা খুলে দিলেন। আমি গাড়ি বের করলাম। কর্নেল আমার বাঁপাশে বসে বললেন—বাইনোকুলার বা ক্যামেরার দরকার নেই। শুধু দর্শন করে আসব।

দারোয়ান সেলাম ঠুকে গেট খুলে দিল। তারপর কর্নেলের নির্দেশে অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে পার্ক স্ট্রিট, তারপর থিয়েটার রোডে পৌঁছুলাম। থিয়েটার রোড আর সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের মধ্যে একটা গলিরাস্তার যোগাযোগ লক্ষ্য করলাম। সেই গলিতে কিছুটা এগিয়ে কর্নেল বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। গাড়ি থেকে নেমে এতক্ষণে বুঝলাম, দীপনারায়ণবাবু যে ফ্ল্যাটে থাকতেন, সেই ফ্ল্যাটে এখন জাহাজিবাবু বাস করে। এই ঠিকানাটা দীপনারায়ণবাবুর বোন সুনয়নী দেবী দিয়েছিলেন।

কাছে গাড়ি মেরামতের গ্যারাজে গিয়ে কর্নেল নাম্বার জিজ্ঞেস করে এলেন। তারপর আমাকে তিনি অপেক্ষা করতে বলে একটা বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। সামনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল সিঁড়িতে ওঠার সময় এক মুসলিম ভদ্রলোক নেমে আসছিলেন। তাঁর

মাথায় টুপি। মুখে দাড়ি। পরনে পাঞ্জাবি আর লুঙি। গলায় একটা মাফলার জড়ানো। কলকাতায় ডিসেম্বরেও শীত তীব্র নয়। কর্নেল তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি আঙুল তুলে কিছু দেখিয়ে নেমে এলেন। তারপর আমার দিকে একবার তাকিয়ে সোজা সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের দিকে চলে গেলেন। তাঁর হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল।

একটু পরে কর্নেল নেমে এলেন। তারপর দরজা দিয়ে বেরিয়ে বললেন—ঠিকানা ঠিকই আছে। কিন্তু ওই দু-কামরা ফ্ল্যাটে থাকেন কাজি গোলাম হোসেন। পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক বললেন—উনি তো এখনই বেরিয়ে গেলেন। না—ওখানে এক হিন্দু ভদ্রলোক অনেক বছর আগে থাকতেন। তারপর ফ্ল্যাটটা খালি ছিল। মালিক থাকেন দিল্লিতে। ওই ফ্ল্যাট তিনিই কাজিসাহেবকে নাকি ভাড়া দিয়েছেন। কাজিসাহেব একা থাকেন। কারও সঙ্গে মেশেন না। বদরাগি লোক বলে তাঁকে সবাই এড়িয়ে চলেন।

কর্নেল গাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে আমার বাঁদিকে বসতে যাচ্ছেন, সেইসময় তাঁর জ্যাকেটের পিছনে এক টুকরো কাগজ আঁটা দেখতে পেলাম। কাগজটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম—এটা আপনার পিঠে আঠা দিয়ে আটকানো ছিল।

কর্নেল কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন—জয়ন্ত! আমাকে জাহাজিবাবু বোকা বানিয়ে চলে গেছে পাশ দিয়ে। যাবার সময় আমার পিঠে এটা আটকে দিয়ে গেছে। এতে লেখা আছে, 'দ্বিতীয়বার এলেই মারা পড়বে।

ছয়

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল দোমোহানি সেচবাংলোয় পাওয়া হুমকির চিঠিটার সঙ্গে আজকের চিরকুটের লেখা আতশ কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করেছিলেন। দুটো লেখাই একজনের। কর্নেল চিঠি আর চিরকুটটা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানছিলেন। চোখ যথারীতি বন্ধ।

বলেছিলাম—জাহাজিবাবু লিখেছিল আপনাকে চেনে। তাহলে এই রিস্ক নিল কেন সে? ওকে তো আবার ওই ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে। লোকটা যদি সত্যিই আপনার প্রকৃত পরিচয় জেনে থাকে, তাহলে তার এ-ও জানার কথা, আপনি তার পিছনে পুলিশ লাগিয়ে দেবেন।

কর্নেল বলেছিলেন—পুলিশ নিজে থেকেই ওখানে হানা দেবে। কারণ চন্দ্রপুর থানার ওসি রাজেনবাবু নিশ্চয় লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে খবর পাঠিয়েছেন। তুমি সাংবাদিক। তোমার জানার কথা, পুলিশ সহজে কোনো বাড়তি কাজে হাত লাগায় না। পুলিশেরও আজকাল অনেক অসুবিধে আছে। কোথায় হাত দিতে গিয়ে কোন রাজনৈতিক গার্জেনের ছোবল খাবে!

—কেন? আপনি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার আপনার বিশেষ স্নেহভাজন মি. অরিজিৎ লাহিড়িকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিন!

—এখনও সে-সময় আসেনি। আমি চাই না পুলিশ এখনই জল ঘোলা করুক। তাতে মূল রহস্য আর কোনওদিনই জানা যাবে না। আমাকে নিজের পদ্ধতিতে এগোতে হবে। হালদারমশাই আসুন। তারপর পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কী রকম, তা হয়তো বোঝা যাবে।...

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদারের আবির্ভাব ঘটল সাড়ে নটায়। সবেগে ঢুকে ধপাস করে বসে বললেন—হেভি মিস্ট্রি। তাই এট্টু দেরি হইয়া গেল।

কর্নেল বললেন— বলুন হালদারমশাই!

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে যা বললেন, তা এই :

'অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপটেন এস এন সিংহ সাউদার্ন অ্যাভিনিউতে বাড়ির দোতলায় একা থাকেন। তাঁর একমাত্র ছেলে থাকে আমেরিকার বস্টনে। সে সেখানে বিয়ে করেছে। বছরে একবার এসে

বাবাকে দেখে যায়। ক্যাপটেন সিংহের রান্না আর কাজকর্ম করে দিয়ে যায় একজন ঠিকে ঝি। এই মেয়েটি থাকে লেকের ধারে একটা বস্তিতে। রাস্তায় দিকের ঘরটা ক্যাপটেন সিংহের ড্রয়িং রুম। দেশবিদেশের নানারকম শিল্পদ্রব্যে সাজানো। ভিতরের দরজা দিয়ে গেলে শোবার ঘর। সেখানে আলমারি-ঠাসা বই আর দেওয়ালে টাঙানো আছে তাঁর পারিবারিক ছবি। তৃতীয় ঘরটা কিচেন আর ডাইনিং। কিচেনের অংশটা পার্টিশন করা আছে।

কথায়-কথায় ক্যাপটেন সিংহ বলেছেন, সারাজীবন ঘরছাড়া হয়ে কাটিয়েছেন। তাই তাঁর বন্ধুবান্ধব নেই। আত্মীয়-স্বজন কলকাতার নানা জায়গায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কম। অবসরজীবনে তিনি স্থানীয় একটা ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। ক্লাবটা উঠে গেছে। তবে পাড়ায় কয়েকজন তাঁর বয়সি ভদ্রলোকের সঙ্গে বন্ধুতা আছে। প্রতিদিন ভোরে তাঁদের সঙ্গে লেকের ধারে হাঁটাহাঁটি করে আসেন। ঠিকে ঝি আসে বেলা আটটা-সাড়ে আটটায়।

হালদারমশাই জানতে চেয়েছিলেন, গতিবিধি জানার জন্য তাঁর পিছনে লোক লাগানোর কোনও কারণ আছে বলে কি তিনি মনে করেন? ক্যাপটেন সিংহ বলেন, তেমন কোনও কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে বছর দশেক আগে তাঁর এক সহকর্মী তাঁকে একটা প্যাকেট রাখতে দিয়েছিলেন। তখন তিনি জাহাজে ছিলেন। জাহাজটা আসছিল মিশরের পোর্ট সইদ বন্দর থেকে বোম্বে। তারপর কলকাতা। তাঁর সেই সহকর্মীর নাম ছিল অজয়েন্দু রায়। বোম্বে আসার পথে আরব সাগরে জাহাজটার তলায় ফাটল ধরে ডুবতে থাকে। বিপদসংকেত পাঠান তিনি। বোম্বে বন্দর থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ পৌঁছোয়। কিন্তু তখন জাহাজটার পিছন দিক ডুবে যায়। অনেক নাবিক প্রাণ হারায় জলের তলায়। মোড়কটা ক্যাপটেন সিংহের ব্যাগে ছিল। ব্যাগটা তিনি সবসময় কাছে রাখতেন। তিনি উদ্ধার পান। কিন্তু অজয়েন্দু রায়ের আর খোঁজ পাননি। জাহাজে মিশরের তুলো বোঝাই ছিল। সব নষ্ট হয়ে যায়। বোম্বেতে কিছুদিন থাকার পর ক্যাপটেন সিংহ তাঁর কোম্পানির আর একটা ছোটো মালবাহী জাহাজ নিয়ে কলকাতা বন্দরে আসেন। তারপর প্যাকেটটা বাড়িতে রেখে খিদিরপুর ডকে নিজের কাজে ফিরে যান।

অজয়েন্দু রায়ের অধীনে একজন অফিসার ছিলেন। তাঁর নাম শম্ভুনাথ চৌধুরি। তিনি ক্যাপটেন সিংহের কাছে অজয়েন্দুবাবুর গচ্ছিত প্যাকেটের কথা কীভাবে জানতে পেরেছিলেন, এটাই আশ্চর্য! প্রায়ই এই লোকটা তাঁর কাছে প্যাকেটটা দাবি করত। অন্যের জিনিস তিনি কেন দেবেন শম্ভুবাবুকে? তিনি ওঁকে ধমক দিয়ে বলতেন, তেমন কোনও প্যাকেট অজয়েন্দুবাবু তাঁকে দেননি। তারপর তো চাকরি থেকে ক্যাপটেন সিংহ অবসর নেন। দু-বছর আগে একদিন তিনি ব্যাংকে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে তাঁর ঠিকে-ঝি সুশীলার কাছে শোনন, এক ভদ্রলোক তাঁর খোঁজে এসেছিলেন। তাঁকে সুশীলা ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখেছিল। তারপর কখন ভদ্রলোক চলে গেছেন, সুশীলা দেখতে পায়নি। ক্যাপটেন সিংহ সুশীলাকে বকাবকি করেন। তবে সুশীলার দোষ ছিল না। তাঁকে তিনি বিশ্বাস করেন। তাই বাড়ির চাবি তাকে দিয়ে যেতেন। কারণ সুশীলা সব ঘর পরিষ্কার করত। মেঝে মুছত। যাই হোক, দিনে তাঁর কথাটা মাথায় আসেনি। রাত্রে তিনি সন্দেহবশে বেডরুমে তাঁর খাটে বিছানার তলা খোঁজেন। প্যাকেটটা ম্যাট্রেসের তলায় রাখা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

সুশীলার কাছে আগন্তুক ভদ্রলোকের চেহারার যে বিবরণ তিনি পান, তাতে তিনি চিনতে পারেননি ভদ্রলোককে। তাঁর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ছিল। পরনে টাই-স্যুট ছিল। তিনি পাইপ খাচ্ছিলেন।

এমন সাহেব-মানুষকে সুশীলা ড্রয়িংরুমে বসতে দেবে, এটা স্বাভাবিক। ব্যাংকটা কাছেই। কাজেই ক্যাপটেন সিংহের শিগগির বাড়ি ফেরার কথা। তবে তারপর থেকে সুশীলার হাতে চাবি

দিয়ে তিনি বেরোন না। সুশীলা ঘর পরিষ্কার এবং রান্না করে চলে যাওয়ার পর তিনি দরকার হলে বাইরে যান।...

হালদারমশাইয়ের কথা শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কর্নেলের কথা বলার আগে আমার কোনও কথা বলা উচিত হবে না। চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবুর সঙ্গে হালদারমশাইয়ের মক্কেলের একটা যোগসূত্র তাহলে পাওয়া গেল। ক্যাপটেন সিংহকে অজয়েন্দু রায় যা রাখতে দিয়েছিলেন, তা জাহাজিবাবুই যে ছদ্মবেশে চুরি করে নিয়ে যায়, তা-ও স্পষ্ট হল। জিনিসটা যে পিতলের নলে রাখা পার্চমেন্ট, তা-ও বোঝা গেল। শুধু বুঝতে পারলাম না, এতদিন পরে কে ক্যাপটেন সিংহের গতিবিধির ওপর নজর রেখেছে? তার উদ্দেশ্যই বা কী?

হালদারমশাই ব্রেকফাস্ট করে এসেছেন। কর্নেল ও আমি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপর কফি আনল ষষ্ঠীচরণ। হালদারমশাই ফুঁ দিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন—দুইখান পয়েন্ট আমার মাথায় আইয়া পড়ছে। কমু?

কর্নেল বললেন—বলুন।

—সুশীলা রোজ ঘর পরিষ্কার করত। সে নিশ্চয় প্যাকটেখান বিছানার তলায় দেখছিল। তার লগে শম্ভুনাথ চৌধুরি ছদ্মবেশে গোপনে যোগাযোগ করছিল। সুশীলা ক্যাপটেন সিংহেরে মিথ্যা কইছে। গোপনে সে-ই টাকার লোভে প্যাকেটখান শম্ভুনাথের দিছে। ক্যাপটেন সিংহ সুশীলার বিশ্বাস কইরা ঠকছেন। এই হইল গিয়া প্রথম পয়েন্ট।

—দ্বিতীয় পয়েন্ট?

গোয়েন্দাপ্রবর চাপা স্বরে বললেন—ক্যাপটেন সিংহ আমার মক্কেল। কিন্তু তিনি আমারে কিছু কথা নিশ্চয় গোপন করছেন। আমার মনে হয় কী জানেন কর্নেল স্যার? কমু?

—নিশ্চয়। কী মনে হয়, তা খুলে বলুন।

—অজয়েন্দু রায় ক্যাপটেন সিংহেরে প্যাকেটখানা রাখতে দেন নাই। সিংহসায়েবই অজয়েন্দুবাবুর থেক্যা ওটা চুরি করছিলেন। জাহাজডুবির সময় অজয়েন্দুবাবুরে উনিই সম্ভবত আরব সমুন্দুরে ধাক্কা মাইর‍্যা ফেলছিলেন।

কর্নেল হাসলেন।—তারপর অজয়েন্দু রায় কোনও ভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং ক্যাপটেন সিংহ তাঁকে জিনিসটা ফেরত দেননি বা দিতে পারেননি। কারণ প্যাকেটটা চুরি গিয়েছিল—

কর্নেলের কথার ওপর আমি বললাম—সময়ের কথা ভুলে যাচ্ছেন। জাহাজডুবি হয়েছিল দশবছর আগে। আর ক্যাপটেন সিংহের ঘর থেকে প্যাকেটটা শম্ভুনাথ হাতায় দু-বছর আগে। বেঁচে থাকলে অজয়েন্দুবাবু প্যাকেটটা এতবছর ধরে দাবি করতে আসেননি কেন?

হালদারমশাই বললেন—ক্যাপটেন সিংহ আমারে কিছু কথা গোপন করছেন।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আপনার অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হল, এতদিন পরে ক্যাপটেন সিংহের গতিবিধির উপর যে নজর রেখেছে, সে কি অজয়েন্দুবাবুর চর? অজয়েন্দুবাবু কি বেঁচে গিয়েছিলেন এবং কোনও কারণে দশবছর চুপচাপ ছিলেন? কী সেই কারণ?

আমি বললাম—কিন্তু তিনি চর লাগিয়েছেন কেন? সরাসরি নিজে ক্যাপটেন সিংহের সামনে যাচ্ছেন না কেন?

হালদারমশাই বললেন—কর্নেলস্যার! এইজন্যই কইছিলাম হেভি মিস্ট্রি। আমার মক্কেল আমারে কথা গোপন করলে আমি তারে ক্যানসেল কইর‍্যা দিমু।

কর্নেল বললেন—না হালদারমশাই! আপনার কেসে আমারও ইনটারেস্ট আছে। কেন আছে তা পরে বলব। আপাতত ক্যাপটেন সিংহের কাছে আপনার জানা দরকার, কে তাঁকে ফলো করে। আপনি ওঁকে রাস্তায় হেটে যে কৌশলে হোক, লোকটাকে দেখিয়ে দিতে বলবেন। সাবধান! উনি যেন পিছু ফিরে ইশারায় না দেখান। শুধু মুখের কথায় লোকটার বর্ণনা দেন। হালদারমশাই! চিয়ার

আপ! আপনি চৌত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করেছেন। অবসরের সময় আপনি ছিলেন ডিটেকটিভ ইন্‌স্পেকটার। আপনাকে বেশি কথা বলতে চাই না। তবে প্লিজ, হঠকারিতা করবেন না!

উত্তেজনায় গোয়েন্দাপ্রবরের গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি বললেন—না, না কর্নেলস্যার। লোকটা ক্যাপটেন সিংহরে ফলো করে। এবার আমি অরে ফলো করুম।

বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'যাই গিয়া' বলে সবেগে প্রস্থান করলেন।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঝে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু পরে টেলিফোন বাজল। অমনই কর্নেল চোখ খুলে সিধে হয়ে হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। তারপর রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—বলছি।—...মি. হাটি! মর্নিং! বলুন।...হ্যাঁ। কাজি গোলাম হোসেন থাকেন। আমি সকালেই গিয়েছিলাম ওখানে!...কাজিসাহেবকে না পাওয়ারই কথা।...কেন একথা বলছি? মি. হাটি, লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে বলুন, সাদা পোশাকে কাজিসাহেবের ডেরার কাছে যেন সারাক্ষণ অন্তত দুজন সশস্ত্র লোক মোতায়েন থাকে।...হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওই কাজিসাহেবই পাজি জাহাজিবাবু।..হ্যাঁ। শিয়োর। আর একটা কথা। আপনি লালবাজারকে বলুন, কড়েয়া থানা থেকেও যেন কাজিসায়েবের দিকে নজর রাখা হয়।..হ্যাঁ। ওটা কড়েয়া থানা এলাকায় পড়ে।...ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।...

রিসিভার রেখে কর্নেল আবার ধ্যানস্থ হলেন। বললাম—তাহলে আমরা চলে আসবার পরই লালবাজার থেকে অফিসার গিয়েছিলেন?

—হুঁ।

—জাহাজিবাবু মহা ধূর্ত। ও এখন কিছুদিন গা ঢাকা দেবে। পাড়ায় নিশ্চয় ওর পোষ্য গুণ্ডা-মস্তান আছে!

—হুঁ।

—অজয়েন্দুবাবুর ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, অর্থাৎ উনি যদি বেঁচে থাকেন, তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন? উনি বেঁচে না থাকলে অন্য কেউ কি পার্চমেন্টটার কথা জানত? সে-ই কি ক্যাপটেন সিংহের ওপর নজর রেখেছে, যাতে উনি জিনিসটা কাকেও বেচলে সে জানতে পারবে?

—হুঁ।

এবার আমার জ্ঞানবুদ্ধির ফিরে এল। কর্নেলের এই 'হুঁ' মানে উনি আমার কথা শুনছেন না। এই হুঁ-র সঙ্গে আমি দীর্ঘকাল পরিচিত। তাই চুপ করে গেলাম। খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল হঠাৎ চোখ খুলে সিধে হয়ে টেবিলের ড্রয়ার টানলেন। একটা নোটবই বের করে পাতা ওলটাতে থাকলেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে ইংরেজিতে বললেন—ইন্ডিয়ান শিপিং কর্পোরেশন?...আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মি. অসীম সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই।...আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইয়া! কলোনেল!

প্রায় তিন মিনিট পরে সাড়া এল, তা বুঝলাম। কর্নেল বললেন—মি. সোম!...হ্যাঁ, সেই সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধই বটে! আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী।...ধন্যবাদ। তবে বিষয়টা একটু জটিল। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মতো। আপনি নোট করে নিলে ভালো হয়।...দশবছর আগেকার ঘটনা। জাহাজের নাম জানি না। তবে দেশি জাহাজ। কাজেই আপনাদের কাছে পুরোনো রেকর্ডে খোঁজ মিলতে পারে। পোর্ট সইদ থেকে জাহাজটা আসছিল বোম্বে। মিশরের উৎকৃষ্ট তুলো বোঝাই ছিল।...হ্যাঁ। জাহাজটার তলায় কী ভাবে ফাটল ধরে আরব সাগরে ডুবে গিয়েছিল। সেই জাহাজের ক্যাপটেনের নাম ছিল এস এন সিংহ। সৌমেন্দ্রনাথ সিংহ। এটাই জাহাজটা শনাক্ত করার একটা পয়েন্ট।...ও কে! সেই জাহাজে একজন অফিসার ছিলেন অজয়েন্দু রায়। তিনি নাকি বোম্বে থেকে উদ্ধারকারী জাহাজ সেখানে পৌঁছুনোর আগেই সমুদ্রে তলিয়ে যান।...না। লাইফ জ্যাকেট পরার

সুযোগ পেয়েছিলেন কিনা জানি না। মোট কথা তিনি নাকি নিখোঁজ হয়ে যান।...ক্যাপটেন সিংহ এখন অবসরপ্রাপ্ত। আমার বয়সি বৃদ্ধ। তাঁকে আমি চিনি। তাঁর কাছেই এই ঘটনা শুনেছি।...হ্যাঁ। তিনিই বলেছেন, অজয়েন্দু রায় আরব সাগরে ডুবে মারা পড়েন। কিন্তু আমার জানার বিষয় শুধু একটা। মাত্র একটা।...হ্যাঁ অজয়েন্দু রায় সম্পর্কে আপনাদের পুরোনো রেকর্ডে কোনও তথ্য আছে কিনা। থাকলে কী সেই তথ্য?...তা সময় লাগুক। প্লিজ মি. সোম! এটা খুব জরুরি।...হ্যাঁ। একটা কেস আমার হাতে এসেছে বইকি। যথাসময়ে আপনাকে জানাব।...ধন্যবাদ মি. সোম। অসংখ্য ধন্যবাদ।...

রিসিভার রেখে কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট লাইটার জ্বেলে ধরালেন। বললাম—বাঃ! এই একটা কাজের কাজ করলেন। কিন্তু জাহাজিবাবু শম্ভুনাথ চৌধুরির নামটা ওঁকে দিলেন না কেন?

কর্নেল ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—জয়ন্ত! কান টানলে মাথাও আসে।...

লাঞ্চের পর সবে অভ্যাসমতো ডিভানে একটু ভাতঘুম দিতে শুয়েছি, হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিলাম, কর্নেলের ডাকে উঠে বসতে হল। উনি সহাস্যে বললেন—মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসো। সাড়ে তিনটে বাজে। বিকেল চারটেতে ড. রথীশ মুখার্জির সঙ্গে দেখা করার কথা। উনি থাকেন ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে। শিগগির রেডি হয়ে নাও।...

ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেসে একটা পাঁচিলঘেরা বাড়ির গেটের সামনে কর্নেল নামলেন। দেখলাম, তাঁকে সেলাম ঠুকে দারোয়ান গেট খুলে দিল। লন দিয়ে এগিয়ে কর্নেলের নির্দেশে একপাশে গাড়ি দাঁড় করালাম। দোতলার বারান্দা থেকে এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ, মাথায় কর্নেলের মতো টাক, দাড়ি নেই, কিন্তু একটুখানি গোঁফ আছে, পরনে পাঞ্জাবির ওপর শাল জড়ানো, সহাস্যে বললেন—আসুন! আসুন কর্নেলসায়েব!

নিচে একটি মধ্যবয়সি লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে নমস্কার করে কর্নেল ও আমাকে নিচের ঘরে নিয়ে গেল। বসার ঘর। কিন্তু চারদিকে শিলিং অবধি র‍্যাকে বই ঠাসা। বসার ঘর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে কর্নেলের হাত ধরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক টানতে টানতে একটা ঘরে ঢোকালেন। এ ঘরটাও বইয়ে ঠাসা। এক প্রান্তে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছনে জানালা। বিকেলের এক চিলতে রোদ এসে টেবিলে পড়েছে। বই ছাড়া ঘরে এখানে-ওখানে টুলের ওপর নানারকম মূর্তি চোখে পড়ল।

কর্নেল আমার সঙ্গে ড. মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিলেন। ড. মুখার্জি সেই লোকটাকে শিগগির কফি আনতে বললেন। আমরা তাঁর মুখোমুখি বসলাম।

ড. মুখার্জি মুচকি হেসে বললেন—আপনাকে দেখলেই রহস্যের গন্ধ পাই। এখনও পাচ্ছি!

কর্নেল হাসলেন।—এবারও লিপিরহস্য!

—কী লিপি?

—পার্চেমেন্টে লেখা কিউনিফর্ম লিপি।

ড. মুখার্জি সকৌতুকে চাপা স্বরে বললেন—গুপ্তধন? আমি বলি গুপ্তধন ইজ লুপ্তধন! দেখি আপনার পার্চমেন্ট।

কর্নেল বললেন—সমস্যা হল, মূল পার্চমেন্টটা হাতে পাইনি। ফোটোকপি এনেছি। বলে তিনি জ্যাকেটের ভিতর পকেট থেকে পার্চমেন্ট স্ক্রোলের মতো গুটিয়ে রাখা একটা একই সাইজের ফোটো বের করে ওঁর হাতে দিলেন।

ড. মুখার্জি ব্যগ্রভাবে ফোটোকপিটা সোজা করে টেবিলল্যাম্পের আলোয় চারটে কাচের পেপারওয়েট চারকোণে চাপা দিলেন। তারপর প্রকাণ্ড আতশ কাচ দিয়ে কিছুক্ষণ লিপিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে ড. মুখার্জিকে লক্ষ্য করছিলেন। একটু পরে বললেন—পাঠোদ্ধার সম্ভব কি?

ড. মুখার্জি বললেন—ওপরে বামকোণে এই রেখাগুলো কারুকার্য নয়। আরবি লিপিতে লেখা আছে : 'আল-কাহিরো কাজিনাত্ আত্-তুহাত্।' তার মানে, কায়রো মিউজিয়াম। আল-কাহিরোকে আমরা বলি কায়রো।

—তাহলে এটা কায়রো জাদুঘরের পার্চমেন্ট? কিন্তু লিপি তো কিউনিফর্ম! মিশরে এ লিপি তো প্রচলিত ছিল না বলেই জানি। আপনি অবশ্য আমার চেয়ে আরও বেশি জানেন।

এই সময় সেই লোকটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে এল। টেবিলে ট্রে একপাশে রেখে সে চলে গেল। ড. মুখার্জি বললেন—আপনারা কফি খান। আমি একটু আগে খেয়েছি। এক মিনিট! বলে তিনি পাশের র‍্যাক থেকে একটা প্রকাণ্ড বই দুহাতে টেনে আনলেন। তারপর সেটার সূচিপত্র দেখে একটা পাতা বের করলেন। কয়েকটা পাতা উলটে তিনি হাসলেন।— পেয়েছি এটা হিটাইট লিপি। বর্তমান তুরস্কের 'বোগাজ কই' নামে একটা পাহাড়ি জনপদে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে উনিশ শতকে পাপিরাসে লেখা একটা চিঠি উদ্ধার করা হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে হিটাইট অর্থাৎ হাত্তির রাজা সুপ্পিলুলিউমাসকে মিশরের কিশোর রাজা তুত-আংক-আমন অর্থাৎ তুতানখামেনের অকালমৃত্যুর পর তাঁর বিধবা বালিকাবধূ নেকারতিতি এই চিঠিতে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি পুনর্বিবাহ করতে চান। কিন্তু মিশরে তাঁর অনেক শত্রু আছে। তাই তিনি হাত্তিদেশের একজন বর চান। কিন্তু কর্নেলসায়েব! প্যাপিরাসে লেখা সেই চিঠির এটা একটা নকল কপি। মূল প্যাপিরাসে লেখা চিঠিটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ প্রত্নবিদ উইলিয়াম রাইট পার্চমেন্টে এই কপি করেন।...

সাত

হিটাইট বা হাত্তিদেশের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে ড. মুখার্জির বক্তৃতা আমার ক্রমশ মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিল। লক্ষ্য করছিলাম, কর্নেলও উশখুশ করছেন। পণ্ডিতদের পাল্লায় পড়লে এই দুরবস্থা থেকে রেহাই নেই। সন্ধ্যা সাতটা বাজতে চলেছে। কর্নেলের ইশারায় আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম—স্যার! আমাকে কাগজের অফিসে ফিরতে হবে। আমি কর্নেলকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাব ভেবেছিলাম। তো জ্ঞানার্জনের লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

ড. মুখার্জি বললেন—তা এতক্ষণ বলবেন তো? কর্নেলসায়েব আর একদিন আসুন। মিশরের বিধবা রাজবধূ নেকারতিতির সঙ্গে কোনও হিটাইট রাজপুত্রের সত্যি বিয়ে হয়েছিল কিনা, তার প্রমাণ মেলেনি। যাই হোক, কর্নেলসায়েব! এটা নকল কপি হলেও পার্চমেন্টটা কায়রো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। সেই নকলের দামও কম নয়। মার্কিন ধনীরা লক্ষ ডলারে হাতাতে চাইবে। আপনি এটার মূল কপি কোথাও কি দেখেছেন?

কর্নেল কথা না বাড়িয়ে বললেন—না। একটা বিদেশি পত্রিকায় ছবি দেখে কৌতূহল হয়েছিল।...

গড়িয়াহাট রোডে বাঁক নিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর কর্নেল চাপা স্বরে বললেন—জয়ন্ত! একটা লাল মারুতি আমাদের ফলো করছে। গাড়িটা ড. মুখার্জির গেটের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। লক্ষ্য রেখে চলো।

একটু পরে ব্যাকভিউ মিররে দেখলাম গাড়িটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। কর্নেল বললেন—ডানদিকের গলিরাস্তায় আচমকা মোড় নাও। তারপর আমি গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারব মারুতিটাকে।

কর্নেলের নির্দেশে অলিগলি ঘুরতে ঘুরতে একসময় চেনা রাস্তা ব্রড স্ট্রিটে পৌঁছুলাম। কর্নেল বললেন—এটা সুলক্ষণ। কেউ নিজে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে, সে আমাদের এই কেসে খুব জড়িয়ে আছে। কিন্তু এবার আমাদের সাবধানে এগোতে হবে। আমরা সত্যিই বিষধর সাপের ল্যাজে পা দিয়েছি।

বললাম—হ্যাঁ। লক্ষ ডলার দামের জিনিস হাতিয়েছেন। জাহাজিবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন—ব্রোঞ্জের চাকতিটা মিশরের বিধবা কিশোরী নেকারতিতির। আবার চিঠিটাও সেই রাজবধূ নেকারতিতির। দুটোই আসলের কপি। পোর্ট সইদ বন্দরও মিশরের। ক্যাপটেন সিংহের জাহাজ ওই বন্দর থেকে তুলো বোঝাই করেছিল। এ থেকে একটা স্পষ্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে। দুটো জিনিসই কায়রো জাদুঘর থেকে কেউ চুরি করেছিল। এবার প্রশ্ন হল, ক্যাপটেন সিংহ আর অজয়েন্দু রায় এই দুজনেরই কেউ চোর। অথবা তাঁদের কেউ অন্য কোনও চোরের কাছে দাম দিয়ে দুটো জিনিস কিনেছিলেন। বেশি দামে কারও কাছে বিক্রি করাই উদ্দেশ্য ছিল। তারপর জাহাজিবাবু ওটা ক্যাপটেন সিংহের ঘর থেকে চুরি করে দোমোহানির কাছে কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল।

—প্রায় একবছর ওটা পুঁতে রাখার কারণ কী হতে পারে?

কর্নেল একটু পরে বললেন—হয়তো জাহাজিবাবু উপযুক্ত খদ্দের খুঁজছিল। পাচ্ছিল না।

—ঠিক বলেছেন। এতদিনে খদ্দের পাওয়ায় সে পার্চমেন্টটা তুলে আনতে তার বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়েছিল। তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু কর্নেল, জাহাজিবাবু নিজে ওটা আনতে যায়নি কেন?

—চন্দ্রপুরে নিশ্চয় তার কোনও শত্রু আছে, যে ব্যাপারটা জানে এবং জাহাজিবাবুর ওপর নজর রেখেছিল। তাই সে ঝুঁকি নেয়নি। তবে সেটা জানতে হলে সাবধানে পা বাড়াতে হবে, জয়ন্ত! ধৈর্য ধরো।

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ষষ্ঠীচরণের তৈরি কফি খাওয়ার পর কর্নেল জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন—জয়ন্ত! লাল মারুতিটা আমার বাড়ির গেটের সামনে দিয়ে গলির ভিতর উধাও হয়ে গেল। গাড়িটা গেটের ওদিকে বড়ো রাস্তায় হয়তো দাঁড়িয়ে ছিল। তবে আমরা গাড়িটার অনেক আগে এসে গেছি।

একটু ভয় পেলাম!—গাড়ি থেকে কি কেউ আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়ত?

কর্নেল হাসলেন।—হয়তো ছুঁড়ত। তবে আমাদের মেরে ফেলবার জন্য নয়। ভয় পাইয়ে দেবার জন্য। আর রাত্রেও তুমি আমার এখনে থেকে যাও। ই এম বাইপাসে গাড়িটা তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে।

বললাম—ওই রাস্তায় আমি কাগজের অফিস থেকে প্রতি রাত্রে বাড়ি ফিরি। পুলিশ পেট্রলের লোকজন ছাড়াও পুলিশ সার্জেন্টরা আমার পরিচিত। তাদের বললে আমার গাড়ির সঙ্গে আমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত যাবে। অপরাধ সংক্রান্ত স্পেশাল করেসপন্ডেন্টকে তারা খাতির করে।

এই সময় ডোরবেল বাজল। তারপর ষষ্ঠী গিয়ে দরজা খুলতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার তেমনি সবেগে প্রবেশ করলেন এবং সোফায় বসে একটিপ নস্যি নিলেন।

কর্নেল বললেন—কিছু খবর এনেছেন আশা করি।

—আনছি। একটুখানি রেস্ট লই, তারপর কইতাছি।

দেখে মনে হচ্ছিল গোয়েন্দাপ্রবর কারও সঙ্গে হাতহাতি করে এসেছেন। কারণ ডানহাতের তর্জনীতে একটুকরো ব্যান্ডেজ দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু পরে তিনি যেন ধাতস্থ হলেন। তারপর বললেন— আপনার কথামতো সকালে আমার মক্কেলের বাড়ি গিছলাম। তাঁরে কইছিলাম, বিকাল চারটায় তিনি য্যান বাড়ি থেইক্যা বারাইয়া দেশপ্রিয় পার্কের দিকে চলেন। আমি আপনার জইন্য ওয়েট করুম। আপনারে একখান ঠিকানা জিগাইমু। আপনি সেই সুযোগে লোকটার চেহারা আর পোশাকের ডেসক্রিপশান দেবেন। তো সেইমতো আমি লোকটার দেখলাম। পরনে প্যান্ট আর সোয়েটার ছিল। মাথায় একখান মাফলার জড়ানো ছিল। মুখে খোঁচা-খোঁচা গোঁফদাড়ি। কাঁধে

কাপড়ের ব্যাগ ঝুলতাছে। কাজেই তারে চেনার অসুবিধা হয় নাই। সে খাড়াইয়া সিগারেট টানছিল। ক্যাপটেন সিংহ হাঁটলেন। সেও হাঁটল।

হালদারমশাই একটু চুপ করে থাকার পর আবার বললেন— দেশপ্রিয় পার্কে ক্যাপটেন সিংহ কিছুক্ষণ বইয়া ছিলেন। দেখলাম, লোকটাও একটু তফাতে খাড়াইয়া আছে। তারপর ক্যাপ্টেন সিংহ বাড়ি ফিরলেন। তখন পাঁচটা বাজে। সবখানে আলো জ্বলছে। লোকটা ক্যাপটেন সিংহের বাড়ি পর্যন্ত ফলো কইর‍্যা আবার দেশপ্রিয় পার্কের দিকে হাঁটা দিল। তখন অরে ফলো করলাম। সে একখান বাসে চাপল। আমিও চাপলাম। শরৎ বোস রোডে একখানে সে নামল। আমিও নামলাম। তারপর সে বাঁদিকে গলিতে ঢুকল। একটু পরে আরও ছোট্ট গলি। তারপর একটা বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। তত আলো ছিল না। যে তারে দরজা খুইল্যা দিল, সেই লোকটারে দেখি নাই। তবে বাড়িটা পুরানো। দোতলা। দরজা-জানালা বন্ধ।

তিনি আবার চুপ করলে বললাম—তা আপনার আঙুল কাটল কিসে?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ করুণ হাসলেন।—একটু তফাতে পানের দোকানে গিয়া জিগাইলাম, ওই বাড়িতে কে থাকে চেনো? পানওয়ালা কইল, ক্যান? কিনবেন নাকি? হরিবাবু বাড়ি বেচবেন শুনছি। হরিবাবুর পুরা নাম সে জানে না। তারপর আমি কয়েক পা আউগ্‌গাইয়া আবার বাড়িটার কাছে গেছি, অমনি আমার কে ঝাঁপ দিল। আমি চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। আচমকা এমন অ্যাটাকের জইন্য সবসময় রেডি থাকি। ছিলাম।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে টানতে কথা শুনছিলেন। আমি বললাম—তার হাতে ছোরা ছিল নাকি?

হালদারমশাই বললেন—হঃ। ঝাঁপ দেওনের সাথে সাথে অর পায়ে হেভি কিক মারছিলাম। ড্যাগারের ডগা আমার এই আঙুলে লাগল। সেকেন্ড কিক অর পেটে মারলাম। তারপর আমার ফায়ার আর্মস তাক করলাম। হাত উঠাও। আমি পুলিশ।

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন। বললাম—লোকের ভিড় হয়েছিল নিশ্চয়?

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—এটাই আশ্চর্য! কেউ বারায় নাই। লোকটা ড্রেনে পড়ছিল। আমি দেখলাম, আমারই ভ্যানিশ হওনের দরকার। অগো ফায়ার আর্মস থাকতেই পারে। বড়ো রাস্তায় ওষুধের দোকানে আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধলাম। তারপর ট্যাক্সি লইয়া কর্নেলস্যারের বাড়ি আইলাম। রাস্তায় বড্ড জ্যাম। কই ষষ্ঠীচরণ? এবারে কফি লইয়া আহো।

ষষ্ঠী ভিতরের ঘরের পর্দার ফাঁকে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল। আমি লক্ষ্য করিনি। দেখলাম, সে হাসিমুখে অদৃশ্য হল। 'টিকটিকি'বাবুর দিকে সে সবসময় কেমন চোখে তাকিয়ে থাকে। হালদারমশাই চলে গেলে সে হেসে অস্থির হয়। বলে, এমন মজার মানুষ দেখা যায় না। উনি পুলিশের অফিসার ছিলেন, তা ভাবতে গেলেই অবাক লাগে।

ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল চোখ খুলে বললেন—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে হালদারমশাই! বাড়িটা চিনেই আপনার চুপচাপ চলে আসা উচিত ছিল। ওরা এবার সতর্ক হয়ে উঠবে।

হালদারমশাই বললেন—কে জানে ক্যান এমন হইয়্যা গেল!

কর্নেল হাসলেন।—আসলে মাঝে মাঝে অ্যাকশনে নেমে ভুলে যান যে আপনি আর পুলিশ ইন্সপেকটার নন। একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা।

—হঃ ঠিক কইছেন।

আমি বললাম— চৌত্রিশ বছরের পুলিশজীবনের জের আর কী!

—হঃ! ওই জেরেই মাঝে মাঝে জেরবার হই। বলে হালদারমশাই প্রাণ খুলে খি খি করে হাসলেন।

কফি খাওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কর্নেলস্যার! এবার কন, আর কী করুম?

কর্নেল বললেন—এর পর আপনাকে ছদ্মবেশে ছাড়া ওখানে যাওয়ার উপায় দেখছি না। আপনি ছদ্মবেশ ধরতে পটু। সাধু-সন্ন্যাসী বা আধপাগলা ভবঘুরে—যেটা আপনার খুশি। শুধু এটুকু আপনার জানা দরকার, ওই বাড়িতে বসে কে ক্যাপটেন সিংহের পিছনে ওই গুন্ডা লোকটাকে লাগিয়ে রেখেছে। যদি তার নাম হরিবাবু হয়, তা হলে সেই হরিবাবুর চেহারাপোশাক ইত্যাদির বর্ণনা পেলে ভালো হয়। তাই বলে সঙ্গে আমার মতো ক্যামেরা নিয়ে যাবেন না যেন। আর একটা কথা। হরিবাবু গুন্ডা পোষে। তাই আপনার আরও সতর্ক হওয়া উচিত। হ্যাঁ—আজকের ঘটনায় বোঝা যাচ্ছে, আপনি যে ওকে ফলো করেছিলেন, তা গুন্ডাটা যেভাবে হোক, টের পেয়েছিল। এবার সে আর তার মালিক হরিবাবু দুজনেই খুব সতর্ক থাকবে।

—ঠিক! ঠিক কইছেন। বলে হালদারমশাই চলে গেলেন।...

পরদিন সকালে লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব-ইন্সপেকটার নরেশ ধর সাদা পোশাকে এসে হাজির। নরেশবাবু আমাদের দুজনেরই সুপরিচিত এবং কর্নেলকে অনেক কেসে সাহায্য করেছেন। নমস্কার করে উনি সোফায় বসলেন। তারপর চাপা হেসে বললেন—রাজেনদা আমাকে ঠকিয়েছিলেন। শেষে ধরে ফেললাম আমি।

কর্নেল বললেন—তা আপনাকে দেখেই বুঝেছি। চন্দ্রপুরের ও সি রাজেন হাটি আমাকে বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তবে আমি ওঁর একটা কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, আপনি কেমন করে ধরলেন?

—কর্নেলসায়েব! থিয়েটার রোডের যে এলাকায় আপনারা দুজনে গিয়েছিলেন, সেখানে আমাদের একজন সোর্স আছে। তার কাছে শুনেছি, একজন সায়েব আর একজন বাঙালি ভদ্রলোক কাজিসাহেবের ডেরায় গিয়েছিলেন। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝে ফেলেছিলাম, কারা গেছেন। তারপর রাজেনদা আজ সকালে ফের ফোন করেছিলেন। তখন ওঁকে চেপে ধরলাম। ব্যাস!

কর্নেল হাঁক দিলেন।—ষষ্ঠী! তোর নালবাজারের বাবুমশাইকে কফি খাইয়ে দে। আজ শীতটা টের পাচ্ছি যেন।

বললাম—নরেশবাবু! কাজিসাহেবের খবর কী তা-ই বলুন।

নরেশবাবু একটু হেসে বললেন—ওখানকার সোর্স আমাদের অনেক আগে বলেছিল, তার সন্দেহ হচ্ছে, ভদ্রলোক মুসলমান নন। সোর্স নিজে মুসলমান। তার মতে, মুসলমানদের কতকগুলো আদব-কায়দা ভাবভঙ্গি আছে। ওই ভদ্রলোকের মধ্যে তেমন কিছু নেই। তাই লোকটা সম্পর্কে পুলিশের খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হল, কোনও ঘটনা না ঘটলে নিছক একজন সোর্সের কথায় ভদ্রলোকের পিছনে লাগার ঝুঁকি আছে। সোর্স ভুল করতেই পারে। অনেকসময় ভুল করেও বটে। তাই আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। খামোখা কাকেও জেরা করার সময় পুলিশের নেই। একটা কেস চাই। কেস ছিল না। এতদিনে কেস পেলাম।

ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন—কফি খান নরেশবাবু। কফি খেতে খেতে বলুন কাজিসাহেব কি ডানা মেলেছেন?

নরেশবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—কর্নেলসায়েব! আজ আপনি না গিয়ে যদি আগে আমাদের একটু সুযোগ দিতেন! সেই দুঃখটা জানাতেই এসেছি!

—তার মানে, আমাকে দেখার পরই কাজিসাহেব ডেরা থেকে পালিয়েছে?

—তা-ই আমার ধারণা।

—কিন্তু সে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার জ্যাকেটের পিঠে একটা আঠামাখানো চিরকুট সেঁটে দিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, দ্বিতীয়বার এলেই মারা পড়ব। আমার মনে হয়েছিল, আমাকে সে ইচ্ছে করেই নিজের পরিচয় দিয়ে গেছে। এটা একটা চ্যালেঞ্জ!

—স্যার! চন্দ্রপুরের শম্ভুনাথ চৌধুরি একসময় জাহাজে চাকরি করত। আমাদের রেকর্ডে দেখলাম, সে খিদিরপুর ডক এরিয়ার চোরাচালানি একটা দলের নেতা। তারপর রাজেনদা বললেন, চন্দ্রপুরে তার বাড়ি। সেখান থেকে সে বর্ডারে চোরাচালানি কারবার করে। কিন্তু তাকে এ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে ধরা যায়নি। তাছাড়া সে বছরে গড়ে একবার মাত্র চন্দ্রপুরে যায়। নরেশবাবু ঘড়ি দেখে আবার বললেন—শম্ভু চৌধুরির আগেকার ডেরা ছিল খিদিরপুর এলাকায়। লোকটা ছদ্মবেশ ধরতে পারে। ওখান থেকে তাড়া খেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। পুলিশ তাকে খুঁজে বের করতে পারেনি। এদিকে সে কাজিসায়েব সেজে থিয়েটার রোডের একটা গলিতে নতুন ডেরায় বসে দিব্যি কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। আবার সে অন্য কোনও ডেরায় গিয়ে জুটেছে।

—ওর ঘর সার্চ করেছেন?

—হ্যাঁ। চন্দ্রপুরে একটা খুন করে এসেই সে সম্ভবত আপনার ভয়ে, রাতারাতি ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলেছিল। আমরা কিছু আসবাবপত্র দেখলাম। সবই ভাড়ার আসবাব। এক চিলতে চিহ্ন রেখে যায়নি লোকটা।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—আপনাদের ডি সি সায়েবকে এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছেন?

নরেশবাবু হাসলেন—নাঃ স্যার! আপনার স্নেহধন্য লাহিড়িসায়েবকে জানাবার মতো কেস এটা নয়। তা ছাড়া আপনি যখন এই কেসে জড়িয়ে গেছেন, জানাতে হলে আপনিই জানাবেন।

—এখনও অরিজিৎকে জানাবার সময় হয়নি নরেশবাবু! আপনারা উড়োপাখির ডেরা খুঁজে বের করুন। পুলিশ যা পারে, তা কি আমি পারি?

—কর্নেলসায়েব! আপনি যা পারেন, তা কিন্তু পুলিশ পারে না। আপনি প্রকৃতিবিজ্ঞানী। পাখি প্রজাপতি অর্কিড ক্যাকটাসের খোঁজে আপনি কোথায়-কোথায় ঘোরেন। আপনার বাইনোকুলার আপনাকেই মানায়। পুলিশ কি বাইনোকুলারে আপনার পাখি খোঁজার মতো খুঁজলেই অপরাধীকে পেয়ে যাবে?

সরকারি গোয়েন্দা নরেশ ধর রসিক মানুষ। হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। কর্নেল বললেন—স্বীকার করছি নরেশবাবু! লোকটা অত ধূর্ত, তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি আজ সকালে না গেলে হয়তো জাহাজিবাবু আপনাদের হাতে ধরা পড়ত।

—না স্যার! ওটা কথার কথা হিসেবে বলেছি। জিনিসপত্র সে সরাবে বলে রেডি করেই রেখেছিল। আপনারা চলে আসবার পরই ম্যাটাডোরে সব চাপিয়ে সে চলে গেছে। আমাদের সোর্স ওই সময় পাড়ায় ছিল না। আচ্ছা, চলি।

নরেশবাবু পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে ফের বললেন—আপনার হালদারমশাইয়ের খবর কী?

কর্নেল হাসলেন।—তিনি একখান জব্বর ক্যাস পাইছেন।

নরেশবাবু আরও এক চোট হেসে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—সাড়ে নটা বাজে। আমরা সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব। রাস্তায় পেট্রলপাম্প আছে। ফুয়েল ভরে নেব। জয়ন্ত! ঝটপট রেডি হয়ে নাও। আমিও রেডি হচ্ছি!

অবাক হয়ে বললাম—কোথায় যাবেন?

—তিতলিপুর!

—সর্বনাশ! আবার সেই সাংঘাতিক জায়গায়? হঠাৎ এ খেয়াল কেন বলুন তো?

—খেয়াল নয়, ডার্লিং! আমার মাথায় একটা থিয়োরি এসে গেছে। আজই তা যাচাই করা দরকার।

কর্নেলের এই খেয়ালি স্বভাবের সঙ্গে আমি পরিচিত। তবে আমিও তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। তাই দ্রুত পোশাক বদলে এবং জ্যাকেটের ভিতরে আমার পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের

রিভলভার রেখে কর্নেলকে অনুসরণ করলাম। কর্নেলের সেই একই বেশভূষা। পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা।

হাইওয়েতে জায়গায়-জায়গায় জ্যাম ছিল। তিতলিপুর পৌঁছুতে এগারোটা বেজে গিয়েছিল। দোমোহানির রাস্তায় বাঁদিকে জঙ্গল রেখে একটু পরে সেই মোরাম-বিছানো পথে এগিয়ে দীপনারায়ণবাবুর বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। গ্রামের কিছু লোকজন থমকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। সদর দরজায় বাঁশের বাতার বেড়া আটকানো আছে। দোতলার বারান্দা থেকে সুনয়নী আমাদের দেখে নেমে এসেছিলেন।

তিনি আমাদের নমস্কার করে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বারান্দায় দুটো চেয়ার এনে দিল একটা লোক। সুনয়নী দেবী থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—আপনাকে দেখে সাহস পেলাম কর্নেলসায়েব।

কর্নেল বললেন—আমি শুধু একটা কথা জানতে এসেছি। জেনেই চলে যাব।

—বলুন!

—আচ্ছা, আপনাদের পূর্বপুরুষ জমিদার পরিবারের বড়ো তরফের বংশধর ছিলেন আপনার দাদা। আমি শুনেছি, ছোটো তরফের বংশধর নরেনবাবু। সেচ বাংলোতে সবাই বলে, নরুঠাকুর। তাহলে মেজো তরফের কোনও বংশধর নিশ্চয় আছে?

সুনয়নী শ্বাস ছেড়ে বললেন—হ্যাঁ। আছে। তবে তাকে খুব ছোটোবেলায় দেখেছি। সে কলকাতায় থাকত। জাহাজে বড়ো অফিসার ছিল, তা বড়দার কাছে শুনেছি। জাহাজিবাবু শম্ভুকে তো সে-ই জাহাজে চাকরি দিয়েছিল!

—তাঁর নাম কি অজয়েন্দু রায়?

আমাকে অবাক করে সুনয়নী দেবী বললেন—হ্যাঁ। অজয়েন্দু নারায়ণ রায়। আমার মেজদা।

আট

কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম। আন্দাজে ঢিল উনি ছোড়েন না। আমার অজ্ঞাতসারে নিশ্চয় ওঁর হাতে কোনও সূত্র এসে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তাহলে দেখছি রহস্যটা জমজমাট হয়ে উঠল।

কথাটা বলে সুনয়নী দেবীও অবাক হয়েছেন লক্ষ্য করলাম। তিনি মৃদুস্বরে বললেন—মেজদাকে আমি ছোটোবেলায় দেখেছিলাম, সে-কথা তো আপনাকে বলেছি। বড়দার কাছে অবশ্য তার অনেক কথা শুনেছি। মেজদার কথা আপনি জানতে চাইছেন। মেজদা কি—

কর্নেল ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—জাহাজে চাকরির কথা ছাড়া আর কী কথা শুনেছেন, আগে বলুন। তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব।

সুনয়নী দেবী মুখ নামিয়ে আস্তে বললেন—বড়দা বলতেন, মেজদা আমেরিকা থেকে এক মেমসায়েবকে বিয়ে করে এনেছিল। মেমবউয়ের সঙ্গে বনিবনা হয়নি। সে মেজদাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

—আর কিছু?

—আর একটা কথা শুনেছিলাম। সাংঘাতিক কথা। কথাটা বলা উচিত হবে কিনা জানি না।

সুনয়নী দেবী একটু কুণ্ঠার সঙ্গে কথাটা বললেন। তাই কর্নেল বললেন—আপনি আপনার বড়দার খুনিকে শাস্তি দিতে চান না?

—হ্যাঁ! নিশ্চয় চাই। তবে...

—তাহলে সব কথা খুলে বলুন। আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। আমি আপনার পাশে আছি।

একটু চুপ করে থাকার পর সুনয়নী বললেন—জাহাজ ডুবে মেজদা মারা গেছে বলে বড়দার কাছে খবর এসেছিল। বড়দা তখন কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এক রাত্রে মেজদা গোপনে বড়দার কাছে এসেছিল। তার কিছু জিনিসপত্তর রেখে গিয়েছিল। বড়দা পরে আমাকে বলেছিলেন, পুলিশ তাকে খুঁজছে। বড়দা রাগি লোক ছিলেন। বলেছিলেন, অজ আমাদের রায়বংশের কলঙ্ক। আর—

—হ্যাঁ। বলুন। আপনার ভয়ের কারণ নেই।

—আর জাহাজিবাবু, মানে চন্দ্রপুরের শম্ভু চৌধুরি যখনই গ্রামে আসত, তখনই বড়দার সঙ্গে প্রায়ই আড্ডা দিত। গতবছর এমনই শীতের এক রাত্রে বড়দার সঙ্গে জাহাজিবাবু চুপিচুপি মেজদা সম্পর্কে কী সব কথা বলছিল। আমি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারিনি।

—আপনি আপনার বড়দার কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চাননি?

—চেয়েছিলাম। কিন্তু বড়দা রেগে গিয়েছিলেন। আমাকে নাকগলাতে নিষেধ করেছিলেন।

—সেই কথাবার্তার মধ্যে এমন কি কিছু আপনি শুনেছিলেন, যা আপনার মনে পড়ে?

সুনয়নী দেবী আবার মুখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকলেন। একটু পরে বললেন—জাহাজিবাবু বড়দাকে বলছিল, অজুর লুকিয়ে রাখা জিনিসটার বড়দা যেন তাকে দেয়। তার বদলে জাহাজিবাবু বড়দাকে টাকা দেবে।

—হুঁ। আর কিছু?

সুনয়নী মাথা নাড়লেন।—আর তেমন কিছু মনে পড়ছে না। ওই যে বললাম, বড়দা খুব রাগি মানুষ ছিলেন। কিছু জানতে চাইলে খাপ্পা হয়ে বেরিয়ে যেতেন।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন—এবার আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই। আপনি দীপনারায়ণবাবুর লেখা যে পোস্টকার্ডটা আমাকে দেখিয়েছেন, ওতে আপনার মেজদা সম্পর্কে একটা লাইন আছে। 'অজু তোমার কাছে যেতে পারে। তাকে পাত্তা দেবে না।' এই 'অজু' কে, সেই নিয়ে ধাঁধায় পড়েছিলাম। আপনার কথা শুনে ধাঁধার জট খুলে গেল। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার চলি।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। সুনয়নী চাপা স্বরে বললেন—মেজদাকে কেন পুলিশ খুঁজছে, দয়া করে আমাকে বলে যান কর্নেলসায়েব!

উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বললেন—ঠিক সময়ে সব জানতে পারবেন। আর একটা কথা, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আমি চন্দ্রপুর থানায় বলে দেব। সাদা পোশাকে অন্তত দুজন পুলিশ আপনার বাড়িতে আপনাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় হিসেবে থাকবে।

—কেন একথা বলছেন?

—জাহাজিবাবু আর তার লোকেরা আপনার বড়দার ঘরে হামলা করতে পারে। কিন্তু না—আপনি একটুও ভয় পাবেন না।

এবার সুনয়নী শক্ত মুখে বললেন—কর্নেলসায়েব! আমি জীবনকে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছি। অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেছি। এখন আমি মরিয়া। তা ছাড়া তিতলিপুরের রায়বংশের রক্ত আমার শরীরে আছে। রায়বাঘিনি কথাটা জানেন তো?

কর্নেল হাসলেন।—জানি। তবু আপনি সাবধানে থাকবেন।...

কলকাতা ফেরার পথে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—তাহলে একটা পুরোনো পোস্টাকার্ড থেকে আপনি অজয়েন্দুবাবুর সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন?

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে বললেন—হুঁ।

—কর্নেল?

—বলো?

—সেই লাল মারুতিটা আমাদের ফলো করে আসেনি কিন্তু। এলে টের পেতাম।

কর্নেল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন—এসেছিল। কিন্তু খুব দূর থেকে ফলো করেছিল। এই বাইনোকুলারে যা দেখা যায়, তোমার চর্মচক্ষুতে তা দেখা যায় না।

—সর্বনাশ! এখনও কি গাড়িটা আমাদের ফলো করে আসছে?

—না। মন্দিরের কাছে হাইওয়েতে তোমার গাড়ি বাঁক নেওয়ার সময় গাড়িটা উলটোদিকে উধাও হয়ে গেছে। সম্ভবত চন্দ্রপুরে জাহাজিবাবুর কাছে গেছে।

—গাড়িটা তাহলে চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবুর?

—এ বিষয়ে আমি এখনও শিয়োর নই, জয়ন্ত।

—তাহলে যে বলছেন চন্দ্রপুরে জাহাজিবাবুর কাছে গেছে?

—আমি 'সম্ভবত' বলেছি। শিয়োর নই।...

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে পৌনে একটা বেজে গিয়েছিল। ষষ্ঠীচরণ মুচকি হেসে বলেছিল—একটু আগে টিকটিকিবাবু ফোন করেছিলেন। আবার ফোন করবেন বাবামশাইকে।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বলেছিলেন—আমাদের খিদে পেয়েছে।

—সব রেডি বাবামশাই!

কর্নেল শীতকালে সপ্তাহে মাত্র একদিন স্নান করেন। আজ তাঁর স্নানের দিন নয়। আমি গরমজলে স্নান করে শরীরটা ঝরঝরে তাজা করে নিলাম। দেড়টা নাগাদ খাওয়াদাওয়ার পর যথারীতি ডিভানে চিত হয়ে ভাতঘুমের জন্য প্রস্তুত হলাম। কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চরুট টানছিলেন।

কিন্তু টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে আমার ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল।

কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—বলুন হালদারমশাই!...কিন্তু আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন?...বাড়ি থেকে—তার মানে...আশ্চর্য! বলেন কী! সুশীলা...হ্যাঁ আপনার অনুমান তাহলে সত্যি? তারপর? ...হুঁ...হুঁ...হুঁ...ঠিক আছে। আপনি আপনার ক্লায়েন্ট ক্যাপটেন সিংহকে এখনই কথাটা জানাবেন না।...হ্যাঁ। আপনি এখনই আমার কাছে চলে আসুন।...আহা! চর্মচক্ষে দিনের বেলায় হরির দর্শন পেয়েছেন। আপনি ভাগ্যবান।...রাখছি। চলে আসুন!

কর্নেল রিসিভার রেখে আমার দিকে ঘুরলেন। বললাম—আমার ভাতঘুম আজ আর বরাতে নেই। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রবর সাংঘাতিক কিছু খবর আপনাকে জানিয়ে দিলেন মনে হচ্ছে। ঘুমের জন্য তাই আমার দুঃখু নেই। কিন্তু 'সুশীলা'-র ব্যাপারটা কী? ক্যাপটেন সিংহের পরিচারিকা—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ঘুম না আসে, চোখ বুজে ভেড়ার পালের ভেড়াগুলো গুনতে থাকো। আমি ততক্ষণ চুরুটের সুখ উপভোগ করি। নো মোর টক।...

কতক্ষণ পরে ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী!

তারপর সবেগে গোয়েন্দাপ্রবর কে কে হালদার ঘরে ঢুকলেন। দেখলাম, তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি। পরনে প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার। ছদ্মবেশ ছেড়ে স্নান করেছেন, তা-ও বোঝা যাচ্ছিল। সোফায় বসে আগে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন—কর্নেল স্যার কইছিলেন হরির দর্শন পাইছি। হঃ! তা পাইছি।

কর্নেল বললেন— এবং ক্যাপটেন সিংহের কাজের মেয়ে সুশীলারও?

—হঃ। ঠিক কইছেন!

—কার দর্শন কোথায় পেলেন?

—ফোনে কওন যায় না। এখন কইয়া ফেলি। আমি পাগলা সাজছিলাম। সেই গলির অন্যদিকে বটতলায় একখান মন্দির আছে। সেইখানে বইয়া ছিলাম। হঠাৎ দেখি, সুশীলা আইয়া হরিবাবুর

বাড়িতে ঢুকল। তারপর সেই লোকটা—যে ক্যাপটেন সিংহরে ফলো করে, সে বারাইল। কিছুক্ষণ পরে সে একখান ট্যাক্সি আনল। এইবার বাড়ি থেইক্যা যিনি বারাইলেন, তিনিই যে হরিবাবু তা বুঝলাম। ক্যান কী, গলিতে এক ভদ্রলোকে তারে নমস্কার কইরা কইল—এই যে হরিবাবু! কেমন আছেন? হরিবাবু ট্যাক্সিতে চাপল। তার লগে সুশীলাও চাপল। ট্যাক্সিখান যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক হরিবাবুর লোকেরে জিগাইলেন, তোমার বাবু বাড়ি বেচবেন শুনলাম? লোকটা কী একটা কইল, বুঝলাম না। সে বাড়ি ঢুকল। আমিও উঠলাম। ট্যাক্সির নাম্বার দেখছিলাম। পরে নোটবইয়ে টুকছি। কে কইল দেখি নাই—'পাগলা লেখাপড়া জানে!' আর একজন হাসতাছিল 'সেয়ানা পাগল!' এইসব শুইন্যা আমি কাট করলাম।

কর্নেল গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন—হরিবাবুর চেহারা কেমন?

—দেইখ্যা বুড়া মনে হইব। কিন্তু বুড়া না। তাগড়া শরীর। মাথায় সাদা চুল। গোঁফ আছে। গোঁফ কাঁচাপাকা। পরনে ধুতি, সার্জের খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। কাঁধে শাল ছিল। হাতে ছড়ি ছিল। আর একখানা ব্রিফকেস।

আমি বলে উঠলাম—তাহলে এই হরিবাবু কখনই চন্দ্রপুরের জাহাজিবাবু নয়।

হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরে কী বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে আমাকে বললেন—উঠে পড়ো জয়ন্ত! শুয়ে কথা বলে রোগীরা। উঠে বোসো।

তারপর তিনি হালদারমশাইকে বললেন—আপনি কি সুশীলার বাড়ির ঠিকানা জানেন?

হালদারমশাই সোয়েটারের গলার ভিতর হাত ঢুকিয়ে শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলেন। পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—ক্যাপটেন সিংহর লগে ঠিকানা লইছিলাম। উনি সুশীলারে বিশ্বাস করেন। কইছিলেন, মাইয়াটারে ওনার দেশের বাড়ি থেইক্যা আনছিলেন।

—ক্যাপটেন সিংহের তাহলে গ্রামে বাড়ি ছিল?

—হঃ।

—আপনি এ কথাটা আমাকে তো বলেননি!

গোয়েন্দাপ্রবর অবাক হয়ে বললেন—আপনি জিগান নাই। জিগাইলে কইতাম।

—ক্যাপটেন সিংহের দেশের বাড়ি কোথায়, তা কি জিজ্ঞেস করেছিলেন?

—না। আপনি যখন কইতাছেন, তখন এবার জিগাইমু।

—দেরি করা ঠিক হবে না হালদারমশাই। আপনি বরং এখান থেকে ফোনে ক্যাপটেন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওঁর ফোনে আড়ি পেতেছে কেউ, সে-কথা উনি আমাকে জানিয়েছেন। তাই না?

—হঃ।

—তাহলে ফোনে ওঁকে শুধু বলুন, আপনি ওঁর সঙ্গে জরুরি কাজে দেখা করতে যাচ্ছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর তখনই রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর বললেন—রিং হইতাছে। কেউ ধরতাছে না ক্যান? আমি যাইয়া দেখি বরং। মিসটিরিয়াস ব্যাপার।

বলে উনি যথারীতি সবেগে বেরিয়ে যাওযার পর কর্নেল জাপানি ওয়ালক্লকে সময় দেখে নিলেন। তারপর বললেন—শিপ কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মি. অসীম সোম এখনও সম্ভবত অজয়েন্দু রায়ের ব্যাপারে কোনও রেকর্ড খুঁজে পাননি। অথচ খুব শিগগির আমার ওটা দরকার।

বললাম—সুনয়নী দেবী বলছিলেন, ওঁর মেজদা পুলিশের ভয়ে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। এদিকে ক্যাপটেন সিংহ বলেছেন, জাহাজডুবির আগে উনি একটা গোপন জিনিস তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। ক্যাপটেন সিংহ রিটায়ার করার পর সেই গোপন জিনিসটা নাকি বিছানার তলায় রেখেছিলেন। তা ছাড়া সেই জিনিসটা যে কী, তা কি ক্যাপটেন সিংহের জানবার কৌতূহল হয়নি? জয়ন্ত! ক্যাপটেন সিংহের কথাটা বড্ড গোলমেলে।

একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম—কর্নেল! জিনিসটা জাহাজিবাবু চুরি করেছিলেন—এটা আপনারই সিদ্ধান্ত। তাহলে জিনিসটা একটা নলে রাখা পার্চমেন্ট! আপনি সেটা তিতলিপুরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছেন।

কর্নেল হাসলেন।—চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছি। কিন্তু ক্যাপটেন সিংহ যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হালদারমশাইকে জানাননি, এটাই আশ্চর্য!

—আমার মতে, যে-ভাবে হোক, ক্যাপটেন সিংহের সঙ্গে আপনার দেখা করা উচিত।

—দেখা যাক।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। আমার ভাতঘুম কেটে গেছে। আমি উঠে গিয়ে সোফায় বসলাম। শীতের দিনের আলো কমে এসেছে। একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর কফিতে চুমুক দিলেন। মুখে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য। তাই আমিও গম্ভীর হয়ে কফি খেতে থাকলাম।

কফিপানের পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম, সেই বিকট গাম্ভীর্যটা আর নেই। মুখে একটু হাসি ফুটেছে। বললেন—ডার্লিং! ভাতঘুম নষ্ট করেছি এবং একটু বকে দিয়েছি বলে এই বৃদ্ধের প্রতি তোমার ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক।

হেসে ফেললাম।—মোটেও না। আপনি তুম্বো মুখ করে থাকলে অস্বস্তি হয়।

—আমি ক্যাপটেন সিংহের পরিচারিকা সুশীলার ব্যাপারটা ভাবছিলাম। মেয়েটি জাহাজিবাবু শম্ভু চৌধুরির চর বলে হালদারমশাইয়ের অনুমান। অনুমানটা সম্ভবত ঠিকই। কিন্তু সেই মেয়ে আজ হরিবাবুর বাড়ি এসে ট্যাক্সি চেপে হরিবাবুর সঙ্গে কোথাও বেরিয়েছে। তাহলে হরিবাবুর সঙ্গে জাহাজিবাবুর সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। তাই না?

—অঙ্ক কষলে তা-ই দাঁড়াচ্ছে বটে! কিন্তু কে এই হরিবাবু?

—সঠিক প্রশ্ন।

—তার মানে, আমরা তিতলিপুরের জঙ্গলে পথ হারিয়ে হন্যে হচ্ছি!

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসিটি হাসলেন। তারপর বললেন—ঠিক বলেছ। তিতলিপুরের জঙ্গলে দুর্লভ প্রজাতির নীল সারসের চেয়ে আরও দুর্লভ কিছু আছে।

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—বলছি! বলুন নরেশবাবু!...ধন্যবাদ! চন্দ্রপুরের ও সি মি. রাজেন্দ্র হাটি বুদ্ধিমান!...হ্যাঁ। দীপনারায়ণবাবুর ঘরে নিশ্চয় কিছু সূত্র পাওয়া যেতেই পারে।..ঠিক আছে। রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে আবার আমার দিকে সহাস্যে তাকালেন। বললাম—সুনয়নী দেবীর বাড়িতে সাদা পুলিশের গার্ড রাখবার কথা বলেছিলেন। সেই ব্যাপারটা কি?

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু কখন লালবাজারের ডিটেকটিভ সাব-ইন্সপেকটার নরেশবাবুকে ফোন করেছিলেন?

—তুমি যখন বাথরুমে স্নান করছিলে!

—একটু আগে আপনি বললেন, তিতলিপুরের জঙ্গলে নাকি আরও দুর্লভ কিছু আছে। ব্যাপারটা কী?

কর্নেলের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে আবার বাধা পড়ল। ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী!

তারপর প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার আবার সবেগে প্রবেশ করে সোফায় সশব্দে বসলেন। বললেন—হেভি মিস্ট্রি কর্নেলস্যার!

কর্নেল বললেন—বলুন হালদারমশাই!

এবার হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে যা বললেন, তার সারমর্ম এই :

গোয়েন্দাপ্রবর ক্যাপটেন সিংহের বাড়ি গিয়ে দেখেন, তাঁর দোতলার ঘরের দরজা এবং কোলাপসিব্‌ল্ গেটে তালা আঁটা। একতলার মুদির দোকানের মালিক মিছরিলালকে তিনি ক্যাপটেন সিংহের কথা জিজ্ঞেস করেন। মিছরিলাল তাঁকে বলেছে, ক্যাপটেনসায়েবের হঠাৎ স্ট্রোক হয়েছিল। সুশীলা ট্যাক্সিতে একজন ডাক্তারবাবুকে ডেকে এনেছিল। সেই ট্যাক্সিতে অজ্ঞান অবস্থায় ক্যাপটেনসায়েবকে কোনো নার্সিং হোম কিংবা হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মিছরিলালকে সুশীলা ডেকেছিল। মিছরিলাল একা একশো। সে ক্যাপটেনসাহেবকে সিঁড়ি দিয়ে বয়ে এনে ট্যাক্সিতে ঢুকিয়েছিল। সুশীলা পিছনের সিটে ক্যাপটেনসায়েবকে ধরে বসে ছিল। সামনের সিটে বসেছিলেন ডাক্তারবাবু।

সবটা শোনার পর আমি বললাম—কিন্তু হেভি মিস্ট্রি বলছেন কেন হালদারমশাই?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন—বুঝলেন না? হরিবাবু তো ডাক্তার না। তারে ডাকতে অত দূর থেইক্যা সুশীলা আইবে ক্যান? ক্যাপটেন সিংহরে কিডন্যাপ করছে হরিবাবু।

দেখলাম, কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করে কাকে চাপাস্বরে কিছু বলছেন। হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—ট্যাক্সির নম্বর লইছি। পুলিশেরে কর্নেলস্যার নম্বরটা জানাবেন। তারে ধরলে মিস্ট্রি সল্‌ভ হওনের কথা।...

নয়

রিসিভার রেখে কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! পোশাক বদলে নাও। এখনই বেরুতে হবে। আমিও রেডি হয়ে নিই।

তখনই উঠে পড়লুম। যে ঘরে আমার ডেরা, সেখানে গিয়ে পোশাক বদলে নিলাম। জ্যাকেটের ভেতর-পকেটে গুলিভরা রিভলভারটাও সাবধানে রাখলাম।

ড্রয়িংরুমে গিয়ে দেখি, হালদারমশাই বিরসবদনে বসে আছেন। কিন্তু গোঁফের ডগার কাঁপন দেখে বোঝা যাচ্ছে, উনি প্রচণ্ড উত্তেজিত। আমাকে দেখে বললেন—প্রব্লেম হইল গিয়া, তখন আমি পাগলার বেশ ধরছি। সেই ট্যাক্সিটারে ফলো করবার উপায় ছিল না। বড়ো রাস্তায় ট্যাক্সি পাইতাম। কিন্তু পাগলেরে কোনো ট্যাক্সিড্রাইভার পাত্তা দিত, কন জয়ন্তবাবু?

বললাম—ঠিক বলেছেন। আপনার কিছু করার ছিল না।

—ছিল। একটুকখান উপায় ছিল। আমারই ভুল।

—কীসের ভুল?

—বাড়ি ফিরিয়্যাই ক্যাপটেন সিংহরে ফোন করা উচিত ছিল আমার। সাড়া নিশ্চয় পাইতাম না। কাজেই সোজা ওনার বাড়ি যাওয়াই উচিত ছিল। গোয়েন্দাপ্রবর শ্বাস ছেড়ে ফের বললেন—তা না কইরা স্নান করছিলাম। খাওয়ায় মন দিছিলাম। তারপর কর্নেলস্যারেরে ফোন করছিলাম। ক্যান যে এমন মতিভ্রম হইল কে জানে? চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। এমন ভুল কখনও হয় নাই।

কর্নেল সেজেগুজে বেরিয়ে এলেন। বললেন—আপনি ভুল করেননি হালদারমশাই! আপনি ঘুড়ির সুতো ঢিলে করে দিয়েছেন। ক্যাপটেন সিংহকে কিডন্যাপ করার যথেচ্ছ সুযোগ পেয়েছে হরিবাবু। এর ফলে বরং আমাদেরই সুবিধে হয়েছে। চলুন। বেরুনো যাক। ষষ্ঠী! দরজা বন্ধ কর। কোনও ফোন এলে বলবি, আমি বেরিয়েছি। কখন ফিরব, কিচ্ছু ঠিক নেই।...

গাড়ির পিছনের সিটে হালদারমশাই আর কর্নেল বসলেন। দু-পাশের জানালার কাচ তুলে দিলেন কর্নেল। বুঝলাম, উনি সারাপথ আত্মগোপন করে থাকতে চান। বড়ো রাস্তায় পৌঁছে আমার অস্বস্তি ফিরে এল। ব্যাকভিউ মিররে লক্ষ্য রাখলাম, কোনও লাল মারুতি আমাদের অনুসরণ করছে কি না।

কর্নেল নির্দেশে ড্রাইভ করছিলাম। রাস্তায় লাল মারুতি পিছনে বা সামনে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। একবার ভাবলাম, অস্ত্রটা বাঁ পাশে সিটের ওপর ফেলে রাখি। কিন্তু কার্নেল কী বলবেন ভেবে তা করলাম না। শীতের বিকেল দ্রুত রং হারিয়ে ফেলছে। ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে জ্যামে কিছুক্ষণের জন্য আটকে গেলাম। তারপর ক্রমশ রাস্তার দু-ধারে আলো জ্বলে উঠল।

পিছনে কর্নেলকে বলতে শুনলাম—সেই গলিটা চিনতে পারবেন তো?

হালদারমশাই বললেন—পারব। মুখস্থ হইয়া গেছে। এখনও কিছুটা দূর আছে। হাজরা রোড পার হইয়া।

কর্নেল একটু ঝুঁকে আমার প্রায় কানের কাছে বললেন— হাজরা রোডের মোড়ে গাড়ি একটু সময় দাঁড় করাবে। ওখানে লালবাজার থেকে ডিটেকটিভ এস আই নরেশ ধরের জিপ আর বালিগঞ্জ থানার পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করার কথা। বরং স্পিড কমিয়ে বাঁদিকে ঘেঁষে চলো।

একটু হেসে বললাম—আপনার বাইনোকুলার আনা উচিত ছিল।

কর্নেল কিছু বললেন না। হালদারমশাই বললেন—কী যে কন জয়ন্তবাবু! চারিদিকে আলোর প্রচণ্ড ছটা। বাইনোকুলারের কাম না।

মিনিট দশেক পরে দেখতে পেলাম, হাজরা রোডের মোড়ের এদিকে ফুটপাত ঘেঁষে পুলিশের একটা জিপ আর একটা কালো ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। নরেশবাবু জিপের পাশে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। আমার ফিয়াট গাড়ির নম্বর ওঁর জানা।

কাছাকাছি গিয়ে একবার হর্ন বাজালাম। নরেশবাবু তাকালেন। তারপর হাতের মৃদু ইশারায় এগিয়ে যেতে বললেন। একটু পরে গ্রিন সিগন্যাল পেয়ে এগিয়ে চললাম। ব্যাকভিউ মিররে লক্ষ্য করলাম, নরেশবাবুর বাহিনী একটু দূর থেকে আমাদের অনুসরণ করছে।

মিনিট পাঁচেক পরে হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন— সামনে বাঁদিকের গলি জয়ন্তবাবু!

গলিটা সংকীর্ণ। দুটো গাড়ি যাতায়াত করতে পারে। রিক্‌শ, ঠ্যালাগাড়ি, মানুষজনের ভিড় পেরিয়ে হালদারমশাইয়ের নির্দেশে আবার বাঁদিকে ঘুরলাম। কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! গাড়িটা ওই বটতলার মন্দিরের কাছে রাখো।

এই গলিতে তত আলো নেই। দু'ধারে ঠাসাঠাসি উঁচু বাড়ি। ফুটপাত বলতে কিছু নেই। তবে এখানে তত ভিড় নেই। শুধু মন্দিরের চত্বরে বসে বিহারের দেহাতি লোকেরা ঢোল কত্তাল তুমুল বাজিয়ে ধর্মসঙ্গীত গাইছে। পাঁচটা বাজতেই এখন রাতের ছায়া। সেই ছায়াকে অবশ্য দু'ধারের বাড়ির জানালা থেকে আসা আলোর ছটা এলোমেলো করে ফেলেছে। গলিটা ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। পথচারীদের কোনও কৌতূহল এখন লক্ষ্য করছিলাম না।

বেরিয়ে গাড়ি লক করে দেখলাম, কর্নেলও হালদারমশাই একটা বাড়ির দরজার সামনে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের একটু তফাতে পুলিশের গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে আছে। শুধু নরেশবাবু জিপ থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এটাই তা হলে সেই হরিবাবুর বাড়ি? বাড়িটা দোতলা। একপাশে দরজা বা গেট। দোতলা বা একতলায় কোনও আলো নেই। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন—হালদারমশাই! ব্যাড লাক। দরজার বাইরে তালা আঁটা।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন—আমাগো পুলিশ হেল্প করুক। তালা ভাইঙ্গা বাড়ি সার্চ করুম! আপনি নরেশবাবুরে ডাকেন।

নরেশবাবু ততক্ষণে এসে গেছেন। একটু হেসে বললেন—ব্ল্যাংক সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছি। নাম, বাড়ির নাম্বার, গলির নাম বসিয়ে নিলেই চলবে। তবে আপাতত তার দরকার দেখছি না। তালা ভেঙেই ঢুকতে হবে।

পুলিশভ্যান থেকে একজন উর্দিপরা অফিসার এবং সশস্ত্র কনস্টেবল বাহিনী ডেকে আনলেন নরেশবাবু। এবার পথচারীরা থমকে দাঁড়াচ্ছে দেখতে পেলাম। নরেশবাবুর জিপ থেকে সাদা পোশাকের পাঁচজন পুলিশ নেমে এল। তাদের হাতে বেঁটে লাঠি। তারা ভিড় হটাতে ব্যস্ত হল। দু-পাশের বাড়ির জানালা আর ব্যালকনি থেকে লোকেরা ব্যাপারটা দেখছে।

এক ভদ্রলোক নরেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—হরিবাবুকে খুঁজছেন কি?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—আজ্ঞে স্যার, আমার নাম অমরেন্দ্র বিশ্বাস। পাশের বাড়িটা আমার।

—তা হলে তো হরিবাবুকে আপনি চেনেন?

—চিনি মানে, তত কিছু না। উনি বেরোন কদাচিৎ। ওঁর সারভ্যান্ট ভগতকেও একটু-আধটু চিনি। হরিবাবু বাড়ি বেচে চলে যাবেন শুনেছি। প্রায়ই খদ্দের আসে দেখেছি। কী জানি কী ব্যাপার বুঝি না। তা স্যার আপনারা...

নরেশবাবু এবার পুলিশি মেজাজে বললেন—বাড়ির পাশে একজন ক্রিমিন্যাল থাকত। আর আপনারা কিছু টের পেতেন না?

অমরেন্দ্র বিশ্বাস করজোড়ে বললেন—আমি ছাপোষা মানুষ স্যার! কী করে জানব পাড়ার কোন লোক ক্রিমিন্যাল?

—হরিবাবু তালা এঁটে কখন কেটে পড়েছে, জানেন?

ভদ্রলোক বললেন—না স্যার! আমি লক্ষ্য করিনি কিছু। অফিস থেকে ফিরে একটা নার্সিং-হোমে গিয়েছিলাম। আমার ভগ্নীপতির হার্টের অসুখ। সেখান থেকে আসছি।

অন্য এক ভদ্রলোক একটু তফাতে পানের দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন—হরিবাবুকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন তো? একদিন আপনারা আসবেন, তা জানতাম।

নরেশবাবু বললেন—আপনি কে? কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে, আমি অ্যাডভোকেট নরেন্দ্রকুমার সেনের ক্লার্ক পরিতোষ মণ্ডল। আমার স্যারেরও হরিবাবু সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। বাড়িটা এক বিধবা মহিলার। বছর সাত-আট আগে তার কাছে হরিবাবু কিনেছিল, পুরো টাকা দেয়নি। আমার স্যার সেই মহিলাকে হেল্প করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হরিবাবুর হাতে অনেক গুণ্ডামস্তান আছে। আজকাল কী অবস্থা হয়েছে তা তো আপনাদের চেয়ে বেশি কে বুঝবে স্যার? হ্যাঁ। তালা ভেঙে সার্চ করুন আপনারা। পাড়ার লোকরা খুশি হবে স্যার। লোকটা চোরাকারবারি বলে গুজব রটে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে দুজন কনস্টেবল একটা ছোট্ট লোহার রডের সাহায্যে তালাটা ভেঙে ফেলল। বুঝলাম, এ-কাজে দুজনেই বেশ দক্ষ। এইসময় হালদারমশাই চাপাস্বরে নরেশবাবুকে বললেন—পিছনের দিকে বাড়ির কোনও দরজা আছে কিনা কে জানে!

নরেশবাবু একটু হেসে বললেন—ভাববেন না মি. হালদার! আমাদের লোকজনের সেদিকেও নজর আছে।

দরজার ভিতরে সংকীর্ণ একটা করিডর। বাঁদিকে একটা তিনতলা বানি। জানালায়-জানালায় অজস্র মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। ডান দিকে হরিবাবুর বাড়ি এবং নিচের তলায় একটা দরজা। সেই দরজাতেও তালা আঁটা ছিল। তালা ভেঙে একটা ঘরে ঢুকে নরেশবাবু সুইচ টিপে আলো জ্বেলে

দিলেন। পুরোনো সোফাসেট, জীর্ণ একটা চেয়ার আর টেবিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এ ছাড়া ঘরটাতে কিছুই নেই। এই ঘরের কোণ থেকে দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে। কর্নেল নিচের তলার পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে বললেন,—এই ঘরে ভগত থাকে মনে হচ্ছে।

একটা খাটিয়া। মশারি ঝুলছে দেয়ালের কোণে। বিছানা ছাড়া কেরোসিন কুকার, অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি, ঘটি আর বাসন-কোসন ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। কর্নেল বিছানা তুলে দেখলেন। তলায় কিছু নেই।

দোতলাতেও দুটো ঘর। প্রথম ঘরটার দরজার তালা ভাঙতে হল। এই ঘরে ভগতের খাটের মতোই খাট ছাড়া আর কোনও জিনিস নেই। পাশের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন নরেশবাবু। একটা সেকেলে খাটে বিছানা পাতা আছে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে। একটা মাত্র কাঠের আলমারিতে অগোছাল বই ঠাসা। সব বই ধর্মসংক্রান্ত। পুবের জানালার ওপরে একটা তাকে সিদ্ধিদাতা গণেশের সিঁদুররাঙা মূর্তি। কিছু শুকনো ফুল পড়ে আছে।

প্রথমে পুলিশি ধরনে সার্চ শুরু হল। কর্নেল খাটের তলায় উঁকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন—হালদারমশাই! হরিবাবু মনে হচ্ছে শুধু ব্রিফকেস আর ছড়ি নিয়ে কেটে পড়েছে। এমন কিছু রেখে যায়নি, যাতে তাকে খুঁজে বের করার সূত্র পাওয়া যায়।

বালিগঞ্জ থানার অফিসার নরেশবাবুকে বললেন—আমার ধারণা, হরিবাবু এখানে মাঝে মাঝে এসে থাকত। স্থায়ীভাবে কেউ এ-বাড়িতে বসবাস করলে আরও আসবাব বা জিনিসপত্র পাওয়া যেত।

বিছানার ওপর চাদরটা তত পরিষ্কার নয়। বালিশ দুটোও যেমন-তেমন। তলার পুরোনো তোশক নিচে ফেলে দুজন কনস্টেবল নারকেল ছোবড়ার গদি টেনে এনে একপাশে নামাল। নরেশবাবু বালিশ, তোশক আর গদি খোঁজাখুঁজি করে হাসলেন।—লোকটা যে-ই হোক, খুব ধুরন্ধর। নিজের এতটুকু চিহ্ন রেখে যায়নি। কর্নেলসায়েব! আপনার কী ধারণা?

কর্নেল বললেন—আপনার সঙ্গে আমি একমত। চলুন। বেরুনো যাক।...

বালিগঞ্জ থানার অফিসারের নির্দেশে দোতলার দরজায় একজন কনস্টেবল হাতকড়া এঁটে দিল। আমরা নেমে এলাম।

গলিতে ততক্ষণে মানুষের ভিড় হটাচ্ছে পুলিশ। নরেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে কর্নেল বললেন— বাকিটা পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে এবার আমরা কেটে পড়ি জয়ন্ত! আসুন হালদারমশাই!...

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ষষ্ঠীচরণের তৈরি সুস্বাদু কফি খেতে খেতে বললাম—একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে কর্নেল! সত্যি! ভীষণ অবাক হয়েছি।

কর্নেল বললেন— কী ব্যাপারে?

—রীতিমতো হইহল্লা করে পাড়ায় শোরগোল তুলে হরিবাবুর বাড়িতে হানা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? এতে তো হরিবাবু খুব সতর্ক হয়ে যাবে। ওর চ্যালাদের কেউ-কেউ নিশ্চয় ঘটনাস্থলে ছিল।

হালদারমশাই বললেন— জয়ন্তবাবু ঠিক কইছেন। আমিও কিছু বুঝলাম না। দুয়ারে তালা আটকানো ছিল। তার মানে বাড়ির ভিতরে হরিবাবু নাই। আমার ক্লায়েন্টরে কিডন্যাপ কইরা নিজের বাড়িতে সে রাখবে ক্যান?

কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরালেন। তারপর একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ! রীতিমতো শো-বিজনেস বলা যায়। তোমাদের কথা ঠিক। কিন্তু এর দরকার ছিল।

গোয়েন্দাপ্রবর বললে—ক্যান কর্নেলস্যার?

—হরিবাবুর সঠিক ডেরা যে ওই বাড়িটা নয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ওখানে সে সবসময় থাকত না, তা ওর ঘরগুলো দেখেও বোঝা গেল। অথচ হালদারমশাই তাকে ফিটফাট ফুলবাবুর বেশে দেখেছেন। যে ওইরকম ফুলবাবুটি সেজে বেরোয়, ঘরে তার অন্তত একটু আভাস মিলবে। কিন্তু মিলল না। ঘরগুলো একেবারে সাদামাটা। চালচুলোহীন লোকের আস্তানা। সোফাসেটও ছেঁড়াখোঁড়া।

বললাম—ক্যাপটেন সিংহকে কিডন্যাপ করার পর সে এসে ঘরের দামি বা দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে গেছে হয়তো।

কর্নেল হাসলেন।—হরিবাবু নিজে না এসে তার চ্যালা ভগতকে সে-সব জিনিস নিয়ে যেতে বলে থাকবে। কারণ হালদারমশাই দেখেছিলেন, বাড়িতে ভগতকে রেখে সে সুশীলার সঙ্গে ট্যাক্সিতে চেপে চলে যায়। যাই হোক, এবার হালদারমশাইকে একটা কাজ করতে হবে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন—কন কর্নেলস্যার!

—আপনি সুশীলার বাড়ি চলে যান। খোঁজ নিন সে বাড়িতে আছে কি না। বাড়িতে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমাকে কোনও জায়গা থেকে টেলিফোনে শুধু জানিয়ে দেবেন। আর ট্যাক্সির নাম্বারটা এই কাগজে লিখে দিন।

কর্নেলকে নাম্বারটা লিখে দিয়ে হালদারমশাই বললেন—আপনি চাইলে ক্যাপটেন সিংহের নেমকার্ড আপনারে দিমু।

—দিন। সুশীলার ঠিকানাটাও বরং লিখে দিন।...

গোয়েন্দাপ্রবর অভ্যাসমতো সবেগে বেরিয়ে গেলেন। তারপর কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে সাড়া এলে তিনি বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।..মি. সোম! আপনাকে অজয়েন্দু রায়ের সম্পর্ক...ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। ওটা কি কাকেও দিয়ে আমার কাছে পাঠাবেন?...ইউ আর ওয়েলকাম মি. সোম! আমার সৌভাগ্য...হ্যাঁ। আমি আছি। অন্তত এ-রাতে কোথাও বেরুচ্ছি না। শীতের রাতে এই বৃদ্ধ অর্কিড-পাখি-প্রজাপতি-ক্যাকটাসের জন্য কোথাও হানা দিতে অক্ষম মি. সোম।... ঠিক আছে। আসুন।...

কর্নেল রিসিভার রেখে সোফায় হেলান দিলেন। বললাম—মি. সোম নামটা আমার শোনা মনে হচ্ছে।

কর্নেল চোখ বুজে বললেন—শিপিং কর্পোরেশনের কলকাতা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার মিঃ অসীম সোম।

—উনি থাকেন কোথায়?

—ক্যামাক স্ট্রিটে কোম্পানির বাংলোবাড়িতে...

প্রাধ আধঘণ্টা পরে ডোরবেল বাজল। তারপর একজন স্মার্ট চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে বললেন—পথে একটু দেরি হয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটে জ্যাম। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট আসবার কথা কাগজে পড়েছিলাম। সম্ভবত তাঁর জন্যই পার্ক স্ট্রিটের ওই অবস্থা।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর করমর্দন করে বসালেন। তারপর বললেন—অনেকদিন পরে আপনি এলেন!

মি. সোম একটা ব্রিফকেস খুলতে খুলতে বললেন—হ্যাঁ। প্রায় এক বছর। গত নভেম্বরে এসে আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছিলাম।

কর্নেল হাসলেন।—ও কিছু না। আন্তর্জাতিক মাফিয়া ডনরা অনেকেই আমার পাল্লায় পড়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে। শাহিন খান এখন নাকি দুবাইয়ে ঘাঁটি করেছে। আপনাদের আর সে বিরক্ত করে না আশা করি?

—না। এই নিন আপনার অজয়েন্দু রায়ের পুরো ডেটা। এই খামে সব কাগজপত্র, মাদার কম্পিউটার থেকে বের করতে একটু সময় লেগেছে, এই যা।

কর্নেল একটা লম্বা পেটমোটা খাম নিলেন এবং বললেন—আগে কফি। এটা পরে খুলব। খুঁটিয়ে পড়ার পর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে পরে আপনাকে রিং করব। ষষ্ঠী! শিগগির কফি চাই। হ্যাঁ—আলাপ করে দিই।

মি. সোম হাসলেন।—দরকার হবে না। জয়ন্তবাবুকে আমি দেখেই চিনেছি। উনি হয়তো আমাকে ভুলে গেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে খিদিরপুর ডকে শিপিং কর্পোরেশনের একটা জাহাজভর্তি মাল চুরি যাওয়ার সাংঘাতিক ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। মি. সোমের সঙ্গে করমর্দন করে বললাম—দুঃখিত মি. সোম। ভুলে গিয়েছিলাম আপনার কথা।

—তাতে কী? আপনারা সাংবাদিক। নিত্যনতুন ঘটনা এসে আপনাদের ব্যস্ত রাখে।

এইসময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—হ্যাঁ। বলুন মি. হাটি।..ও মাই গড! কোথায় ছিল ট্যাক্সিটা?...রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েছিল, আপনি শিয়োর?...মেয়েটিকে শনাক্ত করতে পেরেছেন?...সুশীলা দাসী?...মাথার পিছনে গুলি—কী অদ্ভুত! ঠিক দীপনারায়ণবাবুর মতো...হ্যাঁ, ট্যাক্সিড্রাইভারের পালানোরই কথা।...সকালে দেখা হবে। রাখছি।...

দশ

শিপিং কর্পোরেশনের ম্যানেজার অসীম সোম কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার রেখে তাঁর দিকে ঘুরে বসলেন। মি. সোম একটু হেসে বললেন—অজয়েন্দু রায়ের সঙ্গে কোনও এক সুশীলা দাসীকে মার্ডারের সম্পর্ক নেই তো?

কর্নেলও হাসলেন।—আছে।

—বলেন কী কর্নেল সরকার!

—যথাসময়ে সব আপনাকে জানাব।

ঘড়ি দেখে মি. সোম উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—চলি তাহলে। আজ সন্ধ্যায় আমাদের ক্লাবে একটা ডিনারপার্টি আছে। আপনাকে খামটা দিয়ে সেখানে যাব ভেবেছিলাম। একটু দেরি হয়ে গেল।...

অসীম সোম চলে যাওয়ার পর বললাম—একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তাহলে। যে-সুশীলার সাহায্যে হরিবাবু ক্যাপটেন সিংহকে কিডন্যাপ করেছে, তাকেই হরিবাবু কেন গুলি করে মারল?

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে অভ্যাসমতো চোখ বুজলেন। বুঝলাম, আমার এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি আপাতত আলোচনায় রাজি নন।

কিছুক্ষণ করে ডোরবেল বাজল। তারপর সবেগে প্রবেশ করলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই। তাঁকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কর্নেল চোখ খুলে বললেন—বলুন হালদারমশাই!

হালদারমশাই জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—সুশীলা থাকত একটা তেরপলের ঝোপড়িতে। একজন কইল, সুশীলা তার ঝোপড়ি পাঁচু মিস্ত্রিরে বিক্রি কইর‍্যা দ্যাশে গেছে। পাঁচু মিস্ত্রিরে জিগাইলাম সুশীলার দ্যাশ কোথা? পাঁচু কইল, সে-খবর তার জানা নাই!

—আপনাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর এক টিপ নস্যি নেওয়ার পর আস্তে বললেন—ক্যাপটেন সিংহর বাড়ি গিছলাম। পুলিশ ওনার ঘরের তালা ভাইঙ্গ্যা ঢুকছে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সেই নরেশবাবুরে দেখলাম। আমারে দেইখ্যা উনি কইলেন, ঘরে ক্লোরোফর্মের কড়া গন্ধ ট্যার পাইছেন।

—তার মানে ক্যাপটেন সিংহকে ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করেছিল ওরা?

—হ্যাঁ। ঠিক কইছেন কর্নেল স্যার।

—আপনি কি কফি খাবেন? কফি নার্ভ চাঙ্গা করে হালদারমশাই!

হালদারমশাই এবার মুচকি হেসে বললেন—খামু। কিন্তু আসল ঘটনা এখনও কই নাই। শোনেন কর্নেল স্যার! চৌতিরিশ বৎসরের পুলিশ-লাইফ যার, তারে ফান্দে ফেলে কোন হালায়?

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—আবার কি কেউ আপনাকে আক্রমণ করেছিল?

—হঃ। ক্যাপটেন সিংহর বাড়ির পিছনে একটা গলি দিয়া শর্টকাট করছিলাম। গলিতে আলো কম ছিল। হঠাৎ পাশ থেইক্যা কে আমারে কইল, আপনি মি. হালদার না? আপনার লগে কথা আছে। একটু দাঁড়ান। আমি যেই তার দিকে ঘুরছি, সে চিৎককার করল, চোর! চোর! তারপর আমার গলার কাছে সোয়েটার চাইপ্যা ধরল। এদিকে তার চিৎকার শুইন্যা আরও লোকে চিৎকার করছিল। চোর! চোর! আমি তখনই তার ফান্দ ট্যার পাইছি। তার প্যাটে একখান লাথি মারলাম। হালা মাটিতে পড়ল। অমনি আমি দৌড় দিলাম। পিছনে পাড়াসুদ্ধু চিৎকার করছিল, চোর! চোর!

কর্নেল হেসে ফেললেন।—হ্যাঁ। আপনি ঠিকই বলেছেন। ওটা একটা ফাঁদই বটে। কলকাতায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কোনও শত্রুকে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলার জন্য 'চোর! চোর!' চিৎকার ভালো কাজ দেয়। লোকেরা কিছু না বুঝেই বেচারাকে পেটাতে শুরু করে।

বললাম—হালদারমশাই তাহলে খুব বেঁচে গেছেন!

হালদারমশাই বললেন—আমারে পেটায় কে? পকেটে রিভলভার ছিল। দুরাউন্ড গুলি ছুঁড়লেই লোকেরা—হঃ! কী যে কন জয়ন্তবাবু!

ষষ্ঠী কফি দিয়ে গেল। চুপচাপ কফি খেয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভের উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। আবার একটিপ নস্যি নিয়ে তিনি বললেন—লোকটা হরিবাবুর স্যাঙাত। কিন্তু আশ্চর্য লাগে কর্নেলস্যার, সে আমার নাম জানল কীভাবে?

কর্নেল এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—বোঝা যাচ্ছে, হরিবাবু ক্যাপটেন সিংহের দিকে নজর রাখার জন্য ভগত ছাড়াও আরও কাকেও বেছে নিয়েছিল। সে এমন লোক, যে ক্যাপটেন সিংহের বাড়ির কাছাকাছি থাকে। সম্ভবত সুশীলাকে সে চেনে। যাই হোক, এবার কাজের কথা বলি।

হালদারমশাই বললেন—যেখানে যাইতে কইবেন, যামু।

—হালদারমশাই! উত্তেজিত হবেন না যেন। মাথা ঠান্ডা রেখে শুনুন।

—কন কর্নেল স্যার।

—কিছুক্ষণ আগে চন্দ্রপুর থানা থেকে খবর পেয়েছি, চন্দ্রপুর যাওয়ার পথে তিতলিপুর জঙ্গলের ধারে সেই ট্যাক্সিটা পাওয়া গেছে। সুশীলাকে কেউ মাথার পিছনে গুলি করে মেরে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়েছে। ট্যাক্সিড্রাইভারকে পাওয়া যায়নি। খালি ট্যাক্সিটা রাস্তার ধারে দাঁড় করানো আছে।

গোয়েন্দাপ্রবর গুলিগুলি চোখে কথাগুলো শুনছিলেন। গোঁফের দুইভাগ তিরতির করে কাঁপছিল। এবারে জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—হরিবাবু না। অরে মারছেন ক্যাপটেন সিংহ। ওনার ফায়ার আর্মস থাকা স্বাভাবিক। জ্ঞান ফেরার পর ক্যাপটেন সিংহ সুশীলারে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিচ্ছেন।

আমি বললাম—হরিবাবুর তা হলে কী হল?

—তারেও মারছেন ক্যাপটেন সিংহ।

—তার সঙ্গে ভগত ছিল!

—প্রাণভয়ে ভগত পলাইয়া গেছে। ট্যাক্সিড্রাইভারও পলাইয়া গেছে।

—ক্যাপটেন সিংহ নাকি অসুস্থ এবং বৃদ্ধ মানুষ। তিনি হরিবাবুর লাশের কি ব্যবস্থা করেছেন তা হলে?

—ঘটনাস্থলে গিয়া ক্লু খুঁজলেই মিলব। শিয়োর! তাই না কর্নেল স্যার?

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন। ঘটনাস্থলে না গেলে কিছু বোঝা যাবে না। হালদারমশাই! এবার বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিন। তারপর কাল সকাল আটটার মধ্যে আমার এখানে চলে আসবেন। আপনার এবার বিশ্রাম দরকার। খুব ধকল গেছে।...

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার আস্তেসুস্থে বেরিয়ে গেলেন। তারপর কর্নেল টেবিল-ল্যাম্পের আলো জ্বেলে মি. সোমের দিয়ে যাওয়া খামটা খুললেন। ভিতরে টাইপ-করা দু শিট কাগজ ছিল। ওতে শিপিং কর্পোরেশনের এক অফিসার অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের জাহাজি জীবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য আছে।

কর্নেল দু শিট কাগজে দেওয়া তথ্যগুলো অন্তত বার তিনেক পড়ার পর সোজা হয়ে বসলেন। আমার দিকে ঘুরে বললেন—ভদ্রলোক যেন আরব্য উপন্যাসের একটি চরিত্র। আশা করি, জয়ন্ত আরব্য উপন্যাস পড়েছে?

—পড়েছি। স্রেফ রূপকথা। তবে পড়তে ভালো লাগে। বিশেষ করে সিন্দবাদ নাবিকের উপাখ্যানগুলো রোমাঞ্চকর।

কর্নেল হাসলেন।—বাঃ সিন্দবাদ নাবিক! অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের জাহাজি জীবনটাও কতকটা ওইরকম মনে হল। অবশ্য জাহাজ কোম্পানির তথ্যে এ ধরনের ইশারা আছে মাত্র। কোনও বড়ো বন্দরে তাঁদের জাহাজ নোঙর করে বেশ কিছুদিন কোনও কারণে আটকে থাকলে অজয়েন্দু শম্ভুনাথ চৌধুরিকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে যেতেন। এটা জাহাজ কোম্পানির অফিসার বা কর্মীদের ক্ষেত্রে নিয়মবিরোধী কাজ। কিন্তু ক্যাপটেন সুশীলকুমার সিংহ তাঁদের গার্জেন। হ্যাঁ—ক্যাপটেন সিংহের দেশের বাড়ি ছিল চন্দ্রপুর।

—বলেন কি! ওই কাগজ দুটো আমাকে দিলে পড়ে আনন্দ পেতাম।

কর্নেল খামটা সকৌতুকে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখে মিটিমিটি হেসে বললেন—এখন বেশি কিছু জানতে নেই। জানলে চূড়ান্ত চমকের মজা থেকে বঞ্চিত হবে। মুখে-মুখে বরং যা বলি, শুনতে পারো।

অগত্যা বললাম—কাকেও হাতের তাস আগেভাগে দেখান না আপনি। তো ঠিক আছে। মুখেই বলুন।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন—ক্যাপটেন এস কে সিংহের দেশের বাড়ি ছিল চন্দ্রপুরে। অজয়েন্দু তাঁর বাল্যবন্ধু।

—এসব কথা কি মি. সোমের দেওয়া কাগজে লেখা আছে?

—মোটেই না।

—আমি চোখ না খুলে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন—ওই তথ্য থেকে একটা স্কেচ এঁকেছি। শুনতে ইচ্ছে হলে শোনো।

হাসতে হাসতে বললাম—ঠিক আছে। বলে যান।

—ক্যাপটেন সুশীল কুমার সিংহের সুপারিশে অজয়েন্দু চাকরি পেয়েছিলেন। শম্ভুনাথ চৌধুরি চাকরি পেয়েছিল অজয়েন্দুর সুপারিশে। ওরা দুজনে কোম্পানির নিয়মকানুন না মেনে কোথায়-কোথায় চলে যেত, তা আগেই বলেছি। নিয়মকানুন বিরোধী হলেও জাহাজের লগবুকে ক্যাপটেন সিংহকে সে-কথা লিখে রাখতে হত। কারণ বাইরে গিয়ে বিপদ-আপদ হলে জাহাজ

কোম্পানিকেই ঝক্কি সামলাতে হবে। যাই হোক, বছর দশেক আগে একটা জাহাজ মিশরের পোর্ট সইদ ভারত থেকে কলকারখানার যন্ত্রাংশ নিয়ে গিয়েছিল। মাল খালি হলে সেই জাহাজে মিশরের তুলো বোঝাই করার কথা। আমেদাবাদের কাপড়কলের অর্ডার ছিল। তুমি জানো মিশরের তুলো 'ইজিপ্সিয়ান কটন' নামে বিশ্বখ্যাত। তো তুলো আসতে দেরি হচ্ছিল। এই অছিলায় অজয়েন্দু শম্ভুনাথকে সঙ্গে নিয়ে কায়রোতে তুলো কোম্পানির অফিসে যান। দুদিন পরে ওঁরা জাহাজে ফিরে আসেন। তারপর তুলো এসে বন্দরে পৌঁছোয়। সেই তুলো বোঝাই করে জাহাজ বোম্বাই ফিরে আসছিল। আগস্ট মাস। বোম্বাই থেকে আঠারো নটিক্যাল মাইল দূরে ঝড়ের মুখে জাহাজডুবি হয়। ক্যাপটেন সিংহ রবারে ভেলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে অজয়েন্দু বা শম্ভুনাথ ছিল না। এদিকে বোম্বাইয়ে তার আগে মিশর সরকারের অভিযোগ অনুসারে ভারত সরকার গোয়েন্দাবাহিনী তৈরি রেখেছিলেন। মিশরের অভিযোগ ছিল, ওই তুলোর জাহাজের দুজন অফিসার জাদুঘর থেকে অমূল্য প্রাচীন সম্পদ চুরি করে পালিয়েছে। তাদের সাহায্যকারী ইব্রাহিম বেগকে মিশর সরকার গ্রেফতার করেছিল। ইব্রাহিম ধোলাইয়ের চোটে ওই দুই ভারতীয়ের পরিচয় দিয়েছে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। বললাম—তারপর?

কর্নেল একটু হেসে বললেন নিশ্চয় ওরা দুজনে এমন কিছু আঁচ করে থাকবে। তা না হলে জাহাজডুবির পর আর তাদের খোঁজ পাওয়া যাবে না কেন? মালবাহী জাহাজ। লোকজন তত বেশি ছিল না। রবারের নৌকো ছাড়াল কয়েকটা হালকা কাঠের বোটও ছিল। রবারের পোশাকও ছিল, যাতে হাওয়া ভরলে ফুলে ওঠে। সমুদ্রে ভেসে থাকা যায়।

—তার মানে সবাই উদ্ধার পেয়েছিল। শুধু অজয়েন্দু আর শম্ভুনাথের খোঁজ পাওয়া যায়নি?

—হ্যাঁ, প্রায় দশ বছর এই দুজন লোক কোম্পানির খাতায় মৃত হলেও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'সি বিআই'-এর খাতায় জীবিত। কয়েক বার খোঁজ পেয়েও সি বি আই তাদের ধরতে পারেনি। মি. সোম ফুটনোটে এইসব কথা লিখে দিয়েছেন। আর একটা মূল্যবান তথ্য আছে। মি. সোমের কোম্পানির একজন জাহাজি অফিসার নাকি খিদিরপুর ডকে হংকংয়ের একটা জাহাজে শম্ভুনাথ চৌধুরিকে দেখতে পেয়েছিলেন। সে জাহাজ থেকে একটা বোটে নেমে ডক ইয়ার্ডে এসেছিল। সেই অফিসার তাতে চার্জ করতেই শম্ভুনাথকে আড়াল করে তার গ্যাংয়ের লোকেরা। তারপর বেচারা নিরীহ অফিসারকে সেই গুণ্ডারা মারধর করে। সেই সুযোগে শম্ভুনাথ উধাও হয়ে যায়।

বলে কর্নেল ঘড়ি দেখলেন।—জয়ন্ত, সাড়ে নটা বেজে গেছে! এ রাতে শিগগির ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়া যাক, সকালে বেরুতে হবে। বলে তিনি ডাকলেন—ষষ্ঠী!

ষষ্ঠীচরণ আড়াল থেকে নিশ্চয় কর্নেলের কথা শুনছিল। কিচেনের দিক থেকে সে সাড়া দিয়ে বলল—সব রেডি বাবামশাই!...

সকালে কথামতো হালদারমশাই এসে পৌঁছেছিলেন। আমরা তখনই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কর্নেল বলেছিলেন, পথে কোথাও ব্রেকফাস্ট করা যাবে।

তিতলিপুরের মোড় পেরিয়ে কর্নেলের নির্দেশে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। ডানদিকে টানা জঙ্গল। বাঁদিকে কখনও মাঠ, কখনও গ্রাম। কিছুক্ষণ পরে হাইওয়ে যেখানে বাঁদিকে ঘুরে গেছে, সেখানে একটি মোটামুটি চওড়া পিচরাস্তা জঙ্গলের ভিতরে দিয়ে এগিয়েছে। কর্নেল বললেন—আমরা ফরেস্ট বাংলোতে উঠব।

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন—সেই ট্যাক্সিখান কি এই রাস্তায় আইতেছিল?

—হ্যাঁ। এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে চন্দ্রপুর যেতে হয়। বলে তিনি বাইনোকুলারে চোখ রাখলেন। একটু পরে বললেন—জঙ্গলে এখনও কুয়াশা। তাই খালি চোখে পুলিশের গাড়ি দেখা যাবে না।

বললাম—বাইনোকুলারে পুলিশের গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন?

—পাচ্ছি। থানার ও সি রাজেন্দ্র হাটি জিপের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

এবার একটা ছোটো জলভরা নদীর ব্রিজ দেখা গেল। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে পুলিশের জিপ দেখতে পেলাম। বাঁদিকে রাস্তাটা ঘুরে গেছে। সেদিকে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। সমৃদ্ধ গ্রাম বা গ্রামনগরী বলা যায়। কারণ, অনেক পাকাবাড়ি আর যানবাহন চোখে পড়ল। কর্নেল বললেন—পশ্চিমে একটা পাকা সড়ক আছে। শর্টকাটে হাইওয়েতে পৌঁছোনো যায়। তাই এই রাস্তা এমন নির্জন হয়ে আছে।

ও সি রাজেন্দ্র হাটি সহাস্যে বললেন—মর্নিং কর্নেল সরকার।

কর্নেল হাসলেন।—মর্নিং হাটি। আশা করি, আমাদের দেরি হয়নি?

মোটেও না।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। কর্নেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদারের সঙ্গে মি. হাটির আলাপ করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—সেই ট্যাক্সিটা কি থানায় নিয়ে গেছেন?

ও সি বললেন—হ্যাঁ। রাত্রেই ওটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই জঙ্গলের ধারে পড়ে থাকলে গাড়িচোররা ওটাকে হাপিস করে দিত। এই এলাকার চোর-ডাকাত দমন করা কঠিন। এই জঙ্গল আর পনেরো কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের বর্ডার।

—চলুন। ঘটনাস্থলটা দেখি।

ডানদিকে একটু এগিয়ে মি. হাটি বললেন—সুশীলা দাসীর বডি এই ঝোপের ধারে পড়ে ছিল। আর ট্যাক্সিটা ছিল এখানে—রাস্তার কাছাকাছি। সম্ভবত গাড়ির মধ্যে ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। ড্রাইভার ট্যাক্সির ব্রেক না চাপলে নিচের ওই খালে গিয়ে পড়ত।

হালদারমশাই বললেন—হ্যাঁ। ঠিক কইছেন। ঝোপের অবস্থা দেইখ্যাই তা বুঝছি।

দেখলাম, সুশীলার লাশ যেখানে পড়ে ছিল, সেখানে এখনও রক্তের ছোপ। শিশিরে অবশ্য রক্তের রং ফিকে হয়ে গেছে। ততক্ষণে কর্নেলের গোয়েন্দাগিরি শুরু হয়ে গেছে। ইতস্তত তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনও হাঁটু মুড়ে বসে আতশ কাচে কী দেখছেন। হালদারমশাইও অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘোরাঘুরি করছেন।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। মি. হাটি আমাকে সহাস্যে চাপা স্বরে বললেন—আমাদের পক্ষ থেকে তন্নতন্ন খোঁজা হয়েছে। এবার দেখা যাক, কর্নেলসাহেব কোনও ক্লু পান নাকি।

হালদারমশাই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মি. হাটি বললেন—ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে মনে হচ্ছে। ওভাবে কোথায় যাচ্ছেন উনি?

একটু হেসে বললাম—ঠিক ধরেছেন মি. হাটি। উনি আপনার মতো পুলিশ অফিসার ছিলেন। কিন্তু মাথায় ছিট আছে। কর্নেলেরও আছে। ওই দেখুন, কর্নেলও অদৃশ্য হলেন।

মি. হাটি এবার একটু গম্ভীর মুখে বললেন—আমরা অবশ্য জঙ্গলে ঢুকিনি। ঢোকার কোনও কারণও ছিল না। ওঁরা কীসের জন্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেলেন বুঝতে পারছি না।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর মি. হাটি একজন সশস্ত্র কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে কর্নেল যেদিকে, সেদিকে চলে গেলেন।

আরও দশ মিনিট পরে দেখলাম, হালদারমশাই হন্তদন্ত বেরিয়ে আসছেন জঙ্গল থেকে। জিজ্ঞেস করলাম—কী ব্যাপার হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবরের পোশাক শিশিরে ভিজে গেছে। উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন—জুতার ছাপ ফলো করছিলাম। একখানে দেখলাম পুরানকালের ধ্বংসস্তূপ।

—হ্যাঁ। এই জঙ্গলের মধ্যে মোগল আমলের একটা কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আছে। কিন্তু কর্নেল কোথায়? তাঁকে দেখতে পাননি?

—নাঃ। ধ্বংসস্তূপের আড়ালে কে য্যান খাড়াইয়া ছিল। আমি শুধু শুনলাম শুকনা পাতার ওপর দৌড়াইয়া পালানোর শব্দ। জয়ন্তবাবু! এখনই মি. হাটি যদি পুলিশফোর্স লইয়া—বলেই তিনি অবাক হলেন।—অ্যাঁ? মিঃ হাটি গেলেন কই?

—জঙ্গলে। কর্নেলকে ফলো করে গেছেন উনি।

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—মিসটিরিয়াস কারবার।

ওঁদের ফিরতে যত দেরি হচ্ছে, তত আমার উদ্বেগ বাড়ছিল। অবশেষে ওঁদের দেখতে পেলাম। ও সি মি. হাটি একজন লোকের সোয়েটার ও শার্টের কলার চেপে ধরে টানতে টানতে তাকে আনছেন। ভদ্রলোক বলাই উচিত তাকে। কাছাকাছি এলে আমি তাকে চিনতে পারলাম। এই ভদ্রলোকই দীপনারায়ণবাবুর সঙ্গে দোমোহানিগামী রাস্তায় মল্লযুদ্ধ করছিলেন। সেই ছবি কর্নেল তুলেছিলেন। কাজেই আমার চিনতে দেরি হল না। ইনিই সেই শম্ভুনাথ চৌধুরি! অদ্ভুত ব্যাপার! এখন এই জঙ্গলে ঢুকে কী করছিলেন জাহাজিবাবু?

কাছে এসে কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—জাহাজিবাবু দৌড়ে আসছে দেখে আমরা দু-পাশে দুটো স্তূপের আড়ালে ওত পেতেছিলাম। ইনি একেবারে আমাদের ওপর এসে পড়লেন।

হালদারমশাই বলে উঠলেন—আমার সাড়া পাইয়া এই লোকটাই দৌড় দিছিল।...

এগারো

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যে 'জাহাজিবাবু' শম্ভুনাথ চৌধুরি কাজিসায়েবের ছদ্মবেশে কর্নেলের জ্যাকেটে ভয়-দেখানো কথা লেখা কাগজের টুকরো এঁটে পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিল, যাকে প্রায় দশ বছর ব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দারা খুঁজে হন্যে হয়েছেন, এমনকী কলকাতার লালবাজারের ঘুঘু গোয়েন্দারাও এযাবৎ যার টিকিটিও দেখতে পাননি, সে যেন আজ কর্নেলের কাছে স্বমূর্তিতে ধরা দেওয়ার জন্য তিতলিপুরের জঙ্গলে এসে অপেক্ষা করছিল।

মাঝে মাঝে বহু ঘটনা দেখে আমার মনে হয়েছে, কর্নেলের যেন কিছু অলৌকিক শক্তি আছে। আজ আবার তা বিশ্বাস করার মতো ঘটনা ঘটল। এ কথাটা কর্নেলকে বললেই তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি শুনতে পাব। কাজেই চুপ করে থাকাই উচিত।

হালদারমশাইয়ের কথায় আমার সম্বিৎ ফিরল। তিনি বললেন—এই লোকটা সুশীলার সাহায্যে ক্যাপটেন সিংহের ঘর থেইক্যা দামি জিনিস চুরি করছিল? কী কাণ্ড! আর ডানহাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা ক্যান?

কর্নেল সহাস্যে বললেন—কারও সঙ্গে আবার মল্লযুদ্ধ করেছে!

অবাক গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—আবার মানে? আগেও কি—

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন—যথাসময়ে সব শুনবেন। প্রথম মল্লযুদ্ধের ছবিটাও আপনাকে দেখাব। মি. হাটি! আপনি তা হলে জাহাজিবাবুকে নিয়ে যান। ওর পেট থেকে কিছু বেরোয় কি না দেখুন। আমরা ফরেস্ট বাংলোয় গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই। ফরেস্ট বাংলোয় টেলিফোন আছে তো?

মি. হাটি বললেন—আছে। এই বাংলোটা সেচবাংলোর চেয়ে সুন্দর। মৌরীনদী পেরিয়ে এসেছেন। সেই নদীর ধারেই ফরেস্ট বাংলো। নদীটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দোমোহানি জলাধারে গিয়ে মিশেছে। আচ্ছা, চলি কর্নেলসায়েব। সময়মতো দেখা করব।

কর্নেল বললেন—জাস্ট আ মিনিট মি. হাটি! একটা কথা আছে।

দুজনে একটু তফাতে গিয়ে চুপিচুপি কী কথা বললেন। এদিকে জাহাজিবাবুর কোমরে এবং দুই দড়ি বেঁধে কনস্টেবলরা ততক্ষণে জিপের পিছনের দিকে ঢুকিয়েছে।

পুলিশের জিপ চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন—ফরেস্ট বাংলোয় যাওয়ার আগে একটা কাজ সেরে নেওয়া যাক হালদারমশাই! আপনি জুতোর ছাপ দেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই ছাপগুলো কোথায় প্রথমে আপনার চোখে পড়েছিল, একবার দেখে নিতে চাই।

হালদারমশাই রাস্তা থেকে ডাইনে জঙ্গলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে কর্নেলকে সেই ছাপ দেখালেন। কর্নেল হাঁটু মুড়ে বসে আতশ কাচ দিয়ে কিছু দেখার পর পাশের একটা ঘন ঝোপের কাছে গেলেন। বললেন—হালদারমশাই! শম্ভুনাথ চৌধুরি সম্ভবত এখানে কিছু খুঁজতে এসেছিল। মাই গুডনেস! লক্ষ্য করছেন কি, ঝোপের ওপর রক্তের ছাপ এখনও স্পষ্ট। শিশিরে কিছুটা ধুয়ে দিলেও ছাপগুলো রয়ে গেছে!

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—লোকটার হাতে ব্যান্ডেজ দেখলাম! কর্নেল স্যার! আর হাতে কেউ গুলি করছে! তাই না?

—ঠিক ধরেছেন। গুলি খেয়ে পালিয়ে গিয়ে জাহাজিবাবু কোথাও ব্যান্ডেজ বেঁধে নিয়েছে। চেনা কোনও ডাক্তারের কাছে গিয়ে থাকবে। কিন্তু আজ এখানে কী খুঁজতে এসেছিল সে?

কর্নেলের কথা শুনে হালদারমশাই জায়গাটা খুঁজতে শুরু করলেন। গাড়িতে হেলান দিয়ে দুই গোয়েন্দার কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ দেখতে অবাক হয়ে ভাবত, দুই পাগল এখানে এসে জুটল কোথা থেকে?

কিছুক্ষণ পরে গোয়েন্দাপ্রবর ঘন ঘাসের ভিতর থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন—পাইছি! কর্নেল স্যার! পাইছি!

তিনি কর্নেলের কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখালেন। এবার দেখতে পেলাম, ওটা একটা ফায়ার আর্মস। কর্নেল ওটা পরীক্ষা করে দেখে বললেন—সিক্সরাউন্ডার রিভলবার! হুঁ, বিদেশি অস্ত্র। পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবার। জাহাজিবাবুর হাতে কেউ গুলি করার সময় এটা ছিটকে পড়েছিল। সে আজ খুঁজতে এসেছিল অস্ত্রটা। পুলিশের গাড়ি থেকে জঙ্গলের আড়ালে ওত পেতে বসেছিল। তারপর আমরা এসে গেলাম এবং আপনি জুতোর ছাপ আবিষ্কার করে এগিয়ে গেলেন। পুরো ঘটনাটা অঙ্কের মতো কষে ফেলা যায়।

—হঃ! বলে উল্লসিত প্রাইভেট ডিটেকটিভ লম্বা পায়ে গাড়ির কাছে এলেন। একটিপ নস্যি নিয়ে খিক খিক করে হাসলেন।—জয়ন্তবাবু কিছু বোঝলেন?

আমিও বললাম—হঃ!...

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কর্নেলের নির্দেশমতো এগিয়ে ডানদিকে একটা মোরাম বিছানো সংকীর্ণ রাস্তায় চললাম। চন্দ্রপুরগামী পিচরাস্তা বাঁদিকে এগিয়েছে। আমরা এবার ঘন জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। দু'ধারে ল্যাম্পপোস্ট এবং টেলিফোনের তার দেখা যাচ্ছিল। মিনিট সাতেক পরে সেই নদীর ওপর ছোটো ব্রিজ দেখা গেল। ব্রিজে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ কর্নেল বললেন—জাস্ট আ মিনিট জয়ন্ত! একটু থামো।

কর্নেল নেমে গাড়ির পিছনদিকে রাস্তার ডানদিকে উঁচু একটা গাছের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপরই দ্রুত এসে গাড়িতে উঠে বললেন—চলো! জিজ্ঞেস করলাম—কী দেখতে গিয়েছিলেন?

—অর্কিড।

—এখানে অর্কিড? এটা তো পাহাড়ি এলাকা নয়।

—জয়ন্ত! পরগাছা বললে তুমি বুঝবে। আসলে অর্কিড দু'রকম হয়। ভূমিজীবী আর পরজীবী। পরজীবী অর্কিডকেই আমরা পরগাছা বলি!

পিছনে হালদারমশাই মন্তব্য করলেন—কর্নেলস্যারের লগে-লগে ঘুরলে নলেজ বাড়ে।

ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সুদৃশ্য ফরেস্ট বাংলো চোখে পড়ল। একটা উঁচু জায়গার ওপর রঙিন ছবির মতো বাংলার পিছনের অংশ দোতলা। সামনে খোলা ছাদে বসে রাত্রিকালে অরণ্যের সৌন্দর্য দেখা যাবে।

হালদারমশাই বললেন—এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নিশ্চয় আছে। হাতিও থাকতে পারে। তাই না কর্নেলস্যার!

কর্নেল বললেন—বাঘ, ভালুক, হাতি যদি না-ও থাকে, ভূতপ্রেত অবশ্যই আছে।

আমরা দুজনে হেসে ফেললাম। একটুখানি চড়াইয়ের উঠে বাংলোর গেট। গেটের সামনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরা এক সুদর্শন আমার বয়সি যুবক দাঁড়িয়ে ছিলেন। করজোড়ে নমস্কার করে তিনি সহাস্যে বললেন—আমি এই ফরেস্টের রেঞ্জার সৌম্য চক্রবর্তী! কর্নেলসায়েব! আমি ভাবিনি চর্মচক্ষে আপনাকে দেখতে পাব। ভিতরে গাড়ি রাখার গ্যারাজ আছে। প্লিজ! ভিতরে আসুন।...

আমাদের জন্য দোতলার প্রশস্ত ঘরটি খালি রাখা হয়েছিল। সৌম্যবাবুর কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম চন্দ্রপুর থানার ও সি রাজেন্দ্র হাটিই এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে মাঝে মাঝে পর্যটক আসে। দল বেঁধে কিংবা একা। তবে শীতের সময় খুব কম লোকই বেড়াতে আসে। গত শরতে সব ঘর নাকি ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এটা ফরেস্ট বাংলো হলেও পর্যটন দফতরের সুপারিশে পর্যটকদের থাকতে দেওয়া হয়। নদীর দু'ধারে ঘন জঙ্গল শরৎকালে সবুজ হয়ে ওঠে। নদীর ধারে পিকনিক করারও অনুমতি দেওয়া হয়। তা ছাড়া শখের অ্যাডভেঞ্চারের জন্য মোগল ফৌজদার জাহান খাঁর কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আছে। প্রায় ছয় বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে কেল্লাবাড়ি ছিল। পূর্বপ্রান্তে দোমোহানির কাছে এখনও কিছু অংশ অটুট আছে, তা আমার দেখা হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপ বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে আছে। হালদারমশাই বাঘ-ভালুকের খবর জানতে উদগ্রীব ছিলেন।

সৌম্যবাবু বললেন—ভালুক না থাকলেও বাঘ আছে। একদল হরিণ এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বুনো শুয়োর, হনুমানের পাল, শেয়াল, সাপ এসব প্রাণীর নির্ভয় আশ্রয় এই জঙ্গল।

কফি পানের পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে খোলা ছাদে গেলেন। তারপর বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে থাকলেন। হালদারমশাই নস্যি নিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি বিছানায় চিৎপাত হলাম।

শীতের দিনের আয়ু কম। বেলা দেড়টার মধ্যে নিচের তলায় ডাইনিংরুমে খাওয়াদাওয়ার পর খোলা ছাদের ওপর চেয়ারে বসে রোদের আরাম নিচ্ছিলাম এবং কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে যেন ঝিমোচ্ছিলেন, এমন সময় একজন পরিচালক এসে খবর দিল, কর্নেলসায়েবের টেলিফোন আছে।

কর্নেল তখনই চলে গেলেন। তারপর হালদারমশাই বললেন—যত ভাবছি, তত জট পাকাইয়া যায়। আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনি কী কন, শুনি!

বললাম—কী ব্যাপারে?

গোয়েন্দাপ্রবর চাপা স্বরে বললেন—কর্নেল কইলেন জাহাজিবাবু ডানহাতে হরিবাবু গুলি করছে। এদিকে সুশীলা ট্যাক্সিতে বইয়া ছিল। তার মাথার পিছনে গুলি লাগল কেমনে? জাহাজিবাবু অরে গুলি করার জন্য রিভলবার তাক করছিল এবং গুলিও হয় তো করছিল। তারপর হরিবাবু অর হাতে গুলি করল। এখন কথা হইল গিয়া সুশীলাকে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করছে কেউ। নাঃ! অঙ্ক মিলছে না!

—এমন যদি হয়, সুশীলা কোনও কারণে গাড়ি থেকে নেমে সেই ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল?

—সুশীলা নামবে ক্যান? ক্যাপটেন সিংহরে কি অন্য গাড়িতে লইয়া গেছে হরিবাবু?

—হালদারমশাই! কলকাতায় একটা লাল মারুতি কয়েকবার আমার গাড়িকে ফলো করে বেড়াচ্ছিল। এমনকি গতকাল সকালে হাই ঝোপটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল?

—সুশীলা নামবে ক্যান? ক্যাপটেন সিংহরে কি অন্য গাড়িতে লইয়া গেছে হরিবাবু?

—হালদারমশাই! কলকাতায় একটা লাল মারুতি কয়েকবার আমার গাড়িকে ফলো করে বেড়াচ্ছিল। এমনকী গতকাল সকালে হাইওয়েতে তিতলিপুরের মোড় পর্যন্ত ফলো করেছিল।

হালদারমশাই নড়ে বসলেন।—তাহলে অঙ্ক ঠিক। হরিবাবুর একটা লাল মারুতি থাকতেই পারে। কোনও কারণে সেই গাড়ির বদলে ট্যাক্সি ভাড়া করছিলেন হরিবাবু। মারুতির ড্রাইভারেরে হরিবাবু ট্যাক্সিটারে ফলো করতে কইছিলেন। কিন্তু মারুতি বদলে ট্যাক্সি লইলেন ক্যান?

এরপর প্রাইভেট ডিটেকটিভ আরও কিছুক্ষণ অঙ্ক কষতে থাকলেন বা তাঁর থিয়োরি দাঁড় করাতে মগ্ন হলেন। ততক্ষণে রোদের আরামে আমার চোখে ভাত-ঘুমের টান এসে গেছে।

কর্নেলের আবির্ভাবে ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কর্নেল নিশ্চয়ই হালদারমশাইয়ের জল্পনা শুনতে পেয়েছিলেন। সকৌতুকে বলে উঠলেন—হালদারমশাই ট্যাক্সির পিছনে একটা লাল মারুতি এনে দাঁড় করিয়েছেন। বাঃ, এটা মন্দ না। জয়ন্তের কী মত হালদারমশাই?

বললাম—আমার কোনও মত নেই। হালদারমশাইয়ের থিয়োরি ওটা।

—হালদারমশাই! ও সি রাজেন্দ্রবাবুর কথাটা খেয়াল করে শোনেননি মনে হচ্ছে!

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিতভাবে বললেন—কী কথা?

—চন্দ্রপুর থেকে ব্রেকভ্যান এনে ট্যাক্সিটা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার সহজ মানে, ট্যাক্সিটি ওইখানে পৌঁছে বিগড়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার তাকে চালু করতে পারেনি।

আমি ও হালদারমশাই এক গলায় বলে উঠলাম—তাই তো!

কর্নেল চেয়ারে বসে বললেন—ততক্ষণে ক্যাপটেন সিংহের জ্ঞান ফেরার কথা। ট্যাক্সি চালু করা গেল না দেখে হরিবাবু, সুশীলা আর ভগত গাড়ি থেকে নেমেছিল। ক্যাপটেন সিংহকেও নামানো হয়েছিল। ওই অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক।

হালদারমশাই বললেন—সুশীলা যদি সেই বোপটার কাছে জঙ্গলের দিকে পিছন ফিরিয়্যা খাড়াইয়া থাকে, তা হইলে জাহাজিবাবুর গুলি প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জে তার মাথার পিছনে লাগবার কথা। কী কন?

—আপনার থিয়োরি ঠিক। এবার দরকার অন্য একটা গাড়ি। বিগড়ে যাওয়া ট্যাক্সির কাছে বেশিক্ষণ তো দাঁড়ানো ঠিক হত না। কারণ হরিবাবু ক্যাপটেন সিংহকে জোর করে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে। কিডন্যাপের ব্যাপার।

কথাগুলো কর্নেল কৌতুকের ভঙ্গিতে বলছিলেন। হালদারমশাই কিন্তু গম্ভীর মুখে শুনছিলেন। এবার উৎসাহে বললেন—ঠিক। ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! এইজন্যই আমি জয়ন্তবাবুরে কইছিলাম, এর পর দরকার একখান গাড়ি।

একটু হেসে বললাম—গাড়িটা অবশ্যই লাল মারুতি।

কর্নেল সায় দিলেন।—হুঁ। লাল টুকটুকে মারুতি।

গোয়েন্দাপ্রবর দ্বিগুণ উৎসাহে বললেন—জাহাজিবাবু অ্যাটাক করছিল। সুশীলা মরল। হরিবাবুর পালটা গুলিতে জাহাজিবাবুর হাত জখম হইল। রিভলভার ঘাসে গিয়া পড়ল। তখন সে পলাইয়া গেল। এখন কথা হইল গিয়া জাহাজিবাবুর এই এলাকায় দলবল থাকতে পারে। কী কন?

—শুনেছি আছে।

—সেইজন্য হরিবাবুদের ওখান থেইক্যা তখনই পলাইয়া যাওনের কথা। হঃ! আর একখান গাড়ি না পাইলে হরিবাবুরা পলাইবে ক্যামনে?

এসব কচকচি বা জল্পনা-কল্পনা আর আমার ভালো লাগছিল না। বললাম—ওসব কথা থাক কর্নেল। কে ফোন করেছিল জানতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল বললেন—চন্দ্রপুর থাকা থেকে ও. সি. রাজেন্দ্র হাটি আমাকে যেতে বললেন। জাহাজিবাবুকে জেরা করে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সে নাকি তিতলিপুরে সুনয়নী দেবীর খোঁজখবর নিতে যাচ্ছিল। রাস্তায় যানবাহন পায়নি। হঠাৎ ওই ট্যাক্সিটা এসে তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সিরই কোনও লোক তার দিকে গুলি ছোঁড়ে। সে ভয় পেয়ে জঙ্গলের ভিতর পালিয়ে যায়। আর—সুশীলা নামে কোনও মেয়েকে সে চেনে না। কোনও মেয়েকে সে ট্যাক্সিতে দেখেনি। তার মৃতদেহও দেখেনি।

বললাম—তা হলে কখন বেরোবেন? চন্দ্রপুর থেকে রাত্রিবেলা জঙ্গলের পথে ফিরে আসতে হবে। এখনই বেরিয়ে পড়া উচিত।

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন—জয়ন্তবাবুর চিন্তার কারণ নাই। থানা থেইক্যা পুলিশফোর্স আমাগো এসকর্ট কইর‍্যা আনব।

কর্নেল বললেন—মি. হাটিকে বলেছি, আপনারা জাহাজিবাবুকে জেরা চালিয়ে যান। আজ আমি থানায় যাচ্ছি না। ফরেস্ট বাংলোর দিকে আসবার সময় একটা গাছের ডালে আশ্চর্য প্রজাতির একটা অর্কিড দেখেছি। পায়ে হেঁটেই সেখানে যাব। জয়ন্ত ইচ্ছে করলে ভাতঘুম দিয়ে নিতে পারে।

বললাম—আর ভাতঘুম আসবে না। আপনার সঙ্গে অর্কিড দেখতে যাব।

গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমিও যামু! কর্নেলস্যার! গাছের ফাঁকে দেখছিলাম, একখান উঁচু দেউড়ি'এখনও খাড়াইয়া আছে। দেখতে ইচ্ছা করে।...

সেজেগুজেই বেরুতে হল। কারণ এখানে শীতের প্রকোপ যেন দোমোহানি এলাকার চেয়ে বেশি। অবশ্য এমনও হতে পারে, এই কয়েকদিনে শীতের দাপট বেড়েছে। দোমোহানি সেচবাংলোয় থাকলে হয়তো শীতের কামড়ে জব্দ হয়ে যেতাম। কারণ ওখানে বিস্তীর্ণ একটা জলাধার আছে।

ব্রিজ পেরিয়ে মোরামবিছানো রাস্তায় আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল সেই গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাছটা বিশাল এবং গুঁড়ি থেকে শাখাপ্রশাখা পর্যন্ত মোটা লতা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। লতাটার পাতা চওড়া। গুঁড়িকে ঢেকে ফেলেছে।

বিকেলের জঙ্গলে ছায়া ঘন হয়ে আছে। আমি অর্কিডটা খুঁজছিলাম। হালদারমশাই এদিকে-ওদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে সম্ভবত জাহাজিবাবুর সাঙ্গোপাঙ্গদের খুঁজছিলেন। তাঁর ডান হাত প্যান্টের পকেটে। অর্থাৎ তিনি তাঁর ফায়ার আর্মসের বাঁটে হাত রেখেছেন। কিন্তু কেউ ঝোপঝাড় বা গাছের আড়াল থেকে গুলি ছুঁড়লে তিনি কী করবেন?

কথাটা ভেবে আমার শরীরে মুহূর্তে আতঙ্কের শিহরন জাগল। এদিকে কর্নেল রাস্তা থেকে নেমে পিঠের কিটব্যাগের চেন টেনে একটা ছোটো কাটারি বের করলেন। ওটা একটা 'জাঙ্গল-নাইফ'—যা তাঁর সামরিক জীবনের একটা স্মারক বলে তিনি গর্ব করেন। কাটারির গড়ন কতকটা ভোজালির মতো। সেটা দিয়ে তিনি গুঁড়িতে জড়িয়ে থাকা লতা-পাতা ছাঁটতে শুরু করলেন।

এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় আপনার অর্কিড? লাতাপাতার ভিতরে লুকিয়ে আছে নাকি?

কর্নেল জবাব দিলেন। না গুঁড়ির পিছনে জঙ্গলের দিকে মাটি পর্যন্ত লতাপাতার খানিকটা অংশ ছেঁটে ফেলে আপন মনে বললেন—হুঁ। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তা-ই।

হালদারমশাই কাছে গিয়ে বললেন—কী কর্নেলস্যার?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন—বিদ্যুতের তার।

—অ্যাঁঃ?

—আসার সময় বাইনোকুলারে ব্যাপারটা চোখে পড়ছিল। বলে কর্নেল রাস্তায় উঠে এলেন।—ওই দেখুন! এই গাছটার উপরের ডালপালা ছেঁটে বিদ্যুতের চারটে লাইন গেছে ফরেস্ট বাংলোর দিকে। ওই তারগুলো যাতে গাছের কোনও অংশের সঙ্গে ছোঁয়া না লাগে, তাই গাছটার অনেকটা অংশ কেটে রাখা হয়েছে। বাতাসে বা ঝড়ের সময় দৈবাৎ গাছটার কোনও অংশের সঙ্গে ছোঁয়া লাগলেই ট্রান্সফর্মার জ্বলে যাবে। কারণ সজীব উদ্ভিদ বিদ্যুৎ পরিবাহী। এবার লক্ষ্য করুন। দুটো লাইন অর্থাৎ নেগেটিভ-পজিটিভের সঙ্গে নন-কন্ডাক্টিভ রবারে মোড়া একটা তার জোড়া আছে। সেই তার গাছের লতাপাতার আড়াল দিয়ে মাটিতে এসে ঢুকেছে।

গোয়েন্দাপ্রবর গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন—কী কাণ্ড! মাটির তলা দিয়্যা ইলেকট্রিক লাইন চুরি করছে কেউ। কর্নেলস্যার! জঙ্গলের মধ্যে তাহলে কোনও ঘরে বিদ্যুৎ লইয়া গেছে।

আমি বললাম—হয়তো ফরেস্টগার্ডদের কোনও গোপন ঘাঁটি আছে জঙ্গলে। কাঠচোরদের জন্য গার্ডরা সেখানে পাহারা দেয়।

কর্নেল বললেন—জঙ্গলে এমন পাহারার ব্যবস্থা থাকতেই পারে। কিন্তু সে-খবর রেঞ্জার সৌম্যবাবু ছাড়া বাংলোর কেউ সম্ভবত জানে না। সৌম্যবাবু তো দুপুরে জিপ নিয়ে চন্দ্রপুরে তাঁর অফিসে চলে গেছেন।

হালদারমশাই বললেন—কর্নেল স্যার! ফরেস্টগার্ডদের ঘাঁটি খোঁজার দরকার কী?

—দরকার আছে। কিন্তু ঘন জঙ্গলে সেই ঘাঁটিটা কোথায়, তা খুঁজে বের করা কঠিন। রোদ কমে আসছে।

—তা হইলে আমরা মাটি খুঁড়িয়া তারটারে ফলো করি?

কর্নেল হেসে উঠলেন।—কাজটা অন্তত হাফডজন মজুরের। কোদাল দরকার। বলে তিনি রাস্তার উত্তরদিকে—যেদিক থেকে আমরা ফরেস্ট বাংলোতে এসেছিলাম, সেই দিকটা দেখতে থাকলেন। বললেন—উত্তর থেকে বাতাস বইছে। কী একটা শব্দ শুনলাম যেন। থানা থেকে মি. হাটি জিপে চেপে আসছেন নাকি?

তারপরই তিনি চাপাস্বরে বলে উঠলেন ফের—মাই গড! লাল মারুতি!

হালদারমশাই ও আমি এক গলায় বললাম—কই? কই?

—বাঁদিকে জঙ্গলে ঢুকে গেল। জয়ন্ত! হালদারমশাই! রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে আমাদের নামতে হবে। ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগোব। কুইক! বলে কর্নেল রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম।

বারো

কখনও গুঁড়ি মেরে কখনও ঘন গাছের আড়ালে একটুখানি দাঁড়িয়ে কর্নেল গাড়িটাকে খুঁজছিলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি চাপাস্বরে বললেন—এখানে গাড়িটা রাস্তা থেকে নেমে জঙ্গলে ঢুকেছে। চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা ঘাসে ঢাকা জায়গা দিয়ে গেছে গাড়িটা। কিন্তু আমরা ফাঁকা জায়গায় যাচ্ছি না।

বলে তিনি আমাদের থামতে ইশারা করলেন। তারপর বাঁ দিকে এগিয়ে ঝোপঝাড়ে থাকা একটু ধ্বংসস্তূপে উঠে গেলেন। বুঝলাম, কর্নেল বাইনোকুলারে গাড়িটা খুঁজবেন। কিন্তু ক্রমে ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে কি গাড়িটা ওই যন্ত্র দিয়ে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

কিন্তু অসম্ভব হয়তো কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে। তিনি সাবধানে স্তূপ থেকে নেমে এলেন। হালদারমশাই ফিশফিশ করে জিজ্ঞেস করলেন—কিছু দ্যাখলেন?

কর্নেল বললেন—একটা ভাঙা দেউড়ি এখনও খাড়া হয়ে আছে। তার নিচের দিকে লাল মারুতির একটুখানি অংশ দেখা যাচ্ছে। সাবধানে আসুন আপনারা। জয়ন্ত তোমার ফায়ার আর্মস এনেছ তো?

বললাম—এনেছি।

—হালদারমশাই?

—হঃ! জঙ্গলে নিরস্ত্র হইয়া ঢুকব ক্যান?

—কিন্তু বিন্দুমাত্র শব্দ নয়। দেখছেন তো? সবখানে ঝরাপাতা পড়ে আছে। যত সময় লাগুক, নিঃশব্দে এগোতে হবে। আর্মস রেডি রাখুন।

শীতের জঙ্গলে ঝরা পাতার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটা খুব সহজ কাজ নয়। তবে আমরা ঝোপঝাড় এবং কেল্লার ধ্বংসস্তূপের আড়ালে গুঁড়ি সময় লাগল। তারপর একটা স্তূপের আড়ালে লাল মারুতিটা দেখতে পেলাম। একটা উঁচু টুটাফাটা এবং আগাছাঢাকা দেউড়ি কাছাকাছি দেখা গেল। গাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। ধ্বংসস্তূপের পাশ কাটিয়ে প্রথমে কর্নেল তাঁর সামরিক জীবনের গেরিলাযুদ্ধের একটা কৌশল যেন দেখিয়ে দিলেন।

পিছন থেকে লোকটার ঘাড়ের ওপর ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। এখন তাঁর বাঁ হাতে রিভলভার। আর লোকটা তখনই নিঃশব্দে নেতিয়ে পড়ে গেল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন—জয়ন্ত! আমার কিটব্যাগের চেন টেনে দড়ি বের করো।

হালদারমশাই অস্ত্রহাতে চিতাবাঘের মতো চারদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। দড়ি বের করে চেন এঁটে দিলাম। কর্নেল লোকটার দুই হাত টেনে পিঠমোড়া করে বাঁধলেন। দুটো পাও বেঁধে ফেললেন। লোকটা গাড়ির ড্রাইভার, তা বোঝা গেল। তার হাত থেকে চাবির গোছা ছিটকে পড়েছিল। চাবি কর্নেল কুড়িয়ে নিলেন।

এবার দেখলাম, দেউড়ির অন্য পাশে বৌদ্ধস্তূপের মতো দেখতে একটা গম্বুজঘর। এ ধরনের গম্বুজঘর দিল্লি, আগ্রা এবং অন্যত্র দেখেছি। এগুলো মোগল আমলে প্রহরীদের জন্য তৈরি করা হত। এই গম্বুজঘরটা ঘন লতাগুল্মে ঢাকা। মুখের দিকটায় লতার ঝালর ঝুলে আছে। তার ফাঁকে আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে।

কর্নেলের নির্দেশে হালদারমশাই আর আমি লোকটাকে ধরাধরি করে একটু তফাতে আরেকটা ধ্বংসস্তূপের আড়ালে রেখে এলাম।

কর্নেল বললেন—আর্মস রেডি করে আমার পিছনে আসুন হালদারমশাই! জয়ন্ত! তুমিও এসো।

ঝুলন্ত লতাপাতার ঝালর একটু ছেঁড়া দেখে বোঝা গেল, কেউ বা কারা গম্বুজঘরে ঢুকেছে। গুঁড়ি মেরে স্যাঁতসেতে শ্যাওলাঢাকা হাত চার-পাঁচ মেঝের পর সিঁড়ির ধাপ দেখা গেল। নিচে থেকে আলোর ছটা ধাপে পড়েছে। শেষ ধাপে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। সামনে বন্ধ দরজা। দরজার ফাটল দিয়ে আলো বেরিয়ে গম্বুজঘরের মেঝে পর্যন্ত ছটা ফেলেছে।

ভিতর থেকে চাপা গলায় কেউ কাকে ধমক দিচ্ছে—এই শেষবারের জন্য বলছি, সঠিক জবাব দাও।

জড়ানো গলায় এবং কাতর স্বরে কেউ বলল—আমাকে আর কষ্ট দিয়ো না। মেরে ফ্যালো।

—তবু কথাটা বলবে না? তাহলে থাকো তুমি এই পাতালঘরে। আলোর লাইন কেটে দিয়ে দরজায় তালা এঁটে চলে যাই। কেমন?

—অজু! অজু! দয়া করো ভাই। একটু দয়া করো।

—কোনও দয়া নয়। বিশ্বাসঘাতকের জন্য এই শাস্তিটাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।

আচমকা ঘরের আলো নিভে গেল। তারপর কপাটের ফাটল দিয়ে টর্চের আলো দেখা গেল। আর হ্যাঁচকা টানে কেউ ভিতর থেকে দরজা খুলতেই কর্নেল তাঁর বিশাল শরীরের ধাক্কায় লোকটাকে ধরাশায়ী করলেন। আমি টর্চ জ্বাললাম। হালদারমশাই একলাফে পাতালঘরে ঢুকে ধরাশায়ী লোকটাকে দেখে বলে উঠলেন—অ্যাঁ! এই হালা তো দেখি সেই হরিবাবু।

হরিবাবুর হাতের টর্চ ছিটকে পড়ে মেঝেয় আলো ছড়াচ্ছিল। কর্নেল বললেন—হালদারমশাই! আপনার হরিবাবুর জ্যাকেটের ভিতর-পকেটে শক্ত কী একটা ভরা আছে। ওটা নিশ্চয় ফায়ার আর্মস! বের করে নিন।

গোয়েন্দাপ্রবর এ-কাজে পটু। একটা ফায়ার আর্মস জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করে তিনি গর্জন করলেন—ইচ্ছা করে দিই হালার খুলি উড়াইয়া।

কর্নেল হরিবাবুর বুক থেকে উঠে তার জামার কলার ধরে তাকে দাঁড় করালেন। হরিবাবু লাল চোখে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ছিলেন। কর্নেল তার ডান কানের পিছনে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বললেন—একটুও নড়বে না হরিবাবু। নড়লেই মুণ্ডু উড়ে যাবে। এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো আমার সঙ্গে চলো। হালদারমশাই! আপনি আমার পাশে এসে হরিবাবুকে নিয়ে যেতে সাহায্য করুন। জয়ন্ত! তুমি ক্যাপটেন সিনহাকে নিয়ে এসো।

টর্চের আলোয় ঘরের কোণে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। উনিই সেই ক্যাপটেন এস কে সিনহা। তাঁর কাছে গেলে তিনি কান্নাজড়ানো গলায় বললেন—ও হরিবাবু নয়। ওর নাম অজয়েন্দু রায়।

হালদারমশাই শুধু বললেন—অ্যাঁ! তারপর কর্নেলের সঙ্গে অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের কাঁধের কাছে অন্যদিকের কলার ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকলেন।

আমি বুদ্ধি করে সুইচ খুঁজে আবার আলোটা জ্বেলে দিলাম। এবার চোখে পড়ল, ঘরের মেঝেয় কয়েকটা প্রকাণ্ড প্যাকেট। একটা বস্তায় কী সব আছে। বস্তার মুখ বাঁধা। কিন্তু সিঁড়ি থেকে কর্নেলের তাড়ায় ক্যাপটেন সিনহাকে ধরে ওঠালাম। পা ফেলতে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল।

গম্বুজঘর থেকে বেরিয়ে কর্নেল আমাকে তাঁর প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে লাল মারুতির চাবি বের করে নিতে বললেন।—জয়ন্ত! ক্যাপটেনসাহেবকে সামনের সিটে বসাও। অজয়েন্দু ওরফে হরিবাবুকে পেছনে ঢোকাচ্ছি।

হালদারমশাইয়ের সাহায্যে কর্নেল পিছনের দুটো সিটের মাঝখানে যেন গুঁজে দিলেন মোটাসোটা নাদুসনুদুস অজয়েন্দু নারায়ণ রায়কে। এখন তার পরনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট।

কর্নেল বললেন—আমি হরিবাবুকে সামলাচ্ছি। আপনি ড্রাইভারকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসুন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ লম্বা ধ্বংসস্তূপটার কাছে গিয়ে খি খি করে হাসলেন—ভগত মরে নাই কর্নেলস্যার। বাঁধন খুলবার চেষ্টা করতাছে। এই ব্যাটা! মিলিটারি বাঁধন তুই খুলবি ক্যামনে? আয়! তরে মড়া কইর‍্যা কান্ধে চাপাই।

যে কথা, সেই কাজ। আমি বললাম—ওকে এটুকু গাড়িতে কোথায় ঢোকাবেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—এ গাড়ির ডিকিতে ঢোকাতে হলে ওকে কেটে টুকরো টুকরো করতে হবে।

হাত-পা বাঁধা ভগত হালদারমশাইয়ের কাঁধ থেকে ঝুলছিল। এ-কথা শুনে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল।

কর্নেল বললেন—বরং এক কাজ করুন হালদারমশাই। ওকে হরিবাবুর কোলের ওপর দিয়ে লম্বালম্বি শুইয়ে দিন। আপনি আমার পাশের সিটে বসে ওর মুণ্ডুটা ধরে থাকুন।

সে এক অদ্ভুত অবস্থা। পিছনের দুটো সংকীর্ণ সিটে ডানদিকে কর্নেল, বাঁদিকে হালদারমশাই এবং মাঝখানে অজয়েন্দু রায়, তার দুই পা দুমড়ে তলায় ঢুকে আছে। বেচারা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এদিকে তার বুকের ওপর বোঝা তার বিশ্বস্ত অনুচর ভগত। হালদারমশাই বললেন—হালা এই হাত দিয়া আমারে মারতে ড্যাগার তুলছিল!

কর্নেলের নির্দেশে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম। আমার গাড়িটা পুরোনো ফিয়াট। কিন্তু কালেভদ্রে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার মারুতি জিপসি আমাকে চালাতে হয়েছে। এক্ষেত্রে একটাই অসুবিধে। জায়গাটা জঙ্গল হেডলাইটে ফাঁকা জায়গা খুঁজে এগোতে হচ্ছিল। মারুতির মতো খুদে গাড়িতে আটজন লোক। যেকোনও মুহূর্তে উলটে যাওয়ার ভয়ও ছিল।

মোরামরাস্তায় সবেগে উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কর্নেল! চন্দ্রপুরের পথ আমি চিনি না। থানা কোথায় তা-ও জানি না।

আমার পাশ থেকে ক্যাপটেন সিংহ জড়ানো গলায় বললেন—চলুন। আমি চিনিয়ে দেব।

চন্দ্রপুরগামী পিচরাস্তায় পৌঁছোনোর পর সামনে দূরে একটা গাড়ির জোরালো হেডলাইট দেখা যাচ্ছিল। পিছন থেকে হালদারমশাই বললেন—জয়ন্তবাবু! সাবধান! এইটুখান রাস্তা।

আমি হর্ন বাজাতে বাজাতে এবং হেডলাইট কখনও নিভিয়ে কখনও জ্বালিয়ে এবার গতি কমিয়ে এগোচ্ছিলাম। একটু পরেই আমাদের গাড়ির পথ আটকে সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল এবং টর্চের আলো পড়ল আমাদের ওপর। তারপরই সামনের গাড়ি থেকে ও সি রাজেন্দ্র হাটিকে রিভলভার উঁচিয়ে নামতে দেখলাম। কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে সহাস্যে বললেন—আসুন মি. হাটি! আপনার হাতে অমূল্য সম্পদ দুটো তুলে দিই।

রাজেন্দ্র হাটি এসে আমাদের গাড়ির ভিতর টর্চের আলো ফেললেন, যদিও কর্নেল দরজা খুলে নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারুতির ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছিল। মি. হাটি মুচকি হেসে বললেন—কোনটা কে মি. হালদার?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন—মি. হাটি! আগে এই মালটারে হ্যান্ডকাপ পরানো দরকার। এটা হইল গিয়া হরিবাবু—মানে, অজয়েন্দু নারায়ণ রায়। আর যারে বাইন্ধা মড়ার মতো লম্বা করছি, এটা হইল গিয়া অর চ্যালা ভগত।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে টানছিলেন। পুলিশের জিপ থেকে ততক্ষণে একদঙ্গল কনস্টেবল নেমে লাল মারুতিটাকে ঘিরে ধরেছে। মি. হাটির নির্দেশে অজয়েন্দু এবং ভগতকে টেনে তারা বের করল। হাতকড়ি পরিয়ে অজয়েন্দু রায়কে টেনে নিয়ে গেল। ভগতের পায়ের বাঁধন খোলা যাচ্ছিল না। অগত্যা কর্নেল তাঁর মিলিটারি বাঁধন খুলে দিলেন। তাকেও কনস্টেবলরা পুলিশ জিপের পিছনে ঢোকাল।

মি. হাটি বললেন—সামনের সিটে ইনি কে?

কর্নেল বললেন—ইনিই ক্যাপটেন এস কে সিনহা। অজয়েন্দু রায় এঁকে কলকাতা থেকে কিডন্যাপ করে এনেছিল। বাকি কথা যথাসময়ে শুনবেন। চলুন। আপনার ডেরায় গিয়ে কফি খাব। তারপর অন্য কথা।

পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করে এগোচ্ছিলাম। পিছনের সিটে এবার আরাম করে কর্নেল ও হালদারমশাই বসেছেন। হালদারমশাই বললেন—কর্নেল স্যার! ওই পাতালঘরে চোরাই জিনিস আছে মনে হয়। মি. হাটিরে জানান দেওয়া উচিত ছিল। ক্যান কী, এই সুযোগে অগো চ্যালারা যদি জিনিসগুলি লইয়া যায়?

কর্নেল বললেন—পাতালঘরটার দিকে আপাতত কেউ পা বাড়াবে না।

—কর্নেলস্যার! আমার ধারণা, পাতালঘরটার কথা জাহাজিবাবুও জানে। অজয়েন্দু রায়ের লগে অর বন্ধুতা ছিল। বর্ডার এলাকায় দুইজনেই চোরাকারবার করত। আপনি কী কন?

—ঠিক বলেছেন।

—কিন্তু অগো বন্ধুতা নষ্ট হইল ক্যান?

—পরে সব খুলে বলব। ক্যাপটেন সিনহার কাছে গচ্ছিত জিনিসটা জাহাজিবাবু চুরি করার পর জাহাজিবাবু সম্ভব অজয়েন্দু রায়ের সঙ্গে আর দেখা করত না। এদিকে অজয়েন্দুর সন্দেহ হয়েছিল, ক্যাপটেন সিনহাই সেই জিনিস গোপনে বেচবার চেষ্টা করছেন। তাই সুশীলার সাহায্যে ক্যাপটেন সিনহাকে সে কিডন্যাপ করল।

ক্যাপটেন সিনহা বললেন—আমার এই দুরবস্থার জন্য সুশীলাই দায়ী। মেয়েটার জন্য কষ্ট হয়। কিন্তু শয়তানের ফাঁদে পড়লে মানুষকে মরতে হয়। হতভাগিনী বেঘোরে মারা পড়ল।

কর্নেল বললেন—ট্যাক্সি খারাপ হওয়ার পর সুশীলা বেরিয়েছিল। তাই না?

—হ্যাঁ। তারপর গুলির শব্দ শুনলাম। সুশীলা ঝোপের ওপর পড়ে গেল। তারপর আবার গুলির শব্দ হল। কিন্তু তখন কে কাকে গুলি করছে বুঝতে পারিনি। আমাকেও গুলি করে মারবে ভেবে ঈশ্বরকে ডাকছিলাম।

—এই মারুতি গাড়িটা কোন দিক থেকে এসেছিল, আপনি দেখেছিলেন?

—না। তবে অজয়েন্দুর হাতে সেলফোন দেখেছিলাম। আমার ধারণা, ওই ফোনে সে গাড়িটাকে আনতে বলেছিল।

—তারপর আপনাকে এই গাড়িতে চাপিয়ে অজয়েন্দু চন্দ্রপুর নিয়ে গিয়েছিল?

—তাই হবে। মাথা তখন ঝিমঝিম করছিল। শুধু মনে আছে, একটা বাড়ির দোতলায় আমাকে খেতে দিয়েছিল।

—তারপর আজ বিকেলে আপনাকে এই গাড়িতে চাপিয়ে তিতলিপুরের জঙ্গলে নিয়ে এসেছিল।

—হ্যাঁ। অজয়েন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, শম্ভু আর আমি ওর চোরাই মাল বেচে অনেক টাকা পেয়েছি। শম্ভুকে খুঁজে না পেয়ে অজয়েন্দু আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছিল। নিশ্চয় সুশীলাকে টাকা খাইয়ে বশ করেছিল সে।

—আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা জিনিসটা কী, তা আপনি কি জানেন?

—জানতাম। কায়রো মিউজিয়াম থেকে চুরি করে আনা একটা পার্চমেন্ট। পেতলের নলে সেটা ভরা ছিল। তখন অজয়েন্দু ফেরারি আসামি। গোপনে একরাত্রে আমার কাছে ওটা রাখতে এসেছিল।

—ওটার সঙ্গে কোনও ফলক ছিল না?

—না। ...ও হ্যাঁ। অজয়েন্দু বলেছিল, একটা ব্রোঞ্জের ফলকও ছিল। সেটা শম্ভু হাতিয়ে নিয়েছিল।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—অজয়েন্দু রায় ঠিক কথা বলেনি। সে নিজেই ওটা তার দাদা দীপনারায়ণকে রাখতে দিয়েছিল। দীপনারায়ণ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শম্ভুকে ওটা বেচবেন বলে টাকাকড়ি অগ্রিম নিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সেটা হারিয়ে যায়। সেই আক্রোশে শম্ভু সম্প্রতি এক রাত্রে দীপনারায়ণবাবুকে খুন করেছে।

—আমি কিছু জানি না। বলে ক্যাপটেন সিনহা আমার দিকে তাকালেন—বাবা! একটু জল খাওয়াতে পারো? গলা শুকিয়ে গেছে।

পিছনে থেকে কর্নেল তাঁর জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। ক্যাপটেন সিনহা অতিকষ্টে কিছুটা জল খেলেন। কিছুটা তাঁর প্যান্ট ভিজিয়ে দিল।...

চন্দ্রপুর থানা থেকে পুলিশের দুটো গাড়ি এসেছিল। একটা গাড়ি আমায় ও হালদারমশাইকে ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দিয়েছিল। কর্নেল অন্য গাড়িতে ও. সি. মি. হাটিকে তিতলিপুর জঙ্গলে

সেই পাতালঘর দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ক্যাপটেন সিংহকে চন্দ্রপুরে একটা নার্সিংহোমে রাখা হয়েছিল।

গোয়েন্দাপ্রবরের খুব ইচ্ছা ছিল, তিনিও কর্নেলের সঙ্গে যাবেন। কিন্তু কর্নেল বলেছিলেন—আপনি আর জয়ন্ত একত্র থাকা দরকার। এখনও আমরা বিপদের মধ্যে আছি। জাহাজিবাবুর গ্যাংয়ের লোকেরা সবাই ধরা পড়েনি।

কর্নেল ফিরে এসেছিলেন রাত এগারোটায়। পাতালঘরে দেশবিদেশের কিছু দেবমূর্তি, সোনাদানার অলংকার আর কয়েক প্যাকেট বিস্ফোরক ছিল। আর একটা কথা—সেই ট্যাক্সিচালকের খোঁজ পাওয়া গেছে। লালবাজার থেকে নরেশ ধর চন্দ্রপুর থানায় জানিয়েছেন কাল সকালে তাকে নিয়ে চন্দ্রপুরে আসছেন।

জিজ্ঞেস করেছিলাম—কালকের দিনটাও এখানে আমরা থাকব নাকি?

—না জয়ন্ত! আমরা কাল সকালেই কলকাতা ফিরব। হালদারমশাই তাঁর মক্কেল ক্যাপটেন সিনহার জন্য থেকে যেতে পারেন অবশ্য!

গোয়েন্দাপ্রবর মাথা নেড়ে বলেছিলেন—না কর্নেলস্যার! আমার মক্কেল নার্সিংহোমে আছেন। পুলিশ ওনার দেখভাল করতাছে। আমার কাজ শেষ।

আমি বললাম—আচ্ছা কর্নেল! মিশরের রানি নেকারতিতির চিঠি আর সেই ফলকটার কী ব্যবস্থা করবেন?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—বেচলে কোটিপতি হতাম। কিন্তু অত টাকা নিয়ে করবটা কী? তার চেয়ে ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রকের মধ্যস্থতায় মিশরের রাষ্ট্রদূতের হাতে সমর্পণ করব। দেখব, কী হইচই পড়ে যায়। পৃথিবী সব দেশের টিভিতে সেই দৃশ্য দেখা যাবে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ খি খি করে হেসে বললেন—আমাগো য্যান বাদ দিবেন না কর্নেলস্যার! কী কন জয়ন্তবাবু?

সায় দিয়ে বললাম—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই।...

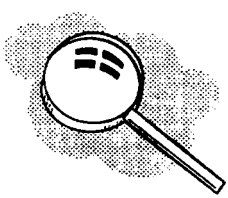

জুতো রহস্য

ভদ্রলোক দরজার পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "জুতো পায়ে ঢুকতে পারি স্যার?"

"নিশ্চয় পারেন। তবে খুলে রেখে এলেও আপনার নতুন জুতো যে চুরি যাবে না, সে-গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।"

"অ্যাই! তা হলে যথাস্থানেই এসেছি।" বলে ভদ্রলোক হন্তদন্ত ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। "আমার ভাগ্নে গোকুল স্যার, আপনি চেনেন ওকে—বাবুগঞ্জ ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার। আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল, এর কিনারা করতে আপনিই পারবেন।"

"জুতো চুরির?"

"আজ্ঞে।"

"ক'জোড়া চুরি গেছে এ-পর্যন্ত?"

"তিনজোড়া।" ভদ্রলোক করুণমুখে বললেন, "এ-বাজারে একজোড়া চামড়ার জুতোর দাম চিন্তা করুন স্যার। এক সপ্তায় তিন-তিনজোড়া জুতো লোপাট। গত রোববার থেকে শুরু। রোববার সন্ধেবেলায়। তারপর বিস্যুদবার ঠিক সেই সন্ধেবেলায় আবার লোপাট। শুক্কুরবার ফের কিনলাম। ফের সেদিনই সন্ধেবেলা লোপাট হয়ে গেল। এ কেমন চোর স্যার, সবার জুতো ঠিকঠাক পড়ে থাকে, আর আমার জুতোই ব্যাটাচ্ছেলে নিয়ে পালায়? নতুন জুতো তো আরও কত লোকে পরে যায়। তাদের জুতো ভুলেও ছোঁয় না। খালি আমার জুতো!"

"ঠাকুরবাড়ির দরজা থেকে?"

"ঠিক ধরেছেন স্যার। রাজাদের ঠাকুরবাড়ি। কবে ওঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন। দালান-কোঠা সবই ধসে পড়েছে। শুধু ঠাকুরবাড়িটাই কোনওরকমে টিকে ছিল। পোড়া খাঁ-খাঁ অবস্থা। দেবতার নামে জমি আছে! কিন্তু পুজো-আচ্চা বন্ধ ছিল। সেবায়েত থাকলে কী হবে? পায়ে বাত। চলাফেরা করতে পারে না। নিজের ঘরে শুয়েই নমো-নমো। বুঝলেন তো স্যার?"

"বুঝলাম! তারপর কোনও সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হল ঠাকুরবাড়িতে?"

"অ্যাই!" ভদ্রলোক নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।"

"তিনি আসার পর রোজ সন্ধে থেকে শাস্ত্রপাঠ-কথকতা-কীর্তনের আসর বসছিল?"

"আজ্ঞে।" ভদ্রলোক আবার নড়ে বসলেন। "গোকুল যা বলছিল—"

"আপনার নাম কী?"

"পাঁচুগোপাল সিংহ।"

"আপনার বাবার নাম?"

"আজ্ঞে যদুগোপাল সিংহ। তিনি আমার ছোটবেলায়—"

"আপনার ঠাকুরদার নাম?"

'জয়গোপাল সিংহ।"

"তিনি কী করতেন?"

"তিনি রাজবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।"

"খাজাঞ্চি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। খাজাঞ্চি মানে ক্যাশিয়ার স্যার। আজকাল খাজাঞ্চি বললে—"

"আপনার বাবা কী করতেন?"

"রাজবাড়ির সেরেস্তাদার—মানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন।"

"আপনি কী করেন?"

"রেলে টিকিটচেকার ছিলাম। গত মাসে রিটায়ার করে পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি। আমার বিধবা দিদি—গোকুলের মা স্যার। দিদিই আমাদের বাড়িতে থাকত। আমি আসার পর সে গোকুলের সরকারি কোয়ার্টারে চলে গেছে। অত করে বললাম। থাকল না। বলে কী, আর এ-বাড়িতে ভূতের অত্যাচার সইতে পারবে না।"

"ভূতের অত্যাচার?"

" আজ্ঞে!" ভদ্রলোক চাপা গলায় বললেন, "রাতবিরেতে কীসব অদ্ভুত শব্দ। কুকুর চ্যাঁচালেই থেমে যেত। তবে প্রথম প্রথম গা করিনি। শেষে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলাম। তাতেও কাজ হল না। এমন সময়—"

"সাধুবাবার আবির্ভাব। কাজেই তাঁর শরণাপন্ন হলেন।"

"হলাম। কিন্তু সাধুবাবার কৃপায় ভূতের অত্যাচার যদি বা বন্ধ হল, হঠাৎ এই আরেক উপদ্রব শুরু হয়ে গেল। জুতো-চুরি। তিন তিনজোড়া জুতো স্যার।"

"সাধুবাবা কোনও আস্কারা করতে পারলেন না?"

ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। "আস্কারা করতে গিয়েই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড স্যার। কাল শনিবার সকালে ঠাকুরবাড়ির যে ঘরটায় সাধুবাবা থাকতেন, সেই ঘরের বারান্দায় চাপ-চাপ রক্ত দেখা গেল। সারা বাবুগঞ্জে হুলুস্থুলু। পুলিশ এল। রক্তের ছাপ পেছনকার দরজার ঘাটেও পাওয়া গেল। নিচে গঙ্গা। পুলিশ বলল, বডি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। আমি এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। শেষে গোপনে গোকুলকে সব বললাম। তখন গোকুল—"

"আপনার বাড়িতে আর কে থাকে?"

"কেউ না স্যার। আমি একা থাকি। স্বপাক খাই। বরাবর নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস আছে।"

"আপনি যে রোজ সন্ধেয় বাড়ি থেকে সাধুবাবার আসরে যেতেন—"

"কাছেই স্যার। খুব কাছে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনার কী মনে হতো না বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে?"

ভদ্রলোক হাসবার চেষ্টা করে বললেন, "ভুলো স্যার। ভুলোর চ্যাঁচানি যে একবার শুনেছে, সে-ই কানে আঙুল গুঁজে পালাবে।

"ভুলো কোনও কুকুরের নাম?"

"আজ্ঞে। ঠিক ধরেছেন। গোকুল যা-যা বলছিল—"

"ভুলোকে আপনি কোথায় পেলেন?"

"দিদির পোষা দিশি কুকুর। দিদি চলে গেলেও ভুলো চলে যায়নি।"

"তা বলে ভুলো এখন আপনার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?"

"অ্যাঁ?" ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। "তাই তো! ওর কথা কাল থেকে আমার খেয়ালেই নেই। ভুলোকে আমি কাল থেকে দেখেছি, না দেখিনি? হুঁ, দেখিনি। কী আশ্চর্য। ভুলো কি তাহলে দিদির কাছে চলে গেছে? অকৃতজ্ঞের কাণ্ড দেখছ?"

"আপনি ফিরে গিয়ে ওর খোঁজ নিন। দেরি করবেন না।'"

পাঁচুগোপালবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আর একটা কথাও না বলে হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।.....

এতক্ষণ চুপচাপ বসে এইসব কথা শুনছিলাম। এবার দেখলাম আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ এবং রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছেন। চওড়া টাক বড্ড বেশি চকচক করছে। একটু হেসে বললাম, "আশ্চর্য কর্নেল! আপনি অন্ধকারে ঢিল ছোড়েন এবং দিব্যি সেই ঢিল লক্ষ্যভেদ করে।"

কর্নেল চোখ খুলে জোরে মাথা দোলালেন। "অন্ধকারে? নাহ জয়ন্ত! আমি আলোতেই ঢিল ছুড়েছি।"

"জুতো-চুরির কথা আপনি জানতেন তাহলে?"

"নাহ। ভদ্রলোককে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে গঙ্গার ধারে ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার গোকুলবাবুকে চিনি। গত এপ্রিলে বাবুগঞ্জে উনি আমাকে কয়েকটা অর্কিডের খোঁজ দিয়েছিলেন।" কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটি যত্ন করে ধরিয়ে বললেন, "জুতোর ব্যাপারটা তুমিও আঁচ করতে পারতে, যদি ওঁর কথাগুলো লক্ষ করতে। তাকে বুঝে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর বেরিয়ে আসে।"

"কিন্তু সাধুবাবার ব্যাপারটা?"

"ডার্লিং! বরাবর দেখে আসছি, কাগজের লোক হয়েও তুমি কাগজ খুঁটিয়ে পড়ো না। তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকাতেই বাবুগঞ্জের সাধুবাবা নিখোঁজ এবং রক্তের খবর বেরিয়েছে।"

"বেশ। কিন্তু কুকুরের ব্যাপারটা?"

"পাঁচুগোপালবাবুর মুখেই শুনেছ, কুকুর চ্যাঁচালে ভূতুড়ে শব্দ থেমে যেত। কাজেই একটা কুকুর থাকার চান্স ছিল।"

"তাহলে ভূত আসলে জুতো চুরি করতেই আসত।"

"বাহ!" কর্নেল হাসলেন। "ক্রমশ তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।"

"রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা। কুকুরটা নিপাত্তা হয়ে গেল সাধুবাবার মতো?"

"এবং তিনজোড়া জুতোও নিপাত্তা হয়ে গেছে।"

"কিন্তু কুকুরের জন্য ভদ্রলোক প্রায় গুলতির বেগে বেরিয়ে গেলেন কেন বলুন তো?"

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। আবার চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন এবং চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে ওকে আপনমনে বিড়বিড় করতে শুনলাম। "খাজাঞ্চি। আগের দিনে রাজা খেতাবধারী বড় জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। ট্রেজারি। খাজাঞ্চি ঠিক ক্যাশিয়ার নয়, ট্রেজারার। সে আসলে খুব সম্মানজনক পদ। তবে খুব আস্থাভাজন লোক হওয়া চাই। আস্থা! খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা—আস্থা!"

ষষ্ঠীচরণ আর-এক প্রস্থ কফি রেখে গেল। বললাম, "কর্নেল! কফি!"

"হ্যাঁ। কফি খেয়েই আমরা বেরোব।" কর্নেল চোখ খুলে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন, 'আমরাও গুলতির বেগে বেরিয়ে যাব। বাসে মাত্র ঘন্টা তিনেকের জার্নি। পৌঁছেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে।"

বাবুগঞ্জ গঙ্গার ধারে বেশ জমকালো মফস্বল শহর। টেলিফোন এক্সচেঞ্জও আছে। সরকারি ডাকবাংলো শহরের শেষ প্রান্তে। গাছপালাঘেরা নিঝুম নিরিবিলি পরিবেশ। কেয়ারটেকার গোকুলবাবু যেন জানতেন কর্নেল তাঁর মামাবাবুর কাছে খবর পেয়েই ছুটে আসবেন। তাই সুস্বাদু ইলিশ সহযোগে চমৎকার একখানা মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। খাওয়ার পর উনি ইনিয়ে-বিনিয়ে রাজমন্দিরে এক সাধুবাবার আকস্মিক আবির্ভাব এবং রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করলেন। শেষে বললেন, "মামাবাবুর মাথায় ছিট আছে। মা এতকাল দাদামশাইয়ের ভিটে আগলে রেখেছিলেন। এত বলেও আমার কোয়ার্টারে মাকে আনতে পারিনি। তারপর মামাবাবু

রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন। অমনই নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হল। আসলে ভূতটুত, জুতো-চুরি বোগাস। মামাবাবুর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়েই মা অগত্যা আমার কাছে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে মামাবাবু আপনার কাছ থেকে ফিরে আবার এক পাগলামি করতে এসেছিলেন। খামোকা ঝগড়াঝাটি।"

কর্নেল বললেন, "ভুলোর জন্য?"

"আপনি শুনেছেন?" গোকুলবাবু হাসলেন। "ভুলো মায়ের পোষা দিশি কুকুর। কিন্তু আমি থাকি সরকারি কোয়ার্টারের দোতলায়। ভুলো বিলিতি হলে কথা ছিল। তাছাড়া যা বিচ্ছিরি চ্যাঁচায়। মামাবাবুর ধারণা, ভুলো মায়ের কাছে পালিয়ে এসেছে। এলেও ওই এরিয়ায় ঢুকবে কেমন করে? এক এরিয়ার কুকুর অন্য এরিয়ায় গেলে কুকুরগুলো তাকে ঢুকতে দেবে?"

চলে যাওয়ার আগে গোকুলবাবু জানিয়ে গেলেন, তাঁর মামাবাবুর জুতো চুরির ব্যাপারটা নয়, সাধুবাবার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে তাঁর খটকা লেগেছিল। সেইজন্যই ওঁকে কর্নেলের কাছে পাঠিয়েছিল।

বাসজার্নির ধকল এবং লাঞ্চের পর ভাতঘুমের অভ্যাস আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। কর্নেলের ডাকে উঠে বসলাম। গঙ্গার ওপারে সূর্য সবে অদৃশ্য হয়েছে। দিনের আলো কমে গেছে। চারদিকে পাখিরা তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। কর্নেল পিঠ থেকে কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রেখেছিলেন। জিগ্যেস করলাম, "প্রজাপতির ধরতে বেরিয়েছিলেন, না কী অর্কিডের খোঁজে?"

"নাহ। জুতোর খোঁজে।"

হেসে ফেললাম। "আপনি কি ভেবেছিলেন চোর আপনাকে পাঁচুগোপালবাবুর জুতো ফেরত দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছে?"

"কতকটা তা-ই।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, "হ্যাঁ। জুতো মারা আর কাকে বলে? ছ'পাটি ছেঁড়া পামশু আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারা! একপাটি আমার টাকে পড়তে যাচ্ছিল। মাথা না সরালে পেরেকে রক্তারক্তি হয়ে যেত। সোল ওপড়ালে সব জুতোরই পেরেক বেরিয়ে থাকে। সবে একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে মুখ তুলেছি, অমনই টুপিটা পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে জুতো ছুঁড়েছে!"

'বলেন কী! কোথায়?"

"রাজবাড়ির ধ্বংসস্তূপের ভেতর। চিন্তা করো জয়ন্ত, সোল ওপড়ানো পেরেক-বেরোনো জুতো।"

"সোল ওপড়ানো জুতো?" আরও অবাক হয়ে বললাম, 'তাহলে কি পাঁচুগোপালবাবুর জুতোর সোলের ভেতর কিছু লুকনো ছিল?"

"পর-পর তিনজোড়া জুতো চুরি যাওয়ার কথা শুনেই সেটা তোমার মাথায় আসা উচিত ছিল। বিশেষ করে সেকালের এক জমিদারবাড়ির ট্রেজারারের পৌত্রের জুতো।"

এই সময় উর্দিপরা একটা লোক ট্রেতে কফি নিয়ে এল। সে সেলাম দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল ডাকলেন, "রামহরি!" সে কাছে এলে কর্নেল বললেন, "তুমি তো এখানকার লোক। রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে কে-কে আছে এখন?"

রামহরি বলল, "ঠাকুরমশাইয়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে নেই। এখন শুধু গিন্নিঠাকরুণ আছেন। ঠাকুরমশাই তো বাতের অসুখে বিছানায় পড়ে আছেন।"

"ঠাকুরমশাইয়ের কোনও ভাই বা জ্ঞাতি নেই?"

"এক ভাই ছিল। বনিবনা হতো না। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল। সে প্রায় তিন-চার বছর আগের কথা স্যার। শুনেছি সে জেলখানায় আছে। চুরি-ডাকাতি করে বেড়াত। সেই নিয়েই তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া।"

"ঠিক আছে। তুমি এসো রামহরি।"

রামহরি চলে গেলে কর্নেল চুপচাপ কফি খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'চলো। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি যাই।"

বিদ্যুতের আলোয় বাবুগঞ্জ ঝলমল করছিল। বড় রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল একটা সাইকেল রিকশা নিলেন। সন্ধেরাতের প্রচণ্ড ভিড়। রিকশাওয়ালা অনেক গিঞ্জি গলি পেরিয়ে একখানে থেমে বলল, "আর যাওয়া যাবে না স্যার। পায়ে হেঁটে চলে যান। আমি বলেই এলাম। অন্য কেউ কিছুতেই আসবে না।"

কর্নেল বললেন, "কেন হে? ভূতের ভয়ে নাকি?"

রিকশাওয়ালা কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, "ঠাট্টাতামাশার কথা নয় স্যার। এই তল্লাটে দিনদুপুরে কেউ পা বাড়ায় না আজকাল। যাচ্ছেন যান। তবে সাবধানে যাবেন।"

সে রিকশা ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল। এদিকটায় বিদ্যুৎ নেই। কর্নেল টর্চ জ্বেলে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। একফালি আঁকাবাঁকা পথ। সামনে মিটমিটে আলো জ্বলছিল। কর্নেলের টর্চের আলোয় একটা জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি দেখা গেল। কাছে গিয়ে উনি ডাকলেন, "ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?"

দরজা খুলে এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে কর্নেলকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, "কোত্থেকে আসছেন আপনারা?"

কর্নেল বললেন, "কলকাতা থেকে আসছি। একটা কথা বলেই চলে যাব।"

"উনি তো অসুস্থ।"

"নাহ। কথাটা আপনার সঙ্গে।"

"আমার সঙ্গে? কী কথা?"

"আপনি কি ঠাকুরবাড়িতে সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ভদ্রমহিলা আবার চমকে উঠেই সামলে নিলেন। "কেন সে-কথা জিগ্যেস করছেন বাবা? আপনারা কি পুলিশের লোক? আমরা কোনও সাতেপাঁচে থাকি না।"

"আমার কথার জবাব দিলে খুশি হব। ঠিক জবাব না পেলে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন।"

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে ভয় পেলেন ভদ্রমহিলা। বললেন, "আমরা তো কারও কোনও ক্ষতি করিনি বাবা!"

"আপনি কি সাধুবাবার আসরে যেতেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী আস্তে বললেন, "একদিন গিয়েছিলাম।"

"শুক্রবার সন্ধেয়?"

"হ্যাঁ বাবা।"

"কতক্ষণ ছিলেন আসরে?"

"যতক্ষণ ভাগবতপাঠ হল, ততক্ষণ ছিলাম।"

"সবাই চলে গেলে আপনি কি সাধুবাবার সঙ্গে চুপিচুপি দেখা করেছিলেন?"

ভদ্রমহিলা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ। তা—"

"আপনি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন?"

ঠাকুরমশাইয়ের স্ত্রী চুপ করে থাকলেন।

"বলুন। তা না হলে ঝামেলায় পড়বেন কিন্তু।"

এই সময় ঘরের ভেতর থেকে খ্যানখেনে গলায় কে বলে উঠল, "বলে দাও না। এত ভয় কীসের? ভূতো নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে। একদিন না-একদিন সে খুন হতোই। হয়েছে। পুলিশকে বলে দাও সব কথা।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "সাধুবাবাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন। তাই না? সেইজন্য চুপিচুপি তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কী বলেছিলেন আপনি তখন আপনার ভুতোঠাকুরপোকে?"

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। "ওকে বললাম, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। আর কিছুদিন থাকলে আরও অনেকে চিনে ফেলবে। তুমি শিগগির পালিয়ে যাও ঠাকুরপো। হঠাৎ সেই রাত্তিরে ঠাকুরপো খুন হয়ে গেল। চাপ-চাপ রক্ত!"

কর্নেল বললেন, "আপনার ঠাকুরপো ভূতনাথের নামে পুলিশের হুলিয়া জারি করা আছে। এলাকার কয়েকটা ডাকাতির মামলা ঝুলছে তার নামে।"

"জানি। সেইজন্যই তো—"

"হ্যাঁ। তাই তাকে চিরদিনের জন্য বেঁচে যাওয়ার একটা ফন্দি দিয়েছিলেন। আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি।"

কথাটা বলেই কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক হয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।....

বাংলায় ফিরে দেখি, পাঁচুগোপালবাবু অপেক্ষা করছেন। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। কর্নেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন, "অনেক খুঁজে পেয়ে গেছি স্যার। আপনি যা বলেছিলেন, ঠিক তা-ই।"

কর্নেল বললেন, "জুতো?"

"আজ্ঞে।" বলে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগে হাত ঢোকালেন।

"এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন।"

ঘরে ঢুকে পাঁচুগোপালবাবু ব্যাগ থেকে দু'পাটি পামশু বের করলেন। জীর্ণ বেরঙা ছেঁড়া বেঢপ জুতো। বললেন, "ঠাকুরদার সিন্দুকের তলায় লুকানো ছিল স্যার। ঠাকুরদার জুতোই মনে হচ্ছে। ইস! কী বিচ্ছিরি গন্ধ!"

কর্নেল জুতোজোড়া নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে টেবিলে রাখলেন। বললেন, "এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজবাড়ির ওদিকটায় এতক্ষণে ঘন অন্ধকার। আপনি সেখানে গিয়ে এই গানটা গাইবেন—"

"গা-গান? আমি স্যার গান গাইতে পারি না যে!"

"চেষ্টা করবেন। নিন, মুখস্থ করুন :

চলে আয় ওরে ভুতো
পায়ে দিবি রাঙা জুতো।"

পাঁচুগোপালবাবু অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে আওড়ালেন। তারপর করুণমুখে বললেন, "কে-কেন গান গাইতে হবে স্যার? আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না!"

"আপনার জুতো-চোর ভূতটাকে ধরতে হবে না? তিন-তিনজোড়া জুতো চুরি করেছেন সে। তাকে ধরা উচিত নয় কি?"

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললেন, "বডি পাওয়া গেছে কর্নেলসায়েব! শকুনে প্রায় সাবাড় করেছে। তবে স্কেলিটনটা আছে। বেশি দূরে ভেসে যায়নি। মাত্র দু'কিলোমিটার দূরে একটা খাড়িতে ভাসছিল। মুন্ডু-কাটা বডি।"

পাঁচুগোপালবাবু লাফিয়ে উঠলেন। "সাধুবাবার বডি?"

কর্নেল বললেন, "নাহ। আপনার ভুলোর।"

পাঁচুগোপালবাবু আর্তনাদ করলেন, "হায়, হায়। ভুলোকে কে মারল?"

"ভুতো।" বলে কর্নেল উঠলেন। "আপনার ঠাকুরদার জুতোজোড়া নিন। চলুন, ভুতোকে ফাঁদে ফেলা যাক।"

পুলিশ জিপ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার কর্নেলের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করে চলে গেলেন। কর্নেল পাঁচুগোপালবাবুকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন।

ঘুরঘুটে অন্ধকার এলাকা। এবার কর্নেল টর্চ জ্বালছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে একটা কালো ঢিবির পাশে গুঁড়ি মেরে বসলেন। তারপর পাঁচুগোপালবাবুকে চাপাস্বরে বললেন, "সামনে দাঁড়িয়ে জোরে গানটা শুরু করুন।"

ভদ্রলোক কেশে গলা সাফ করে হেঁড়ে গলায় সুর ধরে আওড়ালেন :

"চলে আয় ওরে ভুতো
পায়ে দিবি রাঙা জুতো।"

বারকতক গাওয়ার পর কালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল ওঁর সামনে। খোনা গলায় বলে উঠল, "এঁনেছিস? দেঁ! দেঁ!"

পাঁচুগোপাল চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আতঙ্কে। "ওরে বাবা! এ যে দেখছি সত্যিই ভূ-ভূ-ভূত!"

অমনই এদিক-ওদিক থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। একটা সাধুবাবার চেহারার লোক পালানোর জন্য লাফ দিতেই কর্নেল গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। দু'জন কনস্টেবলকে দেখলাম লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। কর্নেল তার দাড়ি-জটা উপড়ে নিয়ে বললেন, "ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে চিনতে পারছেন না পাঁচুগোপালবাবু? রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর ভাই ভূতনাথ। আপনার ভুলোর মুন্ডু কেটে রক্ত ছড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল। আপনার ঠাকুরদার দু'পাটি জুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দশটা সোনার মোহরের খবর বহুদিন আগে ভূতনাথ পেয়েছিল আপনার দিদির কাছে। আপনার দিদি কথায়-কথায় মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন ওকে। পরে বুদ্ধি করে বলেছিলেন, সেই মোহর আপনার জুতোর সোলে লুকনো আছে। তখন আপনি রেলের চাকরি করেন। ট্রেনে-ট্রেনে ঘোরেন। ভূতনাথ তাই সুযোগ পায়নি। আপনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার পর তাই সে আপনার জুতো চুরির ধান্দা করেছিল। যাই হোক, চলুন। বাংলোয় ফেরা যাক।"

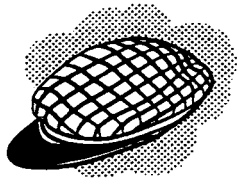

কালো গোখরো

ঘাসের ভেতর থেকে আচমকা একটা গোখরো সাপ ফোঁস করে ফণা তুলল। অমনি এক লাফে পিছিয়ে এল শানু। পাড়াগাঁয়ের ছেলে। সাপ কখনও দ্যাখেনি তা নয়। কিন্তু এমন করে বিষাক্ত সাপের মুখোমুখি কখনও হয়নি। তাছাড়া নদীর ধারে এই জঙ্গুলে নিরিবিলি জায়গায় সে প্রায় রোজই আসে। এই খোলামেলা ঘাসের জমি পেরিয়ে নবাবি আমলের পোড়া-মসজিদটার উঁচু চত্বরে যায়। সেখানে বসে স্কুলের বই পড়ে। সামনে পরীক্ষা। এদিকে বাড়িতে বড্ড বেশি হইচই।

কিন্তু এখানে একটা গোখরো সাপ থাকতে পারে, সে-কথা শানুর মাথায় আসেনি। আর সাপটাও কী প্রকাণ্ড! রোদ্দুরে ঝলমল করছে তার বিশাল চক্কর। লক-লক করছে সরু জিভ। নিষ্পলক নীল চোখে সে শানুকেই দেখছে যেন।

তারপরই তেমনি আচমকা কোত্থেকে এক-টুকরো ইট এসে পড়ল ফণা-তোলা সাপটার মাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল সেটা। লেজটা ঘাসের ভেতর প্রচণ্ড নড়তে থাকল।

শানু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। তারপর আবার একটুকরো ইট এসে পড়ল সাপটার ওপর। ছটফটানি থেমে গেল ক্রমশ। তখন শানু দেখল, ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে, আর কেউ না, স্বয়ং আবদুলচাচা, নবাবগঞ্জ গ্রামের লোকে যাকে বলে আবদুলখ্যাপা।

শানুর মুখে এতক্ষণে কথা ফুটল। বলল, "আবদুলচাচা।"

একটু খ্যাপাটে চালচলনের জন্য গাঁয়ের লোকে তাকে আবদুলখ্যাপা বলে বটে, কিন্তু সবাই যেমন জানে, তেমনি শানুও জানে, লোকটা সত্যি-সত্যি খ্যাপামানুষ নয়। আসলে সে বড় খামখেয়ালি। এ গাঁয়ে তার ঘরদোর বলতে কিছু নেই। কখনও কোথাও ছিল কিনা সেটাই বিশ্বাস হয় না লোকের। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ফাইফরমাশ খেটে বেড়ায়। পয়সাকড়ি পায়-টায় না। শুধু দু'মুঠো খেতে পেলেই সে খুশি। যেখানে-সেখানে সে খুঁজে নেয় রাত কাটানোর ডেরা। শানু জানে, ইদানিং সে গাঁয়ের বাইরে নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতর পোড়ো-মসজিদটাকেই ডেরা করে ফেলেছে। এখানে নির্জনে পড়াশুনো করতে এসেই শানুর সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। শানু তাকে চাচা বলে ডাকে। শানু যতক্ষণ পড়াশুনো করে আবদুল থাকলে তাকে এতটুকুও বিরক্ত করে না। কিন্তু পড়া শেষ হলে শানু 'আবদুলচাচা' বলে ডাকলেই সে হাসিমুখে বেরিয়ে আসে মসজিদ থেকে। শানুর পাশে বসে পড়ে। তারপর সে তার গল্পের ঝুলি খোলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পই না জানে আবদুল। শানু অবাক হয়ে শোনে। কতদিন তার সাধ জাগে, এই নিঝুম পুরনো নবাবি মসজিদে আবদুলচাচার সঙ্গে সে রাত কাটাবে, আর দেখতে পাবে জ্যোৎস্না-রাতে ছায়ামূর্তিগুলো এসে সার বেঁধে নমাজ পড়ছে। তাদের মধ্যে আছেন ইতিহাসের বইতে পড়া সেই সব সুলতান, উজির, আমির-ওমরার আত্মারা! ভাবতেই শানুর গা শিউরে ওঠে।

আবদুলের পরনে খাটো ছেঁড়াখোঁড়া একটা নীলচে লুঙ্গি। খালি গা। তার মুখে খোঁচা খোঁচা একরাশ গোঁফদাড়ি। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। মুখে হাসিটি সবসময় লেগেই আছে। শুধু তার বড় বড় চোখদুটি কেমন যেন রহস্যময় মনে হয় শানুর। তবে আবদুলের শরীরখানি বেশ তাগড়াই। জোরও কম নেই। একসময় শানুদের জমিতেও সে মজুর খেটেছে।

শানু তার বাবার কাছে শুনেছে, শানুর তখন তিন বছর বয়স, সে ছিল এক ভয়ঙ্কর বন্যার বছর। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ উলুকাশের জঙ্গলে বন্যার জলে সেবার অথৈ সাগর হয়ে উঠেছিল। সেখানে

একটা হিজল-গাছের ডগা থেকে চিৎকার শুনে রিলিফের নৌকোয় লোকেরা গিয়ে দ্যাখে, একটা লোক গাছের ডালে বসে আছে। তারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সেই এই আবদুল। তারপর থেকে সে এই নবাবগঞ্জেই থেকে গেল।.....

শানু অবাক হয়ে দেখছিল, আবদুল মরা সাপটির লেজ ধরে মাথার ওপর চরকির মতো বারকতক পাক খাইয়ে ছুড়ে ফেলল ঝোপের ওদিকে। তারপর হাসিমুখ শানুর সামনে দাঁড়াল। বলল, 'ভয় পেয়েছিল, মালিক? হুঁ, গোখরো বলে কথা। তবে কিনা, মানুষের মধ্যেও কিছু-কিছু গোখরো আছে।'

শানু চমকে উঠে বলল, 'কেন ও কথা বলছ আবদুলচাচা?'

আবদুল সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, 'যাও যাও। লেখাপড়া করো গে। আমি ততক্ষণ নদীর ওপারটা ঘুরে আসি।'

শানু এবার ঘাসের ভেতর সতর্ক দৃষ্টি রেখে হাঁটতে থাকল। আবদুল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নদীর দিকে চলে গেল। গম্বুজওয়ালা মসজিদটির দশা জীর্ণ। এদিকে-সেদিকে কিছু-কিছু ধ্বংসস্তূপ আছে। সেগুলিতে জঙ্গল গজিয়েছে। বোঝা যায়, প্রাচীন সময়ে এখানেই বসতি ছিল। কিংবদন্তি আছে, এখানে নাকি ছিল কোনও এক সুলতানের রাজধানী। এখনও জঙ্গল আর চাষের জমিতে কিছু চিহ্ন চোখে পড়ে। এক-টুকরো কারুকার্য করা পাথর, কিংবা একটা স্তূপ। কোথাও বা একটা শ্যাওলা-ধরা ফটকের একাংশ।...

পোড়া মসজিদের উঁচু চত্বরটি পাথরের। কোথাও কোথাও ফাটল ধরেছে। গজিয়ে উঠেছে কোনও উদ্ভিদ। ভেতরে রাজ্যের চামচিকের আস্তানা। একদিন একটা শেয়ালকেও বেরিয়ে আসতে দেখেছিল শানু। শেয়ালটা যেন ভারি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। যেন মনে-মনে বলছিল, 'এ ছেলেটা আবার কে রে বাবা— এখানে পড়াশোনা করতে আসে?' শানু সেই ভেবেই শেয়ালটাকে দেখে হেসে ফেলেছিল। অমনি শেয়ালটা একলাফে চত্বর থেকে নেমে উধাও।

একসময় নাকি এইসব জঙ্গলে বাঘও থাকত। শানুর ঠাকমা বলেন, কত রাতে বাঘের ডাকও নাকি শুনেছেন। শানুর বাবা বলেন, 'ওই পোড়ো-মসজিদের ভেতরই তো বাঘের ডেরা ছিল। ওখানেই তো শেষ বাঘটাকে গুলি করে মেরেছিলেন মির্জাসায়েব। মির্জাসাহেব তখন এ জেলার নামকরা শিকারি।'

এ সব গল্প শোনার পর শানু বড্ড ভয় পেত এখানে আসতে। একটু শব্দ হলেই চমকে উঠত, এই বুঝি বাঘ এসে হালুম করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু আবদুলকে এখানে দেখার পর থেকে তার সে-ভয় ঘুচে যায়।

তবে আবদুলের মুখে এই পোড়ো-মসজিদের ভূত-পেরেতের গল্প শোনার পর থেকে তার গা ছম-ছম করেও বটে। তাছাড়া শুধু কি ভূত-পেরেত? আকাশ থেকে নাকি জিন-পরিরাও এখানে আসে। কিন্তু আবদুল এও বলেছে, 'সে তো সবই রাতের বেলায়। দিন-দুপুরে মানুষের কাছে ঘেঁসে এমন সাধ্যি ওদের নেই। ভূত-পেরেত বলো, জিন-পরি বলো, সব্বাই মানুষকে বড় ভয় পায়। এ দুনিয়ায় মানুষের চেয়ে ভয়ানক জীব আর কিছু নেই রে সোনা।'

চত্বরে বসে শানু আজ আনমনা। মাঝে-মাঝে আবদুলচাচা কতরকম অদ্ভুত কথা বলে বটে; কিন্তু 'মানুষ' কথাটা কেন অমন করে বলে সে? আবদুলের কথাটা তার মনে প্রতিধ্বনি তুলছিল, মানুষের মধ্যেও কিছু-কিছু গোখরা আছে।'

আজ ছুটির দিনের দুপুরবেলা। সবে শীত পড়েছে। শেষ হেমন্তের রোদ্দুর এখনও ঝকমকে। তবে গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ঘাসের সেই গাঢ় সবুজ রঙের চেকনাই ভাবটি ক্ষয়ে গেছে। চত্বরে

বসে শানু দেখতে পাচ্ছিল, নদীর ওপারে সাদা ফুলে ভরা কাশবনের ভেতর একা হেঁটে চলেছে আবদুলচাচা। কিন্তু কোথায় চলেছে সে?

গোখরো সাপ দেখার পর থেকে আজ কিছুতেই পড়ায় মন বসছিল না শানুর। মাঝে-মাঝে মুখ তুলে এদিকে-ওদিকে দেখে নিচ্ছিল। তার ভয় হচ্ছিল, আবদুলচাচা তো মরা ভেবে গোখরো সাপটাকে ছুঁড়ে ফেলল। সেটা যদি সত্যি না মারা পড়ে থাকে? গাঁয়ের লোকে বিষাক্ত সাপ মেরে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। তাদের বিশ্বাস, তা না করলে সাপটা আবার বেঁচে উঠবে এবং যে তাকে মেরেছে তাকে ছোবল মারার জন্য ওত পেতে বেড়াবে। বেড়ালের নাকি ন'টা প্রাণ। আর সাপের নাকি একশ' নটা!

কিন্তু আবদুল এমন উদ্ভুটে লোক যে, সে-কথা বিশ্বাসই করে না দেখা যাচ্ছে।

শানুর ভয় হচ্ছিল, সাপটা হয়তো বেঁচে উঠেছে এতক্ষণে এবং আবদুলের সঙ্গে তাকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে। কারণ, আবদুল তো আসলে শানুকে বাঁচানোর জন্যই সাপটার মাথায় ইট ছুড়ে মেরেছিল।

শানু এই ভেবে ঘাসজমিটার দিকে তাকাচ্ছে, কখনও নদীর ওপর কাশবনের ভেতর আবদুলকে লক্ষ করছে, এমন সময় টুপ করে একটুকরো ঢিল এসে পড়ল চত্বরে। অমনি শানু আঁতকে উঠল। তত ভিতু ছেলে সে নয়। কিন্তু এখন সে অবস্থাটাই অন্যরকম। টুপ-টুপ করে আবার কয়েকটা ঢিল এসে পড়তেই শানু বই গুটিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অমনি মসজিদের ওপাশ থেকে হি-হি হাসি শোনা গেল। তারপর শানু দেখল, ভূত-টুত নয়, মির্জাবাড়ির ছেলে, শানুরই সহপাঠী ও বন্ধু সেলিম হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছে।

সেলিম চোখ নাচিয়ে বলল, 'কী রে? খুব যে বড়াই করিস, ভূতের ভয় নাকি তোর নেই?'

শানু অপ্রস্তুত হেসে বলল, 'ভ্যাট্! আমি কি ভয় পেয়েছিলাম নাকি?'

সেলিম ভেংচি কেটে বলল, 'না! তাইতো বই গুটিয়ে শ্রীমান ফার্স্টবয় উঠে দাঁড়িয়েছিল? হাতে আমার ক্যামেরাটা থাকলে তোর পোজখানা তুলে রাখতাম, আর ক্লাসসুদ্ধু সবাইকে দেখতাম!'

শানু হার মেনে বলল, 'হঠাৎ অমন করে এমন জায়গায় ঢিল পড়লে তুই কেন, আবদুলচাচাও আঁতকে উঠত।'

সেলিম হঠাৎ শানুর হাত ধরে বলল, 'শানু! দ্যাখ, দ্যাখ। আবদুলচাচা দৌড়ে আসছে কেন?'

নদীর ওপারে আবদুলকে দৌড়ে আসতে দেখে শানুর বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তা হলে কি সত্যিই মরা গোখরোটা জ্যান্ত হয়ে ওকে তাড়া করে গেছে এবং ছোবল দিয়েছে? শানু ঝটপট সেলিমকে একটু-আগের ঘটনাটা শুনিয়ে দিল। ততক্ষণে আবদুল এসে নদীতে নেমেছে।

নদীটা ছোট্ট। হেমন্তের শেষে তার বুকে এখন হাঁটুজল। এখানে-সেখানে বালির চড়া জমেছে। আবদুল জল ভেঙে এপারে পৌঁছল। তারপর একটা হাত কপালে রেখে সূর্যকে আড়াল করে পুবের ওই কাশবনে যেন কী দেখতে থাকল।

তখন উদ্বিগ্ন শানু চেঁচিয়ে তাকে ডাকল, 'আবদুলচাচা, আবদুলচাচা। কী হয়েছে?'

শানুর ডাক শুনে আবদুল এদিকে ঘুরল। কিন্তু তার মুখে হাসি দেখা গেল। সে লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে এক লাফে পোড়ো-মসজিদের চত্বরে উঠল। তারপর সেলিমকে দেখে বলল, 'তুমিও আছ দেখছি গো! শানুর জন্যে পাকা বুনোকুল আনতে গিয়েছিলাম ওপারে। এই দ্যাখো, কী রসালো কুল ধরেছিল কুলের জঙ্গলে। নাও, দুই বন্ধুতে মিলে খাও!'

সে কোঁচড় থেকে একরাশ সোনালি কুল ঢেলে দিল চত্বরে। সেলিম ঝাঁপিয়ে পড়ল। শানু তবু আবদুলের দিকে তাকিয়ে আছে। আবদুল বলল, 'এই মলো। হাঁ করে কী দেখছ তুমি?'

শানু বলল, 'তুমি অমন করে দৌড়ে এলে। তারপর—'

তার কথা কেড়ে আবদুল বলল, 'ও কিছু না। তুমি কুল খাও দিকি। ওই দ্যাখো, বুড়ো মির্জার নাতি একাই সব সাবাড় করে ফেলল!'

শানু দেখল সত্যিই বটে। সেলিম টপাটপ কুলগুলো মুখে পুরছে আর যেন আঁটিসুদ্ধু চিবিয়ে খাচ্ছে। শানুও এবার ভাগ বসাল। কাড়াকাড়ি করে দুই বন্ধুতে কুল খেতে লাগল। একটু পরে শানু দেখল, আবদুল তেমনি দাঁড়িয়ে নদীর ওপারটা দেখছে। ব্যাপারটা সেলিমও লক্ষ করেছিল। এবার বলল, 'আবদুলচাচা, ব্যাপারটার খুলে না বললে আমরা আর তোমার কুল খাব না। এমনকী, তোমার সঙ্গে কথাও বলব না।'

আবদুল ঘুরে দুই বন্ধুর দিকে তাকাল এ বার তার মুখটা কেমন যেন গম্ভীর। পরমুহূর্তে সে একটু হাসল। বলল, 'তাহলে একটু খুলেই বলি, সোনারা!'

দু'জনে একগলায় বলে উঠল, 'বলো আবদুলচাচা!'

চত্বরে ভেঙেপড়া দেয়ালের একটা পাথরের চাঙড়ে বসে আবদুল বলল, 'তোমাদের তো জিন-পরির কত গল্প শুনিয়েছি। জিনরা হল আসমানের মানুষ। তাদের ডানা আছে! তো তাদের মধ্যে দু'রকম জিন আছে। সাদা জিন আর কালো জিন। সাদা জিন মানুষের উপকার করে। কালো জিন মানুষের ক্ষেতি করে। তা আজ অনেকদিন পরে একটা কালো জিনের পাল্লায় পড়েছিলাম বাবারা।'

দুই বন্ধু একগলায় বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি, আবদুল একটু করুণ হাসল, 'বারো বছর আগে ওই কালো জিন একবার আমার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু সে আমাকে কাবু করতে পারেনি। এতকাল পরে আবার তাকে দেখে ভয় পেয়ে পালিয়ে এলাম, সোনারা!'

শানু ও সেলিম পরস্পর তাকাতাকি করল। তারপর শানু বলল, 'যাঃ! তোমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আবদুলচাচা। তুমিই না বলো, জিন-পরি দিনেরবেলা আকাশ থেকে নামে না, মানুষকে দেখাও দেয় না!'

আবদুল গুম হয়ে বলল, 'সে তো সাদা জিন। এ যে কালো জিন! মানুষের চেহারায় দেখা দেয়। বাগে পেলে মানুষকে জানসুদ্ধু খতম করে দেয়। বাবারা, মানিকরা! আর এখানে থেকো না। শিগগির বাড়ি চলে যাও। এই দ্যাখো, আমিও লুকুতে চললাম মসজিদের ভেতর।' এই বলে সে সত্যি পোড়ো-মসজিদের ভেতর ঢুকে গেল।

সেলিম খি-খি করে হেসে বলল, 'এই জন্যই লোকে ওকে আবদুল-খ্যাপা বলে! মুরুকগে, আয় শানু! আর বই-টই নয়। কর্নেলদাদু ক'টা প্রজাপতি ধরলেন দেখি।'

শানু অবাক হয়ে বলল, 'কর্নেলদাদু। সে আবার কে রে?'

সেলিম বলল, 'ও! তুই তো চিনিসনে ওঁকে। কাল কলকাতা থেকে এসেছেন। আমার দাদুর বন্ধু। নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আবদুলচাচার চাইতেও অদ্ভুত লোক রে! মুখে একরাশ সাদা দাড়ি, মাথায় ইয়াব্বড় টাক। যেন ক্রিসমাসের সান্তাক্লজ', বলেই সেলিম নড়ে উঠল, 'তুই কী রে শানু! ফার্স্ট বয় হলে কি স্কুলের বই ছাড়া কিছু পড়তে নেই? পড়িসনি কর্নেলের অ্যাডভেঞ্চারের কোনও বই?'

শানু একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়েছি মনে হচ্ছে', বলে সেও চঞ্চল হয়ে উঠল, 'মনে পড়েছে। কর্নেল আর তার সঙ্গী সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর একটা অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি পড়েছি। কী আশ্চর্য!'

সেলিম বলল, 'কর্নেল কিন্তু একা এসেছেন। আয়, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

দুই বন্ধু প্রায় দৌড়ে জঙ্গল ভেঙে এগিয়ে চলল। শানু এত অবাক যে, সাপের ভয়টা একেবারে কেটে গেছে মন থেকে। কালো জিনের কথাও সে ভুলে গেছে। এমন সব সাঙ্ঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারের নায়ককে সে সশরীরে শুধু দেখতেই পাবে না, তার সঙ্গে আলাপও হবে, এ তো অকল্পনীয়।

একটু এগিয়ে গিয়ে সেলিম থমকে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল, 'ওই দ্যাখ!'

শানু দেখল, একটা ধ্বংসস্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। মাথায় টুপি। পরনে ছাইরঙা জ্যাকেট আর প্যান্ট। কাঁধে ঝুলছে একটা ক্যামেরা। চোখে বাইনোকুলার রেখে তিনি পাখি দেখছেন হয়তো। সেলিম চেঁচিয়ে উঠল, 'কর্নেলদাদু, তখন কর্নেল ঘুরলেন। শানু হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে সেলিম তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। বলল, 'কর্নেলদাদু। এর নাম শানু। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়।'

কর্নেল সস্নেহে শানুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার ডাক নাম তো শানু। আসল নাম কী?'

শানু আস্তে বলল, 'সন্দীপন।'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পোড়া-মসজিদের দিক থেকে একটা আর্তনাদ ভেসে এল। কর্নেল চমকে উঠেছিলেন। সেলিম চমক খাওয়া গলায় বলল, 'আবদুলচাচার গলা বলে মনে হল!'

শানু বলে উঠল, 'সর্বনাশ। আবদুলচাচাকে কালো জিনটা অ্যাটাক করেনি তো?'

'কালো জিন,' কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। তারপর পা বাড়িয়ে ডাকলেন দুই বন্ধুকে, 'এসো তো, কী ব্যাপার দেখি।'

পোড়ো-মসজিদের কাছে পৌঁছতেই চোখে পড়ল চত্বরে পড়ে আবদুল ছটফট করছে যন্ত্রণায়। কর্নেল এক লাফে চত্বরে উঠে আবদুলের কাছে গেলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী হয়েছে তোমার?'

আবদুল অতি কষ্টে ঠোঁট ফাঁক করে বলল, 'সা—সা—' তারপর তার লম্বা-চওড়া শরীরটা হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। তার ঠোঁটের পাশে চাপচাপ ফেনা আর রক্ত।

শানু আর্তনাদের সুরে বলল উঠল, 'সাপ! সাপ! সেই সাপটা!'.....

দুই

ব্রেকফাস্ট টেবিলে মুখোমুখি বসে কর্নেল আর মির্জা গোলাম হায়দার কথা বলছিলেন। কর্নেল বললেন, 'বিষাক্ত সাপের প্রতিশোধ নেওয়ার অনেক গল্প আমিও শুনেছি। কাগজেও খবর বেরিয়েছিল সে-বার।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'গ্রামাঞ্চলে লোকেরা এটা বিশ্বাস করে বলেই বিষাক্ত সাপ মেরে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কিন্তু সেলিম বলল, কিছুক্ষণ আগে নাকি আবদুল বলেছিল, একটা কালো জিন তাকে তাড়া করেছিল—'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বারো বছর আগেও নাকি একবার ওই কালো জিনটা তাকে তাড়া করেছিল!'

মির্জাসায়েব হেসে উঠলেন হো-হা করে। 'আবদুলখ্যাপা উদ্ভুট্টে সব গল্প শোনাত ছেলেপুলেকে। ভূত প্রেত ও জিন-পরিতে আমার বিশ্বাস নেই, সে তো আপনি জানেন কর্নেল। যৌবনে একসময় শিকারের নেশায় কত জঙ্গলে একা রাত কাটিয়েছি। কখনও কোনও অশরীরীর হদিশ পাইনি, যদিও আমি শুনেছি বহু শিকারি নাকি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। প্রখ্যাত শিকারি জিম করবেটও ভূতে বিশ্বাস করতেন।'

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে আনমনে শুধু সায় দিলেন। নবাবগঞ্জের এই অংশটায় শহরের ছাপ পড়তে শুরু করেছে। বিদ্যুৎ আছে। বাজার আছে। একটি হাইওয়ে চলে গেছে গা ঘেঁসে সুদূর কলকাতার দিকে। মির্জাসায়েবের বাড়িটি বিশাল। এঁরা এখানকার বনেদি মুসলিম পরিবার। এঁরা নিজেদের সেই তুর্কি সুলতানের বংশধর বলে দাবি করেন, নদীর ধারে যাঁর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় এখনও।

মির্জাসায়েব হাসতে হাসতে বললেন, 'সারা গাঁয়ে কিন্তু গোখরো সাপের প্রতিশোধের গল্পটাই হিড়িক তুলেছে। তবে লোকে বলছে আবদুল যে সাপটাকে মেরেছিল, সেটা ছদ্মবেশী কালো জিনও হতে পারে।'

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী পাওয়া যায়, দেখা যাক।'

মির্জাসায়েব অবাক হলেন, 'কেন? আপনি কি অন্য কিছু সন্দেহ করছেন?'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'হুঁ। একটা খটকা বেধেছে।'

'কী আশ্চর্য,' মির্জাসায়েব একটু উত্তেজিতভাবে বললেন, 'আপনি নিজেই তো বলেছিলেন, মরার সময় বিষাক্ত সাপে-কাটা মানুষেরই স্পষ্ট লক্ষণ দেখেছেন। এমনকী আবদুল সাপ কথাটাও বলেছে। অথচ আপনিই থানায় খবর দিয়ে সদর শহরের মর্গে লাশ পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। খটকাটা কীসের, কর্নেল?'

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'পোড়ো-মসজিদের ভেতর আবদুল ইদানীং ডেরা করেছিল। সেই ডেরায় ঢুকে আমি দেখেছি ওর নোংরা বিছানা তছনছ করে রেখেছে কেউ। কেউ-বা কারা যেন কিছু তন্নতন্ন করে খুঁজেছে।'

মির্জাসায়েব আবার হাসলেন, 'কেউ না। আবদুল নিজেই করে থাকতে পারে। ওর খ্যাপামির কথা কে না জানে? হঠাৎ হঠাৎ খ্যাপামির চূড়ান্ত করে ফেলত—আমি নিজেও দেখেছি।'

কর্নেল এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'যে জিনিসটা কেউ বা কারা অমন তন্নতন্ন করে খুঁজছে, সম্ভবত সেটাই আমি কোনার দিকে মেঝের ফাটলে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

মির্জাসায়েব চমকে উঠে তাকালেন কর্নেলের মুখের দিকে। তখন কর্নেল পকেট থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট জিনিস বের করলেন। মোড়ক খুলে টেবিলে সেটা রাখতেই মির্জাসায়েব বলে উঠলেন, 'এ কী। এটা দেখছি একটা সোনার মোহর।'

'হ্যাঁ, সোনার মোহর,' কর্নেল বললেন, 'ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপে দৈবাৎ আবদুল একটা মোহর কুড়িয়ে পেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা বাই দা বাই, আপনি তো ফার্সিভাষা জানেন। আগে দেখুন তো কী লেখা আছে এতে?

মির্জাসায়েব চশমা পরে মোহরটার একপিঠে দেখতে দেখতে বললেন, 'হরফগুলো ক্ষয়ে গেছে তবু পড়া যাচ্ছে :

খানখানান লতিফ খান, ২৮ জেলহজ্জ, হিজরি সন ৮৬৩।....একমিনিট, বলে মির্জাসায়েব উঠে গিয়ে বুক সেলফ থেকে একটা বই টেনে বার করলেন। বইটার পাতা উলটে বললেন, 'হুঁ, ইংরেজি সন তারিখের হিসেবে ২৬ অক্টোবর, ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ। বাংলায় তখন ইলিয়াসশাহি বংশের রাজত্ব। সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদশাহের আমল। রাজধানী তখন ছিল গৌড়ে, বর্তমান মালদহে।'

কর্নেল বললেন, 'এবার উলটো পিঠটা পড়ে দেখুন তো।'

মির্জাসায়েব মোহরের উলটো পিঠটা চোখ বুলিয়ে বললেন, 'একটা ফারসি প্রবচন লেখা আছে দেখছি। সাদামাটা বাংলায় এর মানে হল, 'সাত বৃদ্ধ যেখানে, মানিক ফলে সেখানে।' আসলে

প্রাচীন পারস্য দেশে বৃদ্ধদের খুব খাতির করা হতো। কারণ পারসিকরা ভাবত, বৃদ্ধরাই সবচেয়ে জ্ঞানী। আর জ্ঞানকে তুলনা করা হতো মণি-মানিক্যের সঙ্গে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'ভারতেও তাই। তবে শুধু বিশেষ বিশেষ দেশে নয়, পৃথিবীর সব দেশেই প্রাচীন যুগে বৃদ্ধদের জ্ঞানী বলে খুব সম্মান করা হতো। বাংলা প্রবচনেও তো আছে, তিন-মাথা যেখানে, বুদ্ধি নেবে সেখানে।'

মির্জাসায়েব অট্টহাসি হেসে বললেন, 'আমরা দু'জনেও বৃদ্ধ। অথচ আজকালকার ছেলেরা যেন বৃদ্ধদের সবতাতেই অস্বীকার করতে চায়।'

কর্নেল বললেন, 'সুতরাং শ্রীমান সেলিম তার দাদুকে আড়াল থেকে ভেংচি কাটতেই পারে।'

অমনি দরজার পর্দার ওধারে ধুপ-ধুপ শব্দে এবং খিল-খিল হেসে কার দৌড়ে পালানো টের পাওয়া গেল। মির্জাসায়েব এগিয়ে গিয়ে পরদা তুলে দেখে বললেন, 'তবে রে বেওকুফ্। রোসো দেখাচ্ছি মজা! আড়িপাতা হয়েছিল এখানে। কিন্তু এখানে যে এক বাঘা গোয়েন্দা বসে আছেন, তাঁর নজর এড়ানো কি এতই সোজা?'

কর্নেল নিবে-যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "আচ্ছা মির্জাসায়েব, বাদশাহি মোহরে বাদশাহি গৌরব আর ঈশ্বরের মহিমার কথা লেখা থাকে, এটাই নিয়ম। কিন্তু এই মোহরে এমন প্রবচন লেখা আছে দেখে অবাক লাগছে না আপনার?'

মির্জাসায়েব গম্ভীর হয়ে বসে বললেন, 'তাই তো। আপনি ঠিকই বলেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রম থাকতেও পারে হয়তো।'

কর্নেল বললেন, 'পুরনো মুদ্রাসংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞানগম্যি আছে। এই ব্যতিক্রমটা মেনে নিতে বাধছে। যাই হোক, আবদুলের মৃত্যুর ব্যাপারে আরও একটা খটকা লেগেছিল। সেটা হল, আবদুল শানু ও সেলিমকে বলেছিল, বারো বছর আগে নাকি এ অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হয়েছিল এবং আবদুলকে গাছের ডালে পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে আবদুল এই নবাবগঞ্জে এসে আছে।'

মির্জাসায়েব একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার সেই কালো জিনের কথা? জিন-টিন স্রেফ বাজে কথা!'

কর্নেল বললেন, 'এমন তো হতে পারে মির্জাসায়েব, কালো জিন বলতে আবদুল তার কোনও শত্রুকেই বুঝিয়েছিল, যার ভয়ে সে তার দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সময় বন্যায় ভেসে যায় এবং অনেক কষ্টে একটা গাছে আশ্রয় নেয়?'

মির্জাসায়েব একটু থেমে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু কোথায় ওর দেশ বা বাড়িঘর ছিল, সেটাই তো কেউ জানে না। আবদুল নিজের কাউকে বলেছে বলে জানি না। আমিই তো ওকে প্রথম আশ্রয় দিয়েছিলাম। কিন্তু প্রায় এক বছর হাবাগোবার মতো মনে হতো তাকে। ফাইফরমাশ খাটত। কিন্তু কথা বলত খুব কম। শেষে একদিন নিজেই আমার বাড়ি থেকে চলে গেল। শুনলাম শানুদের বাড়ি গিয়ে উঠেছে। ওদের জমিতে মজুর খাটছে।'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মোহরটা আপনি রেখে দিন। একটু সাবধানে রাখবেন। আমি বেরোচ্ছি। দেখি, আজ একটা অন্তত প্রজাপতি ধরতে পারি নাকি!'

রাস্তায় কিছুটা এগিয়ে গেছেন, সেলিম এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, 'আজ আমাকে সঙ্গে না নিয়ে বেরোচ্ছেন যে কর্নেলদাদু?'

কর্নেল হাসতে হাসতে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'জানি, তোমাকে সঙ্গে পেয়ে যাব। তা তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

'শানু?' সেলিম বলল, 'শানুকে ডেকেই তো আসছি। আজ সোমবারও স্কুলে ফতেহা-দোয়াজ দহমের ছুটি।'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ, তোমাদের প্রফেটের বার্থডে।'

একটু পরে রাস্তায় শানুকে দেখা গেল। সে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কর্নেলের সঙ্গে দুই বন্ধু মোড় দিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে থাকল। এদিকে গ্রামের শেষ প্রান্ত। বিদ্যুতের তার এদিকে আসেনি। গরিব-গুরবো মানুষের বসতি। খোড়ো ঘর। জীর্ণ দশা। পেছনেই খেলার মাঠ, তারপর জঙ্গল আর ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ নদীর ধার অবধি ছড়ানো। জঙ্গলের ভেতর পোড়ো-মসজিদের বিশাল গম্বুজটি দেখা যাচ্ছিল। গম্বুজেও ফাটল ধরেছে। গজিয়ে উঠেছে বট-অশ্বত্থের চারা।

যেতে-যেতে শানু বলল, 'কর্নেল। কাল রাত্তিরে আমাদের দোতলার ছাদ থেকে মসজিদের কাছে টর্চের আলো দেখেছি, জানেন?'

কর্নেল বললেন, 'তারপর?'

শানু বলল, 'বারকতক টর্চ জ্বেলে কে কী যেন খুঁজছে মনে হল। তারপর আর কিছু দেখিনি।'

সেলিম বলল, 'একটা কথা, কর্নেলদাদু।'

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে একটা পাখি দেখতে দেখতে বললেন, 'বলো।'

সেলিম বলল, 'মরা গোখরো সাপটা আবার জ্যান্ত হয়ে আবদুলচাচাকে কামড়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। দাদুকে আপনি একটা মোহর—'

কর্নেল দ্রুত বললেন, 'চুপ! জানো না? বাতাসেরও কান আছে।'

সেলিম কাঁচুমাচু মুখে হাসল। শানু বলল, 'কিন্তু কাল সারা বিকেল কর্নেলদাদুর সঙ্গে আমরা সেই মরা সাপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও তো পাইনি।'

সেলিম তর্কের সুরে বলল, 'তার মানে, তুই ওই সব গপ্পে বিশ্বাস করিস?'

শানু বলল, 'কিন্তু সাপটা গেল কোথায়? আমার সামনেই তো আবদুলচাচা সাপটার লেজ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুড়ে ফেলল। কোথায় গিয়ে পড়ল আমি দেখেছিলাম। অথচ সেখানে কোথাও মরা সাপ নেই!'

সেলিম বলল, 'শেয়াল বা কুকুর মুখে করে নিয়ে গেছে।'

কর্নেল বললেন, 'শেয়াল-কুকুর গোখরো সাপের মাংস সুস্বাদু বলে মনে করে না, ডার্লিং। তবে ঈগল, চিল, ময়ূর কিংবা বাজপাখির কথা আলাদা। সাপের মাংস এসব পাখির প্রিয় খাদ্য।'

সেলিম বলল, 'কর্নেলদাদু, কাক, কাকের কথা বলছেন না?

'হুঁ, কাকের অবশ্য অখাদ্য বলে কিছু নেই, বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে পোড়ো-মসজিদটা দেখতে থাকলেন।

সেলিম জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল কিছু, হঠাৎ কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন মসজিদটার দিকে। শানু ও সেলিম তাঁর পেছন পেছন চলল। মসজিদের চত্বরে উঠে কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'এসো। আমরা মসজিদের ভেতরটা একবার দেখি।'

কর্নেল পা বাড়িয়েছেন, সেলিম বলে উঠল, 'কর্নেলদাদু, কর্নেলদাদু! জুতো খুলে তবে মসজিদে ঢুকতে হয়।'

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ ডার্লিং!'

তিনজনে চত্বরে জুতো খুলে রেখে মসজিদের ভেতর ঢুকল। চার-পাঁচশ বছর ধরে এই মসজিদ পোড়ো হয়ে রয়েছে। একটা দিক ধসে পড়েছে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হয়, এখনই বুঝি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। গম্বুজটা বিশাল। তার তলায় ছাদ ফুঁড়ে গাছপালার শেকড় বেরিয়ে এসেছে। ফাটল

দিয়ে রোদ্দুর এসে ভেতরটা স্পষ্ট করেছে বটে, কিন্তু কোণার দিকটা ভেঙে পড়ায় আবছা আঁধার জমে আছে। গা ছমছম করে ওঠে ভেতরে ঢুকলে। প্রকৃতি যে অসংখ্য নখ দিয়ে আঁচড় কেটে চলেছে একটা ঐতিহাসিক কীর্তিকে খতম করে দেবে বলেই।

একঝাঁক চামচিকে সেলিম ও শানুর ওপর আচমকা এসে পড়তেই তারা আঁতকে উঠেছিল। মেঝেয় চামচিকের নাদি, পলেস্তারা খসা বালি আর চুন সুরকির আস্তরণ, দেয়ালে-দেয়ালে মাকড়সার জাল, চড়ুইপাখির বাসা ঘুলঘুলিতে। শুধু একটা কোণ বেশ পরিষ্কার। সেখানেই আবদুলের ডেরা ছিল।

কর্নেল বললেন, "আশ্চর্য তো। কাল বিকেলে আমি এখানে আবদুলের বিছানা ছড়িয়ে থাকা দেখেছি। সেগুলো তো নেই।'

সেলিম ও শানু মুখ তাকাতাকি করল। তারাও ভারি অবাক হয়ে গেছে।

কর্নেল ঝুঁকে পড়ে মেঝেয় আতশকাচ দিয়ে কী যেন খুঁজতে ব্যস্ত হলেন। সেলিম বলল, 'কী খুঁজছেন কর্নেলদাদু?'

কর্নেল বললেন, 'কাল বিকেলে টর্চের আলোয় যা খুঁজে পাইনি, এখন পাচ্ছি।'

শানু উত্তেজিতভাবে জিগ্যেস করল, 'কী?'

কর্নেল সোজা হয়ে বললেন, 'জুতোর ছাপ।'

সেলিম মুচকি হেসে বলল, 'কাল নিশ্চয় আপনি জুতো পরে ভেতরে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ' কর্নেল স্বীকার করলেন, 'কাল আমার খেয়াল হয়নি, ধর্মস্থানে পায়ে জুতো পরে ঢুকতে নেই। তবে যে ছাপ এখন দেখলাম, তা আমার জুতোর ছাপ নয়। অন্য কারও। যে আবদুলের বিছানা তন্নতন্ন খুঁজেছিল, এ নিশ্চয় তারই জুতোর ছাপ।'

শানু চমকে উঠে তাকাল সেলিমের দিকে। সেলিম চোখের ইশারায় জানিয়ে দিল, ব্যাপারটা পরে ওকে খুলে বলবে।

কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে অন্ধকার জায়গাগুলোও পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন। দুই বন্ধু অবাক চোখে প্রখ্যাত গোয়েন্দাবুড়োর কীর্তিকলাপ দেখতে থাকল।

একটুপরে কর্নেল এক টুকরো মাটি কুড়িয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'হুঁ, লোকটা আবদুলকে ফলো করে এসেছিল নদীর ওপার থেকে। তার জুতোয় এই মাটি লেগে ছিল।'

সেলিম বলল, 'কী করে বুঝলেন কর্নেলদাদু?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'নদীর এপারটা উঁচু। প্রাচীন রাজধানী হওয়ার দরুন এপারের মাটিতে চুনসুরকি বালি মিশে রয়েছে। কিন্তু ওপারের মাটিটা স্রেফ পলিমাটি। এই মাটির টুকরোও পলিমাটি।'

শানু ও সেলিম একগলায় বলল 'ঠিক, ঠিক।'

কর্নেল বললেন, 'চলো। বেরোনো যাক।'

শানু ও সেলিম এখান থেকে বেরোতে পারলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তারা আগে বেরিয়ে গেল। কর্নেল আর একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে তবে বেরোলেন।

কিন্তু তারপরই শানু ও সেলিমের উত্তেজিত চিৎকার শুনলেন। বেরিয়ে গিয়ে দেখেন, তিন জোড়া জুতোই উধাও। শানু ও সেলিম এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেলিম শাসচ্ছে, 'ভালো হবে না বলছি। কে জুতো লুকিয়েছে, বলো! নইলে....'

শানু বলল, 'কে সে কর্নেলদাদু?'

কর্নেল জবাব দিলেন না। চোখে বাইনোকুলার রেখে চারপাশে সেই লোকটিকেই যেন খুঁজতে থাকলেন। ওদিকে সেলিম এক লাফে চত্বর থেকে নেমে গেল। তারপর, 'তবে রে জুতোচোর' বলে

ঝোপজঙ্গলের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল ডাকলেন, 'সেলিম, সেলিম।' কিন্তু সেলিম যেন শুনতেই পেল না। শানু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর সে যেই বন্ধুকে অনুসরণের জন্য পা বাড়িয়েছে, কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, 'যেও না শানু। ও জুতোচোরকে ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। এখনই ফিরে আসবে।'

দু'জনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কর্নেল আবার বাইনোকুলারে সেলিমকে খুঁজতে থাকলেন। কিন্তু তাকে দেখতে পেলেন না। আর কিছুক্ষণ পরে কর্নেল বললেন, 'চলো তো দেখি। সেলিম কোনদিকে গেল?'

সেলিম জঙ্গলের ভেতর যেদিকে গেছে, সেদিকে এগিয়ে চললেন দু'জনে। মাঝে-মাঝে দু'জনেই সেলিমকে ডাকছিলেন। কিন্তু কোনও সাড়া পেলেন না। তখন শানুর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। সে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'কর্নেলদাদু। সেলিম কালো জিনটার পাল্লায় পড়েনি তো?'

কর্নেলের মুখেও এতক্ষণে উদ্বেগ ফুটে উঠেছে। শুধু বললেন, 'এসো।'

দু'জনে গোটা এলাকা সেলিমকে খুঁজে খুঁজে হন্যে হচ্ছিলেন। কিন্তু সেলিমের পাত্তা নেই। জঙ্গলে ধ্বংসস্তূপের পরে খানিকটা চষা জমি। সেখানে লাঙল চষছিল একটা লোক। কর্নেল ও শানুকে দেখে সে লাঙল থামিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল। কর্নেলকে সে সায়েব ভেবেছিল। কর্নেল যখন বাংলায় তাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি এদিকে মির্জাসায়েবের নাতি সেলিমকে দেখেছ? তখন সে আরও অবাক হয়ে গেল। সেলাম ঠুকে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার। একটু আগেই তো দেখলাম, একটা লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওই দিকে চলে গেল!

শানু বলে উঠল, 'ওদিকে মানে, সাতবুড়ুয়ার দিকে?'

চাষি লোকটি মাথা নাড়ল। কর্নেল বললেন, 'সাতবুড়ো। সেটা কী?'

শানু বলল, 'ওই যে দেখছেন গাছপালার ভেতর মন্দিরগুলো। আসলে ওটা সপ্তশিবের মন্দির। ভেঙেচুরে পড়ে আছে। বুড়োশিবের মন্দির আর কী। তাই লোকে বলে সাতবুড়ুয়ার মন্দির। কিন্তু সেলিমের কাণ্ডটা শুনে রাগ হচ্ছে। অমন করে কার সঙ্গে.....'

তার কথায় বাধা পড়ল। একটা লোক দৌড়ে আসছিল গ্রাম থেকে। সে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে সেলাম করে বলল, 'কর্নেলসায়েব! মির্জাসায়েব আপনাকে এখনই ডেকেছেন। শিগগির আসুন।'

কর্নেল ও শানু তার পেছন-পেছন ব্যস্তভাবে গ্রামের দিকে চললেন।

মির্জাসায়েব বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কী একটা ঘটেছে। কর্নেলকে দেখেই নিঃশব্দে একটা ভাঁজ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন। কর্নেল ভাঁজ খুলে দেখলেন একটা চিঠি। তাতে লেখা আছে :

আজ বারো ঘন্টার মধ্যে আবদুলের মোহরটা জঙ্গলে নবাবি মসজিদের ভেতর কাগজে মুড়ে চোখেপড়ার মতো জায়গায় না রেখে এলে মির্জার নাতিকে জবাই করা হবে। যদি পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, তাহলে তাঁর নাতিকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে।

তিন

মির্জাসায়েব বাড়ির অন্দরমহলের একটি ঘরে মির্জাসায়েব, কর্নেল, নবাবগঞ্জ থানার অফিসার ইন-চার্জ মহিউদ্দিন এবং সদর শহরের সি. আই. ডি ইন্সপেকটার জিতেন্দ্রনাথ গোপনে আলোচনা করছিলেন। বেলা প্রায় একটা বাজে। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নবাবগঞ্জ এসেছেন এবং সামান্য এক মানুষ আবদুলের মৃত্যু নিয়ে তাঁর এত উৎসাহ ও সন্দেহের কথা জেনে জিতেন্দ্রনাথ ছুটে এসেছেন সদর থেকে জিপে চেপে। মির্জাবাড়িতে গোপনে এবেলা ওঁদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন

হয়েছিল। বাড়িতে কান্নাকাটি হুলস্থূল পড়ে গেছে সেলিমের জন্য। সেলিমের বাবা থাকেন সুদূর আবুধাবিতে। তাঁকে এখনই ট্রাংকল বা টেলিগ্রাম করে এ বিপদের কথা জানাতে বারণ করেছেন কর্নেল।

আলোচনারত মুখগুলি গম্ভীর। সবাই চাপা গলায় কথা বলছেন। ও.সি. মহিউদ্দিন বললেন, 'মর্গের রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু। বিষাক্ত সাপের দুটো দাঁত থেকে। আবদুলের ডান পায়ের ওপর সে-চিহ্ন দেখেছেন ডাক্তার। কিন্তু—আশ্চর্য। মির্জাসায়েবের নাতিকে—'

তাঁর কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'সে কথা পরে হবে মহিউদ্দিনসায়েব। আবদুলের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে কি না বলুন।'

মহিউদ্দিন বললেন, 'হ্যাঁ। কালই বিভিন্ন থানায় রেডিও মেসেজে জানিয়েছিলাম। আজ সকালে লালগোলা থানার রেডিও মেসেজে যা জানলাম, তা হল এই : আবদুলের বাড়ি ছিল পদ্মার ধারে সাহেবগঞ্জে। ও ছিল আসলে বনেদি ফ্যামিলির লোক। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই একটু ছিটগ্রস্ত টাইপের। বছর বারো আগে আবদুলের সঙ্গে গফুর খাঁ পাঠান নামে একজন লোকের মারামারি হয়। মারামারির কারণ কেউ জানে না। গফুর একজন দাগি ক্রিমিন্যাল। বহুবার জেল খেটেছে। গফুরকে স্থানীয় লোকে বলে 'গোখরো-পাঠান'। বুঝলেন তো? ওকে সবাই বলত, 'গোফরা-পাঠান'। তা থেকেই শেষে ওর নাম হয়েছিল গোখরো পাঠান। যাই হোক, তার গায়ে হাত তোলার পরিণাম সাঙ্ঘাতিক হওয়ার কথা। সম্ভবত সেই ভয়েই আবদুল গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসে।

কর্নেল মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। বললেন, 'হুঁ। মনে হচ্ছে এই ঐতিহাসিক সোনার মোহর নিয়েই দু'জনের মধ্যে বিবাদ বেধেছিল।'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'গোখরো পাঠানের নামে তিনটে খুন আর একডজন ডাকাতির অভিযোগে পরোয়ানা ঝুলছে। ব্যাটাচ্ছেলে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

মহিউদ্দিন একটু হেসে বললেন, 'শেষ পর্যন্ত তা হলে কী গোখরো-পাঠানের পাল্লায় পড়েছিল আবদুল? অথচ তার মৃত্যু হল গোখরোর কামড়ে। অদ্ভুত যোগাযোগই বলতে হবে।'

মির্জাসাহেব বললেন, 'নবাবগঞ্জের লোকে বলছে, সাপ মেরে পুড়িয়ে দেয়নি আবদুল। সেই সাপটাই তাকে নাকি কামড়েছে। তা হলে দেখছি ব্যাপারটা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

কর্নেল বললেন, 'না, মির্জাসায়েব। মর্গের রিপোর্টে গণ্ডগোল আছে বলে মনে হচ্ছে। কারণ, পরবর্তী ঘটনাগুলো বলে দিচ্ছে আবদুলের মৃত্যু সাপের কামড়ে হয়নি। বাই দা বাই, মহিউদ্দিনসায়েব, গোখরো-পাঠানের চেহারা বর্ণনা পেয়েছেন রেডিও মেসেজে?'

জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'আমাদের রেকর্ডে আছে। দেখতে চাইলে ওর ফোটোও আপনাকে এনে দিতে পারি দফতর থেকে।'

কর্নেল বললেন, 'তার গায়ের রং কালো এবং সে দেখতে কদাকার কি?'

দু'জন পুলিশ অফিসারই অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তারপর জিতেন্দ্রনাথ মুচকি হেসে বললেন, 'ও-জন্যই পুলিশমহলে কর্নেলকে 'অন্তর্যামী' বলা হয়।'

কর্নেল হাসলেন, 'না জিতেনবাবু! আমি অন্তর্যামী নই। আবদুল বলেছিল গতকাল ওকে নদীর ওধারে একটা কালো জিন তাড়া করেছিল। বারো বছর পরে নাকি সেই কালো জিনটার সঙ্গে আবদুলের আবার দেখা। তাই আমার ধারণা হয়েছিল, আসলে সে তার শত্রুর গায়ের রং কালো ও চেহারা কদাকার, এটাই বলতে চেয়েছিল।'

দুই পুলিশ অফিসারই সপ্রশংস ভঙ্গিতে সায় দিলেন। মির্জাসায়েব বললেন, 'এবার বলুন, আমার নাতি সেলিমের কী হবে? আগের মতো গায়ের তাকত থাকলে ওই গোখরা-পাঠানকে গুলি করে মারতাম। আমি এখন বুড়ো হয়েছি।' তাঁর চোখে জল এসেছিল। হাতের চেটোয় চোখ মুছে ফের বললেন, 'কত সাংঘাতিক মানুষখেকো বাঘকে সামনাসামনি গুলি করে মেরেছি। ও তো একটা মানুষের বেশধারী শয়তান!'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ভাববেন না মির্জাসায়েব। এ পর্যন্ত কোথাও কোনওদিন আমি হারিনি। আমার বিশ্বাস, এবারও হারব না, বলে উনি মহিউদ্দিনের দিকে ঘুরলেন, 'মর্গের রিপোর্ট ঠিক নয় মহিউদ্দিনসায়েব। আপনি বরং—'

বাধা দিয়ে বিরক্তমুখে মহিউদ্দিন বললেন, 'কিন্তু আপনিও তো আবদুলের মৃত্যুর সময় তার মুখে 'সাপ' কথাটা শুনেছেন।'

কর্নেল বললেন, 'সাপ শুনিনি। সে অতিকষ্টে সা-সা বলেছিল। আসলে সে কী বলতে চাইছিল, আমরা এখনও জানি না, বলে কর্নেল মির্জাসায়েবের দিকে ঘুরলেন, 'আপনি তো আমার মতো ইতিহাস প্রত্নবিদ্যার কেতাব পড়েন। আপনার কাছে স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত কোনও বই আছে?'

মির্জাসায়েব গম্ভীর মুখে বললেন, আছে। রবার্ট স্মিথের লেখা 'দা ডেকাডেন্স অফ দা টার্কি সুলতানেট অব বেঙ্গল।' ওতে পুরনো নবাবগঞ্জের ডিটেলস আছে।'

কর্নেল হাসলেন, 'আপনার নাতিকে উদ্ধারের আগে ওই বইটাতে আমি একটু চোখ বুলোতে চাই।'

বাঁকা হেসে দারোগা মহিউদ্দিন বললেন, 'কর্নেল কি ওই বইয়ের ভেতর মির্জাসাহেবের নাতিকে কিডন্যাপ করার ক্লু পাবেন নাকি?'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'মহিউদ্দিন সায়েব, সেই কবিতাটি নিশ্চয় জানেন : 'যেইখানে পাবে ছাই/ উড়াইয়া দেখ তাই/ পাইলে পাইতে পার অমূল্যরতন।' আমি তাই ছাইপাঁশ হাতড়ে দেখারই পক্ষপাতী।'

মহিউদ্দিনদারোগা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে এখনই থানায় ফিরতে হবে। ভাববেন না মির্জাসাহেব। এমন ফাঁদ পেতে রাখব, যাতে গোখরো-পাঠান পা না দিয়ে পারবে না।'

মির্জাসায়েব আঁতকে উঠে বললেন, 'সে যদি জানতে পারে, পুলিশকে খবর দিয়েছি, তা হলে সেলিমকে আর ফিরে পাব না। আল্লার দোহাই। আপনারা যা কিছুই করুন, যেন সেলিমকে—'

বাধা দিয়ে মহিউদ্দিন বললেন, 'না, না। আমরা যথেষ্ট সাবধানে কাজ করব।'

জিতেন্দ্রনাথও উঠলেন। দুই পুলিশ অফিসার কর্নেল ও মির্জা সায়েবকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন। সতর্কতা হিসেবে ওঁদের খিড়কির দরজা দিয়ে অন্দরমহলে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাড়ির বিশ্বাসী ভৃত্য করিম ওঁদের গোপনীয়তার জন্য ওদিকটায় নজর রেখেছিল। করিম অবস্থা বুঝে দুই পুলিশ অফিসারকে খিড়কি দিয়ে নিয়ে গেল।

মির্জাসায়েব ও কর্নেল এসে বাইরের ঘরে বসলেন এবার। মির্জাসায়েব আলমারি থেকে স্মিথের বইটি কর্নেলকে দিয়ে বললেন, 'গোখরা না গোখরো-পাঠানের গায়ের রং নাকি কালো। অথচ মকবুল লাঙল চষার সময় সেলিমকে যার সঙ্গে যেতে দেখেছিল, তার গায়ের রং নাকি কালো নয়। আমি কিছু বুঝতে পারছি না কর্নেল!'

কর্নেল বইটার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বললেন, 'লোকটাকে মকবুল চেনে না বলেছে। কাজেই গোখরো-পাঠান নবাবগঞ্জে কোনও সঙ্গী জোটায়নি।'

'তার মানে এ লোকটা গোখরো-শয়তানের কোনও চেলা। বদমাশটা তাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে, এই তো?' বলে মির্জাসাহেব কর্নেলের দিকে তাকালেন।

কর্নেল তখন বইটার একটা পাতায় চোখ রেখেছেন। যেন মির্জাসায়েবের কথা কানেই ঢুকছে না। তিনি হঠাৎ বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল। তারপর মির্জাসায়েবকে স্তম্ভিত করে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন। কতকটা দৌড়নোর ভঙ্গিতেই।

মির্জাসায়েব বলে উঠলেন, 'তাজ্জব!'

চার

শানু সপ্তশিবের ভাঙা মন্দিরের ওখানে একা দাঁড়িয়ে ছিল। সেলিমের বিপদ সে চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। নবাবগঞ্জ হাইস্কুলে ক্লাস এইটে দু'জনেই পড়ে। শানু ফার্স্ট বয়, সেলিম সেকেন্ড বয়। প্রতি বছর দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে ফার্স্ট হওয়া নিয়ে। কিন্তু সেলিম ফার্স্ট হতে পারে না। তবু এ জন্য শানুর প্রতি এতটুকু ঈর্ষা জাগে না, মুখে যতই ঠাট্টাতামাশা করুক। তারা বরাবর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পুজোয় বা ঈদের পরবে শানু বা সেলিমদের বাড়িতে পরস্পরের খাওয়াদাওয়ার ডাক পড়ে। দুটি পরিবারেও খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক। তাই সেলিমের এই বিপদে শানু মরিয়া হয়ে উঠেছিল তাকে উদ্ধারের জন্য।

চাষি মকবুল বলেছে, সেলিম একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সপ্তশিব বা সাতবুড়ুয়ার মন্দিরের দিকে যাচ্ছিল। তাই শানু এখানে চলে এসেছে। দুপুরে ভালো করে খেতেও পারেনি। ছুটে গিয়েছিল সেলিমদের বাড়িতে কর্নেলের খোঁজে। কিন্তু তখন কর্নেল দুই পুলিশ কর্তাকে নিয়ে অন্দরমহলে গোপনে আলোচনারত। তাই শানুকে বাড়ির কেউ কর্নেলের খবর দেয়নি। করিম বলেছিল, 'কর্নেলসাহেবকে খুঁজছে? উনিও তো এক আবদুলখ্যাপা। পাখ-পাখালির পেছনে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন কোথায় দেখো গে।'

সপ্তশিবের মন্দির বলতে আর কিছু টিকে নেই। ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ অনেকটা জায়গা জুড়ে। মধ্যিখানে বিশাল এক বটগাছ চারদিকে অজস্র ঝুরি নামিয়েছে। দিনদুপুরেই জায়গাটা নিঝুম আঁধার হয়ে থাকে। তাছাড়া জায়গাটার এমন বদনাম যে, দিনদুপুরেও একাদোকা কেউ পারতপক্ষে এদিকে পা বাড়ায় না। কারণ শিবের চেলারা যে ভূত-পেরেত। শিবের মন্দির ধ্বংস হয়েছে; কিন্তু তাঁর চেলারা পাহারা দিচ্ছে না বুঝি? একাদোকা পা বাড়ালেই ঘাড়টি মটকে দেবে।

শানুর তাই মাঝে-মাঝে গা ছমছম করছিল। হেমন্তের বিকেলে গাছপালা জুড়ে অজস্র পাখি চেঁচামেচি করছিল। এখনই দূরের গাছপালা ঘিরে কুয়াশার নীল আস্তরণ ঘনিয়ে উঠেছে। বিকেলের হলুদ রোদ গায়ে মেখে উড়ে চলেছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। নদীর ওপারে বিলের জলে এখনই তাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। হাঁসের ঝাঁকটাকে শানু পেছনে ফিরে মুখ তুলে দেখছিল। আবদুলচাচা তার এ অভ্যাসের মূলে। আবদুল বলত, 'রাতের বেলা জোস্না হলে হাঁসগুলোর ভেতর থেকে পরিরা আপন রূপ ধরে। কেন জানো তো? অনেক পরি যে হাঁসের রূপ ধরে দুনিয়ার নেমে আসে। দুনিয়ার নদী-খালবিলের পানিতে সাঁতার না কাটলে আসমানের পরিদের ঘুম হয় না পরিস্তানে।' এসব কথা শোনার পর শানু হাঁসের ঝাঁক দেখলেই মুখ তুলে তাদের দেখতে দেখতে ভাবত, কোন হাঁস পরি, আবদুলচাচা নিশ্চয় চিনতে পারে। কেন তাকে চিনিয়ে দেয় না আবদুলচাচা? আজ আর সেই আবদুলচাচা নেই। শানু দুঃখে শ্বাস ফেলল।

একটু অনামনা হয়ে পড়েছিল শানু। হঠাৎ কোথাও শুকনো পাতায় মস-মস শব্দ আর কাদের চাপা গলার কথাবার্তা শুনে সে চমকে উঠল। তারপর একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। একটু পরে সে দেখল, দুটো লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে।

একজনের চেহারা দেখে শানু শিউরে উঠল। ও কি মানুষ না ভূত? জীবনে অমন কালো-কুচ্ছিত চেহারার মানুষ দ্যাখেনি শানু। থ্যাবড়া নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় একরাশ চুল। তার পরনে নীলচে আঁটো প্যান্ট আর জ্যাকেট। কাঁধে একটা কীটব্যাগ। আকারে বেঁটে হলেও সে বেশ মজবুত গড়নের লোক। মুহূর্তে শানুর মনে হল, একেই কি আবদুলচাচা কালো জিন বলেছিল?

তার সঙ্গীটি ঢ্যাঙা গড়নের লোক। তার পরনে প্যান্ট আর গলাবন্ধ সোয়েটার। এখনও তত শীত পড়েনি। কিন্তু শানুর মনে হল, রাত কাটানোর জন্যই গায়ে সোয়েটার চড়িয়েছে লোকটা। তার নাকটা চোখে পড়ার মতো লম্বা।

হঠাৎ শানুর মনে হল, এই ঢ্যাঙা লোকটিকে কোথায় দেখেছে। মুখটা খুব চেনা। অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না।

কালো কুচ্ছিত লোকটা বলল, 'হুঁশিয়ার থাকবে। এখানে পুলিশ দেখলেই জানবে, মির্জাব্যাটা পুলিশকে সব জানিয়েছে। আর সঙ্গে-সঙ্গে মির্জার নাতিকে জবাই করে ফেলবে।'

ঢ্যাঙা লোকটা খি-খি করে হেসে বলল, 'ছোঁড়াটা যে ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছে। শ্বাসনালি কাটার কষ্টও টের পাবে না।'

কালো লোকটা ধমক দিয়ে বলল, 'পুলিশ দেখেও যদি ছোঁড়াটাকে জবাই না করো, তোমার কী হবে বুঝতে পারছ? বলে সে জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে কী একটা যন্ত্র বের করল। খুব ছোট্ট যন্ত্র।

দেখামাত্র ঢ্যাঙা লোকটা ভয়পেয়ে বলল, 'আরে, রসিকতা বোঝো না কেন? সবতাতেই ফোঁস করে ওঠো। এজন্যই লোকে তোমাকে গোখরো-পাঠান বলে।'

কালো লোকটা জিনিসটা ঢুকিয়ে রেখে বলল, 'মোহরটা যদি পাই, তাহলে আমরা দু'জনেই রাজা হয়ে যাব। বুঝলে তো?'

মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে ঢ্যাঙা লোকটা বলল, 'তা হলে যাও। গিয়ে দেখ নবাবি মসজিদের চত্বরে মোহরটা রেখে গেছে নাকি। হাতে আর মোটে কয়েক ঘন্টা টাইম।'

কালো লোকটা বলল, 'মুশকিল হয়েছে কী জানো? মির্জার ওই কলকাতার বন্ধু কর্নেল না ফর্নেল, সে একজন ঘুঘু। আমার ধারণা, সে একজন পুলিশের গোয়েন্দা। যাই হোক, আমিও বাবা গোখরো-পাঠান। বিস্তর ঘুঘু আমি টিট করেছি। নবাবি মসজিদের ধারে কাছে তাকে দেখলেই গোখরোর ছোবল কী জিনিস টের পাইয়ে দেব।'

ঢ্যাঙা বলল, 'তুমিও সাবধানে থেকো কিন্তু। আর শোনো, জুতোগুলো আমি বটগাছের কোটরে লুকিয়ে রেখেছি। ওগুলো পুঁতে ফেললে ভালো হতো। পুলিশ যদি—'

ওকে বাধা দিয়ে কালো লোকটা বলল, 'পরে পুঁতে ফেলো বরং। এখন গিয়ে দ্যাখো ছোঁড়াটার আবার ঘুম ভেঙে গেল নাকি। ঘুম ভেঙেছে দেখলে আর এক ডোজ ওষুধ খাইয়ে দেবে।'.....

শুনতে শুনতে শানু বারবার শিউরে উঠছিল আতঙ্কে। তার বুক এমন ঢিপ-ঢিপ করছিল যে এখনই বুঝি সে মারা পড়বে। কালো লোকটার হাতের খুদে যন্ত্রটাই বা কী, যা দেখে ঢ্যাঙা লোকটা এমন ভয় পেল, সে বুঝতে পারছিল না। তাছাড়া আরও দুটো ব্যাপার সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না। চাষি মকবুল দেখেছে, সেলিম একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সাতবুড়ুয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেলিম 'তবে রে জুতোচোর' বলে ছুটে গিয়ে কেন আবার সেই জুতোচোরের সঙ্গেই কথা বলতে বলতে এদিকে আসছিল?

আর, মাত্র একটা সোনার মোহর পেয়ে এরা দু'জনে রাজা হয়ে যাবে কীভাবে? একটা সোনার মোহরের আর কতই বা দাম? ঐতিহাসিক মোহরের দাম থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কি রাজা হওয়া যায় এ যুগে? তবে বোঝা গেল, এই গোখরো পাঠান লোকটাকেই কালো জিন বলেছিল

আবদুলচাচা। গোখরো-পাঠান যাওয়ার সময় শানুর প্রায় মিটার দুই তফাত দিয়ে—বলতে গেলে নাকের ডগা দিয়েই শুকনো পাতায় জুতোর মসমস শব্দ করতে করতে চলে গেল।

ঢ্যাঙা লোকটি হাই তুলে তুড়ি বাজাল। অনেকের এ অভ্যাস থাকে, শানু দেখেছে। ঢ্যাঙা এবার পকেট থেকে সিগারেট বের করে সিগারেট ধরাল। তারপর শিস দিয়ে একটা হিন্দি হিট গানের সুর তুলতে তুলতে যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে পা বাড়াল। তখন শানু সাবধানে তাকে অনুসরণ করল।

প্রাচীন যুগে এখানে একটা বড় মন্দিরকে কেন্দ্র করে ছটা মন্দির ছিল। মূল মন্দিরটা ভেঙে এই প্রকাণ্ড বটগাছ গজিয়েছে। বিশাল গুঁড়ির সঙ্গে এখনও চাপ-চাপ ইট-পাথরের চাঙড় আটকে আছে। বাকি মন্দিরগুলোর ধ্বংসস্তূপ ঘিরে ঘন জঙ্গল গজিয়েছে। একচিলতে রোদ্দুর ঢোকে না, এমন ছায়াভরা সুড়ঙ্গ পথের মতো একফালি রাস্তায় ঢ্যাঙা লোকটা এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে। শানু দূরত্ব রেখে তাকে অনুসরণ করছিল। মাথার ওপর দুপাশ থেকে ঝুঁকে পড়া লতাপাতায় লোকটার মাথা ঠেকে গেলে সে রেগে গেল। চাপা গলায় বিরক্তি প্রকাশ করে সে পকেট থেকে একটা ভোজালি গড়নের ছোরা বের করল। তারপর লতাপাতাগুলো কেটে ফেলল। তখন শানু দেখতে পেল, সামনে একটা গোলাকার স্তূপ বা মাটিতে বসে যাওয়া গম্বুজের মতো ঢিবি রয়েছে। ঢিবির সামনে দরজার মতো ফোকর।

সঙ্গে-সঙ্গে শানুর মনে পড়ে গেল, ইতিহাসের বইতে এমন গড়নের স্থাপত্য সে ছবিতে দেখেছে। এ কী তা হলে কোনও প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ? সাঁচি, ভারহুত এবং আরও বহু জায়গার যে সব প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ আছে, এটা যেন তাদেরই একটা খুদে প্রতিরূপ।

স্তূপের ফোকরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। লোকটা টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকে গেল। সেই সুযোগে শানু পা টিপে টিপে এগিয়ে স্তূপের ফোকরের একপাশে সেঁটে রইল। ভেতরে লোকটা গুঁড়ি মেরে বসে টর্চের আলো ফেলেছে। সে এদিকে পেছন ফিরে আছে। কিন্তু টর্চের আলোয় শানু যা দেখল, তার বুক ফেটে কান্না জাগল। অতি কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করল।

সেলিমের দুটো হাত এবং দুটো পা দড়িতে বাঁধা। সে চিত হয়ে পড়ে আছে। চোখ দুটো বন্ধ।

লোকটা তাকে কাতুকুতু দিয়ে পরীক্ষা করল, সে সত্যি ঘুমিয়ে আছে, নাকি ঘুমের ভান করে আছে। ঘুমের ওষুধ খাওয়ানোর কথা শানু কিছুক্ষণ আগে শুনেছে। সে বুঝল, সেলিম সত্যিই ওষুধের প্রভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

লোকটা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার এদিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে শানু স্তূপের অন্যপাশে ঘন আগাছা আর লতাপাতায় ঠাসা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

কিন্তু তার ফলে বেশ খানিকটা শব্দও হল। অমনি লোকটা সেদিকে তাকাল। তার চোখে সন্দেহ ঝিলিক দিচ্ছে। সে টর্চের আলো ফেলল।

ভাগ্যিস শানু লতাপাতার আড়ালে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। তাই একটুর জন্য বেঁচে গেল। লোকটা নিশ্চয় তাকে শেয়াল বা অন্য কোনও জন্তু ভেবে এদিকে খুঁজতে এল না। নইলে কী হতো, ভেবে শানুর দম আটকে যাওয়ার অবস্থা একেবারে।

লোকটা আগের মতো গুঁড়ি মেরে এবং শিস দিতে দিতে হিট হিন্দি ফিল্মের সুর বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই শানু আড়াল থেকে বেরিয়ে স্তূপের ফোকরের সামনে এল। দেখল, লোকটা সেই সিগারেটের টুকরোটা ফেলে গেছে এবং তা থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ছায়া প্রগাঢ় বলেই আগুনটুকু জ্বলজ্বল করছে। শানু ঢুকে গেল ফোকরের মধ্য দিয়ে।

স্তূপের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। ঠাহর করে পা বাড়িয়ে বেচারা সেলিমকে ছুঁয়েই বসে পড়ল। আন্দাজ করে প্রথমে সে তার পায়ের বাঁধন খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। হাতের বাঁধনও তেমনি মজবুত। খোলা গেল না। তখন সে সেলিমকে দু'হাতে ওঠানোর চেষ্টা করল।

কিন্তু সেলিম তার চেয়ে শক্তসমর্থ এবং ওজনেও ভারী। শানু রোগাটে গড়নের ছেলে। সেলিমকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সাধ্য তার নেই। টানাটানি করে শানু তাকে ফোকরের বাইরে আনতে পারল। কিন্তু অতি কষ্টে বাইরে আনল বটে, এবার কীভাবে ঘন লতাপাতা ভরা ঝোপের ভেতর দিকে তাকে নিয়ে যাবে ভেবে পেল না শানু। তাছাড়া ঝোপগুলো শেয়াকুল-বৈঁচি-নাটাকাঁটায় ঠাসা। শানুরই শরীরের খোলা জায়গাগুলো কাঁটায় ছড়ে রক্তারক্তি হয়ে গেছে। সেলিমকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হলে সেলিমের শরীরের কী অবস্থা হবে?

সে বুঝতে পারছিল, লোকটা নিশ্চয়ই তাদের সেই চুরি করা জুতোগুলো পুঁততে গেছে। জুতোগুলো কেন সে চুরি করেছিল, শানুর মাথায় আসছে না। তবে এ মুহূর্তে শানুর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতও নেই। সে সেলিমকে কীভাবে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে তাই নিয়ে ভেবে আকুল।

হঠাৎ তার চোখ গেল জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটার দিকে।

প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে আছে সুড়ঙ্গের মতো রাস্তাটাকে। শানু একরাশ শুকনো পাতা কুড়িয়ে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোর ওপর রেখে জোরে ফুঁ দিতে থাকল। কয়েকবার ফুঁ দেওয়ার পর আগুন ধরল পাতাগুলোতে। তখন সে শুকনো কয়েকটা ডাল কুড়িয়ে ধরিয়ে নিল আগুনে। তারপর সেলিমের পা দুটোর মাঝখানের দড়িতে সাবধানে আগুন ধরাল।

দড়িতে আগুন জ্বলতেই ঝটপট নিভিয়ে ফেলল শানু। এর ফলে সেলিমের দুটো পা মুক্ত হল। তবে প্রত্যেকটা পায়ে খানিকটা দড়ি জড়ানো থেকে গেল।

কিন্তু হাত দুটো পেটের কাছে বাঁধা অবস্থায় আছে। সেলিমকে কাত করে একইভাবে ওর হাতের বাঁধন পোড়োনার চেষ্টা করল শানু।

ততক্ষণে আর এক কাণ্ড ঘটে গেছে। শুকনো পাতার আগুন ক্রমশ চারদিকে ছড়িয়ে গেছে এবং ঝোপঝাড় জ্বলতে শুরু করেছে। ধোঁয়ায় দম আটকে যাচ্ছে। শানু কাশতে শুরু করল। সেলিম আর সে দু'জনেই যে এবার ধোঁয়ায় দম আটকে শুধু নয়, আগুনেও জ্যান্ত পুড়ে মরবে।

সেলিমের হাতের বাঁধন পোড়াতে গিয়ে শানুর ততক্ষণে নিজের প্রাণ বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়েছে। আগুন থেকে বাঁচার জন্য সে মরিয়া হয়ে কাঁটাঝোপের যে দিকটায় তখনও আগুন ধরেনি, সেদিকটায় সেলিমকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। কাঁটায় দু'জনেরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

কিন্তু সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় পৌঁছতেই হঠাৎ তাদের ওপর এক ঝলক টর্চের আলো এসে পড়ল। অমনি শানু আতঙ্কে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার পায়ের কাছে সেলিম পড়ে রইল। আর প্রতি মুহূর্তে শানু অপেক্ষা করতে থাকল একটা ধারালো ছোরা এসে তার গলায় বসবে এবং...

শানু চোখ বুজে ফেলল।...

পাঁচ

তারপর শানুর কানে এল, কেউ বলছে, 'ব্রেভো ডার্লিং! এই তো চাই!'

শানু চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। টর্চের আলো নিভে গেছে। কিন্তু জঙ্গলের ছায়ার ভেতর হেমন্তের দিন শেষের কুয়াশা ভরা ধূসরতায় তার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে সাদা দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে জ্যাকেট আর প্যান্ট, কাঁধে ঝুলন্ত ক্যামেরা এবং বুকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার।

শানু বিশ্বাস করতে পারল না নিজের চোখকে। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সে তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল।

তখন কর্নেল এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলেন, 'শানু। শানু।'

শানুর হুঁশ ফিরল। সে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে উঠল 'কর্নেল! আপনি?'

কর্নেল বললেন, 'এখন আর কোনও কথা নয়। চলে এসো এখান থেকে,' বলে শানুর হাতে টর্চটা গুঁজে দিলেন। তারপর সেলিমকে অনায়াসে দু'হাতে তুলে কাঁধে চাপিয়ে পা বাড়ালেন।

ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে অনেকটা চলার পর সেই বটগাছের তলায় পৌঁছে কর্নেল ডাকলেন, 'করিম। করিম!

করিমের সাড়া পাওয়া গেল গুঁড়ির আড়াল থেকে, 'আছি স্যার।'

কর্নেল বললেন, 'তোমার আসামিকে নিয়ে এখানে এসো।'

শানু অবাক হয়ে দেখল, করিম সেই ঢ্যাঙা লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে তার সোয়েটারের কলার খামচে ধরে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে আসছে। করিমের হাতে লোকটার সেই ভোজালি গড়নের ছোরা।

কর্নেল বললেন, 'আসামিকে আমার জিম্মায় রেখে তুমি এখনই সেলিমকে সোজা হেলথ-সেন্টারে নিয়ে যাও। তারপর বাড়িতে খবর দেবে। যাও, দেরি কোরো না।'

করিম ছোরাটা শানুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'নাও বাপধন। বেগতিক দেখলেই এই পাজি গদাইচন্দরের পেটে দেবে গোটাকতক খোঁচা মেরে। কেমন?' বলে সে সেলিমকে কর্নেলের কাঁধ থেকে নিজের কাঁধে নিল। তারপর দ্রুত এগিয়ে চলল গ্রামের হেলথ-সেন্টারের দিকে।

কর্নেল চেঁচিয়ে তাকে বলে দিলেন,'দরকার হলে হেলথ-সেন্টার থেকে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে সদরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বুঝলে তো করিম?'

করিম চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'বুঝেছি স্যা-অ্যা অ্যার!'

এবার কর্নেল ঢ্যাঙা লোকটা অর্থাৎ গদাইচন্দ্রের সোয়েটারের কলার ধরে বললেন, 'চলো হে গদাইচন্দর, দেখি, নবাবি মসজিদে তোমার স্যাঙাতের কী অবস্থা হল।'

গদাই হাউমাউ করে কেঁদে বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই স্যার। গোখরো পাঠানই আমাকে লোভ দেখিয়ে—'

কর্নেল তার গালে থাপ্পড় কষে বললেন, 'চুপ। যা বলার থানায় বলবে।'

খোলা জায়গায় পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'শানু। বলো, কীভাবে তুমি সেলিমের খোঁজ পেলে।'

শানু সংক্ষেপে সবটা বলল। তারপর জিগ্যেস করল, 'আপনি বলুন এবার।'

কর্নেল বললেন, 'জঙ্গলের ভেতর ধোঁয়া দেখে আমি ছুটে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছ আর সেলিম তোমার পায়ের কাছে পড়ে আছে।'

শানু বলল, 'তার আগের ব্যাপারটা বলুন, কর্নেল।'

কর্নেল গদাইকে নিয়ে যেতে-যেতে বললেন, মকবুল হচ্ছে করিমের পিসতুতো দাদা। করিম খুব চালাক লোক। মকবুলের কাছে এই লোকটার চেহারার বিবরণ শুনেই বুঝতে পেরেছিল, লোকটা কে। সেলিম গদাইকে চিনত বলেই তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল। তবে মকবুল একে চেনে না।'

শানু অবাক হয়ে বল, 'সেলিমের কাণ্ড দেখে অবাক লাগছে। কেন সে—'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'সেলিম সুস্থ হলে সেটা জানা যাবে তার মুখ থেকে। তবে গদাইকে তোমারও চেনা উচিত।'

শানু দিন শেষের ধূসর আলোয় ঢ্যাঙা লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তারপরই সে লাফিয়ে উঠল। 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে কর্নেল। এ তো সেই গদাই-চোর। রায়বাবুদের বাড়িতে থাকত। টাকা চুরি করে নিপাত্তা হয়েছিল। সম্পর্কে নাকি নুটু রায়মশাইয়ের ভাগ্নে। একবার আমাদের বাড়িও চুরি করতে ঢুকেছিল। ধরা পড়ে—'

বাধা দিয়ে গদাই বলল, 'বাজে কথা বোলো না। আমি গিয়েছিলাম তোমার বাবার কাছে একটা কাজে। খামোকা সন্দেহ করে আমাকে চোর বলে মেরেছিলে তোমরা।'

শানু ভেংচি কেটে বলল, 'শাট আপ। রাত দুটোয় পাঁচিল ডিঙিয়ে বাবার কাছে কাজে গিয়েছিলে? দেব এক খোঁচা পেটে।'

শানু সেই বাঁকা ছোরাটা বাগিয়ে খোঁচা মারার ভান করলে গদাই বলল, 'ওরে বাবা। এ যে দেখছি মহাবিচ্ছু। স্যার, স্যার। দেখছেন আমাকে স্ট্যাব করতে আসছে?'

কর্নেল বললেন, 'চুপ। একটা কথা বললে সত্যি শানু তোমার পেট ফাঁসাবে।'

শানু হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা কর্নেল, আপনি করিমদার সঙ্গে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলে কেন এসেছিলেন বললেন না কিন্তু।'

কর্নেল বললেন, 'আমিই একা আসছিলাম ওদিকে। হঠাৎ করিম পিছু ডাকল। ঘুরে দেখি, সে দৌড়ে আসছে। সে এসে তার মামাতো ভাই মকবুলের কাছে শোনা কথাটা বলতে এসেছিল আমাকে। যাই হোক, ওর কথা শোনার পর ভাবলাম, অচেনা জায়গায় যাচ্ছি। করিমকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই ভালো। সে স্থানীয় লোক।'

শানু কথার ওপর বলল, 'কিন্তু হঠাৎ সাতবুড়ুয়ায় কেন আসছিলেন?'

কর্নেল বললেন, 'তুমি যেজন্য এসেছিলে, সেজন্যও বটে, তবে তার চেয়ে জরুরি একটা কারণও ছিল। পরে জানতে পারবে। তো, আমি আর করিম বটতলায় পৌঁছে শুনি, খসখস ধুপধুপ শব্দ হচ্ছে কোথায়। দু'জনে চুপি-চুপি এগিয়ে গিয়ে দেখি বটগাছটার গুঁড়ির কোটরে পিছু ফিরে এই গদাইচন্দ্র ওই ছোরাটা দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। তার পাশে আমাদের সেই হারানো তিন জোড়া জুতো। বুঝলুম, জুতোগুলো লুকিয়ে ফেলতে চায়। আমি কিছু করার আগেই করিম পা টিপেটিপে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গদাইয়ের ওপর। তারপর ওর পিঠে বসে বলল, একটা দড়ি হলে ভালো হতো। আমার পকেটে নাইলনের দড়ি থাকে, যখনই জঙ্গলে যাই। গাছ থেকে অর্কিড সংগ্রহ আমার হবি। ফাঁস ছুঁড়ে অর্কিডের ঝাড় টেনে উপড়ে নামাই। এ বয়সে আর যাই পারি, গাছে চড়াটা বরদাস্ত হয় না।'

শানু হাসতে লাগল, 'বুঝেছি। করিমদা একে বেঁধে ফেলল। তারপর আপনি ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ওদিকে দৌড়ে গিয়েছিলেন।'

কথা বলতে বলতে চষা জমি পেরিয়ে ওঁরা খেলার মাঠে পৌঁছলেন। তখন একদল ছেলে ক্রিকেট খেলে সবে চলে যাচ্ছে। আবছা আঁধার জমে উঠেছে। ছেলেগুলো এদিকে তাকাল না। তারা চলে গেলে কর্নেল গদাইকে নিয়ে খেলার মাঠের পূর্বপ্রান্তে গেলেন। শানুও গেল। তারপর কর্নেল শিস দিলেন তিনবার। অমনি জঙ্গলের দিক থেকে তিনবার শিস শোনা গেল।

তারপর একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। শানু দেখল, আর কেউ নয়, থানার দারোগা মহিউদ্দিন। তিনি এসে টর্চের আলো জ্বেলে গদাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ আবার কে?'

কর্নেল চাপা স্বরে বললেন, 'গোখরো-পাঠানের সঙ্গী। কিন্তু আপনাদের খবর কী বলুন?'

মহিউদ্দিন বললেন, 'ও মহা ধড়িবাজ। জাল মোহরটা নবাবি মসজিদের ভেতর কাগজে মুড়ে রেখেছিলাম। গোখরো-পাঠান এল। ভেতরে ঢুকল। অমনি আমরা গিয়ে মসজিদে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য। গোখরো-পাঠান যেন সত্যিই একটা সাপ। সে যেন কোনও গর্তে বা ফাটলে ঢুকে পড়েছে। তাকে আর খুঁজেই পেলাম না।'

কর্নেল বললেন, 'মসজিদের চারদিক ঘিরে রাখা উচিত ছিল।'

'রেখেছিলাম। চারদিকে ঝোপের ভেতর আর্মড কনস্টেবলরা লুকিয়ে ছিল। তারা ওকে আসতে দেখেছে। কিন্তু যেতে দেখেনি।' মহিউদ্দিন ক্ষোভের সুরে বললেন, 'বোকামি হয়ে গেছে। ওকে আসতে দেখামাত্র ঘিরে ধরাই উচিত ছিল। আসলে ভয় ছিল জঙ্গুলে জায়গা তো। সাড়া পেলেই সহজে গা-ঢাকা দেবার চান্স পাবে। কিন্তু মসজিদের ভেতর ঢুকলে তাকে সহজেই কোণঠাসা করা যাবে।'

কর্নেল বললেন, 'জিতেনবাবু কোথায়?'

মহিউদ্দিন বললেন, 'মসজিদের ভেতর সুড়ঙ্গ বা গুপ্তপথ আছে কি না খুঁজছেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপনি এক কাজ করুন। দু'জন কনস্টেবলকে ডেকে এই আসামিকে থানায় লক-আপে রাখার ব্যবস্থা করুন শিগগির।'

মহিউদ্দিন হুইসল বাজালেন। কয়েকজন পুলিশ ঝোপঝাড়ের ভেতর দৌড়ে এল ধুপধুপ শব্দ তুলে। দু'জনের হাতে গদাইচন্দ্রের ভার দিয়ে মহিউদ্দিন বললেন, 'তোমরা একে থানায় নিয়ে যাও। সাবধান। লকআপে ঢুকিয়ে রাখবে।'

ওরা গদাইকে নিয়ে চলে গেলে কর্নেল বললেন, 'চলুন। জিতেনবাবু কদ্দুর এগোলেন দেখা যাক।'.....

পোড়ো মসজিদের ভেতর টর্চের আলোয় জিতেন্দ্রনাথ এবং আরও দুজন পুলিশ অফিসার তখনও গোখরো-পাঠানের পালানোর পথ খুঁজে হন্যে হচ্ছেন।

কর্নেলকে দেখে জিতেন্দ্রনাথ বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল। লোকটা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারদিকের দেয়াল তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম একটা ফাটল পর্যন্ত নেই। দক্ষিণ দিকটা তো দেখছেন। ভেঙে পড়ে নিরেট দেওয়াল হয়ে আছে। ওপরে সামান্য ফাটল আছে, ওই দেখুন। ওখান দিয়ে ভেতরে দিনের আলো ঢোকে মনে হচ্ছে। কিন্তু ওই ফাটল দিয়ে বড়জোর একটা সাপ বা ছুঁচো ঢুকে যেতে পারে! মানুষের পক্ষে অসম্ভব নয় কি?'

'হ্যাঁ, অসম্ভব। তবে—' কর্নেল থেমে গেলেন।

জিতেন্দ্রলাল বললেন, 'তবে কী কর্নেল?'

কর্নেল শানুর হাত থেকে তাঁর টর্চটা নিয়ে মাথার ওপর গম্বুজের খোঁদলে আলো ফেললেন। অমনি সবাই চমকে উঠে দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো গম্বুজের খোঁদলের একটা খাঁজে দুই পা রেখে ভেতরে ফুঁড়ে আসা একগুচ্ছ শেকড় আঁকড়ে ধরে ঠিক বাদুড়ের মতোই ঝুলে আছে একটা লোক।

দেখামাত্র শানু চেঁচিয়ে উঠল, 'গোখরো-পাঠান। গোখরা-পাঠান।'

জিতেন্দ্রনাথ রিভলভার তাক করে বললেন, 'এই পাজি। নেমে আয়। নইলে গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলব তোকে।'

মহিউদ্দিন হাসতে-হাসতে বললেন, 'ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি আছে বটে। আমরা ভাবতেই পারিনি মাথার ওপর—'

তাঁর কথা শেষ হল না। ধপাস করে প্রচণ্ড শব্দে গোখরা-পাঠান মেঝেয় পড়ে গেল। টর্চের আলোয় দেখা গেল তার মুখের দু'পাশে গেঁজলা বেরোচ্ছে। ছটফট করতে করতে বেঁকে গেল তার শরীর। তারপর এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল নাক-মুখ থেকে। তার শরীরটা আবদুলের মতোই স্থির হয়ে গেল। কর্নেল বললেন, 'সুইসাইড করল গফুর-পাঠান,' বলেই ঝুঁকে ওর পায়ের কাছে কী একটা কুড়িয়ে নিলে। শানু জিনিসটা দেখেছিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, 'হুঁ এটা এক ধরনের ইঞ্জেকশান সিরিঞ্জ। এই দেখুন, দুটো সূক্ষ্ম সূচ আছে যন্ত্রটার মুখে। ভেতরে আছে

মারাত্মক সাপের বিষ। আফ্রিকার জঙ্গলে পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপ ব্ল্যাক মাম্বার বিষ। ঠিক এরকম একটি সিরিঞ্জ আমি কোডো আইল্যান্ডে দেখেছিলাম। সেও ছিল এক মারাত্মক দাগি ক্রিমিনাল। তাকে সবাই বলত ব্ল্যাক মাম্বা!'

সি. আই. ডি ইন্সপেক্টর জিতেন্দ্রনাথ আস্তে বললেন, 'আর একে সবাই বলত, গোখরো-পাঠান।'

ছয়

পরদিন সকালে মির্জাসায়েবের ড্রইংরুমে বসে কফি খেতে খেতে কথা বলছিলেন মির্জাসায়েব এবং কর্নেল। সেলিমকে সদর হাসপাতালে পাঠানোর দরকার হয়নি। নবাবগঞ্জ হেলথ-সেন্টারেই সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। রাত্রেই তাকে বাড়ি আনা হয়েছে। সকালে সে আগের মতো চাঙ্গা। লনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে শানুর সঙ্গে গল্প করছে। তবে তার হাতের কবজি আর পায়ের গোড়ালির ওপর দড়ির দাগগুলো এখনও স্পষ্ট।

কর্নেল বললেন, 'আবদুল মরার সময় সা-সা বলেছিল। আমরা ভেবেছিলাম সে সাপের কামড়ের কথা বলছে। আসলে সে সাতবুড়ুয়ার কথাই বলতে চেয়েছিল। স্মিথের বইতে দেখলাম, ওটা সপ্তশিবের মন্দির নয়। সপ্তবুদ্ধ মন্দির। অন্তত তেরো-চোদ্দশ বছর আগে ওখানে ছিল সপ্তবুদ্ধ মন্দির। ওই সপ্তবুদ্ধ শব্দ পরবর্তী যুগে লোকের মুখে সপ্তবুদ্ধ থেকে অপভ্রংশে সাতবুড়ো বা স্থানীয় ভাষারীতিতে সাতবুড়ুয়া হয়ে গেছে।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'হ্যাঁ। বুদ্ধমন্দিরকে শিবমন্দির বলে পরবর্তী যুগে মনে করা হতো—ইতিহাসের কেতাবে পড়েছি। বুদ্ধমূর্তিকেও শিবমূর্তি মনে করা হয় বহু জায়গায়। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, 'মকবুল ও শানুর মুখে সাতবুড়ুয়া কথাটা শুনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল, আবদুলের এই মোহরের উলটো পিঠে ফার্সিতে লেখা আছে :

'সাত বৃদ্ধ যেখানে/মানিক ফলে সেখানে।'

'তখনই সন্দেহ হয়েছিল এটা একটা সংকেতবাক্য। সাতবুড়ুয়ার ওখানেই কোথাও পনেরো শতকের ঐতিহাসিক তুর্কি আমলের শাসক খানখানান লতিফ খান বহু ধনরত্ন লুকিয়ে রেখেছিলেন কী? আতশকাচে মোহরটা পরীক্ষা করার সময় ফার্সি প্রবচনের নিচে সাতটা গোল চিহ্ন চোখে পড়েছিল। একটা গোল চিহ্ন কেন্দ্রে খোদাই করা। তার মধ্যে একটা ক্রসের চিহ্ন। লতিফ খান গৌড়ের বাদশাহের অধীনে শাসনকর্তা ছিলেন। পাছে বাদশাহ তার ধনরত্ন আটক করেন, সেই ভয়ে তিনি স্তূপাকৃতি সপ্তবুদ্ধস্তূপের মূল স্তূপটির তলায় সেগুলি পুঁতে রেখেছিলেন বলেই আমার ধারণা।'

মির্জাসায়েব বললেন, 'কিন্তু সেখানে তো এখন বটগাছ। স্তূপের চিহ্নই নেই।'

কর্নেল বললেন, 'কলকাতায় ফিরে কেন্দ্রীয় প্রত্ন দফতরের কর্তাদের খবরটা দেব। তাঁরা গাছটা কেটে খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজে দেখুন সত্যি মাটির তলায় গুপ্তধন আছে না কি।'

মির্জাসায়েব নড়ে বসলেন, 'বুড়ো হয়ে স্মৃতিভ্রংশ ঘটেছে। ওখানে নাকি অনেকে মোহর কুড়িয়ে পেত শুনেছি। কিন্তু আবদুল কোথায় পেল এই মোহর?'

কর্নেল বললেন 'এটাই মূল মোহর, যাতে লতিফ খান বংশধরদের জন্য সংকেতবাক্য আর সংকেতচিহ্ন খোদাই করেছিলেন। আমার ধারণা, আবদুল সম্ভবত লতিফ খানেরই বংশধর।'

মির্জাসায়েব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমরাই নাকি তাঁর বংশধর। আবদুল কেমন করে—উহুঁ। অসম্ভব।'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'মির্জাসায়েব। একই মানুষের বংশধর কত জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ। আপনি কি জানেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার মেয়ের বংশধরদের একজন ছিলেন হাওড়া রেলস্টেশনের সাধারণ কর্মী, আর একজন খাটালের গোরু-মোষের দুধ বেচতেন, অন্য একজন ঘোড়াগাড়ির কোচোয়ান ছিলেন? এ গল্প নয়, গবেষকরাই খুঁজে বের করে গেছেন। কাজেই আপনার মতো আবদুল বেচারাও খানখানান লতিফ খানের বংশধর হবে, তাতে অসম্ভব কিছু নেই।'

মির্জাসায়েব শুধু বললেন, 'আপশোস। হতভাগা আবদুল।' তাঁর চোখের কোনায় একফোঁটা জল দেখা যাচ্ছিল।

শানু বলল, 'তুই কী বোকা বল তো সেলিম। গদাইকে দেখেই তুই আমাদের কথা ভুলে, এমনকী জুতোর কথা ভুলে ওর সঙ্গে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকলি!'

সেলিম বলল, 'গদাই যে বলল জুতো চুরি করে একটু তামাশা করবে। বলল, এসো না, আমরা জুতো লুকিয়ে রাখব সাতবুড়ুয়ার। ওরা আমাদের খুঁজে হন্যে হোক না, পরে দু'জনে টুকি দেব। ব্যস! লুকোচুরি খেলাটা দারুণ জমে উঠবে। তুইতো জানিস, গদাইদা আবদুলের চাইতেও মজার লোক।'

'মজার লোক' শানু বিরক্ত হয়ে বলল। 'চোর তা জানিস না?'

সেলিম বলল, 'কে জানে যে ওখানে গিয়ে হঠাৎ কালো জিনের পাল্লায় পড়ব।'

শানু হাসল, 'তুই তাহলে এতক্ষণ কী শুনলি? ও তো গোখরো-পাঠান।'

এইসময় কর্নেল বেরিয়ে এসে ডাকলেন, 'সেলিম, শানু আজও কী তোমাদের স্কুলের ছুটি?'

সেলিম বলল, 'আজ আমাকে স্কুলে যেতে বারণ করেছেন দাদু।'

শানু বলল, 'আজ আমারও স্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না।'

কর্নেল বললেন, 'তাহলে চলে এসো। আজ বরং সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলেই প্রজাপতি ধরতে যাই। চাই কী, গুপ্তধনও আবিষ্কার করে ফেলতে পারি। চলে এসো, ডার্লিংস!'

দুই বন্ধু কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে সাতবুড়ুয়ার জঙ্গলের দিকে চলল।

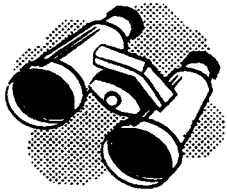

কর্নেলের জার্নাল থেকে—১

ভোর ছ'টায় ছাদের শূন্যোদ্যানে গিয়ে দেখলাম, অ্যারিজোনা থেকে আনা ক্যাক্টিতে সুন্দর কিছু ফুল ফুটেছে। আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলাম। প্রায় চার মাসের সাধনার সিদ্ধি। বুড়ো না হলে ধেই-ধেই করে না হোক, ব্রেকড্যান্স শুরু করে দিতাম। এই প্রজাতির ক্যাকটাসের নাম একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনি। দেখতে কতকটা গোল কাঁঠালের মতো। গ্রীষ্মে একছিটে বৃষ্টি হলে ফুল শিগগির ফুটে ওঠে। লাল টুকটুকে পাপড়ির মধ্যে হলুদ শীষ। শীষের মাথায় কালচে টুপি। হাঁটু মুড়ে বসে আতসকাচ দিয়ে পাপড়ির কিনারা পরীক্ষা করতে থাকলাম। অ্যারিজোনার রাজধানী ফিনিক্সে হর্টিকালচার ল্যাবরেটরির ডিরেক্টর ডাঃ মিডলটন বলেছিলেন—পাপড়ির কিনারায় যদি সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে, তা হলে জানবেন ভাইরাস সংক্রামিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে তেমন কিছু দেখতে পেলাম না। মনটা আরও খুশিতে ভরে উঠল। সূর্য উঠলেই কয়েকটা ফোটো নিতে হবে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ। সূর্য উঠলেও পূর্বের কয়েকটা হাইরাইজ বাড়ির জন্য রোদ্দুর পৌঁছুতে দেরি হয়। বিষদৃষ্টিতে বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় ষষ্ঠী এসে বলল,—বাবামশাই! ফোং!

বিরক্ত হয়ে বললাম,—হতভাগা! তোকে কতদিন না বলেছি, দুটো থেকে আটটার মধ্যে কেউ টেলিফোন করলে বলবি আমি বাড়ি নেই?

ষষ্ঠী কাঁচুমাচু মুখে বলল—সে ফোং নয় বাবামশাই, জয়ন্ত দাদাবাবু ফোং।

—ওকে আসতে বলে দে।—বললাম তো। কিন্তু দাদাবাবু ফোং।

এই সাতসকালে কার মৃত্যু সংবাদ দিতে জয়ন্ত ফোন করেছে? নিছক মৃত্যু হলে কেনই বা ফোন করবে। খুনখারাপি নয় তো?

ড্রয়িংরুমে নেমে এসে ফোন ধরে বললাম,—গুড মর্নিং, ডার্লিং।

—ব্যাড মর্নিং, ওল্ড বস!

—সরি জয়ন্ত। সকালবেলাটা ব্যাড করে দিও না। তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

—আর্মেনিয়ান চার্চের কাছে এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আপনি এখনই চলে আসুন। পুলিশ এসে গেছে। পুলিশকে এখনই বডি না নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছি—

—বডি? কার বডি?

—আমাদের কাগজের একজন ফোটোগ্রাফার ছিলেন। নাম শুনে থাকবেন। প্রচেত রায়। বয়সে খোকা বললেই চলে।

—তা খোকাটির বডি পড়ল কী করে?

—ওঃ কর্নেল। দিস ইজ সিরিয়াস। গত রাত্তিরে দশটা নাগাদ প্রচেত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিস থেকে বের হয়। রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি। ভোরবেলা চার্চের পেছন দিকে একটা পোড়ো বাড়ির ভেতর ওকে মরে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকেরা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ওর পকেটে আইডেন্টিটি কার্ড দেখে অফিসে ফোন করে। অফিসের দারোয়ান আমাকে ফোন করে। কারণ ক্রাইম স্টোরি আমি কভার করি। তো—

প্রচেত রায়ের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে কী?

—হয়েছে। তবে প্রচেতের দাদা-বউদি ছাড়া আর কেউ নেই। ও দাদার কাছে থাকত।

—জয়ন্ত, আমি গিয়ে কী করব?

—কর্নেল! আপনি এলেই বুঝতে পারবেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক।

—একটু আভাস দাও।

—বডিতে কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই।

—তা হার্ট অ্যাটাক।

—ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না।

জয়ন্ত ফোন ছেড়ে দিল। বুঝলাম, আমার ওপর চটে গেছে। কিন্তু ও তো জানে, আমি নিছক শখের গোয়েন্দা নই। যততত্র কারও লাশ পড়লেই আমি নাক গলাতে যাই না। আসলে জয়ন্ত তার অফিসের লোকের এরকম হেলা-ফেলায় মৃত্যুর ঘটনা বরদাস্ত করতে পারছে না।

কিন্তু সমস্যা হল, জয়ন্তকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি, যদিও আমরা পরস্পর বন্ধু। যুবকের সঙ্গে বৃদ্ধের বন্ধুত্ব হতে তো বাধা নেই। এযাবৎ অসংখ্য রহস্যময় ঘটনায় জয়ন্ত আমার সহকারীর ভূমিকা পালন করেছে। কাজটা বোধহয় ঠিক করলাম না। অন্তত আমার স্নেহ এবং বন্ধুত্বের খাতিরে ওর ডাকে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল।

দোনমনায় পড়ে গেলাম। একটু পরে না যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। সবখানে গোয়েন্দাগিরি করার মানে হয় না। ইতিমধ্যে এদিককার খবরের কাগজগুলো এসে গেল। ষষ্ঠীকে বললাম, —ছাদে যাচ্ছি। কফি দিয়ে আসবি।

কাগজগুলো নিয়ে ছাদে গেলাম। প্রথমেই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। প্রথম পাতার একটা বড় খবরে চোখ গেল। ফ্ল্যাগ লাইনে ছাপা হয়েছে :

চন্দ্রপুর কেন্দ্রে উপনির্বাচন বাতিল।

পাগলের গুলিতে নির্দল প্রার্থী হত।

আততায়ীর গুলিতে পাগলও হত।

নিজস্ব সংবাদদাতার খবর

খবরটা সংক্ষেপে এই :

শিল্পনগরী চন্দ্রপুর বিধাননগর আসনটি বিধায়ক রামহরি ব্যানার্জির মৃত্যুতে খালি হয়েছিল। তাই উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের তারিখ দোসরা জুন। নির্দল প্রার্থী পরমেশ চক্রবর্তী গতকাল বিকেলে চৌমাথায় জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। তখন হঠাৎ কারা সভায় হইহল্লা শুরু করে। মাইকের তার কেটে দেয়। পটকা ফাটায়। এই বিশৃংখলার সময় এক বৃদ্ধ উন্মাদ ব্যক্তির রিভলভারের গুলিতে পরমেশবাবুর মৃত্যু হয়। কিন্তু তারপরই সেই উন্মাদ আততায়ীকে কেউ মাথার পিছনে গুলি করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা উন্মাদ লোকটিকে পরমেশবাবুকে লক্ষ করে গুলি ছুঁড়তে দেখেছেন। কিন্তু সেই উন্মাদের আততায়ীকে কেউ দেখেন নি। তাই প্রথমে সবার ধারণা হয়েছিল, পরমেশবাবুকে মেরে উন্মাদ আততায়ী আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেউ নিজের মাথার ঠিক পেছনে এভাবে গুলি ছুড়ে আত্মহত্যা করতে পারে না! ঘটনাস্থলে পরপর দু'বার গুলির শব্দ শোনা গেছে।....

খবরটা পড়ে মনে হল, উন্মাদ আততায়ীকে যে মেরেছে সে পরমেশবাবুর বডিগার্ড হতেও তো পারে। কিন্তু সংবাদদাতা সে-কথা উল্লেখ করেননি। বিশেষ কোনও পয়েন্টও খবরে নেই। আসলে খবর লেখার কাজটা যেমন তেমন দায়সারাভাবে করা হয় আমাদের দেশে।

আবার খুঁটিয়ে পড়লাম। তারপর মনে হল, পরমেশবাবুর কোনও বডিগার্ড থাকলে এতে কোনও রহস্য নেই, কিন্তু বডিগার্ড না থাকলে?

না থাকলে যে লোকটি আততায়ীকে মেরেছে, সে যদি পরমেশবাবুর শত্রুপক্ষের লোক হয়, তাহলে সে নিজেই তো পরমেশবাবুকে মারতে পারত।

হ্যাঁ, মারতে পারত। কিন্তু তার ধরা পড়ার চান্স ছিল। মঞ্চে পরমেশবাবু ভাষণ দিচ্ছিলেন। তার আততায়ী মঞ্চে ওঠেনি। নিচে থেকে গুলি করে। হইচই বেধেছিল মঞ্চের নিচে।

উঁচু জায়গা এবং নিচু জায়গা এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। নিচের কাউকে হট্টগোলের মধ্যে ভিড়ের ভেতর মাথার পেছনে আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে গুলি করলে দ্বিতীয় আততায়ীকে কারও দেখতে না পাওয়াই সম্ভব। এদিকে পরমেশবাবুর বডিগার্ড থাকলে সে পরমেশবাবুর কাছে মঞ্চের ওপরই থাকবে।

আর একটা কথা : পরপর দু'বার গুলির শব্দ এবং দুটি মৃত্যু।

এতক্ষণে হাইরাইজ বাড়ির ওপর সূর্য উঁকি দিচ্ছে। ক্যামেরায় একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনির অসামান্য সুন্দর ফুলগুলোর ছবি তুলতে মন দিলাম।.....

ব্রেকফাস্টের পর ড্রয়িং রুমে বসে প্রখ্যাত মার্কিন পত্রিকা 'নেচার'-এর পাতা ওলটাচ্ছি এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। নমস্কার করে বললেন, —আপনিই কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার?

বললাম,—আপনার সন্দেহের কোনও কারণ আছে?

ভদ্রলোক একটু বিব্রত হয়ে বললেন,—না-মানে, কাগজে আপনার অনেক কীর্তিকলাপ পড়েছি। তাই বলছিলাম—

তাঁর কথার ওপর হাসতে হাসতে বললাম,—ভেবেছিলেন আমি যুবক। কিন্তু চোখে দেখছেন আমিও নেহাত বুড়োমানুষ। মুখে সাদা দাড়ি এবং মাথায় টাক। তাই ভাবছেন, এই বুড়ো লোকটি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ঠাকুর্দা!

আমার কৌতুকে ভদ্রলোক আরও বিব্রত হয়ে বললেন,—না—মানে.....

—আপনার পরিচয় দিন এবার। তারপর বলুন কেন এসেছেন?

ভদ্রলোক এতক্ষণে বসলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। বেশ শক্তসমর্থ গড়নের মানুষ। হাতে একটা ব্রিফকেস। বললেন,—আমার নাম তারক রায়। আসছি চন্দ্রপুর থেকে।

—চন্দ্রপুর। মানে, গতকাল যেখানে ভোটের নির্দল প্রার্থী পরমেশ চক্রবর্তী খুন হয়েছেন?

তারকবাবু বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি পরমেশবাবুর প্রাইভেট সেক্রেটারি। পরমেশবাবুর একটা ইলেকট্রিক বালব তৈরির কারখানা ছিল। কারখানা ভালো চলছিল না। ওঁর চন্দ্রা বালব মার্কেট পায়নি। তাই উনি রাজনীতি করতে নামেন। কিন্তু বড্ড স্পষ্টভাষী মানুষ। প্রচণ্ড নীতিবাগীশ। তাই কোনও রাজনৈতিক দলে পাত্তা পাননি। অগত্যা নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ান।

কথা বাড়ছে দেখে বললাম— সংক্ষেপে বলুন, কেন এসেছেন আমার কাছে?

তারকবাবু কুণ্ঠিতভাবে বললেন,—ব্যাপারটা—

একটু আশ্চর্য মনে হয়েছে আমার। গতকাল বিকেলে মিটিঙে ওঁকে গুলি করে মারা হয়েছে। কাগজে খবর দেখে থাকবেন। কিন্তু গতকাল সকালে উনি আমাকে কথায়-কথায় হঠাৎ বললেন, —তারক। আমার মনে হচ্ছে, আমার কোনও সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে। কিন্তু ভোটে যখন দাঁড়িয়েছি এবং নমিনেশন প্রত্যাহারের তারিখ পেরিয়ে গেছে, তখন আর পিছু হটছি না। যা থাকে বরাতে লড়ব। তবে যদি আমার কোনও বিপদ হয়, তুমি জানবে তার জন্য দায়ী কিষান-মজদুর-পার্টির নেতা অভয় হাজরা। সে আমাকে শাসিয়েছে। তো বিকেলে পরমেশদা মারা পড়লেন। আমি পুলিশকে কথাটা বললাম। পুলিশ বলল, বিনা প্রমাণে অভয় হাজরার মতো ভি. আই. পি-কে আসামি করতে পারব না। বুঝতেই তো পারছেন স্যার, হাজরাবাবুর প্রতিপত্তি আছে। তাই আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

এ পর্যন্ত শুনে আমি বললাম,—আমাকে কি প্রাইভেট গোয়েন্দা ভেবেছেন? দেখুন তারকবাবু আমি ঠিক সে রকম গোয়েন্দা নই। তবে হ্যাঁ, রহস্যের প্রতি আমার একটা আকর্ষণ আছে। কিন্তু আপনার এই কেসে আমি কোনও রহস্য দেখছি না।

তারকবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—রহস্য যে একেবারে নেই, তা নয়। আততায়ীর রিভলবারটা পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। পুলিশ দেখেছে তাতে মোটে দুটো গুলি ভরা আছে। চারটে গুলি খরচ হয়েছে। এর মধ্যে একটা গুলি পরমেশবাবুর হার্টে বিঁধেছে। আর তিনটে গুলি কী হল?

বললাম,—টার্গেট প্র্যাকটিস করে তিনটে গুলি খরচ করে থাকতে পারে আততায়ী।

—তা পারে। কিন্তু স্যার, আততায়ী লোকটা যে একটা বদ্ধ পাগল।

—পাগল?

—হ্যাঁ স্যার। কিনু পাগলা বলে জানি ওকে। বাসটার্মিনাসে থাকত। রোগা পাঁকাটি শরীর।

—তাকেই তো লোকেরা দেখেছে গুলি ছুড়তে?

তারকবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু কিনু পাগলাকেই বা কে গুলি করে মারল?

—পরমেশবাবুর বডিগার্ড ছিল?

তারকবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না স্যার। পরমেশদা জেদি লোক ছিলেন বটে, তবে ওঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচণ্ড। নীতিবাগীশ ছিলেন তা-ও বলেছি।

—রিভলবারটা কি কিনু পাগলের হাতে বা হাতের কাছাকাছি পাওয়া গেছে?

—তার হাতেই ধরা ছিল স্যার।

—হাতে ধরা ছিল?

হ্যাঁ।—তারকবাবু আস্তে বললেন, তখন সভায় হইচই বাধিয়েছিল অভয় হাজরার লোকেরা। ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে হঠাৎ খুনোখুনি। কাজেই—

তারকবাবু হঠাৎ চুপ করলে বললাম,—তখন সময় কটা?

—বিকেল পাঁচটা সওয়া পাঁচটা। জায়গাটা একটা চৌমাথা। এমনিতেই ভিড় থাকে সারাক্ষণ।

—মঞ্চে কে-কে ছিলেন মনে পড়ছে?

—আমি, পরমেশদা, প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার রমেশবাবু এবং জনা দুই সাংবাদিক। একজন স্থানীয়, অন্যজন কলকাতার। পরমেশদা আমাকে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। ওঁদের যাতায়াতের ভাড়াও দিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার কোনও কাগজ পাত্তা দেয়নি। শুধু—

দ্রুত বললাম,—দৈনিক সত্যসেবক।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা-ও যাঁর যাওয়ার কথা তিনি যাননি। গিয়েছিলেন একজন ফোটোগ্রাফার। পরমেশদা তাতেই খুশি। ছবি বেরুলে বেশি পাবলিসিটি হবে খবরের চেয়ে।

ষষ্ঠী কফি এনে দিল। বললাম,—কফি খান। আমি যাব চন্দ্রপুরে। তবে কখন যাব, তা বলতে পারছি না।

কফি খেয়ে তারকবাবু ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন,—আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমার বাড়িতে থাকবেন।

উনি অনেকক্ষণ ধরে খুব সাধাসাধি করতে থাকলেন। বিরক্ত হয়ে বললাম,—সময়মতো যাব। ভাববেন না।....

দুপুরে জয়ন্তকে ফোন করলাম দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে। ফোন ধরে প্রথমে সে একচোট নিল আমাকে,—আপনার সত্যি ভীমরতি ধরেছে। আপনি এমন একটা সাংঘাতিক রহস্যের কিনারা করলেন না। আর আমার মুখ আপনি দেখতে পাবেন না।....ইত্যাদি....।

তাকে মিষ্টি কথায় শান্ত করে বললাম,—তোমার বন্ধু প্রচেতের মর্গের রিপোর্ট পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু। ক্ষতচিহ্ন চুলের ভেতর পাওয়া গেছে। হাতুড়ির ঘা বলে সন্দেহ করা হয়েছে।

—ডার্লিং! আজ তোমাদের কাগজে চন্দ্রপুরের খুনোখুনির খবর পড়েছ?

—পড়েছি। মাই গুডনেস! প্রচেত গতকাল চন্দ্রপুরে নিউজ ফোটো আনতে গিয়েছিল। রিপোর্টার অশনির যাওয়ার কথা ছিল। যায়নি।

—অশনি আছে? ওকে ফোন দাও।

—কী ব্যাপার?

—আহা, দাও না ওকে।

একটু পরে অশনি গুপ্তের সাড়া পেলাম,—হ্যালো ওল্ড ডাভ। আমাকে ফাঁসাবেন নাকি?

—না,না। শোনো অশনি। চন্দ্রপুরে পরমেশবাবুর সভার নেমন্তন্ন মিস করলে কেন? তোমাকে তো রাহাখরচ দিয়েছিলেন ওঁর পি. এ তারকবাবু।

—সর্বনাশ! সর্বনাশ! আপনি সত্যিই দেখছি অন্তর্যামী।

—প্লিজ আনসার মাই কোয়েশ্চন, ডার্লিং।

—আসলে শেষ মুহূর্তে চিফ রিপোর্টার আমাকে অন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়েছিলেন। এদিকে চন্দ্রপুরে কয়েকটা কল-কারখানা বন্ধের খবর আছে। 'ক্লোজার' নামে একটা ফিচার বেরুবে সত্যসেবক পত্রিকা। তাই চিফ রিপোর্টার প্রচেতকেই যেতে বলেছিলেন। বন্ধ কলকারখানার ছবি তুলে আনাই ওকে পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল। আপনি চিফ রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন।

—থাক। তুমি জয়ন্তকে দাও।

জয়ন্ত ফোন ধরে বলল,—বস! আপনি হঠাৎ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠলেন যে?

—জয়ন্ত, আমার সঙ্গে চন্দ্রপুর যেতে হবে তোমাকে।

—মাথা খারাপ? আমাকে ইভনিং ফ্লাইটে দিল্লি যেতে হচ্ছে। সরি কর্নেল!

—আর কিছু ইনফরমেশন পুলিশের কাছে জেনেছ?

—আর কিছু—হ্যাঁ, প্রচেতের ক্যামেরা হারায়নি। কিন্তু ভেতরে ফিল্ম রোলটা নেই। অফিসে বলেছিল, রোলটা শেষ হয়নি।

—ফিল্ম রোল নেই?

—নাহ। ক্যামেরা খালি। আপনাকে অত করে অনুরোধ করলাম, আপনি গেলেন না। কী মিস্ট্রি হেলায় হারালেন বুঝুন।

ফোনে কলকাতার সেচ দপ্তরের এক কর্তাব্যক্তিকে বলে চন্দ্রপুরে ওঁদের বাংলো বুক করেছিলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রেনে পৌঁছে পৌঁছে সাইকেল রিকশায় বাংলোয় পৌঁছলাম। খুশি হলাম দেখে যে, ট্রাংককলে চৌকিদারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমি আসছি। গঙ্গার ধারে একটা খালের মুখে বাংলো। নিসর্গদৃশ্য সুন্দর। চন্দ্রপুরের বসতি এলাকার বাইরে হওয়ায় নিরিবিলি পরিবেশ। জানলা থেকে কিছুক্ষণ বাইনোকুলারে পাখি দেখলাম। গঙ্গার ধারে ঝোপেঝাড়ে প্রজাপতি খুঁজলাম। মোটে দুটো দেখা গেল। তা-ও নিছক সাধারণ প্রজাতির প্রজাপতি।

কফি খেয়ে পায়ে হেঁটে বেরোলাম। চন্দ্রপুরের বাজারে সেই চৌমাথায় পৌঁছেছি, তখনও যথেষ্ট আলো আছে দিনের। ভিড়-ভাট্টা, রকমারি যানবাহন, খুব হই-হট্টগোল।

রাস্তার ওধারে একটা ড্রেন। আবর্জনা আর পচা পাঁক থিকথিক করছে।

আমার স্বভাব হল, সব রহস্যের ক্ষেত্রে একটা থিওরি খাড়া করে নিই। তারপর তথ্য সংগ্রহে পা বাড়াই। তথ্য না পেলে থিওরিটা বাতিল করে আরেকটা থিওরি সাজাই।

আমি একটা জিনিস খুঁজছিলাম ড্রেনে। চমকে উঠে দেখলাম সেটা আছে। এঁটো শালপাতার স্তূপের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। পেছন দিকে খেলার মাঠ। সেই মুহূর্তে একটা ফুটবল এসে পড়ল

সেখানে। চমৎকার সুযোগ পেলাম কুড়িয়ে নেওয়ার। ছেলেগুলো আসার আগেই ফুটবলটা তুলে ছুড়ে দিলাম ওদের দিকে। সেই ফাঁকে জিনিসটাও তুলে নিলাম।

জিনিসটা একটা খেলনার রিভলবার। শালপাতায় জড়িয়ে নিলাম। যেন পাশের মাছের বাজার থেকে মাছ কিনেছি।

এবার রিকশা করে বাংলোয় ফিরে টয় রিভলবারটা বেসিনে রগড়ে ধুয়ে ফেললাম। জানতাম, এমন একটা জিনিস ঘটনাস্থলের আশেপাশে পড়ে থাকার কথা। ওটা কিটব্যাগে রেখে চৌকিদারকে কফি করতে বললাম। গঙ্গার ধারের লনের চেয়ারে বসে গঙ্গা দেখতে থাকলাম। সূর্যাস্তকালে গঙ্গার জলে শেষ আলোর খেলার কোনও তুলনা হয় না। একটু পরে চৌকিদার কফি আনল।

সে কফির পট পেয়ালাসমেত ট্রেতে বেতের টেবিলের ওপর বিনীতভাবে রাখল! তারপর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। বললাম,—কিছু বলবে তুমি?

চৌকিদার কাঁচুমাচু হেসে বলল, —না স্যার। কফি কেমন হয়েছে দেখুন। খারাপ হলে আবার তৈরি করব।

চুমুক দিয়ে বললাম, —ফার্স্টক্লাস হয়েছে। তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে মঙ্গল।

—গতকাল নাকি চন্দ্রপুরে একটা খুনোখুনি হয়েছে?

মঙ্গল গল্পটা বলার জন্য ঘাসে বসল। সে ইনিয়েবিনিয়ে পরমেশবাবুর বোকামির কথা শোনাল। তার মতে, অভয় হাজরার দলবল আছে। তিনি ট্রেড ইউনিয়নও করেন। তিনি এখানকার কলকারখানা বন্ধের মূলে। তাঁর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়ানো ঠিক হয়নি পরমেশবাবুর। ওঁর বালবের কারখানাও তো বন্ধ করতে বাধ্য করেছেন অভয় হাজরা। আসলে ভোটে জিতে অভয়বাবু মন্ত্রী হবেন সম্ভবত। তারপর সব কারখানা খোলার ব্যবস্থা করবেন। কলকাঠিটা তাঁরই হাতে। তাঁর মতো লোকের বিরুদ্ধে লড়াই করে সাধ্য কার? পুলিশও তো তাঁর কেনা।

বললাম,—শুনলাম কে এক কিনু পাগলা পরমেশবাবুকে গুলি করেছে?

মঙ্গল খিক-খিক করে হাসল,—এ স্যার পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। পাগলা লোক। তাকে বন্দুকপিস্তল দিয়ে যাকে গুলি করতে বলবে, সে তাকেই গুলি করবে। পাগলের কি জ্ঞানবুদ্ধি আছে?

—কিন্তু কিনু পাগলাকেও কে গুলি করে মারল?

মঙ্গল এদিক ওদিক দেখে চাপা গলায় বলল,—পাগলা মুখ ফসকে যদি বলে ফেলে কে তাকে পিস্তল দিয়েছে, তা-ই তাকেও ভিড়ের হট্টগোলের ফাঁকে মেরে ফেলেছে।

—পিস্তল না রিভলবার?

—ওই হল স্যার। মানুষ মারা কল তো বটেই।

—আচ্ছা মঙ্গল, সভায় তখন নাকি কারা হাঙ্গামা হইচই বাধিয়েছিল। ধরো, কথার কথাই বলছি, সেই সুযোগে কিনুর বদলে কিনুর খুনিই তো পরমেশবাবুকে মারতে পারত। কিনুকে খুন করার দরকারই হতো না।

মঙ্গল একটু ভেবে নিয়ে বলল,—তা ঠিক স্যার। তবে—

সে হঠাৎ চুপ করলে বললাম,—তবে?

মঙ্গল চাপাস্বরে বলল,—ফোটো তুলছিলেন এক ভদ্রলোক। ফোটোতে খুনির ছবি উঠে যেত।

—তুমি ছিলে সভায়?

—ছিলাম স্যার।

—ফোটো তুলতে দেখেছিলে?

হ্যাঁ। বার বার ঝিলিক মেরে ফটো তুলছিলেন। কিন্তু পাগলাকে পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়তেও দেখেছিলাম।

সন্ধ্যায় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। মঙ্গল আলো জ্বালতে চলে গেল। আমার থিওরির সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে যাচ্ছে ঘটনাগুলো। ফোটোতে খুনির ছবি উঠেছে, এই আশঙ্কায় ফোটোগ্রাফার প্রচেতকে ওইভাবে মারতে হয়েছে। তাকে অনুসরণ করে কলকাতা গেছে খুনি। তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে। কিন্তু ক্যামেরা ছিনতাই করলেই তো হতো। কেন ক্যামেরা ছিনতাই করেনি? এদিকে চৌকিদার মঙ্গল কিনু পাগলাকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে।....

চন্দ্রপুর থানার ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অরুণ মজুমদার আমার পরিচিত। বাংলো থেকে তাঁকে টেলিফোন করলাম। অরুণবাবু বললেন,—হাই ওল্ড বস! সত্যিই কি আপনি নাকি কোনও—

—ডার্লিং! আমিই বটে।

—হাঃ-হাঃ-হাঃ। দ্যাটস রাইট। ডার্লিং সম্ভাষণ এই সসাগরা পৃথিবীতে একজনের মুখেই মানায়। তা হঠাৎ এখানে আপনি কি নিছক প্রজাপতি ধরতে ছুটে এসেছেন?

—বলতে পার। তবে এখানকার প্রজাপতি বর্ণচোরা।

—কর্নেল। আপনার কথায় রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।

—রহস্য একটু আছে। তুমি চলে এসো।

মিনিট পনেরো পরে অরুণের জিপের আলোয় সেচবাংলো ঝলসে উঠল। তাকে আসতে দেখে মঙ্গল চৌকিদারের মুখে বিস্ময় ও উদ্বেগ ফুটে উঠল। বললাম,— মঙ্গল। পটভর্তি কফি আনো শিগগির।

লনে বেতের চেয়ারে বসে অরুণ বলল,—বর্ণচোরা প্রজাপতির কথা শুনেই সন্দেহ হল, আপনি সম্ভবত পরমেশ চক্রবর্তীর মৃত্যুর কেস হাতে নিয়েছেন?

—নিয়েছি।

অরুণ একটু হাসল—কিন্তু পরমেশবাবুকে গুলি করে মেরেছে এক বদ্ধ পাগল। আপনি তো জানেন, পাগল অবস্থায় লোকে খুনখারাপি করে। কাজেই পরমেশবাবুকে খুন করা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। বরং কিনু পাগলাকে ভিড়ের ভেতর কে গুলি করল সেটাই আসল রহস্য।

—তোমার থিওরি কী এ সম্পর্কে?

—খুনি ভিড়ের ভেতর থেকে গুলি ছুঁড়েছে মঞ্চে পরমেশবাবুকে লক্ষ্য করে। একটা গুলিতে মৃত্যু না হতেও পারে। তাই ভেবে দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়েছে। দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে কিনু পাগলার মাথার পেছনে।

—কিন্তু লোকে কিনু পাগলাকে রিভলবার তুলে গুলি ছুঁড়তে দেখেছে।

অরুণ আবার হাসতে লাগল,—একটা গণ্ডগোল বাধলে লোকেরা তা নিয়ে নানারকম গল্প বানায়। ঘটনার আকস্মিকতায় কী দেখতে কী দেখে।

—কিনুর হাতে রিভলবারটাও তোমরা পেয়েছ, অরুণ।

—ভিড়ের গণ্ডগোলের সুযোগে ওর হাতে খুনি গুঁজে দিয়েছে।

—তোমার এই পয়েন্টটা ঠিক আছে অরুণ।

—কোন পয়েন্টটা ঠিক নেই?

একটু বসো, দেখাচ্ছি—বলে বাংলোর ভেতর গেলাম। কিটব্যাগ থেকে সেই ড্রেনে কুড়িয়ে পাওয়া খেলনা রিভলবারটা এনে অরুণকে দেখালাম।

অরুণ অবাক হয়ে বলল,—এটা তো টয় রিভলবার। কোথায় পেলেন?

বললাম,—যেখানে সভা হয়েছিল, তার কাছে ড্রেনের মধ্যে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম এমন একটা জিনিস কাছাকাছি কোথাও লোকের চোখে পড়ার বাইরে পড়ে থাকবে।

—কী অদ্ভুত। আপনি কি মন্ত্রবলে জানতে পেরেছিলেন, কর্নেল?

হাসতে হাসতে বললাম,—নাহ ডার্লিং। সহজ বুদ্ধিতে। আসলে সত্যিকার রিভলবার চালানো কোনও পাগলের সাধ্য নয়। অটোমেটিক রিভলবারের ট্রিগার টানলে গুলি বেরুবে। কিন্তু কোনও পাগলের ট্রিগার টেনে নির্দিষ্ট স্থানে লক্ষ্যভেদ একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া ছটা গুলির মধ্যে তোমরা নাকি দুটো গুলি পেয়েছ রিভলবারে। তাই না?

—হ্যাঁ। চারটে খরচ হয়েছে।

—তা হলে দুটো খরচ হয়েছে গোপনে টার্গেট প্র্যাকটিসে। একটা খরচ হয়েছে পরমেশবাবুকে মারতে। আরেকটা কিনুকে মারতে। কিনু পাগলার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে মারা হয়েছে।

অরুণ টয় রিভলবারটা দেখতে দেখতে বলল,—কী আশ্চর্য। এটা ঠিক ওই আসল অস্ত্রটার হুবহু নকল।

—হ্যাঁ, নকল। লোকেরা এই টয় অস্ত্রটায় দেখেছে কিনু পাগলার হাতে। তার মানে, খুনি তাকে এটা দিয়ে বলেছিল, হট্টগোল বাধলে সে যেন এটা তুলে গুলি ছোড়ার ভান করে। পাগলা মানুষ। তাই খুব মজা পেয়েছিল কাজটা করতে। কিন্তু সে জানত না, এটা একটা বিপজ্জনক ফাঁদ। খুনি তার চেনা। তাই তার মুখ বন্ধ করতে তাকে মারা হয়েছে। পয়েন্টটা তুমি বুঝে দ্যাখো অরুণ। একজন পাগলের গুলিতে পরমেশবাবু মারা পড়তে পারেন, এটা তোমরা সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না। খুঁটিয়ে তদন্ত করবে। তাই ধূর্ত খুনি পাগলকেও মেরেছে।

অরুণ গম্ভীর মুখে বলল,—হ্যাঁ। মেরে ভিড়ের সুযোগে খুনি কিনু পাগলের হাতের টয় রিভলবারটা নিয়ে আসল রিভলবারটা গুঁজে দিয়েছে। টয় রিভলবারটা ড্রেনে ফেলে দিয়েছে।

এবার দৈনিক সত্যসেবকের ফোটোগ্রাফার প্রচেত রায়ের মৃত্যুর ঘটনাটা বললাম অরুণকে। শুনে অরুণ খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাকে পরমেশবাবুর পি. এ. তারকবাবুর কথাও বললাম।

মঙ্গল চৌকিদার এতক্ষণে কফি আনল। সে দাঁড়িয়ে কথা শুনবে ভাবছিল হয়তো। অরুণ তাকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বলল। সে উদ্বিগ্ন মুখে বাংলোর কিচেনে চলে গেল।

অরুণ বলল,—আর্মেনিয়ান গির্জা আমি দেখেছি। পাশে একটা কবরখানা আছে। ওখানে প্রচেতবাবু অত রাত্রে গেলেন কেন?

—খুনি তার চেনা। খুনি তাকে কোনও অজুহাত দেখিয়ে ওই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। এছাড়া কোনও ব্যাখ্যা হয় না। কারণ অচেনা লোকের সঙ্গে প্রচেত ওখানে যাবে কেন? তাছাড়া চেনা বলেই প্রচেতের ক্যামেরা ছিনতাই করতে পারেনি খুনি।

—তার মানে, খুনি চন্দ্রপুর থেকে প্রচেতবাবুর সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল।

—দ্যাটস রাইট ডার্লিং।

অরুণ কিছুক্ষণ কফিপানের পর বলল,—হাতুড়ি দিয়ে মেরে খুন করেছে প্রচেতবাবুকে?

—হ্যাঁ। সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীকে তো তুমি চেনো। সে তা-ই জানাল। মর্গের রিপোর্টে নাকি বলা হয়েছে।

অরুণ আবার বলল,—হাতুড়ি?

মাথা দোলালাম। বললাম,—কোনও সূত্র খুঁজে পাচ্ছ কী?

পাচ্ছি।—বলে অরুণ উঠে দাড়াল : আমার সঙ্গে বেরুতে আপত্তি আছে?

-নাহ।

তা হলে আসুন।....

অরুণের জিপ থানাচত্বরে ঢুকল।

অফিসার-ইন-চার্জ পুলকেশ দে-র সঙ্গে অরুণ আমার পরিচয় করিয়ে দিল। পুলকেশবাবু গোগ্রাসে এবং বিস্ময়ে বললেন,—আপনার মতো প্রখ্যাত মানুষের পায়ের ধুলো পড়বে এখানে, কল্পনাও করিনি কর্নেলসায়েব। আশা করি, পরমেশবাবুর হত্যারহস্য সমাধান আপনার আগমন? তা যদি হয়, আপনার সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা তৈরি।

অরুণ বলল,—মি. দে আজ সকালে আমার সামনে বস্তির এক বুড়িমা একটা ডায়রি করতে এসেছিল। তাকে কোনও দজ্জাল গিন্নি নাকি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে।

পুলকেশবাবু হাসলেন,—সামান্য একটা কয়লাভাঙা হাতুড়ি হারিয়ে গণ্ডগোল। তো এই তুচ্ছ ব্যাপারে ডায়রি কী হবে? গিন্নি মহিলাকে ডেকে পাঠিয়ে একটু বকাবকি করলাম। মহিলা বললেন, —ভুল হয়েছে। মিটমাট করে দিন। বরং পঞ্চাশ টাকা ওকে দিচ্ছি, ওটাই ওর মাইনে। তা-ই দিচ্ছি। আমি টাকাটা দিয়ে বুড়িকে দিলাম। মিটে গেল। কিন্তু কেন—

অরুণ বলল,—কারণ আছে। গিন্নি মহিলার নাম কী?

ডায়রি বইয়ের পাতা উলটে দেখে পুলকেশবাবু বললেন,—সুপ্রভা রায়। স্টেশনের কাছে তিলেপাড়ায় বাড়ি। স্বামীর নাম—

আমি বললাম,—তারক রায় কি?

পুলকেশবাবু অবাক হয়ে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু ব্যাপারটা কী?

বললাম,—এখনই তারক রায়কে পরমেশবাবু এবং কিনু পাগলাকে খুনের দায়ে গ্রেফতার করুন। তারপর গ্রেফতার করুন অভয় হাজরাকে। তাঁর প্ররোচনায় এই হত্যাকাণ্ড।

অরুণ উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়াল।

বলল,—পরমেশবাবুর কারখানা বন্ধ হওয়ায় তারক রায় ঠিকমতো মাইনে পাচ্ছিলেন না শুনেছি। পরমেশবাবু জনপ্রিয় লোক। অভয় হাজরাই তাঁর কারখানা বন্ধের জন্য দায়ী। তাই মরিয়া হয়ে তাঁকে টিট করতে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে, অভয় হাজরার টাকা খেয়ে তারক রায় এই খুনখারাপি করেছেন।

অরুণ একদঙ্গল পুলিশ নিয়ে বেরিয়ে গেল। পুলকেশবাবু পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। সবই বললাম। শোনার পর উনি হাসতে হাসতে বললেন,—কিন্তু অমন ধূর্ত তারকবাবু আপনার কাছে গিয়েই ধরা পড়ছেন। যেচে বিপদ ডাকতে গেলেন কেন বলুন তো?

চুরুট ধরিয়ে বললাম,—একটা সহজ কারণ পুলকেশবাবু। তারকবাবু ভালোমানুষ সাজতে চেয়েছিলেন এবং সেই সুযোগ আমাকে দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন, এ ব্যাপারে দৈবাৎ তাঁর ধরা পড়ার মতো কোনও সূত্র থেকে গেছে কি না। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমি তাঁর বাড়িতে উঠি। তিনি তাহলে আমার সঙ্গে থেকে সূত্রগুলো জানতে পারবেন এবং সেগুলো ম্যানেজ করবেন। কিন্তু আমি তাঁর ফাঁদে পড়িনি। তাঁকে জানাইনি কবে আমি আসছি বা কোথায় উঠছি।

—কিন্তু ওঁকে দেখে আপনার সন্দেহ হয়েছিল কেন?

—যে একজন রহস্যভেদীর সাহায্য নিতে এসেছে, সে তাকে নিজের বাড়িতে ওঠার জন্য সাধবে কেন? তাতে তো প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যাবে। তাই তারকবাবু নিজের বাড়িতে আমাকে ওঠার জন্য বারবার সাধাসাধি করায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, ভদ্রলোকের কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে।

পুলকেশবাবু বললেন,—আপনি সত্যি অনন্যসাধারণ।

কর্নেলের জার্নাল থেকে—২

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে উত্তরপ্রদেশের আজমগড় এলাকায় একরকম অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছিল। এই রোগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অট্টহাস'। কোনও কারণ ঘটেনি, অথচ লোকে আচমকা হা-হা করে বিকট হাসতে শুরু করত এবং হাসির চোটে কিছুক্ষণের মধ্যে দম ফেটে মারা পড়ত।

বীভৎস রোগ বলা যায়। ভারতে তখনও ব্রিটিশ রাজত্ব। বাঘা-বাঘা বিলিতি ডাক্তারের একটা দল গিয়ে এই রোগের কারণ আবিষ্কার করতে পারেননি। কোনও রোগীকে বাঁচানো তো দূরের কথা। ওই সময় আমি সামরিক দফতর থেকে ছাঁটাই হয়েছি। যুদ্ধ থেমে আসছে। তরুণ বয়সে বেকার হয়ে বসে থাকতে মন চাইছিল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন খুঁজে দরখাস্ত করে যাচ্ছিলাম একনাগাড়ে। অবশেষে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। কিন্তু চাকরিটা পেলাম সেই আজমগড়ে। অর্থাৎ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়।

বন্ধু ও হিতৈষীরা নিষেধ করলেন। অট্টহাস রোগের ভয় দেখালেন। কিন্তু আমি কারুর কথায় কান দিলাম না। কারণ চাকরিটা ছিল আমার পক্ষে ভারি লোভনীয়। আজমগড় তখন দেশীয় রাজার স্টেট। বন, পাহাড় এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা। আমার চাকরি মহারাজার গেম ওয়ার্ডেনের। মহারাজার একটি সংরক্ষিত জঙ্গল ছিল। সেখানে প্রচুর শিকারের প্রাণীর সমাবেশ। মহারাজা মাঝে মাঝে শিকারে যেতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। কখনও লাট-বড়লাটের শিকারের খেয়াল হতো। তাঁদেরও নিয়ে যেতেন মহারাজ প্রতাপ সিং বাহাদুর। আমার কাজ হল ওঁদের শিকারের ব্যবস্থা করা। সেইসঙ্গে এই সংরক্ষিত জঙ্গলে চোরা শিকারিরা যাতে ঢুকে জীবজন্তু না মারতে পারে, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হতো।

অট্টহাস রোগ যখন শুধু মানুষকেই ধরছে, তখন মানুষের বসতির বাইরে ঘোর জঙ্গলে থাকাটা নিরাপদ ভেবেই ওই চাকরি নিতে দ্বিধা করিনি। আজমগড় শহর থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে ধারি নামে সুন্দর একটা পাহাড়ি নদীর ধারে জঙ্গলের ভেতরে আমার ডেরা হল। ডেরাও ভারি রোমাঞ্চকর। কাছাকাছি কয়েকটা গাছের প্রকাণ্ড সব ডালের ওপর মাটি থেকে অন্তত বিশ ফুট ওপরে একটা সবুজ রঙের কাঠের বাড়ি। দূর থেকে চোখে পড়া কঠিন ছিল। বাড়িটার ছাউনিও সবুজ রঙের করোগেট শিটের। একটু হাওয়া দিলে কিংবা বৃষ্টি হলে ভীষণ শব্দ হতো, এটাই যা বিরক্তিকর। কিন্তু ক্রমশ সেটা কানে সয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে তিনটে ঘর। একটা ড্রয়িংরুমে—মহারাজা কিংবা তাঁর অতিথি শিকারিরা এলে ওখানেই বসতেন। অন্যটা আমার বেডরুম। বাকিটা কিচেন। সে ঘরে আমার ভৃত্য ও রাঁধুনি মুহব্বত খাঁ থাকত।

দুই

তখন মার্চ মাস। জঙ্গলে বসন্ত এসেছে। কত রকমের বুনো ফুল ফুটেছে। সারাক্ষণ মিঠে গন্ধে জঙ্গল মউ-মউ করে। কাঁধে রাইফেল নিয়ে জঙ্গলের ভেতর চক্কর দিতে বেরোই সকাল-বিকেল দু'দফা। জনাচার ফরেস্টগার্ডও ছিল। তারা পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকায় চার সীমানায় ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে চার জায়গায় থাকত। সেই ঘরগুলোও ছিল গাছের মাথায়। চোরাশিকারি দেখলে বা কিছু ঘটলে গার্ডের হুইসল বাজানোর নিয়ম ছিল। উঁচুতে হুইসল বাজালে তার তীক্ষ্ণ শিস আরেকজন শুনতে পেত। আমিও পেতাম। তখন আমার কুকুর জিমকে নিয়ে ছুটে যেতাম।

দিন পনেরো কেটে গেল। তারপর একদিন জঙ্গলের ভেতর এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে ডেরায় ফিরছি, হঠাৎ কার বিকট হাসি শুনে চমকে উঠলাম। প্রথমে ভাবলাম হায়েনার ডাক। কিন্তু দিনদুপুরে হায়েনা ডাকে না। তাছাড়া হা-হা-হা-হা বিকট শব্দটা থামছে না।

শব্দ লক্ষ করে দ্রুত এগিয়ে গেলাম। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগুতে পোশাক প্রায় ফর্দাফাঁই হবার উপক্রম। আমার প্রিয় কুকুর জিম আমার আগে আগে যাচ্ছিল। শব্দটা থেমে গেল একটা আঁ-আঁ-আঁ আর্ত চিৎকার। অমনি অমন সাহসী মারমুখী কুকুরটাও ভয় পেয়ে আমার দু'পায়ের ফাঁকে এসে লেজ গুটিয়ে ফেলল।

তাকে ধমক দিয়েও নড়ানো যাচ্ছিল না। অগত্যা আমি পা বাড়ালাম। জিম তখন আমার পেছন পেছন কাঁচুমাচু মুখে হাঁটতে থাকল। উঁচু গাছের একটা জটলা, তার পাশে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মতো ন্যাড়া পাথর। সেই পাথরের নিচে ছায়ার ভেতর কী একটা পড়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে হকচকিয়ে গেলাম।

একজন আদিবাসী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার হাতের পাশে একটা দিশি গাদা বন্দুক। নিশ্চয় লুকিয়ে জঙ্গলে হরিণ মারতে এসেছিল। তার মুখ থেকে গলগল করে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে। দেখামাত্র মনে পড়ে গেল অট্টহাসের কথা। ভয়ে সারা শরীর শিউরে উঠল। তাহলে এই লোকটি জঙ্গলের ভেতর এসেও সেই মারাত্মক রোগ থেকে রেহাই পায়নি দেখছি।

হুইসল বাজিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একজন গার্ড এল। সে ব্যাপারটা দেখে চমকে উঠে বলল, 'সর্বনাশ—এ যে দেখছি কাঠুয়াগড়ের সেই রঙ্গলাল। গতমাসে এর দাদা আজিরলালও এভাবে মারা পড়েছে।

বললাম, 'জঙ্গলের ভেতর নাকি?'

গার্ড বুধ সিং গম্ভীর মুখে বলল, 'না স্যার। ওদের বস্তিতে। যাই হোক, এখানে আর থাকা উচিত নয়। চলুন।'

'মড়াটার কী হবে?'

'জানোয়ার খেয়ে ফেলবে। আর কী হবে?'

বুধ সিংয়ের নির্বিকার মনোভাব খারাপ লাগল। বললাম, 'তুমি বরং ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ পাহারায় থাকছি। একজন মানুষ তো বটে!'

বুধ সিং যেন পলায়নের তালে ছিল। সে গোমড়া মুখে বলল, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু আপনি আর এখানে থাকবেন না স্যার। এ বড় ভয়ংকর রোগ। কিছু বলা যায় না।'

বলে সে লম্বা পা ফেলে হন-হন করে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বললাম, 'কী হল, বুধ সিং?'

বুধ সিংয়ের চেহারা দেখে একটু অবাক হলাম। ওখানে ফাঁকা জায়গা বলে যথেষ্ট রোদ পড়েছে। তার মুখের রঙটা হঠাৎ কেমন যেন লাল দেখাচ্ছে। তার চোখ দুটো বড় হয়ে যাচ্ছে। তারপর মনে হল, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। চেঁচিয়ে ফের বললাম, 'কী হল বুধ সিং?'

অমনি বুধ সিং নিঝুম জঙ্গল কাঁপিয়ে হা-হা-হা-হা করে বিকট হেসে উঠল। তার হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল, তারপর দুহাত শূন্যে তুলে সে ভয়ংকর অট্টহাসি হাসতে হাসতে ধপাস করে পড়ে গেল। সে সমানে হাসছিল আর গড়াগড়ি খাচ্ছিল ঘাসের ওপর। তারপর তার মুখে রক্ত দেখতে পেলাম।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখার পর আর স্থির থাকতে পারলাম না। এবার আমার অট্টহাসের পালা ভেবে পড়ি কী মরি করে ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটতে শুরু করলাম। জিমের কথা ভুলে গেলাম যেন। ধারি নদীর ধারে আমার ডেরায় পৌঁছে জিমের খোঁজ করলাম। দেখলাম সে আমার আগেই পৌঁছে

গেছে। কুটিরের তলার আগাছা থেকে বেরিয়ে লেজ নাড়তে লাগল। তাকে আদর করে মুহব্বত খাঁকে ডাকলাম সিঁড়ি নামিয়ে দিতে। কিন্তু কোনও সাড়া পেলাম না। বারকতক ডেকে অবাক হয়ে কুটিরের চারদিকে ঘুরে তাকে খুঁজলাম। বিশ ফুট উঁচুতে কুটির। দরজা-জানলা খোলা। অথচ মুহব্বতের পাত্তা নেই। নদীতে স্নান করতে গেলে তো কাঠের সিঁড়িটা নামানো থাকত। আশংকা—গা ছমছম করছিল। সাহস করে আরও কয়েকবার ডাকলাম। কিন্তু তবু কোনও সাড়া পেলাম না। তাই হুইসল বাজাতে শুরু করলাম। এই হুইসলগুলো মহারাজা বিদেশ থেকে বিশেষভাবে তৈরি করে আনিয়েছিলেন। এতে ফুঁ দিলে তীক্ষ্ণ আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে-হতে বহু দূর অবধি শোনা যায়। প্রয়োজনে এর ক্ষমতা টের পেয়েছি। এদিকে বাকি তিনজন গার্ডের একজনেরও সাড়া মিলল না।

কুটিরে ওঠা অসম্ভব হতো না আমার পক্ষে। কিন্তু আর সে চেষ্টা না করে জিমকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধারি পেরিয়ে ছুটে চললাম আজমগড়ের উদ্দেশে। পাকা রাস্তায় কোনও মোটর গাড়ি পেয়ে যাব....।

তিন

হ্যাঁ, মুহব্বত খাঁও অট্টহাস রোগে মারা পড়েছিল। শুধু তাই নয়, একই দিনে বাকি তিনজন ফরেস্টগার্ডের একই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটেছিল। এরপর জঙ্গলে গিয়ে থাকার সাহস ছিল না। মহারাজা প্রতাপ সিং বাহাদুর বলেছিলেন, 'আমার জঙ্গলের প্রাণীদের চেয়ে মানুষের প্রাণ আমি বেশি মূল্যবান মনে করি। আপনি কিছুদিন প্রাসাদে বিশ্রাম করুন। অবস্থা বুঝে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।' বিশ্রাম করা আমার ধাতে নেই। প্রাসাদের বিশাল চিড়িয়াখানার তদারকিতে মন দিয়েছিলাম। কিন্তু খোঁজ রাখতাম, জঙ্গল এলাকায় আর কেউ মারা পড়েছে কি না। এদিকে মহারাজা আবার ইউরোপের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, যদি কোনও বিশেষজ্ঞ অট্টহাস রোগের কারণ আবিষ্কার ও প্রতিকার করতে পারেন, তাঁকে মোটা টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আমি ডাক্তারি পড়িনি। রোগ বিশেষজ্ঞ নই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা তীব্র জেদ কাজ করছিল। তাছাড়া একটা আশ্চর্য ব্যাপার আমার মাথায় এসেছিল। আদিবাসী চোরাশিকারি রঙ্গলালের অট্টহাসে মৃত্যু দেখে ফরেস্টগার্ড বুধ সিং আক্রান্ত হল সঙ্গে সঙ্গে। অথচ আমার কোনও কিছু হল না? এমনকী মুহব্বত খাঁ এবং আমি একই সঙ্গে থেকেছি। মুহব্বত খাঁ আক্রান্ত হল, আমি হলাম না। এ কি আমার শরীরের বিশেষ ক্ষমতায়? কী ক্ষমতা? বুধ সিং আমার চেয়ে স্বাস্থ্যবান জোয়ান ছিল।

অট্টহাসে যেখানে সেখানে প্রথমে লোক মারা পড়েছে, সেখানে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করলাম। তখনও কোনও কোনও গ্রামে একটা করে লোক মারা পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের মারা পড়তে যারা দেখেছে বা দেখছে, তাদের কিন্তু কিছু হচ্ছে না। কেন?

হাতিপুরা বলে একটা গাঁয়ে সর্বশেষ যে লোকটি অট্টহাসে মারা গেল, তার বাড়ি হাজির হলাম। তার বউকে অনেক জিগ্যেস করে পয়সা কড়ি সাহায্যের লোভ দেখিয়ে একটা মূল্যবান সূত্র বেরিয়ে এল। হ্যাঁ, এটাই আমার সন্দেহ হয়েছিল। লোকটা ছিল ওই জঙ্গলের নিয়মিত চোরাশিকারি। এরপর অন্তত গোটাদশেক অট্টহাসে মৃত্যুর পুরনো কেস তদন্ত করে একই সূত্র মিলে গেল। কেউ ছিল চোরাশিকারি, কেউ জঙ্গলে গিয়েছিল কাঠ ভাঙতে বা গরু চরাতে। তাহলে কি ওই জঙ্গলেই অট্টহাসের বীজাণু আছে?

কিন্তু তাহলে আমি রেহাই পেলাম কেন?

মহারাজার কাছে ফের জঙ্গলে গিয়ে থাকার অনুমতি চাইলাম। উনি আঁতকে উঠে বললেন, 'না না। জঙ্গল ফতুর হয়ে যাক। আমার ওই শখে আর কাজ নেই। আপনি যা করছেন, তাই করুন।' অগত্যা একদিন গোপনে জিমকে নিয়ে মহারাজার অগোচরে জঙ্গলের দিকে পাড়ি জমালাম।

চার

ফরেস্টগার্ড চতুষ্টয়, আজীরলাল এবং মুহব্বত খাঁয়ের জঙ্গলে অট্টহাসে মৃত্যু হওয়ায় ওদিকে কোনও মানুষ আর ভুলেও পা বাড়াবে না জানতাম। কাঠের কুটিরের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি আছে দেখলাম। দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েক মাইল চক্কর দিয়ে এলাম। বিকেলে ধারি নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করলাম। অনেক ভাবলাম। কোনও খেই পেলাম না।

এ রাতে জ্যোৎস্না ছিল। জঙ্গলে মাঝে মাঝে বন্য প্রাণীর চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। রাতচরা পাখি ডাকছিল। সারাক্ষণ উত্তাল বাতাসের শব্দও ছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল জিমের গর গর গর্জনে। উঠে দেখি, জিম জানলার তারের জালিতে মুখ ঘষে নিচে কিছু দেখার চেষ্টা করছে। জানলা আস্তে খুলে নিচে একটু তাকাতে খোলামেলা জায়গায় কালো একটা মূর্তির নড়াচড়া চোখে পড়ল। চোরাশিকারি না কি? যেই হোক, সাহস তো কম নয়।

টর্চ ও রাইফেল নিয়ে চুপি চুপি বেরুলাম। জিমকে ইশরায় বুঝিয়ে দিলাম, তাকে চুপ করে থাকতে হবে। কাঠের সিঁড়ি ছায়ার ভেতর নিঃশব্দে নামিয়ে নেমে গেলাম দু'জনে। তলার প্রচুর ঘাস আর আগাছা। ঘন ছায়ায় একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালাম ছায়ামূর্তিটা মুখ তুলে কুটির দেখছে। একটু পরে সে ওপাশের গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল। তারপর গেছো জন্তুর দক্ষতায় ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে কুটিরের দেয়াল আঁকড়ে ধরল। ওদিকে তারের জালঘেরা বারান্দা আছে। চাপা ঘষ-ঘষ শব্দ শুনতে পেলাম। সে কি তারের জালটা কাটছে?

ইচ্ছে করলে তো সে পরিত্যক্ত নির্জন কুটিরে এতদিন ঢুকতে পারত। এখন যখন ঢুকছে, তখন তার লক্ষ আমি ছাড়া আর কী হতে পারে?

জিমকে ইশারায় চুপ থাকতে বলে পা টিপেটিপে উলটো দিকে সিঁড়িতে চলে গেলাম। ওপরে উঠে টের পেলাম শ্রীমান ছায়ামূর্তি কিচেনের দিকে বারান্দায় সমানে ঘষ ঘষ চাপা শব্দ তুলে তারের জাল কেটে চলেছে। কিচেনে নিঃশব্দে ঢুকে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

জাল কাটা হলে সে বারান্দায় উঠল। তারপর ওপাশ ঘুরে ড্রয়িংরুমের দরজার সামনে দাঁড়াল। ওই দরজা দিয়ে আমরা দুটিতে সদ্য ঢুকেছি। খোলাই আছে। বন্ধ করার কথা খেয়াল করিনি। একটু ইতস্তত করে সে ভেতরে যেই ঢুকেছে, অমনি কিচেনের দরজা থেকে আমি টর্চ জ্বেলেছি এবং জিমও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সে এক বীভৎস কদাকার প্রাণী। কতকটা মানুষের মতো দেখতে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীর। সারা গায়ে লোম। একমাথা জটাপাকানো চুল। একরাশ জঙ্গুলে দাড়িগোঁফ। বিকট দুর্গন্ধ টের পেলাম এতক্ষণে।

কিন্তু তার গায়ে অসুরের মতো জোর। জিমকে দু'হাতে ধরে দরজা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। জিমের আর্তনাদে বুঝলাম মারাত্মক আঘাত পেয়েছে। আমি রাইফেল বাগিয়ে গুলি করলাম। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সেই মুহূর্তে সম্ভবত গুলির প্রচণ্ড শব্দে ভয় পেয়ে ভয়ংকর প্রাণীটা এক লাফে বেরুল এবং যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে গেল। দৌড়ে গিয়ে তাকে আর খুঁজে পেলাম না। নিচে ধপাস করে একটা শব্দ হল বটে, তাকে দেখতেই পেলাম না।

এখন আহত জিমের শুশ্রূষা জরুরি। তার দিকেই মন দিলাম।

পাঁচ

সকালে ড্রইংরুমের ভেতর এক টুকরো মধুভরা মৌচাক আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলাম। ওই প্রাণীটিই কী এই মৌচাক নিয়ে হানা দিয়েছিল?

ভাগ্যিস, মৌচাকটুকু থেকে মধু নিঙড়ে খাওয়ার লোভ করিনি। তাহলে এই গল্প বলার জন্য বেঁচে থাকতাম না।

কিন্তু মৌচাক উপহারের উদ্দেশ্য কী? মেঝের দিকে তাকিয়ে সেইকথা ভাবছি, সেই সময় ধারি নদীর ওদিকে জিমের শব্দ শুনলাম। বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, মহারাজা দুজন সাহেব সঙ্গে নিয়ে আসছেন। তক্ষুনি নেমে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলাম। মহারাজা আলাপ করিয়ে দিলেন। অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত জীবাণু বিশেষজ্ঞ হ্যারিস বার্ডনট এবং তাঁর এক শিকারি বন্ধু ফ্রাঙ্ক জিওট্রাস। ফ্রাঙ্ক প্রাণীতত্ত্ববিদও। আমি এভাবে ফের এসেছি বলে মহারাজা একটু ভর্ৎসনা করলেন আমাকে।

হ্যারিস মৌচাকটা দেখেই চমকে উঠেছিলেন। বললেন, 'সর্বনাশ? এত এক মারাত্মক বিষাক্ত মৌমাছির মধু। অবশ্য সব মৌমাছিই বিষাক্ত। কিন্তু এ জাতের মৌমাছির মধুও বিষাক্ত। এরা আফ্রিকার জঙ্গলে বাস করে। এদেশে এল কীভাবে?'

মহারাজা হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন, 'আফ্রিকার মৌমাছি? তাহলে কী.....'

ওঁকে চুপ করতে দেখে বললাম, 'কী মহারাজা বাহাদুর?'

মহারাজা গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমার পিসতুতো ভাই দুর্জয় সিং আফ্রিকায় ছিল। মাস ছয়েক হল সে ফিরেছে। আমার সঙ্গে তার শত্রুর সম্পর্ক। কিন্তু ব্যাপারটা কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া সে একজন ডাক্তারও বটে।'

বললাম, 'একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে। দুর্জয় সিং এ জঙ্গলে কাউকেও ঢুকতে দিতে চান না।'

মহারাজা বললেন, 'ঠিক, ঠিক, তাই বটে। কিন্তু কেন? আমার জঙ্গলে তার এরকম খবরদারির কারণ তো বোঝা যায় না।'

ফ্রাঙ্ক বললেন, 'মৌচাক ফেলতে এসেছিল যে প্রাণীটি, বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, এ একজাতের আফ্রিকান বাঁদর। গরিলা ও বেবুনের মাঝামাছি প্রজাতির প্রাণী। মানুষের মতো উঁচু। গড়নও সেরকম। দুপায়ে হাঁটতে পারে। কোনও কাজ শেখালে করতে পারে। আফ্রিকায় তাদের বলা হয় জুমোজুমো।

সেবেলা আমরা ফরেস্টগার্ডদের কুটির খুঁজে একটা করে শুকনো মৌচাক পেলাম। রঙ্গলালের মৃত্যু হয়েছিল যেখানে, সেখানেও একটুকরো পেলাম। মুহব্বত খাঁ যে মৌচাকটার মধু খেয়েছিল, সেটা আবিষ্কৃত হল কিচেনের আবর্জনার ঝুড়িতে।

অট্টহাস রোগের কারণ খুঁজে পাওয়া গেল তাহলে। কিন্তু দুর্জয় সিং কেন কাউকে জঙ্গলে থাকতে দিতে চান না?

সেদিনই রাতে মহারাজা খবর পাঠিয়ে একশ সশস্ত্র সেপাই আনালেন জঙ্গলে। নিজেও সঙ্গে রইলেন। হ্যারিস, ফ্রাঙ্ক ও আমি একদলে রইলাম। সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে রইল বাহিনী। জুমোজুমো নামে প্রাণীটি দেখামাত্র গুলি করা হবে।

তখন রাত প্রায় একটা। ফ্রাঙ্ক, আমি এবং হ্যারিস একটা টিলার ধারে বিরাট পাথরের আড়ালে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি, হঠাৎ সামনে টিলার গায়ে একখানা আলো জ্বলে উঠল। আলো লক্ষ করে পাথরের পেছনে গুঁড়ি মেরে তিনজন এগিয়ে গেলাম। একটু পরে খস-খস মাটি কোপানোর শব্দ কানে এল। আলোর কাছেই শব্দটা হচ্ছে। কাছাকাছি গিয়ে অবাক হয়ে দেখলাম, একটা লোক লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই বিকট প্রাণী জুমোজুমো প্রকাণ্ড কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। আমরা ওত পেতে বসে তাদের এই অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলাম।

জুমোজুমো ক্রমাগত মাটি খুঁড়ছে। লোকটি চাপা গলায় তাকে কী নির্দেশ দিচ্ছে। একসময় আর আমি উত্তেজনা দমন করতে পারলাম না। একলাফে বেরিয়ে রাইফেল বাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'হ্যান্ডস আপ।'

ফ্রাঙ্ক এবং হ্যারিস সম্ভবত আমার কাণ্ড দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও বেরিয়ে এলেন রাইফেল তাক করে।

লোকটা সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে। ঘন অন্ধকারে কয়েক সেকেন্ড কিছু দেখতে পেলাম না। তারপর ফ্রাঙ্ক ও হ্যারিসের টর্চ জ্বলে উঠল। জুমোজুমোকে দেখলাম ডিগবাজি খেয়ে পড়েছে। গুলি ছুঁড়লাম। প্রাণীটি গর্জন করে টিলার গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নিচের দিকে চলে গেল।

হ্যারিস লোকটার বুকে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে বলল, 'নড়লেই মারা পড়বে!'

টিলার নিচের দিকে সেইসময় মহারাজার সেপাইদের হইহই শোনা গেল। তারা প্রাণীটাকে দেখতে পেয়েছে। মুহুর্মুহু গুলির শব্দ আর চিৎকার চেঁচামেচিতে রাতের জঙ্গলে হুলস্থূল হচ্ছিল। তারপর মশাল জ্বলতেও দেখলাম।

লোকটার হাত থেকে লণ্ঠন কেড়ে নিয়ে ফ্রাঙ্ক জ্বেলে দিলেন। বেশ লম্বা-চওড়া লোক সে। পরনে বুশশার্ট আর ব্রিচেস। মাথায় ঘন চুল, কোমরে বাঁধা বেল্টে রিভলবার ঝুলছে চামড়ার খাপে। বললাম, 'আপনি কি মহারাজা বাহাদুরের ভাই দুর্জয় সিং?'

সে কোনও জবাব দিল না। কিন্তু পেছন থেকে মহারাজার সাড়া পাওয়া গেল। 'হ্যাঁ—ওর নামই দুর্জয় সিং। ওকে ছাড়বেন না। সারাজীবন আমাকে ও বিপদে ফেলতে চেয়েছে। তাছাড়া ওর নামে ব্রিটিশ সরকার হুলিয়া করেছেন। ওকে কালেক্টরের হাতে তুলে দিতে হবে।

দুর্জয় সিং মহারাজার দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 'তার আগে আমি সবার কাছে তোমার কীর্তি ফাঁস করে দেব।'

মহারাজা বাঁকা হেঁসে বললেন, 'কীর্তি ফাঁস করবে? কেউ বিশ্বাস করবে না।'

দুর্জয় সিং বললেন, 'দাদামশাই বেঁচে নেই তাই। তবে তাঁর উইল আছে ব্রিটিশ সরকারের কাছে। তাতে স্পষ্ট লেখা আছে, বজ্রকান্ত মণি আমাকেই দিয়ে গেছেন। অথচ তুমি তা লুকিয়ে রেখে আমাকে বঞ্চনা করেছ।'

আমরা অবাক হয়ে শুনছিলাম। মহারাজা বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই উদ্ধার করার জন্য কি এখানে মাটি খুঁড়েছিলে দুর্জয়?'

দুর্জয় সিং বললেন, 'আমি জানি তুমি বজ্রকান্ত মণি এই জঙ্গলের ভেতর এনে লুকিয়ে রেখেছ। আমার ভয়ে আজমগড় প্রাসাদে রাখতেও সাহস পাওনি। মহারাজা প্রতাপ সিং হুইসল বাজালেন। কয়েকজন দেহরক্ষী হন্তদন্ত দৌড়ে এল। তারা নিচে অপেক্ষা করছিল সম্ভবত। মহারাজা হুকুম দিলেন, 'একে বেঁধে নিয়ে এসো তোমরা। এখনই আজমগড়ে ফিরে যেতে হবে।'.....

ছয়

পরে সব কথা জানতে পেরেছিলাম, প্রতাপ সিং আর তাঁর পিসতুতো ভাই দুর্জয় সিংয়ের মধ্যে বিবাদ বহু মূল্যবান একটা মণি নিয়ে। দুর্জয় সিং কোনও বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছিলেন, মহারাজা তাঁর সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলায় বিশেষ চিহ্নিত স্থানে সেই মণি লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু জঙ্গলে এসে দুর্জয় সিংয়ের তা খোঁজাখুঁজি করায় বাধা ছিল। ফরেস্টগার্ডরা মহারাজার হুকুমে সবসময় নজর রেখে ঘুরত। তার ওপর আমাকে গেম ওয়ার্ডেনের চাকরি দিয়ে জঙ্গলে পাঠানো হল—যাতে আমিও নজর রাখি কেউ জঙ্গলে যেন ঢুকতে না পারে। দুর্জয় সিং ইতিমধ্যে গোপনে

জঙ্গলে এসে আস্তানা করেছেন। পোষা জুমোজুমো নামে আফ্রিকার প্রাণীটিকে দিয়ে বিষাক্ত মৌচাকের সাহায্য জঙ্গলরক্ষীদের খতম করতে শুরু করেছেন। আমি এসে পড়ায় আমাকেও একই পদ্ধতিতে খতম করতে চেয়েছিলেন। কারণ জঙ্গলরক্ষীদের মতো আমারও দুর্জয় সিংকে দেখে ফেলার সম্ভবনা ছিল। নির্বিঘ্নে মণি অনুসন্ধানের কাজ করতে পারতেন না। যাইহোক, অট্টহাস রোগের ফাঁস হল এভাবে। দুর্জয় সিংয়ের গোপন আস্তানাও পাহাড়ের গুহায় আমরা আবিষ্কার করলাম।

গুহার ভেতর সার-সার বিষাক্ত মৌমাছির মৌচাক ছিল। গুহার মুখে শুকনো জ্বালানি ঠেসে আগুন ধরিয়ে পাথর চাপা দিলাম। আফ্রিকা থেকে দুর্জয় সিং ওই মৌমাছির একটা চাক এনেছিলেন। ক্রমশ তাদের বংশবৃদ্ধি হয়েছিল। সব পুড়ে মরল। আহত জুমোজুমোকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল।

আর বজ্রকান্ত মণি? মহারাজা তা আবার গোপনে কোথাও লুকিয়ে ফেলেন। তার হদিশ আমার জানা নেই।

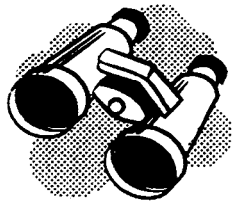

আফগান হাউন্ড রহস্য

এক

এবার অক্টোবর মাসে কর্নেলের সঙ্গে ধরমপুর রিজার্ভ ফরেস্ট বেড়াতে গিয়েছিলাম। অবশ্য কর্নেলের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ এক প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহ। দিন তিনেক পরে কি হল কে জানে, কর্নেল বললেন,—অর্কিডের যে খবর আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়েছিলাম, সম্ভবত তা ঠিক নয়। কারণ এ বনাঞ্চলে আদৌ দুর্লভ কোনও প্রজাতির অর্কিড গজায় কি না সন্দেহ।

আমি বললাম,—এমনও হতে পারে, অর্কিডের বদলে আপনি এখানে কোনও রহস্যের দেখা পেয়ে গেলেন!

কর্নেল তাঁর প্রখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন—জয়ন্ত, অনেক রহস্যের পেছনেই এতদিন ধরে ছোটাছুটি করেছি, কাজেই রহস্য আমাকে আর তত টানে না। অবশ্য দৈবাৎ যদি কিছু পেয়ে যাই অর্কিড খুঁজে না পাওয়ার দুঃখটা ঘুচে যাবে।

—তাহলে আর এখানে থাকতে চাইছেন না?

—ঠিক তাই। কাল সকালে আমরা বেরিয়ে পড়ব। বরং রাজগড়ের ওদিকে পাহাড়ি জঙ্গলে দু-একটা বিরল প্রজাতির অর্কিড পেলেও পেতে পারি। কারণ রাজগড় ছোটনাগপুর পর্বতমালার খুব কাছাকাছি।

আমরা যখন এইসব কথা আলোচনা করছিলাম, তখন বিকেল। বাংলোর চৌকিদার রামভগত আমাদের জন্য সবে কফি এনে দিয়েছে। বনবাংলোটা একটা টিলা পাহাড়ের গায়ে। চারদিকে অন্তত ছ'ফুট উঁচু পাঁচিল। তার ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল দু'জন তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোক নিচের রাস্তা থেকে বাংলোর গেটের দিকে উঠে আসছেন।

চৌকিদার রামভগত তাঁদের দেখামাত্র হনহন করে এগিয়ে গিয়ে সেলাম ঠুকল। তার মানে, ওঁরা তার পরিচিত। আস্তে বললাম,—কর্নেল, কাল চৌকিদার বলছিল, ধরমপুর ফরেস্টে দেখার মতো কিছু নেই। অথচ দেখা যাচ্ছে তবুও এখানে মানুষ আসে। কী দেখতে আসে কে জানে।

কর্নেল বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে সবে কফি শেষ করেছেন, চুরুট ধরিয়ে আমেজে টানছেন। আমার কথায় তিনি চোখ খুলে আগন্তুকদের একবার দেখে নিলেন মাত্র। কোনও মন্তব্য করলেন না।

আগন্তুকদের একজন বয়েসে প্রৌঢ়, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, হাতে একটা পুরু ব্যাগ। অন্যজন বয়েসে তাঁর চেয়ে একটু ছোট। কারণ তার গোঁফ এবং চুল দুটোই কুচকুচে কালো। তাঁর হাতে একটা সুটকেস। রামভগত দু'জনের হাত থেকে ব্যাগ এবং সুটকেসটা নিয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে এল। তারপর বারন্দা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উত্তরপ্রান্তের শেষ ঘরটার তালা খুলল।

বাংলোয় তিনটে ঘর। আমরা আছি দক্ষিণ প্রান্তের ঘরে।

আগন্তুক দু'জনেই আমাদের দিকে কেমন দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে রামভগতকে অনুসরণ করছিলেন। কেন কে জানে তাঁদের দৃষ্টিটা আমার কাছে অস্বস্তিকর মনে হল। কর্নেলের দিকে তাকালাম। তিনি তেমনি চোখ বুজে চুরুট টানছেন।

এরপর স্বভাবতই রামভগত তার নতুন অতিথিদের সেবায় কিছুক্ষণের জন্য ব্যস্ত হয়ে রইল। তারপর যখন সে আমাদের টেবিল থেকে কফির ট্রে নিতে এল তখন তাকে চুপি-চুপি জিগ্যেস করলাম,—ওঁরা তোমার চেনা নাকি?

রামভগত আস্তে বলল,—হ্যাঁ স্যার। ওই যে বড়াসাব আছেন, তাঁর নাম বিক্রমজিৎ সিনহা, আর ছোটাসায়েবের নাম রাকেশ শর্মা। ওঁরা থাকেন রামপুর টাউনে।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে পড়ল, আমরা তো রামপুর রেলস্টেশন হয়েই এসেছি। স্টেশনে রেঞ্জার সুরজিৎ নায়েকের জিপ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি জিগ্যেস করলাম,—ওঁরা দুজন পায়ে হেঁটে এতদূর আসতে পারলেন?

রামভগত একটু হেসে বলল,—এখান থেকে সামান্য দূরে একটা আদিবাসী বসতি আছে। যেখানে সিনহা সাব আর শর্মা সায়েবের একটা রেস্ট হাউস আছে। রেস্ট হাউসে গাড়ি রেখে ওঁরা পায়ে হেঁটেই চলে আসেন।

—আচ্ছা রামভগত, তুমি তো বলছিলে ধরমপুর ফরেস্টে দেখার মতো কিছু নেই। তা রেস্ট হাউস থেকে ওঁরা এই বাংলোয় কেন আসেন?

আমার চোখ এড়াল না, রামভগতের মুখটা কেমন যেন গম্ভীর হয়ে উঠল। সে এবার আরও আস্তে বলল,—আমি স্যার, গরিব লোক। বড়লোকরা কী খেয়ালে এখানে ঘুরতে আসেন, আমি বুঝি না।

—এই জঙ্গলে তো হাতি, ভালুক বা বাঘও আছে শুনেছি। কিন্তু ওঁরা সঙ্গে বন্দুক আনেন না?

কখনও-সখনও আনেন।—বলে রামভগত বাংলোর উত্তরদিকে তার ডেরায় চলে গেল। সেখানে তার বউ মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়েছিল। এই মেয়েটিকে আজ তিন দিন ধরে দেখে মনে হয়েছিল, সে বোবা কালা। কিন্তু শেষ বিকেলের আলোয় তাকে স্পষ্ট দেখলাম ভ্রু কুঁচকে স্বামীকে কিছু বলল। তার উত্তরে রামভগত যেন তাকে ধমক দিল।

এই কথাটা কর্নেলকে বললাম। কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন,—তুমি আমি দু'জনেই অবিবাহিত। কাজেই রামভগত আর তার বৌ-এর মধ্যে কী নিয়ে কথা হল তা আমরা বুঝব না।

বললাম,—আমার মনে হল মেয়েটি কোনও কারণে হঠাৎ একটু চটে গেছে। নতুন অতিথিরা কি তার অবাঞ্ছিত লোক?

কর্নেল চোখ খুলে একটু হেসে বললেন,—বাঃ, বাঃ! এই তো তুমি রহস্যের লেজ দেখতে পেয়েছ।

তখনও সন্ধ্যা নামতে কিছু দেরি আছে। চারদিকের গাছপালা থেকে পাখিদের তুমুল কলরব শোনা যাচ্ছে। কর্নেলের কথা শুনে আমি বললাম—কে জানে কেন, ওই লোকদুটোকে দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন,—বরং এক কাজ করা যাক। নদীর ব্রিজ অবধি একটু ঘুরে আসি চলো।

বলে তিনি আমাদের ঘরের দরজায় তালা এঁটে দিলেন। দু'জনে লনের সুদৃশ্য ফুলবাগিচা পেরিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম রামভগতের কোয়ার্টারের বারান্দায় বাংলোর মালি নবচন্দ্র রামভগতের বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছে।

গেট খুলে আমরা ঢালু পথে নেমে নিচের রাস্তায় পৌঁছুলাম। রাস্তাটা বেজায় এবড়ো-খেবড়ো। দু'ধারে ঝোপঝাড় আর কদাচিৎ কয়েকটা উঁচু গাছ। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আমরা নদীটার দেখা পেলাম। নদীটার নাম ধারিয়া।

এর উপর যে ব্রিজটা আছে তা সঙ্কীর্ণ। সম্ভবত ব্রিটিশ আমলে তৈরি। নদী এখন পুরোটাই

ঘোলাটে জলে ভরা এবং স্রোতও খুব তীব্র। জলের ভেতর পাথর থাকায় নদীটা বড্ড বেশি গর্জন করছে যেন। কর্নেল ব্রিজের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। আমি ব্রিজের রেলিংয়ে ঝুঁকে স্রোতের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

একটু পরে যেদিক থেকে এসেছিল, সেইদিকে নদীতীরের ঝোপঝাড়ের ভিতর একটা লম্বা লাল জিভ বের করা কালো কুকুরের মাথা কয়েকমুহূর্তের জন্য চোখে পড়ল। উত্তেজিতভাবে ডাকলাম, —কর্নেল, কর্নেল, ওটা কী কুকুর?

কর্নেল ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরটা ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—কোথায় কুকুর?

—ওই ঝোপটার ভেতর মুখ বের করেছিল। লাল জিভ। যেটুকু দেখেছি, তাতে আমার ধারণা ওটা একটা অ্যালসেশিয়ান।

কর্নেল সেইদিকে বাইনোকুলার তাক করে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,— তোমার দেখার ভুল হয়নি তো?

—না। আমি স্পষ্ট দেখেছি কুকুরটা হিংস্র চোখে যেন আমাদেরই দেখছিল।

এবার কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। গতকাল আমরা যখন এই নদীর জলপ্রপাতের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, তখন আমিও কয়েক সেকেন্ডের জন্য এমনি কুকুরের মুখ দেখেছিলাম। কথাটা তোমাকে বলিনি, কারণ তাহলে তুমি ভয় পেতে।

আমি একটু আমতা-আমতা করে বললেন,—না, আসলে আমি ভেবেছিলাম আদিবাসীরা অনেকে শিকারি কুকুর পোষে। সেইসব শিকারি কুকুরকে বলা হয় আফগান হাউন্ড। কারণ এইজাতের কুকুর শেরশাহের আমলেই এদেশে আনা হয়েছিল। আর শেরশাহ ছিলেন একজন আফগান।

আদিবাসীদের শিকারি কুকুর হোক আর যাই হোক, আমার মনে আবার একটা অস্বস্তি জেগে উঠল। বললাম,—চলুন, বরং সন্ধ্যার আগেই বাংলোয় ফেরা যাক।

কর্নেল কোনও কথা বললেন না কিন্তু। আমাকে অনুসরণ করলেন। লক্ষ করলাম, তাঁর মুখে এখন গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে।

এবার দু'জনে একটু দ্রুত হাঁটছিলাম। বাংলোর নিচে পৌঁছে হঠাৎ কর্নেল হেসে উঠলেন।

জিগ্যেস করলাম,—কী ব্যাপার। হঠাৎ হাসছেন যে?

—যাই বলো জয়ন্ত, একটা কুকুরের জন্যে ধারিয়া নদীর ব্রিজে দাঁড়িয়ে আমাদের চাঁদ ওঠা এবং জ্যোৎস্না দেখা হল না। কাল সন্ধ্যাতেই তো আমরা ওখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করেছি। জ্যোৎস্নায় পাহাড়ি নদীর স্রোত কী সুন্দর দেখায়। সেই সৌন্দর্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করল একটা তুচ্ছ কুকুর।

—কুকুরটার মুখ দেখে আমার কিছু তুচ্ছ মনে হয়নি। সাংঘাতিক হিংস্র মুখ।

কথা বলতে বলতে বাংলোর লনে পৌঁছে দেখি, নতুন অতিথিরা বারান্দায় টেবিল চেয়ার পেতে বসে কথা বলছেন। আমরা গিয়ে বারান্দায় উঠতেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এলেন। বললেন,—রামভগতের কাছে শুনলাম, আপনারা নাকি কলকাতা থেকে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আপনারা?

—আমরা থাকি রামপুর টাউনে। ধরমপুর আদিবাসী বসতিতে আমাদের একটা রেস্ট হাউস আছে। সেখানে মাঝে মাঝে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই। তারপর যদি হঠাৎ খেয়াল হয় তো চলে আসি এই বনবাংলোতে। এখান থেকে ধারিয়া নদী খুব কাছেই। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। বিশেষ করে এই অক্টোবরে আমরা আসি ছিপ ফেলে মাছ ধরতে।

আমি বলে ফেললাম,—আপনাদের সঙ্গে তো কোনও ছিপ দেখলাম না।

ভদ্রলোক একটু হাসলেন,—ছিপ রামভগতের ঘরে আছে। তারও ছিপ ফেলে মাছ ধরার খুব নেশা। যাই হোক—

বলে তিনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—রামভগতের কাছে শুনলাম, আপনি নাকি একজন কর্নেল সাহেব।

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর একটা নেম কার্ড বের করে ভদ্রলোককে দিলেন। তিনি সেটা দেখার পর জিগ্যেস করলেন,—এখানে নেচারোলজিস্ট লেখা আছে। এটা কী?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—আসলে আমি দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিড, ক্যাকটাস ইত্যাদির খোঁজে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই। এখানে এসেছিলাম বিশেষ একজাতের অর্কিডের খোঁজে। দুঃখের বিষয় আজ দুপুর অবধি তা খুঁজে পাইনি।

ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে ডাকলেন,—রাকেশ, এখানে এসো। আলাপ করিয়ে দিই। উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, তোমার মতো এই কর্নেল সাহেবেরও অর্কিডের নেশা আছে।

কর্নেল বললেন,—এখনও আপনাদের নাম জানতে পারিনি।

—দুঃখিত। আগেই আমাদের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। আমার নাম বিক্রমজিৎ সিনহা, আর এ হল আমার ব্যবসার পার্টনার রাকেশ শর্মা।

কর্নেল বললেন,—আমার পরিচয় তো পেয়েছেন। আমার এই তরুণ বন্ধুর নাম, জয়ন্ত চৌধুরি। পশ্চিমবঙ্গের বহুল প্রচারিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার একজন সাংবাদিক।

মিস্টার সিনহা বললেন,—আসুন আমাদের ঘরের সামনে বসে একটু আড্ডা দেওয়া যাক। বুঝতেই পারছেন, ব্যবসা নিয়ে জীবনটা বড্ড একঘেয়ে লাগে। রাকেশের তো আপনার মতো কিছু-কিছু হবি আছে, আমার হবি বলতে শুধু ফিশিং।

মিস্টার সিনহার আদেশে রামভগত আরও দুটো চেয়ার ওঁদের ঘরের সামনে বারান্দায় নিয়ে এল।

ওঁদের এই ব্যবহারে আমার অস্বস্তিটা কেটে গেল। লোকদুটোকে কেন যে ভিলেন মার্কা ভেবেছিলাম কে জানে।

কর্নেল বললেন,—মিঃ শর্মা আপনি এই জঙ্গলে কি কোনও বিরল প্রজাতির অর্কিডের খোঁজ পেয়েছেন?

রাকেশ শর্মা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন,—অর্কিড। হিমালয় ছাড়া আর কোথাও দেখার মতো অর্কিড আছে নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—হিমালয়, সে তো বিশাল ব্যাপার। একজন মানুষের পক্ষে হিমালয় পর্বতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে হয়তো জীবন ফুরিয়ে যাবে।

—কেন? সোজা গ্যাংটকে গিয়ে আশেপাশে ঘোরাফেরা করলেই তো কত সব আশ্চর্য অর্কিড।

—আপনি সিকিমে প্রায়ই যান, তাই না?

—তা যাই। কারণ আমাদের ব্যবসার কাজে সেখানে যেতে হয়।

—আপনাদের ব্যবসা কীসের?

মিস্টার সিনহা বলে উঠলেন,—লাক্ষা। আমরা লাক্ষার কারবার করি ধরমপুরের পশ্চিম এলাকায় বুনো ফুলের বিস্তীর্ণ জঙ্গল আছে। সেখান থেকে আদিবাসীরা লাক্ষা সংগ্রহ করে আমাদের বিক্রি করে। রামপুরে সরকার একটা ল্যাক রিসার্চ সেন্টার খুলেছেন। এতে আমাদের খুব সুবিধা হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—আপনারা ক'দিন থাকছেন?

—দু-তিনটে দিন থাকব। এখন ধারিয়া নদীতে খুব মাছ হয়। আপনারা আর ক'দিন আছেন?

আমাকে অবাক করে কর্নেল বললেন,—আছি। যতদিন না আমি সেই বিশেষ প্রজাতির অর্কিড খুঁজে পাচ্ছি।

রাকেশ শর্মা কথার ওপর বললেন,—বৃথা চেষ্টা। আর তাছাড়া শুনে এলাম কী একটা ভয়ংকর কুকুর জাতীয় প্রাণী এই জঙ্গলে এসে জুটেছে। ধরমপুর আদিবাসী বস্তির তিন-তিনটে লোককে সেই জন্তুটা তুলে নিয়ে গেছে। পরে তাদের হাড়গোড় ওরা খুঁজে পায়।

আমি সেই কুকুরটার কথা বলতে সবে ঠোঁট ফাঁক করেছিলাম, কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আপনারা তাহলে কোন সাহসে এখানে নদীতে মাছ ধরতে এসেছেন?

লক্ষ করলাম মিস্টার সিনহা তাঁর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। তিনিই বললেন,—কর্নেল সাহেব, আমরা এখানে নিরস্ত্র হয়ে আসিনি। আপনারা কি সঙ্গে অস্ত্র-টস্ত্র এনেছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আমরাও অবশ্য নিরস্ত্র হয়ে জঙ্গলে আসিনি।

—রাইফেল এনেছেন নাকি?

—নাঃ! পিস্তল-টিস্তল আছে।

রাকেশ শর্মা বাঁকা হেসে বললেন,—যদি সেই হিংস্র জন্তুটা আক্রমণ করে তাহলে পিস্তল দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

মিস্টার সিনহা বললেন,—এসব কথা থাক। রামভগতকে চা আনতে বলি।

কর্নেল বললেন,—ধন্যবাদ। আপনারা চা খান, আমরা কিছুক্ষণ আগে কফি খেয়েছি।

মিস্টার সিনহা ডাকলেন,—রামভগত, এখানে এসো।

ততক্ষণে সন্ধ্যার ধূসরতা মুছে গিয়ে হালকা জ্যোৎস্নার ছটা দেখা দিয়েছে। চারদিকে গাছপালার আলোছায়াই আজ আমার চোখে পড়ছে। সেই সঙ্গে ভেসে উঠছে লকলকে লাল জিভ বের করা একটা কালো কুকুরের মুখ এবং সাদা হিংস্র দাঁত।

কর্নেল বললেন,—নমস্কার মিস্টার সিনহা। নমস্কার মিস্টার শর্মা। আমরা এবার উঠি।

মিস্টার সিনহা রামভগতকে চায়ের হুকুম দিচ্ছিলেন। রাকেশ শর্মা প্রতি-নমস্কার করে চাপা স্বরে বললেন,—কর্নেল সাহেব, একটু সাবধানে থাকবেন।

নিশ্চয়ই থাকব।—বলে কর্নেল আমাদের ঘরের সামনে এসে চাপাস্বরে বললেন : জয়ন্ত তোমার অস্বস্তিটা দেখছি ঠিকই ছিল।

এই বনবাংলোয় বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। আমরা চেয়ারে বসার পর রামভগতের বদলে আজ সন্ধ্যায় তার বউ একটা হ্যারিকেন এনে টেবিলে রাখল। তার মাথায় ঘোমটা ছিল। কর্নেল খুব চাপাস্বরে তাকে দেহাতি হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

সে বলল,—সুশীলা।

—ওই সাহেব দু'জন প্রায়ই এখানে আসেন—তাই না?

সুশীলা ফিসফিস করে বলল,—হুজুর, ওরা লোক ভালো নয়।

কথাটা বলেই সে হনহন করে চলে গেল।

রাত ন'টার সময়েই রামভগত আমাদের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খাওয়ার পর হ্যারিকেনের আলোয় কর্নেল একটা বই পড়ছিলেন। তিনদিকের তিনটে জানলাই খুলে দিয়েছিলাম। পর্দাও সরিয়ে দিয়েছিলাম। দক্ষিণের ঘর বলে এই ঘরটা মোটামুটি আরামদায়ক। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে জ্যোৎস্না ঢুকেছে। কর্নেলের নাক ডাকছে। কেন ঘুম ভাঙল ভাবছি, হঠাৎ আমাদের পাশের ঘরটায় ঝনঝন শব্দ করে কে যেন থালাবাসন ছুড়ে ফেলল।

তারপরই ক্রমাগত কাচ ভাঙার শব্দ। সেইসঙ্গে অদ্ভুত জান্তব গরর-গরর গর্জন। ব্যস্তভাবে ডাকলাম,—কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের নাক ডাকা থেমে গেল। জড়ানো গলায় বললেন,—কী হয়েছে?

বললাম,—শুনতে পাচ্ছেন না, পাশের ঘরে কী হচ্ছে?

কর্নেল নির্লিপ্তভাবে বললেন,—ও কিছু না। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

কর্নেলের কথায় খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ততক্ষণে সব শব্দ থেমে গেছে। শুধু জ্যোৎস্নামাখা গাছপালা আর বাতাসের এলোমেলো শব্দ। আমার লাইসেন্সড রিভলবারটা বালিশের পাশেই ছিল। এসময় জানলায় কোনও মুখ দেখলে নিশ্চয়ই তাকে গুলি করতাম।

দুই

ঘুম ভেঙে দেখি কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। অন্যদিনের মতো কপাটে কেউ টোকা দিচ্ছিল। উঠে বসে বললাম,—রামভগত নাকি?

রামভগত ভেজানো দরজার কপাট ঠেলে বেড-টি নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বললাম,—আচ্ছা রামভগত, তোমার ওই গেস্ট দু'জন কি মদ খান?

রামভগত বলল,—না স্যার।

—তাহলে কাল রাতে কারা পাশের ঘরে জিনিসপত্র ভাঙচুর করছিল? তাছাড়া কুকুরে ডাকও শুনেছি। ব্যাপারটা কী?

রামভগত নিজের কপালে থাপ্পড় মেরে ভয়ার্ত মুখে বলল,—মাপ করবেন স্যার, আমারই বলা উচিত ছিল। কোনও-কোনও রাতে পাশের ঘরে ওইরকম আজগুবি সব আওয়াজ শোনা যায়।

—বলো কী?

—হ্যাঁ স্যার। ওই ঘরে পুরনো আসবাবপত্র আর নানারকম জিনিস আছে। আমার আপনাদের বলে দেওয়া উচিত ছিল।

—তাহলে তুমি বলতে চাও ওঘরে ভূত আছে? কোনও-কোনও রাতে তারা হানা দেয়?

—হ্যাঁ স্যার। সিনহা সাব আর শর্মা সাব বছরে অনেকবার করে এখানে আসেন তো, তাই তাঁরা ও নিয়ে মাথা ঘামান না। তা স্যার, আজ সকালেই তো আপনাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল। কর্নেল সাহেব বলেছিলেন সকালেই রেঞ্জার সাহেবের জিপ গাড়ি আসবে আপনাদের নিতে।

—হ্যাঁ তাই কথা ছিল। তবে কর্নেল সাহেব বলেছেন আরও দু-চার দিন থাকতেও পারেন। এ জঙ্গলে তাঁর খুব ভালো লেগেছে।

আপনাদের ইচ্ছা স্যার।—বলে সে চলে গেল।

কর্নেল ফিরে এলেন, তখন প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। অভ্যাসমতো কর্নেল টুপি খুলে সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললাম,—মাঝখানের ঘরটায় ভূতেরা যা উপদ্রব করল, তাতে সুনিদ্রা আশা করা যায় না।

কর্নেল হাসতে-হাসতে পিঠের কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রাখলেন। গলা থেকে ঝুলন্ত বাইনোকুলার ও ক্যামেরাও খুলে রাখলেন। রামভগত তাঁকে ফিরতে দেখেছিল। ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাক্স নিয়ে এল। কর্নেল বললেন,—রামভগত, রেঞ্জার সাহেব জিপ পাঠিয়েছিলেন কথামতো। পথে আমার সঙ্গে ড্রাইভার ইসমাইলের দেখা হয়েছে। তাকে বলে দিয়েছি, আমরা এখনও দু-তিনটে দিন হয়তো থাকব। কবে ফিরব সে খবর যথাসময়েই তোমার সাহেবকে জানিয়ে দেব।

রামভগত সেলাম ঠুকে চলে গেল। আমি জিগ্যেস করলাম,—আপনি তো নদীর দিক থেকেই এলেন। লাক্ষা ব্যবসায়ীদের নদীতে ছিপ ফেলে বসে থাকতে দেখেছেন নিশ্চয়ই?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ দেখেছি। তবে বাইনোকুলারে, দূর থেকে। ওঁরা দু'জনে ধারিয়া জলপ্রপাতের নিচে যে জলাশয় আছে, সেখানে ছিপ ফেলে বসে আছেন।

বললাম,—কাল রাতের ঘটনাটা রামভগত ভূতুড়ে উপদ্রব বলে ব্যাখ্যা করল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—এই ভূতুড়ে উৎপাতের কথা আমাকে রেঞ্জারসাহেব বলেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম,—কী আশ্চর্য! কথাটা আপনি আমাকে বলেননি?

—বলিনি। তার কারণ আমার সঙ্গে তুমি এতকাল ঘুরছ, তোমার কতখানি সাহস বেড়েছে তা মেপে নিতে চেয়েছিলাম।

হাসতে-হাসতে বললাম,—তা সাহস কিছুটা বেড়েছে বইকী! না বাড়লে জানলাগুলো বন্ধ করে দিতাম। আপনি কতদূর ঘুরলেন?

—হরপার্বতীর সেই মন্দিরে আজ উঠতে পেরেছি। চিন্তা করো জয়ন্ত। এই বুড়ো বয়েসে প্রায় তিনশ ফুট পর্বতারোহণ কম কথা নয়!

—ওখানে কেন উঠেছিলেন? মন্দির তো নেই, ভেঙে গেছে।

—হ্যাঁ। মন্দির নেই, হরপার্বতীও নেই, কিন্তু ওখানে একটা ছোটো গুহা আবিষ্কার করেছি। তুমি শুনলে অবাক হবে, গুহাতে কোনও মানুষ বাস করে। যদিও তার দেখা পাইনি। একটা ভাঁজ করা ক্যাম্বিসের খাটিয়া আছে। তার মানে কেউ ওখানে শুয়ে রাত কাটায়। অনেকগুলো সিগারেটের ফিলটার টিপ পড়ে থাকতে দেখেছি। তাহলে বোঝো সে যেই হোক, প্রচুর সিগারেট খায়।

—ফিলটার টিপ সিগারেট যে খায়, নিশ্চয়ই তার পয়সাকড়ি ভালোই আছে। কিন্তু সে ওখানে কী করে তা কি টের পেয়েছেন?

কর্নেল থামলেন,—আর যাই করুক, তপস্যা করে না।

—অদ্ভুত লোক তো! কর্নেল, নিশ্চয়ই লোকটার কোনও অভিসন্ধি আছে। নাহলে অমন জায়গায় কেন সে রাত কাটাবে?

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। এক রাশ ধোঁয়ার সঙ্গে বললেন,—জয়ন্ত, তুমি কাল বলছিলে, আমি যেখানেই যাই রহস্য খুঁজে পাই। কিন্তু সমস্যা কী জানো? বরাবর দেখে আসছি রহস্যের আড়াল থেকে কোনও চিরন্তন খুনি আমার সামনে একটা করে রক্তাক্ত মৃতদেহ ছুড়ে ফেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

চমকে উঠে বললাম,—কী সর্বনাশ! ওই অলুক্ষুণে কথা আর বলবেন না কর্নেল। এই বনবাদাড়ে ওইসব লাশ-টাশ নিয়ে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয়। ধরুন এমনও তো হতে পারে, যে কুকুরটাকে আপনি আফগান হাউন্ড বলেছেন, তার আক্রমণে কেউ রক্তাক্ত লাশ হয়ে গেল। তখন কি আপনি কুকুরটাকে মারতে এই বিশাল জঙ্গল এলাকায় ছোটোছুটি করে বেড়াবেন?

কর্নেল আমার কথার উত্তর দিলেন না। চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে রামভগত কফির ট্রে নিতে এল। সে বলল,—ব্রেকফাস্ট কি নটায় খাবেন স্যার?

কর্নেল শুধু বললেন,—হ্যাঁ।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেলের সঙ্গী হতে হল আমাকে। নিচের পিচ রাস্তায় অবশ্য গাছপালার গাঢ় ছায়া পড়েছে। আমরা নদীর ব্রিজের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে এবার দু'ধারে ঘন জঙ্গল। কোথাও-কোথাও নিবিড় ঝোপঝাড়। শরৎকালের জঙ্গলে এটা স্বাভাবিক। কিছুটা চলার পর জিগ্যেস করলাম,—আজও কি আপনার লক্ষ সেই বিরল প্রজাতির অর্কিড?

কর্নেল বললেন,—দৈবাৎ তার দেখা পেতেও তো পারি। তবে আপাতত তোমাকে সেই হরপার্বতীর মন্দিরের নিচের গুহা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি।

বললাম,—সর্বনাশ! তিনশ ফুট পাহাড়ে চড়াবেন আমাকে? এই রোদ্দুরে?

—ডার্লিং! এক সময়ে তুমি মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ট্রেনিং নিয়েছিলে। মাঝে-মাঝে তোমাকে পাহাড়ে চড়াই বলেই তোমার শক্তি বাড়ে।

কথা না বাড়িয়ে তাঁকে অনুসরণ করলাম। একফালি লাল মাটির পথ। কখনও চড়াই, কখনও উতরাই হয়ে বাঁক নিতে-নিতে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা খোলা ঘাসে ঢাকা মাঠ দেখতে পেলাম। আমাদের ডান দিকে একটা খাড়াই টিলা দেখে চিনতে পারলাম, এটাই সেই হর-পার্বতীর মন্দির। আগের দিন টিলাটা পশ্চিমদিকের নদীর ধার থেকে দেখেছিলাম। কর্নেল বাইনোকুলারে হরপার্বতীর টিলা এবং চারদিক খুঁটিয়ে দেখার পর এগিয়ে গেলেন।

এদিকটায় টিলার নিচে একটা শালবন। শালবনের নিচে তত বেশি বাড়ি নেই। এলোমেলো বাতাস বইছিল। এতক্ষণে নীল আকাশে সাদা মেঘের টুকরো চোখে পড়ল। শালবন পেরিয়ে কোনও পুরনো আমলের পাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমাদের পাহাড়ে চড়া শুরু হল। বলছি পাহাড় বা টিলা, কিন্তু এটা অনেকটা মিশরের পিরামিডের মতোই দেখতে। মাঝে-মাঝে মেঘের ছায়া ছাড়া এদিকটায় কোনও গাছের ছায়া পাওয়ার আশা নেই।

কর্নেল মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। পাথরের সিঁড়ি কোথাও-কোথাও পিছল হয়ে আছে। তাই আধঘণ্টা পরে যখন চুড়োয় পৌঁছুলাম তখন আমি হাঁফাচ্ছি। একটা কোণে বটগাছ হরপার্বতীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে মাথা তুলেছে। তার ছায়ায় একটা পাথরে কর্নেল বসলেন। আমি তাঁর পাশাপাশি আর একটা পাথরে বসলাম। সত্যি, আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুর কোনও তুলনা হয় না। তিনি যে ক্লান্ত তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাইনোকুলারে চোখ রেখে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কিছু দেখছিলেন।

জিগ্যেস করলাম,—জলপ্রপাতটা ওইদিকেই আছে, তাই না?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তবে মৎস্যশিকারি দুই লাক্ষা ব্যবসায়ীকে দেখতে পেলাম না। ওঁরা হয়তো ইচ্ছেমতো মাছ ধরে বাংলোয় ফিরে গেছেন।

—সেই গুহাটা কোথায়?

—আমাদের নিচে। চলো, গুহায় বসে চুরুট টানা যাবে।

তাঁকে অনুসরণ করে দেখলাম ঝোপঝাড়ের ফাঁকে পাথরের সিঁড়ির মতো কয়েকটা ধাপ। সাবধানে কর্নেলের পিছনে নেমে গেলাম। গুহার সামনে একটা পাথরের চাতাল। গুহার দরজাটা প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু, ফুট তিনেক চওড়া। চাতালে দাঁড়িয়ে বললাম,—কর্নেল, গুহাবাসী এখন নেই রক্ষে! থাকলে এতক্ষণ লড়াই বেধে যেত।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—লোকটা দিনে থাকে না।

—কেমন করে জানলেন আপনি?

কর্নেল বললেন,—আজ ভোরে ওই পিচ রাস্তায় সম্ভবত তারই সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

—কী আশ্চর্য! আপনি আগে বলেননি কেন?

—এই তো বললাম। তুমি জানতে চাইলে, তাই বললাম।

—কী করে বুঝলেন, সেই এই গুহায় রাত কাটায়?

—তার হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার ছিল। নাঃ—সে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী নয়। দস্তুরমতো ভদ্রলোক।

—কিন্তু সে-ই যে এই গুহায় থাকে, তার কী প্রমাণ পেয়েছেন?

—তার মুখে ফিলটার টিপড সিগারেট ছিল। পিঠে আঁটা ছিল একটা বন্দুক।

—আপনি তাকে কিছু জিগ্যেস করলেন না?

—না। কারণ সে নিজেই বলল, এভাবে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জঙ্গলে একটা অজানা মানুষখেকো জন্তুর উৎপাত আছে। সাবধান! আমি তাকে বললাম, আপনি কি ওই জন্তুটাকে মারবার জন্যেই বন্দুক নিয়ে গিয়েছিলেন? সে আমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে চলে গেল। এবার জয়ন্ত, তাহলে অঙ্ক কষে দেখো।

অবাক হয়ে কর্নেলের কথা শুনছিলাম। বললাম,—লোকটা তাহলে এলাকার কোনও বড়োলোক। ওই বন্দুক তার প্রমাণ। আর স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা বদ্ধ পাগল।

কর্নেল গুহায় ঢুকে গুটিয়ে রাখা ক্যাম্বিসের খাট খুললেন। অবাক হয়ে দেখলাম, বিছানার উপর হিন্দিতে ছাপানো খানচারেক পুরনো বই। জিগ্যেস করলাম,—ওগুলো কিসের বই? গল্প উপন্যাস নাকি?

কর্নেল বললেন,—না। এগুলো মন্ত্রতন্ত্রের বই। ওই কোণে দেখো একটা হ্যারিকেন আছে। হ্যারিকেনটা রাখার জন্যে ওই দেখো, একটা উঁচু টুল।

হাসতে-হাসতে বললাম,—যা বলেছি তাই! বদ্ধ পাগল!

কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। তিনি বইগুলোর পাতা একটা-একটা করে ওলটাতে থাকলেন। তারপর একটা ভাঁজ করা কাগজ খুঁজে বের করে সেটা খুলে চোখ বুলিয়ে নিলেন। জিগ্যেস করলাম,—ওটা কী?

কর্নেল ভাঁজ করা কাগজটা বুক পকেটে ঢুকিয়ে ক্যাম্বিসের খাটটা আগের মতো গুটিয়ে রাখলেন। বললেন,—চলো, এখান থেকে কেটে পড়ি।

কিছুক্ষণ পরে যখন হরপার্বতীর চূড়া থেকে নেমে আসছি, তখন বললাম,—আপনি কি জানতেন ওই ভাঁজ করা কাগজটা এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে? তাই এখানে এসেছিলেন?

কর্নেল বললেন,—গুহাটা তো আজ সকালেই আবিষ্কার করেছি।

—তাহলে আবার এলেন কেন?

—তোমাকে দেখানোর জন্য।

—না কর্নেল, আপনি যেভাবেই হোক, খুব সম্ভবত জানতেন ওই ভাঁজ করা কাগজটা এখানে পাওয়া যাবে।

—কাগজে কী আছে বলে তুমি ভাবছ?

একটু হেসে বললাম,—কোনও গুপ্তধনের ঠিকানা।

কর্নেলও হাসলেন,—ঠিক বলেছ ডার্লিং। তবে এখন কোনও কথা নয়। চলো, এখান থেকে জলপ্রপাতের কাছে যাওয়া যাক।

চূড়া থেকে নেমে আবার একটা শালবন পেরিয়ে ধারিয়া নদীর দেখা পেলাম এক ঝলক। এতক্ষণে জলপ্রপাতের গর্জন শোনা গেল। নদীর ধারে ধারে হাঁটতে-হাঁটতে একসময় জলপ্রপাতের দেখা পাওয়া গেল। এই জলপ্রপাতটা আমি আগেই দেখেছি। তবে নদীর পশ্চিম পাড় থেকে। জলপ্রপাতের নিচে বিস্তীর্ণ একটা জলাশয়। কর্নেল বাইনোকুলারে জলাশয়টা দেখে নিয়ে বললেন, —কিছু জলচর পাখি সবসময়েই হয়তো এখানে থাকে। তাদের বন্দুকে শিকার করা হয়তো সোজা কিন্তু শিকারকে করতলগত করা কঠিন। কারণ দৈবাৎ এই জলাশয়ের শেষ প্রান্তে গেলেই আর একটা ছোটো প্রপাতের পাল্লায় পড়ে নৌকো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে। তাই দেখছ না, এখানে কোনও জেলে নৌকা নেই।

কর্নেল জলাশয়ের অন্য পাড়ে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। জিগ্যেস করলাম,—অর্কিড দেখতে পাচ্ছেন নাকি?

—এসব জায়গায় অর্কিড জন্মায় না।

—তাহলে কী দেখছিলেন?

কর্নেল উত্তর না দিয়ে, উত্তর নদীর ওপর সেই ব্রিজের দিকে, অর্থাৎ উজানের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মনে হল উত্তেজিত হওয়ার মতো কিছু দেখেছেন। তাঁকে চুপচাপ অনুসরণ করলাম।

ব্রিজ পেরিয়ে নদীর পশ্চিম পাড়ে অসমতল মাটিতে পাথর আর উঁচু-নিচু গাছপালার ভেতর দিয়ে কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটছিলেন। আমি হতবাক হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছিলাম।

জলপ্রপাতের ডান দিকে নদীর পাড় খানিকটা ঢালু। আর ওই ঢালু মাটি পুরোটাই ঘাসে ঢাকা। জলাশয়ের কিনারায় বড়ো-বড়ো পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সেখানে নেমে গিয়ে কর্নেল একটা মাছধরা ছিপের গোড়ার দিকটা পাথরের ফাঁক থেকে তুলে নিলেন। দেখলাম ছিপটার গোড়ায় পেতলের হুইল বাঁধা আছে। কিন্তু সুতো ছিঁড়ে গেছে। কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন,—এই হুইলটা রোদে চকচক করছিল। কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না, ছিপের গোড়ার দিক ভেঙে ফেলে রেখে লাক্ষা ব্যবসায়ীরা উধাও হলেন কেন? চলো, বাংলোয় ফিরে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

বাংলোয় ফিরে গিয়ে রামভগতের মুখে যা শুনলাম, তা সাংঘাতিক ঘটনা। সেই হিংস্র জন্তুটা নাকি ছোটো সাহেব, অর্থাৎ রাকেশ শর্মার গলা কামড়ে ধরে জঙ্গলে উধাও হয়েছে। বড়ো সাহেব তাই ধরমপুরে চলে গেছেন। রামপুর টাউন থেকে পুলিশ নিয়ে আসবেন।

তিন

ঘটনাটা শোনার পর কর্নেল গম্ভীর মুখে আমাদের ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। তারপর পিঠ থেকে কিটব্যাগ বাইনোকুলার ক্যামেরা টেবিলে রেখে চুরুট ধরালেন।

আমি হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রপাতের জলাশয়ের ধারে মাছধরা ছিপটা ভাঙা অবস্থায় দেখে এসেছি। আফগান হাউন্ডের অতর্কিত আক্রমণের সময় রাকেশ শর্মা কি ছিপের গোড়ার দিকটা দিয়ে জন্তুটাকে আঘাত করেছিলেন? কিন্তু একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে। ওখানে তো কোনও রক্তের চিহ্ন দেখিনি। একটু পরে কর্নেলকে বললাম,—আচ্ছা কর্নেল, হিংস্র কুকুরটা যদি মিস্টার শর্মার গলা কামড়ে বাঘের মতোই জঙ্গলে উধাও হয়ে থাকে তাহলে ঢালু ঘাসের জমিতে প্রচুর রক্ত পড়ার কথা। কিন্তু আমরা রক্ত দেখিনি।

কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন,—রক্ত আমারও চোখে পড়েনি। অবশ্য অনেক সময়েই কোনও হিংস্র জন্তু গলা কামড়ে টেনে নিয়ে গেলে গলা থেকে কামড় না খোলা অবধি রক্ত ঝরে না। একথা আমি বিখ্যাত বাঘশিকারিদের কাছে শুনেছি। এখন আক্ষেপ হচ্ছে জলাশয়ের ওপরের পাড়ে ঝোপ-জঙ্গলগুলো খুঁজে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি কেমন করে জানব, এমন কিছু ঘটেছে।

আমি একটু চুপ করে থাকার পর বললাম,—হরপার্বতী টিলার গুহা থেকে যে ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে এলেন, ওতে কী আছে? তাছাড়া আপনি কি আগে থেকেই জানতেন যে ওটা ওখানে পাওয়া যাবে?

কর্নেল বললেন,—তোমাকে তো বলেছি, আজই ওই পাহাড়ের গুহা আবিষ্কার করে এলাম। আবিষ্কারের কথাটা ঠিকই। আসলে কাল দুপুরে তুমি যখন গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছিলে আমি বাইনোকুলারে দেখতে পেয়েছিলাম হরপার্বতী মন্দিরের টিলা বেয়ে বাংলোর মালি নবচন্দ্র উঠে গেল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম ভক্তিমান নব হয়তো পুজো দিতে

যাচ্ছে। কারণ তখনও আমি ওই টিলার চূড়ায় মন্দিরটা আস্ত আছে কিনা জানতাম না। তাই আজ প্রাতঃভ্রমণের সময় নিছক খেয়ালে টিলার চূড়ায় উঠেছিলাম।

দেখলাম কোনও মন্দির নেই। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে একটা বেঁটে বটগাছ গজিয়েছে। তখন মনে প্রশ্ন জাগল, নবচন্দ্র এখানে কেন এসেছিল। তারপর খুঁজতে-খুঁজতে কয়েক মিটার নিচে ওই গুহাটা দেখতে পেয়েছিলাম।

বললাম,—কিন্তু তখন আপনি গুহার ভিতর কিছু খোঁজেননি। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তারপর খুঁজে ওই ভাঁজ করা কাগজটা পেলেন। ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না।

কর্নেল ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন,—তখন ভেবেছিলাম গুহাবাসী লোকটার জন্য নব হয়তো খাবার নিয়ে গিয়েছিল। আমার এ ভুল কেন হল তা বুঝতেই পারছ। ভোরবেলা পিচরাস্তার মোড়ে বন্দুকওলা লোকটার হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার দেখেছিলাম।

এই সময়ে রামভগত বারান্দা থেকে বললেন,—এখন কি কফি খাবেন স্যার?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তুমি কফি আনো।

বাইরে রামভগতের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে বললাম,—প্লিজ কর্নেল, ওই কাগজটাতে কী লেখা আছে আমায় খুলে বলুন।

কর্নেল বললেন,—ওতে হিন্দিতে লেখা আছে, "যোগিন্দর, ধরমপুর থেকে সিনহা সাব খবর পাঠিয়েছে কাল বিকেলের মধ্যে বাংলোয় আসছে। তোমার কথামতো আগাম জানিয়ে রাখলাম।" চিঠির নিচে শুধু 'নব' লেখা আছে।

—নব হিন্দি লিখতে জানে?

—কী আশ্চর্য! সে এতকাল বিহার মুলুকে বাস করছে, একটু-আধটু হিন্দি লেখাপড়া জানা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

—ভারি গোলমেলে ব্যাপার। কিছু বোঝাই যাচ্ছে না।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, বড়ো জটিল রহস্য।

কথাটা বলে তিনি জ্বলন্ত চুরুট ঠোঁটে কামড়ে ধরে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। মাথার টুপিটা সম্ভবত খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। মুখ উঁচু করায় টুপিটাই খুলে পড়ে গেল। তবু তিনি ধ্যানস্থ। অগত্যা খালি টুপিটা কুড়িয়ে টেবিলে রাখলাম।

একটু পরে রামভগত কফি নিয়ে এল। তাকে বললাম,—সিনহা সাহেব বলছিলেন, অস্ত্র ছাড়া জঙ্গলে কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়। তাহলে সেই জন্তুটা কী করে তোমাদের ছোটসাবকে তুলে নিয়ে গেল?

রামভগত করুণ মুখে বলল,—সিনহা সাব আর শর্মা সাবের কাছে রিভলবার আছে।

—তুমি কি কখনও দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যার, কতবার দেখেছি। সিনহা সাব বলে গেলেন, আচমকা জানোয়ারটা ঝাঁপ দিয়েছিল। সিনহা সাব মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। ছিপ দিয়ে নাকি জানোয়ারটাকে মেরেছিলেন। তারপর খেয়াল হতেই রিভলবার থেকে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু জানোয়ারটা তখনই একলাফে নাকি উপরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। স্যার, ওই জানোয়ার কোনও খারাপ আত্মা। এই মুলুকের লোকে বিশ্বাস করে, ওটা ভূত-প্রেত ছাড়া কিছু নয়।

ততক্ষণে কর্নেল সোজা হয়ে বসে কফিতে মন দিয়েছেন। গম্ভীর মুখে বললেন,—বুঝলে রামভগত, এবার বোঝা যাচ্ছে ওই হিংস্র ভূতটাই গত রাতে পাশের ঘরে অদ্ভুত সব শব্দ করছিল। শব্দ শুনে কেউ বেরুলেই সে নির্ঘাৎ তার গলা কামড়ে ধরে জঙ্গলে উধাও হয়ে যেত।

রামভগত ভয়ার্তমুখে চাপা স্বরে বলল,—সেইজন্যই তো আমরা ওই ঘর থেকে শব্দ শুনেও রাতে বেরোই না।

—ও ঘরের তালার চাবি কার কাছে থাকে?

—চাবি একটা আমার কাছে ছিল। আর একটা রেঞ্জারসাবের কাছে।

—তোমার কাছে ছিল মানে! এখন নেই?

—না স্যার, চাবিটা হারিয়ে গেছে। কী করে যে হারিয়ে গেল কে জানে! রেঞ্জার সাহেব ওই চাবিটা আমাকে আলাদা করে রাখতে বলেছিলেন। তাই আমি ওটা আমার ঘরের কুলুঙ্গিতে রুদ্রদেবের তলায় রেখেছিলাম। আমার বউকে পর্যন্ত একথা জানাইনি। কিছুদিন আগে রেঞ্জার সাহেব এসে ওই ঘরটা খুলতে বলেছিলেন। তিনি চাবিটা আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমি রুদ্রদেবের মূর্তির তলায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও চাবিটা পাইনি। রেঞ্জার সাহেব আমাকে খুব বকাবকি করে বলেছিলেন, একটা নতুন তালার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত করেননি।

বাইরে কেউ ডাকছিল,—রামভগত! রামভগত!

রামভগত তখনি বেরিয়ে গেল। দরজার পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, দু'জন মেটে রঙের উর্দি পরা লোক। তাদের কাঁধে বন্দুক। বললাম,—কর্নেল, আপনি বলছিলেন এই রিজার্ভ ফরেস্টের গার্ডরা নিজের-নিজের বাড়িতে বসে ডিউটি করে। এখন দেখছি তাদের টনক নড়েছে।

কর্নেল বললেন,—ওদের দোষ নেই। রেঞ্জার সাহেবকে তো বলতে শুনেছ এই জঙ্গলটা সবে মাসচারেক আগে সরকার রিজার্ভ ঘোষণা করেছে। এই বাংলোটা ছিল ইংরেজ আমলের কোনও প্রকৃতিপ্রেমিক ইংরেজের বাংলো বাড়ি। দেওয়ালের অবস্থা দেখে তা বুঝতে পারছ না? এখানে শিগগিরই নাকি বিদ্যুতের লাইন এসে যাবে। তারপর বাংলোটা মেরামত করা হবে।

কফি শেষ করে বললাম,—বাংলোতে তিনটে মোটে ঘর। মধ্যের ঘরটা পুরনো আসবাবপত্র নাকি ভর্তি। আর ওই ঘরেই মাঝে-মাঝে কোনও প্রেতাত্মা হিংস্র আফগান হাউন্ডের বেশে দখল করে নেয়। গতরাতে সে এসেছিল। ঘরটা খুলে দেখতে পেলে ব্যাপারটা বোঝা যেত।

কর্নেল অ্যাসট্রেতে রাখা চুরুটটা টেনে নিজেকে চাঙ্গা করলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্ত, ওই ঘরে গত রাতে সত্যিই যে একটা আফগান হাউন্ড ঢুকেছিল এবং তার মালিকও সঙ্গে ছিল, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অবাক হয়ে বললাম,—মালিক! মানে আফগান হাউন্ডটার কোনও মালিক আছে? তা যদি থাকে, তাহলে সে তার পোষা জন্তুটাকে ওভাবে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় কেন? সে নিশ্চয়ই জানে এই কুকুরটা বাঘের চেয়েও হিংস্র। বিশেষ করে বনে-জঙ্গলে ছেড়ে দিলে কুকুরটা তো ক্রমশ বন্য হয়ে উঠবে। তখন কারও বশ মানবে না।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় বাংলোর নিচের রাস্তায় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। জানলার পর্দা তুলে দেখলাম, একটা পুলিশ জিপ, একটা পুলিশ ভ্যান এবং তার পেছনে রেঞ্জার সাহেবের সেই জিপটা এসে থামল। গাড়ি তিনটে থেকে দু'জন পুলিশ অফিসার এবং কয়েকজন সশস্ত্র কনস্টেবল বেরিয়ে এল। পেছনের জিপ থেকে রেঞ্জার সুরজিৎ নায়েক এবং লাক্ষা ব্যবসায়ী সেই সিনহা সাহেব বেরিয়ে এলেন। সবাই এসে বাংলোর বারান্দায় ভিড় করলেন। এবার দরজার পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলাম, বারান্দার চেয়ারগুলো দখল করে পুলিশ অফিসার আর মিস্টার সিনহা এবং আরও দুজন পুলিশ অফিসার বসে পড়লেন। শুধু রেঞ্জার সাহেব আমাদের ঘরের সামনে এসে আমায় দেখে নমস্কার করে বললেন,—মিস্টার চৌধুরি, কর্নেল সাহেব কি আবার অর্কিডের খোঁজে বেরিয়ে গেছেন?

ভিতর থেকে কর্নেল সাড়া দিলেন,—না মিস্টার নায়েক, ঘরে বসে ঈশ্বরের নাম জপ করছি। আপনি আসুন, ভেতরে আসুন।

মিস্টার নায়েক ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর বললেন,—মিস্টার সিনহাকে আমি সতর্ক করে দিয়েছিলাম। ওভাবে যখন তখন-জঙ্গল এলাকায় যাবেন না। জানোয়ারটাকে এলাকার আদিবাসীও দেখেছে। তারা ভয়ে আর কাঠ সংগ্রহের জন্য জঙ্গলের বেশি ভেতরে ঢোকে না। এর আগেও কয়েকটা প্রাণ গেছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, খোঁজাখুঁজি করে শুধু রক্ত আর হাড় ছাড়া ডেড বডির এতটুকু মাংসও দেখতে পাওয়া যায়নি! এমনকী মাথাটাও কে যেন ধারাল দাঁতে কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়েছে!

কর্নেল বললেন,—আপনি এই বাংলোর ভূতের কথা বলেছিলেন। গত রাতে সে তালাবন্ধ ঘরের ভেতর খুব লম্ফঝম্ফ করে গেছে।

আমি বলে উঠলাম,—আর ওই গরর-গরর গর্জনের কথা বলুন।

মিস্টার নায়েক যেন চমকে উঠলেন,—কোনও জন্তুর গর্জন?

—হ্যাঁ। হিংস্র জন্তুর গর্জন বলেই মনে হল।

কর্নেল বললেন,—আমি কিন্তু গর্জন শুনিনি।

বললাম,—শুনবেন কী করে? আপনি তো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন! আমি জাগিয়ে দিতে বললেন, ও কিছু নয়। তারপর আবার আপনার নাক ডাকা শুরু হল।

মিস্টার নায়েক হঠাৎ চাপাস্বরে জিগ্যেস করলেন,—কর্নেল সাহেবের আজ সকালে চলে যাওয়ার কথা ছিল। গতরাতের ওই ভূতুড়ে উৎপাতের রহস্য সমাধান করবার জন্যই কি আপনি থেকে গেলেন?

কর্নেল তেমনি চাপাস্বরে উত্তর দিলেন,—মিস্টার নায়েক, রামপুর থানার অফিসার ইন-চার্জকে কি আমাদের কথা বলেছেন?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—আপাতত পুলিশের কী প্ল্যান?

—ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে নিয়ে রাকেশ শর্মার মৃতদেহ উদ্ধার। অবশ্য আমি ওঁদের বলেছি পুরো লাশ খুঁজে পাবেন না। হাড়গোড় আর রক্ত খুঁজে পাবেন।

এই সময়েই আমাদের ঘরের দরজার সামনে একজন পুলিশ অফিসার এসে বললেন,—আসতে পারি?

মিস্টার নায়েক বললেন,—আসুন মিস্টার প্রসাদ। কর্নেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

আলাপ-পরিচয় জানা গেল তিনিই অফিসার ইনচার্জ মিস্টার হরিহর প্রসাদ।

উনি বললেন,—পুলিশ ফোর্স ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে এখনই বেরিয়ে গেল। আমাদের দু'জন অফিসারও তাদের দলে আছেন।

—মিস্টার সিনহা ওঁদের সঙ্গে যাননি?

—হ্যাঁ। উনিও গেছেন। জলপ্রপাতের নিচে যেখানে ওঁরা মাছ ধরছিলেন, সেখান থেকেই খোঁজা শুরু হবে। আমি আপনার সব পরিচয়ই আমাকে মিস্টার নায়েক দিয়েছেন, তাছাড়া আসতে-আসতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল হাথিয়াগড়ে আমার এক কলিগ সম্প্রতি ও.সি. হয়ে গেছেন। তাঁর কাছে আপনার নাম শুনেছিলাম।

কর্নেল বললেন,—বলুন আমি কী করতে পারি?

—বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের কাছে খবর আছে, ধরমপুর ফরেস্ট এলাকায় নিষিদ্ধ মাদকের একটা চোরা ঘাঁটি আছে। কিন্তু সেটা কোথায় তা আমাদের সূত্রও জানে না। সে শুধু কোনও-কোনও রাত্রে

এই জঙ্গলের ভেতর মোটরগাড়ির আলো দেখতে পেয়েছে। যাই হোক, এর সত্যিমিথ্যে যে যাচাই করব, তার সুযোগ পাইনি। প্রথমত কিছুকাল যাবৎ এই জঙ্গলে একটা অজানা হিংস্র জানোয়ারের উৎপাত, দ্বিতীয়ত আমাদের হাতে তত বেশি ফোর্সও নেই যে জঙ্গলটাকে ঘিরে রাখব।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—মিস্টার সিনহার কাছে তো বটেই, মিস্টার শর্মার কাছেও রিভলবার ছিল। মিস্টার সিনহা শুনলাম দু-রাউন্ড গুলিও ছুঁড়েছেন।

প্রসাদ বললেন,—পিছন থেকে জানোয়ারটা নাকি নিঃশব্দে মিস্টার শর্মার ওপর ঝাঁপ দিয়েছিল। তারপর—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—জানোয়ারটার চেহারা কেমন তা কি মিস্টার সিনহা আপনাকে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। কালো রঙের একটা প্রকাণ্ড কুকুরের মতো জন্তু। তিনি নাকি এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে সময়মতো গুলি ছোঁড়ার বদলে ছিপের গোড়ার দিকটা দিয়ে জন্তুটাকে আঘাত করেন।

কর্নেল রেঞ্জার নায়েককে বললেন,—আপনার সঙ্গে কি মাঝখানের ওই ঘরের তালার চাবি আছে?

নায়েক বললেন,—আছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিস্টার প্রসাদ, মাঝখানের ঘরটাতে রাত্রে মাঝে-মাঝে ভূতের উপদ্রব হয়।

প্রসাদ একটু থেমে বললেন,—হ্যাঁ, মিস্টার নায়েকের কাছে শুনেছি।

কর্নেল বললেন,—চলুন, ওই ঘরটার তালা খুলে ভিতরে একটু খোঁজখবর নেওয়া যাক। ভূত কোন পথে আসে এবং পালায় তা জানা দরকার।

নায়েক আগে বেরিয়ে গিয়ে তালা খুলে কপাটে চাপ দিলেন। কিন্তু কপাট খুলল না। তিনি এবার সজোরে ধাক্কা দিলেন। দরজা একটু ফাঁক হল। তারপর দেখা গেল একটা ভাঙাচোরা কাঠের আলমারি দরজার সামনে দাঁড় করানো আছে। সুরজিৎ নায়েক খুব অবাক হয়ে বললেন, —আলমারিটা এখানে কে এনে রাখল? রামভগত! রামভগত!

রামভগত দৌড়ে এসে বলল,—কী হয়েছে স্যার?

—এই আলমারিটা এখানে কেন?

রামভগত আমতা-আমতা করে বলল,—আমার চাবি তো হারিয়ে গেছে। আপনি নতুন তালাচাবি দেবেন বলেছিলেন, এখনও দেননি।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে আলমারিটাকে টেনে সরিয়ে দিলেন। তারপরই দেখতে পেলাম ঘরের ভেতর ভাঙাচোরা একটা খাটে অনেকগুলো হাড়গোড় আর চাপচাপ রক্ত।

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর ছোটো টর্চটা বের করে ভিতরে ঢুকে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, —হাড়গুলো দেখে বোঝাই যাচ্ছে, একটা কোনও ছোটো প্রাণীর হাড়। ...হ্যাঁ, ওই দেখুন মিস্টার প্রসাদ, এগুলো ভেড়ার লোম বলে মনে হয় না আপনার?

ও.সি. মিস্টার প্রসাদ পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—ওই মাই গড! ঘরে কেউ কি ভেড়া পুষে রেখেছিল?

মিস্টার নায়েক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গম্ভীর মুখে রামভগতকে বললেন,—তোমার চাবি হারিয়ে গেছে। তাহলে এখানে একটা ভেড়া ঘুমোচ্ছিল কী করে?

রামভগত কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না স্যার।

ভিতর থেকে কর্নেল বললেন,—রামভগতের চাবিটা যে চুরি করেছে, সে কাল রাতে চুপি-চুপি এখানে একটা ভেড়া এনে এই খাটে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেড়া কি সাধে বলে! ভেড়া মানেই নির্বোধ। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ওদিকে চাবিচোর দরজা খুলে রেখেছিল।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—কেন?

—আমার অনুমান। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ অনুমান। হিংস্র জানোয়ারটা কাছাকাছি কোথাও তার মালিকের সঙ্গে এসে অপেক্ষা করছিল। চাবিচোর সম্ভবত কোনও সঙ্কেত দিয়েই সরে পড়ে, আর মালিক তার পোষ্য জানোয়ারটাকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়।

মিস্টার নায়েক বললেন,—কিন্তু আলমারিটা কে রেখেছিল এখানে?

—এবার খুলেই বলি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্তুটা একটা আফগান হাউন্ড। তার মালিক কোনও উদ্দেশ্যে তাকে দিয়ে মানুষ হত্যা করায়। গতরাত্রে আফগান হাউন্ডটা ক্ষুধার্ত ছিল। অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত রাখা হয়েছিল।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার!

—হ্যাঁ আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত। কিন্তু আপনি আমার থিয়োরির কাঠামোটা শক্ত করে দিয়েছেন।

—কীভাবে?

কর্নেল তাঁর কথার জবাব না দিয়ে খাটের তলায় এবং মেঝের সবখানে ভাঙা আসবাবপত্রের ভেতর আলো ফেলে দেখছিলেন। দেখা শেষ হলে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, আফগান হাউন্ডটাকে এ ঘরে ঢুকিয়ে ভৌতিক উপদ্রব করানোর জন্য আরও কয়েকটা নির্বোধ ভেড়াকে এ ঘরে রাখা হয়েছিল।

এতক্ষণে রামভগত চাপাস্বরে বলে উঠল,—বুঝেছি, বুঝেছি। দেখি সেই চাবিচোর এখন কোথায় আছে! তাকে ধরে নিয়ে আসি।

বলেই সে দৌড়ে চলে গেল।

চার

রেঞ্জার মিস্টার নায়েক অবাক হয়ে বললেন,—ভেড়ার কথা শুনে রামভগতের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মাথা খারাপ হওয়ারই কথা। আপনাদের মালি নবচন্দ্রের যে ভেড়া পোষার শখ ছিল তার কারণ জেনে এবার রামভগত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

—নব ভেড়া পুষত? আপনি কী করে জানলেন?

—দরকার হলে পুষত। অর্থাৎ যে রাতে ভৌতিক উৎপাত ঘটবে সেদিনই সে একটা কচি ভেড়া নিয়ে আসত। কাল দুপুরে জঙ্গল থেকে ফেরার সময় বাইনোকুলারে দেখছিলাম, নব একটা কচি ভেড়াকে কোয়ার্টারের পেছনে বেঁধে রেখেছে। এদিকে এই ঘরের ভেতর প্রচুর ভেড়ার লোম এবং হাড় দেখলাম। দুটো মিলিয়ে আমার এই সিদ্ধান্ত।

ও. সি. মিস্টার প্রসাদ সায় দিয়ে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন। যাই হোক, এবার জলপ্রপাতের নিচে যেখানে মিস্টার সিনহারা মাছ ধরছিলেন সেখানে যাওয়া যাক। কর্নেল সাহেব কি যাবেন আমার সঙ্গে?

কর্নেল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন ফরেস্ট গার্ডকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। সে লনে পৌঁছে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—শর্মা সাহেবের বডি পাওয়া গেছে স্যার। কিন্তু সে

জন্তুটাকে দেখতে পাইনি। বডি ক্ষতবিক্ষত। হয়তো তার খাওয়ার সময় আমরা গিয়ে পড়ায় জন্তুটা গা ঢাকা দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—গত রাতে জন্তুটা একটা আস্ত ভেড়া খেয়েছে, তাই মিস্টার শর্মার ডেডবডি বেশি খেতে পারেনি। পরে খাবে বলে চলে গেছে।

কর্নেলের রসিকতায় মিস্টার প্রসাদ হেসে উঠলেন। মিস্টার নায়েক ফরেস্ট গার্ডকে বললেন, —ডেডবডি কি ওঁরা এখানে নিয়ে আসবেন?

ফরেস্ট গার্ড বলল,—বডি নিয়ে আসার জন্যে পুলিশ অফিসাররা আমাকে বললেন বাংলো থেকে একটা বাঁশ আর তেরপল নিয়ে আসতে।

নায়েক ডাকলেন,—রামভগত, রামভগত, শিগগির এখানে এসো।

রামভগত এসে রুষ্টমুখে বলল,—ওই নব আমার ঘর থেকে তালা চুরি করেছে স্যার। আমার বউ একদিন বলছিল, আমি যখন ধরমপুর বাজারে গেছি, তখন নব চুপি-চুপি এই ঘরটা খুলেছিল।

নায়েক বললেন,—নবর কথা পরে। একটুকরো শক্ত বাঁশ আর তেরপল চাই। আছে তো?

—তা আছে স্যার। তেরপলটা একটু ছেঁড়া হবে।

—তা হোক। শিগগিরই নিয়ে এসো।

রামভগত একটা শুকনো লম্বা বাঁশ আর ভাঁজ করা তেরপল নিয়ে এল। ফরেস্ট গার্ড সেদুটো কাঁধে নিয়ে পা বাড়াল।

এবার কর্নেল বললেন,—চলো, আমরাও যাব।

প্রসাদ, নায়েক, কর্নেল এবং আমি ফরেস্ট গার্ডকে অনুসরণ করলাম। কর্নেল বললেন, —জয়ন্ত, তুমি আমার কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলারটা এনে দাও। ঘরে তালা দিতে ভুলো না।

তাঁর নির্দেশ পালন করে আমিও দলটার সঙ্গ ধরলাম।

ফরেস্ট গার্ড পিচরাস্তা ধরে পূর্বে অর্থাৎ ব্রিজের দিকে হাঁটছিল। এই সময় কর্নেলকে বলতে শুনলাম,—আচ্ছা মিস্টার প্রসাদ, এই এলাকায় আপনি যোগিন্দর নামে কোনও লোককে চেনেন?

মিস্টার প্রসাদ দাঁড়িয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন,—যোগিন্দর সাউ?

—হ্যাঁ, লোকটার একটা বন্দুক আছে। রোদে পোড়া, কিন্তু স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথা একটু ছিট আছে বলে মনে হল।

—হ্যাঁ, আপনি তাহলে ঠিকই দেখেছেন। যোগিন্দরকে কোথায় দেখলেন?

—ব্রিজের ওপারে কিছুটা এগিয়ে হরপার্বতী মন্দিরের দিক থেকে তাকে আসতে দেখেছিলাম। তখন ভোর ছটা। আমি মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলাম।

নায়েক এবার বলে উঠলেন,—সর্বনাশ! আপনি খুব বেঁচে গেছেন কর্নেল সাহেব। লোকটা সাংঘাতিক ডাকাত! শুনেছি, তার সামনে অচেনা লোক পড়লে সে তাকে গুলি করে মারে।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—হ্যাঁ ডাকু যোগিন্দার। একসময় সে অনেক খুন-খারাপি এবং ডাকাতি করেছে। তার দলের সবাইকে আমরা ধরতে পেরেছিলাম। তারা এখন জেলে। কিন্তু যোগিন্দরকে ধরতে পারিনি।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—ব্যবসায়ী মিস্টার সিনহা এবং মিস্টার শর্মার সঙ্গে কি কোনওসময় যোগিন্দরের যোগাযোগ ছিল?

হরিহর প্রসাদের অভ্যাস কথা বললেই দাঁড়িয়ে পড়া। তিনি বললেন,—ওই দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথা একটি সূত্রে জেনেছিলাম। ওরা লাক্ষা ব্যবসায়ী। কিন্তু লাক্ষার প্যাকেটের

তলায় নাকি যোগিন্দরের চোরাই মাল ওঁরা পাচার করেন। কিন্তু বারদুয়েক হানা দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলাম। মিস্টার সিনহা তাই আমার ওপর কিছুদিন ক্ষুব্ধ ছিলেন।

কথা বলতে-বলতে ফরেস্ট গার্ডকে অনুসরণ করে আমরা জঙ্গলে ঢুকলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট হেঁটে যাওয়ার পর জলপ্রপাতের গর্জন কানে এল। ফরেস্ট গার্ড এবার বাঁদিকের ঢালু একটা জঙ্গলে ঢুকল। তারপরই চোখে পড়ল প্রকাণ্ড কয়েকটা পাথরের উপর কনস্টেবলরা রাইফেল হাতে বসে আছে। এখানটা একটা খাদের মতো জায়গা। এখনও জল জমে আছে। সেই জলের মধ্যে পড়ে আছে ক্ষতবিক্ষত একটা মৃতদেহ।

একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মিস্টার সিনহা সিগারেট টানছেন। তাঁর দুটো চোখই লাল। কর্নেল সোজা তার কাছে গিয়ে বললেন,—জন্তুটাকে কি আপনি দেখতে পেয়েছিলেন?

কর্নেলের কথার ভঙ্গিতে আমার অবাক লাগল। এ কিরকম প্রশ্ন করছেন উনি?

মিস্টার সিনহা ধমকের সুরে বললেন,—দেখতে পাব না মানে? আমি তো রাকেশের কাছ থেকে প্রায় হাত তিরিশের দূরে ছিপ ফেলেছিলাম। কালো প্রকাণ্ড জন্তুটা পা টিপে-টিপে পেছন থেকে এসে রাকেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাকেশের আর্তনাদ শুনেই আমি চোখ ফিরিয়ে ছিলাম। ওই অবস্থাতেই হতবুদ্ধি হয়ে আমি ছিপের গোড়ায় হুইল বাঁধা অংশটা দিয়ে জন্তুটার মাথায় আঘাত করতে গেলাম। ছিপটা ভেঙে গেল। জন্তুটা গ্রাহ্যও করল না। বড়ো আশ্চর্য ব্যাপার! রাকেশকে সে গলায় কামড়ে ধরে এক লাফে ঘাসের জমি পেরিয়ে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল। ততক্ষণে আমার মনে পড়ে গেছে আমার কাছে রিভলবার আছে। পরপর দু-রাউন্ড গুলি ছুঁড়লাম।

ওদিকে ফরেস্ট গার্ড এবং কনস্টেবলরা মিস্টার শর্মার মৃতদেহটা খাদ থেকে তুলে ত্রিপলে মুড়ছিল। একজন ফরেস্ট গার্ড উঁচু গাছ থেকে ঝুলন্ত লতা টেনে নামিয়ে বলল,—দড়ি আনা উচিত ছিল। কী করা যাবে, এ লতাগুলো খুব শক্ত। এই দিয়ে বাঁশের সঙ্গে তেরপলে জড়ানো যেতে পারে।

একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর বললেন,—বডিটা বাংলোয় নিয়ে যেতে হবে। এতক্ষণে অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছনোর কথা।

তিনি কয়েকজন কনস্টেবল এবং ফরেস্ট গার্ডদের নির্দেশ দিলেন। তারা তেরপলে ঢাকা লাশটা বাঁশের দুই প্রান্ত কাঁধ লাগিয়ে বাংলোয় দিকে চলে গেল।

হরিহর প্রসাদ মিস্টার সিনহার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি লক্ষ রেখেছিলাম কর্নেলের দিকে। দেখি তিনি সেই গাছের ধারে হাঁটু মুড়ে বসে কিছু দেখছিলেন। দেখার পর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —জন্তুটা কুকুরজাতীয় প্রাণী। তবে নেকড়ে নয়। মিস্টার প্রসাদ এই এলাকায় কি আদিবাসীর শিকার করার জন্য আফগান হাউন্ড পোষে?

মিস্টার প্রসাদ উত্তেজিতভাবে বললেন,—আফগান হাউন্ড? হ্যাঁ। আমার এক কলিগ পুলিশের ডগ স্কোয়াডে ছিল। তার মুখে আফগান হাউন্ডদের ইতিহাস শুনেছি। ধরমপুর এলাকায় আদিবাসীরা কেন, অন্যেরাও এই জাতীয় কুকুর পোষেন বলে শুনেছি। তাঁরা অবশ্য বাড়ি পাহারা দেবার জন্যই এই প্রজাতির কুকুর পোষেন।

কর্নেল বললেন,—আপনি কখনও আফগান হাউন্ড দেখেছেন?

—না। শুনেছি মাত্র।

মিস্টার সিনহা বললেন,—আমার নিজেরই একটা আফগান হাউন্ড ছিল। সেটা রোগে ভুগে মারা যায়।

কর্নেল বললেন,—তাহলে তো আফগান হাউন্ড আপনি দেখেছেন। যে জন্তুটা মিস্টার শর্মাকে আক্রমণ করেছিল, সেটা দেখে কি আপনার মনে হয়নি যে ওটা আফগান হাউন্ড?

—না। ওটা নিছক কুকুর নয়। সম্ভবত কালো নেকড়ে।

ও.সি. মিস্টার প্রসাদ একটু হেসে বললেন,—নেকড়ে কি কালো হয়?

—হতেই পারে। কালো চিতার কথা শুনেছি। কোনও দেশে নাকি কালো বাঘ আছে। কাজেই কালো নেকড়ে থাকতেই পারে।

কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন,—মিস্টার সিনহা, কুখ্যাত যোগিন্দারের সঙ্গে আপনার কখনও আলাপ হয়েছে?

মুহূর্তে লাক্ষা ব্যবসায়ীর মুখের চেহারা বিকৃত হয়ে গেল। কর্কশ কণ্ঠে বললেন,—দেখুন, আপনি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। মিস্টার প্রসাদ এখানে উপস্থিত না থাকলে আপনার এই ধৃষ্টতার ঠিক জবাব দিতাম।

মিস্টার প্রসাদ তাঁর কাঁধে হাত রেখে বললেন,—প্লিজ, শান্ত হোন মিস্টার সিনহা। উনি আপনাকে নিছক একটা প্রশ্ন করেছেন। স্রেফ কৌতূহল। কারণ যোগিন্দরের নামে এ অঞ্চলে অনেক গল্প চালু আছে। সব ব্যবসায়ীই নাকি তাকে ভেট দিতে বাধ্য হয়। যাই হোক, এখানে আর আমাদের কিছু করার নেই। বাংলোয় ফেরা যাক।

এরপর আমরা বাংলোয় ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে রাকেশ শর্মার মৃতদেহ স্ট্রেচারে চাপিয়ে নিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স অনুসরণ করে পুলিশ ভ্যানে দু'জন অফিসার এবং আর্মড কনস্টেবলও চলে গেল।

রামভগত আমাদের জন্য লাঞ্চের ব্যবস্থা করছিল। দেখলাম তাকে রান্নায় সাহায্য করছে তার বউ আর অচেনা একটা লোক। রেঞ্জার এবং নায়েক খোঁজ নিয়ে এসে বললেন,—নবচন্দ্রের পাত্তা নেই।

মিস্টার সিনহা তাঁর ঘর খুলে ভেতরে ঢুকেছিলেন। আমরা আমাদের ঘরে বসেছিলাম। বারান্দায় একজন পুলিশ অফিসার আর চারজন আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ঘরে ঢুকে ও.সি. প্রসাদ বললেন,—সিনহা সাহেব তাঁর পার্টনারের ডেডবডির সঙ্গে গেলেন না দেখছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—উনি ধরমপুরে ওঁর রেস্টহাউস থেকে পায়ে হেঁটেই বাংলোয় যাতায়াত করেন শুনেছি। হয়তো পায়ে হেঁটেই যাবেন।

মিস্টার নায়েক বললেন,—উনি আমার সঙ্গে গেলে আমি ওঁকে পৌঁছে দিতে পারি।

কর্নেল বললেন,—তাহলে আমাদের রামপুর পৌঁছে দিতে আপনাকে আবার জিপ পাঠাতে হবে।

—পাঠাব। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি আফগান হাউন্ডটাকে কোতল না করে এখান থেকে যাবেন না।

মিস্টার প্রসাদ বললেন,—আমার মাথায় একটা সন্দেহ জাগছে। এখানে ধরমপুর থানায় বদলি হয়ে এসেই শুনেছিলাম ডাকু যোগিন্দরের নাকি একটা শিকারি কুকুর ছিল। কর্নেল যাকে বলছেন আফগান হাউন্ড। যোগিন্দর নিপাত্তা। সে কি কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আপনি আজ রাত্তিরটা আপনার ফোর্স নিয়ে এখানে থেকে যান। আমার আশা, আমি ডাকু যোগিন্দরকে ধরিয়ে দিতে পারব। কিন্তু না—এখন আর প্রশ্ন করবেন না।

এরপর যা ঘটেছিল তা একেবারে অভাবিত। সেই ঘটনা এবার সংক্ষেপে বলছি...

মিস্টার সিনহা ও.সি-র কাছে বিদায় নিয়ে লাঞ্চের পরই পায়ে হেঁটে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এবং মিস্টার শর্মার ব্যাগ ও স্যুটকেসটা মিস্টার নায়েকের কথায় দু'জন ফরেস্ট গার্ড তাঁর সঙ্গে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল ও.সি. মিস্টার প্রসাদকে একান্তে ডেকে কী সব আলোচনা করছিলেন। আমি তা জানতে চাইনি। কারণ জানতে চাইলেও কর্নেল আমাকে বলবেন কি না সন্দেহ।

রাত আটটার পর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছিল। এই সময় কর্নেল, মিস্টার নায়েক, মিস্টার প্রসাদ আর তাঁর পুলিশবাহিনী পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিল। ব্রিজ পেরিয়ে যাবার পর বুঝতে পেরেছিলাম আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমরা যাচ্ছি সেই হরপার্বতীর মন্দিরের টিলার দিকে। সবাই কর্নেলের নির্দেশে নিঃশব্দে গাছের ছায়ার আড়ালে সেঁটে গিয়ে টিলার নিচে বসেছিলাম। এরপর টিলার চারদিকে চারজন আর্মড কনস্টেবল রাইফেল তাক করে গুঁড়ি মেরে বসেছিল। ইতিমধ্যে শিশির পড়ে চূড়ার ওঠার সেই পাথরের সিঁড়ি কিছুটা পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। আমরা গুঁড়ি মেরে সাবধানে টিলার বটগাছটার তলায় যখন পৌঁছুলাম তখন চারদিকে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। প্রতিমুহূর্তে আমার ভয় হচ্ছে সেই আফগান হাউন্ডটা এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না তো?

বনে-বনে ঘুরে কুকুরটার তো বুনো হয়ে যাবার কথা। তার হিংসাও বেড়ে যাবার কথা।

মিনিট পাঁচেক বিশ্রাম নেবার পর সেই গুহার দিকে গুঁড়ি মেরে আমরা নেমে গেলাম। সেই সময়েই কানে এল চাপা গলায় সুর করে কেউ কিছু আবৃত্তি করছে। নিচের চাতালে কর্নেল এবং ও.সি. প্রসাদ এক হাতে টর্চ অন্য হাতে রিভলবার নিয়ে সশব্দে যেন ঝাঁপ দিলেন। পরপরই মিস্টার প্রসাদের গর্জন শোনা গেল,—যোগিন্দর! বন্দুকের দিকে হাত বাড়িও না। হাত গুঁড়ো হয়ে যাবে।

অন্য পুলিশ অফিসার, আমি এবং নায়েক পরক্ষণেই তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের হাতেও গুলি ভরা রিভলবার। দেখলাম, সেই ক্যাম্বিসের খাটে বসে একটা রুক্ষ এবং বলিষ্ঠ চেহারার লোক নিস্পলক চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপরেই কর্নেল টর্চের আলো তার খাটিয়ার নিচে ফেলে বললেন,—আরে নবচন্দর যে! ওখানে ঢুকে কী করছ? বেরিয়ে এসো।

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং ও.সি. এগিয়ে গিয়ে যোগিন্দরের জামার কলার ধরে টেনে তাকে নিচে নামালেন। তার বন্দুকটা খাটে পড়ে রইল। মিস্টার নায়েক নবচন্দ্রকে ঠেলে তুলে বললেন, —এই যে যোগিন্দরের চ্যালা! কতগুলো ভেড়া এ পর্যন্ত কুকুরটাকে খাইয়েছ?

পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের ব্যাগে হ্যান্ডকাফ ছিল। যোগিন্দরের দুটো হাত পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে তিনি হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। সেই সময়েই হঠাৎ ঘুরে কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন,—সাবধান!

ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় দেখলাম কখন চুপি-চুপি একটা কালো রঙের জন্তু চাতালে ওঠার চেষ্টা করছিল। কর্নেল পরপর দুটো গুলি করলেন। ও.সি. মিস্টার প্রসাদও তাকে লক্ষ করে তিনবার গুলি ছুঁড়লেন। অবশ্য তার আগেই হিংস্র আফগান হাউন্ডটা কর্নেলের পায়ের কাছে নেতিয়ে পড়েছে। টর্চের আলোয় দেখলাম তার মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। কালো রঙের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার ধারাল দাঁত এবং লকলকে জিভ নিস্পন্দ।

ডাকু যোগিন্দর এবং নবকে নিয়ে গুহার উপরে উঠে মিস্টার প্রসাদ চিৎকার করে ডাকলেন, —পান্ডেজি, রোঘুয়া, হাসিন, তোমরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে এসো।

চারজন আর্মড কনস্টেবলের পৌঁছতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লাগল। ওদের দোষ নেই, তিনশ ফুট ওঠা সামান্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া সিঁড়িগুলো শিশিরে পিছল হয়ে আছে।

কর্নেল তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে নাইলনের একটা শক্ত দড়ি বের করলেন। তাঁর কিটব্যাগে দরকারি সবরকমের জিনিসই থাকে। তিনি নেমে গিয়ে মৃত কুকুরটার গলায় ফাঁস বেঁধে একা টানতে-টানতে চূড়ায় উঠছিলেন। মিস্টার প্রসাদের হুকুমে একজন কনস্টেবল কর্নেলকে এই শ্রমসাধ্য কাজ থেকে অব্যাহতি দিল। সে তাগড়াই চেহারার লোক। ডাকু যোগিন্দরের প্রিয় আফগান হাউন্ডটিকে সে অক্লেশে টানতে-টানতে চূড়ায় ওঠাল। এবার আমাদের বাংলোয় ফেরার পালা।

কিন্তু তখনও জানতাম না, আরও একটা বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কর্নেল নবচন্দ্রকে বললেন,—তোমার ঘরে আর কতগুলো ভেড়া আছে, গুনে দেখতে চাই।

মিস্টার প্রসাদ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেলের চাপে পড়ে নবকে তার ঘরের তালা খুলতে হল। তারপর কর্নেল ঘরের ভেতর টর্চের আলো ফেলে বললেন,—মিস্টার প্রসাদ! ওই দেখুন খাটিয়ার তলায় অনেকগুলো প্যাকেট রাখা হয়েছে। ওগুলোই সম্ভবত নিষিদ্ধ মাদক।

মিস্টার প্রসাদ একটা প্যাকেট টেনে বের করে খুললেন। ভেতরের পলিথিনের আবরণ ছিঁড়ে তিনি বললে উঠলেন,—মাই গড! এ তো হেরোইন!

মিস্টার নায়েক থাপ্পড় তুলে গর্জন করলেন,—শয়তান! তুমি মালিগিরির চাকরি নিয়ে ওই ডাকুর সঙ্গে এই কারবার চালিয়ে যাচ্ছ?

পিছন থেকে রামভগতের বউ বলে উঠল,—হুজুর, এই সব জিনিসের মালিক বড়ো সাহেব আর ছোটো সাহেব।

কর্নেল বললেন,—তুমি কি মিস্টার সিনহা আর শর্মার কথা বলছো?

—হ্যাঁ হুজুর।

কর্নেল বললেন,—আমার সন্দেহ, রাকেশ শর্মা কোনও কারণে তার পার্টনার মিস্টার সিনহার উপর চটে গিয়েছিলেন। টাকাকড়ি নিয়ে বিবাদও এর কারণ হতে পারে। তাই মিস্টার সিনহার হুকুমে ডাকু যোগিন্দর তার আফগান হাউন্ডকে রাকেশ শর্মার দিকে লেলিয়ে দিয়েছিল।

রামভগতের বউ বলে উঠল,—হ্যাঁ হুজুর। আমি কাল রাতে নব আর ওই ডাকুর সঙ্গে বড়ো সাহেবকে চুপি-চুপি কথা বলতে দেখেছিলাম।

কর্নেল বললেন,—মিস্টার প্রসাদকে নবর লেখা একটা চিঠি এবার দেব। তবে তার আগে আফগান হাউন্ডকে একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক।

বাংলোর লনে জ্যোৎস্নায় কালো রঙের ভয়ংকর একটা আফগান হাউন্ডের মৃতদেহ দেখার ইচ্ছে আমার ছিল না। বারান্দায় চুপচাপ বসে পড়লাম।

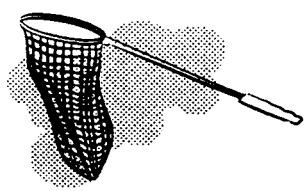

হিকরি ডিকরি ডক রহস্য

অ্যান্টিক ঘড়ি চুরি

ভোরবেলা থেকেই আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। এতক্ষণে ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার— আমাদের প্রিয় হালদারমশাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বৃষ্টির শব্দ শুনে জানালার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন, — ব্যস! জব্বর একখান বাধল এবার!

বললুম, — তা বাধুক না হালদারমশাই! আমরা কর্নেলের গেস্ট হয়ে খিচুড়ি খাব।

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিজ্ঞানী অর্কিড সংক্রান্ত একটা রঙিন ছবির বই পড়ছিলেন। বললেন,— সুখবর আছে জয়ন্ত! ষষ্ঠী আজ বাজার থেকে বাংলাদেশের ইলিশ এনেছে!

হালদারমশাই বিরস মুখে বললেন, — কয় তো পদ্মার ইলিশ! আসলে কোলাঘাটের।

হাসতে - হাসতে বললুম, — ও! আপনি তো খাঁটি বাঙাল। আমরা ঘটি। আমাদের মুখে সব ইলিশই ইলিশ!

হালদারমশাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, ডোরবেল বাজল। কর্নেল অর্কিডের বই টেবিলে রেখে হাঁক দিলেন, — ষষ্ঠী!

তারপর অ্যাশট্রে থেকে আধপোড়া চুরুটটা তুলে লাইটার জ্বেলে ধরালেন। সাদা দাড়ি ঝেড়ে তিনি বললেন, — ডাঃ চক্রবর্তী আসছেন! তাঁর খাতিরে আর এক দফা কফি খাওয়া যাবে।

একটু অবাক হয়ে বললুম, — তাঁর আসবার কথা ছিল বুঝি?

— নাহ্। কথা ছিল না।

— তাহলে কী করে বুঝলেন?

আমার কথা থেমে গেল। সত্যিই পাড়ার ডাক্তার তারক চক্রবর্তী হাতে ডাক্তারি ব্যাগ এবং গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর আমাদের দেখে সহাস্যে বললেন, — বাহ্! বেশ জমাট আড্ডায় ঢুকে পড়লুম তাহলে!

কর্নেল বললেন, — বুঝলেন ডাঃ চক্রবর্তী? জয়ন্ত এইমাত্র জিজ্ঞেস করছিল, আপনিই যে ডোরবেলের সুইচ টিপেছেন, তা বুঝলুম কী করে? বুঝলুম দুটো কারণে। দোতলায় লিন্ডাদের কুকুরটা চ্যাঁচাল না, এবং ডোরবেল খুব আস্তে বাজল।

ডাঃ চক্রবর্তী অবাক হয়ে বললেন, — কী অদ্ভুত!

মোটেও নয়। — কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, কোনও লোক যদি তেতলায় আমার ডেরায় প্রায়দিনই আসে, লিন্ডাদের কুকুর রেক্সি চুপ করে থাকে। কিন্তু মাঝে-মাঝে এলে একটুখানি চ্যাঁচায়। কেউ কদাচিৎ এলে বা প্রথমবার এলে রেক্সি প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করে। তো লিন্ডার ঠাকুরদা মিঃ জেভিয়ার অসুস্থ এবং আপনাকে রোজই এ সময় আসতে হচ্ছে। তাই রেক্সি চুপ করে ছিল। আর ডোরবেল! আপনি ডাক্তার মানুষ। যে সুইচ নানারকম লোকেরা আঙুল দিয়ে টেপে, আপনি তা একটুখানি ছুঁয়ে দেন। হ্যাঁ— এটা আমি লক্ষ করেছি। আপনি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন, এটা তো ঠিক কাজ। কারও সুইচ জোরে টিপে ডেটল-জলে হাত ধোয়াটা কাজের কথা নয়। ধরুন, আপনার আগে যে সুইচ টিপেছিল, তার আঙুলে বা হাতে কোনও ক্ষত আছে, যা থেকে বিষাক্ত ভাইরাস সুইচে আটকে গেছে।

ডাঃ চক্রবর্তী হো-হো করে হেসে উঠলেন, — এনাফ! দ্যাটস্ এনাফ কর্নেলসায়েব! আপনি সত্যি বলেছেন। বিশেষ করে আপনার ঘরে ঢুকলে এক পেয়ালা কফি না খেয়ে যাব না। বাঁ হাতে এই ব্যাগ, ডানহাতের আঙুলে সুইচ টিপি। অবশ্য এ আমার বাতিক, তা নিজেও বুঝি!

ষষ্ঠী সকালবেলায় কফির জল তৈরিই রাখে। ঝটপট ট্রেতে কফির পট, দুধ, চিনি, চামচ আর চারটে কাপ আনল। কর্নেল বললেন, — যে যার নিজের পছন্দমতো কফি তৈরি করে নিন। আগে ডাঃ চক্রবর্তী।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল দোতলার জেভিয়ার সায়েবের অসুখ সম্পর্কে ডাঃ চক্রবর্তীর কাছে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। এই সময় দেয়ালঘড়িতে চারবার পিয়ানোর মিঠে সুর বাজার পর ঢং-ঢং করে নটা বাজল।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, — বাহ্! ঘড়িটা তো সুন্দর বাজনা বাজায়।

কর্নেল বললেন, — জাপানি ঘড়ি। ব্যাটারিতে চলে। পনেরো মিনিটে একটা সুর, আধঘন্টায় দুটো সুর, পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনটে আর পুরো ঘন্টায় চারটে সুর বাজে।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, — তবে যা-ই বলুন কর্নেলসায়েব! পুরোনো আমলের ঘড়ির কারিগরি ছিল ভারি আশ্চর্য! আমার দাদামশাইয়ের বাড়ি ময়ূরগড়ে ছোটবেলায় সেখানে বেড়াতে যেতুম। ময়ূরগড়ের জমিদার ছিলেন আমার দাদামশাইয়ের বন্ধু। তাঁর সঙ্গে জমিদারবাড়ি গিয়ে ভীষণ অবাক হয়ে যেতুম। জমিদারবাবুর ঘড়ির নেশা ছিল প্রচণ্ড। দোতলায় যে ঘরে উনি থাকতেন, সিঁড়ির দু-ধারের দেয়াল থেকে শুরু করে বারান্দা, তারপর ঘরের ভেতর চারদেওয়ালে অজস্র নানা সাইজের ঘড়ি টাঙানো থাকত। আর সে কী বাজনা! তবে তার চেয়ে অদ্ভুত, কোনও ঘড়ির ভেতর খুদে পাখি যতটা বাজছে, ততবার একটা ঘণ্টিতে ঠোঁট ঠুকত। আবার কোনও ঘড়ির ভেতর পেতলের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে খুদে এক ইঞ্চি এক সায়েব নেমে এসে ঘণ্টিতে খুদে হাতুড়ির ঘা দিত। ওহ্! না দেখলে কল্পনা করা যায় না!

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, — ডাক্তারবাবু ময়ূরগড় না কী কইলেন য্যান?

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, — হ্যাঁ। ময়ূরগড়। দুর্গাপুরের কাছে।

গোয়েন্দামশাই ব্যস্তভাবে একটা খবরের কাগজ তুলে পাতা ওলটাতে থাকলেন, — কোন্ পাতায় খবরটা দেখলাম য্যান?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, — ছয়ের পাতায়, মফস্বলের খবরে পাবেন। অ্যান্টিক ঘড়ি চুরি।

ডাঃ চক্রবর্তীও নড়ে বসলেন, — ময়ূরগড়ের সেই জমিদার-বাড়ির ঘড়ি চুরি গেছে?

হ্যাঁ। আপনার দেখা সেই জমিদার প্রমোদরঞ্জনের এক ছেলে মনোরঞ্জন রায় ওই বাড়িতে বাস করেন। অন্য ছেলে সুরঞ্জন রায় দুর্গাপুর থাকেন।

হালদারমশাই খবরটা বিড়বিড় করে পড়ার পর সোজা হয়ে বললেন। তাঁর গোঁফ তিরতির করে কাঁপছিল। বুঝলুম, উনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন— লিখছে, ছয়খানা অ্যান্টিক ঘড়ি চুরি গেছে। অ্যান্টিক কী?

কর্নেল বললেন, —শতাধিক বছরের পুরনো জিনিসকে সাধারণত অ্যান্টিক বলা হয়। যে কোনও অ্যান্টিক জিনিসের বাজারদর চড়া। বলা যায় না, ছ'খানা অ্যান্টিক ঘড়ির দাম লাখ-দেড়লাখ টাকা হতেই পারে।

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, — এক দেড়লাখ কী বলছেন কর্নেলসায়েব? ওই বাড়িতে যে সব ঘড়ি দেখেছি, তার একটার দামই হয়তো এক-দেড়লাখ। ওইসব ঘড়ি চোখে না দেখে কল্পনা করা যায়

না সেকালের ঘড়ি তৈরিতে কী অসাধারণ দক্ষতা ছিল!... খবরটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। চল্লিশবছর হয়ে গেল প্রায়। আর ময়ূরগড়ে যাওয়া হয়নি। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর মামারা দুর্গাপুরে গিয়ে বাড়ি করেছিলেন। কার কাছেই বা যাব?

বলে ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কফির জন্য কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই বললেন, — চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। এমন ঘড়ি চুরির কেস কখনও হাতে পাই নাই। ডাক্তারবাবু যে সব ঘড়ির কথা কইয়া গেলেন, তাও চোখে দেখি নাই।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, — সব ঘড়ি তো চুরি যায়নি লিখেছে। এখনও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘড়ি থাকতে পারে। ইচ্ছে হলে ময়ূরগড় গিয়ে দর্শন করেও আসতে পারেন।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসলেন, —ইচ্ছা তো করে। ক্লায়েন্ট আমারে হায়ার না করলে যাই ক্যামনে?

— আপনি তো ছদ্মবেশ ধরতে পটু। ছদ্মবেশে চলে যান। কোনও একটা ছলছুতো করে মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করুন। আপনার তো ডিটেকটিভ এজেন্সির লাইসেন্স আছে। অসুবিধে কীসের?

হাসতে-হাসতে বললুম,— কর্নেল আপনাকে তাতাচ্ছেন হালদারমশাই!

হালদারমশাই হাসলেন,— না জয়ন্তবাবু! কর্নেলস্যার যা-ই কন, আমার কিন্তু সত্যই দেখতে ইচ্ছা করতাছে। ডাক্তারবাবু পাখির কথা কইলেন। এক ইঞ্চি সায়েবের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঘণ্টি বাজানোর কথা কইলেন।

বললুম—তাহলে চলে যান।

—যাব?

—হ্যাঁ। স্বচক্ষে গিয়ে দেখে আসুন। লোকে সুন্দরবনে বাঘ দেখতে যায় না?

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জানালা দিয়ে বৃষ্টির অবস্থা দেখে বললেন, — নাহ্। বৃষ্টি কমছে। যাই গিয়া।

কর্নেল বললেন,— খিচুড়ি আর ইলিশের কী হবে হালদারমশাই?

আইজ না কর্নেলস্যার! বাড়িতে কুটুম্ব। যাই গিয়া! — বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘর থেকে কেন যেন সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম,—কাজটা ঠিক করলেন না কর্নেল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হালদারমশাই আজই ময়ূরগড়ে চলে যাবেন। আর খামোকা নাক গলাতে গিয়ে বিপদে পড়বেন।

কর্নেল হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। আস্তে বললেন, — আমরাও আজ ময়ূরগড় রওনা হচ্ছি জয়ন্ত!

চমকে উঠে বললুম,— তার মানে?

—মানে অতি সহজ ডার্লিং! প্রাক্তন খনি ইঞ্জিনিয়ার মনোরঞ্জন রায় আমার বন্ধু। বছর পাঁচেক আগে ময়ূরগড় এলাকার পোড়োখনিগুলোতে এক বিশেষ প্রজাতির অর্কিড দেখেছিলুম। এই বর্ষাকালে সেগুলোর মধ্যে বেছে তিন-চারটে আনতে পারলে আশা করি শীত নাগাদ ফুল ফোটাতে পারব।

—উঁহু! শুধু অর্কিড বলে মনে হচ্ছে না! রহস্যের ঝুলিটা একটু খুলুন কর্নেল!

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে - বুলোতে বললেন, — রহস্যের ঝুলি খোলা খুব সহজ নয় জয়ন্ত! কারণ রায়মশাই গত রাতে ময়ূরগড় থেকে ট্রাংককল করে শুধু বললেন, শিগগির যেন তাঁর কাছে যাই। তিনি নাকি খুব বিপদের মধ্যে আছেন। ব্যস! এই দুটি কথা। তারপর আজ সকালের কাগজে তাঁর বাড়ি থেকে ছটা মূল্যবান অ্যান্টিক ঘড়ি চুরির খবর পড়লুম। মফস্বলের খবর। কাজেই তুমি নিজে সাংবাদিক হয়ে বুঝতে পারছ, এসব খবর একটু দেরি করেই ছাপে।

সায় দিয়ে বলুম, — হ্যাঁ। নিছক খালি জায়গা ভরাতেই ছাপা হয়।

কর্নেল হাঁকলেন, — ষষ্ঠী!

ষষ্ঠীচরণ পরদার ফাঁকে মুখ বের করে বলল,—আজ্ঞে বাবামশাই?

— এবেলা খিচুড়ি আর দু'রকমের ইলিশ। তোর দাদাবাবুর নেমতন্ন।

ষষ্ঠী হাসল,— আজ্ঞে বাবামশাই, তা কি আর বুঝিনি?

পায়ে-পায়ে বিপদ

হাওড়া স্টেশনে দুর্গাপুরগামী ট্রেন ধরতে গিয়ে সেদিন বিকেলেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। ট্রেন ছাড়ার কথা সাড়ে তিনটেতে। সদ্য বাঁদিকের প্লাটফর্মে একটা মেল ট্রেন এসে পৌঁছেছে এবং ডানদিকের প্লাঠফর্মে আমাদের ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। তাই প্লাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। কর্নেল আগে এবং আমি তাঁর পেছনে ডানদিক ঘেঁষে ভিড় ঠেলে হাঁটছিলুম। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ চাপাস্বরে বলে উঠল, —বুড়ো মরতে চলেছে রে!

সঙ্গে-সঙ্গে পিছু ফিরেছিলুম। কিন্তু পেছনের অসংখ্য মুখের ভিড়ে কোন মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েছে, বুঝতে পারলুম না। বারবার পিছু ফিরে লক্ষ রাখতে যাচ্ছিলুম। এই সময় কর্নেল ভিড়ের মাঝে হঠাৎ থেমে একটু হেসে বললেন, — লক্ষণ শুভ জয়ন্ত! যাত্রার শুরুতেই হুঁশিয়ারি!

বললুম, — কথাটা আপনি শুনতে পেয়েছেন?

— হ্যাঁ। এমনকী তাকে সম্ভবত দেখতেও পেয়েছি।

— আপনি তো পিছু ফেরেননি!

কর্নেল হাসলেন, — আমার পেছনেও চোখ আছে ডার্লিং! যাই হোক, আমরা ফার্স্টক্লাসের সামনে এসে গেছি। রিজার্ভেশনের দরকার মনে করিনি। দেরি একটু করলেও পানাগড় হয়ে ট্রেনটা রাত আটটার মধ্যে পৌঁছনোর কথা। চলো, ওঠা যাক।

ফার্স্টক্লাসে উঠে খুঁজতে-খুঁজতে একটা খালি কুপ পাওয়া গেল। দু'দিকে জানালার ধারে দু'জনে বসলুম। কর্নেলের কিটব্যাগ সিটে তাঁর পাশে রইল। অন্য ব্যাগটা সিটের তলায় ভরে দিলেন উনি। গলায় ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছিল। সেটা ওঁর পেটের কাছে আটকে থাকল।

মাথার টুপি খুলে টাকে হাওয়া দিতে-দিতে বললেন, — ট্রেন ছাড়বার সময় ফ্যান চালু হবে। কী ভ্যাপসা গরম! আবার বৃষ্টি নামবে মনে হচ্ছে।

আমার ব্যাগ পায়ের কাছে রেখে আরাম করে বসেছিলুম। কিন্তু একটু পরেই এক প্রৌঢ় অবাঙালি ভদ্রলোক দুটো প্রকাণ্ড সুটকেস কুলির মাথায় চাপিয়ে কুপে ঢুকে আমাকে বললেন, — ইয়ে লোয়ারবার্থ হামনে রিজার্ভ কিয়া। উয়ো সিট হামারা হ্যায়।

অগত্যা জানালার মায়া ত্যাগ করে কর্নেলের পাশে গিয়ে বসলুম। তারপর কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এক দম্পতি ঢুকলেন। তাঁদেরও এই লোয়ারবার্থ রিজার্ভ করা। কিন্তু এই ভদ্রলোক বাঙালি। তাঁর স্ত্রী সম্ভবত কর্নেলের ঋষির মতো চেহারা দেখে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, — না-না! আপনি বসুন! এই টিংকু! কী হচ্ছে? রিংকু! অমন করে না! দাদুকে বসে থাকতে দাও।

ততক্ষণে কর্নেল কচি ছেলে-মেয়ে দুটিকে পাশে জানালার ধারে বসিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে গল্প জুড়েছেন। তারাও কর্নেলের দাড়ি দেখে অভিভূত। তাদের বাবা-মা আমার পাশে বসেছেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন,— কতদূর যাবেন আপনারা?

বললুম, দুর্গাপুর! আপনারা?

আমরা পাটনা! — তিনি ঘড়ি দেখলেন, আপনারা আটটা- সওয়া আটটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন, যদি লেট না করে। মধ্যে মাত্র দুটো স্টপ। বর্ধমান আর পানাগড়।

এবার ঢুকলেন বেঁটে মোটাসোটা এক গুঁফো ভদ্রলোক। তাঁর হাতে শুধু একটা ব্রিফকেস। অবাঙালি ভদ্রলোকের লোয়ার বার্থ এবং তাঁর আপার বার্থ! তিনি আমাদের উল্টোদিকের সেই লোয়ার বার্থে বসে পাইপ ধরালেন। তারপর কর্নেলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। দৃষ্টিটা কেমন যেন সন্দেহজনক। অথবা আমার চোখের ভুল!

ঠিক সাড়ে তিনটেতে ট্রেন ছাড়ল। তার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টির ছাট আসছিল। অবাঙালি ভদ্রলোক কাচ নামিয়ে দিলেন। কিন্তু মায়ের বকুনি সত্ত্বেও টিংকু-রিংকু 'দাদু'-কে কাচ নামাতে দিল না। তারা বৃষ্টি দেখবেই।

দু-ঘন্টা পরে ট্রেন বর্ধমান পৌঁছল। এইসময় কর্নেল উঠে গেলেন। সম্ভবত কফির নেশায়। তার একটু পরে সেই গুঁফো ভদ্রলোকও উঠে গেলেন। দশ মিনিটের স্টপ। সময় কাটতে চায় না। টিংকু-রিংকু এবার কর্নেলের সিটে বসেছে। কিন্তু ট্রেন ছাড়ল, তবু কর্নেলের পাত্তা নেই। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে কুপের দরজা দিয়ে উঁকি মারলুম। কিন্তু কর্নেলকে দেখতে পেলুম না। তারপর করিডরে ডাইনে তাকাতেই দেখি, কর্নেল তুম্বোমুখে এগিয়ে আসছেন। বললুম, — এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

কর্নেল জবাব না দিয়ে কুপে ঢুকে টিংকু-রিংকুর পাশে বসলেন। তারপর সেই গুঁফো ভদ্রলোককে এতক্ষণে ফিরতে দেখলুম। তাঁর ব্রিফকেস সিটেই ছিল। তিনি সিটে বসে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, — ওভাবে ট্রেন ছাড়ার সময় আমাকে ধাক্কা দিয়ে কফির কাপ ফেলে দেওয়া আপনার উচিত হয়নি। আপনি বৃদ্ধ মানুষ। কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত!

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,— আমি পেপারকাপ ফেলে দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আপনি দরজায় যে-ভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাতে আমার অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত। ভাগ্যিস আমি আপনার হাতটা আঁকড়ে ধরেছিলুম।

ভদ্রলোক খাপ্পা হয়ে বললেন, — আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, না টেনে প্লাটফর্মে নামিয়ে ছিলেন? তারপর তো আপনি দিব্যি চলন্ত ট্রেনের অন্য দরজা দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি যদি উঠতে না পারতুম?

উঠতে পেরেছেন তো! — বলে কর্নেল সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।

গুঁফো ভদ্রলোক সরোষ দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বললেন, — মাঝখান থেকে আমার তিনশো টাকা দামের বিলিতি পাইপটা গচ্চা গেল! দেবেন কিনে?

কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন, — আবার যদি দেখা হয়, সুদে-আসলে পুষিয়ে দেব।

আমার পাশের বাঙালি ভদ্রলোক— মানে টিংকু-রিংকুর বাবা মধ্যস্থতা করার জন্য বললেন, — ট্রেন ছাড়বার সময় দরজা একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েই থাকে।

গুঁফো ভদ্রলোক খেঁকিয়ে উঠলেন, — না! উনি আমার হাত ধরে টেনে প্লাটফর্মে ফেলে দিয়েছিলেন।

কর্নেল চোখ খুলে এবার একটু হেসে বললেন, — উঁহু! উনি আমাকে উঠতে বাধা দিচ্ছিলেন। অগত্যা ওঁকে টেনে প্লাটফর্মে নামাতেই হল। যাওয়া না হয় তো দু'জনেরই হোক।

বাজে কথা বলবেন না! — গুঁফো ভদ্রলোক বললেন ঃ জানেন আমি কে? পানাগড়ের সিনহা সাপ্লাই কোম্পানির ম্যানেজার। আমার নাম ভূতনাথ হাজরা। আমার কোম্পানি পানাগড় মিলিটারি ক্যাম্পে অর্ডার সাপ্লাই করে।

কর্নেল বললেন,— বাহ্! তাহলে তো আপনি মিলিটারি বিমান ঘাঁটির ক্যাপ্টেন ডি. এন. সাঠেকে চেনেন! তাঁকে বলবেন, বর্ধমান স্টেশনে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে একটু মল্লযুদ্ধ হয়েছিল।

ভূতনাথ হাজরা কথাটা গ্রাহ্য করলেন না। কিন্তু বাঙালি ভদ্রমহিলা— টিংকু-রিংকুর মা অমনি বলে উঠলেন—কী অবাক! তাই আপনাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। ক্যামেরা, বাইনোকুলার! আমার কী সৌভাগ্য! এতদিন ছবিতে দেখেছি!

বলে তিনি উঠে ঝটপট কর্নেলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, —আর আপনি নিশ্চয় 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার বিখ্যাত সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি? নমস্কার! আপনার কত লেখা পড়েছি। কর্নেলসায়েবকে নিয়ে লেখা সাংঘাতিক সব অ্যাডভেঞ্চার! ওগো! এঁরা দুজনেই বিখ্যাত লোক। তুমি তো বই-টই পড়ো না। বাংলা কাগজও পড়ো না!

টিংকু-রিংকুর বাবা আমাদের নমস্কার করলেন। তাঁর স্ত্রী আবার গদগদ হয়ে বললেন, — গতবার কলকাতা বইমেলায় আমি পুরো সেট কর্নেল সমগ্র কিনেছি। আর টিংকু-রিংকুর জন্য কিনেছি প্রেতাত্মা ও ভালুকরহস্য। ওরা বড় হয়ে পড়বে।

আলাপ জমে গেল। টিংকু-রিংকুর বাবার নাম অমল ঘোষ। মায়ের নাম সুনন্দা ঘোষ। অমলবাবু পাটনায় গর্দানিবাগ এলাকায় কেন্দ্রীয় শিল্প দফতরের অফিসে চাকরি করেন। তাঁর বাড়িও সেখানে। সুনন্দা দেবীর বাবা-মায়ের বাড়ি কলকাতার ভবানীপুরে।

কথায়-কথায় পানাগড় এসে গিয়েছিল। ভূতনাথ হাজরা কর্নেলের দিকে আবার সরোষে দৃষ্টিপাত করে বেরিয়ে গেলেন।

ট্রেন আবার ছাড়লে সুনন্দা দেবী বললেন, — কর্নেলসায়েব নিশ্চয়ই কোথাও রহস্যভেদ করতে যাচ্ছেন?

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্। যাচ্ছি ময়ূরগড়ে অর্কিডের খোঁজে। আমরা দুর্গাপুরে নেমে যাব।

সুনন্দা দেবী বললেন, — কিন্তু আমার কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে, ওই গুঁফো লোকটা ইচ্ছে করেই আপনাকে ট্রেনে উঠতে দিচ্ছিল না। ওর চেহারা দেখে কেমন যেন গা-ছমছম করছিল।

কর্নেল বললেন,—ওঁকে আমি কস্মিনকালে দেখিনি। আমার সঙ্গে ওঁর কী শত্রুতা থাকতে পারে?

সুনন্দা দেবী মুখ টিপে হেসে বললেন, — আপনি এখন কিছু খুলে বলবেন না, তা জানি। আপনি অর্কিড নয়, নিশ্চয়ই ময়ূরগড়ে কোনও রহস্যের পেছনে ছুটে যাচ্ছেন। ওই লোকটা তা টের পেয়েই আপনাকে আক্রমণ করেছিল। ঠিক আছে। না বলুন এখন। যথাসময়ে দৈনিক সত্যসেবকের পাতায় জয়ন্তবাবু স্টোরিটা লিখবেন। তারপর সামনের বছর কলকাতা বইমেলায় তা বই হয়ে বেরুবে।

দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছুনোর আগেই সুনন্দা দেবী আমার দিদি হয়ে উঠলেন। টিংকু-রিংকু কর্নেলকে 'কর্নেলদাদু' আর আমাকে 'জয়ন্তমামা' বলতে শুরু করল। ট্রেন পৌঁছুল সাড়ে আটটায়। আধঘন্টার বেশি লেট। আমরা নেমে গেলুম। সুনন্দ দেবী দরজায় এসে বিদায় দিলেন। বললেন, — একবার যেন পাটনায় আপনারা আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন! নেমকার্ডটা যেন হারাবেন না।

অমলবাবু কর্নেলকে আগেই নেমকার্ড দিয়েছিলেন। কর্নেল হাত নেড়ে জানালায় টিংকু-রিংকুর মুখের দিকে তাকিয়ে টা-টা করলেন। ওরা হেসেই অস্থির।

প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমি এতক্ষণে বললুম,—কর্নেল! ওই ভূতনাথই যে হাওড়া স্টেশনে পেছন থেকে 'বুড়ো মরতে চলেছে রে' বলেছিল, তাতে ভুল নেই।

কর্নেল একটু হেসে চাপাস্বরে বললেন, — নাহ্। ওর এক চেলা। বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই আমি কফি আনতে নেমে গেলুম। আমার দু-হাতে দুটো পেপারকাপে কফি ছিল। এককাপ তোমার জন্য। তো ট্রেনে ওঠার সময় দেখি, পেছনের কামরা থেকে নেমে এসে সে ভূতনাথ হাজরার সঙ্গে কথা বলছে। কিছুতেই আমাকে উঠতে দেবে না। তখন চেলাটাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে ফেলে দিলুম। গরম কফির ছ্যাঁকায় সে বাপরে করে উঠেছিল। কফির দুটো কাপই বরবাদ হল। তারপর অগত্যা ভূতনাথকে হ্যাঁচকা টানে নামালুম। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল। দৌড়ে গিয়ে অন্য দরজায় উঠে পড়লুম। ভূতনাথও তাই করল। ওর চেলাটার অবস্থা আর লক্ষ করিনি।

— ওর সেই চেলাই যে 'বুড়ো মরতে চলেছে রে' বলেছিল, কীভাবে টের পেলেন?

— কথাটা কানে যেতেই মুখ ঘুরিয়েছিলুম। অমন কথা যদি কেউ বলে, বলার পরও তার মুখে সেই কথার ভাবটুকু মিলিয়ে যেতে দেরি হবে। এটা মনস্তত্ত্ব, জয়ন্ত! রাগের কথা শেষ হওয়ার পরও মানুষের মুখে রাগের ভাবটা থেকে যায় কিছুক্ষণ। ওই কথাটা ব্যঙ্গের। কাজেই ছোকরার মুখের কথা শেষ হওয়ার পরও যে ব্যঙ্গভাব কয়েক সেকেন্ডের জন্য ছিল, তা আমার চোখে পড়েছিল। বয়স কুড়ি-বাইশের মধ্যে। পরনে জিন্‌স্ আর গোলগলা চকরাবকরা গেঞ্জি। গলায় নকল সোনার হার আর বাঁহাতে শেকলের মতো রুপোর ঢিলে বালা— আজকাল যা স্টাইল! যাগ্‌গে। চলো! আগে কফি খেয়ে চাঙ্গা হওয়া যাক্।

— তারপর ময়ূরগড় কীভাবে যাব আমরা?

— চিন্তা কোরো না। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

একটা কফির স্টলে গিয়ে পেপারকাপে কফি খাওয়া হল। সেই সময় আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। জুলাই মাসে বৃষ্টি হতেই পারে। কিন্তু এই বৃষ্টির রাতে ময়ূরগড় কীভাবে যাওয়া হবে বুঝতে পারছিলুম না।

কর্নেল পিঠে কিটব্যাগ এঁটে ডানহাতে অন্য একটা ব্যাগ নিয়ে বললেন, — এসো।

বললুম, — বৃষ্টিতে ভিজে যাব যে!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, — স্টেশনের গেটে গেলেই আশা করি ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বৃষ্টির জন্য স্টেশনে ক্রমে ভিড় জমেছিল। গেটের কাছে যেতেই ভিড় ঠেলে খাকি রঙের উর্দি পরা একটা রোগাটে চেহারার লোক এসে কর্নেলকে সেলাম ঠুকল। সে হাসিমুখে বলল, — মুখার্জিসাব আমাকে গেটে ওয়েট করতে বলেছিলেন। তো টেরেন চলে গেল। আমি শোচ্ করছিলাম কী, কর্নিলসাব কি আসলেন না?

কর্নেল বললেন, — কফি খাচ্ছিলুম ইসমাইল! তো তুমি কেমন আছ?

— আমি ঠিক আছি সাব! এক মিনিট। আমি গাড়ি সিঁড়ির কাছে নিয়ে আসছি।

বললুম, — বাহ! সব ব্যবস্থা পাকা!

হ্যাঁ। পাকা। — কর্নেল বললেন, মুখার্জিসায়েব হলেন ময়ূরগড় বন-দফতরের বড়কর্তা। পার্বতীনাথ মুখার্জি। তুমি খিচুড়ি-ইলিশ খেয়ে যখন ঘুমোচ্ছিলে, তখন ট্রাংককলে ওঁকে জানিয়েছিলুম আমরা যাচ্ছি।

— ময়ূরগড়ে বনজঙ্গল আছে নাকি?

— ময়ূরগড়ে নেই। কাছাকাছি আছে। আমরা মনোরঞ্জন রায়ের বাড়িতে উঠছি না— অন্তত অবস্থা না বুঝে। উঠছি তাঁর বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে বনবাংলোতে। অবশ্য বাংলোটা জঙ্গলের ভেতরে নেই। আছে জঙ্গলের সীমানায় একটা টিলার গায়ে। নিচে একটা ঝরনা আছে। ঝরনাটার পথ কিন্তু রহস্যময়।

— কেন?

— পোড়োখনি এলাকা ওটা। খনির খাদ ভেতর দিয়ে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে এগিয়ে গেছে দামোদর নদের দিকে। ব্রিটিশ আমলের খনি সব। অভ্র, ডলোমাইট, আরও কত রকমের খনি ছিল! এখন আর কিছুই নেই। এসো। গাড়ি এনেছে ইসমাইল!

সে ছাতি বের করে দরজা খুলছিল। কর্নেল বৃষ্টির তোয়াক্কা না করেই গাড়িতে ঢুকলেন। আমি ইসমাইলের ছাতির তলায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে ইসমাইল বলল,—মুখার্জিসাব জিপ নিয়ে আসতে বলেছিলেন। তো পরে উনি শোচ করলেন কী, বরষাতে জিপে এলে কর্নিলসাব ভিজে যাবেন। তাই অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দিলেন। এ গাড়ি উনার নিজের গাড়ি সাব!

আলোকিত এলাকা পার হয়ে গাড়ি অন্ধকারে হেডলাইট জ্বেলে সাবধানে ছুটছিল। দু-ধারে ঝোপঝাড়, কখনও উঁচু গাছের সারি চোখে পড়ছিল। জিজ্ঞেস করলুম, — ময়ূরগড় কত দূর?

ইসমাইল বলল, ওই দেখুন সাব! রাস্তার মধ্যিখানে একটা বড় পাথর ফেলেছে হারামজাদা শয়তানরা। এ রাস্তায় রাতে রাহাজানি করে ডাকাতরা।

তুমি হেডলাইট জ্বেলে রাখো।—বলে কর্নেল বাইনোকুলারে কিছু দেখে নিলেন। তারপর শার্টের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তাঁর রিভলভার বের করলেন। আস্তে বললেন, — ইসমাইল! তুমি আস্তে এগিয়ে চলো। দুটো লোক ডানদিকে শালগাছের আড়ালে বসে আছে।

ইসমাইল একটু দ্বিধার পর এগিয়ে চলল। এতক্ষণে পাথরটা দেখতে পেলুম। পাথরটার ডাইনে বা বাঁদিক দিয়ে গাড়ি যাবে না। পাথরটার কাছাকাছি যেতেই দুটো মুখোশপরা লোক ডানদিক থেকে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে একটা ভোজালি, অন্যজনের হাতে একটা লম্বা দা। গাড়ি পাথরটার হাত দশেক দূরে থামল। তারপরই কর্নেল দরজা খুলে নেমে রিভলভার থেকে তাদের পায়ের কাছে গুলি ছুড়লেন। অমনি তারা লাফ দিয়ে উঠে শালবনের ভেতর ঢুকে পড়ল। কর্নেল শালবনের দিকে আর একবার গুলি ছুড়লেন। তারপর হেঁট হয়ে পাথরটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ইসমাইল হাসতে হাসতে বলল, — ডাকুরা শোচ করেনি গাড়িতে কে আছেন।

কর্নেল এসে বললেন, — আশা করি আর হামলা হবে না।

গাড়ি আবার চলতে থাকল। বৃষ্টির মধ্যে এই আকস্মিক হামলায় আমি হতবুদ্ধি হয়ে বসে ছিলুম। একটু পরে বললুম, — কী সর্বনেশে লোক ওরা! আশ্চর্য! কল্পনাও করিনি!

কর্নেল বললেন, — তার চেয়ে আশ্চর্য, তোমার কাছেও লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস আছে। তুমি সেটার কথা ভুলে গিয়েছিলে। তুমিও বাঁদিক থেকে নেমে রিভলভার বের করে ওদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুড়লে ওরা আতঙ্কে মূর্ছিত হতো। তখন ওদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদের দিয়েই পাথরটা সরানো যেত।

বললুম, — আসলে আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম।

ভবিষ্যতে যেন আর হকচকিয়ে যেয়ো না। — বলে কর্নেল একটুকরো ভেজা কাগজ দেখালেন। তাতে লাল ডটপেনে বড় বড় হরফে লেখা আছে : 'সাবধান'।

বললুম, — এটা কোথায় ছিল?

— পাথরটার তলায়। তাই বেশি ভিজে যায়নি।

— কী সর্বনাশ! তাহলে এ কি সেই ভূতনাথ হাজরার আয়োজন?

— হতে পারে। তবে বোঝা যায়, লোকদুটো আমাদের নিছক ভয় দেখাতে এসেছিল, যাতে আমরা গাড়ি ঘুরিয়ে দুর্গাপুরে ফিরে যাই জয়ন্ত! ওরা যার লোকই হোক, সে চায় না আমি ময়ূরগড়ে যাই।

— কিন্তু সে টের পেল কী করে?

— সম্ভবত রায়মশাইয়ের ফোন ওরা ট্যাপ করে রেখেছে।

কথাটা শুনে আমি এবার হ্যান্ডব্যাগের চেন খুলে আমার রিভলভারের বাঁটটা মুঠোয় ধরে বসে রইলুম। মনে পড়ল, বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কর্নেল বলেছিলেন, — সব সময়ের জন্য তৈরি থাকতে হবে জয়ন্ত! সম্ভবত আমরা এমন পথে যাত্রা শুরু করেছি, যেখানে পায়ে-পায়ে বিপদ আসতে পারে।

কেন বলেছিলেন, তার জবাব পাইনি। কিন্তু যা দেখছি, আমাদের পথে সত্যিই বিপদ ওত পেতে আছে।

হিকরি ডিকরি ডক

বনবাংলোয় অবশ্য নির্বিঘ্নে পৌঁছেছিলুম। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। বাংলোটা সুন্দর। বিদ্যুৎ আছে। কেয়ারটেকার-কাম-পাচক সিদ্ধেশ্বর কর্নেলের পরিচিত। চৌকিদার সুখরামও তা-ই। বুঝলুম, কর্নেল— এই বাংলোয় আগেও এসেছিলেন।

ইসমাইল সকালে আসবে বলে গাড়ি নিয়ে চলে গিয়েছিল। রাতের খাওয়ার পর বারান্দায় বসে কর্নেল সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। সে কটকের লোক। এই বাংলোতে তার দশবছর কেটে গেছে বনজঙ্গল আর অর্কিডের খোঁজখবর নিতে নিতে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা সিদ্ধেশ্বর, কাগজে পড়েছি, ময়ূরগড়ের জমিদারবাড়ি থেকে নাকি অনেকগুলো ঘড়ি চুরি গেছে?

সিদ্ধেশ্বর মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে ছিল। সুখরামও একটু তফাতে উবু হয়ে বসে মাঝে মাঝে কথা বলছিল। কর্নেলের কথার জবাবে সিদ্ধেশ্বর বলল, — শুনেছি তো চুরি গেছে। আমার কী মনে হয় জানেন স্যার? বাড়ির লোকেই চুরি করে কাউকে বেচে দিয়েছে। রায়মশাইয়ের ঘর, না কেল্লা— আপনিই দেখেছেন। বলুন? বাইরের কে ওই কেল্লায় ঢুকতে পারবে?

কর্নেল বললেন, — ঘরের লোক বলতে কে?

— আজ্ঞে, রায়মশাইয়ের বাড়িতে ওঁর দূরসম্পর্কের এক ভাগনে আছে। সে বড়ই নেশাখোর উড়নচণ্ডী। আর আছে পুরোনো কাজের মেয়ে সৌদামিনী। তার স্বামী শশধর দু'বছর আগে মারা গেছে। ছেলে রাজু মায়ের কাছে থাকে। রাজুরও বদনাম আছে। মস্তানি করে বেড়ায়। রায়মশাই তো বিয়ে করেননি, তা আপনি জানেন। হ্যাঁ— আর সেই পিনাকীবাবুর কথা মনে আছে আপনার? রায়মশাইয়ের বাবার আমলের কর্মচারী।

— পিনাকীবাবু এখনও আছেন ও বাড়িতে?

— আছেন। যাবেন কেথায়? উনি ও রায়মশাইয়ের মতো বিয়ে করেননি। বুড়ো মানুষ। বাড়ির কাজকর্ম করে দেন। ঘড়িগুলোতে উনিই বরাবর দম দিতেন। রায়মশাইয়ের খুব কাছের লোক বলতে উনিই।

— মানে— রায়মশাই পিনাকীবাবুকে বিশ্বাস করেন?

সিদ্ধেশ্বর হাসল, — না করে উপায় কী? রায়মশাইয়ের ভাই সুখরঞ্জনবাবুর খবর জানো?

— উনি তো দুর্গাপুরেই থাকেন। শুধু কালীপুজোর সময় ফ্যামিলি নিয়ে দাদার বাড়ি আসেন।

— কালীপুজো তাহলে এখনও চালু আছে জমিদার বাড়িতে?

— আছে। তবে আগের মতো জাঁকজমক হয় না। নমো-নমো করে নেহাত দায়সারা পুজো হয়। আর — আপনি তো জানেন, রায়বাড়ির কালী বিসর্জন হয় না।

— হ্যাঁ। অষ্টধাতুর কালীপ্রতিমা।

এইসময় সুখরাম হাই তুলে বলল, — দো রোজ আগে আমি সন্‌ধের টাইমে বাড়ি থেকে আসছিল। তো দেখলাম কী, পুটুবাবু আর রাজু পশ্চিম মাঠ থেকে আসছে। আমাকে দেখে আচানক

ছুপা হইয়ে গেল! মালুম হল না, কাহে ছুপা হইয়ে গেল। রাজু বহত হারামি লড়কা আছে কর্নেলসাব!

কর্নেল বললেন, —পশ্চিমের মাঠ মানে তো পোড়োখনি এলাকা!

— জি হ্যাঁ।

সিদ্ধেশ্বর হাসল,—হ্যাঁ স্যার! আমিও কয়েকবার এই বাংলো থেকে দেখেছি, দু'জনে ঝরনার ধারে বসে আছে। লুকিয়ে গাঁজা খেতে যায় হয়তো।

আবার হঠাৎ বৃষ্টি এল। জোরালো বৃষ্টি। কর্নেল বললেন, — আচ্ছা সিদ্ধেশ্বর! তোমরা গিয়ে শুয়ে পড়ো। রাত এগারোটা বাজে। আমরাও শুয়ে পড়ি। হ্যাঁ— বাংলোয় মশার উৎপাত নেই তো?

— না স্যার! উঁচু জায়গা। সবসময় খুব হাওয়া। দেখবেন ফ্যানের হাওয়াতে শীত করবে। তবে মশা হয় শীতের সময়। সে-ও সামান্য।

ওরা উঠে বাংলোর বারান্দা দিয়ে পেছনে চলে গেল। আমরা ঘরে ঢুকলুম। বললুম, — জানালাগুলো কি খোলা থাকবে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, — থাকবে। তোমার ভয়ের কারণ নেই জয়ন্ত! বাংলোর চারদিকে আলো। এখানে শিল্পনগরী দুর্গাপুর থেকে বিদ্যুৎ আসে বলে লোডশেডিং হয় না। তাছাড়া চারদিকের বাউন্ডারি ওয়ালের মাথায় পাঁচফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। গেটে তালা বন্ধ থাকে। আর সুখরামকে দেখলে। ওর কান ঘুমের মধ্যে যেন জেগে থাকে। সুখরাম একসময় এই মুলুকের সেরা কুস্তিগির ছিল। এখন বয়স হয়েছে। তবু পুরনো সুনামের জোরে লোকেরা ওকে খুব সমীহ করে চলে! হ্যাঁ— তোমাকে বলা উচিত। সুখরাম একবার এই বাংলোর কাছে একটা মানুষখেকো বাঘকে টাঙিতে কুপিয়ে মেরেছিল। সরকার থেকে সেইজন্য তাকে পাঁচহাজার টাকা বখশিস দেওয়া হয়।

— জঙ্গলে এখনও বাঘ আছে নাকি?

— রিজার্ভ ফরেস্টে বাঘ থাকবে না? হাতি ভালুক শুয়োরও আছে। পাইথন সাপও আছে। তবে তোমার তাতেও ভয়ের কিছু নেই কোনও হিংস্র জানোয়ার এই বাংলায় ঢুকতে পারবে না।

বৃষ্টির রাতে এমন নিরাপদ বনবাংলোতে আমার স্বস্তির সঙ্গে ঘুম এসে গিয়েছিল, যদিও নতুন জায়গায় গেলে সহজে আমার ঘুম আসে না।

সেই ঘুম ভাঙল সকাল সাতটা নাগাদ। সিদ্ধেশ্বর বেড-টি এনে ডাকছিল। কর্নেলকে দেখতে পেলুম না। জিজ্ঞেস করলে সিদ্ধেশ্বর বলল, — কর্নেলসায়েব ভোরবেলা বেরিয়েছেন। ওঁর স্বভাব তো জানি স্যার! অর্কিড বা প্রজাপতির — কিংবা ধরুন কোনও পাখির পেছনে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন।

সকালে বৃষ্টি ছিল না। ভাঙাচোরা মেঘের ফাঁকে রোদ ঝলমল করছিল। বেড-টি খেয়ে বারান্দায় গেলুম। সকালের রোদে চারপাশটা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পূর্বে দূরে ময়ূরগড় দেখা যাচ্ছিল। রীতিমতো ছোট শহর। উত্তরে অসমতল সবুজ বনভূমি আর উঁচু-নিচু টিলাপাহাড়। পশ্চিমে ঢেউখেলানো মাঠ। প্রকাণ্ড সব পাথর আর টাঁড় মাটি। কদাচিৎ কোথাও ঝোপঝাড় বা গাছ। বাংলোর নিচেই পশ্চিমে একটা ঝরনা ছোট নদীর মতো বয়ে চলেছে। বর্ষাকাল বলে জলটা একটু ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। ঝরনাটা এসেছে উত্তরদিকের বনভূমির ভেতর থেকে এবং বাংলোর কাছাকাছি বেঁকে পশ্চিমবাহিনী হয়েছে। পশ্চিমের অসমতল মাঠটাই যে খনি এলাকা ছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল।

বাথরুম সেরে আবার বারান্দায় এলুম। তারপর চোখে পড়ল, পোড়োখনি এলাকার একটা ঢিবির মাথায় বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বাইনোকুলারে কিছু দেখছেন। তারপর তিনি ঢিবি থেকে নেমে অদৃশ্য হলেন।

অদৃশ্য হলেন তো হলেন। প্রায় আধঘন্টা তাঁকে আর খুঁজে পেলুম না। সিদ্ধেশ্বর সাইকেল নিয়ে লনে এসে বলল, — বাজারে যাচ্ছি স্যার! চা-কফির দরকার হলে সুখরামকে ডাকবেন আর ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা আছে। কর্নেলসায়েব ফিরলে সুখরাম তো রইল।

পূর্বদিকে যে রাস্তা দিয়ে আমরা রাত্রে এসেছি,তার মোড়ে কর্নেলকে এতক্ষণে দেখতে পেলুম। তাঁর পেছনে একটা সাদা গাড়ি আসছিল। গাড়িটা তাঁর কাছে থেমে গেলে কর্নেল ঢুকে গেলেন। বুঝলুম, ইসমাইল গাড়ি আনছে।

হর্ন শুনে সুখরাম গেট খুলে দিল। গাড়িটা এসে পোর্টিকোর তলায় থামল। কর্নেল বেরিয়ে বললেন, — মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে?

বললুম, — মর্নিং বস্! আপনি পোড়োখনির মাঠে ঢিবিতে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে কি ভূতনাথের কোনও চেলাকে দেখছিলেন?

কর্নেল হাসলেন, — নাহ্। লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখছিলুম। ওরা টাঁড় জমিতে বসে ছিল। কিন্তু বড্ড চালাক। ছবি তুলতে দিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রেকফাস্ট করে কফি পানের পর কর্নেল বললেন, — চলো জয়ন্ত! জমিদারবাড়ি যাওয়া যাক।

গাড়িতে জমিদারবাড়ি যেতে মিনিট দশেক লাগল। বাড়িটা শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে একটা উঁচু জমিতে জীর্ণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। গড়নে কতকটা ক্যাস্‌ল্ বা দুর্গপ্রাসাদের মতো। চারদিকে উঁচু-গাছ। লোহার প্রকাণ্ড গেট। বাড়ির ভেতর জেলখানার মতো উঁচু বাউন্ডারি-ওয়ালা। ফুলবাগান আগাছায় ঢাকা পড়েছে। পামগাছ, বর্মি বাঁশের ঝাড়, কতরকমের বিদেশি গাছপালা জঙ্গল হয়ে আছে।

হর্ন শুনে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে গেট খুলে দিয়ে কর্নেলকে দেখে করজোড়ে নমস্কার করলেন। তাঁর দাড়ি আর চুড়োবাঁধা চুল, কপালে সিঁদুরের ছোপ মুখে সাধুসন্ন্যাসীর আদল ফুটিয়েছে। কিন্তু গায়ে সাদা ফতুয়া আর পরনে ধুতি। বাঁ-হাতে রিস্টওয়াচ। পায়ে সাদাসিধে চপ্পল।

গাড়ি পোর্টিকোর সামনে থামলে কর্নেল বেরুলেন। তিনি বললেন,—পিনাকীবাবু, আপনি কেমন আছেন?

বৃদ্ধ বললেন,—মায়ের আশীর্বাদে একরকম কেটে যাচ্ছে স্যার! একটু আগে রায়মশাই আপনার আসার কথা বলছিলেন। গেস্টরুম গুছিয়ে রেখেছি।

কর্নেল বললেন,—আমরা বনবাংলোয় উঠেছি পিনাকীবাবু! আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

—এটা স্যার ঠিক করেননি। রায়মশাই দুঃখ করবেন। আসুন। ওঁর শরীর আগের মতো জুতসই নয়। তাতে গত সপ্তাহে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে আমরা বারান্দায় উঠলুম। তারপর বারান্দার শেষপ্রান্তে গিয়ে আবার ঘোরালো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় গেলুম। সিঁড়ির দু'ধারের দেয়ালে ডাঃ চক্রবর্তী ছোটবেলায় নাকি অনেক ঘড়ি দেখেছিলেন। সে-সব নেই। দোতলার বারান্দায় ছড়ি-হাতে এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। পরনে পাজামা আর তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। সুচলো পুরু কাঁচাপাকা গোঁফ আর ঝাঁকড়া চুল। সব মিলিয়ে তাঁর চেহারায় বনেদি আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। নমস্কার করে গম্ভীরমুখে বললেন,—আসুন কর্নেলসায়েব! ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের মুখুজ্জে একটু আগে আমাকে টেলিফোনে জানাল, আপনারা তাদের গেস্ট। যাই হোক, আপনার যা ইচ্ছা! পিনাকীদা! তুমি সদুকে গিয়ে কফি করতে বলো! আর—পুঁটু আছে?

পিনাকীবাবু বললেন,—পুঁটুবাবু কি বাড়িতে বসে থাকার ছেলে? বোধ করি ক্লাবে আড্ডা দিতে গেছেন।

— রাজু?

— রাজুকে ভোরবেলা থেকে দেখছি না। সদুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। বলল, কোন চুলোয় গেছে কে জানে।

— ঠিক আছে। তুমি যাও। আসুন কর্নেলসায়েব।

একটা বিশাল ঘরে আমরা ঢুকলুম। ঘরের শেষপ্রান্তে একটা উঁচু মেহগনি কাঠের নকশাদার পালঙ্ক। সব আসবাবই সেকেলে। কিন্তু চোখে পড়ল চারদিকের দেয়ালে শুধু ঘড়ি আর ঘড়ি। গোল, ডিমালো, চৌকো ছোট-বড় অদ্ভুত গড়নের সব ঘড়ি। অনেক ঘড়িতে দোলক আছে। ঘর ভরে যাচ্ছে টিক্-টিক্ শব্দে। আমার কানে বিরক্তিকর। কিন্তু রায়মশাইয়ের তো কান সওয়া।

খাটের কাছাকাছি সোফাসেট আর ডিভান। ইতস্তত সাজানো ব্রোঞ্জ, পেতল, কালোপাথর আর মার্বেলের বিচিত্র ভাস্কর্য। আলমারিতে-আলমারিতে পুরনো বই। আমরা সোফায় বসলুম। রায়মশাই মুখোমুখি ডিভানে বসলেন। তারপর কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। রায়মশাই বললেন, — দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা এখানে আসে। তবে আমি ইংরাজি পেপার রাখি। খবরটা দুর্গাপুরের কোনও সাংবাদিক পুলিশ সূত্রে পেয়ে সব কাগজকে বিলি করেছিল। সুরঞ্জন কাল সকালে জিপে চেপে ছুটে এসেছিল। ওকে বললুম, ছ'টা ঘড়ি বারান্দায় ছিল। সেইগুলো চোরেরা খুলে নিয়ে গেছে। ওগুলো তত কিছু উঁচুদরের জিনিস নয়। সুখরঞ্জন দুপুরে খেয়ে চলে গেল।

কর্নেল বললেন, — কিন্তু আপনার বিপদটা কী?

রায়মশাই আস্তে বললেন, গত একমাস যাবৎ কে বা কারা ডাকে একটা করে চিঠি পাঠাচ্ছে। মোট পাঁচখানা চিঠি পেয়েছি। পোস্ট অফিসের ছাপ খুব অস্পষ্ট। একটা চিঠির স্ট্যাম্পের ওপর ছাপ আবছা হলেও পড়তে পেরেছিলুম। পানাগড় থেকে ডাকে ফেলা হয়েছে।

অমনি বলে উঠলুম, — কর্নেল! সেই ভূতনাথ হাজরা!

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, — চিঠিগুলো দেখি।

রায়মশাই একটা টেবিলের ড্রয়ার চাবি দিয়ে খুলে একগোছা খাম আনলেন। বললেন, — সব চিঠিতেই লাল ডটপেনে শুধু একটা ছড়া লেখা। তলায় একটা মড়ার খুলি আঁকা। আপনি দেখুন। তবে আশ্চর্য, এই ছড়াটা ছোটবেলায় আমার ঠাকুরদা আমাদের দুই ভাইকে মুখস্ত করিয়েছিলেন। এ ছড়া আমার ছোটবেলায় সুর ধরে আওড়াতুম!

কর্নেল ততক্ষণে চিঠিগুলো বের করে ফেলেছেন। তারপর আতশ কাচ দিয়ে খামের স্ট্যাম্পে ডাকঘরের ছাপ পড়ার চেষ্টা করছেন।

রায়মশাই বললেন, ছড়াটা অদ্ভুত। মাথামুন্ডু বোঝা যায় না। শুনুন বলি।

বলে তিনি সুর ধরে আওড়ালেন :

হিকরি ডিকরি ডক
নকড়ি ছকড়ি ক্লক
ধরোটি বারোটি পাক
বাজিলে চিচিং ফাঁক

কর্নেল এবার চিঠিগুলোতে চোখ বুলিয়ে বললেন, — হ্যাঁ। সব চিঠিতে একই হাতের লেখা ওই ছড়া। 'হিকরি ডিকরি ডক' একটা ইংরেজি পদ্যের লাইন। ছোটবেলায় পড়েছিলুম। ঘড়ির শব্দের অনুকরণ।

রায়মশাই বললেন, — হ্যাঁ। ঠাকুরদা ওই লাইনটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ছড়াটার বাকি অংশের অর্থ শোনাবার আর সুযোগ পাননি। হঠাৎ মারা যান।

কর্নেল বললেন, — ভুল হতেও পারে। তবে একটা চিঠি কলকাতার জি পি ও-তে পোস্ট করা। দুটো চিঠি দুর্গাপুর থেকে। একটা বর্ধমান আর একটা পানাগড় থেকে।

এইসময় পিনাকীবাবু ট্রে-হাতে ঘরে ঢুকলেন। সেন্টারটেবিলে ট্রে রেখে বললেন,— আমি বাজারে যাই রায়মশাই! সায়েবরা তো বাংলোতে উঠেছেন। নাকি দুপুরবেলাটা এখানে— ।

কর্নেল বললেন, — না পিনাকীবাবু! যখন আসব এ বাড়ি, তখন জানিয়েই আসব এবং খাব।

রায়মশাই পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে পিনাকীবাবুকে দিলেন। তারপর বললেন,— সদুকে বলে যাও পিনাকীদা! পুঁটু হোক, কি রাজু হোক, এই সিঁড়ি দিয়ে যেন না ওঠে। বাইরে থেকে সিঁড়ির দরজা সদুকে আটকে দিতে বলো। পুঁটু এলে হলঘরের ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে যেন নিজের ঘরে যায়। আর শোনো! তুমি দেখে যাও বারান্দায় এ ঘরে আসার পার্টিশান ওয়ালের দরজা ভেতর থেকে আটকানো আছে কি না।

পিনাকীবাবু চলে গেলেন। কর্নেল বললেন, — এবার বলুন, বারান্দার ছটা ঘড়ি কীভাবে চুরি গেল?

রায়মশাই বললেন,— গত সপ্তাহে শনিবার, আজ হল শুক্রবার, রাত্রে কী করে যে চোর ঢুকল, বুঝতে পারছি না। বাবার আমলে — আপনার মনে পড়বে, সিঁড়ি থেকে তিনটে ঘড়ি চুরি যাওয়ার পর দোতলার বারান্দায় সিলিং পর্যন্ত দেয়াল গাঁথা হয়েছিল, হলঘরের ভেতরকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে কেউ যাতে এই ঘরে না আসতে পারে। মজবুত একটা দরজা অবশ্য বসানো হয়েছিল। ওটা আমি রোজ রাত্রে চেক করে তবে শুই। যে সিঁড়ি দিয়ে আপনারা উঠলেন, সেটাও ভেতর থেকে আটকে দিই। আবার বারান্দায় ঢোকার মুখে সিঁড়ির মাথায় আর একটা দরজা দেখলেন। ওটাও ভেতর থেকে বন্ধ রাখি। এদিকে বারান্দার থামে গ্রিল আছে। তাহলে চোর ঢুকল কোন পথে, এটাই অদ্ভুত!

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, — সেদিন আপনি কত রাতে শুয়েছিলেন?

— রাত সাড়ে দশটায় আমি ঘরের দরজা এঁটে শুয়ে পড়ি।

— ওটায় তো অ্যাটাচ্‌ড্ বাথরুম?

— হ্যাঁ। ওটা ঠাকুরদার আমলে তৈরি। কিন্তু আমি বাথরুমের দরজার হ্যাচকল টেনে আটকাতে ভুলি না।

— আপনি কি শনিবার সন্ধ্যায় বা তারপর কোনও কারণে নিচে নেমেছিলেন?

রায়মশাই তাঁর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, — হ্যাঁ। মনে পড়ে গেল। রাজুকে সৌদামিনী পেটাচ্ছিল। চ্যাঁচামেচি হচ্ছিল খুব। তাই বিরক্ত হয়ে আমি নিচে নেমে গিয়েছিলুম। অবশ্য মিনিট পাঁচেক পরে ফিরেছিলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, — অতএব আমার মতে, ওই সুযোগে চোর ঢুকে সম্ভবত আপনার খাটের তলায় লুকিয়ে ছিল। এটা পাটিগণিতের অঙ্ক রায়মশাই! যেমন কী না ওই 'হিকরি ডিকরি ডক'।

রায়মশাই বলে উঠলেন, — তা সম্ভব। খুবই সম্ভব। কারণ আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুই। কিন্তু আপনি 'হিকরি ডিকরি ডক' ছড়াটাকে পাটিগণিতের অঙ্ক বলছেন কেন?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, — মনে হচ্ছে কোনও অঙ্কের সূত্র এতে নিশ্চয় লুকোনো আছে। তা না হলে আপনার ঠাকুরদাই বা এটা আপনাদের দুই ভাইকে মুখস্থ করাবেন কেন এবং সেই ছড়ালেখা চিঠিই বা কেউ ডাকে পাঠিয়ে আপনাকে মৃত্যুর ভয় দেখাবে কেন?

— হ্যাঁ। মড়ার খুলি এঁকে পাঠাচ্ছে বলেই আমি সত্যি ভয় পেয়েছি।

আমি কফি খেতে-খেতে ঘড়িগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখছিলুম। বললুম, — কোনও ঘড়িতে ঘন্টার সময় হলে খুদে পাখি ঘণ্টিতে ঠোকরায় শুনেছি। সেটা কোথায়?

রায়মশাই বললেন, ও ওই যে বেঁটে চ্যাপ্টা ঘড়িটা দেখছেন!

এতক্ষণে ঘড়িটা চোখে পড়ল। দোলকের তলায় একটা সরু দাঁড়ে খুদে পেতলের পাখি বসে আছে। বললুম, — ওটা বাজে?

— হ্যাঁ। একটু পরে দশটা বাজবে। তখন দেখবেন।

— আর একটা ঘড়িতে নাকি সিঁড়ি বেয়ে খুদে সায়েব এসে ঘণ্টি বাজায়?

— সেটাও আছে। ওই দেখুন বড় চৌকো ঘড়িটা। সিঁড়িটায় আলো পড়েনি। তবে ঘণ্টার সময় হলেই টুপিপরা সায়েব হাতুড়ি হাতে নামতে শুরু করলে চোখে পড়বে।

— ঘড়িগুলো সবই কি একসঙ্গে বাজে?

— প্রায় একসঙ্গেই বাজে। এক-আধ সেকেন্ড কোনওটা আগে-পরে বাজে এই যা!

রায়মশাই উঠে গিয়ে আমাকে ছড়ি দিয়ে ঘড়ি দেখাতে শুরু করলেন। আমিও ওঁর কাছে গেলুম। উনি বললেন, — তিনটে বাদে পনেরোটা ঘড়ি এখনও সচল। রাইট টাইম দেয়। ওই তিনটে আমি বাবার আমলেও বাজতে শুনিনি। তবু ঠাকুরদার স্মৃতি হিসেবে টাঙানো আছে।

বলে তিন দেয়ালে তিনটে ঘড়ি তিনি দেখিয়ে দিলেন।

জিগ্যেস করলুম, — পনেরোটা ঘড়িতে কি রোজ দম দিতে হয়?

রায়মশাই বললেন, — হ্যাঁ। ঠিক সকাল আটটায় দম দিতে শুরু করি। তবে আমি একা পারিনে। হাত ব্যথা হয়ে যায়। পিনাকীদাও দম দেয়। আর মাঝে-মাঝে— বছরে অন্তত একবার কারিগর ডেকে এনে অয়েলিং করাতে হয় মাত্র।

কর্নেল বললেন, — কারিগর মানে সেই অঘোরবাবু?

— অঘোরবাবু দু'বছর আগে মারা গেছেন। ওঁর ছেলে নরেনও পাকা কারিগর আর বিশ্বাসী। নরেন গত শীতে অয়েলিং করে দিয়ে গেছে। কিন্তু কোনও ঘড়ি গন্ডগোল করেনি এ পর্যন্ত। শুধু ওই তিনটে ঘড়ি অঘোরবাবু বা তাঁর ছেলে সচল করতে পারেননি। তিনটেই নাকি বিগড়ে গেছে।

রায়মশাই ডিভানে এসে বসলেন। আমিও সোফায় বসে পড়লুম। কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপরই ঘড়িগুলো থেকে আশ্চর্য মিঠে সেতারের ঝংকারের মতো শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণে দশবার নানা সুরে ঘণ্টার বাজনা শুরু হল। সেই বাজনার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। মনে হল, সারা ঘর জুড়ে মনমাতানো অর্কেস্ট্রা বাজছে। আমরা যেন এক মধুর অর্কেস্ট্রার ধ্বনিঝংকারের মধ্যে ভেসে চলেছি। আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলুম।

সেই ঘড়ির পাখি বা আরেকটা ঘড়ির সায়েবকে যে দেখব, সে-কথা মনেই রইল না। বললুম, — অপূর্ব! অসাধারণ! এ যেন জাদুকরের তৈরি এক মায়াজগৎ রায়মশাই!

কর্নেলের মুখে কিন্তু নির্বিকার ভাব লক্ষ করে অবাক হলুম। রায়মশাই বললেন, — বারান্দার ছ'টা ঘড়ি চুরির জন্য আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। পুলিশ যা করার করুক। কিন্তু ওই চিঠিগুলো—।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, —হ্যাঁ। 'হিকরি ডিকরি ডক'।

আড়িপাতা যন্ত্র আবিষ্কার

ভেবেছিলুম, কর্নেল এবার উঠবেন। তিনি উঠলেন না। সোফায় হেলান দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে কিছু চিন্তাভাবনার পর বললেন, — এবার আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই রায়মশাই! রায়মশাই বললেন, — করুন!

— পানাগড়ের ভূতনাথ হাজরা নামে বেঁটে মোটাসোটা গুঁফো কোনও ভদ্রলোককে আপনি চেনেন?

— ভূতনাথ হাজরা? না তো! তবে—

— বলুন!

— চেহারার যে বর্ণনা দিলেন, আমার দূর সম্পর্কের ভাগনে স্বপন— মানে পুঁটুর এক কাকার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পুঁটু আমার পিসতুতো বোনের ছেলে। ওর বাবা-মা বেঁচে নেই। পিসতুতো বোন লতিকার অনুরোধে ওকে নিয়েছি। ইচ্ছা আছে যদি ওর স্বভাব চরিত্র শোধরায়, তাহলে ওকে দত্তক নেব। তো ভদ্রলোকের গায়ের রং শ্যামবর্ণ। পুঁটুর উনি কাকা, মানে— সেও বড় জটিল সম্পর্ক। লতিকার স্বামী ইন্দ্রনাথের ভায়রাভাই কালীনাথ রায়চৌধুরি। গতবছর একদিন পুঁটু ওঁকে বাজারে দেখতে পেয়ে এ বাড়িতে এনেছিল। কালীনাথবাবুর পানাগড়ে কী যেন কারবার আছে। উনি আমাকে ঘড়ি বিক্রির লোভ দেখিয়েছিলেন। এই সব অ্যান্টিক ঘড়ির দাম নাকি দশ-পনেরো হাজার। আমি মুখের ওপর না বলে দিয়েছিলুম।

— গায়ের রং শ্যামবর্ণ? কপালের ডানদিকে ক্ষতচিহ্ন আছে?

রায়মশাই একটু পরে বললেন, — হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাকে আপনি চেনেন নাকি?

— চিনি। এবার বলুন, গত রবিবার আপনি ঘুম থেকে কখন উঠেছিলেন?

— ছ'টায়। রোজ ছ'টায় আমার ঘুম ভাঙে।

— রাত্রেও তো ঘড়িগুলো বাজে। আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না?

রায়মশাই হাসলেন, — হয় বলেই তো শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে ঘুমের বড়ি খেয়ে শুই।

— রবিবার ঘুম ভাঙার পর এই ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, না খোলা ছিল?

— সমস্যা হল, কড়া ঘুমের ওষুধ। তাই ছ'টায় উঠি বটে, কিন্তু ঘোর কাটে না। তাই মনে পড়ছে না দরজা খোলা ছিল, না বন্ধ ছিল। প্রথমে বাথরুমে ঢুকে তারপর বারান্দায় গিয়ে বসি কিছুক্ষণ। সদু নিচে থেকে চা নিয়ে ডাকে। তখন বারান্দার দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচের দরজা খুলি। চা খাওয়ার পর ঘোরটা কেটে যায়। তো সেদিন সদুই সিঁড়ির দরজা আর বারান্দার দরজা খোলা দেখে উঠে এসেছিল। তারপর তারই চোখে পড়েছিল, বারান্দার দেয়ালের ছ'টা ঘড়িই নেই।

— হুঁ। চোর আপনার ঘুমের ওষুধ খাওয়ার কথা জানে। সে পালঙ্কের তলায় লুকিয়ে ছিল।

— কিন্তু অতগুলো ঘড়ি একা সে কী করে নিয়ে গেল বুঝতে পারছি না।

— একা নয়। তার এক বা একাধিক চেলা উঠোনের জঙ্গলের ভেতর লুকিয়ে ছিল হয়তো।

— পুলিশও তা-ই বলেছে। তবে পালঙ্কের তলায় কারও লুকিয়ে থাকার কথা তাদের মাথায় আসেনি। যাইহোক, সদুর ছেলে রাজুকে ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা করেছিল। তার মুখ দিয়ে কিছু বের করতে পারেনি পুলিশ। শেষে সদুর কান্নাকাটিতে আমিই রাজুকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছিলুম। তবে এ কথা ঠিক, রাজু বোকাবুদ্ধু গবেট প্রকৃতির ছেলে । নেশা-ভাং করে বলে মায়ের কাছে মার খায়।

— পুঁটুকে পুলিশ কিছু— ।

রায়মশাই কর্নেলের কথার ওপর বললেন, — থানায় নিয়ে জেরা করে ছেড়ে দিয়েছিল। তার কথায় সন্দেহযোগ্য কিছু পায়নি পুলিশ। এমনকী পিনাকীদাকে আর সদুকেও পুলিশ জেরায় জেরবার করেছিল।

পানাগড়ে আপনার পিসতুতো বোনের নাম-ঠিকানা চাই রায়মশাই! — বলে কর্নেল কিটব্যাগের চেন খুলে খুদে একটা নোটবই বের করলেন। পকেট থেকে কলম টেনে নিলেন।

রায়মশাই বললেন,— লতিকা মজুমদার। ওর স্বামীর নাম ইন্দ্রনাথ মজুমদার। ইন্দ্রনাথ ডাক্তারি করে। তার মহামায়া নার্সিং হোম সবাই চেনে। হোমের পেছনেই তার পৈতৃক বড়ি।

কর্নেল নাম-ঠিকানা লিখে বললেন,— ডাঃ মজুমদারের নিশ্চয়ই টেলিফোন আছে?

— আছে। আমার লাইন এস. টি. ডি. নয়। আপনি চাইলে ট্রাংকল করতে পারি।

নাহ্। — বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, আপনার টেলিফোন লাইনটা একটু পরীক্ষা করতে চাই।

— করুন। ওই তো টেলিফোন।

— নাহ্। প্রথমে টেলিফোন বক্স। তারপর অন্যত্র।

— বক্স নিচের বারান্দায় আছে। একেবারে গেটের কাছাকাছি।

— আপনি বসুন। আমি দেখে আসি। জয়ন্ত! তুমি বরং আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে দরকার হতেও পারে।

রায়মশাই বিস্মিত হয়ে বসে রইলেন। কর্নেলের সঙ্গে আমি বেরিয়ে গেলুম। পোর্টিকোর সামনে গাড়িতে ঠেস দিয়ে ইসমাইল এক প্রৌঢ়ার সঙ্গে কথা বলছিল। প্রৌঢ়া কর্নেলকে দেখে করজোড়ে ঝুঁকে প্রণাম করল। বলল, — কত বছর পরে এলেন কর্নেলসায়েব! ভালো ছিলেন তো?

কর্নেল বললেন, — ভানু মারা গেছে শুনে কষ্ট হল সৌদামিনী।

— সবই কপালের লেখন কর্নেলসায়েব! দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খাচ্ছিল-দাচ্ছিল। হঠাৎ রাত্তিরে বুকে ব্যথা উঠল। ডাক্তারবাবু আসতে আসতে শেষ।

— আচ্ছা! পরে কথা হবে। ইসমাইল! একটুখানি দেরি হবে। তাড়া নেই তো তোমার?

ইসমাইল ড্রাইভার বলল, — কী যে বলেন স্যার, মুখার্জিসাবের হুকুম আছে, আপনি যেখানে যাবেন, যত টাইম থাকবেন, আমাকেও হাজির থাকতে হবে। কুছু শোচ করবেন না।

কর্নেল বারান্দায় হাঁটতে - হাঁটতে শেষপ্রান্তে গেটের কাছাকাছি টেলিফোন বক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিঠে কিটব্যাগটি আঁটা। বক্স বন্ধ ছিল। কিন্তু তালা আঁটা ছিল না। বক্স খুলে তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, — ওভারহেড লাইন। চলো, বাইরে গিয়ে দেখি।

গেটের একটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে তিনি বাড়ির বাইরে দেয়ালে সাঁটা কালো রবারের পাইপ দেখতে-দেখতে থমকে দাঁড়ালেন। বাইনোকুলারে টেলিফোনের তার দেখতে থাকলেন। কালো পাইপ থেকে ফোনের তার বেরিয়ে একটা শালকাঠের খুঁটিতে পৌঁছেছে। খুঁটির পেছনে একটা লম্বাটে গাছ। কর্নেল বললেন, — বাহ্! অদ্ভুত কৌশল।

বললুম, — কী ব্যাপার?

— খুঁটির মাথায় তারের মাত্র দু-তিন সেন্টিমিটার জায়গার রবার কেটে কেউ বা কারা আড়িপাতা খুদে টেপ জুড়ে রেখেছে। আড়িপাতা যন্ত্রটা কাঠের খাঁজে এমনভাবে বসানো, সহজে চোখে পড়বে না। এইসব জাপানি খুদে যন্ত্র আজকাল সর্বত্র পাওয়া যায়। যন্ত্রটা দরকারমতো খুলে আনা যায়। তারপর টেপরেকর্ডারে ঢুকিয়ে ফোনের কথাগুলো শোনা যায়।

— তাহলে খুঁটি বেয়ে উঠতে হবে।

— খুঁটিটা আঁকাবাঁকা। খাঁজও আছে। ওঠা-নামা সহজ কাজ। মনে হচ্ছে রায়মশাই সম্প্রতি অনেক টাকা খরচ করে টেলিফোন লাইন নিয়েছেন।

বলে কর্নেল চারদিক দেখে নিয়ে একটু হাসলেন, — জয়ন্ত! তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং নেওয়া আছে। উঠে গিয়ে সাবধানে ওটা খুলে আনো। যেন মূল তার না ছেঁড়ে। চিয়ার আপ!

একটু ইতস্তত করে বললুম, — ভেঙে পড়বে না তো?

— আমার ওজনে কী হবে জানি না। তবে এটা শালকাঠ। তোমার ওজনে ওর কিছুই হবে না।

অগত্যা বাঁকা অংশ আর খাঁজে পা রেখে সাবধানে উঠে খুদে টেপ যন্ত্রটা খুলে ফেললুম। এটার

সঙ্গে জোড়া দেওয়া মিহি তারটুকু মূল তারের সঙ্গে জড়িয়ে দিলুম। তারপর বললুম, — একটু কালো টেপ কেটে সেলোফেন ছাড়িয়ে তারটাতে জড়িয়ে টিপে আটকে দিলুম। এবার নামতে তত অসুবিধে হল না। পায়ে রবারসোলের খাঁজকাটা জুতো। কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়জঙ্গলে অভিযানে বেরুলে এই দুতো পরেই আসি।

কর্নেল কালো টেপ এবং আড়িপাতা যন্ত্রটা কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন, — চলো! এবার রায়মশাইয়ের কাছে যাই।

গিয়ে দেখি, রায়মশাই সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ। বললেন,— জয়ন্তবাবু শালকাঠের খুঁটিতে উঠেছিলেন দেখছিলুম। কী ব্যাপার?

বারান্দায় উঠে কর্নেল বললেন, — আপনার টেলিফোনের লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র আটকানো ছিল।

— কী অদ্ভুত!

ঘরে ঢুকে আমরা সোফায় বসলুম। রায়মশাই আগের মতো মুখোমুখি ডিভানে বসলেন। কর্নেল বললেন,—আপনার কি টেপরেকর্ডার আছে?

— না তো! পুঁটুর আছে। রাজুরও একটা আছে। সদু ছেলের বায়না মেটাতে কিনে দিয়েছে।

— এই খুদে টেপ যন্ত্রটা তাহলে সৌদামিনিকে বলে বা পুঁটুর কাছ থেকে টেপরেকর্ডার কোনও ছলে চেয়ে নিয়ে গোপনে বাজাবেন। অন্তত গতকাল সকাল থেকে আজ আমরা আসবার সময় পর্যন্ত টেলিফোনে আপনার এবং অন্য কারও মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছে, সব এতে রেকর্ড করা আছে।

রায়মশাই বাগিং যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বললেন,—এ কাজ কার হতে পারে?

— যে ছড়া লিখে আপনাকে হুমকি দিচ্ছে, তার।

— বুঝলাম। কিন্তু ছড়া লেখার মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

— রায়মশাই! সে ধরেই নিয়েছে, আপনি ওই ছড়ার মর্ম জানেন। তাই যে জিনিসটা ছড়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে, সেটার দাবিতে সম্ভবত এবার শিগ্‌গির চিঠি পাবেন। আসলে পাঁচটা চিঠি লিখে সে যাচাই করে নিচ্ছে আপনার কী প্রতিক্রিয়া। এবার আপনি যেহেতু আমাকে ডেকেছেন, তাই সে ওটা দাবি করবেই। অন্তত আমার অঙ্কটা এই। কারণ আপনি যে সেই জিনিসটা বাইরে কোথাও রেখে আসেননি, বা কাকেও বিক্রি করে দেননি, তা সে বিলক্ষণ জানে।

— ছড়ার মধ্যে লুকিয়ে আছেটা কী?

— সম্ভবত আপনার পূর্বপুরুষের কোনও সম্পদ, যা খুবই দামি।

রায়মশাই মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে বললেন, — আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। ঠাকুরদা আমাকে কী বিপদের মধ্যে ফেলে গেছেন!

কর্নেল আস্তে বললেন, — সেই দামি জিনিস আপনার ভাইয়ের কাছেও নেই। এর একটাই অর্থ হয়। জিনিসটা হয়তো এইসব ঘড়ির মধ্যেই লুকানো আছে। কারণ ঠাকুরদার সব ঘড়ি আপনার কাছে।

রায়মশাই মুখ তুলে বললেন, — যদি তা বারান্দার ঘড়িগুলোর মধ্যে লুকোনো থাকে?

— চুরি যাওয়া ঘড়িগুলোর মধ্যে ওটা থাকলে আর আপনার কাছে চিঠি আসবে না।

— তবু যদি আসে?

— তাহলে বুঝবেন, ঘড়ি-চোর অন্য লোক। আর চিঠি লিখছে অন্য লোক।

— কেন? এমন তো হতেই পারে, ওই ছ'টা ঘড়ি একই লোক চুরি করেছে এবং সেগুলোর মধ্যে জিনিসটা না থাকায় আবার হুমকি দিয়ে চিঠি লিখছে!

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, — হ্যাঁ। তা হতেই পারে। তবে আমার ধারণা— অঙ্কই বলতে পারেন, ওই আড়িপাতা যন্ত্র বলে দিচ্ছে লোকটা মহা ধূর্ত। পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা দামি জিনিস যে - ঘড়িতে লুকোনো আছে, সেটা আপনি বারান্দায় টাঙিয়ে রাখবেন না, এটা বোঝা তার পক্ষে খুবই সহজ। কারণ আগেই বললুম, সে ধরেই নিয়েছে, ছড়াটার মর্ম আপনি জানেন।

রায়মশাই বললেন,—ঠিক। আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এ ঘরের এতগুলো ঘড়ি কতবার অয়েলিং করানো হয়েছে, কোনওটার মধ্যে তো কিছু পাওয়া যায়নি। এমনকী অচল তিনটে ঘড়ির মধ্যেও কিছু নেই।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, — এবার চলি। আপনার ওপর আপাতত হামলার সম্ভাবনা নেই। আমার পক্ষে বনবাংলোতে থাকা এখন উচিত। কারণ আমি আপনার বাড়িতে থাকলে আমার গতিবিধির ওপর লোকটা নজর রাখতে পারবে। তাই আমি বাইরে থেকেই আপনার জন্য কাজ করে যাব। হ্যাঁ— গোপনে আড়িপাতা যন্ত্রটার মধ্যে থেকে টেপরেকর্ডার বের করে নিয়ে টেপরেকর্ডারে বাজিয়ে শুনবেন। তারপর আমাকে জানাবেন, কী- কী কথা শুনলেন। এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

বলে কর্নেল বেরুলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম।

পোড়োখনির বন্দি

বনবাংলোয় ফিরে কর্নেল ইসমাইলকে বললেন,— আজ আর গাড়ির দরকার হবে না। তুমি মুখার্জিসায়েবকে বোলো, কাল সকালে আমরা পানাগড় যেতে চাই। যদি অসুবিধে না হয়, তিনি যেন তোমাকে গাড়ি দিয়ে পাঠান।

ইসমাইল বলল,—ফাস্টকেলাস রোড হয়েছে সার! পানাগড় যেতে দো ঘণ্টাভি লাগবে না। আমি মুখার্জিসাবকে জরুর তলব দিচ্ছি।

সে সেলাম ঠুকে গাড়ি নিয়ে চলে গেল। আকাশে টুকরো-টুকরো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। তাই মাঝে-মাঝে রোদ মাঝে-মাঝে ছায়া পড়ছে। এগারোটা বাজে। সুখরাম এসে সেলাম দিয়ে জানতে চাইল, কফি লাগবে কি না। কর্নেল বললেন, — না সুখরাম! আর কফি নয়। সাড়ে বারোটা নাগাদ লাঞ্চ খাব।

সে বলল, — আস্নান করলে পানি বাথরুমের চৌবাচ্চায় পাবেন সার! ভরতি করে দিয়েছি।

ঠিক আছে। — বলে কর্নেল বাইনোকুলারে পশ্চিমদিকে পোড়োখনি এলাকা দেখতে থাকলেন।

বললুম, — হঠাৎ ওদিকে কী দেখছেন?

— লাল ঘুঘুর ঝাঁক।

— আপনি একবার বলেছিলেন লাল ঘুঘুর ঝাঁক খুব অলুক্ষণে।

— হ্যাঁ। যতবার যেখানে লাল ঘুঘুর ঝাঁক দেখেছি, ততবার সেখানে—

বলে তিনি হঠাৎ থেমে বাইনোকুলার নামালেন। তারপর ঘরে ঢুকে আওড়ালেন :

'হিকরি ডিকরি ডক
নকড়ি ছকড়ি ক্লক
ধরোটি বারোটি পাক
বাজিলে চিচিং ফাঁক'

বললুম, — আগের দিনের লোকেরা বড্ড হেঁয়ালির জট পাকানো ধাঁধা তৈরি করত।

কর্নেল বললেন,— হ্যাঁ। আজকাল কিছু গোপন রাখতে হলে যেমন কম্পিউটারে ডাটা ফিড করিয়ে কোডনাম্বার রাখা হয়। কোডনাম্বার না জানলে তুমি বুঝতেই পারবে না কী তথ্য লুকোনো আছে।

— আচ্ছা কর্নেল, রায়মশাইয়ের শত্রুপক্ষ কোথাও ওত পেতে নিশ্চয় বাগিং যন্ত্র উদ্ধার দেখে ফেলেছে!

অসম্ভব নয়। — বলে তিনি হাসলেন : তুমিই ওটা ছিঁড়েছ। কাজেই সাবধান! তোমার সিক্স রাউন্ডার রিভলভার সবসময় তৈরি রাখবে।

— কাল রাতের ব্যাপারটা এমন অভাবিত যে তৈরি ছিলুম না!

— তৈরি থাকা উচিত ছিল। আমার সামরিক জীবনের শিক্ষা জয়ন্ত! যুদ্ধের মধ্যে পা বাড়ানোর মুহূর্ত থেকে তৈরি থাকতে হয়। তৈরি ছিলুম বলেই বর্ধমান স্টেশনে ভূতনাথ হাজরা ওরফে কালীনাথ রায়চৌধুরির মতলব টের পেয়েছিলুম।

— কাল পানাগড়ে কি তার খোঁজেই যাবেন?

— জানি না কার খোঁজে যাব। তবে রায়মশাইয়ের পিসতুতো বোনের সঙ্গে আগে দেখা করব।

কর্নেল সপ্তাহে বড়জোর দু'দিন স্নান করেন। শীতকালে তো মাসে মাত্র দু'দিন। স্নান না করে ওঁর কোনও অসুবিধে হয় না। সামরিক জীবনের অভ্যাস।

কিন্তু আমি স্নান না করে থাকতে পারি না। বাংলোর পেছনে কুয়ো আছে। টিলার গায়ে কুয়ো শুনে অবাক হয়েছিলুম। কর্নেলের কাছে জানতে পারলুম, ওটা একটা প্রস্রবণ ছিল। কুয়োর মধ্যে তাকে ভরে বাড়তি জল নালা দিয়ে নিচের ঝরনায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

জলটা যেমন স্বচ্ছ, তেমনি ঠান্ডা। আরামে স্নান করলুম। তারপর সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ সেরে ঘুমোনোর জন্য বিছানায় বসেছি, কর্নেল বললেন, — আজ ভাতঘুম নয়, জয়ন্ত! আধঘন্টা পরে বেরুব।

— কোথায় বেরুবেন? বৃষ্টি হতে পারে যে-কোনও সময়। বর্ষাতি আনিনি।

— বৃষ্টি নামলে মাথা বাঁচানোর প্রচুর জায়গা পাবে।

— কোথায়?

— পোড়োখনি এলাকায় প্রচুর গুহার মতো জায়গা আছে।

— ওখানে কেন যাবেন?

— আশ্চর্য জয়ন্ত! আমরা কি নিছক বেড়াতে এসেছি? হ্যাঁ— আবার বলছি, তৈরি হয়ে থেকো যেন।

আধঘন্টা পরে যখন কর্নেলের সঙ্গে ফুলেফেঁপে-ওঠা ঝরনার তীর দিয়ে হাঁটছিলুম, তখন আকাশ মেঘলা। কিন্তু বৃষ্টির জন্য নয়, খানা-খন্দে ভরা দুর্গম এলাকা আর প্রকাণ্ড সব পাথরের আড়ালে ভূতনাথ হাজরা ওরফে কালীনাথের চেলারা ওত পেতে আছে বলে মুহুর্মুহু গা-ছমছম করছিল। কর্নেল মাঝে-মাঝে কোনও ঢিবিতে উঠে বাইনোকুলারে লক্ষ রাখছিলেন। যেতে-যেতে গুহার মতো একটা করে খনির গহ্বর চোখে পড়ছিল। অনেক গহ্বরের মুখে পাথর আটকানো। কিছুক্ষণ পরে ঝরনাটাকে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে যেতে দেখলুম।

ঢিবির ওপর এবং পাথরের ফাঁকে ঝোপঝাড়, কোথাও বা গাছ। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল কেউ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। গত রাত্রে আসার পথে দুটো লোকের হাতে যে চকচকে ধারালো অস্ত্র দেখেছি, তা বারবার মনে পড়ছিল।

একসময় চাপাস্বরে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,— আমরা কোথায় যাচ্ছি?

কর্নেল শুধু বললেন,— চুপ।

একটু পরে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে থাকল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা পাথুরে ঢিবির গুহায় ঢুকে টর্চের আলো জ্বাললেন। ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার ছিল। বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে এই গুহাটা ভালো একটা আশ্রয় বটে, কিন্তু এ যেন এক সুড়ঙ্গ। সামনে বাঁক নিয়ে পাতালে নেমে গেছে। গুঁড়ি মেরে বসে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, — এটা ছিল ডলোমাইটের খনি। খনিমুখ সিল করা ছিল পাথর দিয়ে। বছর পাঁচেক আগে এসে তা দেখেছিলুম। এখন দেখছি কেউ বা কারা পাথরগুলো সরিয়েছে। আরে! এগুলো কী?

বলে তিনি কাছেই টর্চের আলোতে কয়েকটুকরো পুঁটলিপাকানো কাগজ কুড়িয়ে নিলেন। তারপর শুঁকে দেখে একটু হেসে বললেন, — নিষিদ্ধ মাদক হেরোইনের পুরিয়া। কারা এখানে এসে হেরোইন খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে।

বললুম, — সুখরাম বলছিল দু'দিন আগে এই এলাকায় পুঁটু আর রাজুকে দেখেছে।

তাহলে তারাই। — বলে কর্নেল টর্চ জ্বেলে গুঁড়ি মেরে কিছুটা এগিয়ে গেলেন।

আমিও টর্চ জ্বেলে তাঁকে অনুসরণ করলুম। তারপর দেখি, সামনে কুয়োর মতো গহ্বর। কর্নেল টর্চের আলোয় সেই গহ্বরটা দেখতে - দেখতে বললেন, — মাত্র ফুট ছ-সাত গভীর। ওই দেখো, তলায় আবার সুড়ঙ্গের মতো পথ। ডলোমাইটের গুঁড়ো পড়ে আছে।

কথাটা বলেই তিনি বাঁদিকে সরে গেলেন এবং আমাকেও ঠেলে সরালেন। চমকে উঠে বললুম, — কী?

— আলো নেভাও!

কর্নেল টর্চ নিভিয়েছিলেন সঙ্গে-সঙ্গে। আমিও নিভিয়েছিলুম। কিন্তু নেভাবার মুহূর্তে যা দেখলুম, আমার সারা শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে গেল যেন। রিভলভারটা আগেই বের করে ডান হাতে রেখেছিলুম। ইচ্ছে করছিল ট্রিগার টেনে গুলি করি। একটা প্রকাণ্ড মোটা সাপ গহ্বর থেকে সবে মাথাটা আমাদের ডানদিকে তুলে উঠে আসছিল।

কর্নেল কিছুক্ষণ পরে টর্চের আলো ফেললেন পেছনে, যেদিক থেকে আমরা ঢুকেছি। এবার দেখলুম সাপটা গুহামুখের দিকে চলেছে। কর্নেল বললেন, — পাইথন। বাংলায় বলা হয় ময়াল সাপ। সংস্কৃত ভাষায় একেই বলে অজগর। কারণ এই সাপ অজ অর্থাৎ ছাগলজাতীয় প্রাণী গিলে খায়।

সাপটার লেজের দিকে আলো। তাই গুহা থেকে সোজা বেরিয়ে গেল। চোখে আলো পড়লে নিশ্চয়ই ঘুরে আমাদের গিলতে আসত। বললুম, — কী ভয়ঙ্কর জায়গা! পুঁটু আর রাজু এর পাল্লায় পড়লে কী হতো?

কর্নেল বললেন, —পাইথন এমনিতে নিরীহ সাপ। মানুষ ওর খাদ্য নয়। কিন্তু ওর গায়ে পা পড়লে পা জড়িয়ে ধরে হাড় গুঁড়ো করে দেয়। তবে ক্ষুধার্ত হলে মানুষের ঠ্যাং গিলতে দ্বিধা করে না।

বললুম,—তাহলে আমরা জোর করে বেঁচে গেছি!

—নাহ্! নির্বিষ সাপ। চোখে কয়েক সেকেন্ডের আলো পড়ার জন্য এই গর্ত থেকে ওঠার মুখে একটু থমকে গিয়েছিল। আলো জ্বেলে রাখলে চোখ ধাঁধিয়ে যেত ওর। একখানে স্থির থাকত। সাপটাকে আমি চলে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি।

গুহার বাইরে বৃষ্টিটা ততক্ষণে থেমে গিয়েছিল। আমরা বেরিয়ে গিয়ে আবার সাপটাকে দেখতে পেলুম। একটা প্রকাণ্ড পাথরের পাশে ঝোপের ভেতর সাপটা ঢুকে যাচ্ছিল।

কর্নেল বললেন, — সাপটা এই গুহায় থাকে সম্ভবত। এবেলা হয়তো খরগোশের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। এলাকায় প্রচুর খরগোশ, শেয়াল আর খেঁকশিয়াল বাস করে।

বলে তিনি আবার হাঁটতে থাকলেন! এবার দু'ধারে ঢিবি। মধ্যিখানে সংকীর্ণ জায়গায় সাবধানে পা ফেলে আমরা এগিয়ে গেলুম।

এঁকেবেঁকে কিছুদূর চলার পর ডাইনে এতক্ষণে ঝরনাটাকে দেখতে পেলুম। একটা শেয়াল ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে তক্ষুনি উধাও হয়ে গেল। কর্নেল বললেন, — শেয়ালটা মাছের আশায় ওত পেতে ছিল। ঝরনায় প্রচুর মাছ আছে।

— শেয়াল মাছ খায়?

কর্নেল হাসলেন, — শেয়াল কী খায় না?

ঝরনা ডাইনে রেখে তিনি বাঁদিকে বটগাছের গুঁড়ির নিচে দুটো লোক দেখেছিলুম। তারা আদিবাসী নয়। কাজেই ব্যাপারটা দেখা দরকার।

বাঁদিকে আবার একটা ঢিবি আর তার ওপর ঝাঁকড়া বেঁটে বটগাছ। ঢিবির গায়ে গুহায় মতো সেইরকম গোলাকার সুড়ঙ্গ। বুঝলুম, এটাও কোনও পোড়ো খনি। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে ঢিবিতে উঠে গেলেন। তারপর বটগাছটার গুঁড়ির নিচে প্রকাণ্ড শেকড়ের পাশে অনেকগুলো সিগারেটের ফিলটারটিপ চোখে পড়ল।

কর্নেল একটা আধপোড়া এবং গুঁড়িতে ঘষে নেভানো সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে আতশ কাচ দিয়ে দেখে বললেন, — সিগারেটটা বিদেশি। ফাইভ ফাইভ ফাইভ। লোকটা শৌখিন।

অমনি মনে পড়ে গেল। বললুম, — কর্নেল! ট্রেনে ভূতনাথ হাজরা এই ব্রান্ডের প্যাকেট বের করেছিল।

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। বললেন, — হ্যাঁ। বাইনোকুলারে তাকেই দেখেছিলুম। যাই হোক, এখানে সঙ্গে সেই ছোকরাকে নিয়ে সে বসেছিল কেন, সেটাই কথা। চলো, নিচের খনিমুখে ঢুকে দেখা যাক কিছু সূত্র মেলে নাকি।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, বটগাছের অন্য পাশে খানিকটা ছাই। বৃষ্টিতে ভিজে কাদা হয়ে আছে। বললুম, — কর্নেল! এখানে ওরা আগুন জ্বেলেছিল!

কর্নেল বললেন, — দেখেছি জয়ন্ত! এসো।

নিচে নেমে খনিমুখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখলুম, এটাও পাথর দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কিন্তু কারা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরগুলো সরিয়ে ফেলেছে, তা স্পষ্ট। সেই পাথরের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে টর্চ জ্বেলে কর্নেল আগে ঢুকলেন। তারপর আমি। ভেতরটা পরিষ্কার। তারপরই কর্নেল বলে উঠলেন, — কী একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। এসো তো দেখি।

সুড়ঙ্গটা বেশ লম্বা এবং আঁকাবাঁকা। আমার কানেও ভেসে এল শব্দটা। কতকটা 'উঁ' আঁ উঁ আঁ এই ধরনের। যেন কোনও প্রাণী গোঙাচ্ছে। দুটো বাঁক ঘুরেই কর্নেল বলে উঠলেন, — কী সর্বনাশ!

টর্চের আলোয় দেখলুম, একটা লোক খালি গায়ে পড়ে আছে উপুড় হয়ে। তার পরনে গেরুয়া একটুকরো খাটো কাপড় কোনওরকমে জড়ানো এবং আন্ডারপ্যান্ট দেখা যাচ্ছে। তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। পাশেই পড়ে আছে জটাজুট— অর্থাৎ পরচুলা। তার হাতের বাঁধন কর্নেল ছুরি দিয়ে কেটে বাকি দড়িগুলো খুলে ফেললেন। তারপর তাকে চিত করে শোয়ালেন। অমনি চমকে উঠে বললুম, — সর্বনাশ! হালদারমশাই যে!

তাঁর মুখে টেপ সাঁটা ছিল। কর্নেল টেপ খুলে ফেলতেই তিনি উহু হু হু আর্তনাদ করলেন। সত্যিকার গোঁফের সঙ্গে টেপ আটকানো ছিল। কর্নেল বললেন, — উঠে পড়ুন হালদারমশাই।

হালদারমশাই অতিকষ্টে উঠে বসে বললেন, — স্বপ্ন? না সত্য?

সত্য হালদারমশাই!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার বললেন, — বুঝি না ক্যান যে দুই হালায় আচমকা আমারে বাঁধল? কইলাম, আমি সন্ন্যাসী। আমারে বান্ধো ক্যান? ওহ্!

—আপনি বটতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিলেন, তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ওখানে কেন বসেছিলেন?

—সব কমু। আমারে জল খাওয়ান। আর বটের গুঁড়ির ওপর আমার ব্যাগ লুকানো আছে। তাতে আমার জামাপ্যান্ট আছে। চলেন, পোশাক পরব।

জলের বোতল কর্নেলের কিটব্যাগে ছিল। জল খেয়ে অতিকষ্টে হালদারমশাই আমাদের সঙ্গে বেরুলেন। তারপর ঢিবিতে উঠে বটতলায় গিয়ে লম্বা হাত বাড়িয়ে গুঁড়ির ওপরদিক থেকে কিটব্যাগ পেড়ে নিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, — আপনার রিভলভার ছিল। সেটা ব্যবহার করেননি কেন?

হালদারমশাই গেরুয়া কাপড়টুকু ফেলে দিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরতে পরতে বললেন, — হাতের কাছে রাখি নাই জয়ন্তবাবু! আমি ভাবি নাই দুই শয়তান আচমকা আমার উপরে হামলা করব! রিভলভার এই শেকড়ের তলায় রাখছিলাম।

কর্নেল ওদিকে মোটা শেকড়ের তলার ফাঁক থেকে তাঁর রিভলভারটি বের করে তাঁকে দিলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, — বড় ক্ষুধা পাইছে।

কর্নেল বললেন, — চলুন! বাংলো পর্যন্ত কষ্ট করে গেলেই খেতে পাবেন।

বললুম, — আপনি সম্ভবত কয়েক ঘন্টা ওই অবস্থায় বন্দি ছিলেন। হাঁটতে পারবেন তো?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন, — কী যে কন জয়ন্তবাবু! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। বারবার ট্রেনিং লইছি। একটু আস্তে হাঁটব এই যা। পাও দুখান অবশ হইয়া গেছে।

বলে তিনি দুই ঠ্যাং ছুড়ে রক্ত চলাচল ঠিক করলেন। তারপর আর্তস্বরে বললেন, — কিন্তু আমার জুতা? জুতা কই গেল?

কর্নেল বললেন, — জুতোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সাবধানে আস্তেসুস্থে চলুন।

অজগরের ডেরায় চোরাই মাল

বনবাংলোয় ফিরতে প্রায় পাঁচটা বেজে গিয়েছিল। সিদ্ধেশ্বর ও সুখরাম হালদারমশাইকে দেখে অবাক হয়েছিল। কর্নেল সিদ্ধেশ্বরকে তাঁর অতিথির জন্য শিগগির কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। ইতিমধ্যে হালদারমশাই স্নান করে কর্নেলের চটি পরে ধাতস্থ হয়েছিলেন। সিদ্ধেশ্বর ফুলকো লুচি আর দুপুরের একটা তরকারি দিয়ে গিয়েছিল। খেতে-খেতে হালদারমশাই তাঁর কাহিনি শোনাচ্ছিলেন।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে তিনি সেদিন বাড়ি যান। তারপর সেজেগুজে বেরিয়ে হাওড়ায় সাড়ে বারোটার ট্রেন ধরেন। দুর্গাপুর নেমে সন্ধ্যা নাগাদ তিনি বাসে ময়ূরগড় পৌঁছে 'মা তারা' হোটেলে ওঠেন। থানায় গিয়ে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়েও প্রাইভেট গোয়েন্দা পাত্তা পাননি। পুলিশ সর্বত্র প্রাইভেট গোয়েন্দাদের নাক গলানো পছন্দ করে না। রাত্রে তিনি জমিদার-বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে হোটেলে ফেরেন।

সকালে তিনি জমিদারবাড়ি আসার সময় লক্ষ করেন, দু'জন লোক একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটির পরনে ধোপদুরস্ত একেলে পোশাক। লোকদুটো তার হাতে একটা নোটের বান্ডিল গুঁজে দিলে যুবকটি শিস দিয়ে গানের সুর

ভাঁজতে-ভাঁজতে হালদারমশাইয়ের পাশ দিয়ে ময়ূরগড়ের দিকে চলে যায়। আর সেই লোকদুটি, একজন মধ্যবয়সি বেঁটে গুঁফো এবং অন্যজন জিনস-গেঞ্জি পরা ছোকরা, অসমতল মাঠের দিকে হন্তদন্ত হেঁটে চলে যায়। ব্যাপারটা রহস্যজনক। তাই হালদারমশাই ওদের অনুসরণ করেন।

কিছুক্ষণ পরে তাদের দেখতে পান ওই ঢিবির ওপর বটগাছের তলায়। তখন হালদারমশাই গুঁড়ি ঘিরে পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে ঢিবির তলায় পৌঁছান। তাঁর কানে আসে, ওরা ঘড়ি নিয়ে কথাবার্তা বলছে। কিছুক্ষণ পরে তারা ঢিবি থেকে নেমে উল্টোদিকে চলে যায়। ঢিবিতে চড়ে হালদারমশাই তাদের আর দেখতে পাননি। তখন তাঁর সন্দেহ হয় ওরাই ঘড়ি চোর আর কাছাকাছি কোথাও ওদের গোপন ডেরা আছে। তাই তিনি চটপট নকল জটাজুট গোঁফদাড়ি পরে যথারীতি সন্ন্যাসী সেজে বটতলায় বসে থাকেন। কিটব্যাগে পোশাক খুলে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন। রিভলভার তো পাশে শেকড়ের তলায় ছিল। তিনি বটতলায় শুকনো কিছু পাতা ও কাঠকুটো কুড়িয়ে অনেক কষ্টে আগুন জ্বেলে ধুনি তৈরি করেন। পাতা-কাঠকুটো ভিজে ছিল। অনেক চেষ্টার পর আগুন জ্বলে ওঠে।

সন্ন্যাসীবেশী হালদারমশাই সতর্কভাবে লক্ষ রেখেছিলেন চারদিকে। অথচ কীভাবে যে লোকদুটো চুপিসাড়ে কখন ঢিবিতে উঠেছে, তিনি দেখতে পাননি। আসলে তখন বৃষ্টি পড়ছিল। তাই তিনি মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই সুযোগে আচমকা তারা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে কাবু করে ফেলে। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাঁর মুখে টেপ সেঁটে তারা তাঁকে ধরাধরি করে নামিয়ে নিয়ে গুহার ভেতর উপুড় করে ফেলে রাখে। মধ্যবয়সি লোকটা বলে, — ব্যাটা টিকটিকি! তোমাকে দেখেই টের পেয়েছিলুম কে তুমি। এই বটতলায় কস্মিনকালে সাধুসন্ন্যাসী দেখিনি। এটা পোড়ো খনি এলাকা। এখানে সাধুবাবা আসবেন কেন? থাকো তুমি। এবার অজগর সাপ এসে তোমাকে গিলে খাক।

ছোকরাটি যাওয়ার সময় বলছিল,— বাবু! অতগুলো ঘড়ি বয়ে নিয়ে যাবেন কী করে? কাল্লু-গুল্লুকে খবর দিন। আমরা চারজনে একে-একে ভাগাভাগি করে নিয়ে যাব। আপনার গাড়িতে তুলব সন্ধ্যাবেলা।

গুঁফো বলছিল, — কাল্লু - গুল্লু ভিতুর ভিতু! ওরা বলেছে, আর আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। গতরাতে তারা নাকি গুলি খেতে-খেতে বেঁচে গেছে।

—তাহলে এক কাজ করুন। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ গাড়িটা যতটা সম্ভব কাছাকাছি এনে রাখুন। আমরা দু'জনে কিছু কিছু করে বয়ে নিয়ে যাব।

—ঠিক বলেছ ছোট্টু। ওখানে আবার ওরা দু'জনে লুকিয়ে নেশা করতে আসে। ওরা সন্ধ্যার আগেই চলে যাবে। তখন আর অসুবিধে নেই।

এই অভিজ্ঞতার কথা বলে গোয়েন্দাপ্রবর হঠাৎ নড়ে বসলেন, — হঃ! জুতার কথা মনে পড়ছে। জুতাজোড়া ঝোপের মইধ্যে লুকাইয়া রাখছিলাম।

কর্নেল চুরুট টানতে টানতে মন দিয়ে কথাগুলি শুনছিলেন। ঘড়ি দেখে বললেন, — তাহলে আমাদের সন্ধ্যা ছটায় বেরুতে হবে। বৃষ্টি-বাদলা যা-ই হোক রায়মশাইয়ের চুরি যাওয়া অ্যান্টিক ঘড়িগুলো কোথায় লুকানো আছে বুঝতে পেরেছি।

বললুম, — পুলিশকে খবর দিলে ভালো হতো না?

সময় নেই।—বলে কর্নেল বারান্দায় গিয়ে আকাশ দেখলেন। তারপর বাইনোকুলারে পোড়োখনির এলাকা দেখতে থাকলেন।

তারপর ঘরে ঢুকে বললেন, — বরং চোরের ওপর বাটপাড়ি করা যাক। হালদারমশাই! আপনি বরং বিশ্রাম করুন। আমরা এখনই বেরুচ্ছি।

গোয়েন্দাপ্রবর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন, — আমিও যামু। জুতা! আমার জুতাজোড়া!

—পারবেন তো হাঁটতে?

—কর্নেলস্যার কী যে কন! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশ লাইফের এক্সপিরিয়েন্স!

সুখরামকে ঘরে তালা এঁটে রাখতে বলে কর্নেল বেরুলেন। তাঁর পেছনে উত্তেজিত হালদারমশাই এবং তাঁর পেছনে আমি। আগে যে পথে গিয়েছিলুম, সেই পথে হেঁটে চললুম আমরা।

আধঘন্টা পরে কর্নেল যেখানে থমকে দাঁড়ালেন, সেখানে বৃষ্টির জন্য মাথা বাঁচাতে আমরা গুহা অর্থাৎ পোড়োখনিমুখে ঢুকেছিলুম। সাপটার কথা মনে পড়ে গা-ছমছম করছিল। কিন্তু কর্নেল চারদিক বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে গুহার ভেতর টর্চ জ্বেলে ঢুকলেন। তারপর আস্তে বললেন, — যে গর্ত থেকে সাপটা উঠেছিল, সম্ভবত সেই গর্তে ঘড়িগুলো আছে।

তিনি টর্চ জ্বেলে সেই প্রকাণ্ড গর্তের ভেতর আলো ফেললেন এবং লাফ দিয়ে নামলেন। গর্তটা যে ছ'ফুটের বেশি নয় তা কর্নেলের মাথার মাপে বোঝা গেল। তিনি বললেন, — বস্তায় ভরা আছে। এই বস্তাটাকে জড়িয়ে সম্ভবত সাপটা শুয়ে ছিল। এটাই সাপটার ডেরা। হালদারমশাই! জয়ন্ত! আমি বস্তাটা তুলে ধরছি। আপনারা নিঃশব্দে টেনে নেবেন। তারপর জয়ন্ত তুমি গুহার বাইরে গিয়ে লক্ষ রাখবে।

তিনি দু-হাতে ঘড়ি বোঝাই বস্তাটা তুলে ধরলেন। ছ'টা ঘড়ি বেশ ওজনদার। বস্তাটা ওপরে তোলার পর আমি বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। রিভলভার হাতে নিয়ে লক্ষ রাখলুম।

একটু পরে দেখি, হালদারমশাই কুঁজো হয়ে বস্তাটা কাঁধ থেকে পিঠে ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসছেন।

ফেরার পথে তিনি বস্তাটা কর্নেল বা আমাকে বইতে দিলেন না। প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টরের পেটাই ট্রেনিংপ্রাপ্ত শরীর। পথে শুধু বার দুই কাঁধবদল করলেন এই যা।

বাংলোয় ফিরে দেখি, সুখরাম অবাকচোখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। বাংলোর গেটে উঠতে কিন্তু হালদারমশাই এবার হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। বললেন, — খালি টিক-টিক কড়াক্-কড়াক্ শব্দ হয় ক্যান?

বস্তাটা সুখরাম এসে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে বলল, — ইয়ে কৌন চিজ আছে কর্নেলসাব?

কর্নেল বললেন, — কাউকে যেন বোলো না সুখরাম। তোমার চাকরি চলে যাবে। এ হল জমিদারবাড়ির চোরাই ঘড়ি। গর্তে লুকিয়ে রেখেছিল চোর!

হায় রামজি! — বলে সুখরাম কপালে করাঘাত করল।

—তুমি সিদ্ধেশ্বরকে বলো, তিনকাপ কফি চাই।

—জি কর্নেলসাব!

কর্নেল ঘরের মেঝেয় বস্তার মুখ খুলে একটা করে নানা সাইজের ঘড়ি বের করলেন। ছ'টা ঘড়ি বের করে বললেন, — হালদারমশাই বলছিলেন, টিক-টিক কড়াক্-কড়াক্ শব্দ হচ্ছে কেন? সেকালের দক্ষ কারিগরের হাতে তৈরি সব বিদেশি ঘড়ি। ঝাঁকুনি খেয়ে কোনও-কোনওটা চালু হয়ে গিয়েছিল। দম ফুরিয়ে গেছে। তবু এত সূক্ষ্ম এগুলোর যন্ত্রপাতি যে নড়াচড়া করলেই কিছুক্ষণ চালু থাকে।

সিদ্ধেশ্বর কফির ট্রে এনে ঘড়িগুলি দেখেই মাতৃভাষায় বলে উঠল, — হা জগড়নাথঃ!

কর্নেল বললেন, — সিদ্ধেশ্বর! তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

উত্তেজিত সিদ্ধেশ্বর বলল, — বলুন সার!

— তুমি এখনই সাইকেলে চেপে থানায় যাও। আমার এই কার্ডটা ও. সি. বা কোনও

অফিসারকে দেখিয়ে শুধু বলবে, ইনি জমিদারবাড়ির হারানো ঘড়ি উদ্ধার করেছেন। আপনারা এখনই আসুন। আর বলবে, ওঁরা যেন টেলিফোনে কথাটা রায়মশাইকে অবশ্যই জানিয়ে দিয়ে এখানে চলে আসেন।

সিদ্ধেশ্বর তখনই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল সহাস্যে বললেন, — ঘড়িগুলো উদ্ধারে আমার কোনও কৃতিত্ব নেই। সব কৃতিত্ব আমাদের প্রিয় হালদারমশাইয়ের।

গোয়েন্দাপ্রবর কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, — কিন্তু আমার জুতা? ঘড়ি জুতার কথা ভুলাইয়া দিল।

—জুতো কাল সকালে গিয়ে উদ্ধার করবেন।

—কিন্তু যারে টাকা দিতে দেখছি, সেই ছ্যামড়াটা কে?

কর্নেল হাসলেন, — তাকে যথাসময়ে দেখতে পাবেন।

বললুম, — ভুতনাথ কেন এতদিন পরে টাকা দিল তাকে?

—সম্ভবত কিস্তিতে দিচ্ছে। তবে যথাসময়ে এসব কথা জানা যাবে।

—আচ্ছা কর্নেল, ওই যুবকটি পুঁটু নয় তো?

—আবার কে হতে পারে? সঙ্গে বোধ করি রাজও আছে। দু'জনেই হেরোইন খায়।

বললুম, — ঠিক বলেছেন। সুখরাম দু'জনকে ওই এলাকায় দেখেছিল।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, — কিন্তু 'হিকরি ডিকরি ডক' এবার দেখছি আমাকে গণ্ডগোলে ফেলে দিল।

—কেন বলুন তো?

—তখন রায়মশাইকে বলছিলুম, ঘড়ি চোর আর এই ছড়া লিখে পাঠানো লোক, যে টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র বসিয়েছিল, তারা আলাদা। এখন দেখছি, সেই ভুতনাথ অর্থাৎ পানাগড়ের ব্যবসায়ী কালীনাথ চোরাই ঘড়ি কিনেছে এবং সে-ই কিনা আমাকে ময়ূরগড়ে আসতে দু-দু'বার বাধা দিয়েছিল। তার মানে সে জানত আমি ময়ূরগড়ে আসছি। এ-ও জানত, আমি কে। অতএব আড়িপাতা যন্ত্রে সে রায়মশাইয়ের আমাকে ট্রাংকল করা শুনেছিল। শোনার পরই কলকাতা ছুটে গিয়েছিল। তা-ই মনে হয় না?

—হ্যাঁ। কলকাতা থেকে সে তার চেলাকে নিয়ে আমাদের ফলো করেছিল, এটা তো স্পষ্ট।

কর্নেল চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসে চুরুট টানতে থাকলেন। বুঝলুম, রহস্যভেদী রহস্যের সুড়ঙ্গে ঢুকে অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। একটু পরে তিনি চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন,—নাহ্ জয়ন্ত! আমার থিয়োরি ঠিক। ছড়া লিখে যে হুমকি দিচ্ছে, সে দ্বিতীয় লোক। ভুতনাথ ওরফে কালীনাথের অগোচরে সে তাকে কাজে লাগিয়েছে। কালীনাথ— আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার টোপ গিলেছে। অ্যান্টিক ঘড়ি বেচে সে প্রচুর টাকা কামাবে। কিন্তু কালীনাথ ছড়া - রহস্য জানে না।

হালদারমশাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটিপ নস্যি নিলেন। নস্যির কৌটো তাঁর ব্যাগে ছিল। উত্তেজনায় তাঁর গোঁফ তিরতির করে কাঁপছিল।

থানা থেকে পুলিশের জিপ এসে ঢুকল, তখন প্রায় সাতটা বাজে। একজন পুলিশ অফিসার নেমে এসে কর্নেলকে সহাস্যে নমস্কার করে বললেন, —নমস্কার স্যার! আমি ও. সি. দীপক ভদ্র। কাল রাত্রেই বর্ধমান থেকে এই রেঞ্জের ডি. আই. জি. মিঃ অরবিন্দ বোস আপনার আগমনের কথা আমাকে জানিয়েছিলেন। আমার বড় সৌভাগ্য, এতদিনে আপনাকে চর্মচক্ষে দর্শন করলুম।

কর্নেল বললেন, — একটু দেরি হয়ে গেছে। তবু যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, ঘড়ি-চোরদের ধরা যাবে। সাড়ে সাতটা নাগাদ ওদের গাড়ি আসবে ওই খনি এলাকার কাছাকাছি। এই ঘড়িগুলো নিয়ে যেতেই তারা আসবে। কাজেই কোনও গাড়ি ওই এলাকায় দেখলেই—।

কর্নেলের কথার ওপর দীপক ভদ্র বললেন, — নো প্রবলেম স্যার! আমার কাছে সেলুলার ফোন আছে। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার অপরাধ দমনের জন্য সরকার আমাদের আধুনিক সরঞ্জাম দিয়েছেন। আমি আমার উপযুক্ত সহকর্মীকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি।

ও. সি. বারান্দার একপ্রান্তে গিয়ে পকেট থেকে সেলুলার ফোন বের করে তার খুদে অ্যান্টেনা টানলেন এবং বোতাম টিপে চাপাস্বরে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে ঘড়িগুলো দেখে বললেন, — এ যে লক্ষ-লক্ষ টাকার ঘড়ি কর্নেলসায়েব! এ সব অ্যান্টিক ঘড়ি চোরাপথে বিদেশে চালান যায়। কী করে এগুলো উদ্ধার করলেন?

কর্নেল বললেন,—আমি উদ্ধার করলেও এগুলোর খোঁজ পেয়েছিলুম এই ভদ্রলোকের কাছে। ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আমাদের প্রিয় হালদারমশাই।

হালদারমশাই সুযোগ পেয়ে ক্ষোভে বললেন, — থানায় প্রথমে গিয়েছিলাম। আপনারা আমারে পাত্তা দ্যান নাই।

ও. সি. দীপক রুদ্র জিভ কেটে সহাস্যে বললেন, — ভেরি সরি মিঃ হালদার! আসলে আমাদের কাজে প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ঢুকতে দেওয়ার রিস্ক আছে। কে কোন ছলে ঢোকে। যাই হোক, আমি এজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

হালদারমশাই তখন খুশি হয়ে বললেন,—মশয়! চৌতিরিশ বৎসর আমি পুলিশে চাকরি করছি। ইন্সপেক্টর হইয়া রিটায়ার করছিলাম। তো এখনও শরীর ফিট আছে। তাই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুললাম।

দীপক ভদ্র বললেন, কী কাণ্ড! সব কথা আপনার খুলে বলা উচিত ছিল।

কর্নেল হাসলেন,—ঘড়ি উদ্ধার কাহিনি আগে শুনুন দীপকবাবু! তাহলে বুঝবেন হালদারমশাই কী সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছিলেন।

বলে তিনি হালদারমশাইয়ের সব ঘটনা ও. সি.-কে শোনালেন। এই সময় তাঁর সেলুলার ফোন বিপ্-বিপ্ শব্দ করতে থাকল। তিনি দ্রুত অ্যান্টেনা টেনে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, — ওকে শ্যামলবাবু! ওয়েলডান!... দুজন? ...ও! বুঝেছি, এ সেই কুখ্যাতমস্তান ছোকরা ছোট্টু... গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যান। ... পানাগড়ের ব্যবসায়ীটিকে জেরা করা দরকার। এই এলাকা থেকে অনেক অ্যান্টিক মূর্তি চুরির কেস আছে। বোধ করি, ইনিই তিনি। .... হ্যাঁ। আমি ঘড়িগুলো নিয়ে এখনই বেরুচ্ছি। ওভার।

গ্রিক দেবতা কিউপিড

এ রাতে হালদারমশাইকে সুখরাম পাশের ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। খাওয়ার পর কর্নেল তাঁকে জোর করে শুতে পাঠালেন। বললেন, — আপনার ঘুম দরকার হালদারমশাই! তাহলে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করতে পারবেন। অবশ্য আর আপনার তত চিন্তাভাবনার দরকার নেই। শুধু প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করবেন। মূল রহস্য এখনও ফাঁস করা যায়নি, তা তো বললুম আপনাকে। হ্যাঁ— দরজা বন্ধ করতে ভুলবেন না যেন।

রাত সওয়া দশটা বাজে। আজ রাতেও ঝমঝমিয়ে এতক্ষণে বৃষ্টি নামল। কর্নেল চেয়ারে বসে মুখে জ্বলন্ত চুরুটসহ বললেন, — কী অদ্ভুত ধাঁধা! জয়ন্ত, তুমিও জট ছাড়ানোর চেষ্টা করো!

'হিকরি ডিকরি ডক
নকড়ি ছকড়ি ক্লক
ধরোটি বারোটি পাক
বাজিলে চিচিং ফাঁক'

বললুম, — এ হিং টিং ছট বোঝার চেষ্টা আমি করব না। আপনিই করুন। তো কাল সকালে কি পানাগড় যাবেন?

— নাহ্। আর যাওয়ার দরকার দেখছি না। কালীনাথের ব্যাকগ্রাউন্ড পুলিশের কাছে পাওয়া যাবে।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। চুরুট অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে দরজা এঁটে দিলেন। তারপর বাথরুমে ঢুকলেন। পোশাক বদলে রাতের পোশাক পরে তিনি টেবিলের সামনে বসলেন। টেবিলল্যাম্প জ্বেলে সেই চিঠিগুলো কিটব্যাগ থেকে বের করে বললেন, — জয়ন্ত! তুমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি এগারোটায় শোব। তার আগে আমার ঘুম আসে না তা তো জানো!

সকাল সাতটায় সুখরাম বেড-টি এনে আমাকে ডাকছিল। উঠে বসে দেখলুম, বাইরে রোদ ঝলমল করছে। কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। সুখরাম মুচকি হেসে বলল, — সিধুদাদা এখনই বাজারমে চলিয়ে গেল। কাহে কী, পুলিশ কোন-কোন আদমিকে পাকড়াল, খবর লিবে।

— তোমার কী মনে হয় সুখরাম?

— সার! সব চোরি-ডাকাতিকি পিছে বাড়ির কোই-না কোই আদমি থাকে। ওহি পুঁটুবাবু, হারামি লড়কা রাজু দোনো পাকাড় যাবে। পুলিশ তাদের ছাড়বে না, দেখে লিবেন।

আটটায় ইসমাইল গাড়ি আনল। তখন হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ল। পাশের ঘরের দরজায় তালা আঁটা। সুখরামকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, — উনহিভি কর্নেলসাবের সঙ্গেতে চলিয়ে গেছেন।

ইসমাইল পোর্টিকোর তলায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে হুমড়ি খেয়ে গাড়ির তলায় কিছু দেখছিল। এবার সে উঠে দাঁড়াল। আমাকে সেলাম দিয়ে বলল, — দেরি হইয়ে গেল সার! গাড়ির সাইলেন্সার পাইপ টুটে আওয়াজ হচ্ছিল। গ্যারিজে ঝালাই করিয়ে আনতে হল। কর্নেলসাবকে দেখছি না?

বললুম, পানাগড় যাচ্ছেন না উনি। তাই বেড়াতে বেরিয়েছেন।

ইসমাইল খৈনি বের করে ডলতে-ডলতে বাংলোর পেছনে সুখরামের সঙ্গে গল্প করতে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, সিদ্ধেশ্বর বাজার করে ফিরছে। টিলার চড়াইটুকু তাকে নেমে সাইকেল ঠেলে আনতে হচ্ছে।

লনে ঢুকে সে একগাল হেসে বলল,—রায়মশাই ঘরে চোর পুষছিলেন। তাঁর আদরের পুঁটুবাবু আর রাজুকে পুলিশ শেষরাত্রে ধরে নিয়ে গেছে। কর্নেল সায়েব আর হালদারসায়েবের সঙ্গে পথে দেখা হল। কর্নেলসায়েব দুটো অর্কিডের চারা পেয়েছেন। বললেন, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করে বেরুবেন আবার।

আরও আধঘন্টা পরে দেখলুম দুই রহস্যভেদী কথা বলতে-বলতে ফিরে আসছেন। কর্নেলের হাতে প্লাস্টিকের থলেয় ভরা মাটিসুদ্ধু অর্কিডের চারা। আর হালদারমশাইয়ের হাতে কর্নেলের চপ্পল। তাঁর পায়ে এখন নিজের জুতো। বুঝলুম, জুতো উদ্ধারের জন্যই গোয়েন্দামশাই কর্নেলের সঙ্গী হয়েছিলেন।

লনে এসে হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, — জুতা ভেজে নাই। ঝোপের মধ্যিখানে পাতা চাপাইয়া রাখছিলাম।

বললুম, — কর্নেল! পুঁটু আর রাজুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। সিদ্ধেশ্বর বলল।

কর্নেল বললেন, — রায়মশাই মনে কষ্ট পাবেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে ব্রেকফাস্ট করেই বেরুব।

ব্রেকফাস্ট করে আমরা তিনজনে বেরোলুম। ইসমাইল কর্নেলের নির্দেশে জমিদারবাড়ির দিকে গাড়ি ছোটাল। কালকের মতোই হর্ন শুনে সেই পিনাকীবাবু গেট খুলে দিলেন। তিনি গম্ভীরমুখে বলতে-বলতে এলেন, — পুঁটুবাবু আর রাজুকে পুলিশ শেষরাতে ধরে নিয়ে গেছে। এদিকে ছোট রায়মশাই এই মাত্র দুর্গাপুর থেকে এলেন। সদু দুই ভায়ের পায়ে ধরে কান্নাকাটি করছিল। কাঁদলে কী হবে? ওই ছেলের জন্য ওর কপালে কত ভোগান্তি আছে।

পোর্টিকোর তলায় একটা জিপসি মারুতি দেখতে পেলুম। ইসমাইল একটু তফাতে গাড়ি দাঁড় করাল। পিনাকীবাবু চেঁচিয়ে বললেন, — ওগো মনো! ও রায়বাবু! কর্নেলসায়েবরা এসেছেন।

রায়মশাই নিচের সিঁড়ির দরজা আটকে রেখে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। নেমে এসে গম্ভীরমুখে বললেন, — আসুন! দরজা খোলা থাক।

দোতলার বারান্দায় উঠে তিনি বললেন, — কিছুক্ষণ আগে দুর্গাপুর থেকে সুরঞ্জন এসেছে। এবার তাকেও ছড়াটা লিখে কেউ হুমকি দিচ্ছে। একই হাতের লেখা।

কর্নেল বারান্দাতেই তাঁর সঙ্গে হালদারমশাইয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর সোফায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরবয়সি এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর চেহারার সঙ্গে মনোরঞ্জনবাবু অর্থাৎ রায়মশাইয়ের তত মিল নেই। রায়মশাই তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, — সুখরঞ্জন। চিঠিটা কর্নেলসায়েবকে দেখাও!

সুরঞ্জনবাবু বুকপকেট থেকে খামে ভরা চিঠি বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠিতে চোখ বুলিয়ে বললেন, — হ্যাঁ। একই হস্তাক্ষর। যাই হোক রায়মশাই! তাহলে দেখা যাচ্ছে শনিবার সন্ধ্যায় পুঁটুবাবুই আপনার খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলেন। তিনি ভালোই জানেন, আপনি ঘুমের ওষুধ খান। রায়মশাই বললেন, — পুঁটুকে আমি আর এ বাড়ি ঢুকতে দেব না। সদুকে বলে দিয়েছি, যতই কান্নাকাটি করো, তোমার ছেলেকে এ বাড়ি ঢুকতে দেব না। তাতে তুমি চলে যাও তো যাও।

হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, — আচ্ছা সুরঞ্জনবাবু, পৈতৃক সম্পত্তিতে তো আপনারও অধিকার আছে। আপনি ঘড়ির ভাগ কেন নেননি?

সুরঞ্জনবাবু হঠাৎ এই প্রশ্নে যেন হকচকিয়ে উঠেছিলেন। আস্তে বললেন, — আমি ঘড়ি নিয়ে কী করব? আমি নিজের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত।

রায়মশাই বললেন,—তাহলে খুলে বলি। সুরঞ্জনকে ঘড়ি আমি দিইনি। তার বদলে আমার নিজের লাগানো এক একর জমির শালগাছ বিক্রি করে দেড়লাখ টাকা ওকে দিয়েছিলুম।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—আহ্ দাদা! এসব পারিবারিক কথা কেন তুমি—

রায়মশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—কেন বলব না? তুমি যখন-তখন এসে পূর্বপুরুষের লুকোনো কী মাথামুন্ডু সম্পদ দাবি করবে, যা কোথায় আছে আমি আজও জানি না।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—বাইরের লোকের সঙ্গে এসব আলোচনা আমি পছন্দ করি না।

—এটা আর ঘরের ব্যাপার হয়ে নেই সুরঞ্জন! কে আমাকে এবং তোমাকেও হুমকি দিয়ে চিঠি লিখছে। একখানা চিঠি পেয়েই তুমি মাথাখারাপ করে দৌড়ে এসেছ। আর আমি পেয়েছি পাঁচখানা চিঠি।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা রায়মশাই, একটা কথা জিগ্যেস করি। ধরা যাক, সত্যিই এ বাড়িতে কোথাও আপনাদের পূর্বপুরুষের মূল্যবান সম্পদ লোকানো আছে। তার অংশ তো সুরঞ্জনবাবুরও প্রাপ্য!

রায়মশাই আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন,—সুরঞ্জনকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমি যা দিয়েছি, তা অনেক। আমার সম্বল বলতে শুধু এই বাড়ি আর স্বোপার্জিত টাকা ব্যাঙ্কে রেখে মাসিক হাজার তিনেক টাকা সুদ। এ বাজারে কষ্টেসিষ্টে চালাতে হয়। তাছাড়া পুঁটুকে আমি তাড়িয়ে দেব। আমার মৃত্যুর পর তো সুরঞ্জনই সব পাবে।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—এটা কিন্তু ঠিক বললে না দাদা! আমার কানে এসেছে, তুমি তোমার সব সম্পত্তি একটা আশ্রমের নামে উইল করে রেখেছে।

—সেই উইল বাতিল করা বা না করা নির্ভর করছে তোমার আচরণের ওপর। বারবার এসে তুমি আমাকে উত্ত্যক্ত করে যাচ্ছ!

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রায়মশাই গিয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন,—কে?... হ্যাঁ! কর্নেলসায়েব এখানে আছেন। ...হ্যাঁ, ধরুন। দিচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—কে থানার ও.সি.।

কর্নেল ফোনে শুধু অনবরত হ্যাঁ, হুঁ বলে গেলেন। তারপর টেলিফোন রেখে আগের জায়গায় বসলেন।

সুরঞ্জনবাবু ঘড়ি দেখে বললেন,—আমি উঠছি। যদি আমার বরাতে খারাপ কিছু ঘটে যায়, তুমিই কিন্তু দায়ী হবে দাদা!

কর্নেল বললেন,—প্লিজ একটু বসুন সুরঞ্জনবাবু! আমার কয়েকটা কথা আছে।

—কী বিষয়ে?

—আপনি কীসের ব্যবসা করেন?

—ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের। মডার্ন সবরকম গ্যাজেট—কম্পিউটারও বিক্রি করি।

—পানাগড়ে কি আপনার কোনও ব্রাঞ্চ আছে?

—আছে। বর্ধমানেও আছে।

—আপনি ভূতনাথ হাজরা নামে কাউকে চেনেন?

সুরঞ্জনবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন,—নাহ। কেন?

—আসার পথে ওই নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরও—

বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন,—যাকগে! আপনার কেন ধারণা যে ঠাকুরদার শেখানো ছড়ার মধ্যে কোনও গোপন সম্পদের সূত্র আছে?

—থাকতে বাধ্য। ছোটোবেলায় বুঝিনি। এখন বুঝতে পেরেছি।

—ছড়াটা আপনার মুখস্থ তো?

—আলবাত মুখস্থ।

—বলুন তো, শোনা যাক।

সুরঞ্জনবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন,—আপনি দাদার বন্ধু। রিটায়ার্ড সামরিক অফিসার। আপনাকে আমি বছর পাঁচেক আগে এ বাড়িতে আসতে দেখেছিলুম। আপনার পরিচয় আমি ভালোই জানি। আপনার উদ্দেশ্য কী আগে বলুন তো?

—ছড়ার কথাগুলো আপনার দাদার মুখে শুনেছি। আপনার মুখেও শুনতে চাই। কারণ আমার যেন ধারণা, ছড়াটা উচ্চারণের মধ্যে যে মূল ছন্দ আছে, তা সঠিক উচ্চারিত হলে সম্ভবত ধাঁধাটার সূত্র মিলতে পারে।

সুরঞ্জনবাবু আওড়ালেন :

'হিকরি ডিকরি ডক
নকড়ি ছকড়ি ক্লক

ধরোটি বারোটি পাক
বাজিলে চিচিং ফাঁক'

কর্নেল বললেন,—নাহ। একই ছন্দ।

এই সময় বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। রায়মশাই বারান্দায় গেলেন। তার একটু পরে ও.সি. দীপক ভদ্র, আর একজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন তাগড়াই চেহারার কনস্টেবলকে বারান্দায় দেখা গেল। রায়মশাই বললেন,—কী ব্যাপার দীপকবাবু?

—আপনার অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকতে চাই।

—কেন বলুন তো?

কারণ আছে। কর্তব্যে বাধা দেবেন না প্লিজ!—ও.সি. দীপক ভদ্র ঘরে ঢুকে সোজা সুরঞ্জনবাবুর কাছে গিয়ে বললেন : আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন সুরঞ্জনবাবু!

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—তার মানে? কোথায় যাব আমি?

—থানায়। সুরঞ্জনবাবু! নিজের দাদার বিরুদ্ধে পানাগড়ে আপনার ব্রাঞ্চ অফিসের ম্যানেজার কালীনাথ রায়চৌধুরির সঙ্গে গোপন চক্রান্ত এবং ঘড়ি চুরিতে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হলুম। আসুন।

রায়মশাই হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুরঞ্জনবাবু মুখ নিচু করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন,—নিচে আমার গাড়ি আছে।

দীপকবাবু বললেন,—গাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের লোক আছে। আপনার গাড়িও আমাদের আটক করতে হচ্ছে। কারণ আপনার মারুতির ডিকিতে নিষিদ্ধ মাদক আছে। সে খবর আমাদের সোর্স থেকে অলরেডি জেনে গেছি।

কর্নেল বললেন,—পুটুবাবু আর রাজুকে সুরঞ্জনবাবুই হেরোইন জোগাতেন!

ও.সি. হাসলেন,—ঠিক ধরেছেন। পুটুবাবু আর রাজু এবার পিটুনি খেয়ে সব কবুল করেছে। গত সপ্তাহে ঘড়িচুরির ব্যাপারে ওদের জেরা করলেও রায়মশাইয়ের খাতিরে পিটুনি দেওয়া হয়নি।

সুরঞ্জনবাবুর কাঁধে হাত রেখে দীপক ভদ্র বেরিয়ে গেলেন। রায়মশাই দু-হাতে মুখ ঢেকে কান্নাজড়ানো গলায় বলে উঠলেন,—সুরঞ্জন! তোর মনে এই ছিল? তুই এত লোভী?

কর্নেল বললেন,—রায়মশাই! শান্ত হয়ে বসুন! হালদারমশাই! আপনি নিচের সিঁড়ির দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে আসুন।

হালদারমশাই ঝটপট বেরিয়ে গেলেন এবং দু-মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন।

কর্নেল বললেন,—কাল সকালে যখন আপনার ঘরে এলুম, তখন ফ্যানের হাওয়ায় এই পোস্টকার্ডটা এই টেবিল থেকে আমার পায়ের কাছে উড়ে এসে পড়েছিল।

তিনি বুকপকেট থেকে ভাঁজ করা একটা পোস্টকার্ড বের করলেন,—এটা আপনার ছোটোভাই সুরঞ্জনবাবুর লেখা।

রায়মশাই রুমালে চোখ মুছে বললেন,—আপনাকে খুলে বলা উচিত। সুরঞ্জন আমার সৎভাই।

—জানি। সেবার এসে পিনাকীবাবুর কাছে আপনাদের পরিবারের অনেক কথা শুনেছিলুম। তাই গোড়া থেকেই আমার একটা চোখ ছিল সুরঞ্জনবাবুর দিকে। এবার দেখুন, এই পোস্টকার্ডের লেখা আর লাল ডটপেনে ছড়ার লেখার মধ্যে শুধু অক্ষরের ছোটো-বড়োর তফাত। কালই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম—তো সে-কথা থাক। এবার শুনুন! ছড়ার অর্থ আমি উদ্ধার করতে পেরেছি।

বলে কর্নেল মাথার ওপর কড়িকাঠ দেখালেন,—'হিকরি ডিকরি ডক' বললেই ঘড়ি বোঝায়। এবার 'নকড়ি ছকড়ি ক্লক'। এই ঘরে গুনে দেখেছি নটা কড়িকাঠ আছে। সেটা হল নকড়ি। এবার ছকড়ি। গতরাত্রে আমি এটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে বের করেছি। নটা কড়িকাঠ পর্যন্ত গিয়ে আবার

ঘুরে ছটা কড়িকাঠ পর্যন্ত এলুম। কেমন তো? এবার ওই দেখুন একটা বেঁটে প্রকাণ্ড চৌকো ঘড়ি। ওদিক থেকে গুনলে ছটা কড়ির নিচে আর উলটোদিক থেকে গুনলে তিনটে কড়ির নিচে। নকড়ি ছকড়ি!

রায়মশাই বললেন,—কিন্তু ওটা তো অচল ঘড়ি। ওটার ভেতরে কিছু নেই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—এবার ছড়ায় আছে 'ধরোটি বারোটি পাক'। লক্ষ করুন ঘড়ির মাথায় ইংরেজিতে পেতলের টি অক্ষর সাঁটা আছে। এই টেবিলটাই যথেষ্ট। হালদারমশাই! প্লিজ এটা ধরুন।

দু'জনে ছোটো টেবিলটা ঘড়ির তলায় নিয়ে গেলেন। কর্নেল তাতে সাবধানে উঠে বললেন, —'ধরোটি' মানে 'টি' অক্ষরটা ধরো। এই দেখুন, ধরলুম। মানে একটু চাপ দিলুম। দেখেছেন? 'টি' অক্ষরটা খাঁজ থেকে বেরিয়ে এল। এবার ছড়া বলছে, 'ধরোটি বারোটি পাক'। তার মানে, 'টি' ধরে বারোবার পাক দাও। দিচ্ছি। এক... দুই... তিন... চার...

কর্নেল বারো গোনার পরই কর্‌রর্‌ শব্দ হল। তারপরই বেশ জোরে ঘণ্টা বাজতে থাকল। বারোবার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেল ঘড়িটা দেয়াল থেকে খুলে নামালেন। হালদারমশাই ধরলেন ঘড়িটা। অবাক হয়ে দেখলুম দেয়ালে একটা চৌকো ছোটো কপাটের মতো ইঞ্চি ছয়েক অংশ খুলে গেছে। কর্নেল বললেন,—বাইরে থেকে রংটা দেয়ালের রঙে মেশানো। কিন্তু এটা পাতলা একটা তামার পাত। ঘড়িটা বারোবার বাজলে সেই শব্দের ধাক্কায় পাতটা খুলে যায়। অর্থাৎ 'বাজিলে চিচিং ফাঁক'। দেখা যাক, ভেতরে কী আছে। খোঁদলটাতে ঠাসা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি।

কর্নেল ভেতর থেকে একটা কালো ছ'ইঞ্চি লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া বাকসো বের করে টেবিল থেকে নামলেন। ঘড়িটা টেবিলে রেখে হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে সোফায় কর্নেলের পাশে বসে পড়লেন। রায়মশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন।

বাকসোটার মাথা গালা দিয়ে সিল করা আছে। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে একটা স্ক্রুডাইভার বের করে সিলটা ছাড়ালেন। তারপর মাথাটা স্ক্রু-ডাইভার ঢুকিয়ে ফাঁক করলেন। লাল মখমলে মোড়া যে জিনিসটা এবার বেরুল, সেটা একটা চার ইঞ্চিটাক উঁচু ঝকঝকে সোনার মূর্তি। চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল আলোয়। কর্নেল বললেন,—এটার চোখ দুটো হিরের। ঠোঁটদুটো পদ্মরাগ মণির। জুতোর সোনায় পান্না খচিত। আর মাথার মুকুটে এই উজ্জ্বল ধাতুটি সম্ভবত মরকতমণি। ডানাদুটোও সোনার। রায়মশাই! এই মূর্তি এদেশি নয়। এটি গ্রিক দেবতা কিউপিডের মূর্তি।

রায়মশাই বললেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা নাকি ইউরোপে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন। তাঁর নানা দেশে বন্ধু ছিলেন। ঘরে ওই যে সব বিদেশি ভাস্কর্য দেখছেন, ওগুলো তাঁরই সংগৃহীত। কিন্তু কী আশ্চর্য! ঠাকুরদা কেন আমাদের কথাটা খুলে বলেননি? বাবাকেও বলেননি!

কর্নেল বললেন,—সম্ভবত আপনার ঠাকুরদাকেও তাঁর ঠাকুরদা শুধু ছড়াটাই শিখিয়েছিলেন। তাই আপনার ঠাকুরদা খুলে বলতে পারেননি। ভেবেছিলেন, বংশের কেউ-না-কেউ একদিন ছড়াটার অর্থ খুঁজে বের করবে।

হালদারমশাই বললেন,—আমাদের এই কর্নেলস্যারের ব্রেন—বুঝলেন রায়মশায়? এক্কেরে ভগবানের নিজের হাতে তৈরি। ওহ! আমাগো মাথা ব্যাবাক গুলাইয়া যায়। কী য্যান ছড়াটা?

কর্নেল আওড়ালেন :

'হিকরি ডিকরি ডক
নকড়ি ছকড়ি ক্লক

ধরোটি বারোটি পাক
বাজিলে চিচিং ফাঁক'

তারপর বললেন,—রায়মশাই! এবার মূর্তিটা আগের মতো গর্তে ঢুকিয়ে রেখে ঘড়িটা তার ওপর টাঙিয়ে রাখা যাক। কী বলেন?

—নিশ্চয়ই। এ গোপন রহস্য আমি জেনে রাখলুম। এই যথেষ্ট।

ঘড়িটা আগের মতো অচল হয়ে টাঙানো রইল। কর্নেল ও হালদারমশাই টেবিলটা সরিয়ে আনলেন। তারপর রায়মশাই বললেন,—পিনাকীদাকে ডেকে কফি বলে আসি।

তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পরই কালকের মতো সারা ঘর জুড়ে সেতারের মতো ঝংকার শোনা গেল এবং তারপর দশবার নানা সুরে মিঠে-কোমল ঘণ্টা বাজতে থাকল। হালদারমশাইয়ের চোখ গুলিগুলি এবং গোঁফ উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপতে থাকল। কিছুক্ষণ যেন এক জাদুকরের তৈরি মায়াজগতের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলুম। কালকের মতো খুদে পাখির ঠোঁটের ঠোকর বা খুদে সায়েবের সিঁড়ি বেয়ে নেমে হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টি বাজানো লক্ষ করতে ভুলেই গেলুম।

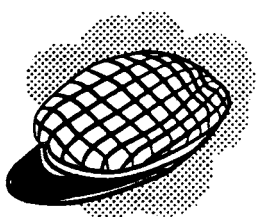

অলক্ষ্মীর গয়না

সম্প্রতি কোনও রহস্যময় কারণে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ভারত মহাসাগরের টোরা আইল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন। সেখানে নাকি রাত-বিরেতে এক আজব প্রাণী চরে বেড়ায়। তার মুখটা ঘোড়ার, ধড়টা মানুষের—এক কথায় ঘোড়ামানুষ বলা যায়। সেই দারুণ রোমাঞ্চকর গল্প খুব মন দিয়ে শুনছিলুম আর ভাবছিলুম, আমাদের পৌরাণিক বৃত্তান্তে যে হয়গ্রীব অবতারের বৃত্তান্ত আছে, টোরা দ্বীপের ঘোড়ামানুষরা তাঁরই বংশধর নয় তো! এমন সময় ষষ্ঠীচরণ এসে কর্নেলের হাতে একটা কার্ড দিয়ে বলল,—একজন ভদ্রলোক এয়েছেন বাবামশাই!

খুদে কার্ডটার অবস্থা জরাজীর্ণ। কর্নেল উলটে-পালটে দেখে বললেন,—ঢ্যাঙা, রোগা চেহারা, মাথার মধ্যিখানে টেরি?

আমাকে অবাক করে ষষ্ঠীচরণ বলল,—আজ্ঞে।

—কালো কোট, ঢোলা পাতলুন, কাঁধে ঝোলা?

আজ্ঞে বাবামশাই!—ষষ্ঠীচরণের সরু দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

নিয়ে এসো।—বলে কর্নেল তেল-চিটচিটে ছেঁড়াফাটা কার্ডটা আমাকে এগিয়ে দিলেন, লাস্ট কার্ড, ডার্লিং। সাবধানে হ্যান্ডেল করো। নইলে তোমায় নিজের পয়সায় বেচারার নেমকার্ড ছেপে দিতে হবে।

কার্ডে আগন্তুকের নাম ছাপানো রয়েছে। প্রফেসর তানাচা, দা গ্রেট ম্যাজিশিয়ান। ঠিকানার ওপর ময়লা জমেছে। তাই অস্পষ্ট। বললুম,—চিনা কিংবা জাপানি নাকি?

—উঁহু। খাঁটি বাঙালি।

—অদ্ভুত নাম। কিন্তু আজকাল কি দেয়ালের ওপারেও আপনার দৃষ্টি চলে!

—একটু আগে জানালার কাকটাকে তাড়াতে গিয়ে দেখেছি, প্রফেসর তানাচা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আমার এই ফ্ল্যাটের দিকে করুণ মুখে তাকিয়ে আছেন। নিশ্চয়ই দ্বিধায় ভুগছিলেন— একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমার কাছে আসাটা ঠিক হবে কি না। ...এই যে। আসুন, আসুন প্রফেসর তানাচা। বসুন।

যিনি ঢুকলেন, তিনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকলে হলফ করে বলতে পারতুম, ইনি অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের খোলবাজিয়ে। মধ্যিখানে সিঁথি-করা চুল, ঢুলুঢুলু চাউনি, ভাবুক ভাব এবং ঠোঁটে মাখনের মতো কোমল হাসি। তবে কোট-প্যান্টের অবস্থা ওঁর কার্ডের মতোই করুণ। নোংরা ঝোলাটা কফি-টেবিলে রেখে কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—ভয়ে বলি, কি নির্ভয়ে বলি?

কর্নেল বললেন,—নির্ভয়ে বলুন প্রফেসর তানাচা। আর ইয়ে—কফি চলবে কি?

খুব চলবে। তবে দু-ভাগ দুধ, এক ভাগ কফি।—প্রফেসর তানাচা গলার ভেতর বেহালা বাজানোর মতো টেনে-টেনে হেঁ-হেঁ করে কেমন একটা হাসতে লাগলেন।

ওঁর কফি না খেয়ে তাহলে তো বরং দুধ খাওয়াই উচিত। কফি খাওয়ার অভ্যাস নেই তো না খেলেই হয়। আমি প্রফেসর তানাচার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ভদ্রলোককে দেখে কেন কে জানে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যায়। ম্যাজিকের খেলা দেখান বা নাই দেখান, লোকটির ঢুলঢুলু চাউনিতে কিন্তু ম্যাজিক আছে।

ষষ্ঠীচরণকে ডেকে কফির কথা বলে কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই। আমার তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবকের স্পেশাল রিপোর্টার।

প্রফেসর তানাচা খুশি হয়ে বললেন,—কী সৌভাগ্য। সত্যি বলতে কী, সত্যসেবকে আপনার লেখা 'রাতের ট্যাক্সিতে ভূতুড়ে যাত্রী' পড়েই ওঁর কাছে আসা। অনেক কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করেছি আপনাদের অফিস থেকে। প্রথমে আপনার খোঁজই করেছিলুম। শুনলুম, আপনি সাঁওতালডি গেছেন। ফিরতে দেরি হবে। তা লোডশেডিংয়ের কিছু সুরাহা হবে বুঝলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—সুরাহা হলেও কি আপনার বাড়িতে ভূতের দৌরাত্ম্য থামবে ভাবছেন প্রফেসর তানাচা? সবই ভূতের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে।

প্রফেসর তানাচার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।—আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা কাগজে পড়েই তো আসা। স্বীকার করছি কর্নেলসায়েব, একসময় দেশেবিদেশে আমি নিজেও অনেক ভূতুড়ে ম্যাজিক দেখিয়েছি—কিন্তু আপনার কোনও তুলনা হয় না। বহুদিন ম্যাজিক ছেড়ে দিয়েছি। ম্যাজিকের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিল বলতে পারেন। তাছাড়া, অনিদ্রার ব্যাধি, নানারকম মানসিক অশান্তি, অর্থাভাব। তো...

ওঁর কথা কেড়ে কর্নেল বললেন,—ট্যাক্সির ভূতটার মতো আপনার ভূতটাও আশা করি টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব উদার?

প্রফেসার তানাচার চোখের ঢুলঢুলু ভাবটা চলে গেল। বললেন,—কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য। আপনি দেখছি থটরিডিং জানেন!

—কত টাকা পেয়েছেন?

প্রফেসর তানাচা চাপাগলায় বললেন,—পাঁচদিনে মোট পঞ্চাশ টাকা। ডেলি একটা করে দশ টাকার নোট খামের ভেতর। ওপরে লেখা, 'উইশ ইউ গুড লাক।' এ কী কাণ্ড বলুন তো স্যার? লোকে টাকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে। খুনখারাপি পর্যন্ত করছে। আর এমনি-এমনি রোজ সক্কালবেলা মেঝের ওপর দশ টাকার নোটভরা খাম!

—আজ বুঝি আর কোনও খাম পাননি?

প্রফেসর তানাচা মুখটা করুণ করে মাথা দোলালেন। আমি দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি হাবাকান্তের মতো। তারপর দেখি, কর্নেল হেলান দিয়ে বসে চোখদুটো বন্ধ করে টাকে হাত বুলোচ্ছেন। কয়েক সেকেন্ড পরে হঠাৎ চোখ খুলে বললেন,—আপনার ঘর থেকে কিছু চুরি যায়নি তো?

চুরি?—প্রফেসর তানাচা একটু হাসলেন, আছেটা কী যে নেবে? মির্জাপুরের একটা মেসবাড়ির ছাদে ছোটো চিলেকোঠার মতো ঘরে থাকি। একটা ভাঙাচোরা তক্তপোশ—তার ওপর যেমন-তেমন একটা বিছানা পাতা। তলায় একটা সুটকেস। তার মধ্যে ছোটোখাটো ম্যাজিকের কিছু আসবাব আছে। আর আছে একটা কুঁজো আর জল খাওয়ার জন্য কাচের গেলাস। ব্যস, এই মোটে সম্বল। চোর নেবেটা কী?

—আপনি তো আফিংয়ের নেশা করেন?

প্রফেসর তানাচা হকচকিয়ে গেলেন প্রথমটা। পরে অপ্রস্তুত হেসে লাজুক ভঙ্গিতে বললেন, —অনিদ্রার রুগি। কী করি বলুন।

—দরজা খোলা রেখে ঘুমোন তো?

—অনেকদিন বৃষ্টি নেই। যা গরম পড়েছে।

—কিছু চুরি যায়নি বলছেন?

নাঃ।—প্রফেসর তানাচা জোরে মাথা নাড়লেন।

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন,—ধরুন, কোনও তুচ্ছ জিনিস, অথবা আপনি এখনও খেয়াল করে দেখেননি এমন কিছু?

ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণে কফি আনল। কর্নেল ফের বললেন,—কফি খেতে-খেতে ভাবুন। ভেবে বলুন প্রফেসর তানাচা!

তিনজনে একসঙ্গে কফিতে চুমুক দিলুম। ঘরের আবহাওয়া কেন যেন থমথমে মনে হচ্ছিল আমার। একটু পরে কর্নেল কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে চুরুট ধরিয়েছেন, প্রফেসর তানাচা হঠাৎ নড়ে উঠলেন। তারপর দুধে-সাদা কফিটুকু কোঁত করে গিলে কফির পেয়ালা ঠকাস করে রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

তারপর—সর্বনাশ! ঠাকুরদার কবচটা...বলেই সটান পরদা তুলে অদৃশ্য হলেন। পরদাটা যেন ঝড়ের ধাক্কায় বেজায় দুলতে থাকল।

কর্নেল চুরুটের নীল রঙের প্যাঁচালো ধোঁয়া উড়িয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—কী বুঝলে জয়ন্ত?

—অনেক কিছু। আপনি দেখছি ম্যাজিশিয়ানদের রাজা। এতসব জানলেন কীভাবে? ভদ্রলোককে নিশ্চয়ই চেনেন।

—ওঁকে এই প্রথম দেখলুম, ডার্লিং!

কর্নেল সোফা থেকে উঠে জানালার ধারে গেলেন। তবে সেখানে তাড়ানোর মতো কোনও কাক নেই। উঁকি মেরে নিচের রাস্তা দেখতে-দেখতে বললেন,—প্রফেসর তানাচা বাস পেয়ে গেলেন। যাই হোক, তুমি একটু অবাক হয়েছ টের পাচ্ছি। দ্যাখো জয়ন্ত, আসল কথাটা হচ্ছে অবজার্ভেশন—পর্যবেক্ষণ। তাছাড়া, তুমি তো জানো, ম্যানওয়াচিং আমার একটা হবি। এ কিছু কঠিন নয়—চেষ্টা করলে তুমিও এগুলো পারও। যেমন ধরো—উনি যে আফিংখোর, সেটা ওঁর চোখ দেখলেই ধরা যায়। তাছাড়া কফির সঙ্গে বেশি দুধ চাইলেন। আফিংখোররা দুধের প্রতি বেশিমাত্রায় আসক্ত। ট্যাক্সির ভূতুড়ে যাত্রীর খবর তুমিই লিখেছ। যাত্রীটি রাত দুটোয় ট্যাক্সিওয়ালা নির্দিষ্ট জায়গায় যাতে আবার আসে, তাই ইচ্ছে করে অনেক টাকা ভাড়া দিত। প্রফেসর তানাচা এটা উল্লেখ করামাত্র বুঝলুম তেমন কিছু ঘটে থাকবে।

—আজ খাম পাননি, কীভাবে জানলেন?

কর্নেল হাসলেন।—আজ টাকা পেলে আসতেন না। এভাবে টাকা পাওয়ার কথা কে আর পাঁচকান করতে চায় বল? সে অবশ্যই ভাবত, টাকাটা যদি অদৃশ্য দাতামহাশয় রেগেমেগে বন্ধ করে দেন? বন্ধ হয়েছে বলেই আমার কাছে আসা।

—কিন্তু চুরি?

—ওঁর মতো আফিংখোরকে টাকা দেওয়ার এই একটিই উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অভাবী মানুষ। হাতে টাকা পেলে আফিংয়ের মাত্রা চড়িয়ে ফেলবেন এবং মড়ার মতো পড়ে থাকবেন। সেই সুযোগে চোর ইচ্ছেমতো চুরির বস্তুটি হাতড়ানোর অঢেল সময় পাবে। তবে গরমের জন্য দরজা খুলে রাখার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। সম্ভবত নেশার মাত্রা বেশি হওয়ায় দরজা লাগানো হতো না। আফিংখোরদের এই সমস্যা ডার্লিং। মৌতাত কিছুতেই নষ্ট হতে দেবে না— সে যদি ঘরে আগুন লাগে, তবুও।

কর্নেল হঠাৎ ভুরু কুঁচকে সটান এগিয়ে এলেন।—আরে! ভদ্রলোক ব্যাগটা ফেলে চলে গেলেন যে!

টেবিলে ব্যাগটা এতক্ষণে আমার নজরে পড়ল। বললুম,—আফিংখোরদের ব্যাগের ভেতর কী থাকতে পারে?

কর্নেল ব্যাগের মুখটা ফাঁক করে দেখে বললেন,—টাকা না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে প্রফেসর তানাচা গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে আমার এখানে এসেছিলেন। লুঙ্গি আর গামছা ভেজা রয়েছে। আর... আর... এটা... হুঁ। একটা নোটবই দেখছি। পরের জিনিসে হাত দিতে নেই। কিন্তু এটা একটা স্পেশাল কেস। ভদ্রলোককে আরও একটু চেনা দরকার।

চটিমতো কালো মলাটের জীর্ণ নোটবই। ওঁর কার্ডটার মতোই অবস্থা। প্রথম পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখি, শ্রীতারানাথ চাটুজ্জে—বড়ো হরফে লেখা রয়েছে। বললুম,—তানাচার রহস্য ফাঁস হল, কর্নেল! পাতা ওলটান।

পরের পাতায় লাল কালিতে সম্ভবত তন্ত্রমন্ত্র লেখা। ওঁ হ্রীং ক্রীং ফট ফট... মাড়য় মাড়য় তাড়য় তাড়য়... এইসব বিদঘুটে লাইন। বশীকরণ মন্ত্র। মারণমন্ত্র। তাড়নমন্ত্র। কোন গাছের শেকড়ের কী অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তার বৃত্তান্ত। তারপর একটা পাতা খুলে কর্নেল বললেন,—এও কি মন্ত্র! নাকি ছড়া?

'কবে যাবি রে সেই সমাজে
ছাড় কুইচ্ছে পোড়া পাম রে'...

এই আজব ছড়া কিংবা মন্ত্র আমি আওড়াতে শুরু করলুম। কয়েকবার আওড়ে দিব্যি মুখস্থ হয়ে গেল। কর্নেল নোটবইটা ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে বললেন,—বেশ ছন্দ আছে লাইনদুটোতে। সহজে মুখস্থ হয়ে যায়। জয়ন্ত, যে প্রফেসর তানাচার ঠাকুরদার কবচ ওভাবে চুরি যায়, তাঁর নোটবইয়ে এই উদ্ভুটে ছড়া বা মন্ত্রের নিশ্চিয়ই কোনও তাৎপর্য আছে। বরং দুপুরবেলা এ নিয়ে বসব। এখন আমার ছাদে যাওয়ার সময় হল। মেক্সিকান ক্যাকটাসটার গায়ে ভোরবেলা ইলেকট্রোনোমিটার লাগিয়ে রেখে এসেছি। দুষ্টু গাছটা গ্রাফিক চার্টে সাড়া দিয়েছে নাকি দেখা দরকার।

কর্নেল উঠলেন। বুঝলুম, এখন আর আড্ডার আশা নেই। বুড়ো এবার উদ্ভিদ আর পোকামাকড়ের রাজ্যে ঢুকে পড়বেন। তখন আফিংখোর প্রফেসর তানাচার মতোই ওঁর দশা হবে। প্রকৃতিবিদ্যার মৌতাত মাথা ভাঙলেও ঘুচবে না। অতএব আমিও উঠে পড়লুম। বললুম,—চলি কর্নেল! প্রফেসর তানাচা-রহস্যের কী কতটা দাঁড়াল ফোনে জানিয়ে দেবেন। দৈনিক সত্যসেবকের জন্য দারুণ একটা স্টোরি হবে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—প্রফেসর তানাচা হয়তো পিশাচসিদ্ধ হতে চেয়েছিলেন একসময়। ওটা পিশাচ-জাগানো মন্ত্র হলেও হতে পারে। জপ করে দ্যাখো, ডার্লিং।...

এর পর কয়েকটা দিন আবার আমাকে অফিসের কাজে বাইরে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হল। তার মধ্যে যখনই সময় পেয়েছি, কর্নেলকে ফোন করেছি। প্রফেসর তানাচার আর পাত্তা নেই। ব্যাগটাও ফেরত নিতে আসেননি। সপ্তাহটাক পরে কর্নেল ফোন করলেন আমাকে মির্জাপুরের সেই মেসে প্রফেসর তানাচার খোঁজে গিয়েছিলেন। দরজায় তালা আটকানো রয়েছে। মেসের ম্যানেজার বলেছেন, পাগলা লোক। কখন থাকেন, কখন না—কিচ্ছু ঠিক নেই।

ফোনে কর্নেলকে বললুম,—ঠাকুরদার কবচ উদ্ধার করতে প্রফেসর তানাচা সম্ভবত আপনার সেই হয়গ্রীব অবতারের মুলুকে পাড়ি দিয়েছেন। ওঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়ছেন না কেন?

কর্নেল বললেন,—সময় নেই ডার্লিং। অক্টোবর শেষ হয়ে এল। মেক্সিকান ক্যাকটাসটার ওপর শিশির ও কুয়াশার কী প্রতিক্রিয়া ঘটে, দেখার জন্য ব্যস্ত রয়েছি। তাছাড়া ভৈঁশারার জঙ্গল থেকে সে প্রজাপতিটা ধরে এনেছিলুম, তার ডানার রং হঠাৎ বদলাতে শুরু করেছে। প্রকৃতিরহস্যের গোলকধাঁধায় আটকে গেছি। ...কর্নেল ঝাড়া পাঁচ মিনিট এইসব বুঁকনি ঝেড়ে ফোন ছাড়লেন।

সেদিনই বিকেলের ডাকে ভারি অদ্ভুত একটা চিঠি পেলুম।

'ওহে সাংবাদিক,

তুমি তো সব সময় রোমাঞ্চকর খবর খুঁজে বেড়াও। দোসরা নভেম্বর রাত দশটায় লোহাগড়া রাজবাড়ির পেছনে নদীর ধারে অলক্ষ্মীর থানে চলে এসো। রোমাঞ্চকর খবর পেয়ে যাবে হাতে নাতে।

ইতি,
ইস্কাপনের টেক্কা।'

চিঠিটা পড়ে প্রথমে একচোট হাসলুম। খবরের কাগজের লোকদের ঠাট্টা-তামাশা করে অনেকে চিঠি লেখে। কেউ কেউ প্রাণের ভয় দেখিয়ে শাসায়। এ আমার গা-সওয়া। বহুবার দারুণ রকমের খবরের টিপস পেয়ে হন্তদন্ত গিয়ে দেখেছি, পুরোটাই হৌক্স—স্রেফ গুল।

কিন্তু এই ছোটো চিঠিটার বৈশিষ্ট্য হল, খবরের কাগজ কেটে-কেটে এক বা একগুচ্ছ শব্দ আঠা দিয়ে কাগজে সেঁটে চিঠিটা তৈরি করা হয়েছে। 'ইস্কাপনের টেক্কা' কোত্থেকে কেটে বসানো হয়েছে বুঝতে দেরি হল না। দৈনিক সত্যসেবকেরই দুইয়ের পাতায় নিচে একটা কমিক সিরিজ ছাপা হয়। ওটা সেখান থেকেই নেওয়া। 'লোহাগড়া রাজবাড়ির' এবং 'অলক্ষ্মীর থানে' কোত্থেকে কেটেছে, কাগজের ফাইল হাতড়ে উদ্ধার করতে পারলুম না।

একত্রিশে অক্টোবর রাত সাড়ে-নটায় যখন অফিস থেকে বেরুলুম, তখনও ব্যাপারটা হৌক্স বলেই ভেবেছি। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ক্রমশ একটা চাপা অস্বস্তি জেগে উঠতে থাকল মনের ভেতর। আবার চিঠিটা নিয়ে বসলুম। খামের ওপর আমার নাম-ঠিকানাও ছাপা অক্ষরে সাঁটা। সেটা খুব সহজ কাজ। দৈনিক সত্যসেবকে প্রকাশিত আমার লেখা ফিচার থেকে নামটা কেটে নেওয়া যায়। আর সত্যসেবকের ঠিকানাও শেষ পাতার তলায় মুদ্রিত থাকে। ডাকটিকিটের ওপর ডাকঘরের নাম কিছুতেই পড়া গেল না।

ব্যাপারটা কর্নেলকে জানাবার ভরসা পাচ্ছিলুম না। বুড়োর মতিগতি যা টের পেয়েছি, তাতে ওঁর এখন প্রকৃতিরহস্যের মৌতাত জমে উঠেছে। এখন আর কানের কাছে ক্র্যাকার ফাটালেও প্রজাপতির ডানা কিংবা ক্যাকটাসের গায়ে আটকানো যন্ত্রটি থেকে ওঁর দৃষ্টি একচুল সরানো যাবে না।

কিন্তু অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নে লম্বা-চওড়া একটা রাত কাটিয়ে পয়লা নভেম্বর সকালে মরিয়া হয়েই বুড়োকে ফোন করলুম। কিন্তু সাড়া দিল ওঁর ভৃত্য শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। বলল,—কাগুজে দাদাবাবু নাকি? বাবামশাই তো নেই। কাল বিকেলে কোথায় যেন গেলেন—হ্যাঁ, গড়গড়া বললেন, নাকি সোনাগড়া... দুচ্ছাই! পেটে আসছে মুখে আসছে না।

—লোহাগড়া নয় তো?

আজ্ঞে! আজ্ঞে! তাই বটে কাগুজে দাদাবাবু। —ষষ্ঠীচরণ খিকখিক করে হাসতে লাগল।

—কিছু বলে যাননি?

—কবেই বা বলেকয়ে যান? উঠল বাইতো মক্কা যাই—বরাবর তো তাই। তবে কথা কী কাগুজে দাদাবাবু...

—আহা, ঝটপট বলো!

লোহাগড়ার রাজবাড়ি থেকে গাড়ি পাঠ্যেছিল, বুঝলেন? —ষষ্ঠীচরণ আবার হাসতে লাগল।

—হাসির কী হল?

—গাড়িখানা দেখলে আপনিও হাসতেন কাগুজে দাদাবাবু!

—বুঝেছি, ভিনটেজ কার। রাজা-জমিদারদের অবস্থা এখন শোচনীয়। আচ্ছা, ছাড়ি ষষ্ঠীচরণ?

শুনুন, শুনুন! —ষষ্ঠীচরণ ব্যস্তভাবে বলল, এইমাত্র মনে পড়ল। বাবামশাই আপনার কথা কী যেন বলে গেলেন—দুচ্ছাই! পেটে আসছে, মুখে আসছে না। ...হ্যাঁ, আপনাকে যেতে বলেছেন। আপনি যেন অবশ্য করে যাবেন।

এতক্ষণ বলতে কী হয়েছিল? রাগ করে ফোন রেখে দিলুম। আরও কয়েকটা মিনিট রাগটা থাকল। মনিব ও চাকর দু'জনেই সমান পাগল। কর্নেল কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন না? কিংবা যাওয়ার সময় একবার রিং করলেও কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো!

কিন্তু রহস্যটা তাহলে যে সত্যি-সত্যি ঘনীভূত হয়ে উঠল। 'ইস্কাপনের টেক্কা' আমাকে দোসরা নভেম্বর রাত দশটায় লোহাগড়া রাজবাড়ির পেছনে নদীর ধারে অলক্ষ্মীর মন্দিরে হাজির হতে বলেছে। আর এদিকে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে সেই লোহাগড়া রাজবাড়িরই লোক গাড়ি চাপিয়ে নিয়ে গেল! ব্যাপারটা মোটেও আকস্মিক যোগাযোগ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হৌক্স বলেও মনে হয় না।

যতবার কথাটা ভাবলুম, ততবার রহস্যের একটা কালো পরদা ভেসে উঠল মনে। সেই কালো পরদার ফাঁকে সাদা রঙের একটা তাস ইস্কাপনের টেক্কা ঝিলিক দিতে থাকল। আর মুহুর্মুহু গা ছমছম করতে থাকল।

তবে ইস্কাপনের টেক্কা যেই হোক, আপাতত লোহাগড়া জায়গাটা কোথায় সেটা খুঁজে বের করা দরকার। কর্নেল-বুড়োর মুন্ডুপাত করলুম অসংখ্যবার। ঠিকানা তো ঠিকমতো বাতলে যাবেন ষষ্ঠীচরণের কাছে? এখন লোহাগড়ার খোঁজে বেরুনো মানে খড়ের গাদায় সুচ খুঁজতে যাওয়া!

হঠাৎ খেয়াল হল, রাজবাড়ি যখন আছে, তখন জায়গাটা নেহাত অখাদ্য নয়। তাছাড়া অলক্ষ্মীর মন্দির যেখানে আছে, সেখানকার খ্যাতি বা অখ্যাতি নিশ্চয়ই অসামান্য। অতএব চেষ্টা করে দেখা যাক।

আমার বরাত ভালোই বলতে হয়। ...অফিসের লাইব্রেরিতে গিয়ে স্থান-নামের গাইডবুক হাতড়ে লোহাগড়া পেয়ে গেলুম। বিহার সীমান্তে পূর্বরেলের একটা ছোটো স্টেশন। তবে ঐতিহাসিক জায়গা। বিশেষ করে লোহা নদীর ধারে অলক্ষ্মীর মন্দির নাকি দেখার মতো জিনিস। সতেরো শতকে বর্তমান রাজবংশের এক পূর্বপুরুষ শিবেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন দুর্ধর্ষ মানুষ। প্রজাদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতেন। প্রতিদিন মানুষের রক্ত না দেখে জলগ্রহণ করতেন না। তিনিই অলক্ষ্মীকে হটিয়ে লক্ষ্মীমূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত-অদ্ভুত কী-সব ঘটনা ঘটতে থাকে। শেষপর্যন্ত মন্দিরটা ভেঙে দিলেও অলক্ষ্মীকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারেননি। মন্দিরের উঁচু চৌকোণা মেঝের ওপর এখনও সিংহাসনে বসে অলক্ষ্মীর কালো পাথরে গড়া মূর্তি ক্রুর চোখে তাকিয়ে রয়েছে। অলক্ষ্মীর পুজো করবে এমন বেআক্কেলে ভক্ত কেই-বা আছে?...

দুই

কী কষ্টে যে লোহাগড়া পৌঁছলুম, বলার নয়। ট্রেন নয়, যেন ছ্যাকড়া গাড়ি। পৌঁছুল রাত এগারোটা বাজিয়ে। খাঁ-খাঁ, নিঝুম প্ল্যাটফর্ম। স্টেশনমাস্টার একচোখো ভূতুড়ে লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর আশ্রয়প্রার্থী হওয়া ছাড়া উপায় কি? আর একজনও যাত্রী নামেনি ট্রেন থেকে। জ্যোৎস্নার ফিং ফুটছে চারদিকে। গাছপালায় কুয়াশা জমে রয়েছে। এদিকে-ওদিকে টিলাগুলো জ্যোৎস্নায় বিশাল হাতির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—হ্যালো জয়ন্ত!

চমকে উঠেই মানুষটিকে দেখে সব ক্ষোভ, হতাশা, ক্লান্তি তক্ষুনি চলে গেল। মনটাও বিগলিত হল বইকী! এত রাতে আমার বৃদ্ধ বন্ধু নিশ্চয়ই দুর্লভ প্রজাতির রাতপাখি দেখতে স্টেশনে আসেননি।

—বিকেলের ট্রেনটাও দেখে গেছি!

গোয়েন্দাপ্রবর আমার কাঁধে হাত রাখলেন।—এ বুড়োর ওপর রাগ করো না ডার্লিং! রাজাবাহাদুরের তলব পেয়েই ছুটে আসতে হল। তুমি কাগজের লোক। কতরকম তোমার অ্যাসাইনমেন্ট থাকে। হুট করে গিয়ে চলো বললেই তো আর বেরিয়ে পড়তে পারও না আমার মতো।

—কৈফিয়ত কে চেয়েছে? এ-মুহূর্তে চাইবার মতো একটি জিনিসই আছে। তা হল কড়া গরমাগরম চা কিংবা কফি।

পাবে।—আশ্বস্ত করলেন ঘুঘুমশাই। স্টেশনের বাইরে পৌঁছুলে কে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, —আপনার সাংবাদিক বন্ধু কি এসেছেন কর্নেল?

ছায়ার আড়াল থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত এসেছে জয়গোপালবাবু। আপনাকে বলছিলুম না? পৃথিবীর যেখানে-যেখানে অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, জয়ন্ত সেখানে গিয়ে ঢুঁ মারে। আমি জানতুম, ও না এসে পারবে না।

কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু জয়গোপালবাবু হাসলেন না। বুঝলুম, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। হাত বাড়িয়ে আমার হাত নিয়ে হ্যান্ডশেক করলেন।—লোহাগড়া রাজবাড়িতে আপনাকে সাদর অভিনন্দন, জয়ন্তবাবু!

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, ইনি রাজ এস্টেটের ম্যানেজার। অসমসাহসী মানুষ। অথচ ইনিও... হঠাৎ কর্নেল চুপ করে গেলেন।

জয়গোপালবাবু বললেন,—আসুন কর্নেল! জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই ক্লান্ত।

আমার মনে হল, ভদ্রলোক যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্নেলের সঙ্গে স্টেশনে এসেছেন। যে-কোনও কারণে হোক, রাজবাড়িতে দ্রুত ফিরতে চাইছেন।

ছোটো স্টেশনবাজার নিঝুম হয়ে গেছে। একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছে। কয়েকজন লোক ঝিমধরা হয়ে বসে রয়েছে। হাতে চায়ের গেলাস। চায়ের জন্য মন চনমন করে উঠল। কিন্তু জয়গোপালবাবুর তাড়ায় গাড়িতে ঢুকতে হল। এই গাড়িটাই তাহলে কলকাতা পাঠানো হয়েছিল কর্নেলকে আনতে। ষষ্ঠীচরণ গাড়িটা দেখে যে হেসেছিল, তাতে কিছু অন্যায় হয়নি তার। একেবারে ঝরঝরে ভিন্টেজ কার। আর রাস্তার অবস্থাও তেমনি এবড়ো-খেবড়ো। বসতি এলাকা ছাড়িয়ে একটা টিলার পাশ দিয়ে ছোটো একটা রাস্তায় গাড়ি মোড় নিল। তারপর জ্যোৎস্নায় ধু-ধু সাদা ন্যাড়া একটা তেপান্তর পেরোতে থাকল। রাজবাড়ি বেশ দূরে বলে মনে হল।

মাইলটাক রাস্তা ফের একটা ধকল গেল। একটা ঝিলের ধার দিয়ে প্রবল আওয়াজে ঝিলচর বুনো হাঁসগুলোকে চমক খাইয়ে রাজবাড়ি পৌঁছলুম। দেউড়ি দিয়ে গাড়ি ঢুকলে এক ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে গেট বন্ধ করে দিল। জয়গোপালবাবু তাঁর উদ্দেশে বললেন,—রাঘব! শিগগির ঠাকুরকে বলে আগে একপট কফি নিয়ে আয়।

হলঘরের পাশের একটা ঘরে কর্নেল উঠেছেন। জয়গোপালবাবু সকালে দেখা হবে বলে চলে গেলেন। একটু পরে সেই রাঘব কফি রেখে গেল। কড়া কফি খেতে-খেতে ইস্কাপনের টেক্কার চিঠিটা বের করে দেখালুম। কর্নেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—এদিকে আরেক রহস্য জমে উঠেছে, যেজন্য ছুটে এসেছি। রাজাবাহাদুর অজিতেন্দ্রের ধারণা, শিগগির রাজবাড়িতে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। রাতবিরেতে অদ্ভুত সব ধুপধুপ, ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে। কারা যেন চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। কোথায় কী ভাঙচুর করছে। রাজাবাহাদুর নাকি স্বচক্ষে

দেখেছেন, অলক্ষ্মীর মূর্তি বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, দরজায় টোকার শব্দ। দরজা খুলে কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এবং এ সবই ঘটছে রাত্রিবেলা। দিনে সব কিছু স্বাভাবিক। রাত এলেই বিভীষিকা।

কর্নেল চুপ করার সঙ্গে-সঙ্গে কোথাও ঝনঝন প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। কে যেন কোনও ধাতব জিনিস ছুড়ে ফেলল। কর্নেল বললেন,—ওই শোনো! কাল শেষ রাতে পৌঁছেও এই শব্দটা শুনেছি...।

শব্দটা শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম, তা ঠিক। কিন্তু এই ধুরন্ধর বৃদ্ধ যেন আরও বেশি চমকে উঠেছেন। তা দেখে হাসিও পাচ্ছিল। বললুম,—তাহলে দু'দিন ধরে বেশ একটা রহস্যপুরীতে কাটাচ্ছেন দেখছি। কিন্তু হে প্রাজ্ঞ ঘুঘুমশাই, আপনি কি তাহলে অবশেষে ভূত সত্যি বলে মানলেন?

কর্নেল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি এখনও ব্যাপারটা তামাশা বলে ভাবছ, ডার্লিং! তোমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তুমি একটুও ভয় পাওনি। আমার কিন্তু সত্যি কেমন ভয় করছে।

অবাক হলুম। চিরদিনের দুঃসাহসী আর শক্তিমান কর্নেলের মতো মানুষের কীসের ভয় করছে? ভূতের ভয় নিশ্চয়ই নয়। বললুম,—আপনার কি মনে হয় এসব ভূতুড়ে ব্যাপারের পেছনে কোনও লোক আছে, যার ছদ্মনাম 'ইস্কাপনের টেক্কা'?

কিছু বলা যায় না। শুধু আঁচ করছি, কেউ একটা সাংঘাতিক কোনও কাজ করতে চায়। এসব তারই প্রস্তুতি। —বলে কর্নেল চুরুট জ্বাললেন। তারপর জানালার কাছে গেলেন।

ওপরে এবার কোথায় যেন ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ... ভারী পায়ে হাতির মতো কোনও ওজনদার জন্তুর যেন হেঁটে বেড়ানোর শব্দ শোনা গেল। উত্তেজিতভাবে বললুম,—ও কীসের শব্দ?

কর্নেল কোনও জবাব দিলেন না। শব্দটা আমাদের এই ঘরের ছাদে এলে আমার এতক্ষণে সত্যি-সত্যি ভূতের ভয় পেয়ে বসল। ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ... পায়ের শব্দে ছাদটা কেঁপে উঠছে। এ কখনও মানুষের পায়ের শব্দ হতে পারে না।

একটু পরে শব্দটা সরে গেল। দূরে মিলিয়ে গেলে কর্নেল বললেন,—কাল রাতে ওই শব্দ শুনে ছুটে গিয়েছিলুম। হলঘরের সিঁড়ির নিচে গেছি, হঠাৎ ওপরে চোখ গেলে হাতির পেছনকার দুটো পা একপলকের জন্য দেখতে পেলুম। যাই হোক, রাতবিরেতে রাজবাড়ির দোতালায় হাতি ঘুরে বেড়ানোটা কাজের কথা নয়।

বলে কর্নেল দুটো জানালাই বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন,—শুয়ে পড়ো জয়ন্ত। হুঁ, তার আগে অবশ্য কিছু খেয়ে নাও। ওই দ্যাখো, তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে টেবিলে।

বিভীষিকা বলতে ঠিক কী বোঝায়, লোহাগড়া-রাজবাড়িতে একটা রাত কাটিয়েই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিলুম। হলঘরে ঠাকুরদাঘড়ির টঙাস-টঙাস বিদঘুটে শব্দটা ক্রমশ যেন বাড়ছিল। তারপর কড়াত করে শ্বাস টেনে ঠং-ঠং করে বেজে ওঠাটাও পিলে-চমকানো বললে ভুল হয় না। এক সময় যেন হলঘরের দিকের দরজায় কেউ ঠুক-ঠুক করে বার তিনেক টোকা দিয়েছিল। কর্নেলের বারণ না থাকলেও দরজা খুলতুম না।

লম্বা-চওড়া ঢাউস দুটো জানলা বন্ধ ছিল। তাই ঘুম আসছিল না। দমবন্ধ হয়ে আসছিল যেন। শেষে সাহস করে মশারি থেকে বেরিয়ে খুলে দিয়েছিলুম। কিন্তু সাহস করে বাইরে তাকাতে পারিনি। হঠাৎ যদি চোখে পড়ে, অলক্ষ্মীর মূর্তি বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছে, নির্ঘাৎ ভিরমি খেয়ে পড়ব। ঘরের ভেতর চাঁদের আলো উপচে আসছিল। কিন্তু সেই দুধের মতো সাদা আলোর দিকে

তাকাতেও ভয় করছিল। শেষরাতে শেয়ালের ডাক শুনেছিলুম। তার একটু পরে ওপরের কোনও ঘরে ফের ঝনঝন শব্দে কেউ কিছু ছুড়ে ফেলল। কে যেন প্রচণ্ড রাগে ভাঙচুর করে বেড়াচ্ছে। কে সে?

তারপর হলঘরের সিঁড়ি বেয়ে ধুপ-ধুপ শব্দ করে কে নেমে এল। সেই ভূতুড়ে হাতিটাই কি? ভয়ে রিভলভারটা বের করে ওত পেতে রইলুম বিছানায়। কিন্তু সেই অলৌকিক হাতি ঘরের দরজা ভাঙতে ঢুঁ দিল না। কুকুরের গজরানি শুনলুম। ফের সব চুপ। বাইরে ঝিমধরা জ্যোৎস্নায় একটা প্যাঁচা ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁও করে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

উঠে দেখি, সাড়ে সাতটা বাজে। কর্নেল নেই। সম্ভবত অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। হলঘরের দিকের দরজা খোলা রয়েছে। পরদার পেছন থেকে কে বলল,—চা এনেছি স্যার!

গ্যাট্টাগোট্টা চেহারার সেই রাঘব নামে লোকটা ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। বিনীত ভঙ্গিতে বলল, —যখন দরকার হবে, ডাকবেন স্যার। আমার নাম রাঘব। আমি পাশের ঘরেই থাকি।

জয়গোপালবাবুর কথা জিগ্যেস করলে রাঘব বলল,—ম্যাঞ্জারবাবু এখন কুকুরের ঘরে আছেন। ওনার ওই এক নেশা স্যার। সারাদিন কুকুর নিয়েই কাটান।

রাঘব চলে গেলে দক্ষিণের দরজা খুলে ওদিকের বারান্দায় গেলুম। এবার দিনের আলোয় পরিবেশটা স্পষ্ট হচ্ছিল। বসতি এলাকার বাইরে নিরিবিলি জায়গায় এই রাজবাড়িটা যেন নিঝুম এক প্রেতপুরী। বিশাল এলাকা জুড়ে উঁচু পাঁচিলে চারদিক ঘেরা। একসময় যা সাজানো-গোছানো বাগান ছিল, তা এখন প্রায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। তার ভেতর একটা কালো কামানও দেখতে পাচ্ছিলুম। চায়ের পেয়ালা রেখে সিঁড়ি বেয়ে লনে নামলুম। ঘাসে এখনও রাতের শিশির চকচক করছে। একফালি পায়েচলা পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলুম। দক্ষিণের পাঁচিলের সমান্তরালে এই পথ পুবে এগিয়েছে। পুবের ফটকের অবস্থা জরাজীর্ণ। লোহার কপাট মরচে ধরে ভেঙে পড়েছে। সেখান দিয়ে বেরুলে একটা নদী দেখতে পেলুম। এই তাহলে লোহা নদী। অর্ধবৃত্তাকারে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে ঘুরেছে। এই বাঁকের মুখে উঁচু জমিতে রাজবাড়ি এলাকা। অলক্ষ্মীর মন্দির খুঁজতে ঝোপঝাড় ভেঙে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। তারপর দেখি, পাঁচিলের নিচে কে হুমড়ি খেয়ে বসে চুপিচুপি কী যেন করছে।

লোকটার সঙ্গে আমার দূরত্ব মিটার-চল্লিশের বেশি নয়। তার গায়ে কালো কোট দেখেই চমকে উঠলুম। পরমুহূর্তে সে মুখটা এদিকে ঘোরাল। অমনি দেখি, আরে! এ যে সেই প্রফেসর তানাচা। চেঁচিয়ে ডাকলুম,—প্রফেসর তানাচা! হ্যাল্লো প্রফেসর তানাচা!

আমাকে প্রচণ্ড অবাক করে প্রফেসর তানাচা ঝটপট উঠে সামনের উঁচু ঝোপটার ভেতর ঢুকে পড়লেন। এক পলকের জন্য তাঁর হাতে যেন একটা ছুরি দেখলুম। রোদে সেটা চকচক না করলে চোখে পড়ত না। আমি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে জোরে ডাকতে লাগলুম,—প্রফেসর তানাচা! প্রফেসর তানাচা! শুনুন, শুনুন!

কোনও সাড়া এল না। ভদ্রলোক বেমালুম গা-ঢাকা দিয়েছেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, বাঁ-দিকে নদীর ঢাল থেকে একটা ধূসর রঙের টুপি ঠেলে উঠল। তারপর বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ আবির্ভূত হলেন। —এই যে জয়ন্ত! খুব সকাল-সকাল ঘুম ভেঙেছে দেখছি। ভেবেছিলুম, তুমি ন'টার আগে আজ উঠবে না।

উত্তেজিতভাবে বললুম,—কর্নেল, এইমাত্র প্রফেসর তানাচাকে দেখলুম!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—হুঁ—পাপাভেরাসিয়া ফ্যামিলি। পপি জেনাসের অন্তর্ভুক্ত।

—কী সব বলছেন! স্পষ্ট দেখলুম প্রফেসর তানাচা একটা ছুরি নিয়ে ওখানে...

বুঝেছি। হোয়াইট পপি। —কর্নেল সাদা দাড়ি থেকে একটা পোকা ঝেড়ে ফেললেন। ডার্লিং, তুমি ঘটি না বাঙাল?

রাগ করে বললুম,—খাঁটি ঘটি। কিন্তু কী প্রলাপ বকছেন বলুন তো?

তুমি ঘটি। অতএব পোস্ত খেতে ভালোবাস। কিন্তু তুমি কি জানো, পোস্ত হোয়াইট পপিরই ফল? —বলে কর্নেল আমার হাত ধরে পাঁচিলের ধারে নিয়ে গেলেন। —ওই দ্যাখো, প্রফেসর তানাচার ছুরি কার গলা ফাঁক করছিল।

ঠাহর করে দেখি, ছ-সাত ইঞ্চি খুদে একরকম উদ্ভিদের ঝাঁকে জায়গাটা ভর্তি। গাছগুলোর ডগার দিকে চেরা দাগ। বললুম,—ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। এ কি প্রফেসর তানাচার ম্যাজিকের কাজে লাগবে নাকি?

কর্নেল হো-হো করে হাসলেন। —এগুলো আফিংগাছ, জয়ন্ত! ওই চেরা জায়গায় যে আঠা জমে উঠবে, তাই নির্ভেজাল আফিং। বেচারা প্রফেসর তানাচার আফিং কেনার পয়সা দিচ্ছিল কোনও উদারচেতা ভূত। বন্ধ করে দেওয়ায় উনি প্রকৃতির দরজায় এসে হাত পেতেছেন। তবে তোমার সঙ্গে তফাতটা হল, তুমি যে গাছের ফল খাও, উনি সেই গাছেরই আঠা খান।

—কলকাতা আর লোহাগড়ার দূরত্ব তিনশো কিলোমিটারেরও বেশি। উনি কীভাবে জানলেন এখানকার জঙ্গলে আফিংগাছ আছে?

—যেভাবেই হোক, জেনেছেন। আমি কেমন করে জানতে পারি, কোথায় কোন জঙ্গলে দুর্লভ প্রজাতির পাখি আছে?

—যাই বলুন, ওঁর আচরণ খুবই রহস্যময়। ঠাকুরদার কবচ চুরি গেছে বলে ব্যাগ ফেলে উধাও হলেন। তারপর এতদিন বাদে এখানে ওঁকে আফিংয়ের ধান্দায় দেখতে পেলুম। তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, আমাকে দেখেই পালিয়ে গেলেন কেন?

—হয়তো ভদ্রলোক বড়ো লজ্জা পেয়েছেন। পাওয়ারই কথা। তাই দূর থেকে দেখেও আমি ওঁর ধারে কাছে যাইনি।

কর্নেল আমার হাত ধরে টেনে পা বাড়ালেন। বললুম,—অলক্ষ্মীর মন্দিরটা কোথায় বলুন তো?

—পেছনে জঙ্গলের ভেতর। অলক্ষ্মীকে দেখলে কিন্তু তোমার শরীর হিম হয়ে যাবে। মূর্তিমতী বিভীষিকা।

—ভয় দেখাবেন না। আমি কচি খোকা নই। আমি দেখতে চাই মূর্তিটা।

—উঁহু। ইস্কাপনের টেক্কার নির্দেশ পালন করো জয়ন্ত। আজ ঠিক রাত দশটায় সে তোমাকে ওখানে যেতে বলেছে। তার আগে নয়। এটা একরকম 'ভদ্রলোকের চুক্তি', ডার্লিং। মেনে চলা উচিত।

নদী ডাইনে রেখে আমরা পাড় ধরে উত্তরে এগিয়ে চললুম। আমাদের বাঁ-দিকে রাজবাড়ি এরিয়ার টানা উঁচু পাঁচিল। সেই ভাঙা ফটকের পর একটা ভাঙাচোরা ঘর দেখা গেল। কর্নেল বললেন,—এটা একসময়ে রাজাবাহাদুরের বোট-হাউস ছিল। ওই দ্যাখো নৌকো রয়েছে। নৌকোটা নিশ্চয়ই জলে ভাসবার মতো হয়ে নেই। ...তারপর থমকে দাঁড়ালেন। একদিকে কাত-হয়ে-পড়া কাঠের ঘরটা থেকে কে একজন বেরুচ্ছিল। সাধুবাবা নাকি? কিন্তু কী বিকট রাক্ষুসে চেহারা সাধুবাবার!

সাধুবাবা না কোনও পাগল? আমাদের দেখেই তেড়ে এল। —কে রে? পালা! শিগগির পালা বলছি। অলক্ষ্মী জেগে উঠেছে। কড়মড় করে মুন্ডু চিবিয়ে খাবে। পালিয়ে যা, পালিয়ে যা!

সে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিতেই কর্নেল বললেন,—গতিক সুবিধের নয়, জয়ন্ত। কেটে পড়াই ভালো মনে হচ্ছে উনি এক অঘোরপন্থী সাধু। এঁদের খাদ্য হল মানুষের মড়া।

পাথরটা আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। আমরা ঘুরে পিঠটান দেওয়ার মতো হাঁটতে থাকলুম। সেই ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে কর্নেল খিকখিক করে বাচ্চাদের মতো হাসলেন,—দেখলে

তো ডার্লিং, কী সাংঘাতিক জায়গা এই লোহাগড়া? খুব সাবধান! আমার বুড়ো, দরকচা, শক্ত মাংসের চেয়ে তোমার মাংস আশা করি ঢের নরম এবং সুস্বাদু। অঘোরপন্থীদের নোলা দিয়ে জল ঝরবে তোমায় দেখে। অবশ্য তুমি প্রফেসর তানাচার পিশাচ-জাগানো মন্ত্র জানো। আওড়ে দেখতে পারও।

কর্নেল সুর ধরে আওড়ালেন :

'কবে যাবি রে সেই সমাজে
ছাড় কুইচ্ছে পোড়া পাম রে।'...

একটু দূরে জয়গোপালবাবুকে দেখা যাচ্ছিল। একটা কুকুর ওঁর সামনে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল। কুকুরটা আমাদের দিকে দৌড়ে এল। প্রথমে কর্নেলের, তারপর আমার প্যান্ট শুঁকে মনিবের কাছে ফিরে গেল। কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবু দেখছি ট্র্যাকিং ডগ পোষেন। এটা কী জাতের কুকুর জানো? লাব্রাডর রিট্রিভার। এদের দেখতে কিন্তু দিশি কুকুরের মতো। কানদুটোই যা ঝোলা। এদের অরিজিন নিউফাউন্ডল্যান্ডে। তবে নাগাল্যান্ডেও এ-জাতের কুকুর আছে। শিকারি পাখিকে গুলি করলে বারুদের গন্ধ শুঁকতে-শুঁকতে ঠিক জায়গায় গিয়ে পাখি কুড়িয়ে আনে। কিন্তু তোমার অমন আঁতকে ওঠার কারণ ছিল না। এরা বড্ড মানুষঘেঁষা কুকুর। লালবাজারে গোয়েন্দা দফতরের ডগস্কোয়াডে লাব্রাডর রিট্রিভার দেখেছি। খুনিকে ধরতে সাহায্য করে।

জয়গোপালবাবু এগিয়ে আসছিলেন আমাদের দিকে। দিনের আলোয় ভালো করে দেখার সুযোগ হল ওঁকে। ভদ্রলোকের পেল্লায় চেহারা। পরনে আঁটো প্যান্ট, স্পোর্টিং গেঞ্জি। চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা। কাছাকাছি এলে কোত্থেকে আর-একটা উঁচু লম্বাটে ছিপছিপে গড়নের কুকুর গরগর করে তেড়ে এল আমাদের দিকে। উনি শিস দিলে সে পেছনের দু-পা মুড়ে বসে প্রকাণ্ড জিভ বার করে আমাদের দেখতে থাকল। এ কুকুরটা যেন ঘিয়ে-ভাজা। একটুও লোম নেই। লেজটা কাটা। আগের কুকুরটাও যেন ভয়ে তার কাছে ঘেঁষছিল না। কর্নেল জ্ঞান দিলেন আমাকে। —এ হল গিয়ে ডোবারম্যান পিঞ্চার। জায়মান ডগ। খুব হামলাবাজ। এর সম্পর্কে তুমি একটু সাবধান থেকো জয়ন্ত!

জয়গোপালবাবু বললেন,—গুড মর্নিং কর্নেল। মর্নিং জয়ন্তবাবু।

কর্নেল বললেন,—মর্নিং! আপনার কুকুরদুটো দেখে খুব আনন্দ হল জয়গোপালবাবু!

আমার আনন্দ হয় না কর্নেল। কারণ এ ব্যাটারা নিষ্কর্মার ধাড়ি। —জয়গোপালবাবু বললেন, রাতে এরা ছাড়া থাকে। তবু ওইসব কাণ্ড হয় স্বকর্ণেই তো শুনেছেন। বরং অ্যালসেশিয়ানটাই কাজের ছিল। অন্তত ছোটাছুটি করে বেড়াত অশরীরীর পেছনে। বেচারার বরাত! সাপের কামড়ে মারা পড়ল।

সে কী! রাজবাড়ি এরিয়ার বিষাক্ত সাপ আছে নাকি? —প্রশ্নটা আমিই করলুম।

জয়গোপালবাবু বললেন,—আছে। সাপ নেই কোথায় বলুন?

কর্নেল বললেন,—ওখানে এক সাধুবাবা থাকেন দেখলুম।

সাধু? —জয়গোপালবাবু ভুরু কুঁচকে বিরক্তভাবে বললেন, ও তো জনাই-পাগলা। একসময় রাজবাড়িতেই কাজকম্ম করত-টরত। রাঘবকে দেখেছেন তো? ওর মাসতুতো দাদা। বললে বিশ্বাস করবেন না, জনাই কাঁচা মাংস খায় রাক্ষসের মতো। অ্যালসেশিয়ানটাকে ওখানে পুঁতে দিয়েছিলুম। ওই যে ফলকটা দেখছেন, ওখানে। কবর থেকে তাকে তুলে রাত্রিবেলা করেছে কী, জনাই কামড়ে-কামড়ে খাচ্ছে। টর্চের আলো পড়তেই ব্যাটা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কথা বলতে-বলতে আমরা রাজবাড়ির দিকে এগিয়ে গেলুম। দক্ষিণের বারান্দায় পৌঁছে কর্নেল হঠাৎ বললেন,—আচ্ছা জয়গোপালবাবু, তারানাথ চাটুজ্জে নামে কাউকে চেনেন?

জয়গোপালবাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। —হুঁ—লোহাগড়া এস্টেটের নায়েব ছিলেন ব্রজনাথবাবু। আমি তাঁকে দেখিনি। তাঁরই নাতি। রাজবাড়ি এরিয়ার ভেতর একসময় ওঁদের ফ্যামিলি থাকত। তারাদার বাবা হরনাথ রাজবাড়ির সরকারমশাই ছিলেন। তারাদা চিরকাল বাউণ্ডুলে মানুষ। ম্যাজিশিয়ান হওয়ার বাতিক চড়েছিল মাথায়। তা আপনি ওঁকে চেনেন নাকি?

—কলকাতায় একবার আলাপ হয়েছিল। ম্যাজিকের শোয়ে।

ম্যাজিক কি সত্যি দেখাতে পারত তারাদা? আমার বিশ্বাস হয় না।—জয়গোপালবাবু একটু হাসলেন, তবে হ্যাঁ—তাসের দু-একটা ম্যাজিক জানত বটে। দশজোড়া তাস নিয়ে থটরিডিংয়ের একটা খেলা দেখেছিলুম। সেটা অবশ্য বেশ অবাক হওয়ার মতো খেলা। ধরুন, প্যাকেট থেকে দশজোড়া বেছে নিতে বলল। তারাদা কিন্তু সেগুলো দেখছে না। বলল, একজোড়া করে তাস মনে রাখ। ধরুন, আমি মনে রাখলুম ইস্কাপনের সাহেব আর হরতনের তিরি। আপনি মনে রাখলেন চিড়িতনের বিবি আর রুইতনের গোলাম। জয়ন্তবাবু যে-জোড়াটা মনে রাখলেন, সেটা হল হরতনের গোলাম আর ইস্কাপনের তিরি। কেমন তো? এবার তাসগুলো চারটে সারিতে সাজিয়ে রাখা হল চিত করে। তারাদা বলল, তোমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা তাস-জোড়া এক সারিতে থাকতে পারে, আবার দুই সারিতেও থাকতে পারে। শুধু আমায় বলো, কোন সারিতে আছে। আশ্চর্য, প্রত্যেক সারিতে পাঁচটা করে তাস। অথচ তারাদা ঠিক জোড়াটা বের করে দিত।

কর্নেল বললেন,—বাঃ! তো তারানাথবাবু এখন কোথায় থাকেন?

—কলকাতায় থাকে শুনেছি। কখনও-সখনও আসে এখানে। এলে কখনও আমার কোয়ার্টারে, কখনও রাঘবের ঘরে থাকে। কিছু ঠিক নেই। রাজাবাহাদুর তো তারাদাকে দেখলেই তাড়া করবেন। একবার রাজবাড়ি থেকে চুরিচামারি করে পালিয়েছিল। সেই থেকে এ বাড়ি ঢোকা বারণ। কিন্তু কী করি বলুন? এসে পড়লে দেখে মায়া হয়। আশ্রয় দিই। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, রাজাবাহাদুর জানতে পারলে কেলেংকারি হবে।

নদীর ধারে ওঁকে এক পলক দেখছিলুম যেন। চোখের ভুল হতেও পারে।—যে আনমনে কর্নেল কথাটা বললেন।

কিন্তু কর্নেলের কথা শুনে জয়গোপালবাবু একটু অবাক হলেন। —সে কী! এলে তো জানতে পারতুম। যাকগে, আপনাদের ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করি। তাছাড়া সাড়ে-ন'টায় রাজাবাহাদুর আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বলেছেন। নটা বাজে প্রায়।

জয়গোপালবাবু বেরিয়ে গেলেন। জানালা দিয়ে দেখলুম, কুকুরদুটো ওঁর দুপাশে হেঁটে যাচ্ছে বডিগার্ডের মতো।...

তিন

ব্রেকফাস্টের পর আমরা ওপরতলায় রাজাবাহাদুর অজিতেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বেঁটে গোলগাল ওজনদার মানুষ। মুখে অমায়িক হাসি। আমার পরিচয় পেয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন,—দৈনিক সত্যসেবক নিয়মিত পড়ি মশাই। আপনার লেখা 'রাতের ট্যাক্সিতে ভূতুড়ে যাত্রী' পড়ে দারুণ লেগেছিল। এবার এ-বাড়ির ভূত-রহস্য নিয়ে কিছু লিখুন।

বললুম,—লেখার মতো ব্যাপার বটে!

—বটে কী বলছেন? উত্তর-পূর্ব কোনার ঘরটাতে সন্ধ্যার পর গিয়ে ঢুকুন না। আপনার চোখের সামনে চেয়ারগুলো টেবিলের একদিক থেকে অন্যদিকে গিয়ে বসবে। বিলেতে এই ভূতুড়ে কাণ্ডকেই বলে পলটারজিস্ট।

—বলেন কী! পলটারজিস্ট তো খুব রহস্যময় ব্যাপার। বিজ্ঞানীরাও এ-রহস্য ফাঁস করতে পারেননি।

কর্নেল আমার পাশ ঘেঁষে বসেছিলেন। কেন যেন আঙুলে খুঁচিয়ে দিলেন আমাকে। রাজাবাহাদুর খিকখিক করে হাসছিলেন। বললেন,—কী? ভূতের কীর্তি স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে তো?

হঠাৎ আমার মাথায় এল, একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষের সামনে বসে আছি। রাজাবাহাদুরের এসব কথাবার্তা, ভঙ্গি, হাসি—কোনওটাই যেন সুস্থ মানুষের নয়। আমার হাবভাব লক্ষ করেই বুঝি কর্নেল একটু কেশে বললেন,—রাজাবাহাদুর! আপনার মাথার যন্ত্রণাটা কমেছে তো? ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে না তো?

রাজাবাহাদুরের মুখের হাসি নিভে গেল। বাঁকা মুখে বললেন,—ভবেশ ডাক্তারের ওষুধে অসুখ সারবে না কর্নেল। গত বছর শীতের সময় আপনি এলেন, তখন থেকে এইরকম হচ্ছে আর ভবেশের ওষুধ গিলে যাচ্ছি। শেষে জয়গোপালকে বললুম, কলকাতা নিয়ে চলো। ও বলল, কষ্ট করে অত দূর যাবেন কেন? আমি ভালো ডাক্তার আনিয়ে দিচ্ছি। তো তাও এক সপ্তাহ হয়ে গেল। জয়গোপাল বলছে, এসে যাবেন'খন। বুঝুন অবস্থা!

জয়গোপালবাবু দরজার পরদা তুলে ঘরে ঢুকে বললেন,—আজই এসে পড়বেন রাজাবাহাদুর! তিনটেয় স্টেশনে গাড়ি পাঠাব। উনি ট্রাংককল করে জানিয়েছেন কলকাতা থেকে।

কর্নেল বললেন,—কোন ডাক্তার বলুন তো!

জয়গোপালবাবু কর্নেলকে চোখ টিপে কিছু ইশারা করে বললেন,—নাম শুনেছেন কি না জানি না। ডাক্তার ডি. জি. ঢোল। খুব বড়ো ডাক্তার ব্রেন স্পেশালিস্ট।

কর্নেল কেন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। রাজাবাহাদুর আনমনে জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন,—ব্রেনের ভেতর যেন একটা ছেঁদা হয়েছে। আর সেখানে ঢুকে গেছে একটা চড়ুইপাখি। সারাক্ষণ খালি কিচিরমিচির শব্দ। নাঃ, আমি আর বাঁচব না।

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। —আপনি বিশ্রাম করুন রাজাবাহাদুর। এবার আমরা যাই।

রাজাবাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে ফিক করে মিষ্টি হাসলেন। চোখ নাচিয়ে বললেন,—কিন্তু যে জন্য আপনাকে হন্তদন্ত হয়ে আনালুম, তার কত দূর কী হল? হতচ্ছাড়া ভূতটার একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন শিগগির! বড্ড বাড় বেড়েছে যে!

দেখুন না, কী করি।—বলে কর্নেল নমস্কার করে বেরুলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। রাজাবাহাদুর আমাকে দৈনিক সত্যসেবকে লেখার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

নিচের ঘরে ফিরে কর্নেল বললেন,—কী মনে হল রাজাবাহাদুরকে দেখে?

—মাথায় গণ্ডগোল আছে। কিন্তু আপনি তো আমাকে এ-কথা বলেননি!

—বলিনি। তুমি ওঁর মুখোমুখি হয়ে কী ধারণা করবে, সেটা জানার দরকার ছিল।

—ডাক্তার ঢোল কে? নাম তো শুনিনি!

—আমিও শুনিনি। তবে জয়গোপালবাবু কাল আমাকে গোপনে বলেছেন, ডাক্তার ডি. জি. ঢোল নামে একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে আনানো হচ্ছে কলকাতা থেকে। দেখা যাক কী হয় শেষপর্যন্ত।...

দুপুরে খাওয়ার পর ভাতঘুমের অভ্যাস আছে আমার। তাছাড়া রাতে ভালো ঘুম হয়নি। উঠে দেখি সূর্য ডুবতে চলেছে। কর্নেল কোথায় প্রজাপতির পেছনে দৌড়তে গিয়েছিলেন। ফিরলেন সন্ধ্যা গড়িয়ে। কয়েক জাতের প্রজাপতির স্বভাবচরিত্র বর্ণনা করলেন। রাঘব আরেক দফা চা আনল। এর কাছে শুনলুম, কলকাতার ডাক্তার এসে গেছেন। হলঘরের উলটোদিকের একটা ঘরে

উনি উঠেছেন। তবে রাজাবাহাদুর নাকি ডাক্তারকে দেখেই চটে গেছেন। পাত্তা দিচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য ডাঃ ঢোল নিজেই আলাপ করতে এলেন। ভারি অমায়িক মানুষ।

বললেন,—এ কোথায় এলুম বলুন তো মশাই? এ যে একেবারে সৃষ্টিছাড়া জায়গা!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—কেন বলুন তো!

ডাঃ ঢোল বেঁটে গোলগাল চেহারার মানুষ। পাকা ফলের মতো টুকটুকে গায়ের রং। মাথায় কদমকেশর ছাঁটের চুল। একটুকরো ছাগলদাড়ি রেখেছেন। চিবুক থেকে দাড়িটা বর্শার ফলার মতো উঁচিয়ে রয়েছে। সেই দাড়ির ফলা হাতের মুঠোয় ধরে গলা চেপে বললেন,—আমার মনে হচ্ছে এই রাজবাড়িতে যাদের দেখছি, তারা কেউ মানুষ নয়। চেহারাগুলো দেখেছেন? যেন একেকটা মড়া। চাউনি দেখলে গা ছমছম করে। তার ওপর রাজবাড়ির অবস্থাটা লক্ষ করুন। টাউন থেকে মাইল দেড়-দুই দূরে নির্জন নিঃঝুম জায়গায় এ যেন এক প্রেতপুরী।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন ডাক্তার ঢোল।

একথায় উৎসাহ পেয়ে ডাঃ ঢোল বললেন,—ওই বুড়ো রাজাবাহাদুরকে মানুষ বলে মনে হয় আপনার? যেন কবর থেকে তোলা মমি। অথচ মেজাজ আছে বুড়োর। আমি তো মশাই এসেই দেখছি গোখুরি করে বসেছি! রকম-সকম ভালো ঠেকছে না।

আমি বললুম,—রাজাবাহাদুরের অসুখটা কী?

ডাঃ ঢোল বিরক্তমুখে বললেন,—কাছে এগোতে দিলে তো বুঝব? পৃথিবীতে অনেকরকম পাগল আছে। এ জীবনে বিস্তর বাঘা-বাঘা পাগলের চিকিৎসাও করেছি। কিন্তু রাজাবাহাদুর এক সেয়ানা পাগল।

বলে ডাঃ ঢোল কর্নেলের দিকে ঘুরে ফিসফিস করে বললেন,—শুনলুম, রাজবাড়িতে কীসব ভূতুড়ে ঘটনাও নাকি ঘটে। সেজন্যে কলকাতা থেকে প্রাইভেট গোয়েন্দা এসেছেন। মশাই কি তিনিই?

কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন,—কার কাছে শুনলেন ডাক্তার ঢোল?

রাঘব নামে লোকটা বলছিল। —ডাঃ ঢোল একটু হাসলেন, আমি তাহলে একটুখানি নিশ্চিন্ত হতে পারি, কী বলেন মিস্টার... ইয়ে... সরি। আপনার নামটা বারবার ভুলে যাচ্ছি!

—আমাকে কর্নেল বলেই ডাকবেন ডাক্তার ঢোল।

ডাঃ ঢোল সোজা হয়ে বসলেন। মুখে প্রশংসার ছাপ। —কর্নেল! তার মানে আপনি মিলিটারির লোক?

—ছিলুম। এখন অবসরপ্রাপ্ত।

তা হোক! আমার মনের জোর বেড়ে গেল শুনে। —ডাঃ ঢোল খুশি হয়ে বললেন, যদি কোনও গণ্ডগোল বাধে, আপনি যখন আছেন—তখন আমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

তারপর আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন,—আর এই ইয়ংম্যান তো একজন সাংবাদিক। খুব আনন্দের কথা। হাতে কাগজ থাকলে মশাই পৃথিবী জয় করা যায়। আমরা গণ্ডগোলে পড়লে আপনি ফলাও করে কাগজে ছেপে দেবেন। অমনি গভমেন্টের টনক নড়বে। পুলিশের রথী-মহারথীরা এসে হাজির হবেন লোহাগড়া রাজবাড়িতে।

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—কী ঘটতে পারে বলে আপনার মনে হচ্ছে বলুন তো?

ডাঃ ঢোল চাপাগলায় বললেন,—এনিথিং! সবকিছু ঘটতে পারে। আমার একটুও ভালো ঠেকছে না এবাড়ির হালচাল।

—যেমন?

কর্নেলের প্রশ্ন শুনে ডাঃ ঢোল গম্ভীরমুখে বললেন,—ম্যানেজারবাবু বলছিলেন, রাজাবাহাদুর যে বংশের মানুষ, সেই বংশের প্রত্যেকে নাকি ডাকসাইটে খুনি। খুনের প্রবৃত্তি এঁদের রক্তে আছে।

রাজাবাহাদুর নাকি হঠাৎ-হঠাৎ খেপে গিয়ে ছুরিছোরা নিয়ে যাকে সামনে পান, তাড়া করেন। কাজেই যে-কোনও সময়ে কেউ খুন হয়ে যেতে পারে। তারপর ধরুন...

—হুঁ বলুন ডাক্তার ঢোল।

—যে ঠাকুরমশাই রাজবাড়ির রান্নাবান্না করেন, তিনি বলছিলেন, রাত-বিরেতে রাজবাড়ির ভেতর নাকি আগের আমলের কোন রাজাবাহাদুর ঘুরে বেড়ান। ধুপ-ধুপ শব্দ নাকি ঠাকুরমশাই রোজ রাতে শুনতে পান।

আমরাও শুনেছি। —আমার দিকে তাকিয়ে কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন।

ডাঃ ঢোল একটু ভয় পেলেন বুঝি। —সর্বনাশ! বলেন কী?

—আর কী শুনেছেন ডাক্তার ঢোল?

—রাজবাড়ির কোনও পূর্বপুরুষ নাকি কোথায় গুপ্তধন পুঁতে রেখেছেন। রাতবিরেতে তা খুঁজে বেড়ায় কারা।

—কার কাছে শুনলেন?

—রাঘব বলছিল।

ততক্ষণে বাইরে জ্যোৎস্না ফুটেছে। কর্নেল উঠে গিয়ে দক্ষিণের দরজায় দাঁড়ালেন। বললেন, —বাঃ! চমৎকার জ্যোৎস্না!

ডাঃ ঢোল তাঁর কাছে গিয়ে জ্যোৎস্না দেখতে-দেখতে তারিফ করলেন।—অপূর্ব! কিন্তু কী ট্র্যাজেডি দেখুন তো কর্নেল! প্রকৃতির এমন সুন্দর জিনিসটা উপভোগ করার ইচ্ছে সত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত হচ্ছি।

—কেন?

ভয়ে-ভয়ে একটু হেসে ডাঃ ঢোল বললেন,—এমন রাত্তিরে ঘুরে বেড়াতে বুঝি ইচ্ছে করে না?

কর্নেল বললেন,—ইচ্ছে করে তো ঘুরুন। জয়ন্ত, তুমি ডাক্তার ঢোলকে নিয়ে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নায় ঘুরে এসো না! আপনি আমার এই তরুণ বন্ধুর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গিয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করতে পারেন ডাক্তার ঢোল। ভাববেন না, জয়ন্ত ডানপিটে যুবক। তাছাড়া ওর কাছে রিভলভারও আছে।

সত্যি নাকি? —ডাঃ ঢোল অবিশ্বাসের চোখে আমার দিকে তাকালেন।

অগত্যা ওঁকে রিভলভারটা দেখাতেই হল। আসলে ঘরে চুপচাপ বসে না থেকে বাইরে অমন সুন্দর শরৎকালের জ্যোৎস্নায় আমারও ঘুরতে ইচ্ছে করছিল।

ডাঃ ঢোলকে নিয়ে বেরোলুম। এদিকটায় চওড়া ঘাসের লন এবং বাগান। মনে হল, কর্নেল আসলে ডাঃ ঢোলকে বাইরে পাঠিয়ে কোনও গোপন তদন্ত অথবা সেইরকম কিছু সেরে ফেলতে চান।

ঘাসে এখনই শিশির জমতে শুরু করেছে। টের পাচ্ছিলুম, মুখে ডাঃ ঢোল জ্যোৎস্না রাতের প্রশংসা করলেও মনে ভয় রয়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে পা ফেলছিলেন। কিছুটা এগিয়ে একবার ঘুরে রাজবাড়িটার দিকে তাকালুম। সত্যি-সত্যি প্রেতপুরী বলে মনে হল। সাদা জ্যোৎস্নায় ধূসর রঙের বাড়িটার গা থেকে যেন অলৌকিক জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

আমাকে ঘুরতে দেখে ডাঃ ঢোল খপ করে আমার কাঁধ চেপে ধরে বললেন,—কী? কী?

—কিছু না। আসুন।

—বেশিক্ষণ কিন্তু ঘুরব না জয়ন্তবাবু। পেশেন্টকে আবার একবার অ্যাটেন্ড করতে হবে। নইলে ম্যানেজারবাবু চটে যাবেন।

এদিকে-ওদিকে একটা করে গাছ অথবা ঝোপঝাড় কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে ধূসর কুয়াশার চাদর জড়ানো। আরও একটু এগিয়ে টানা পাঁচিলের কাছে পৌঁছলুম। ঠিক সেই সময় কাল রাতের সেই প্যাঁচাটা বিচ্ছিরি ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ চিৎকার করে মাথার ওপর আসতেই ডাঃ ঢোল আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।—কী? কী?

—ভয়ের কিছু নেই ডাক্তার ঢোল! নিছক প্যাঁচা।

—কে জানে মশাই! প্যাঁচার ডাক কখনও শুনিনি।

এবার ডাঃ ঢোল আমার একটা হাত শক্ত করে ধরে রেখেছেন। পাঁচিলের সমান্তরালে একটুখানি এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, পুবের ফটকের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। ডাঃ ঢোল ভয় পাবেন ভেবে ওঁকে কিছু বললুম না। ছায়ামূর্তিটা তেমনি কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জনাই-পাগলা না কি!

কিন্তু তারপর আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। ছায়ামূর্তিটা হঠাৎ বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম। ডাঃ ঢোল একই সুরে গলার ভেতর বলে উঠলেন—কী? কী?

কিছু না। —পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে সেই জায়গাটা তন্নতন্ন খুঁজলুম। তারপর মনে হল, জ্যোৎস্না রাতে এমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

ডাঃ ঢোল বললেন,—কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে জয়ন্তবাবু? জিনিসটা কী?

হাসতে-হাসতে বললুম,—রাতবিরেতে চোখে মানুষ অনেক ভুল দেখে। তবে না, তেমন কিছু আমি দেখিনি।

ডাঃ ঢোল থেমে দাঁড়িয়ে বললেন,—রাতবিরেতে কেন? মানসিক রুগিরা দিনদুপুরেও কতরকম ভুলভাল জিনিস দেখতে পায়। তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে হ্যালুসিনেশন। ধরুন, রুগি হঠাৎ ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, জানলার নিচে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে! এমনকী, তার পোশাকের বিবরণও দিল। কিন্তু সবটাই তার চোখের ভুল। আপনাকে একটা বই দেব। পড়ে দেখবেন। ডক্টর মার্লো পন্টির লেখা 'দি ফিলসফি অফ পার্সেপশান'। তাতে...

ঠিক এই সময় নদীর ওদিকে একদল শেয়াল হঠাৎ হুক্কাহুয়া করে জোরে চেঁচাতে শুরু করল। অমনি ডাঃ ঢোল আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ভয় পাওয়া গলায় বললেন,—কী? কী?

—শেয়াল ডাকছে।

—সত্যিকার শেয়াল তো? কে জানে মশাই, শেয়ালের ডাক কখনও শুনিনি।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিলুম ওঁর কবল থেকে। তারপর বললুম,—আপনার শাস্ত্রের কথামতো হ্যালুসিনেশন হতেও পারে। চলুন, এবার ফেরা যাক।

ডাঃ ঢোল হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। —তবে যাই বলুন, ভয় পাওয়ারও একটা মজা আছে। তাছাড়া আপনার সঙ্গে যখন রিভলভার আছে, তখন নিশ্চিন্তে ভয় পাওয়া যায়। আমার তো মশাই, দারুণ আনন্দ হল।

রাজবাড়ির দিক থেকে কুকুরের গজরানি শোনা যাচ্ছিল। তা শুনে ডাঃ ঢোল বললেন, —আর-এক বিপদ ওই কুকুরদুটো। সাংঘাতিক কুকুর মশাই! দেখলেই হাঁ করে চিবুতে আসে। ম্যানেজার জয়গোপালবাবুর ওই এক বিদঘুটে স্বভাব। কুকুর যারা পোষে, তারা আমার চক্ষুশূল। উনি কি ভাবছেন, সাংঘাতিক ভূতুড়ে কিছু ঘটলে কুকুর দিয়ে ঠেকাবেন? কুকুর কি ভূতপ্রেতকে ভয় পায় না? নিশ্চয়ই পায়। কী বলেন?

আনমনে বললুম,—পাওয়া তো উচিত।

হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ দোসরা নভেম্বর। এখন মোটে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা বাজে। আর আড়াই ঘণ্টা পরে পুবের ফটকের ওদিকে নদীর ধারে অলক্ষ্মীরর মন্দিরে একটা কিছু ঘটবে। 'ইস্কাপনের টেক্কা' আমাকে সেখানে রাত দশটায় উপস্থিত থাকতে বলেছে।

বুকের ভেতর রক্ত নেচে উঠল উত্তেজনায়। এবং ভয়েও বটে। এতক্ষণে কেমন আড়ষ্টতা জেগে উঠল শরীরে।

কর্নেলকে দক্ষিণের বারান্দায় দেখতে পাচ্ছিলুম। কাছে গেলে বললেন,—আশা করি, ডাক্তার ঢোলের নৈশভ্রমণ রোমাঞ্চকর হয়েছে?

ডাঃ ঢোল বললেন,—দারুণ রোমাঞ্চকর। সেই তো বলছিলুম জয়ন্তবাবুকে। সঙ্গে রিভলভার থাকলে রাতবিরেতে ঘোরার মজা আছে। বিশেষ করে প্যাঁচা এবং শেয়ালের ব্যাপারটা রিয়্যালি ওয়ান্ডারফুল!

ঘুঘুমশাই ইতিমধ্যে রাঘবকে বলে একপট কফি আনিয়ে রেখেছেন। শিশির আর নভেম্বরের রাত্রির হিমে একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলুম। কফিটা আরাম করে খাওয়া হল। তারপর ডাঃ ঢোল উঠলেন।—অসংখ্য ধন্যবাদ কর্নেল! সময় বড়ো সুন্দর কাটল। আশা করি এভাবেই কাটবে! এবার চলি। একটু পরে আবার রাজাবাহাদুরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে।

ডাঃ ঢোল চলে গেলে হলঘরের দিকের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর চাপাগলায় বললুম, —আপনি কি এই সুযোগে কিছু তদন্ত সেরে নিতে পেরেছেন?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—দ্যাটস রাইট, বৎস! ঠিকই ধরেছ।

—ডাক্তার ঢোল সম্পর্কে নিশ্চয়ই?

—হুঁ।

—কী বুঝলেন?

—ওঁর নাম ডাক্তার দোলগোবিন্দ ঢোল। কোনও গণ্ডগোল নেই। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটে বাসা। চেম্বার শ্যামবাজারে। তবে তত নামী সাইকিয়াট্রিস্ট নন।

—আর কিছু?

কর্নেল হাসলেন। —নাঃ ডার্লিং! লোকটির মধ্যে কোনও ভণ্ডামি নেই। একটু ভিতু প্রকৃতির, এই যা। জয়গোপালবাবু ওঁকে মোটা ফি-র লোভ দেখিয়েই এনেছেন। নইলে এমন ভূতুড়ে জায়গায় আসতেন বলে মনে হল না। ওঁর ব্যাগে জয়গোপালবাবুর কয়েকটা চিঠি দেখলুম। তা থেকেই বোঝা গেল ব্যাপারটা।

ঘড়ি দেখে বললুম,—সাতটা পঁয়তাল্লিশ বাজে। আমরা কখন বেরুব?

—নটা পঁয়তাল্লিশ নাগাদ। রাঘবকে বলেছি, আজ নটার মধ্যে রাতের খাওয়া সেরে নিতে চাই। সারাদিন ঘুরে বড্ড ক্লান্ত।

কর্নেল কোনার দিকে ইজিচেয়ারে পা ছড়িয়ে বসলেন। তারপর চোখ বুজে ধ্যানস্থ হলেন। আমি একটা বিলিতি ভ্রমণবৃত্তান্তের বই খুলে বসলুম। কিন্তু কিছুতেই মন বসল না বইয়ে। পাশের হলঘরে ঠাকুরদাঘড়ির বিচ্ছিরি টঙাস-টঙাস শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ভারি বিরক্তিকর।

কিছুক্ষণ পরে হলঘরের দিকের দরজায় টোকার শব্দ হল। তারপর জয়গোপালবাবুর গলা শুনতে পেলুম। দরজা খুলে দিলে জয়গোপালবাবু ভেতরে এলেন। —অসময়ে একটু বিরক্ত করতে এলুম, কর্নেল!

কর্নেল বললেন,—না, না। আসুন, আসুন!

জয়গোপালবাবু ঘরের ভেতর চোখ বুলিয়ে বললেন,—কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনাদের?

—মোটেই না। খাসা আছি।

গত বছর যখন আপনি এলেন, তখন কিন্তু রাজবাড়িতে বেশ শান্তি ছিল।—জয়গোপালবাবু একটু হেসে বললেন, গত মাস দু-তিন যাবৎ হঠাৎ নানারকম অশান্তি। তবে একটা ব্যাপার স্বীকার

করতেই হবে, এত সব কাণ্ড হচ্ছে—কিন্তু দেখুন, কারুর একতিল ক্ষতি হয়নি এ পর্যন্ত। ভগবানের ইচ্ছেয় ক্ষতিটতি না হলেই বাঁচি।

—কেন? কী ক্ষতির আশংকা করছেন বলুন তো?

জয়গোপালবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন,—নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন কর্নেল! কিন্তু রাতের বেলায় যে সব অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে—কিংবা ধরুন, দরজায় টোকা দিচ্ছে, অথচ দরজা খুলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এইতে আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। কোনও সাংঘাতিক ঘটনারই যেন আগাম সংকেত। বাই দা বাই, কর্নেল কি অশরীরী আত্মায় বিশ্বাস করেন?

কর্নেল একটু হাসলেন। —বিশ্বাস করার সুযোগ পাইনি জয়গোপালবাবু।

—আমিও পাইনি। কিন্তু এ রাজবাড়ির ইতিহাস তো খুব নির্মল নয়। বহু খুনোখুনি, অত্যাচার—এসব ঘটেছে অতীতকালে। বর্তমান রাজাবাহাদুরের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ। এখনও লোকের বিশ্বাস, তাঁর অশরীরী আত্মা রাজবাড়িতে ঘুরে বেড়ায় তিনি সতেরো শতকে রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম ছিল শিবেন্দ্রনারায়ণ। অলক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা তাঁরই আরেক অপকীর্তি। লোকে বলে, অলক্ষ্মীর পায়ে নরবলি দেওয়ার সাধ ছিল তাঁর। কিন্তু যে-কোনও কারণে হোক, সে সাধ মেটেনি। তাই তাঁর আত্মা এখনও নরবলি দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—কে জানে! মানুষের জ্ঞান বড়ো সীমাবদ্ধ জয়গোপালবাবু! বিজ্ঞানের সামনে এখনও কত বিরাট অনাবিষ্কৃত জগৎ পড়ে রয়েছে।

জয়গোপালবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, আর বিরক্ত করব না। সাবধানে থাকবেন। যা সব চলছে। —বলে উনি বেরিয়ে গেলেন।...

আজ দোসরা নভেম্বর। আকাশে ভারিক্কি চেহারার চাঁদ ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে। জ্যোৎস্নার ওপর নীলচে কুয়াশা জমে বাইরের সবকিছু কেমন থমথমে করে তুলেছে। প্রতি সেকেন্ডে আমার উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছিল। কী রোমাঞ্চকর খবর শোনাবে ইস্কাপনের টেক্কা? কে সে? কেন এমন করে সে আমাকে ওই বিদঘুটে জায়গায় ডাকল? তার কোনও কুমতলব নেই তো? ভয় হচ্ছিল এবার। কর্নেল কিন্তু নির্বিকার। রাঘব নটার মধ্যে খাইয়ে দিল। একটু পায়চারি করার ছলে আমরা দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। দূরে কোথাও জয়গোপালবাবুর কুকুরের গজরানি শুনলুম। কিন্তু পুবের ফটক পেরিয়ে গেলেও কুকুরদুটো আমাদের এদিকে এল না। নদীর জলে জ্যোৎস্না ঝকমক করছে। ওপারে কী পাখি দু'বার ডেকে চুপ করে গেল। তারপর সামনে কোথাও একপাল শেয়াল ডাকতে লাগল। ঝোপঝাড় আর ঘাসে ইতিমধ্যে প্রচুর শিশির জমেছে। আমার মনে ক্রমশ এবার একটা অস্বস্তি জাগতে শুরু করেছে। পকেটে গুলিভরা খুদে রিভলভারটা একবার ছুঁয়ে দেখলুম।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছিল সামনে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন, —বসে পড়ো। এখনও দু-মিনিট বাকি আছে দশটা বাজতে। দু'জনে ঝোপের আড়ালে বসে পড়লুম। একটা প্যাঁচা ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। ফাঁকা জমিটার ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো চৌকামতো উঁচু চত্বর দেখতে পাচ্ছিলুম। তার ওপর ওটাই কি অলক্ষ্মীর মূর্তি?

দমবন্ধ করে বসে আছি। সময় কাটতে চাইছে না। কতক্ষণ পরে হঠাৎ দেখি, এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে কে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চত্বরটায় উঠল। তারপরই চাপা একটা আর্তনাদ শুনতে পেলুম। সেইসঙ্গে ধস্তাধস্তির শব্দ হল। কর্নেল টর্চ জ্বেলে দৌড়ে গেলেন। আমি ওঁর পেছনে ছিলুম। টর্চের আলোয় প্রথমে চোখ পড়ল কালো রঙের মূর্তিটার দিকে। ও কি জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ-মুহূর্তে? হিংস্র ভয়ঙ্কর তার চেহারা। আর তার কোলের ওপর কেউ পড়ে রয়েছে। কর্নেল এক লাফে চত্বরে উঠে তার কাছে গেলেন। তারপর চমক-খাওয়া গলায় বলে উঠলেন,—সর্বনাশ! এ যে দেখছি প্রফেসর তানাচা!

চার

বড়োজোর আধ-মিনিটের মধ্যে এই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল। অথচ আমরা হতভাগ্য প্রফেসর তানাচাকে বাঁচাতে পারলুম না ভেবে কষ্ট হচ্ছিল। কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাস জড়ানো গলায় বললেন,—এ আমি ভাবিনি। কল্পনাও করিনি এমন কিছু ঘটবে।

হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। আমার হাতেও টর্চ আছে এবং পকেটে আছে গুলিভরা রিভলভার, বেমালুম ভুলে গিয়েছিলুম সে-কথা। এতক্ষণে টর্চ জ্বেলে প্রফেসর তানাচাকে ভালো করে দেখলুম। সিংহাসনে বসে-থাকা হিংস্র চেহারার এক নারীমূর্তির কোলে বুক চিতিয়ে পড়ে আছেন ভদ্রলোক। পরনে সেই কালো কোট, ছাইরঙা ঢোলা পাতলুন। শরীরের নিচেটা ঝুলে রয়েছে। মুখে আতঙ্কের ছাপ। চোখ বন্ধ। নাকের দুই ছিদ্র দিয়ে জ্বলজ্বলে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। তারপর অলক্ষ্মীর ওপর আলো ফেললুম। শিউরে উঠে দেখি, তার দুটো হাতে মানুষের গলা টিপে ধরার ভঙ্গি। তার দুটো পাথুরে চোখে ক্রূর হিংসা চকমক করছে। ঠোঁটে জিঘাংসার বাঁকা নিঃশব্দ হাসি। টর্চের বোতাম থেকে আমার অবশ আঙুল সরে গেল। আলো নিভে গেল।

কর্নেল নিজের টর্চ জ্বেলে চত্বরে সম্ভবত হত্যাকারীর চিহ্ন খুঁজছিলেন। জিগ্যেস করলুম, —কর্নেল, খুনি কি অশরীরী? আমরা তো এদিকেই লক্ষ রেখে বসে ছিলুম। অথচ শুধু প্রফেসর তানাচাকে দেখতে পেয়েছি—তাকে তো দেখতে পাইনি।

গোয়েন্দাপ্রবর কোনও জবাব দিলেন না। প্রফেসর তানাচার কাছে এসে হেঁট হয়ে ওঁর পোশাক হাতড়াতে শুরু করলেন। প্যান্টের পকেটে একটা নোংরা রুমাল, একটা দু-টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা পেলেন। সেগুলো ঢুকিয়ে রেখে এবার শার্টের পকেটে হাত ভরলেন। একটা ভাঁজ-করা খাম বেরিয়ে এল। খামটা নিজের পকেটে চালান করে দিলেন কর্নেল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন,—পুলিশে খবর দেওয়া দরকার এক্ষুনি জয়ন্ত, আমি এখানে থাকছি। তুমি রাজবাড়ি গিয়ে জয়গোপালবাবুকে সব জানাও।

আমি? —ভীষণ ভড়কে গিয়ে বললুম, যা ঘটেছে, এরপর একা এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাজবাড়ি যাওয়া তার ওপর ওই দুটো রাক্ষুসে কুকুর! আপনি যাই বলুন কর্নেল, এ আমার পক্ষে অসম্ভব।

কর্নেল বললেন,—তাহলে তুমি এখানে থাকো। আমি খবর দিয়ে আসি।

আরও আঁতকে উঠে বললুম,—সেটা আরও অসম্ভব। এই ভয়ঙ্কর জায়গায় মড়া আগলানো! বাপস। তাছাড়া অলক্ষ্মীর মূর্তিটা দেখছেন না কেমন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে? আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, অলক্ষ্মীই এ হত্যাকাণ্ডের নায়িকা।

কর্নেল গুম হয়ে বললেন,—ঠিক আছে। চলো, দুজনেই যাই।

চত্বর থেকে নেমেছি, হঠাৎ কোথায় কেউ বিকট খ্যানখ্যানে গলায় হেসে উঠল।—ওরে, পালিয়ে যা! পালিয়ে যা! অলক্ষ্মী জেগে উঠেছে। মারা পড়বি। পালিয়ে যা! টর্চের আলোয় একটু তফাতে জনাই-পাগলাকে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। তারপর আশেপাশে মোটা-মোটা ঢিল পড়তে শুরু করল। আমরা পাগলাকে তাড়া করলুম। সে বিকট হাসতে-হাসতে পালিয়ে গেল।

পূর্ণিমার চাঁদটা ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে নদীর ওপরে। জলের কলকলানি শোনা যাচ্ছে। জ্যোৎস্না ঝকঝক করছে জলে। ওপারে একদঙ্গল শেয়াল ডাকতে থাকল। রাজবাড়ির ফটকে গিয়ে কর্নেল বললেন,—কুকুরদুটোকে ভয় করার কারণ ছিল না, জয়ন্ত! সাপের ভয়ে হোক, কিংবা যে কারণেই হোক, রাতবিরেতে রাজবাড়ির ভেতর থেকে সম্ভবত ওদের বাইরে

যেতে দেন না জয়গোপালবাবু। আসার সময় যে গজরানি শুনেছিলে, তার কারণ ওরা ট্রাকিং ডগ। ঘ্রাণশক্তি প্রবল। আমাদের চলাফেরা আঁচ করেছিল। ওই শোনো, আবার ওরা গজরাচ্ছে।

রাজবাড়ির কাছে গিয়ে কানে এল, ওপরতলায় চ্যাঁচামেচি হচ্ছে। কর্নেল বললেন, —রাজাবাহাদুর কাকে যেন শাসাচ্ছেন মনে হচ্ছে?

ভেজানো দরজা ঠেলে আমাদের ঘরটাতে ঢুকলুম। কর্নেল হলঘরের দিকের দরজা খুলে রাঘবকে ডাকলেন। সাড়া এল না। রাজাবাহাদুরের চিৎকার শুনলুম।

—গেট আউট! ডাক্তার না ফাক্তার যেই হও, আমার সামনে আসবে না বলে দিচ্ছি। খুন করে ফেলব। আমার কেবলই খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে। আবার কাছে আসছ? গেট আউট।

বুঝলুম, রাজাবাহাদুর ডাঃ ঢোলকে শাসাচ্ছেন। একটু পরে শাসানি থেমে গেল। কর্নেল বললেন,—আশ্চর্য! রাঘব তো হলঘরে শোয়। বিছানাটা খালি দেখছি।

কর্নেল ওপরে উঠতে যাচ্ছেন, বড়ো কুকুরটা সিঁড়ির মাথায় এসে রুখে দাঁড়াল। যেন ঝাঁপ দেবে। কর্নেল পিছিয়ে এলেন। লেজকাটা ঘিয়েভাজা নির্লোম লালচে রঙের ওই কুকুরটা দেখে আমার গা হিম হয়ে গেল। একটু পরে তার সঙ্গী কানঢোলা কুকুরটাও এসে সিঁড়ির মাথায় হাই তুলে দু-ঠ্যাং সোজা করে বসে পড়ল।

কিন্তু পুলিশকে তো খবর দেওয়া দরকার! কর্নেল বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। আমি পরদা তুলে উঁকি মেরে ব্যাপারটা দেখছিলুম। তক্ষুনি দরজা আটকে দিলুম। কর্নেলকে বললুম,—ডক্টর ঢোলকে কি কুকুরদুটো কিছু বলে না?

—খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, জয়ন্ত! ওঁকে তো যখন-তখন রাজাবাহাদুরকে অ্যাটেন্ড করতে হবে। তাই হয়তো জয়গোপালবাবু কুকুরদুটোকে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছেন—যাতে ডাক্তার ঢোলকে যেন তারা বাধা না দেয়।

মিনিট পাঁচেক পরে কর্নেল যখন খুব অস্থির হয়ে উঠে পায়চারি করছেন, হলঘরে ডাঃ ঢোলের সাড়া পাওয়া গেল। রাঘবকে ডাকছেন। কর্নেল ঝটপট গিয়ে দরজা খুলে ওঁকে ডেকে আনলেন। ডাঃ ঢোল ঘরে ঢুকে রাগী মুখ করে বললেন,—অদ্ভুত ব্যাপার মশাই! রাজাবাহাদুর আসলে সিজোফ্রেনিয়ায় ভুগছেন। দিনে একরকম, রাতে তার উলটো। ডাক্তার জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড।

—কিন্তু আপনি যে ওপরে গেলেন এবং এলেন, কুকুরদুটো আপনাকে তাড়া করল না?

কর্নেলের এই বেমক্কা প্রশ্নে ডাঃ ঢোল প্রথমে একটু চমক খেলেন। তারপর ফিক করে হাসলেন, —করবে না বুঝি? দেখলেই তো হাঁ করে ব্যাটাচ্ছেলেরা কামড়াতে আসে। আমাকে ঠাকুরমশাই পেছনের দিকের সিঁড়ি দিয়ে রাজাবাহাদুরের ঘরে নিয়ে গেল। নেমে এলুম সেদিক দিয়েই। কুকুরদুটো ঠাকুরমশাইকেও তো খাতির করে না। টের পাচ্ছেন না, রাত্তিরে রাজবাড়ির জনপ্রাণীটি ঘরের বাইরে বেরোয় না। একে ভৌতিক উপদ্রব, তার ওপর ওই সাংঘাতিক কুকুর।

—কিন্তু আমার যে একবার ওপরে যাওয়া দরকার। রাজাবাহাদুরের ঘরে ফোন আছে দেখেছি। পুলিশকে ফোন করা দরকার।

ডাঃ ঢোল অবাক হলেন। —পুলিশকে? কেন বলুন তো?

—নদীর ধারে অলক্ষ্মীর চত্বরে একটা ডেডবডি পড়ে আছে।

—সর্বনাশ! তাহলে সত্যি-সত্যি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল? কে—কে খুন হল কর্নেল? কার ডেডবডি দেখে এলেন?

কর্নেল সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন,—জয়গোপালবাবুর ঘরেও ফোন আছে সম্ভবত। আপনারা একটু বসুন। যেন চলে যাবেন না ডাঃ ঢোল! আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

কর্নেল বেরিয়ে গেলে ডাঃ ঢোল বললেন,—কী ব্যাপার বলুন তো জয়ন্তবাবু?

বললুম,—ঘুম আসছিল না। তাই বেড়াতে বেরিয়েছিলুম আমরা। অলক্ষ্মীর মন্দিরে গিয়ে দেখি একটা ডেডবডি পড়ে আছে। নাকে রক্ত।

—বলেন কী! আমার তো মশাই বুক কাঁপছে। আগে এসব জানলে কক্ষনও আসতুম না। উঃ! কী সর্বনেশে ঘটনা মশাই। আগে যদি জানতুম...ওঃ!

—কীসব জানলে?

আমার প্রশ্নে ডাঃ ঢোল অবাক হলেন যেন। —বুঝলেন না? দরজায় রাতবিরেতে টোকা, ক্যানাস্তারার শব্দ, ধুপধুপ করে চলাফেরা। তার ওপর ওই বজ্জাত কুকুরদুটো—এবং সিজোফ্রেনিক রুগি।

—রাজাবাহাদুরের ব্যাপারটা কী?

—ওই তো বললুম, ডাক্তার জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইডের কেস। দেবতা এবং শয়তান একই লোকের মধ্যে। স্পিলট পার্সোনালিটির ব্যাপার। এসব পেশেন্ট রাত্তিরে নিজেও টের পায় না কী করছে। সেই যে এক ভদ্রলোক রাত্তিরে নিজের গায়ের কোটটি বাগানে পুঁতে রেখে আসতেন। সকালে চাকরকে বকাবকি করতেন।

ডাঃ ঢোলের কথা শুনে মনে হচ্ছিল, তাহলে কি রাজাবাহাদুরই প্রফেসর তানাচাকে খুন করে পালিয়ে এসেছেন এবং তাঁর হাবভাব দেখে রাজবাড়ির ঠাকুরমশাই ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন? ডাঃ ঢোলের দিকে আনমনে তাকিয়ে রইলুম।

নাকি ডাঃ ঢোলও এই চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—আচ্ছা ডাক্তার ঢোল, আপনি কি মনে করেন রাজবাড়ির বাইরে গিয়ে রাজাবাহাদুরের পক্ষে কাউকে খুন করা সম্ভব?

ডাঃ ঢোল সোজা হয়ে বসে বললেন,—আপনার প্রশ্নে যুক্তি আছে। এসব রুগি দিনে হাঁটাচলা করতে পারে না। কিন্তু রাত এলেই এদের শরীরে কী এক শক্তি ভর করে।

—আপনি কি আপনার পেশেন্টকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেন?

—তা আর বলতে? জোর করে একটা ঘুমের ইঞ্জেকশান দিতে হল।

ডাঃ ঢোলের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, উনি উঠে দাঁড়ালেন। —আমি মশাই এ ভূতের বাড়িতে আর থাকব না। পেশেন্ট গোল্লায় যাক। টাকার আমার দরকার নেই। কাল সকালেই কেটে পড়ব।

ডাঃ ঢোল আমাকে আরও সন্দিগ্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ওঁর ঘরের দরজা বন্ধ হতে শুনলুম। আমিও দরজাটা বন্ধ করে দিলুম। কর্নেলের এত দেরি হচ্ছে কেন কে জানে। চেয়ারে বসে আকাশ-পাতাল হাতড়াতে থাকলুম। এই রাজবাড়ির নায়েব হরনাথ চাটুজ্জে প্রফেসর তানাচার ঠাকুরদা ছিলেন। সেই ঠাকুরদার কবচ ওইভাবে কলকাতার সেনবাড়ি থেকে চুরি গেল। তারপর প্রফেসর তানাচা কর্নেলের ঘরে ব্যাগ ফেলে নিপাত্তা হলেন। ইস্কাপনের টেক্কার উড়ো চিঠি পেয়ে লোহাগড়ায় এ এক গোলকধাঁধা।

ঠুক-ঠুক-ঠুক।

চমকে উঠলুম। হলঘরের দিকের দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। আবার—ঠুক-ঠুক-ঠুক।

হঠাৎ নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠলুম। ধুরন্ধর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সহচর হয়ে কত সব সাংঘাতিক ঘটনার মধ্যে পড়েছি। কতবার মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। আর এই লোহাগড়া রাজবাড়িতে এসে ভূতের ডাকে ভয় পাব! রিভলভার আর টর্চ নিয়ে এক ঝটকায় দরজা খুললুম।

আশ্চর্য! কেউ নেই। হলঘরের ম্লান আলোটা জ্বলছে। তবু টর্চ জ্বাললুম। তারপর ওপরে কোথাও শব্দ হল ধুপ-ধুপ-ধুপ! আলো ফেললেই এক পলকের জন্য চোখে পড়ল, অবিকল হাতির

পেছনকার দুটো পা ওপরের বারান্দা কাঁপিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সেই আজগুবি হাতি। শব্দ উঠছে ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ! কালো গাব্দা দুটো পা ওপরের বারান্দায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

রিভলভার বাগিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ কোত্থেকে সেই ঘিয়ে ভাজা লোমহীন উঁচু ছিপছিপে চেহারার সাংঘাতিক মারমুখী কুকুরটা—ডোবারম্যান পিঞ্চার, দাঁত বের করে সিঁড়ির মাথায় তখনকার মতোই রুখে দাঁড়াল। পরক্ষণে কোথাও ঝন-ঝন-ঝনাত শব্দে কেউ কিছু ছুড়ে ফেলল।

তক্ষুনি ছিটকে পিছিয়ে এসে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা এঁটে দিলুম। ঠকঠক করে কাঁপুনি শুরু হল। সব সাহস উবে গেল। ফেঁসে-যাওয়া বেলুনের মতো নেতিয়ে পড়লুম বিছানায়। কিন্তু কর্নেল কী করছেন এখনও? কোনও বিপদে পড়েননি তো? একটা সিগারেট ধরিয়ে উদ্বেগ প্রশমন করতে থাকলুম। নার্ভ অনেকটা শান্ত হল। তারপর দেখি, আমার বিছানায় ভাঁজ করা একটা কাগজ পড়ে রয়েছে। সেটা খুলেই ভড়কে গেলুম।

ময়লা কাগজে ডটপেনে দ্রুত লেখা একটা চিঠি। আমরা যখন বেরিয়েছিলুম অলক্ষ্মীর মন্দিরে, তখনই কেউ জানালা গলিয়ে বা ভেজানো দক্ষিণের দরজা খুলে ফেলে গিয়ে গেছে।

কী সাংবাদিকপ্রবর? কথা রাখলুম কি না বলো! তুমি সাংবাদিক যখন, তখন নিশ্চয় জানো যে, সব টাটকা খবরের ফলো-আপ বা পরবর্তী খবরও থাকে। আগামীকাল, তেসরা নভেম্বর, রাত দুটো নাগাদ রাজবাড়ির দোতলায় উত্তর-পূর্বদিকের শেষ ঘরটার দরজার সামনে দাঁড়ালে সেটা পাবে। ইতি,

ইস্কাপনের টেক্কা

এবার আমার বাকি সাহসটুকুও উবে গেল। কে এই ইস্কাপনের টেক্কা? সে দেখছি আমাকে বুড়ি করে আসলে ধুরন্ধর গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গেই সাংঘাতিক এক খেলায় মেতে উঠেছে। প্রথম চিঠির কথা হাতে নাতে ফলে গেছে। এবার দ্বিতীয় চিঠি না জানি আর কোনও ভয়ঙ্কর ঘটনার সংকেত! এবার তার লক্ষ্যবস্তু আমি নই তো? সে ভালোই জানে, কর্নেলের প্রিয় সঙ্গী আমি। কর্নেল আমাকে পুত্রের চেয়ে বেশি স্নেহ করেন। আমার ওপর আঘাত হেনে কি সে কর্নেলের ওপর কোনও প্রতিশোধ নিতে চায়?

খুবই সম্ভব। অতীতে কর্নেল অনেক হিংস্র খুনি ও অপরাধীকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত এই ইস্কাপনের টেক্কা তাদেরই কেউ হবে। তাছাড়া লোহাগড়া রাজবাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কও যেন আছে। তাই সে প্রতিহিংসার জাল পেতেছে এই লোহাগড়া রাজবাড়িতে।...

চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে রইলুম। কর্নেল কেন আসছেন না? জানালার বাইরে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। যদি অলক্ষ্মীর মূর্তিটা জ্যোৎস্নায় রাজবাড়ির বাগানে হাওয়া খেতে আসে? দূরে আবার শেয়াল ডাকল। সেই প্যাঁচাটা যেন আজ রাতে অস্থির হয়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আর অমঙ্গলের বার্তা ঘোষণা করছে—ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও! হলঘরের ঘড়িটা বিদঘুটে টঙাস-টঙাস শব্দ করছিল সারাক্ষণ। এবার খ্যানখ্যানে গলায় বারোবার ডাক ছাড়ল। সারা বাড়ি কাঁপতে লাগল সেই আওয়াজে।

কতক্ষণ পরে কর্নেলের সাড়া পেলুম দক্ষিণের দরজায়। —জয়ন্ত, ঘুমিয়ে পড়োনি তো?

সঙ্গে-সঙ্গে সব ভয় কেটে গেল। ব্যস্তভাবে দরজা খুলে বললুম,—এত দেরি!

—জয়গোপালবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উনি থাকেন রাজবাড়ির বাইরে উত্তরদিকে একটা আলাদা একতলা বাড়িতে। ওঁকে বিস্তর ডাকাডাকি করে ওঠালুম। পুলিশকে ফোন করলেন। আধঘণ্টা পরে পুলিশ এল। তখন পুবের ফটক দিয়ে বেরিয়ে অলক্ষ্মীর মন্দিরে গেলুম। তারপর...

কর্নেল চুপ করলে বললুম,—তারপর?

—আশ্চর্য! ডেডবডিটার পাত্তা নেই। দারোগাবাবু খাপ্পা হয়ে চলে গেলেন।

—ডেডবডি নেই দেখলেন?

কর্নেল একটু হাসলেন। —জয়গোপালবাবু বললেন, এ কাজ তাহলে জনাই-পাগলার। সে মড়া খায়, উনি নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন। সময়মতো খাবে বলে লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। যাই হোক, বোট-হাউসে গিয়ে জনাই-পাগলাকে খুঁজলুম আমরা। তারও পাত্তা নেই।

আর দেরি না করে ইস্কাপনের টেক্কার চিঠিটা দেখালুম কর্নেলকে। তারপর দরজায় টোকা, হস্তী-পদদর্শন ইত্যাদি ঘটনাও খুঁটিয়ে শোনালুম। কর্নেল, চোখ বুজে দুলতে-দুলতে বললেন,—হুঁ, শুয়ে পড়ো ডার্লিং। বেশি ভাবলে মাথা গুলিয়ে যাবে।

এ রাতে আর কিছু ঘটল না। আমার ভালো ঘুম হয়নি। যখনই কান পাতি, কর্নেলের নাকডাকা শুনি। তারপর একটু ঘুম এসে থাকবে। ভাঙল যখন, তখন আমার বৃদ্ধ বন্ধুর প্রাতঃভ্রমণ সারা হয়েছে। টেবিলে চা নিয়ে বসে আছে। আমাকে চোখ খুলতে দেখে অভ্যাসমতো সম্ভাষণ করলেন, —গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি, সুনিদ্রা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে রাঘব ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে এল। কর্নেল বললেন,—কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে রাঘব?

রাঘব থতমত খেয়ে বলল,—কলকাতায় যাত্রা শুনতে গিয়েছিলুম স্যার!

—ভালো। ম্যানেজারবাবু কী করছেন?

—মাঠে কুকুরদুটোকে শিক্ষে দিচ্ছেন স্যার। ওনার ওই বাতিক।

—আচ্ছা রাঘব, জনাই তোমার মাসতুতো দাদা—তাই না?

রাঘবের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। —হ্যাঁ স্যার। মাসতুতো দাদা। সে-ই আমাকে এ রাজবাড়িতে এনেছিল। জনাইদা রাজাবাহাদুরের বাবার আমলের লোক। কপালের দোষে এই অবস্থা। দেখলে মনে বড়ো কষ্ট হয়।

—জনাই পাগল হয়ে গেল কেন রাঘব?

রাঘব মুখ নিচু করে বলল,—ম্যাঞ্জারবাবুর কানে গেলে আমাকেও মারবে স্যার!

তুমি নির্ভয়ে আমাকে বলতে পারো। —কর্নেল ওকে আশ্বস্ত করে বললেন, তোমার ম্যানেজারবাবুর কানে কেউ তুলবে না।

রাঘব চাপাগলায় বলল,—সবই পরে শুনেছি। স্বচক্ষে দেখিনি স্যার! জনাইদা নাকি ম্যাঞ্জারবাবুর ঘরে রেতের বেলা ঢুকেছিল—কেন ঢুকেছিল বলতে পারব না স্যার! ম্যাঞ্জারবাবুর একটা কুকুর ছিল—এদুটো নয়, অন্য একটা কুকুর। সেই কুকুরটা ওকে যত কামড়েছিল, ম্যাঞ্জারবাবুও তত মেরেছিলেন। মার খেয়ে জনাইদা রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তারপরে কিছুদিন নিপাত্তা হয়ে রইল। কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখি নদীর ধারে বোট হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সাধুর মতো চুল-দাড়ি গজিয়েছে। চিনতেই পারল না আমাকে। আসলে সেই মার খেয়েই জনাইদা পাগল হয়ে গেছে।

—কতদিন আগে জনাই মার খেয়েছিল?

—মাস দু-তিন হতে চলল প্রায়।

—তুমি নিশ্চয়ই তারানাথ চাটুজ্জেকে দেখেছ এ-বাড়িতে—নায়েববাবুর নাতি?

রাঘব হাসল। —ও! ম্যাঞ্জারবাবুর বাড়িও উঠতেন। রাজাবাহাদুরের হুকুমে ওনার এ-বাড়ি আসা বন্ধ হয়েছিল। ম্যাঞ্জারবাবুর হুকুমে আমরা ওনাকে থাক-তে জায়গা দিতুম। আহা, বড়ো ভালো লোক ছিলেন। বুদ্ধির দোষে বেঘোরে মারা পড়লেন!

তুমি ওঁকে শেষবার দেখেছ কখন? —কর্নেলের প্রশ্নে রাঘব কেমন একটু হকচকিয়ে গেল।

ঢোক গিলে বলল,—গতকাল বিকেলে দূর থেকে যেন নদীর ধারে একপলক দেখেছিলুম। চোখের ভুল হতেও পারে। তবে ওনার ওই অভ্যাসও ছিল স্যার!

—কী অভ্যাস?

—জঙ্গলে আফিংগাছ খুঁজে বেড়ানো।

—আফিংগাছ শুধু? নাকি অন্য কিছু?

রাঘব সাদা মুখে তাকাল। তারপর হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল,—ম্যাঞ্জারবাবু বকবেন স্যার! দেরি হয়ে গেল। আমি যাই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হুঁ! ম্যানেজারবাবুকে তোমার বড্ড ভয়, জানি। কিন্তু আমি তোমায় সাহস দিচ্ছি রাঘব। ভয় করো না। বলো, আর কী খুঁজে বেড়ান ম্যাজিকবাবু?

রাঘব করুণমুখে বলল,—সত্যি বলছি, জানি না স্যার! ম্যাজিকবাবু পাগলা লোক। ওনার কতরকম বাতিক।

—কে ওঁকে খুন করতে পারে বলে মনে হয় তোমার?

রাঘব মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে বলল,—অলক্ষ্মী খুব সাংঘাতিক 'জাগ্যত' ঠাকুর স্যার! রাতবিরেতে কেন, দিনেও কেউ ওখানে যায় না।

—হুঁ—জাগ্রত ঠাকুর বলছ তো?

—আজ্ঞে স্যার।

—তোমার জনাইদা কি সত্যি মড়া খায় রাঘব?

রাঘব আরও গম্ভীর হয়ে বলল,—পাগল তো! ম্যাঞ্জারবাবুর সেই কুকুরটা সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল। জনাইদা নাকি তার মড়া পর্যন্ত খেয়েছিল। এই যে শুনছি ম্যাজিকবাবু মড়াটা পাওয়া যাচ্ছে না। জনাইদাই লুকিয়ে রেখেছে দেখবেন।

—আচ্ছা, তুমি এসো রাঘব।

ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে কর্নেল বললেন,—চলো ডার্লিং! আজ একটু প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে আসি। প্রকৃতির মধ্যে ঘোরাঘুরি করলে মাথা পরিষ্কার হয়।

কালকের মতো জয়গোপালবাবুকে কুকুরদুটোকে ট্রেনিং দিতে দেখলুম দূর থেকে। আজ ওরা আমাদের দিকে দৌড়ে এল না। পুবের ফটক পেরিয়ে প্রথমে গেলুম বোট-হাউসে। জনাইপাগলের পাত্তা নেই। ঘুরে নদীর ধারে-ধারে হেঁটে অলক্ষ্মীর মূর্তির কাছে পৌঁছলুম। দিনের আলোয় মূর্তিটাকে দেখে রাতের মতো তত ভয়ংকর মনে হচ্ছিল না। বরং যে প্রাচীন ভাস্কর এটা গড়েছে, তার প্রশংসা করতে ইচ্ছে করছিল। কালো পাথরের সিংহাসনে কালো পাথরের নারীমূর্তি। একটু এবড়ো-খেবড়ো গড়ন। চত্বরে গিয়ে কাছ থেকে ভালো করে মূর্তিটা দেখছিলুম। এই সময় চোখে পড়ল, পিঠের কাছে সিংহাসনের ফাটলে কী একটা ঢুকে রয়েছে। সেটার সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা। সুতো ধরে টানতেই বেরিয়ে এল একটা তাস—ইস্কাপনের টেক্কা! উত্তেজিতভাবে বললুম,—কর্নেল! কর্নেল! এই দেখুন!

কর্নেল একটু তফাতে ঝোপে ঢুকে কী যেন করছিলেন। ঘুরে আমার হাতে তাসটা দেখে বললেন,—বুঝতে পারছ ডার্লিং? হত্যাকাণ্ডটা জমকালো করার জন্য এটা প্রফেসর তানাচার ডেডবডির গলায় বাঁধতে চেয়েছিল আমাদের এই রহস্যময় নায়ক। কিন্তু সময় পায়নি। তবে তার চেয়ে আরও মজার জিনিস এখানে আবিষ্কার করেছি।

তাসটা পকেটে ভরে চত্বর থেকে নামলুম। তারপর কর্নেলের কাছে গিয়ে দেখি, ওঁর হাতে একটা ছোটো নেলপালিশের শিশি। অবাক হয়ে বললুম,—অলক্ষ্মীদেবী কি নেলপালিশ লাগান নখে?

কর্নেল হো-হো হাসতে লাগলেন।—কী বোকা! কী বোকা! ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! লোকটার বাহাত্তুরে ধরেছে!

—কে বোকা? কার বাহাত্তুরে ধরেছে?

কর্নেল হাসির মধ্যেই বললেন,—আবার কার? কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের।...

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের বয়স বাহাত্তর হওয়ার আগেই বাহাত্তুরে ধরেছে, একথা আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি করব না। ব্যাপারটা কী বলুন তো শুনি?

কর্নেল হঠাৎ আমাকে টেনে ঝোপের মধ্যে বসে পড়লেন। আচমকা ওঁর ওই বিদঘুটে আচরণে বেজায় ভড়কে গিয়েছিলুম। চোখে চোখ পড়লে ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বললেন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন এবং আমাকেও ওইভাবে অনুসরণ করতে বললেন। শক্ত পাথুরে মাটি এবং ঝোপগুলোয় প্রচুর কাঁটা—শরীরের কত জায়গা যে ছড়ে গেল কহতব্য নয়।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—অল ক্লিয়ার! উঠে পড়ো ডার্লিং!

উঠে দাঁড়ালুম। চারদিক দেখতে দেখতে বললুম,—ব্যাপারটা কী?

প্রফেসর তানাচার খুনি সম্ভবত কিছু খুঁজতে আসছিল। কিন্তু আমরা যত সাবধানই হই, সে ঠিক বসে পড়ার মুহূর্তে আমাদের দেখতে পেয়েই পিঠটান দিল। কিন্তু আশ্চর্য জয়ন্ত! আমি কেন এমন বোকা হয়ে গেলুম লোহাগড়ায় এসে? কেনই বা আগাম বাহাত্তুরে ধরল?

বলে গোয়েন্দাপ্রবর পোশাক ঝাড়তে থাকলেন। টুপি খুলেও ঝাড়লেন। সাদা দাড়ি থেকে কয়েকটা শুকনো পাতা আর একটা খুদে রঙিন পোকাও বেছে ফেললেন।...

পাঁচ

কর্নেল কেন নিজেকে বোকা এবং 'বাহাত্তুরে ধরেছে' বললেন, বিস্তর প্রশ্ন ছুড়েও আদায় করা গেল না। ট্র্যাকিং ডগ যেমন করে গন্ধ শুঁকে খুনির আনাগোনার রাস্তায় ছোটে, তেমনি করে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরলেন—নিচের দিকে দৃষ্টি। বারকতক অলক্ষ্মীর চত্বরে চক্কর দিলেন। তারপর সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরালেন।

হাল ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলুম। সামনের ঝোপে থরেবিথরে বুনো ফুল ফুটে কেমন একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে। তার নিচে ভরা নদী কলকলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। নদীর প্রসার মিটার তিরিশের বেশি নয়। ওপারে কাশবন ফুলে-ফুলে সাদা হয়ে আছে। তারপর ঢেউ-খেলানো ধানের মাঠ এবং এখানে-ওখানে একটা করে টিলা-পাহাড়। প্রকৃতির মধ্যে এলে যখন কর্নেলের কথামতো মগজ পরিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা, তখন আশা করি আমিও রহস্যটা বুঝে উঠতে পারব।

হুঁ—নেলপালিশটা একটা রহস্য বটে। নদীর ধারে এ জিনিস ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকাটা কাজের কথা নয়।

নয় কি? ওই তো কিছুটা দূরে বাঁকের মাথায় আদিবাসীদের একটা বস্তি দেখা যাচ্ছে। কোনও আদিবাসী বালিকা এ পথে লোহাগড়ার বাজারে গিয়েছিল এবং শখ করে একটা নেলপালিশ কিনেছিল। ফেরার পথে সেটা কীভাবে এখানে পড়ে গেছে।

মনে-মনে খুশি হয়ে বললুম, ইউরেকা! তারপর ঘুরে দেখি, বাহাত্তুরে-ধরা ভদ্রলোকটি অদৃশ্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওঁকে খুঁজে পেলুম না। তখন অলক্ষ্মীর উঁচু চত্বরে উঠলুম। এবার ওঁর টুপিটি দৃষ্টিগোচর হল। কালো বাইনোকুলার চোখে রেখে হাঁটু দুমড়ে বসে নিশ্চয়ই কোনও দুর্লভ পক্ষিবরকে দর্শন করছেন। বোঝা গেল, এবেলার মতো ওঁকে আর পাওয়া যাবে না।

চত্বর থেকে নেমে বোট-হাউসের দিকে সাবধানে এগিয়ে গেলুম। প্রফেসর তানাচার মড়াটা জনাই-পাগলা যদি সত্যি লুকিয়ে রেখে থাকে, এতক্ষণে খানিকটা অংশ ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে

গেছে তাহলে। ত্রিসীমানায় পুলিশ নেই। অতএব জনাই নিশ্চিন্তে আস্তানায় ফিরে রাতের ঘুমটা পুষিয়ে নিতেও পারে।

যা ভেবেছিলুম, ঠিক তাই। বোট-হাউসের ভেতর জনাই-পাগলার ঠ্যাংদুটো দেখতে পেলুম। তারপর পুরো শরীরটা। ভাঙা পানসির আড়ালে ছায়ায় ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলুম। জনাই ঠ্যাং নাচাচ্ছে। চোখদুটো বুজে রয়েছে। উঁহু, ঘুমোচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিলুম, ঘুমোলে পাগলামি সেরে যায়। তাই পাগলরা ঘুমোয় না।

সাহস করে একটু কাশতেই জনাই তড়াক করে উঠে বসল। বোট-হাউসের মেঝে থেকে এক টুকরো ইটও হাতে নিল। তখন পকেট থেকে রিভলভার বের করে বললুম,—সাবধান জনাই! গুলি ছুড়ব বলে দিচ্ছি।

জনাই ইট ফেলে হাঁউমাউ করে উঠল। —ওরে বাবা! মরে যাব! মাইরি বলছি, মরে যাব! এই! এই!

বোট-হাউসে ঢুকে বললুম,—ম্যাজিকবাবুর মড়া কোথায়?

জনাই রিভলভারটার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে বলল,—পাইলে গেছে। তোমার দিব্যি।

—পালিয়ে গেছে? মড়া কখনও পালায়? নিশ্চয়ই তুমি খাওয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছ।

—যাঃ! কী যে বলে। ম্যাজিকবাবু আফিং খায়। ওর মড়া তেতো।

—জয়গোপালবাবুর কুকুরটার মড়া বুঝি মিষ্টি ছিল?

জনাই-পাগলা হাত বাড়িয়ে বলল,—একটা সিগ্রেট দেবে? দাও না।

রিভলভারটা পকেটে ঢুকিয়ে ওকে একটা সিগারেট দিলুম। দেশলাই জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিলে জনাই চোঁ-চোঁ করে কয়েকটা টান দিল। তারপর কাশতে লাগল। বললুম,—জনাই! ম্যাজিকবাবুর মড়াটা কোথায় গেল?

সিগারেটটা নিভিয়ে সে জটাচুলের ভেতর গুঁজে বলল,—মা অলক্ষ্মীর দিব্যি, পাইলে গেল। ধরতে গেছি, আর অমনি পাইলেছে!

পাগলামি করো না জনাই! তাহলে সত্যি গুলি ছুড়ব। —বলে ওকে ভয় দেখাবার জন্য যেই পকেটে হাত ভরেছি, অমনি জনাই আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে গুলতির মতো বেরিয়ে গেল। ধুলোময়লা ঝাড়তে-ঝাড়তে বোট-হাউস থেকে বেরিয়ে আর তাকে দেখতে পেলুম না।

ফটকের কাছে গোয়েন্দাপ্রবরের সঙ্গে দেখা হল। বললুম,—আপনার পাখিটিও বুঝি প্রফেসর তানাচার মড়ার মতো পাইলে গেল?

কর্নেল একটু হাসলেন। —জনাই-পাগলাকে যেভাবে পালাতে দেখলুম, ঠিক সেভাবেই। তবে আমি তাকে ভয় দেখাইনি।

—আপনি কী করে দেখলেন, আমি ওকে ভয় দেখাচ্ছিলুম?

কর্নেল বাইনোকুলারটি দেখিয়ে বললেন,—এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বহু দূরের ঘটনা দৃষ্ট হয়, ডার্লিং! যাই হোক, জনাই দেখলুম তোমাকে খুব খাতির করছিল!

প্রফেসর তানাচার মড়া পালানোর গল্প শুনে কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বললেন,—চলো! রোদ্দুর বড্ড চড়া। ফেরা যাক।

রাজবাড়ি পৌঁছে কর্নেল রাঘবকে ডাকলেন। রাঘবের ডিউটি আমাদের ফাইফরমাশ খাটা। তাই সে হলঘরে মোতায়েন ছিল। কর্নেল বললেন,—রাঘব! রাজবাড়িতে কেউ তাস খেলেন না?

রাঘব বলল,—রাজাবাহাদুর খেলেন দেখেছি। তবে একা-একা খেলেন।

পেশেন্স খেলা! —কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, হুঁ, আর কেউ খেলেন না? ম্যানেজারবাবু?

—আজ্ঞে না স্যার। ওনার খালি ওই কুকুর।

—এক প্যাকেট তাস জোগাড় করতে পারো?

রাঘব মাথা চুলকে বলল,—তাহলে সেই বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। ম্যাঞ্জারবাবুকে বলি।

—না। রাজাবাহাদুরের তাসের প্যাকেট বুঝি পাওয়া যাবে না?

—আপনার নাম করে বললে সে কি আর দেবেন না স্যার? এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

রাঘব চলে গেলে সন্দিগ্ধভাবে বললুম,—তাস কী হবে? আপনাকে তো কখনও তাস খেলতে দেখিনি।

কর্নেল হাসলেন। —ম্যাজিক দেখাব জয়ন্ত! থটরিডিংয়ের খেলা দেখিয়ে তোমাকে তাক লাগিয়ে দেব।

একটু পরে রাঘব এক প্যাকেট তাস নিয়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। —রাজাবাহাদুর ঠাকুরঘরে ঢুকেছেন। সেই ফাঁকে নিয়ে এলুম স্যার! জানতে পারলে কিন্তু আমার রক্ষে থাকবে না।

কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করলেন।

রাঘব চলে গেলে কর্নেল নিজের বিছানায় বসে তাসগুলো নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কীসব খেলতে শুরু করলেন, যেন কচি খোকা। ছড়াচ্ছেন, আবার তুলে শাফল করছেন। আবার ছড়াচ্ছেন। সাজাচ্ছেন। দেখতে-দেখতে বিরক্তি ধরে গেল। চোখ বুজে সিগারেট টানতে থাকলুম। একসময় 'ভেতরে আসতে পারি' বলে ডাঃ ঢোল ঘরে ঢুকলেন। কর্নেলকে তাস নিয়ে খেলতে দেখে বললেন, —পেশেন্স খেলছেন নাকি কর্নেলসায়েব?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—আসুন ডাক্তার ঢোল! আপনাদের আমি ম্যাজিক দেখাব।

—খুব ভালো, খুব ভালো। দেখান! ভেবেছিলুম আজই কেটে পড়ব। হল না। ম্যাজিক দেখেই সময় কাটাই।

—এখানে আসুন। জয়ন্ত, তুমিও এসো।

এ বুড়োখোকার এ-ধরনের পাগলামি বিস্তর দেখেছি। কাছে গেলে বললেন,—ডাক্তার ঢোল! আমি হাত দেব না। ঘুরে বসছি। দেখবও না কিছু। দশজোড়া তাস আপনারা বাছুন। বাকি তাস সরিয়ে রাখুন। এই দশজোড়ার মধ্যে আপনি একজোড়া আর জয়ন্ত একজোড়া মনে-মনে বেছে নিন। স্মরণে রাখুন। তারপর কুড়িটে তাস একত্র করে রেখে দিন।

সে তো প্রফেসর তানাচার ম্যাজিক! জয়গোপালবাবু বলছিলেন! —না বলে পারলুম না কথাটা।

ডাঃ ঢোল কুড়িটা তাস নিয়ে দশটা জোড়া করে ফেললেন। বললেন, —হুঁ—আমি একজোড়া বাছলুম। জয়ন্তবাবু, আপনি বাছুন।

আমি ইস্কাপনের বিবি আর একটা রুহিতনের তিরি বাছলুম। ডাঃ ঢোল দশজোড়া তাস একত্র করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল ঘুরে বসেছিলেন এতক্ষণ। বললেন,—হয়েছে? ফু-মন্তর লেগে যা!

বলে তাসগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে উনি সুর ধরে আওড়ালেন,—কবে যাবি রে সেই সমাজে, ছাড় কুইচ্ছে পোড়া পাম রে।

আমি তো অবাক।

পাঁচটা করে তাস এক সারিতে রেখে চারটে সারিতে সাজালেন কর্নেল। তারপর বললেন, —ডাক্তার ঢোল, আপনার তাসজোড়া এক সারিতে আছে, নাকি দুই সারিতে একটা করে আছে?

—প্রথম সারিতে একটা, তৃতীয় সারিতে একটা।

কর্নেল প্রথম সারি থেকে হরতনের গোলাম আর তৃতীয় সারি থেকে চিড়িতনের দশ তুলে বললেন,—রাইট?

ডাঃ ঢোল অবাক হয়ে বললেন,—বাঃ! এ তো ভারি অদ্ভুত!

আমি বললুম,—আমার জোড়াটা শেষ সারিতে আছে।

কর্নেল শেষ সারি থেকে ইস্কাপনের বিবি আর রুহিতনের তিরি তুলে বললেন,—রাইট?

—হুঁ। কিন্তু...

কোনও কিন্তুর ব্যাপার নেই ডার্লিং! এ হল মন্তর-তন্তরের ব্যাপার। —কর্নেল তাসগুলো গুটিয়ে রেখে চুরুট ধরালেন।

ডাঃ ঢোল বললেন,—আপনি দেখছি মশাই প্রচণ্ড গুণী লোক। জয়গোপালবাবুর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনছিলুম। তবে ম্যাজিকের কথাটা তো উনি বলেননি।

—তবে আরও একটা ম্যাজিক দেখাই?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! —ডাঃ ঢোল খুব উৎসাহ দেখালেন।

কর্নেল বললেন,—পুরো এক প্যাকেট তাস এখানে আছে। আপনারা জানেন, প্যাকেটে মোট তাস থাকে বাহান্নখানা। জোকার দুটো বাদ দিন। কেমন তো!

—খুব জানি।

কর্নেল তাসগুলো ডাঃ ঢোলকে দিয়ে বললেন,—একটা তাস এ থেকে আমি অদৃশ্য করে দিয়েছি। দেখুন তো কোনটা!

ডাঃ ঢোল তাসগুলো খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলেন। আমি কর্নেলের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কর্নেলের মুখে রহস্যময় হাসি। তাসগুলো দেখে ডাঃ ঢোল বললেন,—ইস্কাপনের টেক্কাটা তো দেখছি না? লুকিয়ে রেখেছেন বুঝি?

কর্নেল হাত বাড়িয়ে বললেন,—জয়ন্ত, তোমার পকেটে মন্ত্রবলে চালান করে দিয়েছি? দাও।

চমকে উঠেছিলুম। কিন্তু কিছু বললুম না। ইস্কাপনের টেক্কাটা বের করে দিলুম। আশ্চর্য! একই কোম্পানির তৈরি তাস। তাহলে রাজাবাহাদুরই কি ডাঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের কাহিনির মতো রাতের বেলা অন্যরকম হয়ে ওঠেন? তিনিই কি তাহলে প্রফেসর তানাচার খুনি?

গা শিউরে উঠল। কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—দেখলেন তো ডাক্তার ঢোল? জয়ন্ত কেমন বোকা বনে গেছে?

ডাঃ ঢোল তারিফ করে বললেন,—রিয়ালি! আপনি দারুণ গুণী লোক! তুলনা হয় না।

কর্নেল তাসের প্যাকেট একপাশে সরিয়ে রেখে বললেন,—তারানাথ চাটুজ্জে—মানে প্রফেসর তানাচা প্রথম খেলাটা আবিষ্কার করেছিলেন, জানেন ডাক্তার ঢোল? দ্বিতীয়টা অবশ্য আমার আবিষ্কার। দুঃখের বিষয় প্রফেসর তানাচাকে কে শুধু খুন করল তাই নয়, ওঁর ডেডবডিটাও লুকিয়ে ফেলল।

ডাঃ ঢোল ভুরু কুঁচকে বললেন,—কিছু ক্লু পেলেন?

—পেয়েছি। একটা নেলপালিশের শিশি। এই দেখুন।

খুনে শিশিটা নিয়ে ডাঃ ঢোল নাড়াচাড়া করার পর ছিপি খুলেই চমকে উঠলেন। সর্বনাশ! এ তো লিকুইড ক্লোরোফর্ম! নাকে লাগালেই মানুষ অজ্ঞান হয়ে যাবে। —বলে উনি ঝটপট ছিপি এঁটে দিলেন। একটা ঝাঁঝালো মিঠে গন্ধ কয়েক সেকেন্ডের জন্য ছড়িয়ে পড়ল।

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন,—হ্যাঁ, ক্লোরোফর্ম। নেলপালিশের সঙ্গে মেশানো। নির্বোধ প্রফেসর তানাচা! ব্যাপারটা টের পাননি। আচ্ছা ডাক্তার ঢোল, জয়গোপালবাবুর সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

পরিচয় মোটেও ছিল না। উনিই আমার ক্লিনিকের বিজ্ঞাপন কাগজে দেখে ট্রাংককলে যোগাযোগ করেছিলেন। সময় পাচ্ছিলুম না। শেষে তাড়া দিলেন। অ্যাডভান্স টাকাও পাঠালেন। তখন চলে এলুম। —ডাঃ ঢোল মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, কিন্তু একথা জিগ্যেস করছেন কেন বলুন তো! আমার ওপর কি কোনও সন্দেহ আছে আপনার?

কর্নেল হাত তুলে বললেন,—না, না। জাস্ট জানতে চাইছি।

কী জানি মশাই, আপনার সম্পর্কে যা সব শুনছি, বড্ড ভয় করে। —শুকনো হাসলেন ডাঃ ঢোল।

কর্নেল চাপাগলায় বললেন,—আপনার একটু সাহায্য চাই ডাক্তার ঢোল! পাব তো!

—অবশ্যই পাবেন। বলুন, কী করতে হবে।

—জয়গোপালবাবুর দুটো কুকুর আছে। একটা মোটামুটি শান্ত, মানুষ-ঘেঁষা স্বভাবের। ওটাকে নিয়ে সমস্যা নেই। অন্য কুকুরটা—যেটা লম্বাটে ছিপছিপে গড়নের, মানে ডোবারম্যন পিঞ্চার জাতের কুকুরটার কথা বলছি।...

—ওরে বাবা! সে যে ধড়িবাজ বদমাশ! দূর থেকে খালি আমাকে দাঁত দেখায়!

—ডাঃ ঢোল, মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে সব প্রাণীর প্রভু করেছে। আপনি বিচক্ষণ মানুষ। দ্বিতীয় কুকুরটাকে যেভাবেই হোক ইঞ্জেকশান দিয়ে আজ রাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হবে।

ডাঃ ঢোল চমকে উঠে নাক চুলকে বললেন,—সর্বনাশ! সে তো বড্ড রিস্কি।

—আমি আপনাকে অ্যাসিস্ট করব ডাক্তার ঢোল! কিন্তু সাবধান, জয়গোপালবাবু যেন না টের পান।

তা আর বলতে? —ডাঃ ঢোল চিন্তিতভাবে বললেন, কিন্তু কথাটা হল, যদি হঠাৎ কামড়ে দেয়! বলা যায় না, কুকুরের লালায় সাংঘাতিক সব ভাইরাস গিজগিজ করে।

কর্নেল বললেন,—মনে রাখবেন ডাক্তার ঢোল, ওই কুকুরটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ওপরই সব রহস্যের সমাধান নির্ভর করছে।

ডাঃ ঢোল অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন,—আচ্ছা।

এই সময় রাঘব পরদা তুলে বলল,—স্যার! রাজাবাহাদুর আপনাদের দু'জনকে তলব করেছেন।

ডাঃ ঢোল নিজের ঘরে গেলেন। আমরা দু'জনে রাজাবাহাদুরের কাছে গেলুম। পুজো সেরে রাজাবাহাদুর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। হেসে বললেন,—আসুন কর্নেল! আসুন সাংবাদিকবাবু!

কর্নেল তাসের প্যাকেট দিয়ে বললেন,—আপনার তাস রাজাবাহাদুর! আশা করি, এ অনধিকার চর্চার জন্য ক্ষমা করবেন।

—ক্ষমা করতে পারি এক শর্তে। যদি হারানো তাসটা উদ্ধার করতে পারেন।

—করেছি।

—তাহলে ক্ষমা করে দিলুম।

—আমার আরেকটা ছোটো প্রশ্ন আছে, রাজাবাহাদুর।

—জবাব দেওয়ার মতো হলে দেব। নইলে দেব না।

—জয়গোপালবাবু জনাইকে এমন মার মেরেছিলেন যে মাথায় সাংঘাতিক চোট লেগে পাগল হয়ে গেল। কেন মেরেছিলেন?

—জনাই ওর অ্যালসেশিয়ানকে বিষাক্ত ইঞ্জেকশান দিয়ে মেরে ফেলেছিল।

কর্নেল একটু হাসলেন। —আর প্রশ্ন করছি না। কিন্তু জনাইকে হুকুমটা গোপনে সম্ভবত আপনিই দিয়েছিলেন। রাজাবাহাদুর, জয়গোপালবাবুকে আপনি ভয় করেন, জানি, অথচ এত

ভয়ের কারণ ছিল না। এখনও হয়তো নেই।

রাজাবাহাদুর চাপাগলায় উত্তেজিতভাবে বললেন,—আছে। ও ডাক্তার এনেছে। জোর করে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে। কারণ সে দেখছে, আমি আপনাকে ডেকে এনেছি—তার সব কারচুপি ধরে ফেলেছি।

কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—হুঁ, দরজায়-দরজায় টোকা, উত্তর-পূর্ব ঘরটার ভেতর কাঁসার বাসন ছুড়ে ফেলার ঝনঝন শব্দ, ভারী পায়ে হেঁটে যাওয়া...

রাজাবাহাদুর সায় দিয়ে বললেন,—ধুপ-ধুপ-ধুপ-ধুপ... যেন দু পেয়ে হাতি হাঁটছে।

—আজ রাতে যদি আমার প্ল্যান সফল হয়, তাহলে দরজায় টোকা কেউ দেবে না এবং কাঁসার বাসনও কেউ ছুড়বে না।

আর ওই দু পেয়ে হাতিটাকে বুঝি বেঁধে রাখা যায় না? —রাজাবাহাদুর খিকখিক করে হাসলেন।

চেষ্টা করব। —বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, তাহলে আসি রাজাবাহাদুর। একটু সাবধানে থাকবেন।

রাজাবাহাদুর আমার দিকে তাকিয়ে রগুড়ে ভঙ্গিতে বললেন,—কী সাংবাদিকমশাই! কেমন সব গরমাগরম রহস্য! নোট নিচ্ছেন তো! সময়মতো দৈনিক সত্যসেবকে লিখবেন কিন্তু।

ওঁকে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে কর্নেলের সঙ্গে বেরিয়ে এলুম। আমাদের ঘরে পৌঁছে কর্নেলকে বললুম,—বাপস! মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। কিচ্ছু ঢুকছে না।

—কোনটা ঢুকছে না বলো তো বৎস!

—কোনটার কথা বলব! ধরুন, প্রফেসর তানাচার তাসের থটরিডিং এবং ওই মন্ত্রটা!

কর্নেল হাসলেন। —আরে, ওটা ওই তাসের খেলার একটা সূত্র। জয়গোপালবাবু দশজোড়া তাসের খেলার কথা বলার পর অনেক ভেবে রহস্যটা ধরেছি। মন্ত্রটা লক্ষ করো মোট দশজোড়া বর্ণ আছে। ক ব য (জ) র ই স ম ছ ড় প। প্রত্যেকটির বর্ণ দুটো করে। তাহলে কুড়িটে হল। ধরো তুমি ইস্কাপন আর রুহিতনের দুটো টেক্কার জোড়া মনে রাখলে। আমি 'ক'-য়ে রাখলুম ইস্কাপনের টেক্কা। পরের 'ক' পাচ্ছি তৃতীয় লাইন তৃতীয় অক্ষরে। 'ছাড় কুইচ্ছে' লাইনে পাঁচটা অক্ষরের তৃতীয় হল 'ক'। সেখানে রাখলুম তোমার মনে রাখা তাসজোড়ার দ্বিতীয়টা—রুহিতনের টেক্কা। তুমি যখনই বলবে তোমার তাস প্রথম ও তৃতীয় লাইনে আছে, তখনই আমি জানতে পারছি কোন-কোন তাস জোড়া বেঁধেছিল।... কর্নেল একটা কাগজে সাজানোর পদ্ধতি লিখে দেখালেন।

ক	বে	যা	বি	রে
সে	ই	স	মা	জে
ছা	ড়	কু	ই	চ্ছে
পো	ড়া	পা	ম	রে

হতাশ হয়ে বললুম,—তাহলে নিছক ম্যাজিক! ধুস! আমি ভেবেছিলুম গুপ্তধনের সংকেত।...

দুপুরে খাওয়ার পর দেখি, ঘুঘুমশাই একটা জরাজীর্ণ বই পড়ছেন খুব মন দিয়ে। 'কুলকারিকা : লৌহগড় রাজবংশের ইতিহাস। শ্রীমন্মহারাজ অসিতেন্দ্র নারায়ণ দেবশর্মা প্রণীত।'

কর্নেল সন্ধ্যা পর্যন্ত বইটা নিয়েই কাটালেন। বিকেলে আমি এবং ডাঃ ঢোল পশ্চিমের ঝিলে হাঁস দেখতে গিয়েছিলুম। রাজবাড়ির গেটে ঢুকে চোখে পড়ল, জয়গোপালবাবু রাঘবকে শাসাচ্ছেন, —কুকুর দিয়ে খাওয়াব তোকে। জনাইকে দেখেও শিক্ষা হয়নি?

ঘরে ফেরার পর রাঘব যখন চা দিতে এল, তার মুখ ভার। কর্নেল তখনও বইটা পড়ছেন। হলঘরের ঘড়িতে সাতটা বাজলে বই বন্ধ করে বললেন,—আজ তেসরা নভেম্বর। আজ রাত দুটোয় প্রফেসর তানাচার আত্মার আবির্ভাব। মল্লযুদ্ধের সম্ভাবনা। নায়েব ব্রজনাথের হারানো কবচ উদ্ধার। কটা আইটেম হল, জয়ন্ত? হুঁ—আরেকটা আছে। সেটা বলব না। তৈরি থাকো, ডার্লিং! অবশ্য তোমার তো নেমন্তন্নই আছে...।

ছয়

রাত দশটা বাজল খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে। জয়গোপালবাবু আজ অনেকক্ষণ আড্ডা দিলেন এ-ঘরে। তারপর হাই তুলে শুভরাত্রি জানিয়ে শুতে গেলেন। ডাঃ ঢোল রাজাবাহাদুরকে ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়ে থাকবেন সম্ভবত। আজ আর ওপরে কাল রাতের মতো রাজাবাহাদুরের চ্যাঁচামেচি শুনতে পেলুম না। রাত সাড়ে এগারোটায় আমাকে চমকে দিয়ে হলঘরের দরজায় টোকা বাজল ঠুক-ঠুক-ঠুক। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—দরজা খোলো জয়ন্ত!

উনি শোননি। টেবিল ল্যাম্পের কাছে বসে চুরুট টানছিলেন। রিভলভার হাতে দরজা ভয়ে-ভয়ে খুলতেই ডাঃ ঢোল ঢুকে পড়লেন। মুখে উত্তেজনার ছাপ।

কর্নেল বললেন,—খবর?

খুব ভালো। তবে রাঘব হেল্প না করলে পারতুম না। —ডাঃ ঢোল চাপাস্বরে বললেন, আপনি না বললে—ওর হেল্প চাইতে সাহসই পেতুম না। দেখলুম ওর মাসতুতো দাদার ওই দশার জন্য ম্যানেজারবাবুর ওপর ভীষণ রাগ। এতদিন প্রকাশ করার সুযোগ পায়নি লোকটা।

—হুঁ—কুকুরটা এখন কোথায় ঘুমুচ্ছে?

—হলঘরের সিঁড়িতে।

—অন্যটা?

ওর মাথার কাছে বসে আছে। মাঝে-মাঝে স্যাঙাতের গা শুঁকছে। —ডাঃ ঢোল চুপিচুপি হাসলেন, আমার কিন্তু বড়ো আনন্দ হচ্ছে, কর্নেল! জীবনে এমন সাংঘাতিক কাজ কখনও করতে পারিনি। তবে এও সত্যি, আপনারই বুদ্ধি আর প্রেরণা ছাড়া কি পারতুম? কক্ষনও না। —রাজাবাহাদুরের খবর কী?

—জয়গোপালবাবুর তাগিদ। না অ্যাটেন্ড করে উপায় আছে? তবে আপনার কথামতো ঘুমের বদলে নার্ভ স্ট্রং করার জন্য একটা ইঞ্জেকশান দিয়েছি। আসলে ওঁর নার্ভের চাপে ওই অনিদ্রা আর অস্বস্তির ব্যাধি। এ থেকেই তো সিজোফ্রেনিয়া ডেভালাপ করে। এখন সবে ফার্স্ট স্টেপ চলছে।

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—জয়গোপালবাবু আপনাকে দিয়ে সাব্যস্ত করতে চেয়েছিলেন প্রফেসর তানাচা দৈবাৎ খুন হয়ে গেলে, হত্যাকারীর দায়িত্ব যাবে রাজাবাহাদুরের ঘাড়ে। কারণ রাতে ওঁর সেন্স থাকে না। কী করেন টের পান না। কাজেই...

—রাইট, সেন্ট পার্সেন্ট রাইট। আপনি ইশারা না দিলে তো আমি ঝোঁকের মাথায় রাজাবাহাদুরকেই প্রায় দায়ী করে বসেছিলুম!

কর্নেল চোখ বুজে একটা একটু দুলতে-দুলতে বললেন,—রাজাবাহাদুরের বয়স প্রায় সত্তরের ওপরে। নিঃসন্তান বিপত্নীক মানুষ। এত বড়ো বাড়িতে আগের মতো লোকজন নেই। প্রায় খাঁ-খাঁ অবস্থা। এই পরিবেশে অলক্ষ্মীর ভূতুড়ে ক্রিয়াকলাপ শুরু হলে নার্ভের অসুখ হতে বাধ্য। কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান মানুষও। তাই মূল ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন। ভয় পাননি। তাই মরিয়া হয়ে জয়গোপালবাবু আপনার সাহায্য নিয়ে ওঁকে রাতে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছেন—যাতে ব্রজনাথের কবচ খুঁজে বের করা যায়।

চুপ করে থাকা গেল না। বললুম,—কিন্তু কবচ তো প্রফেসর তানাচার কাছে ছিল। ওঁর ঘর থেকে চুরি গিয়েছিল সেটা।

কর্নেল বললেন,—মনে করে দ্যাখো জয়ন্ত। কলকাতায় আমার ঘরে আমি চুরির প্রশ্ন তুলতেই প্রফেসর তানাচা উদভ্রান্তের মতো 'সর্বনাশ! ঠাকুরদার কবচটা' বলে বেরিয়ে যান। চুরি যে হয়েছে, সেটা কিন্তু বলেননি। ঠাকুরদার কবচটা চুরি গেছে কি না, সেটা দেখতেই ছুটে গিয়েছিলেন।

ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে বললুম,—কী আছে কবচে যে তাই নিয়ে এত কাণ্ড?

কর্নেল চাপাগলায় বলতে শুরু করলেন,—সতেরো শতকে দুর্ধর্ষ রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ শুধু অলক্ষ্মীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেননি, তার জন্য গয়নাও বানিয়েছিলেন। লক্ষ টাকা দামের হিরের গয়না। তাঁর মৃত্যুর পর সেই গয়না তাঁর ছেলে নরেন্দ্রনারায়ণ খুলে এনে রাজবাড়িতে রাখেন। কিন্তু অলক্ষ্মীর গয়না খুলে আনার পর নাকি দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। মানুষের কুসংস্কারের এই রীতি। শেষে গয়নাটা কোথাও পুঁতে রাখা হয়। এর সন্ধান জানতে পেরেছিলেন ব্রজনাথ চাটুজ্জে—রাজবাড়ির নায়েব। কিন্তু তাঁর সাহস হয়নি ওটা উদ্ধার করতে। তাই এক টুকরো কাগজে সেটা লিখে কবচের মধ্যে রেখেছিলেন। মৃত্যুর সময় বলে যান, আমার বংশধরদের কারুর সাহস থাকলে এই কবচ যেন খুলে দেখে। কুসংস্কার বড়ো জটিল ব্যাধি, জয়ন্ত! তাঁর নাতি প্রফেসর তানাচা এর গুরুত্ব বুঝতেন। কিন্তু খুলে দেখার সাহস ছিল না। যাই হোক, 'কুলকারিকা' বইতে এ-বিষয়ে কিছু আভাস আছে। রাজাবাহাদুর আমাকে সব খুলে বলেছেন। জয়গোপালবাবু সেই কবচের সন্ধানে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। মির্জাপুরের মেসবাড়ির প্রফেসর তানাচার ঘরে সেটা খুঁজে না পেয়ে উনি ফাঁদ পাতেন। অলক্ষ্মীর কাছে দোসরা অক্টোবর রাত দশটায় প্রফেসর তানাচাকে হাজির থাকতে বলেন। লোভ দেখান, কথামতো কাজ করলে উনি টাকা পাবেন।

—কীভাবে জানলেন?

—প্রফেসর তানাচার বুকপকেটে জয়গোপালবাবুর চিঠি ছিল।

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। আপনি ওঁর পকেট থেকে একটা খাম বের করে নিয়েছিলেন।

—আমরা যে ওখানে ঠিক ওই সময় ওত পাতব, জয়গোপালবাবু জানতেন না। তাই তাড়াতাড়িতে বাকি কাজ করতে পারেননি। কিন্তু আমাদের ভুল হল। দু'জনেই চলে এলুম। তবে নেলপালিশের শিশিটা পালাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। আর খুঁজে পাননি। খুঁজতে গিয়েও আমাদের দেখে কেটে পড়েন।

মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। বললুম,—সে রাতে অলক্ষ্মীর মন্দিরে আমরা তো শুধু প্রফেসর তানাচাকে দেখেছিলুম। জয়গোপালবাবু থাকলে টর্চের আলোয় তাঁকেও দেখতে পেতুম না কি?

জয়ন্ত, জ্যোৎস্নারাতে সিংহাসনে উপবিষ্ট অলক্ষ্মী দেবীর কোলে কেউ বসে থাকলে চোখে পড়া কঠিন। প্রফেসর তানাচাও টের পাননি। —কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। ফের ধরিয়ে নিলেন। বাইরে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্নায় সেই অলুক্ষুণে প্যাঁচাটা ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল। তারপর দূরে নদীর ওদিকে শেয়াল ডাকতে লাগল। অজানা ভয়ে আমার গা ছমছম করে উঠল।

বললুম,—তাহলে ইস্কাপনের টেক্কা কে?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—সেটা আজ রাতেই জানতে পারবে, জয়ন্ত। অধীর হয়ো না।

তারপর উনি হঠাৎ হলঘরের দরজায় বেরুলেন। একটু পরে ফিরে এলেন প্রকাণ্ড একজোড়া গামবুট নিয়ে। এমন পেল্লায় গড়নের কালো গামবুট কস্মিনকালে দেখিনি। এ কি মানুষের পায়ের জন্য তৈরি, না দানবের?

অবাক হয়ে বললুম,—ওরে বাবা! এ কি দত্যিদানোর পায়ের গামবুট?

ডাঃ ঢোল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। তিনিও শিউরে উঠে বললেন,—এই গামবুট পরেই রাজবাড়ির অশরীরী ঘুরে বেড়ায় সারা রাত। হুঁ, যাই বলুন কর্নেল, রাজবাড়ির ভূতপ্রেতগুলোও মানসিক রুগি। নইলে কে কবে শুনেছে, ভূত গামবুট পরে ঘুরে বেড়ায় ধুপ-ধুপ করে?

কর্নেল বললেন,—ভূত নয়, ডাক্তার ঢোল। মানুষই পরে বেড়ায়। বিশেষ অর্ডার দিয়ে তৈরি এই গামবুট লোকটাকে প্রাণের দায়ে পরতে হয় এবং মনিবের হুকুমমতো রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াতে হয় হাতি-ভূত সেজে।

ডাঃ ঢোল এবং আমি একসঙ্গে বললুম,—কে সে?

আবার কে? রাঘব। —কর্নেল একটু হেসে বললেন, আজ ইচ্ছে করেই বেচারি এদুটো সিঁড়ির তলায় রেখেছিল, যাতে আমাদের নজরে পড়ে। রাঘব আর মনিবের হুকুম মানতে চাইছে না। আমাদের দেখে ও সাহসী হয়ে উঠেছে।

দেড় ঘণ্টা সময় আর কাটতে চায় না। ডাঃ ঢোলকে দেখলুম চেয়ারে লম্বা হয়ে ঢুলছেন। কর্নেল চোখ বুজে ধ্যানস্থ। টেবিল ল্যাম্প নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। হলঘরের ঘড়িতে ঢঙাস-ঢঙাস বিদঘুটে শব্দে দুটো বাজলে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—জয়ন্ত! এসো। ডাক্তার ঢোল! চলে আসুন। এ রাতে রাস্তা ক্লিয়ার।

ডাঃ ঢোল চোখ মুছতে-মুছতে উঠলেন। আস্তে দরজা খুলে আমরা বেরুলুম। হলঘরে আলো নেই। ওপরের বারান্দায় টিমটিমে বালব জ্বলছে সিঁড়িতে বিশাল কুকুরটা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে ডিঙিয়ে আমরা ওপরে গেলুম। তারপর দেখি, জয়গোপালবাবুর অন্য কুকুরটা রাজাবাহাদুরের ঘরের দরজায় সামনের একটা ঠ্যাং তুলে অন্য ঠ্যাং দিয়ে ঠুক-ঠুক করে ঘা দিচ্ছে। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—কেমন ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে দেখছ তো? ডোবারম্যান পিঞ্চারটা ওকে পাহারা দিত। আনাচে-কানাচে কেউ এসে রহস্যটা ধরে ফেলবে, তার জো ছিল না। তেড়ে যেত আগে থাকতে। অ্যালসেশিয়ানটাকেও দরজায় টোকা দেওয়া শেখানো হয়েছিল। টোকা দিয়ে নিঃশব্দে গা-ঢাকা দিত। ওই দ্যাখো, লাব্রাডর রিট্রিভার জাতের কুকুরটাও কেমন লুকিয়ে পড়ল। চলে এসো—ও এখন কী করবে দেখা যাক।

বারান্দা পূর্বে ঘুরে গেছে। বড়ো-বড়ো থাম রয়েছে। দেখলুম, একটা ঘরের দরজা ঠেলে কুকুরটা ঢুকে পড়ল। তারপর সেই শব্দটা হল—ঝন-ঝন-ঝনাত। কর্নেল বললেন,—ওটা কিচেন। থালাটা ছুড়ে ফেলে তক্ষুনি কুড়িয়ে যথাস্থানে রাখবে। ওই দ্যাখো, কেমন গোবেচারার মতো বেরিয়ে আসছে এবার।

কুকুরটা আমাদের দেখে দৌড়ে এল। আমি আঁতকে উঠেছিলুম তাকে আসতে দেখে। ডাঃ ঢোল সটান আমার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু কুকুরটা আমাদের প্রত্যেকের পা শুঁকে নিঃশব্দে চলে গেল অন্যদিকে। আমরা বারান্দা দিয়ে ঘুরে উত্তর-পূর্ব কোণে পৌঁছলুম। কর্নেল ডাঃ ঢোলকে টেনে নিয়ে থামের আড়ালে ওত পাতলেন। আমি শেষ ঘরটার সামনে গিয়ে দুরুদুরু বুকে দাঁড়ালুম। পকেটে হাত ভরে রিভলভারের বাঁটটা চেপে ধরলুম। তারপর পরদা তুলে দেখলুম, দরজা বন্ধ। ভেতরে কারা খুব চাপাগলায় কথা বলছে। একটু পরে বুঝলুম, তর্কাতর্কি চলেছে। কপাটের ফাঁকে কান পাতলুম। ভেতর থেকে ওইসব কথাবার্তা স্পষ্ট ভেসে আসছিল।

—তুমি আগাগোড়া সব ফাঁস করেছ রাজাবাহাদুরের কাছে। তোমাকে আমি অলক্ষ্মীর থানে আসতে বলেছি, তাও বলে দিয়েছ। নইলে রাজাবাহাদুর ওই ঘুঘুদুটোকে কেন ওসময় ওখানে পাঠাবেন। জানবেন কীভাবে বলো?

—বেশ করেছি। কেন তুমি আমার কবচ চুরি করতে চেয়েছিল, তার জবাব আগে দাও।

—কবচ নিশ্চয়ই তুমি রাজাবাহাদুরের কাছে রেখেছ। যদি...

—বেশ করেছি।

চমকে উঠলুম। এ কী! এ যে প্রফেসর তানাচার গলা। মনে পড়ে গেল, জনাই-পাগলা বলেছিল—'মড়া পাইলে গেছে!' প্রফেসর তানাচার মড়া দেখছি সত্যি পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যদি মড়া হবে, তাহলে কথা বলছে কেমন করে? হতবুদ্ধি হয়ে শুনতে থাকলুম।...

—তাহলে তোমাকে আর বাঁচানো গেল না, তারাদা। ডনের পেটেই তোমাকে পাঠিয়ে দিই। ডনকে দেখেছ তো? কতবড় হাঁ তার।

—আরে যাও-যাও। কবচটা যাও বা দিতুম, আর দেব না।

—পাঁচশো টাকা পাবে তারাদা।

—বিনিপয়সায় দিতুম। আমাকে তুমি অলক্ষ্মীর ওখানে যেতে বললে, গেলুম। অজ্ঞান করলে কেন? তাও না হয় করলে, মারা তো পড়িনি—কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় হাত-পা বেঁধে এ-ঘরে এনে রাখলে। ভালোমন্দ খেতে দিলে। তাই চুপ করে লুকিয়ে রইলুম। কিন্তু আমার আফিংয়ের গুলি? রাত দুটো অব্দি একগুলি আফিং পেলুম না। এখন এসে কবচ চাইছ। ইস! ওরে আমার চাঁদ রে!

—তারাদা, এবার কিন্তু আমি মরিয়া। হাতে কী দেখছ?

—সর্বনাশ! তুমি আমাকে ছু-ছু-ছুরি দেখাচ্ছ? আমি এবার চেঁচাব বলে দিচ্ছি।

—চেঁচাবার আগেই তোমার হার্টে ঢুকে যাবে ছুরি। কেমন ধারাল হয়ে আছে দেখছ তো?

—ওঃ কী বুদ্ধু আমি! টাকার লোভে তোমার ফাঁদে পা দিলুম গো! আমার মরণ হয় না কেন?

—ন্যাকামি রাখো! ওঠো তারাদা। রাজাবাহাদুরকে ইঞ্জেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ওঁর ঘরে গিয়ে কোথায় কবচ আছে, বের করে দাও। চলো! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—তুমি খোঁজোগে। আমি কি জানি কোথায় রেখেছেন উনি? তাছাড়া ওঁর ঘরের দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ।

—সামনেকার দরজা বন্ধ। ওপাশের দরজা ভেজানো আছে।

—হিঃ হিঃ হিঃ! তোমার বুদ্ধি আছে গোপাল। রাঘবব্যাটাকেও বশ করে ফেলেছ দেখছি।

—ওঠো! দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—বেশ। যাচ্ছি। কিন্তু পাঁচশো টাকা দেবে বলেছ। হাতে-হাতে চাই বলে দিচ্ছি।

—এই দ্যাখো পাঁচখানা একশো টাকার নোট। দেখতে পাচ্ছ?

—জাল নোট নয় তো গোপাল? তোমাকে বিশ্বাস হয় না। তুমি আমায় যা ভোগাচ্ছ।

—আঃ। চলো। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

পায়ের শব্দ শুনে সরে এলুম। থামের আড়ালে কর্নেল ইশারা করছিলেন। ওঁদের কাছে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে পড়লুম। দরজা খুলে প্রথমে বেরুলেন জয়গোপালবাবু, তাঁর পেছনে প্রফেসর তানাচা। স্পষ্ট দেখলুম, ওঁর নাকের তলায় সেই রক্তের ছোপ—উঁহু, নেলপালিশের রং লেগে রয়েছে। বারান্দা ঘুরে রাজাবাহাদুরের ঘরের দিকে ওঁরা চলে গেলে আমরা নিঃশব্দে উঠে পড়লুম। দু'জনকে আর দেখা গেল না। পাশের কোনও ঘর দিয়ে রাজাবাহাদুরের ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে বুঝি।

রাজাবাহাদুরের ঘরের সামনে যেই গেছি, দরজা খুলে রাজাবাহাদুর হাসিমুখে বেরুলেন। পরনে রাতের পোশাক। ফিসফিস করে বললেন,—রেডি থাকুন। ওরা ঘরে ঢুকে আমাকে দেখতে পাবে না। ভড়কে যাবে।

আমরা ওত পাতলুম ফের। ঘরে আলো জ্বলে উঠল। তারপর ঘরের ভেতর থেকে ওদের কথা শোনা গেল।

—আরে! রাজাবাহাদুর কোথায়?

—বাথরুমে ঢুকেছেন।

—অসম্ভব। রাত দুটোয় আমার আসার কথা নিশ্চয়ই ফাঁস করে দিয়েছ। তাই রাজাবাহাদুর অন্য ঘরে শুয়েছেন। তা যা করেছ, করেছ। কবচটা বের করো।

—কবচটা বালিশের তলায় রেখেছিলেন সেদিন।...উঁহু। নেই দেখছি।

রাজাবাহাদুর নিঃশব্দে হেসে পকেট থেকে কালো সুতোয় বাঁধা প্রকাণ্ড একটা কবচ বের করে আমাদের দেখালেন। ভেতরে ওদের কথা ফের শোনা গেল। —চালাকি? বের করো খুঁজে। নইলে...

—ওরে বাবা। মরে যাব! মরে যাব। এই! কী হচ্ছে! বাবা যে! রাজাবাহাদুর! বাঁচান! বাঁচান!

প্রথমে রাজাবাহাদুর হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে গেলেন। আমরাও ঢুকলুম। উজ্জ্বল আলোয় দুই মূর্তি ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা স্কেচের মতো ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। তারপর প্রফেসর তানাচা গুলতির বেগে ছিটকে আমাদের পেছনে চলে এলেন। রাজাবাহাদুর কবচটা জয়গোপালবাবুর মুখের সামনে নেড়ে মুখ ভেংচে বললেন,—কবচ নেবে? কবচ? তুমি বরখাস্ত। এতদিন ধরে ভোগাচ্ছ। কবে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতুম। সাহস পাইনি, তাই। যাও, কেটে পড়ো রাজবাড়ি থেকে।

জয়গোপালবাবু হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছোরা তুলে ডাঃ ঢোলের ওপর—'তবে রে নেমকহারাম' বলে এক চিক্কুর ছেড়ে। ভয়ে চোখ বুজলুম। তারপর ধস্তাধস্তি শুনে চোখ খুলে দেখি, জয়গোপালবাবুকে ধরাশায়ী করে আমার বৃদ্ধ বন্ধু তাঁর বুকে বসে ছোরা ধরা হাতটা মোচড়াচ্ছেন। ছোরাটা পড়ে যেতেই রাজাবাহাদুর কুড়িয়ে নিলেন। ধার পরীক্ষা করে বললেন,—শান দিয়েছে, বুঝলেন মশাই? হুঁ—তাই অস্ত্রাগারের একটা ছোরা বেমালুম উড়ে গিয়েছিল! রোসো, থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকি।

রাজাবাহাদুর পালঙ্কের পাশে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। কর্নেল জয়গোপালবাবুর বুক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। জয়গোপালবাবু ফোঁস-ফোঁস করে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলছেন। গোয়েন্দাপ্রবরের ওজন বুড়ো হাড়ের দরুন এক কুইন্টাল মতো হবে! ডাঃ ঢোল কাঁপতে-কাঁপতে বললেন,—সর্বনাশ! এ যে সাংঘাতিক খুনে লোক! কর্নেল খপ করে না ধরলে ছোরাটা...বাপস! ভাবা যায় না! সত্যি ভাবা যায় না! ও কর্নেল! এই ভদ্রলোকেরই দেখছি সিজোফ্রেনিয়া হয়েছে। ইনিই ডাক্তার জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড!

রাজাবাহাদুর ফোন করে এসে বললেন,—থামুন মশাই! আপনি তো আমাকেই জেকিলহাইডের রোগ ধরিয়ে দিচ্ছিলেন।

কর্নেল শক্তগলায় বললেন,—জয়গোপালবাবু! পালানোর মতলব করবেন না কিন্তু। তারপর পকেট থেকে নিজের খুদে অথচ সাংঘাতিক পিস্তলটি বের করে ওঁর নাকের ডগায় ধরলেন। —ভালোছেলের মতো চুপচাপ বসে থাকুন। রাজাবাহাদুর! পুলিশ কী বলল!

—বলল, এক্ষুনি এসে পড়ছি, মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে।

প্রফেসর তানাচা এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিলেন। এবার বললেন,—আচ্ছা, আপনারা কি মনে করেন এই গোপলা হতচ্ছাড়া আমাকেও খুন করে ফেলত?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ, কবচ না পেলেই করত। কারণ, আপনি ওর কীর্তিকলাপ সব জানেন। আপনাকে এরপরও বাঁচিয়ে রাখলে রাজবাড়িতে জয়গোপালবাবুর থাকা খুব রিস্কি হতো।

প্রফেসর তানাচা ঢোক গিলে ভয়ার্ত স্বরে বললেন,—ওরে বাবা! তাহলে ওর কথায় রাজি হয়ে ভুল করেছিলুম। আপনার মুখে চুরির কথা শুনেই খেয়াল হয়েছিল, কবচটা যদি চুরি না যায়, তাহলে কোনও নিরাপদ জায়গায় রেখে আসব। সেনবাড়িতে গিয়ে দেখলুম, চুরি যায়নি চোর খুঁজে

পায়নি। তখন সেই দিনই লোহাগড়া চলে এলুম। এসেই চুপিচুপি রাজবাড়ি ঢুকে রাজাবাহাদুরের জিম্মায় রেখে কলকাতা ফিরে গেলুম। দিন-দুই পরে হঠাৎ এই গোপলা হতচ্ছাড়ার চিঠি পেলুম।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, চিঠিটা আপনার পকেটে ছিল। এই দেখুন, এখন আমার কাছে।

খামটা দেখে প্রফেসর তানাচা বললেন,—আপনি স্যার সত্যি মহা ঘু... জিভ কেটে উনি থেমে গেলেন।

কর্নেল হাসলেন। —সবাই আমাকে ঘুঘুমশাই বলে প্রফেসর তানাচা! এতে লজ্জার কারণ নেই আপনার।

প্রফেসর তানাচা বললেন,—আমাকে গোপলা অজ্ঞান করে ওঘরে এনে গুম করে রাখবে কি জানতুম?

রাজাবাহাদুর ভেংচি কেটে বললেন,—ন্যাকা! গোমুখ্যু! অ্যাফিংখোর কোথাকার!

আহা! আমি তো চিঠি পেয়ে ফের এসে আপনাকে জানিয়ে দিলুম। আমার কী দোষ?—প্রফেসর তানাচা করুণমুখে বললেন।

রাজাবাহাদুর খাপ্পা হয়ে বললেন,—তোমায় বলেছিলুম, অলক্ষ্মীর থানে যাওয়ার সময় ইস্কাপনের টেক্কা কালো সুতো দিয়ে বেঁধে গলায় লটকে নিও। ফেলে দিয়েছিলে কেন? কর্নেল না খুঁজে পেলে টেক্কাটা গচ্চা যেত না?

অলক্ষ্মীর চত্বরে উঠে সবে গলায় লটকাতে যাচ্ছি, হঠাৎ আমার নাকে...—প্রকাণ্ড আয়নার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন প্রফেসর তানাচা, ইস। দেখছ নাকের তলায় কী লাগিয়ে দিয়েছে গোপলা? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! রুমাল বের করে উনি রগড়াতে শুরু করলেন।

রাজাবাহাদুর দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন,—সত্যি-সত্যি রক্ত বের করো না রগড়াতে গিয়ে। যা কাণ্ড চলছে, রক্তারক্তি হলেই বিপদ। একটা কিছু হলে সব দোষ আমার ঘাড়ে এসে পড়বে।

কর্নেল বললেন,—ঠিক তাই হতে যাচ্ছিল রাজাবাহাদুর। এ-ঘরে প্রফেসর তানাচাকে জয়গোপালবাবু খুন করে ফেলত। আপনাকে দায়ী করাও সহজ হতো। ডাঃ ঢোল অতশত না বুঝেই সিজোফ্রেনিক রোগী বলে সাক্ষ্য দিতেন আদালতে। এসব রোগী রাতের বেলায় যা কিছু করে, নিজে টের পায় না। অতএব আপনি নিজের অজ্ঞাতসারে খুন করেছেন বলে সাব্যস্ত হতো। তার ওপর ডাঃ ঢোলের ওপর খাপ্পা হয়ে আপনি বলেওছিলেন, 'আমার খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে।' ডাঃ ঢোল সে কথাও বলতেন আদালতে।

রাজাবাহাদুর ফিক করে হাসলেন। ডাঃ ঢোলকে বললেন,—বলতেন নাকি মশাই?

ডাঃ ঢোল অপ্রস্তুত হাসলেন শুধু। আমি ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলুম চুপচাপ। এতক্ষণে আমার মগজের ধুলোবালি যেন সাফ হয়ে গেল। না বলে পারলুম না,—কর্নেল! ইস্কাপনের টেক্কা কে বুঝতে পেরেছি।

কর্নেল বললেন,—আগেই বোঝা উচিত ছিল দ্বিতীয় চিঠির ভাষা দেখে। রাজাবাহাদুরের কথা বলার ভঙ্গি ওটার ছত্রে-ছত্রে স্পষ্ট।

হতভম্ব হয়ে বললুম,—শুধু একটা ধাঁধা থেকে যাচ্ছে। রাত দুটোয় ওঘরে এমন নাটক হবে, গতকাল রাতেই কীভাবে জানলেন রাজাবাহাদুর?

আমার প্রশ্ন শুনে রাজাবাহাদুর চোখ নাচিয়ে বললেন, জয়গোপালের প্ল্যানের কথা রাঘব সবই জানত যে মশাই! রাঘবকে ও বলেছিল, ওই পুরোনো আসবাবপত্রে ঠাসা ভূতুড়ে ঘরে অজ্ঞান তারানাথকে অলক্ষ্মীর থান থেকে তুলে এনে রাখবে। রাঘবকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল। কথা ছিল, রাঘব অলক্ষ্মীর গয়না বেচা টাকার অর্ধেক পাবে—যদি সে ওকে সাহায্য করে আজ রাত দেড়টা-দুটোয় তারানাথকে নিয়ে আমার ঘরে যখন হানা দেবে তখন যেন ও সঙ্গে থাকে। রাঘবের মাসতুতো দাদা জনাই বেচারাকে জয়গোপাল মারের চোটে পাগলা করে ছেড়েছে। রাঘব জানে,

আমি বুড়োমানুষ। ওই শয়তানটার কাছে আমিও কত অসহায়। রাঘবের মনে রাগ হবে না? সে সব বলেছিল আমাকে। রাঘবের বদলে আমিই এ ঘরের ওই দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে বেচারাকে সন্দেহ থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলুম। খামোকা গরিব মানুষ। তাকে বিপদে ফেলি কেন? বরং বদমাশটাকে হাতেনাতে পাকড়াও করি। তাই কর্নেলকে আনতে গাড়ি পাঠিয়েছিলুম। আর... —আমার দিকে ঘুরে বললেন, এই সাংবাদিক ভদ্রলোককে মজাটা দেখাতে চেয়েছিলুম। কি মশাই? দারুণ রোমাঞ্চকর না? লিখবেন তো দৈনিক সত্যসেবকে?

এইসময় সবার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে জয়গোপালবাবু আচমকা কর্নেলকে ধাক্কা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে লাফ দিলেন। রাজাবাহাদুর চিৎকার করে উঠলেন,—পাকড়ো!

কর্নেল বললেন,—এ রাতে ওঁকে আর ধরা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। রাজাবাহাদুর! তাছাড়া ওঁকে খুঁজে গ্রেফতার করার দায়িত্ব পুলিশের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভালো।

রাজাবাহাদুর শান্ত হয়ে হঠাৎ ফিক করে একটু হাসলেন। —তাহলে একপ্রস্থ গরম কফি হয়ে যাক, কী বলেন? আহা, আমি কতদিন কফি খাইনি। আজ আপনাদের সঙ্গে এক কাপ খাব। কি ডাক্তার ঢোল? মাত্র এক কাপ খেলে ক্ষতি হবে কি?

ডাঃ ঢোল বললেন,—খাবেন বইকী রাজাবাহাদুর! জয়গোপালবাবু আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইতেন বলেই তো কফি খেতে দিতেন না।

রাজাবাহাদুর উৎসাহে নেচে উঠলেন। রাঘবের দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন,—এই হতচ্ছাড়া! হাঁ করে দেখছিস কী? ঠাকুরমশাইকে ওঠা গিয়ে। দ্যাখগে, সে আমার এই তারানাথের চেলা হয়ে আফিং গিলে পড়ে আছে নাকি।

রাঘব চলে গেল।

রাজাবাহাদুর সেই ঢ্যাপসা মোটা কবচটার সুতো ধরে দোলাতে-দোলাতে বললেন,—এই অলুক্ষুণে কবচটাই যত কাণ্ডের মূলে। কাল এটাকে নদীতে ছুড়ে ফেলতে হবে, বুঝলেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—খুব ভালো কথা। তবে কবচটা আমি একবার দেখতে চাই রাজাবাহাদুর!

রাজাবাহাদুর কবচটা দিলে কর্নেল খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—প্রফেসর তানাচা, আপনি কি কবচটা খুলেছিলেন? মনে হচ্ছে, কবচের মুখে আঁটা গালা বেশিদিনের নয়।

প্রফেসর তানাচা সে কথায় কান না করে বললেন,—আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে রাজাবাহাদুর! আমি শোব কোথায়?

রাজাবাহাদুর দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন,—আমার মাথায় শো হতভাগা আফিংখোর!

কোনার দিকের ডিভানে প্রফেসর তানাচা সটান চিত হলেন এবং চোখ বুজে ঠ্যাং দোলাতে শুরু করলেন। কর্নেল বললেন,—প্রফেসর তানাচা, কবচ আপনার কাছে ছিল। কাজেই আপনি ছাড়া কেউ খোলেনি। এর ভেতর নাকি অলক্ষ্মীর হিরের নেকলেসের সন্ধান আছে। আপনি ভেবেছিলেন, গয়নাটা পেলে বিক্রি করে দেবেন। কিন্তু...

কর্নেলের কথা কেড়ে প্রফেসর তানাচা চোখ বুজে এবং ঠ্যাং দোলাতে-দোলাতে বললেন, —বড্ড সাংঘাতিক মন্ত্রপূত কবচ স্যার! খুললে শাপ লাগবে। আমার লেগেছে দেখছেন না! লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছি একেবারে। অলক্ষ্মীর শাপ যা তো কথা নয়।

কর্নেল রাজাবাহাদুরকে বললেন,—একটা চিমটে দিতে পারেন রাজাবাহাদুর?

খুব পারি। —বলে রাজাবাহাদুর একটা টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোটো চিমটে বের করলেন। একগাল হেসে বললেন, চিমটেটা এনে দিয়েছিল পাজি জয়গোপাল। নাকের ভেতর বড্ড লম্বা-লম্বা লোম হয় দেখছেন তো! এ দিয়ে দুপুরবেলা পটাপট সেই লোম ওপড়াই।

কর্নেল চিমটে দিয়ে কবচের মুখ সাফ করছিলেন। প্রফেসর তানাচা শুয়ে থেকে চোখ বোজা অবস্থায় বললেন,—আমারও ওই অবস্থা। তা রাজাবাহাদুর, আপনার হাঁচি পায় না?

পায়। চিমটে দেখলেই। —রাজাবাহাদুর হেঁচে ফেললেন বারকতক।

কর্নেল কবচের গালা সাফ করে চিমটে দিয়ে একটুকরো গোল করে পাকানো হলদে রঙের জিনিস বের করলেন। সেই সময় রাঘব কফির ট্রে আনল।

কফি খেতে-খেতে আমরা টেবিলের ওপর ঝুঁকে হলদে জিনিসটা দেখতে থাকলুম। ওটা পুরোনো আমলের একটুকরো তুলোট কাগজ। ছেঁড়াখোড়া অবস্থা। কর্নেল ভাঁজ খুলে বিছিয়ে দিলেন কাগজটা।

কাগজটা চারধারে চমৎকার লালরঙের নকশার বর্ডার আঁকা। জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কয়েক জায়গায় কাগজও ফেটে-তুবড়ে রয়েছে। কিন্তু তাতে লালকালিতে বড়ো-বড়ো হরফে যা লেখা আছে, তাই দেখে আমি অবাক হয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম,—তাসের ম্যাজিক যে!

কারণ, কাগজে সেই তাসের ম্যাজিকের সংকেত-সূত্রটাই লেখা রয়েছে।

কবে যাবিরে সেই সমাজে
ছাড় কুইচ্ছে পোড়া পাম রে

কর্নেলের মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। বললেন,—তাহলে এ শুধু ম্যাজিকের সূত্র নয়, গুপ্তধনেরও সংকেত!

প্রফেসর তানাচা খিকখিক করে হাসছিলেন। সুর ধরে ছড়াটা আওড়ে বললেন,—নদীর ধারে বিস্তর খুঁজে বেড়িয়েছি। হদিশ করতে পারিনি স্যার!

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—নদীর ধারে কেন প্রফেসর তানাচা?

প্রফেসর তানাচা চোখ বুজেই জবাব দিলেন,—অলক্ষ্মীর গয়না কি রাজবাড়ির ত্রিসীমানায় কেউ রাখার সাহস পায় স্যার? অলক্ষ্মীর জিনিস অলক্ষ্মীর ডেরার ওখানেই কোথাও থাকবে। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকুন বুঝি।

—কিন্তু এ ছড়াটা তো তাসের ম্যাজিকের সূত্র!

সেটাই তো ধাঁধা স্যার! —প্রফেসর তানাচা ফের খিকখিক করে হাসতে লাগলেন। ঠ্যাং দুটোও জোরে দুলতে থাকল ডিভানের ওপর।

তাই দেখে রাজাবাহাদুর থাপ্পড় তুলে গর্জালেন,—নাচ থামা উল্লুক! ঠ্যাং কেটে ফেলব বলে দিচ্ছি।

তখন প্রফেসর তানাচা মড়ার মতো লম্বা হয়ে গেলেন। ঠ্যাংদুটোও থেমে টান হয়ে গেল। দূরে নিচের তলা থেকে হলঘরের ঠাকুরদাঘড়ির ঘণ্টার বিকট শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠল। রাত তিনটে বাজে।...

সাত

সকালে দেরি করে ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু উঠে দেখি, বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে উধাও হয়েছেন। ডাঃ ঢোলের কাছে শুনলুম, শেষরাতে কখন লোহাগড়া থানার দারোগা ভজগোবিন্দবাবু সদলবলে এসেছিলেন। আসামী না পেয়ে খুব খাপ্পা হয়ে বলে গেছেন, সে রাতে অলক্ষ্মীর থানে ডেডবডির নাম করে খামোকা হয়রান করা হয়েছে ওঁকে। আজ ফের আসামী ধরার নাম করে হয়রান। উনি দেখে নেবেন কর্নেলকে। দু-দুবার ওঁর ঘুম নষ্ট!

ডাঃ ঢোল বললেন,—চলুন জয়ন্তবাবু! শরীর ম্যাজম্যাজ করছে। কিছুক্ষণ জগিং করে আসি।

দুজনে বেরোলুম। রাজবাড়ির ভেতর উত্তর-পূর্বের ঘাসের মাঠে দেখলুম রাজাবাহাদুর দাঁড়িয়ে আছেন এবং জয়গোপালবাবুর কুকুরদুটো ওঁকে বুড়ি করে খেলছে। রাজাবাহাদুর বাচ্চাছেলের মতো হাসছেন।

ডাঃ ঢোল আঁতকে উঠে বললেন,—সর্বনাশ! আমাকে দেখলেই ব্যাটারা খেপে যাবে। কাল রাতে যা করেছি! শিগগির কেটে পড়ুন জয়ন্তবাবু!

ডাঃ ঢোল জগিং অর্থাৎ দৌড়ব্যায়ামের ছলে গুলতির বেগে পুবের ফটক পেরিয়ে গেলেন। অগত্যা আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম।

ডাঃ ঢোল হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—ফলো করেনি তো ওরা?

ওঁকে আশ্বস্ত করে বললুম,—না। আমাদের দেখতে পায়নি। নতুন মনিব পেয়েই মশগুল ওরা।

ডাঃ ঢোল হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন,—যথেষ্ট হয়েছে। এ বয়সে জগিং খুব কষ্টকর। তাছাড়া...বলে কেমন চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন।

জিগ্যেস করলুম,—কী ডাক্তার ঢোল?

ডাঃ ঢোল চাপাগলায় বললেন,—এখানে নাকি এক পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধুর আড্ডা। সে নাকি মড়া খায়। দেখেছেন ওনার আড্ডাটা?

—দেখেছি। সাধু নয়, নিছক পাগল। আপনার পেশেন্ট আর কী!

কথা বলতে-বলতে আমরা অলক্ষ্মীর মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলুম। জনাই-পাগলার কাহিনি শুনে ডাঃ ঢোল বললেন,—রাঘবকে বলব। আমার কাছে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবে ওর দাদাকে। ভালো মেন্টাল হসপিটালে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেব।

ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হেঁটে অলক্ষ্মীর মন্দিরের চত্বরে পৌঁছে দেখি, অলক্ষ্মীমূর্তির সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসে আছেন ঘুঘুপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তাঁর মাথায় টুপি। পাশে একটা ছোটো প্রজাপতি ধরা জাল। আর জালের মধ্যে রংবেরঙের একটা প্রজাপতি চুপচাপ ঝিমুচ্ছে।

কিন্তু তার চেয়ে চোখে পড়ার মতো দৃশ্য, কর্নেল একটা প্রকাণ্ড বই পড়ছেন আপন মনে। বুঝলুম না, অলক্ষ্মীর ডেরায় নিশ্চিন্তে বসে এমন বই পড়ার খেয়াল কেন মাথায় চাপল!

ডাঃ ঢোল মূর্তিটা ভয়ে-ভয়ে দেখে বললেন,—প্রণাম করা কি উচিত হবে? অলক্ষ্মীকে কি প্রণাম করব জয়ন্তবাবু?

কর্নেল চোখ তুলে একটু হেসে বললেন,—ভক্তি হলে করুন ডাক্তার ঢোল।

ডাঃ ঢোল বাঁকা মুখে বললেন,—না মশাই! ভক্তি জাগছে না। কী সাংঘাতিক চোহারা! যেন গলা টিপে মারতে আসছে।

চত্বরে উঠে বললুম,—হ্যালো ওল্ডম্যান! এখানে এসে বই পড়ার মানেটা কী?

কর্নেল বললেন,—লোহাগড়া রাজবংশের কুলকারিকা—সেই বইটা জয়ন্ত। যত পড়ছি, রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে। এ বংশের সবাই কেমন যেন বাতিকগ্রস্ত। বর্তমান রাজাবাহাদুরের ঠাকুরদা ছিলেন প্রসিতেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর বাতিক অসামান্য। তিনি নিজেকে এই কলিযুগে ভগবানের অবতার বলে প্রচার করতেন। অর্থাৎ তিনিই নাকি কল্কি অবতার। সাদা পোশাক পরতেন। সাদা ঘোড়ায় চেপে বেড়াতেন। তাঁর বাবা হরষিতেন্দ্র তাঁর মতিগতি দেখে শেষে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তখন প্রসিতেন্দ্র এখানেই লোহানদীর তীরে একটা আশ্রম তৈরি করেন। আশ্রমের নাম দেন কল্কিসমাজ। তবে ভক্ত বিশেষ জোটেনি—শুধু প্রফেসর তানাচার ঠাকুরদা ব্রজনাথ ছাড়া। তাও ব্রজনাথ রাতবিরেতে লুকিয়ে কল্কি অবতারকে প্রণাম করতে আসতেন।

—ব্রজনাথ তো নায়েব ছিলেন। তিনিই অলক্ষ্মীর গয়নার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু সেই আশ্রমটা কোথায় ছিল কে জানে? নদীর ধারে তো তেমন কোনও চিহ্ন দেখছি না।

এই সময় পুবের ফটক দিয়ে রাজাবাহাদুরকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে সেই কুকুরদুটো। ডাঃ ঢোল এতক্ষণ চত্বরের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার তড়াক করে এক লাফে চত্বরে উঠে অলক্ষ্মীর সিংহাসনের আড়ালে চলে গেলেন। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ডাকলেন,—রাজাবাহাদুর! রাজাবাহাদুর!

রাজাবাহাদুর ওখান থেকে হাত নেড়ে বললেন,—যাব না।

কর্নেল একটু হেসে চত্বর থেকে নামলেন। বইটা বগলদাবা করে প্রজাপতিধরা জালটা কাঁধে নিয়ে পা বাড়ালেন। আমি ওঁর সঙ্গে চললুম। কিন্তু ডাঃ ঢোল চোখের ইশারায় জানালেন, যাবেন না।

কাছে গেলে রাজাবাহাদুর বললেন,—ওই অলুক্ষণে জায়গায় আমি মশাই যাই-টাইনে। নদীর ধারে আসাই ছেড়েছি কতকাল। এখন জয়গোপালের কুকুরদুটোর সাহসে এলুম।

কুকুরদুটো ওঁর দু-পাশে দু-ঠ্যাঙে বসে আছে। কর্নেল বললেন,—এরা আপনার বশ মেনেছে দেখছি।

মানবে না? ওদের বুদ্ধি নেই? এতদিন এরা কার পয়সায় খেয়েছে? আর জয়গোপাল তো আমারই পয়সায় এদের কিনা এনেছিল। বুঝলেন ব্যাপারটা? আমারই পয়সায়—অথচ আমাকেই ভূতের ভয় দেখাত হতচ্ছাড়া।—রাজাবাহাদুর ছড়ি তুলে শাসালেন, পালিয়ে যাবে কোথায়? একবার পেলে হাড় ভেঙে দেব মারের চোটে। তারপর ভজু-দারোগার কাছে চালান করে দেব। বুঝবে ঠেলা।

কর্নেল এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললেন,—আচ্ছা রাজাবাহাদুর, এখানে আপনার ঠাকুরদার আশ্রমটা কোথায় ছিল জানেন?

রাজাবাহাদুর ভুরু কুঁচকে বললেন,—কল্কি সমাজের কথা বলছেন কি?

—ঠিক তাই।

খিকখিক করে হেসে রাজাবাহাদুর বললেন,—ঠাকুরদা ছিল ষোলোআনা পাগল। ওই যে নদীর ভাঙনটা দেখছেন, আগের বছর বর্ষায় ওটা ধসে গেছে। প্রায় এক একর জায়গা খেয়ে নদী এত কাছে সরে এসেছে। আশ্রম-টাশ্রম তলিয়ে গেছে কোথায়।

—হুঁ। আচ্ছা রাজাবাহাদুর, আশ্রমে কি পামগাছ ছিল?

—ছিল। গেটের দুধারে ছিল দুটো। ভেতরেও কয়েকটা ছিল। বিরাট-বিরাট সব পামগাছ।

—কোনও পামগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল কি?

রাজাবাহাদুর অবাক চোখে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন,—আপনি কি আমার ঠাকুরদার আমলে এসেছিলেন লোহাগড়ায়? তখন তো আপনি দুগ্ধপোষ্য বালক মশাই!

কর্নেল বললেন,—ঠিকই বলেছেন রাজাবাহাদুর।

—তাহলে কেমন করে জানলেন কোনও পামগাছের মাথায় বাজ পড়েছিল নাকি?

—আমার অনুমান।

আপনার ধুরন্ধর গোয়েন্দাগিরির কথা ঢের শুনেছি। এবারও দেখলুম। কিন্তু আপনি দেখছি, দিব্যদ্রষ্টা কর্নেল! অ্যাঁ! —রাজাবাহাদুর বেজায় হাসতে থাকলেন।

—বাজপোড়া পাম ছিল তাহলে?

—হুঁ। ছিল একটা। সেটা একেবারে ভেতরে। আশ্রমের একতলা দালানের উত্তর-পশ্চিম কোনায়। সেটা ছিল সবচেয়ে লম্বা পামগাছ। ঠাকুরদার সঙ্গে এক সায়েবের খাতির ছিল। তিনি মেক্সিকোর মরুভূমি থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন পামগাছের কয়েকটা চারা।

—তাহলে আর অলক্ষ্মীর গয়না উদ্ধারের আশা নেই। নদীতে তলিয়ে গেছে।

রাজাবাহাদুর চমকে উঠেছিলেন কর্নেলের কথা শুনে। আমিও রাজাবাহাদুর বললেন,—তার মানে?

কর্নেল হাসলেন।—অলক্ষ্মীর হিরের গয়না সেই বাজপড়া পোড়া পামগাছের নিচে পোঁতা ছিল।

—কী করে বুঝলেন?

—কবচের ভেতরকার কাগজে লেখা ছড়াটা থেকে।

বলেন কী! —রাজাবাহাদুর ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

এইসময় পেছনের এক ঝোপ থেকে প্রফেসর তানাচাকে বাঘের মতো বেরুতে দেখলুম সম্ভবত ভদ্রলোক ওখানে জংলি আফিমগাছ থেকে আফিং সংগ্রহ করছিলেন। এবং ওত পেতে আমাদের কথাবার্তাও শুনছিলেন। সটান এসে আর্তনাদের ভঙ্গিতে বললেন,—অলক্ষ্মীর গয়না নদীতে তলিয়ে গেছে? হায়, হায়! আমিও ঠিক এই কথাটা ভেবেছিলুম গো!

রাজাবাহাদুর ছড়ি তুলে বললেন,—চোওপ! কুকুর লেলিয়ে দেব। মড়াকান্না শুরু করলে হতচ্ছাড়া আফিংখোর! প্রফেসর তানাচা ভড়কে দু-পা পিছিয়ে গেলেন তক্ষুনি।

কর্নেল বললেন,—ছড়াটাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে :

কবে যাবি যে সেই সমাজে
ছাড় কুইচ্ছে পোড়া পাম রে।

...এবার লক্ষ করুন কথাগুলো। গদ্য করে বললে দাঁড়ায় : সেই সমাজে কবে যাবি রে? কোন সমাজে? না—কল্কি সমাজে। তার মানে আশ্রমে। তারপর বলা হয়েছে : ছাড় কুইচ্ছে। অর্থাৎ এই ইচ্ছাটা কু। কারণ অলক্ষ্মীর গয়না নেওয়ার ইচ্ছে খারাপ ইচ্ছে। অতএব এ ইচ্ছে না করাই ভালো। এবার দেখুন, কাগজে 'পোড়া পাম রে' কথাটায় 'পাম' এবং 'রে' আলাদা করে লেখা। কোন পাম অর্থাৎ পাম গাছ? না—পোড়া পামগাছ। বোঝা যাচ্ছে, পোড়া পামগাছই লুকিয়ে রাখা গয়নার ডেরা।

প্রফেসর তানাচা কপাল চাপড়ে বললেন,—আমি জানতুম, ওটা নিছক তাসের ম্যাজিক নয়—ওর মধ্যেই মজা আছে। অথচ একটুও আঁচ করতে পারিনি। পামগাছটায় বাজ পড়েনি—আমার কপালেই বাজ পড়েছিল! হায়-হায়! অমন দামি জিনিসটা! পেলে কোটিপতি হতুম গো!

রাজাবাহাদুর তেড়ে গেলেন। —কোটিপতি হতে, না আফিংপতি হতে! আফিংয়ের পাহাড় কিনে ফেলতে। তার চেয়ে এ বেশ হয়েছে।

মনের দুঃখে প্রফেসর তানাচা ফটক দিয়ে রাজবাড়ি এলাকায় চলে গেলেন। বুঝলুম, বেচারা বেজায় ভেঙে পড়েছেন।

কুকুরদুটো কিছুক্ষণ থেকে উসখুস করছিল। এতক্ষণে হঠাৎ বোট-হাউসের দিকে দৌড়ুল। রাজাবাহাদুর ছড়ি তুলে তাদের ডাকতে-ডাকতে সেদিকে গেলেন। তারপর দেখি, জনাই-পাগলা বোট-হাউস থেকে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে গিয়ে পড়ল। তারপর সে আঁকুপাঁকু করে সাঁতার কাটতে-কাটতে ওপারে উঠল এবং এদিকে হাত নেড়ে তিড়িংবিড়িং করে নাচতে-নাচতে গালমন্দ করতে থাকল। এপারে বোট-হাউসের সামনে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর পালটা ছড়ি নাচিয়ে তাকে শাসাচ্ছিলেন।

কুকুরদুটো বোট-হাউসে ঢুকে পড়েছে। কর্নেল ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা দেখছিলেন। বললেন, —এসো তো দেখি জয়ন্ত! কুকুরদুটো ওখানে ঢুকে কী করছে।

বোট-হাউসের সামনে গিয়ে উঁকি দিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। ভাঙাচোরা বোটের খোঁদলে জয়গোপালবাবু আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। কুকুরদুটো তাঁকে শুঁকছে।

রাজাবাহাদুরও এদিকে ঘুরে দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে বললেন,—এ কী! জয়গোপাল যে?

কর্নেল ওঁর বাঁধন খুলে দিলেন। জয়গোপালবাবুর চেহারা এখন অন্যরকম। চোখমুখ ফুলো-ফুলো। প্যান্ট জামা ফর্দাফাঁই। কর্নেল বললেন,—ব্যাপার কী জয়গোপালবাবু? রাতে রাজবাড়ি থেকে পালিয়ে নিশ্চয়ই জনাই-পাগলার পাল্লায় পড়েছিলেন?

জয়গোপালবাবু গলার ভেতর বললেন,—হ্যাঁ!

রাজাবাহাদুর চোখ পিটপিট করে বললেন,—তোমার অবস্থা দেখে আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে জয়গোপাল! তোমাকে অ্যাট্টুকুন থেকে মানুষ করেছি নিজের ছেলের মতো। আমার ছেলেপুলে নেই। ভেবেছিলুম, যা আছে সব তোমার নামে উইল করে দেব। আর তুমি কিনা অলক্ষ্মীর গয়নার লোভে আমার পেছনে ভূত লেলিয়ে দিলে?

জয়গোপালবাবু উঠে এসে রাজাবাহাদুরের পাদুটো জড়িয়ে ধরে হাঁউমাউ করে বললেন,—খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। আমায় আপনি ক্ষমা করে দেন। আর কখনও এমন কাজ করব না।

রাজাবাহাদুর চোখ মুখে বললেন, দিলুম। ওঠো। ঘরে চলো। আহা, সারারাত কী কষ্ট গেছে তোমার! —জয়গোপালবাবুর কাঁধে হাত রেখে পা বাড়িয়ে ফের বললেন,—আর কখনও ছুরিটুরি ছুঁয়ো না। আমাদের অস্ত্রাগারের ওই ছুরিটা খুব অলুক্ষুণে। আমারই ওটা হাতে নিলে মনে হতো খুনখারাপি করে ফেলি। তা হ্যাঁ রে গোপাল, জনাই-পাগলা খুব মেরেছে বুঝি?

জয়গোপালবাবু কচিখোকার মতো বললেন,—হ্যাঁ। হঠাৎ পাথর মেরেছিল। আর যেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি, ব্যাটা আমাকে ধরে ফেলেছে। বোট-হাউসে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে পুরোনো দড়িগুলো দিয়ে বেঁধে...

রাজাবাহাদুর বললেন,—চুপ। আর কথা বলে না।

ফটকে ঢোকার মুখে ডাঃ ঢোলকে খুঁজলুম। দেখি, অলক্ষ্মীর চত্বর থেকে হাত নেড়ে ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা জনাইকে ক্রমাগত ডাকছেন। বুঝলুম, সাইকিয়াট্রিস্ট ডাক্তার একজন সত্যিকার পেশেন্টের দেখা পেয়ে গেছেন—তাকে হাতছাড়া করতে চান না। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতা নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার মতলব জেগেছে মাথায়।...

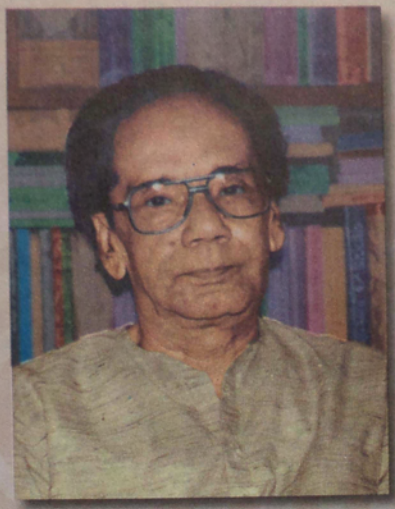

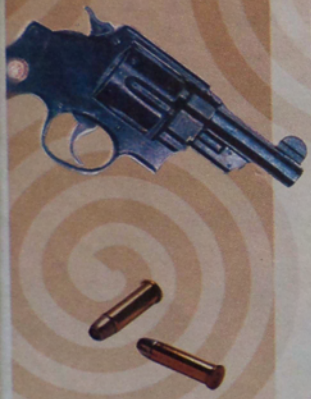

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।

কিশোর কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

৩

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই

কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১ম, ২য়)
নেপথ্যে আততায়ী
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভূতুড়ে

এতে আছে

আলেকজান্ডারের বাঁটুল/৯
লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য/৩৬
বলে গেছেন রাম শন্না/৬২
কোদণ্ড পাহাড়ের বা-রহস্য/৮৮
ভীমগড়ের কালো দৈত্য/৯৮
পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর/১০৬
ভূতুড়ে এক কাকতাড়ুয়া/১২১
রাজবাড়ির চিত্ররহস্য/১৪৭
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য/১৮২
সিংহগড়ের কিচনি-রহস্য/২১০
রাজা সলোমনের আংটি/২৪৩
বত্রিশের ধাঁধা/২৮১

আলেকজান্ডারের বাঁটুল

বাঁটুল, ফিরে এস

জিনিসটা দেখতে ক্রিকেটবলের মতো। কিন্তু বেজায় খসখসে এবং কালো রঙের। হাতে নিয়ে দেখলুম বেশ ওজনদারও বটে। সারা গায়ে হিজিবিজি কী সব লেখা আছে দুর্বোধ্য ভাষায়। সেই সঙ্গে জায়গায় জায়গায় সূক্ষ্ম নকশার কারিকুরি। নাড়াচাড়া করে দেখে বললুম, "জিনিসটা কী?"

যিনি এটা নিয়ে সকালবেলা কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ড্রইংরুমে হাজির হয়েছেন, তাঁর নাম বেণীমাধব রায়। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। স্বাস্থ্যবান শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ। আমার প্রশ্ন শুনে একটু হেসে বললেন, "বুঝতে পারলেন"? এটা আসলে একটা লোহার বাঁটুল। কিন্তু ও লোহায় মরচে ধরার যো নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, 'বাঁটুল? তার মানে যা ছুঁড়ে আদিবাসীরা পাখি-টাকি শিকার করে? বাঁটুল তো আমি দেখেছি। গুলতি থেকে মার্বেলের গুলির সাইজের মাটির বাঁটুল আমিও ছেলেবেলায় কতবার ছুঁড়েছি কার্নিশে পায়রা মারতে। বাঁটুল কখনও এমন প্রকাণ্ড হয়, দেখিনি তো! তাছাড়া এটার ওজন মনে হচ্ছে প্রায় আধকিলো। গুলিত থেকে ছোঁড়াও তো অসম্ভব মশাই।"

বেণীমাধবাবু রহস্যময় হাসলেন। "এটা প্রায় তেরশো বছরের পুরোনো গ্রিক বাঁটুল। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৭ সালে গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণে আসার সময় আফিগানিস্তানে পাঞ্জশির উপত্যকায় ঘোরবন্দ নদীর ধারে তাঁবু ফেলেছিলেন। ওই সময় তাঁর বাঁটুলটা হারিয়ে যায়। ওই আমলের ইতিহাসে এসব কথা আছে। যাই হোক, তার প্রায় ২২৩৯ বছর পরে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে পুরাবিজ্ঞানী জন মার্শাল ওই এলাকায় এক লুপ্ত সভ্যতার ধ্বংশাবশেষ পুনরুদ্ধারের সময় মাটির তলা থেকে এমনি একটা বাঁটুল কুড়িয়ে পান। তেমনি একটা বাঁটুল আমার ভাগ্যেও জুটেছে। তবে আমি এটা কোথায় পেয়েছি, তা বলা যাবে না। জিনিসটার দাম কয়েক কোটি টাকা। মার্শালের বাঁটুলটা লন্ডনের জাদুঘরে আছে সেটা কিন্তু আলেকজান্ডারের নয়।"

হাঁ করে শুনছিলুম। শোনার পর বললুম, "কিন্তু এটাই যে সম্রাট আলেকজান্ডারের বাঁটুল, তার প্রমাণ কী?"

বাঁটুলটার গায়ে খোদাই করা হিজিবিজিতে আঙুল রেখে বেণীমাধববাবু বললেন, "এই তো সব লেখা আছে প্রাচীন গ্রিক হরফে। আর এই গোল চিহ্নটা দেখছেন, এটা হল গ্রিক সম্রাটের শিলমোহর।"

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, উনি দাঁতে চুরুট কামড়ে একটা প্রকাণ্ড ইংরেজি বই খুলে গম্ভীর মুখে পড়ছেন। ওঁরা সাদা দাড়িতে চুরুটের ছাই পড়ছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। বেণীমাধববাবু বাঁটুলদা কফিটেবিলে চৌকোণা কৌটোয় রাখলে এতক্ষণে মুখ তুলে কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ—কী যেন বলছিলেন বেণীমাধব? রাতবিরেতে আপনার ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়?"

বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে গেলেন। "হ্যাঁ কর্নেল। একমাস হল জিনিসটা আমি পেয়েছি। তারপর থেকেই প্রায়ই রাত্রিবেলা অদ্ভুত সব কাণ্ড হচ্ছে আমার ঘরে। দেয়ালে টাঙানো ছবি পড়ে যাচ্ছে ঝনঝন শব্দে। কিন্তু আলো জ্বালিয়ে দেখি কিছু পড়েনি—কিংবা ভাঙেওনি। কোনো রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি, কেউ ধুপধুপ শব্দ করে ঘরের ভেতর হেঁটে বেড়াচ্ছে! অথচ আলো জ্বাললে আর তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কোনোরাতে হঠাৎ শুনি, ফিসফিস করে কারা কথাবার্তা বলছে। আলো

জ্বাললেই সব চুপ। সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে গতরাতে। এতসব কাণ্ডের পর এমনিতেই আতঙ্কে ঘুম আসতে চায় না। প্রায় জেগেই কাটাই। কাল সাড়ে তিনটেয় এক কাণ্ড হল। টেবিলল্যাম্পটা জ্বেলেই রাখি সারারাত। হঠাৎ দেখি কালো কুচকুচে একটা হাত মাথার দিকের জানালা দিয়ে ঢুকে টেবিলল্যাম্পের সুইচ অফ করে দিল। লাফিয়ে উঠে বসলুম। পিস্তল আছে আমার। পিস্তল নিয়ে সুইচ টিপে বড় আলো জ্বেলে দিলুম। উঁকি মেরে কাউকে দেখতে পেলুম না। সকালে দেখি টেবিল আর জানালার ধারে এই লোমগুলো পড়ে আছে।"

পকেট থেকে বেণীমাধববাবু একটা কাগজের মোড়ক বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল মোড়কটা খুললেন। কয়েকটা কালো দু-তিন ইঞ্চি লোম। কর্নেল একটা লোম চিমটি কেটে তুলে বললেন, "বেজায় শক্ত দেখছি। যেন সূচ। ঠিক আছে। এগুলো থাক। আর বাঁটুলটা..."

কথা কেড়ে বেণীমাধববাবু বললেন, "ওটা আপাতত আপনার কাছেই থাক কর্নেল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি এবার। জিনিসটা ঘরে রাখতে সাহস হচ্ছে না। ভেবেছিলুম ব্যাংকের লকারে নিয়ে গিয়ে রাখব কি না। কিন্তু আজকাল কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। লকার ভেঙে চুরি যাওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। আপনিই ওটা রাখুন।"

কর্নেল মোড়ক এবং বাঁটুলের সুদৃশ্য কৌটোটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরে রেখে এলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে বেণীমাধববাবু। আমরা তাহলে ওবেলা একবার আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। আপনার ঘরটা একবার পরীক্ষা করা দরকার।"

বেণীমাধববাবু নমস্কার করে চলে গেলেন। কর্নেল আবার সেই ইংরেজি বইটা খুলে বসলেন। বললুম, "এটা কি সত্যি বাঁটুল? এবং আলেকজান্ডারেরই বাঁটুল বলে মনে করেন?"

গোয়েন্দাপ্রবর বই থেকে মুখ তুলে হাসলেন। "ডার্লিং! সেকালের বীরপুরুষরা ছিলেন সবই তাগড়াই মানুষ। খাদ্যে তখনও কেউ ভেজাল দিতে শেখেনি। হাওয়াবাতাসও এমন বিষিয়ে যায়নি। বিশুদ্ধ বাতাসে তাঁরা শ্বাসপ্রশ্বাস নিতেন এবং অনেকে আস্ত একটা রামপাঁঠা খেয়ে হজম করতেন। তাঁদের বাঁটুল কি একালের মার্বেলের গুলির মতো হবে।"

বুঝলুম, রসিকতা করছেন। চটে যাওয়ার ভান করে বললুম, বাজে কথা বলবেন না! বরং এত ভেজাল খেয়ে এবং দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েও একালের মানুষ যা করছে, তা সেকালের ওই বীরপুরুষেরা কল্পনাও করতে পারতেন না। আমার ধারণা, বেণীমাধববাবু এই সকালবেলা একটা আজগুবি গল্প বলে তাকে তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"তাই বুঝি?"

"ঠিক তাই। ভুঁয়ো বাঁটুলটা একটা ছল। লোমগুলো নিশ্চয় কোনো বাড়ির রোয়াকের আড্ডাবাজ কোনো পাঁঠার। আমার সন্দেহ, ওর কোনো উদ্দেশ্য আছে।"

"কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে তোমার সন্দেহ হচ্ছে?"

"বলা কঠিন এই মুহূর্তে। তবে ভদ্রলোকের চেহারায় কেমন ধূর্ততার ছাপ আছে। চোখ দুটো দেখলেন না বেড়ালের মতো যেন।"

কর্নেল হো-হো করে হেসে বললেন, "বুঝতে পারছি, ওঁকে তুমি পছন্দ করোনি। ডার্লিং! বেণীমাধব রায় একসময়কার বিখ্যাত ব্যবসায়ী বংশের মানুষ। এখন ওঁদের অবস্থা পড়ে গেছে। কিন্তু এদেশে কিউরিও দ্রব্যের কারবারী হিসেবে নাম করতে হবে সবার আগে। বিচিত্র ধরনের প্রাচীন জিনিস উনি কেনাবেচা করেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ওঁর কিউরিও শপে তুমি দেশবিদেশের বহু কোটিপতি খদ্দেরের দর্শন পাবে দুবেলা। কাজেই ওঁর প্রতি অকারণ সন্দেহ পোষণ কোরো না। কেন উনি আমার সঙ্গে ছলনা করতে আসবেন মিছিমিছি?"

কর্নেলের কথা শুনেও আমার সন্দেহ গেল না। কিন্তু আর কথা না বাড়িয়ে ওঁর বইটার দিকে তাকালুম। খুব পুরনো বই বলে মনে হল। পোকায় যথেচ্ছ কেটেছে বইটাকে। জায়গায়-জায়গায় দুটো-একটা করে শব্দ কামড়ে খেয়েছে। বললুম, "এত মন দিয়ে কী বই পড়ছেন বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "আলেকজান্ডারের জীবনী। তাঁর সমকালের এক গ্রিক ঐতিহাসিক আরিয়ানের লেখা।"

"তার মানে আপনি বিশ্বাস করছেন, জিনিসটা সত্যি আলেকজান্ডারের বাঁটুল?"

কর্নেল বইটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "সেকথা পরে। কিন্তু গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের একটা প্রিয় বাঁটুল সত্যি ছিল এবং তা আফগানিস্তানে এসেও হারিয়েও গিয়েছিল। পড়ে দেখলে 'ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।"

বইটা নিয়ে খোলা পাতাটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলুম! একখানে লেখা আছে :

"....সম্রাট খুব ভেঙে পড়েছিলেন বাঁটুল হারিয়ে। সারারাত ঘুমোননি। সকালে ঘোরবন্দ নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের উপর বসে আমাদের বললেন, আমাকে হিন্দুস্থান থেকে হয়তো নিরাশ হয়ে ফিরতে হবে। বাঁটুলটা বড় পয়মন্ত ছিল। আমরা তাঁকে খুব বোঝালুম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে দুঃখের ছাপ মুছল না। পরে হিন্দুস্থানের রাজা পোরাসের (পুরু) সঙ্গে আমাদের যুদ্ধে জয় হলে তখন সম্রাটকে বললুম, দেবতা জিউস আপনার সহায়—তখন সম্রাট আমার কানে কানে বললেন, কাল রাতে দেবতা জিউস আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন, আর এগিও না। ফিরে যাও।"

পড়ার পর বললুম, "হুঁ—তাহলে সত্যিসত্যি একটা বাঁটুল ছিল। কিন্তু..."

কর্নেল আমার কথা কেড়ে বললেন, " কিন্তু রহস্যটা হল অন্যত্র। জয়ন্ত, ময়রার যেমন সন্দেশে রুচি থাকে না, তেমনি খবরের কাগজের লোক হওয়াতে কাগজে রুচি নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, "হঠাৎ একথার অর্থ?"

"তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার দুইয়ের পাতায় অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা তুমি পড়োনি।"

"কী বিজ্ঞাপন?"

কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে দুইয়ের পাতার একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন। বিজ্ঞাপনটা ছোট। "বাঁটুল, যেখানেই থাক, ফিরে এস। যা চাও, পাবে। রবিবার যশোর রোডে মন্দিরতলায় রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো, ইতি মামা।"

বিজ্ঞাপনের শেষ কথাগুলো অদ্ভুত বটে। কিন্তু এখানে সম্ভবত একটা ছেলের নাম। আজকাল কত ছেলে বাড়ি থেকে পালাচ্ছে!

আমার মনের কথা যেন টের পেলেন গোয়েন্দামশাই। একটু হেসে বললেন, 'কে বলতে পারে বিজ্ঞাপনের বাঁটুল আলেকাজান্ডারের বাঁটুল নয়?"

জোর গলায় বললুম, "অসম্ভব। ইনি জনৈক শ্রীমান বাঁটুল চন্দ্র ছাড়া কেউ নয়। আলেকজান্ডারের বাঁটুল কেউ চিনতে চাইলে বেণীমাধববাবুর কিউরিও শপেই যেতে পারত। তাছাড়া ইতি—মামা, যখন লেখা আছে, তখন আর কথা নেই। সম্ভবত বাঁটুলচন্দ্রটি বড় সেয়ানা ছেলে।"

কর্নেল আর কোনো মন্তব্য করলেন না। বইটা টেনে নিয়ে ফের পড়তে শুরু করলেন।...

আরেক ধাঁধা

বেণীমাধব রায়ের বাড়ি সল্টলেকের উত্তর সীমায়। পেছনে খাল। তার ওধারে দমদম এয়ারপোর্টগামী ভি. আই. পি. রোড। বাড়িটা বছর দুই আগে বানিয়েছেন বেণীমাধব। একতলা হলেও বেশ বড় ও নিরিবিলি জায়গায়। এপাশে-ওপাশে অনেকটা তফাতে কয়েকটা বাড়ি সবে তৈরি হচ্ছে। বিকেল পাঁচটায় পৌঁছে ঝটপট চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলুম। উলুকাশ আর ঝোপঝাড়-গাছপালায় জায়গাটা জঙ্গল হয়ে আছে। তাছাড়া যে সময়ের কথা বলছি, তখন সল্টলেকে সবে ঘরবাড়ি হচ্ছে। চারদিক প্রায় খাঁ খাঁ করছে। যে ঘরে ভূতের উপদ্রব হয়, সেই

ঘরটা একেবারে উত্তর অংশে। পেছনে একটুকরো পোড়ো জঙ্গুলে জমি। তার পেছনে তারকাঁটার উঁচু বেড়া। বেড়া ঘেঁষে গাছপালা গজিয়েছে। কর্নেল সে দিকটা কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলেন। তারপর আমরা ঘরটাতে ঢুকলুম।

বেণীমাধব অবিবাহিত মানুষ। এ বাড়িতে তাঁর এক পিসিমা আর দূরসম্পর্কের এক ভাগ্নে অমল, তাছাড়া একজন রাঁধুনি দয়ার ঠাকুল, দুজন চাকর ভবা ও চাঁদু, দারোয়ান বীরবাহাদুর, ঝি পাঁচুর মা—লোকজন বলতে এই। বেণীমাধববাবুর গাড়ি আছে দুটো। কিন্তু ড্রাইভার রাখেননি। একটা নিজে চালান, অন্য গাড়িটা অমলকে দিয়েছেন। অমল মামার টাকায় ইলেকট্রোনিকস জিনিসপত্রের ব্যবসা করে। তার দোকান আছে চৌরঙ্গী এলাকায়। আমরা অমলকে দেখতে পেলুম না। সে তার দোকান থেকে বাড়ি ফেরে অনেক রাতে। আমরা আসব বলে বেণীমাধববাবু তিনটের মধ্যে তাঁর কিউরিও শপ বন্ধ করে বাড়ি চলে এসেছেন।

বেণীমাধবের শোবার ঘরটা বেশ বড়। খাটের পাশে একটা টেবিল। তার গা ঘেঁষে জানালা। সেই জানালা দিয়ে একটা লোমশ হাত ঢুকে টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দিয়েছিল। কর্নেল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ—অনেক লোম পড়ে আছে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা বেণীমাধববাবু, কাল রাতে যখন ঘটনাটা ঘটল, তারপর কোনো মোটরগাড়ির শব্দ শুনেছিলেন কি?"

বেণীমাধব বললেন, "পেছনে খালের ওধারে ভি. আই. পি. রোড। সে শব্দ তো দিনরাত সবসময় শোনা যায়।"

"না। ধরুন, কাছাকাছি কোনো গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শুনেছিলেন কি?"

"খেয়াল করিনি।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "খালের ধারে তারকাঁটার বেড়ার একটা জায়গা কেউ ফাঁক করে রেখেছে দেখে এলুম। সেখানেও এমনি কালো লোম পড়ে আছে কাজেই বানরজাতীয় প্রাণী ওই পথেই এসেছিলাম। ওদিকে খালের ওপর একটা কাঠের পোলও দেখতে পেলুম। আমার ধারণা, প্রাণীটা কেউ পুষেছে এবং ট্রেনিং দিয়েছে। তারপর গাড়ি করে তাকে এনে আপনার বাড়ির দিকে পাঠিয়েছে।"

বেণীমাধববাবু চিন্তিতমুখে বললেন, "কিন্তু কেন? টেবিলল্যাম্পটা নিভিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য কী?"

"টেবিলল্যাম্প তো সারারাত জ্বালিয়ে রাখেন বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ কর্নেল। ভূতুড়ে কাণ্ড কয়েকরাত চলার পর ওটা জ্বালিয়ে রাখতে শুরু করি।"

"টেবিলল্যাম্প জ্বললে আর কোনো উৎপাত ঘটে না বুঝি?"

"না।"

"তাহলে বোঝা যাচ্ছে, টেবিলল্যাম্প কেন নেভানোর দরকার হয়েছিল।" কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন। তারপর একটু হাসলেন। টেবিলল্যাম্পটা এপাশে সরিয়ে ভালই করেছেন। মে মাসের এই গরমে জানালা বন্ধ করা যাবে না। প্রাণীটার নাগালের বাইরে রাখাই ভাল। তা আপনি কি মশারি খাটিয়ে শোন?"

"উপায় নেই কর্নেল। সল্টলেকে বারমাস যা মশার উৎপাত।"

ঘরের ভেতর আসবাবপত্র প্রচুর। বেশিরভাগই সেকেলে ডিজাইনের জিনিস। আমি প্রকাণ্ড একটা কাঠের আলমারির দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বেণীমাধব একটু হেসে বললেন, "এসব জিনিস আমার ঠাকুরদার আমলের। মায়াবশে এগুলো বদলে আধুনিক ডিজাইনের ফার্নিচার কিনিনি। তাছাড়া আজকালকার জিনিস বড় ঠুনকো।"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "পুরানো জিনিসের প্রতি ওঁর মায়া থাকা স্বাভাবিক, জয়ন্ত। ওঁর কিউরিও শপ তার প্রমাণ।"

বেণীমাধব বললেন, "ঠিক বলেছেন, কর্নেল। যে জিনিস যত পুরনো, তার প্রতি আমার তত মায়া। বাতিকও বলতে পারেন। ওই যে ব্রোঞ্জের প্রদীপটা দেখছেন, ওটা গুপ্তযুগের। টাকার অংকে ওটার দাম লক্ষ টাকা—কিন্তু ওটা বেচিনি। দোকান থেকে এনে রেখেছি। আর এই পোড়ামাটির সিংহটা দেখছেন, ওটা ভারহুত স্তূপ থেকে সংগৃহীত। নানা হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছিল। এটাও বেচিনি।" তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে ফের বললেন। "বাঁটুলটাও আমি মায়ায় পড়ে বেচিনি। বিক্রী করতে চাইলে ওর দাম পেতুম দেড়কোটি টাকা।"

কথা বলতে বলতে কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে আলো জ্বলেছে। একবার কফি, একবার চা এবং কিছু মিষ্টদ্রব্যও খাওয়া হয়েছে আমাদের। হঠাৎ কর্নেল উত্তেজিতভাবে একটা জানালার দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, "আরে ওটা কী।" তারপর হন্তদন্ত হয়ে ওদিকে উঠে গেলেন। পর্দা তুলে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, "বেণীমাধববাবু! সেই আজগুবি বাঁদরটা পালাচ্ছে! এই মাত্র উঁকি দিচ্ছিল এখানে।"

বেণীমাধব লাফিয়ে উঠে বললেন, "তবে রে ব্যাটা!" তাপর বিছানার চাদর তুলে ওঁর পিস্তলটা নিয়ে রাগে অস্থির হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর চেঁচামিচি শুনলুম।

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। এবার আরও ভড়কে গেলুম কর্নেলের কাণ্ড দেখে। বেণীমাধববাবু বেরিয়ে যেতেই উনি তাঁর বিছানার তলায় হাত ভরে একটু চাবির গোছা টেনে নিলেন। তারপর ঝটপট একটা টেবিলের ড্রয়ারের চাবি মেলাতে থাকলেন। কয়েকটা চাবির পর একটা চাবি ফিট করল। তখন ড্রয়ার খুলে কী সব হাতড়াতে-হাতড়াতে চাপা গলায় বললেন, "জয়ন্ত! তুমি ওঁকে কিছুক্ষণ আটকে রাখো গিয়ে। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?"

কর্নেলের সঙ্গে বহুবছর কাটাচ্ছি। আমাকে কী করতে হবে তখনই টের পেয়েছিলুম। পেছনের দরজায় বেরিয়ে দেখি, ঠাকুর-চাকর-দারোয়ান সবাই বেরিয়ে পড়েছে। তারা খামোকা "চোর! চোর!" বলে চেঁচাচ্ছে। বেণীমাধব পিস্তল উঁচিয়ে কাঁটাতারের বেড়াটার দিকে নজর রেখে দাঁড়িয়ে আছেন সম্ভবত তাঁর ধারণা, প্রাণীটা ফোকর গলিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে। অমনি তাকে গুলি করবেন।

আমি গিয়ে তফাতে অন্ধকারে একটা ঝোপের দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠলুম, "ওই পালাচ্ছে!"

বেণীমাধব "কই, কই," বলে সেদিকে ছুটলেন। আমি তাঁর পেছনে দৌড়লুম। তারপর ফের প্রাণীটাকে দেখতে পাওয়ার ভান করে বললুম, "দেখুন তো, ওটা কুকুর, না সেই জন্তু?'

বেণীমাধব হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "কোথায় কোথায়?"

"ওপাশে ওই যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, তার ভেতর ঢুকল যেন।"

"চলুন তো দেখি!"

বাড়িটার ভেতর অন্ধকার ঠাসা। বেণীমাধব বললেন, "টর্চটা আনা উচিত ছিল। থাক্‌গে। মনে হচ্ছে, ব্যাটাচ্ছেলে কেটে পড়েছে, চলুন।"

আসতে আসতে বললুম, "এক কাজ করলে হত না বেণীমাধববাবু? কর্নেল বলেছিলেন, ভি. আই. পি.রোডে গাড়ি চাপিয়ে কারা প্রাণীটাকে নিয়ে আসে। চলুন তো, সেই ফোকর গলিয়ে আমরা দেখে আসি। অন্তত গাড়ির নম্বর নিতে পারব।"

কথাটা মনে ধরল ওঁর। বাড়ির পেছনে আগাছা ঢাকা জমি পেরিয়ে তারকাঁটার বেড়ার ফোকর খুঁজতে দেরি হল না। ওধারের রাস্তা থেকে যথেষ্ট আলো আসছিল। খালের ধারে দাঁড়িয়ে কোনো থেমে থাকা গাড়ি দেখা গেল না। যাবে না, তা তো আমি জানিই। কিন্তু ওঁকে আটকে রাখা দরকার। বললুম, "খাল পেরিয়ে গেল ভাল হত। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না কিছু। রাস্তার মধ্যিখানে আইল্যান্ডে ওইসব জঙ্গল করে রেখেছে যে!"

বেণীমাধব বললেন, "ঠিক বলেছেন জয়ন্তবাবু। চলুন!"

কিন্তু পা বাড়াতে গিয়ে কর্নেলের ডাক কানে এল। "বেণীমাধববাবু! জয়ন্ত! কোথায় আপনারা?'

কর্নেল বাড়িটার পেছনের বারান্দা থেকে ডাকছিলেন। অগত্যা আমরা ফিরে এলুম। আসতে আসতে বেণীমাধব রুষ্টভাবে বললেন, "কালই নিজের খরচায় ফোকরটা বন্ধ করে দেব। গভমেণ্টের লোকেরা কিছু লক্ষ্য রাখে না।"

ঘরে ঢুকে ক্লান্তভাবে উনি বসলেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "এভাবে ঘর খোলা রেখে যাওয়া আমি সঙ্গত মনে করিনি। তাই উত্তেজনা দমন করে পাহারা দিলুম। কোন দিকে পালাল দেখলেন?"

বেণীমাধব শ্বাস ছেড়ে বললেন, "দেখতে পেলে তো গুলি করে মারতুম। টর্চ নিতে মনে ছিল না। আলো-আঁধার হয়ে আছে জায়গাটা।"

আমি বললুম, "বোঝা যাচ্ছে, কোনো কারণে, কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই জন্তুটা সন্ধ্যা হতে না হতেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আপনার বাড়িতে। সম্ভবত ঘরে ঢুকে লুকিয়ে থাকত খাটের নিচে।

বেণীমাধব র‍্যাকের মাথা থেকে টর্চ দিয়ে ঝটপট খাটের তলাটা দেখলেন। ওঁর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠেছিল। এবার মনে হল, ভেতর ভেতরে খুব ভয় পেয়ে গেছেন।

আবার কফি এল। কফি শেষ করে ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন, "আজ উঠি বেণীমাধববাবু। আপনার ভাগ্নে অমলবাবুর ফিরতে বোধকরি রাত হবে। ওর সঙ্গে পরে সময়মতো আলাপ করা যাবে।

বেণীমাধববাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছে হেসে ফেললুম। কর্নেল ধমকের সুরে বললেন, "চুপ। কোনো কথা নয়।"

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের ফ্ল্যাটে পৌঁছলুম যখন, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। কর্নেল সোফায় আরাম করে বসে চুরুট ধরিয়ে বললেন, "তাহলে বোঝা গেল, একটা আজগুবি জন্তু—ধর, কোনো বাঁদরই তার মনিবের হুকুমে সত্যিসত্যি বেণীমাধবের বাড়ির জানালায় হাত বাড়িয়ে টেবিলল্যাম্প নিভিয়েছিল। এই ঘটনাটা মিথ্যা হলে বেণীমাধব আমার কথা শুনে অমন হুলস্থূল করে ছুটে বেড়াতেন না।'

"কিন্তু ওঁর ঘরে গোয়েন্দাগিরি করলেন কেন আপনি?"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "দুটো জিনিস পরীক্ষা করার সুযোগ নিয়েছিলুম। একঢিলে দুটো পাখি মারা বলতে পার। প্রথমটার কথা বললুম তোমাকে। দ্বিতীয়টা হল দৈনিক সত্যসেবকের সেই বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত। বেণীমাধবের ড্রয়ারে নোটবইয়ের ভেতর বিজ্ঞাপনের একটা কাটিং দেখলুম। সেটার চেয়ে বিস্ময়কর হল, দৈনিক সত্যসেবকের সেই বিজ্ঞাপন বিভাগের একটা রসিদ। একশো কুড়ি টাকা দিয়ে বেণীমাধবই ওই বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হ্যাঁ—তোমাকে বললে তুমিই তোমাদের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে ওই তথ্যটুকু এনে দিতে পারতে। কিন্তু বেণীমাধববাবুর বাড়ি যাওয়ার পর কথাটা আমার মাথায় এসেছিল হঠাৎ।"

"কেন?" কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর একসময় চোখ খুলে বললেন, "আজ শুক্রবার। রবিবার আগামী পরশু। তৈরি থেকো জয়ন্ত।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাড়ির পথে চলেছিল, তখন মাথাটা ভোঁ ভোঁ করছে। কিছুতেই মাথায় আসছে না, বেণীমাধবের ওইরকম অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেওয়ার কারণ কী?

মন্দিরে মৃত্যুর ত্রাস

দমদম এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর যশোর রোডের ধারে কর্নেলের এক বন্ধু ডাক্তার শিবকালী মজুমদারের বাড়ি। ডাঃ মজুমদার কর্নেলের বয়সী। কিন্তু কর্নেলের মতো মোটাসোটা তাগড়াই নন। বেঁটে রোগাটে গড়ন। প্রকাণ্ড গোঁফ। তাঁর সঙ্গে আমার চেনাজানা অনেকদিনের। রবিবার সন্ধ্যায় কর্নেলের সঙ্গে পৌঁছে দেখি, ডাঃ মজুমদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির সামনে ঢাকা লনে চেয়ার পেতে বসে অনেক গল্পসল্প হল। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর ডাঃ মজুমদার বললেন, "সাড়ে ন'টা বাজে। এখনই বেরিয়ে পড়া যাক। মন্দিরতলা অবশ্য কাছেই। থানাতেও আপনার কথামতো সব জানিয়ে রেখেছি। আমরা মন্দিরের পেছনে পুকুরপাড় ঘুরে যাব। মন্দিরে রাতে কেউ থাকে না।"

ডাঃ মজুমদার এর আগে কয়েকটা কেসে কর্নেলকে সাহায্য করেছেন। সেগুলো ছিল হত্যাকাণ্ড। ডাঃ মজুমদার একজন নামকরা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ। এটা অবশ্য হত্যাকাণ্ডের কেস নয়। তবু সঙ্গে তিনি থানায় আমার ভালই লাগছিল।

ওঁর বাড়ির পেছনে অন্ধকার মাঠের ধানক্ষেত, সব্জিক্ষেত আর চাষ জমিতে জলকাদায় একাকার হয়ে সেই পুকুরপাড়ে পৌঁছলুম। ঘন আগাছার জঙ্গল সেখানে। টর্চের আলো সাবধানে পায়ের কাছে ফেলে তিনজনে হাঁটছিলুম। পুকুরটা খুব গভীর মনে হল। যশোর রোডে মোটরগাড়ি চলাচলের বিরাম নেই। হেডলাইটের ছটা বারবার দেখিয়ে দিচ্ছিল সামনের মন্দিরটাকে। সেকালের বিশাল মন্দির। বটগাছ আছে পাশে। আমরা বটগাছের আড়ালে ওঁত পেতে বসলুম। ঘড়িতে নটা পঁয়তাল্লিশ, তখন রাস্তায় একটা জিপ যাচ্ছে দেখতে পেলাম। পেছনে একটা ট্রাক আসছিল, তার আলোয় জিপটাকে পুলিশের বলে মনে হল। জিপটা ট্রাকটাকে যেতে দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থামল। ডাঃ মজুমদার ফিসফিস করে বললেন, "পুলিশ এসে গেল তাহলে।"

জিপটা একটু থেমেই চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের কাছাকাছি এসে ব্রেক কষল একটা প্রাইভেট কার। গাড়ির দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে আলো জ্বলল এবং দেখলুম বেণীমাধব নামছেন। তিনি একা এসেছেন গাড়ি নিয়ে। উত্তেজনায় আমার দম আটকে যাচ্ছিল। বেণীমাধব গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরের সামনে এসে একটু কাশলেন। মন্দিরের সামনে পাঁচিল এবং উঁচু ফটক রয়েছে। ফটক দিয়ে তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেখলুম। পাঁচিলটা তত উঁচু নয়। বেণীমাধবকে আবছা দেখা যাচ্ছিল। ভেতরে গিয়ে উনি আবার কাশলেন। তারপর টর্চ জ্বেলে মন্দিরের ভেতরে আলো ফেললেন। আমরা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওঁর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছি। টর্চের আলোটা কয়েক সেকেন্ড মাত্র স্থির রইল। তারপর বেণীমাধব আলো নিভিয়ে ফেললেন এবং হন্তদন্ত ফিরে চললেন ওঁর গাড়ির দিকে।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেণীমাধববাবু! বেণীমাধববাবু!" তারপর দৌড়লেন রাস্তার দিকে। সেই সময় মন্দিরের দুপাশ থেকে কয়েকজন পুলিশ বেরিয়ে টর্চ জ্বালল। ভারিক্কি গলায় পুলিশ অফিসারের হাঁকডাক শুনতে পেলুম—"গাড়ি থামান! নইলে গুলি করব।"

কিন্তু বেণীমাধবের গাড়িটা বোঁ করে গুলতির মতো ছুটে গেল। পুলিশের জিপটা একটু তফাতে গাছের আড়ালে দাঁড় করানো ছিল। পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলরা দৌড়ে গিয়ে জিপে চাপলেন। তারপর জিপটা দ্রুত ছুটল বেণীমাধবের গাড়ির উদ্দেশে। কর্নেল চেঁচিয়ে কিছু বললেন পুলিশ অফিসারকে, হয়তো কানে গেল না।

ঘটনাটা এত ঝটপট ঘটে গেল যে আমার হকচকানি কাটতে সময় লাগল। কর্নেল ততক্ষণে

ফটক দিয়ে মন্দিরবাড়িতে ঢুকেছেন। ডাঃ মজুমদার আর আমি অন্ধকারে বটতলায় দাঁড়িয়ে আছি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে। এবার হুঁশ ফিরল। দুজনে মন্দিরবাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম।

কর্নেল টর্চ জ্বেলে মন্দিরের ভেতর আলো চমক খাওয়া স্বরে বললেন, " এ কী !"

যা দেখলুম, শরীর শিউরে উঠল আতঙ্কে। শিবলিঙ্গের নিচে একটা লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। তার চোখদুটো ঠেলে বেরিয়েছে। দাঁতের ফাঁকে জিভও বেরিয়ে রয়েছে। বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। নাকের তলায় একটু রক্তও আছে। মনে হল, কেউ লোকটাকে মেরে ফেলেছে। লোকটার মুখে খোঁচাখোঁচা গোঁফ দাড়ি। দেখতে ভিখিরিদের মতো।

ডাঃ মজুমদার বললেন, "সর্বনাশ! এ আবার কে?" তারপর হন্তদন্ত হয়ে মন্দিরে ঢুকলেন জুতো খুলে রেখে। কর্নেল বললেন, "আপনিই পরীক্ষা করে দেখুন। আমি মন্দিরে ঢুকব না।"

টর্চের আলোটা পরীক্ষা করে দেখার পর ডাঃ মজুমদার গম্ভীর মুখে বললেন, "বহুক্ষণ আগেই মারা গেছে। গলায় ফাঁস আটকে মেরে ফেলা হয়েছে সম্ভবত। হ্যাঁ—এই যে দেখছি, নাইলনের দড়ি পড়ে রয়েছে। কর্নেল, আমার মনে হচ্ছে—শিবলিঙ্গের আড়ালে খুনী বসেছিল ওত পেতে। এই লোকটা যে কোনো কারণেই হোক, এখানে ঢুকে সম্ভবত প্রণাম করছিল। সেই সময় গলায় আচমকা ফাঁস আটকে হ্যাঁচকা টান দিয়েছে।"

তারপর উনি পায়ের কাছে ঝুঁকে কী কুড়িয়ে নিলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, ফের, "কর্নেল! কর্নেল! এ যে দেখছি সেইরকম কালো-কালো লোম! দেখুন!"

কর্নেল হাত বাড়িয়ে নিলেন। টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ। প্রাণীটা যে শিম্পাঞ্জি, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু পুলিশ অফিসার ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখুন। আমি বারণ করলুম বেণীমাধববাবুর পেছনে ছুটতে। শুনলেন না। বেণীমাধববাবুকে তো ওঁরা বাড়িতেই পাওয়া যেত পরে। আসল রহস্য পেছনে ফেলে রেখে ওঁর পেছনে ছোটার মানে হয় না।"

ডাঃ মজুমদার বললেন, "পুলিশ বেণীমাধবকে পাকড়াও করে করবেটা কী? উনি প্রভাবশালী লোক। তাছাড়া ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগটাই বা কী? মন্দিরে আসা নিশ্চয় অপরাধ নয়।"

"আমার ধারণা, পুলিশ আপনার বক্তব্য ঠিক বুঝতে পারেনি।'

"আমি ওদের বলেছিলুম, মন্দিরতলায় একটা চোরাই মাল কেনাবেচা হবে। আপনার কথা বলেছিলুম। যাক্‌গে, এখন এই লাশটার ব্যাপারে কী করা যায় বলুন তো?"

কর্নেল রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটু হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে, বেণীমাধবের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে পুলিশ ফিরে আসছে। বেণীমাধবকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। বিনা অভিযোগে।"

পুলিশের জিপটা সত্যি ফিরে এল। জিপ থেকে নেমে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সেই পুলিশ অফিসার। বললেন, "বেণীমাধব রায় মহা ধড়িবাজ লোক। বলে কী, মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়েছিলুম। যাই হোক, ওঁকে ঘাঁটালুম না আপাতত। কিন্তু অন্য পার্টি তো এল না কর্নেল।"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, " এসেছিল। কিন্তু তৃতীয় এক পার্টি তাকে খুন করে মাল হাতিয়ে কেটে পড়েছে অনেক আগেই। ওই দেখুন।"

মন্দিরের ভেতর লাশটা দেখেই পুলিশ অফিসার চমকে উঠলেন। "সর্বনাশ! এ আবার কে?"

কর্নেল বললেন, "যেই হোক, একে কিন্তু বেণীমাধববাবু খুন করেননি—তা আপনারা এবং আমরা সবাই দেখেছি। বেণীমাধব এই মড়াটা দেখেই ভয় পেয়ে চলে গেছেন। আইনত উনি বড়জোর একজন সাধারণ সাক্ষী হতে পারেন। যাইহোক, বডিটা মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন এখনই।"

আমরা রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম। পুলিশ অফিসার আবার জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কনস্টেবলরা মন্দিরে পাহারায় রইল। কর্নেল বললেন, "চলুন ডাঃ মজুমদার। কনস্টেবলদের বলে

যাচ্ছি, দরকার হলে আমাদের সঙ্গে আপনার বাড়িতে যোগাযোগ করবে ওরা। এখানে দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

ডাঃ মজুমদারের বাড়ির সামনের লনে আমরা বসলুম। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। জোরাল হাওয়া দিচ্ছিল বলে মশার উৎপাত নেই। কফি এল একপ্রস্থ। কফি খেতে খেতে ডাঃ মজুমদার বলেন, "লোকটার পরিচয় না পেলে কিছু বোঝা যাবে না। দেখে মনে হল, পাগলা ভিখিরি-টিখিরি যেন। ওকে খুন করল কেন?"

কর্নেল হাসলেন। "বাঁটুল রহস্য আরো ঘনীভুত হলে ডাঃ মজুমদার। শুধু এটুকুই আপাতত বলতে পারি।"

আমি বললুম, "বেণীমাধবের কাছেই সব রহস্যের চাবি রয়েছে। চলুন না, তাঁর কাছে যাই!"

কর্নেল হাসলেন। "দরকার নেই ডার্লিং! উনিই কাল সকালে আমার কাছে হাজির হবেন।"

ডাঃ মজুমদার বললেন, "আচ্ছা কর্নেল, শিম্পাঞ্জিকে দিয়ে মানুষ খুন করানো কী সম্ভব?"

"নিশ্চয় সম্ভব। শিম্পাঞ্জি বুদ্ধিমান প্রাণী। তাকে খুন করতে শেখানো মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। প্রথমে মানুষের ডামি তৈরি করে ডামির গলায় ফাঁস আটকানোর ট্রেনিং দিলেই শিখে নেবে। বেণীমাধবের ঘরে টেবিলল্যাম্প না নিভলে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হয় না। তাই শিম্পাজিটাকে তার মালিক টেবিলল্যাম্পের সুইচ অফ করতেও শিখিয়েছে। আরো কত কী শিখিয়েছে কে জানে!"

"ভৌতিক উপদ্রবটা সত্যি অদ্ভুত!" ডাঃ মজুমদার বললেন। "ব্যাপারটা কী হতে পারে?"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "নিছক একটা ক্যাসেটে টেপের ব্যাপার সম্ভবত। বেণীমাধবের ঘরে আলো না থাকলেই ব্যাপারটা জমে ওঠে। আলো জ্বললে ভূতুড়ে উৎপাত মোটেও জমে না। বরং ধরা পড়ার চান্স থাকে। আমার ধারণা, শিম্পাঞ্জিটা খুদে টেপরেকর্ডার নিয়ে এসে জানালা ধারে সেটা চালিয়ে দেয়। ক্যাসেটে কাচ ভাঙার শব্দ, ফিসফিস করে কথাবলার শব্দ, হাঁটাচলার শব্দ—সবই রেকর্ড করা আছে।"

অবাক হয়ে বললুম, "কিন্তু এর উদ্দেশ্য কী?"

কর্নেল বললেন, "হয়তো কেউ কোনো কারণে বেণীমাধববাবুকে ভয় দেখাচ্ছে।" ডাঃ মজুমদার মন্তব্য করলেন, "কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রহস্য সত্যিই ঘনীভূত..."।...

পলাতক দেহরক্ষী অ্যাস্টিডোনা

পরদিন সকালে কর্নেলের বাড়ি গিয়ে দেখি বেণীমাধব হাজির। এদিন ওঁকে ভীষণ বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। চোখদুটো লাল। উস্কখুস্ক চুল। আমাকে দেখে কোনো সম্ভাষণ করলেন না। কর্নেলের সঙ্গে আগের কোনো কথার জের টেনে বললেন, "যা বলছিলুম, কর্নেল! সত্যি আমি এতখানি তলিয়ে ভাবিনি। নইলে আপনাকে ব্যাপারটা জানাতুম। বৈজুনাথের সঙ্গে আমার অনেকদিনের কারবার। দুনিয়া জুড়ে ওর ঘাঁটি। অদ্ভুত-অদ্ভুত পুরনো জিনিস জোগাড় করে সে কিউরিও শপে বেচে। আলেকজান্ডারের বাঁটুল আমি তার কাছেই কিনেছিলুম। বাঁটুলটা কেনার পর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলুম। জিনিসটা বেচার ইচ্ছে ছিল না। ভেবে ছিলুম সাজিয়ে রাখব ঘরে। কিন্তু রাখতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর দেখি...."

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, "দেখলেন না যে ওটা দুভাগ হয়ে গেছে এবং ভেতরে আছে একটা প্রকাণ্ড হিরে!"

আমি চমকে উঠলাম। বেণীমাধবের মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। বললেন, "তাহলে আপনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ।" কর্নেল বললেন। " তবে বাঁটুলটা আমার হাত থেকে দৈবাৎ পড়ে যায়নি। ওর ভেতরে হিরে লুকানো আছে, সেটা আরিয়ানের লেখা সম্রাট আলেকজান্ডারের জীবনী পড়েই জেনেছি।

ওটা দেখতে বাঁটুলেরই মতো এবং গ্রিক যোদ্ধারা আত্মরক্ষার জন্য এ জিনিস কাছে রাখতেন বটে, কিন্তু কিছু বাঁটুলের ভেতর মূল্যবান পাথর বা মণিমুক্তাও লুকিয়ে রাখা হত। সেগুলো আসলে বাঁটুল নয়, কৌটো। বিশেষ করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কিংবা পররাজ্যে হানা দেবার সময় এই অদ্ভুত কৌটো কাজে লাগাত। লুণ্ঠিত বিশেষ মণিমুক্তা এর ভেতর নিরাপদে রাখা যেত। কেউ টের পেত না। ভাবত, ওটা আত্মরক্ষার অস্ত্র মাত্র।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ফের বললেন, "আপনি বাঁটুলটা দিয়ে গেলে আতস কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম, ওটার মাঝামাঝি জোড়া দেওয়া এবং একটা কালো বিন্দু রয়েছে। সেখানে ছুরির ডগার চাপ দিতে খুলে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, ভেতরে প্রকাণ্ড একটা হিরে ঝলমল করছে। তখন বুঝলুম কেন এটা আপনি আমার জিম্মায় রাখতে দিয়ে গেছেন।"

বেণীমাধব বললেন, "বৈজুনাথ বলেছিল, এরকম গ্রিক বাঁটুল তার কাছে আরো একটা আছে। সেটা নাকি সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বাবা ফিলিপের। বৈজুনাথ সেটার দাম দেড়গুণ বেশি চেয়েছিল। আমি তখনও জানি না এর ভেতর কী আছে। তাই বেশি দাম শুনে নিতে রাজি হইনি। পরে পস্তালুম খুব। বৈজুনাথের বিরুদ্ধে দেশবিদেশের প্রত্নদ্রব্য নিয়ে চোরাকারবারের অভিযোগে পুলিশের হুলিয়া ঝুলছে। প্রকাশ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা কঠিন। সে-ও বরাবর গোপনে দেখা করত। তার এক বন্ধু থাকে পার্কস্ট্রিটে। তাকে বলে এলুম বৈজুনাথ যেন শিগগির দেখা করে আমার সঙ্গে। কিন্তু কদিন পরে বৈজুনাথ আমার দোকানে এল ভিখিরির ছদ্মবেশে। কিন্তু আমার গরজ দেখে সে এবার বাঁটুলটার দাম আরো বাড়িয়ে দিল।"

কর্নেল জিগ্যেস করলেন, "কত চাইল বৈজুনাথ?"

"আলেকজান্ডারের বাঁটুলের দাম চেয়েছিল পাঁচহাজার টাকা। দরাদরি করে তিনহাজারে কিনেছিলুম। এটার দাম চাইল দশ হাজার টাকা। অথচ প্রথমে চেয়েছিল মোটে ছ'হাজার টাকা।"

"তারপর আপনি কী বললেন ওকে?"

"আমি একটু দ্বিধায় পড়লুম। যদি এ বাঁটুলটার ভেতর হিরে না থাকে? তাছাড়া....." একটু বিষণ্ণভাবে হাসলেন বেণীমাধব। "তাছাড়া বাঁটুলটা যে সত্যিসত্যি ফিলিপের, তার প্রমাণ কী? ওটা জাল বাঁটুলও তো হতে পারে। প্রত্নদ্রব্য হিসেবে এসব জিনিসের বাজার দর প্রচণ্ড। তাই জাল হওয়া খুব স্বাভাবিক।"

"ঠিক বলেছেন। তবে আলেকজান্ডারের বাঁটুলটা অবশ্য জাল নয় বলে মনে হচ্ছে। কারণ ওর ভেতর হিরে আছে এবং আরিয়ান ঠিক তারই আভাস দিয়েছেন জীবনীগ্রন্থে।"

বেণীমাধব বললেন, "বৈজুনাথের সামনে সেটা তো পরীক্ষা করা যায় না। তাছাড়া সে আমাকে দেবেও না গোপনে তার চোখের আড়ালে পরীক্ষা করতে। তাই ইতস্তত করছিলুম। তখন বৈজুনাথ নিজে থেকে প্রস্তাব দিল, ঠিক আছে। টাকা জোগাড় করে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন কৌশলে। কারণ আমার পক্ষে আর এখানে আসা সম্ভব হবে না। পুলিশ ওঁত পেতে বেড়াচ্ছে। কোন্ কাগজে কীভাবে বিজ্ঞাপন দিতে হবে, তাও সে বলে দিয়ে গেল। সে একথাও বলল যে, আমার বাড়িতে যাবে না।"

বৈজুনাথ নামটা তো বাঙালি নয় তাহলে দৈনিক সত্যসেবকে বিজ্ঞাপন দিতে বলেছিল কেন?"

বেণীমাধব হাসলেন। "বৈজুনাথ ওর ছদ্মনাম। ও আসলে বাঙালি। ওর প্রকৃত নাম আমিও জানি না। অনেকগুলো নাম নিয়ে ও কারবার চালাত।"

"তারপর আপনি বিজ্ঞাপন দিলেন?"

"শেষপর্যন্ত দিলাম। আমার লোভ বেড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া মনে মনে ঠিক করেছিলুম নির্জন মন্দিরে আমাকে সে বাঁটুলটা বেচামাত্র ওটা খুলে দেখে নেব। যদি হিরে না থাকে, তাহলে...."

"তাহলে পিস্তল দেখিয়ে ওকে ভয় পাইয়ে টাকা ফেরত নেবেন—এই তো?"

"ঠিক বলেছেন।"

"হুঁ—বৈজুনাথ আপনার বাড়ি যেতে চায়নি কেন বোঝা যাচ্ছে। সে ভেবেছিল, বাড়িতে ওকে পেয়ে আপনি ব্ল্যাকমেইল করে কম দাম দেবেন।"

"বৈজনাথ বড় ধুরন্ধর ছিল। কিন্তু বেঘোরে মারা পড়ল শেষ পর্যন্ত!"

এতক্ষণে টের পেলুম, যশোর রোডের সেই মন্দিরে যার মড়া দেখেছি, সেই লোকটা বৈজুনাথ। ভিখিরির ছদ্মবেশেই ওখানে গিয়েছিল সে।

কর্নেল বললেন, "বাঁটুলের ভেতরে হিরের খোঁজ কেউ আগে থেকেই জানত, বেণীমাধববাবু। তাই সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তার সম্পর্কে আমরা এখনও কিছু জানি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি যে তার একটা শিক্ষিত শিম্পাঞ্জি আছে। শিম্পাঞ্জিকে দিয়ে সে টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে ক্যাসেট বাজিয়ে ভূতপ্রেতের ভয় দেখিয়েছে আপনাকে। সে ভেবেছিল, আলেকজান্ডারের বাঁটুলের ভেতরকার হিরের খবর আপনি জানেন না। অতএব ভূতের উৎপাতে উত্যক্ত হয়ে ভাববেন ওই বাঁটুলটাই এর মূলে এবং ওটা হাতছাড়া করতে চাইবেন। আচ্ছা বেণীমাধববাবু, কেউ কোনোদিন কি আপনার দোকানে এসে বাঁটুলের খোঁজ করেছিল?"

বেণীমাধববাবু বললেন, "বাঁটুল সম্পর্কে কেউ খোঁজ করেনি। তবে হ্যাঁ—একজন খদ্দের কিছুদিন আগে জিগ্যেস করছিল। খ্রীস্টপূর্ব কোনো গ্রিক প্রত্নদ্রব্য আমার কাছে পাওয়া যায় নাকি।"

"কেমন চেহারা তার, মনে আছে?"

"আপনার মতোই মুখে দাড়ি ছিল। তবে কালো দাড়ি। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে। লম্বা গড়ন। গায়ের রঙ ময়লা। লোকটাকে আমার মনে আছে। কারণ..." একটু ভেবে বেণীমাধব বললেন, "হ্যাঁ—ওর নাকটার জন্য। ওরকম বাঁকা লম্বা নাক সচরাচর দেখা যায় না। বাজপাখির মতো কতকটা। তার চোখে সানগ্লাস ছিল। লোকটাকে আমার পছন্দ হয়নি। কেমন নাকিস্বরে ইংরেজিতে কথা বলছিল।"

কর্নেল গুম হয়ে কী ভাবতে থাকলেন। চোখ বুজে টাকে একবার হাত বুলিয়ে সাদা দাড়িতে আঁচড় কাটতে থাকলেন অভ্যাসবশে। আমি একটা পত্রিকায় চোখ রাখলুম। বেণীমাধব উসখুস করছিলেন। কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। সেই সময় কর্নেল বললেন, "পার্কস্ট্রিটে বৈজুনাথের সেই বন্ধুর চেহারা কেমন?"

বেণীমাধববাবু বললেন, "নাঃ । সে নয়। সে যত ছদ্মবেশে আসুক, আমি চিনে ফেলব। তাছাড়া সে ফর্সা, মোটাসোটা। তার নাকটা বেঁটে। আমার বয়সী লোক।"

"নাম কী?"

"ভোমরলাল চোপরা। অবাঙালি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের বড় ব্যবসা আছে। তবে বুঝতেই পারছেন, সে কেমন।"

"ঠিকানাটা লিখে দিন প্লিজ। ফোন নাম্বার জানলে তাও লিখে দিন।"

বেণীমাধব একটুকরো কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। কর্নেল সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললে,, "ঠিক আছে। আপনি কিছু ভাববেন না বেণীমাধববাবু। আপনার মূল্যবান জিনিস নিরাপদেই থাকছে। খুনে শিম্পাঞ্জির মালিককে খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগবে এই যা।"...

বেণীমাধববাবু চলে গেলে বললুম। "ভোমরালালের পক্ষে বাঁটুলের গুপ্তরহস্য জানা খুবই সম্ভব। তাই না কর্নেল?"

কর্নেল একটু হেসে ফোন তুলে ডায়াল করলেন। তারপর ওঁর এইসব কথাবার্তা শুনলুম। ইংরেজিতেই কথা বলেছিলেন কর্নেল।..."হ্যালো! আমি মিঃ চোপরার সঙ্গে কথা বলতে চাই।...ও,

আচ্ছা! কোথায়! ..আচ্ছা, আচ্ছা। ...হ্যাঁ, আমি ওঁর এক বন্ধু কথা বলছি। আমার নাম বি.এম.রায়। কবে ফিরবেন বলে গেছেন? ...কিন্তু আমার যে জরুরি দরকার ওঁর সঙ্গে। ট্রাংক কলে কথা বলব, যদি ঠিকানাটা দয়া করে জানান।।...বুঝেছি! আচ্ছা, ঠিক আছে।"

কর্নেল ফোন রেখে বললেন, "চোপরা গেছে কাশ্মীরে বেড়াতে। শ্রীনগরে দুদিন থেকে যাবে লাডাকে। ওর পি. এ. ফোন ধরেছিল। বলল, ওঁর সঙ্গে ট্রাংকলে যোগাযোগ করা যাবে না, কোথাও থাকার ঠিক নেই।"

হাসতে হাসতে বললুম, "কলকাতার গরম সহ্য হচ্ছিল না।—তাই বুঝি লাডাকে?"

কর্নেল বললেন, "লাডাকের রাজধানী লেহ্। সেখানে নাকি চোপরার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে। ওর পি. এ. বলল। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চোপরা একটু কিছু আঁচ করেই কেটে পড়েছে কলকাতা থেকে। কারণ ওর পি. এ. বলল কবে কলকাতা ফিরবে ঠিক নেই। লাডাক থেকে বিদেশেও যেতে পারে।"

"দেশবিদেশে যাদের কারবার তাদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক তাই না?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে আবার চোখ বুজলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ উঠে গিয়ে সেই পুরনো ইংরেজি বইটা নিয়ে এলেন। দ্রুত পাতা উল্টে একখানে চোখ রেখে বললেন, "হুঁ—লাডাক। আরিয়ান লিখেছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত সম্রাটের সন্দেহ ছিল, পলাতক দেহরক্ষী অ্যাস্টিডোনা তাঁর অমূল্য বাঁটুল চুরি করে নিয়ে পূর্বদিকে পালিয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পর এক চীনা পরিব্রাজক আলেকজান্দ্রিয়ায় আমাকে বলেছিলেন, কাশ্মীরের উত্তরে লাডাক রাজ্যে একদল গ্রিককে দেখেছেন। বুঝলুম, ওরা সম্রাটের বাহিনী থেকে পলাতক গ্রিক দেহরক্ষী সেনাদল। বাঁটুল হারিয়ে সম্রাট এত খাপ্পা হয়েছিলেন যে তাঁর দেহরক্ষী পঞ্চাশজন সৈনিককেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অ্যাস্টিডোনা এদের নায়ক ছিল। সে পালিয়ে যায় প্রথমে। পরে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরো চল্লিশজন। বাকি ন'জনের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। চীনা পরিব্রাজকের কথায় জানা গেল, সেই একচল্লিশ জন গ্রিক সৈনিক লাডাক রাজ্যে বাস করছে।"

কর্নেল ওই অংশটুকু পড়ার পর বললেন, "আরিয়ানের প্যাপিরাসে লেখা পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার একটি ধ্বংসবশেষে। তা ১৮৯৪ সালে ইংরেজ ঐতিহাসিক হ্যালডেন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই বইটা ১৯০৮ সালে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণ। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে পেয়ে গিয়েছিলাম। এটা এত কাজে লাগবে ভাবতেই পারিনি।"

বললুম, "কাজে আর কতটুকু লাগল? শিম্পাঞ্জিওয়ালা খুনীকে যদি ধরিয়ে দিতে পারত, তাহলে বুঝতাম!"

কর্নেল আমার পরিহাসে কান করলেন না। আপনমনে বিড়-বিড় করে কিছুক্ষণ 'লাডাক' এবং 'গ্রিক দেহরক্ষীদল' কথাদুটো উচ্চারণ করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "জয়ন্ত! এই প্রচণ্ড গরমে প্রাণ আইঢাই করছে। যাবে নাকি লাডাকে? সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পনেরোহাজার ফুট উঁচুতে লাডাকের অবস্থান। এখন সেখানে দারুণ স্নিগ্ধ আবহাওয়া। চিরবসন্তের দেশ ডার্লিং।"

হুঁ, আমার বৃদ্ধ বন্ধু আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন। বললুম, "যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেখানে সেই খুনে শিম্পাঞ্জি, আর তার দুষ্ট মনিবটির সঙ্গে দেখা হবার চান্স আছে কি?"

"থাকতেও পারে!"

"তাহলেই তো মুশকিল!"

"মুশকিল কীসের?" প্রাজ্ঞ গোয়েন্দাপ্রবর নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে বললেন, "যেখানে মুশকিল, সেখানেই মুশকিল আসান। ডার্লিং জয়ন্ত, শেষপর্যন্ত এই বুড়োকে কিন্তু সত্যি মুসলিম পীর মুশকিল আসান সাজতে হবে এবং তুমি হবে আমার চেলা।"

"ছদ্মবেশ ধরতে হবে নাকি?"

"হুঁউ। লাডাকের অধিবাসীরা মোটামুটি দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মুসলিম এবং বৌদ্ধ। হিন্দুর সংখ্যা খুবই কম। কাজেই মুসলিম পীর সাজাটা নিরাপদ। কারণ আমাকে বৌদ্ধলামা মানাবে না, যতই নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করি, তাছাড়া..." কর্নেল নিজে সাদা দাড়ি দেখিয়ে বললেন, "লামাদের দাড়ি থাকে না। তাই লামা সাজতে হলে আমার এই সুন্দর দাড়িটা ছেঁটে ফেলতে হবে। জয়ন্ত, প্রাণ ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু এই দাড়ি ত্যাগ করা অসম্ভব।"

উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, "আপনি না হয় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। মুসলিম মন্ত্র আওড়ানো আপনার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আমি ওসব কিছু জানিনে!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "ভয় নেই। আমি মাঝে মাঝে যা আওড়াব—তুমিও তাই আওড়াবে।"

সায় দিলুম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না।

পীরবাবার কেরামতি

শ্রীনগর থেকে লাডাকের রাজধানী লেহ-এর দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। শোনমার্গ নামে একটা জায়গা থেকে রাস্তার দু'ধারের দৃশ্য বদলাতে শুরু করেছিল। ফুলে-ফুলে ঢাকা মাঠ, দূরে সাদা তুষারে ঢাকা পর্বতশ্রেণি। রাস্তা ক্রমশ এঁকেবেঁকে চড়াইয়ে উঠছিল। তারপর পাহাড়ের রাজ্য। পিলে চমকানো বাঁকের নিচে অতল খাদ দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। আর কী অদ্ভুত গড়নের সব পাহাড়! কত রকম রঙ তাদের—সোনালী, খয়েরী, কালো, কোনোটা নীল। দিগন্তে যেন আদিম যুগের সব অতিকায় ডাইনোসর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনো পাহাড়ের গড়ন বেঁটে, কোনোটা যেন দৈত্যের মতো। কোনোটার মাথায় সেকালের ভাঙাচোরা দুর্গ—নিচে পর্যন্ত পাথর ছড়ানো। বৌদ্ধ মন্দির গুম্ফাও দেখতে পাচ্ছিলুম। হলদে রঙের আলখেল্লাধারী বৌদ্ধ ধর্মগুরু লামাদেরও দেখতে পাচ্ছিলুম। দুপুরে লেহ পৌঁছে বাস থেকে আমরা নেমেছিলুম। তখন ছদ্মবেশ ধরিনি।

যে হোটেলে আমরা উঠলুম, তা থিক্‌সে গুম্ফার কাছাকাছি নিরিবিলি একটা পাহাড়ের গায়ে, হোটেলের নাম 'সানি লজ'। তার মালিক সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার। পাঞ্জাবের লোক। অর্জুন সিং নাম। দেখলুম, উনি কর্নেলের পরিচিত। নিচের উপত্যকায় ঘাসের মাঠে গুজ্জর রাখালরা ভেড়া চরাচ্ছিল। অর্জুন সিং বললেন, "ওরা যাযাবর জাতি। ওদের বলা হয় গুজ্জর বখরাওয়ালা। কর্নেল, আপনি নাগপা উপজাতির কথা জানতে চাইছেন তো? নাগপারা থাকে সামনের ওই পাহাড়টার পেছনে। ওদের চেহারা ভারি সুন্দর। কিংবদন্তি আছে যে ওরা নাকি গ্রিকদের বংশধর। গ্রিক সম্রাট আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনী আফগানিস্তানে পৌঁছলে কোনো কারণে একদল গ্রিক সৈনিক পালিয়ে এসেছিল লাডাকে। নাগপারা তাদেরই নাকি বংশধর।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ—ওদের কথা বইয়ে পড়েছি। ওদের সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ।"

অর্জুন সিং বললেন, "ঠিক আছে। ওদের একজনের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাকে ডেকে পাঠাব।"

কর্নেল বললেন, 'দরকার নেই। আমি গিয়ে আলাপ করব ওদের সঙ্গে।"

অর্জুন সিং গম্ভীর মুখে বললেন, "নাগপারা এমনিতে খুব ভদ্র। কিন্তু ওরা বাইরের লোকের প্রতি খুব সন্দেহপরায়ণ। তাই বাইরের লোকের সঙ্গে মিশতে চায় না। তাছাড়া ওরা কি দুর্দান্ত হিংস্র প্রকৃতিরও। সাবধানে মেলামেশা করা দরকার।"

কথা হচ্ছিল হোটেলের ব্যালকনিতে বসে। একটু পরেই কর্নেল বললেন, "আচ্ছা ব্রিগেডিয়ার সিং, এখানে কলকাতার ভোমরলাল চোপরা কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ অফিস আছে শুনেছিলুম। কোথায় সেটা?" অর্জুন সিং একটু হেসে বললেন, "চোপরাকে চেনেন নাকি?"

"না । নাম শুনেছি।"

"চোপরা বিপজ্জনক লোক। ও আসলে চোরাচালানি। এখান থেকে চীনের কাশগড়ে যাবার একটা রাস্তা আছে। দুর্গম রাস্তা অবশ্য। চোপরা সেই রাস্তায় চীন থেকে বে-আইনিভাবে জিনিসপত্র আমদানি করে। আমাদের সেনাবাহিনী সারা এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। কারণ সীমান্ত খুব বেশি দূরে নয়। চোপরার ধূর্ততা অসাধারণ। সেনাবাহিনীর চোখ এড়িয়ে কারবার করে।"

"চোপরার অফিসটা কোন্ এলাকায়?"

অর্জুন সিং আঙুল তুলে শহরের দিকে দেখিয়ে বললেন, "ওই যে একটা সাদা বাড়ি—তার নিচে বাজার দেখা যাচ্ছে। বাজারের পেছনে গম্বুজওলা মসজিদের পাশেই চোপরার অফিস। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। টিলার আড়ালে পড়ে গেছে।"

এরপর কর্নেল আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন অর্জুন সিংকে, চুপি চুপি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর দেখলুম অর্জুন সিং হা-হা করে হেসে উঠলেন প্রচণ্ড ভুঁড়ি দুলিয়ে। কর্নেল আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরে। বললেন, "এবেলা বিশ্রাম করা যাক। সন্ধ্যার মুখে আমরা বেরুব। জয়ন্ত, তখন আমি কিন্তু মুশকিল আসান পীর। আর তুমি আমার চেলা।"

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, "ছদ্মবেশ না ধরলেই কি নয়?"

কর্নেল একটু হেসে শুধু বললেন, "যস্মিন দেশে যদাচার।"

ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং বিকেল গড়িয়ে আমাদের ঘরে এলেন। চাপা গলায় বললেন, "হ্যাঁ—খবর নিয়েছি। চোপরা এসেছে দিন চারেক আগে।"

কর্নেল বললেন, "আমাদের পোশাক পরা শেষ হলে আমরা বেরুব কিন্তু।"

"করিডর দিয়ে এগিয়ে পেছনের দিকে নেমে যাবার সিঁড়ি আছে। ওদিকটা নির্জন। আপনারা নিশ্চিন্তে বেরুতে পারেন। ওদিকে দরজা আমি খুলে রাখছি। নামবার সময় কিন্তু ভেজিয়ে দিয়ে যাবেন।" বলে অর্জুন সিং চলে গেলেন।

কর্নেল দরজা এঁটে দিয়ে স্যুটকেশ খুলে বললেন, "চিৎপুরে দাশ অ্যাণ্ড কোম্পানি যাত্রা থিয়েটারের পোশাক ভাড়া দেয়। এগুলো তাদের কাছ থেকে জোগাড় করেছি। ডার্লিং, তোমার তো দাড়ি নেই। অতএব নকল দাড়ি পরতে হবে। মুখ আর দু-হাতের চামড়া একটু ময়লা দেখানো দরকার। পেণ্ট এনেছি। মেখে নাও। আশা করি, কখনও-কখনও থিয়েটারে নেমেছে। অসুবিধা হলে আমি সাহায্য করব।"

কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ শেষ করে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালুম, না পারলুম নিজেকে চিনতে, না কর্নেলকে চিনতে। দুজনের পরনে দুটো কালো আলখেল্লা। মাথায় নোংরা রঙিন কাপড়ের পাগড়ি। গলায় ইয়া মোটা রঙিন পাথরের মালা। কর্নেলের হাতে একটা হাতলওয়ালা ধূপদানি, আর প্রকাণ্ড কালো চামর। আমার হাতে একটা মস্তবড় লোহার চিমটে। চিমটেয় আংটা পরানো রয়েছে অনেকগুলো। কর্নেল দেখিয়ে দিলেন, কেমন করে চিমটেটা তুলে বুকে মৃদু ঘা মারতে হবে এবং ঝুনঝুন শব্দ উঠবে। সেইসঙ্গে বিড়বিড় করতে হবে—ঠোঁট দুটো সবসময় কাঁপবে। তারপর কী বলতে হবে, তাও শিখিয়ে দিলেন।

ধূপদানিতে একগাদা টিকে ভরে আগুন ধরালেন কর্নেল। তারপর ধূপ ছড়িয়ে দিলেন। ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেল। তারপর বেরিয়ে পড়লুম।

হোটেলের পেছনে খাড়া পাহাড়। খাঁজকাটা গা দিয়ে নিচের রাস্তায় নামলুম যখন, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বেমক্কা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ইয়া পীর মুশকিল আসান।"

ট্রেনিং মতো আমিও চেঁচিয়ে বললুম, "যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান।"

রাস্তা ক্রমশ বাজারের দিকে নেমেছে! ঘোড়ার টানা গাড়ি, মোটরগাড়ি, হরেকরকম যানবাহন চলাচল করছে। তত বেশি ভিড় চোখে পড়ল না। পীরবাবা যে দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছেন এবং

ওই বুলি বলে হাঁক দিচ্ছেন, সেই দোকানের লোক এসে ধূপদানির তলার দিকে বাটির মতো গোল পাত্রটাতে ঠকাস করে পয়সা ফেলছে। আর পীরবাবা তার মাথার চামর বুলিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র আওড়ে 'মুশকিল আসান' করছেন।

কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, প্রচুর মুসলিম এদেশে বাস করে। গম্বুজওলা মসজিদের সামনের ধাপবন্দী সিঁড়িতে আমরা যখন বসলুম, তখন ধাপের নিচে ভিড় জমে গেল। মসজিদ থেকে প্রার্থনা করে দলে দলে লোক বেরিয়ে এল। তারাও ভিড় করে দাঁড়াল। পীরবাবা সমানে হাঁক দিচ্ছেন, "ইয়া পীর মুশকিল আসান!" আমি পাল্টা চেঁচিয়ে উঠছি, "যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান!"

আড়চোখে দেখছিলুম, বাঁপাশে—রাস্তার ধারে একটা বাড়ির মাথায় সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'চোপরা অ্যান্ড কোং।' অফিস এখন বন্ধ। দোতলার ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে।

পীরবাবার ধূপদানির তলাকার বাটিটা পয়সার ভরে গেল। তারপর ভিড় ক্রমশ কমে গেল। মনে হল, খুব সকাল সকাল এখানকার লোকেরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। একদল লোক আবার প্রার্থনার জন্য মসজিদে ঢুকল এবং কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল। পীরবাবা আর তার চেলা দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর কেউ আশীর্বাদ নিতে আসছে না। রাত আটটা বাজে। মসজিদের ভেতর ঘড়ির বাজনা শুনে বুঝলুম সেটা।

এবার কোত্থেকে দুটো রাস্তার কুকুর এসে আমাদের বেজায় ধমকাতে শুরু করল। কিছুতেই তাড়ানো গেল না তাদের। তখন হঠাৎ পীরবাবা গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, "বেটা! বাঁটুলঠো নিকালো! মার দো দোনো কুত্তাকো!"

আমি অবাক হয়ে তাকাচ্ছি। পীরবাবা ফের জোরগলায় ধমক দিলেন, "কাঁহা তেরা বাঁটুল? হাম তুমকো যো বাঁটুল দিয়া, কাঁহা রাখা তুম? দেখো আভি টুঁড়কে।"

তারপর কুকুর দুটোর দিকে ঘুরে চেঁচালেন আগের মতো হিন্দিভাষায়—"যে-সে বাঁটুল নয়, পাঁচ-পাঁচশো গ্রাম ওজন। মারলে তোদের মাথা ফুটো হয়ে যাবে জানিস ব্যাটারা?"

কুকুর দুটো কী বুঝল কে জানে, হয়ত মুঠো নাড়া দেখেই কেটে পড়ল লেজ গুটিয়ে। তারপর দেখি চোপরা অ্যান্ড কোং-এর পাশের গলি থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। সে হনহন করে এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। পরনে প্যান্টশার্ট, ফর্সা, মোটাসোটা গড়ন। নাকটা মোটা। সে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, "সেলাম পীর বাবা।"

পীরবাবা চামর তুলে মিঠে গলায় বললেন, "এস বেটা! মুশকিল আসান করে দিই!"

লোকটা নিচের সিঁড়িতে ধপাস করে বসে পড়ল।

"বেটা তোমার নাম কী?"

"জী পীরবাবা, আমার নাম ভোমরলাল চোপরা। সামান্য ব্যবসাদার।"

আমি চমকে উঠলুম। তারপর সামলে নিয়ে বিড়বিড় করার ভঙ্গিতে ঠোঁট কাঁপাতে থাকলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কী মুশকিলে পড়েছ, বলো তো বেটা ভোমরলাল?"

ভোমরলাল এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপাগলায় বলল, "পীরবাবা আমার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, আপনি কত লোকের মুশকিল আসান করছেন। তাই আপনার কাছে এলুম। বাবা, আমি বড্ড মুশকিলে পড়েছি। কিন্তু এখানে রাস্তার ধারে সে সব কথা খুলে বলা যাবে না। দয়া করে যদি আমার ঘরে পায়ের ধুলো দেন, ভাল হয়।"

পীরবাবা উঠে দাঁড়ালেন। "ঠিক হ্যায় বেটা! চলো।"

আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। ধূর্ত চোপরা নিশ্চয় ঘরের ভেতর উজ্জ্বল আলোয় আমাদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলবে। কর্নেল কাজ ঠিক করছেন না। কিন্তু কর্নেল দেখলুম, দিব্যি হেঁটে চলেছেন ওর পেছনে।

পাশের সরু গলিতে ঢুকে একটা দরজা। তারপর সিঁড়ি। ওপরে গিয়ে একটা ঘরে আমাদের বসাল চোপরা। তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

পীরবেশী কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন, "এবার বলো বেটা কী মুশকিলে পড়েছ?"

অমনি প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে বলল, "টুঁ শব্দ করলে মরবে। কৈ বাঁটুলটা বের কর। চটপট। নইলে খুলি উড়িয়ে দেব দুজনের!"

শিম্পাঞ্জির কবলে

হকচকিয়ে গিয়েছিলুম চোপরার কাণ্ড দেখে। লোকটা দেখছি, সত্যি খুনে প্রকৃতির। ইচ্ছে করল, এই ফুট আড়াই লম্বা ও ভারি লোহার চিমটেটা নিয়ে ওর পিস্তলধরা হাতটাকে গুঁড়িয়ে দিই। কিন্তু কর্নেল ততক্ষণে মুখে প্রচণ্ড ভয় ফুটিয়ে ধুপ করে বসে পড়েছেন তারপর হাঁউমাউ করে বললেন, "দিচ্ছি বাবা, আগে তোমার এই সাংঘাতিক জিনিসটা সরাও!"

বলে আমার দিকে ঘুরলেন। "ব্যাটা! তুম ভি বৈঠ যাও।" তখন আমিও করুণ এবং ভীত মুখ করে ওঁর ভঙ্গিতে হাটু দুমড়ে আসন করে বসলুম।

চোপরার একহাতে পিস্তল, অন্য হাতটা বাড়িয়ে আছে। কর্নেল তাঁর আলখেল্লার ভেতর থেকে সত্যি একটা বাঁটুল বের করলেন। ঠিক যেমনটি বেণীমাধব ওঁকে রাখতে দিয়েছেন, তেমনটি। উদ্বিগ্ন হয়ে ভাবলুম, বেণীমাধবের বাঁটুলটাই কি শয়তান চোপরাকে দিয়ে দিচ্ছে কর্নেল?

চোপরা খপ করে বাঁটুলটা কেড়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এবং নেড়েচেড়ে দেখল। গায়ের ওপরকার খোদাই করা নকশা ও লেখাজোখাও দেখল। দেখে বলল, "এই ব্যাটা ফকির! কোথায় পেলি এ জিনিস?"

কর্নেল বললেন, "নাগপাদের বস্তির কাছে একটা পাহাড়ী গুহায় কুড়িয়ে পেয়েছি বাবা!"

"ওখানে মরতে গিয়েছিলি কেন?"

"ওটাই যে আমার ডেরা বাবা!" কর্নেল মিষ্টি হেসে বললেন। তারপর চোখদুটো ধুরন্ধর লোকের মতো একটু টিপে চাপা গলায় ফের বললেন "মাসখানেক আগে তোমার মতো এক বড়া আদমিকে এমনি একটা জিনিস দিয়েছিলুম। কিন্তু সে তোমার মতো পিস্তল বের করেনি। তাকে খুশি হয়ে দিয়েছিলুম। জিনিসটা খুব পয়মন্ত। ঘরে থাকলে মুশকিল আসান হয়। তারপরে..."

চোপরার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "আর কাউকে দিয়েছিস নাকি?"

কর্নেল বললেন, "আহা, বলতে দাও সেকথা। পয়মন্ত জিনিসটা পেয়ে লোকটার কপাল ফিরে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে এসে বলল, জিনিসটা হারিয়ে ফেলেছে। আর একটা যদি দিই, তার খুব উপকার হয়।"

"তুই আবার দিলি তাকে?"

"হ্যাঁ বাবা। গুহার ভেতর খুঁজলেই এ জিনিস পাওয়া যায়।"

চোপরা পিস্তল পকেটে ভরে বলল, "নাগপারা তোকে থাকতে দেয় ওদের এলাকায়? শুনেছি ওরা খুব দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ। বাইরের লোককে ওদের এলাকায় যেতেই দেয় না!"

কর্নেল হাসলেন। "ব্যাটা আমি খোদার ফকির। পীর মুশকিল আসানের চেলা। আমাকে নাগপারা কিছু বলে না।"

চোপরা বাঁটুলটা আবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, "এই ব্যাটা ফকির! জিনিসটার জন্য তোকে দুটো টাকা দিচ্ছি। আর শোন, এ জিনিস আমার আরও চাই। তোকে আরও টাকা দেব। তোর ডেরায় আমাকে নিয়ে চল।'

কর্নেল আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, "সর্বনাশ! নাগপারা যদি টের পায়, তাহলে আমাকে

আর আমার চেলাকে তো বটেই, তোমাকেও মেরে ফেলবে। বাবা, একটু ধৈর্য ধরো। আমি কাল সকালে তোমাকে আরও কয়েকটা এনে দেব। ভেব না!"

চোপরা ক্রূর চাহনিতে একবার কর্নেলের দিকে, আরেকবার আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "উঁহু! আজ রাতেই চাই। নে—ওঠ্ শিগগির।"

কর্নেল আরও আঁতকে ওঠার ভঙ্গি করে বললেন, "কথা শোনো বাবা! নাগপা বস্তিতে সাংঘাতিক একপাল কুকুর আছে। তারা রাত জেগে পাহারা দেয়। আমাদের দুজনকে তারা কিছু বলবে না। কিন্তু তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারব না।"

চোপরা ফের পিস্তল বের করে বলল, "তবে রে ব্যাটা ফকির। আমার সঙ্গে চালাকি হচ্ছে? নাগপা-বস্তি কোথায় আমি জানি না বুঝি? ওরা থাকে উপত্যকার সমতলে। পাহাড়-টাহাড় ওদের বস্তি থেকে খানিকটা দূরে। বস্তি দিয়ে গেলে তবে তো ওদের কুকুরের পাল্লায় পড়ব। আমরা ঘুরপথে যাব। ওঠ্ শিগগির।"

আমি মনে মনে ঘাবড়ে গেলুম। কর্নেলের মুখটাও গম্ভীর দেখলুম। চোপরা পিস্তলটা ওঁর পাগড়িতেই ঠকাতেই উনি "ওরে বাবা! যাচ্ছি, যাচ্ছি!" বলে উঠে দাঁড়ালেন।

ধুরন্ধর চোপরা হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বলল, "এই ব্যাটা ফকিরের চেলা, তুই এখানে থাক। ফকিরবুড়ো যদি আমাকেও কোথাও বেমক্কা ফেলে কেটে পড়ে! তুই জামিন রইলি। গুহাটা দেখে এসে তবে তোকে ছেড়ে দেব। আর ফকিরবুড়ো যদি আমাকে ঠকায়, তাহলে তোর পরিণাম কী হবে আগে দেখে রাখ্। এ বুড়োও দেখে যাক্। তাহলে আমাকে ঠকাবে না।"

বলে সে শিস দিল তিনবার। অমনি অন্যপাশের একটা দরজা ঠেলে যে বেরিয়ে এল, তাকে দেখে প্রচণ্ড চমকে উঠলুম। গোয়েন্দাপ্রবর তাহলে ঠিকই আঁচ করেছিলেন!

কালো বীভৎস চেহারার একটা শিম্পাঞ্জি ঘরে ঢুকল। কুত-কুতে চোখে আমাদের দেখতে দেখতে বিকট ভঙ্গিতে হাসবার মতো দাঁত বের করল। চোপরা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "জাম্বু। তুই এই ব্যাটাকে পাহারা দিবি। পালানোর চেষ্টা করলেই ওকে নিকেশ করে ফেলবি।" বলে চোপরা হাত দিয়ে গলা টেপার ইশারা করল।

হতচ্ছাড়া শিম্পাঞ্জিটা আবার দাঁত বের করল আমার দিকে তাকিয়ে। কর্নেলের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে চোপরা তাঁকে বাইরের দরজা দিয়ে নিয়ে গেল। তরপর দরজা বন্ধ করল। বুঝতে পারলুম, দরজায় তালা দিচ্ছে সে।

আমি শিম্পাঞ্জির দিকে তাকিয়ে রইলুম! ভয়ে বুকে টিপটিপ করছে। আমার গায়ের কালো আলখেল্লার ভেতর রিভলবার লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু জন্তুটাকে গুলি করলে চোপরার লোকেরা টের পেয়ে যাবে। তাছাড়া বাইরে যাবার পথ বন্ধ। একা তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারব না। ওর লোকেদের কাছেও যে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, কে বলতে পারে?

শিম্পাঞ্জিটা হেলে-দুলে গদাইলস্করী চালে আমার দিকে এগিয়ে এল। তারপর দাঁত দেখিয়ে ধমক দেবার ভঙ্গিতে বাঁদুরে ভাষায় কী যেন বলল। আমি ভয়ে-ভয়ে ওর সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করলুম। বললুম, "ওহে জাম্বু! এস, এস। তোমার সঙ্গে আলাপ করা যাক্।"

অমনি ভেতরের দরজায় একটা হোঁৎকামোটা চীনাদের মতো চেহারার লোক উঁকি মেরে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ্। বাত্‌চিত্ করলে জাম্বু থাপ্পড় মারবে। চুপচুপ বসে থাক্।"

লোকটার হাতে দেখছি একটা লম্বাটে সেকেলে পিস্তল! সে আবার দরজার পর্দার আড়ালে চলে গেল। বুঝলুম, আমার সত্যিই টুঁ শব্দ করা চলবে না।

ঘরটা বেশ বড়ো। মেঝে কাশ্মীরী কার্পেটে ঢাকা। বাড়িটা কাঠের মনে হল। মেঝেও কাঠের। তাই জাম্বু নড়াচড়া করলেই মচমচ শব্দ হচ্ছে। সে আমাকে কিছুক্ষণ ধমক দিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি

খেল। তারপর সোফায় চিত হয়ে শুয়ে মানুষের মতো ঠ্যাং নাচাতে থাকল। কিন্তু আমি একটু নড়লেই সে চমকে উঠছিল এবং দাঁত বের করে ধমক দিচ্ছিল। কখনও জিভ বের করে ভেংচি কাটছিল। রাগে আমি অস্থির। কিন্তু কিছু করার নেই। এদিকে কর্নেলের জন্যও ভীষণ ভাবনায় পড়েছি। চোপরা অসম্ভব ধূর্ত লোক বটে। নাগপা বস্তিটা কোথায় কর্নেল সঠিক জানেন না। কোন্ পাহাড়ে গুহা আছে, তাও জানেন না। গুহা যে থাকবেই তারও মানে নেই। কর্নেল কেন যে ছাই ওসব বলতে গেলেন তাকে! হয়তো এবার নিজের প্রাণটিও খোয়াবেন বেঘোরে—আমার প্রাণটিও যাবে শেষ পর্যন্ত।

শিম্পাঞ্জিটা চিত হয়ে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে মুখ কাত করে আমাকে দেখে নিয়ে জিভ বের করে ভেংচি কাটছে। তারপর দাঁত বের করে অদ্ভুত কিচমিচ শব্দে যেন হাসছে। আমার আর সহ্য হল না। ফের সে জিভ বের করে ভেংচি কাটলে আমিও জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটলুম।

তখন সে তড়াক করে উঠে বসল। তারপর হেলে-দুলে এগিয়ে এল। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমার। মরিয়া হয়ে আলখেল্লার ভেতর হাত ভরে রিভলভার বের করব ভাবছি, সে লম্বাটে হাত বাড়িয়ে আমার দুটো কান মুলে দিল। রাগে-দুঃখে আমি গর্জে উঠলুম, "তবে রে হতচ্ছাড়া!" সেই সময় দরজার পর্দা তুলে সেই লোকটা ধমক দিল, "ফের চ্যাঁচাচ্ছিস?"

বললুম, "জান্তু আমার কান মুলে দিচ্ছে দেখছ না?"

লোকটা হ্যা হ্যা করে হাসল। "বেশ করেছে! তুই নড়াচড়া করছিস কেন?"

কানদুটো জ্বালা করছিল। রক্ত বেরুচ্ছে কি না কে জানে! পাগড়ির দুপাশ টেনে কানদুটো ঢেকে ফেললুম। জান্তু এবার আমার সামনেই মেঝেতে চিত হয়ে শুল। এবং চার হাত-পা তুলে স্থির হয়ে রইল। লোকটা আবার আড়ালে চলে গেল।

সময় কাটছে না। কর্নেলের সঙ্গে এতকাল কত সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, কিন্তু এমন বিপদে কখনও পড়িনি। কর্নেলের বার্ধক্যজনিত বুদ্ধি বিভ্রম ছাড়া একে কী বলব? কেন যে যেচে এমন করে বাঘের মুখে গলা বাড়িয়ে দিতে এলেন!

শিম্পাঞ্জিটা সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে—চোখ বুজে হাত-পা তেমনি ওপরে তুলে রেখেছে। ঘুমোচ্ছে বদমাস খুনে বাঁদরটা! হঠাৎ দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল এবং কর্নেলকে দেখতে পেলুম। সেই পীরবাবার পোশাকটা পরনে। পাগড়ি নেই মাথায়। স্বপ্ন নয় তো?

স্বপ্ন নয়—ব্যাপারটা সত্যি ঘটছে। কর্নেল দরজা খুলেই ইশারা করলেন বেরিয়ে যেতে। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু পা বাড়াতেই মেঝেয় শব্দ হল এবং শিম্পাঞ্জিটা চোখ খুলল। তখন একলাফে দরজার দিকে গেলুম। জন্তুটা লাফিয়ে উঠল। ভেতরের দরজার পর্দা তুলে লোকটাও উঁকি মারল। কিন্তু কর্নেল দড়াম করে দরজা আটকে ঝটপট তালা এঁটে দিলেন। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা আটকে গেল। তারপর দুজনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলুম। তারপর আরেকটা দরজা পেরিয়ে গলিতে—গলি থেকে রাস্তায়।...

ওল্টি ও হিস্টোফান

হোটেলে আমাদের ঘরে ঢুকে কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, চোপরা এখনও পাহাড়ের চাতালে পড়ে রয়েছে। শীতটা সে এতক্ষণে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। যেটুকু গরম পড়ে, সন্ধ্যার পর থেকে তা চাপা দিতে ঠাণ্ডা হিম সাংঘাতিক একটা হাওয়া আসে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। রাত যত বাড়ে, ঠাণ্ডার দাপটও তত বাড়ে। আশা করি সেটা টের পেয়েছ, ডার্লিং!"

বললুম, "ততটা পাইনি আলখেল্লার দৌলতে। কিন্তু চোপরাকে বেকায়দায় ফেললেন কীভাবে?"

"ওকে নিয়ে এই হোটেলের পাশ দিয়ে গেছি। ঢাল বেয়ে নেমে বাঁদিকে একটা পাহাড়ের চাতালে উঠেছি। তারপর আচমকা ধূপদানিটা ওর পিস্তলধরা হাতের ওপর প্রচণ্ড জোরে মেরেছি। পিস্তলটা খাদে গিয়ে পড়েছে। তখন ওকে জাপটে ধরে কুপোকাত করতে দেরি হয়নি। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলেছি পাগড়ি দিয়ে। পাগড়িটা এত কাজে লাগবে ভাবতে পারিনি। দশহাত লম্বা পাগড়ি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে রেখে ওর পকেট থেকে চাবি নিয়ে দৌড়ে গেছি। যাক্ গে, তুমি আলখেল্লাটা ছেড়ে ফেলো। রাত দশটা বাজে প্রায়।"

আলখেল্লা ছেড়ে রাতের পোশাক পরে বললুম, "সেই বাঁটুলটার কী হল?"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ওটা তো নকল বাঁটুল। মসজিদের সিঁড়িতে বসে থাকার সময় দুটো কুকুর এসে পড়ায় আমার বুদ্ধি খুলে গিয়েছিল। নইলে আমার উদ্দেশ্য ছিল, সারারাত ওখানে থেকে চোপরার অফিসের দিক লক্ষ্য রাখা। আর কথা নয়। ঘুমনো যাক।"

বিছানায় শুয়ে আলো নিভিয়ে বললুম, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ওইসব বাঁটুল একটা-দুটো নয়—আরও থাকতে পারে। গ্রিক দেহরক্ষীদের কাছেও নিছক অস্ত্র হিসেবে ওগুলো কি ছিল না? সম্রাটের বাঁটুল কিংবা তাঁর বাবা ফিলিপের বাঁটুল অ্যাস্টিডোনা করেছিল।"

কর্নেল ঘুম জড়ানো গলায় পাশের বিছানা থেকে বললেন, "ফিলিপের বাঁটুলে চোপরা কোনো হিরে পায়নি। সে ওর কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি। সারাপথ ওর সঙ্গে কথা বলে এর আভাস পেয়েছি। চোপরার বিশ্বাস, সব বাঁটুলে হিরে লুকোনো থাকতে নাও পারে। কিন্তু কিছু বাঁটুলে যে থাকবেই, তা নিশ্চিত।"

"হিরের কথা বলেছিল নাকি চোপরা?"

"হিরের কথাটা বলেনি। বলছিল, কিছু বাঁটুল খুব পয়মন্ত তা সে জানে। আবার কিছু বাঁটুল অপয়া, তাও সে জানে। যাক্ এসব কথা। ঘুমোও।"...

বেশ শীত করছিল। কম্বল মুড়ি দিতে হল। বেশ আরামে ঘুমোনো গেল সারারাত। সকালে উঠে দেখি, কর্নেল বিছানায় নেই। ব্যালকনিতে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কফি খেলুম। তারপর কর্নেল ফিরলেন। বুঝলুম, অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। গলা থেকে বাইনোকুলার ঝুলছে। লাডাকের পাখি প্রজাপতির পেছনে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছেন সম্ভবত।

একটু হেসে বললেন, "সেই চাতালটা লক্ষ্য করেছি দূর থেকে। বাইনোকুলার দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। চোপরা নেই। আমার পাগড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ওর কাছে ছোরাও ছিল বোঝা গেল। তবে ডার্লিং, সেখানে এক মজার দৃশ্য দেখতে পেলুম। দুটো পাহাড়ী ছাগল জাতীয় প্রাণী পাগড়ির টুকরোগুলো মহানন্দে চিবুচ্ছে।"

ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং এলেন।

কর্নেল বললেন, "ব্যস্ত হবেন না ব্রিগেডিয়ার সিং। কলকাতা থেকে আজ বেণীমাধব এসে পড়ার কথা। ওঁকে দিয়েই ফাঁদে ফেলব চোপরাকে। বৈজুনাথকে যে সে শিম্পাঞ্জি দিয়ে খুন করিয়েছে, সেটা প্রমাণ করা চাই আইনের চোখে। নইলে চোপরাকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করবেন না।"

অর্জুন সিং বললেন, "হ্যাঁ—সেও একটা কথা। তবে পুলিশকে আগেভাগে জানানো উচিত।"

কর্নেল বললেন, "পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দাপুলিশের অফিসাররা ইতিমধ্যে শ্রীনগরে পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে ওঁরা লেহ এসে পৌঁছবেন যেকোনো সময়ে। কাশ্মীরের গোয়েন্দাপুলিশ অনুমতি না দিলে ওঁরা তো চোপরাকে গ্রেফতার করতে পারবেন না। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি কলকাতা থেকে।"

অর্জুন সিং হেসে বললেন, "আঁটঘাট না বেঁধে আপনি কাজে নামেন না দেখছি।"

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রইলুম। আমার বেশি রাগ শিম্পাঞ্জিটার ওপর। পাজি বাঁদরটা আমার কান দুটো মুলে ব্যথা করে ফেলেছে। বাঁদরের হাতে কানমলা খাওয়ার চেয়ে অপমানজনক আর কিছু নেই।

বিকেলে বেণীমাধববাবু এসে পৌঁছলেন। পথে বাস খারাপ হয়েছিল, তাই খুব ভুগেছেন। ওঁর জন্য পাশের ঘর বুক করা ছিল। আমরা কথাবার্তা বলছি, সেই সময় এলেন পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দাপুলিশের এক বড়কর্তা প্রণব রুদ্র। ওঁর সঙ্গে আমার চেনাজানা অনেকদিনের। পর্যটক সেজে এসেছেন দলবল নিয়ে। উঠেছেন অন্য একটা হোটেলে।

প্রণববাবু আর কর্নেল চাপা গলায় কথা বলতে থাকলেন। আমি আর বেণীমাধব ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। দৃশ্য দেখার জন্য আমি একটা ভিউফাইন্ডার নিয়ে গেছি। সেটা চোখে রেখে কথা বলছি বেণীমাধবের সঙ্গে এবং মাঝে মাঝে বেণীমাধবও আমার ভিউফাইন্ডারটা নিয়ে দৃশ্য দেখছেন। তারিফ করছেন।

হঠাৎ উনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবু! দেখুন তো ওই পাহাড়ের রাস্তায় ওটা কী?"

ভিউফাইন্ডারে চোখ রেখে দেখি, খানিকটা দূরে সোনালী রঙের পাহাড়ের গায়ের আঁকাবাঁকা রাস্তায় চোপরার সেই শিম্পাঞ্জিটা হেলে-দুলে চলেছে এবং তার পেছন-পেছন যাচ্ছে একটা লোক। তাকে চিনতে পারলুম না। লোকটার পরনে মাদারির পোশাক। মাথায় পাগড়ি, হাতে একটা ডুগডুগি রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না।

একটু পরে তারা নিচে নামতে থাকল। সমতলে নেমে গেলে আর তাদের দেখতে পেলুম না। সামনে আরেকটা পাহাড়ের আড়াল রয়েছে। কর্নেলকে তক্ষুণি ডেকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলুম।

কর্নেল বললেন, "ওদিকেই নাগপা বস্তি আছে শুনেছি। চোপরার উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। যাইহোক, বেণীমাধববাবু, আপনি আর দেরি করবেন না। চোপরার অফিসে চলে যান।"

বেণীমাধব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনাকে দেখে চোপরা নিশ্চয় অবাক হবে। আপনি বলবেন, এতকাল বৈজুনাথের সঙ্গে কারবার করেছেন। বৈজুনাথই বলেছিল, নাগপা বস্তির ওদিকে একটা পাহাড়ের গুহায় বাঁটুল কুড়িয়ে পেয়েছে। এখন বৈজুনাথ নেই। তাই আপনি চোপরার সাহায্য চাইছেন। কাজেই আরও বাঁটুল উদ্ধার করতে পারলে দুজনে আধাআধি ভাগ করে নেবেন।"

বেণীমাধব চিন্তিতমুখে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল ও প্রণব রুদ্র বেরুলেন তার মিনিট দশেক পরে। কর্নেল আমাকে হোটেলেই থাকতে বলে গেলেন।

চুপচাপ একা বসে থাকতে খারাপ লাগছিল। বিকেলের ঝলমলে রোদে বাইরের অপূর্ব দৃশ্য। এভাবে কাঁহাতক বসে থাকা যায়? কর্নেলের নির্দেশ মানতে ইচ্ছে করছিল না। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লুম।

হোটেলের নিচের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতেই ডানদিকের উপত্যকায় একটা বস্তি চোখে পড়ল। ওটাই কি নাগপা বস্তি? পাহাড়ের ঢালে সবুজ ঘাসে একজন গুজ্জর রাখাল ভেড়া চরাচ্ছিল। তাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করতে সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, ওটাই নাগপা বস্তি।

মাথায় কী খেয়াল চাপল সোজা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলুম। নিচের উপত্যকায় পৌঁছে কিছুদূর এগিয়ে একটি খাল দেখতে পেলুম। স্বচ্ছ জল বেয়ে যাচ্ছে। খালের ধারে উইলো আর পপলার গাছের জঙ্গল। খালের বুকে অজস্র পাথর। পা রেখে-রেখে সাবধানে ওপারে চলে গেলুম। জঙ্গলের পর ফাঁকা ঘাসের জমিতে যেই গেছি, একটা সাদা কুকুর দৌড়ে এল। শিস দিতেই সে থেমে গেল। তার কাছে এগোব কি না ভাবছি, একটি কমবয়সী মেয়ে—মাথায় স্কার্ফ জড়ানো,

পরনে সুন্দর রঙীন ঘাগরা, একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে আমাকে দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। অপূর্ব সুন্দর চেহারা মেয়েটির। ফর্সা রঙ। বড়জোর বছর দশেক বয়স।

কুকুরটা ছুটে গিয়ে তার কোলে উঠল। আমি একটু হেসে হিন্দিতো বললুম "তোমার নাম কী?"

মেয়েটি হাসল একটু। কিন্তু কিছু বলল না।

পকেট হাতড়ে ভাগ্যিস কয়েকটা চকোলেট পেয়ে গেলুম। কাল আসার পথে কিনেছিলুম শোনমার্গে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল বারবার। কাঁহাতক জল খাওয়া যায়? তাই চকোলেট চুষছিলাম কর্নেলের পরামর্শে। এখন চকোলেটগুলো কাজে লাগল।

মেয়েটি দ্বিধা না করে সেগুলো নিলো। কুকুরটার মুখেও গুঁজে দিল একটা। তারপর ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলল, "তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ? কোথায় থাকো তুমি?"

বললুম, "আমি কলকাতা থেকে আসছি। খুব সুন্দর তোমাদের দেশ।"

মেয়েটি মাথা দুলিয়ে বলল, "আমার বাবা বলে কলকাতা আরও সুন্দর দেশ।"

"তাই বুঝি? নাম কী তোমার?"

"ওন্টি।"

"ওন্টি? বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো তোমার।"

ওন্টির সঙ্গে কথা বলছি, সেই সময় ওদিকে কোথায় ডুগ-ডুগির শব্দ শোনা গেল। ওন্টির কানে গেলে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, "মাদারি খেলা দেখাতে এসেছে। আমি খেলা দেখব।"

সে কোল থেকে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল। কুকুরটা কিন্তু চাপা গরগর শব্দ করে ওন্টির দুপায়ের ফাঁকের ঢুকে পড়ল। ওন্টি না বুঝলেও আমি বুঝতে পারছিলুম, কুকুরটা তার সহজাত বোধে টের পেয়েছে যে কাছাকাছি একটা বিপজ্জনক জন্তু এসেছে। বললুম, "ওন্টি, চলো! তোমার সঙ্গে মাদারির খেলা দেখব।"

গাছপালার ফাঁকে পাথরের এবড়োখেবড়ো ঘর বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। নাগপারা গরিব মানুষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওন্টির পেছন-পেছন ঘরগুলোর কাছে যেতেই একটা লোক বেরিয়ে এল। সে সন্দেহজনক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ওন্টি তাকে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল। তখন সে হাসিমুখে আমাকে 'নমস্তে' করল।

ওন্টির কুকুরটা এগোতে চাইছিল না। ওন্টি অগত্যা তাকে কোলে তুলে নিল আবার। লোকটা ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আপনি কলকাতার লোক শুনে খুশি হলুম স্যার! আমার বড় ইচ্ছে করে কলকাতা যাই। কিন্তু পয়সাকড়ি পাব কোথায় অত?'

ঝটপট ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললুম। লোকটা ওন্টির বাবা। তার নাম হিস্টোফোন। এ নাম যে গ্রিক ভাষার অপভ্রংশ, তাতে ভুল নেই। বংশপরম্পরা প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে এই নাগপারা গ্রিক ভাষার একটা অপভ্রংশ উপভাষা ব্যবহার করে আসছে। হিস্টোফোন সামান্য লেখাপড়া জানে। তাকে কলকাতা নিয়ে যাব বলায় সে খুশি হয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। ততক্ষণে ওন্টি মাদারির খেলা দেখতে উধাও হয়েছে।

ঠাসাঠাসি পাথরের বাড়ি নিয়ে বস্তিটা দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িগুলোর অবস্থা জরাজীর্ণ এবং আকারে ছোট। একটা ইদারার কাছে ফাঁকা জায়গায় মাদারি খেলা দেখাচ্ছে। ভিড় করে লোকেরা দেখছে। বস্তির অসংখ্য কুকুর নিরাপদে তফাতে দাঁড়িয়ে বেদম গালাগালি করছে শিম্পাঞ্জিটাকে।

হিস্টোফোন বলল, "মাদারিররা ভালুক বা বাঁদর নিয়ে খেলা দেখাতে আসে। তবে এই মাদারিটাকে এর আগে দেখিনি। ওর ওই জন্তুটা কী বলুন তো স্যার?"

"ওটা একটা শিম্পাঞ্জি।"

হিস্টোফোন অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, "ওটা দেখতে বড্ড কুচ্ছিত। ওর স্বভাবও নিশ্চয় ভাল নয়।"

"তা তো নয়ই। শিম্পাঞ্জি বিপজ্জনক জন্তু।"

হিস্টোফোন তারিফ করে বলল, "তবু কেমন বশ মানিয়েছে দেখুন!"

একটু পরে সে আমাকে এককাপ কড়া চা এনে দিল। চা খেতে খেতে দেখলুম, খেলা শেষ করে 'মাদারি' শিম্পাঞ্জিটাকে নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। ভয় হল, শিম্পাঞ্জিটা আমাকে চিনতে পারবে না তো?

কিন্তু ওদের ঘিরে নিয়ে আসছে নাগপাদের নানা বয়সী মানুষের ভিড়। আমাকে মাদারি বা জান্তু কেউই দেখতে পেল না ভিড়ের ভেতর থেকে। ওরা এগিয়ে গিয়ে একটা বাড়ির সামনে থামল। সেই সময় ওন্টি ফিরে এসে তার বাবাকে কী বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসল। হিস্টোফোন বলল, "মাদারি আর জান্তুটা আজ রাতে সোলোন নামে একজনের বাড়িতে থাকবে! সোলোন ওকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল।'

জিগ্যেস করলাম, "সোলোন কে?"

"আমাদের সর্দারের ছেলে। এ বস্তিতে একমাত্র সোলোনই আপনাদের কলকাতা গিয়েছিল। আপনি কিন্তু আমাকে কলকাতা নিয়ে যাবেন স্যার?"

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, "তাহলে উঠি হিস্টোফোন।"

আসার সময় ওন্টিকে একটু আদর করে এলুম। ওর বাবা হিস্টোফোন আমাকে সেই খাল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল। তারপর চাপা গলায় বলল, "আপনি যদি আমাকে কলকাতা দেখাতে নিয়ে যান, তাহলে আপনাকে একটা সুন্দর জিনিস উপহার দেব। জিনিসটা ওন্টি কুড়িয়ে পেয়েছিল।"

"জিনিসটা কী হিস্টোফোন?"

"একটা লোহার বল। বলটার গায়ে ছবি আঁকা আছে।"

হিস্টোফোন এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এ জিনিসের দাম আছে স্যার! একমাস আগে কলকাতার একটা লোক এসেছিল বস্তিতে। সে আমাদের সর্দারকে বলেছিল, লোহার বল কিনতে এসেছে। সর্দার খুব রেগে গিয়েছিল। এসব লোহার বল নাকি দেবতাদের খেলার জিনিস। বস্তির অনেকে কুড়িয়ে পেয়ে ঘরে তুলে রেখেছে। কেউ প্রাণ গেলেও বেচবে না। কারণ, এ বল তো মানুষ তৈরি করেনি। দেবতারা সেকালে তৈরি করেছিলেন খেলবেন বলে। খেলা হয়ে গেলে ছুঁড়ে ফেলেছেন। তো স্যার, সর্দার কলকাতার লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বস্তি থেকে ।"

কান খাড়া করে শুনছিলুম। খুব চমকে উঠেছিলুম ওর কথা শুনে। "বললুম, সেই লোকটা কেমন করে জানল লোহার বলের কথা?"

হিস্টোফোন আরও গলা চেপে বলল, "আমার কলকাতা দেখার খুব ইচ্ছে বলেই বলছি আপনাকে। যেন আর কেউ না জানতে পারে স্যার।"

"জানতে পারবে না। বললো হিস্টোফোন!"

"আমার খুড়ো রাস্টোফানই এর মূলে। খুড়ো শহরের একটা হোটেলে কাজ করে। সেই লোকটার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে একদিন বস্তিতে নিয়ে এসেছিল খুড়ো। ঘরের তাকে একটা এরকম লোহার বল রাখা ছিল। সেটা দেখে লোকটা আগ্রহ প্রকাশ করল। খুড়ো বলল, এটা দেবতাদের খেলার জিনিস। আপনি আমার অতিথি। ভাল লাগে তো নিন। তবে সর্দার জানলে রাগ করবে!"

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে বললুম, "হিস্টোফোন জিনিসটা একবার দেখাবে আমাকে?"

হিস্টোফোন হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। বেলা পড়ে এসেছে। শিগগির অন্ধকার হয়ে যাবে। খালের ধারে একটা পাথরের ওপর বসে হিস্টোফোনের প্রতীক্ষা করতে থাকলুম। মিনিট পাঁচেক পরে সে ফিরে এল। জামার পকেট থেকে জিনিসটা বের করে বলল, "এই দেখুন স্যার!"

সেই গ্রিক বাঁটুল। একই রকম হিজিবিজি লেখা আর নকশা আঁকা। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে বললুম, "তোমাকে আমি কিছু টাকা দিচ্ছি হিস্টোফোন! জিনিসটা আমাকে দাও।"

অমনি হিস্টোফোন বাঁটুলটা খপ করে কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। গম্ভীর মুখে বলল, "উঁহু! আগে কলকাতা নিয়ে যাবেন। তারপর দেব!"

বুঝলুম, নাগপারা যতই ভদ্র হোক—গোঁয়ার-গোবিন্দ কম নয়। হাসতে হাসতে বললুম, 'ঠিক আছে। তাই দিও। শোন, আমি থাকি সানি লজ হোটেলে। ওই যে দেখছ, পাহাড়ের গায়ে লাল, নীল আলোয় হোটেলের নাম লেখা। তুমি কাল সকালেই যেও বরং। গিয়ে বলো, জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করব।"

হিস্টোফোন আমার নামটা বিড়বিড় করে মুখস্থ করে নিল। আমি সাবধানে খাল পেরিয়ে ওপারে গেলুম, হিস্টোফোন এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে চলে যাচ্ছে।

হোটেলে পৌঁছে দেখি, কর্নেল ফেরেননি। ব্যালকনিতে চুপচাপ বসে রইলুম। উত্তেজনায় মনে মনে ছটফট করছিলুম। হিস্টোফোনের বাঁটুলটার ভেতর কি হিরে আছে? যদি থাকে, হিরেটা ওকে ফেরত দেওয়া উচিত। বেচারা গরিব মানুষ। ওটা বেচলে সে বড়লোক হয়ে যাবে।

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। বললেন, "কোথাও বেরোও নি তো?" বলে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে মুচকি হাসলেন। "উঁহু, বেরিয়েছিলে দেখছি।"

"আপনি কি অন্তর্যামী?"

"না। তবে তোমার জুতোয় আর প্যান্টে লাল ধুলোর ছোপ দেখে বুঝেছি, বেরিয়েছিলে।"

একটু হেসে বললাম, "বসুন অনেক কথা আছে।"

ডাইনির গুহায়

এ রাতে কিছু ঘটেনি। সকালে বেণীমাধব এলেন ঘরে। তখন শুনলুম, চোপরা ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছে। বেণীমাধবকে পাত্তাই দেয়নি। বলেছে, ওসব কারবারে সে নেই। ইচ্ছে করলে বেণীমাধব একা বাঁটুলের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে পারেন। বাঁটুলের ভেতর হিরে থাকার কথা চোপরা নাকি বিশ্বাস করে না।

কর্নেল বললেন, "অসাধারণ ধূর্ত লোক এই চোপরা। আমার এই ফাঁদে সে পা দিল না তাহলে!"

আমি বললুম, "তা দিল না। কিন্তু ওদিকে সে খুনে শিম্পাঞ্জি আর একটা লোককে নাগপা বস্তিতে পাঠিয়েছে যখন, তখন বোঝা যাচ্ছে—সে একটা বাঁটুল সংগ্রহ করতে চায়।"

"ঠিক তাই।" কর্নেল সায় দিয়ে চুরুট টানতে থাকলেন। চোখ বন্ধ। তারপর হঠাৎ নড়ে বসলেন। "জয়ন্ত! তোমার নাগপা বন্ধু হিস্টোফোনের তো আসার কথা এখন?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কৈ? আটটা বেজে গেল।"

কর্নেল উঠে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। চোখে বাইনোকুলার রেখে নাগপা বস্তির দিকটা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেন। তারপর বললেন, "ওদের বস্তিতে কী একটা গণ্ডগোল হচ্ছে যেন। অনেক লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।"

ব্যালকনিতে গিয়ে বললুম, "বাইনোকুলারটা দিন তো দেখি।"

কর্নেল দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা দিলে চোখ রাখলুম। তারপর চমকে উঠলুম। হিস্টোফোন বলেই তো মনে হচ্ছে—সে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যিখানে। আর চারদিক থেকে লোকেরা হাত নেড়ে যেন শাসাচ্ছে। ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ কচলাচ্ছে ওন্টি। তার কোলে সেই সাদা কুকুরটা।

বাইনোকুলার ফেরত দিয়ে ব্যস্তভাবে বললুম, "কী হয়েছো দেখে আসি।"

কর্নেল একটু ইতস্তত করে বললেন, "যাবে? কিন্তু ..."

বেণীমাধব বললেন, "আমি বরং যাই জয়ন্তবাবুর সঙ্গে।"

কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন, "আচ্ছা। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।"

আমরা দুজনে হন্তদন্ত হয়ে চললুম। রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগিয়ে ঢাল বেয়ে নামলুম। ঘাসের ঢালু জমিতে সেই গুজ্জর রাখালকে ভেড়া চরাতে দেখলুম। সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।

খাল পেরিয়ে যাবার পর আবছা গোলমালের শব্দ এল। বস্তির পেছনে প্রকাণ্ড সব পাথর রয়েছে। তার আড়ালে গিয়ে দুজনে বসে পড়লুম। ওদের ভাষা জানি না। শুধু বুঝলুম, হিস্টোফোনকে ওরা কোনো কারণে গালাগালি করছে আর শাসাচ্ছে যেন। তা কি আমার জন্য। নাগপা বস্তিতে বাইরের লোককে এনে খাতির করেছিল বলে?

একটু পরে ওন্টির কুকুরটা ধুপ করে কোল থেকে লাফিয়ে পড়ল। তারপর দৌড়ে আমাদের কাছে চলে এল। পেছন-পেছন দৌড়ে ওকে ধরতে এল ওন্টি। এসেই আমাদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

ইশারায় ওকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, "কী হয়েছে ওন্টি?"

ওন্টি কান্না জড়ানো স্বরে বলল, "বাবা তোমাকে দেবতাদের বল দিয়েছে বলে বাবাকে সবাই বকছে। সর্দার বলছে, বাবার হাত-পা বেঁধে ডাইনির গুহায় ফেলে দিয়ে আসবে।"

"কিন্তু দেবতাদের বল তো তোমার বাবা আমাকে দেয়নি। ওটা ওদের দেখাচ্ছে না কেন তোমার বাবা?"

ওন্টি চোখ মুছতে মুছতে কুকুরটাকে কোলে নিল। তারপর বলল, "বলটা তো আমার। আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। রোজ বলটা নিয়ে আমি খেলতে যাই। রণির সঙ্গে খেলি যে। বাবা জানলে বকবে। তাই লুকিয়ে যাই।"

"তোমার এই কুকুরটার নাম বুঝি রণি?"

ওন্টি মাথা নাড়ল। বলল, "আজ সকালে বলটা নিয়ে খেলছিলুম। মাদারিটা সর্দারের বাড়ির সামনে বসেছিল। ওর বাঁদরটাকে লেলিয়ে দিল আর বাঁদরটা এসে রনির কাছ থেকে কেড়ে নিল।"

খাপ্পা হয়ে বললুম, "মাদারিটা কোথায় এখন?"

"চলে গেছে।" ওন্টি নাক মুছে বলল, "আমি সর্দারকে বললুম—কিন্তু বিশ্বাস করল না। বলল, তুই ঝুট বলছিস। তোর বাবা বলটা সেই কলকাতার লোকটাকে বেচে দিয়েছে।"

এই সময় হট্টগোলটা হঠাৎ বেড়ে গেল। পাথরের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখলুম, লোকেরা হিস্টোফোনকে দড়িতে বাঁধছে। আর থাকতে পারলুম না। দৌড়ে ওদের সামনে হাজির হলুম আমরা। ওরা আমাদের দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। টুলে বসে থাকা একটা লোক। সাদা চুলদাড়ি, হিংস্র চেহারা এবং তার পরনে আঁট পাতলুন আর গায়ে একটা নীলরঙের বেঢপ জ্যাকেট। সে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল। মনে হল এদের সর্দার সে।

কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকগুলো ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে আর বেণীমাধবকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলল। চ্যাঁচামেচি করেও ফল হল না। এক মিনিটের মধ্যে ওরা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। পকেটে রিভলবার থাকা সত্ত্বেও কিছু করা গেল না।

ফার, পাইন, ওকপার পপলার গাছের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা পাহাড়ের ধারে এনে ফেলল আমাদের। তারপর চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা দেখা যাচ্ছিল। গুহার মুখে ধপাস করে ফেলে দিয়ে ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এই তাহলে ডাইনির গুহা! অজানা আতঙ্কে বুক ধড়াস করে উঠল। আমার পাশে বেণীমাধবকে উপুড় করে ফেলেছে। বেণীমাধব অনেক কষ্টে চিত হয়ে বললেন, "এ কী বিপদে পড়া গেল জয়ন্তবাবু!"

গুহার ভেতর দিকের অন্ধকার থমথম করছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলুম, একরাশ হাড়গোড় আর কয়েকটা মড়ার খুলি পড়ে আছে। শিউরে উঠলুম। বললুম, "সর্বনাশ! গুহার ভেতর নিশ্চয় মানুষখেকো জন্তু আছে, বেণীমাধববাবু!"

তারপর খসখস শব্দ শুনে বাঁদিকে ঘুরে, দেখি, শুধু আমরা দুজন নই—বেচারা হিস্টোফোনকেও ফেলে দিয়ে গেছে আমাদের সঙ্গে। হিস্টোফোন গুহার দেয়ালে খাঁজকাটা একটা পাথরে পায়ের দড়িটা জোরে ঘষছে। ডাকলুম, "হিস্টোফোন।"

হিস্টোফোন হিংস্র মুখভঙ্গি করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল। তারপর সামনে পায়ের বাঁধনটা ঘষড়াতে থাকল। তার দেখাদেখি আমরাও অন্যপাশের দেয়ালের দিকে গড়িয়ে গেলুম। গুহার মুখে খানিকটা জায়গা বাইরের রোদের আভায় আলোকিত হয়ে আছে। কিন্তু মুখে ঝোপজঙ্গল বলে আলোটা খুব কম। উঁচু ধারাল একটা পাথর খুঁজে আমরা দুজনে পালাক্রমে আগে পায়ের বাঁধনটা ঘষড়াতে শুরু করলুম। হাতের বাঁধন আগে কাটা যাবে না। কারণ আমাদের প্রত্যেকের হাত পিঠের দিকে বাঁধা।

দড়িগুলো শক্ত লতা দিয়ে তৈরি। তাই সহজে ছেঁড়া যায় না। কতক্ষণ পরে হিস্টোফোনের কথা শুনে ঘুরে দেখি, সে বাঁধন কেটে ফেলেছে। হিংস্রমুখে সে বলল, "ডাইনিটা তোমাকে খেয়ে ফেলুক। তোমার জন্য আমার এই দুর্দশা। আমি চললুম।"

বললুম, "হিস্টোফোন! কথা শোনো। তুমি গিয়েও তো বস্তিতে ঢুকতে পারবে না! কিন্তু তোমার মেয়ে ওন্টির কী হবে ভেবে দেখেছ হিস্টোফোন?"

হিস্টোফোন একটু ভড়কে গেল এবার। মুখ গোমড়া করে বলল, "সন্ধে অব্দি কোথাও লুকিয়ে থাকব। তারপর চুপিচুপি ওন্টিকে নিয়ে পালিয়ে যাব।"

"বরং এক কাজ করো হিস্টোফান! তুমি আমাদের বাঁধন খুলে দাও। আমাদের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে থাকবে, তারপর সন্ধ্যায় তোমার মেয়েকে নিয়ে যাবে। রাতেই তোমাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব।"

হিস্টোফোনের মনে ধরল কথাটা। সে ভয়ের চোখে গুহার ভেতরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিন্তু বাঁধন খুলে দিতে দিতে যদি ডাইনিটা এসে পড়ে?"

"আমার প্যান্টের পকেটে রিভলবার আছে। বের করে হাতের কাছে রাখো।"

"আমি গুলি ছুঁড়তে জানি না।"

"তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি কী করতে হবে।"

হিস্টোফোন ঝটপট আমার পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে ফেলল। তাকে মুখে বুঝিয়ে দিলাম, ট্রিগার কীভাবে টানতে হবে। সেফটি-ক্যাচ তোলার ঝামেলা নেই। অস্ত্রটা অটোমেটিক। ভাগ্যিস ওরা আমাকে চিত করে ফেলে দিয়েছিল—একটু কাত হলেই চোট খেয়ে গুলি বেরিয়ে যেত।

হিস্টোফোন আমার বাঁধন খুলে দিল। তারপর বেণীমাধবের বাঁধন খুলতে শুরু করল। আমি রিভলভার নিয়ে তৈরি রইলুম। কিন্তু ডাইনি হোক আর যেই হোক, মানুষখেকোটির কোনো সাড়া নেই। বেণীমাধবের বাঁধন খুলে দিলে উনি উঠে পড়লেন। তারপর আমরা তিনজনে গুহা থেকে বের হয়ে এলুম।

কিন্তু যেমনি পা বাড়াতে গেছি, চড়বড় করে গুহার সামনে একরাশ পাথর পড়ল। অমনি পিছিয়ে এলুম। হিস্টোফোন উত্তেজিতভাবে বলল, "সর্বনাশ, বস্তির লোকেরা আড়ালে ওত পেতে আছে। ওরা আমাদের বেরুতে দেবে না। বেরুলেই পাথর ছুঁড়বে।"

রাগে খেপে গিয়ে রিভলবার থেকে পরপর দুটো গুলি ছুড়লুম। পাহাড়ে প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি হল। তারপর তিনজনে বেরিয়ে গেলুম গুহার বাইরে।

কিন্তু আবার চড়বড় করে পাথর পড়া শুরু হল, আবার গুহায় ঢুকতে হল। ওরা আড়ালে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। খামোকা গুলি ছুড়ে লাভ নেই।

হঠাৎ হিস্টোফোন কান খাড়া করে কী শুনে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "গুলির শব্দে ডাইনিটার ঘুম ভেঙে গেছে! সর্বনাশ! এবার কী হবে?"

ঘুরে দেখি গুহার ভেতর অন্ধকারে দুটো হলদে আলো জুলজুল করছে। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলুম। আলো দুটো ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। বেণীমাধবের হাতে তাঁর পিস্তলটা দেখতে পেলুম এতক্ষণে। আমি আলো দুটো লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ার আগেই উনি পিস্তলের গুলি ছুড়লেন। অমনি কানফাটানো গর্জন শুনলুম। পলকের মধ্যে দেয়ালের ধারে সরে গিয়েছিলুম সহজাত আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির বশেই। কী একটা হলুদ-কালো প্রাণী লাফ দিয়ে পড়ল মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে আমি রিভলভারের ট্রিগারে চাপ দিলুম। আবার বিকট গর্জন শুনলুম। তারপর দেখি, একটা চিতাবাঘ ডিগবাজি খেতে-খেতে বেরিয়ে গেল গুহার বাইরে।

"তাহলে ইনিই নাগপাদের মানুষখেকো ডাইনি।" বেণীমাধব মন্তব্য করলেন।

হিস্টোফোন গম্ভীর মুখে বলল, "ডাইনিটা এখন চিতাবাঘ সেজেছে।"

গুহার মুখে উঁকি মেরে দেখলুম, চিতাবাঘের পিঠে রক্ত দগদগ করছে। সে গড়াতে গড়াতে নেমে চলেছে পাথরের উপর দিয়ে। ওদিকে একদঙ্গল নাগপাকে দেখলুম পড়ি-কী মরি করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে। হিস্টোফোন তাই দেখে হাসতে লাগল। বললুম, "এখানে আর নয়। হিস্টোফোন, ঘুরপথে আমাদের এখনই হোটেলে পৌঁছনো দরকার।"...

শেষ লড়াই

সমতলে জঙ্গল ও পাথরের ভেতর অশেষ কষ্ট ভোগ করে সেই খালটার ধারে পৌঁছলাম আমরা। হিস্টোফোন করুণ মুখে বলল, "ওন্টির জন্য আমার মন কেমন করছে, তার মা বেঁচে থাকলে ভাবনা ছিল না।"

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললুম, "ভেব না। পুলিশের সাহায্যে তাকে তোমার কাছে এনে দেব।"

খালের জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে আমরা সামনে উঁচু রাস্তার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নীল রঙের পাথরের আড়ালে ধূসর রঙের টুপি দেখতে পেলুম। চোপরা নয় তো? ইশারায় বেণীমাধব ও হিস্টোফোনকে চুপচাপ আসতে বলে পা টিপে এগিয়ে গেলুম, টুপিওয়ালা লোকটি ওদিকে ঘুরে কী দেখছে। তার পেছনে গিয়ে রিভলভার উঁচিয়ে 'হ্যান্ডস আপ' বলতে গেছি, আর লোকটা চাপা গলায় বলে উঠেছে, "চুপ, চুপ!"

চমকে উঠে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে আবিষ্কার করলুম এবং হেসে ফেললুম।

কর্নেল আঙুল দিয়ে পাথরের ওপাশে কিছু নির্দেশ করলেন। উঁকি মেরে দেখলুম, একটা ফাঁকা ঘাসজমিতে ওক গাছের ছায়ায় বসে আছে ভোমরালাল চোপরা আর মাদারিবেশী তার সেই চেলা। শিম্পাঞ্জিটা থেবড়ে বসে আপেল খাচ্ছে আর পিঠ চুলকোচ্ছে। বেণীমাধববাবু চাপা স্বরে বললেন, "আরে! চোপরার ওই সঙ্গীটাই আমার দোকানে গিয়েছিল। ওর বাঁকানো বাজপাখির নাকটা দেখুন।"

চোপরার হাতে একটা বাঁটুল। হিস্টোফোন ফিসফিস করে বলল, "ওই দেখুন, দেবতার বলটা আমার মেয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে কি না। খামকা আমাকে ওরা ভোগাল!" একটু পরে চোপরা উঠে দাঁড়াল। বাঁকা নাকওয়ালা সঙ্গীকে কিছু বলল। ওর সঙ্গী ডাকল, "ওঠ্ জাম্বু! খুব হয়েছে।"

জাম্বু পেছনে, ওরা সামনে—কয়েক পা এগিয়েছি, অমনি পাথরের আড়াল থেকে গর্জন করে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত আহত সেই চিতাবাঘটা। জাম্বু পাল্টা গর্জন করল। তারপর চিতাটা তার ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোখের পলকে দুটি জানোয়ার মরণপণ লড়াইয়ে নেমে গেল। শিম্পাঞ্জি আর চিতাবাঘ পরস্পর জন্ম-শত্রু।

চোপরা পকেট থেকে পিস্তল বের করেছে, কিন্তু গুলি ছুড়তে পারছে না।—পাছে শিম্পাঞ্জিটার গায়ে গুলি লাগে। দুটি হিংস্র জন্তুর গর্জনে ও লড়াইয়ে তুমুল কাণ্ড চলেছে। চিতাটা আমার গুলিতে জখম না হলে হয়ত পিঠটান দিত শিম্পাঞ্জির এক থাপ্পড় খেয়েই। কিন্তু আহত চিতাবাঘটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে আচমকা শিম্পাঞ্জিটার গলা কামড়ে ধরল। শিম্পাঞ্জিটা নেতিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে চোপরা চিতাটার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল। তখন চিতাটাও নেতিয়ে পড়ল। ক্রমশ দুটি প্রাণীর দেহ নিষ্পন্দ হয়ে গেল।

দুটি জানোয়ারই মারা পড়েছে। চোপরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় হিস্টোফোন দৌড়ে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে গিয়ে চোপরার পায়ের তলা থেকে তার বাঁটুলটা কুড়িয়ে নিল। চোপরা তো তার দিকে পিস্তল তাক করে বলল, "এই ব্যাটা নাগপা! ওটা দে, বলছি। নইলে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।"

কর্নেল আমাদের ইশারা করলেন। আমাদের তিনজনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। কর্নেল বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "পিস্তল ফেলে দাও ভোমরালাল! চোপরা ভড়কে গিয়ে পিস্তল ফেলে দিল। আর ওর ঢ্যাঙা বাজনেকো সঙ্গীটা গতিক বুঝে দৌড়ে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে গেল। তাকে তাড়া করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলুম।

চোপরা কোনো কথা বলল না। শিম্পাঞ্জিটার কাছে ধপাস করে বসে পড়ল। কর্নেল বললেন, "শোক প্রকাশ পরে করবেন ভোমরালালজী! এখন আমাদের সঙ্গে আসুন।"

চোপরা ঘাড় গোঁজ করে বসে রইল।

তখন কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তুমি হোটেলে গিয়ে প্রণববাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করো। ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিংকে বললে উনি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। তুমি ওদের নিয়ে এস। আসামীকে গ্রেফতার করে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।"

আমি পা বাড়ালুম। হিস্টোফান বলল, "দেবতার বল ফিরে পেয়েছি— আর আমার ভয় নেই। সর্দারকে গিয়ে দেখালেই আমার সব দোষ মাফ। আমি বস্তিতে ফিরে চললুম।"

সে দৌড়ে খাল পেরিয়ে চলে গেল। আমি চললুম হোটেলের দিকে। উঁচু রাস্তার উঠে বাঁ-দিকে ঘুরে দেখলুম, হিস্টোফানকে দেখে তার মেয়ে ওন্টি দৌড়ে আসছে। কুকুরটাও তার দিকে দৌড়চ্ছে। বস্তি থেকে দলে-দলে লোকেরা বেরিয়ে অবাক হয়ে ওদের দেখছে। ডাইনির গুহা থেকে যে বেঁচে ফিরতে পেরেছে এবং শুধু তাই নয়, দেবতার বল উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, সম্ভবত বস্তিতে এবার তার সম্মান বেড়ে যাবে।

বাবা-মেয়ের উজ্জ্বল মুখ দূর থেকে রোদ ঝলমল করতে দেখে আমার মন আনন্দে ভরে গেল।

কিন্তু হোটেলের কাছাকাছি পৌঁছেই ফিরতে হল। ব্রিগেডিয়ার অর্জুন সিং আর প্রণব রুদ্র একদল পুলিশ নিয়ে এদিকেই হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।...

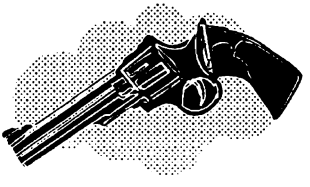

লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে চমকে-ওঠা ভঙ্গিতে বললেন, "খাইছে!"

জিজ্ঞেস করলুম, "কে কাকে খেল হালদারমশাই?"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বললেন, "লাফাং চু!"

"তার মানে?"

"দ্রিদিম্বা!"

বলেই কাগজটা যেমন-তেমন করে দুমড়ে রেখে হালদারমশাই সটান বেরিয়ে গেলেন। ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিস্যু বোঝা গেল না।

এ-কথা ঠিকই যে, হালদারমশাই মাঝে-মাঝে বেমক্কা কিছু-কিছু উদ্ভুট্টে কাণ্ড করে ফেলেন। সেটা সম্ভবত ওঁর ছিটগ্রস্ত স্বভাবের দরুনই বটে। তা ছাড়া সব-তাতে নাক গলানোর অভ্যাসও আছে। একসময় পুলিশে চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। কালে-ভদ্রে দু'-একজন মক্কেল জোটে, অর্থাৎ 'কেস' হাতে পান। সেই কেস জটিল হলে সুখ্যাত রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে পরামর্শ নেওয়ার জন্য হাজির হন এবং ঘনঘন নস্যি নেন। এদিন সাতসকালে ওঁর আবির্ভাব দেখে অবশ্যি তেমন কিছু অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু ওই দুর্বোধ্য দু'টি শব্দ আওড়ে ওঁর আকস্মিক প্রস্থানের কারণটা কী?

"কী হল ডার্লিং? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

ঘুরে দেখি এতক্ষণে ছাদের বাগান থেকে নেমে এসেছেন কর্নেল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু।"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হুঁ। তো হালদারমশাই কোথায় গেলেন?"

"দ্রিদিম্বা।"

কর্নেল অট্টহাসি হেসে এগিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। "বোঝা যাচ্ছে খবরটা কাগজেও বেরোবে, সেটা আঁচ করতে পারেননি হালদারমশাই।"

"খবর? কীসের খবর?"

মুখে কপট ভর্ৎসনার ছাপ ফুটিয়ে কর্নেল বললেন, "তুমি একজন সাংবাদিক, জয়ন্ত! সাংবাদিক হিসেবে তোমার যথেষ্ট সুনামও আছে। অথচ আমার অবাক লাগে, নিজের পেশার প্রতি তুমি একেবারে উদাসীন।"

একটু হেসে বললুম, "হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন? হালদারমশাই..."

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে।"

"কত খবর বেরোয় কাগজে, সব খবর পড়তেই হবে, তার মানে নেই।" বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিলুম। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বোঝার জন্যই।

ষষ্ঠীচরণ কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে এনে টেবিলে রাখল। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "টিকটিকিবাবু বাথরুমে নাকি?"

"নাহ্! ওঁর কফিটা বরং তুমিই গিলে ফেলো গে ষষ্ঠী।"

ষষ্ঠী ডিটেকটিভ বলতে পারে না, কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই 'টিকটিকি' বলে। কারণ সে হালদারমশাইয়ের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে প্রচুর আমোদ পায়। কর্নেল তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই সে বিব্রতভাবে বলল, "খামোকা অতটা দুধ নষ্ট। আজকাল দুধের যা আকাল। টিকটিকিবাবু বেশি দুধ ছাড়া কফি খান না।"

বলে সে আমার পরামর্শমতো অতিরিক্ত দুধ-মেশানো কফির পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "ষষ্ঠী হালদারমশাইকে টিকটিকিবাবু বলে। জয়ন্ত, আশা করি টিকটিকি কথাটা জানো। পুলিশের গোয়েন্দাদের একসময় টিকটিকি বলা হত। সেটা ডিটেকটিভ শব্দটার ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি।"

"কিন্তু খবরটা কোথায়?"

"ছয়ের পাতায় আট নম্বর কলামের মাথায়।"

খবরটা এবার চোখে পড়ল।

রায়গড়ে ভৌতিক উপদ্রব

রায়গড়, ২৩ মার্চ—*সম্প্রতি এখানে এক অদ্ভুত উপদ্রব শুরু হয়েছে। গভীর রাতে অনেক বাড়ির জানলায় কে বা কারা খটখট শব্দ করে ভুতুড়ে গলায় বলে, 'লাফাং চু দ্রিদিম্বা!' কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজে কাউকে দেখা যায় না। এমনকি বাড়ির চারপাশে আলো জ্বললেও এই ঘটনা ঘটছে। সাহসী যুবকরা দলবেঁধে পাহারা দিয়েও এর কিনারা করতে পারেনি। পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশও এ রহস্য ফাঁস করতে ব্যর্থ হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ২০ মার্চ রাতে থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারেও এই ভুতুড়ে ঘটনা ঘটেছে। তিনি রিভলভার থেকে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেন। তাতেও কাজ হয়নি। তার ঘণ্টাটাক পরে 'বনশোভা নার্সারি'র প্রোপ্রাইটর সাধুচরণ লাহার বাড়ির জানলায় 'লাফাং চু দ্রিদিম্বা' শোনা যায়। শ্রীলাহা এবং তাঁর পরিবার প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত উল্লেখ্য, এখানে গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে, সেটি ঐতিহাসিক। রায়গড়ের রাজা কীর্তিমান রায় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত পঞ্চানন আচার্য মহাশয়ের মতে, রায়গড়বাসীদের অনাচারে ক্রুদ্ধ দেবতা মহাদেব তাঁর ভূতগণকে লেলিয়ে দিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁর তুষ্টিসাধনের জন্য মহাযজ্ঞ, বলিদানাদি পুণ্যকৃত্য আবশ্যক।*

খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার পর হাসতে হাসতে বললুম, "বোগাস! আসলে অনেক সময় কাগজের পাতা ভরার জন্য আজেবাজে বা উদ্ভট খবর দরকার হয়। যাঁরা খবর জোগাড় করেন, তাঁরাও এই কম্মটি করে থাকেন। তা ছাড়া তিলকে তাল না করলে খবর হয় না। বিশেষ করে লোকে তো মুখরোচক খবরই চায়।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "খবরটা পড়ার পর মনে হচ্ছিল, হালদারমশাইয়ের আবির্ভাব আসন্ন। কারণ ক'দিন আগে উনি ফোনে দুঃখ করে বলছিলেন, কেস-টেস একেবারে পাচ্ছেন না। জীবনটা একঘেয়ে লাগছে। দেশ থেকে রহস্য-টহস্য কমে গেলে ওঁর এজেন্সিই যে তুলে দিতে হবে। ভেবে দ্যাখ জয়ন্ত, গণেশ অ্যাভিনিউয়ে তেতলার ছাদে ছোট্ট একখানা ঘরের ভাড়া পাঁচশো টাকা! হালদারমশাইয়ের মতো রিটায়ার্ড মানুষের পক্ষে কী সাঙ্ঘাতিক সমস্যা তা হলে!"

"কাজেই হালদারমশাই রায়গড়ের ট্রেন ধরতে গেলেন।" কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, "কিন্তু উনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে অমনভাবে বেরিয়ে গেলেন, এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।"

"একটু আগেই বলেছি, রহস্যটা যে কাগজের খবর হবে সেটা আঁচ করতে পারেননি," কর্নেল অভ্যাসমতো হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। "হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাকেও অবাক করেছে।"

"কিন্তু কর্নেল, তা-ই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন? এমন হতে পারে, হালদারমশাই নেহাত আড্ডা দিতেই এসেছিলেন। খবরটা পড়েই রহস্যের টানে ছুটে গেলেন। ওঁর পাগলামির কথা আমরা ভালোই জানি।"

কর্নেল হাসলেন। "তুমি আসার আগেই হালদারমশাই এসেছিলেন কি না?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওঁর মধ্যে কোনো উত্তেজনা দেখিনি।"

"তুমি লক্ষ করোনি, ডার্লিং! উনি এসেই ষষ্ঠীকে ছাদে পাঠিয়েছিলেন আমাকে খবর দিতে। নিজেই যেতে পারতেন। যাননি, তার কারণ তোমার জানা উচিত। তুমিও এসে সোজা ছাদে চলে যেতে। কিন্তু যাওনি।"

"ছাদের দরজায় কী সব সাঙ্ঘাতিক ক্যাকটাস রেখেছেন যে!"

"হুঁ। অ্যাপোরোক্যাকটাস ফ্ল্যাজেলিফর্মিস। এই সিরিউস প্রজাতির ক্যাক্টি ব্যালকনিতে রাখার উপযুক্ত। এরা বৃষ্টি সইতে পারে না। অথচ ঠাণ্ডা পরিবেশ চাই। ভীষণ কাঁটায় ভরা, কতকটা অক্টোপাসের গড়ন। কিন্তু কী অসাধারণ লাল ফুল ফোটে। উঁকি মেরে দেখে এসো বরং।"

"প্লিজ কর্নেল!" বিরক্ত হয়ে বললুম, "হালদারমশাই এবং লাফাং চু দ্রিদিম্বা..."

হাত তুলে কর্নেল বললেন, "ওই ক্যাক্টিগুলো ছাদে ওঠার মুখে রেখেছি, যাতে কেউ হুট করে গিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে না পারে। ক্যাক্টি আর অর্কিড অনেক বেশি মনোযোগ ও সেবা দাবি করে ডার্লিং!"

"এইজন্যই সেদিন এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, আপনার ওই কর্নেল ভদ্রলোক..."

"নিঃসঙ্কোচে বলো ডার্লিং! আজ আমার মুড খাসা। ওপালটিয়া বাসিলারিস ক্যাক্টির একটা কাটিং মেক্সিকোর সোনোরা থেকে আনিয়েছিলুম। দারুণ ফুল উপহার দিয়েছে। অবিশ্বাস্য!"

"ভদ্রমহিলার মতে, আপনি খুব ন্যাকো।"

কর্নেল হা-হা হো-হো হেসে বললেন, "ব্রিলিয়ান্ট! ভদ্রমহিলা যথার্থ বলেছেন। ন্যাকা কথাটার মানে বলো তো?"

"যে জেনেও না-জানার ভান করে।"

"হুঁ। তবে কথাটা এসেছে আরবি নেক থেকে। নেক মানে পুণ্যবান, ভালোমানুষ। এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় ঢুকে বিকৃত হয়ে যায়। মানেও বদলে যায়। নেক থেকে নেকা। এ ক্ষেত্রে উচ্চারণ এবং ব্যঙ্গাত্মক অর্থবিকৃতি ঘটেছে। একা যেমন অ্যাকা।"

প্রায় আর্তনাদ করলুম, "আহ্ কর্নেল!"

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। একটা নম্বর ডায়াল করে বললেন, "সুপ্রভাত রায়সায়েব! কর্নেল সরকার বলছি। ...আচ্ছা, আপনার বাগানে যে একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ে দেখেছিলুম...হুঁ, আপনি চমৎকার নাম দিয়েছেন কুষ্মাণ্ড ক্যাক্টি...কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড? হাঃ হাঃ হাঃ! এনিওয়ে, ওগুলো তো রায়গড় থেকে...বনশোভা নার্সারি? আই সি!...কী অবাক! আমি কল্পনাও করিনি আপনি রায়গড়ের ঐতিহাসিক রাজাদের বংশধর। আসলে রাজবংশধররা কুমারবাহাদুর বা প্রিন্স...হুঁ, আপনি পছন্দ করেন না তা হলে। ...শুনুন, ওই অকালকুষ্মাণ্ড আমার দরকার। কীভাবে...ধন্যবাদ। রাখছি।"

কর্নেল ফোন রাখার পর হাই তুলে বললুম, "কোনো এক রায়গড়ে ভূতের পেছনে দৌড়লেন এক ভদ্রলোক। এদিকে আর-এক ভদ্রলোক মনে হচ্ছে অকালকুষ্মাণ্ডের পেছনে দৌড়তে চলেছেন। তবে এই যোগাযোগটা অদ্ভুত রকমের আকস্মিক।"

প্রকৃতিবিদ এতক্ষণে মাথার আঁটো-টুপি খুলে টাকে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন, "রহস্য জিনিসটার সঙ্গে আকস্মিকতার সম্পর্ক অনিবার্য, জয়ন্ত!"

"আপনার এই অকালকুষ্মাণ্ডে কোনো রহস্য আছে বুঝি?"

"আছে। প্রকৃতির চেয়ে বেশি রহস্য আর কোথায় আছে?"

"নাকি রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই সেরে নিতে চান?"

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোফার কাছে এগিয়ে নীচে থেকে একটা নোটবুক কুড়িয়ে বললেন, "বলেছি, তুমি হালদারমশাইকে লক্ষ করোনি। করলে চোখে পড়ত, খবরটা পড়ার পর ভদ্রলোক এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, নোটবইটার কথা ভুলে গেছেন। সম্ভবত ওটা আমাকে দেখানোর জন্য হাতে রেখেছিলেন।" কর্নেল নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। "তারপর আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কাগজ পড়ার জন্য এটা সোফায় রাখেন। এত বড় নোটবই পকেটে ঢোকানো যায় না। এটা ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির নোটবই মনে হচ্ছে। যাই হোক, খবরটা পড়ার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এবং চলে যাওয়ার সময় নোটবইটা নীচে পড়ে যায়।...হুঁ! এই তো! একটা বেনামী চিঠির কপি ছাড়া এটা আর কী হতে পারে? মূল চিঠিটা...জয়ন্ত! ফোনটা ধরো।"

টেলিফোন বাজছিল। সাড়া দিতেই হালদারমশাইয়ের গলা ভেসে এল। "জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলস্যারকে দিন না, প্লিজ!"

"আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?"

"হাওড়া স্টেশন। আর কইবেন না! নোটবই ফ্যালাইয়া আইছি।"

"ওটা আপনার কর্নেলস্যারের হাতে রয়েছে।"

"ওঁকে ফোনটা দিন! ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।"

হালদারমশাই পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেও কথা বলেন মাঝে-মাঝে। বিশেষ করে উত্তেজনার সময়। ফোন কর্নেলকে দিলুম। কর্নেল বললেন, "হুঁ, বলুন হালদারমশাই!...বলেন কী!...মক্কেলের নিষেধ? ঠিক আছে। সব পেশাতেই কিছু এথিক্স বা নীতি মেনে চলা হয়। আপনি ডিটেকটিভ। কাজেই...না, না! আপনার কাজ আপনি করুন। ...গোপনে যোগাযোগ রাখবেন? বেশ তো!...ঠিক আছে উইশ ইউ গুড লাক।..."

ফোন রেখে কর্নেল গম্ভীর মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল নোটবইয়ের একটা পাতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। হালদারমশাইয়ের হস্তাক্ষরে লেখা আছে :

২৬ মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। তার মধ্যে ত্র্যম্বক না পেলে আদরের নাতি বিশু বলিদান হবে। আবার বলা হচ্ছে, ত্র্যম্বক রেখে আসবে শ্মশানবটের গোড়ায় চৌকো পাথরটার ওপর। পুলিশকে জানালে শিবেরও সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়। আর-একটা কথা। লাফাং চু দ্রিদিম্বা দিয়ে কাজ হবে না। ওই ভূতটাকে আমরা চিনি। তাকে ফাঁদ পেতে ধরব। সাবধান।

পড়ার পর বললুম, "সর্বনাশ! কিডন্যাপ কেস মনে হচ্ছে যে!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হ্যাঁ। পঞ্চানন আচার্যের নাতি বিশুকে কারা গুম করে রেখেছে।"

"ত্র্যম্বক তা হলে নিশ্চয় কোনো দামি জিনিস?"

"ত্র্যম্বক শিবের এক নাম। তবে কথাটার মানে, যে-দেবতার তিনটে চোখ আছে।" কর্নেল নোটবইটা নিয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে বসলেন। "আমাদের হালদারমশাই নিজের পেশার ব্যাপারে খুব মেথডিক্যাল। ফোনে আমাকে ওঁর মক্কেলের নাম জানাতে চাইলেন না। বললেন, নিষেধ আছে। কিন্তু নোটবইয়ে নাম-ঠিকানা সবই লেখা আছে দেখছি।"

"ওঁর মক্কেল সেই শিবমন্দিরের সেবাইত পঞ্চানন আচার্য, সে তো বোঝা-ই যাচ্ছে!"

"নাহ্ জয়ন্ত!" কর্নেল একটু হাসলেন। "নাতি কিডন্যাপ্‌ড্ হয়েছে যাঁর, তিনি মোটেও হালদারমশাইয়ের কাছে আসেননি। সম্ভবত তাঁর জানার কথাও নয় যে, কে. কে. হালদার নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন। হালদারমশাইয়ের মক্কেল হলেন রায়সায়েব, যাঁর সঙ্গে একটু আগে ফোনে কথা বললুম। বালিগঞ্জ লেনের প্রমোদরঞ্জন রায়। ভদ্রলোক ইন্টারন্যাশনাল হর্টিকালচার সোসাইটির একজন মেম্বার।"

অবাক হয়ে বললুম, "ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি!"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, "অবশ্য এমনও হতে পারে, রায়সাহেব তাঁদের রায়গড় শিবমন্দিরের সেবাইতমশাইয়ের নাতিকে সদিচ্ছাবশেই উদ্ধার করতে চেয়েছেন। হয়তো পঞ্চাননবাবুই ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। তাই..." কর্নেল হঠাৎ থেমে গিয়ে হেলান দিলেন ইজিচেয়ারে। চোখ বন্ধ করে রইলেন।

"কিন্তু কর্নেল রায়সায়েব কেন হালদারমশাইকে নিজের নাম গোপন রাখতে বলবেন?"

কর্নেল চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, "ঠিক, ঠিক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"

"রায়সায়েব কি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানেন?"

"না জানলেও হালদারমশাই জানিয়ে থাকবেন। তাই..." কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "হুঁ, রায়সায়েব চান না আমি এতে নাক গলাই। তখন ফোনে বললেন, একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি—সেই অকালকুষ্মাণ্ডের জন্য কষ্ট করে রায়গড়ে আমার যাওয়ার দরকার নেই। উনিই শিগগির পাঠিয়ে দেবেন।"

"তা হলে হালদারমশাই ওঁর অজ্ঞাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন?"

"হুঁ।" কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হালদারমশাই খুব মেথডিক্যাল। কিন্তু বড্ড হঠকারী। বহুবার নিজেই নিজের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ডেকে এনেছেন, তা তো তুমিও দেখেছ। লাফাং চু দ্রিদিম্বা ভৌতিক রহস্যে আমার মাথাব্যথা ছিল না। অকালকুষ্মাণ্ডও আমি ঘরে বসে পেয়ে যাব। কিন্তু হালদারমশাইয়ের জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, জয়ন্ত! এই দ্যাখো না! নিজের নোটবইটাই ফেলে গেলেন এবং স্টেশনে গিয়ে সেটার কথা খেয়াল হল। এদিকে রায়সায়েবের এমন লুকোছাপারই বা কারণ কী? তিনি তো আমার পরিচয় ভালোই জানেন। নাহ্ ডার্লিং! আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এটা আমার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। বললুম, "আপনি কি এখনই রওনা দেবেন নাকি?"

"বনশোভা নার্সারিতে আমি বারতিনেক গেছি, জয়ন্ত! প্রোপ্রাইটর সাধুচরণ লাহা আমার চেনা লোক। গঙ্গার ধারে প্রায় তিরিশ একর জমি জুড়ে ওঁর বিশাল নার্সারি। নন্দনকানন বললেই চলে। এমন নার্সারি এদেশে আর দু'টি নেই। লাহাবাবু দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড আর ক্যাক্টি গ্র্যাফ্‌টিং করে নানা জায়গায় চালান দেন।"

"ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, "তুমিও যাচ্ছ।"

"সে কী! আমাকে যে আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সে যেতে হবে।"

"চিফ রিপোর্টারকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও, মুখ্যমন্ত্রীমশাইয়ের ভাষণের চেয়ে লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য পাঠকরা বেশি খাবে। বরং ফোনটা আমাকে একবার দিও। বুঝিয়ে দেব।..."

দুই

রায়গড়ে পৌঁছতে প্রায় পৌনে চারটে বেজে গেল। গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো গঞ্জের গায়ে একালের ছাপ পড়েছে। নতুন-পুরোনোতে মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা। ভিড়ভাট্টা হইচইয়ে তুলকালাম অবস্থা। আমরা একটা সাইকেলরিকশা নিলুম। বসতি এলাকা ডাইনে রেখে রিকশা যে পথে এগোল, তার দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "রোখ্‌কে! রোখ্‌কে! শিবমন্দিরে প্রণাম করে আসি। এক্ মিনিট।"

রিকশাওয়ালা বলল, "বেশি দেরি করবেন না স্যার! নার্সারি থেকে আমাকে একা ফিরতে হবে। বেলা গড়িয়ে যাবে। সুনসান নিরিবিলি রাস্তা।"

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "চোর-ছিনতাইয়ের ভয় আছে নাকি?"

রিকশাওয়ালা তুম্বো মুখে বলল, "না স্যার! ইদানীং এখানে বাবার চেলাদের খুব উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

"তুমি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছ?"

রিকশাওয়ালা বুকে-কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "আজ্ঞে, ঠিকমতো সেবাযত্ন না হলে বাবা রাগেন! পেথম রাগ পড়েছিল ঠাকুরমশাইয়ের গিন্নির ওপর। রাত্তিরে খিড়কির দোরের কাছে ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন। এই তো দু'মাস আগের কথা! ডাক্তার বলল, হার্টফেল! আজকাল ডাক্তারদের এই এক কথা, হার্টফেল। তবে কেউ-কেউ বলেছিল বটে মার্ডারকেস। আমি বিশ্বাস করিনে স্যার!"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কথা শুনছিলেন। বললেন, "তুমি কার কথা বলছ?"

"আজ্ঞে এই মন্দিরের যে ঠাকুরমশাই আছেন, তেনার ওয়াইফ ছিলেন।"

"বুঝেছি। তা..."

"আর দেরি করবেন না স্যার! শিগগির প্রণাম করে আসুন।"

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, "মন্দিরে এখন ঠাকুরমশাই আছেন তো?"

"থাকার তো কথা।"

"ওঁর বাড়িতে আর কে আছেন?"

"ওঁর নাতি বিশু। মা-বাপ মরা ছেলে স্যার! ঠাকুরমশাই মানুষ করছেন। ইস্কুলে পড়ে।"

"বিশুও নিশ্চয় আছে এখন? স্কুলের তো ছুটি হয়ে গেছে।"

রিকশাওয়ালা হাসল। "বিশুকে পাওয়া কঠিন। এই আছে তো এই নেই। কোথায়-কোথায় ঘোরে টোটো করে। তবে ছেলেটা বড্ড ভালো স্যার!"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা, এই লাফাং চু দ্রিদিম্বা ব্যাপারটা..."

রিকশাওয়ালা আঁতকে উঠে ফের কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, "ওসব কথা বলবেন না স্যার! যান, যান! প্রণাম করে আসুন। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

রাস্তা থেকে একফালি পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে শিবমন্দিরের জরাজীর্ণ ফটক পর্যন্ত। দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ ঢেকে রেখেছে ঝোপঝাড় আর কিছু উঁচু গাছ। কর্নেল যেতে যেতে চাপা স্বরে বললেন, "বোঝা গেল, বিশু কিডন্যাপ্‌ড্ হওয়ার কথা এখানে এখনও সম্ভবত কেউ জানে না।"

সায় দিয়ে বললুম, "আরও একটা কথা জানা গেল, সেবাইত ভদ্রলোকের স্ত্রীর মৃত্যুটা অনেকের কাছে সন্দেহজনক।"

কর্নেল বাইনোকুলার তুলে পাখি দেখার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, "একটা নিষেধাজ্ঞা রইল জয়ন্ত, তুমি সবসময় মুখটি বুজে থাকবে—বিশেষ করে যখন আমি কারও সঙ্গে কথা বলব।"

অভিমান চেপে বললুম, "ও কে বস!"

কর্নেল হাসলেন। "না, না। অন্যান্য কথা বলবে। শুধু এই ঘটনাসংক্রান্ত কোনো কথা বাদে। তবে যখন তুমি-আমি একা থাকব, তখন যথেচ্ছ কথা বলার বাধা নেই।"

ফটক দিয়ে ঢুকে একটা চত্বর দেখা গেল। এখানে-ওখানে দেশি ফুল-ফলের গাছ। সামনে প্রকাণ্ড শিবমন্দির। ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। ডাইনে একতলা কয়েকটা ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। জুতো খুলে আমরা মন্দিরের দরজায় উঠে গেলুম। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে জ্বাললেন। সেই আলোয় একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ দেখা গেল। সিঁদুরের ছোপ পড়েছে আগাগোড়া। কিছু মিইয়ে যাওয়া ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে। হঠাৎ কর্নেল টর্চ নিভিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "প্রণাম করো ডার্লিং! ঝটপট প্রণাম!"

উনি হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঠেকালে আমি অবাক হয়েছিলুম। কারণ এ যাবৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে কোথাও এমন ভক্তি প্রদর্শন করতে দেখিনি। ওঁর দেখাদেখি আমাকেও মাথা ঠেকাতে হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখি, নীচের চত্বরে এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বাটে গড়ন। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফ ফতুয়া। কপালে লাল তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষমালা। খালি পা।

কর্নেল বিনীতভাবে বললেন, "আমার আন্তরিক ইচ্ছে, পুজো দিই। তা আপনিই কি এই মন্দিরের পুরোহিত?"

"আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি!"

"বনশোভা নার্সারিতে অথবা লাহাবাবুর বাড়িতে..."

"উঁহু। গঙ্গার ধারে। আপনার গলায় সেই যন্তরটাও ঝুলছে দেখছি। কী দ্যাখেন ওই দিয়ে?"

"পাখি-টাখি দেখি। পাখি দেখতে আমার ভালো লাগে ঠাকুরমশাই!"

এর ঠাকুরমশাই তা হলে সেই পঞ্চানন আচার্য। মুচকি হেসে বললেন, "আমার নাতি বিশেটারও ওই নেশা। বুঝলেন? একটা টিয়াপাখি পুষেছিল। রাগ করে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছি। তাতে হতভাগার এমন রাগ যে না-খাওয়া না-দাওয়া, কোথায় উধাও। যা না যেখানে যাবি। ক'দিন কে খেতে দেয় দেখব'খন। আবার এই শর্মার পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হবে।"

কর্নেল এবং তাঁর পিছনে আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম চত্বরে। কর্নেল বললেন, "আপনার নাতির বয়স কত? কোন ক্লাসে পড়ে?"

ঠাকুরমশাই বললেন, "বারো-তেরো হবে। ক্লাস সিক্সে গাড্ডা খেয়ে পড়ে আছে। আর বলবেন না মশাই! বিশু নয়, বিচ্ছু। বুঝলেন? কী বুঝলেন?"

"বিচ্ছু।"

ঠাকুরমশাইয়ের চোখ দু'টি কেমন ঢুলুঢুলু এবং মুখে অমায়িক ভাব। চোখ নাচিয়ে হেসে বললেন, "মশাইদের কি কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কর্নেল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বললেন, "ছোট ছেলের এই নিরিবিলি জায়গায় একা থাকতে ভালো লাগবে কেন? তাই হয়তো মাঝে-মাঝে কোনো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি চলে যায়। আপনি খোঁজ নিচ্ছেন না কেন?"

পঞ্চানন আচার্য এবার একটু বিরক্ত হলেন। "ধুর মশাই! আত্মীয়স্বজন বলতে ওর কেউ কোথাও আছে নাকি? রায়গড়েই কারও বাড়ি গিয়ে থাকে। এবারও তা-ই আছে।"

"তা আপনি ওর পাখি খুলে দিলেন কেন?"

"অত কৈফিয়ত দিতে পারব না মশাই!"

কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে বললেন, "আগামীকাল পুজো দেব। জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য কত অ্যাডভান্স লাগবে বলুন। আমি লাহাবাবুর নার্সারিতে আছি।"

ঠাকুরমশাই পার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছোট, না মাঝারি, না বড়পুজো?"

"আজ্ঞে?"

"ছোটপুজোর রেট পঞ্চাশ। মাঝারি পাঁচশো। বড় সাড়ে সাতশো।"

"এত তফাত কেন?"

ঠাকুরমশাই হাসলেন। "ছোটতে নিরিমিষ। মাঝারিতে কেজি দশেক, বড়তে কেজি পনেরো থেকে বিশ। পাঁঠার যা দাম বেড়েছে, আর বলবেন না মশাই! ওই তো হাড়িকাঠ দেখতে পাচ্ছেন। অবস্থা দেখুন না ঘুণ ধরে নড়বড় করছে। মাঝারি বা বড়পুজো হলে কেতোকে খবর দিতে হবে। তাকেও মজুরি দিতে হবে।"

কর্নেল পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে রেখে বললেন, "ছোটই দেব। রক্তটক্ত আমার ধাতে সয় না। এই রইল অ্যাডভান্স।"

ঠাকুরমশাই নোট দুটো দেখতে দেখতে বললেন, "আর-একটা চাই। পুজোসামগ্রীর বেজায় দর।"

কর্নেল আর-একটা দশ টাকার নোট রাখলেন। তারপর বললেন, "কখন আসব বলুন?"

"দাঁড়ান। পাঁজি দেখে আসি।"

টাকা তুলে নিয়ে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হেঁটে গেলেন ঠাকুরমশাই। একতলা একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে গেলেন।

চাপাস্বরে বললুম, "সত্যিই কি পুজো দেবেন নাকি?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, "মাঝে-মাঝে একটু ধর্মকর্ম করলে মনে শান্তি আসে ডার্লিং!"

ঠাকুরমশাই বেরিয়ে আসছিলেন। এবার চোখে চশমা। হাতে পাঁজি। বারান্দা থেকে নামার সময় একটা শূন্য পাখির খাঁচায় মাথার টোক্কর লাগল। অমনি 'হ্যাত্তেরি' বলে খাঁচাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ছুঁড়ে ফেললেন।

তারপর পাঁজির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এগিয়ে এলেন। "হ্যাঁ! কালবেলা গতে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ—আপনারা সূর্য ওঠার আগেই চলে আসুন।"

কর্নেল করজোড়ে প্রণাম করে পা বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনি যে খাঁচাটা ফেলে দিলেন, আপনার নাতি এসে রাগ করবে না?"

"বয়ে গেল!" ঠাকুরমশাই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন। "গত সপ্তায় পাখি উড়িয়ে দিয়েছি। এ-সপ্তায় খাঁচা উড়িয়ে দিলুম। পাখি ফিরে এসে থাকবে কোথায়?" টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন পঞ্চানন আচার্য।

"আপনার নাতি চলে গেল কবে?"

"আজ রোববার। বেস্যুতবার ইস্কুল থেকে বিকেলে এসে বইখাতা রেখে চলে গেল।"

"বলে যায়নি কোথায় যাচ্ছে?"

"বলল, কেতো ওর পাখি দেখতে পেয়েছে। ধরতে যাচ্ছে।"

"কেতো কে?"

"আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক কোপে একশো পাঁঠা কাটে মশাই! বড়পুজো দিলে দেখতেন!"

রিকশাওয়ালাকে দেখা গেল ফটকের বাইরে। মুখে তিতিবিরক্ত ভাব। ডাকল, "বড্ড লেট হয়ে গেল স্যার! এমন করলে চলে? এতক্ষণ ফিরে গিয়ে আরও কয়েক খেপ পেসেঞ্জার টানতুম ইস্টিশনে।"

ঠাকুরমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গিয়ে রিকশায় উঠলুম। রিকশাওয়ালা গজগজ করতে থাকল। "পাঁচুঠাকুরের পাল্লায় পড়তে আছে? সবসময় ভাং-এর নেশায় চুর হয়ে থাকেন। কিন্তু পুজো দিতে চাইলেই টনটনে হুঁশ। শুনেছি, রায়রাজাদের যখের ধন আগলাচ্ছেন সাতপুরুষ ধরে। তবু টাকার লোভ গেল না!"

কর্নেল বললেন, "বলো কী! যখের ধন?"

রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে বলল, "আজ্ঞে স্যার, আপনারা শিক্ষিত লোক। আপনাদের কি অজানা আছে? শিবঠাকুরের মাথায় থাকেন সাপ। সেই সাপের মাথায় আছে এক মণি। সাতরাজার ধন কি না বলুন স্যার?"

"এই মন্দিরের শিবের মাথায় তো সাপ দেখলুম না হে! ন্যাড়া শিবলিঙ্গ আছে বটে। সাপ তো নেই।"

রিকশাওয়ালা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "আছে। ছিল। কে দেখা পায়, কে পায় না। আর মণির কথা যদি বলেন, তা-ও আছে। ছিল। যে জানার সে ঠিকই জানে।"

"কে সে?"

"পাঁচুঠাকুর। আবার কে!"

ডাইনে গঙ্গা দেখা গেল এতক্ষণে। সামনে কিছুটা দূর বনশোভা নার্সারির গেট। দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। রিকশাওয়ালা রায়রাজাদের গপ্প শোনাচ্ছিল। এসব গপ্পের কাঠামো দেখেছি একইরকম। ধার্মিক রাজার সামনে সশরীরে দেবতার আবির্ভাব, পুজোর নির্দেশ, বর দান এবং একটি মন্দির নির্মাণ। এই গপ্পে দেবতা নিজের মাথার সাপের মণিটিও দান করেছিলেন রায়রাজাকে।

ফিসফিস করে কর্নেলকে বললুম, "ত্র্যম্বক!"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালেন শুধু।

নার্সারির গেটে আমরা রিকশা থেকে নামতেই কে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো, কর্নেল সরকার!"

কালো তাগড়াই চেহারা, থুতনিতে দাড়ি, পরনে লাল শার্ট, জিনস আর পায়ে গামবুট, পিঠে সম্ভবত কীটনাশকের খুদে ট্যাঙ্ক বাঁধা, হাতে স্প্রের নল। এক ভদ্রলোক ফুলের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। কর্নেল তাঁকে সম্ভাষণ করে বললেন, "হ্যালো মিঃ বাগ! কেমন আছেন? আপনার কর্তাবাবু কোথায়?"

মিঃ বাগ মুচকি হেসে বললেন, "সাধুদা ভূতের ভয়ে বাড়ি থেকে নার্সারিতে আসছেন না। কাগজে খবর পড়েননি? আজই তো বেরিয়েছে। এনি ওয়ে, ওয়েলকাম! মালিক নেই তো কী হয়েছে? নোকর আপনার সেবার জন্য হাজির।"

কর্নেল বললেন, "আমার কয়েকটা একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ে চাই। রায়সায়েবের বাগানে দেখে দৌড়ে এসেছি।"

মিঃ বাগকে হঠাৎ যেন চমকে উঠতে দেখলুম। নাকি আমার চোখের ভুল? তখনই অবশ্য সহাস্যে বললেন, "আসুন। আসুন। সে হবে 'খন। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বিশ্রাম করুন।..."

তিন

নার্সারির একটেরে গঙ্গার ধারে বাংলোধাঁচের সুন্দর একটা বাড়ি। ম্যানেজার অরিন্দম বাগ একা থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক একজন হর্টিকালচার-বিশেষজ্ঞ। রায়সায়েবের সুপারিশে সাধুবাবু ওঁকে বছর দেড়েক আগে বহাল করেছেন। সাধুবাবু তাই এখন রাতে রায়গড়ের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। আগে এই বাংলোতেই থাকতেন। মান্যগণ্য অতিথি এলে তাঁদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নার্সারির বেশির ভাগ কর্মী স্থানীয় লোক। তাঁরা সন্ধ্যায় বাড়ি চলে যান। জনাতিনেক থাকেন উলটো দিকের একতলা সারবন্দি ঘরগুলোতে। সেখানেই নার্সারির অফিস আছে। গেটের কাছাকাছি ট্রাক ও টেম্পোর গ্যারাজ আছে। রাতের পাহারার জন্য বন্দুকধারী গার্ডও আছে জনা দুই।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল এবং মিঃ বাগ ক্যাক্টি নিয়ে দুর্বোধ্য আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তারপর আমার কথা বেমালুম ভুলে দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত ক্যাক্টি পরিদর্শনে।

বেলা পড়ে এসেছে। জানলা দিয়ে গঙ্গাদর্শনেই মন দিলুম অগত্যা। এইসময় চোখে পড়ল, কর্নেলের বাইনোকুলারটা টেবিলে পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চোখে রাখলুম। লেন্স অ্যাডজাস্ট করার পর গঙ্গার ওপার-এপার চমৎকার খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, শিবমন্দিরের দিকে একটা প্রকাণ্ড বটের গাছ এবং সেটাই হয়তো সেই শ্মশানঘাট, তার তলা থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার!

গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে ঢুকে ঘাপটি পেতে বসে পড়লেন।

মিনিট পাঁচেক পরে একটা ডিঙি নৌকো এসে শ্মশানবটের কাছে ভিড়ল। ঝোপের আড়াল পড়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হালদারমশাইকে গুড়ি মেরে এগোতে দেখলুম সেদিকে।

একটা কিছু ঘটতে চলেছে নিশ্চয়। হালদারমশাই অদৃশ্য হয়ে গেলে বাইনোকুলার নিয়ে পুবের দরজা খুলে বের হলুম। কিন্তু নিরাশ হতে হল। এদিকের গেটে তালা আঁটা আছে। বেরনো যাবে না। সবুজ রঙের লোহার কপাট অন্তত ফুট ছয়েক উঁচু। তার মাথায় গ্রিল এবং গ্রিলের ওপর কাঁটাতার। নার্সারি না দুর্গ?

ঘরের মেঝে উঁচুতে বলে জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। তাই ঘরে ফিরে আবার বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম।

সেই নৌকো তরতর করে চলে যাচ্ছে। কোথাও হালদারমশাইকে দেখতে পাওয়া গেল না। আলোর রং ধূসর হয়ে গেছে। সব আবছা হয়ে পড়েছে এবার।

একটু পরে কর্নেল এবং মিঃ বাগের সাড়া পেলুম। কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। মিঃ বাগ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বললেন, "জয়ন্তবাবু হয়তো লক্ষ করেননি আমরা মাঠেঘাটে থাকলেও সিটিলাইফের আরাম ভোগ করি।"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত মাঝে-মাঝে নেচারকে কাছে পেতে চায়। আমারই সঙ্গদোষে।"

মিঃ বাগ হাসলেন, "সমস্যা হল, নেচার খুব একটা নিরাপদ কিছু নয়। এই নার্সারিতে বেজায় সাপের উৎপাত হয়। অবশ্য এখন মার্চের শেষাশেষি, সাপেদের ঘুমের শেষ প্রহর। এপ্রিলের মাঝামাঝি একবার পাশ ফিরে শোবে। তারপর মে মাসে বেরোতে শুরু করবে। জুনে তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। নার্সারি ওদের কামোফ্লেজের পক্ষে চমৎকার জায়গা। গত জুনে ক্যাক্টি ভেবে একটা—নাহ, জয়ন্তবাবু ভাবলেন ওঁকে ভয় দেখাচ্ছি!"

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, "জয়ন্ত অলরেডি ভয় পেয়ে গেছে।"

মিঃ বাগ জিভ কেটে বললেন, "সরি! আচ্ছা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি একটু কাজ সেরে নিইগে ততক্ষণ। আর-এক দফা কফিও বলে দিচ্ছি। কর্নেলসায়েব তো ভীষণ কফিভক্ত।"

উনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, "তোমাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন ডার্লিং? অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলে?"

চাপা স্বরে হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বললুম। নৌকোটার কথাও।

শুনে কর্নেল গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "হালদারমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে। তুমি গুলির শব্দ শুনেছ কি?"

"নাহ্।"

"অবশ্য এত দূর থেকে রিভলভারের শব্দ শোনা অসম্ভব। তবে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হল, নৌকোতে ওঁর প্রতিপক্ষের লোক-টোকই ছিল। যদি ওঁর কোনো বিপদ না হয়ে থাকে, শিগগির আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

"উনি কি জানেন আপনিও এখানে এসেছেন?"

"উনি আমাকে আসতে বলেছেন। বনশোভা নার্সারিতে থাকতে বলেছেন।"

"তখন স্টেশন থেকে টেলিফোনে তা-ই বলছিলেন বুঝি?"

"হুঁ।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়ি টানছিলেন। বললুম, "এই বাগভদ্রলোককে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনি লক্ষ করেছেন কি না জানি না, তখন গেটে ক্যাক্টির কথা বলামাত্র উনি যেন চমকে উঠলেন।"

"হুঁ।"

"একটু আগে সাপের ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

"হুঁ!"

"কী খালি হুঁ-হুঁ করছেন? খুলে আলোচনা করুন।"

কর্নেল সেই পাঁচুঠাকুরের মতো ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমি ছোটপুজোর কথা ভাবছি, জয়ন্ত! আগামীকাল প্রত্যূষে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ।"

"আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

"ত্র্যম্বক দর্শনের পুণ্য মিস করা উচিত নয়, ডার্লিং! না, না—আমি মহাদেবের মাথার সাপের মণি-টনির কথা বলছি না। ত্র্যম্বক স্বয়ং মহাদেব।"

আমরা চাপাস্বরে কথা বলছিলুম। এই সময় একটা লোক ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এই লোকটা আগেরবার কফি এনেছিল। কর্নেল বললেন, "এসো হরি! তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করছিলুম!"

হরি ট্রে রেখে সেলাম ঠুকে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল স্যার! বাগসায়েবকে কর্তামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। জিপগাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন বাগসায়েব। গণেশড্রাইভারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। তা গণেশের এদিকে জ্বর। অগত্যা..."

"আচ্ছা হরি, এদিকের গেটের চাবি কার কাছে? একটু গঙ্গার ধারে ঘুরতে যেতুম।"

হরি জিভ কেটে বলল, "এঃ হে! একটু আগে বললে—গেটের চাবি বাগসায়েবের কাছে থাকে। তবে স্যার, আমার মতে, রাতবিরেতে না বেরনোই ভালো। অবস্থা আর আগের মতো নেই। লোকে সন্ধ্যার পর আর বাইরে বেরোচ্ছে না ইদানীং।"

"ভূতপ্রেতের ব্যাপার নাকি?"

হরি মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল, "আজ্ঞে তা-ই বটে! রাতবিরেতে জানলার বাইরে কে খোনাগলায় কী যেন বলে। আমিও শুনেছি।"

"বলো কী? কবে শুনেছ?"

"এই তো গত রাত্তিরে। ভয়ে কাউকে বলিনি।"

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু কী বলে ভূতটা?"

হরি বলার আগে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা?"

"তা-ই বটে, তা-ই বটে!" হরি আড়ষ্টভাবে হাসল। "তবে আমার মনে হয়, উনি বুড়িঠাকরুনের আত্মা। আজ্ঞে স্যার, অপঘাতে মরণ বলে কথা। খিড়কির দোর থেকে আর মাত্তর কয়েক-পা নামলেই মা গঙ্গা। জলে পড়লেই আত্মার উদ্ধার হত। কিন্তু বডি পড়েছিল দোরগোড়ায়।"

কর্নেল বললেন, "তুমি কার কথা বলছ হরি?"

"আজ্ঞে পাঁচুঠাকুরের গিন্নি ছিলেন তিনি। বেজায় দজ্জাল মেয়ে ছিলেন। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। মারা গিয়েও লোককে জ্বালাচ্ছেন।"

"অপঘাতে মরণ বলছ কেন?"

হরি সতর্ক ভঙ্গিতে চাপা স্বরে বলল, "কাউকে যেন বলবেন না স্যার! ভেতর-ভেতর কথাটা সবাই জানে। পাঁচুঠাকুর নেশাভাং করেন। রোজ একভরি আফিং তাঁর চাই। ঠাকরুনের গয়নাগাঁটি, সোনাদানা সব লুকিয়ে বেচে দিতেন। এই নিয়ে দু'জনকার ঝামেলা। শেষে নাকি দেবতার ধন পর্যন্ত বেচতে চেয়েছিলেন পাঁচুঠাকুর। বেগতিক দেখে ঠাকরুন রাতদুপুরে দেবতার ধন লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন। পাঁচুঠাকুর ঘড়েল লোক। তক্কেতক্কে ছিলেন। যে-ই ঠাকরুন বেরিয়েছেন, অমনি পেছন থেকে গলা টিপে ধরে..."

হরি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "কার কাছে শুনেছ এসব কথা?"

"কর্তামশাই আর বাগসায়েব বলাবলি করছিলেন। দয়া করে ওঁদের যেন বলবেন না আমি এসব কথা বলেছি। গরিব মানুষ স্যার! ঘরে একদঙ্গল পুষ্যি।"

"হুঁ।" কর্নেল আস্তে বললেন, "তা হলে দেবতার ধন বেচে দিয়েছেন পাঁচুঠাকুর? কিন্তু দেবতার ধন কিনল কে? কিনলে তো মহাপাপ। তাই না হরি?"

হরি একটু ইতস্তত করে বলল, "আজকাল পাপের ভয় কেউ করে না স্যার। আমার আবার মন্দ..."

বাইরে কেউ হেঁড়েগলায় ডাকল, "হরি! হরি! অ্যাই হোরে!"

হরি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমার মরারও সময় নেই। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই হরি-হরি আর হোরে! পরে বলব স্যার!"

বলে সে বেরিয়ে গেল। বললুম, "দেবতার ধন নিশ্চয় সেই ত্র্যম্বক। কিন্তু কর্নেল, পাঁচুঠাকুর যদি তা কাউকে বেচে দিয়ে থাকেন, তাঁর কাছে তা-ই দাবি করে তাঁর নাতিকে কিডন্যাপ করা হল কেন? উড়োচিঠিটা তাঁকে উদ্দেশ করেই লেখা।"

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, "একটা চিঠি নয়। দুটো।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী করে বুঝলেন দুটো?"

"হালদারমশাই নোটবইয়ে টোকা চিঠিটা দ্বিতীয় চিঠির কপি। কারণ ওতে 'আবার বলা হচ্ছে' এই কথাটা আছে।" কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন। "কিন্তু ঠাকুরমশাইকে দেখে মনে হল, কোনো উড়োচিঠি পাননি এবং নাতিকে গুম করে রাখা হয়েছে, তা-ও জানেন না। আমার অবাক লাগছে এটা।"

"সম্ভবত খুব ধূর্ত লোক। গভীর জলের মাছ।"

কর্নেল হাসলেন। "চিঠিতে 'আদরের নাতি' কথাটা আছে কিন্তু! তা ছাড়া ত্র্যম্বক যে ওঁর কাছেই এখনও আছে, কিডন্যাপার যে বা যারাই হোক, তারা এতে নিঃসন্দেহ। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ

পয়েন্ট, রিকশাওয়ালার কথা শুনে এবং এই নার্সারিতে আসার পর বুঝতে পেরেছি, বিশু কিডন্যাপড হওয়ার কথা এখানে এখনও জানাজানি হয়নি।"

"কর্নেল! পাঁচুঠাকুর বলছিলেন, বিশু কেতোর বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায়। আর ফেরেনি। কে কেতো সেটা জেনে নেওয়া উচিত। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।"

"তার আগে ছোটপুজো ডার্লিং!"

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। পুবের বারান্দায় গিয়ে বসব ভেবে দরজার কাছে গেছি, হঠাৎ আলো নিভে গেল। কর্নেল বললেন, "চুপচাপ ঘরেই বসে থাকো জয়ন্ত। ঠাকরুনের প্রেতাত্মার আবির্ভাব যে-কোনো মুহূর্তে হতে পারে।"

ঘরে-বাইরে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস না থাকলেও এমন কথা শুনে গা ছমছম করা স্বাভাবিক। নিজেকে সাহস দিতে শুকনো হাসি হাসলুম। কিন্তু চেয়ার খুঁজতে গিয়ে শোবার খাটের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। কর্নেল টর্চ জ্বাললেন। হাসতে হাসতে বললেন, "সাবধান জয়ন্ত! প্রেতাত্মা এসব চান্স মিস করে না।"

এইসময় বাইরে কে হেঁড়ে গলায় চেঁচাল, "হরি! মুকুন্দকে বল জেনারেটর চালিয়ে দিক।"

হরি ডাকছিল, "মুকুন্দবাবু! মুকুন্দবাবু।"

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আবার চেঁচামেচি শোনা গেল। এবার অন্যরকম চিৎকার-চেঁচামেচি। তারপর বন্দুকের শব্দ। কর্নেল টর্চ জ্বেলে বেরোলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। অন্ধকার নার্সারিতে এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোর ঝলকানি এবং "চোর! চোর! চোর!" বিকট হাঁকডাক ছুটোছুটি চলেছে।

এতক্ষণে কাছাকাছি কোথাও জেনারেটর চালু হল। আলো জ্বলে উঠল। লনে আমাদের দেখে হরি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, "চোর ঢুকেছিল স্যার! একটা চটের থলে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁটাতার কেটে পাঁচিল টপকে ঢুকেছিল। কী সাহস দেখুন!"

কর্নেল গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, "চটের থলে?..."

চার

নার্সারিতে চোর পড়ার খবর পেয়ে ম্যানেজার বাগসায়েব হন্তদন্ত ফিরে এসেছিলেন রায়গড় থেকে। এসেই প্রথমে গার্ডদের একচোট নিলেন। উত্তর দিকের পাঁচিলের মাথায় কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর ঢুকেছিল। তখনই সেখানটা জোড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। চটের থলেটা পড়ে ছিল যেখানে, সেখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে ক্যাক্টির অজস্র টব। বাগসায়েব ফেরার আগেই কর্নেল থলেটা দেখে এসেছেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর। আস্তে বললেন, "চলো জয়ন্ত, ঘরে গিয়ে বসি।"

বাগসায়েবের হম্বিতম্বি আর ছোটাছুটি দেখে হাসি পাচ্ছিল। ঘরে ঢুকে বললুম, "একেই বলে মশা মারতে কামান দাগা। ওইটুকু একটা চটের থলে দেখে বোঝা যাচ্ছে নেহাত ছিঁচকে চোর।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে টানছিলেন। আমার কথা শুনে বললেন, "কিন্তু তারকাটা চোর!"

"আজকাল এটা কোনো ব্যাপার নয়। আগের দিনে চোরেরা সিঁদকাঠি ব্যবহার করত। এখন তারকাটা প্লাস ব্যবহার করে। হার্ডওয়্যার স্টোরে কিনতে পাওয়া যায়। দামও তত কিছু বেশি নয়।"

"থলেতে কী চুরি করতে এসেছিল বলে তোমার ধারণা?"

"দামি কোনো প্ল্যান্টের কাটিং।"

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে হাসলেন। "ঠিক ধরেছ। এই নার্সারিতে অনেক বিদেশি আর দুষ্প্রাপ্য প্ল্যান্টের কাটিং মজুত রয়েছে। তবে এত ঝুঁকি নিয়ে নার্সারিতে ঢুকেছে যে, সে ওইটুকু থলে এনেছিল কেন, এটাই প্রশ্ন।" বলে একটু চুপ করে থাকলেন কর্নেল। তারপর বললেন, "দ্বিতীয় প্রশ্ন, ওই সময়ই হঠাৎ লোডশেডিং।"

বাইরে জেনারেটরের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এতক্ষণে বন্ধ হল এবং এবার আলো লাল হতে-হতে নিভে গেল। আবার সেই গাঢ় অন্ধকার। তার আধমিনিটটাক পরে উজ্জ্বলতর হয়ে আলো জ্বলে উঠল। বললুম, "কলকাতা হলে অন্তত দু ঘণ্টার আগে কারেন্ট আসত না!"

বাগসায়েব ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে বললেন, "ভারি অদ্ভুত ব্যাপার, কর্নেল!"

কর্নেল বললেন, "মেন সুইচ কেউ অফ করে দিয়েছিল নাকি?"

মিঃ বাগ চমকে উঠে বললেন, "হ্যাঁঃ!"

"চোরকে সুইচবোর্ডের তালা ভাঙতে হয়েছে তা হলে?"

"আপনি দেখেছেন বুঝতে পারছি!"

"নাহ্ মিঃ বাগ! আমার অনুমান।"

মিঃ বাগ অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এর আগেও নার্সারিতে চোর পড়েছে শুনেছি। তাই পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছিলেন সাধুদা। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এবার সুইচবোর্ডের তালা ভেঙে মেন সুইচ অফ করে এবং কাঁটাতারের বেড়া কেটে চোর কী চুরি করতে এসেছিল?"

"সম্ভবত অকালকুষ্মাণ্ড।"

"কী বললেন? কী বললেন? অকালকুষ্মাণ্ড?" মিঃ বাগ হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখেই বললেন, "ওইটুকু চটের থলেতে বড় জোর ওইরকম জিনিসই চুরি করে নিয়ে যাওয়া যায়।"

"আপনার রসিকতার তুলনা হয় না।" মিঃ বাগ দামি বিদেশি সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "যাই হোক, আমি বুঝতে পেরেছি, চোরের সহকারী এই নার্সারিতেই আছে।"

"বাগের ঘরে ঘোগের বাসা আর কি! সরি—বাঘের ঘরে।"

বাগসায়েব আবার একচোট হাসলেন। "একটু রিলিফ পাওয়া গেল। আপনি না থাকলে মেজাজ এখনও কতক্ষণ বিগড়ে থাকত।" বলে একটু ঝুঁকে এলেন কর্নেলের দিকে। চাপা গলায় বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে গণেশ ড্রাইভারকে। সাধুদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিপ ড্রাইভিং আমার এখনও তত সড়গড় হয়নি। গণেশকে ডাকতে পাঠালুম। হরি এসে বলল, গণেশের নাকি জ্বর। ব্যাটাচ্ছেলেকে পুলিশের হাতে তুলে দেব কি না ভাবছি।"

"তার আগে দেখা উচিত, সত্যি-সত্যি জ্বর কি না।"

"ঠিক বলেছেন। দেখে আসি।"

মিঃ বাগ তখনই বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। গঙ্গার দিকের দরজা খুলে বললেন, "এসো জয়ন্ত! এদিকের বারান্দায় বসা যাক।"

বেরিয়ে গিয়ে বললুম, "এই ঠাণ্ডার মধ্যে বসার কোনো মানে হয় না। মার্চের শেষেও এখানে দেখছি শীত চলে যায়নি।"

ছোট্ট বারান্দায় সুন্দর সব নানারকম ক্যাক্টি আর মরসুমি ফুলের টব সাজানো রয়েছে। গেট পর্যন্ত লনের দু'ধারেও পুষ্পসজ্জা, কেয়ারি করা ঝোপ। এদিকটাতেও যথেষ্ট আলো। বেতের চেয়ারে বসে বললুম, "আপনি মিঃ বাগকে অকালকুষ্মাণ্ড বললেন। উনি কথাটা বুঝতে পারেননি।"

"তুমি পেরেছ?"

"হ্যাঁ। সকালে ফোনে রায়সায়েবের সঙ্গে কথা বলার সময় আপনার মুখে শুনেছি। তা ছাড়া সেই অকালকুষ্মাণ্ড নেওয়ার ছলেই আপনি এখানে এসেছেন।"

"হুঁ, একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি।" বলে কর্নেল আঙুল তুললেন একটা টবের দিকে, "ওই দ্যাখো ডার্লিং, অকালকুষ্মাণ্ড!"

বারান্দার কোনার দিকে টবে অজস্র তীক্ষ্ণ কাঁটায় ভরা গোলাকার একটা ক্যাক্টি দেখতে পেলুম। হঠাৎ কর্নেল উঠে গেলেন টবটার কাছে। টর্চের আলো ফেলে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। বললুম, "অতক্ষণ ধরে কী দেখছেন?"

"ফুল ফোটেনি কেন? আশ্চর্য তো!"

"আপনিই বলছিলেন প্রকৃতিতে প্রচুর রহস্য আছে।"

"আছে।"

কর্নেল আরও কিছুক্ষণ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখার পর উঠে এলেন। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললুম, "কী ব্যাপার?"

"তুমি ঠিকই বলেছ। বারান্দায় ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। গঙ্গার ধারে বলেই এদিকটা এত ঠাণ্ডা।"

কর্নেল কথাটা বলেই ঘরের দরজার দিকে ঘুরেছেন এবং আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি, কাছাকাছি কোথাও বিদঘুটে নাকিস্বরে কে বলে উঠল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা! লাফাং চু দ্রিদিম্বা!"

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। উত্তেজিতভাবে ফিসফিসিয়ে উঠলুম, "কর্নেল!"

কর্নেল প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দার নীচে নেমে গেলেন। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। এপাশে-ওপাশে উঁচু গাছপালার আড়ালে অন্ধকার থেকে কে যেন আমাদের দেখছে। এই অস্বস্তিকর অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসেছিল। কর্নেল এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলছিলেন। আর প্রেতাত্মার সাড়া পাওয়া গেল না।

একটু পরে কর্নেল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে মিটিমিটি হেসে বললেন, "গুড লাক, ডার্লিং! রায়গড়ে আসা তা হলে সার্থক হল বলো!"

"গলার স্বরটা আমার কিন্তু মেয়েলি বলেই মনে হল।"

"ঠাকরুনের প্রেতাত্মার গলা। কাজেই মেয়েলি হওয়া স্বাভাবিক।"

"ভূত-প্রেত বলে কিছু থাকতে পারে না।"

"কিন্তু তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলে!"

"আচমকা ওইরকম নাকিস্বরে কেউ উদ্ভুট্টে কীসব বলে উঠলে মানুষ একটু চমকে উঠতেই পারে।"

মিঃ বাগ ফিরে এলেন এতক্ষণে। বললেন, "গণেশের সত্যি জ্বর। তবে জ্বর গায়ে সুইচবোর্ডের তালা ভাঙাটা ওর পক্ষে কঠিন কিছু নয়। গ্যারাজঘরের পাশেই ট্রান্সফর্মার আর সুইচবোর্ড আছে। সাধুদার সঙ্গে পরামর্শ না করে পুলিশে খবর দেওয়া ঠিক হবে না। আবার রায়গড় যেতে হবে। কী ঝামেলা দেখুন তো! আপনার সঙ্গে জম্পেশ করে আড্ডা দেব, তার উপায় নেই। আমার ফিরতে দেরি হলে আপনারা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন। হরিকে বলে যাচ্ছি।"

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, "মিঃ বাগ! একটু আগে আমরা বাইরে কোথাও লাফাং চু দ্রিদিম্বা শুনতে পেয়েছি।"

"কী, কী?" মিঃ বাগ ভুরু কুঁচকে বললেন, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা? আশ্চর্য ব্যাপার তো!"

"হরিও নাকি গত রাতে শুনেছে। আপনাকে বলতে সাহস পায়নি।"

মিঃ বাগ রুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, "সাধুদাও শুনেছিলেন। এমন ভিতু লোক দেখা যায় না। ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না। ক'দিন ধরে বাড়িতে যাগ-যজ্ঞ শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধুম চলেছে। যাই

বলুন কর্নেল, মফস্বলের লোকেরা এখনও বড্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তবে দেখুন, আমাকে উত্যক্ত করতে এলে ভূত হোক আর যে-ই হোক, গুলি করে মারব।"

বলে বাগসায়েব জোরে বেরিয়ে গেলেন। বললুম, "ভদ্রলোক কেমন যেন গোঁয়ার-গোবিন্দ টাইপ।"

"হুঁ! তবে হর্টিকালচার বিদ্যায় এমন এক্সপার্ট আমি এ-পর্যন্ত দেখিনি। বিশেষ করে ক্যাক্টি সম্পর্কে উনি আস্ত এনসাইক্লোপিডিয়া!" কর্নেল স্বগতোক্তি করার মতো মিঃ বাগের প্রশস্তি শুরু করলেন। "কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। ওই বারান্দার একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়িতে কেন ফুল ফোটাতে ব্যর্থ হলেন? পরীক্ষা করে দেখলুম, ফুল ফোটানোর জন্য বেচারা তৈরি। অথচ—এক মিনিট!"

কর্নেল পুবের দরজা খুলে আবার বেরোলেন। আমি চুপচাপ বসে রইলুম। আমার প্রকৃতিবিদ বন্ধুর অজস্র বাতিকের সঙ্গে আমি পরিচিত।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে উনি ঘরে ফিরলেন। মুখে প্রশান্ত হাসি। বললেন, 'ফুল না ফোটার কারণ বুঝতে পেরেছি। সত্যিই প্রকৃতি বড় রহস্যময়ী, ডার্লিং! শুধু বুঝতে পারছি না, এই মূল্যবান অকালকুষ্মাণ্ডটা কেন ওখানে হেলাফেলায় রাখা হয়েছে? কেন?" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চুরুট ধরালেন কর্নেল। চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। আস্তে বলে উঠলেন, "মাই গুডনেস! তা হলে কি চোরের কবল থেকে বাঁচাতেই এমন হেলাফেলা করে রাখা এবং পিছনের দিকের খোলাবারান্দায়? চোর যদি বিশেষ একটা অকালকুষ্মাণ্ড চুরি করতেই আসে, স্বভাবত সে ঢুকবে ক্যাক্টির বাগানে। সেখানেই সে ওটা খুঁজবে। এবং ঠিক তা-ই ঘটেছে। চোর ক্যাক্টির বাগানেই ঢুকেছিল। দৈবাৎ কারও চোখে পড়ায় থলে ফেলে পালিয়ে গেছে। অথচ যেটা সে চুরি করতে এসেছিল, সেটা এখানে থাকার খবর সে জানত না।"

না বলে পারলুম না, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?"

কর্নেল চোখ নাচিয়ে বললেন, "ব্যাপার যাই হোক, ভোরবেলা ছোটপুজো দিতে যাচ্ছি। বিছানা থেকে হিড়হিড় করে টেনে ওঠাব, জয়ন্ত। বাবা ভোলানাথ পুজো দেওয়ার আগেই প্রসন্ন হয়ে বর দিয়েছেন মনে হচ্ছে।"

ভাবনায় পড়ে গেলুম। ভোরে ওঠা অভ্যাস নেই। তা ছাড়া এখানে এখনও শীত চলে যায়নি। কপালে ভোগান্তি আছে মনে হচ্ছে।

রাত দশটা বেজে গেল। তখনও বাগসায়েব ফিরলেন না। হরির তাগাদায় আমরা খেতে গেলুম। খাওয়ার পর হরি আমাদের ঘরে এল বিছানা সাজাতে। মশারি খাটিয়ে দিয়ে সে বলল, "বড্ড মশা হয়েছে ইদানীং। আর-একটা কথা বলি স্যার, রাতবিরেতে যেন বেরোবেন না।"

কর্নেল বললেন, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা?"

হরি সেই রিকশাওয়ালার মতো কপালে হাত ঠেকিয়ে চাপাস্বরে বলল, "দেব্‌তার ধন যতদিন দেব্‌তার কাছে ফেরত না যাচ্ছে, ততদিন ঠাকরুনের আত্মা শান্তি পাবে না।"

"দেবতার ধন গেল কোথায়, হরি?"

হরি ফিসফিস করে বলল, "তখন বলতে-বলতে বলা হল না। আমার সন্দ স্যার, পাঁচুঠাকুর আমাদের কর্তামশাইকেই বেচে দিয়েছে।"

"কেন তোমার এ সন্দেহ হচ্ছে?"

"পাঁচুঠাকুর ইদানীং প্রায়ই কর্তামশাইয়ের কাছে আসত। দু'জনে চুপিচুপি কীসব কথাবার্তা হত। তারপর তো দিদিঠাকরুন রাতবিরেতে বাড়ির আনাচে-কানাচে এসে সাড়া দিতে লাগলেন। অমনই কর্তামশাইয়ের তরাস বাজল। ভয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বুঝুন স্যার! ভয় তো সব্বাই

পেয়েছে। কিন্তু কর্তামশাইয়ের ভয়টা এত বেশি কেন?" হরি একটু হাসল। "কর্তামশাইয়ের বাড়ি রোজ পুজোআচ্চা, অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্তন চলেছে। কিন্তু পাঁচুঠাকুরকে পুজোআচ্চায় ডাকেননি। বুঝুন তা হলে!"

"দেব্‌তার ধন জিনিসটা কী, জানো হরি?"

হরি কপালে ফের হাত ঠেকিয়ে বলল, "বাবার মাথায় থাকেন সাপ, সেই সাপের মাথার মণি।"

"তুমি দেখেছ?"

"না স্যার, শুনেছি।"

হরি চলে গেলে কর্নেল বললেন, "দরজা বন্ধ করে দাও, জয়ন্ত! আর শোনো, হরির কথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন কোরো। রাতবিরেতে বাইরে বেরিও না—যা কিছু ঘটুক। সাবধান!"

কর্নেল হাসিমুখে কথাটা বললেও মনে হল, সত্যিই সাবধান করে দিচ্ছেন আমাকে। দরজা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়লুম। নতুন জায়গায় গেলে সহজে ঘুম আসতে চায় না। তা ছাড়া একটা জমজমাট রহস্যের মধ্যে এসে পড়লে তার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করাও আমার বরাবর অভ্যাস। কর্নেলকে টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছে মাথাচাড়া দেয়। কিন্তু এ এমন এক রহস্য, যার কোনো খেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কখন চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল ঘুমের টানে। হঠাৎ ঘুমটা ছিঁড়ে গেল। বাইরে পুবের বারান্দায় কী খুটখাট শব্দ হচ্ছে। জানলা খোলা আছে। কিন্তু উঠে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার সাহস হল না। শব্দটা থেমে গেলে চুপিচুপি ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!" কর্নেলের নাক ডাকা থামল না। তারপর ঘুম আর আসতেই চায় না।

একসময় কর্নেলের ডাকাডাকিতে চমকে উঠে দেখি, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কর্নেল বললেন, "উঠে পড়ো, ডার্লিং! ছোটপুজো দিতে যেতে হবে। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর শোনো, ব্যাগট্যাগ সব গুছিয়ে নাও। আমরা সম্ভবত আর নার্সারিতে ফিরছি না।"

পাঁচ

বাইরে গাঢ় কুয়াশা জমে আছে। সদর গেট দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটা পোড়ো জমি পেরিয়ে গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধে উঠলুম। তারপর গতরাতে বাইরের সেই সন্দেহজনক শব্দটার কথা বললুম কর্নেলকে। কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন, "চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়ে গেছে বলা চলে। তবে এ চোর অন্য চোর।"

"হেঁয়ালি করার অভ্যাস আপনার গেল না!"

"পুবের বারান্দার সেই অকালকুষ্মাণ্ড টবসমেত উধাও।"

"বলেন কী!"

"জানতুম, টবটা এ-রাতেই উধাও হতে পারে। তাই ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে ওদিকে বেরিয়েছিলুম। দেখলুম, টবটা নেই। যাই হোক, এখন পুজো দিতে যাচ্ছি। আর ও-সব মন্দ কথা নয়। মনকে পবিত্র রাখা উচিত, ডার্লিং!"

হালদারমশাইকে যেখানে বসে থাকতে দেখেছিলুম, তার একটু তফাতে শ্মশানবট। কর্নেলকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলুম। কিন্তু উনি গ্রাহ্য করলেন না। বটতলায় গিয়ে দেখি, অজস্র ঝুরি আর শেকড়বাকড়ে ঢাকা মাটিতে পাথরের টুকরো পড়ে আছে। কোনো পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সম্ভবত। বিশুর কিডন্যাপাররা এই বটগাছের গোড়ায় যে চৌকো পাথরে 'ত্র্যম্বক' রেখে আসতে

বলেছে, কর্নেল সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। পাথরটা বেশ লম্বা-চওড়া। কতকটা বেদির মতো দেখতে। নীচে প্রচুর ছাই পড়ে আছে। সাধুসন্ন্যাসীরা এসে খুনি জ্বেলে বসে থাকেন মনে হল।

চারদিকে কুয়াশা। বটতলায় আবছা আঁধার জমে আছে তখনও। পাথরটা দেখে কর্নেল পা বাড়িয়েছেন, হঠাৎ বটগাছটার আড়াল থেকে দুটো লোক বাঘের মতো কর্নেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি মাত্র হাত তিনেক পিছনে ছিলুম। ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছি। কর্নেল টাল সামলে নিয়ে কী একটা করলেন কে জানে। মাত্রা দু'-তিন সেকেন্ডের ঘটনা। লোক দুটো দু'ধারে ছিটকে পড়ে ককিয়ে উঠল। কর্নেল ডান দিকের লোকটার পিঠে একটা পা চাপিয়ে দিলেন। এবার আমার হুঁশবুদ্ধি ফিরল। বাঁ দিকের লোকটার ওপর লাফ দিতে গেলুম। সে আমাকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। ভাগ্যিস, পাথর বা শেকড়ের ওপর পড়িনি। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি, কর্নেলের হাতে রিভলভার। লোকটার পিঠে পায়ের চাপ দিতেই সে আবার ককিয়ে উঠল। কর্নেল ঝুঁকে তার জামার কলার ধরে টেনে দাঁড় করালেন।

আন্দাজ বছর পঁচিশেক বয়সের এক যুবক। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। পরনে যেমন-তেমন একটা প্যান্ট আর নোংরা শার্ট। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। গলায় একটা তক্তি। খালি পা। কারণ চপ্পল দুটো ছিটকে পড়েছে।

কর্নেল তার কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে বললেন, "নাম কী?"

সে হাত দুটো জোড় করে বলল, "আর কখনও এমন করব না স্যার। এবারকার মতো ছেড়ে দিন।"

"নাম কী?"

"ভু-ভু-ভু..."

"ভুতো?"

"হ্যাঁ স্যার। দয়া করে ছেড়ে দিন স্যার। আর কখনও এমন হবে না। নাক-কান মলছি স্যার!"

কর্নেল তাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চললেন। সে কাকুতি-মিনতি করতে থাকল। শিবমন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। কর্নেল বললেন, "ছোটপুজোর বদলে বড়পুজোই দেওয়া যাবে, জয়ন্ত! কী বলো? বাবা মহাদেবের সামনে একে বলি দেব। কেতো এ-সব কাজে নাকি খুব পাকা। ঠাকুরমশাই বলছিলেন, শোনোনি?"

ভুতো হেঁড়ে গলায় কেঁদে উঠল। "ওরে বাবা! কেতো আমাকে পেলে সত্যি বলিদান দেবে। স্যার! স্যার! আপনার পায়ে পড়ি স্যার!"

স্যার তাকে পায়ে পড়ার সুযোগ দিলেন না। মন্দিরের সেই ফটক দিয়ে আমরা চত্বরে ঢুকলুম। ঢুকেই দেখি, পাঁচুঠাকুর তাঁর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে পলক নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "এ ব্যাটাকে কোথায় পেলেন আপনারা?"

কর্নেল বললেন, "বড়পুজোই দেওয়া যাক তা হলে। কী বলেন ঠাকুরমশাই?"

পাঁচুঠাকুর আকর্ণ হেসে বললেন, "কী রে ভুতো? কেতোকে ডেকে আনি তা হলে?"

ভুতো বেজায় কান্নাকাটি জুড়ে দিল। কর্নেল বললেন, "কেতোকে খুব ভয় পায় মনে হচ্ছে?"

পাঁচুঠাকুর বললেন, "সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। কেতো ওকে পেলে এক্ষুনি বলি দেবে।"

"কেন বলুন তো?"

"কেন, তা কেতোই জানে। চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। যাকগে, পুজোর সময় হয়ে এল। যান, গঙ্গায় চান করে আসুন। আপনিও যান মশাই!" বলে পাঁচুঠাকুর আমাকেও চোখের ইশারায় খিড়কির দরজা দেখিয়ে দিলেন।

আঁতকে উঠে বললুম, "চান করতে হবে নাকি?"

"গঙ্গায় চান না করে এলে পুজো দেবেন কী করে? নিয়ম মেনে চলতে হবে না?"

কর্নেল বললেন, "কিন্তু এই ভুতোর কী হবে? এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। বটতলায় আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে আর একজন ছিল।"

পাঁচুঠাকুর ভুতোকে বললেন, "সঙ্গে কে ছিল রে? সত্যি করে বল। তা হলে ছাড়া পাবি। নইলে খ্যাচাং করে বলিদান হয়ে যাবি। কেতো তক্কেতক্কে আছে।"

ভুতো নাক ঝেড়ে বলল, "ব্যাঙাদা ছিল।"

পাঁচুঠাকুর চোখ কপালে তুলে বললেন, "ব্যাঙা তোর মতো ছিনতাইবাজ হল কবে থেকে? সে তো লাহাবাবুর নার্সারিতে চাকরি করে। ভালো মাইনেকড়ি পায়।"

ভুতো ফোঁস-ফোঁস করে বলল, "তা জানি না ঠাকুরমশাই! মাইরি, বাবা মহাদেবের দিব্যি। শেষ রাত্তিরে আমাকে বাড়ি থেকে ডেকে এনেছিল। এই বুড়ো সায়েবের কাছে কী দামি জিনিস আছে, ছিনতাই করতে হবে। ব্যাঙাদা বলল, তুই জাপটে ধরবি। আমি জিনিসটা ছিনতাই করব।"

পাঁচুঠাকুর গুম হয়ে গেলেন এবার। আস্তে বললেন, "ক'টা বাজল। দেখুন তো মশাই?"

কর্নেল বললেন, "ছ'টা।"

"সময় আছে। আমি কেতোকে ডেকে নিয়ে আসি। এর একটা বিহিত করা দরকার। ব্যাটাকে ছাড়বেন না যেন।" বলে পাঁচুঠাকুর হনহন করে বেরিয়ে গেলেন।

ভুতো আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, "ভুতো! তোমাকে ছেড়ে দেব, যদি একটা কথার সত্যি জবাব দাও।"

ভুতো কান্না থামিয়ে বলল, "বলব স্যার! বাবা মহাদেবের দিব্যি।"

"কেতোর সঙ্গে তোমার কীসের বিবাদ?"

ভুতো ফিসফিস করে বলল, "কেতো লাহাবাবুর নার্সারিতে চুরি করতে যাবে বলেছিল। আমি যেন ওর সঙ্গে থাকি। কিন্তু ব্যাঙাদা আমার মাসতুতো দাদা, স্যার। তাই ভাবলুম, ব্যাঙাদাকে দলে টানতে পারলে ভালো হয়। আমি তো জানতুম না ব্যাঙাদার সঙ্গে কেতোর আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। ব্যাঙাদাকে কথাটা বললুম। অমনই ব্যাঙাদা পইপই করে আমাকে বারণ করল। তারপর এক কেলেঙ্কারি। সেদিনই বিকেলে লাহাবাবু আর ম্যানেজারবাবু পুলিশ নিয়ে কেতোর বাড়ি হাজির। বেগতিক দেখে গা-ঢাকা দিলুম। দারোগাবাবু কেতোকে থানায় নিয়ে গিয়ে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেই থেকে কেতোর আমার ওপর রাগ।"

"গত রাতে নার্সারিতে চোর ঢুকেছিল জানো তো?"

ভুতো পিটপিট করে তাকিয়ে বলল, "ব্যাঙাদা বলছিল। এতক্ষণ কেতোকে ধরতে পুলিশ বেরিয়েছে।"

"তা হলে আর কেতোর ভয় করছ কেন?"

"কিছু বলা যায় না স্যার। এবার কেতো কোথাও লুকিয়ে আছে। ঠাকুরমশাই নিশ্চয় জানেন। তাই ওকে ডাকতে গেলেন।" বলে ভুতো কর্নেলের পা ধরার চেষ্টা করল। "আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।"

কর্নেল তাকে ছেড়ে দিতেই সে খিড়কির দরজা খুলে গুলতির বেগে উধাও হয়ে গেল। পাঁচুঠাকুরও এসে গেলেন তক্ষুনি। মুখটা বেজায় তুম্বো। সঙ্গে কেউ নেই। বললেন, "ব্যাটাটা কই?"

কর্নেল বললেন, "হাত ফসকে পালিয়ে গেল।"

পাঁচুঠাকুর প্রায় ভেংচি কেটে বললেন, "পালিয়ে গেল! আপনার হাতে পিস্তল ছিল। তবু পালিয়ে গেল? খেলনা পিস্তল নাকি?"

"ঠিক ধরেছেন। কিন্তু আপনার কেতো কই?"

"নেই। ওর বউ বলল, গত রাত্তিরে বেরিয়েছে। এখনও বাড়ি ফেরেনি। মরবে হতচ্ছাড়া।"

"আপনার নাতির খবর কী?"

"আছে কোথাও।" পাঁচুঠাকুর তাড়া দিলেন, "যান। চান করে আসুন। পুজোর জোগাড় করি। আর শুনুন, ওই ম্লেচ্ছ বস্ত্র পরে থাকলে তো চলবে না। সঙ্গে ধুতি পট্টবস্ত্রাদি আছে তো?"

"তা তো নেই!"

"ঠিক আছে। কলিতে সবই জলচল। আর দশটা টাকা ধরে দেবেন।"

গতিক বুঝে বললুম, "আচ্ছা ঠাকুরমশাই, কলিতে বিনা স্নানেও কি চলবে না? যদি আর দশটা টাকা ধরে দিই?"

পাঁচুঠাকুর মাথা দুলিয়ে সায় দিয়ে বললেন, "তা হলে অন্তত আচমনটা করে আসুন। হ্যাঁ—হিসেবটা বুঝিয়ে দিই। পুজোর বাকি পাওনা হল গে কুড়ি। বস্ত্রের দশ। চানের বাবদ দশ। একুনে চল্লিশ।"

খিড়কির দরজার নীচেই পুরোনো ঘাট ধাপে-ধাপে নেমে গেছে গঙ্গায়। শ্যাওলা আর ঘাস গজিয়ে আছে। গঙ্গার জলে লাল আভা ছড়িয়ে রয়েছে। ওপারে কুয়াশাঢাকা গাছপালার মাথায় লালচে ছটা। কর্নেল বাইনোকুলারে ওপারটা দেখছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "মাই গুডনেস!"

"কী হল?"

"ওটা দেখছি একটা দহ।"

"তাতে অবাক হওয়ার কী আছে?"

"আছে। কারণ এই ঠাণ্ডা হিম জলে সাঁতার কেটে এপারে আসছেন,—হুঁ, আমাদের হালদারমশাই-ই বটে। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মানুষ। তাতে পুলিশে চাকরি করতেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, শেষ মার্চের এই ভোরবেলা ওঁর সাঁতার কাটার ইচ্ছে হল কেন?"

এতক্ষণে দূরে কালো একটি বস্তুর নড়াচড়া দেখতে পেলুম। বাতাস বন্ধ। তাই জল নিস্তরঙ্গ। বললুম, "কী সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কী আছে? এর আগেও বহুবার হালদারমশাইকে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে দেখেছি। তুমিও নিশ্চয় দেখেছ। কেন? গতবার সেই কাটরার মাঠে তুলারাম দণ্ডীমশাইয়ের ফার্মে কাকতাড়ুয়া রহস্যের কথা ভুলে গেলে?"

আমি কিছু বলার আগেই পিছনে পাঁচুঠাকুরের সাড়া পেলুম। "কী? এখনও আচমন হয়নি?"

কর্নেল বললেন, "সাঁতার কাটা দেখছি ঠাকুরমশাই!"

"অ্যাঁ! সাঁতার কাটা? এদিকটায় অথৈ দহ। কার সাধ্যি সাঁতার কাটে?"

"ওই দেখুন, কালো একটা মুণ্ডু।"

পাঁচুঠাকুর কিছুক্ষণ চেষ্টার পর দেখতে পেয়ে বললেন, "মরবে! এক্কেবারে মারা পড়বে। তা মরুক গে! গঙ্গায় ডুবে ম'লে মোক্ষ। আপনারা আসুন। মাহেন্দ্রযোগ বেশিক্ষণ থাকে না।"

"আপনি পুজোয় বসুন। যাচ্ছি।"

পাঁচুঠাকুর চলে গেলেন। হালদারমশাই কোনাকুনি সাঁতার কেটে আসছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘাটে পৌঁছে গেলেন। উনি ধাপে উঠে বসতে দেখলুম, পরনে প্যান্টশার্ট লেপটে আছে। পায়ে জুতো নেই। মুখ থেকে জল মুছতে থাকলেন। কর্নেল ডাকলেন, "হালদারমশাই!"

"ক্কী?" বলে ঘুরলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। তারপর তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। আবার চোখ দুটো মুছে তাকালেন গুলিগুলি চোখে। "ওটা কেডা? জয়ন্তবাবু না?"

বললুম, "আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না হালদারমশাই?"

"লাগলে আর কী করুম! এট্টু রেস্ট লই। জাস্ট আ মিনিট!"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, তোমার ব্যাগে কাপড়চোপড় আছে। বের করো। আগে তোয়ালেটা!"

হালদারমশাই উঠে এলেন ধাপ বেয়ে। তারপর কোনো কথা না বলে দৌড়ে চললেন ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। উনি উধাও হয়ে গেলে বললুম, "ওঁর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?"

কর্নেল চোখে বাইনোকুলার তুলে ওঁর গতিবিধি দেখতে থাকলেন। একটু পরে বললেন, "অসাধারণ! এই না হলে ডিটেকটিভ? জয়ন্ত, হালদারমশাই শ্মশানবটে প্রকৃত টিকটিকির মতোই উঠে যাচ্ছেন। আই সি! ওঁর কিটব্যাগটা লুকনো ছিল দেখছি।"

পাঁচুঠাকুর এলেন আবার। "বিনি যজমানেই পুজো হয়ে গেল। কই, চল্লিশ টাকা দিন।"

কর্নেল বললেন, "চলুন, দিচ্ছি। আমাদের এক বন্ধু আসছেন। একটু অপেক্ষা করুন।"

পাঁচুঠাকুর বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাই আর-এক প্রস্থ প্যান্টশার্ট পরে কাঁধে কিটব্যাগ ঝুলিয়ে এসে পড়লেন। বাঁ হাতে ভিজে নিংড়ানো কাপড়চোপড়। পায়ে রবারের স্যান্ডেল। মুখে প্রসন্ন হাসি। বললেন, "কর্নেল স্যারের সঙ্গে কনট্যাক্ট করার সুযোগ পাইনি রাত্তিরে। ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলুম। নৌকোয় করে ওই চরে নিয়ে গিয়ে তারপর লোকটা 'আসছি' বলে নিপাত্তা। রাত্তিরে গঙ্গায় সাঁতার কাটার সাহস হল না। তাই দিনের আলো ফুটলে—আরে! ভদ্রলোক গেলেন কোথায়? উনিই তো আমাকে...খাইছে!"

ঘুরে দেখি, পাঁচুঠাকুর নেই। মন্দির চত্বরে ঢুকেও ওঁর পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।

ছয়

হালদারমশাই বিড়বিড় করছিলেন, "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!"

কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই : এখানে এসে মক্কেলের নির্দেশমতো হালদারমশাই পাঁচুঠাকুরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ পাঁচুঠাকুরই দুটো বেনামী চিঠি পেয়ে সেই মক্কেল ভদ্রলোককে অনুরোধ করেছিলেন, নাতিকে যেন উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। হালদারমশাইকে পাঁচুঠাকুর বলেন, তাঁর ধারণা গঙ্গার ওই চরে তাঁর নাতিকে আটকে রেখেছে কারা। সন্ধের মুখে নৌকোয় সেখানে পৌঁছে দেবেন হালদারমশাইকে। তবে চুপিচুপি যেতে হবে। হালদারমশাই শ্মশানবটের ওদিকে অপেক্ষা করবেন। পাঁচুঠাকুর নৌকো ভাড়া করে আনবেন। কথামতো নৌকো এল। পাঁচুঠাকুরও এলেন। তারপর নৌকো চরে পৌঁছলে পাঁচুঠাকুর মাঝিদের অপেক্ষা করতে বলে হালদারমশাইকে নিয়ে চরের জঙ্গলে ঢোকেন। একখানে তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে পাঁচুঠাকুর চলে যান। তারপর আর তাঁর পাত্তা নেই। নৌকোর খোঁজে এসে দ্যাখেন, নৌকোও নেই। কিটব্যাগটা কী ভেবে সঙ্গে নিয়ে যাননি। বটগাছের গুঁড়ির ওপর লুকিয়ে রেখেছিলেন। শুধু টর্চ আর রিভলভার সম্বল। সারারাত চরের জঙ্গলে কী কষ্টে যে কাটান, বলার নয়। ভোরবেলা রিভলভার আর টর্চটা নরম বালিতে পুঁতে রেখে 'জয় মা' বলে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। এখন আবার নৌকো ভাড়া করে ওই জিনিস দুটো আনতে যেতে হবে। কিন্তু কথা হল, পাঁচুঠাকুর কেন এমন অদ্ভুত ব্যবহার করলেন, গোয়েন্দা ভদ্রলোক বুঝতে পারছেন না।

হালদারমশাই কথা শেষ করে পা বাড়ালেন। "মক্কেলকে গিয়ে বলি। একটা নৌকোর ব্যবস্থা করতে হবে।"

"এক মিনিট হালদারমশাই!" কর্নেল বললেন, "আপনার নোটবই!"

"হঃ!" বলে ঘুরে হাত বাড়ালেন ডিটেকটিভ।

কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো ব্যাগ থেকে নোটবইটা বের করে দিয়ে বললেন, "আমার একটা ভুল হয়েছিল। স্বীকার করা উচিত। নোটবইয়ে রায়সাহেবের নাম ঠিকানা টোকা দেখেই আমি ভলটা করেছি। এখন বুঝতে পারছি, আপনার মক্কেল রায়গড়ের সাধুচরণ লাহা।"

"হঃ!" বলে হালদারমশাই হন্তদন্ত চলে গেলেন।

আমি এবার হালদারমশাইয়ের ভঙ্গিতে বললুম, "কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য!"

"আশ্চর্য হওয়ার সময় পরে আরও পাবে, ডার্লিং! পাঁচুঠাকুর আর এবেলার মতো ডেরায় ফিরবেন না মনে হচ্ছে। ততক্ষণে ওঁর ঘরটা একটু দেখা দরকার।" বলে কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর থেকে যে জিনিসটা বের করলেন, সেটা সম্ভবত 'মাস্টার-কি' ওই যন্ত্রটি দিয়ে যে-কোনো সাধারণ তালা খোলা যায়।

জানলাগুলো খোলা ছিল। ঘরের ভেতর একটা সেকেলে প্রকাণ্ড খাট। নোংরা বিছানা পাতা আছে। দেওয়াল-আলমারিতে পাঁজিপুঁথি ধর্মশাস্ত্রের বই ঠাসা। তলার তাকে স্কুলের বই, খাতাপত্তর, অনেক ডটপেন। আলমারির কাচ কবে ভেঙেচুরে গেছে। কোনার দিকে একটা কাঠের সিন্দুক। দড়িতে কিছু কাপড়চোপড় ঝুলছে। বিশুর প্যান্টশার্ট দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বেচারাকে কারা কোথায় আটকে রেখেছে। এখনও অবশ্য প্রায় ৪৫ ঘণ্টা সময় আছে হাতে। এই সময়ের মধ্যে ত্র্যম্বক না পেলে কিডন্যাপাররা তাকে...

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "ওঃ!"

কর্নেল বিশুর খাতাপত্তর ঘাঁটছিলেন। বললেন, "হুঁ, বড্ড মশা!"

"মশা নয়। বেচারা বিশুর কথা ভাবছি।"

কর্নেল খাতাগুলো রেখে খাটের কাছে গেলেন। বালিশের তলা খুঁজলেন, তারপর গদির তলায় হাত ভরলেন। বললেন, "তুমি একটু বারান্দায় যাও, জয়ন্ত! কাউকে আসতে দেখলে জানাবে।"

বারান্দায় গিয়ে নজর রাখলুম। কেউ কোথাও নেই। সেই পাখির খাঁচাটা তেমনই পড়ে আছে জঞ্জালের গাদায়। একটু পরে কর্নেল বেরিয়ে বললেন, "পাঁচুঠাকুর লোকটি সত্যিই বড় অদ্ভুত। হরির কথা ঠিক। উনি লাহাবাবুকে ত্র্যম্বক বেচেছিলেন। রায়সাহেবের কয়েকটা চিঠি থেকে বোঝা গেল, পূর্বপুরুষের দেবতার ধন হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনে রায়সাহেব পাঁচুঠাকুরের ওপর বেজায় খাপ্পা। তাঁরও সন্দেহ, পাঁচুঠাকুরই ওটা কাউকে বেচে দিয়েছেন। ওটা না পেলে এবার পুলিশকে জানাবেন। বেগতিক দেখে ঠাকুরমশাই অগত্যা একটা চাল চেলেছেন মনে হচ্ছে। জয়ন্ত, এখনই আমাদের লাহাবাবুর কাছে যাওয়া দরকার।"

দরজার তালাটা কোনোরকমে আটকে কর্নেল বারান্দা থেকে নামলেন। ফের বললেন, "কুইক! এখানে থাকা আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না।"

রাস্তায় কিছুক্ষণ হেঁটে একটা সাইকেলরিকশা পাওয়া গেল। লাহাবাবুর বাড়ি রায়গড় বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে। মাইকে সঙ্কীর্তনের ঘটা শুনেই বুঝলুম, লাহাবাবুর বাড়ি এসে গেছি। দোতলা বিরাট বাড়ি। ভেতর দিকে সঙ্কীর্তন চলেছে। গেটেই হালদারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "আসুন! আসুন!" বলে সম্ভাষণ করে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। যেন হালদারমশাইয়েরই বাড়ি।

সোফায় ছড়ি হাতে বেঁটে প্রকাণ্ড এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কপালে লাল তিলক। কর্নেলকে দেখে তাঁর মুখে একটু করুণ হাসি ফুটল। বললেন, "এ-সবই

আমার পাপের ফল স্যার! আর বেশি কী বলব? ওই বদমাশ পাঁচুঠাকুরের পেটে এত কুবুদ্ধি তা কি জানতুম?"

একটু চুপ করে থেকে লাহাবাবু বললেন, "আপনার মনে পড়তে পারে। বলেছিলুম, নার্সারিতে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করব। গত শিবচতুর্দশীতে তার ভিত হয়ে গেছে। তারপর ত্র্যম্বক আমার হাতে এল। নার্সারিতে নিয়ে গিয়ে দেবতার ধন যত্ন করে রাখলুম। একটু অসাবধান হয়েছিলুম। দেবতার ধনে কে আর হাত দেবে? ব্যস! রাতারাতি চুরি গেল আলমারি থেকে। অথচ আলমারির তালাও কেউ ভাঙেনি।"

"সে রাতে আপনি নার্সারিতে ছিলেন না?"

"না। যাই হোক, রায়রাজাদের সম্পত্তি। গোপনে কিনেছিলুম। গোপনে শিবমন্দিরেই রাখতুম। চুরি গেলে তাই তা নিয়ে হইচই করিনি। হঠাৎ ওই রাতবিরেতে ভৌতিক উপদ্রব। লোকে বলত। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। সে রাতে আমার ঘরের জানলার বাইরে—দোতলায়, বুঝলেন? একেবারে মেয়েলি গলায় বলছে, লা..."

কর্নেল ওঁর কথার ওপর বললেন, "বলছে, লাহাবাবু আমি বিশুর দিদিমা!"

লাহাবাবু নড়ে বসলেন। "ঠিক, ঠিক। সবাই শুনছে লাফাং চু দ্রিদিম্বা। কিন্তু আমি শোনামাত্র বুঝতে পারলুম কে কী বলছে।" লাহাবাবু চোখ বুজে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করে করজোড়ে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করলেন।

হালদারমশাই 'খাইছে' বলে একটিপ নস্যি গুঁজলেন নাকে।

কর্নেল বললেন, "তারপর কী হল বলুন?"

লাহাবাবু বললেন, "তার পরদিন পাঁচুঠাকুর এসে হাজির। ওর হাতে দুটো বেনামী চিঠি। কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ত্র্যম্বকের টাকা শোধ দেবে কিস্তিতে। ওর নাতিকে বাঁচাতে হবে। বিপদে পড়ে গেলুম। ত্র্যম্বক তো চুরি গেছে। সম্প্রতি কাগজে এই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম। কাটিং রাখা ছিল। চুরি যাওয়া ত্র্যম্বক উদ্ধার করার কথা ভেবেই ওটা রেখেছিলুম। এবার ভাবলুম, ত্র্যম্বক এবং বিশু উভয়কেই ভালোয়-ভালোয় উদ্ধার করা যায় কি না। তাই চুপিচুপি গত পরশু কলকাতা চলে গেলুম। ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য নাম-ঠিকানা কাউকে জানাতে নিষেধ করলুম। কিন্তু তখনও কি জানি, আপনিও একজন আরও পাকা ডিটেকটিভ? এইমাত্র হালদারবাবু সব বললেন।"

হালদারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, "আপনারা কথা বলুন। আমি দেখি, নৌকো পাই নাকি।"

কর্নেল বললেন, "সেই চিঠি দুটো কি আপনি হালদারমশাইকে দিয়েছেন?"

হালদারমশাই বললেন, "না কর্নেল সাব! আমি শুধু শেষ চিঠিটার কপি রেখেছি। আচ্ছা চলি! উইপন হাতে না থাকলে কাজে নামা রিস্কি।"

উনি বেরিয়ে গেলে লাহাবাবু পাঞ্জাবির তলায় ফতুয়ার ভেতরকার পকেট থেকে দু'টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠি দুটো খুলে পড়ার পর বললেন, "হুঁ, শ্রীমান বিশুর খাতা থেকে ছেঁড়া কাগজ। আর হাতের লেখাটাও শ্রীমান বিশুর।"

লাহাবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, "অ্যাঁ! তা হলে দাদু-নাতি মিলে আমার কাছ থেকে ত্র্যম্বক আদায়ের ফন্দি? ওরে বাবা! ছেলেটাকে সবাই যে বিচ্ছু বলে, ঠিকই বলে দেখছি।"

"বিশু হয়তো দাদামশাইয়ের কথা শুনে মজা পেয়েই এমনটা করেছে। তার দেখা যতক্ষণ না পাচ্ছি, ততক্ষণ তাকে দোষী করা উচিত হবে না।" কর্নেল চুরুট জ্বেলে বললেন ফের, "গত রাতে আপনার ফার্মে চোর পড়েছিল শুনেছেন নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ। বাগ রাত্তিরে এসে সব বলল। পাঁচুঠাকুরের স্যাঙাত ওই কেতোর কাজ। বাগ পুলিশকে জানিয়েছে। এর আগেও কেতো চুরির প্ল্যান করেছিল। ক্যাক্টি বা বিদেশি প্ল্যান্টের খদ্দের প্রচুর। আজকাল সবাই গার্ডেনিংয়ের নেশায় পড়ে গেছে। কম দামে পেলে তো কথাই নেই।"

"ব্যাঙা নামে আপনার নার্সারিতে একটা লোক আছে?"

"চোর। এক নম্বর চোর। বাগের অনুরোধে ওকে তাড়াচ্ছি না।"

"বাগসায়েব সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?"

লাহাবাবু হাসলেন, "বাগ আমার ছেলের মতো। আমার ছেলেপুলে তো নেই। ও অবশ্য আমাকে সাধুদা বলে ডাকে। রায়সায়েবকে একজন হর্টিকালচার-এক্সপার্ট দেখে দিতে বলেছিলুম। আমার বয়স হয়েছে আর অত ছোটাছুটি করতে পারিনে। তো..." লাহাবাবু জিভ কেটে উঠে দাঁড়ালেন। "আপনাদের খালিমুখে বসিয়ে রেখেছি। একটু বসুন। গোপাল! হারাধন! কই রে সব? কেত্তনে মেতে আছে, বুঝলেন?"

উনি ডাকতে-ডাকতে ছড়ি খুটখুট করে চলে গেলেন ভেতরে। এতক্ষণে বললুম, "বিশুর হাতে লেখা চিঠি! তা হলে বিশু কিডন্যাপড হয়নি। তাই না কর্নেল?"

কর্নেল এ-কথার জবাব না দিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন, "মাথার মণি হারিয়ে সাপটা এখন পাগল হয়ে উঠেছে। দেখলেই ছোবল দেবে। শুধু বোঝা যাচ্ছে না, কেতো কেমন করে জানল ত্র্যম্বক কোথায় লুকনো আছে? ব্যাঙা তার শত্রু। অতএব নার্সারিতে অন্য কেউ আছে, যে কি না কেতোকে খবরটা পাচার করেছে। এটা ঠিক, সে জানত না জিনিসটা ঠিক কোনখানে কীভাবে লুকনো আছে। শুধু জানত, কোনো একটা ক্যাক্টির মধ্যেই আছে। হয়তো মণিচোরকে দৈবাৎ মণিটা লুকনোর ব্যবস্থা করতে দূর থেকে দেখেছিল। সেই ক্যাক্টিটা ছোট্ট থলেয় ঢোকানো যায়। অথচ তীক্ষ্ণ কাঁটার জন্য চটের পুরু থলে চাই।"

অবাক হয়ে বললুম, "অ্যাঁ?"

কর্নেল দাড়ি নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ!"

"তার মানে সেই অকালকুষ্মাণ্ডটা? সেটা তো আপনি..."

"চুপ। চুপ। দেওয়ালের কান আছে।"

উত্তেজনা চেপে বললুম, "ওক্কে বস।"

লাহাবাবুকে আশ্বাস দিয়ে কর্নেল বেরোলেন। তখন প্রায় ন'টা বেজে গেছে। কর্নেল একটা সাইকেলরিকশা ডাকলেন। বললেন, "রায়রাজাদের শিবমন্দির দর্শনে যাব।"

রিকশায় যেতে-যেতে বললুম, "আবার ওখানে কেন?"

"শ্রীমান বিশুকে খুঁজে বের করা দরকার।"

শিবমন্দির এলাকা এখনও তেমনই নিরিবিলি সুনসান। সাইকেলরিকশাটা চলে যাওয়ার পর কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখে নিয়ে আস্তে বললেন, "পাঁচিলের এপাশে গুঁড়ি মেরে এগোতে হবে। সাবধান।"

কথা না বাড়িয়ে ওঁকে অনুসরণ করলুম। একতলা বাড়ির দিকটায় পাঁচিলে একটা প্রকাণ্ড ফোকর দেখা গেল। সেখানে গিয়ে কর্নেল উঁকি দিলেন। আমিও উঁকি দিলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাঁচুঠাকুর এদিক-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। হাতে একটা ছোট্ট রেকাবি। পুজোর নৈবেদ্য ছাড়া আর কী হতে পারে?

কর্নেল ফোকর দিয়ে ঢুকলেন। আমিও ঢুকলুম। তারপর পা টিপেটিপে হেঁটে মন্দিরের পেছনে চলে গেলুম দু'জনে। চত্বর থেকে মন্দিরের মেঝে প্রায় ফুট পাঁচেক উঁচু। এদিকে একটা ছোট্ট

ঘুলঘুলি। লোহার গরাদ আছে। কর্নেল উঁকি মেরে কিছু দেখার পর চোখের ইশারায় আমাকেও দেখতে বললেন। কর্নেলের মুখে মিটিমিটি হাসি। ঘুলঘুলিতে চোখ রাখতেই দেখলুম, অন্যদিকের ঘুলঘুলি থেকে রোদ ঢুকেছে এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পাতালঘরের মেঝেয় একটা যেমন-তেমন বিছানা পাতা। সেই বিছানায় বসে পাঁচুঠাকুর একটা বছর দশ-বারো বয়সের ছেলেকে আদর করে খাওয়াচ্ছেন। দু'জনের চাপাস্বরে কথাবার্তাও কানে এল।

"আর আজকের দিনটা একটু কষ্ট করে থাক। কাল ভোরবেলা দু'জনে তোর মাসির বাড়ি চলে যাব। দেখি না ত্র্যম্বক দেয় নাকি লাহাবাবু?"

"এখানে আমার আর থাকতে ইচ্ছে করছে না দাদামশাই! বড্ড ভয় করছে।"

"আঃ! কাঁদে না। আমি তো রাত্তিরে তোর কাছে থাকি। না কি? ভয় কীসের?"

"ত্র্যম্বক লাহাবাবু যদি না দেয়?"

"না দিলে রায়সায়েব আমাকে খুন করে ফেলতেন। ওই কেতো হারামজাদাটা কী লাগিয়ে এসেছে ওঁর কানে। না হলে উনিই বা কেমন করে জানবেন?"

"তুমি আমার পাখি উড়িয়ে দিলে কেন বলো?"

"সাধে কি তোকে বোকা বলি? তুই খেয়ে নে। আমি একবার শ্মশানতলা দেখে আসি, ত্র্যম্বক রেখে গেছে নাকি।"

কর্নেল আমাকে টেনে সরিয়ে আনলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, "কুইক! চলে এসো।"

দু'জনে সাবধানে সেই ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলুম। হাঁটতে-হাঁটতে শ্মশানবটের কাছে পৌঁছে কর্নেল বললেন, "তুমি ওই ঝোপের আড়ালে চলে যাও।"

ঝোপের আড়াল থেকে দেখলুম, কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা কালো কাগজে মোড়া ছোট্ট কী একটা জিনিস গুঁড়ির নীচে সেই চৌকো পাথরটার ওপর রাখলেন। তারপর চলে এলেন আমার কাছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি, পাঁচুঠাকুর আসছেন। চঞ্চল চাউনি। পা টিপেটিপে এসে থমকে দাঁড়ালেন। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "জয় বাবা! জয় বাবা!" বলে করজোড়ে চৌকো পাথরটার সামনে এসে ভূমিষ্ঠ হলেন। দেখলুম, দু'চোখে জল গড়াচ্ছে।

কিন্তু যেই দু'হাতে কাগজে মোড়া জিনিসটা উনি তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়েছেন, গুঁড়ির আড়াল থেকে বাগসায়েব বেরিয়ে এলেন। "অ্যাই বিচ্ছু! দে ওটা। নইলে গুলিতে খুলি ছ্যাঁদা করে দেব।"

বাগসায়েবের হাতে রিভলভার। পাঁচুঠাকুর ককিয়ে উঠে মোড়কটা ওঁর হাতে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বটগাছের ডাল থেকে কে বাগসায়েবের কাঁধে পড়ল। বাগসায়েবের রিভলভার থেকে গুলি বেরিয়ে গেল। পাখিরা চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিল। দু'জনে ধস্তাধস্তি চলেছে, পাঁচুঠাকুর সেই সুযোগে কেটে পড়ার তালে ছিলেন। হঠাৎ এক স্যুটপরা স্মার্ট চেহারার ভদ্রলোককে মন্দিরের দিক থেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। পাঁচুঠাকুর তাঁকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "রায়সায়েব! রায়সায়েব! এই নিন আপনাদের ত্র্যম্বক!"

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাল্লো রায়সায়েব!"

রায়সায়েব হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। এতক্ষণে বাগসায়েবের কাঁধে ঝাঁপিয়ে-পড়া লোকটাকে চিনতে পারলুম। আমাদের হালদারমশাই বাগসায়েবের পিঠে চেপে বসে আছেন। বললেন, "ঘুঘু দ্যাখছে, ফাঁদ দ্যাখে নাই!"

কর্নেল বললেন, "ঘুঘু নয় হালদারমশাই! টিয়ে! ওই শুনুন!"

গাছের উঁচু ডালপালার ভেতর থেকে শোনা গেল, "লাফাং চু দ্রিদিম্বা!"

হালদারমশাই ভড়কে গেলেন। অমনই তাঁকে উলটে দিয়ে ধরাশায়ী করে অরিন্দম বাগ ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে উধাও হয়ে গেলেন। হালদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাকড়ো! পাকড়ো!"

কর্নেল বললেন, "ছেড়ে দিন। বাগসায়েবের চাইতে লাফাং চু দ্রিদিম্বা-বলা পাখিটাকে ধরার চেষ্টা করুন।"

পাঁচুঠাকুর আকর্ণ হেসে বললেন, "আমার নাতি ওই বুলি শিখিয়েছিল স্যার। লাহাবাবুকে ভয় দেখিয়ে ত্র্যম্বক আদায় করতে চেয়েছিল। তবে দোষটা আমারই।"

কর্নেল বললেন, "এখন আপনি নাতিকে মন্দিরের পাতালঘর থেকে বের করে আনুন। বেচারা বড় মুষড়ে পড়েছে।"

রায়সায়েব বললেন, "এটা আমার পূর্বপুরুষের ধন, কর্নেল! একে বলে ক্যাটস আই। বৈদূর্যমণি। কেতোকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। দেখি, ওকে বাঁচানো যায় কি না।"

পাঁচুঠাকুর দৌড়ে মন্দিরের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশুকে বের করে আনলেন পাতালঘর থেকে। বিশু বেরিয়ে এসে শিস দিতেই টিয়াপাখিটা ওর কাঁধে এসে বসল। বিশু খিকখিক করে হেসে বলল, "লাহাবাবু খুব ভয় পেয়েছিল। ওকে ভয় দেখাতেই পাখিটাকে শিখিয়েছিলুম, 'লাহাবাবু, আমি বিশুর দিদিমা!' লোকে ভাবত লাফাং চু দ্রিদিম্বা।"...

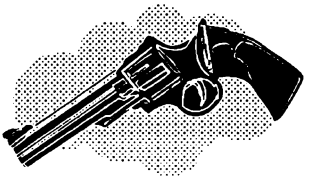

বলে গেছেন রাম শন্না

সেদিন কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের জাদুঘর-সদৃশ ড্রয়িংরুমে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেলুম। বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ বেজায় গম্ভীরমুখে কোনার দিকে বসে আছেন এবং ভুরু কুঁচকে জানালার বাইরে কার উদ্দেশে বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। ওঁর ঋষিতুল্য সাদা দাড়িতে একটা কালো চকরাবকরা প্রজাপতি নিশ্চুপ বসে আছে, নিশ্চয় ওঁর সংগ্রহশালার কোনো দুর্লভ প্রজাতি। কিন্তু কর্নেলের এ-ব্যাপারে কোনো দৃকপাত নেই।

ওই জানালার বাইরে এক বিশাল নিমগাছ। সেখানে ঝাঁকে-ঝাঁকে শীতের কুচকুচে কালো কাক তুমুল চ্যাঁচামেচি করছে। সেটাই কি আমার বৃদ্ধ বন্ধুর বিরক্তির কারণ? উনি কি ওদের শাপমন্যি করছেন? করারই কথা। ওই কদাকার পাখিগুলো ছাদের যত্নলালিত প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডের দুষ্প্রাপ্য অর্কিড এবং ক্যাকটাসের ওপর প্রায়ই হামলা করে।

'গুড মর্নিং' সম্ভাষণের জবাব না পেয়ে একটু ইতস্তত করার পর সোফায় বসে পড়লুম। একটু পরে ষষ্ঠীচরণ নিঃশব্দে কফির পেয়ালা রেখে গেল। তার মুখখানাও বেশ তুম্বো। অনুমান করলুম —তাহলে নির্ঘাত এই সুন্দর শীতের সকালে প্রভু-ভৃত্যে কোনো মনকষাকষি হয়ে থাকবে এবং প্রভু-ভদ্রলোক পেয়ারের ভৃত্যের উদ্দেশেই গোপনে শাপান্ত করছেন।

কিন্তু কী করে থাকতে পারে ষষ্ঠীচরণ? কোনো প্রজাপতির ঠ্যাং ভেঙে ফেলেছে? নাকি টোরা দ্বীপ থেকে সংগৃহীত তিনপেয়ে অলুক্ষুণে বাদুড়টির খাঁচা খুলে দিয়েছে? যতদূর জানি, ষষ্ঠী ওই কিম্ভূত স্তন্যপায়ী উড়ুক্কু জন্তুটিকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না।

কফিতে চুমুক দিয়ে আড়চোখে দেখলুম কর্নেল এবার টেবিলের দিকে ঝুঁকে কী যেন লিখছেন। মিনিট দুই পরে উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন এবং পায়চারির ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তখন বললুম,—ষষ্ঠীচরণটা বড্ড বাজে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গলার ভেতর বললেন,—ষষ্ঠীর চেয়ে বাজে লোক জগমোহন বোস।

—জগমোহন আবার কে?

কর্নেল একটা ভারী শ্বাস ছেড়ে বললেন,—আসলে লোকটা প্রচণ্ড অর্থপিশাচ। দেখো জয়ন্ত, টাকার চেয়ে দামি জিনিস হল মুখের কথা। কথা দিয়ে যে কথা রাখে না তার মতো পাপী আর কে?

—ঠিক, ঠিক। কিন্তু কী কথা দিয়ে কথা রাখেনি আপনার এই জগমোহন?

দুঃখিত স্বরে কর্নেল বললেন,—আগেও লোকটা ঠিক এরকম করেছিল। এম্মানুয়েল দ্য সামসার লেখা 'দা ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা অফ ক্রিসো আইল্যান্ডস' বইটার দরদাম ঠিক করে এলুম। পরদিন আনতে গিয়ে শুনি, বেশি দাম পেয়ে কাকে বেচে দিয়েছে। ১৭৮৪ সালের বই। অতি দুষ্প্রাপ্য। আমার ক্ষোভের কারণ শুধু তাই নয়, জগমোহন দাঁত বের করে হাসছিল। ভাবতে পারো?

সহানুভূতি দেখিয়ে বললুম,—ভীষণ অন্যায়।

ফোঁস করে ফের শ্বাস ছেড়ে কর্নেল বললেন,—তুমি কি এই প্রবাদ শুনেছ ডার্লিং? যত হাসি তত কান্না—বলে গেছেন রাম শন্না।

—শুনেছি। সত্যি তো হাসি ভালো নয়। জগমোহন কেঁদে কূল পাবে না পরে।

কর্নেল বললেন,—রাম শন্না অর্থাৎ রামশংকর শর্মা ১৮৫৯ সালে 'আত্মচরিত' নামে নিজের জীবনী লেখেন। খুব রোমাঞ্চকর তাঁর জীবন। কম বয়সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে জাহাজে সি-বয়ের চাকরিতে ঢোকেন। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। বৃদ্ধ বয়সে নদীয়ার গ্রামে ফিরে পৈতৃক ভিটেতে প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ হয়। রামশংকর গোপনে বিদ্রোহীদের অর্থসাহায্য করতেন। তার ফলে ইংরেজ শাসকদের কোপে পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ফাঁসিসেলে থাকার সময় তিনি ওই আত্মচরিতখানি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সরকারের অনুমতি নিয়ে তাঁর ভাই শ্যামশংকর বইটি ছেপে বের করেন। বইটি সত্যি মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য। জগমোহনকে কিছুদিন যাবত তাগিদ দিচ্ছিলুম, বইটি যদি জোগাড় করতে পারে।

বাধা দিয়ে বললুম,—জগমোহনের কি বইয়ের দোকান আছে?

—হুঁ। কলেজ স্ট্রিটে গেলে দেখতে পাবে, সাইনবোর্ডে লেখা আছে : 'হারানো বই'। ঘুপচি ঘরের ভেতর আগাপাশতলা পুরোনো বইতে ঠাসা। দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। ফুটপাথ থেকে কথা বলতে হবে। তবে জগমোহনকে তুমি পুরোপুরি দেখতে পাবে না। বইয়ের গাদার ফাঁকে ওর নাকটুকু ছাড়া আর কিছু চোখে পড়বে না। শরীরের বাকি অংশ দেখতে হলে তোমাকে টাকা বের করতে হবে। তখন দেখবে বইয়ের সুড়ঙ্গ থেকে ফ্যাকাশে একটা হাতের তালু বেরিয়ে আসছে।

কর্নেল করুণ হাসলেন। ফের বললেন,—গতকাল সন্ধ্যায় সে ফোনে বলল : শিগগির চলে আসুন। বইটা পাওয়া গেছে। কিন্তু এদিকে হতচ্ছাড়া ষষ্ঠী এমন কীর্তি করে বসে আছে যে তখন আমার মরবারও ফুরসত নেই। পাগল হয়ে খুঁজছি।

—কী?

—বৈজ্ঞানিক নাম হল ভ্যানেসা আর্টিসি। বাংলায় বলতে পারো কাছিম-প্রজাপতি। কারণ দূর থেকে দেখলে মনে হবে লিলিপুট কাছিম। উড়লেই কিন্তু ঝলমলে পরী। আমার বিশ্বাস, নচ্ছার ষষ্ঠী ওটাকে ওড়াতে চেয়েছিল। অমনি হাত ফসকে পালিয়েছে। ওঃ জয়ন্ত! কী কষ্ট করে না ওটা জোগাড় করে এনেছিলুম। তুমি জানো, এই শীতে ওদের ঘুমোবার সময়! বেচারাকে ঘুম থেকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে ব্যাটাচ্ছেলে ষষ্ঠীচরণ...

ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—রাম শন্নার বইটা আর পাবেন কি না জানি না, তবে আপনার প্রজাপতিটা আপনি পাবেন—যদি স্থির হয়ে একটু দাঁড়ান।

ওঁকে ভীষণ চমকে দিয়ে ওঁর দাড়ি থেকে খপ করে প্রজাপতিটা ধরে ফেললুম। কর্নেল বিস্ময় ও আনন্দে এক চিক্কুর ছেড়ে আমার হাত থেকে প্রিয় প্রজাপতিটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে দৌড়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—ডার্লিং! এবেলা তোমার লাঞ্চে নেমন্তন্ন।

কিছুক্ষণ বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ যেন শিশু হয়ে গেলেন। ষষ্ঠীচরণকে ক্ষমা করে দিলেন। মুখ টিপে হেসে সে ঝটপট ফের দুপেয়ালা কফি এবং প্লেটভর্তি স্ন্যাক্স রেখে গেল। কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, এত হাসি হয়তো ভালো না। কারণ রাম শন্না বলে গেছেন, যত হাসি তত কান্না।

কর্নেল বললেন : হ্যাঁ—জগমোহনের আচরণে সত্যি দুঃখ পেয়েছি, জয়ন্ত। কাল রাত নটায় দোকান বন্ধ করার সময় ফোন করে বলেছে, আমি যাইনি বলে অন্য এক খদ্দেরকে বইটা বেচে দিয়েছে। দেখো ওর কাণ্ড। সন্ধ্যা সাতটায় বইটা পেয়েছে বলে খবর দিল। তার দু'ঘণ্টা পরে জানাল, অন্য একজনকে বেচে দিয়েছে। আবার সেই সঙ্গে ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসি।

—কী আছে বইটাতে যে, এত আফসোস হচ্ছে আপনার?

কর্নেল হঠাৎ কোনার সেই টেবিলটার দিকে উঠে গেলেন। তারপর একটুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ফিরলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে একটুখানি বিড়বিড় করার পর বললেন,—আচ্ছা জয়ন্ত, এমন পাঁচটা পাখির নাম করো তো, যা ক অক্ষর দিয়ে শুরু।

ভেবে নিয়ে বললুম,—কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা...

—খাসা জয়ন্ত, খাসা! দিশি মতে ক অক্ষর খুব পয়মন্ত। ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর। হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণের নাম এই অক্ষর দিয়ে শুরু। ভক্ত প্রহ্লাদের গল্পে আছে, পাঠশালায় বালক প্রহ্লাদ ক পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেলত। তো জয়ন্ত, তুমি যে পঞ্চপাখির নাম বললে,—প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপিতে তারা ছিল পাঁচটি পবিত্র শব্দের প্রতীক। স্যাটর, আরেপো, টেনেট, অপেরা, রোটাস। মিশরে রোমানদের রাজত্বকালে এই শব্দগুলো দিয়ে এক আশ্চর্য ধাঁধা বানানো হয়েছিল। এই দেখো।

তাহলে তখন আমার বিজ্ঞ বন্ধু কাগজে এই ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কাগজটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলুম। তাতে লেখা আছে :

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

চুপ করে আছি দেখে কর্নেল বললেন,—কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ছে না?

—হ্যাঁ। যেদিক থেকে যে অক্ষর ধরে পড়ি, পাঁচটা একই শব্দ পাচ্ছি। মিশরীয়রা মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত সাজিয়েছে তো!

—শুধু তাই নয়। ছকটা চারদিকে SATOR শব্দ দিয়ে ঘেরা। রোমানরা একে বলত Cirencester Word Square এবং এ নাকি এক রহস্যময় শব্দবর্গ। সম্ভবত খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে প্যাপিরাসে মিশরীয় চিত্রলিপিতে এই শব্দবর্গ লেখা হয়। উনিশ শতকে এটি উদ্ধার করা হয়। হিড়িক পড়ে যায় এই ধাঁধার জট ছাড়াতে। আপাতদৃষ্টে রোমান ভাষায় শব্দগুলো পর পর রেখে মানে করলে দাঁড়ায় : The Sower Arepo holds the wheels carefully. অর্থাৎ সোজা কথায় : 'আরেপো নামে একটা লোক শস্যের বীজ ছড়ানোর সময় বীজ ছড়ানো যন্ত্রের চাকাগুলো সাবধানে ধরে থাকে।' কিন্তু এ কথায় কী বলতে চাওয়া হয়েছে? নানা জনে নানা মানে বের করলেন। তারপর ১৮৪৭ সালে এক ইংরেজ আবিষ্কার করলেন একটা অদ্ভুত জিনিস। সিন্দুকের ভেতর পাঁচটা চামড়ার মোড়ক। মোড়কের ভেতর একটা করে প্রকাণ্ড পেরেক। আর মোড়কগুলোর গায়ে রোমান হরফে লেখা আছে SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS। প্রতিটি পেরেকে নাকি রক্তের দাগ এবং রোমান ভাষায় কিছু খোদাই করা বাক্য। ইউরোপে আরও হইচই পড়ে গেল। পণ্ডিতরা একবাক্যে রায় দিলেন, তাহলে এই হচ্ছে সেই পাঁচটা পেরেক, যা বিঁধিয়ে যিশু খ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ভ্যাটিকানে যিশুর পবিত্র রক্তমাখা পেরেকগুলো রাখার আয়োজন হল। বিশেষ জাহাজ গেল সেই উদ্দেশে। কিন্তু ফেরার পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজটা ডুবে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগে। ব্যস, সেখানেই এই ঘটনার শেষ।

বললুম,—তাহলে বোঝা যাচ্ছে শব্দগুলো পাঁচটা পেরেকের নাম। কিন্তু এতকাল পরে ওগুলো আপনার মগজে বিঁধিয়ে দিল কে?

—রামশংকর শর্মা ওরফে রাম শন্না।

—সে কী!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—গতকাল ভৈরবগড় রাজবাড়িতে ওঁদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে বইটা দেখি। ২০৪ পৃষ্ঠার বই। খুব জীর্ণ অবস্থা। একরাতেই পড়ে শেষ করি। এক অসাধারণ বাঙালি অ্যাডভেঞ্চারিস্টের আশ্চর্য কীর্তিকলাপ। কিন্তু এক জায়গায় রামশংকর লিখেছেন : ত্রিনিদাদের গ্রামে বাস করার সময় ঝড়জলের রাতে একজন রুগ্ন স্প্যানিশ পাদ্রি তাঁর ঘরে আশ্রয় নেন। শেষরাতে তিনি মারা যান। তাঁর আলখাল্লার মধ্যে চামড়ার একটা মোড়ক ছিল। স্থানীয় গির্জায় পাদ্রির জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়ার আগে কৌতূহলবশে রামশংকর মোড়কটা খোলেন। তার ভেতর ফুটখানেক লম্বা কালো মোটা একটা লোহার পেরেক ছিল, তার গায়ে রোমান হরফে কীসব লেখা ছিল। পেরেকটাতে একটুও মরচে ধরেনি এবং আশ্চর্য ব্যাপার, তাতে রক্তের দাগ ছিল। চামড়ার মোড়কেও রোমান হরফে লেখা ছিল SATOR; কী ভেবে ওটা রামশংকর ফেরত দেননি। পরে এক বিশপের কাছে কথাটার মানে জিজ্ঞেস করে রহস্যটা টের পান। তাহলে জাহাজডুবির সময় অন্তত একটা পেরেক কেউ বাঁচাতে পেরেছিল—হয়তো সেই রুগ্ন পাদ্রিই।

জিজ্ঞেস করলুম,—রাম শন্না কী করলেন পেরেকটা?

সেটাই প্রশ্ন। আত্মচরিতে কোথাও সেকথা লেখা নেই। এমনকি, পরে ওটার উল্লেখ পর্যন্ত নেই।—কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে বললেন, বইটা রাজাবাহাদুরকে উপহার দিয়েছেন রামশংকরেরই এক বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্জে। খুব দুষ্প্রাপ্য বই। সঙ্গে মাইক্রোফিল্মের সরঞ্জাম ছিল না। ভাবলুম সময়মতো এসে মাইক্রোফিল্ম কপি করে নেব। তো আমার বরাত। কদিন আগে রাজাবাহাদুর ট্রাংককলে জানালেন, বইটা চুরি গেছে। তাঁর সন্দেহ, রাজবাড়ির আশ্রিত এক ভদ্রলোকের জুয়াড়ি নেশাখোর ছেলে হরিসাধনই একাজ করেছে। কারণ ইতিপূর্বে তাঁর লাইব্রেরি থেকে কিছু দুষ্প্রাপ্য বই চুরি গেছে।

—তাই আপনি কলেজ স্ট্রিটে জগমোহনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন?

—তা তো বটেই! বইটা ফেরত পেলে রাজাবাহাদুর খুশি হতেন, আমারও মাইক্রোফিল্ম কপি হয়ে যেত।

—এবং পেরেক-উদ্ধারে অবতীর্ণ হতেন!

আমার মন্তব্য শুনে গোয়েন্দাপ্রবর একটু হাসলেন। —ব্যাপারটা বোধ করি অত সহজ নয়, ডার্লিং! তবে আত্মচরিতের পরিশিষ্ট অংশটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, কথাগুলোর মধ্যে কী যেন ইঙ্গিত আছে। তো...

ষষ্ঠীচরণ এসে বলল,—এক ভদ্রলোক এয়েছেন! খুব হাঁফাচ্ছেন। চোখ-মুখ লাল হয়ে রয়েছেন।

কিন্তু ভদ্রলোক অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে আমার পাশে ধপাস করে বসে পড়লেন। ষষ্ঠীচরণ কড়াচোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোকের গড়ন নাদুসনুদুস। পরনে দামি স্যুট। হাতে ব্রিফকেস। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। পুরু কাঁচাপাকা গোঁফ আর মাথায় অল্প টাক আছে। রুমালে মুখ ঘষে বললেন,—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার! দু'লক্ষ টাকার মাল সাপ্লাইয়ের অর্ডার বাতিল হতে চলেছে! আমায় বাঁচান!

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে লক্ষ করছিলেন ভদ্রলোককে। বললেন,—কে আপনি?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামদুলাল সিনহা। আরবমুলুকে ইলেকট্রনিক গুডস রফতানির কারবার আছে। স্যার, পার্ক স্ট্রিটে আমার সিনহা ট্রেডিং কোম্পানির পাশের চেম্বারে আপনি যাতায়াত করেন।...

—হুঁ, ডক্টর বৈদ্য আমার বন্ধু।

—তিনিই পরামর্শ দিলেন আপনার কাছে আসতে।

—কিন্তু সাপ্লাই অর্ডার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে আমি কী করতে পারি?

—না স্যার, না! সেজন্য আসিনি। একখানা বই চুরি গেছে।

ভুরু কুঁচকে তাকালেন গোয়েন্দাপ্রবর। —বই? কী বই?

এক মিনিট স্যার! বলছি। —রামদুলালবাবু ব্রিফকেস খুলে একটুকরো কাগজ বের করলেন। কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন, এই দেখুন বইটার নাম-টাম সব লেখা আছে। কলেজ স্ট্রিটের জগমোহন বোস আমার সম্পর্কে বেয়াই হন। তাঁকে বলে রেখেছিলুম বইটার জন্য। কাল সন্ধ্যাবেলা উনি ফোন করলেন, বইটা পাওয়া গেছে। পাঁচশো টাকার এক পয়সা কমে হবে না। পার্টি দাঁড়িয়ে আছে বই নিয়ে। দু-লাখ টাকার ডিল স্যার! দৌড়ে গেলুম টাকা নিয়ে।

—দাঁড়ান! এই হাতের লেখা কার?

—যাঁকে প্রেজেন্ট করতুম, তাঁর স্যার। ওনার মাধ্যমেই তো অর্ডারটা পেয়েছি স্যার!

—ইংরেজিতে লেখা কেন?

—উনি যে বাংলা জানেন না স্যার!

—কী নাম?

—এক রোডরিগ। গোয়ার লোক স্যার! থাকেন বোম্বেতে।

—উনি বাংলা বই কী করবেন?

রামদুলালবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—তা তো জানি না স্যার! ক'দিন আগে বোম্বে গেলুম, তখন এই কাগজে লিখে দিয়ে বললেন, বইটা জোগাড় করে দিলে দু'লাখ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবেন।

—বেশ। এবার বলুন—বইটা কীভাবে চুরি গেল?

রামদুলালবাবু বললেন,—এক গেলাস জল খাব স্যার।

ষষ্ঠীচরণ ভেতরের পর্দা তুলে দৃশ্যটা উপভোগ করছিল। কর্নেল বলার আগেই জল দিয়ে গেল। রামদুলালবাবু জলটা ঢকঢক করে খেয়ে রুমালে মুখ মুছে বললেন,—বইটা অফিসেই টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বাড়ি গিয়েছিলুম। অফিসে কিছু কাজ ছিল। সারতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। আজ সওয়া বারোটার ফ্লাইটে বোম্বে যেতুম বইটা সঙ্গে নিয়ে। অফিসের কিছু কাগজপত্রও নেওয়ার দরকার ছিল। তাছাড়া থাকি সেই বেহালায়। ভেবেছিলুম, যাওয়ার পথে অফিস হয়ে সব নিয়ে যাব। তো অফিসে এসে দেখি, বইটা নেই। তন্নতন্ন খুঁজে অফিসের সব্বাইকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিশ পেলুম না।

—ড্রয়ারে তালা দেওয়া ছিল?

—ঠিক খেয়াল হচ্ছে না স্যার! এসে দেখলুম তালা দেওয়া নেই। ড্রয়ারের তালা কিন্তু ভাঙা নেই।

—চাবি আপনার কাছে থাকে তো?

—হ্যাঁ স্যার! তবে অফিসের চাবি দারোয়ানের কাছে থাকে। কিন্তু দারোয়ান কেন বই চুরি করবে?

—অফিসে রাতে দারোয়ান ছাড়া আর কে থাকে?

রামদুলালবাবু চমকে উঠলেন।—আর কেউ থাকে না। তবে গত রাতে... স্যার! তাহলে কি সেই লোকটাই?

—কোন্ লোকটা?

—রোডরিগ সায়েবের রিপ্রেজেন্টেটিভ। কাল বিকেলে বোম্বে থেকে ভদ্রলোক এসেছিলেন। কার্ড দেখালেন। বললেন, রাত্তিরটা থেকে গৌহাটি যাবেন ভোরের ফ্লাইটে। আমি বললুম, তাহলে কষ্ট করে হোটেলে গিয়ে লাভ কী? অফিসে দুখানা ঘর—মাঝখানে পার্টিশান। ওঁকে পাশের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। সকালে অফিসে এসে দারোয়ানের কাছে জিজ্ঞেস করলুম। বলল, —ভদ্রলোক ভোরে চলে গেছেন।

—কী নাম?

একটু ভেবে নিয়ে রামদুলালবাবু বললেন,—কী যেন—আর মৈত্র, নাকি এস মৈত্র। তবে স্যার, অবিশ্বাস করব কেমন করে? রোডরিগ সায়েবের কত রিপ্রেজেন্টেটিভ তো মাঝে-মাঝে কলকাতা আসে। আমার অফিসে রাত কাটিয়ে যায়।

—কেমন চেহারা?

—ছিপছিপে গড়ন। ফর্সা রং। মুখে দাড়ি।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে। আপনি এখন আসুন। আমি দেখছি।

রামদুলালবাবু কর্নেলের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন,—আমার সাংঘাতিক ক্ষতি হবে স্যার, বইটা না পেলে। বেয়াই বলেছে ও বই মাথা ভাঙলেও আর পাওয়া যাবে না কোথাও। মাত্র ওই একটা কপি ছিল। তাছাড়া, আমি আবার বেয়াইয়ের দোকানে গিয়েছিলুম স্যার! সেখান থেকেই আসছি। জগমোহন বোস একই কথা বলল।

আরও কিছুক্ষণ সাধাসাধি করে রামদুলালবাবু বিদায় নিলেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললুম,—জগমোহন এর পেছনে নেই তো? হয়তো বইটার আরও শাঁসালো খদ্দের জুটে গেছে।

কর্নেল বললেন,—অনেক ক্ষেত্রে জগমোহন বইচোরের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু এ-ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো। রোডরিগ নামে একটা লোকের এ বই কেন দরকার হল! জয়ন্ত, সময় আছে তোমার?

—আজ আমার অফ-ডে। কেন?

—চলো তো একবার কলেজ স্ট্রিট ঘুরে আসি।

দুই

কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে প্রচণ্ড ট্রাফিক জ্যাম। লোকে লোকারণ্য। আমার গাড়ি আটকে গেল জটে। মিছিল কিংবা পথসভা নাকি? এক পথচারীকে জিজ্ঞেস করলুম,—কী ব্যাপার দাদা?

দাদা-ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন,—আর বলবেন না মশাই! দিনে-দিনে এ হচ্ছেটা কী? প্রকাশ্য দিবালোকে একগাদা লোকের চোখের সামনে খুনখারাপি! উঃ আমার মাথাটা কেমন করছে। স্ট্রোক না হলে বাঁচি।

আরেক পথচারী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,—কে খুন হল? কোথায় খুন হল?

—ওই যে, দেখুন গে না স্বচক্ষে। একটা মুখোশপরা লোক বইয়ের দোকানদারকে গুলি করে পালিয়েছে।

পাশে দাঁড়িয়ে পেন বেচছিল এক হকার। সে মন্তব্য করল,—জগাইদাটা মরবে আমি জানতুম। কার বই চুরি করে কাকে বেচত। দেখেশুনে ওর দোকানের সেলসম্যানগিরি ছেড়ে রাস্তায় নেমেছি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কর্নেল গাড়ি থেকে মুখ বের করে দেখে বললেন,—জগাইদা মানে জগমোহন মনে হচ্ছে, জয়ন্ত! ওর দোকানের সামনেই ভিড়টা বেশি দেখছি। তুমি গাড়িটা কাছাকাছি রেখে অপেক্ষা করো। আসছি।

এতক্ষণে আমার পিলে চমকাল। বললুম,—সর্বনাশ! জগমোহন খুন হয়ে গেল তাহলে?

কর্নেল নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেলেন। পেনওয়ালা হকার আমার কথাটা শুনতে পেয়েছিল। বলল,—হ্যাঁ স্যার! নাকি জিপগাড়ি চেপে একটা লোক এসেছিল। এসেই টিস্যুম-টিস্যুম করে দুই গুলি!

লোকটা আমার দিকে তাক করছিল কয়েকটা কলম নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ ট্রাফিকজট খুলতে শুরু করল। হর্নের শব্দে কান ঝালাপালা হতে থাকল। বাঁ-পাশে খালি পেয়ে একটু এগিয়ে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকলুম।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, গোয়েন্দাপ্রবর আসছেন। এসে হাসতে-হাসতে বললেন,—চলো! ফেরা যাক!

উনি গাড়ির ভেতর ঢুকে আরাম করে বসলে, বললুম,—হাসছেন যে? বডি দেখলেন—নাকি নিয়ে গেছে হাসপাতালে?

—কার বডির কথা বলছ ডার্লিং? জগমোহনের?

—হ্যাঁ। আবার কার?

লোকটা অসম্ভব ধূর্ত। —কর্নেল চুরুট ধরালেন। গাড়ি মোড় ঘুরে এবার মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছেছে। কর্নেল বললেন,—তবে একথা সত্যি যে একটা মুখোশধারী লোক এসে ওর দোকানে হানা দিয়েছিল। তারপর ফটফট আওয়াজও শোনা গেছে। কিন্তু জগমোহন বহাল তবিয়তেই আছে।

আশ্বস্ত হয়ে বললুম,—তাহলে খুব জোর বেঁচে গেছে বেচারা।

খুব ভয় পেয়ে গেছে জগমোহন।—কর্নেল হাসতে থাকলেন। আমাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বলল, ভাগ্যিস বইয়ের আড়ালে ছিল সে, নইলে রক্তারক্তি হয়ে পড়ে থাকত।

—কিন্তু এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! প্রথম চোটে গুলি ফসকেছে বলে বারবার ফসকাবে না।

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। চোখ বুজে সিটে হেলান দিয়ে মৃদু-মৃদু টান দিতে থাকলেন চুরুটে। সেইসঙ্গে একটা-একটা করে ওপড়ানোর ভঙ্গিতে দাড়ি টানতে থাকলেন। বরাবর দেখেছি, রহস্যের গোলকধাঁধায় ঢুকে যখন বেরুবার পথ পান না, তখন এমন দাড়ি ছেঁড়ার তাল করেন।...

ওঁর ফ্ল্যাটে আমার আজ লাঞ্চের নেমন্তন্ন। ষষ্ঠীচরণ আয়োজন করেছিল প্রচুর। ঘুঘুমশাই সেই যে চুপ করেছেন তো করেছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছিলেন না। খাওয়ার পর ছাদে চলে গেলেন ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে'। আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস প্রবল। সোফায় হেলান দিয়ে চমৎকার একটা ভাত-ঘুম হয়ে গেল। শীতের বেলা কখন ফুরিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে দেখি, ঋষিসুলভ চেহারা নিয়ে এবং প্রসারিত হাতে কফির পেয়ালা নিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। সস্নেহে বললেন,—নাও ডার্লিং! জড়তা ঘুচিয়ে দিতে কফির তুল্য পানীয় আর নেই। আর শোনো, ও-ঘরে জগমোহন এসে বসে আছেন। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি ওঁকে। এবার ডাকা যেতে পারে।

ষষ্ঠী জগমোহনকে ডেকে আনল কর্নেলের নির্দেশে। সেইসঙ্গে তাঁকেও কফি দিয়ে গেল। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে বুঝতে পারছিলুম, কী অবস্থা হয়েছে মনের। যেন ব্লটিংপেপারে আঁকা স্কেচ। মোটাসোটা নাদুসনুদুস গড়নের মানুষ। মাথায় এলোমেলো একরাশ চুল। চশমা নাকের ডগায় আটকে আছে কোনোরকমে। কপালে একটা টাটকা সিঁদুরের ফোঁটা—সম্ভবত কালীঘাটে দৌড়েছিলেন পুজো দিতে। সেখান থেকেই হয়তো আসছেন। কফির দিকে তাকিয়ে খাবেন কি না

ঠিক করতে পারলেন না কয়েক সেকেন্ড। শেষে সিদ্ধান্ত করলেন খাবেন এবং এক চুমুকে পেয়ালা অর্ধেক শুষে বলবেন,—আমি গেছি। এক্কেরে গেছি!

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন,—আপনি যাবেন না তো আর কে যাবে?

জগমোহন হাত নেড়ে আর্তনাদ করলেন,—আর কখনও এমন হইব না স্যার! যদি হয়, আমার কানদুটো কাইট্যা কুত্তার গলায় লটকাইয়া দিয়েন!

কর্নেল ধমক দিলেন,—তাহলে বুঝতে পারছেন, কীসের গর্তে হাত ভরেছিলেন?

পারছি না স্যার? খুব পারছি।—জগমোহন করুণস্বরে বললেন, আপনের কাছে মিথ্যা কওনের সাধ্যি নাই। হ, বইখান ভৈরবগড় রাজবাড়ির। ওই পোড়াকপাইলা হরিসাধন আমার এ সর্বনাশ করল! আপনে যেমন অর্ডার দিছলেন, আমার বেয়াইমশয় সিঙ্গিবাবুও দিছিল। তো কথা হইল...

কর্নেল বললেন,—সিঙ্গিমশায়ের অফিস থেকে বইটা চুরি গেছে।

জগমোহন ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। তারপর গলায় কাকুতিমিনতি ফুটিয়ে বললেন,—যা লইয়া দিব্যি করতে বলবেন, করুম স্যার! আর যার লগে করি, বেয়াইমশয়ের লগে তঞ্চকতা করুম না।

—শুনুন জগমোহনবাবু! যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর কখনও রামশংকর শর্মার আত্মচরিতের ধারেকাছে যাবেন না। কেউ লক্ষ টাকা দিতে চাইলেও ও বই জোগাড় করার চেষ্টা করবেন না। সোজা বলে দেবেন, পাওয়া যাবে না।

—আবার? মুখোশপরা লোকটাও হেই কথা কইয়া গুলি ছুড়ছিল না? বইয়ের গাদায় গুলি লাগল। হেই না বাঁইচ্যা গেলাম স্যার!

—ঠিক আছে। আপনি আসুন।

জগমোহন দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন। কর্নেল বললেন,—কিছু বলবেন?

যে কথাটা জিগাইতে আইছিলাম, হেই কথাটাই বাদ। —জগমোহন একটু হাসলেন। রেয়ার বুকসের কারবার করিয়া চুল পাকাইলাম স্যার! কিন্তু রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কী এমন বই যে এত গণ্ডগুল বাধছে? এদিকে আপনিও কইলেন, সাপের গর্তে হাত ভরছিলাম। ক্যান একথা কইলেন স্যার?

জগমোহনবাবু!—কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, বইখানা আসলে ভীষণ অপয়া। ওই বই নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেই ভালো। জানেন তো? যত হাসি তত কান্না—বলে গেছেন রাম শন্না। ইনি হলেন সেই রাম শন্না। অতএব যা বললুম—মনে রাখবেন।

হ, বুঝছি। —বলে জগমোহন চলে গেলেন। কী বুঝলেন, তিনিই জানেন। হয়তো বুঝলেন, হাসতে মানা।

ঘরের ভেতর দিনশেষের ছায়া গাঢ় হচ্ছিল। কর্নেল সুইচ টিপে বাতি জ্বেলে দিলেন। তারপর পায়চারি করতে-করতে বললেন,—তাহলে ব্যাপারটা কেমন জট পাকিয়ে গেল, জয়ন্ত! বোম্বের কে এক রোডরিগ সায়েব রামশর্মার আত্মচরিতের খবর রাখেন। রামদুলাল সিংহকে বইটা জোগাড় করে দিতে বলেছিলেন তিনি। জগমোহন হল সিঙ্গিমশায়ের বেয়াই। ভৈরবগড় রাজবাড়ি থেকে হরিসাধন এর আগে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই চুরি করে এনেছে। কাজেই জগমোহন তার শরণাপন্ন হল। হরিসাধন বই চুরি করে এনে বেচল। তারপর দুটো ঘটনা ঘটল। রামদুলালের অফিস থেকে সেই বই চুরি এবং জগমোহনের দোকানে মুখোশধারীর হামলা। সত্যিকার পিস্তল ছোড়েনি সে। বইয়ের গাদায় গুলির কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। তার মানে, থিয়েটারের পিস্তল নিয়ে এসেছিল। হুঁ—জগমোহনকে ভয় দেখাতেই এসেছিল।... জয়ন্ত, আমার অনুমান সত্য। সে আসলে

জগমোহনকে বোঝাতে চেয়েছে যে, এই বই আর যেন বেচাকেনা না করে জগমোহন।... কিন্তু কেন?

—তাহলে তার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না।

—কী ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না বলতে চাইছ তুমি?

—পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেকের—যার দাম হয়তো বিদেশে কোটি-কোটি ডলার।

কর্নেল হাসলেন।—তুমি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছ, ডার্লিং! একজ্যাক্টলি তাই। কেউ বা কারা টের পেয়েছে, রামশর্মার আত্মচরিতের ভেতর স্যাটর নামে ঐতিহাসিক পেরেক লুকিয়ে রাখার কোনো সূত্র আছে।... হুঁ, রোডরিগেরও উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাকে টেক্কা দিয়ে বইটা হয়তো অন্য একজন হাতিয়ে নিল।

—সিঙ্গিমশায়ের অফিসে আর. মৈত্র না এস. মৈত্র নামে যে লোকটা এসেছিল, সে নয় তো?

গোয়েন্দাপ্রবর সায় দিলেন। —ঠিক, ঠিক। এখন কথা হচ্ছে, এই মৈত্র লোকটা যেই হোক, সে রোডরিগের পরিচিত। তার পরিচিত নয় শুধু, তার অন্তরঙ্গ বলে মনে হচ্ছে। সে রোডরিগের সঙ্গে সিঙ্গিমশায়ের যোগাযোগের কথা জানতে পেরেছিল। তারপর ছুটে এসেছিল কলকাতায়।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে ধপাস করে বসে পড়লেন। চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন। তারপর আপনমনে বললেন,—কিন্তু কোথায় আছে সেই পেরেক? মিশরীয় চিত্রলিপিতে পাঁচটা পাখি! তার একটা অর্থ : The Sower Arepo holds the wheels carefully. প্রথমে গলগথা বধ্যভূমি থেকে যিশুর দেহ কবরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন পেরেক পাঁচটা কেউ খুলে নিয়েছিল ক্রুশ থেকে। তাহলে কি আরেপো নামে এক চাষির চতুষ্কোণ শস্যক্ষেত্রে সেগুলো পুঁতে রাখা হয়েছিল?... তারপর কেউ উদ্ধার করে ইথিওপিয়ার দুর্গে নিয়ে যায়।... একটা পেরেক পেলেন রামশংকর শর্মা।... SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS? রহস্যময় শব্দবর্গ! শব্দগুলোতে লেগেছে R O A T S E P মোট সাতটা বর্ণ। এই সাতটা বর্ণে কতগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করা যায়, দেখা যাক।

হঠাৎ উঠে গিয়ে কোণের টেবিলে বসলেন কর্নেল। তারপর প্যাডের ওপর কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন। বুঝলুম, বুড়োকে এবার ভূতে পেয়েছে। এ ভূত ঘাড় থেকে নামতে রাত পুইয়ে যেতেও পারে। তাই ষষ্ঠীচরণের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বললুম,—তোমার বাবামশাইকে বলে দিও, আমি গেলুম।

ষষ্ঠী ঘাড় নাড়ল। মুখে মুচকি হাসি।...

সেদিনই অনেক রাতে টেলিফোনের বিরক্তিকর আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। সাংবাদিক হওয়ার এই এক জ্বালা। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কোনো কর্তাব্যক্তি না হয়ে যান না। হয়তো কোথায় গুরুতর ট্রেন দুর্ঘটনা, মন্ত্রীর ওপর বোমা, কিংবা কোনো ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুরে কী গণ্ডগোল। হয়তো শুনব, এখনই রওনা হও অকুস্থলে। জ্বালাতন!

খাপ্পা হয়ে ফোন তুলে বললুম,—কী হয়েছে? তারপর আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর গলা শুনতে পেলুম।

—ডার্লিং! রাত দুটোয় তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্য খুবই দুঃখিত।

বুড়োমানুষরা অনিদ্রায় ভোগেন, অন্যদেরও ভোগান।

—বলুন।

—জয়ন্ত! সেই সাতটা অক্ষর থেকে এইমাত্র একটা নতুন শব্দ বেরিয়ে এসেছে। বিস্ময়কর যোগাযোগ, ডার্লিং! নদীয়া জেলার যে গ্রামে রামশর্মার বাড়ি ছিল, তার প্রাচীন নাম কি ছিল জানো? সাতপুর।

—বেশ তো। সেজন্য এত রাতে ফোন করার কী দরকার হল?

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! সাতপুরকে বিদেশি উচ্চারণে রোমান হরফে পেয়েছি। SATPORE!

—খুব ভালো কথা। তাতে কী হয়েছে?

SATOR, AREPO, TENET, ROTAS, OPERA থেকে কী আশ্চর্যভাবে বেরিয়ে এল SATPORE? প্রাচীন পৃথিবী রহস্যময়, জয়ন্ত! আর শোনো, কাল সকাল নটায় তৈরি থেকো। আমরা সাতপুর অর্থাৎ বর্তমান রামশংকরপুরে যাচ্ছি। সাড়ে নটায় শেয়ালদায় ট্রেন।

—কাল আমার অফ-ডে নেই। সপ্তাহে মাত্র একদিন অফ-ডে পাই।

—জয়ন্ত, একটু আগে রামশংকরপুর থেকে রাম শন্নার বংশধর প্রণবশংকর বাঁড়ুজ্জে ট্রাংককল করেছিলেন। ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুর ওঁর কুটুম্ব। রাজাবাহাদুরের পরামর্শে আমাকে ট্রাংককল করা। রাত দশটায় প্রণবশংকরের বাড়ির পেছনের বাগানে ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরের ডেডবডি পাওয়া গেছে। বুঝতে পারছ? তিনমাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন উমাশংকর। হঠাৎ ওঁর ডেডবডি...

কথা কেড়ে বললুম, ঠিক আছে। সকাল ৯টায় তৈরি থাকব।—তারপর ফোন রেখে চিত হয়ে শুয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। টের পেলুম, আমার মাথার ভেতর ঘুঘু ডাকছে।...

তিন

শহরে-গ্রামে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে গেলে যা দাঁড়ায়, তার নাম রামশংকরপুর। গঙ্গার ধারে একেবারে শেষপ্রান্তে রাম শন্নার তৈরি বিরাট ঐতিহাসিক দালানবাড়ি। নিরিবিলি জায়গা বলা যায়। ঘন গাছগাছালি আর এন্তার ঝোপজঙ্গল গঙ্গাতীরের উর্বর মাটিতে যথেষ্ট গজিয়ে রয়েছে। কিন্তু এই বাঁড়ুজ্জেবাড়ি থেকে উত্তরে একটুখানি এগোলেই অন্যরকম দৃশ্য। বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, থানা, কোর্টকাছারিতে জমজমাট। শহরের মতো লোকের ভিড় আর যানবাহনের দাপট।

একর-সাতেক জায়গার ঠিক মাঝখানে দোতলা প্রকাণ্ড সেকেলে বাড়ি। চারদিকে কোথাও ফাঁকা ঘাসজমি, কোথাও সবজিখেত, কোথাও ফুলফলের ক্ষয়াটে বাগান। একটা পুকুর পর্যন্ত আছে। সারা চৌহদ্দি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিন্তু সে-পাঁচিলের অবস্থা বাড়িটার চেয়ে জরাজীর্ণ। কোথাও ভেঙেচুরে গেছে; কোথাও পাঁচিল ফুঁড়ে গাছও গজিয়েছে। পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের দশাও করুণ। গঙ্গা ঘাট থেকে একটু দূরে সরে গেছে কালক্রমে। এই দেউড়ির কপাট কবে লোপাট হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে ঢুকলে বর্মি বাঁশের একটা ঝাড়। তার পাশে পুরোনো এক ফোয়ারা। কবে মরেহেজে গেছে ফোয়ারাটা। তার পাথুরে গা ফাটিয়ে আগাছা গজিয়েছে। মাঝখানে টুটাফাটা স্তম্ভের ওপর একটু ঝুঁকে যেন ঝারিতে জল ভরছে এক অপ্সরা। কিন্তু তার মাথাটাই নেই।

মুণ্ডুকাটা অপ্সরার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন,—রাম শর্মা দেশে ফিরে রাজা-রাজড়ার মতো জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। তার একটা নমুনা তো দেখতেই পাচ্ছ! এই অপ্সরামূর্তি কিন্তু মোটেও দিশি নয়। ত্রিনিদাদের বাড়ি থেকে বহু ঝক্কি পুইয়ে বয়ে এতদূরে এনেছিলেন শর্মামশাই। উনি বেঁচে থাকলে অপ্সরার মুণ্ডু নেই দেখে খুব কষ্ট পেতেন।

প্রণবশংকর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন,—১৯৪২ সালের ঝড়ে ওখানে একটা প্রকাণ্ড শিরীষগাছ ভেঙে পড়েছিল। একটা ডালের ধাক্কায় মুণ্ডুটা ভেঙে গিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—ফোয়ারাটা পাঁচকোনা দেখছি!... হুঁ, ভেনিসের ক্রগো স্কোয়ারে ঠিক এমনি একটা ফোয়ারা দেখেছিলুম। তবে তার কেন্দ্রে পেতলের যে মূর্তি আছে, সেটা সম্ভবত দেবী

ইস্তারের। ইস্তার ছিলেন প্রাচীন সুমেরের যুদ্ধদেবী। কিন্তু তাঁর মূর্তির পায়ের তলায় পাঁচকোনা ফোয়ারা হল খ্রিস্টীয় পবিত্র নক্ষত্রের প্রতীক। ওই নক্ষত্র দেখে পুবদেশের জ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন যিশু জন্মেছেন। তাঁরা নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে বেথেলহেমের আস্তাবলে পৌঁছান। —বলে কর্নেল পায়ের কাছে ঘাস থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। হলদে রঙের ছেঁড়া কাগজকুচি মনে হল। সেটা ভালো করে দেখে পকেটে রেখে দিলেন। তারপর চারপাশের ঘাসে কিছু খুঁজতে থাকলেন। ঘাসফড়িং হতে পারে। ঘাসফড়িংও ওঁর চর্চার বিষয় বলে জানি। প্রণবশংকর কিন্তু কর্নেলের ব্যাপার-স্যাপার দেখে বোধ করি মনে-মনে বিরক্ত হয়েছেন। বারোটা নাগাদ পৌঁছুনোর পরেই উনি আমাদের হত্যাকাণ্ডের জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন। ফোয়ারার কাছেই ওঁর নিরুদ্দিষ্ট ভাই উমাশংকরকে খুন করা হয়েছে। বডি সকালে পুলিশ মর্গে নিয়ে গেছে। আচমকা কেউ উমাশংকরের মাথায় সম্ভবত লোহার রড দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। এক আঘাতেই মৃত্যু হয়—কারণ শরীরে আর কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

কর্নেল ওসব বিবরণে একটুও কান করেননি। শুধু রাম শর্মার কথা নিয়েই বকবক করছেন। এতে আমারও বিরক্তি আসছিল। কর্নেল এবার গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার চোখে রেখে গাছের পাখি দেখছেন। প্রণবশংকরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্য ওঁর ভাইয়ের প্রসঙ্গে কথা বললুম, —উমাশংকর কতদিন আগে নিখোঁজ হন, মিঃ ব্যানার্জি?

—তা মাস তিনেক হবে।

—কোনো ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?

কোনো ঝগড়াঝাটির প্রশ্নই ওঠে না। তবে ছোটকু একটু জেদি প্রকৃতির ছিল। মাঝে-মাঝে তুচ্ছ কথায় ভীষণ রেগে যেত। কিন্তু হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার আগের রাতে ওর মেজাজ অত্যন্ত শান্ত দেখেছিলুম। রাতে একসঙ্গে দু-ভাই মিলে খাওয়াদাওয়া করলুম। দিব্যি স্বাভাবিকভাবে গল্পগুজব করল। শুতে গেল। সকালে গঙ্গাধর ওর ঘরে চা নিয়ে গিয়ে দেখে, নেই। ভাবল, বাথরুমে আছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও তার পাত্তা নেই।...

প্রণবশংকর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন,—আমার ছেলেপিলে নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বছর দুই আগে। আমার বয়স ৬৫ বছর হতে চলল। ওই ছোটকুই ছিল আমার বেঁচে থাকার সম্বল। অথচ কী দুর্ভাগা আমি, দেখুন জয়ন্তবাবু! হঠাৎ অমন করে সেই ছোটকু নিপাত্তা হয়ে গেল। কত খোঁজখবর করলুম। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলুম। তারপর এতদিনে ওর ডেডবডি ফিরে পেলুম।

—ডেডবডি প্রথম কে দেখেছিল?

গঙ্গাধর।—প্রণবশংকর রুমালে চোখ মুছলেন।—গঙ্গাধর এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আছে। ছোটকুকে সে ছেলের মতো ভালোবাসত। গতরাতে, তখন আটটা-সাড়ে আটটা হবে, গঙ্গাধর তার ঘর থেকে একটা আবছা চিৎকার শুনেছিল। ও ভেবেছিল, চোর ঢুকেছে বাগানে— প্রায়ই রাতবিরেতে চোর আসে। গোবিন্দ-মালি হয়তো তাই চেঁচিয়ে তাকে ডাকছে। জ্যোৎস্না ছিল। গঙ্গাধর পশ্চিমের এই বারান্দায় বেরিয়ে আসে। তারপরই দেখতে পায় কে পালিয়ে যাচ্ছে। তাড়া করে এখানে এসেই ছোটকুর বডিতে ঠোক্কর খেয়ে পড়ে যায় গঙ্গাধর। তারপর...

কর্নেল এগিয়ে এসে বললেন,—মিঃ ব্যানার্জি, এখানে আপাতত আর কিছু দেখার নেই। এবার চলুন, উমাশংকরবাবুর ব্যাগটা আমি দেখতে চাই।

প্রণবশংকর পা বাড়িয়ে বললেন,—চলুন। দেখাচ্ছি।

যেতে-যেতে কর্নেল বললেন,—পুলিশের কী ধারণা মিঃ ব্যানার্জি? কিছু জানতে পেরেছেন?

—হুঁ। পুলিশের ধারণা, উমাশংকর কোনো শত্রুর ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সেই শত্রু তাকে তাকে ছিল। তা না হলে সে পিছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে কেন?

—আপনার কী মনে হয়?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। শুধু আশ্চর্য লাগছে যে, ছোটকুর শত্রু ছিল, অথচ আমায় কেন বলেনি?

—আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, নিখোঁজ হওয়ার আগে উমাশংকরবাবুর হাবভাবে কোনো গণ্ডগোল চোখে পড়েনি?

—তেমন কিছু তো দেখিনি। তবে কিছুদিন থেকে একটু আনমনা হয়ে থাকত যেন। চুপচাপ একা বসে কী যেন ভাবত। রাত জেগে কী সব করত। অনেক রাতে ওর ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। জিজ্ঞেস করলে হেসে বলত, কিছু না।

—কিন্তু উমাশংকরবাবুর সঙ্গে শত্রুতা থাকতে পারে কার?

—সেটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। তবে একালের ছেলে। কিছু বলা যায় না। হয়তো ভেতর-ভেতর রাজনৈতিক দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য ওকে প্রকাশ্যে কোনোদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে দেখিনি। আমার সঙ্গে কোনোরকম রাজনৈতিক আলোচনাও করত না।

বাড়ির নীচের তলায় দক্ষিণের একটা বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রণবশংকর তাঁর ভাইয়ের ব্যাগটা আনতে গেলেন।

কর্নেল গম্ভীরমুখে আরামকেদারায় বসে চুরুট ধরালেন। বললুম,—ফোয়ারার ওখানে সম্ভবত একটা ক্লু সংগ্রহ করেছেন। একটু শুনি, কী ধরনের ক্লু।

কর্নেল ঠোঁটের কোনায় হাসলেন।—গোয়েন্দারা ক্লু খুঁজলেই নাকি পেয়ে যায়। এটাই সাবেকি পদ্ধতি, ডার্লিং! হ্যাঁ—আমিও একটা কিছু পেয়েছি। তবে সেটা ক্লু কি না জানি না। একটুকরো ছেঁড়া ময়লা কাগজ—মাত্র একবর্গ ইঞ্চি মাপের। তবে কাগজটুকুর বৈশিষ্ট্য হল, তা খুব পুরোনো এবং একটু চাপ লাগলেই গুঁড়ো হয়ে যায়।

প্রণবশংকর একটা সাধারণ কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন,—ব্যাগটা একটু তফাতে পড়েছিল ঝোপের ভেতর। আপনারা আসবার কিছুক্ষণ আগে গোবিন্দ ওটা কুড়িয়ে পেয়েছে। ব্যাগটা ছোটকুরই বটে। কারণ এই দেখুন ওর প্যান্ট, শার্ট, তোয়ালে, আর সব টুকিটাকি জিনিস।... আরে! এটা আবার কী?

জিনিসগুলো বের করে টেবিলে রাখছিলেন প্রণবশংকর। চৌকো জিনিসটা দেখে কর্নেল বললেন,—এটা একটা ব্যাটারিচালিত মেটাল-ডিটেক্টর। কোথাও কোনো ধাতব জিনিস লুকোনো থাকলে এর সাহায্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—তাহলে কি উমাশংকরবাবু...

গোয়েন্দাপ্রবর এমন কটমটিয়ে তাকালেন যে মুখ বন্ধ করলুম তক্ষুনি। প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—মেটাল-ডিটেক্টর দিয়ে কী করত ছোটকু?

সে-কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল ব্যাগের ভেতর হাতড়ে বললেন,—হুঁ, বুঝেছি। আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, ভৈরবগড়ের রাজাবাহাদুরকে রামশংকর শর্মার আত্মচরিত কবে আপনি উপহার দিয়েছিলেন?

প্রণবশংকর স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন,—গত অগস্ট মাসে। এ অঞ্চলে কী একটা কাজে উনি এসেছিলেন। এদিকে এলেই আমার বাড়িতে ওঠেন। বৈবাহিকসূত্রে ওঁদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতার সম্পর্ক।

—রাজাবাহাদুরকে বইটা দেওয়ার জন্য উমাশংকরবাবু কি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ খাপ্পা হয়েছিল আমার ওপর। আমি ওকে বুঝিয়ে বললুম, বইটা এখানে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। বরং রাজাবাহাদুরের লাইব্রেরিতে থাকলে যত্ন হবে। তাছাড়া রাজাবাহাদুরও বলেছিলেন, বইটা আবার উনি ছাপার ব্যবস্থা করবেন।

—রাজাবাহাদুরের সঙ্গে উমাশংকরের সম্পর্ক কেমন ছিল?

প্রণবশংকর একটু ইতস্তত করে বললেন,—এটুকু বলতে পারি, রাজাবাহাদুর এ-বাড়ি এলে ছোটকু ওঁকে এড়িয়ে থাকত। আড়ালে ওঁর হামবড়াই ভাবের জন্য খুব ঠাট্টা-তামাশা করত। বলত, যাত্রাদলের রাজা। আসলে ছোটকুটা বরাবর একটু বিদ্রোহী-টাইপের মানুষ ছিল। সবাই যাকে সম্মান করছে, ও তাকে তুচ্ছ করবেই করবে।

—উনি কি ভৈরবগড় রাজবাড়িতে যেতেন?

কে? ছোটকু? —প্রণবশংকর মাথা নাড়লেন।—সেই ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে যা গেছে- টেছে। বড় হয়ে আর যায়নি। বলত, রাজাগজাদের যা গুমোর, গেলে চাকর ভেবে পা টিপতে বলবে। দরকার নেই গিয়ে।

কর্নেল মন্তব্য করলেন,—হুঁ, উমাশংকরবাবুর মানসিক গঠনটা বুঝতে পারছি। —তারপর ব্যাগের তলা থেকে একটা কাগজকুচি বের করে পরীক্ষা করতে থাকলেন।

প্রণবশংকর অন্যমনস্কভাবে টেবিলের ওপর রাখা ছোটভাইয়ের শার্টটা ভাঁজ করছিলেন। বললেন,—ব্যাগে কী আছে ভালো করে এখনও দেখিনি। মানিব্যাগটা অবশ্য পাওয়া গেছে। যে প্যান্টটা পরেছিল, তার হিপ পকেটে ওটা পাওয়া গেছে। টাকাকড়ি বিশেষ ছিল না।

কর্নেল বললেন,—মানিব্যাগটা একটু কষ্ট করে নিয়ে আসবেন?

এনে দিচ্ছি। —বলে প্রণবশংকর চলে গেলেন।

কর্নেল এবার ব্যাগ রেখে প্যান্ট ও শার্টটা নিয়ে পড়লেন। শার্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে খুলে দেখলেন। চুপচাপ বসে ঘুঘুমশাইয়ের কাণ্ডকারখানা দেখছিলুম। চোখে চোখ পড়লে বললেন,—জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস নেই জয়ন্ত! কিন্তু কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। যেমন ধরো, রামশংকর শর্মা! এক দুর্দান্ত সাহসী মানুষ। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়। যে-কোনো ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত সবসময়। তিনিই যেন তাঁর বংশধর উমাশংকরের মধ্যে পুনর্জন্ম নিয়েছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।...

প্রণবশংকর মানিব্যাগটা নিয়ে এলে কর্নেল কথা থামিয়ে সেটা নিলেন। বললেন,—কিছু বের করা হয়নি তো মিঃ ব্যানার্জি?

—না, না! বের করার প্রশ্নই ওঠে না।

কর্নেল মানিব্যাগের ভেতর থেকে কয়েকটি মুদ্রা বের করে বললেন,—হুঁ, যা ভেবেছিলুম। এই মুদ্রাগুলোর মধ্যে দুটো মুদ্রা ত্রিনিদাদের।

প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম,—ত্রিনিদাদের মুদ্রা কোত্থেকে পেলেন উমাশংকর?

কর্নেল বললেন,—ত্রিনিদাদে। আবার কোথায় পাবেন?

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—সে কী! ছোটকু ত্রিনিদাদ গিয়েছিল নাকি?

—হ্যাঁ, মিঃ ব্যানার্জি! ওঁর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

প্রণবশংকর বললেন,—আমার বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। রাম শর্মা শুনেছি ত্রিনিদাদ মুলুকে ছিলেন। সেখানে ঘরবাড়িও করেছিলেন। ওঁর আত্মচরিত ভালো করে পড়িনি অবশ্য। তবে

ছোটকু... হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে বটে, ছোটকু মাঝে-মাঝে বলত, রাম শর্মার ভিটে দেখতে যাবে। কিন্তু সে তো সেই সাউথ আমেরিকার মাথায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজে।

আমি বললুম,—তাহলে পাসপোর্ট থাকা উচিত সঙ্গে। পাসপোর্ট কোথায়?

কর্নেল বললেন,—বোঝা যাচ্ছে না পাসপোর্টটা কী হল। যাই হোক, মিঃ ব্যানার্জি, একটা জিনিস হাতানো খুনির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। সেটা সে হাতাতে পেরেছে। কারণ, ব্যাগের ভেতর এবং ফোয়ারার কাছে আমি দুকুচি নমুনা খুঁজে পেয়েছি।

প্রণবশংকর বললেন,—কী বলুন তো?

রামশংকর শর্মার আত্মচরিত। —বলে কর্নেল এবার পকেট-নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন।—হুঁ—পাসপোর্টের নাম্বার টোকা আছে। তার মানে পাসপোর্ট ছিল।... এখানে দেখছি ইংরেজিতে দু' লাইন নোট। 'Reported to Police. Trabanka P.S. Case No. P.F. 223 dated 15.10.80.' তার মানে পাসপোর্টটা নিশ্চয়ই চুরি গিয়েছিল। ত্রাবাংকা নামে কোনো জায়গার থানায় ডাইরি করেছিলেন। কোন্ তারিখে উনি নিপাত্তা হন মিঃ ব্যানার্জি?

—সাতই অক্টোবর

—হুঁ—আরে। এখানে দেখছি : Appointment with F. Rodrigue at 6 P.M.' সেই রোডরিগ! রামদয়াল সিঙ্গিকে যে বইটা জোগাড় করে দিতে বলেছিল!—কর্নেল মুখ তুলে বললেন, মিঃ ব্যানার্জি, আপনার ভাই ত্রিনিদাদ গিয়ে পাসপোর্ট এবং সম্ভবত টাকাকড়িও চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন। সেখানে রোডরিগ নামে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। এটুকু বুঝতে পেরেছি, রোডরিগ পয়সাওলা ব্যবসায়ী। নানা দেশে তাঁর ব্যাবসা-বাণিজ্য আছে। উমাশংকরবাবু তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন এবং তাঁর সাহায্য পেয়েই ত্রিনিদাদে তিন মাস তিনি থাকতে পেরেছিলেন। শুধু একটা ভুল করেছিলেন। রোডরিগকে আত্মচরিতের কথাটা বলা ঠিক হয়নি। জিনিসটার দাম কোটি-কোটি ডলার—যদি উদ্ধার করা হয়।... হুঁ, জট অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। কিন্তু রোডরিগ তো এখন বোম্বেতে। এতদূরে ঠিক সময়মতো লোক পাঠিয়ে উমাশংকরের কাছ থেকে আত্মচরিত হাতানো... নাঃ! এখনও জট থেকে যাচ্ছে।

প্রণবশংকর হাঁ করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই সময় গঙ্গাধর এসে বলল, —খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে বড়বাবু। পিসিমা বললেন, দুটো বাজতে চলল। ওঁদের খবর দে।

প্রণবশংকর উঠলেন।—তাই তো! ছি, ছি—বড্ড দেরি হয়ে গেল খেতে। দয়া করে এবার আসুন কর্নেল! কথাবার্তা যা হওয়ার পরে হবে। আমাদের তো অরন্ধন। নেহাত আপনাদের জন্য দু-মুঠো ডাল ভাতের ব্যবস্থা করেছি।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, স্নান করবে নাকি? আমি অবশ্য ভোরে ও-কাজ সেরেই বেরিয়েছি।

আঁতকে উঠে বললুম,—এই হাড়কাঁপানো শীতে মফস্বলের জলে স্নান? বাপ্‌স! কী ঠান্ডা এখানে!

গঙ্গাধর বলল,—গরম জল করে দেব স্যার?

—থাক।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—তুমি নিশ্চয়ই আগের জন্মে বেড়াল ছিলে ডার্লিং! তাই জলকে এত ভয়।

বললুম,—আপনি তাহলে আগের জন্মে উদবেড়াল ছিলেন। তাই শীতের ভোরে জল মাখতে ভালোবাসেন।

চার

খাওয়ার সময় তদারক করছিলেন এক বৃদ্ধা। প্রণবশংকর আলাপ করিয়ে দিলেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়া। উনি ছাড়া আর কোনো মহিলা এ-বাড়িতে নেই। ওঁর নাম কুমুদিনী। খুব স্নেহপ্রবণ মহিলা। আদরযত্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন। কথায়-কথায় দুঃখ করে বললেন,—ছোটকু বেঁচে থাকলে অতিথিদের জন্য কী যে ছুটোছুটি করত! পরিতোষকে বললুম ব্যবস্থা করতে। পরিতোষের হাজারটা কাজ। তবে বাবা, আজ তো অরন্ধন বাড়িতে। আপনাদের জন্য নিয়মভঙ্গ করতে হল।

প্রণবশংকর বললেন,—পরিতোষ বেচারার দোষ নেই, কাল সারারাত জেগেছে। থানা-পুলিশের হাঙ্গামা তো কম নয়। সকালে আবার দৌড়ল থানায়। সেখান থেকে মর্গে। যতক্ষণ না বডি নিয়ে আসবে, ততক্ষণ হয়তো ওর শান্তি নেই। তারপর আর আসেনি পরিতোষ?

কুমুদিনী বললেন,—এসেছিল একটু আগে। আবার বেরুল।

—আজ আর ওর ফার্মে যাওয়া হল না। কী যে হচ্ছে সেখানে কে জানে! পরিতোষের ভয়ে কেউ ফসলে হাত দিতে সাহস পায় না!

কর্নেল বললেন,—পরিতোষ কে?

প্রণবশংকর বললেন,—এ বাড়ির কেয়ারটেকার বলতে পারেন, ম্যানেজারও বলতে পারেন। ছোটবেলা থেকে এ-বাড়িতে আছে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। মাঠে কৃষিখামার করেছি। তাও দেখাশোনা করে। বাড়িরও সবকিছু তদারক করে। ও না থাকলে আমাকে পথে বসতে হত। ছোটকু তো বরাবর নিষ্ক্রিয়—কোনো বৈষয়িক ব্যাপারে সে থাকেনি। বলত, 'নুটু থাকতে আবার আমায় কেন! নুটু একা একশো।' সত্যি তাই। তবে পরিতোষ বেচারার মুখের দিকে এখন তাকানো যায় না। ছোটকুর ব্যাপারে সে একেবারে ভেঙে পড়ার দাখিল। ছেলেবেলা থেকে দুটিতে একসঙ্গে মানুষ হয়েছে। একসঙ্গে খেলাধুলো করেছে। পড়াশুনা করেছে। দুটিতে খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। ছোটকু নিরুদ্দেশ হলে পরিতোষ সারা ভারত ওর খোঁজে ছোটাছুটি করেছিল। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। সে এক অবস্থা!

—পরিতোষবাবু এলে একটু পাঠিয়ে দেবেন? ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—আসুক। বলব'খন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে কর্নেল বললেন,—আপনার টেলিফোন কোন্ ঘরে আছে মিঃ ব্যানার্জি?

—নীচের ঘরে। ওখানে পরিতোষ অফিসমতো করেছে। সবই ওর দায়িত্বে। আমার বয়স হয়েছে—কিছু দেখাশোনা করতে পারিনে।

—আমি একটা ট্রাংককল বুক করতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে। আসুন, আসুন।

আমি ওঁদের সঙ্গে গেলুম না। ভাতঘুমের টান ধরেছে সঙ্গে-সঙ্গে। একতলায় নেমে সটান আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ার আগে বারান্দার রোদ্দুরে বসে মৌজ করে সিগারেট টানতে থাকলুম। বরাবর এটাই অভ্যাস। সিগারেট শেষ করে ঘরের ভেতর বিছানায় কম্বলটার দিকে লোলুপদৃষ্টে তাকাচ্ছি, কর্নেল এসে গেলেন। এসেই চোখ পাকিয়ে বললেন,—উঁহু! দিনদুপুরে ঘুমোনো মোটেই ভালো কথা নয়। আয়ুক্ষয় হয়। বরং চলো, আমরা একবার ঝটপট ভৈরবগড় ঘুরে আসি।

—ভৈরবগড়! সে আবার কোথায়?

—বেশি দূরে নয়। গঙ্গা পেরুলে বাস। বাসে চেপে মাইল-পাঁচেক মাত্র।

মনে-মনে বুড়োর মুণ্ডুপাত করতে-করতে পা বাড়ালুম। বাজার এলাকার দিকে হাঁটতে-হাঁটতে বললুম—হঠাৎ ভৈরবগড়ে কী ব্যাপার বলুন তো?

—রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসি—এত কাছে এসে পড়েছি যখন। তাছাড়া হরিসাধনেরও খোঁজখবর নেব।

—হরিসাধন—মানে সেই নেশাখোর বইচোর! তাকে কি রাজাবাহাদুর আর বাড়ি ঢুকতে দিয়েছেন?

—চলো তো, দেখি।

বাজার এলাকার ভিড় ঠেলে আমরা গঙ্গার ঘাটে পৌঁছলুম। একটা নৌকো ভাড়া করে ওপারে পৌঁছতে প্রায় একটা ঘণ্টা লেগে গেল। কিন্তু খুব সুন্দর এই জার্নি। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে পড়ন্ত শীতের বেলায় জলপাখি দেখে নিলেন।

বাসের ভিড় দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কলকাতার বাসে ভিড় হয় বটে, কিন্তু এর তুলনায় সে-ভিড় কিছুই না। বাসটার আগাপাশতলা লোক ভর্তি। তবু কন্ডাক্টার চ্যাঁচাচ্ছে,—চলে আসেন! চলে আসেন! ছেড়ে গেল! ছেড়ে গেল ভৈরবগড়-দাঁইহাট-কাটোয়া-আ-আ!

হয়তো কর্নেলের সায়েবি চেহারা ও বেশভূষা, কিংবা দাড়িটাড়ি দেখে কন্ডাক্টার ড্রাইভারের ডান ও বাঁ-পাশ থেকে দুই বেচারাকে হিড়হিড় করে নামিয়ে আমাদের জায়গা করে দিল। হতভাগা যাত্রীদ্বয়কে সে কোথায় গুঁজল কে জানে! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—পৃথিবীটা যে নিছক সুখের জায়গা, মাঝে-মাঝে এটা টের পাওয়া দরকার ডার্লিং!

—কিন্তু অন্যদের বঞ্চিত করে এভাবে জায়গা নেওয়া কি উচিত হল?

ড্রাইভার একগাল হেসে বলল,—ওদের কথা ভাববেন না স্যার। ওরা আমার নিজের লোক। বিনিপয়সায় যাচ্ছে। ভৈরবগড়ে আপনারা নামলে ওদের ডেকে নেব।

দুধারের গাছপালাঘেরা পিচের রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলেছে। পাঁচ মাইল যেতে অন্তত বারপাঁচেক বাস থামল। কিছু যাত্রী নামল, উঠল তার দ্বিগুণ। আমাদের নামিয়ে যখন বাসটা চলে গেল, তখন তাকে দেখাচ্ছিল যেন চলন্ত মৌচাক—তবে মৌমাছিগুলো মানুষ এই যা।

বাস-রাস্তার মোড় থেকে সাইকেলরিকশা করে এগিয়ে আমরা রাজবাড়ির ফটকের কাছে নামলুম। একজন দারোয়ান কর্নেলকে দেখামাত্র মিলিটারি সেলাম ঠুকল। বুঝলুম কর্নেলকে সে চিনতে পেরেছে। ওপাশের একতলা সারিবদ্ধ ঘরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। হাতে চায়ের পেয়ালা। তিনি দৌড়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

একটু পরে রাজবাড়ির বিশাল ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করতে-করতে রাজাবাহাদুর এসে গেলেন। প্রণবশংকরের বয়সি মানুষ। পরনে সাদাসিধে পাঞ্জাবি-পাজামা। চোখে পুরু লেন্সের কালো চশমা। কিন্তু রোগা টিঙটিঙে গড়ন। বললেন,—খুব শিগগির এসে পড়েছেন আপনারা। আমি ভেবেছিলুম, ছটার আগে পৌঁছতে পারবেন না। তবে দেখুন কর্নেল, আমার কিন্তু কোনো অপরাধ নেই। আমি জিপ পাঠাতে চাইলুম, আপনি বারণ করে দিলেন।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—আমার এই তরুণ বন্ধু একজন সাংবাদিক। ওকে দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে একটুখানি অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছি। এবার কলকাতা ফিরে দৈনিক সত্যসেবকে মফস্বলের বাসযাত্রীদের কথা লিখবে, আশা করি।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে বুঝতে পারলুম, কর্নেল রামশংকরপুরে প্রণবশংকরের বাড়ি থেকে ফোন করে আসার কথা জানিয়েছেন। আলাপ-পরিচয় এবং কফি খাওয়ার পর উমাশংকরবাবুর হত্যাকাণ্ডের কথা উঠল। রাজাবাহাদুর গম্ভীরমুখে বললেন,—ঘটনাটা ভারি অদ্ভুত। উমাশংকর

একটু তেজি স্বভাবের ছিল বটে; কিন্তু ওকে কেউ খুন করবে ভাবাও যায় না। তাছাড়া তিন মাস গা-ঢাকা দিয়েই বা কেন রইল, আমার কাছে সবটাই একটা রহস্য। তাই গত রাতে প্রণবদা ফোনে ঘটনাটা যখনই আমাকে জানালেন, আমার মনে হল, আপনার শরণাপন্ন হওয়া উচিত। পুলিশ এ-ব্যাপারে কতদূর কী করবে ভরসা হয় না। তো, আমি নিজেও বহুবার আপনার লাইন পাওয়ার চেষ্টা করলুম। এখানকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ওয়ার্থলেস। কলকাতা ধরতেই পারল না। তখন প্রণবদাকে ফের ফোন করে বললুম, আপনি দেখুন চেষ্টা করে। নাম্বার দিচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—হরিসাধনবাবুর খবর কী?

হরিসাধন? —রাজাবাহাদুর বাঁকামুখে বললেন, বইটা চুরি করে ব্যাটাচ্ছেলে আর এ বাড়ি ঢোকেনি। বুঝে গেছে, এবার ত্রিসীমানায় দেখলেই মাথাটি ন্যাড়া করে দেব।

—আচ্ছা, একটা কথা রাজাবাহাদুর! রাম শর্মার আত্মচরিত প্রণবশংকরের কাছে আপনি উপহার পান গত আগস্ট মাসে। আপনার লাইব্রেরিতে রাখার পর আর কাউকে কি পড়তে দিয়েছিলেন!

রাজাবাহাদুর মাথা নেড়ে বললেন,—না। লাইব্রেরিতে বইটা রেখেছিলুম দুষ্প্রাপ্য বইয়ের শেলফে। আপনি বাদে কাউকে পড়তে দিইনি। বইটার কথা আর কেউ জানে বলেও মনে হয় না। নইলে যাঁরা উনিশ শতক নিয়ে রিসার্চ করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই খোঁজখবর করতেন। তাছাড়া আমি তো বিস্তর বইটই পড়ি। কোথাও এ বইয়ের কোনো উল্লেখ পর্যন্ত পাইনি। এর একটাই কারণ থাকতে পারে। ব্রিটিশ সরকারের কোপে পড়ে যাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হয়েছে, তাঁর ভাই শ্যামশংকর সাহস করে বইটা ছাপলেও বোধ করি এক কপিও কেউ সাহস করে কেনেননি। জগমোহন বোসের মতো লোক, যে এ ধরনের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের খোঁজখবর রাখে, সে পর্যন্ত বইটার নাম শোনেনি। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন বলুন তো কর্নেল?

কর্নেল একটু হাসলেন। —উমাশংকর খুন হওয়ার সঙ্গে বইটার যোগাযোগ রয়েছে।

—সে কী!

—উমাশংকর বইটা নিয়ে বহুদিন ধরে মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

—বলেন কী! কেন?

—অক্টোবরে এসে বইটা পড়ার পর আপনার সঙ্গে পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক 'স্যাটর' নিয়ে আলোচনা করেছিলুম, মনে আছে তো?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ খুব মনে আছে। বলেছিলেন, পেরেকটা সম্পর্কে রামশংকর কেন হঠাৎ চুপ করে গেলেন!

—প্রণবশংকর হঠাৎ আপনাকে বইটা উপহার দেওয়ায় উমাশংকর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কারণ, উনি পেরেকটার হদিস বই থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পরে যেভাবেই হোক, ওঁর মাথায় ঢুকেছিল, রামশংকর ত্রিনিদাদে ত্রাবাংকা নামে একটা জায়গায় যে বাড়ি করেছিলেন, সেই বাড়িতেই কোথাও ওটা লুকানো আছে। তাই উনি ত্রিনিদাদে পাড়ি দেন। দাদাকে বলেননি। কারণ, দাদা তাঁকে কিছুতেই যেতে দিতেন না।

—কিন্তু ত্রিনিদাদে গিয়েও তো জানাতে পারত। এদিকে সবাই ওর জন্য কষ্ট পাচ্ছে।

—প্রণবশংকরকে তো জানেন। আমার ধারণা হয়েছে, ভদ্রলোক কোনো ব্যাপারে গোপনীয়তা কাকে বলে জানেন না। খুব খোলা মনের মানুষ। পাঁচকান করবেন বলেই হয়তো জানাননি উমাশংকর।

—ঠিক বলেছেন। প্রণবদার পেটে কথা থাকে না।

—উমাশংকর ত্রিনিদাদে যাওয়ার পর ওঁর পাসপোর্ট আর টাকাকড়ি চুরি গিয়ে বিপদে পড়েন। সেই সময় রোডরিগ নামে গোয়ার এক বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হয়। অনুমান করা যায়,

রোডরিগকে তিনি হতাশা ও ব্যর্থতার চাপে তাঁর ত্রিনিদাদে আসার উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন। পেরেকটার দাম কোটি-কোটি ডলার এখন! এটা কোন্ বড়লোক না সংগ্রহশালায় রাখতে চাইবে। বহু দেশের সরকারও চাইবেন, এটা তাঁদের জাদুঘরে থাক। ভ্যাটিকানে রাখার জন্যও খ্রিস্টীয় ধর্মগুরুরা এই পবিত্র জিনিসটি দাবি করবেন।

রাজাবাহাদুর সায় দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ—আপনি সেবারও এসব কথা বলেছিলেন।

—রোডরিগের সাহায্যে উমাশংকর রাম শর্মার বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। বিস্তারিত কিছু জানি না। তবে বোঝা যায়, কী ঘটেছিল। পেরেক আবিষ্কার করতে না পেরে রোডরিগের সঙ্গে উমাশংকর ফিরে আসেন। তারপর আমরা কিছু ঘটনা ঘটতে দেখেছি। রোডরিগ বোম্বে এসেই কলকাতার ব্যবসায়ী রামদয়াল সিঙ্গিকে বইটা জোগাড় করতে বলে। তার বদলে সিঙ্গিমশাইকে দু'লক্ষ টাকার অর্ডার পাইয়ে দেবার লোভ দেখায়। যেভাবেই হোক, সেটা জানতে পেরে উমাশংকর সতর্ক হয়ে যান। কলকাতায় ছুটে আসেন। ঘটনাচক্রে সেই দিনই সিঙ্গিমশাই বইটা জোগাড় করেছেন জগমোহনের কাছে।

—ঠিক, ঠিক। ব্যাটাচ্ছেলে হরিসাধনকে দিয়েই জগমোহন এ-কর্মটি করেছিল—এখন বুঝতে পারছি।

—উমাশংকর জনৈক মৈত্র নাম নিয়ে রোডরিগের ব্যবসার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে সিঙ্গিমশায়ের অফিসে রাত কাটান এবং বইটা পেয়ে যান। তারপর মুখোশ পরে জগমোহনের দোকানে ঢুকে টয়পিস্তল দেখিয়ে তাকে শাসিয়ে যান, যেন এ বইয়ের বেচাকেনা আর না করে। সেই বই নিয়ে সন্ধ্যার পর চুপি-চুপি পেছনের ফটক দিয়ে উনি বাড়ি ঢুকছিলেন। কেউ ওত পেতে ছিল। তাঁর মাথায় বাড়ি মেরে বইটা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

—নিশ্চয়ই রোডরিগের লোক?

কর্নেল মাথা নাড়লেন,—বোঝা যাচ্ছে না। চুপিচুপি বাড়ি ঢোকার কারণ—উমাশংকর সম্ভবত দাদার বকুনি খাওয়ার ভয়ে সরাসরি প্রথমেই দাদার মুখোমুখি হতে চাননি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স হলেও উমাশংকর একটু খেয়ালি ছিলেন। ছেলেমানুষি করতেন বিস্তর। কুমুদিনী দেবীর কাছে এসব কথা শুনলুম।

—তা না হয় বুঝলুম। কিন্তু রোডরিগ ছাড়া আর কার পেরেক নিয়ে মাথাব্যথা থাকা সম্ভব! সে জানবেই বা কী করে যে ছোটকু ওই সময় পেছনের ফটক দিয়ে বাড়ি ঢুকবে?

কর্নেল সোজা হয়ে বসে বললেন,—একজ্যাক্টলি! এটাই হল আদত প্রশ্ন। সেইজন্যে আমি গোপনে আপনার কাছে জানতে এসেছি, রামশংকরপুরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এমন কেউ কি আপনার কাছে বইটার খোঁজে এসেছিল?

কেউ আসেনি। —রাজাবাহাদুর চিন্তিত মুখে বললেন।

—একটু স্মরণ করে দেখুন তো!

কিছুক্ষণ চুপচাপ চিন্তা করার পর রাজাবাহাদুর বললেন,—নাঃ! মনে পড়ছে না তেমন কিছু।

—বইটা আপনি আবার ছেপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন?

রাজাবাহাদুর বললেন,—হ্যাঁ। মার্চ নাগাদ বের করব ভেবে রেখেছিলুম। আপনাকে তো বলেওছিলুম সে কথা। এ মাসেই কলকাতা গিয়ে ভালো একটা প্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করতুম। এই তো কিছুদিন আগে প্রণবদা ফোন করে জানতে চাইলেন, কবে বইটা ছাপছি।...

কর্নেল নড়ে বসলেন। ওঁর চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—প্রণবশংকর জানতে চাইছিলেন?

—হ্যাঁ।

—কেন হঠাৎ একথা জানতে চাইলেন প্রণবশংকর? উনি তো বইটই নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানুষ নন। সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকেন।

রাজাবাহাদুর হাসলেন। —হ্যাঁ—আমি ওঁকে ঠাট্টা করে বললুম, এতকাল ধরে বইটা যে নষ্ট হচ্ছিল, আপনাদেরই ছাপানো উচিত ছিল। পূর্বপুরুষের লেখা বই। দৈবাৎ আমার চোখে না পড়লে তো নষ্ট হয়েই যেত।... প্রণবদা বললেন, ঠিকই বলেছ। তখন বইটার মূল্য বুঝিনি।

—প্রণবশংকর তাই বললেন?

রাজাবাহাদুর কর্নেলের উত্তেজনা লক্ষ করে অবাক হলেন। —আপনি কি প্রণবদাকে...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, না, না। তা নয়। —তারপর উঠে দাঁড়ালেন। তবে এই কথাটাই জানতে চেয়েছিলুম অবশ্য। যাই হোক, রাজাবাহাদুর, আমি এখনই রামশংকরপুরে ফিরতে চাই। এবার কিন্তু আপনার জিপগাড়িটা চাইছি।

—অবশ্য, অবশ্য। এক মিনিট, আমি রমেনকে বলে দিচ্ছি। আপনাদের একবারে প্রণবদার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। গঙ্গায় জিপ পার করার নৌকা আছে। অসুবিধে হবে না।

ফেরার পথে কর্নেলকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করিনি। জিপে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছুতে মিনিট কুড়িরও কম লাগল। নৌকোয় জিপসুদ্ধ পেরুতে মোটে মিনিট-দশেক। যন্ত্রচালিত নৌকোয় গাড়ি পার করার ব্যবস্থা আছে।

বাঁড়ুজ্জেবাড়ির ফটকে আমাদের নামিয়ে দিয়ে রাজাবাহাদুরের জিপগাড়ি চলে গেল। সাতটা বেজে গেছে। বাড়িটা একেবারে নিশুতি নিঝুম হয়ে রয়েছে। জ্যোৎস্না ও কুয়াশায় চারদিকে কেমন ঝিমন্ত দশা।

প্রণবশংকর দাঁড়িয়েছিলেন বসার ঘরের বারান্দায়। বললেন,—ফিরে এলেন ভৈরবগড় থেকে? দেখা হল রাজাবাহাদুরের সঙ্গে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। উমাশংকরবাবুর বডি ফেরত আসেনি মর্গ থেকে?

—চারটেয় এল। সব রেডি ছিল। দাহ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। এই মিনিট-কুড়ি হল শ্মশান থেকে ফিরছি।

কথা বলতে-বলতে আমরা দক্ষিণের সেই ঘরে গেলুম—যে ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছে। একটু পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল। একথা-ওকথার পর কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা মিঃ ব্যানার্জি, কিছুদিন আগে আপনি রাজাবাহাদুরকে ফোনে রাম শর্মার আত্মচরিত ছাপানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন?

প্রণবশংকর হঠাৎ এ-কথায় হকচকিয়ে গিয়ে বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করেছিলুম। কে বলুন তো? জিজ্ঞেস করা কি ভুল হয়েছে?

না, না। ভুল নয়। —কর্নেল হাসলেন, আমার জানবার উদ্দেশ্য, হঠাৎ কেন আপনি কথাটা জানতে চাইলেন রাজাবাহাদুরের কাছে?

প্রণবশংকর বিব্রতভাবে বললেন,—দেখুন, ও-সব বই-টইয়ের আমি কিছু বুঝিও না। ইন্টারেস্টও নেই। কোনো ব্যাপারেই নেই। ওই পরিতোষ একদিন বলল যে, বইটা আমাদেরই বের করা উচিত ছিল। আফটার অল, এ-বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমাদের পূর্বপুরুষ। রাজাবাহাদুর সত্যি-সত্যি ছাপবেন কি না কে জানে! তাই শুনে আমি বললুম, দেখছি খোঁজ নিয়ে।

—পরিতোষবাবুকে একবার ডাকবেন?

প্রণবশংকর ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ওকে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছি। কিন্তু এত ধকলে বেচারার জ্বর এসে গেছে। শ্মশান থেকে ফিরেই শুয়ে পড়েছে লেপমুড়ি দিয়ে। চলুন বরং, ওর ঘরেই যাওয়া যাক।

আমরা বাড়ির দক্ষিণ ও পূর্বদিক ঘুরে উত্তর-পূর্ব কোণের একটা ঘরের সামনে পৌঁছলুম। ঘরের ভেতরে আলো জ্বলছে। প্রণবশংকর ডাকলেন,—নুটু! ও নুটু! তারপর দরজায় টোকা দিলেন। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেললেন এবার। দরজাটা ভেজানো ছিল। খুলে গেল।

বিছানায় আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে কেউ শুয়ে আছে। প্রণবশংকর আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—সর্বনাশ! জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? নুটু, ও নুটু! বলে তিনি মাথার দিকের লেপ খানিকটা সরালেন।

কিন্তু সেখানে বালিশের ওপর পরিতোষবাবুর মাথার বদলে একটা লম্বা পাশবালিশের একটু অংশ দেখা গেল। প্রণবশংকর চমকে উঠেছিলেন। কর্নেল এক টানে লেপটা সরিয়ে দিতেই দেখলুম, বিছানায় পাশবালিশটা মানুষের মতো লম্বালম্বি শোয়ানো রয়েছে। প্রণবশংকর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন,—এর অর্থ?

কর্নেল বললেন,—পরিষ্কার। পরিতোষবাবু গতিক বুঝে গা ঢাকা দিয়েছেন।

অসম্ভব! এ হতেই পারে না। —বলে প্রণবশংকর খাপ্পা হয়ে বেরুলেন। বাইরে তাঁর হাঁকডাক শোনা গেল। গঙ্গাধরকে ডাকাডাকি করছেন। বলছেন,—দ্যাখ তো গঙ্গু, নুটু কোথায় গেল?

আমি প্রাজ্ঞ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। উনি ঘরের সবকিছু খুঁটিয়ে দেখছেন। বালিশ তোশক উলটে টেবিলের কাছে গেলেন। ড্রয়ার টেনে দেখলেন, খোলা। ভেতরে কী সব হাতড়ালেন। তারপর টেবিলের ওপাশে বইয়ের র‍্যাকের কাছে গেলেন। পকেট থেকে টর্চ বেরুল এবার। বললেন,—মাই গুডনেস! এ-সব কী! দেখছ জয়ন্ত, কী কাণ্ড?

বুঝতে না পেরে বললুম,—না তো। কিচ্ছু ঢুকছে না মাথায়।

—জয়ন্ত, এই বইগুলো দেখতে পাচ্ছ না? মোরহেডের লেখা 'মিশরীয় চিত্রলিপির রহস্য।' লর্ড কারনারভনের লেখা 'মমিপ্রথার ইতিহাস।' আর এই দেখো, 'মিশরে রোমানযুগের ইতিহাস'। এটা হল বিখ্যাত বই—'যিশুখ্রিস্ট এবং হারানো পাঁচটি পেরেক।' পরিতোষের ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!

বলে গোয়েন্দাপ্রবর টেবিলের তলা থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট টেনে বের করলেন। তারপর দলাপাকানো কাগজ, অ্যাশট্রে থেকে ফেলে দেওয়া সিগারেটের টুকরো, এইসব আবর্জনা ঘাঁটতে শুরু করলেন।

একটু পরে দেখি, কয়েকটা দলাপাকানো কাগজ টেনে সমান করে ফেললেন এবং পকেটে ভরতে দেরি করলেন না। তারপর কাগজকুচি কুড়িয়ে মেঝেয় ফেলে জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। প্রণবশংকর হন্তদন্ত এসে বললেন,—পরিতোষের এ-আচরণের মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছি না। কেন সে এমন অদ্ভুত কাজ করল?

সে কথার জবাব না দিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিঃ ব্যানার্জি, গতকাল সকালে কিংবা আগের রাত্রে কলকাতা থেকে কোনো ট্রাংককল এসেছিল কি?

—এসেছিল। তখন সবে আমি ঘুম থেকে উঠেছি। গঙ্গু বলছিল, নুটুবাবুর কল এসেছে কলকাতা থেকে।

—কী কথাবার্তা হচ্ছিল শোনেননি?

গঙ্গাধর দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। বলল,—নুটুবাবু কাউকে বারবার বলছিল, বড়বাবু রেগে আছেন। লুকিয়ে সন্ধ্যার পর এসো। আর বলছিল, চোরের ওপর বাটপাড়ি? খুব হাসছিল। ওই দুটো কথা মনে আছে স্যার।

কর্নেল বললেন,—উমাশংকরের দ্বিতীয় ভুল এটা।...

পাঁচ

আমাদের আস্তানায় ফিরে কর্নেল টেবিলের ওপর কাগজগুলো বিছিয়ে বললেন,—এবার দেখো, জয়ন্ত! অবাক হবে। দেখে সত্যি অবাক হলুম। কর্নেলের কাছে যে শব্দবর্গ দেখেছিলুম, একটা কাগজে সেটা লেখা রয়েছে।

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

পরের কাগজগুলোতে লেখা আছে :

কাক, কোকিল, কাঠঠোকরা, কাকাতুয়া, কাদাখোঁচা...

AEORPST SATPORE–সাতপুর...

রমাকান্ত কামার/সুবল বসু/রায়মণি ময়রা/সদা দাস...

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—এই বাংলা নামগুলো সম্ভবত নিছক খেলা। ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে থেকে পড়বে, নামগুলো একই থাকে। খেলা বলার কারণ, ওর তলায় লেখা আছে : কনক/জলজ/নতুন/নন্দন/কণ্টক, চামচা/মলম... খুব জটিল ধাঁধা নিয়ে মাথা ঘামানোর পর এই একটু রিলিফ আর কি!

প্রণবশংকর ওঁর মুখের দিকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়েছিলেন। বললেন,—কর্নেল! দোহাই আপনার! দয়া করে বলুন, পরিতোষই কি ছোটকুকে খুন করেছে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। পরিতোষের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বই হাতানো। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য প্রতিদ্বন্দ্বী খতম।

তাহলে কথাটা পুলিশকে এখনই জানানো দরকার। দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলুম—সেই সাপের বিষদাঁত ভাঙা দরকার।

প্রণবশংকর রাগে থরথর করে কাঁপছিলেন। কর্নেল তাঁকে শান্ত করতে বললেন,—প্লিজ, আর-একটু ধৈর্য ধরুন। এখনও মোক্ষম প্রমাণ আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

—কী সেটা?

—মার্ডার উইপন—যা দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল।

—সে কি কেউ রাখে? ওই তো পা বাড়ালেই গঙ্গা। ফেলে দিয়েছে।

ফেলে দিলেই বরং ধরা পড়ার চান্স ছিল। কারণ গোবিন্দ-মালি...এক মিনিট। আসছি। বলে কর্নেল হঠাৎ হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।

প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন,—কোথায় গেলেন অমন করে, বলুন তো জয়ন্তবাবু?

—মনে হচ্ছে, গোবিন্দ মালির কাছে।

প্রণবশংকর গুম হয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকার পর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

ক্রমশ শীত বাড়ছিল। মফস্বলে এত বেশি শীত আন্দাজ করতে পারিনি। যেমন-তেমন একটা জ্যাকেট চড়িয়ে এসেছিলুম। বিছানা থেকে কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে আরামকেদারায় বসতে যাচ্ছি। আলো নিভে গেল। নিশ্চয়ই লোডশেডিং। বাড়ির ওপরতলায় প্রণবশংকরের ডাকাডাকি শুনলুম। গঙ্গাধরকে হ্যারিকেন জ্বালতে বলছেন।

বাইরে জ্যোৎস্নায় কুয়াশা জমেছে। প্রাঙ্গণ এবং গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে গা ছমছম করছিল। মিনিট-পাঁচেক হয়ে গেল, তবু গঙ্গাধর আলো দিয়ে গেল না। ভাবলুম, ওকে ডেকে অন্তত একটা

মোমবাতি দিতে বলি। দরজায় গিয়ে 'গঙ্গাধর' বলে ডেকেছি, সেইসময় আবছা একটা শব্দ হল ঘরের ভেতর। ভেতরের দিকের দরজাটাও খোলা রয়েছে। ঘুরে দেখি, আবছা একটা মূর্তি কী যেন করছে—খসখস শব্দ হচ্ছে। বাইরের ময়লা জ্যোৎস্না এদিকের দরজা দিয়ে যেটুকু ছটা পাঠাতে পেরেছে, তা অন্ধকারেরই মতো। বললুম,—কে? কে ওখানে?

অমনি হিসহিস করে কে গলার ভেতর বলে উঠল,—চুপ। খতম করে ফেলব।

কেন যে ছাই টর্চটা বের করে রাখিনি অ্যাটাচি থেকে! তবে আমিও দমবার পাত্র নই। 'গঙ্গাধর! গঙ্গাধর! চোর! চোর!' বলে যেই চিৎকার ছেড়েছি, চোর হতচ্ছাড়া আমাকে এক ধাক্কায় কুপোকাত করে বেরিয়ে গেল। কম্বলজড়ানো অবস্থায় মেঝেয় পড়ে আমার দশা হল ফাঁদে পড়া শেয়ালের মতো। কম্বল থেকে বেরিয়ে যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন গঙ্গাধরের সাড়া এল। সে হ্যারিকেন নিয়ে দৌড়ে আসছিল।

গঙ্গাধর হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—কী হয়েছে স্যার? চোর ঢুকেছিল?

গম্ভীরভাবে 'হুঁ' বলে টেবিলের দিকে তাকালুম। সেই কাগজগুলো নেই। বুঝলুম, আড়াল থেকে চোর নজরে রেখেছিল তাহলে। কিন্তু ওগুলো নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? প্রমাণ লোপ করার চেষ্টা? তাছাড়া আর কী হতে পারে?

গঙ্গাধর গোমড়ামুখে তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলল,—ওদিকে আরেক কাণ্ড। সেজন্যে আলো আনতে দেরি হল। নুটুবাবুর ঘরেও চোর ঢুকেছিল।

—বলো কী! কিছু চুরি গেছে নাকি?

—বইয়ের র‍্যাক খালি করে বইগুলো নিয়ে গেছে।

—হুঁ, প্রমাণ লোপের চেষ্টা।

গঙ্গাধর বুঝতে না পেরে বলল,—আজ্ঞে?

—কিছু না। তুমি আর-একবার কড়া করে চা খাওয়াতে পারো গঙ্গাধর?

আনছি স্যার। —বলে সে চলে গেল।

এবার চোর পালিয়ে বুদ্ধি বেড়েছে আমার। টর্চ আর খুদে ২২ ক্যালিবারের রিভলভারটা বের করে ফেললুম। কতক্ষণ পরে গঙ্গাধর চা দিয়ে গেল। বলে গেল,—বড়বাবুর শরীর খারাপ করেছে। উনি শুয়ে রয়েছেন। বললেন, ওনারা যেন কিছু না মনে করেন।...

ঘণ্টা-দুই পরে কর্নেল ফিরে এলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,—গঙ্গাধরের মুখে সব শুনলুম। আশা করি, বহাল তবিয়তে আছ ডার্লিং!

—আছি। কিন্তু চোর সেই কাগজগুলো নিয়ে পালিয়েছে। ওদিকে পরিতোষবাবুর ঘর থেকে...

হাত তুলে গোয়েন্দামশাই বললেন, শুনলুম। তাতে কী? —বলে বসলেন এবং আস্তেসুস্থে চুরুট ধরালেন।

জিজ্ঞেস করলুম,—কোথায় গিয়েছিলেন?

কর্নেল হেলান দিয়ে বসে বললেন,—আমার বাহাত্তুরে ধরতে যে বেশি বাকি নেই, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে টের পেয়ে যাই। এ বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো লোক গোবিন্দ দাস। না ডার্লিং, পদাবলি রচয়িতা সেই কবি নন, ইনি মালি। আমার দোসর বলতে পারো। কারণ ক্যাকটাস চেনে। অর্কিড চেনে। এ বাড়ির সব পুরোনো গাছের গুঁড়ির ওপর এবং বিভিন্ন ডালে আশ্চর্য সুন্দর এক জাতের অর্কিড আছে। গোড়ার দিকটা লাল, ডগা নীল। এই শীতে তারা ফুল ফোটায়। সাদা থোকা-থোকা ফুল। গোবিন্দ বলল, রাম শন্না কোন্ মুলুক থেকে এনেছিলেন। পাঁচ পুরুষ ধরে তারা এ-গাছ সে-গাছে জন্মাচ্ছে। মরছে, আবার জন্মাচ্ছে।

—সেই অর্কিডের গল্প শুনছিলেন গোবিন্দের কাছে?

—হ্যাঁ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গোবিন্দ এ-বাড়িতে অপ্রয়োজনীয় সেকেলে আসবাবের মতো। দয়া করে তাকে এখনও আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। তার খুরপিতে মরচে ধরে ভেঙে গেলে তাকে আর নতুন খুরপি এনে দেওয়া হয় না। বড়বাবু তো থেকেও নেই। ম্যানেজারবাবুর যত ঝোঁক চাষবাসে। এমনকি, ওই ক্ষয়াটে ফুলফলের বাগানে নাকি আলু ফলাবেন বলে শাসিয়েছেন।

—ম্যানেজার কে?

নুটুবাবু—মানে, পরিতোষ।—কর্নেল চোখ বুজে চুরুটে মৃদু টান দিয়ে বললেন, বেচারা গোবিন্দের ছোট শাবলটা আজ সকাল থেকে উধাও। গোরুছাগলের অত্যাচারে অস্থির। সে একটা বেড়া দেবে ভাবছিল। কিন্তু গর্ত খোঁড়ার শাবলটাও কে চুরি করে নিয়ে যায়। কখন চুরি গিয়েছিল সে জানে না। গতকাল বিকেলেও দেখেছিল।

—কর্নেল! আপনি কি...

প্রাজ্ঞ গোয়েন্দা বললেন,—আনন্দের কথা, শাবলের জন্য বড়বাবুর কাছে নালিশের আগেই সেটা সে যথাস্থানে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হয়েছে। হ্যাঁ ডার্লিং, ওটা আর ফিরে না এলে গোবিন্দ বড়বাবুকে নালিশ করত। শাবলটা হঠাৎ ওভাবে নিপাত্তা হওয়া নিয়ে জল্পনাকল্পনা হত—বিশেষ করে উমাশংকরের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে।

কর্নেল ফুঁ দিয়ে চুরুটের ধোঁয়া সরিয়ে ফের বললেন,—কিন্তু শাবলটা যথাস্থানে ফিরে পেয়ে গোবিন্দ খুশি। —তার আর নালিশ জানাবার কারণ রইল না। হ্যাঁ—পরিতোষ তাই শাবলটা গঙ্গায় ফেলে দেয়নি। জানত, গোবিন্দ ও-নিয়ে মাথা ঘামানোর মানুষ নয়। বরং আর ফিরে না পেলেই মাথা ঘামাত। অন্যদের বলত।

—শাবলটা দেখলেন?

মাথা দুলিয়ে কর্নেল বললেন,—নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে শাবলটার কথা আমাকে বলল গোবিন্দ। নইলে ওটা তার কাছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়—অন্তত হারানিধি ফিরে পাওয়ার পর। এখন কথা হচ্ছে, লোহার শাবল দিয়ে মাথার পেছনে আঘাত করলে শাবলে রক্ত লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। রক্ত ছিটকে বেরোতে যত কম হোক, একটু সময় লাগে। ভোঁতা জিনিস দিয়ে চুলের ওপর আঘাত। ধরো, রক্ত ছিটকে বেরোতে অন্তত তিন-চার সেকেন্ড দেরি হবে। তার মধ্যে জিনিসটা সরে এসেছে। কাজেই রক্ত নাও লাগতে পারে। কিংবা যদি লাগে, অনেকসময় খালি চোখে তা দেখা নাও যেতে পারে। এক্ষেত্রে ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়া কিছু করার নেই। গোবিন্দের শাবলের ওপর এই জোরালো টর্চের আলো ফেলে আতশ কাচ দিয়ে দেখলুম, রক্তের সূক্ষ্ম ছিটে লেগে রয়েছে।

বলে কর্নেল তাঁর ওভারকোটের ভেতর থেকে কাগজে মোড়া ফুটদেড়েক লম্বা একটা জিনিস বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর বের করলেন একটা বই। চামড়ায় বাঁধানো হলেও সেটার অবস্থা জরাজীর্ণ। অবাক হয়ে বললুম,—ওটা কী? কোথায় পেলেন ওটা?

—তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নে বোঝা যাচ্ছে, তুমি এটা কী বই বুঝতে পেরেছ। ডার্লিং, এই সেই হারানো বই—রামশংকর শর্মার আত্মচরিত।

—কোথায় পেলেন আগে বলুন?

কর্নেল নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বললেন,—গোবিন্দ অর্কিড চেনে। রাম শর্মার আনা অর্কিডের বংশধরদের ওপর তার খুব লক্ষ। ফুল ফুটলে তো কথাই নেই, সে আনন্দে নেচে ওঠে। অর্কিডের কথায় খুশি হয়ে বলল, কোণের শিরীষ গাছটার গুড়ির ওপর যে অর্কিডগুলো আছে, ওবেলা তাতে ফুল ফুটেছে। দেখবেন নাকি হুজুর? আমি কেন, সাহেবি-পোশাকপরা সবাই ওর কাছে হুজুর। তো

আমার টর্চ খুব জোরালো। ফুল দেখতে-দেখতে হঠাৎ চোখে পড়ল, অর্কিডের ঝালরের ভেতর কী যেন রয়েছে। পাখির বাসা? গোবিন্দকে বললুম, মই আছে কি? গোবিন্দ বলল, আনছি হুজুর।

বাধা দিয়ে বললুম,—অর্কিডের ভেতর বইটা লুকনো ছিল তাহলে?

ধুরন্ধর বৃদ্ধ কোনো জবাব দিলেন না। বইটা টেনে নিলুম হাত থেকে। চোখ বুজে চুরুটে টান দিয়ে বললেন,—আগে পরিশিষ্টটা পড়ো, শুনি।

পড়তে শুরু করলুম। জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। সবটা পড়া যায় না।

...ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের প্রতি উপদেশদান নিমিত্ত কহি যে, সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করিবেক। বিশেষত কহি যে যিশুখ্রিস্টও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া অস্মদেশে স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার শোণিতে মনুষ্যজাতির পাপ ধৌত হইয়াছে। অপিচ যে ২ জড়বস্তুসমুদয় তাঁহার শোণিতপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহারা জড়ত্বনাশ হেতু ধন্য হইয়াছে।... উদ্যানে পক্ষীসকল বিচরণ করে। উহারা পঞ্চ প্রকার পঞ্চরূপের প্রতীক। সেই পঞ্চরূপ হইল পঞ্চবাণ। খ্রিস্টের শোণিতপ্রাপ্ত পঞ্চবাণ... উদ্যানের শোভাস্বরূপিণী অপ্সরার রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত কহি যে উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ বিধায় উহা ধন্য। বহু প্রযত্নে উহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।...

কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। বইটা আমার হাত থেকে নিয়ে পরিশিষ্ট পড়তে শুরু করলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্ত, সম্ভবত এখানেই রাম শর্মা কী যেন আভাস দিয়েছেন।... অপ্সরামূর্তি —মানে নিশ্চয় ফোয়ারার মাথায় ওই মূর্তিটা। পাঁচকোণা ফোয়ারা।... রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দিচ্ছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের।... উহার অনিন্দ্যসুন্দর আননে আত্মবলিদানের স্পর্শগুণ... জয়ন্ত! একথায় কি যিশুর ক্রুশে আত্মবলিদান বোঝাচ্ছে না?... কিন্তু কথাটা লক্ষ করো। আ—ন—নে। তার মানে মুখে। মুখে মানে মাথার ভেতর...!

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন উত্তেজিতভাবে। আমারও মাথার ভেতর একটা সাড়া জাগল। বললাম, —কিন্তু ফোয়ারার ওই অপ্সরার মাথাই তো নেই। কবে ঝড়ের সময় গুঁড়ো হয়ে গেছে। প্রণবশংকর বলছিলেন না?

কিন্তু তাহলে পেরেকটা নিশ্চয় কেউ পেয়েছিল। দেখেও কিছু টের পায়নি। —কর্নেল অস্থির হয়ে বললেন। একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিস!

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তারপর টর্চের আলো দেখলুম। কেউ ভারী গলায় বলল, —কোন্ ঘরে?

গঙ্গাধরের কথা শোনা গেল,—ওই যে স্যার, হ্যারিকেন জ্বলছে।

কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে বললেন,—মিঃ সান্যাল নাকি? চলে আসুন।

হ্যাল্লো ওল্ড ডাভ! —একজন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। আরও চারজন পুলিশ অফিসার তাঁর পেছন-পেছন ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বুঝলুম গত দু-ঘণ্টা ধরে গোয়েন্দাপ্রবর শুধু গোবিন্দের সঙ্গে আড্ডা দেননি, এঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন।

কর্নেল বললেন,—মিঃ সান্যাল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি। আর জয়ন্ত, ইনি পুলিশ সুপার মিঃ অজিতেশ সান্যাল।

অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের পর কাজের কথা শুরু হল। থানা অফিসার ইন্দ্রজিৎ ভদ্র বললেন,—পরিতোষকে মাঠে মিঃ ব্যানার্জির ফার্মে পাওয়া গেছে। কর্নেল, আপনার অনুমান কাঁটায়-কাঁটায় মিলে গেছে। এইমাত্র ওকে পাকড়াও করে সোজা আসছি। আসামি এতক্ষণ থানার লক-আপে।

কর্নেল বললেন,—এই নিন মার্ডার উইপন। ফরেনসিকে পাঠাতে হবে। ওতে রক্ত আর খুনির হাতের ছাপ আছে। পাকা সাক্ষী গোবিন্দ-মালিও।

কাগজের মোড়কে ভরা শাবলটা একজন অফিসার সাবধানে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে প্রণবশংকর নেমে এলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—রাস্কেল খুনিটা ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে কালসাপটা?

মিঃ সান্যাল হাসতে-হাসতে বললেন,—কিছুক্ষণ আগে। আপনার ফার্ম হাউসে গিয়ে রাত কাটাবে ভাবছিল। আগে থেকে ওত পেতে ছিল আমাদের লোকজন। ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন গিয়ে।

প্রণবশংকর বসলেন। বললেন,—চায়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। আপনারা একটু বসুন দয়া করে।

কর্নেল বললেন,—এই দিকটা আমি এখানে আসার পরও ভাবিনি। বোম্বের রোডরিগেরই লোক এখানে আছে ভেবেছিলুম। কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলুম না, বোম্বে থেকে ওর পক্ষে এত দ্রুত এখানে যোগাযোগ—তাছাড়া বইটা চুরির খবর পাওয়া, সবই কেমন গোলমেলে মনে হচ্ছিল। বিকেলে ভৈরবগড় গিয়ে রাজাবাহাদুরের কাছে যখন জানতে পারলুম, মিঃ ব্যানার্জি বইটা ছাপার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন, তখনই টের পেলুম মিঃ ব্যানার্জির পেছনে থেকে কেউ তাগিদ দিচ্ছে। বহু ভাবনা-চিন্তার পর বইটা এবার তার খুব দরকার হয়েছে। যাই হোক, পরিতোষ মরিয়া হয়ে প্রমাণ লোপের চেষ্টা করছিল লোডশেডিংয়ের সুযোগে। বইটাও শিরীষ গাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে যেত। কিন্তু আমি সেখানে থাকায় পারেনি। ভেবেছিল পরে একসময় এসে নিয়ে যাবে। এবার একটা কথা জিজ্ঞেস করি মিঃ ব্যানার্জিকে।

প্রণবশংকর বললেন,—বলুন কর্নেল।

—ফোয়ারার অপ্সরার মাথা ১৯৪২ সালের ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তখন আপনার বয়স কত?

—তা চব্বিশ-পঁচিশ হবে।

—তাহলে তো আপনার মনে থাকা উচিত। অপ্সরার মাথা ভেঙে যাওয়ার পর কোনো পেরেক জাতীয় কিছু দেখেছিলেন ওর ভেতর?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। গলার ভেতর লোহার শূল মতো বসানো ছিল—মুণ্ডটা জোড়া দেওয়ার জন্য।

কর্নেল শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন,—না মিঃ ব্যানার্জি, ওটাই সেই পবিত্র ঐতিহাসিক পেরেক।

বলেন কি!—প্রণবশংকর অবাক হয়ে বললেন। তাই বুঝি ওটার গায়ে খুদে হরফে কীসব লেখা ছিল যেন।

—সেটা তারপর কী হল মনে আছে?

গঙ্গাধর দরজার কাছ থেকে বলল,—কেন বড়বাবু, সেটা গোবিন্দের বউ উপড়ে এনেছিল না? ছাগল বাঁধার খুঁটি করেছিল। গোঁজের মতো জিনিসটা। পায়ে নকশাকাটা ছিল।

কর্নেল বললেন,—তাহলে সেটা গোবিন্দের ঘরে থাকা উচিত।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বলল,—গোঁজটা ভারি অপয়া ছিল স্যার। গোবিন্দের বউ যে-ছাগল ওতে বাঁধত, হয় তাকে শেয়ালে নিয়ে যেত, নয়তো রোগে ভুগে মারা পড়ত। শেষে বউটাও মরে গেল। তখন গোবিন্দ একদিন ওটা গঙ্গায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। তারপর আর কোনোরকম ক্ষতি হয়নি স্যার!

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন,—গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিল?

এতক্ষণে দেখলুম দরজার কাছে একটা ভীষণ বুড়োমানুষ তুলোর কম্বল জড়িয়ে বসে রয়েছে। সে খকখক করে কাশল প্রথমে। তারপর বলল,—হুজুর, ওই নকশাকাটা মন্তর লেখা গোঁজই এ বাড়ির সব্বোনাশ করছে। বড়বাবুর ছেলেপুলে নেই। একটা ভাই ছিল, সেও বেঘোরে খুন হলেন।

ইদিকে আমার দশা দেখুন। কোনোরকমে বেঁচে আছি। কোনো সুখশান্তি নেই হুজুর। সেই থেকে কোনো সুখশান্তি নেই। ওই যে কথায় বলে, যত হাসি তত কান্না/ বলে গেছে রাম শন্না! লোহার গোঁজে মন্তর খোদাই করে রেখেছিল কেউ। তাইতে ওনারও ফাঁসিতে পেরান গিয়েছিল।

ঘরে সবাই কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আলো জ্বলে উঠল। প্রণবশংকর বললেন,—গঙ্গু! চা কোথায় রে?

আনি বড়বাবু!—বলে গঙ্গাধর চলে গেল।

কর্নেলের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, গালে হাত রেখে বসে আছেন চুপচাপ। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। পবিত্র ঐতিহাসিক জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতে পারতেন তুমুল উত্তেজনায়।...

সকালের ট্রেন ধরব বলে আমরা তৈরি হয়েছিলুম। কর্নেল বললেন,—এসো জয়ন্ত! একবার ফোয়ারার বিদেশিনী অপ্সরাকে বিদায় জানিয়ে আসি।

ফোয়ারার কাছে গিয়ে বললেন,—আমায় সত্যি বাহাত্তুরে ধরেছে ডার্লিং। নইলে কাল দুপুরে এই পাঁচকোণা ফোয়ারা দেখেই অনুমান করা উচিত ছিল, এখানেই রহস্যের চাবি লুকিয়ে রয়েছে। ওটা দেখামাত্র খ্রিস্টীয় পবিত্র নক্ষত্রের কথা মাথায় এসেছিল। অথচ পেরেকটার সঙ্গে এর স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকা উচিত। SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS!—এক মিনিট!

বলে কর্নেল ফোয়ারার ভেতর নেমে ফাটলধরা চুন-কংক্রিটের স্তম্ভের একদিকে ঘাস ও আগাছা সরালেন। একটা ছুরি বের করলেন পকেট থেকে। ছুরি দিয়ে ঘষতে থাকলেন বেশ কিছুক্ষণ।

তারপরই মুখ তেতো করে সরে এলেন। দেখি, স্তম্ভের গায়ে একটা কাকের টেরাকোটা মূর্তি ফুটে বেরিয়েছে। তাহলে অন্যদিকে কোকিল, কাকাতুয়া, কাঠঠোকরা আর কাদাখোঁচাও নিশ্চয় আছে।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু আর ঘুরেও দাঁড়াতে রাজি নন। বললেন,—ট্রেনের সময় হয়ে গেছে। চলে এসো জয়ন্ত।

বুঝলুম, ওই কাকটাই গণ্ডগোল বাধিয়েছে। কাক ওঁর দুচোখের বিষ।...

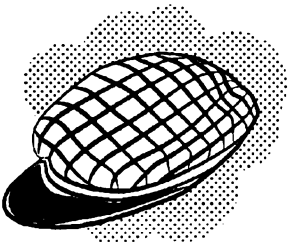

কোদণ্ড পাহাড়ের বা-রহস্য

হাথিয়াগড় বনবাংলো চৌকিদার ঘন্টারাম সাবধান করে দিয়েছিল, সম্প্রতি তল্লাটে একটা মানুষখেকো বাঘের খুব উপদ্রব। কাজেই আমরা যেন সবসময় হুঁশিয়ার থাকি।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের পাল্লায় পড়ে বরাবর যা হয়, এবারও তাই হল। হাথিয়াগড় জঙ্গলে কোদণ্ড নামে একটা হাজার দশেক ফুট উঁচু পাহাড় আছে এবং সেই পাহাড় থেকে একটা জলপ্রপাত নেমে প্রকাণ্ড জলাশয় সৃষ্টি করে নদী হয়ে বয়ে গেছে। জলাশয়ে নাকি প্রচুর মাছ। কর্নেল ছিপ ফেলে সেই মাছ ধরবেন এবং আমাকে অসংখ্য দিব্যি কেটে বলেছিলেন, 'না ডার্লিং! পাখি-প্রজাপতি আর নয়। এবার মাছ—স্রেফ মাছই আমার লক্ষ্য। ছিপে গাঁথতে পারি বা না পারি, সেটা কোনো কথা নয়। ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে। জলটাও খুব স্বচ্ছ। কাজেই বঁড়শির টোপের কাছে মাছের আনাগোনা স্পষ্ট দেখা যাবে। আসলে আমি মাছের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ইদানীং একটু মাথা ঘামাচ্ছি। কাজেই ডার্লিং....'

বিশেষ করে মনস্তত্ত্বের কচকচি শোনার চেয়ে তক্ষুণি রাজি হওয়াই ভাল। তা ছাড়া বক্তৃতা শোনার চেয়ে মানুষখেকো বাঘ-টাঘের পেটে গিয়ে লুকানো আরও ভাল।

জলাশয়টি এবং পারিপার্শ্বিক অবশ্য সত্যিই সুন্দর। যেন ছবিতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। অক্টোবরের বিকেলের রোদ্দুরটিও খাসা। কর্নেল ছিপ ফেলে বসে আছেন। স্বচ্ছ জলের তলায় ছোট-বড় নানা জাতের মাছের আনাগোনাও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মাছগুলো বড় সেয়ানা। টোপের আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু টোপে মুখ দিচ্ছে না। এদিকে আমার বাঘের ভয়। বারবার পেছনটা এবং এদিক-ওদিক দেখে নিচ্ছি। বাতাস বন্ধ। কোথাও একটুখানি শব্দ হলেই চমকে উঠছি। কর্নেলের দৃষ্টি কিন্তু ফাতনার দিকে। প্রপাতটা বেশ খানিকটা দূরে বলে জল পড়ার শব্দ অত প্রচণ্ড নয়, আবছা।

একটু পরেই গণ্ডগোল বাধাল হতচ্ছাড়া বাউন্ডুলে একটা রঙবেরঙের প্রজাপতি। কোত্থেকে উড়ে এসে ফাতনার ওপর বসল। অমনি যথারীতি প্রকৃতিবিদের মাথা খারাপ হয়ে গেল। ক্যামেরাটি তাক করলেন। কিন্তু ধূর্ত প্রজাপতি বেগতিক বুঝে উড়ে গেল। তখন বাইনোকুলারে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর 'জয়ন্ত, জয়ন্ত! ছিপটা...' বলে উধাও হয়ে গেলেন। আমি ডাকতে গিয়ে চুপ করলুম। রাগে, ক্ষোভে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না। একেই বলে, স্বভাব যায় না মলে!

কিন্তু কর্নেলের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষখেকো বাঘটার আতঙ্ক এসে আমাকে কাঠ করে ফেলল।

এমনই কাঠ সেই মুহূর্তে ছিপের হুইলে ঘর-ঘর শব্দ হল এবং শেষে বঁড়শিগেলা শক্তিমান একটা মাছ হ্যাঁচকা টান দিল, ছিপটা আমার হাত ফসকে জলে গিয়ে পড়ল। শুধু বললুম, 'ওই যাঃ!'

অমনি বাঁদিকে ঝোপের আড়াল থেকে প্রকৃতিবিদের গলা শুনতে পেলুম। 'তোমাকে ছিপটার দায়িত্ব দিয়েছিলুম জয়ন্ত!'

ছিপটা তখন জলার মাঝখানে একবার খাড়া হচ্ছে, একবার কাত হচ্ছে। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললুম, 'সরি! কিন্তু আপনি দিব্যি করেছিলেন, পাখি-প্রজাপতির পেছনে দৌড়বেন না।'

কর্নেল ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'অভ্যাস, ডার্লিং! যাই হোক, ঘন্টারামই এখন ভরসা। তাকে ডেকে এনে দামি ছিপটা উদ্ধার করা দরকার। আশা করি, মাছটার লোভে সে....'

হঠাৎ কোথাও পরপর দুবার গুলির শব্দ শোনা গেল। কর্নেল থেমে গিয়ে কান খাড়া করে শুনলেন। ব্যস্তভাবে বললুম, 'কোনও শিকারি, নিশ্চয় মানুষখেকো বাঘটাকে গুলি করল।'

কর্নেল বললেন, 'হুঁ', রাইফেলের গুলির শব্দ। এসো তো, ব্যাপারটা দেখা যাক।'

উনি পা বাড়ালে বললুম, 'জঙ্গলে কোথায় কোন শিকারি গুলি করল, খুঁজে বের করবেন কীভাবে?'

'কান, জয়ন্ত, কান।' কর্নেল নিজের একটা কান দেখালেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মার জঙ্গলে গেরিলাযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিলুম। কোন শব্দ কোনদিকে কতদূরে হল, সেটা আঁচ করতে পারি। চলে এসো।'

ঘন জঙ্গল আর পাথরের চাঁই ছড়ানো। যেতে-যেতে প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করছি, বাঘটা না মরে জখম হয়ে থাকলে দৈবাৎ তার সামনে গিয়ে পড়ি তো অবস্থা শোচনীয় হবে। তবে কর্নেল আমার আগে যাচ্ছেন, সেটাই ভরসা। জখমি বাঘ তাঁর ওপরই ঝাঁপ দেবে। ঝাঁপ দিলে আমি 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' করে পিঠটান দেবই। কোনও মানে হয়?

ক্রমশ জঙ্গল ঘন হচ্ছিল। একে তো বিকেলবেলা, তার ওপর ঘন এবং উঁচু-নিচু গাছের ছায়া আবছা আঁধার করে রেখেছে। কর্নেল হন্তদন্ত হাঁটছেন। আমি বারবার হোঁচট খাচ্ছি। একখানে একটু খোলামেলা জায়গা, ঘাসে ঢাকা জমি। জমিটার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরের নিচের ঘাসগুলো বেশ উঁচু। তার ভেতর কী-একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। তখন কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

গিয়ে দেখলুম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

রক্তাক্ত দেহে একজন মানুষ পড়ে রয়েছে। পরনে আঁটোসাঁটো শিকারির পোশাক। পায়ে হান্টিং জুতো। একপাশে রাইফেলটা ছিটকে পড়ে আছে। ফালাফালা পোশাক আর চাপচাপ রক্ত। কর্নেল তাঁর মুখের কাছে ঝুঁকে গেলে অতিকষ্টে বললেন, 'বা...' এবং তারপর শরীরটা বেঁকে স্থির হয়ে গেল।

কর্নেল সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর।

উত্তেজিতভাবে বললুম, 'বা বললেন! মানে বাঘ, কর্নেল! মানুষখেকো বাঘটা ওকে আক্রমণ করেছিল।'

কর্নেল চুপচাপ দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছিলেন। তারপর রাইফেলটা কুড়িয়ে নিলেন। চেম্বার খুলে পরীক্ষা করে দেখে আস্তে বললেন, 'অটোমেটিক রাইফেল! কিন্তু....'

কর্নেল ঘাসে-ঢাকা জমিটার ওপর হুমড়ি খেয়ে কিছুক্ষণ কী-সব দেখলেন-টেখলেন। জিগ্যেস করলুম, 'কিন্তু কী, কর্নেল?'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত, তুমি বডি পাহারা দাও। এই রাইফেলটা নাও। সাবধান, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটা অটোমেটিক। এই পাথরটা যথেষ্ট উঁচু আর নিরাপদ। তুমি পাথরটায় বসে বডি পাহারা দেবে। আমি আসছি।'

বলে রাইফেলটা আমার হাতে দিয়ে ব্যস্তভাবে জঙ্গলে ঢুকলেন এবং নিপাত্তা হয়ে গেলেন। কোনও আপত্তি করার সুযোগই পেলুম না। হাতে রাইফেল। তাতে কী? এই ভদ্রলোকের অবস্থাটা কী হয়েছে? শিকারের বইয়ে পড়েছি, মানুষখেকো বাঘ অতিশয় ধূর্ত।

সাবধানে উঁচু পাথরটার মাথায় চড়ে বসলুম। অদূরে পাহাড়টার কাঁধ ছুঁয়েছে সূর্য। রোদ্দুর ফিকে হয়ে আসছে। এতক্ষণে পাখ-পাখালির তুমুল কলরব শুরু হল। কর্নেল কখন ফিরবেন কে

জানে! কাছাকাছি জঙ্গলের ভেতর মানুষখেকোটা কোথাও নিশ্চয় ওঁত পেতে আছে। শিকারটিকে কড়মড়িয়ে খেতে আসবে। তখন ধরা যাক, গুলি করলুম। কিন্তু যদি ফস্কে যায় গুলি? বাঘটা লাফ দিয়ে আমকে...সর্বনাশ!

দরদর করে ঘাম ঝরতে থাকল। জীবনে এমন সাংঘাতিক অবস্থায় কখনও পড়িনি। পাথরটার সবচেয়ে উঁচু অংশে বসে আছি। তাই নিচের রক্তাক্ত মৃতদেহ চোখে পড়ছে না। পড়লে ওই ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে আরও ভয় পেতুম।

কিন্তু কর্নেল আমাকে মড়ার পাহারায় বসিয়ে রেখে কোথায় গেলেন? বাংলো এখান থেকে অন্তত এক কিলোমিটার দূরে। চৌকিদার ঘন্টারামকে দিয়ে হাথিয়াগড় টাউনশিপে খবর পাঠাবেন কী? কার কাছে খবর পাঠাবেন। হয়তো থানায়। তা হলে এখানে কর্নেল এবং পুলিশ এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে! এদিকে সঙ্গে টর্চ নেই।

এইসব দুর্ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, এমন সময়ে সামনেকার জঙ্গল ফুঁড়ে দুজন লোক বেরুল। তারা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। একজন হিন্দিতে বলল, 'হায় রাম! বাবুজির বরাতে এই ছিল?' তারপর রক্তাক্ত দেহটির দিকে ঝুঁকে কান্নাকাটি শুরু করল।

অন্যজন বলল, 'অত করে বারণ করলুম। বাবুজি শুনলেন না। হায় হায়! এ কী হল?'

জিগ্যেস করলুম, 'আপনারা কোত্থেকে আসছেন?'

প্রথমজন চোখ মুছে বলল, 'হাথিয়াগড় থেকে, বাবুজি! একজন বুড়োসায়েব খবর দিলেন, আমাদের বাবুজি বাঘের পাল্লায় পড়ে মারা গেছেন।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'দেরি কোরো না! হাত লাগাও। এখানে বডি পড়ে থাকলে মানুষখেকো বাঘটা বডি খেতে আসবে। ওঠাও ওঠাও!'

প্রথমজন বলল, 'বাবুজির বন্দুক?'

বললুম, 'এই যে!'

রাইফেলটা আমার হাতে দেখামাত্র সে হাত বাড়াল। 'দিন স্যার! বাবুজির খুব শখের বন্দুক ওটা!'

এই সময় কাছাকাছি কোথাও জঙ্গলের ভেতর বাঘটা ডাকল, আ-উ-ম। তারপর চাপা গরগর গজরানিও শোনা গেল। আমি পাথর থেকে নামতেই রাইফেলটা প্রায় ছিনিয়ে নিল প্রথম লোকটা। আবার বাঘের গরগর গর্জন শুনতে পেলুম। রাইফেল বগলদাবা করে প্রথম লোকটি তাড়া দিল, বাঘটা এসে পড়েছে। বডি ওঠাও।'

দুজনেই তাগড়াই চেহারার লোক। গায়ে জোর আছে বোঝা গেল। শিকারি ভদ্রলোকের রক্তাক্ত মৃতদেহ কাঁধে তুলে ওরা ব্যস্তভাবে হাঁটতে শুরু করল।

আমি ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতর ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। ওরা লম্বা পায়ে দৌড়চ্ছে। নাগাল পাচ্ছি না। খানিকটা এগিয়ে গেছি, ডানদিকে আবার বাঘের গরগর গজরানি শুনতে পেলুম। একখানে গাছপালার ফাঁক গলিয়ে একটু ফিকে আলো এসে পড়েছে। সেখানে একটা ঝোপের ফাঁকে বাঘের মাথা দেখতে পেলুম।

অমনি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। হ্যাঁ, মাথা খারাপই বটে। নইলে কী করে গাছে চড়ে বসলুম এর ব্যাখ্যা হয় না।

গাছটা অবশ্য তত উঁচু নয় এবং কয়েকটা ডাল নিচুতে নাগালের মধ্যেই ছিল। যতটা উঁচুতে পারা যায়, উঠে গেলুম। হাত ছড়ে গেল। জামাও একটু-আধটু ফর্দাফাঁই হল। ডালে বসে নিচের দিকে লক্ষ্য রাখলুম, বাঘটা মড়া হাতছাড়া হওয়ার রাগে এবার আমাকেই খাওয়ার জন্য ফন্দিফিকির করছে কি না। শিকারের বইয়ে বাঘের গাছে চড়ার কথাও পড়েছি। সেটাই দুর্ভাবনার ব্যাপার।

কিন্তু বাঘটা আর গজরাচ্ছে না। হয়তো মড়াবাহী লোকদুটোকেই চুপি-চুপি অনুসরণ করেছে। এখন কথা হল, কর্নেলের কাছেই ওরা ওদের বাবুজির খবর শুনেছে, অথচ, কর্নেল ওদের সঙ্গে এলেন না কেন? সম্ভবত ওরা দৌড়ে এসেছে এবং কর্নেল তাই ওদের নাগাল পাননি। এবার যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বেন। কান খাড়া করে বসে রইলুম।

কতক্ষণ কেটে গেল। জঙ্গল অন্ধকারে ছমছম করতে থাকল। চারদিকে নানারকমের ভূতুড়ে শব্দ। কাঠ হয়ে বসে আছি, হঠাৎ নিচের দিকে টর্চের আলোর ঝলক এবং কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম। 'এই যে! এদিকে।'

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া দিলুম, 'কর্নেল! কর্নেল!'

নিচে থেকে আমার ওপর আলো এসে পড়ল। কর্নেল বললেন, 'তুমি গাছের ডগায় কী করছ, জয়ন্ত?' তারপর ওঁর স্বভাবসিদ্ধ হা-হা অট্টহাসি।

রাগ চেপে অতি কষ্টে গাছ থেকে নেমে বললুম, 'কোনও মানে হয়? লোকদের খবর দিয়ে এতক্ষণে এসে জিগ্যেস করছেন, গাছের ডগায় কী করছি!'

কর্নেলের সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার আর জনা-দুই কনস্টেবল এসেছেন। কর্নেল আমার কথা শুনে বললেন, 'লোকদের খবর দিয়ে মানে? যাঁদের খবর দিতে গিয়েছিলুম, তাঁরা তো আমার সঙ্গে।'

অবাক হয়ে বললুম, 'দুজন লোক বডি তুলে নিয়ে গেল! তারাই বলল....'

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বলে উঠলেন, 'মাই গুডনেস! আমারই বুদ্ধির ভুল! আমাকে নির্ঘাত বাহাত্তুরে ধরেছে, আগাগোড়া খুলে বলো তো জয়ন্ত!'

সব শোনার পর কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত এমন বোকামি করে বসবে, ভাবিনি, যাই হোক, চলুন মিঃ সিনহা। আগে ঘটনাস্থলটা দেখাই।'

পুলিশ অফিসারটির নাম মিঃ সিনহা। তিনি পা বাড়িয়ে বললেন, 'জয়ন্তবাবু বললেন, সত্যিই বাঘটাকে দেখেছেন। গজরানিও শুনেছেন। কাজেই ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি।'

কর্নেল এদিকে-ওদিকে টর্চের আলো ফেলেছিলেন। একখানে আলো পড়তেই বাঘের মাথাটা ঝোপের ফাঁকে দেখা গেল। সবাই থমকে দাঁড়ালেন। কনস্টেবলরা বন্দুক তাক করল। কর্নেল তাদের বললেন, 'সবুর! খামোকা গুলি খরচ করে লাভ নেই।'

তারপর নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন ঝোপটার দিকে। বাঘটা আর একটুও গর্জন করছিল না। কর্নেল সোজা গিয়ে বাঘের মাথাটা খামচে ধরলেন এবং হা-হা করে হেসে উঠলেন।

মিঃ সিনহা বললেন, 'এ কী কর্নেল!'

'হ্যাঁ—একটা নিছক ডামি মুন্ডু। নকল মুন্ডু।' কর্নেল বাঘের মুন্ডুটা উপড়ে নিয়ে আমাদের কাছে এলেন। 'আসলে জয়ন্তকে ভয় দেখাতেই এই চালাকি করেছিল।'

বললুম, 'কিন্তু বাঘের ডাক?'

'ওটাও নকল।' কর্নেল সেই খোলা ঘাসজমিটায় পৌঁছে ফের বললেন, 'অনেক শিকারি অবিকল বাঘের ডাকের নকল করে বাঘকে আকৃষ্ট করেন। জিম করবেট বা অ্যান্ডারসনের শিকার-কাহিনিতে পড়েছি। তা ছাড়া জয়ন্ত যে অবস্থায় পড়েছিল, শেয়ালের ডাককে বাঘের ডাক বলে ভুল হতো ওর!'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'আমি অত বোকা নই।'

কর্নেল বললেন, 'মজাটা এই যে নিজের বোকামি নিজেই টের পাওয়া যায় না। ডার্লিং, কেউ এসে মড়াটা দাবি করলে সেটা না হয় দেওয়া চলে, হাতের সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে, রাইফেলটা দেওয়া যায় না।'

খোলা জায়গাটায় কিছু আলো আছে তখনও। মিঃ সিনহা ঘাসের ওপর রক্তের ছাপ টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। বললেন, 'হুঁ তলার মাটিটা নরম। কিন্তু সত্যিই বাঘের পায়ের ছাপ নেই।'

'নেই।' কর্নেল বললেন। 'সেটাই আমার সন্দেহের কারণ!'

মিঃ সিনহা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বডিটা কোথায় পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে—এখনই ব্যবস্থা করা দরকার।'

এতক্ষণে লক্ষ্য করলুম, তাঁর হাতে একটা ওয়াকি-টকি রয়েছে। বেতারে চাপা গলায় থানায় মেসেজ পাঠালেন। তারপর বললেন, 'চলুন কর্নেল ফেরা যাক। আপনাদের বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে যাব।'

সামান্য দূরে জঙ্গলের একটেরে পিচের রাস্তা। সেখানে পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছিল।...

বনবাংলোর বারান্দায় বসে কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, 'ছিপটা আর মাছটার কথা ভেবে এ রাতে আমার ঘুমের বারোটা বেজে যাবে ডার্লিং! সকালে....'

কথা কেড়ে বললুম, 'কিন্তু ওই শিকারি ভদ্রলোক পাণ্ডেজির ব্যাপারটা আমার ঘুমেরও বারোটা বাজাবে।' কর্নেল হাসলেন। 'হুঁ, ব্যাপারটা অবশ্য রহস্যময়। তবে স্রেফ তোমার বোকামির জন্যই রহস্যটা ঘনীভূত হল। তোমার হাতে একটা রাইফেল ছিল জয়ন্ত। পাঁচটা গুলির তিনটে ভরা ছিল। তুমি ওদের বডি তুলে নিয়ে যাওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারতে—যতক্ষণ না আমি পৌঁছচ্ছি!'

'কিন্তু আপনি কোনও আভাস দিয়ে যাননি!'

'ঘটনার আকস্মিকতায়, ডার্লিং!' কর্নেল সাদা দাড়ি চুলকে বললেন। 'দুবার গুলির শব্দ। তারপর পাণ্ডেজি বা বলেই শেষ-নিঃশ্বাস ফেললেন। বাঘের কথাই ভাবা সে-মুহূর্তে স্বাভাবিক। তারপর মনে হল, গুলি-খাওয়া বাঘ শিকারির ওপর ঝাঁপ দিলেও গর্জন করবে ক্রমাগত। অথচ গর্জনের শব্দ শুনিনি তো! তখনই প্রথম সন্দেহ জাগল। এটা কোনও হত্যাকাণ্ড নয় তো? সম্ভবত আমাদের হঠাৎ গিয়ে পড়ায় খুনিরা গা ঢাকা দিয়েছে। তা ছাড়া ঘাসের তলায় বাঘের পায়ের ছাপ নেই!'

'পাণ্ডেজি ভদ্রলোক কে?'

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন! তারপর অভ্যাসমতো চোখ বুজে বললেন, 'শিবচরণ পাণ্ডে হাথিয়াগড়ের বনেদি বংশের মানুষ। শিকারে প্রচণ্ড নেশা ছিল। আমার একজন পুরানো বন্ধুও বলতে পার ওঁকে।' তারপর চোখ খুলে চাপাস্বরে বললেন, ফের, আসলে পাণ্ডেজির চিঠি পেয়েই এবার আমার এখানে আসা এবং প্রপাতের জলায় মাছ ধরতে যাওয়া।'

চমকে উঠে বললুম, 'কী চিঠি?'

গোয়েন্দাপ্রবর জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা চিঠি বের করে দিলেন। চিঠিটা পড়ে আরও অবাক হয়ে গেলুম। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটার বাংলা করলে এই দাঁড়ায় :

'প্রিয় কর্নেল,

সম্প্রতি হাথিয়াগড় এলাকার একটা ধূর্ত মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। মানুষখেকো বাঘ ধূর্ত হয়। কিন্তু এ বাঘটা এমনই ধূর্ত যে, তার মানুষ মারার খবরই শুধু শুনি। কিন্তু মড়ার পাত্তা পাই না। খুব খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। আসল ব্যাপারটা হল : কোদণ্ড পাহাড়ের জলপ্রপাতের নিচে যে জলটা আছে, সেখানে বাঘটা জল খেতে আসবে ভেবে পরপর তিনটে রাত ওঁত পেতে ছিলুম। প্রতি রাতেই একটা অদ্ভুত জিনিস দেখছি। প্রপাতের দিকটাতে একটা উঁচু পাথর জল থেকে মাথা তুলেছে সেটা দেখতে কাছিমের খোলের মতো। ওখানে হঠাৎ একটা আলো জ্বলে ওঠে। আলোটা কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে। তারপর নিভে যায়। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। মাঝরাতে জ্যোৎস্নায় সব দেখতে পাই। প্রথমে আলোটা জ্বলে তারপর দেখি,

একটা ছোট্ট নৌকো এগিয়ে চলেছে আলোটার দিকে। প্রথম দুটো রাত ভেবেছিলুম জেলে-নৌকো মাছ ধরছে। কিন্তু মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব চলছে। কাদের এত সাহস হতে পারে? তৃতীয় রাতে জোরাল টর্চের আলো ফেলে নৌকোর লোকগুলোকে ডাকলুম। অমনি ওরা নৌকো অন্যদিকে ঘুরিয়ে দক্ষিণপাড়ে চলে গেল। অনেকটা ঘুরে পিচ রাস্তার ব্রিজ হয়ে সেখানে গেলুম। নৌকোটা বাঁধা আছে। লোক নেই। ব্যাপারটা রহস্যময়। সকালে আবার গেলুম সেখানে। নৌকোটা নেই। আমি এর মাথামুন্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। অনুগ্রহ করে রহস্যটা ফাঁস করে যান। শুভেচ্ছা রইল।

শিবচরণ পান্ডে

চিঠিটা ফেরত দিয়ে বললুম, 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি বটে!'

'হুঁ, রহস্য!' কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন এবং চওড়া টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমার কী মনে হয়, শুনি জয়ন্ত!'

একটু হেসে বললুম, 'আমি তো বোকা।'

'না না। বোকারা গাছে চড়তে পারলেই বুদ্ধি খোলে—চীনা প্রবাদ। তুমি গাছে চড়তে পেরেছ, ডার্লিং!'

কথার ভঙ্গিতে আরও হাসি পেল। বললুম, 'তা ঠিক। তারপর থেকে আমার মাথা সত্যি খুলে গেছে। এখন বুঝতে পারছি, ওই জলায় কেউ বা কারা গোপনীয় কিছু করছে এবং পান্ডেজি সেটা দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে মেরে ফেলা হল।

আমরা গিয়ে না পড়লে—সরি, আপনি গিয়ে না পড়লে ওটা মানুষ-খেকো বাঘের হাতে মৃত্যু বলে চালানো সোজা ছিল।'

'বাঃ! অপূর্ব! খাসা বলেছ ডার্লিং!' বৃদ্ধ ঘুঘুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

প্রশংসায় খুশি হয়ে বললুম, 'মানুষখেকো বাঘের ব্যাপারটাও রটনা বলে মনে হচ্ছে। যাতে জঙ্গলে লোকেরা না ঢোকে।'

কর্নেল সায় দিলেন। 'ঠিক, ঠিক!' বিশেষ করে ওই জলায় জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তারাও বাঘের ভয়ে যাতায়াত বন্ধ করেছে। যাই হোক, সকাল ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। তবে সত্যি জয়ন্ত, আমার ছিপটাও খুব দামি। আর মাছটাও নিশ্চয় বড়। দেখা যাক, ঘন্টারাম মাছটার লোভে আমার ছিপটা উদ্ধার করে দেয় নাকি। ঘন্টারাম! ঘন্টারাম! ইধার আও তুম!'

কর্নেল ঘন্টারামকে ডাকতে থাকলেন। ঘন্টারামের সাড়া পাওয়া গেল কিচেন থেকে। সেই রাতের খাবার তৈরি করছিল। এই সময় হঠাৎ কর্নেল মুচকি হেসে চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু জয়ন্ত, তোমার থিওরিতে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। পান্ডেজির শেষ কথাটি "বা...।" এ সম্পর্কে তোমার কী বক্তব্য?'

এবার একটু ঘাবড়ে গেলুম। বললুম, 'বা-রহস্য সত্যিই গোলমেলে। ওকে যদি মানুষেই হত্যা করে থাকে, 'বা...' মানে, বাঘ বলছে চাইলেন কেন?' বলেই ফের বুদ্ধি খুলে গেল। উত্তেজিতভাবে বললুম, 'হাঁ—বুঝেছি। পান্ডেজি এই নকল বাঘের মুন্ডুটা ঝোপের ফাঁকে দেখেছিলেন। মুন্ডুটা....'

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুন্ডুটা প্লাস্টিকে তৈরি খেলনার মুখোশ। তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ ডার্লিং! এই নকল মুন্ডু সম্পর্কেই হয়তো পান্ডেজির কিছু বক্তব্য ছিল। মৃত্যু সেই কথাটি শেষ করতে দেয়নি। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা 'বা...রহস্যে' আটকে যাচ্ছে দেখছি। নকল বাঘের মুন্ডুর কথাই বা বলতে গেলেন কেন পান্ডেজি?'

এতক্ষণে ঘন্টারাম সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। কর্নেল বললেন, 'এসো ঘন্টারাম। তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

ঘন্টারাম বিনীতভাবে বলল, 'বোলিয়ে কর্নেলসাব।' তাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।....

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। ভোরের দিকেই বোধহয় ঘুমটা আমাকে বাগে পেয়েছিল। কর্নেলের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বললেন, 'নটা বাজে। উঠে পড়ো ডার্লিং!'

একটু অবাক লাগল। কর্নেলের প্রাতঃভ্রমণে বেরুনোর অভ্যাস আছে জানি। কিন্তু বরাবর সবখানেই সাতটা-সাড়ে সাতটার মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষ করে এসে আমাকে ঘুম থেকে ওঠান। অথচ আজ সকালে নটা অবধি বাইরে ছিলেন।

তারপরই মনে পড়ে গেল ছিপ উদ্ধারের পরিকল্পনাটা। তাহলে ঘন্টারামকে নিয়ে প্রপাতের জলায় ছিপ উদ্ধারে গিয়েছিলেন। তাই এত দেরি? বললাম, 'ছিপটা পেলেন?'

কর্নেল গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'না :! ঘন্টারামের ধারণা, ছিপসুদ্ধু মাছটা জলার দক্ষিণে স্রোতের দিকটায় চলে গিয়েছিল। এতক্ষণ কয়েক মাইল দূরে চলে গেছে নদীর ধারে কোনও আদিবাসী বসতির কাছে গিয়ে পড়লে তাদের পেটে মাছটা হজম হয়ে গেছে। অবশ্য ছিপটা উদ্ধার করা যায়। দেখা যাক।' বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। চোখ বন্ধ। দাড়িতে আঙুলের চিরুনি কাটতে থাকলেন।

বাথরুম সেরে এসে দেখি, টেবিলে ব্রেকফাস্ট রেডি। ঘন্টারামকে আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে। সে চলে গেলে বললুম, 'আপনি খুব মুষড়ে পড়ছেন দেখছি। কিন্তু ঘন্টারামের মুখটা বড় বেশি তুম্বো হওয়ার কারণ আশা করি মাছ না পাওয়ার ব্যর্থতা নয়?'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ জয়ন্ত!' বৃদ্ধ ঘুঘু মিটিমিটি হাসতে থাকলেন। 'বেচারাকে সাতসকালে বঁড়শি-বেঁধা মাছের বদলে একটা মড়া ঘাঁটতে হয়েছে। তার ওপর ওর বউ ওকে মড়া ঘাঁটার জন্য আবার একদফা স্নান করিয়েছে।'

চমকে উঠে বললুম 'মড়া?'

'পান্ডেজির ডেডবডি।' কর্নেল টোস্টে কামড় দিয়ে বললেন, 'পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহা খুব জেদি মানুষ। পুরো পুলিশবাহিনী এবং বন দফতরের সব ক'জন রক্ষী, মায় রেঞ্জার সাহেবকেও লড়িয়ে দিয়েছিলেন। তল্লাটের বনজঙ্গল শ্মশান-মশান সারারাত চষা হয়েছে। বেগতিক দেখে খুনিরা পান্ডেজির বডি ওই জলায় তলার পাথর বেঁধে ডুবিয়ে রেখেছিল। ঘন্টারাম সেটা উদ্ধার করেছে। সে মোটা বখশিস পাবে সরকার থেকে! কিন্তু....'

কর্নেল খাওয়ায় মন দিলেন। বললুম, 'কিন্তু কী?'

'ওই বা....।'

চুপ করে গেলুম। বা-রহস্য সত্যিই নির্ভেজাল রহস্য। এই সময় দরজা দিয়ে চোখে পড়ল, বাংলোর লনে ঘন্টারামের হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চা সেই নকল বাঘের মুন্ডুটা নিয়ে খেলছে। তার মা এসে বাচ্চাটাকে বকাবকি করে কোলে তুলে নিল এবং মুন্ডুটা ছুড়ে ফেলে দিল। বুঝলাম, ঘন্টারামের বউ ওটাকে অলুক্ষুণে ভেবেছে। কিন্তু মুন্ডুটা কর্নেল কি বাচ্চাটাকে উপহার দিয়েছিলেন?

প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর কীভাবে সেটা আঁচ করে বললেন, 'ঘন্টারামের বউ খুব ভয় পেয়ে গেছে, জয়ন্ত! ওর ধারণা জীবজন্তুর নকল মুন্ডু বানানো ঠিক নয়। এতে তাদের ঠাট্টা করা হয়। তার ওপর মানুষখেকো বাঘ। তার নকল মুন্ডু! মানুষখেকো বাঘটা রেগে আগুন হয়ে গেছে এতে।'

কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। একটু পরে কফিতে মন দিলেন, ওঁর প্রিয় পানীয়। বললুম, 'জলার সেই কাছিমের খোলের মতো পাথরটা পুলিশ পরীক্ষা করল না? ওখানেই তো পান্ডেজি আলো দেখেছিলেন।'

'নিরেট পাথর।' কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া উড়িয়ে বললেন।

'নৌকো নিয়ে ওখানে গিয়েছিলুম। তা ছাড়া পাথরটা বেজায় পিছল। শ্যাওলা জমে আছে। ওঠা কঠিন। উঠলেও দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মিঃ সিনহা পা হড়কে জলে পড়ে গেলেন। পুলিশের উর্দি, রিভলবার সব ভিজে কেলেঙ্কারি।'

একটু ভেবে বললুম, 'তা হলে আলোটা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন পান্ডেজি। দূর থেকে দেখা ভুল হতেই পারে!'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলো, বেরুনো যাক।'

'ছিপ উদ্ধারে নাকি?'

'ঘন্টারামকে সে-দায়িত্ব দিয়েছি। আমরা কোদন্ড পাহাড়ে জলপ্রপাতের মাথায় উঠব, ডার্লিং! একটু কষ্টকর। তবে তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিঙে ট্রেনিং নেওয়া আছে। এসো, বেরিয়ে পড়ি....!'

এই খেয়ালি বুড়োর পাল্লায় পড়ে অনেকবার ভুগেছি। কিন্তু সে-কথা বলতে গেলেই উনি আমার মাথার ঘিলুর দিকে আঙুল তুলবেন। সবই নাকি আমারই বোকামির ফল। কাজেই কথা না বাড়ানোই ভালো। তবে এবারকার কোদণ্ড পর্বতারোহণ মন্দ লাগছিল না। প্রপাতটা শুধু সুন্দর নয়, যেন একটা প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রাও। তাছাড়া দুধারে বৃক্ষলতা এবং রঙবেরঙের ফুলে সাজানো।

ফুল থাকলে প্রজাপতি থাকবে এবং গাছ থাকলে পাখি। প্রকৃতিবিদ প্রপাতের মাথায় চড়তে-চড়তে প্রচুর ছবি তুললেন। বাইনোকুলার চোখে রেখে কতবার থেমে পড়লেন। আমি যখন মাথায় পৌঁছে গেছি তখন উনি ফুট বিশেক নিচে একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা তাক করেছেন। ওপরে আসলে একটা নদী। নদীটা এখানে এসে নিচে ঝাঁপ দিয়ে প্রপাত সৃষ্টি করেছে। গনগনে রোদ্দুর। তাতে পাহাড়ে চড়ার পরিশ্রম। হাঁপ ধরে গেছে! একটা ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম। যেখানে পাথর মাটি মিশে আছে। ঘন জঙ্গল। দূরে উত্তরে বনবাংলোটি দেখা যাচ্ছিল। ক্লান্তভাবে গাছের নিচে পাথরটাতে বসেছি, অমনি পেছন ঝোপে মচমচ শব্দ হল। ঘুরে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক বাঘের মতো আমার ওপর এসে পড়ল এবং মুখে টেপ সেঁটে দিল। চ্যাঁচানোর সুযোগই পেলুম না। কাল বিকেলে দেখা সেই লোকদুটোই বটে।

একজন একটা ছুরি গলায় ঠেকিয়েছিল। কাজেই হাত-পা নাড়ানো বা ধস্তাধস্তির উপায় নেই। গলায় ছুরি ঢুকে যাবে।

তারপর আমার চোখে রুমাল পড়ল এবং টের পেলুম আমি ওদের কাঁধে। কাল বিকেলে পান্ডেজির মড়া যেভাবে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেভাবেই আমাকেই নিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পরে কাঁধ থেকে আমাকে নামিয়ে বসিয়ে দিল। তারপর চোখ থেকে রুমাল খুলে নিল। মুখের টেপটা কিন্তু খুলল না। জায়গাটা প্রথম কিছুক্ষণ অন্ধকার মনে হচ্ছিল। একটু পরে দৃষ্টি পরিষ্কার হল। তখন দেখলুম, এটা একটা মন্দির। ফাটলধরা এবং পোড়ো মন্দির। দেয়াল ফুঁড়ে শেকড়বাকড় বেরিয়েছে। সামনে বেদির ওপর শিবলিঙ্গ। বেদির একপাশে একজন গাব্দাগোব্দা ষন্ডামার্কা চেহারার লোক পা ঝুলিয়ে বসে আছে। পেল্লায় গোঁফ। কুতকুতে চোখে ক্রূর হাসি। সে খৈনি ডলছিল। খৈনিটা দুই সাঙাতকে বিলি করে বাকিটুকু নিজের মুখে ঢোকাল। তারপর হিন্দিতে বলল, 'টেপ খুলে দে। কথা বের করি।'

হ্যাঁচকা টানে আমার মুখের টেপ খুলল একজন। যন্ত্রণায় আঃ করে উঠলুম। বেদির লোকটা বলল, 'এই ছোট টিকটিকি! পাণ্ডে ব্যাটাচ্ছেলে মরার সময় কী বলেছে?'

ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'বা—'

'চো-ও-প্!' বলে সে পাশ থেকে একটা জিনিস তুলে দেখাল। জিনিসটা অবিকল মানুষের হাতের গড়ন। কিন্তু পাঁচটা আঙুল নখের মতো বাঁকা এবং ধারালো। 'দেখেছিস এটা কী? এর নাম বাঘনখ। পাণ্ডের মতো ফালাফালা করে ফেলবো। কলজে উপড়ে নেবো। সত্যি কথা বলো!'

মিনতি করে বললুম, 'বিশ্বাস করুন। পাণ্ডেজি শুধু 'বা' বলেই মারা যান।'

'শুধু বা! আর কিছু নয়?' বলে সে বাঘনখটা উঁচিয়ে ধরল। আঁতকে উঠে বললুম, 'বিশ্বাস করুন। শুধু বা!'

লোকটা তার সাঙাত দুজনকে বলল, 'তোমরা এবার বুড়ো টিকটিকিটাকে ধরে নিয়ে এসো। বেগড়বাই করলে ছুঁড়ে প্রপাতের তলায় ফেলে দেবে।'

ওরা তখুনি বেরিয়ে গেল। কর্নেলের জন্য আঁতকে কাঠ হয়ে রইলুম। চোখে বাইনোকুলার রাখলে ওঁর আর কোনও দিকে মন থাকে না। সেটাই ভাববার কথা।

লোকটা বলল, 'এই উল্লুক! 'বা' মানে কী বুঝেছিস?'

'আজ্ঞে, বা মানে বাঘ।'

'আর ওই দাড়িওলা বুড়ো বুঝেছে?'

'সেটা ওঁর মুখেই শুনবেন। আমাকে তো উনি খুলে কিছু বলেননি।'

লোকটা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বড্ড দেরি করছে। হলটা কী? একটা বাহাত্তুরে বুড়োকে ধরে আনতে এতক্ষণ লাগছে!' বলে সে মন্দিরের দরজার কাছে গেল। তারপর আপনমনে গজগজ করতে থাকল।

এই সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না। গায়ের জোরে ওর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। তাই নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে বেদি থেকে বাঘনখটা তুলে নিলাম।

কিন্তু লোকটা কীভাবে যেন টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার হাতে ওটা দেখেই পকেট থেকে ছুরি বের করল। আমার হাতে বাঘনখ ওর হাতে ছুরি। পরস্পর পরস্পরকে তাক করছি এবং দুজনের মুখ থেকেই হুমহাম গর্জন বেরুচ্ছে। দুজনে বেদী চক্কর দিচ্ছি। আমি মরিয়া, সেও মরিয়া।

হঠাৎ সেই সময় শিবলিঙ্গটা নড়তে শুরু করল। তারপর একপাশে কাত হয়ে পড়ল এবং আমাদের দুজনকেই হকচকিয়ে দিয়ে একটা মুন্ডু বেরুল।

মুন্ডুটিতে টুপি এবং সাদা দাড়ি। সেটি প্রখ্যাত ঘুঘুবুড়ো কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের।

নাকি স্বপ্ন দেখছি?

উঁহু, স্বপ্ন নয়। এক লাফে কর্নেল বেদি ফুঁড়ে বেরিয়ে রিভলভার তাক করলেন লোকটার দিকে। সে ছুরি ফেলে দিয়ে দুহাত ওপরে ওঠাল এবং দেয়ালে সেঁটে গেল। কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন। মন্দিরের ভেতর যেন বাজপড়ার শব্দ। বললেন, 'কী বাবুরাম! কেমন জব্দ। শাবাশ জয়ন্ত! ব্রাভো! এই তো চাই।'

বাইরে ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। পুলিশ অফিসার মিঃ সিনহাকে আসতে দেখলুম। সঙ্গে কয়েকজন কনস্টেবল। তারা এই বাবুরামের দুই সাঙাতের হাতে-হাতে দড়ি এবং সেই দড়ি কোমরেও পরিয়ে টেনে আনছে। যেন এই শিবমন্দিরে জোড়াপাঁঠা বলির জন্য আনা হচ্ছে।

কর্নেল ডাকলেন, 'ভেতরে আসুন মিঃ সিনহা। স্বয়ং বা-বাবাজি ধরা পড়েছে।'

মিঃ সিনহা ঢুকেই দৃশ্যটা দেখে একচোট হাসলেন। দুজন কনস্টেবল বাবুরামের হাতে হাতকড়া এঁটে দিল। মিঃ সিনহা এবার ওলটানো শিবলিঙ্গ দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'এ কী!'

কর্নেল বললেন, 'ওখান দিয়ে আমার আবির্ভাব ঘটেছে। একটু দেরি হলেই রক্তারক্তি হয়ে যেত। আসলে ওটা একটা সুড়ঙ্গ পথ।'

মিঃ সিনহা উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'কী আশ্চর্য!'

কর্নেল বললেন, 'প্রপাতের একধারে দাঁড়িয়ে পাথরের আড়ালে একটা ফোকর আবিষ্কার করেছিলুম। ঢুকে দেখি এটাই সেই সুড়ঙ্গপথ। ধাপে-ধাপে কোদণ্ডদেবের মন্দিরে উঠে এসেছে। হ্যাঁ, আসল কথাটা বলা দরকার। ঘন্টারামই বলেছিল এই মন্দিরের তলায় নাকি একটা সুড়ঙ্গপথ

আছে। সেখানে তার মাসতুতো ভাই দাগি ফেরারি আসামি এই বাবুরাম লুকিয়ে থাকে বলে তার ধারণা। ঘন্টারাম খুব নীতিবাগীশ লোক। তাকে সরকার থেকে পুরস্কার পাইয়ে দেবেন মিঃ সিনহা। তবে আপনার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। কথামতো আপনি দলবল নিয়ে এখানে না এসে পড়লে জয়ন্ত বেচারাও....'

রেগেমেগে বললুম, 'বাঘনখ দিয়ে বাবুরামকেও 'বা' বলিয়ে ছাড়তুম।'

কর্নেল হাসলেন। 'খুনের দায়ে পড়তে ডার্লিং। যাই হোক, মিঃ সিনহা, মন্দিরের তলায় একটা কুঠুরিতে পাণ্ডেজির রাইফেল আর প্রচুর ডাকাতির মাল মজুত রয়েছে। আসামিদের থানায় পাঠিয়ে দিন। আর আপনার হাতের ওয়াকি-টকিতে মেসেজ পাঠান। জিনিসগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

বলে আমার হাত থেকে বাঘনখটি নিয়ে কর্নেল মিঃ সিনহাকে দিলেন এবং আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো ডার্লিং! খুব ধকল গেছে তোমার বাংলোয় ফেরা যাক।'

সেই গাছটার কাছে এসে বললুম, 'বা-রহস্য ফাঁস হল। কিন্তু আলো-রহস্য?'

কর্নেল বললেন, 'তখন আমাকে নিচে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলে, ওখান থেকেই টর্চের আলো দেখাত বাবুরাম। তখন ওর দলের লোকেরা ডাকাতি করা মাল নৌকোয় নিয়ে আসত। আসলে কোদণ্ডমন্দিরের পেছনে আদিবাসী জেলেদের একটা বসতি আছে। তারা প্রপাতের নিচের জলায় রাতবিরেতে জাল ফেলে মাছ ধরতে যেত। মানুষখেকো বাঘের ভয়ের চেয়ে পেটে খিদে নামক রাক্ষসের ভয় বেশি জয়ন্ত! বেচারারা এত গরিব যে নৌকো কেনার ক্ষমতা নেই। তো ওরা মাছ ধরে পাহাড়ি পথে বসতিতে ফিরে গেলে তখন বাবুরাম আলোর সংকেত করত।'

বললুম, 'তাহলে পাণ্ডেজি পরে টের পেয়েছিলেন বাবুরাম ডাকুরই কীর্তি! তাই....'

'হ্যাঁ'। বলে হঠাৎ কর্নেল বাইনোকুলার চোখে তুললেন এবং ঝোপঝাড় ভেঙে অদৃশ্য হলেন।

বুঝলুম, সেই সাংঘাতিক গাছটার তলায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওঁর অপেক্ষা করতে হবে! তবে আর হামলার ভয়টা নেই। অতএব সেই সুন্দর পাথরটাতে বসে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করায় বাধা নেই।....

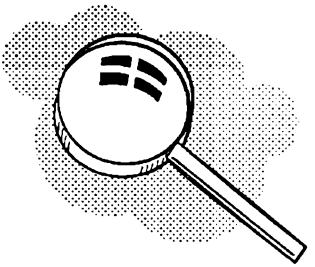

ভীমগড়ের কালো দৈত্য

সরকারি ডাকবাংলো থেকে বিকেলে বেরুনোর সময় চৌকিদার সুখলাল হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে যা বলেছিল, তার সারমর্ম ছিল এরকম :

পশ্চিমের সবচেয়ে উঁচু আর ন্যাড়া পাহাড়ের ওধারে বাস করে এক 'কালা দেও', অর্থাৎ কিনা কালো দৈত্য। তার চেহারা ঘনকালো মেঘের মতো। পেল্লায় তার গড়ন। তার হিংস্র দাঁত ঝকঝক করে উঠলেই কানে তালা ধরানো হুঙ্কার শোনা যাবে। দৈবাৎ যদি তাকে পাহাড়ের ওপর দেখতে পাই, আমরা যেন তক্ষুণি পালিয়ে এসে কোনও ফাঁকা জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি। তা না হলে সে আমাদের তুলে নিয়ে দূরে পাথরের ওপর ছুড়ে ফেলবে।...রামজিকা কিরিয়া সাব, কালা দেও হামারা ভাতিজা রঘুয়াকো মার ডালা।....

আর কার-কার কালো দৈত্যের পাল্লায় পড়ে একেকটি আছাড়ে হাড়গোড় দলা পাকিয়ে কয়েক মাইল দূরে লাশ পাওয়া গিয়েছিল, সেই রোমহর্ষক বর্ণনাও দিয়েছিল সুখলাল।

ভীমগড়ের পাহাড়ি জঙ্গলে শেষ মার্চের বিকেলে কর্নেলের সঙ্গী হয়ে বেরুনোর সময় চৌকিদারের ওইসব কথা শুনে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেলের মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলুম, তিনি কেমন যেন নির্বিকার। বারকয়েক কালো দৈত্যের ব্যাপারটা কী হতে পারে, জিগ্যেস করেও কোনও উত্তর পাইনি। তিনি ভীমগড়ের শেষদিকটায় খানা-খন্দে ভরা পিচরাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। হয়তো পাখি। বসন্তকালে গাছপালায় পাখিদের ডাকাডাকি স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের কথা অবশ্য জানি। কলকাতার একটি ইংরেজি কাগজে এক দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির অর্কিডের খবর পড়েই তাঁর রাতারাতি ভীমগড় আগমন।

এদিকে অর্কিডের প্রতি আমার আগ্রহ না থাকলেও আমাকে তিনি এখানে টেনে এনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,—জয়ন্ত। ভীমগড় নাম শুনেই তোমার বোঝা উচিত, সেখানে মহাভারতের ভীম না হোন, অন্য কোনও ভীম বাস করতেন। আর গড় মানে দুর্গ। কাজেই রাজাগজার ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে। কোনও সময়ে ভীম নামে কোনও রাজা সেখানে অবশ্যই ছিলেন। এমন তো হতেই পারে সেই রাজা ভীমের গুপ্তধন তাঁর দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকোনো আছে। আর গুপ্তধনের এমন নেশা, ধরো দৈবাৎ গুপ্তধনসন্ধানী কোনও দলের হদিশ সেখানে তুমি পেয়ে গেলে এবং সেই সূত্র ধরে একখানা সাংঘাতিক রোমাঞ্চকর স্টোরি লিখে তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় ছেপে দিলে। ব্যস! হিড়িক পড়ে যাবে। তাই না?

একটু চটে গিয়ে বলেছিলুম,—আমাকে কি আপনি অবোধ বালক ভেবেছেন?

কর্নেল অমনই গম্ভীরমুখে তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন,—জয়ন্ত! এই পৃথিবীকে অবোধ বালকের চোখে তাকিয়ে দেখলে কত অদ্ভুত ঘটনা আবিষ্কার করা যায়। যাই হোক, চলো তো! আশা করি, ভীমগড় তোমাকে কোনও-না-কোনও একটা চমক দেবে।...

সেই বিকেলে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় কর্নেলের সেই কথাগুলো মনে পড়ে গেল। এবার বলে উঠলুম,—কর্নেল! আপনি ভীমগড়ে চমকের কথা বলেছিলেন। দেখছি, সত্যিই এখানে একটা চমকের আভাস পাচ্ছি। চৌকিদার সুখরামকথিত কালো দৈত্য!

কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। কালো দৈত্য।

—কিন্তু তখন থেকে কতবার আপনাকে জিগ্যেস করছি, ব্যাপারটা আসলে কী? আপনি কোনও জবাবই দিচ্ছেন না।

আমরা চলেছি দক্ষিণে। আমাদের বাঁদিকে মাঝে-মাঝে এক-একটা জরাজীর্ণ বাড়ি এবং কোথাও বা বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। আগাপাছতলা ঝোপঝাড়, গাছপালায় সব ঢাকা। কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে আঙুল তুলে বাঁদিকে উঁচু মাটির ওপর সেই বাড়িগুলো দেখিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! কালো দৈত্যদর্শন সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা। কিন্তু এই এলাকায় বসতির অবস্থা দেখছ? জনহীন এই এলাকাটা নিশ্চয়ই কালো দৈত্য রাগ করে ভেঙেচুরে দেয়নি। তুমি তো সাংবাদিক। একটুখানি দেখে নিয়ে বলো তো, এগুলোর এমন দশা কেন হয়েছে?

দেখে নিয়ে হাসতে-হাসতে বললুম,—কালো দৈত্যের ভয়ে লোকেরা এখান থেকে পালিয়ে গেছে।

—ওই দ্যাখো। একটা ভাঙা ফটকের গায়ে এখনও মার্বেল ফলক আটকে আছে। ফলকে পশ্চিমের পাহাড়ের ওপর থেকে সূর্য এখনও প্রচুর আলো ফেলেছে।

উঁচু মাটিতে উঠে গিয়ে ফলকটা দেখে এলুম। বললুম,—কী আশ্চর্য! বাংলায় লেখা আছে 'সন্ধ্যানীড়।' তলায় কী নাম লেখা আছে, পড়া গেল না। শ্যাওলা পড়েছে!

কর্নেল এবার হাঁটার গতি দ্রুত করে বললেন,—এটা একসময় ছিল ভীমগড়ের বাঙালিটোলা।

—কিন্তু বাঙালিরা সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে কেন?

—সম্ভবত তাঁদের সন্তান-সন্ততি ইউরোপ-আমেরিকায় পাড়ি জমিয়েছে। নয়তো কলকাতায় সুখে বসবাস করছে। আসলে বাঙালি এখন এসব মুলুকের প্রকৃতির চেয়ে আরও সুন্দর সেজেগুজে থাকা প্রকৃতির খোঁজ পেয়ে গেছে। লক্ষ্য করছ না? কী এলোমেলো জঙ্গল, বেখাপ্পা টিলা আর একঘেয়ে দৃশ্য!

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল রাস্তাটা ছেড়ে ডানদিকে পশ্চিমে এবড়োখেবড়ো গেরুয়ামাটির পায়ে-চলা রাস্তায় পা বাড়ালেন। রাস্তাটা অস্বাভাবিক নির্জন। ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে এবং সামনে-দূরে কালো একটা পাহাড়ের মাথা সূর্য ততক্ষণে ছুঁয়ে ফেলেছে। দুধারে নানান গাছের জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোথাও ফাঁকা ঢালু মাঠে ছোটবড় নানা গড়নের পাথর আর ঝোপ।

কর্নেল সামনে বাঁদিকে জঙ্গলে ঢাকা একটা টিলার দিকে ঘুরে বললেন,—ইংরেজি কাগজের সেই প্রকৃতিবিদ যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে এই টিলার গায়েই অর্কিডের খোঁজ পাওয়ার কথা। তুমি এখানে অপেক্ষা করো। আমি দেখি, তার খোঁজ পাই নাকি।

বলে তিনি টিলায় চড়তে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন,—সাবধান জয়ন্ত! ওই পশ্চিমের উঁচু পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখবে। কালো দৈত্যটা দেখতে পেলেই আমাকে ডাকবে।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল টিলার জঙ্গলে উধাও হয়ে গেলেন। এইসব জঙ্গলে হিংস্র জন্তু থাকা সম্ভব। কালো দৈত্যের চেয়ে তারাই আপাতত আমার কাছে সাংঘাতিক। মহুয়ার ফল পাকতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু বুনো ভালুক কী অত বোঝে? পাশের ওই মহুয়াগাছের দিকে হানা দিতে এসে আমাকে দেখতে পেলেই দাঁত-নখ বের করে ঝাঁপ দেবে।

এইসব ভেবে প্যান্টের পকেট থেকে রিভলবার বের করে তৈরি হয়ে থাকলুম। অবশ্য মাঝে-মাঝে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকটা দেখে নিচ্ছিলুম। সূর্য এখন পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। চারদিকে ধূসরতা ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে।

কতক্ষণ পরে কর্নেলকে দেখতে পেলুম। তিনি অমন পড়ি-মরি করে টিলার জঙ্গল ভেঙে নেমে আসছেন কেন?

অবাক হয়ে চেঁচিয়ে বললুম,—কী হয়েছে?

কর্নেল আমার কাছাকাছি এসে বললেন,—জয়ন্ত! দৌড়তে হবে। কুইক!

—ব্যাপার কী? বাঘ-ভালুক নাকি?

—কালো দৈত্য!

—তার মানে?

—তোমাকে পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলুম। তুমি এত বোকা—তা ভাগ্যিস টিলার ওপর থেকে আমার চোখে পড়েছিল।

কর্নেল প্রায় দৌড়নোর ভঙ্গিতে উতরাই পথে নামতে-নামতে কথাগুলো বলছিলেন। ঘুরে একবার পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, কালো মেঘ দ্রুত ছড়িয়ে আসছে। তারপরই বিদ্যুতের ঝিলিক এবং কানে তালা ধরানো গর্জন শোনা গেল।

দৌড়তে-দৌড়তে বললুম,—ওটা তো মেঘ!

কর্নেল ততক্ষণে ডানদিকে ফাঁকা মাঠে নেমে গেছেন। তারপরই কানে এল, অস্বাভাবিক একটা শনশন-গরগর গর্জন। সেই সঙ্গে পিছনে কোথাও বাজ পড়ল।

কর্নেল একটা ঝোপের গোড়া দু-হাতে আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় তাঁর মতো আমিও পাশে একটা ঝোপের গোড়া দু-হাতে চেপে ধরে উপুড় হলুম। এরপর যা ঘটতে থাকল, তা যেন মহাপ্রলয়। ঝড়, বৃষ্টি আর বজ্রপাত। তার চেয়ে সাংঘাতিক ঘটনা, যে ঝোপ আঁকড়ে ধরেছি, সেটা যেন আমাকে সুদ্ধু উড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং শিকড় উপড়ে যাবে, ঝড়ের এমন প্রচণ্ড গতিবেগ।

কর্নেলের দিকে তাকাব কী, চোখ খোলা যাচ্ছিল না। বৃষ্টির ধারালো ফোঁটার সঙ্গে ঝড়ে ওড়া বেলেপাথরের টুকরো আর ঝাঁকে-ঝাঁকে কাঁকর আমার ওপর মুঠো-মুঠো ছুঁড়ে মারছিল সেই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তি। ততক্ষণে হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পেরেছি, চৌকিদার সুখরামের কাছে শোনা সেই 'কালা দেও' প্রকৃতপক্ষে কী।

কতক্ষণ কালো দৈত্যের এই তাণ্ডব চলেছিল জানি না, একসময় কর্নেলের ডাকে অতিকষ্টে চোখ খুলে তাকালুম। কর্নেল ভিজে একেবারে জবুথবু। আর ঝড়টা নেই। কিন্তু বৃষ্টি ঝরছে। কর্নেল বললেন,—উঠে পড়ো জয়ন্ত! দৈত্যটা কেটে পড়েছে। কিন্তু বৃষ্টিতে বেশিক্ষণ ভেজা ঠিক নয়।

উঠে দাঁড়িয়ে টের পেলুম সারা শরীর ব্যথায় আড়ষ্ট। কর্নেলকে অতিকষ্টে অনুসরণ করলুম। গেরুয়া মাটির রাস্তা কাদা হয়ে গেছে। কর্নেল এবার পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে বললেন, —কাদায় হাঁটতে অসুবিধে হবে। এসো, পাশের শালবনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাই। তোমার টর্চ আনোনি?

আমার বৃষ্টি-ভেজা শরীর ঠান্ডায় কাঁপছিল। বললুম,—ভুলে গেছি। তখন কি জানতুম...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে। আমার পিছনে এসো। ডাইনে বাঁয়ে লক্ষ্য রাখবে। এ সময় খুদে জন্তু-জানোয়ারের লোভে পাইথন সাপ বেরিয়ে পড়ে।

সাহস দেখিয়ে বললুম,—ফায়ার আর্মসের গুলিতে পাইথনের মাথা গুঁড়িয়ে দেব কর্নেল! আমি এখন মরিয়া হয়ে উঠেছি।

কর্নেল বললেন,—বাঃ! এই তো চাই। ভীমগড়ের প্রথম চমক এটা।

এরই মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি সমানে ঝরছে। মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। তবে কালো দৈত্যের হাঁকডাকে আর তত জোর নেই।

কিছুক্ষণ পরে সেই ভাঙাচোরা পিচরাস্তায় পৌঁছলুম। আবার বৃষ্টিতে বাগে পেল। বললুম, —কর্নেল! বরং সেই বাঙালিটোলার কোনও ঘরে আশ্রয় নিয়ে মাথা বাঁচানো যাক। বৃষ্টি ছাড়লে বেরিয়ে পড়ব।

কর্নেল সায় দিলেন,—কথাটা আমিও ভেবেছিলুম। শেষ দিকটায় একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

জরাজীর্ণ বাড়িটা দোতলা। কাছাকাছি যেতেই দোতলার ডানদিকের জানলার ফাঁকে আলো দেখতে পেলুম। বললুম,— বাড়িটাতে লোক আছে। দোতলায় আলো জ্বলছে।

দেখেছি।—বলে কর্নেল বারান্দায় উঠলেন।

আমিও উঠলুম। কিন্তু বারান্দার ছাদ ফাটাফুটো। ফোঁটা-ফোঁটা নোংরা জলের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে বললুম,—কর্নেল! বাড়ির লোকেদের ডাকা উচিত। অন্তত ভিতরে কিছুক্ষণ আশ্রয়ের সুযোগ পাব।

কর্নেল এই অবস্থাতেও হাসলেন,—ঠিক বলেছ। এক কাপ গরম চা-ও মিলতে পারে। নাঃ, কফির আশা না করাই ভালো।

তিনি দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন। কিছুক্ষণ পরে ভিতরে আলোর ছটা চোখে পড়ল। তারপর দরজা খুলে গেল। একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক হাতের হেরিকেন একটু তুলে বাংলায় বলল,—বলুন আজ্ঞে।

কর্নেল বললেন,—আমরা কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। পথে ঝড়বৃষ্টিতে কী অবস্থা হয়েছে, তা দেখতেই পাচ্ছ! বারান্দায় দাঁড়াতে পারছি না। এ বাড়ির মালিক কে?

—মালিক আজ্ঞে কলকাতায় থাকেন। আমি এই বাড়ি পাহারা দিই।

—তুমি তো বাঙালি মনে হচ্ছে! এই বিপদে আমাদের একটু সাহায্য করো। আমাদের ভিতরে বসতে দাও। বৃষ্টি ছাড়লেই আমরা চলে যাব।

লোকটার গোঁফে যেন পোকা আটকেছে, এমন ভঙ্গিতে গোঁফ ঝেড়ে একটু দ্বিধা দেখিয়ে বলল, —তা-তা বসতে পারেন আজ্ঞে। কিন্তু আর লণ্ঠন তো নেই। এটা নিয়ে আমাকে দোতলায় যেতে হবে।

—লণ্ঠনের দরকার নেই। তুমি তোমার কাজে যাও। আমাদের এই টর্চই যথেষ্ট।

বলে কর্নেল তার পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করে গিয়ে দেখলুম, ঘরে কয়েকটা নড়বড়ে চেয়ার আর টেবিল ছাড়া কোনও আসবাব নেই। দুজনে মুখোমুখি বসলুম। কর্নেলের তাগড়াই শরীরের ওজন চেয়ারটা সামলে নিল। তিনি বললেন,—তোমার নাম কী?

লোকটা তখনও কেমন অবাক-চোখে তাকিয়ে ছিল। বলল,—আজ্ঞে আমি কালীপদ।

—আচ্ছা কালীপদ, দুকাপ চায়ের ব্যবস্থা করা যায় না? ভালো বকশিস পাবে।

কালীপদ তার গোঁফ থেকে আবার পোকা বের করার ভঙ্গি করল। তারপর বিরসমুখে মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে! চা-ফা আমার চলে না। ওই যাঃ! তরকারিটা পুড়ে গেল হয়তো! —বলে সে হন্তদন্ত ভিতরে চলে গেল। তারপর ভিতরের কপাট ওদিক থেকে বন্ধ করার শব্দ হল।

একটু পরে কানে এল টেবিলে টুপটুপ করে যেন জল ঝরছে। বললুম,—কর্নেল! ছাদ ভেঙে পড়বে না তো? একতলার ছাদের ওপর দোতলার ছাদ আছে। মনে হচ্ছে দুটো তলাই মেরামতের অভাবে ফেটে গেছে।

কর্নেল সবে চুরুট ধরিয়েছিলেন। আমার কথা শুনে টর্চ জ্বেলে টেবিলটা দেখলেন। বললেন, —ঠিক বলেছ!

কর্নেল টর্চের আলো নেভাননি। আমি টেবিলের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে বললুম, —জলের ফোঁটা লালরঙের কেন?

—আগের দিনে চুনসুরকির মশলা দিয়ে বাড়ি তৈরি হতো। সুরকিগুঁড়ো হতে পারে।

কর্নেলের হাত থেকে টর্চ নিয়ে সিলিঙে আলো ফেলে দেখলুম, কড়ি-বরগার ওপর সাজানো টালির একটা ফাটল দিয়ে লালরঙের তরল পদার্থটা পড়ছে।

কর্নেল বললেন,—ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে। টর্চ নেভাও।

টর্চের আলো টেবিলে ফেলে আঙুল দিয়ে লাল রঙটা পরীক্ষা করে বললুম,—কর্নেল! সুরকির গুঁড়ো কি এমন আঠালো হয়?

মাই গুডনেস!—বলে কর্নেল আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে সিলিং এবং টেবিলের ওপরটা পরীক্ষা করলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—তুমি হয়তো ঠিক বলেছ জয়ন্ত! বৃষ্টিটা একটু কমেছে মনে হচ্ছে। কালীপদকে ডাকা যাক!

তিনি উঠে গিয়ে ভিতরের দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। খুলল না। তখন হাঁক দিলেন, —কালীপদ! কালীপদ!

কোনও সাড়া এল না! আরও কয়েকবার ডাকাডাকির পর কর্নেল কপাটে সজোরে তাঁর মিলিটারি লাথি মারলেন। তিনটে লাথির পর কপাট ভেঙে পড়ল। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, —জয়ন্ত! তোমার ফায়ার আর্মস রেডি রাখো। আমার পিছনে এসো। সাবধান! চারদিকে লক্ষ্য রাখবে।

টর্চের আলোয় নিচু পাঁচিলে ঘেরা একটুকরো উঠোনে ঘন ঝোপজঙ্গল আর একটা পোড়ো ইঁদারা দেখতে পেলুম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে ডাইনে একটা ঘর। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। কর্নেল এক হাতে তাঁর রিভলভার অন্যহাতে টর্চের আলোয় ভিতরটা দেখে নিলেন। ঘরে একটা খাটিয়া পড়ে আছে। সেটা কেউ বহুদিন যাবৎ ব্যবহার করেছে বলে মনে হল না।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যে ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখেছিলুম, সেই ঘরটাও ফাঁকা। কোনও আসবাব নেই। তাহলে কালীপদ লণ্ঠন নিয়ে এ ঘরে কী করছিল?

কথাটা জিগ্যেস করার সুযোগ পেলুম না। কর্নেল পরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে বললেন, —এই ঘরের নিচেই আমরা ছিলুম। এ ঘরে দেখছি তালা আঁটা আছে। এক মিনিট! তুমি টর্চটা ধরো। জ্বেলে রাখো।

কর্নেল তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে একটা অদ্ভুত গড়নের প্লাস বের করলেন। তারপর সেটা দিয়ে কী কৌশলে তালা খুললেন কে জানে? কপাটদুটো ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। আমার হাতে টর্চ। আলো ফেলে যা দেখলুম, তা কর্নেলের পাল্লায় পড়ে অনেকবার আমাকে দেখতে হয়েছে।

মেঝেয় একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। পরনে প্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জি।

কর্নেল আমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে মৃতদেহটা দেখে বললেন,—আমার এই এক দুর্ভাগ্য জয়ন্ত! যেখানে যাই, এক অদৃশ্য আততায়ী আমার সামনে একটা মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। যাই হোক। মৃতদেহটার কয়েকটা ফোটো তুলে নিয়ে কেটে পড়া যাক।

তাঁর ক্যামেরায় ফ্ল্যাশবাল্‌ব্‌ কয়েকবার ঝিলিক দিল।....

চৌকিদার সুখলাল সঙ্গে একজন লোক নিয়ে আমাদের খোঁজে আসছিল। বাংলোর কাছাকাছি তাদের সঙ্গে দেখা হল। সুখলালকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। 'কালা দেও'-এর পাল্লায় পড়ে আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি জেনে সে আশ্বস্ত হল।

বাংলোয় ফেরার পর আমরা ভেজা পোশাক বদলে নিলাম। সুখলাল কফি নিয়ে এল। কর্নেল তাকে জিগ্যেস করলেন,—বাঙালিটোলার শেষের দোতলা বাড়িটাতে কি কেউ থাকে?

সুখলাল অবাক হয়ে বলল,—না কর্নিলসাব!

—তুমি কালীপদ নামে বেঁটে মোটাসোটা কোনও বাঙালিকে চেনো?

সুখলাল একটু ভেবে নিয়ে বলল,—পাঁচবরস আগে কালীপদ ওই বাড়ির জিম্মাদার ছিল। লেকিন সে কলকাত্তা চলিয়ে গেছে। কালীপদ দুবলা আদমি ছিল। বুঢ়া ভি ছিল। লেকিন...

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—বাংলোর কেয়ারটেকার মোহনবাবু কী বাড়ি চলে গেছেন?

—হাঁ কর্নিলসাব।

—ওঁর অফিসের চাবি তাহলে উনি নিয়ে গেছেন?

—'ডুপলিকাট্' হামার কাছে আছে। কুছু দরকার হলে বলিয়ে সাব!

—টেলিফোন করতে চাই।

—কুছ অসুবিধা নাই।....

কর্নেল দ্রুত কফি শেষ করে তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তিনি কাকে ফোন করতে যাচ্ছেন, তা জানতুম। একটা বেঁটে হোঁতকা-মোটা-গুঁফো লোক কাউকে কোনও ছলে ওই পোড়োবাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে, এটা আমার কাছে স্পষ্ট। হঠাৎ আমরা গিয়ে পড়ায় যে লাশ ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে, তা-ও বোঝা যাচ্ছে।

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন,—আশ্চর্য ব্যাপার জয়ন্ত। ভীমগড়ের পুলিশ ভূতপ্রেত বিশ্বাস করে কল্পনাও করিনি। ও. সি. ভদ্রলোক আমার কথায় হেসে অস্থির। বললেন, এর আগে বারদুয়েক কারা ওই পোড়োবাড়িতে আমাদের মতোই রক্তাক্ত লাশ দেখে থানায় খবর দিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে তন্নতন্ন খুঁজে লাশ তো দূরের কথা, ছিটেফোঁটা রক্তও খুঁজে পায়নি।

অবাক হয়ে বললুম,—ভারি অদ্ভুত তো!

—হ্যাঁ। এদিকে সুখলাল ব্যাপারটা জেনে নিয়ে একই কথা বলল।

—কিন্তু আমরা তো রক্তাক্ত লাশ দেখেছি। আপনি ক্যামেরায় লাশটার ছবিও তুলেছেন।

কর্নেল গুম হয়ে একটু বসে থাকার পর বললেন,—আমি ও. সি. জয়রাম সিংহকে আমার ক্যামেরায় লাশের ছবি তোলার কথাও বলেছি। আমি খাপ্পা হয়ে মিঃ সিংহকে পুলিশসুপার মিঃ প্রশান্ত ত্রিবেদীর নাম করে বলেছি, মিঃ ত্রিবেদী আমার পরিচিত। তাঁকে খবরটা জানাতে বাধ্য হব। তা শুনে ও. সি. একটু ভড়কে গিয়ে অবশ্য নিছক দুজন আর্মড কনস্টেবল পাঠাতে রাজি হলেন।

—কর্নেল! আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কনস্টেবলরা পৌঁছনোর আগেই খুনি পোড়োবাড়ি থেকে লাশটা সরিয়ে গুম করে ফেলবে। এই তো?

—ঠিক ধরেছেন।

—কথাটা আমিও ভেবেছি। কাজেই আমাদের চুপচাপ বসে থাকা ঠিক হবে না। উঠে পড়ো। বেরুনো যাক। সঙ্গে এবার টর্চ নিতে ভুলো না!

—সেই পোড়োবাড়িতে যাবেন?

কর্নেল রহস্যময় ভঙ্গিতে হেসে বললেন, —চলো তো! সুখলালকে সঙ্গে নেব। কারণ সুখলাল এবার আমাদের গাইড হবে।

দেখলুম, সুখলাল তখনই বল্লম আর টর্চ নিয়ে এল। তার সেই সঙ্গীকে বাংলোয় থাকতে বলে আমাদের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়ল!

ততক্ষণে আকাশ থেকে মেঘ সরে নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। আমাকে অবাক করে সুখলাল আর কর্নেল উত্তরে ভীমগড় বসতির দিকে হাঁটছিলেন। লাশ আছে দক্ষিণে পরিত্যক্ত বাঙালিটোলার একটা জরাজীর্ণ বাড়িতে। আর আমরা তার উলটোদিকে কোথায় যাচ্ছি কে জানে! প্রশ্ন করতে গিয়ে থামতে হল। অদূরে স্ট্রিটল্যাম্পের ম্লান আলোয় দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসছিল।

আমাদের দেখে তারা থমকে দাঁড়াল। সুখলাল বলল,—রাম-রাম পাঁড়েজি!

পাঁড়েজি হিন্দিতে বলল,—রাম-রাম সুখলাল ভাইয়া! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এঁরা কে?

—ইনিই কর্নিলসাব। থানায় বড়বাবুকে লাশের খবর দিয়েছেন।

দুজন কনস্টেবলই খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠল। কর্নেল বললেন,—পাঁড়েজি! লাশ দেখবেন তো আমাদের সঙ্গে চলুন! দেরি করবেন না। সুখলাল। তুমি রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

সম্ভবত বাঙালিটোলার পোড়োবাড়িতে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে হবে না ভেবেই সশস্ত্র কনস্টেবলদ্বয় খুশি হয়েছিল। এর পর কিছুটা এগিয়ে বসতি এলাকার সংলগ্ন ডান দিকের রাস্তায় সুখলাল আমাদের নিয়ে চলল। আমবাগান এবং ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে রাস্তাটা এগিয়ে গেছে। কিছুদূর চলার পর যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে একটা ঝিল দেখা দিল। তারপরই পিছনের দিকে কোথাও 'রামনাম সৎ হ্যায়' চিৎকার শোনা গেল।

তখনই কর্নেল বললেন,—আমাদের লুকিয়ে পড়তে হবে। শিগগির।

ঝোপের আড়ালে আমরা লুকিয়ে পড়লুম। ক্রমশ 'রামনাম সৎ হ্যায়' চিৎকার কাছেই শোনা গেল। কর্নেল পাণ্ডেজিদের চাপাস্বরে হিন্দিতে কিছু বললেন। তারপর খাটিয়ায় একটা মড়া চাপিয়ে লণ্ঠন হাতে কয়েকজন লোক এসে পড়তেই কর্নেল এবং কনস্টেবলদ্বয় ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল টর্চের আলো জ্বেলে উদ্যত রিভলভার হাতে গর্জন করে উঠলেন,—থামো! নইলে গুলি করব।

টর্চের আলোয় সেই জাল 'কালীপদকে' দেখতে পেয়েছিলুম। সবার আগে লণ্ঠন ফেলে দিয়ে সে পালাতে যাচ্ছিল। পাঁড়েজি তাকে ধরে ফেলল। কিন্তু বাকি লোকেরা খাটিয়া ফেলে ঝোপের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল খাটিয়ার কাছে গিয়ে বললেন,—এই সেই ভূতুড়ে লাশ। সুখলাল! দেখো তো চিনতে পারো কি না!

সুখলাল লাশের মুখ দেখে আঁতকে উঠে বলল,—আরে! এ তো পরসাদজি আছেন।

পাঁড়েজি গুঁফো লোকটার পিঠে রাইফেলের বাঁটের এক খোঁচা মেরে বললেন,—কর্নিলসাব! এই লোকটার নাম মগনলাল। দাগি খুনি। এলাকার ডাকুদের সর্দার!

অপর কনস্টেবল বলল,—হায় রাম! পরসাদজি তো খুব ভালো লোক ছিলেন। এই শয়তানটা ওঁকে খুন করল কেন?

কর্নেল বললেন,—আমার ধারণা, এই প্রসাদজিকে ফাঁদে ফেলে মগনলাল খুন করেছে। ফাঁদটা কীসের তা যথাসময়ে জানা যাবে। পাঁড়েজি, আপনি আসামিকে নিয়ে থানায় চলে যান। ও. সি. মিঃ সিংহকে খবর দিন।

পাঁড়েজি আঁতকে উঠে বলল,—না কর্নিলসাব! এই ডাকু বহত্ খতরনাক আছে। তার চেয়ে চৌবেজি থানায় গিয়ে খবর দিক। আমরা এখানে অপেক্ষা করি।

অপর কনস্টেবল চৌবেজি টর্চের আলো জ্বালতে-জ্বালতে কাঁধে বন্দুক রেখে যেভাবে হেঁটে গেল, মনে হল মগনলালের অনুচরদের আচমকা হামলার ভয়ে সে বেজায় আড়ষ্ট।....

কর্নেল বলেছিলেন, ফাঁদ পেতে প্রসাদজি নামে ওই ভদ্রলোককে মগনলাল খুন করেছে। আর বাংলোর চৌকিদার সুখলাল বলেছিল, পরসাদজি খুব ভালো লোক ছিলেন। কিন্তু পরদিন সকালেই আসল ঘটনা জানা গিয়েছিল। কীভাবে জানা গিয়েছিল, সেটাই শেষ চমক বলা যায়।

ভোর পাঁচটায় আমাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে কর্নেল বলেছিলেন,—চলো জয়ন্ত! আমার রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হয়ে যাবে। সেই পোড়োবাড়িতে সারা রাত পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে বলেছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি কী অবস্থা। তারপর অর্কিডের খোঁজে একচক্কর ঘুরব। চিন্তা কোরো না। ফ্লাস্কভর্তি কফি আর প্রচুর বিস্কুট সঙ্গে আছে।

কী আর করা যাবে, কর্নেলের পাল্লায় পড়ে অনেকবার জেরবার হয়েছি। এবারও হতে হবে। হাঁটতে অবশ্য ভালো লাগছিল। বসন্তকালের ভোরবেলায় পাখিদের ডাকে কী এক মায়া আছে!

সেই পোড়োবাড়িতে গিয়ে দেখছিলুম, ভিতরের বারান্দায় সেই জীর্ণ খাটিয়ায় একজন কনস্টেবল শুয়ে তখনও নাক ডাকাচ্ছে। বাকি তিনজন বারান্দায় মেঝের থামে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাদের সাড়া পেয়ে তারা উঠে দাঁড়াল। কর্নেলের প্রশ্নের জবাবে তারা একবাক্যে বলল, রাত্রে একটা চুহা অর্থাৎ ইঁদুরের শব্দও তারা শোনেনি।

কর্নেল এবার উঠোনের ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করব কি না ভাবছিলুম। কিন্তু তিনি উঠোনের কোণে সেই ইঁদারায় উঁকি মেরে কিছু দেখার পর সহাস্যে ডাকলেন,—জয়ন্ত! দেখে যাও!

গিয়ে দেখি ইঁদারার ওপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় মোটা দড়ি বাঁধা আছে এবং দড়িটা ইঁদারার পাড়ে একটা ফাটলের মধ্যে দিয়ে তলায় নেমে গেছে। কর্নেলের টর্চের আলোয় দেখলুম, দড়ির শেষপ্রান্তে বাঁধা একটা কালো ব্যাগ ঝুলছে।

কর্নেল ব্যাগটা দড়ি ধরে টেনে তুললেন। ততক্ষণে দুজন কৌতূহলী কনস্টেবল এসে গেছে। তারা দুজনে হতবাক হয়ে ব্যাপারটা দেখছিল।

ব্যাগে তালা আঁটা ছিল। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ও. সি. মিঃ সিংহ এখনই এসে পড়বেন।

বললুম—ব্যাগে কী থাকতে পারে?

কর্নেল হাসলেন।—সম্ভবত মগনলাল ডাকুর ডাকাতি করা দামি কিছু জিনিস। ব্যবসায়ী রমেশ প্রসাদ এই চোরাই মাল কিনতে এসে খুন হয়েছে।

—খুনের কারণ কী?

—হ্যাঁ। তোমাকে ইচ্ছে করেই বলিনি। কারণ ভীমগড়ে কিছু-কিছু চমকের কথা দিয়েছিলুম তোমাকে। কাল রাতে মগনলালের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল পাওয়া গেছে। বান্ডিলগুলো তার জামার তলায় একটা কাপড়ে সারবন্দি অবস্থায় লুকানো ছিল। বুক থেকে পিঠ অবধি বেড় দিয়ে বাঁধা ছিল। টাকাটা সে প্রসাদজিকে খুন করে হাতিয়েছিল।

সেই সময় বাইরে জিপের শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরে ও. সি. মিঃ সিংহ দুজন পুলিশ অফিসার এবং কনস্টেবলসহ বাড়িতে ঢুকে ব্যস্তভাবে বললেন,—মর্নিং কর্নেলসায়েব! ওখানে কী করছেন?

কর্নেল থামলেন।—মর্নিং মিঃ সিংহ! যা অনুমান করেছিলুম, তা সত্য হয়েছে। এখানে এসে ব্যাপারটা দেখে যান।

হ্যাঁ, কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন। ব্যাগের তালা ভাঙতেই বেরিয়ে পড়ল কাপড়ের থলে ভর্তি একরাশ সোনার গয়না। হিরে বসানো একটা জড়োয়া নেকলেসও।

ও. সি. উত্তেজিতভাবে বললেন,—গত মাসে আহিরগঞ্জের একটা বাড়িতে ডাকাতি হয়েছিল। এগুলো সেই ডাকাতি করা মাল মনে হচ্ছে। আহিরগঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী পাটোয়ারিজি ডাকাতি হওয়া জিনিসের যে লিস্ট দিয়েছিলেন, তা আমার মনে আছে। এই জড়োয়া নেকলেসটা দেখেই সব মনে পড়ে গেল!

এর পর আর কী! ভীমগড়ের চূড়ান্ত চমক আমাকে সত্যিই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য রোমহর্ষক একটা স্টোরির মশলা উপহার দিয়েছিল। তখন কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়ি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে আর আমার এতটুকু দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া ভীমগড়ের কালো দৈত্যের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।...

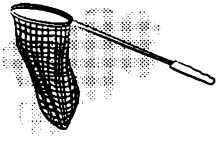

পদ্মার চরে ভয়ঙ্কর

ডানপিটে বেপরোয়া মানুষদেরও অদ্ভুত অদ্ভুত কুসংস্কার থাকে। দুর্দান্ত শিকারি জিম করবেট মানুষখেকো বাঘ মারতে গিয়ে আগে একটা সাপ মারতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা সাপ না পারলে তিনি কিছুতেই বাঘটা মারতে পারবেন না। ব্রিটেনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ধুরন্ধর গোয়েন্দা কিলবার্ন কোনো হত্যা রহস্যের কিনারা করার আগে একটা ঘুঘু পাখি কিনে আকাশে উড়িয়ে দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আগে একটা ঘুঘু পাখিকে মুক্তি না দিলে তাঁর গোয়েন্দাগিরি ব্যর্থ হবে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ডানপিটে তো বটেই, তিনি শিকারেও যেমন দক্ষ, গোয়েন্দাগিরিতেও তেমনি ধুরন্ধর! কাজেই তাঁর ওই রকম একটা কুসংস্কার থাকা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, স্বাভাবিক। কিন্তু এতকাল তাঁর সঙ্গে ঘোরাফেরা করেও সেটা টের পাইনি, এটাই আশ্চর্য! আসলে আমি এখনও ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট বোকা, মুখে যতই চালাকির ভান করি না কেন।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টে তেমন কিছু চমকপ্রদ নয়। কোঠারিগঞ্জ সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা পদ্মার চরগুলোর খবর নিচ্ছিলুম। ক্যাপ্টেন নটবর সিং বলছিলেন, এই ম্যাপটা বরং সঙ্গে রাখুন আপনারা। চিহ্ন দেওয়া এই চরগুলো আমাদের ভারতের। দিনের বেলা নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারেন। তবে কখনও রাতবিরেতে যাবেন না। ডাকাত আর স্মাগলারদের তখন গতিবিধি শুরু হয়। আমাদের জওয়ানদের সঙ্গে অনেক সময় সংঘর্ষও বাধে।

কর্নেল মন দিয়ে ম্যাপটা দেখছিলেন। দেখার পর বললেন, আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, এই একটা প্রকাণ্ড চর আঁকা আছে দেখছি। এর গায়ে লাল চিহ্ন দেওয়া কেন?

নটবর সিং একটু হেসে বললেন, ওটা ডিসপুটেড, অর্থাৎ বিতর্কিত চর। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ওই চরটা নিয়ে ঝগড়া আছে। অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মীমাংসা হয়নি এখনও। শুনছি আগামী মে মাসে দিল্লীতে আবার দু'দেশের মধ্যে বৈঠক বসবে। তখন 'পীরের চর' নিয়ে কথা উঠবে।

কী চর বললেন? 'পীরের চর' না কী যেন? কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন!

নটবর সিং বললেন, হ্যাঁ। পীরের চর। চরটা বেশ বড়। প্রায় সবটাই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গলের ভেতর এক পীর বাবার কবর আছে। কবরের ওপর ভাঙাচোরা একটা দালান বাড়ি রয়েছে। আগে ওখানে পদ্মার ওপার-এপার দুই পারের হিন্দু-মুসলিম ভক্তরা মানত করতে যেত। তারপর নাকি কী সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ভয়ে লোকেরা পীরের থানে যাওয়া ছেড়ে দিল। জঙ্গল গজিয়ে গেল।

কর্নেল ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, অদ্ভুত ঘটনাটা কী?

নটবর সিং হাসতে লাগলেন—একজোড়া বাঘ।

বাঘ! কর্নেল অবাক হয়ে বললেন। বাঘ তো জঙ্গলেই থাকে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা বলছেন কেন?

অদ্ভুত এ কারণে যে, ওই একজোড়া বাঘ মাঝে মাঝে মানুষের গলায় শাসাতো। নটবর সিং তামাশার ভঙ্গিতে বললেন। আমি স্যার পীরের চরে গোপনে বার দুই গেছি, কিন্তু বাঘ তো দূরের কথা, একটা শেয়ালও দেখিনি। এ তল্লাটের লোকের কাছেই ব্যাপারটা শুনেছিলাম। অথচ এ কিন্তু সত্যি, পীরের চরে আরও ভুলে কেউ পা বাড়ায় না।

আমি এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলুম। এবার বললুম, কেউ বাঘের চামড়া পরে বাঘ সেজে হয়তো লোককে ভয় দেখাত।

নটবর সিং বললেন, সে কথা আমিও ভেবেছি। স্মাগলারদের ঘাঁটির কথাও ভেবেছি। তারাই হয়তো ওভাবে ভয় দেখাত। কিন্তু লোকের মনে একবার আতঙ্ক ঢুকলে আর তো বেরোয় না! পীরের চরে যাওয়া সেই থেকে বন্ধ। আর এখন তো দু'দেশের সরকারই মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পীরের চরে কাউকে যেতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

কর্নেল ম্যাপ থেকে মুখ তুলে কী দেখছিলেন। গঞ্জের বাইরে এই ক্যাম্প। আমবাগানের ভেতর কয়েকটা তাঁবু। নীচে পদ্মা বয়ে যাচ্ছে। বসন্তকালের সকালের রোদে নদীর জল আর মাঝে মাঝে ধূ-ধূ চর, কোথাও চরে ধূসর ঘাসবন, একটা বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সমুদ্র আর মরুভূমি পাশাপাশি শুয়ে আছে।

কর্নেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, ওহে! শোনো—শোনো!

ক্রাচে ভর করে একটা ভিখারি গোছের নোংরা ছেঁড়াখোড়া পোশাকের লোক যাচ্ছিল গঞ্জের বাইরের দিকে। কর্নেলের ডাকে সে থমকে দাঁড়াল। তারপর আমাদের দিকে আসতে থাকল।

খোঁড়া লোকটি তো হতবাক। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে আস্ত একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলেন। লোকটার চোখ আরও বড় হয়ে গেল। কর্নেল তার হাতে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, গুড বাই, মাই ফ্রেন্ড! আবার দেখা হবে।

লোকটি ক্যাপ্টেন সিং আর সেপাইদের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে যেভাবে টাট্টু ঘোড়ার মতো ক্রাচ খটমটিয়ে দ্রুত চলে গেল, বুঝলুম—এত বেশি টাকা সে জীবনে ভিক্ষে পায়নি এবং ভেবেছে, হাবিলদার আর সেপাইদের এ ব্যাপারে মনঃপুত নয়—এক্ষুনি তাই ভাগ চেয়ে বসতেও পারে। অতএব কেটে পড়াই ভাল।

নটবর সিং আমার মতো, অবাক হয়েছিলেন। বললেন, ওই বজ্জাতটাকে দশ টাকা ভিক্ষে দিলেন স্যার, ও তো এবার নেশা-ভাঙ করবে আর জুয়ো খেলতে যাবে। ওকে আপনি চেনেন না!

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন, ও কিছু না। আচ্ছা হাবিলদার সায়েব, বেলা বাড়ছে। আমরা তাহলে আসি। এস জয়ন্ত!

ক্যাম্পের সবাই কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমরা চলতে থাকলুম পদ্মার পাড়ে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন, সচরাচর কেউ ভিখিরিকে দশ টাকা দেয় না। তাই ওরা অবাক হয়েছে। বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম, অবাক আমিও কম হইনি।

ডার্লিং! কর্নেল সস্নেহে আমার একটা হাত হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, তুমি ভালই জানো, ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা দান-ধ্যানের ক্ষমতা আমার নেই। তবে কোনো শুভ কাজে বেরুনোর আগে হঠাৎ কোনো প্রতিবন্ধীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেটাকে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। বহুবার বহু ব্যাপারে ঠিক বেরুনোর মুখে অন্ধ, খোঁড়া কিংবা বিকলাঙ্গ মানুষ দেখতে পেলেই সে কাজটা সফল হয়েছে। তাই আমি এসব সময়ে তেমন কোনো মানুষ দেখতে পেলে দশ টাকা কেন, আরও বেশি দান করতে রাজি।

এ কিন্তু আপনার নিছক কুসংস্কার।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'কু' কিংবা 'সু' জানি না—তবে এটা আমার সংস্কার। তাছাড়া এটা আমার বহুবার পরীক্ষিত।

হাসতে হাসতে বললুম, বাংলা প্রবাদ কিন্তু উল্টোটাই বলে। বলে কী জানেন? প্রতিবন্ধী দর্শনে যাত্রা নাস্তি। যাত্রারম্ভে হাঁচি টিকটিকির বাধার মতো।

কর্নেল চুপচাপ হাঁটছিলেন। তাঁর মাথায় এখন ধূসর রঙের টুপি। কড়া রোদে টাক জ্বলে যাবে। সাদা দাড়ি পদ্মার জোরালো হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ছে। পিঠে হ্যাভারস্যাক, গলায় ঝুলছে সেই অদ্ভুত ক্যামেরা—যা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ এবং একটি বাইনোকুলার।

আমার পিঠে বন্দুক, পকেটে কয়েকটা গুলিও আছে। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক কাঁধে ঝুলিয়েছি। পিঠে একটা কিটব্যাগে কিছু জামাকাপড়, ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম ইত্যাদি।

বরাবর এভাবেই কর্নেলের সঙ্গে আমি বেরোই। এবার মার্চের শেষাশেষি মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পদ্মার পাড় ধরে এই অভিযানের উদ্দেশ্য, বুনো হাঁস শিকার। নীতিগতভাবে পশুপাখিকে গুলি করে মারার আমি বিরোধী। কিন্তু হিমালয় পারের লক্ষ লক্ষ যাযাবর হাঁসের দু-চারটিকে মেরে সুস্বাদু মাংস ভোজনে এমন কিছু পাপ হবে বলে মনে করি না।

কর্নেলের উদ্দেশ্য চিরাচরিত। বিরল প্রজাতির পক্ষী দর্শন এবং ফটো তোলা। পদ্মার চরে কী এক প্রজাতির জলচর পাখি আসে নাকি—যা হাঁস এবং বকের মাঝামাঝি গড়নের। ঠোঁট এবং মাথা হাঁসের মতো, পা এবং শরীর বকের মতো। এই কিম্ভূত বিদঘুটে পাখির নাম দিয়েছি বখাঁস্। বক্ ও হাঁসের সন্ধি। কিন্তু কর্নেল তামাশায় কান দেননি।

আমবাগান, ঝোপঝাড়ে ভরা জমি, কোথাও চষা ক্ষেত আর বাঁ দিকে পদ্মা রেখে আমরা হাঁটছিলুম। পাড় বরাবর একটা সরু পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে চাষাভুষো লোকজনের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারা সবাই যাচ্ছে কোঠারিগঞ্জ বাজারে আনাজপাতি বেচতে।

একটা পুরনো মন্দির পড়ল পথের পাশে। একটু তফাতে একটা বসতি। মন্দিরের চত্বরে কয়েকজন লোক জাল বুনছে—কেউ জাল শুকোতে দিয়েছে। আমাদের দেখে তারা কাজ ফেলে তাকিয়ে রইল। কর্নেল ওদের উদ্দেশে ভদ্রতাসূচক হেসে একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলেন। ওরা হাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝলুম, আস্ত সায়েব দেখে ওরা ভড়কে গেছে। কর্নেলকে দেখে এমন ভুল তো সবাই করে! কিন্তু কর্নেল যখন বললেন, পদ্মায় কেমন মাছ হচ্ছে-টচ্ছে? ওরা সায়েবের মুখে বাংলা শুনে তখন খুশি হয়ে একসঙ্গে কলকল করে জবাব দিতে থাকল।

তা স্যার, মাছ হচ্ছে বই কিছু কিছু। কিন্তু আজকাল বর্ডারের সেপাইরা বেশি দূরে যেতে দেয় না। তার ওপর চোর-ডাকাতও ওপার থেকে এসে হামলা করে। মাছ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি পীরের চরের ওদিকে পদ্মার একটা পুরনো খাদ আছে। সেখানে তো খুব মাছ পাওয়া যেতে পারে। তাই না?

ওদের সর্দার চোখ বড় করে মাথাটা জোরে দোলাল। তারপর ভয় পাওয়া গলায় বলল, না স্যার। সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা! পীরের চরের থেকেও ভয়ঙ্কর।

কেন বলো তো?

জেলে সর্দার বলল, ওই খাদের নাম রাক্ষুসির বাঁওড়। লোভে পড়ে ওখানে মাছ ধরতে গিয়ে আমাদের গাঁয়ের অনেক লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমার বড় ছেলে—নাম ছিল গণেশ। ইয়া বড় বুকের ছাতি—পেল্লায় চেহারা। তিন বছর বাদে বারণ না মেনে রাক্ষুসির বাঁওড়ে গেল—আর ফিরে এল না।

জেলে সর্দার ফোস করে শ্বাস ছেড়ে কান্না সামলে নিল। কর্নেল ম্যাপটা খুলে জায়গাটা দেখতে দেখতে বললেন, হুম! ভারি ভয়ঙ্কর জায়গা তাহলে।

ওদের একজন জিজ্ঞেস করল, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আমরা আপাতত যাব 'মহিমবাবুর চরে', কর্নেল বললেন। সেখানে নাকি প্রচুর বুনো হাঁস দেখা যায়।

তা যায় বটে! জেলে সর্দার বলল। কিন্তু হাঁসের দেখা বেশি মেলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে। শীত পর্যন্ত এত হাঁস দেখা যায়, পদ্মার জল কালো হয়ে ওঠে যতদূর চোখ যায়। এখন তো স্যার শীত

ফুরিয়েছে, এখন তত বেশি নেই। তবে আছে—সারা বছর যারা থাকে, তারা আছে। তাদের সংখ্যাও কম নয়। দেখবেন গিয়ে?

কর্নেল বসলেন, হুম! সে কথা আমিও শুনেছি। পদ্মার চর এলাকায় বারো মাস শুধু হাঁস কেন, কত রকমের পাখির আড্ডা। তাই না?

আজ্ঞে ঠিকই বলেছেন।

লোকগুলোকে সিগারেট বিলি করলুম কর্নেলের আদেশে। কর্নেলের তো চুরুট ছাড়া চলে না, চুরুট ধরিয়ে আরও কিছুক্ষণ খবরাখবর নিলেন। কথা আছে, মহিমবাবুর চরে গিয়ে ডেরা পাতব। ওখানে আগে থেকে একটা নৌকো নিয়ে লোক থাকবে।

নির্জন রাস্তা। বড় বড় গাছপালায় জঙ্গল হয়ে আছে। একটা বটগাছের তলায় পৌঁচেছি, পেছনে ক্রিং ক্রিং সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেলুম।

ঘুরে দেখি, কোঠারিগঞ্জে রাতে যার বাড়িতে ছিলুম, সেই সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবু আসছেন সাইকেলে চেপে। পিঠে বন্দুক। ব্যাপার কী! উনি না আজ ভোরবেলায় কলকাতা যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন!

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন, হ্যাল্লো মোহন! আমি জানতুম, তোমার কলকাতা যাওয়া হবে না।

মোহনবাবু বললেন, আপনি কি অন্তর্যামী কর্নেল!

কতকটা। কর্নেল সহাস্যে বললেন। রাতে তোমার দাদুর সঙ্গে তোমার কথাবার্তায় বেশ বুঝতে পারছিলুম, আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে তোমার যতটা টান, দাদুর কাজে কলকাতা যাওয়ায় ততটা নেই। কাজেই ধরেই নিয়েছিলুম, তুমি ট্রেন ফেল করবে।

মোহনবাবু আমার সমবয়সী যুবক। খুব হাসিখুশি স্বভাবের। সাহসী বলেও মনে হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এখন এই এলাকায় পাটকাঠি থেকে কাগজ তৈরির কারখানা গড়ার চেষ্টা করছেন। এ এলাকায় প্রচুর পাট চাষ হয়।

মোহনবাবু বললেন, দেখুন কর্নেল, দাদুর কাজ দু'দিন পরে হলেও চলবে। কিন্তু আপনাদের সঙ্গ তো আর পাব না! আপনাদের দু'জনের কীর্তিকথা এতকাল কাগজে পড়েছি। হঠাৎ কপালগুণে আপনারা যে এই জঙ্গলে পাণ্ডব বর্জিত এলাকায় এসে পড়বেন, কল্পনাও করিনি। তা আবার আমাদের বাড়িতেই!

কর্নেল সস্নেহে ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমার বাবা এ জেলার প্রখ্যাত শিকারি ছিলেন। ওড়িশার জঙ্গলে যখন মানুষখেকো বাঘ শিকারে গিয়ে প্রমথনাথ মারা যান, আমি তাঁর সঙ্গী ছিলুম। তোমার বয়স তখন খুব কম। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝে গেছি অবশ্য।

মোহনবাবু বললেন, মায়ের কাছে সব শুনেছি। দাদুও বলছিলেন।

কথা বলতে বলতে আমরা আরও মাইলটাক এগিয়ে মহিমবাবুর চরের এলাকায় পৌঁছলুম। বাঁ দিকে পদ্মার জল অনেকগুলো বালির ঢিবির আনাচ-কানাচ ঘুরে বয়ে যাচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বুঝি মহিমবাবুর চর খুঁজছিলেন। সাইকেল দাঁড় করিয়ে রেখে মোহনবাবু একটা খাড়ির ধারে গিয়ে কাদের ডাকতে থাকলেন।

একটু পরে ফিরে এসে বললেন, চলুন, নৌকো রেডি।

বালি-কাদা ভরা পিছল খাড়িতে একটা পানসি নৌকো নিয়ে মাঝিরা অপেক্ষা করছিল। নৌকো চেপে আমরা চললুম সেই চরের দিকে। চরটা দেখা যাচ্ছিল না। শুনেছি, মহিম হালদার নামে কেউ বহুকাল আগে ওই চরে গিয়ে বসতি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবার বন্যায় ঘরবাড়ি ভেসে যেত। তারপর থেকে চরটা জনহীন হয়ে পড়ে আছে। শুধু মহিমবাবুর পুরনো একতলা ইঁটের বাড়িটা রয়ে গেছে। সেখানে মাঝে মাঝে সীমান্ত বাহিনী গিয়ে ক্যাম্প করে থাকে। এখন সীমান্ত এলাকা শান্ত বলে তারা ওখানে নেই।

ঘণ্টা তিনেক লাগল পৌঁছুতে।

মাঝিরা নৌকোয় থাকল। তারা রান্নাবান্না করবে এখন। আমরা যতক্ষণ থাকব, ওদেরও থাকতে হবে।

ঘন কাশবন আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা চর। উঁচু গাছের সংখ্যা খুব কম। সবচেয়ে উঁচু জায়গাটা একটা জীর্ণ দালান বাড়ি। সীমান্তবাহিনীর ফেলে যাওয়া কয়েকটা খাটিয়া রয়েছে ঘরে। জানালা-দরজা ফেটে রয়েছে। বারান্দায় একটা উনুন দেখতে পেলুম। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে বললেন, ওটাই বুঝি সেই পীরের চর?

খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল, মাইলটাক দূরে পদ্মার বুকে একটা ঘন সবুজ দ্বীপ। চারদিকে জল। মোহনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, হ্যাঁ, কর্নেল, ওখানেই নাকি দুটো বাঘ মানুষের গলায় কথা বলত।

আর রাক্ষুসির বাঁওড় কোন্‌টা?

মোহনবাবু আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, তাও কানে গেছে? ওই দেখুন—পীরের চরের ডান দিকে পদ্মা খানিকটা ঢুকে গেছে বিলের মতো-দেখতে পাচ্ছেন? ওটাই সেই ভূতুড়ে বাঁওড়।

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে হঠাৎ বললেন, আশ্চর্য তো!

আমরা দু'জনে এক গলায় বললুম, কী?

একটা স্পিড-বোট।

মোহনবাবু কর্নেলের কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন বাইনোকুলার। দেখতে দেখতে বললেন, তাই তো! আমাদের সীমান্ত বাহিনীর গোটা দুই স্পিড-বোট আছে বটে, সে তো সেই লালগোলা ক্যাম্পে। তাছাড়া এ স্পিড-বোটের গড়নও অন্যরকম।

আমি বললুম, বাংলাদেশের নয় তো?

কর্নেল বললেন, না। কারণ স্পিড-বোটে একটা স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা আছে। আর একটা মড়ার খুলি এবং তার তলায় আড়াআড়ি দুটো হাড়ও আঁকা। তার মানে, সাবধান! আমি সাক্ষাৎ মৃত্যু!

বলেন কী! অজানা ভয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল আমার।

মোহনবাবু বললেন, স্পিড-বোটে জনা চার লোক বসে আছে। ওরে বাবা! একটা সাব-মেশিনগান ফিট করা আছে দেখছি। কর্নেল! কর্নেল! ওরা পীরের দিকে এগোচ্ছে।

কর্নেল বললেন, যাক্ যার যেখানে খুশি। আমরা তো পাখির ব্যাপারে এসেছি! ইয়ে—ডার্লিং জয়ন্ত! তাহলে এবার সঙ্গের খাদ্যগুলোর সৎকার করে নিয়ে বেরুনো যাক। রোদ্দুরটা খাসা। আবহাওয়াও মোলায়েম। ওই দেখ, কত পাখি! জয়ন্ত! বিশ্বাস করো, একসঙ্গে এত জলচর পাখি কখনও দেখিনি! অভূতপূর্ব। বিস্ময়কর!

দুই

অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়করই বটে। এমন লক্ষ লক্ষ, নাকি কোটি কোটি জলচর পাখির সমাবেশ কোথাও দেখিনি। যতদূর চোখ যায়, খালি পাখি আর পাখি। তাদের চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। জল থেকে এখানে ওখানে বালির চর জেগে রয়েছে। সেইসব চরে অসংখ্য পাখি বিশ্রাম করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ছে। আবার ছল-ছলাৎ শব্দে জলে নামছে। মনে হচ্ছে একটা দীর্ঘ চাবুক আকাশ থেকে কেউ সপাং করে জলে মারল।

বন্দুকের আওয়াজ করলে কর্নেলের সেই 'বখাঁস' দর্শন হবে না। তাই উনি আমাকে আর মোহনবাবুকে দক্ষিণে যেতে বলে একা গেলেন চরের উত্তর দিকে। কাশবনের আড়ালে ওঁর টুপিটি দেখা যাচ্ছিল। আমরা চরের দক্ষিণ দিকে ঢালুতে নেমে আর ওঁকে দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে মোহনবাবুর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেল যে, আমরা পরস্পরকে তুমি বলতে শুরু করলুম এবং নাম ধরে ডাকাডাকি চলল।

মোহন বলল, আজকাল এত বেশি জলচর পাখি নির্ভয়ে এ তল্লাটে এসে জুটছে কেন জানো? এদিকে কেউ পা বাড়ায় না বলে। এসব পাখি মারা বেআইনি। কিন্তু সেজন্য নয়। প্রথম কথা, বর্ডার বাহিনীর নিষেধাজ্ঞা আছে। দ্বিতীয় কথা হল, পীরের চর আর রাক্ষুসির বাঁওড় সম্পর্কে লোকের ভীষণ আতঙ্ক। যারা এদিকে একা-দোকা এসেছে, তারা কেউ ফিরে যায়নি।

চরের একদিকটা ঢালু হয়ে জলে নেমেছে। সমুদ্রের বেলাভূমির মতো। একেবারে ফাঁকা এদিকটা শুধু ধু-ধু বালি। আমাদের দেখামাত্র বুনো হাঁসের ঝাঁক উড়ে দূরে গিয়ে বসল। বন্দুকের পাল্লার বাইরে। অনেক ঘোরাঘুরি করেও গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পেলুম না।

দেখতে দেখতে রোদ কমে এল। তারপর টের পেলুম, হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মোহন বলল, আমাদের বরাত মন্দ জয়ন্ত! পাখিগুলো দেখছি মহা ধড়িবাজ! কী আর করা! কাল ভোরবেলা অন্যদিকে বেরনো যাবে। এখন ফেরা যাক্।

মহিমবাবুর চর বেশ লম্বা-চওড়া। লম্বায় মাইলটাক না হয়ে যায় না। চওড়াতেও মনে হল প্রায় পৌনে এক মাইল। কাশবন, বালিয়াড়ি, কাঁটাঝোপের ভেতর ঘোরাঘুরি করে ধূর্ত পাখিগুলোকে যখন কিছুতেই বন্দুকের নাগালে পেলুম না, তখন ডেরায় ফিরে গেলুম।

কর্নেল ফিরলেন সন্ধ্যা নাগাদ। তখন পুবে মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। আজ পূর্ণিমা তাহলে। জ্যোৎস্না ফুটতে ফুটতে আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেল। নৌকোর মাঝিরাও এসে জুটল। ওরা নৌকোয় রাত কাটাতে নারাজ। আগের ব্যবস্থা মতো লণ্ঠন আর রান্নার সরঞ্জাম নৌকোয় ছিল। সব বয়ে নিয়ে এল। ভেবেছিলুম, বুনো হাঁসের মাংসের ঝোল খেয়ে পদ্মার এই বেমক্কা ঠাণ্ডাটা ঠেকাব। হল না। তবে মাঝিরা বুদ্ধি করে জাল ফেলে কিছু মাছ ধরেছিল।

কর্নেলেরও আমাদের মতো মন ভাল নেই। অনেক হাঁটাহাঁটি আর জল-কাদা-বালিতে উপুড় হয়ে 'বখাঁস' দেখার চেষ্টা করেছেন। থাকলে তো!

কর্নেলের মতে, নিশ্চয় আছে। এক পক্ষীবিদ্ সায়েবের বইতে পড়েছেন। বোম্বাইয়ের নামকরা পক্ষীবিদ্ সেলিম আলিও লিখেছেন পদ্মার চরের এই আশ্চর্য জলচর পাখির কথা।

রাত আটটার মধ্যে শালপাতায় মোটা চালের ভাত আর মাছের ঝোল খাওয়া হয়ে গেল। সায়েব মানুষ কর্নেলও খুব তারিয়ে তারিয়ে চেটেপুটে খেলেন এবং মাঝিদের রান্নার সুখ্যাতি করলেন।

তারপর এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন। এখনই পীরের চরে যেতে চান। ইচ্ছে করলে আমরাও ওঁর সঙ্গে যেতে পারি।

কিন্তু যেতে হলে নৌকো চাই। মাঝিরা আতঙ্কে কাঠ হয়ে বলল, তারা প্রাণ গেলেও পীরের চরে যাবে না। দিনেই যাবে না, তো এই রাতের বেলায়! সায়েবের কি মাথা খারাপ! ওদিকে যে যায়, সে আর ফেরে না।

মোহন বলল, ঠিক আছে। আমি নৌকো বাইতে জানি। এ দেশের ছেলে। এ কাজটা ভালই পারি। জয়ন্ত, তুমি নৌকো বাইতে পারো তো?

জোরে মাথা নেড়ে বললুম, মোটেও না। কর্নেলও পারেন না।

কর্নেল বললেন, তুমি কি ভুলে গেলে জয়ন্ত? ভারত মহাসাগরের টোরা দ্বীপ থেকে একবার একা ভেলায় পাড়ি জমিয়েছিলুম প্রাণের দায়ে! আর এ তো পদ্মা!

তাও বটে। এ বুড়োর অসাধ্য কাজ কিছু থাকতে নেই। কিন্তু দ্বিধাজড়ানো গলায় বললুম, এই রাত-বিরেতে ওই জঙ্গুলে চরে কি না গেলেই চলে না! বরং সকালে যাওয়া যাবে।

একজন মাঝি ভয় দেখিয়ে বলল, স্যার, পীরের চরের জোড়া বাঘ এখনও শুনেছি আছে। তাছাড়া প্রচণ্ড সাপের উৎপাত আছে। কেউটে-গোখরো তো আছেই, আর আছে অজগর সাপ। স্যার, আমি দূর থেকে একবার দেখেছি, অজগর সাপটা মাথায় মণি নিয়ে বেড়াচ্ছে। আর চারদিকে আলো ঠিকরে পড়ছে। জঙ্গল আলো হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস করুন।

কর্নেল কানে নিলেন না। মোহনের মুখেও দ্বিধার চিহ্ন নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে টর্চ আছে। প্রত্যেকের পায়ে গামবুট আছে। দুটো বন্দুক আছে। কর্নেলও নিশ্চয় তাঁর রিভলভারটা সঙ্গে এনেছেন।

জ্যোৎস্নার রাতে পদ্মায় নৌকো করে যাওয়ার আনন্দ আছে। বারবার মনে পড়ছে সেই ভয়ঙ্কর স্পিড-বোটটার কথা। কারা ওরা! ওদের কাছে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আছে। ওরা যে ভাল মানুষ নয়, তা তো বোঝাই গেছে। বোটের গায়ে মড়ার খুলি আঁকার মানে একটাই—তা হল, 'আমরা সাক্ষাৎ মৃত্যু!' কর্নেল-দাঁড়ে বসেছেন। মোহন একা আলতো হাতে বৈঠা বাইছে। আমরা যাচ্ছি স্রোতের ভাটিতে। তাই নৌকো তরতর করে এগোচ্ছে। আমি পানসির ছাদে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে উঁচু পাড়, অন্যদিকটায় জল। কিছু দূর যাবার পর নৌকো কোনাকুনি চলতে থাকল। পাড় থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেলাম।

জ্যোৎস্নায় চারদিক কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছিল, ভুল করে বাংলাদেশের সীমানায় গিয়ে পড়ব না তো!

কর্নেলকে না বলে পারলুম না—পীরের চর তো দেখা যাচ্ছে না। আন্দাজে অন্য কোথাও নৌকো নিয়ে গেলেই মুশকিল!

কর্নেল পানসির পেছন থেকে জবাব দিলেন, এবার নাক বরাবর। তাছাড়া ওই দেখ আলো!

আলো মানে! চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলুম।

মোহনও মুখ ফেরাল। বলল সর্বনাশ! ওটা তাহলে সেই স্পিড-বোটের আলো।

কর্নেল বললেন, না। আলোটা উঁচুতে। তার মানে পীরের চরের জঙ্গলে।

আলোটা দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম, কর্নেল, জনমানুষহীন পীরের চরে কেউ নিশ্চয় আলো হাতে আমাদের বরণ করার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু বরণ কীভাবে করবে, সেটাই একটু ভাবনার কথা।

কর্নেল কোনো জবাব দিলেন না। ওদিকে আলোটা নড়তে নড়তে হঠাৎ যেন নিবে গেল। বন্দুকটা শক্ত করে চেপে ধরলুম।

তারপর টের পেলুম, আমাদের নৌকো বিশাল এক ঝাঁক পাখির দিকে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার পাখি ভয় পেয়ে উড়তে শুরু করল। অনেক বেপরোয়া পাখি তরতর করে জল কেটে দূরে সরে যেতে থাকল। চারদিকে প্রচণ্ড একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। জলের শব্দ, ডানার শব্দ, আঁক-আঁক ট্যাঁ-ট্যাঁ চিৎকার। একটু পরে সামনে কালো পাহাড়ের মতো আবছা ভেসে উঠল পীরের চর।

জলে ঝোপঝাড় ঝুঁকে আছে। ঘন কালো তাদের রঙ। অন্ধকার ওত পেতে আছে যেন আমাদের জন্য। নৌকো ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে এক জায়গায় ফাঁকা বালির তট পাওয়া গেল। সেখানে নৌকো বেঁধে রাখা হল একটা ঝোপের সঙ্গে। পাহাড়ের মতো আবছা ভেসে উঠল পীরের চর।

জলে ঝোপঝাড় ঝুঁকে আছে। ঘন কালো তাদের রঙ। অন্ধকার ওত পেতে আছে যেন আমাদের জন্য। নৌকো ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করে এক জায়গায় ফাঁকা বালির তট পাওয়া গেল। সেখানে নৌকো বেঁধে রাখা হল একটা ঝোপের সঙ্গে। তারপর আমরা ঢালু পাড় বেয়ে উঠে গেলুম পীরের চরে।

কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, কোনো কথা নয়। চুপচাপ আমার পেছন পেছন এস। দরকার হলে আমিই টর্চ জ্বালব—তোমরা জ্বেলো না যেন!

ওপরে মাটিটা শক্ত। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে বড় বড় গাছ আছে। চাঁদের আলো পড়েছে চকরা-বকরা হয়ে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সাপের ফোঁস শুনতে পাব! কিন্তু কিছুটা এগিয়ে ভয়টা কেটে গেল। বিষধর সাপ পায়ে ছোবল মেরে সুবিধে করতে পারবে না, পায়ে গামবুট রয়েছে আমাদের।

সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা গেল। সেখানে যেতেই আমরা থমকে দাঁড়ালুম। ডাইনে সম্ভবত একটা বটগাছ। জ্যোৎস্নায় অজস্র ঝুরি দেখা যাচ্ছে মনে হল। ঝুরিগুলোর ভেতর একখানে জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো বাঘ আপন মনে খেলা করছে। তাদের লেজ দুটো খুব নড়াচড়া করছে। পরস্পর কামড়াকামড়ি আর জড়াজড়ি করে ওরা খেলছে।

কর্নেলের ইশারায় আমরা বসে পড়লুম। বন্দুক এগিয়ে বাগিয়ে রইলুম, যদিও জানি, পাখি-মারা কার্তুজে বাঘের একটুও ক্ষতি করা যাবে না। অবশ্য আওয়াজে ভড়কে যেতেও পারে।

বাঘ দুটোর খেলা আর শেষ হয় না। কতক্ষণ পরে এবার যা দেখলুম, চোখে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্ভবত যে আলোটা দেখেছিলুম, সেইটেই হবে। দুলতে দুলতে কোত্থেকে এল। তারপর আলোর ছ'টায় আবছা দেখা গেল একটা অদ্ভুত চেহারার মানুষকে। কালো আলখাল্লায় ঢাকা আপদমস্তক। নাকটা বাঁকা বাজপাখির ঠোঁটের মতো। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সে বাঘ দুটোর কাছে এসে লণ্ঠন নামিয়ে রাখল। তখন বাঘ দুটো তার পায়ে মাথা ঘষতে থাকল।

লোকটা বাঘ দুটোর পিঠে থাপ্পড় মেরে বলল, খুব হয়েছে! এবার নিজের কাজে যাও বাবারা! চারিদিকে চক্কর মেরে নজর রাখবে। হুঁশিয়ার!

বাঘ দুটো পেছনের দু'পা গুটিয়ে সামনের দু'পা সোজা রেখে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে। আলখাল্লাধারী ফের বলল, হাঁ করে দেখছ কী বাবারা? আজ শয়তান কাশিম খাঁকে দেখেছি মোটর-বোটে রাক্ষুসির বাঁওড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবরদার! শয়তানটা যেন এ পবিত্র মাটিতে পা রেখে নোংরা করে না!

বাঘ দু'টো দু'দিকে চলে গেল। ভাগ্যিস, আমাদের দিকে এল না। এলে কী হত, ভাবতেও গা শিউরে উঠল!

আলখাল্লাধারী আলো নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকা মাত্র কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, চলে এস। সাবধানে কিন্তু।

জঙ্গলের ভেতর জায়গায় জায়গায় জ্যোৎস্না পড়েছে। গাছগুলো সবই উঁচু। তাই এবার হাঁটতে অসুবিধে নেই। আলখাল্লাধারী আলো নিয়ে যেখানে ঢুকল, সেটাই তাহলে পীরের মাজার। একতলা জীর্ণ একটা বাড়ি। দরজা বন্ধ করে দিল সে।

আমরা বাড়িটা ঘুরে পেছনের দিকে গেলুম। ভাঙা জানলা দিয়ে ভেতরের আলো দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে কর্নেল সেখানে উঁকি দিলেন। তারপর আমাকে ইশারা করলেন। ফাটলে চোখ রেখে দেখি, ঘরের মেঝেয় সেই আলখাল্লাধারী লোকটা বসে আছে। তার সামনে একটা কবর। কবরে পুরনো আমলের ছেঁড়াখোঁড়া একটা লাল ভেলভেট কাপড় ঢাকা। কবরের অন্যদিকে বসে রয়েছে তিনজন হিংস্র চেহারার লোক। তাদের পরনে প্যান্ট-শার্ট এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে রাইফেল, বুকে কার্তুজের মালা।

আলখাল্লাধারী বলল, হ্যাঁ, শয়তানটা আজ আবার এসেছে। কিন্তু ওর সঙ্গে লড়াই করে এঁটে ওঠা যাবে না। কারণ এবার হারামজাদা কাশিম খাঁ সঙ্গে একটা সাব-মেশিনগান এনেছে। কাজেই ওর সঙ্গে লড়তে যাওয়া বোকামি। বরং বাদশা-বেগমকে লেলিয়ে দিয়েছি। ওরা ওদের ভিড়তে দেবে না চরে।

ইতিমধ্যে কর্নেল আর মোহনও আমার পাশে মাথা গুঁজে ফাটলে চোখ রেখেছেন। আমরা থ' বনে গিয়ে শুনছি ওদের কথাবার্তা। বুঝতে পারছি বাদশা-বেগম সেই বাঘ দু'টোর নাম। কিন্তু ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না!

একজন অনুচর বলল, কিন্তু বাদশা-বেগমকে ওরা যদি গুলি করে মারে?

আমার এ জানোয়ার দু'টোর বুদ্ধিসুদ্ধির ওপর একটু আস্থা রেখো জনার্দন! আলখাল্লাধারী লোকটা বলল। তার মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। তুমি কি জানো না, এ পর্যন্ত কত জন ওদের পেটে হজম হয়ে গেছে?

দ্বিতীয় অনুচর বলল, তারা নেহাত মাছমারা জেলে—নিরীহ মানুষ! কিন্তু কাশিম খাঁ—

কথা কেড়ে আলখাল্লাধারী বলল, হুঁশিয়ার রহিম বখ্‌শ! তোমার দেখছি ওদের ওপর বড্ড দরদ! তুমি জানো! ওরা সবাই কাশেমের টাকা খেয়ে পীরের চরে গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছিল মাছধরার ছলে? জেলেপাড়ার গণেশ নামে এক ছোকরাকে বাদশা কামড় বসিয়েছিল। আমার খেয়াল হল বাঘের পেটে যাবার আগে ওকে জেরা করে দেখি, সত্যি সত্যি মাছ ধরতে এসে পীরের চরে পা দিয়েছে নাকি! জেরা করে জানলুম, ওপার থেকে কাশেমের লোক গিয়ে ওকে টাকা খাইয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠিয়েছে।

তৃতীয় অনুচর বলল ওস্তাদজী! মহিমবাবুর চরে কারা এসেছে দেখেছি। তাদের মধ্যে একটা বুড়ো সায়েব আছে। সে চোখে দূরবীন লাগিয়ে পাখি দেখে বেড়াচ্ছিল।

ওস্তাদজী হাসল—সায়েবদের পাখি দেখার নেশা আছে, গদাই। বুঝলে তো? পদ্মার চরে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক থেকে শিকারিরাও আসে। কাজেই ও নিয়ে ভেবো না।

তৃতীয় অনুচর গদাই চেহারাতেও তদ্রূপ। নাদুসনুদুস গড়ন। প্রকাণ্ড মাথা। অন্য সময়ে তাকে দেখলে হাসি পেতে পারে। কিন্তু এখন ওর হাতে অটোমেটিক রাইফেল।

গদাই বলল, ওদের সঙ্গে কোঠারিগঞ্জের সদাশিববাবুর নাতি মোহনবাবুকেও দেখেছি।

ওস্তাদজী খিকখিক করে হেসে বলল, মোহন! মোহন বড় ভাল ছেলে। ছোটবেলায় কোঠারিগঞ্জে থাকার সময় ওকে দেখেছি। এখন খুব বড় হয়ে গেছে নিশ্চয়!

জনার্দন বলল, এখন একটু চা পেলে মন্দ হত না ওস্তাদজী! বাইরে ঠাণ্ডাটি বাড়ছে। তাছাড়া সারা রাত জেগে কাজ করতে হলে মাঝে মাঝে চা দরকার।

ওস্তাদ ডাকল, ভুতো! অ্যাই ভুতো!

ওদিক থেকে সাড়া এল।—চা হয়ে গেছে ওস্তাদজী!

নিয়ে আয় ঝটপট!

চায়ের কেটলি আর গোটাকতক গ্লাস হাতে যে লোকটা ঘরে ঢুকল, তাকে দেখেই চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই সকালে বর্ডার বাহিনীর ক্যাম্পে দেখা খোঁড়া লোকটা! বগলে ক্রাচ এখনও রয়েছে। কর্নেলকে চিমটি কাটলুম। সাড়া পেলুম না।

ওরা চা খেতে থাকল। তারপর দূরে কোথাও বাঘের ডাক শুনতে পেলুম। কয়েকবার ডেকেই চুপ করে গেল। ভেতরের লোকগুলো নিশ্চয় শুনতে পায়নি। ওরা নিশ্চিন্ত মনে কথা বলছে পরস্পর। কান পেতে শুনতে থাকলুম। মাঝে মাঝে পেছনে ঘুরে দেখেও নিলুম, বাদশা বা বেগমের জন্য মনে আতঙ্ক রয়েছে। পেছনের দিকটা ফাঁকা না হলেও উঁচু গাছের সংখ্যা কম। তাই পরিষ্কার নজর হচ্ছে অনেকটা দূর পর্যন্ত।

ওস্তাদ বলল, শয়তান কাশেম আসলে ভেবেছে, বুলবন পেশোয়ারীর সোনাদানায় তার ভাগ আছে। কেন? না, সে পেশোয়ারীর কর্মচারী ছিল। ভেবে দেখ তোমরা! ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে যখন ওপারে হাঙ্গামা লাগল, অবাঙালি মুসলিম বড়লোকেরা অনেকেই এই বর্ডার পেরিয়ে পালিয়ে

আসছে—বুলবন পেশোয়ারী আর থাকবে কোন্ সাহসে? পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের লকার ভেঙে প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট নিয়ে ভাগলো। হ্যাঁ, কাশেম খাঁ বলতে পারে বটে, সে বর্ডার পেরুতে তার ওই স্পিড-বোটটা দিয়ে পেশোয়ারীকে সাহায্য করেছিল। তাতে কি পেশোয়ারীর সোনার হিস্যে তার পাওনা হয়!

করিম বখশ বলল, পেশোয়ারী এই পীরের চরেই যে সোনা পুঁতে রেখেছিল, তার প্রমাণ?

ওস্তাদ চোখ পাকিয়ে বলল, করিম বখশ! তুমি বরাবর বড্ড সন্দেহপ্রবণ লোক!

করিম আমতা আমতা হেসে বলল, না ওস্তাদজী! ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার! নইলে খামোকা যেখানে-সেখানে মাটি খুঁড়ে লাভ কি?

জনার্দনও সায় দিয়ে বলল, ঠিক, ঠিক।

খোঁড়া লোকটা—ভুতো, চায়ের এঁটো গ্লাসগুলো নিয়ে চলে গেল। গদাই বলল, হ্যাঁ ওস্তাদজী। সবটা আপনার মুখে শুনতে চাই। আর কতদিন ভুল পথে ছোটাছুটি করে মরব!

ওস্তাদ বলল, পেশোয়ারীকে তার মালপত্তর সমেত কাশেম এই চরে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। আমাকে বলে যায়, ওকে যেন নিরাপদে লালগোলা পৌঁছে দিই। রাতে আমার এই আস্তানায় যত্ন করে পেশোয়ারীকে রাখলুম। আমি ভাবতেই পারিনি, ওর কাছে অত সোনা আছে! তবে হ্যাঁ, দেখে মনে হয়েছিল বটে বেজায় বড়লোক। টাকাকড়িও আছে সঙ্গে। ভাবলুম, ঘুমোলে স্যাঙাতকে শেষ করে সবটা হাতাব। লাশটা বাদশা-বেগমকে খাইয়ে দেব। কিন্তু ব্যাটা কীভাবে সব টের পেয়েছিল জানি না। না কি কাশেমই আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল! রাতে আমি মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সকালে উঠে দেখি পেশোয়ারী নেই। তখন সন্দেহ হল, ব্যাটা আমাকে মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে। গ্লাস পরীক্ষা করে দেখলুম, সাদা গুঁড়ো কী সব জিনিস রয়েছে গ্লাসের তলায়।

গদাই বলল, বলেন কী! তারপর?

ওস্তাদ বলল খুব রাগ হল। বুলবনকে খুঁজতে বেরুলুম। এ চর থেকে সাঁতার কেটে পালাতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গের বাক্সপেঁটরা? খুঁজতে খুঁজতে একখানে দেখি, আমার বাদশা আর বেগম বুলবন হতভাগাকে থাবার ঘায়ে আধমরা করে ফেলেছে। ঘাড়ে কামড় বসাতে যাচ্ছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। বাঘ দুটো আমাকে দেখে সরে দাঁড়াল। বুলবনের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। কাছে গিয়ে বসতেই অতি কষ্টে বলল, "আমার পাপের ফল। পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাট। পীরের তলায় সোনাটা—" শুনেই চেঁচিয়ে উঠলুম, কোথায়? বুলবনের দম আটকে গেল। তখন কী আর করি! বাঘ দুটোকে ডেকে বললুম, শীগগির এ ব্যাটাকে গিলে খা। পীরের চরে মড়া পড়ে থাকার বিপদ আছে। কখন বর্ডার পুলিস এসে দেখে ফেলবে!

জনার্দন বলল, ওস্তাদজী! আমার মাথায় একটা কথা এসেছে।

কী তা বলেই ফেলো বাপু। ওস্তাদ বিরক্ত হয়ে বলল।

পেশোয়ারী নিশ্চয় কোথাও বালির মধ্যে সোনাটা পুঁতে রেখেছিল, জনার্দন বলল। এ জঙ্গলের ভেতর মাটিতে পুঁতলে তো আপনি খুঁজে পেতেন। সদ্য মাটি খোঁড়ার চিহ্ন থাকত। কাজেই বালিতে পুঁতেছিল ব্যাটা।

ওস্তাদ তার দিকে তাকিয়ে বলল, এ কথাটা তো এত দিন মাথায় আসেনি! তুমি ঠিকই বলেছ জনার্দন! বালিতে পুঁতলে জায়গাটা খুঁজে পাওয়ার কথা নয়। কী বোকা আমরা! এতকাল জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে হন্যে হলুম, অথচ—

কথা থামিয়ে আলখাল্লাধারী উঠে দাঁড়ায়। ব্যস্তভাবে বলল, চলো তাহলে! আগে পুবের বালির চড়ায় যাই। একদিক থেকে খোঁড়া শুরু করি। যতদিন লাগে লাগুক—মাস, বছর লাগুক।

এবার দেখলুম, কয়েকটা কোদাল আর ঝুড়ি রয়েছে ঘরের কোনায়। সেগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে তিন রাইফেলধারী আর ওস্তাদ বেরুল। ঘরে লণ্ঠনটা রইল। ওস্তাদের গলা শোনা গেল ওদিক থেকে—অ্যাই ভুতো! কোথাও যাবিনে। চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাক্!

ক্রাচে ভর করে ভুতো ঘরে ঢুকল। তারপর সটান শুয়ে পড়ল। লোকটার একটা পা হাঁটুর কাছ থেকে কাটা। সে সেই কাটা পা নাচাতে থাকল শুয়ে শুয়ে। চোখ দুটো বোজা। নিশ্চয় গাঁজা টানছিল এতক্ষণ। এখন নেশায় চুর হয়ে গেছে।

তিন

আমরা নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করছিলুম। শুধু আতঙ্ক ওই বাঘ দুটোর জন্য। আমাদের দৈবাৎ দেখে ফেললে প্রচণ্ড বিপদে পড়তে হবে।

ওস্তাদ দলবল নিয়ে পুবের বালিয়াড়িতে চলেছে। এদিকে ফাঁকা বলে জ্যোৎস্নায় তাদের ছায়ামূর্তি নজর হচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণে ঠান্ডাটা বেজায় বেড়ে গেছে। কাঁপুনি হচ্ছে। একখানে একটু থেমে কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, রাক্ষুসির বাঁওড় পশ্চিমে। আমরা যাচ্ছি পুবে। কাজেই মনে হচ্ছে, বাঘ দু'টোর আচমকা হামলার ভয় আর নেই। কারণ ওদের রাক্ষুসির বাঁওড়ের দিকটায় পাহারা দিতে বলা হয়েছে। কাশেম খাঁ স্পিড-বোট নিয়ে ওদিক থেকেই আসবে কিনা!

একটা বালির ঢিবির ওপর ওস্তাদ আর তিন অনুচরের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছিল। তারা ওধারে নেমে অদৃশ্য হলে আমরা সেই ঢিবিতে গিয়ে বসে পড়লুম। বালির ঠান্ডা পোশাকের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। তার ওপর পদ্মার হু-হু হাওয়া। নিচে ওস্তাদদের দেখা যাচ্ছে। এবার খোঁড়ার আয়োজন চলেছে।

আমরা ঘাপটি মেরে বসে রইলুম। মোহন বলল, ওদের বোকামি দেখে হাসি পাচ্ছে। ওরা কি গোটা বালিয়াড়ি খুঁজে সোনা আবিষ্কারের মতলব করেছে! তাহলে তো এক বছর লেগে যাবে।

বললুম এ তো খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার শামিল!

কর্নেল বললেন, ওরা আসলে মরিয়া হয়ে উঠেছে সোনার লোভে। আচ্ছা মোহন, লোকগুলোকে কি চিনতে পেরেছ? তোমাদের এলাকার লোক বলেই মনে হচ্ছে।

মোহন বলল, চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। চিনতে পারলুম না।

হুম! আমার ধারণা, এরা আসলে একদল ডাকাত। আর আলখাল্লাধারী ওদের সর্দার, সেটা তো 'ওস্তাদজী' বলা শুনে বোঝাই যাচ্ছে, কর্নেল বললেন, কিন্তু আমার মাথায় ঢুকছে না, বাঘ দুটো কীভাবে ওর পোষ মানল? বাঘ সম্পর্কে আমার অনেক কিছু জানা আছে। কম বয়সে বাঘ মানুষের পোষ মানে বটে, কিন্তু বয়স হলে তারা তাদের বন্য হিংস্র স্বভাব ফিরে পায়। তখন তাদের আর পোষ মানিয়ে রাখা যায় না। তার ওপর বাঘ দুটো মানুষখেকো।

বললুম, কর্নেল! পীরের জঙ্গলে বাঘ দুটো খায় কী? কী খেতে দেয় ওস্তাদ?

কর্নেল বললেন, মানুষ।

মোহন ও আমি শিউরে উঠলুম। বললুম, মানুষ খেতে দেয়!

তাই বোঝা যাচ্ছে। কর্নেল বললেন। শুনেছি এই এলাকায় এ যাবৎ অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। তাই না মোহন?

মোহন উত্তেজিতভাবে বলল, হ্যাঁ কর্নেল! এতদিনে তাহলে সে রহস্যের কিনারা হল।

কর্নেল বললেন প্রাণীবিদদের লেখা বইয়ে পড়েছি, সারা জীবন ধরে কোনো বাঘ যদি শুধু মানুষের মাংস খায় বা তাকে খাওয়ানো হয়, তাহলে এক সময় তার অবস্থা হয়ে ওঠে আফিংখোর মানুষের মতো। অর্থাৎ সারাক্ষণ নেশাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ওই অবস্থায় তার স্বাভাবিক হিংসা লোপ

পায়। আক্রমণবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত নেড়ি কুকুর হয়ে ওঠে বেচারা। অবশ্য জানি না, বাদশা-বেগমের সেই অবস্থাটা এসেছে কি না! এখনও না এসে থাকলে ভবিষ্যতে আসবে। তখন ওদের তাড়া করলে বা ঘুঁষি মারলেও দাঁত বের করে থাবা তুলে আক্রমণ করবে না।

সকৌতুকে বললুম, গজরাতে পারবে না?

কর্নেল বললেন, ওটা তো তার মাতৃভাষা। কাজেই জয়ন্ত, গর্জনটা তাকে করতেই হবে।

বলে কর্নেল ঢিবির আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন। ফের বললেন, ওরা সম্ভবত শেষ রাত পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করবে। কাজেই অকারণ এখানে বসে থেকে লাভ নেই। এস, আমরা পীরের মাজারে যাই। ভুতো এতক্ষণ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

কেনই বা তাহলে ওদের অনুসরণ করে আসা, কেনই বা ফের পীরের মাজারে যাওয়া—কিছুই বুঝলুম না। কর্নেলের গতিবিধির অর্থ খোঁজা বৃথা। কোনো কথা না বলে ওঁকে অনুসরণ করলুম। জঙ্গলে ঢুকে আবার বাঘ দুটোর জন্য আতঙ্ক জাগল।

কিন্তু কিছুটা এগোতেই পড়বি তো পড় একেবারে সেই বাঘ দুটোরই মুখোমুখি। সেই ঝুরিওয়ালা বটগাছটার তলায় ফাঁকা জায়গায় যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখানেই। তেমনি করে খেলা জুড়েছে হতচ্ছাড়ারা।

এবার কিন্তু আমাদের দেখতে পেল। পেয়েই পিলে চমকানো ঘড়ঘড় গর্জন করে তেড়ে এল। কর্নেল চাপা গলায় বলে উঠলেন, গাছে ওঠো! গাছে উঠে পড়ো।

সামনে যে ঝুরিটা ছিল, সেটা বেয়ে প্রাণপণে উঠতে শুরু করলুম। একটা বাঘ নিচে দাঁড়িয়ে সমানে ঘড়ঘড় করতে থাকল। মাটিতে লেজ বারবার আছড়ে আমাকে শাসাতে থাকল।

মোহনকে এক পলক দেখেছিলুম, দিশেহারা হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। আরেকটা বাঘ একটু তফাতে আমার ডাইনে গজরাচ্ছে শুনে বুঝলুম, মোহন ওখানেই একটা গাছে উঠতে পেরেছে।

কিন্তু কর্নেল কোথায় গেলেন?

গামবুট পরে গাছে ওঠা সহজ কথা না। লাখ টাকা বাজি ধরলেও পারতুম না। কিন্তু এ হল গিয়ে প্রাণের দায়! কে যেন ঠেলে বটগাছের উঁচু ডালে তুলে দিয়েছে। বেচারা কর্নেলের জন্য ভয় হচ্ছিল। বুড়ো বয়সে গামবুট পরে গাছে চড়া কি সহজ কথা! আমরা যুবক বলেই পেরেছি!

বাঘটা নিচে ঝুরির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে আর ওপর দিকে মুখ তুলে যেন বেজায় গালমন্দ করছে। পস্তানি হচ্ছিল, যদি বুদ্ধি করে রাইফেলটা আনতুম! বন্দুকের ছররা গুলিতে ওর গায়ে আঁচড় পড়বে না। তবু বন্দুকের নল তাক করে আমিও বাঘটাকে ভয় দেখাতে শুরু করলুম।

মোহন বোকামি করে ছররা গুলি ছুড়ে বসবে না তো! তাহলে ওস্তাদরা টের পেয়ে দৌড়ে আসতে পারে।

মোহনের বন্দুকের আওয়াজ ভাগ্যক্রমে শোনা গেল না। ও বুদ্ধিমান ছেলে।

কতক্ষণ পরে বাঘটা একবার চাপা হালুম শব্দ করল। তখন দেখি, তার জোড়াটাও হালুম করে এসে গেল। দুটিতে আবার খেলা শুরু করল। গাছের ডালে বসে ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এবার কর্নেলের মুণ্ডুপাত করছিলুম! কেন যে ওঁর সঙ্গে এমন করে চলে আসি যেখানে সেখানে, এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, বুড়ো গোয়েন্দাপ্রবর মোটেও বখাঁস দেখতে পদ্মার চরে আসেননি। ভেতরে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

এক এক সময় পশ্চিমে দূরে সম্ভবত রাক্ষুসির বাঁওড়ে কাশেম খাঁর স্পিড-বোটের গরগর শব্দ শোনা গেল। অমনি বাঘ দুটো তড়াক করে লাফিয়ে উঠে কান খাড়া করে দাঁড়াল। তারপর নিঃশব্দে সেদিকে চলে গেল।

সুযোগ বুঝে সাবধানে নেমে এলুম। জামা আর হাতের তালু ছিঁড়ে গেল। নেমেই চাপা গলায় ডাকলুম, মোহন! মোহন!

মোহনের সাড়া পাওয়া গেল একটু তফাতে গাছের ডগায়—এই যে আমি!

কাছে গিয়ে দেখি, একটা লম্বা গুঁড়িওয়ালা গাছের মগডালে প্রকাণ্ড হুতুমপ্যাঁচার মতো বসে আছে সে। বললুম, নেমে এস শিগগির! অল ক্লিয়ার!

মোহন করুণ স্বরে বলল, নামতে পারছি না। পা পিছলে যাচ্ছে। লাফ দাও বরং!

ওরে বাবা! হাড়গোড় ভেঙে যাবে যে!

ভাঙবে না। ঝটপট লাফ দাও। মাটিটা নরম।

মোহন বলল, একটা মই খুঁজে আনো জয়ন্ত!

মই! অবাক হয়ে বললুম। এই বনবাদাড়ে কোথায় পাব! চড়তে পেরেছ যখন, নামতেও পারবে।

পারছি কই? চেষ্টা তো করছি!

খাপ্পা হয়ে বললুম, তাহলে থাকো! আমি কর্নেলের খোঁজে চললুম।

মোহন কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, যেও না জয়ন্ত, যেও না! ওরে বাবা! আমার বড় ভয় হচ্ছে।

ওকে না ডানপিটে ভেবেছিলুম! এত ভীতু, তা তো বুঝতে পারিনি। তাছাড়া গ্রামের ছেলে। গাছে চড়ার অভ্যাস থাকা উচিত। তার চেয়ে বড় কথা, গাছে চড়াটাই কঠিন, নামা, তো খুব সোজা।

রাগ করে কয়েক পা এগিয়েছি, পেছনে সড়্ সড়্ সড়্ ধপাস্ করে একটা শব্দ শুনে বুঝলুম মরিয়া হয়ে বেচারা নেমে পড়েছে।

মোহন এসে সঙ্গ নিল। বলল, বাপ্স্! খুব শিক্ষা হল বটে! জীবনে এমন করে কখনও গাছে চড়িনি।

দু'জনে চারপাশে নজর রেখে হাঁটছিলুম। আর মাঝে মাঝে চাপা গলায় কর্নেলকে ডাকছিলুম। সাড়া নেই। তাহলে গাছে না চড়ে বুড়ো ঘুঘুমশাই পীরের বাড়িটায় গিয়ে ঢুকেছেন!

পীরের বাড়ির দরজা খোলা। ভাঙাচোরা অবস্থা। ভেতরে একটা উঠোন। খাপচা খাপচা জ্যোৎস্না পড়েছে। বারান্দায় উঠে দেখি, সেই ভুতো ঘরের ভেতর তেমনি চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে কাটা ঠ্যাংটা নড়ছে না। তার নাক সমানে ডাকছে। লণ্ঠনটা তেমনি জ্বলছে।

লাল ভেলভেটে জরির কাজ করা একটা প্রকাণ্ড চাদরে পীরের কবর ঢাকা। হঠাৎ দেখি, কাপড়টা নড়ছে একপাশে। ভীষণ নড়তে শুরু করলে আঁতকে উঠে এতক্ষণে টর্চ জ্বাললুম। মোহন অস্ফুট স্বরে 'ও কী' বলেই চুপ করেছে। ওর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে। আমারও। টর্চের আলোয় এই তাজ্জব কাণ্ড দেখলে মাথা ঠিক রাখা কঠিন। কবরটা কি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে? ভয়ে দম আটকে গেল।

তারপর ঢাকনাসুদ্ধ কবরের মাথার দিকটা মৃদু ঢঙ শব্দ করে বাক্সের ডালার মতো উঠে গেল। তারপর একটা টুপি পরা মাথা বেরুলো। তারপর যিনি বেরুলেন, তিনি আমার বহু বছরের গুরু ও বন্ধু মহাপ্রাজ্ঞ কর্নেলসায়েব! তবে তাঁর সাদা দাড়ি কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গের ময়লায় কালো হয়ে গেছে। তাঁকে যুবক দেখাচ্ছে। প্রথমে বললেন, আলো নেভাও ডার্লিং! চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। তারপর কবরের ঢাকনা আগের মতো ঠিকঠাক করে দিয়ে বললেন, বুলবন পেশোয়ারীর পঞ্চাশ কিলো সোনার বাঁট ঠিক জায়গাতেই আছে। আপাতত ওখানেই থাক। কাল নটবর সিং তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে বরং এর কিনারা করবেন।

আমরা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

কর্নেল বললেন, এখন সমস্যা হল ভুতোকে নিয়ে। ভুতো ঘুমের ভান করে পড়ে আছে কি না জানা দরকার। ওকে কাতুকুতু দাও তোমরা। দেরি কোরো না।

আমি আর মোহন কাছে যেতেই ভুতো তড়াক করে উঠে বসে হাঁউমাউ করে বলল, ওরে বাবা! কাতুকুতু দিলে আমি মরে যাব! দোহাই হুজুররা! ওই কাজটি করবেন না।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছ! ওকে লক্ষ করে এ রকমই সন্দেহ হয়েছিল। আমরা চলে গেলে ও কবরের গুপ্ত সুড়ঙ্গে ঢুকত আর সোনাটা হাতিয়ে কেটে পড়ত।

ভুতো নাক-কান মলে বলল, ছি ছি! সে কী কথা। সায়েব আমাকে সকালে দশ টাকা ভিক্ষে দিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন, বাবা ভূতো! আরও বখসিস পাবে, আমাদের সঙ্গে চলো!

ভুতো ভয় পাওয়া মুখে বলল, কোথায় যাব হুজুর? আমাকে তাহলে বাদশা-বেগমের পেটে পাঠিয়ে দেবে কাল্লু খাঁ!

কাল্লু খাঁ! মোহন চমকে উঠল। কাল্লু ডাকাত? এই পীরের থানের সেবককে বছর দশেক আগে সে খুন করে ফেরারি হয়েছিল না?

কর্নেল, কাল্লু খাঁয়ের কথা দাদুর কাছে শুনেছি। আগে নাকি সে সার্কাসের দলে খেলোয়াড় ছিল। বাঘের খেলা দেখাত। আশ্চর্য, ব্যাপারটা অনেক আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল।

কর্নেল বললেন, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, কাল্লু খাঁর পক্ষেই দুটো বাঘ পোষা সম্ভব। পীরের থানের সেবককে খুন করে সে এখানেই আস্তানা গেড়েছে এতকাল। বাঘ দু'টোর ভয় দেখিয়ে ভক্তদের থানে আসা বন্ধ করেছে সে। দারুণ এলেমদার লোক! একটা বিতর্কিত চরে নিরাপদে ঘাঁটি গেড়ে বাস করছে।

বললুম, কিন্তু এই কবরের ভেতর গুপ্ত ঘর বা সুড়ঙ্গের কথা সে টের পেল না কেন?

কর্নেল বললেন, টের পায়নি, তা তো বুঝতেই পারছি। আসলে সে এমনটা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু বুলবন পেশোয়ারী যেভাবেই হোক টের পেয়েছিল, কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে। সোনাটা সেখানে রেখে সে পালাচ্ছিল। বাদশা-বেগমের পাল্লায় পড়ে বেচারার প্রাণ যায়। মরার সময় সে শেষবার বলতে পেরেছিল—'পীরের তলায় সোনাটা.....।' তাই শুনে কাল্লু খাঁ ভেবেছে, পীরের চরের কোথাও পোঁতা আছে। পীরের কবর কথাটা মুখে আসেনি পেশোয়ারীর। যাক গে, এবার কেটে পড়া যাক্। ভুতো আমাদের সঙ্গে এস।

ভুতোর আপত্তি টিকল না। আমি আর মোহন তাকে টেনে নিয়ে চললুম। শাসালুম, চেঁচালে বন্দুকের গুলিতে মুণ্ডু উড়ে যাবে। ভয়ে সে চুপ করে থাকল।

পানসি নৌকোয় উঠে বসলুম আমরা। এখন রাত বারোটা পনেরো। নৌকো ছাড়ার সময় পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটোর প্রচণ্ড গর্জন শোনা যাচ্ছিল।

এক সময় আমরা পীরের চর ছাড়িয়ে পদ্মার স্রোতের উজানে পড়লুম। ভুতো আমার কষ্ট দেখে বলল, মেজ হুজুর! আমাকে দিন বরং। ঠ্যাং-ট্যাং কাটা গেলেও হাত দুটো তো আছে! আর বৈঠা আমি দু বেলা বাই।

ভুতো আর মোহন বৈঠা বাইতে থাকল। মনে হল, ভুতো লোকটা আসলে ভাল। পেটের দায়ে কাল্লু খাঁর দলে ইনফরমার হয়ে ঢুকেছিল। রান্নাবান্না কাজকর্মও করে দিত। ভুতো সারা পথ সে কথা বলতে থাকল। শেষে বলল, একখানা ছিপ নৌকো লুকোনো আছে হুজুর। পশ্চিমের জঙ্গলের নীচে খাড়ির মধ্যে আছে। পুলিসকে বলবেন, খুঁজে বের করবে। আর হুজুর, দেখবেন, আমার যেন জেল না হয়। তাহলে আমার বউ ছেলেমেয়েরা বড্ড কষ্টে পড়বে। বরং, আমাকে বড় হুজুর একটা চাকরি জুটিয়ে দেবেন। তাহলেই হল।

মহিমবাবুর চরের কাছাকাছি গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা কর্নেল, আপনি কীভাবে জানলেন কবরের তলায় গুপ্ত ঘর আছে?

কর্নেল বললেন, কাল্লু খাঁ বুলবনের মরার সময়কার কথাটা যখন বলল, তখনই সন্দেহ হয়েছিল। 'পীরের তলায় সোনাটা'—এর মানে কী হতে পারে? পীর যেখানে শুয়ে আছেন অর্থাৎ পীরের কবর, তার তলায়।

ধন্য আপনার বুদ্ধি! মোহন তারিফ করে বলল।

মহিমবাবুর চরে পৌঁছুতে রাত তিনটে বেজে গেল। যাবার সময় স্রোতের ভাটিতে গিয়েছিলুম। ফেরার সময় উজানে বলে এত বেশি সময় লাগল।

উদ্বেগে মাঝিরা ঘুমোতে পারেনি। আমাদের দেখে উঠে বসল। বলল, পীরের জঙ্গলে বাঘের ডাক শুনে আমরা খুব ভয় পেয়েছিলুম হুজুর। এখন ওই শুনুন! বন্দুকের আওয়াজও হচ্ছে। সবই ভূতপেরেতের কাণ্ড।

কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনছিলেন। বললেন, খুব গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে পীরের চরে। তাহলে কি কাশেম খাঁর সঙ্গে কাল্লু খাঁর লড়াই বেধে গেল?

আবছা গুলির শব্দ আর মাঝে বাঘের গর্জন ভেসে আসছিল পীরের চর থেকে। জ্যোৎস্নায় ওদিকটা ধূসর। পদ্মার বুকে ঘন কুয়াশা জমেছে। এক সময় কর্নেল বললেন, শুয়ে পড়া যাক। মোহন, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে যাবে। সাইকেল করে ঝটপট নটবর সিংয়ের ক্যাম্পে যাবে। আমার চিঠি নিয়ে যেও।

সকালে আবার আমরা পীরের চরে গেলুম। এবার বর্ডার বাহিনীর মোটর লঞ্চে চেপে। গিয়ে যা দেখলুম, গা শিউরে উঠল। এমন বীভৎস দৃশ্য কখনও দেখিনি।

কাল্লু খাঁ, জনার্দন, গদাই, রহিম বকশ মড়া হয়ে পড়ে আছে পুবের বালিয়াড়িতে। সারা গা গুলিতে ক্ষতবিক্ষত। পশ্চিমের জঙ্গলে বাঘ দুটো—বাদশা আর বেগমও তেমনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে আছে। কাশেম খাঁ কাকেও রেহাই দেয়নি। বেচারা ভুতো জোর বেঁচে গেছে!

কবরের ঢাকনা তুলে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সোনার বাঁট উদ্ধার করা হল। সোনাটা প্রাক্তন পাকিস্তান স্টেট ব্যাঙ্কের ঢাকা শাখার। কাজেই ওটা ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে ফিরিয়ে দেবেন।

মহিমবাবুর চরে আমরা আরও দিন দুই ছিলুম। কর্নেল 'বখাঁস', না আবিষ্কার করে কলকাতা ফিরবেন না। তাঁর বক্তব্য, এবার পদ্মার চরে সত্যি সত্যি বিরল প্রজাতির ওই পক্ষী দর্শনেই এসেছি। স্বপ্নেও ভাবিনি, পীরের চরে এত সব রহস্য আছে! দৈবাৎ গিয়ে পড়েছিলুম এবং সোনার কথা জানতে পারলুম কাল্লু খাঁর মুখে। তবে হ্যাঁ, নটবর সিংয়ের কাছে তো বটেই, সদাশিববাবুর কাছেও কাল্লু খাঁর গল্প শুনেছিলুম। সে সার্কাসে ছিল এক সময়, তাও শুনেছিলুম। তাই যখন পীরের জঙ্গলে জোড়া বাঘের গুজব শুনলুম, তখন মনে হল একটা যোগসূত্র থাকতেও পারে। সে-জন্যে পীরের জঙ্গলে উঁকি মারতে গিয়েছিলুম। আমি কিন্তু আজও এ-কথা বিশ্বাস করিনি। এই ধুরন্ধর বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবরের সব ব্যাপারই রহস্যময়। এমন তো হতে পারে, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে হারানো সোনার জন্য ভারত সরকার গোপনে তদন্ত করছিলেন এবং সুযোগ্য ঘুঘুমশাইটিকেই এ ব্যাপারে পদ্মার চরে যেতে অনুরোধ করেছিলেন!

আরও একটা কথা। খঞ্জ মানুষ ভুতোকে বেমক্কা দশ টাকা দান করাও কি কর্নেলের কুসংস্কার না কোনো গোপন অভিসন্ধি ছিল, বলা কঠিন।

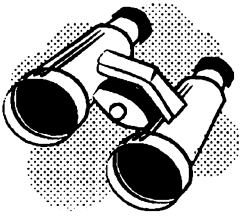

ভূতুড়ে এক কাকতাড়ুয়া

এমন যদি হয়, বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটি নিঝুম জ্যোৎস্নায় রাতে ক্ষীণ সুরে গান গাইতে গাইতে চলাফেরা করে বেড়ায়, তা হলে সত্যিই ব্যাপারটা বড্ড ভয়-ভূতুড়ে হয়ে ওঠে। কিন্তু তার গায়ের জামায় আর বেগুনপাতায় রক্তের ফোঁটা থাকলে সে-একটা সাঙ্ঘাতিক রহস্যই!

কাকতাড়ুয়াটি বানিয়েছিল ফান্টু, তুলারাম দণ্ডীমশাইয়ের ভাগনে। স্কুল ফাইনালে তিন-তিনবার ফেল করায় যাকে গঙ্গার পাড়ে মামার সাধের ফার্মে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পরে দেখা গেল, ফান্টুর মেধা খেত-খামারেই ভাল খুলেছে। খামোকা কাগজে ছাপানো কথাবার্তা মুখস্থ করে জীবন বরবাদ করে ফেলছিল। কাটরার মাঠে দণ্ডীমশাইয়ের পনেরো একর খেতে মরসুমি ফসল আর ফুল-ফলের ফলন দেখার মতো! এক টুকরো নার্সারির লাবণ্য তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। গত শীতে কালীগঞ্জে কৃষি-প্রদর্শনী মেলায় তিন কিলো ওজনের বেগুন সরকারি মেডেল পাইয়ে দিল, এও একটা বড় ঘটনা।

তবে সবই নাকি ঈশান কোণে পোঁতা কাকতাড়ুয়াটির জোরে, এটা ফান্টুর নিজের মত। গঙ্গার ধারে ওই যে পুরনো শিবমন্দির আর বটের গাছ, সেখানে কখনও-না-কখনও সাধু-সন্নেসি এসে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকেন। তাঁদেরই একজনকে তুষ্ট করে পরামর্শটি পায় সে। পৃথিবীতে সবকিছু নাকি জোড়ায়-জোড়ায় সিধে আর উল্টো থাকার নিয়ম। যেমন, দিন আর রাত, মাটি আর জল, গরম আর ঠান্ডা, মামা আর মামি—ফান্টুর দেওয়া নমুনা। মামা যেমন কুচুটে বদরাগী, মামি তেমনি শান্ত, মিঠে, নরম। তো লক্ষ্মীর উলটো অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মীর দৃষ্টি সবসময় কু। বিশেষ করে বেগুনখেতের দিকে তার নজর বেশি। পোকায় পোকায় বেগুন জেরবার। শেষে যেই কাকতাড়ুয়াটি তৈরি করে ঈশাণ কোনায় পোঁতা হল, একজিবিশনে মেডেল! আর কী প্রমাণ চাই?

কাকতাড়ুয়া বানানো খুব সোজা। পলকা দু'টুকরো বাঁশ আড়াআড়ি বেঁধে ক্রুশ তৈরি করো। তাতে খড় জড়িয়ে কষে বাঁধো। দু'ধারে দু'হাত বাড়ানো একঠেঙে মানুষটির আকার হল। এবার একটা ছেঁড়াখোঁড়া পাঞ্জাবি পরিয়ে দাও। মাথায় বসিয়ে দাও, একটা কেলে মাটির হাঁড়ি। চুন দিয়ে ওতে চোখ-মুখ এঁকে দাও, দাঁতশুদ্ধু। দেখবে কী বিকট চেহারা হল! অলক্ষ্মী অবশ্য শুধু এতেই ভয় পাবার নয়, সেই সন্নেসি কাকতাড়ুয়াটির মাথায় মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিলেন, যেটা ফান্টুর মুখস্থ হয়ে গেছে: 'ঔং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!'

হুঁ, পাঞ্জাবিটি মামার। মামির কাছে গোপনে চেয়ে আনা। মামা হাড়কেপ্পন, হিসেবি মানুষ। তবে একটাই সুবিধে, বড্ড ভুলো মন। পাঞ্জাবিটি চিনতে দেরি হয়েছিল এবং তখন একজিবিশনে মেডেল জুটেছে। ফান্টু একগাল হাসি আর আশীর্বাদই পেল। তারপর থেকে মামার মন ফার্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সন্ধেটি হলেই গঙ্গা পেরিয়ে কাটরার মাঠে ছোট্ট একতলা ফার্মহাউসে রাত কাটান। খুব 'নেচার, নেচার' করেন। বলেন, "নেচারেই শান্তি আছে রে বাবা! সাধুসন্নেসিরা সেটা জানেন বলেই তো নেচারের ভেতর ঘুরে বেড়ান।" ফাল্গুনের জ্যোৎস্নারাতে ঘুম ভেঙে মামাকে খোলা বারান্দায় হেঁড়ে গলায় গান গাইতেও শুনেছিল ফান্টু।

কিন্তু এ-গান সে-গান নয়। নিশুতি রাতে চলন্ত কাকতাড়ুয়ার খোলা সুরের ভয়-জাগানো গান। মামা-ভাগনে দু'জনেই আতঙ্কে কাঠ। ফার্মহাউসে বিদ্যুৎ আছে। ঘটনার সময় রহস্যময় লোডশেডিং। টর্চের আলো ফেলতেই কাকতাড়ুয়াটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। গানও গেল থেমে।

ফার্মে আরও দুজন লোক আছে। মুকুন্দ আর রমজান। মুকুন্দ পাওয়ার টিলার চালায়। রমজান কীটনাশক ওষুধ ছড়ায়। দণ্ডীমশাইয়ের সন্দেহ, দু'জনেই গাঁজাখোর। ওঠানো গেল না। সকালে দেখা গেল, কাকতাড়ুয়াটি নিজের জায়গা ছেড়ে অন্তত হাত-তিরিশেক এগিয়ে বেগুনখেতের মাঝামাঝি পোঁতা আছে। বেগুনের গাছে যথেচ্ছ কাঁটা। ফান্টু সাবধানে কাকতাড়ুয়াটিকে আগের জায়গায় পুঁতে রেখে এল।

পরের রাতে আবার একই ঘটনা।

বদরাগী দণ্ডীমশাই এ-রাতে বন্দুকে গুলি ভরে তৈরিই ছিলেন। ধুধু জ্যোৎস্নায় কাকতাড়ুয়াটি জ্যান্ত হয়ে ঠ্যাঙ বাড়িয়ে ধোঁনা সুর ভাঁজছে কি, বন্দুক চিক্কুর ছাড়ল। ফট্টাস শব্দ এবং কাকতাড়ুয়া বেগুনখেতের ভেতর কুপোকাত!

কিন্তু না, তখনও রক্তের ফোঁটা দেখা যায়নি। ভোরে ফান্টু গেল অবস্থা দেখতে। মামা তখনও জয়ের আনন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ফট্টাস শব্দটি ছিল কাকতাড়ুয়া বেচারার মুণ্ডুর, মানে—সেই কেলে হাঁড়িটি গুলি লেগে চৌচির হওয়ার। মন্ত্রপড়া মুণ্ডুর দশা দেখে ফান্টুর মন খারাপ হয়ে গেল। কবন্ধ কাকতাড়ুয়াকে পুঁতে রাখল অগত্যা।

সেদিনই দ্বিতীয় রহস্যের সূত্রপাত।

তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের সম্পর্ক আছে। কালীগঞ্জের বাজারে পশুখাদ্য খোল-ভুসির বড় আড়ত তাঁর। দুপুরে ঔরঙ্গবাদ থেকে এক ট্রাক টাটকা গমের ভুসি এসেছিল। বাঁধা খদ্দেররা ধরলে টাটকা ভুসি বেচতে হয়। একটা বস্তার ভেতর থেকে বেড়িয়ে পড়ল একটা মড়ার খুলি। হইচই পড়ে গেল চারদিকে। এ কী বিদঘুটে ব্যাপার!

সাপ্লায়ার দণ্ডীমশাইয়ের মাসতুতো ভাই চণ্ডীচরণ। খবর গেল তাঁর কাছে। খুলিটি ওজনদার, প্রায় ন'শো গ্রাম। সেই নশো গ্রাম ভুসি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি এল চণ্ডীচরণের কাছ থেকে। চিঠির বক্তব্য হল, সম্ভবত যে-গমখেতের গম থেকে এই ভুসির উৎপত্তি, তার শিয়রে একটি কাকতাড়ুয়া ছিল এবং খুলিটি সেটির মাথায় বসানো ছিল। কোনও আমুদে চাষির রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। দাদা যেন ক্ষমাঘেন্না করে দেন এবারকার মতো। এবার থেকে সব মাল বিশদ খতিয়ে না দেখে পাঠানো হবে না।

দণ্ডীমশাই বিশেষ তুষ্ট হলেন। বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটির মাথা তিনি গত রাতে ফাটিয়েছেন। ফান্টু কেলে হাঁড়ির খোঁজে সারাদিন হন্যে হচ্ছে, খবর পেয়েছেন। আজকাল আর মাটির হাঁড়িতে রান্নার চল নেই। দৈবাৎ একটা পেয়ে গিয়েছিল সেই সন্নেসির দয়ায়, যিনি মৃৎপাত্রে রান্না করা ছাড়া অন্ন অশুচি গণ্য করতেন।

সন্ধে হতে-না-হতে গঙ্গা পেরিয়ে দণ্ডীমশাই কাটরার মাঠে তাঁর ফার্মে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন মড়ার খুলিটি। একগাল হেসে বললেন, "ফান্টু, এই দ্যাখ, কী এনেছি তোর জন্যে।"

ফান্টু আঁতকে উঠে বলল, "ওরে বাবা! এ আমি কী করব মামা?"

"ধুর বোকা!" দণ্ডীমশাই বললেন। "দেখিসনি কাকতাড়ুয়ার মাথায় মড়ার খুলিও থাকে। নে, ব্যাটাচ্ছেলেকে পরিয়ে দে। ন্যাড়া লাগছে বড্ড। আর শোন, সাধুবাবার কাছে কী মন্ত্র শিখেছিলি, ফুঁকে দিতে ভুলিসনে যেন।"

ফান্টু খুলিটা কাকতাড়ুয়ার ঘাড়ে আটকে দিয়ে মন্ত্রটা পড়ল, "ঔং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!"

তারপর মামার কাছে ফিরে বলল, "ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না মামা। যদি—"

দণ্ডীমশাই চোখ কটমট করে বললেন, "কী যদি? যদি-টদি কিছু নয়। ত্যাঁদড়ামি করলেই গুলি খাবে।"

রমজান বলল, "বাবুমশাই, মনে হচ্ছে, এ-ব্যাটা একটু বেশি ত্যাঁদড়ামিই করবে।"

"কেন, কেন?"

"যার খুলি, সে শুদ্ধু এসে যোগ দেবে। ছিল এক, হবে দুই।"

দণ্ডীমশাই বাঁকা হেসে বললেন, "আমার বন্দুকও দোনলা। একসঙ্গে দুটো ঘোড়াই টিপে দেব।"

মুকুন্দ কিছু না বুঝেই বলল, "খুব জমে যাবে মনে হচ্ছে। খুলিতে গুলিতে জমজমাট।"

দণ্ডীমশাই ভেংচি কেটে বললেন, "যাই হোক, তোমাকে তো আর ডেকেও পাওয়া যাবে না।"

মুকুন্দ জিভ কেটে বলল, "কী যে বলেন স্যার! কিছু বাধলে ডেকেই দেখবেন, কী করি!"

কী করে, যথারীতি দেখা গেল সে-রাতে। গাঁজা খাক নাই খাক, দুই বন্ধুর ঘুমটাও বড্ড বেশি। ফান্টু চুপি চুপি ডাকতে গিয়ে ফিরে এল। পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্না ফেটে পড়ছে কাটরার মাঠে। কাকতাড়ুয়াটি, রমজানের হিসেব অনুসারে, দুনো জ্যান্ত হয়েছে। খোঁনাসুরে কী গাইছে, কথাগুলো বোঝা যায় না, হাওয়ার তোলপাড় খুব। বন্দুকের নল জানালার বাইরে, ট্রিগারে আঙুল, হ্যামার দুটোই ওঠানো, দণ্ডীমশাই তৈরি। শুধু একটু কৌতূহল জেগেছে, শেষ পর্যন্ত কী করে কাকতাড়ুয়া হতচ্ছাড়া, তাই দেখবেন।

তেমন কিচ্ছুটি করছিল না। শুধু গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজা আর দু'ধারে চিতানো লম্বা হাতদুটো সমেত একবার এদিকে, একবার ওদিকে ঘোরা, ট্যাঙস ট্যাঙস করে এ কোনা থেকে ও কোনো পায়চারি। গত রাতে গুলি খেয়েই যেন রেগে আছে, এমন বেপরোয়া ভঙ্গি। শেষে ঘরটার দিকে মুখ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। অমনি খাপ্পা দণ্ডীমশাই একসঙ্গে দুটো ট্রিগারই টেনে দিলেন।

ফলে উলটো ধাক্কাটা যথেষ্ট দিল বন্দুকের কুঁদোটা এবং পড়ে গেলেন দণ্ডীমশাই। পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আলো! আলো!"

হুঁ, এ রাতেও বিদ্যুৎ অদ্ভুতভাবে বন্ধ! সাড়ে-বারোটা বাজে। টর্চের আলো ফেলে কাকতাড়ুয়াটিকে বেগুনখেতের ভেতর কাত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মামা-ভাগনে সাহস করে বেরোতে পারলেন না। আগের দুটো রাতের মতোই। তারপর বিদ্যুৎ এল আধঘন্টা পরে—এও আগের দু'রাতের মতোই।

ভোরে কাকতাড়ুয়া পাঞ্জাবিতে একটু রক্তের ছোপ, তারপর বেগুনগাছের পাতায় খুঁজতে খুঁজতে আরও পাওয়া গেল। শেষ দিকটায় ঝোপঝাড় ও কাঁটাতারের বেড়া পর্যন্ত রক্তের দাগ রেখে গেছে কেউ। বেড়ার সঙ্গে বুনো লতার ঝালর থাকায় আগে ধরা পড়েনি। এদিন ঝালর সরাতেই বেরিয়ে পড়ল কাঁটাতারের খানিকটা অংশ কাটা। একটা বড় ফোকর। গুলিখোরটি যেই হোক, ভূত কি মানুষ, ওই পথেই পালিয়েছে।

ফান্টু চ্যাঁচাতে থাকল "মামা, মামা, মামা!"

দুই

"এই আপনার তেরো নম্বর কেস?"

"হঃ আনলাকি থারটিন।" গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার ওরফে কে কে হালদার ওরফে আমাদের হালদারমশাই নাকে নস্যি গুঁজে নাকি-স্বরে বললেন। মুখে তেতো ভাব, অনিশ্চয়তার।

কিছুদিন থেকে আমার ফ্রেন্ড-ফিলজফার গাইড কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর ছাদের বাগানে নিপাত্তা হয়ে আছেন। এদিকে পৃথিবীতে কত রহস্যময় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে! কাগজে ছাপা হচ্ছে তার খবর। কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতে ভূতুড়ে কাকতাড়ুয়ার খবর আমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতার পাঠানো। তবে বিশদ কিছু ছিল না। কাটরার মাঠে জনৈক

তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়াটি নাকি রাতবিরেতে জ্যান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এটুকুই ছাপা হয়েছিল। কর্নেলের আশা ছেড়ে অগত্যা গিয়েছিলুম হালদারমশাইয়ের আপিসে। গণেশ অ্যাভিনিউতে একটা চারতলা বাড়ির চিলেকোঠায় তাঁর 'হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি'। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড রাস্তা থেকে দেখা যায়।

ঘরে ঢুকে দেখি, সামনে নোটবই আর নস্যির খোলা কৌটো, আঙুলের টিপে নস্যি, গোঁফ বেয়ে সেই নস্যি ঝরছে, অর্থাৎ সিরিয়াস কেস হাতে পেয়েছেন! মুখও গুরুগম্ভীর। নোটবইয়ের পাতায় কোনও কোনও শব্দ লাল রঙের খোপে ঢোকাচ্ছেন। উলটো দিক থেকে তিনটে শব্দ বন্দী দেখতে পেলুম, 'তুলা', 'দণ্ড', 'মুণ্ড'।

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, "তুলারাম দণ্ডীর ব্যাপারটা নয় তো?"

এবার মুখ তুলে ফিক করে হাসলেন হালদারমশাই। "হঃ!" বলে বিচিত্তির রুমালে, ন্যাতা বলাই উচিত, নাক ও গোঁফ মুছলেন। রীতিমত আপিস যখন, তখন একজন বেয়ারাও বহাল আছে। তার নাম রামধারী। হালদারমশাই পুলিশে চাকরি করতেন। রামধারীও করত। পেল্লায় চেহারা। কেটলি নিয়ে চা আনতে বেরোল কর্তার ইশারায়।

তারপর হালদারমশাই সবিস্তারে রহস্যের জালটি আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন, নিজের ভাষায় যেটি আগেই মোটামুটি বর্ণনা করেছি। দিয়ে বললেন, "মিনিট দশেক আগে দণ্ডীমশাই গেলেন। রাত জেগে ট্রেনে এসেছিলেন। সাড়ে ন'টার বাস ধরে ফিরে যাবেন। কারবারি মানুষ। কিন্তু—"

"কিন্তুটা কী?"

"ওই যে কইছিলাম, আনলাকি থারটিন।" একটু গুম হয়ে থাকার পর ফের বললেন, "আপনে কী কন?" হালদারমশাই সমস্যাগ্রস্ত, সেটা বোঝাতে মাঝে মাঝে পূর্ববঙ্গীয় মাতৃভাষায় কথা বলে ফেলেন।

"কেস তো নিয়েছেন!"

"নিয়েছি। কথাও দিয়েছি।"

"তা হলে আর কথা কী? চলুন, আমিও সঙ্গ দেব।"

হালদারমশাইকে একটু উত্তেজিত দেখাল। চাপা স্বরে এবং ভুরু নাচিয়ে বললেন "কর্নেল স্যার কী বলেন শুনে আসি চলুন! কেসটা শুনে যদি কোনও ক্লু দেন, মন্দ হবে না। ওল্ড ম্যানরা এমনিতেই ওয়াইজ, তার ওপর কর্নেল স্যারের মতো ওয়াইজ ম্যান কে কোথায় দেখেছে?"

"কর্নেল তাঁর শূন্যোদ্যানে ঢুকে গেছেন। গাছ হয়ে গেছেন। নড়াচড়া চোখে পড়বে। তবে বোবা।"

হালদারমশাই খিখি করে হাসতে লাগলেন। "না, না, এই কেসে রক্ত টক্ত আছে, বুঝলেন না? স্রেফ ভুতুড়ে ব্যাপার হলে কথা ছিল! কর্নেল স্যার হলেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। রক্তের গন্ধ পেলেই ঝাঁপিয়ে আসবেন।"

চা খাওয়ার পর হালদারমশাইয়ের টানাটানিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদের ডেরায় আবার গেলাম। শূন্যোদ্যান থেকে নেমে ব্রেকফাস্ট করে সবে চুরুট ধরিয়েছেন। আমাদের দেখে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, "বসার আগে দুজনেই একবার ছাদে গিয়ে দেখে আসুন ষষ্ঠী কী করছে। না, না ডার্লিং, হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তুমিও যাও। দেখে এসো। এতদিন যে কেন আইডিয়াটা আমার মাথায় আসেনি, আশ্চর্য!"

হালদারমশাই ততক্ষণে ছাদে পৌঁছে গেছেন। আমি সোফায় বসে পড়লাম। ষষ্ঠী কী করছে দেখার মুড নেই। কর্নেল তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে আপনমনে বললেন, "এতদিন ধরে অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছি। অথচ মাথায় এই সামান্য ব্যাপারটা আসেনি। এবার ব্যাটাচ্ছেলেরা দেখবে কি, তল্লাট ছেড়ে পালাবে!" বলে স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাস্য করতে থাকলেন।

অট্টহাসি থামলে বললুম, "কাক?"

"ঠিক ধরেছ, ডার্লিং!"

"ষষ্ঠী কাকতাড়ুয়া তৈরি করছে বুঝি?"

"হুঁউ। তুমি বুদ্ধিমান।"

"কাগজে কালীগঞ্জের কাকতাড়ুয়ার খবর পড়েছেন বুঝি?"

কর্নেল নড়ে বসলেন। "আমাকে সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে, জয়ন্ত। কাকতাড়ুয়া জিনিসটা যে এত কাজের, কতবার কত জায়গায় দেখেছি। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসেনি। আসলে কলকাতা বহু জরুরি জিনিস ভুলিয়ে দেয়। হরিয়ানায় আমার এক বন্ধু কর্নেল কেশরী সিংয়ের ফার্মে একটিমাত্র কাকতাড়ুয়া বহু একর জমির গম রক্ষা করেছিল—না, কাকের মুখ থেকে নয়, হরিণের মুখ থেকে। জিনিসটাকে আমরা বাংলায় কাকতাড়ুয়া বলি বটে, কিন্তু ওটা সমস্ত প্রাণীকে ভয় পাইয়ে দেয়। মানুষকে, ডার্লিং, মানুষকেও। বিশেষ করে রাতবিরেতে তো বটেই!"

হাসি চেপে বললুম, "ভয় পেয়ে গুলিও চালায় অনেক মানুষ!"

"স্বাভাবিক। খুবই স্বাভাবিক।" বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ সায় দিলেন। "জ্যোৎস্নারাতে বাতাস দিলে কাকতাড়ুয়াকে জ্যান্ত মনে হয়। কাজেই চমকে উঠে গুলি চালানো অসম্ভব কিছু নয়, হাতে ফায়ার আর্মস্ যদি থাকে।"

"তারপর যদি সকালে কাকতাড়ুয়ার গায়ে..."

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, "রক্তের দাগ থাকলে তাতে কিছু প্রমাণ হয় না জয়ন্ত।"

জোর গলায় বললুম, "প্রমাণ হয় না? কী বলছেন আপনি!"

"রক্তের দাগ বলে যেটা ভাবা হচ্ছে, সেটা রক্তেরই দাগ কি না যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছ, ততক্ষণ কিছু প্রমাণ হয় না।"

"কালীগঞ্জের তুলারাম দণ্ডীর বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়ার জামায় আর বেগুনগাছের পাতায় রক্তের দাগ পাওয়া গেছে।"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তারপর মিটিমিটি হাসলেন। "হালদারমশাই সম্প্রতি যে হারে কাগজে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, এই কেস তাঁর হাতে আসা স্বাভাবিক। যাই হোক, তুমি আবার এসেছ এবং হালদারমশাই তোমার সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে, তুমি এতে খুব আগ্রহী।"

"নিশ্চয়। কাগজের রিপোর্টাররা আজকাল অন্তর্তদন্ত লেখে। আমিই বা সুযোগ ছাড়ি কেন?"

কর্নেল হঠাৎ কেন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "হালদারমশাই সম্ভবত কাকতাড়ুয়াটির গঠনকৌশল লক্ষ করছেন মন দিয়ে। উনি গ্রামাঞ্চলে পুলিশের দারোগা ছিলেন। ষষ্ঠী বর্ধমানের গ্রামের লোক। সে কাকতাড়ুয়া বোঝে। আসলে হালদারমশাইয়ের বরাবর দেখে আসছি বুদ্ধিসুদ্ধি উৎসাহ, সাহস, অভিজ্ঞতা সবকিছুই প্রচুর আছে। শুধু একটু অনুসন্ধিৎসা আর একটু পর্যবেক্ষণ এই দুটো জিনিসের ঘাটতি আছে।" চোখ খুলে আমার চোখে চোখ রেখে বললেন হঠাৎ, "আমি বলি কি, তুমি কালীগঞ্জে যেও না।"

"কেন বলুন তো?"

"তুমি যে ছদ্মবেশ ধরতে একেবারে আনাড়ি।" গম্ভীর মুখেই কর্নেল বললেন। "আশা করি, লোহাগড়ার ঘটনাটা ভুলে যাওনি। তোমার গোঁফ খুলে পড়ে গিয়ে কী কেলেঙ্কারি ঘটেছিল!"

ঝটপট বললুম, "কালীগঞ্জে ছদ্মবেশ ধরার দরকারটা কী!"

"দরকার হবে, যদি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ঘুরতে চাও।" বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ওপর একটা সুইচ গোছের কিছু টিপে দিলেন।

অমনি খড়খড়-খসখস বিবিধপ্রকার শব্দ শোনা গেল। তারপর কাকের চ্যাঁচামেচি। সেইসঙ্গে এইসব কথাবার্তা: "হ্যাঁ হ্যাঁ....ব্যস... হয়েছে....খাসা! এবার মন্তরটা পড়ে দিই মাথায়। ওং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়ায় তাড়য় স্বাহা!"

হালদারমশাইয়ের গলা। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, "ছাদের বাগানে কী ঘটছে, ঘরে বসে খোঁজখবর নেবার জন্য এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা করেছি, জয়ন্ত! মন্ত্রতন্ত্র পাঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে, হালদারমশাই ছদ্মবেশ ধরেই কালীগঞ্জে যাবেন—অবশ্যই সাধুবাবা সেজে। যাবার সময় চিৎপুর হয়েই যাবেন, ওখানে যাত্রা থিয়েটারের ড্রেস-সাপ্লায়ার প্রচুর। কাজেই ভেবে দ্যাখো, কী করবে!"

ষষ্ঠীচরণ ভক্তিমাখা মুখে ছাদ থেকে নেমে এসে ঘোষণা করল, "বাবামশাই কাজ পাক্কা।"

কর্নেল শুধু বললেন, "কফি।" ষষ্ঠী গুম হয়ে চলে গেল ভেতরে। একটা প্রশংসা আশা করেছিল বেচারা!

হালদারমশাই যথারীতি ষষ্ঠীকে মনে করিয়ে দিলেন "দুধটা একটু বেশি করে, ভাইটি!" তারপর এসে সোফায় বসলেন। হ্যান্ডব্যাগ থেকে নোটটা বের করে একটু হেসে বললেন, "কর্নেল স্যারকে, বুঝলেন জয়ন্তবাবু এই জন্যেই অন্তর্যামী বলি। ওপরে গিয়ে তো চক্ষু ছানাবড়া। বড়ই আশ্চর্য। ভাবা যায় না!"

কর্নেল বললেন, "হালদারমশাই কি সন্নেসি সেজে কালীগঞ্জে যাচ্ছেন?" "অ্যাঁ!" হালদারমশাই অবাক হয়ে আমার দিকে ঘুরে ফিক করে হেসে বললেন, "হঃ বুঝছি। জয়ন্তবাবু সব কইয়া দিছেন স্যাররে।"

বললুম, "পুরোটা বলিনি। আপনি বলুন। দেখুন কী ক্লু পান!"

হালদারমশাই সোফার কোনায় পিছলে গেলেন, কর্নেলের ইজিচেয়ারের পাশে। তারপর চাপা স্বরে মন্ত্রপাঠের মতো নোট-বই থেকে রহস্যজনক ঘটনাটির বিবরণ দিতে থাকলেন। ইতিমধ্যে ষষ্ঠী কফির ট্রে রেখে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই দ্বিগুণ উদ্যমে বাকি বৃত্তান্ত শেষ করে বললেন, "আমি যে প্ল্যান ছকেছি, আগে বলে দিই কর্নেল স্যার।"

কর্নেল বললেন, "সাধুবাবা সেজে গঙ্গার ধারে মন্দিরতলায় ধুনি জ্বেলে বসবেন তো?"

জবাবে হালদারমশাই 'খিখি-খিখি' করলেন। অর্থাৎ সেটাই ইচ্ছে।

"জয়ন্তবাবুকে তা হলে চেলা সাজতে হবে।"

আপত্তি করে বললুম, "মোটেও না। আমি ফার্মে কৃষি-সংবাদদাতা হয়ে থাকব। দৈনিক 'সত্যসেবকে' কৃষির একটি পাতা বেরোয় ফি সপ্তায়।"

"সাধু সাজার সুবিধে এ-ক্ষেত্রে আছে।" কর্নেল বললেন। "সাধুসন্নেসিরা গাঁজা খেয়ে ধ্যানে বসেন। তাই এলাকার গাঁজাখোরদের চেলা হিসেবে পাওয়ার আশা আছে। বিশেষ করে রমজান আর মুকুন্দকে সবার আগে পাওয়ার কথা। হালদারমশাই তাদের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেতেও পারেন।"

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে নোট করে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ এটা একটা বড় পয়েন্ট।"

"আবার নাও পেতে পারেন!"

"সে কী!" বলে হালদারমশাই নোটবইতে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেগে দিলেন।

"যদি তারাও চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত থাকে—"

"কীসের চক্রান্ত, কর্নেলস্যার?" হালদারমশাই করুণ মুখে প্রশ্নটা করলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ভূত হোক বা মানুষ হোক, কেউ বা কারা চায় না তুলারাম দণ্ডী ফার্মে রাত্রিবাস করেন—শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে আপাতত। জয়ন্ত, যাচ্ছ, যাও। কিন্তু সাবধান!"

জেদ ধরে বললুম, "যাচ্ছি।"

"কাকতাড়ুয়াটি বিপজ্জনক, ডার্লিং! তবে আরও বিপজ্জনক জিনিস তুলাদণ্ড।"

হালদারমশাই নোটবইতে 'তুলাদণ্ড' লালকালিতে বন্দী করে আমার পক্ষ হয়ে বললেন, "বুঝাইয়া কন!"

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "তুলারাম দণ্ডীর সঙ্গে তুলাদণ্ডের যোগ আছে। কারণ খোলভুসি ওজন করে বেচতে হয়। দণ্ডী পদবির কী ব্যাখ্যা উনি দেন জানি না। তবে দণ্ডী বলতে প্রাচীন যুগে রাজবাড়ির দারোয়ান বোঝাত। কালীগঞ্জে গুপ্তযুগের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে শুনেছি।"

হালদারমশাই শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, "গুপ্তধন! গুপ্তধন!"

"সমস্যা হল," কর্নেল বলতে থাকলেন, "বরাবর দেখে আসছি, 'গু' এই যুক্তবর্ণটি সর্বত্র গণ্ডগোলের প্রতীক। হুঁ, গণ্ডগোলেও 'গু' লক্ষ করুন। তারপর দেখুন, দণ্ড, মুণ্ড, ভাণ্ড, পিণ্ড, চণ্ড, ষণ্ড, লণ্ডভণ্ড.....। যাই হোক, এবার কাকতাড়ুয়া কথা ভাবুন। দণ্ডের ওপর মুণ্ডু দেখতে পাচ্ছেন। দণ্ডমুণ্ড সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! তা ছাড়া দণ্ডমশাইয়ের বেগুন খেতে মুণ্ডটি আস্ত মড়ার খুলি!"

গোয়েন্দামশাই খসখস করে নোট করছিলেন। বললেন, "একটা কথা জিগানো বাকি, কর্নেল স্যার। কাটরার মাঠ। কাটরাটা কী কন তো?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "সেখানে গিয়েই জানা যাবে!"

হালদারমশাই আমাকে পাত্তা দিলেন না। বললেন, "দণ্ডীবাবু বলছিলেন, সেখানে নাকি মোগল-পাঠানে খুব কাটাকাটি হয়েছিও। তাই কাটরা। আপনি কী কন?"

কর্নেল ফের একটা অট্টহাসি হাসলেন। "হয়েছিল। তবে কাটরা কথাটা আসলে কাঠরা। মানে, রবিশস্য। কোথাও-কোথাও কাঠখন্দও বলা হয় রবিশস্যকে।" বলে আমার দিকে তাকালেন। "কাঠরা বলতে কাঠগড়াও বোঝায়, জয়ন্ত। না, না, কাঠগড়ার ভয় তোমার কীসের? শুধু একটা ব্যাপার সাবধান করে দিই। কাটরার শ্মশানে নাকি পিশাচ আছে।"

শুনে একটু ভড়কে গেলুম নিশ্চয়। 'পিশাচ' শব্দটা লিখে হালদারমশাই নোটবই বুজিয়ে তাড়া দিলেন। "উঠে পড়া যাক, জয়ন্তবাবু। বারোটা পাঁচে ট্রেন।" বলে সহাস্যে কর্নেলকে ধন্যবাদ দিলেন। "অনেক ক্লু দিয়েছেন। থ্যাংকস, থাউজ্যান্ড থ্যাংকস কর্নেল স্যার!"

তিন

গুরুজনের চোখে ছেলেপুলের বয়স বাড়ে না। ফলে দণ্ডীবাবুর বর্ণনা অনুসারে তৈরি হালদারমশাইয়ের নোটবুকের বৃত্তান্ত থেকে ফান্টুর যে মূর্তি বানিয়েছিলুম, মিলল না। বরং ওকে দেখলেই কেন যে হাসি পায়! বেঢপ গড়ন বলেই হয়তো কার্টুনচিত্র মনে হয়। গোলগাল, বেঁটে, মুখটি প্রকাণ্ড—তবে এক্ষেত্রে 'গু' বর্ণ বিপজ্জনক কদাচ নয়। বড় বড় দাঁত, খোলা হাসি সবসময় মুখে টাঙানো। নিরীহ গোবেচারা বলাই উচিত। পরনে কালো রঙের শর্টস আর নীলচে স্পোর্টস্ গেঞ্জি। পায়ে গামবুট। ধুলো কাদায় নোংরা। মাথায় আঁটো-সাঁটো টুপি দিনশেষেও আঁটা দেখে দণ্ডীবাবু ধমক দিলেন, "রোদ্দুর আছে? আবার আমাকে বলা হয় ভুলো মন! যা, ওই নোংরা মেঠো পেন্টুল-ফেন্টুল খুলে আয়।"

ফান্টু আমাকে বোঝাচ্ছিল, কী কৃৎকৌশলে উদ্ভিদের কাছে অনেক বেশি আদায় করা যায় এবং সে সত্যিই কৃষিবিজ্ঞানীর কান কাটতে পারে। মামার কথায় জিভ কেটে বিব্রতভাবে পাম্প ঘরের সামনে চৌবাচ্চাটির দিকে গেল। পনেরো একর ফার্মের চারদিকে ঝোপঝাড়, কিছু গাছের জটলা। পুবে পোড়ো শিবমন্দির আর বট, দ্রুত আবছা হয়ে আসছে। হু হু করে বাতাস দিচ্ছে। বেগুনখেতের এক কোণে, খানিকটা দূরে কাকতাড়ুয়াটি কালো হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে আর দুলছে। গা ছমছম

করছিল। ফার্ম-ঘরের খোলামেলা বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দণ্ডীবাবু তেরাত্তিরের রহস্যময় ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। নতুন কোনও কথা শুনলুম না। হালদারমশাই গঙ্গার ওপারে কালীগঞ্জে দণ্ডীবাবুর বাড়িতে আছেন। নিশুতি রাত্তিরে তাঁর অভিযান শুরু হবে। প্ল্যানমাফিক আমি কলকাতার কাগজের কৃষি বিষয়ক রিপোর্টার। রমজান আর মুকুন্দ কলকাতার কাগজে তাদের ছবি ছাপা হবে শুনে আমাকে খাতিরের চূড়ান্ত করছিল। শেষে মুকুন্দ গঙ্গা পেরিয়ে আমার সরেস রকম সৎকারের জন্য মাছ-মাংস-রসগোল্লা-দই আনতে গেল বাজার থেকে। রমজান চায়ের সঙ্গে দাগড়া-দাগড়া বেগুনী আর 'পটাটো-চিপস' আনাল। গর্বে হেসে বলল, "সবই আমাদের এই মাটির উৎপন্ন স্যার। এই বেগুন বলুন, বেগুন। আলু বলুন, আলু!"

দণ্ডীবাবু কৌতুকে বললেন, "বল্ না চায়ের পাতাও ফলিয়েছিস! কাগজে তাও ছাপা হবে!"

কর্তাবাবুর কথায় রমজান দমল না। বলল, "সেও আমাদের ভাগনেবাবুর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়, বাবুমশাই। দেখবেন, কবে চায়ের বাগান করে বসে আছে। লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি—সবই ফলাতে পেরেছে, চা এমন কী জিনিস?"

দণ্ডীবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "আলো জ্বেলে দে! খালি বড় বড় কথা আর রাতটি এলেই ঘুমিয়ে পড়া!"

রমজান সুইচ টিপে দরজার ওপরে কার্নিশের নিচের বালব্‌টি জ্বেলে দিল। আমার উদ্দেশে বলল, "কিছু দরকার হলেই ডাকবেন, স্যার! আমি ধাঁ করে একচক্কর মাঠে ঘুরে আসি। গম পেকেছে। সন্ধ্যার দিকেই গম-চোরদের উৎপাত হয়।" সে চলে গেলে দণ্ডীবাবু বললেন, "আমার এই লোক দুটো রমজান আর মুকুন্দ, খুব বিশ্বাসী। অনেস্ট। শুধু একটাই দোষ। রাত দশটার পর গাঁজার নেশায় মড়া হয়ে পড়ে থাকে।"

ফান্টু চায়ের গেলাস হাতে এল। টুপিটা নেই এই যা! পরনে সেইরকম পোশাক—শর্টস আর গেঞ্জি। মুখে কার্টুন-হাসি টাঙানো। একটা চেয়ার টেনে একটু তফাতে বসে বলল, "চান করার সময় একটা কথা মাথায় এল মামা। বলি কাগজের দাদাকে?"

দণ্ডীবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ভাগনের দিকে।

ফান্টু বলল, "গতরাত্তিরে কাকতাড়ুয়া দুষ্টুমি করেনি। মামা ছিলেন না, তাই। আজ রাত্তিরে মামা আছেন। দেখবেন, ঠিক গণ্ডগোল বাধাবে। যত রাগ যেন মামার ওপর!"

দণ্ডীবাবু ঊরুতে ঠেস দিয়ে রাখা দোনলা বন্দুকটি তুলে নিয়ে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। আমার ওপর রাগ! আমি কোন্ ব্যাটাচ্ছেলের পাকা ধানে মই দিয়েছি? বুঝলেন জয়ন্তবাবু! এ স্রেফ কারুর জেলাসি। কেউ বা কারা চায় না আমার ফার্মে তিন কিলো বেগুন ফলুক। একজিবিশানে মেডেল পাক্।"

ফান্টু বলল, "না মামা, তোমাকে বারবার বলেছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না—"

তাকে থামিয়ে দিয়ে দণ্ডীবাবু বললেন, "থাম তো! খালি এক কথা।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কথাটা কী?"

দণ্ডীবাবু ফ্যাঁচ করে বড়ই বেমানান হাসিটি হাসলেন। আসলে তাঁর রুক্ষ কেঠো চেহারার জন্য সবসময় মুখে তিতকুটে জিনিস গেলার ভাব। হাসলে মনে হয়, খ্যাঁক করে কামড়ে দিলেন। বললেন, "ভূত! যে সে ভূত নয়, গঙ্গার মড়াখেকো পিশাচ! ছেলেটা কাটরার মাঠে থাকতে থাকতে কী একটা হয়ে গেছে যেন। সব সময় উদ্ভুট্টে কথাবার্তা! বলে কী জানেন! গাছপালা, পাখপাখালি, পোকামাকড় সবকিছুর কথা বুঝতে পারে।"

"পারি তো!" ফান্টু বলল, "সাধুবাবা আমাকে বলে গেছেন, যার প্রাণ আছে সেই কথা বলে। চেষ্টা করলেই বোঝা যায়, কী বলছে।"

বললুম, "কিন্তু তুমি ভূত-প্রেত-পিশাচ এসব বিশ্বাস করো কি?"

ফান্টু বলল, "করি। দেখেছি যে!"

"কী দেখেছ, বলো।"

দণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "খুব হয়েছে আর নয়। সাধুবাবা না, এই রমজান আর মুকুন্দ ওর মাথাটি খেয়েছে। জয়ন্তবাবু, দোহাই আপনাকে। ফিরে গিয়ে যেন এইসব উদ্ভুট্টে কথাবার্তা কাগজে ছাপবেন না! একে তো আপনাদের কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা গঞ্জুবাবু জ্যান্ত কাকতাড়ুয়ার ভৌতিক খবর ছাপিয়ে হুলস্থুল বাধিয়েছেন। আড়তে অসংখ্য জায়গার লোক এসে আমাকে জেরায়-জেরায় জেরবার করে দিচ্ছে। এবার আপনিও যদি ভূত-প্রেত-পিশাচের খবর ছাপেন, তিষ্টোনো যাবে না। আমাকে আড়তের কারবার ছেড়ে, এই ফার্ম ছেড়ে হিমালয়ে পালাতে হবে।"

ফান্টু বড় আকারে নিঃশব্দে হেসে বলল, "হিমালয়ে গেলে সাধুবাবার দেখা পেয়ে যাবে, মামা।"

"যাচ্ছি!" দণ্ডীবাবু ভেংচিকাটা মুখ করে বললেন, "বলিস তোর পিশাচব্যাটাচ্ছেলেকে, দণ্ডীবাবু লড়ে যাচ্ছে, লড়বে। কাকতাড়ুয়া নই, দু'ঠেঙে মানুষ। হাতে বন্দুক। খুলি উড়িয়ে দেব।"

এ-সব কথার নিশ্চয় একটা মানে আছে, আমার বুঝে নেওয়ার দরকার। তাই বললুম, "দণ্ডীমশাই, পিশাচটি আপনার মতে মানুষ?"

আমার কথা শেষ করার আগেই দণ্ডীবাবু বললেন, "আলবাত মানুষ। নইলে রক্তের ছাপ কেন? বেগুনখেতের পেছনকার কাঁটাতারের বেড়ায় খোঁদল ছিল কেন? বুঝলেন না! প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বেগুনগাছ। ঝাঁকড়া ইয়াব্বড় পাতা। ব্যাটাচ্ছেলে করে কি, বেড়ার খোঁদল দিয়ে গুড়ি মেরে বেগুনখেতে ঢোকে। ঢুকে কাকতাড়ুয়ার নিচেটা ওপড়ায়। গুড়ি মেরে সেটাকে নাচাতে নাচাতে খেতময় ঘোরে আর ভূতুড়ে সুর ভাঁজে, ওই দেখেই ভয় পেয়ে আমি ফার্মহাউসে রাত্রিবাস ছেড়ে দেব। দিচ্ছি! যাও-বা কোনও-কোনও রাতে বাড়িতে থাকতুম, আর থাকছি না। দেখি তোমার দৌড়!"

বললুম, "ব্যাপারটা পরিষ্কার হল এতক্ষণে। কিন্তু কে সে?"

দণ্ডীবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "সেটাই তো বোঝা গেল না!" তারপর চাপা স্বরে ফের বললেন, "সেজন্যই ডিটেকটিভ এজেন্সিতে যাওয়া। বুঝলেন না?"

"হুঁ, এ তো স্পষ্ট, কেউ বা কারা আপনার ফার্মহাউসে রাত্তিরে থাকা পছন্দ করছে না।"

"করছে না?"

"কিন্তু কেন?"

দণ্ডীবাবু এবার আম· ওপর চটলেন। "আহা, সেজন্যই তো ডিটেকটিভ ভাড়া করা! আপনাদের কাগজের লোকেরা খালি প্রশ্ন করতেই জানেন। তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেন না।" বলে ফের আগের মতোই বেমানান একটি ফ্যাঁচ করলেন, অর্থাৎ হাসলেন। "সরি, আপনি আমার গেস্ট। কিছু মনে করবেন না। ব্যাপারটা যত ভাবছি, তত প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। আমি মশাই টি. আর দণ্ডী, এ তল্লাটের বাঘ বলে আমাকে। আর আমাকে ওই বিটকেল কাকতাড়ুয়ার নাচ দেখিয়ে ভড়কানোর চেষ্টা! বড্ড অপমানজনক ব্যাপার নয়? বলুন আপনি!"

সায় দিয়ে বললুম, "সত্যি অপমানজনক। তবে আপনি বলছিলেন, জেলাসি!"

দুঃখিত মুখে অর্থাৎ আরও তেতো গেলার ভঙ্গিতে দণ্ডীবাবু বললেন, "আপাতদৃষ্টে জেলাসিই মনে হচ্ছে। এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখি, ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কেঁচো খুঁড়তে সাপ বের করতে পারেন কি না!"

ফান্টু আমাদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ কথা শুনছিল। এতক্ষণে বলল, "রিপোর্টারদা ক'টা বাজছে দেখুন তো?"

ঘড়ি দেখে বললুম, "ছ'টা তেতাল্লিশ!"

"আর সতেরো মিনিট পরে প্রিন্স অ্যালবার্ট ফুটতে শুরু করবে। যাই, কাছে গিয়ে বসে থাকি।"

ফান্টু উঠে দাঁড়ালে জিজ্ঞেস করলুম, "কী ফুল ফান্টু!"

ফান্টু বলল, "গোলাপ। দেখবেন তো আসুন না।"

দণ্ডীমশাই বললে, "দিনে দেখবেন জয়ন্তবাবু। ফান্টু বসে থাকতে হয় তো তুই থাকবি। খালি বাতিক।"

ফান্টু বলল, "রিপোর্টারদা, সকালে কিন্তু ফোটো তুলতে হবে। পুরো ফুটতে ভোর হয়ে যাবে। দেখবেন কত্ত বড় গোলাপ।"

সে চলে গেলে কর্নেলের কথা মনে পড়ল। হায় বৃদ্ধা প্রকৃতিবিদ! না এসে কী হারালেন, জানেন না। এই ফান্টুচন্দ্রের মধ্যে যেন কর্নেলের আদল। ছাদের বাগানে কোনও অর্কিডের ফুল ফোটার পথ চেয়ে উনি এমনি করে পাশে বসে রাত কাটান!

একটু পরে পূর্ব দিকে গঙ্গার ওপারে বিশাল লালরঙের জিনিসটি যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। রঙ বদলে চাঁদটা ছোট হলে মুকুন্দ গান গাইতে গাইতে দু'হাতে ব্যাগ নিয়ে ফিরল। রমজান তার সঙ্গে। দণ্ডীবাবু বললেন, "নন্দী-ভৃঙ্গী! বুঝলেন জয়ন্তবাবু? একজন গেল বাজারে একজন জমি দেখতে। ফিরবে জোড় বেঁধে। যত্ত সব!"

ওঁর চটে যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলুম না। মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, "স্যার, শিবমন্দিরে আবার এক সাধু এসে ধুনি জ্বেলেছেন দেখে এলুম। মাথায় পেল্লায় জটা।"

দণ্ডীবাবু বললেন, "তাহলে তো এ-রাতে শিবমন্দিরে তোদের মড়া গড়াবে।"

দু'জনেই জিভ কাটল। মুকুন্দ বলল, "বাবা ধ্যানে বসছেন। দেখে মনে হল ধ্যান ভাঙতে ভোর হয়ে যাবে। তাছাড়া স্যার, ঘরে গেস্ট। রাঁধাবাড়া ফেলে সাধুসঙ্গ করা কি উচিত?" সে হন্তদন্ত হয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

রমজান পকেট থেকে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের করে চণ্ডীবাবুর হাতে দিল। বলল, "গেটের কাছে পড়ে ছিল। মুকুন্দ বলল, ফেলে দে। ফেলে দিলে চলে? যদি বেনামী চিঠি হয়! যা ভূতুড়ে কাণ্ড চলেছে রাতবিরেতে।"

দণ্ডীমশাই ব্যস্তভাবে পড়ে বললেন, "ধুস, পদ্য লিখেছে কেউ। ফান্টুও হতে পারে, কিচ্ছু বলা যায় না। নেচারের মধ্যে থাকলে মনে কত ভাব জাগে মানুষের!"

ওঁর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে দেখি, লাল আঁকাবাঁকা হরফে লেখা আছে :

নিঝুম রাতে গাছগাছালির মাথার ওপর
উঠলে চাঁদ,
বেগুনখেতে পাততে যাব শেয়াল ধরার
ফিচেল ফাঁদ।

বললুম, "দণ্ডীবাবু পদ্যটা হয়তো নিছক পদ্য নয়। কেউ যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে! শেয়াল-ধরা ফাঁদ পাততে আসবে বেগুনখেতে এবং 'ফিচেল' কথাটাও কেমন সন্দেহজনক!"

ঠিক এই সময় কোথায় বিকট শব্দে সত্যিই শেয়াল ডেকে উঠল। আমার বুক ধড়াস করে উঠেছিল। দণ্ডীমশাই ভুরু কুঁচকে বললেন, "কাটারার মাঠে এখনও শেয়াল আছে তা হলে?"

রমজান বলল, "কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে দু'একটা আছে। কখনও-সখনও ডাকে শুনেছি।"

বারকতক হোয়া-হোয়া করে ডেকে শেয়ালটা চুপ করে গেল। কেমন একটা ভয়-জাগানো অনুভূতি আর গা ছমছম করা ভাব পেয়ে বসল আমাকে। আবছা জ্যোৎস্নায় নিঝুম পরিবেশের

ভেতর ফান্টুর দেখা পিশাচটার সবে ঘুম ভাঙল বুঝি! একটা প্যাঁচা ক্র্যাঁও-ক্র্যাঁও করে ডাকতে ডাকতে শিবমন্দিরের দিকে চলে গেল।

মুকুন্দের ডাকে রমজান চলে গেল। দণ্ডীমশাই আস্তে বললেন, "চ্যালেঞ্জ না কী বলছিলেন যেন?"

"হ্যাঁ। পদ্যটা কেমন যেন রহস্যজনক!"

দণ্ডীমশাই কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে পড়লেন। তারপর বাঁকা মুখে বললেন, "খুলি উড়িয়ে দেব। ফিচলেমি করে দেখুক না! ঢের ফাঁদ আমার দেখা আছে।"

বলে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধে বন্দুক, এক হাতে লম্বা টর্চ। বেগুনখেতের দিকে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে গেলেন। সাহসী মানুষ, সন্দেহ নেই। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতেই গেলেন নিশ্চয়!

একটু পরে কাকতাড়ুয়াটির ওপর তাঁর টর্চের আলো পড়লে আঁতকে উঠলুম। পাঞ্জাবি পরে কাকতাড়ুয়ার খুলি-মুণ্ডুটি দাঁত বের করে আঁধার চোখে তাকিয়ে যেন হিহি করে হাসছে। দৃষ্টি সরিয়ে নিলুম সঙ্গে সঙ্গে।

ফান্টু এসে গেল। "রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্ট মুখ খুলেছে। মামা কোথায়?

বললুম, "তোমার মামা বেগুনখেতে ঢুকেছেন।"

ফান্টু জোরালো হেসে বলল, "এই রে, কাঁটায় আটকে ফাঁদে পড়ার অবস্থা হবে সেদিনকার মতো। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেগুনখেতে ঢুকলে কী হয়, এখনও শিক্ষা হয়নি মামার!"

"আচ্ছা" ফান্টু, তুমি পদ্য লেখো কি?"

ফান্টু কান পর্যন্ত হাসি টেনে একটু পরে বলল, "লিখতে ইচ্ছে করে রিপোর্টারদা। পারি না। বেগুনের সঙ্গে মিল দিতে গেলে সেগুন আনতে হয়। কিন্তু বেগুন আর সেগুনে কত তফাত, বলুন!"

"আহা, তুমি পদ্য লিখেছ কি না জানতে চাইছি।"

"নাঃ, পোষায় না। ততক্ষণ সয়েল টেস্ট করতে মাথা ঘামানো ভাল।" ফান্টু ঠিক কর্নেলের মতোই চুল থেকে একটা পোকা বের করে উড়িয়ে দিল। দিয়ে বলল, "তবে এই এরিয়ায় পদ্য লিখতে পারে একজনই। কাগজে ছাপাও হয়।"

"কে তিনি?"

"ভাণ্ডারী মাস্টারমশাই!" ফান্টু প্রশংসা করে বলল। "আমাদের স্কুলে বাংলা পড়াতেন। রিটায়ার করেছেন গতবছর। বিকেলে গঙ্গার ধারে একলা ঘুরে বেড়ান। মাথায় লম্বা চুল, চিবুকে তেমনি লম্বা একগোছা ছুঁচলো দাড়ি। ওঁকে দেখে আপনি হেসে সারা হবেন। কিন্তু গুণী মানুষ।"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে ফান্টু চাপা স্বরে ফের বলল, "মামা জানতে পারলে বকবেন। কিন্তু লুকিয়ে ফার্মের এটা-সেটা দিয়ে আসি। খুব গরিব হয়ে গেছেন ভাণ্ডারীমশাই! সেদিন একটা বেগুন পেয়ে দেখুন না, একখানা পদ্য দিয়েছেন। দারুণ পদ্য।"

ফান্টু ঘরে ঢুকে পদ্যটা নিয়ে এল। ভাণ্ডারী-তে 'ণ্ড' আছে। শুনেই অস্বস্তি লেগেছিল। এবার হাতের লেখা দেখে অস্বস্তিটা বেড়ে গেল এবং রহস্যটা জটিল হয়ে পড়ল।

একই ছাঁদের হরফ। তবে নীলচে কালিতে লেখা।

কেল্লাবাড়ির দারোয়ানের বংশ
তাই পদবী দণ্ডী
তারই এক মাসতুতো ভাই চণ্ডী
চোর-জোচ্চোর দেশটা করছে ধ্বংস

হস্তে তৌল দণ্ড
পাষণ্ড আর ভণ্ড
বেচছে ভেজাল ভুসি ও খোল সর্ষের
ষণ্ডদুটি আছে বড়ই হর্ষে
অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা বাপ
বস্তার ভেতর রাস্তা ঢুঁড়ছে সাপ!

পদ্যটা পড়ে বললুম, "এর মানে কী বলো তো? 'বস্তার ভেতর রাস্তা ঢুঁড়ছে সাপ।' একথা কেন লিখেছেন ভাণ্ডারীমশাই?"

ফান্টু বলল, "পদ্যের আবার মানে থাকে নাকি? পদ্য পদ্য। কই, দিন। লুকিয়ে রেখে আসি। মামা দেখলেই হয়েছে!"

"এটা আমার কাছে থাক, ফান্টু।"

"রাখবেন, রাখুন। কিন্তু সাবধান রিপোর্টারদা, মামার চোখে যেন পা পড়ে!"

"না, না। তুমি ভেবো না।" বলে পদ্যটা ভাঁজ করে জ্যাকেটের ভেতর পকেটে চালান করে দিলুম। শিগগির হালদারমশাইকে দেখানো দরকার। মুকুন্দের কথায় টের পেয়েছি, শিবমন্দিরের সাধুটি কে!

এইসময় বেগুনখেতের দিক থেকে দণ্ডীবাবুর ডাক শোনা গেল, "ফান্টু, ফান্টু।"

ফান্টু বলল, "এই রে! যা ভেবেছিলুম। মামা আটকে গেছেন কাঁটায়!" সে ঘরে ঢুকে একটা কাটারি বের করে নিয়ে দৌড়ে গেল।

অবস্থাটা দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। বেগুনখেতের অনেকটা ভেতরে আবছা জ্যোৎস্নায় একটা কালো মূর্তির বুক থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। খুব নড়াচড়া করছেন দণ্ডীমশাই। ফান্টু বুক সমান উঁচু বেগুনগাছের জঙ্গলে দিব্যি ঢুকে পড়ল। চেঁচিয়ে বলল, টর্চ কী হল মামা?"

দণ্ডীবাবু চিঁ চিঁ করুণ স্বরে বললেন, "কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে কোথায় পড়ে গেছে। খুঁজে পাচ্ছিনে!"

"বন্দুক পড়ে যায়নি তো?"

"না, না! খালি কথা বাড়ায়। অ্যাই যাঃ! গেল, নতুন জামাকাপড় পর্দাফাঁই হয়ে গেল। কী... কী সাঙ্ঘাতিক বেগুনগাছ রে বাবা! যেন জ্যান্ত! নড়লেই খিমচি—উঃ! ইঃ!"

আমার কাছে টর্চ আছে। কিন্তু দণ্ডীবাবুর দুর্দশা উপভোগ করার চেয়ে এই সুযোগে ঝটপট ভাণ্ডারীমশাইয়ের পদ্যটা শিবমন্দিরে সাধুবেশী গোয়েন্দার কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি মনে হল। ফার্মের মাঝ-বরাবর একচিলতে রাস্তা। দু'ধারে সুন্দর কেয়ারি-করা বেড়া-গাছ। গেট খুলে গঙ্গার ধারে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে সাবধানে পায়ের কাছে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে দক্ষিণ পূর্ব কোণে শিব মন্দিরের দিকে চললুম। কানে ভেসে এল, 'ঔং হ্রীং ক্লীং ফট্ ফট্ মারয় মারয় তাড়য় তাড়য় স্বাহা!' তারপর ধুনির আলোও চোখে পড়ল।

তারপরেই আচমকা উলটে পড়ে গেলুম।

হোঁচট খেয়ে পড়িনি। কে বা কারা পেছনে ঝোপের আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার ওপর। টুঁ শব্দটি করার সুযোগ পেলুম না। আমার মুখে টেপ সেঁটে দিল। তারপর আমার হাতদুটো পিঠমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে কেউ ফিসফিসিয়ে বলল, "চুপচাপ না থাকলে শ্বাসনলি কেটে যাবে।" কাজেই চুপচাপ থাকতেই হল। শ্বাসনলি কাটা মড়া হয়ে এখানে পড়ে থাকার মানে হয় না।

চার

কিন্তু তারপর সত্যিই আমাকে মড়া হতে হল, শ্বাসনলি কাটা না হলেও। অর্থাৎ জ্যান্ত মড়া। পিটপিট করে তাকিয়ে দেখলুম, একটা খাটিয়া এল। চারটে ছায়ামূর্তি এসে খাটিয়ায় আমাকে তুলে চিতপাত শুইয়ে দিল। তারপর খাটিয়া কাঁধে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "বলো হরি! হরি বো-ও-ল!"

মন্দির চত্বরে ধুনির আলোয় জটাজুটধারী হালদারমশাইকে স্পষ্ট দেখলুম, উঁচুতে থাকার দরুন। চোখ বুজে ধ্যানস্থ। মাত্র হাত-দশেক পাশ দিয়ে খাটিয়ায় শুয়ে শ্মশানযাত্রার পথে মনে-মনে ওঁর মুণ্ডুপাত করছিলুম তাকিয়ে তো দেখবেন কী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে! বিকট স্বরে হরিধ্বনি কানে যাচ্ছে, একবার অন্তত মুখ তুলে চোখ খোলা উচিত ছিল না কি?

বটতলার পর ফাঁকা মাঠ। এখানে-ওখানে ঝোপঝাড়, কিছু গাছ। এতক্ষণে প্রচণ্ড ভয়ে সিঁটিয়ে গেলুম। রসিকতা বলে মনে হচ্ছে না। আর, মড়ার খাটিয়ায় তোলার সময় যদিও তাই ভেবেছিলুম। এরা নির্ঘাত আমাকে চিতায় শুইয়ে আগুন জ্বেলে দেবে, তাই যত হরিধ্বনি দিচ্ছে, তত চমকে-চমকে উঠছি। হৃৎপিণ্ড তুমুল লাফালাফি করছে।

অন্তত আধ-কিলোমিটার পরে খাটিয়া মাটিতে নামল। চাঁদটা গঙ্গার ওপর থেকে ফান্টুর মতো কার্টুনহাসি হাসছে আমার দশা দেখে। এবার ছায়া মূর্তি চতুষ্টয় আমাকে খাটিয়ার সঙ্গে সেঁটে আগাগোড়া বাধল। একজন শি-শি শব্দে হেসে ভূতুড়ে গলায় বলল, "জলে ফেলে দে রে, তলিয়ে যাক।"

অন্যজন বলল, "পাঁজাটাক কাঠ থাকলে চিতেয় দিতুম।"

আরেকজন বলল, "অ্যাই, আর এখানে নয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

ভূতুড়ে গলাটি সেইরকম শি-শি করে হেসে বলল, "পিশেচবাবা এসে কড়মড়িয়ে খাবে বরং। চল্, এবার সাধুবাবার একটা ব্যবস্থা করি।"

একজন হঠাৎ নড়ে উঠল। "অ্যাই! পিশেচবাবা আসছে!"

চারজন বিকট স্বরে "বলো হরি! হরি বো-ও-ল" বলতে বলতে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল। জায়গাটা যে শ্মশান, পোড়া কাঠের গন্ধে অনুমান করতে পারছিলুম। খাটিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধায় এখন আমার নড়াচড়ার সাধ্যি নেই। অতি কষ্টে চোখের তারা কোণস্থ করে জ্যোৎস্না ঝিলমিল জল এবং একটা উঁচু ন্যাড়া গাছ দেখতে পাচ্ছিলুম। শিমুলগাছই হবে। সেখান থেকে অলক্ষণে প্যাঁচার ডাক শোন গেল। তারপর দূরে ডেকে উঠল একটা শেয়াল—সেই শেয়ালটাও হতে পারে। শেয়ালের ডাক থামলে শুকনো পাতায় খড়খড়্ মসমস শব্দ শোনা গেল। পিশেচবাবা বলতে নিশ্চয় পিশাচ, যাকে ফান্টু দেখেছে এবং সেই পিশাচ নরমাংসভোজী হওয়াই সম্ভব! এখন কথা হল, আসছে, দুষ্টু-চতুষ্টয় তাকে আসতে দেখে পালিয়ে গেল। খড়মড়, খসখস শব্দ ক্রমাগত শুনছি। সে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, তাও বুঝতে পারছি। পিশাচ বলে যদি কিছু সত্যিই থাকে, তার জ্যান্ত মাংসে অরুচি হলে তবেই আমার বাঁচার চান্স অন্তত নব্বই শতাংশ। নইলে তো গেছিই!

ভেবে ঠিক করলুম, গোঁ-গোঁ আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দেব, আমি মড়া নই, জ্যান্ত। খড়খড় খসখস শব্দটা আমার বাঁদিকে ঝোপের ওধারে এসে থেমে গেল। চোখ কোণস্থ করে ঝোপের ওধারে লম্বাচওড়া পিশাচবাবার ছায়ামূর্তিও দেখতে পেলুম।

অমনি নাকে যথাসাধ্য দম টেনে নিয়ে সেই দম টেপআঁটা মুখ দিয়ে জোর ওঁ কিংবা গোঁ ধ্বনিসহযোগে ঠেলে দিলুম। ফুটুত করে একটা শব্দ হল এবং টেপটির একদিক উপড়ে গেল।

টের পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, "পিশাচবাবা, আমি মড়া নই, জ্যান্ত মানুষ!"

অমনি বিদঘুটে গলায় পিশাচবাবা বলল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউ! মানুষের গন্ধ পাঁউ!" তারপর ঝোপ থেকে বেরিয়ে খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়াল এবং হা-হা-হা-হা করে অট্টহাসি হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, অট্টহাসিটা চেনা ঠেকছে। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পিশাচবাবার মুখে সাদা দাড়ি। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পরনে জ্যাকেট ও পাতলুন। গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা ও বাইনোকুলার। মাথায় টুপি। পিঠে কিটব্যাগ আঁটা। হাতে একটি ছড়িও দেখতে পাচ্ছি। হুঁ, 'হ্যালুসিনেশন' বলে এরকম অসুখ আছে! সেই অসুখে ধরলে মানুষ ভুলভাল দেখে শুনেছি।

অথবা মৃত্যুকালীন সুখস্বপ্ন! অবশ্য, যক্ষ-রক্ষ-ভূত-প্রেত-পিশাচ নানারকম রূপ ধরতেও পটু। এই শ্মশানের মানুষখেকো পিশাচবাবা আমাকে কামড়ে খাওয়ার সময় যাতে বেশি চ্যাঁচামেচি, কান্নাকাটি না করি, সেজন্যই আমার সুপরিচিত রূপটি ধরেই দেখা দিয়েছে এবং কোন্ জায়গা থেকে খেতে শুরু করবে, তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে। মরিয়া হয়ে চোখ বুজে ফেললুম।

তারপর টের পেলুম, দড়িগুলো ঢিলে হয়ে যাচ্ছে! পায়ের দড়ি খুলে গেল এবং ছদ্মরূপধারী পিশাচবাবা আমাকে ঠেলে অন্যপাশে কাত করে হাতের দড়িও খুলে দিল। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। তড়াক করে উঠেই পালানোর চেষ্টা করলুম।

কিন্তু পারলুম না। আমার কাঁধে থাবা পড়ল এবং আবার সেই হা-হা-হা-হা অট্টহাসি। "জল ডার্লিং! এ-মুহূর্তে খানিক জল দরকার। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিলে ঘিলু চাঙ্গা হবে। ওঠো, উঠে পড়ো।"

কয়েক হাত নিচেই গঙ্গা। বেগড়বাঁই না করে হুকুম তামিল করলুম। তারপর সত্যিই ঘিলু চাঙ্গা হল এবং রুমাল বের করে মুখ মুছতে-মুছতে বললুম, "তা হলে স্বপ্ন নয়!"

"নয়, সেটা এখনও বুঝতে না পারলে আরও খানিকটা জলের ঝাপটা দাও।"

"দরকার হবে না। কিন্তু আমাকে উদ্ধারের জন্য আপনি কি মন্ত্রবলে উড়ে এলেন কলকাতা থেকে?"

"মন্ত্রবলে নয়, ডার্লিং! চার চাকার মোটরগাড়িতে—এক্সপ্রেস বাসে।"

"কিন্তু রাতবিরেতে এই শ্মশানে ছুটে আসার কারণ কী?

"পিশাচবাবার হুকুমে। তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে।"

প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, দূরে বিকট চ্যাঁচানি শোনা গেল, "বলো হরি! হরি বো-ওল! বলো হরি! হরি বো-ও-ল!" কর্নেল আমাকে টানতে-টানতে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেলেন। কাঁধ ধরে ঠেলে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফিসফিসিয়ে বলে উঠলুম, "ওরা নির্ঘাত হালদারমশাইকে আমার মতো বেঁধে আনছে। উনি শিবমন্দিরে সাধু সেজে—"

"চুপ! স্পিকটি নট।"

চুপ করে থাকলুম। হরিধ্বনি ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সাবধানে উঁকি মেরে দেখলুম, একটু দূরে চার ছায়ামূর্তি কী একটা বয়ে আনছে! তবে খাটিয়া নয়। কাছাকাছি আসামাত্র কর্নেল বিদ্‌ঘুটে গলায় একখানা হুঙ্কার ছাড়লেন, কতকটা বাঘের গজরানির মতো।

শোনামাত্র ওরা থমকে দাঁড়াল। তারপর কাঁধের লম্বাটে জিনিসটা ফেলে দিয়ে পিটটান দিল। কর্নেল দৌড়ে গেলেন। আমিও।

হ্যাঁ, জটাজুটধারী হালদারমশাই-ই বটে। মুখে টেপ সাঁটা আমারই মতো। আগাগোড়া দড়ি জড়ানো গায়ে। আশ্চর্য ব্যাপার, জটা ও দাড়ি খুলে যায়নি এবং কাঁধ থেকে ফেলে দেওয়ায় চোটও খাননি। কর্নেল বাঁধন খুলে দিতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দুই ঠ্যাঙে সিধে দাঁড়ালেন এবং জটা-দাড়ি নিজেই খুললেন। দেখলুম, টেপটি নকল গোঁফদাড়ির সঙ্গে সেঁটে থাকায় ওঁর সুবিধে হয়েছে বেশি। সহজেই খুলে গেল।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, আলখাল্লাধারী হালদারমশাই অবাক হলেন না কর্নেলকে দেখে। মুখ দিয়ে যে ধ্বনি বেরোল, তা হল, "খি-খি-খি-খি....!"

কর্নেল বললেন, "আছাড় খেয়ে ব্যথা লাগেনি তো হালদারমশাই?"

"হঃ কি যে কন! সয়েল না, স্যান্ড। বালু, বালু!" বলে খালি পায়ে বুড়ো আঙুলে নরম মাটির অবস্থাটা বুঝিয়েও দিলেন।

কর্নেল বললেন, "মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিন বরং—"

"ক্যান?"

"আপনার ওপর এমন একটা সাঙ্ঘাতিক ধকল গেল। মনে হচ্ছে, এখন আপনি ধাতস্থ হতে পারেননি।"

"অ্যাঁ! হালদারমশাই এতক্ষণে চমকালেন। কর্নেল এবং আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে লম্বা পায়ে জলের ধারে গেলেন।

একটু পরে আলখাল্লায় মুখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে বললেন, "ক্কী.....ক্কী আশ্চর্য ঘটনা। কর্নেল স্যার, আপনি? এতক্ষণ তাই চেনাচেনা ঠেকছিল। আপনি কখন এলেন? আর এই শ্মশান-মশান জায়গায় ক্কী...ক্কী অবাক!"

কর্নেল বললেন, "সব কথা পরে হবে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় হালদারমশাই! যে-কোনও সময়ে পিশাচবাবার আবির্ভাব ঘটতে পারে। চলুন, কেটে পড়া যাক।"

হালদারমশাই বললেন, "পিশাচবাবা! সে আবার কে?"

"ভুলে গেছেন দেখছি। নোটবইতে টুকেছিলেন না?"

হালদারমশাই চুপ করে গেলেন।

জ্যোৎস্না খানিকটা ঝলমলে হয়েছে। কোথাও গমখেত, কোথাও ধবধবে সাদা ন্যাড়া চষা-মাটি, কোথাও ঝোপঝাড় আর গাছের জটলা। মাঠের মধ্যে দূরে বা কাছে বিদ্যুতের আলো দুলদুল করছিল। বাঁ দিকে পশ্চিমে সোজা এগিয়ে সামনে কালো চাপ-চাপ উঁচু-নিচু পাঁচিলের মতো জিনিসটা দেখিয়ে কর্নেল বললেন, "কেল্লাবাড়ির ধ্বংসাবশেষ।"

জিজ্ঞেস করলুম, "ওখানে গিয়ে কী হবে? বরং দণ্ডীবাবুর ফার্মে যাই চলুন।"

কর্নেল আস্তে আস্তে বললেন, "এসো তো।" তারপর পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে নাড়তে থাকলেন।

কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপের দিকে একটা আলো জ্বলে উঠল। আলোটা এদিকে-ওদিকে নড়াচড়া করে নিবে গেল। কর্নেলও টর্চ নেবালেন। আলখাল্লাধারী হালদারমশাই বললেন, "এক মিনিট! এক মিনিট! জটা-দাড়ি না পরলে এ পোশাকে বড্ড বিচ্ছিরি দেখাবে। জয়ন্তবাবু, একটু হেল্প করুন। বিটকেল টেপটা ছাড়ানো যাচ্ছে না।"

টেপটা ছাড়িয়ে দিলুম। কিন্তু কিছু গোঁফ আটকে থাকল তাতে। হালদারমশাই সেটা ফেলে দিয়ে কষে জটা-দাড়ি আঁটলেন। তারপর বললেন, "চলুন, আই অ্যাম রেডি অ্যান্ড স্টেডি।"

পায়ের কাছে আলো ফেলে কর্নেল আগে হাঁটছিলেন। একটু পরে শুকনো খাল অর্থাৎ গড়খাইয়ের সামনে পৌঁছলুম। সাবধানে নেমে গেলুম। নরম দূর্বাঘাসে গড়খাইটা ভরে আছে। ওপারের ঢালে একফালি পায়ে-চলা রাস্তা। উঠতে অসুবিধে হল না। রাস্তার ওপর ঝোপঝাড় ঝুঁকে রয়েছে। সামনে আবার সেই রহস্যময় টর্চের আলো জ্বলে উঠল। কর্নেল সাড়া দিয়ে বললেন, "সঙ্গে গেস্ট আছে নন্দবাবু! আগে চা দরকার! হবে তো?"

অবাক কাণ্ড! জবাব পদ্যে এল :

খাবেন নেহাত চা
সে আর এমন কী।
কুকারে কেটলিটাও
চাপিয়ে রেখেছি

গেস্ট পেলে তো ধন্যই
প্রস্তুত সেজন্য।।

কর্নেল থামিয়ে না-দিলে পদ্যটা চলত। তবে মজাটা হল, কর্নেলও পদ্যেই থামলেন :

যথেষ্ট যথেষ্ট
খামোকা কেন কষ্ট।।

একটা লণ্ঠন জ্বালানো হচ্ছিল। জবাব এল ফের পদ্যেই এবং সঙ্গে সঙ্গে চাপা খিকখিক হাসি :

পদ্য বলা কষ্ট নয় বদভ্যাস
ব্রেনে যদি বসত করেন বেদব্যাস।।

হ্যাঁ আমার অনুমান সঠিক। ফান্টুর কাছে শোনা সেই ভাণ্ডারী মাস্টারমশাই। কিন্তু দেখলে হাসি পাবে বলেছিল, পেল না। একটু রোগা, টিঙটিঙে, একটু কুঁজো, প্রচণ্ড লম্বা নাক। চিবুক থেকে অন্তত আট ইঞ্চি লম্বা গোঁফের মতো দাড়ি ঝুলছে, আর মাথায় লম্বা সন্নেসি-চুল। মুখে অমায়িক হাসি। পরনের পাঞ্জাবি এত লম্বা যে, ধুতি ঢেকে ফেলেছে প্রায়।

গাছ ও ঝোপের ভেতর কোনওরকমে টিকে থাকা, দরজা জানালার কপাট লোপাট হওয়া, হাঁ-হাঁ করা একটা ঘর। ছোট্ট গেরস্থালি পাতা। ফান্টু বলেনি এখানেই কবি ভাণ্ডারীমশাইয়ের ডেরা। হয়তো সে জানে না এই ডেরার খবর। ভাণ্ডারীমশাই সাধুবেশী হালদারমশাইকে দেখে চোখ নাচিয়ে বললেন,

হচ্ছে সন্দেহ
সাধু নন অন্য কেহ।

হালদারমশাই নিশ্চয় পদ্য বানাতে পারেন না। কারণ তিনি জবাবে তার প্রসিদ্ধ "খি-খি-খি-খি" উপহার দিলেন। কর্নেল বললেন, "ঠিক ধরেছেন নন্দবাবু, ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে কে হালদার।"

"তা হলে নমস্কার।" বলে কবিবর মিষ্টি হাসলেন।

ডিটেকটিভ এনেছে দণ্ডী।
খবর পেয়েই চণ্ডী।
কালীগঞ্জে প্রেজেন্ট।
একটা ইনসিডেন্ট
বাধতে পারে শেষটা—"

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "কী এই কেসটা?"

কবি নন্দ ভাণ্ডারী কেটলিতে ফুটন্ত জলে চা-পাতা ফেলে, সেটা নামিয়ে রেখে দুধ গরম করতে দিলেন। তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে কাপ-প্লেট বের করে বাইরে ধুতে গেলেন। হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, "শেষটার সঙ্গে কেসটা বেশ মিলেছে হালদারমশাই।"

হালদারমশাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, "কেসটা বুঝতে দরকার একটু চেষ্টা।"

হারদারমশাই একটু চটে গেলেন। "ধুর মশাই! খালি পদ্য। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। পদ্য-টদ্য আমার আসে না। ওদিকে এতক্ষণ কী হচ্ছে কে জানে! বেগুনখেতে—"

বাইরে থেকে কবিবর বললেন—

বেগুনখেতে রাতবিরেতে নাচত কাকতাড়ুয়া।
চুপিসাড়ে ঝোপেঝাড়ে বলত শেয়াল ক্যা হুয়া।

দণ্ডীবাবু ফন্দি করে যেই আনল ডিটেকটিভ।
চণ্ডীচরণ বুঝল তখন এবার সে ইনএফেকটিভ।

তারপর ঘরে ঢুকে দুধের পাত্র নামিয়ে কুকার নেবালেন। চা তৈরি করতে করতে ফের ভাণ্ডারীমশাই আপনমনে আস্তে বললেন,

"হচ্ছে ভয়।
কী হয়, কী হয়।
ছেলেটা যে বোকা।
জিনিয়াস একরোখা।
ওরে পোড়ামুখো।
তোর হাতেই হুঁকো।
খেয়ে যাচ্ছে ভূত—

হালদারমশাই চটেই ছিলেন। বলে উঠলেন, "কী অদ্ভুত!"

কর্নেল তারিফ করার ভঙ্গিতে বললেন, "আসছে হালদারমশাই, আসছে!"

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন, "কী!"

"পদ্য।"

আমি ফোড়ন না কেটে পারলুম না। "এবং ছন্দও।"

হালদারমশাই গুম হয়ে বসে রইলেন। মনে হল, যা ঘটছে সেটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন। কবি নন্দ ভাণ্ডারীর মুখেও সেই আমুদে ভাবটা নেই। হাতে-হাতে চা এগিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড একটা ধকলের পর গরম চা আমাকে চাঙ্গা করতে থাকল। হালদারমশাইকেও বটে। কারণ তাঁর সন্নেসি-মুখে প্রশান্তি ফুটতে শুরু করল।

ভাণ্ডারীমশাই চা শেষ করে বললেন,

অনারেবল গেস্ট।
নাউ টেক রেস্ট।
ওয়ান থিং টু ক্লিয়ার।
ইফ ইউ হিয়ার
দা জ্যাকল হাউলস।
সামথিং ইজ ফাউল।

তক্তপোশের তলা থেকে তিনি একটা পুঁটুলি বের করলেন। তারপর সেটা বগলদাবা করে কর্নেলের দিকে চোখ নাচিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম, হালদারমশাই কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। কর্নেল লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিলেন। বললেন, "কী বুঝলেন বলুন হালদারমশাই!"

"প্রচুর—প্রচুর রহস্য।"

"হ্যাঁ, রহস্য প্রচুরই। আপনাকে বলেছিলুম, 'গু' বর্ণটি যেখানে, সেখানেই গণ্ডগোল। কবি নন্দলাল ভাণ্ডারীকেও দেখলেন। গু বর্ণটি তাঁর নামেও আছে। কাজেই কিছু গণ্ডগোল তাঁরও আছে, তবে সেটা মাথায়।"

আমি বললুম, "কিন্তু আপনার সঙ্গে এর পরিচয় হল কীভাবে?"

কর্নেল একটু হাসলেন। "গত একমাস যাবৎ নন্দবাবু আমাকে পদ্যে চিঠি লিখে আসছেন। পাগলের পাগলামি ভেবে গ্রাহ্য করিনি। তারপর কাগজে সত্যিই ভূতুড়ে কাকতাড়ুয়ার খবর

বেরোল। আজ সকালে হালদারমশাই আর তুমি গেলে। হালদারমশাইয়ের কাছে দণ্ডীবাবুর আসার খবর পেলুম। তখন নন্দলালবাবুর পদ্যগুলোকে গুরুত্ব দিতেই হল। উনি লিখেছিলেন :'

ভাঙা কেল্লাবাড়ি আমার ইদানীংকার আস্তানা।
মুখে দাড়ি দুজনকারই সেটাই চেনার রাস্তা না?

"অতএব পরস্পর চেনাচিনির অসুবিধে হয়নি।"

"শ্মশানে গিয়েছিলেন কেন?"

"হরিধ্বনি শুনেই নন্দবাবু আমাকে শ্মশানে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন দণ্ডীবাবুকে কিডন্যাপ করা হচ্ছে। তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলুম। আমাকে দেখে পিশাচবাবা ভেবে লোকগুলো খাটিয়া ফেলে পালিয়ে গেল। তখনও ভাবিনি, তোমাকে ওরা ধরে এনেছে! তোমার কান্নাকাটি শুনে তবে বুঝলুম—"

"মোটেও কান্নাকাটি নয়" প্রতিবাদ করলুম। "আমি যে জ্যান্ত মানুষ, সেটাই জানাতে চাইছিলুম।"

হালদারমশাই প্রচণ্ডভাবে খি-খি-খি-খি করলেন এতক্ষণে। তারপর বললেন, "খাইছে আর কি!"

বললুম, "কিন্তু পিশাচবাবার ব্যাপার কী? ফান্টুও বলছিল, তাকে দেখেছে।"

কর্নেল বললেন, "কাটরার মাঠের নরমাংসভোজী পিশাচবাবার থান তোমাকে বলেছিলুম, মনে নেই? শুনলুম দণ্ডীবাবু আর চণ্ডীবাবু দুজনেরই দিকে নাকি তাঁর নজর।"

হালদারমশাই বললেন, "জিনিয়াস ছেলেটার হাতে ভূতের হুঁকো খাওয়ার কথা বললেন পোয়েটমশাই। বড়ই রহস্যজনক! কর্নেল স্যার কি কিছু ক্লু পেলেন?"

"কীসের?" কর্নেল আনমনে জবাব দিলেন। কারণ তিনি যেন কিছু শোনার চেষ্টা করছিলেন।

হালদারমশাই বললেন, "হুঁকোর।"

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন। সেই সময় শেয়ালের ডাক শোনা গেল। অমনি উঠে দাঁড়ালেন। "ইফ দ্য জ্যাক্‌ল হাউলস্/ সামথিং ইজ ফাউল" বলে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় দৌড়েই গেলেন বলা উচিত।

হালদারমশাই বলে উঠলেন, "খাইছে! পোইদ্য। বুঝলেন না? পোইদ্য—পইট্টি! কর্নেলসারেরে খাইছে!" ওই-কারের মতো একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন গোয়েন্দাবর। তারপর গেরুয়া আলখাল্লার ভেতর থেকে নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন। শেয়ালটা থেমে গেল হঠাৎ। তার একটু পরে বন্দুকের গুলির শব্দ ভেসে এল দূর থেকে। পরপর দু'বার। হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। এখানে বসে থাকার মানে হয় না আর। চলুন জয়ন্তবাবু, কী ঘটছে দেখে আসি!" বলে আমাকে টেনে ওঠালেন।

সেই গড়খাই পেরিয়ে মাঠে পৌঁছানোর পর শ্মশানের দিক থেকে হরিধ্বনির শব্দ ভেসে এল। অমনি হালদারমশাই দম-আটকানো গলায় বললেন, "আবার কারে বাঁধল?"

বলে আচমকা টাট্টু ঘোড়ার মতো গমখেত ভেঙে উধাও হয়ে গেলেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর গা ছমছম করতে থাকল। জ্যোৎস্নার রাতে কাটরার মাঠে একা পড়ে গিয়ে এখন প্রতি মুহূর্তে ভয়, হুঁ—সেই নরমাংসভোজী পিশাচবাবারই! কে জানে, সামনে বা পেছনে কোনও গর্ত থেকে বা ঝোপঝাড় ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেই গেছি।

দণ্ডীবাবুর ফার্মটা কোন্‌দিকে ঠাহর করার চেষ্টা করলুম। বাঁ দিকে একটু দূরে বিদ্যুতের আলো জুলজুল করছে। ওইটেই হবে। মরিয়া হয়ে সেইদিকে নাক-বরাবর হাঁটতে থাকলুম।

পাঁচ

ফার্মহাউস এলাকা একেবারে সুনসান নিশুতি। বেগুনখেতে কালো হয়ে কাকতাড়ুয়াটি দাঁড়িয়ে আছে। মড়ার খুলি এমনিতেই দেখতে বিটকেল, তার ওপর সময়টা এরকম। শেয়ালের ডাক শুনে কর্নেলের দৌড় এবং শ্মশানের হরিধ্বনি শুনে ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের নিমেষে অন্তর্ধান, ওদিকে নরমাংসভোজী পিশাচবাবার ব্যাপারটাও কম সাঙ্ঘাতিক নয়। কাজেই কাকতাড়ুয়াটির দিকে এখন না তাকানো উচিত।

খোলা বারান্দায় ফান্টু দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করছিল, তাঁর হাতে দোনলা বন্দুক। সেই বন্দুকটাই হবে। কিন্তু ইনি তো দণ্ডীবাবু নন, তাঁর বিপরীত। নাদুস, নুদুস, বেঁটে। মুখের ভাব অমায়িক। প্রথমে ফান্টুই আমাকে দেখতে পেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, "রিপোর্টারদা, কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ? আমি তো আপনার জন্য ভেবে-ভেবে সারা। শেষে বড়মামা খুঁজতে গেলেন আপনাকে।"

বেঁটে ভদ্রলোক একটু যেন চমকে গিয়েছিলেন। তারপর মিঠে হাসলেন। আসুন-আসুন! এতক্ষণ ফান্টু আপনার কথাই বলছিল। কাগজে ওর ছবি বেরোবে শুনে খুব ভাল লাগল।"

ফান্টু বলল, "আপনি পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েননি তো রিপোর্টারদা!'

"নাঃ।" বলে বেতের চেয়ারে বসে পড়লুম। বেজায় ক্লান্ত। শুতে পেলে বাঁচি, এমন অবস্থা। শরীরের গিঁটে গিঁটে ব্যথা, যা বাঁধা বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা! মাথাও ঝিমঝিম করছে রহস্যের চোটে।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। "আমার নাম চণ্ডীচরণ খাঁড়া। তুলোদা আমার মাসতুতো দাদা। আর বলবেন না স্যার! ভুসির বস্তায় মড়ার খুলি ঢুকিয়ে দিয়েছিল কেউ। নেহাতই রসিকতা। কিন্তু তুলোদার আবার সবতাতে বড্ড বাড়াবাড়ি। বেগুনখেতের কাকতাড়ুয়ার মাথায় সেটি বসিয়ে দিয়ে কেলেঙ্কারি বাধিয়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে এলুম। হচ্ছেটা কী, হাতে নাতে দেখে তারপর ব্যবস্থা।"

ফান্টু বলল, 'তোমাকে দেখে কিন্তু আর নড়ছে না, দেখছ ছোটমামা!'

"নড়ুক না। তুলোদা'র চেয়ে আমার হাতের টিপ কেমন দেখিয়ে ছাড়ব!"

"কিন্তু বন্দুকে তো আর কার্টিজ নেই, ছোটমামা। বড়মামা দুটোই ফায়ার করে ফেলেছেন!"

চণ্ডীবাবু বন্দুক মোচড় দিয়ে খালি কার্তুজ দুটো বের করে দেখে ফেলে দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "তুলোদার একটুতেই বাড়াবাড়ি।"

ফান্টুও খুব হাসতে লাগল। "উড়ো পদ্য পেয়ে শেয়াল-ধরা ফাঁদ খুঁজতে জামাকাপড় ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে বড়মামার। বের করে আনতে সে এক ঝামেলা! মেজাজ খাপ্পা হয়েই ছিল, আরও খাপ্পা করে দিল।"

"কে?"

"আবার কে? কাকতাড়ুয়া।"

"নড়াচড়া করছিল নাকি?"

"তুমি শুনলে কী এতক্ষণ? পর পর দুটো ফায়ার করেও বড়মামার রাগ পড়তে চায় না। মুকুন্দদা আর রমজানদা এসে অনেক করে বোঝাল। তারপর মাথা ঠাণ্ডা হল। তারপর এই রিপোর্টারদার কথা বললুম। তখন বড়মামা রিপোর্টারদাকে খুঁজতে বেরোলেন টর্চ নিয়ে।'

"হ্যাঁ রে ফান্টু, তুলোদা পিশাচবাবার পাল্লায় পড়েনি তো?"

ফান্টু একটু ভেবে বলল, "একটা কথা মাথায় আসছে ছোটমামা!"

"কী কথা বল্ তো?"

"বড়মামাকে পিশাচবাবা কিছু বলবে না। কেন জানো? আজ সন্ধে থেকে শ্মশানে তিনটে মড়া গেল।"

"গেল বটে। হরিধ্বনি দিচ্ছিল।"

"পিশাচবাবা এখন ওই তিনটে মড়া খেতেই ব্যস্ত। পেট ফুলে ঢোল হবে।"

'ঠিক বলেছিস।' বলে চণ্ডীবাবু আমার দিকে ঘুরলেন। "সওয়া দশটা বাজে প্রায়। স্যারকে খুব টায়ার্ড দেখাচ্ছে। ফান্টু, ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থা কর। তোদের নন্দী-ভৃঙ্গীর সাড়া নেই—দ্যাখ, গাঁজা টেনে পড়ে আছে নাকি?'

ফান্টু চলে গেল কিচেনের দিকে। চণ্ডীবাবু গুলিশূন্য বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে বললেন, "খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন স্যার। আমি তুলোদাকে খুঁজে নিয়ে আসি। মাঠে তুলকালাম করে বেড়াচ্ছে হয়তো!"

চণ্ডীবাবু চলে গেলেন গেটের দিকে। একটু পরে ফান্টু ফিরে এসে বলল, "রিপোর্টারদা, ওরা নেই। না মুকুন্দদা, না রমজানদা!" সে একটু রাগ করেছে বোঝা যাচ্ছিল। ফের বলল, "বড়মামা আসুন, এবার সব বলে দেব।"

"কী বলে দেবে ফান্টু!"

ফান্টু প্যাঁচার মতো মুখ করে বলল, "ওরা রোজ রাত্তিরে চুপিচুপি কোথায় যায়! আমাকে বলতে বারণ করছিল, তাই বলিনি মামাকে। এবার দেখছি বলতেই হবে।"

একটু অবাক হয়ে বললুম, "তা হলে ওরা সত্যি গাঁজা খেয়ে মড়ার মতো ঘুমিয়ে থাকে না বলছ?"

"হ্যাঁ!" বলে ফান্টু হাই তুলল। "চলুন রিপোর্টারদা, আমরা খেয়ে নিই।"

"তোমার মামারা ফিরে আসুন। একসঙ্গে খাব বরং।"

ফান্টু হঠাৎ হাসল। "তা হলে চলুন রিপোর্টারদা, প্রিন্স অ্যালবার্টকে দেখে আসি। একা যেতে ভয় করছে। আজ রাতে বড্ড বেশি শেয়াল ডাকছে। শেয়াল ডাকলেই বুঝতে পারি পিশাচবাবা বেরিয়েছে।"

ফার্মহাউসের পাশ দিয়ে একফালি পায়ে চলা রাস্তা। কয়েক পা এগিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। বললুম, "কী হল?"

ফান্টু বলল, "টর্চ? আমার টর্চটা বড়মামা নিয়ে গেছেন। আপনার কাছে টর্চ নেই?"

"ছিল," বলতে গিয়ে সামলে নিলুম। কারণ, তা হলে ওকে সব কথা খুলে বলতে হয়। বলার মুড নেই। তাই বললুম, "নেই।"

"নার্সারির ওখানে একটা চালাঘর আছে। আলোটা জ্বেলে দেব, চলুন। একটু দূরে অবশ্যি—তা হলেও দেখা যাবে।" বলে ফান্টু হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকল। ওর সঙ্গ ধরতে বারকতক পা হড়কে আছাড় খাওয়ার উপক্রম। তারপর সামনের দিকে গমখেত পড়ল। আঁকাবাঁকা আলপথে অনেকটা যাওয়ার পর ফান্টু বলল, "নার্সারির এরিয়ায় এসে গেছি রিপোর্টারদা! এই দেখুন, কতরকম ক্যাকটাস, পাতাবাহার আর ঝাউ লাগিয়েছি। ওইখানে গোলাপবাগান। পাঁচ রকমের গোলাপ আছে। প্রিন্স অ্যালবার্ট—"

ফান্টু থেমে গেল। খানিকটা দূরে হঠাৎ আলো জ্বলল। বিদ্যুতের আলো। সেই আলোয় দেখলুম, চণ্ডীবাবু একটা চালাঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে মুকুন্দ ও রমজানের সঙ্গে কথা বলছেন। ফান্টু খুব অবাক হয়ে বলল, "ছোটমামা ওখানে কী করছেন?"

সে দৌড়তে যাচ্ছিল, টেনে ধরে আটকে দিলুম। বললুম, "চুপ! বরং দু'জনে আড়ালে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিই, চলো!"

ফান্টুর মনে ধরল কথাটা। ঝাউ, ক্যাকটাস, পাতাবাহারের ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে কাছাকাছি এক জায়গায় বসে পড়লুম। হাত-বিশেক দূরে চালাঘরটা, সবকিছুই দেখা ও শোনা যাচ্ছে। চণ্ডীবাবু দুটো ছোট্ট প্লাস্টিকের থলে পাঞ্জাবির দুই পকেটে ঢুকিয়ে বললেন, "বন্দুকটা তুলোদার ঘরে রেখে দিয়ে যাও! আর এই নাও, পাঁচ টাকা করে বাড়িয়েই দিলুম।"

রমজান ও মুকুন্দ টাকাগুলো পকেটে ঢোকাল। তারপর মুকুন্দ ফিক করে হেসে বলল, "পিশাচবাবা এতক্ষণ দণ্ডী-স্যারের হাড় চুষছে। খুব রাগী লোকের হাড়ে টক-ঝালটা বড্ড বেশি থাকে।"

চণ্ডীবাবুও ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসলেন। রমজান বলল, "কাগজের বাবুটিকে আমার কেমন সন্দেহ হয়। বাবুমশাই।"

চণ্ডীবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ হে! শ্মশান থেকে দিব্যি ফেরত এল দেখে আমি তো তাজ্জব! পিশাচবাবা ওকে খেল না কেন? তা ছাড়া বাঁধন খুলে পালিয়ে এল কী করে?"

মুকুন্দ বলল, "আপনার লোকগুলো কোনও কম্মের নয়। বরাবর দেখে আসছি, সবতাতেই বড্ড তাড়াহুড়ো করে। কাকতাড়ুয়া নাচাতে গিয়ে গুলি খেয়ে রক্তারক্তি হল।"

"ধুস, রক্ত নয়, কুমকুমের ছোপ।" চণ্ডীবাবু মুখ বাঁকা করে বললেন। "ওদিন দোলপূর্ণিমা ছিল না! হোলির কুমকুম-পটকা। বেন্দাটা অতি চালাক। কে ওকে বলেছিল, কাকতাড়ুয়ার গলায় কুমকুম-পটকা বাঁধতে? জানা কথা, তুলোদা আগের রাত্তিরের মতো মুণ্ডু তাক করেই গুলি ছুঁড়বে। হাঁদারাম!"

মুকুন্দ ও রমজান বেজায় হাসতে লাগল। মুকুন্দ বলল, "তাই বলুন! পটকা ফেটে রঙবেরঙ!"

চণ্ডীবাবু বললেন, "রঙবেরঙ করতে গিয়ে আমাকেও বিপদে ফেলেছিল আর কি! তুলোদার তো হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনে—যাকগে, আলো নেবাও। আর শোনো, গোয়েন্দাবাবু তো পিশাচবাবার পেটে গেছে। কাগজের বাবুটিকেও ফের শ্মশানে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। বেন্দার দল তোমাদের হেল্প করবে।"

রমজান বলল, "এক কাজ করা যাক। কাগজবাবুর খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দিলেই, ব্যস, মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়বে। তখন ওকে চ্যাংদোলা করে শ্মশানে রেখে আসা যাবে।"

মুকুন্দ সায় দিয়ে বলল, "পিশাচবাবার শেষরাত্তিরে নিশ্চয় খিদে পাবে! তখন ওকে খাবে।"

কথাগুলো শুনে শিউরে উঠেছিলুম। ফান্টু আমাকে চিমটি কাটলে ফিসফিসিয়ে বললুম, "চুপ।"

আলো নিবে গেল। তারপর কাছেই কোথাও শেয়ালের ডাক শোনা গেল। চণ্ডীবাবু চালাঘর থেকে নেমে জ্যোৎস্নায় দাঁড়ালেন। বললেন, "ফার্মের জমি তুলোদা ফান্টুর নামে উইল করে রেখেছে। ফান্টু তো আমারও ভাগনে। আশা করি, বেগড়বাঁই করবে না।"

"মুকুন্দ বলল, না, না। ফান্টু তো জানেই না কীসের চাষ করছে! চণ্ডী-স্যার বীজ এনে দিতেই সয়েল টেস্ট করে কতরকমের সার দিয়ে ফুলে ফুলে ছয়লাপ করে দিয়েছে। মাথা আছে বটে!"

চণ্ডীবাবুর বন্দুক রমজানের কাঁধে। সে আর মুকুন্দ আমাদের দিকে, চণ্ডীবাবু উল্টোদিকে সবে কয়েক-পা হেঁটেছেন, অমনি কোথাও একটা অমানুষিক গর্জন শোনা গেল। কতকটা এইরকম, "খ্যাঁ-ও-ও! খ্যাঁ-ও-ও! খ্যাঁ-ও!"

তারপর চণ্ডীবাবুর সামনাসামনি ঝোপ ফুঁড়ে কালো একটা মূর্তি বেরোল। চণ্ডীবাবু টর্চ জ্বেলেই "বাবা রে" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন। টর্চটা বোধ করি আতঙ্কের চোটে হাত থেকে পড়ে নিবে

গেল। কিন্তু ওই এক পলকের আলোয় দেখতে পেলুম দু'ঠেঙে কালো গরিলার মতো একটি প্রাণীকে। ভয়ঙ্কর মুখ থেকে সাদা দুটো কষদাঁত বেরিয়ে আছে। দু'হাতে বড়-বড় নখ।

ফান্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করল, "পিশাচবাবা। পিশাচবাবা!"

রমজান ও মুকুন্দের এক-গলায় আর্তনাদ শুনলুম। তারপর তারা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়েই পালিয়ে গেল। চণ্ডীবাবু পালাতে যাচ্ছেন, সেই সময় চালাঘরের পেছন থেকে কেউ এসে তাঁকে জাপটে ধরল। জ্যোৎস্নায় আবছা যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ধস্তাধস্তি বেধেছে মনে হচ্ছে। তারপরেই, কী আশ্চর্য, কর্নেলের গলা শুনতে পেলুম, "হালদারমশাই, চালাঘরের আলোটা জ্বেলে দিন! শিগ্‌গির।"

আলো জ্বলল।

কর্নেলকে দেখলুম, সবে ধরাশায়ী দশা থেকে উঠে দাড়াচ্ছেন। টুপিটা পড়ে গেছে। টাক ঝকমক করছে। চণ্ডীবাবু অদৃশ্য। হাত ফসকে পালিয়ে গেছেন বোঝা গেল।

পিশাচবাবা দাঁড়িয়ে আছে। আলখাল্লা ও জটাজুটধারী হালদারমশাই চালাঘর থেকে নেমে খি-খি-খি-খি করলে। পিশাচবাবার ভয়ঙ্কর মুখ থেকে মানুষের ভাষায় পদ্য বেরোল, সঙ্গে ফোঁস করে একটি দীর্ঘশ্বাস।

গঙ্গায় দিল দণ্ডী ঝম্প
চণ্ডীও দিল লম্বা লম্ফ।।

পদ্য শুনেই ফান্টু লাফিয়ে উঠল এবং 'মাস্টারমশাই' বলে চিক্কুর ছেড়ে দৌড়ে গেল।

আমিও গেলুম। ভয়ঙ্কর মুখোশ এবং কালো কাপড়ে তৈরি মনুষ্যাকৃতি খোলসের টিপ-বোতাম পুট পুট করে খুলে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী। সহাস্যে ফান্টুকে বললেন,

ওরে বাবা ফান্টুস
একটুকু চাই হুঁশ
বললেও ইঙ্গিতে
পারিসনি বুঝে নিতে
মামা এনে দিল বীজ
যত্ন করে চষেছিস
জানিস এইগুলো কী
ওপিয়াম পপি রে!

বলে পায়ের কাছ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ে ফেললেন। ফান্টু বলল, এগুলো তো ফুল মাস্টারমশাই, পপিফুল!"

কবি ভাণ্ডারীমশাই চটে গেলেন।

এই দ্যাখো ছেলেটা
কী যে ভেলভেলেটা
বোঝালেও বোঝে ভুল
বলে কিনা পপিফুল!

ফান্টু অবাক হয়ে বলল, "তা হলে কী এগুলো?"

ভাণ্ডারীমশাই বললেন,—

শোন্ তবে আগাগোড়া
সব সাপ নয়, ঢোঁড়া

কোনওটার থাকে বিষ
এইবার বুঝেছিস
এই পপি ডেঞ্জারাস
আফিং এরই নির্যাস।"

ফান্টু একটু গুম হয়ে থাকার পর বলল, হুঁ, বুঝেছি। তাই মুকুন্দদা রমজানদা গাছগুলোর ডগা চিরে রাখত। রস বেরিয়ে আঠার মতো জমে থাকত আর ওরা চুপিচুপি রাত্তিরে এসে সেগুলো খুলে নিয়ে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরত। আমাকে বলত, মামাকে যেন না বলি। আমি অত কি জানি, বলুন তো!"

ভাণ্ডারীমশাই তাঁর পৈশাচিক ছদ্মবেশ গুটিয়ে পুঁটলি বানালেন এবং সেটি বগলদাবা করে বললেন,

ওরে সোনা গুড বয়
করে ফ্যাল ডেস্ট্রয়
বিলম্ব নয় বাপ
হাতে দেবে হ্যান্ডকাপ
আবগারি দারোগা
তব তেরা ক্যা হোগা
ব্রিং সাম গুড বিষ
আভি করে দে ফিনিশ।।

ফান্টু বলল, "এখনই বিষ স্প্রে করে দিচ্ছি। কর্নেল বললেন, আসুন নন্দবাবু, ফান্টু ওপিয়াম পপি জ্বালিয়ে দিক। আমরা ফার্মহাউসে গিয়ে দেখি, দণ্ডীবাবু সাঁতার কেটে ফিরতে পারলেন নাকি!"

ভাণ্ডারীমশাই হাই তুলে বললেন,

রাত নিঝুম
পাচ্ছে ঘুম
উঠছে হাই
ডেরায় যাই।।

তারপর সটান ঘুরে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। জ্যোৎস্নায় তাঁর ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে শেয়ালের ডাক শোনা গেল! সেদিকে। অদ্ভুত মানুষ!

হালদারমশাই ততক্ষণে চালাঘরে গিয়ে ছদ্মবেশ ছেড়েছেন এবং সেটি তিনিও পুঁটুলি বানিয়ে বগলদাবা করে বেরোলেন। প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো ছিল। বোঝা গেল, আলখাল্লার ভেতর প্যান্ট-শার্ট পরেই ছিলেন। অবশ্য পা-দুটো খালি। বললেন "কী কাণ্ড! পোইদ্যের লগে পিশাচ আর শৃগালের সম্পর্ক আছে শুনি নাই। এক্কেরে শৃগালের ডাক!"

বললুম, "উনি শেয়াল ডাকতে পারেন নাকি?"

"ওই তো ডাকছেন! শুনছেন না?"

কর্নেল বললেন, "আমার টর্চটা খুঁজে বের করতে হবে। দণ্ডীবাবুর বন্দুকটাও।"

খোঁজাখুঁজি করতে করতে ফান্টু এসে পড়ল। হাতে স্প্রে। হাসতে-হাসতে বলল, "ওদিকে এক কাণ্ড। বড়মামা এসে গেছেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছেন। বললেন, গঙ্গাস্নান করে এলুম। আমি তো জানি, পিশাচবাবার ভয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন! বলতে গেলে রেগে যাবেন। তাই সে-কথা

বললুম না। তবে পপিফুলের ব্যাপারটা আর যা-যা হয়েছে এখানে, সব বলেছি। শুনে মামা হতভম্ব।"

বললুম, "তোমার মামা জানেন না এগুলো আফিংগাছ!"

ফান্টু বলল, "না। বড়মামাকে তো চণ্ডীমামা—মানে, ছোটমামা ফুলের বীজ বলে কোত্থেকে এনে দিয়েছিলেন! বড়মামা আপনাদের জন্য ওয়েট করছেন। শিগ্‌গির যান। মামার অবস্থা শোচনীয়। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকলে কী হবে? রাত্তিরে গঙ্গার জল যা ঠাণ্ডা!"

কর্নেল টর্চ খুঁজে পেলেন। তারপর বন্দুকটাও পাওয়া গেল। হালদারমশাই বন্দুক কাঁধে এবং পুঁটুলি বগলদাবা করে মার্চের ভঙ্গিতে পা বাড়ালেন। কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,

কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা
বেগুনভাজা আর পরোটা
কিংবা লুচি অর্ধডজন
ইচ্ছে হয় করি ভোজন
দিচ্ছে কেডা
রাত বারোটায়

হালদারমশাই খি-খি সহযোগে বললেন, "খাইছে! পোইদ্যে পাইছে!"

বললুম, "আপনাকেও, হালদারমশাই! পদ্যে পেয়েছে। সাবধান!"

হালদারমশাই সম্ভবত সাবধানতাবশেই চুপ করে গেলেন। পদ্যের সঙ্গে পিশাচ ও শেয়ালের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন উনি। পিশাচ যদি বা সাজতে পারেন, শেয়ালের ডাক ডাকতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে!

ছয়

দণ্ডীবাবু ঘরের ভেতর তক্তপোশের বিছানায় সত্যিই কম্বল মুড়ি দিয়ে বসেছিলেন। আমাদের দেখে করুণ মুখে বললেন, "আসুন, আসুন! ফান্টুর মুখে সব শুনলুম। শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। ওই চণ্ডী—পাষণ্ড ষণ্ড, ভণ্ড আমার মাসতুতো ভাই! আমাকে ফাঁসাবার কী ষড়যন্ত্র করেছিল, দেখুন! তারপর লোকে বলত, চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই! উঃ কী সাঙ্ঘাতিক ঘটনা!"

দেখলুম, বারান্দার বেতের চেয়ারগুলো ঘরে ঢোকানো হয়েছে এবং তা আমাদেরই খাতির করে বসতে দেওয়ার জন্যে তো বটেই! আমরা বসলুম। হালদারমশাই বললেন, "দণ্ডীবাবু, কর্নেল স্যারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই! ইনি—"

কথা কেড়ে দণ্ডীবাবু বললেন, "কী আশ্চর্য, শ্মশানে ইনিই আমার বাঁধন খুলে দিলেন মনে পড়ছে—হুঁ, দাড়ি দেখেই চিনতে পারছি। নমস্কার স্যার, নমস্কার! বুঝতেই পারছেন, ওই অবস্থায় শত্রু-মিত্র চেনা কঠিন। আমি ভাবলুম, পিশাচবাবার চেলা-টেলা হবে। পিশাচ বাবার খাওয়াদাওয়ার সুবিধে করে দিচ্ছে।" বলে সেই অদ্ভুত 'ফ্যাঁচ' শব্দটি বের করলেন মুখ থেকে। অর্থাৎ দুর্লভ হাসিটি হাসলেন।

হালদারমশাই বললেন, "ইনি স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আমার গুরুদেব কইতে পারেন এনারে। ইনি না আইয়া পড়লে কী যে হইত, কওন যায় না।"

আবেগে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "অমন করে জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত হয়নি দণ্ডীবাবু! আপনি বিচক্ষণ মানুষ। ভাল করে তাকিয়ে দেখবেন তো?"

দণ্ডীবাবু বললেন, "ওই যে বললুম, শত্রু-মিত্র চেনার অবস্থা ছিল না। গেলুম জয়ন্তবাবুকে খুঁজতে, আর আচমকা কারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর চ্যাংদোলা করে তুলে হরি বোল বলতে-বলতে শ্মশানে ফেলে পালিয়ে গেল। এদিকে ইদানীং পিশাচবাবার গল্পটা প্রচণ্ড রটেছিল। আপনি আমার বাঁধন খুলছেন, তখন সাক্ষাৎ পিশাচবাবা এসে আপনার পেছনে দাঁড়িয়ে আচে। হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে হুঙ্কারও দিচ্ছে। ওই অবস্থায় জলে ঝাঁপ না দিয়ে উপায় কী, বলুন স্যার?"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, গতস্য শোচনা নাস্তি। আমার কিছু প্রশ্ন আছে, দণ্ডীবাবু।'

"বলুন, বলুন!"

"আপনার ফার্মে পপিফুলের খেতটা যে আসলে ওপিয়াম পপির খেত সেটা কি আপনি জানতেন না?"

"বিশ্বাস করুন। ওপিয়াম কী থেকে হয়, আমি জানতুম না। একটু আগে ফান্টু সব বলে গেল। আমি জানতুম ফুল, তো ফুল! পপিফুল! ফান্টুর ফুলের বড্ড শখ। চণ্ডী যে সেই সুযোগ নেবে, কে জানত! গত অক্টোবরে চণ্ডী নিজের হাতে একটা বীজের প্যাকেট দিয়ে গেল। বলল, "ফান্টুকে দিও। এগুলো পপিফুলের বীজ। দারুণ ফুল ফুটবে। গন্ধে মউমউ করবে। বদমাস! জোচ্চোর! পরের হাতে হুঁকো খাওয়ার ফন্দিটা কেমন দেখুন?"

"ইদানীং আপনি ফার্মে এসে রাত্রিবাস করছিলেন কেন, দণ্ডীবাবু?"

দণ্ডীবাবু একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে শ্বাস ফেলে বললেন, "সারাটা দিন আড়তে কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকি। বড্ড একঘেয়ে লাগে। ছেলেমেয়েও নেই বাড়িতে, শুধু গিন্নি আর আমি। তাই অনাথ ভাগনেটাকে এনে রেখেছিলুম। সে থাকে ফার্মে। ছেলেমানুষ তো! রাতবিরেতে কী হয়, যা অবস্থা আজকাল! এও একটা কথা। তবে আরেকটা কথা হল, খটকা।"

"কীসের খটকা?"

ফান্টু বলেছিল, চণ্ডী আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে ফার্মে আসে। বুঝুন ব্যাপারটা। কোথায় ঔরঙ্গাবাদ, আর কোথায় কাটরার মাঠ! চণ্ডী আসে, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করে যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, সন্ধ্যাবেলায় কেন? ফান্টুটার এগ্রিকালচারে মাথা আছে। আর সব ব্যাপারে আস্ত বোকা। এদিকে চণ্ডী লোক ভাল নয়। কাজেই খটকা লেগেছিল। সন্ধ্যার আগেই ফার্মে এতে রাত কাটাতে শুরু করলুম। ব্যস! কাকতাড়ুয়া নাচিয়ে আমাকে ভয় দেখানোর খেলা আরম্ভ হল।"

ফান্টু এসে গেল। বড় করে হেসে বলল, "জ্বালিয়ে দিয়েছি মামা। ফিনিশ!"

চণ্ডীবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "গেস্টদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ফান্টু! অনেক রাত হয়ে গেছে।"

ফান্টু বলল, "মুকুন্দদা রান্না করে রেখেছে মামা!"

চণ্ডীবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "চোর! চোর! চোরদের রান্না গেস্টদের খাওয়াব কী রে হাঁদারাম! তা ছাড়া তুই তো বললি, খাবারে আফিমের রস মিশিয়ে দেবার চক্রান্ত করছিল। কাল সকালে সব খাবার শ্মশানে ফেলে দিয়ে আসব। মড়াখেকো শেয়াল-কুকুরের পেটে যাক। তুই এক কাজ কর বরং। বেগুনখেতে যা। বেগুন নিয়ে আয়। আমি ময়দা ছেনে পরোটা বানাচ্ছি। লুচি করতে হলে রাত পুইয়ে যাবে। তার চেয়ে পরোটা ইজ ইজি। কী বলেন স্যার? কর্নেল সায় দিলেন। হালদারমশাই উৎসাহে দাঁড়ালেন। তারপর "চলুন, আমিও হাত লাগাই" বলে পা বাড়িয়েছেন এমন সময় বাইরে কাছেই শেয়াল ডেকে উঠল, "হেয়ো হোয়া হোয়া!"

একটু থমকে দাঁড়ালেন চণ্ডীবাবু ও হালদারমশাই। তারপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে কিচেনে গিয়ে

ঢুকলেন। বললুম, "কর্নেল, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হল তাহলে! রাত বারোটায় পরোটা আর বেগুনভাজা। খাসা। কিন্তু শেয়ালের ডাক শুনে মনে হচ্ছে আরেকজন গেস্ট আসছেন হয়তো!"

তারপরই হঠাৎ বাইরে ফান্টুর চিৎকার শোনা গেল। "মামা মামা!"

সব্বাই বেরিয়ে গেলাম। দণ্ডীবাবু হাঁক দিলেন,—কী হয়েছে রে?

বেগুনখেতের দিকে হাত তুলে আবার বলল, "কাকতাড়ুয়াটা আবার নাচছে—ওই দ্যাখো।"

চমকে উঠতেই হল। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কাকতাড়ুয়া দু'হাত ছড়িয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে। দণ্ডীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, বন্দুক! বন্দুক! বন্দুক নিয়ে আয় ফান্টু!"

অমনি কাকতাড়ুয়া পদ্যে বলে উঠল :

বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়া
নিশুত রেতে নাচ করে
ডাকে শেয়াল কেয়া হুয়া
ভূরিভোজন আঁচ করে
দণ্ডীভায়া এ কী বিচার
করবে গুলি বন্দুকে
উপকারী বন্ধুকে?

দণ্ডীবাবু সহাস্যে বললেন, "ভাণ্ডারীভায়া নাকি? আরে, এসো, এসো! সুস্বাগতম! তবে এ কেমন আসা হে? বেগুনখেতে বড্ড কাঁটা। জামাকাপড় আটকে ফর্দাফাই হয়ে যাবে যে!"

কবি নন্দলাল ভাণ্ডারী কাকতাড়ুয়াটির আড়াল থেকে বেরোলেন।

না, বেরোলেন বলা ভুল হচ্ছে। দেখা দিলেন। তারপরই আর্তনাদ করলেন,

"ওরে ওরে ফান্টা
সত্যিই কাঁটা রে
আগে কে জানত
শেয়ালের ফাঁদ তো
হয় এইরকমই
কণ্টকে জখমই
আঃ উঃ বাবা রে
বাঁচা রে বাঁচা রে

ফান্টু কাটারি এনে উদ্ধার করতে গেল তাঁকে। হালদারমশাই ক্রমাগত খি-খি-খি-খি করছিলেন। শেষে বললেন, "কী কাণ্ড! বাইগনখ্যাতখান এক্কেরে লণ্ডভণ্ড!"

বললুম, "সাবধান হালদারমশাই! আবার আপনাকে পদ্যে পেয়েছে।"

অমনি হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "না, না। কথার কথা!"...

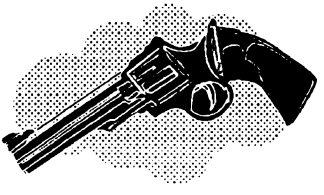

রাজবাড়ির চিত্ররহস্য

প্রাইভেট ডিকেটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন,—খাইসে!

জিগ্যেস করলুন,—কী হল হালদারমশাই?

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে নোংরা রুমালে নাক মুছলেন। তারপর বললেন,—জয়ন্তবাবুরে একখান কথা জিগাই।

—বলুন হালদারমশাই।

গোয়েন্দাপ্রবর বাঁকা হেসে বললেন,—আপনাগো কাগজে আইজ দুইখান মার্ডারের খবর লিখসে।

—তাতে কী হয়েছে? কোথাও মার্ডার হয়েছে, তাই খবর লেখা হয়েছে।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—একখান মার্ডার তেমন কিসু না। ভিক্‌টিম চায়ের দোকানে বইসা চা খাইত্যাছিল, কারা তারে বোম মারসে। কিন্তু আর একখান মার্ডার হইসে এক্কেরে ঘরের মধ্যে। ভিক্‌টিমের মাথায় গুলি করসে খুনি। ভিক্‌টিম তখন দরজার কাছাকাছি মেঝের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়সে। কিন্তু তার ডাইন হাতের মুঠায় একগোছা কাঁচাপাকা চুল।

এবার একটু কৌতূহলি হয়ে বললুম—তা হলে বোঝা যাচ্ছে ভিক্‌টিম খুনির মাথার চুল উপড়ে নিয়েছে।

হালদারমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন,—প্রথম কথা, দরজা বন্ধ ছিল। পুলিশ দরজা ভাইঙা ওই অবস্থায় ভিক্‌টিমরে দেখসে। কিন্তু এমন একখান হেভি মিস্ট্রির খবর আপনাগো কাগজে এইটুকখান কইরা ছাপসে। ওদিক প্রথমে যে মার্ডারের কথা কইলাম, সেইখবর ছাপসে বড় কইরা প্রথম পাতায়। ক্যান?

আমি আমাদের কাগজ মন দিয়ে পড়ি না। তা ছাড়া কাল শনিবার আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসেও যাইনি। হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললাম,—এমন হতে পারে প্রথম পাতার ভিক্‌টিম একজন ভি.আই.পি। আর দ্বিতীয় খবরটা হয়তো দেরিতে পাওয়া গিয়েছিল। তখন কাগজে যেটুকু জায়গা ছিল, খবরটা কাটছাঁট করে কোনওরকমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন নাইট এডিটর।

হালদারমশাই তেমনই উত্তেজিতভাবে বললেন,—নাইট এডিটর ঠিক করেন নাই। অমন হেভি মিস্ট্রি! ভিক্‌টিমের হাতের মুঠোয় খুনির চুল! তারপর আরও হেভি মিস্ট্রি, দরজা যখন বন্ধ ছিল তখন খুনি পলাইল কোন পথে?

কর্নেল তাঁর টাইপরাইটারে সম্ভবত প্রজাপতি, অর্কিড বা দুস্প্রাপ্য প্রজাতির পাখি নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলেন। এতক্ষণে তাঁর কাজ শেষ হল। তারপর টাইপ করা কাগজগুলো গুছিয়ে ভাঁজ করে টেবিলের ড্রয়ারে রাখলেন। এবং বললেন,—হালদারমশাই, খবরটা ছোট করে লেখা হলেও আপনি কয়েকটা পয়েন্ট মিস করেছেন।

—মিস করসি? কী মিস করসি কন তো কর্নেল স্যার।

কর্নেল টাইপরাইটারের কাছ থেকে উঠে এসে আমাদের কাছাকাছি তাঁর ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটা লাইন আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। দরজার ল্যাচ-কি ছিল। তার মানে কেউ ঘরের ভেতর থেকে ল্যাচ-কি তে চাপ দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে

পারে, কিন্তু সে বেরিয়ে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাইরে থেকে আর খোলা যায় না। আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার দরজা কী আপনি লক্ষ করেননি?

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—হঃ! আপনি ঠিক কইসেন।

বলে তিনি আবার সেই অংশটা পড়ার জন্য কাগজটা তুলে নিলেন। তারপর যথারীতি বিড়বিড় করে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ হলে তিনি বললেন,—আর কী মিস করসি বুঝলাম না।

কর্নেল বললেন,—ভিক্‌টিমের মুঠোয় ধরা কাঁচাপাকা চুলের গোছা উল্লেখ করে খবরে লেখা হয়েছে, চুলগুলো পুলিশ সহজেই টেনে বের করে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠিয়ে দিয়েছে।

হালদারমশাই বললেন,—ওই লাইনটা আমি মিস করি নাই কর্নেল স্যার! ওই চুল তো ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানোই লাগবো।

কর্নেল হাসলেন,—হালদারমশাই কোনও মৃত মানুষের হাতের মুঠিতে আটকে থাকা কোনও জিনিস সহজে খুলে নেওয়া যায় না। আপনি তো একসময় পুলিশের চাকরি করেছেন, ওই সহজ কথাটা আপনার চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

অমনি হালদারমশাই নড়ে সিধে হয়ে বসলেন। তারপর কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—হঃ, আমারই ভুল।

এবার আমি জিগ্যেস করলুম,—কর্নেল, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন খুনিই ওই চুলগুলো ইচ্ছে করে পুলিশকে মিস গাইড করার জন্য হাতে গুঁজে দিয়েছিল। তাই কি?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—এজন্যই তোমাকে বলি জয়ন্ত, তুমি বোঝো সবই, তবে দেরিতে।

এবার আমি খবরটা পড়ার জন্য হালদারমশাইয়ের কাছ থেকে কাগজটা নিলুম। হেডিংটা ছোট্ট 'কেষ্ট মিস্ত্রি লেনে রহস্যময় খুন'। খবরটা এক লাইন পড়েই বুঝতে পারলুম, ওটা আমাদের নতুন ক্রাইম রিপোর্টার দীপকেরই লেখা।

সবে দুটো লাইন পড়েছি, এমনসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল অভ্যাসমতো হাঁক দিলেন, —ষষ্ঠী!

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—এবার দ্যাখেন কে আসে!

কথাটা শুনে বুঝতে পারলুম বরাবর যেমন হয়, কর্নেলের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রইংরুমে যখনই আমরা কোনও রহস্যময় ঘটনা নিয়ে আলোচনা করি, তখনই সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেউ-না-কেউ এসে পড়েন।

কিন্তু আমাদের নিরাশ করে ঘরে ঢুকলেন বেঁটে বলিষ্ঠ গড়নের এক ভদ্রলোক। তাঁর পরনে সাদা-সিধে ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে একটা বাদামি রঙের ব্রিফকেস। তিনি ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—কর্নেলসাহেব কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কর্নেল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছিলেন। বললেন,—আমি যদি ভুল না করি তাহলে আপনি যদুগড়ের মধুরবাবু।

ভদ্রলোক সোফায় বসে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আপনার স্মৃতিশক্তির ওপর আমার বিশ্বাস এখনও আছে। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমি যদুগড়ের রাজবাড়ির কেয়ারটেকার হতভাগ্য মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যেই বটে।

লক্ষ করলুম কর্নেলের চোখে যেন বিস্ময় ফুটে উঠেছে। তিনি বললেন,—আমি আপনাকে চিনেছি বটে, কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে আপনার চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করছি। যদুগড়ের কুমারবাহাদুর রুদ্রনারায়ণ রায় আপনাকে 'বাবুর বাবু' বলে পরিহাস করতেন, কারণ আমিও দেখেছি আপনার পোশাক-পরিচ্ছদে বেশ বিলাসিতা ছিল। আপনার চেহারাতেও প্রাণবন্ত ভাব ছিল। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন দীর্ঘকাল রোগে ভুগেছেন।

মধুরবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—আমার জীবনে এই তিনবছরে অনেক কিছুই ঘটে গেছে। আমি যদুগড় ছেড়ে এসেছি তিন বছর আগে। কলকাতায় এক বিধবা দিদির কাছে বাস করছি। দিদির একটি মাত্র ছেলে। সে থাকে বোম্বেতে। যাই হোক, যেজন্যে আজ হঠাৎ আপনার কাছে এসে হাজির হয়েছি, তা বলি।

বলে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই, জয়ন্ত চৌধুরি, দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বিখ্যাত সাংবাদিক, আর উনি প্রাইভেট ডেটেকটিভ মিস্টার কে. কে. হালদার। তবে আমরা ওঁকে হালদারমশাই বলি।

মধুরবাবু এবং আমাদের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হল। তারপর তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন,—আমার কথাগুলো গোপনীয়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—যত গোপনীয়ই হোক, আপনি এদের সামনে স্বচ্ছন্দে খুলে বলতে পারেন। কারণ এরা দুজনেই আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তবে আগে কফি খান। কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে। বলে কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী, কফি কোথায়?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কফির-ট্রে হাতে নিয়ে ষষ্ঠী ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর ট্রে সেন্টার-টেবিলে রেখে নিঃশব্দে চলে গেল। আমি জানি কর্নেলের ঘরে নতুন কেউ এলেই ষষ্ঠী দ্রুত কফি তৈরি করে ফেলে।

মধুরবাবুকে কর্নেল এক পেয়ালা কফি তুলে দিলেন। তারপর নিজে এক পেয়ালা কফি তুলে নিয়ে বললেন,—মধুরবাবু, কুমারবাহাদুরের কোনও খবর রাখেন?

মধুরবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না। তবে কুমারবাহাদুরের মেয়ে বল্লরীকে আমি আমার দুঃখ জানিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলুম। বল্লরীকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলুম। সে আমাকে আগের মতোই আপনজন ভেবে চিঠির উত্তর দিয়েছিল। তার বাবা নাকি এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। তাই প্রায়ই আমার কথা বলেন। বল্লরী রাগ করে বাবাকে আমার ঠিকানা দেয়নি। লিখেছিল,—কাকাবাবু আপনি এখানে ফিরে আসুন।

কফি শেষ করে মধুরবাবু বললেন,—এবার তা হলে ব্যাপারটা বলি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজিয়ে বললেন,—হাঁ বলুন।

মধুরবাবু আবার একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন,—ঘটনাটা ভারি অদ্ভুত। গত পরশু, শুক্রবার বিকেলে অভ্যাস মতো আমি গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম। গঙ্গাদর্শনে আমার মন শান্ত হয়। তো আউটরাম ঘাটের দিকে একটা খালি বেঞ্চে বসে গঙ্গাদর্শন করছিলুম। রবিবার ছাড়া অন্যদিন গঙ্গার ধারে লোকজন কমই থাকে। কিছুক্ষণ পরে প্যান্টশার্ট পরা এক ভদ্রলোক বেঞ্চের অন্য কোণে এসে বসলেন। তাঁকে একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। এর কোনও কারণ ছিল তা নয়। বেড়াতে গিয়ে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। যদি দৈবাৎ ভদ্রলোক যেচে পড়ে কথা শুরু করেন সেই ভয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। ভদ্রলোকের মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ, মাথায় তেমনই এলোমেলো একরাশ কাঁচাপাক চুল। প্যান্ট-শার্ট-জুতো অবশ্য বেশ পরিচ্ছন্ন। একটু পরে চোখের কোনা দিয়ে দেখলুম তিনি ব্রিফকেসের ওপর একটা কাগজ রেখে কিছু লিখছেন। লেখা শেষ হলে কাগজটা তিনি ভাঁজ করলেন। তারপর গঙ্গার দিকে আপন মনে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে সূর্য লাল হয়ে যখন অস্ত যাচ্ছে তখন লক্ষ করলুম তিনি ডানদিকে ঘুরে কী যেন দেখলেন। তারপর আমাকে ভীষণ অবাক করে বললেন,—কিছু যদি মনে না করেন একটা অনুরোধ করব। আমি বললুম,—অনুরোধের কী আছে, বলুন। তিনি বললেন,—প্লিজ, আমার এই ব্রিফকেসটা আপনার কাছে রাখুন। আর এই চিঠিটা পড়ে দেখুন। কথাটা বলেই তিনি ব্রিফকেসটা একরকম জোর করেই আমার দুই উরুর ওপর রেখে সেই ভাঁজকরা কাগজটা আমার বুক পকেটে

গুঁজে দিলেন। তারপর সবেগে পিছনের রেললাইন ডিঙিয়ে তিনি গাছপালার আড়ালে উধাও হয়ে গেলেন। আমি তো ভীষণ হতবাক হয়ে গেছি! তারপর পকেট থেকে সেই ভাঁজ করা কাগজটা খুলে পড়তে-পড়তে আমার বোধবুদ্ধি গুলিয়ে গেল। কাগজটা আপনাকে দেখাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—আপনার হাতে যে ব্রিফকেসটা দেখছি, ওটা নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোকের ব্রিফকেস।

—ঠিক ধরেছেন। এটা আমার হাতে মানায় না। বেশ দামি ব্রিফকেস। বলে তিনি বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল ভাঁজ খুলতে-খুলতে জিগ্যেস করলেন,—একটা কথা। ওই ব্রিফকেসটা কি আপনি খুলেছিলেন, বা খোলার চেষ্টা করেছিলেন?

মধুরবাবু বললেন,—আজ্ঞে না কর্নেলসাহেব। আপনি তো আমাকে ভালোই জানেন। আমি কী প্রকৃতির মানুষ। হ্যাঁ, বলতে পারেন, মানুষের স্বভাব বদলায়, কিন্তু আমি বদলাইনি। তা ছাড়া আমার একটা ভয়ই পিছু ছাড়ছে না। যদি ব্রিফকেসটা খুলতে গেলেই কোনও সাংঘাতিক বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আপনি তো জানেন আজকাল সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গিরা এভাবে বিস্ফোরণ ঘটায়।

হালদারমশাই কান খাড়া করে কথা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন,—হঃ, ঠিক কইসেন। ওটার মধ্যে সাংঘাতিক এক্সপ্লোসিভ কিছু থাকতেও পারে। আর একটা কথা কই আমি। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করসি। তাই আমার সন্দেহ হইত্যাসে সেই ভদ্রলোক আপনার কোনও শত্রুর চর হইতেও পারে। কী কন কর্নেল স্যার!

কর্নেল কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ে মধুরবাবুর দিকে তাকালেন,—এটা একটা চিঠি। দেখা যাচ্ছে সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ 'বারিন' বলে যিনি স্বাক্ষর করেছেন, তাঁকে কি আপনি একটুও চিনতে পারেননি?

—নাঃ এটাই আমার দুর্ভাগ্য। বারিনের সঙ্গে আমার শেষ দেখা বছর দশেক আগে। সে যদুগড়ে তার ব্যবসার ব্যাপারে একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। দৈবাৎ রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়। তখন তার মুখে দাড়ি ছিল না। তাছাড়া গায়ের রং ছিল খুব ফরসা। দশ বছর পরে সে মুখে একরাশ গোঁফদাঁড়ি নিয়ে আমার পাশে বসলে আমার পক্ষে তাকে চেনা কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

কর্নেল বললেন,—দ্যাখা যাচ্ছে সে আপনাকে চিনতে পেরেই আপনার কাছে এসে বসেছিল। বরং আমার অনুমান, তার কোনও শত্রু ওই সময়েই গঙ্গার ধারে তাকে ফলো করে আসছিল। তা ছাড়া চিঠি পড়ে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, সেই শত্রুর লক্ষ ছিল তাকে খুন করে ব্রিফকেসটা হাতানো। যাই হোক, চিঠির কথা পরে। এবার আপনি বলুন, তার অনুরোধমতো আপনি কী কাল সকালে তাঁর ঠিকানায় ব্রিফকেসটা পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলুম আর শুনলুম—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন,—বারিনবাবু তাঁর ঘরে খুন হয়েছেন, তাই না?

মধুরবাবু দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। আত্মসম্বরণ করার পর তিনি ধরা গলায় বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি কেষ্ট মিস্ত্রি লেনে গিয়ে দেখি, একটা দোতলা বাড়ির সামনে পুলিশের কয়েকটা গাড়ি আর বাড়ির ভেতরে-বাইরে পুলিশ গিজ-গিজ করছে। আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি অনেকদিন আগেই, কিন্তু কী ঘটেছে তা জানার জন্য একজন পান-সিগারেট বিক্রেতার কাছে একটা সিগারেট কিনলুম। তারপর তাকে জিগ্যেস করলুম, এখানে এত পুলিশ কেন দাদা? লোকটা বলল, ওই বাড়ির দোতলায় এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁকে কে বা কারা গতরাত্তিরে কখন খুন করে গেছে। সকালে একটা হোটেল থেকে ওর জন্যে ব্রেকফাস্ট নিয়ে গিয়েছিল একটা লোক। সে দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি করে। কিন্তু সাড়া পায়নি। তারপর হঠাৎ তার চোখে পড়ে দরজার বাইরে চাপ-চাপ খানিকটা রক্তের ছোপ। অমনি সে হোটেলে খবর দেয়। তারপর পাড়ার লোকেরা জড়ো হয়, পুলিশ ডাকে।

মধুরবাবু দম নিয়ে বললেন,—কথাগুলি শোনামাত্র আমি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিলুম। তারপর আমার দিদি নিরুপমাকে সব কথা খুলে বলেছিলুম। সে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। আমাকে পুলিশের কাছে যেতে বারণ করেছিল। তার মতে পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করবে না, উলটে আমাকেই হয়তো খুনি সাব্যস্ত করবে। তার চেয়েও বড় কথা, ব্রিফকেসে যদি চোরাই মাল থাকে? দিদির কথা শুনে আমি আর থানায় যাইনি। তারপর গত রাতে নানাকথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার মনে পড়ে যায় আপনার কথা। আপনার নেমকার্ডটা আমি খুঁজে পাইনি। তাছাড়া দিদির বাড়িতে টেলিফোনও নেই। তাই সকাল হলে সোজা আপনার বাড়ি চলে এলুম। আপনার এ-বাড়িতে আমি একবার কুমারবাহাদুরের চিঠি নিয়ে এসেছিলুম, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তবে আপাতত একটা কাজ জরুরি বলে মনে হচ্ছে। কাজটা হল এই ব্রিফকেসটা খুলে ফেলা। চিন্তার কারণ নেই আমার কাছে মেটাল বা এক্সপ্লোসিভ ডিটেকটর যন্ত্র আছে।

বলে কর্নেল উঠে গেলেন। আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলুম।

দুই

লক্ষ করছিলুম হালদারমশাইয়ের চোখদুটি যথারীতি গুলি-গুলি হয়ে উঠেছে এবং গোঁফের দুই সূচাল ডগা তিরতির করে কাঁপছে। তিনি আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—আমার বিশ্বাস ব্রিফকেসটার ভেতরে টাকাকড়ি কিংবা সোনাদানা আছে।

আমি কিছু বলার আগেই কর্নেল এসে ব্রিফকেসটার ওপর একটা ছোট্ট ডিটেকটর ছোঁয়ালেন। কোনও শব্দ শোনা গেল না। মধুরবাবুকেও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন,—মেসিনটা দিয়ে কী বুঝলেন কর্নেলসাহেব?

কর্নেল দ্বিতীয় ডিটেকটরটা ব্রিফকেসের ওপর ছোঁয়াতে-ছোঁয়াতে হাসিমুখে বললেন, —আমাদের নিরাশ করল ব্রিফকেসটা। এতে বিস্ফোরকও নেই, আবার কোনো অস্ত্রশস্ত্রও নেই।

গোয়েন্দপ্রবর বলে উঠলেন,—তা হলে আমি যা কইসিলাম জয়ন্তবাবুরে, তাই-ই সইত্য।

বললুম,—হ্যাঁ, টাকাকড়ি সোনাদানা থাকতেও পারে। তবে সে সব থাকলে বারিনবাবু কি তাঁর পুরোনো বন্ধুর হাতে বিশ্বাস করে রেখে যেতে পারতেন কি না, সেটা মধুরবাবুই বলতে পারবেন।

মধুরবাবু বললেন,—বারিন চিঠিতে লিখেছে ইচ্ছে হলে আমি তালা ভেঙে ব্রিফকেস খুলে দেখতে পারি কী আছে। কারণ সে জানে আমি তার কোনও জিনিস হাত দেব না, বা তালাও ভাঙব না।

কর্নেল বললেন,—তা হলে কী করা যায় আপনিই বলুন মধুরবাবু?

—আজ্ঞে? আমি কী বলব? আপনি যদি ওটার তালা ভেঙে ভেতরে কী আছে দেখতে চান, আমার তাতে আপত্তি নেই। বরং জয়ন্তবাবু আর হালদারমশাই দুজন সাক্ষী থাকবেন।

কর্নেল হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হেসে বললেন,—হালদারমশাই, আপনি কী বলেন?

হালদারমশাই এবার গম্ভীরমুখে বললেন,—আমি কী আর কমু, ব্রিফকেসের মালিক তো খুন হইয়া গেসেন। কাজেই এটা একটা মার্ডার কেস। তাই আমার মতে ওটা না ভাইঙা ও.সি. হোমিসাইডেরে খবর দিলে ভালো হয়।

মধুরবাবু হাত তুলে মাথা নেড়ে আপত্তি জানিয়ে বললেন,—না-না, ওকাজ করলে আমি মারা পড়ে যাব। পুলিশ আমাকে ছাড়বে না।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তা ঠিক। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। আপনি তো আমার কাছে এসেছেন। পুলিশের কাছে গেলে ঝামেলা হবে বলেই এসেছেন—তাই না?

মধুরবাবু ব্যস্তভাবে বললেন,—হ্যাঁ, কর্নেলসাহেব।

—তা হলে এটার ভেতর কী আছে তা জানতে আমাদের যেমন আগ্রহ, আপনারও তাই।

মধুরবাবু বললেন,—হ্যাঁ। বারিনের কাজকর্মের খবর বহুকাল আমি জানি না। আমার ধারণা ব্রিফকেসটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা সে শত্রুপক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েই আমাকে দিয়ে কেটে পড়েছিল। কাজেই আপনি যদি তালা ভেঙে ভেতরের জিনিস দেখে নেন, তাহলে বারিনকে খুনের উদ্দেশ্য বোঝা যাবে।

এবার কথাটা হালদারমশাইয়ের মনঃপুত হল। তিনি বললেন,—হঃ, এটা একটা পয়েন্ট বটে। পুলিশ খুনের মোটিভ বুঝে পাওয়ার আগেই আপনি তা পাইয়া যাবেন।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে কয়েকটা ছোট বড় স্ক্রু-ড্রাইভার এবং একটা ছোট্ট হাতুড়ি বের করলেন। তারপর ব্রিফকেসটা কোলে রেখে একটা স্ক্রু-ড্রাইভারের মাথায় আস্তে হাতুড়ির ঘা দিতে থাকলেন। দুমিনিটের মধ্যেই একটা লক্ খুলে গেল। দ্বিতীয় লকটা খুলতে তার চেয়ে কম সময় লাগল। তারপর ব্রিফকেসটা তিনি টেবিলে রেখে ডালা খুললেন।

আমরা খুব উত্তেজিত হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। দেখলুম ব্রিফকেসের ভেতর একটা টার্কিস তোয়ালে ভরা আছে। কর্নেল সেটা তুলে নিতেই দেখা গেল খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা প্রায় ব্রিফকেসের তলার সাইজের। কাগজের মোড়ক খোলার পর দেখলুম তিনটে একই সাইজের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি।

কর্নেল একটা-একটা করে ছবি আমাদের দেখালেন। তিনটে ছবিই পোর্ট্রেট। ফটোগ্রাফ নয়, অয়েল পেন্টিং। একটা ছবি নানা অলঙ্কারে সেজে থাকা এক মহিলার। বাকি দুটো দুজন পুরুষের। একজন যুবক, অন্যজন বয়স্ক। তিনটি ছবি দেখেই বোঝা যায় এই মানুগুলি অভিজাত পরিবারের। কর্নেল আতস কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখে বললেন,—তিনটি ছবির চিত্রকর একজন সাহেব বলে মনে হচ্ছে। জড়ানো ইংরেজি হরফে লেখা আছে 'আর মার্লিন' বা মার্টিন। আমি বিখ্যাত চিত্রকরদের অনেকের নামই জানি না। তবে আমার কাছে বিদেশি চিত্রকরদের একটা এনসাইক্লোপিডিয়া আছে। সঠিক নামটা পেতেও পারি, কারণ দেখে তো মনে হচ্ছে এরা রাজা মহারাজা পরিবারের লোক। আর ছবিগুলোও আঁকা বহুবছর আগে।

মধুরবাবু বললেন,—এবার ছবির তলায় কিছু আছে নাকি দেখুন তো।

কর্নেল ছবি তিনটে টেবিলে রাখলেন তারপর ব্রিফকেসটা উপুড় করে ঝাড়বার ভঙ্গি করলেন। বললেন,—নাঃ, আর কিচ্ছু নেই।

আমি বললুম,—ওপরের ডালার ভেতরে একটা চেন দেখতে পাচ্ছি।

আমি আর কিছু বলার আগেই কর্নেল চেন টেনে ভেতর থেকে কতকগুলো নেমকার্ড বের করলেন। তারপর বললেন,—নানা জায়গার নানা লোকের নেমকার্ড। এদের কেউ-কেউ কোনও কোম্পানির লোক।

মধুরবাবুকে হতাশ দেখাচ্ছিল। তিনি বিস্ময়ের সুরে আস্তে বললেন,—এই তিনটে ছবির জন্য বারিন অমন করে ভয় পেয়ে পালালই বা কেন? সে কি এই ছবিগুলোর জন্যই খুন হয়ে গেল? কর্নেলসাহেব আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে— আপনিই এই অদ্ভুত ঘটনার পিছনে কী আছে তা জানতে পারবেন, কারণ আপনার পরিচয় আমি ভালোই জানি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন,—ঘটনাটা রহস্যজনক তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই রহস্য ফাঁস করতে হলে আপনার সাহায্য দরকার। একটা কথা আপনাকে খুলেই বলি, আপনি যদি আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেন তবেই আমার পক্ষে ঠিকভাবে হাঁটা সম্ভব হবে।

মধুরবাবু বললেন,—আমি আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত। অবশ্য যদি এমন কোনও প্রশ্ন করেন যে বিষয়ে আমার জানা নেই তাহলে আমি ঠিক উত্তর দিতে পারব না।

এবার কে জানে কেন গোয়েন্দাপ্রবরের মুখে খি-খি হাসি শোনা গেল। তিনি বললেন,—এটা যে আদালতের ব্যাপার হইয়া গেল। যাহা বলিব সইত্য বলিব, মিথ্যা বলিব না।

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন,—ঠিক ধরেছেন। যাইহোক, মধুরবাবু প্রথমে আপনি আমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিন। বারিনবাবুর পুরো নাম কী? আর তার সঙ্গে কবে কোথায় কোন সূত্রে আপনার পরিচয় হয়েছিল?

মধুরবাবু বললেন,—বারিনের পুরো নাম, বারীন্দ্রনাথ সিনহা। ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ যদুগড় রাজ হাইস্কুলে। ওর বাবা ছিলেন রেলের অফিসার। যদুগড়ে বদলি হয়ে আসার পর বারিনকে তিনি ক্লাস সিক্সে ভরতি করে দেন। বারিন ছিল খুব আলাপি ছেলে। আমার সঙ্গে ওর হৃদ্যতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তখন আমার বাবা ছিলেন যদুগড় রাজপরিবারের ম্যানেজার। যাইহোক, আমরা দুজনে ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে পাটনার কলেজে পড়েছিলুম। বি.এ. পাশ করে বারিন কোথায় চলে গিয়েছিল জানি না। ওর বাবা রিটায়ার করে যদুগড়েই বাড়ি করেছিলেন। তাঁর কাছে বারিনের কথা জানতে চাইলে তিনি রাগ করে বলতেন, ওই হতভাগার কথা তুমি জিগ্যেস কোরো না আমাকে। আমি জানি না সে কোথায় কী করছে।

কর্নেল বললেন, তারপর বারিনের সঙ্গে আপনার আবার কবে দেখা হয়েছিল?

—আগেই বলেছি বছর দশেক আগে। সে যদুগড়ে কোনও কোম্পানির ব্যবসার কাজে এসেছিল।

—বারিনবাবুর বাবা কি তখন বেঁচে ছিলেন?

—না, তিনি মারা যাওয়ার পর বারিনের মা তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ভাগলপুরে। তারপর তিনি যদুগড়ের বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে জামাইয়ের কাছে গিয়ে থাকতেন।

—বারিন আপনার কাছে এসব কিছু জানতে চায়নি? নাকি সে তার মায়ের এবং বোনের খবর জানত?

মধুরবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—বারিন এ কথা জানত। সে বলেছিল, সে তখন বম্বেতে বড় একটা কোম্পানিতে কাজ করে। সেই কাজের সূত্রেই তাকে যদুগড়ে আসতে হয়েছে। আমি তাকে রাজবাড়িতে আমাদের কোয়ার্টারে থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু সে বলেছিল তার হাতে আর সময় নেই। এখুনি তাকে পাটনায় চলে যেতে হবে।

—আচ্ছা মধুরবাবু একটু স্মরণ করার চেষ্টা করুন তো, যদুগড়ে কোন ব্যবসায়ীর কাছে বারিনবাবু এসেছিলেন? তা কি তিনি আপনাকে বলেছিলেন?

মধুরবাবু চোখ বুজে কিছুক্ষণ আঙুল খুঁটলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন,—হ্যাঁ, বারিন আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি তাকে হরদয়াল ট্রেডিং এজেন্সির অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

কর্নেল বললেন,—ওই অফিসটা যে ব্যবসা সংক্রান্ত তা বোঝা যাচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন বা জানতেন ওরা কীসের ব্যবসা করত।

মধুরবাবু এবার বিকৃত মুখে বললেন,—হরদয়াল ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের ব্যবসা করত। কিন্তু যদুগড়ে ওর বদনাম ছিল স্মাগলার বলে। একবার ওকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল। হংকং থেকে

নেপাল থেকে যেসব ইলেকট্রনিক জিনিস চোরাচালান হয়, সেই চক্রের সঙ্গে হরদয়ালের যোগাযোগ ছিল।

—এখন কি ওই ট্রেডিং এজেন্সিটা আছে?

—তিন বছর আগে আমি যদুগড় থেকে চলে এসেছি। তখন ওটা ছিল, তা দেখেছি। হরদয়াল মারা গেলে তার ছেলে রামদয়াল ব্যবসা চালাত। এই তিন বছরে সেটা উঠে গেছে কি না জানি না।

কর্নেল বললেন,—আপাতত আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। এবার আপনি আপনার কলকাতার ঠিকানা দিন।

বলে কর্নেল একটা কাগজের প্যাড আর কলম এগিয়ে দিলেন। মধুরবাবু তাতে নিজের নাম, বাড়ির ঠিকানা লিখে দিলেন।

কর্নেল সেটা হাতে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে রেখে ব্রিফকেসের ছবিগুলো আগের মতো কাগজের মোড়কে ভরে রেখে দিলেন। তারপর তোয়ালেটা হঠাৎ কী খেয়ালে খুলে পায়ের কাছে ঝাড়লেন। তখনই দেখলুম তোয়ালের ভেতর থেকে একটা লম্বা-চওড়া খাম মেঝেয় ছিটকে পড়ল। মধুরবাবু বলে উঠলেন,—আরে ওটা আবার কী?

কর্নেল খাম খুলে একটা ভাঁজ করা খুব পুরোনো কাগজ বের করলেন। কাগজের ভাঁজগুলো কোথাও-কোথাও একটু আধটু ছিঁড়ে গেছে। সাবধানে ভাঁজখুলে অভ্যাসমতো তিনি আতস কাচের সাহায্যে দেখতে-দেখতে বললেন,—মধুরবাবু, রহস্য আরও ঘনীভূত হল মনে হচ্ছে।

মধুরবাবু সোফা থেকে একটু উঁচু হয়ে কাগজটা দেখতে-দেখতে বললেন,—এটা একটা ম্যাপ মনে হচ্ছে! ম্যাপটাতে শুধু আঁকিবুঁকি ছাড়া স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই।

কর্নেল বললেন,—আছে, তবে সেগুলোতে ইংরেজি এ বি সি ডি ইত্যাদি অক্ষর লেখা আছে। ম্যাপের দাগগুলো মোটা কিন্তু অক্ষরগুলো ছোট তাই সহজে চোখে পড়ে না।

মধুরবাবু জিগ্যেস করলেন,—এটা কীসের ম্যাপ বলে মনে হচ্ছে আপনার?

কর্নেল একটু থেমে বললেন,—এটা কোনও জায়গার ম্যাপ হতে পারে, তবে ও ম্যাপ আঁকার উদ্দেশ্য কী তা এখন অনুমান করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।

হালদারমশাই উত্তেজিত হয়ে বললেন,—কর্নেলস্যার, কোথাও কোনও দামি জিনিস লুকোনো আছে—এটা তারই ম্যাপ হইতে পারে না? জয়ন্তবাবু কী কন?

সায় দিয়ে বললুম,—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই। এটা যাকে বলে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের ম্যাপ।

মধুরবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন,—গুপ্তধন? বারিন কি কোনও গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছিল? তা না হলে এ ম্যাপ সে এঁকে লুকিয়ে রাখল কেন? কর্নেলসাহেব এখন আমার মনে হচ্ছে ছবিগুলোর জন্য নয়, এই লুকিয়ে রাখা ম্যাপটার জন্যই বারিনকে কেউ অনুসরণ করেছিল। আর এটা না পেয়েই রাগের চোটে সে বারিনকে খুন করে চলে গেছে।

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—মধুরবাবু আপনি কি ব্রিফকেসটা আপনার কাছে রাখতে চান?

মধুরবাবু হাত এবং মাথা জোরে নেড়ে বললেন,—না-না কর্নেলসাহেব, ওই সর্বনেশে জিনিস আমার কাছে রেখে আমি কি স্বেচ্ছায় কারও হাড়িকাঠে গলা গলিয়ে দেব? ওসব সাংঘাতিক জিনিস আপনিই রাখুন। আর আমার একটা অনুরোধ, বারিন আমার এক সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য আমার মনে খুব আঘাত লেগেছে। আপনি দয়া করে বারিনের খুনিকে পুলিশের হাতে তুলে দিন। আর সেইসঙ্গে সেই ম্যাপের রহস্যও ফাঁস করুন। আমাকে আপনি সবসময়েই পাবেন।

কর্নেল ম্যাপটা খামে ভরে তোয়ালের ভাঁজে রেখে ব্রিফকেসে ঢোকালেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর একটা নেমকার্ড বের করে মধুরবাবুকে দিলেন। বললেন,—দরকার হলে আপনি

আমাকে ফোন করবেন। আর যদি প্রয়োজন মনে করেন, আপনার দিদিকেও আমার কথা খুলে বলবেন। কারণ তাঁর সাহায্যও যে আমার লাগবে না এমন কথা বলা যায় না।

মধুরবাবু চলে যাওয়ার সময় আমাকে ও হালদারমশাইকেও নমস্কার করে গেলেন।

কর্নেল ব্রিফকেসটা নিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। বুঝতে পারলুম তিনি এই কেসটাতে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন। গুরুত্ব দেওয়ারই কথা, কারণ এই ব্রিফকেস কেন্দ্র করে যা ঘটেছে তা প্রচণ্ড রহস্যময়।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন,—আচ্ছা জয়ন্তবাবু, মধুরবাবুরে দেইখ্যা আপনার কী ধারণা হইল কন শুনি।

বললুম,—আপাত দৃষ্টিতে সাধাসিধে লোক বলেই মনে হল। একসময় খুব বিলাসিতায় জীবন কাটাতেন তা তো শুনলুম, কিন্তু এখন হয়তো তাঁর তেমন কিছু রোজগার নেই। বিধবা দিদির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ইচ্ছে করলে তিনি তো ব্রিফকেসটার তালা ভেঙে টাকাকড়ি সোনাদানা আছে কি না দেখতে পারতেন। অন্য লোকে অন্তত আগ্রহের জনও তেমনটি করে। কিন্তু উনি তা করেননি।

গোয়েন্দাপ্রবর একটিপ নস্যি নিয়ে নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন,—কিছু কওন যায় না। মাইনসের চেহারা দেইখ্যা বা কথা শুইন্যা কিছু বোঝা যায় না। জয়ন্তবাবু, চৌত্রিশ বৎসর চাকরি করসি—

এই সময়েই কর্নেল ফিরে এসে বললেন,—হালদারমশাই আপনার চৌত্রিশ বছরের পুলিশি অভিজ্ঞতা দিয়ে আপাতত একটা কাজ করে ফেলুন।

হালদারমশাই ব্যগ্রভাবে বললেন,—কন কর্নেলস্যার।

কর্নেল বললেন,—আপনাকে আমি নিহত বারিনবাবুর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। আপনি আজ সন্ধ্যার মধ্যেই একটা খবর এনে দিন। ও বাড়িতে বারিনবাবু কি একা থাকতেন, নাকি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ থাকত?

কথাটা শোনামাত্র গোয়েন্দাপ্রবর কোনও কথা বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

তিন

এমনিতেই রবিবারের দিনটা আমি কর্নেলের বাড়িতে কাটাই। কিন্তু কোনও রহস্যজনক ঘটনার পিছনে দৌড়োতে হলে কর্নেলের হাত থেকে আমার রেহাই মেলে না। তাছাড়া আমার স্বার্থও থাকে। কারণ সেই ঘটনার ভিত্তিতে পাতার পর পাতা রিপোর্টিং লিখে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ পাই এবং তাতে পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে সুনাম কুড়োই।

দুপুরে খাওয়ার পর অভ্যাসমতো ডিভানে চিত হয়ে ছিলুম। সেই সময় লক্ষ করলুম কর্নেল ঘরের ভেতর থেকে সেই ব্রিফকেসটা নিয়ে এলেন। তারপর সেটার ভেতর থেকে সেই ম্যাপটা বের করলেন। আমার চোখে ঘুমের টান এসেছিল, সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল কর্নেল ম্যাপটা খুঁটিয়ে দেখে তা থেকে কোনও সূত্র বের করবেন।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ঘুম ভাঙল ষষ্ঠীচরণের ডাকে। তার হাতে যথারীতি চায়ের কাপ-প্লেট। এটা বহুদিনের রীতি। ষষ্ঠী জানে ঘুমের পর আমি চা খেতেই ভালোবাসি। ডিভানে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে জিগ্যেস করলুম,—ষষ্ঠী তোমার বাবামশাই কি সাধের বাগান পরিচর্যা করতে গেছেন?

ষষ্ঠী ফিক করে হেসে বললে,—আজ্ঞে দাদাবাবু, উনি আমাকে বলে গেছেন, তোর দাদাবাবুকে বলবি তার গাড়িটা আমি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

এমন ঘটনা নতুন নয়। কিন্তু বরাবরই এতে আমার রীতিমতো অভিমান হয়। কেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে ওঁর কোনও অসুবিধা হয়? বললুম,—তোমার বাবামশাই কখন ফিরবেন তা কি বলে গেছেন?

ষষ্ঠী বলল,—আজ্ঞে না। বলেই সে চমকে ওঠার ভঙ্গি করল—এই রে! সাড়ে-চারটে বাজতে চলল। ছাদের বাগানের কথা ভুলেই বসে আছি।

সে দ্রুত চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল। চা খাওয়ার পর কাপ প্লেটটা নিয়ে সোফার কাছে গেলুম এবং সেটা সেন্টার টেবিলে রেখে দিলুম। ঠিক এই সময়ই টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই হালদারমশাইয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—কর্নেল স্যার, আমি হালদার কইত্যাসি।

কর্নেলের কণ্ঠস্বর নকল করার চেষ্টা করে বললুম—বলুন হালদারমশাই।

কিন্তু গোয়েন্দপ্রবরকে যতই অবহেলা করি, তাঁর কান প্রাক্তন পুলিশের কান। তিনি বললেন, —জয়ন্তবাবু, এখন জোক করার মুডে আমি নাই।

অগত্যা হাসতে-হাসতে বললুম,—আপনি কি ছদ্মবেশে আছেন, নাকি কেউ আপনাকে অ্যাটাক করেছিল?

হালদারমশাই বললেন,—বুসছি, কর্নেল স্যার ছাদের বাগানে আছেন। থাকলে প্লিজ শিগগির ডেকে দ্যান।

বললুম,—হালদারমশাই আপনার কর্নেল স্যার আমার গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালিয়েছেন।

—কী কাণ্ড! ষষ্ঠীরে কইয়া জাননি কিছু?

—ওই তো বললুম, ষষ্ঠীকে ঠিক ওই কথাটাই তিনি বলে গেছেন—জয়ন্তর গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছি!

—আপনি তখন কী করত্যাসিলেন?

—ঘুমোচ্ছিলুম। আপনি তো ভালোই জানেন দুপুরে আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস আছে।

—তা হইলে তো একটু গণ্ডগোল হইয়া গেল।

—কীসের গণ্ডগোল?

—কর্নেল স্যার থাকলে তেনার লগে কনসাল্ট করতাম।

—আপনি আমার সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারেন।

হঠাৎ ফোনের লাইন কেটে গেল। আমি কয়েকবার হ্যালো-হ্যালো করার পর রিসিভার নামিয়ে রাখলুম। তারপর কেন যেন মনে হল কেউ কি হালদারমশাইয়ের হাত থেকে ফোন কেড়ে নিল? একটু উদ্বেগ বোধ করলুম। এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক মাঝে মাঝে ভুলে যান তিনি এখন পুলিশ ইন্সপেক্টর নন, তাছাড়া জেদের বসে অনেক সময়েই এমন হঠকারি কাজ করে বসেন যে কর্নেলকে সেজন্য অনেক ছোটাছুটি করতে হয়।

এইসব ভাবতে-ভাবতে দৃষ্টি গেল সোফার নিচে। যেখানে মধুরবাবু বসে ছিলেন সেখানে সোফার তলায়ে কী একটা ছোট্ট চাকতির মতো জিনিস পড়ে আছে। তখনই হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলুম। ততক্ষণে ঘরের আলো কমে এসেছে। আগে কর্নেলের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিয়ে জিনিসটার দিকে তাকালুম। একটা তামার চাকতি বলেই মনে হল। চাকতিটার সাইজ এক টাকার কয়েনের মতো। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দেখতে-দেখতে আবিষ্কার করলুম চাকতির গায়ে অজানা ভাষার হরফে কীসব লেখা আছে। উলটো পিঠে একটা মূর্তি আঁকা। মূর্তিটা দেখতে ভয়ঙ্কর।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কর্নেলের ড্রইং রুমে দেশ বিদেশের বিস্ময়কর বহু জিনিস আছে বটে, কিন্তু সেগুলো সবই কাচের আলমারির ভেতর সাজানো আছে। এটা নিশ্চয়ই কর্নেলের নয়।

তাহলে কি এটা মধুরবাবুর পকেট থেকে দৈবাৎ তাঁর অজান্তে পড়ে গিয়েছিল? মনে পড়ল মাঝে-মাঝে তিনি রুমাল বের করে মুখ মুছছিলেন।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় শীতের আর পাত্তা নেই বরং বাইরে বেরুলে গরম লাগে। কিন্তু কর্নেলের ড্রইং রুমের ফ্যানের হাওয়া সত্ত্বেও উত্তেজনা মানুষকে ঘামিয়ে তুলতে পারে।

আরও একটু চিন্তার পর আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল, এটা কোনও দেশের প্রাচীন মুদ্রাও হতে পারে। কিন্তু মধুরবাবু এটা পাঞ্জাবির ডান পকেটে না রেখে বাঁ-পকেটে রেখেছিলেন কেন, যে পকেটে কি না রুমাল ভরা আছে।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠী ছাদ থেকে নেমে এসে ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল। তারপর মুচকি হেসে বলল,—দাদাবাবু টিকটিকিবাবু আসছেন।

ষষ্ঠী হালদারমশাইকে টিকটিকিবাবু বলে। মিনিট দুই-তিন পরে ডোরবেল বাজল। ষষ্ঠী পিছনের করিডোর দিয়ে গিয়ে বাইরের লোকেদের জন্য দরজা খোলে। কিন্তু তাকে দরজা খুলতে নিষেধ করে আমি নিজেই ড্রইংরুমের সংলগ্ন ছোট ওয়েটিং রুমটা দিয়ে এগিয়ে গেলুম। তারপর দরজা খুললুম।

হালদারমশাইকে দেখে অবাক হয়ে বললুম,—কার সঙ্গে মারামারি করে এলেন? আপনার কপালে ছোট একটা ব্যান্ডেজ দেখছি। ডান হাতের বুড়ো আঙুলেও পট্টি বাঁধা।

হালদারমশাই বাঁকা হেসে বললেন,—ও কিছু না। কর্নেল স্যার ফেরেন নাই?

বললুম,—না।

ড্রইংরুমে এসে হালদারমশাই ধপাস করে সোফায় বসে বললেন,—এক গ্লাস জল খামু। ষষ্ঠীরে ডাকেন।

আমি হাঁক দিলুম,—ষষ্ঠী, শিগগির এক গ্লাস জল নিয়ে এসো।

ষষ্ঠী তখনই জল এনে দিল। তারপর তার টিকটিকিবাবুর ক্ষতচিহ্নের দিকে তাকিয়ে কিছু জিগ্যেস করতে ঠোঁট ফাঁক করল। কিন্তু আমি তাকে চোখ টিপে নিষেধ করে ইশারায় চলে যেতে বলুলম। কারণ, হালদারমশাই এখন অন্য মেজাজে আছেন। ষষ্ঠীকে ধমক দিতেও পারেন।

ষষ্ঠী চলে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলুম,—মনে হচ্ছে আপনার ওপর কেউ হামলা করেছিল।

হালদারমশাই জলের গ্লাস রেখে এক টিপ নস্যি নিলেন, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে সেই নোংরা রুমাল বের করে নাক মুছে বললেন,—আইজ একটু ভুল করসিলাম। সঙ্গে আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা ছিল না। আর্মস ছাড়া আমি কখনও কোনও স্পটে যাই না। আসলে কর্নেল স্যারের কথা শুইন্যাই সোজা স্পটে চলে গিসলাম।

—তা আপনার ওপর হামলা করল কে?

গোয়েন্দাপ্রবর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,—আমি তখন আপনার লগে ফোনে কথা কইতেসিলাম। সেই ফোনটা পাইসিলাম একটা ফার্মেসিতে। আইজ রবিবার, কিন্তু ফার্মেসিটা খোলা ছিল। আপনার লগে কথা কইত্যাসি, এমনসময়ই এক হালায় হঠাৎ আমার পিছন থিক্যা ফোনটা কাড়বার চেষ্টা করল। ফার্মেসির মালিক কর্মচারী সবাই মনে হল লোকটারে ভয় পায়। তারা চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকল। এদিকে আমি এমন কাণ্ড দেইখ্যা একটুখন অবাক হইসিলাম। ফোনটা কাড়িয়া লইয়া লোকটা কইল,—এক্ষুনি এখান থেইক্যা কাইট্যা পড়ো। নইলে এই দেখসো আমার কী আসে!

জিগ্যেস করলুম,—ছোরা ছুরি নাকি ফায়ার আর্মস?

হালদারমশাই জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা একখান ছোরা।

জিগ্যেস করলুম,—আপনাকে কি সে ওটা দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করেছিল?

গোয়েন্দাপ্রবর বাঁকা হেসে বললেন,—নাঃ, আমিই হালার হাত থেইক্যা ড্যাগারখান কাইড়া লইছি। কাড়াকাড়ির সময় আমার কপালে আর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে ড্যাগারের ডগা একটুখানি লাগসে।

—তারপর কী হল?

—হালার প্যাটে হাঁটুর গোঁত্তা এমন জোরে মারসি, সে তখনই টেলিফোন শুদ্ধু নিচে গড়াইয়া পড়সিল। তারপর আর সাড়াশব্দ নাই।

—তার মানে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?

—হঃ! তো আমি ফার্মাসিতে কইলাম আমারে দুইখান ব্যান্ডেজ লাগাইয়া দিন।

দোকানের একজন কর্মচারী আমার হুকুম পালন করল। আমি তারে কইলাম,—আমি কে আপনারা জানেন? লালবাজারের ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক। অমনি দ্যাখলাম যেটুকু ভিড় জমসিল, তখনই সাফ হইয়া গেল। আমি বুক ফুলাইয়া রাস্তায় নাইম্যা একটা ট্যাক্সি ডাকলাম।

—আর লোকটা ওখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল?

এবার গোয়েন্দ্রপ্রবর খোলা মনে হেসে বললেন,—আমি আর পিছু ফিরি নাই।

—লোকটা কে তা চিনতে পেরেছিলেন?

—না। তবে এইটুকু বুঝঝি হালা আমারে জগদীশবাবুর বাড়ি থিক্যা ফলো কইরা আইছিল।

—জগদীশবাবু কে?

—কমু। কর্নেল স্যারেরে আইতে দিন, তারপর ডিটেলস সব জানতে পারবেন।

কর্নেল এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। তখন প্রায় ছ'টা বাজে। তিনি এসেই হালদারমশাইকে দেখে বলে উঠলেন,—যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটেছে দেখছি। তখন আপনি আমার কথা শুনেই বেরিয়ে গেলেন, আমি সুযোগ পেলুম না যে আপনাকে একটু সাবধান করে দেব।

হালদারমশাই বললেন,—ও কিসু না। তারপর পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা ড্যাগার বের করে বললেন,—কর্নেলস্যার, আপনি তো জানেন আমার মাথা আফটার অল—।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—পুলিশের মাথা—এই তো? যাই হোক, বসুন আমি পোশাক বদলে আসি। আর জয়ন্ত, তোমার গাড়ি চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য এই বৃদ্ধের প্রতি মনে-মনে খুব রেগে আছ। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, তোমার কেমন চমৎকার একটা ভাত-ঘুম হয়ে গেল। বলবে, তুমি সঙ্গে গেলে কি আমার কোনও অসুবিধে হতো? হ্যাঁ, হতো।

বলে তিনি ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি হালদারমশাইয়ের হাত থেকে ভাঁজ করা ড্যাগারটা খুলে ফেললুম। ছ'ইঞ্চির বেশি লম্বা শান দিয়ে ধারাল করা অস্ত্র। হালদারমশাই ছোরাটা আমার হাত থেকে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন,—মনে হইত্যাসে ষষ্ঠীচরণ এখনই কফি লইয়া আইবে। সে ফায়ার আর্মস দেইখ্যা ভয় পায় না, কিন্তু ড্যাগার দেইখ্যা খুব ভয় পায়।

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। তাঁর পেছনে ষষ্ঠীচরণও কফি আর দু-প্লেট স্ন্যাকস নিয়ে এসে গেল। এবং সেন্টার টেবিলে ট্রে-টা রেখে চুপচাপ চলে গেল।

এরপর কিছুক্ষণ আমরা কফি পানে মন দিলুম। কফি শেষ করে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, —এবার হালদারমশাইয়ের রিপোর্ট শোনা যাক।

হালদারমশাই ইনিয়ে-বিনিয়ে যে ঘটনা শোনালেন, তা সংক্ষেপে এই :

কর্নেলের কথা অনুসারে হালদারমশাই বারিনবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। বাড়িটার মালিক একজন অবাঙালি ভদ্রলোক। তাঁর নাম, জগদীশ প্রসাদ রাও। বাড়িটা দোতলা, এবং নতুন। ওই গলির মধ্যে বাড়িটা চোখে পড়ার মতো। সামনের একটা গেট আছে, ভেতরে ছোট্ট একটা লন। সামনের অংশটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এবং পাঁচিলে কাঁটাতারের বেড়া আছে। হালদারমশাই গেটের

কাছে গিয়ে দারোয়ানকে ডাকেন। তারপর দারোয়ানের হাতে তাঁর নেমকার্ড দিয়ে বলেন, বাড়ির মালিকের সঙ্গে তাঁর দেখা করা জরুরি। দারোয়ান বলে তার সাহেব এখন বিশ্রাম করেছেন। দেখা করতে হলে চারটের পর আসতে হবে।

হালদারমশাই একটু গলা চড়িয়ে ইংরেজিতে বলেন, তিনি একজন ডিটেকটিভ। এবং এই বাড়িতে আজ যে ভদ্রলোক খুন হয়েছেন তাঁর আত্মীয় তাঁকে এই খুনের তদন্তের ভার দিয়েছেন। এতে কাজ হয়। ডান দিকে দোতলার একটা ঘরের দরজা খুলে ব্যালকনিতে এক ফরসা রঙের ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন। তিনি কথাটা শুনতে পেরেছিলেন। তাই দারোয়ানকে বলেন, হালদারমশাইকে যেন নিচের বসার ঘরে নিয়ে আসে।

এরপর জগদীশবাবুর সঙ্গে হালদারমশাইয়ের কথাবার্তার আর বাধা ছিল না। জগদীশবাবু বলেন, নিহত বারিনবাবু ছিলেন তাঁর একজন বন্ধুমাত্র, তার বেশি কিছু নয়। গত মাসে বারিনবাবুকে তাঁর বাড়িতে থাকার জন্য অনুরোধ জানান। জগদীশবাবুর ফ্যামিলি মাসখানেকের জন্য দেশে গেছে। তাঁর দেশের বাড়ি হরিয়ানায়। কাজেই দোতলার যে ঘরটা আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠ কারো জন্য খালি রাখা হয়, অর্থাৎ তাঁর গেস্টরুম, সেখান তিনি বারিনবাবুকে অস্থায়ী ভাবে থাকতে দিয়েছিলেন। বারিনবাবুর কাছে এযাবৎ কোনও লোক দেখা করতে আসেননি। ওঘরে একটা বাড়তি টেলিফোন আছে, সেটা তিনি বারিনবাবুকে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

এসব কথা হালদারমশাই তাঁকে প্রশ্ন করেই জানতে পেরেছেন। এরপর হালদারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে জগদীশবাবু বলেন, গতরাত্রে কখন এমন একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটেছে তিনি টের পাননি। দারোয়ানও এতটুকু জানতে পারেনি। বারিনবাবু পাড়ার একটা হোটেলের সঙ্গে নিজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। কারণ, উনি কখন খাবেন তার কোনও সময়ের ঠিক ছিল না।

এরপর হালদারমশাইকে নিয়ে তিনি দোতলায় বারিনবাবুর ঘরে যান। পুলিশ যা তদন্ত করার করে নিয়ে চলে গেছে। তাই ঘরের চাবি জগদীশবাবুর কাছে আছে। ঘরে ঢুকে হালদারমশাই যথাসাধ্য খুঁটিয়ে দেখে কোনও সূত্র পাওয়ার চেষ্টা করেন। ঘরের রক্ত ততক্ষণে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। জগদীশবাবু তাকে বলেন, তাঁর ধারণা কোনও চেনা লোক বারিনবাবুর কাছে এসেছিল। কিন্তু সে তা হলে নিশ্চয়ই পাঁচিলের কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকে ছিল। এমনকী জগদীশবাবুর ধারণা, তাকে বারিনবাবুই গভীর রাতে কোনও এক সময় পাঁচিল ডিঙিয়ে আসতে বলেছিল। পুলিশ দেখেছে দারোয়ানের ঘরের পাশে একটা বকুলগাছ আছে। সেই বকুলগাছে খুনির আসার চিহ্ন পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। এখন জগদীশবাবুর আক্ষেপ, তিনি বারিনবাবুর ওপর কেন যে এত আস্থা রেখেছিলেন বুঝতে পারছেন না।

এসব কথা বলার পর হালদারমশাই একটু দম নিয়ে বললেন,—ঘরে বারিনবাবুর যেসব জিনিস ছিল, তা পুলিশ সিজ কইরা লইয়া গ্যাসে, কিন্তু আমার মনে একখান ধন্ধ ঢুকসে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—কী ধন্ধ?

গোয়েন্দপ্রবর খুব চাপা স্বরে বললেন,—কর্নেলস্যার, আমার সন্দেহ, বারিনবাবুরে ওই জগদীশবাবুই খুন করসেন।

কর্নেল বললেন,—সেটা অসম্ভব কিছু নয়।

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর বললেন, —বলুন মধুরবাবু....বলেন কী? আপনার লেটার বক্সে হুমকি দেওয়া চিঠি? ঠিক আছে, কাল দিনের বেলায়—ধরুন, সকাল নটার মধ্যে আপনি চলে আসুন।

চার

সেই সন্ধ্যায় কর্নেল হালদারমশাইকে জগদীশবাবুর কাজ কারবারের খোঁজ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছিলেন। হালদারমশাই চলে যাওয়ার পর আমি সোফার নিচে কুড়িয়ে পাওয়া সেই চাকতিটা কর্নেলকে দেখিয়েছিলুম। চাকতিটা যে মধুরবাবুর পকেট থেকেই পড়েছে, আমার এই ধারণার কথাও বলেছিলুম। কিন্তু কর্নেলের মতে ওই চাকতিটা তোয়ালের ভাঁজের ভেতরেই সম্ভবত রাখা ছিল। সোফার নিচে কার্পেটের ওপর তোয়ালেটা লম্বা করে ঝেড়ে ফেলার সময় অবশ্য কোনও শব্দই শোনা যায়নি। তারপর কর্নেল আমাকে অবাক করে বলেছিলেন,—তুমি এটাকে তামার চাকতি ভাবছ, কিন্তু এটা আসলে একটা ব্রোঞ্জের সিল।

আতস কাচের সাহায্যে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সিলটা পরীক্ষা করে দেখার পর কর্নেল বলেছিলেন,—প্রাচীন লিপি বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান, তাতে মনে হচ্ছে, এই লিপিগুলি ব্রাহ্মি। আর উলটো পিঠে যে মূর্তিটা দেখছ, সেটা বৌদ্ধ ধর্মের এক অপদেবতার। তার নাম 'মার'।

রহস্যটা ক্রমেই এত জটিল হয়ে উঠল দেখে সে রাতে আমার ভালো ঘুমই হয়নি। সকালে বেড-টি খাওয়ার পর বাথরুমে গিয়েছিলুম, তারপর প্যান্টশার্ট পরে সাধের বাগানে যাব ভাবছিলুম। কারণ কর্নেলের এখন ছাদেই থাকার কথা। কিন্তু চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে ড্রইং রুমের ভেতর থেকে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুন। ড্রইংরুমে গিয়ে দেখি মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যে বিরক্ত মুখে সোফায় বসে আছেন। মনে হল ভদ্রলোক আমার মতোই বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন। সবে আটটা বাজে, তাই বোঝা যায় উনি ঘুম থেকে উঠেই এখানে চলে এসেছেন।

আমাকে দেখে তিনি নমস্কার করলেন। আমি একটু তফাতে বসে জিগ্যেস করলুম,—হাতের লেখা দেখে মধুরবাবু কি কাউকে চিনতে পেরেছেন?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—জয়ন্ত, মাঝে-মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করো আমার অবাক লাগে।

বললুম,—বাঃ, অবাক লাগার কী আছে? মধুরবাবু এতবছর দিদির বাড়িতে বাস করেছেন, কতরকম লোকের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা থাকা তো স্বাভাবিক। তাদের হাতের লেখা দেখতে পাওয়াও অসম্ভব কিছু নয়।

মধুরবাবু বিষণ্ণমুখে বললেন,—হাতের লেখা দেখে আমার মনে হয়েছে কেউ কোনও কমবয়সি ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে চিঠিটা লিখিয়েছে। কর্নেল সাহেবও আমার কথা স্বীকার করেছেন।

কর্নেল বললেন,—হাঁ, এটা যে-কোনও কমবয়েসি এবং বানান ভালো না জানা ছেলে বা মেয়েকে দিয়ে লেখানো হয়েছে, এতে আমি নিঃসন্দেহ। তুমি নিজেই পুরো চিঠিটা পড়ে দ্যাখো।

চিঠিটা নিয়ে দেখলুম, একটা একসারসাইজ খাতার পাতা ছিঁড়ে আঁকাবাঁকা হরফে এবং ভুল বানানে লেখা আছে, 'মধুরকেষ্ট মালটা তুমি যে হাতিয়েছ তা জানি। আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে ওটা তুমি আউটরাম ঘাটে গঙ্গার ধারে সেই বেঞ্চিতে যদি রেখে না আসো, তা তোমার মুণ্ডুতেও একটা গুলি ঢুকে যাবে। ইতি—'

চিঠিটা পড়ার পর বললুম,—একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, বারিনবাবুকে যে শুক্রবার গঙ্গার ধারে ফলো করে গিয়েছিল, সে সম্ভবত দূর থেকে মধুরবাবুর হাতে ব্রিফকেসটা দেখেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল মধুরবাবুর মতো নিরীহ মানুষের কাছ থেকে সে তো শুক্রবার রাত্রেই সোজা ওঁর দিদির বাড়িতে ঢুকে ওটা কেড়ে নিয়ে আসতে পারত। বিশেষ করে তার কাছে যখন পিস্তল বা রিভলভার আছে।

মধুরবাবু বললেন,—আমার দিদিকে আপনি দেখেননি। সে পাড়ায় খুব জনপ্রিয়। তার ডাকে পাড়াশুদ্ধ এসে হাজির হবে। এই চিঠি যে লিখেছে সে নিশ্চয়ই একথাটা জানে।

কর্নেল বললেন,—লোকটা যে আপনার অলক্ষ্যে আপনাকে কাল সকালে বা আজ সকালে ফলো করে আসেনি, কে বলতে পারে? আমার ধারণা ব্রিফকেসটা ফেরত নেওয়ার জন্য সে তিন দিনের সময় দিয়েছে, তার কারণ সে জানে ওটা আপনার কাছে নেই।

আমি বললুম,—তা হলে খালি ব্রিফকেসটা মধুরবাবুর হাতে দিয়ে পুলিশের সাহায্যে একটা ফাঁদ পাতলেই তো হয়। যেই লোকটা মধুরবাবুর হাত থেকে ব্রিফকেস নেবে অমনি তাকে পুলিশ এবং আমরা পাকড়াও করে ফেলব।

কর্নেল হাসলেন,—জয়ন্ত, লোকটা যেই হোক, সে অত বোকা নয়।

মধুরবাবু কাতর মুখে বললেন,—আমার কলকাতায় থাকতে এখন খুবই আতঙ্ক হচ্ছে। তিনদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি সে কথামতো, ব্রিফকেসটা না পায়, তাহলে প্রচণ্ড ক্রোধে আমাকে হয়তো মেরে ফেলবে। দিদিও বলছিল কর্নেলসাহেবরা যা করার করবেন, আমি যেন চুপি-চুপি যদুগড়েই ফিরে যাই। কুমারবাহাদুরের রাগ এতদিনে পড়ে গেছে, তাছাড়া ওঁর মেয়ে আমাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখেছে, কাজেই যদুগড়ে ওঁদের আশ্রয়ে থাকলে আমি নিরাপদে থাকতে পারব।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কিছু ভাবছিলেন। তিনি চোখ না খুলেই বললেন,—এই প্ল্যানটা মন্দ নয়। আপনি বরং আজই যদুগড়ে চলে যান। যাতে সেই লোকটা আপনাকে ফলো করার সুযোগ না পায় সেইজন্য আপনি একটা ট্যাক্সি করে অলিগলি ঘুরতে-ঘুরতে হাওড়া স্টেশনে চলে যাবেন। ট্যাক্সিওলা জিগ্যেস করলে বলবেন, আমার ইচ্ছে মতো আমি যাব। তোমার তো মিটারের অঙ্ক বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে।

মধুরবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—এই অবস্থায় তাই করতে হবে।

টাকাকড়ি আমার হাতে তত নেই। দিদির কাছে ধার চাইলে অবশ্য পেয়ে যাব। দিদি জামাইবাবুর প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা ছাড়াও মাসে-মাসে পেনসেন পাচ্ছে। তাছাড়া নিজের বাড়ি। একতলায় ভাড়াতে আছে।

কর্নেল বললেন,—বাঃ, তাহলে তো কোনও অসুবিধেই নেই। আপনি আজই সুযোগমতো কলকাতা থেকে কেটে পড়ুন। প্রয়োজনে আমি কুমারবাহাদুরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনার খবর নেব।

মধুরবাবু করজোড়ে বললেন,—কিন্তু কর্নেলসাহেবকে একটু অনুরোধ, এইসব ঘটনার কথা যেন কুমারবাহাদুরের কানে না যায়।

—না, না, সে নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় যদুগড়ের রাজবাড়িতে—তাই না! তাই আপনার খবর নিতে আমার কোনও অসুবিধে নেই।

মধুরবাবু আমাদের দু-জনকে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলুম কর্নেলের একদফা কফি খাওয়া হয়ে গেছে। তাই বললুম,—এমন জমজমাট রহস্যের গোলকধাঁধায় পড়ে আমার নার্ভ অসাড় হয়ে গেছে। রাত্রে ভালো ঘুমও হয়নি।

কর্নেল এবার তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন এবং যথারীতি ষষ্ঠীকে দেখলুম পরদার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। কর্নেল হাঁক দিয়ে বললেন,—ষষ্ঠী, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কফি না আনলে তোর গর্দান যাবে।

ষষ্ঠীর মুখ পরদার আড়ালে হারিয়ে গেল। বললুম,—কর্নেল, গত রাতে আমি লক্ষ করেছি আপনি আপনার বেডরুমে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কী যেন করছিলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি বৌদ্ধযুগের ওই ব্রোঞ্জের সিলটা একটা সিল সংক্রান্ত পুরোনো বইয়ের পাতায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলুম।

—খুঁজে পেয়েছেন তো?

—হ্যাঁ, রাত একটা নাগাদ ওই সিলটার ছবি খুঁজে পেয়েছি। ওটা থেরবাদী, অর্থাৎ বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের একটা সিল। ঐতিহাসিক ডক্টর ফার্গুসন লিখেছেন এই সিল-এ পালি ভাষায় এবং ব্রাহ্মি লিপিতে যা লেখা আছে, তাতে প্রাচীন মগধ অর্থাৎ আধুনিক বিহারের একটা মঠে লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের আভাস পাওয়া যায়।

চমকে উঠে বললুম,—তা হলে ঘুরে-ফিরে গুপ্তধনের কথাই ফিরে আসছে।

—হ্যাঁ। আসছে বটে। এবার শুনলে তুমি আরও অবাক হবে সিল-এর যে পিঠে অপদেবতা মার-এর মূর্তি খোদাই করা আছে, তার নিচের দিকে কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখা আতস কাচে লক্ষ করে আমি একটা কাগজে তা নকল করেছি। তারপর তোয়ালের ভেতর লুকিয়ে রাখা পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া কাগজটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে অবাক হয়েছি। সিল-এর আঁকাবাঁকা রেখাগুলো আসলে একটা ম্যাপ। যে ম্যাপ বড় আকারে পুরোনো কাগজে আমরা দেখেছি।

এই সময়েই ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাকস রেখে গেল। কফি খেতে-খেতে বললুম, —আমার নার্ভ চাঙ্গা হতে শুরু করেছে। আমার চোখে এখন কী ভাসছে জানেন?

কর্নেল বললেন,—প্রাচীন মগধ। অর্থাৎ আধুনিক বিহার।

আমি উত্তেজিত ভাবে বললুন,—কর্নেল, এমনকী হতে পারে না, বিহারের কোথাও সেই মঠের ধ্বংসাবশেষ বারিনবাবু আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু গুপ্তধন নিশ্চয়ই খুঁজে পাননি। আপনি কী বলেন?

—ঠিক বলেছ ডার্লিং।

হাসতে-হাসতে বললুম,—যাক, অনেকদিন পরে আবার আপনার মুখ থেকে ডার্লিং শব্দটা বেরোল। তার মানে আপনার অঙ্ক ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

—নিছক অঙ্ক নয়, মনে হচ্ছে সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। অর্থাৎ ভগ্নাংশের অঙ্ক। তাই বড় জটিল।

একটু পরে বললুম,—আপনি যদুগড়ে হয়তো অনেকবার গেছেন। কারণ, সেখানকার রাজবংশের কুমারবাহাদুর আপনার বন্ধু। যদুগড় অঞ্চলে নিশ্চয়ই অনেক ঘোরাঘুরি করেছেন। ওখানে কি কোথাও বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করেননি?

কর্নেল হাসলেন,—ভগ্নাংশটা তুমি নিমেষে সমাধান করে ফেললে?

—এমনকী হতে পারে না? বিহারে তো বহু জায়গায় বৌদ্ধদের কীর্তিকলাপের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় ডোরবেল বাজল। তিনি অভ্যাসমতো হাঁকলেন, —ষষ্ঠী—

একটু পরে সবেগে প্রবেশ করলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। তিনি সোফায় বসে বললেন,—মর্নিং কর্নেলস্যার। মর্নিং জয়ন্তবাবু।

কর্নেল বললেন,—কোনও সুখবর এনেছেন মনে হচ্ছে হালদারমশাই!

হালদারমশাই মুচকি হেসে বললেন,—খবর একখান আনসি, তা সু কিংবা কু এখনও জানি না। তবে আগে ষষ্ঠীর হাতের কফি খামু, নার্ভ চাঙ্গা করুম, তারপর সব কমু।

ষষ্ঠী হালদারমশাইকে দরজা খুলে দিয়েই তাঁর জন্য স্পেশাল কফি তৈরি করতে গিয়েছিল। শিগগির সে সেই কফি নিয়ে এল।

হালদারমশাই কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—আঃ!

ষষ্ঠী দাঁড়িয়ে আছে দেখে কর্নেল বললেন,—ওঃ, বুঝেছি। তুই বাজার যাবি।

ষষ্ঠী বলল,—আধঘণ্টা লেট হয়ে গেল। টাটকা মাছ আর পাব কিনা কে জানে?

কর্নেল উঠে গেলেন। বুঝলুম ষষ্ঠীকে বাজারের টাকা দিতে যাচ্ছেন। সেই সুযোগে আমি চুপি-চুপি জিগ্যেস করলুম,—কী খবর এনেছেন, তার একটু আভাস দিন না হালদারমশাই।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন,—জগদীশবাবুর কাজ কামের হদিশ পাইসি।

কী হদিশ শোনার সুযোগ পেলাম না। কর্নেল এসে গেলেন। ইজিচেয়ারে বসে তিনি চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন,—এবার আপনার খবরটা বলে ফেলুন হালদারমশাই।

হালদারমশাই তেমনই চাপাস্বরে বললেন,—জগদীশবাবুর ব্র্যাবোর্ন রোডে ব্যবসার অফিস আছে।

—কীসের ব্যবসা?

কর্নেলের প্রশ্নের উত্তরে হালদারমশাই আরও চাপা গলায় বললেন,—নীলামের ব্যবসা। আইজ সকাল সাতটায় ওনার বাড়িতে আবার গিসলাম। একটুখান মেক-আপ করসিলাম। মাথায় পরচুলা আর গোঁফ-দাড়ি ছিল। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। জগদীশবাবুর গাড়ি বার হইয়া গেল, তারপর দেখলাম জয়ন্তবাবুর বয়েসি একজন ইয়াং ম্যান ওনার বাড়ি ঢুকত্যাসে। অমনি তারে গিয়া কইলাম, জগদীশবাবুর লগে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। লোকটি কইল, তিনি তো কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছেন। আপনি কে? কইলাম আমি ভবানীপুরের এক জমিদার বাড়ির থিক্যা আসত্যাসি। আমার নাম রাখালচন্দ্র বিশ্বাস। আমার কর্তামশাইয়ের টাকার অভাব। তাই উনি আমারে এখানে আইতে কইলেন। জগদীশবাবু নাকি পুরোনো মাল বেচাকেনার কারবার করেন। যুবকটি কইল, তাহলে আপনি দুপুর একটা নাগাদ স্যারের অফিসে দেখা করবেন। আমি কইলাম, ঠিকানা? সে তার পকেট থেইক্যা এই কার্ডখান বার কইরা আমাদের দিল।

বলে গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেলকে একটা কার্ড দিলেন।

কর্নেল সেটা পড়তে-পড়তে বললেন,—হ্যাঁ, ভদ্রলোক দেখছি পুরোনো আসবাব পত্রের বেচাকেনা করেন। মহাবলী অকসন হাউস। অবশ্য এই নিলামের কারবারিরা সুযোগ পেলে গোপনে প্রত্নদ্রব্যেরও ব্যবসা করেন। যাইহোক, আপনি একটা কাজের মতো কাজ করেছেন। যুবকটিকে তার নাম জিগ্যেস করেননি?

—করসিলাম। কইল, স্যারেরে কইবেন চঞ্চল সাহা আপনারে এই কার্ড দিছেন। সে আরও কইল, আমি ওনার একজন এজেন্ট।

আমি বললুম,—কর্নেল, ভগ্নাংশটা আর তো তবে জটিল মনে হচ্ছে না।

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। হালদারমশাই বললেন,—আমার সন্দেহ বারিনবাবু এই ব্যবসার লগে যুক্ত ছিল। আমি এখনও কইত্যাসি জগদীশবাবুই বারিনবাবুরে খুন করসেন।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—হালদারমশাই, আপনি এক কাজ করুন। এখনই মধুরবাবুর বাড়ি চলে যান। গিয়ে তাকে বলুন তার সঙ্গে আপনিও যদুগড়ে যাবেন। আপনার পরিচয় তো মধুরবাবু পেয়েছেন। আপনি এবার ওঁর দিদি নিরুপমার সঙ্গে দেখা করে আপনার আইডেনটিটি কার্ড দেখিয়ে বলবেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনাকে মধুরবাবুর বিপদে সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। নিরুপমাদেবী যেন আমাকে ফোন করে কথাটা যাচাই করে নেন। আর একটা কথা। সামান্য কিছু টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে আপনার এজেন্সির কনট্র্যাক্ট পেপারে ওঁদের সই করিয়ে নিন। বলবেন আইনের স্বার্থে এটা করা দরকার।

—হ বুসসি। কনট্র্যাক্ট পেপারে সই করলে মধুরবাবু আমার ক্লায়েন্ট হইয়া যাবেন। কোনও ঝামেলা বাধলে ওই কনট্র্যাক্ট পেপার আমার কাজে লাগবো।

কথাটা বলেই তিনি যথারীতি বেরিয়ে গেলেন। আমি বললুম,—তা হলে হালদারমশাই আর মধুরবাবু যদুগড়ে চলে যাচ্ছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—অপেক্ষা করো, আমরাও যদুগড়ে যাব। তার আগে শুধু ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্পষ্টভাবে গড়ে নিতে হবে।

আমি জিগ্যেস করলুম,—আচ্ছা কর্নেল, ওই তিনটে ছবি সম্পর্কে কি কোনও চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

—ও নিয়ে এখন চিন্তা-ভাবনা করে লাভ নেই। ছবি তিনটে দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনও রাজপরিবারের ছবি।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন,—প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। আমরা ব্রেকফাস্ট করে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব।

—কোথায় যাবেন?

—এখন কোনও প্রশ্ন নয়। যথাসময়ে তুমি নিজেই তা জানতে পারবে।

পাঁচ

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললুম,—কাল বিকেলে আপনি একা এই গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন জিগ্যেস করতে ভুলে গিয়েছি।

কর্নেল বললেন,—পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুবিমল চক্রবর্তীর কাছে। তোমাকে সঙ্গে না নেওয়ার কারণ ছিল। ডক্টর চক্রবর্তীকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। সেবার একটা দুষ্পাঠ্য প্রাচীন লিপির অর্থোদ্ধারে—

কথাটা মনে পড়ায় বললুম,—ও সেই রাগি ভদ্রলোক? যিনি চেঁচিয়ে কথা বললে ভাবেন তাঁকে ঠাট্টা করা হচ্ছে, আবার আস্তে কথা বললেও ভাবেন তাঁকে ব্যঙ্গ করে করা হচ্ছে?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—কাজেই বুঝতেই পারছ, তোমাকে আবার দেখলে উনি খাপ্পা হয়ে আমাকেও ভাগিয়ে দিতেন। তোমাকে বলেছিলুম মনে পড়ছে, যাঁরা কানে কম শোনেন, তাঁরা খুব সহজেই রেগে যান।

—ওঃ সে এক সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। আপনি না থাকলে ভদ্রলোক আমাকে বিনা দোষে লাঠিপেটা করে ঘর থেকে বের করে দিতেন। তো কালকে আপনি ওই বৌদ্ধ সিলটা ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন?

—ঠিক ধরেছ, ডক্টর চক্রবর্তীর মতে ওই সিলটা তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দির মাঝামাঝি সময় তৈরি হয়েছিল। তা ছাড়া ওঁকে ম্যাপটাও দেখিয়েছিলুম। ওঁর মতে ম্যাপে যে ইংরেজি অক্ষরগুলো লেখা হয়েছে, তা কোনও শব্দের প্রথম অক্ষর। যাই হোক, গাড়ি চালাতে-চালাতে কথা বললে অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে। দেখছ না এখন পিক আওয়ার শেষ হয়নি।

কর্নেলের নির্দেশে আমি পার্ক স্ট্রিট দিয়ে ধর্মতলার মোড়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন প্রচণ্ড জ্যাম। একটু বিরক্ত হয়ে বললুম,—আমরা যাচ্ছিটা কোথায় বললে কি আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হবে!

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সহস্যে বললেন,—না। তবে তোমাকে একটা চমক দেওয়ার ইচ্ছে আছে। কাজেই তুমি চুপ করে থাকো।

এরপর সেন্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে সোজা বিডন স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছুলাম। কর্নেল ডাইনে বিডন স্ট্রিটে গাড়ি ঢোকাতে ইঙ্গিত দিলেন। কয়েকটা বাড়ির পর বাঁদিকের একটা গলির মুখে উনি গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—এখানে পার্ক করে রাখো, কোনও অসুবিধে হবে না।

গাড়ি লক করে কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। গলির ভেতর কিছুটা এগিয়েই দেখি ডানদিকে প্রাচীন আমলের একটা বিরাট দেউড়ি। তার ভেতরে তেমনি প্রাচীন একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির গড়নে ইতালীয় ভাস্কর্যের ছাপ স্পষ্ট। একতলা এবং দোতলায় মোটা-মোটা থাম। লনের দুপাশে ফুলের সমারোহ। গেটে কর্নেলকে দেখামাত্র একজন পেল্লাই চেহারার গুঁফো লোক সেলাম দিয়ে বলল,—আসেন, আসেন, কর্নেলসাহাব। হামার মালিক থোড়া আগে আমাকে খবর ভেজেছেন, কী কর্নেলসাহাব আসবেন। তা আপনার গাড়ি কুথায়?

কর্নেল বললেন,—বেশিক্ষণ থাকব না বলে গাড়ি গলির মোড়ে রেখে এসেছি। তা তুমি কেমন আছ রামলাল?

রামলাল গেট খুলে দিয়ে বলল,—আপকা কৃপা, হামি খুব ভালো আছি।

এইসময়েই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গাড়িবারান্দার তলা থেকে বেরিয়ে আমাদের দিকে হন্ত-দন্ত এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বললেন,—রাজবাহাদুর আপনার আসার কথা আমাকে বলেছেন।

এতক্ষণে সত্যি চমকে উঠলুম। কারণ এই ভদ্রলোকের নাম অচিন্ত্যবাবু। ইনি কর্নেলের বাড়ি কয়েকবার গিয়েছিলেন। তারপরই মনে পড়ল ভানুগড় রাজবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া অমূল্য কিছু জুয়েলস কর্নেল উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। সেই রহস্যময় কেসের সময় আমাকে আমার কাগজের কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়েছিলেন।

অচিন্ত্যবাবুও আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন,—নমস্কার, নমস্কার, জয়ন্তবাবু। তা আপনারা কি ট্যাক্সিতে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—না, আপনি তো জানেন আমার ছ্যাকড়া লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়িটা বেচে দেওয়ার পর জয়ন্তর উৎকৃষ্ট ফিয়াটেই আমি চাপতে অভ্যস্ত। জয়ন্তর ঘাড়ে চেপেই ঘুরি।

অচিন্ত্যবাবু বললেন,—কী আশ্চর্য! গাড়ি কি বাইরে কোথাও রেখে আসছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, কারণ রাজাসাহেবের সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই আমরা অন্য জায়গায় যাব। গাড়ি ওখানেই থাক।

অচিন্ত্যবাবু আমাদের গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে একটা প্রশস্ত হলঘরে নিয়ে গেলেন। বনেদী রাজা-জমিদারের বাড়ির এইসব হলঘর কর্নেলের সাহচর্যে অনেক দেখেছি। এটা তার ব্যতিক্রম নয়। দেয়ালে বড়-বড় তৈলচিত্র। গোলাকার বিশাল শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে সারবদ্ধ গদিআঁটা চেয়ার, ইতস্তত প্রকাণ্ড চীনা ফ্লাওয়ার ভাস এবং বিবিধ ভাস্কর্য সাজানো। একপাশে আরামদায়ক সোফায় আমাদের বসতে বলে অচিন্ত্যবাবু কারপেট বিছানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলেন, সেই সময়ই কুকুরের হাঁকডাক কানে এল। আতঙ্কে দেখলুম দুটো প্রকান্ড বিদেশি কুকুরের গলায় চেন হাতে নিয়ে সিঁড়ির মাথায় ধপধপে সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরে এক ভদ্রলোক আবির্ভূত হলেন। তাঁর চেহারায় আভিজাত্য স্পষ্ট। গলার কাছে পৈতে দেখা যাচ্ছিল। বুঝলুম তিনি ব্রাহ্মণ এবং এও বুঝলুম তিনিই রাজাসাহেব। তাঁর কণ্ঠস্বরও বেশ গম্ভীর। তিনি বললেন,—অচিন্ত্য এই বেয়াদপ দুটোকে বেঁধে রেখে এসো। নইলে ওরা আমাদের কথাবার্তায় প্রবলেন বাধাবে।

অচিন্ত্যবাবু কুকুর দুটোকে নিয়ে চলে গেলেন। তারপর রাজাসাহেব রেলিং ধরে নামতে-নামতে সহাস্যে বললেন,—ডনি আর জনিকে সঙ্গে নিয়ে আসছিলুম কেন জানেন, কর্নেলসাহেব? আপনাকে যেন ওরা একটু বকে দেয়। কথাটা বলেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

কর্নেল বললেন,—গতরাত্রে আপনি তো আমাকে নিজেই বকে দিয়েছেন। কারণ, আমি নাকি আপনাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি।

রাজাসাহেব সোফায় আমাদের মুখোমুখি বসে বললেন,—তা বকেছি, কারণ আমার প্রিয় বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে যে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির ক্যাকটাসটা পাঠিয়েছিলুম, তার প্রাপ্তিস্বীকার করেননি।

কর্নেল কপালে একটা মৃদু থাপ্পড় মেরে বললেন,—মাই গুডনেস! তাইতো! কিন্তু দোষটা আপনারই। সঙ্গে কোনও চিরকুট ছিল না। তাছাড়া আমিও তখন বাড়িতে ছিলুম না তাই পরে ওটার কথা ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু রাজাসাহেব, আপনার তো উচিত ছিল একটা ফোন করে আমাকে জানানো।

রাজাসাহেব বললেন,—আলবত ফোন করেছিলুম।

—আমি নিশ্চয়ই ফোন ধরিনি, কারণ আমি তখন বাড়িতে ছিলুম না। নিশ্চয়ই আমার পরিচারক ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। যাগ্যে, আপনার পাঠানো ক্যাকটাস বাড়ছে। চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। কারণ হাতে সময় কম।

রাজাসাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আপনি না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। এই ভদ্রলোক আপনার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরি।

সায় দিয়ে আমি নমস্কার করতেই তিনি আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন,—আপনার আমি ভক্ত। সত্যি বলতে কী, কর্নেলসাহেবকে আমি আপনার চোখেই দেখি।

কর্নেল বললেন,—রাজাসাহেব, আর নয়, এখনই উঠব। কাজের কথাটা—

বাধা দিয়ে রাজাসাহেব বললেন,—কফি আসছে, আপনিই তো বলেন, কফি নার্ভ চাঙ্গা করে তা ছাড়া কতদিন পর আপনার সঙ্গে বসে আমি কফি খাব—এও আমার জীবনের একটা আনন্দ।

একটু পরেই অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে একজন পরিচারিকা কফির ট্রে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। তারপর সে কর্নেল ও আমাকে করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে আবার দোতলায় উঠে গেল। রাজাবাহাদুর বললেন, অচিন্ত্য তুমি নিজের কাজে যাও।

অচিন্ত্যবাবু দোতলায় উঠে গেলেন। তারপর কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—কাল রাত্রে আপনাকে ফোনে যদুগড়ের রাজবাড়ির কেয়ারটেকার মধুরকৃষ্ণ মুখার্জির কথা বলেছি। যদুগড়ের কুমারবাহাদুর তো আপনার বেয়াই। মধুরবাবুকে আপনি অনেক বছর ধরেই চিনতেন। বিশেষ করে আপনি যখন ভানুগড়ে থাকতেন তখন শুনেছি আপনি প্রায়ই বেয়াই বাড়ি যেতেন। আমার প্রশ্ন, মধুরবাবু সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই একটা ধারণা হয়েছিল। অর্থাৎ সে কী প্রকৃতির লোক, আপনি নিশ্চয়ই টের পেয়েছিলেন।

রাজাসাহেব বললেন,—আরে সে তো এক বাবুর বাবু। সবসময়ই খুব সেজে-গুজে থাকত, সেন্ট মাখত। কিন্তু তাকে তো আমার খারাপ বলে মনে হয়নি।

—আপনার বেয়াইমশাই কেন ওকে বছর তিনেক আগে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আপনি কি তা জানেন?

রাজাসাহেব এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—রুদ্রনারায়ণ, অর্থাৎ আমার বেয়াইমশাই গতবার কলকাতায় এসে আমার বাড়িতেই উঠেছিলেন। তার কাছে তত বেশি কিছু শুনিনি। তবে উনি বলেছিলেন, মধুর রাজবাড়ি থেকে একটা অমূল্য প্রাচীন জিনিস হাতিয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ।

—জিনিসটা কী তা আপনাকে উনি বলেননি?

রাজাসাহেব চাপাস্বরে বললেন,—আমার বেয়াইমশাই বাবার বাতিক ছিল পুরাদ্রব্য সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত জাদুঘর বানানোর।

—জানি। পাতালের সেই গোপন জাদুঘর আমি দেখে এসেছি। কিন্তু জিনিসটা কী?

আমাকে অবাক করে রাজাসাহেব বললেন,—একটা খুব প্রাচীন বৌদ্ধ সিল। তবে মধুরবাবুকে উনি হাতেনাতে ধরেননি, শুধু সন্দেহ হয়েছিল। তা ছাড়া মধুরবাবু নাকি স্থানীয় একজন ব্যবসায়ীর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন বলে খবর পেয়েছিলেন।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—অসংখ্য ধন্যবাদ রাজাসাহেব। আমি শুধু এই গোপন খবরটুকুই আপনার কাছে জানতে চেয়েছিলুম।

রাজাসাহেব ব্যগ্রভাবে বললেন,—বাই এনি চান্স আমার বেয়াইমশাই কি আপনাকে সেই হারানো সিল-এর সন্ধানে অনুরোধ করেছেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—না। আমি অন্য কেস-এর সূত্রে সেই হারানো সিল-এর কথা জানতে পেরেছি। যাইহোক, আপনাকে একটা অনুরোধ, আপনি যেন এ বিষয়ে আপনার বেয়াইমশাইকে কোনও কথা জানাবেন না। যথা সময়ে আপনি এবং আপনার বেয়াইমশাই সবই জানতে পারবেন। কিন্তু এখন যদি আপনি তাঁকে কিছু জানান, তা হলে, আমার সব চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমি এবার আসি।

রাজাবাহাদুর গম্ভীরমুখে দরজা অবধি আমাদের এগিয়ে দিলেন। তারপর আমরা গেটের দিকে চললুম।

কিছুক্ষণ পরে দুজনে গাড়িতে চেপে গাড়ি স্টার্ট দিলুম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, আমার সঙ্গে আজ বেরিয়ে যা জানতে পেরেছ, তা যেন ঘুণাক্ষরে অন্য কারও কানে না ওঠে।

বললুম—কখনও কি আমি তেমন কিছু করেছি?

—করোনি, কিন্তু তোমাকে সতর্ক করা দরকার আছে।

—এবার কোথায় যাবেন?

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, ব্র্যাবোর্ন রোডে। চলো, আমি শর্টকাটে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।

বললুম,—আমার ধারণা আপনি জগদীশপ্রসাদ রাওয়ের মহাবলী অকসন হাউসে যাচ্ছেন।

—তুমি বুদ্ধিমান।

তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। অলিগলি রাস্তা ঘুরে আমরা ব্র্যাবোর্ন রোডে পৌঁছুলাম। তারপর কর্নেলের নির্দেশে একটা পার্কিং-এর জায়গা খুঁজে নিয়ে সেখানেই গাড়ি দাঁড় করালুম।

কর্নেল বললেন,—গাড়ি লক করে চলে এসো।

রাস্তার ওপারে গিয়ে একটা গলির ভেতর কর্নেল ঢুকলেন। তারপর বললেন,—এই বাড়িটাই মনে হচ্ছে।

বাড়িটা ছ'তলা। দোতলায় সাইনবোর্ড—'মহাবলী অকসন হাউস'।

দোতলায় গিয়ে বারান্দায় কয়েক'পা হেঁটে হলঘরের মতো একটা বিরাট ঘর চোখে পড়ল। ভেতরে অবশ্য মোটা-মোটা থাম দেখা যাচ্ছিল। আর দেখা যাচ্ছিল নানা ধরনের সেকেলে আসবাবপত্র। হলঘরটার প্রথম দরজায় কোলাবসিবল গেট এবং সেটা তালাবন্ধ। কয়েক-পা এগিয়ে আর একটা কোলাবসিবল গেট। কিন্তু সেটা খোলা। গেটের পাশে টুলে একজন বন্দুকধারী এবং উর্দি পরা লোক বসে আছে। বুঝলুম সে নিরাপত্তারক্ষী। ভেতরে কোনও লোক দেখলুম না। কর্নেলকে দেখে সম্ভবত বিদেশি ভেবেই রক্ষী উঠে দাঁড়িয়ে একটা সেলাম দিল। কর্নেল তাকে হিন্দিতে বললেন,—জগদীশপ্রসাদ রাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সাহেবকে হিন্দি বলতে দেখে রক্ষী একটু অবাক হয়েছে মনে হচ্ছে। সে ইশারায় পাশে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

সেই ঘরের দরজায় অবশ্য কোনও লোক নেই। ভেতরে ঢুকে দেখি একটা করিডোর। আর সার-সার কয়েকটা কেবিন। একটা কেবিন থেকে বেয়ারা গোছের একজন লোক বেরিয়ে এসে কর্নেলকে দেখে থমকে দাঁড়াল। কর্নেল হিন্দিতে বললেন,—মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বলে তিনি তার হাতে নিজের নেমকার্ড গুঁজে দিলেন।

লোকটা তখনই যে কেবিন থেকে বেরিয়েছিল, সেই কেবিনে ঢুকে গেল। তারপর প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে সেলাম দিয়ে বলল,—আপলোগ আইয়ে।

কর্নেলের সঙ্গে কেবিনে ঢুকে দেখলুম প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে একজন তাগড়াই চেহারার টাই-স্যুট পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। কর্নেল বাংলায় বললেন,—আপনি কি মিস্টার জগদীশপ্রসাদ রাও?

মিস্টার রাও খাঁটি বাঙালির মতোই বললেন,—আগে বসুন, তারপর কী বলতে চান বলুন।

আমরা দু-জনেই পাশাপাশি বসলুম। তারপর কর্নেল বললেন,—আপনার এই অকশন হাউসের নামডাক শুনেছি। তবে আমি সেজন্য আসিনি। এসেছি অন্য একটা কারণে। আমার এক আত্মীয় বারিন দত্ত আপনার বাড়িতে ছিল।

মুহূর্তে মিস্টার রাওয়ের চোখদুটো জ্বলে উঠল। আস্তে বললেন,—তাকে কেউ গত শুক্রবার রাতে মার্ডার করেছে। আপনি কি পুলিশের কাছে সেই খবর শুনে আমাকে কিছু জিগ্যেস করতে এসেছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। বারিন আপনার বাড়িতে খুন হয়েছে তা জানি। আমি শুধু আপনার কাছে জানতে এসেছি, তাকে কেউ খুন করার পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?

মিস্টার রাও সেইরকম জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে বললেন,—আমি জানতুম না সে একজন চোর। সে আমাকে বলেছিল পুরোনো জিনিস কেনাবেচার ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা আছে। আমি যদি তাকে থাকবার জায়গা দিই তাহলে সে আমাকে আমার কাজে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু সে আমার অফিস থেকে তিনটে দামি পোর্ট্রেট চুরি করেছিল। সেটা তার মৃত্যুর পর জানতে পেরেছি। কাজেই ওর সম্পর্কে আমি কোনও কথা বলব না। আপনারা আসতে পারেন।

ছয়

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ জগদীশবাবুর দিকে ঘুরে বললেন,—একটা জরুরি কথা জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি। আশা করি আপনি সঠিক জবাব দেবেন।

জগদীশবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন,—জবাব দেওয়ার মতো হলে তবেই দেব।

কর্নেল বললেন,—আপনি কখনও আপনার ব্যবসার কাজে কি যদুগড়ে গিয়েছিলেন?

—যদুগড়? কোন যদুগড়?

—বিহারের যদুগড়।

জগদীশবাবু একটু চমকে উঠলেন মনে হল। তিনি বললেন,—কেন?

—সেখানকার রাজবাড়িতে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে।

—তা সব রাজবাড়িতেই থাকতে পারে।

এবার কর্নেল একটু গম্ভীর কণ্ঠস্বর বললেন,—আপনি যদুগড় রাজবাড়ির কেয়ারটেকার মধুরকৃষ্ণবাবুকে কি চেনেন?

আবার লক্ষ করলুম জগদীশবাবু কেমন যেন বিব্রত বোধ করছেন। তিনি আস্তে বললেন, —তাকে আমি চিনি না।

কর্নেল তেমনই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বললেন,—আমার কাছে খবর আছে আপনি তাকে চিনতেন, এবং এখনও চেনেন। কারণ গত তিনবছর ধরে মধুরবাবু কলকাতাতেই আছেন এবং তিনি বারিনবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু। তাই প্রায়ই আপনার বাড়িতে, অর্থাৎ বারিনবাবুর কাছে যাতায়াত করতেন।

জগদীশবাবু এবার যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। তাঁর হাবভাব একেবারে বদলে গেল। তিনি বললেন,—আপনি কে? আপনার প্রকৃত পরিচয় কী?

কর্নেল আগের মতো মেজাজে বললেন,—আপনার কাছে একজন প্রাইভেট ডিকেটিভ মিস্টার কে. কে. হালদার গিয়েছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু কী ব্যাপার আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

—মিস্টার হালদারের পিছনে আপনি কেন একজন খুনি দুর্বৃত্তকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন? না, আপনি কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না। আমি সবই জানি।

—আপনি কি সি. বি. আই. অফিসার?

—আপনি আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। মধুরবাবু সম্পর্কে আমি যা বলেছি, তা ঠিক কি না?

জগদীশবাবু একটু ইতস্তত করার পর বললেন,—মধুরবাবু কি না জানি না, একজন বেঁটে বলিষ্ঠ গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারিনবাবুর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করতে আসতেন। পোশাক-আশাকে তাঁকে সাধারণ লোক বলেই মনে হতো।

—গত শুক্রবার বিকেলে আপনি কি বাড়িতে ছিলেন?

—না! ব্যবসার কাজে বেরিয়েছিলুম।

—কখন বাড়ি ফিরেছিলেন?

—রাত দশটার পরে।

—বারিনবাবুর ঘরে তখন কি আলো জ্বলছিল?

—অত লক্ষ করিনি। তা ছাড়া রাতে বারিনবাবু মাতাল অবস্থায় থাকতেন। তাই তাঁকে এড়িয়ে থাকতুম।

কর্নেল তাঁকে বললেন,—আপনি আমাকে যেসব কথা বললেন, পুলিশ আপনাকে জেরা করলে যেন ঠিক তাই বলবেন।

বলে কর্নেল শার্টের বুক পকেট থেকে একটা খুদে টেপ রেকর্ডার বের করে তাঁকে দেখালেন এবং বললেন,—আপনি উলটো কথা বললে বিপদে পড়বেন, কারণ এই যন্ত্রে আপনার সবকথা রেকর্ড করা হয়ে গেছে। আরও শুনুন, আপনি যদি মিস্টার হালদারের মতো আমাদের পিছনেও গুন্ডা লেলিয়ে দেন, তার পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

আমাকে অবাক করে কর্নেল তাঁর প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর রিভলভারটি দেখিয়ে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে অনুসরণে দেরি করলুম না।

এরপর রাস্তা পেরিয়ে আমার গাড়িতে ওঠার পর কর্নেল হেসে উঠলেন। বললুম,—হাসছেন কেন? ব্যাপারটা তো খুব সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে। আপনি কী করে জানলেন যে মধুরবাবুর ও বাড়িতে যাতায়াত ছিল?

কর্নেল বললেন,—আন্দাজে বহুবার ঢিল ছুড়ে লক্ষভেদ করতে পেরেছি। এবারও পারলুম। সেজন্যই হাসছি। তা ছাড়া সঠিক জায়গায় ঢিলটি লাগলে অন্যপক্ষের কী অবস্থা হয়, তা তো নিজের চোখেই দেখলে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে যেতে-যেতে বললুম—এবার নিশ্চয়ই বাড়ি?

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই।

যেতে-যেতে বললুম,—এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। মধুরবাবু বারিনবাবুর কাছে প্রায়ই যাতায়াত করতেন, আপনি এমনটা কী করে অনুমান করলেন? সব অনুমানের মোটামুটি এক অস্পষ্ট ভিত্তি তো থাকেই!

কর্নেল বললেন,—ওটা আমার নিছক একটা অঙ্ক।

—তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে মধুরবাবু যে ঘটনার কথা বলে ব্রিফকেসটা নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ঘটনা একেবারে মধুরবাবুর বানানো।

কর্নেল বললেন,—এখন এসব কথা নয়। বাড়ি ফিরে স্নানাহার করার পর বিশ্রাম দরকার।

—কেন? রহস্যের জটিল জট তো প্রায় আপনাআপনি খুলেই পড়েছে।

কর্নেল টুপি খুলে মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—জয়ন্ত, তোমাকে বহুবার যুক্তিশাস্ত্রে অবভাস তত্ত্বের কথা বলেছি। যা যেমনটি দেখছ তা সবময়ই সর্বক্ষেত্রে তেমন নাও হতে পারে। রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি দেখবে দুটো লাইন যেন ক্রমশ কাছাকাছি হতে-হতে একত্রে মিশে গেছে। কিন্তু ওটা তোমার দেখার ভুল।

এরপর আর কথা বলা চলে না। বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় পৌনে একটা বেজে গিয়েছিল। স্নানাহারের পর খেয়ে নিয়ে কর্নেল ড্রইংরুমে তাঁর ইজিচেয়ারে বসেছিলেন এবং চুরুট টানছিলেন। আমি যথারীতি ডিভানে চিৎপাত হয়ে ভাতঘুমের চেষ্টা করছিলুম। একটু পরে লক্ষ করলুম, কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়েল করছেন। তাপপর তিনি মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন বোঝা যাচ্ছিল না।

এই অবস্থায় ভাতঘুমের হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। সেই ভাতঘুম ভেঙেছিল ষষ্ঠীর ডাকে,—সাহেব!

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তাকে জিগ্যেস করেছিলুম,—আজ তোমার বাবামশাই আমার গাড়ি চুরি করেননি তো?

ষষ্ঠী সহাস্যে বলল,—আজ্ঞে দাদাবাবু, বাবামশাই আপনার গাড়ি চুরি করেননি। লালবাজারের সেই পুলিশবাবু, কী যেন নাম তার—

বললুম,—নরেশবাবু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। লালবাজারের নরেশবাবুই বটে। ওই যাঃ, ছাদের বাগানে কাকের বড় উৎপাত।

বলে সে হন্ত-দন্ত হয়ে চলে গেল। ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি লালবাজারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব-ইনসপেক্টর নরেশ ভদ্র এসে কর্নেলকে তুলে নিয়ে গেছে। তাহলে দেখছি রহস্যটা আবার অন্যদিকে মোড় নিল।

কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলুম। হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। দুষ্টুমি না করে বললুম—আপনি কোথা থেকে বলছেন।

—জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেল স্যার নেই?

—না বেরিয়েছেন।

—আমি যদুগড় থিক্যা কইত্যাসি। আমি উঠসি সরকারি ডাকবাংলোতে। আর মধুরবাবু আছেন রাজবাড়িতে। একটু আগে মধুরবাবু টেলিফোনে আমারে কইলেন, কুমারবাহাদুর তাঁর ফিরে যাওয়াতে খুশি হয়েছেন। কিন্তু কুমারবাহাদুরের জামাই তাঁকে যেন থাকতে দিতে চান না। তাই তিনি এক বাল্যবন্ধুর বাড়িতে গিয়া থাকবেন ভাবসেন। আমি তাঁরে কইলাম, অপমান সহ্য কইরা অন্তত আরও একটা দিন থাকেন। আমি কর্নেলস্যারেরে ফোন করত্যাসি, যাতে তিনি শিগগির আইসা পড়েন।

বললুম,—কর্নেল এলেই কথাটা বলছি। আর কোনও জরুরি কথা আছে? যদুগড়ের পশ্চিমে নদীর ধারে আদিবাসিরা বুনো আলুর খোঁজে মাটি খুঁড়ত্যাছিল। সেখানে তারা একটা পাথরের মূর্তি দেখসে। সেই মূর্তি দেখার জন্য সেখানে সারাদিন খুব ভিড়।

—আপনি যাননি দেখতে?

—না। কর্নেল স্যার আইলে ওনারে শিগগির আইতে কইবেন।

হালদারমশাই লাইন কেটে দিলেন। আর প্রায় মিনিট পনেরো পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তখন তাঁকে হালদারমশাইয়ের টেলিফোনের কথাটা বললুম। তিনি বললেন,—আজ রাতের ট্রেনেই আমরা যদুগড় যাচ্ছি।

একটু পরে ষষ্ঠী কফি আর স্ন্যাকস দিয়ে গেল ঘরের আলোও জ্বেলে দিল। কফি খেতে-খেতে বললুম,—লালবাজারে নরেশবাবু আপনাকে নাকি উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—শ্রীমান ষষ্ঠীচরণের শ্রীমুখের খবর তা বুঝতে পারছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, জয়ন্ত, ষষ্ঠীও ক্রমশ গোয়েন্দা হয়ে উঠছে।

বললুম,—তা হতেই পারে। আপনি বলুন না ব্যাপারটা কী।

কর্নেল বললেন,—ধূর্ত জগদীশ রাও লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ফোন করে আমার চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। এবং সবকথা জানিয়েছিল। ভাগ্যিস ফোনটা ধরেছিলেন নরেশবাবু! তিনি ওকে আরও ভয় দেখিয়ে বলেছেন, আমি সত্যিই সি.বি.আই. অফিসার। নিহত বারিনবাবু সম্পর্কে এখনও কোনও গোপন তথ্য থাকলে যেন পুলিশকে জানিয়ে দেয়।

—কিন্তু আপনাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন নরেশবাবু?

—জগদীশবাবুর কথায় নরেশবাবু জেনে গিয়েছিলেন বারিনের হত্যাকাণ্ডের রহস্যে আমি নাক গলিয়েছি। তাই নরেশবাবু আমার কাছে জানতে এসেছিলেন কথাটা সত্যি কি না। যাইহোক সেই সুযোগে আমি ওঁর কাছে বারিনবাবুর পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এবং ফরেনসিক তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়েছিলুম। নরেশবাবু সঙ্গে কেস ফাইল আনেননি। তাই ওঁর সঙ্গে লালবাজারে গিয়ে সেই রিপোর্ট দেখে এলুম।

—রিপোর্টে কী দেখলেন, বলতে আপত্তি আছে?

—না। গুলি করা হয়েছিল বারিনবাবুর কপালে আগ্নেয়াস্ত্রের নল ঠেকিয়ে। গুলিটা পয়েন্ট বত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে ছোঁড়া। ফরেনসিক রিপোর্টে বারিনবাবুর হাতের মুঠোর কাঁচাপাকা চুলের গোছা পরচুলা নয়। তিনি আততায়ীর মাথার চুল খামচে ধরেছিলেন। খুনির মাথার চুলগুলো ছিল লম্বা। আর একটা ব্যাপার, নরেশবাবুর নিজের মনে হয়েছে খুনির রিভলভারে সাইলেন্সার লাগানো ছিল, তাই কেউ গুলির শব্দ শুনতে পায়নি। যাই হোক, লালবাজারে বসেই তোমার জন্য ট্রেনের ফার্স্টক্লাসের একটা স্লিপার বুক করতে বলেছি। তুমি তো জানো, ইস্টার্ন রেলের সব অফিসারই আমাকে খানিকটা পাত্তা দেন।

এবার কর্নেল কফিতে মন দিলেন। আমি জানি রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার হিসেবে কোথাও ট্রেনে বা প্লেনে যেতে কর্নেলের পয়সা খরচ হয় না। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের চোখেও উনি একজন ভি.ভি.আই.পি.।

রাত দশটায় ডিনার সেরে নিয়ে কর্নেলের নির্দেশে তৈরি হয়ে নিলুম। মাঝে-মাঝে কর্নেলের ডেরায় আমাকে কাটাতে হয় বলে আমার কয়েক প্রস্থ পোশাক-আশাক এখানেই থাকে। আর যেহেতু আমি কর্নেলের কনিষ্ঠ সহযোগী এবং তাঁর রহস্যভেদের কাহিনি ফলাও করে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখি, সেইহেতু কর্নেলের কথামতো বাইরে বেরুলেই আমাকে পকেটে লাইসেন্সড রিভলভার এবং কিছু বুলেট রাখতে হয়।

কর্নেল বলেছিলেন, হাওড়া স্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ছাড়বে রাত সাড়ে এগারোটায়। তাই সাড়ে দশটাতেই আমরা বেরিয়ে পড়েছিলুম। ছ'নম্বর প্ল্যাটফর্মের কাছে যেতেই একজন রেলওয়ে অফিসার কর্নেলকে নমস্কার করে তাঁর হাতে যেটা গুঁজে দিলেন, সেটা আমারই টিকিট। কর্নেল পার্স বের করে টাকা মিটিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—থ্যাঙ্কস রজত। তুমি জয়ন্তকে দেখতে চেয়েছিলে তো, এই সেই জয়ন্ত।

ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করলেন। প্রতি নমস্কার করে আমি কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কারণ অবাক হয়ে দেখলুম কথাটা বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন।

কাছে গিয়ে বললুম,—এখনও তো গাড়ি ছাড়ার সময় হয়নি। আপনি হঠাৎ ঘোড়দৌড় শুরু করলেন কেন?

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মহাবলী অকশন হাউসের মালিক সেই জগদীশবাবুকে দূর থেকে লক্ষ করেছি। তিনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন কি না জানি না। হুইলার বুকস্টলের ওপাশে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা ব্রিফকেস।

বললুম,—গিয়ে জিগ্যেস করলেই হয়, তিনি যদুগড় যাচ্ছেন কি না।

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন,—এই থামের আড়ালে আমরা দাঁড়াই। দেখা যাক উনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন কি না।

প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিগ্যেস করলুম,—এই ট্রেনেই কি আমরা যাব?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, আমরা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। এই কামরাতেই আমরা যাব।

—তা হলে উঠেপড়া যাক।

—এক কাজ করো। তুমি উঠে গিয়ে বারো নম্বর ক্যুপের একটা লোয়ার সিটে বসে পড়ো, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—তার মানে জগদীশবাবু এই ট্রেনেই চাপছেন কি না তা দেখতে চান।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—যা বললুম করো। তুমি ডান দিকে কাত হয়ে সবেগে পা ফেলে দরজায় উঠবে।

তাঁর কথামতো আমি কামরায় উঠে গেলুম। তারপর বারো নম্বর ক্যুপ খুঁজে নিয়ে বাঁ-দিকে নিচের বার্থে জানালার কাছে বসলুম। আমার একটা সুটকেস আর ব্যাগ সিটের তলায় ঢুকিয়ে রাখলুম। তারপর জানলা দিয়ে কর্নেলকে খুঁজলুম। তাঁর পিঠের কিটব্যাগটি যথারীতি আঁটা আছে এবং চেনের ফাঁক দিয়ে প্রজাপতি ধরার জালের লাঠির কিছু অংশ মাথা উঁচিয়ে আছে। ডান হাতে একটা গাবদাগোবদা ব্যাগ। তিনি হুইলার স্টলের দিকেই তাকিয়ে আছেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি ট্রেনে উঠলেন। তারপর বারো নম্বর ক্যুপে ঢুকে ডান দিকে লোয়ার বার্থে বসলেন। জিগ্যেস করলুম,—জগদীশবাবুকে কি এই ট্রেনে উঠতে দেখলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ভদ্রলোক কোটিপতি। বাড়িতে এবং অফিসে এয়ারকন্ডিশনড ঘরে থাকেন। কাজেই এই ট্রেনেও তিনি এ.সি. কম্পার্টমেন্টে চেপে যাবেন তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

—আচ্ছা কর্নেল, এমন তো হতে পারে উনি এই ট্রেনে দিল্লি যাচ্ছেন।

—হ্যাঁ, তাও যেতে পারেন। তবে যদুগড় স্টেশনে নেমে তুমিও একটু সতর্ক থেকো এবং চোখ খোলা রেখো।

—তার মানে আমাদের যেন তিনি দেখতে না পান—এই তো?

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছিল ট্রেন ছাড়ার খবর। তারপরই হুইসেল দিয়ে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। সেই সময়েই কি একটা অস্বস্তি এবং আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল। জগদীশবাবু এই ট্রেনে যাচ্ছেন!

সাত

যদুগড় স্টেশনে ট্রেনটা যখন থেমেছিল, তখন ভোর পৌনে ছ'টা বাজে। কর্নেলের পিছনে সাবধানে নেমে বললুম,—জগদীশবাবুকে কি দেখতে পাচ্ছেন?

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপচাপ থাকতে বললেন। মাঝারি স্টেশন কিন্তু ট্রেনটা দিল্লি যাবে বলেই বড্ড ভিড়। প্রায় আধঘণ্টা সামনে টি-স্টলের কাছে দাঁড়িয়ে দুজনে চা খেলুম। চা খেয়ে কর্নেল চুরুট ধরালেন। সেই চুরুট শেষ হওয়ার পর তবে তিনি পা বাড়ালেন। জগদীশবাবুর কথা আর তাঁকে জিগ্যেস করলুম না।

গেটে গিয়ে দেখলুম কয়েকটা বাস আর অজস্র রিকশা নিচের চত্বর থেকে সামনের রাস্তায় পৌঁছুনোর জন্য যেন যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার অবাক লাগল ঘন কুয়াশা দেখে। কুয়াশায় সবকিছু ঢেকে আছে। আর শীতের কথা বলার নয়।

জিগ্যেস করলুম,—আমরা কোন বাহনে চেপে যাব? একে-একে সবগুলোই তো চলে গেল।

কর্নেল হাসলেন,—ওই দ্যাখো, একটা জিপ এগিয়ে আসছে।

অবাক হয়ে বললুম,—ওটা তো পুলিশের জিপ মনে হচ্ছে।

কর্নেল কিছু বলার আগেই জিপটা এসে আমাদের কাছাকাছি থেমে গেল। তারপর একজন পুলিশ অফিসার জিপ থেকে নেমে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বললেন,—একটু দেরি হয়ে গেল স্যার।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—মোটেও দেরি হয়নি।

কর্নেল জিপের সামনে উঠলেন এবং পিছনের সিটে ওঠার জন্য আমাকে অনেক কসরত করতে হল। পুলিশ অফিসার জিপে স্টার্ট দিয়ে বললেন,—আমি কখনও আপনাকে স্বচক্ষে দেখিনি। আমার সৌভাগ্য যে আপনার সেবা করতে পারছি।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনার পরিচয়ই তো এখনও দিলেন না।

—স্যার আমার নাম শাহেদ খান। আমার বাংলা বলা শুনে আপনি অবাক হতে পারেন। আসলে আমার বাবা ইউ.পি.-র লোক। আর মা কলকাতার বাঙালি মেয়ে, আমি কলকাতাতেই মানুষ হয়েছিলুম।

কুয়াশায় চারদিক ঢাকা থাকলেও আবছা দেখা যাচ্ছিল উঁচু-নিচু নানা আকারের টিলা-পাহাড়। চড়াই-উতরাই হয়ে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আমরা একটা নদীর ব্রিজ পেরিয়ে গেলুম। নদীতে তত জল নেই। বালির চড়া আর কালো-কালো পাথর দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে জিপ বাঁয়ে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা একটা বাংলোর সামনে পৌঁছুলাম। মিস্টার খান বললেন, —এটা যদুগড়ের এক ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের গেস্টহাউস বলতে পারেন। এস.পি. সাহেবের মেসেজ পেয়েই ও.সি. মিস্টার জয়রাম পাণ্ডে এই বাংলোটাই আপনার জন্য ঠিক করেছেন। শুনেছি আপনি প্রকৃতির মধ্যে ঘুরতে ভালোবাসেন। তাই আমার ধারণা আপনার এখানে থাকতে ভালোই লাগবে।

একটা টিলার গায়ে এই একতলা বাংলোতে ঢুকে আমার ভালোই লাগল। বাংলোর চৌকিদার আমাদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে একটা ঘরে ঢোকাল। কর্নেল তখনও লনে দাঁড়িয়ে মিস্টার খানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

তারপর মিস্টার খান জিপ নিয়ে চলে গেলেন এবং কর্নেল এসে বাংলোয় ঢুকলেন। বললুম—কখনও দেখিনি আপনি রহস্যের সমাধানে পুলিশের অতিথি হয়েছেন, আমার মাথায় একটা ধাঁধা ঢুকে গেছে।

কর্নেল মিটি-মিটি হেসে বললেন,—তুমি কি দ্যাখোনি, বরাবরই রহস্যের শেষ দৃশ্যে আমাকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়।

চমকে উঠে বললুম,—বলেন কী? আপনি বারিনবাবুর হত্যা রহস্যের শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছেন, অথচ আমি আপনার পাশে থেকেও কিছু টের পেলুম না?

কর্নেল পিঠের কিটব্যাগ এবং গলায় ঝোলানো ক্যামেরা ও বাইনোকুলার খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর মাথার টুপি খুলে রেখে বললেন,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং একটু বুদ্ধি থাকলেই চারপাশে কী হচ্ছে টের পাওয়া যায়। না ডার্লিং, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই মোটেই বলছি না, দৃষ্টিশক্তি এবং বুদ্ধি তোমার যথেষ্টই আছে। তবে তুমি তা খরচ করতে বড্ড আলসেমি করো—এই যা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংলোর চৌকিদার ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে এল। কর্নেল তাকে হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

সে সেলাম দিয়ে বলল,—সাব, হামার নাম গয়ানাথ।

—তোমার বাড়ি যদুগড়ে?

—হাঁ সাব।

—তুমি যদুগড়ের রাজবাড়ি কেয়ারটেকার মধুরবাবুকে চেনো?

—জি সাব, ওই বাবুকে হামি চিনতুম। তিনবছর আগে রাজবাড়ি থেকে তাকে কুমারবাহাদুর তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলে সে একটু হেসে উঠল,—তাজ্জব বাত সাব, কাল বিকেলে সেই মধুরবাবুকে আবার দেখতে পেলুম। বাজারে এক ব্যবসায়ী আছে। তার টি.ভি., ক্যামেরা, এইসব জিনিসের কারবার। মধুরবাবু তার টেবিলের সামনে বসে চা খাচ্ছিলেন।

—তা হলে মধুরবাবু আবার যদুগড়ে ফিরেছেন?

—আপনি কি তাকে চেনেন সাব?

—হ্যাঁ, চিনি।

—মধুরবাবুর নামে এখানে বদনাম আছে। কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।

কথাটা বলেই গয়ানাথ চলে গেল।

কফি খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আমি বাথরুম থেকে আসছি ইতিমধ্যে যদি টেলিফোন বাজে তুমি ধরবে এবং একটু অপেক্ষা করতে বলবে।

বলে তিনি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। মিনিট দশেক পরে পোশাক বদলে তিনি ফিরে এলেন। বললুম,—কেউ আপনাকে ফোন করেনি।

কর্নেল বললেন,—তা হলে আমি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করব।

নোটবই খুলে নম্বর দেখে তিনি ডায়াল করলেন। সাড়া পেয়ে বললেন,—আমি মিস্টার কে. কে. হালদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।...কী হালদারমশাই, কেমন বুঝছেন?...হ্যাঁ আমরা এসে গেছি।...ধরমচাঁদ লাখোটিয়ার বাংলোতে উঠেছি। আপনি চলে আসুন।

ততক্ষণে কুয়াশা সরে রোদ ফুটছে। বাংলোর নিচে কিছুটা দূরে এই নদীটা দেখা যাচ্ছে। নদীর ওপারে আগাছার জঙ্গলের ভেতর বড়-বড় কালো পাথর হাতির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার ওধারে ঘন শালবন।

মিনিট কুড়ি পরে সাইকেল রিকশায় চেপে গোয়েন্দা প্রবর আবির্ভূত হলেন। কর্নেল বারান্দায় গিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করে ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—একখান আশ্চর্য খবর লইয়া আইসি। আমি বাংলোর বারান্দায় বইয়া চা খাইত্যাসি, সেই সময়ই দেখলাম, কলকাতার সেই জগদীশবাবু একটা গাড়ি থিক্যা নামলেন, তারপর তিনি একটা বাড়ির বারান্দায় উঠলেন। গাড়িখান বাড়িটার পাশের গ্যারেজ ঘরে ঢুকল। কিন্তু আমার চোখ ছিল জগদীশবাবুর দিকে একটু পরে দরজা খুইল্যা এক ভদ্রলোক বারাইলেন। তারপর জগদীশবাবুরে ঘরের ভেতর লইয়া গেলেন। সেই সময়ই বাংলোর চৌকিদার কইল আমার টেলিফোন আছে।

যাইহোক ফোনে আপনার কথা শুইন্যা এখানে আসবার সময়ই বাড়িটা লক্ষ করসি। গেটে ইংরিজিতে লেখা আছে 'মাতাজি ধাম'। তার নিচে লেখা আছে হরদয়াল অগ্রবাল।

আমি বলে উঠলুম,—সেই হরদয়ালবাবুর বাড়ি? যিনি স্মাগলিং করে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন? কিন্তু এখন তো তিনি বেঁচে নেই, কাজেই হালদারমশাই যাঁকে দেখেছেন, তিনি তাঁর ছেলে রামদয়াল।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—আঃ জয়ন্ত, হালদারমশাইকে কথা বলতে দাও।

বকুনি খেয়ে চুপ করে গেলুম। হালদারমশাই বললেন,—এবার মধুরবাবুর কথা শোনেন, কাইল সন্ধ্যায় উনি আমার কাছে আইসিলেন। তিনি কইলেন, কুমারবাহাদুর জামাই রাজবাড়িতে তাঁর থাকা পছন্দ করসে না। তাই তিনি তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে থাকবেন। তারপর আপনারা এলে তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাইল দুপুরে আদিবাসিরা বুনো আলুর লতা খুঁজতে গিয়ে কী একটা দেবতার মূর্তি উদ্ধার করসে। সেই মূর্তি এখন—।

কর্নেল তার কথার ওপরে বললেন,—পুলিশের জিম্মায়।

হালদারমশাই হতভম্ব হয়ে বললেন, আপনি ক্যামনে জানলেন?

কর্নেল বললেন,—পুলিশ সূত্রে জেনেছি। যাইহোক, এবার আপনাকে একটু গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি। আপনি আপনার বাংলো থেকে 'মাতাজি ধাম' বাড়িটার দিকে লক্ষ রাখবেন। দৈবাৎ যদি মধুরবাবুকে ওই বাড়িটার কাছে দেখতে পান, অমনি আমাকে টেলিফোনে খবর দেবেন। এক মিনিট, বরং আপনি এখনই রাজবাড়িতে গিয়ে আগে খবর নিন মধুরবাবু নামে কেউ ওখানে আছেন কি না। জিগ্যেস করলে বলবেন, মধুরবাবুর সঙ্গে আপনার চেনাজানা আছে।

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—যাই গিয়া। তবে একটা কথা কর্নেলস্যার। রাজবাড়িতে যদি মধুরবাবু না থাকেন আমি কি মাতাজি ধামে এসে কারুকে জিগাইমু?

কর্নেল বললেন,—ওঃ না। আপনি শুধু লক্ষ রাখবেন বাড়িটার দিকে।

হালদারমশাই যথারীতি সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল চৌকিদারকে সাড়ে আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বলেছিলেন। ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। সাড়া পেয়ে বললেন,—মর্নিং! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।....নমস্কার মিস্টার পাণ্ডে....না-না, একেবারে রাজার হালে আছি। এবার শুনুন, আমি কিছুক্ষণ পরে রাজবাড়িতে কুমারবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে যাব। একটা জরুরি কাজের কথা তাই বলে নিই। আমি যেখানে থেকেই হোক আপনাকের রিং করলে আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফোর্স নিয়ে পৌঁছোনোর জন্য যেন তৈরি থাকবেন।....হ্যাঁ, মিস্টার খানের কাছে শুনেছি, লালবাজার পার্টি দুপুরের ট্রেনে এসে যাবেন।....হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এই কেসটা কলকাতা এবং যদুগড় দুটো জায়গারই কেস। তবে ধড়টা এখানকার, লেজটা কলকাতার। বলে কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

জিগ্যেস করলুম,—এখনই কি বেরুচ্ছেন?

—হ্যাঁ, রেডি হয়ে নাও। আমরা পায়ে হেঁটেই যাব। রাজবাড়ি শর্টকাটে যাওয়া যায়। বলে তিনি তাঁর সেই পেটমোটা ব্যাগ খুলে যা বের করলেন তা দেখে আমার অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। বারিনবাবুর ব্রিফকেসে পাওয়া সেই তিনটে ছবি তিনি সেই তোয়ালেতেই জড়িয়ে বাঁধলেন। তারপর সেটা বগলদাবা করে বললেন,—চলো, বেরুনো যাক, হালদারমশাইয়ের ফোন যখন পেলুম না, তখন বোঝা যাচ্ছে তিনি মাতাজি ধামের কাছে মধুরবাবুকে দেখতে পাননি। এমনও হতে পারে রাজবাড়িতে গিয়েই আমরা হালদারমশাইয়ের দর্শন পাব।

বাংলোর পাশ কাটিয়ে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলা পথে কর্নেল হাঁটছিলেন। পথের দু-ধারে ঘন ঝোপ। আমরা যাচ্ছি উত্তর দিকে। বাঁ-দিকে একটু দূরে ঘর-বাড়ি চোখে পড়ো। তারপর পথের দু-ধারের ঘন গাছপালা আর কিছু দেখতে দিল না।

মিনিট দশেক হাঁটার পর কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। আস্তে বললেন,—আমরা রাজবাড়ির কাছে এসে পড়েছি। এবার তোমাকে কষ্ট করে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে আমার সঙ্গে আসতে হবে।

একটু পরে চোখে পড়ল উঁচু একটা বাউন্ডারি ওয়াল। জায়গায়-জায়গায় ফাটল ধরেছে, ইটও বেরিয়ে আছে। সেই পাঁচিলের সমান্তরালে পশ্চিম দিকে কিছুটা চলার পর খোলামেলা একটা জায়গায় পৌঁছলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কুমারবাহাদুরকে চমকে দেওয়ার ইচ্ছা আছে। তাছাড়া সদর রাস্তায় বগলে এই বোঁচকাটা রাখা নিরাপদ মনে করিনি।

চমকে উঠে জিগ্যেস করলুম,—নিরাপদ মনে করেননি? কেন?

—ভুলে যেও না, জয়ন্ত, এই তোয়ালেটা এবং তার ভেতরের জিনিস এখানে কারও চেনা হতেই পারে।

আরও অবাক হয়ে বললুম,—এটা মধুরবাবু ছাড়া আর কে চিনবেন?

কর্নেল আমার কথার জবাব না দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। আবার উত্তরে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বাউন্ডারি ওয়ালের শেষে একটা গেটের সামনে পৌঁছুলাম। গেটের কাছে গাঁট্টাগোট্টা চেহারার হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরা একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। কর্নেলকে দেখা মাত্র সে সেলাম ঠুকে বলে উঠল,—কর্নেলসাব! আপনি যে আসবেন তার খবর তো দেননি? খবর দিলে আপনাকে কষ্ট করে পায়ে হেঁটে আসতে হতো না।

কর্নেল বললেন,—কুমারবাহাদুর আছেন?

—হ্যাঁ, কর্নেলসাব। আপনারা আসুন, আমি ওনাকে খবর দিচ্ছি।

বিহার অঞ্চলে রাজা-জমিদারদের রাজবাড়ি কর্নেলের সঙ্গগুণে অনেক দেখেছি। তবে এই রাজবাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন এবং দেশি-বিদেশি ফুল এবং গুল্মে সাজানো। আমরা এগিয়ে কিছুটা গেছি, এমনসময় কর্নেলের মতোই বৃদ্ধ এবং প্রকাণ্ড চেহারার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক গাড়ি বারান্দার ছাদে আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন,—কী আশ্চর্য, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

কর্নেল বললেন,—না, হঠাৎ-ই আমাকে চলে আসতে হল। হাতে সময় কম, আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেই বেরুতে হবে।

গেটে দেখা সেই লোকটি আমাদের হলঘরের ভেতর দিয়ে দোতলায় নিয়ে গেল। চওড়া বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার এবং টেবিল ছিল। সেখানে আমরা বসলুম। কুমারবাহাদুর বললেন,—আপনার সঙ্গী এই যুবকটিকে দেখে আমার ধারণা ইনিই সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

এরপর কর্নেল বগলদাবার তোয়ালে জড়ানো ছবিগুলো টেবিলে রেখে বললেন,—দেখুন তো, এগুলো চিনতে পারেন কিনা?

তোয়ালে খুলে ছবিগুলো দেখামাত্র কুমারবাহাদুর কর্নেলের হাত চেপে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন। আমি তো হতবাক।

কর্নেল বললেন,—কুমারবাহাদুর, আমার হাতে সময় কম। এই ছবিগুলো আমি কীভাবে উদ্ধার করেছি যথাসময়ে জানতে পারবেন। এবার আর দুটো হারানো জিনিস আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।

বলে উনি জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সিলটা এবং ভাঁজকরা ম্যাপটা তাঁর হাতে তুলে দিলেন। কুমারবাহাদুর সিল এবং ম্যাপটা দু-হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, —সত্যিই আমি স্বপ্ন দেখছি।

—স্বপ্ন নয়। আপনাদের জাদুঘর থেকে এই ছবি এবং সিল হারানোর কথা আপনার কলকাতার বেয়াইমশাইয়ের কাছে শুনেছি। কিন্তু তার আগেই দৈবাৎ এগুলো আমার হস্তগত হয়েছিল। তাই দেরি না করে আপনার হারানো জিনিস আমি ফেরত দিতে এসেছি।

কুমারবাহাদুর চোখ মুছে বললেন,—আমার মেয়ে-জামাই আজ পাটনা গেছে। ওরা ফিরবে কয়েকদিন পরে। ওরা থাকলে খুবই আনন্দ পেত।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মধুরবাবু ফিরে এসেছেন শুনলুম, কোথায় তিনি?

—কাল পাটনা যাওয়ার আগে জামাই মধুরকে দেখে খুব চটে গিয়েছিল। সে বলে গেছে ওই লোকটাকে যেন আমি আর আশ্রয় না দিই। কিন্তু কী করব বলুন। মধুর এসে আমার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। তারপর বলল,—জাদুঘরের হারানো জিনিস আমি নাকি শিগগির ফিরে পাব। তাই তো পেলাম দেখছি। আমার অবাক লাগছে।

আট

কর্নেল বললেন,—এবার একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপন কথা আছে। কিন্তু এখানে নয়, সেটা আপনার ঘরে বলতে চাই।

কুমারবাহাদুর তখনই বারান্দা ধরে এগিয়ে গেলেন, আমরা তাঁকে অনুসরণ করলুম। লক্ষ করলুম তাঁর হাতে একটা চাবির গোছা আছে। একটা ঘরের পরদা সরিয়ে তালা খুললেন। তারপর বললেন,—আসুন।

ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন,—দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছি।

তারপর কুমারবাহাদুর এবং আমরা একটা টেবিল ঘিরে বসলুম। কুমারবাহাদুর ছবিগুলো, ব্রোঞ্জের সিল এবং ম্যাপটা টেবিলে রাখলেন। কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—আপনি কি ছবিগুলোর ফ্রেম এবং পিছন দিকটা লক্ষ করেছেন?

কুমারবাহাদুর একটা ছবি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন,—ফ্রেম তো তেমনি আছে।

—কিন্তু পিছনের দিকটা দেখে কি আপনার খটকা লাগছে না?

এবার কুমারবাহাদুর বলে উঠলেন,—কী আশ্চর্য! পিছনের দিকটাই নতুন করে কাগজ সাঁটা হয়েছে। ছবিগুলো কি কেউ খুলেছিল?

কর্নেল বললেন,—আমিই খুলেছিলাম। কারণ বহু বছর আগের বাঁধানো ছবির পিছন দিকটা দেখে সন্দেহ হয়েছিল, পিছনগুলো কেউ খুলেছে।

এবার কুমারবাহাদুর উত্তেজিতভাবে বললেন,—ছবি খোলার কারণ কী?

—কারণ ছবিচোর জানত এই তিনটে ছবির ভেতরই বহুমূল্য রত্ন লুকনো আছে। আমি দেখাচ্ছি। ভেতরে এই দেখুন দুটো করে পুরোনো পিসবোর্ড আছে। আতস কাচে দেখেছি দুটো পিসবোর্ডের মধ্যে আবছা নকশা কাটা কোনও জিনিসের ছাপ পড়েছে।

কুমারবাহাদুর চমকে উঠে বললেন,—তা হলে এর ভেতর মূল্যবান রত্ন লুকোনো ছিল।

—ছিল। সেগুলো ছবিচোর হাতিয়ে নিয়ে নতুন করে পিছনে কাগজ এঁটে রেখেছিল। ব্রোঞ্জ, সিল আর নকশা নিয়ে তার মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। তিনখানা বহুমূল্য নকশাদার হালকা পাতের

অলঙ্কার পেয়েই সে খুশি হয়েছিল। যাইহোক, আর কোনও কথা নয়, আমি একবার টেলিফোন করব।

কুমারবাহাদুর টেলিফোন দেখিয়ে দিতেই কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, তারপর বললেন,—হালদারমশাই কী খবর বলুন।... কতক্ষণ আগে?...এইমাত্র? ঠিক আছে। আপনি এসে বাড়িটার কাছাকাছি কোনও জায়গায় দাঁড়ান। যেখান থেকে ও বাড়ির কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না।

কর্নেল আবার ডায়াল করলেন, তারপর বললেন,—মিস্টার পাণ্ডে, আপনারা তৈরি আছেন তো?...তা হলে এখনই বেরিয়ে পড়ুন এবং রামদয়াল অগ্রবালের বাড়ি 'মাতাজি ধাম' চারদিক থেকে ঘিরে ফেলুন। আমি এখনই বেরুচ্ছি।

কুমারবাহাদুর কান ভরে শুনছিলেন। তিনি জিগ্যেস করলেন,—কর্নেলসাহেব, কী ব্যাপার বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল হেসে বললেন,—আপাতত আছে। কারণ আমার এই অভিযান সার্থক হবে কি না নিশ্চিত নই। আপনি অপেক্ষা করুন, যথাসময়ে এসে আপনাকে সব বলব।

কর্নেল ঘরের দরজা খুলে বেরুলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে একবার ঘুরে দেখলুম কুমারবাহাদুর দরজার বাইরে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা গেটের কাছাকাছি পৌঁছেছি এমনসময় পাশের একতলা ঘর থেকে সেই হাফপ্যান্ট পরা লোকটি সেলাম ঠুকে বলল,—এখনই চলে যাচ্ছেন কর্নেলসাব?

কর্নেল বললেন,—মগনলাল, আবার আমরা আসব।

সেই সময়ই নিচের রাস্তায় দুটো পুলিশের জিপ এবং একটা কালো রঙের প্রিজন ভ্যান ঝড়ের বেগে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত, আমরা এবার শর্টকাটে না গিয়ে সদর রাস্তা দিয়েই হেঁটে যাই।

রাস্তাটা চড়াইয়ের দিকে উঠেছে। মিনিট দশেক হাঁটার পর সমতল রাস্তায় পৌঁছে দেখলুম বাঁ-দিকে মাতাজি ধাম-এর সামনে পুলিশের তিনটে গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে। এবং রাইফেল হাতে নিয়ে পুলিশবাহিনী বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। একটু তফাতে হালদার মশাই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের দেখেই হন্তদন্ত এগিয়ে এলেন। তারপর চাপাস্বরে কর্নেলকে বললেন,—এখনই জাল ফ্যালাইয়া তো দিলেন। কোন মাছটারে ধরবেন বুঝতে পারতাসি না।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—আপনার কথা শুনেই জাল ফেলেছি। আসুন দেখি কী অবস্থা।

হালদারমশাই কী বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। একদিকে আমি তো একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। কিছু বোঝার শক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আমাদের দেখে সেই এস. আই. মিস্টার শাহেদ খান চাপা হেসে বললেন,—কর্নেলসাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

কর্নেল বারান্দায় উঠে শুধু বললেন,—অর্থাৎ আমার টাইমিং সেন্স কাজে লেগে গেছে।

প্রথম ঘরটা বসবার ঘর। সেই ঘরে দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই। শাহেদ খান ভেতরের ঘরের দরজায় পরদা তুলে বললেন,—স্যার কর্নেলসাহেবরা এসে গেছেন।

ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর কেউ ডাকলেন,—আসুন কর্নেল সাহেব। কর্নেল তাঁর পিছনে আমি এবং হালদারমশাই ঢুকে দেখি এটা যেন একটা গোডাউন। ঘরের এখানে-ওখানে স্তূপাকৃতি প্রকাণ্ড সব প্যাকেট সাজানো এবং এককোণে জানালার ধারে ছোট্ট সোফাসেটে বসে আছেন জগদীশ প্রসাদ। একজন ভুঁড়িওয়ালা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক এবং আমাদের সুপরিচিত সেই মধুরকৃষ্ণ মুখুজ্যেমশাই। সেন্টার টেবিলে খবরের কাগজ ছড়িয়ে রেখে তার ওপর সূক্ষ্ম নকশাকাটা অর্ধবৃত্তাকার মুকুটের মতো গড়নের তিনটে জিনিস। প্রত্যেকটিতে নানারঙের রত্নখচিত আছে। তার

ওপর আলো পড়ে আমার চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছিল। আরও একটা জিনিস দেখতে পেলুম। টেবিলের একপাশে একটা ব্রিফকেস খুলে রাখা হয়েছে। সেটা নোটে ভর্তি। হালদারমশাই আমার কানে-কানে বললেন,—কী কারবার দ্যাখসেন?

কর্নেল সোফার কাছে গিয়ে বললেন,—মিস্টার পাণ্ডে, একেবারে ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলেন দেখছি।

দৈত্যাকৃতি মিস্টার পাণ্ডের ডান হাতে রিভলভার ছিল। উনি সেটা বাঁ-হাতে নিয়ে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। তারপর বললেন,—দরজা ভেঙে ঢুকতে হয়নি। কারণ এই তিন ঘুঘু বেটাচ্ছেলে ভেবেছিল বাইরের ঘরের দরজা খোলা রাখলে সন্দেহ হবে না যে ভেতরে ঘরে কিছু হচ্ছে।

মিস্টার পাণ্ডে ছাড়া ঘরে সশস্ত্র দুজন পুলিশ অফিসার হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশও দেখতে পেলুম। বুঝলুম তারা স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক। তারপরই দেখলুম মধুরবাবু হাঁউ-মাঁউ করে কেঁদে উঠেছেন। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, —আমি কিছু জানি না কর্নেলসাহেব। রাজবাড়িতে আমার জায়গা হবে না দেখে আমি রামদয়ালজির কাছে একটা চাকরির আশায় এসেছিলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার মতো ধূর্ত মানুষ আমি এ যাবৎ কাল দেখিনি। আমাকে একটা অদ্ভুত গল্প বলে আপনি যে নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন, তা কোথায় পৌঁছুবে আমি জানতে পেরেছিলুম বারিনবাবুর হাতে মুঠোয় কাঁচাপাকা একগোছা চুল থাকার কথা শুনে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—অ্যাঁ, কী কইলেন? কাঁচাপাকা চুল?

—হ্যাঁ, হালদারমশাই। মধুরবাবুর মাথা লক্ষ করে দেখুন। উনি যেদিন আমার কাছে যান, সেদিন আমার চোখ পড়েছিল, ওঁর মাথার সদ্য ছাঁটা ছোট-ছোট চুলে। আপনারা জানেন মধুরবাবু খুব সৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁকে কুমারবাহাদুর ঠাট্টা করে 'বাবুর বাবু' বলতেন। তাছাড়া আমিও ওঁকে যখন প্রথম দেখেছিলুম, তখন ওঁর মাথায় ছিল, টেরিকাটা ঝাঁকড়া চুল।

মিস্টার পাণ্ডে বললেন,—কলকাতার এই জগদীশবাবুর ব্রিফকেস থেকে আমরা একটা রিভলভার উদ্ধার করেছি। মনে হচ্ছে সেটাই মার্ডার উইপন। লালবাজার থেকে আমাকে বারিন সিনহা নামে এক ভদ্রলোকের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কেস হিস্ট্রি রেডিও মেসেজে পাঠানো হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—লালবাজারের ডিটেকটিভরা সদলবলে দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বেন। তাঁদের হাতে এই তিনজনকেই আপনারা হয়তো তুলে দেবেন।

—দেব। কিন্তু এই কয়েক লাখ টাকার তিনটে রত্নখচিত সোনার মুকুট কোথায় এবং কে দেখতে পেয়ে চুরি করেছিল?

—আপাতত সংক্ষেপে বলি। এই মধুর মুখুজ্যে ছিল এখানকার রাজবাড়ির কেয়ারটেকার। তার বাবাও ছিলেন রাজ এসটেটের ম্যানেজার। পুরুষানুক্রমে এ বাড়িতে থাকার দরুন মধুরবাবু জানতে পেরেছিল কুমারবাহাদুরের পূর্বপুরুষদের তিনটি বাঁধানো ছবির পিছন দিকে সাবধানে এই তিনটি রত্নখচিত মুকুট লুকোনো ছিল। মধুরকৃষ্ণ রাজবাড়ি থেকে সেগুলো হাতিয়ে এই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছিল এবং ছবির পেছনে নতুন করে কাগজ এঁটে দিয়েছিল। তাই প্রথম দিনই ওর কাটা চুল এবং এই নতুন করে আঁটা কাগজ আমার মনে সন্দেহ জাগিয়েছিল। এরপর মধুরকৃষ্ণ প্রথমে বারিনের সঙ্গে তারপর জগদীশপ্রসাদের সঙ্গে এগুলো নিয়ে দরাদরি শুরু করে। এ অবশ্য আমার অনুমান।

তারপর জগদীশ আর মধুরকৃষ্ণ দুজনে কেন বারিন সিনহাকে খুন করল তাও আমার কাছে স্পষ্ট। এই মুকুটগুলোর দাম বাজার দরে এত বেশি টাকা, যে বারিনের পক্ষে তা কেনা সম্ভব ছিল

না। তার চেয়ে বড় কথা বারিন বেঁচে থাকলে তাকেও সমান বখরা দিতে হবে। অতএব তাকে শেষ করে ফেলাই উচিত।

এরপর মধুরকৃষ্ণ খুব ভয় পেয়েছিল। কারণ জগদীশপ্রসাদ এরপর তাকেও হয়তো মেরে ফেলবে। তাই নিজের প্রাণ রক্ষার জন্যে সে একটা ব্রিফকেসে শুধু ছবিগুলো আর দু-একটা জিনিস ভরে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে একটা গপ্পো ফেঁদে আসলে আমার কাছে আশ্রয়ই চেয়েছিল। সে জানে আমি তার গল্পটা শোনার পর তাকে আশ্রয় দেব। যাইহোক, সে রত্নগুলো নিজের কাছে লুকিয়ে রেখে আমার কথা মতো প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার হালদারের সঙ্গে যদুগড়ে এসেছিল। এটা কিন্তু আমারই একটা চাল। শেষ পর্যন্ত সে এখানে এসে সাধু সেজে রাজবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে নিশ্চয়ই কোটিপতি স্মাগলার এই রামদয়ালের কাছে রত্ন বেচতে চাইবে। এটা আমি অনুমান করেছিলুম।

মিস্টার পাণ্ডে জগদীশ প্রসাদকে দেখিয়ে বললেন,—কিন্তু এই ভদ্রলোক কীভাবে জানলেন যে মধুরবাবু এখানে এসে রামদয়ালের দ্বারস্থ হবে?

কর্নেল বললেন,—আমার অনুমান জগদীশ প্রসাদের হাত থেকে বাঁচতে মধুরকৃষ্ণ অনেক ভেবে তাকেও বখরা দিতে চেয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, এদের তিনজনের মধ্যেই একটা যোগাযোগ হয়ে যায়, এবং ঠিক সময়ে জগদীশ তার বখরা নিতে এখানে এসে পড়ে। আজকাল টেলিফোনের উন্নতির যুগে পরস্পর যে যেখানেই থাকুক যোগাযোগ করা কঠিন কিছু নয়।

মিস্টার পাণ্ডে বললেন,—সবকথা আমি এই তিন বেটাচ্ছেলের মুখ থেকে বের করে নেব। আমার নাম জয়রাম পাণ্ডে! আমি যে কী, তা অন্তত এই রামদয়াল অগ্রবাল ইতিমধ্যেই ভালোই জেনে গেছে।

কর্নেল বললেন,—তা হলে আপনার বমাল আসামিদের নিয়ে থানায় চলে যান। লালবাজারের লোকেরা এসে পড়লেই আইনত যে ব্যবস্থা করা উচিত তা করবেন।

এই বলে কর্নেল সবে ঘুরেছেন, হালদারমশাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কয়েক পা বাড়িয়ে মধুরবাবুর মাথায় একটা জায়গায় চুল সরিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন,—দ্যাখসেন! বাঁ-কানের পাশে একটুখানি জায়গা লাল হইয়া আসে। এই জায়গাটা কাইল দুপুরে হঠাৎ আমার চোখে পড়সিল। জিগাইলাম ফোঁড়া হইসে নাকি মধুরবাবু? মধুরবাবু সেইখানে হাত বুলাইয়া কইলেন, কী একটা হইসিল। আমি চুলকাইয়া দিসিলাম। কে জানে সেপটিক না হয়!

বলে হালদারমশাই খি-খি করে হাসতে-হাসতে কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।

* * * * *

আমরা তিনজনে 'মাতাজি ধাম' থেকে বেরিয়ে যে বাংলোয় কর্নেল এবং আমি উঠেছি, সেখানে গেলুন। কর্নেল চৌকিদারকে বললেন,—একজন গেস্ট আছে। কোনও অসুবিধে হবে না তো?

চৌকিদার বলল,—কোনও অসুবিধে হবে না স্যার, শুধু হুকুম করুন, কখন আপনারা লাঞ্চ খাবেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক একটায় আমরা খেয়ে নেব। তবে আপাতত তুমি আমাদের তিন পেয়ালা কফি এনে দাও।

কিছুক্ষণ পরে চৌকিদার কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে-খেতে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—একটা কথা বুঝতে পারত্যাসি না কর্নেলস্যার।... হঃ, আপনি কথাটা তখন মিস্টার পাণ্ডেরে কইসিলেন বটে, কিন্তু আমি বুঝি নাই।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—বলুন হালদারমশাই।

—মধুরবাবু মিথ্যা একখান গল্প কইয়া আপনার কাছে গিসল ক্যান? সে তো ওই রত্নগুলি হাতাইয়া বাকি সব জিনিস নষ্ট কইরা ফেলতে পারত। কিন্তু তা না কইরা সে আপনার কাছে গেল ক্যান?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জগদীশপ্রসাদের ভয়ে।

—এবার কন যখন সে বারিনবাবুর কাছে গিয়াসিল তখনই কি জগদীশবাবু বারিনবাবুকে খুন করেন?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বারিনবাবু জগদীশবাবুর চুল না ধইরা মধুরবাবুর চুল ধরলেন ক্যান?

—দৃশ্যটা আমি মনে-মনে সাজিয়েছি। শুক্রবার রাত্রে তিন স্যাঙাতে মিলে মধুরবাবুর চুরি করা রত্ন নিয়ে আলোচনা করছিল। ধরা যাক, তিনজনেই ঠিক করে রত্নগুলো যদুগড়ে গিয়ে রামদয়ালের কাছে বিক্রির প্রস্তাব করা হবে। কারণ, তিনজনই রামদয়ালকে চেনে। জগদীশবাবুও যে চিনত, তা তো আমরা এখন জানি। এখানে এসে তার বাড়িতেই জগদীশবাবু ঢুকেছিল।

যাইহোক, এবার সেই দৃশ্যের কথায় আসি, কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর মধুরবাবু উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময়েই জগদীশবাবু মধুরবাবুর চক্রান্ত অনুসারে আচমকা এগিয়ে এসে বারিন সিনহার কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে গুলি করেন। আচমকা আক্রান্ত হওয়ার মুখে মানুষ সহজাত বোধে যা করে, বারিনবাবু ঠিক তাই করেছিল। হাত বাড়িয়ে জগদীশবাবুর চুল ধরতে গিয়ে মধুরবাবুর মাথাটা হাতের কাছে পেয়েছিল। তাই সে মধুরবাবুরই একগোছা চুল ছিঁড়ে নেয়।

আমি জিগ্যেস করলুম,—আপনি তা হলে একেবারে প্রথম থেকেই মধুরবাবুকে সন্দেহ করেছিলেন।

—সে তো আগেই বলেছি। মধুরবাবুর মাথার চুলছাঁটা দেখে আমার অবাক লেগেছিল। যখন অবাক লেগেছিল। তখন অবশ্য তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধুরবাবু যখন বলল,—বারিন নামে তার এক বন্ধু খুন হয়েছে, সে নাকি ব্রিফকেস দিয়েছিল—তার হাতের মুঠোয় একগোছা কাঁচাপাকা চুল আছে। জয়ন্ত, খুনি যত ধূর্তই হোক এইভাবেই একটা বেঁফাস কথা বলে ফেলে কিংবা তার ধরা পড়ার কোনও সূত্র নিজের অজান্তে রেখে যায়। একটু চিন্তা করো জয়ন্ত, ভিকটিমের হাতের মুঠোয় কাঁচাপাকা চুল থাকার কথাটা বলে মধুরকৃষ্ণ কি বোকামি করেনি? আসলে সে বারিনবাবুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছিল।

হালদারমশাই ততক্ষণে কফি শেষ করেছেন। একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—আমরা কি আইজ যদুগড়ে থাকব?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—নিশ্চয়ই থাকব। আর এই সুযোগে আপনাকে আর জয়ন্তকে রাজবাড়ির বিস্ময়কর পাতাল-জাদুঘর দেখাব।

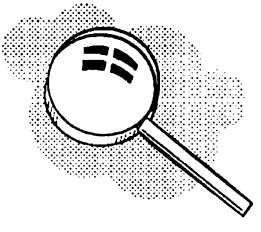

প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

এক

সেবার ডিসেম্বরের মাঝামাঝিও কলকাতায় শীতের তত সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর হঠাৎ এক বিকেলে আকাশ ধূসর করে এসে গেল ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর সেই সঙ্গে এলোমেলো বাতাস। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিস থেকে বেরিয়ে কনকনে ঠান্ডা হিমশীতের পাল্লায় পড়ে গেলুম। পাঁচটায় সন্ধ্যা নেমে গেছে। চৌরঙ্গি রোড ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখি, সামনে যানজট। অগত্যা বাঁ-দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে লিন্ডসে স্ট্রিট হয়ে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটে পৌঁছে দেখি, সেখানেও সামনে জ্যাম। তখন আবার বাঁ-দিকের গলি হয়ে ইলিয়ট রোডের মুখে চলে গেলুম। তারপরই কথাটা মাথায় এসে গেল।

এই বৃষ্টিঝরা শীতের সন্ধ্যায় ইলিয়ট রোডে আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে গেলে মন্দ হয় না! ষষ্ঠীচরণের তৈরি গরম কফি খেতে-খেতে এবং কর্নেলের সঙ্গে গল্প করতে-করতে ততক্ষণে যানজট ছেড়ে যাবে। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফিরতে বেশি সময় লাগবে না।

'সানি ভিলা'-র গেটে গাড়ি ঢুকিয়ে পোর্টিকোর কাছাকাছি পার্ক করলুম। শুধু একটাই চিন্তা। বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে ইলিয়ট রোডে জল জমবে।

কিন্তু এখন আর তা নিয়ে চিন্তার মানে হয় না। তিনতলায় উঠে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ডোরবেলের সুইচ টিপলুম। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেল এবং কর্নেল সহাস্যে বললেন, —এসো জয়ন্ত! তোমার জন্য একটু আগে ষষ্ঠীকে তেলেভাজা আনতে পাঠিয়েছি।

ওঁর জাদুঘরসদৃশ্য ড্রয়িংরুমে ঢুকে বললুম,—আমি আসব তা কি আপনি ধ্যানবলে জানতে পেরেছিলেন?

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে বললেন,—অঙ্ক কষে জয়ন্ত! স্রেফ অঙ্ক!

—জ্যোতিষীদের অঙ্ক?

প্রকৃতিবিজ্ঞানী মিটিমিটি হেসে বললেন,—উঁহু। স্রেফ পাটিগণিত।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—পাটিগণিতের অঙ্ক কষে আপনি আজকাল জানতে পারেন কে আসবে?

অন্য কারও কথা নয় জয়ন্ত, তোমার আমার কথা।—কর্নেল তাঁর টাক এবং সাদা দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, অঙ্কটা সোজা। আজ সোমবার, তোমার দশটা-পাঁচটা ডিউটি। তুমি অফিস থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গি হয়ে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে ইস্টার্ন বাইপাস ধরে সল্টলেকে যাবে। একদিকে আজ সন্ধ্যায় ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট দিল্লি থেকে কলকাতা এসে রাজভবনে রাত কাটাবেন। তাই এয়ারপোর্ট থেকে বাইপাস ধরে পার্ক স্ট্রিট এবং রাজভবন পর্যন্ত তাঁর গমনপথ ট্রাফিকপুলিশ পরিষ্কার রেখেছে। নিরাপত্তারক্ষীরা প্রত্যেকটি মোড়ে টহল দিচ্ছে। যাই হোক, এই অবস্থায় তোমার অলি-গলি শর্টকাট করে এই রাস্তায় এসে পড়াটা অনিবার্য এবং এসে পড়লে এই বৃদ্ধের কথা, বিশেষ করে বৃষ্টিঝরা শীতের সন্ধ্যায় ষষ্ঠীচরণের তৈরি দুর্লভ স্বাদের কফির কথা তোমার মনে আসাটা অনিবার্য।

ওঁর পাটিগণিতের হিসেব শুনতে-শুনতে হেসে ফেললুম,—এই যথেষ্ট! বুঝে গেছি।

কর্নেল আস্তে বললেন,—তুমি তেলেভাজা খেতে ভালোবাসো, এটাও আমার জানা।

বললুম,—ওহ! আপনার হাড়ে-হাড়ে এইসব হিসেবি বুদ্ধি কর্নেল!

ডার্লিং! আমাদের অবচেতন মনই সচেতন মনকে চালনা করে। সম্ভবত অফিস থেকে বেরুনোর পর তোমার অবচেতন মন এই সুন্দর সন্ধ্যায় আমার ডেরার কথা ভেবেছিল। শীতের বৃষ্টি, কফি এবং প্রত্যাশা—যদি দৈবাৎ দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য একটা রোমাঞ্চকর স্টোরি পেয়ে যাও!—কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন, হ্যাঁ। স্টোরির একটুখানি লেজ তুমি আগাম দেখে নিতেও পারো সেটা রোমাঞ্চকরও বটে!

বলে কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার বের করে আমাকে দিলেন। ভাঁজ খুলে চিঠিটা পড়তে শুরু করলুম।

শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বড় বিপদে পড়িয়া আপনাকে গোপনে এই পত্র লিখিতেছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক সত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা করুন। সাক্ষাতে পূর্ণ বিবরণ পাইবেন। অত্র পত্রে সংক্ষেপে শুধু জানাইতেছি যে, তিনমাস পূর্বে বিশেষ কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়া ফুটপাতে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলাম। বাড়ি ফিরিয়া পুস্তকখানি পড়িবার অবকাশ পাই নাই। সিঁড়ি হইতে পড়িয়া বাম হাঁটু ভাঙিয়া গিয়াছিল। প্রায় একমাস শয্যাশায়ী ছিলাম। তার মধ্যে প্রতি রাত্রে ভৌতিক উৎপাত। বহুপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাই। পাশের ঘরে কাহারা ফিসফিস করিয়া কাথাবার্তা বলে। ভূতের ওঝা, ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি স্বস্ত্যয়ন, পাহারার ব্যবস্থা সকলই করিয়াছি। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। গতকল্য সন্ধ্যায় লাঠি ধরিয়া গঙ্গাতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। হঠাৎ অদৃশ্য হস্তে কেহ আমাকে সজোরে চাঁটি মারিল এবং আবার আছাড় খাইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছি। এদিকে সেই পুস্তকটিও অদ্ভুত আচরণ করিতেছে। সাক্ষাতে সকলই বলিব। শীঘ্র মদীয় ভবনে পদার্পণ করিতে আজ্ঞা হয়। নমস্কারান্তে ইতি—

শ্রী অক্ষয়কুমার সাঁতরা
সাকিন—হাটছড়ি পোঃ অঃ বড়হাটছড়ি
জেলা—নদীয়া।

চিঠি পড়া শেষ হতে-হতে ষষ্ঠীচরণ এসে গিয়েছিল। ভেজা ছাতি সাবধানে মুড়ে সে একগাল হেসে বলল,—বাহ। এই দাদাবাবু এসে পড়েছেন। বাবামশাই বললেন, তোর দাদাবাবুর জন্যে গরম-গরম তেলেভাজা নিয়ে আয়।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—প্লেটে করে নিয়ে আয়। আর তার পেছন-পেছন পটভর্তি কফি যেন আসে।

ষষ্ঠী পর্দা তুলে ভেতরে চলে গেল। চিঠিটা কর্নেল আমার হাত থেকে নিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে

রাখলেন। বললুম,—গ্রাম্য মানুষ। তবে মোটামুটি ভালোই লিখতে পারেন। বয়স্ক বলে মনে হচ্ছে। কুসংস্কার! বইটার নাম 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'। তাই হয়তো—আপনি একটু আগে অবচেতন মনের কথা বলছিলেন, ভদ্রলোক অবচেতন মনে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন,—বইটার অদ্ভুত আচরণের কথা লিখেছেন অক্ষয়বাবু! সেটাই কিন্তু ওঁর চিঠির একটা বড় পয়েন্ট।

একটু হেসে বললুম,—হাটছড়ি! গ্রামের নামটাও বেশ অদ্ভুত। তো আপনি সেখানে পদার্পণ করবেন নাকি?

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে আবার বললেন,—বইটার অদ্ভুত আচরণ!

—কিন্তু গ্রামটা কোথায় এবং কীভাবে সেখানে যাওয়া যায়, তা তো লেখেননি ভদ্রলোক!

পোস্টঅফিস বড়হাটছড়ি। তার মানে পাশাপশি দুটো গ্রাম।—কর্নেল এইরকম অন্যমনস্কতায় বললেন, গঙ্গার তীরে এক জোড়া জনপদ। ছোট এবং বড়। হুঁ—পোস্টঅফিসে খোঁজখবর নিলে হদিস মিলতে পারে। বিশেষ করে জি.পি.ও-তে। ওখানে আমার চেনাজানা এক অফিসার আছেন। বিনোদবিহারী ঘড়াই। এক মিনিট। দেখি, ওঁর বাড়ির ফোন নাম্বার খুঁজে পাই নাকি।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে একটা মোটা ডায়রি টেনে নিলেন টেবিল থেকে। এই সময় ষষ্ঠী একটা প্লেটে তেলেভাজা রেখে গেল। কর্নেলের দৃষ্টি ডায়রির পাতায়। কিন্তু দিব্যি হাত বাড়িয়ে একখানা বিশাল বেগুনি তুলে নিলেন। অবাক লাগল। উনি নিজে তেলেভাজা পছন্দ করেন না। আজকাল নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বড় সতর্ক। এখন দেখি, সাদা গোঁফ দাড়ি বেগুনির পোড়া তেলে ভিজে যাচ্ছে। তবু ভ্রুক্ষেপ নেই।

কিছুক্ষণ পরে বললেন,—হ্যাঁ। পাওয়া গেছে। তবে একটু পরে ফোন করব। কাল অফিসে গিয়ে উনি আমাকে জানিয়ে দিতে পারবেন আশা করি।

বললুম,—আপনি তেলেভাজা খাচ্ছেন দেখছি!

কর্নেল সে-কথায় কান দিলেন না। বললেন,—ঠিকানা খুঁজে বের করার একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি পোস্ট অফিসের শরণাপন্ন হওয়া। ধরো, কলকাতারই কোনও গলিরাস্তার একটা নম্বর খুঁজছ। কিন্তু পাচ্ছ না। বিশেষ করে কলকাতার মতো পুরনো শহরে কোনও ঠিকানা জানা সত্ত্বেও খুঁজে বের করা শক্ত। তখন পোস্টম্যানের সাহায্য নাও। পেয়ে যাবে।

তেলেভাজা শেষ হতে-হতে কফি এসে গেল। সেইসময় উঁকি মেরে বৃষ্টির অবস্থা দেখে এলুম জানালায়। সেইরকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর নেই। ছিটেফোঁটা ঝরছে। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, —হাটছড়ি গ্রামে তাহলে—

কর্নেল ঝটপট বললেন,—অবশ্যই। বইটার অদ্ভুত আচরণ যা-ই হোক, গ্রামটা গঙ্গার তীরে। কাজেই আশা করছি ওই এলাকায় গঙ্গার অববাহিকায় জলা বা বিল থাকতে বাধ্য। বিল থাকলে এই শীতের মরশুমে নানা প্রজাতির বিদেশি পাখিরও দেখা পেয়ে যাব।

হাসতে-হাসতে বললুম,—বেচারা অক্ষয়বাবু আপনার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। তাঁকে ফেলে আপনি পাখির পেছনে ছোটাছুটি করে বেড়াবেন?

না, না। আগে অক্ষয়বাবু, তারপর বিদেশি পাখি।—কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, এবং রীতিমতো রোমাঞ্চকর একটা স্টোরি যদি চাও, তাহলে তুমিও আমার সঙ্গী হবে।

—আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা বোগাস! ভদ্রলোকের পাগলামি!

বইটা জয়ন্ত, বইটা আমার পয়েন্ট। ফুটপাতে অনেকসময় অনেক পুরনো এবং দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া যায়। সেইসব বইয়ে যা-ই লেখা থাক, বইগুলোর পেছনে বহুক্ষেত্রে অজানা তথ্য লুকিয়ে

থাকে।—কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এমনকী বইয়ের ভেতরেও থাকে। একবার আমার হাতে একটা বই এসেছিল—

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে ষষ্ঠী এসে বলল,—এক ভদ্রলোক বাবামশাই! বলছেন, খুব জরুরি দরকার।

—নিয়ে আয়।

ধুতি এবং তাঁতের কাপড়ের পাঞ্জাবি পরা উস্কোখুস্কো চেহারার একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—আজ্ঞে বড় বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—বসুন। আপনার নাম?

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বসে বললেন,—আমার নাম ভক্তিভূষণ হাটি। আমি থাকি গোবরার ওদিকে কান্তি খটিক লেনে! আমি ট্যাংরা থানা থেকে আসছি। থানার বড়বাবু বললেন, আপনি কর্নেলসায়েবের কাছে যান। ভূতপ্রেতের কেস পুলিশের আওতায় পড়ে না। পেনাল কোডে নাকি তেমন কোনও ধারা নেই।

ভদ্রলোক বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাগুলো বলছেন দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। কর্নেলও কিন্তু সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন,—বড়বাবু ঠিকই বলেছেন। তো আপনাকে ভূতে জ্বালাচ্ছে বুঝি?

ভক্তিবাবুর কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল! ব্যাগে হাত ভরে বললেন,—আগে বইটা দেখাই!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন—বই? 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'?

ভক্তিবাবু অবাক হয়ে বললেন,—আপনি জানতে পেরেছেন? হ্যাঁ—থানার বড়বাবু তাহলে ঠিকই বলেছিলেন। স্যার! খুলেই বলি তা হলে।

ব্যাগের ভেতর হাত তেমনি রেখে ভক্তিবাবু বললেন,—আমি রেলওয়েতে চাকরি করতুম। গতবছর রিটায়ার করেছি। একা মানুষ। পৈতৃক একতলা বাড়ি আছে। তার একটা ঘরে ভাড়াটে থাকে। অন্য ঘরটায় আমি থাকি। তো সময় কাটাতে বরাবর বই পড়ার অভ্যাস আছে। কদিন আগে কলেজস্ট্রিটের ফুটপাত থেকে বইখানা কিনেছিলুম। রাত্তিরে পড়ব বলে টেবিলে রেখেছিলুম। বিকেলে প্রতিদিন বেড়াতে বেরোই। বাড়ি ফিরে স্বপাক খাই। খাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে বই পড়ব। কিন্তু কোথায় বই? খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে দেখি, বইটা আলমারির তলায় পড়ে আছে। এতো ভারি আশ্চর্য! যাই হোক বইটা ঝেড়েমুছে যেই পড়তে বসেছি, অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। বইটা টেবিলে রেখে মোমবাতি জ্বেলে দেখি, বইটা টেবিলে নেই!

কর্নেল মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন,—হুঁ। তারপর?

ভক্তিবাবু চাপা গলায় বললেন,—বইটা টর্চ জ্বেলে খুঁজতে শুরু করলুম। তারপর দেখি, ওটা কুলুঙ্গিতে চড়ে বসে আছে। এবার খুবই ভয় পেলুম। ভয়ে-ভয়ে বইটা মোমের আলোয় যেই খুলেছি, জানলা দিয়ে একটা ইয়া মোটা গুবরে পোকা এসে মোমবাতিটা উল্টে ফেলে দিল।

কর্নেল বললেন,—দেখি আপনার বইটা।

ভক্তিবাবু বইটা বের করে তাঁর হাতে দিলেন। দেখলুম, আসল মলাটটা কবে ছিঁড়ে গেছে। লেখকের নাম বা টাইটেল পেজও নেই। বইবিক্রেতা হলদে রঙের মোটা কাগজে মলাট করে বইটাকে লাল সুতো দিয়ে সেলাই করেছে। সেই মলাটে লাল কালিতে লেখা আছে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'।

কর্নেল বইটা খুলে দেখে বললেন,—বইটার নাম দেখছি ভেতরে কোথাও ছাপা নেই।

ভক্তিবাবু বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে লোকটা পুরনো বই বেচছিল, তাকে জিগ্যেস করেছিলুম। সে বলেছিল, বইটার যা নাম ছিল, তাই-ই সে লিখেছে। তবে লেখকের নামের পাতা ছিল না বলে লেখকের নাম সে লিখতে পারেনি।

কর্নেল বললেন,—খুব পুরোনো বই দেখছি। পোকায় ইচ্ছে মতো কেটেছে। কোনও এক রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনকাহিনি। যাই হোক, আর কী ঘটেছে বলুন!

ভক্তিবাবু বললেন,—সেইদিন থেকে বইটা লুকোচুরি খেলেছে। ধরুন, বিছানায় রেখে বাথরুমে গেছি। ফিরে এসে দেখি, বইটা টেবিলের তলায় পড়ে আছে। সব চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, যখনই পড়ব বলে খুলেছি, অমনি বাধা পড়েছে। কেউ এসে ডেকেছে। নয়তো আরশোলা উড়ে এসে চোখে বসেছে। কিংবা আচমকা ঝরঝর চুনবালি খসে পড়েছে।

—আর কিছু?

হ্যাঁ। সেটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক। —ভক্তিবাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল, রাত্তিরে অদ্ভুত শব্দ হয় ঘরের ভেতর। কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। ছাদের ওপর ধুপধুপ শব্দ শুনি। কখনও জানালার কাছে ছায়ামূর্তি এক সেকেন্ডের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

আমি বললুম,—কিন্তু এখন তো কর্নেল বইটা খুলে পড়ছেন। কিছু হচ্ছে না!

আমি কথাটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কর্নেলের টাকে একটা মোটা কালো পোকা চটাস শব্দে পড়ল। কর্নেল খপ করে পোকাটাকে ধরে ফেলে বললেন,—গুবরে পোকা মনে হচ্ছে!

ভক্তিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। পাংশু মুখে বললেন,—স্যার! এর একটা বিহিত করুন। বাড়ি ফিরতে আমার ভয় করছে। আমার নাম-ঠিকানা এই কাগজে লিখেই এনেছি। দয়া করে রেখে দিন।

বলে তিনি একটুকরো কাগজ কর্নেলের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে গেলেন।

কর্নেল গুবরে পোকাটাকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এসে বললেন,—প্রেতাত্মার অভিশাপই বটে! জয়ন্ত! পড়বে নাকি বইটা?

বললুম,—নাহ্। আপনার ছাদের বাগান থেকে শীতের বৃষ্টিতে তাড়া খেয়ে গুবরে পোকারা চলে আসছে সম্ভবত। আমি গুবরে পোকার চাঁটি খেতে রাজি নই।

কর্নেল শুধু বললেন,—আমার ছাদের বাগানে গুবরে পোকা?...

দুই

পরদিন সকালে কর্নেলকে টেলিফোন করলুম। সাড়া পেয়ে তাঁর মতোই বললুম,—মর্নিং কর্নেল! আশা করি রাতে সুনিদ্রা হয়েছে?

কর্নেল বললেন,—আমার হয়েছে। ষষ্ঠীর হয়নি! সে নাকি বেজায় ভূতুড়ে স্বপ্ন দেখেছে।

—বইটার খবর বলুন!

—বইটা পড়তে গিয়ে আচমকা লোডশেডিং। তিন ঘণ্টা পরে বিদ্যুৎ এসেছিল। তবে অত রাতে আর পড়ার ইচ্ছে ছিল না।

—কিন্তু ওটা ঠিক জায়গায় ছিল তো?

বালিশের তলায় রেখেছিলুম। আমার মাথার ওজন আছে। তাই প্রেতাত্মা ওটা বের করতে পারেনি।—বলে কর্নেল হাসলেন, তো তুমি আমার ছাদের বাগানে গুবরে পোকার কথা বলেছিলে! কাল রাতে আমার টাকে যেটা পড়েছিল, সেটা জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলা বোকামি হয়েছিল। সকালে বাগানে উঠে দেখি, একটা ক্যাকটাসের গোড়ায় বজ্জাতটা চিত হয়ে পড়ে আছে। যাই

হোক, ওটা পাশের নিমগাছে ক্ষুধার্ত কাকদের দিকে ছুঁড়ে ফেলেছি। কাকগুলো ঠুকরে ওকে ভাগাভাগি করে খেয়েছে।

—এখন কি বইটা আপনি পড়ছেন?

—নাহ্! আলমারির ভেতর রেখে তালা বন্ধ করেছি। এবার একটু বেরুব। রাখছি জয়ন্ত!...

কর্নেল টেলিফোন রেখে দিলেন। আজ আমার ইভনিং ডিউটি। বিকেল তিনটে থেকে রাত নটা। ভাবলুম, অফিস যাওয়ার পথে কর্নেলের বাড়ি হয়ে যাব। ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছিল। নদীয়া জেলার কোনও হাটছড়ি গ্রামের অক্ষয় সাঁতরা এবং পূর্ব কলকাতার কান্তি খটিক লেনের ভক্তিভূষণ হাটি দুজনেই একই বই কিনে ঝামেলায় পড়েছেন।

আড়াইটে নাগাদ কর্নেলের ডেরায় হাজির হয়েছিলুম। আমাকে দেখে প্রকৃতিবিদ বললেন, —এসো জয়ন্ত! তোমার কথাই ভাবছিলুম!

—বইটার খবর বলুন! কোনও উৎপাত করেনি তো?

করবে কী করে? আলমারির চাবি আমার কাছে। —কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন তো শোনো। হাটছড়ি গ্রামের খোঁজ পেয়েছি। জি.পি.ও-র মিঃ ঘড়াই জানিয়েছেন, বড়হাটছড়ি কৃষ্ণনগর পোস্টাল সার্কেলে। অতএব কৃষ্ণনগর ডাকঘরে পৌঁছুতে পারলে বাকি খবর পাওয়া যাবে। চলো। বেরুনো যাক।

—আমি যাব কী? অফিস যেতে হবে। বিকেল চারটেয় রাজভবনে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—তোমার কাগজের চিফ রিপোর্টার সরলবাবুকে একটু আগে জানিয়ে দিয়েছি, জয়ন্ত আমার সঙ্গে এক প্রেতাত্মাকে ইন্টারভিউ করতে যাচ্ছে। সরলবাবু বুদ্ধিমান লোক। বললেন, যেন ঘুণাক্ষরে অন্য কাগজের কেউ টের না পায়। দৈনিক সত্যসেবক এক্সক্লুসিভ স্টোরি ছাপবে। এই হল ওঁর শর্ত।

নিচে কর্নেলের গাড়ির গ্যারাজ-ঘর অনেকদিন থেকে খালি আছে। কারণ কর্নেল তাঁর পুরনো ল্যান্ডরোভার গাড়িটা রাগ করে বেচে দিয়েছিলেন। গাড়িটা যখন-তখন অচল হয়ে যেত। সেই খালি গ্যারাজে আমার ফিয়াটগাড়ি ঢুকিয়ে রেখে তালা এঁটে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। একটা ব্যাগে একপ্রস্থ জামাকাপড়, দাড়িকাটার সরঞ্জাম, টুথব্রাশ, পেস্ট, সাবান ইত্যাদি সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। কারণ রিপোর্টারের চাকরি করি। কখন কোথায় হুট করে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাতে সময়ও থাকে না।

কর্নেলের পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, প্রজাপতি ধরা জাল, গলায় ঝোলানো ক্যামেরা আর বাইনোকুলার—সেই একই ট্যুরিস্টমার্কা বেশভূষা। শীতের কারণে গায়ে পুরু জ্যাকেট আর মাথায় টাকঢাকা টুপিও চড়িয়েছিলেন।

ট্রেনে কৃষ্ণনগর পৌঁছুতে সাড়ে ছ'টা বেজে গিয়েছিল। কর্নেল ট্রাঙ্ককলে সরকারি বাংলোর একটা ডাবলবেড রুম বুক করে রেখেছিলেন। কাজেই রাত কাটাতে কোনও অসুবিধে ছিল না। বাংলোর কেয়ারটেকার মধুবাবু কর্নেলের পরিচিত। রাতে খাওয়ার তদারকে নিজেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। কথায়-কথায় কর্নেল তাঁকে জিগ্যেস করেছিলেন,—আচ্ছা মধুবাবু, বড়হাটছড়ি নামে একটা গ্রাম আছে গঙ্গার ধারে। চেনেন নকি? আপনি তো স্থানীয় মানুষ। তাই জিগ্যেস করছি।

মধুবাবু বলেছিলেন,—খুব চিনি। এখান থেকে বাসে মাত্র আট কিলোমিটার। তবে গ্রাম আর নেই স্যার! এখন রীতিমতো টাউন। তা সেখানে বেড়াতে যাবেন নাকি?

—ইচ্ছে আছে।

—বেড়ানোর মতো জায়গা নয় স্যার! অবশ্য গঙ্গা আছে। কিন্তু গঙ্গা দর্শনের জন্য বড়হাটছড়ি যাওয়ার মানে হয় না!

—আসলে ওই এলাকায় নাকি একটা বিশাল জলাভূমি আছে। শীতের সময় নানারকম বিদেশি হাঁস আসে শুনে—

মধুবাবু হেসে অস্থির—বুঝেছি। বুঝেছি! আপনি হাঁসখালি বিলের কথা বলছেন। সেটা অবশ্য কাছাকাছিই বটে। ছোটহাটছড়ির পাশেই। ছোটহাটছড়ি স্যার, বড়হটাছড়ির লেজের টুকরো বলতে পারেন। মধ্যিখানে একটা ছোট্ট সোঁতা বিল থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় পড়েছে। সোঁতার ওপর কাঠের ব্রিজ আছে। তবে স্যার, সত্যি বলতে কী, ওটাই ছিল পুরনো আমলের আসল হাটছড়ি। গঙ্গার ভাঙনে ওখান থেকে বসতি সরে গেছে যেখানে, সেটাই এখন বড়হাটছড়ি।

—ছোটহাটছড়িকে তাই নাকি শুধু হাটছড়ি বলা হয়?

—ঠিক ধরেছেন স্যার! মূল নাম তো হাটছড়িই ছিল। ওখানে এখনও একটা জমিদারবাড়ি আছে। অর্ধেকটা গঙ্গায় তলিয়ে গেছে। বাকি অর্ধেকটাতে প্রাক্ত জমিদারবংশের কেউ-কেউ থাকেন। জমিদারবংশের পদবি কিন্তু সাঁতরা স্যার!

—মধুবাবু! ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা বলেন 'সামন্তরাজ' কথাটা থেকেই অপভ্রংশে সাঁতরা পদবি।

—তা-ই বটে স্যার। আমি ভাবতুম সাঁতরা পদবি জমিদারদের হয় কী করে?...

সবখানে দেখেছি, কর্নেল স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে অনেক তথ্য জোগাড় করে ফেলেন। তা হলে হাটছড়ি গ্রাম এবং অক্ষয় সাঁতরার ব্যাকগ্রাউন্ড জানা গেল। এতক্ষণে আমার মনে ক্ষীণ আশা জাগল, সত্যিই একটা রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা স্টোরি হয়তো পেয়ে যাব এবং দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাঠকরা তো গোগ্রাসে গিলবে।

সকালে ব্রেক ফাস্ট করে আমরা বাসস্ট্যান্ডে গেলুম। বড় হাটছড়ির বাস ছাড়ল সাড়ে ন'টায়! ভাগ্যিস আমরা বসার সিট পেয়েছিলুম। বাসটা যখন ছাড়ল, তখন বাসটার ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। তারপর রাস্তায় যেখানে সেখানে থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পিলপিল করে যাত্রী বাসটার দুধারে, পেছনে, মাথার ওপর যেন মৌমাছির চাকের মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ভয় হচ্ছিল রাস্তার যা অবস্থা, দুধারে গভীর খাদ—বাসটা টাল সামলাতে না পেরে উলটে যাবে না তো?

মাত্র আট কিলোমিটার যেতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। কর্নেল একটা সাইকেল রিকশ ডাকলেন। কিন্তু হাটছড়িতে সাঁতরাবাবুদের বাড়ি যাবেন শুনে সে বলল,—পায়ে হেঁটে চলে যান স্যার! ওই কাঠের বিরিজ দেখছেন! রিকশর ভার সহ্য করতে পারবে না। কোন কালের বিরিজ! সাবধানে লোক চলাচল করে।

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—আমার ওজন সইতে পারবে তো হে? কী মনে হয় তোমার?

রিকশওয়ালা পরামর্শ দিল,—কিনারা দিয়ে যাবেন না যেন। শুনেছি, বড় সাঁতরাবাবু বিরিজ ভেঙে নাকি পড়ে গিয়েছিলেন। হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গিয়েছিল।

—অক্ষয়বাবুর কথা বলছ?

—আজ্ঞে।

—উনি বড়। তাহলে ছোটর নাম কী?

—কালীপদবাবু। উনি রোগা প্যাঁকাটি লোক স্যার!

রিশওয়ালা দুজন যাত্রী পেয়ে তক্ষুনি চলে গেল। কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখে নিয়ে বললেন,—চলো জয়ন্ত! বেশিদূর নয়। গাছপালার ফাঁকে দোতলা বিশাল একটা পুরোনো বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওটাই সম্ভবত অক্ষয়বাবুর বাড়ি।

কাঠের সাঁকোটার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। কর্নেল সাবধানে পেরিয়ে গেলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। সঙ্কীর্ণ রাস্তার দুধারে ঘন গাছপালা ঝোপঝাড়। রাস্তায় পুরোনো আমলের ইটের খোয়া মাথা উঁচিয়ে আছে। ডাইনে বাঁক নিয়ে দেখি ভেঙে পড়া গেট এবং ধ্বংসস্তূপ। বাঁ-দিকে কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের ভেতর গিয়ে ঢুকেছে। গেটের পর এবড়ো-খেবড়ো খোয়াঢাকা রাস্তার দুধারে পাম গাছের সারি। মাঝে-মাঝে একটা করে গাছ মরে দাঁড়িয়ে আছে কঙ্কাটার মতো। কিছুটা এগিয়ে সামনে নতুন তৈরি পাঁচিল। বাড়িটা দুভাগে ভাগ হয়ে আছে। দুটো দরজা। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বড়বাবু এবং ছোটবাবুর আলাদা-আলাদা দরজা। তার মানে দুই ভাই পৃথগন্ন। প্রথমে ডাইনের দরজাটার কড়া নাড়া যাক।

কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল এবং তাগড়াই চেহারার ফতুয়া ও খাটো ধুতি পরা কালো রঙের একটা লোক করজোড়ে প্রণাম ঠুকে বলল,—সায়েবরা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আমি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই!

সে বলল,—ভেতরে আসুন আজ্ঞে! বড়কর্তামশাই দোতলার জানলা দিয়ে আপনাদের দর্শন পেয়েছেন।

ভেতরে একটুকরো উঠোন। উঠোনে ফুলের গাছের সঙ্গে আগাছার জঙ্গল গজিয়ে আছে। এক কোণে একটা গাই গরু চরছে। নিঝুম হয়ে আছে বাড়িটা। লোকটা আমাদের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে গেল। একটা ঘরের সামনে সে একটু কেশে বলল,—আজ্ঞে ওনারা এসে গেছেন বড়কর্তামশাই।

ভেতর থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সাড়া এল,—ভেতরে নিয়ে আয় হতভাগা! যেন বিনয়ের অবতার!

পুরোনো জীর্ণ পর্দা তুলে সে বলল,—আসতে আজ্ঞা হোক!

সত্যিই লোকটা বিনয়ের অবতার। ঘরটা বেশ বড়। বনেদি আসবাবপত্রে সাজানো। এমনকী ঝাড়বাতিও ঝুলছে। কোণের দিকে জানলার পাশে একটা উঁচু মস্ত বড় পালঙ্ক। পালঙ্কে ওঠার জন্য কাঠের ছোট্ট টুলের ওপর বিবর্ণ গালিচা ঢাকা। পালঙ্কে বালিশ ঠেস দিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক পা ছড়িয়ে এক পা হাঁটু অব্দি তুলে বসে ছিলেন। নমস্কার করে বললেন,—আসুন কর্নেলসায়েব! এখানে এসে বসুন।...ধানু! তুই এঁদের জন্য কফি নিয়ে আয়। কর্নেলসায়েব কফির ভক্ত। আর শোন! শিগগির রান্নার ব্যবস্থা করতে বল নবঠাকুরকে।

ধানু চলে গেলে অক্ষয়বাবু বললেন,—বাঁ হাঁটুতে ব্যান্ডেজ কর্নেল সায়েব! তাই উঠে বসতে পারছি না। কিছু মনে করবেন না যেন।

বলে একটু করুণ হেসে আমার দিকে তাকালেন,—উনি বুঝি সেই রিপোর্টার জয়ন্তবাবু? নমস্কার! নমস্কার কী সৌভাগ্য! এতদিন দৈনিক সত্যসেবকে আপনাদের দুজনকার কত কীর্তিকলাপ পড়েছি। কল্পনাও করিনি, আমার জীবনেও এমন সাংঘাতিক রহস্যময় ঘটনা ঘটবে এবং আপনাদের স্বচক্ষে দর্শন করব!

কর্নেল বললেন,—আপনার স্ত্রী এবং সন্তানাদি—

অক্ষয়বাবু বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, বিয়েই করিনি তো স্ত্রীসন্তানাদি—সারাজীবন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক। শেষজীবনে পৈতৃক বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছি। আমার বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদ পুরো বাড়িটা দখল করে রেখেছিল। মামলা-মোকদ্দমা করে শেষে দখল পেলুম। বাড়ির অর্ধেকটা গঙ্গায় তলিয়ে গিয়েছিল। ওদিকটা গভর্মেন্ট দখল করে বনবিভাগের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ভাঙনরোধী জঙ্গল গজিয়েছে। নইলে এখান থেকে গঙ্গা দর্শন করা যেত।

—সেই বইটার কথা বলুন!

অক্ষয়বাবু চাপা গলায় বললেন,—আমার দুর্মতি! মাস তিনেক আগে কলকাতা গিয়েছিলুম। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেখানে পুরোনো বই বিছিয়ে বসে ছিল একটা লোক। হাঁকছিল, যা নেবেন তাই দু-টাকা। তো হঠাৎ চোখ গেল ওই বইটার দিকে আসল মলাট নেই। হলদে মোটা কাগজে মলাট করে—

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন,—আপনার চিঠিতে বইটার অদ্ভুত আচরণের উল্লেখ আছে। সেই কথা বলুন!

অক্ষয়বাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। এবার উনি যা-যা বললেন, সবটাই কলকাতার কান্তি খটিক লেনের সেই ভক্তিবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছিল। তবে ভক্তিবাবুর দু-দুবার ঠ্যাং ভাঙেনি। অক্ষয়বাবুর ভেঙেছে। এই যা তফাত।

ইতিমধ্যে ধানু কফি আর চানাচুর রেখে গেল ট্রেতে। কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললেন,—বইটা এখন কোথায় রেখেছেন?

অক্ষয়বাবু বললেন,—দেয়ালে আঁটা আয়রনচেস্টে রেখেছি।

—তা হলে তারপর আর কোনও উপদ্রব হচ্ছে না?

—উপদ্রব মানে, রাতদুপুরে আয়রনচেস্টের ভিতর বিদ্‌ঘুটে শব্দ শুনতে পাই।

—আপনার বাড়িতে আপনি, কাজের লোক ধানু আর নবঠাকুর ছাড়া আর কেউ নেই?

—আজ্ঞে না।

—পাশের বাড়িতে আপনার বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদবাবু থাকেন। তাঁর ফ্যামিলিতে কে-কে আছে?

—ওর দজ্জাল বউ রাধারানি,—রাধারানির এক উড়নচণ্ডী নেশাখোর ভাই—মানে কালীর শ্যালক তাপস, কাজের মেয়ে ক্ষান্তমণি। রাধারানির সন্তানাদি নেই। ভীষণ ঝগড়াটে মেয়ে। খামোকা সকাল-সন্ধ্যা আমার নামে পিণ্ডি চটকায়।

কর্নেল দক্ষিণের জানালার দিকে আঙুল তুলে বললেন,—ওইটে বুঝি আপনাদের গৃহদেবতার মন্দির?

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ। নৃসিংহদেব আমাদের গৃহদেবতা। পাঁচশো বছরের পুরনো বিগ্রহ কর্নেলসায়েব! পালা করে পুজোর খরচ বহন করি। এক সপ্তাহ আমি। পরের সপ্তাহ কালী।

—পূজারীর নাম কী?

—আমার রান্নার ঠাকুর নবই বরাবর পূজারী। কালীর সঙ্গে রফা করেছিলুম। বাইরের পূজারী রাখলে অনেক বেশি দিতে হবে। নবঠাকুরকে কালী যা দেয়, তা আমার দেওয়ার অর্ধেক। কম খরচায় কালী পুণ্যার্জন করছে। তবু ওর লোভ যায় না।

—কীসের লোভ?

অক্ষয়বাবু একটু ইতস্তত করে বললেন,—ওর বিশ্বাস, আমাদের পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া ধনরত্ন নাকি আমি গোপনে গচ্ছিত রেখেছি। অথচ দেখুন মাত্র তিনবছর হল আমি বাড়ি ফিরেছি। সারাজীবন পাহাড়পর্বত অরণ্যে সাধু-সঙ্গ করে বেড়িয়েছি। কোনও গোপন ধনরত্ন থাকলে তার খবর কালীরই রাখার কথা পিতৃদেবের মৃত্যুকালে কালীই মাথার কাছে ছিল। আমি তখন কোথায়?

—আপনার কী ধারণা?

—কী বিষয়ে?

—পূর্বপুরুষের ধনরত্ন—

অক্ষয়বাবু জোরে মাথা নেড়ে হাসলেন,—কর্নেলসায়েব! ধনরত্ন যা কিছু ছিল, তা আমার ঠাকুর্দাই খরচ করে গেছেন। ঠাকুমার মুখে ছোটবেলায় শুনেছি। খুব খরুচে লোক ছিলেন তিনি।

বলে অক্ষয়বাবু হাত বাড়িয়ে পালঙ্কের পেছনে একটা সুইচ টিপলেন নিচের দিকে ক্রিরিরিরিং করে চাপা শব্দ হল। এতক্ষণে লক্ষ করলুম বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে।

ধানু দরজার বাইরে থেকে সাড়া দিল,—আজ্ঞে বড়কর্তামশাই?

—হতভাগার এই স্বভাব। ভেতরে আয়!

ধানু ভেতরে এলে অক্ষয়বাবু বললেন,—সায়েবদের থাকার ঘর ঠিক করেছিস?

আজ্ঞে, নিচের ঘরে গেসরুমে।

গেস্টরুম বল।—অক্ষয়বাবুর হাসলেন, কর্নেলসায়েবদের নিয়ে যা আপনারা বিশ্রাম করুন। খাওয়া-দাওয়ার পর যথাসময়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

নিচের তলায় পশ্চিমদিকের গেস্টরুমটা মন্দ নয়। দক্ষিণে খোলা বারান্দা। পশ্চিমের দরজা খুললে কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা সরকারি জঙ্গল। তবে দক্ষিণের বারান্দায় রোদ্দুর আছে। বারান্দার নিচে শানবাঁধানো চত্বর। তার শেষে মন্দির। কর্নেল বাইনোকুলারে জঙ্গলে সম্ভব পাখি খুঁজছিলেন। হঠাৎ বললেন,—সর্বনাশ এই জঙ্গলে ভালুক এল কোত্থেকে?

অবাক হয়ে বললুম,—ভালুক? বলেন কী!

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন,—কয়েক সেকেন্ডের দেখা। ঝোপে লুকিয়ে গেল। জয়ন্ত! আমাদের সাবধানে থাকা দরকার।... কর্নেলের কথায় ভয় পেয়েছিলুম। পশ্চিমের দরজা খুললে ভাঙা জমিদারবাড়ির পাঁচিল, তার ওধারে বনদফতরের কাঁটাতারের বেড়া কোনও ভালুককে আটকাতে পারবে না। আবার দক্ষিণেও তাই। পাঁচিল ধসে পড়েছে কবে। তার ওপর আগাছা গজিয়েছে। কাজেই ভালুক ইচ্ছে করলে দুটো দিক থেকেই এসে হানা দিতে পারে।

এখানে ঠান্ডাটা বড্ড বেশি। তাই স্নান করলুম না। আর কর্নেলের তো সামরিক জীবনের অভ্যাস। স্নান না করে দিব্যি দুসপ্তাহ কাটিয়ে দিতে পারেন। আমাদের ঘরে টেবিল-চেয়ার আছে। দুপুরে খাওয়াটা সেখানেই হল। ধানু বাইরে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। নবঠাকুর ভালোই রাঁধেন।

কর্নেল তাঁকে জিগ্যেস করলেন,—পুরনো বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব হয়। এ বাড়িতে হয় না?

নবঠাকুর বললেন,—আগে হত না। ইদানীং হচ্ছে স্যার! রাতবিরেতে নানককম বিদঘুটে শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তবে আমি একটু আধটু তন্ত্রমন্ত্র চর্চা করি। মন্ত্র পাঠ শুরু করলেই প্রেতাত্মা পালিয়ে যায়। ধানুকে জিগ্যেস করে দেখুন।

ধানু বলল,—আমি স্যার ওপরতলায় বড়কর্তামশাইয়ের পাশের ঘরে থাকি। অত্যাচারটা ওপরতলায় বেশি হয়। ছাদে মচমচ ধুপ-ধুপ শব্দ শুনতে পাই। বড়কর্তার জানলার পাশে ফিসফিস করে কারা কথাবার্তা বলে, টর্চ জ্বালি। কিন্তু কাউকে দেখতে পাই না।

কর্নেল বললেন,—ইলেকট্রিক আলো জ্বলে?

আলোর কথা বলবেন না স্যার!—ধানু হাসল, এই আছে, এই নেই। কোনও-কোনও রাতে তো কারেন্ট থাকেই না। সেইজন্য ওই দেখুন, আপনাদের জন্য লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

—আচ্ছা ধানু, ওই জঙ্গলে বুনো জন্তুজানোয়ার আছে কি না জানো?

জবাব দিলেন নবঠাকুর,—কিছুদিন থেকে একটা ভালুক দেখা যাচ্ছে শুনেছি। তবে আমি দেখিনি স্যার!

ধানু বলল,—হ্যাঁ স্যার! গাঁয়ের লোকেরা নাকি দেখেছে। আমি পরশু সন্ধ্যাবেলা গাইগরু আর বাছুরটাকে ওই গোয়ালঘরে ঢোকাতে যাচ্ছিলুম হঠাৎ টর্চের আলোয় পাঁচিলের ওপর কালো মুন্ডু দেখলুম। মুন্ডুটা তক্ষুনি ওধারে নেমে গেল। গরুটা খুব চমকে উঠেছিল। ভালুকই বটে। সেইজন্যে পাঁচিলের ওপর কাঁটাঝোপ কেটে চাপিয়ে রেখেছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার বড়কর্তা ভালুক দেখে সিঁড়িতে পড়ে হাঁটু ভাঙেননি তো?

ধানু গম্ভীর মুখে বলল,—জানি না স্যার! উনি খুলে কিছু বলেননি। রাত দুপুরে কেন নিচে নামছিলেন জানি না। লোডশেডিং ছিল। হঠাৎ হুড়মুড় শব্দ আর ওনার চ্যাঁচানি শুনে গিয়ে দেখি সিঁড়ির নিচে হাঁটু চেপে ধরে ককাচ্ছেন। সেই রাত্তিরে নাড়ুবাবু ডাক্তারকে বড়হাটছড়ি থেকে ডেকে আনলুম। উনি ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন। একমাস বড়কর্তামশাই বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

—আবার নাকি আছাড় খেয়ে হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বড়কর্তামশাইয়ের বিকেলে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস আছে। গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ওই জঙ্গলের মধ্যিখানের রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে যেতে হয়। যেই বিছানা ছেড়ে লাঠি হাতে হাঁটতে শুরু করেছেন, অমনি সেই অভ্যাস চাগিয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গার ধারে আবার আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। ভাগ্যিস জেলেপাড়ার লোকেরা ওনাকে দেখতে পেয়েছিল। ধরাধরি করে বয়ে এনেছিল। আবার নাড়ু ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন।

এই সময় নিচে কোথাও ঘণ্টি বাজল ক্রিরিরিরিং! শোনামাত্র ধানু চলে গেল।

খাওয়ার পর কর্নেল দক্ষিণের দরজা খুলে চেয়ার নিয়ে গিয়ে রোদে বসলেন। চুরুট ধরিয়ে বাইনোকুলার তুলে সম্ভবত জঙ্গলে ভালুকটা খুঁজতে থাকলেন। আমি ভাত-ঘুম দিতে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। নবঠাকুরের ডাকে চোখ খুলে দেখি, সে চা এনেছে। বাইরে শেষবেলার ধূসর আলো। তারপরই ভালুকের কথা এবং কর্নেলের সাবধানবাক্য মনে পড়ল। আঁতকে উঠে দেখি, দক্ষিণের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমার গায়ে কম্বল। হ্যাঁ—কর্নেলের কাজ। জিগ্যেস করলুম—ঠাকুরমশাই! কর্নেলসায়েবকে দেখেছেন?

নবঠাকুর বললেন,—সায়েব তো কখন বেরিয়ে গেছেন। বোধ করি, বেড়াতে গেছেন।

চা খাওয়ার পর দক্ষিণের দরজা খোলার সাহস হল না, উত্তরের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরদিকের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলুম। বিদ্যুৎ আছে। কেন না বাড়িতে আলো জ্বলছে। ডানদিকে ছোটকর্তা কালীপদবাবুর বাড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, এক ভদ্রমহিলা দোতলার জানলা বন্ধ করে দিলেন। বুঝলুম, উনিই সেই দজ্জাল মহিলা। কালীপদবাবুর স্ত্রী। একটু পরে সম্ভবত ওঁরই চিৎকার কানে এল,—ক্ষান্তমণি! অ ক্ষান্ত! বঁটিতে শান দিয়ে রেখেছিস তো?

কেউ চেরা গলায় বলল,—হ্যাঁ গিন্নিমা! এমন শান দিয়েছি যে, এক কোপে দু-দুটো বলি হয়ে যাবে!

সর্বনাশ! নিশ্চয় আমাকে এবং কর্নেলকে লক্ষ করে কথা হচ্ছে। আস্তে ডাকলুম,—ঠাকুরমশাই!

নবঠাকুর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। ফিক করে হেসে বললেন,—কান দেবেন না স্যার! আমরা প্রতিদিন শুনে-শুনে অভ্যস্ত। তবে মজাটা দেখবেন?

বলে সে জোরে ডাকল—ধানু! অ ধানু! জঙ্গলে ভাল্লুক এসেছে। বল্লমটা শান দিয়েছ তো?

ধানু গোয়ালঘরে গরু ঢোকাচ্ছিল। সেখান থেকে সাড়া দিল—বল্লম চকচক করছে ঠাকুরমশাই! ভাল্লুক এঁফোড়-ওফোঁড় করে ফেলব।

দ্বিগুণ জোরে ভদ্রমহিলা বললেন,—ক্ষান্ত! অ ক্ষান্তমণি! বঁটিখানা দে তো!

ক্ষান্তমণির সাড়া এল,—এই নিন গিন্নিমা! জোরে ছুঁড়ে মারবেন! খ্যাচাং করে মুণ্ডু কেটে যাবে।

তারপর পুরুষকণ্ঠে কেউ ধমক দিল,—কী হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায়? শাঁখে ফুঁ না দিয়ে মুণ্ডু কাটাকাটি কেন?

এই সময় কর্নেল ফিরে এলেন। আমার মাথার ওপর কোথাও বেল বেজে উঠল। ধানু হন্তদন্ত হয়ে ওপরে চলে গেল। তারপর কান ফাটানো শাঁখ বাজল। নবঠাকুর পট্টবস্ত্র পরে কোষাকুষি গঙ্গাজলের ঘটি, ফুলের ডালি নিয়ে সিঁড়ির পাশের দরজা খুলে মন্দিরে পুজো দিতে গেলেন। কর্নেল এসে চাপাস্বরে বললেন,—ভাগ্যিস অক্ষয়বাবু বিয়ে করেননি। যা বোঝা গেল, এ বাড়িতে একজন মহিলা থাকলে কেলেঙ্কারি হত। জ্ঞাতিকলহ সাংঘাতিক ব্যাপার!

বললুম,—আপনি প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন? নাকি হাঁসখালির বিলে হাঁস দেখতে?

কর্নেল হাসলেন,—নাহ্! জঙ্গলে ভালুক খুঁজতে!

—বলেন কী! ভালুক অকারণে হিংস্র হয়ে ওঠে শুনেছি!

—হ্যাঁ। তবে ভালুকের বদলে তার কয়েকগাছা লোম কুড়িয়ে পেয়েছি!

—কোথায়? কোথায়?

—মন্দিরের পেছনে একটা ঝোপের ভেতর।

ধানু এসে বিনীতভাবে বলল,—বড়কর্তামশাই সায়েবদের ডাকছেন আজ্ঞে! আপনারা চলুন ওপরে। ঠাকমশাই মন্দিরে আছেন। আমি কফি তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগ এবং তার চেনের ফাঁকে প্রজাপতি ধরা জালের স্টিক উঁচিয়ে আছে। গলা থেকে ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার ঝুলছে। মাথার টুপি ঝেড়ে পরলেন। তারপর নিচে নেমে উঠোনের ঘাসে হান্টিং জুতোর তলা ঘষে সাফ করে বললেন,—চলো জয়ন্ত! সাজসরঞ্জাম সঙ্গেই থাক।

দোতলায় অক্ষয়বাবু ঘরে আলো জ্বলছিল। তবে লোডশেডিংয়ের কথা ভেবে পাশে একটা টেবিলের ওপর চিনে লণ্ঠন দম কমিয়ে রাখা হয়েছে। জানলাগুলো বন্ধ। ওপরে শীতের হাওয়ার উপদ্রব বেশি।

আমরা বসলুম। অক্ষয়বাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—স্বকর্ণে শুনলেন কালীর বউ অকারণ ঝগড়া বাধাতে চায়?

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ ভদ্রমহিলা সম্ভবত মানসিক রোগী।

অক্ষয়বাবুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল,—ঠিক। ঠিক ধরেছেন! আমার ভয় হয় কবে না সত্যি এ বাড়িতে কারও দিকে বঁটি ছুঁড়ে মারে। কালীর উচিত ওকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া। কে বলবে বলুন?

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলের রাস্তায় গঙ্গার ধারে গিয়েছিলুম। কাছেই শ্মশান আছে দেখলুম।

—ওটাই সাবেক আমলের শ্মশান। শ্মশানকালীর মন্দির ছিল ধ্বংস হয়ে গেছে।

—আপনি কি ওখানে গিয়েই অদৃশ্য হাতের চাঁটি খেয়েছিলেন?

অক্ষয়বাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল। ঝটপট বললেন,—আজ্ঞে হাঁ। নিতান্ত কৌতূহল। শ্মশানের কাছাকাছি যেই না গেছি, অমনি মাথায় জোরে চাঁটি। আছাড় খেয়ে পুরনো আমলের ঘাটের একটুকরো পাথরে পড়ে গিয়েছিলুম। পড়বি তো পড়, সেই বাঁ হাটু ঠুকে—উঃ! একটুও নড়ানো যাচ্ছে না। কলকাতা গিয়ে চিকিৎসা করাব কি না ভাবছি।

এই সময় খট খটাং করে চাপা শব্দ হতে থাকল। অক্ষয়বাবু আঁতকে উঠে বললেন,—ওই শুনুন! আয়রন চেস্টের ভেতর বইটা যেন লাফাচ্ছে!

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো আলোর টর্চ বের করে আয়রনচেস্টের কাছে গেলেন। তারপর ওটার গায়ে কান পেতে বললেন,—হ্যাঁ। একটা কিছু নড়াচড়া করছে বটে!

—বইটা! ভূতুড়ে বইটা!

আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছি। কর্নেলে বললেন,—আয়রনচেস্টের চাবিটা দিতে আপত্তি না থাকলে একবার দিন।

না, না। আপত্তি কীসের? এই নিন। —বলে অক্ষয়বাবু বালিশের তলা থেকে একটা প্রকাণ্ড চাবি তাঁর দিকে ছুড়ে দিলেন। কর্নেল চাবিটা লুফে নিয়ে আয়রনচেস্ট খুললেন। ভারী এবং মোটা ইস্পাতের দরজার হাতল টানার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেলের মুখের ওপর একটা বই ছিটকে পড়ল। উনি দ্রুত মুখ ঘুরিয়েছিলেন। তাই বইটা ওঁর দাড়িতে লেগেছিল। বইটা ধরে উনি আয়রনচেস্টের ভেতরটা দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। তারপর তালা এঁটে দিলেন।

কর্নেল চাবিটা অক্ষয়বাবুকে ফেরত দিয়ে বইটা খুলছেন, এমন সময় লোডশেডিং হয়ে গেল। অক্ষয়বাবু হাত বাড়িয়ে চিনা লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দিলেন। তারপর বললেন—দেখলেন? দেখলেন?

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন,—থাক। বইটা এখন খোলার দরকার নেই। বলা যায় না, লণ্ঠনটা নিভে গেলে কেলেঙ্কারি। আমার টর্চ জ্বেলে যদি পড়ার চেষ্টা করি, হয়তো প্রেতাত্মা আমার টর্চ বিগড়ে দেবে। ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই।

হলুদ মলাটে লাল সুতোয় সেলাই করা এবং লাল কালিতে লেখা 'প্রেতাত্মার অভিশাপ'। ঠিক একই বই কলকাতায় ভক্তিবাবু দিয়ে গেছেন কর্নেলকে। বইটা উনি কিটব্যাগে ঢুকিয়ে চেন এঁটে দিলেন। তারপর বললেন,—আচ্ছা অক্ষয়বাবু, বাই এনি চান্স আপনি ভক্তিভূষণ হাটি নামে কোনও ভদ্রলোককে চেনেন?

অক্ষয়বাবু বললেন,—ভক্তিভূষণ হাটি? না তো। কোথায় থাকেন তিনি?

—কলকাতায়।

—তা ওঁর কথা কেন জিগ্যেস করছেন কর্নেলসায়েব?

—উনিও এক কপি 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' কিনে আপনার মতো বিপদে পড়েছেন!

—অ্যাঁ? বলেন কী?

—তবে ওঁকে অবশ্য প্রেতাত্মা আছাড় মারেনি। চাঁটিও মারেনি। উনি দিব্যি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন।

অক্ষয়বাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন,—উনিও কি আপনার সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। বইখানা আমি আপনার মতো আলমারির লকারে চাবি এঁটে রেখে এসেছি।

—আলমারির ভেতর কোনও শব্দটব্দ—

—আমি শুনিনি। তবে আমার কাজের লোক ষষ্ঠীচরণ শুনেছে।

এই সময় ধানু কফি এবং স্ন্যাক্সের ট্রে নিয়ে এল। এতক্ষণ নিচের মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছিল। এবার থেমে গেল। ধানু ট্রে রেখে দ্রুত চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ওই জঙ্গলে একটা বুনো ভালুক আছে শুনলাম। দুপুরে বাইনোকুলারে কী একটা কালো জন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমিও দেখেছি।

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ। ধানুও ভালুকটার মুখ দেখেছে বলছিল। বুঝতে পারছি না। ওই জঙ্গলে ভালুক কী করে এল। এক হতে পারে, কোনও মাদারির খেলোয়াড় ভালুক হয়তো পালিয়ে এসেছে। শুনেছি, পোষা ভালুক কোনও কারণে হঠাৎ খেপে যায়। তখন বুনো ভালুকের চেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে। কেউ থানায় পুলিশকে বা ফরেস্ট অফিসে কেন খবর দিচ্ছে না? দেখি, ধানুকে দিয়ে আমিই খবর পাঠাব।

কফি খেয়ে পেয়ালা রেখেছি এবং কর্নেল চুরুট ধরিয়েছেন, এমন সময় হঠাৎ ছাদের ওপর ধুপধুপ শব্দ হল এবং কড়িবরগার ফাঁকে ঝরঝর করে একটু চুনবালি খসে পড়ল। অক্ষয়বাবু আঁতকে উঠে বললেন,—ওই শুনুন! তারপর তিনি ডাকলেন, ধানু! ধানু!

বিদ্যুৎ নেই। তাই কলিংবেল বাজানোর উপায় নেই। ধানু নিচে থেকে সাড়া দিল, —বড়কর্তামশাই! যাচ্ছি!

অক্ষয়বাবু হাঁক দিলেন,—বল্লম! বল্লম নিয়ে চিলেকোঠায় চলে যা ধানু! আবার সেই অত্যাচার!

কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। অক্ষয়বাবু বললেন,—যাবেন না কর্নেলসায়েব। আপনারা আমার অতিথি। অতিথির বিপদ হলে মুখ দেখাতে পারব না!

কর্নেল সিঁড়ি বেয়ে চিলেকোঠার ছাদে গিয়ে টর্চ জ্বাললেন। আশ্চর্য! ছাদে কেউ নেই। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে পশ্চিমের আলিসায় ঝুঁকে টর্চের আলো জ্বেলে বললেন,—আশ্চর্য!

জিগ্যেস করলুম,—কী? কী?

—কয়েকসেকেন্ডের জন্য দেখলুম পাইপ বেয়ে সেই ভালুকটা নামছে! সার্কাসের ভালুক নাকি?

—আর দেখতে পেলেন না?

—নাহ্। নিচে ঝোপ জঙ্গল আছে।

ধানু বল্লম আর টর্চ হাতে উঠে এল এতক্ষণে। বলল,—বল্লমটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। কিছু দেখতে পেলেন আপনারা?

কর্নেল বললেন,—নাহ।

ধানু পুবদিকে টর্চের আলো ফেলে বলল,—ছাদও পাঁচিল তুলে ভাগ করা হয়েছে। ছোটকর্তামশাইয়ের ছাদে যে আলো ফেলে খুঁজব, তার উপায় নেই! বঁটি নিয়ে ছোট গিন্নিমা তেড়ে আসবেন।

আমার মনে হয় ওদিকে কোনও শব্দ হয়নি।—কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, তা হলে ওঁরা ওঁদের অংশের ছাদে খুঁজতে আসতেন।

ধানু চাপাস্বরে বলল,—কিছু বলা যায় না। ছোটকর্তামশাই পাঁচিল ডিঙিয়ে এ ছাদে এসে ধুপ-ধুপ শব্দ করেন কি না কে জানে?

আমরা সিঁড়ির মুখে গেছি, এমনসময় কালীপদবাবুর অংশের ছাদে কে জড়ানো গলায় গেয়ে উঠল—'তালুকদারের ভালুক গেল শালুক খেতে পুকুরে—এ—এ....'

ধানু হাসি চেপে বলল,—ছোটকর্তামশাইয়ের শালাবাবু। তাপসবাবু আজ্ঞে! নেশা করেছেন মনে হচ্ছে

কর্নেল বললেন,—বাহ! তাপসবাবুর ভালুকদর্শন হয়েছে।...

চার

ছাদ থেকে দোতলায় নেমে কর্নেল বললেন,—ধানু! তোমার কর্তামশাইকে বলো, আমরা আপাতত নিচে যাচ্ছি। আমাকে পোশাক বদলাতে হবে। হাঁসখালির বিলে হাঁস দেখতে গিয়েছিলুম। পোশাকে কাদা লেগে আছে।

নিচে গেস্টরুমের দরজায় লণ্ঠন জ্বেলে রেখে নবঠাকুর রান্নাঘরে ছিলেন। উঁকি মেরে বললেন,—আপনারা কলকাতার মানুষ স্যার! কটায় খাবেন?

কর্নেল বললেন,—তোমার কর্তা কটা বাজলে খান?

—আজ্ঞে নটায়।

—ঠিক আছে আমরাও ওইসময় খাব। আপাতত এক বালতি জল চাই।

—একটু গরম জল মিশিয়ে দিচ্ছি স্যার! যা ঠান্ডা পড়েছে! জল একেবারে বরফ!

তা-ই দাও।—বলে কর্নেল লণ্ঠন তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। লণ্ঠন টেবিলে রেখে কিটব্যাগ খুলে দেয়ালের ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে দিলেন। টুপিটাও ঝুলিয়ে রেখে চেয়ারে বসলেন।

বললুম,—ভুতুড়ে বইটা দেখছি আপনার কিটব্যাগের ভেতর একেবারে শান্ত হয়ে আছে।

কর্নেল হাসলেন,—ক্লান্তি জয়ন্ত, ক্লান্তি! তখন আরনচেস্টের ভেতর অত নাচানাচি করেছে। তারপর আমার দাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুড়সুড়ি খেয়েছ। তাই ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছে! ভয়ও পেয়েছে বইকী! আবার যদি দাড়িতে চেপে ধরি?

চাপাস্বরে বললুম,—ব্যাপারটা সত্যি অবিশ্বাস্য! বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা মেলে না। তা ছাড়া ছাদেই বা ভালুক উঠল কেন?

—ভালুক গাছে চড়তে পারে। পাইপ বেয়ে ছাদে চড়তে পারে না?

—কিন্তু কেন?

—সম্ভবত সার্কাসের ভালুক। এই শীতে গ্রামাঞ্চলেও সার্কাসের দল আসে। কোনও দল থেকে পালিয়ে এসেছে। তো তুমি বলছ, ছাদে চড়ল কেন? অভ্যাস! ট্রাপিজের খেলায় পাকা। তাই ছাদে চড়ে কসরত দেখাচ্ছিল!

কর্নেলের চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন। বললুম,—পোশাক বদলাবেন বললেন। কিন্তু সঙ্গে তো আমার মতো বাড়তি একপ্রস্থ পোশাক আনেননি আপনি।

—আলবাত এনেছি। কিটব্যাগটা কেমন হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পাচ্ছ না?

বলার সঙ্গে-সঙ্গে কিটব্যাগটা ব্র্যাকেট থেকে ধপাস করে নিচে পড়ে গেল। চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল উঠে গিয়ে ব্যাগটা তুলে বললেন,—মরচে ধরা পুরনো ব্র্যাকেট। হুকগুলো ক্ষয়ে গেছে। বরং ব্যাগটা টেবিলে রাখি।

কর্নেল নিচে থেকে ব্র্যাকেটের ভাঙা হুকটা কুড়িয়ে বাইরে ছুড়ে পেললেন। বললুম,—কর্নেল! ব্যাপারটা কিন্তু সন্দেহজনক।

উনি কোনও কথা বললেন না। চেন খুলে প্যান্ট-শার্ট বের করে নিলেন। তারপর চেন এঁটে টেবিলে লম্বালম্বি ব্যাগটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। একটু পরে নবঠাকুর এক বালতি জল এনে সংলগ্ন বাথরুমে রেখে এলেন। এতক্ষণে বিদ্যুৎ এল।

কর্নেল জ্যাকেট খুলে সেই ব্র্যাকেটের হুক পরীক্ষা করে শক্ত একটা হুকে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর পোশাক বদলাতে বাথরুমে ঢুকলেন।

একটু পরে দেখি, টেবিলে কিটব্যাগটা কাত হয়ে পড়ল। আমার বুকের ভেতর যেন ঠান্ডাহিম ঢিল গড়িয়ে গেল। এবার যদি কিটব্যাগটা নাচতে শুরু করে, কী করব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

কিন্তু কিটব্যাগটা কাত হয়েই রইল। কর্নেল প্যান্ট-শার্ট বদলে তোয়ালেতে মুখ মুছে দাড়ি এবং টাকের তিনপাশের চুল আঁচড়ে ধোপদুরস্ত হয়ে বেরুলেন। জ্যাকেটটা পরে নিলেন। তারপর খাটের তলা থেকে রবারের চটি পরে চেয়ারে বসলেন। একটু হেসে বললেন,—কিটব্যাগটা দ্বিতীয়বার পড়ায় তুমি যদি ভয় পেয়ে থাক, কিছু বলার নেই।

একটু দ্বিধার সঙ্গে বললুম,—না—মানে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কারণ আপনিই বলেন, কোনও ঘটনাকে তার সঠিক ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে বিচার করা উচিত। কিটব্যাগে 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' আছে। তাই—

কর্নেল হাসলেন,—ব্যালান্স, জয়ন্ত! ব্যালান্স! এ ধরনের লম্বাটে কোনও ব্যাগকে সোজা বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা কঠিন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাপার! তবে আমি ইচ্ছে করেই ব্যাগটা ওভাবে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলুম। নাহ্! তুমি দেখছি, দিনে-দিনে ক্রমশ—

ওঁর কথা থেমে গেল। পশ্চিমদিকের দরজায় আচমকা শব্দ হল এবং নড়তে থাকল। সেইসঙ্গে খরখর খসখস অদ্ভুত শব্দ। কর্নেল সোজা উঠে গিয়ে দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বললেন,—বাবা ভালুক! খামোকা রিভলভারের একটা গুলি খরচ করাবে কেন? আজকাল গুলির যা দাম বাবা! এভাবে কিছু হবে না ডার্লিং! তুমি ভুল পথে হাঁটছ!

অমনি দরজার নড়াচড়া এবং শব্দটা থেমে গেল। বললুম,—কী সর্বনাশ! ভালুকটা নাকি?

কর্নেল বললেন,—সার্কাসের ভালুক তো! মানুষের কথা বোঝে।

বললুম,—কালই আপনি থানায় এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বরং খবর দিয়ে আসুন। এভাবে একটা ভালুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন কার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলা যায় না।

হুঁ। দেব।—বলে কর্নেল চোখ বুজে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন।

নবঠাকুর দরজার সামনে এসে বললেন,—কফি খেতে ইচ্ছে হলে বলবেন স্যার! কর্তামশাই আপনার জন্য কেষ্টনগর থেকে কফি আনিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল চোখ বুজে বললেন,—কেষ্টনগরে আমরা একবার কফির বদলে চাফি খেয়েছিলুম। মনে আছে জয়ন্ত?

বললুম,—হ্যাঁ। চা আর কফি মিশিয়ে চাফি। তার সঙ্গে অবশ্য সরপুরিয়া ছিল।

নবঠাকুর বললেন,—আজ্ঞে, সরপুরিয়াও আছে। রাত্তিরে খাওয়ার সময়—

কর্নেল বললেন,—না ঠাকুরমশাই। সকালে ব্রেকফাস্টে দেবেন বরং!

—ঠিক আছে স্যার। ফ্রিজে রাখা আছে। কারেন্ট থাক আর না-ই থাক, সরপুরিয়া কখনও নষ্ট হয় না।

ধানু এসে বলল,—বড়কর্তামশাই আপনাদের ডাকছেন আজ্ঞে!

ঘড়ি দেখে কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত! সময় কাটছে না। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে গল্প করা যাক।

বললুম,—দরজা খোলা থাকবে?

—থাক।

ধানু বলল,—দরজায় শেকল আটকে দিচ্ছি স্যার। ঠাকমশাই আছেন। আমিও আছি। কিচ্ছু চুরি যাবে না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে বললুম,—ফিরে গিয়ে যদি দেখেন, বইটা কিটব্যাগ থেকে বেরিয়ে টেবিলের তলায় কিংবা বিছানায় চলে গেছে?

যাক না।—কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, প্রেতাত্মাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেখা যাক, কী করে।

অক্ষয়বাবু পালঙ্কে একই অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। বিছিয়ে রাখা পায়ের হাঁটু মেলে ব্যান্ডেজে হাত বোলাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে ধুতি টেনে পা ঢেকে বললেন—আসুন কর্নেলসায়েব!

আমরা ওর পালঙ্কের কাছে সেকেলে সোফায় বসলুম। কর্নেল বললেন,—ওপাশের ছাদে কালীবাবুর শ্যালক মাতাল হয়ে গান গাইছিলেন!

অক্ষয়বাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—কালীকে ওই ছোকরাই সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে। দিদির কাছে তাপস নাকি নেশার টাকা আদায় করে। কালীর বউ আবার ভাইয়ের এতটুকু বদনাম শুনলে খেপে যায়। তো আপনার সামনেই দু-দুবার অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চয় কোনও চিন্তাভাবনা করেছেন?

কর্নেল বললেন,—কিছু বুঝতে পারছি না। তবে ওই ভালুকের ব্যাপারটা আলাদা। ওটা নিশ্চয় কোনও সার্কাস দলের ভালুক। অনেক কসরত জানে।

—আমার পা ভালো থাকলে ভালুকটাকে গুলি করে মারতুম!

—আপনার বন্দুক আছে বুঝি?

আছে।—বলে বিছানার ওপাশ থেকে দোনলা বন্দুক তুলে দেখালেন অক্ষয়বাবু! এলাকায় চুরিডাকাতি হয়। তাই বন্দুকের লাইসেন্স জোগাড় করেছিলুম। কিন্তু ভালুককে গুলি করে মারা যায়। প্রেতাত্মাকে তো যায় না। সেটাই প্রবলেম। আপনি দেখলেন তো! ভূতুড়ে বইটা কী খেল দেখাল!

—হ্যাঁ। আমি মুখ না ঘোরালে নাক ভেঙে দিত!

—ওহ! কী সর্বনেশে বই! ওটাকে কেন যে গঙ্গায় ফেলে দিইনি? আসলে আমার মনে হয়েছিল, এর পেছনে কোনও জটিল রহস্য আছে। তাই আপনাকে ডেকে বইটা না দেখানো পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলুম না। হ্যাঁ—বইটা কি নিচে রেখে এসেছেন?

কর্নেল হাসলেন,—আমার ব্যাগে ভরে রেখেছি। তবে ব্যাগটা দেয়ালের ব্র্যাকেট ঝুলিয়েছিলুম। ব্র্যাকেটের হুক ভেঙে ব্যাগটা নিচে পড়ে গিয়েছিল।

—অ্যাঁ! বলেন কী?

—ব্যাগটা টেবিলে সোজা রেখে বাথরুমে ঢুকেছিলুম। এসে দেখি ব্যাগটা কাত হয়ে পড়ে আছে। জয়ন্তের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে!

অক্ষয়বাবু মাথা নেড়ে বললেন,—বইটা তাহলে নিচে রেখে আসা ঠিক হয়নি।

এইসময় হঠাৎ আমাদের পিছন দিকে জানলার ওধারে ফিসফিস শব্দে কারা কথা বলে উঠল। অক্ষয়বাবু নড়ে বসলেন। ইশারায় আঙুল তুললেন।

কর্নেল পালঙ্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে জানলা খুললেন। তারপর টর্চের আলো জ্বাললেন। বললেন,—আশ্চর্য! এদিকে তো দাঁড়াবার মতো জায়গা নেই। খাড়া দেয়াল নেমে গেছে!

অক্ষয়বাবু বললেন,—সেই তো বলছি! আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে গেছে।

ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি হতবাক হয়ে বসে আছি। ভয় যে পাইনি, তা নয়। তবে কর্নেল পাশে আছেন বলে সাহস পাচ্ছিলুম।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আপনাদের গৃহদেবতা নৃসিংহদেবের পুজোআচ্চা নিয়মিত হয়। অথচ তিনিও প্রেতাত্মাটাকে জব্দ করতে পারছেন না। এটাই আশ্চর্য!

পাশের বাড়ি থেকে হঠাৎ বিকট মেয়েলি কান্নার শব্দ ভেসে এল। অক্ষয়বাবু বললেন,—ওই আরেক জ্বালা! মেন্টাল পেশেন্ট!

ধানু!—বলে হেঁকে উনি পালঙ্কের পাশে একটু সুইচ টিপলেন।

ধানু বাইরে থেকে বলল,—বলুন আজ্ঞে!

—ভেতরে আসবি তো? কী হয়েছে রাধারানির? অমন কান্নাকাটি করছে কেন?

ধানু ভেতরে ঢুকে বলল,—বলেন তো জেনে আসি আজ্ঞে!

—তোর তো ক্ষান্তমণির সঙ্গে কথা হয়। তাকে চুপিচুপি ডেকে শুনে আয় অমন মড়াকান্না কাঁদছে কেন?

—আজ্ঞে, ক্ষান্তমণি আমার মামাতো বোন বড়কর্তামশাই! আপনি যখন আসেননি, তখন আমি ছোটকর্তামশাইয়ের বাড়ি কাজ করতুম তো। যখন আপনি এলেন, তখন ক্ষান্তমণিকে এনে দিলুম ওনাদের জন্য।

—নে! ইতিহাস শুরু করে দিল। যা! জেনে আয় শিগগির! আমার বড় অস্বস্তি হচ্ছে!

ধানু চলে গেল। কর্নেল বললেন,—বোঝা যাচ্ছে ধানু আপনাদের পরিবারের পুরাতন ভৃত্য!

—হ্যাঁ। আমি যখন ফিরে এলুম, তখন বাবার কথামতো ধানু আমার সারভ্যান্ট হয়েছিল। বাবা নাকি মৃত্যুর আগে ধানুকে এই আদেশ দিয়েছিলেন।

কর্নেল একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আপনি একটু আগে বললেন, আপনার ভ্রাতৃবধুর কান্না শুনে আপনার অস্বস্তি হচ্ছে। কেন অস্বস্তি হচ্ছে তা বলতে আপত্তি আছে?

অক্ষয়বাবু চাপা গলায় বললেন,—ওই যে নেশাখোর ছোকরা তাপসের কথা বলছিলুম। ও এখানকার যত নেশাখোর গুন্ডা-মস্তানের সঙ্গে মেলামেশা করে। আমার ভয় হয়, কালী বউয়ের ভয়ে ওকে যা প্রশ্রয় দেয়, কবে না টাকার লোভে হতভাগা কালীকেই—

বলে উনি চোখ বুজে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করলেন। আপনমনে আবার বললেন,—প্রভু নৃসিংহদেব! রক্ষা করো প্রভু!

অক্ষয়বাবু করজোড়ে চোখ বুজে গৃহদেবতার নাম আওড়াতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে ধানু এসে বাইরে সাড়া দিল,—আজ্ঞে বড়কর্তামশাই!

অক্ষয়বাবু চোখ খুলে বললেন—ভেতরে আসতে কি লজ্জা করে হতভাগা?

ধানু ভেতরে ঢুকে বলল,—কেষ্টনগরে ছোটকর্তামশাইয়ের শ্বশুরমশাইয়ের হঠাৎ অসুখ। সেই খবর পেয়ে ছোটগিন্নিমা কান্নাকাটি করছেন। ছোটকর্তামশাই বাড়ি ছেড়ে যাবেন কী করে? তাই শালাবাবু আর ক্ষান্তমণি ছোটগিন্নিমাকে নিয়ে কেষ্টনগর যাবেন। সাড়ে নটায় লাস্ট বাস! সেই বাসে চেপে যাবেন আজ্ঞে!

যতসব!—অক্ষয়বাবু রুষ্ঠমুখে বললেন, আমি ভাবি না জানি কী সর্বনাশ হয়েছে বাড়িতে।

ধানু চলে গেল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ওঠা যাক। বিকেলে হাঁসখালির বিলে বুনো হাঁসের ছবি তুলতে গিয়ে খুব হাঁটাহাঁটি করেছি। ক্লান্ত লাগছে।

অক্ষয়বাবু বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন। নবঠাকুরকে বলা আছে, যখন খেতে চাইবেন, তখনই ব্যবস্থা হবে। যা শীত পড়েছে! হঠাৎ শীত। বুঝলেন? পরশু আর কাল এদিকে খুব বৃষ্টি হল। তাই এবার শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে। আর—বইটা!

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ, বইটা প্রেতাত্মার। কাজেই একটু দুষ্টুমি করতেই পারে।

নিচে এসে দেখি, ধানু আর নবঠাকুর রান্নাঘরের মেঝেয় বসে গল্প করছেন। আমাদের দেখে ধানু উঠে এসে দরজার শেকল খুলে দিল।

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—বইটার কী অবস্থা দেখা যাক!

তিনি কিটব্যাগের চেন খুলে বললেন,—এ কী? বইটা নেই দেখছি!

আমার চোখ গেল পশ্চিমের দরজার কাছে। দেখলুম, বইটা দরজার নিচে পড়ে আছে। কর্নেলকে বললুম,—ওই দেখুন!

কর্নেল বইটা তুলে এনে কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন,—প্রেতাত্মাই বটে! ধানু পাশের বাড়িতে খবর আনতে গিয়েছিল! ঠাকুরমশাই রান্নাঘরে ছিলেন। তখন প্রেতাত্মা চুপিচুপি ঘরে ঢুকে এই কর্মটি করেছে।

বলেই উনি চমকে উঠলেন হঠাৎ,—জয়ন্ত! জয়ন্ত টেবিলে ভালুকের লোম পড়ে আছে দেখছ?

অবাক হয়ে দেখলুম, টেবিলে সত্যি কয়েকটা কালো লোম পড়ে আছে।...

পাঁচ

একে তো নতুন জায়গায় গেলে আমার ঘুম আসতে চায় না, তার ওপর প্রেতাত্মা এবং ভালুকের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা! কতক্ষণ পরে সবে চোখের পাতায় ঘুমের ঘোর লেগেছে, হঠাৎ সেটা কেটে গেল কী একটা শব্দে। নিঝুম রাতে যে-কোনও ছোট্ট শব্দ বড় হয়ে কানে ধাক্কা দেয়।

মন্দিরের দিকে কার চলাফেরার শব্দ এবং চুপিচুপি কথাবর্তার শব্দ। কর্নেলের নাক ডাকছিল। চাপাস্বরে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

ওঁর নাকডাকা থেমে গেল। তারপর ঘুমজড়ানো গলায় বললেন— ঘুমোও।

জানালার ফাঁকে বাইরের বিদ্যুতের আলো আর দেখা যাচ্ছিল না। বুঝলুম লোডশেডিং চলছে। বাইরের শব্দও থেমে গেল হঠাৎ।

কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়? কর্নেলের পরামর্শ মনে পড়ল। ঘুম না এলে একশো থেকে উলটো দিকে নিরানব্বুই-আটানব্বুই করে শুনতে হয়। এতে কাজ হয়েছিল। কখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভেঙে গেল বাইরে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে। হুড়মুড় করে উঠে বসলুম তারপর মশারি থেকে বেরিয়ে দেখি, কর্নেল বিছানায় নেই। মশারিটা অর্ধেক তোলা আছে। দক্ষিণের দরজা হাট করে খোলা। বাইরে ভোরের আলো গাঢ় কুয়াশায় ধূসর হয়ে আছে। দক্ষিণের মন্দির চত্বর থেকে চ্যাঁচামেচি হচ্ছিল। তাই দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় গেলুম। দেখলুম, নবঠাকুর হাউমাউ করে কর্নেলকে কী বলছেন। ধানু ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে। দোতলা থেকে অক্ষয়বাবু চিৎকার করে বলছেন,—ধানু! ধানু! কী হয়েছে?

চত্বরে নেমে গিয়ে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—কী হয়েছে কর্নেল?

কর্নেল ভারী গলায় বললেন,—মার্ডার!

—মার্ডার—মানে খুন? কে খুন হয়েছে?

কর্নেল বললেন,—কালীবাবু।

তারপর ধানুকে বললেন,—শিগগির থানায় যাও। পুলিশে খবর দাও! গিয়ে বলো, কালীপদবাবু খুন হয়েছেন।

বলে তাকে ধাক্কা দিলেন কর্নেল।

ধাক্কায় কাজ হল। ধানু দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেল। নবঠাকুর পূজারীর বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কান্নাজড়ানো গলায় আমাকে বললেন,—গঙ্গাস্নান করে পুজো করতে এসে দেখি মন্দিরের দরজা খোলা। ছোটকর্তাবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ওই দেখুন! রক্তারক্তি অবস্থা!

কর্নেল তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন,—আপনি অক্ষয়বাবুকে গিয়ে বলুন কী হয়েছে—উনি ডাকাডাকি করছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?

নবঠাকুর চলে গেলেন। আমি মন্দিরের সিঁড়িতে উঠে দেখলুম, এক রোগাটে গড়নের ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। পায়ের দিকটা দরজার বাইরে এবং বাকি অংশ দরজার ভেতরে। পরনে ধুতি। গায়ে জামার ওপর সোয়েটার। কিন্তু সেটা ছিঁড়ে ফালাফালা। মাথার পেছনে চাপচাপ রক্ত।

দেখেই নেমে এসে বললুম,—কর্নেল! এ সেই শয়তান ভালুকটার কাজ!

কর্নেল মোজাপরা-পায়ের চটি খুলে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। তারপর ওঁর খুদে টর্চ জ্বেলে নৃসিংহদেবের মূর্তির পেছনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মূর্তিটা পাথরের এবং সিঁদুরে লাল হয়ে আছে।

একটু পরে উনি বেরিয়ে এসে বললেন,—তুমি এখানে থাকো। আমি আসছি।

বলে কালীবাবুর বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে উধাও হয়ে গেলেন। আমি একা মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমের জঙ্গল এবং দক্ষিণে ভেঙেপড়া পাঁচিলের দিকে বারবার তাকাচ্ছিলুম। ভালুকটা আবার এসে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কী করে আত্মরক্ষা করব? আমার মনে হচ্ছিল, কালীপদবাবু কোনও কারণে মন্দিরে এসেছিলেন এবং সেইসময় ভালুকটা এসে ওঁর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভালুকের নখ খুব ধারাল। মাথার খুলি পর্যন্ত নখের আঘাতে ভেঙেচুরে দিয়েছে। সোয়েটার ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেলেছে।

একটু পরে কালীপদবাবুর বাড়ির ভেতর থেকে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম,—জয়ন্ত! জয়ন্ত! শিগগির এখানে এসো।

কর্নেল যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলেন, সেখান দিয়ে ঢুকে দেখি, উঠোনের কোনায় পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে সেই ভালুকটা দুই ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে এবং দুই হাত তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে নাড়ছে। মুখ দিয়ে চাপা হুঙ্কার ছাড়ছে ভালুকটা। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

কর্নেল তার দিকে রিভলভারের নল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে তিনি সহাস্যে বললেন,—সার্কাসের খেলা দেখো জয়ন্ত! এত বলছি, এবার খেলা শেষ। কথা শুনছে না। ওকে যে ধরব, তার ঝুঁকি আছে। নখগুলো দেখছ? বরং তুমি আমার রিভলভারটাও নাও। অটোমেটিক উইপন। গুলি ভরা আছে। আমাকে আক্রমণ করলেই ওকে গুলি করবে।

কর্নেলের রিভলভারটা হাতে নিয়ে ভালুকটার দিকে তাক করলুম। কিন্তু কর্নেল আমাকে অবাক করে এবার বললেন,—আসলে আমি চুরুট ধরানোর সুযোগ পাচ্ছিলুম না। এবার চুরুট ধরিয়ে নিই। হাতে ফায়ারআর্মস নিয়ে চুরুট ধরানো যায় না।

উনি জ্যাকেটের পকেট থেকে চুরুট বের করে লাইটারে ধরালেন। তারপর রিভলভারটা আমার হাত থেকে নিয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—আর কী ভক্তিবাবু? খোলস বদলান। জয়ন্তকে এই মজাটা দেখানোর জন্য ডেকেছি। উঁহু হু! যথেষ্ট হয়েছে। আমি জানি, আপনি এই ঘটনায় কী ভূমিকা পালন করেছেন। ভক্তিবাবু! এবার নিজমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করুন।

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম,—কী বলছেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ইনিই কান্তি খটিক লেনের সেই ভক্তিভূষণ হাটি। একসময় ম্যাজিসিয়ান ছিলেন। তখন নিজেকে বলতেন প্রোফেসর বি বি হাটি। তারপর এশিয়ান সার্কাসে ঢোকেন। আমার টাকে গুবরেপোকা ছুড়ে মেরেছিল হাটিবাবু। স্রেফ হাতের ম্যাজক। ভক্তিবাবু! এক্ষুনি পুলিশ এসে পড়বে আর দেরি করবেন না!

এবার ভালুকবেশী ভক্তিভূষণ হাটি পিঠের দিকের জিপ টেনে ভালুকের খোলস ছেড়ে বেরুলেন। তারপর করুণ মুখে বললেন,—আমাকে ছেড়ে দিন স্যার! লোভে পড়ে আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আর কখনও—

তাঁকে থামিয়ে কর্নেল বললেন,—সব জানি ভক্তিবাবু! আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কলকাতা থেকে জেনেই এসেছি।

বলে এগিয়ে গিয়ে ভালুকের খোলসটা তুলে নিলেন কর্নেল তারপর সেটা আমাকে দিয়ে হাটিবাবুর জামার কলার ধরলেন,—চলুন! এবার যাওয়া যাক।

ভক্তিবাবুর পরনে আঁটো প্যান্ট। গায়ে শার্ট এবং ফুলহাতা সোয়েটার! তাঁকে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন কর্নেল। তারপর সেখান থেকে অক্ষয়বাবুর বাড়ির দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকালেন। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কর্নেল ডাকলেন,—অক্ষয়বাবু! অক্ষয়বাবু!

নবঠাকুর আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। অক্ষয়বাবুর কান্না শোনা যাচ্ছিল। আমরা ভেতরে ঢুকলে উনি কান্না থামিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন।

কর্নেল বললেন,—কাল আপনাকে জিগ্যেস করেছিলুম ভক্তিভূষণ হাটি নামে কাউকে চেনেন কি না। এই সেই ভক্তিভূষণ হাটি, ওরফে প্রোফেসর বি বি হাটি। ম্যাজিসিয়ানও বটে, সার্কাসের খেলোয়াড়ও বটে। দেখুন তো এঁকে চিনতে পারছেন কি না?

অক্ষয়বাবু ভাঙাগলায় বললেন,—না।

কর্নেল বললেন,—এই লোকটাই ভালুকের পোশাক পরে ভালুক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

অক্ষয়বাবু সঙ্গে-সঙ্গে দোনলা বন্দুক তাক করে গর্জে উঠলেন,—ওকে আমি গুলি করে মারব। কালীকে এই শয়তানটাই খুন করেছে।

কর্নেল হাটিবাবুকে নিয়ে তক্ষুনি বসে পড়লেন এবং অক্ষয়বাবুর বন্দুক থেকে পরপর দুটো গুলি বেরিয়ে দেয়ালের ছবিতে লাগল। এ এক সাংঘাতিক অবস্থা! কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! অক্ষয়বাবুর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নাও।

আমি ছুটে গিয়ে ওঁর হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিলুম। অক্ষয়বাবু হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, —ওকে সহজে ছাড়ব না। ওকে পুলিশে দেব। ও হো-হো! আমার ভাই কালীকে ওই ব্যাটাচ্ছেলে ভালুক সেজে মেরে ফেলেছে!

ভক্তিবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন,—একটাও কথা নয়। চলুন আমরা এবার নিচে যাই। পুলিশ আসছে দেখতে পাচ্ছি। বন্দুকটা এবার অক্ষয়বাবুকে ফিরিয়ে দাও জয়ন্ত!

নিচে গিয়ে আবার মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা দাঁড়ালুম। নবঠাকুর মন্দিরের বারান্দায় বসে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। একটু পরে পুলিশ এসে গেল। একজন প্রকাণ্ড চেহারার পুলিশ অফিসার কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—এস.পি. সায়েব কাল রাতে ওয়্যারলেসে মেসেজ পাঠিয়েছেন। আপনার কথা বলেছেন। আপনার অনেক কীর্তির কথা এ যাবৎ শুনে আসছি। এতদিনে সৌভাগ্যবশত চাক্ষুষ পরিচয় হল। আমার নাম তরুণ রায়। বড়হাটছড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ।

কর্নেল বললেন,—আপনাদের যাছে নিশ্চয় একটা ভালুকের খবর গিয়েছিল?

—হ্যাঁ স্যার। তবে বিশ্বাস করতে পারিনি।

—এই দেখুন সেই ভালুক।

—তার মানে?

—এঁর নাম ভক্তিভূষণ হাটি। প্রোফেসর বি. বি. হাটি ম্যাজিশিয়ান। পরে এশিয়ান সার্কাসে যোগ দেন। ইনিই এই ভালুকের পোশাক পরে ওই জঙ্গলে ঘুরতেন। অক্ষয়বাবুর বাড়ি ছাদে উঠে ভূতুড়ে শব্দ করতেন। এঁকে অ্যারেস্ট করুন। জয়ন্ত! ভালুকের পোশাকটা ওঁকে দাও!

একদল পুলিশ মন্দিরের দরজায় কালীবাবুর মৃতদেহ দেখছিল। একজন এস. আই বললেন, —সাংঘাতিক মার্ডার স্যার! মাথার খুলি ভেঙে গেছে। পিঠের দিকটা ফালাফালা!

ও.সি. তরুণ রায় বললেন,—এই লোকটাকে থানায় নিয়ে যান ব্রতীনবাবু। এই নিন এর ভালুকের পোশাক।

এস আই ব্রতীনবাবু বললেন,—কী অদ্ভুত! এই লোকটাই ভালুক সেজে ছোট সাঁতরাবাবুকে খুন করেছে?

হাটিবাবুকে দুজন কনস্টেবল পিছমোড়া করে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল। ব্রতীনবাবু তাদের সঙ্গে গেলেন। ও.সি বললেন,—অ্যাম্বুলেন্স আনা গেল না। স্ট্রেচার নিয়ে আসতে বলেছি। ডাক্তারবাবু আর ফটোগ্রাফার হরিবাবু এখনই এসে পড়বেন। আইনের কিছু ব্যাপার আছে কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—জানি। বডি কী অবস্থায় ছিল, তার ফটো তুলতে হবে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে জানাবেন মৃত না জীবিত। ততক্ষণে ওদিকে চলুন মিঃ রায়। কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নিই।

ওঁরা দুজনে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন। চাপা গলায় কর্নেল কথা বলতে থাকলেন।

একটু পরে ফটোগ্রাফার হরিবাবু এসে বললেন,—কোথায় বডি?

একজন কনস্টেবল তাঁকে দেখিয়ে দিল। তখন তিনি জুতো খুলে মন্দিরের বারান্দায় উঠে নানাদিক থেকে ফ্ল্যাশবাল্‌ব জ্বেলে অনেকগুলো ফোটো তুললেন। ততক্ষণে ডাক্তারবাবু এসে পড়েছেন। তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—কী সর্বনাশ! সাঁতরা ফ্যামিলিতে নৃসিংহদেবের অভিশাপ লেগেছে মনে হচ্ছে। অক্ষয়বাবু পড়ে গিয়ে হাঁটু জখম। পর-পর দু-বার। তারপর কালীবাবু ভালুকের পাল্লায় পড়ে গেলেন!

বুঝলুম, ইনিই সেই নাড়ুবাবু-ডাক্তার। বডি পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এসে বললেন, —ডেড। রক্তের অবস্থা দেখে মনে হল অন্তত ঘণ্টা ছয়েক আগে ভালুক ওঁকে আক্রমণ করেছিল। পোস্টমর্টেমে সঠিক সময় জানা যাবে। মাথার পেছনে থাবা মেরেছে। পিঠের দিকে শুধু সোয়েটার ছিঁড়েছে ধারালো নখে। ক্ষতচিহ্ন নেই পিঠে।

হাসপাতাল থেকে চারজন লোক স্ট্রেচার এনেছিল। তারা কালীবাবুর মৃতদেহ তুলে নিয়ে গেল। ও.সি. তরুণ রায় বললেন,—ডাক্তারবাবু! আপনি প্লিজ শিগগির যান। ডেডবডি সম্পর্কে একটা প্রাইমারি রিপোর্ট শিগগির চাই।

অক্ষয়বাবুকে একবার দেখে যেতুম।—নাড়ু ডাক্তার বললেন, হাঁটু দু-দুবার ভেঙে বেচারা শয্যাশায়ী!

—পরে দেখবেন।

ডাক্তারবাবু হন্তদন্ত চলে গেলেন। কর্নেল বললেন,—মিঃ রায়! আসুন। এবার নৃসিংহদেবকে দর্শন করবেন।

জুতো খুলে রেখে দুজনে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম, কর্নেল ওঁকে বিগ্রহের পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন এবং দুজনে হাঁটু মুড়ে বসে কী দেখতে থাকলেন।

একটু পরে দুজনে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা বলুন। আর জয়ন্ত, তুমিও মিঃ রায়ের সঙ্গে যাও। হ্যাঁ—পরিচয় করিয়ে দিই মিঃ রায়। এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার।

ও.সি. বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! আমি আপনার লেখার ভক্ত জয়ন্তবাবু! মুখোমুখি আলাপ হয়ে খুশি হলুম। চলুন। অক্ষয়বাবু এ বিষয়ে কী বলেন শোনা যাক।

ভেতরে ঢুকে দেখি, নিচের বারান্দায় ধানু দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছে। নবঠাকুর তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

আমরা দোতলায় গিয়ে অক্ষয়বাবুর ঘরে ঢুকলাম। ও.সি. বললেন,—আপনিই অক্ষয়কুমার সাঁতরা?

অক্ষয়বাবু নমস্কার করে বললেন,—বসুন। কালী আমার বৈমাত্রেয় ভাই হলেও ওকে স্নেহ করতুম। আমার বুকের পাঁজর ভেঙে গেল দারোগাবাবু!

আমরা বসলুম। অক্ষয়বাবু ভাঙা গলায় 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই কেনা থেকে শুরু করে তাঁর দু-দুবার হাঁটু ভাঙা এবং ভৌতিক উপদ্রব সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

এতক্ষণে কর্নেল এসে বললেন,—মিঃ রায়! যা ভেবেছিলুম ঠিক তা-ই। জিনিসটা আমি নিচে কনস্টেবলদের জিম্মায় রেখে এলুম।

অক্ষয়বাবু বললেন,—কর্নেল! এ কী হল বুঝতে পারছি না! প্রেতাত্মার সঙ্গে ভালুকবেশী ওই লোকটার কী সম্পর্ক?

কর্নেল বললেন,—আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি। আপনি শুধু এবার আমাকে আয়রনচেস্টের চাবিটা দিন!

—কেন? কেন?

—প্লিজ অক্ষয়বাবু! প্রেতাত্মারহস্য উন্মোচনের জন্য আপনি আমাকে ডেকেছিলেন। আমি এসেছি। এবার রহস্যটা ফাঁস করা দরকার নয় কি?

অনিচ্ছার ভঙ্গিতে আয়রনচেস্টের চাবি দিলেন অক্ষয়বাবু! কর্নেল চাবি দিয়ে আয়রনচেস্ট খুলে ডাকলেন,—মিঃ রায়! জয়ন্ত! প্রেতাত্মার কীর্তি দেখে যাও!

আমরা ওঁর কাছে গেলুম। কর্নেল বললেন,—এখানে আপনারা বসুন। আমি ব্যাপারটা দেখাচ্ছি।

বলে উনি সোজা অক্ষয়বাবুর কাছে গেলেন এবং পালঙ্কের পাশে একটা সুইচ টিপলেন। বিদ্যুৎ ছিল। সুইচ টেপার সঙ্গে-সঙ্গে আয়রনচেস্টের ভেতর একটা ছোট্ট গোলক নড়তে শুরু করল এবং ঘটাং ঘট শব্দ হতে থাকল। তরপর হঠাৎ সেটা খানিকটা এগিয়ে এল। কর্নেল বললেন,—বইটা ছিল গোলকটার সামনে দাঁড় করানো। সুইচ জোরে টিপতেই বইটাকে গোলকটা ধাক্কা মেরেছিল এবং ছিটকে এসে আমার দাড়িতে পড়েছিল।

এবার শুনুন ফিসফিস কথাবার্তা—বলে আরেকটা সুইচ টিপলেন কর্নেল।

অমনি জানলার বাইরে ফিসফিস কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল জানলা খুলে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার সাবধানে টেনে ছুড়লেন। অক্ষয়বাবুকে লক্ষ্য করলুম। মুখটা পাথরের মুখ হয়ে গেছে যেন।

ছয়

বুঝতে পারছিলুম না, অক্ষয় সাঁতরা প্রেতাত্মার ম্যাজিক কেন দেখিয়েছিলেন! কর্নেল ওঁর বিছানার পাশ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলেন। তারপর সোফায় এসে বসলেন। ভাবলুম, ভাইয়ের মৃত্যুতে যা খেপে আছেন অক্ষয়বাবু, বন্দুক সরিয়ে রাখা উচিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—তা হলে অক্ষয়বাবু! প্রেতাত্মার রহস্য ফাঁস হল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার বন্ধু ভক্তিভূষণ হাটিই আপনাকে এই যান্ত্রিক ম্যাজিক শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

অক্ষয়বাবু গলার ভেতর থেকে বললেন,—আমি নিজেই ওটা তৈরি করেছিলুম!

—কেন অক্ষয়বাবু?

—আপনার রহস্যভেদী বলে খ্যাতি আছে। তাই পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলুম আপনাকে।

—পরীক্ষায় আমি পাস করেছি বলুন?

—হুঁ।

—কিন্তু হাটিবাবুকে ভালুক সাজিয়েছিলেন কেন?

—কখনও না। আমি ওকে চিনি না।

—চেনেন। আসলে দু-কপি 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই ফুটপাত থেকে কিনে এক কপি আপনি হাটিবাবুকে দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এর একটাই উদ্দেশ্য। প্রেতাত্মার ব্যাকগ্রাউন্ডকে মজবুত করা। কলকাতার গোবরা এলাকায় কান্তি খটিক লেনের একটা লোক ওই বই কিনে একই উপদ্রবে ভুগছে। বাহ্! চমৎকার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়ে গেল।

ও.সি মিঃ রায় বললেন,—এই ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরির উদ্দেশ্য কী?

—বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদকে হত্যা!

অক্ষয়বাবু নড়ে উঠলেন,—ওই লোকটা ভালুক সেজে কালীকে মেরেছে। আমি খোঁড়া হয়ে শয্যাশায়ী।

কর্নেল হাসলেন। প্রথমে প্ল্যান ছিল, কালীপদবাবুকে প্রেতাত্মা হত্যা করবে। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না ভেবে প্ল্যান বদলানো হল। হাটিবাবু সার্কাসের খেলোয়াড়। বাঘ ভালুককে খেলিয়েছেন। অতএব তাঁকে কৃত্রিম ভালুকের পোশাকে সাজানোর প্ল্যান হল। নখগুলো দেখুন! ধারালো লোহায় তৈরি। এদিকে আমি এসে গেছি। অতএব হাটিবাবুকে ভালুক সাজিয়ে আমার এবাড়িতে উপস্থিতির সময় কালীবাবুকে খুন করলে দোষটা গিয়ে পড়বে বুনো ভালুকের ওপর।

মিঃ রায় বললেন,—কালীবাবুকে হত্যার মোটিভ কী?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—বলছি। তার আগে যা ঘটেছে তা বলা দরকার। আমাকে ভুল পথে হাঁটানো হয়েছিল। আমি ভেবেছিলুম, কেউ ভালুক দিয়ে অক্ষয়বাবুকে হত্যার প্ল্যান করেছে। সম্ভবত ওঁর বৈমাত্রেয় ভাই কালীবাবুই হত্যা করতে চান অক্ষয়বাবুকে। কারণ তাহলে সব সম্পত্তি কালীবাবু পাবেন। যাই হোক, কাল সন্ধ্যায় আয়রনচেস্টের ম্যাজিক দেখে আমার ভুল ভেঙেছিল। কিন্তু তখনও আঁচ করতে পারিনি কালীবাবুই ভিকটিম হবেন। কারণ কালীবাবুর স্ত্রী বর্তমান। কালীবাবু মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি তাঁর স্ত্রী পাবেন। তাহলে এই খেলার উদ্দেশ্য কী? আজ ভোরে নবঠাকুরের চিৎকার শুনে ছুটে গেলুম। তারপর হতবাক হয়ে দেখলুম, কালীবাবু নিহত। অমনি মনে পড়ল, অক্ষয়বাবু আমাকে বলেছিলেন কালীবাবুর সঙ্গে পৈতৃক ধনরত্ন নিয়ে তাঁর ঝগড়া। সন্দেহবশে তাই মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের পেছনে গেলুম। মিঃ রায় আপনাকেও দেখিয়েছি বেদিতে পিছনদিকে চাবি ঢোকানোর ছিদ্র আছে। ওটা দেখামাত্র আমার মনে পড়ে গেল একটা পুরোনো রহস্যের কথা। বাবা দুই ছেলেকে দুটো চাবি দিয়ে মারা যান। পর-পর দুটো চাবি ছাড়া বিগ্রহ বেদির তালা খুলবে না। জয়ন্ত সেই ঘটনা 'কা-কা-কা রহস্য' নামে একটা গল্পে লিখেছিল।

আমি বললুম,—এখানেও কি সেই ব্যাপার?

কর্নেল বললেন,—কতকটা। তো ঘটনাটা মনে পড়া মাত্র কালীবাবুর বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকলুম। সোজা দোতলায় উঠে যে ঘরটা খোলা পেলুম, সেটা কালীবাবুর শোবার ঘর এবং সেই ঘরে ভালুকবেশী ভক্তি হাটি ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছে। পকেট থেকে রিভলভার বের করতেই সে পাশের ঘর দিয়ে পালিয়ে গেল। কী খুঁজছিল সে? বালিশের তলায় কিছু নেই। কিন্তু তোশকের তলায় একটা ভাঁজ করা চিঠি পেয়ে গেলুম। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই বুঝলুম কী হয়েছে। তারপর ভালুকের খোঁজে ছুটে গেলুম উঠোনে সে লুকোবার চেষ্টা করছিল। যাই হোক, মিঃ রায়! চিঠিটা পড়ে দেখুন।

কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে চিঠিটা ওঁকে দিলেন। আমি পাশে বসে আছি। কাজেই চিঠিটা আমারও পড়া হয়ে গেল।

স্নেহের কালীপদ,

অবশেষে ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ। তুমি আমার অনুপস্থিতিতে পিতৃদেবের শেষকৃত্য করিয়াছ। বাড়িরও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছ। কাজেই গৃহদেবতার মুকুট তোমারই প্রাপ্য। আমি শুধু হারছড়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। তুমি অদ্য সন্ধ্যায় কোনও কৌশলে তোমার স্ত্রী এবং শ্যালককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিবে। কারণ বিশেষ করিয়া তাপসের উপস্থিতিতে বহুমূল্য রত্নরাজি তুমি লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। তাপস মহা ধূর্ত। তোমার স্ত্রী তাহাকে খুবই স্নেহ করে। তাছাড়া স্ত্রীজাতির পেটে কথা থাকে না। তাই উহারা দুইজনেই যেন না জানিতে পারে। তুমি কাল শেষ রাত্রে গোপনে মন্দিরে তোমার চাবি লইয়া উপস্থিত থাকিবে। আমি শয্যাশায়ী। কিন্তু কষ্ট করিয়া লাঠির সাহায্যে মন্দিরে আমার চাবিসহ উপস্থিত হইব। তোমার চাবি দ্বারা অগ্রে বেদির তালা এক পাক ঘুরাইতে হইবে। আমি আমার চাবি দ্বারা দ্বিতীয় পাক ঘুরাইলেই বেদি খুলিয়া যাইবে। তখন দুই ভ্রাতা মিলিয়া পূর্বোক্তরূপে দেবতার রত্ন ভাগ করিয়া লইব। সাবধান! ঘূণাক্ষরে কেহ যেন জানিতে না পারে।

ইতি—আশীর্বাদক অঃ কুঃ

ও.সি. তরুণ রায় চিঠি ভাঁজ করে পকেটে রেখে সহাস্যে বললেন,—অঃ কুঃ মানে অক্ষয়কুমার! অক্ষয়বাবু তাহলে আপনি লাঠি ধরে আজ শেষ রাত্রে মন্দিরে গিয়েছিলেন?

অক্ষয়বাবু জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—না, না! আমি চিঠিটা লিখেছিলুম বটে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথার চোটে পা বাড়াতে পারিনি। ওই ভালুকবেশী বদমাস জানত না দুটো চাবি ছাড়া বেদি খোলা যাবে না। বেশ বুঝতে পারছি, ওই শয়তানটা কালীপদর চাবি হাতিয়ে রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার চুরি করার লোভে কালীকে খুন করেছে! ব্যাটা ওঁত পেতে ছিল কোথায়!

ও.সি. বললেন,—কিন্তু হাটিবাবু রত্নমুকুট এবং মুক্তোর হারের কথা জানল কীভাবে?

কালীটা ছিল বোকা! —অক্ষয়বাবু বললেন, কালী আমাকে বিশ্বাস করতে না পেরে নিশ্চয় ওকে কিছু বলেছিল। বিশ্বাস করুন, আমি পা নড়াতে পারি না। দু-দুবার আছাড় খেয়ে হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে গেছে। নাড়ু ডাক্তারকে জিগ্যেস করলে জানতে পারবেন। তিনি আমার সাক্ষী। এই দেখুন তাঁর প্রেসক্রিপশন। এক্সরে প্লেটও দেখাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—থাক। মিঃ রায়! অক্ষয়বাবুর বন্দুকটা আপাতত পুলিশের কাছে জমা থাক। কী বলেন?

ও.সি. বন্দুকটা নিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। ভাইয়ের শোকে অক্ষয়বাবুর মাথার ঠিক নেই। রাগের চোটে যাকে–তাকে গুলি করে মারতে পারেন। বিশেষ করে হাটিবাবুকে লক্ষ করে উনি গুলি ছুঁড়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—অক্ষয়বাবু! তা হলে আপনার বক্তব্য, আমার রহস্য ফাঁস করার ক্ষমতা পরীক্ষার জন্যই আপনি প্রেতাত্মার আয়োজন করেছিলেন?

অক্ষয়বাবু জোর দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। শয্যাশায়ী হয়ে আছি। সময় কাটে না। তাই আপনাকে নিয়ে একটু মজা করতে চেয়েছিলুম। জানতুম না, নির্বোধ কালী ওই ভক্তি হাটির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করবে।

ঠিক আছে। —কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন, তা হলে আপনার পরীক্ষায় আমি পাস করেছি। এবার কলকাতা ফিরে যাই। ওঠো জয়ন্ত!

আমরা নিচে গিয়ে গেস্টরুম থেকে আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ও.সি. তরুণ রায়ের সঙ্গে হেঁটে চললুম। দুজন কনস্টেবলও তাঁর আদেশে চলে এল। সাবধানে কাঠের সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন,—তা হলে মিঃ রায়! আমরা বনদফতরের বাংলোয় গিয়ে উঠছি। আশা করি, যথাসময়ে দেখা হবে।

ও.সি একটু হেসে বললেন,—ভাববেন না। পাখি ডানা মেলার সুযোগ পাবে না। এতক্ষণ লোক চলে গেয়ে যথাস্থানে।

একটা সাইকেল রিকশতে চেপে আমরা গঙ্গার ধারে বনদফতরের বাংলোতে পৌঁছলুম। কর্নেল বললেন,—কৃষ্ণনগরে এস. পি সায়েবকে বলে বাংলোর একটা ঘর বুক করে রেখেছিলুম। আমার ধারণা ছিল, আমরা সাঁতরা বাড়িতে থাকার রাতেই কিছু ঘটবে। অঙ্ক জয়ন্ত, স্রেফ অঙ্ক!

বাংলোর কেয়ারটেকার আমাদের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিমের একটা ডাবলবেড ঘরে নিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন,—আগে এক দফা কফি আর কিছু স্ন্যাক্স। সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট করব।

দক্ষিণের ব্যালকনিতে রোদ পড়েছে। পশ্চিমে গঙ্গা। দক্ষিণে ভাঙনরোধী ঘন জঙ্গল। ঘটনার চাপে আমার স্নায়ু একেবারে বিধ্বস্ত। উর্দিপরা ক্যান্টিনবয় ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। তারপর কফিতে চুমুক দিতে-দিতে স্নায়ু চাঙ্গা হল। বললুম,—বাপ্‌স্! কী সাংঘাতিক রহস্য!

কর্নেল হাসলেন,—রহস্যের আর বাকি কী থাকল ডার্লিং?

বললুম,—রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার স্বচক্ষে দেখতে পেলে জানতুম রহস্য ফর্দাফাঁই হয়েছে।

—আশা করি দেখতে পাবে!

একটু পরে বললুম,—ওই ভক্তিভূষণ হাটি লোকটি ডাবল এজেন্টের কাজ করেছে। অক্ষয়বাবুর সঙ্গে তার পরিচয় আছে, এটা স্পষ্ট। কারণ দুজনেই 'প্রেতাত্মার অভিশাপ' বই নিয়ে আপনাকে লড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আপনিও বলছিলেন, পরে ভালুকের হাতে মৃত্যুর প্ল্যান করা হয়েছিল। যেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, অক্ষয়বাবু সত্যি শয্যাশায়ী। কাজেই ভক্তি হাটি গোপনে কালীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে অক্ষয়বাবুকে রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার থেকে বঞ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছিল। তারপর সে মন্দিরে কালীবাবুকে মেরেছে। কিন্তু সে জানত না, একটা চাবিতে বেদি খুলবে না। মাঝখান থেকে—

কর্নেল বললেন,—আর ওসব কথা নয়। কারণ এখনও তোমার নার্ভ চাঙ্গা হয়নি।

—কেন? কেন?

—ভালুকবেশী ভক্তি কী খুঁজতে কালীবাবুর ঘরে ঢুকেছিল?

—টাকাকড়ি সোনাদানা চুরি করতে ঢুকেছিল। কারণ দেবতার সম্পদ সে পায়নি।

কথায় বলে, চোরের কৌপিন লাভ। কিছু না পেলে চোর অগত্যা সাধুর কৌপিন নিয়ে পালায়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার কথায় যুক্তি আছে অস্বীকার করা যায় না।

গঙ্গার ধারে প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বইছিল। তাই ঘরে ঢুকে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাস্ট এল।

খিদে পেয়েছিল। খাওয়ার পর বললুম,—আপনি আবার হাঁসখালির বিলে হাঁস দর্শনে যাবেন নাকি?

—যাব। তবে আপাতত একবার থানা ঘুরে আসি। প্রোফেসর বি বি হাটি কী করছেন, দেখে আসি।

কর্নেল চলে গেলেন। আমি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। এখানে প্রেতাত্মা বা ভালুকের ভাবনা নেই। কাজেই নিরুপদ্রবে ঘুমুনো যাবে। গত রাতে ভালো ঘুম হয়নি।

কর্নেল ফিরে এসে ঘুম ভাঙালেন। তখন সাড়ে বারোটা বাজে। বললুম,—প্রোফেসর হাটির ম্যাজিক দেখলেন?

—হুঁউ। তবে তুমি স্নান করে ফেলো গরম জলের ব্যবস্থা আছে। আজ আমিও স্নান করব।

স্নানের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটু জিরিয়ে নাও। তিনটেয় বেরুব। শীতের বেলা তিনটে মানে আলোর দফারফা। হাঁসখালির বিলে আজ আর পাওয়া হবে না। গঙ্গার ধারে বাঁধের পথে বরং হাটছড়ি গ্রামের পুরনো শ্মশানে গিয়ে প্রাচীন সামন্তরাজাদের প্রত্ন নিদর্শন দেখব। শুনলুম একসময় ওখানে শ্মশানকালীর মন্দির ছিল। অমাবস্যার রাতে নরবলি হত।

তিনটেয় আমরা গঙ্গার ধারে বাঁধের ওপর নির্জন একফালি রাস্তায় হাঁটছিলুম। ডাইনে নিচে গঙ্গা। বাঁদিকে ঘন জঙ্গল। প্রায় আধ কিলোমিটার হাঁটার পর দেখলুম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একফালি রাস্তা এসে বাঁধে মিশেছে। নিচে ঘাট। একটু এগিয়ে বিশাল বটগাছ এবং মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল। তার পাশে শ্মশান। এখনও মড়া পোড়ানো হয়। তাই খানিকটা জায়গা জুড়ে চিতার ছাই, ভাঙা মাটির কলসি এইসব জিনিস পড়ে আছে।

কর্নেল বটগাছের পেছনে প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড়ের ওপর বসে বললেন,—চুপটি করে বোসো।

বললুম,—এই পাথরটা বুঝি সামন্তরাজাদের আমলের?

—চুপ। কথা নয়।

কর্নেল বাইনোকুলারে গঙ্গাদর্শন করতে থাকলেন। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে এভাবে চুপচাপ বসে থাকার মানেটা কী! ক্রমে সূর্য গঙ্গার ওখানে গাছপালার আড়ালে নেমে গেল। কিছুক্ষণ গঙ্গার জলে লাল ছটা ঝকমক করতে থাকল। তারপর ধূসরতা ঘনিয়ে এল। এই সময় চোখে পড়ল, একটা ছোট নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। অমনি কর্নেল আমাকে ইশারায় গুঁড়ি মেরে বসতে বললেন।

তারপর যা দেখলুম, ভীষণ অবাক হয়ে গেলুম। কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সে নৌকোর মাঝিকে নৌকাটা আরও একটু এগিয়ে আনতে ইশারা করল। সঙ্গে-সঙ্গে কর্নেল দৌড়ে গিয়ে কম্বল মুড়ি দেওয়া লোকটিকে ধরে ফেললেন। আশেপাশের ঝোপঝাড় থেকে কয়েকজন পুলিশকেও বেরুতে দেখলুম। কর্নেল বললেন,—অক্ষয়বাবু! কাঠের সাঁকোয় পা হড়কে পড়ে হাঁটু ভাঙার ভান করেছিলেন। এক রিকশওয়ালার কাছে সে-কথা শুনেছি। দ্বিতীয়বার প্রেতাত্মার চাঁটি খেয়ে নয়, মিথ্যামিথ্যি এখানে আবার আছাড় খেয়েছেন বলে নাড়ুবাবু ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আপনি দিব্যি হাঁটতে পারেন। তা ছাড়া আপনি বন্দুকবাজও বটে। ভক্তিবাবুর মুখ বন্ধ করতে গুলি ছুঁড়েছিলেন। ভাগ্যিস, আমি সতর্ক ছিলুম।

ততক্ষণে দুজন কনস্টেবল অক্ষয়বাবুকে ধরে ফেলেছে। কর্নেল একটানে কম্বল সরাতেই দেখা গেল, তাঁর হাতে একটা পুঁটুলি। কেড়ে নিয়ে কর্নেল বললেন,—এর মধ্যে নৃসিংহদেবের রত্নমুকুট আর মুক্তোর হার আছে।

অক্ষয় সাঁতরা মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। নৌকাটা পালিয়ে যাচ্ছিল। একজন কনস্টেবল লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে আটকাল। মাঝি বলল,—আমার কোনও দোষ নেই স্যার! ধানুকে দিয়ে বড়কর্তাবাবু খবর পাঠিয়েছিলেন নৌকায় চেপে ওপারে যাবেন।

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে এতক্ষণে ও.সি তরুণ রায়কে আসতে দেখলুম। উনি এসে সহাস্যে বললেন,—তাহলে পাখি ডানা মেলতে যাচ্ছিল দেখা যাচ্ছে। বাহ্! দিব্যি দুই ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছেন সাঁতরাবাবু। চলুন! এবার শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করবেন। বৈমাত্রেয় ভাই কালীপদ সাঁতরাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে খুন করার অভিযোগ আপনাকে গ্রেফতার করা হল। চলুন তাহলে। আর কী?

কর্নেল বাঁধের পথে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধারালো কিছু ভারী জিনিস দিয়ে মাথার পেছনে তিন জায়গায় আঘাত করার কথা বলা হয়েছে। হাতুড়িটা পেছনে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন অক্ষয়বাবু। আমি সেটা সকালেই কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। হাতুড়িটার একদিক শূলের মতো। অন্যদিক ভোঁতা। শূলের দিকে মারলে অনেকটা ভালুকের নখের আঘাত বলে মনে হতে পারে তবে হাতুড়িটা অর্ডার দিয়ে বানানো। এক আঘাতেই মগজের ঘিলু ভেদ করে ফেলবে। মিঃ রায়! আপনারা এগোন। আমরা দুজনে ধীরেসুস্থে যাচ্ছি।

পুলিশের দলটি আসামিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। নৌকাটায় একজন কনস্টেবল বসে আছে এবং মাঝি বেচারা কিনারায় লগি মেরে উজানে নিয়ে চলেছে।

কর্নেল একখানে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন,—কী জয়ন্ত? কেমন রোমাঞ্চকর স্টোরি পেয়ে গেলে! আসলে অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি বলে একটা প্রবচন আছে। নিজেকে নিরাপদে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যেই অক্ষয় সাঁতরা এতসব আয়োজন করেছিলেন! তাঁর বন্ধু ভক্তিভূষণ হাটি কবুল করেছেন, একসময় অক্ষয় সাঁতরা এশিয়ান সার্কাসের ম্যানেজার ছিলেন। বাবার মৃত্যু-সংবাদ শুনে চাকরি ছেড়ে হাটছড়িতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর বাবার মৃত্যুর আগে নবঠাকুরকে গোপনে একটা চাবি দিয়ে বলেছিলেন, অক্ষয় ফিরে এলে যেন চাবিটা তাকে তিনি দেন। নবঠাকুর জানতেন না চাবিটা কীসের। অক্ষয়বাবুও সম্ভবত জানতেন না। কালীপদবাবুই তাঁকে গোপন কথাটা বলে থাকবেন। কারণ ধনরত্নের লোভ সাংঘাতিক লোভ।

—নবঠাকুর তা-ই বলেছেন বুঝি?

হ্যাঁ। —বলে কর্নেল পা বাড়ালেন, চলো জয়ন্ত! বাংলোয় ফিরে কড়া কফি খাওয়া যাক। গঙ্গার হাওয়া বেজায় ঠান্ডা।...

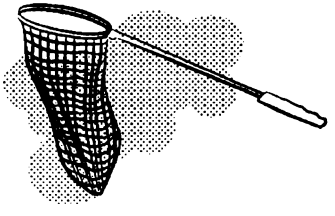

সিংহগড়ের কিচনি-রহস্য

সেবার অক্টোবর মাসে কর্নেলের সঙ্গে সিংহগড়ে বেড়াতে গিয়ে এক অদ্ভুত পাগলের পাল্লায় পড়েছিলাম। অদ্ভুত বলার কারণ, সে আচমকা একটা গাছের ডাল থেকে আমার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করছিল একটা ছড়া শেখানোর জন্য।

হ্যাঁ—একটা অদ্ভুত ছড়া।

তবে ঘটনাটা গোড়া থেকেই বলা যাক। সিংহগড় বিহারের একটা সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র। আমরা উঠেছিলুম জনপদ থেকে একটু দূরে ধারিয়া নদীর তীরে একটা টিলার গায়ে সরকারি ডাকবাংলোতে। রাত্রে পৌঁছে ভোরে যথারীতি কর্নেল মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন। এবং ফিরে এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরুব, জয়ন্ত। সিংহগড়ের পুরনো বসতি এলাকায় একটা গাছে দুর্লভ প্রজাতির একটা অর্কিড দেখে এলুম। অত উঁচুতে এই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে উঠতে পারলুম না। এবার গিয়ে দেখা যাক, উঁচু গাছে চড়ার জন্য কোনও লোক খুঁজে পাই নাকি। খিদে পেয়েছিল বলে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।

ব্রেকফাস্ট করে আমরা ন'টা নাগাদ বেরিয়েছিলুম। পাহাড়ি এলাকা। পুরনো বসতি নির্জন খাঁ-খাঁ করছিল। রাস্তাটাও এবড়ো-খেবড়ো। দু-ধারে ঢেউ খেলানো মাটির ওপর একটা করে পুরনো বাড়ি। অনেক বাড়িরই চৌহদ্দির পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। বাড়িগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, বাগানবাড়ির মতো। রাস্তার দু-ধারে যত ঝোপঝাড়, তত গাছ। কর্নেল আমাকে একখানে দাঁড়াতে বলে সামনে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেই বাড়িটার উঠোনে একটি কিশোর গরু চরাচ্ছিল। ঘাস আর ঝোপঝাড় ভর্তি উঠোন।

আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ ওপর থেকে মাথায় ঝাকড়মাকড় চুল, মুখে গোঁফদাড়ি, গায়ে ময়লা, ছেঁড়া হাওয়াই শার্ট, পরনে হাঁটু থেকে ছেঁড়া পাতলুন, একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে হি-হি হেসে বলল, এই ছড়াটা বল দিকি! নইলে কাতুকুতু দেব।

বলেই সে আওড়াল :

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা।।...

আমি চমকে গিয়ে হতবাক। সে আমাকে নোংরা আঙুলে কাতুকুতু দিতে শুরু করল। বল। বল। নইলে কাতুকুতু-কাতুকুতু-কাতুকুতু...

অগত্যা চেঁচিয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেল সেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছেন। আমার চিৎকার কানে ঢুকছে না। এদিকে পাগল আমাকে ছড়াটা না শিখিয়ে ছাড়বে না। বারবার ছড়াটা বলছে আর কাতুকুতু দিচ্ছে। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরাতেও পারছি না।

সেই সময় ডানদিকের বাড়ি ভাঙাচোরা গেট সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একটি ছড়ি। তিনি তাড়া করে এলেন। অ্যাই বাঁদর। আবার বদমাইসি শুরু করেছ? লাঠিপেটা করব হতভাগাকে।

পাগল সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়ে এক দৌড়ে গাছপালার ভেতর উধাও হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, কিছু মনে করবেন না। ও আমার ছোটভাই বিক্রমজিৎ। ক'মাস থেকে উন্মাদ রোগে ভুগছে। রাঁচির কাছে কাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলুম। সেখান থেকে পালিয়ে এসে লোককে জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে। তা আপনারা কি কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন?

এতক্ষণে কর্নেল ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। বললেন, কী হয়েছে জয়ন্ত?

ভদ্রলোক বিব্রতভাবে বললেন, তেমন কিছু না। আমার ভাইয়ের কথা হচ্ছিল। আমার ভাই বিক্রমজিৎ উন্মাদ রোগে ভুগছে।

কর্নেল হেসে ফেললেন। জয়ন্তকে কাতুকুতু দিচ্ছিল দেখলুম। আপনি কি এখানকার বাসিন্দা?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ। আমার নাম অমরজিৎ সিংহ। এই বাঙালিটোলায় থাকি। ওই আমার বাড়ি। আপনাদের পরিচয় পেলে খুশি হতুম।

কর্নেল তাঁর একটা নেমকার্ড ওঁকে দিলেন। উনি সেটা পড়ে বললেন, আপনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? নেচারিস্ট মানে?

প্রকৃতি প্রেমিক বলতে পারেন। আর আমার এই তরুণ বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার। অমরজিৎ আমাদের নমস্কার করে বললেন, কী বলব কর্নেলসায়েব! আমারই পূর্বপুরুষের নামে সিংহগড় নাম। একসময় আমার পূর্বপুরুষ এখানকার জমিদার ছিলেন। তাঁদের পদবি ছিল রাজা। এখন প্রায় নিঃস্ব অবস্থা বলতে পারেন। অভিশাপ কর্নেলসায়েব। দেবতার অভিশাপ।

কর্নেল বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আগ্রহ হচ্ছে। তবে আমার এই হবি। ওই গাছের ডগায় একটা অর্কিডের ঝাড় আছে। এই ছেলেটিকে দিয়ে সেটা পেড়ে আনাই আগেই। তারপর কথা হবে।

অমরজিৎ সিংহ বললেন, চলুন। আপনাদের সঙ্গে যাই নইলে পাগল বিক্রমজিৎ হয়তো আবার উৎপাত শুরু করবে। এদিকটাতে বাইরের লোক দেখতে পেলেই ওর পাগলামি বেড়ে যায়।

বাঁ-দিকে পোড়ো একটা বাড়িরই অংশ ছিল জায়গাটা। সেখানে জঙ্গল হয়ে আছে। একটা বিশাল শিরীষ গাছের ডগায় কর্নেল অর্কিডটা ছেলেটিকে দেখিয়ে দিলেন। সে তরতর করে চড়ে গেল ডগায় এবং কর্নেলের নির্দেশ মতো অর্কিডের ঝাড়টা উপড়ে নিয়ে নেমে এল। কর্নেল তাকে দশ টাকা বখশিস দিলেন। সে খুশি হয়ে চলে গেল।

কর্নেল পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে একটা পলিথিনের থলি বের করলেন। থলির ভেতর কালো কাদার মতো জিনিসের ওপর অর্কিডের ঝাড়টা বসিয়ে দিয়ে বললেন, ব্যাস! আমার কাজ শেষ।

অমরজিৎ বললেন, থলের তলায় এগুলো কি সার?

কর্নেল হাসলেন। সার বলার চেয়ে পরজীবী এই উদ্ভিদের খাদ্য বলা উচিত। ওগুলো পচা কাঠের গুঁড়ো। তার সঙ্গে কিছু মাটি মেশাতে হয়েছে। আসলে কাঠে কার্বন আছে। গাছের ডালের কোনও খোঁদলে বৃষ্টির জল জমে জায়গাটায় পচন ধরে। সেখানে অর্কিডের সূক্ষ্ম বীজকণিকা বাতাসে উড়ে এসে পড়লে অর্কিড গজায়। তার খাদ্য ওই পচা কাঠের কার্বন।

রাস্তায় গিয়ে অমরজিৎ বললেন, এখানে একসময় প্রচুর বাঙালি ভদ্রলোক বাস করতেন। এখন অনেকেই বাড়ি বেচে দিয়ে বা ফেলে রেখে চলে গেছেন। কালেভদ্রে বাঙালিরা এখানে বেড়াতে আসেন। আপনারা দয়া করে যদি গরিবের বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেন, খুশি হব।

কর্নেল বললেন, অবশ্যই। বিশেষ করে আপনার পূর্বপুরুষই এই সিংহগড়ের প্রতিষ্ঠাতা। আপনার কাছে পুরনো কথা শুনলে ভালো লাগবে।

গেটটা লোহার। কিন্তু মরচে ধরে অর্ধেকটা ভেস্তে গেছে। বাউন্ডারি ওয়াল মোটামুটি টিকে আছে। উঠোনে শুকনো ফোয়ারা এবং গাড়িবারান্দা বা পোর্টিকো আছে। দোতলা বাড়ি। আমাদের নিচের হলঘরে বসিয়ে অমরজিৎ ওপরে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, দিদিকে বললুম আপনাদের কথা। আপনারা অতিথি। অন্তত এক কাপ চা না খাওয়ালে চলে?

ঘরটা হলঘরই বটে। একপ্রান্ত থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে সিঁড়িটা কাঠের। বনেদিয়ানার নিদর্শন এটা। কিন্তু ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। কয়েকটা ছেঁড়াফাটা গদি আঁটা চেয়ার আর একটা বিশাল গোল টেবিল। একপাশে তক্তাপোশে মাদুর পাতা এবং একটা বিছানা গোটানো আছে।

আমরা চেয়ারে বসলুম। উল্টোদিকে মুখোমুখি অমরজিৎ বসে একটু হেসে বললেন, যমপুরীর যম হয়ে বসে আছি কর্নেলসায়েব। কিন্তু যম তো ধনসম্পদ পাহারা দেয়। আমি কি পাহারা দিচ্ছি? শুধু বংশের স্মৃতি এই বাড়িটা। বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেই গায়ের জোরে কেউ দখল করে ফেলবে। যেমন, বেশ কিছু বাড়ি বেদখল হয়ে গেছে। এদিকে বাড়ি যে বেচব, কিনবে কে? এদিকটায় লোকে আসতে চায় না। কারণ, টাউনশিপের দিকে যেসব সুযোগসুবিধা—রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জলের কল এসব আছে, এদিকটায় সেসব নেই। কুয়ো থেকে জল তুলতে হয়। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। পূর্বদিকে ধারিয়া নদীর ধারে একটা জেলেবসতি আছে। তারা গরিব লোক। মহাজন তাদের রক্ত শুষে নেয়।

কর্নেল বললেন, আপনি দেবতার অভিশাপের কথা বলেছিলেন।

অমরজিৎ জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঠাকুরদার ঠাকুরদা যে দুর্গপ্রাসাদে বাস করতেন, সেটা এখন ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। ঠাকুরদা বাবার আমলে জমিদারির খানিকটা টিকে ছিল। তিনিই এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে এসে এই বাগানবাড়িতে বাস করতেন। পরে দুর্গপ্রাসাদ মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। তখন শেষ জীবনটা এ বাড়িতে কাটান। সেই সময় দুর্বুদ্ধিবশে তিনি গৃহদেবতার রত্নালঙ্কার বিক্রি করে ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য বার্ষিক কর পরিশোধ করেন। কর না মেটালে জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়ে যেত। ব্যাস! গৃহদেবতার অভিশাপ লাগল। ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে হঠাৎ সেই ঘোড়া কেন যেন খেপে গিয়ে তাঁকে পিঠ থেকে ফেলে দেয়। তিনি পাহাড়ের খাদে পড়ে মারা যান। আমার ঠাকুরদা শত্রুজিৎ সিংহের বাতিক ছিল পায়রা পোষা। এ বাড়ির ছাদে পায়রা ওড়ানোর সময় তিনি পা ফস্কে নিচে পড়ে মারা যান। আমার বাবার নাম ছিল ইন্দ্রজিৎ। তাঁর শখ ছিল ঘুড়ি ওড়ানোর। ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনিও—

অমরজিৎ হঠাৎ থেমে গেলেন। ওপর থেকে সাদা থানপরা এক মহিলা মৃদুস্বরে ডাকছিলেন, ঝন্টু, ঝন্টু!

অমরজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে একটা ট্রে নিয়ে এলেন। তাতে দু'কাপ চা আর দুটো প্লেটে দুটো করে সন্দেশ ছিল। তাঁর অনুরোধে সন্দেশ খেতে হল। তারপর চায়ে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, আশ্চর্য লাগছে। পর-পর দুর্ঘটনায় মৃত্যু!

অমরজিৎ বললেন, অভিশাপ। তাছাড়া আর কী বলব? ঠাকুরমা আমাদের দু-ভাই এবং দিদিকে মানুষ করেছিলেন। দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন পাটনায়। জামাইবাবু ছিলেন রেলের অফিসার। বিয়ের দু-মাস পরে তিনি ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান। অথচ আমাদের বংশের ওপর দেবতার অভিশাপ। যাই হোক, ঠাকুরমা মারা গেলে দিদি আমাদের দুই নাবালক ভাইয়ের গার্জেন হলেন। জমিদারি বাবার আমলেই হাতছাড়া হয়েছিল। কিছু জমি আর একটা আমবাগানের জোরে প্রাণরক্ষা।

এখানকার আম খুব বিখ্যাত। গ্রীষ্মে এলে আম খাওয়াতে পারতুম। তবে চোরের উৎপাতে অস্থির। আজকাল গাছের মুকুল এলে আম ব্যবসায়ীদের বিক্রি করে দিই। একথোক টাকা পাই।

কর্নেলে চুরুট ধরিয়ে বললেন, আপনার ভাই পাগল হয়েছেন কবে?

গত ডিসেম্বরে মন্টু—মানে বিক্রমজিৎ গড় জঙ্গলে ঢুকেছিল। ওর পাখি পোষার বাতিক আছে। পাখি ধরতে গিয়েছিল ওর বন্ধু মাধবের সঙ্গে। মাধবের কাছেই শুনেছিলুম, হঠাৎ মন্টু পা হড়কে পড়ে যায়। তারপর হাত-পা ছুঁড়ে প্রলাপ বকতে-বকতে দৌড়ুতে থাকে। মাধব আমাকে খবর দিয়েছিল। কয়েকজন লোক নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। হঠাৎ একটা গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আবোলতাবোল কী সব বলতে শুরু করল। ওকে ধরে নিয়ে এলুম। তারপর শেষে কাঁকে হাসপাতালে রেখে এলুম। কিছুদিন আগে কীভাবে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। শুধু দিদির কথা শোনে। রাতে ওই বিছানায় শুয়ে থাকে। দরজার ভেতরে তালা এঁটে দিই। সারা রাত প্রলাপ বকে। দেবতার অভিশাপ ছাড়া আর কী বলব? বাবার মৃত্যুর পর মা হৃদরোগে মারা যান। শুধু আমি আর দিদি অভিশাপ থেকে এখনও পর্যন্ত মুক্ত আছি। সবই দেবতার রহস্যময় লীলা। আমাদের দুজনকে হয়তো আরও সাংঘাতিক কোনও শাস্তি দেবেন।

আপনার দিদির নাম কী?

পরমেশ্বরী।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মন্টুবাবু কী একটা ছড়া বলেছিলেন যেন?

অমরজিৎ হাসলেন। ঠাকুরমা আমাদের দু-ভাইকে ওই ছড়াটা শেখাতেন। কিছু বুঝি না।

ছাড়াটা কী যেন?

অমরজিৎ আওড়ালেন :

পঞ্চভূতে ভূ নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড় ছোলা।...

গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে অমরজিৎ জিগ্যেস করলেন, আপনারা কোথায় উঠেছেন কর্নেলসায়েব?

কর্নেল বললেন, সরকারি ডাকবাংলোতে। আমরা কয়েকটা দিন আছি। সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্টের সময় কিংবা সন্ধ্যার দিকে বাংলোয় থাকব। যদি ওখানে যান, খুশি হব। আপনাদের বংশের ঘটনাগুলো ভারি অদ্ভুত। আমারও অনেকরকম হবি আছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা ঘটলে আমি সেখানে নাক গলাই।

অমরজিৎ কথাটা শুনেই চাপা গলায় বলে উঠলেন, তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমি যাব। কারণ, বলে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন। থাক। যথাসময়ে সব বলব।

কর্নেল অর্কিড ভর্তি থলেটা আমাকে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, জয়ন্ত! পাগলের হাতে কাতুকুতু খেয়ে তুমি জামাটা নোংরা করে ফেলেছ।

দেখে নিয়ে বললুম, ছ্যা, ছ্যা। কালি মাখিয়ে দিয়েছে দিখছি। ওর আঙুলে কালি লেগে ছিল।

কালি নয়। মনে হচ্ছে, পচা পাঁক ঘেঁটেছিল কোথাও। বলে কর্নেল হাসলেন। তুমি একটা কথা মনে রেখ। পাগল যা-যা করবে, তুমিও ঠিক তাই-তাই করলে সে তোমাকে পাগল ভেবে তক্ষুনি

পালিয়ে যাবে। তুমি যদি ওকে পাল্টা কাতুকুতু দিতে, দেখতে ও তখুনি বলত, আরে, এ যে দেখছি এক পাগল। তারপর কেটে পড়ত।

বলেন কী? কোনও বইয়ে পড়ছেন বুঝি?

হ্যাঁ। পড়েছি। এই আচরণকে ইংরেজিতে বলে 'লোগোথেরাপি'। এই মন্টু পাগল আজ আমাকেও কাতুকুতু দিতে হামলা করেছিল। আমি উল্টে ওকে কাতুকুতু দিতে গেলুম। কাতুকুতু কাতুকুতু কাতুকুতু। ব্যাস মন্টু থমকে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বলে উঠল, দুচ্ছাই। এ যে দেখছি একটা বদ্ধ পাগল। বলে কেটে পড়ল।

আপনার 'লোগোথেরাপি' অনুসারে তোতলাদের সঙ্গে তোতলামি করতে গেলে কিন্তু বিপদ।

না। তোতলামি সারাতে তোতলাদের কোনও নাটকে তোতলার পার্ট দিতে হয়। আমি বলছি পাগলদের কথা। কর্নেল বাইনোকুলারে কী দেখে নিলেন। তারপর বললেন, কী কাণ্ড। পাগল মন্টু একটা গাছের মগডালে চড়ে বসে আছে দেখছি। আগে জানলে ওকে দিয়েই অর্কিডটা পেড়ে নিতুম।

দুই

দুপুরে আমাদের ঘরে ক্যান্টিন-বয় খাবার দিতে এল। কর্নেল তাকে জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কী?

সে বিনীতভাবে বলল, আমি রামপরসাদ আছি স্যার।

আচ্ছা রামপ্রসাদ, এখানে গড়ের জঙ্গলটা কোথায়?

সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, জি সার, আপনি কিচনি-কিলার কথা বলছেন?

কিচনি কেন?

রামপ্রসাদ মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল, ওহি কিলার চারতরফ খাদা আছে সার। বহত পানি ভি আছে। খাদার পানিতে কিচনি আছে।

কর্নেল হাসলেন। তুমি দেখেছ?

না সার। উয়ো কিচনি যিসকো দেখা দেতি, উয়ো পাগলা হো য়াতা। অর মর যাতা।

রামপ্রসাদ চলে গেলে জিগ্যেস করলুম, কিচনি কী?

জলের প্রেতিনী। শুনলে তো? যাকে সে দেখা দেয়, সে পাগল হয়ে মারা পড়ে। মন্টু—মানে বিক্রমজিৎ সিংহ তাহলে গড়ের জঙ্গলে কিচনি দেখেই পাগল হয়েছে।

যত সব বাজে কুসংস্কার।

কর্নেল মাছের টুকরো থেকে কাঁটা ছাড়িয়ে মুখে ভরলেন। বললেন, এখানে নদী থাকায় মাছের অভাব নেই। কী অপূর্ব স্বাদ। আমার ধারণা গড়ের জঙ্গলের গড়খাইয়ে যে মাছগুলো আছে, তাদের স্বাদ আরও খাসা। সঙ্গে ছিপ আনলে মাছ ধরার চেষ্টা করতুম।

হেসে ফেললুম। তারপর কিচনি দেখে পাগল হয়ে আমাকে বিপদে ফেলতেন। আপনাকে রাঁচির কাঁকে উন্মাদাশ্রমে পাঠাতে হত।

তবে যে বললে বাজে কুসংস্কার?

হ্যাঁ। তবে কুসংস্কার মানুষকে নির্বোধ করে ফেলে এই যা।

কর্নেল তারিয়ে-তারিয়ে মাছ খেতে-খেতে বললেন, দেড়টা বাজে। আড়াইটেতে আমরা গড়ের জঙ্গল দেখতে যাব। সাবধান জয়ন্ত, তুমি যেন হঠাৎ কিছু দেখে নির্বোধ হয়ে পড়ো না।

খাওয়ার পর রামপ্রসাদ ট্রে নিতে এল। কর্নেল তাকে বললেন, রামপ্রসাদ! তুমি তখন সবই বললে। কিন্তু কিচনিকেলা কোথায় তা তো বললে না?

সে পশ্চিমের খোলা জানালার দিকে আঙুল তুলে বলল, উয়ো দেখিয়ে সার। ওহি জঙ্গল আছে।

লক্ষ করে দেখলুম, প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা উঁচু ঢিবি দেখা যাচ্ছে। সেটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। যতদূর দেখা যাচ্ছে, ঢেউ খেলানো মাঠ—কোথাও আবাদি, কোথাও অনাবাদি এবং ঝোপঝাড়ে ঢাকা। তিনদিকে আরও দূরে নীল পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘ ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাংলোর নিচে দক্ষিণে একটা কাঁচা রাস্তা এগিয়ে গেছে। এঁকেবেঁকে অসমতল সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে রাস্তাটা হয়তো কোনও পাহাড়ি জনপদে পৌঁছেছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কর্নেল যথারীতি পিঠে কিটব্যাগ এঁটে এবং তার মধ্যে প্রজাপতি ধরা জাল গুঁজে রেখেছেন। স্টিকটা টিনের ফাঁকে বেরিয়ে আছে। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা এবং বাইনোকুলার। রোদ থেকে টাক বাঁচাতে চুপি পরেছেন। পায়ে হান্টিং বুট পরেছেন। একেবারে অভিযাত্রীর প্রতিমূর্তি।

আমরা কাঁচা রাস্তায় জলকাদা বাঁচিয়ে সাবধানে হাঁটছিলুম। কর্নেল মাঝে মাঝে থেমে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। পাখি কিংবা প্রজাপতি।

দূরের কোনও পাহাড়ি গ্রাম থেকে একদল আদিবাসী আসছিল। তারা আমাদের দেখেও দেখল না। পাশ দিয়ে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে-বলতে চলে গেল। প্রায় আধঘণ্টা চলার পর দেখলুম, রাস্তাটা গড়ের জঙ্গলকে এড়িয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে। সেখানে একটা অনুর্বর টাঁড় জমির উপর দিয়ে কর্নেল হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, গড়ের জঙ্গলে মানুষজন সত্যি যায় না দেখা যাচ্ছে। কোনও পায়ে চলা পথের চিহ্ন নেই।

বাঁদিকে নাক বরাবর এগিয়ে যতই ঢিবির ওপর জঙ্গলটার কাছাকাছি হচ্ছিলুম, কে জানে কেন একটু গা-ছমছম করছিল। জঙ্গলের ছায়া পূর্বে কিছুটা এগিয়ে এসেছে। কারণ সূর্য পশ্চিমের আকাশে একটু ঢলে পড়েছে। চারদিকে অসংখ্য গ্রানাইট পাথর ছড়িয়ে আছে ঝোপঝাড়ের ভেতর। গড়খাইয়ের সামনে পৌঁছে কর্নেল বললেন, ওই দেখ জয়ন্ত। ওইখানে ছিল দুর্গপ্রাসাদে যাওয়ার পথ। ব্রিজ ভেঙে জলে পড়ে গেছে। তবে এই টুকরোগুলোর ওপর দিয়ে জঙ্গলে ঢোকা যায়।

সেখানে গিয়ে লক্ষ করলুম, গড়খাইয়ের এপারে পুরনো রাস্তার কিছু চিহ্ন এখনও আছে। পাথরে বাঁধানো রাস্তার ওপর দু-ধারের মাটি ধুয়ে নেমে পথটাকে লুকিয়ে ফেলেছে। ব্রিজের কাঠামো পাথরে খিলান করা। ওপারে বিশাল তোরণের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল। মধ্যিখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা। তারপর পাথরের ইটের তৈরি পথের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। নানারকম রঙবেরঙের ফুলে ভরা ঝোপঝাড়।

কর্নেল বাইনোকুলারে ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, এস জয়ন্ত। সাবধানে পা ফেলবে। পাথরগুলো পিছল মনে হচ্ছে।

বললাম, ভাববেন না। মাউন্টেনিয়ারিংয়ের ট্রেনিং কাজে লাগাব।

গড়খাইয়ের জলটা কালো এবং কেমন আঁশটে গন্ধ যেন। সম্ভবত রাশিরাশি পাতা পচে এই অবস্থা হয়েছে। পেরিয়ে গিয়ে কর্নেল বললেন, এক মিনিট। দুটো ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে নিই। সাপ থাকা খুবই সম্ভব। তা ছাড়া টাল সামলানোর জন্যও লাঠি দরকার।

উনি কিটব্যাগ থেকে ডালকাটা 'জাঙ্গল নাইফ' বের করে একটা বেঁটে অজানা গাছের শক্ত দুটো লম্বা ডাল কাটলেন। তারপর লাঠি তৈরি করে একটা আমাকে দিলেন।

দিলেন বটে, কিন্তু সাপের কথা ভেবে প্রতি মুহূর্তে শিউরে উঠছিলুম। ঝোপঝাড় এবং ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা উঁচু পাথরের দেয়াল এবং ঘরের একটা অংশ চোখে পড়ল। ঘর বলা উচিত নয়। ঘরের অংশ। লোহার কড়িবরগা কোনও কালে কারা খুলে নিয়ে গেছে। স্থানে স্থানে উঁচু গাছও বিকেলের হাল্কা বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। জায়গাটা পাখির

চিড়িয়াখানা বলা চলে। কর্নেল পাখি দেখছিলেন বাইনোকুলারে। দক্ষিণের ঢালে গাছপালার মাথায় বসে থাকা এক সারস দম্পতির ছবি তুললেন। ক্যামরার টেলিলেন্স ফিট করে নিয়েছিলেন আগেই। তারপর উত্তরে বাইনোকুলারে কী দেখতে-দেখতে চাপা স্বরে বলে উঠলেন। কী আশ্চর্য! জয়ন্ত, বসে পড়।

আমাকে কাঁধ চেপে বসিয়ে দিয়ে কর্নেল বসলেন। জিগ্যেস করলুম, কী?

কর্নেল বললেন, কিচনি নয় মানুষ।

কোনও আদিবাসী হয়তো শিকারে এসেছে?

না। বলে উনি আবার বাইনোকুলার চোখে রাখলেন। আস্তে বললেন, ভদ্রলোককে আমি বাংলোয় দেখেছি। দোতলার উত্তরদিকের ঘরে উঠেছেন। কিন্তু উনি এখানে কী করছেন?

এতক্ষণে লোকটাকে দেখতে পেলুম। প্যান্ট, চকরাবকরা গেঞ্জি এবং মাথায় টুপি পরা ষণ্ডামার্কা চেহারার একটা লোক। মুখে জমকালো গোঁফ আছে। একটা চ্যাপটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে। একটু পরে সে চমকে ওঠার ভঙ্গিতে ডাইনে ঘুরে দাঁড়াল এবং পকেট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে দুহাতে ধরে দুবার গুলি ছুড়ল। নিঝুম জঙ্গলে আচমকা বিকট শব্দ এবং ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উড়ে পালিয়ে গেল।

লোকটা এবার যেন ভয় পেয়েই পাথর থেকে লাফ দিয়ে নেমে গুঁড়ি মেরে দৌড়োতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে দেখলুম পূর্বের তোরণের ধ্বংস্তূপের কাছে একবার ঘুরে কিছু দেখল এবং আবার একটা গুলি ছুড়ে নেমে গেল ঢাল বেয়ে।

কর্নেল এবার একটু উঁচু হয়ে বাইনোকুলারে দেখতে-দেখতে বললেন, পালিয়ে যাচ্ছেন ভদ্রলোক। জানি না, কিচনি দেখে গুলি ছুঁড়ে পালাচ্ছেন কি না। বাংলোয় ফিরে হয়তো আর একজন পাগলের দেখা পাব।

কর্নেলের কৌতুকে কান দিলুম না। বললুম, আপনি অদ্ভুত ঘটনা দেখলে নাক গলান। এটা একটা সাংঘাতিক অদ্ভুত ঘটনা।

হুঁ। একটু অপেক্ষা করো। ভদ্রলোক আরও দূরে চলে গেলে ব্যাপারটা দেখতে যাব।

আমি সেই পাথরের চত্বরটার দিকে লক্ষ রেখেছিলুম। এতক্ষণে দেখলুম, কী আশ্চর্য, সেই মন্টু পাগল চত্বরটাতে উঠে ধেই-ধেই করে নাচছে এবং ছড়াটা আওড়াচ্ছে।

একটু পরে সে অদৃশ্য কোনও লোককে কাতুকুতু দিতে থাকল। মুখে বলছিল সে, কাতুকুতু, কাতুকুতু, কাতুকুতু।

কর্নেল বললেন, পাগলকে দেখে ওই ভদ্রলোক ভয় পেয়ে গুলি করলেন কেন? অমন করে পালিয়েই বা গেলেন কেন? চলো জয়ন্ত আমরা মন্টুবাবুর কাছে যাই।

বললুম, যদি ও ঢিল ছোঁড়ে?

এস তো দেখা যাক।

কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কিছুটা এগিয়ে একটা চাঙড়ে উঠে কর্নেল ডাকলেন, মন্টুবাবু। কাতুকুতু দেব। কাতুকুতু, কাতুকুতু, কাতুকুতু।

অমনি পাগল করজোড়ে বলে উঠল, ওরে বাবা। মরে যাব। মাইরি মরে যাব।

তাহলে চুপটি করে দাঁড়ান।

দাঁড়িয়েই তো আছি মুনিবর। পাগল হেসে অস্থির হল। মুখে দাড়ি দেখলে মাইরি সাধু সন্নেসি মনে হয়। সক্কালে দূর থেকে চোখে কালো চোঙ লাগিয়ে কী দেখছিলে বলো তো?

কর্নেল বললেন, আপনাকে দেখছিলুম। আপনি গাছে-গাছে গেছোবাবা হয়ে ঘোরেন কেন?

পাগল বলল, ঘুরি কি সাধে রে ভাই? দেখতে পেলে যে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তারপর অ্যায়সা কাতুকুতু দেবে, ওরে বাবা!

কথা বলতে-বলতে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন কর্নেল। আমি তাঁর পেছনে। পাথরের চত্বরটার কাছাকাছি গিয়ে কর্নেল চাপা গলায় বললেন এক ভদ্রলোক এখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি হঠাৎ গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে পালিয়ে গেলেন কেন?

পাগল হেসে কুটিকুটি হয়ে বলল, ভয় পেয়ে পালাল।

কিচনি দেখে?

ওরে বাবা। বোলো না। নাম করলেই বিপদ।

কিন্তু আপনাকে তো কিচনি কিছু বলেন না!

পাগল গম্ভীর মুখে বলল, ওর সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। বলে দুপা পিছিয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকাল সে। এই! তোমরা রাঁচি থেকে আমাকে ধরতে আসো নি তো?

কখনও না। আমরা কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসেছি। তা আপনি নাকি ক'মাস আগে এই গড়ের জঙ্গলে এসে কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তারপর পাগল হয়ে—

পাগল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আমি পাগল না রে ভাই। আমাকে পাগল বললে খুব দুঃখ পাই।

ঠিক আছে আপনি পাগল না। কিন্তু এখানে কেন এসেছিলেন? কেন এখানে এখনও আসেন?

কী কথার ছিরি! আসব না? ছোটবেলা থেকে আসি। আমার চৌদ্দ পুরুষের জায়গা। ঠাকুরমা বলতেন, রোজ গড়ের জঙ্গলে যাবি। বলে সে ঠোঁটে তর্জনী রাখল। নাহ্। বলব না। ঠাকুরমা পই-পই করে বলেছিলেন, কাউকে কিছু বলবিনে।

দাদাকেও বলবেন না?

কখনও না।

দিদিকে?

উঁহু।

জোরে মাথা নেড়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে নিচে নামল। তারপর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে কোথায় লুকিয়ে গেল।

কর্নেল পাথরের চত্বরে উঠে বাইনোকুলারে তাকে খুঁজতে থাকলেন। তারপর বললেন, আশ্চর্য তো! কোথায় গেলেন মন্টুবাবু?

হয়তো কোথাও গুঁড়ি মেরে বসে আছেন।

কর্নেল চত্বর থেকে নেমে বললেন, এস তো। যেদিক থেকে উনি এসেছিলেন, সেই দিকটা একবার দেখা যাক।

উত্তর-পশ্চিম কোণে পাথরের ঘরের যে অংশটুকু টিকে আছে, সেখানে গিয়ে কর্নেল খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর কয়েকপা এগিয়ে গিয়ে হেসে উঠলেন।

জিগ্যেস করলুম, হাসছেন কেন?

ওই দেখ জয়ন্ত। এখানে-ওখানে কারা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। আসলে সর্বত্র প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ গুপ্তধনের গুজব রটনার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

প্রকৃত পাগল এই গুপ্তধন সন্ধানীরা। বলে কর্নেল পূর্বদিকে ঘুরলেন। চলো। ফেরা যাক। আলো কমে এসেছে।

আমরা পূর্বদিকের ভাঙা তোরণের কাছে পৌঁছুলুম। তোরণের ধ্বংসস্তূপের ওপর একটা উঁচু অশ্বত্থ গাছের ডগা থেকে মন্টু পাগলের চিৎকার শোনা গেল। সেই ছড়াটা সুর ধরে সে আওড়াচ্ছে—

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর ব্যোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা।...

আমরা সাবধানে গড়খাই পেরিয়ে গিয়ে সে পথে এসেছিলুম, সেই পথে ফিরে চললুম। বাংলোয় পৌঁছতে ছটা বেজে গেল। দোতলায় উঠে কলিংবেল বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে কর্নেল কফি আনতে বললেন। তারপর দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসলেন। এই সময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল বললেন, কাম ইন।

অবাক হয়ে দেখি, সেই চকরাবকরা গেঞ্জি পরা ষণ্ডামার্কা ভদ্রলোক। তিনি নমস্কার করে বললেন, একটু বিরক্ত করতে এলুম। কিছু মনে করবেন না। জানলা দিয়ে আপনাদের গড়ের জঙ্গল থেকে ফিরতে দেখছিলুম। তাই একটা কথা জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হল। আপনারা ওখানে ভয়ঙ্কর চেহারার কালোকুচ্ছিত একটা প্রাণীকে দেখতে পাননি?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য। আমরা কিচনির দর্শন পাইনি।

ভদ্রলোক চেয়ারে বসে বললেন, ওহ। আমার একটা হরিব্‌ল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে।

কর্নেল বললেন, বলুন। শোনা যাক।...

তিন

ভদ্রলোকের পরিচয় জানা গেল কথার ফাঁকে। তাঁর নাম হীরালাল রায়। পাটনায় থাকেন। বংশ পরম্পরায় বাঙালি। পাটনায় কন্ট্রাক্টর এবং অর্ডার সাপ্লাই-এর ব্যবসা আছে তাঁর। সিংহগড়ে ব্যবসার কাজে এসেছেন। এখানে এসে গড়ের জঙ্গলে কিচনির গল্প শুনেছেন। তাঁর এই একটা স্বভাব। অদ্ভুত কোনও গল্প শুনলেই তার সত্যমিথ্যা যাচাই করা। তাই তিনি জেদের বশে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলেন।

তারপর ঘুরতে-ঘুরতে একখানে থপ-থপ শব্দ শুনে চমকে ওঠেন। পরক্ষণে তাঁর চোখে পড়ে, বিশাল ব্যাঙের মতো একটা কালো রঙের জন্তু। কিন্তু মাথায় বড়-বড় চুল আছে। মুখটা ভয়ঙ্কর। দুটো লাল চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে।

দেখামাত্র হীরালালবাবু তাঁর লাইসেন্স করা রিভলভার থেকে দুবার গুলি ছোড়েন। লক্ষভ্রষ্ট হয়েছিল গুলি। তিনি আঁতকে দিশাহারা হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেতে-যেতে একবার ঘুরে দেখেন, বীভৎস জন্তুটা তাঁকে তাড়া করে আসছে। তখন আবার একবার গুলি ছোড়েন। কিন্তু এবারও গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তখন তিনি প্রাণভয়ে গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, তাঁকে আমরা পালাতে বা গুলি ছুড়তে দেখেছি। কিন্তু কর্নেল আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন, আমরা কিন্তু কিছুই দেখিনি। তবে একজন পাগলকে উঁচু গাছের মগডালে চড়ে গান গাইতে দেখেছি।

হীরালাল ভুরু কুঁচকে বললেন, পাগল? গাছের ডালে?

হ্যাঁ। বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কে গাছের মগডালে চড়ে গান গাইবে?

এই সময় রামপ্রসাদ কফির ট্রে নিয়ে এল। কর্নেল হীরালালবাবুকে কফি খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি চা-কফি কিছুই খান না। তিনি এবার বললেন, আপনারা কি কলকাতা থেকে আসছেন?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর নেমকার্ড দিলেন। আমিও আমার নেমকার্ড দিলুম। হীরালালবাবু কার্ড দুটো পড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি রিটায়ার্ড কর্নেল! আর আপনি সাংবাদিক। কর্নেলসায়েব আপনি গভমেন্টকে যদি জানান, তাহলে মিলিটারি পাঠিয়ে গড়ের জঙ্গল খুঁজে আজব জন্তুটাকে ধরে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে। আর জয়ন্তবাবু আপনি খবরের কাগজে ব্যাপারটা লিখলে তা আরও ভালো হয়।

কর্নেল হাসলেন। আগে কিচনির দর্শন পাই এবং তার ফটো তুলি, তবে তো?

হীরালালবাবু চলে গেলেন। ততক্ষণে আলো জ্বেলে দিয়েছিল রামপ্রসাদ। আমরা চুপচাপ কফি খেতে থাকলুম। একটু পরে কর্নেল আস্তে বললেন, ভদ্রলোকের কথা শুনে কী মনে হল জয়ন্ত?

সত্যি কথাই বললেন। কিছু গোপন করলেন না।

হ্যাঁ। তবে একজন ব্যবসায়ী লোকের পক্ষে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চার কতটা স্বাভাবিক এটাই প্রশ্ন।

ব্যবসায়ী হলে কি কেউ অ্যাডভেঞ্চারার হতে পারে না?

পারে হয় তো। কিন্তু—

কিন্তু কী?

কর্নেল চুপচাপ কফি খাওয়ার পর চুরুট ধরিয়ে বললেন, একটা অস্বাভাবিকতা থেকে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী লোক। ব্যবসার কাজে সিংহগড়ে এসেছেন। কাজেই পরিচিত লোকজন আছে। সত্যি কিচনি দেখার জন্য গড়ের জঙ্গলে গেলে হীরালালবাবুর পক্ষে সঙ্গীসাথী নিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। একা গিয়েছিলেন কেন? কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে আপন মনে বললেন, নাহ্। ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ওঁর বয়স। উনি যুবক নন যে এ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারে উৎসাহ থাকবে। ওঁর বয়স পঞ্চাশের বেশি বলেই মনে হল। এ বয়সে—নাহ্ জয়ন্ত। খটকা থেকে যাচ্ছে। তাছাড়া আমরা ওঁকে নেমকার্ড দিলুম। কিন্তু উনি আমাদের ওঁর নেমকার্ড দিলেন না। আজকাল ব্যবসায়ীরা পকেটে নেমকার্ড নিয়ে ঘোরে।

কর্নেলের ব্যাখ্যায় যুক্তি ছিল। তবে এ নিয়ে ওঁর মাথা ঘামানোর অর্থ হয় না। স্পোর্টিং গেঞ্জি এবং প্যান্ট পরা শক্ত সমর্থ গড়নের মানুষ হীরালাল রায়। সঙ্গে লাইসেন্স করা রিভলভারও আছে। রিভলভার—

অ্যাঁ? নিজের চিন্তায় নিজেই অবাক হয়ে মুখ দিয়ে শব্দটা বের করে ফেললুম।

কর্নেল বললেন, কী হল জয়ন্ত?

আচ্ছা কর্নেল, কোনও ব্যবসায়ী রিভলভার রাখতে পারেন, যদি শত্রুর ভয় থাকে তবেই। তাই না?

কর্নেল শুধু বললেন, হুঁ।

কিংবা যে ব্যবসায়ী দামি জিনিসের কারবার করেন, সঙ্গে প্রচুর টাকাকড়ি থাকে, তিনি আত্মরক্ষার জন্য—

কথায় বাধা পড়ল। রামপ্রসাদ এসে সেলাম দিয়ে বলল, এক বাবুসাব আসলেন সার। আপনাদের সঙ্গেতে দেখা করবেন।

পাঠিয়ে দাও তাঁকে। আর একটা বাড়তি কাপপ্লেট দিয়ে যাও। পটে এখনও কফি আছে।

রামপ্রসাদ যাঁকে নিয়ে এল, তিনি অমরজিৎ সিংহ। পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন। হাতে একটা ছড়িও আছে। নমস্কার করে ব্যালকনিতে একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

কর্নেল বললেন, গড়ের জঙ্গলে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে আপনার ভাইকে দেখলুম।

অমরজিৎ বললেন, ওকে আটকে রাখতে পারি না। বেঁধে রাখলে দিদি বকাবকি করে। ওই গড়ের জঙ্গলে ঢুকে কী দেখে আতঙ্কে পাগল হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রাণটা হারাবে। কী করব বলুন?

রামপ্রসাদ একটা কাপপ্লেট দিয়ে গেল। কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে এস।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসলুম। কর্নেল অমরজিৎবাবুকে কফি তৈরি করে দিয়ে বললেন, আপনি কীসব ঘটনার কথা বলবেন বলেছিলেন। এবার স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

অমরজিৎবাবু কফি খেতে-খেতে বললেন, মন্টু পাগল হওয়ার পর থেকে ন'মাসে মোট ন'খানা উড়ো চিঠি পেয়েছি। একই কথা। একই কাগজে লাল কালিতে লেখা। সঙ্গে এনেছি। দেখাচ্ছি। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারি না।

বলে পাঞ্জাবির ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন উনি। খামটা হলুদ রঙের। কর্নেলের হাতে দিয়ে আস্তে বললেন, চিঠিগুলো প্রতি ইংরেজি মাসের মাঝামাঝি ভোরবেলা গেটের ভেতর ভাঁজ করে কেউ ফেলে দিয়ে যায়। দিদিরি পরামর্শে এ নিয়ে পুলিশের কাছে যাইনি। পড়ে দেখলেই বুঝবেন।

কর্নেল খাম থেকে ভাঁজ করা চিঠিগুলো বের করলেন। চোখ বুলিয়ে আমাকে একটা চিঠি দিলেন দেখলুম, সম্বোধনহীন চিঠিতে আঁকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—

দেবতার অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে শীঘ্র তাঁকে
উদ্ধার করে গড়ের জঙ্গলে ঈশান কোণে
শিমুলতলায় গোপনে রেখে এস। রাখার পর আর
পিছনে তাকিও না। তাহলে আবার অভিশাপ
লাগবে। সাবধান। এই কথা যেন কেউ জানতে
না পারে। জানালে অনিবার্য মৃত্যু।

কর্নেল ন'খানা চিঠিতে চোখ বুলিয়ে ভাঁজ করে খামে ভরে বললেন, আপনাদের গৃহদেবতা কী?

অমরজিৎ বললেন, শিব। আমাদের বাড়িতে ছোট একটা মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। দিদি তাঁর পুজোআচ্চা নিজেই করে। আগে একজন ব্রাহ্মণ পূজারি ছিলেন। অর্থাভাবে তাঁকে বিদায় দিতে হয়েছিল। আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু দিদির মতে, ক্ষত্রিয়েরও পুজোর অধিকার আছে। যাই হোক, এসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু চিঠিগুলো অদ্ভুত। কোন দেবতাকে উদ্ধার করতে হবে বা কীভাবে করতে হবে, জানি। তিনি কোথায় আছেন, তাও জানি না।

কর্নেল বললেন, আপনি বলছিলেন, আপনার ঠাকুরদার বাবা নাকি গৃহদেবতার অলঙ্কার বিক্রি করার ফলে অভিশাপ লেহেছিল। কিন্তু শিবলিঙ্গে তো রত্ন বা অলঙ্কার পরানো হয় না।

অমরজিৎ গম্ভীর মুখে বললেন, ঠাকুরমার মুখে শোনা কথা। তবে তখন আমি নিতান্ত বালক। তাই এ প্রশ্ন মাথায় আসেনি। পরে এসেছিল। তারপর এই চিঠি পাওয়ার পর দিদির সঙ্গে আলোচনা করেছি। দিদি বলেন, জন্মাবধি আমরা বাড়ির মন্দিরে শিবলিঙ্গ দেখে আসছি।

কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, আচ্ছা, এমন তো হতে পারে। আপনার ঠাকুরদার বাবার মৃত্যুর আগে ওই মন্দিরে অন্য কোনও বিগ্রহ ছিল। সেটা হঠাৎ হারিয়ে গেলে আপনাদের ঠাকুরদা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অমরজিৎ নড়ে বসলেন। হ্যাঁ। হ্যাঁ। দিদিও ঠিক এই কথা বলেছিলেন। মোট কথা, এমন কিছু ঘটে থাকলে তা আমাদের জন্মের আগেই ঘটেছিল।

আমি বললুন, আপনাদের কোনও জ্ঞাতি—মানে নিকটাত্মীয় কেউ নেই এখানে?

অমরজিৎ বললেন, নাহ্, আর নিকটাত্মীয় বলতে ঠাকুরমার দাদার বংশধররা আছে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কস্মিনকালে যোগাযোগ নেই। শুনেছি আমার ঠাকুরমা পাটনার মেয়ে ছিলেন।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। উনি চোখ বুজে চুরুট টানছেন।

অমরজিৎ বললেন, আর যদি নিকটাত্মীয় ধরেন, জামাইবাবুর দাদা এবং ছোটভাই। তাঁরাও পাটনার লোক। তবে তাঁদের এসব কিছুই জানার কথা নয়।

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, এছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেছে?

না। কিন্তু আমার ভাবতে অবাক লাগে, গড়ের জঙ্গলে গত ডিসেম্বরে মন্টু কোনও পাথরে পা হড়কে গিয়ে আচমকা পাগল হল কেন? দিব্যি সুস্থ শান্ত ভদ্র ছিল মন্টু। মাধব ওর সঙ্গে ছিল। সেও খুব অবাক হয়েছিল।

ওর সেই বন্ধু মাধব এখন কোথায় আছেন?

মাধব এখানেই আছে। সিংহগড় টাউনশিপে বড় একটা দোকান করেছে। যে বাড়ির উঠোনে গরুচরানো রাখালটাকে ডেকে আপনি গাছে চড়িয়েছিলেন, ওটাই মাধবদের বাড়ি। বাড়িটা এখন খালি পড়ে আছে। ওরা টাউনশিপে নতুন বাড়ি করেছে।

মাধবের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। ওঁর ঠিকানাটা বলুন।

অমরজিৎ বললেন, গান্ধী মার্কেট বললে যে-কোনও রিকশাওয়ালা পৌঁছে দেবে। ওখানে বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স বেশ বড় দোকান। মাধাবকুমার বোস। ডাকনাম বাবু।

কর্নেল বললেন, চিঠিগুলো আমার কাছে রাখতে আপত্তি আছে?

আজ্ঞে না। আপনি যদি এর একটা কিনারা করতে পারেন, আতঙ্ক থেকে রক্ষা পাই। আর—দিদি বলছিল, কাল দয়া করে যদি দুপুরবেলা এই গরিবের বাড়িতে দুমুঠো খান—

সে হবেখন। আপনার দিদির হাতে সময় মতো চেয়ে খাব। কাল সকালে আপনার দিদির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

অবশ্যই। দিদিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আমরা সাড়ে নটার মধ্যে যাব। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকে খামটা তাঁর ব্যাগে ঢোকালেন। তারপর ব্যালকনিতে ফিরে এসে বসলেন। আচ্ছা অমরজিৎবাবু, গড়ের জঙ্গলে কিচনি বা জলের প্রেতিনী আছে বলে এখানে গুজব শুনলুম। এ বিষয়ে আপনার কী ধারণা?

অমরজিৎবাবুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। আস্তে বললেন, হ্যাঁ। ওখানে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী বলুন বা ভূতপেত্নি যাই বলুন, আছে সেকথা সত্যি।

আপনি দেখেছেন?

অমরজিৎ চাপা গলায় বললেন, মন্টু পাগল হওয়ার পর কাঁকে মানসিক হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দিয়ে এসে একদিন খেয়ালবশে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মন্টু কি কিচনি দেখে ভয়

পেয়ে পাগল হয়ে গেছে? কিচনি বলে সত্যি কি কিছু আছে? মনে এই প্রশ্নটা তোলপাড় করছিল। খুলেই বলছি কর্নেলসায়েব। আমার এখানে একটু বদনাম আছে। ডানপিটে সাহসী জেদি স্বভাবের জন্যও বটে, আবার মারকুটে বলেও বটে। অনেক বদমাশকে আমি এ যাবৎ ধোলাই দিয়েছি। শরীরে ক্ষত্রিয়ের রক্ত বইছে। যাই হোক, গড়ের জঙ্গলে ইচ্ছেমতো ঘোরঘুরি করে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ চোখে পড়ল, খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে কী একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তু বসে আছে। ভালুক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু না। বিশাল একটা ব্যাঙের মতো প্রাণী। মাথায় লম্বা চুল। দুটো লাল চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। জন্তুটা চলতে শুরু করলে থপ থপ শব্দ হচ্ছিল। তারপর হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার আর সাহস হল না দাঁড়িয়ে থাকতে। গুঁড়ি মেরে পালিয়ে এলুম। তারপর মাথার জেদ চেপে গিয়েছিল। এখানকার জেলে এবং আদিবাসীদের মধ্যে সাহসী লোক জোগাড় করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গড়ের জঙ্গলে পরদিন হাঁকা লাগালুম। হাঁকা বোঝেন তো সার?

হ্যাঁ। শিকারের জন্য জঙ্গল তোলপাড় করা।

ঢাক-ঢোল-শিঙে বাজিয়ে হাঁকা শুরু হল। বিকেল পর্যন্ত তন্নতন্ন খোঁজা হল। কিন্তু কোথায় সেই বিদঘুটে জন্তুটা? তার পাত্তাই পেলুম না।

ঠিক আছে। কাল সকালে তা হলে যাচ্ছি। খাওয়ার আয়োজন নয়। দিদিকে বলবেন।

অমরজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তাহলে চলি?

আমরা এগিয়ে দেব কি বাড়ি অবদি? ওদিকটায় তো আলো নেই।

অমরজিৎ হাসলেন। টর্চ আছে। তবে কর্নেলসায়েব কি আমার কথা মন দিয়ে শোনেননি। ঝন্টু সিংহের নাম শুনেই গুণ্ডা বদমাস লেজ তুলে পালিয়ে যায়। আচ্ছা, চলি। নমস্কার।

কর্নেল দরজা খুলে ওঁকে বিদায় দিয়ে এসে আস্তে বললেন, করিডরে হীরালালবাবু দাঁড়িয়েছিলেন। আমি দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

বললুম, তাহলে আমাদের সাবধানে থাকা দরকার।

কর্নেল সে কথায় কান দিলেন না। বললেন, চিঠিগুলো তো তুমি দেখেছ। কী মনে হল?

সবগুলো দেখিনি।

কর্নেল হাসলেন। ঘরের উজ্জ্বল আলোয় পরীক্ষা করে দেখবে চলো। তারপর বলবে।

ঘরে ঢুকে কর্নেল খামটা আমাকে দিলেন। চিঠিগুলো বের করে খুঁটিয়ে দেখলুম। তারপর বললুম, একই ভাষা। একই হাতের লেখা।

আর কিছু?

আর কিছু—মানে, কোনও বৈশিষ্ট্যের কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

লোকটা বাঙালি এবং শিক্ষিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, জয়ন্ত। এই চিঠিগুলো একটা চিঠির ফোটো কপি। মূল চিঠিটা লোকটার কাছে আছে। সে প্রতি মাসে একটা করে ফোটো কপি পাঠাচ্ছে।

অবাক হয়ে বললুম, তাই তো। কাগজগুলো মোটা। অক্ষরগুলোও হুবহু একরকম। যেন জেরক্স কপি।

জেরক্স কপির রঙ কালো হয়। এগুলো লাল। এ থেকে বোঝা যায়, লোকটার নিজস্ব প্রিন্টিং মেশিন আছে। সেই মেশিনটা সম্ভবত অর্ডার দিয়ে বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। স্পেশাল কোনও মেশিন। যাই হোক, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। জয়ন্ত আমার কাজটা এবার সহজ হয়ে গেল।...

চার

কর্নেল অভ্যাসমতো ভোরে বেরিয়েছিলেন। সাড়ে আটটায় ফিরে এসে বললেন, তুমি আজ সকাল-সকাল উঠেছ দেখছি।

একটু হেসে বললুম, হয়তো হীরালালবাবুর ভয়ে। আপনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যান। সেই সুযোগে লোকটা হানা দিতে পারত।

কর্নেল কিটব্যাগ, ক্যামেরা ও বাইনোকুলার রেখে বললেন, হীরালালবাবুকে দূর থেকে দেখেছি।

কোথায়?

গড়ের জঙ্গলের চারদিকে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সঙ্গে এক ভদ্রলোক ছিলেন অবশ্য।

মন্টুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি?

নাহ। বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে নিচের ক্যান্টিনে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। সাবেক বসতি এলাকায় যাবার পথে গাছের দিকে লক্ষ রেখেছিলুম। আচমকা পাগল মন্টুবাবু ঝাঁপ দিয়ে পড়ে কাতুকুতু না দেন। জামা নোংরা করে ফেলাটা কাতুকুতুর চেয়ে বিচ্ছিরি।

অমরজিৎবাবু গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে খাতির করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হল ঘরে গিয়ে বললেন, মন্টু রাতে বাড়ি ফেরেনি। দিদি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আমারও ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। মন্টু যেখানেই থাক, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে আসে। খোঁজ নিতে বেরিয়েছিলুম ভোরবেলায়। কেউ তাকে দেখেনি।

আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন অমরজিৎ। তাঁর শোবার ঘরের বারান্দায় পুরনো বেতের চেয়ারে বসালেন। তাঁর দিদি পরমেশ্বরী এসে আমাদের নমস্কার করে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

কর্নেল বললেন, মন্টুবাবু রাতে বাড়ি ফেরেননি শুনলুম!

পরমেশ্বরী একটু চুপ করে থেকে বললেন, গাছ থেকে পড়ে যেতেও পারে। ওর ওই দুর্বল শরীর। আবার কেউ ওকে মেরে ফেলতেও পারে।

কেন?

আপনি ঝন্টুর কাছে উড়ো চিঠিগুলো তো দেখেছেন?

হুঁ। কর্নেল একটু ইতস্তত করে বললেন, আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। সেজন্যই এসেছি।

বলুন।

আপনার তো পাটনায় বিয়ে হয়েছিল। সেখানকার হীরালাল রায় নামে কোনও ব্যবসায়ীকে চেনেন?

না তো। পাটনা থেকে কবে চলে এসেছি। এমন হতে পারে, হয়তো চিনলেও ভুলে গেছি। কেন এ কথা জিগ্যেস করছেন?

ভদ্রলোক গড়ের জঙ্গলে কাল থেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছেন।

অমরজিৎ বললেন, গুপ্তধনের গুজবে অনেক নির্বোধ ওখানে গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে। সরকার জায়গাটা দখল করেছেন এই মাত্র। শুনেছিলুম, প্রত্নবিভাগ ওখানে উৎখনন করে ইতিহাসের উপাদান খুঁজে দেখবেন। এখনও সেই প্ল্যান নাকি ফাইলচাপা আছে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, যাই হোক, পরমেশ্বরী দেবীকে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। আপনাদের বাড়িতে যে মন্দির আছে, সেখানে শিবলিঙ্গ আছে। আপনি কি জানেন, অতীতে ওই মন্দিরে অন্য কোনও বিগ্রহ ছিল?

না। ছোটবেলা থেকে শিবলিঙ্গ দেখে আসছি। তবে—বলে পরমেশ্বরী হঠাৎ থেমে গেলেন।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, হুঁ। বলুন।

ঠাকুমার কাছে শুনেছি, ঠাকুরদার বাবার আমলে সিংহগড় প্রাসাদে শিবের বিগ্রহই ছিল। সেই বিগ্রহের রত্নালঙ্কার বিক্রি করে বংশে অভিশাপ লেগেছিল।

অমরজিৎ বললেন, আমি কিন্তু কোথাও শিবের বিগ্রহ—মানে মূর্তি দেখিনি। শুনেছি দক্ষিণ ভারতে নটরাজরূপী বিগ্রহ আছে। উত্তর ভারতে হরপার্বতীর যুগ্ম বিগ্রহ দেখেছিলুম।

কর্নেল বললেন, উড়ো চিঠিতে বিগ্রহ দাবি করা হয়েছে। লিঙ্গরূপী বিগ্রহ হলে তা এতদিন উড়ো চিঠি লেখার বদলে উপড়ে নিয়ে যেত লোকটা। আচ্ছা পরমেশ্বরীদেবী, মাধববাবুর বাবা বা ঠাকুরদাকে কি আপনি দেখেছেন?

হ্যাঁ। ওঁদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল। মাধবের পূর্বপুরুষ আমাদের পূর্বপুরুষের কর্মচারী ছিলেন।

মাধবের সঙ্গে আপনার ছোটভাইয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল?

হ্যাঁ। স্কুল থেকে ওরা সহপাঠী। এখানে কলেজ ছিল না। আমাদের আর্থিক অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই মন্টুকে আর পড়ানো সম্ভব হয়নি। মাধব পাটনা কলেজে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বি এ-তে ফেল করেছিল। তারপর আর পড়াশোনা করেনি।

অমরজিৎ বললেন, আমিও কলেজে পড়ার সুযোগ পাইনি। এখন অবশ্য এখানে কলেজ হয়েছে।

কর্নেল বললেন, মাধবের বাবা বেঁচে আছেন?

পরমেশ্বরী বললেন, হ্যাঁ। ওর বাবা কমলকুমার বোস হাসপাতালে কম্পাউন্ডারি করতেন রিটায়ার করে নিজেই ডাক্তার হয়েছিলেন।

অমরজিৎ বললেন, হাতুড়ে ডাক্তার। তবে গরিবদের ডাক্তার হিসাবে সুনাম ছিল। এখন বয়স হয়েছে। ধর্মে মতি হয়েছে। তীর্থ ভ্রমণের বাতিক আছে। তাঁর ছেলে মাধব স্টেশনারি দোকানের সঙ্গে ওষুধের দোকানও করেছে। তাই মায়ের নামে বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স খুলেছে। আমার অবাক লাগে, মাধব মন্টুর মতোই টো টো করে ঘুরে বেড়াত। কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবসা করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

কর্নেল পরমেশ্বরীদেবীকে বললেন, হীরালাল রায়ের কথাটা স্মরণ করার চেষ্টা করবেন।

পরমেশ্বরী বললেন, হ্যাঁ। আমার স্বামী রেলের কর্মী ছিলেন। কত লোকের সঙ্গে আলাপ ছিল। বন্ধুদের কোয়ার্টারে ডেকে এনে ছুটির দিনে খাওয়াতে ভালবাসতেন।

আমার পক্ষে সম্ভব হলে হীরালালবাবুর একটা ছবি তুলে আপনাকে দেখাব।

চেনা হলে নিশ্চয় চিনতে পারব।

আমি তাহলে উঠি।

পরমেশ্বরী ব্যস্ত হয়ে বললেন, এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যান কর্নেলসায়েব।

ধন্যবাদ। আবার এসে খাব। বলে কর্নেল উঠলেন। অমরজিৎবাবু, আপনার ভাইকে যদি দুপুর অব্দি খুঁজে না পান, আমাকে যেন জানাবেন। আর হ্যাঁ, পরমেশ্বরীদেবীকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। গড়ের জঙ্গলে জলের পেত্নি কিচনি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

পরমেশ্বরী গম্ভীর মুখে বললেন, ঝন্টু নাকি দেখেছিল। তবে আমার ধারণা, ওর চোখের ভুল। আসলে গড়ের জঙ্গলে গুপ্তধনের গুজবের মতো এও একটা গুজব। বিহারের গ্রামাঞ্চলে কিচনির ওপর লোকের অগাধ বিশ্বাস।...

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল বললেন, কোনও রহস্যময় ঘটনার উৎস খুঁজতে হলে আগে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড স্পষ্ট জানা চাই। মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জানা হয়ে গেল। চল। এবার টাউনশিপে যাওয়া যাক।

সরকারি বাংলোর নিচের চত্বরে সাইকেল রিকশা পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশাওয়ালাকে বললেন, গান্ধী মার্কেট। জলদি জানা পড়েগা ভাই।

কয়েকটা চড়াই উতরাই এবং পোড়ো জমি, ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে আমরা টাউনশিপে পৌঁছুলুম। রিকশাওয়ালা কুড়ি টাকা ভাড়া চেয়েছিল। সেটা ন্যায্য ভাড়া বলতে হবে। গান্ধী মার্কেট আধুনিক ধাঁচের বাজার। তার মানে, সাধারণ মানুষের জন্য এ বাজার নয়।

বিজয়া ভ্যারাইটি স্টোর্স বিশাল দোকান। কর্নেল তাঁর ক্যামেরার জন্য দু-রিল কালার ফিল্ম কিনলেন। তারপর ফার্মেসির কাউন্টারে গিয়ে কয়েকটা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট কিনে কর্মচারীটিকে বললেন, প্রোপাইটার মাধববাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। তিনি কি আছেন?

কর্নেলের সায়েবি চেহারা এবং দাড়ি দেখে কর্মচারীটির মনে সম্ভবত ভক্তি জেগেছিল। সে বলল, উয়ো দেখিয়ে। উনহি মাধবজি আছেন। এ ভারুয়া, সাবলোঁগকো মাধবজিকা পাশ লে যা।

এক তরুণ আমাদের দোকানের ভেতর এদিক-ওদিক গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে মালিকে কাছে পৌঁছে দিল। গোল টেবিলের এক কোনায় ক্যাশিয়ার কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। অন্য কোনায় দুটো টেলিফোনের সামনে আরামদায়ক আসনে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সি প্যান্ট-স্পোর্টিং গেঞ্জি পরা এক ভদ্রলোক বসে দুটো টেলিফোনেই পালাক্রমে কথাবার্তা বলছেন। আমাদের দেখে ইশারায় তিনি সামনের চেয়ারে বসতে বললেন।

আমরা বসলুম। একটা পরে টেলিফোন রেখে তিনি বললেন, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ সার?

অমরজিৎবাবুর বর্ণনার সঙ্গে মিলছে না। টো টো করে বনেবাদাড়ে ঘোরা মন্টুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুটির একটা ছবি মনে দাঁড় করিয়েছিলুম। ছবিটা মুছে গেল। কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিয়ে বললেন, অমরজিৎ সিংহের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে আলাপ করতে এলুম।

মাধববাবু কার্ডটা দেখে রেখে দিলেন। তারপর হাসি মুখে বললেন, আমি কি আপনার মতো মানুষের আলাপের যোগ্য? বলুন, হট না কোল্ড—

ধন্যবাদ। বেশিক্ষণ সময় নেব না। আপনি ব্যস্ত মানুষ।

চাপে পড়ে ব্যস্ত হয়েছি। নইলে আমি একসময় ছিলুম টো-টো কোম্পানিতে।

তাঁর হাসির সঙ্গে কর্নেলও হাসলেন, হ্যাঁ। ঝন্টুবাবু বলেছিলেন। আপনি তাঁর ভাই মন্টুবাবুর বন্ধু। দুজনে বনেজঙ্গলে পাখির খোঁজে বেড়াতেন। তো মন্টুবাবু হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

খুব ট্র্যাজিক ঘটনা। বেচারা এত ভালো, ভদ্র আর সরল ছেলে ছিল। ছোটবেলা থেকে আমার বন্ধু সে।

আমার জানতে আগ্রহ হচ্ছে। ডিসেম্বরে গড়ের জঙ্গলে গিয়ে কী এমন ঘটেছিল যে মন্টুবাবু—

হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে মাধববাবু বললেন, আমি নিচে দাঁড়িয়ে ছিলুম। মন্টু একটা পাথরের স্ল্যাবে উঠে ফাঁদ পাততে যাচ্ছিল। পা স্লিপ করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। অনেক চেষ্টার পর তার জ্ঞান ফেরে। তারপর প্রলাপ বকতে শুরু করে। আমার বাবা ডাক্তার। তিনি পরে ওকে পরীক্ষা করে বলেছিলেন মাথার ভেতর কোনও নার্ভে চোট লেগে ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। এনিওয়ে, আপনার এ ব্যাপারে আগ্রহের কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?

আছে। কার্ডে আপনি দেখেছেন, আমি একজন নেচারিস্ট। নেচার—অর্থাৎ প্রকৃতিতে অনেক রহস্যময় জিনিস আছে। আমি সেই রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়াই। মন্টুবাবু প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে হঠাৎ পাগল হয়েছিলেন। সেই রহস্য আমাকে আগ্রহী করেছে।

সিংহ ফ্যামিলির সঙ্গে কি আপনার আগে থেকে আলাপ ছিল?

না। সদ্য কাল আলাপ হয়েছে। অর্কিড সংগ্রহও আমার হবি। তো অমরজিৎবাবুর বাড়ির উল্টোদিকে একটা উঁচু গাছের মাথায় বিরল প্রজাতির একটা অর্কিড দেখেছিলুম। হঠাৎ একটা গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এক পাগল আমার এই তরুণ বন্ধুটিকে কাতুকুতু দিয়ে অস্থির করছিল।

মাধববাবু হাসলেন। হ্যাঁ। পাগল হওয়ার পর মন্টু এমন করে বেড়াচ্ছে শুনেছি।

কর্নেল বললেন, অমরজিৎবাবু দৌড়ে এসে একে বাঁচান। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ছোটভাইয়ের পাগল হওয়ার ঘটনা তাঁর কাছেই শুনেছি। আপনার সঙ্গে মন্টুবাবুর বন্ধুত্বের কথা এবং কীভাবে মন্টুবাবু পাগল হন, সবই বলেছেন তিনি। তা আমার মনে হয়েছে, গড়ের জঙ্গলে কোনও রহস্যময় প্রাকৃতিক শক্তির পাল্লায় পড়েই কি মন্টুবাবু পাগল হয়েছিলেন? যেহেতু আপনি ঘটনাস্থলে ছিলেন, তাই আমার আপনার সবটা শোনার আগ্রহ জেগেছে।

ওই তো বললুম। তেমন কোনও অলৌকিক দৃশ্য আমি দেখিনি।

গড়ের জঙ্গলে কিচনি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?

মাধববাবু কথায়-কথায় হাসেন। হাসতে-হাসতে বললেন, কে জানে মশাই। গড়ের জঙ্গল নিয়ে কত অদ্ভুত গুজব চালু আছে। আমি কিচনি-টিচনি দেখিনি। তবে সম্প্রতি পাটনা থেকে আমার এক ব্যবসায়ী বন্ধু এখানে এসেছেন। তিনি কাল বিকেলে গড়ের জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে নাকি স্বচক্ষে কিচনি দেখে পালিয়ে এসেছেন।

তাঁর নাম কী? কোথায় উঠেছেন তিনি?

হীরালাল রায়। সরকারি বাংলোতে উঠেছেন। আজ তাঁকে আমার বাড়িতে চলে আসতে বলেছি।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আপনার বন্ধুর সঙ্গে আমার তাহলে আলাপ হয়েছে। উনি কিচনি দেখে নাকি রিভলভার বের করে গুলি ছুঁড়েছিলেন।

হীরালাল রায়ও এক পাগল। বলে মাধববাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ওঁর রিভলভার আছে জানতুম না।

একটা কথা। আজ সকালে অমরজিৎবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তিনি বললেন, মন্টুবাবু রাতে বাড়ি ফেরেননি। তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

পাগলের ব্যাপার। কোথাও আছে। ফিরবেখন।

আপনার বাবা ডাক্তার। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুশি হতুম।

বাবা হরিদ্বার গেছেন। একেকজন একেক রকমের পাগল। বাবা ধর্মপাগল।

উঠে আসার সময় লক্ষ করলুম, মাধববাবু বেজায় গম্ভীর হয়ে গেছেন। বাইরে গিয়ে কথাটা কর্নেলকে বললুম। কর্নেল বললেন, বন্ধু রিভলভার সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন, এই ব্যাপারটা সম্ভবত ওঁকে চিন্তিত করেছে। যাই হোক, চলো, আমরা আপাতত বাংলোয় ফিরি।...

বাংলোর লনে রঙবেরঙের ফুলগাছ। তাতে প্রজাপতি ওড়াউড়ি করে বেড়াচ্ছিল। কর্নেল হঠাৎ প্রজাপতির ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সেই সময় দেখলুম, একটা ব্রিফকেস এবং কাঁধে মোটা একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে হীরালালবাবু বেরিয়ে আসছেন। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে কর্নেলের ছবি তোলা দেখে চলে গেলেন।

কর্নেল ছবি তোলা বন্ধ করে এগিয়ে এলেন। তারপর একটু হেসে চাপা স্বরে বললেন, কাজ হয়ে গেল। ভাগ্যিস ভদ্রলোককে বেরিয়ে আসতে দেখেছিলুম।

জিজ্ঞেস করলুম, কিন্তু কী কাজ হয়ে গেল?

প্রজাপতির ছবির সঙ্গে হীরালাল রায়ের ছবি তুললুম। রোদে স্ন্যাপশট। ছবিটা ভালই হবে।

আমরা দোতলায় নিজেদের ঘরে ফিরে পোশাক বদলে দক্ষিণের ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। কর্নেল বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখতে-দেখতে হঠাৎ বলে উঠলেন, সর্বনাশ। যা সন্দেহ করেছিলুন, তাই হয়েছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ঝন্টুবাবুকেও দেখতে পাচ্ছি। একদল লোক তাঁর সঙ্গে গড়ের জঙ্গল থেকে—হ্যাঁ। ওরা একটা মাচায় চাপিয়ে মড়া বয়ে আনছে। জয়ন্ত। পাগল মন্টুবাবু মারা পড়েছেন।

কর্নেলের হাত থেকে বাইনোকুলার নিয়ে দেখলুম, সত্যি তাই। গাছের ডাল কেটে মাচা বানিয়ে একদল লোক সেটা বয়ে আনছে। উজ্জ্বল রোদে দেখা যাচ্ছিল মন্টুবাবুকে। মাচায় চিত হয়ে আছেন। আগে হেঁটে চলেছেন তাঁর দাদা ঝন্টুবাবু।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত। আমি এখনই আসছি। তুমি ঘর ছেড়ে নড়ো না। সাবধান।...

পাঁচ

কর্নেল ফিরে এলেন প্রায় একঘণ্টা পরে। কলিং বেল টিপে রামপ্রসাদকে ডেকে খাবার আনতে বললেন। তারপর বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখে জল দিয়ে তোয়ালেতে মুছে বললেন, তুমি কি স্নান করেছ?

বললুম, না। স্নান করব না। ঘটনাটা আগে বলুন।

কর্নেল চেয়ার টেনে বসে বললেন, কয়েকজন আদিবাসী গড়ের জঙ্গলে খরগোস শিকারে ঢুকেছিল। তারা পাগল মন্টুর ক্ষতবিক্ষত মড়া দেখতে পেয়ে ঝন্টুবাবুকে খবর দিয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, উড়ো চিঠিতে যে শিমুল গাছের কথা আছে, তার তলায় পড়েছিলেন মন্টুবাবু। আমি বাংলো থেকে যাবার সময় কেয়ারটেকারের ঘর থেকে থানায় টেলিফোন করে গিয়েছিলুম। ঝন্টুবাবুর ধারণা, গাছ থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে। ওঁকে বুঝিয়ে বললুম, তবু পোস্টমর্টেম করা দরকার। পুলিশকেও জানানো দরকার যাই হোক, শিগগির জিপে চেপে পুলিশ এসে গিয়েছিল। সেই মাচায় চাপিয়েই বডি মর্গে নিয়ে গেল। আদিবাসীরা সিংহগড়ের রাজবংশের প্রতি খুব অনুগত দেখলুম। তবে এখন ওসব কথা থাক। খিদে পেয়েছে।

ট্রেতে খাবার এনে টেবিলে রেখে রামপ্রসাদ বলল, সার! আজ কিচনি এক বাবুকো মার ডালা। উয়ো এক পাগল আদমি থা। পহেলা কিচনি দেখকার বাবু পাগল হো গয়া। দুসরা বার কিচনি উসকো মার ডালা।

কর্নেল বললেন, শুনেছি রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদ ভয়ার্ত মুখে বলল, আপনারা নতুন আসিয়েছেন সার। কভি কিচনিকি কিলামে মাত ঘুসিয়ে। উয়ো বহত খতরনাক জাগাহ আছে।...

খাওয়ার পর কর্নেল ব্যালকনিতে বসে চুরুট ধরালেন। আমি অভ্যাস মতো বিছানায় গড়িয়ে নিচ্ছিলুম। চোখের পাতায় ঘুমের টান এসেছিল। কর্নেলের ডাকে চোখ খুলতে হল। উঠে পড়ো জয়ন্ত। বেরুব।

উনি সেজেগুজে তৈরি। আমি প্যান্ট-শার্ট পরে তৈরি হয়ে নিলুম। তারপর কাল বিকেলে যে রাস্তা ধরে গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিলুম, সেই রাস্তায় হেঁটে চললুম।

আধঘণ্টার মধ্যে গড়ের জঙ্গলে পৌঁছে গেলুম আমরা। কর্নেল বাইনোকুলারে শিমুল গাছটা খুঁজে বের করে বললেন, কালকের লাঠি দুটো রাস্তায় ফেলে গিয়েছিলুম। আসার সময় দেখতে পেলুম না। দাঁড়াও। আগে দুটো লাঠি দরকার।

কালকের মতো গাছের লম্বা ডাল কেটে লাঠি তৈরি করে আমরা ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললুম। শিমুল গাছটার তলায় গিয়ে দেখি, পাথরের ওপর শুকনো রক্তের ছাপ এখনও রয়ে গেছে। শিমুল গাছটা শরৎকালে খুব ঝাঁপালো হয়ে আছে। কিন্তু কাঁটাভর্তি গুঁড়ি বেয়ে কারও পক্ষে এই গাছে চড়া সম্ভব নয়।

কর্নেল খুঁটিয়ে চারপাশটা দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন। তারপর ঘাসের দিকে ঝুঁকে বললেন, এই ঘাসগুলো কাত হয়ে গেছে। রক্তের ছাপও দেখতে পাচ্ছি। বোঝা যাচ্ছে, কেউ মন্টুবাবুর লাশ টেনে নিয়ে গিয়ে শিমুল গাছের তলায় রেখেছিল।

কর্নেল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বললেন, এখানেও রক্তের ছাপ দেখা যাচ্ছে। জয়ন্ত, তুমি বিশেষ করে পেছনে আর দুপাশে লক্ষ রাখবে।

উনি গুঁড়ি মেরে রক্তের ছাপ অনুসরণ করছিলেন। আমি সতর্ক দৃষ্টে পিছনে এবং দুপাশে লক্ষ রেখে হাঁটছিলুম। একখানে আবার একটা পাথরের স্ল্যাব দেখা গেল। বেশ চওড়া। কয়েকটা কোণ আছে পাথরটার। নক্ষত্রের প্রতীক বলা চলে। কর্নেল বললেন, এটা বোধ হয় দুর্গপ্রাসাদের ছাদে কোনও জায়গার ওপর থামের মাথায় বসানো ছিল। মোগল আমলের স্থাপত্যে চবুতরার মাথায় এ ধরনের ছাদ থাকত। হ্যাঁ, ভাঙা থামের চিহ্নও লক্ষ করছি। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এখানেই রক্তের ছাপ শেষ হয়েছে। জয়ন্ত, আমার সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হল।

কী সন্দেহ?

মন্টুবাবুকে খুন করেছে কেউ। আমার মনে আগে থেকেই এই সন্দেহটা থেকে গেছে। মন্টুবাবু সম্ভবত এমন কিছু গোপন কথা জানতেন, তা ওঁর কাছে জানার জন্য ওঁকে পীড়ন করায় উনি পাগল হয়ে যান।

বলেন কী! মাধববাবু তো—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, মাধববাবু মিথ্যা বলতেও পারেন। হ্যাঁ। ওই দেখ এই পাথরের ওপাশে ছেঁড়া নাইলনের দড়ির কয়েকটা টুকরো পড়ে আছে। জয়ন্ত। কাল সারারাত এবং আজ সকাল পর্যন্ত মন্টুবাবুকে দড়ি বেঁধে এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল।

বলে কর্নেল পাথরটার শেষদিকে গিয়ে ঝুঁকে বসলেন। সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। এখানে। মন্টুবাবুর লাশে বুকের কাছে আর গালে পোড়া দাগই আমি দেখেছিলুম। তখন মনে হয়েছিল, ওগুলো ময়লা বা কাদার ছোপ। কর্নেল মুখ তুলে সামনে একটা ঝোপের দিকে তাকালেন। বললেন, ওই দেখ জয়ন্ত। ওগুলো বিছুটির ঝোপ। গায়ে বিছুটিপাতা লাগলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। কয়েকটা বিছুটি গাছ পড়ে আছে লক্ষ করো। হাতে গ্লাভস পরে কেউ পাগলের ওপর অকথ্য পীড়ন করেছে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে মেরে ফেলেছে।

আমি বিছুটির জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে ছিলুম। সেই কোথাও চাপা থপ থপ শব্দ হল। কর্নেলও শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে শব্দটা লক্ষ করে বাইনোকুলার তুললেন। বললেন, কী একটা কালো প্রকাণ্ড জন্তুর পিঠ দেখতে পেলুম। মাথায় লম্বা চুলও আছে। সেই কিচনি। থাক। বিরক্ত করব না। থানা থেকে সি আই ডি ইন্সপেক্টর রমেশ পাণ্ডের আসার কথা। এতক্ষণ এসে পড়া উচিত ছিল। জিপে আসার অসুবিধে নেই। পৌনে তিনটে বেজে গেল।

কর্নেল ঘড়ি দেখে শিমুল গাছটার তলায় গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলুম। জায়গাটা উঁচু বলে পূর্বদিকে তোরণের ধ্বংসস্তূপ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাইনোকুলারে আবার চারদিক দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে জিপের শব্দ এল কানে। কর্নেল ঘুরে দেখে বললেন, এসে গেছেন রমেশ পাণ্ডে।

চারজন সশস্ত্র কনস্টেবলের সঙ্গে রোগাটে চেহারার এক পুলিশ অফিসার সাবধানে ভাঙা ব্রিজের পাথরে পা রেখে গড়ের জঙ্গলে ঢুকলেন। কর্নেল হাত নেড়ে ডাকলেন, মিঃ পাণ্ডে। এখানে আসুন।

পুলিশের দলটি বুটের শব্দে জঙ্গল কাঁপিয়ে এগিয়ে এল। রমেশ পাণ্ডে বললেন, একটু দেরি হয়ে গেল কর্নেল সরকার। ডেডবডির পোস্টমর্টেমের প্রাইমারি রিপোর্ট পেয়ে কোয়ার্টারে ফিরে খাওয়াদাওয়া করে বেরুতে—যাই হোক। আপনি এতক্ষণ নিশ্চয়ই কিছু সূত্র পেয়ে গেছেন।

কর্নেল তাঁকে রক্তের ছোপগুলো দেখাতে-দেখাতে সেই খাঁজকাটা পাথরটার কাছে গেলেন। নিজের মতামত দিয়ে বললেন, মর্গের রিপোর্ট কী বলছে বলুন?

রমেশ পাণ্ডে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। ডেডবডিতে অত্যাচারের চিহ্ন আছে। তবে মারা হয়েছে গুলি করে। মাথার পেছনে গুলি করে পাথর দিয়ে থ্যাঁতলানো হয়েছে। পিঠে এবং কোমরেও ভোঁতা জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। যাতে মনে হয় উঁচু জায়গা থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে মারা গেছে লোকটা। মাথার ভেতর হাড়ের খাঁজে বুলেটনেল আটকে ছিল। পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করা হয়েছিল। দৈবাৎ গুলিটা ঘুরতে-ঘুরতে হাড়ের খাঁজে আটকে গিয়েছিল। মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চান্স ছিল। তা হলে ডাক্তার অন্য রিপোর্ট লিখে বসতেন। আসলে অত খুঁটিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই এখানকার হাসপাতালে। হ্যাঁ, ডাক্তারের মতে, ভোরের দিকে মারা হয়েছিল। রাইগর মর্টিস সবে শুরু হয়েছে, এমন সময়ে বডি ডাক্তারের হাতে দেওয়া হয়।

কর্নেল বললেন, আপনাকে এক ভদ্রলোকের কথা বলেছিলুম।

পাণ্ডে হাসলেন। পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছি। এবার গিয়ে ওঁর অস্ত্রটা চাইব। লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস কি না এবং কত ক্যালিবার, তাও দেখব। কিন্তু একজন পাগলকে এমন করে খুন করার কোনও মোটিভ খুঁজে পাচ্ছি না। আপনার কী ধারণা?

কর্নেল বললেন, ভিকটিমের দাদা অমরজিৎ সিংহ কোনও আভাস দিতে পারেননি?

না। আসার সময় ওঁর সঙ্গে দেখা হল। হাসপাতালে বডির ডেলিভারি নিতে যাচ্ছিলেন। উনি শুধু বললেন, দেবতার অভিশাপ ছাড়া কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না।

কর্নেল হাসলেন। গুলি করে মারাও কি দেবতার অভিশাপ?

পাণ্ডে চাপা স্বরে বললেন, ব্যাকগ্রাউন্ডটা তদন্ত করলে জানা যাবে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে কোনও গন্ডগোল ছিল কি না। মাধব বোস ভিকটিমের বন্ধু ছিলেন। এখন ভদ্রলোক বড় ব্যবসায়ী। তাঁর কাছেও যাব আমরা।

ইন্সপেক্টর রমেশ পাণ্ডে নাইলনের দড়িগুলো, সিগারেটের টুকরো এবং সাবধানে বিছুটির ডালগুলো খবরের কাগজ ব্যাগ থেকে বের করে মুড়ে নিলেন। তারপর বললেন, চলুন। ফেরা যাক।

কর্নেল বলেন, আপনারা এগোন। আমি এই জঙ্গলে অর্কিড আছে কি না খুঁজে দেখি। তাছাড়া দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতিও এখানে দেখতে পাওয়া সম্ভব।

পাণ্ডে হাসলেন। সাবধান কর্নেল সরকার। গড়ের জঙ্গলে নাকি কিচনি আছে, জলের প্রেতিনী।

কর্নেলও হাসতে-হাসতে বললেন, দেখা গেলে তো ভালো হয়। ছবি তুলব।

কিন্তু সাবধান। এখানে নাকি সাপের খুব উপদ্রব আছে।

বলে রমেশ পাণ্ডে কনস্টেবলদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। ভদ্রলোক দেখতে রোগাটে হলেও খুব স্মার্ট মনে হল।

উনি চলে যাওয়ার পর জিগ্যেস করলুন, আপনার পরিচয় কি উনি জানেন?

আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। ওঁকে আমার নেমকার্ড দিয়েছি। যদি বেশি উৎসাহী হন, তাহলে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করে লালবাজার পুলিশে হেটকোয়ার্টারে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে খবর নেবেন। তাতে আমার বেশি সুবিধে হবে।

কর্নেল বাইনোকুলারে আবার কিছুক্ষণ চারদিক খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর পা বাড়িয়ে আস্তে বললেন, কিচনি সত্যি এখানে আছে। কিন্তু আমার অবাক লাগছে, কিচনি কেন মন্টুবাবুকে রক্ষা করতে আসেনি! মন্টুবাবু বলেছিলেন, কিচনির সঙ্গে তাঁর নাকি ভাব হয়েছে।

বোগাস। আপনিও কী দেখতে কী দেখছেন। ভালুক-টালুক হয় তো।

কর্নেল হঠাৎ থেমে ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। তারপর বাঁ-দিকে একটা স্তূপের আড়ালে হাঁটু মুড়ে বসে ক্যামেরায় কীসের ছবি তুললেন। পরপর তিনবার ক্যামেরার শাটার ক্লিক করল।

তারপর সরে এসে আস্তে বলেলেন, চলো। কেটে পড়া যাক।

গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আগের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে জিগ্যেস করলুম, অমন চুপিচুপি কীসের ছবি তুললেন এবার বলুন।

কিচনির।

ভ্যাট।

বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছে। এক মিনিট। এখনও আলো আছে। ফিল্মের রিলটাতে আর দু-তিনটে ছবি তোলা যায়। রিলটা শেষ করে আজ রাতেই ওয়াশ ডেভালাপ প্রিন্ট করে ফেলব।

কর্নেল তাঁর স্যুটকেসে পোর্টেবল স্টুডিও সরঞ্জাম এনেছেন। বাইরে কোথাও গেলে ওটা সঙ্গে নিয়ে যান। বাথরুমকে ডার্করুমে পরিণত করেন। টাঁড় জমিটার ওপর যেতে-যেতে কর্নেল হাঁটু মুড়ে বসে মুখে হুস শব্দ করলেন। অমনি এক ঝাঁক পাটকিলে রঙের পাখি উড়ে গেল। কর্নেল পর-পর শাটার টিপে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ওঁর মুখে কেমন বিরক্তির ছাপ লক্ষ করে বললুম, কী? ছবি উঠবে না মনে হচ্ছে নাকি?

কর্নেল বলেন, না জয়ন্ত। ছবি উঠবে। আসলে, সিংহ পরিবারের দেবতার অভিশাপের মতো আমার জীবনেও যেন এই একটা অভিশাপ। যেখানে এই লালঘুঘুর ঝাঁক দেখেছি, সেখানেই খুনোখুনিতে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কাল সকালে এখানে এই লালঘুঘুর ঝাঁক দেখেছিলুম। ছবি তোলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু বরাবরকার মতো মনে-মনে একটু আঁতকে উঠেছিলুম। তুমি কুসংস্কার বলবে। বলো। কিন্তু এটা হয়।...

বাংলোয় ফিরে যথারীতি ব্যালকনিতে বসে আমরা কফি খেলুম। তারপর কর্নেল বললেন, বাথরুমে যেতে হলে যাও জয়ন্ত। এবার ঘণ্টা তিনেকের জন্য বাথরুম ডার্করুম হবে।

বাথরুমকে ডার্করুম বানিয়ে কর্নেল ঢুকে গেলেন। ঘরের আলোও নিভিয়ে দিয়ে গেলেন। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ রইল। আমি ব্যালকনিতে বসে সময় কাটাতে আরও এক পেয়ালা কফি সাবাড় করলুম। পটে আরও কফি লিকার ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কর্নেল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এবার টেবিলল্যাম্প জ্বেলে আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, চারটে নেগেটিভ প্রিন্ট করতে দিলুম। হীরালালবাবুর ছবি ভালোই উঠেছে। ফুলের সামনে হীরালাল। আর কিচনির ছবি আশানুরূপ না হলেও মোটামুটি উঠেছে। জায়গাটাতে পুরো রোদ ছিল না। তিনটেই পাশ থেকে তোলা।

বললুম, তাহলে ভূতপেত্নি নয়। কোনও জন্তু!

নিশ্চয়। কর্নেল হাসলেন। পেত্নি হলে কি আর ছবি উঠত?

এই সময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল উঠে গিয়ে বললেন, কে?

রামপ্রসাদের সাড়া এল। হামি রামপ্রসাদ আছি সার। আপনার টেলিফোন আসল। তাই বড়াসাব বলল, কর্নিলসাবকো খবর দো।

কর্নেল দরজা খুলে বললেন, চলো যাচ্ছি। জয়ন্ত, দরজা আটকে দাও। সাড়া না পেলে দরজা খুলো না।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। দরজা আটকে ঘরেই বসলুম। আমার একটা লাইসেন্স করা ফায়ার আর্মস আছে। বাইরে গেলে সঙ্গে নিই। এবার তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছিলুম। অস্ত্রটা সঙ্গে থাকলে সাহস বেড়ে যেত। কিন্তু এখন আর আক্ষেপ করে লাভ নেই।

মিনিট পনেরো পরে কর্নেলের সাড়া পেয়ে দরজা খুলে দিলুম। উনি দরজা বন্ধ করে ব্যালকনিতে গিয়ে বললেন, মিঃ পাণ্ডের টেলিফোন। হীরালাল রায়কে অ্যারেস্ট করেছেন। আচমকা মাধববাবুর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ওঁরা। হীরালালবাবুর কাছে একটা পয়েন্ট পঁয়ত্রিশ ক্যালিবারের রিভলভার পাওয়া গেছে। সিক্স রাউন্ডার ফায়ার আর্মস দুটো গুলি ভরা আছে। বাকি চারটে ফায়ার করা হয়েছে। কিচনির কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি মিঃ পাণ্ডে। বললুম, হীরালালবাবুকে কাল আমরা তিনটে গুলি ছুঁড়তে দেখেছিলুম। তাহলে চতুর্থটা মন্টুবাবুর মাথায় ঢুকেছে।

কর্নেল বললেন, আমি মিঃ পাণ্ডেকে বললুম, এখানে ফরেন্সিক এক্সপার্ট বা ব্যালাস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট নেই। ডাক্তারের অনুমানের ওপর নির্ভর না করে বুলেট নেলটা পাটনায় ফরেন্সিক এক্সপার্টের কাছে পাঠান।

কিন্তু হীরালালবাবুর আচরণ সন্দেহজনক।

কর্নেল একটু চুপ করে বললেন, জয়ন্ত, আজ সকালে হীরালালবাবু গড়ের জঙ্গলে আর একটা গুলি কিচনিকে লক্ষ করে ছুঁড়েছিলেন। আমি কাছাকাছি টাঁড় জমিটার পাশে ছিলুম। উনি জঙ্গল থেকে পড়ি কি মরি করে পালিয়ে এসে এক রাউন্ড ফায়ার করেছিলেন।

বললুম, তাহলে কে মারল মন্টুবাবুকে? রহস্য যে জট পাকিয়ে গেল।

কর্নেল বলেন, তাছাড়া সমস্যা হল, একই ক্যালিবারের ফায়ার আর্মস অন্যেরও থাকতে পারে। কাজেই রহস্য সত্যিই জটিল হল।

ছয়

রামপ্রসাদ রাতের খাবার রেখে গিয়েছিল। কর্নেল তাকে বলেছিলেন, আমরা আজ দেরি করে খাব। তুমি বরং সকালে এসে এঁটো থালাবাটি আর ট্রে নিয়ে যেও।

রাত সাড়ে দশটায় কর্নেল বাথরুমে ঢুকে আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন। লক্ষ করেছিলুম, দড়িতে ক্লিপ এঁটে চারটে ছবি ঝোলানো আছে। তখনও ছবিগুলো শুকোয় নি। আমরা খেয়ে নিয়েছিলুম। তারপর রাত এগারোটা নাগাদ কর্নেল ছবির প্রিন্টগুলো নিয়ে এসে টেবিলল্যাম্পের আলোয় আমাকে কিচনির ছবি তিনটে দেখিয়েছিলেন।

পাশের ঝোপের উচ্চতা আন্দাজ করে বোঝা গিয়েছিল, জন্তুটা অন্তত পাঁচফুট উঁচু। অবিকল প্রকাণ্ড ব্যাঙের মতো দেখতে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে। বসে আছে ঠিক ব্যাঙের মতো। পাশ থেকে তোলা ছবি। তাই শুধু দেখা যাচ্ছিল একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে। অজানা কোনও প্রাণী হওয়াই সম্ভব।

পরদিন ভোরে কর্নেল বেরিয়েছিলেন। আমার ঘুম ভেঙেছিল সাতটা নাগাদ। কলিং বেল বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে আজ বেডটি আনিয়ে নিলুম। কর্নেল সকাল-সকাল ফিরে এলেন।

বললেন, আজ বেড়ানো হল না। সিংহবাড়ি গিয়েছিলুম। পরমেশ্বরীকে হীরালালের ছবি দেখালুম। উনি ছবি দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ তো তাঁর দেবর বনবিহারী। গোঁফ রেখেছে। দেখতে মোটাসোটাও হয়েছে। খুব দুর্ধর্ষ ছেলে ছিল। রেলের চোরাই লোহালক্কড় বিক্রির অভিযোগে দুবার ধরা পড়েছিল। তাঁর স্বামী ভাইকে অনেক তদ্বির করে বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে এ বাড়িতে সে কয়েকবার এসেছে। অমরজিৎবাবুও সায় দিয়ে বললেন, ছবিটা দেখে তাঁর চেনা লাগছে। মাধবের সঙ্গে বনবিহারীর আলাপ হয়েছিল এখানেই। মন্টু, মাধব আর বনবিহারী একসঙ্গে ঘুরে বেড়াত। ওঁরা দুজনেই খুব অবাক হয়েছেন। কেন বনবিহারী তাঁদের বাড়ি না এসে বাংলোয় উঠেছে? কেনই বা সে হীরালাল নাম নিয়েছে? তাকে পুলিশ খুনের দায়ে গ্রেফতার করেছে শুনেও দুজনে অবাক। মন্টুকে কেন সে খুন করবে? যাই হোক, অমরজিৎ এবং পরমেশ্বরীকে চুপচাপ থাকার পরামর্শ দিয়ে এলুম।

জিগ্যেস করলুম, ওঁদের কিচনির ছবির কথা বলেননি?

কর্নেল হাসলেন। চেপে যাও জয়ন্ত। কিচনি সম্পর্কে ভুলেও মুখ খুলবে না।

ন'টায় ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্নেলের কথামতো বেরুনোর জন্য তৈরি হচ্ছি, সেইসময় দরজায় কেউ নক করল। দরজা খোলা ছিল কর্নেল বললেন, কাম ইন।

ঘরে ঢুকলেন রমেশ পাণ্ডে। পরনে পুলিশের পোশাক নেই। প্যান্ট-শার্ট পরে এসেছেন। তিনি একটা চেয়ার টেনে বসে বললেন, বুলেট নেলটা কাল সন্ধ্যায় স্পেশাল মেসেঞ্জার মারফত পাটনায় ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠিয়েছিলুম। কিছুক্ষণ আগে ট্রাঙ্ককলে ব্যালাস্টিক মিসাইল এক্সপার্ট রঘুবীর সিনহা জানালেন, বুলেটটা থ্রি নট থ্রি। তবে ওটা পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের রিভলবার থেকে ছোঁড়া হয়েছে। এই অবস্থায় হীরালাল বাবুকে আটকে রাখার মানে হয় না। তাঁর রিভলভারটার লাইসেন্স আছে। ব্যবসায়ী লোক। সঙ্গে টাকা-পয়সা নিয়ে ঘোরেন। তাই—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, ভদ্রলোকের আসল নাম কিন্তু বনবিহারী রায়। উনি ভিকটিম মন্টুবাবুর দিদি পরমেশ্বরী দেবীর দেবর। আপনি অমরজিৎবাবু এবং পরমেশ্বরীদেবীর কাছে গেলে এ খবর পেয়ে যাবেন। আমি সকালে হীরালালবাবুর ছবি নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়েছিলুম।

পাণ্ডে বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি হীরালালের ছবি তুলেছিলেন?

হ্যাঁ। কর্নেল হাসলেন। গড়ের জঙ্গলে ওঁর যাতায়াত দেখে সন্দেহ হয়েছিল। তাই কাল লনে ফুলে বসা প্রজাপতির ছবি তোলার ছলে ওঁর ছবি তুলেছিলুম। আমার সঙ্গে ফটো প্রিন্টের পোর্টেবল সরঞ্জাম আছে। ছবিটা আপনাকে দিচ্ছি। পাটনায় এই ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে পারেন।

ছবিটা পকেটে রেখে রমেশ পাণ্ডে একটু হেসে বললেন, কর্নেল সরকারের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও কাল রাতে জেনে গেছি। আমাদের সবরকম সহযোগিতা পাবেন। আপনি নিজের পথে হাঁটুন। আমরা আমাদের পথে হাঁটি। আশা করি, এক জায়গায় পরস্পর মুখোমুখি হতে পারব।

কর্নেলের কথায় কলিং বাজিয়ে রামপ্রসাদকে ডেকে কফির অর্ডার দিলুম। রমেশ পাণ্ডে বললেন, সিংহগড়ে পয়েন্ট আটত্রিশ ক্যালিবারের লাইসেন্সড রিভলভার কারও নেই। যদি থাকে সেটা বেআইনি। আপনি নিশ্চয় জানেন, বিহার মুল্লুকে বেআইনি অস্ত্র প্রচুর আছে। আমরা বহু ক্ষেত্রে অসহায়। রাজনীতিকদের চাপে সব জেনেও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়।

কর্নেল বললেন, আচ্ছা মিঃ পাণ্ডে, সিংহগড়ে অফসেট বা লেজার প্রিন্টিং প্রেস আছে?

সিংহগড়ে? নাহ্ কর্নেল সরকার। তবে সাবেক আমলের ট্রেডল মেশিনের প্রিন্টিং প্রেস আছে। বিজ্ঞাপন, পাঁউরুটির মোড়ক ইত্যাদি ছাপা হয়। এখানে ওসব আধুনিক টেকনলজির প্রিন্টিং প্রেসে কী ছাপবে?

রমেশ পাণ্ডের জন্য কফি এল। স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ বকবক করলেন। একসময় কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, সিংহগড়ে প্রাচীন মূর্তি বা ভাস্কর্য পাচারের কোনও চক্র কি কখনও ধরা পড়েছিল মিঃ পাণ্ডে?

হ্যাঁ। গতবছর একটা চক্র আমরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিলুম। এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে প্রাচীন বিগ্রহ চুরি করে ট্রাকে পাচার করা হচ্ছিল। দলে পাঁচজন লোক ছিল। চারজন ধরা পড়েছিল। তারা জেল খাটছে এখনও। একজন ধরা পড়েনি। সেই কিন্তু রিং লিডার। তার আসল নাম ধোলাই দিয়ে সাগরেদের কাছে আদায় করতে পারিনি। তারা বলেছিল, তাকে ব্যাঙবাবু বলে জানে। সেই ব্যাঙবাবু নাকি বাঙালি। তবে সে কোথায় থাকে, তা তারা জানে না।

ব্যাঙবাবু? কর্নেল কেন যেন একটু চমকে উঠলেন। ব্যাঙা ডাকনাম শুনেছি। কিন্তু ব্যাঙবাবু তো অদ্ভুত নাম!

পাণ্ডে বললেন, বুঝুন কর্নেল সরকার। থার্ড ডিগ্রি ধোলাই কী জিনিস নিশ্চয় জানেন। সেই ধোলাই খেয়েও তারা 'ব্যাঙবাবু' ছাড়া অন্য নাম বলেনি। আমার ধারণা, লোকটা বাইরে থাকত। পাটনা হোক, কি কলকাতা হোক। তার চেহারার বর্ণনা আদায় করেছিলুম। বেঁটে, গোলগাল লোক। কাঁচা পাকা চুল। বয়সে বৃদ্ধ। কিন্তু তার গায়ে নাকি প্রচণ্ড জোর। তারা বারতিনেক রাতের বেলায় তাকে বাঙালিটোলার একটা পোড়োবাড়িতে দেখেছিল বাড়ি সার্চ করে আমরা কোনও সূত্র পাইনি। দিনরাত ওত পেতে থেকেও তার পাত্তা মেলেনি। বলে পাণ্ডে একটু হাসলেন। তো মূর্তি পাচারের কথা কেন বলুন তো?

কর্নেল বললেন, পাগল মন্টুবাবুকে অত্যাচার করে মেরে ফেলায় এই প্রশ্নটা মাথায় এসেছে। মন্টুবাবু কি কোনও প্রাচীন দামি বিগ্রহের খোঁজ রাখতেন?

হ্যাঁ। আপনারা প্রশ্নে যুক্তি আছে। রমেশ পাণ্ডে কফি দ্রুত শেষ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কর্নেল সরকার। আমার মাথায় এটা আসা উচিত ছিল। মন্টুবাবু সিংহগড় রাজবংশের লোক। তাঁর পড়ে পূর্বপুরুষের কোনও বিগ্রহের খবর জানা সম্ভব ছিল—যা তাঁর দাদা জানতে পারেননি। মন্টুবাবুকে হত্যার একটা মোটিভ পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, চলি। প্রয়োজনে পরস্পর যোগাযোগ রাখব।

রমেশ পাণ্ডে চলে গেলে কর্নেল আপন মনে বললেন, ব্যাঙবাবু।

বললুম, গড়ের জঙ্গলে তোলা কিচনির ছবিটা কিন্তু ব্যাঙের মতোই।

কর্নেল হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। চল, বেরুনো যাক। এই খেলাটা সেই ব্যাঙের বলেই মনে হচ্ছে। তবে আপাতত ব্যাঙবাবুর চেয়ে ব্যাঙজাতীয় ওই জন্তুটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি বাংলোর পশ্চিমে অসমতল সেই মাঠের রাস্তায় গিয়ে বললুম, আবার গড়ের জঙ্গলে? কর্নেল একই জায়গায় বারবার গিয়ে শুধু এই বিদঘুটে জন্তুটার ছবি তুলে কী হবে? জন্তুটা আর যাই করুক, পাগল মন্টুবাবুকে সে তো খুন করেনি।

কর্নেল বললেন, বুঝতে পারছি। তুমি বনবিহারী ওরফে হীরালালের মতো ওই জন্তুটাকে ভয় পাচ্ছ।

রামপ্রসাদ বলছিল, এখানকার সব মানুষই ওর ভয়ে গড়ের জঙ্গলে ঢোকে না।

কিন্তু আদিবাসীরা ওখানে শিকার করতে ঢোকে। মন্টুবাবুর লাশ তারাই দেখতে পেয়েছিল।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, জন্তুটা আদিবাসীদের দেখা দেয় না। কেন দেখা দেয় না, তার কারণ অনুমান করা যায়। আদিবাসীদের বিষাক্ত তীরকে ভয় পায় জন্তুটা। তাদের লক্ষভেদও অব্যর্থ। জন্তুটা যেভাবেই হোক, এটা বোঝে।

হাঁটতে-হাঁটতে সেই উঁচু টাঁড় জমিটার কাছে পৌঁছে কর্নেল বললেন, আজ আমরা গড়ের পশ্চিম দিকটা দেখব। আমার ধারণা, দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ গড়খাইয়ের জলে পড়ে সম্ভবত ওদিকে একটা রাস্তা তৈরি করেছে। কারণ, এই পথটা এঁকেবেঁকে পাহাড়ের নিচে একটা আদিবাসীদের গ্রামে পৌঁছেছে। ওদিক থেকে গড়ের জঙ্গল অনেক কাছে। ওরা হয়তো ওদিক দিয়েই জঙ্গলে ঢোকে।

কিছুটা এগিয়ে চোখে পড়ল, কাঁচা রাস্তাটা বাঁদিকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে গড়ের জঙ্গলের কাছে গেছে। তারপর ডাইনে বাঁক নিয়ে চড়াইয়ে উঠে একটা ছোট্ট গ্রামে ঢুকেছে। গ্রামটা একটা টিলার কাঁধে। কিন্তু বাংলো থেকে চোখে পড়ে না।

কর্নেল রাস্তার বাঁক থেকে দক্ষিণে ঝোপঝাড়ে ভর্তি মাঠের দিকে হাঁটতে থাকলেন। একটু পরে আমরা পশ্চিমের গড়খাইয়ের ধারে পৌঁছুলুম। কর্নেলের অনুমান সত্য। দুর্গপ্রাসাদের খাড়া পাঁচিলের একটা অংশ এখানে দেখা যাচ্ছে। পাথরের ইটের ফাঁকে গুল্ম লতা গজিয়েছে। গড়খাইয়ে প্রচুর পাথর পড়ে আছে বটে, কিন্তু সেগুলোতে পা ফেলে যাওয়া অসম্ভব। কর্নেল আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, বাহ! এইরকম কিছুই আশা করেছিলুম।

একটা পাথরের বিশাল পাঁচিল আড়াআড়ি ভাবে গড়খাইয়ে ভেঙে পড়েছে। পাঁচিলটার দৈর্ঘ্য গড়খাইয়ের চেয়ে বেশি। তবে জায়গায়-জায়গায় একটু অংশ জলে ডুবে আছে। ব্যালান্স রেখে হাঁটলে সহজে ওপারে পৌঁছানো যায়। কর্নেল পায়ের কাছটা দেখিয়ে বললেন, এই দেখ। দিব্যি একটা পায়ে চলা পথের চিহ্ন আছে। শরৎকাল বলে পথটা ঘাসে কিছুটা ঢাকা পড়েছে। এপথেই আদিবাসীরা শিকার করতে ঢোকে।

পাঁচিলটা প্রস্থে অন্তত পাঁচ-ছ'ফুট। কিন্তু দুটো পাশ ভেঙে মাত্র এক-দেড় ফুট জলের ওপর উঁচিয়ে আছে। কর্নেল আগে এবং আমি পেছনে ব্যালান্স রেখে সাবধানে ওপারে গেলুম। তারপর চওড়া একটা ফাটলের মতো পাথরের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে হঠাৎ কর্নেল গুঁড়ি মেরে বসলেন এবং আমাকেও বসিয়ে দিলেন।

তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে দেখলুম, হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি পরা একটা মোটাসোটা লোক বেঁটে একটা গাছের ছায়ায় বসে সিগারেট টানছে। তার মুখোমুখি আর একটা লোক বসে হাত নেড়ে কিছু বলছে। এই লোকটা ওর চেয়ে লম্বা। পরনে প্যান্ট আর খয়েরি রঙের শার্ট। হাতে একটা বন্দুক এবং কাঁধে একটা ব্যাগ।

প্রায় হাত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ দূরে এবং আমাদের থেকে অনেকটা নিচে ওরা বসে আছে। কিছুক্ষণ পরে বন্দুকধারী লোকটা উঠে দাঁড়াল। সে আমাদের দিকে উঠে আসছে দেখে কর্নেল ফাটল থেকে সরে আমাকে ইশারায় উল্টোদিকের আড়ালে লুকোতে বললেন। কর্নেল লুকিয়ে পড়লেন ঘন ঝোপের আড়ালে। লোকটা কাঁধে বন্দুক নিয়ে শিস দিয়ে গান করতে-করতে ফাটল পথে নেমে গেল এবং গড়খাইয়ে পড়ে থাকা পাঁচিলের ওপর দিয়ে দ্রুত ওপারে পৌঁছুল। একটু পরে পশ্চিমের মাঠে ঝোপঝাড় আর পাথরের আড়ালে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল আবার ফাটলের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। নিচের লোকটাকে এবার হেঁটে যেতে দেখলুম উত্তর-পশ্চিম কোণে টিকে থাকা ভাঙা ঘরটার দিকে। ততক্ষণে কর্নেল ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে তার ছবি তুলে নিয়েছেন। আমার কানের কাছে মুখ এনে উনি ফিসফিস করে বললেন, চিনতে পারলে কি ব্যাঙবাবুকে?

চমকে উঠে বললুম তাই তো। মোটা বেঁটে গোলগাল চেহারা। মাথায়—

চুপ। —বলে কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তর-পশ্চিম দিকে দেখতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, চল। এই যথেষ্ট, ফেরা যাক খিদে পেয়েছে।

কাঁচা রাস্তায় পৌঁছে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে বললেন, বন্দুকওয়ালা লোকটা ওই টাঁড়ে গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

একটু ভয় পেয়ে বললুম, আমাদের লক্ষ করে গুলি ছুঁড়বে না তো?

কর্নেল হাসলেন। না। লোকটা লালঘুঘু শিকার করতে চায়। দেখা যাক। লালাঘুঘুরা বেজায় ধূর্ত।

কর্নেল হন্তদন্ত হয় হাঁটতে থাকলেন। টাঁড় জমিটার একটু দূরে পৌঁছেছি, সেইসময় লোকটা বন্দুক থেকে গুলি ছুড়ল। এক ঝাঁক লালঘুঘু উড়ে গড়ের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। কর্নেল ক্যামেরা বাগিয়ে একটা ফুলেভরা ঝোপে প্রজাপতির ছবি তুলতে গেলেন। তখন লোকটা আমাদের দেখতে পেল। সে টাঁড় থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়াল।

কর্নেল কোনও প্রজাপতিকে অনুসরণ করছেন, এই ভঙ্গিতে ক্যামেরা তাক করে গুঁড়ি মেরে বসলেন। দেখলুম, ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করাই আছে। তার মানে লোকটার ছবি তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য।

একটু পরে শাটার টিপলেন কর্নেল পরপর দুবার। লোকটা অবাক হয়ে তাঁকে দেখছিল। কাছে গেলে সে বলল, ক্যা সাব? আপ ফাটরাঙ্গাকি তসবির উঠাতা হ্যায়?

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্রজাপতি ধরা জাল বের করে বললেন, বহতন হুঁশিয়ার ফাটরাঙ্গা। নেটমে নেহি পাকড় যাতি তো ক্যা করেগা?

ইসমে ক্যা ফায়দা?

হবি হ্যায় ভাই, হবি। আপকা য্যয়সা শিকার কি হবি হ্যায়।

আপ কাঁহাসে আতা হ্যায় সাব?

কলকত্তাসে। আপ হেঁয়াকা রহনেওয়ালা হ্যায়?

হাঁ।

আমরা তার সঙ্গে হাঁটছিলুম। কর্নেল তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। তারপর গড়ের জঙ্গলের কিচনির কথা তুললেন। সে ভয় দেখিয়ে বলল, কিচনি দেখলে লোক পাগল হয়ে যায়। কিচনি মানুষকে আছড়ে মারে। সরকারি বাংলোর কাছে পৌঁছে কর্নেল তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে শুধু বলল, মগনলাল। তারপর বন্দুক কাঁধে নিয়ে শিস দিয়ে গান করতে-করতে চলে গেল।...

স্নানাহারের পর কর্নেল চুরুট শেষ করে বললেন, তুমি গড়িয়ে নাও জয়ন্ত। আমি বাথরুমকে ডার্করুম করে ফিল্মের একটা অংশ কেটে ওয়াশ ডেভালাপ করে ফেলি। বাকি ফিল্মগুলো বাঁচিয়ে কাজটা করতে হবে।

রোদে হেঁটে ক্লান্ত ছিলুম। স্নানাহারের পর ভাতঘুম আমাকে পেয়ে বসল। সেই ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। উনি বললেন, উঠে পড়ো জয়ন্ত চারটে বাজে।

ব্যাঙবাবু আর মগনলালের ছবি চমৎকার উঠেছে। দেখবে এস।

ছবিগুলো দেখে বললুম, মিঃ পাণ্ডেকে এবার জানানো উচিত।

জানাব। কফি আসুক কফি খেয়ে বেরুব।

রামপ্রসাদ কফি দিয়ে গেল। কফি খেয়ে সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা বেরুলুম। কর্নেল সাবেক বসতি বাঙালিটোলার দিকে যাচ্ছেন দেখে জিগ্যেস করলুম, ঝন্টুবাবুর বাড়ি গিয়ে কী হবে? পুলিশকে জানাতে দেরি হলে ব্যাঙবাবু কেটে পড়তে পারে।

কর্নেল বললেন, পুলিশ পরে। আগে ঝন্টুবাবুকে দরকার।

অমরজিৎ সিংহের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল। উনি কর্নেলের কাছে আসছিলেন। কর্নেল নির্জন রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রথমে তাঁকে মগনলালের ছবি দেখালেন। অমরজিৎ বললেন, এর ছবি

কোথায় তুললেন? এর নাম মগনলাল। সাংঘাতিক লোক। পুলিশও একে সমীহ করে চলে। এখানকার এক রাজনৈতিক নেতার ডান হাত।

কর্নেল এবার ব্যাঙবাবুর ছবিটা বের করে বললেন, এঁকে চেনেন কি?

অমরজিৎ অবাক হয়ে বললেন, আরে। ইনি তো কমলবাবু, ডাক্তার। মাধবের বাবা।

কর্নেল হাসলেন। এঁর হরিদ্বারে থাকার কথা। অথচ ইনি এখানেই আছেন। এঁর আরেকটা নাম ব্যাঙবাবু। জানেন কি?

অ্যাঁ? বলে অমরজিৎ নড়ে উঠলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়ছে। ছোটবেলায় আমরা ওঁকে ব্যাঙবাবু বলে আড়ালে ঠাট্টা করতুম। ব্যাঙের মতো হাঁটাচলা দেখে এ পাড়ায় অনেকেই কমলজেঠুকে ব্যাঙ ডাক্তার বলতেন বটে।...

সাত

অমরজিৎ সিংহকে কর্নেল আর কোনও কথা খুলে বললেন না। তাঁর সব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে শুধু বললেন, যথাসময়ে জানতে পারবেন। এবার বলুন আমার কাছে কী বিশেষ কারণে যাচ্ছিলেন?

অমরজিৎ ওরফে ঝন্টুবাবু বললেন, বনবিহারী থানার হাজত থেকে দিদিকে খবর পাঠিয়েছিল। দিদি যায়নি। আমি গিয়েছিলুম। ফেরার পথে বাংলোয় আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনেছিলুম আপনারা বেরিয়েছেন।

কর্নেল বললেন, তা হলে বংলোয় চলুন। সেখানে বসে কথা হবে।

ঝন্টুবাবু বললেন, থাক। দেখা যখন হয়ে গেল, তখন কথাটা বলে চলে যাই। দিদি মন্টুর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে। তাকে একা রেখে এসেছি। তো কথাটা বলি। থানার হাজতে আমাকে দেখে বনবিহারী কান্নাকাটি করে বলল, দাদা, আমাকে বাঁচান। বিনা দোষে আমাকে পুলিশ ধরেছে। ওকে জিগ্যেস করলুম, তুমি নাম বদলেছ কেন? বনবিহারী বলল, আগের দুষ্কর্মের জন্য সে অনুতপ্ত। সৎ ভাবে বেঁচে থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করার জন্য কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে সে নাম বদলেছে। এখানে এসেছিল সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে অর্ডার সংগ্রহ করতে মাধব তাকে আশ্বাস দিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে সময়মতো সে দেখা করতে যেত।

গড়ের জঙ্গলে কেন গিয়েছিল বলেনি?

বনবিহারী বলল যে, আগে এখানে এসে সে কিচনির গপ্প শুনেছিল। এখন তার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস আছে। তাই সাহস করে সেখানে কিচনি খুঁজতে গিয়েছিল। কিচনির দেখা সে পেয়েছে। চারটে গুলি ছুঁড়েও কিচনিকে সে মারতে পারেনি। আমি বললুম, এ বয়সে ছেলেমানুষি এখনও যায়নি তোমার? মন্টুর সাংঘাতিক মৃত্যুর কথাও তাকে বললুম। তা শুনে সে বলল, এর প্রতিশোধ সে নেবে, যদি আমি তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়াতে পারি। তখন ওকে জিগ্যেস করলুম, কে মন্টুকে খুন করেছে সে কি জানে? বনবিহারী বলল যে, সে জানে। কিন্তু তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনলে তবেই সে সব কথা খুলে বলবে। আমি পুলিশকে অনেক অনুরোধ করলুম। জামিন হতে চাইলুম। কিন্তু পুলিশ তাকে ছাড়বে না। মন্টুর খুনের অন্যতম আসামী করা হয়েছে তাকে। তাই কাল তাকে কোর্টে তুলবে।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু বলেছে সে?

ঝন্টুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ। একটা কথা বনবিহারী বলছিল। কথাটা বুঝতে পারিনি। কে নাকি তাকে ঠকিয়েছে। তার অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেছে। এর প্রতিশোধ সে নেব। পুলিশ তার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দিল না। তাই এ ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করার সুযোগ পাইনি।

ঠিক আছে। আপনি বাড়ি যান। আমি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখি, কী করা যায়।

ঝন্টুবাবু চলে গেলেন। আমরা বাংলোতে ফিরলুম। কর্নেল বললেন, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো। আমি মিঃ পাণ্ডেকে টেলিফোনে পাই কি না দেখি।

দোতলায় আমাদের রুমের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন, রমেশ পাণ্ডে আসছেন। একসঙ্গে কফি খাওয়া যাবে।

তখনও দিনের আলো ছিল। কর্নেল বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখতে-দেখতে বললেন, মগনলাল আবার শিকারে বেরিয়েছে। সেই টাঁড় জমিতে লালঘুঘুর ঝাঁক খুঁজছে। লালঘুঘুর মাংস নাকি সুস্বাদু। কিন্তু ওই পাখিগুলো মগনলালের চেয়ে ধূর্ত। ব্যস। উড়ে পালিয়ে গেল। ওকে গুলি ছোঁড়ার সুযোগই দিল না। মগললাল হতাশ হয়ে কাঁচা রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছে।

বললুম, ব্যাঙবাবুর কাছে যাচ্ছে।

কর্নেল বাইনোকুলার রেখে হাসলেন। সিংহ রাজাদের বিগ্রহ উদ্ধারে ব্যাঙবাবু মগনলালের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর পূর্বপুরুষ সিংহ রাজাদের কর্মচারী ছিলেন। কাজেই ওই বিগ্রহের কথা বংশপরম্পরায় তাঁদের জানার কথা।

আমার ধারণা, বিগ্রহ গড়ের জঙ্গলেই লুকানো আছে।

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, বিগ্রহের রত্নালঙ্কার বিক্রি করেছিলেন ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার বাবা। তাই বলে বিগ্রহ লুকিয়ে রাখবেন কেন? লুকিয়ে রাখার পিছনে কোনও যুক্তি নেই।

তাহলে সেই বিগ্রহ গেল কোথায়?

এর সোজা এবং যুক্তিসঙ্গত উত্তর হল, বিগ্রহ ধ্বংস্তূপে চাপা পড়েছিল।

চিন্তা করো জয়ন্ত। ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার বাবা দুর্গপ্রাসাদ ছেড়ে চলে এসেছিলেন কেন? মেরামতের অভাবে প্রাসাদ ভেঙে পড়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার পক্ষে ওই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বিগ্রহ উদ্ধারের ক্ষমতা ছিল না। অমন বিশাল ধ্বংস্তূপ—কল্পনা করো, তখন জঙ্গল গজায়নি। শুধু বিশাল দুর্গপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ একটা টিলার মতো উঁচু হয়ে আছে। তা সরাতে প্রচুর টাকা খরচ করে মজুর লাগানো দরকার। শুধু মজুর নয়, দক্ষ উৎখননকর্মী এবং ক্রেন দরকার ছিল। গত একশ বছরে প্রাকৃতিক কারণে গড়ের জঙ্গলের সেই চেহারা বদলে গেছে। বিশেষ করে ১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল। তার ফলে ভূপ্রকৃতির গঠন বদলে গিয়েছিল। সেই ভূমিকম্পের চিহ্ন গড়ের জঙ্গলে লক্ষ করেছি। এখানে থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত এলাকা ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ধারিয়া নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছিল।

কর্নেল ভূমিকম্প নিয়ে সমানে বকবক করতে থাকলেন। ওঁর এই স্বভাব। আমি অসমতল সবুজ প্রান্তর আর দিগন্তে পর্বমালার দিকে তাকিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছিলুম। এসময় দরজায় কেউ নক করল। কর্নেল বললেন, কম ইন।

দরজা ভেজানো ছিল। দেখলুম, সাদা পোশাকে রমেশ পাণ্ডে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন, এখানে চলে আসুন মিঃ পাণ্ডে। এখনই কফি এসে যাবে নিচে বলে এসেছি ছ'টা নাগাদ কফি পাঠাতে।

পাণ্ডে এসে ব্যালকনিতে বসলেন। একটু হেসে বললেন, আপনি অফসেট বা লেজার প্রিন্টিং প্রেসের কথা জিগ্যেস করছিলেন। আমাদের সোর্স খবর দিয়েছে, পাটনায় মাধববাবুর শ্যালক চন্দ্রনাথবাবুর ওই প্রেস আছে।

কর্নেল পকেট থেকে খামে ভরা সেই ন'খানা চিঠি বের করে দিলেন পাণ্ডেকে। পাণ্ডে চিঠিগুলো দেখে বললেন, বাংলা বলতে পারলেও আমি পড়তে পারি না। এগুলো কী?

কর্নেল তাঁকে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানিয়ে একটা চিঠি পড়ে শোনালেন।

পাণ্ডে বললেন, ঝন্টুবাবু আমাদের জানাননি। তাহলে এতদিনে ধরে ফেলতুম কে ওঁর গেটে চিঠি রেখে আসে। শুনেছি, ঝন্টুবাবু সাহসী লোক।

কর্নেল বললেন, ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি। দিদি এবং পাগল ভাইয়ের কথা ভেবেই চুপচাপ ছিলেন। লক্ষ করুন, এগুলো সবই পুরু আর্টপেপারে ছাপা ফটো কপি। প্রত্যেকটা মূল একটা চিঠির কপি।

আপনার কি সন্দেহ মাধববাবুর শ্যালকের প্রেসে এগুলো ছাপা হয়েছে?

সম্ভবত।

পাণ্ডে হাসলেন। আপনি নিশ্চয় কোনও বিশেষ কারণে এই সন্দেহ করেছেন?

হ্যাঁ। ব্যাঙবাবুর কারণে।

রমেশ পাণ্ডে অবাক হয়ে বললেন, ব্যাঙবাবু? তাকে কি আপনি চেনেন?

কর্নেল জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এইসময় রামপ্রসাদ ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স আনল। সে চলে গেলে কর্নেলের ইশারায় আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলুম।

কর্নেল তিনটে কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে বললেন, ব্যাঙবাবু গড়ের জঙ্গলে ডেরা পেতেছে। সম্ভবত ওখানে উত্তর-পশ্চিম কোণে কোনও একটা ঘর এখনও টিকে আছে। সেই ঘরে ব্যাঙবাবু মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকে, তা স্পষ্ট। আজ দুপুরে ব্যাঙবাবুর এই ছবিটা টেলিলেন্সের সাহায্যে দুর থেকে তুলেছি। আপনি দেখুন। তারপর বলুন মগলনালকে আপনি আপনার প্রয়োজনে গ্রেফতার করতে পারবেন কি না। কারণ, সে নাকি স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার ডানহাত।

ছবিটা দেখে পাণ্ডে বললেন, বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। মগনলালের সঙ্গে ব্যাঙবাবু তাহলে যোগাযোগ করেছে?

হ্যাঁ। দুজনে মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। পরে মগললালের ছবিও তুলেছি। এই দেখুন।

রমেশ পাণ্ডে একটু চুপ করে থেকে বললেন, মগললালকে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু তাকে আটকে রাখা যাবে না। তবে—কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, বলুন?

রমেশ পাণ্ডে গলার ভেতর থেকে বলেন, মগনলালের গার্জেনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। তিনিও প্রভাবশালী। তিনি একবার বলেছিলেন, কোনও সুযোগে এনকাউন্টারে মগনলালের মৃত্যু ঘটানো হোক। কিন্তু আমার বিবেকে বাধে। যদি সত্যিই কোনও সাংঘাতিক ক্রাইমের সময় সুযোগ মেলে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু মগললাল ধূর্ত লোক। সে ব্যবসায়ীদের কাছে চাঁদা আদায় করে। অনেক সময় ডাকাতিও করে। কিন্তু ঘটনাস্থলে সে থাকে না। তার নামে তিনটে খুনের অভিযোগ আছে। তাকে জামিন দেওয়া হয়েছে। যদি খুনের সময় মুখোমুখি তাকে পেতুম, গুলি করে মেরে এনকাউন্টারে মৃত্যু বলে চালানো যেত।

কর্নেল বললেন, না-না। নরহত্যার প্রশ্ন ওঠে না। অপরাধীর আইনমাফিক বিচারই কাম্য। আমি আপনাকে কখনই এমন প্রস্তাব দেব না। বরং এমন কাজের বিরোধিতাই করব। যাই হোক, ব্যাঙবাবুর গড়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে গিয়ে থাকার উদ্দেশ্য, সিংহ রাজাদের পূর্বপুরুষের বিগ্রহ খুঁজে বের করে তা বিদেশে পাচার করা। বিগ্রহ ওই জঙ্গলে ধ্বংসস্তূপের তলায় কোথাও চাপা পড়েছিল।

রমেশ পাণ্ডে বললেন, আমার মতে আজ রাতেই গড়ের জঙ্গলে হানা দিয়ে ব্যাঙবাবুকে গ্রেফতার করা দরকার। তার নামে এখনও হুলিয়া ঝুলছে।

কর্নেল হাসলেন। অথচ ব্যাঙবাবু মাথায় পরচুলা আর মুখে নকল দাড়ি পরে দিব্যি ধার্মিক সাধুসন্তের চেহারা নিয়ে সিংহগড়ে বাস করেন। মাঝে মাঝে তীর্থযাত্রায় বাইরে যাবার ছলে গড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকেন। বিগ্রহের খোঁজে সেখানে ব্যর্থ খোঁড়াখুঁড়ি করেন। তবে না। রাতে ওঁর ডেরা যদি খুঁজে পান আপনারা, জঙ্গলে উনি গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে যাবেন। তার চেয়ে কাল সকাল

সাতটা নাগাদ হানা দেওয়াই ভালো। প্রচুর ফোর্স দরকার। সারা গড়ের জঙ্গল ঘিরে রেখে হানা দিতে হবে।

পাণ্ডে চিন্তিত মুখে বললেন, সিংহগড় থানায় বেশি ফোর্স নেই। এস. পি. সায়েবকে বলে ধরমপুরা আর লখিমপুরা থানা থেকে ফোর্স আনাতে হবে। রাতের মধ্যে ফোর্স আসা দরকার। শুধু একটু অসুবিধা। গড়ের জঙ্গলের একটা রাফ ম্যাপ আগে তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

আমি করেছি। বলে কর্নেল ঘরে ঢুকে কিটব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এলেন। সেটা খুলে বললেন, স্মৃতি থেকে আজ দুপুরে খাওয়ার পর এটা এঁকেছি। একেবারে নির্ভুল না হলেও মোটামুটি একটা রাফ ম্যাপ এটা। যেখানে মন্টুবাবুর বডি পাওয়া গিয়েছিল এবং যেখানে তাঁকে হত্যা কর হয়েছিল, সেই জায়গাটা ম্যাপে আছে।

পাণ্ডে ম্যাপটা দেখতে-দেখতে বললেন, পশ্চিমেও একটা প্রবেশ পথ দেখছি।

হ্যাঁ। ও পথে আদিবাসীরা শিকারে যায়।

আচ্ছা কর্নেল সরকার, যেখানে মন্টুবাবুকে খুন করা হয়েছিল, ওখানে স্টার চিহ্ন কেন?

ওখানে একটা পাঁচকোনা পাথর আছে লক্ষ্য করেননি? একটা কোনা অবশ্য ভাঙা।

না। লক্ষ করিনি। আসলে তখন খুনের মোটিভ নিয়েই চিন্তাভাবনা করছিলুম।

ওটা মোগল আমলের চবুতরার ছাদের অনুকরণে তৈরি। এমনভাবে ধসে পড়েছে যে কোণগুলো সহজে চোখে পড়ে না। ঘাস আর ঝোপে ঢাকা পড়েছে কিছুটা।

রমেশ পাণ্ডে উঠে দাঁড়ালেন। তা হলে চলি। ফিরে গিয়ে এস. পি. সায়েবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা রাতের মধ্যেই করে ফেলছি। আপনি এবং জয়ন্তবাবু আমাদের সঙ্গে থাকবেন।

কর্নেল তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে বললেন, আর একটা কথা মিঃ পাণ্ডে। এস. পি. সায়েবকে বলবেন, কাল পাটনার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের অধিকর্তাকে বলে শিগগির একটা টিম পাঠানোর ব্যবস্থা যেন করেন।

কেন বলুন তো?

ধ্বংসস্তূপে চাপাপড়া প্রাচীন একটি বিগ্রহ তাঁরা উদ্ধার করে জাদুঘরে রাখবেন।

পাণ্ডে অবাক হয়ে বললেন, বিগ্রহের খোঁজ তাহলে আপনি পেয়েছেন।

হ্যাঁ পেয়েছি। কিন্তু আগে ব্যাঙবাবুকে পাকড়াও করার পর বিগ্রহ উদ্ধারের কাজ শুরু হবে। দেরি করা চলবে না।

রমেশ পাণ্ডে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল দরজা বন্ধ করে এসে বসলেন। বললুম, বিগ্রহের খোঁজ কী করে পেলেন আপনি?

কর্নেল চাপা গলায় সুর ধরে আওড়ালেন—

পঞ্চভূতে ভূত নাই
মুখে ঈশ ভজ ভাই
তালব্য শ পালিয়ে গেলে
যোগফলে অঙ্ক মেলে
হর হর বোমভোলা
খাও ভাই গুড়ছোলা...

বললুম, হেঁয়ালি না করে খুলে বলুন না কর্নেল।

কর্নেল বললেন, আপাতদৃষ্টে উদ্ভট মনে হলেও খুব সোজা একটা ছড়া। এতে একটা গোপন তথ্য লুকানো আছে। তাই ঝন্টুবাবুর ঠাকুরমা দুই ভাইকে ছোটবেলায় এটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

বড় হয়ে ছড়া থেকে তথ্য বের করে তাঁর পৌত্রেরা যদি বংশের প্রাচীন বিগ্রহ উদ্ধার করতে পারে, তাই তিনি এই ছড়া বানিয়েছিলেন।

বলে কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে নোট বই বের করে ডট পেনে লিখতে শুরু করলেন। প্রথম লাইনে বলা পঞ্চভূতে ভূত নাই। তার মানে ভূত বাদ দিলে রইল 'পঞ্চ'। এবার, মুখে ঈশ তালব্য শ গেলে রইল 'ঈ'। পরের লাইন যোগফলে অঙ্ক মেলে। তার মানে মুখের সঙ্গে ঈ যোগ করলে দাঁড়ায় 'মুখী'। এবার দাঁড়াল 'পঞ্চমুখী'। হর হর ব্যোমভোলা বলতে 'শিব'। 'পঞ্চমুখী শিব'। গুড় আর ছোলা তাঁর প্রসাদ। শিবের পঞ্চমুখী বিগ্রহ বহু জায়গায় আছে। পঞ্চমুখী শিব ছিলেন সিংহ রাজাদের আসল গৃহদেবতা। তাঁর মন্দিরের ছাদও ছিল পঞ্চমুখী। আমরা যে পাথরটা গড়ের জঙ্গলে দেখছি, তা সেই মন্দিরের ছাদ। তার তলায় বিগ্রহ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ঝন্টুবাবুর ঠাকুরদার সেই জনবল বা অর্থবল ছিল না যে তিনি খোঁড়াখুঁড়ি করে বিগ্রহ উদ্ধার করেন। কারণ, শুধু খুঁড়লে তো চলবে না। ওই পাঁচকোনা পাথরের ছাদটা সরাতে হবে। ক্রেনের সাহায্য ছাড়া সেটা সম্ভবই নয়। তবে হ্যাঁ, সুড়ঙ্গ খুঁড়েও বিগ্রহ উদ্ধার করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সঠিক স্থান না জানলে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে লাভ নেই। তাছাড়া ওপরে ভারী পাথর। সুড়ঙ্গ ধ্বসে পড়ারও ঝুঁকি ছিল।

বললুম, আমার ধারণা মন্টুবাবু হয়তো জানতেন, কোনদিকে সুড়ঙ্গ খুঁড়লে বিগ্রহ পাওয়া যাবে।

কর্নেল আস্তে বললেন, ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে। 'ডেডস্ ডু নট স্পিক'। মৃতেরা কথা বলে না। কাজেই ওটা নিছক ধারণাই থেকে যাচ্ছে।

কিন্তু মন্টুবাবু পড়ে গিয়ে পাগল হয়েছিলেন কেন। এটা খুব অদ্ভুত না?

কর্নেল বললেন, কমল বোস ওরফে ব্যাঙবাবু ছিলেন হাতুড়ে ডাক্তার। তাঁকে জেরা করলে জানা যেতে পারে, ছেলে মাধবের সাহায্যে মন্টুবাবুকে গড়ের জঙ্গলে ডেকে এনে কথা আদায় করার জন্য কোনও নার্ভের ওষুধ জোর করে খাইয়ে দিয়েছিলেন কি না? নার্ভকে আচ্ছন্ন করে সাইকিয়াট্রিস্টরা রোগীর অবচেতন মনের গোপন কথা জেনে নেন। ব্যাঙবাবু হাতুড়ে ডাক্তার। হিতে বিপরীত হয়ে গিয়েছিল। দেখা যাক, আগে অপারেশন সাকসেসফুল হোক। তখন জানা যাবে।...

উপসংহার

কর্নেলের তাড়ায় ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হয়েছিল। বেড-টি খেয়ে সেজেগুজে বেরুতে-বেরুতে সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। কর্নেল বাংলোর লন পেরিয়ে গিয়ে বললেন, রমেশ পাণ্ডে বুদ্ধিমান। বাইনোকুলারে তন্নতন্ন খুঁজে গড়ের জঙ্গলের দিকে পুলিশ দেখতে পাইনি। ক্যামোফ্লেজ করে ঝোপের আড়ালে পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছেন। অবশ্য একটা পুলিশ ভ্যান কাঁচা রাস্তা দিয়ে আদিবাসীদের গ্রামের দিকে যেতে দেখেছি।

কর্নেল যথারীতি তাঁর প্রাতঃভ্রমণের ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন। কিছুক্ষণ পরে টাঁড় জমিটায় উঠে আমরা গড়ের পূর্বদিকে পৌঁছুলুম। কোথাও পুলিশের টিকিও দেখতে পেলুম না।

ধসে পড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে গড়ে ঢোকার সময় কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। কোনও পাখি শিস দিচ্ছিল। কর্নেল পালটা শিস দিলেন। তারপর একটা ধ্বংস্তূপের আড়ালে রমেশ পাণ্ডের টুপি দেখা গেল। উনি পুলিশের পোশাক পরে অপারেশনে এসেছেন। কর্নেল তাঁকে ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন।

তারপর উনি বাইনোকুলারে চারদিকে খুঁটিয়ে দেখে এগিয়ে গেলেন উত্তর-পশ্চিম কোণে। উঁচুতে সেই ভাঙা ঘরের অংশটা লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে একটুকরো পাথরের ওপর দাঁড়ালেন।

শরৎকালের সকালবেলার রোদে সবুজ বৃক্ষলতা গুল্মে শিশির ঝলমল করছিল। পাখির ডাকে মুখর চারদিক। এমন একটা সুন্দর নিসর্গে মনোরম সকালবেলায় কমল বোস ওরফে ব্যাঙবাবুকে পাকড়াও করার জন্য অভিযান বড় বিসদৃশ ঘটনা।

হঠাৎ কর্নেল আমার উদ্দেশে একটু চড়া গলায় বললেন, জয়ন্ত সর্বনাশ। ওই বুঝি সেই সাংঘাতিক জলের পেত্নি কিচনি। ওরে বাবা! কী ভয়ঙ্কর চেহারা।

আমি কিছু দেখতে না পেলেও আঁতকে উঠে বললুম, পালান কর্নেল। শিগগির পালিয়ে যাই আসুন।

কর্নেল বললেন, ওরে বাবা। কিচনিটা যে আমাদের দিকেই আসছে।

এতক্ষণে একটা ধ্বংস্তূপের আড়াল থেকে বিদঘুটে জন্তুটাকে বেরুতে দেখলুম। প্রকাণ্ড একটা কালো ব্যাঙের মতো দেখতে। মুখটাও ব্যাঙের মতো। কিন্তু ধারালো সাদা দাঁত আছে মুখে। চোখ দুটো লাল এবং ঠেলে বেরিয়ে আসছে। থপথপ শব্দে জন্তুটা হাঁ করে এগিয়ে এল। তারপর গলার ভেতর ভুতুড়ে শব্দ করতে থাকল।

আমি পিছিয়ে গিয়ে প্রাণের দায়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, মিঃ পাণ্ডে। মিঃ পাণ্ডে।

জন্তুটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দেখলুম, কর্নেল পাথর থেকে লাফ দিয়ে নেমে জন্তুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করলেন। ততক্ষণে রমেশ পাণ্ডে এবং একদল সশস্ত্র পুলিশ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কর্নেলের বিশাল শরীরের তলায় পড়ে জন্তুটা হাত-পা ছুড়ছিল। কর্নেল ডাকলেন, মিঃ পাণ্ডে। চলে আসুন এখানে। ব্যাঙবাবুকে কিচনির খোলস ছাড়িয়ে বের করুন এবার।

পাণ্ডের আদেশে কনস্টেবলরা গিয়ে জন্তুটাকে মাটিতে ঠেসে ধরল। কর্নেল বললেন, আর কী ব্যাঙবাবু। এবার খোলস ছেড়ে দেখা দিন। কালো রেক্সিনে ফোম ভরে সেলাই করে খাসা কিচনির খোলস তৈরি করেছেন।

এবার মানুষের গলায় কিচনিটা কেঁদে উঠল, বেরুচ্ছি সার। আমাকে একটু উঠে বসতে দিন।

কনস্টেবলরা হাসতে-হাসতে তাকে টেনে ওঠাল। পিঠের দিকে চেন টেনে কর্নেল খোলস থেকে একটা লোককে বের করলেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, এ কী! এ তো ব্যাঙবাবু নয়।

আমি অবাক। লোকটা রোগা। মালকোঁচা করে ধুতি পরা। গায়ে একটা নোংরা গেঞ্জি। সে হাউমাউ করে কেঁদে বলল, বাবু আমাকে এই পোশাক পরিয়ে আপনাদের ভয় দেখাতে বলে রাতেই চলে গেছেন সার। আমি জানতুম না কিছু।

পাণ্ডে তার পেটে বেটনের গুঁতো মেরে বললেন, তুই কে?

আজ্ঞে হুজুর, আমার নাম কেষ্টচরণ। আমি বাবুর বাড়িতে কাজ করি।

তোর বাবুর নাম কী?

আজ্ঞে, কমলবাবু। আগে ডাক্তারি করতেন। তিনিই।

পাণ্ডে বললেন, সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। এই ব্যাটা! তোর বাবু কোথায় গেছে?

কাল সন্ধ্যাবেলা মগললালকে দিয়ে বাবু খবর পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আমি তাই এসেছিলুম হুজুর। বাবু বলে গেছেন, বাড়ি যাচ্ছেন। সন্ধ্যার পর আসবেন। দিনে কেউ এলে যেন ভয় দেখাই।

কর্নেল বললেন, মিঃ পাণ্ডে। এই কেষ্টচরণকে নিয়ে আপনি এখনই কমলবাবুর বাড়ি সার্চ করুন। একজন অফিসার আর জনা দুই কনস্টেবল আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ব্যাঙবাবুর ডেরা আমি দেখতে পেয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখা দরকার, ওটা চোরাই বিগ্রহ লুকিয়ে রাখার ঘাঁটি কি না।

কেষ্টচরণ হাঁউমাউ করে আরও কী বলার চেষ্টা করছিল। বলার সুযোগ দিলেন না পাণ্ডে। দ্রুত চলে গেলেন।

একটু পরে একজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন সশস্ত্র কনস্টেবল এল। কর্নেল তাদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। আমি পেছনে হাঁটছিলাম। হঠাৎ গুলির শব্দ হল এবং একজন কনস্টেবল আর্তনাদ করে পড়ে গেল। দেখলুম, তার কাঁধে রক্ত ঝরছে।

পুলিশ অফিসার তখনই হুইসেল বাজালেন এবং অর্ডার দিলেন, ফায়ার।

সকালের গড়ের জঙ্গল বারুদের কটু গন্ধ আর পাখিদের আর্ত চিৎকারে ভরে গেল। এতক্ষণে দেখলুম, একটু উঁচুতে একটা গুহার মতো ফোকর লক্ষ করে ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছুঁড়ছে পুলিশ। সেই ফোকর থেকে আধখানা ঝুলে আছে একজন মানুষের রক্তাক্ত দেহ।

কর্নেল চিৎকার করে বললেন, স্টপ। স্টপ ইট। মগনলাল ইজ ডেড। তাহলে মগনলালকে ডেরায় পাহারায় রেখেই ব্যাঙবাবু বাড়ি গিয়েছিলেন। সেই ডেরায় পৌঁছে দেখি, ওটা একটা টিকে থাকা পাথরের ঘর। শেষদিকে একটা ঘুলঘুলি আছে। মগললালের মৃতদেহ পুলিশ টেনে নিচে নামাল। তার বন্দুকটা নিচে পড়ে গিয়েছিল।

ঘরটার ভেতর একটা কাঠের বাক্সে কয়েকটা বিগ্রহ পাওয়া গেল। একপাশে একটা খাটিয়ায় বিছানা পাতা এবং মশারি খাটানো আছে। কুঁজো ভর্তি জল, গ্লাস এবং একটা টিফিন কেরিয়ার দেখতে পেলুন। কর্নেল কাঠের বাক্স থেকে বিগ্রহগুলো দেখতে-দেখতে তলা থেকে একটা কালো রঙের রিভলভার এবং একটা বুলেটের বাক্স তুলে নিলেন। পুলিশ অফিসারটি বললেন, আরে, ব্যাঙবাবুকা ফায়ার আর্মস?

কর্নেল বললেন, ইয়ে হ্যায় মার্ডার উইপন। পাগল মন্টুবাবুকো মার ডালা ব্যাঙবাবু।

কিছুক্ষণ পরে আমরা গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেলুম। পুলিশবাহিনীর একটা অংশ সেখানে থেকে গেল আহত কনস্টেবলকে তার সহকর্মীরা ততক্ষণে নিয়ে গেছে পুলিশ ভ্যানের কাছে। পাণ্ডের আয়োজন এতক্ষণে চোখে পড়ল। গড়ের জঙ্গলের চারদিক থেকে দলে-দলে পুলিশ মার্চ করে চলেছে সিংহগড়ের দিকে।...

বাংলোয় ফিরে ব্রেকফাস্ট করার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়েছেন, এমনসময় রামপ্রসাদ এসে জানাল, কর্নিলসাবকা ফোন।

শুনেই কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো পরে উনি ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, ব্যাঙবাবু ধরা পড়েছে। মাথায় পরচুলা, মুখে নকল গোঁফ দাড়ি, পরনে গেরুয়া লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরে সাইকেল রিকশাতে সবে উঠে বসেছে, রমেশ পাণ্ডে গিয়ে হাজির। চল, এবার সিংহবাড়ি যাওয়া যাক। ঝন্টুবাবু এবং তাঁর দিদিকে খবরটা দিলে ওঁরা মনে একটু শান্তি পাবেন। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বনবিহারী কবুল করেছে, বিগ্রহ কেনার জন্য সে মাধববাবুর বাবাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙবাবু তাকে ঠকিয়েছেন। সে রাগে ফুঁসছে। কিন্তু কিছু করার নেই তার।...

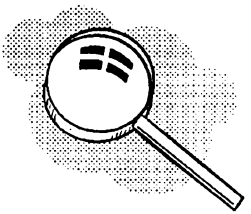

রাজা সলোমনের আংটি

এক

জুলাই মাসের সেই সন্ধ্যাবেলায় টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। কর্নেলের ড্রয়িংরুমে পাঁপরভাজা আর কফি খেতে-খেতে আড্ডাটা দারুণ জমে উঠেছিল।

তবে আড্ডার যা নিয়ম। এক কথা থেকে অন্য কথা, তা থেকে আরেক কথা—এইভাবেই চলে। এটুকু মনে পড়ছে, দাড়ি রাখার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল। রিটায়ার্ড জজসায়েব অনঙ্গমোহন হাটিই কর্নেলের দাড়ি নিয়ে কথাটা তুলেছিলেন। তারপর সেই আলোচনা এক মুখ থেকে অন্যমুখে ঘুরতে ঘুরতে কেনই বা বাদুড়ে এসে পৌঁছুল বুঝতে পারলুম না। মিঃ হাটিকে বলতে শুনলুম,—বহরমপুরে যখন আমি সেশান জাজ ছিলুম, তখন কোর্টরুমের জানালা দিয়ে দেখতে পেতুম, একটা প্রকাণ্ড গাছে অসংখ্য বাদুড় ঝুলে আছে। আচ্ছা কর্নেলসায়েব! আপনি তো বিজ্ঞ মানুষ। বাদুড় কেন উলটো হয়ে ঝুলে থাকে বলুন তো?

কর্নেলকে মুখ খোলার সুযোগ দিলেন না হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মহেন্দ্র ঘোষদস্তিদার। তিনি বললেন,—বইয়ে পড়েছিলুম, ব্রাজিলে আমাজন নদীর অববাহিকায় দুর্গম জঙ্গলে রক্তচোষা বাদুড় আছে। তাদের পাল্লায় পড়লে রক্ষা নেই। মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ত চুষতে-চুষতে—

ডাক্তার তারক চক্রবর্তী তাঁর কথার ওপর কথা চাপিয়ে দিলেন,—ভ্যাম্পায়ার! বুঝলেন? ওদের বলা হয় ভ্যাম্পায়ার। সেই সূত্রেই তো ইউরোপে ড্রাকুলার গল্প লিখেছিলেন—কে যেন?

ব্রাম স্ট্রোকার। —মিঃ হাটি বলে উঠলেন। তবে আমাদের দেশেও রক্তচোষা ডাইনিদের গল্প আছে। আমি মালদায় থাকার সময় আদিবাসীরা একজন বৃদ্ধাকে ডাইনি বলে মেরে ফেলেছিল। পুলিশ দশজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের গণ্ডগোলে ন'জনকে খালাস দিয়েছিলুম। একজনকে ফাঁসি।

ডাঃ চক্রবর্তী চমকে উঠে বললেন,—ফাঁসি? তারপর? তারপর?

—তারপর আর কী? হাইকোর্ট আমার রায়ে সম্মতি দিয়েছিল। লোকটার ফাঁসি হয়েছিল।

মিঃ ঘোষদস্তিদার হাসতে-হাসতে বললেন,—মিঃ হাটি! আপনি যা-ই বলুন, এ কেসে গণ্ডগোল আছে। আমি আসামীর পক্ষে দাঁড়ালে বেচারা মারা পড়ত না। চার্জশিটে দশজনের যদি নাম থাকে, তাহলে—

মিঃ হাটি কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে ডাঃ চক্রবর্তী সকৌতুকে বললেন,—ফাঁসিতে মৃত্যুও তো অপঘাতে মৃত্যু। আর অপঘাতে মৃত্যু হলে মানুষ প্রেত হয়ে যায়। ভূতও বলতে পারেন। সেই লোকটা ভূতপ্রেত হয়ে আপনাকে জ্বালাতন করেনি তো?

মিঃ হাটি গম্ভীরমুখে বললেন,—ভূতপ্রেতে আমার কস্মিনকালে বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! আমার জজিয়তি-জীবনে ওই একবারই একজনের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলুম। বাকি জীবনে যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই একটা অদ্ভুত ঘটনা বারবার ঘটেছে। নাঃ, স্বপ্ন নয়! প্রত্যক্ষ ঘটনা। রাতবিরেতে জানালার ওধারে—ওঃ! এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

তাঁর চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এতক্ষণে আড্ডায় কেমন একটা গা-ছমছম করা আবেশ সঞ্চারিত হল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার অর্থাৎ আমাদের প্রিয় হালদারমশাই সম্ভবত রহস্যের গন্ধ পেয়ে গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন,—কী দেখছিলেন স্যার?

একটা লোক। সেই ফাঁসির আসামীর মতো চেহারা। বেঁটে। কালো কুচকুচে গায়ের রং। এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল।—মিঃ হাটি শ্বাস ছেড়ে বললেন : ফাঁসির হুকুম শুনে লোকটা যে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল, সেইরকম দৃষ্টি। আদিম হিংস্র দুটি চোখ! শুতে যাওয়ার সময় কোনও-কোনও রাত্রে ইচ্ছে করেই খোলা জানালার বাইরে তাকাতুম! অমনই তাকে দেখতে পেতুম। তার চেয়ে সাংঘাতিক দৃশ্য, তার গলায় মোম দেওয়া সেই দড়ির ফাঁস! একদিন তো আমি আমার লাইসেন্সড পিস্তল থেকে গুলি ছুড়েছিলুম। হইচই পড়ে গিয়েছিল। আমার আর্দালি রহিম বখ্‌শ্ টর্চের আলোয় কোয়ার্টারের চৌহদ্দি তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। কাকেও দেখতে পায়নি। তারপর বদলি হয়ে গেলুম কৃষ্ণনগর। সেখানেও কোনও-কোনও রাত্রে একই দৃশ্য!

হালদারমশাই বললেন,—এখনও কি আপনি তারে দেখতে পান?

গোয়েন্দাপ্রবরকে নিরাশ করে মিঃ হাটি বললেন,—নাঃ! রিটায়ার করার পর আর তাকে দেখতে পাইনি।

মিঃ ঘোষদস্তিদার বললেন,—হ্যালুসিনেশন! বলছিলুম না আপনার ওই কেসে গণ্ডগোল ছিল! আপনার অবচেতন মন নিশ্চয় ফাঁসির হুকুমের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাই—

ডাঃ চক্রবর্তী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন,—ভূতপ্রেত নিয়ে যতই জোক করি না কেন, ভূতপ্রেত আছে। বছর চল্লিশ আগের কথা। তখন আমি ডাক্তারি পড়ছি। লাশকাটা ঘরে মড়া কাটাকুটি করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অস্থি ইত্যাদি বিষয়ে হাতেকলমে শিখতে হচ্ছে। একদিন দুপুরবেলায় পথদুর্ঘটনায় মৃত একটা লোকের টাটকা লাশ মর্গে এসেছে। সেই আমলের বিখ্যাত অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, আমি তাঁর ছাত্র—প্রোফেসর চার্লস গ্রোভার পুলিশের অনুরোধে দ্রুত শবব্যবচ্ছেদের দায়িত্ব নিলেন। আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র। তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আসলে এক বড়লোকের লাশ। তো ডাঃ গ্রোভার নিজে ব্যবচ্ছেদ করছেন এবং তাঁর নির্দেশমতো আমিও ছুরি চালাচ্ছি। বললে বিশ্বাস করবেন না, হঠাৎ লাশের মুখে হাসি ফুটে উঠল। নিঃশব্দ হাসি। কিন্তু সে কী বীভৎস হাসি, তা বলে বোঝাতে পারব না। ডাঃ গ্রোভারের মতো মানুষও স্তম্ভিত হয়ে বুকে ক্রস আঁকলেন। তারপর লাশের মুখটা অন্যপাশে কাত করে দিলেন। কী সর্বনাশ! আবার মুখটা চিত হল। আবার সেই হাসি! নিঃশব্দে ভয়ঙ্কর হাসি। আর চোখদুটো—ওঃ!

অ্যাডভোকেট মিঃ ঘোষদস্তিদার বলে উঠলেন,—হ্যালুসিনেশন! হ্যালুসিনেশন!

সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

এদিকে যেন ডোরবেলের শব্দেই জমাটি আড্ডা নিমেষে ভণ্ডুল। ডাঃ চক্রবর্তী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওঠা যাক। বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে সমস্যা হবে। চেম্বারে এতক্ষণ রুগিরা এসে ভিড় করেছে।

মিঃ ঘোষদস্তিদার ঘড়ি দেখে বললেন,—এই রে! পৌনে আটটা বাজে। সাড়ে সাতটায় একজন বড়ো মক্কেল আসবার কথা ছিল। কর্নেলসায়েব! চলি। কথায়-কথায় দেরি করে ফেলেছি!

মিঃ হাটিও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—আমার মিসেস চটে যাবেন। আটটায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে একখানে যাওয়ার কথা। চলি কর্নেলসায়েব!

ওঁরা বেরিয়ে যাওয়ার পর হালদারমশাই বাঁকা হেসে চাপা স্বরে বললেন,—অ্যাডভোকেট ভদ্রলোক ঠিক কইছেন। হ্যালুসিনেশন! চোখের ভুল। চৌতিরিশ বৎসর পুলিশলাইফে রাত্রে ঘুরছি। কিছু দেখি নাই।

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণ এক ভদ্রলোককে নিয়ে এল। বুঝলুম, তিন-তিনজন প্রকাণ্ড মানুষের ফাঁক গলিয়ে ষষ্ঠীচরণ এঁকে আনতে অসুবিধেয় পড়েছিল।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের বেশি বলেই মনে হল। পাতাচাপা ঘাসের মতো ফ্যাকাসে গায়ের রঙ। মাথায় কাঁচাপাকা সিঁথিকরা লম্বা ঘাড় ছুঁইছুঁই চুল। খাড়া নাক। বসা চোয়াল চোখদুটি

টানাটানা। গোঁফদাড়ি পরিষ্কার করে কামানো। পরনে ছাইরঙা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর অগোছাল ধুতি। তাঁর কাঁধে একটা কাপড়ের নকশাদার ব্যাগ। বাঁ-হাতের আঙুলে একটা পলাবসানো সোনার আংটি। তিনি করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—বসতে পারি?

কর্নেল তাঁকে লক্ষ করছিলেন। বললেন,—অবশ্যই।

ভদ্রলোক সোফায় বিনীতভাবে বসে বললেন,—আমার নাম গোপীমোহন হাজরা। আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলুম। পেয়েছেন কি না জানি না। তবে ওই যে একটা কথা আছে, গরজ বড়ো বালাই!

আপনার চিঠি আমি পেয়েছি।—বলে কর্নেল আবার হাঁক দিলেন : কফি!

অমন একটা জমজমাট আড্ডা ভেঙে দিতেই যেন এই লোকটির আবির্ভাব! আমার একটু খারাপ লাগছিল। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালুম। তিনি যেন আমার মনের কথা টের পেয়ে কেমন চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিলেন এবং নস্যির কৌটো বের করে নস্যি নিলেন।

গোপীমোহনবাবু আমাদের দেখে নিয়ে বললেন,—কথাবার্তা একেবারে প্রাইভেট কর্নেলসায়েব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই! উনি বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মিঃ কে. কে. হালদার। আর এর নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। দুজনই আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আমার কোনও কথা এই দু'জনের কাছে গোপন থাকে না। তার চেয়ে বড়ো কথা, আপনার নিজের মুখে আপনার সমস্যার কথা এঁরা শুনলে আমার এবং আপনার দুজনকারই সুবিধে হবে। আপনি তিন-তিনটি মস্তিষ্কের সাহায্য পাবেন। তাই না?

গোপীমোহনবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আপনার যা অভিরুচি কর্নেলসায়েব! তবে ওই যে কথাটা বললুম। গরজ বড়ো বালাই! গ্রাম্য কথা। কিন্তু কথাটা কত খাঁটি তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই আপনার উত্তরের অপেক্ষায় বসে না থেকে এই বৃষ্টিবাদলার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি। বিপদের ওপর বিপদ। ট্রেন লেট করার জন্য সন্ধ্যা সাতটায় শেয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেছি। তিন ঘণ্টা লেট! ফেরার ট্রেন রাত বারোটা পঁচিশে। আর লেট না করলে পাক্কা তিন ঘণ্টার জার্নি! কী সাংঘাতিক রিস্ক নিয়ে এসেছি বুঝুন!

—বুঝলুম। ফেরার ট্রেন লেট না করলে আপনি রাত তিনটে পঁচিশে বা সাড়ে তিনটে নাগাদ স্টেশনে নামবেন। তারপর ভোরবেলা পর্যন্ত আপনাকে স্টেশনেই বসে থাকতে হবে। সম্ভবত ছোটো স্টেশন। শেষ রাত্রে নিঝুম খাঁ-খাঁ অবস্থা। আপনি প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করবেন, এই বুঝি সেই ভয়ঙ্কর প্রেতাত্মা এসে আপনার সামনে দাঁড়াল!

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। কর্নেলের কথা শেষ হতেই বলে উঠলেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—প্রেতাত্মা। চলতি কথায় ভূত।

হাসতে-হাসতে বললুম,—আবার সেই ভূত?

গোপীমোহনবাবু আমার প্রতি যেন ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, —আপনারা কলকাতার মানুষ। আমাদের মতো গ্রামের মানুষদের সমস্যার কথা বুঝবেন না।

এবার গম্ভীর হয়ে বললুম,—সমস্যাটা খুলে বললে নিশ্চয়ই বুঝব। দরকার মনে করলে খবরের কাগজেও লিখব। তবে সমস্যাটা ভূতপ্রেতসংক্রান্ত হলে অন্য কথা।

গোপীমোহনবাবু তেমনই ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বললেন,—আপনারা কলকাতায় সারাক্ষণ ভিড়ের মধ্যে থাকেন। চব্বিশ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পান। রাতবিরেতে আলো জ্বলে। পাখা ঘোরে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা এর উলটো।

—কেন, আজকাল গ্রামেও তো বিদ্যুৎ গেছে। এই তো সেদিন বিদ্যুৎ দফতরের কর্তারা সাংবাদিকদের জানালেন, বিদ্যুৎ এত উদ্বৃত্ত যে—

থামুন স্যার! —গোপীমোহনবাবু চটে গেলেন : বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত হলে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতের অমন অবস্থা কেন? পাখা ঘোরে, হাওয়া পাই না। পাঁচশো পাওয়ারের বালব জ্বালালেও আলো থাকে না। হ্যারিকেন জ্বালতে হয়। তার ওপর বিদ্যুতের ভূতুড়ে লুকোচুরি খেলা। এই একটুখানি ঝিলিক দিয়েই চলে গেল তো গেল। ব্যস! আর দেখা নেই। সত্যিকার ভূতের উপদ্রবের চেয়ে গ্রামের বিদ্যুৎ আরও সাংঘাতিক ভূতুড়ে। এ সব লিখবেন কাগজে? পারবেন না। লিখবেন না। কারণ এ সব কথা লিখলে কাগজে বছরে লাখ-লাখ টাকার বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে যাবে।

কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। এই সময় ষষ্ঠীচরণ কফি নিয়ে এল। কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন,—কফি খান গোপীমোহনবাবু!

গোপীমোহন হাজরা কফির কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন,—আসলে আমার সমস্যার সঙ্গে আমাদের ঝাঁপুইহাটির বিদ্যুতের সমস্যাও জড়িয়ে গেছে। রাতবিরেতে উজ্জ্বল আলো থাকলে ব্যাটাচ্ছেলের কখনও আমার ঘরের জানালায় উঁকি মারার সাধ্য ছিল না।

কর্নেল বললেন,—আপনার চিঠিতে ভূতের উপদ্রবের কথা ছিল। কিন্তু আমি তো ভূতের ওঝা নই। তাই উত্তর দেব কি না ঠিক করতে পারিনি। যাই হোক, আপনি নিজে এসে গেছেন যখন, তখন ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন। শোনা যাক। তারপর দেখব কী করতে পারি।

গোপীমোহনবাবু বললেন,—চিঠিতে তো সব কথা খুলে লেখা যায় না। তা ছাড়া ঝাঁপুইহাটির সাবেক জমিদারবংশের কর্মচারী আমি। কর্তাবাবুর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে তাঁর কথামতো চিঠিটি লিখেছিলুম।

—আপনার কর্তাবাবুর নাম কী?

—আজ্ঞে, জয়কুমার রায়চৌধুরি। বয়স প্রায় আশি বছর হবে। কিন্তু এখনও শক্তসমর্থ মানুষ।

—আপনি কি তাঁর বাড়িতেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে-টিয়ে করিনি। কর্তাবাবুর অন্নজলে বেঁচে আছি। মাইনেও যা পাই, দিব্যি চলে যায়।

—আপনার কাজটা কী?

—বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করা। কর্তাবাবুর জরুরি চিঠিপত্র লিখে দেওয়া। আমাকে ওঁর বাড়ির কেয়ারটেকার-কাম-প্রাইভেট সেক্রেটারিও বলতে পারেন। ওঁর জমিজমার ব্যাপারটা দেখাশুনা করে একজন। তার নাম কালীনাথ। সে এক পালোয়ান।

—কর্তাবাবুর স্ত্রী বা সন্তানাদি—

গোপীমোহনবাবু কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—স্ত্রী বেঁচে নেই। দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড়ো ছেলে থাকে আমেরিকায়। ছোটো ছেলে বোম্বেতে। মেয়ের শ্বশুরবাড়ি কলকাতায়। কর্তাবাবু একা থাকেন। কখনও-সখনও ছেলেমেয়ে, জামাই আর নাতি-নাতনিরা আসে। তাদের পাড়াগাঁয়ে থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু কর্তাবাবু পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক পা নড়তে চান না। বলতে গেলে, আমরাই ওঁর ফ্যামিলির লোক। আমি, কালীনাথ, ভোলা আর তার বউ শৈল—তাছাড়া আছে রান্নার ঠাকুর নকুল মুখুজ্জে। মুখুজ্জেমশাই গৃহদেবতা রুদ্রদেবের সেবায়েত।

হালদারমশাই শুনতে-শুনতে এবার ধৈর্য হারিয়ে বলে উঠলেন,—ভূতের কথাটা আগে কইয়া ফ্যালেন মশয়! ভূত আপনার কী প্রবলেম বাধাইছে, তা-ই কন।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—গোপীমোহনবাবু ভূতটাকে ব্যাটাচ্ছেলে বলছিলেন। তার মানে সে পুরুষভূত। হ্যাঁ—এবার আপনি সেই ব্যাটাচ্ছেলে ভূতটার কথা বলুন!

গোপীমোহনবাবু বললেন,—ব্যাটাচ্ছেলে বলছি কি কম দুঃখে? বেঁচে থাকলে আপনি-আজ্ঞে করতুম। রাতবিরেতে আমার ঘরের জানালার ধারে এসে সে ফিসফিস করে বলে, আংটি দে! আংটি দে! কীসের আংটি, কার আংটি তা-ও তো জানি না।

—আহা, ভূতটা বেঁচে থাকতে অর্থাৎ জীবদ্দশায় কে ছিল, তাই বলুন!

—কর্তাবাবুর দূরসম্পর্কের এক ভাইপো ফেলারাম মুখুজ্জে। গতবছর এমনি বর্ষার রাত্রে কর্তাবাবু তাকে খুব বকাবকি করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা জানি না। কর্তাবাবু এমন রাশভারী মানুষ! বেশি প্রশ্ন করলে খুব চটে যান। তো সেই রাত্রে কখন ফেলারাম মুখুজ্জে বাড়ির পিছনে বটগাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করেছিলেন। ভোরবেলা শৈল ব্যাপারটা দেখে চ্যাঁচামেচি করেছিল। ওঃ! সে এক বীভৎস দৃশ্য!

—ফেলারামবাবুর ভূত প্রথম কবে আপনার জানালায় এসে উঁকি মেরেছিল?

—গতমাসে। তারিখ মনে নেই। খেয়েদেয়ে এসে শুতে যাচ্ছি, হঠাৎ লোডশেডিং! বিদ্যুৎ থাকলেও যে পাখার হাওয়ায় সুখে ঘুমুব, তার জো নেই। তবে পাখা ঘুরছে দেখলেও মনের শান্তি। তো প্রচণ্ড গরম। তাই ভাবলুম, বারান্দায় মাদুর পেতে শোব। মাদুর নিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ উত্তরের জানালার ওদিকে কে ফিসফিস করে বলে উঠল, আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে! আমরা পাড়াগাঁয়ের মানুষ। বিদ্যুৎ না হয় ক'বছর আগে এসেছে। আগে তো অন্ধকারে দিব্যি দেখতে পেতুম।

অধীর হয়ে গোন্দোপ্রবর বললেন,—ফেলারামকে জানালার ধারে দেখলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অন্ধকারে?

—ওই যে বললুম পাড়াগাঁয়ের মানুষ। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখলুম সেই ফেলারাম মুখুজ্জেই বটে! গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো আছে।

—তখন আপনি কী করলেন?

—তখন তো আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি। ভয়ে দিশেহারা হয়ে চিৎকার করে কালীনাথকে ডাকলুম। সে সাহসী। গায়ের জোরও আছে। সে দৌড়ে এসে আমার কথা শুনেই লাঠি আর টর্চ নিয়ে বাড়ির পিছনে চলে গেল। কাকেও দেখতে পেল না। সে হেসে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিল। তার কয়েকদিন পরে রাত্রিবেলা আবার জানালার ধারে ফেলারাম! গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো। আর ফিসফিস করে সেই একই কথা : আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে!

কর্নেল বললেন,—আপনার কর্তাবাবুর এ ব্যাপারে কী বক্তব্য?

গোপীমোহনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—প্রথম-প্রথম উনি আমার কথা গ্রাহ্য করেননি। একদিন উনি নিচের তলায় লাইব্রেরিঘরে বসে বই পড়ছেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। উনি রোজ রাত্রে লাইব্রেরিতে এসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বই পড়ে তারপর দোতালায় শুতে যান। উনি যতক্ষণ লাইব্রেরিতে থাকেন, ততক্ষণ কালীনাথ বারান্দায় দরজার কাছে বসে থাকে। তো হঠাৎ কর্তাবাবু শুনতে পেলেন, জানালার ওধারে কে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলছে—আংটি দে! আংটি দে! আংটি দে! কর্তাবাবু তাকিয়ে দেখেন গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো সেই ফেলারাম মুখুজ্জে! কর্তাবাবু রাগী মানুষ। কালীনাথকে ডেকে বললেন, ধর তো ফেলারামকে! হতভাগা মরে গিয়েও জ্বালাচ্ছে! কালীনাথ খুঁজে হন্যে হয়ে ফিরে এসেছিল।

—তাহলে আপনি আর আপনার কর্তাবাবু ছাড়া আর কেউ ফেলারাম মুখুজ্জের ভূতকে দেখতে পায়নি?

—আজ্ঞে না। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ব্যাটাচ্ছেলের সাহস বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহে তিনরাত্রে তিনবার সে দেখা দিয়েছে। আংটি চেয়েছে। বুদ্ধি করে টর্চ রেখেছিলুম। টর্চ জ্বাললে কিন্তু তাকে দেখতে পাইনে। টর্চ যেই নিভিয়ে দিই, অমনি সে আংটি চায়। এর মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছিনে। বলবেন, ওঝা ডাকিনি কেন? ডেকেছিলুম। নকুল মুখুজ্জেমশাই ধার্মিক মানুষ। শান্তিস্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ সব করেছেন। এমনকী কদিন আগে গয়ায় গিয়ে ফেলারামের পিণ্ডিও দিয়ে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! ব্যাটাচ্ছেলে এখনও জ্বালাচ্ছে রাত-বিরেতে। গতরাত্রেও একই কাণ্ড। অগত্যা আপনার কাছে ছুটে আসতেই হল।

—তাহলে আমি কী করতে পারি বলে আপনার ধারণা?

গোপীমোহনবাবু চাপাগলায় বললেন,—কর্তাবাবু খুলে কিছু বলছেন না। তবে উনিই কার কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে আমাকে চিঠি লিখতে বলেছিলেন। আজ ওঁর হুকুমেই এসেছি। ওই আংটির ব্যাপারটা নিয়ে আমারও বেজায় খটকা বেধেছে।

হালদারমশাই এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—হঃ! খটকা আমারও বাধছে। ভূত আংটি চায় ক্যান? কর্নেলস্যার! হেভি মিস্ট্রি!

দুই

এর পর বরাবর যা হয়ে থাকে তা-ই হল। 'হেভি মিস্ট্রি'-র প্রবল আকর্ষণে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার ঝাঁপুইহাটির গোপীমোহন হাজরার সঙ্গী হলেন। গোপীমোহনবাবুর এতে আপত্তির কারণ ছিল না! বরং রাতের ট্রেনজার্নিতে এমন একজন গোয়েন্দা সঙ্গী পেয়ে তিনি খুশিই হলেন। দু'জনের মধ্যে কথা হল, গোপীমোহনবাবু শেয়ালদা স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। হালদারমশাই তাঁর বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

তবে গোপীমোহনবাবু কর্নেলকেও ঝাঁপুইহাটি যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে গেলেন। কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে জানিয়ে দিলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে পৌঁছুবেন।

প্রথমে গোয়েন্দাপ্রবর, তার কিছুক্ষণ পরে গোপীমোহনবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল চোখবুজে চুপচাপ চুরুট টানছিলেন। হঠাৎ চোখ খুলে সোজা হয়ে বসে বললেন,—মাই গুডনেস। ঝাঁপুইহাটির জয়কুমার রায়চৌধুরির কথা আমাকে বাবুগঞ্জের হেমেন্দ্র সিংহরায় বলেছিলেন! গত বছর শীতকালে আমি হেমেনবাবুর আমন্ত্রণে বাবুগঞ্জ গিয়েছিলুম। ওখানে গঙ্গার অববাহিকায় বিস্তীর্ণ একটা জলাভূমি আছে। সেখানে শীতের সময় অসংখ্য প্রজাতির হাঁস আর সারস আসে। একটা জলটুঙ্গির অদ্ভুত নাম! ডাকিনীতলা।

বললুম,—ডাকিনীতলা? সর্বনাশ! ডাকিনী মানেই তো ডাইনি। দেখেছিলেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—ডাইনিরা নাকি কামরূপ কামাখ্যা থেকে আস্ত উড়ন্ত গাছে চেপে রাতবিরেতে নানা দেশে যায়। জায়গা পছন্দ হলে সেখানেই গাছটা মূলসুদ্ধ বসিয়ে দেয়। আর সেই গাছের ডালে বসে চুল এলিয়ে বাতাসের সুরে গান গায়। সেই গাছ সে-এলাকার লোকে চিনতে পারে না! বাবুগঞ্জের লোকেরা জলাভূমির একটা জলটুঙ্গিতে গাছটাকে চিনতে পারেনি। আমার মতে, ওটা ডাইনির স্পেসশিপ বা প্লেনও বলতে পারো! হয়তো কলকব্জা বিগড়ে যায় বলেই ডাইনি বেচারিকে সেখানেই ল্যান্ড করতে হয়। যাই হোক, এবার ডাইনি বেচারির দুঃখটা বুঝতে চেষ্টা করো ডার্লিং! সে আসলে নির্বাসিত। দেশে ফেরার উপায় নেই। তাই সে গান গায় না। কাঁদে। বাতাসের সুরে কাঁদে। এই হল আমার সিদ্ধান্ত।

কর্নেলের কথা শুনে হেসে আমি অস্থির। বললুম,—ঠিক বলেছেন। ডাকিনীতলার ডাইনিবেচারির কান্না আপনি তাহলে শুনেছিলেন?

—শুনেছিলুম বইকী। বিস্তীর্ণ বিলে নৌকোয় চেপে পাখিদের ছবি তুলে ফিরে আসছিলুম। সঙ্গে হেমেনবাবু। তাঁরও আমার মতো পাখিটাখির বাতিক আছে। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুয়াশামেশানো জ্যোৎস্নায় মনে হল, কে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হেমেনবাবুকে কথাটা বললুম। উনি বললেন, হ্যাঁ। এই শব্দটা কীসের, তা বোঝা যায় না। আমি বহুবার শব্দটা শুনেছি!

—সত্যি?

—নির্ভেজাল সত্যি ডার্লিং! বড়ো রহস্যময় সেই সুরেলা কান্না। নৌকোর মাঝিরা বিড়বিড় করে 'জয় মা জয় মা' বলতে-বলতে নৌকোর গতি বাড়িয়ে দিল।

—আশ্চর্য! আপনি ওই রহস্যটার সমাধান করে এলেন না?

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—সমাধান করেছিলুম বইকী!

—কীসের শব্দ ওটা?

—বললুম তো! নির্বাসিতা ডাইনির সুর ধরে কান্না! বেহালার সুরের মতো!

—ভ্যাট! আপনি রসিকতা করছেন।

কর্নেল হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন,—রসিকতা নয়। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিটার দক্ষিণে বাবুগঞ্জ। দূরত্ব প্রায় আধ কিলোমিটার। আর ওটার পূর্বে ঝাঁপুইহাটি। ঝাঁপুইহাটির দূরত্ব জলটুঙ্গিটা থেকে বড়োজোর তিনশো মিটার। ঝাঁপুইহাটির একটা অংশ লেজের মতো এগিয়ে এসেছে বিলের দিকে। তো হেমেনবাবুকে কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই রহস্যময় শব্দটাকে বেহালার সুরের সঙ্গে তুলনা করেছিলুম। তখন উনি বলেছিলেন, ঝাঁপুইহাটির জমিদারবংশে বরাবর গানবাজনার চর্চা ছিল। এখন ওদের বংশে যিনি আছেন, তাঁর নাম জয়কুমার রায়চৌধুরী। এখন আর তিনি গানবাজনার চর্চা করেন না। তবে ওঁর একজন কর্মচারীকে এখনও বহাল রেখেছেন। কারণ কর্মচারীটি চমৎকার বেহালা বাজায়। হেমেনবাবুর এইসব কথা শুনে বলেছিলুম, সেই বেহালাবাদক কর্মচারী ডাকিনীতলায় রাতবিরেতে এসে বেহালা বাজান সম্ভবত। হেমেনবাবু হেসে অস্থির হয়ে বলেছিলেন, কিছু বলা যায় না। লোকটা বড্ড খেয়ালি স্বভাবের। সবসময় সঙ্গে বেহালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

কর্নেল চুপ করলে বললুম,—তাহলে ডাকিনীতলায় শীতের রাতে সেই লোকটাই গিয়ে বেহালা বাজায়? কেন বাজায়?

কর্নেল আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। চুরুট কামড়ে ধরে চোখ বুজলেন। সুতোর মতো নীল আঁকাবাঁকা ধোঁয়া তাঁর টাকের ওপর এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে যেতে থাকল।

ফের বললুম,—লোকটার মাথায় তাহলে ছিট আছে!

কর্নেল একেবারে ধ্যানমগ্ন বেগতিক দেখে আমি উঠতে যাচ্ছি। ডোরবেল বাজল। অমনি কর্নেলের ধ্যানভঙ্গ হল। যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

কর্নেলের এই ড্রয়িংরুমে বাইরে থেকে ঢুকতে হলে ছোটো একটা ওয়েটিং রুমের মতো ঘর পেরিয়ে আসতে হয়। কর্নেল কোনও কাজে ব্যস্ত থাকলে ষষ্ঠীকে বলে রাখেন,—কেউ এলে ও ঘরে কিছুক্ষণ বসতে বলবি। সময়মতো আমি ডেকে নেব।

ডোরবেল বাজার কিছুক্ষণ পরে ষষ্ঠীচরণ ড্রয়িংরুমে ঢুকে একগাল হেসে বলল,—কী কাণ্ড দেখুন বাবামশাই! একেবারে মাথাখারাপ যাকে বলে!

কর্নেল বললেন,—সেই ভদ্রলোক এসেছিলেন?

—আজ্ঞে। ও-ঘরে উনি—

—বেহালা রেখেছিলেন। কিন্তু যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলেন?

—আজ্ঞে বাবামশাই! মজার লোক। দরজা খুললুম। উনি আমার পাশ কাটিয়ে ঢুকে চেয়ার থেকে নীল কাপড়ের মোড়কে ঢাকা কী একটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন। এখন মনে হচ্ছে, ওটা বেহালাই বটে! আশ্চর্য ব্যাপার! একটা কথাও বললেন না। আমি তো হতভম্ব! পরে মনে পড়ল, প্রথমবার আসবার সময় ওটা ওঁর হাতে দেখেছিলুম।

ষষ্ঠীচরণ হাসতে-হাসতে ভেতরে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে বললুম,—গোপীমোহন হাজরা তা হলে ঝাঁপুইহাটি জমিদারবাড়ির সেই বেহালা-বাজিয়ে কর্মচারী?

কর্নেল বললেন,—গোপীমোহনবাবুর সিঁথিকরা লম্বা চুল দেখেই আমার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সম্ভবত যাত্রা-থিয়েটার বা গানবাজনা করেন। গ্রাম্য বেহালা-বাজিয়েদের ওই রকম টিপিক্যাল চেহারা হয়। হেমেনবাবুর কথাটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝেছিলুম, গোপীমোহন হাজরাই সেই বেহালা-বাজিয়ে কর্মচারী। কিন্তু ওঁর সঙ্গে বেহালা দেখিনি বলে দ্বিধায় পড়েছিলুম।

বললুম,—কিন্তু এই ভদ্রলোক শীতের রাতে ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে বেহালা বাজাতে যান কেন?

কর্নেল হাসলেন,—হয়তো ডাকিনীতলার মাহাত্ম্য বজায় রাখতে চান। রাতবিরেতে বিলে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। তাদের মুখে-মুখে মাহাত্ম্য রটে যায় ডাকিনীর। পুজোআচ্চা হয়। মানতের পয়সাকড়ি পড়ে।

—বুঝলুম। কিন্তু ওঁর কথাবার্তা-হাভভাবে কোনও পাগলামির লক্ষণ তো দেখলুম না। দিব্যি সুস্থ মানুষ। টনটনে জ্ঞানবুদ্ধি।

—হ্যাঁ। তবে গলায় দড়ির ফাঁস এঁটে ফেলারাম মুখুজ্জের ভূত কেন ওঁকে আংটি চাইতে আসে, এটাই অদ্ভুত। দেখা যাক, হালদারমশাই কতটা এগোতে পারেন।

—আপনি কবে ঝাঁপুইহাটি যাবেন তাহলে?

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—তোমার কৌতূহল তীব্র হয়ে উঠেছে, তা টের পাচ্ছি। অপেক্ষা করে থাকো! সময় হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।

সত্যি বলতে কী, আংটি চাইতে আসা গলায়-দড়ি ভূতটার চেয়ে জলটুঙ্গিতে ডাকিনীতলায় গোপীমোহন হাজরার রাতবিরেতে বেহালা বাজানোর ব্যাপারটা আমার কৌতূহল তীব্র করেছিল। পরদিন বিকেলে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে বসে পুলিশসূত্রে পাওয়া দুটো ডাকাতি আর তিনটে ছিনতাই কেসের খবর লিখছি, সেই সময় কর্নেলের টেলিফোন এল,—জয়ন্ত! বাড়ি ফেরার পথে আমার ডেরায় এসো!

বললুম,—ঝাঁপুইহাটিতে নতুন কিছু কি ঘটেছে?

—ফোনে কিছু বলা যাবে না। রাখছি।

তাড়াতাড়ি খবরগুলো লিখে চিফ রিপোর্টারের টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লুম। তখন প্রায় সাড়ে ছটা বাজে। কাল সন্ধ্যার মতোই টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির লনে একপাশে গাড়ি রেখে যখন তিনতলায় তাঁর অ্যাপার্টমেন্টের ডোরবেলের সুইচ টিপলুম, তখন উত্তেজনায় আমার আঙুল কাঁপছিল।

ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে মুচকি হেসে চাপাস্বরে বলল,—টিকটিকিবাবুর অবস্থা দেখুনগে দাদাবাবু!

সে হালদারমশাইকে আড়ালে টিকটিকিবাবু বলে। দ্রুত ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলুম, হালদারমশাই মাথার মাঝখানে একটা পট্টি বেঁধে বসে আছেন। বললুম,—কী সর্বনাশ! আপনার মাথায় ব্যান্ডেজ কেন হালদারমশাই?

হালদারমশাই বিমর্ষমুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—তেমন কিছু না। কোন ব্যাটায় ঢিল ছুড়ছিল। একখান ঢিল আইয়া মাথায় পড়ল।

—কবে? কখন?

—আইজ দুপুরবেলায়।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ছড়ায় আছে না? 'ঠিক দুপ্পুর বেলা/ভূত মারে ঢেলা।'

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—ভূত না। মাইনষের কাম। জমিদারবাড়িতে লাঞ্চ খাইয়া বাড়ির আশপাশ দেখতে বারাইছিলাম। গ্রামের শেষদিকটায় বাড়ি। পশ্চিমদিকে ঝোপ-জঙ্গল। হাঁটতে-হাঁটতে কতকদূর যাইয়া দেখি ব্যাবাক জল। আমাগো পূর্ববঙ্গের মতো বিশাল বিল। একটা ঝাঁকড়া গাবগাছের তলায় খাড়াইয়া ছিলাম। হঠাৎ ঢিল পড়তে থাকল। রিভলভার রেডি ছিল। কইলাম, গুলি করুম। অমনি একখান ঢিল আইয়া মাথার মধ্যিখান পড়ল। এইটুখানি ঢিল। কিন্তু মাথার চামড়া কাইট্যা রক্ত পড়তে থাকল। রাগে এক রাউন্ড ফায়ার করলাম। তখন ঢিল পড়া বন্ধ হইয়া গেল।

জিগ্যেস করলুম,—গাবগাছের ওপর থেকে কি ঢিল পড়ছিল?

—নাঃ! ঝোপের দিক থেকে ব্যাটায় ঢিল ছুড়ছিল। ফায়ার করছি সেই দিকেই। কিন্তু গুলি লাগলে ট্যার পাইতাম।

—তারপর আপনি জমিদারবাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন?

—হঃ!

—ব্যান্ডেজ কে বেঁধে দিল?

—জয়কুমারবাবুর ফার্স্টএডের বাকসো ছিল। বুড়া হইলে কী হইব? সব কামে উনি পাকা। নিজের হাতে ব্লেডে মাথার এক ইঞ্চি চুল চাঁছলেন। ওষুধ দিয়া ব্যান্ডেজ করলেন। তো উনি কইলেন, বিলের ধারে ওই গাবগাছের খুব বদনাম আছে। দিনদুপুরেও পারতপক্ষে কেউ একা সেখানে যায় না।

—তাহলে ঝাঁপুইহাটি দেখছি খুব রহস্যময় জায়গা। আনাচে-কানাচে ভূতেরা ঘুরে বেড়ায়।

হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—কর্নেলস্যারের লগে পরামর্শ করা দরকার। তাই ফেরত আইলাম। আরও খান দুই মিসটিরিয়াস ঘটনা ঘটছে।

ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে গেল। কর্নেল বললেন,—আবার এক পেয়ালা গরম কফি খান হালদারমশাই! আপনার নার্ভ আরও চাঙ্গা হবে।

খামু? তা আপনি যখন কইতাছেন, খাই। —বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কফির পেয়ালা তুলে অভ্যাসমতো ফুঁ দিয়ে তারপর চুমুক দিলেন।

কর্নেল বললেন,—তাহলে জয়ন্ত, বুঝতেই পারছ ঝাঁপুইহাটি কী সাংঘাতিক জায়গা ঝোপজঙ্গল থেকে আচমকা কেউ ঢিলের বদলে মারাত্মক কিছু ছুড়ে মারলেই বিপদ।

হালদারমশাই বললেন,—কইলাম ঢিল। কিন্তু মাটির ঢিল নয়, পাটকেল কইতে পারেন। অথচ ওখানে ইট-পাটকেল দেখি নাই। নরম মাটি। কোন ব্যাটায় পাটকেল ছুড়ছিল। তার মানে, আমারে সে ফলো করছিল। অনেকগুলি পাটকেল সঙ্গে নিছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি এক রাউন্ড ফায়ার করে ভালোই করেছেন হালদারমশাই। ভূত হোক, আর মানুষ হোক, ফায়ার আর্মসকে ভয় পায়। এবার সে সতর্ক হবে।

বললুম,—আর দুটো রহস্যময় ঘটনা কী হালদারমশাই?

হালদারমশাই বললেন,—জয়কুমারবাবু দোতলার একখান ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা করছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় চাইরটা। বৃষ্টি ছিল। সবে পোশাক বদলাইয়া চেয়ারে বসছি। আর সেই

পালোয়ান কাশীনাথ মশারি লইয়া ঘরে ঢুকছে। বিদ্যুৎ ছিল লো ভোল্টেজ। উত্তরের জানালা দিয়া হঠাৎ দেখি আবছা আলোতে বৃষ্টির মধ্যে বটতলার দিকে কেউ যাইতাছে। তখনই টর্চের আলো ফোকাস করলাম। এক সেকেন্ডের জন্য চোখে পড়ল, সেই লোকটার গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো।

—তারপর? তারপর?

—তারপর সে ভ্যানিশড। কাশীনাথ কইল, ও কিছু না। কিন্তু আমি ট্রেনজার্নিতে টায়ার্ড। সারা রাত্র জাগছি। ঘুম আসতাছে। তাই শুইয়া পড়লাম।

—আর-একটা রহস্যময় ঘটনা কী?

—আইজ সকাল দশটায় ব্রেকফাস্ট করছিলাম। তারপর সেই বটগাছের কাছে তদন্ত করতে গেলাম। গিয়া দেখি, গাছটার গুঁড়ির উল্টোদিকে কাদার কয়েকখান ছাপ। কেউ গাছে চড়ছিল। রাত্রিবেলা—মানে কাইল শেষরাত্রে যারে দেখছিলাম সেই গাছে চড়ছিল। ক্যান? হেভি মিস্ট্রি।

—হেভি মিস্ট্রি তো বটেই। ভূতের পায়ে কাদা লাগবে আর সেই পায়ের ছাপ গাছের গুঁড়িতে দেখতে পাওয়া যাবে, এ কেমন ভূত?

গোয়েন্দাপ্রবর মাথা নেড়ে বললেন,—ভূত না। মাইনষের কাম। কথাটা আমি জয়কুমারবাবুর লগে আলোচনা করলাম। উনি কইলেন, মাইনষের কামই বটে। কিন্তু উনি স্বচক্ষে যারে জানালার বাইরে দেখছিলেন, সে সেই ফেলারাম ছাড়া আর কেউ না। অথচ চিতায় তার ডেডবডি পুইড়া কবে ছাই হইয়া গেছে। আমি কইলাম, আপনার চোখের ভুল হইতেও পারে। উনি কইলেন, না। উনি নাকি ঠিকই দেখছিলেন।

—আপনি আংটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি?

—করছিলাম। উনি কইলেন, আংটির কথা উনি জানেন না। ফেলারামের আঙুলে উনি আংটি দেখেন নাই। আংটি সে পাবে কোথায়? উড়নচণ্ডী নেশাখোর চালচুলোহীন লোক। দয়া কইর‍্যা বাড়িতে আশ্রয় দিছ্‌লেন। প্রায়ই সে নাকি বাড়ির দামি জিনিসপত্র চুরি করত। কোথায় কারে বেইচ্যা আসত। জয়কুমারবাবুর লাইবেরির কত দামি বই সে চুরি কইর‍্যা কোথায় কারে বেচছিল। তবে এইজন্য উনি ফেলারামবাবুরে শুধু বকাবকি করতেন। তার বেশি কিছু না।

বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—কর্নেলস্যার! আমি এবার যাই গিয়া। যা-যা কইছেন, সেই-সেইমতো কাম হইব।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। চোখ না খুলেই বললেন,—হ্যাঁ। আপনি বাসেই সোজা বাবুগঞ্জে চলে যান। আমার চিঠিটা হেমেনবাবুকে দেবেন। আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। আজ দুপুরে আমি হেমেনবাবুকে ট্রাংককল করে আমার যাওয়ার কথা বলেছি।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—বাবুগঞ্জে টেলিফোন আছে নাকি?

—বাবুগঞ্জ মফস্বল শহর হয়ে উঠেছে। সেখানেই বিদ্যুতের সাব-স্টেশন, থানা, হাসপাতাল, বাজার। পাশের গ্রাম ঝাঁপুইহাটির বিশেষ উন্নতি হয়নি। তবে রেললাইনের কাছাকাছি গ্রাম ঝাঁপুইহাটিতে একসময় রায়চৌধুরি বংশের জমিদারি দাপট ছিল বলেই স্টেশনের নাম ঝাঁপুইহাটি থেকে গেছে।

হালদারমশাই বললেন,—আমি ঝোঁকের মাথায় অন দা স্পটে গিয়ে ঠিক করি নাই। বাইরে কোথাও শেল্টার লইয়া জমিদারবাড়িতে লক্ষ রাখলে কাম হইত। কর্নেলস্যার! যাই গিয়া।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেইসময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। ...হ্যাঁ। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...হেমেনবাবু? এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার যাচ্ছেন। ...কী? কী?... সর্বনাশ! কখন?... আপনি কী করে খবর পেলেন?...কে এসেছিল? একটু জোরে বলুন প্লিজ!... হ্যাঁ। আমি মর্নিংয়ে যাব। ... জোরে বলুন! লাইন ডিসটার্ব করছে!... হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

বুঝলুম, লাইন কেটে গেল। ট্রাংককলে এত বেশি কথা বলার সময় পাওয়া যায় না। একটা কথা। এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন মফস্বলে এস টি ডি লাইন চালু হয়নি। সে যাই হোক, রিসিভার রেখে কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—গোপীমোহনবাবুর ডেডবডি পাওয়া গেছে বিলের ধারে। একদল জেলে যথারীতি সূর্যাস্তের পর বিলে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। তারাই দেখতে পায় গোপীমোহন হাজরা উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মাথার পিছনটা রক্তাক্ত। আততায়ী অতর্কিতে পিছন থেকে শক্ত কিছু দিয়ে মাথার পিছনে আঘাত করেছিল। এর পর জয়কুমারবাবুর বাড়ি থেকে কেউ বাবুগঞ্জ থানায় খবর দিতে গিয়েছিল। সে-ই হেমেন্দ্র সিংহরায়কে খবরটা জানিয়ে গেছে। এর বেশি কিছু বুঝতে পারলুম না।

কর্নেলের কথা শেষ হওয়ার পরই হালদারমশাই কোনও কথা না বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন। আমি হতবাক হয়ে শুনছিলুম। এবার বললুম,—মনে হচ্ছে, হালদারমশাই হঠাৎ চলে এসে ভুল করেছেন। উনি ওখানে থাকলে খুনি যে-ই হোক, সে হতভাগ্য গোপীমোহনবাবুকে মেরে ফেলার ঝুঁকি নিত না।

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে ফেলে বললেন,—একটা ব্যাপার স্পষ্ট হল। ভূতের ভয় দেখিয়ে কাজ হচ্ছে না এবং কলকাতা থেকে গোয়েন্দা আনা হয়েছে। কাজেই ভূতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

তিন

পরদিন কর্নেল এবং আমি বাসে চেপে বাবুগঞ্জ পৌঁছুলুম। তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে। আকাশ মেঘলা। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাস থেকে নেমে দু'জনে বাসস্ট্যান্ডের ছাউনির তলায় গিয়ে রেনকোট পরে নিলুম। কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগ হাতে নিলেন। আমি একটা বড়সড় নীলরঙের পলিথিন ব্যাগ নিয়েছিলুম। তাতে কর্নেলের কিছু পোশাক-আশাক ঠাসা ছিল।

কর্নেল বললেন,—শর্টকাটে হেমেনবাবুর বাড়ি এখান থেকে তত কিছু দূর নয়। চলো! হেঁটে যাওয়াই ভালো। সাইকেলরিকশোতে যেতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে।

বাসস্ট্যান্ডের চারদিকে বাজার। বৃষ্টির মধ্যেও ছাতি মাথায় মানুষজন ভিড় জমিয়েছে। ট্রাক-বাস-টেম্পো-সাইকেলরিকশোর ভিড়ও যথেষ্ট। জল-কাদাও চারদিকের চত্বরে থকথক করছে। এর মধ্যে দিয়ে কর্নেল পায়ে হেঁটে যেতে চাইছেন শুনে বিব্রত বোধ করছিলুম।

কিন্তু আমরা বাসস্ট্যান্ডের ছাউনি থেকে সবে বেরিয়েছি, একটা মাঝবয়সি লোক এসে সেলাম দিল। কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন,—আরে অনিল যে! তুমি বাজারে এসেছিলে বুঝি?

অনিল নামে লোকটা বলল,—না স্যার! বাবু আপনার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন! ওই দেখুন গাড়ি। বাবু বলেছেন, বাস লেট করলে বৃষ্টিতে সায়েব ভিজে যাবেন। চলুন স্যার!

বাসস্ট্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চওড়া রাস্তার পাশে একটা সাদা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। আমরা সেই গাড়িতে উঠে বসলুম। অনিলই ড্রাইভার। কিছুদূর দুধারে দোকানপাট। তারপর ডাইনে ঘুরে সুন্দর ছবির মতো একতলা-দোতলা বাড়ি এবং সাজানো ফুলবাগিচা। অনিল বলল,—বাবু এই নিউ টাউনশিপে এক বিঘে জায়গা কিনে রেখেছিলেন। নতুন বাড়ি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সাবেক বাড়ি ছেড়ে আসতে পারলেন না। জায়গাটা দশলাখ টাকায় বেচে দিয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—আমার মতে, ভালোই করেছেন। গঙ্গার ধারে পৈতৃক বাড়ি ফেলে এখানে চলে আসার মানে হয় না। পশ্চিমে গঙ্গা, উত্তরে বিল। অমন জায়গা ছেড়ে আসতে আছে?

—আজ্ঞে তা অবিশ্যি ঠিক। তবে যা দিনকাল পড়েছে, ওদিকটায় জল-ডাকাতদের বড্ড উপদ্রব। নৌকোয় চেপে ডাকাতরা এসে কতবার হামলা করেছে। বাবুপাড়ার সব পয়সাওয়ালা লোক টাউনের ভেতরদিকে ক্রমে-ক্রমে চলে এসেছেন। শুধু আমার বাবুমশাই সাহস করে আছেন।

—আচ্ছা অনিল, বাসে আসবার সময় শুনলুম, ঝাঁপুইহাটিতে জমিদারবাড়ির কে নাকি খুন হয়েছে?

অনিল এবার বাঁদিকে সংকীর্ণ পিচরাস্তায় গাড়ি ঘোরাল। তারপর বলল,—ও বাড়িতে গৃহদেবতার অভিশাপ লেগেছে স্যার! গতবছর এমনি বর্ষার রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল ফেলারাম মুখুজ্জে। এবার বর্ষায় আবার অপঘাতে মরল গোপীবাবু। আমি দেখতে যেতুম না। আমার বাবুর সঙ্গে জমিদারবাড়ির কর্তাবাবুর মেলামেশা আছে। তাই বাবু আমাকে বললেন, গাড়ি বের করো অনিল। ঝাঁপুইহাটি যাব। বর্ষায় রাস্তার মোরাম কাদা হয়ে গেছে। সাবধানে গাড়ি চালিয়ে গেলুম। গাড়ি জমিদারবাড়ির কাছে রেখে বাবুর সঙ্গে বিলের ধারে গিয়ে দেখি, পুলিশ এসে গেছে। গোপীবাবুর লাশ স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে গেল হাসপাতালের লোকেরা। শুনলুম, মাথার পেছনে ডাণ্ডা মেরেছে কেউ। বাবুমশাই থানার অফিসারদের সঙ্গে কীসব কথাবার্তা বললেন। তারপর ওঁরা জমিদারবাড়ি এসে ঢুকলেন। আমি গাড়িতে বসেছিলুম। গোপীবাবুর মতো লোককে কেউ মেরে ফেলবে এ কথা ভাবাই যায় না।

কর্নেল বললেন,—গোপীবাবু নাকি ভালো বেহালা বাজাতেন?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। জমিদারবাড়িতে একসময় গানবাজনার চর্চা ছিল। তাছাড়া আমাদের বাবুগঞ্জে ফাংশান হলেই গোপীবাবুকে বেহালা বাজানোর জন্য খাতির করে ডেকে আনা হতো। একটু খামখেয়ালি লোক ছিলেন। হঠাৎ-হঠাৎ চটে যেতেন। কিন্তু বেজায় নিরীহ লোক। তাঁকে কে খুন করল, কেনই বা খুন করল বোঝা যায় না।

—বাসে আসবার সময় শুনছিলুম, জমিদারবাড়িতে নাকি গলায়-দড়ি ভূতের উপদ্রব আছে?

অনিল হাসল,—কথাটা ইদানীং বাবুগঞ্জেও রটেছে স্যার। পাশাপাশি গ্রাম। ঝাঁপুইহাটির লোকেরা বাজারে আসে। কাজেই ঝাঁপুইহাটিতে কিছু ঘটলে বাবুগঞ্জে তার খবর আসতে দেরি হয় না।

—তোমার কী ধারণা?

—আজ্ঞে স্যার, ভূত-পেরেত নিশ্চয় আছে। অপঘাতে মানুষ মরলে তার আত্মার মুক্তি হয় না। কাজেই ফেলারামবাবুর আত্মা জমিদারবাড়ি ছেড়ে যেতে পারছে না।

এবার আর এক বাঁক ঘুরে গঙ্গার বাঁধের সমান্তরাল রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে একটা পুরোনো বিশাল বাড়ির গেটে গাড়ি পৌঁছল। গেটে দারোয়ান ছিল। হর্ন শুনে গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো রাস্তায় এগিয়ে গাড়ি দাঁড়াল পোর্টিকোর তলায়। একজন শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক করজোড়ে নমস্কার করে সহাস্যে বললেন,—সুস্বাগতম!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—কী সৌভাগ্য! আপনার এই তরুণ সাংবাদিক বন্ধুর কথা শুনেছিলুম! আসুন জয়ন্তবাবু!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্তের কথা কি আপনাকে আমি বলেছিলুম?

—আপনি বলেননি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা বলেছে।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! ইনিই হেমেন্দ্রকুমার সিংহরায়। আমি বাইনোকুলারের সাহায্যে পাখি চিনতে পারি। হেমেনবাবু খালি চোখেই চিনে ফেলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ!

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে আমার কাঁধে হাত রেখে হলঘরে ঢুকলেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে বললেন,—দূরদৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি কর্নেলসায়েব। কাল বিকেলেই আমি নৌকো করে বিলে গিয়েছিলুম। জেলেদের মুখে খবর পেয়েছিলুম, স্লুইস গেটের পাশে অশ্বত্থ গাছে নাকি দুটো গগনবেড় পাখি এসেছে। গিয়ে তাদের পাত্তা পেলুম না। ফেরার সময় ডাকিনীতলা জলটুঙ্গির পশ্চিমদিক হয়ে আসছিলুম। তখন সূর্য মেঘের আড়ালে ডুবে গেছে। যে গাব গাছের তলায় গোপীবাবুর লাশ পাওয়া গেছে, সেদিকে আমি নিশ্চয়ই তাকিয়ে থাকব। অথচ গোপীবাবুকে দেখতে পাইনি। দেখতে পেলে উনি বেঁচে যেতেন। আমার হাতে বন্দুক ছিল। অথচ সময়ের হিসেবে দেখছি, ঠিক ওই সময় গোপীবাবু বিলের ধারে এসেছিলেন।

কর্নেল বললেন,—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে যাওয়াই ওঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবত।

—ঠিক ধরেছেন। গত শীতকালে আপনার কাছে আভাস পেয়ে আমি মজাটা দেখার জন্যে একদিন ওখানে গিয়ে ওত পেতেছিলুম। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যার একটু আগে ঝাঁপুইহাটির চরণজেলে ছোটো একটা নৌকা বেয়ে এল জেলেপাড়ার ঘাট থেকে। তারপর গোপীবাবুকে ডাকিনীতলায় পৌঁছে দিতে গেল। আপনি ঠিকই ধরেছিলেন। রাতবিরেতে গোপীবাবু ডাকিনীতলায় বেহালা বাজাতে যেতেন। চরণ ছিল তাঁর সঙ্গী।

দোতলার বারান্দায় হাঁটতে-হাঁটতে বললুম,—অদ্ভুত ব্যাপার! কেন ওঁরা—

আমার কথার ওপর হেমেনবাবু বললেন,—এই কেনটা আমাকেও বহুদিন জ্বালিয়েছিল। একদিন চরণকে হুমকি দিতেই সে রহস্যটা ফাঁস করে দিল। গোপীবাবুর নাকি গাঁজা খেলে বেহালার হাত ভালো খুলে যায়। রায়চৌধুরিমশাই টের পেলে বিপদ ঘটবে। তাই গোপনে ডাকিনীতলায় গিয়ে গাঁজা খেয়ে মনের সুখে গোপীবাবু বেহালা বাজাতেন। চরণও গাঁজার ভক্ত। মাঝে-মাঝে গাঁজা চটকে ছিলিম সাজিয়ে গোপীবাবুকে দেয় এবং তার প্রসাদ পায়। দুই গেঁজেলের কীর্তি! তবে শুনেছি, গাঁজা খেলে নাকি সত্যিই মনের কনসেন্ট্রেশন আসে। সাধুসন্ন্যাসীরা ধ্যানে বসার আগে সেইজন্য নাকি গাঁজা খান!

উত্তরদিকে শেষপ্রান্তের ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জানালা দিয়ে পশ্চিমে বাঁধের গাছপালার ফাঁকে বর্ষার উত্তরঙ্গ গঙ্গা এবং উত্তরের বিস্তীর্ণ জলাভূমি দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল বাইনোকুলারে একবার দেখে নিয়ে বললেন,—শীতকালের চেয়ে এখন বর্ষাকালেই প্রকৃতির রূপ বেশি খোলে।

হেমেনবাবু বললেন,—প্রকৃতির রূপ পরে দেখবেন। স্নান করতে হলে করে নিন। তারপর খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে বেরুবেন। না— এই অসময়ে কফি নয় কর্নেলসায়েব! আমারও খিদে পেয়েছে। আপনাদের সঙ্গে খাব বলে অপেক্ষা করছিলুম।

এতক্ষণে আমার হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম,—প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদারের খবর কী? ওঁর তো গতরাত্রেই এখানে আসবার কথা।

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—উনি গতরাত্রে বারোটা নাগাদ এসেছেন। কাল কর্নেলের ট্রাংককল পেয়ে আমি ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলুম। আজ ভোরে উনি বললেন, ওঁর পক্ষে ঝাঁপুইহাটির কাছাকাছি কোথাও থাকলে সুবিধে হয়। তাই ইরিগেশন বাংলোয় ওঁকে নিয়ে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। বাংলোটা বাবুগঞ্জের উত্তর-পূর্ব কোণে শেষপ্রান্তে। নিচেই বিল। চমৎকার জায়গা। ওদিকে ঝাঁপুইহাটিও খুব কাছে। একটা আমবাগান আর জটাবাবার থান পেরিয়ে নাকবরাবর সিধে হাঁটলে জমিদারবাড়ি আরও কাছে। সেচবাংলোয় টেলিফোন আছে। কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করে ওঁর খোজ নিলুম। কেয়ারটেকার শচীন বলল, মিঃ হালদার ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছেন।

কর্নেলের তো সামরিক জীবনের অভ্যাস। সপ্তাহে দু'দিন অন্তর স্নান করেন। তবে এটা এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। নভেম্বর থেকে মার্চ সপ্তাহে মাত্র একদিন। তবে গরম জলে শরীর স্পঞ্জ করেন মাঝে-মাঝে। আমি একা স্নান করতে বাথরুমে ঢুকলুম।

তারপর পোশাক বদলে বেরিয়ে এসে দেখি, হেমেনবাবুর সঙ্গে কর্নেল কথা বলছেন। হেমেনবাবুর একটা কথা কানে এসেছিল। 'জয়কুমারদা আংটির ব্যাপারটা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন।' আমাকে দেখে হেমেনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আমি লাঞ্চের ব্যবস্থা করি। রতন এসে আপনাদের ডেকে নিয়ে যাবে।

তিনি চলে গেলে কর্নেলকে বললুম,—আংটি রহস্য নিয়ে আপনাদের কথা হচ্ছিল। একটু আভাস অন্তত দিন!

কর্নেল হাসলেন,—আংটি এখনও রহস্য হয়েই আছে। জয়কুমারবাবু আংটির ব্যাপারে কী বুঝেছেন, তা হেমেনবাবুকে খুলে বলেননি। কাজেই তোমাকে কোনও আভাস দিতে পারছিনে।

বলে তিনি আমার ব্যাগ থেকে তাঁর একপ্রস্থ পোশাক আর তোয়ালে বের করে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। আমি পশ্চিমের জানালা দিয়ে গাছপালার ফাঁকে গঙ্গা দেখতে থাকলুম।

খাওয়ার ঘর নিচের তলায়। হেমেনবাবুর স্ত্রী সুষমা দেবী আমাদের খুব আদর-যত্ন করে খাওয়ালেন। কর্নেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। কর্নেলকে সুষমা দেবী পরিহাস করে বললেন, —কর্নেলসায়েব সেবার এসে বলেছিলেন, শিগগির আবার আসব। তো এমন সময় এলেন, বেড়াতে বেরুনোর উপায় নেই। আকাশের মুখ ভার। বৃষ্টি আর বৃষ্টি! বাবুগঞ্জের ইলিশ খেলেও পোষাত। এবার এখনও ইলিশের দেখা নেই।

হেমেনবাবু বললেন,—এবার বর্ষায় আশ্চর্য ব্যাপার! গঙ্গায় ইলিশ নেই! সেবার কর্নেলসাহেয়বকে শীতের সময়ও ইলিশ খাইয়েছিলুম।

এইসব কথাবার্তার মধ্যে খাওয়া শেষ হল। দোতলার সেই ঘরে এসে কর্নেল ইজিচেয়ারে আরাম করে বসে চুরুট ধরালেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুমের আশায় বিছানায় শুয়ে পড়লুম। কর্নেল বললেন,—আধঘণ্টা জিরিয়ে নাও। তারপর আমরা বেরুব।

বললুম,—বৃষ্টি তো বন্ধ হয়নি।

—হয়েছে। মেঘও কেটে যাচ্ছে। আশা করি বিকেলে একটুখানি রোদ্দুর ফুটবে।

কর্নেলের কথা সত্যি হল। তিনটে নাগাদ হেমেনবাবুর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে যখন চাপলুম, তখন আকাশ প্রায় পরিষ্কার। উজ্জ্বল রোদ্দুরে গাছপালা ঝলমল করছে। অনিল গাড়ি চালাচ্ছিল। বাজার পেরিয়ে সেই ব্যাসস্ট্যান্ডের সামনে দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর বাঁদিকে মোরামবিছানো লাল রাস্তায় গাড়ি বাঁক নিল। দুধারে সরকারের বনদফতরের তৈরি নানারকম গাছের জঙ্গল। তারপর ঝাঁপুইহাটি গ্রামে ঢুকল গাড়ি। টালি বা টিনের চালের বাড়ির পাশে ইটের বাড়িও চোখে পড়ল। একখানে সংকীর্ণ গলি রাস্তা দিয়ে ঘুরে অবশেষে উঁচু প্রকাণ্ড এবং জরাজীর্ণ একটা দেউড়ির কাছে গাড়ি থামাল অনিল। আমরা নেমে গেলুম। হেমেনবাবু বললেন,—এখানকার মাটির এই গুণ। শিগগির জল শুষে নেয় বলে তত কাদা হয় না। আজ রাত্রে যদি আর বৃষ্টি না হয়, মাটির রাস্তা শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে।

দেউড়ি আছে। কিন্তু কপাট নেই। হাট করে খোলা। অনিল হর্ন বাজিয়েছিল। একটু পরে একজন কালো দানবের মতো মানুষ, পরনে খাটো ধুতি এবং গায়ে ফতুয়া, করজোড়ে একটু ঝুঁকে প্রণাম করে বলল,—আসুন দাদাবাবু! কর্তামশাই আমাকে এখনই বলছিলেন, আপনার বাড়ি গিয়ে খবর নিয়ে আসি। তা ইনি সেই কর্নেলসায়েব? প্রণাম স্যার! আপনাকে দূর থেকে শীতের সময় দাদাবাবুর সঙ্গে নৌকোয় দেখেছিলুম। আসুন! ভেতরে আসুন!

হেমেনবাবু বললেন,—কালীনাথ! গোপীবাবুর বডি দাহ হয়ে গেছে তো?

—আজ্ঞে, সকালে আমরা পাড়ার কজনকে নিয়ে কেষ্টনগরে গিয়েছিলুম। ম্যাটাডোর ভাড়া করে বডি এনে আপনাদের বাবুগঞ্জের শ্মশানঘাটে দাহ করেছি। একটু আগে গঙ্গাস্নান করে ফিরেছি। গোপীদার ভাগ্য দাদাবাবু! শ্মশানে খুব ভিড় হয়েছিল। কতজনে ফুলের মালা দিয়ে ভক্তি জানাল।

—হ্যাঁ। গোপীবাবু জনপ্রিয় ছিলেন। ফাংশানে বা যাত্রা-থিয়েটারে বেহালা বাজাতেন। তো আমাকে একটু খবর দাওনি কেন?

—আজ্ঞে, মাথার ঠিক ছিল না। এখনও নেই। মাথামুন্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। সবাই বলছে, খুনি ভুল করে কাকে মারতে কাকে মেরেছে!

বাউন্ডারি ওয়ালের অবস্থাও শোচনীয়। দোতলা প্রাসাদতুল্য বাড়িটা অবশ্য অটুট আছে। একতলা এবং দোতলায় সারবন্দি মোটা থাম। প্রাঙ্গণের অনেকটা জুড়ে ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। বাড়ির সামনে কিছু অংশ পরিষ্কার। সেখানে বারান্দার একটা অংশ অর্ধবৃত্তাকারে বেরিয়ে এসেছে। কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে ওখানে উঠতে হয়। সেই অর্ধবৃত্তাকার জায়গায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পরনে পাজামা আর খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। মাথার চুল সাদা। গোঁফও সাদা। ফর্সা রং। চেহারায় বনেদি আভিজাত্যের ছাপ আছে।

আমাদের দেখে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তারপর ছড়িসুদ্ধ হাতে কর্নেলের হাত জড়িয়ে ধরে ধরাগলায় বললেন,—সেই তো এলেন। কিন্তু বড় দেরি করে এলেন কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—জয়কুমারবাবু! আমি জানি, আপনি বিদ্বান মানুষ। আপনি এটুকু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, ব্যাপারটা ভৌতিক বলেই আমি তত গুরুত্ব দিইনি। অবশ্য আংটির ব্যাপারটা শুনে আমি মনে-মনে একটা অঙ্ক কষেছিলুম। অঙ্কটা দেখা গেল ঠিক ছিল না। গোপীমোহনবাবু আমাকে নিশ্চয় সব কথা খুলে বলেননি। বললে আমার অঙ্ক হয়তো ঠিকই মিলে যেত।

জয়কুমারবাবু বললেন,—কালী! এই রোয়াকে কয়েকটা চেয়ার পেতে দে। এখানে ছায়া পড়েছে। খোলামেলা হাওয়ায় এঁদের বসাই। এই গ্রামে বিদ্যুতের যা দুরবস্থা!

অর্ধবৃত্তাকার রোয়াকে আমরা বসার পর জয়কুমারবাবু বললেন,—গোপী কি আপনাকে বলেনি ফেলারাম গতবছর এমনি জুলাই মাসের নিশুতি রাতে ওই মন্দিরের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিল।

কর্নেল বললেন—না তো?

—আশ্চর্য! কালীনাথ কীভাবে টের পেয়ে ফেলারামকে হাতেনাতে মন্দিরের ভেতর ধরে ফেলেছিল। আমাদের গৃহদেবতা রুদ্রদেবের বেদি ধরে সে টানাটানি করছিল। সেই জন্যই তো আমি তাকে দড়ি দিয়ে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলুম। আর কীভাবে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলারাম মনের দুঃখে পেছনের বটগাছে উঠে সেই দড়ির ফাঁস গলায় আটকে ঝুলে পড়েছিল।

—গোপীবাবু এ কথা তো বলেননি। উনি বলেছিলেন কী ব্যাপারে আপনি তাঁকে বকাবকি করেছিলেন। সেই জন্য তিনি আত্মহত্যা করেন।

হেমেনবাবু বললেন,—রুদ্রদেবের বেদি ধরে কেন টানাটানি করেছিল ফেলারাম?

জয়কুমারবাবু রুষ্টমুখে বললেন,—বিগ্রহ ওপড়াতে পারেনি। তাই বেদিসুদ্ধ উপড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তুমি ভালোই জানো হেমেন! আজকাল বিগ্রহ চুরি করে বিদেশে পাচার করে বদমাশ লোকেরা প্রচুর টাকাকড়ি পায়! কিন্তু আমার অবাক লাগছে। গোপীকে আমি এই কথাটা কর্নেলসায়েবকে গুরুত্ব দিয়ে বলতে বলেছিলুম। অথচ সে বলেনি। এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!

হেমেনবাবু বললেন,—জয়কুমারদা! আপনি কি বলতে চাইছেন গোপীবাবু ফেলারামের সঙ্গে বিগ্রহ পাচারের চক্রান্তে লিপ্ত ছিল?

—না। তা বলছি না। কিন্তু আমার খটকা লাগছে। এই আসল কথাটা না বললে কর্নেলসায়েব ভাবতেই পারেন, আমি বা আমার হুকুমে কালীনাথ কোনও বহুমূল্য আংটির লোভে তাকে ফাঁস আটকে মেরে বটগাছে লটকে দিয়েছিলুম!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক বলেছেন। আমার অঙ্কটা এইরকমই ছিল।

জয়কুমারবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন,—শুনছ? শুনছ হেমেন? গোপী ইচ্ছে করেই কর্নেলসায়েবকে ভুল পথে চালাতে চেষ্টা করেছিল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে অবশ্য এ ঘটনাটা আমি বলিনি। তবে আমার সন্দেহ, ওঁকে লক্ষ করে ঢিল ছুড়েছিল হতভাগা গোপীমোহনই। আর কেউ না। মিঃ হালদারকে সে তাড়াতে চেয়েছিল। বেঁচে থাকলে সে কর্নেলসায়েবকেও তাড়ানোর চেষ্টা করত।

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—তাহলে গোপীবাবু কর্নেলসায়েবের কাছে যাবেন কেন?

—আমার হুকুম মানতে সে বাধ্য। যদি সে ফিরে এসে বলত, কর্নেলসায়েবের দেখা পেলুম না, তাহলে আমি তোমাকে ট্রাংককল করতে বলব, গোপী তা ভালোই জানত।

এই সময় একটা গোলটেবিল এনে রাখল কালীনাথ। তারপর একটা লোক ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে চা বা কফির পট ও কাপপ্লেট ট্রেতে বয়ে এনে টেবিলে রাখল। হেমেনবাবু বললেন, —কি ভোলা? এখনও তোমার পায়ের হাড় বসেনি?

ভোলা বলল,—আজ্ঞে না। কলকাতার ডাক্তারবাবু একমাস অন্তর যেতে বলেছিলেন। কিন্তু কর্তামশাইয়ের সংসার ফেলে যাই কী করে?

জয়কুমারবাবু চটে গিয়ে কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তোমার পা ভাঙল কী করে?

ভোলা বলল,—আজ্ঞে, পেছনকার বটগাছের একটা ডাল এসে দালানে ধাক্কা মারত। রাত্তিরে অদ্ভুত শব্দ হতো। কর্তামশাই ডালটা কাটতে বলেছিলেন। ডাল কেটে নামবার সময় পা ফসকে নিচে পড়েছিলুম।

—কতদিন আগে?

—আজ্ঞে গতবছর। তার কদিন পরে ফেলাবাবু আত্মহত্যা করেছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়কুমারবাবু! ওই বটগাছটাই আসলে ভূত।

চার

কর্নেলের কথা শুনে হেমেনবাবু হেসে ফেললেন। কিন্তু জয়কুমারবাবু গম্ভীরমুখে বললেন, —বটগাছটা সম্পর্কে ছোটোবেলা থেকেই অনেক ভূতুড়ে গপ্প শুনেছি। কিন্তু আমার ঠাকুরদার হাতে লাগানো গাছ। তার মানে প্রায় দুশো বছর গাছটার বয়স। আমাদের পরিবারে তাই বটগাছটা সম্পর্কে শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। গাছটা কেটে ফেলার প্রশ্ন কখনও ওঠেনি। তবে মাঝে-মাঝে গাছটার ডালপালা এই দালানের ওপর চলে আসত।

ভোলা বলল,—ভূতুড়ে শব্দ শোনা যেত দালানে ধাক্কা লেগে। তা ঠিক। তবে সেজন্য নয়। চোরডাকাত বাইরে থেকে পাঁচিলে উঠে ডাল বেয়ে দোতলায় নামতে পারে ভেবেই ওইসব ডাল কেটে ফেলা হতো।

কালীনাথ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল,—তাছাড়া বটগাছটায় কাকের বড়ো উপদ্রব হয়। কাকের স্বভাব তো জানেন! দালানের ওপর কোনও ডাল এগিয়ে এলে সেখানে বাসা করত। আর রাজ্যের সব কুচ্ছিত জিনিস এনে বাসায় রাখত। ছাদে সেগুলো পড়ে যেত। ছাদ নোংরা হতো।

কর্নেল বললেন,—বুঝেছি। তবে ও কথা থাক। জয়কুমারবাবু! এবার বলুন, ফেলারাম মুখুজ্জের প্রেতাত্মাকে কি আপনি সত্যি দেখেছিলেন?

জয়কুমারবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—খালিচোখে আমি দিনের বেলা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাই। শুনলে অবাক হবেন, আমার চোখে এই আশিবছর বয়সেও ছানি পড়েনি। তবে বই বা কাগজপত্র—মানে লেখাপড়া করতে রিডিং গ্লাস দরকার হয়। রাত্রিবেলা বই পড়ার সময় জানালার ধারে ফিসফিস করে কে তিনবার 'আংটি দে' বলায় আমি চমকে উঠে তাকিয়েছিলুম।

—তখন আপনার চোখে রিডিং গ্লাস ছিল?

—ছিল। আবছা দেখেছিলুম গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো কেউ উঁকি দিচ্ছে! অমনি টর্চের আলো ফেলেছিলুম। তারপর তাকে দেখতে পাইনি।

—তাকে আপনি ফেলারাম মুখুজ্জে বলে চিনতে পেরেছিলেন?

জয়কুমারবাবু গলার ভেতর বললেন,—আসলে তার গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো দেখেছিলুম একটু স্পষ্ট। তাই ধরেই নিয়েছিলুম সে ফেলারাম! তাছাড়া মুখে গোঁফদাড়ি ছিল।

কর্নেল বললেন,—ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। রাতবিরেতে আবছা আলোতে অন্য কেউ গলায় দড়ির ফাঁস আটকে উঁকি দিলেও স্বভাবত সে ফেলারাম বলেই সাব্যস্ত হতো।

—গোপী তাকে নাকি স্পষ্ট দেখেছিল। ফেলারাম বলে চিনতে পেরেছিল।

—গোপীবাবু আর বেঁচে নেই। কাজেই আপনি এবার বলুন, আংটির ব্যাপারটা কী?

জয়কুমারবাবু চাপাস্বরে বললেন,—হেমেনকে বলেছি সে কথা। আসলে আংটির কথাটা আমার মনেই ছিল না। কালী কাল কথাপ্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিল। ঝাঁপুইহাটিতে বিদ্যুৎ এসেছিল বছর তিনেক আগে। তখন ভোল্টেজ স্বাভাবিক ছিল। তাই কুয়োর জল ছাদে একটা ট্যাঙ্কে তোলার জন্য পাম্পিং মেশিন কিনেছিলুম। দোতলায় বাথরুম তৈরি করেছিলুম। কলের মিস্তিরি ডেকে পাইপ কিনে বেসিন আর শাওয়ারের ব্যবস্থা করেছিলুম। কিন্তু পরের বছর থেকে ভোল্টেজ কমে গেল বিদ্যুতের। পাম্পে জল ওঠে না। অগত্যা পুনর্মূষিক ভব। নিচের তলায় সাবেক বাথরুম আবার ব্যবহার করতে হল।

জয়কুমারবাবু একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন,—আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি খুব পুরোনো। ঠাকুরদার বই সংগ্রহের বাতিক ছিল। তাছাড়া নানা বিষয়ে বই থেকে নোট করে রাখতেন একটা নোটবইয়ে। সেই নোটবইয়ের একটা পাতায় লাল কালিতে লেখা ছিল—দেখাচ্ছি। একমিনিট! কালী! আমার সঙ্গে চল!

বলে উনি ছড়িহাতে উঠে গেলেন। একতলার একটা ঘরের তালা খুলতে কালীনাথকে চাবির গোছা দিলেন। কালীনাথ তালা খুলে দিলে ঘরে ঢুকে গেলেন। হেমেনবাবু মুচকি হেসে বললেন, —কর্নেলসায়েব! এবার মনে হচ্ছে আপনি জমিদারবাড়ির ভূতরহস্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লু পাবেন!

জয়কুমারবাবু একটু পরে এসে গেলেন। তাঁর হাতে একটা জীর্ণ মোটাসোটা ডায়রি বই। তিনি পকেট থেকে রিডিং গ্লাস অর্থাৎ চশমা বের করে চোখে পরলেন। ডায়রি বা নোটবইটার বিবর্ণ পোকায় কাটা পাতা সাবধানে উলটে কর্নেলকে দিলেন। বললেন,—এই দেখুন। ঠাকুরদা লালকালিতে কী লিখেছেন।

আমরা ঝুঁকে পড়লুম পাতাটা দেখতে। কর্নেল বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন,

'আমার বংশধরদের উদ্দেশ্যে এই গুপ্তকথা লিখিয়া রাখিতেছি। আমাদিগের গৃহদেবতা শ্রী শ্রী রুদ্রদেবের আশীর্বাদধন্য একটি অতীব প্রাচীন স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় ক/১৮৪ সংখ্যক পুস্তকের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। উহা অঙ্গুলিতে ধারণ করিলে গৃহদেবতার কৃপায় অমঙ্গল দূর হইবে। তবে সাবধান, অঙ্গুরীয় যেন কদাচ জল স্পর্শ করে না। স্নান আচমন প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করিবার সময় উহা খুলিয়া রাখিতে হইবে।...'

কর্নেল মুখ তুলে বললেন,—আপনি আংটিটি খুঁজে বের করে আঙুলে পরেছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কীরকম বেঢপ গড়নের আংটি। ওপরে কোনও রত্ন-টত্ন বসানো ছিল না। সেখানে ডিম্বাকৃতি নিরেট সোনার টুকরো বসানো ছিল। আমি ঠাকুরদার নির্দেশমতো আংটি পরে থাকতুম। তো গতবছর গ্রীষ্মকালে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম আংটিটা আঙুল থেকে কখন কোথায় খুলে পড়েছে। একটু ঢিলে ছিল আংটিটা। তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও পেলুম না। ফেলারামের প্রতি সন্দেহ হল। সে কুড়িয়ে বেচে দিয়েছে হয়তো। কিন্তু সে কান্নাকাটি করে রুদ্রদেবের নামে শপথ করে কেলোর কীর্তি বাধাল। গোপী, কালী, ভোলা, ভোলার বউ শৈল আর নকুলঠাকুরকে ফেলারামের দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম। বাড়ির দামি জিনিস বিক্রি করলে ফেলারামের হাতে পয়সাকড়ি আসত। তখন তার চেহারা হাব-ভাব বদলে যেত। কিন্তু ওরা তেমন কোনও পরিবর্তন লক্ষ করেনি। অগত্যা আংটির আশা ছেড়ে দিলুম। এদিকে আমার জমিজমা নিয়ে হাজারটা সমস্যা। আংটিটার কথা মন থেকে বিসর্জন দিলুম। কিন্তু কথা হচ্ছে, উলটে ফেলারামের প্রেতাত্মা আমার বা গোপীর কাছে সেই আংটি চাইতে রাতবিরেতে হানা দেবে কেন? আংটিটা তো আমারই ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—যাক্ ও কথা। মর্গের রিপোর্টে গোপীবাবুকে কী দিয়ে খুন করা হয়েছিল জানতে পেরেছেন?

হেমেনবাবু বললেন,—ভোঁতা শক্ত কোনও জিনিস দিয়ে খুনি তার মাথার পেছনে আঘাত করেছিল। থানার ও.সি. বলেছেন, লোহার রড বা লোহার মুগুরই মার্ডার উইপন।

—গোপীবাবুর বেহালা পাওয়া গেছে?

কালীনাথ বলল,—গাবতলায় ঝোপের ভেতর পাওয়া গেছে। কেউ বেহালাটা যেন শক্ত জিনিস দিয়ে ঠুকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করেছে। বেহালার কাপড়ের খাপটা কাছেই পড়ে ছিল। পুলিশ সব নিয়ে গেছে।

কর্নেল হঠাৎ একটু নড়ে বসলেন,—হ্যাঁ! জয়কুমারবাবু! বাথরুমের কথা বলছিলেন আপনি। কেন বলছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—বলতে ভুলে গেছি। আমি বাথরুমে স্নান করতে ঢোকার পর আংটিটা খুলে উঁচু জানালার ধারে রাখতুম, যাতে জলস্পর্শ না হয়। আংটিটা হারিয়ে যাওয়ার এতদিন পরে হঠাৎ কাল স্নান করতে ঢুকে দেখলুম, একটা কাক উঁচু জানলার ওপরে বসে কিছু ঠোকরাচ্ছে। অমনি মনে হল, কাক আংটিটা নিয়ে যায়নি তো?

কালীনাথ সায় দিয়ে বলল,—কর্তামশাইয়ের কথা শুনে আমি কাল বটগাছটাতে উঠে কাকের কয়েকটা বাসা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আংটি খুঁজে পাইনি।

আমি বললুম,—কর্নেল! হালদারমশাই তাহলে কালীনাথের পায়ের ছাপ দেখেছিলেন বটগাছের গুঁড়িতে।

হেমেনবাবু বললেন,—হালদারমশাই, মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার?

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ। বুঝতেই পারছেন গোয়েন্দারা সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখেন। ওঁর কথা থাক। জয়কুমারবাবু যা বলছেন, তাতে যুক্তি আছে। কাকের এই অদ্ভুত স্বভাব আমার সুপরিচিত। কারণ কলকাতায় আমার ছাদের বাগানের নিচে একটা নিমগাছে কাকের বড্ড উপদ্রব। আমি ওদের বাসায় মেয়েদের চুলের ফিতের টুকরো, ভাঙা চুড়ি, এমনকী লোহার ছোট্ট স্প্রিংও দেখেছি।

কালীনাথ বলল,—বাকি বাসাগুলো কালই ভেঙে দিয়ে খুঁজে দেখব।

জয়কুমারবাবু বললেন,—যে কাক আমার আংটি চুরি করেছিল, একবছর পরে সে বেঁচে আছে বা বটগাছে এখনও আছে কি না ঠিক আছে কিছু? কাকেরা জায়গা বদলায় না? গ্রামের কাকেরা আজকাল শহরে গিয়ে জুটেছে শুনেছি। আমাদের বটগাছে আগের মতো অত কাক তো আর দেখি না।

হেমেনবাবু বললেন,—কথাটা ঠিক। বাবুগঞ্জে ক্রমে কাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। শহরে কাকেদের প্রচুর খাবার মেলে কাজেই গ্রামে কালক্রমে আর কাক দেখাই যাবে না!

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনারা বসুন। আমি একবার বটগাছটার অবস্থা দেখে আসি।

কালীনাথ তাঁর সঙ্গে যেতে পা বাড়িয়েছিল, কর্নেল তাকে নিষেধ করে বাড়ির পূর্বদিক ঘুরে উত্তরে অদৃশ্য হলেন। একটু পরে দক্ষিণে আগাছার জঙ্গলের ওধারে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে একটা মন্দিরে কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। একটি মেয়ে—সম্ভবত ভোলার বউ শৈল শাঁখে ফুঁ দিল। জয়কুমারবাবু চেয়ারে বসেই মন্দিরের দিকে ঘুরে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন,—সন্ধ্যারতি দিচ্ছে নকুলঠাকুর। আজকাল আমি আর সন্ধ্যারতির সময় মন্দিরে উপস্থিত থাকি না হেমেন! তুমি এঁকে বিগ্রহদর্শন করিয়ে আনো!

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—কি জয়ন্তবাবু? যাবেন নাকি?

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—চলুন! রুদ্রদেবের বিগ্রহ কখনও দর্শন করিনি। দেখতে আগ্রহ হচ্ছে।

হেমেনবাবুকে অনুসরণ করে প্রাঙ্গণের একখানে দেখলুম, আগাছার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ পায়েচলা পথ আছে। পথের মাঝামাঝি গিয়ে হেমেনবাবু বাঁদিকে আঙুল তুলে বললেন, —ওখানে একটা ফোয়ারা ছিল। ছোটোবেলায় এ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছি বাবার সঙ্গে। তখন এই সব ঝোপঝাড় ছিল না। ফুলের বাগান ছিল। ওই ফোয়ারাটাও আস্ত ছিল। পাথরের থামটা দেখতে পাচ্ছেন? ওখানে একটা অপ্সরার মূর্তি বসানো ছিল।

মন্দিরটার চত্বর উঁচু, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। নিচে জুতো খুলে চত্বরে উঠে দরজার কাছে উঁকি দিলুম। করজোড়ে প্রণাম করলুম হেমেনবাবুর দেখাদেখি। আবছা-অন্ধকারে একটা প্রদীপ জ্বলছে। বেঁটে তামাটে রঙের এবং পট্টবস্ত্রপরা ঠাকুরমশাই পুজো করছেন। কাঁসর বাজাচ্ছে একটি ছোট্ট ছেলে। হেমেনবাবু বললেন,—নকুলঠাকুরের ছেলে। স্কুলে পড়ে।

বললুম,—নকুলবাবুর ফ্যামিলি কি এ বাড়িতে থাকেন?

—না। নকুলবাবুর ফ্যামিলি থাকে বাবুগঞ্জে। নকুলবাবু জমিদারবাড়িতে চাকরি করেন। চাকরি মানে, রান্নাবান্না-পুজোআচ্চা এইসব কাজ। এবার বিগ্রহটা লক্ষ করুন। কী মনে হচ্ছে দেখে?

খুঁটিয়ে দেখে বললুম,—কী আশ্চর্য! অবিকল যেন বুদ্ধমূর্তি।

—ঠিক ধরেছেন। বুদ্ধমূর্তি রুদ্রদেব হয়ে গেছেন। কিন্তু এ কথা যেন ভুলেও জয়কুমারবাবুকে বলবেন না! খুব প্রাচীন মূর্তি। কষ্টিপাথরে তৈরি। বেদিটাও কষ্টিপাথরের।

—ফেলারামবাবু সম্ভবত বিগ্রহটা চুরি করতে চেয়েছিলেন!

হেমেনবাবু বললেন,—আসুন। ব্যাপারটা বলছি।

মন্দির-চত্বর থেকে নেমে জুতো পরে সেই পথ দিয়ে ফিরছিলুম। হেমেনবাবু বললেন,—বেদিটা তো দেখলেন। বড়জোর দুফুট লম্বা দেড়ফুট চওড়া। লাইমকংক্রিটের সঙ্গে গাঁথা আছে। বেদি ওপড়ানো কি সম্ভব? কী মনে হল আপনার?

বললুম,—তাই তো! শাবল বা ওইরকম কিছু দিয়ে ঘা মেরেও ওপড়ানো কঠিন।

হেমেনবাবু মুচকি হেসে চাপাস্বরে বললেন,—বিগ্রহ যে চুরি করবে, সে বেদি ওপড়ানোর চেষ্টা করবে কেন? তাই না?

—ঠিক বলেছেন।

—আমার ধারণা ফেলারাম বেদিটার কোনও গোপন কথা জানতে পেরেছিল।

অবাক হয়ে বললুম,—কী গোপন কথা?

—বেদিটা সহজেই হয়তো সিন্দুকের ডালার মতো খোলা যায়।

—আপনি কি গুপ্তধনের কথা বলছেন?

—দেখুন জয়ন্তবাবু! প্রাচীনযুগে মন্দিরে ধনরত্ন নানা কারণে লুকিয়ে রাখা হতো। কাজেই যদি গুপ্তধনের কথা বলেন, আমি তাতে অবিশ্বাস করব না।

—তাহলে জয়কুমারবাবু বা তাঁর পূর্বপুরুষের নিশ্চয়ই তা জানার কথা।

—জয়কুমারদা কিছু নিশ্চয়ই জানেন। তা না হলে ফেলারাম মুখুজ্জেকে থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন কেন? উদ্দেশ্য ছিল, ভোরবেলা পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেওয়া। যে বেদি ওপড়ানো অসম্ভব, তার জন্য লোকটাকে অত কড়া শাস্তি দেওয়ার কারণ কী? কালীনাথকে আমি চিনি। সে নিশ্চয়ই ফেলারাম মুখুজ্জেকে প্রচণ্ড মারধরও করেছিল। ওই লোকটাকে এলাকার সবাই বলে কালী পালোয়ান। ঠাট্টা করে অনেকে বলে কেলে-দত্যি। কালীর স্বাস্থ্য তো দেখলেন। ওর হাতের একটা থাপ্পড়ে রোগা মানুষ ফেলারামের অক্কা পাওয়ার কথা।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—হেমেনবাবু! তাহলে কি কালীর মার খেয়ে ফেলারামবাবু মারা পড়েছিলেন। আর তাঁর গলায় ফাঁস আটকে বটগাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

হেমেনবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। আস্তে বললেন,—ঝাঁপুইহাটি পাড়াগাঁ। আত্মহত্যার কেসে যে পুলিশকে খবর দিতে হয়, তা ক'জন জানে? তাছাড়া ফেলারাম মুখুজ্জের হয়ে থানায় যাবেটা কে? সকালেই সাত তাড়াতাড়ি তাকে দাহ করা হয়েছিল বলে শুনেছি।

কথাগুলো বলেই তিনি হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়িতে বিদ্যুতের অবস্থা বড় করুণ। বাল্‌বগুলোর ভেতর লালরঙের সূক্ষ্ম তার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কালীনাথ একটা হ্যাজাগ জ্বালছিল। সে হ্যাজাগটা বারান্দার ওপর ঝুলন্ত একটা হুকে আটকে দিল।

কর্নেল ততক্ষণে ফিরে এসেছেন। জয়কুমারবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। আমরা গিয়ে বসলুম। জয়কুমারবাবু আমাকে বললেন,—বিগ্রহদর্শন করলেন? কর্নেলসায়েবকে বলছিলুম। উনি বললেন, বরং সকালে এসে দর্শন করবেন।

কর্নেল বললেন,—জয়কুমারবাবুর গান শোনার ইচ্ছা ছিল। শুনেছি, উনি অসাধারণ ধ্রুপদী সঙ্গীত গাইতে পারেন। কিন্তু গোপীবাবু নেই। কে বেহালা বাজাবেন? তবলা কে বাজায় অবশ্য জানি না।

জয়কুমারবাবু বললেন,—সঙ্গীতচর্চা এ বয়সে আর করতে পারি না। আমি তানপুরা বাজিয়েই গাইতুম। এখন হাত কাঁপে। তবলা সঙ্গত করত ভোলা। তবলায় ওর হাত খুব ভালো।

ভোলা চায়ের কাপপ্লেট নিতে এসেছিল। সে বলল,—কর্তামশাইকে কতবার বলেছি, তবলার বাঁয়া ফেঁসে আছে। সারিয়ে আনি। উনি বলেন, থাক গে!

কর্নেল বললেন,—তবলা কবে ফেঁসে গেল?

—প্রায় একবছর ধরে ফেঁসে পড়ে আছে স্যার।

—তবলা কি নিজে থেকেই ফেঁসে যায়?

—আজ্ঞে, যায়। কর্তামশাইকে জিগ্যেস করুন।

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ওয়েদারে টেম্পারেচারের ওঠানামার দরুণ তবলা এমনিই ফেঁসে যায়। গত বছর জুন মাসে প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। তারপর হঠাৎ বৃষ্টি। অনেকদিন পরে ইচ্ছে হয়েছিল, বৃষ্টির রাতে গানবাজনার আসর বসাই। তো ভোলা তবলা-বাঁয়া নিয়ে এসে বলল, বাঁয়া ফেঁসে গেছে!

কর্নেল আমাকে অবাক করে ওকে জিগ্যেস করলেন,—ভোলা, বটগাছের ডাল কাটার পর কি বাঁয়াতবলাটা ফেঁসেছিল?

ভোলা কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। বলে,—আজ্ঞে!

জয়কুমারবাবু একটু হেসে বললেন,—বটগাছের ডাল কাটার সঙ্গে কি বাঁয়াতবলা ফেঁসে যাওয়ার সম্পর্ক আছে কর্নেলসায়েব?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—বটগাছ স্বয়ং বৃক্ষদেবতা। অঙ্গছেদন করলে তাঁর ক্রোধ স্বাভাবিক। ভোলার ওপর প্রথমে, তারপর তাঁর ক্রোধটা তার তবলার ওপর পড়েছিল মনে হচ্ছে।

সবাই হেসে উঠলেন। জয়কুমারবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব এসে আমাদের মুখে হাসি ফোটালেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। কাল রাত্তির থেকে বাড়ি একেবারে শ্মশান হয়ে উঠেছিল।

কর্নেল বললেন,—এবার উঠব। তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

—করুন প্রশ্ন!

—আপনার বাবা কিংবা ঠাকুরদা কিংবা আপনার কি এমন কোনও ফোটো আছে, যাতে আঙুলে সেই আংটির—মানে, আমি আংটি পরা ছবিই দেখতে চাই।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আছে। আমার সঙ্গে লাইব্রেরিতে আসুন। দেখাচ্ছি। কালী! হ্যাজাগটা খুলে নিয়ে আয়।

বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সেই ঘরের তালা খুললেন জয়কুমারবাবু। কালীনাথ আগে হ্যাজাগ নিয়ে ঢুকল। তারপর একে-একে আমরা ঢুকলুম। বিশাল ঘর। চারদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা প্রকাণ্ড আলমারিতে পুরোনো বই ঠাসা আছে। কাচের ভেতর বইগুলো দেখা যাচ্ছিল। একখানে উঁচুতে একটা প্রকাণ্ড ছবি দেখিয়ে জয়কুমারবাবু বললেন,—আমার ঠাকুরদার অয়েলপেন্টিং। এক সায়েব শিল্পীর আঁকা। ওই দেখুন, ওঁর বাঁ-হাতের আঙুলে সেই আংটি।

কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন। আংটিটা সত্যিই বেঢপ। ডিম্বাকৃতি একটা নিরেট সোনার আব যেন বসানো আছে। ছবির আয়তনের অনুপাতে আংটিটার ওই ডিম্বাকৃতি অংশটা প্রায় একইঞ্চি লম্বা এবং মাঝখানটা প্রায় আধইঞ্চি চওড়া। এই আংটি সারাক্ষণ আঙুলে পরে থাকা অস্বস্তিকর মনে হল।

কর্নেলের গলায় যথারীতি বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। তিনি তাঁর ক্যামেরায় সম্ভবত আংটির ছবিটা তুললেন। ফ্ল্যাশবাল্‌ব ঝিলিক দিল।

ঠিক এইসময় বাইরে কেউ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল,—বাঁচাও! বাঁচাও!

কর্নেল দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। তারপর কালীনাথ হ্যাজাগ নিয়ে বেরুল। আলোটা সে রেখে মেঘের মতো হাঁক ছেড়ে বলল,—কী হয়েছে ঠাকুরমশাই?

দেখলুম ঠাকুরমশাই নকুল মুখুজ্জে বৃত্তাকার রোয়াকের নিচে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন। তাঁর সেই ছেলেকে দেখতে পেলুম না।

পাঁচ

কিছুক্ষণ পরে নকুলঠাকুর ধাতস্থ হয়ে বললেন,—মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ করে তালা এঁটে বিল্টুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম। তারপর আমি এদিকে এগিয়ে আসছি, হঠাৎ পেছনে কে ফিসফিস করে বলে উঠল, 'আংটি দে! আংটি দে!' ঘুরে দেখি দড়ির ফাঁস আটকানো ফেলারাম। সে দু-হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরতে এল। আমি অমনি চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পালিয়ে এলুম। ওরে বাবা! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! সেই ফেলারাম!

কালীনাথ ততক্ষণে লাঠি আর টর্চ নিয়ে মন্দিরের দিকে ছুটে গেছে। জয়কুমারবাবু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন,—আমি কিছু বুঝতে পারছি না! কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না!

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ঠাকুরমশাই! মন্দিরের কাছে আর ওই আগাছার জঙ্গলে তো আলো নেই। মন্দিরের মাথায় যে বাল্‌বটা জ্বলছে, তার আলো খুব মিটমিটে। আপনি অন্ধকারে ভুল দেখেননি তো?

নকুল মুখুজ্জে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন,—তত কিছু অন্ধকার নয়। আমি স্পষ্ট দেখছি।

—ফেলারামকে দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গলায় ফাঁস আটকানো। ওরে বাবা! সেই ফেলা মুখুজ্জে!

—একটু ভেবে বলুন। আগে গলার ফাঁস দেখতে পেয়েছিলেন, নাকি তার মুখ দেখতে পেয়েছিলেন?

—আজ্ঞে? স্যার, গলার ফাঁসের দিকে প্রথমেই চোখ পড়েছিল! তারপর মুখের গোঁফদাড়ি!

—ধরুন, যদি অন্য কেউ গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ফিসফিস করে আংটি চায়?

—তা কী করে হবে? আমি যে ফেলারামকেই দেখলুম। চোখ জ্বলছিল। দুটো হাত বাড়িয়ে—ওঃ!

জয়কুমারবাবু বললেন,—নকুল! তুমি বিশ্রাম নাও এ বেলা— শৈল বরং রান্না করুক। ভোলা! ও ভোলা! কোথায় গেলি তুই?

বারান্দার থামের আড়াল থেকে ভোলা বেরিয়ে এল। বলল,—গোয়ালঘরে ছিলুম। মশার কামড়ে গরুগুলো ছটফট করে। ঘাসের তলায় ঘুঁটের আগুন দিচ্ছিলুম। ধোঁয়ায় চোখের অবস্থা সাংঘাতিক।

—ঠাকুরমশাইকে তাঁর ঘরে নিয়ে যা। শৈলকে বল, গরম-গরম চা করে দেবে। আর আমাদের জন্যও আরেক দফা চা।

কর্নেল বললেন,—থাক জয়কুমারবাবু! আমরা এবার চলি। একটু সাবধানে থাকবেন!

কালীনাথ এসে বলল,—কেউ কোথাও নেই। মানুষ হলে হেমেনবাবুর ড্রাইভারের চোখে পড়ত। দেউড়ি দিয়ে না পালানো ছাড়া উপায় ছিল না তার। অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোনোর সাধ্যি নেই কারও। খিড়কির দোর ভেতর থেকে বন্ধ।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আমার বন্দুক আর দুটো কার্টিজ এনে দে। এই নে চাবি। ফেলারামের ভূত হোক আর যে-ই হোক, গুলি করব। আর এই বদমাইশি সহ্য হচ্ছে না।

জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে দেউড়ির কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন,—বটগাছটা ভিন্ন প্রজাতির। এ দেশে এমন বটগাছ কোথাও দেখিনি।

হেমেনবাবু বললেন,—কেন?

—সব বটগাছের প্রচুর ঝুরি নামে। জমিদারবাড়ির বটগাছটার ঝুরি নেই। এ ধরনের বটগাছ আমি ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরের দেশগুলোতে দেখেছি। ফিগট্রি বলতে আমাদের দেশে ডুমুর গাছ

বোঝায়। ডুমুর গাছও অবশ্য বটগাছেরই জ্ঞাতি। কিন্তু এই বটগাছটা ওইসব অঞ্চলের সত্যিকার ফিগট্রি। এখন বর্ষায় প্রচুর ফল ধরেছে। পাখিরা হল্লা করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফলগুলো খাচ্ছে। আমি একটা ফল কুড়িয়ে স্বাদ নিলুম। বেশ মিষ্টি। এদেশের বটফলও পাখিদের কাছে সুখাদ্য। কিন্তু এই বটফল মানুষও খেতে পারে।

হেমেনবাবু বললেন,—বলেন কী! দিনের বেলা এসে খেয়ে দেখব তাহলে!

গাড়িতে ঢুকে কর্নেল বললেন,—আমার ধারণা, রায়চৌধুরিবাবুদের পূর্বপুরুষদের কেউ পশ্চিম এশিয়া থেকে এই গাছের চারা এনেছিলেন।

আমি বললুম,—বটগাছটা নিয়ে আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন তো?

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—ফেলারামের ভূতরহস্যের সঙ্গে কর্নেল নিশ্চয়ই গাছটার কোনও যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন!

অনিল গাড়ি স্টার্ট দিল। হেডলাইটের আলোয় জনহীন রাস্তা আর গাছপালা ঝলসে যাচ্ছিল। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আপনি ঠিকই ধরেছেন হেমেনবাবু! জয়কুমারবাবুর ঠাকুরদার আঙুলে যে আংটি দেখলুম, সেটাকে তুর্কিরা বলে, কিং সলোমন'স রিং!

—অ্যাঁ? বলেন কী!

—বাইবেলের সেই রাজা সলোমনের আংটি। আমি এক তুর্কি ভদ্রলোকের কাছে শুনেছিলুম, ওই আংটির ডিম্বাকৃতি অংশের ভেতর মারাত্মক বিষ ভরা থাকত। কোনও শত্রুকে মেরে ফেলতে চাইলে তার সঙ্গে শত্রুতার মিটমাট করে নিয়ে প্রাচীনযুগের তুর্কিরা তাকে সরাইখানায় আমন্ত্রণ করত। তারপর তার অজ্ঞাতসারে আংটির বিষ শত্রুর পানীয়ে মিশিয়ে দিত।

হেমেনবাবু হেসে বললেন,—জয়কুমারদার ঠাকুরদার আংটিতে মারাত্মক বিষ ভরা ছিল না তো? আমার সত্যি গায়ে কাঁটা দিচ্ছে শুনে!

কর্নেল চুপচাপ চুরুট টানতে মন দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সরকারি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে-যেতে আমি বললুম,—হালদারমশাই কোথায় গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াচ্ছেন কে জানে!

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাইকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের কারণ নেই। উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ। স্থলের চেয়ে জলই ওঁর প্রিয়। এই এলাকাটা কতকটা পূর্ববঙ্গের মতোই। নদী বিল খাল! এখন সর্বত্র জল।

হেমেনবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব! জয়ন্তবাবুকে মন্দিরে রুদ্রদেবের বিগ্রহ দর্শন করিয়েছি। জয়কুমারদা বলছিলেন, ফেলারাম বিগ্রহের বেদি ওপড়াচ্ছিল। জয়ন্তবাবু তো দেখেছেন। বিগ্রহের বেদি ওপড়ানো অসম্ভব। ফেলারাম মুখুজ্জে মন্দিরে ঢুকে এমন কী করছিল। যে জয়কুমারদা ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে থামের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন?

কর্নেল সে কথায় কান না দিয়ে বললেন,—জয়ন্ত বিগ্রহদর্শন করে পুণ্যার্জন করেছে। এবার সাধুসন্ন্যাসী দর্শন করুক। আরও পুণ্য হবে।

বললুম,—কোথায় সাধুসন্ন্যাসী!

কথাটা বলেই হেডলাইটের আলোয় দেখলুম, একজন জটাজুটধারী কৌপীনপরা সন্ন্যাসী এক হাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে মড়ার খুলি আর কাঁধে ঝোলানো গেরুয়াঝুলি নিয়ে সামনের দিক থেকে আসছিলেন। গাড়ির হেডলাইট থেকে চোখ বাঁচাতে মড়ার খুলিটা চোখের সামনে তুলে রাস্তার বাঁদিকে ঘাসের ওপর সরে দাঁড়ালেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ করলুম, সন্ন্যাসী খুলিটা নামিয়ে কর্নেলকে যেন দেখে নিলেন। কর্নেল বললেন,—সাক্ষাৎ অবধূত। অবশ্য কাপালিকও হতে পারেন।

হেমেনবাবু বললেন,—... জলটুঙ্গিতে মাঝে-মাঝে সন্ন্যাসীদের এসে ডেরা পাততে দেখেছি।

—ইনিও সেখানে যাচ্ছেন সম্ভবত।

আমি সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরেছিলুম। গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই ছাড়া কেউ নন। উনি এই ছদ্মবেশটা ধরতে খুব পটু। কথাটা চেপে গিয়ে বললুম,—আকস্মিক যোগাযোগটা বিস্ময়কর। কর্নেল সন্ন্যাসীর কথা বলামাত্র সন্ন্যাসীদর্শন হয়ে গেল!

কর্নেল বললেন,—তুমি সামনে দূরে তাকালে সন্ন্যাসীকে অনেক আগেই দেখতে পেতে!

হেমেনবাবু সকৌতুকে বললেন,—জয়ন্তবাবু সাংবাদিক। আপনি বলছেন, জয়ন্তবাবুর দূরদৃষ্টি নেই?

কর্নেল হাসলেন,—জয়ন্তকে আপনি তাতিয়ে দিচ্ছেন হেমেনবাবু!

এইসব হাসি-পরিহাসের দিকে আমার মন ছিল না। আমি ভাবছিলুম, নকুলঠাকুরের কথা! আমরা ও-বাড়িতে থাকার সময়ই ফেলারামবাবুর 'গলায়-দড়ি' ভূতটা ওঁকে দেখা দিল কোন সাহসে? ওঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পারছিলুম, সত্যিই উনি ভয় পেয়েছেন।

অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, কর্নেল একা বাড়ির পিছনদিকে বটগাছটা দেখতে গিয়েছিলেন। ওঁকে ভূতটা দেখা দেয়নি! ফেলারামবাবুর প্রেতাত্মা কর্নেলকে আংটি চাইলেও পাবে না বলেই কি দেখা দেয়নি? হ্যাঁ—অ্যাংটিই ভূতটার টার্গেট। এদিকে কর্নেল বলছেন, ওই আংটি পশ্চিম এশিয়ায় তুর্কিরা ব্যবহার করে। কিং সলোমন'স রিং। এমন অদ্ভুত রহস্যের পাল্লায় কর্নেল কখনও পড়েছেন বলে মনে পড়ে না।

বাবুগঞ্জের বাজার পেরিয়ে যাওয়ার সময় শুনলুম, হেমেনবাবু ফেলারাম মুখুজ্জেকে কালীনাথের প্রচণ্ড প্রহারের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছেন। আমাকে যা সব বলছিলেন। মৃত ফেলারামবাবুকে বটগাছে ঝুলিয়ে আত্মহত্যা বলে চালানোর ওপর হেমেনবাবু গুরুত্ব দিচ্ছেন। কর্নেল একটু পরে বললেন,—সেটা অসম্ভব নয়। তবে ফেলারামবাবুর মন্দিরে ঢোকার উদ্দেশ্যটা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু এটুকু অনুমান করা যায়, ওই আংটির সঙ্গে সম্ভবত মন্দিরের বিগ্রহ রুদ্রদেবের সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে।

হেমেনবাবু বললেন,—আমি জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আলোচনার সময় গুপ্তধনের সম্ভাবনার কথা বলেছিলুম। এমন হতেই পারে, জয়কুমারদা জানেন না ওই আংটির মধ্যে মন্দিরে লুকিয়ে রাখা তাঁর পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের সূত্র আছে। কী মনে হয় আপনার?

কর্নেল বললেন,—আপনার কথায় যুক্তি আছে। দেখা যাক, এই সম্ভাবনাটার কোনও ক্লু পাওয়া যায় নাকি।

হেমেনবাবু বললেন,—থানার ও. সি. তপন বিশ্বাস আপনার সঙ্গে আলাপের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। ডি.আই.জি. সায়েবের মুখে আপনার সম্পর্কে অনেক কথা তিনি শুনেছেন!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ডি.আই.জি. মানে শচিন রুদ্র?

—হ্যাঁ। চেনেন তাঁকে?

—শচিন কলকাতার লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ট্রাফিকে ডি.সি. ছিল। সেখান থেকে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে কিছুকাল থাকার পর পায় ডবল প্রমোশন। একটা আন্তর্জাতিক চোরা মাদক চালানচক্রকে সে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিত ছেলে। পুলিশে এ ধরনের প্রতিভাবান উচ্চশিক্ষিত ছেলে যত বেশি ঢুকবে, তত পুলিশের বদনাম ঘুচবে। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—হয়েছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় না কিছু। বয়স তিরিশ-বত্রিশ বলে মনে হয়েছে।

—এই প্রমোশনে শচিন খুশি হয়নি। বুঝতেই পারছেন, কোনও রাজনৈতিক স্বার্থ ওকে প্রমোশনের নামে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

হেমেনবাবু বললেন,—অনিল! থানার সামনে গাড়ি দাঁড় করাবে।

বাবুগঞ্জ থানার অফিসার-ইন-চার্জ তপন বিশ্বাস কর্নেলকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকতে যাচ্ছিলেন! কর্নেল খপ করে তাঁর হাত ধরে ফেলে করমর্দন করলেন। বললেন,—আপনাদের ডি.আই.জি. শচিন রুদ্র আমাকে 'ফাদার খ্রিসমাস' বলে। অবশ্য সেটা শীতকালে।

তপনবাবু বললেন,—বসুন স্যার। রুদ্রসায়েবের কাছে শুনেছি আপনি কফির ভক্ত। তবে এখানে খাওয়ার মতো কফি পাওয়া যায় না।

কর্নেল খুশি হয়ে বললেন,—হ্যাঁ। এই মুহূর্তে কফি আমার দরকার। নার্ভ ঝিমিয়ে পড়েছে। ঝাঁপুইহাটির জমিদারবাড়ি গিয়ে ভূতের গপ্প শুনে ক্লান্তও হয়েছি।

তপনবাবু কফি আনতে বললেন একজন কনস্টেবলকে। তারপর বললেন,—আমার কোয়ার্টার থেকেই কফি আসবে। হেমেনবাবু টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর যে-কোনও মুহূর্তে আপনি এসে যাবেন।

কর্নেল বললেন,—গোপীমোহন হাজরার পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কী কারণ বলা হয়েছে?

তপনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—ভূতের হাতে মারা পড়েননি ভদ্রলোক। এমনিতেই ওঁর হার্টের একটা ভালভ খারাপ ছিল। তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার, বেঁচে থাকলে শিগগির ওঁর লাং-ক্যান্সার হতো। শক্ত ভোঁতা কোনও ভারী জিনিস দিয়ে মাথার পেছনে খুনি এত জোরে আঘাত করেছিল, মাথার খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়েছিল। সমস্যা হল, অমন নিরীহ এক আর্টিস্ট লোককে খুনের উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আশ্চর্য ব্যাপার, খুনি প্রচণ্ড রাগে ওঁর বেহালাটা ভেঙে প্রায় গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বেহালার খাপ ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করেছে। ঘটনাটা প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ বলে আপাতদৃষ্টে মনে হয়। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তে ওঁর তেমন কোনও শত্রু ছিল বলে জানা যায়নি। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এস. আই. মনোরঞ্জন পাল এখনও হাল ছাড়েননি।

হেমেনবাবু বললেন,—খুনির গায়ে জোর প্রচণ্ড বলতে হবে!

—হ্যাঁ। এক ঘায়ে মাথার পিছনটা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে দিতে হলে প্রচণ্ড শক্তি দরকার। বিশেষ করে মানুষের মাথার পিছনদিকটা অন্য অংশের চেয়ে শক্ত।

হেমেনবাবু একটু হেসে বললেন,—ওরকম গায়ের জোর জমিদারবাড়ির কালীনাথেরই আছে। কিন্তু কালী পালোয়ানের দুটো হাতই যথেষ্ট। গোপীবাবু তার এক ঘুঁসিতেই মারা পড়তেন। তাছাড়া কালী পালোয়ান ওঁকে মারবে কেন?

কফি এসে গেল। তার সঙ্গে কাজুবাদাম, পটেটো চিপস। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, —অসাধারণ! কফির স্বাদ নির্ভর করে হাতের ওপর। যার হাত এই কফি করেছে, তার প্রতিভা আছে!

তপনবাবু সহাস্যে বললেন,—আমার গৃহিণী আপনার ফ্যান। জয়ন্তবাবুরও ফ্যান। সত্যি কথাটা এবার বলি কর্নেলসায়েব! ডি.আই.জি. সায়েব আপনার পরিচয় দেওয়ার বহু আগে থেকেই আমার গৃহিণীর সূত্রে আপনার এবং জয়ন্তবাবুর পরিচয় আমার জানা হয়ে গেছে। কেয়া বলে, 'দা মাস্টার ট্রায়ো।' কিন্তু 'ট্রায়ো'-র তৃতীয়জন প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে রেখে এলেন কেন?

হেমেনবাবু বলে দিলেন,—তিনিও আছেন। গত পরশু রাত ১২টা থেকে দুপুর পর্যন্ত মিঃ হালদার আমার গেস্ট ছিলেন। তারপর—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—হালদারমশাই খেয়ালি আর হঠকারী প্রকৃতির মানুষ। আপনাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে ইন্সপেক্টর ছিলেন। পুলিশজীবনের প্রায় সবটাই ওঁর মফস্বলে কেটেছে। কাজেই পাড়াগাঁয়ের নাড়ি-নক্ষত্র চেনেন। বাই দা বাই, জমিদারবাড়িতে 'গলায়-দড়ে' ভূতের উপদ্রবের কথা কি আপনি শুনেছেন?

তপন বিশ্বাস হেসে উঠলেন,—শুনেছি। সর্বত্র রটে গেছে। জমিদারবাড়ির ফেলারাম মুখুজ্জের আত্মহত্যার সময় আমি এ থানায় ছিলুম না। আগের ও.সি. চন্দ্রমোহনবাবু ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তাঁর কাছে শুনেছিলুম, ফেলারামবাবুর অনেক ধারদেনা ছিল। ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন।

—আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ফেলারামবাবু ভূত হয়ে জমিদারবাড়ির লোকেদের খুব জ্বালাতন করছেন।

তপনবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আমাদের সোর্সে শুনেছি, ফেলারামবাবুর ভূত আংটি চাইতে আসে। ওদিকে জয়কুমারবাবুর নাকি একটা সোনার আংটি কবে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই আংটি ফেলারামবাবুর প্রেতাত্মা চাইতে আসে কেন? আংটি তো তার নয়। যাই হোক, কর্নেলসায়েব বলুন, কিছু আঁচ করতে পেরেছেন নাকি?

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—নাঃ! বড্ড গোলমেলে কেস। গোলকধাঁধায় ঢুকে গেছি। কথা দিচ্ছি, আপনার প্রয়োজন হলে সবরকম সাহায্য আপনি পুলিশের কাছে পাবেন।

আমরা ও.সি. তপনবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে থানা থেকে বের হয়ে গাড়িতে চাপলুম। তারপর হেমেনবাবুর বাড়িতে ফিরলুম।

তখন রাত প্রায় সওয়া আটটা। কর্নেল বললেন,—আরেক দফা কফি খাব রাত নটা নাগাদ। অসুবিধে না হলে ডিনার খাব রাত দশটায়।

হেমেনবাবু বলে গেলেন,—আপনার যা অভিরুচি!

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পর থেকে গুমোট গরম টের পাচ্ছিলুম। বাবুগঞ্জে বিদ্যুতের অবস্থা ভালো। ফ্যানের নিচে বসে বললুম,—আমি একটা অঙ্ক কষেছি কর্নেল!

কর্নেল টুপি খুলে ইজিচেয়ারে বসে বললেন,—বলো! শোনা যাক।

—জয়কুমারবাবুর ঠাকুরদার তুর্কি আংটির ভেতর এমন কোনও সূত্র লুকোনো আছে, যার সাহায্যে মন্দিরে রুদ্রদেবের বেদির তলায় লুকোনো গুপ্তধন উদ্ধার করা যায়।

—ধরো, তোমার অঙ্কটা ঠিক। তাহলে আংটি যে পেয়েছে বা হাতিয়ে নিয়েছে, সে গুপ্তধন আত্মসাৎ করে কেটে পড়ত। ফেলারারামের প্রেতাত্মা তা নিশ্চয়ই টের পেত। সে এখনও আংটি চাইতে হানা দিত না।

—আংটি এখনও কেউ পায়নি। কারণ নিচের তলার বাথরুমের জানালা থেকে কোনও কাক আংটি নিয়ে গিয়ে তার বাসায় রেখেছিল। আংটি হয়তো এখনও কাকের বাসাতেই আছে।

—আংটি কাক তুলে নিয়ে গেছে গতবছর জুন মাসে। কাকেরা প্রতিবছর নতুন করে বাসা বানায়। বাসা বদলাতেও দেখেছি আমি।

—তাহলে কোথাও ঝোপজঙ্গলে পড়ে আছে। কিংবা কাদার তলায় চলে গেছে। বরং বটতলাটা ভালো করে খুঁজলে আংটিটা এখনও খুঁজে পাওয়ার চান্স আছে।

কর্নেল জ্বলন্ত চুরুট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলেন। তারপর চোখ খুলে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—গোপীমোহনবাবুর সব সময় বেহালা সঙ্গে রাখা এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেই বেহালা গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা এই কেসে খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, জয়ন্ত!

একটু চমকে উঠে বললুম,—তাহলে কি গোপীবাবুর বেহালার ভেতর আংটি লুকোনো ছিল?

—খুনির বেহালার ওপর রাগের কী কারণ থাকতে পারে?

উত্তেজিতভাবে বললুম,—কর্নেল! তাহলে আজ রাত্রে খুনি মন্দিরে ঢুকবে!

—খুনি অত বোকা নয়। সে হালদারমশাইকে গতকাল এবং আমাদের আজ জমিদারবাড়িতে দেখেছে। আমাদের কথাবার্তাও শুনেছে। তাই সে সতর্ক হতে বাধ্য। আর তার ওই সতর্কতার আভাস আমরা পেয়েছি নকুলঠাকুরের সামনে ফেলারামের প্রেতাত্মার আবির্ভাবে। প্রেতাত্মা আংটি চাইছিল ওঁর কাছে। ওটা খুনির একটা চাল। আমাদের সে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে।

—কর্নেল! তাহলে খুনি কি জমিদারবাড়িরই কেউ?

কর্নেল আবার চোখবুজে হেলান দিলেন। তারপর আস্তে বললেন,—অবশ্যই।

—সেই লোকটাই কি গলায় দড়ির ফাঁস আটকে ফেলারামবাবুর ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে?

আবার কে?—বলে কর্নেল ধ্যানমগ্ন হলেন।

ছয়

রাত্রে খাওয়ার সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। খাওয়ার পর দোতলায় আমাদের ঘরে এসে কর্নেলকে বলেছিলুম,—হালদারমশাই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আছেন। এই বৃষ্টিতে ওঁর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে।

কর্নেল বলেছিলেন—একালের সন্ন্যাসীরা রিস্টওয়াচ পরেন। গাড়ি চাপেন। রেলগাড়ি, বাসমোটর বা প্লেনেও চাপেন দেখেছি। বৃষ্টিতে তাঁরা রেনকোট পরতেও পারেন। যাই হোক, ওসব চিন্তাভাবনা না করে শুয়ে পড়া যাক। বৃষ্টির রাতে বিছানা খুব আরামদায়ক হয়ে ওঠে।

বিছানা সত্যি আরামদায়ক হয়েছিল। ঘুম ভেঙেছিল কারও ডাকাডাকিতে। চোখ খুলে দেখি, একটা লোক আমার জন্য বেড-টি এনেছে।

নিশ্চয়ই কর্নেলের নির্দেশ। উঠে বসে চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে বললুম,—কর্নেলসায়েব কি বেরিয়েছেন?

লোকটি বিনীতভাবে বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার বাবুমশাই আর সায়েব ভোরবেলা গঙ্গার বাঁধে বেড়াতে গেছেন।

জিগ্যেস করলুম,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, আমার নাম বেচারাম। সবাই বেচু বলে ডাকে।

—আচ্ছা বেচু, তুমি ঝাঁপুইহাটির ওদিকে ডাকিনীতলায় কখনও গেছ?

—চৈত্র সংক্রান্তির রাত্তিরে ওখানে এ তল্লাটের অনেকে মানত দিতে যায়। আমিও যাই।

—ডাকিনীতলা মানে কি কোনও গাছ?

বেচু মুখে ভয়-ভক্তির ভাব ফুটিয়ে বলল,—স্যার! ওই গাছটার নাম অচিন গাছ। অমন গাছ আমি কোথাও দেখিনি। চৈত্র-সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলা ঢাকঢোল, কাঁসির বাজনা শুরু হলেই গাছটার ডালপালা থরথর করে কাঁপে। না দেখলে বিশ্বাস হবে না। জেলেদের মুখে শুনেছি, রাতবিরেতে ওই গাছে ডাকিনীর কান্না শোনা যায়।

—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে অন্যসময় মানুষজন যায় না?

—কার বুকের পাটা? একাদোকা গেলে মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে যে! একবার ঝাঁপুইহাটির একটা লোক সাহস করে গিয়েছিল। তারপর তার আর পাত্তা নেই। তখন দলবেঁধে অনেক লোক নৌকোয় চেপে ডাকিনীতলায় তাকে খুঁজতে গেল। গিয়ে দেখে, লোকটা ডাকিনীতলায় পড়ে আছে। রক্তবমি করে মারা পড়েছে।

—কতদিন আগের কথা এটা?

—এই তো গতবছর। বাবুগঞ্জের লোকও ঝাঁপুইহাটিতে গিয়ে তার মড়া দেখতে ভিড় করেছিল।

এই সময় নিচের তলা থেকে কেউ তার নাম ধরে ডাকল। বেচারাম তখনই চলে গেল। বুঝলুম সে আরও কিছু সাংঘাতিক ঘটনার কথা বলত। সুযোগ পেল না।

কর্নেল ফিরলেন সওয়া নটায়। সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললুম,—মর্নিং কর্নেল! আশা করি আপনি স্লুইস গেটের কাছে অশ্বত্থ গাছে সেই গগনবেড় পাখির দর্শন পেয়েছেন?

টুপি, পিঠে-আঁটা কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার টেবিলে রেখে কর্নেল বললেন, —আমার দুর্ভাগ্য! ক্যামেরায় টেলি-লেন্স ফিট করার সময় দুষ্টু পাখিটা তার প্রকাণ্ড ঠোঁট ফাঁক করে আমাকে গালাগালি করে উড়ে গেল। বাইনোকুলারে দেখলুম, উড়তে-উড়তে সে ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির জঙ্গলে চলে গেল। সম্ভবত সেখানে ওর জুটি আছে। বাসা থাকাও সম্ভব। বাসাতে ওদের কাচ্চাবাচ্চা থাকার মরশুম এটা।

—আপনারা কি গঙ্গার বাঁধে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এবার যাব হেমেনবাবুর পানসি নৌকোতে।

—সাবধান কর্নেল! কিছুক্ষণ আগে বেচু বেড-টি দিতে এসে বলল, গতবছর ডাকিনীতলায় একটা লোক গিয়ে রক্তবমি করে মারা পড়েছিল।

কর্নেল হাসলেন,—লোকেরা একটু বাড়িয়ে বলে। হেমেনবাবুর কাছে শুনেছি, একটা লোক চুরি করে কাঠ কাটতে গিয়েছিল ডাকিনীতলার জঙ্গলে। সাপের কামড়ে মারা পড়েছিল।

শিউরে উঠলুম,—সর্বনাশ! সন্ন্যাসীবেশী হালদারমশাই কোনও কারণে ওখানে রাত কাটাতে গেলে সাপের পাল্লায় পড়বেন!

কর্নেল বাথরুমের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন,—হালদারমশাই একসময় জাঁদরেল দারোগাবাবু ছিলেন। রাতবিরেতে বনবাদাড়ে চোর-ডাকাতের খোঁজে বিস্তর হানা দিয়েছেন। সাপ সম্পর্কে তাঁর সতর্কতা স্বাভাবিক। যাই হোক, আমরা নটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট করে বেরুব।

হেমেনবাবুর বাড়ির উত্তরে বাঁধানো ঘাটে একটা পানসি নৌকো বাঁধা ছিল। আমরা সেই পানসিতে চাপলুম। পেছনে হালের মাঝি, সামনে দাঁড়ের মাঝি। হেমেনবাবুর হাতে দোনলা বন্দুক। তাঁকে জিগ্যেস করলুম,—বিলের জলে শানবাঁধানো ঘাট কীভাবে তৈরি করেছেন?

হেমেনবাবু বললেন,—কোনও-কোনও বছর গ্রীষ্মকালে বিলের জল কমে যায়। ওই ঘাট থেকে দূরে সরে যায়। বছর দশেক আগে এলাকায় ভীষণ খরা হয়েছিল। সেই সুযোগে পাকাঘাট তৈরি করেছিলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্ত একটু চিন্তা করলেই কথাটা বুঝতে পারত। সত্যি হেমেনবাবু! জয়ন্ত কীভাবে সাংবাদিকতা করে, আমার কাছে এটা এখনও রহস্য।

মনে-মনে চটে গিয়ে বললুম,—ইঞ্জিনিয়াররা জলভরা নদীতে ব্রিজ তৈরি করেন। তাই আমি ভেবেছিলুম, সেইভাবেই ঘাটটা তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু তাতে প্রচুর টাকা খরচ হয়। তাই—

আমার কথা চাপা পড়ল কর্নেলের কথায়। বাইনোকুলারে তিনি দূরে একটা জলটুঙ্গি দেখতে-দেখতে বলে উঠলেন,—কী আশ্চর্য! সেই সন্ন্যাসী একটা গাছের তলায় ধুনি জ্বেলে বসে আছেন দেখছি! ওখানে একটা ছোটো ছিপনৌকো বাঁধা আছে। কোনও শিষ্য নৌকোটা গুরুদেবের সেবার জন্য দিয়েছেন হয়তো!

হেমেনবাবু বললেন,—নৌকোটা তাহলে ঝাঁপুইহাটির চরণ-জেলের। গাঁজার প্রসাদ পেতে এবার চরণ সন্ন্যাসীর সঙ্গ ধরেছে।

বিলের জল উত্তাল বাতাসে দুলে উঠছিল। যত পানসি নৌকো এগোচ্ছে, ঢেউ ক্রমশ বাড়ছে। কর্নেল ছইয়ে হেলান দিয়ে টাল সামলাচ্ছিলেন। আকাশে আজ ভাঙাচোরা মেঘ। মাঝে-মাঝে উজ্জ্বল রোদ্দুর ঝলসে উঠছে। জলটুঙ্গিটা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। খালিচোখে চাপ-চাপ

সবুজের পুঞ্জ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ কর্নেল বললেন,—হেমেনবাবু! মাঝিদের বলুন, আমরা সোজা উত্তরে এগিয়ে ডাকিনীতলার পশ্চিমদিকে নামব। সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ করা উচিত হবে না। তাছাড়া গগনবেড় পাখিটাকে ওইদিকেই জলটুঙ্গিতে যেতে দেখেছি।

হেমেনবাবু সেইমতো নির্দেশ দিলেন। তারপর আমাকে বললেন,—বুঝলেন জয়ন্তবাবু, আজকাল আইন হয়েছে, পাখি বা বন্য জীবজন্তু মারা চলবে না। তবে আমি বহুবছর আগে পাখি শিকার করা ছেড়ে দিয়েছি। বন্দুকটা নিয়েছি অন্য কারণে। বিলের কোনও-কোনও জলটুঙ্গিতে ডাকাতদের ডেরা থাকে। জেলেদের ওরা কিছু বলে না। জেলেদের সঙ্গে ওদের শর্ত হল, জেলেরা ওদের কথা গোপন রাখবে। তাহলে জেলেরা নিরাপদে মাছ ধরতে পারবে। কিন্তু আমাকে জলডাকাতরা শত্রু মনে করে। ওদের হাতেও আজকাল ফায়ার আর্মস থাকে।

বললুম,—সর্বনাশ! আপনাকে দেখলে তাহলে ওরা যদি গুলি ছোড়ে?

হেমেনবাবু হাসলেন,—ডাকিনীতলার জলটুঙ্গিতে ডাকাতরা ডেরা পাতে না। কারণ ওই জলটুঙ্গিটা ঝাঁপুইহাটি গ্রামের কাছে। খালিচোখেই পুলিশ ওদের দেখতে পাবে। তাছাড়া ডাকাতরাও গ্রাম্য লোক। ডাকিনী সম্পর্কে ওদের মনে আতঙ্ক আছে। তাই চৈত্র সংক্রান্তির রাতে গোপনে ডাকিনীতলায় মানত দিতে আসে।

বাতাস বইছিল পূর্বদিক থেকে। তাই আমাদের নৌকো উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছিল। কাছে ও দূরে জেলেনৌকো দেখতে পাচ্ছিলুম। ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পশ্চিমে গিয়ে এবার সামনে থেকে বয়ে আসা বাতাসের চাপে নৌকোর গতি কমে গেল। কর্নেল বাইনোকুলারে এখন সম্ভবত গগনবেড় পাখি খুঁজছিলেন।

ডাকিনীতলার জলটুঙ্গির পশ্চিমদিকে পানসি যখন ভিড়ল, তখন প্রায় বারোটা বাজে। হেমেনবাবু দাঁড়ের মাঝিকে বললেন,—পবন! তোমার খুড়ো পানসিতে বসে বিশ্রাম নিক। তুমি দা আর লাঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলো। এখানে ঝোপঝাড় কম। দায়ে কেটে পথ করতে হবে। লাঠি বাঁ-হাতে রেডি রাখবে। সাপের উপদ্রব আছে শুনেছি।

পবন বলিষ্ঠ গড়নের যুবক। কষ্টিপাথরে গড়া যেন তার শরীর। গলায় শখ করে রুপোর সরু হার ঝুলিয়েছে। তাতে একটা ছোটো লকেটে কোনও সাধুবাবার ছবি দেখলুম। বাঁ-বাহুতে একটা তামার মাদুলি লাল সুতোয় বাঁধা আছে। সে এক লাফে লাঠি আর লম্বাটে দা হাতে নিয়ে নেমে একটা গাছের গুঁড়িতে নৌকোর কাছি শক্ত করে বেঁধে দিল। তারপর বলল,—বাবুমশাই! ওই দেখুন ঝোপঝাড়ের ভেতর পায়ে-চলা পথ। এ তো আশ্চর্য ব্যাপার! এদিকে নৌকো ভিড়িয়ে কারা চলাচল করে। ডাকাতরা এখানে ঘাঁটি করেনি তো?

কর্নেল নৌকো থেকে নেমে বাইনোকুলারে খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—সামনে ঘন জঙ্গল দেখছি। পথটা চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে। দেখা যাক, ডাকাতরা কীভাবে আমাদের অভ্যর্থনা করে।

হেমেনবাবু বললেন,—কর্নেল! অকারণ ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী?

পবন বলল,—জঙ্গলের আড়াল থেকে ডাকাতরা গুলি ছুড়তে পারে স্যার!

কর্নেল বললেন,—তাহলে আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি চুপিসাড়ে গিয়ে দেখে আসি কোথায় পথটা শেষ হয়েছে!

কর্নেল হেমেনবাবু বা পবনের নিষেধ শুনলেন না। অগত্যা আমরা তিনজনে তাঁকে অনুসরণ করলুম। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ঘুরে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইঙ্গিতে বললেন—কথা বলা চলবে না।

উঁচু গাছের পর ঝোপঝাড়ের ভেতর পথটা ডাইনে ঘুরেছে। সেই ঝাঁকের মুখে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে কর্নেল থামলেন। এবার কাদের চাপাগলায় কথাবার্তা শোনা গেল। আমরা কর্নেলের কাছে

গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলুম। স্যাঁতসেঁতে ঘাসে ঢাকা মাটি। রাতের বৃষ্টির জল ঝোপের নিচের পাতায় আটকে ছিল। আমাদের ভিজিয়ে দিল। কিন্তু তখন আমাদের কান কাদের কথাবার্তার দিকে। এইসব কথা কানে আসছিল :

—ফেলারামবাবুর কথা মিথ্যা হতেই পারে না। গতরাত্রে বৃষ্টির সময় সুযোগ ছিল।

—কিন্তু কালী ব্যাটাচ্ছেলে যে সারা রাত জেগে থাকে। ওর চোখে এড়িয়ে বাড়ি ঢোকা কঠিন।

—কালী করবেটা কী? পাইপগানের গুলিতে ওর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

—তা না হয় দিলুম। কিন্তু বুড়োকর্তা দোতলা থেকে বন্দুকের গুলি ছুড়বে যে! কাল তোরা বৃষ্টির সময় পাঁচিল ডিঙোতে চাইছিলি। অত উঁচু পাঁচিল ডিঙোতে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে পড়ে থাকতে হবে।

—হ্যাঁ রে! গুপীবাবুও তো বলেছিল মন্দিরে মেঝেতে সাত রাজার ধন লুকোনো আছে।

—আছে তো বটেই। তা না হলে কি ফেলারামবাবু মারা পড়ে? গুপীবাবুরও একই দশা হয়?

—গুপীবাবু আমাকে বলেছিল, কালীর এক ঘুঁসিতেই ফেলারাম পটল তুলেছে! হাঃ হাঃ হাঃ!

—হাসিস নে! রাগে আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে। তারপর গুপীবাবুও মারা পড়ল।

—মাইরি! গুপীবাবুকে গাবতলায় কে মারল কে জানে! কেন মারল বুঝি না!

—ন্যাকা! বুঝিস না কিছু? ফেলারাম মুখুজ্জে বুড়োকর্তার ঠাকুরদার কী বই পড়ে জানতে পেরেছিল মন্দিরে সাত রাজার ধন লুকোনো আছে। গুপীবাবুকে ফেলারামবাবু জুটি করতে চেয়েছিল। দু'জনই মারা পড়ল। পুলিশ মাইরি বুড়োকর্তার টাকা খেয়ে সব জেনেও চুপ করে আছে।

—ফেলারামবাবুর ভূতের গুজব রটেছে। ব্যাপারটা বোঝা যায় না। হ্যাঁ রে! আমাদের কেউ রাতবিরেতে ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে না তো?

—বলা যায় না। ঘরের শত্রু বিভীষণ থাকতেই পারে। ভেবেছে, জমিদার বাড়িতে ভয় দেখিয়ে একা মন্দিরের ধনরত্ন বাগিয়ে নেবে।

—আমরা ছ'জন আছি দলে। ছ'জনই এখানে আছি। ডাকিনীমায়ের দিব্যি খেয়ে প্রত্যেকে বল—

—চুপ! সেই সাধুবাবা এদিকে আসছে। শোন। লোকটা সাধু নয়। সাধু সেজেছে! কিছু মতলব আছে।

—উঠে পড় সবাই। কুতুবপুরের জলটুঙ্গিতে মঘাদা আসবে বলেছে। মঘাদা যা বলে, তা-ই করব। আর সাধুবাবার কথা বলছিস? যাওয়ার সময় ওকে ল্যাং মেরে দেখি, সত্যি-সত্যি সাধু নাকি।

—আই! ওদিকে যাসনে। নৌকো এদিকে রেখেছি। বাবুগঞ্জের হেমেনবাবুর পানসি দেখেছি ওদিকে কোথায় যাচ্ছে।

—চুপ! উঠে পড়। আর নয়। আরে! সাধুবাবা কি লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিল নাকি? তবে রে!

তারপর আর কোনও কথা শোনা গেল না। এলোমেলো উত্তাল বাতাসে গাছপালার শব্দ অন্য কোনও শব্দ ঢেকে দিল। কর্নেলের ইশারায় আমরা ওই অবস্থায় বসে রইলুম। মিনিট পাঁচেক পরে হেমেনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—চিনতে পেরেছি। ওরা মঘাডাকাতের চেলা। আমার মনে হচ্ছে, ফেলারামবাবু গোপীবাবু মন্দিরের গুপ্তধনের আশায় মঘাডাকাতের দলের সাহায্য নিতে চেয়েছিল।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন,—সন্ন্যাসীর ওপর ওরা হয়তো হামলা করেছে! সন্ন্যাসী একা। ওরা ছ'জন। চলুন। ব্যাপারটা দেখি!

ঝোপের ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে-যেতে কর্নেল আবার চাপাস্বরে বললেন,—হেমেনবাবু! দরকার হলে ওদের মাথার ওপর দিয়ে ফায়ার করবেন! জয়ন্ত! তোমার ফায়ার আর্মস বের করো! পবন! তুমি আমাদের পেছনে থাকবে।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। হালদারমশাইয়ের কাছে তাঁর রিভলভার থাকার কথা। কিন্তু রিভলভার বের করার সুযোগ পাবেন কি? ছ'জন ডাকাতের সঙ্গে একা লড়বেন কী করে? ওরা ওঁকে প্রাণে মেরে ফেলতেও পারে।

এবার একটুকরো ফাঁকা ঘাসের জমি। তারপর উঁচু-নিচু গাছের ঘন জঙ্গল। বর্ষায় জঙ্গল দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। তার ওদিকে কোথাও হালদারমশাইয়ের গর্জন শোনা গেল,—হালাগো গুলি কইরা মারুম! ছাড়। ছাড় বলছি। খাইসে! হালারা সত্যই ডাকাত। আমারে বান্ধিস ক্যান তোরা?

কর্নেল ইশারায় হেমেনবাবুকে শূন্যে ফায়ার করতে বললেন। তারপর ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে তিনি ছুটে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম আমরা। পবন গর্জে উঠল,—মুণ্ডু কেটে বলি দেব। আমার বাবাও ডাকাত ছিল! আমি গগন ডাকাতের ছেলে!

এতক্ষণে দেখলুম, হালদারমশাই একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা আছেন। কিন্তু তাঁর জটাজুট খসে পড়েনি। ডাকাতরা তাঁর দাড়িও ওপড়ায়নি। সম্ভবত সে-সুযোগ পায়নি। অতর্কিতে ঝোপ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বেঁধে ফেলেছে। তারপর হেমেনবাবুর গুলির শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

হেমেনবাবু বললেন,—পবন! তুমি তোমার খুড়োকে গিয়ে দ্যাখো। তার বিপদ দেখলে ডাকবে।

পবন চলে গেল। কর্নেল ততক্ষণে কিটব্যাগ থেকে তাঁর জঙ্গল-নাইফ বের করে দড়ি কেটে গোয়েন্দাপ্রবরকে মুক্ত করলেন। বললেন,—আপনার ঝুলি কোথায়?

হালদারমশাই বললেন,—ভুল করছি। ঝুলি সঙ্গে লই নাই। ঝুলিতে আমার ফায়ার আর্মস আছে। কিন্তু আপনারা আইয়া পড়লেন কীভাবে? নাকি স্বপ্ন দেখতাছি?

হেমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—কী আশ্চর্য! মিঃ হালদার যে!

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! আর কইবেন না। চরণ কইছিল, ডাকিনীতলায় একদল ডাকাত ঘাঁটি করছে। কিন্তু ডাকাতগো পিছনে লাগার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্য। এক মিনিট! ডাকিনীতলায় আমার ত্রিশূল আর ঝুলি আছে। লইয়া আসতাছি। আপনারা এদিকে আউগাইয়া যান। ডাকাতগো ঘাঁটি দেখবেন!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল উলটোদিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুদূর চলার পর দেখলুম, ওলটানো মস্ত নৌকোর মতো একটা কুঁড়েঘর। উলুকাশ দিয়ে চাল তৈরি করা হয়েছে। কাঠমোটা গাছের ডাল কেটে বানানো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এই ডেরাটা বেশিদিনের নয়।

উঁকি মেরে দেখলুম, ভেতরে ব্যানাখড়ের ওপর কয়েকটা চট বিছানো আছে। আর কিছু নেই। জিনিসপত্র সবই নিয়ে পালিয়েছে ডাকাতেরা।

কর্নেল বললেন,—হেমেনবাবু! পুলিশকে জানিয়ে দেবেন, আজ সন্ধ্যার পর যেন কুতুবপুরের জলটুঙ্গি পুলিশ ঘিরে ফেলে।

হেমেনবাবু বললেন,—তা আর বলতে? মঘাডাকাতের দল গতমাসে বাবুগঞ্জে দুটো বাড়িতে ডাকাতি করেছে। আমার বাড়িতে হামলা করতে এসেছিল। উত্তরের জানালা দিয়ে দু'রাউন্ড ফায়ার করে ভাগিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা এবার জয়কুমারের গৃহদেবতার মন্দিরে হামলার চক্রান্ত করেছে। খুব ভাবনার কথা।

হালদারমশাই সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ছেড়ে প্যান্টশার্ট পরে আবির্ভূত হলেন। ছদ্মবেশের সঙ্গে গেরুয়া ঝুলি ওঁর পলিথিনের ব্যাগে ঢুকেছে। কিন্তু ত্রিশূলটা নেই। তিনি বললেন,—চরণ কইছিল এই কুঁড়েঘরের কথা। সে গোপনে দেখছিল একদিন। তো কাইল রাত্রে বৃষ্টির সময় টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে এখানে আইলাম। দেখলাম, কেউ নাই। হালারা আইজ ভোরবেলা আইছিল। আমি আরামে রাত কাটাইয়া খুব ভোরে ডাকিনীতলায় গিছলাম।

বললুম,—আপনার ত্রিশূল কোথায় গেল হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর হাসলেন,—ত্রিশূল অর্ডার দিয়া বানাইয়া লইছি। পার্ট বাই পার্ট খুইল্যা ব্যাগে রাখা যায়। মড়ার খুলিটা প্লাস্টিকের।

কর্নেল বললেন,—আপনি ডাকিনীতলায় রাত্রি জাগতে এসেছিলেন কেন?

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—চরণ কইছিল, গোপীবাবুরে সে গাঁজার লোভে কোনও-কোনও রাত্রে ডাকিনীতলায় লইয়া আইত। তারপর গোপীবাবু ডাকিনীর গাছের ডালে উঠতেন। বেহালা বাজাতেন! গোপীবাবুর গাছের ডালে বইস্যা বেহালা বাজানোর কথায় আমার খটকা বাধছিল। তাই কাল সন্ধ্যার পর ডাকিনীতলায় আইছিলাম। কথামতন চরণ নৌকা লইয়া খাড়া ছিল। তার লোভ গাঁজার। আমি তারে পাঁচ টাকা দিয়ে কইলাম, তুমি যেখানে হইতে পারো, গাঁজা লইয়া আও। আমি ধ্যানে বসি। চরণ গাঁজা কিনতে গেল। তখন আমি গাছে চড়লাম। যে-ডালে বইয়া গোপীবাবু বেহালা বাজাতেন, চরণ দেখাইয়া দিছিল। টর্চের আলোয় দেখি, ডাল যেখানে গাছের কাণ্ড হইতে বারাইছে, সেই জোড়ের মুখে কালো এক ইঞ্চি পিচের মতো জিনিস ঠাসা। ছুরির ডগা দিয়া উপড়াইয়া দেখি—এই দেখেন, কী লুকানো ছিল!

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে যা বের করলেন, তা দেখে আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, —এই তো সেই কিং সলোমন'স রিং। রাজা সলোমনের আংটি!

সাত

হেমেনবাবুর পানসি নৌকোয় চেপে আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছলুম। তখন দুটো বেজে গেছে। খাওয়ার পর হালদারমশাই বললেন,—ইরিগেশন বাংলো হইতে কাইল লাঞ্চ খাইয়াই চেক আউট করছি। অরা কইল, পেমেন্ট হেমেনবাবু করবেন। আপনি শুধু বিলে সই করেন। এটা কেমন কথা?

হেমেনবাবু বললেন,—ও নিয়ে চিন্তা করবেন না মিঃ হালদার! আপনি আমার গেস্ট।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে সেই তুর্কি আংটি 'কিং সলোমন'স রিং' আতশ কাচ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একটু পরে তিনি কিটব্যাগ থেকে একটা খুবই ছোটো স্ক্রু-ডাইভারের মতো জিনিস বের করলেন। তারপর একটা খবরের কাগজ টেবিলে বিছিয়ে তার ওপর আংটিটা রেখে তিনি সেই জিনিসটা দিয়ে আংটির ডিমালো অংশের একপাশে চাপ দিলেন। অমনি ডিমালো অংশের খাপ খুলে গেল। ভেতরে বিষের গুঁড়ো থাকবে ভেবেছিলুম। তেমন কিছু দেখলুম না। কর্নেল আংটিটা উপুড় করে ঠুকতেই ইঞ্চিটাক লম্বা সরু একটা চাবি কাগজে পড়ল। অমন খুদে চাবি এ যাবৎ কোথাও দেখিনি।

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন,—ওইটুকখান চাবি কী কামে লাগবে?

কর্নেল বললেন,—সেকালের কারিগরের দক্ষতা দেখলে অবাক হতে হয়। এই খুদে চাবিটা কোনও বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি। ধাতু বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন, এটা কোন-কোন ধাতুর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল।

হেমেনবাবু বললেন,—ওটা নিশ্চয় কোনও তালা খোলার চাবি?

—ঠিক ধরেছেন। খুদে চাবিটা আংটিতে ঢুকিয়ে আগের মতো আটকে দেওয়া যাক। ততক্ষণে আপনি থানার ও.সি.-কে ফোন করে জানিয়ে দিন, আমরা এখনই যাচ্ছি। সঙ্গে পুলিশ ফোর্স এবং অফিসার নিয়ে উনি যেন তৈরি থাকেন। গোপীবাবুর হত্যাকারীর জন্য অবশ্যই ওঁকে হাতকড়া নিয়ে যেতে হবে। আর মঘার দলকে আজ কুতুবপুরের জলটুঙ্গিতে পাকড়াও করার কথাও ও.সি..-কে বলবেন।

হেমেনবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হালদারমশাইয়ের গোঁফ যথারীতি তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি চাপাগলায় বললেন,—খুনিরে চিনলেন ক্যামনে কর্নেলস্যার?

কর্নেল হাসলেন,—খানিকটা তথ্য-প্রমাণ, খানিকটা অঙ্ক। দুইয়ে-দুইয়ে চার করতে পেরেছি। আপনারা দুজনে তৈরি হয়ে নিন। আমি তৈরি আছি।

সাড়ে তিনটেতে হেমেনবাবুর গাড়িতে চেপে আমরা বেরোলুম। কর্নেল প্রকাণ্ড মানুষ। অনিল-ড্রাইভারের বাঁদিকে বসলেন। আমি, হালদারমশাই আর হেমেনবাবু পেছনে বসলুম।

থানার সামনে গিয়ে দেখলুম, ও.সি. তপন বিশ্বাস পুলিশ-জিপের পাশে বেটন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। জিপের পেছনে ঠাসাঠাসি করে সশস্ত্র পুলিশেরা বসে আছে। ও.সি.-র পাশে এক পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি কর্নেলের উদ্দেশে সেলাম ঠুকলেন। তপনবাবু বললেন,—ইনি গোপীবাবুর মার্ডারকেসের আই.ও—ইনভেস্টিগেটিং অফিসার, সাব-ইন্সপেক্টর মনোরঞ্জন পাল।

কর্নেল বললেন,—আমরা জমিদারবাড়িতে ঢোকার মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পরে আপনারা ঢুকবেন। ততক্ষণ একটু তফাতে অপেক্ষা করবেন। আমবাগানের কাছে রাস্তার মোড়ে আপনারা থাকলে জমিদারবাড়ি থেকে কেউ দেখতে পাবে না।

আধঘণ্টা পরে জমিদারবাড়ির গেটে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! আমরা এগোচ্ছি। কালীনাথ আমাদের দেখতে পেয়েছে। আপনাকেও চিনতে পারবে। আপনি বলবেন, ওই বটগাছটার ফল খুব মিষ্টি। আমি কয়েকটা পাকা ফল নিয়ে আসি। বলে আপনি বটতলায় থাকবেন।

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন,—ওখানে খাড়াইয়া থাকুম! ক্যান?

—যথাসময়ে জানতে পারবেন। কুইক!

কালীনাথ এসে করজোড়ে প্রণাম করে বলল,—কর্তামশাই আপনার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। কাল রাত্রে বৃষ্টির সময় উনি লাইব্রেরি ঘরের জানালায় আবার ফেলারামবাবুকে দেখেছেন!

হালদারমশাই বটগাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—এমন বটগাছ কোথাও দেখি নাই! কর্নেলস্যার! দেখছেন ফলগুলি কত মোটা আর লাল টুকটুকে। আমি খাইয়া দেখছিলাম। খুব মিঠা।

বলে তিনি বাড়ির উত্তরে কম্পাউন্ড ওয়ালের কাছে বিশাল বটগাছটার দিকে চলে গেলেন। কর্নেল, আমি আর হেমেনবাবু কালীনাথকে অনুসরণ করলুম। সেই অর্ধবৃত্তাকার উঁচু রোয়াকে জয়কুমারবাবু কালকের মতো ছড়ি-হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কালীনাথ আর ভোলা কয়েকটা চেয়ার এনে দিল। জয়কুমার বললেন,—ভোলা! শিগগির গিয়ে কফির ব্যবস্থা কর।

ভোলা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। আমরা বসার পর জয়কুমারবাবু গতরাতে বৃষ্টির সময় লাইব্রেরি ঘরের জানালায় গলায় দড়ির ফাঁস আটকানো ফেলারামের আবির্ভাবের কথা বললেন। কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি গুলি করবেন বলেছিলেন। গুলি করেননি?

জয়কুমারবাবু বললেন,—বন্দুকের নল ওঠাবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল। কর্নেলসায়েব! এর একটা বিহিত করুন। আর কত উপদ্রব সহ্য করা যায়?

—বিহিত করতেই এসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভূতটা ধরা পড়বে। তবে এবার আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—আপনার ঠাকুরদার নাম কী ছিল?

—অভয়কুমার রায়চৌধুরি। আমার বাবার নাম অক্ষয়কুমার রায়চৌধুরি।

—আপনার ঠাকুরদা কি কখনও বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে বাধ্য হয়ে ওঁকে স্বেচ্ছাসৈনিক হতে হয়েছিল। কথাটা অদ্ভুত শোনাবে। কিন্তু দেশীয় রাজা জমিদারদের ওপর ব্রিটিশ সরকার প্রচুর যুদ্ধ-করের বোঝা চাপিয়েছিল। অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা ঠাকুরদার ছিল না। তাছাড়া তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছিল। তাই তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পক্ষে তুরস্ক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই সব কথা তাঁর লেখা 'আমার জীবন' বইয়ে ছিল।

—ছিল, মানে এখন বইটা কি নেই?

—ওই বদমাশ নেশাখোর ফেলারাম বইটা চুরি করে কোথায় কাকে বেচে দিয়েছিল।

—আপনি তো বইটা পড়েছিলেন?

—পড়েছি। অনেকবার পড়েছি।

—তাতে কি সেই আংটির কথা ছিল না?

জয়কুমারবাবু চাপাস্বরে বললেন,—ছিল। আংটিটা তিনি একজন মৃত তুর্কি সেনার আঙুল থেকে কৌতূহলবশে খুলে নিয়েছিলেন। পরে জানতে পারেন, ওতে সাংঘাতিক বিষ ভরা আছে। তাই আংটি খুলে বিষের গুঁড়ো ফেলে দিয়েছিলেন।

—আপনার ঠাকুরদা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে ধনী তুর্কি বণিক আজিজ কোকার বাড়ি লুঠ করেছিলেন?

জয়কুমারবাবু অবাক হয়ে বললেন,—আপনি কি বইটা পড়েছেন? বইটা কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যেতে পারে। দুষ্প্রাপ্য বই।

এবার আমাকে অবাক করে হেমেনবাবু বললেন,—আপনার ঠাকুরদার এককপি 'আমার জীবন' আমার ঠাকুরদা অজিতেন্দ্র সিংহরায়কে উপহার দিয়েছিলেন। আজ সকালে কর্নেলসায়েবকে বইটা দিয়েছিলুম।

জয়কুমারবাবু বললেন,—তাহলে লুকিয়ে লাভ নেই। আমার ঠাকুরদা আজিজ কোকার বাড়ি লুঠের সময় একছড়া নানা রত্নখচিত হার হাতিয়েছিলেন। সেই হারে যে সূক্ষ্ম নকশা ছিল, তাকে বলা হয় অ্যারাবেক্স। এ আর এ বি ই এক্স! অর্থাৎ আরবদেশের সূক্ষ্ম নকশা! বইয়ে লেখা ছিল, —'হারছড়া আমি গোপনে এনেছিলুম। কখনও ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলে তা স্বাধীন ভারত সরকারের কোষাগারে উপহার দেব।' আমার মুখস্থ আছে। কিন্তু হেমেন! তুমি তো কখনও আমাকে এ কথা বলোনি যে, তোমাদের বাড়িতে—

বাধা দিয়ে হেমেনবাবু বললেন,—আপনি তো জিগ্যেস করেননি, তাই বলিনি। ফেলারামাবাবু এই বইটাই চুরি করে কোথাও বেচেছে, তা কি আপনি আমাকে বলেছিলেন?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছ।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বইয়ের শেষপাতায় শেষ বাক্যের নিচে দু'লাইন ছড়া আছে। পড়েছেন?

—হ্যাঁ। 'রুদ্রদেবের পায়ের তলে/লক্ষ হীরামানিক জ্বলে'

এই সময় কালীনাথ চা আনল ট্রেতে। ভোলা ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এসে বলল,—গরুগুলো আজ খাবে কী কর্তামশাই? এখনও গ্যাঁদা ঘাস দিয়ে গেল না। দেখে আসব নাকি?

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ভোলা! তোমার স্ত্রী শৈলর হাতে তৈরি চা কি নকুলঠাকুর খান? কাল তোমাদের কর্তামশাইকে বলতে শুনলুম, ঠাকুরমশাইকে শৈল গরম চা করে দেবে। তাই জিগ্যেস করছি।

জবাব দিলেন জয়কুমারবাবু। বললেন,—খাবে না কেন? স্বজাতি যে। এ বাড়িতে তিন মুখুজ্জে ছিল। নকুল মুখুজ্জে, ফেলারাম মুখুজ্জে আর এই ভোলারাম মুখুজ্জে। ফেলারাম লেখাপড়া শিখেছিল। চাকরি পেয়েছিল। ঘুষ খেতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা পড়ে চাকরি গেল। তখন এসে আমার কাছে আশ্রয় নিলে। ভোলাকে বাবা লেখাপড়া শেখাতে পারেননি। ওরা দু'ভাই। ওদের বাবা-ঠাকুরদা আমাদের জমিদারি সেরেস্তায় কর্মচারী ছিল। ভোলা টেনেটুনে নাম সই করতে পারে!

ভোলা গাল চুলকোচ্ছিল। মুখে বিব্রত হওয়ার ছাপ। এবার বলল,—গ্যাঁদাকে দেখে আসি।

কালীনাথ বলল, ওই গ্যাঁদা ঘাসের বোঝা মাথায় নিয়ে আসছে।—বলেই সে পা বাড়াল। ফের বলল,—কর্তামশাই! থানা থেকে পুলিশের গাড়ি এসেছে। বড়ো দারোগাবাবু আসছেন। সঙ্গে ছোটো দারোগাবাবু।

একজন হাফপ্যান্টপরা উদোম গা বালক মাথায় ঘাসের বোঝা নিয়ে বারান্দার নিচে দিয়ে চলে গেল। ভোলা বলল,—এত দেরি কেন রে? গোয়ালঘরে ধোঁয়া দিতে হবে।

সে বারান্দা থেকে নামছিল। কর্নেল বললেন,—ভোলা! শোনো! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ভোলা হকচকিয়ে গিয়ে বলল,—আমার সঙ্গে স্যার?

—হ্যাঁ। তুমি বারান্দায় একটু বসো।

ভোলা বারান্দায় একটা থামের কাছে বসল। ও.সি. তপন বিশ্বাস, এস.আই. মনোরঞ্জন পাল এবং চারজন কনস্টেবল এল। দু'জন কনস্টেবলের হাতে রাইফেল। অন্য দু'জনের হাতে দুটো ছোটো লাঠি। জয়কুমারবাবু তাঁদের আপ্যায়ন করে কালীনাথকে বললেন,—লাইব্রেরিঘরে গিয়ে বসা যাক। কালী! লাইব্রেরি খুলে দে।

লাইব্রেরিঘরে যাওয়ার সময় কর্নেল ভোলাকে ডাকলেন,—তুমিও এসো ভোলা। তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করব।

ভোলা তবু নড়ছে না দেখে কালীনাথ তার হাত ধরে টানল। —এসো ভোলারামবাবু! তোমাকে সায়েব ডাকছেন। হাজার হলেও বামুনের ছেলে। সায়েব তোমাকে খাতির করে ডাকছেন। এসো!

লাইব্রেরিঘরে আমরা ঢুকলুম। দরজায় কনস্টেবলরা এসে দাঁড়াল। ভোলা গম্ভীরমুখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন,—আচ্ছা ভোলা! তুমি গতবছর জুন মাসে কর্তাবাবুর হুকুমে বটের ডাল কাটতে উঠেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পা ফসকে পড়ে গিয়ে তোমার পায়ের হাড় ভেঙেছিল?

—আজ্ঞে!

—হঠাৎ তোমার পা ফসকে গেল কেন? কোনও কারণে নিশ্চয় অন্যমনস্ক হয়েছিলে। তুমি তো আগেও কতবার বটের ডাল দালান ছুঁলে কর্তার হুকুমে কেটেছিলে। কোনওবার পা ফসকায়নি। তাই মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই তুমি কিছু দেখে চমকে উঠেছিলে। আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে—

হঠাৎ ঘুরে কর্নেল জয়কুমারবাবুকে বললেন,—তার আগেই আপনার আংটি হারিয়েছিল। তাই না?

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাল কাকের স্বভাবের কথা আপনি বলছিলেন!

কর্নেল হাসলেন—হ্যাঁ। একটা কাক বাথরুমে উঁচু জানালায় রাখা আপনার আংটি তুলে নিয়ে গিয়ে বটগাছে তার বাসায় রেখেছিল। প্রসঙ্গত বলি, আংটিতে জলস্পর্শ বারণ ছিল। তার কারণ, আংটির ভেতরে একটা লুকোনো জিনিসে মরচে ধরার সম্ভাবনা ছিল। যাই হোক, ভোলা ডাল

কেটে নামবার সময় কাকের বাসায় আংটি দেখে চমকে উঠেছিল। তার দাদা ফেলারামের কাছে সে ওই আংটির গোপনকথা শুনেছিল। তাই উত্তেজনায় সে কেঁপে উঠেছিল। আংটিটা হাতিয়ে উত্তেজনার চোটে সে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিল। কি ভোলা? তাই না?

ভোলা মুখ নামিয়ে গাল চুলকোতে থাকল।

কর্নেল বললেন,—আংটিটা তুমি অন্য কোথাও রাখতে সাহস পাওনি। তার আগে বলি—তুমি আছাড় খেয়ে পড়ার সময় কে সবার আগে তোমার কাছে গিয়েছিল?

কালীনাথ বলল,—শৈলবালা স্যার! শৈলবালা বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চ্যাঁচামেচি শুনে আমি দৌড়ে গিয়েছিলুম।

কর্নেল বললেন,—আংটি ভোলা তার স্ত্রী শৈলবালার হাতে দিয়েছিল। শৈলবালাকে ও.সি. তপনবাবু পরে জেরা করবেন। আমার অঙ্কটা লক্ষ করুন। হাসপাতাল থেকে ফিরে ভোলা তার দাদা ফেলারামের তাগিদে—কিংবা অন্য কোনও কারণে আংটিটা বাঁয়াতবলা ফাঁসিয়ে দিয়ে তার ভেতর রেখেছিল। এদিকে গোপীমোহন হাজরা বেহালা-বাজিয়ে মানুষ। তবলা কেন ফেঁসেছে—

তাঁর কথার ওপর জয়কুমারবাবু বললেন,—গোপী তবলা সারিয়ে আনত বরাবর। তাকে তবলাটা শিগগির সারিয়ে আনতে বলেছিলুম।

কর্নেল বললেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে গোপীবাবু তবলার ভেতর আংটিটা দেখে তখনই আত্মসাৎ করেছিলেন। ইতিমধ্যে ফেলারামবাবু গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছেন। গোপীবাবু শিক্ষিত লোক। তিনি নিশ্চয়ই অভয়কুমার রায়চৌধুরির 'আমার জীবন' পড়েছিলেন।

জয়কুমারবাবু বললেন,—হ্যাঁ। গোপীকে আমি লাইব্রেরি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলুম। কারণ ফেলারাম প্রায়ই বই বা অন্যান্য জিনিস চুরি করে কোথায় বেচে আসত।

—বোঝা যাচ্ছে, গোপীবাবু গুপ্তধনের লোভেই আংটি বেচে দেননি। আজ দুপুরে আমরা মঘাডাকাতের চেলাদের কাছে ডাকিনীতলার জঙ্গলে শুনেছি, গোপীবাবু তাদের মন্দির লুঠ করার চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। ওই ডাকাতদের ফেলারামবাবুই বলেছিলেন, মন্দিরে গুপ্তধন আছে। যাই হোক, ভোলা নিশ্চয় টের পেয়েছিল, মঘাডাকাতের সঙ্গে গোপীবাবুর চক্রান্ত হয়েছে। ভোলা! তাই না?

ভোলা ফুঁসে উঠল,—আমি স্বচক্ষে দেখেছি মঘার সঙ্গে গোপীবাবু গাবতলায় বসে কথা বলছে।

—তাই তুমি সাহস পাওনি গোপীবাবুকে চ্যালেঞ্জ করতে। অথচ তুমি ঠিক বুঝেছিলে কে বাঁয়াতবলার ভেতর থেকে আংটি হাতিয়েছে। তাছাড়া তোমার এক পায়ে জোর নেই। তাই অবশেষে তুমি তোমার দাদার ভূত সেজে ভয় দেখাতে শুরু করলে!

জয়কুমারবাবু বললেন,—ফেলারামের মুখে গোঁফদাড়ি ছিল!

কর্নেল হাসলেন,—ভোলা নকল গোঁফদাড়ি পরলে তাকে দাদার মতো দেখাবে। তাই না?

জয়কুমারবাবু ছড়ি তুলে গর্জন করলেন,—ওরে বজ্জাত! ওরে নেমকহারাম!

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আমি এখনই আসছি। কাল বিকেলে বটতলায় ঘোরাঘুরি করে আমি কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছি। নিয়ে আসছি।

জয়কুমারবাবু বললেন,—আর কি তা আছে? ভোলার দজ্জাল বউ শৈল এতক্ষণে তা লুকিয়ে ফেলেছে।

হেমেনবাবু বললেন,—বটতলায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার পাহারা দিচ্ছেন।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। লাইব্রেরি ঘরে কিছুক্ষণ ঘোর স্তব্ধতা এল। কালীনাথ ভোলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় চারজন কনস্টেবল। সেই স্তব্ধতা না এলে জানালা দিয়ে মেয়েলি গলার

কর্কশ চ্যাঁচামেচি আমরা শুনতে পেতুম না। জয়কুমারবাবু বললেন,—কালী! শৈল কাকে গালাগালি করছে দেখে আয়!

ও.সি. তপনবাবু বললেন,—কালী নয়। মনোরঞ্জনবাবু! আপনি যান। ভোলার স্ত্রীকে এখানে ডেকে আনুন।

ডাকবার দরকার হল না। কর্নেল জলকাদা মাখা একটা ছোটো চটের থলে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হালদারমশাইও এসে গেলেন। তাঁদের পিছনে মধ্যবয়সিনী রোগা ফর্সা এক মহিলাও চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ঘরে ঢুকল। সে হালদারমশাইয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল,—ওই বাঙাল মিনসের কী সাহস! বামুনের মানতের থলেয় হাত দেয়! শাপ লাগবে না? মুখে রক্ত উঠে মরবে না? আমি আমার ভাসুরের আত্মার মুক্তির জন্য মানত দিয়েছিলুম। সেই থলে ছুঁয়ে দিল? ও বুড়োসায়েব! মানতের থলে খুললে মুখে রক্ত উঠবে বলে দিচ্ছি।

কালীনাথ হাঁকল,—চো-ও-প! তুলে বিলের জলে ছুড়ে ফেলব।

ততক্ষণে থলে খুলে কর্নেল প্রথমে বের করেছেন একটা ছেঁড়া দড়ির ফাঁস। তারপর বের করলেন কাগজের মোড়ক। তা থেকে বেরুল নকল গোঁফদাড়ি। তারপর কর্নেল নিরেট লোহার ছোটো একটা প্যাঁচালো রড বের করলেন। একটু হেসে তিনি বললেন,—এটাই মার্ডার উইপন। ধুয়ে ফেললেও আতশ কাচে দেখেছিলুম, খাঁজে-খাঁজে রক্তের চিহ্ন আছে। এই থলেটা পাঁচিলের কাছে মানকচুর ঝোপের ভেতর লুকোনো ছিল। নকল গোঁফদাড়ি গত রাতে বৃষ্টির সময় পরার জন্য ভিজে গিয়েছিল। এখনও ভিজে আছে। থলেতে ঘটা করে সিঁদুরের ছোপ দেওয়া হয়েছে। মানতের জিনিস কিনা! আসলে ফেলারাম মুখুজ্জের ভূতের হামলা চালিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল।

কালীনাথ বলে উঠল,—ওই লোহার ডাঙস দিয়ে গাইগরুর খুঁটি পোতা হয়। গোপীবাবু খুন হওয়ার দিন বিকেলে ভোলা গাবতলার কাছে গরুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনবাবু উঠে গিয়ে ভোলার দু-হাত পিছনে টেনে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। জয়রামবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন,—ভোলার হাতে এত জোর যে গোপীর খুলি ফাটিয়ে মেরেছে?

কর্নেল বললেন,—প্রতিদিন যাকে গাইগরু নিয়ে গিয়ে এই লোহার রড দিয়ে খুঁটি বসাতে হয়, তার হাত এই ওজনদার দুরমুসের ঘা মারতে পোক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কথা বলতে-বলতে আচমকা ভোলারাম গোপীবাবুর মাথার পেছনে দুরমুসের ঘা মেরেছিল। আংটি হরণের প্রতিশোধ নয়। খুনের উদ্দেশ্য ছিল গোপীবাবুর বেহালার ভেতর লুকিয়ে রাখা আংটি উদ্ধার। কিন্তু আংটি বেহালার ভেতর ছিল না।

উপসংহার

ও.সি. তপন বিশ্বাসের নির্দেশে সাবইন্সপেক্টর মনোরঞ্জনবাবু সেই থলেসহ ভোলাকে এবং দুজন কনস্টেবল শৈলবালাকে নিয়ে গেল। তপনবাবু বললেন,—আমি হেমেনবাবুর গাড়িতে ফিরব। জায়গা হবে তো?

হেমেনবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই হবে।

জয়কুমারবাবুর হাত কাঁপছিল। আস্তে বললেন,—কী সাংঘাতিক কাণ্ড! কর্নেলসায়েব! আপনি কি আংটির খোঁজ পেয়েছেন?

কর্নেল পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বের করে খুললেন। মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। বিদ্যুতের আলো ক্ষীণ! কালীনাথ হ্যাজাগ জ্বালতে গেল। টর্চের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল

অভয়কুমার রায়চৌধুরির সংগৃহীত 'রাজা সলোমনের আংটি।' কর্নেল সংক্ষেপে ডাকিনীতলার ঘটনা শুনিয়ে বললেন,—এই আংটি উদ্ধার করেছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার। আমাদের প্রিয় হালদারমশাই!

হালদারমশাই বললেন,—আংটির কথা ভাবি নাই। চরণ কইছিল, কোনও-কোনও রাত্রে গোপীবাবু গাঁজা খাইয়া একটা ডালে গিয়া বইতেন। সেখানে উনি বেহালা বাজাইতেন। এই কথায় আমার খটকা বাধছিল। ক্যান ওই ডালে বইয়া গোপীবাবু বেহালা বাজাইতেন?

কর্নেল বললেন,—এবার ভোজবাজি দেখুন! আংটির মধ্যে একটা খুবই ছোটো আর সূক্ষ্ম চাবি লুকানো আছে। এই চাবি দিয়ে সম্ভবত রুদ্রদেবের বিগ্রহের বেদি খোলা যায়। সন্ধ্যারতি শেষ হোক। তারপর আমরা মন্দিরে যাব।

জয়কুমারবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—ঠাকুরদা তাঁর বইয়ের শেষে ছড়া লিখেছিলেন : 'রুদ্রদেবের পায়ের তলে। লক্ষহীরা মানিক জ্বলে।' হ্যাঁ—সেই রত্নহার বেদির তলায় লুকানো ছিল। আমার জামাই সুভদ্র কলকাতায় একটা ট্রেডিং কোম্পানি খুলে ব্যাংক থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়েছিল। ঋণের দায়ে কোম্পানি নীলাম হওয়ার মুখে আমার মেয়ে নীলা এসে আমাকে ধরল। জমিজমা বেচে সুভদ্রের ঋণ শোধ করে তাদের কাছে গিয়ে আমাকে থাকতে হবে। ছেলেদুটো তো বিদেশে। কদাচিৎ আসে। চিঠিপত্র লিখেও বাবার খোঁজ নেয় না। নীলা আর সুভদ্র প্রায়ই আসে। খোঁজখবর নেয়। তো আমি সেই রত্নহার গোপনে বের করে নীলাকে দিয়েছিলুম। বলেছিলুম—এই রত্নহার আমার ঠাকুরদার লুঠের জিনিস। রুদ্রদেবের তাই অভিশাপ লেগেছে এ বাড়িতে। এটা নিয়ে তোরা আমাকে অভিশাপ থেকে বাঁচা। তোরাও বাঁচ। রুদ্রদেবের কৃপা হয়েছিল। সে বছর জমিতে ফসলও প্রচুর পেয়েছিলুম। আমার জামাইয়ের কোম্পানি ঋণের ধাক্কা সামলে মোটামুটি ভালোই চলছে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তাই 'রাজা সলোমনের আংটি' সম্পর্কে আর আপনার মাথাব্যথা ছিল না?

—ঠিক বলেছেন। এই আংটিতে বড়োজোর একভরির মতো সোনা আছে। তার দাম আর কতটুকু? গোপীটা বোকা। বেচে দিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে প্রাণে বাঁচত। গুপ্তধনের লোভে পড়েছিল হতভাগা!

ও.সি. তপন বিশ্বাস বললেন,—জয়কুমারবাবু! খুনের মামলার স্বার্থে এই আংটিটা আমি সিজ করতে বাধ্য হচ্ছি। কর্নেলসায়েবরা আছেন। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হেমেনবাবু আছেন। আমি তাঁদের সামনে আংটিটা নিচ্ছি। থানায় গিয়ে সিজার লিস্টের কপি পাঠিয়ে দেব।

আপনার অভিরুচি!—বলে জয়কুমারবাবু কালীর দিকে ঘুরলেন। সে হ্যাজাগ জ্বেলে এনেছিল। জয়কুমারবাবু হঠাৎ আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন : ওরে কালী! আমরা দুজন এই পোড়োবাড়ি পাহারা দেব। এ কী হয়ে গেল রে কালী?

নকুলঠাকুর ঘরে ঢুকে বললেন,—কর্তামশাই! আমিও তো আছি। আমার কথা ভুলে গেলেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—চলি জয়কুমারবাবু! আশা করি, আর আপনার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হবে না।

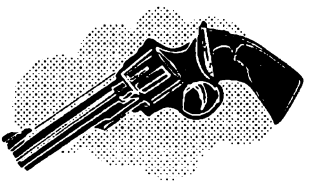

বত্রিশের ধাঁধা

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার— আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি কাগজটা ভাঁজ করে রেখে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর বললেন, — জয়ন্তবাবু তো সাংবাদিক। তাই কথাটা আপনারে জিগাই।

বললুম,—বলুন হালদারমশাই।

গোয়েন্দাপ্রবর একটু হেসে বললেন,— আপনাগো কাগজে বিজ্ঞাপনে দেখি, কোনওটার হেডিং নিরুদ্দেশ। আবার কোনওটার হেডিং নিখোঁজ। ক্যান? মানে তো এক।

—এটা বিজ্ঞাপন বিভাগের লোকেদের খেয়াল। তাঁরাই তো বিজ্ঞাপনের হেডিং দেন।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে একটা ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিলেন। দাঁতে কামড়ানো চুরুটের নীল ধোঁয়া তাঁর টাকের ওপর ঘুরপাক খেতে খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তিনি পত্রিকাটা বুজিয়ে রেখে বললেন,—জয়ন্তের জবাব হালদারমশাইয়ের মনঃপুত না হওয়ারই কথা।

হালদারমশাই সায় দিলেন,—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ। দুইরকম হেডিং অথচ একই মানে। ক্যান দুইরকম?

কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। মিটিমিটি হেসে বললেন,—হালদারমশাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন জয়ন্ত! এটা হালকাভাবে নিও না। রীতিমতো ভাষাবিজ্ঞানের শব্দার্থতত্ত্বের মধ্যে ব্যাপারটা পড়ে।

বললুম, সর্বনাশ! এই সুন্দর সকালবেলায় ওইসব গুরুগম্ভীর তত্ত্ব আওড়াবেন না প্লিজ!

—মোটেও গুরুগম্ভীর তত্ত্ব নয় জয়ন্ত! হালদারমশাই তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পড়ছিলেন। তুমিও একবার পড়ে নিলে পারো!

এবার একটু অবাক হতে হল। আজকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে কর্নেল কোনও রহস্যের লেজ দেখতে পেয়েছেন নাকি? কাগজটা তুলে নিয়ে কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। 'নিরুদ্দেশ' শিরোনামে পর-পর দুটো বিজ্ঞাপন আছে। প্রথমটা এই :

'বাবা অমু! তুমি শীঘ্র বাড়ি ফিরে এসো। তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। টাকার দরকার হলে টেলিফোনে জানাও।—বাবা'

দ্বিতীয়টা এই :

'*পুঁটুদা, তুমি যা চেয়েছিলে তা-ই হবে। যেখানেই থাকো, ফিরে এসো। — ভুঁটু*'

এরপর 'নিখোঁজ শিরোনামের তলায় একটি প্যান্ট-হাফশার্ট-পরা বলিষ্ঠ গড়নের ছেলের ছবি। তার নিচে ছাপা হয়েছে :

'এই ছবিটি শ্রীমান দীপক কুমার রায়ের। বয়স প্রায় ১৪ বছর। গায়ের রং ফর্সা। চিবুকে একটু কাটা দাগ আছে। কেউ এর সন্ধান দিতে পারলে নগদ ১০ হাজার টাকা পুরস্কার।

পীতাম্বর রায়, ৮-১ সি ঘোষপাড়া লেন, কলকাতা - ৪৬'

এরপর জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিকদের ছবিসহ বিজ্ঞাপন। কাগজ থেকে মুখ তুলে বললুম—নাঃ! বিজ্ঞাপনের লোকেদের খেয়াল-খুশিমতো হেডিং।

কর্নেল দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন,—হালদারমশাই ঠিক ধরেছেন। নিরুদ্দেশ আর নিখোঁজ একই ব্যাপার। কিন্তু বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে কথাদুটোর মানেতে যে একটা তফাত আছে, তা তোমার বোঝা উচিত ছিল।

হালদারমশাই একটু উত্তেজিত হলেই ওঁর ছুঁচলো গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপে। লক্ষ করলুম উনি উত্তেজিত। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বললেন, — হঃ! বুঝছি। যে স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে পালায়, তার হেডিং দিচ্ছে নিরুদ্দেশ। আর কোনওভাবে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যারে বাড়িছাড়া কইর‍্যা কেউ বা কারা গুম করে, কিংবা ধরেন, মার্ডার কইর‍্যা ফ্যালে—

ওঁর কথার ওপর বলে উঠলুম—কী সর্বনাশ! হালদারমশাই; ওসব অলুক্ষুণে কথা প্লিজ বলবেন না।

কর্নেল বললেন,—নিখোঁজ ছেলেটির ছবি দেখার পর মার্ডার কথাটা শুনলে সত্যি খারাপ লাগে। কাজেই হালদারমশাই, এ প্রসঙ্গ থাক। হেডিং দুটোর প্রচলিত অর্থ বুঝেছেন, এই যথেষ্ট।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে তখনও উত্তেজিত এবং অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। একটু পরে তিনি আস্তে বললেন,—কর্নেলস্যার! কর্নেল হাসলেন,—আপনি কী বললেন, বুঝতে পেরেছি হালদারমশাই। নিখোঁজ ছেলেটি সম্পর্কে আপনার উৎসাহ জেগেছে।

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—দশ হাজার টাকার জন্য না। আমার ডিটেকটিভ এজেন্সির হাতে এখন কোনও কেস নাই, এ জন্যও না। কথাটা হইল গিয়া, এমন বিজ্ঞাপন মাইনষে দেয় কখন? যখন পুলিশ দিয়াও কাম হয় না, তখন।

—ঠিক বলেছেন।

—ভদ্রলোকের লগে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা হয়।

—বেশ তো। ঠিকানা দেওয়া আছে। টুকে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর সোয়েটারের ভেতর হাত ঢুকিয়ে খুদে নোটবই এবং ডটপেন বের করলেন। তারপর পীতাম্বর রায়ের ঠিকানা টুকে নিয়ে বললেন,—কলকাতা ছেচল্লিশ কোন এরিয়া য্যানো?

কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে ছোট্ট স্ট্রিট-ডাইরেক্টরি বের করলেন। তারপর পাতা উলটে দেখে নিয়ে বললেন,—ঠিকানাটা গোবরা এলাকার।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার তখনই উঠে দাঁড়ালেন এবং সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

বললুম, — যাকগে। হালদারমশাই তখন দুঃখ করছিলেন, আজকাল রহস্যের খুব আকাল চলেছে দেশে। চুরি ছিনতাই ডাকাতি খুনোখুনি প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু সবই প্রকাশ্যে আর সাদামাটা ব্যাপার। কাকেও মেরে গুম করে ফেলাটাও আর তত রহস্যজনক নয়। কাজেই দেখা যাক, এই ঘটনাটার পেছনে ছুটোছুটি করে উনি যদি কোও রহস্য খুঁজে পান, মন্দ কী?

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, এইসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন, — ষষ্ঠী!

একটু পরে দুজন ভদ্রলোক এসে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। একজনের পরনে প্যান্ট শার্ট, জ্যাকেট। রাশভারী মধ্যবয়সী মানুষ। অন্যজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি শাল। কর্নেল প্রথমজনের উদ্দেশে বলে উঠলেন, — কী আশ্চর্য! মিঃ অধিকারী যে! বসুন, বসুন! ষষ্ঠী! শিগগির কফি চাই।

মিঃ অধিকারী বললেন, — কিছুদিন থেকেই আসব-আসব করছিলুম। শেষ পর্যন্ত আসতেই হল। আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য। আমাদের রায়গড় স্কুলেই শিক্ষকতা করতেন। গতবছর রিটায়ার করেছেন। কুমুদ! বুঝতেই পারছ ইনি সেই স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এবার কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দিলেন। লক্ষ করলুম অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভদ্রলোকের চেহারায় যেন কিছুটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। চোখের তলায় কালচে ছোপ। কপালে ভাঁজ। মুখে ও চোখে বিষণ্ণতা গাঢ় ছাপ ফেলেছে।

মিঃ অধিকারীর পুরো নাম কৃষ্ণকান্ত অধিকারী। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, — জয়ন্ত আমার বিশ্বস্ত। তাছাড়া সব ব্যাপারে ও আমার সহকারী। কথা যত গোপনীয় হোক, ওর সামনে বলতে দ্বিধা করবেন না।

মিঃ অধিকারী বললেন, — আমি অক্টোবর-নভেম্বর এই দুটো মাস ব্যবসার কাজে বাইরে ছিলুম। ফিরেছি ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে। তারপর ঘটনাটা শুনে প্রথমে পুলিশ সোর্সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। শেষে আপনার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম। কুমুদ আমার বাল্যবন্ধু। অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাকে সাহায্যের জন্য যতদূর যেতে হয়, আমি রাজি।

— ঘটনাটা কী?

— কুমুদ! তুমিই বলো। তোমার মুখ থেকেই কর্নেলসায়েবের শোনা উচিত।

কুমুদ একটু কেশে গলা সাফ করে বললেন, — রায়গড়ে তো আপনি গেছেন! একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে খেলার মাঠ আর তার পাশে ঘন জঙ্গলটা সম্ভবত দেখেছেন!

কর্নেল বললেন, — হ্যাঁ। জঙ্গলটার অদ্ভুত নাম। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আমি অবশ্য কোনওরকম হাড়-মট-মট করা শব্দ শুনিনি।

মিঃ অধিকারী বললেন, — আপনাকে তো বলেছিলুম, কোনও যুগে কেউ শুকনো গাছে বাতাসের শব্দ শুনে ভূতুড়ে গপ্প রটিয়েছিল। একটা ভূত নাকি হাঁটাচলা করে। আর পায়ের হাড় মট-মট করে ভাঙার মতো শব্দ হয়। বোগাস! কুমুদ! সংক্ষেপে বলো এবার।

কুমুদবাবু বললেন, — লক্ষ্মীপুজের পরদিনের ঘটনা। আমার একটিমাত্র ছেলে। সুদীপ্ত নাম। ডাকনাম দীপু। ক্লাস টেনের ছাত্র। পড়াশুনা, খেলাধুলো সবেতেই ভালো। তবে একটু একরোখা আর দুঃসাহসী। তো অন্যদিনের মতো সেদিন বিকেলে দীপু ক্লাবের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। ওদের খেলার কোনও সময় - অসময় থাকে না। সূর্য ডুবেছে, তখনও ওরা খেলায় মেতে আছে। জঙ্গলের দিকটায় একটা গোলপোস্ট। দীপুর কিকের খুব জোর। তার কিকে বলটা গোলপোস্টের ওপর দিয়ে জঙ্গলের ভেতর পড়েছিল। তাই দীপুই বলটা কুড়িয়ে আনতে জঙ্গলে ঢুকেছিল।

এইসময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন, — কফি খান। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

কুমুদবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও কফির পেয়ালা তুলে নিলেন কৃষ্ণকান্তবাবু তাগিদে। কয়েক চুমুক খাওয়ার পর তিনি জোরে শ্বাস ফেলে বললেন, — দীপু জঙ্গলে বল আনতে গেল তো গেলই। আর ফিরল না। আজ জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখ। দীপু এখনও ফিরল না।

কর্নেল বললেন, — একটু খুলে বলুন প্লিজ! আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। তবু সব কথা খুলে না বললে তো আমার পক্ষে এক পা এগোনো সম্ভব নয়।

কুমুদবাবু বললেন, — দীপু ফিরছে না দেখে ওর বন্ধুরা প্রথমে ডাকাডাকি করে। সাড়া না পেয়ে ওরা দীপু যেখানে জঙ্গলে ঢুকেছিল, সেখান দিয়ে ঢোকে। তখন জঙ্গলে আঁধার ঘনিয়েছে। অনেক ডাকাডাকি আর খোঁজাখুঁজি করে ওরা ভয় পেয়েছিল। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে জন্তুজানোয়ার থাকতে পারে। কিন্তু বাঘ-ভালুক থাকার কথা শোনা যায় না। ওরা রায়গড়ে ফিরে পাড়ার লোকেদের খবর দেয়। আমিও খবর পেয়ে ছুটে আসি। তারপর টর্চ-লাঠিসোঁটা আর বন্দুক নিয়ে আমরা জঙ্গলে ঢুকেছিলুম। তখন শরৎকালে জঙ্গল খুব ঘন। সাপের উৎপাতও স্বাভাবিক।

কুমুদবাবু চুপ করলেন। কর্নেল বললেন, — জঙ্গলটা তো বেশ বড়। আপনারা পুরোটাই কি খুঁজেছিলেন?

— না। জঙ্গলের ভেতরে একটা গভীর ডোবা আছে। সেই ডোবার পাড়ে খানিকটা টাটকা রক্ত দেখেছিলুম। আর—

— বলুন!

— আমরা যখন রক্ত দেখছি, তখন জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত— অমানুষিক চিৎকার শুনতে পেয়েছিলুম। না— চিৎকার বলাও যাবে না। চেরা গলায় আর্তনাদ— কিংবা ওইরকম একটা তীক্ষ্ণ কাঁপাকাঁপা হিংস্র শব্দ— শব্দটা একটানা অন্তত একমিনিট ধরে শোনা গেল। কৃষ্ণকান্তের বন্দুক আছে। ওর ভাই বরদা দুবার ফায়ার করল বন্দুকের। কিন্তু আমরা আর এগোতে সাহস পেলুম না। রক্ত দেখেই ধরে নিয়েছিলুম দীপু কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে। বাঘ-ভালুকের কথা শোনা যায় না বটে, কিন্তু জঙ্গল তো! কোত্থেকে এসে জুটলেই হল। তবে সেই অমানুষিক চিৎকারটা কোন জানোয়ারের, তা আমরা এখনও বুঝতে পারিনি।

— তারপর আপনারা কী করলেন?

— সে রাত্রে থানায় খবর দিলুম। পুলিশ রাত্রে জঙ্গলে ঢুকতে রাজি হয়নি। সকালে থানার কজন সশস্ত্র কনস্টেবল নিয়ে বড়বাবু ডোবার পাড়ে রক্ত দেখেই বললেন, — দীপুকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। এলাকার লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সারা জঙ্গল তোলপাড় করল। কিন্তু দীপুর চিহ্নটুকু খুঁজে পাওয়া গেল না।

কর্নেল কুমুদবাবুর কথা শোনার পর বললেন, — এটাই যদি ঘটনা হয়, তাহলে মিঃ অধিকারী, আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতেন না।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী বললেন, — আপনি ঠিকই ধরেছেন কর্নেলসায়েব! কুমুদ! এবার বাকি অংশটা বলো।

কুমুদবাবু বললেন, — দিন দশেক পরে পোস্টম্যান একটা খাম দিয়ে গেল। খামের ওপরে ইংরেজিতে আমার নাম - ঠিকানা লেখা ছিল! কিন্তু ভেতরে ছিল শুধু একটা রঙিন ফোটো। ফোটোটা দীপুর।

কর্নেল তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, — আপনার নিখোঁজ ছেলের ফোটো?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি অবাক হয়েছিলুম। ফোটোটা উলটে দেখে আরও অবাক হলুম। পিছনে লাল কালিতে লেখা আছে : দীপু বেঁচে আছে। সময় হলেই বাড়ি ফিরবে।

মিঃ অধিকারী বললেন, —অদ্ভুত ব্যাপার! কুমুদ নিজের ছেলের হাতের লেখা চেনে। খামের ওপর ইংরেজি লেখা আর ফোটোর পিছনে বাংলায় লেখা নাকি দীপুর নয়।

কুমুদবাবু বললেন, — হ্যাঁ। দীপুর লেখা নয়। অন্য কেউ লিখেছে।

মিঃ অধিকারী বললেন, — খাম আর ফোটোটা কর্নেলসায়েবকে দাও কুমুদ!

কুমুদবাবু বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খাম থেকে ফোটোটা বের করে উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর বললেন, — হুঁ। তারপর?

কুমুদবাবু বললেন, — এর কদিন পরে আবার একটা খাম এল ডাকে। একই হাতের লেখা এবার শুধু একটা চিঠি। চিঠিতে লেখা আছে—

মিঃ অধিকারী বললেন, — চিঠিটা বরং কর্নেলসায়েবকে দাও।

কুমুদবাবু পকেট থেকে আর একটা খাম বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চিঠিটা বের করে মৃদুস্বরে পড়তে থাকলেন,

'দীপুর পড়ার টেবিলে ড্রয়ারের মধ্যে খুঁজে দেখুন একটা অঙ্কের ধাঁধা লেখা আছে। ধাঁধার চারদিকে ৩২ লেখা আছে দেখতে পাবেন। যদি ওটা ড্রয়ারে না থাকে ওর বই আর খাতাগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই ওটা পাবেন। পেয়ে গেলে ধাঁধার কাগজটা খামে ভরে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে জোবার দক্ষিণপাড়ে একটুকরো ঢিল চাপা দিয়ে গোপনে রেখে আসবেন। সাবধান! পুলিশ কিংবা অন্য কাকেও ঘুণাক্ষরে একথা জানাবেন না। কিংবা নিজেও সেখানে গোপনে লক্ষ রাখবেন না। তাহলে দীপুকে আর ফিরে পাবেন না।'

পড়া শেষ করে কর্নেল— বললেন, — ধাঁধাটা পেয়েছিলেন?

— আজ্ঞে না। অগত্যা কী করব, অনেক ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখে জঙ্গলের ভেতর ডোবার পাড়ে রেখে এসেছিলুম। লিখেছিলুম, ওটা খুঁজে পাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে আরও দু'সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক।

—তারপর?

ঠিক দু-সপ্তাহ পরে আবার একটা চিঠি এল ডাকে। ওটা পেয়েছি কি না জানতে চেয়েছে। —বলে কুমুদবাবু আবার একটা খাম কর্নেলকে দিলেন।

মিঃ অধিকারী বললেন, — কুমুদ আবার সময় চেয়ে চিঠি রেখে এসেছিল। তার কিছুদিন পরে আমি হংকং থেকে ফিরলুম। কুমুদ আমাকে সব ঘটনা বলল। তখন আমাদের রেঞ্জের পুলিশের ডি. আই. জি. সুকুমার ভদ্রের কাছে কুমুদকে নিয়ে গেলুম। মিঃ ভদ্র হেসে উড়িয়ে দিলেন। পাত্তাই দিলেন না। বললেন, ছেলে বাবার সঙ্গে দুষ্টুমি করছে। আর কিছুদিন অপেক্ষা করুন। দীপু ঠিকই বাড়ি ফিরে আসবে।

কুমুদবাবু বলেন, — ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনি, দীপু তেমন ছেলে নয়। জঙ্গলে রক্তের ব্যাপারটাও ডি. আই. জি. সায়েব গ্রাহ্য করলেন না। বললেন, — তাঁর কাছে এই কেসে রায়গড় থানার পুলিশ-রিপোর্ট আছে। ডোবাটার কাছে আদিবাসীদের ওঝারা নাকি গোপনে মুরগি বলি দেয়।

মিঃ অধিকারী বললেন, — সেটা অবশ্য ঠিক। জঙ্গলের পূর্বে আদি বস্তি আছে। ছোটবেলায় দেখেছি ওরা জঙ্গলে গিয়ে ধামসা বাজিয়ে নাচ-গান করে পুজো দিত। আজকাল ওরা খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তা বলেও পুরোনো প্রথা কেউ গোপনে মেনে চলতেই পারে। যাই হোক, কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, দীপুর অন্তর্ধান রহস্যের একটা কিনারা করুন।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওঁরা দুজনে চলে গেলেন। তারপর বললুম, — রীতিমতো রহস্যজনক ঘটনা কর্নেল! বিশেষ করে অঙ্কের ধাঁধা এবং ৩২ সংখ্যাটার মধ্যে নিশ্চয় কোনও মূল্যবান জিনিসের সম্পর্ক আছে।

কর্নেল দীপুর ফোটোটা খুঁটিয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে 'নিখোঁজ' শীর্ষক ছবিটা দেখতে থাকলেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতশ কাচ বের করে দুটো ছবি মিলিয়ে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, — বত্রিশের ধাঁধার আর একটা দিক খুবই অদ্ভুত জয়ন্ত! খবরের কাগজে ছাপা নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের ছবি আর রায়গড়ের কুমুদবাবুর নিখোঁজ ছেলে সুদীপ্ত ওরফে দীপুর ছবি হুবহু মিলে যাচ্ছে।

চমকে উঠে বললুম, — দেখি, দেখি।

তারপর ছবি দুটো দেখেই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। দুটো ছবিই একজনের!

দুই

কর্নেল আতশ কাচে বিজ্ঞাপনের ছবি আর সেই ফোটোটা আরও কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর এদিনের আরও কয়েকটা ইংরেজি ও বাংলা খবরের কাগজ খুলে বিজ্ঞাপনগুলো দেখার পর বললেন, — নাঃ! পীতাম্বর রায় শুধু তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় দীপুর ছবিসহ বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন।

বললুম, — কিন্তু শুধু একটা কাগজে কেন? নিখোঁজ দীপুর জন্য যিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চান, তাঁর পক্ষে অন্য কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল। ... অন্তত একটা ইংরেজি কাগজেও বিজ্ঞাপন দেওয়া উচিত ছিল না কি?

কর্নেল সায় দিলেন, — অবশ্যই ছিল।

বলে তিনি একটু হাসলেন, — এমন হতে পারে, পীতাম্বর রায় ধরেই নিয়েছেন, বহুলপ্রচারিত এবং জনপ্রিয় একটা বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াই যথেষ্ট।

— আমার আরও একটা ব্যাপারে অবাক লাগছে কর্নেল!

— বলো!

— রায়গড়েও নিশ্চয়ই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা যায়।

— যাওয়া স্বাভাবিক। তবে এদিনের কাগজ সেখানে পৌঁছুতে বিকেল হয়ে যাওয়া কথা।

— না— আমি বলতে চাইছি, দীপুর বাবা আর তাঁর বন্ধু কৃষ্ণকান্তবাবু কলকাতা আসার পথে কি খবরের কাগজ পড়েনি? বিশেষ করে দৈনিক সত্যসেবকের মতো জনপ্রিয় কাগজ!

— পড়েননি। অথবা পড়লেও বিজ্ঞাপনটা তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তা না হলে কথাটা তাঁর বলতেন।

— আমার ধারণা, রায়গড়ে পৌঁছে ওঁরা সেখানকার কারও কাছে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা জানতে পারবেন। কারও না কারও চোখে বিজ্ঞাপনটা পড়তে বাধ্য।

— হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ।

বলে কর্নেল কাগজ থেকে বিজ্ঞাপনটা কেটে নিলেন এবং উলটো পিঠে পত্রিকার নাম ও তারিখ লাল ডটপেনে লিখে রাখলেন। তারপর টেবিলের নিচে ড্রয়ার থেকে একটা বড় খাম বের করে বিজ্ঞাপন, ফোটো এবং দীপুর বাবার দিয়ে যাওয়া সেই চিঠি দুটো তাতে ভরে রাখলেন।

সেই সময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল। বললুম, — আচ্ছা কর্নেল, এই বিজ্ঞাপনদাতা পীতাম্বর রায় দীপুর বাবা কুমুদবাবুর কোনও আত্মীয় নন তো? হয়তো কুমুদবাবুর কাছে কোনও সূত্রে খবর পেয়ে তিনি বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন!

কর্নেল খামটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢোকাচ্ছিলেন। বললেন, — কিন্তু পীতাম্বর রায় বিজ্ঞাপনে দীপুকে দীপককুমার রায় করেছেন। এদিকে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নাম সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বা সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য।

বললুম,—ধরা যাক, পীতাম্বর রায় কুমুদবাবুর আত্মীয় নন। হিতৈষী বন্ধু। সুদীপ্ত শুনতে দীপক শুনেছিলেন।

কর্নেল হাসলেন, — সাবধান জয়ন্ত! তুমি একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছ। বরং আর এক পেয়ালা কফি খেয়ে ঘিলু চাঙ্গা করো!

বলে তিনি হাঁক দিলেন, — ষষ্ঠী! কফি।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। কফি খেতে-খেতে বললাম, হালদারমশাই এতক্ষণে নিশ্চয়ই গোবরা এলাকায় গিয়ে পীতাম্বর রায়কে খুঁজে বের করে ফেলেছেন। দেখা যাক, তিনি কোন খবর আনেন।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। এতক্ষণে তুমি গোলকধাঁধা থেকে বেরুতে পেরেছ।

— তার মানে, হালদারমশাই দীপুর অন্তর্ধানরহস্য একা-একা ফাঁস করে ফেলবেন বলছেন? আপনাকে নাক গলাতে হবে না?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ চুরুট টানতে থাকলেন।

সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল চোখ না খুলে বললেন, — ফোন ধরো জয়ন্ত!

হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, — কর্নেলস্যার!

দ্রুত বললুম, — বলুন হালদারমশাই!

— জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলস্যার কী করতাছেন?

—ধ্যানে বসেছেন। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন? অমন হাঁসফাঁস করেই বা কথা বলছেন কেন?

কর্নেল আমার হাত থেকে রিসিভার ছিনিয়ে নিয়ে বললেন,—বলুন হালদারমশাই!... হ্যাঁ।... তারপর?... বলেন কী?... আপনি বরং আমার এখানে চলে আসুন।... ঠিক বলেছেন। রাখছি।

বললুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তোমার রসিকতা করার বদঅভ্যাস আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রসিকতা সঙ্গত নয়। বিশেষ করে উনি যখন রীতিমতো মল্লযুদ্ধ করে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে আমাকে টেলিফোন করছেন।

চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—মল্লযুদ্ধ মানে?

—হালদারমশাইয়ের মুখে সে-সব কথা শুনে পাবে।

একটু বিব্রত হয়ে বললুম,—কিন্তু আমি তা কেমন করে জানব? তাছাড়া আমি ওঁর সঙ্গে কিন্তু রসিকতা করিনি।

—তোমার কণ্ঠস্বরে রসিকতার আভাস ছিল।

—সরি!

কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—না, না। সরি বলার মতো কিছু করোনি তুমি। তবে তৈরি থাকো। হালদারমশাই তোমার জন্য আর-একটা গোলকধাঁধা নিয়ে আসছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর এলেন প্রায় মিনিট কুড়ি পরে। চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ। ডানহাতের বুড়ো আঙুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা। সোফায় ধপাস করে বসে বললেন,—ফায়ার আর্মস লইয়া যাই নাই। ভুল করছিলাম।

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খান। তারপর ওসব কথা। ষষ্ঠী! হালদারমশাইয়ের জন্য কফি নিয়ে আয়।

এবার লক্ষ করলুম, হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে জায়গায়-জায়গায় কালচে ছোপ। প্যান্টের নিচের দিকটা ভিজে গেছে। আঙুলে ব্যান্ডেজ। তার মানে, কারও সঙ্গে মল্লযুদ্ধটা বেশ জোরালো হয়ে গেছে।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ কফি রেখে হালদারমশাইয়ের দিকে আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে চলে গেল। হালদারমশাই যথারীতি ফুঁ দিয়ে কফি পান করতে থাকলেন।

তারপর হঠাৎ খি-খি করে হেসে উঠলেন তিনি। বললেন,—কী কাণ্ড! ঘুঘু দ্যাখছে, ফান্দ দ্যাখে নাই। ড্রেনে অরে ফ্যালাইয়া দুই পাঁও দিয়ে রগড়াইছি!

কর্নেল বললেন,—আগে কফি খেয়ে নিন হালদারমশাই!

গোয়েন্দামশাই এবার তারিয়ে-তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। কফি শেষ হলে তিনি অভ্যাসমতো একটিপ নস্যি নিলেন, তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

ঘোষপাড়া লেন একটা ঘিঞ্জি গলি। দুধারে খোলা নর্দমা। গলিটা শেষ হয়েছে একটা কারখানার দেওয়ালে। ৮/১/সি নম্বরে একটা মান্ধাতা আমলের দোতলা বাড়ি। বাড়িটার দোতলায় একটা মেস আছে। মেসের তিনটে ঘরে যারা থাকে, তাদের নানারকমের পেশা। কেউ বেসরকারি অফিসের কর্মী, কেউ ড্রাইভার, কেউ খবরের কাগজের হকার। বাঙালি-অবাঙালি দুই-ই আছে। আজ রবিবারে মেসের বাসিন্দারা কে-কোথায় বেরিয়েছে। দোতলার ছাদে একটা টিনের শেডঢাকা ঘরে রান্না হয়। হালদারমশাই মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়ার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এ সব খবর পান।

তো তিনি গেছেন পীতাম্বর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু পীতাম্বরবাবু প্রতি শনিবার বিকেলে অফিস থেকে সোজা দেশের বাড়িতে চলে যান! সোমবার সেখান থেকে ফিরে অফিসে যান। তারপর মেসে ফেরেন সন্ধ্যাবেলায়। কোনও-কোনও দিন রাত নটাও বেজে যায়। পীতাম্বরবাবু যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে থাকে জনৈক রমেশ শর্মা। রমেশ কোনও ব্যবসায়ীর গাড়ির ড্রাইভার।

কথায়-কথায় হালদারমশাই পীতাম্বরবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানা জানতে চান। ম্যানেজার আদিনাথবাবু মেসের রেজিস্টার খুলে ঠিকানাটা লিখে দেন। তারপর হালদারমশাইয়ের চোখে পড়ে, আদিনাথবাবুর টেবিলে আজকের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়ে আছে।

খবরের কাগজটা পড়ার ছলে হালদারমশাই আদিনাথবাবুকে বিজ্ঞাপনটা দেখিয়ে দিয়ে বলেন, —এ কী! পীতাম্বরবাবুর ছেলে নিখোঁজ নাকি? বিজ্ঞাপনটা দেখে আদিনাথবাবু খুব অবাক হয়ে যান। কারণ পীতাম্বরবাবু এমন একটা ঘটনার কথা তাঁকে জানাননি!

দুজনে যখন কথা বলছিলেন, তখন বারান্দায় কেউ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। আদিনাথবাবু টের পেয়ে তাকে ডেকে বলেন,—কী গোবিন্দ? ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? এখানে এসো।

কথাটা বলে আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে ইশারায় জানিয়ে দেন, এই ছোকরা এ পাড়ার এক মস্তান। গোবিন্দ ঘরে না ঢুকে এবং কোনও কথা না বলে চলে যায়। তখন আদিনাথবাবু হালদারমশাইকে বলেন, আপনার বন্ধু পীতাম্বরবাবুর সঙ্গে এই গুণ্ডামাস্তানটার খুব ভাব। পীতাম্বরবাবুকে সতর্ক করে দিয়েছিলুম। কিন্তু কথা কানে নেননি। পীতাম্বরবাবু আপনার বন্ধু বটে, কিন্তু খুলেই বলছি, ওঁর হাবভাব আমার মোটেও পছন্দ হয় না। আমার ধারণা, পীতাম্বরবাবুর ছেলে বা ছোটভাই—যেই হোক, তার নিখোঁজ হওয়ার জন্য উনি নিজেই দায়ী।

বিচক্ষণ হালদারমশাই আর কথা না বাড়িয়ে মেসের ফোন নম্বর জেনে নিয়ে চলে আসেন। তারপর নির্জন গলিতে সেই গোবিন্দের মুখোমুখি পড়ে তার সঙ্গে পীতাম্বরবাবুর কথা তুলে ভাব জমাতে চেষ্টা করেন। তখনই ঘটে যায় অঘটন। হঠাৎ গোবিন্দ প্যান্টের পকেট থেকে একটা চাকু বের করে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হালদারমশাই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। এমন অবস্থায় পুলিশজীবনে বহুবার পড়েছেন। তিনি গোবিন্দের পায়ে জোরে লাথি মারেন। গোবিন্দ নোংরা ড্রেনে পড়ে যায়। তারপর হালদারমশাই তার চাকুটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং দৈবাৎ তাঁর বুড়ো আঙুলের নিচে একটু কেটে যায়। তবে চাকুটা তিনি করায়ত্ত করেছিলেন।

ততক্ষণে একজন-দুজন করে লোক জড়ো হয়েছিল গলিতে। তারা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা দেখছিল। কেউ এগিয়ে আসেনি। হালদারমশাই চলে আসার আগে গোবিন্দের মুখে জুতোসুদ্ধ চাপ দিয়ে ড্রেনের নোংরা জল আর আবর্জনায় অন্তত দুমিনিট ডুবিয়ে রেখে হনহন করে চলে আসেন। আর পিছু ফেরেননি।

সদর রাস্তায় একটা ফার্মেসিতে ব্যান্ডেজ কিনে গোয়েন্দাপ্রবর ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে তিনি কর্নেলকে ফোন করেছিলেন।

হালদারমশাই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্প্রিংয়ের চাকুটি দেখালেন। বাঁটের কাছে একটু চাপ দিতেই প্রায় চার ইঞ্চি ফলা বেরিয়ে এল। দেখেই আঁতকে উঠলুম।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন,—পীতাম্বর রায়ের দেশের বাড়ির ঠিকানাটা এবার দিন হালদারমশাই! ঠিকানাটা সম্ভবত বর্ধমান জেলার রায়গড়।

হালদারমশাই প্যান্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা কাগজটা বের করতে গিয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর চোখদুটো গুলিগুলি হয়ে উঠল। উত্তেজনায় গোঁফের ডগা তিরতির করে কাঁপতে থাকল। তিনি বলে উঠলেন,—আপনি ক্যামনে জানলেন?

কর্নেল কাগজটা নিয়ে বললেন,—নিছক অনুমান।

গোয়েন্দাপ্রবর আর-এক টিপ নস্যি নিয়ে বললেন,—কী কাণ্ড!

বললুম,—এই কাণ্ডের পিছনে একটা বড়ো কাণ্ড আছে হালদারমশাই!

হালদারমশাই আমার দিকে সেইরকম গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন,—কন কী?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—জয়ন্ত আপনাকে নিয়ে রসিকতা করছে। ওর কথায় কান দেবেন না। আপনার কাজ আপনি করে যান।

তা করব। —হালদারমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, পীতাম্বরবাবু অমন আনসোশ্যাল হারামজাদারে ক্যান বহাল করছেন, এই রহস্য জানা দরকার। আমি পীতাম্বরবাবুর লগে দেখা করতে গিছলাম। গোবিন্দ ক্যান শুধু এইজন্যই আমারে স্ট্যাব করার চেষ্টা করল? আমার বুদ্ধিসুদ্ধি এক্কেরে ব্যাবাক তালগোল পাকাইয়া গেছে।

—প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে আপনার তো লাইসেন্স আছে। দরকার মনে করলে আপনি পুলিশের সাহায্য নিতে পারবেন।

হালদারমশাই একটু হেসে বললেন,—পুলিশের সাহায্য আমার লাগবে না কর্নেলস্যার! আমার প্ল্যান কী, তা আপনারে জানাইয়া দিই।

—হ্যাঁ। আমাকে না জানিয়ে কিছু করবেন না যেন।

কখনও করছি কি? —বলে হালদারমশাই সোয়েটারের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট নোটবই বের করলেন। তারপর বললেন,—পীতাম্বরবাবুর মেসের ফোন নম্বর লইছি। কাল সোমবার রাত্রে ওনারে ফোন করব। তারপর ওনারে বলব, নিখোঁজ দীপককুমার রায়ের খোঁজ আমি পাইছি। আপনি শিগগির সাক্ষাৎ করুন। আমি ওনারে গণেশ অ্যাভেনিউয়ে আমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতেই আইতে বলব।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন,—তার মানে, আপনি যে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তা পীতাম্বরবাবুকে জানাবেন?

—হঃ!

—বাঃ! আপনার প্ল্যানটা চমৎকার। এ ধরনের কেসে প্রাইভেট ডিটেকটিভের নাক গলানো তো স্বাভাবিক।

বললুম,—পীতাম্বরবাবু আপনার কাছে যাবেন বলে মনে হয় না!

হালদারমশাই হাসলেন,—না আইতে চাইলে অরে থ্রেটন করব। পুলিশের ভয় দেখাব।

কর্নেল বললেন,—আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবে মক্কেলের ফোটো তুলে রাখেন। তাই না? আমার দরকার পীতাম্বর রায়ের একটা ছবি।

গোয়েন্দাপ্রবর আশ্বাস দিলেন,—পীতাম্বর রায়ের ছবি আপনি পাইবেন কর্নেলস্যার! যে ভাবেই হোক, অরে মিট করব। ছবিও তুলব।

—ওঁদের মেসের ফোন নাম্বারটা আমাকে দিন।

হালদারমশাই নোটবই থেকে নাম্বারটা কর্নেলকে দিলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, —বর্ধমান জেলার রায়গড়ের নাম কইলেন তখন। ব্যাপারটার এট্টুকখানি হিন্ট দিন কর্নেলস্যার!

কর্নেল চুরুটে কয়েকটা টান দিয়ে সেটা অ্যাশট্রেতে ঘরে নেভালেন। তারপর বললেন,—আপাতত আপনাকে শুধু এটুকু জানিয়ে রাখছি, রায়গড়ে আমি বার-দুয়েক গিয়েছিলুম। প্রথমবার গিয়েছিলুম প্রায় পাঁচবছর আগে। ওখানে একটা প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। আর আছে একটা গভীর জঙ্গল। তো আমি গিয়েছিলুম আমার এক বন্ধু ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে। ডঃ চট্টরাজ কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের একজন কর্মকর্তা। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ খোঁড়াখুঁড়ি করে তাঁর একটা টিম প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছিল। আপনি তো জানেন, এ বিষয়ে আমারও কিছু বাতিক আছে। যাই হোক, সেখানে গিয়ে আলাপ হয়েছিল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নামে একজন বড়ো ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাঁর হেড অফিস আসানসোলে। রায়গড়ে তাঁর পৈতৃক বাড়ি। রায়গড়ের জঙ্গলে তাঁর সঙ্গে অনেক ঘোরঘুরি করেছিলুম। মিঃ অধিকারী তরুণ বয়সে দক্ষ শিকারি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘুরে বিরল প্রজাতির কিছু পাখির ছবি তুলেছিলুম। পরের বছর মিঃ অধিকারী কলকাতায় নিজের কাজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবার আসল কথাটা বলি। ওই জঙ্গলটার নাম হাড়মটটিয়ার জঙ্গল। কারণ রাতবিরেতে ওই জঙ্গলে হাড়-মট-মট করে কোনও অদ্ভুত জন্তু অথবা ভূতপ্রেত নাকি ঘুরে বেড়ায়। এই রহস্য ফাঁস করার উদ্দেশ্যেই আমি মিঃ অধিকারীর সঙ্গে আবার রায়গড়ে গিয়েছিলুম।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—হাড়মটমটির শব্দ শুনছিলেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—গিয়েছিলুম মার্চ মাসে। তখন রাতবিরেতে জোরে বাতাস বয়। অনেক অদ্ভুত শব্দ শুনেছিলুম, তা ঠিক। তবে হাড়মটমটিয়ার রহস্য রহস্যই থেকে গেছে।

—পীতাম্বর রায়ের বাড়ি রায়গড়ে—আপনিই কইলেন। অরে চেনেন?

নাঃ। তবে নামটা যেন শুনেছিলুম।—বলে কর্নেল আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টে তাকালেন।

বুঝলুম, আমি যেন এখনই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের কাছে ফাঁস না করি। আমি একটা পত্রিকা পড়ার ভান করলুম।

হালদারমশাই বললেন,—আমি এবার যাই কর্নেলস্যার! যেভাবে হোক, পীতাম্বর রায়েরে মিট করব। আর ছবি তুলব।

—কিন্তু এবার একটু সতর্ক থাকবেন যেন!

—হঃ। লাইসেন্সড রিভলভার আছে। সাথে রাখুম।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বললুম,—ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনি হালদারমশাইকে জানালেন না কেন?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—জানালে উনি এখনই রায়গড়ে ছুটে যেতেন। আপাতত আমি পীতাম্বর রায়ের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে চাই। কেন সে অমন বিজ্ঞাপন দিল, তা আমার জানা দরকার।

এইসময় আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। বললুম,—আচ্ছা কর্নেল! আপনি রায়গড়ে একটা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কথা বললেন। দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সঙ্গে সেখানকার কোনও দামি প্রত্নদ্রব্যের সম্পর্ক নেই তো?

কর্নেল আমাকে চমকে দিয়ে বললেন,—আছে। সম্ভবত সেটাই বত্রিশের ধাঁধা।

তিন

রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপ থেকে আবিষ্কৃত কোনও প্রত্নদ্রব্যের সঙ্গে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের সম্পর্কে আছে শুনে কর্নেলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। তাঁকে এখন বড়ো বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কথাটা বলে তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন।

একটু পরে বললুম,—দীপুর অন্তর্ধানের কারণ সম্পর্কে আপনি তাহলে দেখছি একেবারে নিশ্চিত?

কর্নেল গলার ভেতরে বললেন,—হুঁ।

—কিন্তু সেই প্রত্নদ্রব্যটা কী?

ওটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ডঃ চট্টরাজের কাছে শুনেছিলুম। একটা ছোটো বাকসের মতো জিনিসটার গড়ন। কিন্তু বাকসো নয়। তাছাড়া ওটা কোনও অজানা ধাতুতে তৈরি। —বলে কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন, আশ্চর্য ঘটনা! ওটা ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকেই চুরি হয়ে গিয়েছিল।

—আপনি বলছিলেন, সম্ভবত বত্রিশের ধাঁধার সঙ্গে ওটার সম্পর্ক আছে।

—সম্ভবত বলার কারণ, ডঃ চট্টরাজ বলেছিলেন, চৌকো গড়নের কালো জিনিসটার গায়ে খুদে হরফে কী সব লেখা ছিল। দেখতে নাকি নাগরি লিপির মতো। ওটা পরিষ্কার করার সময় দেয়নি চোর। তবে ডঃ চট্টরাজ ওটার ওপরের দিকে নাগরি লিপিতে ৩ এবং ২ এদুটো সংখ্যা অনুমান করেছিলেন। নেহাতই অনুমান। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তিনি ঠিকই পড়েছিলেন।

—ডঃ চট্টরাজ এই চুরির কথা পুলিশকে জানাননি?

—আমি নিষেধ করেছিলুম। কারণ এতে একটা হইচই শুরু হত। ডঃ চট্টরাজকেও পুরাতত্ত্ব দফতরের কাছে কৈফিয়ত নিতে হতো। তাঁর সুনামহানিরও আশঙ্কা ছিল।

—আপনি তো তখন সেখানে ছিলেন!

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমি সেদিন ওখানে ছিলুম না। কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর সঙ্গে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তবে ওখানে থাকলেও চোরধরা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডঃ চট্টরাজের দলে ছিলেন দশ-বারো জন লোক। আর খোঁড়াখুঁড়ির কাজে স্থানীয় কয়েকজন মজুরের সাহায্য দরকার হয়েছিল। মিঃ অধিকারীই সেইসব মজুর জোগাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা নিরক্ষর। এছাড়া এলাকার লোকেরাও রোজ এসে ভিড় করত। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার পক্ষে ব্যাপারটা ছিল খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার মতো। তার চেয়ে বড়ো কথা, চুরি যাওয়া জিনিসটাকে তত গুরুত্ব দেননি ডঃ চট্টরাজ।

হাসতে-হাসতে বললুম,—তাহলে এবার জিনিসটার গুরুত্ব খুব বেড়ে গেল।

কর্নেল হাসলেন না। তেমনই গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ। ডঃ চট্টরাজ গত বছর রিটায়ার করেছেন। যাদবপুরে থাকেন। দেখি, ওঁকে পাই কি না।

বলে কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বললেন, —ডঃ চট্টরাজ আছেন?... আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। ইলিয়ট রোড থেকে বলছি।... বাইরে গেছেন? মানে, কলকাতার বাইরে?... কবে ফিরবেন?... বলে যাননি? আপনি কে বলছেন? হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

রিসিভার রেখে কর্নেল বিরক্ত মুখে বললেন,—অদ্ভুত লোক! সম্ভবত নতুন কোনও কাজের লোক। ডঃ চট্টরাজের পুরাতন ভৃত্য পরেশ আমাকে চেনে। এই লোকটার গলার স্বর যেমন কর্কশ, কথাবার্তাও তেমনই উদ্ধত প্রকৃতির লোকের মতো।

—ডঃ চট্টরাজের স্ত্রী বা ছেলেমেয়ে তো আছেন। আপনি—

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন,—ওঁর স্ত্রী বেঁচে নেই। ছেলে থাকে আমেরিকায়। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লিতে। মেয়ে-জামাই দুজনেই বিজ্ঞানী। যাদবপুরের বাড়িতে ডঃ চট্টরাজ একা থাকেন।

বলে তিনি আবার হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। দাঁতের ফাঁকে রাখা জ্বলন্ত চুরুটের নীল ধোঁয়া আঁকাবাঁকা হয়ে তাঁর চওড়া মসৃণ টাকের ওপর নাচতে-নাচতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। তবে এতক্ষণে বুঝলুম,—বৃদ্ধ রহস্যভেদী পাঁচ বছর আগেকার রায়গড়ের স্মৃতির মধ্যে আরও কোনও সূত্র খোঁজাখুঁজি করছেন।

বললুম,—আমি এবার উঠি। দেড়টা বাজে।

কর্নেল আগের মতো গলার ভেতর বললেন,—উঁ?

আপনি ধ্যান করবেন। আমি চুপচাপ বসে থাকব। এর মানে হয় না। —বলে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

সেই সময় ষষ্ঠীচরণ ভেতরের দরজায় পরদার ফাঁকে মুখ বের করে সহাস্যে বলল,— দাদাবাবু? আপনার এবেলা নেমন্তন্ন।

অমনই কর্নেলের ধ্যানভঙ্গ হল। চোখ কটমটিয়ে ষষ্ঠীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমরা খাব।

ষষ্ঠী বলল,—সব রেডি বাবামশাই!

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত কি স্নান করতে চাও? আমার মতে, এই শীতের অবেলায় স্নান করলে ঠান্ডা লেগে জ্বর-জ্বালা হবে। চলো, খেয়ে নেওয়া যাক।

খাওয়ার পর ড্রয়িংরুমে এসে কর্নেল বললেন,—কিছুক্ষণ পরে আমরা বেরুব।

বললুম,—পীতাম্বর রায়ের সেই মেসে যাবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—নাঃ! ওই ব্যাপারটা হালদারমশাইয়ের হাতেই থাক। চাকু হারিয়ে সেই গোবিন্দ এখন ভোজালি জোগাড় করে ফেলেছে।

—গোবিন্দের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি না। হালদারমশাইয়ের ওপর সে আচমকা চড়াও হল কেন?

—প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল। কিন্তু ওই অবস্থায় ওঁকে ডিটেলস জানাবার জন্য পীড়াপীড়ি করিনি। আমার ধারণা, মেসের ম্যানেজার আদিনাথ ধাড়াকে হালদারমশাই নিশ্চয়ই মুখ ফসকে এমন কোনও কথা বলে ফেলেছিলেন, যা গোবিন্দের কানে গিয়েছিল। হালদারমশাইয়ের হঠকারী স্বভাবের কথা তুমি তো জানো!

একটু পরে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন জেগেছে।

—বলো!

—রায়গড়ের ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে যে চৌকো কালো জিনিসটা পাওয়া গিয়েছিল, সেটার কথা কি ডঃ চট্টরাজের কলিগরা জানতেন না? জানলে তো তাঁরা সরকারি রিপোর্টে কথাটা উল্লেখ করতে বলতেন! আমি যতটা জানি, এসব রিপোর্টে পুরো টিমের সই থাকে।

—তুমি ঠিক বলেছ। উৎখননে পাওয়া প্রতিটি জিনিসের তালিকাও করা হয়। তাতেও পুরাতাত্ত্বিক দলের সদস্যদের সই থাকে। কিন্তু ডঃ চট্টরাজ আমাকে গোপনে জানিয়েছিলেন, ওই জিনিসটা উনি দৈবাৎ কুড়িয়ে পান। ওটার কোনও গুরুত্ব আছে বলে ওঁর মনে হয়নি। তাই দলের কাকেও বলেননি।

—অথচ ওটা ওঁর ক্যাম্প থেকে চুরি গেল!

—হ্যাঁ। স্মৃতিটা ঝালিয়ে নিতে-নিতে আজ আমার মনে হল, এটা একটা আশ্চর্য ঘটনা।

—আপনি তখন বলছিলেন বটে! কিন্তু আশ্চর্য কেন?

—ডঃ চট্টরাজ তারপর যখন জিনিসটার গুরুত্ব টের পেলেন, তখন ওটা অসাবধানে রাখলেন কেন?... ঠিক এই কথাটা ওঁকে জিগ্যেস করে কোনও সদুত্তর পাইনি।

—আজ কি তাই ওঁকে তখন ফোন করলেন?

—হ্যাঁ। তুমি বুঝতেই পারছ, এতদিন পরে সেই চুরি যাওয়া জিনিসটাকে কেন্দ্র করে একটা জমজমাট রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। কাজেই ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে কথা বলা এখন কত জরুরি। অথচ উনি নাকি বাইরে গেছেন।

কর্নেলকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। আধপোড়া চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে রেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—এক মিনিট। আমি পোশাক বদলে আসি।

বেলা আড়াইটে নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। আমার গাড়ি নিচে পার্ক করা ছিল। কর্নেল সামনের সিটে আমার বাঁদিকে বসে বললেন,—হাজরা রোডের দিকে চলো। তারপর আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম,—অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করেই যাচ্ছেন। কার কাছে?

কর্নেল হাসলেন,—চলো তো!

হাজরা রোডে পৌঁছে কর্নেলের নির্দেশে কিছুদূর চলার পর ডানদিকে একটা সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তায় এগিয়ে গেলুম। তারপর এক জায়গায় তিনি আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন, দেখলাম বাঁদিকে একটা চওড়া গেট। ওপারে বুগেনভিলিয়ার ঝাঁপি। কর্নেল নেমে গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর একটা লোক গেট খুলে দিল। কর্নেল ইশারায় আমাকে গাড়ি ভেতরে ঢোকাতে বললেন।

গাড়ি ঘুরিয়ে ঢালু ফুটপাত দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় চোখে পড়ল, মার্বেলফলকে লেখা আছে 'রায়গড় রাজবাটি'। দেখামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠলুম।

নুড়িবিছানা লনের অবস্থা, আগাছায় ঢাকা ফুলের গাছ, শুকনো ফোয়ারার শীর্ষে ভাঙাচোরা একটা মূর্তি এবং দোতলা পুরোন বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটা ইতিহাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাড়িটার স্থাপত্য ইতালীয় ধাঁচ। বড়ো-বড়ো থাম এবং জানালা। পোর্টিকোর তলায় গাড়ি রেখে নেমে দাঁড়ালুম। কর্নেল ততক্ষণে সেই লোকটির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে প্রকাণ্ড দরজার সামনে পৌঁছে গেছে। লোকটা ঘরের ভেতর দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

বললুম,—কী আশ্চর্য!

কর্নেল বললেন,—তোমাকে একটু চমক দিয়ে আনন্দ পেলুম। এসো।

ওপরতলায় এতক্ষণে কুকুরের গর্জন শুনতে পেলুম। বললুম,—সর্বনাশ! কুকুরটা ছেড়ে দেওয়া নেই তো?

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই লোকটি হলঘরের সিঁড়িতে নামতে-নামতে বলল,—যান সার! কুমারবাহাদুর ওপরের বারান্দায় আছেন। উনি আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন।

কাঠের সিঁড়িতে বিবর্ণ লালচে কার্পেট পাতা আছে। হলঘরের মেঝেতেও আছে। এ ধরনের অনেক বনেদি অভিজাত পরিবারের বাড়িতে কর্নেলের সঙ্গে কতবার এসেছি।

চওড়া এবং লম্বাটে বারান্দার মাঝখানে বৃত্তাকার একটা অংশ। সেখানে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হুইলচেয়ারে বসে ছিলেন। কর্নেলকে দেখে সহাস্যে বললেন,—আসুন! আজ ঘুম থেকে ওঠার পর কেন যেন মনে হচ্ছিল, আপনি আসবেন।

বলে তিনি হাঁক দিলেন,—মধু! রেক্সিটা বড্ড চ্যাঁচাচ্ছে। ওকে নিচে নিয়ে যা। আর সাবিত্রীকে বল, কর্নেলসায়েব এসেছেন। কফিটফি চাই।

কোণের একটা ঘর থেকে কালো দানোর মতো একটা গুঁফো লোক বেরিয়ে এসে কর্নেলকে সেলাম ঠুকল। তারপর কুকুরটার চেন খুলে নিচে নিয়ে গেল।

আমরা কুমারবাহাদুরের মুখোমুখি বসলুম। কর্নেল আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। কুমারবাহাদুরের নাম অজয়েন্দুনারায়ণ রায়। একসময় এঁরই পূর্বপুরুষ রায়গড় পরগনার রাজা ছিলেন। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। কথায়-কথায় জানতে পারলুম, বছর দশেক আগে সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। দুটো পা-ই অকেজো হয়ে গেছে। তাই হুইলচেয়ারে বসে দোতলায় চলাফেরা করেন। নিচে নামেন না।

মধুর মতো তাগড়াই চেহারার এক প্রৌঢ়া কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। সে কর্নেলের দিকে ঝুঁকে প্রণামও করল। কর্নেল বললেন,—কেমন আছ সাবিত্রী? দেশে যাও-টাও তো?

সাবিত্রী আস্তে বলল,—আর কার কাছে যাব কর্নেলসায়েব? একটা ভাই ছিল। সে দুর্গাপুরে চাকরি পেয়ে চলে গেছে।

সে চলে গেলে কুমারবাহাদুর বললেন,—আর সে রায়গড় নেই। মাঝেসাঝে ওখানকার কেউ-কেউ এসে দেখা করে যায়। হ্যাঁ—আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। কলেজ হয়েছে। কিন্তু দলাদলি হাঙ্গামা নাকি বেড়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—গত লক্ষ্মীপুজোর সময় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের কাছে ফুটবল খেলতে গিয়ে—

হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে কুমারবাহাদুর বললেন,—শুনেছি। গতমাসে কেষ্ট অধিকারী এসেছিল। আপনার সঙ্গে নাকি তার আলাপ হয়েছে বলছিল। খুব পয়সা করেছে কেষ্ট। বলছিল, হংকং ঘুরে এসেছে সদ্য।

—দীপু নামে যে ছেলেটি নিখোঁজ হয়েছে, তার বাবা কুমুদ ভট্টাচার্যকে কি আপনি চেনেন?

—চিনব না মানে? আমার সুপারিশেই তো কুমুদ মাস্টারি পেয়েছিল। তা প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন আমি রায়গড়ের এম.এল.এ. ছিলুম। কেষ্ট বলছিল, কুমুদ রিটায়ার করেছে। এদিকে ওর ছেলে হঠাৎ জঙ্গলের ভেতর নিখোঁজ হয়ে গেল। তখন আমিই কেষ্টকে বলেছিলুম, কুমুদকে নিয়ে আপনার সঙ্গে শিগগির দেখা করো। দেখা করেনি ওরা?

—আজ সকালে ওঁরা এসেছিলেন।

কুমারবাহাদুর হেসে উঠলেন,—তাই কি আপনি আমার কাছে কোনও ক্লু খুঁজতে এসেছেন?

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—যদি তা-ই ভাবেন, তাহলে আপনার ধারণা কী বলুন।

—কুমুদের ছেলের ব্যাপারে?

—হ্যাঁ।

কুমারবাহাদুর একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমাদের বাড়িটা সরকারকে কলেজ করতে দিয়েছিলুম। এতদিন সেখানে কলেজ হয়েছে। ওই বাড়িতে আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরি ছিল। কুমুদ যখন বেকার, ওকে একটা দায়িত্ব দিয়েছিলুম। লাইব্রেরি আমার ঠাকুরদার আমলের। বইপত্র অগোছাল অবস্থায় ছিল। বহু দুষ্প্রাপ্য বই নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাকে সব বইয়ের ক্যাটালগ তৈরির দায়িত্ব দিয়েছিলুম। সেই সময় আমার পূর্বপুরুষের লেখা একটা সংস্কৃত কুলকারিকার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওতে আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস এবং প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য ছিল।

—সেটা কি ছাপানো বই ছিল?

—না। তখনও এ দেশে ছাপাখানার চল হয়নি। হাতে তৈরি পুরু কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপি।

আমি বলে উঠলুম,—ওতে কি আপনার পূর্বপুরুষের কোনও গুপ্তধনের কথা—

আমার কথার ওপর কুমারবাহাদুর হাসতে-হাসতে বললেন,—না জয়ন্তবাবু! গুপ্তধনটন থাকলে তা আমার ঠাকুরদার আমলেই খুঁজে বের করা হতো। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তিনি ব্যবসাবাণিজ্য করে কেষ্ট অধিকারীর মতো কোটিপতি হতেন। এই যে বাড়িটা দেখছেন, এটা ছাড়া আমার একটুকরো স্থাবর সম্পত্তি নেই। কোনওমতে ঠাটঠমক বজায় রেখেছি। তাও কতদিন পারব জানি না। হয়তো এই বাড়িটা কোনও প্রোমোটারকে বেচে একটা ফ্ল্যাটের খাঁচায় বাস করতে হবে।

কর্নেল বললেন,—সংস্কৃতে লেখা সেই পাণ্ডুলিপি কি আপনি পড়েছিলেন?

—নাঃ। আমার অত সংস্কৃতবিদ্যা ছিল না। বাবারও ছিল না। অবশ্য আমার ইচ্ছে ছিল ওটা কোনও সংস্কৃতজানা পণ্ডিতকে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করিয়ে ছাপতে দেব। আমার পূর্বপুরুষের পারিবারিক ইতিহাস দেশের ঐতিহাসিকদের কাজে লাগতে পারত।

—তা হলে কি আপনার ধারণা, কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর নিখোঁজ হওয়ার পিছনে সেই পাণ্ডুলিপির সম্পর্ক আছে?

কুমারবাহাদুর গম্ভীরমুখে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী আমাকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল। সে বলছিল, কুমুদ ভট্টাচার্য সংস্কৃত জানে। স্কুলে সে সংস্কৃত পড়াত। কাজেই কেষ্টর ধারণা সত্য হতেই পারে। আমি কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বলেছিলুম কেষ্টকে। আশ্চর্য! আজ কেষ্ট আর কুমুদ আপনার কাছে এসেছিল। অথচ আমার কাছে কেষ্ট ওকে নিয়ে এল না। ব্যাপারটা গোলমেলে। আপনি যখন এই কেসে হাত দিয়েছেন, তখন আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, রায়গড়ে গিয়ে কুমুদকে সরাসরি চার্জ করুন। ছেলে কেন নিখোঁজ হল, তার আসল সূত্র কুমুদের কাছেই পাবেন। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—মিঃ অধিকারী আপনাকে কতটুকু বলেছে জানি না। তিনি কি উড়ো চিঠিতে বত্রিশের ধাঁধার কথাটা বলেছেন?

—বলেছে। কেষ্ট অধিকারী মহা ধূর্ত লোক। আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইছিল। আমি তাকে বলেছিলুম, কোনও ধাঁধা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আমাদের পরিবারে এমন কোনও গুজবের কথাও চালু ছিল না।

কর্নেল হাসলেন,—আমার ধারণা, আপনি কিছু জানেন।

কুমারবাহাদুর আস্তে বললেন,—ব্যাপারটা গুপ্তধন-টন নয়। পাণ্ডুলিপিতে নাগরি লিপিতে লেখা একটা ছক দেখেছিলুম, তা সত্য। আমার মতে, ওটা তন্ত্রসাধনার কোনও গোপন সূত্র।

—ছকটা আপনি টুকে রাখেননি?

—নাঃ।

আপনার এটুকু সূত্রই আমার কাছে মূল্যবান। এবার আমরা উঠি। —বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।

কুমারবাহাদুর একটু হেসে বললেন,—এর বদলে আমিও কিছু প্রত্যাশা করি কর্নেলসায়েব!

—বলুন।

—সেই হারানো পাণ্ডুলিপি আপনি আমাকে উদ্ধার করে দিন।

—কুমারবাহাদুর! আমার প্রথম লক্ষ্য সেই পাণ্ডুলিপি। কারণ ওটা না খুঁজে পেলে কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের কিনারা করা আমার পক্ষে কঠিনই হবে। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুতে পৌনে সাতটা বেজে গিয়েছিল। কর্নেল ষষ্ঠীকে কফি করতে বলে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর টুপি খুলে রেখে টাকে হাত বুলোতে থাকলেন। জিগ্যেস করলুম,—রায়গড় যাচ্ছেন কবে?

কর্নেল আস্তে বললেন,—আজ রাতের ট্রেনেই যাচ্ছি। তুমি কফি খেয়ে বাড়ি যাও। তারপর তৈরি হয়ে এসো। তোমার গাড়ি আমার খালি গ্যারাজঘরে রাখার অসুবিধে নেই। আমি হাওড়া স্টেশনে ফোন করে ট্রেনের খবর নি।

বলে তিনি রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন,—কে বলছেন?... সে কী কথা! আমার কর্তাবাবা তো বেঁচে নেই।... বলেন কী? টাক ফুটো করে দেবেন? আমার টাকের প্রতি কেন সুনজর ব্রাদার?... আচ্ছা। আচ্ছা।

কর্নেল রিসিভার রেখে তুম্বোমুখে বললেন,—কেউ হুমকি দিল। মনে হচ্ছে, সাপের লেজে পা দিয়েছি।

চার

শীতের রাতে ট্রেনজার্নির অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু এমন বিচ্ছিরি ট্রেনজার্নি এই প্রথম। ট্রেনটা যেন ঘুমোতে-ঘুমোতে এগোচ্ছিল। আর সে কী শীত! আসলে রায়গড় ছোটো স্টেশন। তাই সেখানে কোনও মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। এই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে একটা ফার্স্টক্লাসের বগি এবং নামেই তা ফার্স্টক্লাস। মনে হচ্ছিল অসংখ্য ছেঁদা দিয়ে শীত ঢুকে আঁচড়ে-কামড়ে অস্থির করে তুলছে।

কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। ফার্স্টক্লাসে আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। যখনই কোথাও ট্রেন থামছিল, তখনই সতর্ক হয়ে লক্ষ রাখছিলুম। কুপের দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ করা ছিল। কিন্তু সেই যে কর্নেলকে টেলিফোনে হুমকি দিয়েছিল এবং কর্নেল বলেছিলেন,—মনে হচ্ছে যেন সাপের লেজে পা দিয়েছি; তাই সারাক্ষণ চাপা একটা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছিল না।

তবে সারা পথ কেউ কুপের দরজায় নক করেনি এবং আমি জ্যাকেটের ভেতরপকেটে আমার লাইসেন্সড রিভলভার তৈরি রেখে বাথরুমে যাওয়ার ছলে দেখে নিচ্ছিলুম, অন্য কোনও কুপে কেউ উঠেছে কি না। কেউ কোনও স্টেশনে এই ফার্স্টক্লাসে ওঠেনি। তবু অস্বস্তি কাটছিল না।

রায়গড়ে পৌঁছুনোর কথা ভোর পাঁচটা নাগাদ। পৌঁছুল সাড়ে সাতটায়। নিঝুম নিরিবিলি ছোটো স্টেশন। আমরা দুজন ছাড়া আরও কয়েকজন যাত্রী নেমে চায়ের স্টলে ভিড় করল। তারা সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। মাটির ভাঁড়ে ফুঁ দিতে-দিতে চা খেয়েই তারা নিচের চত্বরে নেমে গেল। তারপর দেখলুম, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রাকের পেছনে উঠে গেল এবং ট্রাকটা গোঁ-গোঁ শব্দ করতে-করতে গাঢ় কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ট্রেনটা তোমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে। এবার এখানে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নাও।

বললুম,—কষ্ট কী বলছেন? হাড় কাঁপিয়ে দিয়েছে, এমন সাংঘাতিক শীত।

—আরও সাংঘাতিক শীত তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে জয়ন্ত। হাড়মটমটিয়া তার নাম।

চা-ওয়ালা খুব খাতির করে গরম কফির কাপ-প্লেট হাতে তুলে দিয়ে বলল,—স্যারদের কোথায় যাওয়া হবে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—শুনলে না? হাড়মটমটিয়া বললুম।

চা-ওয়ালা কিন্তু হাসল না। সে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল,—স্যার! আপনারা কি হাড়মটমটিয়ার নতুন ফরেস্ট বাংলোয় যাবেন?

—হ্যাঁ।

সে চাপাস্বরে বলল,—সাবধানে থাকবেন স্যার।

—কেন বলো তো?

—গত রাতে নটার ট্রেনে আমার মাসতুতো ভাই যতীন কলকাতা গেল। তার মুখে শুনলুম, ফরেস্ট বাংলোর পেছনদিকে কাল সন্ধ্যাবেলা হাড়মটমটিয়া আবার একটা মানুষ খেয়েছে!

—আবার একটা মানুষ খেয়েছে?

—যতীন তো তা-ই বলে গেল। সে নাকি রক্তারক্তি কাণ্ড! চৌকিদার হাড়মটমটিয়ার হাঁকডাক শুনতে পেয়েছিল। তারপর রায়গড়ে খবর দিয়েছিল। যে লোকটাকে খেয়েছে, সে নাকি রায়গড়ের লোক। ওখানে সন্ধ্যাবেলা কেন গিয়েছিল কে জানে!

—তোমার বাড়িও কি রায়গড়ে?

—না স্যার। পাশের গ্রামে, হাতিপোঁতায়।

—হাড়মটমটিয়া আবার মানুষ খেয়েছে বললে। আগেও কি খেয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। রায়গড়ের এক মাস্টারমশাইয়ের ছেলেকে খেয়েছিল শুনেছি। তা মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি। শুধু রক্তটক্ত পড়েছিল। যতীন বলে গেল, এবার লোকটার রক্তমাখা মড়া পাওয়া গেছে।

—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, কানুহরি দাস।

—আচ্ছা, এই যে হাড়মটমটিয়া বলছ, সেটা কি কোনও জন্তু?

কানুহরি চা-ওয়ালা আবার চাপাস্বরে বলল,—জন্তু-টন্তু নয় স্যার! কেউ বলে পিশাচ। কেউ বলে যখ। রায়রাজাদের গড় পাহারা দিত। সেখানে থেকে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। পিশাচ বলুন, যখ বলুন, মানুষের রক্ত তাদের খাবার। শুধু রক্তই বা কেন? মাংসও খায় শুনেছি। কুমুদ মাস্টারমশাইয়ের ছেলেটাকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল না? কচি হাড়। তাই হাড়সুদ্ধু খেয়ে ফেলেছিল। বুঝলেন না?

বুঝলুম।—বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন।

এতক্ষণে কয়েকজন যাত্রী এসে চায়ের স্টলে ভিড় করল। কানুহরি তাদের একজনকে বলল, —নিমাই! শুনলুম, আবার নাকি হাড়মটমটিয়া তোমাদের গ্রামের কাকে খেয়েছে?

নিমাই বাঁকা মুখে বলল,—বজ্জাতি করতে গিয়েছিল। তেমনি ফলও পেয়েছে।

—বজ্জাতি মানে?

—বজ্জাতি না হলে জঙ্গলে গিয়ে যখের ধন খুঁড়ে বের করতে গিয়েছিল কেন উপেন? বাংলোর চৌকিদারের মুখে খবর পেয়ে অনেক লোক ছুটে গিয়েছিলুম। ঢাকঢোল কাঁসি বাজিয়ে মশাল জ্বেলে সে এক কাণ্ড! তারপর দেখি উপেন দত্ত একটা গর্তের পাশে পড়ে আছে। একটা শাবলও দেখতে পেলুম! রক্তারক্তি ব্যাপার।

—হাড়মটমটিয়ার ডাক শুনতে পাওনি?

আমরা শুনতে পাইনি। চৌকিদার নাকি শুনেছিল।—নিমাই বেঞ্চে বসে বাঁকা মুখে বলল, ছেড়ে দাও! কথায় বলে না? লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মা কালীর দিব্যি কানুদা! উপেন ফি শনিবার কলকাতা থেকে এসে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের পাশে ঘুরঘুর করে বেড়াত—তা জানো?

—বলো কী নিমাই?

নিমাই চায়ে চুমুক দিয়ে বলল,—নিজের চোখে দেখেছি। বাবুপাড়ার ছেলেরা খেলার মাঠে ফুটবল ক্রিকেট-ফিকেট সব খেলত। আমি বসে-বসে খেলা দেখতুম। আর শনিবার হলেই উপেন দত্ত সেখানে হাজির। এক ফাঁকে কখন জঙ্গলে ঢুকে যেত।

নিমাই এবং কানুহরির কথাবার্তা চলতে থাকল। কর্নেল হঠাৎ উঠে পড়লেন। তারপর কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচের চত্বরে নেমে আস্তে বললেন,—কী বুঝলে জয়ন্ত?

বললুম,—গেঁয়ো লোকদের কুসংস্কার। জনৈক উপেন দত্তকে কেউ বনবাংলোতে ডেকে পাঠিয়েছিল। তারপর মওকা বুঝে খুন করেছে। অবশ্য এটাও একটা রহস্যময় হত্যাকাণ্ড। আপনি নাক গলাচ্ছেন দেখলেও অবাক হব না।

কর্নেল হাঁটতে-হাঁটতে বললেন,—গেঁয়ো লোকেদের কুসংস্কার বলছ। শহরের উচ্চশিক্ষিত এবং বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদেরও প্রচুর কুসংস্কার থাকে। পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ হলে এর প্রমাণ পেতে।

—কিন্তু আমরা কি পায়ে হেঁটেই বনবাংলাতে যাব?

—বনবাংলো এখান থেকে শর্টকাটে মাত্র দু-কিলোমিটার। লক্ষ করো, রুক্ষ মাটি, ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঁইয়ে ভরা ঢেউখেলানো মাঠটা আমাদের চলার পক্ষে খাসা! কারণ এখনও কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কুয়াশায় গা ঢাকা দিয়ে চলাই ভালো। আমার ইচ্ছে ছিল, ঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছুলে চুপি-চুপি বনবাংলোয় পৌঁছনো যাবে। কিন্তু ট্রেনটা যাচ্ছেতাই দেরি করে পৌঁছুল।

ওঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেললে কেলেঙ্কারি!

কর্নেল হাসলেন,—যেদিকে সোজা হাঁটছি, সেদিকেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল। আশা করি দিনের বেলা হাড়মটমট করে বেড়ানো পিশাচ বা যখটা আমাদের দেখা দেবে না। সে তো নিশাচর!

কিছুদূর চলার পর রুক্ষ অনাবাদি মাঠটা ঢালু হয়ে নেমেছে দেখা গেল। তারপর একটা ছোটো শীর্ণ নদী। নদীতে একফালি জলস্রোত তিরতির করে বয়ে চলেছে। নদীর বুকে অজস্র পাথর ছড়িয়ে আছে। কর্নেলের নির্দেশে সাবধানে সেইসব পাথরে পা ফেলে ওপাশে পৌঁছুলুম। ততক্ষণে কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। সোনালি রোদ আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে শিশিরে নিম্নাঙ্গ ভিজে করুণ দশা হল। তবে গায়ে পুরু জ্যাকেট এবং মাথায় টুপি থাকায় শরীরের ঊর্ধ্বাংশ রক্ষা পেল।

এবার সামনে আবছা কালো বিশাল উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—এবার পাহাড়ে উঠতে হবে নাকি?

কর্নেল বললেন,—ওটা পাহাড় নয়। ওটাই সেই হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল! এখান থেকে মাটিটা ক্রমশ উঁচু হয়েছে বলে কুয়াশার ভেতর জঙ্গলটা পাহাড় মনে হচ্ছে।

চড়াইয়ে উঠে গিয়ে একফালি মোরাম বিছানো রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে একটা ঢিবিতে উঠে গেছে। সেই ঢিবির ওপর হলুদ রঙের ছোটো বাংলো দেখতে পেলুম।

বাংলোর চৌকিদার আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। সে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল, —আপনি কি কর্নেলসাহেব? রেঞ্জারসায়েব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাংলোর বারান্দায় বসে রেঞ্জারসায়েব চা খাচ্ছিলেন। বারান্দার নিচে একটা জিপগাড়ি। কর্নেল এবং আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন,—আসুন! আসুন কর্নেলসায়েব! গতরাতে যখন আপনি টেলিফোন করলেন, তখন আমি সবে এই বাংলো থেকে বাড়ি ফিরেছি। ফোনে সব কথা বলতে পারিনি। তবে আপনি আসছেন শুনে খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছিলুম। তারপর ভোরবেলায় উঠে এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলুম।

কর্নেল আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেঞ্জারের নাম অমল চ্যাটার্জি। চৌকিদারকে তিনি শিগগির কফি আনতে বললেন। লক্ষ করলুম, ভদ্রলোক কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। উত্তেজনার কারণ আমার অবশ্য জানা। স্টেশনে শুনে এসেছি, রায়গড়ের জনৈক উপেন দত্তের রক্তাক্ত লাশ কাল সন্ধ্যায় এই বাংলোর পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর পাওয়া গিয়েছে।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—আপনাকে বলেছিলুম, শিগগির আমরা এই জঙ্গলের একটা বাংলো বানাচ্ছি। এরপর এলে আপনি সেখানেই থাকবেন। আপনার মতো একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর পক্ষে এটাই উপযুক্ত জায়গা। তো দেখুন, বাংলো হয়ে গেছে। বিদ্যুতের ব্যবস্থা এখনও করা যায়নি। আর কিছুদিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

চৌকিদার ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন,—কাল সন্ধ্যায় কেন আপনাকে এখানে আসতে হয়েছিল, সে-সব কথা স্টেশনে শুনে এলুম।

শুনেছেন?—মিঃ চ্যাটার্জির চোখদুটো উত্তেজনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল : এ এক অদ্ভুত ঘটনা কর্নেলসাহেব! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে কোনও হিংস্র জন্তু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমার একার কেন, রায়গড়ের সবারই সন্দেহ, উপেন দত্ত ওখানে সন্ধ্যাবেলা নিশ্চয়ই লুকিয়ে রাখা কোনও দামি জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল।

—পুলিশ এসেছিল নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। পুলিশ বডি তুলে নিয়ে গেছে। রায়গড় হাসপাতালে বডির পোস্টমর্টেম হবে। তবে আপাতদৃষ্টে পুলিশের ধারণা আমার সঙ্গে মিলে গেছে।

—কোনও হিংস্র জন্তুর হামলা?

—ঠিক তা-ই। রায়গড়ের বেশিরভাগ লোকের বিশ্বাস এ কাজ হাড়মটমটিয়ার!

রেঞ্জারসায়েব কথাটা বলে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আর সব লোকের কী ধারণা?

—উপেন দত্ত লোকটার নামে অনেক বদনাম ছিল। এলাকার চোর-ডাকাতদের কাছে চোরাই মাল কিনে কলকাতায় ব্যবসা করত। কাজেই পাওনা-কড়ি নিয়ে কোনও চোর বা ডাকাতের সঙ্গে বিবাদ ছিল। সে উপেনকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে।

—আপনি তো লাশ দেখেছেন। কী অবস্থায় ছিল?

—গর্তের পাশে কাত হয়ে পড়ে ছিল। সোয়েটার ছিঁড়ে ফালাফালা। সারা শরীরে ধারালো নখের আঁচড় কাটা। মাথার খুলির অবস্থাও তাই।

—শুনলুম, চৌকিদারই প্রথমে লাশ দেখতে পেয়েছিল?

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—নাখুলাল! তুমিই বলো সায়েবকে।

চৌকিদার নাখুলাল বলল,—সার! এই বাংলোর পেছনে একটা কেমন আওয়াজ হয়েছিল। আমি বল্লম আর টর্চ নিয়ে গেলুম। ভাবলুম, চোরচোট্টা—নয়তো শেয়াল। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ স্যার! পেছনের পাঁচিল পর্যন্ত সাবধানে এগিয়ে গেলুম। তারপর নিচের জঙ্গলের ভেতর আলো ফেললুম! তখনই দেখলুম, একটা লোক ঝোপে ঢুকে গেল। আমি চেঁচিয়ে বললুম, কে ওখানে? কোনও সাড়া এল না। আর তারপরই হাড়মটমটিয়ার চেরাগলার গজরানি ভেসে এল।

কর্নেল বললেন,—তুমি কি আগে কখনও তার গজরানি শুনেছ?

—হ্যাঁ সার! এই বাংলো হওয়ার পর রাত্তিরে তিন-তিনবার শুনেছি। প্রথমে শনশন করে হাওয়ার মতো শব্দ ওঠে। তারপর মট মট মট মট—তারপর কানে তালাধরানো আওয়াজ। আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ! এইরকম।

—তো তারপর তুমি কী করলে?

—এখানে থাকার সাহস হল না আর। ঘুরপথে মাঠ দিয়ে আমাদের বস্তিতে চলে গেলুম।

মিঃ চ্যাটার্জি বললেন,—কর্নেলসায়েব তো নাখুলালদের বস্তি দেখেছেন!

কর্নেল বললেন,—আদিবাসীদের বস্তি?

—হ্যাঁ, নাখুলালরা সবাই খ্রিস্টান। তা-ও আপনি জানেন!

—জানি। তো নাখুলাল! তারপর কী করলে বলো!

নাখুলাল শ্বাস ছেড়ে বলল,—বস্তির লোকেরা আমাকে রায়গড়ে খবর দিতে পাঠাল। খুলেই বলছি স্যার! হাড়মটমটিয়া আমাদের দেবতা। আমাদের লোকেরা বলে 'ঠাকুরবাবা'। ওঁকে আমরা ভক্তি করি। কিন্তু জঙ্গলে আমি একটা লোক দেখেছি। ঠাকুরবাবা তাকে খেয়ে ফেলেছেন। আমাদের তখন একটাই কাজ। রায়গড়ে খবর দেওয়া। কেন? না—আর যেন অন্য জাতের কেউ ঠাকুরবাবাকে চটায় না।

—তুমি খবর দিলে কাকে?

—আজ্ঞে সার কেষ্টবাবুকে। উনি এখন রায়গড়ের লিডার। সদ্য উনি কলকাতা থেকে ফিরেছেন শুনলুম। কিন্তু খবর পেয়েই গাঁসুদ্ধু লোক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলেন। তারপর— মিঃ চ্যাটার্জি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—এখন সরকারি নিয়ম করা হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের খবর না দিয়ে এই জঙ্গলে ঢোকা যাবে না। তাই আমাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, আমাকে একা আসতে হল বন্দুক নিয়ে। এখনও ফরেস্ট গার্ড বহাল করা হয়নি।

—লাশ শনাক্ত করার পর কি পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! লাগেজ ঘরে রেখে এখনই একবার ওখানে যেতে চাই।

—অবশ্যই। নাখুলাল! সায়েবদের ঘর খুলে দাও।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা বাংলোর পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলুম। নাখুলাল বাংলোয় থাকল। মিঃ চ্যাটার্জি তাকে আমাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে বললেন।

ঢালু মাটিতে পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। ঝোপঝাড় আর উঁচু-উঁচু গাছের তলায় শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। অমল চ্যাটার্জির কাঁধে বন্দুক। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

একটু পরে মোটামুটি সমতল মাটি পাওয়া গেল। এখানে জঙ্গলের কিছুটা অংশ ফাঁকা। ফাঁকা রুক্ষ মাটিতে একটা গর্ত খোঁড়া আছে দেখতে পেলুম। গর্তের পাশে কালচে ছোপগুলো যে উপেন দত্তেরই রক্ত, তা বুঝতে পারলুম।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে গর্তের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। মাত্র হাতখানেক গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেই গর্তের দিকে তিনি তাকিয়ে যেন ধ্যানমগ্ন হলেন।

মিঃ চ্যাটার্জি একটু হেসে বললেন,—শক্ত চাঙড় মাটি, তা না হলে জন্তুটার পায়ের ছাপ পড়ত।

বললুম—আশ্চর্য! জঙ্গলের এই জায়গাটুকু এমন রুক্ষ কেন? একটু ঘাস পর্যন্ত গজায়নি।

—আমার ধারণা, এর তলায় গ্রানাইট পাথর আছে। এই অঞ্চলে এমন রুক্ষ নীরস মাটি অনেক জায়গায় দেখেছি। ঘাসও গজাতে পারে না।

—কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জি, উপেনবাবু যদি কোনও চোরাই মাল পুঁতে রাখতে চাইতেন, তাহলে এমন জায়গা বেছে নিলেন কেন?

—সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। আবার এমন যদি হয়, উপেনবাবু কোনও চোরাই মাল এখানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং কাল সন্ধ্যায় তা তুলে নিতে এসেছিলেন—তাহলে সেই চোরাই মালটাই বা গেল কোথায়? কাল সন্ধ্যায় অত আলো এবং মানুষজনের ভিড় ছিল এখানে। কারও-না-কারও চোখে পড়তই জিনিসটা। কী বলেন?

—এমন হতে পারে আক্রান্ত হওয়ার সময় দূরে ছুড়ে ফেলেছিলেন!

রেঞ্জারসায়েব হাসলেন,—আমি ভোরবেলা এসে এখানে চারদিকে জঙ্গলের ভেতর খুঁজেছি। কুয়াশা ছিল। কিন্তু ওটা বাধা নয়। তেমন কোনও জিনিস খুঁজে পাইনি।

এইসময় কর্নেল গর্তের চারপাশের মাটি থেকে কী কুড়োচ্ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মিঃ চ্যাটার্জি! আপনার অনুমান ঠিক। এই দেখুন, কালো রঙের অজস্র লোম পড়ে ছিল এখানে।

মিঃ চ্যাটার্জি তাঁর হাত থেকে কয়েকটা কালো লোম নিয়েই বললেন,—ভালুকের লোম! এই জঙ্গলে ভালুক থাকার গুজব শুনেছিলাম। তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বুনো ভালুক খুব হিংস্র। মানুষ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। হ্যাঁ—ওইরকম ক্ষতচিহ্ন একমাত্র ভালুকের নখের আঁচড়েই হতে পারে।

কর্নেল বললেন,—ঠিক বলেছেন। এবার চলুন। বাংলোতে ফেরা যাক।

অমল চ্যাটার্জি হাত থেকে লোমগুলো ঝেড়ে ফেলে বললেন,—আপনারা একটু সতর্ক থাকবেন কর্নেলসায়েব। বিশেষ করে আপনাকেই বলছি কথাটা। বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি অর্কিড কিংবা পরগাছার নেশায় আপনার দেখেছি জ্ঞানগম্যি থাকে না।

তিনি কথাটা বলে হেসে উঠলেন। তারপর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে থাকলেন। এই সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্টেশনে শোনা সেই নিমাইয়ের কথা। রায়গড়ের উপেন দত্ত প্রতি শনিবার কলকাতা থেকে এসে এই জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন। গতকাল অবশ্য রবিবার ছিল। শনিবারে জঙ্গলে ঢুকলে যে উপেন দত্ত রবিবার আবার ঢুকবেন না, তার মানে নেই। দেখা যাচ্ছে, রবিবারও ঢুকেছিলেন এবং বেঘোরে ভালুকের আক্রমণে মারা পড়েছেন।

কর্নেলের পাশে গিয়ে চাপাস্বরে বললুম,—কর্নেল! এই উপেন দত্ত সেই পীতাম্বর রায় নয় তো?

কর্নেল মৃদু হেসে গলার ভেতর বললেন,—তুমি সবই বোঝা জয়ন্ত! তবে একটু দেরিতে। হ্যাঁ—উপেন দত্তই যে পীতাম্বর রায়, তাতে কোনও ভুল নেই। তবে কথাটা চেপে যাও।

আমরা বাংলোর নিচে পৌঁছেছি, হঠাৎ ওপরে বাংলোর পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে নাখুলাল চিৎকার করে উঠল,—সায়েব! ভালুক! ভালুক!

রেঞ্জারসায়েব চমকে পিছনে ঘুরে গুড়ুম করে বন্দুক ছুড়লেন। জঙ্গলে পাখিদের চ্যাঁচামেচি এবং কেন একটা হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। কর্নেল তখনই বাইনোকুলারে পিছনদিকে জঙ্গলের ভেতর ভালুক খুঁজতে থাকলেন।

রেঞ্জারসায়েব অমল চ্যাটার্জি বন্দুক বাগিয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব! ভালুকটা কি দেখতে পেলেন?

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন,—কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছি। জন্তুটা দেখতে ভালুকের মতো নয়।

মিঃ চ্যাটার্জি উত্তেজিতভাবে বললেন,—তাহলে কি ওটা শিম্পাঞ্জি?

কর্নেল হাসলেন,—এদেশের জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি থাকে না মিঃ চ্যাটার্জি! আপনি তা ভালোই জানেন।

—না। মানে, আমি বলতে চাইছি, এলাকায় শীতের সময় মেলা বসে। সার্কাসের দলও আসে। দৈবাৎ কোনও সার্কাসের শিম্পাঞ্জি পালিয়ে এসে এই জঙ্গলে ঢুকতেও পারে।

—ওটা শিম্পাঞ্জিও নয়।

—তাহলে ওটা কী?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া। সম্ভবত সে চুপিচুপি আমাদের কথা শুনতে আর আমরা কী করছি, তা দেখতে এসেছিল।

রেঞ্জারসায়েব হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

পাঁচ

ফরেস্ট রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জি আমাদের ব্রেকফাস্টের পর চলে গেলেন। বলে গেলেন,—রায়গড় ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসের একটা কোয়ার্টারে তিনি আপাতত থাকার এবং অফিস করার জায়গা পেয়েছেন। পরে এই বাংলোর পাশে তাঁর অফিস এবং কোয়ার্টার হবে। যাই হোক, দরকার হলে চৌকিদারকে পাঠালে তিনি চলে আসবেন। তাছাড়া সময় হাতে থাকলে তিনি কর্নেলকে সঙ্গ দেবেন। বিশেষ করে এই জঙ্গলে যে অদ্ভুত প্রাণীটা এসে জুটেছে, তার সম্পর্কে কৌতূহল তাঁর যথেষ্ট। তবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুসারে প্রাণীটাকে প্রাণে মারা যাবে না।

ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে চুরুট টানতে-টানতে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা নাখুলাল! তোমার খ্রিস্টান নাম কী?

চৌকিদার সবিনয়ে বলল,—যোশেফ নাখুলাল সার!

—তোমাদের ফাদার স্যামুয়েল কি এখন বস্তিতে স্কুল চালাচ্ছেন?

না সার! ফাদার স্কুলের স্যামুয়েল কি এখন বস্তিতে স্কুল চালাচ্ছেন?

না সার! ফাদার স্কুলের ভার দিয়েছেন আমার ভাইপো ফিলিপকে। ফিলিপ—সুরেন ওর নাম। দুমকা মিশন স্কুল থেকে পাশ করে এসেছে। —বলে চৌকিদার কণ্ঠস্বর চাপা করল : সুরেন মাস্টারমশাইয়ের ছেলে দীপুর বন্ধু ছিল সার! দীপু যেদিন জঙ্গলে হারিয়ে যায়, সুরেনই তো সাহস করে বাবুদের ছেলেদের ডেকে তাকে খুঁজতে ঢুকেছিল।

—আচ্ছা নাখুলাল, ওদের যে ফুটবলটা জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি খুঁজে পেয়েছিল ওরা?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে ভয়পাওয়া মুখে বলল,—সেদিন বলটার দিকে কারও মন ছিল না। পরদিন সকালে সুরেন বলটা দেখতে পেয়েছিল। বলটা কোনও জানোয়ার ছিঁড়ে ফালাফালা করে রেখেছিল। ব্লাডারও ছিঁড়ে ফেলেছিল। সুরেনকে আপনি জিগ্যেস করবেন।

—করব। তোমাদের বস্তিটার কী নাম যেন?

—রংলিডিহি। আপনি দেখে থাকবেন, বস্তির মাটির রং একেবারে লাল। বুড়োদের কাছে শুনেছি, রংলিডিহিও জঙ্গলের মধ্যে ছিল। আর এই জঙ্গল ছিল একেবারে রেললাইন পর্যন্ত। এখন ওদিকটা ফাঁকা।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নাখুলাল! তুমি আমাদের খাওয়ার জন্য বাজার করে আনো। বাজার তো সেই রায়গড়ে। তুমি কি পায়ে হেঁটে যাবে?

—না সার! সাইকেল আছে। বাংলোর পিছনে আমার থাকার ঘর। সেখানে আছে। আপনারা আসবেন শুনে আমি সাইকেল এনে রেখেছি।

কর্নেলের কাছে টাকা নিয়ে যোশেফ নাখুলাল সাইকেলে থলে ঝুলিয়ে ঢালু রাস্তায় নেমে গেল এবং একটু পরে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হল।

বাংলোটা উঁচুতে বলে শীতের হাওয়া এসে হুলস্থূল বাধাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে বিছানায় বসে পড়লুম। নতুন তৈরি ঘরে পেন্ট আর চুনকামের গন্ধ পাচ্ছিলুম। পশ্চিমের জানালা খোলা ছিল। চোখে পড়ল ঢেউখেলানো অনাবাদি, কোথাও আবাদি প্রান্তর। তার শেষে নীল পাহাড়ের উঁচু-নিচু শিখর। বুঝলুম, ওদিকটা বিহার এবং ওই পাহাড় ছোটনাগপুর রেঞ্জের একটা অংশ।

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—রায়গড়-রাজাদের পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখতে হলে পশ্চিম-উত্তর কোনে তাকাও। যে নদীটা পেরিয়ে এলুম, ওখানে তা জলে ভরা। কারণ দুর্গের নিচে দহ ছিল একসময়। এখন দহ বুজে গেছে। তবে জলের স্রোত সাংঘাতিক তীব্র।

বললুম,—এখনও কুয়াশা আছে। আপনার বাইনোকুলারটা দিন।

বাইনোকুলার অ্যাডজাস্ট করে নিতেই চোখে পড়ল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধ্বংস্তূপ ছড়িয়ে আছে। এবং একটা অংশ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল পর্যন্ত এগিয়ে আছে।

হঠাৎ দেখলুম, ধ্বংসস্তূপের আড়াল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াল। দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু কর্নেলের বাইনোকুলারে তাদের অবয়ব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। একজনের পরনে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট ও মাথায় টুপি। তার কাঁধে একটা কিটব্যাগ ঝুলছে। অন্যজন বেঁটে এবং মোটাসোটা। তার পরনে প্যান্ট, গায়ে সোয়েটার আর মাথায় মাফলার জড়ানো। দুজনের মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। তারা অঙ্গভঙ্গি করে সম্ভবত কথা বলছে।

কর্নেলকে বললুম কথাটা। অমনি তিনি বাইনোকুলার প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন,—কী আশ্চর্য! পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ওখানে কী করছেন?

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলুম। বললুম,—দুজনেই জঙ্গলে ঢুকে গেলেন।

—যাকগে। এখন এ নিয়ে মাথাব্যথার মানে হয় না। ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে তুমি গড়িয়ে নাও। নাখুলাল ফিরে এলে স্নান করে ফ্রেশ হওয়া যাবে।

নাখুলাল ফিরল ঘণ্টাদেড়েক পরে। সে বলল,—সুরেনকে আসতে বলেছি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তুমি আমাকে আরেক পেয়ালা কফি খাইয়ে দাও।

নাখুলাল হাসল,—জানি সার! রেঞ্জারসায়েব বলেছেন, আপনি হরঘড়ি কফি খান।

—এখানে স্নানের জলের ব্যবস্থা আছে তো?

—আছে সার! বাংলোর পিছনে নিচে একটা কুয়ো আছে। কুয়োর মুখ ঢাকা। ওই দেখুন, টিউবেল। টিউবেলের নল কুয়োর মধ্যে ঢোকানো আছে। আমি জল তুলে দেব। এক বালতি জল গরম করে দেব।

বলে সে বাংলোর পিছনদিকে কিচেনে চলে গেল। তারপর দশমিনিটের মধ্যেই একপট কফি এনে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্নেলের কথায় কফি পান করতে হল। কর্নেলের বরাবর ওই এক কথা : কফি নার্ভকে চাঙ্গা করে।

কফি খেয়ে আমি পোশাক বদলে বিছানায় গড়িয়ে পড়লুম। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বাংলোর পিছনে গেলেন। ভাবলুম, হাড়টমটিয়া নামক অদ্ভুত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীটিকে বাইনোকুলারে আবার খুঁজতে গেলেন। চৌকিদার প্রাণীটাকে দেখে ভালুক ভেবেছিল। কিন্তু আমি প্রাণীটাকে না দেখতে পেলেও কোনও হাড়মটমট-করা শব্দ শুনিনি। এদিকে কর্নেল গম্ভীরমুখে বলছিলেন, প্রাণীটা ভালুকের মতো দেখতে হলেও ভালুক নয় এবং ওটাই হয়তো সেই হাড়মটমটিয়া! সে নাকি ওত পেতে আমাদের কথা শুনতে এসেছিল! কী অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার!

এই দিনদুপুরে কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে গা ছমছম করে উঠল! ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত আর বিখ্যাত ব্যবসায়ী কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে দুর্গের ধ্বংসস্তূপে দেখার কথাও মনে পড়ল। ওঁদের আচরণও অদ্ভুত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে বারান্দায় বসলেন। বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বারান্দায় আমাকে দেখে কর্নেল বললেন,—ভেবেছিলুম তুমি কম্বল ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছ!

বেতের চেয়ার টেনে বসে বললুম,—স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুমোব। কিন্তু আপনি কি হাড়মটমটিয়ার খোঁজে বাংলোর পিছনে ওত পেতেছিলেন?

—না। নাখুলালের সঙ্গে গল্প করছিলুম। লোকটি খুব সরল প্রকৃতির। আদিবাসীদের এই গুণটা আছে। খ্রিস্টান হলেও রংলিডিহির বুড়ো-বুড়িরা যেমন, তেমনি যুবক-যুবতীরাও জঙ্গলের

দেবতাকে মানে। শুনলে না? তখন নাখুলাল ঠাকুরবাবার কথা বলছিল। তবে এই ঠাকুরবাবা এক ভয়ঙ্কর দেবতা। আগে মানুষের রক্ত খেত। এখন মুরগির রক্ত পেলেই খুশি হয়। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে একটা ডোবা আছে, ওটার পাড়ে ঠাকুরবাবার থান ছিল। এখন থানটা বটগাছের শেকড়ে ঢাকা পড়েছে। তবে নাখুলালের মুখ থেকে কিছু তথ্য পেলুম। দীপুর হারিয়ে যাওয়ার রাত্রে ডোবার পাড়ে রক্ত দেখে পুলিশ বলেছিল, আদিবাসীরা মুরগি বলি দিয়েছিল, সেই রক্ত। নাখুলাল বলল, পুলিশের কথা ঠিক। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে কেউ-কেউ ঠাকুরবাবার কাছে মুরগি বলি দিয়ে মানত করে। মানত করার জন্য গোপনে বিকেলের দিকে বলির জায়গাটা পরিষ্কার করতে হয়। তো নাখুলাল কথায়-কথায় বলে ফেলল, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে মানত দিয়েছিল তার জ্যাঠুতুতো দাদা মানকু। মানকুর সঙ্গে বিকেলে গোপনে থান পরিষ্কার করতে গিয়েছিল শিবু। শিবু খ্রিস্টান হলেও ওঝার পেশা ছাড়েনি। সে মন্তরতন্তর জানে।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। জিগ্যেস করলুম,—তারপর?

কর্নেল আস্তে বললেন,—মানকু আর শিবু-ওঝা দুটো লোককে একটা ঝোপের আড়ালে বসে থাকতে দেখেছিল। তাদের সাড়া পেয়ে ওরা লুকিয়ে পড়ে। ওদের একজনকে মানকু আর শিবু চিনতে পেরেছিল। সেই লোকটা রায়গড়ের উপেন দত্ত। অন্যজনকে চিনতে পারেনি।

—এসব কথা কি ওরা পুলিশ বা কুমুদবাবুকে বলেছিল?

—না। ওরা খামোকা ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। তাছাড়া ওদের মানত করার কথা শুনলে ফাদার স্যামুয়েল চটে যেতেন। মিশন থেকে সাহায্য বন্ধ হয়ে যেত। তাই নাখুলাল আমাকে অনুরোধ করল, এসব কথা যেন কাকেও না বলি।

কথাগুলো শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম। বললুম,—কর্নেল! তাহলে উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায় আর তার সেই গুন্ডা গোবিন্দ বল কুড়োতে আসা দীপুকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর দীপু কোনও সুযোগে পালিয়ে যায়। তাই পীতাম্বর রায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

কর্নেল হাসলেন,—অঙ্কটা একটু জটিল জয়ন্ত!

—কেন?

কর্নেল বললেন,—পরে বুঝবে। আপাতত স্নান করে ফেলো। প্রায় বারোটা বাজে।

স্নানাহারের পর কর্নেল বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে হেলান দিলেন। আমি অভ্যাসমতো ভাতঘুম দিতে গায়ে কম্বল চাপা দিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

সেই ঘুম ভাঙল চৌকিদারের ডাকে। সে চা এনেছিল। বিছানা ছেড়ে ঘড়ি দেখলুম। চারটে বেজে গেছে। জিগ্যেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

চৌকিদার বলল,—সুরেন এসেছিল সার! কর্নেলসায়েব তার সঙ্গে আমাদের বস্তিতে গেছেন।

কর্নেলের খেয়ালিপনা আমার জানা! রাগ করার মানে হয় না। বারান্দা থেকে লনে গিয়ে দিনশেষের বিবর্ণ রোদে দাঁড়িয়ে চা পানে মন দিলুম। লনের দুধারে সুদৃশ্য স্কুলবাগান। ঝাউগাছ, অর্কিড আর কয়েকরকম পাতাবাহার। এতক্ষণে দেখলুম একজন মালি এসে আপনমনে বাগান পরিচর্যা করছে। চৌকিদার তার সঙ্গে গল্প করতে গেল।

প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রেললাইন পূর্ব থেকে বাঁক নিয়ে পশ্চিম ঘুরেছে। ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে একটা মালগাড়ি। রেললাইন পেরিয়ে একটা পিচের রাস্তা এই বাংলোর পূর্বদিকে আদিবাসী বস্তির কিনারা ঘেঁসে উত্তরে অদৃশ্য হয়েছে। ওটাই বোধহয় রায়গড়গামী সড়ক। এই অবেলায় পিচের সড়কে মাঝে-মাঝে একটা করে ট্রাক বা বাস যাতায়াত করছে। একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারও আসতে দেখলুম। গাড়িটা আদিবাসী বস্তির পূর্বে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালি কাজ শেষ করে চলে যাওয়ার সময় আমাকে সেলাম ঠুকে গেল। সরকারি অফিসার ভেবেছে হয়তো। চৌকিদার বাংলোর পিছনের ঘর থেকে একটা চীনা লণ্ঠন জ্বেলে আমাদের ঘরে রাখল। তারপর একটা হ্যারিকেন বারান্দায় টেবিলে রাখল।

বললুম,—নাখুলাল? তুমি পেছনের ঘরে থাকো। তোমার ভয় করে না?

নাখুলাল বুকে ক্রস এঁকে বলল,—না সার! আমার বল্লম আর তির-ধনুক আছে। তবে সার! জঙ্গলে আছেন বাবাঠাকুর আর আমার বুকে ক্রস আছে। প্রভু যিশু আছেন মাথার ওপর। ওই দেখুন! প্রভুর দয়া! চাঁদ উঠেছে।

এই বনভূমিতে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য উপভোগ করব কী, আমার মনে শুধু সেই অদ্ভুতুড়ে জন্তুটার জন্য আতঙ্ক। হাওয়ায় গাছপালার অদ্ভুত শব্দে এদিক-ওদিকে তাকাচ্ছিলুম। হাতে ততক্ষণে টর্চ নিয়েছি এবং আমার লাইসেন্সড রিভলভারটা ঘরে বালিশের পাশে রেখেছি।

বারান্দায় বসে অকারণ এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোয় জ্যোৎস্নাকে ক্ষতবিক্ষত করছিলুম। কতক্ষণ পরে কাঠের গেট খুলে কর্নেলকে ঢুকতে দেখলুম। তিনি কাকে বললেন,—এবার তুমি চলে যাও। খামোকা কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসার দরকার ছিল না।

কেউ বলল,—তা কি হয় সার? আপনি বাংলোয় না পৌঁছানো পর্যন্ত মনে শান্তি পেতুম না।

কণ্ঠস্বর কোনও তরুণের মনে হল। উচ্চারণ বেশ মার্জিত। চৌকিদার বলল,—সুরেন এসেছিল সার?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে তোমার ভাইপো! খুব ভদ্র। সাহসীও বটে! নাখুলাল বলল,—ফাদার বলেছেন ওকে কলেজে ভর্তি করে দেবেন।

—বাঃ! তবে আপাতত কফি নাখুলাল!

—হ্যাঁ সার! আমি জল চাপিয়ে রেখেছি কুকারে।

কর্নেল বারান্দায় উঠে ইজিচেয়ারটা টেনে বসলেন। বললেন,—জয়ন্ত! কথা বলছ না? তার মানে এই বৃদ্ধের প্রতি খাপ্পা হয়েছ। কিন্তু তোমার ভাতঘুম নষ্ট করার মানে হয় না। এতে তোমার শরীর ফিট হয়ে গেছে।

বললুম,—মোটেও খাপ্পা হইনি। লনে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না উপভোগ করছিলুম।

কর্নেল হাসলেন,—উপভোগ, নাকি হত্যা করছিলে? দূর থেকে বারবার টর্চের আলোর ঝলক দেখে আমি ভাবনায় পড়েছিলুম। হাড়মটমটিয়াকে ওত পাততে দেখেছ সম্ভবত।

বললুম,—ওকথা থাক। কতদূর ঘুরলেন বলুন!

নাখুলাল পটভর্তি কফি, দুধ, চিনি, এক প্লেট স্ন্যাক্স আর কাপপ্লেট রেখে গেল। কর্নেল কফি তৈরি করতে-করতে বললেন,—তুমি ঘুমোচ্ছিলে। তখন সুরেন এসেছিল। ছেলেটির বয়স ষোলো-সতেরো বছর মাত্র। দারুণ সাহসী। জঙ্গলে যেখানে সে বলটা পরদিন কুড়িয়ে পেয়েছিল, সেখানে নিয়ে গেল আমাকে। লক্ষ করলুম, খেলার মাঠ থেকে বলটা অতদূরে পৌঁছুতে পারে না। তার মানে কেউ বলটা ইচ্ছে করেই ওখানে নিয়ে গিয়েছিল, যাতে দীপু বলটা দেখতে না পায়। যাই হোক, সুরেন আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ি থেকে প্লাস্টিকের থলেতে ভরে ছেঁড়া বলটা এনে দেখাল।

—বলটা নিয়ে আসেননি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগটা দেখালেন। ওটা তাঁর পায়ের কাছে রাখা ছিল। বললেন,—পরে দেখবে। আপাতদৃষ্টে মনে হবে, কোনও হিংস্র জন্তু ওটাকে যথেষ্ট ছিঁড়েছে। কিন্তু আতশ কাচের সাহায্যে দেখে বুঝলুম, সূক্ষ্ম সূচলো কোনও যন্ত্রে কেউ এই কাজটা করেছে। অর্থাৎ দীপু যেন

কোনও হিংস্র জন্তুর কবলে পড়েছে, এটাই তখন লোককে বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। বুঝতেই পারছ, দীপুকে যারা অপহরণ করেছিল, তারা তাকে নিরাপদে সম্ভবত কলকাতা নিয়ে যেতে সময় চেয়েছিল।

—কর্নেল! তাহলে আমার ধারণা ট্রেনে নয়, দীপুকে কিডন্যাপাররা মোটর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ঠিক ধরেছ। আমার থিয়োরি তা-ই।

—কিন্তু কুমুদবাবুর সঙ্গে দেখা করে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু নারায়ণ রায়ের পারিবারিক পাঠাগারের সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তার আগে আমাদের জানা দরকার, উপেন দত্ত জঙ্গলের ভেতর পাথুরে মাটিতে, কেন গর্ত খুঁড়ছিল? জয়ন্ত! আজ রাত্রে আমরা ওখানে যাব। সুরেনকে বলেছি, সে রাত ন'টার মধ্যে খেয়েদেয়ে এখানে চলে আসবে।

—নাখুলাল এসব কথা তাদের বস্তিতে রটিয়ে দেবে না তো?

—সুরেন তার জ্যাঠাকে সব বুঝিয়ে বলবে।

আধঘণ্টা পরে নাখুলাল মাথায় হনুমানটুপি এবং গায়ে ওভারকোট পরে কফির ট্রে নিতে এল। সে একটু হেসে বলল,—কর্নেলসায়েব! সুরেনকে কেমন লাগল আপনার?

কর্নেল বললেন,—খুব ভালো। সাহসী ছেলে। শোনা! সুরেন আবার এখানে রাত নটা নাগাদ আসবে।

নাখুলালের মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল। সে বলল,—অত রাতে জঙ্গলের পথে সে একা আসবে? সার যদি বলেন, আমি গিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আসব।

কর্নেল হাসলেন,—তোমার চিন্তার কারণ নেই নাখুলাল! ফাদার স্যামুয়েল সুরেনকে যে ক্রস দিয়েছেন, তাতে প্রভু যিশুর কথা খোদাই করা আছে। ওই ক্রস যার গলায় ঝুলছে, কারও সাধ্য নেই তার ক্ষতি করে।

আদিবাসী খ্রিস্টান যোশেফ নাখুলাল তাতে খুব আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। গম্ভীরমুখে সে চলে গেল।

বাইরে ঠান্ডা বাড়ছিল। আমরা ঘরে গিয়ে বসলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে প্ল্যাস্টিকে মোড়া সেই ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার বের করে দেখালেন। বললুম,—কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে।

কর্নেল বললেন,—কী?

—ছেঁড়া ফুটবলের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, উপেন দত্ত ওরফে পীতাম্বর রায়কে কি একই অস্ত্রে হত্যা করা হয়েছে? তার শরীরে নাকি হিংস্র জন্তুর মতো নখের আঁচড় ছিল!

কর্নেল ছেঁড়া ফুটবল আর ব্লাডার কিটব্যাগে আগের মতো প্লাস্টিকে মুড়ে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন,—সাধারণত এভাবে নখের আঁচড়ে কিছু ফালাফালা করা বুনো ভালুকের অভ্যাস। লোকেরা বা নাখুলাল নিজেও যে গর্জন শুনেছিল, বুনোভালুক কতকটা ওইরকম গর্জনই করে। হ্যাঁ—এ জঙ্গলে ভালুক থাকা অসম্ভব নয়। তাই দীপুর কিডন্যাপার ব্যাপারটা ভালুকের ওপর চাপানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। তারপর তার ফটো এবং বত্রিশের ধাঁধার ব্যাপারটা এসে গিয়েছিল। কিন্তু লোকেরা তো এসব গোপন কথা জানে না! এরপর উপেন দত্তের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। লোকেরা আগের মতো ভালুক বা ওই জাতীয় হিংস্র জন্তুকেই আততায়ী ভাবছে। আবার হাড়মটমটিয়ার কিংবদন্তিতে যারা বিশ্বাসী, তারা ভাবছে এটা ওই ভূতুড়ে প্রাণীর কাজ। এদিকে উপেন দত্ত চোরাই মালের কারবার করত। তা নিয়েও নানা কথা রটেছে। এ

থেকে শুধু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যায়। তা হল : কেউ বা কারা একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়।

—কেন?

—এর উত্তর পাব, যদি উপেন দত্ত যা খুঁজছিল, তা দৈবাৎ আমরা পেয়ে যাই।

—রাত্রে কেন? দিনে সেই জিনিসটা খুঁজে বের করা যায় না?

—দিনে ঝুঁকি আছে। কারণ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ আর কৃষ্ণকান্ত অধিকারীকে আমরা একত্রে আবিষ্কার করেছি।

রাত নটায় সুরেন এল। সদ্য গোঁফের রেখা গজানো ছেলেটিকে মুখে লাবণ্য যেমন আছে, তেমনি স্মার্টনেসও আছে। আমাকে সে নমস্কার করে কর্নেলকে বলল,—কর্নেলসায়েব! আমি আমার জেঠুর সঙ্গে কথা বলে আসি।

আমরা সাড়ে নটায় খেয়ে নিলুম। নাখুলালের মুখ তখনও গম্ভীর। রাত দশটায় আমরা বাংলোর উত্তরের গেট খুলে বেরিয়ে গেলুম। নাখুলাল বল্লম আর পাঁচ ব্যাটারি টর্চ হাতে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ সকালে যেখানে যেতে একটুও ভয় পাইনি, এই জ্যোৎস্নারাতে সেখানে পৌঁছুতে প্রতি মুহূর্তে চমকে উঠছিলুম। আমার এক হাতে টর্চ, অন্যহাতে রিভলভার। কর্নেলের কাঁধে শুধু কিটব্যাগ। আর সুরেনের হাতে টর্চ আর একটা শাবল।

গাছের ছায়া দুলছে শীতের হাওয়ায়। জ্যোৎস্নায় চারপাশে অজানা রহস্য অনুভব করছি। মনে হচ্ছে, কারা যেন ছায়ার আড়ালে ওত পেতে আছে—তারা যেন মানুষ নয়। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কোথায় গাছের শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ হতে থাকল। আমরা থমকে দাঁড়ালুম। কর্নেল টর্চ জ্বালতে নিষেধ করলেন।

শব্দটা মিনিট দুয়েক পরে থেমে গেল। সুরেন ফিসফিস করে বলল,—এই শব্দটা আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু কীসের শব্দ তা বুঝতে পারিনি।

কর্নেল আস্তে বললেন,—চলো! এসে গেছি।

সেই ফাঁকা জায়গায় গর্তটার কাছে পৌঁছে কর্নেল চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—উপেন দত্তের গর্ত থেকে হাত তিনেক দূরে—এই যে এখানে। টর্চ জ্বালবার দরকার নেই। এখানে দিনে একটা আবছা ক্রসচিহ্ন দেখেছিলুম।

বলে উনি সেখানে বসে কিটব্যাগ থেকে কী একটা খুদে কালো জিনিস বের করলেন। জিনিসটাতে একবিন্দু লাল আলো ফুটে উঠল। এবার চিনতে পারলুম। ওটা কর্নেলের সেই মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্র। যন্ত্রটা ক্ষীণ পিঁ-পিঁ শব্দ করতে থাকল। কর্নেল সুইচ টিপলে শব্দ বন্ধ হল। আলোও নিভল। তিনি বললেন,—সাবধানে খোঁড়ো সুরেন!

আমি এবং কর্নেল একটু তফাতে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইলুম। সুরেনের শাবল খুব সহজেই মাটিতে ঢুকে যাচ্ছিল। বুঝলুম, এখানে শক্ত মাটির বদলে বালি ভরা আছে একটু পরে সুরেন শাবল রেখে দু'হাতে বালি সরিয়ে একটা ছোটো প্যাকেটের মতো জিনিস বের করল। কর্নেল সেটা তার হাত থেকে নিয়ে বললেন,—জায়গাটা আগের মতো ভরাট করে দাও। সকালে আমি এসে পাথর কুড়িয়ে এনে ঠিকঠাক করে দেব।

কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে চললুম। বাংলোর কাছাকাছি গেছি, হঠাৎ পিছনে একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

কর্নেল বললেন,—কুইক! দৌড়ে বাংলোয় গিয়ে ঢুকতে হবে।

ছয়

সামান্য চড়াই বেয়ে বাংলোর পিছনের গেটে পৌঁছে দেখি, নাখুলাল ওভারকোট পরে এক হাতে বল্লম এবং অন্য হাতে টর্চ নিয়ে সবে তার ঘর থেকে বেরুচ্ছে। সুরেন গেট বন্ধ করে আদিবাসী ভাষায় তার জ্যাঠা নাখুলালকে কিছু বলল। তার কথার জবাবে নাখুলালও কিছু বলল। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় তার মুখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ করলুম।

পরে আমাদের ঘরে বসে চীনে লণ্ঠনের আলোয় সুরেনের মুখে চাপা হাসি দেখতে পেলুম। বললুম,—তোমার জেঠা নাখুলাল দূর থেকে অদ্ভুত গর্জন শুনে ভয়ে কোণঠাসা হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি ভয় পাওনি মনে হচ্ছে।

সুরেন বলল,—আমার জেঠুকে তখন জিগ্যেস করলুম, গেটে তোমার দাঁড়িয়ে থাকার কথা। তুমি ঘরে ঢুকে কী করছিলে? জেঠু বলল, হাড়মটমটিয়াকে সায়েবরা রাগিয়ে দিতে গেলেন। আমি গেটে একা দাঁড়িয়ে থাকলে সে আগে আমাকেই উপেন দত্তের মতো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত। আসলে হয়েছে কী জানেন? ওই অদ্ভুত গজরানি শুনে জেঠু বেজায় ভয় পেয়েছে।

—কিন্তু তুমি ভয় পাওনি?

না সার! ওই গজরানি আমি অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সাহস করে দাঁড়িয়ে দেখেছি, গজরানিটা হঠাৎ থেমে গেছে। হাড়মটমটিয়া আমাকে দেখা দেয়নি, মারতে আসা তো দূরের কথা। —বলে সুরেন হেসে উঠল : কর্নেলসায়েবকে বলতে যাচ্ছিলুম, সাহস করে দাঁড়াব। দেখবেন, কেউ হামলা করবে না। তাছাড়া আপনার হাতে তো রিভলভার ছিল।

কর্নেল হাসলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন,—সুরেন! হাড়মটমটিয়া যে জিনিসটা এতদিন পাহারা দিচ্ছিল সেটা আজ রাতে আমরা হাতিয়ে নিয়েছি। তাই সে খাপ্পা হয়ে তেড়ে আসছিল। জয়ন্ত গুলি ছুড়লেও সে ভয় পেত না।

সুরেন একটু অবাক হয়ে বলল,—যে প্যাকেটটা খুঁড়ে তুললুম, ওতে কী আছে সার?

—পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো, তোমার বন্ধু দীপু নিখোঁজ হওয়ার পিছনে এই জিনিসটাই দায়ী। যাই হোক, তুমি এত রাতে বাড়ি ফিরো না। তোমার জ্যাঠার কাছে থাকো।

নাখুলাল বারান্দা থেকে আদিবাসী ভাষায় সুরেনকে কিছু বলল। সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপর দুজনে বারান্দা দিয়ে ঘুরে পিছনের দিকে চলে গেল।

কর্নেল দরজা বন্ধ করে দিয়ে জ্যাকেটের ভেতর থেকে ছোটো প্যাকেটটা বের করলেন। সেটা শক্ত সুতোয় আগাগোড়া জড়ানো। এবং বাঁধা ছিল। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে সুতো কেটে ফেললেন। তারপর কালো পলিথিনের মোড়ক খুললে শক্ত কাগজের মোড়ক দেখা গেল। কর্নেল আস্তে বললেন,—জানি না, এতে যা আছে ভাবছি, তা সত্যিই আছে কি না। থাকলে আমাদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে।

তারপর তিনি আরও একটা মোড়ক খুলে ফেললেন। কুচকুচে কালো, চৌকো, ইঞ্চি চারেক প্রস্থ এবং ইঞ্চি ছয়েক দৈর্ঘ্যের এক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেলুম। জিনিসটার উচ্চতাও প্রায় চার ইঞ্চি। সব দিকেই সুন্দর কারুকার্য করা। তবে ওটার একদিকে খুদে গোল বোতাম সারিবদ্ধভাবে বসানো আছে। কর্নেল বললেন,—বেশ ওজন আছে। হাতে নিয়ে দেখতে পারো!

হাতে নিয়ে অনুমান করলুম ওজন প্রায় হাফ কিলোগ্রাম হবে। আগাগোড়া উলটে পালটে দেখার পর বললুম,—এটা পাথর মনে হলেও পাথরের নয় কর্নেল!

কর্নেল আমার হাত থেকে ওটা নিয়ে বললেন,—না। এটা অজানা কোনও ধাতুতে তৈরি। জয়ন্ত! আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ চট্টরাজের ক্যাম্প থেকে এই জিনিসটাই চুরি গিয়েছিল, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। পীতাম্বর রায় ওরফে উপেন দত্তই এটা চুরি করে জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিল। কোনও কারণে গতরাতে সে এটা খুঁড়ে বের করতে এসেছিল। কিন্তু সে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল জায়গা খুঁড়ছিল। সেই সময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ী। সম্ভবত সে উপেনের অজ্ঞাতসারে তাকে অনুসরণ করে এসেছিল!

বললুম,—কিন্তু আততায়ী যদি কোনও মানুষ হয়, তাহলে তাকে ওভাবে ক্ষতবিক্ষত করে মারল কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার এটুকু বোঝা উচিত জয়ন্ত। দীপুকে কোনও জন্তু মেরে ফেলেছে বলে গুজব রটেছিল। তা ছাড়া এই জঙ্গলে নাকি হাড়মটমটিয়া নামে সাংঘাতিক ভূত বা পেতনি আছে বলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করে। কাজেই আততায়ী এবং তার পেছনে যারা আছে, তারা উপেন দত্তের মৃত্যু কোনও অদ্ভুত জন্তুর আক্রমণেই হয়েছে, এটা দেখাতে চেয়েছিল।

—কিন্তু ওই অমানুষিক গর্জন কি সত্যিই কোনও জন্তুর!

—জানি না।

—কর্নেল! আপনি আমাদের ছুটে পালিয়ে বাংলোয় আশ্রয় নিতে বলেছিলেন!

—হ্যাঁ। রাতবিরেতে জঙ্গলে শুধু রিভলভার দিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় না। যাই হোক, এবার শুয়ে পড়া যাক। কাল সকালে আমরা কুমুদবাবুর বাড়ি যাব।

পরদিন ঘুম ভেঙে দেখি, নাখুলাল বেড-টি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে আজ উজ্জ্বল রোদ ফুটেছে। কালকের মতো কুয়াশা নেই। জিগ্যেস করলুম,—কর্নেলসায়েব কোথায় নাখুলাল?

নাখুলাল বলল,—উনি ভোরে উঠে সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন।

—কোনদিকে গেছেন দেখেছ?

নাখুলাল উত্তর-পশ্চিম কোণে দূরের দিকে আঙুল তুলে বলল,—পুরনো গড়ের খণ্ডহরের দিকে যেতে দেখেছি সার!

বেড-টি বিছানায় বসে আমার খাওয়ার অভ্যাস। কিন্তু বাইরে রোদ দেখে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। কুয়াশা আজ যেন দূরে সূরে গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পিচের সড়কে মাঝে মাঝে যানবাহন যাতায়াত করছে।

নাখুলাল বলে গেল, বাথরুমে গরম জল দিয়েছে। এখনই মুখ না ধুলে জলটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাই বাথরুমে ঢুকলুম। তারপর প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বাংলোর পশ্চিমদিকে গেলুম। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপে কুয়াশা ঘন হয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অনুর্বর রুক্ষ মাঠ এবং নদীর দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল, কেউ হনহন করে এগিয়ে আসছে। অস্পষ্ট একটা মূর্তি। কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ আছে। লোকটা নদী পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে আসার পর চিনতে পারলুম।

লোকটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই! কিন্তু উনি কী করে জানলেন আমরা এই বনবাংলোতে উঠেছি?

আরও কাছাকাছি এসে তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন এবং চলার গতি বাড়িয়ে দিলেন। বাংলোর সদর গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটু পরে গোয়েন্দাপ্রবর এসে গেলেন। বললুম,—আসুন হালদারমশাই! আপনাকে কে বলল আমরা এখানে আছি?

হালদারমশাই আড়ষ্টভাবে হেসে বললেন,—সেই গোবিন্দরে ফলো করছিলাম। মেসের ম্যানেজারেরে ফোন করছিলাম কাইল বিকালে। তিনি কইলেন, গোবিন্দ তারে কইছে, পীতাম্বরবাবু

মারা গেছেন। পীতাম্বরবাবুর ভাগনা খবর আনছে। সেই ভাগনারে ম্যানেজারবাবু চেনেন। সে মাঝে-মাঝে মেসে গিয়া মামার লগে থাকত। তো দুইজনে পীতাম্বরবাবুর জিনিসপত্র লইয়া হাবড়া স্টেশনে গেছে।

বললুম—আপনি তাহলে তখনই হাওড়া স্টেশনে ছুটে গিয়েছিলেন?

—ঘরে চলেন। সব কমু। কর্নেলসায়েব কই গেলেন?

—মর্নিংওয়াকে।

হালদারমশাই বারান্দায় বসে মাথায় জড়ানো মাফলার খুললেন। নাখুলাল এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে বললুম,—নাখুলাল! ইনি কর্নেলসায়েবের বন্ধু। শিগগির এঁর জন্য চায়ের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম হল : হাওড়া স্টেশনে গিয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে গোবিন্দদের আবিষ্কার করতে পারেননি। অগত্যা ফিরে আসবেন ভাবছেন, সেই সময় তাঁর চোখে পড়ে, গোবিন্দ আর তার বয়সি এক যুবক বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নামছে। অমনি তিনি আড়ালে গিয়ে তাদের দিকে লক্ষ রাখেন। কিন্তু রায়গড় যাওয়ার ট্রেন রাত বারোটায়। এনকোয়ারিতে খবর নিয়ে টিকিট কেটে হালদারমশাই তাদের চোখের আড়ালে অপেক্ষা করেন। অবশেষে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ভিড়লে তিনি গোবিন্দদের পিছনের কামরায় ওঠেন। ভোরবেলা রায়গড় স্টেশনে নেমে গোবিন্দ আর তার সঙ্গী একটা ট্রাকে জায়গা পেয়ে চলে যায়। হালদারমশাই বেশ কিছুক্ষণ পরে স্টেশনচত্বরে নেমে কীভাবে যাবেন, তার খোঁজ নিচ্ছিলেন। একদল আদিবাসী সেই সময় হাঁটতে-হাঁটতে স্টেশনচত্বরে ঢুকছিল। তাদের জিগ্যেস করে তিনি জানতে পারেন, হাঁটাপথে রায়গড় তত দূরে নয়। নাকবরাবর এগিয়ে তাদের বসতির ভেতর দিয়ে গেলে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরত্ব। সেই আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন, রায়গড়ে কোনও হোটেল নেই। এদিকে ষষ্ঠীচরণ তাঁকে জানিয়েছিল আমরা রায়গড়ে এসেছি। কথায়-কথায় এক দাড়িওয়ালা সায়েবের খোঁজ নেন তিনি। প্রাইভেট ডিটেকটিভের বুদ্ধি! তাছাড়া তিনি প্রাক্তন এক জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। কর্নেল যে বনবাংলোয় উঠেছেন, সেই খবরও তিনি পেয়ে যান।

ইতিমধ্যে চা এনেছিল চৌকিদার। চা খেতে-খেতে হালদারমশাই তাঁর কথা শেষ করে বললেন, —আদিবাসী ভদ্রলোকেরে পীতাম্বর রায়ের কথা জিগাইলাম। ও নামে রায়গড়ে কেউ নাই শুনিয়া ওনারে কইলাম, রায়গড়ের এক ভদ্রলোক কলকাতায় থাকতেন। তিনি মারা গেছেন হঠাৎ। তখন ভদ্রলোক কইলেন, একজন জঙ্গলে কী সাংঘাতিক জানোয়ারের পাল্লায় পইড়া মারা গেছে বটে। তার নাম উপেন দত্ত। তখন গোবিন্দর কথা বললাম। ভদ্রলোক কইলেন, গোবিন্দ একজন গুণ্ডা। উপেন দত্ত লোকটাও ভালো ছিল না। গোবিন্দ ছিল তার এক চেলা!

এবার আমি উপেন দত্তের মৃত্যুর ঘটনা হালদারমশাইকে বললুম। এ-ও বললুম, উপেন দত্ত সত্যিই পীতাম্বর রায়। তবে গতরাতের ঘটনা বললুম না। বলতে হলে কর্নেলই বলবেন।

কর্নেল একা ফিরলেন, তখন নটা বাজে। তিনি হালদারমশাইকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, —সুপ্রভাত হালদারমশাই! আমি কিছুক্ষণ আগে বাইনোকুলারে আপনাকে আবিষ্কার করে অবাক হয়েছিলুম। আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা নেই!

গোয়েন্দাপ্রবর জিভ কেটে বললেন,—লজ্জা দ্যান ক্যান কর্নেলস্যার? গোবিন্দ আর তার এক সঙ্গীরে ফলো করিয়া আইয়া পড়ছি!

কর্নেল নাখুলালকে ডেকে বললেন,—আমাদের এই গেস্টের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে নাখুলাল! আমি রেঞ্জারসায়েবকে খবর দেব। তোমার চিন্তার কারণ নেই। পাশের ঘরটা খুলে দাও। আর আমাদের তিনজনের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করো!

নাখুলাল পাশের ঘরের তালা খুলে দিল। তারপর ব্রেকফাস্টের আয়োজন করতে গেল। হালদারমশাই পাশের ঘরে উঁকি মেরে এসে বললেন,—নতুন ঘর! পেন্টের গন্ধ পাইলাম। ইলেকট্রিসিটি নাই?

কর্নেল বললেন,—নাঃ! তবে এখন শীতকালে অসুবিধে নেই। হ্যাঁ—মশা আছে! তাই মশারিও আছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে নাখুলাল ট্রেতে সাজিয়ে ঘিরে ভাজা লুচি, আলুর তরকারি আর সন্দেশ দিয়ে গেল। এখানে ভালো পাঁউরুটি পাওয়া যায় না। তবে ঘি নাকি নির্ভেজাল। সন্দেশও উৎকৃষ্ট। ব্রেকফাস্টের পর কফি এল। নাখুলালকে বাজার করার টাকা দিলেন কর্নেল। সে সাইকেলে চেপে চলে গেল।

কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম—দুর্গের ধ্বংসস্তূপে সুরেনকে নিয়ে ঘুরছিলেন দেখেছি। ওখানে কি কিছু আবিষ্কার করলেন?

কর্নেল বললেন,—আবিষ্কার করার অনেক কিছু এখনও থাকতে পারে ওখানে। তবে সেটা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কাজ। আমি দেখতে গিয়েছিলুম, কাল কৃষ্ণকান্ত অধিকারী আর ডঃ চট্টরাজ ওখানে কী কারণে গিয়েছিলেন। ঘুরতে-ঘুরতে একটা ধ্বংসস্তূপের ভেতর গুহার মতো জায়গা চোখে পড়ল। ছোটো গুহার সামনে লতার ঝালর ছিল। সুরেন বলল, একবার দীপু তাকে এই গুহাটা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। গুহার ভেতর কালো লোম পড়ে থাকতে দেখে তারা ভেবেছিল ওখানে ভালুক থাকে। তাই তখনই সেখান থেকে দুজনে পালিয়ে গিয়েছিল। দৈবাৎ ভালুকটা যদি এসে পড়ে! তো আমিও ওখানে ভালুকজাতীয় জন্তুর লোম পড়ে থাকতে দেখলুম।

বললুম,—উপেনের মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, সেখানেও তো লোম কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। এদিকে নাখুলালও কাল ভালুক দেখে চিৎকার করছিল। কিন্তু আমার এখনও ধারণা জন্তুটা ভালুক নয়।

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। বললেন,—ভালুক যদি অ্যাটাক করতে আসে, গুলি করুম।

কর্নেল হাসলেন,—না হালদারমশাই! জন্তুটা সম্ভবত ভালুক নয়। তবে দৈবাৎ আপনি জন্তুটাকে দেখতে পেলে গুলি ছুড়বেন না। আপনার রিভলভার দেখাতে পারেন! তাতেই জন্তুটা ভয় পাবে।

—রিভলভার দেখলে ভালুক ভয় পাবে? কন কী কর্নেলস্যার?

পাবে।—বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন : আপনি ঘুমিয়ে নিন। আমাদের ঘরে তালা এঁটে দিয়ে আমরা এবার বেরুব। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নিন। আমরা বারোটা নাগাদ ফিরব।

বাংলোর নিচের রাস্তায় নেমে কর্নেল বললেন,—সুরেনকে কুমুদবাবুর কাছে আমাদের আসার খবর দিতে পাঠিয়েছি। আমরা আদিবাসী বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে যাব।

অদিবাসী বস্তিটি বেশ পরিচ্ছন্ন। কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগ আঁটা, গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তারা তাঁকে বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে তাদের গির্জাঘর, স্কুল, এমনকী জঙ্গলে তাদের পূর্বপুরুষের ঠাকুরবাবার থান দেখাতে চাইছিল। কিন্তু কর্নেলের মুখে বাংলা শুনে তাদের আগ্রহ কমে গেল।

বস্তি পেরিয়ে বাঁদিকে সেই খেলার মাঠে পৌঁছুলুম। মাঠের পূর্বপ্রান্তে সেই পিচরাস্তা দেখা গেল। খেলার মাঠের ওপর দিয়ে আমরা কিছুটা গেছি, তখন সুরেনকে দেখতে পেলুম। সুরেন বলল,—মাস্টারমশাই বাড়িতে আছেন। আপনার আসার কথা শুনে খুব খুশি হয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁর বাড়ি কি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে?

সুরেন আঙুল তুলে বলল,—ওই তো! শেষ দিকটায় বটগাছের ফাঁক দিয়ে একতলা পুরনো বাড়ি।

কর্নেল বাইনোকুলারে উত্তরদিকে অবস্থিত রায়গড় খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বললেন,—চলো!

কুমুদ ভট্টাচার্য তাঁর বাড়ির উঁচু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে অভ্যর্থনা করে বসার ঘরে ঢোকালেন! তিনি বললেন,—আপনি দয়া করে এসেছেন। আমার মনে আশা জেগেছে, দীপুকে আপনি উদ্ধার করতে পারবেন। কিন্তু ওদিকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার! কেষ্টবাবুর সঙ্গে সেদিন কলকাতায় আপনার কাছে গিয়েছিলুম, সেদিনকার একটা খবরের কাগজে দীপুর ছবি ছাপিয়ে কে লিখেছে—

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন,—হ্যাঁ। আপনারা চলে যাওয়ার পর বিজ্ঞাপনটা আমি দেখেছি।

কুমুদবাবু বললেন,—বাড়ি ফিরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি তো অবাক। কেষ্টবাবুর বাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে বলেছিলুম। উনি বললেন, কর্নেলসায়েবের নিশ্চয়ই এটা চোখে পড়েছে। উনি পীতাম্বর রায়ের ঠিকানায় খোঁজ নেবেন।

—নিয়েছি। সে এই রায়গড়ের লোক। তাছাড়া আপনি শুনলে আরও অবাক হবেন, তার নাম উপেন দত্ত, যে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে মারা পড়েছে!

কুমুদবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

কর্নেল ঘরের ভেতরটা চোখ বুলিয়ে দেখে বললেন,—আমার ধারণা, এটাই দীপুর পড়ার ঘর!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এক মিনিট। আমি আসছি।

বলে কুমুদবাবু ভেতরে চলে গেলেন। ঘরের একধারে একটা ছোটো তক্তপোশে বিছানার ওপর বেডকভার চাপানো আছে। তার পাশে দেওয়াল ঘেঁসে এবং চেয়ার। টেবিলের ওপর পড়ার বই এবং খাতাপত্র সাজানো। টেবিলসংলগ্ন দেওয়ালে কাঠের র‍্যাক। চারটে র‍্যাকে বই ঠাসা আছে। কর্নেল উঠে গিয়ে সেই র‍্যাকের নতুন ও পুরনো বই দেখতে থাকলেন। বললেন,—নানা বিষয়ের বই পড়ত দীপু। বিজ্ঞান আর ইতিহাসের বই-ই বেশি। খেলাসংক্রান্ত বইও দেখছি।

বলে কর্নেল খেলাসংক্রান্ত একটা বই টেনে নিলেন। পাতা উলটে দেখতে থাকলেন। সেটা দেখার পর আর-একটা খেলার বই টেনে বের করলেন। তারপর লক্ষ করলুম, এই বইটার ভেতর থেকে কর্নেল একটুকরো কাগজ বের করে জ্যাকেটের ভেতর চালান করলেন।

সেই সময় কুমুদবাবু এসে গেলেন। বললেন,—দীপুর খেলাধুলোয় যেমন, তেমনই নানারকম বই পড়ার আগ্রহ ছিল।

কর্নেল বইটা র‍্যাকে ঢুকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। তা-ই দেখছিলুম।

একজন ফ্রক পরা কিশোরী চায়ের ট্রে রেখে গেল। কুমুদবাবু বললেন,—গরিব মানুষ। আপনার সেবাযত্ন করার ক্ষমতা নেই। নেহাত চা-বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করছি।

কর্নেল বললেন,—আমরা এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। আপনার অ্যাপায়নের দরকার নেই। অবশ্য চা খেতে আপত্তি নেই। কফির পর চা খেতে মন্দ লাগে না।

সুরেনকে কুমুদবাবু চায়ের কাপ-প্লেট নিজের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—সুরেন দীপুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দীপু নিখোঁজ হওয়ার পর দীপুর বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র সুরেনই খুব ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে।

চা খেতে-খেতে কর্নেল বললেন,—আপনি তো স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তার আগে আপনি রায়গড় রাজবাড়ির পারিবারিক লাইব্রেরি দেখাশুনা করতেন শুনেছি?

কুমুদবাবু কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে বললেন,—একটা কথা আপনাকে কেষ্ট অধিকারীর সামনে বলার সুযোগ পাইনি। সুরেনের সামনে বলা যায়। রাজবাড়ির লাইব্রেরিতে একখানা সংস্কৃত ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ছিল। কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায় সেই পাণ্ডুলিপির অনুবাদ করতে বলেছিলেন আমাকে। পাণ্ডুলিপিটা আমি দেখেছিলুম। কিন্তু কদিন পরে গিয়ে শুনি, ওটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

কুমুদবাবু চুপ করলেন। তাঁকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তারপর?

কুমুদবাবু আরও চাপাস্বরে বললেন,—আমার সন্দেহ হয়েছিল, রাজবাড়ির এক কর্মচারী মাখন দত্ত রাজবাড়ির অনেক জিনিস চুরি করে তার ভাই উপেন দত্তের সাহায্যে বিক্রি করত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাখনই পাণ্ডুলিপি চুরি করেছিল। মাখনকে কুমারবাহাদুর বিশ্বাস করতেন। আমার সামনেই তাকে উনি বলেছিলেন, ওতে তাঁর পূর্বপুরুষের একটা গোপন কাহিনি আছে। মোগল বাদশাহ আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ নাকি তাঁর পূর্বপুরুষকে একটা আশ্চর্য জিনিস উপহার দিয়েছিলেন। তার ভেতরে ছিল অমূল্য কী একটা রত্ন। কিন্তু কীভাবে সেই জিনিস খুলে রত্নটা বের করতে হয়, তা মানসিংহ বলেননি। তিনি বলেছিলেন, নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে অঙ্ক কষে রত্নটা বের করে নেবেন।

—তারপর?

—মানসিংহের সেই উপহার কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল, রাজবংশের কেউ তার হদিশ পাননি। শুধু পাণ্ডুলিপিতে হয়তো তার হদিশ ছিল। আমি খুঁটিয়ে পড়ার সুযোগ পাইনি। হাতের লেখা। তার ওপর নাগরি লিপি। তবে একটা শ্লোকে চোখ বুলিয়ে দেখেছিলুম একটা জটিল অঙ্কের কথা আছে। অঙ্কটা অদ্ভুত।

—আপনার কি মনে আছে অঙ্কটা?

—হ্যাঁ। এক থেকে পনেরো পর্যন্ত পনেরোটি সংখ্যা চার সারিতে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে ওপরে, নিচে এবং দুধারে যোগ করলে যোগফল হবে বত্রিশ।

কর্নেল হাসলেন,—হ্যাঁ। বত্রিশের ধাঁধা! তা আপনি কি দীপুকে অঙ্কটার কথা বলেছিলেন?

—বলেছিলুম। দীপু অঙ্কে খুব পাকা।

—কবে বলেছিলেন?

—যখন শ্লোকটা পড়ি, তখন দীপুর জন্মই হয়নি। কিন্তু অঙ্কটা আমার মনে ছিল! গত পুজোর সময় একদিন উপেন দত্ত আমার বাড়িতে এসেছিল। সে দীপুর খোঁজ করছিল। দীপুকে সে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। পরে দীপু নিখোঁজ হলে উপেনের ওপর আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ছেলে দীপু; উপেন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বলেছিল, আমাকে জানায়নি। উপেন তাকে কলকাতা থেকে অনেকগুলো বই কিনে এনে উপহার দিয়েছিল। তাই আমি ভেবেছিলুম, দীপুর যেসব বই পড়ার ইচ্ছে, তা আমি কিনে দিতে পারি না। তাই দীপু হয়তো উপেনকাকুকে সেইসব বইয়ের কথা বলেছিল। দীপু উপেন দত্তকে উপেনকাকু বলত। কিন্তু তারপর দীপু কেন যেন উপেনকে এড়িয়ে চলত। বলত, লোকটা ভালো নয়।

—উপেনের সঙ্গে মিঃ অধিকারীর সম্পর্কে কেমন ছিল?

কুমুদবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—উপেন কলকাতায় ব্যবসা করত শুনেছি। তবে চোরাই মালের কারবারি বলে এখানে তার বদনাম ছিল। কেষ্টবাবুর সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তাহলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনে দীপুর ছবি দেখে আপনি অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু পীতাম্বর রায় যে উপেন দত্ত, তা বুঝতে পারেননি?

—আজ্ঞে না। কেষ্ট অধিকারীও পারেনি। তবে আমাদের দুজনেরই সন্দেহ হয়েছিল, দীপুকে সে অপহরণ করেছিল, দীপু যে-ভাবে হোক তার হাত থেকে পালিয়েছে। কিন্তু সে বাড়ি ফিরল না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আমার অঙ্কটা এবার বলি। দীপু যার সাহায্যে উপেনের হাত থেকে পালিয়েছিল, সম্ভবত তার হাতেই আবার বন্দি হয়েছে। আপনার কাছে পাঠানো উড়ো চিঠি থেকে বোঝা যায়, দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার সমাধান করেছিল। কিন্তু তা উপেন দত্তকে দিতে চায়নি বলেই কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার খোঁজ দেয়নি। সে নিশ্চয়ই বলেছিল, তার খাতাপত্রের ভেতর কোথাও ওটা আছে।

—কিন্তু আমি তন্নতন্ন খুঁজেও তা পাইনি।

এইসময় বাইরে কেউ ডাকল,—কুমুদ! কুমুদ! ওহে ভট্টাচার্য!

কুমুদবাবু উঁকি মেরে দেখে আস্তে বললেন,—কেষ্ট অধিকারী এসেছেন।

কৃষ্ণকান্ত অধিকারী ঘরে ঢুকে কর্নেলকে দেখে বললেন,—কর্নেলসায়েবের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তিনি নতুন ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন, সেই খবর একটু আগে পেলুম। তাই ভাবলুম, কুমুদকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যাব।

কর্নেল বললেন,—মিঃ অধিকারী! এখান থেকে এবার আপনার বাড়িতে যেতুম।

সাত

কুমুদবাবুর বাড়ির পিছনদিকে একটা গলিরাস্তায় কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। কুমুদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সেই গাড়িতে গিয়ে চাপলুম। সুরেন বেচারা মনমরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল তাকে বললেন,—তুমি বরং বাংলোয় গিয়ে খুড়োর রান্নাবান্নায় সাহায্য করো!

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পুরনো বসতি এলাকা ছাড়িয়ে নতুন টাউনশিপে পৌঁছলুম। কথাপ্রসঙ্গে মিঃ অধিকারী বললেন,—কুমুদ ভট্টাচার্যের পাড়ায় একজনের বাড়ি গিয়েছিলুম। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্ত নামে একটা লোক নাকি ভালুকের কামড়ে মারা পড়েছে। উপেনের সঙ্গে আমাদের একটুখানি কারবারি সম্পর্কে ছিল। লোকটা বজ্জাত ছিল ঠিকই। তবে দালাল হিসেবে ব্যবসাবাণিজ্যে তার বুদ্ধি ছিল প্রখর। তার দাদা মাখন দত্ত জমিদারবাড়ির কর্মচারী ছিল। নগেনই আমাকে ডেকেছিল। নগেন এখন চলাফেরা করতে পারে না। তাই আমি ওর বাড়ি গিয়েছিলুম। সেইসময় মাখনের ভাগনে বিজয় বলল, কুমুদমাস্টারের বাড়িতে একজন দাড়িওয়ালা সায়েব এসেছেন!

মিঃ অধিকারী হাসতে-হাসতে বললেন—অমনি বুঝলুম আপনি এসেছেন। এদিকে বনদফতরের রেঞ্জার অমল চ্যাটার্জির সঙ্গে সকালে বাজারে দেখা হয়েছিল। সে কথায়-কথায় আপনাদের খবর দিল। অমল আমার এক বন্ধুর ছেলে। দুর্গাপুরের ওদিকে থাকত। সম্প্রতি এখানে বদলি হয়ে এসেছে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—মাখনবাবু কি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে আপনাকে ডেকেছিলেন?

মিঃ অধিকারী গাড়ির স্পিড কমিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। মাখনের সন্দেহ, তার ভাইকে কেউ খুন করে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসেছিল। আমি যেন পুলিশকে একটু বলে দিই। কিন্তু উপেন পুলিশ রেকর্ডে দাগি স্মাগলার। কিছু করা যাবে না।

—আচ্ছা মিঃ অধিকারী, আপনি কি গোবিন্দ নামে কাকেও চেনেন?

মিঃ অধিকারী হাসলেন—কুমুদ গোবিন্দের কথা বলছিল বুঝি?

—নাঃ! আমি আদিবাসী বস্তির একজনের কাছে শুনেছি, গোবিন্দ নামে উপেনবাবুর এক শাগরেদ ছিল। সে নাকি কলকাতা থেকে রায়গড়ে ফিরে এসেছে।

একটু পরে মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। গোবিন্দটা যেমনই গোঁয়ার, তেমনই দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছোকরা। এখানে বজ্জাতি করে বেড়াত বলে ব্যবসায়ীরা ওর পিছনে পুলিশ লাগিয়েছিল। গোবিন্দ কলকাতায় গিয়ে উপেনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গোবিন্দ ফিরে এসেছে, সে-খবর মাখনবাবুর কাছে পেয়েছি। সত্যি বলতে কী, আমি একটু উদ্বিগ্ন হঠে উঠেছি। গোবিন্দ রায়গড়ের দুর্বৃত্তদের লিডার হয়ে উঠতে পারে।

মিঃ অধিকারীর দোতলা বিশাল বাড়ি দেখে বুঝলুম, তিনি বনেদি ধনী পরিবারের বংশধর। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা অনেকটা জায়গার ওপর পুরনো বাড়ির চেহারা একেলে করা হয়েছে। রংবেরঙের ফুলের বাগান এবং কেয়ারিকরা নানারকম দেশি বিদেশি গাছ চোখে পড়ল। নুড়িবিছানো লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় দাঁড়াল।

মিঃ অধিকারী আমাদের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরটা আধুনিক আসবাবে সাজানো। নানা দেশের সুন্দর সব ভাস্কর্য, প্রকাণ্ড ফ্লাওয়ার ভাস ইত্যাদি শিল্পদ্রব্য দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক ব্যবসায়ী হলেও রুচিশীল। এমন মানুষের সঙ্গে উপেন দত্তের সম্পর্ক যেন মানায় না।

তিনি একটা লোককে আমাদের জন্য কফি আনতে বলে মুখোমুখি বসলেন। প্রশস্ত ঘরটার মেঝে পুরোটা চিত্রবিচিত্র এবং নরম কার্পেটে ঢাকা। কর্নেল বললেন,—ঘরটা নতুন করে সাজিয়েছেন দেখছি!

মিঃ অধিকারী বললেন,—হ্যাঁ। আমার ছেলে তীর্থঙ্কর আমেরিকার নিউজার্সি এলাকায় থাকে। সে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট আর কম্পিউটার ট্রেনিং কোর্স শেষ করে পুজোর আগে ফিরবে। কী আর বলব বলুন? তীর্থঙ্কর ওখানে একটি মার্কিন মেয়েকে বিয়ে করেছে। বউমা ইতিমধ্যে বাংলা শিখে নিয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। —ভালোই তো।

দুজনে এইসব নিয়ে কথা বলতে থাকলেন। আমার মনে হচ্ছিল, কেন কর্নেল কোনও অছিলায় প্রত্নতত্ত্ববিদ ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের কথা তুলছেন না? মিঃ অধিকারীর সঙ্গে গতকাল সকালে তো দুর্গের ধ্বংসস্তূপে ডঃ চট্টরাজকে কর্নেল দেখতে পেয়েছিলেন।

সেই লোকটা ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস এনে বলল,—এখনই একবার ওপরে চলুন আজ্ঞে! আসানসোল থেকে বাচ্চুবাবুর টেলিফোন এসেছে! গিন্নিমা আমাকে বললেন।

কথাটা শুনেই মিঃ অধিকারী হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে চলে গেলেন। সেইসময় কর্নেল লোকটিকে জিগ্যেস করলেন,—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, আমার নাম ভুজঙ্গ।

—তোমাদের বাড়িতে কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি কি চলে গেছেন?

আজ্ঞে কলকাতা থেকে তো কেউ এ বাড়িতে আসেননি! —বলেই সে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

—আজ্ঞে, কাল এক ভদ্রলোক কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তারপর কর্তাবাবু তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, তিনি উঠেছেন নদীর ধারে সরকারি ডাকবাংলোতে। কলকাতারই লোক বটে।

কর্নেল পকেট থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন,—তোমার কর্তাবাবুকে যেন এসব কথা বলো না। মুখটি বুজে থাকবে। কেমন?

ভুজঙ্গ প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে চাপাস্বরে বলল,—আজ্ঞে! কী বলব সার আপনাকে? আমার কর্তাবাবু হাড়কেপ্পন লোক। মাসে খোরাকি আর পঁচিশ টাকা মাইনে।

—তোমার বাড়ি কি রায়গড়েই?

—না সার! মদনপুরে আমার বাড়ি। মাস ছয়েক হল, এ বাড়িতে কাজে লেগেছি। শিগগির এ কাজ ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচি। সার! কলকাতায় আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দেবেন?

—দেখব। তুমি গোপনে বনবাংলোয় আমার সঙ্গে সময়মতো দেখা করো!

লোকটা কৃতার্থ হয়ে সেলাম করে চলে গেল। বললুম,—আপনি কী করে বুঝলেন ভুজঙ্গকে ঘুষ খাইয়ে ডঃ চট্টরাজের খবর পাওয়া যাবে? ও যদি মুখ ফসকে মিঃ অধিকারীকে—

কর্নেল আমাকে থামিয়ে মুচকি হেসে বললেন,—অবজারভেশন জয়ন্ত! পর্যবেক্ষণ! এমন একটা অভিজাত বাড়িতে অতিথির জন্য যে ট্রে নিয়ে আসছে, তার ট্রে আনার ভঙ্গি এবং মুখের হাবভাব দেখেই অনুমান করা যায়, পরিচারক এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত, না অনভ্যস্ত! এ সব পরিবারের কাজের লোকেরা স্মার্ট হয়। ভুজঙ্গকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, সে নেহাত গ্রাম্য লোক এবং এখনও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি।

বলে কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আমার কফি পানের ইচ্ছা দিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও পেয়ালা হাতে নিতে হল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ অধিকারী ব্যস্তভাবে ফিরে এসে বললেন,—আমি দুঃখিত কর্নেলসায়েব! আসানসোল হেড অফিস থেকে আর্জেন্ট কল এসেছে। আমাকে এখনই গাড়ি নিয়ে ছুটতে হবে। সম্ভবত কাল সকালে ফিরে আসব। না, না। আপনারা কফি শেষ করে নিন। আমি রেডি হয়ে আসি। আপনাদের আমি বনবাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে যাব।

কর্নেল বললেন,—আমাদের জন্য ভাববেন না। তিনবছর পরে রায়গড়ে এলুম। একটু ঘোরাঘুরি করতে চাই।

আমরা শিগগির কফির পেয়ালা হাত থেকে নামিয়ে রাখলুম। ভুজঙ্গ হাসিমুখে এসে ট্রে নিয়ে গেল। তারপর মিঃ অধিকারী টাই-সুট পরে ব্রিফকেস হাতে বেরিয়ে এলেন। আমরা দুজনে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে গেট পেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল উলটোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম, মিঃ অধিকারীর অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা সবেগে বেরিয়ে গেল।

নিউ টাউনশিপ এলাকা পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেকটি একতলা বা দোতলা বাড়ির সামনে পিছনে ফুল-ফলের গাছ। হাঁটতে-হাঁটতে একটা চৌরাস্তার কেন্দ্রে বসানো উঁচু বেদির ওপর নেতাজির প্রতিমূর্তির কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন,—একটা সাইকেলরিকশো পেলে ভালো হতো।

জিগ্যেস করলুম,—কোথায় যাবেন?

—ডাকবাংলোয়।

—সর্বনাশ! ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করবেন নাকি?

কর্নেল হাসলেন,—সর্বনাশ কীসের? তিনি যদি রায়গড়ে বেড়াতে আসতে পারেন, আমরাও কি আসতে পারি না? উনি তো জানেন রায়গড় আমার প্রিয় ঐতিহাসিক জায়গা!

চৌরাস্তা থেকে বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে একটা খালি সাইকেলরিকশো পাওয়া গেল। কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন,—ডাকবাংলো চলো!

নিউ টাউনশিপ এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে রাস্তা ডাইনে বাঁক নিয়েছে। এবার বাঁদিকে সেই শীর্ণ নদীর অন্য রূপ চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে ভাঙন রোধের জন্য গাছপালা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

সমান্তরালে জলভরা ছোটো নদী বয়ে চলেছে। তারপর সরকারি ডাকবাংলো চোখে পড়ল। একতলা সেকেলে বাংলোর ভোল ফেরানো হয়েছে। রঙিন টালির চাল এবং চারদিকে বারান্দা। লনের দুপাশে ফুলবাগিচা আর দেশি বিদেশি বিচিত্র সব কেয়ারিকরা গাছ।

কর্নেল রিকশোওয়ালাকে বললেন,—তুমি একটু অপেক্ষা করো। আমরা এখনই আসছি।

বাঁদিকে সবুজ ঘাসের ওপর একটা বেতের চেয়ারে সম্ভবত কোনও হোমরাচোমরা সরকারি অফিসার বসে রোদের আরাম নিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের একবার তাকিয়ে দেখলেন মাত্র। বারান্দার সিঁড়ির ওপর উর্দিপরা একটা লোক বসে ছিল। সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল।

কর্নেল বললেন,—ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই। তুমি তাঁকে খবর দাও।

লোকটা বলল,—ওই নামে কেউ বাংলোয় নেই সার!

—তাহলে আমার শুনতে ভুল হয়েছে। এক ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসেছেন। ফর্সা, লম্বা, মুখে—মানে চিবুকে কাঁচাপাকা দাড়ি। চোখে চশমা...

—বুঝেছি সার! আপনি কেষ্ট অধিকারীমশাইয়ের বন্ধুর কথা বলছেন?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিক ধরেছ।

—সার! উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন। রিকশো ডেকে দিলুম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে মুখে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! আমার সঙ্গে ওঁর দেখা করার কথা চিল! হঠাৎ কেন চলে গেলেন?

লোকটা বলল,—ওঁকে অধিকারীমশাই টেলিফোন করেছিলেন। তাই চলে গেলেন।

—আর ফিরে আসবেন না বলে গেছেন নাকি?

—হ্যাঁ সার।

—ওঁর নামটা ভুলে যাচ্ছি। ট্রেনে আসবার সময় আলাপ হয়েছিল। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজ, না...

—সার! চট্টরাজ নয়। চ্যাটার্জি সায়েব। ডি. চ্যাটার্জি। বড়ো সরকারি অফিসার।

—ঠিক বলেছ!

বলে কর্নেল চলে এলেন। সাইকেলরিকশোতে চেপে বললুম,—বড্ড গোলমেলে ঘটনা কর্নেল!

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—মিঃ অধিকারী দেখছি গভীর জলের মাছ। কলকাতায় কুমারবাহাদুরের কথা শোনার পরই তাঁর সম্পর্কে আমার সন্দেহ জেগেছিল। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, কুমুদবাবুকে সঙ্গে নিয়ে উনি যখন আমার কাছে যান, তখন উনি দীপুর অন্তর্ধানরহস্যের মূল কারণটা জানতেন না। সম্ভবত পীতাম্বর রায় অর্থাৎ উপেন দত্ত এখানে এসে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর উপেন সম্ভবত মিঃ অধিকারীর কথায় হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে পুঁতে রাখা প্রাচীন রত্নকোষ—হ্যাঁ, জিনিসটাকে প্রাচীন যুগে রত্নকোষ বলা হতো—

ওঁর কথার ওপর বললুম,—ঠিক বলেছেন। মিঃ অধিকারীই হয়তো রত্নকোষ বিনা পয়সায় বাগিয়ে নেওয়ার জন্য জঙ্গলের ভেতর উপেনকে খুন করেছেন।

রিকশোওয়ালার দিকে ইশারা করে কর্নেল আস্তে বললেন,—চুপ! এখন কোনও কথা নয়।

কিছুক্ষণ পরে রিকশোওয়ালা জিগ্যেস করল—আপনারা কি চৌরাস্তার কাছে নামবেন সার?

কর্নেল বললেন,—না। তুমি হাইওয়েতে চলো। রংলিডিহির মোড়ে আমরা নামব।

রংলিডিহি নাখুলালদের বস্তির নাম, তা ভুলে গিয়েছিলুম। হাইওয়ে ওই আদিবাসী বস্তির প্রান্তে ধনুকের মতো বেঁকে আবার সোজা দক্ষিণে চলে গেছে। বাঁকের মুখে নেমে রাঙামাটির এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হেঁটে বনবাংলোয় পৌঁছুতে মিনিট পনেরো লাগল। রাস্তাটা জঙ্গলের ভেতর

দিয়ে চড়াইয়ে উঠেছে। বাংলোর গেটের কাছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—জঙ্গলে কী একটা জানোয়ার আছে। আমি ফায়ার করার সুযোগ পাই নাই। নাখুলালের মুখে যা শুনছি তা মিথ্যা না।

কর্নেল বললেন,—একটা পনেরো বাজে। স্নান করেননি কেন?

হালদারমশাই বললেন,—যা ঘটছে, স্নানের কথা মাথায় ছিল না। চলেন। সব কইতাছি।

আমাদের ঘরের তালা খুললেন কর্নেল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের জানালা আমিই খুলে দিলুম। নাখুলাল এসে সেলাম দিয়ে বলল,—সুরেন আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে বাড়ি গেল। খেয়েদেয়ে আসবে। আপনারা কখন যাবেন সার?

কর্নেল বললেন,—দেড়টায়। এখন সওয়া একটা বাজে।

নাখুলাল চলে গেলে হালদারমশাই যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তিনি নাখুলালের সঙ্গে গল্প করতে-করতে বাংলোর পিছনে গিয়েছিলেন। তার মুখে জঙ্গলের হাড়মটমটিয়া নামে অদ্ভুত জন্তুর কথা শোনেন। তারপর উপেন দত্তের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ যেখানে পড়েছিল, তিনি খুঁজতে-খুঁজতে সেখানে যান। তারপর হঠাৎ তাঁর বাঁদিকে ঘন ঝোপের ভেতর মটমট করে শুকনো ডাল ভাঙার মতো শব্দ শুনতে পান। অমনই তিনি রিভলভার বের করে সেদিকে সাবধানে এগিয়ে যান। কী একটা কালো ভালুকের মতো জন্তুকে আবছা দেখামাত্র তিনি রিভলভার তাক করেন। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, জন্তুটা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাহস করে ঝোপের কাছে গিয়ে তিনি অনেক কালো লোম দেখতে পান। জন্তুটা যে ভালুক নয়, তার কারণ বুনোভালুক মানুষ দেখামাত্র তেড়ে আসে। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, সে অদৃশ্য হল কেন? পিছনের জঙ্গল আরও ঘন। সেখানে একটা বিড়াল গলে যাওয়ার উপায় নেই।

শোনার পর কর্নেল বললেন,—ওসব নিয়ে ভাববেন না। আর জঙ্গলেও যেন একা যাবেন না। লাঞ্চ খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসব।

খাওয়ার পর অভ্যাসমতো আমি কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাতঘুমের চেষ্টায় ছিলুম। কর্নেল এবং হালদারমশাই খোলামেলা জায়গায় ঘাসের ওপর দুটো চেয়ারে মুখোমুখি বসে চাপাস্বরে কথা বলছিলেন। বুঝতে পেরেছিলুম, কর্নেল এবার গোয়েন্দাপ্রবরকে পুরো ঘটনা ব্যাকগ্রাউন্ডসমেত জানাতে চান।

কতক্ষণ পরে আমার ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গিয়েছিল কর্নেলের ডাকে। শীতের রোদ ফিকে সোনালি হয়ে উঠেছে। চারটে বেজে গেছে। আমি উঠে বসলে কর্নেল বললেন,—শিগগির তৈরি হয়ে নাও। সঙ্গে তোমার ফায়ার আর্মস নেবে।

বললুম,—এসময় এক পেয়ালা চা বা কফি খেলে শরীরটা চাঙ্গা হতো।

কর্নেল হাসলেন,—ওই দ্যাখো, টেবিলে প্লেট ঢাকা দেওয়া তোমার চায়ের কাপ। আমি আর হালদারমশাই কফি খেয়ে নিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—হালদারমশাইও যাচ্ছেন তো?

—উনি কিছুক্ষণ আগে চলে গেছেন।

—ওঁকে কোথায় পাঠালেন?

—আসানসোলে মিঃ অধিকারীর হেডঅফিসে। সেখানে ওঁর একটা বাড়িও আছে। সুরেন হালদারমশাইকে রংলিডিহির মোড়ে বাসে তুলে দেবে। ঘণ্টাতিন সময় লাগবে।

—ওঁকে আসানসোলে পাঠালেন কেন?

কর্নেল পিঠে তাঁর কিটব্যাগ এঁটে গলা থেকে বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা ঝুলিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। চোখ কটমটিয়ে ধমক দিলেন,—নো কেন! চা গিলে শিগগির তৈরি হও। অত কেন-কেন কেন?

আমি সত্যিই চা গিলে ফেলে তৈরি হয়ে নিলুম। এবার কর্নেল সহাস্যে বললেন,—বাঃ! এই তো চাই।

কর্নেল জানালা বন্ধ করে তালা এঁটে নাখুলালকে বললেন,—বেরুচ্ছি নাখুলাল!

নাখুলাল কালকের মতো মালির সঙ্গে গল্প করছিল। সেলাম দিয়ে বলল,—কখন ফিরবেন সার?

—যদি একটু রাতও হয়, তুমি চিন্তা করো না।

কর্নেল বাংলো থেকে নেমে রাঙামাটির সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—কর্নেল! আপনি আজ অবিকল এক মন্ত্রীমশাইয়ের মতো বলছিলেন, অত কেন-কেন কেন? অবশ্য তারপরও তিনি আমাদের সাংবাদিক দলটিকে ভেংচি কেটে বলেছিলেন, খালি কেনর ক্যানেস্তারা!

কর্নেল বললেন,—তোমার নার্ভ চাঙ্গা হয়ে গেছে। এবার শোনা! রংলিডিহির মোড়ে সুরেন হালদারমশাইকে বাসে তুলে দিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে আমরা যাব মাখন দত্তের বাড়ি।

—উপেন দত্তের দাদা মাখন দত্ত। তাই না?

—তোমার কিছু মনে থাকে না। যাই হোক, তুমি ওখানে যাচ্ছ সাংবাদিক পরিচয়ে, যা তোমার প্রকৃত পরিচয়। উপেন দত্তের মৃত্যু সম্পর্কে খবর সংগ্রহের জন্য তুমি কলকাতা থেকে এসেছ। বুঝেছ তো? এবার পরে কথাটা মন দিয়ে শোনা। এ ছাড়া কুমুদবাবুর ছেলে দীপুর জঙ্গলে নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে তুমি সকালে কুমুদবাবুর বাড়ি গিয়ে সব খব নিয়েছ। কেমন?

—বুঝেছি।

—তুমি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবে। সান্ত্বনা দেবে। সরকারি সাহায্যের জন্য দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখবে—একথাও বলবে। মাখনবাবুর সঙ্গে কথা বলা সময় তাঁর দেখা রায়গড় রাজবাড়ি এবং রাজলাইব্রেরির কথাও তুলবে। তারপর মওকা বুঝলে সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটার—

কর্নেলের কথা শেষ হল না। অতর্কিতে সংকীর্ণ এবং এবড়োখেবড়ো রাস্তার বাঁদিকের ঘন ঝোপ থেকে কেউ কর্নেলের দিকে প্রায় ঝাঁপ দিল। আমি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। তারপর দেখলুম, কর্নেল আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আততায়ীর তলপেটে স-বুট লাথি মারার সঙ্গে-সঙ্গে সে আর্তনাদ করে ধরাশায়ী হল। কর্নেল তার পিঠের ওপর দমাস করে বসে রিভলভার বের করে তার কানের পাশে ঠেকিয়ে বললেন,—ট্রিগার টানলেই কী হবে তুমি বুঝতে পারছ তো?

এতক্ষণে দেখতে পেলুম, তার হাতের ছোরাটা ছিটকে পড়েছে। ছোরাটার ফলা প্রায় ছ'ইঞ্চি। ওটা কুড়িয়ে নিলুম। এবার আমার হাতে রিভলভার।

কর্নেলের মতো প্রকাণ্ড এবং ওজনদার মানুষ তার পিঠে বসেছিলেন এবং তার ফলে তার মুখটা মাটিতে ধাক্কা খেয়ে নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল। কর্নেল এবার তার দু'হাত পিছনে টেনে আমাকে বললেন,—আমার ব্যাগে দড়ি আছে। শিগগির বের করে দাও।

কর্নেলের পিঠে আঁটা ব্যাগের চেন টেনে নাইলনের শক্ত দড়ি বের করে দিলুম। আমি জানি, এই ব্যাগে স্ক্রু-ডাইভার থেকে শুরু করে সবরকমের জিনিস ভরা থাকে। কর্নেল দড়িতে আততায়ীর হাতদুটো পিঠমোড়া করে বেঁধে ওর পিঠ থেকে নামলেন। তারপর চুল খামচে ধরে তাকে দাঁড় করালেন। রক্তাক্ত মুখে সে হাঁফাচ্ছিল। কর্নেল তার পাঁজরে একটা ঘুঁসি মেরে বললেন,—তোর নাম গোবিন্দ। তাই না?

আততায়ী বয়সে তরুণ। এখনও রক্তাক্ত মুখে তাকে বীভৎস দেখাচ্ছিল। সে কোনও কথা বলল না। কর্নেল মুচকি হেসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—চলো! এই শয়তানটাকে জঙ্গলের ভেতর একটা গাছে বেঁধে রেখে আসি। হাড়মটমটিয়া খুবলে-খুবলে এর মাংস খাবে।

কর্নেল এই বলে তাকে টেনে বাঁদিকে জঙ্গলে ঢোকানোর ভঙ্গি করতেই সে বিকট ভাঙা গলায় কেঁদে উঠল,—আর এমন করব না সার। আমি টাকার লোভে—ও হো হো! বাবা গো!

কর্নেল বললেন,—আগে বল তোর নাম গোবিন্দ? মিথ্যা বললে তোকে গাছে বেঁধে রেখে আসব।

সে গোঙানো গলায় বলল,—হ্যাঁ সার। আমি গোবিন্দ।

কে তোকে টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে খুন করতে বলেছে?—বলে কর্নেল তার চুল ওপড়ানোর মতো সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন।

গোবিন্দ হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—কেষ্টবাবু সার! আজ আসানসোল যাওয়ার সময় আমাকে বলেছিল, দাড়িওলা সায়েবকে খুন করলে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে।

কর্নেল আবার তার চুলে টান দিয়ে বললেন,—কুমুদবাবুর ছেলে দীপু কোথায়?

—মা কালীর দিব্যি, জানি না সার! উপেনদা তাকে কলকাতায় একজনের বাড়িতে রেখেছিল। দীপু সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

এই সময় একদল আদিবাসী মজুর হাঁটাপথে রায়গড় স্টেশন থেকে আসছিল। তারা এসে নিজেদের ভাষায় হইচই করতে থাকল। একজন বাংলায় বলল,—সায়েব! এর নাম গোবিন্দ গুন্ডা। পুলিশের তাড়া খেয়ে কলকাতা পালিয়েছিল। আমাদের বস্তিতে গিয়েও এই বজ্জাত গুন্ডা যাকে খুশি, খামোকা মারধর করে টাকা আদায় করত। এই গুন্ডাটা রংলিডিহিতে ঢুকলে আমাদের বউ-ঝিরা ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ত। একে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

বলে সে আদিবাসী ভাষায় কিছু বলল। দুজন দৌড়ে চলে গেল। কর্নেলের নির্দেশে ছোরাটা ভাঁজ করে গোবিন্দের প্যান্টের পকেটে ভরে দিলুম। কর্নেল আদিবাসীদের ঘটনাটা শোনালেন। একজন প্রৌঢ় আদিবাসী আচমকা গোবিন্দর পিঠে এক কিল মেরে নিজেদের ভাষায় কিছু বলল। বুঝলুম, অতীতে গোবিন্দ তার কোনও ক্ষতি করেছিল।

একটু পরে রংলিডিহি থেকে ধামসা আর কাঁসি বাজাতে-বাজাতে একদল লোককে আসতে দেখলুম। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! ওরা গোবিন্দকে হয়তো গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলবে। তার আগে তুমি আর আমি রিভলভার থেকে শূন্যে গুলি ছুড়ে ওদের থামানোর চেষ্টা করব।

এই কথা শুনে সেই আদিবাসী লোকটা বলল,—আমি এগিয়ে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে বলছি সার। তা না হলে রংলিডিহির লোকেরা গোবিন্দকে আস্ত রাখবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন।

কথাটা বলে সে এবং আরও দুজন লোক দু'হাত তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটে গেল।

আট

সবে আদিবাসী লোক তিনটি ছুটে গেছে এবং সামনে ধামসা-কাঁসি বাজানো রংলিডিহির ক্রুদ্ধ আদিবাসী জনতা গর্জন করতে-করতে তেড়ে আসছে, এই সময় পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় গোবিন্দের দিকে যেমন আমার, তেমনই কর্নেলের লক্ষ না থাকাই স্বাভাবিক ছিল। আর এই সুযোগে ওই অবস্থায় গোবিন্দ আচম্বিতে জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল।

এই আকস্মিক ঘটনার জন্য তৈরি ছিলুম না। শুধু চেঁচিয়ে উঠলুম,—ধরো! ধরো! পালিয়ে যাচ্ছে! পালিয়ে যাচ্ছে!

কর্নেল গোবিন্দকে ধরার জন্য পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আদিবাসী জনতাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছিল। তাদের একটা দল লাঠি-বল্লম-কাটারি হাতে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

এতক্ষণে কর্নেলের মুখে কথা ফুটল,—সর্বনাশ! গোবিন্দ ওই অবস্থায় হয়তো পালাতে পারবে না। লোকগুলো ওকে খুন করে ফেলবে!

ততক্ষণে ধামসা-কাঁসির বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে। আদিবাসী জনতা থমকে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে ঘুরে নিজেদের ভাষায় কী সব বলাবলি করছে। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তাদের বললেন, —তোমরা বরং কেউ শিগগির থানায় গিয়ে পুলিশকে খবর দাও। কী ঘটেছিল, সে-কথা আমি পুলিশকে বুঝিয়ে বলব।

একজন বলল,—সার! গোবিন্দকে পুলিশ ধরবে না। আমি আজই দেখেছি, গোবিন্দ কেষ্টবাবুর গাড়িতে চেপে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। কেষ্টবাবুকে পুলিশ খুব খাতির করে।

এই সময় দৌড়ুতে-দৌড়ুতে সুরেন এসে গেল। সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—পথে আসতে -আসতে সব শুনেছি সার! গোবিন্দ নাকি আপনাকে খুন করতে এসেছিল!

কর্নেল বললেন,—সুরেন! আমার এই নেমকার্ড নিয়ে এখনই তুমি রায়গড় থানায় চলে যাও। এখানে আসবার আগে আমি পুলিশের ডি. আই. জি. অরবিন্দ মুখার্জিকে টেলিফোনে খবর দিয়েছিলুম। উনি নিশ্চয়ই রায়গড় থানায় আমার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

বলে তিনি বুকপকেট থেকে নেমকার্ড বের করে সুরেনকে দিলেন। সুরেন সবে পা বাড়িয়েচে, এমনসময় জঙ্গল থেকে সেই সশস্ত্র লোকগুলি বেরিয়ে এল। তাদের একজন আদিবাসী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল। অমনই দেখলুম, চঞ্চল জনতা ছবিতে আঁকা মানুষের মতো নিস্পন্দ হয়ে গেল।

বললুম,—কী ব্যাপার সুরেন?

সুরেন চাপাস্বরে বলল,—বাবা হাড়মটমটিয়া গোবিন্দকে মেরে ফেলেছে।

কর্নেল চমকে উঠলেন,—সে কী! ওদের একজনকে ডাকো তো সুরেন! ব্যাপারটা শুনি।

সুরেনের ডাকে লাঠি হাতে বলিষ্ঠ গড়নের এক যুবক এগিয়ে এসে আমাদের সেলাম ঠুকে ভয়ার্ত মুখে বলল,—সার! গোবিন্দ বেশিদূর যেতে পারেনি। বাবা হাড়মটমটিয়া উপেন দত্তের মতোই তার চেলা গোবিন্দের মাথার খুলি আর মুখ থেকে বুক পর্যন্ত চিরে ফেলেছে। চিত হয়ে পড়ে আছে গুন্ডাটা।

তার এক সঙ্গী বলল,—শুনেছি, গোবিন্দ আপনাকে খুন করতে এসেছিল। আমাদের মনে হচ্ছে, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসবার সময় ঠাকুরবাবা তার পিছু নিয়েছিল। ঠাকুরবাবা পাপীদের শাস্তি দেন কিনা, তাই—

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—সুরেন! তুমি এদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে থানায় চলে যাও। পুলিশ তার সঙ্গে এসে গোবিন্দের অবস্থা দেখবে। শিগগির!

সুরেন সেই বলিষ্ঠ গড়নের যুবকটিকে ডেকে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেল। আদিবাসী জনতা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একে-একে চলে গেল। বুঝলুম, পুলিশকে তারা খুব ভয় করে। তাছাড়া পাছে পুলিশ তাদেরকে গোবিন্দের খুনি বলে পাকড়াও করে, তাই তারা দ্রুত কেটে পড়ল।

জঙ্গলে যারা গোবিন্দকে ধরতে ঢুকেছিল, তারাও চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—তোমরা চলে যেও না। তোমাদের ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং হাতের লাঠি-কাটারিগুলো অন্যদের হাতে দিয়ে তোমরা কয়েকজন আমাদের সঙ্গে এসো। গোবিন্দের লাশ আমি দেখতে চাই।

জনাতিনেক যুবক রাজি হল। অন্যেরা তাদের লাঠি-বল্লব-কাটারি নিয়ে বস্তির দিকে চলে গেল। শীতের সূর্য ততক্ষণে দূর দিগন্তে পাহাড়ের আড়ালে নেমে গেছে। কর্নেল আর আমার কাছে টর্চ ছিল। টর্চ বের করে ওদের অনুসরণ করলুম। জঙ্গলের ভেতরে এখনই আঁধার ঘনিয়েছে। এলোমেলো বাতাসে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে গাছপালায়। ঝোপঝাড় এড়িয়ে উঁচু গাছের তলা দিয়ে আলো ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছিলুম উত্তরে।

কিছুক্ষণ পরে যুবকেরা পশ্চিমে ঘুরল। তারপর খানিকটা খোলা ঘাসে ঢাকা জমিতে পৌঁছুলুম। সেই জমিটার শেষপ্রান্তে যেতেই আচম্বিতে শুকনো ডাল ভাঙার মতো মটমট শব্দ শোনা গেল। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে করজোড়ে ঝুঁকে প্রণাম করার পর বুকে ক্রস আঁকল। বুঝলুম, খ্রিস্টান হলেও এরা পূর্বপুরুষের ধর্মে বিশ্বাস ছাড়েনি। কিন্তু ওই মটমট শব্দ কীসের? শব্দটা আমাদের সামনে জঙ্গলের ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

ওরা এবার আঙুল বাড়িয়ে দুটো ঝোপের মধ্যিখানটা দেখাল। কর্নেল আর আমি এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। এ বড় বীভৎস দৃশ্য।

গোবিন্দ পিঠের দিকে দু'হাত বাঁধা অবস্থায় একটু কাত হয়ে পড়ে আছে। মাথা থেকে বুক পর্যন্ত চাপ-চাপ টাটকা রক্ত এখনও গড়াচ্ছে। তার গায়ের সোয়েটার ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে। কর্নেল একটুখানি দেখে নিয়েই মুখ ঘুরিয়ে সরে এলেন। গম্ভীরমুখে বললেন,—আমারই দোষ, জয়ন্ত! কখনও কারও গায়ে এ পর্যন্ত আমি হাত তুলিনি। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি অথবা সামরিক জীবনের কিছু কদর্য অভ্যাসবশে বেচারাকে আমি ঘুঁসি মেরেছিলুম। এখন আক্ষেপ হচ্ছে। এই হতভাগ্য যুবকটি আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আমি শুধু আত্মরক্ষা করে ওকে আটকে রাখতে পারতুম।

একজন আদিবাসী যুবক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল,—সার! পাপী তার শাস্তি পেয়েছে। এজন্য আপনার কোনও দোষ নেই। প্রভু যীশু বলেছেন, পাপের বেতন মৃত্যু।

আর-একজন কিছু বলতে যাচ্ছে, আচম্বিতে সেই অদ্ভুত গর্জন শোনা গেল। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ!

আদিবাসী যুবকেরা অমনি দিশেহারা হয়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল রিভলভার বের করে ব্যস্তভাবে বললেন,—জয়ন্ত! তৈরি থাকো! চারদিকে লক্ষ রাখো! কিন্তু সাবধান! আলো জ্বেলো না।

আমার রিভলভার হাতে ছিল এবং অন্য হাতে টর্চ। চারদিকে সতর্ক লক্ষ রাখলুম। আজ সন্ধ্যায় গর্জনটা থামছে না। গর্জনটা কোনদিক থেকে আসছে, বোঝাও যাচ্ছে না। চাপাস্বরে বললুম, —কর্নেল! কর্নেল! এক রাউন্ড ফায়ার করা যাক।

না।—বলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে ডানদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ টর্চের আলো ফেললেন। এক পলকের জন্য ভালুকের মতো কালো কী একটা জন্তুকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখলুম। ভালুকের মতো বলছি বটে; কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাতেই মনে হয়েছে, ওটা ভালুক নয়। শিম্পাঞ্জি কিংবা গরিলার মতো। কিন্তু এই জঙ্গলে শিম্পাঞ্জি বা গরিলা থাকা তো অসম্ভব ব্যাপার।

তবে সেই গর্জনটা থেমে গেছে কর্নেল আলো জ্বালবার পরই। কাজেই ওই অদ্ভুত প্রাণীটাই যে গর্জন করছিল, তাতে ভুল নেই।

এই সময় আমাকে অবাক করে কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললুম,—কী ব্যাপার? হাসছেন কেন?

কর্নেল ঘাসে বসে চুরুট ধরিয়ে তারপর বললেন,—বসো! পুলিশ যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণ বসে থেকে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

আমিও বসলুম। তবে অস্বস্তিটা গেল না। বারবার কর্নেলকে প্রশ্ন করেও তাঁর হঠাৎ অট্টহাসির কোনও উত্তর পেলুম না। কিছুক্ষণ পরে গাছপালার শীর্ষে চাঁদ দেখা গেল। বনভূমিতে জ্যোৎস্না ক্রমশ গা ছমছম করা অনুভূতির সঞ্চার করল। শীতের হাওয়ায় কাঁপন জাগল চারপাশের আলো-ছায়ায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সেই সাংঘাতিক অদ্ভুত প্রাণীটা যেন চারপাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে-কোনও সময় অতর্কিতে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগই দেবে না।

কতক্ষণ পরে আমরা যেদিক থেকে এসেছি, সেইদিকে জোরালো আলোর ঝলকানি দেখতে পেলুম। তারপর সুরেনের ডাক ভেসে এল,—কর্নেলসায়েব! কর্নেলসায়েব!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—সম্ভবত সুরেনের সঙ্গী জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছে না।

বলে তিনি টর্চের আলো জ্বেলে সংকেত দিতে থাকলেন। তারপর জোরালো সার্চলাইটের আলো ফেলতে-ফেলতে এসে গেল ওরা। একজন পুলিশ অফিসার কর্নেলকে স্যালুট ঠুকে বললেন,—আপনার খবর আমরা পেয়েছিলুম। আপনি ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন, সে-খবরও পেয়েছি। যাই হোক, কোথায় গোবিন্দ ব্যাটাচ্ছেলের লাশ?

কর্নেল বললেন,—আপনিই কি অফিসার ইন-চার্জ মিঃ তপেশ সান্যাল?

—হ্যাঁ সার!

কর্নেল তাঁকে গোবিন্দের ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখাতে নিয়ে গেলেন। একজন কনস্টেবল হ্যাজাগ এনেছিল। এতক্ষণে হ্যাজাগটা জ্বালাতে ব্যস্ত হল সে। রীতিমতো সশস্ত্র একটি পুলিশবাহিনী এসেছে। সবাই গোবিন্দের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাজাগটা জ্বলে ওঠার পর কনস্টেবলটি মৃতদেহের কাছে রাখল। পুলিশ অফিসার ছিলেন আরও দুজন। তাঁরা সার্চলাইটের আলোয় কাছাকাছি ঝোপঝাড় খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। সুরেন এবং তার সঙ্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি তাদের কাছে গেলুম। তখন সুরেন চাপাস্বরে বলল,—এর নাম ছকুয়া। পিটার ছকুলাল মুর্মু। একে জিগ্যেস করুন, কী দেখেছিল?

ছকুয়া আস্তে বলল,—সার! আমি ঠাকুরবাবাকে একটুখানি দেখেছি।

বললুম,—কেমন চেহারা ঠাকুরবাবার?

ছকুয়া বলল,—কালো। দুই হাত মাটিতে ঠেকে যাবে, এমন লম্বা। বড়-বড় নখ সার! গোবিন্দকে মেরে হয়তো রক্ত খেত। আমাদের দেখেই ভ্যানিশ হয়ে গেল।

বুঝলুম, যুবকটি শিক্ষিত। তাকে জিগ্যেস করলুম,—তুমি কি আর কখনও ঠাকুরবাবাকে দেখেছ?

ছকুয়া বলল,—না সার! তবে একবার আমার বাবা লুকিয়ে এই জঙ্গেলে গাছের ডালে কাটাতে এসেছিল। বাবা গাছের ওপর থেকে দেখেছিল, ঝোপের আড়ালে ঠাকুরবাবা বসে আছে। আর কী আশ্চর্য সার, বাবা কেন মিথ্যা বলবে?

—আশ্চর্যটা কী?

ছকুয়া ফিসফিস করে বলল,—বাবা দেখেছিল, কেষ্টবাবু বন্দুক কাঁধে ঠাকুরবাবার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—সে কী! কেষ্টবাবুকে ঠাকুরবাবা মেরে ফেলেনি?

—সেটাই তো বাবা বুঝতে পারেনি। একটু পরে কেষ্টবাবু চলে গেল। তখন বাবা গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গিয়েছিল। কথাটা বাবা কাকেও বলতে বারণ করেছিল। কিন্তু আজ কথায়-কথায় সুরেনকে বলেছি। সুরেন বলল, কথাটা আপনাকে আর কর্নেলকে যেন বলি।

সুরেন বলল,—আমার মনে হচ্ছে, ওটা কোনও সাংঘাতিক জন্তু। কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু।

বললুম,—ঠিক বলেছে!

এইসময় দেখলুম, আবার জোরাল স্পটলাইট জ্বেলে কারা আসছে। সুরেন বলল,—হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচার নিয়ে আসছে ওরা। বডি তুলে নিয়ে যাবে। সঙ্গে আর্মড ফোর্সও আছে। ওই দেখুন।

কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দের মৃতদেহ স্ট্রেচারে তুলে হাসপাতালের কর্মীরা আর সশস্ত্র পুলিশদলটি চলে যাওয়ার পর অফিসার-ইন-চার্জ তপেশ সান্যাল বললেন,—এখানে আর আমাদের কিছু করার নেই! চলুন কর্নেলসায়েব! আপনাকে আমি ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে থানায় ফিরব। আমাদের জিপ আর একটা ভ্যান রংলিডিহির কাছে দাঁড় করানো আছে।

কর্নেল এতক্ষণে আমার সঙ্গে মিঃ সান্যালের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবেশ সান্যাল নমস্কার করে হাসতে-হাসতে বললেন,—আপনি সাংবাদিক। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেব আপনার কাগজে যা লেখার লিখবেন। তবে পর-পর দুটো একই ধরনের ঘটনা। এই ফরেস্টে সম্ভবত কোনও সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী আছে। আমরা বনদফতর আর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ দফতরে ব্যাপারটা জানাব। প্রাণীটাকে ফাঁদ পেতে ধরা দরকার।

কথা বলতে-বলতে যে দিক থেকে আমরা এসেছিলুম, সেই দিকে এগিয়ে গেলুম। তারপর দক্ষিণে ঘুরে মিনিট দশেক হাঁটার পর সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় পৌঁছুলুম। সুরেন আমাদের সঙ্গ ধরল। ছকুয়া চলে গেল।

কর্নেল বললেন,—আমরা এবার বাংলোয় যেতে পারব। মিঃ সান্যাল! আপনাদের আর কষ্ট করে আসতে হবে না। তবে যে কথাটা বলেছি, আশা করি সেইমতো কাজ হবে!

মিঃ সান্যাল বললেন,—নিশ্চয়ই হবে। আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য ডি. আই. জি. সায়েবের কড়া নির্দেশ আছে। তা ছাড়া এই কেসে আমারও ব্যক্তিগত কৌতূহল তীব্র। আপনি আমার সেই কৌতূহল আরও তীব্র করে দিয়েছেন।

ফরেস্ট বাংলোয় পৌঁছে দেখি, নাখুলাল চর্ট আর বল্লম হাতে নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল বললেন,—নাখুলাল! শিগগির কফি। আজ রাতে ঠাণ্ডাটা বড্ড বেশি। সুরেন! তুমি তোমার জেঠুকে ঘটনাটা শুনিয়ে দিয়ো! তোমার জেঠুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ তো?

সুরেন হাসবার চেষ্টা করে মাতৃভাষায় নাখুলালকে কিছু বলল। তারপর দুজনে বাংলোর পিছনদিকে চলে গেল। বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বলছিল। কিন্তু বাইরে বেজায় হিম। কর্নেল দরজার

তালা খুলে ঘরেঢুকে চীনা লণ্ঠনটা জ্বাললেন। তারপর পিঠের কিটব্যাগ খুলে টেবিলে রাখলেন। বাইনোকুলার আর ক্যামেরা পরীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন,—হতভাগা গোবিন্দের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে এই যন্ত্রদুটোর হয়তো ক্ষতি করে ফেলেছি ভেবেছিলুম। কিন্তু নাঃ। দুটোই আস্ত আছে।

এই সময় ছকুয়ার মুখে শোনা তার বাবার হাড়মটমটিয়া এবং কেষ্ট অধিকারীদর্শনের ঘটনাটি বললুম। কিন্তু কর্নেলের মুখে কোনও বিস্ময়চিহ্ন ফুটে উঠল না। পা দুটো ছড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে মাথার টুপিটা খুলে তিনি শুধু বললেন,—মাদারিকা খেল!

জিগ্যেস করলুম,—তার মানে?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। অন্যমনস্কভাবে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য এবার ভাবনা হচ্ছে জয়ন্ত। কেষ্ট অধিকারী এমন সাংঘাতিক লোক, কল্পনাও করিনি! অবশ্য হালদারমশাই ছদ্মবেশেই কেষ্টবাবুর দুর্গে ঢুকবেন। তাহলেও—

হঠাৎ থেমে তিনি দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। একটু পরে সুরেন ট্রেতে কফি আর দু'প্লেট স্ন্যাক্স নিয়ে এল। বললুম,—সুরেন! তুমি কর্নেলসায়েবকে ছকুয়ার বাবার ঘটনা বল!

কর্নেল বললেন,—না সুরেন! জেঠুর কাছে গিয়ে চা বা কফি খেতে খেতে গল্প কর! জেঠুকে বলবে, আজ রাতে তুমি বাংলোতে খাবে এবং থাকবে।

সুরেন চুপচাপ চলে গেল। বুঝলুম, ছকুয়ার বাবার গল্পটা বলার ইচ্ছা তার ছিল। কিন্তু কর্নেল নিজেই আস্ত রহস্যের প্রতিমূর্তি। তাঁর হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, শিগগির আবার হয়তো কিছু ঘটবে।

কিন্তু সে-রাতে তেমন কিছু ঘটল না। রাত দশটা নাগাদ খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট টানতে-টানতে চীনা লণ্ঠনের দম কমিয়ে আমাকে শুয়ে পড়তে বলেছিলেন। উত্তেজনাজনিত ক্লান্তি আমাকে পুরু কম্বলের ভেতর যথেষ্ট আড়ষ্ট করেছিল। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুধু মুখটা বাইরে রেখেছিলুম। পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ। দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল। ঘুমের রেশ বারবার ছিঁড়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণের জানালা দিয়ে যদি সেই বিকটদর্শন অদ্ভুত প্রাণীটা তার লম্বা হাতের ধারাল নখ দিয়ে আমাকে চিরে ফালা-ফালা করে ফেলে? তারপর একবার মুখ একটু ঘুরিয়ে দেখেছিলুম, কর্নেল তখনও চেয়ারে বসে আলোটা আড়াল করে টেবিলে ঝুঁকে কিছু করছেন। কিন্তু আমার দিকে তাঁর পিঠ। কী করছিলেন, দেখতে পাইনি।

ঘুম ভাঙল নাখুলালের ডাকে। সে বেড-টি দিতে এসেছিল। বাইরে কুয়াশামাখা নিষ্প্রভ রোদ। চায়ের কাপপ্লেট নিয়ে দেখলুম, কর্নেলের বিছানা শূন্য। টেবিলে ওঁর কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা নেই। নাখুলাল বলল,—কর্নেলসায়েব সুরেনকে নিয়ে ভোরে বেরিয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কুয়াশা কেটে গেলে বাংলোর লনে গিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ছিলুম। রোজকার মতো মালি এসে ফুলবাগিচায় ঝারি থেকে জল দিচ্ছিল। এমন সময় দেখলুম, সুরেন নিচের রাস্তা থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে।

সে গেট খুলে লনে ঢুকে বলল,—কর্নেলসায়েব আপনাকে ডেকেছেন। শিগগির রেডি হয়ে আসতে বলছেন।

একটু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলুম,—উনি কোথায় আছেন?

সুরেন দম নিয়ে বলল,—ভোরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রায়রাজাদের দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে থানায় গিয়েছিলেন। তারপর উপেনবাবুর দাদা মাখনবাবুর বাড়িতে গেলেন। সেখানেই কর্নেলসায়েব আছেন।

শেষ কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, কাল বিকেলে আমাকে কর্নেল সত্যসেবক পত্রিকার পক্ষ থেকে মাখন দত্তের সঙ্গে দেখা করতে বলছিলেন। সেই সময় অতর্কিত গোবিন্দ ছুরি হাতে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

দ্রুত তৈরি হয়ে বেরোলুম। জ্যাকেটের পকেটে রিপোর্টারস নোটবুক নিলুম। কাঁধে ঝোলানো কিটব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্রটাও নিতে হল। কারণ কর্নেল 'রেডি হয়ে' যেতে বলেছেন। এই কথাটায় সতর্কভাবে যাওয়ার সংকেত আছে।

সুরেন বলল,—জেঠুকে বলে আসি, আপনারা ব্রেকফাস্ট করবেন না। কর্নেলসায়েব বলে দিয়েছেন।

নাখুলাল গম্ভীরমুখে বাংলোর পিছনদিক থেকে আসছিল। সুরেন এবং তার মধ্যে নিজেদের ভাষায় কিছু কথা হল। তারপর সুরেন এসে বলল,—চলুন সার!

নিচের সেই এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে সুরেন একটু হেসে বলল,—জেঠু আমার জন্য খুব ভাবনায় পড়েছে। তার ভয়, বাবা হাড়মটমটিয়া এবার আমাকে মেরে রক্ত খাবেন।

বললুম,—তুমি ঠাকুরবাবা হাড়মটমটিয়া বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস কর না। তাই না?

সুরেন বলল,—বোগাস সার! রংলিডিহিতে শিবু নামে একজন ওঝা আছে। সে-ই সবার মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। শিবুও নাকি ছকুয়ার বাবার মতো হাড়মটিয়াকে দেখেছে। শিবু বলে, বাবা হাড়মটমটিয়ার নামে মুরগিবলি দেওয়ার রীতি সে এখনও চালু রেখেছে। ডোবার পাড়ে বাবার থান আছে। সেখানে মুরগির রক্ত খাচ্ছিল বাবা। শিবু স্বচক্ষে দেখেছে। বাবাও নাকি তাকে দেখে একটা হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে।

সুরেন হেসে উঠল। বুঝলুম, এই তরুণটি যুক্তিবাদী। সে আমাকে রংলিডিহির দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে হাইওয়েতে নিয়ে গেল। এখানে একটা বাসস্টপ আর কয়েকটা চা-পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান আছে। কয়েকটা সাইকেলরিকশো দাঁড়িয়ে ছিল। সুরেন তার চেনা একজন রিকশাওয়ালাকে ডেকে বলল,—মাখন দত্তের বাড়ি চলো ঝাব্বুদা!

ঝাব্বু আমাকে দেখে নিয়ে বলল,—তিনটাকা লাগবে সুরেন।

সুরেন কিছু বলার আগেই আমি বললুম,—ঠিক আছে। শিগগির চলো!

হাইওয়ে এখানে থেকে বাঁক নিয়ে রায়গড়ের পাশ দিয়ে গেছে। সামনে জোরালো শীতের হাওয়া। ঝাব্বুর তিনটাকা ভাড়ার বদলে দশটাকা দাবি করা উচিত ছিল। প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব পার হতে আধঘণ্টা লেগে গেল। রায়গড়ের মোড়ে বাঁক নিয়ে গলিরাস্তায় বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মাখনবাবুর জরাজীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে রিকশো দাঁড় করাল ঝাব্বু। তাকে একটা পাঁচটাকার নোট দিলে সে খুশিতে আমাকে সেলাম ঠুকল। এই আদিবাসীরা এখনও কী সরল!

উঁচু বারান্দায় সিমেন্টের চটা উঠে আছে। বারান্দায় সুরেন উঠে গিয়ে ঘরের দরজায় উঁকি মেরে বলল,—ছোটসায়েব এসেছেন সার!

ভেতরে ঢুকে দেখলুম, কর্নেল একটা নড়বড়ে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা তক্তপোশে শতরঞ্চি পাতা। সেখান বসে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! আমি সার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার ফ্যান। কাজেই আমি আপনাদের দুজনকেই চিনি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখার কথা ভাবিনি। জয়ন্তবাবু! আপনি আমার পাশে বসুন। সুরেন! তুই এখানেই বোস্ বাবা!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—জয়ন্ত! আশা করি, বুঝতে পারছ মাখনবাবু কী বলছেন?

মাখনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—উপেন আমার ছোটভাই বটে, কিন্তু ওকে আমি ঘৃণা করতুম। জানতুম সে শয়তান গোবিন্দকে নিয়ে কী সাংঘাতিক কাজ করছে। রাজবাড়িতে এখন তো কলেজ

হয়েছে। তার আগে উপেন কত দামি-দামি জিনিস চুরি করে কলকাতায় বেচেছিল। সব জেনেও মুখ খোলার সাহস ছিল না। আমাকে দাদা বলেও সে রেহাই দিত না!

কর্নেল বললেন,—আপনার সাহায্য খুবই জরুরি মাখনবাবু! রাজবাড়ির সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা—

মাখনবাবু তাঁর কথার ওপর বললেন,—ওটা কুমুদের বোকামি! বোকামি কিংবা লোভ। এখন স্বীকার করা উচিত ছিল ওর। অথচ এখনও আপনাদের কথাটা জানায়নি। কেন দীপুকে উপেন কিডন্যাপ করেছিল, কুমুদ জানত না? দীপু সরল ছেলে। রাজবাড়ির ওই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি তার বাবা তাকে দেখিয়েছিল। দীপু কথায়-কথায় তার বন্ধুদের বলে ফেলেছিল। সেই কথা উপেনের কানে পৌঁছুতে দেরি হয়নি। এখন কুমুদ আমার সামনে সত্যি কথাটা বলুক। সে ভট্‌চায। বামুনের ছেলে। পৈতে ছুঁয়ে বলুক, পাণ্ডুলিপিটা সে উপেনকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায় বেচেছিল কি না?

অবাক হয়ে কর্নেলের দিকে তাকালুম। কর্নেল বললেন,—যাকগে। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন ওটা আপনি উপেনবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে যেভাবে হোক, উদ্ধার করে দিন।

মাখনবাবু বললেন,—জয়ন্তবাবুর জন্য চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর আমি গিয়ে দেখি, উপেনের বউ রমা আছে নাকি।

মাখনবাবু ভেতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। একটি বালিকা আমাকে চা দিয়ে গেল। কর্নেলকে এবার গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি আস্তে বললেন,—আজ ভোরে ও.সি মিঃ সান্যাল উপেনের ঘর সার্চ করে গেছেন। কিন্তু ওটা পাননি। মাখনবাবু বলছিলেন, কাল সকালে কেষ্টবাবু—মিঃ অধিকারী এ পাড়ায় এসেছিলেন। কুমুদবাবুর বাড়িতে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তো তিনি উপেন দত্তের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই এসেছিলেন! আমার ধারণা ছিল পাণ্ডুলিপিটা কেষ্টবাবু হাতিয়েছেন। কিন্তু মাখনবাবু একটু আগে বললেন, তাঁর ভ্রাতৃবধূ গতরাতে একটা সুটকেস তাঁর কাছে লুকিয়ে রাখতে দিয়ে গেছে। তবে তালার চাবি রমার কাছে আছে। তাই উনি তার কাছে গেলেন।

অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পর মাখনবাবু ফিরে এসে রুষ্টমুখে বললেন,—বজ্জাত মেয়ে! উপেনের দোসর তো? কর্নেলসায়েব এসে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন সে এসে সুটকেসটা নিয়ে গেছে। আমার বড় মেয়ে সুতপা বলল, কাকিমা মিনিটপাঁচেক আগে বাপের বাড়ি যাচ্ছে বলে গেল। সুরেন! সায়েবদের নিয়ে এক্ষুনি বাসস্টপে যাও। ওকে পেয়ে যাবে।

নয়

সুরেন বেরুতে যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—বসো সুরেন! খামোকা ছুটোছুটি করে লাভ নেই।

মাখনবাবু অবাক হয়ে বললেন,—কী বলছেন কর্নেলসায়েব! রমা সুটকেস নিয়ে উধাও হয়ে গেলে আর কোনওদিন সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করাই যাবে না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আপনি চিন্তা করবেন না মাখনবাবু! আপনাদের বাড়ির দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম পুলিশকে। না—পোশাকপরা পুলিশ নয়। সাদা পোশাকে ছদ্মবেশে তারা ওত পেতে আছে পালাক্রমে। এতক্ষণ আপনার ভ্রাতৃবধূকে সুটকেসসহ পুলিশ পাকড়াও করে ফেলেছে।

মাখনবাবু আশ্বস্ত হয়ে বললেন,—বাঃ! এ একটা কাজের মতো কাজ করেছেন আপনি।

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আপনাকে একটা অনুরোধ, মাখনবাবু!

—বলুন! বলুন!

—আপনার ভাই উপেন দত্তের ঘরটা তো তালাবন্ধ।

—হ্যাঁ। তবে আপনি বললে তালা খোলার চেষ্টা করতে পারি। বাজারে নানকু নামে একটা লোক আছে। সে তালার চাবি তৈরি করে দিতে পারে। দৈবাৎ চাবি হারিয়ে গেলে নানকুর ডাক পড়ে। সুরেন তাকে চেনে।

কর্নেল বললেন,—সুরেন! তুমি নানকুকে ডেকে আনো শিগগির!

সুরেন বেরিয়ে গেল। তারপরই মাখনবাবুর মেয়ে তপতী ভেতরের দরজায় উঁকি মেরে বলল, —বাবা! অরুদা এসে কাকিমার কথা জিগ্যেস করছে। কী বলব!

মাখনবাবু বললেন,—ওকে বসতে বল্। যাচ্ছি।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—অরু কে?

আজ্ঞে, আমার ভাগনে।—বলে মাখনবাবু কণ্ঠস্বর চাপলেন : ভাগনে বলে অরুণের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। উপেন ওকে নষ্ট করেছিল। অরুণ গোবিন্দের জুটি।

আমার মনে পড়ে গেল, হালদারমশাই গোবিন্দ আর উপেন দত্তের ভাগনেকে ফলো করে এসেছেন কলকাতা থেকে। বললুম,—কর্নেল! এই অরুণই গোবিন্দের সঙ্গে কলকাতা থেকে উপেনবাবুর জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে।

মাখনবাবু বললেন,—বরং অরুকে এখানে ডাকি কর্নেলসায়েব!

কর্নেল বললেন,—থাক। আপনি গিয়ে দেখুন সে কী বলছে। তারপর দরকার মনে করলে এখানে ডেকে আনবেন।

—খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেছে অরু। তার মানে, পুলিশের ভয়ে সে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বলে মাখনবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন। কর্নেলের চুরুট নিভে গিয়েছিল। লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে বললেন,—হালদারমশাইয়ের জন্য দুর্ভাবনায় আছি। থানায় টেলিফোন করে আমাকে তাঁর খবর দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু কুমারবাহাদুরকে তাঁর পূর্বপুরুষের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম।

বললুম,—পাণ্ডুলিপিসহ রমা দত্তকে পুলিশ এতক্ষণ নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছে।

এইসময় বাড়ির ভেতরে মাখনবাবুর চড়া গলায় কথাবার্তা শোনা গেল,—ছোটমামির হয়ে তুই ঝগড়া করতে এসেছিস? তোর লজ্জা করে না হতভাগা! তোর ছোটমামিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল তো আমি কী করব? আরে! ও কী করছিস তুই? উপেনের ঘর খুলছিস কেন? চাবি কোথায় পেলি? অরু! ঘর খুলবিনে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। উঠোনের মাঝখানে একটা ইঁদারা। তার ওধারে একটা একতলা নতুন বাড়ি। দোতলা করার জন্য লোহার শিক উঁচু হয়ে আছে ইতস্তত। মধ্যিখানে খোলা সিঁড়িতে পলেস্তারা এখনও পড়েনি। একটা ঘরে তালা খুলছে বলিষ্ঠ চেহারার একজন যুবক। গায়ের রং তামাটে। মাথায় ফিল্মহিরোদের স্টাইলে ছাঁটা চুল। গায়ে নীল টিশার্ট, পরনে জিনস। সে শেষ তালাটা খুলেছে, তখনই কর্নেল গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলেন।

সে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর কর্নেলকে দেখে বলল,—কাঁধ ছাড়ুন বলছি।

কর্নেল তার কাঁধে আরও চাপ দিয়ে একটু হেসে বললেন,—তোমার ছোটমামার ঘরের চাবি তুমি কোথায় পেলে?

অরুণ এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পারল না। বলল,—বড়মামা! তুমি জানো এই ভদ্রলোক কে?

বাড়ি একেবারে স্তব্ধ। মাখনবাবুর স্ত্রী, মেয়ে আর দুই ছেলে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। মাখনবাবু গর্জে উঠলেন,—উনি তোর যম। হতচ্ছাড়া বাঁদর! তোর এত সাহস উপেনের ঘরে ঢুকতে চাস? শিগগির বল কে তোকে চাবি দিল?

অরুণ খেঁকিয়ে উঠল,—তুমি ভেবেছে, ছোটমামা মরে গেছে বলে মিথ্যামিথ্যি ছোটমামিকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে এই বাড়ি দখল করবে?

কর্নেল বললেন,—তুমি ঘরে ঢুকছ কেন অরুণ?

অরুণ বলল,—ছোটমামি আমাকে তার ঘরে থাকতে বলেছে। আমি বাড়ি পাহারা দেব। আপনি জানেন না স্যার, বড়মামা ছোটমামার বাড়ি দখল করে ছোটমামিকে তাড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তার কাঁধ থেকে হাত তুলে নিয়ে বললেন,—ঠিক আছে. তোমার ছোটমামি যখন তোমাকে চাবি দিয়েছে, তখন তুমি তার ঘরের মালিক। মাখনবাবু! আপনি অরুণকে বাধা দেবেন না।

বলে কর্নেল একটু সরে দাঁড়ালেন। অরুণ শেষ তালাটা খুলে ঘরে ঢুকল। আমি ততক্ষণে বারান্দায় উঠে কর্নেলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। লক্ষ করলুম, অরুণ খাটের ম্যাট্রেসের তলা থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বের করল। কর্নেল চুরুট কামড়ে ধরে বললেন,—চলো জয়ন্ত! এঁদের পারিবারিক ব্যাপারে আমাদের নাক না গলানোই উচিত।

সেই সময় প্যাকেটটা বগলদাবা করে অরুণ বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করছিল। আচম্বিতে কর্নেল তার বগলের ফাঁক থেকে প্যাকেটটা টেনে নিলেন। তারপরই দেখলুম, অরুণের হাতে একটা ছুরি ঝকমক করে উঠেছে। মাখনবাবু বোবাধরা গলায় শুধু বলে উঠলেন,—এই! এই!

কর্নেল তৈরিই ছিলেন। গোবিন্দকে ধরাশয়ী করার পদ্ধতিতে অরুণের পেটে লাথি ঝাড়তেই সে ককিয়ে উঠে বারান্দায় পড়ে গেল। কর্নেল যথারীতি তার দিকে রিভলভার তাক করলেন। এবার আমি কাল বিকেলের মতো হতবুদ্ধি হয়ে যাইনি। অরুণের ছুরিটা ছিটকে পড়েছিল। দ্রুত কুড়িয়ে নিলুম। অরুণ কুঁকড়ে গিয়ে গোঙাচ্ছিল। কর্নেলের লাথিটা জোরালো ছিল। প্যাকেটটা আমাকে দিয়ে অরুণের চুল ধরে কর্নেল তাকে দাঁড় করালেন। তারপর তাকে ঘরের ভেতর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। চাবির গোছা চৌকাঠের কাছে পড়ে ছিল। কর্নেল দরজা বন্ধ করে তিনটে তালা এঁটে নেমে এলেন। বললেন,—মাখনবাবু! আপনার ভাগনের জন্য চিন্তা করবেন না। আমি থানায় গিয়ে পুলিশকে বলছি। আপনি এবং আপনার বাড়ির সবাই যা দেখেছেন, পুলিশকে আশা করি তা-ই বলবেন।

মাখবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমেছি, সুরেনকে হন্তদন্ত আসতে দেখলুম। সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল,—নানকুর আসতে একটু দেরি হবে।

কর্নেল বললেন,—নানকুর দরকার আর হবে না সুরেন! আমরা থানায় যাচ্ছি। তুমি বনবাংলোয় চলে যাও। তোমার খুড়ো খুব ভয় পেয়েছে। তোমাকে দেখলে সে সাহস পাবে।

বড়রাস্তায় গিয়ে কর্নেল একটা সাইকেলরিকশো ডাকলেন। বললেন,—থানায় যাব।

রিকশো চলতে শুরু করলে কর্নেল প্যাকেটটার টেপ উপড়ে খুলে ফেললেন। তারপর কয়েকটা স্তর কাগজের মোড়ক খুলে একটা দিক দেখে নিলেন। তাঁর মুখে প্রসন্নহাসি ফুটতে দেখলুম। আমিও দেখে ফেলেছি জিনিসটা কী। সেই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি। মেটে রঙের তুলোট কাগজে নাগরি লিপিতে লেখা 'কুলকারিকা'। বাকিটুকু পড়ার আগেই কর্নেল আগের মতো মোড়ক এঁটে তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগের চেন খুলে পাণ্ডুলিপিটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

বললুম,—তাহলে অরুণের ছোটমামির সুটকেসে পুলিশ কিছু পাবে না।

—কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছু। বোঝা যাচ্ছে, এই মোড়কে কী আছে রমা জানত না। অরুণ তাকে বলেনি। তবে আমার অবাক লাগছে, রাত্রে পুলিশ রমার বাড়ি সার্চ করে এটা দেখতে পায়নি কেন? একটা সম্ভাবনা, জিনিসটা অরুণের কাছেই ছিল। পুলিশ চলে যাওয়ার পর সে চুপি-চুপি ও বাড়িতে ঢুকে এটা খাটের ম্যাট্রেসের তলায় রেখেছিল। তখন মাখনবাবুরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণে অরুণ ঝুঁকি নিয়ে এটা নিতে এসেছিল। কেষ্ট অধিকারী তাঁর কোনও লোককে সম্ভবত অরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলে গিয়েছিলেন।

সায় দিয়ে বললুম,—এটা ছাড়া আর কোনও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।

ও.সি. তপেশ সান্যাল কর্নেলের অপেক্ষা করছিলেন। অভ্যর্থনা করে আমাদের বসালেন। তারপর একজন সাদা পোশাকের কনস্টেবলকে ডেকে কফি আনতে হুকুম দিলেন। বললেন,—উপেন দত্তের স্ত্রীকে বাসস্টপে যাওয়ার পথে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তার সুটকেসে কাপড়চোপড়ের তলায় দুটো হেরোইনের প্যাকেট পাওয়া গেছে। আনুমানিক দাম আড়াই লাখ টাকা। আর একটা অষ্টধাতুর বিগ্রহ পাওয়া গেছে। বিগ্রহ কোন দেবতার, তা বুঝতে পারলুম না। ঠিক এইরকম বিগ্রহ সোনাডিহির জমিদারবাড়ি থেকে দু-বছর আগে চুরি গিয়েছিল। ওঁরা যে ফটো দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। সোনাডিহিতে খবর দেওয়া হয়েছে।

কর্নেল বললেন,—উপেন দত্তের ভাগনে অরুণকে আপনারা খুঁজছিলেন। এইমাত্র উপেন দত্তের ঘরের ভেতর তাকে ঢুকিয়ে তালা এঁটে দিয়েছি। এই চাবি নিয়ে এখনই কোনও অফিসারকে পাঠিয়ে দিন। এই ছোকরা ঠিক গোবিন্দের মতোই হঠাৎ ছুরি বের করে আমাকে স্ট্যাব করতে চেয়েছিল। উপেন দত্তের দাদা মাখনবাবু সপরিবারে ঘটনাটা দেখেছেন।

তপেশবাবু তখনই একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডেকে চাবির গোছ দিয়ে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলেন। তিনি তখনই বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—মিঃ হালদারের কথা আপনাকে বলেছিলুম। তাঁর—

—হ্যাঁ। মিঃ হালদার আসানসোল থেকে রিং করেছিলেন আধঘণ্টা আগে। তিনি আপনাকে জানাতে বললেন, তাঁকে কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। কেউ অধিকারীর বন্ধু একই ট্রেনে কলকাতা ফিরছেন। রাতের দিকে মিঃ হালদার থানায় রিং করবেন। সম্ভব না হলে কাল মর্নিংয়ে।

এইসময় কফি আর বিস্কুট আনল একটি ছেলে। বুঝলুম, থানার পাশেই চা-কফির দোকান আছে। আমার কফি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তপেশবাবুর অনুরোধে কফিতে চুমুক দিলুম। কর্নেল কফি পেলে খুশি হন। কফি খেতে-খেতে তিনি বললেন,—দুপুর দুটোয় কি আপনি ফ্রি আছেন?

তপেশবাবু হাসলেন,—আমি কোনও সময়ই ফ্রি নয়। তবে আপনার জন্য ফ্রি হতে পারি।

—আপনি সঙ্গে একজন এস. আই. এবং দুজন আর্মড কনস্টেবল নেবেন। একটা স্পট লাইটও চাই।

—একটু হিন্ট দেবেন কি?

কর্নেল হাসলেন,—মোটামুটি একটা অ্যাডভেঞ্চার। কাজেই আপনার সঙ্গীদের আপনি বেছে নেবেন। তারা যেন দক্ষ এবং সাহসী হয়। হ্যাঁ—মাখনবাবু বলছিলেন, রায়গড়ে বাঁকা নামে একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে সে মারা যায় বলে রটেছিল। কিন্তু এই থানার তৎকালীন ও.সি. জনৈক মি. ভাদুড়ি তাকে লোহাপুরে একটা পাহাড়ের চাতালে দেখতে পেয়েছিলেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় তাকে আর খুঁজে বের করতে পারেননি তিনি।

তপেশবাবু সোজা হয়ে বসে বললেন,—হ্যাঁ, বাঁকা। তার একটা কেস ফাইল আমি দেখেছি।

বিহারের পুলিশও তার খোঁজে ব্যস্ত। মি. প্রশান্ত ভাদুড়ির রিপোর্ট আমি পড়েছি। বাঁকা ডাকাতের একটা পায়ে গুলি লেগেছিল। তাকে খুঁড়িয়ে হাটতে দেখেছিলেন প্রশান্তবাবু!

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—যাই হোক, অরুণের বিরুদ্ধেও আমি একটা এফ. আই. আর. করে রাখতে চাই।

অবশ্যই। আপনি নিজেই লিখে দিন।—বলে তপেশবাবু একশিট কাগজ দিলেন।

কর্নেল পকেট থেকে কলম বের করে দ্রুত অরুণের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখে তপেশবাবুকে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—মনে রাখবেন, বেলা দুটো। আমি বনবাংলোয় অপেক্ষা করব।

বেরিয়ে এসে সাইকেলরিকশোতে চেপে হাইওয়ে দিয়ে রংলিডিহির মোড়ে পৌঁছুতে এবার মাত্র আধঘণ্টা লাগল। কারণ আমরা দক্ষিণ উত্তাল শীতের হাওয়ার গতিপথে যাচ্ছিলুম। রিকশোভাড়া মিটিয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে একড়োখেব্ড়ো জঙ্গলের দক্ষিণ সীমানার সেই পথটা এবং তিনদিক দেখে নিয়ে পা বাড়ালেন।

বাংলোর সামনে সুরেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে হাসল। বলল,—আমার খুড়ো খুব মনমরা হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—আবার ভালুক দেখেছে, না হাড়-মটমট-করা শব্দ শুনেছে নাখুলাল?

নাখুলাল বাংলোর পিছন থেকে আসছিল। কথাটা শুনতে পেয়েছিল সে। সেলাম করে বিমর্ষ মুখে হেসে সে বলল,—সুরেনের কানে কিছু ঢোকে না। লেখাপড়া শিখে তার কান বদলে গেছে স্যার! আমি দুবার বাংলোর উত্তরদিকে নিচের জঙ্গলে ঠাকুরবাবার চলাফেরার শব্দ শুনেছি।

বলে সে অভ্যাসমতো বুকে ও কপালে ক্রস আঁকল। কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি ভয় পেয়ো না নাখুলাল! বল্লম তুলে চেঁচিয়ে বলবে, শিগগির তোমার হাড়-মটমট শব্দটা থেমে যাবে ঠাকুরবাবা! শিবু-ওঝা তার গুরুকে ডাকতে গেছে।

সুরেন হেসে গড়িয়ে পড়ল। নাখুলাল বলল,—লাঞ্চ রেডি স্যার! স্নান করবেন তো করুন। গরম জল চাপিয়ে রেখেছি।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত স্নান করবে। আমার স্নানের দিন আগামী কাল।

ঘরে ঢুকে আস্তে বললুম,—আপনি অরুণের কাছ থেকে একটা প্যাকেট ছিনতাই করেছেন। অরুণ বা মাখনবাবু পুলিশকে তা বলবেন।

কর্নেল কপট চোখ কটমটিয়ে বললেন,—স্নান করে ফেলো। সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। একটায় লাঞ্চ করব। দটোয় তপেশবাবু আসবেন।

স্নানাহারের পর অভ্যাসমতো আমি বিছানায় গড়াচ্ছিলুম। কর্নেল বারান্দায় বসে চুরুট টানছিলেন। একটু পরে সুরেনকে দেখলুম। সে লনের রোদে ঘাসের ওপর বসল। তার একটু পরে কানে এল, কর্নেল তাকে বলছেন,—গর্তটা তুমি দেখেছিলে। অন্য কাকেও কি বলেছিলে?

সুরেন বলল,—দীপুকে বলেছিলুম। দীপু আর কাকেও বলতে আমাকে বারণ করেছিল।

—তুমি বা দীপু কেউ কি ওখানে ঢুকেছিলে?

—দুজনে একদিন ঢুকতে যাচ্ছিলুম। ভেতর থেকে চাপা গর্জন শুনে দুজনে ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। রায়রাজাদের দুর্গ তো জঙ্গলে ঢাকা ছিল। সেবার কলকাতা থেকে সরকারি লোকেরা এসে জঙ্গল সাফ করেছিল। কিন্তু ওদিকটা সাফ হয়নি। খোঁড়াও হয়নি। দীপু বলেছিল, সরকার আর টাকা দিচ্ছে না। তাই খোঁড়ার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে। ও.সি. তপেশবাবু দুটো নাগাদ আসবেন। আমরা বেরুব। তুমি সঙ্গে থাকবে।

ভাতঘুমে আমার চোখ বুজে এসেছিল। এই বাংলোতে ঠাণ্ডাটা জঘন্য। দিনের বেলাতেও দুটো

কম্বল মুড়ি দিতে হয়। কিন্তু সবে কম্বলের মধ্যে ওম সঞ্চারিত হয়েছে এবং আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি—সহসা কর্নেল কম্বলদুটো তুলে ডাক দিলেন,—জয়ন্ত! আর নয়। উঠে পড়ো।

বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে হল। লনে ও.সি. তপেশ সান্যাল, আর একজন অফিসার এবং দুজন তাগড়াই চেহারার আর্মড কনস্টেবল দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলও তৈরি হয়েছেন দেখলুম। তখনই বাথরুমে ঢুকে মুখে ঠাণ্ডা হিম জলের ঝাপটা দিলুম। তারপর পোশাক বদলে প্যান্টের পকেটে আমার খুদে আগ্নেয়াস্ত্রটি ভরে বেরিয়ে এলুম।

দেখলুম, পুলিশের জিপগাড়ি বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে আছে। জিপে এতগুলো লোক কীভাবে যাবে, বুঝতে পারছিলুম না। কিন্তু কর্নেলের সঙ্গে আমাদের উলটোদিকে বাংলোর উত্তরের ছোট্ট গেটে পায়ে হেঁটে যেতে হল। নাখুলাল গেটের তালা খুলে দিল। কর্নেল তাকে বললেন,—গেট খোলা থাক। আমরা এখনই ফিরে আসছি।

বাংলোর নিচের জঙ্গলে নেমে কিছুটা চলার পর কর্নেল বাঁদিকে পশ্চিমে ঘুরলেন। দুর্গম ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে কর্নেল আবার ডাইনে উত্তরে ঘুরলেন। তারপর ইশারায় সুরেনকে ডাকলেন। সুরেনের হাতে একটা জঙ্গলকাটা লম্বা দা ছিল। সে আস্তে বলল,—পাথরের স্ল্যাবগুলো আর-একটু নিচে, স্যার!

পশ্চিমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘন দুর্গম জঙ্গল। সুরেন দা-এর আঘাতে সামনের একটা ঝোপ কেটে ফেলল। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম পাথরের ঘরের একটা ধ্বংসাবশেষ। শেষপ্রান্তে কুয়োর মতো একটা গর্তের মুখে লতাপাতা ঝালরের মতো ঝুঁকে আছে। গর্তটা নিখুঁত চতুষ্কোণ। ওপরে একটা চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা গাছ গর্তে বৃষ্টি ঢুকতে দেয় না।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আপনি আর একজন আর্মড কনস্টেবল এই গর্তের দিকে লক্ষ রাখবেন। প্লিজ! যেন গুলি ছুড়বেন না। আপনারা ঝোপের আড়ালে এমনভাবে বসবেন, যেন গর্ত দিয়ে কেউ বেরুলে আপনাদের না দেখতে পায়। বাকিটা আপনাদের দক্ষতা আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করছে। আমরা তাহলে আসছি। যথাসময়ে দেখা হবে। সুরেন! এসো।

ও.সি. তপেশবাবু, একজন আর্মড কনস্টেবল, কর্নেল, সুরেন এবং আমি আবার বাংলোয় ফিরে গেলুম। তারপর বাংলোর সদর গেট দিয়ে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে পশ্চিম-উত্তর দিকে কোনাকুনি এগিয়ে চললুম। এদিকে রুক্ষ শক্ত মাটিতে ছোট-বড় নানা গড়নের কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। কদাচিৎ একটা করে বিস্তীর্ণ ঝোপ। কর্নেল মাঝে-মাঝে বাইনোকুলারে সম্ভবত দুর্গের ধ্বংসস্তূপ লক্ষ করছিলেন। প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে নদী দেখলুম। নদীর বুকে পাথরে সাবধানে পা রেখে ওপরে গেলুম।

তারপর আমরা দুর্গের ধ্বংসস্তূপে পৌঁছে সুরেনের নির্দেশ ডানদিকে হাঁটতে থাকলুম। শীতের রোদ বিকেলে নিষ্প্রভ এবং দূরে কুয়াশার পরদা ঝুলছে। এ বেলা হাওয়া তত উত্তাল নয়। একটু পরে দেখলম, দুর্গের পূর্বদিকে অসংখ্য স্তূপ ঘিরে জঙ্গল গজিয়ে আছে। পা বাড়াতে হচ্ছে সাবধানে। সর্বত্র পাথরের স্ল্যাব এবং তার ফাঁকে গাছপালা গজিয়ে আছে। একখানে গিয়ে সুরেন একটা স্তূপ দেখাল।

এই স্তূপটা একটা ছোট্ট ঘরের ধ্বংসাবশেষ। ছাদের একটা অংশ টিকে আছে। ছাদের ওপর থেকে ঘন লতাপাতা নেমে এসেছে। কর্নেল ইশারায় তপেশবাবুকে ডেকে কী একটা দেখালেন। উঁকি মেরে দেখলুম, লতাপাতার নিচে কাশঝোপের ওপর কয়েকটা কালো লোম। এরকম লোম কর্নেলের সঙ্গে এসে একটা গুহার মতো জায়গায় দেখেছিলুম।

তপেশবাবু কাশঝোপের দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—জন্তুটার পায়ের চাপে কাশঝোপের মাঝখানটা বেঁকে গেছে।

কর্নেল ঠিকই বলেন, জয়ন্ত! তুমি বোঝো সবই। তবে বড্ড দেরিতে।

আজ বিকেলের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্য এতক্ষণে স্পষ্ট হল আমার কাছে। কিন্তু অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—আর কোনও কথা নয়। আপনারা সবাই সশস্ত্র। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, যা কিছু ঘটুক, গুলি ছুড়বেন না। স্পটলাইটটা আমাকে দিন। আমি আগে নামব। আমার পাশে তপেশবাবু থাকবেন। পিছনে কনস্টেবল নরসিংহ আর জয়ন্ত। সবার পিছনে সুরেন। জয়ন্ত! তোমার আর্মস বের করো। কিন্তু গুলি ছুড়বে না।

লতাপাতার ঝালর সরিয়ে দিলেন কর্নেল। দেখলুম, প্রায় ছফুট উঁচু এবং ফুট চারেক চওড়া একটা চতুষ্কোণ পাথরের দরজা। কিন্তু কপাট নেই। কর্নেল একটু থেমে খুব চাপাস্বরে বললেন, —কত ফুট নামতে হবে জানি না। এই সুড়ঙ্গপথটা নদীর তলা দিয়ে গেছে।

তপেশবাবু আস্তে বললেন,—আমার অনুমান, অন্তত তিরিশ ফুট নামতে হবে। সিঁড়ি কিছুটা খাড়া হতে পারে।

কর্নেল উঁকি মেরে দেখে বললেন,—হ্যাঁ। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করেছে সিঁড়ি। সাবধান! যেন পা স্লিপ করে না কারও। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমরা খুব আস্তেসুস্থে আর যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নামব। একটানা আলো জ্বালব না। দুপাশের দেওয়ালে একটা হাত রেখে নামতে হবে। পাশাপাশি দুজন।

আমি বুঝতে পারছিলুম না কেন কর্নেল বারবার গুলি ছুড়তে নিষেধ করছেন। সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র শিম্পাঞ্জি জাতীয় প্রাণীটার নখ যে তীক্ষ্ণ, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আক্রমণ করলেও কি চুপ করে থাকতে হবে?

কর্নেল ও তপেশবাবু নামবার মুখে পিছু ফিরে সুরেনকে দেখে নিলেন। সে ধারালো লম্বা দা হাতে নিয়ে নির্বিকার মুখে এগিয়ে এল। কর্নেল একবার স্পটলাইট ফেলে নিচের ধাপগুলো দেখে নিয়ে শুধু বললেন,—বাঃ!

মসৃণ এবং ফুটখানেক চওড়া কালো পাথরের সিঁড়ি একঝলক দেখে নিয়ে আবার গা শিউরে উঠল। কুয়োর মধ্যে নামলে হয়তো মানুষের এমন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। তারপর নামছি তো নামছি। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, সুড়ঙ্গটা ধসে যাবে না তো?

গুনে-গুনে চল্লিশটা ধাপ নামার পর কর্নেল কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্পটলাইটটা আবার জ্বাললেন। এবার সমতল মসৃণ পাথরের পথ। তারপর কর্নেল আবার স্পটলাইট জ্বাললেন। চোখে পড়ল দেওয়াল ঘেঁসে কয়েকটা কাঠের পেটি সাজানো। তপেশবাবু ফিসফিস করে বললেন,—এ কার গোডাউন?

তারপরই কানে তালা ধরে গেল বিকট সেই গর্জনে—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ!

দশ

সেই গভীর সুড়ঙ্গের অমানুষিক ভয়ঙ্কর গর্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে একটা বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু তারপরই গর্জনটা থেমে গেল। কর্নেল স্পটলাইটের আলো ফেলেছিলেন সামনের দিকে। জন্তুটা শিম্পাঞ্জিই হোক, কিংবা আদিবাসীদের 'ঠাকুরবাবা' হাড়মটমটিয়া হোক, তীব্র আলোর নাগাল থেকে সম্ভবত দূরে সরে গেল।

কর্নেল স্পটলাইট নিভিয়ে দিলে ও.সি. তপেশবাবু টর্চ জ্বালালেন। তারপর তিনি সুড়ঙ্গপথে বাঁদিকের দেওয়াল ঘেঁসে রাখা থাক-বন্দি পেটিগুলো পরীক্ষা করে চাপাস্বরে বললেন,—চোরাই

মাল তো বটেই! কিন্তু এগুলো ফেলে রেখে আমরা এগিয়ে গেলে সেই সুযোগে স্মাগলাররা সব লোপাট করতে পারে।

কর্নেল প্লাইউডের পেটিগুলোতে চোখ বুলিয়ে বললেন,—তপেশবাবু! আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলোতে সুইডেনের একটা কোম্পানির নাম ছাপা আছে।

বলেন কী!—বলে তপেশবাবু উপরের একটা পেটি নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না।

কর্নেল সামনে স্পটলাইটের আলো আর একবার ফেলে বললেন,—বাবা হাড়মটমটিয়া এদিকে আর আসবে না। একটা ব্যাপার স্পষ্ট। ওই প্রাণীটা আগ্নেয়াস্ত্রকে ভয় পায়। বরং ঝটপট একটা কাজ করা যাক। সুরেনের দা-এর সাহায্যে একটা পেটি খুলে দেখা যাক, ওতে কী আছে। জয়ন্ত! তুমি স্পটলাইটটা নাও। মাঝে-মাঝে জ্বেলে সামনে আর পিছনে আলো ফেলবে।

তপেশবাবু বললেন,—ঠিক বলেছেন! এমন হতেই পারে, স্মাগলারদের লোক আড়ি পেতে আমাদের এই সুড়ঙ্গে নামতে দেখেছে।

কর্নেল ততক্ষণে ওপরের পেটিটা নামিয়ে ফেলেছেন। তপেশবাবুর কথাটা শুনে আমার আতঙ্ক বেড়ে গেছে। এই সুড়ঙ্গের ভিতরে কেষ্ট অধিকারীর দল বন্দুক পিস্তল নিয়ে আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করলে প্রাণে বাঁচার চান্স নেই। ওই প্রাগৈতিহাসিক ভয়ংকর জন্তুটার চেয়ে স্মাগলাররা আরও বিপজ্জনক।

সুরেনের দা-এর সাহায্যে পেটির একটা দিক খুলে দিতেই কর্নেল বললেন,—যন্ত্রাংশে ভর্তি।

তপেশবাবু জিগ্যেস করলেন,—যন্ত্রাংশ? কী যন্ত্র?

কর্নেল বললেন,—আমার অনুমান এগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের টুকরো। পার্টগুলো জোড়া দিলে বোঝা যাবে অটোমেটিক রাইফেল কিংবা আরও সাংঘাতিক কোনও অস্ত্র।

কী সর্বনাশ!—তপেশবাবু চমকে উঠে বললেন : কর্নেল! তাহলে আগে এই পেটিগুলো সিজ করে থানায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা দরকার। জন্তুটার ব্যবস্থা পরে করা যাবে।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! ওই জন্তুটাই এগুলো পাহারা দেয় বলে আমার ধারণা। জন্তুটা সম্পর্কে এলাকায় গুজব রটে গেছে। তাছাড়া লোকেরা ধরেই নিয়েছে, দীপু জন্তুটার পেটে গেছে। তারপর উপেন দত্তও তার আক্রমণে মারা পড়েছে। তাই স্মাগলারচক্র বলুন কিংবা কেষ্ট অধিকারীর দল বলুন, ওরা নিশ্চিত যে কারও সাহস হবে না এই গোপন সুড়ঙ্গে ঢোকে!

সুড়ঙ্গের ভিতরে চাপাস্বরে এইসব কথাবার্তাও ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল। হঠাৎ সুরেন বলল,—সার! আমি আর এই কনস্টেবলদাদা দুজনে মিলে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বরং ওত পেতে বসে থাকব। কেউ এলেই তার ঠ্যাঙে দায়ের কোপ মারব।

এমন সাংঘাতিক একটা অবস্থায় কর্নেল হেসে ফেললেন,—তুমি বুদ্ধিমান সুরেন! সুড়ঙ্গের মুখে ওত পেতে থাকলে একজন লোক একশোজন শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। তপেশবাবু! আপনি কনস্টেবল নরসিংহকে পুলিশ অফিসার হিসাবে নির্দেশ দিন, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে প্রথমে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে আততায়ীদের তাড়িয়ে দিতে বা পায়ে গুলি করতে পারবে।

তপেশবাবুর নির্দেশ পেয়ে নরসিংহ এবং সুরেন এগিয়ে গেল। যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছি, সেই সিঁড়িতে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে ওরা অদৃশ্য হল। কর্নেল বললেন,—চলুন। এবার আমরা এগিয়ে যাই।

কর্নেল সামনে, তাঁর বাঁদিকে তপেশবাবু এবং ডানদিকে পিছনে আমি। তিনজনের হাতেই গুলিভরা রিভলভার। কর্নেল স্পটলাইটের আলো মধ্যে মধ্যে জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছিলেন। পায়ের

তলায় পাথরের ইট, দুধারে দেওয়ালেও পাথরের ইট এবং মাথার ছাদে চওড়া মসৃণ বড়-বড় কালো পাথরের স্ল্যাব।

জীবনে বহুবার কর্নেলের সঙ্গী হয়ে কত সাংঘাতিক অভিযানে গেছি। কিন্তু এই অভিযান একেবারে অন্যরকম। কোন যুগে রায়গড়ের কোন রাজা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত ও পরাজিত হলে যাতে নিরাপদে একটা নিবিড় অরণ্যপথে (সে যুগে জঙ্গলটা নিশ্চয় আরও দুর্গম আর বিস্তীর্ণ ছিল) সপরিবারে পালিয়ে প্রাণে বাঁচতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে একটা নদীর তলা দিয়ে এই গোপন সুড়ঙ্গপথ তৈরি করেছিলেন। আর এতকাল পরে আমরা সেই পথে একটা মূর্তিমান বিভীষিকার মুখোমুখি হতে চলেছি। এই সব কথা ভেবেই যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্কে আমি উদ্বেলিত হচ্ছিলুম।

চলেছি তো চলেছি। মাঝে-মাঝে কর্নেলের হাতে স্পটলাইটের ঝলকানি, তারপর নিবিড়কালো অন্ধকার। ঘড়ি দেখার কথা মনে ছিল না। তাছাড়া প্রতি মুহূর্তে হিংস্র জন্তুটার আবির্ভাব ঘটাতে পারে। কারণ ক্রমশ তার মরিয়া হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। সুড়ঙ্গের অন্যমুখে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। তা টের পেয়ে সে আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

কর্নেল বলেছেন, জন্তুটা আগ্নেয়াস্ত্র দেখলে ভয় পায়। কেন তাঁর এমন ধারণা হল, বুঝতে পারছিলুম না। কিছুক্ষণ পরে স্পটলাইটের আলো ফেলে কর্নেল বললেন,—আমরা এখন নদীটার তলা দিয়ে যাচ্ছি। ওই দেখুন তপেশবাবু! ছাদ থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে।

তপেশবাবু ছাদ লক্ষ করে বললেন,—ধসে পড়বে না তো?

—ধসে পড়ার কারণ নেই। সেকালের স্থপতি আর কারিগররা কত দক্ষ ছিলেন, বিশ্বের সর্বত্র তার প্রমাণ আছে। জলের ফোঁটাগুলো নিচে পড়ে পাথরের ইটের ফাঁক দিয়ে তলার বালিতে মিশে যাচ্ছে। হ্যাঁ—কিছুটা পথ পিচ্ছিল হয়ে আছে। সাবধানে পা ফেলে আসুন।

নদীর তলায় সুড়ঙ্গপথে হেঁটে যাওয়ার এই অভিজ্ঞতা সাংঘাতিক। কে বলতে পারে হঠাৎ এখনই এই প্রাচীন সুড়ঙ্গের ছাদ ধসে যাবে না? প্রাণ হাতে করে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। একসময় কর্নেল বললেন,—আমরা নদী পেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার আরও সাবধান। পথটা ক্রমশ উঁচু হচ্ছে।

তাঁর কথা শেষ হওয়ার পরই আবার সেই কানে তালা ধরানো ভয়ঙ্কর গর্জন শোনা গেল। —আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! সুড়ঙ্গের মধ্যে এই গর্জন শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন হিম হয়ে যাচ্ছিল। গর্জন থামলে কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—শিম্পাঞ্জি বা গরিলারা কতকটা এইরকম গর্জন করে শুনেছি। কিন্তু—

তিনি হঠাৎ থেমে গেলে তপেশবাবু বললেন,—কিন্তু কী?

আসলে কর্নেল কান পেতে কী শুনছিলেন। বললেন,—গর্জনটা থেমে যাওয়ার পর প্রতিবার শুনেছি শুকনো ডালভাঙার মতো মটমট শব্দ। শুনুন! শব্দটা ভারি অদ্ভুত!

তপেশবাবু এবং আমি দুজনেই এতক্ষণে স্পষ্ট শুনতে পেলুম মটমট শব্দ। এই শব্দ হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলেও শুনেছিলুম। কিন্তু সুড়ঙ্গের ভিতরে শব্দটা যেন কোন অজানা বিভীষিকারই সাড়া। কোনও প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র প্রাণী যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এই শব্দ তারই পা ফেলার শব্দ।

মটমট শব্দটা একটু পরে থেমে গেল। কর্নেল আবার পা বাড়ালেন। এবার ক্রমশ সুড়ঙ্গপথ একটু করে উঁচু হয়েছে। পাথরে জুতো স্লিপ করছে। তাই আমি দেওয়াল ঘেঁসে হাঁটছিলুম। কর্নেল আলো ফেলে হঠাৎ বললেন,—সাবধান! একটা সাপ মনে হচ্ছে!

তপেশবাবু বললেন,—কই? কোথায় সাপ?

—সামনে। ফণা তুলেছে!

—সর্বনাশ! তাহলে বিষাক্ত গোখরো সাপ। আলো দেখলে ওরা ফণা তোলে!

বলে তপেশবাবু কর্নেলের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে তিনি বললেন,—সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি। গুলি করে ওর ফণাটা এখনই গুঁড়ো করে দিচ্ছি।

কর্নেল তাঁকে এগিয়ে যেতে দিলেন না। বললেন,—সাপটা কি বাবা হাড়মটমটিয়ার পোষা? তাকে কামড়ালে তো টের পেতুম। এক মিনিট! আমি সাপটার সঙ্গে একটু খেলা করি!

তপেশবাবু কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলুম,—কর্নেল! কর্নেল! আপনি সামরিক জীবনে অনেকবার বিষাক্ত সাপের পাল্লায় পড়েছেন, তা জানি। কিন্তু এখন আপনার হাতে শুধু একটা স্পটলাইট আর রিভলভার। আপনি আমাকে বলেছিলেন, একটা লাঠির সাহায্যে কতবার বিষাক্ত সাপ ধরেছেন। কিন্তু এখন লাঠিও তো নেই।

তপেশবাবু ব্যস্তভাবে বললেন,—খেলা করে সময় নষ্ট করার অর্থ হয় না কর্নেলসায়েব! আমরা এখানে সাপের সঙ্গে খেলা করতে আসিনি!

কর্নেল তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। বললেন,—আপনার বেটনটা কোমরে ঝুলিয়ে রেখেছেন। ওটাই সাপ ধরার পক্ষে যথেষ্ট! বেটনটা দিন আমাকে।

ও.সি. তপেশ সান্যাল বিরক্ত হয়ে বললেন,—এই নিন। কিন্তু এটা লাঠির চেয়ে ছোট।

কর্নেল বললেন,—কেরালার বেদেরা এইটুকু লাঠি দিয়েই বিষাক্ত সাপ ধরে। দেখুন না আপনি শুধু স্পটলাইটটা নিয়ে আমার পাশে এসে সাপটার ওপর আলো ফেলুন।

এতক্ষণে আমি চিত্রবিচিত্র ফণা তোলা সাপটাকে দেখতে পেলুম। ফণাটা একটু-একটু দুলছে। শিউরে উঠলুম।

কর্নেল গুঁড়ি মেরে বাঁ-হাতে বেটন এবং ডান হাতে রিভলভার নিয়ে সাপটার সামনে প্রায় দু'মিটার তফাতে হাঁটু ভাঁজ করে বসলেন। তারপর আমাদের অবাক করে হেসে উঠলেন। বললেন,—এটাকে এমনভাবে দেখতে পেয়েছিলুম, যেন ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে আসছে। তা এগিয়ে আসতেই পারে। কারণ সাপটা চড়াই থেকে উতরাইয়ে নেমেছে।

কথাগুলো বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে সাপটার মাথা ধরলেন। তপেশবাবু বললেন,— এ কী!

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—সত্যিকার সাপ নয়। রবারের তৈরি খেলনা সাপ! কেউ অন্ধকার থেকে জোরে এই খেলনা সাপটা আমাদের দিকে ছুড়ে ফেলেছে, যাতে আমরা ভয় পাই। হ্যাঁ—সে আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছে। সে জানে, আমরা গুলি করে সাপটা মারব। কিন্তু সে জানে না, জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজার আড়ালে আমাদের লোক ওত পেতে আছে।

কর্নেল বেটনটা ও.সি. তপেশবাবুকে ফেরত দিয়ে স্পটলাইট নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। তপেশবাবু বললেন,—একটা কথা বুঝতে পারছি না। জন্তুটা তো জঙ্গলে সুড়ঙ্গের দরজায় গিয়ে দেখে আসতে পারে, কেউ সত্যি ওত পেতে আছে কি না।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে এখনও দিনের আলো আছে। সে দিনের আলোয় বেরুতে চায় না। অবশ্য তার মালিক কৃষ্ণকান্ত অধিকারী থাকলে অন্য কথা!

তপেশবাবু বললেন,—ওটা কেষ্টবাবুর পোষা জন্তু?

—হ্যাঁ! এবার কিন্তু সাবধান! মনে হচ্ছে, সামনে এবার ওপরে ওঠার সিঁড়ি আছে! কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে স্পটলাইট জ্বেলে উপরদিকে আলো ফেললেন। ওদিকের মতো এদিকেও সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম।

তপেশবাবু উপরদিকে তাকিয়ে বললেন,—কর্নেল! শিম্পাঞ্জি বা গরিলাটাকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে আর গর্জন করছে না কেন?

কর্নেল সিঁড়ির ধাপে সাবধানে পা ফেলে উঠতে-উঠতে বললেন,—গর্জন করছে না, তার কারণ গর্জন করে-করে তার গলা ফেঁসে গেছে। ওই দেখুন, সে উঠে যাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দশ-বারোটা ধাপ উঠেছি, উপরে আচমকা গুলির শব্দ এবং হইহল্লার শব্দ শোনা গেল। কর্নেল বললেন,—সর্বনাশ! সাব-ইন্সপেক্টর মিঃ রক্ষিত বা কনস্টেবল ওটাকে গুলি করে মারল নাকি?

তপেশবাবু বললেন,—ওঁদের গুলি করতে নিষেধ করে গেছি। সম্ভবত শূন্যে গুলি ছুড়ে জন্তুটাকে ভয় দেখালেন মিঃ রক্ষিত। রিভলভারের গুলির শব্দ মনে হল।

কর্নেল বললেন,—বেচারা হাড়মটমটিয়া বিপদে পড়ে গেছে। ওই দেখুন! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে করজোড়ে প্রাণভিক্ষা করছে।

অবাক হয়ে দেখলুম,—গরিলা বা শিম্পাঞ্জির মতো প্রাণীটা দু-হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। স্পটলাইটের আলোয় তার দু-হাতের ধারাল নখগুলো ঝকমক করছে। দুটো দাঁত মুখের দুধারে বেরিয়ে আছে। দাঁতদুটো বাঁকা ধারাল তীক্ষ্ণাগ্র ছুরির মতো।

তপেশবাবু বললেন,—কর্নেলসায়েব! পোষা জন্তুরা মালিকের হুকুমে অনেক কসরত দেখাতে পারে। ব্যাটাচ্ছেলের প্রণামের ভঙ্গিটাও শেখানো। কিন্তু আমরা ভুল করেছি। ল্যাসো বা দড়ির ফাঁস কিংবা খাঁচার ব্যবস্থা করা যেত, যদি বন্যপ্রাণীসংরক্ষণ বিভাগে খবর দিয়ে আসতুম। এই অবস্থায় ওটাকে কীভাবে ধরবেন বুঝতে পারছি না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, তা সে বুঝে গেছে। এখন সে নিজের প্রাণভিক্ষা চাইছে। আসুন! রিভলভার তৈরি রেখে আমার পিছনে আসুন। বাবা হাড়মটমটিয়া আমাদের ওপর ঝাঁপ দিতে এলেই তিনটে গুলি তাকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেব, এটুকু কি সে জানে না?

বলে তিনি জন্তুটার দিকে মুখ তুলে হাসলেন,—ঠাকুরবাবা! ওহে বাবা হাড়মটমটিয়া! ওপরে উঠে যাও। তোমাকে কেউ গুলি করে মারবে না। তুমি ওঠে গিয়ে মিঃ রক্ষিতের সামনে নমো করো গে! ওঠো! ওঠো!

মনে হল, কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর পোষ্য প্রাণী। তাই মানুষের কথা বোঝে। প্রাণীটা ওপরে উঠে গেল। মিঃ রক্ষিতের গর্জন শুনতে পেলুম,—এক পা এগিয়ো না বলছি! আশ্চর্য তো এটা কি বনমানুষ!

কর্নেল সুড়ঙ্গের দরজার মুখে গিয়ে বললেন,—মিঃ রক্ষিত! আশ্চর্যই বটে! না-না ও পালাবে না। ও জানে, এবার পালানোর চেষ্টা করলেই ওর ঠ্যাং ভেঙে যাবে।

কর্নেল বেরিয়ে যাওয়ার পর তপেশবাবু, তারপর আমি বেরোলুম। জঙ্গলে এখন দিনের শেষে বিবর্ণ আলো আর ঠান্ডা হিম বাতাস। চির অন্ধকারের জগত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি এবং চেনা পৃথিবীতে ফিরে এসেছি। বুকভরে নিশ্বাস নিলুম। তারপর জন্তুটার দিকে তাকালুম।

জন্তুটার শরীর প্রকাণ্ড। দুটো হাত অস্বাভাবিক লম্বা। সারা গায়ে কালো লোম। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওর চোখদুটো যেন মানুষেরই মতো।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে বললেন,—আর কেন বাবা হাড়মটমটিয়া? এবার খোলস ছেড়ে বেরোও! নাকি আমি সাহায্য করব?

অমনই জন্তুটা মানুষের ভাষায় হাঁউমাউ করে কেঁদে বলে উঠল,—সার। আমার কোনও দোষ নেই। কেষ্ট অধিকারীর পাল্লায় পড়ে আমার এই দুর্দশা!

কর্নেল হাসলেন,—বুঝেছি! তা তুমিই সেই বাঁকা ডাকাত?

তপেশবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন,—বাঁকা? এর নামে বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য ডাকাতি আর খুনখারাপি কেস আছে!

কর্নেল বললেন,—বাঁকা নিজে শিম্পাঞ্জি বা গরিলার পোশাক খুলতে পারবে না। কেষ্ট অধিকারী অসাধারণ ধূর্ত! ওর গলার কাছে ব্যাটারিচালিত একটা খুদে জাপানি মাইক্রোফোন আর টেপরেকর্ডার ফিট করে দিয়েছে। একটা বোতাম টিপলে গর্জন শোনা যায়। অন্যটা টিপলে মটমট শব্দ হয়। বেচারা বাঁকাকে একেবারে বাঁকা করে রেখেছে কেষ্টবাবু!

বলে তিনি বাঁকাকে জন্তুর খোলস থেকে মুক্ত করলেন। বাঁকার শরীরও প্রকাণ্ড। মাথার চুল কাঁচাপাকা। পরনে হাফপ্যান্ট আর একটা সোয়েটার। সে হাঁটু ভাঁজ করে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল।

কর্নেল খুদে টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে বললেন,—ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকবার টেপটা চালাতে হয়েছে আজ। এদিকে গত দু-তিনদিনও কয়েকবার টেপ বাজিয়েছে। ব্যাটারির দোষ কী?

তপেশবাবু খোলস বা ছদ্মবেশের হাত এবং পায়ের নখ, তারপর দাঁতদুটো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। বললেন,—এ তো দেখছি ইস্পাতের তৈরি। ধারালো বাঁকা চুরির মতো।

কর্নেল বললেন,—তপেশবাবু! সুড়ঙ্গের অন্য দরজায় সুরেন আর নরসিংহ আছে। মিঃ রক্ষিতকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিন। উনি ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আপনি বাঁকা আর তার জন্তুর পোশাক নিয়ে কনস্টেবলের সঙ্গে এখনই থানায় ফিরে যান। তারপর পুলিশভ্যানে অন্তত একডজন আর্মড কনস্টেবলসহ সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখা চোরা আগ্নেয়াস্ত্রের পেটিগুলো নিয়ে আসা দরকার।

তপেশবাবু পকেট থেকে কর্ডলেস টেলিফোন বের করে বললেন,—কোনও অসুবিধে নেই। আমি ফোনে থানায় জানাচ্ছি। এস. ডি. পি. ও. সায়েব এস. পি. সায়েবকে খবরটা জানাবেন। জঙ্গিদের গোপনে অস্ত্রপাচারের খবর আমরা জানতুম। কিন্তু অস্ত্র পেয়ে যাব, চিন্তাই করিনি। আসলে এই সুড়ঙ্গ সম্পর্কে গুজব শুনেছি। কিন্তু আবিষ্কার করার চেষ্টা আমরা করিনি। আপনি কেমন করে জানলেন?

কর্নেল বললেন,—সুরেনের এই এলাকা নখদর্পণে। সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার সে একা করেনি। তার বন্ধু দীপুর সাহায্যে করেছিল। কারণ ওই গড়ে প্রত্নদফতর উৎখননের সময় দুজনেই ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের সঙ্গে ঘুরত। ডঃ চট্টরাজ প্রত্নদফতরের অধিকর্তা ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

তপেশ কর্ডলেস টেরিফোনে খবর দেওয়ার পর বললেন,—এখনই ফোর্স এসে যাচ্ছে। কর্নেলসায়েবকে অনুরোধ, ফোর্স না আসা পর্যন্ত আপনারা আমাকে সঙ্গ দিন।

ততক্ষণে মিঃ রক্ষিত বাঁকার দু-হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছেন এবং কনস্টেবলটি দড়িতে তার কোমর বেঁধে ফেলেছে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে একজন পুলিশ অফিসার স্পটলাইট জ্বেলে এগিয়ে এসে বললেন, —পুলিশভ্যান এসে গেছে সার!

তপেশবাবু কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই প্রচণ্ড শীতে আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আবার দেখা হবে।

কর্নেল বললেন,—আপাতত আমার একটা কাজ শেষ। পরের কাজটা পরে। এখন কফির জন্য আমি ছটফট করছি। চলি।

আমরা নাকবরাবর সিধে জঙ্গলের পথে বাংলোয় পৌঁছলুম। আজ আমার মধ্যে আর একটুও আতঙ্ক ছিল না।

বনবাংলোর চৌকিদার নাখুলাল উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের দেখে উত্তেজিতভাবে বলে উঠল,—জঙ্গলে গুলির শব্দ শুনেছি সার! সুরেনের কোনও বিপদ হয়নি তো?

কর্নেল তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,—না নাখুলাল। বরং সুখবর আছে। যাকে তোমরা বাবা হাড়মটমটিয়া বলতে, সে একজন মানুষ। কালো জানোয়ারের পোশাক পরে সে ভয় দেখাত; যাতে এই জঙ্গলে মানুষজন ঢুকতে না পারে। তুমি বলেছিলে ভালুকের মতো একটা জানোয়ার। আসলে সে একজন ডাকাত। তার নাম বাঁকা। সে গোবিন্দকেও মেরেছে।

নাখুলাল অবাক হয়ে বলল,—বাঁকা ডাকাতের নাম শুনেছি সার! তাহলে জনোয়ার সেজে জঙ্গলে সে ঘুরে বেড়াত? তাকে আপনারা ধরতে পেরেছেন?

—পেরেছি। এখন শিগগির তুমি কফির ব্যবস্থা করো। সুরেনের জন্য ভেব না। সে একটু পরে এসে পড়বে।

বলে কর্নেল বাংলোর পিছন ঘুরে দক্ষিণের বারান্দায় গেলেন। তারপর ঘরের তালা খুলে বললেন,—জয়ন্ত! চীনে লণ্ঠনটা জ্বালো!

বাইরে আঁধার জমেছে। চাঁদ উঠতে দেরি আছে। আলো জ্বেলে বললুম—একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। আপনি বলছিলেন, বাঁকা তার জানোয়ারের পোশাক নিজে খুলতে পারে না। তা হলে সে খাওয়াদাওয়া করত কীভাবে?

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—তুমি লক্ষ করলে বুঝতে পারতে। বাঁকার মাথা ও মুখের অংশ খোলা যায় এবং ইস্পাতের ধারাল নখ-আঁটা হাত দুটোও দস্তানার মতো সে খুলতে পারে। কিন্তু শরীরের বাকি অংশ অন্যের সাহায্য ছাড়া খোলা যায় না।

একটু পরে নাখুলাল কফি আনল। সে ঘটনাটা শোনার জন্য আগ্রহী, তা তার হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—সব ঘটনা তুমি সুরেনের মুখে শুনতে পাবে নাখুলাল! তুমি কিন্তু মুখ বুজে থাকবে। কারণ আমরা চলে যাওয়ার পর কেষ্ট অধিকারীর লোকেরা তো রায়গড়ে থাকবে। তুমি সুরেনের মতো সব জেনে মুখ বুজে থাকলে তাদের হাতে বিপদে পড়বে না। বুঝেছ?

নাখুলাল চুপচাপ চলে গেল। আমি বললুম,—সুরেন সুড়ঙ্গের কথা জানত?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওর বন্ধু দীপুও জানত। তবে সুরেন ডঃ চট্টরাজের চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্যটাতে কী আছে, তা জানত না। তা জানত শুধু দীপু। দীপুই বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়িয়েছিল। তাই তাকে উপেন দত্ত কিডন্যাপ করেছিল।

—কিন্তু এখনও দীপুর খোঁজ পাওয়া গেল না!

কর্নেল আস্তে বললেন,—সম্ভবত হালদারমশাই দীপুর ব্যাপারে কোনও সূত্র পেয়ে ডঃ চট্টরাজকে ফলো করে কলকাতা গেছেন। দেখা যাক, তিনি কী করতে পারেন।

একটু পরে বললুম,—কর্নেল! ডঃ চট্টরাজের তাঁবু থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা প্রথম আপনার কাছে আছে। আমার ধারণা দীপুর বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানো অঙ্কটাও আপনি তার একটা বই থেকে হাতিয়েছেন। এবার তার সাহায্যে প্রত্নদ্রব্যটা অর্থাৎ অদ্ভুত গড়নের ছোট্ট ধাতব জিনিসটা খুলে দেখুন না ওতে কী আছে?

কর্নেল বললেন,—চুপ! দেওয়ালের কান আছে। আর—ওই শোনো! বাংলোর নিচের রাস্তায় পুলিশভ্যান আর জিপগাড়ি যাওয়ার শব্দ হচ্ছে। আমার একসময়কার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত অধিকারী এবার নিছক কেষ্ট অধিকারী হয়ে যাচ্ছেন। জয়ন্ত! এই কেসের এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা। তাই না?

এগারো

সেই রাত্রে পুলিশবাহিনী গড়ের গোপন সুড়ঙ্গ থেকে চোরাই অস্ত্রশস্ত্রের পেটিগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় বাংলোর কাছে সুরেনকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ও.সি তপেশ সান্যাল কর্নেলের সঙ্গে বাংলোর লনে দাঁড়িয়ে কী সব কথা আলোচনা করে চলে গিয়েছিলেন। ততক্ষণে জ্যোৎস্না ফুটেছিল। কিন্তু কুয়াশামাখা সেই জ্যোৎস্না বড় রহস্যময়। সুরেন তার লম্বা ধারালো দা খুড়ো নাখুলালের কাছে রেখে আমাদের ঘরে এসেছিল! কর্নেলের জন্য ততক্ষণে দ্বিতীয় দফা কফি নাখুলাল দিয়ে গেছে। সুরেনও আমাদের সঙ্গে কফি খেল। কর্নেলের মতে, একটা সাংঘাতিক ঘটনার পর সুরেনেরও কফি খাওয়া দারকার। নার্ভ চাঙ্গা হবে।

সুরেন বলেছিল,—উঁকি মেরে দেখেছিলুম জনাতিনেক লোক গড়ের দিকে আসছে। তখন একটু আঁধার নেমেছে। নরসিংহদাকে কথাটা বলামাত্র উনি রাইফেল বাগিয়ে আমাকে টর্চ জ্বালতে বললেন। টর্চের আলোয় রাইফেলধারী পুলিশ আছে টের পেয়ে লোকগুলো কেটে পড়ল। নরসিংহদাও চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—কৌন বা?

সুরেন হেসে অস্থির। কর্নেল তাকে বলেছিলেন,—তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি তো?

—না সার! তবে আমার মনে হচ্ছে, ওরা আসানসোলে কেষ্টবাবুকে খবর দিতে গেছে!

—যাওয়ারই কথা। পুলিশ আজ রাতেই আসানসোল থানাকে খবর দেবে। কেষ্ট অধিকারীর অফিস, দোকান আর সেখানকার বাড়িতে পুলিশ খানাতল্লাশি চালাবে। যত শিগগির সম্ভব কেষ্টবাবুকে পাকড়াও করা দরকার। তা না হলে দীপুর বিপদের আশঙ্কা আছে।

সুরেন বলেছিল,—কেন? দীপু তো কেষ্টবাবুর বিরুদ্ধে কিছু করেনি!

—সুরেন! দীপু কিছু না করলেও এ পর্যন্ত সব ঘটনা তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। তাই কেষ্টবাবুর রাগ দীপুর ওপরই পড়বে।

—সার! দীপু কি কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছে বলে আপনার ধারণা?

—জানি না। তবে বলা যায় না। দেখা যাক।

রাত দশটা নাগাদ আমরা খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলুম। সকালে নাখুলালের ডাকে আমার ঘুম ভেঙেছিল। সে বেড-টি এনেছিল, বাইরে শীতের সকাল কুয়াশায় ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল। আজ শীতটা হঠাৎ বেড়ে গেছে। নাখুলাল সোয়েটারের ওপর কম্বল চাপিয়েছিল। সে বলল,—আজ শীত খুব জমেছে সার!

বললুম,—তা টের পাচ্ছি। কিন্তু এমন প্রচণ্ড শীতে কর্নেলসায়েব বেড়াতে বেরিয়েছেন। তোমাকে কিছু বলে যাননি?

নাখুলাল বলল,—না সার! সুরেনকে সঙ্গে নিয়ে সায়েব গড়ের দিকে যাচ্ছেন দেখেছি।

বুঝতে পারলুম না আবার কেন কর্নেল গড়ের জঙ্গলে গেছেন। ওখানে কেষ্টবাবু লোকেরা আচমকা হামলা করতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে শীতের উপদ্রবে প্যান্টশার্ট সোয়েটার আর পুরু জ্যাকেট পরে লনে রোদে গিয়ে দাঁড়ালুম। রোদের তেজ কম। সকাল আটটা বাজে। তবু অদূরে ঘন কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রায় আধঘণ্টা পরে কুয়াশা কিছুটা কেটে গেল। সেই সময় বাংলোয় নিচের পথ থেকে মাথায় হনুমান টুপি, গলাবন্ধ কোট আর প্যান্টপরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে একটা লোককে উঠে আসতে দেখলুম। বাংলোর গেটের কাছে দাঁড়াতেই তাকে চিনতে পারলুম। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই!

সম্ভাষণ করলুম,—সুপ্রভাত হালদারমশাই! আপনার ফোন করার কথা ছিল। কিন্তু সশরীরে এসে পড়লেন যে?

গোয়েন্দাপ্রবর ক্লান্তভাবে বললেন,—আর কইবেন না জয়ন্তবাবু! কইলকাত্তা গেছি আর ফিরছি। সিট পাই নাই। সারা পথ খাড়াইয়া আইছি।

তখনই নাখুলালকে ডেকে কফি তৈরি করতে বলে হালদারমশাইকে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলুম। দেখলুম, উনি হাতে দস্তানা পরেছেন। দস্তানা এবং হনুমানটুপি খুলে চেয়ারে বসলেন হালদারমশাই। বললুম,—খবর পরে শুনব। আগে কফি আসুক।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ জিগ্যেস করলেন,—কর্নেলস্যার গেলেন কই?

বললুম,—প্রাতঃভ্রমণে। গড়ের দিকে সুরেনের সঙ্গে কর্নেলকে যেতে দেখেছে নাখুলাল!

হালদারমশাই তাঁর গলাবন্ধ কোটের বোতাম খুলে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। তিনি ভাঁজ খুলে কাগজটা আমাকে দেখিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—গড়ের ম্যাপ আনছি। এই কালো দাগটার পাশে লেখা আছে 'টানেল।' তার মানে সুড়ঙ্গ!

অবাক হয়ে বললুম,—কোথায় পেলেন এই ম্যাপ?

গোয়েন্দাপ্রবর খিখি করে আড়ষ্ট হেসে বললেন,—ওঃ চট্টরাজেরে ফলো করছিলাম। উনি আমারে ক্যামনে চিনবেন? এয়ারকন্ডিশন্ড চেয়ারকারে পাশাপাশি সিট।

—বলেন কী! তাহলে অনেক টাকা ভাড়া দিতে হয়েছিল আপনাকে?

—নাঃ! তত বেশি কিছু না। করবটা কী, কন? ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। অথচ চট্টরাজেরে ফলো করতেই হইব।

—বুঝলুম। কিন্তু এই ম্যাপটা?

নাখুলাল কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে ঢুকল। হালদারমশাইকে সে সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে হালদারমশাই বললেন,—ডঃ চট্টরাজ ব্রিফকেস থেকে একটা ডায়রি বই বার করছিলেন। তখনই ভাঁজকরা কাগজখান ওনার পায়ের কাছে পড়ল। উনি ট্যার পাইলেন না। তারপর উনি যখন বাথরুমে গেছেন, তখন এই কাগজখান আমি হাতাইলাম। বুঝলেন তো?

হালদারমশাই হাসতে-হাসতে আবার কফিতে মন দিলেন। আমি ম্যাপটা দেখেই বুঝতে পারলুম, সরকারি পুরাদফতরের প্যাডে আঁকা রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপ। এটা মূল ম্যাপ নয়। সরকারের সংরক্ষিত প্রাচীন ম্যাপের নকল। ম্যাপে দুর্গ এবং সুড়ঙ্গপথের রেখাচিত্র আছে। একখানে চৌকো ঘরের নকশার পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'ট্রেজারি'। অর্থাৎ রাজকোষ। সুড়ঙ্গের পূর্বপ্রান্তে জঙ্গলের চিহ্ন দেখতে পেলুম।

খুঁটিয়ে ম্যাপটা দেখতে-দেখতে কফি খাচ্ছি, এমন সময় কর্নেলের সাড়া পাওয়া গেল। বারান্দায় উঠেই তিনি সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং হালদারমশাই! আপনাকে এত শিগগির কলকাতা থেকে ফিরতে দেখে আমি অবাক হইনি।

হালদারমশাই কর্নেলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি চাপাস্বরে বললেন,— দীপুর খোঁজ পাইছি। সে কলকাতায় ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে ছিল। তারে আনবার জন্যই চট্টরাজ গিছলেন। তারপর তারে লইয়া উনি রাত্রের ট্রেনে আসানসোলে ব্যাক করলেন। আসানসোলে মিঃ অধিকারীর বাড়িতেই দীপুরে সম্ভবত লইয়া গেলেন। আমি আসানসোলে নামলাম না। ক্যান কী, খবরটা আপনারে জানানো দরকার।

সুরেন সম্ভবত তার খুড়োকে কর্নেলের কফি তৈরি করার জন্য বলতে গিয়েছিল। এই সময় সে ফিরে এল। তারপর হালদারমশাইকে দেখে সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। কর্নেল তাকে

বললেন,—সুরেন! তাহলে তুমি রংলিডিহি থেকে শিবু-ওঝার ছেলেকে ডেকে আনো। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দশটা নাগাদ বেরুলেই চলবে।

সুরেন চলে গেল। কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—কী ব্যাপার?

কর্নেল টুপি, কিটব্যাগ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি টেবিলে রেখে বললেন,—গড়ের একটা ধ্বংসস্তূপের মাথার প্রকাণ্ড একটা পিপুল গাছে অদ্ভুত প্রজাতির পরগাছা দেখে এলুম। সুরেন অত উঁচু গাছে চড়তে পারল না। শিবু-ওঝার ছেলে ডন নাকি গাছে চড়তে ওস্তাদ। আমি অবশ্য ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে ছবি তুলেছি।

নাখুলাল কফি রেখে গেল। কর্নেল তারিয়ে-তারিয়ে কফি পান করতে থাকলেন। এবার জিগ্যেস করলুম,—আচ্ছা কর্নেল, আপনি হালদারমশাইকে ফিরতে দেখে অবাক হননি কেন?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। বললেন,—এবার হালদারমশাইয়ের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি শোনা যাক।

হালদারমশাই যা বললেন, তার সারমর্ম এই :

কর্নেলের নির্দেশে আসানসোলে গিয়ে কৃষ্ণকান্ত অধিকারীর কোম্পানির হেড অফিস খুঁজে বের করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। কেষ্টবাবু সেখানে নামকরা ব্যবসায়ী। এক কর্মচারীর কাছে হালদারমশাই কেষ্টবাবুর বাড়ির কথা জিগ্যেস করলে ভদ্রলোক বলেন, অধিকারীসায়েব এই অফিসের তিনতলায় থাকেন। তাঁর আসল বাড়ি রায়গড়ে। তবে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না। খুব ব্যস্ত আছেন।

হালদারমশাই কাছেই একটা হোটেলে ওঠেন। হোটেলের তিনতলায় তাঁর রুম। তাই কেষ্ট অধিকারীর অফিসবাড়ির ওপরতলারদিকে তাঁর নজর রাখার সুবিধা ছিল। রাত্রে তিনি রায়গড় থানায় ফোন করে জানান, এখনও কোনও খবর নেই। সকালে আবার ফোন করবেন। পরদিন সকালে কেষ্টবাবুর অফিসবাড়ির তিনতলার ছাদে হালদারমশাই রোদে দুজনকে চেয়ারে বসে চা বা কফি খেতে দেখেন। ডঃ দেবব্রত চট্টরাজের চেহারার বর্ণনা কর্নেল তাঁকে দিয়েছিলেন। তাই তিনি ডঃ চট্টরাজকে চিনতে পারেন।

দুপুরে খাওয়ার পর হালদারমশাই দেখতে পান, কেষ্টবাবু এবং ডঃ চট্টরাজ একটা গাড়িতে উঠছেন। দ্রুত নেমে গিয়ে তিনি একটা অটোরিকশো ভাড়া করে সাদা গাড়িটিকে অনুসরণ করেন। গাড়িটা রেল স্টেশনে গিয়েছিল। এর পর তিনি ডঃ চট্টরাজকে ট্রেনের চেয়ারকারে উঠতে দেখেন। চেয়ারকারে উঠে চেকারকে অনুরোধ করে টিকিটের ব্যবস্থা করেন। চেয়ারকার প্রায় খালি ছিল। এর পর ডঃ চট্টরাজের পাশের সিটে বসে একসময় তিনি রায়গড়ের প্রাচীন দুর্গের ম্যাপটা পেয়ে যান। কীভাবে পান, তা তিনি আমাকে আগেই বলেছেন। এবার কর্নেলকে সবিস্তারে বলে নিজের অভিযানের বাকি অংশে চলে এসেছিলেন।

গাড়ি বর্ধমান পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি ডঃ চট্টরাজের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন। তাঁর গায়ে-পড়া আলাপে ডঃ চট্টরাজ বিরক্ত হচ্ছিলেন, হালদারমশাই তা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়ার ঝামেলা সম্পর্কে হালদারমশাই কথা তোলেন। তখন ডঃ চট্টরাজ বলেন, তাঁর গাড়ি অপেক্ষা করবে স্টেশনে। হালদারমশাই তখন করুণ মিনতি করে ডঃ চট্টরাজের বাড়ির কাছে নামিয়ে দিতে বলেন। হালদারমশাইয়ের হার্টের অসুখ আছে। তাছাড়া তিনি যাদবপুর এলাকাতেই থাকেন।

এইভাবে গোয়েন্দাপ্রবর বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ডঃ চট্টরাজের গাড়িতে ঠাঁই জোগাড় করেন। ড্রাইভারের সঙ্গে একজন শক্তসমর্থ চেহারার লোক এসেছিল। তাকে

ডঃ চট্টরাজ জিগ্যেস করেন,—শ্রীমান দীপু কেমন আছে? কথাটা শুনেই হালদারমশাই কান পাতেন। কিন্তু চোখ বন্ধ। হার্টের রুগি তো!

লোকটি বলে,—দীপু বড্ড বেগড়বাঁই করছে।

ডঃ চট্টরাজ বলেন,—ওকে আজই রাত বারোটা পাঁচের ট্রেনে বাড়ি পৌঁছে দেব। আমি নিজেই নিয়ে যাব। আমার একটু ধকল হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে?

ডঃ চট্টরাজ তাঁর বাড়ির কাছে হালদারমশাইকে নামিয়ে দিয়ে যান। এরপর হালদারমশাই লেকভিউ রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফেরেন। তারপর হনুমানটুপি পরে পোশাক একেবারে বদলে চোখে চশমা এঁটে ঠিক সময় হাওড়া স্টেশনে পৌঁছান। তিনি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার সময় দীপুর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, সে উপেন দত্তের বাড়ি থেকে পালিয়ে সরল বিশ্বাসে ডঃ চট্টরাজের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ডঃ চট্টরাজ তাকে চুরি যাওয়া প্রত্নদ্রব্য উদ্ধারে সাহায্যের ছলে আটকে রাখেন। দীপুর অবশ্য এতে উৎসাহ থাকারই কথা। ডঃ চট্টরাজকে হালদারমশাই বলতে শুনেছিলেন,—মিঃ অধিকারীই তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। মিঃ অধিকারীর গাড়িতে আমরা সোজা রায়গড় যাব। চিন্তা কোরো না। আগে হারানো জিনিস্টা উদ্ধার করা যাক।

ততক্ষণে কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছেন। গোয়েন্দাপ্রবরের কথা শেষ হলে তিনি চোখ খুলে বললেন,—গত রাতে আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিস আর গোডাউনে পুলিশের হানা দেওয়ার কথা। পুলিশ ওখানে কেষ্টবাবু, ডাঃ চট্টরাজ আর দীপুকে পেলে এতক্ষণ রায়গড় থানায় খবর আসত এবং খবরটা থানা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছুত। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, ধূর্ত কেষ্টবাবু দীপুকে নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ছলে কোথাও গা-ঢাকা দিয়েছে। ডঃ চট্টরাজ সম্ভবত থানায় রিং করতেন।

আমি বললুম,—উনি তো গতকাল কী ঘটেছে জানেন না। আসানসোলে কেষ্টবাবুর অফিসে পুলিশ হানা দেবে, তা-ই বা কেমন করে জানবেন?

কর্নেলের কথা শুনে হালদারমশাই হতবাক হয়ে বসে ছিলেন। এবার শুধু বললেন,—হঃ!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত! তবে হালদারমশাই অত্যন্ত মূল্যবান খবর এনেছেন।

হালদারমশাই আস্তে বললেন,—দীপু কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়ছে ক্যান? কেষ্টবাবু কি তারে ডঃ চট্টরাজের মতন আটকাইয়া রাখবে? জয়ন্তবাবু কাইল কী সব ঘটছে কইলেন। কী ঘটছে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—কেষ্টবাবু এখন মরিয়া। কেন, সে-কথা ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় শুনবেন। গতকাল আমরাও একটা রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছিলুম। তাছাড়া আরও কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে ফেলুন।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের ঘরে ব্রেকফাস্টের সময় কর্নেল হালদারমশাইকে কালকের সব ঘটনা শোনালেন। গোয়েন্দপ্রবর মাঝে-মাঝে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠছিলেন,—আঃ! আমি মিস্ করছি।

সেই জন্তুটা যে ছদ্মবেশী দুর্ধর্ষ বাঁকা ডাকাত, এ কথা শুনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ খিখি করে হেসে অস্থির হলেন। বললেন,—অরে এট্টুখানি দেখছিলাম! ভাগ্যিস গুলি করি নাই!

বললুম,—কর্নেল কেন বলতেন, জন্তুটা ফায়ার আর্মস্‌কে খুব ভয় পায়, সেটা পরে বুঝেছি।

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! জন্তু হইলে ভয় পাইব ক্যান? জন্তুরা কি ফায়ার আর্মস বোঝে?

সওয়া দশটা নাগাদ সুরেন তার সমবয়সি একটা রোগা গড়নের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। কর্নেল সহাস্যে বললেন,—এই তোমার ডন!

সুরেন বলল,—হ্যাঁ সার! আমাদের ফাদার এর ডাকনাম ডন দিয়েছেন। এর খ্রিস্টান নাম ড্যানিয়েল কালীপ্রসাদ বেস্‌রা। মিশনস্কুল ছেড়ে ফাদারের ভয়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! রাত জেগে এসেছেন। ঘুমিয়ে নিন। জয়ন্ত! আমার সঙ্গী হবে নাকি?

বললুম,—আমার মাথাখারাপ? অন্য ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যেতে সবসময় রাজি। কিন্তু আপনি যখন বনেবাদাড়ে পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের জন্য বেরুচ্ছেন, তখন আমি সঙ্গী হতে রাজি নই! ঠেকে-ঠেকে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

কর্নেল হাসতে-হাসতে সুরেন ও ডনের সঙ্গে চলে গেলেন। হালদারমশাই আর আমি লনে রোদ্দুরে দুটো চেয়ার পেতে বসলুম। হালদারমশাই বললেন,—একটা কথা বুঝি না। কেষ্টবাবু পোলাটারে আটকাইয়া রাখব ক্যান?

সায় দিয়ে বললুম,—ঠিক বলেছেন! দীপুকে আটকে রেখে কেষ্ট অধিকারীর কী লাভ? যে জিনিসটা বত্রিশের ধাঁধার জট ছাড়ানোর জন্যে দরকার ছিল, সেই তো উপেন দত্তকে শিম্পাঞ্জির ছদ্মবেশে বাঁকা ডাকাত খুন করার পর কর্নেলের হাতে চলে এসেছে—

গোয়েন্দাপ্রবর উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় দেখলুম কুমুদবাবু হন্তদন্ত হয়ে গেট খুলে বাংলোর লনে ঢুকছেন। তিনি এসে কাঁদো-কাঁদো মুখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন,—কর্নেল সায়েব কোথায়? এদিকে এক সর্বনাশ!

বললুম,—কী হয়েছে কুমুদবাবু?

কুমুদবাবু পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে করুণ মুখে বললেন,—এই চিঠিটা আজ ভোরে বাইরের ঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে কে ঢুকিয়ে রেখেছিল। লক্ষ করিনি। কিছুক্ষণ আগে মেঝে পরিষ্কার করার সময় দীপুর মায়ের চোখে পড়ে। এটা দীপুর লেখা চিঠি। পড়ে দেখুন।

চিঠিটা খুলে দেখলুম লেখা আছে :

'বাবা,

চট্টরাজসায়েবের ক্যাম্প থেকে চুরি যাওয়া জিনিসটা নাকি কোন্ কর্নেলসায়েবের কাছে আছে। তাঁকে এই চিঠি দেখিয়ে বলবেন, ওটা যেন তিনি আজই রাত দশটায় হাড়মটমটিয়ায় জঙ্গলে সেই ডোবার পাড়ে রেখে আসেন। পুলিশকে জানালে আমাকে এরা মেরে ফেলবে। জিনিসটা পেলে আমাকে এরা ছেড়ে দেবে। না পেলে আজ রাত একটায় আমাকে এরা মেরে ফেলবে।

ইতি,

দীপু'

হালদারমশাই আমার মুখের কাছে মুখে এনে চিঠিটা পড়ছিলেন। তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ কানে ঝাপটা মারছিল। তিনি এবার সরে বসে উত্তেজিতভাবে বললেন,—কর্নেলস্যারেরে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

কুমুদবাবু ভাঙা গলায় বললেন,—কর্নেলসায়েব কোথায় গেছেন?

বললুম,—ওঁর যা বাতিক! গড়ের জঙ্গলে পরগাছা আনতে গেছেন! আপনি ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।

আমরা বারান্দায় গিয়ে বসলুম। একটু পরে হালদারমশাই বললেন,—গড়ের জঙ্গল কোথায়? আমারে দেখাইয়া দিলে কর্নেলস্যারেরে খবর দিতাম! জয়ন্তবাবু চেনেন না? কুমুদবাবু, আপনি নিশ্চয়ই চেনেন?

কুমুদবাবু বললেন,—আমার যা অবস্থা, অনেক কষ্টে এসেছি। এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তর কোণে। নদীর ওপারে। নদীতে অবশ্য তত জল নেই।

আমারে দেখাইয়া দ্যান। —বলে গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়ালেন।

আমি সত্যি বলতে কী, চিঠিটা পড়ার পর নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। কুমুদবাবু বারান্দা থেকে নেমে হালদারমশাইকে দূরে গড়ের জঙ্গল অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপে গজিয়ে ওঠে জঙ্গলটা দেখিয়ে দিলেন। হালদারমশাই আমার কাছ থেকে চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

নাখুলালকে ডেকে কুমুদবাবুর জন্য চা আনতে বললুম। নাখুলাল কুমুদবাবুকে 'নমস্তে' করে চলে গেল।

কর্নেল সুরেন আর ডনের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় বারোটা বাজে। দেখলুম, একটুকরো মোটা ডালে লালরঙের ঝলমলে ফুল এবং সবুজ চিকন পাতার পরগাছা আটকানো। শেকড়বাকড় কিছুটা দু'ধারে ঝুলে আছে। কর্নেল কুমুদবাবুকে দেখে বললেন,—এক মিনিট। এটা নাখুলালকে মাটিতে বসিয়ে রাখতে বলে আসি।

বললুম,—হালদারমশাই কোথায়? উনি তো আপনাকেই ডাকতে গেছেন!

কর্নেল ভুরু কুঁচকে বললেন,—হালদারমশাই? তাঁর সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি!

কর্নেল বাংলোর পিছনদিকে চলে গেলেন। কুমুদবাবু বললেন,—দেখা না হয়েই পারে না। জায়গাটা গোলকধাঁধার মতো। হয়তো এখনও উনি কর্নেলসায়েবকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

একটু পরে কর্নেল ফিরে এসে ডনকে কিছু টাকা দিলেন। ডন খুশি হয়ে চলে গেল। সুরেন গেল তার খুড়োর কাছে। কর্নেল এসে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—একটা কিছু ঘটেছে, তা বুঝতে পারছি। বলুন কুমুদবাবু!

কুমুদবাবু চিঠির ব্যাপারটা বলে রুমালে চোখ মুছলেন। কর্নেল বললেন,—চিঠিটা হালদারমশাই নিয়ে গেলেন কেন? চিঠিটা আমার দেখার দরকার ছিল।

কুমুদবাবু বললেন,—ওটা দীপুরই হাতের লেখা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। চিন্তা করবেন না। আপনি বাড়ি গিয়ে স্নানাহার করুন। ঘুণাক্ষরে চিঠির কথা যেন আর কাউকেও জানাবেন না।

কুমুদবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কৃষ্ণকান্তবাবু বাড়িতে নেই। উনি—

তাঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন,—কুমুদবাবু! কৃষ্ণকান্ত অধিকারীই আপনার ছেলে দীপুকে আটকে রেখেছে। কিন্তু সাবধান! একথাও যেন আপনি ছাড়া কেউ না জানতে পারে।

কুমুদবাবু চমকে উঠেছিলেন। তিনি মুখ নিচু করে একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর বিষণ্ণমুখে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বাংলোর পশ্চিমদিকে গিয়ে বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখছিলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে তাঁকে লক্ষ করছিলুম। প্রায় পনেরো মিনিট পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। তিনি ঘড়ি দেখে বললেন,—লাঞ্চের সময় হয়েছে। আমরা লাঞ্চ খেয়ে নিয়ে বেরুব। হালদারমশাইয়ের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। উনি যখন খুশি ফিরে লাঞ্চ খাবেন।

বললুম,—ওঁর কোনও বিপদ হয়নি তো?

—বলা যায় না। হঠকারী আর জেদি মানুষ মাঝে মাঝে নিজেকে আগের মতোই পুলিশ অফিসার ভেবে বসেন, এটাই হালদারমশাইয়ের ব্যাপারে একটা সমস্যা।

বলে কর্নেল পোশাক বদলাতে বাথরুমে ঢুকলেন।

আরও আধঘণ্টা দেরি করে সওয়া একটায় আমরা খেয়ে নিলুম। তারপর দুটোর সময় কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! হালদারমশাই সম্ভবত কেষ্ট অধিকারীর ফাঁদে নিজের

অজ্ঞাতসারে পা দিয়েছেন। চলো! তাঁর খোঁজে বেরুনো যাক। সুরেনকে ডেকে নিচ্ছি। গড়ের জঙ্গল তার নখদর্পণে।

কর্নেল, সুরেন আর আমি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে ডাইনে হাড়মটমটিয়ার জঙ্গল এবং বাঁদিকে সমান্তরালে নদী রেখে গড়ের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছুলুম। সেখানে নদী পেরিয়ে পশ্চিম গড়ের ধ্বংসস্তূপে ঢুকলুম। কর্নেল এতক্ষণ বাইনোকুলারে চারদিক মাঝেমাঝে দেখে নিচ্ছিলেন। গড়ের ধ্বংসস্তূপের গোলকধাঁধায় ঢোকার পর তিনি বললেন,—সুরেন! দ্যাখো তো ওটা কী?

সুরেন এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতে একটা নোংরা রুমাল তুলে ধরল। আমি চমকে উঠে বললুম, —এটা দেখছি হালদারমশাইয়ের নাকের নস্যি-মোছা রুমাল!

আরও কিছুক্ষণ ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে এগিয়ে একখানে থেমে কর্নেল বললেন,—কী আশ্চর্য!

সুরেন বলে উঠল,—সার! ওই দেখুন, কারা সুড়ঙ্গের দরজায় কত বড় পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে!

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে ঝোপ সরিয়ে বললেন,—জয়ন্ত! সুরেন এসো, আমরা পাথরটা সরানোর চেষ্টা করি। কেষ্টবাবুর লোকেরা সুড়ঙ্গের ছোট্ট দরজাটা পাথর দিয়ে কেন বন্ধ করে গেছে, দেখা যাক।

বারো

সেই জগদ্দল পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজা থেকে সরাতে ঠান্ডাহিম শীতের বিকেলে আমাদের শরীর প্রায় ঘেমে উঠেছিল। অনেক চেষ্টার পর পাথরটা একপাশে সরানো গেল মাত্র। তবে এবার অন্তত একজন সুড়ঙ্গে ঢোকার মতো ফোঁকর সৃষ্টি হল। কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিকে দেখে নিতে একটা স্তূপে উঠলেন। তারপর নেমে এসে বললেন,—এখন একটাই সমস্যা। ভিতরে ঢুকলে কেষ্টবাবুর কোনও লোক যদি সুড়ঙ্গে লুকিয়ে থাকে, সে গুলি ছুড়তে পারে। আমরা আত্মরক্ষার সুযোগ পাব না।

বললুম,—ঠিক বলেছেন। আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারি কেষ্ট অধিকারী। কাজেই সুড়ঙ্গে তার লোক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বন্দি হালদারমশাইকে পাহারা দিতেই পারে।

সুরেন বলল,—সার! ওঁকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ধরে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁকে সুড়ঙ্গের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওরা গুলি করে মারেনি তো?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাইকে মেরে ফেলে কেষ্টবাবুর লাভ নেই। বরং ওঁকে বন্দি রেখে আমার কাছে মুক্তিপণ হিসেবে সেই বত্রিশের ধাঁধামার্কা জিনিসটা দাবি করবে। দীপু আর হালদারমশাই দুজনেই কেষ্টবাবুর পাল্লায় পড়েছেন। এতে কেষ্টবাবু আমার ওপর আরও চাপ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে গেছে!

সুরেন বলল,—সার! হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে—

কর্নেল তার কথার ওপর বললেন,—হাড়মটমটিয়ার যুগ শেষ সুরেন! তুমি কি বুঝতে পারছ না কেষ্টবাবু তার চোরাকারবার নিরাপদে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনেকদিন—হয়তো অনেকবছর ধরে বাঁকা ডাকাতকে কাজে লাগিয়েছিল? তার গলার কাছে আঁটা খুদে জাপানি টেপরেকর্ডারে মটমট শব্দ বাজিয়ে সে এমন একটা অবস্থা তৈরি করেছিল, যাতে ওই জঙ্গলে সন্ধ্যার পর এমনকী দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে ভয় পায়।

বললুম,—কিন্তু বেলা পড়ে আসছে কর্নেল! কী করা উচিত এখনই ঠিক করা যাক।

সুরেন বলল,—একটা কথা ভাবছি সার! জঙ্গলের মধ্যে সুড়ঙ্গের অন্য দরজাটাও কি কেষ্টবাবুর লোকেরা এমন করে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছে?

কর্নেল বললেন,—সুরেন! একটা কাজ করতে পারবে? এখান থেকে বেরুলে নদী পেরিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে সিধে ফাঁকা মাঠ। দৌড়ে মাঠ পেরিয়ে রায়গড় থানায় যেতে পারবে?

সুরেন বলল—পারব সার!

—তাহলে এই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে থানার ও.সি. তপেশবাবু কিংবা ডিউটি অফিসারের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি একা এসো না। পুলিশের সঙ্গে আসবে।

বলে কর্নেল তাঁর জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা নোটবই বের করে একটা পাতায় দ্রুত চিঠি লিখে ফেললেন। তারপর নিজের একটা নেমকার্ড সুরেনকে দিলেন। সেই সঙ্গে নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে চিঠিটাও দিলেন। সুরেন পা বাড়িয়েছে, হঠাৎ কর্নেল বললেন,—এক মিনিট। গড়ের জঙ্গল থেকে বেরুনোর পথে তোমার বিপদ হতেও পারে। চলো। আমি তোমাকে নদীর ধারে পৌঁছে দিয়ে আসি! জয়ন্ত! তুমি তোমার রিভলভার বের করে হাতে রাখো। আর এক কাজ করো। ওই স্তূপের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকো। কেউ যেন তোমাকে না দেখতে পায়! সাবধান!

কর্নেল সুরেনকে নদীর ধারে পৌঁছে দিতে গেলেন। আমি কর্নেলের কথামতো রিভলভার হাতে নিয়ে সেই ঝোপের আড়ালে ওত পেতে বসলুম। অস্বীকার করব না, অজানা আতঙ্কে আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলুম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, কেষ্টবাবুর অনুচররা আচমকা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হালদারমশাইয়ের মতো বন্দি করবে। রিভলভার তো হালদারমশাইয়ের কাছেও ছিল!

কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। কর্নেলকে ফিরতে দেখে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আশা করি, তোমাকে ভূতেরা ঢিল ছোড়েনি?

বললুম,—না। আপনাকে ছুড়েছিল নাকি?

—ফেরার পথে ছুড়েছিল।

—সর্বনাশ! তাহলে কেষ্টবাবুর লোকেরা এখনও কাছাকাছি কোথাও আছে!

—আছে। বোকামি করে নিজেরাই সেটা জানিয়ে দিল।

—ভাগ্যিস ওরা গুলি ছোড়েনি!

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আমাকে আড়াল থেকে গুলি করে মারলে কেষ্টবাবু সেই মোগলাই রত্নকোষ আর পাবে না, তা ভালোই বোঝে। যাই হোক, পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা সামনেকার এই স্তূপে উঁচুতে বসে থাকি। সাবধানে উঠবে। পা পিছলে পড়ে গেলে হাড় ভেঙে যেতে পারে।

দুজনে একটা নগ্ন উঁচু ধ্বংসস্তূপে উঠে বসলুম। নিরেট পাথরে ঠাসা এই ধ্বংসাবশেষে কোনও উদ্ভিদ গজাতে পারেনি। দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। দূরে কুয়াশা ঘনিয়েছে। চারদিকে এতক্ষণে পাখিদের দিনশেষের কল-কাকলি শোনা যাচ্ছিল।

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখছিলেন। ঘড়ি দেখলুম, চারটে বাজে। এত শিগগির এখানে শীতের দিন ফুরিয়ে যায় কেন? একটু পরে বুঝতে পারলুম, কুয়াশার জন্যই রোদ্দুর এত ম্লান হয়ে গেছে। আধঘণ্টা পরে কর্নেল বাইনোকুলারে পূর্বদিক দেখতে দেখতে বললেন,—বাঃ! তপেশবাবুরা এসে গেছেন! এসো, নেমে পড়া যাক।

আমরা সবে স্তূপ থেকে নেমেছি, হঠাৎ দেখি, সুড়ঙ্গের দরজার ফোকর দিয়ে লাল ধুলো মাখা চুল আর একটা মুখ উঁকি দিচ্ছে। কর্নেল ছুটে গিয়ে বললেন,—হালদারমশাই! আপনাকে কেষ্টবাবুর লোকেরা ছেড়ে দিল তাহলে?

হালদারমশাইয়ের মুখে টেপ আঁটা আছে। কর্নেল টেপ টেনে খুলতেই উনি উহু হু হু করে

উঠলেন যন্ত্রণায়। তারপর বললেন,—আমার হাত দুইখান পিছনে বাঁধা আছে। আমারে উঠাইয়া লন।

ওঁকে কর্নেল এবং আমি দুদিক থেকে ধরে টেনে বের করলুম। কর্নেল কিটব্যাগ থেকে ছুরি বের করে হাতের বাঁধন কেটে দিলেন। গোয়েন্দাপ্রবরের সারা শরীরে লাল ধুলোকাদা মাখা। একটু ধাতস্থ হয়ে তিনি বললেন,—সবখানে হালারা আমারে বান্ধে ক্যান? আচমকা আমার উপর ঝাঁপ দিয়া—ওঃ!

কর্নেল বললেন,—আপনাকে বেঁধে সুড়ঙ্গে ঢুকিয়েছিল। সুড়ঙ্গের মধ্যে দীপুকে দেখলেন?

—অরে দেখছি। অরে বান্ধে নাই। টর্চের আলো জ্বালছিল কেষ্টবাবু। তারে চিনছিলাম। কিছুক্ষণ আগে উলটাদিক থেইক্যা টর্চ জ্বালাতে-জ্বালতে কেউ আইয়া কইল, স্যার! গতিক ভালো না। সুরেনেরে দৌড়াইয়া যাইতে দেখছি। হয়তো থানায় খবর দিতে গেল। সুড়ঙ্গের পশ্চিমের দরজায় পাথর আটকানো ঠিক হয় নাই। তখন কেষ্টবাবু কইল, এই টিকটিকিটা এখানে বান্ধা থাক। চলো, দীপুকে লইয়া আমরা জঙ্গলের মধ্যে যাই। অরা পলাইয়া গেল। আমার দুই পাঁও বান্ধা ছিল। দেওয়ালের একখানে পাথরের ইট এট্টুখান উঁচু ছিল। সেখানে আন্ধারে পাঁওয়ের দড়ি ঘষতে-ঘষতে যখন ছিঁড়ল, তখন খাড়া হইলাম।

এইসময় তপেশবাবু সদলবলে এসে পড়লেন। তিনি হালদারমশাইকে বললেন,—এ কী অবস্থা মিঃ হালদারের। সুরেনের মুখে অবশ্য ওঁর রুমাল কুড়িয়ে পাওয়ার কথা শুনেছি।

কর্নেল বললেন,—জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্ব দরজার কাছে আপনার লোকেরা আছে তো?

ও.সি. তপেশ স্যান্যাল বললেন,—আপনার চিঠি পেয়ে প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে দুজন অফিসার আর ছ'জন আর্মড কনস্টেবলকে পাঠিয়েছি। ওঁরা গেছেন জিপগাড়িতে। খেলার মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে জিপগাড়ি চলার অসুবিধে নেই। কাল রাত্রেই সেটা লক্ষ করেছিলাম। ঝোপঝাড় কোনও বাধা নয়। এবার বলুন, কী করব? সুড়ঙ্গের দরজার পাথরটা পুরোপুরি সরিয়ে ফেলার পর সুড়ঙ্গে ঢুকলে কেষ্টবাবুর লোকেরা যদি গুলি ছোড়ে, তাহলে আমাদের কারও না-কারও প্রাণের ঝুঁকির প্রশ্ন আছে।

কর্নেল কিছু বলার আগেই হালদারমশাই বলে উঠলেন,—কেষ্টবাবু আর তার দুইজন লোক দীপুরে লইয়া উলটোদিকে পলাইয়া গেছে।

তপেশবাবু বললেন,—কতক্ষণ আগে?

—আধঘণ্টার বেশি! কী জানি, ঠিক টাইম স্মরণ হয় না!

—তাহলে তো ওরা পুলিশফোর্স যাওয়ার আগেই পালিয়ে গেছে!

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—এক কাজ করা যাক। পাথরটা সুড়ঙ্গের দরজায় আটকে দিয়ে পুলিশফোর্স আশেপাশে ঝোপে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। গড়ের এই জঙ্গলে কেষ্টবাবুর লোকেরা কিছুক্ষণ আগেও ছিল। এখন আপনাদের দেখে পালিয়ে যেতেও পারে। আবার পুলিশ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেও পারে। আপনি একজন অফিসারকে সেইমতো নির্দেশ দিন। কেষ্টবাবুর লোকেদের সামনে পেলে উপযুক্ত ব্যবস্থা তিনি নেবেন।

—তারপর?

—তারপর আর কী? চলুন, আমরা জঙ্গলে সুড়ঙ্গের পূর্ব দরজার কাছে যাই। কী ঘটেছে, এখনই জানা দরকার।

তপেশবাবু একজন অফিসারকে ডেকে সেইমতো নির্দেশ দিলেন। তারপর বললেন, —কর্নেলসায়েব! ওখানে আমাদের একজন অফিসারের কাছে কর্ডলেস টেলিফোন আছে। এখনও

কোনও সাড়া পাচ্ছি না। তার মানে, হয় কেষ্টবাবুরা আগেই কেটে পড়েছে, নয়তো পুলিশের জিপের শব্দ শুনে সুড়ঙ্গে লুকিয়েছে। আমি ফোন করে দেখি বরং।

তপেশবাবুর হাতে কর্ডলেস টেলিফোন ছিল। ডায়াল করে একটা সাংকেতিক নম্বর বললেন। তারপর কানের কাছে ফোনটা ধরে কিছু শোনার পর বললেন,—ওকে! ওকে! আমরা যাচ্ছি!

ফোন নামিয়ে তিনি বললেন,—এস. আই. মিঃ মিত্র বললেন, সুড়ঙ্গের দরজার ওপর ঘন ঝোপ আর লতাপাতা আছে। তার ফাঁকে তিনি একটা মুখ দেখতে পেয়েছেন। তাঁকে দেখামাত্র মুখটা অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন,—তার মানে, ওরা এখনও বেরোতে পারেনি। শিগগির চলুন তপেশবাবু! সুড়ঙ্গে গুলির লড়াই করার বিপদ আছে। ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

আমরা গড়ের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদী পার হয়ে পুলিশভ্যানের কাছে পৌঁছুলুম। তপেশবাবু পুলিশভ্যানের ড্রাইভার এবং দুজন সশস্ত্র গার্ডকে ওখানে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর সোজা এগিয়ে গেলেন। হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলের এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। কর্নেল আস্তে বললেন,—আমাদের আর একটু ডানদিকে গিয়ে নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

এই সময় তপেশবাবুর টেলিফোন বিপ-বিপ শব্দ হল। তিনি কর্ডলেস ফোনটা কানের কাছে ধরে সাড়া দিলেন। তারপর কর্নেলকে চাপাস্বরে বললেন,—সাংঘাতিক লোক কেষ্টবাবু! দীপুর কানের কাছে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়েছে। তার দুই সঙ্গী তার পিছনে আছে। কেষ্টবাবু বলছে, তাদের যেতে না দিলে দীপুর মাথায় গুলি করবে। তারপর পুলিশ তাদের গুলি করে মারুক। তাতে পরোয়া নেই।

কর্নেল দিনশেষের ম্লান আলোয় বাইনোকুলারে জঙ্গল দেখে নিয়ে বললেন,—চিনতে পেরেছি। ওই ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে উঠতে হবে। শীতের সময়। তাই ঝরাপাতায় পায়ের শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঝোপঝাড়ের ভিতর ঝরাপাতার উপদ্রব নেই।

কর্নেলের পিছনে সুরেন, তপেশবাবুর পিছনে আমি এবং আমাদের ডানপাশে হালদারমশাই—এইভাবে গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বন্য প্রাণীদের মতো আমরা ঢাল বেয়ে উঠে গেলুম। কর্নেল, তপেশবাবু, হালদারমশাই আর আমার হাতে উদ্যত গুলিভরা রিভলভার। এইসময় জঙ্গলে শীতের হাওয়া বইছিল। এতে আমাদের সুবিধেই হল। একখানে কর্নেল থেমে গেলেন। আমরাও থেমে গেলুম। তারপর সত্যিই এক সাংঘাতিক দৃশ্য চোখে পড়ল।

সুড়ঙ্গের দরজার বাইরে কেষ্ট অধিকারী সুরেনের বয়সি একটি ছেলের কানের পাশে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে এক পা-এক পা করে সামনে এগোচ্ছে। তার দুপাশে দুটো ষণ্ডামার্কা লোকের হাতে বিদেশি রাইফেল বলেই মনে হল। তারা পুলিশের দিকে সেই রাইফেল তাক করে এগোচ্ছে। দুজন পুলিশ অফিসার রিভলভার এবং কনস্টেবলরা রাইফেল উঁচিয়ে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে পজিশন নিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষ শুরু হবে, এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা। তারপর কেষ্টবাবু চাপাগলায় গর্জে উঠল,—আমরা মরব। তার আগে কুমুদমাস্টারের ছেলে মরবে। এখনও ভেবে দ্যাখো পুলিশবাবুরা! ভালোয়-ভালোয় আমাদের যেতে দাও! দেখছ তো? আমার দুই সঙ্গীর হাতে অটোমেটিক কালাশ্‌নিকভ রাইফেল। প্রতি সেকেন্ডে দুটো করে গুলি বেরোয়। তোমরা গুঁড়ো হয়ে যাবে।

হঠাৎ অন্য একটা ঘটনা ঘটে গেল। হালদারমশাই কখন এগিয়ে গেছেন গুঁড়ি মেরে, তা লক্ষ করিনি। তিনি আচম্বিতে ঝাঁপ দিলেন কেষ্ট অধিকারীর ওপরে। কেষ্টবাবু তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হল। এদিকে কর্নেল ও তপেশবাবুও কেষ্টবাবুর দুই সঙ্গীর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের কালাশ্‌নিকভ রাইফেল দুটো দুজন পুলিশ অফিসার দ্রুত এসে জুতোর নিচে চেপে ধরলেন। দুজনে ধরাশায়ী হল।

এবং কেষ্টবাবুর মতোই তাদের পিঠেও সশস্ত্র এবং ওজনদার দুজন মানুষ কর্নেল এবং ও.সি. তপেশ সান্যাল। কেষ্টবাবুর রিভলভার ছিটকে পড়েছিল। হালদারমশাই তার রিভলভারটা দেখিয়ে দীপুর উদ্দেশ্যে বললেন,—এই পোলাটা কী করে! খাড়াইয়া আছ ক্যান? কেষ্টবাবুর ফায়ার আর্মস কুড়াইয়া লও!

দীপু তবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। সুরেন লাফিয়ে এসে কেষ্টবাবুর রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল। তারপর ফিক করে হেসে দীপুকে বলল,—হ্যাঁ রে! তুই তো গিয়েছিলি হাফপ্যান্ট স্পোর্টিং গেঞ্জি পরে। ফিরলি সোয়েটার আর ফুলপ্যান্ট পরে। কে কিনে দিল?

দীপু এবার আড়ষ্টভাবে হেসে বলল,—চট্টরাজসায়েব!

ততক্ষণে ধরাশায়ী কেষ্ট অধিকারী এবং তার দুই সঙ্গীকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করিয়েছে। তপেশবাবু বললেন,—মিত্রবাবু! সাবধানে আসামীদের নিয়ে যান। আমি গড়ের জঙ্গল থেকে পুলিশফোর্সকে কলব্যাক করি। আমি নিচে গিয়ে ভ্যানে ফিরব। কর্নেলসায়েব—

কর্নেল দ্রুত বললেন,—আমি কফি খেতে বাংলোয় ফিরব। দীপুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। সুরেন, ওর বাবাকে তুমি গিয়ে খবর দাও। চলো দীপু!

তপেশবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি এবং দীপু, দুজনকেই আমাদের দরকার হবে।

—জানি। আজ রাতেই আমাদের সবাইকে আপনি কেষ্ট অধিকারী অ্যান্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য পেয়ে যাবেন। অবসরপ্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক ডঃ দেবব্রত চট্টরাজকে বরং রাজসাক্ষী করার ব্যবস্থা আমি কলকাতায় ফিরেই করব। চলি!

বাংলোয় ফেরার পর চৌকিদার নাখুলাল দীপুকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল,—দীপুবাবু! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কর্নেল বললেন, সুরেন দীপুর বাবাকে খবর দিতে গেছে। নাখুলাল! শিগগির কফি চাই! আর আমাদের হালদারমশাইয়ের জন্য এক বালতি গরম জলও চাই। উনি গেরুয়া ধুলো মেখে খাঁটি সায়েব হয়ে গেছেন।

হালদারমশাই বললেন,—খুব ধস্তাধস্তি বাধছিল। এরা চারজন। আমি একা।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে-খেতে কর্নেল বললেন,—তুমি কফি খাচ্ছ না কেন দীপু? কফি খেলে নার্ভ চাঙ্গা হবে। কফি খাও। আজ খেয়েছ?

দীপু বলল,—দুপুরে সুড়ঙ্গের মধ্যে খাবার এনেছিলেন কেষ্টবাবু। আমার খাওয়াদাওয়ার অসুবিধে হয়নি। শুধু উপেনদা আমাকে বস্তির একটা ঘরে গোবিন্দের কাছে আটকে রেখেছিল। সে আমাকে ড্যাগার দেখিয়ে হুমকি দিত। বাইরে থেকে তালা এঁটে রাখত।

—তুমি সেখান থেকে পালিয়েছিলে কী করে?

—এক রাত্রে গোবিন্দ মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় সেই ঘরে শুতে ঢুকেছিল। ভেতর থেকেও রোজ রাত্রে তালা এঁটে দিত। সে রাত্রে সে তালা আঁটতে ভুলে গিয়েছিল। খুব নেশা হয়েছিল তার। সেই সুযোগে আমি পালিয়ে গিয়েছিলুম। ডঃ চট্টরাজের নেমকার্ডের ঠিকানা আমার মুখস্থ ছিল। খুঁজে-খুঁজে তাঁর বাড়ি গেলুম। তাঁকে বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা দিলুম। কিন্তু উনি আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করতেন। বলতেন, উপেন দত্তের লোকেরা তোমাকে খুঁজছে। পরে বুঝেছিলুম, উনিও আমাকে আটকে রেখেছেন।

—হুঁ। বাকিটা আমার জানা। তোমার বত্রিশের ধাঁধার অঙ্কটা তোমার একটা বইয়ের ভিতরে পেয়ে গেছি। এই দ্যাখো!

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা ভাঁজকরা পুরনো কাগজ দেখালেন। দীপু বলল,—কিন্তু রত্নকোষ তো পাওয়া যায়নি।

কর্নেল বললেন,—রত্নকোষের কথা থাক। চুপচাপ কফি খাও। তোমার বাবা এলে একসঙ্গে

আমরা থানায় যাব। তারপর আজ রাত একটার ট্রেনে কলকাতা ফিরব। তোমার আর কোনও বিপদ হবে না।

একটু পরে কুমুদবাবু এলেন সুরেনের সঙ্গে। তিনি দীপুকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন।

❑

পুলিশের গাড়ি কর্নেল, হালদারমশাই এবং আমাকে সেই রাত্রে রায়গড় স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। কলকাতায় ফেরার পর সেইদিন বিকেলে কর্নেল আমাকে এবং হালদারমশাইকে হাজরা রোডে কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

অজয়েন্দুবাবু কর্নেলকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন,—বলুন কর্নেলসায়েব! আপনার অভিযান সফল হয়েছে তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—অভিযান সফল! কিন্তু একটা কথা। আপনি কি জানতেন কৃষ্ণকান্ত অধিকারী নানা অঞ্চলে জঙ্গিদের কাছে চোরা বিদেশি অস্ত্র পাচারের কারবার করত?

অজয়েন্দুবাবু আঁতকে উঠে বললেন,—কী সর্বনেশে কথা! ঘুণাক্ষরে টের পাইনি তো!

—যাই হোক, কেষ্টবাবু সদলবলে ধরা পড়েছে। আপনাকে পরে বিস্তারিত বলব। আপাতত একটা গোপন কাজকর্ম করতে চাই। আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিন। বাইরে যেন কেউ না থাকে।

কুমারবাহাদুর বেরিয়ে গিয়ে সেইমতো ব্যবস্থা করে এসে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন। তাঁকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল। তিনি চাপাস্বরে বললেন,—সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা উদ্ধার করতে পেরেছেন কি?

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগ থেকে প্রথমে খবরের কাগজের প্যাকেটে ভরা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটা তাঁকে দিলেন। তারপর বললেন,—এবার আপনাকে যে জিনিসটা দেব, সেটা দেখলে আপনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষ সেই জিনিসটা মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন।

বলে তিনি কিটব্যাগ থেকে প্যাকেটে ভরা একটা জিনিস বের করলেন। দেখামাত্র চিনতে পারলুম, এটা হাড়মটমটিয়ার জঙ্গলে উপেন দত্তের মৃতদেহের কাছে নগ্ন মাটি খুঁড়ে সুরেন বের করেছিল। কর্নেল মেটাল ডিটেক্টরে এটারই খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে খুলে বলেননি। আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে থেকেছেন।

প্যাকেটের ভিতর থেকে ছোট্ট চৌকোগড়নের কালো জিনিসটা কর্নেল বের করে বললেন,—এটা একটা রত্নকোষ। এটার কথাই সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আছে। এবার দেখুন, আমি বত্রিশের ধাঁধার সূত্র অনুসারে এটা খুলছি। তবে ধাঁধার জট ছাড়ানোর কৃতিত্ব আমার নয়, কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের ছেলে দীপুর। এই ছকের উল্লেখ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে আভাসে ছিল। এই দেখুন!

কর্নেল পকেট থেকে দীপুর বইয়ের ভিতরে পাওয়া কাগজটা টেবিলে মেলে ধরলেন। বললেন,—এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যা 'চতুষ্ক' পদ্ধতিতে এমন সাজাতে হবে, যে-কোনও দিকের যোগফল বত্রিশ হয়। দীপু সেই বত্রিশের ধাঁধার জট কীভাবে খুলেছে লক্ষ করুন।

	৩২	৩২	৩২	৩২	
৩২	১	৮	৯	১৪	৩২
৩২	১১	১২	৩	৬	৩২
৩২	৭	২	১৫	৮	৩২
৩২	১৩	১০	৫	৪	৩২
	৩২	৩২	৩২	৩২	

অজয়েন্দুবাবু রত্নকোষটি দেখে বললেন,—প্রায় তিনশো-চারশো বছরের এই জিনিসটা এখনও পরিষ্কার আছে দেখছি!

কর্নেল বললেন,—পরিষ্কার ছিল না। আমি ব্রাশের সাহায্যে লোশন দিয়ে এটাকে পরিষ্কার করেছি। এবার এই আতশ কাচের সাহায্যে নাগরি অক্ষরে লেখা সংখ্যাগুলো দীপুর ছক অনুসারে টিপে যাচ্ছি। চারদিক থেকে সংখ্যাগুলো চারবার টিপলে রত্নকোষটা খুলে যাবে।

কর্নেল সাবধানে তর্জনীর চাপে রত্নকোষের পর পর লেখা ১ থেকে ১৫টি সংখ্যা একে একে ছক অনুসারে চারদিকে থেকে চারবার পর-পর টিপলেন। অমনই রত্নকোষটা খুলে দুভাগ হয়ে গেল। আমরা দেখলুম, ভিতরে রংবেরঙের একটি রত্নমালা ঝলমল করে উঠল। কর্নেল মালাটি তুলে বললেন,—হীরা-চুনি পান্না মুক্তা সাজানো ঐতিহাসিক মালা। এখন এর দাম হয়তো বহু লক্ষ টাকা। এই মালা মোগল সোনাপতি রাজা মানসিংহ্ আপনার পূর্বপুরুষকে উপহার দিয়েছিলেন। অতএব আইনত এটা আপনারই প্রাপ্য।

বলে তিনি রত্নমালাটি কুমারবাহাদুর অজয়েন্দু রায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। হালদারমশাই সহাস্যে বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! এমন একখানা হিস্টোরিক্যাল জুয়েলের জন্য যুদ্ধ বাধবে না ক্যান?

অজয়েন্দুবাবু রত্নমালা গলা থেকে খুলে কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—আবার আগের মতো রত্নকোষে এটা ভরে দিন। আমি আয়রনচেস্টে লুকিয়ে রাখব। তারপর আপনাকে ডেকে আবার এটা বের করে বিক্রি করব। সেই টাকায় একটা অনাথ আশ্রম খুলব।

কর্নেল মালাটা আগের মতো রত্নকোষে সাজিয়ে দুটো ঢাকনা টিপে ধরলেন। রত্নকোষ আবার বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল টানাটানি করে দেখে বললেন,—আবার বত্রিশের ধাঁধার জট না ছাড়াতে পারলে এটা খুলবে না। কাজেই দীপুর এই কাগজটা রেখে দিন। আর-একটা কথা, কুমুদবাবু গরিব মানুষ। দীপুর পড়াশুনার জন্য—

তাঁর কথার ওপর অজয়েন্দুবাবু বলে উঠলেন,—দীপুর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব আমার। কুমুদকে আজই লিখে পাঠাচ্ছি। এবার এটা আমি আয়রনচেস্টে রেখে আসি। তারপর কফি খেতে-খেতে আপনার কাছে সব কথা শুনব।

উনি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলে হালদারমশাই বললেন,—কথাটা বলি নাই। এবার বলি। কেষ্টবাবুর পিঠে চাপছিলাম। তখনই ট্যার পাইছিলাম, অর পিঠে একখানা আব আছে। কুঁজও কইতে পারেন। কুঁজে হেভি প্রেসার দিছিলাম।

কর্নেল কথাটা শুনে অট্টহাসি হেসে উঠলেন।

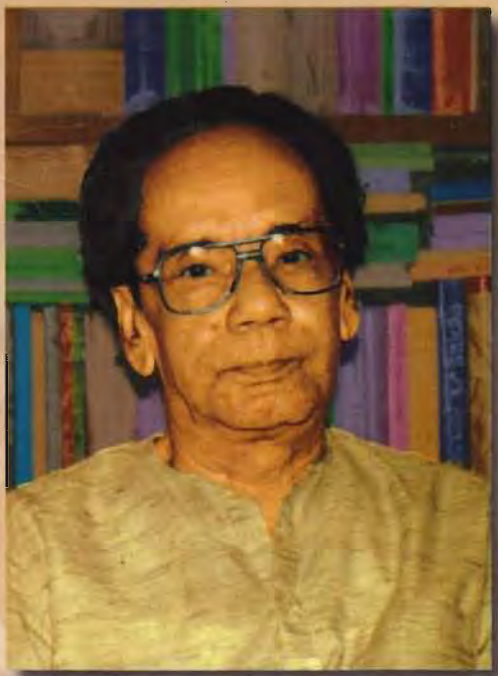

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।

কিশোর

কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কিশোর কর্নেল সমগ্র

৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

KISHORE COLONEL SAMAGRA (Vol - IV)
A Collection of Bengali Detective Stories for Juvenile
by SYED MUSTAFA SIRAJ
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920, Fax : (91-033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 160.00

ISBN : 978-81-295-0803-4

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১০, মাঘ ১৪১৬

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

দাম : ১৬০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেখকের অন্যান্য বই

শঙ্খগড়ের ভ্যাম্পায়ার রহস্য
কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়)
নেপথ্যে আততায়ী
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
ছায়ার আড়ালে
কুয়াশার রঙ নীল
নাগমিথুন
তৃণভূমি
প্রেতাত্মা ও ভালুক রহস্য

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভুতুড়ে

এতে আছে

ব্যাকরণ রহস্য/৯
আজব বলের রহস্য/৫৮
পোড়ো খনির প্রেতিনী/৮৯
নীলপুরের নীলারহস্য/১১২
হায়েনার গুহা/১৩০
হিটাইট ফলক রহস্য/১৬৪
ঠাকুরদার সিন্দুক রহস্য/২১৮
রায়বাড়ির প্রতিমা রহস্য/২৫২
কালিকাপুরের ভূত রহস্য/৩০১

ব্যাকরণ রহস্য

"ছাগলে কী না বলে, পাগলে কী না খায়!" বাঁকা মুখে কথাটি বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার, আমাদের প্রিয় হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

হাসি চেপে বললুম, "একটু ভুল হল হালদারমশাই!"

গোয়েন্দা-ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চার্জ করলেন, "কী ভুল? যতসব পাগল-ছাগলের কারবার!"

"সে-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একমত।"

"তা হলে?"

"কথাটা উলটে গেছে। ওটা হবে, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।"

গোয়েন্দামশাই এবার তাঁর অনবদ্য 'ফ্যাঁচ্' শব্দটি বের করলেন। অর্থাৎ হাসলেন। "তাই বটে। তবে আমার রাগ হচ্ছিল, বুঝলেন? ভদ্রলোকের মাথার গণ্ডগোল আছে। খামোকা কর্নেল-স্যারের মূল্যবান সময়ের অপচয় করে তো গেলেনই, উপরন্তু আমারও ক্ষতি করলেন।" বলে নিজের কাঁচা-পাকা চুল খামচে ধরলেন। মুখে আঁকুপাঁকু ভাব।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার প্রকাণ্ড একটা বইয়ের পাতা খুলে মনোযোগী ছাত্রের মতো কী সব নোট করছিলেন। দাঁতে কামড়ে-ধরা চুরুট। সেটি নিবে গেছে বলেই আমার ধারণা। তবে ওঁর সাদা সান্তাক্লজ সদৃশ দাড়িতে একটু ছাই আটকে আছে এবং সকালের রোদ্দুরের ছটায় চওড়া টাক ঝকমক করছে। মুখ না তুলেই বললেন, "হালদারমশাই যা বলতে এসেছিলেন, আশা করি সেটা ভুলে গেছেন।"

বিমর্ষ মুখে হালদারমশাই শুধু বললেন, "হঃ।"

"মাথার ভেতর পাগল আর ছাগল যুদ্ধ করছে," বলে কর্নেল এবার মুখ তুলে মিটিমিটি হাসলেন। "তবে জয়ন্ত যা বলল, ঠিক নয়। হালদারমশাই ঠিকই বলেছেন, ছাগলে কী না বলে, পাগলে কী না খায়।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী বলছেন! কথাটা একটা বাংলা প্রবচন। তাকে উলটে দিচ্ছেন আপনি?"

কর্নেল আমাকে পাত্তা না দিয়ে বললেন, "আসলে হালদারমশাইয়ের বলতে আসা কথাটা এক্ষেত্রে পাগলেই খেয়ে ফেলেছে।"

বই বন্ধ করে রেখে প্রকৃতিবিদ উঠে দাঁড়ালেন। সাদা দাড়ি থেকে ছাইয়ের টুকরোটি খসে পড়ল। আমাদের কাছে এসে বসলেন। তারপর নিবে-যাওয়া চুরুটটি লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে নিলেন এবং একরাশ ধোঁয়ার ভেতর ফের বললেন, "ছাগলে কী না খায়, এটা একেবারে বাজে কথা। ছাগলের যা খাদ্য, তাই ছাগল খায়। কিন্তু সেই ছাগল যখন মানুষের ভাষায় আবোল-তাবোল বলে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন..."

কর্নেলের কথার ওপর বললুম, "আপনি ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করেছেন দেখছি।"

"হুঁউ, করেছি।"

হতভম্ব হয়ে বললুম, "কী আশ্চর্য! ছাগল শুধু ব্যা করে শুনেছি।"

"ব্যা-করণ রহস্য ডার্লিং! ব্যাকরণ রহস্যও বলতে পারো।"

"কী বলছেন! ওঁর হাবভাব কথাবার্তা শুনেও ওঁকে বদ্ধ পাগল মনে হল না আপনার?"

কর্নেল হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে চোখ বুজলেন। আপনমনে বলতে থাকলেন, "ছাগলটা কালো। কালো যা কিছু, মানুষের কাছে তাই অশুভ। কারণ কালো রং অন্ধকারের প্রতীক। অন্ধকারে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে। তা ছাড়া কালোর সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক আছে ধরে নিয়েই যেন কালো শোকবস্ত্র পরার প্রথা...হুঁ, বিজ্ঞানীরাও এই কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। 'ব্ল্যাক হোল' কথাটিতে সেটা স্পষ্ট। নক্ষত্রের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত এই টার্ম। ...যাই হোক, কালো ছাগলটা আবার কিনা একটা পোড়োবাড়ির ভাঙা দেউড়ির মাথায় চড়ে ঘাস-পাতা খায় এবং অদ্ভুত একটা কথা বলে নিপাত্তা হয়ে যায়!"

হালদারমশাই কান দুটো খাড়া করে ওঁর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আপনি ওই ভদ্রলোকের চেয়ে আরও পাগল!"

"উঁহু, পাগল নয় ডার্লিং, ছাগল," কর্নেল চোখ খুলে বললেন। এবার মুখটা গম্ভীর। "মুরারিবাবু, মুরারিমোহন ধাড়া স্পষ্ট শুনেছেন ছাগলটা তাঁকে কিছু বলছে। একদিন নয়, তি-ন দিন," বলে কর্নেল তিনটে আঙুল দেখালেন।

অমনি হালদারমশাই সশব্দে শ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, "মনে পড়েছে! মনে পড়েছে!"

জিজ্ঞেস করলুম, "কী হালদারমশাই?"

হালদারমশাই ছটফটিয়ে বললেন, "ওই যে কর্নেল-স্যার তিনখান ফিঙার দ্যাখাইলেন, লগে-লগে কথাখান আইয়া পড়ল।"

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূল?"

প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভীষণ হকচকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমিও একটু অবাক। বললুম, "থট-রিডিং, নাকি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছেন?"

ধুরন্ধর প্রকৃতিবিদ বললেন, "তোমার এই একটা অদ্ভুত স্বভাব জয়ন্ত! তুমি কাগজের খবর লেখো, কিন্তু খবর পড়ো না। ময়রা নাকি সন্দেশ খায় না। যাই হোক, হালদারমশাই, জয়ন্তদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আজ যে ভয়ঙ্কর ত্রিশূলের খবর বেরিয়েছে, তার সঙ্গে একটু আগে মুরারিবাবুর আবির্ভাবের সম্পর্ক আছে। না, থট-রিডিং নয়, নিছক অঙ্ক। খবরটার ডেটলাইন হল রূপগঞ্জ। আর মুরারিবাবুর বাড়িও রূপগঞ্জে।"

হালদারমশাই বললেন, "কিন্তু ভদ্রলোক তো ত্রিশূলের ব্যাপারটা বললেন না?"

আমিও বললুম, "শুধু ছাগল-টাগল নিয়েই বকবক করে গেলেন।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "বেশি উত্তেজনা অনেক প্রাসঙ্গিক কথা ভুলিয়ে দেয়। তা ছাড়া ভদ্রলোক পাগল না হলেও একটু ছিটগ্রস্ত, তাতে সন্দেহ নেই। তবে...হ্যাঁ, উনি ফিরে আসছেন। সিঁড়িতে ভীষণ পায়ের শব্দ আর লিন্ডাদের কুকুরটা আবার চেঁচাচ্ছে! যে কারণেই হোক, কুকুরটা ওঁকে পছন্দ করছে না।" বলে হাঁক ছাড়লেন, "ষষ্ঠী, দরজা খুলে দে।"

কলিং বেল বাজল। বাজল বলা ঠিক হচ্ছে না, বাজতে লাগল। বিরক্তিকর! গ্রামগঞ্জের মানুষ বলে নয়, ছিটগ্রস্ত—তাও বিশ্বাস করি না, বদ্ধ পাগল! কলিং বেল একবার বাজানোই তো যথেষ্ট। যেন কারা তাড়া করেছে কাউকে এবং সে মরিয়া হয়ে কলিং বেলের বোতাম টিপে চলেছে। ষষ্ঠীচরণ ছোট্ট ওয়েটিং-রুমের ভেতর বাঁকা মুখে বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলুম। বাইরের লোক এলে ওখানেই বসিয়ে রেখে সে কর্নেল-'বাবামশাই'কে খবর দেয়। আমরা যে বিশাল ঘরটাতে রসে আছি, এটা ড্রইংরুম, তবে জাদুঘর বা প্রত্নশালা-পাঠাগার-গবেষণাগার এসবের একটা বিচিত্র জগাখিচুড়ি।

হ্যাঁ, তিনিই বটে। হুড়মুড় করে পরদা ফুঁড়ে ঢুকেই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি।"

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূল?"

ভদ্রলোক বললেন, "ত্রিশূল।" তারপর অদ্ভুত খ্যাঁক শব্দে কষ্টকর হাসি হাসলেন। এমন বিদঘুটে হাসি মানুষের মুখে কখনও শুনিনি।

হালদারমশাইয়ের 'ফ্যাঁচ-টা হাসিই বটে। এই 'খ্যাঁক'-টা দাঁত খিঁচুনি।

কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন মুরারিবাবু।"

"বসব না। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে! তবে আপনি স্যার, সত্যিই অন্তর্যামী! নকুলদার কথা বর্ণে-বর্ণে মিলে গেল এতক্ষণে। নকুলদার চেনাজানা ছিলেন বঙ্কুবাবু...বঙ্কুবিহারী ধাড়া স্যার...সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই হন। ব্রিটিশ আমলে অমন ডাকসাইটে দারোগা আর দুটি ছিল না। তাঁর কাছে নকুলদা আপনার সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক গল্প শুনেছিল। ...তবে স্যার, কালো ছাগলটারও একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল। ছাগলটার তিনটে শিং। তার, তিরিশ ফুট উঁচু দেউড়ির মাথায় ওঠে কী করে? ...আর স্যার...হ্যাঁ, মনে পড়েছে! কাছেই শিবমন্দিরটা। তার মাথায় ত্রিশূল। ...সেও তিন, এও তিন...তিন তিরিক্কে নয়...নয়-নয়ে একাশি...! ...কালো ছাগলটা স্পষ্ট বলেছে 'একাশি', বুঝুন স্যার! এক প্লাস আশি, একাশি! এক বাদ দিলে রইল আশি। আশির শূন্য বাদ দিন। রইল আট। এবার ওই বাদ দেওয়া এক-কে আটের সঙ্গে যোগ করুন, আবার নয় পাচ্ছেন। তিন তিরিক্কে নয়। ছাগলের তিনটে শিং আর মন্দিরের মাথায় তিনটে শিং। গুণ করলে নয় পাচ্ছেন না কি?...আমি আসি স্যার! ট্রেন ফেল হবে," বলে মুরারিবাবু ঘুরেই পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "ত্রিশূলটা, মুরারিবাবু!"

"ও, হ্যাঁ! ত্রিশূলটার কথা বলা হল না। মাথার ঠিক নেই স্যার!" মুরারিবাবু নিজের মাথায় গাঁট্টা মেরে একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। "কালো ছাগলটা পরপর তিনদিন আমাকে বলেছে, একাশি। চারদিনের দিন রাত্তিরে দেখি, সেই দেউড়ির নীচে ঘাসের ওপর নকুলদা মরে পড়ে আছে। পিঠে তিনটে ক্ষত। রক্ত শুকিয়ে গেছে। চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করলুম। তারপর স্যার আশ্চর্য ঘটনা...মন্দিরের ত্রিশূলে রক্ত...কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! পুলিশ এল। কিন্তু কিছুই হল না। ...চলি স্যার! ট্রেন ফেল হবে।"

হালদারমশাই সোজা টানটান হয়ে বসে কথা শুনছিলেন। অভ্যাসমতো বলে উঠলেন, "রহস্য! প্রচুর রহস্য!"

কর্নেল বললেন, "মুরারিবাবু! পুলিশকে কালো ছাগলটার কথা বলেছেন কি?"

মুরারিবাবু ততক্ষণে ওয়েটিং-রুমটাতে ঢুকে গেছেন। সেখান থেকেই জবাব দিলেন, "বলেছি। দারোগাবাবু বললেন, মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি হোন। ...শুনে বেজায় রাগ হল বলেই আপনার কাছে...নাঃ, ট্রেন ফেল হবে।"

মুরারিবাবু সশব্দে বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে তেমনি জুতোর শব্দ এবং কুকুরের চেঁচানি শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল হাঁকলেন, "ষষ্ঠী, দরজা বন্ধ করে দে।"

হালদারমশাই নড়েচড়ে বসে আবার একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, "তখন শুধু ছাগল ছিল। এবার এল মার্ডার। কাগজে ছাগল-টাগলের কথা লেখেনি। তবে ত্রিশূলে রক্তের দাগ আর ডেডবডির পিঠে তিনটে ক্ষতচিহ্নের কথা লিখেছে। মন্দিরে পুজো বন্ধ ছিল। আবার ঘটা করে ঢাকঢোল পুজোআচ্চা পাঁঠাবলির কথা লিখেছে। রীতিমতো রহস্য।"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "ব্যা-করণ কিংবা ব্যাকরণ রহস্য।"

আমি অবাক হয়ে বললুম, "বারবার এ-কথাটা বলার কারণ কী?"

"তুমি কি ব্যাকরণ পড়োনি ডার্লিং?"

"স্কুলে পড়েছি। কিন্তু এখানে ব্যাকরণ আসছে কী সূত্রে?"

"সন্ধি, জয়ন্ত, সন্ধি! এক এবং আশি এই দুটো শব্দ সন্ধি করলে একাশি হয়।"

ষষ্ঠী ট্রে'তে কফি আর স্ন্যাকস্ রেখে গেল। কর্নেল তার উদ্দেশে বললেন, "শিগগির ছাদে যা তো ষষ্ঠী! কাকের ঝগড়া শুনতে পাচ্ছি! ফের কোনো ক্যাকটাসের ভেতর কার ঠোঁট থেকে মরা ইঁদুর পড়ে গেছে হয়তো।"

ষষ্ঠী ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটল। এই ঘরের কোণা থেকে এঁকেবেঁকে সিঁড়িটা ছাদে কর্নেলের শূন্যোদ্যানে উঠে গেছে। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "রূপগঞ্জের ওদিকে এক জাতের অর্কিড দেখেছিলুম। এনে বাঁচাতে পারিনি। 'রেনবো অর্কিড' নাম দিয়েছিলুম। রামধনুর মতো সাতরঙা ফুল ফোটে। মোট তিনটে পাপড়ি। মাই গুডনেস!" কর্নেল নড়ে বসলেন। "আবার সেই তিন...তিন তিরিক্কে নয়...নয়-নয়ে একাশি। কালো ছাগলের ব্যা-করণ!"

হেসে ফেললুম, "মুরারিবাবু এ-ঘরে এক খাবলা পাগলামি রেখে গেছেন। আপনার মাথায় সেটা ঢুকে পড়েছে।"

হালদারমশাইকে প্রচণ্ড উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কফির পেয়ালায় পুনঃ পুনঃ ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে দ্রুত গিলে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, "ছাগলেরও তিনটে শিং! বোকা বানিয়ে চলে গেল। পাগল না সেয়ানা পাগল। ...অরে ফলো করুম। কর্নেল-স্যারের লগে ফাইজলামি?"

কর্নেল বললেন, "তার আগে একটু ব্যাকরণচর্চা করে নিন, হালদারমশাই!"

"ক্যান?" হালদারমশাইয়ের চোখ দুটো গোলাকার দেখাল।

"ছাগল কোন লিঙ্গ জানেন তো?"

আমি ঝটপট বললুম, "স্ত্রীলিঙ্গ। পুংলিঙ্গে পাঁঠা।"

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমাদের কাগজের লোকেদের নিয়ে এই এক জ্বালা। সুকুমার রায়ের হাঁসজারু! ব্যাকরণ মানো না। ছাগল পুংলিঙ্গ এবং তার দাড়িও থাকে।" বলে হালদারমশাইয়ের দিকে ঘুরলেন। এবার মুখে অমায়িক ভাব। "হালদারমশাই, কথাটা মনে রাখবেন। ছাগল পুংলিঙ্গ। কাজেই তার দাড়ি থাকে। রূপগঞ্জে শিবমন্দিরে যে চারঠেঙে জীবগুলো বলি দেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর দাড়ি আছে, এটা ইমপর্ট্যান্ট।"

"হঃ!" কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার রূপগঞ্জের মুরারিমোহন ধাড়ার দ্বিগুণ জোরে বেরিয়ে গেলেন।

চুপচাপ কফি খাওয়ার পর বললুম, "আপনার কথাটাও সুকুমার রায়ের সেই বদ্যিবুড়োর পদ্যটার মতো হল, যে নাকি হাত দিয়ে ভাত মেখে খেত এবং খিদে পেত বলেই খেত। আশ্চর্য! দাড়িওলা ছাগলকেই তো লোকে পাঁঠা বলে এবং শুধু পাঁঠাই বলি হয়।"

"অবশ্যই।" কর্নেল দাড়ি নেড়ে সায় দিলেন। "ছাগলি বলিদান শাস্ত্রমতে চালু নয়।"

"তা হলে কথাটা ইমপর্ট্যান্ট বলার কারণ কী?"

"একাশির হ্যাপা। সন্ধিবিচ্ছেদ করা কতকটা ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হওয়ার মতো। বলিদান হলেই প্রব্লেম!" কর্নেল ঘনঘন দাড়িতে হাত বুলোতে শুরু করলেন। "হুঁ, ফের সুকুমার রায় এসে যাচ্ছেন। 'গোঁফচুরি' পদ্যটা। 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।' এক্ষেত্রে দাড়ি দিয়ে চেনার একটা ব্যাপার আছে। সব দাড়ি একরকম নয়, ডার্লিং! আমার মনে হচ্ছে, ছাগলটার দাড়ি তাকে বাঁচাতে পারত—কিন্তু তার তিনটে শিং নিয়েই সমস্যা।"

কর্নেল হঠাৎ উঠে পায়চারি শুরু করলেন এবং রূপগঞ্জের ওই ছিটগ্রস্ত ভদ্রলোকের মতো এলেবেলে কথাবার্তা বিড়বিড় করে বলতে থাকলেন। "...বলির জন্তুর কোনো খুঁত থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। কিন্তু তিনটে শিং থাকাটা কি খুঁত? ও-তল্লাটে শাস্ত্রজ্ঞ বামুন আছেন অনেক। শিবমন্দিরের ছড়াছড়ি...ধ্বংসস্তূপ...জঙ্গল...ঢিবি...শৈবযুগে এক রাজাও ছিলেন দেখলুম। শিবসিংহ!"

অমনি লেখাপড়ার টেবিলের সেই প্রকাণ্ড বইটার দিকে চোখ গেল। বাদামি চামড়ায় বাঁধানো পুস্তকখানিতে সোনালি হরফে লেখা আছে, 'Ancient Kingdoms of Bengal, Vol. I'.

একটু হেসে বললুম, "তাহলে এখানেও শিং এসে যাচ্ছে। একটা পপুলার বাংলা গান শুনেছি, 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ/ডিম নেই তবু অশ্বডিম্ব...' তাতে 'ভ্যাবাচাকা' কথাটাও ছিল মনে পড়ছে।"

কর্নেল আমার দিকে ঘুরে বললেন, "রেনবো অর্কিড, ডার্লিং! তুমি তো আকাশে রামধনু দেখেছ। পৃথিবীতে রামধনু... শ'য়ে-শ'য়ে রামধনু দেখতে হলে রূপগঞ্জে চলো। গেঁয়ো যোগী ভিক্ষে পায় না বলে একটা কথা আছে। রূপগঞ্জের লোকেরা রেনবো অর্কিডের কদর বোঝে না। চোখ জ্বলে যায়, জয়ন্ত। কী অসাধারণ সৌন্দর্য এই এপিলে!"

"তার মানে, আপনি যাচ্ছেন এবং আমাকেও তাতাচ্ছেন!"

কর্নেল টেলিফোনের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, "রূপগঞ্জ নামটা যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তিনি নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যরসিক। শুধু কি রেনবো অর্কিডের ফুল? প্রজাপতিও। আর সেই প্রজাপতির ডানায় রামধনুর সাতরঙা সৌন্দর্য! দুঃখের কথা, ডার্লিং! রেনবো অর্কিড এনে বাঁচাতে পারিনি। তার চেয়ে আরও দুঃখ প্রজাপতিগুলো এত চালাক যে, একটাও নেটে আটকাতে পারিনি।"

ফোনে হাত বাড়াতে গিয়ে ডাইনে দরজার দিকে প্রায় ঝাঁপ দিলেন কর্নেল। কী একটা জিনিস তুলে নিলেন মেঝের কার্পেট থেকে।

একটা ছোট্ট গোল কালচে রঙের খয়াটে চাকতি।

বললুম, "কী ওটা?"

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করে দেখতে দেখতে বললেন, "প্রাচীন যুগের মুদ্রা অথবা সিল। পরিষ্কার করলে বোঝা যাবে। মনে হচ্ছে, মুরারিবাবুর হাতেই এটা ছিল। দেখাতে এনেছিলেন। ট্রেন ফেলের ভয়ে তাড়াহুড়োয় হাত থেকে পড়ে গেছে। কার্পেটে পড়ার জন্যই শব্দ হয়নি। তবে...ওই! আবার উনি আসছেন। জয়ন্ত, দরজা খুলে দাও, প্লিজ!"

ফের নীচের দোতলায় কুকুরের চ্যাঁচামেচি, বিচ্ছিরি জুতোর শব্দ। ভদ্রলোক ছিটগ্রস্ত নন, বদ্ধ পাগলই। বাইরের দরজা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে দেখলুম, কলিং বেলের দিকে ওঠানো হাত সটান নেমে গেল এবং সেই বিদঘুটে খ্যাঁক হেসে আমাকে ঠেলে ঢুকে পড়লেন। আগের মতো হাঁসফাঁস করে বললেন, "আবার ভুল! আসলে মাথার ঠিক নেই। ওদিকে ট্রেনের সময় হয়ে গেছে...কোথায় যে জিনিসটা হারিয়ে ফেললুম, কে জানে...হাতেই ছিল..."

"চাকতি?" কর্নেল জিনিসটা দেখালেন।

মুরারিবাবুর মুখে স্বস্তি ফুটে উঠল। "পেয়েছেন? বাঁচলুম তা হলে। যাই, ট্রেন ফেল হবে," বলে ঘুরে পা বাড়ালেন।

কর্নেল বললেন, "মুরারিবাবু, এটা কোথায় পেয়েছেন?"

মুরারিবাবু না ঘুরে জবাব দিলেন, "নকুলদার হাতের মুঠোয়। পুলিশকে বলিনি। ...ট্রেন ফেল হবে।"

তারপর অদৃশ্য হলেন। ফের সিঁড়িতে শব্দ, কুকুরের চ্যাঁচানি। দরজা বন্ধ করে ড্রইং-রুমে ফিরে দেখি কর্নেল একটা শিশিতে ছোট্ট বুরুশ চুবিয়ে চাকতিটাতে খুব ঘষাঘষি করছেন। সোফায় বসে ওঁর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ করতে থাকলুম। একটু পরে ষষ্ঠী শূন্যোদ্যান থেকে নেমে একগাল হেসে ঘোষণা করল, "না বাবামশাই! মরা ইঁদুর নয়, খামোকা ঝগড়া। আপনাকে বলি না কাকেরা বড্ড ঝগড়াটে।"

'বাবামশাই' কান করছেন না দেখে সে আমার উদ্দেশে বলল, "বুঝলেন দাদাবাবু? যার ওপরটা কালো, তার ভেতরটাও কালো। কালো বেড়াল, কালো কুকুর...আপনারা কালো ছাগলের কথা বলছিলেন, কানে আসছিল। বড্ড গণ্ডগোলে স্বভাব, দাদাবাবু! দোতলার মেমসায়েব একটা কালো কুকুর পুষেছেন। খালি চ্যাঁচায়। ওই সিঙ্গিবাবুদের একটা কালো ময়না আছে। আমাকে দেখলেই ইংরিজিতে গাল দেয়..."

কর্নেল মুখ তুলে তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই ষষ্ঠী কেটে পড়ল।

দেখলুম, খয়াটে চাকতিটা মোটামুটি সাফ হয়েছে। "সোনা না পিতল?" জিজ্ঞেস করলুম।

কর্নেল চাকতিটাতে চোখ রেখে বললেন, "তুমি সাংবাদিক হলে কী করে জানি না। আজকাল খাঁটি সাংবাদিক হতে হলে 'জ্যাক অব অল ট্রেড' হওয়া দরকার। কিন্তু হোপলেস জয়ন্ত। সোনা বা পিতল অন্তত চেনা উচিত। এটা ব্রোঞ্জ! হ্যাঁ, পুরোনো সোনা অনেক সময় একটুখানি তামাটে দেখায়। কিন্তু এত বেশি তামাটে নয়।" বলে উঠে গেলেন। বইয়ের ঝাঁক থেকে আবার একটা বিশাল বই নিয়ে এলেন।

গতিক বুঝে বললুম, "চলি। আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স। একটু তৈরি হয়ে যাওয়া দরকার।"

কর্নেল হাসলেন। "মোটা বই দেখে ভয় পাওয়ার কারণ নেই, ডার্লিং! মাথার সাইজ মোটা হলেই যেমন বিদ্যাসাগর হওয়া যায় না, মোটা বই মাত্রই তেমনি বিদ্যার সাগর নয়। মোটা মানুষ হলেই তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যাবে? বরং মজার ব্যাপারটা দ্যাখো জয়ন্ত! বোকাদেরই আমরা মাথামোটা বলি। অথচ মোটা যা কিছু, তার প্রতি আমাদের ভয়-ভক্তি প্রচুর...এই বইটার সাইজ মোটা। প্রচুর বাক্য ছাপা আছে। কিন্তু আমার দেখার বিষয় হল এর ফোটোগ্রাফগুলো। এক মিনিট! চাকতিটার সঙ্গে মিলিয়ে নিই।"

বুঝলুম, বইটা প্রাচীন মুদ্রা এবং সিল সম্পর্কে কোনো পণ্ডিতের গবেষণার ফলাফল। ধৈর্য, নিষ্ঠা আর হাতে সময় না থাকলে এমন জিনিস তৈরি করা যায় না। কিন্তু তার চেয়ে বড় ঘটনা হল, রূপগঞ্জের ব্যা-করণ রহস্য যা ব্যাকরণ রহস্য—কর্নেল যাই বলুন, ভীষণ জট পাকিয়ে গেল যে!

কর্নেল বই বন্ধ করে রেখে চাকতিটাকে আবার আতসকাচে পরীক্ষা করতে থাকলেন। তারপর নিভন্ত চুরুটটি জ্বেলে বললেন, "হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলতে গেলে প্রচুর রহস্য, প্রচুর।"

"জিনিসটা কী?"

"পুরোনো মুদ্রা। কিন্তু আশ্চর্য, এতে একটা তিন-শিংওয়ালা ছাগলের মূর্তি খোদাই করা আছে!"

"বলেন কী!" বলে কর্নেলের কাছে গিয়ে চাকতিটা দেখলুম। আবছা একটা ছাগল জাতীয় প্রাণীর মূর্তি দেখা যাচ্ছে। মাথায় ত্রিশূলের মতো তিনটে শিং, কী সব দুর্বোধ্য লিপিও খোদাই করা রয়েছে।

কর্নেল বললেন, "এও আশ্চর্য, বিস্তর প্রাণী দেবদেবী হিসেবে বা দেবদেবীর বাহন হিসেবে মানুষের পুজো পেয়েছে। কিন্তু ছাগল? সে তো বলির প্রাণী।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। বললুম, "সে যাই হোক, আমার ভাবনা হচ্ছে হালদারমশাই মুরারিবাবুকে মিস করেছেন। তবে মিস করুন বা নাই করুন, রূপগঞ্জে উনি যাবেনই এবং এও ঠিক, গণ্ডগোলে পড়বেন। ওঁর যা স্বভাব। রহস্যের গন্ধ পেলেই হল। আসলে পুলিশের চাকরি থেকে রিটায়ার করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন, কিন্তু মক্কেল জোটে না। কাজেই যেচে মক্কেল জোটাতে ছাড়েন না। পকেট থেকে ট্রেন-ভাড়া দিয়েও যাওয়া চাই।"

"জয়ন্ত, আমরাও ট্রেনে যাব!" কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "গত এপ্রিলে গাড়ি নিয়ে গিয়ে বড্ড ঝামেলায় পড়েছিলুম। জায়গায়-জায়গায় রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। ট্রেনই ভালো। শুধু একটাই অসুবিধে। পরের ট্রেনে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে। প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ইরিগেশন বাংলো। চড়াই রাস্তা বলে সাইকেল-রিকশা মেলে না—সে তুমি যত টাকাই ভাড়া দাও না কেন। একটা ভরসা ঘোড়াগাড়ি। কিন্তু রাতবিরেতে ঘোড়াগাড়ি পাওয়ার চান্স কম। ...হুঁ, ডি ই ভদ্রলোককে বললে জিপের ব্যবস্থা হতে পারে। তাঁকে টেলিফোনে পাওয়া সমস্যা। তবে কলকাতা হেডকোয়ার্টার থেকে বাংলো বুক করার অসুবিধে নেই। দেখা যাক।"

উনি টেলিফোনের দিকে উঠে গেলেন। বললুম, "হালদারমশাইয়ের মতো তাড়াহুড়ো না করলেই কি নয়? আগামীকাল সকালের ট্রেনে গেলে ক্ষতি কী?"

কর্নেল মুখটা যথেষ্ট গম্ভীর করে বললেন, "ক্ষতি মুরারিবাবুরই হওয়ার চান্স বেশি। ভদ্রলোক একেবারে ছিটগ্রস্ত। আমার খুব ভয় হচ্ছে জয়ন্ত..." কথা শেষ না করে কর্নেল ফোন তুলে ডায়াল করতে থাকলেন।

দুই

ট্রেন, না ছ্যাকরা গাড়ি! স্টেশনেও থামছে, আবার যেখানে স্টেশন নেই, সেখানেও থামছে। আর যখনই থামছে, নড়তেই চায় না। চাকাগুলোর শব্দে বড় অনিচ্ছা বিরক্তির প্রকাশ। আমাদের দু'জনের জন্য রিজার্ভ-করা ক্যুপে-তে কর্নেল এক উটকো যাত্রী ঢুকিয়েছিলেন। বর্ধমান স্টেশনে সন্ধ্যা নাগাদ এঁর হন্তদন্ত আবির্ভাব। যাবেন রূপগঞ্জে। নাদুসনুদুস বেঁটে গড়নের লোক। এক হাতে ফোলিও ব্যাগ, অন্য হাতে খবরের কাগজে জড়ানো চৌকো বোঁচকা, পরে দেখলুম সেটা একটা বিছানা। ট্রেনে কোথাও নাকি পা রাখবার জায়গা নেই। কাকুতি-মিনতি করে কর্নেলকে গলিয়ে জল করে ফেলেছিলেন প্রায়, আমি প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলুম। তারপর একটি কার্ড আমাকে ধরিয়ে দিলে আমার আপত্তিও গলে জল হল। অর্থাৎ না করতে পারলুম না। কার্ডে ছাপানো আছে, ডঃ টি. সি. সিংহ। তারপর আমার জানা-অজানা দিশি-বিদিশি ডিগ্রির লেজুড়, এই ট্রেনটার মতোই লম্বাটে। কিন্তু আর যা সব লেখা আছে, তাতে বোঝা যায় ইনি মস্ত বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত। প্রত্নবিদ্যা, নৃবিদ্যা, ভাষাবিদ্যা থেকে শুরু করে এমন বিদ্যা নেই, যা এঁর অজানা। তার প্রমাণও পাচ্ছিলুম হাড়ে-হাড়ে। কান ভোঁভোঁ করছিল। কর্নেল কিন্তু বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছেন আর সায় দিচ্ছেন। শুধু সায় দিচ্ছেন বলা ভুল হল, প্রশ্নও করছেন। বার্থে চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। ওদিকের বার্থে জানালার পাশে হেলান দিয়ে কর্নেল বসে আছেন এবং তাঁর পাশে পণ্ডিতমশাই। কানে এল, কর্নেল জিজ্ঞেস করছেন, "আচ্ছা ডঃ সিংহ, ট্রেনের সঙ্গে স্ট্রেইনের কোনো সম্পর্ক আছে কি, মানে ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক?"

"আছে। বিলক্ষণ আছে। প্রথমে ধরুন ট্রেন শব্দটা। এর আক্ষরিক অর্থ কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া। টে-নে!" ডঃ সিংহ নড়ে বসলেন। "বাংলা টান শব্দটা দেখুন। টে-নে নিয়ে যাওয়া। টানাটানি সহজ কাজ নয়, কষ্টকর। স্ট্রেইন শব্দের আক্ষরিক অর্থও কষ্টে টেনে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এ থেকে কী বেরিয়ে এল দেখুন! ইংরেজি ট্রেন আর বাংলা টান একই শব্দের দুটো রূপ। এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, আমরা বাঙালিরা এবং ইংরেজরা একই জানো।"

কর্নেল প্রশ্ন করলেন, "শিং-এর সঙ্গে সিংহের সম্পর্ক আছে কি?"

"অ্যাঁ?" পণ্ডিতমশাই হকচকিয়ে গেলেন। তারপর হোহো করে হেসে বললেন, "আপনার রসবোধ আছে। উগান্ডার বুগান্ডা মিউজিয়ামে যখন ডিরেক্টর ছিলুম, ডঃ হোয়াহুলা হোটিটি প্রায় ঠাট্টা করে বলতেন, সিংহকে আমরা বলি শিম্‌বা। তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয় আফ্রিকান ছিলেন।

...হ্যাঁ, আপনার প্রশ্নটা ভাববার মতো। শিং এসেছে সংস্কৃত শৃঙ্গ থেকে। যা উঁচুতে থাকে। যেমন পর্বতশৃঙ্গ। পর্বতশৃঙ্গের ছবি দেখবেন, কেমন ছুঁচলো—খোঁচার মতো। আকাশকে যেন গুঁতোচ্ছে। তাই না? তবে সিংহ, সিংহের স্থানও জন্তুদের মধ্যে উঁচুতে। তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, দুটো শব্দেই উচ্চতা বোঝাচ্ছে, আবার হিংস্রতাও বোঝাচ্ছে। শৃঙ্গী জন্তু গুঁতো মারে, আর সিংহ মারে থাবা।"

"শিংওয়ালা জন্তুর গুঁতোয় মানুষ মারা পড়ে, শুনেছি।" কর্নেল বললেন। "রূপগঞ্জে নাকি ছাগলের গুঁতোয় একটা মানুষ মারা পড়েছে। শুনে একটু অস্বস্তি হচ্ছে।"

ডঃ সিংহ ভুরু কুঁচকে বললেন, "ছা-ছাগল...কথাটা কে বলল বলুন তো? কাগজে তো অন্য খবর পড়েছি। প্রাচীন শিবমন্দিরের ত্রিশূলে...হ্যাঁ, আসল কথাটা তা হলে খুলেই বলি। ওই শিবমন্দিরটা পাথরের, বুঝলেন? গত মাসে একবার গিয়ে দেখে এসেছি। আমার ধারণা, ওটা অন্তত দেড় থেকে দু'হাজার বছরের পুরনো। শৈব রাজাদের রাজধানী ছিল রূপগঞ্জ। নদীর নামটা সেই স্মৃতি বহন করছে—শৈব্যা! জঙ্গলের ভেতর ঢিবি, পাথরের স্তম্ভ। শৈব্যাও অনেক স্মৃতিচিহ্ন গ্রাস করেছে। রাক্ষুসি নদী মশাই, শৈব্যা!"

"ব্যা-করণ!" কর্নেল কথাটা বলেই চুরুট জ্বালতে ব্যস্ত হলেন।

ডঃ সিংহ বললেন, "কী, কী? ব্যাকরণ..." বলেই আবার একচোট হাসলেন। "আপনার রসবোধ আছে! শৈব্যাতে ব্যা আছে বটে।"

"ছাগলও ব্যা করে।" একরাশ চুরুটের ধোঁয়ায় কর্নেলের মুখ আবছা হয়ে গেল।

ডঃ সিংহের মুখে কেমন যেন সন্দিগ্ধ ভাব, ফের ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনার এই ছাগলের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, ছাগলের কথা কে বলল আপনাকে, মানে, ছাগলের গুঁতোয় মানুষ মারা পড়ার কথা?"

কর্নেল বললেন, "হাওড়া স্টেশনে একদল লোক বলাবলি করছিল। আচ্ছা, ডঃ সিংহ, ছাগল এবং পাগলে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে কি?"

ডঃ সিংহ হাসতে গিয়ে হাই তুলে বললেন, "আপনার রসবোধ অতুলনীয়। তো যদি কাইন্ডলি, অনুমতি দেন, আমি এখানেই একটু গড়িয়ে নিই। এখনও দু'ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। বিচ্ছিরি ঘুম পাচ্ছে।"

বলে অনুমতির তোয়াক্কা না করে সেই কাগজে-জড়ানো বোঁচকাটি খুললেন এবং কর্নেলকে আরও কোণঠাসা করে শতরঞ্জি-চাদর-বালিশ সাজিয়ে চিত হলেন। বেঁটে হওয়ার দরুন শোয়াটি বেশ পুরোপুরি হল। কর্নেলের চোখে আমার চোখ পড়ল। কর্নেল মিটিমিটি হাসছেন। একটু পরে বললেন, "ডঃ সিংহ কি ঘুমিয়ে পড়লেন?"

"উঃ...হ্যাঁ—না...কী?"

"আপনার পুরো নামটি জানতে ইচ্ছে করছে।"

"তি-তিনকড়িচন্দ্র সিংহ।" বলে পণ্ডিতপ্রবর নাক ডাকাতে শুরু করলেন। আমি তো থ। এরকম ঘুম কখনও কাউকে ঘুমোতে দেখিনি, এক কর্নেল বাদে।

"আবার তিন!" কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন। "তিন তিরেক্কে নয়। নয়-নয়ে একাশি।"

নাকডাকা বন্ধ হল। চোখও খুলে গেল। শিবনেত্র হয়ে বললেন, "কী, কী?"

"কিছু না। আপনি ঘুমোন।" কর্নেল বললেন। "আমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছি।"

আবার নাক ডাকতে থাকল।

কর্নেল বললেন, "বুঝলে জয়ন্ত, অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষের মতো সংখ্যাতত্ত্ব বলে একটা শাস্ত্র আছে। না, স্ট্যাটিসটিক্স নয়, নিউমারোলজি। অ্যাস্ট্রোলজির আওতায় পড়ে এটা। সংখ্যারও নাকি শুভাশুভ আছে। নাম, জন্মের সন-মাস-তারিখ, এসব থেকে সংখ্যা বের করে ভূত-ভবিষ্যৎ জানা

যায় শুনেছি। তো দ্যাখো, ছাগল আর পাগল, শুধু ব্যঞ্জনবর্ণই ধর্তব্য, তিনটি সংখ্যার শব্দ। এও তিন তিরেক্কে নয়। নয়-নয়ে একাশি, সেই ছাগলীয় একাশি। তারপর ইনি বললেন, রূপগঞ্জের নদীটার নাম শৈব্যা, আমি তো শুনেছিলুম 'শোভানদী', রূপগঞ্জের পাশে সুন্দর ফিট করে যায়। কিন্তু ইনি পণ্ডিত মানুষ, বিশেষ করে পুরাতাত্ত্বিক। কাজেই নদীটা নিশ্চয় প্রাচীন যুগে 'শৈব্যা' ছিল। শিবসিংহের রাজধানীর পাশে শৈব্যা নদী ফিট করে যায়। যাই হোক, এখানেও একটা ব্যাকরণঘটিত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। ব্যা-করণ রহস্য, ডার্লিং! ছাগলের আদি-অকৃত্রিম ল্যাঙ্গোয়েজ, ব্যা!"

অসহ্য। কাঁহাতক আর বকবক ভালো লাগে। চোখ বুজেছিলুম। তারপর কখন যেন ঘুমিয়েও পড়েছিলুম। চলমান যানবাহনে মানুষের ঘুম পায় কেন, এ-নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় গবেষণা করে থাকবেন।

হঠাৎ কী-সব শব্দ এবং আমার পায়ের ওপরও ভারী কিছু পড়ল। চোখ খুলেই ভীষণ হকচকিয়ে গেলুম। আতঙ্কে মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! মারদাঙ্গার ফিল্মে অবিকল যেমনটি দেখা যায়।

আমার পায়ের ওপর বসে পণ্ডিতপ্রবর কর্নেলের সঙ্গে হাতাহাতি করছেন। হাতাহাতি কী বলছি! পণ্ডিতের হাতে একটা ছোরা, কর্নেল সেই হাতটা নিজের দু'হাতে ধরে মোচড় দিচ্ছেন।

মাত্র এক সেকেন্ডের দৃশ্য। পায়ে বেঁটে গাব্বাগোব্বা ওজনদার কিছু চাপানো থাকলে ওঠা কঠিন। অগত্যা পা দুটো যথাশক্তি নাড়া দিলুম। একই সঙ্গে ছোরাটাও ঠকাস করে মেঝেয় পড়ে গেল এবং ডঃ তিনকড়িচন্দ্র সিংহ কর্নেলের পেটে ঠিক ছাগলের মতোই ঢুঁ মারলেন। কর্নেল গুঁতো খেয়ে একটু পিছিয়ে গেছেন, পণ্ডিত হাত বাড়িয়ে নিজের ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে নীচে ঝাঁপ মারলেন।

ট্রেনের গতি খুব কম। দাঁড়ানোর মুখে বলে মনে হচ্ছিল। পায়ে ব্যথার দরুন উঠতে একটু সময় লাগল। কর্নেল ততক্ষণে ছোরাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন এবং দরজায় উঁকি দিচ্ছেন। বাইরে বিদ্যুতের আলো। তা হলে কোনো স্টেশন আসছে। মালগাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার মুখে কথা নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। কর্নেল ক্লান্তভাবে একটু হাসলেন, "লোকটা বিছানা ফেলে গেল!" বলে বিছানাটা গুটোতে থাকলেন। "রেডি হও, ডার্লিং! রূপগঞ্জ এসে গেছে।"

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললুম, "কী সাঙ্ঘাতিক!"

"হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক।" কর্নেল আস্তে বললেন। "আমি ঘুমের ভান করে নাক ডাকাচ্ছিলুম। চোখের ফাঁক দিয়ে দেখি, লোকটা আসলে ঘুমোয়নি। আমার মতোই ঘুমনোর ভান করছিল। হঠাৎ চোখ খুলে আমাকে আর তোমাকে দেখে নিল। তারপর সাবধানে উঠে ছিটকিনিটা সরিয়ে দরজা হাট করে খুলে দিল। আমার ভুল হল, রিভলভারটা বের করিনি সঙ্গে-সঙ্গে। ও কী করে, দেখতে চেয়েছিলুম। বাঙ্ক থেকে আমার কিটব্যাগ নামিয়ে চেন খুলে তন্নতন্ন করে কী খুঁজল। না পেয়ে রেখে দিল। তারপর স্যুটকেসটা নামাতে যাচ্ছে, তখন মনে হল, আর চুপ করে থাকা ঠিক হচ্ছে না। যেই বলেছি, "ডঃ সিংহ কি কিছু খুঁজছেন" অমনি এই ছোরা বের করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস, ওই সময় ট্রেন লাইন বদল করছিল! খুব নড়ছিল এই ক্যুপেটা। টাল খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আমি সেই সুযোগে ওর ছোরা-ধরা হাতটা দু'হাতে চেপে ধরে ঠেলে দিলুম। লোকটা তোমার পায়ের ওপর পড়ল। কিন্তু গায়ে কী প্রচণ্ড জোর! কুস্তিগির পালোয়ান একেবারে!"

উঠে দাঁড়িয়ে দুই ঠ্যাং নাড়া দিয়ে রক্ত-চলাচল ঠিক করে নিয়ে বললুম, "আপনাকে আপত্তি জানিয়েছিলুম, আপনি শুনলেন না। এবার বুঝুন উটকো লোক ঢুকিয়ে কী বিপদ বাধিয়েছিলেন!"

কর্নেল চুরুট বের করে জ্বেলে বললেন, "লোকটা জাল ডঃ টি. সি. সিংহ, জয়ন্ত! ডঃ সিংহকে

আমি চিনি। তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান অধ্যাপক। বিশ্বখ্যাত পণ্ডিত। এই লোকটাকে ক্যুপেতে জায়গা দেওয়ার কারণ ছিল। ...চলো, দেখি ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কামালসায়েব জিপ পাঠিয়েছেন কি না। নইলে বরাতে কিছু দুর্ভোগ আছে।"

ট্রেন রূপগঞ্জ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল। রাত প্রায় একটা বাজে।

প্ল্যাটফর্মে নেমে কর্নেল বললেন, "এক মিনিট। তিনকড়িচন্দ্রের বিছানাটা স্টেশনমাস্টারকে জিম্মা দিয়ে আসি। মাইক্রোফোনে ঘোষণা করতেও বলব।"

"এ-বদান্যতার মানে হয় না!" আপত্তি জানিয়ে বললুম। "বরং রেল-পুলিশের কাছে জমা দিন। আর সাঙ্ঘাতিক ঘটনাটা ওদের জানান।"

কর্নেল আমাকে পাত্তা দিলেন না। এত রাতে যাত্রীর সংখ্যা কম। প্ল্যাটফর্মেও নিঝুম খাঁখাঁ অবস্থা। মাঝারি স্টেশন যেমন হয়। একটু গা-ছমছম করছে। কর্নেল যতক্ষণ না ফিরলেন, এদিকে-ওদিকে মুহুর্মুহু তিনকড়িচন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছিলুম। বেঁটে হোঁতকা লোক দেখলেই ঘুসি বাগিয়ে রেডি হচ্ছিলুম। তারপর কর্নেল ফিরে এলেন। মুখে শান্ত হাসি। গেটের কাছে পৌঁছলে একজন গুঁফো তাগড়াই চেহারার লোক মিলিটারি কায়দায় স্যালুট ঠুকল। কর্নেল সহাস্যে বললেন, "কেমন আছ শের আলি?"

শের আলি বিনীতভাবে বলল, "জি, ভালো আছে বান্দা। বহোত ভালো। তো সাব আসতে পারল না। বোলা, কর্নিলসাবকো বোলো, সুবেমে জরুর মিলেঙ্গে। উনির বেটির বুখার হয়েছে, কর্নিলসাব! কুছু অসুবিস্তা হোবে না। বান্দা হাজির আছে, কর্নিলসাব!"

কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। শের আলি জিপের ড্রাইভার। এক সময় মিলিটারিতে ছিল। তাই কর্নেলসায়েবকে এত খাতির করে। তাকে দেখে এতক্ষণে মনে সাহস ফিরে এল। কর্নেলের কাছে রিভলভার থাকা না-থাকা সমান। গুলি চালিয়ে তিনকড়িচন্দ্রকে খতম করে দেবেন, এটা নিছক দুঃস্বপ্ন। বাইরে জিপের কাছে যেতে-যেতে শুনতে পেলুম, স্টেশনে ঘোষণা করা হচ্ছে, "ডঃ টি. সি. সিন্‌হা! ডঃ টি. সি. সিন্‌হা! আপকা বিস্তারা ইঁহাপর সংরক্ষিত হ্যায়! প্রত্যার্পণকে লিয়ে হমলোগ্ প্রতীক্‌ষা কর রহি হ্যায়।" ঘোষিকার কণ্ঠস্বরে আর ভাষায় বিরক্তিকর ভদ্রতা। গা জ্বলে যায়। কিন্তু ভাষাজ্ঞান এসে গেল। যা বিস্তার করা যায়, তাই বিস্তারা! যা বিছানো যায়, তাই বিছানা। বাঃ!

জিপে উঠে কর্নেল বললেন, "রূপগঞ্জ পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু নদীর ওপারে বিহার। এখানে দ্বিভাষী লোক দেখে অবাক হোয়ো না। অবশ্য শের আলি ইউ. পি-র লোক।"

এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের খয়াটে চাঁদটা চোখে পড়ল। বাঁ দিকে বসতি এলাকা, ডাইনে উঁচু-নিচু মাটি। ঝোপ-জঙ্গল ঝুপসিকালো হয়ে রাতের হাওয়ায় নড়াচড়া করছে। এই রাস্তায় আলো নেই। খানিকটা এগিয়ে বাঁ দিকে আঙুল তুলে কর্নেল বললেন, "ওইগুলো পুরোনো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। এবার আমরা নদী পেরোব। তারপর চড়াই। ওই যে সামনে উঁচুতে আলো দেখতে পাচ্ছ, ওটাই সেই বাংলো। বিহার মুলুক। খুব চমৎকার জায়গায় বাংলোটা তৈরি করা হয়েছে। নীচে বিশাল জলাধার। পাখিদের অভয়ারণ্য বলা চলে। ...হ্যাঁ, রেনবো অর্কিড নদীর এপারে। দেখাব'খন। মাথা খারাপ হয়ে যাবে ডার্লিং!"

একটা টিলামতো উঁচু জায়গায় সেচ-বাংলো। চৌকিদার আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। শের আলি জানিয়ে গেল, সকাল আটটার মধ্যে সে কর্নেলসারের সেবায় জিপ নিয়ে আসবে এবং ডি.ই. সাবও আসবেন। কর্নেলসারের জন্য এই জিপগাড়িটি বরাদ্দ করা হয়েছে, এ-কথাও জানিয়ে গেল সে।

খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে তিনকড়িচন্দ্রকে ভুলে গেলুম। চৌকিদার মাধবলালও কর্নেলকে চেনে। কর্নেলকে কে না চেনে? কর্নেলের সবার মন-জয়-করা স্বভাব তো বটেই, উপরন্তু খোলা হাতে

বখশিস্‌ও একটা কারণ। মাধবলাল খাওয়ার সময় কর্নেলকে প্ররোচিত করতে থাকল ক্রমাগত। ...কর্নেলসাব গতবার যে কানে কলম-গোঁজা পাখিটা (সেক্রেটারি-বার্ড) দেখেছিলেন, সেটা ড্যামের অন্য একটা জলটুঙ্গিতে বাসা বেঁধেছে। সামনে এদের ডিম পাড়বার ঋতু। এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে। কর্নেলসাব ওদিকের মাঠে যে প্রজাপতি দেখেছিলেন, তারা আছে। মাধবলাল আপনা আঁখসে দেখেছে। সে আঙুল তুলে দেখাল, "তিন রোজ দেখা সাব—একহি ফাট্‌রাঙ্গা!"

কর্নেল মুরগির ঠ্যাং কামড়ে বললেন, "তিন! তিন তিরেকে নয়। নয়ে-নয়ে একাশি।"

মাধবলাল বুঝতে না পেরে বলল, "হুজৌর?"

"শিবমন্দিরের ত্রিশূলে রক্তের দাগ দেখে এসেছ মাধবলাল?"

সে অমনি চমকে উঠে করজোড়ে প্রণাম করে বলল, "আই বাপ! শিউজিকা পুজা বন্‌ধ থা। তো আদমি বলিদান হো গয়া সাব! উও বাঙ্গালি ঠাকুরমশাইভি আচ্ছা আদমি নেহি থা। বহোত্‌ ঝামেলাবাজ থা। খালি ইসকা-উসকা সাথ টোক্কর লাগাতা। শিউজি উনহিকো বলিদান লে লিয়া।"

"মুরারিবাবুকে চেনো?"

মাধবলাল খিকখিক করে হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ল। "পাগলা। সিরফ্‌ পাগলা!"

কেন পাগলা, জিজ্ঞেস করলে মাধবলাল অনর্গল তার মাতৃভাষায় মুরারিবাবু সম্পর্কে একটা লম্বা বক্তৃতাই দিল। আমাদের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা একটানা চলল। তার সংক্ষিপ্তসার হল এই :

মুরারিবাবুর ঠাকুর্দার আমলে রূপগঞ্জে ওঁদের খুব দাপট ছিল। অমন বড়লোক এ-তল্লাটে আর কেউ ছিল না। প্রচুর জমিজমা, মহাজনি কারবার, বিশাল দালানবাড়ি, একটা মোটরগাড়ি পর্যন্ত ছিল। তারপর যা হয়! সাত শরিকে মামলা-মকদ্দমা, ঝগড়াঝাটি। একটা ভাঙা দেউড়ি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট অবধি আইনের লড়াই তিন পুরুষ ধরে। ততদিনে দেউড়িটার মাত্র আধখানা টিকে আছে। আধখানা দেউড়ির মাথায় জঙ্গল গজিয়ে গেছে। সাবেকি বাড়ি মুখ থুবড়ে পড়েছে। কড়ি-বরগা, দরজা-জানালা চৌকাঠসুদ্ধু যে যখন সুযোগ পেয়েছে, উপড়ে নিয়ে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ওই আধখানা দেউড়ি মুরারিবাবুর হাতছাড়া হয়ে গেল, আর সেই থেকে তাঁর মাথাও খারাপ হয়ে গেল। মামলা এমন জিনিস, বেশিদিন চালিয়ে গেলে মানুষের ঘিলু টেঁসে যায়। ফলে দেউড়িটা নাকি দেখবার মতো জিনিস। এত উঁচু দেউড়ি সচরাচর দেখা যায় না। মাধবলালের ধারণা, পাশের শিবমন্দিরটার চেয়ে দেউড়িটা উঁচু করে তৈরির জন্যই শিবের কোপ পড়েছিল ধাড়াবাবুদের বংশের ওপর। শিবের চেলারা দেউড়ির মাথায় সারা রাত নাচত, দমাদ্দম লাথি মারত, দাপাদাপি করে বেড়াত। কাজেই যত শক্তই হোক, ওটা ধসে পড়ার কারণ ছিল। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, পাথরে কখনও উদ্ভিদ গজায়? শিউজির শাপে পাথর ফেটে তাও গজিয়েছিল। তবে মুরারিবাবুর মাথা খারাপ হওয়ার মূল কারণ সম্পর্কে মাধবলাল নিশ্চিত নয়। তার শোনা কথা, মুরারিবাবু ভাঙা দেউড়ির মাথায় নাকি বিকট চেহারার কোনো শিবের চেলার দর্শন পেয়েই আতঙ্কে পাগলা হয়ে যান।...

কর্নেল এবং আমার জন্য উত্তর-পূর্ব কোণে একটা বড় ডাবল বেডরুম তৈরি রাখা হয়েছে। উত্তরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন, "এখান থেকে জলাধার দেখলে তোমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ডার্লিং! তবে আতঙ্কে নয়, আনন্দে! কী অপূর্ব! কী অলৌকিক সৌন্দর্য! শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় এলে তুমি সত্যিই আকাশের পরিদের ঝাঁকে-ঝাঁকে নেমে স্নান করতে দেখতে। কৃষ্ণপক্ষে জ্যোৎস্নাটা তত খোলতাই নয়।"

বললুম, "খোলা জানালা দিয়ে তিনকড়িচন্দ্র ছোরা না ছোঁড়ে!"

"তুমি বড় বেরসিক, জয়ন্ত!" কর্নেল হাসলেন। "তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। মাধবলালকে যতই রোগাভোগা দেখাক, ওকে নিরীহ ভেবো না। ও এমন মানুষ, যার ঘুমন্ত অবস্থায় কান দুটো দিব্যি জেগে থাকে।"

দরজার পরদার বাইরে থেকে মাধবলালের সাড়া পাওয়া গেল তখনই। "সব ঠিক হ্যায়, সাব?"

কর্নেল বললেন, "ঠিক হ্যায়। তুম শো যাও।"

বলে দরজা এঁটে দিয়ে এলেন। তারপর জানালার ধারে চেয়ার টেনে বসে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু হিমের ছোঁয়া এপ্রিলেও। ফ্যানের হাওয়া এবং পেছনের জলাধারও তার কারণ। চাদর-মুড়ি দিলুম। কর্নেল এয়ারকন্ডিশন্ড রুম একেবারে পছন্দ করেন না। প্রকৃতিবাদীর কারবার! এয়ারকন্ডিশন্ড রুম হলে অন্তত তিনকড়িচন্দ্রের পরোয়া না করে আরামে ঘুমনো যেত।

এপাশ-ওপাশ করছিলুম। মশারি নেই, কারণ মশা নেই। কিন্তু মশারি থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত, যদিও ছোরার মশারি ফুঁড়ে ঢোকার ক্ষমতা আছে। শুধু একটা সুবিধে আমার বিছানার পশ্চিমে নিরেট দেওয়াল এবং দক্ষিণে বাথরুম। কর্নেলের বিছানার পাশেই পুবের জানালা, মাথার দিকে উত্তরের জানালা, দুটোই খোলা। ফ্যানটা দুই বিছানার মাঝামাঝি আস্তে ঘুরছে। ছোরা ছুঁড়লে কর্নেলের বিপদের চান্স নিরানব্বুই শতাংশ। দৈবাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছিটকে এলে তবেই আমার বিপদ এবং সেটার চান্স এক শতাংশ মাত্র।

নাঃ, এই হিসেব করেও আতঙ্ক কাটছে না। ঘুমও আসছে না। একটু পরে দেখি, কর্নেল কোনার দিকের টেবিলের কাছে গেলেন। টেবিলবাতি জ্বেলে সেই চাকতিটা বের করলেন। তারপর নোটবইতে কী সব লিখতে শুরু করলেন। ঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটা তিনটের ঘরে, যাকে বলে কাঁটায়-কাঁটায় রাত তিনটে।

বিরক্ত হয়ে ইচ্ছে করেই সশব্দে পাশ ফিরলুম। কর্নেল বললেন, "ঘুমের ওষুধ হিসাবে ভেড়ার পাল কল্পনা করে ভেড়া গোনার ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে তুমি তিন-শিংওয়ালা ছাগলটিকে কল্পনা করো। ঘুম এসে যাবে। কল্পনা করো, ওটা দৌড়চ্ছে, তুমিও তাকে ধরার জন্য দৌড়চ্ছ এবং ধরতে পারলেই বলি দেবে শিবের মন্দিরে। নাও, স্টার্ট!"

রাগ করে বললুম, "আমি কি বাচ্চাছেলে যে..."

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন, "কী বললে? কী বললে?"

"আমি বাচ্চা ছেলে নই যে এসব বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘুম পাড়াবেন!"

"মাই গুডনেস!" কর্নেল ঘুরে বসলেন আমার দিকে। চোখ দুটো উজ্জ্বল।

"কী হল?"

কর্নেল চুপ। একটু পরে ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলুম এবং সত্যিই একটি তিন-শিংওয়ালা ছাগল কল্পনা করলুম, যেটা দৌড়চ্ছে। মনে-মনে তার পেছনে দৌড়তে থাকলুম। দৌড়তে দৌড়তে দৌড়তে...

"চায়, ছোটাসাব!" তিন-শিংওয়ালা ছাগলটা বলল। "সাব! চায় পিজিয়ে।"

চোখ খুলে দেখি তিন-শিংওয়ালা ছাগল নয়, মাধবলাল। ঘরে উজ্জ্বল রোদ্দুরের ছটা ঝলমল করছে। সে বিনীতভাবে বলল, "বড়াসাব বোলকে গেয়া, সাড়ে সাত বাজকো ছোটাসাবকো বেড-টি দেনা।"

উঠে বসে চায়ের কাপ-প্লেট নিলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "কর্নেলসাব কখন বেরিয়েছেন?"

"ছয় বাজকে।" মাধবলাল খিকখিক করে হাসল। "ফাট্‌রাঙ্গা পাকাড়নে গেয়া, মালুম হোতা। কর্নিলসার ইস দফে জরুর কম-সে-কম একঠো তো পাকড়ায়েগা!...তো হামি বলল, জেরাসা বড়া হোনা চাহিয়ে। কর্নিলসাব বলল, হাঁ, বড়া নেট লেকে আয়া।"

'ফাটরাঙ্গা' জিনিসটা যে প্রজাপতি, বুঝে গেছি। গরম চা খেয়ে চাঙ্গা হওয়া গেল। তারপর বাথরুম সেরে এসে দেখি, প্রকৃতিবিদ গেটে ঢুকছেন। ঢুকে ফুলে-ফুলে সাজানো সুদৃশ্য লনের ওপর দিয়ে উত্তরের নিচু পাঁচিলের কাছে গেলেন। চোখে বাইনোকুলার স্থাপন করলেন। উত্তরের জানালায় গিয়ে জলাধারটি দেখতে পেলুম। অবিকল চিল্কা হ্রদের মতো। প্রচুর পাখিও দেখা যাচ্ছিল। এদিকে-ওদিকে ছোট্ট দ্বীপের মতো টিলা জঙ্গলে ঢাকা।

ভালো করে দেখার জন্য বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসলুম। কর্নেলের পাখি দেখা শেষ হল। ঘুরে বারান্দার দিকে আসতে-আসতে সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং, ডার্লিং! আশা করি, ছাগলটি ধরতে পারোনি?"

হাসতে-হাসতে বললুম, "আশা করি আপনিও ফাটরাঙ্গা ধরতে পারেননি?"

কর্নেল বিমর্যভাবে বললেন, "নাঃ। বেজায় ধূর্ত। ...কী আশ্চর্য!"

হঠাৎ তিনি ছড়ির ডগায় আটকানো গুটিয়ে-থাকা সূক্ষ্ম তন্তুর নেটটি ছাতার মতো বোতাম টিপে খুলে দিলেন। তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলেন। একটা ফুলের ঝোপের মাথায় প্রজাপতিটাকে এবার দেখতে পেলুম। রোদ্দুরে ডানা ঝিলমিল করছে। কিন্তু তারপরই ওটা উড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ডানায় অবিকল সাতটা রঙ রামধনুর মতো স্পষ্ট দেখতে পেলুম। কর্নেল বললেন, "যাঃ! একটুর জন্য..."

প্রজাপতিটা নিচু পাঁচিল পেরিয়ে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর চলে এলেন। বারান্দায় উঠে বললেন, "যাই হোক, নেটে ধরতে না পারলেও ক্যামেরায় ধরেছি। এটাই একটা সান্ত্বনা। তবে ঠিক-ঠিক রংগুলো আসবে কি না কে জানে।"

বললুম, "তিনকড়িচন্দ্রের দেখা পাননি তো?"

কর্নেল হাসলেন। "পেয়েছি। নদীর ব্রিজ থেকে বাইনোকুলারে ওপারের ধ্বংসাবশেষ দেখছিলুম। এক মিনিট ধরে দেখলুম, তিনকড়িবাবু ব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছেন। ওদিকেই সূর্য। তাই সরাসরি লেন্সে রোদ্দুর পড়ছিল। বাকিটা দেখতে পেলুম না।"

কর্নেল কথাগুলো এমন নির্বিকার মুখে বললেন, যেন গতরাতে ট্রেনে আসতে-আসতে তিনকড়িচন্দ্রের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে। হিরো-ভিলেন ফাইটটা নেহাত ফিল্মি ঘটনা, অর্থাৎ স্রেফ অভিনয়! স্বভাবত আমার মুখে রাগ ফুটে বেরিয়েছিল। বারান্দার সাদা রং মাখানো বেতের টেবিলে মাধবলাল ট্রে-তে কফির পট, পেয়ালা রেখে গেল। বুঝলুম, সে কর্নেলের রীতি-নীতি এবং পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে বেশ পরিচিত।

আমার মনের ভাব ধুরন্ধর বৃদ্ধের চোখ এড়ায়নি। বললেন, "চলন্ত ট্রেন, তা যত আস্তে চলুক, বেয়াড়া যাত্রীদের পছন্দ করে না। তা ছাড়া নিয়ম হল, গতিশীল যানবাহন থেকে নিরাপদে নামতে হলে যেদিকে গতি, সেইদিকে ঝাঁপ দিতে হয়। উলটো দিকে ঝাঁপ দিলে হাড়গোড় ভাঙা অনিবার্য। সোজাসুজি ঝাঁপ দিলে তার চান্স সামান্য কমে। আমাদের তিনকড়িবাবু এই প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন। তিনি গতির দিকেই ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই যে বললুম, চলন্ত ট্রেন বেয়াড়া যাত্রীদের পছন্দ করে না। বেচারা একটু ল্যাংচাচ্ছেন। হাতে ছড়ি নিতে হয়েছে। পক্ষান্তরে, তোমার অবস্থা বিবেচনা করো, জয়ন্ত! তুমি অমন ওজনদার মানুষের ধাক্কা সামলে দিব্যি হাঁটাচলা করতে পারছ। একটুও ল্যাংচাচ্ছ না।"

বলার ভঙ্গিতে রাগ পড়ে গেল। বললুম, "ছোরার ঘা কিন্তু আপনিই খেতেন। যাকে বেচারা বলে সমবেদনা জানাচ্ছেন, তার ছোরাটা এখন একবার চাক্ষুষ করলে আমার মতোই রেগে যাবেন।"

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর-পকেট থেকে যে-জিনিসটা বের করলেন, সেটা ছোরার বাঁট বলে মনে হল। অবাক হয়ে বললুম, "বাঁট আছে, ফলা নেই! ভেঙে গেল কী করে?"

কর্নেল বাঁটের একটা জায়গায় চাপ দিতেই ছ-সাত ইঞ্চি ঝকঝকে ফলা গোখরো সাপের ফণার মতো বেরিয়ে পড়ল। বললেন, "স্প্রিংওয়ালা ছোরা। বিদেশি জিনিস। তবে আফ্রিকার নয়, এবং বুগান্ডা মিউজিয়ামের ডঃ হোয়াহুলা হোটিটি উপহার দেননি, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। একটু ভিজে দেখাচ্ছে, লক্ষ করো। আবছা সবুজে রঙের মলম মনে হচ্ছে না? ওটা সাপের বিষ থেকে তৈরি। তার মানে, একটু খোঁচা খেলেই ঘা বিষিয়ে যাবে। এমনকি, ক্রমশ রক্ত বিষিয়ে মারা পড়তেও পারো।"

ভয়ে বুক ধড়াস করে উঠল। বললুম, "তবু শয়তানটাকে আপনি বেচারা বলছেন!"

কর্নেল আবার স্প্রিংয়ের বোতাম টিপে ফলা ঢুকিয়ে মারাত্মক জিনিসটা পকেটে চালান করে দিলেন। বললেন, "এটা আমার জাদুঘরের জন্য একটা চমৎকার স্যুভেনিরও বটে। বছর-দশেক আগে ঠিক এরকম একটি ছোরার সান্নিধ্যে এসেছিলুম, কোকো আইল্যান্ডে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানকার পুলিশকর্তা সেটি হাতিয়ে নেন। একই ছোরা, একই কোম্পানির তৈরি এবং একই বিষের মলম। তিনকড়িবাবু আমাকে ভাবিয়ে তুলেছেন, জয়ন্ত!"

আমরা কফি খেতে খেতে শের আলি জিপ নিয়ে এসে স্যালুট ঠুকল। বলল, "আফসোস কা বাত, কর্নিলসাব! ডি. ই. সাব আসতে পারল না। বেটি কি বুখার বহত বাঢ়ল। তো হাথিয়াগড় মিশনারি হসপিট্যালমে চলিয়ে গেলেন। উনি মাফি মাঙ্গা আপসে।"....

তিন

মুরারিবাবুকে শের আলি চেনে। উনি এখানে 'পাগলাবাবু' নামে সুপরিচিত। কিন্তু ওঁর বাড়ি পর্যন্ত জিপ যাবে না। ঘিঞ্জি গলির পর ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গলে-ঢাকা এলাকা। সেখানে কিছু পুরোনো একতলা বাড়ি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটাতে মুরারিবাবু থাকেন। শের আলির কাছে জানা গেল, সেও ওঁর নিজের বাড়ি নয়। শিবের ত্রিশূলের আঘাতে যাঁর রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছে, সেই নকুলেশ্বর ঠাকুরের বাড়ি। একটা ঘরে মুরারিবাবুকে থাকতে দিয়েছিলেন।

শের আলি বাজারের রাস্তায় জিপ রেখে আমাদের নিয়ে গেল। ডাক শুনে একজন আমার বয়সি যুবক বেরোল। মাথা ন্যাড়া দেখে বুঝলুম, নকুলবাবুর শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। মফস্বলের খবর কলকাতার কাগজের হাতে পৌঁছতে দেরি হয়। 'সম্প্রতি' বলে যে ঘটনা ছাপা হয়, তা হয়তো ঘটে গেছে এক-দু'সপ্তাহ আগে। মুরারিবাবুও এমন অস্পষ্টভাষী মানুষ, ওঁর কথা শুনে মনে হচ্ছিল, সদ্য ঘটনাটি ঘটেছে।

যুবকটি অবাক চোখে আমাদের দেখছিল। শের আলি বলল, "কর্নিলসাব, ইয়ে ঠাকুরমেশার ভাই আছে। আপলোগ বাতচিত কিজিয়ে। ম্যায় গাড়িকা পাশ ইন্তেজার করুঙ্গা!"

সে চলে গেলে যুবকটি বলল, "আপনারা কোত্থেকে আসছেন স্যার?"

কর্নেল বললেন, "কলকাতা থেকে। মুরারিবাবুর সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

যুবকটি খাপ্পা হয়ে গেল হঠাৎ। "মুরারিদাকে নিয়ে পারা যায় না! ওঁর মাথায় কী করে যে ঢুকে গেছে, সোনার মোহর-ভরা ঘড়া পোঁতা আছে কর্তাবাবার ভিটেয়! স্যার, আপনারা বুঝতে পারেননি মুরারিদার মাথায় ছিট আছে?"

কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন, "তোমার নাম কী ভাই?"

"বীরেশ্বর..." বলেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "অ্যাই মুরারিদা, ওখানে কী করছ? দেখছেন পাগলের কারবার?" সে তেড়ে গেল।

একটু তফাতে একটা ঝাঁকড়া গাছ। তার উঁচু ডালে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে মুরারিবাবু উলটোদিকে ঘুরে কী যেন দেখছিলেন। মুখ ঘুরিয়েই আমাদের দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিদঘুটে খ্যাঁক হেসে হনুমানের মতো চমৎকার নেমে এলেন, পরনে পাঞ্জাবি-ধুতি এবং ধুতির কোঁচা পকেটে গোঁজা! গাছটার তলায় জুতো রাখা ছিল। পা গলিয়ে পরে সহাস্যে এগিয়ে এলেন নমস্কার করতে-করতে। "এসে গেছেন! নকুলদা বলেছিল, আমার কিছু হলেই খবর দিবি। ঠিকানাও নিজের হাতে লিখে দিয়েছিল। কিন্তু যাব কী করে? যেতে দিলে তো? সাত দিন স্যার, সাত-সাতটা দিন বন্দী!... এই বিরুটাকে অ্যারেস্ট করা উচিত। আমাকে সা-ত দিন আটকে রেখেছিল। ...এও স্যার তিনের খেলা। তিন সাত্‌তে একুশ...দুইয়ের পিঠে এক একুশ... এবার দেখুন, দুই প্লাস এক ইজ ইকোয়াল টু থ্রি—অ্যাই বিরু! অমন করে তাকাবিনে! ইনি কে জানিস?"

বিরু রাগতে গিয়ে একটু হেসে ফেলল। "কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারছেন তো আপনারা?"

মুরারিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "শাট আপ! তুই সেদিনকার হাফপেন্টুল-পরা ছেলে। তুই কী বুঝিস? আসুন স্যার, আমার ডেরায় আসুন।"

বিরু বলল, "মুরারিদার কোনো কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না স্যার! ওঁর পাল্লায় পড়েই দাদা মার্ডার হয়ে গেল। সোনার মোহর-ভরা ঘড়ার লোভে না পড়বে, না মার্ডার হবে।"

সদর-দরজা খুলে থান-পরা এক মহিলা উঁকি দিচ্ছিলেন। বললেন, "ঠাকুরপো, জিজ্ঞেস করো তো উনি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার নাকি?"

চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল টুপি খুলে বিলিতিভাবে মাথা একটু নামিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ম্যাডাম! আমিই।"

সেই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল, কর্নেল টুপি খুলতেই টাক ঝকমকিয়ে উঠেছিল এবং সেই টাকে একটা ছোট্ট ঢিল এসে পড়ল। কর্নেল টাকে হাত দিয়ে দ্রুত ঘুরলেন। উলটো দিকে একটি একতলা বাড়ির ছাদে বছর দশ-বারো বছরের একটি ছেলে জিভ দেখিয়ে ভো-কাট্টা হয়ে গেল।

বিরু চেঁচিয়ে বলল, "দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি।"

মুরারিবাবু দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "বাপের আশকারা পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করেছে। মারব এক থাপ্পড়!... এসো এবার 'ঘুঁড়ি আঁটকে গেঁছে জ্যাঠামশাই, পেঁড়ে দিন' বলতে!... তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি দেখিয়ে দেব।"

নেপথ্যে আওয়াজ এল, "ব্যা-ব্যা-অ্যা!"

অমনি কর্নেল ফিক করে হেসে বললেন, "ব্যা-করণ!"

মুরারিবাবু বাড়িটার চারপাশে ছুটোছুটি শুরু করলেন। দুর্বোধ্য কীসব কথাবার্তা। বিরুর বউদি গম্ভীরমুখে বললেন, "ছেড়ে দিন! আপনারা ভেতরে আসুন। ঠাকুরপো, ওঁদের নিয়ে এসো।"

ভেতরে একটুকরো উঠোন। কুয়োতলা। উঁচু বারান্দা। একটা ঘর খুলে দিলেন বিরুর বউদি। বিরু বলল, "বসুন স্যার! দাদার ঘর। বাইরে বসার ঘরটা মুরারিদাকে থাকতে দিয়ে গেছে দাদা।"

ঘরের ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। কর্নেলের মুখেও বিস্ময় ফুটে উঠল। ঘরভর্তি পুরোনো বই-পত্রপত্রিকা, তাক এবং আলমারিতে বিচিত্র গড়নের সব পুতুল, পাথরের টুকরোয় খোদাই-করা আঁকিবুকি। কর্নেল বললেন, "এ তো দেখছি প্রত্নশালা! বিরু, তোমার দাদা কী করতেন?"

বিরু বলল, "দাদার ওই এক বাতিক ছিল স্যার! কোত্থেকে সব কুড়িয়ে এনে জড়ো করতেন। স্কুলে মাস্টারি করতেন। মাস্টারি ছেড়ে বাতিক আরও বেড়ে গিয়েছিল। সারাদিন জঙ্গলে টিবিতে ঘুরে বেড়াতেন টোটো করে। আর রাজ্যের যত উদ্ভুট্টে জিনিস কুড়িয়ে আনতেন।"

কর্নেল ঘুরে-ঘুরে সব দেখছিলেন। মুখে বিস্ময় আর তারিফের ছাপ। বিড়বিড় করছিলেন আপনমনে। "...শিলালিপি! ...দাঁতের জীবাশ্ম! ...বুদ্ধমূর্তি, নাকি শিব... আশ্চর্য! বড় আশ্চর্য! এমন ব্যক্তিগত সংগ্রহ কোথাও দেখিনি! ...মাই গুডনেস! এ তো কুষান মুদ্রা! ...ব্রোঞ্জের যক্ষিনী...তাম্রশাসন..."

বাইরে থেকে ডাক এল, "ঠাকুরপো!"

বিরু চলে গেল। কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত! বুঝতে পারছ কিছু?"

বললুম, "হ্যাঁ, আপনার মতোই কুড়ুনে স্বভাবের লোক ছিলেন। তবে আপনি আবার রহস্যভেদীও। আর এই নকুলবাবু রহস্যভেদী ছিলেন না, এই যা।"

"না জয়ন্ত! রহস্যভেদ করতে গিয়েই প্রাণে মারা পড়েছেন ভদ্রলোক।"

"সোনার মোহর-ভরা ঘড়ার রহস্য।"

"উঁহু। ব্যা-করণ রহস্য।" বলে কর্নেল এতক্ষণে চেয়ারে বসলেন।

এইসময় মুরারিবাবু হন্তদন্ত এসে ঢুকলেন। তক্তাপোশে পাতা বিছানায় ধপাস করে বসে বললেন, "পালিয়ে গেল বাঁদরটা! বিষ্ণুবাবুর ঘরে এই এক অবতার। তিন তিরেক্কে দেখিয়ে ছেড়ে দিতুম।"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "ছেলেটি বেশ।"

"বেশ? বিচ্ছু! বাঁদর!" মুরারিবাবু বললেন। "গাছে-গাছে ঘোরে। দালানের মাথায়-মাথায় ছোটে। দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়, স্যার!..." বলে খ্যাঁক করলেন। "তবে আমারই ট্রেনিং, বুঝলেন? একদিন ঘুড়ি আটকে গেছে গাছের ডগায়, করুণ মুখে তাকিয়ে আছে। আমাকে দেখে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, জ্যাঠামশাই, আপনি তো গাছে চড়তে পারেন, দিন না ঘুড়িটা পেড়ে। ...পেড়ে দিলুম। তারপর ট্রেনিং দিতে শুরু করলুম। ...একদিন স্যার নকুলদা বলল, মুরারি, তুমি তো বেশ গাছে চড়তে পারো দেখেছি। বললুম, হুঁ, পারি। বলে কী, তোমাদের দেউড়ির মাথায় চড়তে পারবে? ...না স্যার! কড়িদার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে লড়ে হেরে গেছি। কড়িদা এখানে নেই তো কী হয়েছে? চক্ষুলজ্জা বলে কথা। ...নকুলদা স্যার, বড্ড গোঁয়ার। বিষ্ণুবাবুর ছেলে ওই যে দেখলেন, ...বিচ্ছু, বাঁদর..."

কর্নেল বললেন, "ছাগলও বলতে পারেন। কেমন ব্যা-অ্যা ডেকে ভেংচি কাটল!"

মুরারিবাবু কান করলেন না। "ওর ডাকনাম আবার বিট্টু...বি-ট্-টু...এও তিন! তিন তিরেক্কে নয়, নয়ে-নয়ে একাশি!"

"আপনি কি নিউমারোলজিস্ট, মুরারিবাবু?"

"আজ্ঞে। একটু-আধটু চর্চা করি আর কি!" মুরারিবাবুর ট্রেন চলতে থাকল। "নকুলদা বিট্টুকে ঘুড়ির লোভ দেখিয়ে চড়াল। বাপ্স্! দেউড়ির মাথায় চড়াল। ...বাপ নিজের মাথায় চড়িয়েছে, নকুলদা এককাঠি সরেস। দেউড়ির মাথায় চড়াল। তারপর থেকে রোজ দেখি দেউড়ির মাথায়... শাসালুম, থাম। কড়িদা আসছে! জিভ দেখায় আর ব্যা করে। ইউ আর রাইট। পূর্বজন্মে ছাগলই ছিল।"

"আপনার এই কড়িদাটি কে?"

"তিনকড়িদা! আমার জ্ঞাতি। মহাভারত কি মিথ্যা, বলুন আপনি? কুরুক্ষেত্র কি মিথ্যা? তবে এখন যুদ্ধ কাগজে-কলমে, উকিলে-ব্যারিস্টারে...জজের সামনে। বেধে গেল লড়াই।"

"তিনকড়িবাবু থাকেন কোথায়?"

"শুনেছি জাহাজে চাকরি করে। কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ঘোরে। সমুদ্রে মহাসাগরে। বলবেন, তা হলে মামলা কে লড়ল? ...মামলা লড়ে ব্যারিস্টার। ওর ভগ্নীপতি ব্যারিস্টার। ...হারিয়ে দিলে! সবই

তিন তিরেক্কের খেলা সার!" মুরারিবাবু পকেট থেকে নোটবই বের করে একটা পাতা খুলে দেখালেন। "এই দেখুন! হিসেব কষে রেখেছি। আপনিই খুঁজে বের করতে পারবেন নকুলদাকে কে মারল, শিব না মানুষ? নামের ব্যাঞ্জনবর্ণগুলোই লক্ষ করুন স্যার।"

উঁকি মেরে দেখলুম, লেখা আছে :

ক+র+ন +ল+ন+ল+দ+র+স+র+ক+র=১২

১+২=৩

ন+ক+ল+শ+ব+র+ঠ +ক+র=৯

৩×৩=৯

৯ ÷ ৩ = ৩

কর্নেল নোটবই ফেরত দিয়ে বললেন, "নকুলেশ্বর ঠাকুরকে এলাকায় ঠাকুরমশাই বলত কেন, মুরারিবাবু? নিছক পদবির জন্য?"

"পদবি এল কোত্থেকে?" মুরারিবাবু বললেন, "নকুলদা'র ঠাকুর্দা পর্যন্ত শিবমন্দিরের সেবাইত ছিলেন। আমার ঠাকুর্দা জমিদার আর নকুলদা'র ঠাকুর্দা জমিদারবাড়ির মন্দিরের পুজো-আচ্চা করতেন। সেই থেকেই তো এই সম্পর্ক। ঠাকুরমশাই ডাকতে-ডাকতে ঠাকুর হয়ে গেল। ঠা-কু-র...তিন! নাম্বারের খেলা। অঙ্ক! অঙ্কে অঙ্কে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে। এক থেকে তিন...ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর...তিন থেকে তেত্তিরিশ কোটি। খালি তিনের লীলা!...তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি!...ছাগলটা দেউড়ির মাথায় চড়েছিল, স্যার! বলল, "একাশি!...তি-ন দিন।" বলে মুরারি তিনটে আঙুল তুললেন।

কান ঝালাপালা! এতক্ষণে বিরুর বউদি ট্রে হাতে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন, "এ কি! আমরা সদ্য ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছি।"

ভদ্রমহিলা বললেন, "একটু মিষ্টিমুখ না করলে চলে? কত ভাগ্যে আপনি এসেছেন। উনি প্রায় বলতেন, কর্নেলসায়েবকে চিঠি লিখতে হবে। উনি ছাড়া এর জট...না, না। আপনি অন্তত একটা সন্দেশ খান।" বলে বিরুর বউদি আমার দিকে তাকালেন। "তুমি, বলছি ভাই, কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ঠাকুরপোর বয়সি। খাও! এখানকার মিষ্টি খাঁটি ছানার। তোমাদের কলকাতার মতো সয়াবিনের ছানা নয়।"

মুরারিবাবু উসখুস করছিলেন। বললেন, "আমার এই বউদি, স্যার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! যেমন রূপ, তেমনি গুণ।" বলে কর্নেলের প্লেট থেকে দুটো প্রকাণ্ড সন্দেশ তুলে মুখে পুরলেন।

বিরুর বউদি বললেন, "আহা, ওই তো তোমার প্লেট! তোমাকে নিয়ে পারা যায় না!"

মুরারিবাবু প্লেট গুনলেন। "এক...দুই...তিন!...অ! আমি ভাবলুম...যাকগে! খেয়ে যখন ফেলেইছি...কর্নেলস্যারের যা বয়স, মিষ্টি খাওয়া উচিত না।" উনি নিজের প্লেটটা হাতিয়ে নিলেন এবং খাওয়ার দিকে মন দিলেন।

বিরুর বউদি আস্তে বললেন, "যেদিন রাতে উনি মারা যান, সেদিনই বেশ কয়েকবার আমাকে বলছিলেন, কর্নেলসায়েবকে চিঠি লেখা হচ্ছে না। অ্যাড্রেসটা জোগাড় করেছি। নোটবইতে লেখা আছে। যদি আমি কোনো বিপদে পড়ি তো ওঁকে খবর দিও। পরদিন তো যা মনের অবস্থা, চিঠি লিখব কী! পরের দিন লিখে বিট্টুকে দিয়ে ডাকে পাঠালাম। প্রত্যেকদিন ভাবি, আজই আসবেন। এ-এই করে করে..."

মুরারিবাবু শুনছিলেন। বললেন, "আমাকে তোমরা পর ভাবো। নকুলদা ভাগ্যিস আমাকে বলে রেখেছিল। ...হুঁ হুঁ, কী ভাবছ? এই শর্মাই গতকাল কলকাতা গিয়ে ওঁকে টেনে এনেছে। ...ওই বিরুটা! বিরুটা আমাকে ঘরে তালা আটকে সাতদিন...সা-তটা দিন বন্দী করে রাখল। তারপর আর

এ-ঘরে ঢুকতে পাইনি যে নকুলদার নোটবই থেকে ঠিকানা নেব। ...শেষে পরশুদিন নোটবইটা বিট্টুকে দিয়ে হাতিয়ে...এই দ্যাখো!" বলে পকেট থেকে সেই নোটবইটা বের করলেন।

বিরুর বউদি সেটা ছিনিয়ে নিয়ে কর্নেলকে দিলেন। "দেখছ কাণ্ড? তাই খুঁজে পাচ্ছি না কাল থেকে। বেরোও! বেরোও বলছি ঘর থেকে! পাগলামির একটা সীমা থাকা উচিত!"

মুরারিবাবু বললেন, "উপকার করলে এই হয় সংসারে। ঠিক আছে। তিন কাপ চা দেখছি। অঙ্ক কষলেই এক কাপ আমার। খেয়েই বেরোচ্ছি। আর তোমাদের ত্রিসীমানায় আসব না।"

"হুঁ, গাছে চড়ে বসে থাকোগে!" বিরুর বউদি বললেন, "ওদিকে উনি মার্ডার হয়েছেন, এদিকে একে নিয়ে ঝামেলা। সামলানো কঠিন। শেষে বুদ্ধি করে বিরু আটকে রাখল ঘরে। ...ঠাকুরপো! শোনো তো!"

বিরু বারান্দা থেকে বলল, "কী?"

"বিট্টুকে ডেকে নিয়ে এসো তো। ঘুড়ির লোভ দেখিও, আমার নাম করে। তা হলে আসবে।"

মুরারিবাবু কোঁত-কোঁত করে চা গিলে বললেন, "বিরুর কম্ম নয়। আমি যাচ্ছি।"

উনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বিরুর বউদি বললেন, "ঠাকুরপো, তুমি যাও। মুরারি ঢিল খেয়ে রক্তারক্তি হবে।"

কর্নেল চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "অবশ্য আজকাল ডাকে চিঠি যেতে খুব দেরি হচ্ছে। তাই হয়তো আপনার...তুমিই বলছি বরং... জয়ন্তকে যেভাবে 'তুমি' বলেছ!" কর্নেল প্রায় অট্টহাস্য করলেন।

বিরুর বউদি বললেন, "না, না। আপনি আমার বাবার বয়সি। তুমিই বলুন।"

"তোমার নাম কী মা?"

"রমলা।"

"তোমার স্বামী আমার কথা কবে থেকে বলতে শুরু করেন, মনে আছে?"

রমলা একটু ভেবে বললেন, "আজ ৯ এপ্রিল। উনি মার্ডার হন ২৮ মার্চ। ...হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ১৭ মার্চ রাতে, তখন প্রায় দশটা বাজে, বাড়ি ফিরলেন। কেমন যেন চেহারা...খুব ভয় পেলে যেমন দেখায় মানুষকে। ...তো এমনিতে খুব কম কথা বলতেন। জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে? বললেন, কিছু না। শরীরটা ভালো না। সেই রাতে হঠাৎ বললেন, একটা ধাঁধায় পড়েছি। কর্নেলসায়েবকে চিঠি লিখব। তারপর আপনার পরিচয় দিলেন। কিন্তু ধাঁধাটা কী, কিছুতেই বললেন না। শুধু বললেন, আমার নোটবইতে টুকে রেখেছি। তুমি বুঝবে না।"

কর্নেল নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। "হুঁ, ওঁর ডেডবডি কোথায় পাওয়া যায়?"

"ওই অলুক্ষুনে দেউড়ির নীচে।"

"কে দেখেছিল?"

"মুরারি। জ্যোৎস্না ছিল সে-রাতে। রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরছেন না দেখে মুরারি আর বিরুকে পাঠালুম। বিরু গিয়েছিল বাজারের ওদিকে লাইব্রেরিতে। ওখানে রোজই যেতেন।"

"মুরারিবাবু দেউড়ির দিকে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। ...দেখে এসে...একে আধপাগলা মানুষ, আরও পাগল হয়ে গেলেন। কান্নাকাটি, আবোলতাবোল কথা, ঢিল ছোড়াছুড়ি, যাকে সামনে পান মারতে যান, ভাঙচুর...দু'দিকে দুই বিপদ তখন।"

"আচ্ছা রমলা, তোমাকে নকুলবাবু তিন-শিংওয়ালা ছাগলের কথা বলেছিলেন?"

রমলা চমকে উঠলেন। একটু পরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। বলেছিলেন মনে পড়ছে। সবাইকে জিজ্ঞেস করতেন, কেউ কখনও তিন-শিঙে পাঁঠা দেখেছে নাকি? এটা উনি

মার্ডার হওয়ার ক'দিন আগের কথা। শুধু মুরারি বলল, দেখেছে। ও তো পাগল! ওর কথা! উনি আমল দেননি।"

"তুমি তিনকড়িবাবুকে চেনো?"

"একটু-আধটু চিনি। জাহাজে চাকরি করেন। বার-দুই এসেছিলেন। মুরারির জ্ঞাতি-ভাই। ওর সঙ্গে মামলা লড়ে মুরারির এই অবস্থা। তবে মামলা চলছিল তিন পুরুষ ধরে।"

"একটা দেউড়ি নিয়ে?"

রমলা অনিচ্ছায় হাসলেন। "তাই তো শুনেছি। আসলে জেদের লড়াই।"

"তিনকড়িবাবুর এখানে আর কোনো আত্মীয় আছেন?"

"আছে। করালীবাবু। এখন বাজারের ওখানে বাড়ি করেছে। ব্যাবসা করে খুব পয়সা কামাচ্ছে। তিনকড়িবাবুর কাকার ছেলে।"

"তিনকড়িবাবু কি বেঁটে, মোটাসোটা, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স?"

"বয়স জানি না। বার-দুই বিরুর দাদার কাছে এসেছিলেন। হ্যাঁ, বেঁটে। মোটাসোটা মানুষ। আপনি চেনেন ওঁকে?"

কর্নেল জবাব দিলেন না সে-কথার। বললেন, "নোটবইটাতে মুরারিবাবু খুব হাত লাগিয়েছেন, এটাই সমস্যা। এটা আমি রাখছি, রমলা!"

"রাখুন। আপনি..." রমলা ধরা গলায় বললেন, "একটা নিরীহ সাদাসিধে মানুষকে কে অমন করে মারল, কেন মারল, খুঁজে বের করুন।"

"আপনার ঠাকুরপো কী করে?"

রমলা আস্তে বললেন, "ভাইটাকে মানুষ করতে পারেননি স্কুলটিচার হয়েও। স্কুল ফাইনালে দু'বার ফেল করে এতদিনে একটা চাকরি জুটিয়েছে। ব্যারেজে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন আছে। সেখানকার সিকিউরিটি গার্ড। আসলে দাদা-ভাই দু'জনেই একটু গোঁয়ার, জানেন? দাদা তো কার সঙ্গে ঝগড়া করে স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভাই কবে না একই পথ ধরে! আমার হয়েছে জ্বালা!"

"তা হলে নকুলবাবু রিটায়ার করেননি?"

"না। ভেতরে-ভেতরে খুব রাগী আর জেদি মানুষ ছিলেন। আত্মসম্মানবোধ ছিল ভীষণ। তবে বাইরে থেকে বোঝা যেত না। খুব ভদ্র আর..."

"নিরীহ বলছিলেন?"

রমলা জোর দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। একটা পোকা মারতে হাত কাঁপত। তবে রাগ হলে মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলে দিতেন। এ জন্যই রূপগঞ্জে ওঁকে কেউ পছন্দ করত না। আর ওই এক স্বভাব—তর্ক! পণ্ডিতি তর্ক।"

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, "শুনলুম, লোকে বলছে, শিবমন্দিরের ত্রিশূলে রক্তের দাগ ছিল। বডিতে তিনটে ক্ষত ছিল। তোমার কী ধারণা?"

রমলা ঠোঁট কামড়ে ধরে বললেন, "উনি নাস্তিক মানুষ ছিলেন। সেজন্য ওসব রটানো হয়েছে। আর ত্রিশূলে রক্তের দাগ? মিথ্যা। সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে কেউ।"

"পুলিশ কী বলছে?"

"পুলিশ ত্রিশূলের লাল দাগ তুলোয় মাখিয়ে টেস্ট করতে পাঠিয়েছে। রোজ থানায় গিয়ে খোঁজ নিই। বলে, এখনও কলকাতা থেকে রিপোর্ট আসেনি।"

কর্নেল উঠলেন। "চলি। আমি আছি ইরিগেশন বাংলোয়। দরকার হলে বিরুকে দিয়ে খবর পাঠিও।"

রমলা ব্যস্তভাবে বললেন, "বিট্টুকে খুঁজতে গেল ওরা। চিঠিটা ডাকে দিয়েছিল কি না..."

"থাক। ও-নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই।"....

ঘিঞ্জি গলি দিয়ে বাজারে পৌঁছে দু'জনে থমকে দাঁড়ালুম। শের আলি এবং তার জিপটা নেই। সামনে একটা চায়ের দোকান থেকে একটি ছেলে এসে বলল, "শের আলি বোলা, উও দেখিয়ে সাব! মহিন্দার সিংকা গ্যারিজ...উঁহা চলা যাইয়ে। উও দেখিয়ে শের আলি খাড়া হ্যায়!"

বললুম, "হঠাৎ গ্যারেজে কেন?"

কর্নেল কিছু বললেন না। হনহন করে এগিয়ে চললেন। রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। বাঙালি-বিহারি চেনা কঠিন। দুই রাজ্যের সীমানাবর্তী শহরে এই এক জগাখিচুড়ি।

শের আলি দৌড়ে এল। মুখ উত্তেজনায় লাল। "হারামিলোগোকা খাসিয়ত এইসা হো গেয়া, কর্নিলসাব! দো চাক্কা ফাঁসা দিয়া, ঔর কারবুরেটর জ্যাম কর দিয়া! চাক্কু চালায়া ইঞ্জিনকি অন্দর! তার উরভি কাট দিয়া। কম-সে-কম তিন-চার ঘণ্টে লাগেগি! ম্যায় কা কুঁরু? দেখনে সে তো কলিজা ফাঁসা দেতা।"

কর্নেল একটু হাসলেন। "ঠিক আছে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। আমরা আর একটু ঘুরে আসি।"

একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "শিউজিকো পুরানা মন্দির দর্শন করে ভাই! চলো!"

রিকশায় বসে বললুম, "ব্যাপারটা রহস্যময়!"

"হ্যাঁ। ব্যা-করণ রহস্যের অবস্থা জমজমাট হয়ে উঠল।" কর্নেল বললেন। "তবে এখন আমার ভাবনা আর মুরারিবাবুর জন্য হচ্ছে না। হচ্ছে হালদারমশাইয়ের জন্যে!"

সঙ্গে-সঙ্গে হালদারমশাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল। বললুম, "সত্যিই কি মুরারিবাবুকে উনি ফলো করে এতদূর এসেছেন? বিশ্বাস হয় না।"

কর্নেল পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বললেন, "ভোর ছ'টায় মর্নিং ওয়াকে বেরনোর সময় গেটের বাইরে একটা কাঁটাগাছে এটা আঁটা ছিল, চোখে পড়ার মতো জায়গায়। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

চিরকুটে লাল ডটপেনে লেখা আছে :

পাতিঘুঘু বলিদান
বুড়োঘুঘু সাবধান

বললুম, "সর্বনাশ! হালদারমশাই তা হলে অলরেডি..."

কর্নেল আমার হাত থেকে চিরকুটটা ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "কলকাতা থেকে রূপগঞ্জ থানায় ট্রাঙ্ককলে অলরেডি জানানো হয়েছে। গতকাল এখানে উনি পৌঁছনোর আগেই পুলিশ সতর্ক থাকার কথা। স্বয়ং ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের নির্দেশ। তবু কিছু বলা যায় না।"

শেষ বাক্যটি শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

চার

জঙ্গলে ঢাকা একটা ঢিবির কাছে এসে সাইকেল-রিকশাওয়ালা বলল, "আর যাবেক না সার! হেঁটি-হেঁটি চলেক যান। ম্যালাই লোক যেছে বটেক বাবার ঠেঞে।"

ঢিবির জঙ্গল ফুঁড়ে টাটকা পায়ে-চলা পথের দাগ চোখে পড়ছিল। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে ঢিবিটি তদন্ত করে দেখলেন যেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, "হেঁটি-হেঁটি চলেক যাই, ডার্লিং!"

সঙ্কীর্ণ নতুন রাস্তাটি করার সময় ঝোপঝাড়ও কাটা হয়েছে। কিছুটা এগিয়ে একদঙ্গল লোক যাচ্ছে দেখলুম। একজনের কাঁধে একটা পাঁঠা। তবে দুটো শিং। একটি ঢাকও নিয়ে যাচ্ছে। বললুম, "এ দেশের লোক বড্ড হুজুগে।"

কর্নেল বললেন, "সব দেশের লোকই হুজুগে, জয়ন্ত! তবে তফাতটা হল, এ-দেশে এখনও মানুষের হাতে প্রচুর সময়। সেই সময়কে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা কম। আর যদি কুসংস্কারের কথা বলো, সেও সবখানে মানুষের মগজে ঠাসা। মহা-মহা পণ্ডিতের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়েছে। পিদিমের তলায় আঁধারের মতো তাঁদের এক-একজনের এক-একরকম উদ্ভট কুসংস্কার দেখেছি। ...হুঁ, নাস্তিকদেরও কুসংস্কার দেখেছি, জয়ন্ত! আসলে সত্যিকার নাস্তিক হতে গেলে মনের জোর থাকা চাই। খাঁটি নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। অবিশ্বাস করাটা শক্ত বিশ্বাস করাটা সহজ। কারণ আজন্ম মানুষ বিশ্বাস ব্যাপারটাতে অভ্যস্ত। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসই মানুষের সমাজটাকে বেঁধে রেখেছে। ওই রিকশাওয়ালার কথাই ধরো। আমরা তাকে ভাড়া দেব বিশ্বাস করেই আমাদের বয়ে আনল! বিশ্বাস, ডার্লিং, বিশ্বাস জিনিসটা না থাকলে মানুষের বাঁচা কঠিন হত। কিন্তু কিছু বেয়াড়া লোক থাকে। তারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে। যে বিশ্বাস চালু, তাকে অবিশ্বাস করে। তারপর? চালু-বিশ্বাস যদি বা ভাঙে, আর এক নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়।..."

কর্নেলের এই দীর্ঘ দার্শনিক ভাষণের তাৎপর্য বুঝতে পারছিলুম না। ফালি রাস্তার পর ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে সামনে ধ্বংসস্তূপ এবং তার পেছনে একটা মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ল। চূড়ায় কালচে রঙের ত্রিশূল। কর্নেল বাইনোকুলারে ত্রিশূলটি দেখে নিলেন। বললুম, "রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছেন?"

কর্নেল কথায় কান না দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

বিরক্ত হয়ে হাঁটতে থাকলুম। উনি সমানে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। তারপর ঢাক বেজে উঠল। ধ্বংসস্তূপগুলোর পর একটা খোলা পাথর-বাঁধানো চত্বর। ফাঁকে-ফোকরে উদ্ভিদ গজিয়েছিল। কেটে সাফ করা হয়েছে। একদঙ্গল লোক বসে আছে এবং প্রত্যেকের হাতে একটা করে নানা সাইজের পাঁঠা। প্রকাণ্ড মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠ এবং রক্তে ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। ঢাক-কাঁসি বাজছে। ধেইধেই নাচও চলছে। রক্তারক্তি দেখলে আমার গা গুলোয়। মন্দিরটা দেখতে থাকলুম। কালো পাথরে তৈরি খয়াটে এবং ফাটলধরা প্রাচীন স্থাপত্যের কেমন যেন ভয়াল চেহারা। দেখলেই গা-ছমছম করে। এতক্ষণে লোহার ত্রিশূলে কালচে রক্তের দাগ স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আমাদের দেখতে পেয়ে কয়েকজন পাণ্ডা ভিড় করল। কারও পরনে গেরুয়া, কারও পট্টবস্ত্র এবং প্রত্যেকের কপালে সম্ভবত রক্তের ফোঁটা। সাজিয়ে শিবের প্রিয় বেলপাতা, জবাফুল। কিছু ধুতরো ফুলও দেখতে পেলুম। কর্নেল প্রত্যেককে একটা করে টাকা বিলোচ্ছেন দেখে অবাক হলুম, কলকাতা থেকে একগুচ্ছের এক টাকার নোট জোগাড় করেই এসেছেন! আমার এই বৃদ্ধ বন্ধুটি সত্যিই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।

ঢাকের বাজনার তালে-তালে একজন সন্ন্যাসী চেহারার লোক নেচে-নেচে গাইছে :

নাচে পাগলাভোলা গলায় মালা
হাতে লয়ে শূল
প্রমথ প্রমত্ত নাচে
কানে ধুতুরারই ফুল...

কর্নেল এক টাকার হরির লুঠ দিয়ে লম্বা পায়ে কেটে পড়লেন। মন্দিরের পেছনে গিয়ে ওঁর নাগাল পেলুম। আবার খানিকটা খোলা জায়গা এবং সামনে একটা প্রকাণ্ড উঁচু আধখানা দেউড়ি দেখা গেল। পাথরের এমন তোরণ দিল্লির মেহরৌলিতে কুতবমিনারের কাছে দেখেছি।

"অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী!" কর্নেল মুগ্ধদৃষ্টে তাকিয়ে বলে উঠলেন। "এর মালিকানার জন্য একটা কেন একশোটা কুরুক্ষেত্র বাধা স্বাভাবিক। সত্যিই ডার্লিং! রাজা শিবসিংহের এই উত্তুঙ্গ কীর্তির ভগ্নাবশেষ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা লড়ে ফতুর হতে আমারও ইচ্ছে করছে। দুঃখের বিষয়, সরকার দেশের প্রাচীন কীর্তি সম্পর্কে এত অমনোযোগী কেন, ভেবে পাইনে! ফিরে গিয়ে প্রত্ন-দফতরে কড়া করে চিঠি লিখব।"

বলে কর্নেল ক্যামেরায় নানা দিক থেকে ছবি তুললেন। তারপর কাছে গিয়ে বললেন, "ওপরটা ভেঙে গেলেও অনুমান করছি, তোরণটা অন্তত পঁয়ত্রিশ ফুট উঁচু ছিল। আর এই দ্যাখো, চওড়ায় কী বিশাল! প্রায় দশ ফুট!"

ওদিকে গিয়ে দেখলুম, তোরণ বা দেউড়িটির মাথায় ঘন ঝোপ গজিয়ে রয়েছে। আস্ত একটা বেঁটে বটগাছ মাথা তুলেছে এবং সেটার শেকড় সাপের মতো এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে গা বেয়ে।

হঠাৎ দেউড়ির মাথায় ঝোপের ভেতর আওয়াজ হল, "একাশি!"

চমকে উঠলুম। ঝোপ ফুঁড়ে কালো একটা ছাগলের মুখ দেখা যাচ্ছে এবং রীতিমতো আশ্চর্য ঘটনা, তার তিনটে শিং! উত্তেজনায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল বাইনোকুলারে দেখছিলেন। ঝটপট ক্যামেরা তাক করে শাটার টিপলেন। ছাগমুণ্ডটি দাড়ি ও তিন শিং নেড়ে ফের বলে উঠল মানুষের ভাষায়, "একাশি!" তারপর বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল।

কর্নেল এবং আমি ভাঙা দেউড়িটার চারদিকে ছোটাছুটি করে তাকে আর খুঁজে পেলুম না। কর্নেল ব্যস্তভাবে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে এবং শেকড়বাকড় ধরে ওঠার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তখন বললেন, "তোমার তো মাউন্টেনিয়ারিং-এ ট্রেনিং নেওয়া আছে। দ্যাখো তো চেষ্টা করে। আসলে আমার শরীরটা বেজায় ভারী হয়ে গেছে। নইলে আমিও কিছু পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছি একসময়। জয়ন্ত! কুইক!"

একটু দোনামনা করে বললুম, "মাউন্টেনিয়ারিংয়ের জন্য বিশেষ জুতো পরা দরকার। এই জুতো পরে ওঠা সম্ভব নয়।"

"চেষ্টা করো ডার্লিং!"

কর্নেলের তাড়ায় পাথরের খাঁজে পা রেখে বুটের শেকড় আঁকড়ে অনেকটা ওঠা গেল। প্রায় মাঝখানে পৌঁছে হল বিপদ। শেকড়টা এখন বেশ মোটা। খাঁজে গজানো গুল্ম ধরে উঠতে গেলেই উপড়ে যাচ্ছে। নীচে থেকে কর্নেল ক্রমাগত উৎসাহ দিচ্ছেন। এইবার একটা মোটা লোহার আংটা চোখে পড়ল মাথার ওপরে। মরচে-ধরা আংটা। টেনে দেখলুম, ওপড়ানোর চান্স নেই।

আংটাটি আঁকড়ে বারের কসরত করে গিরগিটির মতো উঠতেই একটা শক্ত ঝোপ বাঁ হাতের নাগালে এসে গেল। এরপর আর ওঠাটা কষ্টকর হল না। ঝোপ আঁকড়ে পাথরের খাঁজে পা রেখে-রেখে মাথায় উঠলুম। ফুট-দশেক চওড়া জায়গা জুড়ে ঘন ঝোপ। তিন-শিঙে ছাগল যেখানে মুখ বের করেছিল, সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। নীচে থেকে কর্নেল বললেন, "গর্ত দেখতে পাচ্ছ কি?"

এমনভাবে বললেন, যেন নিজেও একবার উঠে আবিষ্কার করে গেছেন! হাসতে-হাসতে বললুম, "গর্ত নয়। কুয়ো।"

কর্নেল উত্তেজিতভাবে বললেন, "সিঁড়ি আছে দ্যাখো!"

"আছে।"

"নির্ভয়ে নেমে যাও।"

"পাগল!"

"পাগল না ডার্লিং, ছাগল।"

"কী যা-তা বলছেন?"

"ছাগল নেমে গেছে যখন, তখন তুমিও নামতে পারো। কুইক!"

কথাটা মনে ধরল। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলুম। একটু পরে ঘুরঘুটে আঁধার। সেই আঁধারে আবার ব্যা-ডাক শুনতে পেলুম। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলে দেখলুম সিঁড়ির নীচে সমতল পাথর-বাঁধানো মেঝে। একটা করে দেশলাইকাঠি জ্বালি আর সেই আলোয় ভয়ে-ভয়ে পা ফেলি। তিনকড়িচন্দ্র খুঁড়িয়ে হাঁটছে যখন, তখন এই দুর্গম সুড়ঙ্গপথে তার হামলার আশঙ্কা যে নেই, এটাই আমার দুঃসাহসের কারণ। কিছুটা চলার পর সুড়ঙ্গপথ শেষ হল। বাইরের আলো এসে পড়েছে সামনে। আবার সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে ওপরে। এতক্ষণে অস্বস্তি কেটে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলুম। মাথায় ঘন ঝোপ ও লতার বুনোট। সম্ভবত তিনশিঙে ছাগলটির যাতায়াতে সবুজ রঙের বুনোটটি ছেঁদা হয়ে গেছে। সেই ছেঁদা দিয়ে বেরিয়ে দেখি, একটা ছাদবিহীন ভাঙা ঘরের ভেতর এসে পড়েছি। দু'দিকে ভাঙা উঁচু পাঁচিল, একদিকে ধ্বংসস্তূপ, অন্যদিকটায় জঙ্গল।

এইমাত্র কেউ বা কিছু জঙ্গল ভেদ করে চলে গেছে, ঝোপগুলো তখনও দুলছে। ছাগলটাই হবে। সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকালে বোঝবার উপায় নেই কিছু। মনে হবে ওটা নেহাত আরও সব জঙ্গলের মতো জঙ্গল।

ছাগলটা যেদিকে গেছে বলে সন্দেহ হল, সেদিকেই পা বাড়ালুম। কিন্তু আর এগোনো কঠিন। গুঁড়ি মেরে অবশ্য ঢোকা যায়, এবং চারঠেঙে জন্তুর পক্ষেই খুদে গড়নের জন্য গলিয়ে যাওয়া সম্ভব। কাজেই সে-চেষ্টা ত্যাগ করে ধ্বংসস্তূপের দিকটায় এগিয়ে গেলুম। তারপর কী কষ্টে যে পাথরের স্ল্যাব, ইট আর ঝোপঝাড়লতার ভেতর দিয়ে খোলা সমতল জায়গায় পৌঁছলুম, বলার নয়।

কিন্তু এবার যেদিকে তাকাই, ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি আর একই ধ্বংসস্তূপ। শিবমন্দিরের চূড়া বা তোরণটাও দেখা যাচ্ছে না। একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলুম। ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া এল, "চলে এসো ডার্লিং! ব্র্যাভো!"

দক্ষিণের একটা ভাঙা ঘরের দরজায় প্রাজ্ঞ বন্ধুবর সাদা দাড়ি নেড়ে এবং টুপি খুলে মাথা একটু ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানালেন। "মার্ভেলাস, জয়ন্ত! কনগ্রাচুলেশন! তবে এতখানি নার্ভাস হয়ে পড়ার কারণ ছিল না। এই স্তূপটায় উঠে বাইনোকুলারে মাটি ভেদ করে তোমার উদ্ভিদরূপী অভ্যুত্থান দেখেছি। আমি জানতুম, এটাই ঘটবে।"

কর্নেল খোলা জায়গায় নেমে এলেন। বললুম, "জানতেন! কী জানতেন?"

"তোমার এভাবেই অভ্যুত্থান ঘটবে।"

"তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন ওই সুড়ঙ্গপথটার কথা, আপনি জানতেন?"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "অঙ্ক ডার্লিং! স্রেফ অঙ্ক! পিওর ম্যাথস। তিন তিরেক্কে নয়, নয়-নয়ে একাশি। তবে ব্যাকরণেও অঙ্কের নিয়ম কার্যকর। এক এবং আশি যোগ করলে যেমন একাশি হয়, তেমনি সন্ধি করলেও একাশি হয়। চলো! এবার থানায় গিয়ে হালদারমশাইয়ের খোঁজখবর নেওয়া যাক।"

ধ্বংসস্তূপগুলোর ভেতর দিয়ে কিছুটা এগিয়ে এতক্ষণে দক্ষিণে সেই শিবমন্দিরের ত্রিশূল চোখে পড়ল। হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, "তিনকড়িবাবু! তিনকড়িবাবু! আপনার বিছানা স্টেশনে... কী আশ্চর্য!"

এক পলকের জন্য দেখলুম, শিবমন্দিরের পেছন দিকে ছড়ি হাতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে সেই তিনকড়িচন্দ্র উধাও হয়ে গেলেন। কর্নেল অট্টহাসি হেসে বললেন, "না—ওঁর দোষ নেই। আসলে সেকালের লোকেরা বড্ড ধাঁধা ভালোবাসতেন। একালে যে হঠাৎ ক্যুইজের হুজুগ উঠেছে, সেও সেই পুরোনো স্বভাবের পুনরুভ্যুত্থান। সভ্যতার এই নিয়ম। পুরোনো বাতিক নতুন করে বারবার যুগে-যুগে ফিরে আসে। কিন্তু সমস্যা হল, কিছু লোক আছে, সভ্যতার ব্যাকরণ বোঝে না। ব্যাকরণ মানে না। তারা হাঁসজারুর পেছনে হন্যে হয়।"

কর্নেলের পুনঃ দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শেষ হল, মন্দির-চত্বর পেরিয়ে ঢিবির জঙ্গলচেরা সঙ্কীর্ণ নতুন রাস্তার নীচে পিচের সড়কে পৌঁছে। এতক্ষণে পুণ্যার্থীদের ভিড় বেড়েছে। সাইকেলরিকশা তখনই পাওয়া গেল।

কর্নেল বললেন, "থানেমে লে চলো, ভাই! জলদি যানা পড়ে। বখশিস মিলে গা।"

সাইকেলরিকশাওয়ালা ফিক করে হেসে বলল, 'স্যার, চিনতে পারলেক নাই বটেক। আমিই তো তখন সারদের লইয়ে এলাম বটেক।"

কর্নেল বললেন, "তাই বটেক!"

আমি বললুম, "ওহে রিকশাওয়ালা, তোমাদের এই বটেকটা কী বলো তো?"

রিকশাওয়ালা একগাল হেসে বলল, "উটো একটো কথাই বটেক!"

"কথা তো বটেই! কিন্তু..."

"স্যার লিজের মুখেই তো বইললেন বটেক।"

কর্নেল গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন, "বুঝলে না? বটে তো বটেই বটেক!"...

থানার সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা গেট দিয়ে ঢুকলুম। দু'ধারে ফুলে-ফুলে ছয়লাপ। বললাম, "রূপগঞ্জের ব্যাপার! খুব রূপসচেতন। খালি ফুল আর ফুল। থানাতেও ফুল! খুনে-বদমাশ চোর-জোচ্চোরদের ধরে এনে ফুল শোঁকানো হয় মনে হচ্ছে।"

থানাঘরে ঢুকতেই একজন পুলিশ-অফিসার কর্নেলকে দেখে চেয়ার ছেড়ে প্রায় লম্ফ দিলেন। "হ্যাল্লো কর্নেলসায়েব, আসুন, আসুন। ও.সি. সায়েব এখনই আপনার কথা বলছিলেন।"

অফিসারটি পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। দত্যিদানোর মতো প্রকাণ্ড এবং গুঁফো অফিসার-ইন-চার্জ ভদ্রলোকও অনুরূপ লম্ফ দিয়ে হাত বাড়ালেন। পেল্লায় ধরনের হ্যান্ডশেকের পর বিকট অট্টহাসিতে কানে তালা ধরে গেল। বললেন, "কল্যাণবাবুকে এখনই বলছিলুম, এলে নিশ্চয় ইরিগেশন বাংলোয় উঠবেন। দেখুন তো খোঁজ নিয়ে। কাল ডি. জি-সায়েবের ট্রাঙ্ককল পেয়েই বুঝে গেছি, সিরিয়াস কেস। কাল ট্রেনও দু'ঘণ্টা লেট ছিল। স্টেশনে স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক মোতায়েন ছিল।"

বলে বড়বাবু বসলেন। কর্নেল বললেন, "হালদারমশাইয়ের খবর?"

বড়বাবু বেজার মুখে বললেন, "ওরা তেমন সন্দেহজনক কাউকে তো দেখতে পায়নি। পাগলাবাবুকে কেউ ফলো করেনি। হালদারবাবুর চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন ডি. জি-সায়েব, তেমন কাউকে দেখা যায়নি।"

আমি বললুম, "ছদ্মবেশ ধরার বাতিক আছে ওঁর।"

বড়বাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আপনিই আশা করি সেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কর্নেলের মুখে আপনার কথা শুনেছি। ভালো, খুব ভালো। কিন্তু আপনি তো ভাবিয়ে তুললেন দেখছি!"

কর্নেল বললে, "মিঃ হাটি, মন্দিরের ত্রিশূলের রক্তের দাগ সম্পর্কে ফরেনসিক রিপোর্ট পেয়েছেন কি?"

"আজ সকালে পেয়েছি। মানুষেরই রক্ত। তার চেয়ে সমস্যা, নকুলবাবুর ব্লাড-গ্রুপের সঙ্গে মিলে গেছে।"

শুনেই আঁতকে উঠলুম। বললুম, "তা হলে ওই ত্রিশূলেই নকুলবাবুকে..."

আমার কথায় বাধা দিয়ে বড়বাবু মিঃ হাটি বললেন, "ওই ত্রিশূল ওপড়ানোর সাধ্য মানুষের নেই। তবে স্বয়ং মহাদেবের থাকতে পারে।" বলে আবার সেই দানবীয় অট্টহাসি হাসলেন। হাসি তো নয়, মেঘের ডাক। তার আওয়াজে যেন ভূমিকম্পও হচ্ছিল। অন্তত তাঁর শরীরে সেই কাঁপুনি দেখে তাই মনে হয়।

কর্নেল বললেন, "মন্দিরটা দেখলুম খুব উঁচু। তা ছাড়া চূড়াটা ছুঁচলো এবং শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে। উঁচু মই ছাড়া ওঠাও অসম্ভব। ত্রিশূলে নকুলবাবুর রক্ত কী করে মাখানো হল?"

মিঃ হাটি গুম হয়ে বললেন, "এটাই আশ্চর্য! আমরা ফায়ারব্রিগেড আনিয়ে ত্রিশূল থেকে রক্তের নমুনা নিয়েছিলুম। ফায়ারব্রিগেডের মই ছাড়া চূড়োয় ওঠা যেত না। কল্যাণবাবুও উঠেছিলেন চূড়োর চারদিক পরীক্ষা করতে। সাধারণ মই দিয়ে উঠলে মইয়ের ডগার দাগ পড়ত।"

কল্যাণবাবু বললেন, "কোনো দাগ দেখতে পাইনি। তবে এক হতে পারে, লম্বা বাঁশের মাথায় রক্তমাখা তুলো বেঁধে ত্রিশূলে ঘষে দিয়েছিল খুনি। কিন্তু ভালোভাবে পরীক্ষা করেছি, ত্রিশূলে তুলোর আঁশ লেগে নেই। এমনকি, ত্রিশূলের গা বেয়েও রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েনি। চূড়োতেও রক্তের ফোঁটা নেই কোথাও। তন্নতন্ন খুঁজেছি।"

আমি বললুম, "ন্যাকড়ায় রক্ত মাখিয়ে..."

আবার বাধা পড়ল হাটিবাবুর বিকট অট্টহাস্যে। বললেন, "তা হলে তো মশাই রক্তের ফোঁটায় চূড়ো একাকার হয়ে থাকত। তুলো রক্ত শুষে নেয়। ন্যাকড়া অত শুষতে পারে কি? ভেবে বলুন।"

হাবা বনে বসে রইলুম। কর্নেল বললেন, "কিন্তু আমার ভাবনা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের জন্য। এই দেখুন।" বলে কর্নেল পকেট থেকে সচ্ছিদ্র চিরকুটটা বড়বাবুর হাতে দিলেন। "বাংলোর গেটের বাইরে একটা কাঁটাঝোপে এটা লটকানো ছিল।"

ছড়াটা পড়ে পুনঃ বিকটহাস্যের জন্য রেডি হয়েই বড়বাবু মিঃ হাটির মুখ তুম্বো হয়ে গেল। ভুরু বেজায় কুঁচকে গোঁফ চুলকে বললেন, "মন্দিরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ডি. জি-সায়েবের নির্দেশ দিল সাদা পোশাকের পুলিশ রাখতে, অক্ষরে-অক্ষরে তা পালন করেছি। পাঁঠাগুলোর দিকে লক্ষ রাখতে বলেছিলুম। তিন শিঙে পাঁঠা বলির জোগাড় দেখলেই যেন বমাল আসামি ধরে থানায় পাঠায়। কিন্তু এখনও তেমন কিছু ঘটেনি। নরবলি তো দূরস্থান!"

কর্নেল বললেন, "রাতেও আশা করি পুলিশ ছিল?"

"আলবাত ছিল," মিঃ হাটি জোর গলায় বললেন, "নরবলি যে হয়নি, সেটার গ্যারান্টি দিতে পারি। কাজেই এটা স্রেফ হুমকি।"

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "অন্য কোনো মন্দিরেও তো... মানে, ওদিকটা অনেক ভাঙাচোরা মন্দির দেখলুম। যদি হালদারমশাইকে..."

বড়বাবুর শেষদফা আটকে-রাখা বিকট হাস্যটির বিস্ফোরণ ঘটল। পরিশেষে প্রকাণ্ড মুণ্ড জোরে নেড়ে বললেন, "এখন পর্যন্ত ওই এরিয়া কেন, কোথাও কোনো ডেডবডির খবর নেই। ডি. জি-র ট্রাঙ্ককল পেয়েই আমরা অ্যালার্ট, রেড সিগন্যাল বোঝেন তো?"

কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন, "আচ্ছা মিঃ হাটি, তিনকড়িচন্দ্র ধাড়াকে চেনেন?"

মিঃ হাটির ভুরু বেশ পুরু। কুঁচকে তাকালেন কল্যাণবাবুর দিকে।

কল্যাণবাবু বললেন, "কেন? করালীবাবুর আত্মীয়...সেই স্মাগলার স্যার! জাহাজে চাকরি করে। ...সরডিহির রাজবাড়ির মন্দির থেকে সোনার ঠাকুর চুরির কেসের মূল আসামি ছিল। আইনের

ফাঁকে ছাড়া পেয়ে নিপাত্তা হয়ে গেল। এক মিনিট। কেসের ফাইলটা খুঁজে আনছি।" কল্যাণবাবু সবেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনার একটু সাহায্য এখনই চাই মিঃ হাটি!"

"অবশ্যই পাবেন। বলুন!"

"আমি শিবমন্দিরের ভেতরটা একবার দেখতে চাই। ভক্তদের সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগতে পারে। সেজন্যই পুলিশের সাহায্য ছাড়া এ-কাজটা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।"

বড়বাবু হাঁকলেন, "কল্যাণবাবু, ফাইল পরে হবে। প্লিজ, চলে আসুন!" ...বলে কর্নেলের দিকে ঘুরে বললেন, "মার্ডার কেস! ধম্মকম্ম নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই, কর্নেলসায়েব! ভগবান আছেন, মাথায় থাকুন। আর স্বয়ং ভগবানই বলেছেন কি না 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানি...' এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা!"

পুনঃ ভূমিকম্পসদৃশ বিকট অট্টহাস্য! বাপ্‌স! পুলিশকে এমন হাসতে কখনও দেখিনি। এই ভদ্রলোক যদি চোর-জোচ্চোরকে বেটনের গুঁতোর বদলে এই সাঙ্ঘাতিক হাসির গুঁতো মারেন, সঙ্গে-সঙ্গে পেটের কথা উগরে দেবে। মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাসের বদলে এঁর লাফিং গ্যাস প্রয়োগ করলে অনেক বেশি কাজ হবে সন্দেহ নেই।

কল্যাণবাবু থানার সেকেন্ড অফিসার। সঙ্গে দু'জন সশস্ত্র সেপাই। গেটে রিকশাওয়ালা অপেক্ষা করছিল। কর্নেল এবং আমার সঙ্গে এবার পুলিশ দেখে আঁতকে উঠে সে কেটে পড়তে যাচ্ছিল। কর্নেল মধুর হেসে তার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে সম্ভাষণ করলেন, "এই যে ভাই! ভাড়া আর ওয়েটিং চার্জ তো লিবেই বটেক।"

রিকশাওয়ালা ভয়ে-ভয়ে টাকাটা নিয়ে পালিয়ে যেতে এক সেকেন্ড দেরি করল না। একজন সেপাই মুচকি হেসে বলল, "বহত্ কামাতা শিউজিকা কিরপাসে।"

পুলিশের জিপে এবার তিন মিনিটেই পৌঁছে গেলুম। জিপ রাস্তায় রইল। কর্নেল বললেন, "একজন কনস্টেবল জিপের কাছে থাক, কল্যাণবাবু!"

কল্যাণবাবু বললেন, "কোনো দরকার নেই, কর্নেল! এ আপনার কলকাতা শহর নয়। দেহাতি গঞ্জ। এখানে পুলিশ কেন, পুলিশের জুতোকেও ভয় পায় লোকেরা। রাস্তায় ফেলে গেলেও ছোঁবে না। তা ছাড়া চাবি!" বলে রিঙের চাবিটা নাড়া দিলেন।

মন্দিরে বলিদান চলেছে। তেমনি ঢাক বাজছে। এখন ভিড়টা বেশ বেড়েছে। আমাদের দেখে তিড় থেকে দু'জন তাগড়াই চেহারার লোক বেরিয়ে এল। বুঝলুম, সাদা পোশাকের পুলিশ। কল্যাণবাবু মন্দিরের উঁচু বারান্দায় উঠলেন। পাণ্ডারা এবং তাদের দলপতি গেরুয়াধারী সেই সাধু-সন্ন্যাসী চেহারার লোকটি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। জুতো খুলে রেখে আমরা ভেতরে ঢুকলুম। মন্দিরের ভেতরটা চওড়া। ভাঙাচোরা শিবলিঙ্গে প্রচুর সিঁদুর মাখানো হয়েছে। কর্নেল পকেট থেকে টর্চ জ্বেলে ছাদে আলো ফেললেন। চোখে বাইনোকুলার স্থাপনও করলেন।

একটু পরে টর্চ নিবিয়ে এবং বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "হুঁ! বোঝা গেল।"

কল্যাণবাবু বললেন, "কী বোঝা গেল, কর্নেল?"

"মই বাইরে ব্যবহার করা যায়নি। কারণ অত উঁচু মই জোগাড়ের সমস্যা ছিল। কিন্তু মন্দিরের মেঝে উঁচু। একটা বিশ ফুট মই যথেষ্ট। বিশেষ করে এই লিঙ্গের বেদিতে যদি মইয়ের গোড়া রাখা যায়, মাত্র ফুট-পনেরো মই হলেই চলে।" বলে বেদির পেছনে টর্চের আলো ফেললেন। পকেট থেকে এবার একটা আতস কাচ বের করে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর সোজা হয়ে ফের বললেন, "হুঁ, বেদিতেই মইয়ের গোড়া দুটো রাখা হয়েছিল। পাথরে গোল দুটো ধুলোর ছাপ স্পষ্ট হয়ে আছে এখনও। জল ঢেলে মন্দিরের ভেতরটা পরিষ্কার করার তর সয়নি। খুনের পরদিনই তাড়াহুড়ো করে

পুজো আর বলির আয়োজন করা হয়েছিল। হিসেবি মাথার কাজ, কল্যাণবাবু! স্টার্ট করে দিলেই পুজো আর বলিদানের মেশিন চলবে, জানা কথা। কিন্তু এটাই আশ্চর্য ব্যাপার, অপরাধী নিজের অজ্ঞাতে কিছু সূত্র রেখে যাবেই।"

কল্যাণবাবু হাঁ করে শুনছিলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো।"

কর্নেল হাসলেন। "আপনিই তো দমকলের মইয়ে চুড়োয় উঠেছিলেন। ত্রিশূলের গোড়ায় গোল লোহার চাকতি আঁটা আছে, কী করে আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল?"

কল্যাণবাবু যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "দৃষ্টি এড়াবে কেন? গোল প্রায় সাত-আট ইঞ্চি ব্যাসের লোহার চাকতি আঁটা আছে। তার সেন্টার থেকে ত্রিশূলটা উঠে গেছে।"

কর্নেল কৌণিক ছাদের কেন্দ্রে ফের টর্চের আলো ফেলে বললেন, "দেখুন, তলাতেও অমনি একটা লোহার গোল চাকতি আঁটা। চাকতিটা নতুন! মরচে ধরেনি!"

"মাই গুডনেস!" নড়ে উঠলেন কল্যাণবাবু। "ওপরের চাকতিটাও মরচে-ধরা ছিল না। কিন্তু..."

"কল্যাণবাবু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "তাই তো! আসলে আমি রক্তের দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছিলুম।"

"ঠিক তাই। আপনার দৃষ্টি ছিল তৎকালীন উত্তেজক বস্তুর একমাত্র লাল রং, অর্থাৎ রক্তের মতো জিনিসটার দিকেই।" কর্নেল টর্চ নিভিয়ে বললেন। "এমন সুপ্রাচীন মন্দিরের ত্রিশূল মরচে ধরে আস্ত থাকার কথা নয়—যদি না সেটা বিখ্যাত জাহানকোশা তোপ বা কুতুবমিনারের প্রাঙ্গণে স্তম্ভটার মতো বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি লোহা হয়। এ-ত্রিশূল সেই লোহার নয়। বাইনোকুলারে ত্রিশূল এবং ওই চাকতিতে টাটকা পেটাইয়ের দাগ স্পষ্ট। ডগা খুব তীক্ষ্ণ। তবে চাকতি বলছি, জিনিসটা চাকতি নয়। ওটা ঘুড়ির লাটিমের গড়ন সচ্ছিদ্র একটুকরো লোহা। ত্রিশূলটা স্ক্রু'র মতো ওতে পেঁচিয়ে ঢোকানো আছে। প্রাচীন যুগের বহু মন্দিরে এই পদ্ধতিতে ত্রিশূল আটকানো রয়েছে। কেন জানেন? পাখির বিষ্ঠা বা ময়লা লাগলে খুলে সাফ করার জন্য। তা ছাড়া মরচে ধরলে যাতে বদলানো যায়, সেও একটা কারণ।"

কর্নেল বেদির পেছনে মেঝেয় টর্চের আলো ফেললেন। "ওই দেখুন, কত মরচে-ধরা লোহার গুঁড়ো পড়ে আছে। মরচে-ধরা প্রাচীন ত্রিশূল তলা থেকে ভেঙেচুরে টেনে বের করা হয়েছে। তারপর একই পদ্ধতিতে নতুন ত্রিশূল তলা দিয়ে ঢুকিয়ে ওপরকার পাথরের গোলাকার খাঁজে আটকে দেওয়া হয়েছে। যাতে ফোকর গলে পড়ে না যায়, লোহার গোঁজ ঠোকা হয়েছে তলা থেকে। ছাদের ঝুলকালির জন্য গোঁজগুলো সহজে চোখে পড়ে না।"

কল্যাণবাবু ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কে সে? কার পেটে-পেটে এমন সাঙ্ঘাতিক কুচুটে বুদ্ধি?"

কর্নেল বেরিয়ে গিয়ে বললেন, "এলাকার কামারশালাগুলোতে খোঁজ নিন। তবে আমার মাথায় এখন হালদারমশাইয়ের জন্য ভাবনা। কল্যাণবাবু, এখান থেকে সোজা পশ্চিমে হেঁটে গেলে কি নদীর ধারে পৌঁছব?"

"হ্যাঁ। এই ঢিবির নীচেই হাইওয়ে, তার নীচে নদী। কি দরকার হাঁটবার? চলুন, জিপে পৌঁছে দিই।"

কর্নেল একটু ভেবে বললেন, "হ্যাঁ, তাই চলুন।"

জিপের কাছে পৌঁছেই কল্যাণবাবু হঠাৎ মুরারিবাবুর মতোই তিড়িংবিড়িং করে জিপটার চারদিকে চক্কর মেরে হুমড়ি খেয়ে সামনের চাকার কাছে বসলেন। বসেই লাফিয়ে উঠলেন। মস্ত একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, "কে সে...শয়তান, আমি তাকে দেখে নেব...এত সাহস!"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "টায়ার ফাঁসিয়েছে। কারবুরেটর জ্যাম করেছে। ইঞ্জিনের ভেতরকার তার কেটেছে। যাকগে, কল্যাণবাবু, আপাতত বিদায়। আবার দেখা হবে।"

কর্নেল আমার হাত ধরে টেনে হনহন করে হাঁটতে থাকলেন। আমি হতবাক। কিছুটা এগিয়ে একটা সাইকেল-রিকশা দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন, "মহিন্দার সিংকা গ্যারিজ। তুরন্ত চল্না ভাই।"

এই রিকশাওয়ালা 'বটেক'-এর বদলে বলল, "জরুর, চলিয়ে না, যাঁহাপর যানা।"

গ্যারেজে গিয়ে দেখি, শের আলির জিপ রেডি। স্যালুট ঠুকে বলল, "সব ঠিক হ্যায় কর্নিলসাব! মালুম হোতা, কই বদমাশ গ্যাংকা কুছ খতরনাক মতলব হ্যায়। উও আপকো হেঁয়া ঘুমনা পসন্দ্ নেহি করতা।"

অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

পাঁচ

উত্তরের উজানে ব্যারেজ এবং জলাধারের দরুন এখানে নদীটার দশা করুণ। বুকে বড়-বড় পাথর নিয়ে ক্ষতবিক্ষত চেহারায় পড়ে আছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনসূত্রে পাওয়া দয়ার দান সামান্য জলে এত গভীর নদীকে বড্ড গরিব দেখাচ্ছে! হাইওয়ের ধারে একটা বটতলায় জিপ দাঁড় করিয়ে কর্নেল শের আলিকে বললেন, "ফিরতে দেরি হবে। তুমি বরং চলে যাও। বিকেল চারটে নাগাদ বাংলোয় যেও।"

শের আলি স্যালুট ঠুকে জিপ নিয়ে চলে গেল। আমরা ঢিবিতে উঠে গেলুম। খানিকটা খোলামেলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন, "দেখো, দেখো! রামধনুর জেল্লা দেখো। ওই গাছগুলোর ডালে ফুলন্ত রেনবো অর্কিডের ঝাঁক দেখতে পাচ্ছ না? সূর্যের আলো তিনটে পাপড়ির ভেতর দিয়ে সাতটা রঙে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তিনটে পাপড়ি নয়, যেন তিনটে প্রিজম্।"

সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতো দৃশ্য। বললুম, "ছবি তুলে নিন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার কৃষির পাতায় ছাপিয়ে দেব। তবে আমারও লোভ হচ্ছে। একটা অর্কিড স্যুভেনির হিসেবে নিয়ে যেতুম। কিন্তু অত উঁচুতে ওঠা তো অসম্ভব। বিট্টুকে কিংবা মুরারিবাবুকে পেলে ভালো হত।"

কর্নেল একটা প্রকাণ্ড গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন। গাছটার ডালে-ডালে প্রচুর রেনবো অর্কিড। আপন মনে বললেন, "এও সংখ্যাতত্ত্বের লীলা। তিনটে পাপড়ি! ঘুরে-ফিরে সেই তিনের অঙ্ক।"

বললুম, "কিন্তু তিন তিরেক্কে নয় হচ্ছে না। সাতটা রং!"

"উঁহু! ভুল করছ, ডার্লিং!" কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, "তিন সাত্তে একুশ। দুইয়ের পিঠে এক একুশ। এবার দুই প্লাস এক সমান তিন। অঙ্ক ডার্লিং, অঙ্ক! প্রকৃতি অঙ্কের মাস্টারমশাই।"

কর্নেল গাছটার ওপাশে গিয়ে হঠাৎ বললেন, "কী আশ্চর্য!" তারপর মুখ তুলে গাছের ডালপালা দেখতে থাকলেন। কাছে গিয়ে দেখি একজোড়া ছেঁড়াফাটা তাপ্পিমারা পামপশু। কর্নেল বললেন, "লক্ষণ ভালো নয়। জুতো খুলে রেখে মুরারিবাবু এই গাছে চড়েছিলেন। কিন্তু গাছে তো উনি নেই!" বাইনোকুলারে চারদিকে ঘুরে গাছগাছালি তল্লাশ শুরু করলেন। আমি অবাক।

অবাক এবং উদ্বিগ্ন। বিট্টুকে মুরারিবাবু ডাকতে গিয়েছিলেন নকুলবাবুর বাড়ি থেকে। তারপর এতক্ষণে এই গাছের তলায় ওঁর জুতো! অথচ ওঁর পাত্তা নেই। ভারী অদ্ভুত ঘটনা। ডাকলুম, "মুরারিবাবু, মুরারিবাবু!"

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন, "চুপ!" তারপর হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলুম। ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপ, উঁচু-নিচু গাছ, ঝোপঝাড়ের ভেতর নানা গড়নের পাথরের স্ল্যাব—এই

তা হলে সেই রাজা শিবসিংহের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। দিনের বেলায় এখানে গাঢ় ছায়া। হাওয়ায় ভুতুড়ে গা-ছমছম করা কত রকমের বিদঘুটে শব্দ। একখানে একটা বৌদ্ধ স্তূপের গড়নের গোলাকার প্রকাণ্ড পাথর। গর্তের মতো একটা জায়গা। দরজার ভাঙাচোরা ফোকর। মুখে ঝোপ গজিয়ে আছে। এতক্ষণে কানে এল ফোঁস-ফোঁস গোঁ-গোঁ অদ্ভুত সব শব্দ। কর্নেল ফোকরের মুখের কাছে গিয়ে ঝোপ সরিয়ে টর্চের আলো ফেললেন ভেতরে। তারপর বললেন, "মুরারিবাবু! ওখানে কী করছেন?"

আবার ফোঁস-ফোঁস, যেন নাক ঝাড়ছেন মুরারিবাবু। কিন্তু গোঁ-গোঁ করছেন কেন? কর্নেলের পাশে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি, মুরারিবাবু একটা পাথরের চাঁই নড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ফিসফিসিয়ে ডাকলেন, "আসুন, আসুন, হাত লাগান!"

কর্নেলের পেছন-পেছন ঢুকে গেলুম। মুরারিবাবু হাঁপাচ্ছেন। ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে বললেন, "তিন তিরেক্কে নয়। নয় নয়ে একাশি।"

কর্নেল পাথরের চাঁইটার ওপর টর্চের আলো ফেলে বললেন, "আপনি কি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছেন মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "হ্যাঁ, আলো নেভান। হাত লাগান। ঝটপট। ওরা এসে পড়লেই কেলেঙ্কারি।"

বলে আবার হাত লাগিয়ে ফোঁস-ফোঁস, গোঁ-গোঁ শব্দে ঠেলতে শুরু করলেন। কর্নেলের ইশারায় আমিও অগত্যা হাত লাগালুম। উত্তেজনায় প্রায় কম্পমান অবস্থা। তিনজনের ঠেলাঠেলিতে পাথরের চাঁইটা ওপাশের নিচু জায়গায় গড়িয়ে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড গর্ত দেখা গেল। মুরারিবাবু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতো আওড়ালেন, "তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। আটের পিঠে এক একাশি। তা হলে আট আর একে ফের পাচ্ছি নয়। নয় বিভক্ত তিন। ভাগফল তিন।"

কর্নেল টর্চের আলো ফেললেন গর্তের ভেতর। ফুট পাঁচ-ছয় নীচে ঊর্ধ্বমুখী একটা মাথা—মানুষেরই মাথা এবং জ্যান্ত মাথা। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। মুখে টেপ সাঁটা।

ক্রমে চোখে পড়ল পিঠমোড়া করে দুটো হাত বাঁধা। পা দুটো খোলা। কিন্তু যোগীর আসনে যেন বসে রয়েছে। মুরারিবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "ধ্যাত্তেরি, কিসের বদলে কী! একাশির বদলে এক!"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, নামো। হালদারমশাইকে ওঠাও।"

হালদারমশাই? এতক্ষণে ভ্যাবাচাকা কেটে গেল। বললুম, "কী সর্বনাশ! তা নামবার দরকার কী? হালদারমশাই, উঠে পড়ুন।"

হালদারমশাই জোরে মাথা নাড়লেন। কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, "দেরি কোরো না, জয়ন্ত! নেমে গিয়ে ওঁকে ওঠাও। কী মুশকিল! বুঝতে পারছ না পিঠমোড়া করে হাত-বাঁধা অবস্থায় বসিয়ে রাখলে নিজের থেকে সোজা হয়ে ওঠা যায় না?"

তাই বটে। এক লাফে নেমে গেলুম চওড়া গর্তটাতে। হালদারমশাইকে টেনে দাঁড় করালুম। দড়ির বাঁধন খুলে দিলুম। হালদারমশাই হাত দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে এক লাফে গর্তের কিনারা আঁকড়ে ধরে চমৎকার উঠে পড়লেন। আমিও উঠে এলুম। অনেক চেষ্টায় ওঁর মুখের টেপ ছাড়ানো গেল। সেটা পকেটস্থ করার পর কর্নেল বললেন, "পরে কথা হবে। পাথরটা গর্তের মুখে চাপা দিতে হবে। আসুন, হাত লাগান সবাই!"

এবার একটু বেশি পরিশ্রমই হল। ওজনদার পাথরটা নিচু জায়গা থেকে উঁচুতে গড়িয়ে তুলতে ঘেমে একাকার। হালদারমশাইয়ের হাতে ব্যথা। তবু হুম-হুম শব্দে সবিক্রমে হাত লাগিয়েছেন। পাথরটা আগের মতো গর্তের মুখে রেখে আমরা বেরিয়ে গেলুম।

মুরারিবাবু 'জুতো' বলে ছিটকে দলছাড়া হয়ে গেলেন। সেই গাছটার তলায় গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হল। তাঁর মুখের ভঙ্গিতে বিরক্তি আর নৈরাশ্য। বললেন, "বিট্টুকে তাড়া করে এসে হারিয়ে ফেলেছিলুম। এই গাছটা বেশ উঁচু। মগডালে চড়ে ছেলেটাকে খুঁজছি, হঠাৎ দেখি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে হতচ্ছাড়া তিনকড়িদা আসছে। হাতে ছড়ি। কোথায় কার মার খেয়ে ঠ্যাং ভেঙেছে...তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির কারবার। অঙ্কে ভুল হলেই গেছ!... সঙ্গে দুটো লোকের কাঁধে বস্তা!"

হালদারমশাই দ্রুত বললেন, "বস্তার ভেতর আমি।"

মুরারিবাবু বাঁকা মুখে বললেন, "আমি ভাবলুম সোনার মোহরভর্তি ঘড়া। তাই নিয়ে ভেতরে ঢুকল। একটু পরে খালি বস্তা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর গাছ থেকে নেমে দৌড়ে চলে গেলুম। গর্তটা দেখেছি। পাথরটাও দেখেছি। গর্ত আর পাথর একসঙ্গে দেখিনি। কাজেই গর্ত এক, পাথর এক, আর খালি বস্তা এক। একুনে হল তিন।"

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমরাও এখন তিন, মুরারিবাবু!"

মুরারিবাবু চিন্তিতমুখে বললেন, "তা হলে সোনার মোহরভর্তি ঘড়া পাওয়া উচিত। পাচ্ছি না কেন বলুন তো?"

"পাওয়ার চান্স আছে," কর্নেল বললেন, "যদি প্লিজ অন্তত গোটা-তিন অর্কিড আমাকে পেড়ে দিতে পারেন। ওই দেখুন, ওইগুলো। দেখতে পাচ্ছেন তিনটে করে পাপড়ি? দা নম্বর থ্রি!"

মুরারিবাবু জুতো খুলে তড়াক করে হনুমানের মতো দিব্যি গুঁড়ি আঁকড়ে গাছে উঠে গেলেন। কর্নেল তাঁকে আঙুল দিয়ে কোনটা পাড়তে হবে দেখাতে থাকলেন।

এবার হালদারমশাইয়ের দিকে মনোযোগ দিলুম। জামা ছিঁড়ে গেছে। প্যান্ট অবশ্য অটুট আছে। কিন্তু ধুলোকাদায় নোংরা। মুখে এতক্ষণে রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে। বললেন, "ব্যাটারা আবার নস্যির কৌটোটা পকেট সার্চ করে খামোখা কেড়ে নিল, এ-দুঃখ আর রাগ জীবনে ঘুচবে না। বলে, কি, নস্যি নিলেই হাঁচবে। হাঁচলে লোকে সাড়া পাবে। ভাববে বস্তার ভেতর হাঁচি কেন?...জানেন? বস্তার ফুটো দিয়ে দেখছি, দিনদুপুরে রাস্তাঘাট, বাজার, মানুষজন—সব। পুলিশ পর্যন্ত! একজন ব্যাপারি গোছের লোক জিজ্ঞেস করল, কী মাল দাদা? ব্যাটারা বলল, কুমড়ো। ছিরুবাবুর ছেরাদ্দর ভোজ-কাজ হবে। কিনে নিয়ে যাচ্ছে। ...উঃ, জয়ন্তবাবু, হেনস্থার একশেষ।"

"আপনাকে কীভাবে ধরল ওরা?"

"আর বলবেন না। আমারই বোকামি।" হালদারমশাই শ্বাস ছাড়লেন। "এই গেছো-ভদ্রলোককে ফলো করে তো এলুম। কী খেয়াল হল, স্টেশনের রিটায়ারিং রুমের দোতলায় একটা সিঙ্গল রুম বুক করলুম। তারপর রেল-ক্যান্টিনে খাওয়াদাওয়া করে সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লুম। মুরারিবাবুর বাড়ির খোঁজ করে শুনি, তাঁর আদতে বাড়িই নেই। তখন শিবমন্দিরে গেলুম। হ্যাজাক জ্বেলে বলিদান হচ্ছে। ঢাক বাজছে। তদন্ত শুরু করলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় বাবা মহাদেব ত্রিশূল মেরে মানুষের রক্ত খেয়েছেন যেন? সে বলল, চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। ওদিকটা অন্ধকার। পা বাড়িয়ে মনে পড়ল, ওই যাঃ! রেলের রেস্টরুমে ব্যাগের ভেতর রিভলভারটা ফেলে এসেছি। তো কী আর করব! খানিকটা গেছি, লোকটা বলে উঠল—একাশি! আর সঙ্গে-সঙ্গে কারা আমাকে ধরে ফেলল। তারপরই মুখে টেপ। পিঠমোড়া

করে বেঁধে এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা বাড়িতে ঢোকাল। বাড়িটাতে লোকজন নেই। অন্ধকার। একটা ঘরে ঢুকিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।"

"পিঠমোড়া করে বাঁধা অবস্থায়?"

হালদারমশাই করুণ হাসলেন। "না। বাঁধন খুলে খাটের বিছানার সঙ্গে মড়াবাঁধা করে বাঁধল। সেই যেমন 'কাকতাড়ুয়া' কেসে কাটরার শ্মশানে বেঁধেছিল, ঠিক তেমনি। তারপর সারাটা রাত ওইভাবে..."

হঠাৎ কর্নেল বললেন, "চুপ!" তারপর ইশারায় গাছটার পেছনে ঝোপের আড়ালে লুকোতে বললেন। নিজেও এসে ঘাপটি পেতে বসলেন আমাদের সঙ্গে।

দেখলুম, ওদিকে জঙ্গলের ভেতর স্তূপটার দিকে এগিয়ে চলেছে চারজন লোক। একজন সেই তিনকড়িচন্দ্র—হাতে ছড়ি, দু'জন ষণ্ডামার্কা লোক, অপরজন সেই সন্ন্যাসীবেশী লোকটা, সে মন্দির প্রাঙ্গণে নেচে-নেচে গান গাইছিল। কিন্তু এখন তার হাতে একটা চকচকে ধারালো খাঁড়া। হালদারমশাইকে শিউরে উঠে চোখ বুজতে দেখলুম। আমিও আঁতকে উঠে চোখ বুজেছিলুম, আর দেরি করলে কী হত ভেবেই। কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন।

গাছের ডগা থেকে মুরারিবাবুও ওদের দেখতে পেয়েই চুপ করে গেছেন। ডালের সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন কাঠবেড়ালির মতো।

দীর্ঘ মিনিট-পাঁচেক পরে তিনকড়িচন্দ্রকে আবার দেখা গেল। মুখে রোদ পড়েছে, সেজন্যও নয়, রাগে ও ব্যর্থতায় মুখটা দাউদাউ জ্বলছে। সন্ন্যাসীবেশী লোকটা খাঁড়ার উলটো দিক কাঁধে রেখে দাঁত কিড়মিড় করছে। ষণ্ডামার্কা লোক দুটো হাত-মুখ নেড়ে কী বলছে এতদূর থেকে শোনা যাচ্ছে না।

তারপর তারা খোলামেলা জায়গাটার দিকে এগিয়ে এল। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল, মুরারিবাবুর জুতো দুটো চোখে পড়লে ওরা কী করবে? কিন্তু কিছুটা এগিয়ে আসতেই কর্নেল অদ্ভুত গলায় শব্দ করলেন, "ব্যা-অ্যা-অ্যা!"

অমনি প্রথম খাঁড়াধারী সন্ন্যাসী লোকটা "ওরে বাবা!" বলে আর্তনাদ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ষণ্ডামার্কা লোক দুটোও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে দুই দিকে ঝোপজঙ্গল ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেল। তিনকড়িচন্দ্র হকচকিয়ে গিয়েছিল প্রথমে। কর্নেল আবার "ব্যা-অ্যা" ডাক ডাকতেই সেও ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পিটটান দিল।

তারপর যা ঘটল, তা আরও তাজ্জব ঘটনা। মুরারিবাবু তরতর করে গাছ থেকে নেমে এসে জুতো দুটো হাতে নিলেন এবং "এ ব্যা তো সে ব্যা নয়", বলে দৌড়ুলেন। চোখের পলকে তিনিও উধাও হয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, "হুঁ, ব্যা-করণ রহস্য।"

আমি বললুম, "পাগল, পাগল।"

হালদারমশাই বললেন, "ছাগল, ছাগল!"

কর্নেল উঠে গিয়ে মুরারিবাবুর পেড়ে দেওয়া দুটো অর্কিড কুড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখে বললেন, "নাঃ! ছিঁড়ে ফেলেছেন গোড়াটা। এভাবে অর্কিড বাঁচানো যায় না। যাকগে, পরে দেখা যাবে। চলুন হালদারমশাই, আপাতত এই পর্যন্ত। ফেরা যাক।"

হাইওয়েতে নেমে কর্নেল হালদারমশাইয়ের বৃত্তান্তটি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, "এবেলা বরং আমার গেস্ট হোন। রেস্ট নিয়ে তারপর রেস্টরুম থেকে আপনার ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে আসবেন। জিপের ব্যবস্থা করা যাবে।"

হালদারমশাই মাথা নেড়ে মাতৃভাষায় বললেন, "না, কর্নেলস্যার! এখনই রেস্টরুমে যাইয়া ব্যাগটা লইয়া আসি। আমার খাবারটা রেডি রাইখ্যেন বরং। উইপ্‌ন্ হাতে না লইয়্যা বারাইলে কী হয়, ট্যার পাইছি।"

বলে হনহন করে আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন, "ভাগ্যিস নকুলবাবুর নোটবইটাতে ওই স্তূপটার উল্লেখ ছিল এবং গর্তটার কথাও লেখা ছিল। নইলে সত্যিই হালদারমশাই বলি হয়ে যেতেন! আসলে আমি ভেবেছিলুম কথামতো ওঁকে অ্যারেস্ট করে থানার লক-আপে সাদরে রাখা হবে, ওঁর নিরাপত্তার জন্যই। কিন্তু থানায় গিয়ে দেখলুম তা করা হয়নি। থানায় আমার যাওয়া অবধি ওঁর বেঁচে থাকার চান্স পুরোপুরি ছিল অবশ্য। কিন্তু আমি মন্দিরে গিয়ে যখন ত্রিশূল রহস্য ফাঁস করছি, তখন লক্ষ করলুম, দরজার কাছে কান পেতে ওই সন্ন্যাসী লোকটি আমার কথা শুনছে। অমনি মনে হল, এবার বন্দী হালদারমশাইয়ের বিপদ আসন্ন। ওরা ধরেই নিয়েছে বা কলকাতা পর্যন্ত মুরারিবাবুকে ফলো করে টের পেয়েছে, আমরা যাচ্ছি এবং হালদারমশাই আমাদেরই লোক।"

বললুম, "তা হলে মন্দির থেকে সোজা স্তূপে এলেন না কেন?"

কর্নেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমাকে বরাবর বলেছি ডার্লিং, তুমি সাংবাদিক। কিন্তু ভালো সাংবাদিক হতে গেলে ভালো পর্যবেক্ষক হওয়া দরকার। সন্ন্যাসী লোকটা আমাদের পেছন-পেছন এসেছিল। আমরা রিকশায় চাপলে সেও একটা রিকশায় চেপেছিল। ভাবলুম আমাদের ফলো করছে। কিন্তু ধাড়া ট্রেডিং কোম্পানির দোকানের সামনে সে রিকশা থেকে নামল! তখন বুঝলুম সে তিনকড়িবাবুকে খবর দিতে যাচ্ছে।"

বলে কর্নেল সেই নোটবইটা খুলে দেখালেন। "এই দ্যাখো, এরিয়া-ম্যাপ। এই হাইওয়ের বটতলা থেকে উঠলে স্তূপটা খুঁজে বের করা সোজা। মন্দিরের দিক থেকে এগোলে অনেকগুলো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই বিশেষ স্তূপটা খুঁজে বের করা কঠিন হত। যাই হোক, মুরারিবাবু জুতো দুটো আমাকে পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছিল।"

ব্যারেজের ব্রিজে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলুম, "আপনার ব্যা-ডাক শুনে অমন আতঙ্কের কারণ কী বলুন তো?"

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে জলাধারের পাখি দেখতে দেখতে বললেন, "তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। একাশিতেই ব্যা-করণ রহস্য বা ব্যাকরণ রহস্য যাই বলো, লুকনো আছে।"

"প্লিজ, হেঁয়ালি নয়।"

"তোমাকে তা হলে প্রাচীন ভারতীয় মিথলজি পড়তে হবে। শিবকে পশুপতি বলা হয়। মহেনজো-দরোর একটি সিলে পশুপতিদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। তাঁর শিং আছে। কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতে তিনটে শিং ছিল। একটা শিং ক্ষয়ে গেছে। তিনটে শিং নাকি ত্রিশূলের প্রতীক। শৈবযুগে এ-অঞ্চলে তিন-শিংওয়ালা ছাগলরূপী পশুপতিদেবের পুজো হত। সেটা ব্রোঞ্জের চাকতিতে দেখেছ। শিবসিংহের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষে এখনও নাকি কৃষ্ণপক্ষে পশুপতিদেবের সেই অবতার দেখা দেন এবং ব্যা-ডাক ডাকেন। এই ডাক নাকি ভীষণ অলুক্ষুনে। শুনলেই অমঙ্গল। নকুলবাবু তিনশিঙে ছাগল সত্যিই দেখেছিলেন এবং আমরাও আজ স্বচক্ষে দেখেছি।"

এ পর্যন্ত শুনেই কে জানে কেন, আতঙ্কে বুক ধড়াস করে উঠল। এতক্ষণে মনে হল, ভাঙা দেউড়িতে উঠে এবং সুড়ঙ্গপথে নেমে কী সাঙ্ঘাতিক গোঁয়াতুমি না করেছি! অমন বিপজ্জনক ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হয়নি। তার চেয়ে ভয়ানক ব্যাপার, আমি সেই প্রাণীরূপী অবতারের অলুক্ষুনে ব্যা-ডাক শুনেছি। দিনদুপুরে বুক টিপটিপ করতে থাকল।

বাংলোয় পৌঁছে আড়াইটে অবধি অপেক্ষা করেও হালদারমশাইয়ের দেখা পাওয়া গেল না। কর্নেল নকুলবাবুর নোটবইটা নিয়ে প্রতিটি পাতা আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। নিজের নোটবইতে কী সব টুকলেনও। মুখটা গম্ভীর, এবং মাঝে-মাঝে তিতিবিরক্ত ভাব ফুটে বেরোচ্ছিল। কয়েকবার হালদারমশাইয়ের না আসার কথাটা তুললুম। কানেই নিলেন না।

খাওয়ার পর সবে শুয়েছি, ভাতঘুমের বাঙালি অভ্যাস, কর্নেল চোখ বুজে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন, হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসলেন। তারপর সেই নোটবইটা খুলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "জয়ন্ত, জয়ন্ত, গুপ্তধন গুপ্তধন!"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "এখানে গুপ্তধন কোথায়?"

গোয়েন্দাপ্রবর আমাকে টেনে ওঠালেন এবং বারান্দায় নিয়ে গেলেন। বেতের চেয়ারে বসে বললেন, "বোসো ডার্লিং! সত্যিই গুপ্তধনের সঙ্কেত-লেখ আবিষ্কার করেছিলেন নকুলবাবু। মুরারিবাবু ইচ্ছেমতো আঁকিবুকি কেটে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। তবে আমার সৌভাগ্য, সঙ্কেত-লিপিটা অন্য একটা পাতায় ঠিকই আছে। আতস কাচের সাহায্যে অবিকল কপি করেছি। এই দ্যাখো।"

কর্নেল তাঁর নিজের নোটবইয়ের একটা পাতা খুলে দেখালেন। কিছুই বুঝতে পারলুম না। কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং একেই বলে।

বললুম, "মাথামুণ্ডু নেই! এ কী অদ্ভুত লিপি!"

কর্নেল বললেন, "এটা একটা শিলালেখ থেকে অবিকল কপি। খানিকটা অংশ ভেঙে গিয়েছিল। এই শিলালেখটা নকুলবাবুর ঘরে আছে কি না দেখা দরকার। তবে একটা ব্যাপার আশ্চর্য! ব্রোঞ্জের সিল বা মুদ্রাটির লিপির সঙ্গে এর হুবহু মিল। তুমি নিজেই দ্যাখো।"

পরীক্ষা করে দেখে বললুম, "একই লিপি বলে মনে হচ্ছে।"

কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন, "লিপিটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই ঠিক করতে পারছি না। ...না, ব্রাহ্মী-লিপি নয়। কিন্তু ব্রাহ্মীর সঙ্গে প্রচুর মিল।"

বলে আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন এবং টাকে হাত। তারপর চোখ খুলে বললেন, "জয়ন্ত! এখনই শের আলি জিপ নিয়ে এসে পড়বে। ...হুঁ, ওই আসছে। তুমি এক কাজ করো। বাংলো ছেড়ে বিশেষ বেরিও না। আমি নকুলবাবুর বাড়ি হয়ে থানায় যাব। তারপর পুলিশের জিপে কলকাতা..."

ছটফটিয়ে বললুম, "না, না। আমিও যাব।"

কর্নেল হাসলেন। "কাল দুপুরের মধ্যে এসে পড়ব, ডার্লিং! প্রাচীন লিপিটার পাঠোদ্ধার খুব জরুরি। তুমি হালদারমশাইয়ের সান্নিধ্যে আশা করি ভালোই কাটাবে। ভেবো না, ওঁর কাছে রিভলভার আছে।"

"কিন্তু ওঁকে পাচ্ছি কোথায়?"

"পাবে।" কর্নেল আশ্বস্ত করলেন। "ধারালো খাঁড়া দেখার পর হালদারমশাই আর বেপরোয়া হবেন না। আমার বিশ্বাস!...আরে! শের আলির জিপে মুরারিবাবু এসেছেন দেখছি। ভালোই হল। ততক্ষণ ওঁর সান্নিধ্যে কাটাও।"

কর্নেল ঘরে ঢুকলেন পোশাক বদলাতে। গেট খুলে দিল মাধবলাল। জিপ এসে বারান্দার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। মুরারিবাবু এক লাফে নেমে সহাস্যে বললেন, "তখন একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল।—ইয়ে আপনার নামটা কী যেন..."

"জয়ন্ত চৌধুরী।"

মুরারিবাবু খ্যাঁক করলেন। "ঘরপোড়া গোরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়, বুঝলেন না? কর্নেলসায়েব কই? ঘুমোচ্ছেন বুঝি? থাক, ঘুম ভাঙাব না। আপনার সঙ্গেই গল্পগুজব করা যাক। তিন তিরেক্কে নয়...দাঁড়ান। আপনার নামের নম্বর-ইউনিট বের করি। বর্গীয় জ..." আঙুল গুনতে শুরু করলেন উনি। হিসেব শেষ হলে বললেন, "সপ্ত ব্যঞ্জন। সাত। সাত তিনে একুশ। দুইয়ের পিঠে এক। তা হলে দুই যুক্ত এক সমান তিন। সেই তিন! যাবেন কোথায় আপনি? আমার নামও দেখুন। মুরারিমোহন ধাড়া। অষ্ট ব্যঞ্জন। আটকে তিন দিয়ে গুণ করুন। চব্বিশ হল। দুইয়ের পিঠে চার চব্বিশ। তা হলে দুই যুক্ত চার, সমান ছয়। ছয়কে আধখানা করুন। সেই তিন। হল তো?"

বলে এবার দু'বার খ্যাঁক করলেন। বড় বিপদে পড়া গেল দেখছি! এঁকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে কর্নেল কেটে পড়লে আমার অবস্থা হালদারমশাইয়ের চেয়ে করুণ হবে।

কর্নেল বেরিয়ে এলেন কাঁধে কিটব্যাগ, গলায় বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলিয়ে। মাথায় ছাইরঙা টুপি। শের আলি স্যালুট দিল। মুরারিবাবুও উঠে কতকটা একই ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকালেন। উনি কিছু বলার আগেই কর্নেল বললেন, "জয়ন্তর সঙ্গে গল্প করুন মুরারিবাবু! আমি আসছি।"

তারপর সোজা গিয়ে জিপে উঠলেন এবং শের আলি তাঁকে নিয়ে গর্‌র্‌র্ করে বেরিয়ে গেল। তুম্বো মুখে বসে রইলুম। কোনো মানে হয়?

মুরারিবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "কী কাণ্ড! কিছু বোঝা গেল না তো?"

বললুম, "বুঝতে হলে ফলো করুন মুরারিবাবু!"

মুরারিবাবু বললেন, "মাথা খারাপ? শের আলির জিপ না, রকেট। ওই দেখুন, কোথায় চলে গেছে। যাঃ! হারিয়ে গেল। শের আলি—চার ব্যঞ্জন। তিন গুণ করুন। বারো হল। বারোর অর্ধেক ছয়। ছয়ের অর্ধেক তিন। সেই তিন! যাবেন কোথায় মশাই? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অণু-পরমাণু চলছে অঙ্কে। তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি। শিবের জীব বলেছিল, একাশি।"

সমানে বকবক করতে থাকলেন মুরারিবাবু। মাধবলাল দূরে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। পাগলাবাবুকে দেখেই তার হাসি পায় মনে হল।

এই পাগলাবাবুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করা যাক। "বসুন, আসছি," বলে উঠে ঘরে গেলুম। তারপর উত্তরের জানালায় গিয়ে বিদঘুটে স্বরে ডাকলুম, "ব্যা-অ্যা-অ্যা!"

অমনি মুরারিবাবুর খ্যাঁক-খ্যাঁক কানে এল। অর্থাৎ ভয় পাননি, হাসছেন। ঘরে ঢুকে সহাস্যে বললেন, "বারে-বারে আর ভুল হবে না। তবে খুব আনন্দ হল জয়ন্তবাবু! আপনি রসিক লোক। আমার খুব পছন্দ।" তারপর বসে বকবক শুরু করলেন।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে হালদারমশাইয়ের ডাক শোনা গেল, "জয়ন্তবাবু, আইয়া পড়ছি।"

ছয়

বেরিয়ে গিয়ে দেখি, গেটের ওধারে একটা এক্কা ঘোড়াগাড়ি থেকে লাফ দিয়ে সবে নেমেছেন হালদারমশাই। মাধবলাল ঘোড়ার গাড়িকে ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। গাড়িটা চলে গেল। হালদারমশাই বললেন, "কর্নেলস্যারের লগে রাস্তায় দ্যাখা হইল।"

মুরারিবাবু হালদারমশাইকে দেখে অভ্যাসমতো খ্যাঁক করলেন। বললেন, "তখন তাড়াহুড়োর মধ্যে...আর কর্নেলসায়েব গাছে চড়ালেন...মশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। আপনাকে কেন তিনকড়িদা গর্তে ঢুকিয়ে বলি দিতে চাইছিল বলুন তো?"

বারান্দায় বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু চটে গিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে কলকাতায় কর্নেলস্যারের ঘরে দেখেছেন। এখন বলছেন, পরিচয় হয়নি। আপনার জন্যই আমার আজ..."

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, "সন্ধিবিচ্ছেদ হয়ে যেত ব্যাকরণমতে।"

হালদারমশাই অনিচ্ছায় হাসলেন। "হ্যাঁ, ধড় আর মুণ্ডু আলাদা হতে বসেছিল।"

জিভ চুকচুক করে দুঃখ দেখিয়ে মুরারিবাবু বললেন, "আহা রে! তিনকড়িদা'টা মহা ধড়িবাজ। তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির খেলা আর কি!"

"একাশি!" গোয়েন্দাপ্রবর নড়ে বসলেন। বেতের চেয়ার মচমচ করে উঠল। "আমাকে যারা বন্দী করে বলি দিতে যাচ্ছিল, তারাও একাশি বলেছিল। ব্যাপারটা কী?" বলে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন মুরারিবাবুর দিকে।

মুরারিবাবু কিছু বলার আগে তাঁকে ঝটপট হালদারমশাইয়ের পরিচয় দিলুম। শোনার পর মুরারিবাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "তা হলে আর চিন্তা নেই। ডিটেকটিভে ডিটেকটিভে ছয়লাপ। যাবে কোথায়? নকুলদা, খুনের কিনারা হবে। সোনার মোহরভর্তি ঘড়াও বেরোবে। তিনপুরুষে তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশির মামলা। সবরকম কোঅপারেশন পাবেন স্যার!"

মাধবলালকে চা করতে বললুম। হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "জয়ন্তবাবুর লগে দুইখান কথা আছে।" তারপর আমার হাত ধরে ঘরে ঢুকে ফিসফিস করলেন, "সঙ্গে রিভলভার আছে। আর ভয় নেই। কর্নেলস্যার নিজের লাইনে চলুন, আমরা বলি নিজের লাইনে। কী কন?"

বললুম, "কর্নেল কলকাতা গেলেন। কাল দুপুরের মধ্যে ফিরবেন।"

"অ্যাঁ!" বলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন হালদারমশাই। চোখের পাপড়ি কাঁপতে থাকল।

"হ্যাঁ। আমাকে বলে গেছেন কোথাও যেন না বেরোই।"

"এটা কি একটা কথা হইল? আপনে পোলাপান নাকি? ছাড়েন তো!" কিটব্যাগ টেবিলে রেখে হালদারমশাই ভেতর থেকে রিভলভার আর গুলি বের করলেন। ছ'টা গুলি খোপে ঢুকিয়ে অস্ত্রটা ঢোলা প্যান্টের পকেটে রাখলেন। তারপর নস্যির কৌটো বের করে বললেন, "এই নস্যির জন্য লাঞ্চের নেমন্তন্ন খেতে আসতে পারিনি। যাকগে, এখন তো কর্নেলস্যারের খাটেই তা হলে আমার শোয়ার জায়গা হবে।"

মুরাবিবাবু আপনমনে তিন-তিরেক্কে করতে করতে নীচের লনে ফুল দেখে বেড়াচ্ছেন আর সম্ভবত ফুলেদের ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করছেন। মাধবলাল নজর রেখেছিল। কিচেন থেকে হাঁক ছাড়ল, "এ বাবুমোশা! ফুলউলসে হাত মাত্ লাগাইয়ে।"

মুরারিবাবু চটে গিয়ে বললেন, "ক্যা ফুল দেখাতা হ্যায় তুম?...হুঁ! মা-ধ-ব-লা-ল! পঞ্চব্যঞ্জন হ্যায়। স্রিফ্ পাঁ-চ। সমঝতা? তিনোসে নেহি আতা! তিন ঔর দো—ব্যস! তিন কাটা যায়েগা, দো রহেগা!" বলে বুড়ো আঙুল নেড়ে দিলেন। "অঙ্কের বাইরে পড়ে গেছ, সমঝা?"

হাসি চেপে বললুম, "তা হলে আমাদের ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের নামের হিসেবটা করে দিন মুরারিবাবু। সংখ্যাতত্ত্ব অনুসারে..."

বাধা দিয়ে মুরারিবাবু বললেন, "পুরো নাম?"

হালদারমশাই খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "নিউমারোলজি? আপনি জানেন? তাই বলুন! আমার নাম কৃতান্তকুমার হালদার।"

চা আসতে-আসতে হিসেব কষে ফেললেন মুরারিবাবু। "একাদশ ব্যঞ্জন। ...হুঁ, একটু গণ্ডগুলে নম্বর। সেইজন্যই খাঁড়ার ঘা প্রায় এসে পড়েছিল! ...আরে তাই তো! এগারোকে তিনগুণ করলে তে-তিরিশ। দু-দুটো তিন পাশাপাশি। আপনাকে মারে কে? সেই তো! আপনাকে পাঁঠাবাঁধা করে বেঁধে গর্তে ফেলে খাঁড়ায় শান দিতে গিয়ে দেরি হতই। হয়েছে!"

বলে ফুঁ দিয়ে সশব্দে চা টানলেন। মাধবলালকে ডেকে বললুম, "ডরো মাত্ মাধবলাল! হাম হিসাব কার দেতা। তিন পাঁচ পন্দেরাহ্। এক পাঁচ। এক ঔর পাঁচ ছে। ইস্‌মে দো তিন হ্যায়!"

মুরারিবাবু মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চাপা খ্যাঁক করলেন। মাধবলাল চলে গেলে ফিসফিস করে বললেন, "ভয় দেখাচ্ছিলুম। বুঝলেন না? তিন নেই কোথায়? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনের খেলা। তিন তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি।"

বুঝলুম চা পেয়ে খুশি হয়েছেন খুব। তারিয়ে-তারিয়ে চা শেষ করে ফের বললেন, "চলুন ডিটেকটিভমশাই!"

হালদারমশাই উৎসাহে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও টেনে ওঠালেন। সাহস দিয়ে বললেন, "সঙ্গে উইপন্ আছে। চলে আসুন! কর্নেলসারেরে দেখাইয়া দিমু...এমন চান্স আর পাইবেন না। কাইল আইয়া দেখবেন..." বলে ভুরু নাচিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন, কী ঘটবে।

মুরারিবাবুরও প্রচণ্ড তাড়া। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই বেরোলাম বাংলো থেকে। হালদারমশাই মন্দ বলেননি। কর্নেল ফেরার আগেই রহস্যভেদ এবং খুনে-লোকগুলোকে পাকড়াও করিয়ে দিয়ে তাক লাগানোর চান্স ছাড়া ঠিক নয়।...

এবার মুরারিবাবু আমাদের গাইড। হাইওয়ের ওধারে উঁচু জঙ্গুলে ঢিবিতে উঠে হালদারমশাই বললেন, "আগে সেই দেউড়ি!"

মুরারিবাবুর পেছন-পেছন ঘন জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর হাঁটছিলুম। এখনই জায়গাটা আবছা আঁধারে ভরে গেছে। এবেলা বাতাস বন্ধ। গুমোট গরম। নিঝুম বন আর ধ্বংসাবশেষে ঝিঁঝিপোকা আর পাখির ডাককে মনে হচ্ছে স্তব্ধতারই একটা আলাদা স্বাদ। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছি। কিছুক্ষণ পরে খোলা একটা জায়গায় পৌঁছলুম। এবার সামনে সেই ভাঙা তোরণ দেখতে পেলুম।

হালদারমশাই বললেন, "কোথায় বডি পড়ে ছিল, দেখিয়ে দিন!"

মুরারিবাবু দেউড়ির ওধারে গিয়ে পাঁচিলের নীচে একটা জায়গা দেখালেন। "এইখানে উপুড় হয়ে পড়েছিল নকুলদা।" একটু তফাতে গিয়ে ওপরে আঙুল তুলে বললেন, "আর ওইখানে তিন-শিঙে ছাগলটা..."

কথা শেষ না হতেই দেউড়ির ওপরে তিন-শিঙে সেই কালো ছাগলের মুণ্ডু ঝোপ ফুঁড়ে বেরোল এবং অদ্ভুত গলায় বলে উঠল, "এ-কাশি!"

সঙ্গে-সঙ্গে মুরারিবাবু তখনকার মতোই দিশেহারা হয়ে মন্দিরের দিকে ঘুরেছিলেন। কিন্তু তখনই হালদারমশাই "তবে রে" বলে রিভলভার বের করে চিসুম আওয়াজে গুলি ছুড়লেন। একঝাঁক টিয়া চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে পালিয়ে গেল। ছাগলের মুণ্ডুটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হালদারমশাই রিভলভার তাক করে আবার কিম্ভূত প্রাণীটিকে খুঁজছেন, সেই সময় হইহই করে একদঙ্গল লোক আর কল্যাণবাবু দু'জন বন্দুকধারী সেপাইসহ এসে পড়লেন। মুরারিবাবুও তাঁদের সঙ্গে আছেন। কল্যাণবাবু আমার দিকে না-তাকিয়ে সোজা হালদারমশাইকে চার্জ করলেন, "আর য়ু মিঃ কে. কে. হালদার, দা প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

হালদারমশাই সগৌরবে এবং সহাস্যে বললেন, "ইয়েস, আই অ্যাম!"

"ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। কাম উইথ মি।"

"হোয়াই?" বলে হালদারমশাই পকেট থেকে তাঁর আইডেনটিটি কার্ড বের করলেন।

কিন্তু কল্যাণবাবুর ইশারায় সাদা পোশাকের পুলিশ এবং বন্দুকধারী সেপাইরা তাঁকে ঘিরে ধরল। কল্যাণবাবু বললেন, "গিভ মি ইওর আর্মস, প্লিজ!"

বোবা হয়ে গেলেন হালদারমশাই। রিভলভারটি কল্যাণবাবুর হাতে সঁপে দিয়ে ফোঁস করে একটি শ্বাস ছাড়লেন।

আমি বললুম, "এ কী হচ্ছে কল্যাণবাবু? কর্নেল তো আর..."

আমাকে থামিয়ে রূপগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন, "আই অ্যাম অন ডিউটি মিঃ চৌধুরী! প্লিজ ডোন্ট ইন্টারভেন।"

হালদারমশাই ব্যূহবেষ্টিত হয়ে গোমড়ামুখে চলে গেলেন। ভিড়টা সরে গেলে মুরারিবাবু ফিসফিস করে বললেন, "কিছু বুঝতে পারলুম না! তিন-তিরেক্কে হয়ে গেল কেন বলুন তো? আমি তো শুধু তিন-শিঙে..." বলে বুকে ও কপালে হাত ঠেকালেন। "শিব! শিব! বাবা গো!" বিড়বিড় করে এই মন্ত্র জপতে জপতে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"আমার ডেরায়!" ভয়ার্ত মুখে মুরারিবাবু বললেন। "আসলে কী জানেন? ওই ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের পাশাপাশি দুটো তিন বড্ড গণ্ডগুলে নম্বর। শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাবেন। তবে বেশ ভোগাবে। চলুন, বউদির সঙ্গে গল্প করতে-করতে তেলেভাজা খাব। আর তো কিছু করার নেই।"

শটকার্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন মুরারিবাবু। এবার একটা করে একলা পোড়োভাঙা বাড়ি আর ঝোপঝাড়, কিছু উঁচু গাছ। হানাবাড়ি মনে হচ্ছিল কোনো-কোনো বাড়িকে। হঠাৎ কোত্থেকে ব্যা-অ্যা-অ্যা ডাক ভেসে এল। মুরারিবাবু পালাতে যাচ্ছেন, ওঁকে পেছন থেকে ধরে ফেললুম। মুরারিবাবু হাঁসফাঁস করে বললেন, "পা চালিয়ে চলুন। এসব বাড়ি হানাবাড়ি। লোকজন নেই।"

বাঁ দিকে তাকাতেই একটা বাড়ির পেছনে সেই ছেলেটি, বিট্টুকে দেখতে পেলুম। বুঝলুম ব্যা-ডাক কে ডেকেছে। কিন্তু সাহস আছে তো বিট্টুর! এই হানাবাড়ি এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একা।

বললুম, "মুরারিবাবু, ওই দেখুন ব্যা-করণ রহস্য!"

মুরারিবাবু দেখামাত্র চ্যাঁচালেন। "পাজি, বাঁদর, ভূত, সবসময় খালি...এবার এসো 'জ্যাঠামশাই, দিন নাঁ ঘুঁড়িটা পেঁড়ে' বলে কাঁদতে।"

বিট্টু জিভ দেখিয়ে উধাও হয়ে গেল।

মুরারিবাবু শাসালেন। "বিষ্ণুদাকে বলে তিন-তিরেক্কে করে দিচ্ছি, থামো!"...

বিরুর বউদি মুরারিবাবুর সাড়া পেয়ে সদর দরজা খুললেন। আমাকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, "এসো জয়ন্ত ঠাকুরপো! কর্নেলসায়েব এসেছিলেন সওয়া চারটে নাগাদ। বলে গেলেন, কলকাতা থেকে কাল ফিরবেন। বিরুকে পাঠিয়ে তোমার খোঁজ নিতে বললেন! এসো, ভেতরে এসো।"

মুরারিবাবু বললেন, "আমার গেস্ট। আমার ঘরে বসাই, বউদি! গরম-গরম তেলেভাজা খাওয়াব বলে নিয়ে এলুম।"

রমলাবউদি চোখ পাকিয়ে বললেন, "তোমার ঘরের যা ছিরি করে রেখেছ! থাক্। এ-ঘরে এসো জয়ন্ত!"

কোনো-কোনো মানুষ থাকেন, মনে হয় কতদিনের চেনা। এক মুহূর্তে আপনার জন হয়ে ওঠেন। আসলে এটা পরকে আপন করে নেওয়ার স্বভাব। রমলাবউদি সেইরকম মানুষ। নকুলবাবুর জাদুঘরে আমাদের বসিয়ে তেলেভাজা করতে গেলেন। বিরুর নাইট ডিউটি। একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। মুরারিবাবু খ্যাঁক করে হেসে বললেন, "ডিটেকটিভবাবুকে অ্যারেস্ট করল কেন বলুন তো? গুলি ছোঁড়ার জন্য তিন-তিরেক্কে হয়ে গেলেন? তা যাই বলুন, গুলি ছোঁড়াটা উচিত কাজ হয়নি। বাবার সাক্ষাৎ-অবতার। আমার বড্ড ভয় করছে, জানেন?"

কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। ভয় আমারও করছে। সেচ-বাংলোয় ফেরা এবং একা রাত কাটানো—তিনকড়িচন্দ্রের ষণ্ডা লোকদুটো নয়, বারবার সেই খড়্গধারী সন্ন্যাসী লোকটার চেহারাই মনে ভেসে উঠছিল। শেষে ভাবলুম, থানায় গিয়ে ওসি ভদ্রলোককে বলে পুলিশ-জিপে পৌঁছে দিতে বলব। কল্যাণবাবু খচে আছেন, তার কারণ বোঝা যাচ্ছে। জিপের টায়ার ফাঁসানোতে আগুন হয়ে ঘুরছিলেন। মন্দির থেকে নীচের রাস্তা পর্যন্ত নিশ্চয় ফাঁদ পাতা ছিল। মাঝখান থেকে রাগটা গিয়ে পড়েছে হালদারমশাইয়ের ওপর।

মুরারিবাবু সমানে তিন-তিরেক্কে কষে চলেছেন। ঘরের ভেতর আঁধার হয়ে আসছে। রমলাবউদি বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে একথালা তেলেভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "এই তিন-তিরেক্কেওয়ালা! আলো জ্বালতে পারোনি?"

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন নিজেই। মুরারিবাবু নড়ে বসে বললেন, "একাশির ধাক্কা! মাথা ভোঁভোঁ করছে।" তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তেলেভাজার ওপর। সংখ্যাতত্ত্ববিদ—কাজেই ঝটপট গুনে ফেললেন। "উরেব্বাস! তিন-তিরেক্কে নয়!"

রমলাবউদি ভেংচি কেটে বললেন, "মুখেরটা গুনেছ? তিন-তিরেক্কে নয় তো করছ। খাও ভাই! চা নিয়ে আসছি। তারপর গল্প করব।"

গরম তেলেভাজা মন্দ নয়। কিন্তু মনে দুর্ভাবনা। ওসি ভদ্রলোক যদি বাইরে গিয়ে থাকেন দৈবাৎ? নাঃ, ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। শিগগির কেটে পড়াই ভালো। মাধবলালকে সাহসী লোক বলেই মনে হয়েছে। বরং পাশের এয়ারকন্ডিশন্‌ড্ ঘরটা খুলে দিতে বলব। জানালা বন্ধ করেও আরামে ঘুমনো যাবে।...

রমলাবউদি চা নিয়ে এলেন। বললেন, "কর্নেলসায়েবকে চিঠির ব্যাপারটা বলেছি। তোমাকে বলি। বিট্টু চিঠি ডাকে দিতে গিয়েছিল। পোস্টাফিসে একটা লোক ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়। বলে, আমি ফেলে দিচ্ছি! পোস্টবক্সটা দেওয়ালে ফোকরের মতো তৈরি। একটু উঁচুতে মুখটা। চিঠি ফেললে ঘরের ভেতর গিয়ে জমবে। তো বিট্টু চিঠিটা ওর হাতে দিয়েই চলে আসে। অত বুদ্ধি কি ওর আছে?"

বললুম, "বোঝা যাচ্ছে একটা দল এর পেছনে আছে।"

"তিনকড়িবাবুর কীর্তি শুনলুম কর্নেলসায়েবের কাছে। পইপই করে বলে গেছেন, তাকে যেন পাত্তা না দিই। যদি এসে গণ্ডগোল করে পুলিশে খবর দিতেও বলে গেছেন।"

বলে রমলাবউদি জানলার দিকে ঝুঁকে গেলেন। "কে রে? কে ওখানে? দাঁড়া তো, দেখাচ্ছি মজা!"

রমলাবউদি ছুটে বেরিয়ে গেলেন। জানলায় উঁকি মেরে কিছু দেখতে পেলুম না। মুরারিবাবু বললেন, "তিন-তিরেক্কে খেলা! ছেড়ে দিন! বউদির দিনদুপুরে ভূত দেখা অভ্যেস আছে। নামেই তিন-ব্যঞ্জন কিনা! র+ম+ল।"

ভদ্রমহিলার সাহস আছে! জানলা দিয়ে দেখলুম, টর্চ আর একটা মস্ত কাটারি হাতে পেছনের পোড়ো জমিটায় চক্কর দিচ্ছেন। আমি এভাবে বসে থাকা উচিত মনে করলুম না। বেরিয়ে গিয়ে উঠোনে নেমেছি উনি ফিরে এলেন। বললেন, "কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল জানলার ওধারে। ঠাকুরপোকে বলব, ছাদের চারদিকে বাল্ব লাগাতে।"

একটু ইতস্তত করে বললুম, "আমাকে বাংলোয় ফিরতে হবে, বউদি! ওদিকে যেতে নাকি সন্ধ্যার পর রিকশা বা ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না।"

রমলাবউদি বললেন, "হ্যাঁ, চড়াই রাস্তা। তার ওপর বিরুর দাদা মার্ডার হওয়ার পর ওদিকের রাস্তায় কেউ পারতপক্ষে যেতে চায় না। এ তো ভাই তোমাদের কলকাতা শহর নয়। নামেই টাউন। মানুষজনের মনে রাজ্যের কুসংস্কার।"

একটু হেসে বললুম, "কুসংস্কার কলকাতাতেও কম নেই। তো, চলি বউদি!"

"মুরারিঠাকুরপোর সবসময় পাগলামি করতে লজ্জা হয় না?" রমলাবউদি তেড়ে গেলেন। "তখন তো আমার গেস্ট বলে খুব জাঁক দেখাচ্ছিলে! গেস্টকে পৌঁছে দিতে হবে না?"

তাড়া খেয়ে মুরারিবাবু বেরোলেন। মুখে অনিচ্ছার ভাব। চুপচাপ হাঁটতে থাকলেন। আমরা এবার বাজারের দিকে চলেছি। একটু পরে মুরারিবাবু বললেন, "আমি, কিন্তু, বুঝলেন বাংলো অবধি যাচ্ছি না। কেন জানেন? বউদিকে গার্ড দিতে হবে। জানলার পেছনের লোকটা...একাশি! তিন-তিরেক্কে করে দিলেই হল। মেয়েরা একা না বোকা। বুঝলেন না?"

"বুঝলুম।" হাসবার চেষ্টা করে বললুম, "অন্তত একটা এক্কাগাড়ি কোথায় পাব, দেখিয়ে দিন বরং।"

"পেয়ে যাবেন। ওই তো রাস্তা। কত লোক, কত গাড়িঘোড়া। ভয়টা কীসের?" বলে মুরারিবাবু বাঁই করে ঘুরে হনহন করে গলিপথে নিপাত্তা হয়ে গেলেন। সম্ভবত তিন-তিরেক্কে নয়—এই নয়টা 'না'-অর্থব্যঞ্জক। অর্থাৎ স্রেফ না হয়ে যাওয়া। নঞর্থক হওয়া মানেই সন্ধিবিচ্ছেদ। ধড় এবং মুণ্ডু পৃথক হয়ে যাওয়া। সোজা কথায় খতম। তখন শিবের চেলা হয়ে ঘোরো। প্রেতাত্মা বা ভূত হয়ে যাও। সর্বনাশ!

গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় পৌঁছেছে, সেখানে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক্কাগাড়িই খুঁজছিলুম। কারণ সাইকেল-রিকশা চড়াই ঠেলে ওদিকে যাবে না শুনেছি। ইতিমধ্যে রূপগঞ্জের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কিত মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেছে। আসলে এই জনপদটা কোনো যুগে নদীর তীরে একটা পাহাড়ের মাথা সমতল করে গড়ে উঠেছিল। তাই পশ্চিম ঘরে যে হাইওয়েটা নদীর সমান্তরালে বিহারের দিকে দক্ষিণে এগিয়ে গেছে, সেটা টানা চড়াই। ব্যারেজের মোড়ে পৌঁছলে আর চড়াই ভাঙতে তত হবে না। ব্রিজের ওপরটা স্বভাবত সমতল। তারপর সেচ-বাংলো পর্যন্ত যেটুকু চড়াই, সেটুকু সামান্যই।

"সার ইখানে ডাঁড়িয়ে আছে বটেক!"

শুনেই তাকিয়ে দেখি, সেই সাইকেল-রিকশাওয়ালা। রিকশার ব্রেক কষে সদ্য সামনে থেমেছে। মুখে মধুর হাসি। বললুম, "এই যে ভাই, তুমি শের আলিকে চেনো?"

শের আলির কথা ওকে দেখামাত্র মনে পড়েছিল। ও এই রোগা পাকাটি শরীর অমন চড়াই রাস্তায় রিকশা তুলতে পারবে না, জানা কথা। কাজেই যদি শের আলির কাছে পৌঁছে দেয়, একটা জিপের আশা আছে। রিকশাওয়ালা বলল, "শের আলি? হ্যাঁ সার, চিনি বটেক।"

"ওর বাড়ি নিয়ে চলো তো।" বলে রিকশায় উঠলুম।

রিকশাওয়ালা বলল, "সে তো সার দূর বটেক। রেলের লাইন পেরিয়ে পাঁচ-ছ' মাইল। ইরিগেশং কুয়াটার বটেক..."

"অত দূরে?"

"হাঁ সার, উদিকে ড্যাম আছে বটেক। তার উত্তুর সাইডে বটেক।"

আরও ভাবনায় পড়া গেল দেখছি। অতদূরে গিয়ে যদি শুনি শের আলি নেই? তার স্যারের মেয়ের অসুখ। যদি সেই ভেবে কর্নেল তাকে বলে থাকেন, জিপের দরকার নেই, এবং কলকাতা যাওয়ার মুখে সেটা বলাই স্বাভাবিক, তা হলে তার স্যার অর্থাৎ ডি. ই. কামালসায়েব কোথাকার মিশনারি হাসপাতালে অসুস্থ মেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য এবার নিজের জিপই ব্যবহার করবেন। এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। ইরিগেশন কোয়ার্টার থেকে ফিরতে মোট দশ-বারো মাইল—তার মানে, আরও রাত হয়ে যাওয়া।

চুপ করে আছি দেখে রিকশাওয়ালা বলল, "ভাড়া লিয়ে ভাবছেন বটেক!" সে খুব হাসতে লাগল। "বুঢ়াসাহেবের লোক বটেক আপনি। ক্যানে উ ভাবনা গো? চলেন, লিয়ে যাই। যা দিবেন, লিব বটেক।"

খুলে বলাই উচিত মনে করলুম। "দ্যাখো ভাই, যাব আমি ইরিগেশন বাংলোয়। চেনো তো?"

"চিনি বটেক। ড্যামের দক্ষিণে।" রিকশাওয়ালা উৎসাহ দেখিয়ে বলল। "তা হলে শের আলির কথা ক্যানে?"

"তুমি যেতে পারবে ইরিগেশন বাংলোয়?" চরম কথাটি বললুম এবার।

"হাঁ-আ। ঠেইলতে...ঠেইলতে...ঠেইলতে পহুঁচে দিব বটেক।" রিকশাওয়ালা বলল। "ই মানিককে দেখে সার ভাবছেন কী বটেক? রেকশায় জম্মো, রেকশায় মরণ হবেক—ই মালিক সিটাই জানে বটেক। চল্‌হেন, চল্‌হেন!" সে প্যাডেলে পায়ের চাপ দিল। চল্‌—এর সঙ্গে একটি হ-বর্ণ উচ্চারণ তার জোরটা জানিয়ে দিল।

কিছুটা এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিতেই সুনসান নিরিবিলি এলাকা। আলো নেই। তারপর হাইওয়ে এবং ক্রমশ চড়াই। ডান দিকে খাপচা-খাপচা ঝুপসি জঙ্গল। তার ওদিকে অনেকটা দূরে ড্যাম। চড়াইয়ের মাথার দিকটায় যেখানে ব্যারেজ শুরু, সেখানেই আলো জুগজুগ করছে।

মানিক রিকশাওয়ালাকে অবশেষে নামতেই হল। এতক্ষণে বাতাস উঠেছে এবং আমরা এগোচ্ছি দক্ষিণে, ফলে সামনে বাতাসের ধাক্কা। বললুম, "ওহে মানিক, বরং আমি হেঁটে যাই।"

সে খুব অবাক হয়ে গেল। "কী ভাবছেন বটেক? পারবেক না মানিক?"

"না, না।" একটু হেসে বললুম, "ব্রিজে গিয়ে চাপব। আসলে কী জানো? একলা এই রাস্তায় যেতে একটু কেমন-কেমন লাগে। একজন সঙ্গী চেয়েছিলুম। তুমি আমার সঙ্গী বটেক।"

এতে খুশি হল না, রিকশা-চালকের আঁতে ঘা লাগল। একজন খাঁটি পরিশ্রমী মানুষ সে। বলল, "বুলেছি পঁহুছে দিবেক, তো দিবেক বটেক।"

গোঁ ধরে সে হ্যান্ডেল ধরে টেনে নিয়ে চলল। বিচ্ছিরিরকমের চড়াই। বাঁ দিকে প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, ডান দিকে জঙ্গল। জঙ্গলের আড়ালে কিছুটা দূরে মাঝে-মাঝে ড্যামের জলে তারার আলোর ঝিকিমিকি, ঝিকিমিকি গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ঢেউ উঠেছে জলে।

হঠাৎ দপ করে রিকশার সামনেকার বাতি নিভে গেল। মানিক হাঁসফাঁস করে বলল, "নিভাক! ই মানিকের সার, আলো-আঁধার এক বটেক।"

কিন্তু এটাই আশ্চর্য, এটা হাইওয়ে। অথচ কোনো মোটরগাড়ি এখনও দেখলুম না। ভাবলুম, এটা নেহাত একটা চান্সের ব্যাপার। ঠিক এ সময়টাতে কোনো গাড়ি এখানে এসে পৌঁছচ্ছে না, কিন্তু যে-কোনো সময় দেখা যাবে কোনো ট্রাক বা বাস। হঠাৎ মানিক বলল, "কে বটেক?"

অন্ধকারে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়েছে ততক্ষণে। রিকশার সামনে কয়েকটা কালো মূর্তি। একজন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "একাশি।"

অমনি রিকশা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়লুম। পালিয়ে যেতুম, না একহাত লড়তুম, জানি না। রাস্তায় নামতেই আমাকে তারা জাপটে ধরল। ধরেই মুখে টেপ সেঁটে দিল। মানিক চেঁচিয়ে উঠেছিল। তারপরই সে অদ্ভুত নাকিস্বরে গোঁ-গোঁ করতে লাগল। বুঝলুম, তার মুখেও টেপ পড়ে গেছে।

হালদারমশাইয়ের অবস্থাই হল। লোকগুলোর গায়ে সাঙ্ঘাতিক জোর। লড়তে গেলেই আরও বিপদ বাধবে। কী আর করা যাবে? পিঠমোড়া করে বেঁধে কাঁধে তুলল যখন, তখন ঠ্যাং ছুড়লুম না। সন্ধিবিচ্ছেদের জন্য তৈরি হয়ে গেছি। এরা হালদারমশাই বেহাত হয়ে ঠকেছে, অতএব এবার আর দেরি করবে না। প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে সেই সন্ন্যাসী লোকটাকে খোঁজার চেষ্টা করছিলুম,

যার হাতে খাঁড়া ছিল। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই অন্ধকার। উঁচু ঢিবির ওপর জঙ্গলের ভেতর অন্ধকার একেবারে গাঢ় কালি। অদ্ভুতভাবে মনে একটা কথা ভেসে এল। মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হলে রক্ত প্রচুর বেরোবে। কিন্তু রক্তগুলোও লাল দেখাবে না। কালোই দেখাবে।

একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওরা থামল। ভারিক্কি গলায় একজন বলল, "কথা আদায় কর! সত্যি কথা না বেরোলে বলিদান।"

অন্য একজন বলল, "কাশী তো হাজতে। বলিদানের খাঁড়াটাও পুলিশের হাতে গচ্চা গেল। বলি, দেবেটা কে?"

"কাশীটা একটা গাধা!" গলাটা সেই তিনকড়িচন্দ্রেরই মনে হল। "যাকগে, টেপ খুলে কথা আদায় কর। বুড়োঘুঘুটার সঙ্গী যখন, তখন সব জানে। কতদূর এগিয়েছে, ঠিকঠাক জানা দরকার।"

একজন আমার মুখের টেপ এক ঝটকায় খুলে দিল। চামড়া, গোঁফসুদ্ধু উপড়ে গেল যেন। যন্ত্রণায় "উহুহু" করে উঠলুম। তারপর পিঠে ছুঁচলো কিছু ঠেকল। একজন বলল, "টুঁ করলেই উলটো দিক থেকে হার্ট ছেঁদা হয়ে যাবে। সাবধান!"

একজন আমার কাঁধ ধরে ঠেলে বসিয়ে দিল ঘাসের ওপর। এতক্ষণে কানে আবছা ভেসে এল ঢাকের শব্দ। তা হলে মন্দিরটার কাছাকাছি কোথাও আছি। সামনের লোকটার হাতে ছড়ি দেখতে পেলুম। ঠিকই চিনেছি তা হলে। বললুম, "ডঃ সিংহ নাকি?"

ছড়ির খোঁচা খেলুম পেটে। "শাট আপ! ন্যাকামি হচ্ছে? ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দ্যাখোনি?"

"দেখতে পাচ্ছি তিনকড়িবাবু!"

"মোটকু, কথা আদায় কর।" তিনকড়িচন্দ্র একটু তফাতে বসল। "দেরি করিসনে!"

পিঠে ছুরির ডগার চাপ পড়ল। বললুম, "বলছি, বলছি!"

"বলো!" উদাস গলায় তিনকড়িচন্দ্র বলল। "বলো কদ্দূর এগিয়েছে বুড়োঘুঘু?"

বললুম, "অনেকদূর! কলকাতা অবধি।"

"তার মানে?"

"কর্নেল কলকাতা গেছেন। একটা ভাঙা শিলালিপির পাঠোদ্ধার করতে।"

"তার মানে? তার মানে?"

"নকুলবাবুর নোটবইতে ওই শিলালিপির নকল আঁকা আছে। ওতেই নাকি সোনার মোহরভর্তি ঘড়ার কথা আছে।"

"শাট আপ!" তিনকড়িচন্দ্র ধমক দিল। "মোহর-টোহর বোগাস! আমি জানতে চাইছি একাশিদেবের কথা!"

অবাক হয়ে বললুম, "সবসময় একাশি-একাশি শুনেছি! একাশিদেবের কথা তো শুনিনি।"

"সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।" তিনকড়িচন্দ্র শাসাল। "নোক্‌লো ব্যাটাচ্ছেলেকে ত্রিশূলে গেঁথেছি। তোমাকে...তোমাকে..." তিনকড়িচন্দ্র আমার জন্য সাঙ্ঘাতিক মৃত্যু খুঁজতে-খুঁজতে বলল, "হুঁ, তোমার গা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটব। বলো, কোথায় একাশিদেব লুকনো আছে?"

"কী আশ্চর্য! আমি জানলে তো বলে দিতুম। শিলালিপির ভেতর তার খোঁজ আছে হয়তো। কর্নেল সেজন্যই তো কলকাতা গেছেন। পাঠোদ্ধার করে তবে না জানা যাবে।"

আমার কথায় তিনকড়িচন্দ্র একটু ভাবনায় পড়ে গেল হয়তো। বলল, "ওক্কে। মোটকু, ওকে কাশীর ঘরে...না, কাশীর ঘরে পুলিশ আসার চান্স আছে। স্তূপের ভেতর গর্তটা ভালো জায়গা ছিল। বুড়ো চিনে ফেলেছে। এক কাজ কর।"

পেছনে মোটকু বলল, "বস্তায় ভরে টিকটিকিবাবুর মতো..."

"নাঃ! পুলিশ বস্তা দেখলেই সার্চ করছে দেখে এলুম।" তিনকড়িচন্দ্র উঠল। "একে বরং ভোম্বলবাবুদের পোড়োবাড়িতে নিয়ে চল। ঠ্যাং দুটোও বেঁধে মুখে ফের টেপ সেঁটে ফেলে রাখবি। তালা ভেঙে নতুন তালা এঁটে দিবি ঘরটাতে। বুড়োঘুঘু ফিরলে উড়ো চিঠিতে জানিয়ে দেব, মাল দাও, মাল নাও! গিভ অ্যান্ড টেক! ব্যস!"

সাত

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার হয়ে গেল ওরা চলে যেতেই। দয়া করে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে, এই যা। পিঠমোড়া করে দু'হাত বাঁধা, পা-দুটো বাঁধা। কাত হতে গেলে কষ্ট। চিত হতেও কষ্ট। অতএব উপুড় হয়ে আছি। ঘরটায় অদ্ভুত সব শব্দ। মাঝে-মাঝে কী সুড়সুড়ি দিচ্ছে। গায়ে চলাফেরা করছে। শেষে বুঝলুম, আরশোলা আর ইঁদুরের রাজত্ব ঘরের ভেতর। সাপ থাকাও অসম্ভব নয়। ওদের টর্চের আলোয় মেঝেয় প্রচুর গর্ত দেখেছি।

দরজা-জানলা বন্ধ এয়ারকন্ডিশনড্ ঘর এ-রাতে আশা করেছিলুম। তার বদলে এই সাঙ্ঘাতিক উপহার। আমার নামে কি জোড়া নম্বর থ্রি আছে? পুরো নাম জয়ন্তকুমার চৌধুরী। তা হলে দশ ব্যঞ্জন—মুরারিবাবুর হিসেবে। তিন-তিরেক্কে নয়, হাতে রইল এক।... নাঃ। ...তিন দশে তিরিশ, তিনের পাশে জিরো। জিরো নম্বর নয়—মুরারিবাবুর মতে। তা হলে স্রেফ তিন হয়। কিন্তু তিন তো পয়া নম্বর।

মুরারিবাবুর মতোই ঘিলু টেঁসে যাবে। ঘুমনোর চেষ্টা বৃথা। অনবরত আরশোলার সুড়সুড়ি। ইঁদুরের হপ-স্টেপ-জাম্প্ রেস। র‍্যাটরেস আর কি! মনে-মনে গত রাতে কর্নেলের উপদেশ স্মরণ করে তিন-শিঙে ছাগলের পাল কল্পনা করে গুনতে শুরু করলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, ছাগলটা 'একাশি' বলে এবং তিনকড়িচন্দ্র 'একাশিদেব' বলল। বড় গোলমেলে ব্যাপার।

তারপর চমকে উঠলুম। কী একটা লম্বা লিকলিকে প্রাণী আমার পিঠের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাচ্ছে। সেটা যে সাপ, তাতে সন্দেহ নেই। দম বন্ধ করে কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। সাপটা সম্ভবত ইঁদুরকে তাড়া করেছে। এরপর আর নড়াচড়া করা ঠিক হবে না। শ্বাসপ্রশ্বাসেও সাবধান হওয়া উচিত। মনে-মনে বাবা একাশিদেবকে ডাকতে থাকলুম।

এতকাল ধরে কর্নেলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে কত সব ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চারে গেছি, কিন্তু এমন বিদঘুটে ধরনের বিপদে কখনও পড়িনি। এই বিপদটা বেজায় অপমানজনকও বটে। আরশোলার সুড়সুড়ি, ইঁদুরের কাতুকুতু, সাপের বেয়াদপি। বাইরেও সন্দেহজনক কেমন সব শব্দ। শোঁশোঁ...শনশন...মচমচ...খটখট।

যেন কতকাল ধরে এইরকম নিছক কাঠে পরিণত হয়ে পড়ে আছি। হয়তো গায়ে শ্যাওলা জমেছে। ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। একসময় অন্ধকার কমে গেছে টের পেলুম। ক্রমশ জানলার ফাঁকে এবং ঘুলঘুলিতে ধূসর আলো, তারপর একটু করে ফিকে লালচে ছটা ফুটে উঠল। এবার ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার দেখা গেল। মাদুরে চিবুক ঠেকিয়ে মাথা তুললুম। এবড়োখেবড়ো মেঝে, গর্ত, দেওয়াল ফুঁড়ে শেকড়বাকড়। ফাটল।

আরও কিছু সময় কাটল। তারপর একটা জানলার পাশে ধুপধুপ, খসখস, কিছু টানা-হেঁচড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। অমনি যত জোরে পারি দম নাকে টেনে মুখ দিয়ে বের করলুম। টেপটাও সম্ভবত ঘামে নরম হয়েছিল। ফুটুস শব্দে একটুখানি খসে গেল বাঁ দিকে। গলা শুকিয়ে এমন অবস্থা যে যত জোরে কণ্ঠস্বর বের করলুম, ততটা জোরে বেরোল না। "কে আছ ভাই" কথাটা অদ্ভুত "কঁক্‌কাছ্-ছ-ভাঁ" হয়ে গেল।

কিন্তু সেই যথেষ্ট। সেই জানলাটার ছিটকিনি মরচে ধরে ভেঙে গেছে। খড়াক করে খুলে গেল এবং একটা মুখ দেখতে পেলুম। বিট্টু!

তার হাতে ঘুড়ি-লাটাই। এই ঘরের ছাদে চড়ে হয়তো ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টায় ছিল। আমাকে এ অবস্থায় দেখামাত্র সে বড়-বড় চোখে তাকাল। তারপর ফিক করে হেসে উঠল।

তারপর জিভ দেখাল এবং ব্যা-অ্যা করল। সত্যিই বিচ্ছু ছেলে। ধুপ শব্দে লাফিয়ে পড়ে তখনই উধাও হয়ে গেল। কিছু বলার সুযোগই পেলুম না।

রাগে-ক্ষোভে ছটফট করা ছাড়া উপায় নেই। অদ্ভুত ছেলে তো! একটা লোক এমন অবস্থায় পড়ে আছে দেখেও তার সঙ্গে ফক্কুড়ি করে কেটে পড়ল!

কিছুক্ষণ পরে বাইরে ধুপধুপ শব্দ আবার। তারপর জানলায় এবার মুরারিবাবুর মুখ এবং আমাকে দেখে অবাক হবেন কী, সেই খ্যাঁক করলেন।

অতিকষ্টে বললুম, "দরজা প্লি-ই-জ!"

মুরারিবাবু সরে গেলেন। দরজার দিকে তাঁর কথা শোনা গেল, "এই রে! তিন-তিরেক্কে করে রেখেছে। বিট্টু! হাতুড়ি! হাতুড়ি! বউদিকে গিয়ে বল্, কয়লাভাঙার হাতুড়ি দাও!"

তারপর কড়া টানাটানির বিকট শব্দ এবং দরজার কপাট কাঁপতে থাকল। সেইসঙ্গে মুরারিবাবুর ফোঁস-ফোঁস, গোঁ-গোঁ। স্তূপের ভেতর গর্তের মুখে পাথর ঠেলে সরানোর সময় যেমনটি শুনেছিলুম।

কিন্তু ক্রমশ উনি যেন রেগে যাচ্ছিলেন। "তবে রে তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশি! মারে জো—হেঁইয়ো!...জোরসে টানো—হেঁইয়ো!...ঔর থোড়া—হেঁইয়ো!" কড়াক শব্দে কড়া উপড়ে গেল এবং দরজাও প্রচণ্ড জোরে খুলে গেল। এত জোরে যে, দেওয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়ল ঝুরঝুর করে।

মুরারিবাবু ঘরে ঢুকে পুনঃ খ্যাঁক করলেন। কোমরে দু'হাত রেখে আমাকে দেখতে-দেখতে বললেন, "এই! এই তিন-তিরেক্কের ভয়েই কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে যাইনি। বুঝলেন তো এবার?... আহা রে! কী অবস্থা করেছে দেখছ? একেবারে নয় নয়ে একাশি... ওদিকে আরও এক তিন-তিরেক্কে। মানিক রিকশাওয়ালাকে ডাকাতরা শুনলুম মেরে ফর্দাফাঁই করেছে। মুখে টেপ!...সেই তিন-তিরেক্কের টেপ! ডিটেকটিভবাবুর মতোই অবস্থা। ...আরে! আপনার মুখেও তিন-তিরেক্কে?"

বলে একটু ঝুঁকে টেপটা ওপড়ালেন। যন্ত্রণায় উহুহু করে উঠলুম। বাঁধন খুলে দিচ্ছেন না এখনও। কথা বলতে গলায় যন্ত্রণা। "খু-খুলে দি-দিন" বলে চুপ করলুম।

হঠাৎ মুরারিবাবু এক লাফে পিছিয়ে "বাপ রে, সাপ" বলে একেবারে দরজার বাইরে চলে গেলেন।

অতিকষ্টে মাথা ঘুরিয়ে কোথাও সাপটাকে দেখতে পেলুম না। তবে কোণায় গর্তের পাশে একটা সাপের খোলস দেখা যাচ্ছিল। সেইসময় রমলাবউদির গলা ভেসে এল। "কই? কোথায়! কোথায় ঠাকুরপোকে বেঁধে রেখেছে?"

মুরারিবাবু ঘুরে বললেন, "একেবারে তিন-তিরেক্কে! তার সঙ্গে সাপ।"

রমলাবউদি দরজায় এসে আমাকে দেখেই "ও মা! এ কী!" বলে ঘরে ঢুকলেন। ওঁর হাতে একটা হাতুড়ি। আমার হাতের এবং পায়ের বাঁধন খুলে দু'হাতে আমাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর হাতুড়ি তুলে তেড়ে গেলেন মুরারিবাবুর দিকে। "হাঁ করে এতক্ষণ মজা দেখা হচ্ছিল, ভূত কোথাকার।"

মুরারিবাবু নিমেষে উধাও হয়ে গেলেন। রমলাবউদি এসে আমার কাঁধ ধরে বললেন, "কী সর্বনেশে কাণ্ড! কাল তুমি গেলে বটে, বড্ড ভয় করছিল। পথে কোনো বিপদ-আপদ যেন না ঘটে। চলো, চলো! ইশ! এক রাত্তিরেই কী অবস্থা হয়ে গেছে তোমার!"

বিট্টু নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ চলে গেল। ছেলেটা আপনভোলা খেয়ালি স্বভাবের। কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য ওকে আদর করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু কর্নেলের সেই রামধনু প্রজাপতির মতো এই ছটফটে সুন্দর ছেলেটিকে নাগালে পাওয়া কঠিন।

কাল শেষবিকেলে মুরারিবাবুর সঙ্গে এই হানাবাড়ি এলাকা দিয়ে এসেছিলুম। তখন আমি এক মানুষ, এখন আমি আর-এক মানুষ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেন বেতো-রুগিকে। এ দিকটা নিরিবিলি সুনসান। সকালের রোদ্দুর মিটিমিটি হাসছে আমার দশা দেখে, কাল হালদারমশাইয়ের দশা দেখে আমি যেমন হেসেছিলুম, তেমনি হাসি।

গরম দুধ খাইয়ে রমলাবউদি আমাকে চাঙ্গা করে তুললেন। বিরু নাইট ডিউটি করে এসে ঘুমোচ্ছিল। হাই তুলতে-তুলতে এসে আমাকে একবার দেখে গেল। গম্ভীর মুখে বলেও গেল, "চান করে নিন দাদা! বড্ড বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে আপনাকে।" আয়নায় নিজেকে দেখে শিউরে উঠলুম। আমি না অন্য কেউ? প্যান্ট-শার্টে ঝুলকালি, আরশোলার নাদি। চুলে মাকড়সা পর্যন্ত কখন জাল পেতেছিল। রাতারাতি একেবারে আস্ত ভূতে পরিণত হয়েছি।

রমলাবউদির তাড়ায় স্নান করতে হল। বিরুর পাঞ্জাবি-পাজামা পরে আয়নার সামনে চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখলুম, আমি আবার আমাকে ফিরে পেয়েছি। একটু পরে যখন খেতে বসেছি এবং রমলাবউদি সামনে বসে তিনকড়িচন্দ্রের শ্রাদ্ধ করছেন, তখন মুরারিবাবু হন্তদন্ত ফিরলেন। বললেন, "থানায় গিয়েছিলুম। আপনার ব্যাপারটা যে বলব, শুনলে তো? তিন-তিরেক্কে করতে এল। তবে করালীদাকে শাসিয়ে এসেছি। ...অবাক কাণ্ড মশাই! করালীদা বলল, তিনু তো জাহাজে। ওদের জাহাজ এখন প্যাসিফিক ওসনেে ভাসছে। বুঝুন তিন-তিরেক্কের কারবার!"

রমলাবউদি ধমক দিয়ে বললেন, "বকবক কোরো না তো! ঠাকুরপোকে খেতে দাও। আর শোনো, ইরিগেশন-বাংলোয় গিয়ে ঠাকুরপোর জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

বললুম, "না বউদি, আমি বাংলোয় ফিরে যাই, কর্নেল এসে আমাকে না দেখে ভাবনায় পড়ে যাবেন!"

রমলাবউদি কড়া মুখে বললেন, "না। সারারাত্তির ঘুমোওনি। খেয়েদেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ো। আর তোমাকে একা বেরোতে দিচ্ছিনে। মুরারি, দেখছ পাগলের কাণ্ড? এই আছে, এই নেই। আস্ত ভূত!"

মুরারিবাবু ততক্ষণে কেটে পড়েছেন। বাংলোয় আমার জিনিসপত্র আনতে যে যাননি, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। গেলেও মাধবলাল ওঁকে তা দেবে না। গেট থেকেই ভাগিয়ে দেবে।

স্নান করে চাঙ্গা হয়েছিলুম। কিন্তু পেটে ভাত পড়ার পর চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল। আর দেরি না করে নকুলবাবুর জাদুঘরে ঢুকলুম। রমলাবউদি বিছানা গুছিয়ে পেতে দিতেই লম্বা হয়ে পড়লুম এবং ঘুমও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই ঘুম ভাঙল যখন, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। চোখ খুলে প্রথমে একটি চকচকে টাক দেখতে পেলুম। জানলা দিয়ে শেষ রোদ্দুরের ছটা এসে সেই টাকে পড়েছে। টেবিলে টুপি। ধুড়মুড় করে উঠে বসলুম। "কর্নেল!" বলে উল্লাসে হাঁক ছাড়লুম।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ ঘুরলেন না। টেবিলে একটুকরো ভাঙা কালচে পাথরের ফলক আর নোটবই নিয়ে কী একটা করছেন। একপাশে মুরারিবাবু আর রমলাবউদি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। একটু পরে মুরারিবাবু বললেন, "তিন-তিরেক্কের হিসেব। দেখুন, মিলে যাবে।"

"মিলেছে।" বলে কর্নেল এতক্ষণে আমার দিকে ঘুরলেন। "কী জয়ন্ত? একাশির পাল্লায় তা হলে তুমিও পড়েছিলে? তোমাকে পইপই করে বলেছিলুম, বাংলো ছেড়ে বেরিও না।"

বললুম, "পড়লেও একাশিদেবের নাম জপে বেঁচে গেছি।"

"একাশিদেব?" কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন। "হুঁ, একাশির পাশে দেব যুক্ত করতে পেরেছ, এটাই লাভ। ...না, মুরারিবাবু! তিন যুক্ত দুই পাঁচ করে আর ঝামেলায় পড়বেন না।"

মুরারিবাবু ঝটপট বললেন, "পাঁচে ঝামেলা নেই কর্নেলসায়েব। তিন পাঁচে পনেরো। একের পিঠে পাঁচ। পাঁচ প্লাস এক—ছয়। দুটো নম্বর থ্রি। ...মাধবলালের নামের সংখ্যাতত্ত্ব জয়ন্তবাবুই বের করেছিলেন। ওঁর ক্রেডিট পাওনা। কিন্তু কী মিলেছে বলুন এবার?"

কর্নেল বললেন, "ব্যা-করণ রহস্য ফাঁস করে তবে সব বলব। চলুন, বেরনো যাক। জয়ন্ত, ওঠো। রমলা, ফলকটা যেখানে ছিল, রেখে দাও।"

রমলাবউদি পাথরেরর ভাঙা ফলকটা নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। একটু পরে বারান্দা থেকে বললেন, "চায়ের জল চাপানো আছে। চা খেয়ে তবে বেরোবেন বাবামশাই!"

কর্নেল কখন তা হলে রমলাবউদিরও বাবামশাই হয়ে গেছেন! ষষ্ঠীর বাবামশাই ক্রমশ দেখছি, বিশ্বসুদ্ধু লোকের বাবামশাই হয়ে উঠছেন।

চা খেয়ে যখন বেরোলুম, তখন প্রায় সাড়ে-পাঁচটা বাজে। কর্নেল হানাবাড়িগুলোর দিকে চলেছেন। মুরারিবাবু কেন কে জানে, ভীষণ গম্ভীর। কর্নেল আমার বন্দী হওয়ার ঘটনাটা জেনে নিলেন হাঁটতে-হাঁটতে। তারপর আপন মনে বললেন, "ঘুরে-ফিরে সেই ব্যাকরণ রহস্য অথবা ব্যা-করণ রহস্য এসে পড়ছে। এক আর আশি একাশি। সন্ধি প্রকরণ! মুরারিবাবু, আপনি জয়ন্তর সঙ্গে ভাঙা দেউড়ির ওখানে যান। আমি একটু ঘুরপথে যাচ্ছি।" বলে আমার দিকে ঘুরে একটু হাসলেন। "ভয় নেই ডার্লিং! তিনকড়িচন্দ্র এখন ওদিকে পা বাড়াতে সাহস পাবে না! পুলিশ ওৎ পেতে আছে। সে তত বোকা নয়।"

মুরারিবাবু এবার চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। বুঝলুম, তিনকড়িচন্দ্রের ভয়ে এ-তল্লাটে আসতে বড় অনিচ্ছা ছিল। তাই অমন গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওঁকে। লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। বললেন, "পুলিশ ওত পেতে আছে। আর তিন-তিরেক্কে করে কে? নয় নয়ে একাশি হয়ে যাবে। কিন্তু একাশিদেব কোন্ দেবতা বলুন তো জয়ন্তবাবু?... শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। ...কার কাছে যেন শুনেছিলুম নামটা। পেটে আসছেন, মুখে আসতেই তিন-তিরেক্কে হয়ে যাচ্ছে।"

কর্নেল ঝোপঝাড়-ধ্বংসস্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই দেউড়ির কাছে পৌঁছে গেলুম। এখনও দিনের আলো আছে। তবু চারদিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাচ্ছিলুম। মুরারিবাবুও তাকাচ্ছিলেন। ভুরু কুঁচকে চাপা গলায় বললেন, "পুলিশ ওৎ পেতে আছে! পুলিশ কীভাবে ওৎ পাতে জানেন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ের আড়ালে... এক মিনিট! ওই ঝোপটা দেখে আসি। স্বচক্ষে না দেখলে মশাই, বুকটা খালি তিন-তিরেক্কে তিন-তিরেক্কে করতেই থাকবে।"

এই বলে যেই পা বাড়িয়েছেন, দেউড়ির মাথা থেকে বিদঘুটে আওয়াজ এল, "এ-কা-শি!" সেই তিন-শিঙে ছাগলের মুণ্ডু। মুরারিবাবু থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। তারপরই আচমকা খাপ্পা হয়ে একটুকরো আধলা ইঁট কুড়িয়ে "নিকুচি করেছে তোর একাশির!" বলে ছুড়ে মারলেন। ছাগলের মুণ্ডুটা অদৃশ্য হলে গেল দেউড়ির মাথায় ঝোপের ভেতর। মুরারিবাবু আবার ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়লেন। সে একটা দেখার মতো দৃশ্য। ক্রমাগত ঢিল-ছোড়াছুড়ি করে চলেছেন মুরারিবাবু। ওঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "এ কী করছেন! পুলিশ ওৎ পেতে আছে কোথাও। কারও মাথায় পড়লে কী হবে?"

মুরারিবাবু ক্ষান্ত হলেন সঙ্গে-সঙ্গে। জিভ কেটে বললেন, "সরি, ভেরি সরি!" তারপর চারদিকে করজোড়ে নমস্কার করে অদৃশ্য পুলিশদের উদ্দেশে বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যাররা! একাশির ঠ্যালা। মাথা ঠিক রাখা কঠিন।"

এইসময় দেউড়ির পেছন থেকে কর্নেলের আবির্ভাব ঘটল। মুখে উজ্জ্বল হাসি। কিন্তু হতভম্ব হয়ে দেখলুম, ওঁর হাতে সেই তিন-শিঙে ছাগলটার মুণ্ডু। বললুম, "সর্বনাশ!"

"সর্বনাশ নয়, ডার্লিং! বলিদান-করা মুণ্ডু নয়।" কর্নেল সহাস্যে বললেন। "রক্ত দেখতে পাচ্ছ কি?"

মুরারিবাবু চোখ টেরিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে মুণ্ডুটা কর্নেল তুলে ধরে বললেন, "কী মুরারিবাবু? নকল একাশিদেবকে চিনতে পারছেন কি?"

অমনি মুরারিবাবু খ্যাঁক করে হাসলেন। তারপর মুণ্ডুটা ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "কী কাণ্ড! এও দেখছি তিন-তিরেক্কের খেলা। মুখোশ!"

"হ্যাঁ, মুখোশ।" কর্নেল বললেন, "সুড়ঙ্গের মুখে ঝোপের আড়ালে ওৎ পেতে ছিলুম। যেই ঝোপ ফুঁড়ে উঠেছে, শিং ধরে ফেললুম। মুখোশ উপড়ে এল। আসল প্রাণীটি দুই ঠ্যাঙে দৌড়ে পালিয়ে গেল।"

"বিট্টু?" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, "নিশ্চয় বিট্টু এই মুখোশ পরে মুরারিবাবুকে নিয়ে জোক করত!"

মুরারিবাবু মারমুখী হয়ে "তবে রে হতচ্ছাড়া, বিচ্ছু বাঁদর," বলে ছুটে গেলেন। বিট্টুকে খুঁজে পাবেন কি না সন্দেহ। কর্নেল বললেন, "ওই যাঃ! মুরারিবাবু মুখোশটা নিয়ে চলে গেলেন যে!"

"যাকগে! শিলালিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে কি না বলুন!"

"চলো। বাংলোয় ফিরে গিয়ে বলব।"

টিবি-এলাকা থেকে হাইওয়েতে নেমে বাংলোর দিকে হাঁটতে-হাঁটতে কর্নেল বললেন, "এও একটা সন্ধিবিচ্ছেদ বা ধড়-মুণ্ডবিচ্ছেদ হওয়ার ঘটনা বলা চলে, ডার্লিং! তবে এটা নকল। আসলটা ফাঁস হবে মধ্যরাতে—বারোটা নাগাদ। ফাঁদ পেতে এসেছি। দেখা যাক্।"

"খুলে বলুন। হেঁয়ালি আর ভাল্লাগে না!"

কর্নেল আমার কথার জবাবই দিলেন না। চোখে বাইনোকুলার রেখে পাখি দেখতে দেখতে চললেন। বাংলোর গেটে মাধবলাল উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "ছোটসাবকে লিয়ে হাম বহত্ শোচতা থা। রাতভর নিঁদ নেহি! আজ সারে দিনতকভি শোচতে শোচতে...হা রামজি!"

"জলদি কফি বানাও, মাধবলাল।" বলে কর্নেল বারান্দায় উঠে বেতের চেয়ারে বসলেন। একটু পরেই কফি এল। বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দিল মাধবলাল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। সেটা খুলে টেবিলে বিছিয়ে বললেন, "কলকাতা যাব বলে রওনা হয়ে বর্ধমানে পৌঁছে হঠাৎ মনে হল, ডঃ টি সি সিংহের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত। তাঁর কার্ড তিনকড়িচন্দ্র পেল কী করে? তা ছাড়া ডঃ সিংহ একজন পুরাবিদ এবং ভাষাবিজ্ঞানীও। ...হুঁ, যা ভেবেছিলুম। তিনকড়িচন্দ্র তাঁর কাছে একটা শিলালিপির একটুখানি ভাঙা অংশ নিয়ে গিয়েছিল। উনি সেটা কপি করে রেখে সময় চেয়েছিলেন। লিপিটা দেখে ওঁর অবাক লেগেছিল। তিনকড়িচন্দ্র তার চর মারফত খবর পেয়ে থাকবে, আমি পরের ট্রেনে আসছি। সে বর্ধমান থেকে আমাদের সঙ্গ নিল।"

"কার্ড চুরি করল কী করে?"

"চুরি নয়। চেয়ে নিয়েছিল। নেমকার্ড চাইলে কি দেবেন না" বলে কর্নেল কাগজের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। "এই লিপি খ্রিস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের কুষান-লিপি। ব্রাহ্মীর রকমফের। কিন্তু মজার ব্যাপার, এর ভেতর বাংলায় কিছু কথা লেখা আছে। সম্ভবত ধাড়াবংশের কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তির কীর্তি।"

বললুম, "কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং!"

কর্নেল হাসলেন। "ব্যাকরণ রহস্য ডার্লিং! ব্যঞ্জনবর্ণ-স্বরবর্ণ সন্ধি করলেই কথাটা বেরিয়ে আসবে। এই দেখো! ত+ও+র+ণ=তোরণ। শ+ই+র+এ=শিরে। গ+উ+প+ত+গ+র+ত=গুপ্ত গর্ত। ম+আ+ঝ+এ=মাঝে। ন+আ+ম+ও=নামো। ব+আ+ম+দ+ই+ক+এ=বাম দিকে। ত+ই+ন+ধ+আ+প=তিন ধাপ। ... এরপর শুধু 'ব'। বাকিটা ভেঙে গেছে এবং সেই ভাঙা অংশটা তিনকড়িচন্দ্র দিয়ে এসেছে ডঃ সিংহকে। তাই মিলিয়ে পুরো গুপ্তবাক্যটি হল :

তোরণশিরে গুপ্তগর্ত মাঝে নামো। বাম দিকে তিন ধাপ। বাম-হাতের তর্জনী।

বুঝতে পেরে বললুম, "সত্যিই তিন-তিরেক্কের ব্যাপার। বাপ্‌স! কিন্তু বাম হাতের তর্জনী মানে?"

"সেখানে দাঁড়ালে হাত ঝুলিয়ে বাম হাতের তর্জনী যেখানে ঠেকবে, সেখানেই..."

"ঘড়াভর্তি সোনার মোহর?"

"না। একাশিদেব।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। তোমার মুখে 'বাচ্চা ছেলে' কথার সূত্রে আমার মাথায় আইডিয়াটা আসে। তবে বিট্টু ছেলেটির হাড়ে-হাড়ে বুদ্ধি। নকুলবাবু ওকে তাড়াতেন আর ইতিহাসের গল্প শোনাতেন। শিবের তিন-শিঙে ছাগল-অবতারের গল্প শুনে বিট্টু বাজারের মুখোশ তৈরির দোকানে অর্ডার দিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এ-অঞ্চলে মুখোশ তৈরির প্রচুর দোকান আছে। ছৌ-নাচের মুখোশ এইসব দোকান থেকেই লোকে কেনে। আসলে মুরারিবাবুকে ভয় দেখাতেই বিট্টুর এই দুষ্টুমি। কিন্তু বাচ্চা ছেলে বলে ক্লুটা তুমিই দিয়েছিলে।"

"একাশিদেব ব্যাপারটা কী?"

"আজ রাত বারোটায় দেখবে। ডঃ সিংহকে বলে এসেছি, তিনকড়িচন্দ্রকে শিলালিপিটার বাকি অংশের কপি দেবেন। যেন উনি বর্ধমান মিউজিয়ামে এর খোঁজ পেয়েছেন! ফাঁদটা বুঝলে তো?"

"রাত বারোটা কেন?" উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললুম। "আরও আগে নয় কেন?"

"ওই সময় অমাবস্যা পড়ছে। মন্দিরে খুব ভিড় হবে আজ রাতে। কাজেই সবার মন পড়ে থাকবে মন্দিরে। এদিকে নির্বিঘ্নে তিনকড়ি একাশিদেবকে উদ্ধার করবে। তিনপুরুষ ধরে ভাঙা দেউড়ি নিয়ে মামলার আসল কারণটা তো এই।"

একটু ভেবে বললুম, "কিন্তু তিনকড়িচন্দ্র বেঁটে? দেউড়ির মাথায় সুড়ঙ্গে তিন ধাপ নেমে বাঁ হাত ঝুলিয়ে ওর তর্জনী যেখানে ঠেকবে, মুরারিবাবুর সেখানে ঠেকবে না। একজন বেঁটে, একজন লম্বা।"

কর্নেল হাসলেন। "সেজন্যই অনেক পাথরের ইট ওপড়াতে হবে তিনকড়িচন্দ্রকে। শাবল দিয়ে ইট ওপড়াতে শব্দ হবে। রাত বারোটায় অমাবস্যায় আজ পুজোর ধুম। ঢাক বাজবে প্রচুর। ঢাকের শব্দে শাবলের শব্দ চাপা পড়বে।"

রাত সাড়ে এগারোটায় থানা-পুলিশের জিপ আমাদের হাইওয়ের বটতলায় পৌঁছে দিল। সঙ্গে সেই দত্যিদানোর মতো প্রকাণ্ড মানুষ অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ হাটি। পুলিশের দারোগা না হলে হাতিমশাই বলা যেত। তিনি ভূমিকম্প-হাসি হাসছিলেন না। সম্ভবত ডিউটিতে আছেন বলেই। নয়তো খানতিনেক হাসলেই দেউড়ি ধসে পড়ত। কিন্তু রাত বারোটা বাজতেই চায় না। গুমোট গরম আর স্তব্ধতা। এ-রাতে বাতাস বন্ধ। ঝোপের আড়ালে আমরা বসে সময় গুনছি, কখন মন্দিরে বলির ঢাক বেজে উঠবে অমাবস্যার লগ্নে। সামনে আকাশের নক্ষত্রের ওপর একটা কালো ছায়া, ওটাই ভাঙা দেউড়ি।

একসময় মন্দিরের দিকে হঠাৎ তুমুল ঢাক বেজে উঠল। ভক্তদের জয়ধ্বনি শোনা গেল। ঝোপঝাড়-ধ্বংসস্তূপের ফোকর গলিয়ে মাঝেসাঝে আলোর ঝিলিমিলি। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন "মশাল-নৃত্য!"

তারপর চোখে পড়ল কালো তোরণের ওপর কয়েকটা ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করছে। মিঃ হাটি ফোঁস-ফোঁস শব্দে বললেন, "এসে গেছে। কখন আসামি ধরতে হবে, জানিয়ে দেবেন।"

কর্নেল তেমনই চাপা স্বরে বললেন, "মিঃ হাটি, এবার আসুন আমরা সুড়ঙ্গের মুখে গিয়ে অপেক্ষা করি। ওরা কাজে নামুক। বেরনোর সময় মালসুদ্ধ আসামি ধরবেন।"

তিনজনে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলুম। মিঃ হাটির পায়ের শব্দ নেই, যেন শূন্যে হাঁটছেন। বুঝলুম পুলিশ ট্রেনিং। আমার পা বারবার শুকনো লতাপাতায় পড়ে মচমচ শব্দ উঠছে। কর্নেলের এ-তল্লাট নখদর্পণে, এমন করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন ঘুরঘুট্টে অন্ধকারে। কিছুক্ষণ পরে যেখানে থামতে হল, সেটা একটা ভাঙা বাড়ি। মনে পড়ল, এর মেঝেতে ঝোপের ভেতর সুড়ঙ্গের দরজা রয়েছে। হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, "এই রে, মুরারিবাবু মনে হচ্ছে!"

একটু দূরে টর্চের আলো জ্বলে উঠতে দেখলুম। পায়ের কাছে আলো ফেলতে ফেলতে কেউ এগিয়ে আসছে এদিকে। মিঃ হাটি বললেন, "পাগলাটাকে সামলানো দরকার।"

কর্নেল বললেন, "উনি তিন-শিঙে ছাগলের মুখোশ পরেছেন দেখা যাচ্ছে! এক মিনিট! আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। এই নতুন প্ল্যানে মুরারিবাবুকে কাজে লাগাব।"

বলে উনি গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। তারপর মুরারিবাবুর ওপর আচমকা টর্চের আলো ফেললেন। মুরারিবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পালালেন না। বিচ্ছিরি, 'ব্যা-অ্যা' ডেকে উঠলেন। কর্নেল টর্চ নিভিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "চুপ!" বোঝা গেল, মুরারিবাবুর ব্যা-ডাক ভয় দেখাতেই। কিন্তু নিজেই ভয় পেলেন। তাঁর টর্চের আলো কর্নেলের ওপর পড়ল। তারপর খ্যাঁক করে হেসে টর্চ নেভালেন। মহানন্দে বললেন, "বিট্টুর কাছে সুড়ঙ্গের দরজার খোঁজ পেয়েছি। সোনার মোহরের ঘড়া আনতে যাচ্ছি।"

"চুপ, চুপ। আস্তে!" কর্নেল বললেন, "শুনুন! আপনি সুড়ঙ্গের মুখে ঝোপের ভেতর শুধু মুণ্ডটা বের করে বসুন। আপনার তিনকড়িদা দলবল নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকেছেন। ওঁর ফেরার সময় ব্যা-অ্যা করবেন। খুব শিঙ নাড়বেন কিন্তু!"

মুরারিবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "নাড়ব মানে? তিন-তিরেক্কে নয়, নয় নয়ে একাশিবার নাড়ব। আমার ঠাকুর্দার সোনার মোহরভর্তি ঘড়া!"

"আস্তে! থানার বড়বাবু আছেন, এই দেখুন। রেগে যাবেন।"

মুরারিবাবু শ্বাসের সঙ্গে বললেন, "ও! আচ্ছা!" তারপর ঝোপঝাড় ঠেলে বাড়ির ভাঙা দেওয়ালের পাশের ঝোপ ঠেলে ঢুকে পড়লেন। একবার টর্চ জ্বেলে জায়গাটা শনাক্ত করে নিলেন। সম্ভবত সুড়ঙ্গের মুখে চারঠেঙে প্রাণীর মতোই বসলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল। তারপর মুরারিবাবু যেখানে ঢুকেছেন, সেখানে কয়েকবার আবছা টর্চের আলো ঝিলিক দিল। একটু পরে মুরারিবাবুর বিকট ব্যা-অ্যা-অ্যা ডাক শোনা গেল। অমনি কর্নেল বলে উঠলেন, "মিঃ হাটি, জয়ন্তকে নিয়ে আপনি দেউড়ির ওখানে যান। হুইসল বাজিয়ে আপনার লোকেদের ডাকুন গিয়ে।"

মিঃ হাটি এবার ভূমিকম্পের মতো মাটি কাঁপিয়ে হাঁটতে বা দৌড়তে থাকলেন। সেই সঙ্গে হুইসলও বাজতে থাকল। দেউড়ির দিকে ঝলকে ঝলকে টর্চের আলো, পাল্টা হুইসল, দুদ্দাড়, হুলুস্থুলু। ঝড়, ভূমিকম্প হয়ে গেছে এমন তাণ্ডব! দেউড়ির মাথায় টর্চের আলো পড়েছে এদিক-ওদিক থেকে। সেই আলোয় দেখলুম, সেই ষণ্ডামার্কা মোটকু আর তার সঙ্গী ঝাঁপ দেবার তাল করছে। কিন্তু পারছে না। হাড়গোড় ভেঙে তো যাবেই, তার ওপর পুলিশের খপ্পরে পড়বে। মিঃ হাটি গর্জন করলেন, "খুলি ফুটো হয়ে যাবে। যেখানে আছ, তেমনই থাকো। কল্যাণবাবু!"

কল্যাণবাবুর সাড়া পাওয়া গেল। "ইয়েস স্যার!"

"ওদিকে যান। সুড়ঙ্গের মুখে পাগলাবাবু ওখানে আছে। তিন-শিঙে ছাগলের মুণ্ডু দেখে ভয় পাবেন না যেন।" বলে মিঃ হাটি সেই ভূমিকম্প-হাসি হাসলেন।

টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে কল্যাণবাবু একদল সেপাই নিয়ে ছুটে গেলেন। দেউড়ির মাথায় মোটকু এবং তার সঙ্গী এইসময় গর্তের দিকে ঝুঁকল। তারপরই "ও রে বাবা" বলে পিছিয়ে এসে মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়েই আর্তনাদ করে উঠল। ক'জন সেপাই গিয়ে ঘিরে ধরল তাদের। তারা আছাড়ের চোটে কাতরাতে থাকল। বেটনের গুঁতোও খাচ্ছিল মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। কিন্তু এদিকে আমি উদ্বিগ্ন। সুড়ঙ্গের ভেতর কর্নেল তিনকড়িচন্দ্রের সঙ্গে ট্রেনের কুপেতে যেমন ফিল্মি লড়াই লড়ছিলেন, তেমন কিছু ঘটছে না তো? টর্চের আলো দেউড়ির মাথায় ফেলে ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেলের বদলে বেরোলেন ছাগলাবতাররূপী মুরারিবাবু। বললেন, "একাশি।"

মিঃ হাটি আবার ভূমিকম্প-হাসি হাসতে লাগলেন।

চেঁচিয়ে বললুম, "কর্নেল কোথায় মুরারিবাবু?"

মুরারিবাবু মুখোশ খুলে বললেন, "তিনকড়িদাকে তিন-তিরেক্কে করে ফেলেছেন।" বলেই তারপর গর্তে ঢুকে গেলেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল না।

দূরে সুড়ঙ্গের মুখের দিক থেকে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে কল্যাণবাবুরা আসছেন দেখতে পেলুম। সঙ্গে কর্নেলও আছেন। কল্যাণবাবু তিনকড়িচন্দ্রের জামার কলার ধরে আছেন। সে ল্যাংচাচ্ছে। কাছে এসে কর্নেল বললেন, "একাশি! না—একাশীদেব! তালব্য শ-এ দীর্ঘ ঈ হবে। একটু বানানভুল আর কি!"

ওঁর হাতে একটা ছোট্ট পাথরের মূর্তি। মূর্তিটা তিন-শিঙে ছাগলের। বললুম, "এ কি?"

"ডার্লিং, এটা বিদেশে বেচতে পারলে কোটি টাকা পেতেন তিনকড়িবাবু। তোমাকে বলেছিলুম এক এবং আশি সন্ধি করে একাশি। ব্যা-করণ বা ব্যাকরণ রহস্য।" কর্নেল শিঙ তিনটে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। "একে চন্দ্র—নামতা, জয়ন্ত! শিবের মাথায় চন্দ্র থাকে। মাঝখানেরটা আশী অর্থাৎ সাপ। আশীবিষ পুরো সাপ। এটা আসলে সাপের ফণার প্রতীক। শুধু ফণাটুকু, তাই আশী। ওকে শাস্ত্রে বলে 'কূটাভাস'। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রাজা শিবসিংহের আমলে শিবের কূটাভাস তিন-শিঙে ছাগলে পরিণত হয়েছিল। পশুপতিদেব কিনা! মহেনজো-দরোর ঐতিহ্য, জয়ন্ত। শিবের মাথায় চন্দ্রকলা এবং মাঝখানে সাপের ফণা। সন্ধি করলে এক প্লাস আশি সমান একাশি। ব্যাকরণ রহস্য। তবে ব্যা-করণ রহস্যই বলব। কারণ..."

মুরারিবাবু হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বললেন, "কই, সোনার মোহরভর্তি ঘড়া?"

কর্নেল তাঁকে একাশীদেবের মূর্তিটা দেখিয়ে শুধু বললেন, "একাশী!"

রাগের চোটে মুরারিবাবু বিকট 'ব্যা-অ্যা-অ্যা' করে ভেংচি কেটেই বুঝলেন, থানার বড়বাবু-মেজোবাবুদের সামনে বেয়াদপি হয়ে গেছে। টর্চ জ্বালতে জ্বালতে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। ব্যাকরণে আর রহস্য নেই, বুঝতে পেরেছেন মুরারিবাবু।

কর্নেল বললেন, "চলুন। থানায় গিয়ে এবার হালদারমশাইকে উদ্ধার করি।"

আজব বলের রহস্য

"এক কিলো তুলো ভারী, না এক কিলো লোহা ভারী?" ষষ্ঠীচরণ ট্রে-তে কফি আর স্ন্যাক্স রেখে চলে যাচ্ছিল। এই বেমক্কা প্রশ্নে হকচকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল এবং ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "আজ্ঞে বাবামশাই?"

তার 'বাবামশাই' মানে, আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার চোখ কটমটিয়ে বললেন, "এক কিলো তুলো আর এক কিলো লোহার মধ্যে কোনটা বেশি ভারী?"

ষষ্ঠী ফিক করে হেসে বলল, "নোহা।" সে সবসময় 'ল'-কে 'ন' এবং 'ন'-কে 'ল' করে ফেলে।

আমি হোহো করে হেসে ফেললুম। ষষ্ঠী গাল চুলকোতে-চুলকোতে সম্ভবত ভুলটা খোঁজার চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমাকে অবাক করে কর্নেল বললেন, "ঠিক বলেছিস। বকশিস পাবি।"

ষষ্ঠী খুশি হয়ে চলে গেল। কর্নেল পেয়ালায় কফি ঢালতে থাকলেন। মুখে সিরিয়াস ভাবভঙ্গি। আমি একটু ধাঁধায় পড়ে গেলুম। কর্নেল আমার হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিয়ে বলল, "ষষ্ঠী কিন্তু ঠিক বলেনি।"

"বলেছে।" কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "তুমি কী বলতে চাইছ জানি, জয়ন্ত। এ-ধরনের প্রশ্নকে আগের দিনে বলা হত 'জামাই-ঠকানো প্রশ্ন'। এক কিলো তুলো আর এক কিলো লোহা। দুটোরই ওজন যখন এক, তখন একটা আর-একটার চেয়ে ভারী হতে পারে না। ঠিক কথা। কিন্তু সত্যিই তুলোর চেয়ে লোহা অনেক ভারী জিনিস! আয়তন ডার্লিং, আয়তন! তুমি আয়তনের কথাটা ভুলে যাচ্ছ। আমরা যখন কোনো বস্তুকে দেখি, আগে সেটার আয়তনই চোখে পড়ে। এক কিলো তুলোর যা আয়তন, তা যদি লোহার হয়, তা হলে লোহাটাই বেশি ভারী নয় কি?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কিন্তু ভারী বলতে তো ওজনই বোঝায়।"

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, "হুঁ। তবে ভুলে যাচ্ছ, আমরা আয়তন বাদ দিয়ে কোনো বস্তুকেই কল্পনা করতে পারি না। একটু তলিয়ে ভাবা দরকার জয়ন্ত! বস্তুর যেমন ওজন আছে, তেমনই আয়তনও আছে।"

"আপনার যুক্তির মাথামুণ্ডু নেই। আমি দুঃখিত।"

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে বললেন, "আচ্ছা জয়ন্ত, সমান আয়তনের কোনো ধাতু, ধরো, একটা ক্রিকেটবলের সাইজ লোহা, সোনা আর সিসের মধ্যে কোনটা বেশি ভারী?"

একটু ভেবে বললুম, "সম্ভবত সোনা।"

"হুঁ, সোনা। আমরা সচরাচর যেসব জিনিস হাতে নাড়াঘাঁটা করে থাকি বা মোটামুটিভাবে হাতের কাছে পাই, তাদের মধ্যে সোনা সবচেয়ে ভারী এবং সেটা আয়তনের দিক থেকে।" বলে কর্নেল হেলান দিলেন এবং চোখ বন্ধ। সাদা দাড়ি এবং চওড়া টাকে বাঁ হাতটা পর্যায়ক্রমে বুলোতে থাকলেন। এটা ওঁর চিন্তাভাবনার লক্ষণ।

বললুম, "ব্যাপারটা কী? আজ সকালবেলায় হঠাৎ এসব নিয়ে মাথাব্যথার কারণ কী বুঝতে পারছি না।"

কর্নেল একই অবস্থায় থেকে বললেন, "ওই শোনো ডার্লিং! দোতলায় লিন্ডার প্রিয় কুকুর রেক্সি চেঁচামেচি জুড়েছে। সিঁড়িতে ধুপধুপ ভারী পায়ের শব্দ। এবার কলিং বেল বাজাটা অনিবার্য।" বলে হাঁকলেন, "ষষ্ঠী!" এবং চোখ খুলে সিধে হয়ে বসলেন।

সত্যিই কলিং বেল বাজল। ষষ্ঠীর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর কর্নেলের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে দু'টি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম।

একজন মাঝারি গড়নের ছিমছাম চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক। পরনে ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবি। অন্যজন একেবারে দানো বললেই চলে। পেল্লায় গড়নের পালোয়ান। পরনে হাফপেন্টুল ও স্পোর্টিং গেঞ্জি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। গলায় চাঁদির তক্তি। তার মাথায় একটা ছোট্ট চটের থলে, যে-ধরনের থলেতে বাজার করা হয়। থলের মুখটা দড়ি দিয়ে আঁটো করে বাঁধা আছে। পালোয়ান লোকটি দু'টি পেশিবহুল হাতে থলেটি ধরে আছে এবং এই মোলায়েম এপ্রিলে সে দরদর করে ঘামছে, টলছে এবং হাঁফাচ্ছে। ফোঁস-ফোঁস শব্দ ছাড়ছে নাক-মুখ থেকে।

ভেবেই পেলুম না একটা তোবড়ানো থলের ভেতর কী ওজনদার জিনিস আছে যে এমন পেল্লায় গড়নের মানুষকে কাহিল হতে হয়েছে!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন, "কী রে ভোঁদা? দাঁড়িয়ে থাকবি, না নামাবি?"

পালোয়ান হাঁসফাঁস শব্দে বলল, "ধরতে হবে।"

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "জয়ন্ত! এসো, আমরা ওকে একটু সাহায্য করি। ভবেশবাবু, মনে হচ্ছে আপনাকেও হাত লাগাতে হবে। ষষ্ঠী! তুইও আয়।"

ষষ্ঠী দরজার পরদায় উঁকি মেরে পিটপিটে চোখে ব্যাপারটা দেখছিল। এগিয়ে এল। তারপর আমরা সবাই মিলে পালোয়ানের মাথা থেকে চটের থলেটি নামিয়ে টেবিলে রাখলুম।

বলছি বটে নামিয়ে রাখলুম, যেন আস্ত একটা পাহাড়কে কাত করে ফেললুম। থলের ভেতরে কী আছে কে জানে, মনে হল, অন্তত পাঁচ কুইন্টালের কম নয় সেটির ওজন। টেবিলটা যে মড়মড় করে ভেঙে গেল না, এটাই আশ্চর্য! তবে টেবিলে রাখার সময় বাড়িটাই যেন ভূমিকম্পে নড়ে উঠল। অবশ্য মনের ভুল হতেও পারে।

কর্নেল থলে খুলতে ব্যস্ত হলেন। পালোয়ান মেঝের কার্পেটে বসে হুমহাম শব্দে বলল, "ফ্যান! ফ্যান! জল!"

ষষ্ঠী ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিল। তারপর জল আনতে দৌড়ল। ততক্ষণে কর্নেল দড়ি খুলে থলেটা ফাঁক করেছেন। দেখলুম, থলের ভেতর ক্রিকেটবলের সাইজের কালো একটা জিনিস। অবাক হয়ে বললুম, "এই জিনিসটা এত ভারী? কী এটা?"

ভবেশবাবু সোফায় বসে বললেন, "সেটাই তো রহস্য মশাই! তবে তার চেয়ে বেশি রহস্য, আমার বাথরুমে জিনিসটার আবির্ভাব।"

যে-টেবিলে আজব বলটি রাখা হয়েছে, সেটি কর্নেলের রিসার্চ-ক্ষেত্র বললে ভুল হয় না। টেবিলটি এতদিন ধরে দেখে আসছি। কিন্তু সেটি যে এমন শক্তিশালী তা এই প্রথম জানতে পারলুম। অমন ওজনদার জিনিসের চাপে একটুও মচকাল না। কর্নেল ড্রয়ার থেকে আতসকাচ বের বের করে ততক্ষণে খুঁটিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছেন। এদিকে পালোয়ান পর-পর তিন গ্লাস জল খেয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ভবেশবাবু খুব আগ্রহের সঙ্গে কর্নেলের দিকে লক্ষ রেখেছেন।

আমি ভবেশবাবুকে বললুম, "প্লিজ, ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি?"

ভদ্রলোক একটু বদরাগী অথবা উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। যে-জন্যই হোক, খ্যাঁক করে উঠলেন। "ওই তো বললুম মশাই! রহস্য! আর রহস্য বলেই কর্নেলসায়েবের কাছে আসা।" বলে কর্নেলের দিকে তাকালেন। "কিছু আঁচ করতে পারলেন স্যার?"

কর্নেল আতশকাচ রেখে সোফার কাছে জানালার ধারে তাঁর ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, "আপাতত কিছু বোঝা যাচ্ছে না ভবেশবাবু! জিনিসটা সত্যিই রহস্যময়। কিছুটা সময় লাগবে।"

ভবেশবাবু বললেন, "বেশ তো! যত ইচ্ছে সময় নিন। তবে স্যার, সত্যি বলতে কী, ওই বকশিশ জিনিস আমার ফেরত নিয়ে যেতেও আপত্তি আছে! বাপ্‌স্! গতকাল বিকেলে বাথরুমে ওটা আবিষ্কারের পর থেকে যা-সব ঘটেছে, সবই তো আপনাকে টেলিফোনে বলেছি।"

পালোয়ান এতক্ষণে মেঝে থেকে উঠে সোফায় বসল। তার ওজনও কম নয়। সোফা মচমচ শব্দে কেঁপে উঠল। সে বলল, "ভূতুড়ে জিনিস স্যার! মামাবাবুকে এত বলছি, কানে করছেন না। নির্ঘাত ওটা ভূতের ঢিল।"

কর্নেল বললেন, "ঠিক। ভূতটা সারারাত ঢিলটা ফেরত নিতে বাড়ি চক্কর দিয়েছে। নানারকম ভয়-দেখানো আওয়াজ করেছে। তাই না ভবেশবাবু?"

ভবেশবাবু বললেন, "হ্যাঁ স্যার! সারারাত ঘুমোতে পারিনি। জানলার বাইরে ফিসফিস। দরজায় টোকা। বাগানে শাঁইশাঁই ঘূর্ণি হাওয়া। তারপর ছাদে বেহালার বাজনা! আমার অমন দাপুটে অ্যালসেশিয়ান টারজন, স্যার, সে পর্যন্ত ভয়ে কুঁকড়ে কাঠ!"

পালোয়ান ভোঁদা বলল, "আর সেই ঝনঝন শব্দটা, মামাবাবু? সেটার কথা বলুন!"

"হ্যাঁ, ঝনঝন শব্দ!" ভবেশবাবু চাপা গলায় বললেন, "ঘুম ভেঙে প্রথমে ভাবলুম, পাড়ায় কোথায় মাইকে খত্তাল বাজছে। পরে বুঝলুম, না—অন্য কিছু।"

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "ভূতের কেত্তন!"

পালোয়ান সোফা কাঁপিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। তারপর তার মামাবাবুর ধমক খেয়ে গম্ভীর হয়ে গেল। আমি ওকে বললুম, "ভোঁদাবাবু! আপনি তো ব্যায়ামবীর..."

পালোয়ান ঝটপট বলল, "আমার নাম জগদীশ। তবে আপনি ব্যায়ামবীর বললেন, সেটা ঠিকই। গত বছর স্টেট মাস্‌ল্ এগজিবিশনে ওই টাইটেল পেয়েছি।"

বলে সে ডান হাত তুলে তাগড়া-তাগড়া পেশি ফুলিয়ে নমুনা দেখাল। দেখার মতো বস্তু হলেও আমার কেন যেন অস্বস্তিকর লাগে। মানুষের শরীরকে মানুষ ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিকট করে তোলে এবং সেজন্য খেতাবও জুটে যায়! একে দেহসৌষ্ঠব বা সৌন্দর্য বলে প্রশংসাও করা হয় 'শ্রী' শব্দ সহযোগে। ব্যাপারটার মানে বুঝি না। কিন্তু কর্নেল জগদীশ ওরফে ভোঁদার পেশি-প্রদর্শনীর তারিফ করে বললেন, "অসাধারণ।"

আর অমনি পালোয়ানটি উঠে দাঁড়িয়ে আচমকা অঁক শব্দ করে শরীর বাঁকিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়াল, যেমনটি 'দেহশ্রী'-ক্যাপশনযুক্ত ছবিতে দেখা যায়। ষষ্ঠী ফের অতিথিদের জন্য কফি-টফি আনছিল। থমকে সভয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ভবেশবাবু ধমক দিলেন, "খুব হয়েছে। আর বীরত্ব দেখিয়ে কাজ নেই। কাল রাত্তিরে কোথায় ছিল পালোয়ানি? ঠকঠক করে কেঁপে মা-মা-মা-মা করে আমাকে জড়িয়ে ধরে...হুঁঃ!"

কাঁচুমাচু হেসে পালোয়ান বসল। বলল, "মানুষ তো নয়! মানুষ হলে এক আছাড়ে ছাতু করে ফেলতুম। ভূত-প্রেতের সঙ্গে পারা যায়? ওদের তো বডি নেই!"

কর্নেল বললেন, "যাই হোক, খুব মেহনত করেছ তুমি। কফি খেয়ে চাঙ্গা হও।"

"কফি-চা এসব আমার মানা।" পালোয়ান বলল, "তবে কর্নেল-সার, ইওর অনার।" বলে সে কফির পেয়ালা তুলে একটানে গরম কফি গিলে ফেলল। তারপর স্ন্যাক্সের সবটাই প্রকাণ্ড দুই হাতের চেটোয় তুলে মুখে ভরল।

ভবেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমিও ভাগনেবাবাজির মতো চা-কফি খাই না। আর মনের যা অবস্থা, খাওয়াদাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। আমি উঠি স্যার! আপনি এই রহস্যের কিনারা করুন।"

মামা-ভাগনে চলে যাওয়ার পর বললুম, "তা হলে আপনার লোহা ভারী না তুলো ভারীর রহস্যের সূচনাটা বোঝা গেল। কিন্তু সবটা খুলে না বললে মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে!"

কর্নেল হেলান দিয়ে বসে নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে বললেন, "ওই ভদ্রলোক, ভবেশবাবু একজন লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী। দোকান বড়বাজারে। বাড়ি দমদম এলাকায়। গত পরশু একটা লোক ওঁর দোকানে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে ওই জিনিসটা বেচতে নিয়ে গিয়েছিল। উনি লোহা ভেবে ওটা ওজন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওজনে সাঙ্ঘাতিক ভারী এবং জিনিসটা লোহাও নয়। তাই কেনেননি। হঠাৎ নাকি গতকাল দুপুরে ওঁর স্ত্রী বাথরুমে স্নান করতে ঢুকে জিনিসটা মেঝেয় দেখতে পান। তিনিও নাড়াচাড়া করতে গিয়ে অবাক হন। ওঁকে ফোন করেন। তারপর যা ঘটেছে, তুমি তো শুনলে।"

"কিন্তু তা হলে তো রহস্যটা অনেক বেশি বেড়ে গেল দেখছি!"

"হুঁ। আমাদের হালদারমশাইয়ের ভাষায় বলা চলে প্রচুর রহস্য!"

হালদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কে. কে. হালদারের কথা শুনে বললুম, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। ভবেশবাবুর বাড়িতে যা-সব ঘটেছে, তার রহস্যভেদে হালদারমশাইকে লাগিয়ে দিন। আর জিনিসটা কী, সেটা জানার জন্য বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তই যথেষ্ট। খবর পেয়েছি, উনি বনে কী একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে যোগ দিয়ে সদ্য কলকাতা ফিরেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "তোমার প্ল্যান আমার মাথায় অনেক আগেই এসেছে, ডার্লিং! সাড়ে ন'টা বাজে। চন্দ্রকান্তবাবুর আসার সময় হয়ে গেল। হালদারমশাই এতক্ষণ ছদ্মবেশে ভবেশবাবুর বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরছেন আশা করি। একটু অপেক্ষা করো।"

"একটা ব্যাপার অদ্ভুত লক্ষ করছি।"

"একটা কেন জয়ন্ত, সবটাই।"

"না...মানে, আমি বলতে চাইছি, যে-লোকটা ভবেশবাবুকে ওই জিনিসটা বেচতে গিয়েছিল, তার হাত থেকে কেন এবং কী করে ওটা ভবেশবাবুর বাথরুমে ঢুকে পড়ল?"

"এ-বিষয়ে তোমার কী ধারণা, শুনি।"

"লোকটা কোনো অজানা কারণে জিনিসটা ভবেশবাবুর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল এবং তা দিয়েছে।"

এই সময় কলিং বেল বাজল। তারপর বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত চৌধুরী হন্তদন্ত ঘরে ঢুকে দমফাটানো গলায় বললেন, "স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি পঞ্চান্ন পয়েন্ট ছয়! ভাবতে পারেন? তামার আট পয়েন্ট নয়। সিসের এগারো পয়েন্ট চৌত্রিশ। সোনার উনিশ পয়েন্ট তিরিশ। ইউরেনিয়ামের প্রশ্ন তুলছি না। কারণ খালি হাতে তেজস্ক্রিয় ধাতু ঘাঁটা বিপজ্জনক। কিন্তু পৃথিবীর কোনো ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব অত বেশি হতেই পারে না। পঞ্চান্ন পয়েন্ট ছয়! আমার মাথা বনবন করে ঘুরছে। পশ্চিম জার্মানির বন থেকে ফিরে এই বনবন করে মাথা ঘোরা। ধুস!"

বেঁটে গাবদাগোবদা মানুষ, চিবুকে নিখুঁত তিনকোনা দাড়ি, বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ধপাস করে সোফায় বসলেন। কর্নেল প্যাটপেটে চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "জিনিসটা আপনি তো দেখেননি। হাতে পাওয়া দূরের কথা। তা হলে কী করে ওটার আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসেব করলেন চন্দ্রকান্তবাবু?"

বিজ্ঞানীপ্রবর দাড়ি চুলকে ফিক করে হাসলেন। "ও! গোড়ার কথাটা বলাই হয়নি। দিন-তিনেক আগে রেডারে টের পেলুম কী-একটা খুদে জিনিস কলকাতার আকাশে এদিক-সেদিক করে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি কমপিউটারের সামনে বসে পড়লুম। বড্ড ফিচেল জিনিস মশাই! ঠিক আপনার

ওইসব প্রজাপতির মতো। চিন্তা করুন, ছটফটে রংচঙে বিরল প্রজাতির প্রজাপতি দেখলে আপনার কেমন অবস্থা হয়।"

টিপ্পনি কাটলুম, "কর্নেল খাঁটি পাগল হয়ে যান তখন।"

"ঠিক তাই," বিজ্ঞানী সায় দিলেন। "আমার অবস্থাও তাই হয়েছিল। ওটাকে ফলো করতে-করতে দক্ষিণ-পশ্চিমে থিতু হতে দেখলুম। আলট্রাসোনিক রে পাঠিয়ে জানলুম, একরকম শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করছে ওটা। সেই শব্দতরঙ্গের সূত্রে অপেক্ষিক গুরুত্ব মাপা হয়ে গেল। সারারাত তাই নিয়ে হিসেবনিকেশ করেছি। সকালে হঠাৎ আপনার ফোন। যাই হোক, জিনিসটা কি এসে গেছে?"

কর্নেল বলার আগে আমি বললুম, "ওই দেখুন।"

চন্দ্রকান্ত তড়াক করে উঠে টেবিলের কাছে গেলেন। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা নানারকম যন্ত্র বের করে ওটার গায়ে ঠেকাতে থাকলেন। সেই সঙ্গে নোটবই বের করে খসখস করে কীসব লিখেও নিলেন। শেষে বললেন, "হুঁ! আশ্চর্য! জিনিসটা একটা অপার্থিব ধাতু। কোনো গ্রহ থেকে ছিটকে পড়েছে পৃথিবীতে। এটা আমার ল্যাবে নিয়ে যাওয়া দরকার।"

বললুম, "কিন্তু নিয়ে যাবেন কী করে? সাঙ্ঘাতিক ওজন। আপনার রোবট ধুন্ধুমারকে সঙ্গে আনা উচিত ছিল।"

"ধুন্ধু'র আজকাল বড় দুষ্টুমি জেগেছে, বুঝলেন?" বিজ্ঞানী গম্ভীর হয়ে বললেন, "এটা পেলে হয়তো ক্রিকেট খেলতে শুরু করে দেবে। আসলে আজকাল চারদিকে যেরকম ক্রিকেট নিয়ে বাড়াবাড়ি! ধুন্ধু'র দোষ নেই। বাগান থেকে খেলার মাঠটা দেখা যায়। ক্রিকেটবল অনেক সময় বাগানে এসে পড়ে। ধুন্ধু কুড়িয়ে ছুঁড়ে দেয়। হতভাগা এক্কেবারে ভুলে গেছে যে, সে মানুষ নয়, মেশিন। মানুষের মধ্যে বেশিদিন থাকলে যা হয়!"

কর্নেল বললেন, "তা হলে ওটা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাক। নাকি ভবেশবাবুর পালোয়ান ভাগনেকে ওবেলা আসতে বলব? সে-ই কিন্তু জিনিসটা এতদূর বয়ে এনেছে।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত একটু হেসে বললেন, "বিকল্প ব্যবস্থা না করেই কি এসেছি ভাবছেন?" তিনি একটা ইঞ্চি ছয়েক লম্বা যন্ত্র দেখালেন। "দেখতে পাচ্ছেন? বলুন তো এটা কী?"

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে মাথা দোলালেন।

"এ. জি. এল.। আমার আবিষ্কার।" চন্দ্রকান্ত হাসলেন। "মহাকাশের কোথাও দাঁড়িয়ে এটার সাহায্যে পৃথিবীকে ছুঁড়ে ফেলতে পারি মশাই! অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি লিফটার! যা-তা জিনিস নয়। এটা দিয়ে যদি জয়ন্তবাবুকে ছুঁই, উনি ভরহীন এবং ওজনহীন হয়ে পড়বেন।"

বললুম, "বাঃ! বেশ মজা তো!"

"মজা!" বাঁকা হেসে বিজ্ঞানী বললেন, "ভরহীন হলে কী অবস্থা হবে, বুঝতে পারছেন? ওজনহীন হলে না-হয় পাখির মতো উড়ে বেড়াবেন। কিন্তু ভরহীন হলে? পরমাণু কেন, স্রেফ কণিকা-উপকণিকা হয়ে চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় স্পেসে বিলীন হয়ে যাবেন। আপনার টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

আঁতকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ!"

চন্দ্রকান্ত আরও ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন, "ফোটনেও পরিণত হতে পারেন।"

কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু, তা হলে আপনার এ. জি. এল. ওই আজব বলটি ছুঁলে তো কেলেঙ্কারি।"

"না। এই লাল সুইচটা দেখছেন। এটা পদার্থের ভরকে জিরোতে পরিণত করে। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আমি একটু জোক করছিলুম। যাই হোক, এই সুইচটা টিপব না। টিপব এই সাদা সুইচটা। এটা

ওজনকে জিরো করে দেবে। ভর এবং ওজনের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। অথচ দেখুন, এই শর্মা সেই অসাধ্যসাধন করেছে।" বলে চন্দ্রকান্ত থলের মুখটা খুলে আজগুবি বলটার গায়ে যন্ত্রটা চেপে ধরলেন।

অমনি একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

বিদঘুটে বলটা শূন্যে ভেসে উঠল এবং বাঁই করে খোলা জান.. দিয়ে উধাও হয়ে গেল। চন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "যাঃ! পালিয়ে গেল! পালিয়ে গেল!" তারপর জানলায় গিয়ে উঁকি দিলেন।

কর্নেলের গলায় সবসময় বাইনোকুলার ঝোলে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে জানলায় গিয়ে বাইনোকুলার চোখে তুললেন। তারপর সেখান থেকে ব্যস্তভাবে ছাদের সিঁড়ির দিকে চললেন।

ছাদে কর্নেলের বাগান, গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই যেটির নাম দিয়েছেন 'শূন্যোদ্যান'। সেখানে অদ্ভুত, বিকট, বিদঘুটে গড়নের সব উদ্ভিদ। ক্যাকটাস, অর্কিড, আরও কত বিচিত্র গাছপালা। সেই শূন্যোদ্যানে পৌঁছে দেখলুম চন্দ্রকান্ত তাঁর যন্ত্রগুলোর এটা টিপছেন, ওটা টিপছেন এবং কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে পশ্চিমের আকাশ দেখছেন। এপ্রিলের উজ্জ্বল নীল আকাশে অবাধ শূন্যতা। দেখতে দেখতে চোখ টাটিয়ে গেল আমার।

একটু পরে বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ায় গেল। ওখানে প্রচুর লোহালক্কড়ের দোকান আছে অবশ্য। দেখা যাক।"

চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "না। না। ওটার গতি সেকেন্ডে প্রায় হাজার কিলোমিটার। এই দেখুন। আমার ধারণা, এতক্ষণে ওটা সাহারা মরুভূমিতে পৌঁছে গেছে। আমার এখনই ল্যাবে ফেরা উচিত। কমপিউটারের সামনে বসতে হবে। প্রচুর হিসেবনিকেশ করতে হবে, প্রচুর!"

"হ্যাঁ, প্রচুর। তবে যন্ত্রে হইব না! এ সায়েন্টিস্টের কাম না মশায়! ডিটেকটিভের হাতে ছাইড়া দেওনই ভালো!"

ঘুরে দেখি, সিঁড়ির দিক থেকে এগিয়ে আসছেন গোয়েন্দা কে. কে. হালদার। মুখে রহস্যময় হাসি। কর্নেল বললেন, "খবর বলুন হালদারমশাই! এতক্ষণ আপনার জন্য হা-পিত্যেশ করছি!"

হালদারমশাই আগে একটিপ নস্যি নিলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন, "ভবেশ রক্ষিত লোকটা ভালো না। পুলিশ-সোর্সে আগে খবর নিয়েছিলাম। তিনবার চোরাই মালের দায়ে ধরা পড়েছিল।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। কোনো বিদায়সম্ভাষণ করলেন না। বুঝলুম, বাড়ি ফিরেই ল্যাবে ঢুকবেন।

কর্নেল বললেন, "চলুন হালদারমশাই! নীচে গিয়ে কফি খেতে-খেতে আপনার তদন্ত রিপোর্ট শোনা যাক।"

একটু পরে ড্রয়িংরুমে বসে প্রচুর দুধে প্রায় সাদা কফি ফুঁ দিয়ে খেতে-খেতে প্রাইভেট গোয়েন্দা কৃতান্তকুমার হালদার তাঁর তদন্ত রিপোর্ট দিলেন।

আজকাল কোনো জিনিসই ফেলনা নয়। পুরনো ছেঁড়া জামাকাপড় বা জুতো, কৌটো-শিশি-বোতল, অ্যালুমিনিয়ামের টুটাফাটা পাত্র থেকে শুরু করে গেরস্থালির পরিত্যক্ত সমস্ত আবর্জনা কেনবার জন্য লোকেরা অলিগলি হাঁক দিয়ে বেড়ায়, "বিক্কিরিওলা! বিক্কিরি-ই-ই-ই!" হালদারমশাই বিক্কিরিওলা সেজে ভবেশবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। ভবেশ-গিন্নি খুব জাঁদরেল মহিলা। বিক্কিরিওলা বড্ড বেশি খোঁজখবর নিচ্ছে দেখে ডাকাতের চর ভেবে পালোয়ান ভাগনেকে ডাক দেন। ভাগ্যিস, তখন সে মামার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। উনি পুলিশে ফোন করতে যাচ্ছেন আঁচ করেই গোয়েন্দা কেটে পড়েন। তবে আজব বলটার কথা ততক্ষণে জানা

হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সত্যি একটা প্রচণ্ড ভারী খুদে বল বাথরুমে পড়েছিল। গত রাতে বাড়ির আনাচেকানাচে ভূতেরা উৎপাতও করেছে বটে। কিন্তু সন্দেহজনক ব্যাপার হল, বড়বাজারে ভবেশবাবুর দোকানে ঠেলাগাড়িতে চাপিয়ে যে-লোকটা ওই ভুতুড়ে বল বেচতে গিয়েছিল, তার চোখ ট্যারা এবং গতকাল বিকেলে ভবেশবাবুর বাড়ির কাছাকাছি একটা গলিতে যে-লোকটাকে সিঁটিয়ে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তার চোখও ট্যারা। কাজেই হালদারমশাই থানা থেকে হাসপাতালের মর্গ ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছেন। তাঁর হাতে এখন বড় তথ্য মৃত লোকটির নামধাম।

নোটবই খুলে গোয়েন্দামশাই বললেন, "গজকুমার সিং। ৮২/৩/ই চারু মিস্ত্রি লেন। জায়গাটা বেলঘরিয়ায় একটা মেসবাড়ি। গজকুমারের রেস খেলার নেশা ছিল। ওঁর মেসের লোকেরা বললেন, ফালতু লোক। মাথায় ছিট ছিল। ইদানীং বড়াই করে বলতেন, শিগগির কোটিপতি হয়ে যাবেন। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন।"

এইসময় ফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। "...লোকেট করতে পেরেছেন? খুব ভালো কথা! ...না, না। আপত্তি কী? শুভস্য শীঘ্রং। হাঃ হাঃ হাঃ! এই বুড়ো বয়সে মহাকাশযাত্রা? ...ঠিক আছে। রাখছি।" ফোন রেখে কর্নেল মিটিমিটি হেসে হালদারমশাইকে বললেন, "গ্রহান্তরে গোয়েন্দাগিরি করবেন নাকি হালদারমশাই?"

আমি অবাক। হালদারমশাই সম্ভবত কিছু না বুঝেই ঝটপট নস্যি নাকে গুঁজে বললেন, "হুঁঃ!"

দুই

কর্নেলের কথামতো সন্ধে ছ'টা নাগাদ যখন বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের বাড়ি পৌঁছলুম, দেখি, হালদারমশাই আগেই চলে এসেছেন। যথারীতি এক প্লেট সিন্থেটিক পকৌড়া এবং কফি খেয়ে নস্যিতে নাক জেরবার করে ফেলেছেন। মুখে চাপা উত্তেজনা থমথম করছে। চন্দ্রকান্ত তাঁর ল্যাবে ছিলেন। এসে খুশি-খুশি মুখে বললেন, "সুস্বাগত জয়ন্তবাবু! আপনি মহাকাশ থেকে কিটো গ্রহে পৌঁছেও রেগুলার আপনার দৈনিক 'সত্যসেবক' পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠাতে পারেন। কিন্তু সমস্যা হল, আপনাদের কাগজের অফিসের টেলেক্স তা রিসিভ করতে পারবে না। দেখা যাক, যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারি।"

বললুম, "রিপোর্ট পরে হবে চন্দ্রকান্তবাবু! আমরা কিটো গ্রহে যাচ্ছি বললেন। সেটা কোথায়?"

"সেকেন্ডে গ্যালাক্সিতে। তবে ও-নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। গ্রহ ইজ গ্রহ।"

"সেখানে বাতাস আছে তো?"

বিজ্ঞানী হাসলেন, "কয়েকশো টন বাতাস সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি তো আমার এ. জি. এল. যন্ত্রটি দেখেছেন। বাতাসকে চাপ দিয়ে ঘনীভূত করে ফেলব। এ. জি. এল. তার ওজন জিরো করে ফেলবে। ব্যস!"

কোথায় প্রিঁ-প্রিঁ শব্দ হল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "ধুন্ধু সন্দেহজনক কিছু দেখেছে। এক মিনিট, আসছি।"

চন্দ্রকান্তের এই বাড়িটা দমদম শহরতলি এলাকায় এক টেরে। এলাকাটা গ্রাম বলেই মনে হয়। চারদিকে ঘন গাছপালা। হালদারমশাই সন্দেহজনক শব্দটা কান পেতে শুনে তড়াক করে উঠে বললেন, "বসুন, আসছি।"

বললুম, "ধুন্ধু'র পাল্লায় পড়বেন কিন্তু!"

অমনি গোয়েন্দাপ্রবর বসে পড়লেন। বেজার মুখে বললেন, "হঃ! ওই এক হতচ্ছাড়া! জয়ন্তবাবু, ওই পাজিটাকে যদি সঙ্গে নেন সায়েন্টিস্ট, আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

মনে পড়ল, সেবার চুপিচুপি বিজ্ঞানীর বাড়ি ঢুকতে গিয়ে হালদারমশাইয়ের কী অবস্থা হয়েছিল ধুন্ধু'র হাতে। কিন্তু এমনিতে শ্রীমান ধুন্ধু বেশ খোশমেজাজি রোবট। ইদানীং তাকে চন্দ্রকান্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাচ্ছেন। ধাতব গলায় বেশ গায় সে।

চন্দ্রকান্ত ফিরে এসে বললেন, "ধুন্ধুটা ভিতু হয়ে যাচ্ছে দিনে-দিনে। অন্ধকারে বেড়াল দেখেও চমকে ওঠে।"

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে পড়লেন। ওঁর পিলোব্যাগে প্রজাপতি-ধরা নেটের স্টিক উঁকি মেরে আছে চেনের ফাঁকে। অবাক হয়ে বললুম, "চন্দ্রকান্তবাবু! কিটো গ্রহে প্রজাপতিও আছে নাকি?"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ অট্টহাসি হাসলেন। বিজ্ঞানী বললেন, "আহা! চান্স মিস করতে নেই। যদি সত্যিই থাকে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমরা কতটুকু জানি মশাই, যাই হোক, আমাদের রেডি হওয়া দরকার। ইন্টারন্যাশনাল স্পেস কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাইম সিডিউল পেয়েছি সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। এই আধঘণ্টা পৃথিবীর স্পেস-উইন্ডোর ট্রাফিক আমাদের জন্য বরাদ্দ।"

হালদারমশাই নড়ে উঠলেন। "সেটা কী?"

কর্নেল বললেন, "আমি বুঝিয়ে বলছি। চন্দ্রকান্তবাবু, আপনি স্পেসশিপ রেডি করুন ততক্ষণ।"

বিজ্ঞানী চলে গেলে কর্নেল বললেন, "পৃথিবীর আকাশ থেকে মহাকাশে পৌঁছনো একটা সমস্যা, হালদারমশাই! যেখান-সেখান দিয়ে বেরনো যায় না। একটা নিরাপদ যাত্রাপথ আছে, সেটাই স্পেস-উইন্ডো। কোনো দেশ থেকে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেসশিপ পাঠাতে হলে আগে জানা দরকার পথটা ফাঁকা আছে কি না। নইলে অন্য দেশের পাঠানো স্পেসশিপের সঙ্গে ঠোক্কর লাগতে পারে। তা ছাড়া উল্কার বিপদ আছে। পৃথিবীর চৌম্বক-ক্ষেত্র আছে। সেইসব বিপদ-আপদ এড়িয়ে নিরাপদ পথ আবিষ্কার করতে হয়েছে।"

হালদারমশাই খুব মাথা নাড়ছিলেন বটে, মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কিছু বুঝতে পারছেন না।

বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "আপনারা ল্যাবে চলে আসুন। ল্যাবের গেট নাম্বার টু'র সামনে দাঁড়ান। লিফট পাবেন। লিফট সরাসরি স্পেসশিপে পৌঁছে দেবে। কুইক!"

ল্যাবে ঢুকে দু'নম্বর গেটের সামনে আমরা দাঁড়ালুম। দরজা দু'পাশে সরে লিফট দেখা গেল। লিফটে ঢুকে হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "সেই পাজি ধুন্ধুটা সঙ্গে যাচ্ছে না তো?"

নেপথ্যে চন্দ্রকান্তের হাসি শোনা গেল। "ধুন্ধু মাস্ট মিঃ হালদার। তবে ওকে ভয় পাবেন না। ওকে বলে দিয়েছি, ও আপনার বন্ধু হয়ে থাকবে!"

স্পেসশিপে ঢুকে বুঝলুম গড়ন ডিমালো এবং ছাদের একটা গম্বুজের মাথায় বসানো। চন্দ্রকান্তের পাশে কর্নেল বসলেন। আমি আর হালদারমশাই বসলুম পেছনে। তারপর হালদারমশাই হঠাৎ আঁতকে উঠে বললেন, "গেছি! গেছি!"

পেছন থেকে ধুন্ধু ওঁর কাঁধে হাত রেখেছে। হাসতে হাসতে বললুম, "ধুন্ধু আপনার কাঁধে হাত রেখে বন্ধুতা জানাচ্ছে, হালদারমশাই! আপনিও ওকে বন্ধুতা জানান।"

হালদারমশাই ভয়ে-ভয়ে ঘুরে ধুন্ধু'র চিবুকে ঠোনা মেরে আদর করলেন, "লক্ষ্মীসোনা!"

চন্দ্রকান্ত বললেন, "আমরা উড়ছি। রেডি!"

একটা ঝাঁকুনি লাগল। তারপর কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম, নীচের অজস্র আলোর ফুটকি দেখতে-দেখতে মিলিয়ে গেল। হালদারমশাই ফিসফিস করে বললেন, "আচ্ছা জয়ন্তবাবু! আমাদের স্পেসসুট পরালেন না তো সায়েন্টিস্টমশাই! আমার কেমন যেন ঠেকছে!"

চন্দ্রকান্ত তা শুনতে পেয়ে সহাস্যে বললেন, "এই শর্মার সেটাই কৃতিত্ব মিঃ হালদার। স্পেসসুট-টুট সবই প্রিমিটিভ করে ফেলেছি। কত কিলোমিটার বেগে যাচ্ছি, জানেন? সেকেন্ডে দু'হাজার মাইল। ওই দেখুন, সূর্য ঝলমল করছে।"

হালদারমশাই বললেন, "কিন্তু রোদ্দুর কোথায়? আকাশই বা এত কালো কেন? ধুস!"

তিনি নস্যি নিলেন। অমনি ধুন্ধু পিছন থেকে মুণ্ডু এগিয়ে দিল। হালদারমশাই খি-খি হেসে তার নাকে খানিকটা নস্যি গুঁজে দিলেন। ধুন্ধু নস্যির চোটে ধাতব হাঁচি হাঁচতে হাঁচতে কাত হয়ে পড়ল। চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "মিঃ হালদার! কেলেঙ্কারি করবেন দেখছি। ধুন্ধু'র নড়াচড়ায় স্পেসশিপ ব্যালান্স হারালেই...এই রে! সর্বনাশ!"

হালদারমশাই প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "ক্কী? ক্কী? ক্কী?"

চন্দ্রকান্ত খুটখুট শব্দে বোতাম টেপাটেপি করতে করতে বললেন, "গতিপথ বদলে গেছে। আপনি মশাই বড্ড ঝামেলা বাধান! এই রে! আমরা কোথায় চলেছি কে জানে?"

কর্নেল চুপচাপ নির্বিকার মুখে চুরুট টানছেন। আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলুম। বললুম, "চন্দ্রকান্তবাবু, অ্যাক্সিডেন্ট হবে না তো?"

"হবে কী মশাই? হয়ে গেছে।" বিজ্ঞানী তেতো মুখে বললেন, "আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি।"

"কিন্তু স্পেসশিপ ভেঙে পড়বে না তো?"

"দেখা যাক।"

আরও ভয় পেয়ে হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালুম। উনি মুখ চুন করে বসে আছেন। বললুম, "এবার কী হবে ভাবুন তো হালদারমশাই!"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক বললেন, "হঃ। ভাবতাছি। তবে আমারে দোষ দেবেন না য্যান। ওই পাজি হতচ্ছাড়া নাক বাড়াইয়া..."

উনি থেমে গেলেন। ধুন্ধু আবার নাক বাড়িয়েছে ওঁর কাঁধের ওপর দিয়ে। বিজ্ঞানী টের পেয়ে ধমকে দিলেন, "ধুন্ধু! ট্রাট ট্রাট ট্রাট!"

ওটা নিশ্চয় সাঙ্কেতিক ভাষা। ধুন্ধু ধাতব স্বরে বলল, "ক্রাট ক্রাট ক্রাট!"

"ক্রিও ক্রিও ক্রিও!" হুঙ্কার দিলেন বিজ্ঞানী।

ধুন্ধু তার চৌকো থাবা দিয়ে হালদারমশাইয়ের কাঁধ আঁকড়ে ধরল। কর্নেল বললেন, "নস্যি হালদারমশাই! ধুন্ধু নস্যির মজা টের পেয়েছে। না পেলে আপনার কাঁধের হাড় ভেঙে দেবে। শিগগির!"

হালদারমশাই দ্রুত নস্যির কৌটো বের করে বাকি নস্যির সবটাই ধুন্ধু'র নাকে গুঁজে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল ধুন্ধু'র বিকট হাঁচি এবং হাঁচতে হাঁচতে সে এমন নড়তে থাকল, স্পেসশিপ বেজায় ঝাঁকুনি খাচ্ছিল। চন্দ্রকান্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ইমপসিবল! নিন! কোথায় নামছেন, দেখুন আপনারা।"

নীচে রোদে ঝকমকে সোনালি বালি। যতদূর চোখ যায়, শুধু বালি। অসমতল, কোথাও সমতল বালির বিস্তার। কাছে ও দূরে বালিরই পাহাড়। জায়গাটা মরুভূমি তাতে সন্দেহ নেই। প্রচণ্ড বালি উড়িয়ে স্পেসশিপ অবশ্য নিরাপদে থামল। কর্নেল দরজা খুলে নেমেই বললেন, "বাঃ! অসাধারণ।"

তারপর উনি যথারীতি চোখে বাইনোকুলার তুলে চারদিক দেখতে থাকলেন। আমি আর হালদারমশাই দরজা খুলে নেমে গেলুম। ঘড়ি দেখে অবাক। সাতটা চল্লিশ বাজে! তার মানে দশ মিনিটের জার্নি। ঘড়িতে একই তারিখ যে। সাধারণ জ্ঞানে বুঝলুম, আমরা নিশ্চয় পশ্চিম দিকে সূর্যের পেছন-পেছন ছুটে এসেছি। তাই এখন বিকেলের দেখা পাচ্ছি এখানে। কিন্তু কী বিচ্ছিরি গরম!

হালদারমশাইয়ের দোষেই মহাকাশযাত্রা ব্যর্থ এবং পৃথিবীর কোনো সৃষ্টিছাড়া মরুভূমিতে এসে পড়েছি। হালদারমশাইকে সম্ভবত সেজন্যই কাতর দেখাচ্ছে। তাই ওঁকে সান্ত্বনা দিতে বললুম,

"সত্যি বলতে কী, আমার আনন্দ হচ্ছে জানেন হালদারমশাই? কোন্ উদ্ভুট্রে গ্রহে গিয়ে কী বিপদে পড়তুম কে জানে। তার চেয়ে এটা বরং ভালোই হল।"

হালদারমশাই কিন্তু বেজার মুখে বললেন, "হঃ! ভালোই হল! মরুভূমিতে আইয়া পড়ছি। এখন বেদুইন ডাকাতগুলি আইয়া পড়লেই গেছি!"

"আপনি বেদুইনের কথা ভাবছেন কেন? এটা মেক্সিকোর মরুভূমিও হতে পারে।"

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, "আমি ডিটেকটিভ, ডোন্ট ফরগেট দ্যাট। নামবার সময় গম্বুজওয়ালা ঘর দেখছিলাম একখানে। আরবের ড্যাজার্ট না হইয়া যায় না।"

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, "হুঁ, 'ড্যাজার্টে' অনেক হ্যাজার্ড আছে মনে হচ্ছে হালদারমশাই!"

"ক্যান, ক্যান?" হালদারমশাই তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"ওইদিকে বালির পাহাড়ের মাথায় একটা বেঁটে লোক দেখলুম। গোল কুমড়োর গায়ে নাক-মুখ-চোখ এঁকে দিলে যেমন দেখায়, তেমনি চেহারা। লোকটার হাত-পা কিচ্ছু নেই। দিব্যি গড়াতে গড়াতে ওধারে উধাও হয়ে গেল। কুমড়ো-মানুষের দেশে এসে পড়েছি আমরা।"

রসিকতা করছেন ভেবে একটু হেসে বললুম, "কুমড়োপটাশের দেশে বলুন!"

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন, "হাসির কথা নয়, ডার্লিং! মনে হল, কুমড়ো-মানুষটা বসতিতে খবর দিতে গেল।" বলে ডাকলেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! নেমে আসুন!"

বিজ্ঞানী স্পেসশিপের ভেতর বসে কীসব করছিলেন। তড়াক করে নেমে এসে বললেন, "আশ্চর্য কর্নেল, খুবই আশ্চর্য! আমরা পথভ্রষ্ট হইনি। সঠিক জায়গায় পৌঁছেছি।"

চমকে উঠে বললুম, "সেই কিটো গ্রহে এসে গেছি নাকি?"

চন্দ্রকান্ত খুশি-মুখে বললেন, "হ্যাঁ! খামোকা ধুন্ধুকে দোষ দিচ্ছিলুম। ধুন্ধু দু'-দু'বার জার্ক না দিলেই বরং গতিপথ থেকে এক ডিগ্রি সরে যেতুম। ফলে কী হত জানেন? অনন্তকাল মহাকাশে ভেসে বেড়াতুম। কর্নেল! চলে আসুন! জয়ন্তবাবু! মিঃ হালদার! কুইক। ডিটেক্টরের কাঁটা সেই বলটার দিকে তাক করে আছে। আমরা সেদিকেই এবার যাব।"

কর্নেল আবার বাইনোকুলারে দূরে কিছু দেখছিলেন। বললেন, "যাওয়ার আগে কুমড়ো-মানুষদের একটা গ্রুপফোটো নিতে চাই চন্দ্রকান্তবাবু!"

"কুমড়ো-মানুষ!" বিজ্ঞানী অবাক হয়ে বললেন। "কই, কোথায়?"

"ওই দেখুন, দলবেঁধে গড়াতে গড়াতে আসছে।"

এবার ব্যাপারটা চোখে পড়ল। সেই বালির পাহাড় বেয়ে অন্তত শ'খানেক জ্যান্ত কুমড়ো গড়াতে-গড়াতে নামছিল। সমতলে নেমে এবার তারা গড়াতে-গড়াতে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। অবিকল প্রকাণ্ড ফুটবল মনে হচ্ছে। মাঝে-মাঝে কয়েকটা যেন কিক খেয়ে আকাশে উঠছে। আবার নেমে পড়ছে।

চন্দ্রকান্ত বললেন, "কী বিপদ! নাঃ, ধুন্ধুকে বের করি। কিছু বলা যায় না।"

তিনি স্পেসশিপের পেছনের খোপের দরজা খুলে দিলেন। শ্রীমান ধুন্ধুমার বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াল। হালদারমশাই তার কাছ ঘেঁষে রইলেন। চন্দ্রকান্তকে দেখলুম, হাতে মারাত্মক লেসার-পিস্তল নিয়েছেন।

কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু ক্যামেরা তাক করে আছেন।

কুমড়ো-মানুষেরা আমাদের প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। নাঃ! দাঁড়াবে কী করে? ঠ্যাংই তো নেই। কাজেই থামল বলাই ভালো। এই সময় লক্ষ করলুম, কেমন

অদ্ভুত চাপা একটা ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। ওটাই কি ওদের ভাষা? ক্রমে চোখে পড়ল, ওদের মধ্যে নানা বয়সি কুমড়ো-মানুষ আছে। তারপর সবাই আমাদের জিভ দেখাতে থাকল।

হালদারমশাই খাপ্পা হয়ে বললেন, "অসভ্যতা দ্যাখছেন? মুখ ভ্যাঙায় কেমন!"

কর্নেল টেলিলেন্স ফিট করে কয়েকটা ছবি নিলেন। তারপর আমাদের অবাক করে সোজা এগিয়ে গেলেন ওদের দিকে। চন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, "যাবেন না! যাবেন না!"

আমিও চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল কান করলেন না। সেই ঝাঁ-ঝাঁ শব্দটা এখন থেমে গেছে। হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, "বিপদ বাধবে! ওই দ্যাখেন, কর্নেল-স্যারেরে চক্কর দিয়া ঘিরতাছে।"

কিন্তু এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতেও আমার হাসি পেল, যখন দেখলুম, কর্নেলও ওদের মতো জিভ বের করে অনবরত ভেংচি কাটার ভান করছেন।

তারপর সে এক বিচিত্র ব্যাপার। কুমড়ো-মানুষগুলো কর্নেলের ওপর এসে পড়ল। কেউ ওঁর কাঁধে, কেউ ওঁর মাথায় চড়ল। মাথারটি কর্নেলের টুপি খুলে নিজের মাথায় পরল এবং কর্নেলের চকচকে টাকে সেঁটে বসে রইল। একজন ওঁর দাড়িতে আটকে গেল। এবার আরও আজব দৃশ্য। সার্কাসে লোহার বলের ওপর পা রেখে বলটাকে গড়াতে-গড়াতে এগনো দেখেছি। কর্নেল কি সে-খেলাও জানেন? ওঁর পায়ের তলায় কয়েকটা কুমড়ো-মানুষ এবং উনি দিব্যি নাচার ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছেন। এদিকে ওঁর চারপাশে ওড়াউড়ি করছে আরও সব কুমড়ো-মানুষ। সম্ভবত বসার জুতসই জায়গা খুঁজছে।

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, "মনে হচ্ছে, কর্নেলকে ওরা বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য বেয়াদপি! ধুন্ধু! টুট্ টুট, ক্রুট্ ক্রুট!"

ধুন্ধু বালির ওপর দমাস-দমাস পা ফেলে এগিয়ে গেল। ওকে পেছনে দেখামাত্র কুমড়ো-মানুষের একটা দঙ্গল ঝাঁ-ঝাঁ শব্দে তেড়ে এল। ধুন্ধু'র ওপর তারা প্রকাণ্ড ঢিলের মতো পড়তে থাকল। ধুন্ধু টাল সামলে নিয়ে খপ করে একটাকে ধরে দূরে ছুড়ে ফেলল।

কিন্তু তার কিছুই হল না। সে আবার গড়াতে-গড়াতে এসে লাফ দিয়ে ধুন্ধু'র একটা কানে এসে পড়ল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "ওই যাঃ!"

দেখলুম, ধুন্ধু নেতিয়ে হাঁটু দুমড়ে ধরাশায়ী হল। চন্দ্রকান্ত বললেন, "বাঁ কানের নীচেই সুইচ। চাপ পড়লে ধুন্ধু ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যায়।" বলে তিনি লেসার-পিস্তল উঁচিয়ে দৌড়ে গেলেন।

লেসার-পিস্তলের গুলিতে কোনো কাজ হল না। কুমড়ো-মানুষেরা কর্নেলের মতোই বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে নাচাতে-নাচাতে নিয়ে চলল। উনি পেছন ফিরে চেঁচিয়ে কিছু বললেন। বোঝা গেল না।

হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কোনো মানে হয়? ব্যাটাচ্ছেলেরা..."

ওঁর কথা থেমে গেল। আমাদের পেছনে স্পেসশিপ। তার আড়ালে কখন একদঙ্গল কুমড়ো-মানুষ এসে লুকিয়ে ছিল টের পাইনি। আচমকা তারা এসে হালদারমশাইকে ঘিরে ফেলল এবং তারপর একই দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঢ্যাঙা গোয়েন্দাপ্রবর নাচতে-নাচতে চলেছেন আর চ্যাঁচাচ্ছেন, "জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! বাঁচান, বাঁচান!"

কিন্তু আমার দিকে কুমড়ো-মানুষদের লক্ষ নেই কেন? একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। এ তো ভারি অপমানজনক ব্যাপার! আমাকে ওরা বন্দী করল না, গ্রাহ্যই করল না! আমি কি এতই ফেলনা? আঁতে বড্ড ঘা লাগছিল এবং অভিমান হচ্ছিল।

আর-এক আশ্চর্য ব্যাপার, সূর্য যেখানকার সেখানেই আছে। এ কি তা হলে এক চির-বিকেলের দেশ? সোনালি বালির ওপর নরম গোলাপি রোদ্দুর। একটু ভ্যাপসা গরম আছে, এই যা। একটুও

বাতাস বইছে না। কুমড়ো-মানুষেরা তিন বন্দীকে নিয়ে বালির পাহাড় পেরিয়ে উধাও হয়ে গেলে ধুন্ধু'র কাছে গেলুম।

হঠাৎ মনে হল, ধুন্ধুর এক কানে অফ্ করার সুইচ আছে যখন, অপর কানেও কি পালটা অন করার সুইচ নেই?

যেই কথাটি মাথায় আসা, ডান কানের সুইচটা টিপে দিলুম। অমনি ধুন্ধু ঝনঝন শব্দে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে ঘুরে একখানা স্যালুট ঠুকল। খুশি হয়ে বললুম, "হ্যালো ধুন্ধু! কনগ্র্যাচুলেশন!"

ধুন্ধু তার ধাতব কণ্ঠস্বরে বলল, "ট্রাও ট্রাও ট্রাও!"

এই রোবট-ভাষা আমি বুঝি না। ইশারায় তাকে অনুসরণ করতে বললুম। স্পেসশিপের কাছে গিয়ে দেখি, সে আমার ইশারা বুঝতেই পারেনি। বালির পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মরুক হতচ্ছাড়া! আমার তেষ্টা পেয়েছে, যা-সব আক্কেল গুড়ুম করা কাণ্ড ঘটল! স্পেসশিপে ঢুকে জলের ফ্লাস্ক থেকে অনেকটা জল খেলুম। চন্দ্রকান্তের সিটে গিয়ে স্পেসশিপ চালানোর চেষ্টা করব নাকি?

এই ভেবে উঠতে যাচ্ছি, চোখে পড়ল ধুন্ধু দমাস-দমাস করে বালির পাহাড়টার দিকে হেঁটে চলেছে। রাগে গা জ্বালা করছিল। কিন্তু কী আর করা যায়? নিজের আসনে বসে সিগারেট ধরালুম। এখন আমি মরিয়া। বরাতে যা আছে ঘটুক।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ কী একটা শব্দ। দরজা খোলা ছিল বলেই কানে এল। তাকিয়ে দেখি, কী আশ্চর্য, একটা রোগা খেঁকুটে চেহারার মানুষ, হ্যাঁ, আমার মতোই মানুষ, অবাক চোখে স্পেসশিপটা দেখছে।

তিন

এমন সৃষ্টিছাড়া এক জায়গায় মানুষ দেখলে মানুষের মনে আনন্দ উপচে পড়ে। লাফ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বললুম, "নমস্কার, নমস্কার!"

মানুষটি চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর ভয়ে-ভয়ে বললেন, "আপনি মানুষ বটে তো?"

হাসতে হাসতে বললুম, "আপনার সন্দেহের কারণ? আমি জলজ্যান্ত মানুষ।"

"ওরে বাবা! জ্যান্ত বললেন নাকি?"

"হ্যাঁ। জ্যান্ত বইকি। আপনার মতোই জ্যান্ত।"

"উঁহু। আমি কিন্তু জ্যান্ত নই, মড়া।"

বড় রসিক লোক তো! হো-হো করে হেসে বললুম, "আপনার রসিকতায় বড় আনন্দ পেলুম। এতক্ষণ এই কুমড়ো-মানুষদের দেশে যা-সব কাণ্ড হল, বাপ্স্! আপনাকে দেখে ধাতস্থ হওয়া গেল। তা মশাইয়ের নাম?"

"আপনার নাম আগে শুনি।"

"জয়ন্ত চৌধুরী। স্পেশ্যাল রিপোর্টার। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা।"

"ওরে বাবা! এখানেও রিপোর্টার?" বলে ভদ্রলোক আরও সরে গেলেন।

"আরে! আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"ভয় পাব না? মরেও রেহাই নেই দেখছি। পেছনে রিপোর্টার লেলিয়ে দিয়েছে।"

"মরে মানে?"

"হুঁ, পৃথিবীতে মশাই, রিপোর্টারদের জ্বালাতেই হার্টফেল করেছি। ওঃ! প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার! এই বল কোথায় পেলেন? কে দিল? কী ধাতুতে তৈরি? আমার..."

"বল?" সন্দিগ্ধ হয়ে বললুম, "মশাইয়ের নাম?"

"ঈশ্বর গজকুমার সিং।"

"গজকুমার সিং! আপনি...কী আশ্চর্য! আপনিই তো সেই আজব বল বিক্রি করতে গিয়েছিলেন ভবেশবাবুর দোকানে?" বলেই ওঁর চোখের দিকে তাকালুম। চোখ দুটি ট্যারা! তা হলে ইনি সত্যিই সেই লোকটা।

গজকুমারবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন, "আর বলবেন না! বলটা আমার ঠাকুরদা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে আমাদের বিহার মুলুকের বাড়িতে ছিল। খুলে বলছি মশাই, আমি একজন রেসুড়ে। আগামী শনিবার একটা ঘোড়ার ওপর মোটা দান ধরব ভেবে ওটা বাড়ি থেকে মেসে এনে রেখেছিলুম। তারপর বেচতে যদি গেলুম, বিক্রি হল না। ফেরার পথে কী করে খবর হল কে জানে, ঝাঁকে-ঝাঁকে খবরের কাগজের রিপোর্টার ঘিরে ধরল। প্রাণে মারা পড়লুম।"

"বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন?"

গজকুমারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "তা তো জানি না। শুধু জানি, আমি মরে গেছি। তারপর একটু আগে চোখ খুলে দেখি, ওইখানে বালির ওপর শুয়ে আছি। উঠে বসলুম। তখন আপনার এই গাড়িটা চোখে পড়ল। চলে এলুম।"

"গজকুমারবাবু! সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। আমার ধারণা, আপনি সত্যি মারা পড়েননি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ভুল করে আপনাকে মড়া ভেবে মর্গে ঢোকানো হয়েছিল। তারপর কেউ বা কারা আপনাকে এই কুমড়ো-মানুষদের গ্রহে পাঠিয়ে দিয়েছে!"

গজকুমারবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "যাক্‌গে! একটা সিগারেট দিন।"

সিগারেট দিলুম। উনি আরামে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "মরুভূমি তো। তাই বড্ড গরম। তা আপনি কী যেন বললেন, কুমড়ো-মানুষ না কি?"

"হ্যাঁ। এই গ্রহের নাম কিটো। এখানে অবিকল কুমড়োর মতো মানুষরা থাকে। তাদের হাত-পা নেই। গড়াতে-গড়াতে, লাফাতে-লাফাতে চলে। আমার তিন সঙ্গীকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।"

"আপনাকে ধরে নিয়ে যায়নি কেন বলুন তো?"

"সেটাই তো ভাবছি।"

গজকুমারবাবু আমাকে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, ওরা কী করে টের পেয়েছে, আপনি কাগজের রিপোর্টার। তাই আপনাকে এড়িয়ে গেছে। আপনি প্রশ্নে-প্রশ্নে জেরবার করে হাঁড়ির খবর বের করবেন এবং জব্বর স্কুপ ঝাড়বেন। সেই ভয়েই আপনাকে ধরে নিয়ে যায়নি।"

"কিন্তু আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কেন যায়নি?"

গজকুমারবাবু কাঁচাপাকা চুল আঁকড়ে ধরে একটু ভাবলেন। তারপর খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি খুব করে চুলকে নিয়ে বললেন, "বালিতে বেজায় পিঁপড়ে। জ্বালা করছে। কুমড়ো-মানুষদের দেশে পিঁপড়েগুলোও একই গড়নের। গোটাকতক টিপে মেরেছি। ...হ্যাঁ, আপনি একটা ভালো প্রশ্ন তুলেছেন, আমাকে ধরে নিয়ে যায়নি কেন? আমার মনে হচ্ছে, আমাকে যে বা যারা এখানে নিয়ে এসেছে, তাকে বা তাদের ওরা ভয় পায়। কিন্তু কথা হল, কে বা কারা আমাকে এখানে নিয়ে এল? আপনি ঠিকই বলেছেন জয়ন্তবাবু! সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময়।"

একটু ইতস্তত করে বললুম, "এক কাজ করা যাক। চলুন না, দু'জনে চুপিচুপি ওই বালির পাহাড়ের দিকে যাই। গিয়ে দেখি, আমার সঙ্গীদের কী অবস্থা হল। মানুষ হয়ে মানুষকে বাঁচানো কর্তব্য নয় কি? আমাদের রিস্কটা নেওয়া উচিত।"

গজকুমারবাবু বললেন, "চলুন। কিন্তু হাতে অন্তত একটা লাঠি-ফাটি থাকলে ভালো হত। এই আজগুবি মরুভূমিতে একটা ঝোপঝাড় পর্যন্ত নেই। দেখুন না, আপনাদের গাড়ির ভেতর রড-টড পান নাকি। যা হোক কিছু পেলেই চলবে। অগত্যা একটা হাতুড়ি কি স্ক্রু ড্রাইভার। ছুরি থাকলে আরও ভালো। কুমড়ো-মানুষ বললেন। প্যাঁক করে পেটে ঢুকিয়ে দেব।"

উনি খ্যা-খ্যা করে হেসে উঠলেন। তবে যুক্তিটা মন্দ নয়। স্পেসশিপে ঢুকে চন্দ্রকান্তের সিটের পাশে সৌভাগ্যক্রমে টুলস-ব্যাগটা পেয়ে গেলুম। হাতুড়ি বা ছুরি নেই। নানা সাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাস, আরও কতরকম টুকিটাকি জিনিস আছে। বুদ্ধি করে দুটো বড় সাইজের স্ক্রু-ড্রাইভার নিলুম।

দু'জনে এভাবে সশস্ত্র হয়ে বালির পাহাড়টার দিকে হাঁটতে থাকলুম। এতক্ষণে টের পেলুম, যে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ তখন শুনেছি, তা এই বালির ভেতর থেকে উঠছে। বইতে পড়েছি, পৃথিবীর বহু মরুভূমিতে বালির ওপর চলাফেরা করলে অদ্ভুত সব শব্দ হয়। কোথাও-কোথাও নাকি অর্কেস্ট্রাও শোনা যায়।

বালিতে হাঁটার সমস্যা আছে। দ্রুত এগনো যায় না। তাতে ক্রমাগত অস্বস্তিকর ঝাঁ-ঝাঁ ঝনঝন শব্দ। পাহাড়টা আন্দাজ শ'তিনেক ফুট উঁচু। কিন্তু যতবার উঠতে যাই, পা হড়কে গড়িয়ে পড়ি। দু'জনে অনেক খোঁজাখুঁজি করে অপেক্ষাকৃত শক্ত জায়গা পেলুম। সেখান দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠলুম। তারপর চোখে পড়ল, নীচে উপত্যকার মতো একটা জায়গা এবং সত্যিই স্বর্গোদ্যান বলা চলে।

উজ্জ্বল সবুজ গাছপালা, সুন্দর ঝিরঝিরে ঝরনাধারা এবং ওলটানো বিশাল বাটির মতো অসংখ্য রং-বেরঙের ঘর। ঝরনার ধারে একটা সবুজ ঘাসের মাঠ। মাঠে কুমড়ো-মানুষদের ভিড়। কিন্তু আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, আমার সঙ্গীদের ওরা ধরে নিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু বন্দী করে রাখেনি। তিনটে মোড়ার মতো গড়নের নিটোল রঙিন আসন দিয়েছে বসতে। তিনজনের হাতেই আধখানা প্রকাণ্ড ডিমের খোলার মতো পাত্র। ওঁরা তারিয়ে-তারিয়ে কিছু খাচ্ছেন। ধুন্ধু'র অবস্থা অন্যরকম। সে চিত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বুঝলুম, বেয়াদপি করেছিল। তার শাস্তি। কুমড়ো-মানুষরা নাচানাচি করছে। যেন রং-বেরঙের বড়-বড় বেলুন উড়ছে। গজকুমারবাবু ফিসফিস করে বললেন, চলুন, এরা খুব সজ্জন মনে হচ্ছে। আমার খুব খিদেও পেয়েছে।"

বললুম, "আগে বুঝে নিন, আপনাকে ওরা পছন্দ করছে কি না।"

গজকুমারবাবু স্ক্রুড্রাইভার নাচিয়ে বললেন, "বেগড়বাঁই করলে প্যাঁক করে ঢুকিয়ে দেব। চলে আসুন।"

বলে উনি উঠে দাঁড়ালেন। দু'হাত তুলে সাড়া দিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলেন। কুমড়ো-মানুষেরা থেমে গেল এবং এদিকে তাকাল। তারপর গজকুমারবাবুকে কর্নেলদের মতোই পায়ের তলায় ঢুকে নাচাতে-নাচাতে নিয়ে গেল!

দেখলুম, আমার বৃদ্ধ বন্ধু চোখে বাইনোকুলার তুললেন। তারপর হাত নেড়ে চলে যেতে ইশারা করলেন। খুব রাগ হল। আমাকে কেন হেনস্থা করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কুমড়ো-ব্যাটাচ্ছেলেরা আমাকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। অথচ গ্রাহ্য করছে না।

গোঁ ধরে ঢাল বেয়ে নামতে থাকলুম। খানিকটা নেমেছি, কয়েকটা খোকা কুমড়ো-মানুষ বাঁই-বাঁই করে ফুটবলের মতো এসে আমাকে ধাক্কা মারল। গড়িয়ে পড়ে গেলুম। তারপর যেই উঠে দাঁড়াই, অমনি বাঁই করে গায়ে পড়ে আর আছাড় খাই।

বুঝলুম, আমাকে যে-কোনো কারণেই হোক, এরা পছন্দ করেনি। রাগ করে ঢালে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ফিরে এলুম।

তাতেও রক্ষা নেই। বিচ্ছু খোকাগুলো উড়ে এসে দমাদ্দম গায়ে পড়ছে। ঠাসা বালিশের মতো জিনিস। তাই আঘাতটা গায়ে তত বাজছে না। কিন্তু আছাড় খাচ্ছি।

কী আর করা যাবে? অগত্যা স্পেসশিপে ফিরে এলুম। বালির ওপর হাঁটাহাঁটিতে খিদে পেয়েছে। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত নিশ্চয় সঙ্গে খাবার-দাবার এনেছেন। কিন্তু কোথায় তা? খোঁজাখুঁজি শুরু করলুম। একখানে ইংরেজিতে লেখা আছে : 'খিদে পেলে একটা ক্যাপসুল খান। না পেলে দুটো খান। তারপর একটা খান।'

একটা ক্যাপসুল খেলুম। ফ্লাস্ক থেকে জল খেয়ে ঢেকুর তুলে আসনে হেলান দিলুম। এটা চন্দ্রকান্তের আসন। কী খেয়াল হল, বোতামগুলো টিপতে শুরু করলুম, হয়তো রাগের চোটে মরিয়া হয়েই। তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি।

এবং স্পেসশিপ আকাশে উঠে পড়েছে।

সর্বনাশ! যদি অনন্ত মহাকাশে চিরকাল ভেসে চলে? ভয় পেয়ে সামনে যে বোতাম দেখি, টিপে ধরি। তারপর এক চিররাত্রির দেশ। শুধু আকাশভরা তারা আর অন্ধকার। ভয়ে চোখ বুজে গেল।

কতক্ষণ পরে ফের ঝাঁকুনির চোটে খুলে দেখি, বাইরে নীলাভ আশ্চর্য আলো। আবার কোথায় এলুম কে জানে! দরজা খুলতে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল সামনে ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠেছে ইংরেজিতে সতর্কবাণী : 'নামতে পারো। কিন্তু সাবধান, পৃথিবীর চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ ৯০ শতাংশ কম। উড়ে যাওয়ার সুখ পাবে। তবে নামা কঠিন হবে। তাই বুকে হেঁটে চলবে।'

কী বিপদ! আমি কি সরীসৃপ?

ব্যাপারটা খারাপ লাগছে এই ভেবে যে আমাকে কোনো অদৃশ্য শক্তি যেন বড্ড বেশি হেনস্থা করতে চাইছে। কাগজের লোক হওয়ার জন্যই কি? গজকুমারবাবুর কথাটা মনে ধরল।

নেমেই মনে হল কী একটা শক্তি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। তাই তক্ষুনি উপুড় হয়ে গিরগিটির মতো হাঁটতে থাকলুম। নীলচে রোদ্দুরে মায়াময় দেখাচ্ছে জায়গাটা। তবে বালি নেই, শক্ত পাথর। মাটিও চোখে পড়ল না। এখানে-ওখানে ন্যাড়া পাথরের স্তূপ। দূরে ও কাছে ছোট-বড় বিচিত্র গড়নের বিশাল ভাস্কর্যের মতো পাহাড়। পাথরের রং ঘন কালো।

হঠাৎ দেখি, সামনে একটা ক্রিকেট বলের সাইজের পাথর পড়ে আছে, কর্নেলের ঘরে যেমনটি দেখেছিলুম।

মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। পাথরটা হাতে নিলুম এবং উঠে দাঁড়ালুম। হুঁ, ঠিকই ধরেছি। এই পাথর নিয়ে দিব্যি দু'ঠ্যাঙে চলাফেরা করা যায়—স্বচ্ছন্দে মানুষের মতোই। মাধ্যাকর্ষণ এখানে কম। তাই পাথরটা খুব কাজের।

তা হলে কি সেই পাথর এখানকারই? তার চেয়ে বড় কথা, এটা কোন্ গ্রহ এবং পৃথিবী থেকে কত দূরে?

ভাবতে ভাবতে এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছি, দেখি, খানিকটা দূরে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপাশে কালো লোমশ গোরিলার মতো একটা প্রাণী হেঁটে যাচ্ছে। তার মাথার চুলের সঙ্গে এমনি একটা পাথর বাঁধা। টিকিতে পূজারী ব্রাহ্মণ যেমন করে ফুল বেঁধে রাখেন।

কিন্তু এ তো সর্বনেশে ব্যাপার! যেখানে অমন সাঙ্ঘাতিক প্রাণীর বসবাস আছে, সেখানে চলাফেরা করা নিরাপদ নয়। বিশেষ করে ওই পেল্লায় গড়নের প্রাণীদের সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো অস্ত্রও সঙ্গে নেই।

কিন্তু মানুষের স্বভাব অজানাকে জানা। আমি এই আদিম সহজাত স্বভাব থেকে নিষ্কৃতি পেলুম না। জায়গাটা ভালো করে দেখার জন্য সাবধানে পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলুম।

তারপর দেখি, একশো গজ দূরে একটা টিলার গায়ে বিশাল চৌকো সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ দিয়ে গোরিলা-মানুষেরা যাতায়াত করছে। সবারই চুলের সঙ্গে এমনি পাথরের বল বাঁধা।

অনেকক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসে লক্ষ রাখলুম। এক-সময় দেখলুম, প্রকাণ্ড এক গোরিলা-মানুষ বেরিয়ে এসে একটা উঁচু চত্বরে দাঁড়াল। তার হাতেও একটা বল। বলটা সে ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। তারপর হা-হা করে বিকট হেসে উঠল। আর সব গোরিলা-মানুষও হাসিতে যোগ দিল। কানে তালা ধরে গেল সেই তুমুল হাসির শব্দে। ওদিকে বলটা উধাও হয়ে গেল।

এবার আর-একজন গোরিলা-মানুষ চত্বরটায় উঠল। তার হাতেও একটা বল। সে বলটা ছুড়ল। কিন্তু বলটা আকাশে না গিয়ে সোজা একটা পাহাড়ের ওপর পড়ল। বেচারা কাঁচুমাচু মুখে নেমে গেল।

কিন্তু এ তো দেখছি যেন ডিসকাস ছোড়ার খেলা! তা হলে কি এদের এই খেলারই বল দৈবাৎ পৃথিবীতে গিয়ে পড়ে?

আনন্দে নেচে উঠলুম। আমাদের অভিযানের লক্ষ্য যদি হয় সেই ওজনদার বলের রহস্য উন্মোচন, তা হলে সেই কৃতিত্ব আমার বরাতে জুটে গেল। কিন্তু কৃতিত্ব নিয়ে এখন করবটা কী? কোন কিটো গ্রহে কর্নেলরা রয়ে গেলেন, আর কোথায় আমার প্রিয় পৃথিবী, আর কোথায় এই অজানা গ্রহ!

স্পেসশিপের কাছে ফিরে এলুম। যানটি এমন জায়গায় নেমেছে, প্রায় চারদিকেই প্রকাণ্ড সব পাথরের স্তূপ। তাই ওদের চোখে পড়বে না। কিন্তু দৈবাৎ কেউ যদি এদিকে এগিয়ে আসে?

এবার বিকট হল্লার শব্দ, মাঝে-মাঝে হা-হা-হা-হা প্রচণ্ড হাসির শব্দ ভেসে আসছে। সম্ভবত আজ ওদের খেলাধুলোর উৎসব চলেছে। তাই এদিকে কারও আসার চান্স কম। এই সুযোগে আরও কয়েকটা বল কুড়িয়ে স্পেসশিপে বোঝাই করা যাক।

এত কম মাধ্যাকর্ষণ, কাজেই গোটা ছয়েক বল কুড়িয়ে আনা কঠিন হল না। তারপর বোতাম টিপতে থাকলুম, আগের মতোই এলোপাথাড়ি। এতে কাজ হল। ঝাঁকুনি দিয়ে স্পেসশিপ আকাশে উঠে পড়ল। কিন্তু তারপর টালমাটাল অবস্থা। বিমান ঝড়ের মধ্যে পড়লে যেমন হয়। ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল : 'বেশি ভারী হয়ে গেছি। ওজন কমাও। নইলে বিপদ।'

মনমরা হয়ে একটা দুটো তিনটে করে ছ'টা পাথর ছুঁড়ে ফেলার পর বাকি রইল আমার হাতেরটা। ভিশনস্ক্রিনে ফুটল : 'আরও ওজন কমাও।'

রাগ করে বললুম, "ধ্যাত্তেরি! তুমি যাই বলো, হাতেরটা ফেলছি না। এটা আমার আবিষ্কারের সাক্ষী!"

ভিশনস্ক্রিনে বারবার লাল হরফে ফুটে উঠতে থাকল : 'বিপদ...বিপদ...বিপদ...'

তারপর ঝাঁকুনি খেলুম। স্পেসশিপ নেমেছে। সেই গ্রহ বলেই মনে হচ্ছে। কারণ নীচে রোদ্দুর এবং কালো পাথুরে পারিপার্শ্বিক। আবার তা হলে গোরিলা-মানুষদের গ্রহেই ফিরে এলুম!

বলটা প্যান্টের পকেটে ভরে নেমে গেলুম সাবধানেই। একটা সমতল উপত্যকার মতো জায়গা। দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখছি, হঠাৎ কী-একটা এসে আমার ওপর পড়ল এবং হ্যাঁচকা টান। দেখলুম, ল্যাসো ছুঁড়ে কেউ আমাকে আটকেছে এবং টানছে। আমি পড়ে যাচ্ছি না, তার কারণ বোঝা সহজ। কিন্তু ল্যাসোটার অন্য প্রান্তে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বহু দূর থেকে কেউ ল্যাসো ছুঁড়েছে। কম মাধ্যাকর্ষণের গ্রহে এটা সম্ভব। কিন্তু কে সে? কোনো গোরিলা-মানুষ হলে সত্যিই বিপদ। ভাষা না জানলে কাউকে কিছু বুঝিয়ে বলা কঠিন। ভাষা যে কী অসাধারণ জিনিস, এতক্ষণে মাথায় সেটা স্পষ্ট হল।

বন্দিদশায় চলেছি তো চলেছি। কতক্ষণ পরে দেখতে পেলুম, একটা ছোট্ট নদীর ধারে পাথরের চৌকো বাড়ি। বাড়ির সামনে, কী অবাক, আমার মতোই একটা মানুষ! তার হাতে ল্যাসোর ডগা। তার চেহারা বেজায় রাগী। মুখটা চিনাদের মতো। চিবুকে ছাগলদাড়ি। ঠোঁটের দু'ধার দু'চিলতে সূক্ষ্ম গোঁফ। পরনে আলখাল্লার মতো পোশাক। মাথায় ছুঁচলো টুপি। টুপির ডগায় একই রকম একটা বল বসানো।

সামনাসামনি হলে সে ইংরেজিতে বলল, "আমি সেই চাংকো, দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের সম্রাট। ওহে প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের পুঁচকে ছোকরা! কোন সাহসে তুমি বিনা অনুমতিতে আমার সাম্রাজ্যে ঢুকেছ?"

খট্ করে মিলিটারি স্যালুট ঠুকে বললুম, "বেয়াদপি মাফ করবেন সম্রাট বাহাদুর। আমি দৈবাৎ এখানে এসে পড়েছি। যদি অনুমতি পাই, সব কথা খুলে বলব।"

সম্রাট চাংকো কুতকুতে চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, "তোমাকে ভালো ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত ওই লোকটার ডেঁপো ভাগনেটার মতো নও। বিচ্ছুটা আমায় বলে কী—সে নাকি প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় 'দেহশ্রী' খেতাব পেয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!"

সন্দিগ্ধ হয়ে বললুম, "আপনি ভবেশবাবুর ভাগনে ভোঁদা-পালোয়ানের কথা বলছেন কি? তাদের কী করে পেলেন এখানে?"

সম্রাট চাংকো ফাঁস খুলে খুব হেসে-টেসে বললেন, "ধরে এনেছি। তবে পালোয়ানের অবস্থা দেখবে এসো।"

চার

পালোয়ানের অবস্থা করুণই বটে! পরনে সেই হাফপেন্টুল আর স্পোর্টিং গেঞ্জি। কিন্তু এ কী দশা তার!

একটা বিশাল হলঘরের ভেতর তাকে ছাদে টিকটিকির মতো সেঁটে থাকতে দেখলুম। ডাকলুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু!"

পালোয়ান সিলিং থেকে আমাকে দেখতে পেয়ে কাতর মুখে বলল, "দাদা, আমি নামতে পারছি না। যতবার নামবার চেষ্টা করছি, সিলিংয়ে আরও সেঁটে যাচ্ছি।"

"মাধ্যাকর্ষণের অভাব, জগদীশবাবু!" একটু হেসে বললুম, "আপনার উচিত ছিল এখানকার একটা বল কুড়িয়ে পকেটে রাখা। তা হলে ওজন বেড়ে যেত, দিব্যি চলাফেরা করতে পারতেন।"

"রেখেছিলুম তো! ওই লোকটা কেড়ে নিল।"

সম্রাট চাংকো খাপ্পা হয়ে বললেন, "লোকটা! তুমি আমাকে লোকটা বলছ? আমি সম্রাট চাংকো। আমার সঙ্গে ফাজলামি? যাও তোমাকে বল দিতুম, আর দিচ্ছি না।"

বললুম, "সম্রাটবাহাদুর, আপনার আর এক অতিথি কোথায়?"

সম্রাট চাংকো চোখ পাকিয়ে বললেন, "অতিথি? সে তো আমার বন্দী। তাকে প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে নোংরা জায়গা থেকে ধরে এনেছি।"

"কেন সম্রাটবাহাদুর?"

"আমার বন্ধুর নাতি তাকে একটা বল বেচতে চেয়েছিল। সে তাচ্ছিল্য করে কেনেনি। ছাদে দাঁড়িয়ে দূরবীনযন্ত্রে আমি সব দেখেছি। ওকে পরীক্ষার জন্য বলটা ওর বাড়িতে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলুম। সেই বলকে সম্মানে পুজো না করে সে এই হোঁতকা পালোয়ানের মাথায় চাপিয়ে এক দাড়িওলা বুড়োর বাড়ি নিয়ে গেল। ওঃ! অসহ্য, বড় অসহ্য অপমান!" এই বলে সম্রাট চাংকো দাঁত কিড়মিড় করতে থাকলেন।

জিজ্ঞেস করলুম, "আপনার বন্ধুর নাম?"

"ঐরাবত সিং। প্রথম ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে নোংরা গ্রহে তার জন্ম।"

"পৃথিবী সত্যিই বড় নোংরা গ্রহ, সম্রাটবাহাদুর!"

সম্রাট চাংকো আমার কাঁধে হাত রেখে চুপিচুপি বললেন, "কাউকে বোলো না! আমার জন্মও সেখানে। রাগ করে পালিয়ে এসেছি। ছ্যা-ছ্যা! দিনরাত্তির ঝগড়াঝাঁটি, খুনোখুনি, দলাদলি। সামান্য স্বার্থের জন্য লড়াই। ঘেন্না ধরে গিয়েছিল হে! বিশেষ করে আমার বন্ধু ঐরাবত সিং—ওই যে কী বলে তোমাদের পৃথিবীতে, হুঁ, ভোটের লড়াইয়ে নেমেছিল। হেরে গেল। তোমাদের ভালো করার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু কেন হারল জানো কি? তাকে কারচুপি করে হারিয়ে দিল। রাগে-দুঃখে বেচারা হার্টফেল করে মারা গেল। খবরটা পেলুম দেরিতে। তখন আমি কুমড়ো-মানুষদের গ্রহ সবে জয় করেছি।"

শোনামাত্র বলে ফেললুম, "কুমড়ো-মানুষদের গ্রহেই আমার তিন সঙ্গী এখন বন্দী। দয়া করে ওদের উদ্ধার করুন, ইওর এক্সেলেন্সি! তাঁদের মধ্যে আপনার বন্ধুর নাতিও আছেন।"

সম্রাট চাংকো হা-হা করে হেসে বললেন, "সবই জানি হে ছোকরা! আমার দূরবীনযন্ত্রে সবই দেখেছি। একটু অপেক্ষা করো। আমার বাহিনী পাঠিয়েছি সেখানে। তাদের নিয়ে আসবে।"

এমন সময় একজন বিকট চেহারার গোরিলা-মানুষের কাঁধে চেপে ভবেশবাবুর আবির্ভাব ঘটল। কাঁধ থেকে নেমে ভবেশবাবু আমাকে দেখতে পেলেন। অবাক হয়ে বললেন, "মশাইকে চেনা-চেনা ঠেকছে?"

পরিচয় দিয়ে বললুম, "আপনার ভাগনেকে একটু বুঝিয়ে বলুন, যেন সম্রাটবাহাদুরকে সম্মান দেখান। তা না হলে ওঁকে টিকটিকি হয়েই কাটাতে হবে।"

গোরিলা-মানুষটি ততক্ষণে লাফ দিয়ে-দিয়ে পালোয়ানকে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। কাতুকুতুর চোটে পালোয়ান হেসে অস্থির এবং সিলিং-এ বুক ঠেকিয়ে এদিক-ওদিক করে বেড়াচ্ছে। সম্রাট চাংকোও খুব হাসছেন। ভবেশবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, "উপযুক্ত শাস্তি! পালোয়ানি দেখাবে বেপাড়ায়? নাও, বোঝো ঠ্যালা। আমি তোমাকে বাঁচাব না। তুমি হেসে মরো আর যাই করো। হতভাগা বুদ্ধু!"

বললুম, "সম্রাটবাহাদুর! যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। এবার ওঁকে রেহাই দিন।"

"তুমি বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কথা দিচ্ছি, ও যাতে আর বেয়াদপি না করে আমি দেখব।"

সম্রাট চাংকো গোরিলা-মানুষটিকে অদ্ভুত ভাষায় বললেন, "হাম্বো জাম্বো কাম্বো।" তারপর আলখাল্লার ভেতর থেকে একটা বল বের করলেন। গোরিলা-মানুষটি চলে গেল। তখন সম্রাট চাংকো পালোয়ানকে বললেন, "ওহে পালোয়ান! বল ছুঁড়ে দিচ্ছি। লুফে নিতে হবে। দেখি, তোমার হাতের তাক। না লুফতে পারলে আটকে থাকবে কিন্তু!"

পালোয়ানের দিকে ফের দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তার মামা বললেন, "তোকে বলতুম ক্রিকেট খেলাটা শিখে নে! শিখলে কাজে লাগত!"

চারবারের বার বলটা ক্যাচ ধরল পালোয়ান এবং ধুপ করে নামতে পারল। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম অভ্যাসে, "আউট! আউট! আউট!"

সম্রাট চাংকো চোখ কটমট করে বললেন, "আর যাই বলো হে ছোকরা, তোমাদের ওই নোংরা জায়গার ভুতুড়ে খেলার টার্মগুলো আওড়াবে না। কান পচে যায়।"

পালোয়ান মুচকি হেসে বলল, "দাদা! সত্যিই আউট করে দিয়েছি বলুন! কেমন একখানা ক্যাচ ধরেছি!"

"আবার? আবার?" সম্রাট চাংকো হুঙ্কার দিলেন, "বল কেড়ে নেব বলে দিচ্ছি।"

"ভোঁদা-পালোয়ান ভড়কে গিয়ে জিভ কাটল, "সরি স্যার!"

"স্যার নয়, ইওর এক্সেলেন্সি বলো!"

ভোঁদা মুখ-তাকাতাকি করছে এবং তার মামা চোখ-ইশারা করছেন। আমিও করছি। সম্রাট চাংকো ক্রুদ্ধ হয়ে চোখ পিটপিট করছেন। অগত্যা ভোঁদা বলল, "সরি, ইওর এক্সেলেন্সি!"

সম্রাট চাংকো খুশি হয়ে বললেন, "এসো।"

ঘরের পর ঘর, সবই কালো, তারপর ঘর। অনেক গোলকধাঁধা পেরিয়ে একটা ঘরে পৌঁছলুম আমরা। এতক্ষণে বুঝলুম, সম্রাট চাংকো একজন বিজ্ঞানী। চন্দ্রকান্তবাবুর চেয়ে উঁচুদরের বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহে। বিশাল ল্যাব। কতরকম যন্ত্র। জার। কত বিচিত্র সব কমপিউটার। এককোণে সোফায় আমাদের বসতে বললেন সম্রাট চাংকো। বসার পর তারিফ করে বললুম, "আমাদের বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তেরও একটা ল্যাব আছে। তবে এর কাছে নস্যি!"

সম্রাট চাংকো বাঁকা হেসে বললেন, "চন্দ্রকান্ত বিজ্ঞানের বোঝে কী? ও তো একটা বুদ্ধু।"

"তাঁকে আপনি চেনেন সম্রাটবাহাদুর?"

"আলবাত চিনি। আমার সঙ্গে তাইপে'তে আলাপ হয়েছিল একটা সেমিনারে। যাই হোক, এবার ওদের ধরে আনার ব্যবস্থা করি।" বলে সম্রাট চাংকো একটা যন্ত্রের সামনে বসলেন, "শুধু একটাই সমস্যা। কুমড়ো-মানুষগুলো বেয়াড়া। খুব আমুদে স্বভাবের কিনা! তাই আমাদের জিনিস পেলে ছাড়তে চায় না। দেখা যাক। নইলে আমার গোরিলা-সেনা পাঠাতে হবে। ওদের ওরা খুব ভয় পায়।"

বিশাল ভিশনস্ক্রিনে এবার ফুটে উঠল সেই কিটো গ্রহের মনোরম সবুজ উপত্যকা আর রং-বেরঙের কুমড়ো-মানুষ। আমার বৃদ্ধ বন্ধু চোখে বাইনোকুলার রেখে যথারীতি এদিকে-ওদিকে, সম্ভবত পাখি খুঁজছেন অথবা প্রজাপতি। কিটো গ্রহে পাখি-প্রজাপতি দেখেনি। তবে কর্নেলের চোখ। কিছু বলা যায় না!

গজকুমারবাবুকে দেখলুম রেসের আয়োজন করেছেন। কুমড়ো-মানুষেরা দৌড়চ্ছে। উনি হাততালি দিচ্ছেন। হালদারমশাই একটা ডিমালো বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করছেন। গোয়েন্দার স্বভাব। আর বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত নোটবইতে কীসব টুকছেন। কুমড়ো-মানুষেরা রেসের জায়গায় ভিড় করেছে।

সম্রাট চাংকো বললেন, "ওদের এক্সরের ল্যাসেতে বন্দী করে আনা যায়। যেভাবে আমার বন্ধুর নাতি আর এই মামা-ভাগনেকে ধরে এনেছি। কিন্তু চন্দ্রকান্ত মহা ধূর্ত। ওর পকেটে একটা রে-ডিটেক্টর আছে। টের পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেই সমস্যা। কুমড়ো-মানুষদের ঘরগুলো এমন ধাতুতে তৈরি, কোনো অদৃশ্য রশ্মিই ঢুকতে পারবে না। হুঁ, গোরিলা-বাহিনীই পাঠানো যাক।" বলে হাঁক দিলেন, "টাম্বো মাম্বো জাম্বো!"

অমনি ভিশনস্ক্রিনের দৃশ্য মুছে একদঙ্গল গোরিলা-মানুষের ছবি ফুটে উঠল। তারপর দেখলুম। সেই দানোর মতো গোরিলা-মানুষ, যে ভোঁদা-পালোয়ানকে কাতুকুতু দিচ্ছিল, গোরিলা-মানুষদের চুলের ডগা থেকে আজব বলগুলো খুলে নিল।

সঙ্গে-সঙ্গে তারা বাঁই-বাঁই শূন্যে ভেসে উঠল এবং দেখতে দেখতে উধাও হয়েও গেল। সম্রাট চাংকো বসে রইলেন। এই সুযোগে ফিসফিস করে ভবেশবাবুকে বললুম, "আপনি ওই গোরিলা-মানুষটার কাঁধে চেপেছিলেন কেন?"

ভবেশবাবু তেতোমুখে অমনি চাপা স্বরে বললেন, "ইচ্ছে করে কি চেপেছি মশাই? ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে কী পেয়েছে কে জানে। যখন-তখন এসে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর নামবার চেষ্টা করলেই কাতুকুতু।"

সম্রাট চাংকো ঘুরে বললেন, "কীসের ষড়যন্ত্র হচ্ছে যেন? সাবধান!"

ঝটপট বললুম, "না, ইওর এক্সেলেন্সি! আমরা আপনার ক্ষমতার প্রশংসা করছি।"

"এ কী ক্ষমতা দেখছ হে ছোকরা! আসল ক্ষমতা দেখবে, চাঁদুটাকে আসতে দাও আগে।"

"চাঁদু, মানে চন্দ্রকান্তবাবুর কথা বলছেন কি?"

সম্রাট চাংকো অট্টহাসি হেসে বললেন, "আবার কার?"

বলে তিনি খুটখুট করে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের মতোই কমপিউটারের বোতাম টিপতে থাকলেন। একটু পরে ভিশনস্ক্রিনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল। প্রথমে মনে হল একটা বাজপাখি উড়ে আসছে। কিন্তু ক্রমে সেটা বড় হতে থাকল। তখন দেখলুম বাজপাখি গড়নের একটা বিকট মানুষ, দু'টি প্রকাণ্ড ডানা।

সম্রাট চাংকো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন, "সর্বনাশ! আবার ঈগল-মানুষটা হানা দিতে আসছে দেখছি! জানি না, আমার কোন প্রজাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। সমস্যা হল, ওকে কোনো অস্ত্রেই কাবু করা যায় না।" বলে একটা ছোট্ট স্পিকার হাঁকলেন, "আম্বো ডাম্বো হ্রাম্বো! আম্বো ডাম্বো হ্রাম্বো!"

তারপর আসন ছেড়ে উঠে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

আমরা ওঁকে অনুসরণ করলুম। একটু পরে খোলা চত্বরে দেখলুম সম্রাট চাংকো একটা লম্বাটে পিস্তল তাক করে আছেন। নীলচে রোদ্দুরে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঈগল-মানুষটা আকাশে চক্কর দিচ্ছে। গোরিলা-মানুষদের অবস্থা দেখে মায়া হল। তারা তাড়াহুড়ো করে যে-যেখানে পারছে, লুকিয়ে পড়ছে। আড়াল থেকে বড়-বড় পাথরও ছুঁড়ছে কেউ-কেউ। মাধ্যাকর্ষণ কম। তাই প্রকাণ্ড পাথরগুলো আকাশে ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য, ঈগল-মানুষটা পায়ের নখ দিয়ে পাথর ধরে ফেলে পালটা ছুঁড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেগুলো তুলোর মতো উড়তে উড়তে বহু দূরে গিয়ে আস্তে-আস্তে নেমে যাচ্ছে। সম্রাট চাংকোর পিস্তল থেকে নীল-লাল-হলুদ আলোর গুলি শাঁই-শাঁই করে বেরিয়ে ঈগল-মানুষটাকে আঘাত করছে। কিন্তু তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ধোঁয়া হয়ে চাপচাপ উড়ে যাচ্ছে। আকাশ যেন ক্রমে সাদা মেঘে-মেঘে ঢেকে গেল। তার ভেতর একটা অতিকায় ঈগলের ওড়াওড়ি।

ভোঁদা-পালোয়ান হঠাৎ খেপে গেল। অঁক শব্দে পেশী ফুলিয়ে বলল, "তবে রে বদমাশ!" তারপর সে ঊরুতে থাপ্পড় মেরে ঈগল-মানুষটাকে কুস্তিতে চ্যালেঞ্জ করতে লাগল, "চলা আও! কাম অন!"

ভবেশবাবু ধমক দিলেন, "অ্যাঁই বাঁদর! মারা পড়বি যে! সাঙ্ঘাতিক নখ দেখতে পাচ্ছিস না?"

ভোঁদা-পালোয়ান গর্জে বলল, "নখ ভেঙে ছাতু করে দেব। কাম ইন ঈগলকা বাচ্চা!"

আমি বললুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু! আগে গোটাকতক বল কুড়িয়ে নিন। তা হলে ঈগল-মানুষটাকে নামিয়ে এনে লড়তে পারবেন। সম্রাটবাহাদুর! আপনার ল্যাসো কোথায়?"

সম্রাট চাংকো বলে উঠলেন, "খাসা বুদ্ধি! তুমি বকশিশ পাবে হে ছোকরা! আমার মাথা খুলে গেছে। হায়, হায়! কেন যে এটা অ্যাদ্দিন মাথায় ঢোকেনি?" বলে তিনি আলখাল্লা থেকে সেই ল্যাসোটা বের করলেন। ঝটপট কয়েকটা বল কুড়িয়ে পালোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "আমি ওকে আটকাচ্ছি। তুমি রেডি হও, পালোয়ান!"

তিনবারের বার ল্যাসোটা ঈগল-মানুষের এক পায়ে আটকে গেল। আমি আর ভবেশবাবু ল্যাম্বোর গোড়ায় হাত লাগালুম। তিনজনে টানতে থাকলুম হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে। ঈগল-মানুষটার জোরে এঁটে ওঠা কঠিন। পালোয়ান এবার বলের ওজনে খুব ওজনদার মানুষ। সে-ও হাত লাগাল। এতক্ষণ ঈগল-মানুষ জব্দ হল। নীচে নামানো গেল তাকে। তারপর পালোয়ান

একটা বল ছুড়ল তার দিকে। ঠকাস করে লাগল ডানায়। আমরা তিনজনে ততক্ষণে পাথুরে মাটিতে উপুড় হয়েছি।

পালোয়ান ফের বল ছুঁড়তে যাচ্ছিল, নিষেধ করে বললুম, "না, না। ওজন কমে যাবে আপনার। এবার কুস্তি শুরু করুন। কিন্তু সাবধান! ঠুকরে না দেয়!"

পালোয়ান বলল, "ওজন বেড়েই তো প্রবলেম দাদা! লাফাতে পারছি না যে! ওজন কমাই আগে। তারপর এক লাফে...।" বলে বাড়তি বলগুলো ফেলে দিতে গিয়ে হঠাৎ সে থামল। বলল, "নাহ্ দাদা! বলসুদ্ধু ওর পিঠে চাপব। তা হলে কাবু হবে। আপনারা টেনে আটকে রাখুন।"

ঈগল-মানুষটার ডানার ঝাপটানিতে ঝড় বইছিল। পালোয়ান চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে একফাঁকে লাফ দিয়ে তার পিঠে চেপে গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। ঈগল-মানুষটা তীক্ষ্ণ ঠোঁট ঘুরিয়ে বিকট ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ গর্জন করতে করতে নেতিয়ে পড়ল। পালোয়ান একগাল হেসে বলল, "রামটিপুনির চোটে ব্যাটাচ্ছেলের দম বেরিয়ে গেছে।"

সে ঈগল-মানুষটার পিঠে দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভবেশবাবু বললেন, "নেমে আয় ভোঁদা! আর বীরত্ব দেখাতে হবে না।"

পালোয়ান এক-লাফে নামল। তারপর বাড়তি বলগুলো ঈগল-মানুষের প্রকাণ্ড ঠোঁটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, "বডি উড়ে যাবে না! এ কী জায়গা বাবা! বলগুলো না থাকলে উড়ে যায় মানুষ।"

ঈগল-মানুষ পড়ে রইল। সম্রাট চাংকো পালোয়ানের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমার ওপর খুব খুশি হয়েছি হে, ছোকরা! এসো, তোমাকে এক গ্লাস অমৃত খাইয়ে দিই। চিরজীবী হবে। তবে বলে রাখা উচিত, এই গ্রহ ছেড়ে তোমাদের ওই নোংরা গ্রহে গেলে কিন্তু অমৃত-শরবত কোনো কাজ দেবে না। ভেবে দ্যাখো, কী করবে।"

ভবেশবাবু ভাগনেকে চোখের ইশারায় খেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পালোয়ান বলল, "মামাবাবু! আমি আর পৃথিবীতে ফিরব না। এখানেই কুস্তির আখড়া খুলব। গোরিলা-মানুষদের বডি বিল্ডআপ শেখাব। ওদের অমন তাগড়াই বডি। কিন্তু কোনো কাজে লাগাতে জানে না। খেলা বলতে খালি বল ছোঁড়া। ধুস! ও তো পুঁচকে ছেলেমেয়েদের খেলা।"

ল্যাবে ফিরে সম্রাট চাংকো এক গ্লাস অমৃত দিলেন ভোঁদাকে। সে মামাবাবুর ফের নিষেধ সত্ত্বেও চোঁ-চোঁ করে খেয়ে বলল, "ওঁদেরও দিন দাদু! একলা খাওয়া কি..."

সম্রাট চাংকো ফুঁসে উঠলেন, "দাদু? দাদু মানে? সম্রাট চাংকোকে তুমি দাদু বলছ?"

রফা করে দিয়ে বললুম, "দাদু, মন্দ না ইওর এক্সেলেন্সি! তবে সম্রাটদাদু বলাই উচিত।"

"ওক্কে! সম্রাটদাদু বলো।"

ভোঁদা বলল, "সম্রাটদাদু! মামাবাবু আর এই রিপোর্টারবাবুকে এক গ্লাস করে অমৃত দিন।"

সম্রাট চাংকো চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন, "তুমি রিপোর্টার নাকি হে ছোকরা? সর্বনাশ! আগে জানলে তো সাবধান হয়ে যেতুম। হুঁ, সবাইকে পৃথিবীতে ফেরার অনুমতি দেব। তোমাকে নয়।"

"কেন সম্রাটবাহাদুর?"

"ওরে বাবা! ফিরে গিয়ে তুমি কাগজে আমার কথা লিখবে আর ঝাঁকে-ঝাঁকে এখানে রিপোর্টার এসে জুটবে। আমাকে জেরবার করবে। আমি ওতে নেই। রিপোর্টাররা বড্ড ডিসটার্ব করে!"

"না, সম্রাটবাহাদুর! আজকাল রিপোর্টারদেরই যেচে-পড়ে সবাই খবর দেয়। পাবলিসিটি চায় কাগজে। সে-যুগ আর পৃথিবীতে নেই।"

"আমি পাবলিসিটি চাইনে।" গম্ভীর মুখে এ-কথা বলে এক গ্লাস অমৃত বের করলেন সম্রাট চাংকো, "নাও, খেয়ে ফেলো। পৃথিবীতে তোমাকে ফিরতে যখন দিচ্ছি না, তখন তুমি এটা খাও। এই মামা-ভদ্রলোকের লোহালক্কড়ের ব্যাবসা আছে। এখানে খামোকা পড়ে থাকলে ব্যাবসার লোকসান হবে। শুধু ওঁকে ফিরে যেতে দেব।"

অমৃতটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও খেয়ে দেখলুম, স্বাদটা মন্দ না। কতকটা বেলের শরবতের মতো স্বাদ। ভবেশবাবু করুণ মুখে বললেন, "অগত্যা এক গ্লাস জল পেলে হত। তেষ্টা পেয়েছে, এ-বয়সে এতক্ষণ দড়ি ধরে টানাটানি করে বড্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি সম্রাটবাহাদুর!"

সম্রাট চাংকো ফিক করে হাসলেন, "ঠিক আছে। আপনাকে জলের বদলে অমৃতই দিচ্ছি। তবে ওই নোংরা গ্রহে ফিরলে অমৃতের গুণ টিকবে না। সাবধান মশাই! পৃথিবীতে ফিরে যেন নিজেকে অমর ভাববেন না।"

ভবেশবাবু সোফায় বসে তারিয়ে-তারিয়ে অমৃত খেতে থাকলেন। মুখে অমায়িক ভাব ফুটে উঠল। চাপা স্বরে বললেন, "লোহালক্কড়ের ব্যাবসাটা এখানে করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু চলবে কি? ওই গোরিলা-মানুষগুলো কেনাকাটা-বিক্রিবাটা বোঝে বলে মনে হয় না। খালি হাম্বা-হাম্বা করে বেড়ায় গোরুর মতো!"

পালোয়ান-ভাগনে শুধরে দিল, "না মামাবাবু! হাম্বো হাম্বো!"

"ওই হল আর কি! তবে ভোঁদা, তুই কি সত্যি এখানে থাকবি ভেবেছিস?"

"হুঁউ।"

ভবেশবাবু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, "তোর নামে সম্পত্তি উইল করে দিতুম। আর নবডঙ্কাটিও পাবি না কিন্তু! ভেবে দেখ।"

ভোঁদা পালটা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, "নবডঙ্কাটি! আমি লোহালক্কড়ের মধ্যে থেকে আপনার মতো মরচে ধরে যাব নাকি?"

মামা-ভাগনের মধ্যে ঝগড়া বাধার উপক্রম হয়েছিল, সেই সময় ভিশনস্ক্রিনে একটা দৃশ্য ফুটে ওঠায় তা থেমে গেল। গোরিলা-মানুষদের সঙ্গে ধুন্ধুর যুদ্ধ বেধেছে। কুমড়ো-মানুষরাও দমাদ্দম গোরিলা-মানুষদের ওপর পড়ছে। আর গোয়েন্দা-হালদারমশাই ফাঁক বুঝে গোরিলা-মানুষদের টিকি থেকে লোহার বল খুলে ফেলছেন। অমনি তারা ভড়কে গিয়ে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। সম্রাট চাংকো হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "তবে রে ব্যাটা টিকটিকি!"

পাঁচ

এবার যুদ্ধটা দেখার মতো হত। কিন্তু সম্রাট চাংকো বেরিয়ে গেলেন। আমরাও বেরোলুম। উনি ব্যস্তভাবে হাতের একটা খুদে যন্ত্রের মাথায় বল কুড়িয়ে আটকে ট্রিগারে চাপ দিতে থাকলেন এবং বলগুলো উধাও হয়ে গেল। বুঝলুম, গোরিলাবাহিনীকে বল জোগাচ্ছেন। তা না হলে ওরা এই গ্রহে ফিরে বিপদে পড়বে। একটার-পর-একটা বল ছুঁড়ছিলেন সম্রাট চাংকো। সেই সময় ভবেশবাবু ফিসফিস করে বললেন, "জয়ন্তবাবু! এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। চলুন, পালিয়ে যাই!"

কথাটা মনে ধরল। ভোঁদাকে ইশারা করলুম। সে গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন ভবেশবাবু তার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে থাকলেন। সম্রাট চাংকো ক্রমশ বল ছুড়তে-ছুড়তে এগিয়ে চলেছেন। আমাদের লক্ষ করার সময় নেই ওঁর।

আজব পুরী থেকে বেরিয়ে পড়তে অসুবিধে হল না। কারণ সব প্রহরী গোরিলা-মানুষ তাদের সম্রাটের কাছে গিয়ে জুটেছে এবং হাম্বো হাম্বো করে সম্ভবত তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছে। তা ছাড়া তারা তাদের বাহিনীর বিপদ টের পেয়েও থাকবে।

সোজা গিয়ে পৌঁছলুম। স্পেসশিপের কাছে। আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, কোনো গোরিলা-মানুষ ওটার কোনো ক্ষতি করেনি। আসলে জায়গাটা ওদের বসতি এলাকা থেকে দূরে।

স্পেসশিপে মামা-ভাগনেকে ঢুকতে বললুম। দু'জনে মুখ-তাকাতাকি করে অবশেষে ঢুকলেন। তারপর ভোঁদা বলল, "দাদা! এটা কী প্লেন? এমন প্লেন তো কখনও দেখিনি।"

বললুম, "এটা স্পেসশিপ। প্লিজ, চুপচাপ বসে থাকুন। সিটবেল্ট শক্ত করে বেঁধে নিন। আর বলগুলো বাইরে ফেলে দিন।"

স্পেসশিপটা চালানোর অভিজ্ঞতা খানিকটা হয়েছে। বলগুলো থাকলে আগের অবস্থা হত। তাই বলগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফেলতে হল। মামা-ভাগনে এতে আপত্তি করলেন না। ওঁরা পালাতে পারলে বাঁচেন বলেই মনে হচ্ছিল। ভোঁদা-পালোয়ান কিছুক্ষণ আগেই এই গ্রহে থাকতে জেদ ধরেছিল। এখন সে খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "বাপস! এখানে মানুষ থাকে? ওদিকে আমার ক্লাবের অ্যানুয়াল ফাংশন পয়লা বোশেখ। কত্ত কাজ বাকি আছে।"

বোতাম টিপে স্পেসশিপে স্টার্ট দিলুম। এবার লক্ষ করলুম, প্রত্যেকটা বোতামে নির্দেশ লেখা আছে। কাজেই আর আমাকে পায় কে? স্পেসশিপ নিমেষে আকাশে উঠে গেল।

কিন্তু কুমড়ো-মানুষদের সেই কিটো গ্রহে যাব কী করে? খুঁজতে-খুঁজতে একটা বোতামে লেখা দেখলুম, "এনকোয়ারি।" সেটা টিপতেই ছোট্ট ভিশনস্ক্রিনে সবুজ হরফে ফুটে উঠল, "সামনে টাইপমেশিন। যেখানে যেতে চাও, সেই হরফগুলো টেপো। সাবধান! ভুল হরফে আঙুল পড়ে না যেন।"

টাইপমেশিনে কে. আই. টি. ও হরফগুলো টিপে দিলুম।

মিনিটখানেক পরে ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'এসে গেছে। নামতে হলে ডাউন লেখা বোতাম টেপো।'

ব্যস! চিরবিকেলের দেশের বালিয়াড়িতে স্পেসশিপ নামল। ভোঁদা জানলা দিয়ে দেখে বলল, "এ কোথায় এলুম দাদা? রাজস্থানের মরুভূমি নাকি?"

বললুম, "না জগদীশবাবু! নামুন। কুমড়ো-মানুষদের দেশে এসে গেছি। এখন আমার সঙ্গীদের খোঁজে বেরোতে হবে।"

ভোঁদা নেমে গেল, আমিও নামলুম। ভবেশবাবু বললেন, "আমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। আপনারা যা হয় করুন মশাই! আমি এখন ঘুমোব।"

এটা আগের জায়গা নয়। কুমড়ো-মানুষদের সেই বসতিটা থেকে কতদূর পৌঁছেছি কে জানে? বললুম, "আসুন জগদীশবাবু! এবার কিন্তু রীতিমতো একটা অভিযান হবে। সম্রাট চাংকোর ল্যাবে যে বসতিতে লড়াই দেখেছেন, সেটা খুঁজে বের করা দরকার।"

ভোঁদা চিন্তিতমুখে বলল, "চারদিকেই তো মরুভূমি!"

"চলুন। দেখা যাক। একটা বালির পাহাড় কোথায় আছে, আগে সেটাই খুঁজতে হবে।"

কিছুদূর চলার পর ভোঁদা বলল, "এক কাজ করা যাক দাদা! এখানে বালির ঢিবি করে চিহ্ন দিয়ে রাখি। তারপর আপনি যান ওই দিকে, আমি যাই এই দিকে। এক ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে না পেলে ফিরে আসব এখানে। কেমন?"

"মন্দ বলেননি! ঠিক আছে। আপনি বাঁ দিকে যান, আমি ডান দিকে। পরের বার আমি সামনে, আপনি পেছনে। তবু যদি খুঁজে না পাই আমরা, তা হলে আবার উড়ে অন্য একখানে গিয়ে নামব।"

ভোঁদার ওজন ভারী। তাই তার চলার গতি কম। কিন্তু একটা ব্যাপার লক্ষ করে মনে হল, ভুল জায়গায় নেমেছি। সেই ঝাঁ-ঝাঁ বাজনাটা তো শোনা যাচ্ছে না।

চলেছি তো চলেছি। দেখতে দেখতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেল। বালির নিচু টিলা আছে অনেক। কিন্তু সেইরকম কোনো উঁচু টিলা দেখতে পাচ্ছি না। দূরে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুঁজছি, হঠাৎ সামনে একটা বালির ঢিবি নড়তে শুরু করল। তারপর বেরিয়ে পড়ল দুটো জ্বলজ্বলে নীল চোখ এবং তারপর একটা প্রকাণ্ড কাঁকড়া—অবিকল কুমড়োর গড়ন। কিটো গ্রহের সব প্রাণীই দেখছি একই গড়নের।

ভীষণ চেহারার বিশাল কাঁকড়াটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। পিছু হটতে থাকলুম। কেন যে বুদ্ধি করে হাতে কিছু নিইনি! সেই স্ক্রু-ড্রাইভার দুটো কুমড়ো-মানুষদের বসতিতে পড়ে আছে কোথাও। প্রাণীটা আমাকে আক্রমণ করতেই আসছে। মরিয়া হয়ে দু'হাতে দু'মুঠো বালি তুলে ওটার চোখে ছুঁড়ে মারলুম। তাতে কিচ্ছু হল না।

কুমড়ো-কাঁকড়াটা আমাকে খপ করে ধরে তুলে নিজের পিঠে বসিয়ে নিল এবং নড়বড় করে চলতে শুরু করল। হাতির পিঠে চলার মতো অবস্থা। তার ওপর কাঁকড়াটা নাচতে-নাচতে চলেছে। ফলে আমিও প্রায় নাচছি। একটু পরে মনে হল, প্রাণীটা হিংস্র নয়। কুমড়ো-মানুষদের মতোই আমুদে দেন। দুটো দাঁড়া দিয়ে আমার কোমর আঁকড়ে রেখেছে। তাই পড়ে যাচ্ছি না। কিন্তু নাচতে হচ্ছেই।

তারপর তার গতি বাড়ল। যেন দ্রুতগামী ট্রাক।

সামনে অনেক বালির ঢিবি দেখা যাচ্ছিল। সেগুলো নড়তে নড়তে বেরিয়ে পড়ল আরও একদঙ্গল কুমড়ো-কাঁকড়া। সবাই ঘিরে ধরল। তারপর চারদিক থেকে দাড়া বের করে আমাকে টানাটানি শুরু করল তারা। আমার বাহক কিছুতেই আমাকে হাতছাড়া করবে না। এদিকে টানাটানির চোটে আমি অস্থির। এবার একটু করে খোঁচাও লাগছে। পোশাক ফর্দাফাঁই হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত কী ঘটত বলা যায় না, হঠাৎ আকাশে শনশন শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখি, একটা ঈগল-মানুষ নেমে আসছে।

অমনি কুমড়ো-কাঁকড়াগুলো ঝটপট বালিতে গা-ঢাকা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই সুযোগে আমি লাফ দিয়ে নীচে নামলুম। ঈগল-মানুষটা একটা কুমড়ো-কাঁকড়াকে ধরে টানাটানি করছিল। সে বেচারা গা-ঢাকা দেবার সুযোগ পায়নি।

দেখে মায়া হল। প্রাণীগুলো পৃথিবীর একজন মানুষ নিয়ে একটু আমোদ করতে চেয়েছিল শুধু। শয়তান ঈগল-মানুষটাকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায়? পালোয়ান থাকলে দেখার মতো একটা লড়াই বাধত সন্দেহ নেই।

আবার দু'খাবলা হাতে বালি তুলে নিলুম। এটাই এখন আমার অস্ত্র। ঈগল-মানুষটার চোখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলুম।

এতে কাজ হল। কাঁকড়াগুলো বালির প্রাণী। ঈগল-মানুষটা তা নয়। কাজেই বিকট ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ চিৎকার করে ডানা ঝাপটাতে-ঝাপটাতে উড়ে পালাল। নির্ঘাত অন্ধ হয়ে গেছে শয়তানটা!

সে পালিয়ে যাওয়ার পর কাঁকড়াগুলো বেরোল। এবার তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ। চারদিক ঘিরে অদ্ভুত শব্দ করতে থাকল তারা। আঃ! ভাষা জিনিসটার মাহাত্ম্য আবার হাড়ে-হাড়ে বুঝলুম। একটু পরে ইশারায় ওদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলুম, আমার মতো প্রাণী দেখেছে কি না। যদি দেখে থাকে, আমাকে যেন সোজা পৌঁছে দেয়।

অনেক অঙ্গভঙ্গি করার পর সেই প্রকাণ্ড কুমড়ো-কাঁকড়াটা এগিয়ে এসে খপ করে আমাকে ধরে পিঠে বসিয়ে নিল। তারপর দ্রুত ছুটে চলল। এবার যত যাচ্ছি, বালির ভেতর ঝাঁ-ঝাঁ বাজনা

শোনা যাচ্ছে। তা হলে সঠিক দিকেই যাচ্ছি আমরা। কিছুক্ষণ পরে আনন্দে দেখলুম, সেই বালির লম্বাটে পাহাড়টা সামনে দেখা যাচ্ছে। এবার কাঁকড়া-ভদ্রলোক সাবধানে এগোচ্ছিলেন। বুঝলুম, কাঁকড়া হওয়ার বিপদ এখানে পৃথিবীর চেয়ে কম নয়। কাঁকড়া কার না প্রিয় খাদ্য? চাপা স্বরে ওঁর পিঠে হাত বুলিয়ে সাহস দিচ্ছিলুম।

পাহাড়ের মাথার কাছাকাছি আমাকে নামিয়ে দিয়ে তিনি জোরে ছুটে পালিয়ে গেলেন। হাত নেড়ে তাঁর উদ্দেশে বললুম, "বিদায় বন্ধু! আবার দেখা হবে। আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে এই গ্রহ ছেড়ে যাব না।"

নীচে সেই কুমড়ো-মানুষদের বসতি। কিন্তু খাঁ-খাঁ নিঝুম কেন? সাবধানে নেমে গেলুম সবুজ উপত্যকায়। তারপর দেখলুম, তিনটে গোরিলা-মানুষের মড়া ঝরনার জলে পাথরে আটকে আছে। দারুণ যুদ্ধ হয়ে গেছে তা হলে! আরও খানিকটা এগিয়ে দেখি, টিবিঘরের ভেতর থেকে প্যাটপ্যাট করে অনেকগুলো কুমড়ো-মানুষ আমাকে উঁকি মেরে দেখছে। হাত নাড়তে-নাড়তে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু তারা দরজা বন্ধ করে দিল।

মনমরা হয়ে ঝরনার ধারে গেলুম। এবার কয়েকটা কুমড়ো-মানুষের থ্যাঁতলানো মড়া দেখে শিউরে উঠলুম। তা হলে আমার সঙ্গীদের ওরা বন্দী করে নিয়ে যেতে পেরেছে! স্পেসশিপের কাছে পৌঁছনো দরকার। আবার সম্রাট চাংকোর পুরীতে ফিরে যেতে হবে সেই আজব বলের গ্রহে। ওঁদের উদ্ধার করতেই হবে।

আনমনে বালির পাহাড়টার দিকে চলেছি, হঠাৎ কী এক গন্ধ ভেসে এল। গন্ধটা খুব চেনা। নাক উঁচু করে শুঁকতে শুঁকতে টের পেলুম, চুরুটের গন্ধ। কিটো গ্রহের কুমড়ো-মানুষেরা কি চুরুট খায়? তা ছাড়া চুরুট তো নেহাত পৃথিবীর জিনিস!

এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুঁজতে থাকলুম, কে চুরুট খাচ্ছে। তারপর ডান দিকে ঝরনাধারার বাঁকে একটা ঝোপের মাথায় চকমকে কিছু দেখা গেল। জিনিসটা নড়ছে।

তারপর চিনতে পারলুম, ওটা একটা টাক এবং পার্থিব মাথারই টাক। অমনি চেঁচিয়ে উঠলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ ঘুরে দাঁড়ালেন। মুখটা গম্ভীর। দৌড়ে কাছে গিয়ে বললুম, "আপনাকে সম্রাট চাংকোর গোরিলা-বাহিনী ধরে নিয়ে যায়নি?"

"তা হলে খুশি হতে?" কর্নেল একটু হাসলেন, "খুশি অবশ্য আমিও হতুম। কিন্তু কে জানে কেন, ওরা আমার চাইতে আমার টুপিটাকেই বন্দী করতে ব্যস্ত হল। যাকগে, প্রচুর পাখি দেখা হল ততক্ষণ। প্রজাপতি দেখলুম না, শুধু পাখি। আশ্চর্য ডার্লিং, সব পাখিই কুমড়ো-মানুষগুলোর মতো দেখতে। পা নেই, ঠোঁট নেই। তবে শুধু দুটো ডানা আছে।"

"এখানে দেখলুম এতবড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। আপনি তখন কী করছিলেন?"

কর্নেল শ্বাস ছেড়ে বললেন, "সে বড় অদ্ভুত যুদ্ধ, জয়ন্ত! আমার মতো একজন প্রাক্তন যোদ্ধা অমন বিচ্ছিরি যুদ্ধ কখনও দেখেনি। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ বড্ড আদিম ধরনের ব্যাপার। আঁচড়ানো, কামড়ানো, কাতুকুতু...ছ্যা-ছ্যা!" বলে পোড়া চুরুটটা ঝরনার জলে ফেলে দিলেন, "তোমার খবর বলো!"

আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিলুম। শোনার পর কর্নেল বললেন, "চাংকোর কথা চন্দ্রকান্তবাবু বলছিলেন। তিনিও নাকি এক বিজ্ঞানী। তবে পৃথিবীতে ওঁর নামে হুলিয়া বের করেছে পুলিশ। ফিরলেই অ্যারেস্ট হয়ে জেল খাটতে হবে। তাই গ্রহান্তরে পালিয়ে এসেছেন।"

ব্যস্ত হয়ে বললুম, "চলুন! স্পেসশিপের সাহায্যে চন্দ্রকান্তবাবুদের উদ্ধার করতে হবে।"

প্রকৃতিবিদ যেন অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে পা বাড়িয়ে বললেন, "কিটো গ্রহ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। কী সুন্দর সব বৃক্ষলতা, কত আশ্চর্য রং-বেরঙের আজব পাখি! শুধু ষষ্ঠীর কথা ভেবেই মন কেমন করছে। চলো!"

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "আশ্চর্য মানুষ আপনি! আজব বলের রহস্য ফাঁস করতে অভিযানে বেরোলেন, আর সেসব ছেড়ে এখন কিটো মুন্নুকের প্রকৃতির জন্য হা-হুতাশ করছেন!"

"না, মানে, এখানকার লোকগুলো বড় সজ্জন।" কর্নেল গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন।

বালির পাহাড়টা ডিঙিয়ে কিছু দূর গেছি, সেই কাঁকড়া-ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হল, উনি আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। হাত নাড়তেই এগিয়ে এসে আমাকে পিঠে চাপালেন। কর্নেলের সাদা দাড়ি একবার ছুঁয়ে শি-শি শব্দ করলেন। বোধ হয়, শি-শি মানে খি-খি হাসি!

দু'জনকে পিঠে বয়ে তরতর করে দৌড়লেন দৌড়বীর। স্পেসশিপের কাছে পৌঁছে দেখি, ভেতরে ভবেশবাবু ঘুমোচ্ছেন। ওঁর ভাগনের পাত্তা নেই। কাঁকড়া-ভদ্রলোক চলে গেলেন। বললেন, "ভবেশবাবুকে জাগিও না। ঘুমনো মানুষকে জাগাতে নেই। তা ছাড়া জেগে উঠলেই নিরুদ্দিষ্ট ভাগনের জন্য হইচই বাধাবেন। চলো, আমরা সম্রাট চাংকোর গ্রহে পাড়ি জমাই। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করা দরকার।"

"কিন্তু জগদীশবাবু কোনো বিপদে পড়েননি তো?" চিন্তিত হয়ে বললুম, "বালির ঢিবির কাছে ওঁর অপেক্ষা করার কথা। দেখলুম না তো!"

কর্নেল বাইনোকুলারে চারদিক দেখতে দেখতে বললেন, "বোধ হয় পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভোঁদা-পালোয়ান। তবে ভয় নেই, ডার্লিং! কিটো গ্রহ খুব নিরাপদ জায়গা।"

স্পেসশিপে ঢুকে স্টার্ট দিলুম। ঝাঁকুনির চোটে ঘুম ভেঙে গেল ভবেশবাবুর। রাঙা চোখে তাকিয়ে বললেন, "ইয়ার্কি হচ্ছে ভোঁদা? আমার ঘুম ভাঙিয়েছিস—তোকে এক পয়সার প্রপার্টি দেব না আর।"

কর্নেল পেছনে ঘুরে বললেন, "ভবেশবাবু! আমার মনে হচ্ছে, আপনার ঘুমটা এখনও ভাঙেনি।"

"অ্যাঁ!" বলে ভবেশবাবু চোখ কচলাতে থাকলেন। তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে ফিক করে হাসলেন, "অ। তা হতচ্ছাড়া ভোঁদাটা কোথায়? কারও সঙ্গে কুস্তি লড়ছে নাকি?"

"তা বলা যায় না।" কর্নেল বললেন, "তবে ভাববেন না। ওকে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না।"

"কিন্তু আমরা যাচ্ছিটা কোথায় বলুন তো?"

"সেই আজব বলের দেশে।"

ভবেশবাবু খুশি হলেন, "সম্রাট চাংকো লোকটা বাজে। ওর পাল্লায় পড়া ঠিক হবে না। তবে আমি স্যার এবার অন্তত একডজন বল কুড়োব। নিয়ে গিয়ে বেচতে পারলে প্রচুর লাভ হবে। সম্রাট চাংকোর কাছে শুনেছি, একটা বল থেকে পুরো একটা জাহাজের খোল বানানো যায়। শুধু একটাই সমস্যা, বলগুলোর ভেতর ভূতের বাস। তাই অমন সুড়ুত করে পালিয়ে যায়। ভূতের রোজা ডেকে ভূতটাকে তাড়াব। চাংকোবাবুর দেশে গিয়েই থাকবে ওরা।"

বললুম, "ভবেশবাবু! চাংকোবাবু বলবেন না। বললেই বিপদে পড়বেন।"

ভবেশবাবু গম্ভীর হলেন, "না, না। এখানে আপনাদের সামনে বলছি। ওঁর রাজ্যে গিয়ে বলব না।"

স্পেসশিপটা বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত এমনভাবে তৈরি করেছেন, আমার মতো আনাড়িরও চালাতে আর অসুবিধে হচ্ছিল না। সব নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রমশ সেগুলো বুঝতে পেরে গেছি। কর্নেল

আমার তারিফ করছিলেন বারবার। গোরিলা-মানুষদের দেশ, অর্থাৎ সম্রাট চাংকোর গ্রহে পৌঁছনোর জন্য বুদ্ধি খাটিয়ে টাইপরাইটারে যে ইংরেজি হরফগুলো টিপলুম, তার মানে দাঁড়ায়, 'যেখান থেকে কিছুক্ষণ আগে এসেছি, সেইখানে যেতে হবে।'

ভিশনস্ক্রিনে ফুটে উঠল, 'ওক্কে।'

সেই নীলাভ রোদের গ্রহে স্পেসশিপ নামল। প্রথমে দরজা খুলে আমি হেঁটমুণ্ডে নেমে একটা বল কুড়িয়ে পকেটে ভরে দুই ঠ্যাঙে সোজা হলুম। তারপর দুটো বল কুড়িয়ে কর্নেল এবং ভবেশবাবুকে দিলুম। ওঁরা বল পকেটস্থ করে নেমে এলেন। সমতল উপত্যকাতেই নেমেছি, যেখানে আগের বার নেমেছিলুম। এমন অদ্ভুত আলোয় বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। সম্রাট চাংকোর পুরী কুয়াশার মতো আবছায়ায় লুকিয়ে আছে কোথায়।

কর্নেল বাইনোকুলার চোখে তুলে বললেন, "সামনে সোজা এগিয়ে গেলে সম্রাট চাংকোর বাড়ি। চত্বরে কী একটা হচ্ছে। রেস নাকি? গজকুমার সিংহের কীর্তি! গোরিলা-মানুষদের রেসে নামিয়েছেন। কিটো গ্রহেও কুমড়ো-মানুষদের নিয়ে রেস লড়িয়েছিলেন।"

বললুম, "এবার কিন্তু আমি লুকিয়ে যাব, কর্নেল! সম্রাটবাহাদুর আমার ওপর রেগে আছেন। আপনি আগে চলে যান বরং। আপনাকে পেলে খুশিই হবেন উনি।"

কর্নেল হনহন করে হেঁটে উধাও হয়ে গেলেন। ভবেশবাবু ব্যস্তভাবে বল কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করতে থাকলেন। বললুম, "নিয়ে যাবেন কেমন করে? স্পেসশিপে নেওয়া যাবে না যে!"

ভবেশবাবু বললেন, "দেখা যাক, কী হয়। তবে মশাই, আমি ওখানে যাচ্ছি না। বল কুড়নো শেষ। এবার আমি গাড়ির ভেতর গিয়ে ঘুমোব। কী খাওয়াল অমৃত বলে, খালি ঘুম পাচ্ছে।"

তিনি স্পেসশিপে ঢুকে পড়লেন। আমি সাবধানে চলতে থাকলুম। কিছু দূর চলার পর সেই নদীটা দেখতে পেলুম। নদীর বাঁকের কাছে আবছায়ার ভেতর সম্রাট চাংকোর বাড়ি দেখা গেল। একটা চাপা হট্টগোলও কানে এল। কী করা উচিত ভাবছি, সেই-সময় মাথার ওপর শনশন শব্দ। তাকিয়ে আঁতকে উঠলুম। একটা ঈগল-মানুষ নেমে আসছে আমার দিকে।

একলাফে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম। তারপর দেখলুম, ঈগল-মানুষটার পিঠে কেউ বসে আছে এবং তার মাথার ঝুঁটি ধরে মোচড় দিচ্ছে। ঈগল-মানুষটা ক্র্যাঁ-ক্র্যাঁ বিকট চেঁচিয়ে শনশন শব্দে নীচে নামল। তারপর তার পিঠ থেকে নামল ভোঁদা-পালোয়ান।

নেমেই সে ঈগল-মানুষটার সঙ্গে যেন কানামাছি খেলতে শুরু করল। ঈগল-মানুষটা ঠোঁট হাঁ করে যেদিকে ঘুরছে, পালোয়ান একলাফে তার উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "জগদীশবাবু! জগদীশবাবু!"

পালোয়ান আমাকে দেখেই খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "পাখিটা কানা দাদা! তাই ওর পিঠে চাপতে অসুবিধে হয়নি।" বলে সে লেজটা ধরে ফেলল এবং পালোয়ানের কাণ্ড, বাঁই-বাঁই করে চক্কর খাইয়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলল। ঝপাস শব্দে ঈগল-মানুষটা জলে পড়ে স্রোতের বেগে ভেসে গেল। ডানা ভিজে গেলে আর ওড়ার ক্ষমতা নেই। তা হলে কিটো গ্রহে এই ঈগল-মানুষটাকেই অন্ধ করে দিয়েছিলুম!

ভোঁদা-পালোয়ান খুব হেসে বলল, "খুব জব্দ। তা দাদা, মামাবাবুর খবর কী?"

"স্পেসশিপের ভেতর ঘুমোচ্ছেন।"

ভোঁদা বলল, "ঘুমোক। লোহালক্কড়ের ভেতর বসে মামাবাবুর ঘুমনো অভ্যেস। আর এ তো গাড়ির ভেতর নরম গদি!"

ছয়

আমার কাছে সব শোনার পর ভোঁদা-পালোয়ান তার হাফপ্যান্টের দুই পকেটে অনেকগুলো বল কুড়িয়ে ভরল। তারপর বলল, "এগুলো কেন নিলুম জানেন? গোরিলা-মানুষদের সঙ্গে দরকার হলে ফাইট দেব। আপনিও নিন দাদা। ধরতে এলেই ঠাঁই করে ছুঁড়বেন। ঠ্যাঙে ছুঁড়বেন, নয় তো নাকে। মানুষের বডির ঠ্যাঙ আর নাক, খুব ভাইটাল জায়গা।"

বুদ্ধিটা মনে ধরল। আমিও অনেক বল কুড়িয়ে পকেট বোঝাই করলুম। তারপর দু'জনে সম্রাট চাংকোর পুরীর দিকে সাবধানে এগিয়ে গেলুম।

বড়-বড় পাথরের আড়াল দিয়ে গেটের কাছে পৌঁছলুম আমরা। দু'জন প্রহরী গোরিলা-মানুষ পা ছড়িয়ে দু'ধারে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তা হলে সম্রাট চাংকোর গ্রহে এটা নিশ্চয় রাত্রিবেলা। তাই আলো এত কম! ভোঁদা ফিসফিস করে বলল, "টিকিতে বাঁধা বল খুলে নিলেই এরা জব্দ। আকাশে ভেসে বেড়াবে। আপনি বাঁ দিকের সেন্ট্রির, আমি ডান দিকের সেন্ট্রির বল খুলে নেব। কাম অন, দাদা!"

দু'জন গুড়ি মেরে এগিয়ে কাছে গিয়ে দুই প্রহরীর টিকি থেকে বল খুলে ফেললুম। অমনি তারা আকাশে উঠে গেল। কিন্তু কী ঘুম রে বাবা! আকাশে ভেসেও নাক ডাকাতে থাকল। ভেতরে বিশাল প্রাঙ্গণে ভিড়। গোরিলা-মানুষেরা চক্কর দিয়ে দৌড়চ্ছে। গজকুমার সিং একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। তাঁর পেছনে সিংহাসনে সম্রাট চাংকো বসে আছেন। একপাশে বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে হাসিমুখে বসে থাকতে দেখলুম। কিন্তু গোয়েন্দা-হালদারমশাই কোথায়?

পাছে কারও চোখে পড়ি, আমরা বাঁ দিকের একটা ঘরে ঢুকে পড়লুম। সেই হলঘর। জনপ্রাণীটি নেই। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে চিঁচিঁ করে কেউ বলল, "গেছি! এক্কেরে গেছি! ও জয়ন্তবাবু! আমারে লামান!"

মুখ তুলেই হালদারমশাইকে দেখতে পেলুম। সিলিং-এ টিকটিকির মতো সেঁটে আছেন। বুঝলুম সম্রাট চাংকো শাস্তি দিয়েছেন। চাপা গলায় বললুম, "বল কেড়ে নিয়েছে তো? ঠিক আছে। একটা বল ছুঁড়ে দিচ্ছি। ক্যাচ ধরুন।"

বারবার বল ছুড়ি, কিন্তু হালদারমশাই ধরতে পারেন না। ভোঁদা বিরক্ত হয়ে বলল, "আপনি কখনও ক্রিকেট খেলেননি। কী আপনি? আজকাল ক্রিকেট খেলে না, এমন কেউ আছে?"

হালদারমশাই করুণ মুখে বললেন, "ক্রিকেটবল দেখলেই ভয় করত যে! মনে হত, চোখে এসে পড়বে। জয়ন্তবাবু! ট্রাই এগেন।"

পাঁচবারের বার বলটা খপ করে ধরে ফেললেন গোয়েন্দাপ্রবর। তারপর ধপাস করে মেঝেয় নামলেন। বললুম, "বলটা পকেটে ঢোকান আগে।"

"হঃ!" বল পকেটে ঢুকিয়ে হালদারমশাই বললেন, "খবর কন শুনি!"

"খবর পরে হবে। কর্নেলকে দেখেছেন?"

"হুঁউ! কর্নেল-স্যার আমাকে দেখেও দেখলেন না। ওই ঘরে ঢুকে গেলেন।"

তিনজনে সেই ঘরে ঢুকে গিয়ে দেখি, কর্নেল একটা ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মুখে চুরুট, চোখ বন্ধ এবং নাক ডাকছে। ডাকলুম, "কর্নেল! কর্নেল!"

কর্নেল চোখ না খুলেই বললেন, "শুয়ে পড়ো ডার্লিং! অনেক রাত হয়েছে।"

হালদারমশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ কি ঘুমনোর সময় কর্নেল-স্যার?"

"চাংকোবাহাদুরের বেডরুম এটা। শুয়ে পড়ুন।" আবার কর্নেলের নাক-ডাকা শুরু হল।

সম্রাট চাংকোর রাজকীয় বিছানার দিকে তাকিয়ে হালদারমশাই বললেন, "হঃ!" তারপর হঠাৎ বিকট হাই তুলে সেদিকে এগিয়ে গেলেন এবং শুয়ে পড়লেন।

ভোঁদাই হাই তুলে বলল, "দাদা! বিচ্ছিরি ঘুম পাচ্ছে কেন বলুন তো? আমি শুই?"

বলে সে মেঝেতেই চিতপাত হল। তারপর টের পেলুম আমারও ঘুম পাচ্ছে। সম্রাট চাংকোর বেডরুমে কি ঘুমের ওষুধ ছড়ানো আছে?

একটা গদিআঁটা আসনে বসে হেলান দিলুম। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। কী একটা চ্যাঁচ্যামেচিতে সেই ঘুম যখন ভাঙল, তখন বুঝলুম আমাকে একটা গোরিলা-মানুষ কাতুকুতু দিচ্ছে। এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম। গোরিলা-মানুষটা ক্ষান্ত হল সঙ্গে-সঙ্গে। সম্রাট চাংকো রাগে ফুঁসছেন। দাঁত কিড়মিড় করছেন। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত ফিক-ফিক করে হাসছেন কেন জানি না। ভোঁদা-পালোয়ান মেঝেয় বসে আছে। দুটো গোরিলা-মানুষ তাকে কাতুকুতু দিচ্ছে। কিন্তু তার পেশী ফুলে ঢোল। সুবিধে করতে পারছে না ওরা। যত কাতুকুতু দিচ্ছে, পালোয়ান তত পেশী ফোলাচ্ছে।

আর হালদারমশাইকে কাতুকুতু দিচ্ছে অন্তত একডজন গোরিলা-মানুষ। কিন্তু ওঁর ঘুম ভাঙছে না। তাই সম্রাট চাংকো হাত দুটো ছুঁড়ে খুব চ্যাঁচামেচি করছেন।

ঘরে কর্নেলকে দেখতে পেলুম না। গজকুমার সিংয়ের জন্য একটা চমৎকার বিছানা পাতা হয়েছে। তিনি ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু ওঁর ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছে না কেউ। সম্রাট চাংকোর বন্ধুর নাতি। তাই কি এই খাতির?

সম্রাট চাংকো গর্জন করলেন, "ক্র্যাম্বো হ্র্যাম্বো ল্যাম্বো!"

গোরিলা-মানুষেরা হালদারমশাইকে এবার চ্যাংদোলা করে তুলল। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তকে ফিসফিস করে বললুম, "সর্বনাশ! একটা কিছু করা উচিত আমাদের।"

বিজ্ঞানী চোখের ইশারায় আমাকে চুপ করতে বললেন। সম্রাট চাংকো তাঁর বিছানা ঝেড়ে সাফ করে শুয়ে পড়লেন। তারপর জড়ানো গলায় বললেন, "ভ্রাম্বো লাম্বো নাম্বো।"

গোরিলা-মানুষেরা সঙ্গে-সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সম্রাট চাংকো নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকলেন। বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত বললেন, "এই চান্সের অপেক্ষায় ছিলুম। চলে আসুন, জয়ন্তবাবু! চাংকোর ল্যাবে যাই।"

ভোঁদা আমাদের সঙ্গ নিয়ে বলল, "ওই দাদা যে পড়ে রইলেন?"

চন্দ্রকান্ত ফিক করে হেসে বললেন, "আমাদের পৃথিবীর ভাষায় উনি মড়া—স্রেফ ডেড বডি।"

চমকে উঠে বললুম, "সর্বনাশ! তা হলে গজকুমার সিং নাম বলেছিলেন, সেটাই সত্যি!"

সেই ল্যাবে পৌঁছে চন্দ্রকান্ত জবাব দিলেন, "উনি একজন যথার্থ মৃত মানুষ। কাজেই ওঁকে নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।"

অবাক হয়ে বললুম, "কী আশ্চর্য! আপনার নিশ্চয় কোনো ভুল হচ্ছে।"

"নাহ।" বলে চন্দ্রকান্ত ডাকলেন, "কর্নেল! আপনি কোথায়?"

কর্নেলের সাড়া এল যেন আমাদের পায়ের তলা থেকে, "চলে আসুন! পেয়ে গেছি।"

চন্দ্রকান্ত খুঁজছিলেন। মেঝের দিকে দৃষ্টি। একখানে একটা চৌকো গর্ত দেখতে পেয়ে বললেন, "এই যে!" সেই গর্তের ভেতর সিঁড়ি নেমে গেছে, নীল আলো জ্বলছে। আমরা তিনজনে নীচে নেমে গিয়ে দেখি, এ-ও আর-এক ল্যাব। সেখানে শ্রীমান ধুন্ধু চিত হয়ে শুয়ে আছে। বিজ্ঞানী তার কানে মোচড় দিয়ে ওঠালেন।

কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল। সারবন্দী কাচের কফিনের ভেতর কী আর কে ভেসে আছে একটা করে মৃত মানুষ। কর্নেল বললেন, "চন্দ্রকান্তবাবু! চাংকোর কীর্তি দেখুন!"

চন্দ্রকান্ত সপ্রশংস ভঙ্গিতে বললেন, "জেনেটিক্সে চাংকোর মাথা বরাবরই ভালো খেলত। অপূর্ব! পৃথিবীর সব বেওয়ারিশ লাশ এক্সরে-ল্যাসোর সাহায্যে তুলে নিয়ে এসে প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু স্টেজগুলো লক্ষ করছেন কি?"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। প্রাণ দিয়ে চাংকো তাকে পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষে পরিণত করছেন। আমরা যেসব গোরিলা-মানুষ দেখলুম, তারা ক্রোম্যাগনন প্রজাতির। বিবর্তনতত্ত্বকে নিয়ে চাংকো খেলা করছেন। অসাধারণ প্রতিভাধর বিজ্ঞানী!"

"গজকুমারবাবুকেও গোরিলা-মানুষ করবে চাংকো।" বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্ত দুঃখিতমুখে বললেন, "আমার বড্ড খারাপ লাগছে ভাবতে।"

কর্নেল হাসলেন, "খারাপ লাগলেও কী আর করা যাবে, বলুন! পৃথিবীর নিয়ম হল, সেখানে যে মরে যাবে, সে চিরমৃত। এই গ্রহে সে জীবিত হচ্ছে, এটা মন্দ না। আহা, প্রাণ জিনিসটা বড সুন্দর। তা একেবারে হারিয়ে যাওয়ার চাইতে এ তো ভালোই!"

বিজ্ঞানী দাড়ি চুলকে বললেন, "এ আমার সাবজেক্ট নয়। আমি অ্যাস্ট্রো-ফিজিসিস্ট। কাজেই বায়োলজি, ফিজিওলজি বা জেনেটিক্সে আমার মাথাব্যথা নেই। চলুন, ফেরা যাক। ধুন্ধু, ট্রাও ট্রাও!"

ভোঁদা বলে উঠল, "ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে মেরে গোরিলা-মানুষ করবে না তো? ওঁকে কোথায় নিয়ে গেল, দেখা উচিত স্যার।"

চন্দ্রকান্ত নড়ে উঠলেন, "তাই তো! কর্নেল শিগগির চলুন! ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কথা একবারে ভুলে গেছি। ধুন্ধু! বড্ড শব্দ করছ! ট্রুও ট্রুও ট্রুও।"

কিছুক্ষণ পরে আমরা চত্বরে বেরিয়ে দেখি, হালদারমশাইকে গোরিলা-মানুষেরা একটা পাথরের স্তম্ভে বেঁধেছে এবং বড়-বড় পাথরের চাঁই ছুঁড়ছে। আঁতকে উঠেছিলুম। কিন্তু পাথরগুলো হালদারমশাইয়ের গায়ে লেগে ঝুরঝুর করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। হুঁ, মাধ্যাকর্ষণ কম। তাই এখানকার পদার্থের ওজন কম। শুধু এই বলগুলো ছাড়া। যদি গোরিলা-মানুষেরা বল ছুঁড়ে মারে? চন্দ্রকান্তকে ফিসফিস করে কথাটা বলতেই উনি ধুন্ধুকে লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু তাকে ওরা গ্রাহ্য করল না। কর্নেল ডাকলেন, "হালদারমশাই! হালদারমশাই!"

কোনো সাড়া নেই। আপাদমস্তক বাঁধা অবস্থায় উনি বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আসলে পাথর ছুড়ে-ছুড়ে গোরিলা-মানুষগুলো নেতিয়ে পড়েছে ক্রমশ। বুঝলুম, এরা ক্রোম্যাগনন প্রজাতির মানুষ। তাই পাথর ছাড়া অন্য অস্ত্রের কথা জানে না। জানলে এতক্ষণ হালদারমশাই বেঘোরে মারা পড়তেন। ওদিকে ধুন্ধু এবার বেদম থাপ্পড় চালাতে শুরু করেছে। কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "নস্যি, হালদারমশাই! নস্যি!"

অমনি উনি চোখ খুললেন। বললেন, "কী! কী! ওঃ! অনেকক্ষণ নস্যি লই নাই। নাকটা কেমন করতাছে!" তারপর টের পেলেন সব। খাপ্পা হয়ে চ্যাঁচালেন, "আমারে বাঁধল কেডা? এই ভূতগুলি? তবে রে!"

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বাঁধন খুলে দিলেন। গোরিলা-মানুষেরা বাধা দিল না। আসলে তারা ধুন্ধুর থাপ্পড় খেয়ে বড্ড ক্লান্ত। কর্নেল তাদের দিকে ঘুরে বললেন, "ভ্রাম্বো! থাম্বো! নাম্বো!"

অমনি তারা চলে গেল। বোধ হয়, ঘুমোতেই গেল। বললুম, "আপনি ওদের ভাষা বোঝেন, কর্নেল?"

কর্নেল বললেন, "কানে শুনে-শুনে একটুখানি শিখে নিয়েছি।"

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, "কই নস্যি?"

কর্নেল পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে দিয়ে বললেন, "কুমড়ো-মানুষদের ঘরে ফেলে এসেছিলেন। দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছিলুম।"

বিজ্ঞানী চন্দ্রকান্তের এতক্ষণে স্পেসশিপের কথা মনে পড়ল। বললেন, "কিন্তু আমার স্পেসশিপ? পৃথিবীতে ফিরব কী করে আমরা?" তিনি দাড়ি চুলকোতে থাকলেন উদ্বিগ্নমুখে।

বললুম, "স্পেসশিপ ইনট্যাক্ট আছে। চলুন, সেখানে নিয়ে যাই।"

স্পেসশিপের কাছে গিয়ে আর-এক দৃশ্য দেখে ভড়কে গেলুম। ভবেশবাবুর সঙ্গে একদঙ্গল গোরিলা-মানুষের লড়াই বেধেছে। ওরা ওঁকে পাথর ছুড়ে মারছে। পালটা উনি ছুড়ছেন সেই আজব বল। বলের ধাক্কায় ওরা কুপোকাত হচ্ছে। চন্দ্রকান্ত বললেন, "কী বিপদ! এবার ওরা যদি বল ছোঁড়ে?"

ভোঁদা বলল, "তবে রে!" তারপর দৌঁড়ে গেল। সে গোরিলা-মানুষদের টিকি থেকে বল খুলে নিতে শুরু করল। ফলে ওরা আকাশে ভেসে হাত-পা ছোড়াছুড়ি শুরু করল।

ভবেশবাবু আমাদের দেখে বললেন, "বনমানুষগুলোর বড্ড বাজে স্বভাব। বেশ ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ দরজা খুলে কাতুকুতু দিতে শুরু করেছে। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, অত বড়-বড় পাথর আমার গায়ে পড়ে ছাতু হয়ে গেল কেন বলুন তো? আমি তো ভোঁদার মতো পালোয়ান নই!"

কর্নেল বললেন, "পরে বুঝিয়ে বলব। ঢুকুন ভবেশবাবু! পৃথিবীতে ফেরা যাক। আমার চুরুটের স্টক শেষ।"

ভোঁদা বলল, "গোরিলা-মানুষগুলোর জন্য দুঃখ হচ্ছে, বল কেড়ে নিলুম বটে! ওরা নামবে কী করে? এক মিনিট। বলগুলো ওদের দিকে ছুঁড়ে দিই। তারপর ভোঁ-কাট্টা করব।" সে বলগুলোকে কুড়িয়ে ছুড়তে শুরু করল। গোরিলা-মানুষেরা লুফে নিল এবং নামল। কিন্তু আর আক্রমণ করতে এল না। দল বেঁধে করুণ মুখে তাকিয়ে রইল। ধুন্ধু থাপ্পড় তুলে কী জানি কেন হাত নামাল। মানুষের সঙ্গগুণে তার মানুষ-ভাব এসেছে।

আমরা স্পেসশিপে ঢোকার পর হালদারমশাই বললেন, "আরে কী কাণ্ড! আরও সব গোরিলা-মানুষ আসছে অ্যাটাক করতে। কুইক সায়েন্টিস্টমশাই!"

জানলা দিয়ে দেখি, উপত্যকা জুড়ে হাজার-হাজার গোরিলা-মানুষ আসছে। কিন্তু মারমুখী বলে মনে হচ্ছে না। নীলাভ আলোয় প্রতিটি মুখে বিষণ্ণতার স্পষ্ট ছাপ। ওরা হাত নেড়ে আমাদের কি বিদায় জানাচ্ছে? একদা ওরা আমাদের পৃথিবীরই মানুষ ছিল। সেই স্মৃতি কি ওদের অবচেতনা থেকে জেগে উঠেছে? মনটা খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীতে ওরা মৃত। এখানে ওরা জীবিত।

আমাদের মহাকাশযানের চারদিক ঘিরে গোরিলা-মানুষেরা হাত নাড়ছিল। আমরাও ভেতর থেকে হাত নাড়লুম। সম্রাট চাংকো এখন তাঁর ঘুমঘরে ঘুমোচ্ছেন। তিনি জানতে পারছেন না, তাঁর প্রজারা কী করছে এখন। নীল আশ্চর্য সুন্দর আলোয় হাজার-হাজার বিষণ্ণ আদিম মুখ।

আমরা পাঁচজন মানুষ আকাশে ভেসে যেতে-যেতে নীচে তাদের শেষবারের মতো দেখে নিলুম।

পোড়ো খনির প্রেতিনী

চিৎপুরে প্রচণ্ড ট্রাফিকজটে আমার গাড়ি আটকে গিয়েছিল। কেন যে ... শর্টকাট করার জন্য এই ঘিঞ্জি রাস্তায় ঢোকার দুর্বুদ্ধি হল, তাই ভেবে নিজের ওপর খাপ্পা হয়ে উঠছিলুম ক্রমশ। হঠাৎ চোখে পড়ল, ডানদিকের একটা দোকান থেকে লম্বাচওড়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখে আমার অতিপরিচিত ঋষিসুলভ সাদা দাড়ি। তিনি পা বাড়াতেই ফুটপাথের একটা ব্যস্তবাগীশ লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মাথার ছাইরঙা টুপিটা পড়ে গেল। টুপি কুড়োবার সময় তাঁর বিখ্যাত টাকও দেখতে পেলুম। আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম,—কর্নেল!

আমার বৃদ্ধ বন্ধু শুনতেই পেলেন না। ভিড়ের ভেতর মিশে গেলেন। এবার সেই দোকানের সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই চমক লাগল।

টি এন গুপ্ত অ্যান্ড কোং

সুলভে যাত্রা-থিয়েটারের পোশাক

ভাড়া পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

উত্তর কলকাতার এক প্রাচীন মন্দির থেকে কয়েক লক্ষ টাকার সোনাদানা চুরির খবর আনতে গিয়েছিলুম। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য। বেলা পড়ে এসেছিল। তাই খুব তাড়া ছিল। পত্রিকার অফিসে ফিরে খবরটা লেখার পর ফোন করলুম কর্নেলকে। ভেবেছিলুম, এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ি ফিরেছেন।

ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ ফোন ধরেছিল। বলল,—বাবামশাই সেই কখন বেইরেছেন, এখনও ফেরেননি দাদাবাবু। বলে গেছেন, ফিরতে অনেকটা রাত্তির হবে।

মনে একটা চাপা উত্তেজনা রয়ে গেল। বাড়ি ফিরে রাত দশটা নাগাদ আবার ফোন করতেই যথারীতি ষষ্ঠীচরণের সাড়া পেলুম। সে খিকখিক করে হেসে বলল,—কাণ্ডজে দাদাবাবু নাকি? ইদিকে এক কাণ্ড!

কী কাণ্ড, ষষ্ঠী! কর্নেল ফেরেননি!

ফিরেছেন আজ্ঞে। কিন্তু বললুম না—ইদিকে এক কাণ্ড হয়েছে!

কী মুশকিল! কাণ্ডটা কী?

আজ্ঞে, কাটামুণ্ডু।

কাটামুণ্ডু! তার মানে? কার কাটামুণ্ডু?

আবার কার? বাবামশাইয়ের। খি খি খি ...।

ভড়কে গেলুম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু মানেটা কী? আর ষষ্ঠী এমন হাসছে কেন? শিউরে উঠলাম। কর্নেলের কাটামুণ্ডু ... ষষ্ঠীর অমন পাগলাটে হাসি!

সর্বনাশ! তাহলে কি কর্নেলকে কেউ খুন করে গেছে আর তাই দেখে ষষ্ঠী পাগল হয়ে গেছে?

তক্ষুনি ফোন রেখে ঝটপট বেরিয়ে পড়লুম। রাস্তায় গিয়ে মনে হল, থানায় খবর দেওয়া উচিত হবে কি না। কিন্তু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের মতো ধুরন্ধর এবং শক্তিমান মানুষ খুন হবেন, কিংবা গলায় নির্বিবাদে কাউকে কোপ বসাতে দেবেন, ভাবাই যায় না। আগে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখা দরকার।

কিন্তু ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির সামনে কোনো ভিড় নেই। রাস্তা সুনসান খাঁ-খাঁ। হন্তদন্ত তেতালায় উঠে কলিং বেলের স্যুইচ টিপলুম। আমার হাত কাঁপছিল। শরীর ভারী হয়ে উঠেছিল। দরজা খুলে গেলে ষষ্ঠীচরণের মুখ দেখতে পেলুম। আমাকে দেখে সে চাপা খিকখিক হেসে ফিসফিস করে বলল,—ভারি মজার কাণ্ড, দাদাবাবু। দেখুন গে না।

তাকে ঠেলে হন্তদন্ত ঢুকে পড়লুম। ড্রইংরুমের পর্দা তুলেই থমকে দাঁড়াতে হল! টেবিলের ওপর সত্যি সত্যি একটা কাটামুণ্ডু রয়েছে এবং সেটা কর্নেলেরই বটে। টাক এবং সাদা দাড়ি সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু সেই কাটামুণ্ডের সামনে যিনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন, তিনি সম্ভবত কর্নেলের ভূত নন। কারণ তিনি চোখ তুলে আমাকে দেখলেন এবং মৃদুহাস্যে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন, হ্যাল্লো ডার্লিং!

পাশে বসে আমি হো হো করে হেসে উঠলুম। তারপর বললুম,—আপনার ষষ্ঠীচরণটি এক অপূর্ব জিনিস! বলে কী, বাবামশাইয়ের কাটামুণ্ডু ...

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন,—ষষ্ঠী যে ভুল বলেনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছ, জয়ন্ত! এখন বলো তো মুণ্ডুটা দেখে আমার বলে মনে হচ্ছে কি না?

আপনার ছাড়া আর কার? মুণ্ডুটা দেখতে দেখতে বললুম। একেবারে অবিকল। ওটা যদি রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ সন্দেহ করবে না যে ওটা নকল মুণ্ডু। এমনকি পোস্টমর্টেমের টেবিলে ডাক্তার যতক্ষণ না ছুরি চালাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনিও ধরতে পারবেন না কিছু! তাছাড়া টাকটিও নিখুঁত হয়েছে।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে সহাস্যে বললেন,—ঠিক এমনটিই চেয়েছিলুম।

বললুম,—এটা কি চিৎপুরের টি এন গুপ্ত কোং থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন?

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা দোলালেন। তুমি আজ বিকেলে চিৎপুরে ট্রাফিকজটে আটকে গিয়েছিলে এবং আমাকে ডেকেছিলে, ঠিকই। কিন্তু তখন আমার বেজায় তাড়া ছিল। আশা করি, তুমি কুমোরটুলির প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী দেবেন পালের নাম শুনেছ। দেবেনবাবু ইদানীং পোশাকের দোকানের জন্য ডামি তৈরিতে খুব নাম করেছেন। চৌরঙ্গি এলাকার বহু পোশাকের দোকানে লাইফসাইজ মূর্তিগুলো ওঁরই তৈরি। আগে এসব জিনিস বিদেশ থেকে আনা হত। তবে সেসব মূর্তি অবশ্য সায়েব-মেমদের। এ যুগে সায়েব-মেম চলে না।

আপনার এই কাটামুণ্ডুটা কি মাটির?

মোটেও না। প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি। দোকানের ডামিগুলোও তাই। মাটির মূর্তি ভেঙে যাবার চান্স থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বলুন তো! গুপ্ত কোম্পানিতে কি আপনি পরচুলো কিনতে ঢুকেছিলেন? আর এই কাটামুণ্ডুরই বা উদ্দেশ্য কী?

কর্নেল টাকে হাত বুলিয়ে বললেন,—পরচুলো জিনিসটা বরাবর আমার চক্ষুশূল। বিশেষ করে যাত্রা-থিয়েটারের জন্য যে সব পরচুলো ভাড়া দেওয়া হয়, তাতে অসংখ্য উকুন থাকা সম্ভব। আর জয়ন্ত, সত্যি বলতে কি, টাক মানুষের চেহারায় জ্ঞানীর ব্যক্তিত্ব এনে দেয়। আমার টাক আমার বড় গর্বের জিনিস। তবে কাটামুণ্ডুর কথা জিজ্ঞেস করছ, এটা আমাকে ভালোবেসে উপহার দিয়েছেন কুমোরটুলির দেবেনবাবু। পুরো প্রতিমূর্তি গড়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলুম,—অত পরিশ্রমের দরকার নেই। বরং আমার মাথাটা উপহার দিলেই আমি খুশি।

বুঝলাম। কিন্তু টি এন গুপ্তের দোকানে তাহলে কেন ঢুকেছিলেন?

কর্নেল সে-কথার জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানলেন। তারপর বললেন,—কাল থেকে দিন-চারেকের ছুটি নিতে পারবে জয়ন্ত?

পারব। কেন?

আমরা বেড়াতে যাব একজায়গায়।

কোথায়?

কর্নেল চোখ বুজে গল্প বলার সুরে বললেন,—ধানবাদের ওদিকে ভৈরবগড় নামে একটা জায়গা আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওই এলাকায় অনেক খনি ছিল। এখন সবই পোড়ো হয়ে গেছে—যাকে বলে অ্যাবান্ডান্ড্ মাইন। অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে তোলার মতো কোনো জিনিস আর নেই। নিয়ম হল, পোড়োখনির মুখ সিল করে দিতে হয়। কিন্তু কজনই বা নিয়ম মানে? অনেক খনির মুখ সিল করা হয়নি। কোনোটাতে জল জমে আছে, কোনোটায় গভীর গর্ত। ঝোপজঙ্গল গজিয়ে গেছে। গত শীতে খোলা খনিমুখগুলো থেকে জন্তু জানোয়ার বেরুতে দেখেছিলুম। তবে শেষ পর্যন্ত একটা দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

ষষ্ঠীচরণ কফির ট্রে রেখে গেল। পেয়ালায় কফি ঢালতে ঢালতে বললুম,—হুঁ। বলুন।

কর্নেল একটু হাসলেন। জয়ন্ত, তুমি কি কখনও এমন অদ্ভুত প্রাণীর কথা শুনেছ—যার পায়ের পাতা উলটো, চোখ দুটো সাপের মতো নিষ্পলক, যার চিৎকার শুনলে দুঃসাহসীরও শরীর আতঙ্কে হিম হয়ে যায়?

জোরে মাথা নেড়ে বললুম,—না।

বলছি বটে প্রাণী, কিন্তু দেহাতি লোকেরা বলে পেত্নি। তুমি বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ হিমাচলের যেখানেই যাবে, দেহাতি লোকেদের কাছে এই সাংঘাতিক পেত্নির কথা শুনতে পাবে। উলটো দিকে পায়ের পাতা বলে এই পেত্নিকে মনে হবে পিছু হেঁটে তোমার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। চোখে পলক পড়ে না। ঠাণ্ডা-হিম সেই চোখে তাকিয়ে তোমার দিকে আসতে আসতে হঠাৎ সে বিকট চেঁচিয়ে উঠবে। সেই রক্ত-হিম-করা চিৎকার শুনলে তুমি তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তখন পেত্নি তোমার মুণ্ডুটি মুচড়ে ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত চুষে খাবে।

রাত সাড়ে দশটার কলকাতায় এই বিবরণ শুনতে শুনতে হেসেই ফেলতুম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোডশেডিং হয়ে গেল। অন্ধকারে মনে হল আমার খুব কাছেই পেত্নিটা দাঁড়িয়ে আছে। ঝটপট লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হলুম। একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন,—কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, পোড়োখনি এলাকায় জটাজুটধারী এক সাধুবাবাও নাকি থাকেন। যাই হোক, ভৈরবগড়ের পোড়োখনির ভেতর থেকে পেত্নিটা যদি আজ রাতে বেরিয়েও থাকে, কলকাতা পৌঁছুতে তার ভোর হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো, ডার্লিং।

হৈ-চৈ করে বললুম,—কী যা-তা বলেন! আমি কি ভয় পেয়েছি নাকি?

ষষ্ঠীচরণ একটা বাতি রেখে গেল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বিহার থেকে হিমাচল পর্যন্ত এই পেত্নির খুব নামডাক। ওরা বলে চুরাইল। কোথাও চুঁড়েলও বলে। বাংলার গ্রামে যাকে বলে শাঁখচুন্নি, সে আসলে ওই চুরাইলেরই বাঙালি রূপ। পেত্নির হাতে থাকে শাঁখের চুড়ি। তাই ওই নাম। বাংলায় শাঁখের চুড়ি-পরা পেত্নি অপভ্রংশে শাঁখচুন্নি হয়ে গেছে।

ভৈরবগড়ে আপনি তাহলে চুরাইল দেখেছিলেন?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না ছিল। স্পষ্ট দেখতে পাইনি তার চোখ দুটো নিষ্পলক কিনা, কিংবা তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো দিকে ফেরানো কি না। তবে তার চিৎকারটা শুনেছিলুম। চেরা গলার সেই চিৎকার টেনে-টেনে হিঁপিয়ে কখনও কান্নার মতো, কখনও তীব্র বিপদজ্ঞাপক সাইরেনের মতো! আমি ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। ব্যস্ততার মধ্যে টর্চটাও বিগড়ে গিয়েছিল। যখন আবার জ্বলল, তখন সে অদৃশ্য।

কিন্তু এতদিন পরে চুরাইল-রহস্য উদ্ধারে বেরুনোর কারণ কী? পেত্নিটা কি কারুর মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তপান করেছে?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—করেছে। তারপর উঠে গিয়ে কোণার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার এনে বললেন,—পড়ে দেখো।

আলোর দিকে ঝুঁকে চিঠিটাতে চোখ রাখলুম। তাড়াহুড়ো করে লেখা। হরফগুলো বাঁকাচোরা।

প্রিয় কর্নেল,

ভৈরবগড়ে আবার চুরাইলের আবির্ভাব ঘটেছে। আগে মাঝেমাঝে যেমনটি দেখা গেছে, এবারও তেমনটি। দুজনের কাটামুণ্ডু আর ধড় পাওয়া গেছে। একফোঁটা রক্ত ছিল না। পুলিশ বলছে ডাকাতের কীর্তি। কিন্তু আমি জানি তা নয়। গত রাতে আমাদের পেছনের বাগানে চুরাইলের ডাক শুনেছি। তখন রাত প্রায় একটা। আমার অনিদ্রার কথা তো জানেন। ডাক শুনেই জানালা খুলে উঁকি দিয়েছিলুম। বন্দুক ছিল হাতে। কিন্তু লোডশেডিং চলছিল তখন। টর্চের আলোয় একপলক তার চেহারা দেখলুম। বুক কেঁপে উঠল। বন্দুক ছুঁড়তে পর্যন্ত পারলুম না ভয়ের চোটে। জানালা বন্ধ করে দিলুম। আমার খুব ভয় হচ্ছে, ওই দুজনের বাড়ির পেছনেও এমনি করে সে এসেছিল। দয়া করে আপনি শিগগির আসুন। ইতি,

যদুনারায়ণ দেব।

কর্নেলের কাছ থেকে যখন বেরোলুম, তখন রাত প্রায় এগারোটা বেছেছে। তখনও ওই এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। গাড়ির হেডলাইটের ছটায় অসংখ্য চুরাইল ভেসে উঠছিল যেন। আলোকিত এলাকায় পৌঁছে দেখি, ঘন কুয়াশা জমেছে। মার্চেও এবার শীত পিছু ফিরে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে প্রচুর কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর পেট্টিটা যেন আমাকে অনুসরণ করছিল। নিষ্পলক চোখে পিছু হেঁটে হেঁটে সে এগোচ্ছিল। গাড়ির গতি বাড়িয়েও তাকে যেন ফেলে যেতে পারছিলুম না। বাড়ি পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে যখন বেরুচ্ছি। তখনও মনে হল সে গেটের বাইরে নিষ্পলক ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে ঘরে ঢোকার পর কতক্ষণ কান পেতে থাকলুম, কিন্তু তার ডাক শুনতে পেলুম না। তখন নিজের মিথ্যে ভয়ের কথা ভেবে খুব লজ্জা হল। ...

দুই

খনি এলাকা যতটা রুক্ষ দেখায়, ভৈরবগড় ততটা রুক্ষ নয়। শহর আর গ্রামে মেশানো একটা জনপদ। খনিগুলো অ্যাবান্ডান্ড্ হয়ে ভৈরবগড়ের জৌলুস পড়ে গেছে কবে। রেলস্টেশন আছে বটে, তার চেহারাও খাঁ খাঁ। ঢেউখেলানো মাটি, ছোটবড় আর পাহাড়, বনজঙ্গল নিয়ে কেমন একটা আদিম পরিবেশ।

যদুনারায়ণ দেবের বাড়িটা বেশ পুরনো। তিনপুরুষ আগে ওঁরা বাংলা থেকে এ মুল্লুকে এসেছিলেন খনি-ব্যবসা করতে। এখন অবস্থা আগের মতো জমকালো নয়। বাড়িতে আছেন যদুনারায়ণ, তাঁর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ, যদুবাবুর সাত-আট বছর বয়সী মেয়ে পিঙ্কি, আর যদুবাবুর মা করুণাময়ী। যদুবাবুর স্ত্রী বেঁচে নেই। রুদ্রবাবু এখনও বিয়ে করেন নি। ধানবাদে একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন। রোজ ট্রেনে যাতায়াত করেন।

পেছনে বাগানের দিকের একটা ঘরে আমরা উঠেছি, বাগান অবশ্য নামেই। তিন একর জায়গা জুড়ে গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। একটা প্রকাণ্ড আর চ্যাপটা টিলার মাথায় বাড়িটা। বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়ালে অনেক দূর দেখা যায়। ওই দিকটায় সেইসব পোড়োখনি আছে।

কর্নেল যদুবাবুকে নিয়ে বেরিয়েছেন কোথায়। রাত জেগে ট্রেনে এসেছি। ক্লান্তিও বটে, চোখ দুটোও জ্বালা করছে। তাই ওঁদের সঙ্গে যাইনি। বাগানের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে বেড়া ডিঙিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে একটা পাথরে বসে ছিলুম।

দিন-দুপুরে পেত্নির ভয় থাকার কথা নয়। কিন্তু পোড়োখনি এলাকার দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি হচ্ছিল। সেইসময় কোত্থকে সাদা রঙের একটা ছোট্ট কুকুর দৌড়ে এসে আমার পা শুঁকে জ্বলজ্বল চোখে আমাকে দেখতে থাকল। অবাক হয়ে ভাবছি, কুকুরটা কার, এমন সময় ওপাশের ঝোপ থেকে যদুবাবুর মেয়ে পিঙ্কি ডাক দিল,—কুকি! কুকি!

কুকুরটার সারা গায়ে লোম। গা ঝাড়া দিয়ে সে মুখ ঘোরাল। পিঙ্কি তার কাছে এসে ধমক দিল, —কী? কথা কানে যাচ্ছে না বুঝি? চাঁটি খাবি বলে দিচ্ছি? চলে আয়!

বললুম,—তোমার কুকুর বুঝি? ভারি সুন্দর তো কুকুরটা!

পিঙ্কি আমার কথায় কান দিল না। সে কুকুরটাকে দুহাতে তুলে নিয়ে ঢাল বেয়ে দৌড়তে শুরু করল। তারপর নীচের সমতলে গিয়ে কুকুরটাকে নামিয়ে দিল। দেখলুম, এবার কুকুরটা অর্থাৎ কুকি তার পেছন-পেছন হাঁটছে। একটু পরে পিঙ্কি ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেয়েটা তো বড্ড সাহসী দেখছি! এসেই শুনেছি, চুরাইলের আতঙ্কে লোকে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ঢুকে পড়ে। বাজার-এলাকা শিগগির নিশুতি সুনসান হয়ে যায়। এমনকি দিনের বেলাতেও কেউ একাদোকা মাঠেঘাটে পা বাড়ায় না। আর অতটুকু মেয়েটা দিব্যি একা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই এলাকায়!

কিছুক্ষণ পরে উঁচু একটা জায়গায় ফ্রক পরা পিঙ্কির মূর্তি ভেসে উঠল। তার পায়ের কাছে কুকি। দুজনে খুব মন দিয়ে কী যেন দেখছে।

তারপর কুকিকে লাফাতে লাফাতে ওপাশে চলে যেতে দেখলুম। পিঙ্কিও তার পেছনে ছুটল। সিগারেট ধরিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকলুম। কখনও ওরা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার ওদের দেখতে পাচ্ছি। তারপর কতক্ষণ আর দুটিকে দেখতেই পেলুম না।

কেমন একটা অস্বস্তি লাগল। লম্বা পায়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলুম। ওদের শেষবার যেখানে দেখেছি, সেইদিকে হাঁটতে থাকলুম। জায়গাটা উঁচুনিচু, এবড়ো খেবড়ো। অজস্র খানাখন্দ, কোথাও গভীর গর্ত, নানা গড়নের পাথর পড়ে রয়েছে। মধ্যে-মধ্যে বোপঝাড় বা কিছু গাছ। এপাশে-ওপাশে টিলা। একটা পাথরে উঠে ওদের খুঁজলুম। তারপর দেখলুম, একখানে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি একটু ঝুঁকে কী করছে। কুকিকে দেখতে পেলুম না।

চেঁচিয়ে ডাকলুম,—পিঙ্কি! পিঙ্কি!

পিঙ্কি আমার দিকে ঘুরে হাত নেড়ে কী বলল। তখন দৌড়ে ওর কাছে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, পিঙ্কির সামনে একটা স্তূপের কিনারায় গুহার দরজার মতো প্রকাণ্ড একটা খোঁদল। সেইদিকে হাত বাড়িয়ে পিঙ্কি কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল,—কুকি ওর ভেতর ঢুকে গেল। আর বেরুচ্ছে না—এত ডাকছি!

খোঁদলের কাছে গিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলুম। ফুট-চারেক গভীর একটা গর্ত—তারপর সুড়ঙ্গের মতো ভেতরে চলে গেছে খোঁদলটার। গর্তে ঘাস আর সামান্য ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে। পিঙ্কি ব্যাকুলভাবে ডাকছিল,— কুকি! কুকি! সে শাসাচ্ছিল। আওি 'কুকি' বলে ডাকাডাকি করলুম। কিন্তু কুকুরটার পাত্তা নেই।

এইসব গর্তের ভেতর নেকড়ে, চিতাবাঘ বা হায়না থাকাও সম্ভব। তাদের পাল্লায় পড়ল না তো বোকা কুকুরটা? বললুম,—দেখো তো কী বিপদ হল! ওকে নিয়ে কেন এখানে এসেছিলে!

পিঙ্কি চোখ মুছতে মুছতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল,—রোজই তো আসি। কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলি।

কুকি ওখানে ঢুকতে গেল কেন?

পিঙ্কি মাথা নেড়ে বলল,—জানি না। হঠাৎ ঢুকে গেল।

খোঁদলটাতে মানুষের পক্ষেও ঢোকা সম্ভব। নিশ্চয় একটা পোড়োখনির মুখ এটা। ভেতরে ঘন অন্ধকার থমথম করছে। টর্চ থাকলে ঢুকতে পারতুম। তাই বললুম,—তুমি এক কাজ করো বরং। দৌড়ে গিয়ে বাড়ি থেকে একটা টর্চ নিয়ে এসো। তোমার কুকিকে উদ্ধার করা যাবে।

পিঙ্কি তখুনি দৌড়ল। আমি পাশের একটা ঝোপ থেকে লাঠির মতো একটা ডাল ভেঙে নিলুম। সঙ্গে রিভলবারটা নেই। থাকলে ভালো হত। অগত্যা লাঠি ভরসা করেই ঢুকতে হবে।

লাঠিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোক খুঁজছিলুম, যদি দৈবাৎ কোনো দেহাতি লোক পেয়ে যাই, সেও মন্দ হবে না। পয়সার লোভে তাকে ওই খোঁদলে ঢুকিয়ে কুকিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যায়। নাহলে অগত্যা নিজেকেই ঢুকতে হবে!

হঠাৎ একটু দূরে উঁচু পাথরের আড়াল থেকে কাউকে বেরুতে দেখলুম। সে ফাঁকায় পৌঁছুলে অবাক হয়ে দেখি, লাল কাপড়পরা এক সন্ন্যাসী। চেঁচিয়ে ডাকলুম,—সাধুবাবা! সাধুবাবা!

সাধুবাবা ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমাকে দেখেই সাঁৎ করে আবার উঁচু পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিল। তারপর আর তাকে দেখতে পেলুম না। ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত তো! কর্নেল এই সাধুবাবার কথা বলেছিলেন না?

একটু পরে হাঁপাতে হাঁপাতে পিঙ্কি ফিরে এল। টর্চ এনেছে। ওর সঙ্গে ওদের চাকর দশরথও এসেছে। দশরথের সঙ্গে সকালে আলাপ হয়েছে! লোকটার বয়স হয়েছে বটে, এখনও চেহারাটি শক্তসমর্থ। হাসতে হাসতে বলল,—কুকি কেন ঢুকেছে, হামার মালুম হয়েছে স্যার! ভৈরবগড়ের কুত্তাদের কাছে কুকি শুনেছে কী, ইয়ে সব গুহার অন্দরে করাড়ি রোটি মিলতে পারে।

জিজ্ঞেস করলুম,—করাড়ি রোটি কী দশরথ?

দশরথ বলল,—ইয়ে সব গুহার অন্দরে ভালুকের ডেরা আছে। ভালুক মৌচাক ভেঙে মধু খায়। ঔর জঙ্গলের ফলভি খায়। খেয়ে সেইসব চিজ উগরে দেয়। যখন শুখা হয়, তখন তা রোটি হয়ে যায়। আদমিলোগভি ওহি রোটি পছন্দ করে। হামিভি একদফা খায়া স্যার! বহুত মিঠা।

তা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু ভেতরে ভালুক থাকলে যে বিপদ!

দশরথ হাসল। ভালুক অন্দরে আছে কিনা কুত্তার মালুম আছে, স্যার! ভালুক থাকলে কুত্তা অন্দরে ঘুসবে না।

ঠিক এইসময় খোঁদল থেকে একলাফে কুকি বেরিয়ে এল। মুখে একটুকরো কালচে রঙের পাঁউরুটির মতো জিনিস। দশরথ লাফিয়ে উঠল,—দেখিয়ে, দেখিয়ে! হাম ঠিক বোলা কি না!

পিঙ্কি কুকিকে কোলে তুলে নিয়ে আলতো দুটো চাঁটি মারল। তারপর তার মুখ থেকে করাড়ি রোটির টুকরোটা কেড়ে ছুঁড়ে ফেলল। দশরথ সেই টুকরোটা তুলে নিয়ে বলল,—ফেকো মাত্ দিদি। ইয়ে রোটি যে খাবে, সে তাকতওয়ালা পালোয়ান হয়ে যাবে।

দশরথ আমাকে অবাক করে কুকুরের এঁটো সেই বিচিত্র বস্তুটি মাথায় ঠেকাল প্রসাদের মতো। তারপর ঝেড়েমুছে পকেটে ঢোকাল। তার মুখে খুশি উপচে উঠছিল।

হাঁটতে-হাঁটতে দশরথকে বললুম,—আচ্ছা দশরথ, ওখানে একজন সাধুবাবাকে দেখলুম। কিন্তু যেই আমি ওঁকে ডেকেছি, উনি লুকিয়ে পড়লেন কোথায়। ব্যাপারটা কী?

দশরথ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমার মুখের দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—সাচ্?

হ্যাঁ। একজন সাধুবাবাকে সত্যি দেখেছি, দশরথ।

দশরথের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—আপনি বহত্ পুণ্যবান স্যার, তাই দেখা পেলেন। ওখানে একজন সাধুবাবা থাকেন। লেকিন কেউ তাঁর দেখা পায় না। যারা পায়, তারা বহুত পুর্ণবান আদমি।

তুমি কখনও দেখা পাওনি?

না স্যার! শুনা কি, সাধুবাবার ওমর দোশো বরষ আছে।

বলো কী? দুশো বছর বয়স!

জি হাঁ। ভৈরবগড়ে যাকে পুছ করবেন, সে বলবে।

তাহলে দশরথ, সেই চুরাইলটা কি সাধুবাবার পোষ্য পেত্নি?

আমি হাসতে হাসতে বললুম কথাটা। দশরথ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠে দু-কানে আঙুল ঢুকিয়ে বলল,—রাম রাম! এই মুলুকে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ উও নাম মুখে লিবেন না স্যার!

বলে সে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

কর্নেল ও যদুবাবু বাগানে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। দশরথ কুকির কীর্তি বর্ণনা করল এবং ফতুয়ার পকেট থেকে ভালুকের বানানো রুটির টুকরোটাও দেখাল। যদুবাবু পিঙ্কিকে একটু বকাবকি করলেন। তারপ বললেন,—ওকে নিয়ে এই সমস্যা। যতক্ষণ স্কুলে থাকে, চিন্তা করি না। কিন্তু বাড়িতে থাকলেই কুকুর নিয়ে পোড়োখনির ওদিকে চলে যাবে। অথচ ইদানীং ভুলেও ভৈরবগড়ের লোকেরা ওদিকে পা বাড়ায় না।

কর্নেল দশরথের কাছ থেকে করাড়ি রোটির টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। ফেরত দিয়ে বললেন,—করাড়ি রোটির কথা দক্ষিণ ভারতের জঙ্গল এলাকায় গিয়ে শুনেছিলুম। এবার স্বচক্ষে দেখলুম।

যদুবাবু বললেন,—করাড়ি কেন বলে কে জানে!

কর্নেল বললেন,—তামিল ভাষায় ভালুককে বলে করাড়ি!

দশরথ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে উসখুস করছিল। চাপা গলায় যদুবাবুর উদ্দেশে বলল, —বড়বাবু, এই কলকাতার স্যারকে খনির সাধুবাবা দর্শন দিয়েছেন।

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন,—তাই নাকি জয়ন্তবাবু?

বললুম,—হ্যাঁ। কয়েক সেকেন্ডের জন্য লাল কাপড় পরা জটাধারী এক সাধুবাবাকে দেখেছি।

যদুবাবু কর্নেলকে বললেন,—আপনি কথাটা আমল দিচ্ছিলেন না কর্নেল। তাহলে দেখুন, যা রটে তা সত্যি বটে।

কর্নেল একটু হাসলেন। আমল দিইনি, তা নয়। বলছিলুম,—বিশ্বাস করা যায় এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শী কাউকে পেলে ভালো হয়। যাই হোক, জয়ন্ত যখন দেখেছে, তখন গুজবটা সত্য প্রমাণিত হল।

কর্নেলের বুকে বাইনোকুলার ঝুলছিল। কথাটা বলার পর বাইনোকুলারটা চোখে রেখে পোড়োখনি এলাকার দিকে কী যেন দেখতে থাকলেন। যদুবাবু খুব আগ্রহে চাপা গলায় বলে উঠলেন,—কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি কর্নেল?

কর্নেল বললেন,—লাল ঘুঘু।

লাল ঘুঘু মানে? যদুবাবুর গলায় নৈরাশ্য ফুটে উঠল। আমি ভাবলুম বুঝি সাধুবাবাকে দেখতে পেয়েছেন!

কর্নেল বললেন,—এই লাল ঘুঘুপাখির ঝাঁক সচরাচর দেখা যায় না। এরা ঊষর মরু অঞ্চলের বাসিন্দা। শীতের শেষদিকে চলে আসে উর্বর এলাকায়। বর্ষা পর্যন্ত কাটিয়ে আবার ফিরে যায়। বলে কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে এক-পা এক-পা করে হাঁটতে শুরু করলেন। বুঝলুম এবেলার মতো উধাও হতে চলেছেন। যদুবাবু একটু হেসে বললেন,—যার যা হবি! আসুন, জয়ন্তবাবু। আমরা ঘরে বসে গল্পগুজব করি ততক্ষণ।

যে ঘরে উঠেছি, সেই ঘরে গিয়ে বসলুম দুজনে। দশরথ চা আনতে গেল। পিঙ্কি তার কুকুর নিয়ে বাগানে খেলে বেড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছিলুম। যদুবাবু বললেন,—জয়ন্তবাবু, আপনি তো খবরের কাগজের লোক। এমন ঘটনা কখনও ঘটতে দেখেছেন?

কী ঘটনা বলুন তো?

ভূতপ্রেতের হাতে মানুষ খুন! যদুবাবুর কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ফুটে উঠল। পুলিশ বলছে স্রেফ ডাকাতি। কিন্তু বলুন তো মশাই, ডাকাত কি মানুষের মুণ্ডু কেটে রক্ত খায়?

তা খায় না বটে।

যদুবাবু জানালার বাইরেটা দেখিয়ে বললেন,—আজ রবিবার। গত বুধবার রাত একটায় ওইখানে স্পষ্ট দেখেছি চুরাইল দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি পরা কালো চেহারা। হাতে শাঁখা পরা, চোখ দুটো নীল। টর্চের আলোয় কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও তাকে স্পষ্ট দেখে নিয়েছি। মুখের চেহারা দেখলে রক্ত হিম হয়ে যাবে, মশাই! এই দেখুন না, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

চুরাইলের পায়ের পাতা নাকি উলটো দিকে থাকে?

হুঁ। ঠিক তাই। টর্চের আলো ছিল খুব জোরালো। পা-দুটোও দেখে নিয়েছি না?

যে দুজন লোক চুরাইলের হাতে মার পড়েছে, তারা কে?

যদুবাবু হতাশভাবে একটু হাসলেন। তাদের বাড়িতে তো নিয়ে গিয়েছিলুম কর্নেলকে। একজনের নাম মাধব পাণ্ডে। বাজারের সেরা ব্যবসাদার ছিলেন পাণ্ডেজি। মহাজনি কারবারও ছিল। সুদে টাকা ধার দিতেন অভাবী লোককে। দ্বিতীয়জন হলেন রামনাথ মিশ্র। লোকে বলত মিছিরজি। উনি ছিলেন বড্ড ভালোমানুষ। পাণ্ডেজিরই কর্মচারী উনি।

ওঁরা খুন হয়েছেন কীভাবে?

বোঝা যাচ্ছে না, কেন পাণ্ডেজি অত রাতে বেরিয়েছিলেন। ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভোরবেলা স্টেশনের কাছে মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া যায়। তবে রাতে বাড়ির লোকে তো বটেই, পাশের বাড়ির লোকেরাও চুরাইলের ডাক শুনেছিল। মিছিরজি খুন হন তার পরের রাতে। মিছিরজিও স্টেশনের কাছে একটা বস্তিতে থাকতেন। তাঁরও ঘরের দরজা বাইরে থেকে আটকানো ছিল। পেছনের জঙ্গলে তাঁর মুণ্ডুকাটা লাশ পাওয়া গেছে। তাছাড়া সে-রাতেও ওই বস্তির লোকেরা চুরাইলের ডাক শুনেছিল।

কর্নেল কী বলছেন?

কিছু বলেননি এখনও। ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। লাশ পড়ে থাকা জায়গাটাও দেখলেন। তারপর বললেন,—চলুন ফেরা যাক।

বুঝলুম যদুবাবু খুব হতাশ হয়ে গেছেন কর্নেলের হাবভাব দেখে।

তিন

লাল ঘুঘুর পেছনে সারা দুপুর ঘোরাঘুরি করে কর্নেল ফিরে এলেন বেলা গড়িয়ে। আমার খাওয়াদাওয়া সারা। অবেলায় কর্নেল খেতে বসলেন। বললুম, —এরকম অনিয়ম করলে কিন্তু বেঘোরে মারা পড়বেন। আপনি কি ভাবছেন এখনও বুড়ো হননি?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—বৎস, সাদা দাড়ি মোটেও বার্ধক্যের লক্ষণ নয়। তোমার মতো অনেক যুবকেরও চুলদাড়ি সাদা হয়ে যেতে দেখেছি। ভেবো না; জীবনে দু-একটা দিন দেরি করে খেলে স্বাস্থ্যমশাই তত বেশি চটেন না। যাই হোক, তুমি তৈরি হয়ে নাও। বেরুব।

যদুবাবুর অনিদ্রার রোগ আছে। রাতে ঘুম হয় না বলে দিনে ঘুমোবার চেষ্টা করেন। দশরথ খাবার এনেছিল। যদুবাবুর মা করুণাময়ী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার তদারক করে চলে গেছেন। খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আচ্ছা দশরথ, তোমাদের ছোটবাবু কোথায় গেলেন? আজ ছুটির দিনে তো তাঁর বাড়ি থাকার কথা!

দশরথ বলল,— ছোটবাবুর খোবর ছোটবাবুরই মালুম আছে স্যার! উন্‌হি ওই রোকম আছেন।

কী রকম?

দশরথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে চাপা গলায় বলল,—রাতমে বড়বাবুর সঙ্গে বহুত কাজিয়া কোরেছিলেন। সুবেমে চাও-উও পিয়ে চলে গেলেন তো আভিতক আসলেন না। মাইজির সঙ্গেভি কাজিয়া কোরেন ছোটবাবু!

কেন বল তো?

দশরথ হাসল। রুপেয়াকে লিয়ে। হরঘড়ি রুপেয়া চাইলে কেত্তো রুপেয়া দেবেন বড়বাবু? মাইজিই বা কোথা রুপেয়া পাবেন বলুন স্যার?

রুদ্রবাবু তো চাকরি করেন। মাইনের টাকাতেও কুলোয় না নাকি?

দশরথ মুখ বেজার করে বলল,—ছোড়িয়ে দিন স্যার! ছোটবাবু জুয়াড়ি হোয়ে গেছেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—তাই বল! জুয়া খেললে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি আর থাকে না। কই, এসো জয়ন্ত। আমরা বেরোই।

যদুবাবুর ভাই রুদ্রবাবুর সঙ্গে সকালে আমাদের সৌজন্যমূলক পরিচয় হয়নি। তবে ওঁকে দেখেছিলুম। রোগা গড়নের যুবক। রাগী চেহারা। গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি, পরনে ছিল নেভি-ব্লু প্যান্ট। হাতে স্টিলের বালা। গলায় সরু চেনও দেখেছিলুম।

পোড়োখনি এলাকার দিকে পা বাড়িয়ে কর্নেল বললেন,—যদি রাত্রি পর্যন্ত এদিকে কাটাই, আমার বিশ্বাস চুরাইলের দর্শন পাব। কিন্তু তুমি ভয় পাবে না তো জয়ন্ত?

অবাক হয়ে বললুম,—আপনি কি চুরাইল দেখতেই বেরুলেন?

কর্নেল আস্তে বললেন,—বলা যায় না, যদি দৈবাৎ তার দেখা পেয়ে যাই গতবারের মতো।

মার্চ মাসের এমন সুন্দর বিকেলে চুরাইলের ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। সত্যি বলতে কী, ভূতপ্রেতে আমার কস্মিনকালে বিশ্বাস নেই, যদিও ভূতের ভয় আমার আছে। কিন্তু কর্নেল গতবছর স্বচক্ষে পোড়োখনির পেত্নিটাকে দেখেছেন বলছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যায় না।

কর্নেল মাঝেমাঝে বাইনোকুলার তুলে এদিকে-ওদিকে কী দেখছেন। এখনও দিনের আলো আছে। কাজেই নিশ্চয় লালঘুঘুর ঝাঁক দেখছেন। একখানে হঠাৎ থেমে বললেন,—জয়ন্ত, করাড়ি রোটি কোন গুহায় ছিল চিনতে পারবে কী?

বললুম,—মনে হচ্ছে, বাঁদিকে যেতে হবে। ওই যে ঝোপগুলো দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত তার কাছাকাছি।

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখলুম, পিঙ্কি হাতে একটা প্রকাণ্ড রঙিন বল নিয়ে একটা ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়াল। তারপর বলটা ছুড়ে দিল। তখন ওর কুকুরটাকেও দেখতে পেলুম। অবাক হয়ে গেলুম ওর সাহস দেখে। কুকি বলটাকে কামড়ে ধরে ওর কাছে বয়ে আনার চেষ্টা করছে। বলটা বারবার মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে। কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—মেয়েটি সত্যি খুব সাহসী।

ডাকলুম, 'পিঙ্কি! পিঙ্কি!'

পিঙ্কি একবার ঘুরে দেখল। তারপর একহাতে বল, অন্যহাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে দৌড়তে শুরু করল। একটু পরে দুজনেই কোথাও উধাও হয়ে গেল। বললুম,—মেয়েটির জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, কর্নেল! কখন না কোন্ বিপদে পড়ে!

কর্নেল সেকথায় কান না দিয়ে বললেন,—করাড়ি রোটির গুহাটা খুঁজে বের করো, জয়ন্ত!

খুঁজে পেতে দেরি হল না। কর্নেল পকেট থেকে টর্চ বের করে বললেন,—তুমি এখানে বসে অপেক্ষা করো জয়ন্ত। আমি ভেতরটা দেখে আসি।

আঁতকে উঠে বললুম,—সে কী! আপনি ওর ভেতর ঢুকে কী করবেন?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—করাড়ি রোটি খেলে মানুষ পালোয়ান হয়ে যায়, ডার্লিং!

কিন্তু ভেতরে যদি ভালুকটা থাকে?

তার সঙ্গে ভাব জমাবার মন্ত্র আমার জানা আছে। এই বলে কর্নেল কুয়োর মতো গর্তটাতে নেমে গেলেন। তারপর টর্চ বাগিয়ে সুড়ঙ্গের ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলেন।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হচ্ছে, এক্ষুনি হয়তো দেখব কর্নেল ভালুকের আঁচড় খেয়ে রক্তারক্তি হয়ে এবং কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ফিরেছেন। না, ভালুকের হাতে ওঁর মারা পড়ার কথা ভাবছি না। কারণ ওঁর কাছে রিভলবার আছে। কিন্তু ভালুকমশাই রুটিচোরকে একটু শিক্ষা না দিয়ে কি ছাড়বে?

তারপর আর কর্নেলের ফেরার নাম নেই। বেলা পড়ে এল। টিলাগুলোর ওধারে সূর্য অস্ত গেল। কুয়াশা ঘনিয়ে এল চারদিকে। ক্রমে আঁধার জমল। কর্নেল ফিরছেন না। অস্বস্তিতে বুক কাঁপছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কোথাও দেখলুম না। নিশ্চয় মেয়েটা এতক্ষণ তার কুকুরটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে। দুরুদুরু বুকে ভাবছি কী করব। আমার সঙ্গেও টর্চ, রিভলবার আছে। ঢুকব নাকি ভেতরে? কিন্তু ঠিক তখনই বাঁদিকে খুব কাছেই এক বিকট চিৎকার শুনতে পেলুম।

ঘুরে কিছু দেখতে পেলুম না। অন্ধকারে কেউ ওই বিদঘুটে আর্তনাদ করে চলেছে। কাঁপাকাঁপা একটানা চেরা গলার চিৎকার—বিপদজ্ঞাপক সাইরনের মতো। অমনি শরীর হিম হয়ে গেল। এ তো চুরাইলেরই চিৎকার! কর্নেল ঠিক এমনি একটা বর্ণনা দিয়েছিলেন।

আড়ষ্ট হাতে টর্চের বোতাম টিপলুম। একঝলক আলো ছড়িয়ে গেল। তারপর দেখতে পেলুম পোড়োখনির পেত্নিটাকে। কালো কুচকুচে গড়ন। মানুষের মতো—কিংবা আদতে মানুষের মতো নয়ই, আমার চোখের ভুল হতেও পারে। কী হিংস্র তার মুখ আর নিষ্পলক নীলচে দুটো চোখ! তার পায়ের পাতা সত্যি উলটো ঘোরানো কিনা দেখার চেষ্টা করতেই সে আবার চেঁচিয়ে উঠল —আঁ আঁ আঁ আঁ .... ই ই ই ইঁক! এমন অমানুষিক চিৎকার কোনো প্রাণীর নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

টর্চের আলোয় তাকে এগিয়ে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বের করলুম। তার দিকে তাক করে ট্রিগারে চাপ দিলুম। রিভলবারটা অটোমেটিক। কিন্তু আশ্চর্য গুলি বেরুল না। ঘাবড়ে গিয়ে আবার ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবারও গুলি বেরুল না। অমনি মনে পড়ল, অটোমেটিক বলে রিভলবারে গুলি ভরে রাখিনি। কারণ দৈবাৎ গুলি ছুটে যাবার ভয় থাকে।

ততক্ষণে চুরাইলটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। পকেট থেকে গুলি বের করতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে টর্চটা হাত থেকে পড়ে গেল এবং নিবে গেল। এবার মনে হল অন্ধকারে ডুবে গেছি। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গুলিগুলো ভরে ট্রিগারে চাপ দিলুম। এবার রিভলবারটা গর্জে উঠল। পর পর দুটো গুলি ছোড়ার পর চুরাইলের চিৎকার থেমে গেল। মারা পড়েছে ভেবে সাহসী হয়ে পা বাড়াচ্ছি, কেউ শিস দিল কোথাও। সেই সময় আমার পিছনে কর্নেলের ডাক শুনতে পেলুম, —জয়ন্ত! জয়ন্ত!

চেঁচিয়ে বললুম,—টর্চ জ্বালুন শিগ্‌গির। পেত্নিটাকে আমি গুলি করে মেরেছি।

কর্নেলের হাসি শোনা গেল। পেত্নিকে কখনও গুলি করে মারা যায় না ডার্লিং!

আঃ! টর্চ জ্বালুন না কেন?

তোমার টর্চ কী হল?

কোথায় পড়ে গেছে।

আমার টর্চটা কেউ খনিগুহার ভেতর কেড়ে নিয়েছে।

কর্নেল কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললুম,—সে কী! কেড়ে নিয়েছে মানে?

কর্নেল চুরুট ধরালেন লাইটার জ্বেলে। তারপর বললেন,—খনিটা ছিল ডলোমাইটের। ভেতরটা বেশ চওড়া। এপাশে-ওপাশেও অনেক খোঁদল আছে। করাড়ি রোটি খুঁজছি, হঠাৎ কে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল। টর্চটা ছিটকে পড়ে নিবে গেল। উঠে আর খুঁজেই পেলুম না। লাইটারের আলোয় কোনোরকমে বেরিয়ে এলুম। এসে দেখি, চুরাইলের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ চলছে।

আমিও সিগারেট ধরালুম। তারপর লাইটারের আলোয় কয়েক পা এগিয়ে টর্চটা খুঁজে পেলুম। টর্চের আলোয় নিরাশ হয়ে দেখলুম কোথাও গুলিবিদ্ধ চুরাইল পড়ে নেই। একফোঁটা রক্তও নেই। ভূতপেত্নিদের হয়তো রক্ত থাকার কথা নয়। গুলি তাদের গায়ে লাগারও কথা নয়। তবে আওয়াজে তারা ভয় পেতেও পারে। বললুম,—ব্যাপারটা কী হতে পারে বলুন তো কর্নেল?

কোন্ ব্যাপারটা?

চুরাইল?

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন,—নিছক পেত্নি ছাড়া কিছু নয়, সে তো বুঝতেই পারছ।

কিন্তু আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, ভূতপেত্নি বলে সত্যি কিছু থাকতে পারে।

স্বচক্ষে দেখেও? কর্নেল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললেন,—যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এ-তল্লাটে ঘোরাঘুরি করাতে চুরাইলের ভীষণ আপত্তি আছে। তাই সে ভয় দেখাতে এসেছিল।

চারদিকে ভয়ে-ভয়ে আলো ফেলে আমরা হাঁটছিলুম। হাতে রিভলবারও তৈরি। কর্নেলের কথার জবাবে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না।

কর্নেল টর্চের আলোয় একটুকরো লাল রঙের ছেঁড়া কাপড় দেখিয়ে বললেন,—আমাকে ধাক্কা মারতেই আমিও তাকে ধরার চেষ্টা করেছিলুম। তার পরনের কাপড়ের এই টুকরোটা আমার হাতে থেকে গেছে। তুমি বলেছিলে, সাধুবাবার পরনে লাল কাপড় দেখেছ। কাজেই সে সেই সাধু ছাড়া আর কে হতে পারে? সম্ভবত অন্য কোনো সুড়ঙ্গ দিয়ে ওখানে যাওয়া যায়। সে আমাকে ফলো করেছিল অন্যদিক থেকে।

আমার মাথায় চমক খেলে গেল। বললুম,—কর্নেল! অনেক তান্ত্রিক সাধু প্রেতসিদ্ধ হন শুনেছি। তাঁদের নাকি পোষা ভূতপ্রেত থাকে। চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটা ওই সাধুর পোষা নয় তো?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন,—তাহলে এতদিনে তুমি স্বীকার করলে যে ভূতপ্রেত সত্যি আছে?

কী জানি! কিন্তু আপনিও তো ওসবে বিশ্বাস করেন না!

কর্নেল হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন,—আলবাত করি। কে বলল করি না?

তারপর ডানদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তেমনি চড়া গলায় বলে উঠলেন, কী রুদ্রবাবু! এখানে কী করছেন—অন্ধকারে?

টর্চের আলো সেদিকে ফেলে দেখি,যদুবাবুর ছোটভাই রুদ্রনারায়ণ একটা পাথরের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। খেঁকিয়ে উঠলেন একেবারে,—আঃ! আলো নেবান তো মশাই!

টর্চ নিবিয়ে দিলুম। কর্নেল বললেন,—আসুন! বাড়ি যাবেন না?

না।

আহা! খামোকা বাড়ির লোকের ওপর রাগ করে আর কী হবে রুদ্রবাবু? তাছাড়া এখানে অন্ধকারে বসে থাকাও তো বিপজ্জনক। একটু আগে আপনি কি চুরাইলের ডাক শোনেননি?

রুদ্রবাবু আরও খেঁকিয়ে উঠলেন,—যান মশাই! আপনাদের আর ভালোমানুষি করতে হবে না! আমাকে চুরাইল দেখাচ্ছেন! নিজেদের মাথা বাঁচান আগে—তারপর কথা বলতে আসবেন!

কর্নেল আর কথা বাড়ালেন না। বললেন,—চলো জয়ন্ত! রুদ্রবাবু ভীষণ চটে আছেন মনে হচ্ছে।

ওঁদের বাগানের কাছাকাছি যেতেই লণ্ঠন হাতে দশরথকে দেখা গেল। আমাদের দেখে সে আশ্বস্ত হল। তার হাতে একটা বল্লমও দেখতে পাচ্ছিলুম। বলল,—বড়বাবু আপনাদের লিয়ে বহত্ শোচ করছেন স্যার। পিস্কিদিদি বলল কী, কর্নিল স্যারদের খনির অন্দরে ঘুসতে দেখেছে। ঔর আপনারা এত্তা দেরি করলেন!

বুঝলুম, দশরথের ইচ্ছে ছিল না আমাদের খুঁজতে যাওয়ার। কর্তাবাবুর চাপে পড়ে তাকে বেরুতে হয়েছে। সে যে ভীষণ ভীতু মানুষ, তাতে সন্দেহ নেই।

যদুবাবু অপেক্ষা করছিলেন ব্যস্তভাবে। বললেন,—খুব ভাবছিলুম কর্নেল! এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে শুনুন। মায়ের আলমারি থেকে একটা পুরনো দলিল চুরি গেছে। আপনি আমার বাবার খনির দলিল দেখতে চেয়েছিলেন। ওই দলিলটাও তার মধ্যে ছিল। মা বলছেন, এ নিশ্চয় রুদ্রের কাজ। রুদ্রের সঙ্গে এ-নিয়ে আমারও একচোট হয়ে গেল। বাবু রাগ করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—রুদ্রবাবুকে মাঠে বসে থাকতে দেখে এলুম।

যদুবাবু বাঁকা মুখে বললেন,—চুরাইলের পাল্লায় পড়লেই বাছাধন টের পাবে! তারপর দশরথকে চায়ের হুকুম দিয়ে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন।

কর্নেল বললেন,—ও দলিল রুদ্রবাবু কী করবেন?

যদুবাবু চাপা গলায় বললেন,—আপনাকে বলেছিলুম, ওই দলিলটা আনরেজিস্টার্ড। নন্দলাল ওঝা নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন বাবার খনিব্যবসার পার্টনার। নন্দবাবু নিজের একার নামে একটা পোড়োখনি কিনেছিলেন আরেকজনের কাছে। কেন কিনেছিলেন জানি না। পরে যখন সব খনি অ্যাবান্ডান্ড্ হয়ে গেল, বাবার মাথায় কেন কে জানে ঝোঁক চাপল, নন্দবাবুর কেনা সেই প্রাচীন অ্যাবান্ডান্ড্ খনিটা কিনতে চাইলেন। নন্দবাবু কিছুতেই বেচতে রাজি নন। বাবাও ছাড়বেন না। অবশেষে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম হাঁকলেন নন্দবাবু। বাবা তাই দিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে আজও রহস্য। যাই হোক, পরদিন রেজেস্ট্রি হওয়ার কথা। রাতে হঠাৎ নন্দবাবু ভেদবমি হয়ে মারা গেলেন। দলিল আর রেজেস্ট্রি করা হল না। কিন্তু এ দলিল চুরি যে রুদ্রই করেছে, তাতে ভুল নেই। সে বরাবর মায়ের ওই দলিলটা চাইত। বলত, তার দরকার আছে। কী দরকার সেই জানে। আমার সঙ্গে তো ভালো করে কথাবার্তাই বলে না।

নন্দবাবুর ছেলেপুলে আছে কি?

নন্দবাবু ছিলেন উড়নচণ্ডী স্বভাবের লোক। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর সেই ভদ্রমহিলা কলকাতায় দাদার কাছে চলে যান। যতদূর জানি, তাঁর কোনো ছেলেপুলে নেই।

নন্দবাবুর আর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না ভৈরবগড়ে?

এক পিসতুতো না মাসতুতো দাদা ছিলেন। তিনি তো বছর আষ্টেক আগে নিরুদ্দেশ।

কী নাম ছিল ভদ্রলোকের?

যদুবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—পান্নাবাবু।

কর্নেল বললেন,—সেই পোড়োখনিটা কোথায় আপনি কি জানেন?

যদুবাবু মাথা দোলালেন,—না। বাবার এক উদ্ভট খেয়াল ছাড়া আর কী বলব? নিজেদের সব খনি অ্যাবান্ডান্ড্ হয়ে গেল। আবার একটা অ্যাবান্ডান্ড্ খনি কিনে বসলেন পঞ্চাশ হাজার টাকায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার, না?

খনিটা কোথায়, দলিলটা দেখতে পেলে জানা যেত। কর্নেল চিন্তিতভাবে বললেন। সমস্যা হল যে দলিলটা আনরেজিস্টার্ড। কাজেই রেজেস্ট্রি অফিসে তার কপি মিলবে না।

এতক্ষণে বললুম,—পোড়োখনির ভেতর কোনো দামি জিনিস—ধরুন গুপ্তধন লুকোনো ছিল না তো?

যদুবাবু নড়ে বসলেন। ঠিক, ঠিক। কী আশ্চর্য! এ-কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি! আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন জয়ন্তবাবু! ইশ্, কেন যে দলিল থেকে ওই পোড়োখনির সীমানা-চৌহদ্দি টুকে রাখিনি!

দশরথ চা এনে দিল। তারপর গাল চুলকে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল,—করাড়ি রোটি মিলা হ্যায় স্যার?

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে সত্যি সত্যি একটুকরো করাড়ি রোটি বের করে ওকে দিলেন। দশরথ সেটা ভক্তিভরে দুহাতে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। তারপর খুশি হয়ে বেরিয়ে গেল। যদুবাবু বললেন,—এখানকার লোকের এই এক অদ্ভুত বিশ্বাস! ওই কুৎসিত পদার্থটা খেলে নাকি বুড়োরাও যুবকের শক্তি ফিরে পায়। তবে দশরথ করাড়ি রোটি খেলে কী হবে? গাঁজা খায় যে! গাঁজা ওটার সব গুণ নষ্ট করে দেবে।

দশরথ বাইরে থেকে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল,—রামজির কিরিয়া বড়বাবু! হামি কভি গাঁজা পিই না।

যদুবাবু ধমক দিয়ে বললেন,—খাস না! তাই রাতে ডাকলে তোর সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না!

একটু পরে চা খেতে খেতে বললুম,—কর্নেল, নন্দবাবুর সেই পোড়োখনিটাতে গুপ্তধন থাকার ব্যাপারে আপনার কী মতামত, এখনও বলেননি কিন্তু!

কর্নেল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন, সেই সময় বাইরে পায়ের ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল। তারপর কেউ দৌড়ে বারান্দায় উঠল। যদুবাবু বললেন,—কে? কে? বাইরের লোকটা সশব্দে আছাড় খেল যেন। কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। এই সময় দশরথের চাপা আর্তনাদ শোনা গেল, হায় রাম! এত্তা খুন!

বাইরের আলোটা মিটমিটে। আমরা হন্তদন্ত বেরিয়ে দেখি, বারান্দায় রুদ্রবাবু পড়ে আছেন। তাঁর গলার কাছে ক্ষতচিহ্ন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে। যদুবাবু হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, রুদ্র! রুদ্র! কে তোর এ দশা করল রে? তারপর হাঁউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন ছেলেমানুষের মতো।

কর্নেল রুদ্রবাবুর দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, রুদ্রবাবু! কে আপনাকে মেরেছে?

রুদ্রবাবু অতিকষ্টে বললেন,—বিশ্বাসঘাতক! তারপর তাঁর শরীর স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। বুঝলুম, বেচারার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। আর ঠিক তখনই বাগানের গাছপালার ওদিকে কোথাও সেই চুরাইলের ডাক শোনা গেল ... আঁ—আঁ—আঁ—ই—ই—ইক!

একটা প্রচণ্ড বিভীষিকার রক্ত-হিম-করা আতঙ্ক আমাদের কয়েক মুহূর্তের জন্য নিঃসাড় করে ফেলল।

চার

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্ত করে মর্গে লাশ চালান দিয়েছিল। পুলিশের হাবভাবে বুঝেছিলাম, দায়সারা করে চোর-ডাকাতের ওপরই ব্যাপারটা চাপাতে চায়। কর্নেলকে মোটেও পাত্তা দেয়নি পুলিশ। সকালে দশরথ চা এনে যখন আমার ঘুম ভাঙাল, তখন আটটা বেজে গেছে। উঠে দেখলুম, কর্নেল নেই। দশরথ বলল,—কর্নেল স্যার সুবেসে বেরিয়েছেন। কুছু বোলেননি।

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। জিজ্ঞেস করলে বললেন,—মর্গে গিয়েছিলুম। মর্গের ডাক্তারের মতে, পাণ্ডেজি আর মিছিরজির মতো কেউ রুদ্রবাবুর মুণ্ডু কাটার চেষ্টা করেছিল।

বললুম,—রুদ্রবাবু মৃত্যুর আগে 'বিশ্বাসঘাতক' বলেছেন কর্নেল। ব্যাপারটা রহস্যময় নয়?

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন,—তা তো বটেই! তবে পুলিশ বলছে, খুনী রুদ্রবাবুর পরিচিত লোক। আর খুনের উদ্দেশ্য হল ছিনতাই।

অবাক হয়ে বললুম,—ছিনতাই! উনি কি ওই মাঠে টাকাকড়ি নিয়ে বসেছিলেন?

হ্যাঁ। কারণ আজ ভোরে পুলিশ ইন্সপেক্টর পরমজিৎ সিং পোড়োখনির ওখানে কোথায় রক্তমাখা একশো টাকার নোটের বান্ডিল কুড়িয়ে পেয়েছেন। ছিনতাই করে পালাবার সময় খুনীর হাত থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।

অত টাকা নিয়ে ওখানে কী করছিলেন রুদ্রবাবু? পেলেনই বা কোথায় অত টাকা?

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—এমনও তো হতে পারে, খুনীরই টাকা ওগুলো। অর্থাৎ রুদ্রবাবু সেই দলিলটা চুরি করে তাকেই বেচতে গিয়েছিলেন। দলিল হাতিয়ে এবং টাকা মিটিয়ে হঠাৎ খুনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রুদ্রবাবু আহত অবস্থায় কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু টাকার বান্ডিলটা পড়ে যায়।

তাও হতে পারে বৈকি।

কর্নেল কিছুক্ষণ গুম হয়ে সাদা দাড়ি টানতে শুরু করলেন। বুঝলুম, সূত্র হাতড়াচ্ছেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এসো জয়ন্ত, আমরা একবার পাণ্ডেজির গদি থেকে ঘুরে আসি।

রাস্তায় যেতে যেতে বললুম,—কিন্তু একটা রহস্য কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্রবাবুর পিছন পিছন চুরাইল বা শাঁখচুন্নিটাও ছুটে এসেছিল। তার চিৎকার আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। এখন কথা হল ...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আরও জট পাকিয়ে যাবে, ডার্লিং! এখন সবচেয়ে দরকারি কাজ হল মাথা ঠাণ্ডা রাখা। চুরাইল-রহস্য নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত শুধু হত্যাকাণ্ডের দিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে চাই।

ভিড়ে ভরা বাজার এলাকা ছাড়িয়ে আমরা স্টেশনে পৌঁছলুম। পাণ্ডেজির গদি স্টেশনের ওধারের। ওদিকটায় চুন-সুরকির আড়ত, কাঠগোলা, ছোট কলকারখানা। আর কিছু চা-সিগারেটের দোকান আছে। একখানে প্রকাণ্ড তরাজুতে খদ্দের বস্তা বোঝাই হচ্ছে। কর্নেলকে দেখতে পেয়ে একজন ফর্সা সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক উঁচু তক্তপোশ থেকে নেমে এসে নমস্কার করলেন। কর্নেল পরিচয় করিয়ে দিলেন, পাণ্ডেজির জামাই মোহনবাবু। মোহনবাবু পরিষ্কার বাংলা বলেন। খুব খাতির করে বসালেন। চা-সন্দেশ এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কর্নেল বললেন,—মোহনজি, আপনাকে পুরনো খাতাপত্র দেখতে বলেছিলুম গতকাল। দেখেছেন কি?

মোহনজি পেছনের তাক থেকে একটা প্রকাণ্ড পুরনো খাতা নামিয়ে বললেন,—দেখেছি কর্নেল। শ্বশুরমশাই নিজে এই খাতাটা লিখতেন। এটা ওঁর মহাজনি কারবারের খাতা। এই দেখুন, এই পাঁচজন খাতকের নাম আমি খুঁজে বের করেছি। এঁরা প্রত্যেকেই মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন। এখনও কারুর কারুর বাকি আছে।

খাতার ভেতর থেকে একটা চিরকুট বের করে দিলেন মোহনজি। কর্নেল সেটা দেখতে থাকলেন। উঁকি মেরে দেখলুম, নামগুলো ইংরেজিতে লেখা। সাত নম্বর নামটা দেখে চমকে উঠলুম। রুদ্রনারায়ণ দেব—তিন হাজার টাকা। সুদের হার শতকরা মাসে তিরিশ টাকা। পুরোটাই বাকি।

কর্নেল বললেন,—হ্যান্ডনোটগুলো পেয়েছেন মোহনজি?

মোহনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ছখানা পেয়েছি। একখানা পাইনি। মনে পড়ছে, ওই হ্যান্ডনোটখানার জন্য শ্বশুরমশাই মিছরজিকে খুব বকাবকি করছিলেন। মিছরজিকে উনি খুব বিশ্বাস করতেন তো! আলমারির চাবি অনেক সময় মিছিরজির কাছেও থাকত।

কর্নেলের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। বললেন,—কবে বকাবকি করছিলেন মনে আছে?

এই তো—যে-রাতে শ্বশুরমশাই খুন হলেন, তার আগের দিন।

মিছিরজি খুন হল তার পরের রাতে। তাই না?

হ্যাঁ। মোহনবাবু একটু অবাক হলেন যেন। বললেন,—আপনি কি মনে করছেন হ্যান্ডনোট হারানোর সঙ্গে ওঁদের খুন হওয়ার সম্পর্ক আছে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মোহনবাবুকে উত্তেজিত দেখাল। কিন্তু আমিও যে সে-রাতে চুরাইলের ডাক শুনেছিলাম, কর্নেল! কাল রাতে যদুবাবুর ভাইয়ের বেলাতেও শুনলুম নাকি চুরাইল ডেকেছিল!

হ্যাঁ। ডেকেছিল। আমিও শুনেছি।

মোহনবাবু আরও উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বললেন,—তাছাড়া শ্বশুরমশাইয়ের ডেডবডিতে যেমন, তেমনি মিছিরজির ডেডবডিতেও একফোঁটা রক্ত ছিল না। মর্গের রিপোর্টেও সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি স্থানীয় বুড়োবুড়িদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, চুরাইল নাকি মানুষের মুণ্ডু ছিঁড়ে গলা থেকে রক্ত চুষে খায়। রুদ্রবাবুর বেলায় অবশ্য মুণ্ডু ছিঁড়ে রক্তচোষার সুযোগ পায়নি শুনেছি। তবে গলায় নখ বসিয়ে মুণ্ডু ছিঁড়তে চেষ্টা করেছিল। তাই কিনা বলুন?

কর্নেল আস্তে বললেন,—ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এবার বলুন, এই তালিকার কোন্ খাতকের হ্যান্ডনোট পাওয়া যায়নি।

মোহনবাবু তালিকার একটা নামে ডটপেনের চিহ্ন দিয়ে বললেন,—এঁর। কিন্তু সমস্যা হল, ইনি পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন বছর-দশেক আগে। সুদে-আসলে এখন দাঁড়িয়েছে ... মাই গুডনেস! হিসেবে ভুল হয়নি তো?

কর্নেল দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন,—না। মাসেই যদি শতকরা তিরিশ টাকা সুদ হয়, তাহলে একমাসে পাঁচ হাজার টাকার সুদ হবে পনেরো'শ টাকা। বছরে আঠারো হাজার টাকা। দশ বছরে দাঁড়াবে একলক্ষ আশি হাজার টাকা। সুদসহ ১,৮৫,০০০ টাকা। সহজ হিসেব।

মোহনবাবু হতাশ মুখে হাসলেন। কিন্তু খাতক ভদ্রলোকই তো সেই থেকে নিরুদ্দেশ।

আমার মাথায় গতরাতে যদুবাবুর কাছে শোনা একটা নাম ঝিলিক দিল। বলে ফেললুম,—সেই খনিমালিক নন্দনবাবুর পিসতুতো না মাসতুতো দাদা পান্নাবাবু নন তো?

মোহনবাবু বললেন,—ঠিক, ঠিক। পান্নালাল ওঝা। আমি তাঁকে কখনও দেখিনি। কারণ আমার বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক আগে। তাছাড়া থাকতুম ধানবাদে। গতবছর শ্বশুরমশাইয়ের অনুরোধে ওঁর ব্যবসার দেখাশুনা করতে এসেছি।

ওপাশে একজন বৃদ্ধ কর্মচারী খাতা লিখতে-লিখতে আমাদের কথা শুনছিলেন। বললেন,—পান্নাবাবুর কন্ট্রাকটারি কারবার ছিল। লেবার সাপ্লাই করতেন। সেবার কারবারে লস খেয়ে বিপদে পড়েছিলেন। পাণ্ডেজি সেদিন ওঁকে পাঁচ হাজার টাকা না দিলে লেবাররা ওঁকে মেরে ফেলত। মজুরি মেটাতে পারছিলেন না।

কর্নেল বললেন,—পান্নাবাবুর চেহারা কেমন ছিল?

বৃদ্ধ কর্মচারীটি বাঙালি। বললেন,—রোগা, ঢ্যাঙা মতো। রঙটা বেশ ফর্সা। চোখ দুটো ছিল খয়রা—যাকে বলে বেড়ালচোখো।

কর্নেল মোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন,—পাণ্ডেজি টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেননি?

সেই বাঙালি কর্মচারী ভদ্রলোক বললেন,—জামাইবাবু জানেন না। মামলা করেছিলেন পাণ্ডেজি। দেওয়ানি মামলা, তাতে অন্যপক্ষ গরহাজির। শেষে পাণ্ডেজি প্রতারণার মামলা করেছিলেন। পান্নাবাবুর নামে হুলিয়া জারি হয়েছিল। কিন্তু ওঁকে পুলিশ খুঁজে পায়নি।

মোহনবাবু বললেন,—আশ্চর্য, শ্বশুরমশাই এ-কথাটা তো বলেননি!

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—চলি মোহনজি! দরকার হলে আবার আসব।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে কর্নেল বললেন,—এসো তো জয়ন্ত, আমরা রেললাইন ধরে পোড়োখনি এলাকায় যাই। দিনদুপুরে আশা করি চুরাইলটার আবির্ভাব ঘটবে না।

পোড়োখনির উত্তর-পূর্বে জঙ্গল আর টিলার ভেতর দিয়ে রেললাইনটা ঘুরে গেছে ধানবাদের দিকে। কিছুক্ষণ পরে আমরা রেললাইন থেকে নেমে একটা টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে থাকলুম। এদিকটায় অজস্র খানাখন্দ, বড়-বড় পাথর, লালমাটির ঢিবি আর ঝোপঝাড়। এক জায়গায় গিয়ে কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। বললাম,—কী?

কর্নেলকে উত্তেজিত মনে হল। চাপা গলায় বললেন, —আরে! সাধুবাবা যে!

চমকে উঠে বললুম—কই, কই?

কর্নেল আচমকা হ্যাঁচকা টানে আমাকে বসিয়ে দিলেন এবং নিজেও বসলেন। ফিসফিস করে বললেন,—এসো, আমরা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাই। সাবধান, যেন সাধুবাবা দেখতে না পায়।

সাধুবাবাকে আমি দেখতে পাইনি। কর্নেলের পেছনে-পেছনে ছোটবড় পাথর, ঝোপঝাড় আর ঢিবির আড়ালে অন্ধের মতো প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। প্রকাণ্ড একটা পাথর দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে। পাথরটার একপাশে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে হাঁটু দুমড়ে বসে কর্নেল ঝোপের ভেতর উঁকি দিলেন। দেখাদেখি আমিও উঁকি দিলুম। একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল।

লাল-কাপড়-পরা সেই সাধুবাবা যেন পিঙ্কির কুকুর কুকির সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও পিঙ্কি নেই।

পিঙ্কি নেই। অথচ কুকি আছে! ব্যাপারটা আমার গোলমেলে মনে হল। কিন্তু ওকি সত্যি লুকোচুরি খেলা? কুকি পাথরের আড়ালে লুকোতেই সাধুবাবা একটুকরো পাথর তুলে ছুড়ে মারলেন। কুকি আবার আরেকটা পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল। সাধুবাবার মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলুম। রাগে খেপে গেছেন যেন। আবার পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারলেন। অল্পের জন্য কুকি বেঁচে গেল। এবার সে আমাদের দিকে দৌড়তে শুরু করল। সাধুবাবা তাড়া করে আসতেই একটা খাদে আছাড় খেয়ে পড়লেন। খাদটা গভীর বলে মনে হল। ততক্ষণে কুকি যেন আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে। সে সোজা এসে ঝোপে ঢুকল। কর্নেল মৃদু শিস দিলেন। কুকি থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে একটা ছোট্ট হ্যান্ডব্যাগ রয়েছে। কর্নেল আবার শিস দিলে সে কাছে চলে এল। কর্নেল তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখের হ্যান্ডব্যাগটা ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, —শিগগির জয়ন্ত! সাধুবাবাকে এখনই ধরে ফেলতে হবে!

ঝোপ থেকে বেরিয়ে গেলুম। কর্নেল আমার পিছনে। তাঁর কোলে কুকি। সাধুবাবা এতক্ষণে গর্ত থেকে উঠেছেন। কিন্তু আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। আমি রিভলবার বের করে চেঁচিয়ে বললুম,—খবরদার সাধুবাবা! পালাবার চেষ্টা করলে গুলি ছুঁড়ব।

সাধুবাবা অমনি দৌড়ে গিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। আমিও দৌড়লুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে আর তাঁর পাত্তা পেলুম না। আশেপাশে খোঁজাখুঁজি করে হন্যে হয়ে কর্নেলকে ডাকলুম। একটু তফাতে কর্নেল কোনো অদৃশ্য জায়গা থেকে সাড়া দিয়ে বললেন,—এখানে চলে এসো জয়ন্ত!

একটা পোড়োখনির মুখই হবে। বিরাট গর্ত। সেই গর্তে কি কর্নেল সাধুবাবার মতো পা হড়কে পড়ে গেছেন? কাছে গিয়ে দেখি, আরও অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটেছে। গর্তের ভেতর বেচারি পিঙ্কির মুখ একটুকরো লাল কাপড়ে বাঁধা। দু'হাত এবং পা-দুটো লতা দিয়ে বাঁধা। কুকি তার দিকে যেন অবাক চোখে তাকিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল তার বাঁধন কেটে দিচ্ছেন ছুরি দিয়ে।

কর্নেল বললেন,—আমরা না এসে পড়লে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত, ভেবে শিউরে উঠছি জয়ন্ত!

পিঙ্কি কিন্তু মোটেও ঘাবড়ে যায়নি। দিব্যি উঠে দাঁড়াল। তারপর কুকিকে কোলে নিয়ে দুবার তার গালে চড় মারল,—আর যদি কখনও গুহায় ঢুকিস, তোকে মেরে ফেলব বলে দিচ্ছি!

কর্নেল তাকে ওপরে তুলে ধরলেন। আমি টেনে নিলুম। তারপর কর্নেলকে উঠতে সাহায্য করলুম। কর্নেল পিঙ্কির কাঁধে হাত রেখে বললেন,—তোমাকে সাধুবাবা কেন বেঁধে রেখেছিল, পিঙ্কি?

পিঙ্কি বলল,—কুকি সাধুবাবার ব্যাগ নিয়ে এসেছিল গুহার ভেতর থেকে। সাধুবাবা ওর পেছন-পেছন এসে আমাকে বলল, পিঙ্কি, তোর কুকুর আমার ব্যাগ চুরি করেছে। পিঙ্কি হাসতে লাগল। আমি বললুম, সাধুবাবা! তুমি পারো তো ওর কাছে চেয়ে নাও। তখন সাধুবাবা রেগে গেল। গিয়ে চোখ কটমট করে বলল—তোকে চুরাইল দিয়ে খাওয়াব। তারপর আমার মুখ বেঁধে দিল।

তুমি বাধা দাওনি?

পিঙ্কি খিলখিল করে হাসল। কেন? সাধুবাবার সঙ্গে আমার খুব ভাব যে! রোজ দেখা হয়। কত গল্প বলে। আমার সঙ্গে তো জোক করেছে সাধুবাবা!

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—জোক্ নয়, পিঙ্কি! সাধুবাবা তোমাকে সত্যি চুরাইলের সমানে ঠেলে দিত। আর কখনো সাধুবাবার কাছে এসো না।

পিঙ্কি মুখে অবিশ্বাস ফুটিয়ে বলল,—যাঃ!

কর্নেল বললেন,—সাধুবাবা কোন গুহায় থাকেন তুমি জানো?

পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে বলল,—হুঁ। বলে সে চেঁচিয়ে ডাকল, সাধুবাবা! সাধুবাবা! কোথায় তুমি?

অমনি আমাদের সামনে একটা পাথর এসে পড়ল। কর্নেল বললেন,—শিগগির এখান থেকে কেটে পড়াই ভালো, জয়ন্ত। পিঙ্কি, চলো! সাধুবাবা পাথর ছুঁড়তে শুরু করেছে।

পিঙ্কিকে টানতে টানতে কর্নেল দৌড়লেন। কুকি তার কোল থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করছিল। কিন্তু পিঙ্কি কুকিকে ছাড়ল না। এদিকে দুমদাম করে পাথর এসে পড়ছে ঢিবির আড়াল থেকে। ফাঁকা মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় পৌঁছে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে এবার পিঙ্কিদের বাড়ির পথ ধরলুম। কর্নেল বললেন,—পিঙ্কি, ওবেলা তোমাকে নিয়ে আসব। তখন সাধুবাবার গুহাটা দেখিয়ে দেবে। এখন সাধুবাবা বড় চটে গেছে। পিঙ্কি মাথা দুলিয়ে সায় দিল ...

পাঁচ

সাধুবাবার হ্যান্ডব্যাগটার দশা জরাজীর্ণ। খুলতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। প্রথমে বেরুল নন্দবাবুর সেই পোড়োখনি বিক্রির আন রেজিস্টার্ড দলিল। দলিলে রক্তের ছোপ লেগে আছে। কাল রাতে, রুদ্রবাবুর কাছ থেকে এটা নেওয়া হয়েছিল।

তারপর বেরুল পাণ্ডেজির হারানো হ্যান্ডনোট। পান্নালাল ওঝার সই করা। পাঁচ হাজার টাকা কর্জ নিচ্ছেন পান্নাবাবু শতকরা মাসিক তিরিশ টাকা সুদে। আর বেরুল কিছু কাগজপত্র। বললুম, —তাহলে পোড়োখনির সাধুবাবাই দেখছি পান্নালাল ওঝা।

কর্নেল বললেন,—আবার কে? দেনা আর প্রতারণার মামলায় ফেরার হয়ে পান্নালাল পোড়োখনির ভেতর কোনো গুহায় আত্মগোপন করেছিল,আমার ধারণা ...

কথায় বাধা পড়ল। যদুবাবা আর মোহনজি এলেন। মোহনজি ঘরে ঢুকে বললেন,—শ্বশুরমশাইয়ের একটা নোটবইয়ের ভেতর এই চিঠিটা হঠাৎ পেয়ে গেলুম। চিঠিটা পড়ে মনে হল, এটা একটা ক্লু হতে পারে। দেখুন তো কর্নেল।

কর্নেল চিঠিটা পড়ে বললেন,—হ্যাঁ, ঠিক। এমনটি অনুমান করেছিলুম। চিঠিতে পান্নাবাবু ইংরেজিতে লিখেছেন, ৫ মার্চ রাত বারোটা নাগাদ স্টেশনে পাণ্ডেজি গেলে পান্নাবাবু তাঁকে দলিলটা দেবেন।

যদুবাবু চমকে উঠে বললেন,—কীসের দিলল?

নন্দবাবুর দলিল। অথচ আমরা জানি, তখনও দলিল আপনার মায়ের আলমারিতে ছিল। মাত্র গতকাল সেটা রুদ্রবাবু চুরি করেছিলেন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, পাণ্ডেজিকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে অত রাতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন পান্নাবাবু। উদ্দেশ্য হল, তাঁকে খুন করা।

মোহনজি মৃদু স্বরে বললেন,—কীসের দলিল?

কর্নেল বললেন,—যদুবাবুর কাছে শুনবেন। তবে বোঝা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিরও দলিলটার ওপর লোভ ছিল। প্রচণ্ড লোভই বলব। নইলে অত রাতে বাড়ি ছেড়ে যাবেন কেন? তাছাড়া দলিলের বদলে নিশ্চয় পান্নাবাবু কিছু দাবি করেছিলেন। কী দাবি হতে পারে সেটা? নিশ্চয় কর্জ শোধ। এক লক্ষ পঁচাশি হাজার টাকার বদলে ওই দলিলটা খুব দামি মনে হয়েছিল পাণ্ডেজির কাছে। কেন, বুঝতে পারছ কি জয়ন্ত?

আমি কিছু বলার আগেই যদুবাবু বলে উঠলেন,—পোড়োখনির ঠিকানা দলিলেই ছিল। দেখা যাচ্ছে, পাণ্ডেজিও জানতে পেরেছিলেন, নন্দবাবুর ওই পোড়োখনির ভেতর বহুমূল্য কিছু জিনিস আছে। ভারি আশ্চর্য তো!

কর্নেল বললেন,—মিছিরজিকে দিয়ে পান্নাবাবুই হ্যান্ডনোটটা চুরি করিয়েছিলেন বোঝা যায়। ওটা না থাকলে পাণ্ডেজি বা তাঁর জামাই কেউই পান্নাবাবুর কাছে আইনত টাকা দাবি করতে পারছেন না। পান্নালাল ওঝা অতি ধূর্ত লোক দেখা যাচ্ছে।

মোহনজি বললেন,—কিন্তু মিছিরজিকে কেন খুন করবেন পান্নাবাবু!

যে উদ্দেশ্যে রুদ্রবাবুকে খুন করেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ জিনিস হাতিয়ে নিয়েছেন যে টাকা দিয়ে, সেই টাকা আবার পান্নাবাবুর পকেটে ফিরে আসতে পারে—যদি ওঁদের তিনি খুন করেন। নির্বোধ মিছিরজি টাকার লোভে পান্নাবাবুকে হ্যান্ডনোট ফেরত দিতে গেলেন। টাকাও পেলেন। কিন্তু তাঁকে খুন করে সেই টাকাগুলো কেড়ে নিলেন পান্নাবাবু। রুদ্রবাবুর বেলাতেও একই ব্যাপার।

বলে কর্নেল একটু হাসলেন। যদুবাবু, আপনাদের হারানো দলিল আমার হাতে ফিরে এসেছে।

যদুবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বলেন কী! কোথায় পেলেন?

সময়ে জানতে পারবেন। তবে একটা কথা, আপনার মেয়ে পিঙ্কির কি স্কুলের ছুটি আজ?

না তো। বাড়িতে অমন একটা ঘটনা ঘটল, তাই ওকে স্কুল যেতে দিইনি। কেন?

পিঙ্কি যেন একা কোনোভাবে বাড়ির বাইরে না যেতে পারে। খুব সাবধান। বিকেলে আমি একবার অবশ্য ওকে নিয়ে বেরুব। কিন্তু একা যেন ও না বেরোয়।

যদুবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন,—ঠিক আছে, কিন্তু কেন?

কর্নেল হাসলেন। বললুম তো। সময়ে সবই জানতে পারবেন।

মোহনজি বললেন,—সবই ধাঁধা থেকে গেল, কর্নেল। আপনি বলছেন, পান্নাবাবুই খুনী। কিন্তু ওরকম বীভৎসভাবে খুন—মুণ্ডু কাটা এবং রক্তহীন বডি। আর এই ভয়ঙ্কর চিৎকার।

যদুবাবু বললেন,—ঠিক ঠিক। চুরাইলের ব্যাপারটা তাহলে কী?

কর্নেল হাই তুলে বললেন,—আশা করি, আজ রাতেই চুরাইলের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে।

যদুবাবু ও মোহনজি বেরিয়ে গেলেন। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে বারোটা বাজে প্রায়। কর্নেল আরামকেদারায় চিত হয়ে চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন।

একটু পরে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, নন্দবাবুর পোড়োখনির ঠিকানা তো পাওয়া গেছে। ওর ভেতর যদি সত্যি গুপ্তধন থাকে, তাহলে যদুবাবুই তো তার মালিক হবেন?

কর্নেল চোখ বুজে ছিলেন। চোখ খুলে বললেন,—না জয়ন্ত! তুমি ভাবছ, ওখানে সোনাদানা হিরে-জহরত লুকনো আছে। সাধুবাবা ওরফে পান্নাবাবুর হ্যান্ডব্যাগে বিদেশের এক কোম্পানির লেখা একটা চিঠি আছে। একপলক চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি। পান্নাবাবু গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল করে বেড়াচ্ছিলেন। না—সোনাদানা লুকনো নেই। ওটা আসলে একটা ইউরেনিয়ামের খনি। পান্নাবাবু ওই বিদেশি কোম্পানিকে গোপনে ইউরেনিয়াম বেচতে চেয়েছিলেন। কোম্পানি তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছে। তাই পান্নাবাবু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অবাক হয়ে বললুম—তাহলে আইনত সরকার এর মালিক হবেন, তাই না?

হ্যাঁ। খনিটা ছিল ব্রিটিশ আমলের কোন্ সায়েবের। নিছক অভ্রের খনি। অভ্র তোলা শেষ হলে দৈবাৎ ইউরেনিয়ামের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল নীচের স্তরে। কিন্তু সেই সায়েবকে কোনো কারণে দেশে ফিরতে হয়। যাবার সময় নন্দবাবুকে বেচে দিয়েছিলেন। কর্নেল তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগের দিকে আঙুল তুলে ফের বললেন,—ওই ব্যাগে একটা বই আছে। পড়ে দেখো। ওতে নন্দবাবুর কথা নেই। কিন্তু এদেশের খনির ইতিহাস আছে। প্রচুর তথ্য আছে। ভৈরবগড়ের খনির কথাও আছে। ব্রিটিশ আমলে খনিবিজ্ঞানীরা ভৈরবগড় অঞ্চলে ইউরেনিয়াম থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করেছিলেন।

ব্যাগ থেকে বইটা বের করে পাতা উলটে বললুম,—এসব পড়ার ধৈর্য আমার নেই। কিন্তু আপনার ব্যাগের ভেতর প্যাকেট-করা প্রকাণ্ড বস্তুটি কী?

কর্নেল হাসলেন। কুমোরটুলির ভাস্কর দেবেন পালের আশ্চর্য ভাস্কর্য।

আপনার সেই কাটামুণ্ডু! সঙ্গে নিয়ে এসেছেন দেখছি! ব্যাপার কী?

কর্নেল চোখ বুজে বললেন,—আজ রাতে ম্যাজিক দেখাব, ডার্লিং! কাটামুণ্ডু কথা বলবে।

ছয়

দুপুরে আমার চিরদিন বাঙালির প্রিয় ভাতঘুমের অভ্যাস। গতকাল ভাতঘুমের সুযোগ পাইনি। আজ আমাকে সে লম্বা করিয়ে ছাড়ল। দশরথের ডাকে উঠে দেখি, পাঁচটা বাজে! চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলুম, কর্নেল কোথায় গেলেন?

দশরথ বলল,—কর্নিল স্যার পিঙ্কিদিদিকি সাথ ঘুমতে গেছেন।

মনে পড়ল, সাধুবাবার গুহা দেখাতে নিয়ে যাবার কথা ছিল পিঙ্কির। চা খেয়ে বাগানের শেষপ্রান্তে গিয়ে পোড়োখনি এলাকার দিকে কর্নেল ও পিঙ্কিকে খুঁজলুম। কিছুক্ষণ পরে দুজনকে দেখতে পেলুম। কুকি কর্নেলের কাঁধে চেপেছে। পিঙ্কি হাত নেড়ে কথা বলতে বলতে আসছে। কর্নেল তার কাঁধে একটা হাত রেখে হেঁটে আসছেন।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে মুখোমুখি হলুম ওঁদের। কর্নেল বললেন,—তুমি ঘুমোচ্ছ বলে ডাকিনি ডার্লিং! আশা করি, তোমার রাতের ঘুমটা পুষিয়ে গেছে।

বললুম,—সাধুবাবার আস্তানায় ঢুকেছিলেন নাকি?

কুকিকে পাঠিয়েছিলুম ওঁর হ্যান্ডব্যাগ ফেরত দিতে।

সে কী!

হ্যাঁ। দলিল, হ্যান্ডনোট, যা কিছু ছিল, সব ফেরত দিয়েছি।

পিঙ্কি কুকিকে নিয়ে বাগানে খেলতে ব্যস্ত হয়েছে। সেইসময় যদুবাবু বেরিয়ে এসে ওকে টানতে-টানতে বাড়ি নিয়ে গেলেন।

বললুম,—এগুলো তো পান্নাবাবুর কীর্তির প্রমাণ। ওগুলো ফেরত দিলেন কেন?

পুলিশ ওঁকে যাতে বমাল ধরতে পারে, তার জন্য। কারণ ওগুলো আমার কাছে থাকলে পান্নাবাবু ধরা পড়ার পর আদালতে বলতেই পারেন, ওগুলো যে তাঁর কাছে ছিল, তার প্রমাণ কী? অর্থাৎ উনি হ্যান্ডনোটটা মিছিরজির কাছে হাতিয়েছিলেন, কিংবা দলিলটা রুদ্রবাবুর কাছে, এর তো প্রমাণ নেই। আদালতে কুকুরের প্রমাণ গ্রাহ্য হবে না। বেচারা কুকি তো আর বলতে পারবে না যে সে সাধুবাবার ডেরা থেকে করাড়ি রোটি ভেবে হ্যান্ডনোটটা কামড়ে নিয়ে এসেছিল! আর পিঙ্কি তো দেখেনি এর ভেতর কী আছে। হ্যাঁ—বলবে হ্যান্ডব্যাগটা সে দেখেছিল কুকির মুখে। কিন্তু ওটা যে পান্নাবাবুর, তা তো প্রমাণ করা যাবে না।

কেন? বিদেশি কোম্পানির সেই চিঠিটা?

কর্নেল হাসলেন। লোকটা মহা ধড়িবাজ। চিঠিতে যে নাম ঠিকানা আছে, তা পান্নাবাবুর নয়। জনৈক এম এম বোসের নাম-ঠিকানা। তাও কলকাতার। পান্নাবাবু কলকাতার ওই ঠিকানায় নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন ছিলেন সম্ভবত। যাক্‌গে, এসো ডার্লিং! এবার রাতের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক।

এরপর কর্নেল যা সব করলেন, তার মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলুম না। যদুবাবুর সঙ্গে চুপিচুপি কী কথাবার্তা বললেন। তারপর দেখলুম, যদুবাবু দশরথকে ডেকে তেমনি চুপিচুপি কী সব বললেন। দশরথ বেরিয়ে গেল। আমার প্রশ্নের জবাবে কর্নেল শুধু বললেন,—একটু পরই বুঝবে জয়ন্ত! ধৈর্য ধরো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দশরথ ফিরে এল একবোঝা খড় নিয়ে। যদুবাবু ভাইয়ের শোকে মুহ্যমান। অথচ তাঁর মুখেও একটু হাসির রেখা দেখা যাচ্ছিল। দশরথ ঘড়ে দড়ি জড়িয়ে একটা কিছু বানাচ্ছিল। একটু পরেই বুঝলুম, সে একটা মানুষ তৈরি করছে।

চুপচাপ দেখতে থাকলুম। মুণ্ডুকাটা একটা মানুষের আদল তৈরি হলে দশরথ তাতে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ তাগড়াই করে ফেলল। এবার কর্নেল তাঁর ব্যাগ থেকে নিজের প্যান্ট-শার্ট বের করে মূর্তিটাকে পরালেন। তারপর গলার ওপর সেই কাটামুণ্ডুটা চেপে বসিয়ে দিতেই মূর্তিটা একেবারে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারে পরিণত হল।

সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। বললেন,—এক্ষুনি ফিরে আসছি।

যদুবাবু ও দশরথের মুখে উত্তেজনা দেখা যাচ্ছিল। কর্নেলের ডামি তৈরি করে কাকে ফাঁদে ফেলার আয়োজন হচ্ছে, কে জানে! পান্নালাল ওঝা যদি অত ধূর্ত লোক হন, এই ফাঁদে কি তিনি পা দেবেন? যদুবাবু যেন আমার মনের কথা আঁচ করে মাথা নেড়ে বললেন,—খামোকা চেষ্টা করা! লোকটা খুব ঘড়েল বলে মনে হয় না জয়ন্তবাবু?

সায় দিলুম। দশরথ বলল,—হামার বহুত্ ডর বাজছে বড়বাবু! আমার না কুছ গড়বড় হয়ে যায়! ...

কর্নেল আধঘণ্টা পরে ফিরে এসে বললেন,—দশরথ! ডামিটা ওঠাও। বাগানে নিয়ে চলো। যদুবাবু, আপনি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন। বেরুবেন না যেন।

যদুবাবু চলে গেলেন। মনে হল ভয় পেয়েছেন খুব। দশরথ ডামিটা নিয়ে চলল। বাগানে অন্ধকার জমে আছে। কিন্তু টর্চ জ্বালতে বারণ করলেন কর্নেল। শেষপ্রান্তে গিয়ে ডামিটা একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা হল। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—দশরথ, তুমি বাড়িতে গিয়ে দরজা আটকে দাও। আর শোনো, বাইরের দিকের সব আলো নিবিয়ে দাও এখুনি।

দশরথ পালিয়ে বাঁচল। কর্নেল আমার হাত ধরে একটা ঝোপের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর টেনে বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন,—যে-কোনো মুহূর্তে চুরাইলের আবির্ভাব হবে। যেন ভয় পেও না।

কোনো কথা বললুম না। উত্তেজনায় এবং অজানা আতঙ্কে আমার অবশ্য বুক কাঁপছিল। রিভলবার আর টর্চ নিয়ে বসে রইলুম। কর্নেলের চাপা শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনছিলুম। বুঝতে পারছিলুম, উনিও খুব উত্তেজিত।

বাড়ির বাইরের আলোগুলো নিবে গেল। অন্ধকার আরও জমাট মনে হল এবার। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে বলে চাঁদ উঠতে দেরি হবে। দৃষ্টি একটু স্বচ্ছ হলে মিটার কুড়ি দূরে কর্নেলের ডামিটা অস্পষ্টভাবে টের পাওয়া গেল। বাতাসও কেন কে জানে, বইছে না আর। অন্ধকার রাতটা ক্রমশ বিভীষিকার আসন্ন আবির্ভাবে ঝিম মেরে যাচ্ছে। যদুবাবুর বাড়ির সব জানালা বন্ধ। অন্ধকারে বাড়িটা কালো হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর কুকির ডাক শুনলুম। কেউ তাকে থামানোর চেষ্টা করছিল।

তারপরই চুরাইলের চিৎকার শুনতে পেলুম। আগের সন্ধ্যায়ও পোড়োখনিতে তার চিৎকার শুনেছিলুম। কিন্তু আজকের চিৎকার তার চেয়ে ভয়াবহ। যেন পোড়োখনির রক্তচোষা প্রেতিনী রক্তের গন্ধ পেয়ে খেপে গেছে। ভয়ঙ্কর আর অমানুষিক ওই চিৎকারে বুকের স্পন্দন যেন থেমে যাবে। তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু টের পাচ্ছি সে উল্‌টো পায়ে পিছু হেঁটে ক্রমশ এগিয়ে আসছে আর এগিয়ে আসছে। তার সাপের মতো চোখে পলক পড়ে না। একটানা বিকট চিৎকার করে চলেছে সে।

চিৎকারটা থেমে গেল হঠাৎ। তারপর কার কাশির শব্দ শুনলুম। তারপর কেউ অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে ইংরেজিতে বলল,—আসুন। আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

যে গাছে কর্নেলের ডামি দাঁড় করানো, তার কাছে মাটির ওপর টর্চের আলো পড়ল। আবছা আলোয় কর্নেলের ডামিটা দেখে মনে হল, অবিকল কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন।

লোকটা টর্চ নিবিয়ে চাপা গলায় ইংরেজিতে বলল,—তাহলে আপনি ব্যুগবো কোম্পানির প্রতিনিধি?

হ্যাঁ। আশা করি, আমার চিঠি পেয়েছেন।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকার শাস্তি মৃত্যু, জানেন তো?

সে কী! ও কথার মানে?

মানে এখনই বুঝিয়ে দিচ্ছি! তারপর লোকটা বাংলায় বলে উঠল, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। চুরাইল তোমার মুণ্ডু ছেঁড়ার আগে সেকথা জেনে যাও। বলে সে তিনবার শিস দিল।

অমনি চুরাইলটা আবার বিকট চিৎকার করে উঠল। তারপর ধপাস করে একটা শব্দ হল। কর্নেল আমাকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং টর্চ জ্বাললেন। আমিও টর্চ জ্বাললুম। বাগানের অন্যদিক থেকেও কয়েকটা টর্চ জ্বলে উঠল।

সেই আলোয় দেখলুম, কাল পোড়োখনিতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা অথবা প্রেতিনী কর্নেলের ধরাশায়ী ডামির ওপর ঝুঁকে গলায় কামড় বসিয়েছে এবং লাল কাপড়-পরা সেই সাধু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রেতিনীর মাথায় মেয়েদের মতো চুল, হাতে শাঁখা!

সাধু পালাবার চেষ্টা করতেই বুটের শব্দ তুলে পুলিশ অফিসার আর কনস্টেবলরা দৌড়ে এলেন। তাকে ধরে ফেললেন।

এদিকে পোড়োখনির প্রেতিনী তখন ফড়ফড় করে খড় আর কাপড় ছিঁড়ছে। রক্ত না পেয়ে খেপে গেছে যেন। মুহুর্মুহু বিকট চিৎকার করে সে ডামিটা ফর্দাফাঁই করে ফেলছিল। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে তার মুখে টর্চ ফেললেন। তখন সে মুখ তুলল। নীল জ্বলজ্বলে নিষ্পলক হিংস্র চোখ তার। মাথায় বড় বড় চুল। শাঁখা পরা হাতে ধারালো বাঁকানো নখ। বিকট গর্জন করে উঠে দাঁড়াতেই কর্নেল পর পর দুবার গুলি ছুড়লেন। প্রেতিনী নেতিয়ে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে গেলুম কর্নেলের কাছে।

কর্নেল চুরাইলের মাথার চুল ধরে টান দিতেই উপড়ে গেল। কর্নেল হো হো করে হেসে বললেন,—স্ত্রীলোকবেশী এবং হাতে শাঁখা-পরা এই প্রাণীটিকে আশা করি, চিনতে পেরেছ জয়ন্ত!

কী আশ্চর্য! এটা একটা ভালুক না?

হ্যাঁ। ভালুকই বটে। তবে খুব শিক্ষিত ভালুক। ওকে পান্নাবাবু মানুষের রক্ত খাইয়ে রক্তলোভী করে তুলেছিলেন। কর্নেল একজন পুলিশ অফিসারকে বললেন,—মিঃ সিং! তাহলে আসামীকে আপনারা নিয়ে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি থানায়।

পুলিশ অফিসার হাসতে হাসতে কর্নেলের কাটামুণ্ডুটা কুড়িয়ে বললেন,—আপনার কাটামুণ্ডু কিন্তু চমৎকার কথা বলছিল। আপনি যে এত চমৎকার ভেন্ট্রিলোকুইজম্ জানেন, ভাবতে পারিনি। নিন আপনার কাটামুণ্ডু।

কর্নেল তাঁর কাটামুণ্ডু দেখে নিয়ে বললেন,—একটু রং চটে গেছে মাত্র। আবার কুমোরটুলি গিয়ে পালমশাইকে দেব।

ততক্ষণে বাড়ির বাইরের আলোগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। যদুবাবু, দশরথ, পিঙ্কি আর তার কুকুর বেরিয়ে এল। পুলিশ সাধুবাবা ওরফে পান্নালাল ওঝাকে থানায় নিয়ে গেল। সর্বনাশা মরা ভালুকটা বাগানে পড়ে রইল। কুকি বারান্দা থেকে সেইদিকে লক্ষ্য করে খুব ধমক দিতে থাকল। পিঙ্কি কিছু বুঝতে না পেরে তাকে তুলে নিয়ে চাঁটি মেরে বলল,—খুব হয়েছে!

কিন্তু চুরাইল-রহস্য এভাবে ফাঁস হওয়াতে দশরথ খুশি হয়নি বুঝি। একপ্রস্থ চা এনে দিয়ে বলল,—লেকিন করাড়ি রোটি ইয়ে বদমাস ভালুর না আছে, রামজির কিরিয়া। যো ভালু খুন পিতা, উও কভি রোটি বানানে নেহি জানতা। রোটি ঔর কৈ ভালু বানিয়েছে।

অতএব করাড়ি রোটি খেয়ে তার ক্ষতি হবে না। কর্নেল আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হেসে বললেন,—কী ডার্লিং, কাটামুণ্ডুর কথা বলার ম্যাজিক দেখালুম কি না বলো?

ভেন্ট্রিলোকুইজম্ কবে শিখলেন?

সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত এক হরবোলার কাছে শিখতে হয়েছে। তোমার পাশে বসে দিব্যি কথা বলছিলুম সাধুবাবার সঙ্গে। সাধুবাবা ভেবেছিল, গাছে হেলান দিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। তবে মহাধড়িবাজ লোক। বিকেলে হ্যান্ডব্যাগ ফেরত পাঠানোর সময় সেই বিদেশি কোম্পানির নামে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম,—আমিই ব্যুগবো কোম্পানির প্রতিনিধি। রাত ন'টা নাগাদ যদুবাবুর বাগানে এসে দেখা করুন। সাধুবাবা চালাকিটা ধরে ফেলেছিল। আমিও জানতুম, সে আমার চালটুকু ধরে ফেলবে। কিন্তু তাহলেও সে আসবে। আমাকে খতম করার জন্য তাকে 'চুরাইল' নিয়ে আসতেই হবে। আমি তার সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে চলেছি কি না।

হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু চিৎপুরে গুপ্ত কোম্পানিতে যাওয়ার রহস্যটা কী?

কর্নেল হাসলেন। তোমার মনে পড়ল তাহলে? হ্যাঁ—তুমি শুধু আমাকে গুপ্ত কোম্পানির দোকানে ঢুকতে দেখেছিলে। কিন্তু আমাকে ওদিন অন্তত সারা চিৎপুর এলাকার অসংখ্য দোকানে ঢুকতে হয়েছিল।

কেন?

দুটো জিনিসের তদন্তে। জটাজুট আর অস্বাভাবিক গড়নের একটা পরচুলো সম্প্রতি এক বছরে একইসঙ্গে কেউ কিনেছে কিনা। গত শীতে ভৈরবগড়ে গিয়ে 'চুরাইল'টাকে দেখামাত্র ভালুক বলে সন্দেহ হয়েছিল। তুমি কি ভালুকের মাথা লক্ষ্য করেছ, জয়ন্ত? ওই মাথায় স্ত্রীলোকের পরচুলো আটকাতে হলে বিশেষ অর্ডার দিয়ে পরচুলো বানাতে হবে। যাই হোক, খোঁজ পেয়ে গেলুম শেষপর্যন্ত। এক পরচুলা ব্যবসায়ী কথায়-কথায় বলে ফেলল,—এক ভালুকওয়ালার অদ্ভুত অর্ডার পেয়েছিল। সে নাকি নিজে জটাজুটধারী সাধু সাজবে এবং তার ভালুককে স্ত্রীলোক সাজিয়ে শাড়ি-শাঁখা পরিয়ে খেলা দেখাবে। তাই ....

বাধা দিয়ে বললুম,—ভালুকটার হাতে শাঁখা দেখেছি। পরনে শাড়িও আছে নাকি?

আছে। গণ্ডগোল এবং আতঙ্কের চোটে লক্ষ্য করো নি। এখন গিয়ে দেখে এসো, লালপেড়ে শাড়িও আছে।

দেখে আসার জন্য তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালুম বটে, কিন্তু অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে পা বাড়াতে অস্বস্তি হল। সত্যিকার শাঁখচুন্নি যে নেই, তা কে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে?

আমাকে বসে পড়তে দেখে কর্নেল হো-হো করে হেসে উঠলেন। পিঙ্কিও ব্যাপারটা টের পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। এবার কুকি সুযোগ পেয়ে তাকে ধমক দিল নিজের ভাষায়। পিঙ্কি গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

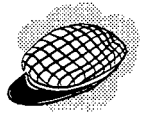

নীলপুরের নীলারহস্য

বৃষ্টিসন্ধ্যার চিঠি

শ্রাবণ মাসের সন্ধ্যা। টিপটিপিয়ে বৃষ্টি পড়ছিল। কর্নেলের ড্রয়িংরুমে বসে কফি খেতে খেতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার—আমাদের প্রিয় হালদার মশাইয়ের পুলিশ জীবনের গল্প শুনছিলুম। রোমাঞ্চকর সব গল্প। হালদারমশাই বলছিলেন,—বৃষ্টিবাদলার রাত্তিরে চোরগো চুরি করনের খুব সুবিধা। ক্যান? না—ঠাণ্ডা ওয়েদারে লোকেরা হেভি ঘুম ঘুমায়। ... তো তখন আমি রাজশাহি জেলার চণ্ডীপুরে থানার অফিসার-ইন-চার্জ। লোকে তখন কইত বড়বাবু। এক বর্ষার রাত্তিরে—

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। হঠাৎ বললেন, —হালদারমশাই! ঠাণ্ডা ওয়েদারে বড়বাবুদের ঘুম আরও হেভি হওয়ার কথা!

হালদারমশাই মাথা নেড়ে বললেন,—কী যে কন কর্নেলস্যার! তখন ব্রিটিশ আমল।

গল্পে বাধা পড়ায় বিরক্ত হয়ে বললুম,—এক বর্ষার রাতে কী হয়েছিল, তা-ই বলুন শুনি।

ঠিক এইসময় আরও রসভঙ্গ করে ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল হাঁকলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে একজন ধুতিপাঞ্জাবিপরা নাদুস-নুদুস গড়নের প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—চিনতে পারছেন তো স্যার? আমি নীলপুরের অঘোর অধিকারী। তা মনে করুন, চারপাঁচ বছর আগের কথা। সেই যে রায়মশাইয়ের বাড়িতে আমাকে দেখেছেন। তারপর মনে করুন হঠাৎই এসে পড়তে হল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বলুন অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু সোফায় বসে বললেন,—তা মনে করুন, তিনটে পঁচিশের ট্রেনে চেপেছি। দমদমে একটা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। শেয়ালদা পৌঁছুতে মনে করুন সাড়ে ছটা।

বুঝলুম, 'মনে করুন' বলাটা ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ। উনি ব্যস্তভাবে কাঁধের ব্যাগটা কোলে টেনে হাত ভরলেন। তারপর একটা চশমার খাপ বের করলেন। ভাবলুম চশমা পরবেন। কিন্তু আমাকে অবাক করে চশমার তলা থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করে উনি কর্নেলকে দিলেন।

কর্নেল কাগজটার ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন,—রায়মশাইয়ের চিঠি?

অঘোর অধিকারী বললেন,—তা মনে করুন রায়মশাই নিজেই আসতেন। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আসবেন কী করে? যা অবস্থা! তাই চিঠি লিখে মনে করুন আমাকেই পাঠালেন। এদিকে ফেরার ট্রেন রাত আটটা পাঁচে। সব ট্রেন তো নীলপুর স্টেশনে দাঁড়ায় না। তারপর মনে করুন আমি রাতবিরেতে রায়মশাইয়ের কাছে না থাকলেও চলে না।

কর্নেল চিঠিটা ততক্ষণে পড়ে ফেলেছেন। বললেন,—চিঠিটা আপনি চশমার খাপে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন কেন অঘোরবাবু?

অঘোরবাবু বিষণ্ণ মুখে বললেন,—আজকাল মনে করুন কী যেন হয়েছে। কিছু মনে থাকে না। চশমার খাপের ভেতর চিঠিটা রাখলে মনে থাকবে। কেন জানেন স্যার? সঙ্গে একটা বই এনেছি।

ট্রেনজার্নিতে সময় কাটাতে বইয়ের মতো জিনিস নেই। এদিকে মনে করুন, সারাক্ষণ চোখে চশমা পরে থাকতে পারি না। নতুন চশমা নিয়েছি তো! তাই মনে করুন—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ছাতি আনেননি দেখছি! আসবার সময় ট্যাক্সি পেয়েছিলেন। এখন না পেতেও পারেন।

—ঠিক বলেছেন স্যার। কিন্তু মনে করুন ছাতি এনেছিলাম। ওই যে বললুম কিছু মনে থাকে না। ট্রেনে ফেলে নেমে এসেছি। তারপর মনে করুন ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় মনে পড়ল। এখনই উঠছি স্যার! শেয়ালদার কাছাকাছি ছাতার দোকান আছে। একটা কিনে নেব'খন।

বলে পা বাড়িয়ে অঘোরবাবু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন,—ওই যাঃ! বলতে ভুলে গেছি। আমি যে মনে করুন আপনাকে রায়মশাইয়ের চিঠি দিলুম, তার প্রমাণ আনতে বলেছেন উনি। আমারও ভুলো মন। আর রায়মশাইও মনে করুন কাকেও আজকাল বিশ্বাস করেন না। আমাকেও না। তাই মনে করুন চিঠি যে পেলেন, তা একটুখানি প্রমাণ—

কর্নেল তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন,—দিচ্ছি। তারপর টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর একটা নেমকার্ড বের করে উল্টোপিঠে কিছু লিখে দিলেন।

কার্ডটা অঘোরবাবু যথারীতি চশমার খাপে ভরে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই হাসলেন,—খালি কয় মনে করুন। কী কাণ্ড!

বললুম,—তা মনে করুন, ভুলো মনের মানুষ। তাই মনে করুন অর্থাৎ স্মরণ করুন বলেন।

হালদারমশাই আরও হেসে অস্থির হলেন। কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—জয়ন্ত ঠিকই ধরেছে। তবে মনে করুন বলেও সবকিছু ঠিকঠাক মনে পড়ে না। নীলপুর কৃষ্ণনগরের কাছে। ওখানকার সরপুরিয়া বিখ্যাত। রায়মশাই আমার জন্য একপ্যাকেট সরপুরিয়া পাঠিয়েছিলেন। অঘোরবাবুর ব্যাগে সেটা থেকে গেছে।

হালদারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন,—ওনারে রাস্তায় গিয়ে ধরব নাকি? সরপুরিয়া কত খাইছি! বলে জিভে জল টানার ভঙ্গি করলেন তিনি। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

অমনি আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরেই আবার অঘোর অধিকারীর আবির্ভাব ঘটল। কাঁচুমাচু মুখে তিনি ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে বললেন,—ভুলো মনের এই এক জ্বালা! রায়মশাই মনে করুন স্যারের জন্য সরপুরিয়া পাঠিয়েছেন। দিতে ভুলে গেছি।

মিষ্টান্নের প্যাকেটটা হলদে পলিব্যাগে মোড়া ছিল। দুহাতে কর্নেলকে এগিয়ে দিয়ে অঘোরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। হালদারমশাই সকৌতুকে বললেন,—মনে করুন আর কিছু আছে নাকি?

আজ্ঞে না। —অমায়িক হাসলেন অঘোরবাবু : এবার মনে করুন বিদায় নিই। ট্রেন ফেল হবে।

কর্নেল স্মরণ করিয়ে দিলেন,—অঘোরবাবু! ছাতা! রাস্তার ছাতা কিনতে ভুলবেন না।

—তা মনে করুন বৌবাজারের মোড়ে কিনে ফেলব। বৃষ্টি পড়ছে। এবার আর ভুল হবে না। বলে নমস্কার করে অঘোরবাবু সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন,—বৃষ্টির সন্ধ্যায় সরপুরিয়া খেতে মন্দ লাগবে না। আরেক দফা কফিও খাওয়া যাবে।

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে ডেকে তিনটে প্লেট আর তিনটে চামচ আনতে বললেন। ষষ্ঠী তক্ষুনি প্লেট আর চামচ এনে দিল। কর্নেল প্যাকেট খুলে সরপুরিয়া চামচে তুলে একটা প্লেটে নিজের জন্য

একটুখানি রাখলেন। তারপর হালদারমশাই এবং আমার প্লেটে অনেকখানি তুলে দিলেন। বাকিটা ষষ্ঠীর জন্য রাখলেন। ষষ্ঠী ততক্ষণে কফির জল গরম করতে গেছে।

হঠাৎ দেখি, কর্নেল প্যাকেটটার তলার কাগজ সরিয়ে একটা মুখআঁটা খাম বের করছেন। হালদারমশাই খাওয়া বন্ধ করে গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললুম,—এ কী! অদ্ভুত তো!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। অদ্ভুত! নীলপুরের শিবশম্ভু রায়ের এই চিঠিটাই আসল চিঠি। অঘোরবাবু বললেন : আজকাল রায়মশাই তাঁকেও বিশ্বাস করেন না। তাই খোলাচিঠিতে আমাকে শুধু ওঁর বাড়িতে শিগগির একবার যেতে বলেছেন। কোথায় নাকি আশ্চর্য প্রজাতির পরগাছা দেখেছেন ইত্যাদি। তারপর একপ্যাকেট সরপুরিয়া পাঠানোর কথা লিখে আন্ডারলাইন করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি অঘোরবাবুকে ইচ্ছে করেই সরপুরিয়ার প্যাকেটের কথা মনে করিয়ে দিইনি।

গোয়ান্দাপ্রবর অবাক হয়ে শুনছিলেন। বললেন,—দ্যাননি ক্যান?

পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম সত্যি উনি ভুলো মনের মানুষ কি না।— বলে কর্নেল খামটা টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখলেন। তারপর সরপুরিয়াটুকু তারিয়ে তারিয়ে খেলেন।

হালদারমশাই বললেন,—বহু বৎসর সরপুরিয়া খাই নাই। জয়ন্তবাবুরে কই, মিষ্টান্ন খাইয়া জল খাইবেন না য্যান। অ্যাসিডিটি হইতে পারে।

কর্নেল সায় দিলেন,—ঠিক বলেছেন। জলের বদলে কফি নিরাপদ।

খামের ভেতর গোপন চিঠিতে নীলপুরের রায়মশাই কী লিখেছেন, তা জানার জন্য খুব আগ্রহ হচ্ছিল। কিন্তু কর্নেলের কোনো তাড়া লক্ষ্য করছি না। ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনল। কর্নেল তাকে বাকি সরপুরিয়াভর্তি প্যাকেটটা দিলে সে খুশি হয়ে নিল এবং একগাল হেসে বলল,—বাবামশাই একবার ঠিক এইরকম সন্দেশ এনেছিলেন।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন,—সরপুরিয়া।

আজ্ঞে। মনে পড়েছে বটে!—বলে ষষ্ঠী চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—নীলপুর নামের ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ওখানে নীলের চাষ হতো। একটা নীলকুঠি ছিল। তা ভেঙেচুরে কবে জঙ্গল গজিয়েছিল। নদীর ধারে সেই জঙ্গলে একসময় বাঘ থাকত। চারবছর আগে সেই জঙ্গলে নির্ভয়ে ঘোরাঘুরি করেছিলুম। ওখানে একটা শ্মশান আছে। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা রাতবিরেতে সেই শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেলে ধুন্ধুমার বাধায়।

হালদারমশাই বললেন,—ধুন্ধুমার? তার মানে?

—কয়েকটা ডেলাইট জ্বেলে লাঠিসড়কিবন্দুক নিয়ে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে শ্মশানে যায়।

—ক্যান?

—নীলকুঠির জঙ্গলে নাকি একটা মড়াখেকো পিশাচ আছে।

—পিচাশ? কন কী!

হালদারমশাই পিশাচকে 'পিচাশ' বলে তা জানি। কিন্তু আমি রায়মশাইয়ের গোপন চিঠির জন্য উসখুস করছিলুম। বললুম,—কর্নেল! চিঠিতে পিশাচের খবর আছে নিশ্চয়ই!

কর্নেল এবার খামের মুখ ছিঁড়ে বললেন,—থাকতেও পারে। সেবার ওখানে গিয়ে রায়মশাইয়ের বাড়ির দোতলা থেকে দুপুর রাতে একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেয়েছিলুম।

গর্জনটা ভেসে এসেছিল জঙ্গলের দিক থেকে। কিন্তু আগেই বলেছি, দিনের বেলায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করে কোনো পিশাচ দেখিনি।

গোয়ান্দাপ্রবর বলে উঠলেন,—গর্জন শুনছিলেন! কিসের গর্জন?

জানি না—বলে কর্নেল চিঠিটা পড়তে থাকলেন। পড়ার পর তিনি চিঠিটা হালদারমশাইকে দিয়ে বললেন : দেখুন। রায়মশাইয়ের হারানিধি উদ্ধার করতে পারেন নাকি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ চিঠিটা পড়ছিলেন। তাঁর গোঁফটা উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল। উঁকি মেরে দেখলুম, চিঠিতে শুধু লেখা আছে :

আমার মহা সর্বনাশ হয়েছে। পূর্বপুরুষের সযত্নে রক্ষিত
রত্ন নীলা হারিয়ে গেছে। এ বাজারে দশ লক্ষ টাকা দাম।
দয়া করে শীঘ্র এসে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।

কর্নেল বললেন,—নীলাটা আমাকে দেখিয়েছিলেন রায়মশাই। প্রায় মুরগির ডিমের সাইজ। রত্নটার নীল রঙে আলো পড়লে চোখ ঝলসে যায়। কিন্তু ওটা হারাল কী করে, তা লেখেন নি।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে.কে. হালদার উত্তেজিতভাবে বললেন,—নীলপুরে যাওয়া দরকার। কর্নেলস্যার কখন যাইবেন, কন। আমি আপনার লগে লগে যামু। নাকি আমি একা যামু? যামু কিসে?

কর্নেল বললেন,—তাই যান। ভোরে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ছাড়ে। ট্রেনের চেয়ে বাসই ভালো। তবে একটু হাঁটতে হবে এই যা। ....

রাতের উপদ্রব এবং বন্দুক

নীলপুরকে নেহাত পাড়াগাঁ ভেবেছিলুম। পরদিন দুপুরে সেখানে পৌঁছে দেখলুম, জমজমাট বাজার আর একতলা-দোতলা প্রচুর বাড়ি আছে। বিদ্যুৎ আছে। শিবশম্ভু রায়ের বাড়ি নীলপুরের শেষপ্রান্তে নদীর ধারে। উঁচু পাঁচিলঘেরা সেকেলে গড়নের দোতলা বাড়ি। তবে পাঁচিল এবং বাড়ির অবস্থা জরাজীর্ণ। এদিকটায় আমবাগান আর এখানে-ওখানে ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে আছে। বাড়ির গেটের অবস্থাও শোচনীয়।

কর্নেল বললেন,— চার বছর আগে রায় ভবনের অবস্থা এমন ছিল না। বোঝা যাচ্ছে, রায়মশাই আর বাড়ি মেরামতে মন দেননি। দিয়েই বা কী করবেন? এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে থাকে আমেরিকায়। মেয়ে বাঙ্গালোরে।

গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অঘোরবাবু বেরিয়ে এলেন। একগাল হেসে বললেন,—এসে গেছেন স্যার? তা এলেন কিসে? মনে করুন বাসে বেজায় ভিড়। তারপর মনে করুন রাস্তা একেবারে খানাখন্দে ভরা।

কর্নেল বললেন,—আমরা বাসে এসেছি অঘোরবাবু!

অঘোরবাবু জিভ কেটে বললেন,—কী সর্বনাশ! ট্রেনে এলে মনে করুন আরামে আসতেন। বলে বাড়ির দিকটা দেখে নিয়ে চাপা স্বরে ফের বললেন,—একটা অনুরোধ স্যার। রায়মশাইকে যেন দয়া করে বলবেন না আমি কাল সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে গেছি। আজ্ঞে মনে করুন, আমি দুপুরেই গেছি।

—কেন বলুন তো?

অঘোরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—রায়মশাই মনে করুন আমাকে সক্কালেই পাঠিয়েছিলেন। স্টেশনে যাবার সময় শুনলুম, ফরেস্ট অফিস থেকে নানারকম গাছের চারা বিলি হচ্ছে। আমার মনে করুন বাগান করার খুব সখ। ওপাশে রায়মশাইয়ের পোড়ো জমিতে মনে করুন গাছের চারাগুলো পুঁতব। রায়মশাই বাড়ির ভেতর মনে করুন—

কর্নেল হাসলেন,—বুঝেছি। সাপের ভয়ে বাড়ির ভেতরে গাছপালা ঝোপঝাড় গজাতে দেন না। তা আপনাদের কাছে কাল সন্ধ্যায় তো গাছের চারা দেখিনি?

—স্টেশনে ওগুলো হরির কাছে রেখে গিয়েছিলুম। আজ্ঞে হরির মনে করুন চায়ের দোকান আছে। খুব ভালো লোক স্যার। তারপর মনে করুন কাল রাত্রে ফেরার সময় চারাগুলো নিয়ে এসেছি।

—রায়মশাই আপনার এত দেরি করার কারণ জিজ্ঞেস করেন নি?

—তা আবার করবেন না? মনে করুন ওঁকে বলেছি, রেল অবরোধ হয়েছিল।

এই সময় দোতলার জানলা থেকে কারও ডাক ভেসে এল,—অঘোর! ও অঘোর!

অঘোরবাবু চেঁচিয়ে বললেন,—রায়মশাই! মনে করুন কর্নেলসায়েব এসে গিয়েছেন! তারপর গেটের দিকে ঘুরে হন্তদন্ত পা বাড়ালেন। একবার ঘুরে আমরা ওঁকে অনুসরণ করছি কি না দেখেও নিলেন।

বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলুম, লম্বাচওড়া চৌকো সেকেলে লাইম কংক্রিটের উঠোন। ডানদিকের পাঁচিলের একপাশে সমান্তরাল কিছু দেশি ফুলের গাছ আছে। কিন্তু গাছগুলোর তলা পরিষ্কার। একটা টিউবয়েল আছে। ফুকপরা এক কিশোরী বালতিতে জল ভরছিল। বাঁদিকের পাঁচিল ঘেঁষে একটা চালাঘর। টালির চাল। সেখানে গরু থাকে, তা বুঝতে পারলুম।

নীচের বারান্দায় রায়মশাইকে দেখা গেল। লম্বা শীর্ণ এক বৃদ্ধ মানুষ। গায়ে ফতুয়া। এবং হাঁটুঅব্দি তোলা ধুতি। তাঁর হাতে একটা ছড়ি। মুখে পাকা গোঁফ। মাথার চুল কিন্তু কাঁচাপাকা এবং মধ্যিখানে সিঁথি। চেহারায় আভিজাত্য। কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আসুন কর্নেলসায়েব। আপনি না এসে পারবেন না এই বিশ্বাস অবশ্য ছিল। কারণ ইংরিজেতে ও. কে. লিখে কার্ড পাঠিয়েছেন! অঘোর যে কার্ডখানা এনেছে, এই যথেষ্ট। ওর আজকাল কিছুই নাকি মনে থাকে না।

কর্নেল আমার সঙ্গে রায়মশাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। রায়মশাই বললেন,—বাবাজীবন, আমার ছেলের বয়সী। কাজেই তুমি বলব।

বললুম,—নিশ্চয়ই বলবেন।

অঘোরবাবু নীচের তলায় একটা ঘরের তালা খুলছিলেন। রায়মশাই বললেন,—এখন ওঘরে নয়। কর্নেলসায়ের আগে আমার ঘরে যাবেন। অঘোর! কিনুঠাকুরকে বলে এখনই কর্নেলসায়েবের জন্য কফির ব্যবস্থা করো। দেরি কোরো না।

দোতলায় উঠে চওড়া বারান্দা দিয়ে হেঁটে শিবশম্ভু রায় মাঝখানের একটা ঘরে তালা খুললেন। চাবি তাঁর পৈতেয় বাঁধা ছিল। ঘরের জানালাগুলো বড়ো এবং খোলা। পর্দা একপাশে গুটোনো আছে। পর্দার অবস্থা দেখে বুঝলুম, বাড়িটার মতোই জীর্ণ এবং বিবর্ণ।

উঁচু মেহগিনি পালঙ্ক একপাশে এবং অন্যপাশে গদিআঁটা কয়েকটা চেয়ার। একটা প্রকাণ্ড টেবিল। টেবিলে কীসব কাগজপত্র, ফাইল, একটা অ্যালার্মঘড়ি এবং একটা ছোট্ট বাক্স। হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স মনে হল। তার পাশে দুটো মোটা অভিধানের মতো বই। নিশ্চয়ই হোমিও মেটিরিয়া মেডিকা।

ফ্যান চালিয়ে দিয়ে রায়মশাই বললেন,—বসুন আপনারা। আমি আসছি।

চেয়ারে বসে টুপি খুলে কর্নেল তাঁর পিঠে আটকানো কিটব্যাগটা নীচে রাখলেন। বাইনোকুলার আর ক্যামেরা তাঁর কোলে বসল। আমার কাঁধের ব্যাগটা আমিও নামিয়ে রাখলুম। রায়মশাই পাশের ঘরে ঢুকেছেন ততক্ষণে।

পালঙ্কের কাছাকাছি ঘরের এককোণে পাশাপাশি দুটো কাঠের বন্ধ আলমারি চোখে পড়ল। তার পাশে দেওয়ালে বসানো একটা আয়রন চেস্ট। বলতে যাচ্ছিলুম,—দশ লক্ষ টাকা দামের নীলা কি আয়রন চেস্টে ছিল? বলা হল না। রায়মশাই ফিরে এলেন দোনলা বন্দুক নিয়ে।

কর্নেল বললেন,—বন্দুক কেন রায়মশাই?

রায়মশাই চাপা স্বরে বললেন,—আপনারা আসার একটু আগে ও-ঘরের জানালায় বন্দুকহাতে বসে ছিলুম। একটা লোক আমবাগানের কাছে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। দুবার লোকটাকে সন্দেহজনকভাবে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখেছি। বন্দুকের নল দেখামাত্র লুকিয়ে পড়েছে। তাই অঘোরকে ডাকছিলুম।

—কেমন চেহারা লোকটার?

—শুধু মাথাটা দেখেছি। মাথায় ছাইরঙা টুপি। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাইনি। অঘোর আসুক। ওকে ওদিকে লক্ষ্য রাখতে বলব।

কর্নেলের দিকে তাকালুম। চোখের ইশারায় ওঁকে বলতে চেয়েছিলুম, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয় হালদারমশাই। কিন্তু কর্নেল আমার দিকে তাকালেন না। বললেন,—আপনাকে সেবার বলেছিলুম জিনিসটা সাবধানে রাখবেন।

শিবশম্ভু রায় চাপাস্বরে বললেন,—সাবধানেই তো রেখেছিলুম। আগে কফি খেয়ে নিন।

অঘোরবাবু নিজেই কফি আনলেন ট্রেতে। বললেন, —রায়মশাই! কিনুদাকে সায়েবদের জন্য মনে করুন স্পেশাল রান্না করতে বলেছি। ওবেলা বরং বাজার থেকে স্পেশাল মাছ-মাংস আনব। ততক্ষণে মনে করুন আমি গিয়ে দেখি, ভুলু কতটা জায়গা পরিষ্কার করল। বিকেলে মনে করুন গাছের চারাগুলো পুঁততেই হবে।

রায়মশাই বাঁকা হেসে বললেন,— বাবুর বাগান করার সখ হয়েছে। বুঝলেন কর্নেলসায়েব? একগুচ্ছের কীসব গাছের চারা এনে রেখেছে।

কর্নেল হাসলেন,—ভালো তো! এখন তো বৃক্ষরোপণ উৎসব চলেছে সবখানে। অঘোরবাবু সেই উৎসব পালন করবেন।

রায়মশাই বললেন,—মনমেজাজ ভালো থাকলে বলতুম, আপনি ওর বৃক্ষরোপণ উৎসব উদ্বোধন করবেন।

অঘোরবাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন,—আজ্ঞে মনে করুন গোটা দশবারো চারা! কিসের গাছ তা-ও জানি না। বিনিপয়সায় বিলি করছিল। তাই মনে করুন আমিও গিয়ে লাইন দিয়েছিলুম।

রায়মশাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—অঘোর! ওসব কথা ছাড়ো! সকাল থেকে দেখছি, আমবাগানের পাশে ঝোপের ভেতর থেকে একটা লোক উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। তোমাকে ডেকে সাড়া পাইনি। আমি বন্দুক বাগিয়ে বসে ছিলুম। এবার দেখলেই গুলি ছুঁড়তুম।

অঘোরবাবু আঁতকে উঠে বললেন,—সর্বনাশ! তাহলে মনে করুন রাতবিরেতে কি ওই লোকটাই বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে আমাদের ভয় দেখাত? দিন তো আমাকে বন্দুকটা। ব্যাটাচ্ছেলেকে মনে করুন তাড়া করে গুলি ছুঁড়ে মনে করুন—

রায়মশাই ওঁর হাতে সত্যিই বন্দুকটা দিলেন। বন্দুক কাঁধে নিয়ে অঘোরবাবু সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। রায়মশাই বললেন,—অঘোর! সাবধান! লোকটাকে সত্যি সত্যি গুলি করবি নে। তার মাথার ওপর গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখাবি। দেখেছিস্ তো? সে-রাতে যেই গুলি ছুঁড়লুম, ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

অঘোরবাবু ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। মুচকি হেসে বললেন,—আমার মাথা খারাপ? সত্যি সত্যি কারও ঠ্যাংয়ে গুলি ছুঁড়লে মনে করুন উল্টে খুনের দায়ে ফেঁসে যাব না?

কর্নেল বললেন,—রাতবিরেতে বাড়িতে ঢিল পড়ত বুঝি?

রায়মশাই বললেন,—হ্যাঁ। কফি খান। বলছি সে-সব কথা।

আমি বললুম,—অঘোরবাবুকে বন্দুক দিলেন। উনি বন্দুক চালাতে জানেন তো?

—সরকার আইন করে শিকার নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু একসময় আমি অঘোরকে সঙ্গে নিয়ে নীলকুঠির জঙ্গলে হরিয়াল মারতে যেতুম। আমার সঙ্গী ছিল অঘোর। মাঝেমাঝে তাকেও গুলি ছোঁড়ার ট্রেনিং দিতুম। আসলে অঘোর আমার ঠাকুর্দার নায়েবের নাতি। ঠাকুর্দা ছিলেন জমিদার। জমিদারি উঠে যাওয়ার পর তাঁর নায়েব সদানন্দবাবু বৃদ্ধ বয়সে এবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর ছেলে রমাকান্ত—মানে অঘোরের বাবা কেষ্টনগরে স্কুলমাস্টারি করতেন। রমাকান্তকাকা হঠাৎ মারা গেলে। অঘোরকে নিয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী সুধাময়ী আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। সুধাকাকিমা বাড়ির কাজকর্ম করতেন। সে অনেক বছর আগের কথা। সুধাকাকিমা মারা গেলেন। অঘোর এবাড়িতেই থেকে গেল। বিয়ে করেনি। মাঝেমাঝে কোথায় উধাও হয়ে যেত। আবার ফিরে আসত। এখন বয়স হয়েছে। এদিকে আমিও একা মানুষ। অল্প কিছু জমিজমা আছে। অঘোরই দেখাশুনা করে। —বলে রায়মশাই করুণ হাসলেন : কর্নেলসায়েব এসব কথা জানেন।

কর্নেল বললেন,—রাত্রে বাড়িতে ঢিল পড়ার ব্যাপারটা বলুন।

—গত সপ্তাহে একদিন মাঝরাত্রে নীচে অঘোরের চ্যাঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দায় বন্দুক হাতে গিয়ে টর্চের আলো জ্বেলে জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে? অঘোর বলল, বাড়ির ভেতর কোনো বদমাস ঢিল ছুঁড়ছিল।

—তখন বাড়িতে কি বিদ্যুৎ ছিল না?

—না। লোডশেডিং ছিল। নীলপুরের বিদ্যুতের হাল শোচনীয়। তো তারপর যে-রাতে লোডশেডিং হয়েছে, সেই রাতে ঢিল। সকালে দেখেছি, উঠোনে ইটপাটকেল ভর্তি। তারপর খেয়াল হল, হাতে বন্দুক থাকতে চুপ করে থাকা উচিত হচ্ছে না। পরশু রাতে তৈরি হয়েই ছিলুম। অঘোরের চ্যাঁচানি শুনে বারান্দা থেকে পরপর দুটো ফায়ার করলুম। ঢিলপড়া বন্ধ হল। তারপর সকালে আবিষ্কার করলুম নীলা চুরি গেছে।

—কোথায় রেখেছিলেন?

ঠিক এই সময় বাইরে কোথাও বন্দুকের গুলির শব্দ হল এবং অঘোরবাবুর চিৎকার শোনা গেল,—ধর! ধর! ভুলু! ভুলু! ...

বটতলায় একটা নৌকোড়

রায়মশাই সেই পাশের ঘরে ঢুকে জানালা থেকে চিৎকার করছিলেন,—অঘোর! অঘোর!

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন। তাঁর কোনো চাঞ্চল্য দেখলুম না। বললুম,—নীচে গিয়ে ব্যাপারটা দেখা উচিত ছিল। হালদারমশাই উঁকি দিতে এসে বিপদে পড়লেন নাকি?

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। একটু পরে রায়মশাই এ ঘরে এসে বললেন, —অঘোর খামোকা একটা কার্তুজ নষ্ট করল। ওদিকটায় বনবাদাড়। আর ভুলু লোকটা ভীতুর শিরোমণি! দিনদুপুরে ভূত দেখতে পায়।

জিজ্ঞেস করলুম,—ভুলুই কি আপনার বাড়িতে থাকে?

—না। ভুলু একজন দিনমজুর। অঘোরের বাগানের সাধ হয়েছে। তাই ওকে দুপুর পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে। জঙ্গল কেটে মাটিতে গর্ত করে রাখবে। ব্যস্।

কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—অঘোরবাবুকে কোথায় দেখে এলেন?

—ও এক আস্ত গবেট। ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভুলুকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, লোকটা কোন্‌দিকে পালিয়েছে।

—এবার বলুন নীলা কোথায় রেখেছিলেন?

রায়মশাই কপালে থাপ্পড় মেরে বললেন,—আমারই দুর্বুদ্ধি! আপনাকে দেখিয়ে ছিলুম, রত্নটা আয়রন চেস্টে থাকত। ঠাকুর্দার বাবার আমলের আয়রন চেস্ট। গতবছর চাবি ঢুকিয়ে ঘোরাতেই চাবি ভেঙে গেল। অঘোরকে দিয়ে কামার ডেকে এনে কোনোক্রমে খোলা তো হল। কিন্তু চাবির ভাঙা অংশটা কামার অনেক চেষ্টাতেও বের করতে পারল না। সে বলল,—কলকাতা থেকে মিস্তিরি আনতে হবে। অঘোর কলকাতা থেকে মিস্তিরি এনেছিল। বললে,—দেওয়াল ভেঙে আয়রন চেস্ট বের করে তার সঙ্গে কলকাতা পাঠাতে হবে। তা না হলে চাবি বের করা যাবে না। নতুন লক তৈরি করে লাগাতে হবে। সে এক হাঙ্গামা! তাই মিস্তিরিকে যাতায়াতের ভাড়া আর কিঞ্চিৎ বকশিস দিয়ে বিদেয় করলুম।

—তা হলে এখন আয়রন চেস্টের অবস্থা কী?

—কপাট ঠেলে আটকে রেখেছি। ভেতরকার জিনিস অন্যত্র সরিয়েছি।

—রত্নটা?

শিবশম্ভু রায় চাপা স্বরে বললেন,—ওটা কিছুদিন কাঠের আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছিলুম। তারপর ভাবলুম, নিরিবিলি জায়গায় বাড়ি। ডাকাত পড়লে আলমারি ভাঙবে সোনাদানার লোভে। তাই মাঝেমাঝে ঠাঁইবদল করে রাখতুম। কখনও পাশের ঘরের কুলুঙ্গিতে গণেশের তলায়। কাগজে মুড়েই রাখতুম। কখনও ওই পালঙ্কে গদির তলায়। আমার দুর্মতি। গত সপ্তাহে ওটা এই হোমিওপ্যাথির বাক্সের ভেতর একটা খোপে ঢুকিয়ে রাখলুম। ভাবলুম, এর ভেতর এমন দামি রত্ন আছে কেউ ভাবতেও পারবে না।

—ওটা হোমিওপ্যাথির বাক্স থেকেই চুরি গেছে?

রায়মশাই করুণ মুখে বললেন,—হ্যাঁ।

—আপনি হঠাৎ হোমিওপ্যাথির দিকে মন দিয়েছিলেন কেন?

—ও! আপনি তো জানেন সে কথা। মধ্যে বছর দুয়েক পা আর কোমের বাত হয়েছিল। অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় সারেনি। তারপর নীলপুরের হোমিওপ্যাথির ডাক্তার অমর মুখুজ্যের চিকিৎসায় সেরে গেল। তখন নিজেই বইপত্তর পড়েটড়ে হোমিওপ্যাথির নেশায় পড়ে গেলুম। অঘোর, কিনু ঠাকুর, তার বউ মানদা, কিনুর মেয়ে কাকলি সব্বাই অসুখবিসুখে আমার ওষুধ খায়। বললে বিশ্বাস করবেন না, ম্যাজিক!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক বলেছেন। ম্যাজিক। কিন্তু এই বাক্সটা কি এখানেই থাকে? নাকি মাঝেমাঝে নীচে নিয়ে গিয়ে অন্য রোগীদের চিকিৎসা করেন?

রায়মশাই বিমর্ষ ভাবে বললেন,—তা করি—মানে, কখনও-সখনও করেছি।

—গত একসপ্তাহের মধ্যে বাক্সটা নীচে নিয়ে গিয়ে কাকেও ওষুধ দিয়েছেন কি?

না—!—রায়মশাই জোরে মাথা নাড়লেন,—তবে একদিন ভুলুর বউ তার বাচ্চার জন্য ওষুধ নিতে এসেছিল। তখন আমি শুধু ওষুধ নিয়ে নীচে গিয়েছিলুম। ওই সময় যদি কেউ এ ঘরে ঢুকে থাকে—বলেই তিনি আবার মাথা নাড়লেন,—বাইরের লোকের ঢোকার প্রশ্নই ওঠে না। বাড়ির কেউ ঢুকতে অবশ্য পারে। কিন্তু যে-ই ঢুকুক, সে কেমন করে জানবে এই বাক্সতে দামি রত্ন লুকোনো আছে?

—রত্নটার কথা বাড়ির কেউ কি জানে?

শিবশম্ভু রায় জোরে মাথা নেড়ে বললেন,—নাহ্! আমি কাকেও বলিনি। জানবার মধ্যে জানে শুধু আমার ছেলে অমলকান্তি। সে থাকে আমেরিকার ডালাসে। মেয়ে নন্দিতা থাকে বাঙ্গালোরে। আমার জামাই ওখানে টাউন প্ল্যানিংয়ের হর্তাকর্তা। বছরে মেয়ে-জামাই একবার আসে পুজোর সময়।

—তাহলে আপনার জামাইও জানেন?

—সুপ্রকাশের না জানার কারণ নেই।

এই সময় অঘোরবাবু বন্দুক কাঁধে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন,— তা মনে করুন মানুষ না ভূত বোঝা গেল না। দেখলুম, ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মনে করুন একটা টুপি ভাসতে ভাসতে ভ্যানিশ হয়ে গেল। তন্নতন্ন খুঁজে পেলুম না। এদিকে ভুলুও মনে করুন—

রায়মশাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। বাধা দিয়ে বললেন,—বন্দুক দাও। খামোকা একটা কার্তুজ খরচ করে এলে।

—তা মনে করুন, আপনিই গুলি ছুঁড়তে বলেছিলেন।

—খুব হয়েছে। কর্নেলসায়েবদের নিয়ে যাও। চান-টানের ব্যবস্থা করে খাইয়ে দাও। আমি যাচ্ছি।

একটু পরে নীচের একটা সাজানো-গোছানো ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে অঘোরবাবু বললেন, —কাকলিকে স্নানের জল ভর্তি করতে বলি। স্নান করলে মনে করুন শরীর ফ্রেশ হয়ে যাবে।

কর্নেল বললেন,—আমি স্নান করব না অঘোরবাবু!

অঘোরবাবু বললেন,—তাহলে মনে করুন আমি ভুলুর কাছে গিয়ে কতগুলো গর্ত করেছে দেখে আসি। তলায় মনে করুন গোবর-সার ফেলে জল ঢালতে হবে। —বলে বারান্দায় গিয়ে তিনি ডাকলেন : কিনুদা! আমি এখনই আসছি। সায়েবদের খাওয়া রেডি করো। ...

খাওয়া-দাওয়া করে কর্নেল জানালার কাছে বসে চুরুট টানছিলেন। আমি বিছানায় অভ্যাসবশে গড়িয়ে নিচ্ছিলুম। একটু পরে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! উঠে পড়ো। বেরুব।

—কোথায় বেরুবেন? হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলে কেলেঙ্কারি!

—বৃষ্টির লক্ষণ দেখছি না। জোরে বাতাস বইছে। ওঠো! নীলকুঠির জঙ্গলে যদি দৈবাৎ পিশাচটার দেখা পাই!

কর্নেলের তাগিদে বেরুতে হল। গেট ভেজানো ছিল। বাইরে গিয়ে কর্নেল বললেন, —অঘোরবাবুর বাগান দেখে আসি।

বললুম,—বাগান তো এখনও হয়নি!

ভবিষ্যতে হবে। —বলে কর্নেল বাড়ির পূর্বদিকে গেলেন। তারপর বললেন : বাঃ! অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করা হয়েছে। গাছের চারা বসানোর গর্তও হয়ে গেছে।

কর্নেল এগিয়ে গিয়ে গর্তগুলো গুনলেন। তারপর ওপাশে একটা ঘাসে ঢাকা জমিতে গিয়ে বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি খুঁজতে থাকলেন।

একটু পরেই তিনি হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। অনুসরণ করতে হল। এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। একটা ছোট্ট নালা ডিঙিয়ে ঝোপজঙ্গলের ভেতর পায়েচলা পথ পাওয়া গেল। সেই পথ ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা প্রকাণ্ড বটগাছ এবং নীচে নদী দেখতে পেলুম।

বটতলায় গিয়ে কর্নেল একটু কাশলেন। অমনি অবাক হয়ে দেখলুম, গাছটার অন্য পাশে ঝুরির আড়াল থেকে আবির্ভূত হলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে. হালদার। আমাদের দেখে তিনি ফিক করে হাসলেন। তারপর বললেন,—ইরিগেশন বাংলার চৌকিদারের ম্যানেজ করছি। অসুবিধা হয় নাই। আপনারা আইলেন কি না খরব লইবার জন্য রায়মশায়ের বাড়ির পিছনে গিছলাম। কী কাণ্ড! অঘোরবাবু সাংঘাতিক লোক। বন্দুক লইয়া তাড়া করছিল। একখান গুলিও ছুঁড়ছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি তাড়া খেয়ে কি সেচবাংলোয় চলে গিয়েছিলেন?

—হঃ। লাঞ্চ খাইয়া এখানে ওয়েট করছিলাম।

—আমাদের জন্য?

নাহ্। আমি ক্যামনে জানব আপনারা এখানে আইবেন? —হালদারমশাই চারদিক দেখে নিয়ে চুপিচুপি বললেন : রায়মশায়ের বাড়ির কাছে অঘোরবাবুর তাড়া খাইয়া এখানে আইয়া পড়ছি, হঠাৎ দেখি একখান নাও ওখানে বান্ধা আছে। আমারে অরা দেখে নাই। মাঝি বিড়ি টানছিল। আর একজন প্যান্টশার্টপরা লোক নাওয়ের থিকা নাইম্যা মাঝিরে কইল, তুমি এখন যাও! চাইর-সাড়ে চাইর বাজলে এখানে আইয়া ওয়েট করবা।

কনের্ল দ্রুত বাইনোকুলারে যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকটা খুঁটিয়ে দেখে বললেন,—বাঃ! তাহলে অন্তত একজন সন্দেহজনক লোককে আবিষ্কার করেছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর মিটিমিটি হেসে বললেন,—নাওখান যদি আগেই আইয়া পড়ে, মাঝির লগে আলাপ করুম। কী কন?

—কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বাংলোয় ফিরতে তো আপনার সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

—সঙ্গে টর্চ আছে। ফায়ার আর্মস আছে।

—পিশাচের পাল্লায় পড়লে রিভলভার দিয়ে আত্মরক্ষা করা যাবে না হালদারমশাই।

হালদারমশাই একচোট হেসে বললেন,—পিচাশ? বাংলো চৌকিদারও কইছিল, নীলকুঠির জঙ্গলে পিচাশ আছে। কর্নেলস্যার! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। কত রাত্রে বনেজঙ্গলে ঘুরছি। পিচাশ দেখি নাই। তবে আপনার লগে যাইয়া দুইবার নকল পিচাশ দেখছিলাম!

এখানকার পিশাচ নকল না হতেও পারে। —বলে কর্নেল বাইনোকুলারে নদী দেখতে থাকলেন। একটু পরে বললেন : একটা ছইঢাকা নৌকো আসছে।

হালদারমশাই বললেন,—যন্তরখান একবার দ্যান কর্নেলস্যার!

কর্নেল ওঁকে বাইনোকুলার দিলেন। গোয়েন্দাপ্রবর কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন,—হ্যাঁঃ।

নৌকোটা কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়ল। হালদারমশাইয়ের ইচ্ছে ছিল একা গিয়ে আলাপ জমাবেন। কিন্তু কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন,—এই যে মাঝিভাই! আমাদের একটু বেড়াতে নিয়ে যাবে? ভাড়ার অসুবিধে হবে না। কত চাও?

মাঝি নৌকো বেঁধে বলল,—না স্যার। হরিপুরের বিশুবাবুর ভাড়া করা নৌকো। বাবু নীলপুরে শ্বশুরবাড়িতে আছেন। বাবু আর বাবুর বউ পাঁচটা নাগাদ এসে পড়বেন। কটা বাজছে স্যার?

হালদারমশাইয়ের মুখ দেখে মনে হল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেননি। ...

একটুখানি ছাই এবং বিশুবাবু

হালদারমশাই মাঝির সঙ্গে আলাপ করলেন। বোঝা গেল, তিনি আমাদের সঙ্গী হতে চান না। বরাবর দেখে আসছি, ওঁর মনে কোনো খটকা বাধলে, উনি তার হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বেন না। কোন্ হরিপুরের জনৈক বিশুবাবু সম্পর্কে ওঁর কেন খটকা বেধেছে, তা আপাতত জানা যাবে না।

ততক্ষণে কর্নেল হাঁটতে শুরু করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে বললুম, —এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

নীলকুঠির জঙ্গলে।

কর্নেল বাইনোকুলারে পূর্বদিকে জঙ্গলের শীর্ষে সম্ভবত পাখি-টাখি দেখে নিলেন। তারপর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হন্তদন্ত হাঁটতে শুরু করলেন। মধ্যে মধ্যে ফাঁকা ঘাসজমি। তারপর জমাট ঝোপের মধ্যে উঁচু-নিচু গাছগুলো এলোমেলো বাতাসে দুলছে। চারদিকে অদ্ভুত শোঁ শোঁ শনশন শব্দ।

এদিকে আমি প্রতিমুহূর্তে সাপের ছোবল খাওয়ার আশঙ্কায় বিপন্ন বোধ করছি। তবে কর্নেল আমার আগে আছেন। সাপ ফোঁস করে উঠলে প্রথমে তিনিই টের পাবেন। কিছুক্ষণ পরে ইটের চাবড়া দেখতে পেলুম। তা হলে এটাই নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ। এখানে গাছের তলা মোটামুটি ফাঁকা এবং এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সব লাইম-কংক্রিটের স্তূপ।

কর্নেল আরও কিছুটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আমাকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে একটা উঁচু প্রকাণ্ড স্তূপের দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন। তিনি জঙ্গলে ঢাকা স্তূপটার কাছাকাছি গেছেন, অমনি ধুপধুপ্ শব্দে কেউ যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল ততক্ষণে স্তূপের ওপাশে চলে গেছেন।

আচমকা এরকম ধুপধুপ দৌড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কর্নেল স্তূপের আড়ালে অদৃশ্য হতেই ডাকলুম,—কর্নেল। কর্নেল!

কর্নেলের সাড়া এল,—এখানে এসো জয়ন্ত!

স্তূপের ওপাশে গিয়ে দেখি, কর্নেল খানিকটা ছাইয়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—কী দেখছেন?

কর্নেল হাসলেন,—যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তা-ই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। এই পদ্যটা তুমি নিশ্চয় পড়েছ। লক্ষ্য করো, ছাইটুকু থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

—কেউ এখানে সবে আগুন জ্বেলেছিল মনে হচ্ছে। পালিয়ে গেল কেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ইস্-স্। আর দু-তিন মিনিট আগে আসতে পারলে লোকটাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতুম। বাইনোকুলারে ওকে জঙ্গলে ঢুকতে দেখে সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু অনুমান করতে পারিনি ওর উদ্দেশ্য কী। এখন বোঝা গেল।

—ওটা কীসের ছাই?

তুমিই পরীক্ষা করে বলো এটুকু ছাই কিসের হতে পারে!—কর্নেল কয়েক পা এগিয়ে ঘাসের ভেতর থেকে একটা দেশলাই কুড়িয়ে নিলেন। বললেন : লোকটা দেশলাই ফেলে পালিয়েছে দেখছি! তার মানে সে যা পোড়াচ্ছিল, তা গোপন কিছু!

ছাইটুকু লক্ষ্য করে বললুম,—কাগজপোড়া মনে হচ্ছে।

—ঠিক ধরেছ।

—কিন্তু লোকটাকে পালানোর সময় দেখতে পাননি?

—কাছেই এই ঝোপটা দেখছো, এর ভেতর ঢুকে গিয়ে সামনে স্তূপের আড়াল হওয়া সোজা।

—তার পালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছি।

কর্নেল আতসকাচ বের করে ছাইটুকু পরীক্ষা করে বললেন,—মনে হচ্ছে একটা চিঠি।

অবাক হয়ে বললুম,—একটা চিঠি পুড়িয়ে ফেলার জন্যে এই জঙ্গলে ঢোকার কী দরকার ছিল?

কর্নেল হাসলেন,—লোকটা যে-ই হোক, বেশি সাবধানী। রায়মশাইয়ের বাড়ির দোতলা বা ওঁর ঘরের জানালা থেকে চারপাশটা দেখা যায়। খোলামেলা জায়গা। কাজেই চিঠিটা নীলকুঠির জঙ্গলে পোড়ানো নিরাপদ। চলো! ফেরা যাক্।

জঙ্গল পেরিয়ে পোড়ো ঘাসে ঢাকা মাঠ এবং সেই নালা পেরিয়ে গিয়ে বললুম,—চিঠি পোড়ানোর ব্যাপরাটা মাথায় ঢুকছে না। কেউ কোনো গোপনীয় চিঠি পোড়াতে চাইলে আমরা এখানে আসবার আগেই পুড়িয়ে ফেলতে পারত। হঠাৎ আজ বিকেলে কেন পোড়াল?

কর্নেল বললেন,—যত ভাববে, মাথার ঘিলু বিগড়ে যাবে। ছেড়ে দাও।

রায়মশাইয়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখলুম, অঘোরবাবু গাছের চারাগুলো গর্তে বসিয়ে ঝারি থেকে জল ঢালছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বললেন,—তা মনে করুন, চারাগুলো তাজা। একবছরেই ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠবে।

কর্নেল চোখ বুলিয়ে চারাগুলো দেখে বললেন,—কিন্তু বেড়া না দিলে গরুছাগলে মুড়িয়ে ফেলবে অঘোরবাবু!

—তা কি দেব না ভাবছেন স্যার? ওই দেখুন রায়মশাইয়ের বাঁশঝাড়। পারমিশন নিয়ে নিয়েছি। কাল ভোরে ভুলু কাটারি নিয়ে আসবে। আমি বাজার থেকে দড়ি কিনে আনব।

—বাঃ! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, চারাগুলো একজাতের গাছের হলে ভালো হত। এটা মনে হচ্ছে আকাশমণি। পরেরটা শিরিষ। কী আশ্চর্য! এটা মনে হচ্ছে অর্জুন গাছ। আর ওটা সম্ভবত ইউক্যালিপ্টাস!

অঘোর অধিকারী বললেন,—হোক্ না! বিনিপয়সায় পেয়েছি।

—কিন্তু এত ঘন করে লাগানো ঠিক হয়নি। গাছগুলো বেড়ে উঠলে ঠাসাঠাসি হয়ে যাবে।

—আজ্ঞে স্যার! মনে করুন গাছ দেখতে ভালোবাসি। তারপর মনে করুন এগুলো হবে আমার নিজের গাছ। বুড়ো বয়সে এখানে কুটির তৈরি করে মনে করুন মুনিঋষির মতো বসে থাকব। রায়মশাই মনে করুন যখন স্বর্গধামে, তখন তো আমার ও বাড়িতে ঠাঁই হবে না। ওঁর ছেলে বা মেয়েজামাই বাড়ি বেচে দেবেন। সেইসব ভেবেই মনে করুন এই প্ল্যান মাথায় এসেছিল।

—চমৎকার প্ল্যান! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি অঘোরবাবু।

অঘোরবাবু হাসতে হাসতে বললেন,—আজ্ঞে স্যার। আমার যে বড্ড ভুলো মন। তাই আগেভাগেই মনে করুন নিজের আশ্রম পত্তন করে রাখলুম।

অঘোরবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা রায়বাড়িতে গিয়ে ঢুকলুম। রায়মশাই উঠোনের শেষপ্রান্তে গরুর চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। বললেন, —নীলকুঠির জঙ্গলে ঢুকেছিলেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। জয়ন্তকে নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে আনলুম।

বর্ষার সময় জঙ্গলে ঢোকা উচিত হয় নি। সাপ থাকতে পারে। —বলে রায়মশাই হাঁক দিলেন : কিনু! সায়েবদের কফি তৈরি করে আনো। অঘোর বোধ করি গাছের চারা পুঁতছে। পাগল একটা!

অমাদের থাকার ঘরের তালা আঁটা ছিল। খাপ্পা হয়ে রায়মশাই বললেন,—চাবি অঘোরের কাছে। কাকলি! এ ঘরের চাবি নিয়ে আয়। অঘোরের কাছে আছে।

কিনু ঠাকুরের মেয়ে কাকলি দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

কর্নেল আস্তে বললেন,—আচ্ছা রায়মশাই! আপনি হরিপুরের বিশুবাবু নামে কাউকে চেনেন—নীলপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি?

রায়মশাই ভুরু কুঁচকে বললেন,—তাকে চেনেন নাকি?

—না। নদীর ঘাটে নৌকো রেখে বিশুবাবু নাকি শ্বশুরবাড়ি বউকে আনতে গেছেন। নৌকোর মাঝি বলল। ওটা নাকি ছোট ঘাট। নতুন তৈরি হয়েছে।

রায়মশাই চাপা স্বরে বললেন,—ঠক! জোচ্চোর। চিটিংবাজ। আগে তো নীলপুরেই থাকত। ঘরজামাই ছিল। হরেন দত্তর আড়ত আছে। একটিমাত্র মেয়ে। তাই বিশুকে আড়তে বসিয়েছিল। বদমাস বিশু এরিয়ার চোরডাকাতদের চোরাই মাল কিনত আর কলকাতায় বেচে আসত। শেষে পুলিশ ওকে ধরেছিল। হনের টাকাকড়ি খরচ করে জামাইকে ছাড়িয়ে এনেছিল। কিন্তু বিশু কোন্ মুখে আর শ্বশুরবাড়িতে থাকবে? কদিন আগে হরেন বলছিল, তার মেয়ে রাগ করে চলে এসেছে। তাই বুঝি বিশু শ্বশুরবাড়ি এল। কিন্তু অমন চোরাপথে কেন? মাঝি বুঝি আপনাদের বলল ছোট ঘাট? নতুন ঘাট? বোগাস! ওখানে ঘাট নেই।

—বিশুবাবু কি আপনার বাড়িতে কখনও এসেছেন?

—নাহ্। আমার কাছে ওর কী কাজ থাকতে পারে? এলে বাড়ি ঢুকতেই বা কেন দেব?

অঘোরবাবু দৌড়ে এলেন,—ইস্! কর্নেলসায়েবদের দেখেও মনে করুন চাবির কথা মনে পড়েনি। আমার ভুলো মন! ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

বলে তিনি তালা খুলে দিলেন। রায়মশাই বললেন,—চাবিটা আমাকে দাও অঘোর। তোমার ভুলো মন নিয়ে আমার সব সময় প্রব্লেম। দাও!

চাবিটা রায়মশাইকে দিয়ে অঘোরবাবু টিউবয়েলে হাত-পা ধুতে গেলেন। দেখলুম, কাকলি হাতল টিপে দিচ্ছে।

ঘরে বসে কফি খেতে খেতে শাঁখ বাজল। সম্ভবত কিনু ঠাকুরের স্ত্রী মানদা শাঁখে ফুঁ দিচ্ছেন। রায়মশাই বললেন,—সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আসি। আপনারা রেস্ট নিন। বলে তিনি স্যুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কফি খাওয়ার পর কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—বিশুবাবুর যা পরিচয় পেলুম, হালদারমশাই না বিপদে পড়েন!

বললুম,—হালদারমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে।

কর্নেল কী বলতে যাচ্ছিলেন, অঘোরবাবু চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন,—তা মনে করুন আজ শান্তিতে ঘুমুতে পারব।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। নিজের আশ্রমের শিলান্যাস করলেন!

—আজ্ঞে না, না! সে কথা বলছি না। আপনি এসেছেন তাই মনে করুন বাড়িতে আর ঢিল পড়বে না রাতবিরেতে।

ঢিলপড়া নাকি গতরাত থেকে বন্ধ হয়েছে?

অঘোরবাবু চাপা স্বরে বললেন,—গতরাতেও মনে করুন ঢিল পড়েছিল। রায়মশাইকে কিছু জানতে দিইনি আমরা। কিনুদাকে জিজ্ঞেস করুন। জানলে গুলি খরচ করতেন। কার্তুজের যা দাম মনে করুন!

—আচ্ছা অঘোরবাবু, আপনি নীলপুরের হরেন দত্তর জামাই বিশুবাবুকে চেনেন?

অঘোরবাবু নড়ে বসলেন,—খুব চিনি। তাকে মনে করুন কোথায় দেখলেন?

—নদীর ঘাটে নৌকো থেকে নেমে গ্রামে ঢুকেছেন।

ব্যাটাচ্ছেলের কাছে মনে করুন আমি পনেরো টাকা পাব। ধার করেছিল। শোধ দেয়নি। রাতের আঁধার মনে করুন কখন কেটে পড়বে। এক্ষুনি গিয়ে ওকে মনে করুন ধরে ফেলতেই হবে। —বলে অঘোরবাবু দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। ...

স্বপ্নের বাগান

একটু পরে কর্নেল জানালায় উঁকি মেরে বললেন,—অঘোরবাবু টর্চ জ্বেলে টাট্টুঘোড়ার মতো দৌড়ে গেলেন।

বললুম,—কিন্তু হরিপুরের বিশুবাবুকে কি আর উনি শ্বশুরবাড়িতে পাবেন? নৌকোর মাঝি বলছিল বিকেল পাঁচটা নাগাদ উনি সস্ত্রীক নৌকোয় উঠবেন। আপনি অঘোরবাবুকে কথাটা বললেই পারতেন।

কর্নেল বললেন,—তাই তো! আমারও দেখছি বড্ড ভুলো মন। বেচারা অকারণ হয়রান হয়ে ফিরে আসবেন। কিংবা বলা যায় না, নদীর দিকে দৌড়বেন। কিন্তু তোমারও কি ভুলো মন জয়ন্ত? তুমি ওঁকে বললে না কেন?

একটু হেসে বললুম,—তা মনে করুন একটু ভুলো মন হয়ে পড়েছি। হালদারমশাই আমাকে অন্যমনস্ক করেছেন।

সাবধান জয়ন্ত! অঘোরবাবুর কথা নকল করতে গিয়ে তুমিও মুদ্রাদোষের কবলে পড়বে। —বলে কর্নেল দরজার কাছে গেলেন : হালদারমশাইয়ের জন্য আমিও উদ্বিগ্ন। আমার এখনই নদীর ধারে যাওয়া উচিত।

—আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

কর্নেল বললেন,—থাক্। আর তোমাকে সন্ধ্যাবেলায় বনবাদাড়ে হাঁটতে হবে না। আমার পায়ে হান্টিং বুট আছে। সাপের দাঁত বিঁধবে না। তুমি অপেক্ষা করো। আমি বেরুচ্ছি। পথে বরং গাছের ডাল কেটে একটা লাঠি বানিয়ে নেব।

কর্নেল তাঁর কিটব্যাগটা পিঠে এঁটে বেরিয়ে গেলেন। বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা নিলেন না। কিটব্যাগে জঙ্গলকাটা কাটারি আছে, তা আমি জানি।

কিছুক্ষণ পরে রায়মশাইয়ের সাড়া পাওয়া গেল। ডাকলেন,—অঘোর। অঘোর!

বারান্দায় কাকলি দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল,—ছোটবাবু টর্চ নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন।

রায়মশাই বললেন,—টর্চ নিয়ে? তার মানে বাজারে আড্ডা দিতে গেছে! আবার আড্ডাবাজ হয়েছে অঘোর। কাল অত রাতে ফিরল। বলল ট্রেন লেট। মিথ্যা কথা। পরশু রাতেও ফিরল দশটার পর। আসুক! মজা দেখাচ্ছি।

বলে উনি আমাদের ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—কর্নেলসায়েবকে অঘোর সঙ্গে নিয়ে গেছে বুঝি?

বললুম,—না। কর্নেল সেচবাংলোয় ওঁর একজন বন্ধুর কাছে গেছেন।

রায়মশাই একটা চেয়ার টেনে বসে চাপা স্বরে বললেন,—আপনি তো কর্নেলসায়েবের কাছের মানুষ। আমার জিনিসটার ব্যাপারে তদন্ত-টদন্ত কতদূর করলেন জানেন?

বললুম,—মনে হচ্ছে, তদন্ত করতেই বেরিয়েছেন। কারণ সেচবাংলোয় ওঁর সেই বন্ধু একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আগেই ওই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল।

রায়মশাই খুশি হয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েবের ওপর আমার ভরসা আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আগেরবার এখানে উনি এসে নীলকুঠির জঙ্গলের পিশাচ রহস্য ফর্দাফাঁই করেছিলেন।

—বলেন কী? আমি জানি না তো! কর্নেল শুধু বলেছেন, ওই জঙ্গলে রাতদুপুরে অমানুষিক গর্জন শুনেছিলেন।

রায়মশাই হাসলেন,—ওটা ছিল চোরাচালানিদের ঘাঁটি। শ্মশানে রাতবিরেতে শবযাত্রীরা গেলে ওদের নৌকো চোখে পড়ে সন্দেহ হতেই পারে। তা পিশাচের গপ্পো রটিয়েছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা। আর ওই অমানুষিক গর্জন ব্যাপারটা মাইক্রোফোনে বিকট চিৎকার। কর্নেল দলটাকে পুলিশ দিয়ে পাকড়াও করিয়েছিলেন। তবে এই গোপন ব্যাপার বাইরের লোকেরা তো জানে না। তাই এখনও রাতবিরেতে শ্মশানযাত্রীরা ডেলাইট জ্বেলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঢাকঢোল বাজায়।

রায়মশাই এবার ঘটনাটা বিস্তারিত শুনিয়ে ছাড়লেন। তার কিছুক্ষণ পরে কর্নেল এসে গেলেন। বারান্দার নীচে থেকে বললেন,—জঙ্গলে জলকাদায় আছাড় খেয়েছি রায়মশাই। শর্টকাটে আসতে গিয়ে এই বিপদ। এক বালতি জল চাই।

রায়মশাই উঠে গেলেন,—কাকলি! এখানেই জল এনে দে। ইহ্ : হাতে আর জুতোয় কত কাদা লেগে গেছে!

কাদা ধুয়ে কর্নেল ঘরে ঢুকলেন। জিজ্ঞেস করলুম,— হালদারমশাইয়ের খবর কী?

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। তোয়ালেতে হাত মুছে জুতো খুলে চটি পরলেন। তারপর বললেন,—রায়মশাই! কফি খাব।

নিশ্চয়ই খাবেন। কিনু! সায়েবকে কফি দাও—বলে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : খবর আছে কিছু?

—আছে। কফি খেয়ে আপনার ঘরে গিয়ে বলব।

রায়মশাই অস্থির হয়ে বললেন,—তাহলে বরং আমার ঘরেই চলুন। সেখানেই কফি পাঠাতে বলছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঠিক আছে! তাই চলুন। জয়ন্ত! তুমিও এসো। ...

দোতলায় রায়মশাইয়ের ঘরে গিয়ে বসার পর কিছুক্ষণের মধ্যে কিনুঠাকুর কফি আর পাঁপরভাজা দিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন,—রায়মশাই! সিঁড়ির দরজাটা ভেতর থেকে আটকে দিয়ে আসুন!

রায়মশাই এ কাজে দেরি করলেন না। খবর শোনার জন্য আমিও উদ্‌গ্রীব। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে চাপা স্বরে বললেন,—সুখবর। কিন্তু আগে বলুন, জিনিসটা কিসের ভেতর রেখেছিলেন?

—ওটা ছিল একটা রুপোর কৌটোর মধ্যে। আমি রুপোর কৌটো ওই আলমারিতে রেখে হোমিওপ্যাথি ওষুধ যে সাদা কাগজে দিই, তার মধ্যে মুড়ে রেখেছিলুম—যাতে চোরডাকাতের সন্দেহ না হয়।

কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করলেন। সেটা অ্যালুমিনিয়ামের। এ ধরনের কোটোয় লোকেরা দোক্তা খায় দেখেছি। কর্নেল বললেন,—এই কৌটোটা কার চিনতে পারছেন কি?

—না তো!

কৌটোটা নতুন কেনা। —বলে কৌটোর মুখ খুলে কর্নেল প্রায় মুর্গির ডিমের গড়ন একটা নীল পাথর টেবিলে রাখলেন। পাথরটাতে আলোর ছটা পড়ে ঝলমল করছিল।

রায়মশাই দুহাতে নীলাটা নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বললেন,—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

রায়মশাইয়ের চোখ জলে ভিজে গেল।

অবাক হয়ে বললুম,—এটা কার কাছে কোথায় হঠাৎ উদ্ধার করলেন?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—ওই কথাটা আমার বলা বারণ। রায়মশাই, রত্নটা এবার যত্ন করে ভালো জায়গায় রাখুন। কাঠের আলমারি নিরাপদ নয়। আপনার ঘরে গতবারে একটা ছোট সিন্দুক দেখেছিলুম। সেটা কোথায়?

রায়মশাই বললেন,—খাটের তলায় পড়ে আছে। বহুদিন ব্যবহার হয় না।

—ওটা ঐ সিন্দুকের মধ্যে রাখুন। কিন্তু সাবধান। ওঘরে আপনার অগোচরে কেউ যেন না ঢুকতে পারে। ...

সে রাতে কর্নেলকে অনেক প্রশ্ন করেও জানতে পারলুম না, এত সহজে কী করে তিনি দশ লক্ষ টাকা দামের নীলা উদ্ধার করলেন।

সকালে উঠে দেখি, কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। আজও আকাশে বৃষ্টিমেঘ ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন শরৎকাল। আমি ঘুম থেকে উঠে কফির বদলে চা খাই। চা খাওয়ার পর বেরিয়ে গেলুম। অঘোরবাবুর হাঁকডাক শোনা যাচ্ছিল। বাড়ির পূর্বদিকে গিয়ে দেখলুম, সেই ভুলু বাঁশ কেটে এনেছে এবং বেড়ার আয়োজন চলেছে। আমাকে দেখে অঘোরবাবু হাসলেন,—এতক্ষণে উঠলেন বুঝি? কর্নেলসায়েবকে মনে করুন একবার নীলকুঠির জঙ্গলে দেখলুম।

বললুম,—অঘোরবাবু! কাল সন্ধ্যায় বিশুবাবুর দেখা পেয়েছিলেন?

অঘোরবাবু বেজার মুখে বললেন,—না। মনে করুন সে বিকেলেই কেটে পড়েছিল।

চারাগুলো একরাত্রেই সতেজ হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে বললুম,—চারাগুলোর ডালে দড়ি বাঁধা আছে। কেটে ফেলা উচিত।

—হ্যাঁ। কেটে ফেলব। আর মনে করুন দুতিনটে দিন যাক্।

একটা চারার দুটো ডালে সাদা সুতো বাঁধা এবং একটা চিরকুট আটকানো দেখে বললুম,—এটা আবার কী?

—তা মনে করুন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের স্লিপ। গাছের নাম লেখা আছে। কিছুক্ষণ বেড়াবাঁধার কাজ দেখার পর বাড়ির ভেতর গেলুম। দেখলুম, কখন কর্নেল বাড়ির পশ্চিমদিক ঘুরে বাড়ি ঢুকেছেন। বললুম,—হালদারমশাই কেমন আছেন? যাননি সেচবাংলোয়?

কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন,—হালদারমশাই এতক্ষণ নীলপুর বাসস্টপে। সেচবাংলোয় গিয়ে দেখা করেছি। এ যাত্রা উনি অক্ষত শরীরে আছেন। তবে হরিপুরের বিশু যেতে দেরি করেছিল! রাত নটায় নৌকোয় হালদারমশাইকে দেখে সে খাপ্পা হয়েছিল। হালদারমশাই কিছু বলার আগে বিশু তাঁকে ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। ওখানে অবশ্য হাঁটু পর্যন্ত জল। হালদারমশাই পাড়ের ঝোপ আঁকড়ে না ধরলে কী ঘটত বলা যায় না। যাই হোক্, ব্রেকফাস্ট করে আমরাও বাসস্টপে যাব। উনি অপেক্ষা করবেন আমাদের জন্য। ...

ব্রেকফাস্ট করে রায়মশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে বেরুচ্ছিলুম। অঘোরবাবু এসে বললেন,—তা মনে করুন কোথায় চললেন স্যার?

কর্নেল বললেন,—কলকাতা ফিরতে হচ্ছে। চলি অঘোরবাবু! পরে আপনার বাগান দেখতে আসব।

অঘোরবাবু বললেন,—আজ্ঞে আসবেন বৈকি। তা মনে করুন বাগান আমার স্বপ্ন। ...

শর্টকাটে বাসস্টপ যাবার পথে বললুম,—কর্নেল! নীলা উদ্ধারের রহস্যটা এবার না বললে মনে করুন—

সাবধান জয়ন্ত! —কর্নেল অট্টহাসি হাসলেন : ওই মনে করুন বড় সাংঘাতিক জিনিস। বাইনোকুলারে দূর থেকে দেখছিলুম, তুমি অঘোর অধিকারীর স্বপ্নের বাগানে দাঁড়িয়ে ছিলে। চারাগুলোর মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য তোমার চোখে পড়েনি?

একটু ভেবে বললুম,—চারাগুলোর ডালে দড়ি বাঁধা ছিল। আর একটা চারার ডালে সাদা সুতোয় বাঁধা ছিল বনবিভাগের চিরকুট।

কর্নেল বললেন,—দোক্তার কৌটোয় নীলা ভরে অঘোর অধিকারী ওই চারাটার তলায় পুঁতে রেখেছিল। বিশুর সঙ্গে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে। অঘোর এখনও জানে না তার চোরাইমালে বাটপাড়ি হয়েছে। তাই আহ্লাদে আছে। আসলে এটা আমার অঙ্ক, জয়ন্ত! এতকাল পরে হঠাৎ অঘোর অধিকারীর বাগান করার সখ হয়েছে! কতকগুলো চারা জোগাড় করেছে। কাল সন্ধ্যায় বেরিয়ে চিরকুটবাঁধা চারাটা ওপড়াতেই কৌটোটো টর্চের আলোয় চকচক করে উঠেছিল। ডার্লিং! এটা নিছক অঙ্ক। আজ জঙ্গলে অঘোরবাবু ভুলুকে একটা চিঠি পোড়াতে পাঠিয়েছিল। চিঠিটা রায়মশাই মেয়েকে লিখেছিলেন। অঘোর অধিকারী নিশ্চয়ই সব চিঠি খুলে পড়ে ফের আঠা এঁটে ডাকবাক্সে ফেলত। এভাবেই সে নীলাটার কথা জেনেছিল। যে চিঠিটা ভুলুকে দিয়ে সে গোপনে পোড়াতে পাঠিয়েছিল, ওতে রায়মশাই লিখেছিলেন, নীলাটা তিনি বুদ্ধি করে হোমিওপ্যাথির বাক্সে লুকিয়ে রেখেছেন। বয়স হয়েছে। হঠাৎ স্ট্রোকে মারা পড়লে তাঁর মেয়ে যেন এসে নীলাটা খুঁজে পায়। অঘোর এই চিঠি পড়েই স্বর্গ হাতে পেয়েছিল।

—এ-ও কি আপনার অঙ্ক?

—আজ ভোরে বেরুনো সময় কৌশলে রায়মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, সম্প্রতি কোনো চিঠি তিনি ছেলে বা মেয়েকে লিখেছিলেন কি না এবং তাতে কী লিখেছিলেন? রায়মশাই জানিয়ে দিলেন। অঘোর অধিকারীকে দিয়েই সব চিঠি ডাকঘরে পাঠান উনি। কাজেই অঙ্কটা মিলে গেল।

—ঢিল পড়ত কেন?

—ওটাই অঘোরের বদমায়েসি। ভূতুড়ে আবহাওয়া তৈরি করতে চেয়েছিল বাড়িতে। রায়মশাই মুখে যা-ই বলুন, আমি খুব ভালো জানি, উনি ভূতপ্রেতে বিশ্বাসী। যদি নীলা চুরি ভূতের ঘাড়ে চাপানো যায়!

বলে কর্নেল বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি দেখে নিয়ে আবার হাঁটতে থাকলেন। ...

* * *

একটু পরিশিষ্ট আছে। তা বলা দরকার। আমরা কলকাতা ফিরে যাওয়ার কিছুদিন পরে কর্নেল রায়মশাইয়ের একটা চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে উনি লিখেছিলেন :

সম্প্রতি অঘোর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। সংসারে তার আর মন নেই। সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে যাবে। হতভাগা কেন সন্ন্যাসী হবে, এটা আমার কাছে রহস্য। তবে এ রহস্য নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপনাকেও এ বিষয়ে মাথা ঘামাতে বলছি না। আর একটা কথা। যাবার আগে সে তার বাগানের চারাগাছগুলো উপড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। ...

হায়েনার গুহা

খুদে-মানুষ মিনিহুন

গায়ে পড়ে আলাপ করতে আমেরিকানদের জুড়ি নেই। লস এঞ্জেলিস থেকে প্লেনে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হনলুলু যাবার সময় এই মারকিন খুড়ো-ভাইপোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল। খুড়োর নাম জন নর্থব্রুক। ভাইপোর নাম রবার্ট ওরফে বব। খুড়োর বয়স ষাটের কাছাকাছি। গায়ে গতরে সাদা হাতি বলা যায়। ভাইপোটি তার উল্টো। কতকটা আমার মতো রোগাটে। মাথাতেও প্রায় সমান-সমান। কথায়-কথায় ফিকফিক করে হাসে। ভারি আমুদে-ছোকরা।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের মাঝারি গড়নের প্লেন। জনা ষাটেক যাত্রী ধরে। মাঝবরাবর করিডোরের মতো যাতায়াতের পথ আছে এবং প্রতিসারে একদিকে তিনটে, অন্যদিকে দুটো করে আসন। তিনটে আসনের দিকে জানলার ধারে আসনটা আমার। বাকি দুটোয় সেই খুড়ো-ভাইপো।

জনখুড়ো আমার গায়ে। তিনিই গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাফ করবেন। মশাই কি দক্ষিণদেশীয়? স্প্যানিশ, পর্তুগিজ?

আমেরিকানরা যখন 'দক্ষিণদেশীয়' বলে তখন বুঝতে হবে ওরা দক্ষিণ আমেরিকার কথা বলছে। এই ক'মাসে টের পেয়েছি, কী জানি কেন সবখানেই ওরা আমাকে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ ভাবে। ডেনভারে একজন আমাকে ইন্দোনেশিয়ার লোক ভেবেছিল। আসলে দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে স্প্যানিশ বা পর্তুগিজদের গায়ের রঙ মোটেও ফর্সা নয়, রোদপোড়া তামাটে। বংশানুক্রমে ওদের পিতৃ-পুরুষদের ইউরোপীয় সাদা চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে দক্ষিণ আমেরিকার জলহাওয়ায় এবং কড়া রোদ্দুরে। তা ছাড়া সেখানে ভীষণ দারিদ্র্য। অপুষ্টিতে তাগড়াই গতর আমার মতো প্যাকাটি হয়ে গেছে অনেকের।

জনখুড়োর প্রশ্নের জবাবে যখন নিজের পরিচয় দিলাম, তখন উনি ভারি অপ্রস্তুত হলেন। বললেন, আমার এ ভুলের জন্যে দুঃখিত মিস্টার। তা হলে আপনি ক্যালকুট্টার লোক? আমার এক দাদা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্যালকুট্টাতে ছিলেন। ওঃ! সে কত অদ্ভুত সব গল্প শুনেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের ভাব হয়ে গেল। বিদেশ-বিভুঁয়ে—বিশেষ করে পথে যেতে যেতে কারুর সঙ্গে আলাপ হলে ভালোই লাগে। পথের ক্লান্তি টের পাওয়া যায় না। জন নর্থব্রুক নিজের পরিচয় দিলেন। উনি লস এঞ্জেলিসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। এমন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে পরিচয় হওয়া খুব আনন্দের। ওঁর ভাইপো বব আমার মতোই পেশায় সাংবাদিক। এখন নভেম্বরের শেষাশেষি আমেরিকায় থ্যাংকস-গিভিং ডে'র উৎসব। তাই দিনতিনেক ছুটি। খুড়ো ভাইপো ছুটি কাটাতে যাচ্ছেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে।

জনখুড়ো বললেন,—আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমরা হনলুলুতে নামছি। তা আপনি কি হনলুলুতেই থাকছেন?

বললাম,—আমার ইচ্ছে, বিখ্যাত সমুদ্রতট ওয়াইকিকিতেই কোথাও থাকব।

জন হাসলেন। ওয়াইকিকি খুব সুন্দর জায়গা। সবাই ওখানেই যায়। কিন্তু আমি বলি কি, যদি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সত্যিকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান, তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে কাউয়াই দ্বীপে।

বব গম্ভীর মুখে বলল,—আমরা সেখানে 'মিনিহুন' দেখতে যাচ্ছি।

বললাম,—মিনিহুন? সে আবার কী?

জন হাসতে হাসতে বললেন,—বব সব সময় তামাশা করে। মিনিহুন নিছক কল্পনা। আপনি নিশ্চয় বিখ্যাত বই গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েছেন? তাতে লিলিপুট নামে খুদে মানুষদের কথা আছে। এই 'মিনিহুন' হল সেই রকম লিলিপুট মানুষ। আশ্চর্য, ক্যাপ্টেন টমাস কুক ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কাউয়াই দ্বীপে এসেছিলেন—তিনিও স্বচক্ষে ওদের দেখেছেন বলে লিখে গেছেন। তারপর দুশো বছর ধরে এই গুজব সমানে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা মিনিহুন কেউ ধরে ফেলা তো দূরের কথা, ফটো পর্যন্ত তুলে দেখাতে পারে নি। কাজেই এটা নিছক গুলতাপ্পি। আসলে কথাটা এসেছে সম্ভবত মিনি থেকে। মিনি মানে খুদে। আর হুন হল সেই বর্বর ইউরোপীয় জাতের লোকের—যাদের নেতা ছিল অ্যাটিলা। হুনদের শরীর ছিল পেশীবহুল। গায়ে প্রচণ্ড জোর। আমাদের সেরা পালোয়ানকেও একজন মিনিহুন নাকি তুলে আছাড় মারতে পারে।

বব তেমনি গম্ভীর মুখে বলল,—আমি কিন্তু এবার যাচ্ছি মিনিহুনদের ছবি তুলব এবং আমার খবরের কাগজে তাদের কথা লিখব। চাউড্রি (চৌধুরী), তুমিও কাগজের লোক। আমার সঙ্গী হও।

জন রাগ করে বললেন,—আবার তুমি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না বাপু! সেবারকার মতো আর তোমাকে আমি খুঁজতে বেরুব না বলে দিচ্ছি। হায়েনার গুহায় মরে পড়ে থাকবে।

অবাক হয়ে বললাম,—হায়েনার গুহা মানে?

জন বললেন,—কাউয়াই দ্বীপের উত্তর উপকূলে একটা এলাকার নাম হায়না। ওখানে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় অসংখ্য গুহা আছে। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিঃ জয়ন্ত চৌধুরী, কক্ষণও ববের কথায় ভুলে ওর পাল্লায় পড়বেন না।

বব আমার দিকে চোখ টিপল। ঠোঁটের কোণায় হাসি। বললাম,—আচ্ছা অধ্যাপকমশাই, মিনিহুন যদি সত্যি না থাকে, এমন গুজব রটল কেন? আমাদের বাংলার প্রবাদ হল—যা রটে, তা কিছু-কিছু সত্যি বটে।

জন বললেন,—আমার ধারণা, আফ্রিকার পিগমিদের মতো বেঁটে একজাতের আদিম অধিবাসী ছিল হাওয়াই এলাকায়। কয়েকশ বছর আগে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে। গল্পটা তাই রটে আসছে। যদি আমাদের সঙ্গে যান কাউয়াই দ্বীপে, গিয়েই শুনবেন মিনিহুন নিয়ে লোকেরা গল্প করছে। এমন কী, গাইডগুলো পর্যন্ত হলফ করে আপনাকে 'মিনিহুন' দেখাতে নিয়ে যাবে। দেখবেন তো নবডংকাটি, খামোকা একগাদা পয়সা গচ্চা যাবে। গাইড আপনাকে সমুদ্রের খাড়ির মাথায় বসিয়ে রেখে বলবে, আপনি ওইখানটায় লক্ষ রাখুন—খুদে মানুষ দেখতে পাবেন। সময়মতো আপনাকে এসে নিয়ে যাব। আপনি তো বসে রইলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ব্যাটা কতক্ষণ পরে এসে বলবে, কী দেখতে পান নি? তা হলে আজ ওরা বেরোয়নি গুহা থেকে। আপনার বরাত! কালকে চেষ্টা করবেন। অনেকসময় হাজার ফুট নীচে পাথরের ওপর একরকম সমুদ্র শকুন দেখিয়ে গাইড বলবে, ওই দেখুন! আপনি যদি বলেন, ওগুলো তো পাখি—তখন গাইডব্যাটা একগাল হেসে বলবে, মশায়ের চোখ খারাপ। পাখি হলে উড়ত না?

বব মিটিমিটি হেসে বলল,—কী জায়েন্টো চাউড্রি? যাচ্ছ তো আমাদের সঙ্গে।

বললাম,—হায়েনার গুহায় তোমার সঙ্গে ঢুকতে বেজায় লোভ হচ্ছে বব। কিন্তু আমার নামটা তুমি ভুল উচ্চারণ করছ। আমি জয়ন্ত চৌধুরী।

বব বিড়বিড় করে নামটা আওড়াতে থাকল। জানলায় দেখি প্রশান্ত মহাসাগরের নীল ঢেউ। আমাদের প্লেন সবুজ দ্বীপের ওপর চক্কর দিচ্ছে। হনলুলু এয়ারপোর্ট এসে গেল দেখতে-দেখতে।

সিগারেট কেসের রহস্য

খুড়ো ভাইপোর সঙ্গে আধঘণ্টা পরে ফের প্লেনে উঠলাম। কাউয়াই দ্বীপে পৌঁছতে মোটে সাতাশ মিনিট লাগল। এই এয়ারপোর্টের নাম লিহিউ। চারদিকে আখের ক্ষেত, মধ্যিখানে বিমান-বন্দর। গেট পেরিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম তিনজনে। জনখুড়ো ট্যাকসি চালককে বললেন,—হায়েনা টাউনশিপ।

কাউয়াইকে বলা হয় উদ্যানদ্বীপ। সবুজ গাছে ভরা। দূরে হাজার পাঁচেক উঁচু পাহাড় 'মাউন্ট ওয়াইয়ালেয়ালে।' আসলে দ্বীপটার চারদিকেই উঁচু পাহাড়। খাড়িগুলো বিপজ্জনক। কাউয়াইদ্বীপে তাই জাহাজ ভেড়ার জায়গা নেই। কয়েক মাইল দূরে জাহাজ রেখে ছোট ছোট বোটে দুঃসাহসীরা খাড়িতে যদি বা ঢুকতে পারে, তীরে ওঠা অসম্ভব। খাড়া পাহাড়। তাই এ দ্বীপের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ শুধু প্লেনে। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে টমাস কুক এ দ্বীপে নামতেই পারেননি।

ছোটবড় গোটা আষ্টেক দ্বীপ নিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। আমেরিকার শাসনে রয়েছে। তাই আমেরিকায় ঘুরে যেমনটি দেখেছি, এখানেও তাই। সুন্দর সুন্দর চকচকে রাস্তাঘাটে পায়ে হাঁটা লোক নেই। এই কাউয়াই দ্বীপকে সত্যি একটা বাগানের মতো সাজিয়ে রেখেছে। হায়েনা উপনগরী পাহাড়ি টিলার গায়ে। উত্তর-পশ্চিম জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগর। প্রায় হাজার ফুট নীচে সমুদ্রের জল গর্জন করছে। সাদা ফেনা দুলছে। ঝাঁকে-ঝাঁকে সমুদ্রপাখি উড়ছে। শব্দে কান পাতা দায়।

ততক্ষণে লিহিউতে নেমেই জনখুড়ো ফোন করে হোটেল বুক করেছেন। হোটেলের নাম কোকো পাম হোটেল। দোতলা হোটেল। ওপরতলায় আমি একটা সিঙ্গল স্যুট, খুড়োভাইপো একটা ডাবল স্যুট ভাড়া করেছেন। এ হোটেলেও যা রাজকীয় বিলাস আর আরামের ব্যবস্থা, আমাদের দেশের সেরা হোটেলেও তা কল্পনা করা যায় না। জানলা দিয়ে খাড়ির নীচে সমুদ্র চোখে পড়ছিল। বিকেল-চারটে বেজে গেছে। পাশের ঘর থেকে ফোন করলেন জনখুড়ো। কফি খেতে ডাকলেন।

গিয়ে দেখি, নিজেরাই কফি তৈরি করেছেন। প্রতি ঘরে কফি তৈরির ব্যবস্থা আছে। কফি খেতে খেতে জন বললেন,—কী মনে হচ্ছে? কাউয়াই স্বর্গোদ্যান না?

স্বীকার করলাম। ... অবশ্যই মিঃ নর্থব্রুব। এমন জায়গা থাকতে পারে, ভাবিনি। তা ছাড়া ...

কথা কেড়ে বব বলল,—তুমিও আমার মতো ওঁকে আংকল জন বা জনখুড়ো বলতে পার জায়েন্টো! তাতে উনি রাগ করবেন না।

জনখুড়ো হাসিমুখে বললেন,—মোটেও রাগ করব না। তুমিও আমার ভাইপোর বয়সি জয়ন্ত!

বললাম,—আপনি তো দিব্যি জয়ন্ত উচ্চারণ করতে পারছেন, কিন্তু বব অমাকে জায়েন্টো বানিয়ে ছাড়ল। অথচ আমি জায়েন্টো বা দৈত্যের এক শতাংশও নই।

এই সময় দেখলাম বব সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিল। আমার চোখে এটা দৃষ্টিকটু। গুরুজনদের সিগারেট দেওয়া তো দূরের কথা, তাদের সামনেও আমরা ভারতীয়রা সিগারেট খাই না। কিন্তু সায়েবদের রীতিনীতি আলাদা। জন সিগারেট নিলেন, বব আমার দিকে এগিয়ে দিল প্যাকেট। বললাম,—ধন্যবাদ বব। আমি আলাদা ব্রান্ডের সিগারেট খাই। আমার কড়া সিগারেট পছন্দ।

বলে পকেট থেকে আমার সিগারেটকেস বের করলাম।

জনখুড়ো আমা সিগারেটকেসটার দিকে তাকিয়েই কেমন যেন চমকে উঠলেন। তারপর খপ করে ওটা প্রায় কেড়ে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে থাকলেন। আমি তো হতভম্ব। বব মিটিমিটি হেসে বলল,—দেখছ কী জায়েন্টো! খুড়োর তোমার সিগারেটকেসটির মধ্যে নিশ্চয় হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের গন্ধ পেয়ে গেছেন। খুড়োমশাই প্রাচীন ইতিহাসের দিগগজ পণ্ডিত

কি না। দেখবে, হয়তো তোমার সিগারেটকেস নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার বক্তৃতা দিতে দৌড়ুবেন।

ভাইপোর তামাশার দিকে মন নেই জনখুড়োর। সিগারেটকেসটা খুলে উনি সিগারেটগুলো বের করে টেবিলে রাখলেন। তারপর জানলার কাছে গিয়ে ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে বললেন, —হুম! জয়ন্ত, এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে? নিশ্চয় লস এঞ্জেলিসের কোনো কিউরিও শপে?

বললাম,—না খুড়োমশাই। কিউরিও শপের জিনিসের দাম দেবার পয়সা কোথায় আমার? সিগারেটকেসটা আমি পয়সা দিয়ে কিনিনি। ওটা আমার এক বাল্যবন্ধুর উপহার।

জনখুড়ো উত্তেজিতভাবে বললেন,—বাল্যবন্ধু! কে সে বাল্যবন্ধু?

বললে কি চিনবেন? —হাসতে-হাসতে বললাম : সে থাকে পশ্চিমবঙ্গের এক অজ পাড়াগাঁয়ে। নিছক চাষাভুষো মানুষ। গাঁয়ের পাঠশালায় আমার সঙ্গে দিনকতক অ আ ক খ শিখেছিল। তারপর পড়া ছেড়ে বাবার সঙ্গে জমি চষতে গিয়েছিল। আর পড়াশোনা হয়নি তার। বছর দুই আগে কলকাতা থেকে গাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—তখন সে এটা উপহার দিয়েছে।

জন নর্থব্রুক আমার মুখোমুখি বসে তেমনি উত্তেজনায় প্রশ্ন করলেন,—আশ্চর্য! সে কোথায় পেল এ জিনিস?

মাঠে জমি চাষ করতে গিয়ে লাঙলের ফালে এটা মাটির তলা থেকে উঠে এসেছিল। —এবার একটু গম্ভীর হয়েই জবাব দিলাম। আমার বিস্ময়টা বেড়ে যাচ্ছিল, তাই।

জনখুড়ো চিন্তিতভাবে বললেন,—এ বড় আশ্চর্য জয়ন্ত! এখন আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার এই কাউয়াই দ্বীপের হায়েনা উপনগরীতে ছুটে আসার মধ্যে নিয়তির অনিবার্য টান টের পাচ্ছি। জয়ন্ত, এই সিগারেটকেস এখানকারই পলিনেশীয় জাতির লোকেরা তৈরি করে। এই দেখো, খুদে হরফে লেখা আছে 'মেড ইন হায়েনা'। কিন্তু তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এর গায়ে প্রাচীন পলিনেশীয় ভাষায় লেখা কয়েকটা কথা। 'আহোয়ায়ালোয়া'। তার পাশে দেখতে পাচ্ছ এই চিহ্নটা? একটা ত্রিভুজের মাথায় যেন চন্দ্রকলা আঁকা। বড় রহস্যময় ব্যাপার জয়ন্ত! আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

খুড়ো মুঠোয় সিগারেটকেসটা আঁকড়ে ধরে চোখ বুজে কী যেন ভাবতে লাগলেন। বব আমার দিকে চোখ টিপে কী ইশারা করল এবং মিটিমিট হাসতে লাগল।

চোখ খুলে জনখুড়ো বললেন,—কাছিমজাতীয় একরকম সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা থেকে এসব সিগারেটকেস তৈরি করে ওরা। আমার চোখে পড়েছিল ওই ত্রিভুজের মাথায় চন্দ্রকলা চিহ্নটা। এটা এই দ্বীপের আদিম রাজার প্রতীকচিহ্ন। আর 'আহোয়ায়ালোয়া' কথাটার মানে 'এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে।' আমি বুঝতে পারছি না, এটা ভারতের একটা গ্রামের মাঠে চাষের জমিতে কীভাবে গেল?

আমিও ব্যাপারটা ভাবছিলাম। এতক্ষণে হদিস মিলে গেল। বললাম,—জনখুড়ো! একটা যোগাযোগ খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে। আমাদের গ্রামের যে মাঠে জিনিসটা আমার চাষীবন্ধু কুড়িয়ে পেয়েছিল, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একটা সামরিক বিমানঘাঁটি বানানো হয়েছিল। তখন আমি নেহাত বাচ্চা। শুনেছি, একদিন একটা ছোট্ট প্লেন কীভাবে সেখানে আছড়ে পড়েছিল নামবার সময়। প্লেনটায় আগুন ধরে যায়। পাইলট বা তার সঙ্গীরা কেউ বাঁচেনি। এখন মনে হচ্ছে, এই সিগারেটকেসটা তাদেরই কারুর কাছে ছিল। যেভাবে হোক, ওটা ধ্বংসস্তূপে টিকে গিয়েছিল। তারপর বিমানঘাঁটিটা যুদ্ধের শেষে উঠে যায়। অনেকবছর পরে জমিতে চাষ পড়ে। তখন সিগারেটকেসটা বেরিয়ে আসে লাঙলের ফলায়।

জন সায় দিয়ে বললেন,—ঠিক ঠিক। বোঝা গেল সব। এ নিশ্চয় কোনো আমেরিকানের কাছে

ছিল। কিন্তু জয়ন্ত, আবার বলছি—যেন তুমি নিয়তির টানেই ছুটে এসেছ হায়েনাতে। কারণ হায়েনার আদিম রাজার প্রতীক-চিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস তোমার কাছে।

ভয় পেয়ে বললাম,—ওরে বাবা! নিয়তি-টিয়তি শুনলে বুক ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপে যে!

বব বলল,—খুড়ো! ওই হোয়া হোয়াহোয়া ব্যাপারটা কী বলছিলেন যেন?

জন বললেন,—তামাশা নয় বব! কথাটার মানে এর ভেতরে গোপন বৃত্তান্ত আছে। তার মানে এই সিগারেটকেসটার ভেতর আদিম রাজা হোলাহুয়া সংক্রান্ত কোনো গোপন বিবরণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা প্লেন দুর্ঘটনার সময় নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা ...

বাধা দিয়ে বললাম,—জনখুড়ো! আমার চাষীবন্ধু বলেছিল এর ভেতর দলাপাকানো শক্ত কিছু জিনিস ছিল। সেগুলো সে ধুয়ে সাফ করেছিল।

জন বললেন,—হুঁ। যা ভেবেছি, তাই।

বব বলল,—দলাপাকানো শক্ত জিনিসগুলো সিগারেট ছাড়া কিছু নয়।

জন ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ। তা হতে পারে জয়ন্ত, জিনিসটা আমি ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার কি আপত্তি আছে?

আমি বলার আগেই বব বলে উঠল,—জায়েন্টো খুব ভালো ছেলে। ওর কোনো আপত্তি নেই। আপনি ওটা নিয়ে গবেষণায় লেগে যান। ততক্ষণ আমি জায়েন্টোকে নিয়ে একবার চক্কর দিয়ে আসি।

জনখুড়ো গম্ভীর মুখে বললেন,—যেখানে যাবে যাও, গুহা-টুহায় যেন ঢুকো না। সাবধান। আর জয়ন্ত, ও যদি কোনো গুহায় ঢুকতে চায়, তুমি ওর চুপ খামচে ধরে ঠেকাবে। বব চুলে জব্দ।

বব তার মাথায় লম্বা মেয়েলি চুলগুলো দুহাতে ঢেকে বলল,—জায়েন্টো, আমার চুলে কিন্তু বিদ্যুৎ আছে। শক মারবে। ছুঁয়ো না।

বলে সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। ...

আংকল ড্রাম

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের নভেম্বর-শেষের আবহাওয়া ভারি মনোরম। কলকাতারই নভেম্বরের মতো। কিন্তু হট করতেই বৃষ্টির বড় উপদ্রব। বেরুলাম যখন তখন চারদিকে ঝলমল করছে বিকেলের গোলাপি রোদ্দুর। সমুদ্রের দিকটা অবশ্য ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে চড়াই-উৎরাই রাস্তা। রেলিংঘেরা ফুটপাথের ধারে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। ফুলে-ফুলে ছয়লাপ, যেদিকে তাকাই। নীচের উপত্যকায় ঘন নারকোলবন। চোখ জুড়িয়ে যায়। রাস্তায় পায়ে হাঁটা লোক কিছু-কিছু চোখে পড়ছিল। পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক ওরা। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন অধিবাসী পলিনেশীয়রা খুব সেজেগুজে ঘুরছে। ওদের মেয়েদের গায়ে ফুলের পোশাক। চওড়া ফুটপাতে বা কোথাও ছোট্ট পার্কে ওরা নাচছে-গাইছে। পুরুষরা বাজনা বাজাচ্ছে। ভিড় জমে আছে। যেতে যেতে হঠাৎ কোত্থেকে বৃষ্টি এসে গেল। দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজতে সবাই ভালোবাসে। আমি আর বব বাদে।

বব আমার হাত ধরে টানতে-টানতে দৌড়ুল। একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলাম। ঢোকার সময় অবাক হয়ে দেখলাম, কয়েকটা ভাষার সঙ্গে বাংলাতেও বড় বড় হরফে লেখা আছে : ঢাকুচাচার রেস্তোরাঁ। পাশে ইংরেজিতে : আংকল ড্রামস রেস্তোরাঁ।

বললাম,—বব! বব! এটা বাঙালি রেস্তোরাঁ দেখছি।

বব বলল,—তাই বুঝি?

ভেতরে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড ভুঁড়িওলা বেঁটে একটা লোক তম্বি করছিলেন ইংরাজিতে। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় বিশাল টাক। দেখামাত্র আমার প্রিয়তম বন্ধু সেই প্রখ্যাত 'বুড়োঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা মনে পড়ে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। হায় কর্নেল! তুমি কোথায়, আর তোমার চিরনেওটা জয়ন্তই বা কোথায়? মাঝখানে দু-দুটো মহাসাগরের ব্যবধান—প্রশান্ত মহাসাগর আর ভারত মহাসাগর।

বব ফিসফিস করে বলল,—এ দেখছি আরেক আংলক। আমার আংকল জন. আর তোমার তা হলে এই বাঙালি আংকল ড্রাম। সত্যি ড্রাম বটে। ড্রামের মতো গমগম করে বাজছে শোনো!

প্রকাণ্ড পিপে-মানুষটা আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন কাউন্টার থেকে। পায়ের চাপে মাটি কাঁপার কথা। কিন্তু মেঝেয় পুরু নরম কার্পেট। কোণার দিকে ছোট্ট মঞ্চে বাজনাপার্টি বসে আছে সেজেগুজে। অবাক হয়ে দেখলাম, মাইকের সামনে একটা শাড়িপরা বাঙালি মেয়ে এসে দাঁড়াল। তারপর মিঠে গলায় বাংলায় ভাটিয়ালি গেয়ে উঠল। তন্ময় হয়ে গেলাম। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এসে বাংলার ভাটিয়ালি শুনব কে ভেবেছিল?

পিপেমানুষটা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পা থেকে মাথা অব্দি গমগমে গলায় এবং বিরাট হাসি মিশিয়ে বলে উঠলেন,—ঢাকা না কইলকাত্তা?

কলকাতা।

প্রকাণ্ড দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন,—হঃ। গন্ধ পাইয়াই বুজছি। আহা রে, কতকাল বাদে ভাইপোডারে পাইলাম। আয়েন, আয়েন। আর শোনেন, আমারে চাচা কইবেন। ঢাকুচাচা।

তারপর ববকে দেখিয়ে বললেন,—এ হালারে জোটাইলেন ক্যান? মাইয়ামাইনষের লাখন চুল রাখছে মাথায় । হালা বুত না প্যারত? মারকিনগুলান, বোঝলেন? ব্যাবাক জংলি।

বব কিছু আঁচ করছিল। ঢাকুচাচা এবার তার হাত নিয়ে জোরালো হ্যান্ডশেক করে নিজস্ব ইংরেজিতে বললেন,—হ্যালো হ্যালো হ্যালো! আই অ্যাম ইওর আংকল ড্রাম!

বব মুচকি হেসে বলল,—আমার একজন আংকল আছে। তবে জোড়া আংকলে আপত্তি নেই।

কাচের দেওয়ালের পাশে আমাদের বসিয়ে ঢাকুচাচা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর নাম মুঝঃফর হোসেন। ডাক নাম তার ঢাকু মিয়া। বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। সতেরো বছর ধরে নানা ঘাটের জল খেয়ে এই হায়েনাতে এসে জুটেছেন। পয়সাকড়ি হয়েছে। মা-মরা মেয়ে জ্যোৎস্নাকে এনেছেন গত বছর। ঢাকায় মামার কাছে থাকত এতদিন জ্যোৎস্না ভালো গাইতে পারে। এই এক বছরে নানাভাষায় গান শিখেছে সে। যে দেশের গান গায়, সেই দেশের পোশাক পরে। ঢাকুচাচা বললেন,—জ্যোৎস্না আইয়া আমার রেস্তোরাঁর বিক্রিবাটা খুব বাড়ছে। হঃ। আর আমার চিন্তা নাই। মাইয়াডার হাতেও রেস্তোরাঁর ভার দিয়া বাইরে ঘোরনের ফুরসত পাই। কাইল সকালে আসেন ভাইপো। আপনারে লইয়া বাইরামু।

চারমাস পরে বাংলায় মন খুলে কথা বলতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। একটু পরে চাচা তাঁর মেয়েকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দিলেন। জ্যোৎস্না ফুটফুটে সুন্দরী। মাথার চুল ববছাঁট। ভারি মিষ্টিস্বভাবের মেয়ে। এক সময় সে আমাকে অবাক করে বলে উঠল,—আচ্ছা। এবার বলুন, আপনি একা কেন কাউয়াই দ্বীপে? সঙ্গে আপনার কর্নেল নেই কেন?

হাঁ করে আছি দেখে সে বলল,—বারে! জয়ন্ত চৌধুরী আর কর্নেলের অ্যাডভেঞ্চার আমি পড়িনি বুঝি? কলকাতায় আমার মাসির বাড়ি। যখন গেছি, একগাদা করে বই কিনে নিয়ে গেছি ঢাকায়। আমি অ্যাডভেঞ্চার আর গোয়েন্দা-কাহিনির পোকা।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে পাঠিকা পেয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব আনন্দের। ববকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে প্রশংসার চোখে আমাকে দেখতে লাগল, চাচা কাউন্টারে চলে গেছেন।

রেস্তোরাঁয় ভিড় বাড়ছে ডিনার খেতে। এখানে লোকের ছটার মধ্যে ডিনার খাওয়া অভ্যাস। বব উসখুস করছে দেখলাম।

জ্যোৎস্না বলল,—আপনাকে জয়ন্তদা বলছি। রাগ করবেন না তো?

জ্যোৎস্না চোখে হেসে রহস্যময় ভঙ্গি করে চাপা গলায় বলল,—নিশ্চয় হায়েনার কোনও গুহায় গুপ্তধনের সূত্র পেয়ে পাড়ি জমিয়েছেন। এবং যেখানে জয়ন্ত চৌধুরী, সেখানেই কর্নেল। কাজেই বুঝতে পারছি, কর্নেল একা কিছু তদন্ত করতে বেরিয়েছেন।

না জ্যোৎস্না! সত্যি বলছি, উনি আসেন নি।

জানি, গোয়েন্দাদের সব কথা গোপন রাখার নিয়ম। তবে জয়ন্তদা আমাকে সঙ্গে নিতে হবে কিন্তু। আমি জানি ... বলে সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে শেষে ববের দিকে তাকালো। ইংরেজিতে বলল,—মিঃ বব। আশা করি কিছুক্ষণ মাতৃভাষায় আমাদের আলাপে তোমার অসুবিধে হচ্ছে না। জরুরি কথাটা সেরে নিয়ে আমরা সবাই এবার ইংরেজিতেই বলব। আমরা বন্ধুর মতো। কেমন?

বব ফিক করে হেসে বলল,—ওক্কে-ওক্কে বেবি! তোমরা জরুরি কথাটা সেরে নাও। আমি আমার জনখুড়োকে ফোনে জানিয়ে দিয়ে আসি আমরা ডিনারটা এখানেই সেরে নিচ্ছি। উনি যেন নিজেরটা, কোথাও সেরে নেন।

বব ফোনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্যোৎস্না বলল,—যা বলছিলাম জয়ন্তদা। এখানে একবছর আছি। মিনিহুন নামে খুদে মানুষের কথা শুনেছি। তারা নাকি গুহার ভেতর থাকে। খুব দুর্গম সে-সব গুহা। ওরা সমুদ্রের মাছের মতো ঘুরতে পারে নাকি। তাই সমুদ্রের তলা থেকে দামি মণিমুক্তা কুড়িয়ে এনে গুহার ভেতর লুকিয়ে রাখে। বছরের পর বছর জমানো সেইসব রত্নের নাকি পাহাড় জমিয়ে রেখেছে ওরা গুহার ভেতর পাতালপুরীতে। রত্নগুলো সূর্যের মতে আলো ছড়ায় সেখানে। পাতালপুরীতে তাই একটুও অন্ধকার নেই। সারাক্ষণ ঝকমকে রোদ্দুর।

হাসতে হাসতে বললাম,—রূপকথা বলছ জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্না মাথা নেড়ে বলল,—মোটেও না। এখানকার পলিনেশীয়রা এসব দারুণ বিশ্বাস করে। আমাদের তিনজন পলিনেশীয় পরিচারক আছে—দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। ওই যে ওরা। দেখছেন তো? ওদের কাছে শুনেছি, কাউয়াই দ্বীপের এক রাজা ছিল। একমাত্র তাকেই নাকি মিনিহুনরা খাতির করত। রাজাকে একবার ওরা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিল পাতালপুরীতে।

বললাম,—ঠিক আছে। যদি সেই পাতালপুরীর খোঁজে বেরোই, তোমাকেও ডাকব। তবে আপাতত আমাকে মাছের ঝোল আর ভাত খাওয়াও তো লক্ষ্মী মেয়ে! চারমাস আমি অখাদ্য খেয়ে কাটাচ্ছি।

জ্যোৎস্না নেচে উঠল! ... এক্ষুনি। আমাদের নিজেদের জন্যে ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত আছে।

ইলিশ! বলো কী? প্রশান্ত মহাসাগরের ইলিশ নাকি?

উঁহু খাঁটি পদ্মার ইলিশ। মাসে একবার আসে চট্টগ্রাম থেকে। ... বলে জ্যোৎস্না প্রায় দৌড়ে চলে গেল। আমার নোলায় জল ঝরার অবস্থা। শুধু চিন্তা, বব বাঙালি খাদ্য খেতে পারবে তো?

দুটি রহস্যময় গুহা

কোকো পাম হোটেলে পৌঁছুতে আরেকদফা ভিজে গেলাম বৃষ্টিতে। চাচা বলছিলেন, শীতকালটা বেজায় বৃষ্টি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। তাই এখন পর্যটকদের ভিড় বছরের অন্য সময়ের তুলনায় কম।

নিজের ঘরে ঢুকে জামাকাপড় বদলে নিলাম। তারপর ববদের ঘরের দরজায় নক করলাম। ববও পোশাক বদলেছে। ভিজে চুল এমন করে ঘষেছে যে আলুথালু ভয়ংকর দেখাচ্ছে। সে চিরুনি

হাতে বাথরুমে ঢুকে গেল। জনখুড়ো টেবিলের সামনে বসে ধ্যান করছিলেন যেন। আমার সাড়া পেয়ে বিড়বিড় করে দুটো শব্দ আওড়ালেন। ওয়েইকাপালি! ওয়েইকানালোয়া!

তারপর ঘুরে একটু হাসলেন। ... বসো জয়ন্ত। 'আহোয়ায়ালোয়া'র রহস্য কিছুটা ভেদ করতে পেরেছি মনে হচ্ছে। পলিনেশীয় ভাষা আমি অল্পস্বল্প জানি। হুম্, তোমার সিগারেটকেসের ভেতরে দুদিকে অনেক কিছু লেখা আছে। তোমার চাষীবন্ধু এটা সাফ করার জন্য এমন ঘষা ঘষেছিল যে অনেক জায়গায় খোদাই করা লেখা মুছে গেছে। আহা, সব যদি অক্ষত থাকত, পুরোটা পড়তে পারতাম। যাক্ গে, যা হবার হয়েছে। যেটুকু পড়া যাচ্ছে, তার সূত্র ধরে এগোলে আমরা দারুণ কিছু আবিষ্কার করতে পারব।

বললাম,—একটু আগে কী দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন জনখুড়ো?

হুম্। ওয়েইকাপালি। ওয়েইকানালোয়া।

এর মানে কী?

হায়েনার দুটো গুহার নাম। নামদুটো সিগারেটকেসের ভেতর লেখা আছে। কিন্তু তার চেয়ে কাজের কথা হচ্ছে, রাজা হোলোহুয়ার বংশের কেউ এখন এখানে আছে কি না খুঁজে বের করতে হবে।

ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্নার মুখে যে পাতালপুরীর কথা শুনেছি, জনখুড়োকে বললাম। খুড়ো এ কিংবদন্তির কথা সবাই জানেন। বললেন,—ওটা নিছক কিংবদন্তি। মিনিহুন বা রত্নপুরী কোনোটাই আমি বিশ্বাস করি না বাপু।

তাহলে সিগারেটকেসে কীসের গোপন বৃত্তান্ত থাকতে পারে? কী লেখা আছে দেখলেন?

খুড়ো হাসলেন। যা লেখা আছে, তা ততকিছু প্রাচীন ব্যাপার নয়। যদিও ভাষা এবং হরফগুলো প্রাচীন পলিনেশীয়। কী লেখা আছে, তা আমি অবিকল অনুবাদ করেছি। এই দেখো।

জনখুড়ো একটা কাগজ দিলেন। তাতে লেখা আছে :

টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয়। যদি আমরা মারা যাই, টিহো এবং মারি হায়েনা ... ওয়েইকাপালি ওয়েইকানালোয়া ... দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দু ফুট বাঁদিকে কবচ ... অসবোর্ন এবং পিটার ওলসন এফ এফ আর ৫০৩৭ ... জি ২২১৩ ...

পড়ার পর বললাম,—শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, অসবোর্ন আর ওলসন নামে সম্ভবত দুজন মিলিটারি পাইলটের এই সিগারেটকেস। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে বিমানঘাঁটিতে তাদের প্লেনটাই ধ্বংস হয়ে থাকবে।

তুমি বুদ্ধিমান জয়ন্ত! জনখুড়ো প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন। ঠিকই ধরেছ। কালই আমি ওয়াশিংটনের সামরিক রেকর্ড দফতরে ফোন করে অসবোর্ন এবং ওলসনের খোঁজ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সব সামরিক দলিল ওখানে রয়েছে। আমার ধারণা, হায়েনার দুটো গুহায় ওরা কিছু লুকিয়ে রেখেছিল। তখন ভীষণ যুদ্ধ চলেছে। যে কোনো সময় ওরা মারা পড়তে পারে। তাই সিগারেট কৌটোয় পলিনেশীয় ভাষায় গোপন হদিস খোদাই করে রেখেছিল।

বললাম,—রাজবংশীয় জনৈক টিহোর কথা আছে ওতে। কেন?

জন বললেন,—এই টিহো ওদের সঙ্গী ছিল সম্ভবত। অর্থাৎ টিহো ব্যাপারটা জানত। ওদের নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল, টিহোকে সিগারেটকেসটা দেবে। ওরা যুদ্ধে মারা পড়লে টিহো ...

জন হঠাৎ থামলেন। চিন্তিতমুখে ফের বললেন,—বাকি কথাটা অস্পষ্ট। শুধু বলা যায়, ওরা মারা পড়লে টিহো কাউকে সিগারেটকেসটা পাঠিয়ে দেবে এমন নির্দেশ ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে হোক, টিহোকে ওরা জিনিসটা দিয়ে যেতে পারেনি।

মনে একটা মতলব এঁটে বললাম,—খুড়োমশাই! আপনার অনুবাদটার একটা কপি পাব কি? আমি ওটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতে চাই।

আলবৎ আলবাৎ। —জনখুড়ো বললেন। ... সিগারেটকেসটা তো তোমার সম্পত্তি।

বব কথা শুনছিল বাথরুমে। মুখ বাড়িয়ে বলল,—খুড়ো! জায়েন্টো ছদ্মনামে গোয়েন্দাকাহিনি লেখে জানেন? অসংখ্য বই লিখেছে। ক্যালকুট্টা থেকে ডেক্কা পর্যন্ত ওর নাম।

বলো কী জয়ন্ত? —জন নড়ে উঠলেন।

বললাম,—হ্যাঁ খুড়োমশাই গোয়েন্দাগল্প আর অ্যাডভেঞ্চার লিখতে লিখতে এমন অভ্যাস হয়েছে, সুযোগ পেলে সত্যিকার রহস্যেও মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে।

খুব ভালো কথা। খুব ভালো কথা। জনখুড়ো একটা কাগজে ওঁর অনুবাদ কপি করলেন। সেটা আমাকে দিয়ে বললেন,—অসবোর্ন আর ওলসন ভারি এলেমদার লোক ছিল, বুঝলে? যে হরফে ওরা লিখেছে, তা কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন রোমান হরফে পলিনেশীয় ভাষা লেখা হয়। তুমি শুনলে অবাক হবে, এই আদিম পলিনেশীয়লিপি হচ্ছে চিত্রলিপি। ছবির রেখায় কথা বোঝানো। তোমাদের সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল আছে। তার আগে প্রাচীন পলিনেশীয় সভ্যতা সম্পর্কে তোমার জানা দরকার।

বব মুখ বাড়িয়ে চোখ টিপল আমাকে। বুঝলাম, সাবধান করে দিচ্ছে, কারণ ওর অধ্যাপক খুড়ো আমার কান ঝালাপালা করে দেবেন বুঝতে পেরেছে। আমিও কি বুঝিনি? বেরসিকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—খুড়োমশাই! কিছু মনে না করেন তো বলি, আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। কাল সব শুনব বরং।

খুড়ো মনমরা হয়ে বললেন, আচ্ছা।

মিহিহুনের রসিকতা

আমেরিকানদের টেলিফোন ব্যবস্থা খাসা। কাউয়াই দ্বীপেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পনেরো মিনিটের মধ্যে কলকাতার লাইনে পেয়ে গেলাম। তারপর সুপরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। কান জুড়িয়ে গেল।

সেই আগস্টমাসে আমেরিকা এসেছি। তারপর বারতিনেক ট্রাংকলে বুড়ো ঘুঘুমশাইয়ের খবর নিয়েছি। উনি পাখি-প্রজাপতি-পোকামাকড় ক্যাকটাস নিয়ে মেতে আছেন আগের মতো। ইদানীং খুনখারাপি বা রহস্যে টান নেই। ওঁর মতে, পৃথিবী দিনেদিনে রহস্যহীন হয়ে পড়েছে। আজকাল খুনিরা সবার সামনে খুনখারাপি করে। আগের দিনে খুনিরা ছিল ভীষণ ভীতু। কত সাবধানে খুন করত। তাদের খুঁজে বের করা কঠিন হত। আজকালকার খুনি ড্যামকেয়ার। কাজেই রহস্য-টহস্য নেই এসব জিনিসে। এদিকে অ্যাডভেঞ্চারও বিজ্ঞানের দৌলতে সস্তা হয়ে গেছে। দুর্গম বলে কোনো জায়গা নেই। আর গুপ্তধন? কর্নেলের ধারণা, সব গুপ্তধন মানুষ হাতিয়ে নিয়েছে দিনে-দিনে। গুপ্তধন বলতে এখন করফাঁকি দিয়ে জমানো কালো টাকা। এসব কাজ আয়কর দফতরের লোকেরাই করে। কাজেই ওসব ছেড়ে কর্নেল প্রকৃতির রহস্যভেদে মন দিয়েছেন।

কর্নেল ফোনে মিঠে গলায় বললেন,—সুখবর আছে ডার্লিং! তোমার পাঠানো আরিজোনা অঞ্চলের মরু ক্যাকটাসে কুঁড়ি গজিয়েছে। তুমি ফিনিক্সে ফের গেলে আরও একটা ক্যাকটাস পাঠাবে।

বললাম,—তিনমিনিট পরে লাইন কেটে দেবে। ঝটপট লিখে নিন, যা বলছি। কাগজ কলম নিন। নিয়েছেন? লিখুন : 'টিহো বিশ্বাসী। টিহো রাজবংশীয় ... '

পুরোটা বললাম। তারপর কর্নেল আমাকে অবাক করে বললেন,—প্রশান্ত মহাসাগরের জলকল্লোল কানে আসছে, ডার্লিং। তুমি কি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে?

হ্যাঁ হাওয়াই দ্বীপে। ম্যাপে দেখে নিন। হায়েনা উপনগরীর কোকোপাম হোটেলে আছি।

জানতো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হায়েনায় আমি একসপ্তাহ ছিলাম। জাপানি বোমার আহত হয়ে ...

আপনি সর্বচর। শুনুন, যা লিখে নিয়েছেন, তাতে সাংঘাতিক রহস্য আছে। ফোনে সব জানানো সম্ভব নয়। আপনি ....

ডার্লিং, হায়েনাতে যখন আছ, তখন আশা করি মেনেহিউন বা মিনিহুন দেখতে ভুলো না। তিনফুট উঁচু, বানরাকৃতি মানুষ। কুচকুচে কালো। অথচ ওদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি আছে। জয়ন্ত! শুনতে পাচ্ছ তো?

আমি বিছানায় বসে ফোন করছিলাম। হঠাৎ কেউ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাতে আমার প্যান্টসুদ্ধ ডান পা চেপে ধরল। দেখি কালো ছোট্ট একটা হাত—অতি কদর্য সেই হাত। শিরা ফুলে আছে। এমন ঠাণ্ডা যে প্যান্ট ও গরম মোজাও বরফ করে ফেলেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! একি!

ফোন তখনও কানে। কর্নেল বললেন,—কী হল ডার্লিং? মিনিহুন নাকি?

আর কথা বলার ফুরসত পেলাম না। আমার ঠ্যাং ধরেক হ্যাঁচকা টান মারল কালো খুদে হাতটা। ফোন পড়ে গেল বিছানায়। আমি গড়িয়ে মেঝের কার্পেটে পড়লাম। তারপর চেঁচিয়ে উঠলাম, —বব! বব!

ঘরে টেবিলবাতির আলো শুধু। মেঝেতে পড়ে থাকতে থাকতে দেখলাম, কী একটা কালো বাঁদরজাতীয় প্রাণী দুপায়ে দৌড়ে গিয়ে বাথরুমের দরজা খুলল—অবিকল মানুষ যেমন খোলে। তারপর ভেতরে ঢুকে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজার হাতল ঘুরিয়ে লক করে দিলাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জনখুড়োকে ধাক্কা দিলাম।

খুড়ো-ভাইপো আমার ধাক্কার চোটে একসঙ্গে মুণ্ডু বের করে বললেন,—কী হয়েছে, কী হয়েছে?

দম আটকানো গলায় বললাম,—মিনিহুন কিংবা মেনেহিউন। আমার ঘরে।

বব হিহি করে হেসে উঠল। জনখুড়ো বেরিয়ে বললেন,—তুমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলে জয়ন্ত!

বব বলল,—দুঃস্বপ্ন।

ব্যস্তভাবে বললাম,—শিগগির আমার সঙ্গে আসুন! বিদঘুটে জীবটাকে বাথরুমে বন্দী করে ফেলেছি।

ওরা দুজনে তখুনি আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। বাথরুমের দরজার সামনে দুধারে খুড়ো-ভাইপো আস্তিন গুটিয়ে জীবটাকে পাকড়াও করার জন্য হুমড়ি খেয়ে বসলেন। আমি, যা থাকে বরাতে বলে দরজার লকটা ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম। তারপর দরজার পাশের সুইচ টিপে দিলাম।

বাথরুম উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। কিন্তু হতচ্ছাড়াটা গেল কোথায়? বাথরুমের মেঝেতে পুরু কার্পেট। সামনে প্রকাণ্ড বেসিন ও আয়না। একধারে কোমোড, অন্যধারে ঝকমকে বাথটাব। বাথটাবের পর্দাটা যথারীতি গোটানো রয়েছে। মিনিহুন হোক আর যেই হোক, একটা আরশোলারও লুকোবার জায়গা নেই বাথরুমে। তা হলে ব্যাপারটা কী হল?

খুড়ো-ভাইপো এবার খ্যা খ্যা করে বেজায় হাসতে লাগল। লজ্জায় পড়ে গেলাম।

জন বললেন,—মাই গুডনেস! বুঝতে পেরেছি তুমি কেন গোয়েন্দা গল্প আর অ্যাডভেঞ্চার লেখো! জয়ন্ত, তুমি সত্যি বড় কল্পনাপ্রবণ।

বব আমাকে একহাত জিভ দেখালো অর্থাৎ ভেংচি কাটল। হতভম্ব হয়ে বললাম,—কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি কলকাতায় ট্রাংকল করছিলাম, জন্তুটা ঠাণ্ডা হাতে আমার পা খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মেরেছিল। দেখতে পাচ্ছেন না ফোনটা এখনও বিছানায় উল্টে পড়ে রয়েছে?

জন ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বব আগের মতো গম্ভীর মুখে বলল, দুঃস্বপ্ন।

হঠাৎ জন কান খাড়া করলেন। তারপর ঘুরে দেয়ালের ওপর দিকে তাকালেন। তারপর একটু হেসে বললেন,—হুম! জয়ন্ত কি বাথরুমে ঢুকে সমুদ্র গর্জন শুনতে ভালোবাসে?

আমি চমকে উঠলাম। সত্যি তো, পেছনের খাড়ি থেকে গম্ভীর সমুদ্রগর্জন শোনা যাচ্ছে। হাজার ফুট নীচে পাথরের দেয়ালে ধাক্কা মেরে প্রশান্ত মহাসাগর মুহুর্মুহু গর্জন করছে।

ওপরে তাকিয়ে দেখি, দেয়াল ও ছাদের মাঝমাঝি জায়গায় তিনফুট লম্বা দুফুট চওড়া কাঁচের লিন্টেল খোলা রয়েছে। জনখুড়ো বললেন,—প্রাণীটা ওই পথেই পালিয়েছে, যদি তোমার স্বপ্ন না হয়।

বললাম,—কিন্তু আমি তো ওটা খুলিনি!

বব ফিক করে হেসে শিস দিতে দিতে তাদের ঘরে ফিরে গেল। জনখুড়ো বললেন,—ওটা আটকে লক করে দাও। খোলা থাকলে তোমার ঘরের হিটিং সিস্টেম কাজ করবে না! প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাবে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফোনটা তুলে কানে রাখলাম। লাইন কখন কেটে গেছে। ফোনটা যথাস্থানে রেখে বললাম,—তা হলে কি সত্যি আমার ঘরে মিনিহুন হানা দিয়েছিল? কিন্তু এ কী ধরনের রসিকতা ব্যাটাচ্ছেলের বলুন তো খুড়োমশাই? আর বেছে বেছে আমার ঘরেই ঢুকল শেষে?

জন গম্ভীর মুখে বললেন,—নিয়তি জয়ন্ত। এ নাম নিয়তি। নিয়তির টানেই তোমাকে ছুটে আসতে হয়েছে হায়েনায়। কারণ তোমার কাছে আছে রাজা হোলাহুয়ার প্রতীকচিহ্ন আঁকা সিগারেটকেস।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কা এবং হন্তদন্ত ববের প্রবেশ।

বব বলল,—শিগগির আসুন খুড়ো! ঘরে চোর ঢুকেছিল। আমাকে ঘুষি মেরে প্রায় দুমিনিট অজ্ঞান করে ফেলেছিল! জ্ঞান হতেই দেখি চোর ব্যাটা হাওয়া হয়ে গেছে।

জনখুড়ো তাঁর ঘরের দিকে ছুটলেন। আমি এবার আমার ঘরের দরজা বাইরে থেকে লক করে ওদের ঘরে গেলাম।

ঢুকে দেখি, জনখুড়োর মাথায় হাত। বললেন,—জয়ন্ত! সর্বনাশ হয়ে গেছে! তোমার সিগারেটকেসটা টেবিলে রেখে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিলাম। সেটা নেই।

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। বব ফিক করে হেসে বলে উঠল,—ওঃ হো! এতক্ষণে বোঝা গেল, এঘরে চোর ঢুকবে বলেই জায়েন্টোর ঘরে মিনিহুন পাঠিয়েছিল! ধন্য ধন্য হে চোর চূড়ামণি! তোমার খুরে খুরে দণ্ডবৎ হই! ধন্য তোমার বুদ্ধিকৌশল। আঃ! কী ব্যথা কী ব্যথা!

বলে সে তার কালো ছোপ পড়া চোয়ালে হাত রেখে বাথরুমে ঢুকল। ...

রাজবংশীয় টিহোর অন্তর্ধান

রাতের ঘুমটা ভালো হয়নি। শোবার আগে খাটের তলা ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। বাথরুমের ভেতরটাও। রাত দেড়টা অব্দি ফের কর্নেলকে ট্রাংকল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। যতবার ওভারসিজ কল অফিসে করি, টেপরেকর্ডারে বেজে ওঠে : 'দুঃখিত মশাই। সমুদ্রপারের লাইন এখন ব্যস্ত। আবার চেষ্টা করুন।'

সকালে ঢাকুচাচার মেয়ে জ্যোৎস্না এসে হাজির। এখন আর চেনাই যায় না, পুরো মেমসায়েবটি। সাদা শার্ট আর জিনিসের প্যান্ট পরেছে। মাথায় হাওয়াই দ্বীপের হলুদ টুপি।

রাতের ঘটনা শুনে সে আঁতকে উঠল। বলল,—এ যে সত্যিকার রহস্যকাহিনি জয়ন্তদা! কিন্তু এবার প্রমাণ হল তো সত্যি মিনিহন আছে?

বললাম,—মিনিহন কিনা কে জানে! আমার তো মনে হল বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল,—যাঃ! বাঁদর কালো হয় নাকি? তা ছাড়া বললেন ভীষণ ঠাণ্ডা হাত। হবেই তো। মিনিহন সমুদ্রেও মাছের মতো ঘুরে বেড়ায় কিনা! এখন নভেম্বরে সমুদ্রের জল ঠাণ্ডা না?

গল্প করতে করতে কফির অর্ডার দিলাম ফোনে। সেইসময় বব ফুলবাবু সেজে ঘরে ঢুকল। নকশাকাটা ঘিয়ে রঙের ঢিলে কুর্তা আর আঁটো জিনস পরা। জ্যোৎস্নাকে দেখে বলল,—হাই!

জ্যোৎস্না বলল,—হাই!

এই হল মারকিন সম্ভাষণ। বব বলল,—খুড়োমশাই পুলিশ দফতরে গেলেন। হোটেলের ম্যানেজার খুব ভয় পেয়ে গেছে। কোকো পামে এই প্রথম চুরি বিশবছর পর। বিশ বছর আগে একবার এক পর্যটকের জুতো চুরি গিয়েছিল এক পাটি কেডস! যাই হোক, বাইরে রোদ্দুরের ফুল ফুটছে। ঘরে বসে থাকার মানেটা কী?

বললাম,—বসো। কফি আসছে। খেয়ে বেরুব। তারপর বাংলায় জ্যোৎস্নাকে বললাম, —জ্যোৎস্না, তোমার সময় হবে তো?

জ্যোৎস্না বলল,—অঢেল সময়। আপনাকে নিয়ে ঘুরে সব দেখাব বলেই তো এসেছি।

বব ভুরু কুঁচকে বলল,—তোমরা মাতৃভাষায় আমাকে গাল দিচ্ছ কি?

বললাম,—সরি বব! ভুল হয়েছে। আমরা তোমার সামনে বাংলা বলব না। কারণ সেটা অভদ্রতা হয়।

একটু পরে পলিনেশীয় পরিচারিকা কফি নিয়ে এল। কফির সঙ্গে প্রকাণ্ড এক প্লেট বাদাম ফাউ হিসেবে। এ বাদাম, জ্যোৎস্না জানালো, এ স্বর্গোদ্যানেরই ফসল। চিবুলে ছানার স্বাদ পাওয়া যায়। আমার জিভে নারকোল মনে হল। পরিচারিকাটি পলিনেশীয়দের মতোই বেঁটেখাটো মোটাসোটা। গায়ের রঙ উজ্জ্বল বাদামি। চ্যাপটা মুখ এবং নাকটা সরু। হঠাৎ দেখলে জাপানি মনে হতে পারে। তবে কাল থেকে পথঘাটে অনেক খাড়ানাকওয়ালী মেমসায়েবের মতো মেয়েও দেখেছি—তারাও পলিনেশীয়। কারুর গায়ের রঙ কালোও। কিন্তু সবসময় মুখে হাসিটি লেগে আছে।

জ্যোৎস্না আমাদের অবাক করে পলিনেশীয় ভাষায় ওর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মেয়েটি চলে গেলে বললাম,—বাঃ জ্যোৎস্না! তুমি ওদের ভাষা শিখে ফেলেছ দেখছি?

জ্যোৎস্না বলল,—অল্পস্বল্প। জয়ন্তদা, ওকে জিজ্ঞেস করলাম টিহো নামে কাকেও চেনো নাকি—আদিম রাজার বংশধর টিহো? ও বলল,—টিহো এখানেই চাকরি করে। এ হোটেলের বেল ক্যাপ্টেন সে। অর্থাৎ পোর্টারদের সর্দার। হোটেলে লোক এলে তার নির্দেশে মেলম্যানরা ব্যাগেজপত্তর ঘরে পৌঁছে দেয়। হোটেল ছাড়লে ঘর থেকে ব্যাগেজ নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠায়। এসব ওদের দায়িত্ব।

বললাম,—জানি। টিহোর কথা কী বলল বলো।

জ্যোৎস্না বলল,—টিহোকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বব এবং আমি একসঙ্গে বলে উঠলাম,—সে কী!

হ্যাঁ। মেয়েটির নাম ওলালা। ওর ধারণা, টিহো সানফ্রান্সিসকোতে তার মারকিন বউটার কাছে ফিরে গেছে। টিহোবুড়োর সংসারটি বেজায় বড় সেখানে। একগাদা নাতিপুতিও আছে। সবাই একসঙ্গে থাকে।

বললাম,—টিহো বয়সে বুড়ো নাকি?

জ্যোৎস্না বলল,—হ্যাঁ-তাই তো বলল ওলালা।

বব বলল,—ওঃ হো! মনে পড়েছে। রিসেপশানে গম্ভীর চেহারার এক বুড়ো পলিনেশীয়কে দেখেছিলাম। ওহে জায়েন্টো, আমার এ কথাও মনে পড়েছে এতক্ষণে —তুমি রিসেপশানের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার রহস্যময় সিগারেট কৌটোটা বের করেছিলে এবং সিগারেট টানছিলে।

জ্যোৎস্না চোখ বড় করে বলল,—তাহলেই সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেল জয়ন্তদা। টিহোবুড়ো তখনই জিনিসটা দেখে চমকে উঠেছিল। তারপর ...

সে হঠাৎ থেমে কী ভাবতে লাগল। তারপর ফের বলল,—দেখুন জয়ন্তদা। কাল বলছিলাম না আপনাকে? মিনিহুনরা রাজা হোলাহুয়াকে খুব খ্যাতি করত বলে কিংবদন্তি আছে। আমার মনে হচ্ছে, টিহোর সঙ্গে মিনিহুনদের যোগাযোগ থাকা সম্ভব। একজন মিনিহুনকে সে ডেকে এনেছিল হোটেলে।

বব হাসতে হাসতে বলল,—তোমরা বাঙালিরা বড় কল্পনাপ্রবণ জাত। যাক্‌গে বাইরে কত রোদ্দুর। ঘরের ভেতর বসে বিদঘুটে আলোচনা করে লাভটা কী? চলো, বেরিয়ে পড়ি।

ওয়েই কাপালির ভেতরে

ঝলমলে রোদ্দুরের দিন। তাই খাড়ির মাথায়, পার্কে, কিংবা খাড়ির নীচে যেখানে নেমে যাওয়ার পথ আছে এবং পাথরের চওড়া চাতালে সমুদ্রের জল লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, সেখানে নাচগানের আসর জমে উঠেছে। প্রতি আসরে ফুলের পোশাক পরা পলিনেশীয় মেয়েরা তো আছেই— পৃথিবীর নানা দেশের লোকেরাও রঙিন পলিনেশী পোশাক পরে নাচছে। আঁতকে উঠলাম দেখে, তোলপাড় করা জলেও লম্বাটে ছিপনৌকোর মতো ক্যানো ভাসিয়েছে দুঃসাহসীরা।

ববের মারকিন রক্ত লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্যে। বলল,—হাই জোস্না। চলো আমরা নীচে নেমে যাই। তারপর একটি ক্যানো ভাড়া করে নাকানিচুবানি খেয়ে আসি।

জ্যোৎস্না বলল,—দারুণ জমবে। চলুন জয়ন্তদা।

আমি আঁতকেই ছিলাম। মিনমিনে গলায় বললাম,—দ্যাখো জ্যোৎস্না, আমি পশ্চিমবঙ্গের ঘটি। পাহাড়জঙ্গল যদিবা চষে বেড়াতে পটু, জল দেখলেই আমি বেড়ালের মতো ভয় পাই। তমি বাঙাল মেয়ে। জলের দেশের জলকন্যা। তোমার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা অসম্ভব।

বব খপ করে আমার হাত ধরে বলল,—এসো। তোমাকে আমরা সাঁতার শেখাবো।

জ্যোৎস্না খিলখিল করে হেসে উঠল। বব একটা প্রায় খাড়া ফাটল দিয়ে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। মাধ্যাকর্ষণেরও টান আছে। তাই নীচের একটা চাতালে পৌঁছতে মিনিট দুইয়ের বেশি লাগল না। অথচ চাতালটা প্রায় হাজার ফুট নীচে।

চাতালের কিনারায় সমুদ্রের জল এসে ফণা তুলছে। ছড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কেমন একটা আঁশটে গন্ধ জলের। অসংখ্য সমুদ্রপাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। ডাকাডাকি করছে। জলের গর্জন, পাখির ডাক, তার ওপর হাওয়াইয়ান নাচগান ও বাজনার চোটে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। খাড়িটা প্রায় সিকি কিলোমিটার চওড়া। সামনে তুলকালাম জলে চাপচাপ সাদা ফেনা দুলছে। তার তলায় পাথর আছে। নৌকোর তলা এক ধাক্কায় ফুটো হবার সম্ভাবনা; তার মধ্যে পলিনেশীয় মাঝির হাঁটু অব্দি নাগাদের মতো রঙিন লুঙি জাতীয় পোশাক এবং মাথায় হলুদ টুপি পরে বৈঠা চালাচ্ছে। ওদের নৌকো চালানোর দক্ষতা দেখে তাক লাগছিল।

জ্যোৎস্না এক ফুলওয়ালীর কাছে একগুচ্ছ ফুল কিনল। তারপর ফুলগুলো মাথায় এবং কোমরে চমৎকার গুঁজে নিল। তখন ওকে মনে হল বাঙাল মেয়েটা এবার পলিনেশীয় মেয়ে হয়ে উঠেছে। বব ক্যানো নৌকা ভাড়া করছিল। দরাদরি করে ঘণ্টায় দশডলারে রফা হল। তার মানে প্রায় আশি

টাকা। আমার ইচ্ছে করছিল এবার ভোঁ দৌড় করে পালিয়ে যাই! কিন্তু হাজার ফুট খাড়া চড়াই ভেঙে ওঠা সহজ কথা নয়।

ক্যানোটা জলের ধাক্কায় প্রচণ্ড দুলছে। দুজন পলিনেশীয় মাঝি সামনে পেছনে বসেছে। প্রথমে জ্যোৎস্না নামল। তারপর সে হাত বাড়াল আমার দিকে। বব আমাকে পেছন থেকে এমন ধাক্কা মারল যে আর একটু হলেই জলে পড়তাম। জ্যোৎস্না ধরে ফেলল। তখন টের পেলাম, বাঙাল মেয়েটার গায়ে তো অসম্ভব জোর! রোসো, আমিও খাঁটি ঘটি। তোমার প্রতাপ জলে, আমার ডাঙায়। সময় এলে বুঝিয়ে দেব, এই জয়ন্ত চৌধুরী কী জিনিস।

ক্যানো নৌকার ভেতর প্রাণ হাতে করে বসে রইলাম। উথাল-পাথাল জলে ক্যানো বেজায় টলমল করছিল। জল গর্জন করে ছুটে আসছে তীরের দিকে। তাই সোজাসুজি এগোনো কঠিন। মাঝিরা তীর বরাবর আশ্চর্য কৌশলে এগোল। তারপর এখানে জলের মধ্যে বড় বড় পাথর থাকায় ভেতরে জল অনেকটা মেজাজ বদলে ভালোমানুষ হয়েছে। সেখানে পৌঁছে জ্যোৎস্না পলিনেশীয় ভাষায় মাঝিদের কিছু বলল। তার মধে শুধু 'ওয়েইকাপালি' কথাটা বুঝতে পারলাম।

জলের ঝাপটায় ততক্ষণে আমরা সবাই ভিজে গেছি। ক্রমাগত ভিজছি। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। বললাম,—জ্যোৎস্না ওয়েইকাপালি গুহার কথা বললে নাকি ওদের?

জ্যোৎস্না হাসল। হ্যাঁ, জয়ন্তদা। ওই যে পুবের দেয়ালমতো জায়গা দেখছেন, ওখানেই ওয়েইকাপালির গুহা। বললাম ওদের রাজা হোলাহুয়ার পুজো দিতে যাচ্ছি। ওরা তাই খুব খুশি। তবে বাড়তি দু ডলার লাগবে।

বব বলল,—দেবো।

অনেক পাথরের গলিঘুঁজির ভেতর দিয়ে এগিয়ে এক সময় মাঝিরা আমাদের আরেকটা ছোট্ট চাতালমতো জায়গার সামনে পৌঁছে দিল। একে-একে আমরা উঠে গেলাম। মাঝিরা ক্যানোতে অপেক্ষা করতে থাকল।

বললাম,—জ্যোৎস্না, তুমি কি আগে এ গুহায় এসেছো কখনও?

জ্যোৎস্না বলল,—আমাদের রেস্তোরাঁর পরিচারক জুহর সঙ্গে একবার এসেছিলাম। জুহ এখানে মানত করতে এসেছিল। তবে ভেতরে বেশি দূরে ঢুকিনি। ভীষণ অন্ধকার। তাছাড়া একগাদা মড়ার খুলি আর হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখেছি।

বব মুচকি হেসে বলল,—তাহলে নিশ্চয় ভূত আছে ভেতরে।

আমার শার্টের পকেটে ভাগ্যিস জনখুড়োর সেই অনুবাদের কাগজটা রয়ে গেছে। বললাম, —জ্যোৎস্না। এসেই পড়লাম যখন, তখন 'দক্ষিণ সাত গজ পূর্ব দুফুট বাঁদিকে কবচ' ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে চাই। কাগজটা আমার সঙ্গেই আছে।

জ্যোৎস্না চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল,—কিন্তু যদি মিনিহুনের পাল্লায় পড়ি।

বব আস্তিন গুটিয়ে বলল,—আমি ক্যারাটের প্যাঁচ জানি। ভেবো না।

প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটানিতে এবং রোদ্দুরে আমাদের পোশাক একটুতেই শুকিয়ে গেছে। এখন হাওয়াটা তত ঠাণ্ডা না, এই রক্ষে। জ্যোৎস্না চাতাল থেকে পা বাড়িয়ে বলল,—সাবধানে আসুন।

অজস্র জোটবড় পাথর পড়ে আছে। কিছুটা ঢালু খাড়া দেওয়ালের মতো জায়গায়। পাথরগুলো কোন যুগে ওপর থেকে ভেঙে গড়িয়ে এসে খাড়ির গায়ে আটকে রয়েছে। তার ভেতর সাবধানে প্রায় তিনশ ফুট ওঠার পর একটা ফাটল দেখতে পেলাম। ফাটলটা চওড়াতে একগজ, লম্বায় দুগজ। জ্যোৎস্না বলল,—এই হচ্ছে ওয়েইকাপালি গুহার মুখ। ভেতরে কিন্তু হলঘরের মতো চওড়া।

বব বলল,—আহা! বুদ্ধি করে একটা টর্চ আনলে কত ভালো হত।

জ্যোৎস্না পকেট থেকে একটা খুদে টর্চ বের করে বলল,—সে কি আনিনি? আমি আপনাদের নিয়ে এখানে আসব বলেই বেরিয়েছিলাম।

দুষ্টু মেয়ে। তোমার মতলবের কথাটা আগে বললে তৈরি হয়েই আসতাম।

আমার কথা শুনে বব বলল,—বেশি তৈরি হওয়া ঠিক না আমি বরাবর দেখেছি, তৈরি হয়ে কিছু করতে গেলে ফল হয় না। চলো, ঢুকে পড়া যাক্।

বললাম,—একমিনিট। জ্যোৎস্না, এটা ওয়েইকাপালি। কিন্তু ওয়েইকোনালোয়া গুহাটা কোথায়?

জ্যোৎস্না বলল,—সেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকে একটু ওপরে। সেখানে কেউ যায় না। যাওয়াও খুব কষ্টসাধ্য। তবে আমাদের পরিচারক জুহুর কাছ থেকে শুনেছি, দুটো গুহার মধ্যে যোগাযোগ আছে। কোথায় নাকি একটা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

গুহার ফাটল দিয়ে আগে ঢুকল জ্যোৎস্না,—কারণ সে আগে একবার এসেছে। তার পেছনে বব। শেষে আমি। ঢুকতেই একটা বিটকেল গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। নাকে রুমাল চাপা দিলাম তিনজনেই।

ভেতরটা সত্যি প্রকাণ্ড হলঘরের মতো। বাইরের আলোর ছটায় সামান্য কয়েক গজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। তার ওধারে ঘন কালো আঁধার। জ্যোৎস্নার খুদে টর্চের আলো কিন্তু দারুণ জোরালো। ইলেকট্রনিক বাতি আসলে সেই আলোয় যা দেখলাম, ভীষণ চমকে উঠলাম।

দুধারে জড়ো করা আছে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি আর হাড়গোড়। এই রহস্যময় গুহার ভেতর যেন রাক্ষস-খোক্কসের বাস। মানুষ ধরে খেয়েছে এখানে। গা ছমছম করতে থাকল। বব একটা খুলি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকল, হাই ম্যান! হাউ আর ইউ?

হঠাৎ জ্যোৎস্না বলল,—চুপ! কী একটা শব্দ পাচ্ছি যেন।

সে আলো নেবালো। অন্ধকারে দূরে কারা চাপা গলায় কথাবার্তা বলছে যেন। কারা ওরা?

বব ফিসফিস করে বলল,—জ্যোৎস্না টর্চ দাও। আমি একটু এগিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কী?

জ্যোৎস্না টর্চ দিয়ে বলল,—বেশি দূরে যেও না। আর সাবধান, দরকার না হলে টর্চ জ্বেলো না।

বব অন্ধকারে এগিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। নাকে রুমাল চেপেই রেখেছি—সরালে দুর্গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উগরে আসছে।

ববের ফেরার নাম নেই। আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি ক্রমশ। সেই কথাবার্তার আওয়াজ কিন্তু সমানে শোনা যাচ্ছে।

কতক্ষণ পরে বব অন্ধকার থেকে ছিটকে এসে পড়ল। ব্যস্তভাবে বলল,— কোকো পাম হোটেলের বেলক্যাপ্টেন সেই টিহোব্যাটাকে দেখলাম মনে হল। তার সঙ্গে জনাতিনেক লোক আছে। গুহার ভেতরটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে, তাই ওদের আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তাছাড়া বাঁকের মুখে প্রকাণ্ড বেদীতে একটা মূর্তি আছে। ওরা মূর্তির পেছনে গজ-ফিতে দিয়ে মেঝেয় মাপছে। কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড, টিহোর কাঁধে সম্ভবত একটা মিনিছন বসে আছে দেখলাম। কালো কুচকুচে বাঁদরের মতো। দেখবে এসো।

অন্ধকারে ববের পেছনে দেয়াল ধরে-ধরে আমরা এগোলাম। অনেকটা এগিয়ে বব ফিসফিস করে বলল,—এবার বাঁদিকে।

বাঁদিকে ঘুরতেই প্রথমে চোখে পড়ল দূরে আলোর ঝলক। একটা মার্কারি ল্যাম্প জ্বলছে। ছায়ার মতো কয়েকটা লোক কীসব করছে টরছে। সামনের বেদির ওপর একটা বিশাল মূর্তি। তার পাশ দিয়ে গেছে করিডোরের মতো গুহা-পথ। আমরা বেদির পেছনে গিয়ে উঁকি মেরে ওদের ব্যাপার-স্যাপার দেখতে থাকলাম।

হোয়া-হোয়া-হোয়া আ-আ!

ওরা চারজনে ফিতে ধরে একবার মেঝে, একবার দেয়ালের এপাশ-ওপাশ মাপামাপি করছে আর চাপা গলায় কী সব কথাবার্তা বলছে। জ্যোৎস্নার পক্ষে বোঝা সম্ভব। কিন্তু আমাদের মুখ খোলা বিপজ্জনক। ওরা টের পেয়ে যাবে।

একটু পরে একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক এদিকে ঘুরে মার্কারি বাতির কাছে এল। বাতিটা কীসের ওপর বসানো। নিশ্চয় ব্যাটারির বাক্সে। খুব জোগাড়যন্ত্র করে গুহায় ঢুকেছে তা হলে।

বব আমাকে খুঁচিয়ে দিল। বুঝলাম এই তাহলে রাজবংশীয় টিহো। গায়ের রঙটা ঘোর বাদামি। পেল্লায় গোঁফ মুখে। নাকটা প্রকাণ্ড এবং একটু থ্যাবড়া। মাথায় কাঁচাপাকা ছোট চুল। কিন্তু গোঁফ একেবারে সাদা।

সে আলোর সামনে ঝুঁকে (ও হরি! এ যে আমার সেই সিগারেট কেস!) সিগারেট কেসের ভেতরটা পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু বুদ্ধি আছে বটে। একটা আতসকাচও এনেছে। আতসকাচের সাহায্যে পড়ার চেষ্টা করছে।

রাগে আমার ভেতরটা গরগর করতে থাকল। আমার বাল্যবন্ধুর উপহার দেওয়া ওই সিগারেটকেসটা আমার কতকালের সঙ্গী। সবসময় ওটা ব্যবহার করতাম না। কদাচিৎ ইচ্ছে হলে তবে এবার আমেরিকা বেড়াতে আসার সময় কী খেয়ালে ওটা সঙ্গে এনেছিলাম।

নাকি জনখুড়ো যা বলেছেন তাই ঠিক? নিয়তি আমাকে টেনে এনেছে এখানে। সিগারেটকেসটা যেখানকার জিনিস, সেখানে ফিরে আসতে চেয়েছিল যেন।

এইসব কথা ভেবেও আমার কেমন একটা অস্বস্তি হতে থাকল। তাই ভাবলাম, চুলোয় যাক। সিগারেটকেস যার হাতে পৌঁছানোর কথা, পৌঁছে গেছে। তবে শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা দেখে যাওয়া যাক্। আমার এই বিদঘুটে স্বভাব—রহস্যভেদী এক বুড়ো ঘুঘুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে স্বভাবটা বাগে পেয়েছে, যেখানে রহস্যের গন্ধ পাই নাক গলাতে ইচ্ছে করে।

টিহো সিগারেটকেসের ভেতরটা আতসকাচের সাহায্যে ফের দেখে নিয়ে সঙ্গীদের কিছু বলল। তখনই চোখে পড়ল সেই আজব কদর্য প্রাণীটাকে।

প্রাণীটা ব্যাটারিবাকসেতে হেলান দিয়ে কলা খাচ্ছিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর কলা ফলে। এই হাওয়াই দ্বীপে কাল লিহিউ বিমানঘাঁটি থেকে আসতে আসতে অজস্র কলাবাগান দেখেছি। একেকটা কলা প্রায় দেড় ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং গাঢ় হলুদ রঙ। এসব কলা আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে প্রচুর বিক্রি হয়। কাজেই এর মধুর স্বাদের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়ে গেছে। বানরজাতীয় জীবটি যদি সত্যি সেই মেনেহিউন বা মিনিহুন হয়, তা হলে বলতে হবে কলাই তার প্রধান খাদ্য। কারণ তার সামনে প্রায় এক কাঁদি কলা রয়েছে।

একটা লোক মার্কারি বাতি ও ব্যাটারি যন্ত্রটা তুলে কাঁধে নিল। তখন খুদে প্রাণীটা দুপায়ে উঠে দাঁড়াল। তার এক হাতে কলার কাঁদি। কালো হাতটায় দাগড়া দাগড়া পেশীর ওপর আলো ঠিকরোচ্ছে। তার মুখটা স্পষ্ট নজরে পড়ল। অবিকল মানুষের মতো। কিন্তু আকারে একটা বড় সাইজের মোসাম্বি লেবুর মতো গোলাকার। কান দুটো বেশ বড়। গায়ে একটুও লোম নেই। সব মিলিয়ে আস্ত একটি মানুষ-চামচিকে বলা যায়—শুধু ডানার বদলে দুটো হাত আছে।

ওরা এগিয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা ফাটলে ঢুকে গেল। ক্রমশ আলোর ছটাও মিলিয়ে গেল। আবার গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল ওয়েইকাপালি গুহা। জ্যোৎস্না ফিসফিস করে বলল,—ওরা সঠিক জায়গাটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওয়েইকানালেয়া গুহার যে সুড়ঙ্গ পথ এগুহায় এসেছে, সেটাই খুঁজতে গেল ওরা। শুনেছি দুই গুহার মধ্যেকার এ সুড়ঙ্গ পথ আজ পর্যন্ত কেউ খুঁজে পায়নি।

বব উঠে দাঁড়িয়ে বলল,—চলো। ওদের পেছন পেছন যাই।

জ্যোৎস্না বলল,—আমি একটি কথা ভাবছি। আমাদের বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে না? মাঝির যদি রাগ করে ক্যানো নিয়ে চলে যায়, খুব বিপদে পড়ে যাব।

বব বলল,—তা হলে তোমরা এখানে অপেক্ষা করো। আমি ঝটপট ওদের বলে আসি, মানত দিতে আমাদের একটু দেরি হবে। প্রার্থনা করব কিনা? তিনজনের প্রার্থনা একটু লম্বা চওড়া হবেই।

জ্যোৎস্না বলল,—তাই যাও বব। যদি আরও দুডলার বেশি চায় দেরি হবার জন্য। রাজি হয়ো।

বব গুহার মেঝেয় সাবধানে টর্চের আলো ফেলতে-ফেলতে চলে গেল।

বললাম,—জ্যোৎস্না! এই মূর্তিটা নিশ্চয় কোনো দেবতার?

জ্যোৎস্না বলল,—হ্যাঁ। পলিনেশীয় জাতির আদিম যুগের এই দেবতার নাম কন-টিকি।

কন-টিকি? অবাক হয়ে বললাম। এ তো খুব চেনা শব্দ মনে হচ্ছে! হ্যাঁ— বিখ্যাত অভিযাত্রী থর হেয়ারডাল কন-টিকি নামে একটা ভেলায় প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন।

জ্যোৎস্না বলল,—কন-টিকি আসলে সূর্যদেবতা। আদিমযুগে প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপে এই সূর্যদেবতার পুজো হত। এখন পলিনেশীয়রা প্রায় সবাই খ্রিস্টান হয়ে গেছে। তাই আর কন-টিকির পুজো হয় না। হায়েনায় এসে শুনেছি, পলিনেশীয়রা এখনও কেউ কেউ কন-টিকির পুজো করে। তবে এ পুজো মানে নেহাত রোগ বা বিপদ আপদে মানত করা। তাও ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে মানত করতে আসে। পাদ্রীরা জানতে পারলে জরিমানা করে যে! কিন্তু জানেন জয়ন্তদা বিদেশিরা মানত দিত এলে পলিনেশীয়রা ভারি খুশি হয়। তবে ভয়ে কেউ এতদূর আসতে পারে না। গুহার দরজার মুখে কিছু ফুল রেখে চলে যায়। কারণ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—ওই সব মড়ার মাথার খুলি হাড় কংকাল! ভূতের ভয়ে এদিকটায় ক্যানো নিয়ে আসতে চায় না। নেহাত টাকার লোভে কেউ আসে।

তুমিও তা হলে এই মূর্তিটার কাছে আসো নি?

মোটেই না। এতদূর আসব, কী দরকার মুখেই যা বিচ্ছিরি গন্ধ।

আমরা ফিসফিস করে কথা বলছিলাম। ইচ্ছে হল, বেদিতে উঠে মূর্তিটাকে ছুঁয়ে দেখি কী দিয়ে তৈরি। তাই বললাম,—জ্যোৎস্না! আমি বেদিতে উঠে মূর্তিটা ছুঁয়ে দেখি। ইচ্ছে করলে তুমিও উঠতে পারো। উঠবে নাকি?

জ্যোৎস্নার কোনো সাড়া পেলাম না। তাই ফের ডাকলাম,—জ্যোৎস্না। আসবে নাকি?

তবু কোনো সাড়া নেই। একটু জোরে ডাকলাম,—জ্যোৎস্না গেলে কোথায়?

আশ্চর্য জ্যোৎস্না কি অন্ধকারে তামাশা করছে আমার সঙ্গে? এ কি তামাশার সময়?

রাগ করে বললাম,—জ্যোৎস্না! সাড়া দিচ্ছো না কেন?

মেয়েটা ডানপিটে এবং গায়ে জোর আছে। তাই বলে এ ভূতুড়ে গুহায় আমার সঙ্গে এমন ফাজলেমি করা কি উচিত হচ্ছে? আমি হাত বাড়িয়ে ওকে খুঁজলাম। পেলাম না। তখন বেদি থেকে অন্ধের মতো দুহাত বাড়িয়ে কানামাছি খেলতে থাকলাম অন্ধকারে। দেয়ালে ধাক্কা লাগতেই আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বললাম,—হচ্ছেটা কী? জ্যোৎস্না! জ্যোৎস্না?

ঠিক সেই সময় অন্ধকারে দূরে আচমকা বীভৎস একটা চেচাঁমেচি শুনতে পেলাম। হোয়া হোয়া—আ—আ? হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ। হোয়া হোয়া হোয়া —আ—আ!

অনেকগুলো রাক্ষুসে মানুষের চিৎকার যেন। বিদেশি ফিল্মে জংলিদের চিৎকারের মতো। হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ! হোয়া হোয়া হোয়া—আ—আ।

অমানুষিক চিৎকার করতে করতে কারা এগিয়ে আসছে এদিকে।

মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলাম না। অন্ধকারে অন্ধের মতো দৌড়তে চেষ্টা করলাম। কোনদিকে দরজা—কোনপথে এসেছি, তা ঠিক করতে পারলাম না। বার বার আছাড় খেলাম। জান্তব চিৎকারটা খুব কাছে বলে মনে হল। তারপর যেই পা ফেলেছি, হড়াৎ করে একটা গর্তে পড়ে গেলাম।

পড়লাম একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা জলে। জলে পড়ায় আঘাত লাগল না। কিন্তু কী তীব্র স্রোত! আমাকে টেনে নিয়ে চলল খড়ের খুটোর মতো!

কতক্ষণ অসহায় ভেসে থাকার পর একখানে স্রোতটা হঠাৎ কমে গেল। অদ্ভুত ব্যাপার তো! তারপর জলটা আমাকে উল্টোদিকে ঠেলতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম সমুদ্রের জল গুহার তলার সুড়ঙ্গে একবার করে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই এরকম দুমুখো টান জলে। হাত বাড়িয়ে শক্ত কিছু খুঁজলাম। হাতে দেয়াল ঠেকল। কিন্তু জলের ধাক্কায় মসৃণ দেয়াল ধরার উপায় নেই। আবার এক হ্যাঁচকা টানে স্রোতের মুখে ভাসলাম। হাত দুটো অসহায়ভাবে ওপরে বাড়াতেই ছাদে ঠেকল। তারপব ছাদটা, ঢালু হয়ে জলে ডুবেছে টের পেলাম। সর্বনাশ! এবার জলের তলায় দম আটকে মারা পড়তে হবে যে! কিন্তু না ডুবে উপায় নেই। মাথা ভেঙে যাবে।

প্রচণ্ড বেগে জল আমাকে টেনে নিয়ে চলল। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আঃ বাতাস! মাথা তোলার জন্য একটুখানি আকাশ।

বুক ফেটে যাবে বুঝি। জলের টান যেন গভীর পাতালে নিয়ে চলেছে। একসময় আর সহ্য করতে পারলাম না। নিঃশ্বাস নেবার জন্য ঠেলে মাথা তুললাম। মাথায় কিন্তু ছাদের ধাক্কা লাগল না। আঃ। আবার একটুকরো আকাশ পেয়েছি। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে থাকলাম। এখানে স্রোতটা কমেছে। জলটা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঁদিকে একটু সরলে আবার তীব্র স্রোত পেলাম। তারপর সামনেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ক্রমশ।

একটা ফাটল দিয়ে রোদ্দুর ঢুকেছে। বরফগলা জলে শরীর নিঃসাড়। কিন্তু রোদ্দুর দেখে বাঁচার তাগিদ জোরালো হয়ে উঠেছে। ফাটলের কাছে পৌঁছতেই আঁকড়ে ধরলাম একটা পাথরের খাঁজ।

ফাটলটা প্রায় হাত দেড়েক চওড়া। অনেক কষ্টে সেখান দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। ...

অগ্নিদেবী পিলির ভক্তবৃন্দ

চারদিক খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পেরেছি আমার অবস্থা হয়েছে রবিনসন ক্রুশোর মতো। যেখানে বসে আছি, তার নীচে হ্রদ। হ্রদের একটা দিক সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। বাকি তিনদিকে পাহাড়। খাড়া দেওয়ালের মতো পাহাড়। হ্রদের জলে হাজার-হাজার পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে। সমুদ্রের সঙ্গে একটা চওড়া নালা দিয়ে হ্রদের যোগাযোগ রয়েছে। সেখানে জলটা প্রচণ্ড ফুঁসছে। কিন্তু হ্রদের ভেতর তত ঢেউ নেই। মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসছে। জলে বসছে। আবার তুমুল চেঁচামেচি করতে করতে উড়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট্ট চাতালে বসে থাকতে থাকতে আমার ভিজে পোশাক শুকিয়ে গেছে। এখন বেলা প্রায় বারোটা বাজে। হ্রদের ওপর দিয়ে একটু আগে একটি হেলিকপ্টার উড়ে গেছে। আমি চিৎকার করেছিলাম—কিন্তু ওরা লক্ষ করেনি। খুব দমে গেছি। আমার ওপর দিকে পাহাড় এত খাড়া, ওদিক দিয়ে ওঠা অসম্ভব। অথচ একটা কিছু করতেই হবে।

বসে থাকতে থাকতে চোখে পড়ল, চাতালটার নীচে যে ফাটল দিয়ে আমি উঠেছি, তার ভেতর একস্থানে একটা প্রকাণ্ড গর্ত রয়েছে। গর্তটা কালো দেখাচ্ছে। ওর ভেতর ঢুকলে আবার সুড়ঙ্গ নদীতে পড়ব কিনা কে জানে! তবু চেষ্টা করা যেতে পারে।

সাবধানে নেমে গর্তটার কাছে গেলাম। পা রাখার জায়গা গর্তের বাইরে কোথাও নেই। তাই পাথরের খাঁজ আঁকড়ে ধরে গর্তের ভেতর ঢুকে পড়লাম। এতক্ষণে মনে পড়ল আমার পকেটে একটা গ্যাস লাইটার আছে। গর্তটা প্রায় একগজ চওড়া, গজ দুই উঁচু। দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে। লাইটার জ্বেলে যেটুকু দেখতে পেলাম তাতে প্রমাণ পাওয়া গেল একসময় এখানে মানুষ এসেছিল। কারণ এক কুচি কাগজ আর কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। (আশায় নেচে উঠলাম। মানুষ এখানে যদি এসে থাকতে পারে, যাওয়ার পথও নিশ্চয় আছে)।

লাইটার নিভিয়ে যা থাকে বরাতে ভেবে সাবধানে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা যাওয়ার পর ফের লাইটার জ্বালি আর দেখে নিই। আবার কিছুটা এগিয়ে যাই। এমনি করে অনেকটা গিয়ে টের পেলাম এটাও একটা গুহা। ক্রমশ ভেতরটা হলঘরের মতো চওড়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু ওয়েইকাপালির মতো কোনো দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি না। বরং কী একটা মিঠে গন্ধ মাঝে মাঝে আবছাভাবে নাকে ভেসে আসছে। গন্ধটা কীসের হতে পারে? এমন মিঠে গন্ধ আমার অচেনা।

তাহলে কি এটাই হায়েনার তিননম্বর গুহা 'মানিনিহোলা'? এই গুহাটার কথা জনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম। এটার নাম শুকনো গুহা। কারণ কী? তলায় সুড়ঙ্গ নদী নেই বলে? জনখুড়ো বলতে পারেনি। শুধু বলেছিলেন, পলিনেশীয় ভাষায় একে বলা হয় শুকনো গুহা।

যে জন্যেই শুকনো গুহা বলা হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মেজাজ নেই। আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে, এটাই আসল কথা। নইলে রবিনসন ক্রুশোর মতো জীবন কাটাতে হবে।

লাইটারের গ্যাস ফুরিয়ে আসছে। তাই অন্ধকারে দেয়াল ছুঁয়ে হাঁটছিলাম। একখানে দেয়ালটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে। সেখানে বাধ্য হয়ে লাইটার জ্বালালাম। চোখে পড়ল, ওয়েইকাপালির মতো এখানেও উঁচু বেদির ওপর একটা মূর্তি রয়েছে। বেদির ওপর মূর্তির পায়ের কাছে একগাদা শুকনো ফুল। আবার লাইটার জ্বেলে মূর্তিটা দেখতে গিয়ে অবাক হলাম। এটা 'কন-টিকির' মতো কালো নয়, হলুদ রঙের পাথরে তৈরি। তা ছাড়া এটা দেবীমূর্তি। কিন্তু কী হিংস্র চেহারা! লাইটারের গ্যাস হঠাৎ এসময়ে পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আবার দেয়ালের দিকে পা বাড়িয়েছি, অমনি অন্ধকারে ঠাণ্ডা কিছু আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুখ চেপে ধরল। ঠাণ্ডা হিম দুটো ছোট্ট হাত। চেঁচিয়ে ওঠারও সুযোগ পেলাম না।

কিন্তু তখুনি টের পেলাম, মিনিহুনের খপ্পরে পড়েছি। ওয়েইকাপালিতে জ্যোৎস্নাও তা হলে ঠিক এইভাবে ব্যাটাচ্ছেলের পাল্লায় পড়েছিল।

একটা দুটো নয়, মনে হচ্ছিল একপাল মিনিহুন আমার ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং আমাকে তারা চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল অন্ধকারে। আমার কাঁধের মিনিহুন মুখটা শক্ত করে ধরে রইল। মনে হল, বাধা দিলে ও আবার হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে।

কিন্তু আশ্চর্য, নাকটা খোলা থাকায় সেই মিঠে গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হয়ে ভেসে আসছিল। এত তীব্র যে গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ...

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলাম একটা চারকোণা ঘরের মেঝের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি। আমার হাতপা বাঁধা হয়নি। কিন্তু গায়ে এতটুকু জোর নেই যে উঠে দাঁড়াই। ঘরের দেয়ালে অসংখ্য দেবীমূর্তির চুলগুলো সাপের মতো ফণাতোলা এবং দুচোখে রাগ ঠিকরে পড়ছে। সামনে একটা সোনালি রঙের সিংহাসন। সিংহাসনে কেউ নেই। সিংহাসনের মাথার ওপর রাজছত্র থেকে হলদু রঙের আলো ছড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর একেবারে ফাঁকা। বিদঘুটে প্রাণীগুলো গেল কোথায়?

অতিকষ্টে দেওয়ালে ভর করে উঠে দাঁড়ালাম। মেঝেয় কোন কালের পুরোনো কার্পেট পাতা রয়েছে। ছাদেও সেই রকম দেবীমূর্তি আঁকা। চারদিক থেকে হিংস্রদৃষ্টিতে মূর্তিটা আমাকে যেন গিলে ফেলতে চাইছে।

সিংহাসনের ওপর রাজছত্রের আলোটা স্থির। কাছে গিয়ে মনে হল, ওটা সাধারণ কোনো আলো নয়। সম্ভবত কোনোরকম রত্নপাথর। তা থেকে আলো ছড়াচ্ছে।

ঘরের দেয়াল একেবারে নিরেট। কোথাও দরজার চিহ্নটি নেই। ভারি অদ্ভুত তো!

চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ সিংহাসনের পেছনের দেয়ালের একটা অংশ ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর আঁতকে উঠে দেখলাম, দুটো কালো কদর্য বাঁদরজাতীয় খুদে মানুষ—হ্যাঁ সেই মিনিহুন ওরা—ঘরে ঢুকল। তাদের দুজনের হাতে দুকাঁদি কলা।

আমি পিছিয়ে এসে দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছি। ওরা কলার কাঁটি দুটো আমার সামনে রেখে একসঙ্গে কালোমুখের সাদা দাঁত বের করে বলল—হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

অবিকল এইসব শব্দ। নিশ্চয় এটাই ওদের ভাষা। আমাকে কি অতগুলো কলা খেতে বলছে ব্যাটাচ্ছেলেরা? ওই কলা একটা খেলেই আমার পেট পিপের মতো ফুলে উঠবে যে।

ভয়ে ভয়ে হুকুম মেনে একটা কলা ভেঙে নিলাম। খিদেও প্রচণ্ডরকম। কলাটা খুব সুস্বাদু, স্বীকার না করলে পাপ হবে। দুই মিনিহুন গম্ভীর মুখে আমার খাওয়া দেখলে কিছুক্ষণ। তারপর সেইরকম বিদঘুটে হুঁ হুঁ করে চলে গেল। দরজাটা আবার দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল।

তাহলে এদের যতটা খারাপ ভেবেছিলাম, ততটা মোটেও নয়। বরং ভদ্র বলেই মনে হচ্ছে। আমি ক্ষুধার্ত টের পেয়ে খাদ্য দিয়ে গেল যখন।

কিন্তু জলতেষ্টা পেয়েছে যে। এবার যদি এককাঁদি ডাব দিয়ে যেত, কী সুখের না হত। এসব দ্বীপে নারকোল গাছের জঙ্গল হয়ে আছে। লোকের বাগান থেকে এ ব্যাটারা নিশ্চয় কলাগুলো চুরি করে আনে। ডাব পেড়ে আনে না কেন?

কী কাণ্ড। ওরা কি মনের কথা টের পায়? দরজাটা খুলে গেল। তারপর সত্যি সত্যি দুটো মিনিহুন। (এরা নিশ্চয় আগের দুজনই) এক কাঁদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডাব এনে বলল,—হুঁ হুঁ হুঁ, হিঁ হিঁ হিঁ উঁয়া উঁয়া।

মুখে মিঠে হাসি রেখে বললাম,—খেতে তো বলছ। কিন্তু ডাব কাটার অস্তর চাই যে। ছুরিটুরি নেই তোমাদের।

ইশারায় ব্যাপারটা বুঝিয়েও দিলাম। ওরা মুখ তাকাতাকি করল। তারপর দুজনে একটা করে ডাব পটাপট ছেঁড়ে আর বোঁটার দিকটা হ্যাঁচকা দিকটা হ্যাঁচকা টানে ওপড়ায়। জল ছলকে পড়ে। কী দারুণ জোর ওদের গায়ে!

প্রাণভরে ডাবের জল খেলাম—পর পর তিনটে। পেট ফুলে ঢোল হল। হাত নেড়ে বললাম, —থাক্ থাক্। এই যথেষ্ট হয়েছে বন্ধুরা।

ওরা এবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভুতুড়ে হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ। পিলে চমকানো হাসিরে বাবা। বললাম,—থাক্। থাক্। আর হাসে না।

ওরা পিটপিটে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম,—হ্যাঁ—অসংখ্য ধন্যবাদ আমার খুদে বন্ধুরা। এবার দয়া করে আমাকে বাইরে পৌঁছে দাও দিকি।

কে জানে কেন, ওরা আমাকে জিভ ভ্যাংচাতে শুরু করল। দেখে তো বেজায় ভড়কে গেলাম। কাঁচুমাচু মুখ করে বললাম,—আচ্ছা আচ্ছা। আর বেরুবার নাম করব না। দোহাই বাবা, আর অমন বিচ্ছিরি ভেংচি কাটে না।

ওরা এবার আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাতে শুরু করল। আমেরিকায় বুড়ো আঙুল দেখানোর খুব আনন্দের এবং বন্ধুতার ব্যাপার। আমি ওদের বুড়ো আঙুল দেখাতে থাকলাম। তখন ওরা সাদা দাঁত বের করে ফের হেসে উঠল, হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ।

এক সময় দরজা খুলে গেল এবং তুম্বো চেহারার এক মিনিহুন ঢুকে হুঁ হুঁ করে কিছু বলল। তখন আমার খুদে বন্ধুদ্বয় আমার দুহাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

করিডোরে সুন্দর একফালি পথ। সেইরকম আলো জ্বলছে। তলায় তেমনি কার্পেট বিছানো রয়েছে। কিছুদূর চলার পর সামনের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে দেখি প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে প্রায় শ'খানেক মিনিহুন গম্ভীরমুখে বসে রয়েছে। উঁচু বেদির ওপর যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দেখে চমকে উঠলাম।

অবিকল সেই দেবীমূর্তির মতো চেহারাও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল সোনালি। কোঁকড়ানো লাল একরাশ চুল মাথায়। পরনে ঝলমলে হলুদ রঙের আলখাল্লার মতো পোশাক।

আমাকে বেদির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে মিনিহুনদ্বয় সরে গিয়ে ভিতে বসে পড়ল। বেদির মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই বুঝতে পারলাম স্বর্গের কোনো দেবী টেবী নন মোটেও মেমসাহেব না হয়ে যান না।

আমার অনুমান সত্যি হল তখনি। মহিলাটি আমেরিকান উচ্চারণের ইংরাজিতে বলে উঠলেন, —আই অ্যাম দা ফায়ার-গডেস পিলি। আমি অগ্নিদেবী পিলি। সারা প্রশান্ত মহাসাগরের পলিনেশীয় দ্বীপগুলোতে এক সময় আমার স্বামী সূর্যদেব কনটিকি এবং আমার পুজো হত। বর্বর ইউরোপীয় জাতির লোক আমাদের পুজো বন্ধ করে দিয়েছে। তাই ওদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। আমার হিংস্র হায়েনার দল ওদের সামনে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। টুকরো-টুকরো করে খেয়ে ফেলে। ওয়েইকাপালির দরজায় খুলি এবং হাড়ের পাহাড় গড়ে তুলেছি। দেখে যেন ওদের শিক্ষা হয়।

আঁতকে উঠে বলে ফেললাম,—মাননীয় মহোদয়া! আমি মোটেও ইউরোপীয় নই। আমি একজন ভারতীয়। আমার চেহারা আর গায়ের রঙ দেখুন।

কথাগুলো 'অগ্নিদেবী' কানে নিলেন বলে মনে হল না। হেসে উঠলেন। বড় হিংস্র হাসি। আর তাঁর কালো কুচকুচে খুদে ভক্তবৃন্দও একসঙ্গে বিকট ভূতুড়ে হাসি হাসতে লাগল— হিঁ হঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ ...

শয়তানের কবলে

কিন্তু ততক্ষণে আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন জেগেছে। কে এই 'অগ্নিদেবী পিলি'? বুঝতে পারছি, ইনি একজন মেমসাহেব তো বটেই, এবং আমেরিকান। কারণ মারকিন মহিলাদের মতো নাকিসুরে ইংরেজি উচ্চারণ করছেন। তা ছাড়া ওই ইংরেজিও আমেরিকান ইংরেজি। প্রায় মাসচারেক আমেরিকায় থেকে আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে, ব্রিটেন কানাডা আর আমেরিকা তিনটি দেশেই ইংরেজি ভাষায় লোকেরা কথা বললেও বেশ খানিকটা তফাত আছে। ভাষায় উচ্চারণ বাচনভঙ্গিতে অনেক অমিল।

তারপরের প্রশ্ন, জ্যোৎস্নাকেও নিশ্চয় মিনিহুনরা তখন আমার মতো করে পাকড়াও করেছিল। তাকে কোথায় রেখেছে? আমাদের ধরে আনার উদ্দেশ্যই বা কী?

অপোগণ্ড জীবগুলোর ভূতুড়ে হাসি থামতেই চায় না। অগ্নিদেবী চেঁচিয়ে ধমক দিলে তবে থামল। তখন সাহস করে বললাম, মাননীয়া অগ্নিদেবী! আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না যে আমি একজন ভারতীয়?

অগ্নিদেবী গর্জে উঠলেন,—ভারতীয় হও আর যেই হও—তোমার সভ্য দুনিয়ার লোকেরা আমার শত্রু। তোমরা বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর ধূর্ত। আমি তোমাদের ঘৃণা করি ... ঘৃণা করি ... ঘৃণা করি ...

বলতে বলতে আরও অস্বাভাবিক এবং হিংস্র হয়ে উঠল ওঁর চেহারা। তারপর দুলতে থাকলেন। দুলতে দুলতে চোখ বুজে ফেললেন। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ছত্রিশ বছর ধরে আমি ওদের অপেক্ষা করছি। ওরা এসে আমাকে নিয়ে গেল না। ওরা আমাকে হায়েনার গুহায় রেখে চলে গেল। বলে গেল, ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা ...

কথাগুলো শুনতে শুনতে চমকে উঠেছিলাম। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে ভরাট গম্ভীর গলায় ইংরেজিতে কে বলে উঠল, মারিয়া! মারিয়া! তুমি কি চুপ করবে? চুপ না করলে তিন নম্বর শাস্তি তোমার পাওনা হবে। সাবধান!

'অগ্নিদেবী'র নাম তাহলে মারিয়া? নামটা কেমন যেন চেনা লাগছে। মারিয়া চুপ করেছেন। চোখ খুলে তেমনি হিংস্র চোখে তাকিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, আমি চুপ করেছি ফাদার গ্রিনকট।

অদৃশ্য ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল,—যাও। এবার তোমার কর্তব্য পালন করো।

মারিয়া আমার দিকে হিংস্রমূর্তিতে তাকিয়ে রইলেন।

মারিয়া! ছুরি আর সাঁড়াশি কোথায় তোমার?

আমার হাতেই রয়েছে ফাদার গ্রিনকট।

আতঙ্কে কাঠ হয়ে দেখলাম, মারিয়ার একহাতে ছুরি অন্যহাতে একটা সাঁড়াশি।

ফাদার গ্রিনকটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার,—ইয়াকে বলো রেকাব নিয়ে ওই বাদামি ভূতটার কাছাকাছি দাঁড়াক। আর উয়াকে বলো ওর সঙ্গীদের নিয়ে বাদামি ভূতটাকে শক্ত করে ধরে থাক। আর মারিয়া! তুমি ওর বুকটা চিরে হৃৎপিণ্ডটা সাঁড়াশি দিয়ে উপড়ে নাও। রেকাবে রেখে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওর ধড়টা আপাতত ওখানে পড়ে থাক পরে একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এ কি দুঃস্বপ্ন—না সত্যি সত্যি ঘটছে? ওই ছুরি দিয়ে আমার বুক চিরে সাঁড়াশি দিয়ে আমার কলজে তুলে নেবে ভাবতেই মাথা ঘুরে উঠল। চিৎকার করতে চাইলাম। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। মারিয়া এবার হি হি করে হেসে উঠলেন। বেদি থেকে নেমে এলেন একহাতে চকচকে ছোরা আর অন্যহাতে কালো সাঁড়াশি নিয়ে। তারপর দেখি, একটা মিনিছন আমাকে পেছনে ধরে ফেলে আমার বুকটা চিতিয়ে রাখল। জীবনে ভুলেও ঈশ্বরের নাম-টাম করিনি। বিশ্বাসও নেই। কিন্তু এখন যখন মরতে যাচ্ছি, বিশেষ করে ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক হবে মৃত্যুটা—তখন ঈশ্বরের নাম গলার ভেতর থেকে বেরুতে চাইল কই? বোবা হয়ে গেছি যেন।

মারিয়া ছোরাটা আমার বুকের কাছে এসে ঝুঁকে দাঁড়তেই চোখ বুজে ফেললাম। তারপর প্রতীক্ষা করতে থাকলাম, এই এবার তীক্ষ্ণধার ছোরা বুকে ঢুকে যাবে— এক-সেকেন্ড দু-সেকেন্ড তিন সেকেন্ড ...

হঠাৎ কানে এল মারিয়া ফিসফিস করে কিছু বলছেন। ভয় পেয়ো না। আমি তোমার শত্রু নই। আমিও তোমার মতো এক বন্দী। তোমার বুকে খানিকটা লাল রঙ মাখিয়ে দিচ্ছি। আর একটুকরো স্পঞ্জ আছে আমার কাছে। সেটাতে লালরঙ ভরা রয়েছে। ওটা রেকাবে করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর শোনো ...

ফাদার গ্রিনকটের আওয়াজ এল,—মারিয়া! দেরি হচ্ছে কেন?

মারিয়া বললেন,—মন্ত্র পড়ছি ফাদার গ্রিনকট। বাধা দিলেন বলে আবার মন্ত্রটা গোড়া থেকে পড়তে হবে।

শয়তান ফাদার গ্রিনকট অদৃশ্য থেকে বলল,—হুঁ। ঝটপট মন্ত্রটা আওড়ে নাও। আমার মেশিন গরম হয়ে যাচ্ছে। বেশি গরম হয়ে গেলে মেয়েটার মতো বাদামি ভূতটার কলজেও পড়ে যাবে। কাজে লাগানো যাবে না।

মারিয়া ফিসফিস করে বলল,—শোনো। আমার চলে গেলে তুমি মড়ার মতো পড়ে থেকো। সাবধান, একটুও নড়ো না। তারপর এরা তোমাকে হায়েনার ঘরে ফেলে দিয়ে আসবে। ভয় নেই—হায়েনাগুলোকে আমি ঘুমের ওষুধ মেশানো মাংস খাইয়ে রেখে এসেছি। ওরা ঘুমোচ্ছে। তুমি ওঘরে চুপচাপ পড়ে থেকো। তারপর আমি সময়মতো যাব'খন।

মারিয়া ছোরা আর লালরঙ ভরা স্পঞ্জটা বুকে ঠেকিয়ে বলল,—সত্যি সত্যি বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করলে মানুষ ফের যেমন আর্তনাদ করে, তেমনি আর্তনাদ করো। সাবধান, শয়তানটা যেন টের না পায় যেন তুমি অভিনয় করছ। এর ওপর তোমার বাঁচামরা নির্ভর করছে।

আমি একসময় থিয়েটার করতাম। মৃত্যু-যন্ত্রণায় আর্তনাদের অভিনয় একবারই করেছিলাম। এখন প্রাণের দায়ে সেইরকম রাম চ্যাঁচানি চেঁচিয়ে উঠলাম, ওঃ। ওঃ। ওঃ ও হো হো হো হো। তারপর গোঙাতে শুরু করলাম। হাতপা ছোঁড়াছুঁড়িও চালিয়ে গেলাম যতটা পারি।

শয়তান ফাদা গ্রিনকটের নেপথ্য অট্টহাসি শোনা গেল হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

আমার হৃৎপিণ্ড রেকাবে রাখলে আমি এলিয়ে পড়লাম। মিনিহুনরা আমাকে চিত করে শুইয়ে দিল। আমার জামা লাল হয়ে গেছে। চবচব করছে একেবারে। মুখ মড়ার মতো করে হাতপা ছড়িয়ে পড়ে রইলাম। মারিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিহুনরা আমাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে চলল সেই হায়েনার ঘরে। গুহার ভেতর যেন প্রাসাদপুরী। কারা বানিয়েছে এই সুন্দর পুরী? মিনিহুনরা তো নয়ই। হয়তো কোনো প্রাচীন যুগের আদিম রাজা এই পাতালপুরী বানিয়েছিল। যেভাবেই হোক ফাদার গ্রিনকট নামে এক শয়তান এখানে আস্তানা করেছে।

হায়েনার ঘর একটা জেলখানা যেন। মনে হল, আদিম পলিনেশীয় রাজার বন্দীশালা ছিল এটা। দুর্গন্ধে বমি আসছে। মাথার ওপর একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় চোখের ফাঁক দিয়ে দেখলাম প্রায় একডজন কুৎসিত চেহারা হায়েনা দাঁত ছরকুটে ঘুমোচ্ছে। কারুর ঠ্যাং ওপরে কারুর পাশে। মিনিহুনরা একটা ফাঁকা জায়গায় আমাকে ধপাস করে ফেলে চলে গেল। গরাদের দরজা বন্ধ করতে ভুলল না।

একটু পরে সাবধানে কাত হলাম। আমার চারপাশে হায়েনার পাল মড়ার মতো পড়ে আছে। এরা যদি দৈবাৎ জেগে ওঠে, আমাকে বাঁচতে হবে না। হায়েনা মানুষকে ভয় পায়, জানি। কিন্তু এরা যেন দল বেঁধে আছে এবং নরমাংস খেতে অভ্যস্ত হয়েছে নিশ্চয়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে বসলাম। হঠাৎ একটা হায়েনা ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতেই বুক ধড়াস করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফের মড়ার মতো চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর মনে হল, তাহলে কি ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর যে হোয়া হোয়া গর্জন শুনেছিলাম তা এইসব হায়েনারই?

কিন্তু হায়েনা তো মানুষের হাসির মতো শব্দ করে। হাঃ হাঃ হাঃ এইরকম শব্দ। কে জানে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হায়েনারা হয়তো ওইরকম হোয়া হোয়া করে।

কতক্ষণ পরে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর দরজা খুলল। আড়চোখে দেখলাম, কালো কাপড়ে ঢাকা মারিয়ার মূর্তি। তখন উঠে বসলাম।

মারিয়া বললেন,—চলে এসো আমার সঙ্গে। সাবধান, কোনো শব্দ নয়। ...

মারিয়ার কাহিনি

একটা সরু করিডোর দিয়ে মারিয়া আমাকে নিয়ে চললেন। এঘর ওঘর হয়ে একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলেন। তারপর বিস্ময় ও আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম,—জ্যোৎস্না।

মারিয়া আমার মুখ চেপে ধরেছেন সঙ্গে সঙ্গে। এ ঘরে সুন্দর একটা বিছানায় জ্যোৎস্না শুয়ে ছিল। উঠে মিষ্টি হেসে চাপাস্বরে বলল,—আসুন জয়ন্তদা। মারিয়া ঠাকমার আমরা অতিথি।

মারিয়া ঠাকমা! বলে কী জ্যোৎস্না। কিন্তু ততক্ষণে মারিয়া কালো আলখাল্লাটা খুলেছেন। এবার দেখি, এ তো এক বৃদ্ধা। তখন মনে হচ্ছিল, যুবতী না হলেও প্রৌঢ় তো ননই—বড়জোর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি বয়স হবে না। এখনই দেখছি, শরণচুলো বুড়ি। মুখের চামড়া কোঁচকানো। কিন্তু গায়ের জোরটা টিকে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে। মারিয়া বললেন,—বসো। তবে চেঁচামেচি করা চলবে না। এখন শয়তান গ্রিনকট ওর ল্যাবরেটরিতে আছে। মিনিহুনগুলোর ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছে। গ্রিনকট ওদের মানুষ না বানিয়ে ছাড়বে না।

বললাম,—মানুষের কলজে ওদের বুকে ঢুকিয়ে মানুষ বানাবে বুঝি?

মারিয়া বললেন,—না, হার্টবদল করবে না। অন্যরকম পদ্ধতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

তা হলে মানুষের কলজে কী কাজে লাগে ওর?

মারিয়া বললেন,—আমি ছত্রিশ বছর ধরে ওর পাল্লায় পড়ে বন্দী হয়ে আছি বলতে পারো। কারণ এখান থেকে বেরুনোর পথ খুঁজে পাইনি। তাই বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটছে জানি না। তবে মাঝে মাঝে টের পেয়েছি, ফাদার গ্রিনকট মিনিহুনের সাহায্যে মানুষ ধরে আনে বাইরে থেকে। কীভাবে ধরে আনে বলছি। মিনিহুনরা জলচরও বটে। খাড়ির সমুদ্রে ডুবে ওত পেতে থাকে। রাতবিরেতে কোনো দুঃসাহসী পর্যটক একলা খাড়ির নিচে চাতালে বেড়াতে এলেই মিনিহুনরা তাকে ধরে আনে। আমার ধারণা, হায়েনার লোকেরা বা সরকারিমহল ভাবেন, পর্যটক বেঘোরে ডুবে মারা পড়েছে। খাড়ির সমুদ্রে প্রচুর হাঙর আছে। কাজেই ওঁরা ধরে নেন, হাঙরে লাশটা খেয়ে ফেলেছে।

জ্যোৎস্না বলল,—আমি একবছর আছি হায়েনায়। তার মধ্যে প্রায় ছ সাতজন পর্যটকের রাতে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার কথা শুনেছি।

মারিয়া বললেন,—ফাদার গ্রিনকট তাদের হার্ট ওষুধপত্র দিয়ে জিয়েই রাখে। তারপর দেখেছি, কারা এসে সেগুলো কিনে নিয়ে যায়। ওই টাকায় গ্রিনকট তার ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি কিনে আনে।

জ্যোৎস্না বলল,—আপনি চুপিচুপি ওর পেছন ধরলে নিশ্চয় বেরুনোর পথ চিনে রাখতে পারতেন। তারপর সেই পথ দিয়ে ...

বাধা দিয়ে মারিয়া বললেন,—ও ভীষণ ধূর্ত। মিনিহুনরা আমাকে যতই খাতির করুক, ও তাদের ঈশ্বরের মতো। তক্কে তক্কে থাকে। কিন্তু এই যে আমি তোমাদের বাঁচালাম, মিনিহুনরা টের পেলেও গ্রিনকটকে জানাতে পারবে না। কেন জানো? প্রথম কথা, ওরা মানুষের ভাষা বোঝে না। দ্বিতীয় কথা, ওরা হাবেভাবে মানুষের আচরণ টের পেলেও ওদের ওপর যা হুকুম, তার বাইরে কিছু করবে না। ওদের বোঝানো হয়েছে। আমি বা কোনো বন্দী যেন এই পাতালপুরী থেকে না পালাতে পারে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ গুহার মধ্যে মানুষ এসে পড়লে তাকে পাকড়াও করে আনতে হবে। অনেক সময় গুহায় সশস্ত্র লোক ঢুকলে গ্রিনকট টের পায়। যেমন আজ কারা ঢুকে গাঁইতি মেরে সুড়ঙ্গের দেয়াল ভাঙছিল, অমনি গ্রিনকট মিনিহুনদের হুকুম দিলে হায়েনার খাঁচা খুলে দিতে। হায়েনারা গিয়ে তাদের খেয়ে ফেলল।

টিহোর ঘটনাটা আগাগোড়া বললাম। তারপর বললাম সিগারেট কেসের কথা।

শুনে মারিয়া চোখের জল মুছে বললেন,—তা হলে এবার শোনো, কীভাবে আমি এখানে ছত্রিশবছর ধরে আটকে রয়েছি।

শুনে মারিয়ার কাহিনি সংক্ষেপে হল এই :

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা হঠাৎ মারকিন পার্লবন্দরে হামলা করে। মারিয়া তখন ওখানে ছিলেন হাসপাতালের নার্স হয়ে। বয়স তখন প্রায় তিরিশ বছর। বিয়ে করেন নি। বাবা-মা থাকেন লস এঞ্জেলসে। পার্লবন্দরে যুদ্ধ বাধলে কার্ল অসবোর্ন, পিটার ওলসন, এবং টিহো

নামে তিনজন পাইলটকে প্যাসিফিক ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ প্রচুর সোনার বাট আমেরিকার ওয়াশিংটন হেডঅফিসে পৌঁছে দিতে বলেন। ওরা ছিল বিমানবাহিনীর ভলান্টিয়ার ফোর্সে। মারিয়ার সঙ্গে ওদের চেনা ছিল। পালিয়ে তখন সবাই প্রাণ বাঁচাচ্ছে। মারিয়া ওদের সঙ্গে ছোট্ট বিমানে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন।

কাউয়াই দ্বীপের হায়েনাতে পৌঁছে ওরা হঠাৎ প্লেন নামায় একটা পাহাড়ি উপত্যকায়। ওদের মতলব, সোনাটা হাতাবে। মারিয়া কী করবেন? ওদের পাল্লায় পড়েছেন তখন। ওদের কথা না মানলে গুলি করে মারবে। আসলে টিহো নামে পলিনেশীয় পাইলটই ওদের এই কু-মন্ত্রণা দিয়েছিল। ওরা রাত্রিবেলা সোনার বাট চারটে প্যাকেট বয়ে নিয়ে এই খাড়ির কাছে পৌঁছায়। টিহো স্থানীয় লোক বলে এই গুহাগুলোর কথা জানত। ওয়েইকাপালির ভেতর ঢুকে একজায়গায় চারটে প্যাকেট পুঁতে রাখা হয়। তার ওপর দিকে একজায়গায় একটা করচ চিহ্ন খোদাই করে রাখে ওরা।

কিন্তু তারপর সমস্যা দেখা দেয়। ওপর থেকে খাড়াই বেয়ে নামা যতটা সোজা হয়েছিল ওঠা ততটাই কঠিন। মারিয়ার পক্ষে ওঠা তো অসম্ভব। কারণ তাঁর পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নেই। ওরা তিনজনে উঠে যায় একে একে। কিন্তু মারিয়া অনেক চেষ্টা করেও পারেননি। যতবার ওঠেন, গড়াতে-গড়াতে এসে নীচের চাতালে পড়েন। প্রচণ্ডভাবে আহত হন। তখন ওপর থেকে ওরা আশ্বাস দিয়ে বলে, শিগগির নৌকা নিয়ে আসবে। মারিয়াকে নিয়ে যাবে।

আর আসেনি ওরা। কী হয়েছিল, মারিয়া জানেন না। গুহার ধারে জখম অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর যখন জ্ঞান হয়, দেখেন একটা পাদরীর পোশাকপরা লোক তাঁর শুশ্রূষা করছে। ফাদার গ্রিনকট তার নাম। কিন্তু তখনও টের পাননি মারিয়া, কে এই ফাদার গ্রিনকট।

ছত্রিশ বছর ফাদার গ্রিনকটের কাছে বন্দীর মতো জীবন কাটাচ্ছেন মারিয়া। এ ছত্রিশ বছরে কয়েকশ মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড বের করার কাজ তাঁকে দিয়েই করিয়েছে শয়তান গ্রিনকট। কিন্তু সজ্ঞানে নয়—অগ্নিদেবী পিলির পোশাক পরিয়ে সেইরকম সাজিয়ে তাঁকে গ্রিনকট একটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। তখন নেশার ঘোরে জ্যান্ত মানুষের বুক চিরে হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলেন হতভাগিনী মারিয়া। বুঝতে পারেন না কী সাংঘাতিক পাপ করছেন।

নেশা চলে গেলে যখন সব টের পান, নির্জনে হুহু করে কাঁদেন। অনুতাপ করেন।

আজ যখন জ্যোৎস্নাকে ধরে আনল মিনিহুনরা, জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকিয়ে খুব মায়া হয়েছিল মারিয়ার। চালাকি করে ওষুধ মেশানো পানীয়টা নিজের হাতে খাওয়ার ভান করে জামার ভেতর ঢেলে ফেলেছিলেন।

আমাকেও যখন ধরে আনে, তখন ঠিক তাই করেছিলেন। নইলে জ্যোৎস্না ও আমি 'হৃদয়হীন' মড়া হয়ে হায়েনাদের পেটে চলে যেতাম। ...

পালানোর চেষ্টা

মারিয়ার সঙ্গে জ্যোৎস্না ঠাকমা সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। কথায় কথায় গ্র্যান্ডমা বলে ডাকছে। ঠাকমার ঘরে আধুনিক যুগের আরামের সবরকম ব্যবস্থা আছে। জ্যোৎস্না দেখলাম ইতিমধ্যে ঘরের ভেতর কোথায় কী আছে, সব জেনে ফেলেছে। সে কফি বানাল নিজের হাতে। ঠাকমাকেও খাওয়াল। ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে বেজেছে। জ্যোৎস্না আগেই দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নিয়েছে মারিয়ার সঙ্গে। খেয়ে মারিয়া ফাদার গ্রিনকটের আদেশ পালন করতে গিয়েছিলেন—অর্থাৎ কি না আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়াতে।

দু-দুটো পলিনেশীয় কলা খেয়ে আমার তখনও পেট ফুলে রয়েছে। অমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল, তাতেও কলা দুটো পেটে হজম হয়নি। কী সাংঘাতিক এসব কলা।

আমরা তাড়াহুড়ো করছি না। কারণ মারিয়া ঠাকমা বলেছেন, গ্রিনকট কারুর হৃদপিণ্ড ওপড়ানোর দিন চব্বিশ ঘণ্টা তার যন্ত্র-ঘরে কাটায়। মিনিহুনের পাল তার সঙ্গে থাকে। কাজেই সামনের রাতটা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায় খুঁজে বের করতে হবে বাইরে যাওয়ার পথ।

মাঝে মাঝে দমেও যাচ্ছি। ছত্রিশ বছর ধরে মারিয়া যখন বেরুনোর পথ খুঁজে পাননি, তখন মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে আমরা কি পথটা খুঁজে পাব?

জ্যোৎস্না বলল,—আচ্ছা ঠাকমা। বাইরের লোকেরা হৃৎপিণ্ড কিনতে আসে বললে, তুমি কি লক্ষ করোনি, কোন পথে তারা যায়?

মারিয়া বললেন,—গ্রিনকট তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে। সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিন্তু তখন আমার তাদের ধারে কাছে যাবার উপায় থাকে না। একদল মিনিহুন গ্রিনকটের ঘরের দরজায় পাহারা দেয়। তবে আড়ি পেতে শুনে যা বুঝেছি, মনে হয়েছে যে পূর্বদিকের কোনো একটা হ্রদে তারা মোটরবোট রেখে অপেক্ষা করে। তারপর গ্রিনকট সেখানে হাজির হয়। তাদের চোখ বেঁধে ফেলে মিনিহুনগুলো। ওই অবস্থায় কোনো সুড়ঙ্গপথে এই পাতালপুরীতে নিয়ে আসে।

শুনে লাফিয়ে উঠলাম। ... ঠাকমা! আমি লেকটা দেখেছি! ওই সুড়ঙ্গপথেই আমি ঢুকেছিলাম পাতালপুরীতে।

মারিয়া বললেন,—কিন্তু সেটা খুঁজে বের করতে পারবে কি?

বললাম,—অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি যেখানে আছে, সেখানে আমাকে বন্দী করেছিল মিনিহুনরা। মূর্তিটা কোথায় আছে আপনি জানেন?

মারিয়া বললেন,—জানি। কিন্তু মূর্তির ওধারে অজস্র সুড়ঙ্গপথ। আমি সব পথেই বাইরে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বেশির ভাগ সুড়ঙ্গপথই হঠাৎ শেষ হয়েছে। কোনোটার শেষে গভীর গর্ত এবং গর্তে জল ফুঁসছে।

আমি স্মরণ করার চেষ্টা করছিলাম, মূর্তি পর্যন্ত আসার সময় কতবার কোনদিকে বাঁক নিয়েছি। বললাম,—আর দেরি না করে বরং মূর্তিটার কাছে চলুন। আমার মনে পড়েছে, একটা জায়গায় বাঁদিকে ঘুরেছিলাম। বাকিটা সিধে নাক বরাবর এসেছিলাম। চলুন, চেষ্টা করে দেখি।

জ্যোৎস্না বলল,—ঠাকমা। যা নেবার গুছিয়ে একটা পোঁটলা করে নিন।

মারিয়া করুণ হেসে বললেন,—নেবার কিছু নেই। আমার জিনিসপত্র এবং পরিচিতিপত্র আর যা ছিল—সবই সেই প্লেনে রেখে এসেছিলাম।

আমি বললাম,—একটা আলো-টালো থাকলে বড্ড ভালো হত।

মারিয়া বললেন,—পাতালপুরীর যেসব আলো দেখছ, তা ফাদার গ্রিনকটের পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র থেকে অদ্ভুত কৌশলে প্রতিফলিত করা হয়েছে একটুকরো সামুদ্রিক পাথরে। এ পাথর পাতালপুরীর যেখানে রাখবে অদৃশ্য আলো এসে প্রতিফলিত হবে তার ওপর।

জ্যোৎস্না বলল,—লোকটা তাহলে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী।

বললাম,—একটুকরো সেই পাথর পেলে ভালো হত তা হলে।

মারিয়া হাসলেন। ... পাতালপুরীর বাইরে কিন্তু পাথরের ওপর প্রতিফলন ঘটবে না। কাজেই আমাদের অন্ধকারেই এগুতে হবে।

আমরা আর দেরি করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম। মারিয়া ঠাকমা এ-ঘর ও-ঘর করে অনেক করিডোর পেরিয়ে নিয়ে চললেন। একখানে থমকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,—সাবধান। সামনে যন্ত্রঘর। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে। কারণ ওটার দেয়ালের ওপরটা কাঁচের। আমাদের দেখতে পাবে ওরা।

আগে মারিয়া, তারপর জ্যোৎস্না শেষে আমি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিলাম। শেষ প্রান্তে গিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড কৌতূহল হল, ভেতরে কী ঘটছে দেখে নিতে।

সাবধানে মুখটা তুললাম। ভেতরে উজ্জ্বল আলো দেখলাম। প্রকাণ্ড হলঘরের একদিকে গোল একটা মঞ্চ। মঞ্চে মিনিহুনেরা ভিড় করে বসে আছে। আর মঞ্চটা আস্তে-আস্তে ঘুরছে। ওদের ওপর একটা প্রচণ্ড লাল আলো এসে পড়ছে। ওদের লাল দেখাচ্ছে। ওরা যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

সারা ঘরে আজব সব যন্ত্র, বড় বড় কাচের পাত্র। কোনোটাতে বাষ্প উঠছে।

তারপর দেখতে পেলাম ফাদার গ্রিনকটকে।

হলুদ রঙের অদ্ভুদ একটা পোশাক পরা লম্বা চওড়া দৈত্যের মতো এক বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে একটা যন্ত্রের সামনে। চাবি টিপছে আর কী সব বলছে। তার মাথায় হলুদ টুপিও আছে। মুখে সাদা গোঁফ দাড়ি। কিন্তু কী মিঠে অমায়িক মুখের ভাব! হাসি লেগেই আছে।

জ্যোৎস্নার টানে ঝটপট মাথা নামিয়ে সরে গেলাম। কাচের দেয়াল শেষ হলে নীল আলোয় ভরা একটা করিডোর দেখা গেল। করিডোর পেরিয়ে ডাইনে একটা ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতেই দেখি সেই ঘর—যেখানে আমাকে মিনিহুনরা ডাব ও কলা খাইয়েছিল।

এখনও সেগুলো পড়ে আছে। বুদ্ধি করে কলার কাঁদি দুটো নিলাম। ইশারায় জ্যোৎস্নাকে ডাবের কাঁসিটা নিতে বললাম। মারিয়া ঠাকমা একটু হাসলেন শুধু।

এ ঘর থেকে বেরিয়ে আবার একটা করিডোর। তারপর দরজা খুলতেই দেখি ঘন অন্ধকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া ফিসফিস করে বললেন,—বাইরে থেকে এই দরজাটা খোলা যায় না। কিন্তু ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

আমার পকেটে লাইটার আছে। কিন্তু মারিয়া ঠাকমা লাইটার জ্বালতে নিষেধ করলেন। অন্ধকারে অনেকটা পথ গিয়ে তারপর মারিয়া ফিসফিস করে বললেন,—অগ্নিদেবী পিলির মূর্তিটা এখানেই কোথাও আছে।

লাইটার জ্বালালাম। সামনে বেদীর ওপর সেই হিংস্র দেবীমূর্তি। তার চোখ থেকে হিংসা ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। লাইটার নিভিয়ে বললাম,—এবার আমি আগে যাব। ঠাকমা, আপনারা আমার পেছনে আসুন। ...

টিহোর চেলা তুয়া

প্রায় তিনঘণ্টা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঘোরাঘুরি করছি। কিন্তু বেরুবার পথ পাচ্ছি না। ঘড়িতে সাতটা বাজে। বুঝতে পারছি, বাইরে অন্ধকার রাত। তাই কোনো ফাটলে বাইরের আকাশ দেখা গেলেও আমরা চিনতে পারব না—বিশেষ করে আকাশে যদি মেঘ থাকে। তা হলেও কি বারোঘণ্টা আমাদের এখানে কাটানো উচিত হবে? বাইরের পৃথিবীতে আলো ফুটলে কোনো ফাটলে তার আভাস নিশ্চয় পাব। কিন্তু ততক্ষণে শয়তান গ্রিনকট কি চুপ করে বসে থাকবে?

মারিয়া বললেন,—পথ খুঁজে বের না করতে পারলে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত। গ্রিনকট খুব নিষ্ঠুর। সে আমাদের ক্ষমা করবে না। তিনজনের হৃৎপিণ্ড নিজেই ওপড়াবে।

জ্যোৎস্না বলল,—এবার আমি চেষ্টা করি। তোমরা আমার পেছনে এসো।

সে সামনে গেল। তারপর পেছনে মারিয়া, শেষে আমি। কয়েক পা গেছি, হঠাৎ আমার ডানহাতের কলার কাঁদিতে হ্যাঁচকা টান পড়ল। থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু আর কিছু ঘটল না। ভাবলাম অন্ধকারে পাথরে ধাক্কা লেগেছিল।

কিন্তু আবার একটু পরে, ফের হ্যাঁচকা টান পড়ল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে আরে এ কী!

মারিয়া, জ্যোৎস্না বলে উঠলেন,— কী কী?

কে কলার কাঁদি ধরে টানল যেন। পরপর দুবার।

জ্যোৎস্না বলল,—ভূতে টানছে। অত ভয় যদি, ঠাকমাকে পেছনে যেতে দাও।

রাগ করে বললাম,—ভূতটুত আমি মানিনে। চলো, এবার টান পড়লে দেখছি কী ব্যাপার।

আবার কিছুদূরে যাওয়ার পর ফের সেইরকম হ্যাঁচকা টান। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিদুটো নামিয়ে রেখে লাইটার জ্বালালাম। জ্যোৎস্না ও মারিয়া থমকে দাঁড়িয়েছে। আলো কমে প্রায় শেষ হয়ে আসছে লাইটারের মাথায়। তবু দেখতে ভুল হল না—আমার পেছনে দাঁড়িয়ে একটা মিনিহন গপগপ করে কলা গিলছে।

মারিয়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ,—তুয়া! তুয়া!

জ্যোৎস্না বলল,—তুয়া কি ঠাকমা?

মারিয়া কান করলেন না জ্যোৎস্নার কথায়। লাইটারের গ্যাস আর নেই। ঘন অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর মারিয়ার মিঠে গলা শোনা গেল,—তুয়া। এ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি?

তারপর টের পেলাম, মারিয়া মিনিহনটার দিকে এগোচ্ছেন। বললাম,—ও ঠাকমা। ব্যাটাচ্ছেলে তুয়া তোমার ন্যাওটা নাকি?

মারিয়া বললেন,—হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে তুয়াকে নিয়ে আমি পালানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি ধরা পড়ে যাই। তুয়া পালিয়ে গিয়েছিল। ওর গলায় আমি আমার সরু চেনটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা এখনও আছে দেখছি। জয়ন্ত, কলার কাঁদি দুটো আমাকে দাও। বাছার বড্ড খিদে পেয়েছে। কতদিন খায়নি মনে হচ্ছে।

কাঁদি দুটো অন্ধকারে ঠাহর করে এগিয়ে দিলাম। তারপর বললাম,—ঠাকমা। মনে পড়েছে, টিহোর কাছে যে মিনিহনটা দেখেছিলাম, তার গলায় এই চেনটাই তাহলে চিকচিক করছিল।

টিহোর কাছে?

হ্যাঁ, ঠাকমা।

জ্যোৎস্না বলল,—তা হলে বোঝা যাচ্ছে টিহো প্রায়ই এসব গুহায় এসে সোনার প্যাকেট খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। কোনোভাবে তুয়াকে সে দেখতে পায়। সঙ্গে নিয়ে যায়।

আমি বললাম,—বাকিটা আমিও আঁচ করতে পেরেছি। আজ সকালে ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর গ্রিনকটের হায়েনারা যখন টিহো ও তার সঙ্গীদের খেয়ে ফেলে, তখন তুয়া পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গুহার সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর কারণ কী ওর?

মারিয়া বললেন,—মনে হচ্ছে, দলে ফিরে যাবার জন্যে কানাচে-কানাচে ঘুরছিল। কিন্তু সাহস পায়নি। আহা, বেচারা আজ সারাদিন না খেয়ে আছে। খাও বাছা, সবগুলো খেয়ে ফেলো। তারপর ডাবের জল খাবে। জোস্‌না ডামগুলো দাও।

কিছুক্ষণ ধরে তুয়ার খাওয়াদাওয়া হল। তারপর মারিয়া বললেন,—আর ভাবনা নেই। তুয়া আমাদের বাইরে পৌঁছে দেবে। বাছাকে এতটুকুন থেকে আমিই লালনপালন করছি বলতে গেলে। ওর বয়স হল নবছর প্রায়। ফাদার গ্রিনকট ওর বাবা-মাকে নিয়ে উৎকট পরীক্ষা করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিল। ওকে আমিই খাইয়ে-দাইয়ে বড় করেছিলাম।

বললাম,—তা যাই বলুন ঠাকমা। আপনার এই শ্রীমান তুয়া বড় নেমকহারাম। টিহো পোষ মেনেছিল কোন আক্কেলে?

মারিয়া বললেন,—প্রাণের দায়ে জয়ন্ত। গ্রিনকটকে মিনিহনরা বেজায় ভয় করে।

তাই বলে ও আমার ঠ্যাং ধরে টানবে? রাগ দেখিয়ে বললাম,—জানেন? কোকো পাম হোটেলে ব্যাটাচ্ছেলে আমার টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিল। তারপর ঠ্যাং ধরে এমন হ্যাঁচকা টান মেরেছিল যে আমি চিৎপাত একেবারে।

মারিয়া বললেন,—চুপ। আর কথা নয়। বাছা তুয়া। এবার চলো আমরা বাইরে যাই।

খুড়ো-ভাইপোর কীর্তি

শ্রীমান তুয়ার সাহায্যে আমরা প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। একটা গোপন পথ আছে কোকো পাম হোটেলের পেছনেই। খাড়ির ধার দিয়ে লম্বা চাতাল চলে গেছে মানিনিহোলা শুকনো গুহার দিকে। টিহো ও পথেই বরাবর গোপনে গুহাগুলোতে গিয়ে সোনা ঢুঁড়ত। বছর তিনেক আগে তুয়াকে সে না খেয়ে কাহিল অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিল একটা গুহার ভেতর। আমরা ফিরেছি সেই গোপনপথে।

হ্যাঁ, কথাটা টিহোর মুখেই জানতে পারলাম। সেকথা বলছি একটু পরে। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সে হায়েনার সেন্টপল হাসপাতালে রয়েছে এখন। বাঁচবে কি না বলা কঠিন।

সে রাতে আমরা কোকোপাম হোটেলে পৌঁছে কী তুমুল অভ্যর্থনা পেয়েছি বলার নয়। সারা হায়েনা টাউন আমার ও জ্যোৎস্নার নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছিল বরের দৌলতে। কতবার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন মিলে ওয়েইকাপালির গুহার ভেতর তন্ন তন্ন খুঁজেছে। তারপর পেয়েছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় টিহোকে। তার সঙ্গীদের তখন ক্ষুধার্ত হায়েনার পাল খেয়ে হজম করে ফেলেছে। টিহো কনটিকির মূর্তির ওপর চড়ে বসেছিল। হায়েনার কামড় খেয়ে তখন তার সারা শরীর রক্তাক্ত।

জনখুড়োর সঙ্গে জুটেছেন আরেক খুড়ো—আংকল ড্রাম ওরফে ঢাকুচাচা। দুজনে মোটরবোটে সহস্র লোকজন নিয়ে ওয়ালিপিলি লেক থেকে সমুদ্র, সমুদ্র থেকে ওয়েইকাপালির খাড়ি পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেছেন। তারপর হতাশ হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে কোকো পাম হোটেলের লাউজে বসে আছেন। এমন সময় আমরা এসে পৌঁছেছি। তাঁদের চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হয়েছে। দেখতে দেখতে কোকোপাম হোটেলের সামনে সে এক জনসমুদ্র। মারকিন দেশ বড় হুজুগে। কত সাংবাদিক, টি.ভি-র ক্যামেরা কত প্রশ্ন—হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল। পরদিন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সব কাগজে তো বটেই, আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে সব বড় বড় কাগজে আমাদের ছবিসহ রোমহর্ষক খবর বেরুল টি.ভি-তে সবাই আমাদের দেখল।

মারিয়া ঠাকমাকে পরদিন লসএঞ্জেলস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশকের লোকেরা টেলিফোনে সাধাসাধি শুরু করল—তাঁর ছত্রিশ বছরের গুহাজীবন আর ফাদার গ্রিনকটের কাহিনি নিয়ে তারা বই করতে চায়। লক্ষ লক্ষ ডলারের প্রস্তাব আসছিল। শেষে ঠাকমা হ্যাত্তেরি বলে সবাইকে না করে দিলেন। বই লিখতে হলে নিজেই সময়মতো লিখবেন। এখন তাঁর মাথায় ঘরে ফেরার চিন্তা।

রাতে কলকাতায় আমার গুরুদেব কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে ট্রাংকল করার চেষ্টা করেছিলাম। লাইন পাইনি। সকালে চেষ্টা করতেই লাইন পেয়ে গেলাম।

গম্ভীর গলায় সাড়া এল। জয়ন্ত নাকি? রাতদুপুরে ঘুম ভাঙালে কেন? আবার মিনিহুন নাকি?

রাতদুপুর কী বলছেন? এখন তো সকাল।

ডার্লিং! তোমার সময়জ্ঞানের গণ্ডগোল আছে বরাবর। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যে সূর্যকে দেখতে পাচ্ছ, কলকাতায় আসতে তার এখনও প্রায় ঘণ্টা ন'য়েক দেরি আছে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাও তো বটে। যাক্ গে, শুনুন। ভারি রোমহর্ষক ব্যাপার। আমি ... তার চেয়ে রোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছে আমার ঘরে। অ্যারিজোনার সেই ক্যাকটাসটার ফুলের ভেতর একটা নীল পরাগ থেকে অপূর্ব গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং ইতিমধ্যে পাড়া জুড়ে প্রশ্ন উঠেছে, এ কীসের গন্ধ?

রাগ করে বললাম,—আমি মরতে মরতে বেঁচে ফিরেছি জানেন? গুহার ভেতরে এক শয়তান—তার নাম ফাদার গ্রিনকট, আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নিয়েছিল প্রায়। তারপর ...

কী নাম বললে?

ফাদার গ্রিনকট।

তাই বলো! জীববিজ্ঞানী ফাদার গ্রিনকট!

অবাক হয়ে বললাম,—আপনি চেনেন নাকি?

নাম শুনেছিলাম একসময়। বাঁদরকে মানুষ আর মানুষকে বাঁদরে পরিণত করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই মার্কিন জীববিজ্ঞানীকে জার্মানরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তা হলে শুনুন, এখন তিন হায়েনার ভূতুড়ে গুহাগুলোর ভেতর একটা পাতালপুরীতে বহাল তবিয়তে বাস করছেন। মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে তার হৃদ্‌পিণ্ড উপড়ে চালান দিচ্ছেন প্রাইভেট ক্লিনিকে।

হুম্। তা হলে ওটাই আদিম পলিনেশীয় রাজা হোলাহুয়ার গোপন প্রাসাদ?

এবার তা হলে বাকিটা শুনুন।

সব শোনা যাবে না ডার্লিং! লাইন কেটে যাবে। তুমি বেঁচে-বর্তে ফিরেছ শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, ছাড়ছি। ঘুম পাচ্ছে।

কর্নেল ফোন রেখে দিলেন। রাগ হল। কিন্তু কী করা যাবে? হাজার হাজার মাইল দূরের লোককে রাগ দেখানোর উপায় আপাতত নেই। আসলে, গোয়েন্দাপ্রবরকে ক্যাকটাস পাঠানোই ভুল হয়েছে। ওই নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন আজকাল। পৃথিবীর সব মানুষ খুন হয়ে গেলেও তাকিয়ে দেখবেন না। বড় বিদঘুটে স্বভাব বুড়োর।

বব এসে বলল,—খুড়োকে নিয়ে মহা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

কী ঝামেলা?

হায়েনার পুলিশকর্তা গ্যান্সলারকে তাড়িয়েছেন। ফের হানা দিতে গেলেন পাতালপুরীতে। সঙ্গে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ আর কয়েকটা ডিনামাইট। মনে হচ্ছে গোটা এলাকাটা উড়িয়ে দেবে ওরা। ফাদার গ্রিনকটকে আর বাঁচানো যাবে না।

বাঁচিয়ে লাভ কী ব্যাটাচ্ছেলেকে? আমার হৃৎপিণ্ড ওপড়ানোর হুকুম দিয়েছিল মারিয়া ঠাকমাকে।

বব ফিক করে হেসে বলল,—ভালোই তো। কোনো কোটিপতির বুকে স্থান পেত তোমার হৃৎপিণ্ড। হয়তো তার বুকটা তোমর চেয়ে অনেক চওড়া। তা ছাড়া ...

বাধা দিয়ে বললাম,—নিজের হৃৎপিণ্ডটা দান করে এসো না।

দৈবাৎ মারা পড়লে তাতে আপত্তি করব না। বব আমার হাত ধরে টেনে বলল। যাক্ গে, চলো—ঠাকমাকে নিয়ে টিহোর কাছে যেতে হবে। জোসনাকে ফোনে বলেছি, সেন্ট পল হাসপাতালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।

হোটেলের ম্যানেজার খাতির করছেন খুব। নিজের গাড়ি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন আমাদের। তুয়া মারিয়া ঠাকমার কোলে চড়েছে তো আর তার নামবার নাম করে না। হাসপাতালে তাকে দেখতে ভিড় জমে গেল। কোনোরকমে ভিড় ঠেলে আমরা টিহোর কেবিনে ঢুকলাম।

সারা গায়ে ও মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে টিহো শুয়েছিল। তুয়া তার দিকে পিটিপিটি চোখে তাকিয়ে বলল,—হুঁ হুঁ হুঁ উঁম্না উঁয়া।

টিহো অতিকষ্টে একটু হাসল। তারপর মারিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মারিয়া বললেন,—কী টিহো! চিনতে পারছ না আমাকে? পাপের শাস্তি পেয়েছ, এতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। ওঃ তোমরা এত বিশ্বাসঘাতক! আমাকে ছত্রিশ বছর গুহার ভেতর ফেলে রেখেছিলে! এবার মনে পড়েছে, আমি কে?

মারিয়ার চোখে জল। টিহো আস্তে বলল,—চিনেছি। তুমি মারিয়া। আমাকে ক্ষমা করো মারিয়া।

ক্ষমা? মারিয়া ক্ষুব্ধভাবে বললেন। অসবোর্ন আর ওলসন তাদের পাপের শাস্তি পেয়েছে। তুমিও পেয়েছ। তবু তোমাদের ক্ষমা করব না। আমার জীবনটা তোমরা নষ্ট করে দিয়েছ!

টিহো বলল,—কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। তবু বলছি সব। শোনো মারিয়া, আমাদের কোনো দোষ ছিল না। কী হয়েছিল, সব বলছি শোনো।

টিহো যে কাহিনি বলল,—তা এই :

মারিয়াকে উদ্ধারের ইচ্ছা তাদের ছিল। প্লেন থেকে হুক আর দড়ি আনতে গিয়েছিল তারা। কিন্তু তখন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা চলছে। ওখানে প্লেন দেখতে পেয়ে একদল সৈন্যের টনক নড়ে। প্লেনটা ঘিরে তারা পরীক্ষা করতে থাকে। এমন সময় এরা তিনজনে সেখানে যেতেই তাদের খপ্পরে পড়ে। কোনো কৈফিয়ত তারা বিশ্বাস করে না। টিহোদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারপর পার্লহারবার থেকে খোঁজ নিলে তাঁদের কীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। সোনা নিয়ে যাবার কথা কোথায়—আর কোথায় তারা প্লেন নামিয়ে বসে আছে এবং সোনার চিহ্নমাত্র নেই। কোর্ট মার্শালে তিনজনের একবছর করে জেল হয়। পাছে সোনার হদিস কর্তৃপক্ষ পেয়ে যান, তাই মারিয়ার কথা ওরা বলেনি।

এক বছর পরে টিহো জেল থেকে বেরিয়ে অসবোর্ন ও ওলসনের খোঁজ করে। টিহো ছিল এই হায়েনার জেলে। ওরা দুজন ছিল লস এঞ্জেলসের জেলে। সেখানে গিয়ে টিহো জানতে পারে, অসবোর্ন জেল থেকে পালানোর সময় রক্ষীর গুলিতে মারা পড়েছে। আর ওলসন মারা পড়েছে ক্যান্সারে। জেলকর্তৃপক্ষকে ওলসন মরার আগে বলে গেছে, তার বন্ধু কাউয়াই দ্বীপের রাজবংশধর টিহোকে যেন এই সিগারেটকেসটা পৌঁছে দেওয়া হয়। সিগারেট কেসে লুকানো সোনার সঠিক জায়গা নির্দেশ করা ছিল।

টিহো একা গুহার ভেতর ঢুকতে সাহস পায়নি। পলিনেশীয়দের কুসংস্কার তার মধ্যে ছিল। তাই সে একজন সঙ্গী খুঁজছিল। যুদ্ধের সময় আরেক পাইলটের সঙ্গে তার বন্ধুতা ছিল। তার নাম ফর্স্টার। তাকে সে বিশ্বাস করে সোনার কথা বলে। দুজনে গুহায় ঢুকে সোনার প্যাকেটগুলো আনার পরিকল্পনা করে। কিন্তু লোভী ফর্স্টার রাতারাতি সিগারেটকেসটা চুরি করে কেটে পড়ে। ওতে পলিনেশীয়ার আদিম ভাষায় সঠিক জায়গার হদিস লেখা আছে। ওই হদিস না পেলে টিহোরপক্ষেও সোনা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। টিহোর বোকামি হয়েছিল, যদি একটা কপি রাখত লেখাগুলোর তাহলে সোনাটা খুঁজে বের করতে পারত—আরও কাউকে সঙ্গে নিত বরং। একা সে কিছুতেই তার পূর্বপুরুষের পাতালপুরীতে ঢুকে অভিশাপের পাল্লায় পড়তে রাজি নয়।

টিহো বুঝতে পারে না, ফর্স্টারের কাছে যে সিগারেটকেস ছিল—তা কেমন করে সুদূর পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের মাঠে মাটির তলায় গেল। সে আমার দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটা করল।

আমি বললাম,—আমার ধারণা—ফর্স্টার ভেবেছিল, সুযোগমতো একা গিয়ে সোনা উদ্ধার করবে। সেই সময় তাকে ভারতে পাঠানো হয়। তার প্লেন দৈবাৎ ভেঙে পড়েছিল আমাদের গ্রামের সেই সামরিক বিমান ঘাঁটিতে।

টিহো বলল,—এতকাল পরে আপনার হাতে একটা সিগারেটকেস দেখলাম —তাতে আমাদের পবিত্র রাজবংশের চিহ্ন! অমনি টের পেলাম, তা হলে এই সেই সিগারেটকেস! কিন্তু ওটা চুরি করে দেখি, ভেতরে অনেক লেখা অস্পষ্ট এবং মুছে গেছে। কাজেই ওটা পেয়েও খুব একটা সুবিধে হল না। তবু ভাবলাম, যেটুকু পড়া যাচ্ছে—তারই সূত্র ধরে খুঁজলে যদি সোনাটা পাই! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য! কোথায় লুকিয়ে ছিল হিংস্র হায়েনার পাল। তারা আমাদের আক্রমণ করল।

অনেকক্ষণ কথা বলে টিহো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার এসে আমাদের বললেন,—আর নয়। আপনারা এবার আসুন। এভাবে কথা বললে ওকে বাঁচানো যাবে না।

আমরা বেরিয়ে এলাম। বব বলল,—ঠাকমাকে হোটেলে রেখে চলো আমার জনখুড়োর অবস্থা কী হল দেখি। ...

ফাদার গ্রিনকট বনাম আংকল ড্রাম

ওয়েইকাপালি গুহার সামনে গিয়ে দেখি যেন যুদ্ধের ঘাঁটি। চারদিকে খাড়ির মাথায় হাজার-হাজার লোক দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছে। পাথরে ম্যাপ বিছিয়ে জনখুড়ো, পুলিশকর্তা গ্যান্সলার এবং আরও সব অফিসার তখনও জল্পনা করছেন। আমাদের সেখানে যাওয়ার বাধা ছিল না। কারণ আমরাই তো এই কাণ্ডের মূলে। উঁকি মেরে ম্যাপ দেখে জ্যোৎস্না বলল,—দেখছ জয়ন্তদা? ওয়েইকাপালি, ওয়াইকানালে আর মানিনিহোলা—এই তিনটে গুহার মধ্যে কেমন যোগাযোগ রয়েছে। এটা মিলিটারি ম্যাপ মনে হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, যাঁরা গুহার ভেতর সার্ভে করে ম্যাপ এঁকেছেন, তার রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরীর হদিস পাননি! অথচ দেখে, কনটিকি এবং পিলির মূর্তি কোথায়, তাও ম্যাপে চিহ্ন দিয়ে বলা হয়েছে।

বব হঠাৎ লাফিয়ে উঠল—ইউরেকা।

পুলিশকর্তা গ্যান্সলার হাঁড়িপানা মুখ করে বললেন,—কী হে ছোকরা? লাফাচ্ছ কেন?

বব বলল,—তুয়া! তুয়াকে আনলেই তো সে পাতালপুরীতে নিয়ে যেতে পারে।

তুয়া! সেটা আবার কী বস্তু? গ্যান্সলার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন।

জ্যোৎস্না বলল,—মিনিহুন। মারিয়া ঠাকমার মিনিহুনটার নাম তুয়া। তুয়াই তো আমাদের গাইড।

জনখুড়ো সোজা হয়ে বললেন,—মাই গড! এটা আমরা কেউ এতক্ষণ খেয়াল করিনি বব! শিগগির! ম্যাডাম মারিয়াকে গিয়ে বলো, এক্ষুনি ওঁর পোষা প্রাণীটিকে নিয়ে যেন চলে আসেন।

বব বলল,—তা যাচ্ছি। কিন্তু খুড়ো মশাই, তুয়াকে প্রাণী বলা কি ঠিক হচ্ছে?

জন ধমক দিয়ে বললেন,—সবটাতে তক্ক করা চাই! প্রাণী না তো কী? মিনিহুন আসলে অধুনালুপ্ত পলিনেশীয় বাঁদর। তবে তারা বুদ্ধিমান বাঁদর।

জ্যোৎস্না বলল,—অধুনালুপ্ত বলছেন কেন খুড়োমশাই? ফাদার গ্রিনকটের দেখা পেলে দেখবেন অসংখ্য মিনিহুন এখনও বেঁচে আছে পাতালপুরীতে।

বব পুলিশের মোটরবোটে চলে গেল। আমরা ওর ফিরে আসার পথে তাকিয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে এসে গেল খবর শিকারী সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর টি.ভি. ক্যামেরা নিয়ে একদঙ্গল লোক। মারকিন মুল্লুকে এদের প্রচুর স্বাধীনতা। পুলিশকে গ্রাহ্যও করে না। বরং পুলিশ জানে, এই সুযোগে তাদের নাম যেমন ছড়াবে, তেমনি টি.ভি-তে ঘরে ঘরে তাদের ছবিও লোকে দেখবে।

জনখুড়ো তাদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন,—বন্ধুগণ! আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমাদের 'পাতালপুরী অপারেশন' শুরু হয়ে যাবে। এই পাতালপুরীতে আছেন এক ধুরন্ধর

জীববিজ্ঞানী—তাঁর নাম ফাদার গ্রিনকট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইনি বানরকে মানুষ এবং মানুষকে বানর করা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। শোনা যায়, হিটলারের হুকুমে তাঁকে জার্মান গুপ্তচরেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব মানুষকে বানর করে ছাড়বেন।

সবাই হেসে উঠল। জনখুড়োর সামনে গোটা পাঁচেক টিভি ক্যামেরার চোখ—এদিকে অনবরত ক্লিক-ক্লিক করে শাটার চলেছে কাগজের ফোটোগ্রাফারের। রিপোর্টাররা নোট করে যাচ্ছে কথাগুলো। আমিও কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। কিন্তু এদের আদিখ্যেতা দেখে হাসি পাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে বব ফিরে এল মারিয়া আর তুয়াকে নিয়ে তারপর 'অপারেশন' শুরু হল।

ওয়েইকাপালি গুহার ভেতর উজ্জ্বল আলো ফেলে সামনের সারিতে চলেছেন মারিয়া ও তুয়া, পেছনে সশস্ত্র পুলিশ হাতে সাবমেশিন গান, স্টেনগান, টমিমান, এমন কী কারুর হাতে গ্রেনেডও। তাদের পেছনে জনখুড়ো, আমি, বব ও জ্যোৎস্না। আমাদের পেছনে টি.ভি-র ক্যামেরা।

কনটিকির মূর্তি পেরিয়ে তুয়া বাঁয়ে ঘুরল। বাঁদিকে একটা সরু ফাটল। ফাটলে হাত ভরে সে একটা কিছু টানল। অমনি এবড়ো-খেবড়ো দেয়ালের খানিকটা অংশ ঘুরে গেল এবং ভেতরে এমনি চওড়া গুহাপথ দেখা গেল।

প্রায় আধঘণ্টা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে একখানে তুয়া ফের তেমনি একটা সরু ফাটলে হাত ভরে কী টানল। এখানেও দরজার মতো ফাঁক হয়ে গেল দেয়াল।

ভেতরে মসৃণ বারান্দার মতো চওড়া খানিকটা জায়গা। তার সামনে কারুকার্যখচিত সুন্দর দরজা। তুয়া দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। তীব্র মিঠে গন্ধ ভেসে এল। পাতালপুরীতে ঢুকলাম আমরা।

কিন্তু এখনও কোথাও আলো জ্বলছে না।

এ-ঘঁর ও-ঘর ঘুরে তুয়া যেখানে নিয়ে এল, দেখেই চিনতে পারলাম। সেই যন্ত্রঘর। কাচের দেয়াল। কিন্তু কোথায় ফাদার গ্রিনকট? কোথায় তার মিনিহুনের দল? কোথায় বা সেইসব হিংস্র হায়েনার পাল?

রাজা হোলাহোয়ার পাতাপুরী স্তব্ধ নির্জন। যন্ত্রঘরে যন্ত্রগুলো আছে। কিন্তু বড়-বড় কাঁচের পাত্র থেকে বাষ্প উঠছে না। কোনো আলোও জ্বলছে না। তারপর তুয়ার আর্তনাদ শুনতে পেলাম। তুয়া সেই গোলাকার মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বোবা মানুষের মতো গলার ভেতর শব্দ করছে—কান্নার মতো শব্দ।

মঞ্চে একটা কালো ছাইয়ের বিরাট স্তূপ দেখা যাচ্ছে। মারিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন, সর্বনাশ। শয়তানটা ওদের পারমাণবিক আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

জন বললেন,—কাদের? মিনিহুনদের?

মারিয়া কান্নাজড়ানো গলায় বললেন,—হ্যাঁ। শয়তান গ্রিনকট ওদের পুড়িয়ে মেরে পালিয়েছে! তুয়া! তুয়া! কোথায় গেল গ্রিনকট, খুঁজে বের করতেই হবে তোকে। প্রতিশোধ নিতে হবে বাছা!

তুয়া অমনি চলতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করলাম আমরা। হায়েনার খাঁচার পাশ দিয়ে যাবার সময় একই দৃশ্য দেখলাম। পলিনেশীয় এক বিচিত্র প্রজাতির হায়েনাদেরও সে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। একি জীববিজ্ঞানীর প্রতিহিংসা?

এবার অগ্নিদেবী পিলির মূর্তি সামনে পড়ল। তার ডাইনে সরু একটা গুহাপথ দিয়ে এগিয়ে বাইরের রোদ্দুর দেখা গেল।

তুয়া একটা ফাটল বেয়ে নামতে শুরু করল।

পিঁপড়ের সার যেমন করে নামে, তেমনি করে আমরা, পুলিশ-বাহিনী, সাংবাদিকরা, টিভির লোকেরা। নেমে গিয়ে মোটামুটি একটা সমতল বিশাল চাতালমতো জায়গায় পৌঁছিলাম।

হঠাৎ জ্যোৎস্না চেঁচিয়ে উঠল,—ও কী! বাবার সঙ্গে গ্রিনকট মারামারি করছে যে।

চাতালের আন্দাজ কুড়ি ফুট নীচে হ্রদের ধারে খানিকটা জায়গায় বালির বিচ। তার ওপর দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে লড়ে যাচ্ছেন আংকল ড্রাম এবং ফাদার গ্রিনকট। জ্যোৎস্না লাফ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ধরে আটকালাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে তুয়া ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে গ্রিনকটের ওপর।

ঢাকুচাচা ওপর দিকে তাকিয়ে আমাদের দেখে বিরাট হাসি হাসলেন। ঢাকের মতো গমগম করে বললে,—হুমুন্দিরে ধরছিলাম। এ বান্দরটা না আইলে অরে ডুবাইয়া ছাড়তাম ঠাণ্ডা পানিতে। হঃ! আমার নাম ঢাকু মিয়া! আমারে চেনে নাই হুমুন্দির পোলা।

হাসবো কী, তুয়া যা করল, দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সে সরু লিকলিকে হাতে গ্রিনকটের গলা টিপে ধরে হ্যাঁচকা টানে ছুড়ে ফেলল হ্রদের জলে। তারপর জলের ভেতর হুলস্থূল শুরু হয়ে গেল। একবারের জন্য ফাদার গ্রিনকটের পা দুটো দেখা গেল। তারপর তলিয়ে গেল চিরকালের মতো।

ঢাকুচাচা দেখতে-দেখতে বললেন,—হাঙরের পাল হুমুন্দিরে লইয়া গেল। যাউক! ...

পদ্মার ইলিশ

পলিনেশীয় রাজা হোলাহুয়ার পাতালপুরী এতদিনে আবিষ্কৃত হয়েছে। হায়েনাটাউনে এবার পর্যটকদের ভিড় বেড়ে যাবে। ওদিকে জনখুড়ো দ্বিতীয় দফা অভিযান চালিয়ে সোনাগুলো উদ্ধার করেছেন। সরকারি কোষাগারে সেটা জমা পড়েছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দাবি, ওই সোনার দামে দ্বীপগুলোকে স্বর্গ বানাতে হবে। মারিয়া তুয়াকে নিয়ে স্যাক্রামেন্টোতে তাঁর বাড়ি ফিরে গেছেন।

আমি ও বব চাচার রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়ার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। জ্যোৎস্না বলল,—বব! তোমার জন্য ঝাল কম দিয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশের নদী পদ্মার ইলিশ। একটু ঝাল না হলে ভালো লাগে না।

বব বলল,—আই উইল ট্রাই। তারপর একটু চেখেই 'ও ফাদার গ্রিনকট' বলে আর্তনাদ করল।

চাচা এসে বলল,—কী? পোলাডা চিল্লায় ক্যান? হঃ বুঝছি, গ্রিনকট কইল না? তবে শোনেন।

চাচা তাঁর দেশোয়ালি ভাষায় এবং ববের জন্যে তাঁর নিজস্ব ইংরাজিতে অনুবাদ করে যা বললেন,—তা হল : সবাই যখন সামনের দিকে ফাদার গ্রিনকটকে ধরবে বলে তোড়জোড় করছে তখন উনি পেছনের দিকে ওত পেতে বসাই ঠিক মনে করেছিলেন। মোটর বোট থেকে মানিনিহোলা গুহার খোঁজে ওপরে উঠতে যাচ্ছেন, হঠাৎ ফাদার গ্রিনকট তাঁর সামনে এসে পড়েছেন। হাবভাব দেখে চাচা তখুনি টের পেয়েছেন, এই সেই হুমুন্দি। অমনি জাপটে ধরেছেন তাকে।

বব ঝোল মুছে ইলিশ চুষতে চুষতে বলল,—ফাইন ফিশ। বাট নট বেটার দ্যান সার্ডিন।

চাচা বললেন,—বান্দরটা গ্রিনকটেরে না ধরলে আমি ধরতাম আর করতাম কী জানেন? আষ্টমন লঙ্কা বাঁইটা হেই ঝোলে চুবাইতাম। হঃ।

হিটাইট ফলক রহস্য

ব্রোঞ্জের ফলক চুরি

মার্চ মাসের এক ভোরবেলায় টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যথারীতি খাপ্পা হয়ে রিসিভার তুলে বলেছিলুম,—রং নাম্বার।

অমনই আমার কানে পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল,—রাইট নাম্বার ডার্লিং! অপ্রস্তুত হয়ে উঠে বসে বলেছিলুম,—মর্নিং ওল্ড বস! আসলে—

—জানি, জানি। তুমি আটটার আগে ওঠ না। তবে আমি জানি, নাইট ডিউটি থাকলে ভোরে ঘুমন্ত সাংবাদিকদের কানের কাছে কামান গর্জন হলেও তাদের ঘুম ভাঙে না। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, তোমার নাইট ডিউটি ছিল না।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপার না থাকলে এই বৃদ্ধ তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙায় না, তা তো তুমি জানো জয়ন্ত!

হাসতে-হাসতে বললুম,—অর্থাৎ আপনার বাড়িতে আমার আজ ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন। তারপর!

কর্নেল কিছুটা চাপা স্বরে বললেন,—তারপর আমরা জনৈক আলুওয়ালার কাছে যাব।

—কী সর্বনাশ! এবার আলুর গুদামে রহস্যের ইঁদুর ঢুকেছে নাকি?

—জয়ন্ত! হাতে সময় কম। এখনই চলে এসো। ...

ঠিক এইভাবেই মার্চের সেই অদ্ভুত দিনটা শুরু হয়েছিল। অদ্ভুত বলছি, তার কারণ আমি কল্পনাও করিনি, জনৈক আলুওয়ালাসায়েবের পাল্লায় পড়ে একসময় আমাকে—হ্যাঁ, শুধু আমাকেই, কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে নয়, সুদূর কোনো দেশের মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে শুয়ে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে।

তবে না। সে-কথা যথাসময়ে হবে। সেদিনকার কথা দিয়েই এই রোমাঞ্চকর কাহিনি শুরু করা যাক।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ব্রেকফাস্ট করে এবং কফি খেয়ে কর্নেলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলুম। তারপর পৌঁছেছিলুম সত্যি সত্যি জনৈক আলুওয়ালাসায়েবের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। অবশ্য তাঁকে আমি এই কাহিনিতে আলুওয়ালা বললেও তাঁর প্রকৃত পদবি আলুওয়াহ্‌লিয়া।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর কর্নেল এবং তাঁর মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল, এবার তা বলা যাক্। ...

—মোহেনজোদাড়োতে ঘোড়া? অসম্ভব। ওখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে এযাবৎ অনেক জন্তুর মূর্তি পাওয়া গেছে, ঘোড়ার কোনো চিহ্নই মেলেনি। এর একটাই মানে দাঁড়ায়। ওখানকার লোকেরা ঘোড়া নামে কোনো জন্তুর কথা জানত না। আর শুধু ওখানে কেন, হরাপ্পা, চানহুদড়ো, কালিবঙ্গান থেকে শুরু করে, যেখানে-যেখানে সিন্ধু সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, কোথাও ঘোড়ার মূর্তি দেখা যায়নি।

—আচ্ছা ডঃ আলুওয়ালা, মোহেনজোদাড়োর ধ্বংসাবশেষ তো বাঙালি পুরাতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। ১৯২১ সালে তিনিই সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা থেকে মাইল বিশেক দূরে একটা বৌদ্ধ স্তূপ দেখতে পান। সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় টের পান, একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় লুকিয়ে আছে। এর প্রায় একশ বছর আগে ওখান থেকে চারশ মাইল দূরে হরাপ্পার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে যাকে বলে বিজ্ঞানসম্মত খনন, তা শুরু হয় ১৯২১ সালে। তারপর ...

—একটা কথা জিজ্ঞেস করি ডঃ আলুওয়ালা। আপনার বাবা ওই সময় লারকানায় স্টেশন মাস্টার ছিলেন। তাই না?

—হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?

—আপনার লেখা একটা প্রবন্ধ পড়ে। চমৎকার প্রবন্ধ।

—বাঃ। আপনার দেখছি পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা পড়ারও নেশা আছে।

—আমি সবই পড়ি, ডঃ আলুওয়ালা। সত্যি বলতে কী, আপনার ওই প্রবন্ধ পড়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগের লোভ সামলাতে পারিনি।

—হাঃ হাঃ হাঃ! এতক্ষণে বুঝলুম, কেন আমার কাছে এসেছেন। বাঁচালেন মশাই। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে কথা বলছি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে অস্বস্তি হচ্ছিল প্রচণ্ড রকমের।

—সে কী! কেন, কেন?

—আপনার কার্ডটা দেখে। ওতে লেখা আছে: কর্নেল নীলাদ্রি সরকার, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। অর্থাৎ কিনা শখের গোয়েন্দা। দেখেই আমি চমকে উঠেছিলুম। আমার কাছে এই সাতসকালে গোয়েন্দা কেন রে বাবা? আমি নেহাত অধ্যাপক মানুষ। হাঃ হাঃ হাঃ! তার ওপর আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক আবার খবরের কাগজের লোক। বলুন, অস্বস্তি হয় কি না!

এই সময় একটা লোক চা ও স্ন্যাকস্ নিয়ে এল ট্রে বোঝাই করে। ডঃ আলুওয়ালা তার থেকে ট্রে প্রায় কেড়ে নিলেন এবং টেবিলে রেখে সযত্নে কফি তৈরি করতে ব্যস্ত হলেন। আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, কর্নেল ডঃ আলুওয়ালার বইঠাসা আলমারিগুলোর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। অপরাধতত্ত্ব থেকে প্রকৃতিতত্ত্বে এসে পৌঁছেছিলেন ইদানীং। এবার দেখছি পুরাতত্ত্বে ঝুঁকেছেন। হুঁ, এবার তত্ত্ববাগীশ না হয়ে ছাড়বেন না।

—চা নিন, কর্নেল।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বললেন,—আপনি মোহেনজোদাড়োর একটা ফলকের হরফগুলো নাকি পড়তে পেরেছেন। দয়া করে সেটা যদি একবার দেখান, বাধিত হব।

ডঃ আলুওয়ালা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আপনাকে দেখাতে আপত্তি নেই। কিন্তু জয়ন্তবাবুকে একটা বিশেষ অনুরোধ করব।

বললুম,—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

—দেখুন, জয়ন্তবাবু! সেই ১৯২২ থেকে এ পর্যন্ত দেশবিদেশের বড় বড় পণ্ডিত সিন্ধু সভ্যতার সময় নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামাচ্ছেন। সীলমোহর এবং ফলকের লেখাগুলো পড়তে পারলে হয়তো সঠিক সময় নির্ণয় করা যেত। কেউ বলছেন, এ সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার সালের, কেউ বলছেন, আরও পরবর্তী যুগের। আজ অব্দি সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। যদিও মাঝে মাঝে কেউ কেউ দাবি করেন যে তিনি লেখাগুলো পড়তে পেরেছেন। আসলে সমস্যা কোথায় জানেন? সম্ভবত যে-ভাষার ওই লিপি, সেই ভাষাই হাজার হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়েছে। যাই

হোক, এই সমস্যার একটা সমাধানের পথ আমি খুঁজে পেয়েছিলুম। আপনারা চিত্রলিপির কথা নিশ্চয় জানেন? অতীত যুগে সূর্য বোঝাতে সূর্য আঁকা হত। পাখি বোঝাতে পাখি। মোহেনজোদাড়োর একটা ফলক নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করেছিলুম। সেটাতে কয়েকটা চিহ্ন দেখে আমার মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয় চিত্রলিপি। চিহ্নগুলোতে ফসলের শীষ, লাঙল, বলদ, শস্যগোলা ইত্যাদির আভাস আছে যেন। এই সূত্র ধরেই ফলকটা আমি অনুবাদ করে ফেলেছি। কিন্তু এখনই হুট করে সেটা প্রচার করতে চাইনে। যদি ভুল প্রমাণিত হয়, উপহাস্যাস্পদ হব। তাই জয়ন্তবাবু খবরের কাগজের লোক বলেই বলছি, ফলকের অনুবাদটা যেন কাগজে ছেপে দেবেন না। আমি পত্রিকার প্রবন্ধে শুধু বলেছি, একটা ফলকের পাঠোদ্ধার করেছি বলে মনে করি। তার বেশি কিছু লিখিনি।

আমি জোরে মাথা দুলিয়ে বললুম,—কক্ষনোও ছেপে দেব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ডঃ আলুওয়ালা। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটাই আমি দৈনিক সত্যসেবকে প্রকাশ করব না। কারণ, আমার মাননীয় বন্ধু কর্নেল আমাকে আগেই সেটা নিষেধ করে দিয়েছেন।

কর্নেল দাড়ি ও টাক পর্যায়ক্রমে চুলকে বললেন,—ঠিক, ঠিক।

ডঃ আলুওয়ালা উঠে গিয়ে একটা স্টিলের আলমারি খুললেন। তারপর একটা ফাইল বের করে আনলেন।

কর্নেল ঝুঁকে পড়লেন কাগজপত্রের দিকে। আমি কিস্যু বুঝলাম না। একগাদা কাগজে নানা বিদ্‌ঘুটে আঁকজোক রয়েছে। তার পাশে নানান উদ্ভুটে শব্দ ইংরাজিতে লেখা।

ডঃ আলুওয়ালা একটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন,—ফলকটায় লেখা আছে কী শুনুন :

'শস্যগোলার অধিকর্তাকে একটি সেরা জাতের বলদ পাঠানো হচ্ছে।'

কর্নেল বললেন,—পাঠাচ্ছেন কে?

—সেকথা ফলকে নেই। মনে হচ্ছে, এটা একটা বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ। আজকাল যাকে বলে চালান বা ইনভয়েস।

—ফলকটা কিসের তৈরি? কোথায় আছে ওটা?

—ফলকটা ব্রোঞ্জের। মাপ হচ্ছে সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া সাত ইঞ্চি লম্বা। ওটা এখন আছে লন্ডনের জাদুঘরে। মোহেনজোদাড়ো এবং হরাপ্পা পাকিস্তানে। তাই পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ওটা দাবি করছেন। শুনেছি, ফলকটা শিগগির ফেরত দেওয়া হবে।

—আপনি কোত্থেকে ফলকের নকল সংগ্রহ করেছিলেন?

ডঃ আলুওয়ালা হাসলেন। —আমার বরাত বলতে পারেন। বাবা ছিলেন লারকানার স্টেশন মাস্টার। এখন তো লারকানা বিরাট শহর। পাকিস্তানের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টোর বাড়ি ওখানে। আমার ছেলেবেলায় লারকানা ছিল অখাদ্য জায়গা। যাই হোক, বাবার একটু-আধটু পুরাতত্ত্বের বাতিক ছিল। স্যার জন মার্শাল ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পুরাতত্ত্ব দপ্তরের কর্তা ছিলেন তখন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অধীনে এক কর্মচারী। রাখালদাসের সঙ্গে বাবার খুব বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রে বাবা ওঁরই কাছ থেকে এই ব্রোঞ্জের ফলকের একটা অবিকল নকল জোগাড় করেছিলেন। সেটা এখনও আমার কাছে আছে। দেখাচ্ছি।

বলে ডঃ আলুওয়ালা উঠলেন। ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। এতক্ষণে আমি আবার কর্নেলকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম,—হ্যালো ওল্ড বস! ব্যাপারটা কী বলুন তো?

—চুপ, চুপ! আমাকে বস বলে ডেকো না।

—তাহলে কি টিকটিকি বলে ডাকব?

—কিচ্ছু না। স্রেফ কর্নেল বলে ডাকবে।

—বেশ। কর্নেল স্যার, এবার বলুন তো সাতসকালে আমাকে ঘুম থেকে তুলে কেন এই গোরস্থানে নিয়ে এলেন?

—গোরস্থান! ... কর্নেল চাপা হাসলেন : তুমি ঠিকই বলেছ জয়ন্ত। মোহেনজোদাড়ো কথাটার মানে মৃতদেহের স্তূপ।

—এবং এই ডঃ আলুওয়ালা দেখছি সেই গোরস্থানের এক মামদো ভূত!

—ছিঃ ছিঃ! মহাপণ্ডিত মানুষ উনি!

—যাই বলুন, হাজার হাজার বছর আগের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা মামদো ভূত নয়তো কী? বর্তমানেই আমাদের কত রকম সমস্যা! তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে কাজ হত। তা নয়, মোহেনজোদাড়ো!

—উঁহু, মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া।

—সে ঘোড়াও তো কত হাজার বছর আগে মরে ভূত হয়ে গেছে। তা ছাড়া এখন ঘোড়ার মূল্য কী? এটা যন্ত্রযুগ। বড়জোর রেস খেলায় বাজি ধরে যারা, তারা ঘোড়া নিয়ে মাথা ঘামায় দেখেছি। আপনি কি ইদানীং রেসুড়ে হয়ে উঠেছেন? ছ্যা ছ্যা!

—জয়ন্ত ডার্লিং! তোমার কথাগুলো কিন্তু ভিন্ন অর্থে সত্যি। আমি সম্প্রতি মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া ভূতের পাল্লায় পড়েছি এবং রেসুড়েদের মতো পিছনে বাজিও ধরেছি।

এবার একটু চমকে উঠলুম। কর্নেলের কথার হেঁয়ালি আছে। কিন্তু আর প্রশ্ন করার সুযোগ পেলুম না। ডঃ আলুওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। একেবারে অন্য রকম চেহারা। হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—তাজ্জব কাণ্ড কর্নেল! ফলকটা খুঁজে পেলুম না।

—সে কী!

—শুধু তাই নয়, শোবার ঘরের যে আলমারির লকারে ওটা রেখেছিলুম, তার তালা ভাঙা। আলমারির পাল্লার তালা কিন্তু ঠিক আছে।

—ভারি আশ্চর্য তো!

—অতি আশ্চর্য! গত রাতেও দেখেছি, লকারটা ঠিক আছে। এখন দেখি তালা ভাঙা। কে এমন সাংঘাতিক কাজ করল বুঝতে পারছি না!

—আর কোনো জিনিস চুরি গেছে কি?

—নাঃ। আমার স্ত্রীর গয়নাগাটি এবং কিছু নগদ টাকা ছিল। সব আছে।

—আপনার স্ত্রী কিছু বলতে পারছেন না?

—আমার স্ত্রী গতকাল সকালে বোম্বাই গেছেন মেয়েকে নিয়ে। বাড়িতে আমি একা।

—আপনার চাকর আছে দেখলুম!

—ও! হ্যাঁ! বৈজু আছে বটে। কিন্তু সে তো খুব বিশ্বাসী ছেলে। প্রায় মাস তিনেক হল, তাকে রেখেছি। বুঝতেই পারেন, আজকাল ভালো ঝি চাকর পাওয়া কত সমস্যা।

—বৈজুকে জিজ্ঞেস করলেন কিছু?

—নিশ্চয় করব। বোধ হয়, বাজার করতে গেছে। ফিরে আসুক।

—আপনি দয়া করে বসুন, ডঃ আলুওয়ালা!

কর্নেলের কথায় উনি ধুপ করে বসলেন। উত্তেজনায় তখনও ওঁকে অস্থির দেখাচ্ছে। আমি বললুম,—পুলিশে জানানো উচিত।

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই। আচ্ছা ডঃ আলুওয়ালা, ফলকের নকল চুরি করে কার কী লাভ হতে পারে?

ডঃ আলুওয়ালা জবাব দিলেন,—বুঝতে পারছি না। তবে একটা কথা, ওই ফলকটার ছবি কিন্তু এ যাবৎ কোনো বইয়ে দেখিনি। কোথাও কোনো উল্লেখও পাইনি। নেহাত বাবার খেয়াল ছিল, তাই সংগ্রহ করেছিলেন, এবং আমি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

—লন্ডন মিউজিয়ামে যে আসল ফলকটা আছে, কী ভাবে জানলেন?

—খবরের কাগজে পড়ে। পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে যেসব প্রত্নদ্রব্য দাবি করেছেন, তার মধ্যে ওই ফলকটার উল্লেখ ছিল।

—হুম। কষ্ট করে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে লন্ডন যাওয়ার চেয়ে আপনার আলমারি থেকে ওটার নকল বাগানো অনেক সোজা হয়েছে।

ডঃ আলুওয়ালার মনে ধরল কথাটা। সায় দিয়ে বললেন,—ঠিক, ঠিক। কিন্তু ওতে এমন কী আছে কে জানে? চোর ইচ্ছে করলে এই ফাইলটাও হাতাতে পারত। এতেও কাগজে আঁকা অবিকল স্কেচ রয়েছে।

কর্নেল হাসলেন। —কাগজের স্কেচের চেয়ে ব্রোঞ্জের নকল ফলকটাই কাজে লাগবে মনে হয়েছে কারুর। আপনার এই স্কেচ তো নকলস্য নকল। আপনার ড্রইং ক্ষমতায় সম্ভবত আস্থা নেই ভদ্রলোকের।

—ভদ্রলোক! সে ব্যাটা ভদ্রলোক। নচ্ছার চোর কাঁহেকা। এখুনি থানায় জানাচ্ছি।

ডঃ আলুওয়ালা উত্তেজিতভাবে ফোনের কাছে গেলেন। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন,—সব সময় এনগেজড্! কলকাতার টেলিফোনকে ভূতে ধরেছে। নাঃ! থানায় গিয়েই সব জানিয়ে আসি। বৈজু আসুক।

এই সময় আমি লক্ষ করলুম কর্নেল টেবিলে রাখা সেই ফাইল থেকে একটুকরো কাগজ তুলে নিয়ে কোটের পকেটে ঢোকালেন। ডঃ আলুওয়ালা টের পেলেন না। আবার ডায়াল করতে ব্যস্ত হয়েছেন। বোঝা যায় থানায় যেতে মন চাইছে না। নেহাত বেঘোরে না পড়লে আজকাল থানায় যেতে কারই বা ইচ্ছে করে!

কিন্তু কর্নেল যা করলেন, তাও যে চুরি! আমি কটমট করে তাকাতেই উনি চোখ টিপে একটু হাসলেন। আমার অস্বস্তি হল। বুড়ো বয়সে কেলেঙ্কারি করবেন যে!

ডঃ আলুওয়ালা আরও কয়েকবার চেষ্টা করার পর থানার লাইন না পেয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। তারপর আমাদের কাছে এসে বিমর্ষভাবে বললেন,—দেখুন তো, কী সর্বনাশ হল।

কর্নেল বললেন,—থানায় গিয়ে জানিয়ে দিন এক্ষুনি। আজ আমরা তাহলে উঠি। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলুম আপনার।

—মোটেই না! ভাগ্যিস আপনারা এসেছিলেন, তাই চুরিটা এত শিগগির ধরা পড়ল। নইলে আমি তো ওই আলমারি এখন খুলতুম না। কিছু টেরও পেতুম না।

কর্নেল ও আমি উঠে দাঁড়ালুম। ডঃ আলুওয়ালা এগিয়ে গিয়ে দরজার পর্দা তুলে ধরলেন। ভদ্রলোক অতি সজ্জন ও কেতাদুরস্ত মানুষ।

আমরা তিনতলা থেকে নেমে আসছি, দোতলার মুখে ডঃ আলুওয়ালার চাকর সেই বৈজুর সঙ্গে দেখা হল। তার হাতে বাজারের থলে। সসম্ভ্রমে একপাশে সরে সে আমাদের সেলাম দিল। কর্নেল তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করতে ঠোঁট ফাঁক করলেন। করেই বুজিয়ে নিলেন। বৈজু জিজ্ঞাসু চোখে

তাকিয়ে রইল। কর্নেল গট গট করে নেমে গেলেন, আমি বৈজুর দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তাঁকে অনুসরণ করলুম।

রাস্তায় আমার গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। একটু পরে গাড়িতে যেতে যেতে বললুম,—আপনিও ওই চুরিতে জড়িয়ে পড়বেন নেই—তখন আপনার ওপরই সন্দেহ হবে।

কর্নেল চাপা হেসে বললেন,—চোরের ওপর বাটপাড়িতে দোষ নেই, জয়ন্ত।

—তার মানে?

—ডঃ আলুওয়ালার ব্রোঞ্জের ফলকটাও চুরি করা।

—সে কী! উনি যে বললেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁর বাবাকে—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন,—স্রেফ মিথ্যে। রাখালবাবু সত্যি এক ভদ্রলোককে আসল ফলকের একটা নকল দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের নাম ডঃ পরমেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি ছিলেন একজন নামকরা প্রত্নবিজ্ঞানী। রাখালবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বাড়ি বর্ধমানের এক গ্রামে। অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্থানীয় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন রিটায়ার করেছেন। সম্প্রতি মাস দুই আগে তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে রহস্যজনক চুরি হয়েছে। চোর আর কিচ্ছু নেয়নি—নিয়ে গেছে শুধু একটা ব্রোঞ্জের ফলক।

—কী কাণ্ড! তা হলে ডঃ আলুওয়ালাই কি এই চুরির পেছনে?

—তা আর বলতে! পুরাতাত্ত্বিক পত্রিকা 'দা এনসেন্ট ওয়ালর্ড'-এ একটা বিশেষ ফলক প্রসঙ্গে ওঁর লেখা প্রবন্ধ পড়েই আমার সন্দেহ জেগেছিল। তাই আজ ওঁর বাড়ি এসেছিলুম। ইচ্ছে করেই নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম। ভদ্রলোক অসম্ভব ধূর্ত।

—কিন্তু ওঁর আলমারি ভেঙে ফলকটা চুরি গেছে! নিশ্চয় ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো।

কর্নেল হো হো করে হাসলেন। —চুরি যায়নি। এক মিথ্যে ঢাকতে আরেক মিথ্যে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। সত্যি, এতক্ষণে একটা জটপাকানো রহস্য সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজা হেহয়ের গুপ্তধন

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন দুপুর অব্দি কাটাতে হল আমাকে। কাপের পর কাপ কফি খেলুম এবং অসংখ্য প্রশ্ন করলুম। জবাবে যেটুকু জানলুম, তা আগেই যা জেনেছি তার একচুল বেশি নয়। অর্থাৎ বর্ধমানের এক গ্রামের জনৈক স্কুল শিক্ষক শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে ব্রোঞ্জের ফলক চুরি গেছে। শচীনবাবু কবে এসে কর্নেলকে ধরে ছিলেন। কর্নেল কথা দিয়েছিলেন, চেষ্টা করবেন ফলকের হদিস পেতে। মনে হচ্ছে, পেয়েও গেছেন। ব্যস, এটুকুই।

কর্নেল ডঃ আলুওয়ালার আঁকা সেই স্কেচটার দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন। কয়েকবার প্রশ্ন করে যখন জবাব আর পেলুম না, তখন বললুম,—বেলা হয়ে গেছে। আমি উঠি তাহলে।

কর্নেলের ধ্যান ভাঙল একথায়। বললেন,—আচ্ছা, জয়ন্ত! ফলকের স্কেচে এই চিহ্নটা দেখে কী মনে হচ্ছে তোমার? বাঁদিক থেকে পঞ্চম চিহ্নটা।

তারপর স্কেচটা আমার সামনে এগিয়ে ধরলেন।

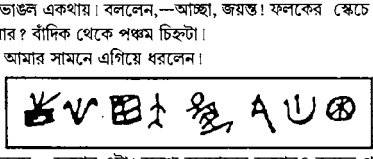

দেখে নিয়েই বললুম,—হনুমান ওটা। অবশ্য অনুমানের হনুমানও বলতে পারেন।

কর্নেল হেসে উঠলেন। বললেন,—তা হলে ডঃ আলুওয়ালার পাঠোদ্ধারটা দাঁড়াচ্ছে : **শস্য অধিকর্তাকে একটি সেরা জাতের হনুমান পাঠানো হল।** এই তো? বৎস, হনুমান শস্যের যম। অতএব শস্য অধিকর্তার কাছে হনুমান পাঠিয়ে রসিকতা করেছিল কেউ!

—তা ছাড়া আর কী হতে পারে? ডঃ আলুওয়ালা ওটাকে কীভাবে বলদ ভাবলেন কে জানে!

—আচ্ছা জয়ন্ত, ওটাকে ঘোড়া ভাবতে দোষ কী?

—কিন্তু ডঃ আলুওয়ালা তো বললেন, মোহেনজোদাড়োতে ঘোড়ার কোনো মূর্তি পাওয়া যায়নি। বুনো জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি আছে। ঘোড়ার মতো উপকারি গৃহপালিত প্রাণীর মূর্তি কেন থাকবে না? তার মানে ঘোড়ার কথা কেউ জানত না। তাই ঘোড়ার চিহ্নই নেই।

—তা বটে। হরাপ্পাতে কুকুর আর মুরগির মূর্তি পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

—তা হলে বুঝতেই পারছেন, ওটা ঘোড়া নয়, হনুমান!

—হুম! জয়ন্ত তুমি শুনলে খুশি হবে যে ওখানে হনুমানের ছবিও পাওয়া গেছে।

লাফিয়ে উঠে বললুম,—তবে তো আর কথাই নেই। ওটা হনুমান। বাঁদিক থেকে চতুর্থ চিহ্নটা লক্ষ করুন না! হনুমানটার তাড়া খেয়ে একটা লোক পালাচ্ছে। এই লোকটাই শস্যঅধিকর্তা।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—শাবাশ জয়ন্ত, শাবাশ! প্রত্নতত্ত্ব দফতর তোমাকে যাতে পুরস্কৃত করেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানো? ডঃ পরমেশ্বর ভট্টাচার্যও এই ফলকটার পাঠোদ্ধার করেছেন বলে দাবি করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ একেবারে আলাদা। তোমাকে দেখাচ্ছি।

বলে কর্নেল উঠে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা কালো জীর্ণ নোট বই বের করে আনলেন। নোট বই খুলে বললেন,—ডঃ ভট্টাচার্যের মতে প্রাচীন যুগের ভারতে প্রচলিত খরোষ্ঠী লিপির মতো সিন্ধুলিপি ডানদিক থেকে পড়তে হবে। সেইভাবে পড়ে উনি কী অনুবাদ করেছেন শোনো :

'... প্রথম চিহ্নের অর্থ : সৌর বৎসরের ষষ্ঠ মাস। সূর্যের চাকার মধ্যে ছটা রেখা থাকায় ওটা হবে ষষ্ঠ মাস। দ্বিতীয় চিহ্নের অর্থ : চন্দ্রের প্রতিপদ। চন্দ্রকলার মধ্যে একটা দাঁড়ি রয়েছে। তৃতীয় চিহ্নের অর্থ : সিন্ধুনদের বাঁকের মধ্যবর্তী ত্রিকোণ ভূমি। চতুর্থ চিহ্নের অর্থ : ঘোড়া। পঞ্চম চিহ্নের অর্থ : মানুষ। ষষ্ঠ চিহ্নের অর্থ : খণ্ডিকৃত কৃষিজমি। সপ্তম চিহ্নের অর্থ : শস্য। অষ্টম চিহ্নের অর্থ : বৃক্ষমূলে প্রোথিত সম্পদ।

কথাগুলি বাক্যের আকারে সাজালে দাঁড়ায় : **বৎসরের ষষ্ঠ মাসে চাঁদের প্রথম তিথিতে এক ব্যক্তি ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুনদের বাঁকে ত্রিকোণ শস্যক্ষেত্রের সীমানায় এক বিশাল গাছের তলায় ধনসম্পদ পুঁতে রেখেছিল।** ....

আমি চমকে উঠে বললুম,—গুপ্তধন! গুপ্তধন!

কর্নেল হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—ডঃ ভট্টাচার্যের ডাইরি থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। শুনে যাও।

'... রাখালদাসবাবুর সঙ্গে আমার এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। উনি আমার অনুবাদ যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন। সিন্ধুনদ এখন মোহেনজোদাড়ো থেকে সামান্য দূরে সরে গেলেও ধ্বংসাবশেষের দু'মাইল দূরে প্রাচীন খাতের চিহ্ন আমরা দুজনেই দেখে এসেছি। অবিকল ওই তৃতীয় চিহ্নের মতো বাঁক দেখেছি। তিনকোণা জমিটার আয়তন আন্দাজ বারো একর। পোড়ো রুক্ষ জমি। ক্ষয়াখর্বুটে গুল্মে ঢাকা। রাখালদাস বলেছেন, প্রত্নদফতরের কর্তা জন মার্শালকে কথাটা বলবেন এবং ওই জায়গায় মাটি খোঁড়ার কাজ শুরু করা হবে।' ...

কর্নেল আবার কয়েকটা পাতা উল্টে গিয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'... আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রবল বর্ষার জন্য খোঁড়ার কাজ একবছর পিছিয়ে গেল। তা ছাড়া জন মার্শালও বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন না। রাখালদাস বলেছিলেন তাঁর শরীর ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। শীঘ্র কলকাতায় ফিরতে চান। ...

'... রাখালদাস কাল চলে গেলেন দেশে। আমি স্টেশনে তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছি। স্টেশন মাস্টার রামচন্দ্র আলুওয়ালার সঙ্গে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম। কথায় কথায় ঝোঁকের মুখে ওঁকে ব্রোঞ্জের ফলকটার কথা বলে ফেললাম। কাজটা ঠিক হল কিনা কে জানে! ভদ্রলোক কিন্তু পুরাতত্ত্বের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। অনেক খোঁজখবর রাখেন। বললেন, সরকারি দফতরের ব্যাপার স্যাপারই এরকম। ওদের বিশ মাসে বছর। বরং আপনি যদি আমার সাহায্য চান, বলুন। মাটি কাটার লোক জোগাড় করে দেব। আমি বললুম ওখানে বেসরকারি লোককে মাটি কাটতে দেওয়া হবে না। আইনে বাধা আছে। তাই শুনে স্টেশনমাস্টার বললেন, তা হলে রাতে লুকিয়ে মাটি খোঁড়ার ব্যবস্থা করা যায়। আমার হাসি পেল। গুপ্তধনের কথা শুনেই ভদ্রলোক লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বললুম, তা কি সম্ভব? এক রাতের কাজ নয়। কাজেই ধরা পড়ে যাবার চান্স আছে। আমারও চাকরি যাবে মশাই? এতে মিঃ আলুওয়ালা খুব নিরাশ হলেন। ...

'... স্যার জন মার্শালকে কলকাতার অফিসে সব জানিয়ে আবার চিঠি লিখেছিলাম। আজ জবাব এসেছে। উনি এবার স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমার পাঠোদ্ধার ভুল। তা ছাড়া ওই বিশেষ চিহ্নটা ঘোড়া নয়। সিন্ধুসভ্যতায় ঘোড়ার কথা অবান্তর। তখন প্রাক-আর্য যুগে ওখানে ঘোড়ার কথা কেউই জানত না। ঘোড়াকে বশ মানানো হয়েছিল মধ্য এশিয়ায়। সে সিন্ধুসভ্যতার যুগের অন্তত দেড় দুই হাজার বছর পরের কথা।

'... হায়! কীভাবে বোঝাব, আমার অনুবাদ যথার্থ। মার্শাল কেন বুঝতে পারছেন না, এমনও তো হতে পারে, তারও আগে তিব্বত বা চীনে ঘোড়াকে বশ মানানো হয়ে থাকবে এবং কোনো দেশত্যাগী অথবা পলাতক রাজপুরুষ ঘোড়ার পিঠে ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মোহেনজোদাড়ো শহরে! তিনিই ধনরত্ন ওইভাবে গুপ্তস্থানে পুঁতে রেখেছিলেন এবং সেই সংবাদ প্রাচীন প্রথামতো একটা ব্রোঞ্জের ফলকে খোদাই করেছিলেন—যাতে তাঁর অবর্তমানে কেউ না কেউ ধনরত্নের সদ্‌গতি করতে পারে।

'... এই অনুমানের কারণ আছে। তিব্বতের মঠে এক পুরোনো পুঁথিতে লেখা আছে : মর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মাবংশোদ্ভূত রাজা হেহয় এক দুর্যোগের রাতে অশ্বসহ এই মঠে আশ্রয় নেন। তাঁর সঙ্গে প্রচুর ধনরত্ন ছিল। বিবেকবান বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা ধনরত্ন ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলেন। তাই রাজা হেহয়কে পরামর্শ দেন, স্বরাজ্য ব্রহ্মাবর্তে ফিরে গিয়ে আপসে মিটমাট করুন। তা শুনে রাজা হেহয় ক্রুদ্ধ হয়ে মঠ ত্যাগ করেন।

'... কোথায় গিয়েছিলেন হেহয়? নিশ্চয় মোহেনজোদাড়ো নামে দ্রাবিড় রাজ্যে। আমার ধারণা হেহয় থেকেই হয় কথাটির উদ্ভব। হয় মানে ঘোড়া। পুরাণে হয়গ্রীব অবতারের কথা আছে। সে কি ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়েরই উপাখ্যান? সম্ভবত রাজ্যে বিদ্রোহের ফলে হেহয়কে উত্তরে পালাতে হয়েছিল। আশ্রয় না পেয়ে সেখান থেকে তিনি কাশ্মীর ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানীতে চলে আসেন। কাশ্মীরে একটি গিরিপথের নাম হোহো। ...'

কর্নেল ডাইরিটি বন্ধ করে বললেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে ডঃ আলুওয়ালার ফলকচুরির উদ্দেশ্য সম্ভবত নিছক পুরাতত্ত্ব নয়, গুপ্তধন। পৈতৃক নেশার ব্যাপার।

বললুম,—কিন্তু মোহেনজোদাড়ো তো এখন পাকিস্তানে। আর কি সুবিধে করতে পারবেন ডঃ আলুওয়ালা?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন,—জানি না। তবে সম্প্রতি একটা সুযোগ ওঁর সামনে এসেছে। সিমলাচুক্তি অনুসারে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের জ্ঞান আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারই ভিত্তিতে খুব শিগগিরি ভারত থেকে একদল পুরাতাত্ত্বিক পাকিস্তানে মোহেনজোদাড়ো এবং হরাপ্পা দেখতে যাচ্ছেন। খবরের কাগজের লোক হয়েও এ খবর রাখ না দেখে অবাক লাগছে বৎস!

বললুম,—রোজ হাজার হাজার খবর বেরোয়। অত মনে থাকে না।

—তা স্বীকার করছি। ... বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। একটু পায়চারি করলেন। তারপর বললেন,—পুরাতাত্ত্বিকদের সঙ্গে একদল সাংবাদিকও যাচ্ছেন শুনেছি। জয়ন্ত, তোমাকে একটা দায়িত্ব দিচ্ছি। তুমি যেভাবে হোক, কর্তৃপক্ষকে রাজি করিয়ে দৈনিক সত্যসেবকের পক্ষ থেকে তোমার নামটা সেই দলে ঢোকাবার ব্যবস্থা করো। আর আমিও চেষ্টা করে দেখি, কোনো ফিকিরে নিজেকে ঢোকাতে পারি।

হাসতে-হাসতে বললুম—খুব সোজা রাস্তা আছে। আপনি তো ইদানীং ন্যাচারালিস্ট বা প্রকৃতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠেছেন। দুর্লভ ও বিরলজাতের পাখি প্রজাপতি পোকামাকড় নিয়ে ধানাইপানাই করছেন বিস্তর। বিদেশি কাগজে অনেক প্রবন্ধও লিখে ফেলেছেন। মাকড়সা আর প্রজাপতি সম্পর্কে তো আপনার খুব মাথাব্যথা। কারণ নাকি, দুইয়ের মধ্যে খুনী ও জোচ্চোরদের প্রবৃত্তি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। অতএব হে প্রাজ্ঞ ঘুঘু! আপনার অসুবিধেটা কোথায়? বিশেষ করে কেন্দ্রীয় দফতরে দিল্লিওয়ালারা অনেকেই তো আপনার বন্ধু। আপনি ...

কর্নেল হাত তুলে থামিয়ে হাসতে বললেন,—যথেষ্ট, যথেষ্ট ডার্লিং। তোমার প্রদর্শিত পথেই আমি এগবো! ...

ডঃ আলুওয়ালার অন্তর্ধান

অনেক চেষ্টাচরিত্র করে পাকিস্তানগামী সাংবাদিকদের দলে ঠাঁই পেলুম। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে যখন পৌঁছেছি, তখনও কিন্তু কর্নেলের পাত্তা নেই। বিমান ছাড়তে আর পনেরো মিনিট দেরি। উদ্বিগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করছি, সেই সময় পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের দলটি এসে পৌঁছলেন। পনেরো জন পণ্ডিত এক জায়গায় জুটলে যা হয়। প্রত্যেকের মুখ গম্ভীর—হাবভাব দেখে ভয় করে আমার। দু-তিনজন বাদে সবার চুল পাকা। জ্ঞানের তাপেই হয়তো টাক পড়েছে অনেকের মাথায়। কিন্তু কোথায় আমার সেই সুপরিচিত টাক? শুধু টাক থাকলেই চলবে না, দাড়িও চাই!

রাশভারি দলটির মধ্যে দাড়িওয়ালা আছেন, টাকওলাও আছেন। কিন্তু একসঙ্গে দাড়ি ও টাক আছে, এমন কাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

তা হলে কর্নেল কি দলে ভিড়তে পারেন নি? ভাবনায় পড়ে গেলুম। আমি খামোকা একা গিয়ে করবোটা কী? তা ছাড়া ওইসব গোরস্থান বা ভূতপেরেতের জায়গায় যাওয়া আমার একেবারে পছন্দসই নয়। নেহাত বুড়ো ঘুঘুমশায়ের টানে এত কাণ্ড করে এখানে হাজির হয়েছি।

মাইকে বিমানযাত্রীদের ডাকাডাকি শুরু হল। সেই সময় ঠাহর করে দেখি, ডঃ আলুওয়ালা ভিড় ঠেলে বেরিয়ে কাকে যেন খুঁজছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন। তারপর

এগিয়ে এলেন হাসিমুখে,—আরে! জয়ন্তবাবু না? আপনিও কি যাচ্ছেন নাকি ডেলিগেশনের সঙ্গে?

—যাচ্ছি। আপনিও আছেন, তা লিস্টে দেখলুম। ... বলে আমি খুব অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করলুম।

ডঃ আলুওয়ালা মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে বললেন,—যাকগে মশাই। বাঁচা গেল। আমি গোলমাল ভিড় একদম পছন্দ করি নে। তাতে বুঝতেই পারছেন, আজকাল আমি অনেক জ্ঞানীগুণী লোকেরই ঈর্ষার কারণ হয়েছি। তাই একদম ইচ্ছে করছিল না যেতে। সরকারও ছাড়লেন না, আর শেষ অব্দি দেখলুম, যে বিষয়ে সারাজীবন গবেষণা করছি—সেই বিষয়েই তো এই ডেলিগেশন। তবে তার চাইতে বড় কথা বাল্যস্মৃতি। লারকানা এলাকায় আমার ছেলেবেলা কেটেছে। কাজেই মনের টানও বাজল।

আমি মন দিয়ে ওঁর কথা শুনছিলাম না। কারণ কর্নেল বুড়ো এখনও এসে পৌঁছলেন না। বিমানযাত্রীদের আবার ডাকা হচ্ছিল। ডঃ আলুওয়ালা আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। সিকিউরিটি পুলিশ ও শুল্ক দপ্তরের লোকেরা পরীক্ষা করছেন। প্রত্যেক যাত্রীকে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

পাসপোর্ট ভিসা এবং অন্যান্য আইন কানুনের ব্যাপার সামলে যখন পাকিস্তান এয়ারলাইনসের বিশাল বোয়িং বিমানের সিঁড়ির কাছে পৌঁছলুম, তখনও কর্নেলের পাত্তা নেই।

কোনো গণ্ডগোলে পড়েননি তো? ডেলিগেশনের লিস্টে নাম আছে দেখেছি। অথচ এখনও আসছেন না কেন?

দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সুযোগ নেই। ডঃ আলুওয়ালা ঠেলতে ঠেলতে বিমানে চড়িয়ে ছাড়লেন। সিট নম্বর মেলাতে গিয়ে দেখি আমার পাশে ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী বলে এক পণ্ডিতের সিট পড়েছে। দুচ্ছাই! বরং কোনো সাংবাদিক পাশে থাকলে জমতো ভালো। মিঃ যোশী গাব্দাগোব্দা প্রকাণ্ড মানুষ। বেঁটে। দাড়িগোঁফ আছে মুখে। অবশ্য টাক নেই। কাঁচাপাকা কোঁচকানো একরাশ চুলে মাথাটা ভর্তি। আমার সঙ্গে তখুনি আলাপ করে নিলেন। ভারি অমায়িক লোক মনে হল। একটু পরেই বিমান ছাড়ার সময় হয়ে গেল। আমি তখন কর্নেলের আশা ছেড়ে দিয়ে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছি।

বিমান ফ্লাই অন রানওয়ে দিয়ে চলতে চলতে ক্রমশ গতি বাড়াল। তারপর মাটি-ছাড়া হল। আজ আবহাওয়া ভারি চমৎকার। সকালের রোদ ঝলমল করছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখি আকাশের এতদূরে পৌঁছেছি যে নীচে সব সমতল দেখাচ্ছে—যেন একখানা চমৎকার কার্পেট পাতা রয়েছে। যাক্ গে! কর্নেল যখন এলেন না, তখন ফলকরহস্য তোলা রইল। অন্য সাংবাদিকরা যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, আমিও যখন সাংবাদিক তখন সেই উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সফর করে আসি। উপায় কী আর?

লারকানা বিমানবন্দর তিন ঘণ্টার যাত্রা। একটু পরে বিমানে পরিচারিকা স্ন্যাকস্ ও কফি দিতে এলেন। স্ন্যাকসের প্যাকেটের সঙ্গে দেখি একটা চিরকুট। তাতে লেখা আছে : ডার্লিং! ইওর ওল্ড ডাভ ইজ হিয়ার।

ওল্ড ডাভ! বুড়ো ঘুঘু। আমি চঞ্চল চোখে তাকাতেই পরিচারিকা একটু হেসে পিছনে ইশারা করলেন। ঘুরেই ইচ্ছে হল চেঁচিয়ে উঠি—হ্যালো ওল্ড ডাভ।

কিন্তু চেঁচামেচি করা গেল না। দুজনে পরস্পরের দিকে হাসলুম শুধু। ধড়ে প্রাণ এল আমার।

ডঃ যোশী আমার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। কথায় কথায় জানলুম, ইনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক। ছাত্রজীবনে কলকাতায় ছিলেন। বাঙালিদের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা

পোষণ করেন। এক ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলুম,— আচ্ছা, স্যার, সিন্ধুসভ্যতার যুগে কি ঘোড়া ছিল না?

ডঃ যোশী যেন চমকে উঠলেন। বললেন,—ঘোড়া? হঠাৎ ঘোড়ার কথা কেন? তারপর হাসতে থাকলেন। সাংবাদিকের পক্ষে ঘোড়া রোগ খুব সুবিধের নয়।

মনে মনে একটু রাগ হল। কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুটিয়ে বললুম,—প্রশ্নটা কি অন্যায়, স্যার?

ডঃ যোশী আমার কাঁধে হাত রেখে সকৌতুক বললেন,—মোটেই না। তবে ইদানীং দেখছি কারুর-কারুর মাথায় সিন্ধুসভ্যতার কাল্পনিক ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করছে।

—তা হলে সিন্ধুঘোটক বলুন!

ডঃ যোশী আরও জোরে হেসে উঠলেন।—যা বলেছেন! অবশ্য সিন্ধুঘোটক থাকে অন্য সিন্ধুতে। অর্থাৎ সমুদ্রে। এ সিন্ধু প্রদেশটা নেহাত মাটি দিয়ে তৈরি। তাই মাটির ঘোড়া দু-একটা থাকলেও থাকতে পারত সিন্ধুসভ্যতার যুগে।

—যেমন আমাদের বাঁকুড়ার ঘোড়া। কুটিরশিল্পের খাসা দৃষ্টান্ত।

ডঃ যোশী আমার পাল্টা রসিকতায় খুশি হলেন। বললেন,—রসকষ আছে বলেই আমি সাংবাদিকদের পছন্দ করি।

—স্যার, একটু আগে বললেন, ইদানীং নাকি কারুর কারুর মাথায় ...

বাধা দিয়ে ডঃ যোশী বললেন,—হ্যাঁ জয়ন্তবাবু। যেমন ধরুন আপনাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ আলুওয়ালার মাথায় ঘোড়া ঢুকেছে। এর আগে উনি মাথায় বলদ ঢুকিয়েছিলেন। এখন বলছেন, বলদটা আসলে ঘোড়াই হবে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে যাকে বলে কিনা 'হয়'।

—শুনেছি হেহয় থেকে নাকি 'হয়'।

—অ্যাঁ বলে ডঃ যোশী আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন,—কোথায় শুনলেন একথা?

বললুম,—এক ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতের কাছে।

—কে তিনি? নাম কী? থাকেন কোথায়?

এতক্ষণে মনে হল, ভুল করেছি। মুখ ফসকে গোপন একটা তথ্য বের করে দিয়েছি। অথচ কর্নেল পই পই করে বারণ করেছিলেন। অগত্যা বানিয়ে বললুম,—কলকাতায় ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ ভবার্ণব ভট্টাচার্যর কাছে।

—ডঃ ভবার্ণব ভট্টাচার্যর নাম তো শুনিনি!

আমার ভাগ্য ভালো এইসময় পরিচারিকা দ্বিতীয় দফা খাদ্য পরিবেশন করতে এলেন। এটা ব্রেকফাস্ট। ডঃ যোশীকে পেটুক মনে হল। তখুনি স্যান্ডউইচের প্যাকেট খুলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু আড়চোখে লক্ষ করলুম, উনি খেতে খেতে মাঝে মাঝে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিচ্ছেন। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগল ...

কিন্তু আমার পক্ষে স্বস্তির কথা, ডঃ যোশী আর এ প্রসঙ্গে গেলেন না। দেশের রাজনীতি নিয়ে পড়লেন। দেখতে-দেখতে কখন সময় কেটে গেল। আমাদের বিমান লারকানা বিমান, বন্দরের ওপর চক্কর দিতে শুরু করল। নীচে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছিল। লারকানার পূর্বে সামান্য দূরে সিন্ধুনদ বয়ে চলেছে।

বিমান যখন মাটিতে নামল, তখন সকাল সাড়ে দশটা। পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি এবং সেখানকার পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয়

ও কোলাকুলি পর্ব সেরে গাড়ি করে শহরের দক্ষিণপ্রান্তে নিরিবিলি এলাকায় একটা স্টার হোটেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। দশতলা এই রাজকীয় হোটেলে বিদেশি পর্যটকদের বেশ ভিড় দেখলুম। শীতের শেষ বলে নাকি এখন ভিড়টা কমেছে। মোহেনজোদাড়ো এখান থেকে কিছু দূরে দক্ষিণে সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরে রয়েছে। তাই এত পর্যটকদের ভিড়।

এলাকার ভূপ্রকৃতি কেমন যেন রুক্ষ। অবশ্য গাছপালা রয়েছে প্রচুর। তাদের রং কেমন ধূসর। ছোট ছোট পাহাড় আছে অসংখ্য। পাকিস্তান সরকার সিন্ধুনদের জল সেচের কাজে লাগিয়েছেন। ফলে ফসলের ক্ষেত ও গাছপালা অনেকটা শ্রী ফুটিয়ে তুলেছে।

কর্নেলের মুখোমুখি হয়েছিলুম হোটেলের লাউঞ্জে। তারপর আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, তাঁর ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ উনিই তদ্বির করে এ ব্যবস্থাটা করে ফেলেছেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘরটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, সাততলায়। কর্নেল দক্ষিণের জানালায় দাঁড়িয়ে ওঁর প্রখ্যাত বাইনোকুলারটি—যা বিরল জাতের পাখির খোঁজে ব্যবহার করেন, চোখে চোখ রেখে বললেন, —হুম! মোহেনজোদাড়ো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

বললুম,—আপনার মাথা খারাপ! এখান থেকে অনেক মাইল দূরে!

—ঠিকই! তবে আমরা একটা টিলার মাথায় দশতলা হোটেলের সাততলায় দাঁড়িয়ে আছি। সামনে বরাবর ফাঁকা। তুমিও দেখতে পার। তা ছাড়া এই দূরবিনটা খুব শক্তিশালী।

—কাছে গিয়েই দেখব'খন। বিকেল তিনটেয় যাওয়ার প্রোগ্রাম না?

—হুঁ। ... বলে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে আবার যেন মোহেনজোদাড়ো দেখতে থাকলেন। কী বিদঘুটে স্বভাব!

বললুম,—এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন।

—বলো ডার্লিং!

—এয়ারপোর্ট পৌঁছতে আপনার দেরি হল কেন?

—পাকিস্তানের দূতাবাসে গিয়েছিলুম এক বন্ধুকে নিয়ে।

—কেন?

—মোহেনজোদাড়োর সরকারি অতিথিশালায় একটা ডাবল বেড ঘর জোগাড় করতে।

—সে কী! ডেলিগেশনের ব্যাপার। এঁদের সঙ্গেই তো থাকা উচিত।

—থাকব না। আমি আগাম ব্যবস্থা সেরে এসেছি।

—আমাদের প্রতিনিধিদের নেতা আপত্তি করবেন না তো?

—ডঃ তিড়কে? মোটেই না। কথা বলে নিয়েছি ওঁর সঙ্গে।

—ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে নিশ্চয় চোখাচোখি হয়েছে আপনার?

—হয়েছে। ভদ্রলোক খাপ্পা হয়ে গেছেন। বিশেষ কথাবার্তাই বললেন না।

—স্কেচ চুরির অভিযোগ করলেন না?

—নাঃ। তো জয়ন্ত, তোমার সঙ্গে ডঃ যোশীর খুব ভাব দেখলুম।

—ভাব জমাতে আমি ওস্তাদ।

—তোমাকে একটা ব্যাপারে সতর্ক করে দিই। ডঃ যোশীর সঙ্গে আর ভাব জমাতে যেও না। বিপদে পড়বে। আমাকেও বিপদে ফেলবে।

—কেন? কেন?

—আপাতত আর কিছু বলব না, ডার্লিং!

জানি, আর হাজার প্রশ্ন করলেও জবাব পাব না, তাই চুপ করে গেলুম। যতক্ষণ কথা বললেন, কর্নেলের চোখে বাইনোকুলার রয়ে গেল। কী দেখছেন অমন করে? আমার অস্বস্তি জাগল। তাই না বলে পারলুম না—এত কী দেখছেন বলুন তো?

কর্নেল বাইনোকুলার আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন,—এবার তুমি দেখ। আমার দেখা শেষ হয়েছে আপাতত।

—দেখবটা কী? মোহেনজোদাড়ো তো?

—না। এই হোটেলের নীচের রাস্তার যে টিলাটা আছে, সেখানে দেখবে একটা পার্ক। পার্কে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছেন দুই ভদ্রলোক।

তখনি বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম। তারপর চমকে উঠলুম। দুই ভদ্রলোকের একজন হচ্ছেন ডঃ আলুওয়ালা। অন্যজনের গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারা। পেল্লায় গোঁফ আছে মুখে। এই গুঁফো লোকটিকে আমাদের দলে দেখেছি, এতে কোনো ভুল নেই।

কিন্তু ডঃ আলুওয়ালা হোটেলে পৌঁছেই বেরিয়ে গেছেন এবং ওই লোকটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে কী কথা বলছেন? ভারি সন্দেহজনক ব্যাপার।

একটু দেখেই আমার ক্লান্তি লাগল। সরে এলুম। কর্নেল পোশাক বদলাতে ব্যস্ত হয়েছেন। আমি পোশাক বদলে নিলুম। দিল্লিতে ভোরবেলা স্নান করে নিয়েছি। এখানে দেখছি মার্চ মাসেও শীতটা কড়া। বাথরুম থেকে এসে দেখি, চা এসে গেছে। তার সঙ্গে প্রচুর ফল এবং মিষ্টান্নও। আমরা সরকারি অতিথি বলেই এত আদর নিশ্চয়।

কিন্তু কর্নেলের মুখটা গম্ভীর কেন? কাছে যেতেই একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বললেন,—ওদের টনক নড়েছে। এই দেখো।

—কাদের?

—খুলে চিঠিটা পড়ে নাও আগে।

খামের মধ্যে ভাঁজ করা একটা চিঠি আছে। খামের ওপরে ইংরেজিতে লেখা : ৬৩২ নম্বর স্যুটের অধিবাসীদ্বয়কে।

চিঠি নয়—চিরকুট বলাই উচিত। তাতে ডটপেনে লেখা আছে : **'ঘোড়াটা রোগা। ওই নিয়ে রেস লড়তে যেও না। সর্বস্বান্ত হবে।**

ইতি—রেসুড়েদের রাজা।'

আমার হাত কাঁপছিল। কর্নেল চাপা হেসে বললেন,—জয়ন্ত কি এতেই ভয় পেয়ে গেলে?

শুকনো হেসে বললুম,—মোটেও না। আপনার কথা মতো আমি সঙ্গে আমার রিভলভারটা এনেছি। গুলিও এনেছি প্রচুর। না না—আইন ভেঙে আনিনি। সিকিউরিটির হাতে ধরা পড়তুম। ওদের মেটাল ডিটেক্টর যন্ত্রে ঠিক টের পেয়ে যেত। দিল্লির পাকিস্তানি দূতাবাসে আপনার যেমন বন্ধু আছেন, আমারও কি থাকতে নেই? তবে আমার প্রত্যক্ষ বন্ধু নয়। বন্ধুর বন্ধু আর কী! আর আপনি তো জানেন, সাংবাদিকরা কিছু বিশেষ সুবিধা সব দেশের সরকারের কাছেই পেয়ে থাকেন। অতএব কোনো ঝামেলা হয়নি অনুমতি পেতে।

কর্নেল বললেন,—আমিও সশস্ত্র, জয়ন্ত। আমারও অনুমতি পেতে ঝামেলা হয়নি। বরং আরও অস্ত্র সাহায্য চাইলে পেয়ে যাব।

—বলেন কী!

—এখনই সব বুঝতে পারবে। করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের সিন্ধুসভ্যতা সংক্রান্ত শাখার প্রধান অধ্যাপক ডঃ আবদুল করিমের আসবার সময় হল। তাঁর সঙ্গে আসছেন

সরকারি গোয়েন্দা দফতরের স্থানীয় অধিকর্তা কর্নেল কামাল খাঁ। আমি সব আয়োজন করেই এসেছি।

সব দুর্ভাবনা মুহূর্তে চলে গেল। চা খেতে-খেতে এবার ডঃ যোশীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রসঙ্গটি তুললুম। কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন,—তুমি এখনও বড্ড ছেলেমানুষ জয়ন্ত! কোন আক্কেলে 'হেইয়' কথাটা বললে ওঁকে?

—মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু ডঃ যোশী আসলে কে?

—এই প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি, তোমার বুদ্ধি খুলেছে। জয়ন্ত, ওই একই প্রশ্ন আমার মাথাতেও ঘুরছে। কারণ পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পত্রিকায় ডঃ যোশীর যে ছবি দেখেছিলুম, তাতে মুখে দাড়ি নেই।

—কী মুশকিল! এখন দাড়ি রেখেছেন উনি?

—সেই ছবির মুখে দাড়ি কল্পনা করেছি, কিন্তু মিলছে না।

—তা হলে কি ইনি জাল ডঃ যোশী?

এই সময় ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিলেন এবং চাপা গলায় কী বললেন। তারপর ফোন রেখে হাসিমুখে ঘুরলেন,—জয়ন্ত, ডঃ করিম এবং কামাল খাঁ এসে গেছেন।

তিন মিনিট অপেক্ষার পর ঘণ্টা বাজল। দরজা খুলে দেখি একজন বেঁটে, অন্যজন দৈত্যের মতো বিশাল লোক ঘরে ঢুকে সম্ভাষণ জানালেন। কর্নেলের সঙ্গে কোলাকুলি শেষ হতেই চায় না। তারপর আমার দিকে দুজনে এগোতেই ভয় পেয়ে গেলুম। এই বেঁটে ও লম্বা পর্বতের সামনে আমি একেবারে নেংটি ইঁদুর যে!

কর্নেল বেঁটে ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন,—আমার একসময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি জীবনে দুজনেই আফ্রিকা রণাঙ্গনে ছিলুম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়।

মনে হল ওঁরা ব্যস্ত। ঝটপট কাজের কথা শুরু করলেন। কর্নেল কামাল খাঁ ব্রিফকেস থেকে একটা ভাঁজ করা ম্যাপ বের করে বিছানায় খুলে ধরলেন। তিনজনে ম্যাপের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর যা সব কথাবার্তা হল, আমি স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারলুম না। শুধু টের পেলুম, এতদিনে মোহেনজোদাড়োর ঘোড়া রহস্যের একটা কিনারা হতে চলেছে।

ওঁরা বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আমরা লাঞ্চ খেতে গেলুম। এই ফ্লোরেও ডাইনিং হল আছে। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভোজ দিচ্ছেন। বক্তৃতাও হল। তারপর অতিথিদের খানাপিনা শেষ হতে পাক্কা একঘণ্টা লেগে গেল।

ঘরে ফিরে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, ভোজসভায় একটা বিশেষ ব্যাপার কি তোমার চোখে পড়ছে?

—বিশেষ ব্যাপার? না তো।

—ডঃ আলুওয়ালা কিন্তু ভোজসভায় অনুপস্থিত!

—তাই নাকি? লক্ষ করিনি।

—তুমি না সাংবাদিক! সব কিছুতে লক্ষ রাখা তোমার উচিত ডার্লিং!

—তাই বলে আলুওয়ালা পটলওয়ালাদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—কিন্তু প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ তিড়কের মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। ডঃ আলুওয়ালা ছিলেন ডঃ যোশীর ঘরে। ডঃ যোশী বলেছেন, তাঁর সঙ্গে নাকি কী একটা ব্যাপারে তর্কাতর্কি হয়েছিল। ডঃ আলুওয়ালা রেগেমেগে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। ডঃ তিড়কে এতে যেমন উদ্বিগ্ন, তেমনি খাপ্পা। ভারতীয় পণ্ডিতের এহেন

আচরণ বিদেশে বাঞ্ছনীয় নয়। যাই হোক, নীচে রিসেপশনের কেউ লক্ষ করেনি কখন উনি বেরিয়ে গেছেন। শুধু লিফটম্যান বলেছে, এক বেঁটে মোটা ভদ্রলোক ব্যাগেজ নিয়ে নেমেছেন। যাক গে, এবার নাটক জমে উঠল মনে হচ্ছে।

ক্লান্তি তো বটেই, বাদশাহী ধরনের একটা অসাধারণ খাওয়ার পর আমার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিল। শুয়ে পড়লুম। সেই সময় লক্ষ করলুম, কর্নেল একটা ম্যাপ খুলে বসেছেন এবং কী সব চিহ্ন দিচ্ছেন ম্যাপে।

ঘুম ভাঙল কর্নেলেরই ডাকে। —ওঠ জয়ন্ত! তিনটে বেজে গেল। আমরা এবার রওনা দেব। ডঃ তিড়কের কাছে বিদায় নেওয়া হয়ে গেছে। আর দেরি করা ঠিক নয়। এখনই কামাল সায়েবের জিপ এসে পড়বে।

দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরে ফোনে রিসেপশান থেকে জানাল—জিপ এসে গেছে। আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ব্যাগেজ হোটেলের লোকেরা এসে নিয়ে গেল। করিডোরে লিফটের দিকে এগোচ্ছি, টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সাংবাদিক মিঃ রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা। বললেন, —এ কী চৌধুরী! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

—এত বাদশাহী আরামে থাকা পোষাবে না ভাই! এক চেনা ভদ্রলোকের ওখানে উঠব।

—সে কী!

মিঃ রঘুনন্দন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দৌড়ে গিয়ে লিফটে ঢুকলুম। কর্নেল বললেন,—কী বললে ওঁকে?

বললুম,—এক চেনা ভদ্রলোকের বাসায় যাচ্ছি ...

নীচে নেমে গিয়ে জিপে উঠলুম। পাঠান ড্রাইভার জিপে স্টার্ট দিল। রাস্তায় যেতে-যেতে একটা অদ্ভুত বৈষম্য চোখে পড়ছিল। বিশাল চওড়া হাইওয়েতে অজস্র বিলিতি গাড়ি যাতায়াত করছে বটে, উট আর ঘোড়াগাড়ির সংখ্যাও কম নয়। মাথায় পাগড়ি ও পা অব্দি রঙবেরঙের আলখাল্লা পরা মানুষের ভিড়ে বিলিতি পোশাকের মানুষও রয়েছে। সেইসঙ্গে ভেড়ার পাল নিয়েও যাচ্ছে যারা—তারা কসাই না রাখাল বুঝতে পারলুম না।

অদ্ভুত এখানকার ভূপ্রকৃতিও। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। এই রাস্তার দুধারে মাঝে-মাঝে টানা সবুজ শস্যের মাঠ, কখনও ধু ধু বালিয়াড়ি আদিগন্ত। ন্যাড়া টিলা, আবার কখনও রুক্ষ বাঁজা জমির ওপর বড় বড় পাথর পড়ে রয়েছে। তারপর রাস্তা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেছে। গাছপালা খুবই কম। তারপর একটানা বাজার। বাজার পেরিয়ে গিয়ে একটা টিলার গায়ে সরকারি গেস্ট হাউস।

গেস্ট হাউসের পুবের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্নেল বললেন,—ওই হের বৎস! সিন্ধুনদ ও তার তীরবর্তী হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সেই মোহেনজোদাড়ো।

কে জানে কেন, অস্বস্তিতে আমার বুক কেঁপে উঠল এতক্ষণে। ...

মামদো ভূতের কবলে

গেস্ট হাউসটার পরিবেশ এই রুক্ষ মরুসদৃশ জায়গায় একেবারে বিপরীত। সবুজ গাছ ও ফুলে সাজানো। মোহেনজোদাড়ো রয়েছে পূর্বে অনেক নীচে। তার ওধারে সিন্ধুনদের চরগুলো দেখা যাচ্ছে। বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে চা খেতে খেতে কর্নেল হঠাৎ বললেন,—ওই দেখো জয়ন্ত, ভারতীয় পণ্ডিত এবং সাংবাদিকদের বাস দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওঁরা মোহেনজোদাড়ো শহরের রাজপথে হেঁটে যাচ্ছেন।

দেখে নিয়ে বললুম,—আমরা কখন বেরুব?

—সন্ধ্যার একটু আগে। ওঁরা বিদায় নিক, তারপর।

—ওরে বাবা! শুনেছি ভূতের ভয়ে নাকি সন্ধ্যার দিকে ওখানে কেউ ঘেঁষে না।

—তা সত্যি। তবে সরকারি লোকেরাও পাঁচটার পর ওখানে কাউকে যেতে দেয় না।

—আমরা কীভাবে যাব তা হলে?

—আমরা আপাতত অন্য এলাকায় যাব।

এরপর কর্নেল মোহেনজোদাড়োর কথা শুরু করলেন। বুঝলুম, বুড়ো ইতিমধ্যে প্রচুর কেতাব পড়ে ফেলেছেন। সিন্ধু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, ইরাকের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরু সভ্যতার সঙ্গে তার সম্পর্ক থেকে শুরু করে আর্যদের ভারতে আগমন এবং দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে সংঘর্ষ—সে এক পেল্লায় ইতিহাস শুনিয়ে ছাড়লেন। আমার কান ও মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। সেই সময় ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁ এসে গেলেন। বাঁচা গেল এবার।

আরেকবার চা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। কিন্তু যথেষ্ট রোদ আছে। কারণ এটা পশ্চিম ভারতের—খুড়ি, পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অঞ্চল। কলকাতার সঙ্গে সময়ের তফাত আছে। কলকাতার সূর্যাস্ত যখন, তখনও এখানে সূর্য দিগন্তের অনেকটা উঁচুতে।

আমরা জিপে চেপে চলেছি। বুঝলুম, গন্তব্যস্থান আপাতত ওই ভূতের শহর নয়, সিন্ধুনদের সেই মজে-যাওয়া ত্রিকোণ জায়গা। বুকের মধ্যে কাঁপন শুরু হয়ে গেল।

দক্ষিণে মাইল দুই এগিয়ে ন্যাড়া এবং পাথরভর্তি জমি এবং টিলাগুলোর মধ্যে একস্থানে জিপ দাঁড়াল। সবাই নামলুম। আগে আগে চললেন ডঃ করিম। উনি পথপ্রদর্শক।

এবার আমরা পুবের দিকে চলেছি। রাস্তাঘাট নেই কোথাও। কাঁটাঝোপ আর পাথুরে জমি। কিছুটা এগিয়ে দূরে আবার সিন্ধুনদ চোখে পড়ল। আমরা যেখানে দাঁড়ালুম, তার নীচে গভীর এবং চওড়া খাদ উত্তর থেকে এসে বাঁক নিয়ে পুবে এগিয়ে গেছে। কর্নেল বলে উঠলেন,—এটাই কি সেই প্রাচীন সিন্ধুনদের গতিপথ?

ডঃ করিম বললেন,—হ্যাঁ। আমাদের এই খাদ পেরিয়ে ওপারে উঠতে হবে।

পাথরে পা রেখে সাবধানে চারজনে নামতে শুরু করলুম। তিনশ ফুট নীচে খাদে অন্ধকার জমে গেছে ইতিমধ্যে।

খাদ থেকে ওপারে ওঠাটা ভারি কষ্টকর। কিন্তু তিনজন বয়স্ক মানুষ—বিশেষ করে একজন তো পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো, অর্থাৎ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—ওঁরা যখন পারছেন, জোয়ান হয়ে আমার না পারার কারণ নেই।

ওপরে উঠে ঢালু সমতল ত্রিকোণ জমিটায় যখন পৌঁছলুম, তখন প্রচণ্ড হাঁফাচ্ছি।

ডঃ করিম বললেন,—আসুন, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। এখনও কিছুটা দেরি আছে।

সবাই শুকনো ঘাসে বসে পড়লুম। জানতে চাইলুম কীসের দেরি।

—চাঁদ ওঠার। জবাবটা কর্নেল দিলেন। জয়ন্ত, প্রথম চাঁদ কিন্তু! প্রতিপদে চাঁদ দেখা যায় না। আজ দ্বিতীয়া।

—তা চাঁদের সঙ্গে কী সম্পর্ক?

—ফলকের সংকেতের কথা কি ভুলে গেছ জয়ন্ত?

—তাই বলুন। কিন্তু চাঁদ উঠলে হবেটা কী শুনি?

ডঃ করিম হাসতে হাসতে বললেন,—জয়ন্তবাবু সাংবাদিক মানুষ। কাজেই এত কৌতূহলী। তবে অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ পরেই সব বুঝতে পারবেন।

দিনের আলো ক্রমশ কমে আসছিল। ওঁরা চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন! কান দিলুম না। আমি একটু কল্পনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিলুম। আজ থেকে অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে শস্যক্ষেত্র ছিল। ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয় রাজ্যচ্যুত হয়ে এদেশে সেদেশে ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়ার পিঠে চেপে যখন এখানে পৌঁছলেন, তখন সবে চাঁদ উঠেছে। একফালি ক্ষীণ চাঁদ। ধনরত্ন লুকিয়ে রাখতে এসেছেন এই নির্জন শস্যক্ষেত্রে। কারণ কখন ওই ধনের লোভে তাঁকে দস্যুরা মেরে ফেলবে বলা যায় না।

কল্পনার চোখে দেখতে থাকলুম দৃশ্যটা। নির্জন নিঝুম, অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠা এই মাঠে ওই যেন একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে এগিয়ে আসছে একটা মানুষ! তারপর ...

আচমকা আমার কল্পনা ছত্রখান হয়ে গেল। কোত্থেকে কে বা কারা গুলিবৃষ্টি শুরু করল মুহুর্মুহু। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লুম। কর্নেল কামাল খাঁর চিৎকার শুনলুম।—লুকিয়ে পড়ুন, লুকিয়ে পড়ুন! পাথরের আড়ালে চলে যান সবাই!

এখানে ওখানে পাথরের মস্ত চাঁই রয়েছে। তখন অন্ধকার কিছুটা ঘন হয়েছে। ঝোপঝাড় ও শুকনো ঘাসে প্রায় সাপের মতো বুকে হেঁটে যে-যেখানে পারলুম। আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হলুম। একটা উঁচু পাথরের আড়ালে পৌঁছে মাথা তুললুম। আবার এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। মুখ গুঁজে মড়ার মতো পড়ে রইলুম।

তারপর সব চুপচাপ।

তারপর জোরালো টর্চের আলো ছড়িয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমাদের দলের কেউ আলো লক্ষ করে গুলি ছুঁড়লেন। আলো নিভে গেল।

এতক্ষণে আমার মনে পড়ল, আসার সময় রিভলভারটা নিতে ভুলে গেছি! নিজেকে অসহায় মনে হল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমাদের দলটা ছত্রভঙ্গ হয়ে কে কোথায় ছিটকে পড়েছি বোঝা যাচ্ছে না। পাথরটা উঁচু এবং প্রকাণ্ড। এপাশ-ওপাশ সাবধানে ঘুরে আবছা অন্ধকারে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি।

একটু পরে সম্ভবত পিছনে খাদের দিক থেকে কর্নেল কামাল খাঁর ডাক শোনা গেল—জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু!

সাড়া দিয়ে বললুম,—আমি এখানে!

সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের পাথরে এক ঝাঁক গুলি এসে পড়ল। স্পিল্‌নটারের ফুলকি আর পাথরের টুকরো ছিটকে পড়তে থাকল। আবার ঘাড় গুঁজে মড়ার মতো পড়ে রইলুম।

গুলি ছোঁড়া বন্ধ করল ওরা। কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মুখ তুলে দেখি, অন্ধকার ঘন হয়েছে। কারুর কোনো সাড়া নেই। চেঁচিয়ে কর্নেলকে ডাকব ভাবলুম। কিন্তু আবার যদি ওরা গুলি ছোঁড়ে, সেই ভয়ে চুপ করে গেলুম।

কিন্তু ওরা কারা? যারাই হোক, অন্তত এটুকু বুঝতে পারছি এখানে আমাদের এসে পড়াটা ওদের পছন্দ হয়নি।

ঘাড় ঘুরিয়ে এ সময় চোখে পড়ল, পিছনে দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশের দিগন্তে একফালি ক্ষীণ চাঁদ জেগে আছে। এখনই ওই চাঁদ অস্ত যাবে। পাঁচ হাজার বছর আগে এখানে ঠিক এই সময়ে যে নাটক শুরু হয়েছিল, আজ এতকাল পরে কি তারই শেষ দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে?

কিন্তু আর এভাবে থাকা যায় না। আস্তে আস্তে গিরগিটির মতো লম্বা হয়ে পিছিয়ে গেলুম। যে ভাবেই হোক, খাদে গিয়ে নামতে হবে। সম্ভবত দুই কর্নেল এবং ডঃ করিম খাদেই নেমে গেছেন এবং আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। একবার নীচে থেকে আবছা ডাকও যেন শুনলুম।

কতক্ষণ ওইভাবে পিছু হটে এগিয়েছি হিসাব নেই। এক সময় দেখি, উঁচু উঁচু পাথরের মধ্যে এসে পৌঁছেছি। মনে পড়ল, খাদের কিনারায় এমনি উঁচু পাথরের সারি ছিল বটে। এবার হামাগুড়ি দিয়ে সোজা এগোলুম। কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে গেল এবং গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে পড়তে থাকলুম।

ক্রমাগত পাথরে ধাক্কা খেতে-খেতে হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। আঁকড়ে ধরার মতো কিছু পাচ্ছি না। শুধু মসৃণ পাথর। তারপর গিয়ে পড়লুম বালির গাদায়। আঘাতটা জোর হল না। বুঝলুম, খাদের তলায় বালির চড়ায় এসে পড়েছি।

চিত হয়ে কতক্ষণ আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকলুম।

হঠাৎ কী একটা খসখস শব্দ হল। তারপর বিশ্রী দুর্গন্ধ টের পেলুম। নিশ্চয় কোনো হিংস্র জন্তু—বাঘ কিংবা নেকড়ে। শুনেছি এদেশের পাহাড়ি এলাকায় নেকড়েরা দলে-দলে ঘুরে বেড়ায়। আতঙ্কে আবার কাঁপুনি শুরু হল।

একটু পরে মনে হল যে খসখস শব্দটা শুনেছিলুম, সেটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। দুর্গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে। নাকে রুমাল চাপা দেব ভেবে যেই প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে গেছি, অমনি কী একটা প্রাণী আমার হাত ধরে ফেলল।

হাত ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে বুঝলুম, প্রাণীটার গায়ে অসম্ভব শক্তি। সে এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে বালির ওপর টানতে শুরু করল।

এবার টের পেলুম, প্রাণীটার মানুষের মতো হাত আছে। সেই হাত আমার কব্জি সাঁড়াশির মতো ধরেছে। পরক্ষণে সে আচমকা পিলে চমকানো হাসি হেসে উঠল—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

ওরে বাবা! এ যে ভূতুড়ে হাসি! তা হলে এ কার পাল্লায় আমি পড়েছি? চেঁচিয়ে ওঁদের ডাকব ভাবলুম, কিন্তু গলা দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ হল। তারপর দেখি, সেই ভূতুড়ে প্রাণীটা দুহাতে আমাকে শূন্যে তুলে নিয়েছে এবং দৌড়তে শুরু করেছে। বিকট গন্ধে নাড়িভুঁড়ি উগরে আসছে।

তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। ...

রাজা হেহয়ের শিলালিপি

যখন জ্ঞান হল, কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারলুম না কোথায় আছি এবং কী ঘটেছে। তারপর সব মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলুম। সর্বাঙ্গে ব্যথা করছে।

সামনে একটা পিদিম জ্বলছে। সেই আলোয় যা দেখা গেল, বুঝলুম আমি একটা গুহার মধ্যে আছি। পিদিম জ্বলছে একটা পাথরের বেদির ওপর। মাটির পিদিম আর বেদির পাশে এক বুড়ো জটা-জুটধারী লম্বাচওড়া দাড়িওয়ালা ফকির চোখ বুজে সম্ভবত ধ্যান করছেন। তাঁর গলায় কয়েকটা রঙিন পাথরের মালা।

তখন মুহূর্তেই আতঙ্ক ঘুচে গেল। ডাকলুম,—ফকিরসায়েব! ফকিরসায়েব!

ফকির চোখ খুললেন এবং ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললুম,—আমাকে এখানে কে আনল ফকিরসায়েব?

ফকির ইশারায় কাছে ডাকলেন। গুহার ছাদটা নিচু। দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যাবে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কাছে গেলুম। তখন ফকির আমাকে অবাক করে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলেন,—তুমি কে বাবা?

—এ কী! আপনি বাঙালি?

—হ্যাঁ বাবা, আমি বাঙালি। কিন্তু তুমি কি কোনো পর্যটক? মোহেনজোদাড়ো দেখতে এসেছিলে?

—হ্যাঁ ফকিরসায়েব। কিন্তু আপনি ...

ফকির একটু হেসে বললেন,—দেখতেই তো পাচ্ছ আমি সংসারত্যাগী ফকির। এই গুহায় সাধনভজন করি। এটাই আমার আস্তানা। কিন্তু তুমি কেমন করে ওই নচ্ছারটার পাল্লায় পড়লে? ভাগ্যিস, ওই সময় একবার বেরিয়েছিলুম। আমার সামনে পড়তেই ব্যাটা তোমাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমি তখন নিয়ে এলুম তোমাকে।

—কে ও? ভূত, না মানুষ?

ফকির আবার হেসে ফেললেন। —ও ব্যাটাকে ভূতও বলতে পার মানুষও বলতে পার। ও একটা ভূত-মানুষ।

—তার মানে কী ফকিরসায়েব?

—মানে? মানে কী আমিও জানি ছাই? এই গুহায় জুটেছি আজ প্রায় দুবছর। প্রথম প্রথম অমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তারপর আমিই ওকে ভয় পাইয়ে দিলুম। আমার এই ফকিরি চিমটে ঝনঝন করে বাজালেই ব্যাটা পড়ি-কী-মরি করে পালিয়ে যায়। তবে একথা ঠিক, ওকে দিনে একবারও দেখিনি! তা হলে ও আসলে কে, ঠিকই বুঝতে পারতুম। ব্যাটা সন্ধ্যার পর বেরিয়ে পড়ে। এই খাদেই ওর গতিবিধি। তবে একবার ফুটফুটে চাঁদের আলোয় সামনা-সামনি দেখেছিলুম। ও মানুষের মতো দু-পায়েও হাঁটে। অসম্ভব জোরে দৌড়াতে পারে। আর ওর একটা বিদঘুটে অভ্যাস। মাঝে মাঝে ঘোড়ার মতো চিঁহি করে ওঠে। মনে হবে, ওটা ওর হাসি। কিন্তু মোটেও তা নয়। ব্যাটা নিজেকে হয়তো ঘোড়া ভাবে।

ফকিরের এসব কথা শুনে আমি তো হতভম্ব। বললুম,—এবার আপনার কথা বলুন।

—আমার কথা কী বলব বাবা? বললুমই তো, আমি সংসারত্যাগী মানুষ।

—কিন্তু আপনি বাঙালি বলেই আমার সব কিছু জানতে ইচ্ছে করছে।

—জেনে কী হবে? তার চেয়ে এখন তোমার বিশ্রাম জরুরি। এ গরিবের আখড়ায় তোমার খুব কষ্ট হবে, জানি। কিন্তু উপায় কী? অল্প কিছু ফল আছে। খেয়ে নাও। কুঁজোয় জল আছে। খেয়েদের শুয়ে পড়ো। কম্বলও পাবে।

—জায়গাটা কোথায় বলুন! আমি বরং ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যাব তা হলে।

—সর্বনাশ! সর্বনাশ! খবর্দার বাবা, এখন গুহা থেকে বেরুলেই বিপদে পড়বে।

—কেন বলুন তো?

ফকির গম্ভীর হয়ে বললেন,—সম্প্রতি কিছুকাল থেকে গুণ্ডাপ্রকৃতির কিছু লোক ওপরের দিকে একটা গুহায় আস্তানা গেড়েছে। তাদের কাছে প্রচুর গুলিবারুদ অস্ত্রশস্ত্রও আছে। মাঝে-মাঝে দেখি, তারা এখানে-ওখানে মাটি খোঁড়াখুড়ি করছে। পাথরের আড়াল থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ করেছি। আমার ধারণা, ওরা গুপ্তধন খুঁজছে। যদি বৈদাৎ ওদের পাল্লায় পড়ে যাও, খুন হয়ে যাবে। কারণ ওদের খবর কেউ জানুক, এটা ওরা চায় না। একদিন আমি তো গুলিতে মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার এই আস্তানার খবর ওরা জানে না।

আজ সন্ধ্যায় যা ঘটেছে, ফকিরকে বলব ভাবলুম। পরে মনে হল, কী দরকার? ফকির হয়তো আরও ভয় পেয়ে যাবেন এবং আমাকে পাল্টা আরেকটা গুপ্তধন সন্ধানী দলের লোক ভেবে বসবেন।

বললুম,—অন্তত একটা কথার জবাব দিন। এই গুহাটা ট্যুরিস্ট লজ থেকে কত দূরে?

—তা মাইল পাঁচেকের বেশি তো হবেই। তবে গুহাটা খাদের ধারেই। একবার বেরিয়ে গেলে কিন্তু আর খুঁজে এখানে ঢোকা মুশকিল। এটাই এ গুহার মজা!

—কেন?

—সে স্বচক্ষে সকালে দেখবে'খন। এটা একটা গোলকধাঁধার মতো। খাদের পাশে দেওয়ালের মতো এবড়োখেবড়ো পাথরে অজস্র ফাটল আছে। কোন ফাটল দিয়ে ঢুকলে এ গুহায় পৌঁছানো যাবে, বোঝা মুশকিল। আমারও মাঝে-মাঝে গণ্ডগোল হয়ে যায়। বিশেষ করে রাতের বেলা। ভুল ফাটলের মধ্যে ঢুকে হয়রান হই। প্রত্যেকটা ফাটলই তলায়-তলায় সুড়ঙ্গের মতো গলিঘুঁজি ঘরে গিয়ে শেষ হয়েছে। শুধু একটা ফাটলের পথ এ গুহায় পৌঁছেছে। সেই ফাটলে অবশ্য একটা চিহ্ন দিয়ে রেখেছি। অন্যের চোখে পড়া মুশকিল। ওটা শুধু আমিই চিনতে পারি। ... বলে ফকির বেদির ওপর রাখা একটা ঝোলা থেকে দুটো আপেল বের করলেন। তারপর বললেন,—নাও। খেয়ে ফেলো। অনেক রাত হয়েছে। আমার এখন ধ্যানে বসার সময়। দয়া করে আর আমাকে ডাকাডাকি কোরো না। আর এই কম্বলটা রইল। গুহার মধ্যে শীত তত টের পাবে না। শুয়ে পড়বে চুপচাপ।

কী আর করি, একটা আপেলে কামড় বসালুম। খিদেয় পেট চোঁচোঁ করছে। মাটির কুঁজো থেকে জলও খেলুম। তারপর নগ্ন পাথরের মেঝেয় শুয়ে পড়লুম। কম্বলটা দরকার হল না। ওই একটা মোটা কম্বল। ফকিরের কম্বলে আর ভাগ বসাই কেন? ফকির আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন ততক্ষণে।

যাক গে, রাতের আশ্রয় পেয়েছি এবং মামদো ভূতের—উঁহু, ঘোড়াভূতের হাত থেকে বেঁচে গেছি, এই পরম সৌভাগ্য।

হঠাৎ মনে পড়ল, কর্নেল বলেছিলেন মোহেনজোদাড়োর ঘোড়াভূতের কথা। তা হলে তো এই সেই ঘোড়াভূত! ওর বিকট হাসির মতো হিঁ হিঁ করে ওঠাটা এখনও কানে ভাসছে।

কিন্তু কে ও? বেঁচেবর্তে ট্যুরিস্ট লজে ফিরতে পারলে কর্নেলকে সব জানাতে হবে। তারপর এই রহস্যের কিনারা করতেই হবে।

এইসব ভাবতে-ভাবতে আর ঘুমই এল না। তার ওপর সারা শরীরে ব্যথা। কেটে ছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। জ্বরজ্বালা না এলে বাঁচি। একটু পরে পাশ ফিরে দেখলুম ফকির একইভাবে ধ্যানস্থ। পাশ দিয়ে বেদিটা দেখা যাচ্ছে।

বেদিটার কিছু অংশে আলো পড়েছে। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলুম বেদির গায়ে অজস্র খোদাই করা চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অবিকল সিন্ধুলিপির মতো।

মতোই বা বলছি কেন? এখানে সিন্ধুলিপিই তো স্বাভাবিক। তা হলে এই বেদিটা নিশ্চয় সিন্ধুসভ্যতার সমকালীন।

চঞ্চল হয়ে উঠলুম। তা হলে তো আমি এযাবৎ অনাবিষ্কৃত একটা প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করে ফেলেছি?

কিন্তু ওই বেদিটা কীসের? নিছক পুজো-আচ্চার বেদি—নাকি ওটা একটা কবর? সিন্ধুসভ্যতার কবরও পাওয়া গেছে অনেকগুলো। তখন যেমন মড়া পোড়ানো হত, তেমনি কবরও দেওয়া হত।

হরাপ্পাতে কয়েকটা কঙ্কালও পাওয়া গেছে। মাটির জালায় সেগুলো ঠেসে ভরা ছিল। কর্নেলের কাছেই তো শুনেছি এসব কথা।

সাবধানে মুখটা একটু বাড়িয়ে লিপিগুলো ভালো করে দেখার চেষ্টা করলুম। তারপর আবার চমকে উঠলুম।

এ কী দেখছি? ডঃ আলুওয়ালার যে ফলকের স্কেচ কর্নেল হাতিয়ে ছিলেন এবং ডঃ ভট্টাচার্য যে ফলকের পাঠোদ্ধার করেছিলেন,—তার সঙ্গে বেদির গায়ের খোদাই করা লিপিগুলোর হুবহু মিল রয়েছে।

সেই ফলকের চিত্রলিপিগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম। না! অবিকল সেই বলদ অথবা হনুমান অথবা ঘোড়া এবং মানুষটাও রয়েছে যে!

তা হলে কি এই বেদির তলায় ...

আর ভাবতে পারলুম না। আনন্দে উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠলুম। যেভাবেই হোক, এই গুহায় ঢোকার পথটা সকালে যাবার সময় ফকিরের অজান্তে চিহ্নিত করে রাখব।

তারপর আর সময় কাটতেই চায় না। ফকির ধ্যানমগ্ন। নিস্তব্ধ গুহা ছমছম করছে।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

ফকিরের ডাকে ঘুম ভাঙলে তাকিয়ে দেখি মাথার ওপর একটা ফাটল দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে গুহায় ঢুকেছে। গুহার ভেতর অন্ধকার নেই।

উঠতে গিয়ে টের পেলুম, এবার হেঁটে অতখানি পথ যাওয়া ভারি কষ্টকর হবে। কিন্তু উপায় নেই।

ফকির সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন,—শরীর কেমন বাবা? হেঁটে যেতে পারবে তো?

একটু হেসে বললুম,—দেখা যাক।

—যদি না পার, থেকে যাও। তোমার সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না!

—না ফকিরসায়েব, আমাকে যেতেই হবে।

—তা হলে এসো।

ফকিরের সাহায্যে আস্তে-আস্তে উঠে বসলুম। নিচু খাদ। ফকির আগে, আমি পেছনে-সাবধানে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকলুম।

সত্যি এ একটা গোলকধাঁধা। ঘুরে-ঘুরে পথটা অন্ধকারে এগিয়েছে। আমি বাঁকগুলো গুনতে থাকলুম। নটা বাঁকের পর অন্ধকার ঘুচল। কিন্তু টের পেয়ে গেছি, এই সুড়ঙ্গ পথের আরও অনেক শাখাপথ আছে। তবে সেই পথগুলো আরও ঘুপটি। কাজেই ভুল হবার চান্স নেই।

আবছা আলোর মধ্যে চলার সময় হাত বাড়িয়ে ফকিরের অজান্তে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরে ফাটলের মুখে পৌঁছনো গেল। ফকির বেরিয়ে গিয়ে ডাকলেন—এসো বাবা!

সেই সময় দ্রুত পাথরের টুকরোটা দিয়ে ফাটলের নীচে একটা বর্গমূল নির্ণয়ের চিহ্নের মতো চিহ্ন দিলুম।

ফাটলটা মোটে ফুট দেড়েক চওড়া, কিন্তু অনেকখানি লম্বা। অতিকষ্টে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, সেই খাদে পৌঁছেছি। খাদটা বালি আর পাথরে ভর্তি। দুধারে খাড়া পাথরের দেওয়াল। ফকির ফের জিজ্ঞেস করলেন,—কষ্ট হচ্ছে কি হাঁটতে?

বললুম,—না।

—আমি কিন্তু বেশি দূর যেতে পারব না। তোমাকে মোহেনজোদাড়ের প্রটেক্টেড এরিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব।

ফকিরের মুখে ইংরেজি শব্দটা শুনে চমকে উঠলুম। উচ্চারণও নিখুঁত। তা হলে কে এই ফকির? বললুম,—আপনি নিজের কোনো পরিচয়ই দিলেন না ফকিরসায়েব।

ফকির একটু হেসে বললেন,—কী হবে পরিচয় জেনে? পরিচয় বলতে আজ আর কি আছে আমার? ঈশ্বরের ধ্যানে কাটাচ্ছি। যেকটা দিন বাঁচব ঈশ্বরের ধ্যানেই কাটাব। বাবা, আমার মতো পাপী আর কে আছে? এ সেই পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত!

—পাপী কেন বলছেন আপনি?

—হ্যাঁ বাবা, আমি মহাপাপী। একদিন আমিও মোহেনজোদাড়োর গুপ্তধনের লোভে পাগল হয়ে উঠেছিলুম। গুপ্তধনের লোভ বড় সাংঘাতিক বাবা! এই লোভেই আমার এক প্রাণের বন্ধুকে খুন করেছিলুম!

বলে ফকির দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমি হতবাক।

পরক্ষণেই উনি সংযত হয়ে চোখ মুছলেন জোব্বায়। তারপর বললেন,—চলো বাবা! এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে।

বাকি পথ আমরা দুজনেই চুপচাপ এলুম। মাইলখানেক চলার পর দেখা গেল, একখানে খাদের দুধারেই ঝোপঝাপ গাছপালা দেখা যাচ্ছে। পাথরও বিশেষ নেই। দুধারে পাড় অনেক ঢালু। ফকির বললেন,—বাঁ পাড়ে উঠে গেলেই আশা করি চিনতে পারবে।

আমি কৃতজ্ঞতায় ওঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে এগিয়ে গেলুম। এক সময় পাড়ে উঠে পিছু ফিরে দেখি ফকির দ্রুত চলেছেন খাদের পথে। একবারও ওঁকে পিছু ফিরতে দেখলুম। না। কিন্তু কে এই ফকির? ...

ঘোড়াভূত ও ডঃ আলুওয়ালা

ট্যুরিস্ট ম্যানেজার ইকবাল খাঁ আমাকে দেখেই দৌড়ে এলেন। বললেন,—কী ব্যাপার মিঃ চৌধুরী? আপনার এ দশা কেন? কোথায় ছিলেন সারারাত? আমরা তো ভেবেই অস্থির। আপনার কর্নেল সাহেব আবার সকালে আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছেন। ডঃ করিম আর কর্নেল কামালও গেছেন একদল মিলিটারি নিয়ে।

—মিলিটারি নিয়ে? সে কী?

ইকবাল খাঁ হাসলেন। —এ দেশে মিলিটারি ছাড়া দুশমনদের জব্দ করা যায় না মিঃ চৌধুরী। আমরা কথায় কথায় মিলিটারির সাহায্য নিই। যাকগে, ঝটপট পোশাক বদলান। আমি খবর পাঠাই ওঁদের।

আমাদের ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি ওঁর কাছে রয়েছে। দরজা খুলে দিলেন। বেয়ারা হুকুমের অপেক্ষায় সেলাম দিয়ে দাঁড়ালে বললুম,—আপাতত এককাপ কড়া কফি ছাড়া আর কিছু দরকার হবে না।

—ব্রেকফাস্ট খাবেন না স্যার?

—ওঁরা ফিরে আসুন, তারপর।

বেয়ারা চলে গেল। একটা এনার্জি ট্যাবলেট বের করে খেয়ে ফেললুম। তারপর বাথরুমে পোশাক ছাড়লুম। স্নান করে এসে দেখি, কফি রেডি।

জানালার কাছে বসে কফি খেতে খেতে মোহেনজোদাড়ো শহরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কী বিচিত্র মানুষের অতীত ইতিহাস!

অনেকক্ষণ পরে বাইরে জিপের শব্দ হল। তারপর দুমদাম জুতোর শব্দ শোনা গেল বারান্দায়। প্রথমে ঢুকলেন কর্নেল কামাল খাঁ। দৈত্যাকৃতি পাঠান ভদ্রলোক এক লাফে এগিয়ে আমাকে প্রায় শূন্যে তুলে ফেললেন। মুখে শুধু—হ্যাল্লো, হ্যাল্লো!

ডঃ করিম বললেন,—তবিয়ত ঠিক আছে তো জয়ন্তবাবু?

বললুম,—হাঁ, ঠিক আছে।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু টাকে হাত বুলোচ্ছেন এবং মিটমিট হাসছেন। টুপিটা বগলদাবা। গলায় বাইনোকুলার ও ক্যামেরা যথারীতি ঝুলছে। বললেন,—আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে ডার্লিং! হবারই কথা। ফকিরসাহেব অতি দয়ালু এবং স্নেহপ্রবণ মানুষ।

চমকে উঠে বললুম,—ফকিরসাহেবের কথা আপনি কীভাবে জানলেন?

তিনজনেই অট্টহাস্য করে উঠলেন। তারপর কর্নেল বললেন,—এটা কোনো অলৌকিক উপায়ে অবগত হইনি আমরা। কারণ আমরা ফকির নই। সাধারণ মানুষ মাত্র।

বিরক্ত হয়ে বললুম,— হেঁয়ালি করার দরকার কী?

ডঃ করিম বললেন,—একটা হেঁয়ালি বোধহয় আছে জয়ন্তবাবু। আপনাকে রাতে বিশেষ খোঁজাখুঁজি করতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। অন্ধকার ওই এলাকায় গেলে আবার দুশমনগুলোর সঙ্গে অকারণ গুলি ছোড়াছুড়ি করতে হত। তাই সকালে বেরিয়ে পড়েছিলুম। খাদ বরাবর সিন্ধুনদ পর্যন্ত এগিয়ে ব্যর্থ হয়ে যখন ফিরে আসছি, একস্থানে আপনার বন্ধু বালিতে আপনার জুতোর ছাপ আবিষ্কার করলেন। ছাপ ক্রমশ উত্তর-পশ্চিমে এগিয়েছে। তার মানে, বোঝা গেল আপনি ফিরে চলেছেন। একটা বাঁক পেরিয়ে দেখি একজন ফকির হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আমাদের তিনি দেখেই পাড়ের দেওয়ালের খাঁজে লুকিয়ে পড়লেন। কর্নেল কামাল খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে দৌড়ে গিয়ে জায়গাটা ঘিরে ফেললেন। গুলি ছোড়ার ভয় দেখালে ফকিরসাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখেই আপনার খবর পাওয়া গেল।

কর্নেলের দিকে ঘুরে বললুম,—ওই ফকির কিন্তু বাঙালি এবং রীতিমতো শিক্ষিত লোক।

কর্নেল বললেন,—জানি বৎস! তবে তুমি কি ওঁর আসল পরিচয় টের পেয়েছ?

—না তো। কে উনি?

—উনি এক প্রখ্যাত বাঙালি পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ডঃ ফরিদ আমেদ! একসময় কলকাতার পুরাতত্ত্ব দফতরের অধিকর্তা ছিলেন। অজন্তা, ইলোরা এবং সিন্ধুসভ্যতার ওপর ওঁর মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থগুলো দেশ-বিদেশে এখনও সমাদৃত হয়। দেশভাগের পর উনি চলে যান প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশে। সেখানে রিটায়ার করার পর দিব্যি ছিলেন। হঠাৎ লন্ডনে একটা সেমিনারে আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে গিয়ে জাদুঘরে একটা ব্রোঞ্জের ফলক দেখতে পান।

—রাজা হেহয়ের আসল ফলকটা তো?

—ঠিক বলেছ। ওই হল ওঁর কাল। অভিশপ্ত ফলক বলতে পার। ফিরে এসে ফলকের পাঠোদ্ধারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে এক দীর্ঘ কাহিনি। সংক্ষেপেই বলছি। বর্ধমানের গ্রামে ডঃ ভট্টাচার্যের ছেলে সেই শিক্ষক ভদ্রলোকের কাছেও উনি অনেকবার যাতায়াত করেছিলেন। কারণ ডঃ ভট্টাচার্যের বইয়ে ফলকটার উল্লেখ ছিল। শেষপর্যন্ত ওঁর ডায়েরিটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন ডঃ আমেদ। নিজের অনুবাদের সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের অনুবাদের মিল দেখে আর ধৈর্য ধরতে পারেন নি। নাম ভাঁড়িয়ে ভারতের নাগরিক সেজেই উনি পাসপোর্ট-ভিসা জোগাড় করেন।

আবার একপ্রস্থ কফি এল। আমার ব্রেকফাস্টও এসে গেল। খেতে-খেতে বললুম,—তারপর কী হল বলুন?

কর্নেল বললেন,—ডঃ আমেদ একটা ভুল করলেন। ডঃ ভট্টাচার্যের ডায়েরিতে লারকানার স্টেশন মাস্টার মিঃ আলুওয়ালার উল্লেখ ছিল। তাঁর ছেলে ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে ডঃ আমেদের অল্প চেনাজানা ছিল। একা মোহেনজোদাড়ো অভিযানে যেতে সাহস করেন নি। ডঃ আলুওয়ালাকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডাঃ আলুওয়ালা পণ্ডিত মানুষ হলে কী হবে? ভীষণ পাজি লোক। যাবার আগে ষড়যন্ত্র করেন যে গুপ্তধন পেলে ডঃ আমেদকে মেরে ফেলা হবে। তাই এক আন্তর্জাতিক ডাকতদলের সর্দার কিষাণচাঁদের সাহায্য নিলেন। কিষাণচাঁদ পণ্ডিত সাজলো। নাম নিল ডঃ ব্রীজেশ সিং। ডঃ আমেদ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হলেন। যাইহোক, ডঃ আমেদ একটা কাজ কিন্তু করেছিলেন, ফলকের প্রকৃত অনুবাদের কথা সঙ্গীদের জানান নি। এখানে এসে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেন তিনজনে। তারপর একরাতে তিনজনে কী একটা কথায় নাকি তুমুল ঝগড়া বেধে যায়। রাগের চোটে ডঃ আমেদ খাদের ওপর থেকে ধাক্কা মেরে ডঃ আলুওয়ালাকে ফেলে দেন। কিষাণচাঁদ তাঁকে আক্রমণ করে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওই সময় একদন মিলিটারি টহলদার দূর থেকে সার্চলাইট ফেলেছিল। নেহাত রুটিন মাফিক ঘোরাঘুরি করছিল ওরা। এর ফলে কিষাণচাঁদ পালিয়ে যায়। ডঃ আমেদ লুকিয়ে পড়েন। সকালে খাদে নেমে একজায়গায় রক্ত দেখে ওঁর অনুতাপ জাগে। ভাবেন, নির্ঘাত ডঃ আলুওয়ালা এখানে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং নেকড়েরা তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলেছে। ধর্মভীরু ডঃ আমেদের অনুশোচনা তীব্র হয়ে ওঠে ক্রমশ। দিনের পর দিন পাপবোধে অস্থির হয়ে ওঠেন। তারপর ফকিরী অবলম্বন করেন। তারপর থেকে ওইভাবে থেকে গেছেন।

—এসব কথা কি উনিই বলেছেন আপনাকে?

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন কর্নেল কামাল খাঁ। —মিঃ চৌধুরী, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ফকিরসাহেব ওরফে ডঃ আমেদকে আমি গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছি। জেরার চোটে উনি সব কবুল করেছেন।

চমকে উঠলুম। —গ্রেফতার করেছেন? কেন?

—প্রথম কথা উনি নাম ভাঁড়িয়ে ভিসা জোগাড় করেছিলেন। পরে আমার গোয়েন্দা দফতর সেটা টের পেয়ে ওঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এটা দুবছর আগের ঘটনা। দ্বিতীয় কথা, উনি বে-আইনিভাবে গুপ্তধন খোঁজাখুঁজি করছেন। আমরা কিষাণ সিং এবং ডঃ আলুওয়ালাকেও গ্রেফতার করার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেয়েই দুজনে গা ঢাকা দিয়েছে।

কর্নেল সরকার বললেন,—কিষাণ সিং কে জানো? তুমি প্লেনে যে ভদ্রলোকের পাশে বসে এসেছ—সেই জাল ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী!

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—গা ঢাকা দিয়ে দুজনে দলবল নিয়ে ওই এলাকায় লুকিয়ে আছে। ওদের অস্ত্রশস্ত্র আছে প্রচুর। কিষাণ সিং-এর লোকেরা তো ওখানে বরাবর রয়ে গেছে। কোনো গুহায় আস্তানা গেড়েছে। খুঁজে বের করতেই হবে।

বললুম,—ফকিরসাহেব কোথায় এখন?

—আপাতত লারকানায় হাজতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

শুনে খুব দুঃখ হল। কিন্তু এদেশে মিলিটারি আইন। কিছু করার নেই।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে কর্নেল কামাল খাঁ এবং ডঃ করিম চলে গেলেন। কর্নেলকে বললুম,—হ্যালো ওল্ড ম্যান। ফকিরসাহেবের কাছে কী শুনেছেন জানি না। আমার ব্যাপারটা এবার আপনার শোনা দরকার। আমি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি।

কর্নেল চমকে উঠলেন—সে কী? কোথায়? কীভাবে পেলে?

—বলব। একটা শর্ত।

—কী শর্ত?

—কথা দিন, পাকিস্তানি গোয়েন্দা দফতরের অধিকর্তা এবং আপনার বন্ধু ওই কর্নেল কামাল খাঁকে বলে ফরিকসাহেবের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—চেষ্টা করতে পারি।

—চেষ্টা নয়, করতেই হবে। কামাল খাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা!

—ঠিক আছে। এবার বলো?

—ফকিরসাহেব যে গুহায় থাকেন এবং আমি যেখানে আশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে একটা বেদি আছে! তার গায়ে অবিকল সেই ফলকের চিত্রলিপি খোদাই করা আছে।

কর্নেল অবাক হয়ে বললেন,—বলো কী জয়ন্ত!

—হ্যাঁ। গুহার পথ খুঁজে বের করা কঠিন। তাই গোপনে একটা চিহ্ন দিয়ে এসেছি।

কর্নেল গম্ভীর মুখে কিছু ভাবলেন তারপর বললেন,—তা হলে তো ফকিরসাহেব অর্থাৎ ডঃ আমেদ গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েই গিয়েছিলেন! অথচ ... আশ্চর্য তো!

—কী আশ্চর্য!

—তবু উনি গুপ্তধন উদ্ধার করেননি কেন?

—হয়তো সংসারত্যাগী ফকির হয়েছেন এবং ডঃ আলুওয়ালাকে মেরে ফেলায় পাপ হয়েছে ভেবেই নির্লোভ থাকার সাধনা করেছেন। বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করছি।

—হুম! তোমার এ কথায় যুক্তি আছে।

—সেই স্বাভাবিক। তাই বেদির সামনে ওঁকে ধ্যানমগ্ন দেখেছি।

—ঠিক, ঠিক ... বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটু পায়চারি করে বললেন,—জয়ন্ত, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেলেন কর্নেল। আমার শরীরের ব্যথাটা যায়নি। একটা পেনকিলার ট্যাবলেট খেয়ে নিলুম এবং শুয়ে পড়লুম। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। ...

দুপুরে লাঞ্চের সময় কর্নেল এসে আমাকে জাগালেন। তখন শরীর অনেকটা হাল্কা হয়েছে আমার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্নেল বললেন,—এখনই ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁ এসে পড়বেন। ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে সেই লারকানা যেতে হয়েছিল। তোমার কথামতো কর্নেল কামালকে অনুরোধ করেছি। সম্ভবত ফকিরসাহেব মুক্তি পাবেন। তুমি চিন্তা করো না। তৈরি হয়ে নাও।

পোশাক পরে ফেললুম ঝটপট। এবার গুলিভরা রিভলভারটা নিতে ভুল করলুম না। বললুম।—দিনের আলো থাকতে-থাকতে পৌঁছানো দরকার। নইলে ফাটলের চিহ্নটা খুঁজেই পাব না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বোধ করি, তোমার চিহ্নের আর দরকার হবে না। কারণ ফকিরসাহেবকে কর্নেল কামাল সঙ্গে আনার চেষ্টা করবেন। নিজের গোপন আস্তানা চিনতে ওঁর ভুল হবে না আশা করি।

আমার মনে যেটুকু গর্ব ছিল, মিইয়ে গেল। মনে মনে কামনা করলুম, ফকিরসাহেব যেন কিছুতেই না আসেন। তা হলে আমাকেই সাধাসাধি করিয়ে ছাড়বে। এতকাল কর্নেল সব রহস্যে

চাবিকাঠিটি নিজের হাতে রেখেছেন। এবার চাবিকাঠি আমি ভাগক্রমে হাতিয়েছি। এমন মওকা ছাড়ব কেন?

কিছুক্ষণ পরে জিপের শব্দ হল বাইরে। আমরা বেরিয়ে গেলুম। ...

জিপে যেতে-যেতে ওঁদের যে আলোচনা হল, তাতে বুঝলুম কর্নেল কামাল খাঁয়ের বাহিনীটি বেশ বড়। একদল দুপুরে গিয়েই সেই শুকনো খাদের মাথায় ত্রিকোণ মাঠটা ঘিরে রেখেছে। পাথরের আড়ালে ওৎ পেতে সৈনিকেরা লক্ষও রেখেছে। সৈনিকগুলো নাকি একেবারে কসাই। কিষাণচাঁদের দলের লোকেদের পেলেই গলায় ছুরি চালিয়ে কোতল করবে। বেছে-বেছে কাঠখোট্টা ধরনের হিংস্র পাঠানদেরই মোতায়েন করা হয়েছে। কাজেই কিষাণচাঁদ আর সুবিধে করতে পারবে না আজ। একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। আগের দিন যেখানে জিপ রেখে আমরা খাদে নেমেছিলুম, সেইখানেই নামলুম। যেতে যেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, খাদের ওপরে উঁচুতে পাথরের আড়ালে মিলিটারি পাঠান সাবমেশিনগান বাগিয়ে বসে আছে। এ যে প্রায় যুদ্ধের আয়োজন।

বুঝলুম, কর্নেল কামাল খাঁ কাল সন্ধ্যায় কিষাণচাঁদের দলের হাতে ইটটি খেয়ে ভারি রেগে গেছেন এবং তার শোধটা ভালোমতো তুলবেন।

বেচারি মিঃ আলুওয়ালার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল। অধ্যাপক এবং পণ্ডিত মানুষ। অথচ গুপ্তধনের নেশায় পড়ে এমন সর্বনাশের পথে ছুটে বেড়াচ্ছেন কতদিন থেকে!

ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের গুপ্তধন যে অভিশপ্ত তাতে কোনো ভুল নেই। সেই অভিশাপের জন্যেই মানুষ হয়ে পড়েছে ষড়যন্ত্রী শয়তান।

যাচ্ছি তো যাচ্ছি, খাদের যেন শেষ নেই। বাঁক ঘুরে পুবে এগিয়ে সেই গুহা। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঠিক সেই জায়গাটা আমি চিনতে পারছিনে কেন? কর্নেল বারবার জিজ্ঞেস করছেন। আমি বাঁদিকে খাড়া দেওয়ালের মতো পাড়ে ফাটল খুঁজছি। এখানে কোথাও ফাটল নেই। তা হলে কি বেশি এগিয়ে এসেছি?

মনে পড়ছে, বাঁকের পরই বাঁদিকে ফাটল শুরু হবার কথা। অজস্র ফাটল পাথুরে পাড়ে তখন লক্ষ করেছিলুম। কিন্তু কই সেগুলো?

এবার কর্নেল মুচকি হেসে বললেন,—জয়ন্ত সব গুলিয়ে ফেলেছে। তা হলে এবার আমরা নিজেদের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে খুঁজি। কী বলেন ডঃ করিম?

ডঃ করিম বললেন,—অগত্যা তাই।

কর্নেল কামাল খাঁ আমাদের দেহরক্ষীর মতো দুহাতে দুটো রিভলভার বাড়িয়ে সাবধানে চারিদিকে দেখতে দেখতে পিছনে আসছিলেন। বললেন,—কী হল?

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত পথ হারিয়েছে।

একেই বলে পিলে চমকানো হাসি। এক কর্নেলের কথা শুনে আরেক কর্নেল যা একখানা হাসলেন, এই খাদের মধ্যে যেন মেঘ ডাকল।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ও ডঃ করিম বালির দিকে ঝুঁকে বোধকরি আমারই সকালবেলার জুতোর ছাপগুলো খুঁজছেন। কিন্তু খাদের মধ্যে প্রবলবেগে বাতাস বইছে। শুকনো বালি উড়ছে। ছাপ ঢেকে গেছে সম্ভবত।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, গুহার ফাটল দিয়ে বেরিয়ে খাদের ওপারে প্রথমেই চোখে পড়েছিল একটা বিরাট লাল পাথর। এখানে কোথাও অমন লাল পাথর না থাকায় ওটা চোখে না পড়ে পারে না। কথাটা বললুম ওঁদের। ওঁরা খুঁজতে ব্যস্ত হলেন।

আমি ডানদিকের পাড়ে পাথরগুলো ভালো করে দেখার জন্যে কর্নেলের কাছে বাইনোকুলার নিলুম। প্রথমে পিছনের দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছি,সেদিকে ডান পাড়টা খুঁটিয়ে দেখলুম। কোনো লাল পাথর নেই কোথাও। অন্তত মাইলখানেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

তারপর সামনের দিকে ডান পাড় বরাবর লক্ষ করলুম। কিন্তু কোথায় গেল লাল পাথরটা? এ যে রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার! সামনে খাদ সোজা পুবে গিয়ে সিন্ধুনদে মিশেছে। পাথরের একটা প্রাকৃতিক বাঁধ দেখা যাচ্ছে শেষ সীমায়। তাই বর্ষায় এই নদের জল ঢোকার সুযোগ পায় না। তবে বৃষ্টির জল জমতে পারে। কিন্তু এই এলাকায় বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। তাই জল জমলেও তার পরিমাণ সামান্য হওয়াই সম্ভব। বুঝতে পারলুম, এজন্যেই গুহাটা নিরাপদ রয়েছে। নইলে বর্ষায় জল ঢুকে যেত। ফকির সাহেবের পক্ষে ওখানে বাস করা সম্ভবই হত না।

বাইনোকুলারে চোখ রেখেই একথা ভাবছিলুম, আমাদের কাছেই ডান পাড়ে একটা পাথরের আড়ালে কালো রঙের কী একটা বসেছিল, সরে গেল। বললুম,—কর্নেল! নেকড়ে বাঘ নিশ্চয় কালো হয় না। অথচ একটা কালো জন্তু দেখলুম যেন। এখানে কি ভাল্লুক আছে?

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—কোথায়, কোথায়?

—ওই যে ওখানে।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে উনি ওপর দিকটা তাক করে দুহাতের রিভলভার থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুড়ে বসলেন। প্রচণ্ড প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর তুলকালাম ঘটে গেল।

আমাদের বাঁদিকের পাড়ে সেই ত্রিকোণ মাঠ অন্তত একশ ফুট উঁচুতে রয়েছে। সেখানে থেকে পাঠান মিলিটারিরা গুলিবর্ষণ শুরু করে দিল। আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হলুম। কর্নেল কামাল খাঁ রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে যখন উঠলেন, তখন সাদা বালিতে মিলিটারি পোশাক ভূতের পোশাক হয়ে উঠেছে। তারপর বিকট চিৎকার করে মাতৃভাষায় কী বললেন।

মুখ তুলে দেখি, পাড়ের উঁচুতে এক মিলিটারি পোশাক পরা মূর্তি দাঁত বের করে স্যালুট দিচ্ছে। পশ্চিম থেকে রোদ্দুর সোজা তার দাঁতে গিয়ে পড়েছে। সে এক দেখার জিনিস বটে!

বাকি তিনজন বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠলুম। হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন, —জয়ন্ত জয়ন্ত! ওই তোমার লাল পাথর।

ঘুরে দেখে আমি হতবাক। আশ্চর্য কাণ্ড, এতক্ষণ ধরে খুঁজছি—কোথাও ছিল না। হঠাৎ যেন আলাদিনের-পিদিমের দৈত্যের মতো ওটা আমাদের নাকের ডগায় এসে ঠিক জায়গায় বসেছে। এই রহস্যের অর্থ কী?

কর্নেল গুম হয়ে যেন একথাই ভাবছিলেন। তারপর ইউরেকা বলে চেঁচিয়ে ওঠার মতো বললেন,—বুঝেছি! বুঝেছি! ব্যাপারটা আর কিছু নয়—মোহেনজোদাড়োর কাক।

—কাক! তার মানে?

—ওই দেখ, কাকগুলো এখন তুমুল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে পালিয়ে যাচ্ছে। আসলে ওই কাকগুলো লাল পাথরটা জুড়ে বসেছিল। তাই এতক্ষণ লাল রং ঢেকে গিয়েছিল। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে পালাতেই লাল পাথরটা বেরিয়ে পড়েছে। শুনেছিলুম বটে কাকের কথা। সিন্ধুপ্রদেশে নাকি অসংখ্য কাকের উপদ্রব আছে। বিশেষ করে নাকি মোহেজোদাড়োতে কাকের উপদ্রবটা বেশি। এবার স্বচক্ষে দেখলুম।

বললুম,—কিন্তু লাল পাথরের বিপরীত দিকের পাড়ে ফাটল থাকার কথা। কিন্তু ফাটল নেই যে!

কর্নেল বললেন,—হুম! ওই তো ফাটল। একটা কেন? সারি সারি কয়েক গজ অন্তর অজস্র ফাটল দেখতে পাচ্ছি!

এতক্ষণে গোলমালটা টের পেলুম। সকালে সূর্যের আলো পড়েছিল। পশ্চিমের পাড়ে। এই পুব পাড়টা ছিল ছায়ায় ঢাকা। তাকালে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল ফাটলগুলো। কিন্তু সূর্য এখন পশ্চিমে রয়েছে! তার উজ্জ্বল কিরণ এসে পড়েছে পুব পাড়ের দেওয়ালে। সোনালি রঙের পাথরে সেই আলো ঠিকরে গিয়ে বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। দেওয়ালটা মসৃণ বলেই রোদের প্রতিফলন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে।

এবার খুঁটিয়ে প্রতিটি ফাটলের তলার দিকে আমার এঁকে রাখা সেই বর্গমূল চিহ্ন খুঁজতে শুরু করলুম। সাতটা ফাটলের পর যে ফাটলটা দেখলুম, তার তলায় চিহ্নটা দেখা গেল এবং আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলুম,—পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!

প্রথমে ঢুকলুম আমি। তার পিছনে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তার পিছনে ডঃ করিম। শেষে কর্নেল কামাল খাঁ।

কর্নেল টর্চ জ্বেলে আমার কাঁধের ওপর ধরে রেখেছেন। গোলকধাঁধার পথ এটা। বাঁকে বাঁকে নটা সরু ফাটল দেখে গেছি। সেগুলো এড়িয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে গুহার মুখে পৌঁছনো গেল।

ভেতরে সকালের মতো আলো নেই। যদিও ফাটল দিয়ে ওপরের আলো টের পাওয়া যাচ্ছে। কারণ সকালে সূর্য ছিল ওদিকেই। সোজা আলো এসে ঢুকছিল। এখন সূর্য পশ্চিমে চলে গেছে।

বেদিতে পিদিম জ্বলছে না। দেখে কেমন খারাপ লাগল। ফকির সাহেবের কম্বলটা ভাঁজ করে রাখা আছে। ওঁর ঝোলাটাও আছে। কর্নেল কামাল খাঁও দুটো নিলেন। ডঃ করিম টর্চের আলোয় লিপিগুলো পরীক্ষা করে বললেন,—এই তা হলে সেই গুপ্তধন!

কর্নেল সরকার বললেন,—বেদিটা ভাঙা উচিত নয়। সেটা একটা জঘন্য অপরাধই হবে। বরং পরীক্ষা করে দেখা যাক আগে।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—আমার কাছে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার ছোট্ট গাঁইতি আছে। দরকার হবে বলে এনেছি।

—দেখছি। বলে কর্নেল সরকার বেদির চারদিক খুঁচিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর ওপাশে গিয়ে দুহাতে সিন্দুকের ডালা খোলার মতো হ্যাঁচকা টান দিলেন। বেদির ওপরটা নড়ে উঠল।

ডঃ করিম বললেন,—এ কী! এ যে দেখছি একটা পাথরের সিন্দুক!

সবাই মিলে হাত লাগিয়ে পাথরের ডালাটা সরানো হল। ভেতরে আলো ফেলতে দেখা গেল, কোণার দিকে দুটো বাঁকা ধূসর রঙের আট-ন-ইঞ্চি মাপের চ্যাপ্টা কী জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে বললেন,—গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। ওঠানো যাবে না!

বললুম,—কী ও দুটো?

—সম্ভবত ঘোড়ার চোয়াল। প্রিয় ঘোড়ার মৃত্যু হলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে তার দুটো চোয়াল যত্ন করে রাখা হত।

ডঃ করিম বললেন,—তা হলে রাজা হেহয়ের ঘোড়ার চোয়াল!

—তা ছাড়া আর কী। ... বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে কী একটা তুলে নিলেন। চোখের সামনে নাড়াচাড়া করে দেখে বললেন,—একটা ব্রোঞ্জের চাকতি। পরিষ্কার করে দেখতে হবে এই সীলমোহরটা কার।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—তা হলে গুপ্তধন নেই?

—সেই তো দেখছি। মনে হচ্ছে, কে কবে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। কর্নেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। কতকাল আগে নিয়ে গেছে, কে বলতে পারে! হয়তো দুহাজার বছর আগে—কিংবা তারও আগে! ভাই কামাল সায়েব! সব গুপ্তধনই এখন তাই নিছক কিংবদন্তিতে পরিণত।

আমরা গুহার মধ্যে হতবাক হয়ে বসে রইলুম। একটু পরে স্তব্ধতা ভেঙে ডঃ করিম বললেন, —গুপ্তধন কী ছিল, জানি না। কিন্তু এ একটা বড় আবিষ্কার নয় কি কর্নেল সরকার? ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের বাকি ইতিহাসটুকু পেয়ে গেলুম। এই পাথরের সিন্দুকই বিশ্বের পুরাতত্ত্বের ইতিহাসে সেরা একটি সম্পদ। আসলে এটাই একটা গুপ্তধন। দেশবিদেশে হিড়িক পড়ে যাবে। বিশেষ করে আপনাদের ভারতীয় পণ্ডিতরা এসেছেন। এই বিস্ময়কর আবিষ্কার দেখতে তাঁদের আমন্ত্রণ জানাব। ইতিহাসের এক রহস্যময় অধ্যায় এবার আলোকিত হয়ে উঠবে। ...

হঠাৎ আমাদের পিছনে থেকে কে জোরালো টর্চের আলো ফেলল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে চিৎকার করে বলল,—একটু নড়লেই গুলি করব। যে যেভাবে আছ চুপ করে বসে থাকো। আর টর্চ নেভাও।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতচকিত। আমাদের টর্চগুলো নিভে গেল।

তারপর কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ডঃ আলুওয়ালা! শুনে দুঃখিত হবেন যে গুপ্তধনের সিন্দুকটা একেবারে খালি। স্বচক্ষেই দেখুন। রাজা হেহয়ের ঘোড়ার চোয়াল দুটো ছাড়া আর কিছু নেই।

মিথ্যা কথা! তোমরা গুপ্তধন বাগিয়ে লুকিয়ে ফেলেছ!

—না ডঃ আলুওয়ালা! আমরা ...

—চুপ! এখনও বলছি, গুপ্তধন বের করো। নয়তো গুলি করে মারব।

—গুপ্তধন যদি সত্যি আমরা বাগিয়ে থাকি এবং আপনাকে তা দিই, তাহলেও তো আপনি আমাদের খুন করবেন ডঃ আলুওয়ালা! কারণ, আমাদের বাঁচিয়ে রাখলে আপনিই বিপদে পড়বেন।

শুনে আমার আত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। অথচ কর্নেল কী ঠাণ্ডা গলায় নির্বিকার মুখে কথা বললেন!

ডঃ আলুওয়ালা জোরালো আলোর পিছনে রয়েছেন বলে ওঁকে দেখতে পাচ্ছি না। এবার হা হা করে হেসে বললেন,—ঠিকই বুঝেছ! তা হলে রেডি। ...

হঠাৎ ওঁর পিছনে কাল রাতে শোনা সেই বিদঘুটে হাসি অথবা ঘোড়ার ডাক শোনা গেল—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ!

তারপর কী একটা ঘটল। ডঃ আলুওয়ালার টর্চ ছিটকে পড়ল। হাতের রিভলভার থেকে গুহার মধ্যে কান ফাটানো আওয়াজে গুলি বেরুল। কয়েক মুহূর্ত অন্ধকারে ধস্তাধস্তির শব্দ শোনা গেল। গুহার ভেতর ততক্ষণ উগ্র দুর্গন্ধে ভরে গেছে।

তারপর আমাদের টর্চগুলো জ্বলে উঠল। সেই আলোয় যা দেখলুম, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা কালো চামচিকের মতো মানুষ জাতীয় প্রাণী ডঃ আলুওয়ালার বুকের ওপর বসে দুহাতে গলা টিপে ধরেছে। ডঃ আলুওয়ালার জিভ বেরিয়ে গেছে।

কর্নেল কামাল খাঁ দুহাতের দুটো রিভলভারেরই ঘোড়া টিপে দিলেন। প্রাণীটা একটা বিদঘুটে আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল।

আমরা হামাগুড়ি দিয়ে গেলুম। ডঃ আলুওয়ালাকে পরীক্ষা করে কর্নেল হতাশভাবে বললেন, —বেচারি মারা পড়েছেন। অতি লোভের পরিণাম!

প্রাণীটাকে কর্নেল কামাল খাঁ ও ডঃ করিম পরীক্ষা করেছিলেন। কর্নেল সরকার একটু ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন,—এ কী! এ যে মানুষ! ...

বিদায় সম্বর্ধনায় তুলকালাম

লারকানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি বিশাল সভাকক্ষে ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্বর্ধনা দেওয়া হচ্ছিল পরদিন সকাল দশটায়। একের পর এক দু-দেশের পণ্ডিতরা বক্তৃতা দিয়ে উঠে মোহেনজোদাড়োতে নতুন এবং বিস্ময়কর প্রত্ন-আবিষ্কারের কথা বলছেন। প্রত্যেকেই কর্নেল বুড়ো এবং এই অধম সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর প্রশংসা করছেন। ডঃ আলুওয়ালার জন্য দুঃখ প্রকাশও করছেন।

শুনে-শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। উসখুস করছি দেখে কর্নেল বললেন,—তোমাকেও বক্তৃতা দিতে হবে ডার্লিং। তৈরি হয়ে নাও।

—পাগল, না মাথাখারাপ! আমি ওতে নেই। এক্ষুনি কেটে পড়ছি!

উঠতে যাচ্ছি, ডঃ করিম ঘোষণা করলেন,—এবার ভারতীয় সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরীর মুখে এই রোমহর্ষক আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শুনবেন আপনারা। মিঃ চৌধুরী কলকাতার প্রখ্যাত পত্রিকা দৈনিক সত্যসেবকের স্পেশাল রিপোর্টার।

কী আর করি, অগত্যা মঞ্চে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে দায়সারা কাহিনি শোনালুম। তারপর আসনের উদ্দেশে এগোলুম। মুহুর্মুহু করতালি চারদিকে। আমি তো একেবারে ঘাবড়ে গেছি!

গিয়ে দেখি, কর্নেলের আসন শূন্য। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওঁকে খুঁজলুম। তারপর দেখি, দরজার পাশে উঁকি মেরে চোখের ইশারায় আমাকে ডাকছেন।

কাছে যেতে-যেতে শুনি, সভাপতি ডঃ করিম ঘোষণা করছেন—এবার আমি প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে অনুরোধ করছি ...

বাইরে গিয়ে কর্নেল বললেন,—এসো, কেটে পড়া যাক।

বললুম,—আপনি অদ্ভুত মানুষ তো! এটা অভদ্রতা হচ্ছে না? আপনাকে তাঁরা বক্তৃতা দিতে ডাকছেন আর আপনি কেটে পড়ছেন?

কর্নেল জবাব না দিয়ে হনহন করে লন পেরিয়ে চললেন। আমার খুব রাগ হল। মাঝে-মাঝে বুড়োর মাথায় যেন ভূত চাপে। এমন একটা জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ছেড়ে এবং রীতিমতো অভদ্রতা দেখিয়ে চলে গেলেন! এতে ভারতেরই মাথা কি হেঁট হচ্ছে না? কারণ উনি একজন ভারতীয় প্রতিনিধি!

দেশের সম্মান বাঁচাতে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এখনই সভামঞ্চে গিয়ে জানিয়ে দেব, কর্নেল সরকার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি ভাষণ দিতে পারছেন না।

কিন্তু হলে ঢুকেই আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

মঞ্চে অবিকল কর্নেল মতোই দাড়ি ও টাকওয়ালা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সবে মাইকের সামনে দাঁড়িয়েছেন এবং সবিনয়ে ঘোষণা করছেন,—অধমের নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ...

আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আসল কর্নেল থাকতে নকল কর্নেল কেন রে বাবা?

ডঃ করিম এবং আরও অনেকে তো আসল কর্নেলকে চেনেন। এমনকি এই দু-তিনদিন ধরে ওঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালেন। অথচ একজন উটকো লোক উঠে গিয়ে কর্নেল সেজে মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছে।

আমি হতভম্ব হয়ে সামনের দিকে সাংবাদিকদের জায়গায় আমার নির্দিষ্ট আসনে বসতে গেছি, সেই সময় আচম্বিতে একটা তুলকালাম শুরু হয়ে গেল।

প্রথমে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। তারপর দেখলুম নকল কর্নেল মাইকের সামনে উঁচু ডেস্কটার তলায় ঢুকে পড়লেন।

তারপর চেঁচামেচি, হুড়োহুড়ি তাণ্ডব চলতে থাকল। মিলিটারি সেপাইদের মঞ্চ ঘিরে ফেলতে দেখলুম। ওরে বাবা! পাকিস্তানে কি আবার মিলিটারি বিপ্লব হচ্ছে তাহলে?

মঞ্চে কর্নেল কামাল খাঁকে দেখলুম। দুহাতে দুটো রিভলভার নিয়ে হেঁড়ে গলায় গর্জন করলেন,—যে-যেখানে আছেন, চুপচাপ বসে পড়ুন! আমরা আততায়ীকে পাকড়াও করেছি।

এই সময় আমার বাঁদিকের দরজার কাছে দেখতে পেলুম, সেপাইরা একটা লোককে টানতে-টানতে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটাকে আমার চেনা মনে হল। ওঃ হো! একেই তো সেদিন পার্কে ডঃ আলুওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলুম। সভা এবার অনেকটা শান্ত হয়েছে। যারা হুড়মুড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা অনেকে ফিরে এসে আসনে বসছে। বুঝলুম, এ দেশে এমন কাণ্ড যেন লোকের গা সওয়া।

কিন্তু ততক্ষণে আমি ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি।

গোয়েন্দা দফতর আগেভাগে টের পেয়েছিল, কর্নেল মঞ্চে উঠলেই গুপ্তঘাতকের পাল্লায় পড়বেন। তাই নকল কর্নেল সাজিয়ে গোপনসূত্রে পাওয়া খবরের সত্যতা যাচাই করতে চেয়েছিল। বলাই বাহুল্য, সত্যিকার কর্নেলকে মঞ্চে হাজির করে ঝুঁকি নিতে চায়নি। কিন্তু বলিহারি সাহস ওই নকল কর্নেল ভদ্রলোকের! যদি গুলিটা লাগত!

আমি আর বসে থাকতে পারলুম না। তখুনি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে কোথাও কর্নেলকে দেখতে পেলুম না।

তখন একটা ট্যাক্সি ডেকে সটান হোটেলে চলে গেলুম। ইন্টারলকিং সিস্টেমের দরজা লক করা আছে। চাবি দিয়ে খুললুম। হ্যাঁ, বুড়ো ঘরেই আছেন। তবে চুপচাপ বসে নেই। টেবিলে সেই গুহার সিন্দুকে পাওয়া চাকতিটা ঘষামাজা করছেন। দুটো ছোট শিশিতে সাদা ও রঙিন তরল পদার্থ রয়েছে। একটা ছোট্ট ব্রাশ দিয়ে ব্রোঞ্জের চাকতিটা পরিষ্কার করছেন কর্নেল।

হিটাইট সীলমোহর

ঘরে ঢুকেই রুদ্ধশ্বাসে যা ঘটেছে বললুম। শুনে কর্নেল একটু হাসলেন। বললেন,—কিষাণচাঁদ ওরফে ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী সহজে ছাড়বে না। এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে।

অবাক হয়ে বললুম,—কেন? গুপ্তধনের সিন্দুক তো খালি! মিছিমিছি আর কেন সে ঝামেলা করতে চাইছে?

কর্নেল চাকতিটা দেখিয়ে বললেন,—জয়ন্ত, ভেবেছিলুম রাজা হেহয়ের গুপ্তধন রহস্যের পর্দা এতদিন খুলতে পেরেছি। কিন্তু তার বদলে দেখছি, রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল।

—বলেন কী!

—এই চাকতিটা লক্ষ করো। একটা ফুটো দেখতে পাচ্ছ। তাই না? আমার ধারণা, ব্রোঞ্জের এই চাকতি বা সীলমোহরটা রাজা হেহয়ের ঘোড়ার কপালে ঝোলানো ছিল। চাকতির হরফগুলোর পাঠোদ্ধার করা পণ্ডিতদের কাজ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ব্রোঞ্জের ফলকটা বা পাথরের সিন্দুকের গায়ে যে-চিত্রলিপি আমরা দেখেছি, এগুলো সেই ঢঙের চিত্রলিপি নয়। তুমি এই আতস কাচের মধ্যে দিয়ে দেখতে পার এ কিছুতেই সিন্ধুসভ্যতার চিত্রলিপি নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের।

আতস কাচের সাহায্যে ব্রোঞ্জের চাকতিটা দেখতে থাকলুম। হ্যাঁ, কর্নেল যা বলছেন তাই বটে।

—এই চাকতির মধ্যে দণ্ডধারী পুরুষটি নিশ্চয় রাজা। ব্রহ্মাবর্তের রাজা হেহয়। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল হেসে বললেন,—ব্যস! তা হলে তুমি তো পাঠোদ্ধার করেই ফেলেছ দেখছি। তোমাকে পণ্ডিতরা এবার বিদ্যাদিগ্‌গজ বাচস্পতি উপাধি দেবেন, জয়ন্ত! নাকি বিদ্যার্ণব—বিদ্যাবাগীশ গোছের কিছু চাই তোমার?

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম,—এটা একটা রামছাগলকে দেখান। বলবে, এই মূর্তিটা একজন রাজার। রাজার হাতে রাজদণ্ড থাকে না?

কে জানে। —বলে কর্নেল অন্যমনস্কভাবে ঘড়ি দেখলেন। তারপর হাই তুলে বললেন,— ডঃ করিম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। তারপর বেরুব।

—কোথায় বেরুবেন? আবার ওই ঘোড়াভূতের আড্ডায় নাকি?

—হুম। কিন্তু তুমি ওকে এখনও ঘোড়াভূত বলছ কেন জয়ন্ত? বেচারী আসলে তো একজন মানুষ। রাজা হেহয়ের গুপ্তধনের লোভে এ পর্যন্ত কত মানুষ যে অমনি পাগল হয়ে গেছে, তার সংখ্যা নেই। এই হতভাগ্যের পরিচয় আর জানা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, সে পাগল হয়ে যাবার পর ওই এলাকার কোনো একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করছিল। আর শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভেবেছিল, রাজা হেহয়ের সেই ঘোড়া!

—কিন্তু ওর গায়ের রঙ এত কালো হল কীভাবে?

—যে গুহায় ও ছিল, সম্ভবত সেই গুহায় কালো ছাই ভর্তি রয়েছে। কীসের ছাই, তাও এখানে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করা হয়েছে। শুনলে অবাক হবে, কারবন-১৪ নামে একরকম আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি আছে। তাতে প্রায় নিখুঁত হিসেব করে বলা যায়, জিনিসটি কত বছরের পুরনো। জানা গেছে, লোকটার গায়ে যে ছাই লেগে আছে, তা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের কাঠ পোড়ানো ছাই।

—বলেন কী! তাহলে মোহেনজোদাড়োতে যখন মানুষ বাস করত, তখনকার ছাই!

—হ্যাঁ জয়ন্ত। তখনকারই।

—কিন্তু গুহার মধ্যে কাঠ পুড়িয়েছিল কেন?

—সম্ভবত ওটা ছিল মোহেনজোদাড়োবাসীদের শ্মশান।

—গুহার মধ্যে শ্মশান! কেন?

—জয়ন্ত, সব দেশেই প্রাগৈতিহাসিক কালে গোপনে মৃতদেহের সৎকার করার প্রথা ছিল। সর্বত্র এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। লোকে বিশ্বাস করত, মৃতদের আত্মা শান্তিতে থাকতে চায়। তাই এমন নির্জন জায়গায় তাদের শেষকৃত্য করা হত—যাতে কোনো ক্রমেই জীবিত মানুষদের জীবনযাত্রার কোনো আওয়াজ তাদের কানে না পৌঁছয়। নইলে তাদের শান্তির ঘুম ভেঙে যাবে এবং বিরক্ত হয়ে জীবিতদের ক্ষতি করতে থাকবে। বুঝলে তো?

—বুঝলুম। কিন্তু এও বুঝলুম, আপনি সেই শ্মশান গুহা আবিষ্কার না করে ছাড়বেন না। কিন্তু একটু আগে সম্বর্ধনা সভায় যা ঘটল, তাতে কি আপনার একটুও ভয় হচ্ছে না?

কর্নেল মিটিমিটি হেসে শুধু মাথা দোলালেন।

—কিষাণচাঁদ ডাকুর হাতে নির্ঘাত এবার প্রাণটি খোয়াবেন দেখছি।

—তুমি কি খুব ভয় পেয়েছ, ডার্লিং?

—আলবাৎ পেয়েছি। সবসময় আমার বুকে ভূমিকম্প হচ্ছে!

কর্নেল হো হো করে হেসে উঠলেন। —তত ভয়ের কারণ নেই জয়ন্ত! আমার বন্ধু কর্নেল কামাল খাঁ অতি ধুরন্ধর গোয়েন্দাসর্দার। কিষাণচাঁদের দলেও ওঁর এজেন্ট রয়েছে। কাজেই নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দাও।

আমার গোঁফই নেই।

—গোঁফ রাখতে শুরু করো। ... বলে কর্নেল ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। ফোন বাজছিল। কাকে কী জবাব দিয়ে বললেন,—ডঃ করিম এবং আমাদের প্রতিনিধিদলের নেতা ডঃ তিড়কে এসে গেছেন।

একটু পরেই ওঁরা দুজনে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ তিড়কে কর্নেলের বয়সি। মস্ত গোঁফ আছে। লম্বা ঢ্যাঙা রোগাটে গড়নের মানুষ। একটু কুঁজোও। তিনজনে টেবিলে ঘিরে বসে চাকতিটা দেখতে ব্যস্ত হলেন। আমি কর্নেলের নির্দেশমতো কফির অর্ডার দিলুম ফোনে। ঘড়িতে এখন বাজছে দুপুর বারোটা। লাঞ্চ সেই একটায়।

একটু পরে প্রথমে মুখ খুললেন ডঃ তিড়কে। —এটা হিটাইট চিত্রলিপি মনে হচ্ছে।

ডঃ করিম বললেন,—হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা।

কর্নেল বললেন,—হিটাইট? পশ্চিম এশিয়াবাসি আর্যদের একটা শাখা ছিল ওরা তাই না?

ডঃ তিড়কে বললেন,—হ্যাঁ, কর্নেল সরকার। হিটাইটরাও আর্য জনগোষ্ঠীভুক্ত ছিল। প্রথমে ওরাও বর্বর পশুপালক ছিল। অনেক প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক নগরসভ্যতা ওরা ধ্বংস করেছিল। পরে ওরা ক্রমশ সভ্য হয়ে ওঠে। বাইবেলেও ওদের কথা আছে। সিরিয়ায় ওদের অনেক ফলক ও সীলমোহর পাওয়া গেছে।

ডঃ করিম বললেন,—হিটাইটরা নিজেদের দেশকে বলত হাট্টি বা হত্তি।

কর্নেল বললেন,—কিন্তু হিটাইট ভাষায় লেখা এই চাকতি রাজা হেহয়ের ঘোড়ার মাথায় ঝোলানো ছিল কেন? হেহয়কে তো উত্তর ভারতের ব্রহ্মাবর্ত রাজ্যের লোক বলা হয়। কোথায় সিরিয়া, কোথায় উত্তর ভারত!

ডঃ তিড়কে একটু ভেবে নিয়ে বললেন,—বড্ড গোলমেলে ব্যাপার, তা সত্যি। এই চাকতিতে কী লেখা আছে না জানা পর্যন্ত রহস্যভেদ করা যাচ্ছে না। ডঃ করিম, চলুন বরং আপনার স্টাডিতে

গিয়ে দুজনে কিছুক্ষণ মাথা ঘামানো যাক্। হিটাইট লিপির পাঠোদ্ধার তো জার্মান পণ্ডিত হেলমুথ থিওডোর বোসার্ট ১৯৪৬ সালে করে ফেলেছেন। কাজেই সেই সূত্র ধরে এগোলে আমরাও নিশ্চয় চাকতির লেখাগুলো পড়ে ফেলতে পারব।

ডঃ করিম বললেন,—কর্নেল সরকারকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কর্নেল সবিনয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—ক্ষমা করবেন ডঃ করিম। আপনাদের কাজের সময় এই অপণ্ডিত মহামূর্খের উপস্থিতি অনেক বিঘ্ন ঘটাবে। আপনারা অনুগ্রহ করে সময়মতো জানাবেন, চাকতিতে কী লেখা আছে। ব্যস, তাহলেই যথেষ্ট।

চাকতি নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। দরজা লক করে এসে কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত আশা করি, বুঝতে পেরেছ যে রাজা হেহয়ের গুপ্তধনরহস্য কেন ঘনীভূত হয়েছে?

মাথা দুলিয়ে বললুম,—কিচ্ছু বুঝিনি।

—যে সিন্দুকটা আমরা গুপ্তধনের আধার বলে ভেবেছি, ওটা আসলে মৃত ঘোড়ার চোয়াল সংরক্ষণের জন্য প্রাচীন প্রথা অনুসারে তৈরি একটা পাথরের সিন্দুক। ... কর্নেল ছাত্রকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলতে থাকলেন। ... একটা ব্যাপার গোড়াতেই আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছিল। ব্রহ্মাবর্তরাজ হেহয়ের মাতৃভাষা কিছুতেই সিন্ধুভাষা ছিল না—হতেই পারে না। তিনি এখানে বিদেশি মাত্র। যদি গুপ্তধনের সঙ্কেত তিনি ফলকে লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে মাতৃভাষাতেই করা স্বাভাবিক ছিল। কাজেই এটা মোটেই রাজা হেহয়ের লিপি নয়। নিশ্চয় অন্য কারুর। তিনি স্থানীয় লিপিকারকে দিয়ে মোহেনজোদাড়োর ভাষায় লিখিয়ে নিয়েছিলেন, তাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ তাতে দ্বিতীয় একজন গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যাবে। কোন বুদ্ধিমান মানুষ এটা করবেন না।

—তা হলে?

—এর একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে। কোনো মোহেনজোদাড়োবাসী সন্দেহবশে রাজা হেহয়ের পিছু নিয়েছিল এবং সে যা দেখেছিল, তা একটা ব্রোঞ্জের ফলকে লিপিবদ্ধ করেছিল। এবার এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডঃ ভট্টাচার্যের অনুবাদটা পড়া যাক। কী দাঁড়াচ্ছে শোনো :

'আমি দেখেছি : সৌরবর্ষের ষষ্ঠ মাসে চাঁদের প্রথম তিথিতে একজন লোক একটা ঘোড়া নিয়ে সিন্ধুনদের তীরে ত্রিকোণ ভূমিতে উপস্থিত হল। ঘোড়ার পিঠে একটা বাক্স ছিল। সে বাক্সটা শস্যক্ষেত্রের সীমানায় একটি বৃক্ষের নীচে পুঁতে রাখল।'

বললুম,—'আমি দেখেছি'-টা কোথায় পাচ্ছেন?

কর্নেল হতাশভঙ্গিতে বললেন,—তা হলে সব প্রাচীন লিপির ইতিহাস তোমাকে শোনাতে হয়। আপাতত সে-সময় হাতে নেই। শুধু জেনে রাখ, সব প্রাগৈতিহাসিক ফলক বা শিলালিপি বা সীলমোহর যা কিছু লেখা আছে, সবের গোড়ার ধরে নিতে হবে, কেউ কিছু বলছেন কিংবা ঘোষণা করছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকটি লেখা ব্যক্তিগত উক্তি। আজকালকার মতো নৈর্ব্যক্তিক নয়। কোনো পুরোহিত বা কোনো রাজা বা কেউ না কেউ কিছু স্থায়ীভাবে অন্যান্য মানুষকে জানাতেই ওগুলো লিখেছেন। নিজে না লিখুন, লিপিকারকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন। কাজেই সব লেখার গোড়ায় 'আমি দেখেছি' বা 'আমি বলছি' এই কথাটা ধরে নিতেই হবে। এই ফলকে একটা ঘটনার কথা লেখা রয়েছে। কাজেই ...

বাধা দিয়ে বললুম,—বেশ, তাই। তা হলে পাথরের বাক্সেও অবিকল একই লেখা এল কী ভাবে?

—এর একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। সে লোভ সামলাতে না পেরে রাজা হেহয় এবং তার ঘোড়াটিকেও হত্যা করেছিল। তারপর তখনকার প্রথা অনুসারে পালিত পশু হিসাবে ঘোড়ার চোয়াল একটা পাথরের সিন্দুকে ভরে ওই গুহায় সমাধিস্থ করেছিল। ঘোড়ার মাথায় ঝোলানো সীলমোহর বা চাকতিটাও সিন্দুকে রেখে দিয়েছিল। কারণ ওটা ঘোড়াটারই একটা সাজ।

—কিন্তু গুপ্তধন?

—বলছি। পাথরের সিন্দুকের গায়েও একই কথা লিখে রাখার কারণ : নিজের জীবনে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, তার একটা বিবরণ আরও স্থায়ীভাবে রেখে যেতে চেয়েছিল সে। এবার গুপ্তধনের প্রসঙ্গে আসি। আমরা দুটো লেখাতেই কিন্তু এমন কোনো আভাস পাচ্ছি না, যাতে নিশ্চয় করে বলা যায় ঘোড়ার পিঠে সোনাদানা হীরা-জহরত ছিল। একটা বাক্স-জাতীয় জিনিস চিত্রলিপির ঘোড়ার পিঠে দেখছি এবং তিনটে ডালওয়ালা গাছের তলাতেও শুধু সেই বাক্সই দেখছি। একই চৌকোণা জিনিস এবং মধ্যিখানে একটা বিন্দুচিহ্ন।

—তা হলে কী এমন অমূল্য জিনিস ছিল বাক্সে, যা রাজা হেহয় কাকেও জানতে দিতে চাননি?

—বোঝা যাচ্ছে না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি মোহেনজোদাড়োবাসী লোভী ও খুনে লোকটি বাক্সর মধ্যে হিরে-জহরত সোনাদানা না পেয়ে নিরাশ হয়ে কিংবা পাপবোধে অনুতপ্ত হয়েই ঘটনাটা লিখে রেখেছিল।

—ভ্যাট্! আরও গোলমাল হয়ে গেল সব। তিব্বতি মঠের পুঁথিতে বলা হয়েছে নাকি, রাজা হেহয় ধনরত্ন নিয়েই আশ্রয় নিয়েছিলেন সেখানে।

—তিব্বতি মঠের সাধুরাও কি ওই লোকটির মতো ভুল করতে পারে না?

—হ্যাঁ! তা অবশ্য ঠিকই।

এই সময় ফের ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে কী শুনে নিয়ে বললেন,—অলরাইট। উই আর রেডি। তারপর ফোন রেখে বললেন,—জয়ন্ত, লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে। তৈরি হয়ে নাও। ...

ফকিরসাহেবের কেরামতি

বিকেলে আমরা আবার চলেছি মোহেনজোদাড়োর দিকে। এবার সঙ্গে রীতিমতো মিলিটারি কনভয়। চারটে ট্রাকভর্তি মিলিটারি সামনে ও পিছনে যেন আমাদের জিপটাকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ তো দেখছি ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে যাওয়ার মতো। আমার অস্বস্তি বেড়ে যাচ্ছিল।

আমাদের জিপে আছেন আর পাঁচজন। কর্নেল, আমি এবং ডঃ তিড়কে বসেছি পেছনে। কর্নেল কামাল খাঁ জিপ চালাচ্ছেন। তাঁর পাশে বসেছেন ডঃ করিম। বুঝতে পারছি, ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিরাপত্তার কড়া আয়োজন করা হয়েছে।

ভারতের অন্যান্য প্রতিনিধি ও সাংবাদিকরা আজ মোহেনজোদাড়োর সাত মাইল দূরে একটা বৌদ্ধস্তূপ দেখতে গেছেন। সহকারী নেতা ডঃ দীনবন্ধু আচার্য তাঁদের নেতা হয়েছে। কারণ মূল নেতা ডঃ তিড়কে আমাদের সঙ্গে এসেছেন।

মোহেনজোদাড়োর কাছাকাছি এসে আমাদের জিপ একটা এবড়োখেবড়ো বাজে রাস্তার দক্ষিণে এগোল। বাঁদিকে অজস্র ন্যাড়া টিলার আড়ালে সিন্ধু নদ দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। ডানদিকে রুক্ষ ধু-ধু মরুভূমি বলাই চলে—বালি, পাথর আর কঠিন মাটির দেশ। ছোট-ছোট কাঁটাগাছ আর ক্বচিৎ ঝোপঝাড় আছে। সেইসব ক্ষয়াখর্বুটে ঝোপের পাতা মুড়িয়ে খাচ্ছে মস্ত-মস্ত ছাগল আর তাগড়াই

গড়নের দুম্বা নামে এক জাতের ভেড়া। কোথাও উটের পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে দড়ি ধরে ধীরে-সুস্থে চলেছে কোনো মানুষ। মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, হাতে একটা লম্বা বর্শা। একখানে জিপসিদের ছোটখাটো একটা দলকে দেখলুম তাঁবু পেতে রান্নাবান্না করছে। ওখানে একটা কুয়ো আছে। একদল ছাগল ভেড়াকে লাইন দিয়ে চৌবাচ্চা থেকে জল খাওয়াচ্ছে রাখালরা। জিপসি মেয়েরা চাকা ঘুরিয়ে জল তুলছে আর অকারণে হাসাহাসি করছে। আমাদের মিলিটারি গাড়িগুলো দেখে কিছুক্ষণ যেন ওরা সবাই ভয় পেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

এবার সত্যি বলতে কী কোনো পথই নেই। অসমতল প্রান্তর ও বালিয়াড়ি পেরিয়ে কনভয় চলেছে। ধুলোর মেঘ চলেছে আমাদের সঙ্গে। দম আটকানো অবস্থা।

কর্নেল ও ডঃ তিড়কে চাপাগলায় কী সব আলোচনা করছেন। মাঝে মাঝে পিছু ফিরে সামনের সিট থেকে ডঃ করিমও তাতে যোগ দিচ্ছেন। কিছু বুঝতে পারছি না—শুধু 'হিটাইট' শব্দটা বাদে।

এদিকে ধুলোর ধূসর হয়ে গেছি সবাই। বড্ড বিরক্তিকর লাগছিল যাত্রাটা। একসময় কর্নেলের উদ্দেশে না বলে পারলুম না, —আর কতদূর?

সামনে থেকে ডঃ করিম জবাব দিলেন,—এসে পড়েছি।

সামনে বাঁদিকে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছিল। ঘড়িতে তখন ছটা বাজে। সূর্য অস্ত যেতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। কিন্তু এবার আর ধুলো নেই। মাটি শক্ত। হলদে ঘাসের চাবড়া গজিয়েছে। তারপর একটা দুটো করে গাছও নজরে পড়তে থাকল। আমরা সিন্ধুনদের প্রায় কিনারা ধরে চলেছি এখন।

কোথাও কোনো বসতি দেখতে পেলুম না। তবে আরও দূরে দক্ষিণে দিগন্তের কাছে সবুজ রং দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—ওটা কী?

ডঃ করিম বললেন,—ওটা সেচ এলাকা। ওখানে সরকারি কৃষিক্ষেত্র আছে।

বাঁয়ে অনেকগুলো টিলা সিন্ধুনদের ধারে সার বেঁধে চলে গেছে সবুজ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। ডাইনেও তেমনি টিলার সারি আছে। এখানে অজস্র কাঁটাগুল্মের জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে। আর তার-মধ্যে একটা করে চ্যাপ্টা পাথর পোঁতা আছে দেখলুম। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওগুলো কোন্ যুগের গোরস্থান। প্রাগৈতিহাসিক যুগের তো বটেই। ওই পাথরগুলো নাকি এই এলাকার এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছে খুব পবিত্র। তারা প্রতি বছর শীতের শুরুতে এসে ওখানে পুজো আচ্চা করে। ভেড়া বলি দেয়। মেলা বসে তখন। অনেক পর্যটক দেখতে আসে। শুনলুম, জায়গাটার নাম দুহালা। নামটা অদ্ভুত লাগল। কতকটা বাংলা-বাংলা নাম যেন!

এখানেই আমাদের কনভয় থামল। আমরা জিপ থেকে নামলুম। কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি সেপাইদের দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব আদেশ দিলেন। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিন্ধুনদের ধারে টিলাগুলোর দিকে চলে গেল। কয়েকজন সেপাই সাবমেসিনগান নিয়ে পাহারায় রইল গাড়িগুলোর কাছে।

ফ্লাস্কে আনা চা খাওয়া হল ঘাসে বসে। আলোচনা শুরু হল তার ফাঁকে-ফাঁকে। সামনে একটা ম্যাপও রাখা হল। ওঁরা ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপটার দিকে। আমি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।

একসময় অধৈর্য হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। সেই প্রাগৈতিহাসিক গোরস্থানে গিয়ে চ্যাপ্টা পাথরগুলো দেখতে লাগলুম। প্রতিটি পাথর মাটির ওপর অন্তত ছ'সাতফুট লম্বা। তার গায়ে দুর্বোধ্য কী যেন লেখা আছে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পূর্বভারতে মেঘালয় এলাকায় এমন অনেক গোরস্থান দেখেছিলুম বটে। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার পথে একটা দেখেছি। আরও নানা জায়গায়। ওগুলো খাসি জাতির লোকদের কাছে খুব পবিত্র। ওরাও পুজো-আচ্চা করে সেখানে গিয়ে।

আমার পিছনে জুতোর শব্দ হচ্ছিল। ঘুরে দেখি, আমার বৃদ্ধ বন্ধুটি আসছেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। —হ্যাল্লো খুদে পণ্ডিত! নতুন কিছু আবিষ্কার করলে নাকি?

— চেষ্টা করছি।

—কিন্তু সাবধান, এখানে বিস্তর ভূত আছে। ঘাড় মটকে দেবে।

বুড়োর কথায় না হেসে পারা যায় না! হাসতে-হাসতে বললুম,—আপনারা কি সেইসব ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে সেপাইসান্ত্রি গোলাগুলি নিয়ে এসেছেন?

—তুমি ঠিকই ধরেছ, জয়ন্ত।

—আর কিষাণচাঁদ ডাকু বুঝি ওদেরই সর্দার।

—বাঃ! তা হলে তোমার বুদ্ধি খুলে গেছে!

—কিন্তু কর্নেল, আগেভাগে বলে দিচ্ছি, ওসব গোলাগুলির মধ্যে আমি নেই।

আমার মুখের কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে সিন্ধুনদের ধারে টিলাগুলোর দিকে পৃথিবী কাঁপানো একটা আওয়াজ হল। তারপর দেখলুম, কিছুটা দূরে প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং তার সঙ্গে বড় বড় পাথরের টুকরো আকাশে ছড়িয়ে গেল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠেছিল। কী সাংঘাতিক ওই বিস্ফোরণ!

কর্নেল চাপা গলায় বললেন,—ডিনামাইট দিয়ে টিলাটা উড়িয়ে দিল বুঝি!

উত্তেজিতভাবে বললুম,—কারা ডিনামাইট চার্জ করল কর্নেল?

—আবার কারা? কিষাণচাঁদরা।

—কেন বলুন তো?

—একটা গুহায় ঢোকার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই পাহাড় উড়িয়ে দিয়ে সে গুহার পথ আবিষ্কার করতে চায়।

—কী আছে সে গুহায়?

—জানি না। শুধু এইটুকুই জানি, কিষাণচাঁদ মশাই ধুরন্ধর লোক এবং সে আমাদের টেক্কা দিতে পেরেছে। সম্ভবত সে অসাধারণ পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতের সাহায্য নিয়েছে।

—ডাকুকে কোন পণ্ডিত সাহায্য করতে যাবেন?

কর্নেল জবাব না দিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। —চলে এসো জয়ন্ত। আমরা এবার রওনা দেব।

ওঁর সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখলুম, ডঃ তিড়কে এবং কর্নেল কামাল খাঁ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এবার দলবেঁধে সবাই দ্রুত টিলাগুলোর উপর দিয়ে এগিয়ে চললুম।

একটা টিলার উপর পৌঁছে বড় পাথরের আড়ালে সব বসে পড়লুম। উঁকি মেরে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। নীচে সিন্ধুনদ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হবে সমুদ্র যেন। কূল-কিনারাহীন। তবে জায়গায় জায়গায় অনেক বালিয়াড়ি দ্বীপের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সেই চাতালে জনাপাঁচেক সশস্ত্র লোক একজন আলখাল্লাধারী ফকিরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফকির আর কেউ নন, আমার প্রাণদাতা সেই সাধকপুরুষ এবং বাঙালি পণ্ডিত ডঃ আমেদ!

কর্নেলের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। ফিসফিস করে বললেন,—যা আশঙ্কা করেছিলুম, তাই ঘটেছে। ফরিকসাহেব কিষাণচাঁদের পাল্লায় পড়েছেন।

ডঃ করিম বললেন,—মুক্তি পেয়েই উনি গা ঢাকা দিয়েছিলেন। অনেক খুঁজে আর পাত্তা পেলুম না। কিন্তু ভাবিনি যে উনি বোকার মতো আবার এখানে এসে পড়বেন।

ওঁকে থামিয়ে দিলেন কর্নেল কামাল খাঁ। ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করলেন। সেই সময় দেখলুম, মিলিটারি সেপাইরা বুকে হেঁটে চাতালটার দুদিক থেকে পাথরের আড়ালে এগুচ্ছে। আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল। নির্ঘাত প্রচণ্ড লড়াই বেধে যাবে। তার মধ্যে ফকিরসাহেব বিপন্ন হয়ে পড়বেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই কর্নেল কামাল খাঁ পাঠান বলেই বুঝি এত গোঁয়ারগোবিন্দ মানুষ।

কিন্তু তারপরই আশ্বস্ত হয়ে দেখলুম, সেপাইরা চাতালের তলায় গিয়ে ঢুকল। এবং ফকিরসাহেব দুহাতে বার কতক তালি বাজালেন। আকাশের দিকে মুখ।

তারপর সিন্ধুনদের দিকে ইশারা করে কিছু বললেন। সশস্ত্র লোকগুলো সেদিকে তাকিয়ে কী দেখতে থাকল। তখন সদ্য সূর্যাস্ত হয়েছে। সিন্ধুর জলে রক্তিম ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেখতে-দেখতে সেই সিঁদুর গোলা জলের রঙ বদলাতে থাকল। এমন বিচিত্র দৃশ্য আমি দেখিনি। সোনালি-রূপালী পাখনা মেলে যেন অসংখ্য পরী স্নান করতে নেমেছে।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর এজন্যে যে শুধু একটা জায়গায় ওই রঙের খেলা দেখা যাচ্ছে। লোকগুলো নিশ্চয় তাজ্জব হয়ে দেখছে। ফকিরসাহেব এবার সোজা দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রার্থনা করছেন।

তারপর দেখলুম, ফকিরসাহেব প্রার্থনা শেষ করে কয়েকবার তালি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চাতালটার কিনারা থেকে মিলিটারি সেপাইরা আচমকা লাফিয়ে উঠল এবং লোকগুলোকে ঘিরে ফেলল।

লোকগুলো চমকে উঠেছিল। ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থায় প্রত্যেকে বন্দুক ফেলে দিয়ে দুহাত তুলে দাঁড়াল।

কর্নেল কামাল খাঁ দৌড়ে নেমে গেলেন। দুহাতে দুটো রিভলভার থেকে দুবার গুলি ছুড়তে ভুললেন না।

আমারও নীচে গিয়ে ব্যাপারটা মুখোমুখি দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু একটু নড়তেই কর্নেল চিমটি কেটে বসে থাকতে ইশারা করলেন।

কর্নেল কামাল খাঁ এবং তাঁর বাহিনী ডাকাতগুলোকে আগ্নেয়াস্ত্রের ডগায় রেখে চাতাল থেকে নামালেন। অপেক্ষাকৃত ঢালু পথটা দিয়ে ভেড়ার পালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে চললেন। ফকিরসাহেব এবার আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

কর্নেল বললেন,—চলুন, এবার যাওয়া যেতে পারে।

আমরা চারজনে নীচে নেমে গেলুম। নামাটা সহজ হল না অবশ্য। পাথরে সাবধানে পা রেখে নামতে হল।

কাছে গিয়েই ডঃ করিম বুকে জড়িয়ে ধরেছেন ফকিরসাহেবকে। কর্নেল এবং ডঃ তিড়কে করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে। আর আমি ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। এই মানুষটি আমার প্রাণদাতা!

ফকিরসাহেব হাসতে হাসতে বললেন,—কেরামতিটা কেমন দেখালুম বলুন? সিন্ধুনদের ওই জায়গাটায় অদ্ভুত আলোর খেলা দেখা যায় সন্ধ্যার আগে। ন্যাচারাল ফেনোমেনা। ব্যাটাদের বললুম, ওই দ্যাখ—ওখানেই রাজা হেহয়ের গুপ্তধন পোঁতা আছে। ওরা বিশ্বাস করল। ...

শ্মশানগুহার বিভীষিকা

ফকিরসাহেব ওরফে ডঃ আমেদের কাছে জানা গেল : কাল বিকেলে কর্নেল খাঁ ওঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন। উনি তাঁর গুহার আড্ডায় ফেরার পথে কিষাণচাঁদের হাতে বন্দি হন। বুদ্ধিমানের মতো তিনি ওদের সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন। নইলে প্রচণ্ড নির্যাতন করে ওরা তাঁকে মেরে ফেলত। এখানে ওই খাড়িমতো জায়গায় উঁচু তিনশো ফুট যে পাথরের দেওয়াল দেখা যাচ্ছে, তার গায়ে দুশো ফুট উঁচুতে একটা গর্ত আছে। এই গর্তটা একটা গুহার পথ। কিন্তু নীচে সিন্ধুনদের জল ওখানে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে। তাই ওখানে কোনো নৌকা নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। গেলেও খাড়া পাথরের দেওয়াল বেয়ে উঠে গর্তে পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তাই কিষাণচাঁদকে উনি পরামর্শ দিলেন, যদি দেওয়ালটার ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ি বেয়ে কেউ নামতে পারে তাহলে একশো ফুট নীচে গর্তটায় পৌঁছতে পারবে। এ কাজ দক্ষ পর্বতারোহীর। ওদের দলে তেমন কেউ নেই। তাই সেই দুপুর থেকে গর্ত খুঁড়ে ডিনামাইট ভরে দিয়েছিল কিষাণচাঁদ। কিছুক্ষণ আগে আমরা সেই ডিনামাইটের বিস্ফোরণ টের পেয়েছি। দেওয়ালটা উড়ে গেছে। গুহার ছাদে ফাটল ধরেছে। সেই ফাটল দিয়ে কিষাণচাঁদ নেমে গেছে একা। সঙ্গীদের বলে গেছে, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি না ফিরলে এই ফকিরকে জবাই করবে।

এখনও কিষাণচাঁদ ফেরেনি। এদিকে চাতালে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ ফকিরসাহেবের চোখে পড়েছিল, একদল মিলিটারি সেপাই পাথরের আড়ালে বসে আছে। তখন তিনি শয়তানগুলোকে কথায় কথায় ভুলিয়ে রাখেন এবং ওই কেরামতি দেখান। সেই সঙ্গে সেপাইদের এগিয়ে আসতেও ইশারা করেন।

কর্নেল কামাল খাঁ বন্দিদের ট্রাকে তুলে চালান করে ফিরে এলেন। এখন আলো আর নেই। ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। উনি এসেই বললেন,—কিষাণচাঁদ তো নেই ওদের দলে!

ফকিরসাহেব বললেন,—চলুন, আপনাদের কিষাণচাঁদের কাছে নিয়ে যাই। কিন্তু তার আগে বলুন, আপনারা এভাবে এখানে হঠাৎ এসে পড়লেন কোন্ সূত্রে?

জবাব দিলেন ডঃ তিড়কে। —সে ভারি অদ্ভুত যোগাযোগ বলতে পারেন। রাজা হেহয়ের ঘোড়ার কপালে যে ব্রোঞ্জের চাকতি ছিল, সেটা নিশ্চয় আপনি পাথরের সিন্দুকে দেখেছিলেন?

—হুঁ, দেখেছিলুম। কিন্তু আমি ও-নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইনি। ঈশ্বরের দিকে যে মন ফিরিয়েছে, তার কাছে আর ওসব জিনিসের কতটুকু মূল্য ডঃ তিড়কে?

—তা ঠিক। এবার ব্যাপারটা শুনুন তা হলে। ওই চাকতিটা একটা হিটাইট সীলমোহর। হিটাইট লিপি আছে ওতে।

—বলেন কী! ব্রহ্মাবর্তরাজের ঘোড়ার সাজে হিটাইট লিপি!

—হ্যাঁ। যাই হোক, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গিয়েছিল, একটা হিটাইট ফলকে সিন্ধুনদ অঞ্চলের সূর্যপূজারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তারা মৃতদেহের কবর দেয় এবং প্রতিটি কবরে পাথর পুঁতে খাড়া করে রাখে। তারা ঘোড়া আমদানি করে হিটাইট দেশ হাট্টি (বর্তমান সিরিয়া) থেকে। মোহেনজোদাড়োবাসীরা অবশ্য ঘোড়া তাদের কাছে দেখে থাকবে। কিন্তু ঘোড়া তারা যে কারণেই হোক, পছন্দ করেনি। হয়তো ঘোড়ার পিঠে চাপা পাপ ভাবত। লাঙল বা গাড়ি টানতে তো বলদই যথেষ্ট। আমি তাই ডঃ করিমকে জিজ্ঞেস করলুম সিন্ধুনদের তীরে তেমন কোনো গোরস্থান আছে নাকি। উনি বললেন,—হ্যাঁ, আছে। তখন ঠিক হল, আমরা সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করব। সেই সময় কর্নেল কামাল খাঁ জানালেন, কিষাণচাঁদের দল দুহালায় রওনা হয়ে গেছে। ওর দলে সরকারি

গোয়েন্দা আছে। সেই খবর দিয়েছে। তখন আমরা বুঝলুম, আমাদের অনুমান সঠিক। কিষাণচাঁদ কীভাবে এসব জানতে পেরেছিল, কে জানে।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—লারকানা জাদুঘরের সহকারি ডিরেক্টর আরশাদ হুসেন কিষাণচাঁদের পরামর্শদাতা। ফিরে গিয়েই ওকে আমি গ্রেফতার করব। এবার চলুন ফকিরসাহেব। অন্ধকার হয়ে এল যে!

ফকিরসাহেব পা বাড়িয়ে বললেন,—চলুন। কিন্তু সাবধান। আলো জ্বালাবেন না। আমি গোপনে একটা পথে আপনাদের ওই গুহায় নিয়ে যাব। শুধু মনে রাখবেন কিষাণচাঁদ খুব ধূর্ত এবং ভীষণ হিংস্র।

ফকিরসাহেব আগে, তাঁর পিছনে কর্নেল কামাল খাঁ, তাঁর পিছনে ডঃ করিম, তারপর একে-একে ডঃ তিড়কে, কর্নেল সরকার এবং আমি। আমি সবার পিছনে। অন্ধকার খুব একটা ঘন হয়নি। তাছাড়া আজ চতুর্থী, চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটেছে। অসুবিধে হচ্ছিল না।

ওপরে উঠে সমতল একটা জায়গা পাওয়া গেল। ততক্ষণে চাঁদের আলো বেশ পরিষ্কার হয়েছে। এক ফাঁকে ফিসফিস করে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—ব্রোঞ্জের চাকতিতে কি সত্যি গুপ্তধনের খোঁজ আছে?

কর্নেল ফিসফিস করে বললেন,—ভাগ চাই নাকি তোমার? পাবে, কথা দিচ্ছি।

রাগে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। আমি কি গুপ্তধনের লোভে ঘুরে বেড়াচ্ছি এঁদের সঙ্গে? অদ্ভুত বললেন তো!

কাঁটাঝোপগুলো এড়িয়ে সাবধানে অনেকখানি যাওয়ার পর ফকিরসাহেব দাঁড়ালেন। সামনে আবার একটা প্রাগৈতিহাসিক কবরখানা মনে হল। সার সার চ্যাপ্টা উঁচু পাথরের চাঁই পোঁতা আছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলো। আগে না দেখা থাকলে ভয়ে ভিরমি খেতুম।

ফকিরসাহেব ইশারায় সেই কবরখানায় ঢুকতে বলে এগিয়ে গেলেন। মাঝামাঝি গিয়ে একখানে একটা পাথরের সামনে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন,—এখানেই। তারপর পাথরের চাঁইটা অক্লেশে দুহাতে উপড়ে ফেললেন। এ যে দৈত্যদানবের কীর্তি! আমরা সবাই হতভম্ব হয়ে গেছি। কেউ কেউ অস্ফুটস্বরে বিস্ময়সূচক শব্দও করেছেন। তাই ফকিরসাহেব বললেন,—এই পাথরগুলো কাঠের তক্তার মতো হাল্কা। এক বিশেষ ধরনের পাথর। অথচ ভারি মজবুত। দুহালা এলাকার লোকেরা বলে চাঁদের পাথর। সূর্যদের পুজোয় খুশি হয়ে নাকি ওদের পূর্বপুরুষদের এইসব পাথর চাঁদ থেকে পাঠিয়ে দিতেন। পরীরা বয়ে আনত। অবশ্য কেউ মারা গেলে, তবেই। যাকগে, নীচের এই বেদিটার তলায় সুড়ঙ্গপথ আছে।

বলে উনি বেদির মতো চারকোণা একটা হাল্কাপাথর একইভাবে তুলে পাশে রাখলেন। বেদির মধ্যে পাথরের চাঁই বসানোর গর্ত রয়েছে।

ফকিরসাহেব বললেন,—সাবধান, আলো জ্বালবেন না কেউ। ভেতরে কিষাণচাঁদ কোথায় আছে আমরা জানি না। সিঁড়ি বেয়ে নামবেন একে-একে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পিঠে হাত রাখবেন।

গর্তটা কোনোমতে একজন ঢোকার মতো। কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, —জয়ন্ত, ইচ্ছে না করলে তুমি অপেক্ষা করতে পার এখানে।

বললুম,—পাগল! একা এই ভূতের রাজ্যে বসে থাকার চেয়ে পাতালে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে মরা ঢের ভালো।

একে-একে সবাই অদৃশ্য হলেন। তারপর কর্নেলের পিছনে আমিও নেমে গেলুম। কেমন একটা বাসি ধূপ-ধুনোর গন্ধ যেন। কুয়োর মতো সুড়ঙ্গের সিঁড়ি বেয়ে নামছি তো নামছি। ঠাসা অন্ধকার। সংকীর্ণ জায়গা। দম আটকে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ পরে টের পেলুম, মেঝের মতো মসৃণ চওড়া একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সামনে দূরে কোথাও একঝলক আলো জ্বলেই নিভে গেল। ফকিরসাহেব ফিসফিস করে বললেন,—আবার সবাই সবাইকে ছুঁয়ে পা বাড়ান। আমি আগে থাকছি।

এবার মেঝের মতো সমতল জায়গায় হেঁটে চলেছি পরস্পরকে ছুঁয়ে। কখনও ডাইনে, কখনও বাঁয়ে ঘুরে-ঘুরে অনেকখানি যাওয়ার পর সবাই দাঁড়ালাম। কোথায় খসখস শব্দ হচ্ছে। শব্দটা বাড়তে থাকল। তারপর উপর্যুপরি বন্দুকের আওয়াজে গুহার স্তব্ধতা চুরমার হয়ে গেল।

তারপর একটা অমানুষিক আর্তনাদ অথবা গর্জন শোনা গেল। আঁ—আঁ—আঁ—আঁ! ওটা যে মানুষের গলার নয়, তা ঠিকই। কিন্তু অমন কানে তালাধরানো ভয়ঙ্কর চিৎকার কোন প্রাণীর?

অমনি ফকিরসাহেব চাপা গলায় বলে উঠলেন—সর্বনাশ! শ্মশান-গুহার দানবটা জেগে গেছে। পালিয়ে আসুন পালিয়ে আসুন। যেপথে এসেছি, সেই পথে।

একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ঝোঁকের মাথায় কর্নেল কামাল খাঁ টর্চ জ্বাললেন। ফকিরসাহেব বললেন,—আলো নয়। আলো নয়! আমার পিছু পিছু সেইভাবে চলে আসুন সবাই।

আমি সবার পিছনে। হুড়োহুড়ি করে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলুম। তারপর গড়াতে গড়াতে আবার মেঝেয়। কর্নেল কি টের পেলেন না? পায়ের শব্দ ওপরের দিকে মিলিয়ে গেল দ্রুত। সেদিনকার চোটখাওয়া জায়গাতেই আবার চোট পেয়েছি। গোড়ালি দুমড়ে গেছে। উঠতে দেরি হল।

তারপর আর কিছুতেই সিঁড়িটা খুঁজে পেলুম না। যেদিকে যাই দেয়ালে বাধা পাই। শেষে একজায়গায় ফাঁক পেয়ে পা বাড়ালুম, কিন্তু সেখানে সিঁড়ি নেই। এদিকে পিছনে আবার বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ আর সেই অমানুষিক গর্জন বা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—আঁ—আঁ—আঁ—আঁ।

পাগলের মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললুম। কিছুটা যাওয়ার পর মনে হল ধূলোবালির মধ্যে হাঁটছি। গলা শুকিয়ে গেছে। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছি। শেষপর্যন্ত মরিয়া হয়ে রিভলভার বের করলুম। এবং দেশলাই বের করে জ্বালাতেই দেখি, আমি কালো ছাই গাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছি!

তা হলে এই সেই মামদো-ভূতের আড্ডা শ্মশানগুহা! এখান থেকে বেরুতে পারলে আমাকেও সবাই মামদোভূত ভেবে বসবে, তাতে কোনো ভুল নেই।

অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আবার কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়ব ভেবে পা বাড়াতে সাহস হচ্ছে না।

ওদিকে গুলির শব্দ ও গর্জন বা আর্তনাদটা আবার থেমেছে। মনে হচ্ছে, কিষাণচাঁদ কিংবা সেই অজ্ঞাত দানবের লড়াই শেষ হয়েছে এতক্ষণে। কে জিতেছে কে জানে! আমি মনে জোর আনার চেষ্টা করতে থাকলুম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম জানি না, হঠাৎ পিছন থেকে আমার গায়ে টর্চের আলো পড়ল। ঘুরেই রিভলভার বাগিয়ে গর্জে বললুম,—কে তুমি?

আলোর পিছন থেকে চাপা অট্টহাসি হাসল কেউ। —কী? বুড়ো ঘুঘুর বাচ্চা! তুমি কেমন করে শ্মশান-গুহার ছাইগাদায় এসে জুটলে হে? তোমার বুড়ো ঘুঘুটি কোথায়? তার সাঙ্গপাঙ্গ টিয়া-বুলবুলি আর সেই হুতুম প্যাঁচাটাই কোথায়?

—আর একটা কথা বললে গুলি ছুঁড়ব।

—তার আগে তোমার মুণ্ডু উড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ না, এটা একটা স্টেনগান?

এবার লক্ষ করলুম, আলোর সামনে কালো একটা নল আমার দিকে তাক করে আছে। বললুম, —তুমি কি কিষাণচাঁদ?

—রিভলভার ফেলে দাও আগে। তারপর কথাবার্তা হবে।

—যদি না ফেলি।

—মুণ্ডুটি হারাবে। রেডি—ওয়ান ... টু ... থ্রি ...

রিভলভার ফেলে দিলুম। ছাইগাদায় ডুবে গেল। কিষাণচাঁদ এসে পায়ে ছাই সরিয়ে সেটা তুলে নিল। দেখলুম, ওর জামাপ্যান্টে রক্ত লেগে আছে। রক্তগুলো ওর নিশ্চয় নয়। কারণ ওকে আহত বলে মনে হচ্ছে না।

সে আমার জামার কলার খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। পায়ের ব্যথার কথা ভুলে গেলুম। নির্ঘাত শয়তানটা আমাকে জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছে।

নিচু ছাদওয়ালা একটা করিডোরের মতো জায়গা পেরিয়ে একটা প্রশস্ত ঘরে পৌঁছলুম। সেখানে দেখি, অনেক মাটির জালা রয়েছে। গুপ্তধন নাকি?

পরক্ষণে বুঝলুম, সব ছাইভর্তি অস্থিভস্ম। কত হাজার-হাজার লোকের অস্থিভস্ম কে জানে! মনে হল, একটু আগে যে ঘরে ঢুকে পড়েছিলুম—সে ঘরের জালাগুলো কেউ ভেঙে ফেলেছে বলে ছাই ঘরময় ছড়িয়ে রয়েছে।

কিষাণচাঁদ এবার পকেট থেকে একটা মোম জ্বালল। একটা জালার মুখে রেখে টর্চ নেভাল। তারপর বাঁকা হেসে বলল,—এবার খবর বলো হে ক্ষুদে ঘুঘু!

বললুম,—খবর সাংঘাতিক। তোমার দলবলকে মিলিটারিরা গ্রেফতার করে চালান দিয়েছে। এবার তোমার সেই দশা হবে। চারদিক মিলিটারিরা ঘিরে রেখেছে

কিষাণচাঁদ একটু ভড়কে গেল যেন। ভুরু কুঁচকে বলল,—তাই নাকি?

—হ্যাঁ! আর তোমার পরামর্শদাতা মুরুব্বি লারকানা জাদুঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকেও এতক্ষণ গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিষাণচাঁদ কী যেন ভাবল! তারপর বলল,—সেদিন প্লেনে আসতে-আসতে তোমার প্রতি আমার স্নেহ জন্মে গিয়েছিল। নয়তো এতক্ষণ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতুম না। তা ছাড়া তুমি সাংবাদিক। সাংবাদিক মারা আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা একই কথা। যাকগে, আমার এই ব্যবহারের বিনিময়ে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

—আলবাত করছি। আমি কৃতজ্ঞ ডঃ অনিরুদ্ধ যোশী! কিষাণচাঁদ বাঁকা হেসে বলল,—ডঃ অনিরুদ্ধ যোশীকে তোমার মনে ধরেছিল দেখছি। হুঁ, আমাকে কিন্তু অদ্ভুত মানিয়েছিল।

—দারুণ! আমি তো একটুও ধরতে পারিনি।

—কিষাণচাঁদ লাখে একটাই জন্মায় হে ছোকরা! যাকগে, এবার তোমাকে নিয়ে কী করব একটু ভাবা যাক। ... বলে সে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। ভাবতে থাকল।

বললুম,—আমি আপনাকে ডঃ যোশী বললে কি রাগ হবে কিষাণভাই?

—তুমি আমাকে ভাই বলছ?

—কেন বলব না? আমাকে এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি কি অকৃতজ্ঞ?

—হুঁ, তুমি এবার পথে এসেছ দেখছি। তা আমাকে ডঃ যোশী বললে আপত্তি করব না। পুনার ডঃ যোশীর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক জানো? আমরা দুজনে স্কুল-কলেজে সহপাঠী ছিলুম। সে

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের দুজনের চেহারাতেও দারুণ মিল! যাকগে সেকথা। শোনো, তোমাকে আমি ... হ্যাঁ মুক্তিই দেব। একটা শর্তে।

—বেশ, বলুন।

—হেহয়রাজার ঘোড়ার সেই ব্রোঞ্জের চাকতিটা আমার চাই।

—কিন্তু আমি কোথায় পাব? আমার কাছে তো ওটা নেই।

—তুমি এই কাগজে নিজের হাতে লেখ : 'আমি বন্দি আছি। আমার মুক্তিপণ হিটাইট ব্রোঞ্জচাকতি। পত্রবাহকের হাতে না দিলে আগামীকাল ভোর ছটায় এরা আমাকে মেরে ফেলবে।' নীচে নাম সই করে তারিখ দাও। আমার লোক এটা আজ রাতে তোমার কর্নেল সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবে। চাকতি কোথায় কীভাবে পৌঁছে দিতে হবে সেসব আলাদা চিরকুটে লিখে দেব। বাকি যা করার, আমি করব। নাও, লেখ।

সে পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে কাগজ ছিঁড়ল এবং একটা ডটপেন দিল। আমি কথাগুলো লিখে সই করে দিলুম, তারিখও দিলুম।

এবার কিষাণচাঁদ জালার ওপর রাখা একটা হ্যাভারস্যাক থেকে মোটা নাইলনের রশারশি বের করল। বুঝলুম, দেওয়াল বেয়ে এই গুহায় ঢোকার জন্য দরকার হবে বলে দড়ি এনেছিল সে।

দড়িতে আমার হাতদুটোকে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর বলল,—চলো, তোমাকে ভালো জায়গায় রেখে আসি। এখানে থাকলে তো তোমার স্যাঙাতরা এসে তোমাকে উদ্ধার করে ফেলবে।

একহাতে টর্চ আর আমার রিভলভার অন্য হাতে স্টেনগানের নল আমার পিঠে ঠেকিয়ে সে আমাকে ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল। আবার একটা নিচু ছাদওয়ালা সংকীর্ণ করিডোরের মতো জায়গা পেরিয়ে গেলুম। এতক্ষণে মনে হল অজস্র ঘর ও করিডোরওয়ালা গুহাটা প্রাকৃতিক গুহা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষরা বানিয়েছিল। এখানেই তারা সম্মানিত লোকেদের অস্থিভস্ম এনে জালায় রেখে দিত।

এবার যে চওড়া ঘরে ঢুকলুম, সেই ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠতে হল। একটা অক্টোপাসের গড়নের মতো জানোয়ার রক্তাক্ত শরীরে পড়ে আছে। বললুম,—ওটা কী প্রাণী? ওটার সঙ্গেই কি আপনি লড়াই করছিলেন তখন?

কিষাণচাঁদ খুশি হয়ে বলল,—হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছ, ওটার কী দশা হয়েছে।

—প্রাণীটার নাম কী ডঃ যোশী।

কিষাণচাঁদ আরও খুশি হয়ে বলল,—ওটা অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীব হেক্টোপাস। ...

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

হেক্টোপাস নামে এই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুটির রক্তাক্ত শরীর থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। এই ঘরেই যদি আমাকে বন্দি করে রাখে, তা হলে বমি করতে করতে নির্ঘাত মারা পড়ব। কিন্তু কিষাণচাঁদ আমাকে সেই ঘর থেকে আরেকটা ঘরে নিয়ে গেল।

এ ঘরের ছাদের ফাটল দিয়ে আকাশ দেখা গেল। তখন বুঝলুম, এই ঘরেরই ওপরটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে ফেলেছে কিষাণচাঁদ। ফাটলটা অনেকটা চওড়া। মেঝেভর্তি পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ভয় হল, এখনই ফাটলধরা ছাদটা ধসে পড়বে না তো?

কিষাণচাঁদ বলল,—এবার আমার কিছু হুকুম তামিল করো লক্ষ্মী ছেলের মতো।

—বলুন কী করতে হবে?

—এই টর্চটা ধরে থেকে আমাকে আলো দেখাবে।

—আমার হাত যে বাঁধা।

তাতে কোনো অসুবিধা হবে না সোনা! তোমার কব্জি দুটো পিছন থেকে বাঁধা আছে এই তো? আমি তোমার হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরিয়ে দিচ্ছি। তুমি এদিকে পিঠ রেখে দাঁড়াও। ব্যস! কিন্তু খুব সাবধান। আলো ওপরে ফেলার চেষ্টা করবে না। তা করলেই দেখতে পাচ্ছ, স্টেনগান রেডি আছে।

—কী করতে চান ডঃ যোশী?

কিষাণচাঁদ চোখ নাচিয়ে বলল,—বাহাদুর ছোকরা দেখছি হে! অ্যাঁ? ডঃ যোশী বলে আমাকে গলাবার চেষ্টা করছ যে! উঁহু, ও চালাকি বারবার খাটবে না। নাও, টর্চ ধরে থাক। সাবধান।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। সে আমার হাতে জ্বলন্ত টর্চ ধরিয়ে দিল। টর্চের মুখ দেওয়ালের দিকে। তারপর চোখের কোণা দিয়ে দেখলুম, সে একটা বড় পাথর ঠেলে এনে এক জায়গায় রাখল। সেই পাথরে তাকে উঠতে দেখে টের পেলুম সে কী করতে চায়।

আমাকে বেঁধে রাখা দড়ির ডগা সে নিজের কোমড়ে জড়িয়ে ভালোভাবে বাঁধল। তারপর ছাদের ফাটল আঁকড়ে ওপরে উঠে গেল। দড়িটা বেশি বড় নয়। টানটান হয়ে রইল। ওপর থেকে সে স্টেনগানের নল বের করে রাখতে ভুলল না। তারপর হুকুম দিল চাপা গলায়,—আঙুল বাঁকা করে টর্চের স্যুইচ অফ করে দাও।

চেষ্টা করে বললুম,—পারছি না যে!

—পারতেই হবে। স্যুইচ তোমার তর্জনীর কাছেই রেখেছি টিপে নীচের দিকে ঠেলে দাও।

অনেক কষ্টে টর্চ নেভাতে পারলুম। তখন সে বলল,—সাবধান! তোমার সঙ্গে আমিও বাঁধা আছি। কাজেই অন্ধকারে পালাবার চেষ্টা কোরো না। এবার যা বলছি, করো। ওই পাথরে উঠে দাঁড়াও।

দু-হাত পেছনে বাঁধা আছে। কিছুতেই উঠতে পারছি না। কোনোভাবেই ওঠা সম্ভব নয়। অথচ সে বারবার ফিসফিস করে বলছে,—কী হল? দেরি হচ্ছে কেন?

বললুম,—অসম্ভব। হাত বাঁধা মানুষ পাথরে চাপবে কী ভাবে?

—লাফ দাও না।

—অন্ধকারে লাভ দিয়ে হাড়গোড় ভাঙবে না? তা ছাড়া পাথরটা যে আড়াই ফুটের বেশি উঁচু মনে হচ্ছে।

—অপদার্থ! মুরগির যেটুকু জোর আছে তোমার নেই। আবার ঘুঘুগিরি করতে এসেছ! ঠিক আছে, তোমাকে ওঠাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি কষ্টদায়ক হবে তোমার কাছে।

অসহ্য লাগছিল। পা-মচকানো ব্যথা, তার ওপর বেঁধে রাখার ফলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে কব্জির ওখানটা ফুলে ঢোল হচ্ছে বুঝতে পারছি। খুব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তার ওপরে সেই অবস্থায় টর্চ ধরে আছি। দাঁতে দাঁত চেপে বললুম,—যা হয়, করুন। আর পারছি না।

আমাকে ওপর থেকে হ্যাঁচকা টানে শূন্যে ঝোলাল। আর্তনাদ করে উঠলুম। দুই বাহু ভেঙে গেল মনে হল। কিন্তু সে চাপা গর্জে বলল,—চুপ!

দ্বিতীয়বার হ্যাঁচকা টানে আমাকে শয়তানটা ফাটলের কাছে তুলে ফেলল। ওর গায়ে দানবের শক্তি যেন।

কিন্তু আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারলুম না। অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলুম জানি না, যখন জ্ঞান হল দেখি মুখের ওপর বিশাল নক্ষত্রভরা আকাশ ঝলমল করছে। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। তারপর টের পেলুম, আমি বালির ওপর শুয়ে

আছি। আমার বাঁধনটা আর নেই। কিন্তু উঠে বসার ক্ষমতাও নেই। এদিকে প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা। যন্ত্রণা ও ঠাণ্ডার চোটে কাতর হয়ে রইলুম।

আমার মাথা, কাঁধ, মুখ ও জামার ওপরটা ভিজে মনে হচ্ছিল। আমি অতিকষ্টে বললুম—কে আছ এখানে?

সঙ্গে সঙ্গে মাথার কাছ থেকে কিষাণচাঁদের সাড়া এল—এই যে সোনা! ঘুম ভেঙেছে দেখছি। অনেক কষ্ট দিলে হে। কিষাণচাঁদ জীবনে যা করেনি, তাকে দিয়ে তাই করালে। তোমার মতো একটা ক্ষুদে বিচ্ছুর সেবাও করতে হল।

—আমি কৃতজ্ঞ ডঃ যোশী।

—চুপ। বাঁদরামি করলে মুখ ভেঙে দেব।

বুঝলুম, কিষাণচাঁদ খামখেয়ালি প্রকৃতির লোক। এখন একরকম, তখন একরকম হয়ে ওঠে। ওর রাগ হয়, এমন কিছু করা উচিত হবে না। বললুম,—দাদা বললে কি আপত্তি করবেন কিষাণচাঁদজি?

—আমি কারুর দাদা নই।

—আমার সেবা করেছেন যে! দাদা ছাড়া ছোটভায়ের সেবা কেউ করে?

—করেছি নিজের স্বার্থে। চাকতিটা না পাওয়া পর্যন্ত যেভাবেই হোক তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

—তারপর বুঝি মেরে ফেলবেন?

—চাকতি পেলে দেখা যাবে।

—আপনি কিন্তু কথা দিয়েছেন, চাকতি পেলে আমাকে ছেড়ে দেবেন।

কিষাণচাঁদ কোনো কথা বলল না। মনে মনে শিউরে উঠলুম। তা হলে কি সে আমাকে মেরে ফেলবে চাকতি পেলেও?

জানি না, আমার চিঠি পেয়ে কর্নেল কী করবেন। আমাকে তিনি কত স্নেহ করেন, তা জানি। কিন্তু ওই চাকতিটা তো তাঁর ব্যক্তিগত জিনিস নয়। যখনই পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি ডঃ করিম এবং কর্নেল কামাল খাঁকে ওটা দেখিয়েছেন তখনই ওটা সরকারি সম্পত্তি হয়ে গেছে।

এই সময় কেউ এসে দাঁড়াল। কিষাণচাঁদ তাকে বলল,—দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ, স্যার। এই নিন, উনি চিঠিও দিয়েছেন।

ডাকাত সর্দারকে স্যার বলা শুনে এখন হাসার অবস্থা নয়। নয়তো হো হো করে হেসে ফেলতুম। কিষাণচাঁদ মন দিয়ে চিঠি পড়ছে এখন। পড়া শেষ হলে সে টর্চ নিভিয়ে জিজ্ঞেস করল—আর কী বললেন?

—বললেন, খাঁটি জিনিসই বটে।

—কখন দেখা হবে ওঁর সঙ্গে?

—চিঠিতে তো সব লিখে দিয়েছেন?

—তোমার মুখেই শুনি।

—কাল দশটায় তিন নম্বর গেটে থাকবেন।

—ঠিক আছে। চলো, রওনা হওয়া যাক।

—আপনার উট কী হল?

—পাঠিয়ে দিয়েছি। হারুনকে বলেছি, উট বেঁধে রেখে তাবারুর জিপ নিয়ে রুণ্ডিতে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। তুমি কোন পথে এলে?

—জুলং বাজার হয়ে।

—মিলিটারি আছে ওখানে?

—নাঃ। তবে শুনলুম, দুহালার দিকে একটা বড় কনভয় রাত বারোটায় রওনা দিয়েছে।

—ঠিক আছে। চলো রওনা হই।

—আসামির অবস্থা কী? কবর দিয়ে যেতে হবে নাকি?

কিষাণচাঁদ টর্চের আলো আমার মুখে ফেলল। ওর স্যাঙাত বলল,—তাজ্জব। এখনও তাজা হয়ে আছে যে স্যার!

কিষাণচাঁদ চাপা হেসে আমার উদ্দেশে বলল,—তা হলে ছোটঘুঘু! আসি আমরা। তুমি আরামে ঘুমোও। তোমাকে মুক্তি দেব বলেছিলুম, দিলুম। আমরা আসি।

ওঠার চেষ্টা করে বললুম,—আমি এখানে পড়ে থাকব? এ তো মরুভূমি!

—বাঙালি হয়ে জন্মেছ। মরুভূমি একবার দেখবে না কেমন বস্তু?

রাগে দুঃখে বলে উঠলুম,—আপনি এত নিষ্ঠুর কিষাণচাঁদজি! আপনি জবাব দিয়েছিলেন, চাকতির বদলে কর্নেলের কাছে আমাকে পৌঁছে দেবেন।

—মোটেও না। তেমন কিছু বলি নি। যা বলেছি, তা করেছি। তোমার ঠিকানা আমার লোক তোমার বুড়ো ঘুঘুকে দিয়ে এসেছে। অতএব ভাবার কিছু নেই। ওরা এসে তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে!

বলে কিষাণচাঁদ উটের পিঠে বসল। ওর স্যাঙাত উটের দড়ি ধরে নিয়ে চলল। আস্তে আস্তে দূরে উটের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। অন্ধকার রাতের মরুভূমিতে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডায় আহত শরীরে পড়ে রইলুম। চোখ ফেটে জল এল এতক্ষণে।

একটু পরে হঠাৎ মাথায় এল, এই মরুভূমিতে কর্নেলরা আমাকে খুঁজে পাবেন কীভাবে? ওঁরা খুঁজতে-খুঁজতে যদি বেলা হয়ে যায়, রোদ তীব্র হতে থাকে, তা হলে তো আমি তেষ্টাতেই মারা পড়ব! তারপর প্রচণ্ড উত্তাপ তো আছেই।

অতএব প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোরকমে যদি রাত থাকতে এগোবার চেষ্টা করি, তা হলে বাঁচার সুযোগ পেতেও পারি।

কিষাণচাঁদ যে দিকে গেল, সেই দিকে তাকিয়ে আবছা দূরে যেন সিগারেটের আগুন দেখলুম। মরিয়া হয়ে ওঠার চেষ্টা করলুম।

হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা চলার পর উঠে দাঁড়ালুম অতিকষ্টে। দুই কাঁধে ভীষণ যন্ত্রণা। আস্তে-আস্তে টলতে-টলতে পা বাড়ালুম। কখনও আছাড় খাচ্ছি, কখনও উঠে হামাগুড়ি দিচ্ছি। আবার কখনও কয়েক পা কুঁজো হয়ে হাঁটছি। এভাবে কিছুটা চলার পর মনে জোর এল।

যখনই দম আটকানোর মতো অবস্থা হল, তখনই থেমে চিত হয়ে শুয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। তারপর হাঁফাতে-হাঁফাতে এইভাবে এগিয়ে গেলুম।

একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র লক্ষ করে চলার ফলে কিষাণচাঁদরা পেথে গেছে, সেই পথেই যাচ্ছি মনে হল। সাদা বালির ওপর নক্ষত্রের আলো পড়ায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল উটের ও মানুষের পায়ের গভীর ছাপ।

একবার মনে হল কিষাণচাঁদের নাগাল পেয়ে গেছি। পরে দেখলুম, ভুল। বাতাসের শব্দ।

এইভাবে চলেছি তো চলেছি। কখনও হাঁটু ভর করে, কখনও বুকে হেঁটে। আবার কখনও উঠে দাঁড়িয়ে পা ফেলার চেষ্টা করছি। মাঝে মাঝে বিশ্রামও নিচ্ছি।

কিছুক্ষণ পরে উটের পায়ের দাগ হারিয়ে ফেললুম। সামনে উঁচু বালির পাহাড় আছে মনে হল। সেখানে গিয়ে অনেক চেষ্টা করেও ওটাতে উঠতে পারলুম না। প্রতিবার কিছুটা উঠে গড়িয়ে নীচে এসে পড়লুম।

বারবার চেষ্টার পর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লুম। শেষবার গড়াতে গড়াতে এত জোরে নীচে পড়লুম যে ঝাঁকুনির চোটে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন দিনের আলো ফুটছে।

অনেক কষ্টে মুখ তুলে চারপাশটা দেখলুম। তারপর আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। যতদূর চোখ যায়, শুধু বালি আর বালি। দিগন্তে আকাশ নিচু হয়ে এসে মিলেছে। মরুভূমি কাকে বলে, এতক্ষণে টের পেলুম।

একটু পরে সূর্য উঠবে। তারপর কী ঘটবে, স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

তবু মানুষের মনে কী যেন একটা শক্তি আছে। বেঁচে থাকার একটা সুতীব্র ইচ্ছা আছে। সেই শক্তি আর ইচ্ছা আমাকে সাহস জোগাল।

আবার ক্ষীণ একটা আশা জেগে উঠল, কর্নেলরা আমাকে খুঁজে বের করবেনই। বিশেষ করে কর্নেল কামাল খাঁ মিলিটারি কনভয় নিয়ে নিশ্চয় বেরিয়ে পড়েছেন ওর সঙ্গে। আমি চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে বসে রইলুম। এ আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। ...

জিপসি মেয়ে রমিতা

কিছুক্ষণ পরে দিগন্তের আকাশ লালচে হয়ে উঠছে, দেখে জানলুম ওটাই তাহলে পূর্বদিক। আমি উত্তর দিকেই এগিয়েছি। আমার পায়ের ছাপ দেখে সেটা বোঝা গেল। কিন্তু এবার সূর্য ওঠার সময় হয়েছে। দেখতে-দেখতে মরুভূমির সূর্য উঁকি দিল। লাল প্রকাণ্ড একটা চাকার মতো সূর্য। বুক শুকিয়ে গেল আতঙ্কে।

চাকাটা ক্রমশ বড় হতে-হতে এক লাফে মাটি ছাড়া হল। এক ভয়ংকর একচক্ষু দানব যেন আমাকে দেখতে পেয়েই লাল জিভ বের করে ঠোঁট চাটছে।

ওদিকে তাকাতে ভয় করছিল। তাই ঘুরে দক্ষিণে দৃষ্টি রাখলুম। তারপর এক আজব দৃশ্য দেখলুম। শূন্যে কী একটা কালো জিনিস ভাসছে।

জিনিসটা কাঁপতে কাঁপতে রঙ বদলাল ক্রমশ। মনে হল কী একটা প্রকাণ্ড চারঠেঙে প্রাণী দিগন্তের আকাশে নড়বড় করে পাখির মতো সাঁতার কাটছে।

একটু পরে দেখি, প্রাণীটা যেন একটা উট।

তা হলে কি মরুভূমিতে দিনের প্রথম মরীচিকা দেখতে পাচ্ছি আমি? মনে-মনে ঠিক করলুম, মরীচিকার দিকে তাকাবো না। মরীচিকার নাকি মায়া আছে। মানুষ বা প্রাণীকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায় এবং পরিণামে ওই মিথ্যার পিছনে ছোটাছুটি করে মারা পড়তে হয়।

কিন্তু আবার দেখবার ইচ্ছে হল ব্যাপারটা। তখন ঘুরে, স্পষ্ট দেখলুম সত্যি সত্যি একটি উট দৌড়ে আসছে। উটের পিঠে একটা ছাতার মতো কিংবা নৌকার ছইয়ের মতো জিনিস চাপানো রয়েছে এবং তাতে দু-জন মানুষ বসে আছে।

মরীচিকার পিছনে মানুষ ছোট। কিন্তু এ যে দেখছি মরীচিকাই আমার দিকে ছুটে আসছে। হতবাক এবং অসহায় হয়ে তাকিয়ে রইলুম।

ততক্ষণে সূর্যের রঙ সোনালি হয়ে উঠছে। দিগন্ত বিস্তৃত ধু ধু বালির সমুদ্রে তরল সোনার

স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেন। ক্রমশ উত্তাপ জেগে উঠছে শীতল বালিতে।

উটটা দেখতে দেখতে এসে পড়ল কাছাকাছি। তখন দেখলুম সামনের দিকে বসে আছে একটি কিশোরী মেয়ে। তার হাতে উটের দড়ি। পিছনে বসে আছে এক বৃদ্ধ। ওরা আমাকে দেখতে পেয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না।

তাই অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলুম,—বাঁচাও! বাঁচাও!

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরীটি উটের দড়ি টেনে ধরল এবং উটটা মুখ উঁচুতে তুলে দাঁড়িয়ে গেল।

আবার চিৎকার করে বললুম,—বাঁচাও! বাঁচাও!

উট দৌড়তে শুরু করছে আমার দিকে। এ কখনও মরীচিকা হতে পারে না। মরীচিকার কোনো ছায়া পড়ে না। কিন্তু এই উট এবং তার আরোহীদের লম্বাটে ছায়া পড়েছে।

উটটা এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কিশোরীটি ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বৃদ্ধ দুর্বোধ্য ভাষায় আমাকে কী বলল, বুঝতে পারলুম না। ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করলুম, পথ হারিয়ে বিপদে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করো।

উটকে ইশারা করতেই হাঁটু ভাঁজ করল। তখন বৃদ্ধ এবং কিশোরী নেমে দাঁড়াল। আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ এবার উর্দু ভাষায় বলল,—তুমি কে? এখান কেমন করে এলে?

উর্দু আর হিন্দিতে তফাত খুব কম। আমি হিন্দিতেই জবাব দিলুম,—আমি হিন্দুস্থানী। খবরের কাগজের লোক। দোশান মরুভূমি দেখতে এসে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। সারারাত ঘুরে মরছি।

বৃদ্ধ হাসল।—তাজ্জব কথা বটে। মরুভূমি দেখার শখ এত বেশি তোমার? ঠিক আছে। এসো আমাদের সঙ্গে। তবে আমার উটটা খুব ক্লান্ত। আগের রাতে আমরা গিয়েছিলুম এই মরুভূমির একটা তীর্থে। সেখানে এক পীরের দরগা আছে। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় রওনা দিয়েছিলুম। কিন্তু উটটা পাজি। পথ ভুল করে উল্টোদিকে চলে গিয়েছিল। তাই সকাল হয়ে গেল। আমরা ফিরে যাচ্ছি রুণ্ডির বাজারে।

বৃদ্ধের গায়ে একটা হাতকাটা ফতুয়া, পরনে ঢিলেঢোলা পাতলুন, কোমরে একপ্রস্থ কাপড় জড়ানো। মাথায় পাগড়ি আছে। তার কাছে একটা বল্লম আর সেকেলে গাদা বন্দুকও দেখতে পাচ্ছিলুম।

মেয়েটির পরনে একটা ঘাগরা। কোমরবন্ধ আছে। ফুলহাতা জামার ওপর একটা হাতকাটা ক্ষুদের জহরকোটের মতো সবুজ ও নকশাদার আঙরাখা চাপানো। পরনে সালোয়ার ও পায়ে নাগরা জুতো। তার চুল বেণীবাঁধা। মাথায় একটা রুমালও সুন্দরভাবে জড়ানো আছে। সে ফ্যালফ্যাল করে আমাকে দেখছে আর দেখছে।

সাজ-পোশাক দেখে মনে হল এরা কি জিপসিদলের লোক? তাই জিজ্ঞেস করলুম,—আপনারা কি রোমানি?

জিপসিরা নিজেদের রোমানি বলে। বৃদ্ধ জবাব দিল,—হ্যাঁ, আমরা রোমানি। আমাদের লোকেরা রুণ্ডি বাজারের ওখানে একটা মাঠে তাঁবু পেতেছে। আমি ওদের সর্দার। দলের জন্যে মানত দিতে গিয়েছিলুম। তা, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, খাওয়া জোটেনি। ঠিক আছে। রোদ বেড়ে যাচ্ছে। উটের পিঠে যেতে-যেতে খেয়ে নেবে।

উটের পিঠে সুন্দর গদির আসন। ছইয়ের মতো একটা কাঠামো চাপানো। তিন দিক তেরপলের মতো শক্ত কাপড়ে ঘেরা। ছাদও রয়েছে। আরামে বসব ভাবলুম। কিন্তু উট চলতে শুরু করলে বেজায় ঝাঁকুনি টের পেলাম। শরীরের ব্যথা বেড়ে গেল।

বৃদ্ধ খুব দয়ালু। সে একটা টিফিন কেরিয়ার বের করে একটুকরো মোটা রুটি, খানিকটা জেলির মতো জিনিস আর একমুঠো কিসমিস দিল। বলল,—খেয়ে নাও। আর এই রইল জল। সবটাই খেয়ে নিতে পার। আর আমাদের জলের দরকার হবে না। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পৌঁছে যাব।

ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটিয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে গল্প শুরু করলুম। কথায় কথায় জানা গেল, বৃদ্ধ সর্দারের নাম মেহেরু। ওর মেয়ের নাম রমিতা। ওরা রুণ্ডিবাজারে এসেছে দিন সাতেক আগে। তার আগে ওরা ছিল কাফরিস্তানে। সেটা বালুচিস্তান ও ইরানের মধ্যে একটা পাহাড়ি এলাকা। কাফরিস্তানে থাকার সময় ওদের তিনটে ভেড়া মারা পড়েছে অসুখে। রুণ্ডিতে এসে কয়েকটা মুরগি মারা পড়েছে। ওদের ধারণা, শয়তানের নজর পড়েছে ওদের দলের ওপর। তাই তিখারি মরূদ্যানের তীর্থে পুজো দিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রমিতার সঙ্গেও আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আমি কোন দেশের লোক সে-দেশটা কেমন—সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। তারপর অবাক হয়ে গেল যেন। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সবুজ বাংলার ছবি ওর কল্পনায় আসছিল না। তারপর কলকাতার কথা উঠল। কলকাতার কথা ওরা শুনেছে। বড় আজব শহর পুবের দেশে নাকি। বাবা ও মেয়ে অজস্র প্রশ্ন করে কলকাতা শহরের কথা জেনে নিল। তারপর বুড়ো বলল,—কলকাতা না দেখে ওর মৃত্যু হবে না। দেখা চাই। তবে সে তো বহুদিনের রাস্তা। সেই যা সমস্যা। ...

ঘণ্টা দেড়েক চলার পর দিগন্তে রুণ্ডি বাজারের বাড়িগুলো ভেসে থাকতে দেখা গেল। একটু ভয় হল এবার। কিষাণচাঁদ রুণ্ডির কথা বলছিল। ওখানে নিশ্চয় ওর লোকজন আছে। আমাকে কি তারা চিনতে পারবে?

আরও আধঘণ্টা চলার পর আমরা রুণ্ডি পৌঁছে গেলুম। রুক্ষ অনুর্বর পাহাড়ি এলাকা। কিছু কল-কারখানা আছে দেখলুম। শহরের বাইরে একটা উপত্যকায় জিপসিদের গোটা পাঁচেক তাঁবু রয়েছে। ছাগল-ভেড়া-দুম্বা আর মুরগির পাল আছে। বেঁটে কয়েকটা ঘোড়া আর উটও আছে। কুকুর আছে একডজন। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করছিল কুকুরগুলো। দু-জন জোয়ান জিপসি তাদের তাড়া করে ভাগিয়ে দিল। তারপর তিরিশ-বত্রিশ জন ক্ষুদে ও বড় নানা বয়সের জিপসি নারী পুরুষ আমাকে ঘিরে ধরল। সর্দার মেহেরু তাদের অল্প কথায় ব্যাপারটা শুনিয়ে আমাকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল।

তাঁবুর মধ্যে একটা খাটিয়ায় সুন্দর বিছানা পাতা রয়েছে। আমাকে শুয়ে পড়তে বলল। একটু পরে রমিতা এল হাসতে-হাসতে। ভাঙা উর্দুতে বলল,—ভাইজি। আপনার স্নান করা দরকার। আমি জল এনেছি কুয়ো থেকে। স্নান করে নিন।

বেরিয়ে দেখি, তাঁবুর সামনে একটা টুল পেতে রেখেছে। দুটো প্লাস্টিক বালতিতে জল রয়েছে। রমিতার হাতে সাবানের কৌটো আর তোয়ালে। শুধু তাই নয়, একপ্রস্থ পোশাকও এনেছে।

টের পাচ্ছিলুম, জিপসিরা একালের শহরে মানুষের ব্যবহৃত সব জিনিসই ব্যবহার করে। স্নান করার পর শরীরের ব্যথা অনেকটা কমে গেল। রমিতা ছাগলের টাটকা দুধ এনে দিল এক গ্লাস। বলল,—ভাইজি, খেয়েদেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। খাবার সময় হলে ডাকব।

চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। আমার পরনে এখন জিপসি পোশাক। ঘুমিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলুম। মরুভূমির মধ্যে দুলতে দুলতে উটের পিঠে চলেছি তো চলেছি। রমিতা বলছে—ভাইজি! বাংলা মুল্লুক আর কতদুর। ...

ঘুম ভেঙে দিল কার ভারী গলার ডাকাডাকিতে। তারপর চোখ খুলে কয়েক মুহূর্ত বুঝতে পারলুম না—কোথায় আছি।

—ডার্লিং! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে বসলুম। এই কণ্ঠস্বর এবং এই বাক্যটি বহুকালের পরিচিত।

দেখি, আমার খাটিয়ার পাশে একটা টুলে বসে আছে আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

নিশ্চয় আবার বিদঘুটে একটা স্বপ্ন দেখছি। চোখ কচলে বললুম,—আপনি কি সত্যিই কলকাতার ইলিয়ট রোডবাসী সেই বৃদ্ধ ঘুঘু?

—অবশ্যই সত্য, ডার্লিং!

—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? জয়ন্ত তো কিষাণচাঁদের হাতে মারা পড়েছে। আমি জয়ন্ত নই! দেখছেন না আমি একজন জিপসি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—লজ্জা করেনি আপনার আমার কাছে আসতে? কাল সারারাত আমি মরুভূমিতে কী ভোগান না ভুগেছি নেহাত বাবা-মা'র পুণ্যে কোনোমতে বেঁচে গেছি।

কর্নেল হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—সব শুনেছি। জয়ন্ত, আমাদের ক্ষমা করো। তোমাকে উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। সারাটা রাত পুরো একটা মিলিটারি কনভয় নিয়ে কর্নেল কামাল খাঁ আর আমি দোশান মরুভূমি তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছি। কিষাণচাঁদ যে পথনির্দেশ দিয়েছিল, তা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যে। ওর নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই।

—আমি জিপসি তাঁবুতে আছি, কে বলল?

—তোমাকে সারারাত খোঁজাখুঁজি করে আমরা রুণ্ডির দিকে আসছিলুম। একস্থানে উটের পায়ের ছাপ দেখে সন্দেহ হল। পরীক্ষা করে দেখলুম, বালিতে কেউ শুয়েছিল। আশেপাশে কয়েকটা জুতোর ছাপও রয়েছে। তারপর উটের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে আমাদের গাড়ি এগোল। ছাপ গেছে সোজা উত্তরে। তখন ভাবলুম, হয়তো কিষাণচাঁদ তোমাকে এখনও ছেড়ে দেয়নি। কোনো কারণে আরও কোনও তথ্য আদায় করতে চায়। যাই হোক, এইমাত্র রুণ্ডি পৌঁছে খবর নিতে শুরু করলুম।—দোশান থেকে কোনো উটওয়ালা এদিকে এসেছে নাকি। তারপর সেইসূত্রে এদের তাঁবুতে এসে দৈবাৎ তোমাকে পেয়ে গেলুম।

তাঁবুর সামনে ভিড় জমেছিল। দুজনে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, কর্নেল কামাল খাঁ একদল সেপাই নিয়ে আসছেন। জিপসিদের মুখে আতঙ্কের ছাপ পড়েছে। ব্যাপারটা কর্নেলকে বললুম। তখন তিনি ওদের উদ্দেশে ছোটখাটো একটা ভাষণ শুরু করলেন। কর্নেল যে এত চমৎকার উর্দু জানেন, কে জানত।

কর্নেলের বক্তৃতা শুনে ওরা খুশি হল। জিপসিরা খুব আমুদে। কেউ কেউ অতি উৎসাহে নাচগান জুড়ে দিল আমাদের ঘিরে।

ভিড় ঠেলে রমিতা এতক্ষণে এসে আমার হাত ধরল।—ভাইজি, তুমি নাকি চলে যাচ্ছ?

—যাচ্ছি বোন!

—বা রে! তোমার জন্যে খানার জোগাড় হয়েছে না? তুম আমাদের মেহমান (অতিথি)।

কর্নেল ওর চিবুক সস্নেহে নাড়া দিয়ে বললেন,—বেটি! এ বুড়ো বুঝি মেহমান নয়?

রমিতা সলজ্জ হেসে মাথা দুলিয়ে বলল,—হ্যাঁ, তুমিও মেহমান।

কর্নেল কামাল খাঁ ভিড়ে উঁকি মেরে বললেন,—আর আমি?

রমিতা ভেংচি কেটে বলল,—তুমি তো মিলিটারি আদমি। মানুষ মারো। তুমি দূর হও এখুনি।

সর্দার মেহেরু বলল,—ছি, ছি বেটি! সবাই মেহমান। আজ সবাই খাবে। আজ আমাদের জীবনে একটা খুশির দিন। তিখারির পীরবাবা আমাদের দয়া করেছেন। তাই এত সব বড়া আদমি আমাদের তাঁবুতে এসেছেন।

বলে সে জিপসি ভাষায় ভিড়ের উদ্দেশে কিছু বলল। অমনি ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। কাঠের খুঁটি পুঁততে শুরু করল জোয়ানরা! তার ওপর রঙিন নকশাকাটা শামিয়ানা চড়াল। বুঝলুম, রীতিমতো একটা পার্টির আয়োজন হচ্ছে। কী সুন্দর ঝালরওয়ালা শামিয়ানা!

একটু তফাতে তেরপলের ছাউনির তলায় উনুনে বড়-বড় পাত্রে রান্না চাপল। যাকে বলে কমিউনিটি ভোজ। একসঙ্গে ওরা খায়। এখন হঠাৎ মেহমান এসে পড়ায় বাড়তি খাদ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। দুজন জোয়ান একটা মস্ত দুম্বা নিয়ে গেল টানতে টানতে। নিশ্চয় ওই দুম্বার মাংসে অতিথিদের সেবা হবে।

গতিক দেখে কর্নেল কামাল খাঁ ওঁর দলবলকে ধমক-ধামক দিয়ে কোথায় যেন পাঠিয়ে দিলেন। পঞ্চাশজন সেপাইয়ের খাবার জোগানো এদের ওপর অত্যাচারের শামিল হত। জনা দুই মিলিটারি অফিসার এবং স্বয়ং কামাল খাঁ রয়ে গেলেন। একটা জিপ থাকল। জিপ ঘিরে জিপসি ছেলেমেয়েরা খেলা জুড়ে দিল। উজ্জ্বল রৌদ্রে বিশাল নীল আকাশের তলায় রঙিন পোশাকপরা ছেলেমেয়েদের মনে হচ্ছিল প্রজাপতির ঝাঁক।

এদিকে তাঁবুর সামনে একদল যুবক-যুবতী। গিটারের বাজনার সঙ্গে নাচগান শুরু করেছে। দেখলুম, বিশালদেহী কর্নেল কামাল খাঁকে ওরা টানতে টানতে ভেতরে ঢোকাল। তারপর তাজ্জব হয়ে গেলুম। মাথার ওপরে একটা হাত ঘুরিয়ে এবং মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিয়ে ভুঁড়ি দুলিয়ে ও কোমর ঘুরিয়ে গোয়েন্দা দফতরের মিলিটারি অধিকর্তা সে কী নাচ নাচছেন!

হঠাৎ রমিতা দৌড়ে এসে কর্নেল বুড়োকে হ্যাঁচকা টান দিল।

তারপর দেখলুম, বুড়ো আসরে ঢুকে গেছেন। এবং দিব্যি নাচ শুরু করেছেন। কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের নাচ দেখব, সে কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম?

ওদের নাচগান চলতে থাকল। সর্দার মেহেরু আমাকে নিয়ে গেল ওর সেই তাঁবুতে। তারপর বলল,—তুমি কমজোর হয়ে গেছ, বেটা। তুমি রোদে ঘুরো না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। খেতে একটু দেরিই হবে। ততক্ষণ তুমি আংরেজি কেতাবটা পড়তে পার।

বইটা দেখে অবাক হলুম। জাঁ পল সার্ত্রের লেখা ফরাসি বইয়ের ইংরাজি অনুবাদ : দা জিপসিজ। বললুম, এই বই কোথায় পেলেন সর্দারজি?

মেহেরু বলল,—এক সাহেব দিয়েছিল। আমাদের খবরা-খবর জানতে এসেছিল। তখন আমরা কাফ্রিস্তানে ছিলুম। ওটা তুমি ইচ্ছে করলে নিতে পার। আমরা কী করব ও নিয়ে?

বইটা পড়তে শুরু করলুম। অনেক খবর জানা গেল। এরা আসলে ভারতেরই বাসিন্দা ছিল কোনো যুগে। এদের ভাষায় হিন্দুস্থানী শব্দ প্রচুর। রোমানি কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'রম্যানি' থেকে। তার মানে ভ্রমণকারী। ফার্সিতে রম্ মানেও ভ্রমণ। 'রমতা' মানে বেড়াচ্ছে।

তাহলে রমিতার মানে দাঁড়ায়—যে মেয়ে সারাজীবন বিশ্বজুড়ে ঘুরে বেড়াবে বলে জন্মেছে। হায়, আমি যদি একজন জিপসি হতুম, রমিতা হত আমার ছোটবোন!

আবার মোহেনজোদাড়ো

রওনা হতে পাঁচটা বেজে গেল। রমিতার জন্য রুণ্ডি বাজার থেকে কয়েকটা সুন্দর পাথরের মালা আর একজোড়া সোনার দুল কিনে এনেছিলুম। সেগুলো পেয়ে রমিতা কি খুশি!

কিন্তু যাবার সময় সে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল,—ভাইজি এমন করে চলে যাবে জানলে ওই মরুভূমিতেই ফেলে রেখে আসতুম।

ওকে আদর করে বললুম,—বোনটি আমার! রাগ করো না। আবার দেখা হবে।

সে বেণী দুলিয়ে জোরে মাথা নেড়ে বলল,—হবে না। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের দুবার দেখা হয় না।

—বেশ। তা হলে মরে গিয়ে আমি তোমাদের দলে জন্মাব।

রমিতা কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ, ভেংচি কেটে দৌড়ে চলে গেল তাঁবুর দিকে। কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ের চড়াইয়ে ওঠার সময় ঘুরে নীচের উপত্যকার জিপসি তাঁবুগুলোর দিকে তাকালুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম, উপত্যকার পুবদিকের টিলার চূড়ার একটা পাথরের ওপর রমিতা দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে রুমাল নাড়ছে।

আমি হাত নেড়ে মনে মনে বললুম—বিদায় রমিতা! বিদায়! মন খারাপ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। এই যাযাবর মানুষগুলোর সম্পর্কে কত ভুল ধারণা ছড়িয়ে আছে। ওরা নাকি চোর-ডাকাত, খুনে এবং জাদুকর।

মনে হল, সব মিথ্যা। ওদের চির-যাযাবর জীবনের আনন্দ, ওদের স্বাধীনতা আর বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম জীবন দেখে ঈর্ষাবশত আমরা ওদের নামে বদনাম রটাই।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের জিপ পৌঁছল একটা প্রশস্ত হাইওয়েতে। অজস্র যানবাহন যাতায়াত করছে। কর্নেল কামাল খাঁ জানালেন—এই হাইওয়ে লারকানায় পৌঁছেছে। উনি জিপ চালাচ্ছেন। কর্নেল ও আমি ওর ডানপাশে বসেছি। এতক্ষণে কর্নেলকে জিজ্ঞেস করার সময় পেলাম। —শেষ পর্যন্ত কী হল গুপ্তধনের?

কর্নেল বললেন,—হিটাইট সীলমোহরের অবিকল একটা নকল ভাগ্যিস আগেভাগেই তৈরি করিয়ে রেখেছিলুম। সেটা দেওয়া হয়েছে কিষাণচাঁদকে। চিত্রলিপি অদলবদল করা হয়েছে ডঃ তিড়কের সাহায্যে। ওই সূত্র ধরে কিষাণচাঁদ ফাঁদে পড়বে। কামালসাহেব ফাঁদ পেতে রেখেছেন। মোহেনজোদাড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লুকিয়ে আছে ওঁর বাহিনী।

—গতরাতে দুহালার সেই গুহায় কি আমার খোঁজ করেননি আপনারা?

—করেছিলাম। তোমাকে পাইনি। তারপর ...

—থাক ও কথা। এবার হিটাইট সীলমোহরটার কথা বলুন।

—ওটা হিটাইটরাজ তাবার্নার সীলমোহর। ওটা একটা আদেশপত্র। তাতে লেখা আছে :

'এতদ্বারা হিটাইটরাজ তাবার্না তার পুত্র হেহয়কে আদেশ দিচ্ছেন, প্রিয় সখা ইন্দিলম্মার অস্থিভস্ম সিন্ধুতীরবর্তী সূর্য-উপাসক সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।'

বললুম,—কিন্তু হেহয় তো উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন!

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, ও ঘটনা আর্যদের আগমনের প্রথম যুগের। হিটাইটরাও আর্য। আর্যদের যে-গোষ্ঠীকে বলা হয় ইন্দো-ইরানীয়, তাদের উপাস্য দুই দেবতা অসুর ও দেবকে কেন্দ্র করে পরস্পর সংঘর্ষ বেধেছিল। দেব-ভক্ত আর্যগোষ্ঠী পালিয়ে এসে পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করে। অসুর-ভক্তরা ইরানে থেকে যায়। ওদিকে একদল হিটাইটও কাশ্মীর হয়ে ভারতে এসে বসতি করে। তাবার্নার পুত্র হেহয় ছিল এই গোষ্ঠীর নেতা। এ পর্যন্ত আমরা প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাস পাচ্ছি। পরেরটুকু এই চাকতি থেকে অনুমান করে নিতে হয়েছে।

—বলুন, শুনি।

—সম্ভবত দেবভক্ত আর্যদের আর একটা দল সূর্য-উপাসক হয়ে ওঠে এবং দুহালায় গিয়ে বাস করতে থাকে। তাদেরই নেতার নাম ইন্দিলাম্মা। ইন্দি শব্দটাতে সিন্ধুর আভাস আছে। যাই হোক, ইন্দিলাম্মা হিটাইটরাজ তাবার্নার প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হাট্টিদেশে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাই তাবার্না তার অস্থিভস্ম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পুত্র হেহয়ের কাছে উত্তর ভারতে। এর পর কী

ঘটেছিল, তিব্বতি মঠের পুঁথিতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার। গৌতম বুদ্ধ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের। আর এ ঘটনা তার আড়াই হাজার বছর আগের। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বৌদ্ধধর্ম আরও প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ ১৯তম বুদ্ধ ছিলেন। কাজেই আর্যযুগেও বৌদ্ধ ছিল। তিব্বত অঞ্চলে। হেহয় এই সময় রাজ্যচ্যুতি হন এবং পিতৃ আদেশ পালন করতে ঘোড়ার পিঠে একটা বাক্সে ইন্দিলাম্মার চিতাভস্ম নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পশ্চিম-তিব্বত ঘুরে তিনি কাশ্মীর হয়ে পাঞ্জাব পেরিয়ে দুহালা পৌঁছানো নিরাপদ মনে করেছিলেন। তারপর যথাসময়ে তিনি পৌঁছান মোহেনজোদাড়ো শহরে। বাক্সে বিন্দুচিহ্ন মৃতের প্রতীক। শ্মশানগুহার জালার গায়ে এই চিহ্ন আমরা দেখেছি।

—কিন্তু তিনি অস্থিভস্মের বাক্স পুঁততে গেলেন কেন?

—ডঃ তিড়কে ব্রোঞ্জের সেই ফলকটা পরীক্ষা করে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছেন। ঘোড়াটার যে চিত্রকল্প আঁকা হয়েছে, তা একটা রুগ্ন ঘোড়ারই। কারণ ঘোড়ার পেটের দিকটায় টানা কয়েকটা রেখা আছে। ওগুলো পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়া ঘোড়া। তা না হলে স্বাভাবিক নীতিতে অন্যান্য জীবজন্তুর ছবির মতোই পেটটা চৌকো করে আঁকা হত। কোন রেখার আঁকিবুকি থাকত না?

—খুব যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা। তারপর?

—ঘোড়াটা বাক্স বইতে পারছিল না। ওদিকে সম্ভবত দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত হেহয় দুহালা পৌঁছতে পারেননি। বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন মোহেনজোদাড়োতে। কিন্তু পবিত্র অস্থিভস্মের বাক্স দেখে লোকেরা কানাকানি শুরু করেছিল। পাছে বাক্সটা কেউ কেড়ে নিয়ে ধনরত্নের বদলে ছাই দেখে তা নষ্ট করে ফেলে, তাই হেহয় ওটা সেবারের মতো নির্জন কোনো গুপ্তস্থানে পুঁতে রাখতে গিয়েছিলেন। ঘোড়াটাও আর ভার বইতে পারছিল না। তাঁর পক্ষে বাক্স বয়ে নিয়ে সৌর উপাসক সম্প্রদায়ের জনপদ খুঁজে বের করা কঠিন কাজ। ফলে যা স্বাভাবিক, তাই করতে গেলেন এবং এক গুপ্ত অনুসরণকারীর পাল্লায় পড়লেন। আশা করি, আবার সব স্পষ্ট হয়েছে তোমার কাছে।

—হয়েছে। তা হলে অস্থিভস্মের জন্যেই এতকাল ধরে এত হাঙ্গামা আর খুনোখুনি? ভ্যাট! কোনো মানে হয়?

হ্যাঁ, জয়ন্ত। অলীক গুপ্তধনের নেশা। এ নেশা চিরকালের।

একটু পরে জিজ্ঞেস করলুম,—ফকিরসাহেব কোথায় আছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—করাচি রওনা হয়ে গেছেন। সেখান থেকে মক্কাতীর্থে যাবেন। সেখানেই বাকি জীবন সন্ন্যাসব্রতে কাটাবেন।

—একটা প্রশ্নের জবাব বাকি আছে।

—কী?

—কাল সন্ধ্যায় সব জেনেও কেন দুহালা অভিযানে গিয়েছিলেন? খামোকা যত রাজ্যের বিপদ আমাকেই ভুগিয়ে ছাড়লেন।

কর্নেল জোরে হাসলেন,—গিয়েছিলুম, শ্মশানগুহায় হেহয়ের বাক্সটারই সন্ধানে। সেই সঙ্গে বন্ধুবর কামাল খাঁয়ের প্ল্যান ছিল দুর্ধর্ষ ডাকু কিষাণচাঁদকে বন্দি করা।

কর্নেল কামাল খাঁ বললেন,—কাল হাত ফসকে পালিয়েছিল। উটের পিঠে যে জয়ন্তবাবুকে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাটা, কীভাবে বুঝব? ব্যাটা ছদ্মবেশ ধরতে ওস্তাদ। দিব্যি উটওয়ালা সেজে নাকের ডগা দিয়ে চলে গেল। তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। তবে আজ আর নিস্তার নেই। ফাঁদে পড়বেই।

বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, অস্থিভস্মের বাক্সটা কি পেয়েছেন?

কর্নেল বললেন,—পেয়েছি। শ্মশানগুহায় একটা জালার মধ্যে ছিল। পাথরের বাক্স। দু ফুট

চওড়া আড়াই ফুট লম্বা। মজার ব্যাপার, হেহয়ের হত্যাকারী এটা পৌঁছে দিয়ে থাকবে। সেই বাক্সের গায়েও অবিকল একই কথা লিখে রেখেছে সে। ব্রোঞ্জের ফলকে এবং ঘোড়ার চোয়াল রাখা সিন্দুকের গায়ে লেখা ছিল, হুবহু তাই। বোঝা যায়, খুব অনুতপ্ত হয়েছিল লোকটা। ...

বাকি পথ আমরা চুপচাপ ছিলুম। জিপের গতি ক্রমশ বাড়ছিল। সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেলুম লারকানায়। সেই হোটেলের পরিচিত ঘরে আমাদের পৌঁছে দিয়ে কর্নেল কামাল খাঁ চলে গেলেন।

অনেক রাতে কর্নেলের ডাকে ঘুম ভাঙল। কর্নেল বললেন,—সুসংবাদ ডার্লিং! এইমাত্র বন্ধুবর কামালের ফোন পেলুম। মোহেনজোদাড়োর শস্যগোলার ওখানে কিষাণচাঁদ এবং তার সঙ্গীরা ধরা পড়েছে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোও! অনেক ভোগান্তি গেছে তোমার ওপর। তবু তোমার বাকি রাতের সুনিদ্রার কথা ভেবে তোমাকে এই খবর দেওয়া জরুরি ভেবেছিলুম। আর ডার্লিং জয়ন্ত, আগামীকাল সকালে আমরা সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাব। শুভরাত্রি। সুনিদ্রা সুখের হোক! ....

ঠাকুরদার সিন্দুক রহস্য

সময়টা ছিল নভেম্বরের গোড়ার দিকে এক রবিবারের সকালবেলা। ইলিয়ট রোড এলাকায় কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে তাঁর জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে আড্ডা দিচ্ছিলুম। কর্নেল গভীর মনোযোগে টাইপরাইটারে কীসব টাইপ করছিলেন। মাঝে-মাঝে তিনি পোস্টকার্ড সাইজ কীসের রঙিন ছবি তুলে দেখছিলেন এবং আবার টাইপে মন দিচ্ছিলেন। অবশেষে বুঝতে পেরেছিলুম, তিনি বিরল প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিড কিংবা ক্যাকটাস সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন। দেশে ও বিদেশে প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে খ্যাতি তাঁর কম নয়। এই বৃদ্ধ বয়সেও যে-কোনো শক্তিমান যুবকের মতো তিনি দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল-মরুভূমি চষে বেড়াতে পারেন। লক্ষ করছিলুম, দাঁতে-কামড়ানো চুরুটের নীল একফালি ধোঁয়া উঠে তাঁর প্রশস্ত টাকের ওপর ঘুরপাক খেতে-খেতে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঝকঝকে সাদা দাড়িতে চুরুটের একটুকরো ছাই আটকে ছিল। জানতুম টাইপ করা শেষ না হলে ছাইটুকু খসে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

সোফার এককোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার—আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই'। তাঁর ডানহাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর চিমটিতে একটুখানি নস্যি। কখন সেটা নাকে গুঁজবেন বোঝা যাচ্ছিল না।

হালদারমশাই একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। রিটায়ার করার পর একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। মাঝে-মাঝে তাঁর এই এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেন। কখনও-সখনও দু-একটা কেসও পান। কেস জটিল হলে তিনি 'কর্নেলস্যারের লগে কনসাল্ট' করতে আসেন। তবে আজ তাঁর হাবভাব দেখে বুঝতে পেরেছিলুম, কোনো কেসের ব্যাপারে কর্নেলের কাছে আসেননি।

নভেম্বর মাস শুরু হয়ে গেলেও এখনও কলকাতায় শীতের কোনো সাড়া নেই। প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে দুটো সিলিংফ্যান পূর্ণ বেগে ঘুরছিল। একসময় নস্যি নাকে গুঁজে প্যান্টের পকেট থেকে নোংরা রুমাল বের করে নাক মুছলেন গোয়েন্দাপ্রবর কে. কে. হালদার। তারপর আপনমনে বললেন,—পড়বার মতন খবর নাই। জয়ন্তবাবু! আপনাগো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা কী যেসব ল্যাখে, বুঝি না! খালি ন্যাতাগো বক্তৃতা। বক্তৃতা কি খবর? খবর কই গেল?

খবর আছে হালদারমশাই!—কর্নেল বলে উঠলেন। দেখলুম, এতক্ষণে তাঁর টাইপ করা শেষ হয়েছে। কাগজগুলো গুছিয়ে ছবিগুলো তার সঙ্গে ক্লিপে এঁটে তিনি একটা প্রকাণ্ড খামে ঢোকাচ্ছিলেন। তাঁর দাড়ি থেকে চুরুটের ছাইটা এবার খসে পড়ে গেছে। হালদারমশাইয়ের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন,—আপনার পড়ার মতো খবর জয়ন্তদের কাগজেই আছে।

হালদারমশাই কর্নেলের দিকে গুলিচোখে তাকিয়ে বললেন,—কী খবর আছে কর্নেলস্যার?

—ছয়ের পাতায় মফস্বলের খবর দেখুন! তিন নম্বর কলামে বোল্ড টাইপে ছাপা!

গোয়েন্দাপ্রবর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাতা উল্টে একটু ঝুঁকে বসে বিড়বিড় করে কী একটা খবর পড়তে শুরু করলেন।

একটু পরে তিনি খিখি করে হেসে উঠলেন,—অ্যাঁ? মৎস্যজীবীদের জালে মুণ্ডুকাটা কালো কুকুর! এটা কী হইল? মুণ্ডুকাটা মাইনষের বডি হইলে কথা ছিল। মুণ্ডুকাটা কুত্তার লাশ!

কর্নেল খামটা ড্রয়ারে ভরে সোফার কাছে তাঁর ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। মিটিমিটি হেসে বললেন,—মুণ্ডুকাটা কালো কুকুরের লাশ আপনার খবর বলে মনে হচ্ছে না হালদারমশাই?

হালদারমশাই বললেন,—বুঝলাম না কর্নেলস্যার। জয়ন্তবাবু কই, মশায়! আপনাগো সাংবাদিকগো হাতে যখন ল্যাখনের মতো খবর থাকে না, তখন মুণ্ডুকাটা কালো কুত্তারে খবর কইরা ফ্যালেন!

বললুম,—কর্নেল ঠিক ধরেছেন। আপনি ধরতে পারেননি।

—ক্যান?

—চিন্তা করে দেখুন! দেবতার সামনে মুণ্ডু কেটে বলিদান করা হয় পাঁঠা। কোথাও-কোথাও মোষের মুণ্ডু কেটেও বলিদানের প্রথা আছে। প্রাচীন যুগে নাকি এইভাবে নরবলির প্রথাও ছিল। কিন্তু কুকুর বলিদান! কোন দেবতা কুকুর-বলি পেলে খুশি হন? এটা একটা রহস্য না?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—নাঃ। পোলাপানগো কাম। মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি! পাড়াগাঁয়ে দেখছি, পোলাপানরা শেয়ালের ছানার মুণ্ডু কাটত। বড়রা বাধা দিত না। ক্যান কী, শেয়াল অগো ছাগল, হাঁস-মুরগি খাইয়া ফ্যালে! কিন্তু কুত্তা হইল গিয়া উপকারী প্রাণী। রাত্রে পাড়ায় চোর ঢুকলে কুত্তা চ্যাঁচাইয়া মাইনষেরে সাবধান করে।

কর্নেল বললেনে,—হালদারমশাই! আপনি নিজেই কুকুর-বলির রহস্য ফাঁস করে দিলেন কিন্তু!

—ফাঁস করলাম! কন কী কর্নেলস্যার?

—হ্যাঁ। পাড়ায় রাতবিরেতে চোর ঢুকলে কুকুর চ্যাঁচামেচি করে মানুষকে সাবধান করে। এটা আপনারই কথা। কাজেই চোরেরা সেই কুকুরকে রাগের বশে বলি দিতেই পারে। আর একটা কথা। খবরের শেষ লাইনটা আপনি পড়েননি।

হালদারমশাইয়ের গোঁফের দুই ডগা উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি খবরের কাগজ তুলে আবার বিড়বিড় করে পড়তে থাকলেন। তারপর শেষ লাইনটা আওড়ালেন : খবর পেয়ে দোমোহানির থানার পুলিশ মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে মুণ্ডুকাটা কালো কুকুরের লাশ উদ্ধার করেছে।

কর্নেল বললেন,—কী বুঝলেন এবার?

হালদারমশাই চাপাগলায় বললেন,—পুলিশ! তা হইলে খবরের একখান ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। কিন্তু দোমোহানির নিজস্ব সংবাদদাতা তা ল্যাখে নাই ক্যান, বুঝি না।

আমি বললুম,—নিজস্ব সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর জায়গার অভাবে কেটেছেঁটে ছাপানো হয়।

ঠিক এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

কর্নেলের এই ড্রয়িংরুমে ঢুকতে হলে ডাক্তারবাবুদের জন্য অপেক্ষারত রোগীদের ঘরের মতো একটা ঘর পেরিয়ে আসতে হয়। কর্নেলের ওই ঘরটা অবশ্য ছোট। ষষ্ঠী আগন্তুককে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে ওদিকের করিডোর হয়ে নিজের ঘর বা কিচেনে চলে যায়। কর্নেলের কাছে সকলের জন্য দরজা খোলা, তা ষষ্ঠী জানে।

যাই হোক, একটু পরে ড্রয়িংরুমের পর্দার ফাঁকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি পা থেকে জুতো খোলার পর জুতো দুটো হাতে নিয়ে ঢুকছিলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি ইচ্ছে করলে জুতো পরেই ঢুকতে পারেন। আর যদি জুতো ওঘরে খুলে রেখেই ঘরে ঢোকেন, আপনার জুতো চুরি যাবে না।

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—আজ্ঞে অভ্যেস!

—তার মানে বাইরে জুতো খুলে কোথাও ঢুকলে আপনার জুতো চুরি হয়!

—আজ্ঞে স্যার! ঠিক ধরেছেন!

—এ পর্যন্ত কতজোড়া জুতোচুরি গেছে?

—পাঁচজোড়া স্যার! আমার দুঃখের কথা আর কাকে বলব? অবশেষে আমার মাসতুতো ভাই পরেশ—পুলিশে চাকরি করে স্যার, সে-ই আপনার নাম-ঠিকানা দিল। আপনার চেহারার বর্ণনাও দিল। পরেশ বলল, এর বিহিত পুলিশ করতে পারবে না। তুমি কর্নেলস্যারের কাছে যাও। তাই এলুম! তা-তাহলে জুতো পরেই ঢুকি?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—হ্যাঁ। দেখছেন না, আমরা জুতো পরেই আছি!

যে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন, তাঁর পরনে সাদাসিধে প্যান্ট-শার্ট, কাঁধ থেকে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে এবং ব্যাগের ভিতর থেকে একটা সোয়েটার উঁকি দিচ্ছে। খাড়া নাকের নীচের প্রজাপতি-ছাঁট গোঁফ আর সিঁথে করা কাঁচাপাকা চুলে ঈষৎ শৌখিনতার ছাপ। পায়ের পামশুজোড়া নতুন তা বোঝা যাচ্ছিল। এ-ও বোঝা যাচ্ছিল, ইনি যেখান থেকে আসছেন, সেখানে শীত এসে গেছে। কারণ তিনি কলকাতায় এসেই গায়ের সোয়েটার খুলে ব্যাগে ঠেসে ঢুকিয়ে রেখেছেন।

ভদ্রলোক সোফায় বিনীতভাবে বসে প্রথমে কর্নেলকে, পরে হালদারমশাই ও আমাকে করজোড়ে নমস্কার করলেন। তারপর বললেন,—আমার নাম জয়গোপাল রায়। রেলে চাকরি করতুম। আজ এখানে, কাল সেখানে বদলির চাকরি। থিতু হয়ে কোথাও বসতে পারিনি যে বাড়ি-ঘর করব। আর করেই বা কী হবে? বাবুগঞ্জে পৈতৃক একতলা একখানা বাড়ি আছে। সেখানে আমার বিধবা বোনকে থাকতে দিয়েছিলুম। চাকরি থেকে গত মাসে রিটায়ার করার পর সেই বাড়িতেই চলে এসেছি, তারপর থেকেই এক উটকো বিপদ!

কর্নেল বললে,—জুতোচুরি?

—আজ্ঞে কর্নেলসায়েব! প্রথমে চুরি গেল পুরোনো পামশুজোড়া। সন্ধ্যাবেলা ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। গোবিন্দ-কোবরেজের ঘরে আড্ডা দিচ্ছিলুম। বাড়ি ফেরার সময় দেখি, সকলের জুতো আছে। আমার জোড়া নেই। সেই শুরু। কিন্তু তখন তলিয়ে কিছু ভাবিনি। আবার বাজার থেকে নতুন একজোড়া জুতো কিনলুম। দিন-তিনেক পরে মুখুজ্যেমশাইয়ের ঠাকুরবাড়িতে কথকতা শুনতে ঢুকেছিলুম। দরজার বাইরে জুতো খুলে রেখেছিলুম। কথকতা শেষ হল রাত দুটোয়। বেরিয়ে এসে আমার জুতোজোড়া আর খুঁজেই পেলুম না।

—তা হলে এইভাবে আপনার মোট পাঁচজোড়া জুতো চুরি হয়েছে?

—হ্যাঁ কর্নেলসায়েব। তারপর থেকে সতর্ক হয়েছিলুম। যেখানে ঢুকি, জুতোজোড়া হাতে নিয়েই ঢুকি কিন্তু এবার শুরু হল আরেক বিপদ! রাতবিরেতে বাড়ির আনাচে-কানাচে কারা ঘুরঘুর করতে আসে।

—সেটা টের পান কী করে?

—আজ্ঞে কালু! আমার বোনের পুষ্যি একটা কালো তাগড়াই কুকুর ছিল। তার নাম কালু। সে চ্যাঁচামেচি জুড়ে দিত। তখন আমি আর আমার বোন হৈমন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁকডাক করে পড়শিদের জাগাই। তারা লাঠিসোটা, টর্চ নিয়ে বাড়ির চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে। তবে দেখুন স্যার, দু-একদিন অন্তর এরকম হলে পড়শিরা বিরক্ত হয় না? দোষটা গিয়ে পড়ত কালুর ঘাড়ে!

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুনছিলেন। বললেন,—হুঁ। তারপর?

জয়গোপালবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—বাবুগঞ্জে বিদ্যুৎ আছে। কিন্তু চোর আসে রাতবিরেতে, হঠাৎ যদি লোডশেডিং হয়, তখন। তো গত মঙ্গলবার ভোরবেলা উঠে দেখি

সাংঘাতিক কাণ্ড। কাড়ির দরজার সামনে রক্তের ছড়াছড়ি। চাপ-চাপ রক্ত। চমকে উঠেছিলুম। কে কাকে আমার বাড়ির দরজার সামনে খুন করেছে ভেবে। তারপর চোখে পড়ল দরজার পাশে দেওয়াল থেকে—

—কালুর মুণ্ডু ঝুলছে?

জয়গোপালবাবু নড়ে বসলেন,—আপনি খবর পেয়েছেন স্যার? তক্ষুনি থানায় গিয়েছিলুম। পুলিশ এসেছিল। সে এক হইচই ব্যাপার! হৈমন্তী কালুর শোকে কেঁদেকেটে অস্থির। কর্নেলসায়েব! পরেশ বলছিল, আপনার নাকি পিছনেও একটা চোখ আছে। ওরে বাবা! সে এক বীভৎস দৃশ্য! আপনি নিশ্চয়—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—আপনি খবরের কাগজ পড়েন?

জয়গোপালবাবু কিছু বলার আগেই গোয়েন্দাপ্রবর হালদারমশাই বলে উঠলেন,—সেই কুত্তার বডি উঠছে মৎস্যজীবীগো জালে! কর্নেলস্যার ঠিকই কইছিলেন। কুকুর-বলির রহস্য ঠিকই ফাঁস করছিলাম।

জয়গোপালবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন,—খবরের কাগজ নিয়মিত পড়ি না। কিন্তু উনি বলছেন মৎস্যজীবী—মানে জেলেদের জালে কুকুরের বডি উঠেছে। কিছু বুঝতে পারছি না!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—পুলিশ আপনাকে খবর দেয়নি?

—আজ্ঞে না তো!

—বাড়ি ফিরে হয়তো আপনার বোনের কাছে জানতে পারবেন, পুলিশ আপনাদের হতভাগ্য কালুর লাশ উদ্ধার করেছে। আপনার বাড়ি বাবুগঞ্জে। নদীর ধারেই গঞ্জ গড়ে ওঠে। আপনাদের বাবুগঞ্জের নদীটার নাম কী?

—বেহুলা। একসময় নাকি বড় নদী ছিল। এখন প্রায় মজে এসেছে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বললেন,—আপনাগো কুত্তাটার মাথা চোরেরা কাটল ক্যান তা কি বুঝছেন?

জয়গোপালবাবু বিব্রতভাবে বললেন,—চ্যাঁচামেচি করত বলে।

রাত্রে জুতোচোরেরা আপনার জুতো চুরি করতে আইলে কুত্তাটা চ্যাঁচামেচি করত—বলে হালদারমশাই কর্নেলের দিকে ঘুরলেন,—কর্নেলস্যার! একটা কথা বুঝি না। চোরেরা ভদ্রলোকের জুতো চুরি করে ক্যান? হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল হাসলেন, —ঠিক বলেছেন হালদারমশাই! হেভি মিস্ট্রি। আচ্ছা জয়গোপালবাবু, কেউ বা কারা আপনার জুতো চুরি করে কেন, একথা কি ভেবে দেখেছেন?

জয়গোপালবাবু করুণমুখে বললেন, —অনেক ভেবেছি কর্নেলসায়েব। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি!

—আপনার বোন হৈমন্তীদেবীর কী ধারণা?

—সে-ও কিছু বুঝতে পারছে না। হৈমন্তী কান্নাকাটি করে চুপিচুপি বলছিল, কালুকে চিরকালের জন্য চুপ করাতে চেয়েছে কেউ বা কারা, তা ঠিক। কিন্তু তার মনে একটা আতঙ্ক ঢুকেছে। কালুকে মারল, মারল, কিন্তু তার মাথা কেটে দোরগোড়ায় ঝোলালো কেন? তার আতঙ্কের কারণ, হয়তো এরপর আমার মাথা কেটে ফেলবে, ওটা তারই নোটিস! হৈমন্তীর ধারণা, রেলে চাকরি করার সময় আমি কারওর কোনো ক্ষতি করেছিলুম। আমি ওকে বলেছি, আমি ছিলুম রেলের সামান্য কেরানি। জ্ঞানত কারও কোনো ক্ষতি করিনি।

কর্নেল ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন,—আপনার বাবা কী করতেন?

—বাবাও রেলে চাকরি করতেন। বাবা অবশ্য রেলে গার্ড ছিলেন। কাটিহারে মারা যান।

—আপনাদের বাড়িটা কে তৈরি করেছিলেন?

—আমার ঠাকুরদা বিনয়গোপাল রায়।

—তিনি কী করতেন?

—ঠাকুরদা বাবুগঞ্জে মুখুজ্যেমশাইয়ের জমিদারির সেরেস্তায় খাজাঞ্চি ছিলেন!

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন,—খাজাঞ্চি? সেটা কী পোস্ট?

কর্নেল বললেন,—ট্রেজারার বলতে পারেন। পুরোনো আমলে জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। অর্থাৎ ট্রেজারি। প্রজাদের খাজনা আদায় করে সেখানে রাখা হত। তাছাড়া জমিদারবাড়ির পারিবারিক সম্পদ, ধনরত্ন এসব কিছুই খাজাঞ্চিখানায় জমা থাকত। খাজাঞ্চি ছিলেন একাধার তদারককারী, আর ক্যাশিয়ার। কোষাধ্যক্ষ বলতে পারেন।

গোয়েন্দাপ্রবর গম্ভীরমুখে বললেন,—হঃ! বুঝছি।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবু! আপনার ঠাকুরদাকে আপনি দেখেছেন?

—আজ্ঞে না। আমার জন্মের আগে তিনি মারা যান। ওদিকে জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদের পর মুখুজ্যেপরিবারের লোকেরা কে কোথায় চলে যায়।

—এখন বাবুগঞ্জে কোন মুখুজ্যে আছেন?

—আজ্ঞে স্যার, প্রমথ মুখুজ্যেমশাই। সেই সাতমহলা বাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ। প্রমথবাবুর হাতে কিছু জমিজিরেত আছে। নিজেই দেখাশোনা করেন। মেকানাইজড্ এগ্রিকালচার। বুঝলেন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—বুদ্ধিমান লোক।

জয়গোপালবাবু আড়ষ্টভাবে হাসলেন,—তা আর বলতে? ভাগচাষিদের ভাগিয়ে দিয়ে পাওয়ারটিলার আর সেচের জন্য পাম্পিং মেশিন কিনে রীতিমতো ফার্মহাউস করে ফেলেছেন। দোতলা নতুন বাড়ি করেছেন। তবে ঠাকুরবাড়িটা পুরোনো আমলের।

—আপনার জুতোচুরির কথা তাঁকে কি আপনি বলেছেন?

—বলিনি। বলে কী হবে? আমার বোন হৈমন্তী ছাড়া আর কেউ জানে না।

—পুলিশকে জানাননি?

জয়গোপালবাবু চাপাস্বরে বললেন,—হৈমন্তী নিষেধ করেছিল। পুলিশ জুতোচুরির কথা শুনলে হাসবে। বরং রাতবিরেতে বাড়িতে চোরের উৎপাতের কথা বলাই ঠিক হবে। তাই আমি পুলিশকে শুধু চোরের কথাই বলেছিলুম। তবে দেখুন কর্নেলসায়েব, দু-একটা মিথ্যা নালিশ না করলে কেস শক্ত হবে না। তাই পুলিশকে বলেছিলেন, চোর রান্নাঘর থেকে থালা-ঘটি-বাটি চুরি করেছে। আরও চুরি করার জন্য প্রায়ই রাতবিরেতে হানা দিচ্ছে।

—কুকুরটার কথা কি বলেছিলেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। পুলিশ ডায়েরি লিখে নিয়ে বলেছিল, কাকে সন্দেহ হয় বলুন। কাকেই বা সন্দেহ করব বলুন? বাবুগঞ্জে চোর নিশ্চয় আছে। তাদের কারও নাম করলে আমাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই কারও নাম বলিনি।

—পুলিশকে আপনাদের কুকুরটার মুণ্ডুকাটার খবর নিশ্চয় দিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। পুলিশ এসে মুণ্ডুটা নিয়ে গিয়েছিল। সে-ও স্যার, আমার মাসতুতো ভাই পরেশের অনুরোধে। পরেশ কলকাতার বেনেপুকুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর। সে-ই তো আমাকে আপনার কথা বলেছে।

ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণে আমাদের জন্য দ্বিতীয় দফা কফি আনল। কর্নেল বললেন,—কফি খান জয়গোপালবাবু। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

জয়গোপালবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বাবুগঞ্জে স্যার জাঁকিয়ে শীত নেমেছে। শেয়ালদা স্টেশনে নেমে গরমের চোটে সোয়েটার খুলতে হল। তবে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কফি খেয়ে সত্যিই চাঙ্গা হচ্ছি!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ গুলি-গুলি চোখে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন,—জয়গোপালবাবুরে একটা কথা জিগাই।

জয়গোপালবাবু বললেন,—আপনি কি স্যার ওপার বাংলার লোক?

—জন্ম হইছিল ওপারে। ছোটবেলায় এপারে আইছিলাম। তো কথাটা হইল, আপনার ঠাকুরদা জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন। ওনার একখান বাড়ি ছাড়া আর কোনো প্রপার্টি ছিল না?

জয়গোপালবাবু যেন চমকে উঠে বললেন,—প্রপার্টি?

তারপর ভদ্রলোক কফির কাপ-প্লেট রেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে কী সর্বনাশ! —বলে আমাদের হতবাক করে বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—এটা কী হইল? অরে আমি ফলো করুম...!

কর্নেল হালদারমশাইকে বাধা না দিলে উনি সত্যিই জয়গোপালবাবুকে অনুসরণ করে হয়তো বাবুগঞ্জে গিয়ে হাজির হতেন। কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! শুনলেন তো! বাবুগঞ্জে এখন জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। শীতের পোশাক ছাড়া সেখানে গিয়ে শীতে কাঁপতেন, না গোয়েন্দাগিরি করতেন? কাজেই তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—হেভি মিস্ট্রি আরও হেভি হইয়া গেল! 'প্রপার্টি' কথাটা যেই কইলাম, অমনই উনি কফি খাওয়া ছাড়ান দিয়া ঘোড়ার মতন ছুট দিলেন।

ঠিক বলেছেন। ঘোড়ার মতোই ব্যাপারটা অদ্ভুতই বটে।—বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। চোখ বুজে তিনি আবার ইজিচেয়ারে হেলান দিলেন।

আমি বললুম,—ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে মনে হচ্ছে। ওঁর কথা বলার ভঙ্গিও কেমন এলোমেলো। গুছিয়ে সব কথা বলতে পারছিলেন না। পুলিশ কুকুরের কাটামুণ্ডু নিয়ে গেল কেন, তাও বুঝিয়ে বললেন না।

হালদারমশাই বললেন,—জয়ন্তবাবু! আপনি সাংবাদিক। পুলিশের কামের মেথড বুঝবেন না।

হাসতে-হাসতে বললুম,—মেথডটা কী?

—মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। মেথডটা আমি জানি। ভদ্রলোক রাত্রিকালে চোরের উৎপাতের কথা কইছিলেন। তারপর ওনার কুত্তাটার মাথা কাইটা ঝুলাইয়া দিছিল অরা। এখন পুলিশের কাম হইল গিয়া কুত্তার মুণ্ডু ডাক্তারেরে দেখাইয়া সার্টিফিকেট লওয়া। পুলিশ যখন ডায়েরি লিখছে, তখন ওই কুত্তার মুণ্ডুকাটার ঘটনাও পুলিশের ডিউটির মধ্যে পড়ে। আপনাগো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় লিখছে, মৎস্যজীবীগো জালে পাওয়া মুণ্ডুকাটা বডিটার খোঁজ লইতে গেছে পুলিশ! তা হইলেই বুঝুন!

হালদারমশাই ঢ্যাঙা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটা। তিনি ছদ্মবেশ ধরতে পটু। তবে তিনি বড্ড হঠকারী স্বভাবের মানুষ। পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদ থেকে রিটায়ার করলেও মাঝে-মাঝে সেই কথাটা ভুলে গিয়ে বিভ্রাট বাধান। আজ সকালে বুঝতে পারছিলুম, তাঁর নাকের ডগায় একখানা অদ্ভুত কেস এসে ঝুলছিল। কেসটা কর্নেলের হলেও তিনি এতে নাক গলাতে উদগ্রীব। অবশ্য এ-ও সত্যি, অসংখ্য জটিল রহস্যজনক কেসে কর্নেল তাঁর সাহায্য নেন। তাই লক্ষ

করছিলুম, পুলিশের কাজের 'মেথড' নিয়ে কথা বলার পর তিনি কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। উত্তেজনায় চোয়ালে-চোয়ালে ঘর্ষণের জন্যই তাঁর গোঁফের দুই সূক্ষ্ম ডগা যথারীতি তিরতির করে কাঁপছিল।

একটু পরে কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—হালদারমশাই। আমার মনে হচ্ছে জয়গোপালবাবুর বোনের আশঙ্কার কারণ আছে। একটা কুকুরকে চিরকালের জন্য চুপ করানোর অনেক উপায় আছে। অথচ কেউ বা কারা কুকুরটার মাথা কেটে দরজার পাশে ঝুলিয়ে রেখেছিল কেন? জয়গোপালবাবুকে নিশ্চয় তারা বোঝাতে চেয়েছিল, তোমার মুণ্ডুও এমনি করে কাটা হবে।

—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! এবার আমার ধারণাটা কইয়া ফেলি?

—হ্যাঁ বলুন!

—কে বা কারা ওনার ঠাকুরদার কোনো প্রপার্টি ফেরত চায়।

আমি অবাক হয়ে বললুম,—ফেরত চায় মানে?

জবাবটা কর্নেল দিলেন,—জয়ন্ত! হালদারমশাই সম্ভবত ঠিক বুঝেছেন! জমিদারের খাজাঞ্চি ছিলেন জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা। এমন হতেই পারে, তিনি কারও কোনো প্রপার্টি—তার মানে কোনো দামি জিনিস হাতিয়ে নিয়েছিলেন। এখন তার বংশধর সেটা ফেরত চাইছে। এছাড়া রাতবিরেতে চোরের উপদ্রবের কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। জিনিসটা খাজাঞ্চি ভদ্রলোকের নিজের হলে চোরেরা এত সব কাণ্ড করতে যাবে কেন? জুতোচুরি, রাতবিরেতে হানা দেওয়া, কুকুরের মুণ্ডুকাটা!

বললুম,—আমার ধারণা, জুতোচুরি মানে জয়গোপালবাবুকে উত্যক্ত করা।

হালদারমশাই বললেন,—হঃ! ঠিক কইছেন জয়ন্তবাবু! বারবার জুতোচুরি করলে মাইনষের মাথা ব্যাবাক খারাপ হওনের কথা! তারপর কুত্তার মুণ্ডুকাটা! জয়গোপালবাবুকে উত্যক্ত কইর‍্যা মারছে অরা। কর্নেলস্যার! আপনি আমারে পারমিশন দ্যান! বাবুগঞ্জে গিয়া খোঁজখবর লই।

কর্নেল বললেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন?

—আপনিও লগে-লগে থাকবেন!

আমি বললুম,—বাবুগঞ্জ কোথায়?

কর্নেল মিটি-মিটি হেসে বললেন,—বেহুলা নদীর ধারে!

বিরক্ত হয়ে বললুম,—ওঃ কর্নেল! এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপারকে আপনি হাল্কাভাবে নিচ্ছেন। ধরুন, যদি সত্যি জয়গোপালবাবুর কোনো বিপদ হয়?

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন,...হ্যাঁ। বলছি।...আরে কী কাণ্ড! পরেশ। তুমি বেনেপুকুরে কবে এলে?...কী আশ্চর্য! আমার নাকের ডগায় আছো! তোমার মাসতুতো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুমিই আসতে পারতে!...হ্যাঁ। জয়গোপালবাবু এসেছিলেন। তোমার কথাও বলছিলেন।...হ্যাঁ তুমি যখন বলছ, আমার পক্ষে যতটা সম্ভব সাহায্য নিশ্চয় করব।...আমারও তাই মনে হল। একটু ছিটগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সেটা এ অবস্থায় স্বাভাবিক। তো শোনো! উনি হঠাৎ উঠে চলে গেলেন।...বুঝতে পেরেছি! তো বাবুগঞ্জ জায়গাটা ঠিক কোথায়?...না। ওই যে বললুম, হঠাৎ চলে গেলেন।...তার মানে শান্তিপুরের আগে!... কাছারিবাড়ির মোড়? তারপর?...নাঃ! বাসে নয়। গাড়িতেই যাব, তত কিছু দূরে নয়।...দোমোহানি ওয়াটারড্যাম?...বাঃ! এখন তাহলে তো সাইবেরিয়ান হাঁসের মেলা বসে গেছে।...বলো কী! গড়ের জঙ্গলেও...ওয়াভারফুল! বুঝলে পরেশ? কদিন থেকে ভাবছিলুম মফস্বলে শীত এসে গেছে। জলাভূমিতে দেশ-বিদেশের পাখি এসে জুটবে। এবার কোথায় যাব, তা ঠিক করতে পারছিলুম

না।...ধন্যবাদ পরেশ! এই খবরটার জন্য ধন্যবাদ।...না, না। ওঁর কেসটা আমি নিয়েছি।...আচ্ছা রাখছি।

রিসিভার রেখে কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়ন্ত, তিতলিপুরের গড়ের জঙ্গলের কথা ভুলে গেছ?

হালদারমশাই নড়ে বসলেন।—হঃ! সেই তিতলিপুর! গড়ের জঙ্গল!

বললুম,—বাজে জায়গা। তিতলিপুরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে নভেম্বর মাসে।

কর্নেল বললেন,—বাবুগঞ্জ তিতলিপুর থেকে সামান্য দূরে। আমরা দোমোহানির যে সেচ-বাংলোতে ছিলুম, সেখানে নয়। আমরা এবার থাকব বাবুগঞ্জের কাছাকাছি অন্য একটা বাংলোতে।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—একজন ছিটগ্রস্ত মানুষের আবোল-তাবোল কথা শুনে আপনিও দেখছি হালদারমশাইয়ের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন! হালদারমশাই একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমানে গোয়েন্দাগিরি ওঁর নেশা ও পেশা। বরং হালদারমশাই আগে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝে আসুন।

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—আমি তো যামুই। হেভি একখান মিস্ট্রির লেজটুকু দেখছি। কিন্তু কর্নেলস্যারের লগে-লগে একদিন ঘুইর‍্যাও আসল কথাটা আপনি বুঝলেন না জয়ন্তবাবু?

—আসল কথাটা কী?

গোয়েন্দাপ্রবর চোখ নামিয়ে বললেন,—পক্ষী! উনি চোখে বাইনোকুলার দিয়া ওয়াটারড্যামে পক্ষী দেখবেন! বেনেপুকুরের এস. আই. ভদ্রলোক কর্নেলস্যারকে হেভি পক্ষীর খবর দিছেন!

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই! সাইবেরিয়ান হাঁস হেভি পক্ষীই বটে। একেকটার ওজন আট-দশ কিলোগ্রামেরও বেশি। সুদূর উত্তরের সাইবেরিয়া থেকে প্রতি শীতে চীন পেরিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে ওরা বাংলার মিঠে জলে সাঁতার কাটতে আসে। আবার শীতের শেষে দেশে ফিরে যায়। প্রকৃতির এ এক বিচিত্র রহস্য! পরিযায়ী পাখিদের রহস্য!

হাসি চেপে বললুম, —হ্যাঁ। এ-ও হেভি রহস্য।

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—তুমি সাংবাদিক। একালের সাংবাদিকরা সর্ববিদ্যাবিশারদ। জয়ন্ত! তোমার জানা উচিত ছিল, পাখিদের হাজার-হাজার মাইল উড়ে আসা এবং ঠিক পথ চিনে ঘরে ফেরা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কত গবেষণা চলেছে। পাখিদের এই পরিযানের রহস্য আজও সঠিকভাবে সমাধান করা যায়নি। শুনলে অবাক হবে, জিনোমবিজ্ঞানীরাও পরিযায়ী পাখিদের ডি. এন. এ.-র মধ্যে...

আবার ডোরবেল বাজল। তাই কর্নেলের বক্তৃতা শোনা থেকে রেহাই পেলুম। কর্নেল যথারীতি হাঁকলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে আমাদের আবার হতবাক করে বাবুগঞ্জের জয়গোপাল রায় এক হাতে জুতোজোড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন এবং পরক্ষণে জিভ কেটে জুতোদুটো পায়ে পরে সোফায় বসলেন।

কর্নেল বললেন,—আপনার ঠাকুরদার প্রপার্টি পেলেন?

জয়গোপালবাবু কাঁচুমাচু মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—হ্যাঁ স্যার! ভাগ্যিস ওই ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। উনি মনে করিয়ে না দিলে আবার পরের রোববার আসতে হত।

বলে তিনি হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। হালদারমশাই বললেন,—কী কন বুঝি না!

জয়গোপালবাবু বললেন,—আজ্ঞে স্যার, এন্টালি মার্কেটের উল্টোদিকে ডাক্তার লেনে আমাদের বাবুগঞ্জের এক ল-ইয়ার পাঁচুবাবু থাকেন। পঞ্চানন বারিক। আমার ঠাকুরদার প্রপার্টির

উইল ওঁর সাহায্যেই আমার বাবা কোর্টে প্রবেট করিয়েছিলেন। ঠাকুরদার উইলে বসতবাড়ির লাগোয়া কাঠাদশেক জমির কথা ছিল। জমিদারবংশের প্রমথ মুখুজ্যেমশাইয়ের খুড়তুতো ভাই অবনী জমিটা দখলে রেখেছিল। বাবা মামলা-মোকদ্দমা করবেন, না রেলের গার্ড হয়ে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক ঘুরে বেড়াবেন। তখন বলেছিলুম, বাবা কাটিহারে মারা যান। তো আমি রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলুম! তখন আমার বোন হৈমন্তী আমাকে ওই জমিটার কথা বলল। হৈমন্তীর আগেই পাঁচুবাবু ল-ইয়ারের সঙ্গে বাবুগঞ্জে ওঁর দেশের বাড়িতে কথা বলেছিল। তারপর সেই উইল পাঁচুবাবু দেখতে চেয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—বুঝেছি। আপনার ঠাকুরদার উইল পাঁচুবাবুর কাছেই থেকে গিয়েছিল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গত রোববার পাঁচুবাবু দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। হৈমন্তী তাঁর কাছে উইল চাইতে গিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, পরের রোববার আমি যেন কলকাতা গিয়ে উইলখানা ওঁর কাছে ফেরত নিই। কারণ এদিন উনি বাবুগঞ্জে যাবেন না। ফ্যামিলি নিয়ে সাড়ে দশটার বাসে চেপে তারাপীঠে তীর্থ করতে যাবেন।

—পেলেন উইল?

জয়গোপালবাবু একটু হেসে বললেন,—আর একটু দেরি করলেই ওঁকে পেতুম না। তীর্থ করতে বেরুনোর মুখে বাগড়া দিলুম। একটু বিরক্ত হয়েই বাড়ি ঢুকে প্যাকেটটা এনে দিলেন। বললেন, দশকাঠা দখলি জমি এতদিন পরে ফেরত পাওয়ার হ্যাপা অনেক। ফিরে এসে বলবেন।

—আপনার ঠাকুরদা সম্পত্তির উইল করেছিলেন কেন? আপনার বাবা ছাড়া কি আর কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল তাঁর?

জয়গোপালবাবু কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। বললেন না।

কর্নেল বললেন,—সম্পত্তির আইনত কোনো নির্দিষ্ট প্রাপক না থাকলে এবং সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হলে তবেই লোক উইল করে। তাই জিজ্ঞেস করছি আপনার ঠাকুরদা উইল করেছিলেন কেন?

জয়গোপালবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন,—ঠাকুরদার শেষ বয়সে দেখাশোনা করতেন আমার পিসিমা। বাবা তো রেলের গার্ড।

—তার মানে, আপনার ঠাকুরদার একটি মেয়ে ছিল?

—ঠিক ধরেছেন স্যার। তো তাঁরও দুর্ভাগ্য আমার বোনের মতো। পিসিমাও বিধবা ছিলেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে। তার নাম প্রবোধ। সে এখন বাবুগঞ্জে আছে। ঠাকুরদার শুধু বসতবাটি আর তার লাগোয়া দশকাঠা পোড়ো জমি বাবাকে দিয়ে গেছেন। উইলে সম্পত্তির বেশি অংশই ছিল পিসিমা কুমুদিনীর নামে। পিসিমা মারা গেলে সেই সম্পত্তি প্রবোধ পেয়েছিল। ধানি জমি, পুকুর, একটা আমবাগান। উড়নচণ্ডী প্রবোধ সব বেচে খেয়ে এখন অবনী মুখুজ্যের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। নির্লজ্জ বজ্জাত! হৈমন্তীর কাছে কম টাকা ধার করেছে! আমাকে দেখলে এখন ছায়া মাড়ায় না!

—আপনার বোন হৈমন্তী টাকা পান কোথায়?

জয়গোপালবাবু চাপাস্বরে বললেন,—প্রাইমারি স্কুলের টিচার যে! অনেক টাকা মাইনে পায়। আপনার দিব্যি স্যার! রেলে আমি হৈমন্তীর মাইনের আদ্ধেক টাকা মাইনে পেতুম। অবশ্য পেনশন পাচ্ছি! হৈমন্তীও পাবে! বদমাশ প্রবোধের মুখ থেকে লালা ঝরবে না? বলুন! অবনী মুখুজ্যে ওকে আশ্রয় দিয়ে দু-দশটাকায় সব সম্পত্তি গ্রাস করেছে। প্রবোধের সায় না থাকলে অবনী আমার বাবার ন্যায্য দশকাঠা জমি দখল করতে পারত? হৈমন্তী তো মেয়ে। সে একা কী করতে পারত?

হালদারমশাই কথা বলার জন্য উসখুস করছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—তাহলে জুতোচুরি, রাত্রে আপনারে জ্বালাতন, তারপর কুত্তার মাথা কাইট্যা ঝোলানো সেই প্রবোধেরই কাম!

জয়গোপালবাবু হাত নেড়ে বললেন,—না। না। প্রবোধের সে সাহসও নেই। আর ক্ষমতাও নেই। নেশাভাঙ করে বুড়ো বয়সে তার শোচনীয় অবস্থা। লাঠিতে ভর করে লেংচে হাঁটে। একটু হেঁটেই হাঁপায়। একদিন সে—

জয়গোপালবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন। কর্নেল বললেন,—বলুন জয়গোপালবাবু।

—কালীপুজোর কদিন আগের কথা। বাজারে গেছি। হঠাৎ দেখি প্রবোধ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকে উঠেছিলুম বইকী! কিন্তু সে হাঁউমাউ করে কেঁদে বলল, ও ভাই গোপাল! আমাকে গোটাদশেক টাকা দে, তোর পায়ে পড়ি! আমার বড্ড কষ্ট রে! অবনী আমাকে এখন তাড়িয়ে দেওয়ার ছল খুঁজছে! কান্নার চোটে ভিড় জমে গেল।

—আপনি টাকা দিলেন?

—দিলুম স্যার! মনটা ভিজে গেল। পিসতুতো দাদা! বুদ্ধির দোষে এই অবস্থায় পড়েছে।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—তা হইলে সে আপনারে উত্যক্ত করতাছে না?

—আজ্ঞে না। কেউ বললেও ও কথা বিশ্বাস করব না।

—তা হইলে সেই অবনীবাবু করতাছে।

জয়গোপালবাবু বললেন,—অবনী মুখুজ্যে জমিটা দখল করেছে, তা ঠিক। তবে ওই জমিতে সে গার্লস হাইস্কুল করবে শুনেছি। হৈমন্তীর মতে, ওটা নাকি ওর চালাকি। আর আমাদের ন্যায্য জমি ফিরে পাওয়ার চান্স থাকবে না। তাই গার্লস স্কুল করে নাম কিনতে চাইছে। কিন্তু আমার জুতো চুরি করবে কেন সে?

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—আপনার ঠাকুরদার উইলটা একটু দেখতে পারি?

জয়গোপালবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই দেখতে পারেন। হৈমন্তী মাঝে-মাঝে আমাকে বলে, ঠাকুরদার উইলেই এমন কিছু গণ্ডগোল আছে, যা কোনো ল-ইয়ারও বুঝতে পারছে না। দলিল-দস্তাবেজের ভাষা স্যার, বোঝা বড়ই কঠিন।

বলে তিনি ব্যাগের ভিতর থেকে বড় আকারের একটা খাম কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খাম থেকে আরেকটা জীর্ণ নোংরা খাম বের করলেন। তারপর দু-পাতার একটা কাগজ বের করে চোখ বুলিয়ে বললেন,—যদি আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস থাকে, আমি এটা দু-একটা দিনের জন্য রাখতে চাই।

জয়গোপালবাবু করজোড়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব, বিপদে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, আপনাকে অবিশ্বাস করতে পারি?

—ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না। আপনি বাবুগঞ্জে বসেই শিগগির এটা ফেরত পাবেন। আর একটা কথা। আপনি যে আমার কাছে এসেছিলেন, তা আপনার বোন ছাড়া আর কাকেও ঘুণাক্ষরে যেন জানাবেন না। তবে আপনার মাসতুতো ভাই পরেশ চৌধুরী পুলিশের লোক। পরেশ আমার বিশেষ স্নেহভাজন। সে আমাকে কিছুক্ষণ আগে টেলিফোন করেছিল। সে আমাকে আপনার কথা বলেছে। কাজেই বাইরের লোক বলতে শুধু পরেশই জানল।

জয়গোপালবাবু খুশি হয়ে বললেন,—পরেশ টেলিফোন করেছিল আপনাকে? তাহলে আর আমি ওর কাছে যাচ্ছিনে। বারোটা পাঁচের লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরব। রানাঘাট জংশনে নেমেই বাস পাব।

বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কর্নেলকে নমস্কার করে পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, —ওঁদের সঙ্গে তো আলাপ হল না! দেখছ কাণ্ড? ছ্যা-ছ্যা! আমার ভদ্রতাবোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছি!

কর্নেল আগে হালদারমশাইয়ের পরিচয় দিতেই জয়গোপালবাবু বিস্ফারিত চোখে নমস্কার করে বললেন,—ওরে বাবা! প্রাইভেট ডিটেকটিভ? জানেন স্যার, হৈমন্তী আমাকে একবার বলেছিল—

তাঁর কথা থামিয়ে কর্নেল আমার পরিচয় দিলেন। জয়গোপালবাবু আমাকে নমস্কার করে বললেন,—আমার কী সৌভাগ্য! ওরে বাবা! আপনারা সব কত নামজাদা মানুষ। আমি সামান্য এক চুনোপুঁটি!...

জয়গোপালবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি একটু হেসে বললুম,—হালদারমশাই কি এখন ওঁকে ফলো করতে চান?

গোয়েন্দাপ্রবর একটিপ নস্যি নিচ্ছিলেন। রুমালে নাক মুছে বললেন,—কর্নেলস্যার যা করতে বলেন, তা করব।

কর্নেল হাস্‌লেন না। নিভে যাওয়া চুরুটটা জ্বেলে বললেন,—বাবুগঞ্জে হালদারমশাই যদি যেতে চান, আপত্তি করব না। বরং খুশি হব। তবে ছদ্মবেশে গেলেই ভালো হয়।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—যামু!

—আপনি তো সবচেয়ে ভালো পারেন সাধু-সন্ন্যাসী সাজতে।

—সাধুর বেশেই যামু!

—কিন্তু ঝুলির ভিতরে আপনার লাইসেন্সড রিভলভার থাকবে। আপনার সরকারি আইডেন্টিটি কার্ডও সঙ্গে থাকা দরকার।

আমি বললুম,—কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড শীত!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—সাধুরা কম্বল গায়ে জড়ায় না? ধুনি জ্বালে না?

—আপনার সেই সিন্থেটিক কাপড়ে তৈরি বাঘছাল, ত্রিশূল আর প্লাস্টিকে তৈরি মড়ার খুলি নিতে ভুলবেন না যেন!

হালদারমশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—বাড়ি গিয়া খাওয়াদাওয়া কইর‍্যাই বারাইয়া পড়ুম। বাবুগঞ্জে গিয়া সন্ধ্যার পর সাধুর ছদ্মবেশ ধরুম। জয়গোপালবাবুর বাড়ির কাছাকাছি জায়গা হইলে ভালো হয়। চলি কর্নেলস্যার। চলি জয়ন্তবাবু!

কর্নেল বললেন,—যথাসময়ে আমাদের দেখা পাবেন। কিন্তু সাবধান হালদারমশাই! কুকুরের মুণ্ডু যে বা যারা কেটেছে, সে বা তারা শুধু ধূর্ত নয়, নৃশংসও বটে।

কর্নেলস্যার! পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশ ছিলাম। ভাববেন না।—বলে গোয়েন্দাপ্রবর সবেগে বেরিয়ে গেলেন।...

আমার ফিয়াট গাড়িটা কিছুদিন থেকে বেগড়বাঁই করছিল। গত সপ্তাহে মেকানিকের পাল্লায় পড়ে জব্দ হয়েছে। পরদিন সোমবার সকাল আটটায় বেরিয়ে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে গাড়িটা যেন পক্ষীরাজের মতো উড়ে যাচ্ছিল। কর্নেল আমার বাঁদিকে বসেছিলেন। তাঁর গলা থেকে ঝোলানো ক্যামেরা আর বাইনোকুলার। পিঠে যথারীতি আঁটা তাঁর প্রসিদ্ধ কিটব্যাগ, যার ভিতর একজন মানুষের জন্য দরকারি অসংখ্য জিনিস ঠাসা। কোণা দিয়ে উঁকি মারছিল প্রজাপতি ধরার জন্য অদ্ভুত একরকম জালের লম্বা হাতল। মাঝে-মাঝে তিনি বাইনোকুলারে পাখি দেখছিলেন,

নাকি অন্য কিছু তা বলা কঠিন। এটা ওঁর এক বাতিক। মাঝে-মাঝে তিনি আমাকে সাবধান করে দিচ্ছিলেন, যেন গতি কমাই।

এই রাস্তায় কর্নেলের সঙ্গে কতবার কত জায়গায় গেছি। কিন্তু আমার কিছু মনে থাকে না। ঘণ্টা আড়াই চলার পর তিনি বললেন,—সামনে ডাইনে একটা পিচরাস্তায় ঘুরতে হবে জয়ন্ত।

রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ। কখনও যাত্রী-বোঝাই বাস, কখনও ট্রাক-লরি-টেম্পো, কখনও বা সাইকেলভ্যানের আনাগোনা। তাই এবার সাবধানে যেতে হচ্ছিল। রাস্তাটা বাঁক নিতে-নিতে চলেছে। দুধারে কখনও গ্রাম, কখনও পাকাধানে ভরা আদিগন্ত মাঠ, দূরে নীলাভ কুয়াশা আর মাঝে-মাঝে জলাভূমি, জঙ্গল, তারপর হঠাৎ ছোট্ট বাজার, বাসস্ট্যান্ড। আধঘণ্টা পরে বাঁ-দিক থেকে আরেকটা পিচরাস্তা এসে এই রাস্তার সঙ্গে মিশে একটু চওড়া হল। কর্নেল বাইনোকুলারে সামনেটা দেখে নিয়ে বললেন,—বাবুগঞ্জ এসে গেছি বলতে পারো। ওই দেখো, বাঁদিকে একটা ছোট্ট নদী। বেহুলা নদীই হবে।

বলে তিনি মাথার টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে নিলেন। বললুম,—সামনে যা ভিড়ভাট্টা দেখছি, ওর ভিতরে ঢুকলে কি সহজে বেরুতে পারব?

কর্নেল বললেন,—আমরা বাবুগঞ্জের ভিতরে ঢুকব না।

—তাহলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—বাবুগঞ্জের পূর্বপ্রান্তে একটুখানি এগোলেই নদীর ধারে সেচদফতরের বাংলো।

একটু অবাক হয়ে বললুম,—আপনি কি আগে কখনও এসেছেন?

—নাঃ!

—তাহলে কেমন করে জানলেন...

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—জানা খুবই সোজা। কলকাতার সেচদফতরের এক বড়কর্তাকে ফোন করে রাস্তার হালহদিশ সব জেনে নিয়েছি। তুমি যখন কাল দুপুরে খাওয়ার পর ডিভানে চিত হয়ে ভাতঘুমে ডুব দিয়েছিলে, তখন এইসব জরুরি কাজ সেরে নিয়েছিলুম। হ্যাঁ-এবার বাঁ-দিকে মোরামবিছানো পথে চলো।

বাঁদিকে গাছপালার ভিতরে একতলা-দোতলা বাড়ি আর ডানদিকে শাল-সেগুনের জঙ্গল। জিজ্ঞেস করলুম,—এই জঙ্গলটা কি সরকারি বনসৃজন প্রকল্পের রূপায়ণ?

কর্নেল হাসলেন,—বাঃ! বেশ বলেছ। এটা তা-ই। শাল-সেগুন এই মাটির স্বাভাবিক উদ্ভিদ নয়।

—তাহলে এ জঙ্গলে বাঘ-ভালুক নেই।

—নাঃ! নিরামিষ জঙ্গল বলতে পারো। তবে শীতের প্রকোপে জঙ্গলের তাজা ভাবটা নেই। শরৎকালে এলে ভালো লাগত।

কিছুক্ষণ পরে সামনে উত্তরে একটা উঁচু জমির ওপর মনোরম বাংলোটা দেখা গেল। নিচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। ভিতরে রঙবেরঙের ফুলের উজ্জ্বলতা। আমাদের গাড়ি দেখতে পেয়েই উর্দিপরা একটা লোক গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো লন পেরিয়ে ডাইনের চত্বরে গাড়ি দাঁড় করালুম। একজন প্যান্ট-শার্ট পরা লোক নমস্কার করে বলল,—কর্নেলসায়েব কি আমাকে চিনতে পারছেন?

কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—কী আশ্চর্য! সুবিমল, তুমি এখানে এসে জুটলে কবে?

—আজ্ঞে গত মার্চ মাসে। মালঞ্চতলার ক্লাইমেট সহ্য হচ্ছিল না। তাই বড়সায়েবকে ধরাধরি করে বাড়ির কাছে বদলি হয়ে এসেছি।

—তোমার বাড়ি কি বাবুগঞ্জে?

—না স্যার! নদীর ওপারে ওই যে দেখছেন, ঝাঁপুইহাটিতে। তো গত রাত্তিরে ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ফোন করে জানালেন, আপনি আসছেন। শুনেই মনটা নেচে উঠল। চলুন স্যার! এদিকটা বেজায় ঠান্ডা!

কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই! জয়ন্ত! সুবিমল হাজরা এই বাংলোর কেয়ারটেকার। জলচর! জলচর পাখির খবর ওর নখদর্পণে। সুবিমল! জয়ন্ত চৌধুরীর নাম তুমি শুনে থাকবে। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার বিখ্যাত সাংবাদিক!

সুবিমল হাজরা আমাকে নমস্কার করে বলল,—কী সৌভাগ্য! আপনার ক্রাইমস্টোরির আমি ফ্যান!

একটু অবাক হয়ে বললুম,—এখানে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা আসে?

—কোন পত্রিকা আসে না তাই বলুন স্যার! কর্নেলসায়েব আমাকে আপনার কথা বলেছিলেন যেন! অনুগ্রহ করে এদিকে আসুন আপনারা। গাড়ির চাবি নিশ্চিন্তে চণ্ডীকে দিন। চণ্ডী! সায়েবদের গাড়ি গ্যারেজে ঢুকিয়ে জিনিসপত্র পৌঁছে দাও।

একজন গাট্টাগোঁট্টা চেহারার লোক কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ করিনি। সে আমাদের সেলাম দিয়ে গাড়ির ডিকি খুলতে যাচ্ছিল। বললুম,—ডিকিতে কিছু নেই। আমাদের ব্যাগেজ ব্যাকসিটে আছে।

বাংলোর দক্ষিণের বারান্দায় রোদ পড়েছে। বেতের কয়েকটা চেয়ার আর টেবিল আছে। কর্নেল সেখানে বসে বললেন,—আচ্ছা সুবিমল! কাগজে পড়েছি, বাবুগঞ্জে কারা নাকি কুকুর-বলি দিয়েছে?

সুবিমল হাসতে-হাসতে বলল,—এক ভদ্রলোক রেলে চাকরি করতেন। রিটায়ার করে বাড়ি ফিরে কীসব কাণ্ড করে বেড়াচ্ছেন। খামোকা যাকে-তাকে ধরে তম্বি করেন, তুমি আমার জুতো চুরি করেছ! পাগল স্যার! পাগল আর কাকে বলে? তাঁর বোন প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেন। একটা পেল্লায় গড়নের কুকুর পুষেছিলেন। গোপালবাবু—মানে সেই টিচারের দাদা, যিনি রেলে চাকরি করতেন, এসে অবধি যার-তার দিকে কুকুর লেলিয়ে দিতেন। আর কুকুরটাও ছিল বজ্জাত। বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ গেলেই তাকে কামড়াতে আসত।

—কাউকে কি কামড়েছিল?

—কামড়ায়নি। তবে চ্যাঁচামেচি করত। দাঁত বের করে তেড়ে আসত! তাই হয়তো দুষ্টু ছেলেরা রাত্তিরে কুকুরকে কোনো কৌশলে বেঁধে বলি দিয়েছিল! আর তাই নিয়ে গোপালবাবু থানাপুলিশ করে হইচই বাধিয়ে ছাড়লেন। মাথায় ছিট আছে স্যার!

এই সময়ে একটা রোগা চেহারার লোক ট্রেতে কফি আর পটাটোচিপস এনে টেবিলে রাখল। সুবিমল বলল,—ঠাক্‌মশাই!

ঠাক্‌মশাই নমস্কার করে বললেন,—সুবিমল! আমি তো ইংরিজি জানি না। তুমি সায়েবকে জিজ্ঞেস করো উনি কী খাবেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—আমি ঠাক্‌মশাইয়ের মুণ্ডু খাব!

ঠাক্‌মশাই সবিনয়ে বললেন,—সায়েব তো ভালো বাংলা জানেন। আর সুবিমল, তুমি গত রাত্তির থেকে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ, এক সায়েব আসবেন। তাঁর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতে হবে। তা স্যার! আমার মুণ্ডু খেতে তেতো লাগবে। তেতো বোঝেন তো স্যার?

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে বললেন,—ঠাক্‌মশাই! আমি কলকাতার এক ভেতো-বাঙালি। আমার চেহারা পোশাক-আশাক দেখে লোকে সায়েব বলে ভুল করে।

ঠাক্‌মশাই ভাঙা দাঁত বের করে হাসলেন,—কী কাণ্ড! এখন চেহারা দেখে বুঝতে পারছি। তবে হঠাৎ করে দেখলে বোঝবার উপায় নেই কিছু! বাঁচা গেল। সুবিমল! আজ তোমার পাতে কী পড়বে বুঝলে? কচু।

বলে বুড়োআঙুল দেখিয়ে তিনি চলে গেলেন। সুবিমল বলল,—ঠাক্‌মশাইয়ের নাম নরহরি মুখুজ্যে! বাড়ি বাবুগঞ্জে। মানুষটি বড় সরল স্যার!

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—শুনেছি বাবুগঞ্জের জমিদার ছিলেন মুখুজ্যেরা। ঠাক্‌মশাই তাঁদের বংশের কেউ নাকি?

—সঠিক জানি না স্যার! তবে মুখে তো বড়াই করে বলেন! সম্পর্ক থাকতেও পারে, না-ও পারে। বাবুগঞ্জে অনেক মুখুজ্যে-চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে আছেন। কফি ঠিক হয়েছে তো স্যার?

—হ্যাঁ। শীতের সময় গরম কিছু দিয়ে গলা ভেজানোই যথেষ্ট। তো তুমি কি বাংলোয় সারাক্ষণ থাকো, নাকি বাড়ি-টাড়ি যাও?

সুবিমল একটু হেসে বলল,—বাংলোয় কেউ এলে বাড়ি যাওয়া হয় না। অন্যদিন সন্ধ্যার সময় কেটে পড়ি। সকালে আসি। সাইকেল আছে।

—কিন্তু নদী পার হও কী করে? নৌকায়?

—না স্যার! আর সে-বাবুগঞ্জ নেই। নদীতে ব্রিজ হয়েছে। বাবুগঞ্জ এখনও ছোটবাবু, মেজবাবু বড়বাবুদের টাউন। এই বাংলোয় বিদ্যুৎ এসে গেছে। টেলিফোনও।

—বাঃ! আচ্ছা সুবিমল, মুখুজ্যেবংশের জমিদারদের কে নাকি কৃষিফার্ম করেছে এখানে? তোমাদের কলকাতার বড়সাহেব বলছিলেন।

—প্রমথ মুখুজ্যে স্যার! ওঁর ফার্মহাউস ওই জঙ্গলের ওধারে। ওখানে নদী বাঁক নিয়ে দক্ষিণে গেছে। সেই বাঁকের ওপরদিকে প্রমথবাবুর ফার্ম। দোমোহানির ওয়াটারড্যাম ওখান থেকে প্রায় পাঁচ কি.মি. পূর্বে।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—তুমি দোমোহানির ড্যামের পাখির খবর বলো সুবিমল। আর জয়ন্ত ! ততক্ষণ তুমি ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে জিরিয়ে নিতে পারো! তিনঘণ্টা টানা ড্রাইভ করেছ।

সত্যিই আমি ক্লান্ত। ঘরে ঢুকে দেখলুম মেঝেয় কার্পেট। দুধারে দুটো নিচু খাট। একটা সোফাসেট। সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুল, একদিকে ওয়ার্ড্রোব। ঘরটা প্রশস্ত। লাগোয়া বাথরুম উঁকি মেরে দেখে নিলুম গিজার আছে। গরম জলে স্নান করা যাবে।

পোশাক বদলে বিছানায় লম্বা হলুম। টের পাচ্ছিলুম, রোদ কমে এলে শীত কী সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠবে। আর শীতের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কথা। ভদ্রলোক গতকাল এখানে এসেছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে কোথায় ধুনি জ্বেলে রাত কাটিয়েছেন কে জানে! তবে ওঁর পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই। পুলিশজীবনের কত রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি তিনি শুনিয়েছেন। অবশ্য কর্নেলের সঙ্গে তাঁকে এযাবৎ অনেক অ্যাডভেঞ্চারে বেপরোয়া পা বাড়াতে দেখেছি।

এবারকারটা কেমন হবে, এখনও বুঝতে পারছি না। জয়গোপালবাবু যে ছিটগ্রস্ত লোক, তা ঠিক। সুবিমলবাবুর কথায় মনে হল, জুতোচুরি নিয়ে ওঁর একটা পাগলামি আছে। অথচ কর্নেল এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা ভেবেছেন কেন কে জানে! কী আছে জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদার দলিলে?

দেড়টার মধ্যে স্নানাহার সেরে নিয়ে কর্নেল বলেছিলেন,—আজ দোমোহানি জলাধারে পাখি দেখার মতো সময় পাব না। বরং বাবুগঞ্জের ভিতরটা দেখে নেওয়া যাক! সুবিমলকে সঙ্গে নিয়ে বেরুব।

আমি বলেছিলুম,—মফস্বলের শহরের যা অবস্থা! ওর ভিতরে আপনার দর্শনযোগ্য কিছু আছে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে গোয়েন্দামশাই কী অবস্থায় কোথায় আছেন, দেখা উচিত।

কর্নেল একটু হেসে বলেছিলেন,—পাশে একটা নদী, তখন শ্মশানঘাট সেই নদীর ধারে কোথাও নিশ্চয়ই আছে। সাধুবাবার বেশে হালদারমশাই শ্মশানঘাট বেছে নিতেও পারেন!

সেই সময় সুবিমল এসে গেল,—এবেলা কী প্রোগ্রাম করেছেন স্যার?

—জয়ন্ত এখানকার শ্মশানঘাট দেখতে চাইছে!

সুবিমল গম্ভীর হয়ে বলল,—বাবুগঞ্জের শ্মশানঘাট খুব প্রাচীন। জমিদারবাবুদের পূর্বপুরুষরা জায়গাটা নদীর তলা থেকে পাথরে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে নদীর স্রোতে ধসে না যায়। বুঝুন স্যার! মালগাড়িতে চাপিয়ে বিহার থেকে সেই পাথর আনা হয়েছিল। তারপর গরু-মোষের গাড়িতে চাপিয়ে বাবুগঞ্জ! বুঝুন কী এলাহি কাণ্ড! তারপর ওই শ্মশানকালীর মন্দির! জয়ন্তবাবু দেখার মতো জায়গাই দেখতে চেয়েছেন। স্যার!

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—দেখার মতো জায়গা মানে?

সুবিমল চাপা গলায় বলল,—শ্মশানকালীর মন্দিরে নরবলি দিত জমিদারের পূর্বপুরুষেরা। শুনেছি, কাকে বলি দেওয়া হবে, তার খোঁজ দিত জমিদারের নায়েব। যে প্রজার খাজনা সবচেয়ে বেশি বাকি পড়েছে, সেই হতভাগাকে রাত্তিরে পাইকরা বেঁধে আনত, স্যার! সে মন্দির ভেঙে গেছে। বটগাছটা গিলে খেয়েছে মন্দির। প্রতিমা তুলে নিয়ে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছে ওরা। আর বটগাছের গোড়ায় মন্দিরের ধ্বংসস্তূপে কত যে মড়ার খুলি আছে—না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কখনও-সখনও কোনো সাধুবাবা এসে খুলিগুলি জড়ো করে বসে থাকে। ধুনি জ্বেলে চোখ বুজে মন্ত্র পড়ে।

কথাটা শুনতে পেয়ে চণ্ডী বলল,—কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিলুম এক সাধুবাবা এসে জুটেছেন।

কর্নেল আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন,—তাহলে জয়ন্তের ইচ্ছে পূর্ণ হোক। সুবিমল! কোথায় সেই শ্মশানঘাট? শর্টকাটে যেতে চাই কিন্তু!

সুবিমল বলল,—তাহলে নদীর ধারে বাঁধের পথে চলুন। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে একটুখানি এগোতে হবে।

পূর্ববাহিনী বেহুলার দক্ষিণ তীরে বাঁধের দুধারে ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়, একটা জেলেবসতি বাঁদিকে চোখে পড়ল। একটা একতলা ঘরের মাথায় টাঙানো আছে 'বাবুগঞ্জ-ঝাঁপুইহাটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি,' লেখা সাইনবোর্ড। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর নদীর ব্রিজের এদিকটায় দুধারে দোকানপাট আর ভিড়। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে আবার বাঁধ এবং গাছের সারি। তারপর নদী যেখানে উত্তরে বাঁক নিয়েছে, সেখানে উঁচু জমির ওপর একটা বিশাল বটগাছ। কর্নেল মাঝে-মাঝে বাইনোকুলারে হয়তো পাখি দেখছিলেন। সুবিমল বলল,—এসে গেছি স্যার!

চওড়া উঁচু জায়গাটা ছাইভর্তি। ঘাসে ঢাকা বটতলার ওদিকটায় ইতস্তত চিতার ছাই। সেই ছাই উত্তরের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঁধ থেকে সেখানে কয়েক পা এগিয়ে তারপর 'সাধুবাবা' কে চোখে পড়ল। সামনে ধুনি জ্বেলে গায়ে কম্বল জড়িয়ে তিনি বসে আছেন। হ্যাঁ—গোয়েন্দাপ্রবরই বটে! আমাদের দেখামাত্র তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

সুবিমল একটু দূরে হাঁটু মুড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছে দেখে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু কর্নেল চোখের ইঙ্গিতে আমাকে দূরে থাকতে বললেন। আমি আস্তে বললুম,—সুবিমলবাবু! সাধুবাবা খুব রাগী মানুষ মনে হচ্ছে। পাশেই ত্রিশূল পোঁতা। কিছু বলা যায় না, হঠাৎ ত্রিশূল ছুড়ে মারতে পারেন। চলুন, ওপাশে ওই নিমগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। কর্নেলের ব্যাপার তো জানেন! উনি সাধুদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলতে পারেন।

নিমতলায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করলুম। কর্নেল অবিকল সুবিমলের মতো হাঁটু মুড়ে নমো করলেন। তবে টুপিপরা মাথা মাটিতে ঠেকানোর অসুবিধে আছে। তারপর দেখলুম, দুজনে কী সব কথা হচ্ছে।

সুবিমল সতর্কভাবে একটু হেসে ফিসফিস করে বলল,—বুঝলেন জয়ন্তবাবু! সাধুবাবা কর্নেলসায়েবকে বিদেশি সায়েব ভেবেছেন। আমি সাধুবাবাদের এই ব্যাপারটা দেখেছি। সায়েব-মেমদের খাতির করে।

একটু পরে কর্নেল এসে বললেন,—সাধুবাবার আশীর্বাদ নিয়ে এলুম।

আমি বললুম,—তাহলে আমিও আশীর্বাদ নিয়ে আসি?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—সাধুবাবা প্রতিদিন মাত্র একজনকে আশীর্বাদ করেন। তারপর যারা যায়, তাদের অভিশাপ দেন। ভাগ্যিস আজ সারাদিন ওঁর কাছে কেউ যায়নি। নইলে আমাকে অভিশাপ দিতেন। এ এক সাঙ্ঘাতিক সাধু! চলো সুবিমল। এখান থেকে কেটে পড়ি।

সুবিমল বাঁধে উঠে বলল,—জয়ন্তবাবু নিশ্চয় মড়ার খুলিগুলো দেখতে পেয়েছেন?

বললুম,—হ্যাঁ! দেখলুম, কত খুলি গাছের শেকড়ে আটকে আছে।

সুবিমল হঠাৎ ফুঁসে উঠল। —ওই হতভাগা প্রজাদের অভিশাপেই তো মুখুজ্যেদের জমিদারি ধ্বংস হয়ে গেছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জমিদারিপ্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল স্বাধীনতার পরে, হতভাগ্যদের অভিশাপ দেরি করে লেগেছিল।

—দেরি কী বলছেন স্যার! প্রথম মুখুজ্যের ঠাকুরদার আমলেই নাকি সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল। তখন আমার জন্মই হয়নি। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের কথা বইয়ে পড়েছি। আপনারা তো আমার চেয়ে বেশি জানেন। বাবার মুখে শুনেছিলুম, আগস্ট মাসে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল ক'দিন ধরে। একরাত্রে স্বদেশিবাবুরা জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ করেছিলেন। অনেক ধনরত্নও নাকি লুঠ হয়েছিল। শোনা কথা, জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা ছিলেন খাজাঞ্চিবাবু। ঝড়জলের জন্য তিনি বাড়ি যেতে পারেননি। তাঁকে বেঁধে রেখে লুঠ চলেছিল। শেষরাত্তিরে বিনয়বাবু—খাজাঞ্চি, কোনোভাবে বাঁধন খুলে পালিয়ে আসেন। তবে শোনা কথা স্যার। খাজাঞ্চিবাবু নাকি বিপ্লবীবাবুদের লুঠ-করা জুয়েলসের কিছুটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই নিয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধেছিল। পুলিশ বিনয়বাবুকে জেল খাটাতে চেয়েছিল। প্রমাণের অভাবে তিনি খালাস পান। তবে জমিদারবাবুদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—তারপর?

—বছর আট-দশ পরে বিনয়বাবু বাবুগঞ্জে ফিরে আসেন। জমিদারবাবুদের অবস্থা ততদিনে পড়ে গেছে। দালানকোঠা মেরামতের অভাবে ধ্বসে পড়েছে। ওই যে বলছিলুম, অভিশাপ!

—তাহলে জয়গোপালবাবুর ঠাকুরদা নিরাপদে বাড়ি-ঘর তৈরি করে বসবাস করতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার। এখনও সেই তিনকামরা একতলা বাড়ি আছে।

—চলো সুবিমল! সেই বাড়িটা বাইরে থেকে দেখে বাবুগঞ্জের ভিতর দিয়ে বাংলোয় ফিরব।

ব্রিজের কাছে আসতেই দেখলুম, একটা লোক লাঠি হাতে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে এদিকে আসছে। গায়ে সোয়েটার। মাথায় মাফলার জড়ানো। আর পরনে যেমন-তেমন প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, লোকটা যে নেশা করেছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। সুবিমলকে দেখেই সে বলে উঠল,—এই যে বাবা হারাধন।

সুবিমল ধমকের সুরে বলল,—মাতলামি করবে না প্রবোধদা! দেখছ না আমার সঙ্গে কারা আছেন?

জয়গোপালবাবুর মুখে তাঁর পিসতুতো ভাই প্রবোধের কথা শুনেছিলুম। এই সেই প্রবোধ। সে জড়ানো গলায় হেসে বলল,—মাইরি সুবিমল! আমার খালি ভুল হয়! ছেলেকে দেখলেই বাপের নাম বলে ফেলি। হ্যাঁ! তুমি ঝাঁপুইহাটির হারাধনের ছেলে সুবিমল। বাবা সুবিমল! সাবধান! জুতো হারিয়ো না যেন! জুতো হারাতে-হারাতে শেষে নিজেই হারিয়ে যাবে! মাইরি বলছি! আমাদের গোপাল! জয়গোপালের জুতো হারাত না? শেষে আজ শুনি সে নিজেই হারিয়ে গেছে। হিমি কেঁদেকেটে থানাপুলিশ করে বেড়াচ্ছে। এই বাবা সায়েব! গিভ মি টেন রুপি! ওনলি টেন।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবু হারিয়ে গেছেন। আপনি তাঁকে খুঁজে বের করুন।

মাতাল প্রবোধ হিহি করে হেসে উঠল।—ওরে বাবা! এ তো দিশি সায়েব দেখছি! ধুস!

কর্নেল আমাকে অবাক করে তাকে একটা দশটাকার নোট দিয়ে বললেন,—জয়গোপালবাবু আপনার মামার ছেলে। তাঁকে খুঁজে বের করে সুবিমলকে গোপনে জানালে একশো টাকা বকশিশ পাবেন। কেউ যেন জানতে না পারে।

টাকা পেয়ে প্রবোধ যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সে সেলাম ঠুকে চাপাস্বরে বলল, —মাইরি, একশো টাকা দেবেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—দেব।

—মা কালীর দিব্যি?

—মা কালীর দিব্যি।

মাতাল প্রবোধ ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ভিড়ের মধ্যে গিয়ে মিশল। শেষ-বিকেলে তখন ব্রিজের মুখে যানবাহন আর তুমুল ভিড়। কারণ বাবুগঞ্জের উত্তরপ্রান্তে ব্রিজের কাছাকাছি দুধারে দোকানপাট। নদীর ওপারের গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোকেরা এসে শেষবেলায় কেনাকাটা করে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত। গরু-মোষের গাড়ি, সাইকেলভ্যান, টেম্পো, লরি-বাস ব্রিজের মুখে এসে জট পাকিয়েছে।

ভিড় পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর সুবিমল কর্নেলকে বলল,—ওই মাতালটাকে টাকা দিলেন স্যার! ও আবার মদের দোকানে গিয়ে মদ গিলবে।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! এবার জয়গোপালবাবুর বাড়ি চলো!

—সামনে ডানদিকের গলিরাস্তায় ঢুকতে হবে। কিন্তু আপনি কি প্রবোধদার কথা বিশ্বাস করেছেন?

—কিছু বলা যায় না। প্রবোধের কথা সত্য হতেও পারে।

বিকেলের আলো দ্রুত কমে আসছিল। গলির দুপাশে মাটি বা ইটের একতলা বাড়ি। কিন্তু গলিপথটা নির্জন। একটু পরে দুধারে পোড়ো জমি চোখে পড়ল। ঝোপ-জঙ্গল গজিয়ে আছে। তারপর একটা পুরোনো একতলা ইটের বাড়ি দেখতে পেলুম। সামনে খানিকটা জায়গায় মাটি নগ্ন।

সেখানে দাঁড়িয়ে সুবিমল বাঁদিকে নিচু পাঁচিলে ঘেরা জমিটা দেখিয়ে বলল,—ওখানে স্যার মুখুজ্যেমশাইয়ের এক শরিক অবনীবাবু গার্লস স্কুল তৈরি করবেন। কিন্তু জমিটা জবরদখল।

জয়গোপালবাবু যখন রেলে চাকরি করতেন, তখন হিমিদি—মানে হৈমন্তীদি, উনি স্যার প্রাইমারি স্কুলের টিচার—তো উনি অবনীবাবুর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেননি। মামলা করার সাহস হয়নি। পঞ্চায়েতে নালিশ করেছিলেন। শেষে পঞ্চায়েত বলেছিল, জমিটা খালি পড়ে আছে। ওটা গার্লস স্কুলের জন্য দান করে দাও।

এই সময় বাড়ির দরজা খুলে একজন প্রৌঢ়া বেরিয়ে বলল,—ওখানে কারা গো?

সুবিমল এগিয়ে গিয়ে বলল,—সরলামাসি! আমি সুবিমল! হিমিদি বাড়ি নেই বুঝি?

—অ! সুবিমল? এই দ্যাখো না বাবা কী বিপদ! আমাকে পাহারায় রেখে বাবুদিদি গেছেন থানায়। সেই দুপুরে গেছেন। এখনও ফিরছেন না। আমি শুধু ঘর-বার করছি।

—কী বিপদ সরলামাসি?

—তুমি শোনোনি? সারা বাবুগঞ্জ শুনেছে। বিপদ বলে বিপদ! অমন এক জলজ্যান্ত লোক গোপালবাবু কলকাতা গেলেন। গিয়ে ফেরার পথে হারিয়ে গেলেন!

—হারিয়ে গেলেন মানে?

—হারিয়ে গেলেন বইকী। রানাঘাট ইস্টিশনে বাবুদাদাকে ট্রেন থেকে কাল বিকেলে নামতে দেখেছিল হরেন-গয়লা। শুধু সে একা দেখেনি। আরও দেখেছিল মুসলমান পাড়ার মকবুল। বাবুদিদির কান্নাকাটি আর থানা-পুলিশ করার খবর পেয়ে তারা এসে বলে গিয়েছে। পুলিশকেও বলেছে। এদিকে সারাটা রাত্তির গেল। সকাল গেল। বাবুদাদার খবর নেই। বাবুদিদির মাসতুতো দাদা কলকাতার পুলিশ। তাকে বাবুদিদি টেলিফোনে খবর দিয়েছিলেন। তিনি দুপুরবেলা এসে বাবুদিদিকে নিয়ে আবার থানায় গেছেন।—বলে প্রৌঢ়া আমাদের দিকে তাকাল।

সুবিমল বলল,—এনারা কলকাতার সায়েব। এখানে বেড়াতে এসেছেন। আমি যেখানে কাজ করি, সেই বাংলোতে উঠেছেন। স্যার! সরলামাসির জেলেপাড়ায় বাড়ি। দেখলে বুঝবেন না মাসির কী ক্ষমতা! ওদের মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অফিসে দিনের বেলা ডাকাত পড়েছিল। মাছ বিক্রির টাকা সেদিন বিলি হওয়ার কথা। খবর পেয়ে নৌকায় চেপে ডাকাত এসেছিল। আর এই মাসি এক ডাকাতকে ধরে উপুড় করে ফেলেছিল। বেগতিক দেখে অন্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

সরলা বলল,—ওসব কথা থাক বাবা সুবিমল। এই বিপদ নিয়ে আমার মাথার ঠিক নেই। অ্যাদ্দিন বাবুদাদা যেখানে যেতেন জুতো হারিয়ে আসতেন। ছেলেছোকরারা ঠাট্টা-তামাশা করত। এখন বাবুদাদা নিজেই কোথায় হারিয়ে গেলেন! রানাঘাট হাসপাতাল থেকে বাবুগঞ্জ পর্যন্ত যত ছোট-বড় হাসপাতাল আছে খোঁজ নিয়েছে পুলিশ। পাত্তা নেই।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুর কি কোনো শত্রু আছে এখানে?

—অমন ভোলাভালা মানুষের কে শত্রু থাকবে সায়েববাবা? বাবুদাদা রেলের চাকরি শেষ করে নিজের বাবার বাড়িতে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। ওনার বোন অ্যাদ্দিন বাড়িখানা যত্ন করে আগলে রেখেছেন। ধরুন, বাবুদিদিরও তো বয়েস হয়েছে। ছেলেপুলে নেই। আর কদ্দিন চাকরি করবেন? আপদে-বিপদে পড়লে আমাকে খবর পাঠান, আসি। পাশে এসে দাঁড়ালে উনিও মনে জোর পান। কিন্তু এ কী হল বুঝতে পারছি না।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! এই বাড়ির দরজায় কারা নাকি কুকুরের মুন্ডু কেটে ঝুলিয়ে ছিল—তুমিই বলছিলে!

সুবিমল কিছু বলার আগেই সরলা বলল,—আজ্ঞে হ্যাঁ সায়েববাবা। বাবুদিদির পোষা কুকুর। কালো রঙের জন্য কালু নামে তাকে ডাকতেন। রাতবিরেতে বাড়ি পাহারা দিত, পেল্লায় কুকুর গো! বাঘের মতো গজরাত।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল বলছিল দুষ্টু ছেলে-ছোকরাদের কীর্তি।

সরলা চোখ বড় করে ক্রুদ্ধস্বরে বলল,—ছেলে-ছোকরাদের সাধ্য কী রাত্তিরে তার কাছে যায়? সায়েববাবা! এ কাজ বজ্জাত লোকেদের। পাশেই দশকাঠা জায়গা গিলে খেয়ে আশ মেটেনি। এখন বাড়িখানা গিলে খাওয়ার মতলব করেছে।

সুবিমল বলল,—কালুকে মেরে বাড়ি দখল করবে কী করে? সরলামাসি! তুমি কী বলছ?

সরলা চাপাস্বরে বলল,—বাবুদিদি বলছিল, কালুকে মারার পর রোজ রাত্তিরে জানালার পিছনে কারা এসে ভূতপেরেতের গলায় কীসব বলে। তখন বাবুদিদি বাড়িতে ইলেকটিরি আলো জ্বেলে দিয়ে বাবুদাদাকে ডাকাডাকি করেন। বুঝলে বাবারা? কাল সন্ধে হয়ে গেল, বাবুদাদা কলকাতা থেকে ফিরলেন না। তখন ওই গলির মুখে মন্ডলবাবুর ছেলে বিট্টুকে বাবুদিদি পাঠিয়েছিলেন। ওঁর ছাত্তর বিট্টু। সে আমায় ডেকে এনেছিল। তারপর রাত্তিরে ওই ভূতপেরেতের উৎপাত। জানলা খুলেই টর্চবাতি জ্বালালুম। কাকেও দেখতে পেলুম না, দৌড়ে পালানোর শব্দ শুনলুম। তখন চেঁচিয়ে বললুম, ওরে বদমাশের দল! আমি সেই ডাকাত-ধরা মেয়ে সল্লা-মেছুনি! এবার চেপে ধরব না, মাছবেঁধা করে বিঁধব।

কর্নেল বললেন,—ভূতপেরেতের গলায় কী বলছিল তারা, বুঝতে পেরেছ?

সরলা বলল,—সবকথা বুঝতে পারিনি। একটা কথা কানে আসছিল। জুতো।

—জুতো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সায়েববাবা! জুতো!

সুবিমল হাসল,—তাহলে দুষ্টু ছেলেদের কাজ!

—ছেলেদের অমন গলার স্বর হয় না। আর পায়ের শব্দও অত জোরালো হয় না। পিছনের দিকে গলির মুখে ততক্ষণে আলো জ্বলে উঠেছে। কাছে ও দূরে শাঁখ বাজছিল।

কর্নেল বললেন,—সরলা! বাড়ির আলো জ্বালবে না?

সরলা এতক্ষণে কাপড়ের আড়াল থেকে টর্চ আর একটা ধারাল হেঁসো বের করে বলল, —ঘরের ভেতর আলোর সুইচ। বাবুদিদি সব ঘরে তালা এঁটে গিয়েছেন।

বলেই সে আঙুল তুলল,—ওই বাবুদিদিরা আসছেন!

ঘুরে দেখলুম, সরলার বয়সি এক মহিলা আর একজন প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার পরা ভদ্রলোক গলিপথে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে সেই ভদ্রলোক কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—স্যার আপনি?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ পরেশ! জয়গোপালবাবুর নিখোঁজ হওয়ার খবর শুনে সেচবাংলো থেকে চলে এসেছি!

বুঝলুম, ইনিই কলকাতা পুলিশের সেই সাব-ইন্সপেক্টর পরেশবাবু। তিনি বললেন,—হিমিদি! ইনিই সেই কর্নেলসাহেব। আর ইনি কর্নেলসাহেবের সঙ্গী সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী।

হৈমন্তী আমাদের নমস্কার করে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। সরলা তাঁকে অনুসরণ করল। কর্নেল বললেন,—তোমরা থানায় গিয়েছিলে শুনলুম।

—সব বলছি স্যার! এখানে এত মশার মধ্যে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন। ভিতরে চলুন।

এই সময় সামনের একটা ঘরের দরজা খুলে গেল। ভিতরে উজ্জ্বল আলো। হৈমন্তী ডাকলেন, —পরেশ! কর্নেলসায়েবদের এই ঘরে নিয়ে এসো।

ঘরের সামনে একটুকরো বারান্দা আছে। বাইরের এই বারান্দায় উঠে কর্নেল থমকে দাঁড়ালেন। পরেশবাবু বললেন,—কী হল স্যার?

কর্নেল পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো টর্চের আলো পায়ের কাছে ফেললেন। দেখলুম ছোট্ট একটুকরো ইটের সঙ্গে বাঁধা ভাঁজকরা একটা হলদে কাগজ। কর্নেল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন,—এটা সরলা বা তোমাদের চোখের পড়ার মতো জায়গায় কখন কেউ রেখে গেছে। দেখা যাক, এতে কী আছে।

ঘরে ঢুকে দেখলুম একপাশে একটা তক্তাপোশ। তাতে সতরঞ্চি বিছানো আছে। আর একটা পুরোনো নড়বড়ে টেবিল, চারটে তেমনই নড়বড়ে চেয়ার। দেওয়ালে পুরোনো একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছে। দেওয়ালের তাকে ঠাসাঠাসি কী সব বই। পরেশেরই কথায় আমরা তক্তাপোশে বসলুম। কর্নেলের তাগড়াই শরীরের চাপে চেয়ার যে ভেঙে যেত, তা পরেশবাবু বিলক্ষণ জানেন মনে হল।

হৈমন্তী ও সরলা দুজনে ততক্ষণে সম্ভবত রান্নাঘরে আমাদের জন্য চা করতে গেছেন। বাবুগঞ্জের শীতটা এতক্ষণে আমাকে বাগে পেয়েছে। জ্যাকেটের জিপ টেনে দিলুম।

কর্নেল ইটের টুকরো থেকে সাবধানে ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেছেন। চোখ বুলিয়ে তিনি পরেশবাবুকে দিলেন। পরেশবাবু পড়ার পর বললেন,—কাদের এত স্পর্ধা? এভাবে চিঠি লিখে হিমিদিকে হুমকি দিয়েছে!

সুবিমল ব্যস্তভাবে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করল,—কী লিখেছে? কী লিখেছে?

আমিও না বলে পারলুম না,—চিঠিটা একবার দেখতে পারি?

পরেশবাবু চিঠিটা আমাকে দিলেন। দেখলুম, হলদে কাগজটার উল্টোপিঠে কীটনাশক ওষুধের বিজ্ঞাপন। খালি পিঠে লাল কালিতে লেখা আছে। ইংরাজিতে একটা লাইন।

HE ME BONETK

এই লাইনটা পড়ে বললুম,—কর্নেল! লোকটা রসিক। ইংরাজিতে যা লিখেছে, তা পড়লে হবে 'হিমি বোনটিকে'। অদ্ভুত রসিকতা তো!

পরেশবাবু বললেন,—এবার বাকিটা পড়ুন। রসিকতা না স্পর্ধা বুঝতে পারবেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—জয়গোপালবাবুর মতোই ছিটগ্রস্ত।

সুবিমল আগের মতো ব্যস্তভাবে বলল,—পড়ুন না জয়ন্তবাবু, কী লিখেছে?

বললুম,—পদ্য বলে মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ! তুমি পদ্যের মতো পড়ো। এই যে হৈমন্তীদেবীও এসে পড়েছেন। আমরা চা খাই। আপনি পদ্য শুনুন। সরলা কোথায়? তাকেও ডাকা উচিত।

হৈমন্তী বললেন,—শ্মশানঘাটের সাধুবাবাকে চা পাঠাতে দেরি হয়েছে। সরলা তাঁকে চা দিতে গেল।

—শ্মশানঘাটের সাধুবাবা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি রাত্তিরে এখানে দু-মুঠো খেয়ে এই ঘরে শুয়ে থাকেন। আবার ভোরবেলা চলে যান। সারাদিন তপ-জপ করেন। ওঁর সেবাযত্ন আমিই করছি। তা কর্নেলসায়েব পদ্যের কথা বলছেন। কী পদ্য?

পরেশবাবু বললেন,—কোনো বজ্জাত তোমাকে হুমকি দিয়ে পদ্য লিখেছে। ওই কাগজটা সুতোয় জড়িয়ে ইটের টুকরোতে বেঁধে বারান্দায় কখন সে রেখে গিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনাকে লেখা চিঠি আপনি পাবেন। আগে কানে শুনে নিন। পড়ো জয়ন্ত!

চিঠিটাতে লেখা পদ্য ছন্দ মিলিয়ে পড়তে শুরু করলুম।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার
তাঁহাকে ডাকার কী দরকার
প্রাণ যদি চাও গোপালদার
সিন্দুক খুলবে ঠাকুরদার
দর্শন পাবে দুই পাদুকার
জঙ্গলে পোড়ো-ভিটে সাধুখাঁর
নিশিরাতে ঠিকঠাঁই রাখবার
হুঁশিয়ার পুলিশকে ডাকবার
চেষ্টাটি করলে গোপালদার
মুন্ডুটি ধড় ছেড়ে যাবে তার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার

কর্নেল বললেন,—চিঠিটা ওঁকে দাও জয়ন্ত!

হৈমন্তীদেবীর হাতে চিঠিটা দিয়ে চায়ে চুমুক দিলুম। তারপর লক্ষ করলুম, হৈমন্তী চিঠিটাতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বললেন,—কর্নেলসায়েব! এ তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! গোলমেলে ঠেকছে!

কর্নেল বললেন,—আগে বলুন কোথায় জঙ্গলে কোনো সাধুখাঁর পোড়ো-ভিটে আছে নিশ্চয় আপনি জানেন?

—হ্যাঁ! পুরোনো জমিদারবাড়ির ওধারে হরনাথ সাধুখাঁ নামে এক ব্যবসায়ীর বাড়ি ছিল। এখন তো সেই জমিদারবাড়ি ধ্বংসস্তূপ। হরনাথবাবু এখন বাজারে এসে বাড়ি করেছেন। চাল-ডাল এসবের আড়তদারি ব্যবসা করেন তিনি।

—আপনার ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় আছে?

হৈমন্তীদেবী কর্নেলের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামালেন। তারপর মাথা নেড়ে আস্তে বললেন,—জানি না।

—আপনার ঠাকুরদার উইল আমি আপনার দাদার কাছ থেকে নিয়ে দেখেছি। তাতে একটা প্রাচীন সিন্দুকের কথা আছে। কিন্তু অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করলুম। আপনাদের তিনকামরা বাড়িটা একতলা। অথচ উইলে লেখা আছে, বাড়ির একটা অংশ দোতলা। সেই অংশের একতলায় সিন্দুকটা আছে।

পরেশবাবু বললেন,—আমি তো এ বাড়িতে ছোটবেলায় কতবার এসেছি। দোতলায় কোনো ঘর দেখিনি। যদি আমার জন্মের আগে কোনো অংশ দোতলা থাকত, সে কথা নিশ্চয় জানতে পারতুম।

হৈমন্তীদেবী গম্ভীরমুখে বললেন,—দোতলা ঘর থাকলে তা ভেঙে যাওয়ার কোনো চিহ্ন থাকত। আমি উইল দেখেছি। ওটা যে মুখুরিবাবু লিখেছিলেন, তাঁরই ভুল বলে আমার ধারণা।

কর্নেল বললেন,—আপনার দাদার কী ধারণা, জানেন?

—দাদার বিশ্বাস, সিন্দুকটা কোনো ঘরে পোঁতা আছে।

—আপনার ঠাকুরদার পাদুকা অর্থাৎ জুতোর ব্যাপারটা কী, আপনি জানেন?

—নাঃ! দাদা আসবার পর তার অনেকগুলো জুতো হারিয়েছিল। তারপর দাদা নিজেই হারিয়ে গেল। শেষে এই চিঠি। কে বা কারা দাদাকে কোথায় বন্দি করে রেখে ঠাকুরদার জুতো দাবি করছে—কিছু বুঝছি না।

—পরেশ! পুলিশ কি জয়গোপালবাবুর অন্তর্ধানের কোনো হদিস পেয়েছে?

পরেশবাবু বললেন,—বাবুগঞ্জে হরেন নামে একজন গোয়ালা আছে। সে দুধের কারবার করে। রোজ কলকাতা যাতায়াত করে সে। সে পুলিশকে বলেছে, প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের মধ্যে গোপালদাকে সে দেখেছিল। আর মকবুল নামে একটা লোক ডিমের কারবারি। সে স্টেশনের পিছনে বাসে চাপবার সময় গোপালদাকে দেখতে পেয়েছিল। গোপালদা হন্তদন্ত হেঁটে একটা প্রাইভেট কারের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন বাস ছেড়ে দেয়। কাজেই মকবুল আর কিছু দেখতে পায়নি। কাজেই পুলিশ ঠিকই সন্দেহ করেছে, গোপালদা কারও প্রাইভেট কারে চেপেছিলেন। সে-ই তাঁকে সুযোগ পেয়ে অপহরণ করেছে।

—গাড়ির রং বা কী গাড়ি, তা কি মকবুল লক্ষ করেছিল?

—গাড়িটার যা বর্ণনা মকবুল দিয়েছে, তাতে অ্যামবাসাডার বলে মনে হয়েছে। গাড়িটার রং তত সাদা নয়। মেটে রঙের। এখন সমস্যা হল, বাবুগঞ্জে আজকাল অসংখ্য গাড়ি আছে। হিমিদির সন্দেহ অবনী মুখুজ্যের গাড়ি। কিন্তু তাঁর অ্যামবাসাডার গাড়ি নেই। সাদা রঙের মারুতি আছে।

বলে পরেশবাবু ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—হিমিদি! আমাকে সাড়ে সাতটার বাসে কলকাতা ফিরতে হবে। কর্নেলসায়েব! আমি একদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলুম। আপনি যখন এসে গেছেন, আমি নিশ্চিন্ত! বাবুগঞ্জ থানার ও.সি. বাসুদেব ঘোষ এখানে আপনার আসবার কথা জানেন। পুলিশ সুপার তাঁকে খবর দিয়েছেন। বাসুদেববাবু সেচ-বাংলোয় আপনার সঙ্গে আজ রাত্রেই দেখা করতে যাবেন।

পরেশবাবু হৈমন্তীদেবীর সঙ্গে বাড়ির ভিতরে গেলেন। সেই সময় সুবিমল চাপাস্বরে বলল, —স্যার! আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—কী সন্দেহ?

—হিমিদির ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় লুকোনো আছে তা হিমিদি হয়তো জানেন।

—কী করে বুঝলে?

—হিমিদির চোখ-মুখ দেখে। সিন্দুকের কথা শুনেই উনি কেমন যেন চমকে উঠেছিলেন।

কর্নেল কিছু বলার আগেই একটা ব্রিফকেস হাতে নিয়ে পরেশবাবু এলেন। তারপর আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হৈমন্তীদেবী বাইরের বারান্দায় গিয়ে তাঁকে বললেন, —তোমাকে টেলিফোন করে সব জানাব পরেশ। তিনি ভিতরে এলে কর্নেল বললেন, —হৈমন্তীদেবী! ওই পদ্যে লেখা চিঠিটা আমার দরকার। আপনার দাদাকে উদ্ধার করার জন্য ওটা একটা মূল্যবান সূত্র। তবে একটা কথা। পুলিশকে এই চিঠির কথা যেন জানাবেন না।

চিঠিটা হৈমন্তীদেবীর হাতের মুঠোয় ছিল। তিনি কর্নেলকে সেটা দিলেন। এই সময় সরলার সাড়া পাওয়া গেল। সে বাইরের বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুকল। তার হাতে ছোট একটা কেটলি আর কাচের গেলাস। সে বলল,—গিয়ে দেখি শ্মশানঘাটে ধুনির আগুন আছে। কিন্তু সাধুবাবু নেই। ডাকাডাকি করে সাড়া পেলুম না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—সাধু-সন্ন্যাসীদের স্বভাবই এরকম। কোথায় কখন থাকেন। আবার উধাও হয়ে যান। আচ্ছা চলি। চিন্তা করবেন না। আপনার দাদাকে আশা করি শিগগির উদ্ধার করে দেব।

যে পথে গিয়েছিলুম, সেচ-বাংলোয় সেই পথেই এসেছিলুম। ঠান্ডায় আমার হাত-পা প্রায় নিঃসাড়। সুবিমল ঠাক্‌মশাইকে কফির তাগিদ দিয়ে রুমহিটারের সুইচ অন করে দিল। তারপর সে বেরিয়ে গেল। তখন কর্নেলকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলুম,—হালদারমশাইয়ের কানে কী ফুসমন্তর দিলেন যে উনি শ্মশানঘাট থেকে উধাও হয়ে গেলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কাল বাবুগঞ্জে এসেই হালদারমশাই শ্মশানঘাটের ওদিকে ঝোপের আড়ালে সাধু সেজে গিয়েছিলেন। তারপর শ্মশানঘাটের বটতলায় ধুনি জ্বেলে বসে ছিলেন। তাঁর বরাত ভালো। হৈমন্তীর সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি খুব ভক্তি আছে। সেটা অবশ্য তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তবে তাঁর দেখাদেখি সরলারও একইরকম ভক্তি আছে। সরলা কাল বিকেলে শ্মশানঘাটে এক সাধুবাবাকে দেখে হৈমন্তীকে খবর দিয়েছিল। ব্যস্! শীতের রাতে শ্মশানঘাটে কাটানো সম্ভব ছিল না বলব না। কারণ হালদারমশাইয়ের পক্ষে পুলিশজীবনে অমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু ওখানে বসে থেকে কষ্ট করে রাত কাটিয়ে তাঁর লাভটা কী? তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জয়গোপালবাবুর বাড়ির আনাচেকানাচে ওত পেতে দুর্বৃত্তদের পাকড়াও করা। কাজেই হৈমন্তী তাঁর সেবাযত্ন করতে চাইলে প্রত্যাখ্যান করবেন কেন?

—তাহলে গতরাতে গোয়েন্দামশাই দুর্বৃত্তদের সঙ্গে লড়াইয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন?

—নাঃ! তারা আড়াল থেকে সম্ভবত দেখেছিল ত্রিশূলধারী এক সাধুবাবা হৈমন্তীর অতিথি!

—তা উনি আজ হঠাৎ বেপাত্তা হলেন কেন? আপনার পরামর্শে?

—হ্যাঁ। হালদারমশাই আমাকে খবর দিলেন, জয়গোপালবাবু বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ। তাঁর বোন থানা-পুলিশ করে বেড়াচ্ছেন। কথাটা শুনেই আমি ওঁকে পরামর্শ দিলুম, প্রাক্তন জমিদারপরিবারের ঠাকুরবাড়িতে চলে যান। খুব হুঙ্কার ছাড়বেন। তন্ত্রমন্ত্র আওড়াবেন।

—তাতে কী লাভ!

—মুখুজ্যেবাড়ির লোকজনের গতিবিধির খবর দৈবাৎ মিলতেও পারে।

—জয়গোপালবাবুর নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে মুখুজ্যেদের কোনো যোগাযোগ আছে বলে মনে করছেন?

—জানি না। তবে চান্স নিলে ক্ষতি কী?

এই সময় ঠাক্‌মশাই ট্রেতে কফি আর পাঁপড়ভাজা এনে টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন, —সাহেবকে থানা থেকে ফোন করেছিল কেউ। চণ্ডী ফোন ধরেছিল।

—চণ্ডী কোথায়?

—আজ্ঞে সে বাড়ি চলে গেছে। কাল সকালে ইঞ্জিনিয়ারসাহেবকে জিপগাড়িতে চাপিয়ে সে কোথায় নিয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে জিপগাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে চণ্ডী। বুঝলেন স্যার? জিপগাড়িটা ইঞ্জিনিয়ারসায়েব আপনাদের জন্যই পাঠিয়েছিলেন। আপনারা গাড়ি এনেছেন শুনে ইঞ্জিনিয়ারসায়েব জিপগাড়িটা চণ্ডীকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন।

ঠাক্‌মশাই মাথায় মাফলার জড়িয়েছেন এবং গায়ে আস্ত একখানা কম্বল। তিনি বেরিয়ে যাওয়ার পর বললুম,—একটা ব্যাপার ভারি অদ্ভুত লাগছে।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—বলো!

—কিডন্যাপার হুমকি দিয়ে পদ্য লিখল কেন? সে এও জানে স্বয়ং কর্নেল নীলাদ্রি সরকার জয়গোপালবাবুর কেস নিয়েছেন এবং এখানে এসেছেন। লোকটাকে রসিক মনে হচ্ছে।

কর্নেল হাসলেন,—পল্লীকবিও বলতে পারো। ছন্দ আর মিল দেখে মনে হচ্ছে, সে অনেকদিন ধরে পদ্য লেখে। অবশ্য আমার তো মনে হয়, বাঙালিরা জাতকবি।

—আচ্ছা কর্নেল, আপনি কখনও কবিতা লিখেছেন?

বাইরে সুবিমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—কার সঙ্গে কথা বলছ জগাই।

—এক ভদ্রলোক সায়েবদের সঙ্গে দেখা করতে চান।

কর্নেল বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে বললেন,—কী আশ্চর্য! হালদারমশাই যে! আসুন! আসুন! সুবিমল! গেট খুলে দিতে বলো!

আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু বাইরে গেলাম না। কর্নেলকে বলতে শুনলাম,—সুবিমল! পটে প্রচুর কফি আছে। একটা কাপ নিয়ে এসো!

কর্নেলের পিছনে হালদারমশাই ঢুকলেন। সাধুবাবার বেশে নয়, প্যান্ট-শার্ট-সোয়েটার-কোট-হনুমানের টুপি পরে এবং কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। বললুম,—কর্নেল বলছিলেন আপনি মুখুজ্যেদের ঠাকুরবাড়িতে—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে হালদারমশাই বললেন,—পরে কইতাছি। আগে রেস্ট লই।

কর্নেল চুপচাপ বসে কফিপানে মন দিলেন। একটু পরে সুবিমল একটা কাপ-প্লেট আনল। কর্নেল বললেন,—সুবিমল! ইনি আমার বন্ধু—ওঃ হো তুমি তো দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় জয়ন্তর ক্রাইম-রিপোর্টাজ পড়ো। তাহলে অনুমান করো নি কে?

হালদারমশাই কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে বললেন,—আইজ রাতে হেভি শীত পড়ছে।

সুবিমল মুচকি হেসে বলল,—মনে পড়েছে। আপনি হালদারমশাই বলে ডাকলেন, তখন আমার অত খেয়াল ছিল না। নমস্কার স্যার। আমি বাংলোর কেয়ারটেকার সুবিমল হাজরা।

গোয়েন্দা এবার হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—বয়সে পোলাপান! আপনি কমু ক্যান? তুমিই কমু!

—নিশ্চয় স্যার! আপনাদের তিনজনকে একত্রে চর্মচক্ষে দেখতে পাব তা কল্পনাও করিনি।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—সুবিমল! বিকেলে শ্মশানঘাটে এঁকেই তুমি নমো করেছিল!

সুবিমল চমকে উঠে বলল,—কী অদ্ভুত! ইনিই সাধুবাধা সেজে শ্মশানঘাটে বসেছিলেন!

—হ্যাঁ, ওই প্রকাণ্ড ব্যাগে ওঁর জটাজুট দাড়ি-টাড়ি আছে। কিন্তু ত্রিশূল? হালদারমশাই! ত্রিশূল কোথায় ফেলে এলেন?

—সব কমু। কফি খাইয়া লই। হেভি ফাইট দিছি। টায়ার্ড।

কর্নেল বললেন,—সুবিমল! হালদারমশাইয়ের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

সুবিমল বলল,—কোনো অসুবিধে নেই স্যার! ইঞ্জিনিয়ার সেনসায়েব এসে যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরে ওঁর থাকার ব্যবস্থা করছি। আর ঠাক্‌মশাইকে বলে আসি, একজন গেস্ট এসেছেন।

সে বেরিয়ে যাওয়ার পর হালদারমশাই ফুঁ দিয়ে দ্রুত কফি শেষ করলেন। তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

কর্নেলের কথামতো সন্ধ্যায় হালদারমশাই শ্মশানঘাট থেকে উঠে বাবুগঞ্জের ভিতর দিয়ে হেঁটে যান। তাঁর নিজস্ব হিন্দিতে জমিদারদের ঠাকুরবাড়ির পথ জিজ্ঞেস করে চলতে থাকেন। তারপর নিজের খেয়ালে সোজা ঠাকুরবাড়িতে না ঢুকে পিছনে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়েন। ততক্ষণে সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে। হালদারমশাই পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ভিতরের চত্বরে উজ্জ্বল আলো। তিনি কী করবেন ভাবছেন, হঠাৎ পিছন থেকে টর্চের আলো এসে তাঁর ওপর পড়ে। বেগতিক দেখে তিনি ত্রিশূল তুলে হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে যান। কিন্তু তাঁর পিছন থেকে কেউ তাঁকে জাপটে ধরে। জোর ধস্তাধস্তি চলতে থাকে। মরিয়া হয়ে হালদারমশাই তাঁর লাইসেন্সড রিভলভার বের করে টর্চের দিকে গুলি ছোড়েন। টর্চের কাচ গুঁড়ো হয়ে টর্চ ছিটকে পড়ে। সামনের লোকটা আর্তনাদ করে ওঠে। এদিকে যে পিছন থেকে তাঁকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলেছিল, সে হালদারমশাইয়ের হাতে রিভলভার দেখে এবং গুলির শব্দ শুনে বাপ্‌রে! বাপ্‌রে! ডাকাত! ডাকাত! বলে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে রাস্তার দিকে ছুটে যায়। লোকেরা লাঠিসোটা-বল্লম নিয়ে

ছুটে আসতে পারে ভেবে হালদারমশাই ত্রিশূলের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর ওই ঝোলাটি চেপে ধরে দৌড়তে থাকেন। নাক বরাবর দৌড়ে নির্জন পিচরাস্তা পেয়ে যান। তারপর টর্চের আলো জ্বেলে সামনে শালের জঙ্গল দেখে ঢুকে পড়েন। জঙ্গলের ভিতরে সাধুবাবার বেশ বদলে প্যান্টশার্ট-সোয়েটার-কোট আর হনুমান টুপি পরে জঙ্গল থেকে বেরুচ্ছেন, সেই সময় দেখতে পান, পাশের একটা মোরামরাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি আসছে। তিনি লক্ষ করেন ওটা জিপগাড়ি। হাত তুলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিনি সেচ-বাংলোর কথা জিজ্ঞেস করেন। জিপের চালক বলে, এই মোরামরাস্তা ধরে চলে যান।

কর্নেল বললেন,—ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সেনের জিপগাড়ি। চণ্ডী গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে, আমাকে তো বটেই, আপনাকেও শত্রুপক্ষ চেনে। এটা একটা ভাববার কথা। তো ওসব পরে ভাবা যাবে। আপনি বাথরুমে ঢুকে অন্তত মুখহাত ধুয়ে ফেলুন। গরমজলের ব্যবস্থা আছে। আপনার মুখে এখনও ছাইয়ের ময়লা লেগে আছে। রুমালে চিতার ছাই মোছা যায় না। আর কপালের লাল রংগুলোও ধুয়ে ফেলবেন।

বললুম,—ছ্যা-ছ্যা! মড়াপোড়া ছাই মুখে ঘষেছিলেন হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর কোট এবং সোয়েটার খোলার পর খিখি করে হেসে বললেন,—সে-ছাই না। কাঠ কুড়াইয়া ধুনি জ্বালছিলাম, সেই ছাই।

সুবিমল এসে বলল,—থানা থেকে ও.সি. বাসুদেববাবু কর্নেলসায়েবকে ফোন করেছেন!

কর্নেল বললেন,—ফোন কি তোমার অফিসঘরে?

—হ্যাঁ স্যার!

কিছুক্ষণ পরে হালদারমশাই মুখ-হাত ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, —শার্ট-গেঞ্জি-প্যান্ট খুললে অনেক ময়লা বাইরাইব। রাত্রে আর স্নান করুম না। কাইল সকালে স্নান কইর‍্যা সব সাফ করুম।

তিনি চেয়ারে বসে হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন,—ওই যাঃ।

—কী হল হালদারমশাই?

—বাঘছালখান জঙ্গলে ফ্যালাইয়া আইছি।

—কাল দিনে গিয়ে খুঁজে পাবেন।

এইসময় কর্নেল ফিরে এলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—ও.সি. ভদ্রলোককে কেমন বুঝলেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মজার কথা শোনো। হালদারমশাইও শুনুন। ও.সি. বাসুদেব ঘোষ কথাপ্রসঙ্গে বললেন, একটু আগে অবনী মুখার্জি নামে এক ভদ্রলোক তাঁর একজন কাজের লোককে সঙ্গে নিয়ে থানায় গিয়েছিলেন। হৈমন্তীদেবী নাকি কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এনেছেন। সেই ডিটেকটিভ সাধুবাবার ছদ্মবেশে মুখার্জিবাবুদের ঠাকুরবাড়িতে ঢোকার জন্য উঁকি দিচ্ছিলেন। অবনীবাবুর দুজন লোক তা দেখতে পেয়ে তাঁকে তাড়া করে। ঠাকুরবাড়িতে ডিটেকটিভ ঢুকবে কোন সাহসে? তো ডিটেকটিভ তাঁর এই লোকটাকে লক্ষ করে গুলি ছোড়েন। ভাগ্যিস গুলি এর টর্চের মাথায় লেগে কাচ গুঁড়িয়ে গেছে। কাজেই সেই সাধুবেশী ডিটেকটিভ আর হৈমন্তীদেবীর নামে এফ. আই. আর. করতে চান অবনীবাবু। ও.সি. তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করবেন বলে বিদায় করেছেন।

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে শুনছিলেন। বললেন,—খাইসে!

—নাঃ! খায়নি। বাসুদেববাবু আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না? বললুম, জানি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার একজন প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর। তাঁর

আত্মরক্ষার জন্য লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস আছে। তবে চরম অবস্থায় পড়লে অর্থাৎ আততায়ী তাঁকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করলে তিনি শূন্যে গুলি ছুড়ে ভয় দেখান। মিঃ হালদার দায়িত্বজ্ঞানহীন নন। অবনীবাবুর দুজন লোক তাঁর মুন্ডু কাটতে চেষ্টা করছিল—যেভাবে হৈমন্তীর কালুর মুন্ডু কাটা হয়েছিল।

হালদারমশাই উত্তেজিতভাবে বললেন,—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার! একজন আমারে জাপটাইয়া মাটিতে ফেলছিল। অন্যজনের এক হাতে টর্চ ছিল। অন্য হাতে লম্বামতো কী একটা ছিল। দাও হইতে পারে। কুত্তাটার মতন আমার মুন্ডু কাইট্যা ফেলত।

বললুম,—তাহলে অবনী মুখুজ্যেই হৈমন্তীদেবীর পিছনে লেগেছেন! জয়গোপালবাবুকে তিনিই কিডন্যাপ করে লুকিয়ে রেখেছেন।

কর্নেল এতক্ষণে চুরুট ধরিয়ে বললেন,—আগে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক অবনীবাবু পদ্য লিখতে পারেন কি না।

হালদারমশাই নড়ে বসলেন,—পইদ্য? পইদ্যের কথা ক্যান কর্নেলস্যার?

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর হাত ভরে সেই হলুদ কাগজটা বের করলেন। তারপর বললেন,—আজ বিকেলে জয়গোপালবাবুদের বাড়ির বারান্দায় এটা রাখা ছিল। জয়ন্ত! পড়ে শোনাও। হালদারমশাই কী বলেন শোনা যাক।

আমি পদ্যটা পড়তে থাকলুম :

'কর্নেল ডাকার কী দরকার
প্রাণ যদি চাও গোপালদার
সিন্দুক খুলবে ঠাকুরদার
দর্শন পাবে দুই পাদুকার
জঙ্গলে পোড়োভিটে সাধুখাঁর
নিশিরাতে ঠিকঠাই রাখবার
হুঁশিয়ার পুলিশকে ডাকবার
চেষ্টাটি করলে গোপালদার
মুন্ডুটি ধড় ছেড়ে যাবে তার
হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার

হালদারমশাইয়ের গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে যথারীতি কাঁপছিল। ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন,—ঠাকুরদার সিন্দুক! দুই পাদুকা! মানে দুইখান জুতা! জয়গোপালবাবুর পাঁচজোড়া জুতা চুরি গেছে। জুতা! ঠাকুরদার জুতা! জুতা চায় ক্যান? জুতায় কী আছে?

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিপ্লব!

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

—বাবুগঞ্জের জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ হয়েছিল।

—অ্যাঁ?

—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছিল কয়েকদিন ধরে। সেই সময় খাজাঞ্চিখানা লুঠ।

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—কর্নেলস্যার কী কইতাছেন জয়ন্তবাবু?

বললুম,—জয়গোপালবাবু কী বলেছিলেন আপনি ভুলে গেছেন হালদারমশাই! উনি বলছিলেন না, ওঁর ঠাকুরদা জমিদারবাড়ির খাজাঞ্চি ছিলেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসলেন,—হঃ! মনে পড়ছে। কর্নেলস্যার কইছিলেন খাজাঞ্চি মানে ট্রেজারার। তা ট্রেজারার ভদ্রলোকের জুতা অ্যাদ্দিন পরে চায় কারা? ক্যান চায়?

বললুম,—আমার ধারণা...

কথায় বাধা পড়ল। পর্দা তুলে সুবিমল ঢুকে বলল,—আপনারা নটায় ডিনার খেয়ে নিলে ভালো হয় স্যার। ঠাক্‌মশাই বড্ড শীতকাতুরে মানুষ। বয়সও হয়েছে।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক আছে। নটায় আমরা খেয়ে নেব।

সুবিমল বেরিয়ে গেলে হালদারমশাই বললেন,—জয়ন্তবাবু কী কইতাছিলেন য্যান?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে আমার দিকে তাকালেন,—রাতবিরেতে জুতোর কথা বললেই ভূতপ্রেতের দল জানালার কাছে এসে জুতো চাইবে। সাবধান জয়ন্ত।

হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন।...

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙেছিল ঠাক্‌মশাইয়ের ডাকে। তাঁর হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। ঠাক্‌মশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—স্যারের ঘুম ভাঙালুম। কিন্তু বুড়োসায়েব ভোরবেলা আমাকে বলে গেছেন, আপনার বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খাওয়ার অভ্যেস।

কর্নেল সর্বত্র এই ব্যবস্থাটা করে প্রাতঃভ্রমণে বের হন। আমার বেড-টি না খেলে বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। চা নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম,—ঠাক্‌মশাই! কাল রাত্রে যিনি এসেছেন, সেই হালদারসায়েব কি ওঠেননি?

—উঠেছেন। বুড়োসায়েব বেরিয়ে যাওয়ার পর উনি উঠে আমার কাছে চা চাইলেন। ওঁকে চা দিয়ে আপনাকে দিতে এলুম।

ঠাক্‌মশাই বেরিয়ে যাওয়ার পর চা খেয়ে বাথরুমে গেলুম। প্রাতঃকৃত্যের পর দাড়ি কেটে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। সেই সময় সুবিমলবাবু সাইকেলে থলে ঝুলিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম,—হালদারমশাই কী করছেন?

সুবিমল বলল,—উনি কিছুক্ষণ আগে বেরুলেন। আমি বাজার করে শিগগির ফিরে আসছি।

তখনও রোদ আর কুয়াশায় চারদিক রহস্যময় দেখাচ্ছিল। সাড়ে সাতটা বাজে। কিছুটা দূরে পূর্ব-দক্ষিণে সেই সরকারি অরণ্য কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু পুবের ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে ম্লান রোদ এসে বাংলোর ফুলবাগানকে ঈষৎ উজ্জ্বল করেছে। হালদারমশাই তো কর্নেলের সঙ্গে বেরোননি। পরে বেরিয়েছেন। কোথায় গেলেন তিনি?

একটু পরে মনে পড়ল, সরকারি শালের বনে বাঘছাল ফেলে এসেছিলেন। সম্ভবত তিনি সেই বাঘছাল খুঁজে আনতে গেছেন। গোয়েন্দাপ্রবর আমাকে বলেছিলেন, ছদ্মবেশের জিনিসপত্র তিনি চিৎপুর এলাকায় যাত্রা-থিয়েটারের সাজপোশাকের দোকান থেকে কেনেন। বাঘছালটা চিৎপুরে কেনা নকল জিনিস হলেও ওটা তো তাঁকে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়েছে। কাজেই ওটা জঙ্গলে ফেলে রাখবেন কেন?

প্রায় নটায় কর্নেল ফিরলেন। সেই ট্যুরিস্টের বেশ! মাথায় টুপি, পিঠে কিটব্যাগ আঁটা। কোমর থেকে ফ্লাস্ক ঝুলছে। গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা। তিনি যথারীতি সম্ভাষণ করলেন, —মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে!

—মর্নিং কর্নেল! বেঘোরে ঘুমিয়েছি। কতদূর ঘুরলেন?

—প্রমথ মুখুজ্যের ফার্মের পাশ দিয়ে হেঁটে দোমোহানি জলাধার পর্যন্ত। কিন্তু কুয়াশা কাটতে দেরি হচ্ছিল। বাইনোকুলার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তাই ফিরে এলুম। পরে দেখা যাবে। হালদারমশাই কোথায়?

—উনি সম্ভবত সরকারি জঙ্গলে ওঁর বাঘছাল খুঁজতে গেছেন। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

ততক্ষণে সুবিমল বাজার করে ফিরে এসেছিল। ঠাক্‌মশাই ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স আনছিলেন। তাঁর সঙ্গে সুবিমলও এল। সে বলল,—আপনি কি পায়ে হেঁটে ড্যাম অব্দি গিয়েছিলেন স্যার?

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—হ্যাঁ। কিন্তু বড্ড কুয়াশা। ওবেলায় গাড়িতে যাব বরং।

—বড় মুখুজ্যের ফার্ম দেখলেন?

—দেখলুম। নিচু পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। বাইনোকুলারে যতটা দেখা যায়, দেখলুম।

ঠাক্‌মশাই চলে গিয়েছিলেন। সুবিমল এবার চাপাস্বরে বলল,—দোমোহানির এক মেছুনির নাম রানি। তাকে রানিদি বলে ডাকি। পথে তার সঙ্গে দেখা হল। তার কাছে হাফকিলো পাবদা মাছ ছিল। মাছগুলো দিয়ে রানিদি বলল, প্রায় দেড় কিলো পাবদা ছিল। আসবার পথে বড় মুখুজ্যের ডাকে ফার্মে ঢুকেছিল সে। মাছ ওজন করার সময় রানিদি একপলকের জন্য নাকি জয়গোপালকে দেখেছে। ঘর থেকে বেরিয়েই ঘরে ঢুকে গেল। রানিদি জানে, জয়গোপালবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুবিমলের কথা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তোমার রানিদি জয়গোপালবাবুকে একপলক দেখেছে। আমি বাইনোকুলারে মিনিটতিনেক দেখেছি। ফার্মের পশ্চিমে গেট। গেটের ভিতর ঢুকলে বাঁদিকে প্রমথবাবুর বাংলো। একেবারে মডার্ন ফার্ম। প্রমথবাবুও পোশাকে আমার চেয়ে বেশি সায়েব। ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে গায়ে রোদ নিচ্ছিলেন। আমি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পাঁচিলের মাথায় বাইনোকুলার রেখে তাঁকে দেখছিলুম। আর তাঁর পাশে একটা চেয়ারে বসে আদি অকৃত্রিম জয়গোপালবাবু চা-পান করছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা হল না। একটা তাগড়াই অ্যালসেশিয়ান কুকুর টের পেয়ে দৌড়ে আসছিল। আমি রাস্তার অন্যপাশে একটা আখের জমিতে ঢুকে পড়লুম। অ্যালসেশিয়ানের মুখের পাশে একটা ষণ্ডামার্কা লোকের মুখ দেখলুম। পিচরাস্তায় কাকেও না দেখতে পেয়ে সে কুকুরটাকে নিয়ে অদৃশ্য হল।

সুবিমল বলল,—অদ্ভুত ব্যাপার স্যার! জয়গোপালদা নিজেকে নিজেই লুকিয়ে রেখেছেন তাহলে!

—চেপে যাও। আর ঠাক্‌মশাইকে বলো, আমরা সাড়ে নটায় ব্রেকফাস্ট করে গাড়িতে বেরুব।

সুবিমল চলে গেলে বললুম,—কর্নেল! এমন তো হতেই পারে, রানাঘাট স্টেশনে জয়গোপালবাবুকে গাড়িতে লিফ্‌ট দেওয়ার ছলে প্রমথবাবু বা তাঁর লোকেরা তাঁকে কিডন্যাপ করে ফার্মহাউসে রেখেছে। প্রাণের ভয়ে বেচারা চুপচাপ আছেন!

—এবং চেয়ারে বসে চা-ও খাচ্ছেন! রানি মেছুনিকে দেখেই লুকিয়ে পড়েছেন।

কর্নেল মিটিমিটি হাসছিলেন। আমি বললুম,—আহা! ভিতু গোবেচারা লোক। প্রাণের দায়ে মানুষ অনেক কিছু করে।

—এবং পদ্য লিখে ঠাকুরদার সিন্দুকে রাখা জুতো দুটো সাধুখাঁর পোড়ো-ভিটেয় রেখে আসতে বলে!

অবাক হয়ে বললুম,—কর্নেল! আপনি কি সিরিয়াসলি বলছেন?

কর্নেল তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি হাসলেন। তারপর বললেন,—নাঃ! তোমার কথায় যুক্তি আছে। জয়গোপালবাবু সম্ভবত পদ্যচর্চা করতেন। তাঁর ওপর তিনি একটু ছিটগ্রস্ত। প্রমথবাবুর কথায় তিনি পদ্যটা লিখতেও পারেন।

—কিন্তু হৈমন্তীদেবী তো তাঁর ঠাকুরদার সিন্দুক কোথায় আছে জানেন না! তাহলে?

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বারান্দা দিয়ে এগিয়ে গেলেন। সুবিমলকে অফিস থেকে বেরুতে দেখলুম। তারপর কর্নেল তার সঙ্গে অফিসে ঢুকলেন।

সাড়ে নটায় আমরা ব্রেকফাস্ট করলুম। তখনও হালদারমশাইয়ের পাত্তা নেই। কর্নেল বললেন, —বলা যায় না। জঙ্গলে বাঘছাল খুঁজতে গিয়ে হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরি করতে প্রমথবাবুর ফার্মের আনাচে-কানাচে হয়তো ওত পেতে বসে আছেন। কিন্তু সমস্যা হল, অ্যালসেশিয়ানের পাল্লায় পড়ে ফায়ার আর্মস থেকে গুলি ছুড়লে কী হবে?

ব্রেকফাস্টের পর সুবিমলও আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল। কর্নেল একটু হেসে বললেন, —আমরা কিন্তু হালদারমশাইয়ের মতো গোয়েন্দাগিরি করতে যাচ্ছি না। কাজেই তুমি আসতে পারো। তাছাড়া তোমার আসবার অধিকার আছে। কারণ তুমি আপাতদৃষ্টে জটিল রহস্যে ভরা একটা ঘটনার এমন মূল্যবান সূত্র দিয়েছ, যা দিয়ে এই ঘটনার সব জট খুলে যাবে।

মনে-মনে অবাক হলেও কিছু বললুম না। রহস্যের জট খোলার কী মূল্যবান সূত্র দিয়েছে সুবিমল, কে জানে!

মোরামরাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বাঁদিকে সেই শাল-সেগুনের সরকারি জঙ্গল পেরিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! গাড়ি থামাও।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললুম, —কী ব্যাপার?

কর্নেল গাড়ি থেকে নেমে বললেন,—যা ভেবেছিলুম, তাই ঘটেছে সম্ভবত। জঙ্গলের মধ্যে কুকুরের হাঁকডাক কানে আসছে। সুবিমল গাড়িতে বসে থাকো। জয়ন্ত! আমার সঙ্গে এসো তো!

আমারও কানে এল জঙ্গলের মধ্যে কুকুরের প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি। কর্নেলকে অনুসরণ করে জঙ্গলে ঢুকলাম। শুকনো পাতার ওপর নিঃশব্দে চলা কঠিন। কুকুরের গজরানি লক্ষ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য! একটা ষণ্ডামার্কা গুঁফো লোকের হাতের চেনে আটকানো প্রকাণ্ড একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। লোকটা ওপরদিকে তাকিয়ে আছে। আর কুকুরটাও ওপরদিকে মুখ তুলে বিকট হাঁকডাক করছে।

তারপরই দেখতে পেলুম একটা শালগাছের উঁচু ডালে বসে আছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই। তাঁর হাতে কোনো ফায়ার আর্মস নেই।

গুঁড়ি মেরে দুজনে এগিয়ে গেলুম। ষণ্ডামার্কা গুঁফো লোকটা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। আর হালদারমশাই ধমক দিচ্ছেন,—হালার কুত্তারে গুলি কইর‍্যা মারুম! অরে লইয়া যাও কইতাছি! সত্যই গুলি করুম!

কর্নেল এবং তাঁর পিছনে আমি একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর কর্নেল ধমক দিয়ে বললেন, —এ কী হচ্ছে? এক্ষুনি অ্যারেস্ট করব বলে দিচ্ছি। কুকুর নিয়ে ফার্মে চলে যাও। গিয়ে দেখো, এতক্ষণ সেখানে পুলিশ বড় মুখুজ্যেবাবু আর জয়গোপালবাবুকে পাকড়াও করেছে।

লোকটা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল,—কে আপনি? ওই বাবুর মতো আপনাকেও টমকে দিয়ে গাছে চড়িয়ে ছাড়ব। ওসব পুলিশ-টুলিশ আমি পরোয়া করি না!

এবার কুকুরটা আমাদের দিকে ঘুরে গজরাতে থাকল। কর্নেল এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, —তাহলে আগে কুকুরটা তারপর তোমার মুণ্ডুটা গুলি করে উড়িয়ে দিই।

বলে তিনি সত্যিই জ্যাকেটের ভিতর থেকে রিভলভার বের করলেন। গাছের ওপর থেকে গোয়েন্দাপ্রবর চেঁচিয়ে উঠলেন,—আমার রিভলভারটা সঙ্গে আনি নাই। হালার কুত্তার মাথা ফুটা কইর‍্যা দ্যান কর্নেলস্যার!

লোকটা রিভলভার দেখে আঁতকে উঠে কুকুরের চেন ছেড়ে দিয়ে গুলতির মতো উধাও হয়ে গেল। কুকুরটাও কী বুঝল কে জানে, তখনই তার পিছনে দৌড়ে অদৃশ্য হল। কর্নেল বললেন, —হালদারমশাই! আপনি শালগাছে চড়লেন কী করে?

হালদারমশাই সোজা গুঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলুম, —আপনার পেট অত মোটা কেন?

হালদারমশাই সোয়েটারের ভিতর থেকে তাঁর বাঘছালটা বের করে সহাস্যে বললেন,—কুত্তার তাড়া খাইয়াও বাঘছাল ফেলি নাই। শুধু একখান ভুল, ফায়ার আর্মস আনি নাই।

কর্নেল বললেন,—আপনি বাঘছাল খুঁজতে কি প্রমথবাবুর ফার্মে গিয়েছিলেন?

—না! বাঘছাল ঠিক জায়গায় ছিল। কুড়াইয়া লইয়া ভাবছিলাম, এই জঙ্গলের ওধারে বড় মুখার্জির ফার্ম। তাই সেখানে গিয়া আড়াল থেইক্যা লক্ষ রাখছিলাম। অমনই কুত্তাটা ট্যার পাইছিল। বুঝেছি।—বলে কর্নেল ঘুরে মোরামরাস্তার দিকে পা বাড়ালেন।

হালদারমশাই আমাদের অনুসরণ করলেন। আমি বললুম,—ভাগ্যিস গাছে চড়েছিলেন। নইলে কুকুরটা আপনার অবস্থা শোচনীয় করে ফেলত।

হালদারমশাই হাসিমুখে বললেন,—কইছিলাম না? পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশের চাকরি করছি। তো কর্নেলস্যার পুলিশের কথা কইছিলেন ক্যান?

সুবিমল বলল,—হিমিদি স্কুলে চলে গেলে ওঁকে ডেকে আনতে হবে।

কর্নেল বললেন,—না। উনি ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়েছেন।

মোরামরাস্তা যেখানে পিচরাস্তার সঙ্গে মিশেছে, তার আগে শালের জঙ্গলটা শুরু হয়েছে। তাই আমাদের সামনে জঙ্গলের কিছুটা আড়াল ছিল। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে দেখলুম, পিচরাস্তায় একটা পুলিশের জিপ আর পিছনে কালো রঙের পুলিশভ্যান দ্রুত বাবুগঞ্জের দিকে চলে গেল। বললুম, —কর্নেল! পুলিশের গাড়ি গেল।

কর্নেল একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন,—এখন পুলিশ নয়, ঠাকুরদার সিন্দুক। আর সিন্দুকের মধ্যে জুতো।

পিছন থেকে হালদারমশাই বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

—আগস্ট বিপ্লব। সুবিমলকে জিজ্ঞেস করুন! সে জানে।

হালদারমশাই সুবিমলকে নিয়ে পড়লেন। সুবিমল তাঁকে বাবুগঞ্জের বাড়িতে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে ঝড়বৃষ্টির কাহিনি শোনাতে থাকল।

বাজারে এখনই ভিড়। হালদারমশাইকে একটা খাবারের দোকানের কাছে নামিয়ে দিলুম। সুবিমল বলল,—মিঃ হালদার! হিমিদির বাড়ি চিনতে পারবেন তো?

হালদারমশাই বললেন,—হঃ। চিন্তা করবেন না। কুত্তার তাড়া খাইয়া ক্ষুধা পাইছে। কিছু খাইয়া লই।

কর্নেল সুবিমলকে শর্টকাটে পৌঁছনোর পথ দেখাতে বলেছিলেন। গলিপথে ঘুরপাক খেতে-খেতে নদীর ব্রিজের কাছে সেই বাজারে গিয়ে সেখান থেকে ডাইনে ঘুরে আবার একটা গলিতে ঢুকেই জয়গোপালবাবুদের বাড়িটা চিনতে পারলুম। গাড়ির শব্দ শুনে কাচ্চাবাচ্চারা ভিড় করেছিল। সুবিমল ধমক দিয়ে তাদের হটিয়ে দিল।

হৈমন্তী বেরিয়ে নমস্কার করে বললেন,—ভিতরে আসুন আপনারা। আমি গেনুদাকে ডেকে বলে আসি, গাড়ি পাহারা দেবে। সুবিমল! ভিতরে গিয়ে বসার ঘরে দরজা খুলে দাও।

কাল রাতে যে ঘরে বসেছিলুম, সেই ঘরে আমি ও কর্নেল বসলুম। একটু পরে হৈমন্তী ফিরে এলেন। কর্নেল বললেন,—গতরাতে কোনো উৎপাত হয়নি তো?

হৈমন্তী বললেন,—না। তবে প্রবোধদা—তাকে চেনেন কি না জানি না—

—চিনি। বলুন!

—আপনারা চলে যাওয়ার পর প্রবোধদা মাতলামি করছিল।

—কিছু বলছিলেন কি উনি?

—মাতলামি করে গান গাইছিল। গোপাল আছে শিবের কোলে! সরলামাসি ওকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। তবে গানটা শুনে খটকা লেগেছিল।

কর্নেল হাসলেন,—প্রবোধবাবু ঠিকই বলেছিলেন।

—তার মানে?

—পরে বলছি। আপনি বাইরের দরজা বন্ধ করে একবার বাড়ির ভিতরে চলুন।

ভিতরে ঢুকে দেখলুম, বাড়িটার গড়ন ইংরেজি এল অক্ষরের মতো। যে ঘরে বসেছিলুম, সেটার ভিতরের দরজা পশ্চিমমুখী। এটার সংলগ্ন দুটো ঘর দক্ষিণমুখী। উঠোনের দুটো দিকে পাঁচিল। পাঁচিলের উত্তর অংশে শেষ ঘরটার সংলগ্ন টালির চালের রান্নাঘর।

কর্নেল বললেন,—আপনার দাদা সম্ভবত এই ঘরটায় থাকতেন। আর আপনি থাকেন রান্নাঘরের পাশে শেষ প্রান্তের ঘরে। তাই না।

হৈমন্তী একটু চমকে উঠে বললেন,—হ্যাঁ। আপনাকে কি দাদা এসব কথা বলেছিল?

কর্নেল তাঁর কথার জবাব না দিয়ে বললেন,—আপনার দাদার ঘরে তালা আঁটা দেখছি। ওটার ডুপ্লিকেট চাবি নেই?

হৈমন্তী গম্ভীরমুখে বললেন,—না। দাদা নিজের ঘরের চাবি নিজের কাছেই রাখে।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা সাদা খাম বের করে বললেন,—এর মধ্যে আপনার ঠাকুরদার উইল আছে। উইলের একটা অংশ পড়ে আমার খটকা লেগেছে। পড়ে শোনাচ্ছি।

বলে তিনি সাদা খামের ভিতর থেকে আরেকটা জীর্ণ খাম বের করলেন। তার ভিতর থেকে সাবধানে এক পাতার একটা পুরু কাগজ বের করলেন। ওপরের দিকটায় স্ট্যাম্প আছে। কত টাকার স্ট্যাম্প দেখতে পেলুম না। হলুদ হয়ে যাওয়া এবং ভাঁজ ছিঁড়ে যাওয়া কাগজটা যে উইল, তা বোঝা গেল। রেজেস্ট্রি করা উইল। কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে আতশ কাচ বের করে একটা অংশ পড়লেন।

'...এতদ্‌ব্যতীত দালানবাটীর পশ্চিমে শেষাংশে দ্বিতলের নিম্নতলে সুরক্ষিত সিন্দুক এবং তন্মধ্যে সংরক্ষিত যাবতীয় দ্রব্য আমার পুত্র শ্রীমান হরগোপাল রায় পাইবে।'

কর্নেল বললেন,—হরগোপাল রায় আপনার বাবা। আপনার ঠাকুরদা 'দ্বিতলের' লিখে 'নিম্নতল' লিখেছেন। কিন্তু শেষাংশ দ্বিতল নয়। দোতলা নয়। একতলা। তাহলে 'নিম্নতল' কথাটার একটাই মানে হয়। তাই না হৈমন্তীদেবী?

হৈমন্তী মুখ নামিয়ে বললেন,—কিছু বুঝতে পারছি না।

—পশ্চিমে শেষাংশে আপনার ঘর। প্লিজ! আপনার ঘরে চলুন!

হৈমন্তী একটু ইতস্তত করে নিজের ঘরে গিয়ে তালা খুলে দিলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণের জানালা খুললেন। আমরা বারান্দায় জুতো খুলে ঘরে ঢুকলুম। দেখলুম, দেওয়ালের পশ্চিমে সেকেলে একটা উঁচু পালঙ্ক। অন্যদিকে আলমারি। র‍্যাকে সাজানো বই। এককোণে ছোট্ট বেঞ্চিতে কভারে ঢাকা বাক্স-প্যাঁটরা।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—'দ্বিতলের নিম্নতল' কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি হৈমন্তীদেবী! এই ঘরের তলায় একটা ঘর আছে। ইংরাজিতে যাকে বলে বেসমেন্ট। আগের দিনে বলা হত 'তয়খানা'। সেখানে দামি জিনিস রাখা হত। আপনার খাটের মাথার দিকে ছোট্ট বেঞ্চে বাক্স-প্যাঁটরা রাখা আছে।

বলে কর্নেল প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর খুদে কিন্তু জোরালো আলোর টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর একটু ঝুঁকে দেখে নিয়ে বললেন,—বেঞ্চের তলায় পেতলের বালতিটা সরাচ্ছি! আমাকে বাধা দেবেন না প্লিজ!

কর্নেল পেতলের বালতি সরাতেই দেখা গেল একটা মোটা লোহার আংটা। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—হৈমন্তীদেবী! লোহার ওই আংটা ধরে জোরে টান দিলে লোহার চৌকো একটা পাত উঠে আসবে। নীচে সিঁড়ি আছে। নেমে গেলেই সিন্দুকটা পাওয়া যাবে।

হৈমন্তী কান্নাজড়ানো গলায় বললেন,—কিন্তু গোপালদাকে সিন্দুকের খোঁজ দিলে সে ঠাকুরদার জুতো দুটো বের করবে। জুতো দুটোর হিলে কী আছে তা কি আপনি জানেন?

কর্নেল বললেন,—জানি! তার মানে, এই সুবিমলের মুখে একটা ঘটনা শোনার পর তা আমি যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করেছি। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে ঝড়বৃষ্টির রাতে স্বদেশি বিপ্লবীরা জমিদারের খাজাঞ্চিখানা লুঠ করেছিলেন। আপনার ঠাকুরদা ছিলেন খাজাঞ্চি। তাঁকে বেঁধে রেখে ধনরত্ন লুঠ করা হয়েছিল। যেভাবে হোক, বাঁধন খুলে আপনার ঠাকুরদা পালিয়ে আসার সময়—হ্যাঁ, আমার অনুমান ঠিক, দৈবাৎ দুটি দামি রত্ন দেখতে পান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রত্নদুটি হিরে। তাই বিদ্যুতের আলোয় তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য হিরের দুটি খণ্ড আপনার ঠাকুরদা কুড়িয়ে পান। এর পরের কাহিনি আপনার জানা। সুবিমল আমাকে বলেছে, আপনার ঠাকুরদাকে জেল খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন জমিদারবাবু। আট বছর তিনি লুকিয়ে থাকার পর ফিরে আসেন।

হৈমন্তী বললেন,—আমি সব জানি। বাবার কাছে শুনেছি। কিন্তু দাদা এতদিনে রেলের চাকরি থেকে রিটায়ার করে আসার পর মুখুজ্যেদের পাল্লায় পড়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলুম। দাদাকে টাকার লোভ দেখিয়ে মুখুজ্যেরা হিরে দুটো হাতাতে চায়। তাই মিথ্যা করে জুতোচুরির গল্প শোনায়।

কর্নেল হাসলেন,—আপনি জানেন তাহলে?

হৈমন্তী চোখ আঁচলে মুছে বললেন,—আগে একটু সন্দেহ হয়েছিল। গতরাতে ওই পদ্য পড়েই বুঝেছিলুম, এটা দাদার পদ্য। হাতের লেখা অন্যের। দাদার পদ্য লেখার অভ্যাস আছে।

হালদারমশাই ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—খাইসে!

এই সময় বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। কর্নেল বললেন,—আপনার দাদা নিখোঁজ হয়েছিলেন। ওঁকে প্রমথ মুখুজ্যের ফার্ম থেকে পুলিশ উদ্ধার করে এনেছে। শিগগির এ ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে তালা এঁটে দিন। আমি বাইরে যাচ্ছি।

পুলিশের জিপ থেকে একজন অফিসার নেমে এসে করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আমার সৌভাগ্য, কিংবদন্তি পুরুষ কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আমি ও. সি. বাসুদেব ঘোষ।

কর্নেল বললেন,—জয়গোপালবাবুকে এনেছেন তো?

—হ্যাঁ। প্রমথবাবুর ফার্মে দিব্যি বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। আমাদের দেখে অবাক হয়ে, পরে বললেন, আমি নিখোঁজ হব কোন দুঃখে? বড় মুখুজ্যেবাবু জামাই-আদরে রানাঘাট স্টেশন থেকে গাড়ি চাপিয়ে ফার্মে নিয়ে এসেছেন। খাচ্ছি-দাচ্ছি! দিব্যি আছি!

জয়গোপালবাবু জিপের পিছনদিক থেকে একলাফে নেমে এলেন। হাসিমুখে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—আপনি এসে পড়েছেন তাহলে?

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন,—পাঁচজোড়া জুতোর মধ্যে প্রথমজোড়া ছিল আপনার। বাকি চারজোড়া জুতো কি বড় মুখুজ্যে কিনে দিয়েছিলেন?

জয়গোপালবাবু জিভ কেটে বললেন,—ছ্যা-ছ্যা! আমার কি জুতো কেনার পয়সা নেই? আপনার দিব্যি! মা কালীর দিব্যি! পুলিশস্যারের দিব্যি! আমার পাঁচজোড়া জুতো সত্যি চুরি গিয়েছিল। সেই জুতোগুলো আজ সক্কালে বড় মুখুজ্যের ফার্মের পাঁচিলের গোড়ায় ঘাসের মধ্যে দেখেছি। সবগুলোর হিল ওপড়ানো। খাপ্পা হয়ে বললুম, বড় মুখুজ্যেদা! এ কী করেছ? বড় মুখুজ্যের এক কথা। ঠাকুরদার জুতোজোড়া এনে দাও। তবে ছাড়া পাবে! তারপর কাল দুপুরবেলা আমাকে দিয়ে পদ্য লিখিয়ে ছাড়ল। না লিখলে অ্যালসেশিয়ান দিয়ে আমাকে খাওয়াবে বলল। শেষে বলল, কালুর মতো মুণ্ডু কেটে এই বাড়ির দরজায় ঝুলিয়ে রাখব। করি কী বলুন?

—প্রবোধবাবু আপনাকে দেখতে পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ বড় মুখুজ্যে তাকে পেট ভরে মদ খাইয়ে ছেড়ে দিলেন!

—তাই তিনি আপনার বোনকে বলে গেছেন, 'গোপাল আছে শিবের কোলে'! প্রমথ শিবের একটি নাম।

ও.সি. বাসুদেব ঘোষ বললেন,—প্রমথ মুখুজ্যের বিরুদ্ধে 'রংফুল কনসাইনমেন্ট'-এর বেআইনি আটকের চার্জে এফ. আই. আর. করেছি। জয়গোপালবাবুর কথা শুনেই বুঝেছিলাম, ভদ্রলোক ওঁর সরলতার সুযোগ নিয়েছিলেন।

জয়গোপালবাবু করজোড়ে বললেন,—মামলা করে কী হবে? ঠাকুরদার জুতো তো কেউ হিমির কাছ থেকে হাতাতে পারবে না। হিমি! বিশ্বাস কর আমাকে। আমি কখনও তোকে ঠাকুরদার সিন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করব না।

ও.সি. বললেন,—ঠাকুরদার সিন্দুক। সেটা কী?

কর্নেল বললেন,—পরে সব বলব। আমি সেচ-বাংলোয় আরও একটা দিন থাকছি। দোমোহানি ড্যামে সাইবেরিয়ান হাঁসের ছবি না তুলে যাচ্ছি না। যাই হোক, আপাতত ভাই-বোনকে আশা করি একটু প্রোটেকশন দেবেন। অবনী মুখুজ্যে কেমন লোক আমি জানি না।

হালদারমশাই কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বুঝলুম, গতরাতে অবনী মুখুজ্যের দুটো লোকের পাল্লায় পড়ে হেনস্থা হওয়ার কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তাঁকে থামতে হল ও. সি. বাসুদেববাবুর কথায়,—সম্ভবত ইনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আপনার বিরুদ্ধে অবনীবাবু নালিশ করতে গিয়েছিলেন।

হালদারমশাই স্মার্ট হয়ে পকেট থেকে তাঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললেন, —আমারে দাও দিয়ে অ্যাটাক করছিল অবনীবাবুর দুইজন লোক। লোক না গুণ্ডা! আমি প্রোফেশনের কাজে যেখানে ঘুরি, অগো কী?

ও.সি. হাসতে-হাসতে জিপে উঠে বললেন,—দিনে সময় হবে না। সন্ধ্যা সাতটায় কর্নেলসাহেবের সঙ্গে সেচ-বাংলোয় গিয়ে ঠাকুরদার সিন্দুকের গল্প শুনব! নমস্কার!

ও.সি. চলে গেলে হৈমন্তী বললেন,—কর্নেলসায়েব! দাদাকে বলে দিন, কখনও যেন আর ঠাকুরদার সিন্দুকের নাম না করে।

জয়গোপালবাবু করুণমুখে বললেন,—কিন্তু ঠাকুরদার দু-পাটি জুতোর একপাটি আমার প্রাপ্য কি না বল হিমি।

হৈমন্তী বললেন,—জুতো নিয়ে কী করবে তুমি? তার চেয়ে অবনী মুখুজ্যের জবরদখল জমিটা তুমি আর আমি আইনত মালিক হিসেবে গার্লস স্কুলের নামে দান করে দেব!

—দিলুম! তারপর?

—দু'পাটি জুতো বিক্রি করে সেই টাকায় গার্লস স্কুলের বাড়ি তৈরি করে দেব।

—জুতো বিক্রি করে? হ্যাঁ? বলিস কী হিমি? কর্নেলসায়েব! এ কী অদ্ভুত কথা!

সুবিমল মুখ ফসকে বলতে যাচ্ছিল জুতোর হিলের মধ্যে কী আছে, কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—জয়গোপালবাবু! অদ্ভুত কথার মানে যথাসময়ে জানতে পারবেন। কিন্তু আপনি নিজের জুতো নিজে চুরি না করলেও প্রমথবাবুর প্ররোচনায় একটা খারাপ কাজ করেছেন!

জয়গোপালবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন,—আজ্ঞে?

—কালু নামে কুকুরটা আপনাকে দেখলে বা আপনি তার কাছে গেলে চ্যাঁচাত না। কারণ আপনাদের বাড়িরই পোষা কুকুর। এবার বলুন কালুকে আপনি কি কোলে তুলে বা কোনোভাবে প্রমথবাবুর লোক দিয়েছিলেন? জয়গোপালবাবু! আপনার সাহায্য ছাড়া কারও সাধ্য ছিল না যে কালুর মুন্ডু কাটবে।

জয়গোপালবাবু ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। তারপর বললেন, —আমি কেমন করে জানব গণশা আমার কোল থেকে তাকে আচমকা কেড়ে নেবে আর কেষ্টা তার মুন্ডু কাটবে? অন্ধকার রাত্তির। আমাকে গণশা আর কেষ্টা ক্লাব থেকে এগিয়ে দেওয়ার ছলে সঙ্গে এসেছিল। তারপর বলল, কালুকে নিয়ে একটা মজার খেলা খেলবে! আমি কি জানতুম কী মজা?

হৈমন্তী বললেন,—তুমি কেন একথা লুকিয়ে রেখেছিলে?

—ভয়ে। তোর দিব্যি। কর্নেলস্যারের দিব্যি। গণশা-কেষ্টা শাসিয়ে গিয়েছিল, তাদের নাম বলে দিলে আমার মুন্ডু কাটবে।

কর্নেল বললেন,—হৈমন্তীদেবী! দাদাকে বাড়ি নিয়ে যান। যথাসময়ে এসে আপনার ঠাকুরদার সিন্দুক আর জুতো দেখব। চিন্তা করবেন না। আপনার প্ল্যানটা ভালো। বাবুগঞ্জে সৎ-ভদ্রমানুষও তো কম নেই। তাঁরা আপনাকে সাহায্য করবেন। গার্লস হাইস্কুল হবে আপনার ঠাকুরদার নামে। আচ্ছা চলি।

রায়বাড়ির প্রতিমা রহস্য

ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। নমস্কারের সময় তাঁর ছড়িটা ডানদিকে বগলের সঙ্গে আটকে রেখেছিলেন। তারপর বললেন, —আমি সুদর্শন রায়। গতরাতে কনকপুর থেকে আপনাকে ট্রাঙ্ককল করেছিলুম।

কর্নেল বললেন, —বসুন সুদর্শনবাবু।

সুদর্শন রায় সোফায় বসলেন। তাঁর ছড়িটা পাশে ঠেস দিয়ে রেখে বললেন,—ট্রাঙ্ককলে একটা কথা বলা হয়নি। একে তো বিচ্ছিরি কীসব শব্দ। তারপর হঠাৎ লাইনটা কেটে গেল। ভবানীপুরে আমার মাসতুতো ভাই জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরিই আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছিল।

—হ্যাঁ। জয়কৃষ্ণবাবু আমাকে গতকাল টেলিফোনে আপনার কথা বলেছেন।

বলেছে?—ভদ্রলোক উৎসাহে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন।—তা হলে আপনার কাছে আমার আসবার কারণও নিশ্চয় জানিয়েছে?

কর্নেলের হাতে অনেকগুলো পোস্টকার্ড সাইজের রঙিন ছবি ছিল। ছবিগুলো প্রজাপতির। গত অক্টোবরে সরডিহার জঙ্গলে অনেক ঘোরাঘুরি করে ক্যামেরায় দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রজাপতির ছবি তুলে এনেছিলেন। এতক্ষণ সেই ছবিগুলো দেখিয়ে তিনি আমাদের কান ঝালাপালা করছিলেন। অবশ্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার—আমাদের প্রিয় হালদারমশাই মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিলেন। কী বুঝছিলেন তা তিনিই জানেন!

এমন একটা অবস্থায় কোন কনকপুরের সুদর্শন রায় এসে বাঁচালেন। ভদ্রলোক বয়সে প্রৌঢ়। চেহারায় আভিজাত্যের ছাপ আছে। সিঁথি-করা কাঁচাপাকা চুল আর পুরু গোঁফে শৌখিনতার ছাপও স্পষ্ট। গায়ে সার্জের পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি। হাঁটু অবধি পশমের মোজা। কাঁধে ভাঁজ করা নকশাদার কাশ্মীরি শাল। অনুমান করলুম, নভেম্বরের শেষাশেষি কলকাতায় ফ্যান চললেও তাঁদের কনকপুরে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে এবং টুপি বা মাফলার নিশ্চয় তাঁর কাঁধের সুদৃশ্য পুষ্ট ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছেন। শুধু তাঁর ছড়িটা সাদাসিধে রকমের। দেখে বোঝা যায় মোটা বেতের ছড়ি এবং মাথাটা ছাতার বাঁটের মতো ঘোরালো। কালো রঙের বাঁট। হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছেন দেখে হাসি পেল। কিন্তু এখন আবহাওয়া গুরুগম্ভীর।

যাই হোক, ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল বললেন,—জয়কৃষ্ণবাবু কিছুটা জানিয়েছেন। তবে টেলিফোনে শুধু ওইটুকু জানা যথেষ্ট নয়। উনি আমার পুরোনো বন্ধু। আমার মতো ওঁরও কিছু বাতিক আছে। পাখি দেখা, অর্কিড সংগ্রহ, ক্যাকটাসের বাগান করা।

সুদর্শনবাবু বললেন,—হ্যাঁ, জয়কৃষ্ণ একসময় নাম করা শিকারিও ছিল। আমার ঠাকুরদা ছিলেন কনকপুরের জমিদার। কনকপুরের পুর্বে পাঁচখালি নামে একটা মহাল ছিল তাঁর আমলে। ওই মহালটা জলজঙ্গলে কিছুটা দুর্গম ছিল। এখনও ওদিকটায় তত উন্নতি হয়নি। জয়কৃষ্ণ বাইশ বছর বয়সে পাঁচখালির জঙ্গলে একটা বাঘ মেরেছিল। তারপর তো পশুপাখি মারা আইন করে নিষিদ্ধ হল। তবু জয়কৃষ্ণ—ওর ডাকনাম আপনি হয়তো জানেন.....

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ঝন্টুবাবু।

—তো ঝন্টু পাঁচখালির জঙ্গলমহলে যাওয়া ছাড়েনি। ওই তল্লাটের মানুষজন ওকে দেবতার মতো ভক্তি করে। আজকাল আর তত যায় না।

এই সময় ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন,—কফি খান সুদর্শনবাবু। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

সুদর্শনবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন,—ঝন্টু আপনাকে কতটুকু জানিয়েছে জানি না। তবে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

কথাটা বলে সুদর্শনবাবু আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই। এ আমার তরুণ বন্ধু খ্যাতিমান সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। আর উনি মিঃ কে. কে. হালদার। প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। এঁরা দুজনেই আমার বিশ্বস্ত সহচর।

সুদর্শনবাবু আমাদের নমস্কার করলেন। তারপর বললেন,—ঘটনার পর আমি কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যাওয়ার কথা ভেবেছিলুম। কিন্তু আমার দাদা সুরঞ্জন পুলিশের উপরতলায় কাকেও ধরার পক্ষপাতী। ঝন্টুর পুলিশমহলে জানাশোনা আছে। কিন্তু সে আপনার কাছে আসবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল।

কর্নেল বললেন,—আপনি এঁদের সামনে স্বচ্ছন্দে ঘটনাটা জানাতে পারেন।

সুদর্শনবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—আমাদের রায়পরিবারের গৃহদেবী মহালক্ষ্মী। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরে-ঘরে লক্ষ্মীপুজো হয়। আমাদের দেবী মহালক্ষ্মীরও ওই রাত্রে পুজো হয়। সারা বছর ওই রাত্রিটা বাদে প্রতিমা রাখা হয় আমাদের দোতলা বাড়ির ওপরতলায় বিশেষভাবে তৈরি একটা ঘরের দেওয়ালসংলগ্ন আয়রনচেস্টে। ঘরের দরজার তালা আর ওই আয়রনচেস্টের তালার দুটো করে চারটে চাবি ছিল। বাবা মৃত্যুর আগে দুটো চাবি আমাকে আর দুটো চাবি আমার দাদা সুরঞ্জনকে দিয়েছিলেন। এবার ব্যাপারটা খুলে বলি। দরজার তালা খুলতে হলে প্রথমে দাদার চাবিটা ঢুকিয়ে একপাক ডাইনে ঘোরাতে হবে। তারপর আমার চাবিটা তালায় ঢুকিয়ে বাঁদিকে একপাক ঘোরাতে হবে। তবেই দরজার তালা খুলবে।

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন,—কন কী? একখান চাবি দিয়া তালা খুলব না?

—না। এরপর আয়রনচেস্ট খুলতে হলেও আগে দাদার চাবি তারপর আমার চাবি ঢুকিয়ে একইভাবে ঘোরাতে হবে। তবেই আয়রনচেস্ট খুলবে। তারপর আমরা দুভাই রুপোর থালায় মহালক্ষ্মীকে বের করব। আয়রনচেস্ট একইভাবে বন্ধ করব। ঘর থেকে বেরিয়ে দেবীকে তুলে দেব আমাদের পুরুতঠাকুর দেবনারায়ণ মুখুজ্যের হাতে। দুভাই মিলে এবার ঘরের দরজার তালা আটকে দেব। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বাড়ির মাঝামাঝি জায়গায়। সিঁড়ির নীচে অপেক্ষা করবে বাড়ির লোকজন। আমরা সবাই যাব ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে মন্দিরের বেদিতে দেবীকে রেখে পুজোআচ্চা শুরু হবে। মোটামুটি এতবছর ধরে এটাই নিয়ম।

কর্নেল বললেন,—বুঝলুম। কিন্তু ঘটনাটা কী?

সুদর্শনবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন,—অক্টোবর মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে দাদা আর আমি আয়রনচেস্ট থেকে দেবীকে বের করে দেখি, মাথার মুকুট নেই। গলার জড়োয়া নেকলেস নেই। দেখামাত্র আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। দাদা ঠান্ডামাথার মানুষ। কিন্তু আমি মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। চিৎকার, চ্যাঁচামেচি করে হইচই বাধিয়ে দিলুম। খবর রটতে দেরি হয়নি। পাড়ার ভদ্রলোকেরা ছুটে এসেছিলেন। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। থানার অফিসার

ইন-চার্জ আমাদের দুভাইকে পৃথকভাবে জেরা করে শেষে খুব হম্বিতম্বি শুরু করলেন। দাদা, না হয় আমি, যে-কোনো একজন চুরি করেছি--এই তাঁর মত।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আপনার দাদা কোথায় চাবি রাখতেন, সে কথা আপনি নিশ্চয় জানতেন না?

সুদর্শনবাবু বিষণ্ণমুখে বললেন,—কর্নেলসায়েব! আপনিও থানার বড়বাবুর মতো কথা বলছেন!

—না। এটা নিছক একটা প্রশ্ন। তা ছাড়া, আমি কখনওই বলছি না আপনার দাদা কোথায় চাবি রাখতেন, তা আপনার জানা ছিল। যাই হোক, এবার বলুন আপনার চাবি আপনি কোথায় রাখতেন?

সুদর্শনবাবু তাঁর বেতের মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে বললেন,—এই ছড়ির ভেতরে।

বলে তিনি কালো রঙের অর্ধবৃত্তাকার বাঁটটা ঘোরাতে শুরু করলেন। বাঁটটা খুলে গেল। তারপর ছড়িটা তুলে তিনি একটু নাড়া দিতেই খুদে রিঙে আটকানো দুটো চাবি ছিটকে নীচে পড়ল। চাবিদুটো কুড়িয়ে নিয়ে তিনি বললেন,—কী ধাতুতে তৈরি জানি না। তবে চাবি দুটোর ওজন আছে।

কর্নেল বললেন,—চাবি দুটো একটু দেখতে চাই।

সুদর্শনবাবু তাঁর হাতে চাবি দিলেন। চাবিদুটোর গড়ন দুরকমের। একটা ইঞ্চিতিনেক লম্বা, অন্যটা তার চেয়ে ছোট। কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতশকাচ বের করে টেবিলল্যাম্প জ্বেলে দিলেন। তারপর আতশকাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখে চাবিদুটো সুদর্শনবাবুকে ফেরত দিলেন। সুদর্শনবাবু চাবিদুটো ছড়ির গর্তে ঢুকিয়ে ঘোরালো বাঁটটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আঁট করে দিলেন।

কর্নেল বললেন,—এই বেতের ছড়িটা আপনি কতদিন আগে কিনেছিলেন? আমার ধারণা এটা অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। তাই না?

—ঠিক ধরেছেন। আগে চাবিদুটো আমি আমার ঘরে আলমারির লকারে রাখতুম। বছর তিনেক আগে পাঁচখালি এলাকার একটা বসতিতে দশরথ নামে একটা লোককে দিয়ে ছড়িটা তৈরি করিয়েছিলুম। ওদের ডোম বলা হয়। পাঁচখালি এলাকায় বেতের জঙ্গল আছে। ডোমেরা বেতের তৈরি ধামা, ধান-চাল মাপবার পাত্র, চুপড়ি, দোলনা এইসব জিনিস তৈরি করে কনকপুরে চৈত্রসংক্রান্তির গাজনের মেলায় বেচতে আসে। দশরথ খুব পাকা কারিগর। আমাদের ছোটবেলায় বাবা দশরথকে দিয়ে বেতের এক সেট টেবিল-চেয়ার তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলো এখনও আছে।

—আপনি বেতের ছড়িতে চাবি রাখা নিরাপদ মনে করেছিলেন। এর কি কোনো বিশেষ কারণ ছিল?

সুদর্শনবাবু একটু চুপ করে থাকার পর বললেন,—গ্রামে আমার ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠিত হাইস্কুল আছে। একটা লাইব্রেরিও আছে। ঠাকুরমার নামে নাম। রত্নময়ী পাঠাগার। বাবা লাইব্রেরিঘরের সঙ্গে আরও একটা ঘর তৈরি করে দিয়েছিলেন। ওই ঘরে তাস, ক্যারাম, দাবা এইসব খেলার আসর বসত। বিকেল চারটে থেকে রাত্রি নটা অবধি সেখানে খেলা চলত। দাবা খেলার নেশা আমার আছে। এদিকে আমার শোওয়ার ঘরে সেই আলমারি আছে। বছর দিনেক আগে রাত সাড়ে নটায় বাড়ি ফিরে দেখি, শোওয়ার ঘরের দরজার তালা ভাঙা। আমার যা স্বভাব। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করে হুলস্থূল বাধিয়েছিলুম। দাদা এসে আমাকে বললেন, ঘরে ঢুকে দেখেছ

কিছু চুরি গেছে কি না? তারপর নিজেই ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। আমি ঘরে ঢুকে দেখলুম, সবকিছু ঠিকঠাক আছে।

হালদারমশাই একটু হেসে বললেন,—চোর তালা ভাঙছিল। কিন্তু চুরির সময় পায় নাই।

কর্নেল বললেন,—আপনার ফ্যামিলি, মানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা?

সুদর্শনবাবু আস্তে বললেন,—আমি বিয়ে করেছিলুম। কিন্তু আমার স্ত্রী ব্লাডক্যান্সারে মারা যান। তারপর আর বিয়ে করিনি। জমি-পুকুর-বাগান দেখাশোনা এসব নিয়েই থাকতুম। শুধু সন্ধ্যা থেকে দাবা।

—তা হলে আপনি সেই ঘটনার পর এই ছড়ি তৈরি করিয়েছিলেন?

—ঠিক ধরেছেন। ছড়িটা বাইরে গেলে সবসময় হাতে থাকবে। আবার দাবার আসরে বসলেও ছড়িটা আমার হাতের পাশে রাখা থাকবে। কোলে ফেলে রাখতেও অসুবিধে নেই।

—আপনার দাদা কী করেন?

—আপনাকে বলেছি, জমিসম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব আমি নিয়েছিলুম। কারণ ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় আমার মন ছিল না। ঝন্টুকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন। আর দাদার কথা জিজ্ঞেস করছেন? দাদা পড়াশুনায় খুব ভালো ছিল। কনকপুর হাইস্কুলে দাদা মাস্টারি করত। দুবছর আগে রিটায়ার করেছে। শোভা-বউদিকে আমি মায়ের মতো শ্রদ্ধা করি।

—আপনার দাদার ছেলেমেয়ে?

—এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বহরমপুরে। তার স্বামী সরকারি অফিসার। তার বদলির চাকরি। এখন সুনন্দা শিলিগুড়িতে থাকে। তার একটি মেয়ে আছে। দাদার ছেলে গৌতম ঝন্টুর বাড়িতে থেকে কোনো কলেজে পড়ত। ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। ঝন্টুর তদ্বিরে সে আমেরিকাতে পড়তে গেছে। কর্নেলসায়েব! দাদা-বউদির প্রতি আমার এতটুকু ঈর্ষা নেই। অথচ বজ্জাত লোকেরা এখন কতরকম আজেবাজে কথা রটাচ্ছে।

—এবার কোজাগরী পূর্ণিমার দিন কি আপনার দাদার মেয়ে-জামাই-নাতনি সবাই এসেছিল?

—হ্যাঁ। তা ছাড়া, আরও কিছু আত্মীয়স্বজনও এসেছিল। প্রতিবছর ওই একটা দিন আমাদের রায়পরিবারে একটা বড় উৎসব। পরদিন কাঙালিভোজন, বস্ত্রদান এসবও হয়। এবার কিছুই হয়নি।

—এখন বাড়িতে কারা আছে?

—দাদা-বউদি। বাবার আমলের কাজের লোক হরিপদ আর গোবিন্দ। গোবিন্দ জমিসম্পত্তি দেখাশোনার কাজে আমাকে সাহায্য করে। সে আমার বিশ্বস্ত লোক। হরিপদ বাড়ির সব ফাইফরমাশ খাটে। রান্না করে মোনাঠাকুর। সে-ই হাটবাজার করে। আর আছে কাজের মেয়ে শৈলবালা। আমি দুধের জন্য একটা গাইগরু পুষেছি। গোরুর দেখাশোনা, দুধ দোহানো এসব কাজও শৈল করে।

—একটু ভেবে বলুন সুদর্শনবাবু! কোজাগরী পূর্ণিমার দিন আপনি ঘুম থেকে ওঠার পর সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত আপনার এই ছড়িটা কোথায় ছিল?

সুদর্শনবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন—আমি ঘরে থাকলে ছড়িটা ব্র্যাকেটে ঝোলানো থাকে। দোতলা থেকে নীচে কোনো কাজে নামলে ঘরে নতুন দামি তালাটা এঁটে দিই। বাড়ি থেকে বাইরে বেরুলে ছড়িটা আমার হাতেই থাকে। সেদিও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

কর্নেল এতক্ষণ পরে চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তা হলে আপনার এবং আপনার দাদার চাবি প্রতিবছর কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন ওই একবার বের করতে হয় দুজনকে। তাই তো?

—হ্যাঁ। ওই একবার।

—বছরের অন্যসময়, ধরুন গত একবছরে কখনও কি আপনি ছড়ির বাঁট খুলে চাবিদুটো আছে কি না দেখে নিয়েছেন?

—খুলে দেখার দরকার হয় না। কেন জানেন? ছড়িটা হাতে নিয়ে মাটিতে ঠেকিয়ে হাঁটতে হয়। আমি অভ্যাসবশে ঠিক বুঝতে পারি ভিতরে চাবি আছে কি না।

—তার মানে, আবছা শব্দ শুনতে পান?

—ঠিক ধরেছেন কর্নেলসায়েব!

—আর-একটা কথা। আপনি দোতলায় থাকেন। আপনার দাদা-বউদি?

—দোতলায়। বুঝিয়ে বলি। দোতলায় মোট ছখানা ঘর। সিঁড়িটা মাঝখানে। তিনটে করে ঘর তার দুধারে। টানা বারান্দা আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকে, মানে পূর্বের প্রথম ঘরটাতে থাকেন মহালক্ষ্মী। পরের ঘরে জমিদারি আমলের দামি আসবাবপত্র রাখা আছে। পূর্বের শেষ ঘরটাতে থাকে দাদা-বউদি। কনকপুরে বিদ্যুৎ আসবার পর বারান্দার ওদিকটায় দেওয়াল তুলে অ্যাটাচড্ বাথরুম করা হয়েছে। আর আমি থাকি পশ্চিমের একেবারে শেষ ঘরটাতে। বাকি দুটো ঘরের মধ্যে আমার পাশের দুটো ঘর আত্মীয়স্বজন বা কোনো বিশেষ অতিথি এলে তাঁদের জন্য রাখা হয়েছে। ঝন্টু গেলে আমার পাশের ঘরে শোয়।

—এবার কোজাগরী পূর্ণিমার কদিন আগে আপনার দাদার মেয়ে-জামাই-নাতনি এসেছিলেন?

—দুর্গাপুজোর আগেই এসেছিল। ষষ্ঠীর দিন।

—তাঁরা আপনার পাশের ঘরে, নাকি অন্য ঘরে ছিলেন?

—আমার পাশের ঘরে। দাদার নাতনি পিংকি আমার কাছে ভূতের গল্প শুনতে চায়। সে আমার বিছানায় শুতো।

—তার পরের ঘরে কেউ ছিলেন ওই সময়?

—আমাদের মামাতো ভাই পরেশ। সে থাকে রাঁচিতে। ল্যাব রিসার্চের অফিসে চাকরি করে। সত্যি বলতে কী, মহালক্ষ্মীপুজোর সব কাজের ঝামেলা সে-ই সামলায়।

—পরেশবাবু সম্পর্কে আপনার কোনো সন্দেহের কারণ নেই তা হলে?

—না। পুলিশ তাকে খুব জেরা করেছিল। কিন্তু তাকে অ্যারেস্ট করেনি।

—তা হলে পুলিশ কাকে অ্যারেস্ট করেছে?

—পুলিশের যা নিয়ম। খামোকা গোবিন্দ আর হরিপদকে দিন পাঁচেক আটকে রেখেছিল। দাদা আর আমি বড়বাবুকে ধরাধরি করে বেচারাদের ছাড়িয়ে এনেছিলুম।

—আচ্ছা সুদর্শনবাবু, আপনাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর কি কোনো ছবি তোলা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। কনকপুর এখন প্রায় টাউন হয়ে উঠেছে। ছবি তোলার স্টুডিয়োও আছে। গতবছর কোজাগরী পূর্ণিমার দিন দাদা কমলা স্টুডিয়ো থেকে রামবাবুকে ডেকে এনেছিল। প্রতিমার ছবি খুব সুন্দর তুলেছিল রামবাবু। রঙিন ছবি। অনেকগুলো কপি করে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে দাদা বিলি করেছিল। আর নীচের তলায় বসার ঘরের জন্য একটা ছবি বড় করে বাঁধানো হয়েছিল। আমার কপিখানা দেখাচ্ছি।

বলে সুদর্শনবাবু তাঁর ব্যাগ থেকে বাঁধানো প্রায় ৯ ইঞ্চি লম্বা আর ৬ ইঞ্চি চওড়া ফ্রেমে বাঁধা একটা রঙিন ছবি বের করে দিলেন। ছবিটা কর্নেল দেখে নিয়ে হালদারমশাইকে দিলেন। তিনি দেখার পর আমাকে দেখতে দিলেন। দেখে মনে হল, মূর্তিটা প্রাচীন। কষ্টিপাথরে তৈরি। মাথায় রত্নখচিত মুকুট। গলায় জড়োয়ার হার।

কর্নেল বললেন,—একমিনিট। আমি এই ছবি থেকে আমার ক্যামেরায় ছবি তুলে নিচ্ছি। দরকার হতে পারে।

কর্নেল তাঁর ক্যামেরায় ছবি তুলে নেওয়ার পর বললেন,—ঠিক আছে সুদর্শনবাবু! আমি আপনাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর চুরি যাওয়া অলংকার উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব। বাড়ি ফেরার পথে আপনি মিঃ রায়চৌধুরিকে জানিয়ে যেতে পারেন, আমি আপনাদের সাহায্য করতে চেয়েছি।

সুদর্শনবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঝন্টুর বাড়ি গেলে শেয়ালদা স্টেশনে সাড়ে এগারোটার ট্রেন ফেল করব। মাঠে পাকা ধান কাটা শুরু হয়েছে। আমাকে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছতে হবে। আপনি কবে কনকপুর যাচ্ছেন তাই বলুন!

কর্নেল বললেন,—যত শিগগির পারি, যাব। কিন্তু একটা শর্ত। আপনার দাদা আর আপনি ছাড়া ওখানকার কেউ যেন জানতে না পারে, আমি কেন কনকপুরে গেছি। আর-একটা কথা। আপনাদের বাড়িতে আমরা উঠব না। মিঃ রায়চৌধুরির কাছে শুনেছি, কনকপুরের কাছাকাছি ইরিগেশন বিভাগের একটা বাংলো আছে। সেখান থেকে আপনার সঙ্গে যথাসময়ে যোগাযোগ করব।

সুদর্শনবাবু বললেন,—আপনার ইচ্ছা। তারপর আমাদের সবাইকে নমস্কার করার পর ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেতের ছড়িটা মুঠোয় ধরে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল এইসময় একটু ঝুঁকে সোফার নীচে থেকে একটা ছোট্ট কার্ড কুড়িয়ে নিলেন। তারপর সেটা দেখে নিয়ে পকেটস্থ করে বললেন,—হ্যাঁ। হেভি মিস্ট্রিই বটে। সুদর্শনবাবুর ব্যাগ থেকে ছবি বের করার সময় এই কার্ডটা ছিটকে পড়েছিল মনে হচ্ছে। কার্ডটা কলকাতার এক জুয়েলারি কোম্পানির।

হালদারমশাই ও আমি দুজনেই চমকে উঠেছিলুম। দুজনে একই সঙ্গে বলে উঠলুম,—জুয়েলারি কোম্পানির কার্ড?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানি। চৌরঙ্গিতে এঁদের বিশাল দোকান। এই কোম্পানি কলকাতার অন্যতম সেরা রত্নব্যবসায়ী। কিন্তু এঁদের কার্ড সুদর্শনবাবু পকেটে না রেখে ব্যাগে রেখেছিলেন কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ভদ্রলোকরে ফলো করুম!

তারপর তিনি সবেগে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল কিছু বললেন না। আমি ব্যস্তভাবে বললুম,—হালদারমশাইকে নিষেধ করা উচিত ছিল। আপনার কথা নিশ্চয় শুনতেন। অথচ আপনি ওঁকে বাধা দিলেন না?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—তুমি তো জানো, হালদারমশাই গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলে ছাড়তে চান না। তা ছাড়া, ইদানীং ওঁর হাতে কোনো কেস নেই। এমন একটা অদ্ভুত রহস্যের গন্ধ পেয়ে উনি চুপচাপ বসে থাকার পাত্র নন। তা ছাড়া, হালদারমশাই পঁয়ত্রিশ বছর পুলিশে চাকরি করেছেন। ওঁকে নিয়ে তোমার উদ্বেগের কারণ নেই।

বললুম,—কিন্তু সুদর্শনবাবুদের মহালক্ষ্মীদেবীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস চুরি গেছে। এই অবস্থায় সুদর্শনবাবুর কাছে একজন বিখ্যাত রত্নব্যবসায়ীর কার্ড!

—আবার বলছি। কার্ড সবাই পকেটে রাখে। সুদর্শনবাবু কার্ডটা তাঁর ব্যাগে ছবিটার সঙ্গে গুঁজে রেখেছিলেন। কেন ওখানে রেখেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতে পারেন। বরং চলো! এগারোটা বাজে। আমরা এক চক্কর ঘুরে আসি।

—কোথায় যাবেন?

—আমি পোশাক বদলে আসি। তারপর বলব।

কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নীচে নেমে আমার গাড়িতে উঠে বসলুম। কর্নেল যথারীতি আমার বাঁদিকে বসলেন। গেট পেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন,—পার্ক স্ট্রিট হয়ে চৌরঙ্গি। তারপর সোজা দক্ষিণে।

রবিবার বলে রাস্তায় গাড়ির ভিড় ছিল না। চৌরঙ্গিতে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে বললুম,—সোজা দক্ষিণেই যাচ্ছি। কিন্তু পৌঁছুব কোথায়?

কর্নেল বললেন, —ভবানীপুরে।

—তাই বলুন। সুদর্শনবাবুর মাসতুতো ভাইয়ের বাড়ি!

—নাঃ! চলো তো! আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

হাজরা রোডের মোড় পেরিয়ে কর্নেলের নির্দেশে ডাইনে একটা রাস্তায় গাড়ি ঘোরালুম। তারপর বাঁদিকে আঁকাবাঁকা গলি রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে একটা চওড়া রাস্তার মোড়ে পৌঁছুনোর পর কর্নেল বললেন,—এসে গেছি। ডানদিকের ওই বড় বাড়িটা। গেটের সামনে হর্ন বাজাবে।

গেটে দারোয়ান ছিল। সে গেট খুলে দিল। নুড়িবিছানো পথের দুধারে দেশি-বিদেশি গাছপালা, আর মরশুমি ফুলের উজ্জ্বলতা। গাড়িবারান্দার তলায় পৌঁছুলে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। কর্নেল নামতেই তিনি নমস্কার করে সহাস্যে বললেন,—আমার সৌভাগ্য! অনেকদিন পরে আপনার দর্শন পেলুম।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—সৌভাগ্য আমারই। কারণ টেলিফোন যিনি ধরেছিলেন, তিনি বললেন, আপনি সাড়ে বারোটার মধ্যে বেরোবেন। তাই আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্তের গাড়িতে এসে গেলুম।

আমি গাড়ি পার্ক করার জন্য একটু এগিয়ে যেতেই ভদ্রলোক বললেন, —আপনি গাড়ি থেকে নেমে আসুন। আমার লোক গাড়ি ঠিক জায়গায় রেখে আপনাকে চাবি ফেরত দেবে।

গাড়ি থেকে নেমে গেলুম। কর্নেল আলাপ করিয়ে দিলেন। —জয়ন্ত! ইনি কলকাতা কেন, সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নবিশারদ মিঃ অবনীমোহন চন্দ্র। চৌরঙ্গিতে এঁদের চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানি প্রায় দুশো বছর ধরে ব্যবসা করছেন। তুমি শুনলে অবাক হবে, ব্রিটেনের রাজপরিবারে এঁর পূর্বপুরুষ প্রাচীন ভারতীয় ডিজাইনের অনেক অলঙ্কার সাপ্লাই করতেন।

ততক্ষণে আমি বুঝে গেছি, হঠাৎ কর্নেলের এখানে আসবার উদ্দেশ্যটা কী। পোশাক বদলাতে ঘরে ঢুকে কর্নেল টেলিফোন করেই এখানে এসেছেন। চার ধাপ সিঁড়ির উপর বারান্দায় উঠেছি, সেই সময় উর্দি পরা একটা লোক আমার গাড়ির চাবি দিয়ে গেল। আধুনিক রীতিতে সাজানো প্রশস্ত ঘরে মিঃ চন্দ্র আমাদের বসিয়ে কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন। তিনি বললেন,—সাড়ে বারোটা নাগাদ আমার বেরুনোর কথা। যাই হোক, আপনার জন্য কফি করতে বলেছি। কফি খেতে-খেতে কথা হবে।

দেখলুম, পাশের ঘরের পর্দা তুলে একজন পরিচারক এগিয়ে এল। সে সেলাম ঠুকে সোফার সেন্টার টেবিলে একটা ট্রে রেখে গেল। আমার আর কফি পানের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কফির পেয়ালা তুলে নিতেই হল। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে আস্তে বললেন,—আপনার কোম্পানির একটা কার্ড পেয়েছি। কোথায় পেয়েছি বা কী করে পেয়েছি, এখন তা বলতে চাইনে। সময়মতো নিশ্চয় তা আপনাকে জানাব।

মিঃ চন্দ্র যেন একটু অবাক হয়েছিলেন। বললেন,—আমাদের কোম্পানির কার্ড তো আমরা যাকে-তাকে দিই না। কেউ কোনো অলঙ্কার যত বেশি টাকারই কিনুন না কেন, তাঁকেও আমরা কার্ড দিই না। ক্যাশমেমোই যথেষ্ট। তবে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে কার্ড দিতে হয়।

—কোন ক্ষেত্রে?

—ধরুন, কোথাও গিয়ে কোনো পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হল এবং তিনি তাঁর পরিবারে কারও বিয়ে উপলক্ষে বিশেষ অর্ডার দিয়ে অলঙ্কার কিনতে চান, তাঁকে কার্ড দিই, আবার কলকাতার কোনো ধনী পুরুষ বা মহিলা আমাদের দোকানে এলেন এবং তাঁদের টাকার দরকার আছে বলে দামি অলঙ্কার বিক্রি করতে চাইলেন, তাঁদের কার্ড দিতে হয়। তাঁরা তো সঙ্গে করে সেই অলঙ্কার নিয়ে যান না। কারণ আজকাল সঙ্গে দামি অলঙ্কার নিয়ে বেরুনোর রিস্ক আছে। তাঁরা কার্ড চেয়ে বলেন টেলিফোনে তাঁরা জানাবেন, কখন আমার কোম্পানির এক্সপার্টরা গিয়ে সেই অলঙ্কার পরীক্ষা করে দরদাম স্থির করবেন।

—বুঝলুম। এ ছাড়া আর কাউকে....

মিঃ চন্দ্র কর্নেলের কথার উপর একটু থেমে বললেন,—খুলেই বলি। গত বছর আমাদের দোকানে অতবড় একটা চুরির কিনারায় পুলিশ যখন হিমশিম খাচ্ছিল, তখন আপনার সাহায্য নিলুম। আপনি দুদিনেই পাঁচলক্ষ টাকার নেকলেস-সহ চোরকে ধরে দিয়েছিলেন। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ কর্নেলসায়েব!

কর্নেল দ্রুত বললেন,—ও কথা থাক। কী খুলে বলতে চাইছিলেন, বলুন।

—নানা দেশের রত্নকারবারিদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। খাঁটি মুক্তো আমরা এজেন্ট মারফত কুয়েত, আবু ধাবি, কাতার এইসব আরব দেশ থেকে আমদানি করি। আপনার কাছে লুকোনোর কারণ নেই। কাস্টমসের চোখ এড়িয়ে গোপনে এই লেনদেন হয়। এজেন্টের কাছে আমাদের কার্ড থাকে। আবার হংকংয়ে আমাদের এজেন্ট আছে। হংকং সবরকমের রত্নের বাজার। হংকংয়ের এজেন্টের কাছে আমাদের কার্ড আছে।

—তা হলে আপনার কোম্পানির কার্ডের একটা গুরুত্ব আছে! সেই কার্ড যে-ভাবে হোক, আমার হাতে এসে গেছে। দেখাচ্ছি, তবে কার্ডটা আপনাকে দেব না। আগেই সেটা বলে রাখলুম।

বলে কর্নেল বুকপকেট থেকে সেই কার্ডটা বের করে মিঃ চন্দ্রের হাতে দিলেন। মিঃ চন্দ্র কার্ডটা দেখার পর বললেন,—কী আশ্চর্য! এই কার্ডটা আমাদের কোম্পানির কার্ড। এই যে দেখছেন, তলার দিকে ছোট্ট গোল রবার সিলের ছাপ, তার উপর আমার হাতে 'এ এম সি' সই করা আছে কালো কালিতে। এটা কোনোভাবে মোছা যাবে না। কারণ পেনের এই কালিটা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি। কর্নেলসায়েব! এই কার্ড নিশ্চয় আমার কোম্পানির কোনো এজেন্টের কাছে ছিল। এতে একটা নাম্বার আছে, খালি চোখে তা দেখা যাবে না। হাতে সময় কম। তা না হলে নাম্বার পরীক্ষা করে রেজিস্টারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে এই এজেন্টের নাম-ঠিকানা বলে দিতুম।

—এজেন্টের কার্ড দৈবাৎ হারিয়ে গেলে তিনি নিশ্চয় আপনাকে জানাবেন?

মিঃ চন্দ্র জোর দিয়ে বললেন,—অবশ্যই জানাবেন। কিন্তু এখনও তো কেউ জানাননি! এটাই অবাক লাগছে।

—তিনি বা আপনি কার্ড হারানোর জন্য পুলিশকে নিশ্চয় জানাবেন। ডায়রি করবেন থানায়।

মিঃ চন্দ্র হঠাৎ একটু দমে গেলেন যেন। আস্তে বললেন,—না, তার অসুবিধে আছে। কারণ আপনি আশা করি অনুমান করতে পারছেন। রত্নব্যবসায়ীদের অনেক ঝক্কি আছে। অনেকসময় এজেন্ট জেনে বা না জেনে এমন জুয়েলস বিক্রেতার খবর দিল, যিনি আয়কর ফাঁকি দিতে চান

কিংবা জুয়েলস চোরাই মাল। তা ছাড়া, বিদেশ থেকে গোপনে রত্ন আমদানির কথাও আপনাকে বলেছি। কাস্টমস বা রেভেনিউ ইনটেলিজেন্সের গোয়েন্দাদের সূত্রে পুলিশ ওই এজেন্টের খবর পেলে বিপদের ঝুঁকি আছে।

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে বললেন,—সব বুঝলুম। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি উঠি। শুধু একটা অনুরোধ। কোন এজেন্টের কার্ড কোথায় কীভাবে হারিয়েছে, সেই খবর আপনি নিশ্চয় পাবেন। পাওয়ার পর আমাকে তা জানাবেন। আমি কথা দিচ্ছি, এতে আপনাদের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেই দায়িত্ব আমার। চলি মিঃ চন্দ্র। নমস্কার।....

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্নানাহারের পর ড্রয়িংরুমের ডিভানে গড়িয়ে পড়েছিলুম। ভাত-ঘুমের অভ্যাস। কর্নেল যথারীতি ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন।

আমার চোখে ভাসছিল, আমরা চলে আসবার সময় অবনীমোহন চন্দ্রের গম্ভীর ও উদ্বিগ্ন মুখ। এটা স্পষ্ট, তাঁর এজেন্টরা আসলে কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবেই কাজ করেন। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে রিপ্রেজেন্টেটিভ। কিন্তু বিদেশি অনেক কোম্পানির মতো চন্দ্র জুয়েলার্স এজেন্ট শব্দটাই ব্যবহার করেন। তা ছাড়া, তাঁরা চোরাই জুয়েলারিও কেনেন। কনকপুরে রায়বাড়ির গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর রত্নখচিত সোনার মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস যে-ই চুরি করুক, সুদর্শনবাবুর সঙ্গে চন্দ্র জুয়েলার্সের কোনো এজেন্ট গোপনে যোগাযোগ করেছে, নাকি সুদর্শনবাবু নিজেই সবার অগোচরে চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এজেন্ট? অমন ধোপদুরস্ত পোশাক-আশাক আর চেহারা দেখে মনে হয় না তিনি জমিজমা সম্পত্তির দেখাশোনা করেন! চাষবাস-পুকুর-বাগান নিয়ে যাঁরা থাকেন, তাঁদের চেহারায় রুক্ষ ছাপ পড়তে বাধ্য।

উত্তেজনায় আমার ভাত-ঘুমের রেশ ছিঁড়ে গেল। কথাটা কর্নেলকে বলার জন্য উঠে বসলুম। সেই সময় টেলিফোন বাজল।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। ...হ্যাঁ। বলছি।... বলুন মিঃ চন্দ্র! ...এক মিনিট! আমি লিখে নিচ্ছি। কর্নেল টেবিল থেকে ছোট্ট প্যাড আর ডটপেন নিয়ে বললেন—বলুন। কে. কে. সেন! পুরো নাম বললে ভালো হয়। কাঞ্চনকুমার সেন। ঠিকানা? মানে ওঁর বাড়ির ঠিকানা...ঠিক আছে। এখন আপনি কোথায় আছেন?... মিঃ সেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কীভাবে?... বুঝেছি। ব্যবসার স্বার্থে এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করে রাখতেই হয়। ...হ্যাঁ। আমি আছি। মিঃ সেনকে আমার কাছে পাঠাতে পারেন। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই। ...না, না। আপনার আসবার দরকার হবে না। আপনি একটা চিঠি লিখে দেবেন ওঁকে। আপনার হাতের লেখা চিনতে অসুবিধে হবে না। ...ঠিক আছে। রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে আমার দিকে ঘুরলেন। মুখে মিটিমিটি হাসি। উঠে গিয়ে তাঁর কাছাকাছি সোফায় বসলুম। বললুম,—সব বুঝে গেছি। এখন শুধু কাঞ্চনকুমার সেন নামে চন্দ্র জুয়েলার্সের এজেন্টের প্রতীক্ষা। তবে শুধু একটা প্রশ্ন। এই ভদ্রলোকের ঠিকানা কী?

কর্নেল প্যাডটা দিলেন। দেখলুম, লেখা আছে ১৩-বি, রামপদ শেঠ লেন, কলকাতা ৭। বললুম,—কলকাতা ৭ কোন এলাকা?

—বড়বাজার। বলে কর্নেল হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোনায় রাখা টেলিফোন গাইডের উপর থেকে একটা আকার ছোট কিন্তু মোটাসোটা বই টেনে নিলেন। লক্ষ করলুম, বইটার নাম কলকাতার পথ নির্দেশিকা। কর্নেল পাতা উল্টে খুঁজে দেখার পর বললেন,—গলিটা আপার চিৎপুর রোড থেকে শুরু হয়েছে। এটা অনেক পুরোনো স্ট্রিট গাইড। তা হোক। রামপদ শেঠ লেন খুঁজে বের করার অসুবিধে নেই। আপার চিৎপুর রোডে ঢুকলেই পেয়ে যাব।

অবাক হয়ে বললুম,—কাঞ্চনবাবু তো আসছেন। তাঁর বাড়ি খুঁজতে যাওয়ার কথা বলছেন কেন?

কর্নেল গাইড বুকটা যথাস্থানে রেখে আস্তে বললেন,—দরকার হতেও পারে।

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল অভ্যাসমতো হাঁক দিলেন,—ষষ্ঠী!

একটু পরে যিনি সবেগে ঘরে ঢুকলেন, তিনি কাঞ্চন সেন নন। আমাদের হালদারমশাই। তিনি সোফায় বসে বললেন,—সুদর্শনবাবুকে ফলো করছিলাম। উনি ট্যাক্সি ধরছিলেন। আমিও একখান ট্যাক্সি ধরলাম। উনি কইছিলেন শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরবেন। কিন্তু উনি চললেন উল্টাদিকে। এক্কেরে ভবানীপুরে। বাড়িটার নাম...

কর্নেল বললেন,—মাতৃধাম?

অবাক হয়ে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—আপনি জানলেন ক্যামনে?

কর্নেল হাসলেন। ওটা ওঁর মাসতুতো ভাই ঝন্টু অর্থাৎ আমার বন্ধু জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির বাড়ি। বোঝা যাচ্ছে, আমার এখান থেকে বেরিয়ে সুদর্শনবাবু শেষপর্যন্ত আমার কথা মেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তো আপনি এখন সম্ভবত শেয়ালদা স্টেশন থেকে আসছেন?

হালদারমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন, —হুঁঃ!

—আপনার খাওয়াদাওয়া?

—স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে খাইয়া লইলাম।

আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল ষষ্ঠীর উদ্দেশে হাঁক দেওয়ার পর আস্তে বললেন, —হালদারমশাই! সম্ভবত এমন কেউ আসছেন, যাঁর সঙ্গে শুধু আমিই কথা বলব। আপনারা দুজনে বরং ডিভানে বসে পত্র-পত্রিকা পড়ার ভান করুন।

হালদারমশাই ও আমি ডিভানে গিয়ে বসলুম। হালদারমশাই দেওয়ালে হেলান দিয়ে খবরের কাগজ খুলে পা ছড়িয়ে বসলেন। আমি একটা রঙিন পত্রিকা খুলে বসলুম। তারপর দেখলুম, একজন রোগাটে গড়নের টাই-স্যুট পরা ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তার বাঁ-হাতে ব্রিফকেস। তিনি নমস্কার করে বললেন,—আমি কে. কে. সেন। মিঃ এ. এম. চন্দ্রের কাছ থেকে আসছি। এই তাঁর চিঠি।

কর্নেল চিঠিটা পড়ে দেখে বললেন,—দাঁড়িয়ে কেন? বসুন মিঃ সেন!

ইনিই তাহলে সেই 'এজেন্ট'। সোফায় বসে তিনি মৃদুস্বরে বললেন,—গত শুক্রবার আমাকে একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। যে ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলুম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বাড়িতেই আমার কার্ডটা কীভাবে দৈবাৎ পড়ে গিয়েছিল। পরদিন অর্থাৎ গতকাল শনিবার ফিরে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটা জানালুম। তিনি তন্নতন্ন খুঁজলেন। বাড়ির সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু কার্ডের খোঁজ মিলল না। সেই কার্ড আপনার হাতে কীভাবে এল?

কর্নেল বললেন,—যেভাবেই আসুক, আপনার কার্ড আপনি ফেরত পাবেন। কিন্তু আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—এই ধরনের সাধারণ কার্ডের বদলে কোম্পানি আপনাদের আইডেন্টিটি কার্ড দেয় না কেন?

—অসুবিধে আছে। কী ধরনের অসুবিধে, তা আপনি মিঃ চন্দ্রের কাছে জেনে নিতে পারেন। এজেন্টদের অনেকসময় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়।

—মিঃ চন্দ্রের কাছে জানবার দরকার মনে করছি না। তবে আমার ধারণা, চোরাই জুয়েলারি বেচা-কেনার ক্ষেত্রে এজেন্টদের ব্যক্তিগত পরিচয় গোপন রাখা উচিত। দৈবাৎ পুলিশ এজেন্টের আইডেন্টিটি কার্ড পেয়ে গেলেই বিপদ। তাতে এজেন্টের ছবি থাকে। কাজেই এই কার্ড নিরাপদ।

—ঠিক বলেছেন স্যার।

—এবার আমি জানতে চাই, আপনি শুক্রবার কোথায় গিয়েছিলেন এবং কার কাছে গিয়েছিলেন! মুখে বলার দরকার নেই। আপনি লিখে দিন। মিঃ চন্দ্রের খাতিরে একথা আমি গোপন রাখব।

কাঞ্চন সেনের মুখে উদ্বেগ ও অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, —কোম্পানির স্বার্থে এসব কথা আমাদের গোপন রাখতে হয়। প্লিজ স্যার, কার্ড ফিরে না পেলে আমাকে মিঃ চন্দ্র কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। এ বাজারে এমন বেশি মাইনের চাকরি—তা ছাড়া, কমিশনেরও ব্যবস্থা আছে, এটা চলে গেলে বিপদে পড়ব।

আপনি কেন বা কী কাজে সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলেন, আমি তা জানতে চাইছি না। আপনাকে তো কথা দিচ্ছি, মিঃ চন্দ্র আমার খুব চেনাজানা মানুষ—তাঁর খাতিরে আমি ওকথা গোপন রাখব। হ্যাঁ—আগে আপনাকে কার্ডটা দেখাই। —বলে কর্নেল বুকপকেট থেকে কার্ডটা বের করে দেখালেন।

কাঞ্চন সেন একটু ইতস্তত করে বললেন,—কার্ডটা আপনি কি কোথাও কুড়িয়ে পেয়েছেন স্যার?

—হ্যাঁ। কুড়িয়ে পেয়েছি।

—কোথায় বলুন তো স্যার?

—যদি বলি, আপনি যেখানে পাদুটো রেকেছেন, সেখানে?

কাঞ্চন সেন নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন,—এটা স্যার অসম্ভব ব্যাপার।

—কেন অসম্ভব? ধরুন, শুক্রবার আপনি যে ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলেন, তিনি কোনো কারণে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং দৈবাৎ পকেট থেকে কিছু বের করতে গিয়ে কার্ডটা পড়ে গিয়েছিল। তিনি চলে যাওয়ার পর আমি ওটা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে রেখেছি। তারপর মিঃ চন্দ্রের কাছে গিয়েছি।

কাঞ্চন সেন এবার চাপাস্বরে বললেন,—অসম্ভব ব্যাপার স্যার। জোর দিয়ে বলছি, এটা অসম্ভব। আমাকে যিনি গোপনে খবর দিয়ে যেতে বলেছিলেন, আপনার কাছে তাঁর আসবার কথা নয়। মিঃ চন্দ্রের কাছে আপনার পরিচয় পেয়েছি স্যার!

—ঠিক আছে। আপনি সেই ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা এই কাগজে লিখে দিন। আপনার টেলিফোন নাম্বারও লিখবেন। আমি আজ রাত্রের মধ্যে আপনার কথার সত্যতা আমার বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে কোনো কৌশলে যাচাই করে নেব। আপনার কথা সত্য হলে আপনি কার্ড পাবেন। আমি আপনার টেলিফোনে আপনাকে খবর দেব।

কাঞ্চন সেন ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছু ভেবে নিলেন। তারপর কর্নেলের দেওয়া কাগজে কিছু লিখে কর্নেলকে দিলেন। তারপর করুণ মুখে ভাঙা গলায় বললেন,—স্যার! দয়া করে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আমার প্রাণ এখন আপনার হাতে।

কথাটা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে বুকপকেটে ঢোকালেন। তারপর হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন—আপনার কথা ঠিক হালদারমশাই! হেভি মিস্ট্রি।

কাঞ্চন সেন চলে যাওয়ার পর আমি ও হালদারমশাই কর্নেলের কাছে সেই নাম-ঠিকানা জানতে চেয়েছিলুম। কিন্তু কর্নেল গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, —ভদ্রলোককে কথা দিয়েছি এটা গোপন থাকবে। কাজেই এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন নয়।

হালদারমশাই বলেছিলেন—আপনিও কইলেন হেভি মিস্ট্রি। তা হইলে এবার আমি কী করুম কন কর্নেলস্যার!

এ কথা শুনে কর্নেলের গাম্ভীর্য চিড় খেয়েছিল। সহাস্যে বলেছিলেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঠিক হবে না হালদারমশাই! অবশ্য বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে দুর্লভ প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি বা অর্কিডের খোঁজ পেলে আমার বরং লাভই হয়। তো আপনার সাহায্য নিশ্চয় আমার দরকার। এক মিনিট।

বলে তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করেছিলেন। তারপর সাড়া পেয়ে বলেছিলেন—মিঃ রায়চৌধুরি? কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...হ্যাঁ। সুদর্শনবাবু এসেছিলেন। ফেরার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করেও গেছেন। ...না। উনি আমাকে বলেননি। তবে আমার হাতে সে-খবরও আছে। বলে কর্নেল হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—যথাসময়ে বলব। এখন একটা জরুরি কাজের কথা বলতে চাই। আপনি তো বুঝতেই পারছেন, আমার বয়স থেমে নেই। এই বৃদ্ধ বয়সে আগের মতো একা কোনো কাজে নামতে ভরসা পাই না। আমাকে সাহায্য করেন একজন ধুরন্ধর ডিটেকটিভ। তিনি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এজেন্সি খুলেছেন। তাঁর নাম মিঃ কে. কে. হালদার। ...তা হলে সুদর্শনবাবু তাঁর কথা আপনাকে বলেছেন? এবার শুনুন। সুদর্শনবাবুকে তখনই যে-কথা বলা দরকার ছিল, বলিনি। কিন্তু ইতিমধ্যে কিছু তথ্য আমার হাতে এসে গেছে। তাতে মনে হচ্ছে, কেসটা জটিল। ...বললুম তো! যথাসময়ে জানতে পারবেন। আপনাকে আমি একটা অনুরোধ করছি। সুদর্শনবাবুকে ট্রাঙ্ককলে জানিয়ে দিন, কাল সোমবার যে-কোনো সময়ে মিঃ হালদার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। মিঃ হালদারের ডিটেকটিভ এজেন্সির কনট্র্যাক্ট ফর্মে তাঁকে একটা সই করতে হবে। এই ফর্মালিটিজ উভয়ের স্বার্থেই মেনে চলা দরকার। তবে চুক্তিপত্রে সইয়ের ব্যাপারটা গোপনে হওয়া উচিত। ঘুণাক্ষরে কেউ যেন টের না পায়। চুক্তিপত্রে সই করলে সুদর্শনবাবু হবেন মিঃ হালদারের ক্লায়েন্ট। ...হ্যাঁ, টাকার প্রশ্ন আছে। তবে টাকার অঙ্ক যাই হোক, সুদর্শনবাবু যেন সই করতে দ্বিধা না করেন। তবে নেহাৎ অ্যাডভান্স হিসেবে আপাতত একশো টাকা না দিলে মিঃ হালদারের অসুবিধে হবে।...হ্যাঁ। তা হলে আপনি বরং একটা চিঠি লিখে দেবেন মিঃ হালদারকে। এখনই আপনার কাছে মিঃ হালদারকে পাঠাচ্ছি। তবে আপনি ট্রাঙ্ককলে সুদর্শনবাবুকে শুধু জানিয়ে রাখবেন, তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক আমার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে যাবেন। ব্যস!... ধন্যবাদ মিঃ রায়চৌধুরি। মিঃ হালদার তাঁর সরকারি আইডেন্টিটি কার্ড নিয়েই আপনার কাছে যাচ্ছেন। ...ঠিক আছে। রাখছি।...

ইতিমধ্যে ষষ্ঠীচরণ কফি এনেছিল। কফি পানের পর হালদারমশাই যথেষ্ট চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলেন। কর্নেল বলেছিলেন,—মিঃ জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির বাড়ি আপনি ভবানীপুরে দেখে এসেছেন।

হঃ। দেখছি। —বলে গোয়েন্দাপ্রবর সবেগে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

কর্নেল বলেছিলেন,—একটা কথা হালদারমশাই!

—কন কর্নেলস্যার!

—আপনার আর আমার কাছে আসবার দরকার নেই। মিঃ রায়চৌধুরির সঙ্গে দেখা করার পর বাড়ি ফিরে আমাকে টেলিফোনে শুধু জানিয়ে দেবেন, কনকপুরে কাল কোন ট্রেনে যাচ্ছেন। কীভাবে যেতে হবে, তা মিঃ রায়চৌধুরির কাছে জানতে পারবেন। কনকপুরে হোটেল থাকা সম্ভব। না থাকলে সুদর্শনবাবুর বন্ধু হিসেবে রায়বাড়িতে থাকতে পারবেন। আমরা দুজনে উঠব সেচদফতরের বাংলোতে। দরকার হলে গোপনে সেখানে যোগাযোগ করবেন। কিন্তু সাবধান

হালদারমশাই! কনকপুরে আমরা আপনার অপরিচিত। এই কথাটা সবসময় মনে রাখবেন। বুঝলেন তো?

—বুঝেছি কর্নেলস্যার।

বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ পর্দা ফুঁড়ে উধাও হয়ে গেলেন।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ হালদারমশাইয়ের ফোন এল। জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরি তাঁকে সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটের ট্রেনে কনকপুর যেতে পরামর্শ দিয়েছেন। কনকপুর স্টেশন থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। সাইকেলরিকশা, বাস, অটো সবই পাওয়া যায়।

কর্নেল সেচদফতরের এক কর্তাব্যক্তির বাড়িতে টেলিফোন করে কনকপুর ইরিগেশন বাংলোয় থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন।

পাঁচটায় দ্বিতীয় দফার কফি দিয়ে গেল ষষ্ঠীচরণ। তখন আলো জ্বলে উঠেছে। শীত না পড়লেও ততক্ষণে সন্ধ্যার আমেজ এসে গেছে। কফি খেতে-খেতে বললুম,—আচ্ছা কর্নেল, আপনি কাঞ্চন সেনের কথার সত্যতা যাচাই করবেন বলছিলেন। কীভাবে করবেন?

কর্নেল হাসলেন। —করব না।

—সে কী! তা হলে ভদ্রলোককে কার্ডটা তখনই ফেরত দিলেই পারতেন।

—জয়ন্ত! কাঞ্চন সেন আমাকে মিথ্যা ঠিকানা দিলে আমার শর্ত শোনার পর দ্বিধায় পড়ে যেতেন। ওঁর মুখে কোনো দ্বিধার চিহ্ন দেখতে পাইনি। তা ছাড়া, উনি ওঁর মালিকের কাছে আমার পরিচয় পেয়েছেন। আমার সঙ্গে ছলচাতুরির সাহস ওঁর নেই।

—কী আশ্চর্য! তা হলে কার্ডটা...

আমাকে থামিয়ে দিয়ে কর্নেল বললেন,—তবু আমি রিস্ক নিতে চাইনি। যেন সত্যিই আমি ওঁর দেওয়া নাম-ঠিকানার সত্যতা যাচাই করব, এ জন্য আমার সময় দরকার—এই কৌশলটুকু এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেই হয়েছে।

একটু ইতস্তত করে বললুম—কাঞ্চন সেন সুদর্শনবাবুর নাম-ঠিকানা দেননি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন,—তোমার নিশ্চিত হওয়ার কারণ?

—কার্ড রাখার কথা পকেটে। ব্যাগের ভিতরে কেউ কার্ড রাখে না।

—কিন্তু সুদর্শনবাবুর ব্যাগ থেকেই কার্ডটা নীচে পড়েছিল।

—কনকপুর গিয়ে সুদর্শনবাবুকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

—চেপে যাও জয়ন্ত! এর পর সুদর্শনবাবুর সঙ্গে দেখা হলে যেন কখনও কার্ডের কথা তুলবে না।

—হালদারমশাইকে নিষেধ করেননি। কিন্তু উনি যদি জিগ্যেস করেন?

—হঠকারী হলেও হালদারমশাই বুদ্ধিমান। বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার ছিলেন। তুমি ওঁকে নিয়ে যতই কৌতুক করো, নিজের কাজে উনি যথেষ্ট সিরিয়াস।

বলে কর্নেল ড্রয়ার থেকে প্রজাপতির রঙিন ছবির খাম বের করলেন। সকালে এই ছবিগুলো আমাদের তিনি দেখাচ্ছিলেন। বক্তৃতা শোনার ভয়ে আমি সটান বাথরুমে গেলুম। তারপর ফিরে আসার সময় একটা বুকশেলফের উপর অগোছালো অবস্থায় পড়ে থাকা কয়েকটা বই খুঁজে অবিশ্বাস্যভাবে একটা মলাটছেঁড়া ইংরেজি গোয়েন্দা উপন্যাস পেয়ে গেলুম।

কিন্তু কর্নেল নিজের কাজে ব্যস্ত। একেকটা ছবি টেবিলল্যাম্পের আলোয় রেখে আতশকাচ দিয়ে কী দেখে-টেখে একটা প্যাড়ে কী সব লিখে চলেছেন। বুঝলুম, এর পর সময়মতো একটা প্রবন্ধ লিখে ছবিগুলো সঙ্গে দিয়ে কোনো বিদেশি পত্রিকায় পাঠাবেন। শুনেছি, তাঁর এসব প্রবন্ধের বাজারদর কমপক্ষে একশো মার্কিন ডলার।

রাত নটার মধ্যে তাঁর কাজ শেষ হল। তারপর ছবি ও কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে ভরার পর তিনি চুরুট ধরালেন। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুরুট টানার পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন এবং টেলিফোনটা কাছে টেনে আনলেন। বুকপকেট থেকে ভাঁজকরা একটা কাগজ খুলে দেখে রিসিভার তুলে কর্নেল ডায়াল করতে থাকলেন।

বুঝলুম, এনগেজড টোন। কর্নেল কয়েকবার ডায়াল করার পর বিরক্ত হয়ে রিসিভার রেখে দিলেন। বললুম,—সম্ভবত কাঞ্চন সেনকে ফোনে পাচ্ছেন না।

কর্নেল ঘুরে আমার দিকে তাকালেন। তুম্বো মুখে বললেন,—আমার হাতে ব্যথা ধরে গেছে জয়ন্ত! এখানে এসো। এই নাম্বারটা ধরে দাও।

তাঁর কাছাকাছি সোফায় বসে তাঁর নির্দেশমতো একটা নাম্বার ডায়াল করলুম। এনগেজড। মিনিট তিনেক পরে আবার ডায়াল করলুম। এনগেজড। তৃতীয়বার চেষ্টার পর বললুম—টেলিফোনটা খারাপ।

কর্নেল এবার নিজে রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন,—মিঃ এ. এম. চন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ...আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...মিঃ চন্দ্র! আপনার কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেন...ও মাই গড! বলেন কী? কখন?...জাস্ট আ মিনিট মিঃ চন্দ্র! পুলিশকে কি আপনি তাঁর কার্ড সম্পর্কে কিছু বলেছেন?...আপনি বুদ্ধিমান। ...ও. কে.! ও. কে.! আমি দেখছি।...হ্যাঁ। আমি ওঁর বাড়িতে এখনই যাচ্ছি। ...হ্যাঁ। পুলিশকে জানিয়েই যাচ্ছি।... আপনি ভাববেন না। কার্ড আপনি যথাসময়ে ফেরত পাবেন। রাখছি।

হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম,—কাঞ্চন সেনের কী হয়েছে?

কর্নেল ডায়াল করতে-করতে বললেন,—কাঞ্চনবাবুকে কেউ তাঁর ঘরে গুলি করে মেরেছে।

তারপর তিনি টেলিফোনে সাড়া পেয়ে বললেন,—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি! ও. সি. হোমিসাইড মিঃ সান্যালের সঙ্গে কথা বলতে চাই। ... বেরিয়েছেন? ঠিক আছে।

টেলিফোন ছেড়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—জয়ন্ত! রেডি হয়ে নাও। কুইক! আমি পোশাক বদলে নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে আমরা নীচে গেলুম। তারপর গাড়িতে চেপে বললুম,—কনকপুরের রায়বাড়ির অদ্ভুত কেসে হাত দিতে না দিতেই একটা বডি পড়ে গেল!

কর্নেল আমার কথা কানে নিলেন বলে মনে হল না। বললেন,—পার্ক স্ট্রিট হয়ে ডাইনে ঘুরে গিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ হয়ে চলো। তারপর হ্যারিসন রোড—সরি, পুরোনো নামটা মাথায় গেঁথে আছে—

—বুঝেছি। মহাত্মা গান্ধী রোডে পৌঁছে চিৎপুরের দিকে এগোব। তবে ওই এলাকায় রবিবারে বলে কিছু নেই। জ্যামে পড়তেই হবে।

কর্নেল কোনো কথা বললেন না। আপার চিৎপুর রোড এখন রবীন্দ্র সরণি। কর্নেল নাম্বার লক্ষ করছিলেন। সংকীর্ণ রাস্তায় ট্রাম বাস ট্রাক ঠেলাগাড়ি রিকশার ভিড়। কর্নেল রাস্তায় একটা লোককে রামপদ শেঠ লেনের কথা জিজ্ঞেস করলে সে সামনের দিকে তর্জনী তুলল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে গলিটার মোড়ে পৌঁছলুম। গলির ভিতরে ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলো। কিন্তু পুলিশ লাঠি

উঁচিয়ে প্রাণপণে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে। আমার গাড়িতে 'প্রেস' স্টিকার লাগানো দেখে একজন কনস্টেবল বাঁ-দিকের এক চিলতে ফুটপাতের উপর গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। বাঁ-দিকে দুটো চাকা সেই ফুটপাতে ওঠালুম। কর্নেল নেমে গিয়ে বললেন,—গাড়ি লক করে এসো! একজন চেনা পুলিশ অফিসারকে দেখতে পাচ্ছি।

পুলিশের একটা বেতার ভ্যান আর দুটো জিপ ডানদিকে একটা ছ'তলা বাড়ির সামনে দাঁড় করানো ছিল। কর্নেলকে দেখে সেই পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে নমস্কার করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন,—স্যার! আপনি এখানে?

—প্রণব! তোমাদের বড়বাবু আর লালবাজারের ও. সি. হোমিসাইড কোথায়?

—ওঁরা একটু আগে চলে গেছেন স্যার!

—ভিকটিমের বডি?

—আধঘণ্টা আগে মর্গে পাঠানো হয়েছে।

—আমি ভিকটিমের ফ্ল্যাটটা দেখতে চাই। লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কেউ আসেননি?

প্রণববাবু কথা বলতে-বলতে সিঁড়িতে উঠছিলেন। বললেন,—ডি. ডি. থেকে এস. আই. নরেশবাবু আর দুজন অফিসার এসেছেন। ভিকটিম বিখ্যাত জুয়েলারি কোম্পানির কর্মচারী। কাজেই কর্নেলসায়েবের আবির্ভাবে আমি অবাক হইনি। নরেশবাবুরাও হবেন না!

বললুম—ছ'তলা বাড়ি। লিফট নেই?

—প্রাচীন আমলের বাড়ি। তবে ভিকটিম ভদ্রলোক থাকতেন তিনতলার একটা ঘরে। ফ্ল্যাটবাড়ি বলা যায় না। তবে অ্যাটাচড বাথরুম আছে।

তিনতলার টানা বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতেই নরেশ ধরকে দেখতে পেলুম। তিনি কর্নেলকে দেখে বললেন,—হুঁ, যা ভেবেছিলুম। চন্দ্রসায়েবের একটা কেসে স্বনামধন্য কর্নেলসায়েব লড়েছিলেন। অতএব এই কেসে তাঁকে দেখতে পাব, এটা স্বাভাবিক।

কর্নেল হাসলেন। —আশা করি অরিজিতের কানেও খবরটা মিঃ চন্দ্র তুলেছেন?

—ডি. সি. ডি. ডি. সায়েবের তাড়া খেয়েই আমাদের ছুটে আসতে হয়েছে। উনি আপনাকেও নিশ্চয় একটু উঁকি মারতে বলেছেন?

—না নরেশবাবু। অরিজিৎ লাহিড়ি এই বৃদ্ধের দাড়ি ধরে টানেননি। যাকগে! চলুন। ঘরটা একটু দেখে নিই।

নরেশবাবুর পিছনে কর্নেল ও আমি মোটামুটি চওড়া ঘুরে ঢুকলুম। দুজন অফিসার ঘরের ভিতর কিছু করছিলেন। আমাদের দেখে তাঁরা ভুরু কুঁচকে তাকালেন। নরেশবাবু বললেন—ওহে আলম! এঁকে চিনতে পারছ কি?

একজন অফিসার কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন—আমার সৌভাগ্য! কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পেলুম!

অন্যজন নমস্কার করে বললেন,—কর্নেলসায়েব আমাকে হয়তো চিনতে পারবেন। আমি মানিক দত্ত। এন্টালি থানায় ছিলুম।

কর্নেল ঘরের ভিতর চোখ বুলিয়ে বললেন,—কাঞ্চনবাবু একা থাকতেন?

নরেশবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কথায় বলে, একা না বোকা!

কর্নেল ডানদিকে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন,—মার্ডার এখানেই হয়েছে। নরেশবাবু! বডি কী অবস্থায় ছিল?

—বাথরুমের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক। পা-দুটো বাথরুমের দরজার বাইরে। মাথার পিছনে প্রায় পয়েন্টব্ল্যাংক রেঞ্জে গুলি করেছে খুনি।

—পাশের ঘরের কেউ গুলির শব্দ শোনেনি?

—পাশের দুটো ঘরে দুজন করে চারজন থাকেন। ও দুটো ঘরকে মেস বলা যায়। চারজনই বাঙালি। হুগলি, হাওড়া, বর্ধমানে বাড়ি। বিভিন্ন দোকানের কর্মচারী ওঁরা। শনিবার বিকেলে বাড়ি চলে যান। ফেরেন সোমবার সকালে। তার ওপাশে সিঁড়ি। তারপর চারটে ঘরে এক মারোয়াড়ি ফ্যামিলি থাকেন। কাঞ্চনবাবুর ঘরে সকাল-সন্ধ্যা লোকজন আসতে দেখেছেন ওঁরা। আর গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া এই এলাকায় আজ রোববারেও সম্ভব নয়, তা নিজেই বুঝে নিন। মোটরসাইকেলের শব্দ তো সব সময়। তার ওপর নীচের তলায় একটা লোহালক্কড়ের দোকান। রোববারেও লোহার পাত কাটার শব্দ শুনছিলুম। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করতে বলেছি।

কর্নেল কোণের দিকে খাটের পাশে টেবিলে একজন মহিলার ছবি দেখে বললেন, —কাঞ্চনবাবুর স্ত্রী সম্ভবত।

নরেশবাবু বললেন,—হ্যাঁ, সম্ভবত। কাঞ্চনবাবুর দেশের বাড়ির ঠিকানায় খোঁজ নিলে জানা যাবে।

—দেশের বাড়ির ঠিকানা পেয়েছেন তা হলে?

—একটা চিঠি থেকে পাওয়া গেছে। কাঞ্চনবাবুর দাদা প্রাণকান্তবাবুর চিঠি। ভাইকে পুজোর সময় বাড়ি যেতে লিখেছেন। টাকাকড়িও চেয়েছেন।

—ঠিকানাটা দিতে আপত্তি আছে?

নরেশবাবু হাসলেন। —কক্ষনও না। ডি. সি. ডি. ডি. সায়েব শুনলে আমার চাকরি যাবে। লিখে নেবেন কি?

কর্নেল পকেট থেকে খুদে নোটবই আর ডটপেন বের করলেন। —বলুন।

—গ্রাম রানিপুর, পোস্ট অফিস কনকপুর, জেলা নদিয়া।

কনকপুর শুনে আমি চমকে উঠেছিলুম। কর্নেল নির্বিকারমুখে নাম-ঠিকানা লিখে বললেন, —ছোট একটা সোফাসেট আছে দেখছি। সেন্টার টেবিলে দুটো চায়ের কাপ। চা শেষ করে কাঞ্চনবাবু বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাঁর গেস্ট তাঁকে গুলি করেছে। তো ডেডবডি প্রথম কে দেখেছিল?

নরেশবাবু বললেন,—মারোয়াড়ি ফ্যামিলির একটা বাচ্চা ওদের বারান্দায় খেলনা ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে খেলছিল। তার দিদি সিঁড়ির মাথা থেকে বল ছুড়ছিল। তারপর বলটা এই ঘরের বারান্দায় এসে পড়েছিল। কিন্তু এখানে বারান্দায় তখন আলো ছিল না। তাই ওরা এখানে আসতে ভয় পাচ্ছিল। তখন মেয়েটির দাদা মোহনলাল বল কুড়োতে আসে। দরজা অর্ধেক খোলা। অথচ ভিতরে অন্ধকার। তার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক।

কর্নেল টেলিফোন দেখিয়ে বললেন,—ওটা কি ডেড?

নরেশবাবু টেবিলের পিছন থেকে ছেঁড়া তার তুলে দেখলেন। —খুব হুঁশিয়ার খুনি। ঘরের আলোও নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দরজার কপাট পুরো লাগানোর হয়তো সময় পায়নি।

কর্নেল সোফার কাছে হাঁটু মুড়ে বসে টর্চ জ্বাললেন। তারপর আতশকাচ দিয়ে কিছুক্ষণ কী সব পরীক্ষা করলেন, তিনিই জানেন। নরেশবাবু মুচকি হেসে বললেন,—ফরেন্সিক এক্সপার্টদের জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক, তার আগে কর্নেলসায়েবের শ্যেনচক্ষুতে খুনির কোনো ক্লু মেলে কি না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ধনবান রত্নব্যবসায়ীর কর্মচারী। কাজেই ফরেন্সিক এক্সপার্টরা আসবেন বইকি। আমি নিছক হাতুড়ে এসব ব্যাপারে।

—হাতের তাস আপনি দেখাবেন না। তা জানি!

কর্নেল হাসলেন। —দেখলুম, লোকটার কাপ থেকে একটুখানি চা পড়ে গিয়েছিল। খুব গরম চা ফুঁ দিয়ে খেতে গেলে এমনটা হতেই পারে। আসলে সে শিগগির চা খেয়ে নিয়ে হাতের কাজ শেষ করতে চেয়েছিল।

নরেশবাবু বললেন,—কাঞ্চনবাবু নিজেই চা তৈরি করে খেতেন। কেরোসিন কুকার আর চায়ের সরঞ্জাম দেখেই তা বোঝা যায়। খেতেন হোটেলে। কারণ চাল-ডাল বা রান্নার পাত্র দেখছি না।

কর্নেল ঘরের ভিতর আবার একবার ঘুরে দেখে নিয়ে বললেন,—নরেশবাবু! কেউ কাঞ্চন সেনের ঘর থেকে কিছু নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খুন করেনি। সে কাঞ্চনবাবুকে খুন করতেই এসেছিল। আর-একটা কথা। সে এই কাজের জন্য রবিবার সন্ধ্যাটা বেছে নিয়েছিল। খুনের নিরাপদ জায়গা কাঞ্চনবাবুর এই ঘর, তা সে বুঝতে পেরেছিল।

—আপনি কি বলতে চান, খুনি আগে থেকে টেলিফোনে কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেই এসেছিল?

—তা আর বলতে? আচ্ছা, চলি নরেশবাবু! বলে কর্নেল ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন। তাঁকে অনুসরণ করতে আমার অবস্থা শোচনীয় বললে ভুল হয় না।...

সে-রাত্রে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, —কাঞ্চন সেনকে কারও খুন করার মোটিভ কি থাকতে পারে? আমার ধারণা, কেউ কোনো বিষয়ে তাঁর মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। তাই না?

কর্নেলকে বড় বেশি গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন,—আমি অন্তর্যামী নই, জয়ন্ত!

—কী আশ্চর্য, আপনি যেন কোনো কারণে বেজায় চটে গেছেন! খুনির প্রতি, নাকি আমার প্রতি?

আমি কৌতুকের মেজাজেই বলেছিলুম কথাটা। লক্ষ করেছিলুম, কর্নেলের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের মেজাজও নেই। তিনি বলেছিলেন,—জয়ন্ত! আমি নিজের প্রতি নিজেই চটে গেছি।

—সে কি!

—একচক্ষু হরিণের গল্পটা নিশ্চয় তুমি জানো! আমি হঠাৎ কী করে একচক্ষু হরিণ হয়ে গিয়েছিলুম বুঝতে পারছি না।

—একটু খুলে বলবেন কি?

—খিদে পেয়েছে। ষষ্ঠী! এগারোটা বাজতে চলল! খেয়াল আছে?

ষষ্ঠী পর্দার পিছনেই ছিল। উঁকি মেরে বলল, —আপনি বসে-বসে চুরুট খাচ্ছেন বাবামশাই! আপনিই বলেন, চুরুট খাওয়ার সময় আমি যেন আপনাকে ডিসটাপ না করি!

কর্নেল তখনই চুরুট অ্যাশট্রেতে ঘষে নিভিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। —চুপ হতভাগা! খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে এবার থেকে ডিসটাপ করবি। উঠে পড়ো জয়ন্ত! নাকি তোমাকে ডিসটাপ করে ফেললুম?

এবার স্বাভাবিক আবহাওয়া ফিরে এসেছিল। বলেছিলুম,—ষষ্ঠীকে আপনি বাংলা পড়িয়েছেন। ইংরেজিও নাকি পড়াতে চান। তার আগে ওর ডিসটাপ-টা শুধরে দেবেন।

—তোমাকে ওই দায়িত্বটা দিলুম। বলে কর্নেল বাথরুমে ঢুকেছিলেন।

সে-রাতে বিছানায় শুয়ে কাঞ্চন সেনের হত্যাকাণ্ডে কর্নেলের নিজের প্রতি চটে যাওয়া এবং নিজেকে একচক্ষু হরিণ বলার কারণ খুঁজতে নাকাল হয়েছিলুম। শুধু এটুকু বোঝা যায়, কাঞ্চন সেনকে কেউ খুন করতে পারে, কর্নেল নিশ্চয় তা ভাবেননি। কিন্তু কাঞ্চন সেন খুন হওয়ার পর তাঁর হয়তো মনে হয়েছে, এরকম একটা শোচনীয় সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথায় এলেও যে-কোনো কারণে হোক, সেটা তিনি তখন গ্রাহ্য করেননি। পরে তাই তাঁর অনুশোচনা হয়েছে।

কর্নেল তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আমার রাত্রিবাসের সময় একবার বলেছিলেন,—ডার্লিং! ইংরেজিতে একটা প্রবচন আছে, তার মোদ্দা মানেটা হল : রাত্রিকালে যে-সব চিন্তাভাবনা আসে, সেগুলোর বিরুদ্ধে সতর্ক থেকো "Beware of the thoughts, come in night!" সতর্ক না থাকলে অনিদ্রার রোগে ভুগবে।

লাইনটা মনে পড়ে গেলে সতর্ক হয়েছিলুম বটে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। সকাল থেকে রাত্রি—পুরো একটা রবিবার ঘটনার পর ঘটনার ধাক্কায় এ যাবৎ অসংখ্যবার বিপর্যস্ত হয়েছি। এটা নতুন কিছু নয়। তবু শুধু মনে ভেসে উঠছিল, কাঞ্চন সেনের করুণ মুখে বলা শেষ কথাটা : স্যার! দয়া করে শুধু একটা কথা মনে রাখবেন। আমার প্রাণ এখন আপনার হাতে!

কর্নেলের একসময় একটা লালরঙের ল্যান্ডরোভার গাড়ি ছিল। গাড়িটা কবে বেচে দিয়েছেন। কিন্তু গ্যারেজটা কাউকে ভাড়া না দিয়ে খালি রেখেছেন। আমার ফিয়াট গাড়িটা সেখানেই রাত্রিযাপন করে। গ্যারেজের চাবি ষষ্ঠীর জিম্মায় থাকে।

পরদিন সকাল নটায় ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল বললেন,—তুমি তোমার সল্টলেকের ফ্ল্যাটে গিয়ে সোয়েটার-জ্যাকেট-টুপি-মাফলার এইসব গরম পোশাক-আশাক নিয়ে এসো। তোমার লাইসেন্সড আর্মস সঙ্গে থাকা দরকার। তোমার গাড়িতেই ফিরে আসব। গাড়িটা আমার গ্যারেজ থাকবে। ট্যাক্সির ওপর ভরসা করা ঠিক হবে না।....

শেয়ালদা স্টেশনে এগারোটা পঁচিশের ট্রেনে তত বেশি ভিড় ছিল না। কর্নেলের সেই চিরাচরিত ট্যুরিস্টের বেশ। পরনে জ্যাকেট, পায়ে হান্টিং বুটজুতো। গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা আর বাইনোকুলার পিঠে সাঁটা সেই কালো কিটব্যাগ, যেটার মাথার দিকে প্রজাপতিধরা জালের হাতল বেরিয়ে তাঁর বাঁ-কাঁধের ওপর দিয়ে বেখাপ্পা খুদে ছড়ির মতো দেখাচ্ছিল। আর-একটা ব্যাগ তাঁর পোশাক-আশাক ইত্যাদিতে ঠাসা। লক্ষ করছিলুম, যাত্রীরা তাঁকে লক্ষবস্তু করে ফেলেছে। এটা অবশ্য সবখানেই দেখে আসছি।

একটা নাগাদ কনকপুর স্টেশনে নেমে দেখলুম, পিছনের চত্বরে বাস, সাইকেলরিকশার ভিড়। এক্কা ঘোড়ার গাড়িও চোখে পড়ল। ছোট্ট একটা বাজার আছে। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত! আমাদের পক্ষে এক্কাগাড়িই ভালো। সাইকেলরিকশায় ঠাসাঠাসি হবে। তা ছাড়া, লক্ষ করো, বেচারা এক্কাওয়ালারা যাত্রী পাচ্ছে না। ক্রমশ গ্রামাঞ্চলের মানুষ নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে সেকেলে যানবাহনের প্রতি অবহেলা দেখাতে শুরু করেছে।

ট্রেনে আসবার সময় শীতের হিম টের পাচ্ছিলুম। চত্বরে নেমে রোদ্দুর আরাম দিল। তারপর যা হয়, বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে সাইকেলরিকশাওয়ালারা ঘিরে ধরেছিল। কর্নেল সোজা গিয়ে একটা এক্কাগাড়িতে উঠে বসলেন। বিহার অঞ্চলে কর্নেলের সঙ্গে এক্কাগাড়িতে চাপার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ঘোড়াটার পাঁজরের হাড় গোনা যায়। কিন্তু এক্কাওয়ালা মহানন্দে তাকে পক্ষিরাজে রূপান্তরিত করতে চাইছিল। কর্নেল তাকে বললেন, —তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। ইরিগেশন বাংলোয় যেতে কনকপুরের বাইরে দিয়ে একটা রাস্তা আছে শুনেছি। সেই রাস্তায় চলো।

এক্কাওয়ালা কর্নেলের মুখে বাংলা কথা শোনার আশা করেনি। সে একবার ঘুরে কর্নেলকে দেখে নিয়ে বলল,—সায়েবরা কি বলকাতা থেকে আসছেন সার?

—হ্যাঁ। তোমার নাম কী?

—আমার নাম মকবুল সার।

—কনকপুরের লোক তুমি?

—না সার! ডুবো জায়গায় বাড়ি ছিল। বানবন্যায় নাকাল হয়ে ইস্টিশানের কাছে বসত করেছি।

—ডুবো জায়গাটা কোথায়?

—পাঁচখালি। এখান থেকে অনেকটা দূর। খালবিল নদীনালা আর জঙ্গল। গরমেন বাঁধ বেঁধেছিল। বাঁধ বারবার ভেঙে যায়। কনটেকটারবাবু টাকা লুঠেপুটে খায়। বেশি কী বলব সার?

—লোকজনের বসতি নেই ওই অঞ্চলে?

—তা আছে সার। বেদে আছে। সাঁওতাল আছে। আমার মতো কত গরিব-গুরবোও আছে।

—আচ্ছা, ওদিকে শুনেছি বেতের জঙ্গল ছিল একসময়। বেতের আসবাবপত্র নাকি কলকাতায় চালান যেত?

—এখনও আছে! কালুখালিতে কয়েকঘর ডোম আছে। তারাই বেতের কাজ করে।

—মকবুল! তুমি তো একসময় ওই এলাকায় ছিলে। কালুখালিতে দশরথ নামে একটা লোক ছিল জানো?

মকবুল হাসল। —সায়েবরা তা হলে আগে এসেছেন এ তল্লাটে?

—হ্যাঁ। আমার এক শিকারি বন্ধুর সঙ্গে এসেছিলুম। উনি দশরথকে আমার জন্য একটা বেতের চেয়ার তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। লোকটার হাতের কাজ খুব সুন্দর!

—দশরথ এখন বুড়ো হয়ে গেছে। তা হলেও তার হাতের কাজ খুব পাকা।

—ওহে মকবুল! আমার মনে হচ্ছে, ডাইনের রাস্তায় যেতে হবে।

—সার! দুধারে জঙ্গল। কাঁচা রাস্তায় ঘোড়াটার কষ্টও হবে।

—ঠিক আছে। একটু আস্তেই না হয় চলো। আমরা তো জল-জঙ্গলে ঘুরতেই এসেছি। বখশিস পাবে!

বখশিসের লোভে এক্কাগাড়ি ডাইনের রাস্তায় নিয়ে গেল মকবুল। কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে হয়তো পাখি-প্রজাপতি বা গাছের ডালে পরজীবী অর্কিড খুঁজতে মন দিলেন। মাটির রাস্তাটা সংকীর্ণ। মাঝবরাবর হলুদরঙের ঘাস এবং তার দুপাশে ধুলোয় মোটরগাড়ির টায়ারের দাগ। জিজ্ঞেস করলে মকবুল আমাকে বলল,—চোরেরা রাতবিরেতে জঙ্গলের গাছ কাটে। কাঠগোলা থেকে লরি এসে সেই কাঠ নিয়ে যায়। কখনও থানাপুলিশ হয় সার! অভাবী লোকেরা পেটের দায়ে চোর হতেই পারে। কিন্তু আসল চোর তো কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা নিয়ে বসে আছে। তাদের ধরে কে?

প্রায় এক কিলোমিটার চলার পর কাঁচারাস্তাটা ডাইনে বাঁক নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। এক্কাগাড়িটা এবার পিচরাস্তায় উঠল। কর্নেল বাইনোকুলারে সামনেটা দেখে নিয়ে বললেন, —ইরিগেশন বাংলো দেখা যাচ্ছে। জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির সঙ্গে বছর তিনেক আগে ওই বাংলোতে উঠেছিলুম।

বললুম,—তা হলে তো আপনার চেনা জায়গা!

—কতকটা। নৌকো করেই ঘুরেছিলুম। সেটা ছিল ডিসেম্বর মাস। সাইবেরিয়ান হাঁস দেখেছিলুম। ছবি তোলার সুযোগ পাইনি। তা ছাড়া, কনকপুরেও যাওয়া হয়নি। মিঃ রায়চৌধুরিও বলেননি, কনকপুরে তাঁর আত্মীয় আছেন। গত পরশু তাঁর টেলিফোন পেয়ে সেটা জেনেছি।

—ভদ্রলোক সম্ভবত তাঁর মাসতুতো দাদাদের এড়িয়ে চলেন। তাই না?

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—তা-ই বা বলি কেমন করে? রায়বাড়ির রহস্যজনক চুরির ঘটনা সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ লক্ষ করেছি। পুলিশের উঁচুতলায় তাঁর প্রভাব সত্ত্বেও সুদর্শনবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এবার আমাদের ওপর উত্তরের বাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। মকবুলের মন এখন তার হাড়জিরজিরে টাট্টুর দিকে। প্রবল বাতাস ঠেলে পা বাড়াতে বেচারার কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কর্নেল মকবুলকে বারবার বলছিলেন,—তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ইচ্ছেমতো ওকে চলতে দাও!

বললুম,—জঙ্গল এলাকাটা বিশাল মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—সরকারি বনসৃজন স্কিমের ব্যাপার। এখানকার মাটি খুব উর্বর। সেবার এসে এত ঘন জঙ্গল দেখিনি।

—তা হলে ফরেস্টবাংলো নিশ্চয় কোথাও আছে?

—আছে। ওই কাঁচারাস্তা দিয়ে এগোলে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার দূরে। রাস্তার অবস্থা তো দেখলে! রাস্তা পাকা হতে কত বছর লাগবে কে জানে! সরকারি ব্যাপার।

পিছন ফিরে দেখে নিয়ে বললুম,—কনকপুর দেখা যাচ্ছে। জঙ্গল ঘুরে না এলে কখন পৌঁছে যেতুম।

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। রাস্তার বাঁদিকে পশ্চিমে বিস্তীর্ণ ধানখেতে পাকা ধান কাটছে লোকেরা। ডানদিকে জঙ্গল থেকে একটা জলভরা খাল বেরিয়ে রাস্তার সমান্তরালে চলেছে। বাংলোটা মনোরম। পিছনের দিকে, উত্তরে ও পূর্বে বিশাল জলাধার। বাতাসে উত্তরঙ্গ সেই জলাধারে দূরে কয়েকটা নৌকো দেখা যাচ্ছিল।

গেটের সামনে এক্কাগাড়ি দাঁড় করাল মকবুল। একজন প্যান্ট-শার্ট সোয়েটার পরা ভদ্রলোক ততক্ষণে গেটের কাছে এসে গেছেন। তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—ভেরি-ভেরি সরি স্যার। ইঞ্জিনিয়ারসায়েব স্টেশনে জিপগাড়ি পাঠাতে বলেছিলেন। কিন্তু গাড়িটা মাঝপথে বিগড়ে গিয়েছিল। মেকানিক ডেকে আনতে দেরি দেখে পাঁচুবাবুর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে ফোন করেছিলুম। ওরা বলল,—এত শিগগির গাড়ি দিতে পারব না। আমার অপরাধ নেবেন না স্যার!

কর্নেল হাসলেন। —না। আপনার উদ্বেগের কারণ নেই। আমরা মকবুলের গাড়িতে চেপে খুব আনন্দ পেয়েছি। আপনি বুঝি বাংলোর কেয়ারটেকার?

—আজ্ঞে! আমার নাম সুখরঞ্জন দাশ। বলে তিনি হাঁক দিলেন,—অ্যাই ভোঁদা। ওখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস হতভাগা? সায়েবরা এসে গেছেন! মালপত্তর নিয়ে যা!

কর্নেল মকবুলের হাতে একটা ভাঁজকরা নোট গুঁজে দিলেন। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে সেলাম ঠুকে কর্নেল ও আমার ব্যাগদুটো নামাল। ভোঁদা নামে বেঁটে একজন যুবক এসে ব্যাগদুটো নিয়ে এগিয়ে গেল। গেটের পর মোরামবিছানো পথ। সরকারি বাংলো যেমন হয়। ফুলে ও সুন্দর গাছপালা-লতা-গুল্মে সাজানো। পশ্চিমপ্রান্তে তিনটে একতলা ঘর। তার মধ্যে একটা গাড়ি রাখার গ্যারেজ।

একজন মালি খুরপি দিয়ে একটা ঝোপের গোড়ার মাটি খুঁড়ছিল। সে সটান উঠে দাঁড়িয়ে কর্নেলের উদ্দেশে সেলাম ঠুকল। একতলা ঘরের বারান্দায় সম্ভবত তার বউ পা ছড়িয়ে বসে ভাত খাচ্ছিল। বউটি ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে বসল।

দোতলা বাংলোর বাঁদিকে সিঁড়ি। সুখরঞ্জনবাবু, তাঁর পিছনে ভোঁদা সবেগে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাওয়ার পর আস্তে-সুস্থে কর্নেল ও আমি ওপরে গেলুম। ওপরে শেষপ্রান্তের ঘরটিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্নেল ঘরে ঢুকে বললেন—সুখরঞ্জনবাবু! বছর তিনেক আগে আমি আর আমার বন্ধু এই ঘরে ছিলুম।

সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—আজ্ঞে স্যার! আমি একবছর হল জয়েন করেছি। তখন কেয়ারটেকার ছিলেন নিত্যগোপাল মুখুজ্যে।

—হ্যাঁ! নিত্যগোপালবাবু। নামটা মনে পড়ল।

—হঠাৎ স্ট্রোকে উনি মারা যান। বলে সুখরঞ্জনবাবু তেড়ে গেলেন ভোঁদার দিকে। —হাঁ করে দেখছিস কী? ঠাক্‌মশাই বোধ করি লেপের তলায় ঢুকে পড়েছে। গিয়ে বল সায়েবরা এসে গেছেন। দুটো বাজতে চলল।

ভোঁদা তখনই দুপদাপ শব্দ করতে-করতে চলে গেল। হোঁৎকা মোটা বেঁটে যুবকটিকে দেখে ন্যালা-ভোলা মনে হচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—সেবার রান্নার লোক ছিল না। মুখুজ্যেমশাই নিজেই আমাদের রান্না করে খাইয়েছিলেন।

—আজ্ঞে স্যার! অমন মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়াই কঠিন। যাক্‌গে। এত বেলায় স্নান না করাই ভালো। বাথরুমে গিজার আছে। গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে নিন। খাবার এখানে পাঠিয়ে দেব, নাকি...

কর্নেল হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। —আমরা নীচের ডাইনিং ঘরেই খাব। আপনার ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই।

সুখরঞ্জন বেরিয়ে গেলেন। বললুম,—বাপস! এ যে বিহারের পাহাড়ি শীত! জানলাও খোলা যাবে না।

কর্নেল বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আমি উত্তরের পর্দা সরিয়ে কাচের জানলা একটুখানি ফাঁক করে দেখে নিলুম। নীচের দিকে জলাধারের তীরে বাঁধানো ঘাট। সেখানে একটা সাদা রঙের বোট বাঁধা আছে। কিন্তু ঠান্ডা হিম জলাধারে রোয়িং করা অম্ভব। অবশ্য কর্নেলের কথা আলাদা। তাঁর মিলিটারি শরীর।

একটু পরে আমরা ঘরের দরজায় তালা এঁটে নীচে ডাইনিংরুমে গেলুম। ঠাকমশাই করজোড়ে নমস্কার করলেন। কর্নেল প্রশ্ন করে জেনে নিলেন, তাঁর নাম বাসুদেব ঠাকুর। তাঁর বাড়ি রানিপুর। কথায়-কথায় জানা গেল, প্রাণকান্ত সেনকে তিনি চেনেন। প্রাণকান্তবাবুর ভাই কাঞ্চন সেন কলকাতায় বড় একটি চাকরি করে। গরিব দাদাকে পাইপয়সা সাহায্য করে না। দাদার বাড়ি আসেও না।

সুখরঞ্জনবাবু একটু তফাতে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন,—আমার বাড়ি কনকপুরে। কাঞ্চন কনকপুর হাইস্কুলে আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল স্যার! আপনি তাকে চেনেন?

কর্নেল বললেন,—আমার এক বন্ধুর কোম্পানিতে ভদ্রলোক চাকরি করেন। সেই সূত্রে একটু আলাপ হয়েছিল। আমার তো পাখিটাখি দেখার বাতিক আছে। কাঞ্চনবাবু বলেছিলেন, তাঁদের গ্রামের ওদিকে বিশাল বিল আছে। সেখানে শীতের সময় প্রচুর জলচর পাখি আসে। তাঁর কাছে

খবর পেয়েই সেবার আমি এখানে পাখি দেখতে এসেছিলুম। তবে উনি বিল বলেছিলেন। আমি এসে দেখেছিলুম, ওয়াটারড্যাম।

ভোঁদা বারান্দায় রোদে বসেছিল। সে জড়ানো গলায় অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল,—কাঁছনবাবু না? এঁই তো সেদিন—কঁকপুরে এসেছিল। বাঁছুবাবু না? বাঁছুবাবুর সঙ্গে বাজারে না? একসঙ্গে রিকশাতে চেঁপেছিল।

সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে তাকে ধমক দিলেন। —চুপ হতভাগা! স্পষ্ট করে একটা কথা বলতে পারে না। জানেন স্যার? রাতবিরেতে ওর কথা শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। আস্ত ভূত!

কর্নেল বললেন,—ওর বাড়ি কোথায়?

ঠাকমশাই বললেন,—আমার গ্রামের ছেলে স্যার! বাবা-মা নেই। কনকপুর বাস্ট্যান্ডে মোট বইত। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে ফাইফরমাশ খাটত। ইঞ্জিনিয়ারসায়েব ওকে এখানে চাকরি দিয়েছিলেন।

খাওয়ার পর ওপরের ঘরে গিয়ে বসেছিলুম,—কর্নেল! ভোঁদা কোন বাঁছুবাবুর সঙ্গে ক'দিন আগে কনকপুর বাজারে কাঞ্চন সেনকে দেখেছে! বাঁছুবাবুটি কে জেনে নিলেন না কেন?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বলেছিলেন,—কম্বলে ঢুকে ভাতঘুম দিয়ে নিতে পারো।

—ইচ্ছে তো করছে। কিন্তু রোদ দেখে লোভ হচ্ছে।

তা হলে বারান্দায় রোদে বসতে পারো। —বলে তিনি একটা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় গেলেন। তারপর দেখলুম, বাইনোকুলারে তিনি সম্ভবত কনকপুর দর্শন করছেন।

রোদের আরাম না কম্বলের আরাম, এই টানাটানির খেলায় শেষপর্যন্ত কম্বল জিতে গেল। আমি কম্বলের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলুম।

তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি। ঘুম ভেঙেছিল ঠাকমশাইয়ের ডাকে। তিনি চায়ের কাপ-প্লেট হাতে নিয়ে ডাকছিলেন। দেখেই বুঝেছিলুম কর্নেলের নির্দেশ। ঠাকমশাই সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। বললেন,—বড়সায়েব ভোঁদাকে নিয়ে পাখি দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি, দূর পশ্চিমে অর্ধবৃত্তাকার গাঢ় নীল সূর্য যথাসাধ্য রং ছড়িয়ে রেখেছে। কিন্তু প্রাকসন্ধ্যার ধূসরতা দ্রুত লাল রংটা মুছে ফেলছে। পুর্ব-দক্ষিণে সেই সরকারি জঙ্গলের গায়ে দেখতে-দেখতে ঘন নীল কুয়াশা জমে উঠল। চা শেষ করতে-করতে দক্ষিণে কনকপুরের আলোর বিন্দু ফুটে উঠতে দেখলুম। বারান্দার চেয়ারে বসে আমার প্রকৃতি দর্শনের একটু পরেই বাংলোর নীচের তলায় আলো জ্বলে উঠল। গেটের দিকে আলো পড়তেই কর্নেল আর ভোঁদাকে দেখতে পেলুম।

একটু পরে কর্নেল উঠে এসে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন,—গুড ইভনিং জয়ন্ত! আশা করি ভাতঘুমটা ভালোই হয়েছে।

বললুম,—গুড ইভনিং বস! ভোঁদাকে নিয়ে কতদূর ঘুরলেন?

কর্নেল বারান্দার আলোর সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। তারপর ভিতরে তাঁর কিটব্যাগ, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার রেখে একটা চেয়ার নিয়ে এলেন। তিনি চেয়ারে বসে আস্তে বললেন, —ইচ্ছে করেই একটা রিস্ক নিয়েছিলুম। সাংঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারত। তৈরি ছিলুম বলে ঘটেনি। অবশ্য ভোঁদা ছেলেটি সত্যিই যাকে বলে হাঁদারাম। কী ঘটল তা বুঝতে পারেনি।

কথাটা শুনেই চমকে উঠেছিলুম। বললুম, —কেউ হামলা করেছিল। তাই না?

কর্নেল হাসলেন। —ড্যামের ধারে উঁচু বাঁধের পথে হাঁটছিলুম। বাঁধের দুধারেই গাছপালা ঝোপঝাড়। ডাইনে খানিকটা ঢালু জমির নীচে সেই খালটা। আসবার সময় খালটা তুমি দেখেছ।

তো আগেই ঢালু জমিতে একটা বটগাছ লক্ষ করেছিলুম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য একটা লোককে গুঁড়ির ওধারে আড়ালে যেতে দেখেছিলুম। ভোঁদা হাঁটছিল আমার বাঁদিকে। বটগাছটার কাছাকাছি বাঁধের পথে পৌঁছুনোর আগেই দেখি, লোকটা গুঁড়ি মেরে ঢালু জমিতে ঝোপের মধ্যে বসে পড়েছে। তার হাতে কী একটা ছিল—সম্ভবত দেশি পিস্তল। আমার উপায় ছিল না, ঝোপটার গোড়া লক্ষ্য করে এক রাউন্ড ফায়ার করতেই হল। অমনই লোকটা বটগাছের আড়াল দিয়ে উধাও হয়ে গেল। ভোঁদা ভেবেছিল, আমি পাখি মারবার চেষ্টা করলুম। তার কথায় পরে আসছি। নেমে গিয়ে বটগাছটার কাছে বাইনোকুলারে দেখলুম, লোকটা খালের ধারে-ধারে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে পড়ি-কি-মরি করে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাঁচারাস্তায় পৌঁছে সে একবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে আবার দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। ভোঁদা তখনও বাঁধে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখার মতো মূর্তি। চোখ বড়। জিভ খানিকটা বেরিয়ে আছে। ফিরে গিয়ে বললুম, পাখিটা মারতে পারলুম না ভোঁদা! ভোঁদা তার বুলিতে যা বলতে চাইছিল, তা বুঝলুম। এদিকটায় বনমুরগি চরে বেড়ায়। কিন্তু তারা বেজায় চালাক।

এইসময় কফি আর স্ন্যাক্স ট্রেতে করে নিয়ে এলেন ঠাকমশাই। তাঁর পিছনে ভোঁদা। ভোঁদা ঘর থেকে বেতের টেবিল এনে রাখল। ঠাকমশাই সহাস্যে বললেন,—বড়সায়েব বনমুরগিকে গুলি করেছিলেন শুনলুম। ভোঁদা তো হেসে অস্থির। বনমুরগি ফাঁদ পেতে ধরতে হয়। বুঝলেন স্যার? আগের দিনে মুমহররা এসে বনমুরগি ধরত। আজকাল আর তাদের দেখতে পাই না!

ভোঁদা অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ভুতুড়ে হাসি হাসল। তারপর ঠাকমশাইয়ের তাড়া খেয়ে চলে গেল।

ঠাকমশাই বনমুরগি এবং মুমহরদের সম্পর্কে আরও কিছু বলতেন। গেটের দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললেন,—ঠাকমশাই! আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা করতে আসার কথা। মনে হচ্ছে, তিনি এসে গেছেন। ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। পটে যা কফি আছে, এতেই হবে। আপনি শুধু একটা কাপ-প্লেট পাঠিয়ে দেবেন।

বাসুদেব ঠাকুর চলে গেলেন। গেটের কাছে হালদারমশাইকে দেখা যাচ্ছিল। মাথায় হনুমানটুপি, পরনে প্যান্ট আর গায়ে সোয়েটারের ওপর কোট চাপানো।

আমাদের দেখতে পেয়ে তিনি হাত নাড়ছিলেন। একটু পরে ভোঁদা তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেল। তারপর ঠাকমশাই কাপ-প্লেট নিয়ে এলেন। হালদারমশাইকে বিনীতভাবে নমস্কার করে চলে গেলেন।

গোয়েন্দাপ্রবরকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কর্নেল বললেন,—কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন হালদারমশাই।

আমি বললুম,—আপনি এলেন কীসে?

হালদারমশাই বললেন,—রিকশোওলারা সন্ধ্যার পর এদিকে আইতেই চায় না। একজন হাঁকল তিরিশ টাকা লাগব। হঃ! দুইখান পাও থাকতে অগো সাধাসাধি করুম ক্যান?

কর্নেল তাঁর হাতে কফির কাপ তুলে দিয়ে বললেন,—উঠেছেন কোথায়?

—উঠছি তো রায়বাড়িতে। সুদর্শনবাবু ওনার দাদা সুরঞ্জনবাবুর লগে আমার পরিচয় দিছেন। উনিও খুশি হইয়া কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করছেন। প্রথমে এট্টুখানি হেজিটেট করছিলেন ভদ্রলোক। তখন সুদর্শনবাবু মিঃ রায়চৌধুরির লেটারখান ওনারে পড়তে দিছিলেন। দোতলায় সুদর্শনবাবুর পাশের ঘরে আছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—কতদূর এগোলেন বলুন!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ চাপা স্বরে বললেন,—সুরঞ্জনবাবু কোথায় চাবি লুকাইয়া রাখেন, তা দেখছি। সুদর্শনবাবু তখন বাইরে গিছলেন। ওনার বউদি ভদ্রমহিলা ছিলেন নীচের তলায়। সুরঞ্জনবাবু আমার ঘরে বইয়্যা ওনাদের ফ্যামিলি হিসটরি কইতাছিলেন। সেইসময় কথাটা তুলছিলাম।

—বাঃ! তারপর?

—উনি নিজের বেডরুমে লইয়া গিছলেন। খাটের মাথার দিকের দেওয়ালে ওনার ঠাকুরদার একখান পোর্ট্রেট টাঙানো আছে। ছবিটার পিছনে দেওয়ালে ছোট্ট তাক আছে। একসময় সেখানে ওনাদের মহালক্ষ্মী দেবীর নকলে তৈরি মাটির ছোট্ট প্রতিমা থাকত। ওনার ঠাকুরদার পোর্ট্রেটখান থাকত অন্য দেওয়ালে। চাবি লুকাইয়া রাখতেন সেই প্রতিমার তলায়। পরে প্রতিমা আলমারির মাথায় রাইখ্যা তাকের মাপে লোহার একখান চৌখুপি বানাইয়া আনছিলেন। বাঁদিকে একখানে আঙুলে চাপ দিলে কপাটের মতন সামনেটা খুইল্যা যাইত। ভিতরে হাবিজাবি জিনিসের মধ্যে চাবি দুইখান লুকাইয়া রাখতেন। চৌখুপির সামনের পাতে দেওয়ালে রঙ করা ছিল। তার ওপরে ঠাকুরদার পোর্ট্রেট। পোর্ট্রেটের তলায় ময়লা দাগ পড়নের কথা। কেউ ছবিখান সরাইলে দাগ দেইখ্যা জানা যাইব। তাই কি না?

—ঠিক বলেছেন।

হালদারমশাই বললেন, —সুদর্শনবাবুর ঘরের তালা কেউ একবার ভাঙছিল, তা তো অলরেডি শুনছেন! তারপর সুরঞ্জনবাবুও সতর্ক হইয়া তাঁর চাবিদুইখান এমন জায়গায় রাখছিলেন, ভাবা যায় না। বলে হালদারমশাই খিখি করে হেসে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলুম,—কোথায় রেখেছিলেন?

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—ওনার ঘরে বইপত্তরের মধ্যে পুরোনো পঞ্জিকা আছে অনেকগুলি। একখান পুরোনো অ্যাত্তো মোটা পঞ্জিকার মাঝখানে চৌকো এট্টুখানি গর্ত করছেন।

কর্নেল বললেন,—পাতা কেটে গর্ত?

—ঠিক কইছেন কর্নেলস্যার। ব্লেড দিয়া এক ইঞ্চিরও বেশি গর্ত করছেন। চৌকো গর্ত। তার মধ্যে দুইখান চাবি।

হালদারমশাই আবার খিখি করে হেসে উঠলেন। বললুম,—অদ্ভুত ব্যাপার তো!

—হঃ! কার সাইধ্য ট্যার পায়, পুরোনো পঞ্জিকার মধ্যে গুপ্তধন লুকাইয়া আছে! হালদারমশাই কণ্ঠস্বর আরও চাপা করলেন। —কাজটা কিন্তু সহজ নয়। চিন্তা করেন কর্নেলস্যার! ব্লেড দিয়া অতগুলি পাতা কাটতে সময় কত লাগছে? তিনইঞ্চির বেশি লম্বা আর আধা ইঞ্চি চওড়া কইর‍্যা পাতা কাটছেন।

বললুম,—এক ইঞ্চিরও বেশি গভীর করতে হলে পঞ্জিকাটা খুবই মোটা হওয়া উচিত।

কর্নেল বললেন,—আগের দিনে কিছু প্রকাশক প্রকাণ্ড শাস্ত্রীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন। সঙ্গে জ্যোতিষচর্চা, মেয়েদের ব্রতকথা, শাস্ত্রীয় পাঁচালি পুরে দিতেন। সস্তা নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা এ সব আট-নশো পৃষ্ঠার পঞ্জিকা আমি দেখেছি। আমার এক বন্ধুর পঞ্জিকাসংগ্রহের বাতিক আছে।

কর্নেলের কথার ওপর হালদারমশাই বললেন—বেশিক্ষণ থাকুম না। দুইখান ইমপর্ট্যান্ট কথা আছে।

—বলুন!

—আইজ সকালে বাজার এরিয়ায় গিছলাম। বড় বেশি ঠান্ডা! রাস্তার ধারে রৌদ্রে খাড়াইয়া চা খাইলাম। তারপর ভিড়ের মধ্যে ক-পাও হাঁটছি, পিছন থেইক্যা কে আমার হাতে কী একখান

দিলা। ঘুইর‍্যা দেখি এক পোলাপান। সে কইল, এক বাবু আমারে দিতে কইছে। তারপরই সে পলাইয়া গেল। তারে তাড়া করলে মাইনষেরা ভিড় করবে। জিগাইবে কী ব্যাপার। তাই মাথা ঠান্ডা রাখলাম। এই দ্যাখেন কী কাণ্ড!

হালদারমশাই কোটের ভিতর পকেট থেকে ভাঁজকরা একটুকরো কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল চোখ বুলিয়ে দেখার পর গম্ভীর মুখে বললেন,—ক্রমশ একটু-একটু করে ঘটনাটা স্পষ্ট হচ্ছে। রায়বাড়ির গৃহদেবীর জুয়েলস চুরি করে চোর। অথচ তা কনকপুর থেকে নিয়ে যেতে পারেনি এবং বেচতেও পারেনি।

কর্নেলের হাত থেকে প্রায় দলাপাকানো কাগজের টুকরোটা চেয়ে নিলুম। কাগজে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে :

'টিকটিকির লেজ কাটিয়া দিলেও লেজ গজাইতে পারে। মস্তক কাটিলে কী হইবে?'

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার! পঁয়তিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করেছি। আমারে কয় টিকটিকি? আইজ বেলা বারোটা পর্যন্ত বাজার এরিয়ায় এখানে-সেখানে ঘুরছি। পোলাটারে খুঁজছি। দেখা পাই নাই!

বললুম,—ভদ্রপরিবারের ছেলে, নাকি সাধারণ ঘরের?

—নাঃ! নোংরা পোশাক! পরনে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। জুতা নাই।

কর্নেল বললেন,—ঘটনাটা কি আপনার মক্কেলদের জানিয়েছেন?

—কক্ষনও না। অগো কমু ক্যান?

—ঠিক করেছেন। আর কী কথা বলতে চাইছিলেন, এবার বলুন!

হালদারমশাই সম্ভবত উত্তেজনায় নস্যি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। এবার একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—সুদর্শনবাবু বিকালে ওনাগো ক্লাবে যাইতে কইছিলেন। আমি ওনারে কইলাম, বাইরে আপনাগো লগে মেলামেশা করনের অসুবিধা আছে। উনি যাওয়ার পর আমি আবার বাজার এরিয়ায় গেলাম। পোলাটারে খুঁজছিলাম। শেষে ঠিক করলাম, আপনার লগে কনসাল্টের দরকার আছে। তারপর একটা চৌরাস্তার মোড়ে খাড়াইয়া ওয়েট করছিলাম। ক্যান কী, আপনি কইছিলেন সন্ধ্যার পর আমি য্যান গোপনে এই বাংলোয় আসি।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! এবার কথাটা কী বলুন!

গোয়েন্দপ্রবর চাপা স্বরে বললেন,—বাঁ-দিকে মোড়ের মুখে একখান দোতলা বাড়ি থেইক্যা সুরঞ্জনবাবু আর-একটা লোকেরে বারাইতে দেখলাম। ওনারা আমারে লক্ষ করেন নাই। ততক্ষণে আলো জ্বলছে। সুরঞ্জনবাবুরে দেইখ্যা মনে হইল, কিছু ঘটছে। দুইজনে সাইকেলরিকশোতে চাপলেন। কিন্তু ওনারা বাড়ির দিকে গেলেন না। উল্টাদিকে গেলেন। আমার খটকা বাধছে।

—কিছু ঘটে থাকলে রায়বাড়ি ফিরেই জানতে পারবেন! সুরঞ্জনবাবুর সঙ্গের লোকটার চেহারা, পোশাক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন?

—করছি। বয়স তিরিশ-বত্রিশের বেশি না। গোঁফ আছে। মাথায় মাফলার জড়ানো ছিল। গায়ে অ্যাশকালার ফুলহাতা সোয়েটার। পরনে মেটে রঙের টাইট প্যান্ট। জুতা লক্ষ করি নাই।

এই সময় বাংলোর দিকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসতে দেখলাম। বাংলোর গেটের কাছে আসতেই চোখে পড়ল একটা জিপগাড়ি। ভোঁদা থপথপ করে এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল। জিপগাড়িটা লন পেরিয়ে নীচে এসে থামল। কর্নেল চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, —ইঞ্জিনিয়ারসায়েবের গাড়ি। এতক্ষণে বোধহয় মেকানিকরা গাড়িটা সচল করে দিয়েছে।

একটু পরে একজন টাই-স্যুট এবং কানঢাকা টুপি পরা এক ভদ্রলোক এবং তাঁর পিছনে কেয়ারটেকার সুখরঞ্জনবাবু এগিয়ে এলেন। সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—স্যার! আমাদের ইঞ্জিনিয়ারসায়েব!

ইঞ্জিনিয়ারসায়েব নমস্কার করে কর্নেলকে বললেন—কর্নেলসায়েবের খুব কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু সরকারি গাড়ির অবস্থা কী আর বলব?

সুখরঞ্জনবাবু একটা চেয়ার এনে দিলে তিনি বসলেন। কর্নেল বললেন,—আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। আর ইনি আমার বন্ধু মিঃ কে. কে. হালদার। অবশ্য মিঃ হালদার কনকপুর রায়বাড়ির গেস্ট!

—আমি এ. কে. গোস্বামী। চিফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ কে. এল. বোস আমাকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, আপনার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু প্রথমেই অসুবিধা ঘটিয়ে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন।

—ও কিছু না। বছর তিনেক আগে ডিসেম্বরে আমি মিঃ জয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরির সঙ্গে এই বাংলোয় এসে কয়েকটা দিন ছিলুম।

আমি তখন ফরাক্কায় ছিলুম। —বলে মিঃ গোস্বামী ঘড়ি দেখলেন। —আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আর কৈফিয়ত দিতে এসেছিলুম। মিঃ বোস বলে দিয়েছেন, আপনার গাড়ির দরকার হলে যেন ব্যবস্থা করে দিই। জিপগাড়িটা আমাকে আমার কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে বাংলোয় থাকবে।

কর্নেল বললেন,—ধন্যবাদ মিঃ গোস্বামী। আমার গাড়ির দরকার হবে না। আমি জল-জঙ্গলে ঘুরতে এসেছি। আমার কিছু হবি আছে। পাখি, প্রজাপতি, অর্কিডের খোঁজে ঘুরে বেড়াই। নৌকোর ব্যবস্থা করে নেব। আমার এই কার্ডটা রাখুন!

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিলেন। মিঃ গোস্বামী কার্ডটা দেখে নিয়ে পকেটে ঢোকালেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—রোয়িং করার একটা ছোট্ট বোট আছে। তবে এখন যা অবস্থা, রোয়িং করার রিস্ক আছে। সুখরঞ্জনবাবুকে বললে নৌকোর ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি চলি কর্নেলসায়েব! ফিশারিজ কো-অপারেটিভের একটা আর্জেন্ট মিটিং শেষ করে আসছি। কো-অপারেটিভের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারিকে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিছু কাজ এখনও শেষ হয়নি।

কর্নেল বললেন,—মিঃ গোস্বামী! তা হলে একটা অনুরোধ। আমার বন্ধু মিঃ হালদারকে রায়বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিলে খুশি হব। আপনি না এলে ওঁকে কষ্ট করে হেঁটে যেতে হত।

—নিশ্চয় পৌঁছে দেব। চলুন মিঃ হালদার!

গোয়েন্দাপ্রবরের আরও কিছুক্ষণ হয়তো থাকার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এই শীতে জিপগাড়িতে ফেরার সুযোগ পেয়ে উনি খুশিই হলেন।

একটু পরে আমরা ঘরে গিয়ে বসলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের নির্দেশে এবার ভোঁদা কফির ট্রে রেখে গেল। বোঝা যাচ্ছিল কর্নেলকে তার ভালো লেগেছে। তাঁর সেবা করতে পারলে সে যেন ধন্য হয়ে যাবে।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল হালদারমশাইয়ের সেই কাগজটা টেবিলল্যাম্পের আলোতে আতশকাচ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তারপর তিনি টেবিলল্যাম্প নিভিয়ে দরজার পর্দা তুলে বাইরেটা দেখে এলেন। চেয়ারে বসে তিনি আস্তে বললেন—হালদারমশাই সুদর্শনবাবুকে কার্ডটার কথা বলেননি। আবার সুদর্শনবাবুরও কার্ডটা সম্বন্ধে মাথাব্যথা থাকলে হালদারমশাইকে

জানাতেন। এ থেকে আমার ধারণা কার্ডটা কেউ ইচ্ছে করেই সুদর্শনবাবুর ব্যাগের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

—কেন?

—প্রশ্নের আগে তুমি চিন্তা করো, কখন কার্ডটা ঢোকানো হয়েছিল? কলকাতা যাওয়ার জন্য উনি ব্যাগে মহালক্ষ্মীর ফোটো এবং কিছু জিনিসপত্র ঢুকিয়েছিলেন। তারপরই কার্ডটা ঢোকানো হয়েছিল। বাড়িতে এটা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই স্টেশনে যাওয়ার সময় বাসের ভিড়ে অথবা ট্রেনে ওঠার পর কেউ কার্ডটা ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়। তুমি লক্ষ করে থাকবে, দুদিকে বোতাম আঁটা কাপড়ের ব্যাগ। এবার তোমার প্রশ্নের একটা উত্তর দেওয়া যায়। সে জানত, সুদর্শনবাবু কোথায় যাচ্ছেন এবং কেন যাচ্ছেন। বাঁধানো ফোটো বের করলেই কার্ডটা বেরিয়ে পড়ার কথা। ওঁর হইচই বাধানোর স্বভাব। কার্ড দেখতে পেলেই উনি আমাকে দেখাতেন। লোকটা ভেবেছিল, উনি যা-ই বলুন, চন্দ্র জুয়েলার্সের কার্ড দেখলে আমার মনে ওঁর প্রতি সন্দেহ জাগবে। আমি ওঁকে অবিশ্বাস করব। তখনই ঘর থেকে বের করে দেব। নয়তো ওঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কারণ ওঁর ব্যাগ থেকে কার্ডটা ছবির সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে! আমি কার্ডটা প্রখ্যাত রত্নব্যবসায়ী চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির।

হাসি পেল কথাগুলো শুনে। বললুম,—কার্ডটা ঠিকই বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুদর্শনবাবুর দৃষ্টি তখন আপনার দিকে ছিল।

কর্নেলও হাসলেন। —সুদর্শনবাবুর অজান্তে কার্ডটা পড়ার ফলে তাঁর প্রতি আমার সন্দেহ আরও প্রবল হওয়ার কথা। কিন্তু এটাই অদ্ভুত ব্যাপার জয়ন্ত, চালাকির মাত্রাটা বেশি হলেই চালাক নিজের ফাঁদে নিজেই পড়ে। কার্ড লোকে বুকপকেটে রাখে। সুদর্শনবাবুর বুকপকেটে ভিড়ের মধ্যে কার্ডটা সে ঢুকিয়ে দিতেও পারত। তা দেয়নি। কারণ সে চেয়েছিল, কার্ডটা মহালক্ষ্মীর ফোটোর সঙ্গে থাকলে ওটা ছিটকে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য।

—তা হলে সে জানত সুদর্শনবাবুর ব্যাগে মহালক্ষ্মীর বাঁধানো ছবি আছে?

—নিশ্চয়ই জানত।

—কর্নেল! এবার বলুন ভোঁদার মুখে শোনা বাঁচুবাবুটি কে?

—তুমি সুখরঞ্জনবাবু বা ঠাকমশাইকে জিগ্যেস করোনি কেন?

—ঠিক আছে! খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করব। কাঞ্চনবাবু আপনাকে যার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয় সেই লোক।

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন,—গ্যারান্টি দিতে পারছি না।

—তার মানে ওটা আপনার ট্রাম্পকার্ড। তুরুপের তাস?

কর্নেল চোখ বুজে চেয়ারে হেলান দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে সুখরঞ্জনবাবু বললেন,—আসতে পারি স্যার?

বললুম,—আসুন সুখরঞ্জনবাবু!

—আপনারা কখন ডিনার খাবেন জানতে এলুম!

কর্নেল বললেন,—শীতের রাত্রে আপনাদের কষ্ট দেব না। নটায় খেয়ে নেব।

সুখরঞ্জনবাবু চলে যাচ্ছিলেন। বললুম,—একটা কথা সুখরঞ্জনবাবু!

—বলুন স্যার?

—তখন ভোঁদা আপনার ক্লাসফ্রেন্ড কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে কাকে দেখেছিল, তা-ই নিয়ে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছে। কর্নেল বলছেন, ভদ্রলোকের নাম বাঞ্ছাবাবু। লোকে বলে বাঞ্ছুবাবু। আমি বলছি বাচ্চুবাবু। কারটা ঠিক?

সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—কনকপুরে বাঞ্ছুবাবুও আছেন। বাচ্চুবাবুও আছেন। বাঞ্ছুবাবুর নাম বাঞ্ছারাম দত্ত। নামকরা ব্যবসায়ী। আর বাচ্চুবাবুর নাম বিশ্বনাথ সিংহ। বাচ্চুবাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। ভোঁদাকে নিয়ে প্রবলেম আছে স্যার। ও কার নাম বলছে, তা বোঝার সাধ্য কারও নেই। লোকটিকে দেখিয়ে দিলে তবে বোঝা যাবে ভোঁদা কার নাম বলছে।

—কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে দুজনের মধ্যে কার সম্পর্ক থাকতে পারে?

—কাঞ্চন বড় চাকরি করে। সায়েব সেজে থাকে, তা-ও শুনেছি। সে ওই দুজনের সঙ্গে এক রিকশোতে বসে কোথায় যাবে? ভোঁদার একটা বদভ্যাস আছে স্যার। ওর সামনে কারও কথা নিয়ে আলোচনা করলে ও বলবে, তাকে অমুক জায়গায় দেখেছে।

কর্নেল হাসলেন। —ভোঁদা দিব্যদর্শী!

আজ্ঞে স্যার! ছেলেটা এমনিতে খুব ভালো। সরল। বিশ্বাসী। শুধু একটাই দোষ। বিশ্বসুদ্ধু লোককে ও চেনে। —বলে সুখরঞ্জনবাবু হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরে বললুম, —কর্নেল! সুখরঞ্জনবাবু দুটো গুলি ছুড়ে গেলেন। টার্গেটে কোনটা বিঁধল!

কর্নেল আস্তে বললেন,—কোনওটাই টার্গেটে বেঁধেনি।...

প্রচণ্ড শীতের আরামও আছে। সকাল আটটায় আমার ঘুম ভেঙেছিল ঠাকমশাইয়ের ডাকে। তাঁর হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। ঠাকমশাই বিনীতভাবে বললেন—বড়সায়েব বলে গেছেন, আপনি বেড-টি খান।

বিছানায় বসে বেড-টি খাওয়ার মতো আনন্দ আর কীসে আসে, বিশেষ করে এমন শীতের সময়? চা নিয়ে বললুম,—বড়সায়েব কখন বেরিয়েছেন!

—আজ্ঞে সেই ছটায়। ফ্লাস্কে কফি তৈরি রেখেছিলুম। উনি ভোঁদাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন!

—সুখরঞ্জনবাবু কী করছেন?

—উনি নৌকোর ব্যবস্থা করতে গেছেন। বড়সায়েব গতরাত্রে নৌকোর কথা বলছিলেন না?

বলে বাসুদেব ঠাকুর চলে গেলেন। তারপর বাথরুমে গিয়ে দাড়ি কামিয়ে বেরুলুম। রাত-পোশাক ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট-জ্যাকেট পরে বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নীল কুয়াশা দূরে সরিয়ে রোদ নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যতদূর দেখা যায়।

ন'টা নাগাদ কর্নেল ফিরে এলেন। সঙ্গে অনুগত ভোঁদা। কর্নেল ওপরে এসে যথারীতি সম্ভাষণ করলেন,—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং বস! আশা করি আজ কোথাও আরেক রাউন্ড ফায়ার করার দরকার হয়নি?

কর্নেল হাসলেন। —ভোঁদা আজ সত্যি একটা বনমুরগি আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু তাকে নিরাশ হতে হয়েছে। ওকে বললুম, দেখছ না বেচারা রোগে ভুগে আধমরা হয়ে গেছে?

বলে তিনি ঘরে ঢুকলেন। বাথরুম সেরে তিনি শুধু প্যান্টটা বদলে নিলেন। হান্টিং বুট ব্রাশ দিয়ে সাফ করলেন। টুপি থেকে মাকড়সার জালের ছেঁড়া কিছু অংশ সাফসুতরো করে বললেন, —এখনও সুখরঞ্জনবাবু ফেরেননি। দেখা যাক। ঠাকমশাইকে বলে এলুম, দশটায় ব্রেকফাস্ট করার পর কফি খাব।

সুখরঞ্জনবাবু ফিরে এলেন প্রায় আধঘন্টা পরে। খবর দিলেন,—ছই নৌকো পাওয়া গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবে। ওই যে বাঁধের ডাইনে খাল আছে, ওই খাল বেয়ে আসবে। বড্ড বেশি দর হাঁকছিল বেচু। ষাট টাকায় রফা হয়েছে।

ব্রেকফাস্টের পর কফি খাওয়া হল। কর্নেলের কথামতো আবার ফ্লাস্কভর্তি কফির ব্যবস্থা করলেন ঠাকমশাই। লক্ষ করলুম, একটা খাবার প্যাকেটও তৈরি হয়ে আছে। ভোঁদা খালের ধারে

গিয়ে অপেক্ষা করছিল। পৌনে এগারোটায় সে থপথপ করে ভালুকের মতো হেঁটে এসে খবর দিল, নৌকো এসে গেছে।

নৌকোটা ছোট। বেচুমাঝি কর্নেলকে হাঁ করে দেখছিল। কর্নেল বললেন, —তোমার নাম বেচু?

—আজ্ঞে হুজুর!

—তোমার নৌকোয় তো হাল বা দাঁড় নেই দেখছি!

বেচু একটু হেসে বলল,—ওসবের দরকার হয় না হুজুর। এই যে লগি দেখছেন, এই যথেষ্ট। নৌকো তো ড্যামে ঢুকবে না। এই খাল দিয়ে গিয়ে ডাকিনিতলার ঝিলে পড়বে। ঝিলে তত বেশি জল নেই। তারপর আবার খাল। হুজুর কালুখালি যাবেন শুনলুম। তা আজ্ঞে, দু-ঘণ্টা তো লাগবে।

নৌকোয় ছইয়ের সামনে বসলেন কর্নেল। ভোঁদা বসল তাঁর সামনে নৌকোর ডগায়, আমি ছইয়ের মুখে বসলুম। বেচু ভোঁদাকে চেনে দেখে অবাক হইনি। সে ভোঁদাকে বলল,—এই ভোঁদারাম! তোর নীচে ফাঁক দিয়ে দ্যাখ, একখানা দা আছে। বের করে হাতে রাখ। হুজুরদের মাথায় ঝোপঝাড়ের ডাল-লতাপাতা ঠেকতে পারে। আগেই দায়ে কেটে ফেলবি।

ভোঁদা নৌকোর তলা থেকে একটা লম্বা চকচকে দা বের করে রাখল। তার মুখে হাসি।

কর্নেল মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বললেন,—কী সর্বনাশ! দেখো বাবা ভোঁদা, যেন আমার মাথায় কোপ দিয়ো না।

ভোঁদা বলল,—নাঁ ছাঁর! এ কাঁছ খুঁব পাঁরি। আঁমি নাঁ? আঁমি আঁমনার ছাঁর উলথোঁ দিঁকে বঁসে নাঁ? কোঁপ—কোঁপ মাঁরব!

নৌকোর পিছনে দাঁড়িয়ে বেচু লগি ডুবিয়ে ঠেলে দিল। তারপর কখনও ছইয়ের বাঁ-পাশ, কখনও ডানপাশ দিয়ে হেঁটে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল। একটু পরে কর্নেলকে চাপাস্বরে ইংরেজিতে বললুম—অন্য একটা কাজে এসে নিজের বাতিকে মেতে উঠলেন! হালদারমশাইয়ের জন্য আমার উদ্বেগ হচ্ছে! আপনার এই জলজঙ্গলে নৌযাত্রা কি পরে করা যেত না?

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে ইংরেজিতে বললেন,—জয়ন্ত! সব চেয়ে সেরা রহস্য প্রকৃতির ভিতরে লুকিয়ে আছে।

—কিন্তু এটা ক্লান্তিকর। একঘেয়ে!

—প্রকৃতিতে কত বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তুমি জানো না!

সেই সময় খালের ওপর ঝুঁকে পড়া ঝোপের ডালে ভোঁদা দায়ের কোপ মারতেই কী একটা পাখি উড়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার তুলে দেখে নিয়ে উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, —উডডাক! জয়ন্ত! দেখলে তো?

উডডাক দুর্লভ প্রজাতির পাখি। অবিকল হাঁসের মতো দেখতে। কিন্তু এ পাখি জলচর নয়। কর্নেলের পাল্লায় পড়ে উডডাকের কথা শুধু শুনেছি তা-ই নয়, তার পিছনে কতবার পাহাড়ি বনজঙ্গলে হন্যে হয়ে ঘুরেছি। ভোঁদা তার ভাষায় কী সব আওড়াল বুঝলুম না।

বেচু বলল,—ভাগ্যি ভালো হুজুর! এখন শীতের সময়। অন্যসময় হলে সাপের দেখাও পাওয়া যেত!

কর্নেল বললেন,—তুমি কোথায় থাকো?

—শেতলপুরে হুজুর! ওই যে বলছিলুম ডাকিনিতলার ঝিল। তার কাছাকাছি। এই খাল বেয়ে নৌকো আনা সহজ নয় আজ্ঞে! সুখরঞ্জনবাবু বললেন, কলকাতা থেকে সায়েবরা এসেছেন। তাই—অ্যাই ভোঁদা!

ভোঁদা খালে ঝুঁকে পড়া লতাপাতার একটা ঝালর কেটে ফেলল।

কর্নেল বললেন,—ওহে বেচু! তা হলে দেখছি, জঙ্গলের এই খাল বেয়ে নৌকো আনতে তোমার খুব কষ্ট হয়েছে।

বেচু হাসল,—আমার কী কষ্ট বড়হুজুর? আমি পাঁচখালি তল্লাটের লোক। কনকপুর তল্লাটের লোকে আমাদের বলে বুনো। অ্যাই ভোঁদা!

ভোঁদা দুদিক থেকে খালে ঝুঁকে পড়া ডাল-লতাপাতায় কোপ মারল। কর্নেল বললেন,—ভোঁদা তুমি এদিকে সরে এসো। আমাকে দা-খানা দাও! যা বলছি শোনো!

বেচু মজা পেয়ে হেসে উঠল। আমি বললুম,—বেচু! উনি একসময় মিলিটারিতে ছিলেন। মিলিটারি বোঝো?

—বুঝব না কেন ছোটহুজুর? পাঁচখালি থেকে বাংলাদেশের বডার তত দূরে নয়। ছোটবেলা থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে মিলিটারি দেখেছি!

কর্নেলকে দেখিয়ে বললুম,—ইনি সেই মিলিটারি অফিসার। ইনি কর্নেলসায়েব। জঙ্গলে-পাহাড়ে যুদ্ধ করে জীবন কাটিয়েছেন। জঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ করতে হলে ঝোপঝাড় কেটে এগোতে হয়। কাজেই এ কাজে ওঁর হাত পাকা।

বেচু আরও সমীহ করে বলল, —আজ্ঞে! সুখরঞ্জনবাবু যেন তা-ই বলছিলেন বটে! হ্যাঁ, হ্যাঁ। কল্লেলসায়েব!

ভোঁদা ভুতুড়ে হাসি হেসে বলল,—আঁমি দাঁনি-দাঁনি! কঁনেল সাঁয়েম!

তার 'কঁনেল সাঁয়েম' তখনই ডানধারের উঁচুগাছ থেকে ঝুলে পড়া লতার একটা বিশাল ঝালর প্রায় নিঃশব্দে কেটে ফেললেন। আমি জানি ওঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগে ভাঁজ করা ধারালো জঙ্গল-নাইফ আছে, তবে বেচুর দা তার চেয়ে সাংঘাতিক।

ওয়াটারড্যামের উঁচু বাঁধ বাঁদিকে রেখে অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর নৌকো চলল ডানদিকে। জঙ্গলের ভিতরে শীতের ঝরাপাতার স্তূপ দেখা যাচ্ছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ক্লান্তিকর যাত্রার পর বেচু বলল,—ডাকিনিতলার ঝিলের কাছে এসে পড়েছি হুজুর!

কিছুক্ষণ পরে সামনে বিশাল আকাশ চোখে পড়ল। ঝিলের গড়ন ধনুকের মতো বাঁকা। কোথাও-কোথাও ঘন কচুরিপানার ঝাঁক। কর্নেল বললেন,—এবার কফির তৃষ্ণা পেয়েছে। ভোঁদা ওই ব্যাগটা এগিয়ে দে বাবা! জয়ন্ত! তুমি ব্যাগ থেকে কাপটা বের করো। ভোঁদা কফি খেতে পারে না। ওকে আর বেচুকে বরং বিস্কুট বের করে দাও।

দূরে ধানখেত আর ধূসর গ্রাম চোখে পড়ছিল। কফি খেতে-খেতে রোদে এতক্ষণে চাঙ্গা হয়ে উঠলুম। ঝিলের জলের একধারে কোথাও জাল পাতা আছে। ডাইনে উঁচু জমির উপর মাঝে-মাঝে কয়েকঘর করে বসতি দেখা যাচ্ছিল। ঝিলের ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটিয়ে স্নান করছিল। আমাদের দেখে—অবশ্য কর্নেলকে দেখেই বলা উচিত, নিস্পন্দ পুতুল হয়ে যাচ্ছিল।

তারপর আবার একটা কচুরিপানাভরা খালে নৌকো ঢুকল। কর্নেল বাইনোকুলারে একটা গাছের ডালে সারসের ঝাঁক দেখার পর দ্রুত ক্যামেরার টেলিলেন্স ফিট করে ফেললেন। তারপর কয়েকটা ছবি তুললেন। ঘাটে বাঁধা ছোট-ছোট নৌকো কোথাও। বিদেশি ছবিতে দেখা অবিকল ক্যানো। সেই ক্যানো বেয়ে চলেছে কোনও মেয়ে। কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলুম,—এখানে ক্যানো দেখছি! আশ্চর্য তো!

কর্নেল মিটিমিটি হাসলেন শুধু। বেচু বলল, —হুজুর! ওগুলোকে বলে ডোঙ্গা। তালগাছের গুঁড়ি খোদাই করে তৈরি।

আবার একটা খালে নৌকো ঢুকল। দুধারে ঘন জঙ্গল। কর্নেল বললেন,—বেচু! কালুখালি আর কতদূর?

বেচু বলল,—এসে গেছি বড়হুজুর। এই খাল থেকেই কালুখালি গ্রাম। সামনে যে বাঁক দেখছেন, তার মুখেই ডাইনে-বাঁয়ে দুটো বসতি।

—তুমি দশরথকে চেনো?

কথাটা শুনেই চমকে উঠলুম। বেচু বলল,—খুব চিনি বড়হুজুর। দশরথ কেন যে এখানে পড়ে আছে কে জানে? ওর হাতের বেতের কাজ কলকাতা অব্দি একসময় চালান যেত। কনকপুরের দত্তবাবুরা ওকে দিয়ে নৌকোবোঝাই মাল নিয়ে যেতেন। তা হুজুর, দশরথের অবিশ্যি দোষ নেইকো। বুড়ো হয়ে গেল। এ তল্লাটে বেতের জঙ্গলও কমে এল। বড়জোর ধামা, চুপড়ি এইসব জিনিস তৈরি করে ওরা কনকপুরে চৈত-সংক্রান্তির গাজনের মেলায় বেচতে যায়। এ সব জিনিস সরু বেতে তৈরি হয়। আগে দশরথরা তৈরি করত মোটা বেতের চেয়ার-টেবিল। এখন অমন বেত খুঁজে পাওয়াই কঠিন।

বাঁকের মুখে গিয়ে ডানদিকের ঘাটে নৌকো রাখল বেচু। একটা গাছের গুঁড়িতে দড়ি দিয়ে নৌকোর ডগার দিকটা বেঁধে দিল। কর্নেল একলাফে নেমে গিয়ে বললেন,—ভোঁদা! ব্যাগটা নিয়ে এসো।

নৌকোর ডগা টলমল করছিল। বেচু তার বাঁশের লগি আমাকে ধরতে বলল। টাল সামলে নেমে গেলুম। কর্নেল বললেন, —বেচু! তুমি তোমার নৌকোয় বসে থাকো। আমরা বেশি দেরি করব না।

ঘড়ি দেখলুম। একটা বেজে গেছে। ঢালু পাড় বেয়ে উপরে উঠে দেখি, একদল নানাবয়সি নর-নারী, কাচ্চা-বাচ্চা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল একজনকে বললেন,—দশরথ কোথায়?

অবাকচোখে কর্নেলকে সবাই দেখছিল। যে লোকটাকে কর্নেল দশরথের কথা জিজ্ঞেস করলেন, সে শুধু আঙুল তুলে একটা কুঁড়েঘরের সামনে একটা গাছের তলায় বাঁশের মাচানে বসে থাকা এক বৃদ্ধকে দেখাল।

আমরা তার কাছে যেতেই সে চোখ তুলে তাকাল। কর্নেল বললেন, —তুমি দশরথ?

দশরথের পরনে খাটো ধুতি। খালি গা। মোটাসোটা মানুষ। সে বলল,—কে বলছেন আজ্ঞে? চোখে ভালো দেখতে পাইনে।

সেই লোকটা বলল,—দুই সায়েব তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন দাশুখুড়ো!

কর্নেল বললেন,—কলকাতা থেকে এসেছি!

দশরথ মাচা থেকে নেমে ঝুঁকে প্রণাম করে বলল,—আমার সৌভাগ্য সার! ও রঘু! সারদের বসতে দে। মাদুরখানা এনে মাচানে পেতে দে শিগগির!

কর্নেল দশরথের কাঁধে হাত রেখে বললেন,—তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না দশরথ! আমি বসব না। শোনো! আমার এক বন্ধুর হাতে তোমার তৈরি ছড়ি দেখেছিলুম। সেই ছড়ি দেখে আমার খুব লোভ হয়েছে। বুঝলে? মোটা বেতের ছড়ি। মাথার দিকটা ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো। কালো রঙের বাঁট। বাঁটটা ঘোরালে খুলে যায়। কনকপুরের জমিদারবাড়ির সুদর্শনবাবুকে তুমি ওইরকম একটা ছড়ি তৈরি করে দিয়েছিলে। তাই না?

—আজ্ঞে সার! বুঝেছি! তবে ওরকম বেত খুঁজে পাওয়া আজকাল কঠিন!

—তোমাকে আমি অগ্রিম পুরো টাকাই দিয়ে যাব। বলো, কত টাকা দিতে হবে!

দশরথ হাসবার চেষ্টা করে বলল, —কথা দিয়ে যদি কথা রাখতে না পারি সার?

—তুমি পারবে। ওইরকম বেত খুঁজতে হলে তুমি এ বয়সে একা তো পারবে না।

—আজ্ঞে! আমার নাতি কানু এসব খোঁজখবর রাখে!

—তাকে বখশিস দেব। কোথায় সে?

একজন লোক বলল,—কানু আমার ছেলে সার। উনি আমার বাবা। কানু বেত কাটতেই গেছে। আমাদের সার বেত নিয়েই কাজ। দলবেঁধে ওরা জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। খুব কষ্টের কাজ।

কর্নেল আমাকে অবাক করে দশরথের হাতে একটা একশোটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন,—একশোটাকা রাখো। ছড়ি তৈরি হলে তোমার নাতিকে দিয়ে ইরিগেশন বাংলোর সুখরঞ্জনবাবুকে পৌঁছে দিয়ো। উনি আমাকে কলকাতায় ছড়িটা পৌঁছে দেবেন। ইরিগেশন বাংলো তুমি নিশ্চয় চেনো?

দশরথকে চঞ্চল দেখাচ্ছিল। সে বলল,—চিনি বইকি সার! তবে আগাম টাকা—

কর্নেল তাকে বাধা দিয়ে বললেন,—টাকা নিয়ে ভেবো না। শুনেছি তুমি কমাস আগে কনকপুরের এক ভদ্রলোককেও ওইরকম ছড়ি তৈরি করে দিয়েছ?

দশরথ হাসল। —আজ্ঞে সার! দিয়েছি বটে। অনেক খুঁজে মোটা বেতখানা পেয়েছিলুম।

—কী যেন নাম ভদ্রলোকের?

—দত্তবাবু। বাঞ্ছারাম দত্ত। দশ-বারো বছর আগে ওনাকে মোটা বেতের চেয়ার-টেবিল তৈরি করে দিতুম। নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যেতেন। কলকাতায় চালান দিতেন।...

সেচবাংলোয় ফিরতে বিকেল চারটে বেজে গিয়েছিল। সুখরঞ্জনবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—দশরথের সঙ্গে দেখা হল স্যার? কী বলল?

কর্নেল বললেন,—অ্যাডভান্স দিয়ে এসেছি। ছড়ি তৈরি হলে আপনার কাছে পৌঁছে দেবে। আপনি যখন সময় পাবেন, কলকাতা গেলে আমাকে দিয়ে আসবেন।

আমি বলেছিলুম,—লোকটা এখনও গরিব থেকে গেছে কেন, বোঝা গেল না!

সুখরঞ্জনবাবু বলেছিলেন,—বন্যা স্যার! দু-একটা বছর অন্তর বন্যা! বন্যায় ওদের ঘর-সংসারের সবকিছু ভেসে যায়। তবু ওখানে না থেকেও ওদের উপায় নেই। শুধু বেত নয়, ওই এলাকায় বাঁশঝাড়ও প্রচুর। বাঁশ থেকেও ওরা কতরকম জিনিস তৈরি করে। বাঁশ অবশ্য কিনতে হয়। বেত কিনতে হয় না। তবে স্যার বলতে নেই—এই ওয়াটারড্যাম করেই বন্যা বেড়ে গেছে। বেশি বৃষ্টি হলেই জল ছেড়ে দেওয়ার অর্ডার আসে। হিতে বিপরীত হয়েছে। তা স্যার, আপনাদের খাওয়াদাওয়া?

কর্নেল বলেছিলেন,—ডাকিনিতলার ঝিলের ধারে নৌকো বেঁধে লুচি-আলুরদমের শ্রাদ্ধ করেছি। বেচু অবশ্য কাছেই তার বাড়িতে খেতে গিয়েছিল।

সুখরঞ্জনবাবু পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, চাপাগলায় বলেছিলেন,—দুপুরে কনকপুর বাজারে গিয়েছিলুম। রানিপুরের একজন চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর কাছেই একটা সাংঘাতিক কথা শুনলুম স্যার!

—সাংঘাতিক কথা মানে?

—কাঞ্চনকে কলকাতায় কারা নাকি মার্ডার করেছে। আজ সকালে ওর দাদা প্রাণকান্তবাবুর কাছে খবর এসেছিল। উনি খবর পেয়েই কলকাতা গেছেন।

—বলেন কী? কাঞ্চনবাবুর সঙ্গে আমার তত বেশি চেনাজানা ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক খুন হয়ে গেলেন! আশ্চর্য তো!

—স্যার! আমিও খুব অবাক হয়েছি। খারাপ লাগছে। আফটার অল একসময় আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। একটু চাপা স্বভাবের ছেলে ছিল। তবে ওকে ব্যাড বয়দের দলে ফেলা যেত না।

—যাকগে! আমরা ক্লান্ত। ঠাকমশাইকে কফির তাগিদ দিন! হ্যাঁ—একটা কথা শুনে যান। আপনাদের ভোঁদার কানে যেন ওই খারাপ খবরটা না পৌঁছয়।

—আমার মাথাখারাপ স্যার? ভোঁদা বলছিল, কদিন আগে নাকি তাকে কার সঙ্গে কনকপুর বাজারে দেখেছে! ভোঁদার স্বভাব বড্ড বাজে। পুলিশের কানে গেলে ওকে লক-আপে ঝোলাবে না?

—ঠাকমশাই রানিপুরের লোক। তাঁকে বলেছেন নিশ্চয়?

—বলেছি। উনিও অবাক।

—উনি ভোঁদার কানে খবরটা তুলবেন না তো?

সুরঞ্জনবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—আমি অলরেডি ঠাকমশাইকে সাবধান করে দিয়েছি।

—বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছেন।

সুখরঞ্জনবাবু চলে গিয়েছিলেন। আমি বাথরুমে ঢুকে গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলুম। কিছুক্ষণ পরে বারান্দা থেকে কর্নেল ডাকলেন,—জয়ন্ত! কফি! নার্ভ চাঙ্গা করে নাও।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম,—প্রশ্নটা করার সুযোগ পাইনি। হঠাৎ আপনার মাথায় বেতের ছড়ির বাতিক চাগিয়ে উঠল কেন? আপনার ঘরে অনেক সুন্দর ছড়ি দেখেছি। একটাও ব্যবহার করতে আজ পর্যন্ত দেখিনি। সুদর্শনবাবুর ছড়িটা নেহাত ছড়ি।

—কুটিরশিল্পের সৌন্দর্য তুমি বুঝবে না জয়ন্ত! তাই ও নিয়ে কোনো কথা নয়! কফি খেয়ে তৈরি হয়ে নাও। বেরুব।

—সর্বনাশ! আবার কোথায় যাবেন?

—কনকপুর!

—পায়ে হেঁটে!

—পায়ে হেঁটে। নৌকোয় পাঁচ-ছঘণ্টা বসে পায়ে বাত ধরে গেছে। পেশি সচল করা দরকার।

—কিন্তু এখনই তো সন্ধ্যা হয়ে এল!

—তাতে কী? কনকপুর পর্যন্ত দুধারে লাইটপোস্ট আছে। ওই দেখো, আলো জ্বলে উঠল।

—কাল সন্ধ্যায় এই আলোগুলো জ্বলতে দেখিনি!

বোধহয় বিদ্যুতের যে ফেস থেকে এই রাস্তার আলো জ্বলে, সেটা খারাপ ছিল। যাই হোক, আলো নিয়ে আলোচনায় লাভ নেই। —কর্নেল হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরে গিয়ে বললেন,—টর্চ নেবে। লোডেড ফায়ার আর্মস সঙ্গে নেবে।

ভিতরে গিয়ে বললুম,—আপনার সেই বনমুরগি বাঁদিকের বন থেকে সাড়া দেবে না তো?

কর্নেল হাসলেন! —কাল এসেই বাইনোকুলারে দেখে হিসেব করে নিয়েছি। কনকপুরগামী পিচরাস্তা থেকে বাঁদিকের জঙ্গলের দূরত্ব অন্তত একশো মিটারের বেশি। ডানদিকে অনেকদূর অবধি ধানক্ষেত। তারপর কনকপুরের আগে ডানদিকে বিদ্যুতের সাবস্টেশন। আলোয়-আলোয় ছয়লাপ। তার চেয়ে বড় কথা, চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেন খুন হয়ে যাওয়ার খবর ইতিমধ্যে রটে গেছে। আর কিছু বলার দরকার আছে কি?

—নাঃ! আমাদের প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে গেছে।...

ভোঁদা আমাদের সঙ্গী হতে চেয়েছিল। সুখরঞ্জনবাবুও বলেছিলেন,—ওকে নিয়ে যান স্যার। যেখানে যেতে চান, ও সেখানে পৌঁছে দেবে। রিকশোওয়ালারা কাছের জায়গাকে দূর বানিয়ে ছাড়বে।

কর্নেল বললেন,—কনকপুর আমার চেনা জায়গা। ভোঁদাকে দরকার হবে না।

প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা একেবারে জনহীন। বিদ্যুতের সাবস্টেশন পেরিয়ে গিয়ে বাঁদিকে খেলার মাঠ। ক্রিকেট ব্যাট হাতে একদল ছেলে তখনও দাঁড়িয়ে কী নিয়ে তর্কাতর্কি করছে। ডাইনে দোতলা বাড়িটার শীর্ষে আলো জ্বলছিল দেখলুম, বড়-বড় হরফে লেখা আছে 'ফণিভূষণ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।'

একটু পরে মানুষজন আর সাইকেলরিকশোর আনাগোনা দেখা গেল। একটা সাইকেলরিকশো দাঁড় করিয়ে কর্নেল বললেন,—থানায় যাব।

রিকশোওয়ালা বলল,—দশ টাকা লাগবে সার!

কর্নেল উঠে বসলেন। তাঁর তাগড়াই গড়নের জন্য পুরো গদিটাই দরকার ছিল। ঠাসাঠাসি চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে বসলুম। কর্নেল রিকশোর হুড তুলে দিলেন। বসতি এলাকার বড় রাস্তায় এই শীতসন্ধ্যাতেও যানবাহন আর মানুষের ভিড়। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ছোট রাস্তায় একটার পর একটা বাঁক নিতে-নিতে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে ঘন বসতি নেই। গাছপালার ফাঁকে বাড়িগুলোকে দেখে সরকারি অফিসের কোয়ার্টার মনে হচ্ছিল। তারপর একটা চওড়া রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে রিকশো থামল। রিকশোওয়ালা বলল,—এসে গেছি সার!

ডাকদিকে থানার গেট। গেটে বেয়নেট লাগানো বন্দুক হাতে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে ছিল। আগে কর্নেল, তারপর আমি নামলুম। রিকশোওয়ালা টাকা পেয়ে সেলাম ঠুকে বলল,—সায়েবদের দেরি না হলে আমি এখানে অপেক্ষা করব। বলুন সার!

কর্নেল বললেন,—তুমি চলে যাও। আমাদের অনেক দেরি হবে।

রিকশোওয়ালা রিকশো ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। কয়েকধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজায় পৌঁছে কর্নেল বেঞ্চে বসে থাকা একজন কনস্টেবলকে বললেন,—ও. সি. মিঃ ভাদুড়ির সঙ্গে দেখা করতে চাই।

কনস্টেবল তর্জনী তুলে কোনার একটি ঘর দেখিয়ে দিল। সেই ঘরের দরজার পর্দা তুলে কর্নেল বললেন,—আসতে পারি? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—আপনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার? আসুন! আসুন স্যার!

কর্নেলের সঙ্গে ভিতরে ঢুকলুম। কর্নেল তাঁর নেমকার্ড এগিয়ে দিলেন। টেবিলের ওধারে একজন মধ্যবয়সি উর্দিপরা অফিসার কার্ডটি দেখার পর উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কর্নেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন। সামনের চেয়ারে একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা স্থূলকায় ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর গায়ে শাল এবং মাথায় মাফলার জড়ানো। তিনি কর্নেলকে দেখছিলেন। কর্নেল বললেন,—পরিচয় করিয়ে দিই। আমার তরুণ বন্ধু সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি আমার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন,—আপনারা বসুন প্লিজ! তারপর সেই ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে তিনি বললেন,—ঠিক আছে অমলবাবু! আমি দেখব কী করা যায়। আপনি কাল বেলা এগারোটার পর একবার টেলিফোন করবেন। আসবার দরকার নেই। নমস্কার।

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন। তাঁর কাছাকাছি বাঁদিকের চেয়ারে একজন পুলিশ অফিসার ফাইল হাতে বসেছিলেন। মিঃ ভাদুড়ি বললেন, —রমেনবাবু! স্বনামধন্য কর্নেলসায়েবের কথা আপনাকে বলেছি। আপনি গেস্টদের পথ্য কফি আর স্ন্যাকসের ব্যবস্থা করুন। ফাইল রেখে যান।

রমেনবাবু তখনই উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে কর্নেলকে তারপর আমাকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। তারপর মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—পুলিশ সুপারের মেসেজ পেয়েছি আজ দুপুরে। বিকেলে ভাবছিলুম, ইরিগেশন বাংলোয় আপনার সঙ্গে দেখা করে আসব। আসলে আমার ব্যক্তিগত কৌতূহল। ও. সি. হাসলেন। —আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছিলুম আমার এক কলিগের কাছে। তিনি আই. বি.-তে ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—গুজবে কান দেবেন না। তো প্রথমেই একটা কথা জেনে নিই। কলকাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ কে. কে. হালদার এসেছেন। উনি কি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন?

—হ্যাঁ স্যার! আজ দুপুরে এসেছিলেন উনি। ওঁকে প্রয়োজনে সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছি। উনি তো একেবারে ঘটনাস্থলে গেস্ট হয়ে আছেন। ওঁকে সাবধানে থাকতে বলেছি। উনি একটা লোকের চেহারা আর পোশাকের বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের সোর্সকে বলেছি, তাকে শনাক্ত করবে।

—আর-একটা কথা। আপনার এরিয়ায় রানিপুর গ্রামের এক ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরি করতেন। কলকাতায় তাঁর ঘরেই কেউ তাঁকে গত পরশু রবিবার সন্ধ্যায় মার্ডার করেছে।

মিঃ ভাদুড়ি আস্তে বললেন,—হ্যাঁ স্যার। ডি. আই. জি. সায়েবের মাধ্যমে একটা কেস ফাইল হয়েছিল। পুলিশ সুপার ফাইলটা আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

—কাঞ্চন সেন সম্পর্কে?

ও. সি. একটু হেসে বললেন,—আপনি সম্ভবত আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন স্যার!

—জানি না। শুধু জানতে চাইছি, কাঞ্চনবাবু সম্পর্কে খোঁজখবর আপনারা নিয়েছেন কি না।

—কাঞ্চনবাবু ক'দিন আগে কনকপুর এসেছিলেন। আমাদের সোর্স থেকে এ খবর পেয়েছি।

এই সময় একজন কনস্টেবল ও সেই পুলিশ অফিসার ট্রেতে কফি আর পটাটোচিপস, চানাচুর নিয়ে এলেন। ও. সি. বললেন,—রমেনবাবু! আমরা কিছু কনফিডেনশিয়াল কথা সেরে নিই। কেমন?

রমেনবাবু ও কনস্টেবলটি তখনই বেরিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে কর্নেল বললেন, —আমার ধারণা, মিঃ হালদার যে লোকটির পরিচয় জানতে চেয়েছেন, রায়বাড়িতে তার অবাধ গতিবিধি আছে। তা ছাড়া, লোকটা সম্ভবত স্থানীয় ব্যবসায়ী বাঞ্ছারাম দত্তের কর্মচারী। আমার ধারণার ভিত্তি আছে মিঃ ভাদুড়ি।

মিঃ ভাদুড়ি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আস্তে বললেন,—আই সি!

—আরও বলছি। সে রবিবার সকালের ট্রেনে কলকাতা গিয়েছিল। সেদিন সে কলকাতায় ছিল। সন্ধ্যায় কাঞ্চন সেনকে খুন করে সে সেই রাত্রে কনকপুরে ফিরে এসেছিল। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, আমি তাকে দেখেছি।

—মাই গুডনেস! কোথায় দেখেছেন তাকে?

—গতকাল বিকেলে ইরিগেশন বাংলো থেকে ওয়াটারড্যামের বাঁধের পথে আমি যাচ্ছিলুম। আমার সঙ্গে বাংলোর ভোঁদা নামে একটি ছেলে ছিল। লোকটা আমাকে গুলি করে মারার জন্য ডানদিকের ঢালু জমিতে ঝোপের আড়ালে বসে পড়ার আগেই তাকে আমি দেখে ফেলেছিলুম। আমার সামরিক জীবনের অভ্যাস মিঃ ভাদুড়ি! বিশেষ করে বনজঙ্গলে চলার সময় আমি ১৮০ ডিগ্রি বরাবর নজর রাখি।

—তারপর?

—সে তৈরি হওয়ার আগেই আমার লাইসেন্সড সিক্সরাউন্ডার রিভলভার থেকে ঝোপের গোড়ায় এক রাউন্ড ফায়ার করেছিলুম। অমনই সে গুঁড়ি মেরে ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়ে যায়। বাইনোকুলারে একটু পরে তাকে জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে দেখি। ভোঁদা একটু বোকাসোকা। তাকে বলেছিলুম, বনমুরগি মারতে গুলি করলুম। বনমুরগিটা পালিয়ে গেল।

—ও মাই গড! কর্নেলসায়েব! শয়তানটা কে আমি তা বুঝতে পেরেছি। আজ রাতেই তাকে লক-আপে ঢোকাব। আপনি প্লিজ ঘটনাটা উল্লেখ করে একটা ডায়রি করুন। কারণ তার গার্জেন প্রভাবশালী লোক।

—করছি। এবার বলুন, রায়বাড়ির গৃহদেবীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস চুরির কেসে কি এগোতে পারছেন না?

—সমস্যা হল, প্রাথমিক তদন্তের পর মনে হয়েছিল ওঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যে-কোনো একজন চুরি করে জুয়েলস বিক্রি করে দিয়েছেন। দুই ভাইকে জেরা করা হয়েছে প্রথমে পৃথক-পৃথকভাবে। পরে দুজনকে একসঙ্গে পাশাপাশি বসিয়ে জেরা করা হয়েছে। এতটুকু সন্দেহজনক কথার আভাস মেলেনি। দ্বিতীয় দফায় ওঁদের কাজের লোক গোবিন্দ ও হরিপদকে সরাসরি অ্যারেস্ট করেছিলুম। কিন্তু তাদের কাছেও কোনো সন্দেহজনক সূত্র পাইনি। অগত্যা আপাতত জামিনে ছেড়ে দিয়েছি। তবে একটা ক্ষীণ সূত্র ওঁদের কাজের মেয়ে শৈলবালার কাছে পেয়েছিলুম। বছর তিনেক আগের কথা। সন্ধ্যা থেকেই লোডশেডিং ছিল। সুদর্শনবাবুর ঘরের তালা সেই সুযোগে কেউ ভাঙছিল। শৈলবালা নাকি চাপা শব্দটা শুনেই উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চুপি-চুপি উঠে যাচ্ছিল। সিঁড়িতে কেউ তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়।

—কিন্তু তারপরও তো মহালক্ষ্মীর জুয়েলস চুরি যায়নি।

—যায়নি। তবে শৈলবালার সন্দেহ, সে-ই পরে জুয়েলস চুরি করেছে।

—লোকটাকে কি শৈলবালা চিনতে পেরেছিল?

—আবছা আঁধারে লোকটাকে চেনা মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সাহস করে কাউকে বলতে পারেনি। যদি সত্যিই সেই লোকটা না হয়?

মিঃ ভাদুড়ি হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আপনাদের কি সে বলেছে, কোন লোকটার কথা সে ভেবেছিল?

মিঃ ভাদুড়ি আরও হাসলেন। তারপর বললেন,—শৈলবালা ভেবেছিল সুদর্শনবাবুই তাকে সিঁড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যুৎ আসার পর তিনিই নাকি বাড়ি ফিরে এসে হইচই বাধান!

কর্নেলও হাসলেন। —নিজেই নিজের ঘরের তালা কেন ভেঙেছিলেন সুদর্শনবাবু, এ বিষয়ে শৈলবালার কী ধারণা?

—আপনাকে বলেছি, শৈলবালার সন্দেহ অনুসারে সুদর্শনবাবুই চোর। জেরার পর শৈলবালা বলেছে, আগে থেকে নিজেকে—শৈলবালার ভাষায় 'নিদুষি'—অর্থাৎ নির্দোষ সাব্যস্ত করে রাখার মতলবে কাজটা তাদের ছোটবাবু করে থাকতে পারেন।

—ছোটবাবু, মানে সুদর্শনবাবু?

—হ্যাঁ। শৈলবালার কথার অর্থ দাঁড়ায় : এভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে রেখেছিলেন ছোটবাবু! পয়েন্টটা অবশ্য উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হুঁ! যায় না। —কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন।—এর সঙ্গে কাঞ্চন সেনের সম্প্রতি কনকপুরে আসার ব্যাপারটা জুড়ে দিলে একটা কেস দাঁড় করানো যায়!

মিঃ ভাদুড়ি আস্তে বললেন,—আপনি কাঞ্চন সেনের ব্যাকগ্রাউন্ড জেনে এসেছেন বলে আমার ধারণা। ভদ্রলোক কলকাতার এক বিখ্যাত জুয়েলারি কোম্পানিতে চাকরি করতেন।

—চন্দ্র জুয়েলার্স কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন। চোরাই জুয়েলস কেনা-বেচার যোগসূত্র এই এজেন্টরা। মিঃ ভাদুড়ি! কাঞ্চন সেন এখানে এসে রায়বাড়িতে ওঠেননি, এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

—আপনি সিওর?

—হ্যাঁ, আমার হাতে তথ্য আছে, কাঞ্চন সেন গত শুক্রবার এসে সেদিনই কলকাতা ফিরে যান। তারপর আবার শনিবার এখানে আসেন এবং সেদিনই কলকাতা ফিরে যান। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁকে মার্ডার করা হয়। আগেই বলেছি, তাঁর চেনা লোক তাঁকে মার্ডার করেছে।

—খুনিকে আজ রাত্রেই ধরে ফেলব।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—অবশ্য যদি সে কনকপুরে থাকে!

—দেখা যাক।

—কাঞ্চন সেনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমার একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। আমি অনুশোচনায় ভুগছি মিঃ ভাদুড়ি! সেই কারণে তার খুনি শিগগির ধরা পড়ুক, এটা আমি চাই। হাতের কার্ড আমি নাকি পুলিশকে দেখাই না বলে পুলিশমহলে একটা ধারণা আছে। আমি আপনাকে অন্তত এ ব্যাপারে আমার হাতের কার্ড দেখাতে চাই।

মিঃ ভাদুড়িকে বিস্মিত লক্ষ করছিলুম। আমিও বিস্মিত। কারণ কর্নেলের মধ্যে এমন ভাবাবেগ আমি কখনও দেখিনি। মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—বলুন স্যার! আমার পক্ষ থেকে যতটা করা সম্ভব আমি করব।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে কাঞ্চন সেনের সেই কার্ডটা মিঃ ভাদুড়িকে দেখতে দিলেন। তারপর তিনি কার্ডটা ফেরত নিয়ে গত রবিবার বিকেলে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে কাঞ্চন সেনের কার্ড ফেরত নিতে আসার ঘটনা সবটাই বললেন। কিন্তু কার্ডটা কীভাবে তাঁর হাতে এসেছিল, সেই অংশটা চেপে গেলেন। —মিঃ ভাদুড়ি! কাঞ্চন সেন আমাকে যে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন, তা এখনই আপনাকে জানাচ্ছি না। আমার বিশ্বাস, এই নাম-ঠিকানা আপনারা নিজেরাই পেয়ে যাবেন। কাঞ্চন সেনের খুনি নিশ্চয় আমার বাড়ি পর্যন্ত গোপনে তাঁকে ফলো করে গিয়েছিল। তারপর সে কাঞ্চন সেনের ঘরে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ছলে যায়। আমার পরিচয় খুনি তার মালিকের কাছে আগেই পেয়েছিল।

—আপনি সিওর হলেন কী করে?

—যথাসময়ে জানতে পারবেন। এরপর খুনি কাঞ্চন সেনের কাছে যায়। কার্ড হারিয়ে চাকরি যাওয়ার আশঙ্কায় কাঞ্চন সেনের মানসিক অবস্থা সুস্থ থাকার কথা নয়। আমার ধারণা, খুনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। কারণ কনকপুর হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন কাঞ্চনবাবু। এমন হতেই পারে, কথায়-কথায় তিনি খুনিকে জানিয়েছিলেন, কার্ড আমার কাছে আছে। তা ফেরত পাওয়ার শর্তও মুখ ফসকে তিনি বলে ফেলেছিলেন। কাজেই মালিকের নির্দেশমতো খুনি চিরকালের জন্য তাঁর মুখ বন্ধ করে দেয়। তারপর—

মিঃ ভাদুড়ি কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—তারপর সে চিরকালের জন্য আপনার মুখও বন্ধ করার জন্য ওয়াটারড্যামের কাছে জঙ্গলে ওত পেতে বসে ছিল।

ঠিক তা-ই। —বলে কর্নেল ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। —একটা কথা। রায়বাড়ির দুই ভাই কে কোথায় চাবি লুকিয়ে রেখেছিলেন, তা জিজ্ঞেস করেছিলেন কি?

ও. সি. মিঃ ভাদুড়িও উঠে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন, —হ্যাঁ। তবে ওঁরা একে অন্যকে লুকিয়ে গোপনে আমাকে জানিয়েছেন! দেখিয়েছেনও।

কর্নেল হাসলেন। —বড়বাবু পুরোনো শাস্ত্রীয় বৃহৎ পঞ্জিকার ভিতরে গর্ত কেটে আর ছোটবাবু তাঁর ছড়ির ভিতরে চাবি লুকিয়ে রাখতেন।

—আমি আপনার কথায় অবাক হচ্ছি না স্যার! শুনেছি, পিছনেও আপনার একটা চোখ আছে।

—নাঃ। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার আমার সোর্স, মিঃ ভাদুড়ি!

মিঃ ভাদুড়ি চেয়ার থেকে উঠে এলেন। —আপনারা এখন কি সেচ-বাংলোয় ফিরে যাবেন?

—হ্যাঁ। দেখি, কোনো রিকশোওয়ালাকে রাজি করাতে পারি নাকি!

—ওদের তো একটা জিপগাড়ি আছে! আপনি বললেই নিশ্চয় পেতেন।

—ইঞ্জিনিয়ার মিঃ গোস্বামী গাড়িটা দিতে চেয়েছিলেন। আমি নিইনি।

—ঠিক আছে। রমেনবাবুকে বলছি, আমাদের গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। শীতের রাত্রে ইরিগেশন বাংলোতে যেতে কোনো রিকশোওয়ালাই রাজি হবে বলে মনে হয় না।

পা বাড়িয়ে হঠাৎ কর্নেল ঘুরে দাঁড়ালেন। আস্তে বললেন,—কাল সকাল দশটা থেকে তৈরি থাকবেন। যে-কোনো সময় আপনার সদলবলে রায়বাড়ি যাওয়ার দরকার হতে পারে।

মিঃ ভাদুড়ি হাসলেন। —আবার বলছি, অবাক হচ্ছি না স্যার! পুলিশ সুপার মিঃ রাজেশ কুমার আমাকে প্রায় হুমকি দিয়ে রেখেছেন, আপনার কাছে যা-কিছুই শুনি, যেন মাথা ঠিক রাখি। মাই গুডনেস! এক মিনিট স্যার! আপনাকে একটা ডায়রি করতে বলেছিলুম। ভুলে গেছি। স্বার্থটা আমারই। একটা আইনগত ভিত্তি থাকা দরকার।

তিনি টেবিলের কাছে গিয়ে একটা প্যাড টেনে নিলেন। —আপনি সংক্ষেপে চিঠির মতো করে ঘটনাটা লিখে দিয়ে সই করুন। আমাকে অ্যাড্রেস করে লিখবেন। ততক্ষণে আমি রমেনবাবুকে জিপের ব্যবস্থা করতে বলি।...

সেচবাংলোয় ফিরে গিয়ে দেখি, হালদারমশাই নীচের ঘরে সোফায় বসে আছেন। পাশে একটা মাঝারি সাইজের ব্যাগ। আমাদের দেখে তিনি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—ওপরে চলেন কর্নেলস্যার। সব কইতাছি।

দোতলায় আমাদের ঘরে ঢুকে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, —সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দুই ভাইয়ে কী লইয়া ঝগড়া বাধছিল। আমি থামাইতে গেছলাম। দুইজনেই আমারে কইলেন, ওনাগো ডিটেকটিভের দরকার নাই। আমিই নাকি ওনাগোর মইধ্যে গণ্ডগোল বাধাইতে আইছি। কর্নেলস্যার! আমারে অকারণে দুইজনে ইনসাল্ট করল। হেভি মিস্ট্রি!...

হালদারমশাইয়ের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আমাদের পাশের ঘরে। সকাল আটটায় বাসুদেব ঠাকুর বেড-টি এনে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—বড়সায়েব আর হালদারসায়েব ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছেন। ভোঁদাকে সঙ্গে নেননি বলে বেচারা মনমরা হয়ে বসে আছে।

ঠাকমশাই হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বেড-টি খেতে-খেতে মনে পড়েছিল গত রাত্রে কর্নেল ও. সি. মিঃ ভাদুড়িকে আজ সকাল দশটা থেকে তৈরি থাকতে বলেছেন। যে-কোনো সময়ে তাঁকে সদলবলে রায়বাড়ি যেতে হতে পারে। তা হলে কি আজ হালদারমশাই-কথিত 'হেভি মিস্ট্রি'-র পর্দা তুলবেন কর্নেল?

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম। বাথরুম সেরে সেজেগুজে বারান্দায় গিয়ে বসেছিলুম। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ও গোয়েন্দাপ্রবরকে গেটে ঢুকতে দেখলুম। ওপরে এসে কর্নেল অভ্যাসমতো সম্ভাষণ করলেন, —মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললুম,—মর্নিং কর্নেল! হাড়কাঁপানো শীতের ভোরে হালদারমশাইকে ওয়াটারড্যামের হিম খাইয়ে জব্দ করেছেন। তাই না হালদারমশাই?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—আমাদের জব্দ করে কেডা? পঁয়তিরিশ বৎসরের পুলিশ-লাইফে অনেক ড্যাঞ্জারাস হিম খাইছি।

তিনি আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। কর্নেল ঘরে ঢুকে গেলেন। বললুম,—প্রাতঃকৃত্য করবেন না?

—প্রাতঃকৃত্য কইরাই বাইরাইছিলাম।

চুপি-চুপি বললুম,—কর্নেল বলেননি, আজ দশটায় রায় বাড়ি যাবেন?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসিমুখে বললেন,—ওয়েট অ্যান্ড সি।

একটু পরে ভোঁদা কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে এনে টেবিলে রাখল। তার মুখটা বেজায় গম্ভীর। সে চলে যাচ্ছিল। কর্নেল বেরিয়ে এসে ডাকলেন,—ভোঁদা! তুমি খেয়েদেয়ে তৈরি থেকো। আমরা সাড়ে ন'টা নাগাদ বেরুব। আর শোনো! আমাকে যে জিনিসগুলো দেখিয়েছিলে, সেগুলো একটা চটের ব্যাগে ঢুকিয়ে নেবে। রাত্রে সুখরঞ্জনবাবুকে বলে রেখেছি। তাঁর কাছে চটের থলে পেয়ে যাবে।

ভোঁদার মুখে হাসি ফুটল। সে বলল,—সুঁকুবাঁবু কঁকপুরে পাঁজা কঁত্তে না? ছাঁইকেঁলে না?

—বুঝেছি। নটার মধ্যে উনি এসে যাবেন।

ভোঁদা থপথপ করে চলে গেল। বললুম,—কী ব্যাপার? ভোঁদা চটের ব্যাগে কী নেবে?

কর্নেল চেয়ারে বসে কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিলেন। তারপর বললেন,—হেভি মিস্ট্রি! কী বলেন হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর শুধু বললেন, —হঃ!...

বেলা ন'টায় কর্নেলের নির্দেশমতো তৈরি হয়ে নীচে ডাইনিংরুমে গেলুম। আমাদের ব্রেকফাস্টের সময় সুখরঞ্জনবাবু সাইকেলে থলে ভর্তি বাজার করে ফিরলেন। তিনি হাসিমুখে ঘোষণা করলেন,—ঠাকমশাই! আজ সায়েবদের পাতে তা-বড় তা-বড় পাবদা মাছ সার্ভ করতে পারবেন। ভাগ্যিস, কেতো-জেলেকে বাজারে ঢোকার মুখেই ধরে ফেলেছিলুম।

ভোঁদা বলল,—সুঁকুবাঁবু! ছঁ-ছঁ-ছঁটের ব্যাঁ—

সুখরঞ্জনবাবু কপট চোখ রাঙিয়ে বললেন,—এই ভোঁদড়টাকে নিয়ে পারা যায় না!

ব্রেকফাস্টের পর আমরা বেরিয়ে পড়লুম। ভোঁদার হাতে চটের থলেতে কী আছে কে জানে! সে যে কর্নেলের কাছ ঘেঁষে ভালুকের মতো হেঁটে চলল। আমরা প্রায় অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছেছি, একটা জিপগাড়ি আসতে দেখলুম। কাছাকাছি এসে গাড়িটা দাঁড়াল। সাব-ইন্সপেক্টর রমেনবাবু নেমে ড্রাইভারকে গাড়ি ঘোরাতে নির্দেশ দিলেন। তারপর কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন,—ও. সি. সায়েব আপনাকে খবর দিতে বলেছেন, যে লোকটার কথা আপনি বলেছিলেন, তাকে গত রাত্রে তিনটে নাগাদ অ্যারেস্ট করা হয়েছে।

—কোথায়?

—কৃষ্ণগঞ্জে। আমাদের সোর্স তাকে পরশু বিকেলে বাসস্ট্যান্ডে কৃষ্ণগঞ্জের বাসে চাপতে দেখেছিল। সেখানে ওর একটা ডেরা আছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হালদারমশাই! আপনি খুশি হতে পারেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, —আমি যার কথা কইছিলাম, সে ধরা পড়ছে?

—হ্যাঁ। ঠিক আছে রমেনবাবু! আমরা পায়ে হেঁটেই যাব। আপনি মিঃ ভাদুড়িকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রমেনবাবু বললেন,—গাড়ি থাকতে হাঁটবেন কেন স্যার?

—একটু সতর্কতা দরকার।

—বেশ তো! পাওয়ার সাবস্টেশনের কাছে আপনাদের নামিয়ে দিয়ে যাব। বলে রমেনবাবু ভোঁদার দিকে তাকালেন। —এ কোথায় যাবে? মনে হচ্ছে, ইরিগেশন বাংলোতে একে দেখেছি।

—রমেনবাবু! এর নাম ভোঁদা। আমার ভাগ্য! একজন বিশ্বস্ত সহযোগী পেয়ে গেছি।

রমেনবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—আমরা পিছনে বসছি! জয়ন্তবাবু! মিঃ হালদার! আমাদের পিছনে বসতে হবে। ভোঁদা! তোর হাতে ওটা কী?

কর্নেল বললেন,—অ্যাটম বোমা রমেনবাবু! ওটা ছোঁবেন না প্লিজ!

কর্নেল সামনে বসলেন। আমরা পিছনে। এই জিপগাড়িটা গত রাতেরটা নয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা বিদ্যুৎ সাবস্টেশনের কাছে পৌঁছে গেলুম। আমাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা বাঁদিকে বাঁক নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই আমাদের গাইড।

হালদারমশাই বললেন,—আপনারে যা কইছি কর্নেলস্যার! একটু দূরের থেইক্যা বাড়িখান দেখাইয়া দিমু। আমারে দেখলে ওনারা হয়তো আবার ইনসাল্ট করবেন!

—ঠিক আছে। তবে আপনাকে যেতে হবে ও-বাড়ি। আপনি লক্ষ রাখবেন। জয়ন্ত একসময়ে বেরিয়ে একটুখানি দাঁড়াবে। আপনি ঠিক তখনই সোজা গিয়ে ঢুকবেন।

খেলার মাঠের ডানদিক ঘুরে ছোট রাস্তা, তারপর বড় রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর হালদারমশাইয়ের নির্দেশমতো বাঁদিকে ঘুরে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। এদিকটা কনকপুরের শেষপ্রান্ত মনে হচ্ছিল। একটা বিশাল বটগাছের তলায় শিবমন্দির। সেখানে দাঁড়িয়ে হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—ডাইনে রাস্তায় আউগাইয়া কারেও জিগাইবেন। গেট আছে। পুরানো দোতলা বাড়ি। উঁচা বাউন্ডারিওয়াল আছে। দ্যাখলেই বোঝবেন। গেটে 'রায়ভবন' লেখা আছে। আর কী কমু?

ডাইনে রাস্তাটা একসময় পিচে মোড়া ছিল। এখন খানা-খন্দে শ্রীহীন অবস্থা। পশ্চিমে এগিয়ে বাড়িটা চোখে পড়ল। দক্ষিণমুখী পুরোনো দোতলা বাড়ি। মাঝামাঝি গেট। ফাটলধরা গেটের মার্বেলফলকে 'রায়ভবন' লেখা। ওপরে বুগেনভেলিয়ার ঝাঁপি। গেটের মরচে ধরা গরাদের সামনে কর্নেল দাঁড়াতেই একটা লোক এসে বলল,—সায়েবদের কোথা থেকে আসা হচ্ছে আজ্ঞে?

কর্নেল বললেন,—কলকাতা থেকে। সুদর্শনবাবুকে খবর দাও!

—ছোটবাবু ওদিকে পুকুরের মাছ ধরাচ্ছেন সার! বড়বাবুকে ডাকব?

—তাই ডাকো।

ওপর থেকে কেউ বলল,—কে রে হরিপদ?

—বড়বাবু! এনারা কলকাতা থেকে এসেছেন।

বুগেনভেলিয়ার ঘন ঝাঁপির জন্য গেট থেকে দোতলা দেখা যাচ্ছিল না। কর্নেল বললেন,—এই কার্ডটা নিয়ে গিয়ে বড়বাবুকে দেখাও হরিপদ।

হরিপদ গেট খুলল না। গরাদের ফাঁক দিয়ে সে কর্নেলের হাত থেকে তাঁর নেমকার্ড নিয়ে চলে গেল। বললুম,—অদ্ভুত তো!

কর্নেল হাসলেন। —অদ্ভুত কিছু নয়। মুখ বুজে থাকবে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা এবং গায়ে শালজড়ানো একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখা গেল। তিনি করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—নমস্কার! নমস্কার! তা হলে

সত্যিই কর্নেলসায়েবের পায়ের ধুলো পড়ল রায়বাড়িতে? ও হরিপদ! গেট খুলিসনি কেন হতভাগা! সায়েবকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস?

হরিপদ গেট খুলল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি সুরঞ্জনবাবু?

—হ্যাঁ কর্নেলসায়েব! ইনি বুঝি সেই সাংবাদিক ভদ্রলোক? গত রাত্রে কলকাতা থেকে ঝন্টু ট্রাঙ্ককল করেছিল। আপনি পৌঁছেছেন কি না জিজ্ঞেস করছিল। আরে! এটা আবার কে?

কর্নেল বললেন,—আমি ইরিগেশন বাংলোয় উঠেছি। ছেলেটি সেখানে কাজ করে। আমাদের রায়ভবন চিনিয়ে দেবে বলে একে নিয়ে এলুম। এর নাম ভোঁদা!

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—অ্যাই ভোঁদা! বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছিস, বেশ করেছিস! তা সায়েবদের সঙ্গে তুই ঢুকলি কেন? বেরো বলছি!

কর্নেল একটু হেসে বললেন, —ভোঁদা আমার সারাক্ষণের সঙ্গী! আসবার পথে কিছু কেনাকাটা করেছি! ওর চটের ব্যাগে রাখা আছে।

সুরঞ্জনবাবু ঘুরে বললেন,—হরিপদ! হাঁ করে কী দেখছিস! বসবার ঘরের দরজা খুলে দে শিগগির! আসুন কর্নেলসায়েব! আর আপনার নামটা কী যেন?

আমি পকেট থেকে আমার একটা নেমকার্ড বের করে দিলুম। উনি পড়ে দেখে বললেন,—হ্যাঁ, জয়ন্ত চৌধুরি। ঝন্টুই বলেছিল। আসুন! দেখতেই পাচ্ছেন, কী অবস্থায় বেঁচে আছি। স্কুল থেকে রিটায়ার করেছি দুবছর আগে। এখনও পেন্ডিং-এর ফাইল আটকে আছে। ভাগ্যিস কিছু জমিজমা, বাগান-পুকুর বাবা রেখে গিয়েছিলেন।

গাড়িবারান্দা দেখে বোঝা গেল, একসময় রায় পরিবারের গাড়ি ছিল। গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে গোলাকার ছোট্ট বারান্দায় উঠলুম। হরিপদ দরজা খুলে দিয়েছিল ততক্ষণে। ভিতরে ঢুকে দেখি প্রশস্ত একটা ঘর। একপাশে পুরোনো সোফাসেট। দেওয়ালে টাঙানো পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তারপর চোখে পড়ল দুদিকের দেওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা আলমারি। তাতে বাঁধানো প্রকাণ্ড সব বই ঠাসা আছে। কর্নেল সোফায় বসে বললেন—আপনার কাকা ওকালতি করতেন শুনেছি। আইনের বইগুলো যত্ন করে রেখে দিয়েছেন।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—হ্যাঁ! কাকাবাবু কৃষ্ণনগর জনকোর্টে অ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁর গাড়ি ছিল। এখান থেকে গাড়িতে যাতায়াত করতেন। বাইশ কিলোমিটার দূরত্ব। বাবা নিষেধ করতেন। কৃষ্ণনগরে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু কাকা একটু জেদি মানুষ ছিলেন। আমাদের বংশের এই রোগটা আছে। তো শেষ অব্দি গাড়িই তাঁকে খেল।

—অ্যাকসিডেন্ট?

—হ্যাঁ। হরিপদ! বললুম না নান্টুকে খবর দে! আর মোনাঠাকুরকে বলে যা, সায়েবদের জন্য চা-টা শিগগির নিয়ে আসে যেন।

—আপনি বসুন!

—বসব। তা যা বলছিলুম। কাকাবাবু আসলে ভাবতেন, কনকপুর ছেড়ে দূরে থাকলে বাবা একা সব সম্পত্তি ভোগ করবেন।

—আপনার কাকাবাবুর ফ্যামিলি?

—সেটাই বলতে যাচ্ছিলুম। খুব ট্র্যাজিক ঘটনা। অ্যাকসিডেন্টের সময় তাঁর গাড়িতেই কাকিমা আর তাঁর ছেলে ছিল। বছর তিনেক বয়স। কাকিমার বাপের বাড়ি চণ্ডীতলায় পৌঁছে দিয়ে কাকাবাবুর কৃষ্ণনগর যাওয়ার কথা ছিল। আর কী বলব?

সুরঞ্জনবাবু জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, —আপনারা বসুন! আমি আসছি।

তিনি ভিতরের দরজা দিয়ে চলে গেলেন। দেখলুম, ভোঁদা দরজার পাশে হাঁটুমুড়ে বসে আছে। কর্নেল ঘরের ভিতরটা দেখছিলেন। আস্তে বললেন,—এই আইনের বইগুলোর দাম অন্তত সে-আমলেই লক্ষাধিক টাকা। এত বই! অথচ ভদ্রলোক এখানে বসেই ওকালতি করতেন!

বললুম,—এই এরিয়ার সব মক্কেল নিশ্চয় ওঁর হাতে ছিল।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে চাপাস্বরে বললেন,—নাকি পূর্বপুরুষের মহালক্ষ্মীর জুয়েলস ওঁর এখানে থাকার কারণ? জয়ন্ত! সম্ভবত সুদর্শনবাবু জানেন না, দু-জোড়া চাবি ওঁর ঠাকুরদাই তাঁর দুই ছেলের জন্য তৈরি করিয়েছিলেন।

বলে তিনি ছবিগুলো দেখতে গেলেন। ডাইনে ও বাঁয়ে আলমারির ওপরে উঁচুতে ছবিগুলো টাঙানো আছে। আর আলমারিগুলোর জন্য দুপাশের দেওয়াল ঢাকা পড়েছে। ওদিকে সম্ভবত কোনো জানলা নেই। কর্নেল ছবিগুলো দেখার পর সোফায় এসে বসলেন।

সেইসময় হন্তদন্ত হয়ে সুদর্শনবাবু ঘরে ঢুকলেন। —কী আশ্চর্য! নমস্কার কর্নেলসায়েব! আপনি আসছেন না! এদিকে আপনার প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কাল একটা ঝামেলা বাধিয়ে এক কাণ্ড করে বসেছিলেন।

—কী কাণ্ড বলুন তো?

—এ বাড়ির কে নাকি ওঁকে গোপনে বলেছে, তিনবছর আগে আমার ঘরের তালা আমি নাকি নিজেই ভেঙেছিলুম। কিন্তু তার চেয়ে সাংঘাতিক কথা—গত মহালয়ার আগের দিন শৈলবালা পাঁচিলের কাছে একটা সাপ দেখে চ্যাঁচামেচি করছিল। তখন আমি নীচে নেমে গিয়েছিলুম। সেইসময় দাদা নাকি আমার ঘর থেকে আমার ছড়িটা নিয়ে সাপ মারতে আসছিল। হালদারবাবুকে কে এসব কথা বলেছে, জানি না। আমার মেজাজ তো জানেন! আপনাকে অলরেডি বলেছি সে কথা!

—আপনি আপনার দাদাকে চার্জ করে বসলেন?

—হ্যাঁ। তারপর দু-ভায়ে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। সেই সময় বাঞ্ছুদা নামে এক ভদ্রলোক—দাদার বন্ধু উনি—এসে পড়ে মিটিয়ে দিলেন। ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের পরিচয় দিতুম না। কিন্তু রাগের বশে—বুঝতেই পারছেন!

—বাঞ্ছুবাবুই কি মিঃ হালদারকে চলে যেতে বললেন?

—উনি কী করে বলবেন? উনি দাদাকে যত, আমাকে তত বকাবকি করে চলে গেলেন। পুলিশ যা পারল না, একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তা পারে? বাঞ্ছুদা ঠিকই বলেছেন মনে হল। সাপ মারবার জন্য দাদা আমার ঘর থেকে মোটা বেতের ছড়িটা আনতে যেতেও পারেন, এই ভেবে আমি দাদাকে খামোকা চার্জ করেছিলুম। কারণ সাপটা হরিপদ মারার পর আমার ঘরে গিয়ে ছড়িটা ব্র্যাকেটে একই অবস্থায় ঝোলানো দেখেছিলুম।

—আর সেই চাবির চাপা শব্দ শুনতে পেতেন তো!

—হ্যাঁ! বিকেলে ক্লাবে যাওয়ার সময় অভ্যাসমতো শব্দটা টের পেয়েছি।

—বাড়ির লোকেদের আপনারা জিজ্ঞেস করেননি, কে মিঃ হালদারকে এসব কথা বলেছে!

—করব না আবার? প্রত্যেকে মহালক্ষ্মীর দিব্যি কেটে বলেছে, সে বলেনি।

এইসময় শীর্ণকায় যে লোকটি চা-টা নিয়ে এলেন, তিনিই মোনাঠাকুর। সুদর্শনবাবু তাঁকে বললেন,—চা না কফি?

ঠাকুরমশাই বললেন,—বড়বাবু চা পাঠাতে বলেছিলেন! বলে তিনি চলে গেলেন।

সুদর্শনবাবু বললেন,—সরি কর্নেলসায়েব! আমার ঘরে আপনার জন্য কফি এনে রেখেছি।

—ঠিক আছে। চা-ই খাওয়া যাক। আপনার পুকুরে মাছ ধরার কাজ শেষ হয়েছে?

—দাদাকে যেতে বললুম। মাছের ব্যাপারীকে ওজন করে দিতে হবে। এদিকে আপনারা এসেছেন। এ বেলা দু-মুঠো—

বলে তাঁর চোখ পড়ল ভোঁদার দিকে। —এই! কে রে তুই?

কর্নেল বললেন,—ইরিগেশন বাংলোয় কাজ করে ছেলেটা। আমি সঙ্গে এনেছি। কিছু কেনাকাটার ব্যাপার ছিল। তো আপনার কি মাছের ব্যাপারীর কাছে যাওয়া দরকার?

—একটুখানি দরকার বইকি। আপনারা চা খান। আমি শিগগির আসছি।

বলে সুদর্শনবাবু আবার হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। চায়ের কাপ হাতে কর্নেল উঠে গিয়ে আবার সেই ছবিগুলো দেখতে-দেখতে কখনও একটু থেমে, কখনও কয়েক-পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে এসে একটু থেমে, ডাইনে থেকে বাঁদিকে ঘোরাঘুরির পরে সোফায় এসে বসলেন। আমি বললুম,—ছবিগুলো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেন বলুন তো?

কর্নেল সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন,—তুমি বেরিয়ে গিয়ে গেটের ওখানে একটু দাঁড়িয়ে চলে এসো। গেট খুলে রাখবে। হালদারমশাই না এসে পড়লে নাটক জমবে না।

একটু দ্বিধার সঙ্গে তাঁর নির্দেশ পালন করতে গেলুম।...

গোয়েন্দাপ্রবর ঘরে ঢুকে সোফার এককোণে বসলেন। তারপর কর্নেলকে দেওয়ালে টাঙানো একটা বিশাল ছবি দেখিয়ে বললেন,—রায়বাহাদুর!

কর্নেল বললেন,—বাঁ-দিকে তিননম্বর বলেছিলেন আপনি!

হালদারমশাই বললেন,—ঘরে আলো জ্বালে নাই ক্যান? ওনারা কই গেলেন?

—পুকুরের ধারে মাছ ধরিয়ে বিক্রি করছেন।

হালদারমশাই অমনই উঠে ছবিটার কাছে গেলেন। তখনই ফিরে এসে বললেন,—ভুল করছিলাম। চাইর নম্বর। রাত্রে এট্টুখানি দেখা। হঃ! রায়বাহাদুর। সুদর্শনবাবু আগের দিন কইছিলেন, ওনার ঠাকুরদার ঠাকুরদা রায়বাহাদুর ছিলেন।

ওঁদের এসব কথা বুঝতে পারছিলুম না। একটু পরে মোনাঠাকুর চায়ের সরঞ্জাম নিতে এসে হালদারমশাইকে দেখে কেন কে জানে মুচকি হেসে চলে গেলেন। তারপর এল হরিপদ। সে হালদারমশাইকে দেখে গম্ভীর মুখে বলল,—আপনি আবার এসেছেন বাবুমশাই! আবার ঝামেলা বাধবে।

বলে সে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। কর্নেল বলবেন,—তোমার কর্তাবাবুদের কাজ শেষ হয়নি হরিপদ?

—হয়েছে আজ্ঞে! ছোটবাবু আমাকে ঘরে আলো জ্বেলে দিতে বললেন। ওনারা এক্ষুনি এসে যাবেন।

সে চলে যাওয়ার একটু পরে দুই ভাই ঘরে ঢুকলেন। তারপর গোয়েন্দাপ্রবরকে দেখে দুজনেই থমকে দাঁড়ালেন। সুরঞ্জনবাবু গম্ভীরমুখে বললেন,—আপনি আবার এসেছেন? কর্নেলসায়েব! ওঁকে চলে যেতে বলুন!

সুদর্শনবাবু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন,—কেলেংকারি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি! কর্নেলসায়েবের খাতিরে গায়ে হাত তুলছি না। বেরিয়ে যান বলছি। নইলে গোবিন্দকে ডাকব।

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আপনারা মিঃ হালদারের সঙ্গে কন্ট্র্যাক্ট করেছিলেন। কিন্তু লিখিতভাবে কন্ট্র্যাক্ট বাতিল করেননি। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ব্যাপারে একটা সরকারি আইন আছে। আমাকে মিঃ হালদার বলছিলেন, কারণ দেখিয়ে কন্ট্র্যাক্ট বাতিল করতে হয়। তা না হলে উনি ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন।

সুরঞ্জনবাবু বাঁকা হেসে বললেন,—ঠিক আছে! আপনি যখন বলছেন, তা-ই করছি। নান্টু! একটা কাগজ এনে দাও।

সুদর্শনবাবু বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল এবার গম্ভীরমুখে বললেন,—একজন স্থানীয় বিশিষ্ট লোককে ডাকতে হবে। তিনি কন্ট্র্যাক্ট বাতিলের কাগজে সাক্ষী হিসেবে সই করবেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে তেমন কেউ নিশ্চয় আছেন?

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—এমন আইন আছে নাকি?

—আছে। আপনি পুলিশকে ফোন করে জেনে নিতে পারেন।

সুদর্শনবাবু এক্সারসাইজ খাতার একটা পাতা ছিঁড়ে এনে সুরঞ্জনবাবুকে দিলেন। সুরঞ্জনবাবু বললেন—নান্টু! কর্নেলসায়েব বলছেন, কন্ট্র্যাক্ট বাতিলের কাগজে কোনো বিশিষ্ট লোককে সাক্ষী রাখতে হবে। এই নাকি আইন।

কর্নেল বললেন, —হ্যাঁ সুদর্শনবাবু! বরং আমার কথা যাচাই করতে থানায় টেলিফোন করুন। পুলিশকে বলুন আমি এখানে আছি। না-না! নিঃসন্দেহ হওয়া উচিত। আপনি ফোন করে আসুন।

লক্ষ করলুম, কর্নেল সুদর্শনবাবুর দিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় চোখের ভঙ্গিতে যেন কী ইশারাও করলেন। সুদর্শনবাবু ফোন করতে যাচ্ছেন দেখে সুরঞ্জনবাবু বললেন,—নান্টু! বাঞ্ছুবাবুকেও একটা ফোন করে এখনই আসতে বলো! ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে। বাঞ্ছুরও আসা দরকার।

একপ্রান্তে সুরঞ্জনবাবুর অ্যাডভোকেট কাকার সেক্রেটারিয়েট টেবিল আছে। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে তিনি বললেন,—বলুন কর্নেলসায়েব! কী লিখতে হবে।

কর্নেল বললেন,—বেশি কিছু না। বাংলায় লিখলেও চলবে। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখুন : প্রাইভেট ডিটেকটিভ শ্রী কে. কে. হালদার মহাশয়ের সহিত আমাদের গৃহদেবী মহালক্ষ্মীর গহনা উদ্ধারের জন্য যে চুক্তি করিয়াছিলাম, তাহা এতদ্বারা বাতিল করিলাম। কারণ তিনি এই কার্য করিতে গিয়া আমাদের পরিবারে অহেতুক মনোমালিন্য ও বিরোধ বাধাইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন।

কর্নেলের এইসব কথা লিখতে সুরঞ্জনবাবুর মাত্র মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। কাগজটা তিনি কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—বাইশ বছর স্কুলমাস্টারি করেছি কর্নেলসায়েব! আশা করি বানান ভুল নেই!

কর্নেল কাগজটা তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—এর তলায় তারিখ দিয়ে আপনি ও সুদর্শনবাবু সই করবেন। বাঁদিকে সাক্ষী সই করবেন।

সুদর্শনবাবু একটু পরে ফিরে এলেন। বললেন,—ও. সি. থানায় ছিলেন। তিনি বললেন, আইনে এইরকম ব্যবস্থা আছে!

সুরঞ্জনবাবু বললেন—বাঞ্ছুবাবুকে পেলে?

—হ্যাঁ। উনি এক্ষুনি আসছেন।

—এসো। আমি সই করেছি। তুমি তলায় সই করো। তারিখ লিখে দিয়ো।

দুজনে সই করার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন,—মিঃ হালদার পূর্ববঙ্গের লোক। ওঁর সামনেই বলছি। একসময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। ওঁর দাপটে চোর-ডাকাতরা এলাকা ছেড়ে

পালাত। আইনকানুন ওঁর মুখস্থ। উনি হঠাৎ এসে পড়বেন জানতুম না। এসেই আমাকে বলছিলেন, ক্ষতিপূরণের কেস করবেন আপনাদের বিরুদ্ধে। আমি ওঁকে বুঝিয়ে শান্ত করেছি।

সুরঞ্জনবাবু বললেন,—কাল রাত্রে ঝন্টু ট্রাঙ্ককলে বলছিল, আপনাকে যেন এই কেসের দায়িত্ব দিই। আপনার সঙ্গে কি কন্ট্র্যাক্ট করতে হবে?

—নাঃ! সুদর্শনবাবু! আপনি বসুন। মিঃ হালদারের সঙ্গে নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। তো বাঞ্ছুবাবুর বাড়ি কতদূরে?

সুরঞ্জনবাবু বললেন, —তত কিছু দূরে নয়। ওই মোটরসাইকেলের শব্দ শুনছি। হরিপদ! ও হরিপদ!

হরিপদ দরজায় উঁকি মেরে বলল,—আজ্ঞে বড়বাবু!

—গেট খুলে দে। বাঞ্ছুবাবু আসছেন মনে হচ্ছে।

একটু পরে বাইরে মোটরসাইকেলের শব্দ থেমে গেল। সুরঞ্জনবাবু উঠে গিয়ে বললেন, —এসো বাঞ্ছু! বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি।

তাঁর সঙ্গে বেঁটে স্থূলকায় একজন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। কর্নেলকে দেখেই উনি থমকে দাঁড়ালেন। —এঁরা কারা?

—কলকাতা থেকে ঝন্টু এঁদের পাঠিয়েছেন। উনি কর্নেলসায়েব! পরে বলছি।

—ডিটেকটিভ ভদ্রলোক আবার এসে ঝামেলা পাকিয়েছেন?

সুরঞ্জনবাবু কাগজটা তাঁকে দেখিয়ে বললেন,—এখানে তুমি উইটনেস হিসেবে একটা সই দাও বাঞ্ছু! নান্টু থানায় ফোন করেছিল। ও. সি. সায়েব বলেছেন এটাই নাকি আইন।

বাঞ্ছুবাবু একটা চেয়ারে বসে সই করে দিলেন। সুরঞ্জনবাবু কাগজটা হালদারমশাইকে দিয়ে বললেন,—এবার দয়া করে কেটে পড়ুন মশাই।

হালদারমশাই কাগজটা কর্নেলকে দিয়ে বললেন,—আর-একবার দেইখ্যা দিন কর্নেলস্যার!

কর্নেল কাগজটা হাতে নিয়েছেন, এমনসময় ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি, এস. আই. রমেনবাবু এবং আরও একজন অফিসার ঘরে ঢুকলেন। বারান্দায় একদঙ্গল কনস্টেবলও এসে দাঁড়াল।

বাঞ্ছুবাবু আড়ষ্টভাবে হেসে বললেন,—কী ব্যাপার স্যার? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না?

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—আপনার বাড়ি হয়েই আসছি দত্তবাবু! আপনাকে আমাদের দরকার।

বাঞ্ছারাম দত্ত করজোড়ে বললেন,—বলুন স্যার!

—কর্নেলসায়েব! আপনি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কথা বলে নিন।

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে কাঞ্চন সেনের কার্ডটা বের করে বললেন,—দেখুন তো দত্তবাবু! এই কার্ডটা চিনতে পারেন কি না।

দত্তবাবু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন,—ওটা কীসের কার্ড স্যার?

—কলকাতার বিখ্যাত চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এজেন্ট কাঞ্চন সেনের কার্ড। তাঁকে আপনি কয়েক লক্ষ টাকার জুয়েলারি বিক্রির খবর দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে শুক্রবার কাঞ্চনবাবু আপনার বাড়ি এসেছিলেন। কিন্তু জুয়েলারি তাঁকে সেদিন দেখানোর অসুবিধে ছিল বলেই আমার ধারণা। কারণ ওগুলো তখনও আপনার কাছে পৌঁছয়নি। তা ছাড়া, চোরাই জুয়েলারি। একটা ঝুঁকি ছিল, আপনি তা জানতেন। তাই জুয়েলারি চুরির দায় অন্যের কাঁধে চাপানোর জন্য আপনি কাঞ্চনবাবুর পকেট থেকে কোনো সুযোগে তাঁর কার্ডটা চুরি করেছিলেন। কাঞ্চনবাবু কলকাতা ফিরে গিয়ে টের পান তাঁর এজেন্ট-কার্ড চুরি গেছে। পরদিন শনিবার তিনি

আপনার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু কার্ডের হদিস পাননি। রবিবার সুদর্শনবাবু তাঁর মাসতুতো ভাই ঝন্টুবাবুর নির্দেশে কলকাতায় আমার কাছে গিয়েছিলেন। বাসে কিংবা ট্রেনে আপনার লোক তাঁর ব্যাগে কার্ডটা গোপনে ভিড়ের মধ্যে গুঁজে দেয়। হ্যাঁ—সুরঞ্জনবাবু আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুরঞ্জনবাবুই আপনাকে জানিয়েছিলেন, তাঁর ছোটভাই কোথায় যাচ্ছেন। আপনি সুরঞ্জনবাবুর কাছেই জেনে নিয়েছিলেন, সুদর্শনবাবু ব্যাগে মহালক্ষ্মীর ছবি আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবেন। সুদর্শনবাবু ছবি বের করলেই চন্দ্র জুয়েলারি কোম্পানির এই বিশেষ কার্ড বেরিয়ে পড়বে। সুদর্শনবাবু কার্ড দেখে চমকে উঠবেন। আমিও কার্ডটা দেখব। এই কার্ড দেখার পর সুদর্শনবাবু আমার সন্দেহভাজন হবেন। কিন্তু ছবি বের করার সময় কার্ডটা ছিটকে পড়েছিল সুদর্শনবাবুর পায়ের নীচে। তিনি তা লক্ষ করেননি। তিনি চলে যাওয়ার পর কার্ডটি আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আর-একটা কথা। কাঞ্চনবাবু কার্ড হারানোর পর আমার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি নিজের হাতে আপনার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—দত্তবাবুর সেই লোককে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। সে জেরার মুখে সব স্বীকার করেছে। কাঞ্চনবাবু আপনাকে শনিবার এসে কার্ড না পেয়ে হুমকি দিয়ে গিয়েছিলেন, কার্ড না পেলে তিনি আপনাকে চোরাই জুয়েলারির কেসে ফাঁসাবেন। তাই রবিবার আপনার লোক, অর্থাৎ কুখ্যাত বাবু ঘোষকে আপনি কলকাতা পাঠিয়েছিলেন। সে কাঞ্চনবাবুর একসময় ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। অনেক চোরাই জুয়েলারি সে কাঞ্চনবাবুর সাহায্যে বিক্রি করেছে। আপনার হুকুম ছিল, বেগতিক দেখলেই তাঁকে যেন বাবু ঘোষ খতম করে। শেষপর্যন্ত বাবু ঘোষ তা করেছে। তাকে আমরা খুনের দায়ে ধরেছি। এবার আপনার পালা! রমেনবাবু! বাঞ্ছারাম দত্তকে অ্যারেস্ট করুন।

রমেনবাবু বাঞ্ছারাম দত্তের কাছে এসে সহাস্যে বললেন,—আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আপনি মানী লোক। চলুন! আমাদের গেস্টহাউসে থাকবেন। একটু কষ্ট হবে। কিন্তু উপায় কী?

বলে তিনি কনস্টেবলদের ডাকলেন,—রামভকত! সুরেন্দ্র! এঁকে প্রিজনভ্যানে নিয়ে যাও। একমিনিট। কই দত্তবাবু! শালের ভেতর থেকে হাতদুটো বের করুন।

দত্তবাবুর দুটো হাতে তিনি হ্যান্ডকাফ এঁটে দিলেন। কনস্টেবলরা দত্তবাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—রামভকত! দত্তবাবুকে একটু পরে নিয়ে যাবে। কর্নেলসায়েব! বলুন!

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন,—দত্তবাবু! আপনি পাঁচখালি এলাকার কালুখালিতে দশরথের কাছে অর্ডার দিয়ে একটা বেতের ছড়ি তৈরি করেছিলেন! অবিকল সুদর্শনবাবুর মতো ছড়ি।

দত্তবাবু বলার ভিতরে বললেন,—তাতে কী হয়েছে?

কর্নেল সবাইকে অবাক করে ভোঁদাকে বললেন, —ভোঁদা! তোমার থলে দাও!

ভোঁদা চটের থলেটা নিয়ে এল। কর্নেল থলেতে হাত ভরে যে জিনিসগুলো বের করলেন, তা একটা বেতের ছড়ির ভাঙাচোরা খানিকটা অংশ। শুধু ঘোরানো কালো রঙের বাঁটটা আস্ত আছে। কিছু অংশে মাটি লেগে আছে। বোঝা যায়, শুকনো কাদা।

কর্নেল হাসলেন। —এগুলো শ্রীমান ভোঁদার আবিষ্কার। দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে ভোঁদা সন্ধ্যার একটু আগে কনকপুর থেকে সেচবাংলোতে ফেরার সময় দূর থেকে দেখেছিল, দত্তবাবু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাঁর মোটরসাইকেলে চেপে তার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। এই ছেলেটা স্বভাবে খুব কৌতূহলী! ছোটবেলা থেকে সে সর্বচর। মঙ্গলবার ভোরে মর্নিংওয়াকে আমার সঙ্গে বেরিয়ে সে এই গোপন ঘটনাটা বলেছিল। তার সঙ্গে গিয়ে এগুলো একটা ঝোপের ভিতরে

দেখতে পেলুম। তার ঢোলা প্যান্টের দুই পকেটে ভরে এগুলো তাকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখতে বললুম। আমার মাথায় একটা থিয়োরি এসেছিল। তার সত্যতা যাচাই করতেই কালুখালিতে দশরথের কাছে গিয়েছিলুম। তার পর সিওর হয়েছিলুম।

সুদর্শনবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি ফুঁসে উঠলেন। —তা হলে কিছুদিন ধরে আমার ছড়ির বদলে বাঞ্ছুদার ছড়িটা আমার ঘরের ব্র্যাকেটে ঝোলানো ছিল! ডিটেকটিভ ভদ্রলোক ঠিক বলেছিলেন। সাপ মারার দিন কে দেখেছিল, দাদা আমার ঘর থেকে আমার ছড়িটা বের করে আনছিল! দাদা! এখনও বলছি, খুলে বলো! তুমিই ছড়ি বদল করেছিলে! হ্যাঁ—তুমি! তুমি! তুমি!

সুদর্শনবাবু দাপাদাপি জুড়ে দিলেন। ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি তাঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন,—চুপচাপ বসে থাকুন। চ্যাঁচামেচি পরে করবেন।

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই! আপনার ব্যাগ থেকে এবার আপনার আবিষ্কৃত জিনিসগুলো বের করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর তাঁর ব্যাগের চেন খুলে খবরের কাগজের মোড়ক বের করলেন। তারপর তিনি মোড়ক খুললেন। দেখলুম, একগাদা আধপোড়া কাগজ। তিনি বললেন,—এগুলি আমি পাইছিলাম রায়বাবুগো পুকুরের পাড়ে। ঝোপের মইধ্যে লুকানো ছিল।

মিঃ ভাদুড়ি পরীক্ষা করে বললেন,—ছাপানো বইয়ের পাতা মনে হচ্ছে।

কর্নেল উঠে গিয়ে সেই রায়বাহাদুরের ছবির তলায় একটা আলমারির কাচের কপাট হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললেন। তারপর বললেন,—হালদারমশাইয়ের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজগুলো পরীক্ষা করে বুঝতে পেয়েছিলুম, আইনের বইয়ের পাতা। এ ঘরে ঢুকে দেখে নিয়েছি, এই দুটো প্রকাণ্ড বই লাইন থেকে একটু এগিয়ে ও পিছিয়ে আছে। অনেকদিন আগে রাখা বই আলমারির র‍্যাকে রাখলে ময়লার রেখা পড়বে। এই দুটো বই সেই রেখা মুখে দিয়েছে।

দুটো বই বগলদাবা করে তিনি টেবিলে রাখলেন। একটা বইয়ের ভিতরে চৌকো করে কাটা গভীর একটা অর্ধবৃত্তাকার অংশ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেখানে কিছু নেই। কর্নেলকে চঞ্চল ও উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তিনি দ্বিতীয় বইটা খুললেন। চৌকো গভীর গর্ত দেখা গেল। কিন্তু এটাতেও কিছু নেই।

মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—টেলড দিয়ে অনেক পরিশ্রম করে কাটা গুপ্তস্থান। কিন্তু শূন্য কেন?

কর্নেল বললেন,—এই বইটার মধ্যে মহালক্ষ্মীর হীরকখচিত সোনার মুকুট লুকানো ছিল। তাই এই বইয়ের গর্তটা অর্ধবৃত্তাকার। আর দ্বিতীয় বইটার মধ্যে মহালক্ষ্মীর জড়োয়া নেকলেস ছিল। এর গর্তটা চৌকো।

বলে কর্নেল ডাকলেন,—সুরঞ্জনবাবু!

সুরঞ্জনবাবু মুখ নামিয়ে বললেন,—বলুন!

—আপনি পুরোনো প্রকাণ্ড শাস্ত্রীয় পঞ্জিকার ভিতরের পাতা কেটে গর্ত করে নিজের চাবিদুটো লুকিয়ে রেখেছিলেন। ও. সি. মিঃ ভাদুড়িকে তা দেখিয়েছিলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—আমারেও তা দ্যাখাইছেন উনি!

কর্নেল বললেন,—এ কাজে আপনার দক্ষতা আছে। কিন্তু আপনার কাকাবাবুর দুটি আইনের বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রাখা দুটি জুয়েলস কোথায় গেল?

সুরঞ্জনবাবু ভাঙা গলায় বললেন,—আমি বুঝতে পারছি না। বিশ্বাস করুন! এ কী অদ্ভুত কাণ্ড।

সুদর্শনবাবু গর্জন করলেন,—নিজেরই চুরি করে লুকিয়ে রাখা জিনিস কোথায় গেল বুঝতে পারছ না? ন্যাকা? ও. সি. সায়েব! কর্নেলসায়েব! বাঞ্ছারাম দত্তের বাড়ি সার্চ করলেই মাল বেরিয়ে

পড়বে। কাল বিকেলে ক্লাবে যাওয়ার সময় আমি দেখেছি, আমার মহাপুরুষ দাদা দত্ত-বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকে গেল।

সুরঞ্জনবাবু মিনমিনে গলায় বললেন,—না-না! আমারও অবাক লাগছে, এ কাজ কে করল? নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি বললেন,—তার মানে আপনি স্বীকার করছেন বইদুটোর মধ্যে মহালক্ষ্মীর মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস লুকিয়ে রেখেছিলেন?

সুরঞ্জনবাবু এবার দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন।—আমি পাপী। আমি মহাপাপী। ওই বাঞ্ছুর প্ররোচনায় আমি ফাঁদে পা দিয়েছিলুম।

এই সময় ভিতর থেকে এক ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ঘরের ভিতরে চোখ বুলিয়ে সবাইকে দেখে নিয়ে বললেন,—কী হয়েছে? এত কান্নাকাটি কীসের?

সুদর্শনবাবুও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন,—বউদি! আমি কল্পনাও করিনি, আমার দাদা—

তাঁকে ভদ্রমহিলা ধমক দিলেন। —চুপ করো! দাদা-অন্তপ্রাণ একেবারে! তোমাকে সাবধান করে দিইনি, দত্তবাবু কেন দুবেলা রায়বাড়ি আসছে, খোঁজখবর নাও?

বুঝলুম, এই মহিলাই সুরঞ্জনবাবুর স্ত্রী শোভারানি। তিনি দত্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বাঁকা হেসে বললেন,—বাঃ! বেশ মানিয়েছে এতদিনে। কত লোককে ফাঁদে ফেলে সর্বনাশ করে এবার নিজেই ফাঁদে পড়েছে বাঞ্ছুরাম। কই? কর্নেলসায়েব কোথায়?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন,—শোভাদেবী! আমি সব বুঝতে পেরেছি। চলুন! রায়বাড়ির গৃহদেবী মহালক্ষ্মীকে এবার আমরা গিয়ে দর্শন করি। হীরকখচিত সোনার মুকুট আর জড়োয়া নেকলেস পরা ছবি আমি দেখেছি। এবার সেই প্রতিমাকে একই বেশে দেখতে পাব। মিঃ ভাদুড়ি! দত্তবাবুকে লক-আপে পাঠিয়ে দিন।

এই সময় হালদারমশাই খুব চাপাস্বরে কর্নেলকে বললেন,—আমারে হুমকি দেওয়া চিঠির হাতের লেখার সঙ্গে সুরঞ্জনবাবুর হাতের লেখার মিল দেখলাম।

কর্নেল হাসলেন। —হ্যাঁ, সেইজন্য এত কাণ্ড করতে হল।

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি এস. আই. রমেনবাবুকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, —তপনবাবু! আমেদসায়েব! আপনারা এখানে থাকুন। আমরা আসছি। চলুন সুরঞ্জনবাবু! আপনার সম্পর্কে কী করা যায়, পরে ভেবে দেখা যাবে। সুদর্শনবাবু! আমার মনে হচ্ছে, এখনই আপনার ঘরে গিয়ে আপনার ছড়িটি পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সুদর্শনবাবু সবার আগে হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন।...

দোতলায় উঠে দেখি, সুদর্শনবাবু একহাতে তাঁর বেতের ছড়ি অন্য হাতে ছড়ির কালো বাঁট নিয়ে তেমনই হন্তদন্ত এগিয়ে আসছেন। তিনি হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন—আমার চাবি নেই! আমার চাবিদুটো চুরি গেছে।

শোভাদেবী ধমক দিলেন। —চুপ করো নান্টু! আর চাবি-চাবি কোরো না। তোমরা দুভাই জানো না। কিন্তু শৈলবালা সাক্ষী! মৃত্যুর আগের দিন শ্বশুরমশাই আমাকে দু-জোড়া চাবিই গোপনে দিতে চেয়েছিলেন। তখন আমার বয়স কম। সাহস করে চাবি রাখতে পারিনি। এবার থেকে আমার কাছে চাবি থাকবে।

সুরঞ্জনবাবু মিনমিনে গলায় বললেন,—আমার চাবিজোড়াও নিয়েছ তুমি?

চুপ! একটি কথাও নয়। —বলে তিনি কোমরের কাছ থেকে দুজোড়া চাবি বের করে সিঁড়ির পূর্বের ঘরের দরজা খুললেন। তারপর ভিতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলেন। এঘরের কোনো জানলা নেই। দ্বিতীয় কোনো দরজাও নেই।

দেখলুম আমাদের পিছনে ভোঁদাও উঠে এসেছে। চোখে চোখ পড়লে সে নিঃশব্দে হাসল।

শোভাদেবী দেওয়ালের মধ্যে বসানো আয়রনচেস্ট দুটো চাবির সাহায্যে খুললেন। তারপর মেঝেয় মাথা লুটিয়ে প্রণাম করে দুহাতে রুপোর চৌকো থালায় বসানো দেবী মহালক্ষ্মীকে বের করলেন। কষ্টিপাথরে তৈরি ছোট্ট প্রতিমার মাথায় রত্নখচিত মুকুট আর গলা থেকে হাঁটু অব্দি ঝোলানো জড়োয়া নেকলেস আলোয় ঝলমল করে উঠল।

সুরঞ্জনবাবু আর সুদর্শনবাবু মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। শোভাদেবী বললেন,—ও. সি. সায়েব, কর্নেলসায়েব! এবার আপনারা কী বলবেন, বলুন!

ও. সি. মিঃ ভাদুড়ি একটু হেসে বললেন,—আপনার স্বামী রাজসাক্ষী হবেন! আর কী বলব? আপনার গোয়েন্দাগিরির কাছে হার না মেনে উপায় নেই। কী বলেন কর্নেলসায়েব? মিঃ হালদার?

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। হালদারমশাই বললেন,—ঠিক কইছেন মিঃ ভাদুড়ি! এতদিনে বুঝলাম, ওনাগো ক্যান গৃহলক্ষ্মী কয়!

মিঃ ভাদুড়ি আমার দিকে ঘুরে বললেন—জয়ন্তবাবু! আপনি তো সাংবাদিক! আমার ধারণা, পুরো ঘটনাটি আপনি আপনাদের পত্রিকায় লিখবেন। তাই না?

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—জয়ন্ত রোমহর্ষক গপ্পো লিখে ফেলবে! ওকে একটু সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

বলে তিনি পিছনে ঘুরলেন। —অ্যাই ভোঁদারাম! উঠে পড়ো বাবা! রায়বাড়ির মহালক্ষ্মী দেবী দর্শন করতে চেয়েছিলে। দর্শন হয়ে গেছে। আর কী?

ভোঁদা এতক্ষণ ধরে উপুড় হয়ে মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে তেমনই নিঃশব্দে হাসল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, প্রতিমার মূল্যবান রত্নরাজির চেয়ে একটি অনাথ, সরল ও নিষ্পাপ তরুণের এই হাসি অনেক বেশি উজ্জ্বল। অনেক বেশি মূল্যবান।...

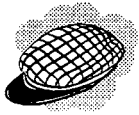

কালিকাপুরের ভূত রহস্য

এক -

সেবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় তত শীত পড়েনি। এক রবিবারে অভ্যাসমতো কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দিতে এসেছিলুম। দেখলুম কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে যথারীতি চুরুট টানছেন, আর সোফার কোণের দিকে বসে প্রাইভেট ডিটেকটিভ আমাদের প্রিয় হালদারমশাই ডানহাতে খবরের কাগজ আর বাঁ-হাতে এক টিপ নস্যি নিয়ে বসে আছেন। আর কর্নেলের কাছাকাছি যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কাঁচুমাচু মুখে বসে আছেন, তাঁকে দেখেই বোঝা গেল তিনি মফস্বলের মানুষ। কলকাতার লোকজনের চেহারা আর হাবভাবে বেশ খানিকটা চেকনাই থাকে। এই ভদ্রলোক মুখ তুলে আমাকে দেখে আর-একটু আড়ষ্টভাবে সরে বসলেন। কর্নেলের জাদুঘর সদৃশ ড্রইংরুমে ঢুকেই আমি সম্ভাষণ করেছিলুম,—মর্নিং কর্নেল।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে গলার ভেতরে 'মর্নিং' আউড়ে আবার চোখ বুজলেন।

ভদ্রলোকের সামনে দিয়ে এগিয়ে আমি সোফার শেষপ্রান্তে বসলুম। এতক্ষণে হালদারমশাই নস্যি নাকে গুঁজে কাগজ নামিয়ে রেখে মৃদুস্বরে বললেন,—আয়েন জয়ন্তবাবু, বয়েন। আপনাগোর সত্যসেবক পত্রিকায় আইজ তেমন কিসু নাই।

আমি চোখের ইশারায় প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললুম,—আছে। সবকিছু কি কাগজে ছাপা হয়!

আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন,—হ, ঠিক কইসেন।

ইতিমধ্যে ষষ্ঠি আমার জন্যে এক পেয়ালা কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, —এবার ডিসেম্বরেও কলকাতায় শীতের দেখা নেই। ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

আমার কথা শুনে সেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন,—আপনাদের কলকাতা শহরে এসে আমাকে সোয়েটার খুলতে হয়েছে। সোয়েটারের ওপর ওই দেখছেন একখানা শাল, তাও জড়ানো ছিল। আমাদের কালিকাপুরে গেলে কিন্তু শীতের কামড়ে আপনার হাড় নড়িয়ে দেবে।

কর্নেল তো তুম্বো মুখে চোখ বুজে কী ধ্যান করছেন, কে জানে।

কালিকাপুরের ভদ্রলোক কথা বলায় গুমোট ভাবটা কেটে গেল। জিগ্যেস করলুম,—আপনি কালিকাপুর থেকে আসছেন? সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে বেশি দুরে নয়, মোটে ঘণ্টাচারেকের ট্রেন জার্নি। স্টেশন থেকে নেমে এক্কাগাড়ি, সাইকেলরিকশা, বাস—সবই পাওয়া যায়। গঙ্গার ধারে আমাদের গ্রামটা এখন আর গ্রাম নেই। ইলেকট্রিসিটি এসেছে, টেলিফোন এসেছে, নিউ টাউনশিপ হয়েছে।

ভদ্রলোক আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কর্নেল চোখ খুলে বললেন,—আপনার বাড়িতে আপনার বাবা আর কাকা ছাড়া আর কে-কে থাকেন?

ভদ্রলোক বললেন,—আমার এক বিধবা পিসি থাকেন। আমার মা তো অনেক বছর আগে মারা গিয়েছেন। কাকা বিয়ে করেননি। সাধুসন্ন্যাসীর মতো ওঁর চালচলন। আমরা ভাবি কবে

হয়তো কাকা সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন। অথচ আপনাকে বলেছি আমার বাবা রুগ্ণ মানুষ, বাড়ি থেকে বেরোতেই পারেন না। কিন্তু কাকার শরীর-স্বাস্থ্য খুব ভালো। নিয়মিত যোগব্যায়াম করেন কিনা।

কর্নেল বললেন,—বাড়িতে কাজের লোক নিশ্চয়ই আছে?

ভদ্রলোক বললেন,—হ্যাঁ, তা আছে। মানদা নামে একটি মেয়ে প্রতিদিন ভোরবেলায় আসে, সারাদিন থেকে সন্ধের পর নিজের খাবারটা বেঁধে নিয়ে বাড়ি চলে যায়। আপনাকে তো বলেছি, ব্যাপারটা প্রথম তারই চোখে পড়ে। আপনি হয়তো ভুলে গেছেন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আপনি বলেছিলেন বটে। কিন্তু মানদা তখনই ফিরে এসে কথাটা আপনাদের বলেনি কেন? আপনি বলেছিলেন পরদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফেরার সময়েই সে কথাটা আপনার পিসিমাকে বলেছিল—তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। আসলে এমন একটা গোলমেলে ব্যাপার যে ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না। আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তাতেই ইলেকট্রিক আলো আছে। গত বছর কালিকাপুরে মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে কিনা! বুঝে দেখুন স্যার, শীতের রাতে এখন ওখানে বড্ড কুয়াশা হয়। তা হলেও মানদা স্পষ্ট চিনতে পেরেছিল লোকটাকে।

হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—তা হইলে ক্যামনে বুসলেন ওই লোকটাই সেই মরে যাওয়া লোক?

ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন,—আমাদের মানদা স্যার খুব চালাক-চতুর মেয়ে। অন্ধকারেও দেখতে পায়। তা ছাড়া যে লোকটাকে দেখেছিল, সে সম্পর্কে আমারই এক দাদা। মাসতুতো দাদা। পাঁচ বছর আগে তাকে আমরা শ্মশানে চিতায় দাহ করে এসেছি। বাবা-কাকা সবাই ছিলেন শ্মশানে।

কর্নেল বললেন,—আপনার ওই মাসতুতো দাদার নাম বিনোদ মুখুজ্যে তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা মুখুজ্যে, আমরা চাটুজ্যে। কথাটা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু আমাদের পাড়ার বামাপদ গোঁসাই হঠাৎ কাল কথায়-কথায় বললেন, হ্যাঁরে শচীন, তোদের বাড়ির কাছে কাল সন্ধেবেলা একটা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছিলুম। মাত্র হাত দশেক দূরে। দ্যাখা মাত্রই চমকে উঠেছিলাম। এ তো সেই পাগলা বিনোদ!

এবার আমি জিগ্যেস করলুম,—পাগলা বিনোদ মানে?

শচীনবাবু বললেন,—কর্নেলসাহেবকে সবই বলেছি। আমার ওই মাসতুতো দাদার কোনও চালচুলো ছিল না। কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াত, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু পাগলামি করত। তারপর বেশ কিছুদিন খুব শান্ত আর গম্ভীর হয়ে থাকত। তাই লোকে ওকে বলত বিনোদ পাগলা, বা পাগলা বিনোদ।

কথাটা বলে শচীনবাবু সার্জের পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। তারপর করজোড়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, কালিকাপুরের জমিদারবাড়ির চণ্ডীবাবু আপনার কাছে পাঠিয়েছেন—সেকথা তো আগেই বলেছি। আমাদের রাতের ঘুম একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যখন-তখন ওই উৎপাত।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, চণ্ডীবাবুকে গিয়ে বলবেন আমরা যে-কোনও দিন কালিকাপুরে গিয়ে হাজির হব। সেখানে কোথায় উঠব তা আগে থেকে বলতে পারছি না। তবে আপনারা নিশ্চয়ই খবর পাবেন।

কালিকাপুরের শচীনবাবু তাঁর ব্যাগের ভেতর শালটাও যেন খুলে ভরে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—এখনই শিয়ালদায় একটা ট্রেন আছে। ট্যাক্সি করে চলে যাব।

বলে তিনি প্রথমে কর্নেলকে, তারপর আমাদের দুজনকে নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন। সেই সময় লক্ষ করলুম, তিনি যেন একটু লেংচে হাঁটছেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর বললুম,—ভদ্রলোকের বাঁ-পায়ে গণ্ডগোল আছে। তা একটা ছড়ি হাতে নিয়ে হাঁটেন না কেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—ছড়িটা উনি দরজার বাইরে ঠেকা দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ছড়ি বলা যায় না, আস্ত বাঁশ বললে ভুল হয় না। কিন্তু বেশ পালিশ করা বাঁশের লাঠি। ভদ্রতা-বশে বা যে-কোনও কারণেই হোক ওটা নিয়ে ঘরে ঢোকেননি।

জিগ্যেস করলুম,—ওঁর সেই মাসতুতো দাদা বিনোদ পাগলার ভূত কি প্রতি রাতে উৎপাত করছে?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন,—প্রতি রাতে নয়, কিন্তু উৎপাত করছে তা বলা যায়। ওঁদের একতলা বাড়ির ছাদে ধুপ-ধাপ করে শব্দ হয়। আবার কখনও উঠোনে অনেকগুলো ঢিল পড়ে। ঢিলগুলো—এটাই আশ্চর্য, দেখতে পাহাড়ি নদীতে পড়ে থাকা নুড়ির মতো।

বলে কর্নেল তাঁর টেবিলের ড্রয়ার থেকে গোটা চারেক নুড়ি বের করলেন। সেগুলো একেবারে নিটোল, কতকটা ডিমের মতো।

হালদারমশাই উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললেন,—মাসতুতো দাদারে দাহ করছিল ওগো শ্মশানে। গঙ্গার ধারে শ্মশান, আর তার ভূত পাহাড় অঞ্চলে যাইয়া এগুলান কুড়াইয়া আনসিল ক্যান? কর্নেলস্যার আপনি আমারে যেন সাথে লইবেন।

কর্নেল ঈষৎ কৌতুকে বললেন,—আমার মতো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবেন আপনি? আপনি তো প্রফেশনাল প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

হালদারমশাই বললেন,—তাড়াইমু কর্নেলস্যার। হাতে কোনও ক্যাস নাই। তাই মনটা ভালো নাই। চৌত্রিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করসি। রিটায়ার কইর‍্যা যা পাইসি তাই যথেষ্ট। এদিকে পেনশেনও পাইত্যাসি আপনার মতন।

কর্নেল চুরুটে শেষ টান দিয়ে বললেন,—ঠিক আছে, তাহলে আপনাকে যাওয়ার সময় ডেকে নেব।

ষষ্ঠি আর এক দফা কফি নিয়ে এল। আমি আপত্তি করছিলুম, কিন্তু কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত, কেসটা তো শুনলে। পাঁচবছর আগে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মানুষ একেবারে জলজ্যান্ত দেহে ফিরে এসেছে, এবং যারা তার সৎকার করেছিল, তাদের ওপর উৎপাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝতে হলে নার্ভ আরও চাঙ্গা করা দরকার।

কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে বললুম,—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে ওখানে শচীনবাবুদের কোনও শত্রুপক্ষ কোনও কারণে তাদের পেছনে লেগেছে। ওসব ভূতপ্রেতের গল্প বোগাস।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! ঠিক কইসেন জয়ন্তবাবু। ওনাদের শত্রুপক্ষই উৎপাত করত্যাসে।

কর্নেল বললেন,—শচীন চাটুজ্যে আমাকে বেশ বড় গলায় বলেছেন, ওঁদের কোনও শত্রু নেই। শচীনবাবু স্কুল-টিচার ছিলেন। এখন রিটায়ার করেছেন। ওঁর বাবা অহীনবাবু রুগ্‌ণ, শয্যাশায়ী।

তিনিও শিক্ষকতা করতেন। ওঁদের কাকা মহীনবাবু সংসারের কোনও সাতে-পাঁচে থাকেননি। তা ছাড়া, ওঁদের বিষয় সম্পত্তিও কিছু নেই। শুধু ওই ভিটে আর তার সংলগ্ন একটা ঠাকুরবাড়ি।

কর্নেল আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন,—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...চণ্ডীপ্রসাদবাবু? কী ব্যাপার? এইমাত্র আপনার চিঠি নিয়ে এসেছিলেন শচীন চাট্যুজ্যে। তিনি চলে গেছেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছি, কারণ আপনার সঙ্গে এই সুযোগে আবার দেখা হবে...অ্যাঁ? বলেন কী? কখন?...ও মাই গড! ব্যাপারটা তাহলে দেখছি ছেলেখেলা নয়!...ঠিক আছে। আমরা মানে আমি আর আমার তরুণ সাংবাদিক-বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী—যার কথা আপনাকে একবার বলেছিলুম। আর একজন রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার, যিনি এখন পেশাদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তিনজনেই সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হব। সম্ভব হলে আপনি...বাঃ! ঠিক আছে।...আচ্ছা, রাখছি।

কর্নেল রিসিভার রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে মাথার প্রশস্ত টাকে একবার হাত বুলিয়ে নিলেন।

লক্ষ করলুম গোয়েন্দাপ্রবরের হাতে কফির পেয়ালা। এবং তিনি গুলিগুলি চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছেন। অভ্যাসমতো দুই চোয়াল তিরতির করে কাঁপছে।

আমি জিগ্যেস করলুম,—কর্নেল, কালিকাপুরে নিশ্চয়ই কোনও অঘটন ঘটেছে—প্লিজ, কথাটা খুলে বলুন।

কর্নেল এবার সোজা হয়ে বসে কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন,—একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। শচীনবাবুদের ঠাকুরবাড়ির সামনে অনেকটা জায়গায় রক্ত পড়ে আছে। ওখানে একটা হাড়িকাঠ আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবমন্দিরের সামনে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

জিগ্যেস করলুম,—কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে?

শচীনবাবু ভোর ছ'টায় স্টেশনে গিয়েছিলেন। তাঁর বিধবা পিসি কাজের মেয়ে মানদাকে নিয়ে পুকুরঘাটে যাচ্ছিলেন। মন্দিরের সামনেই একটা পুকুর। খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুনোমাত্র হাড়িকাঠের পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে চবচবে রক্ত দেখা যায়। মানদা চেঁচামেচি জুড়ে দেয়, পড়শিরা দৌড়ে আসে। কিন্তু কাকে বলি দেওয়া হয়েছে, তার লাশ পাওয়া যায়নি। পরে সবার খেয়াল হয় শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবুর কোনও পাত্তা নেই।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—ওনার সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, শচীনবাবু কইত্যাসিলেন।

কর্নেল বললেন,—এতে স্বভাবতই লোকের সন্দেহ হয়েছে মহীনবাবুকেই কেউ বা কারা কোনও কারণে বলি দিয়ে তাঁর লাশ গুম করে ফেলেছে। পুলিশ এসে তদন্ত করার পর চলে গেছে। জেলে নৌকাগুলোকে নাকি পুলিশ বলেছে গঙ্গায় কোনও লাশ দেখতে পেলে তার যেন পুলিশকে খবর দেয়।

বললুম,—শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবুকেই যে বলি দেওয়া হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আজ সারাদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে। এমন হতেই পারে, তিনি সাধু-সন্ন্যাসী টাইপের মানুষ, বাড়িতে না বলে কোথাও গঙ্গার ধারে কোনও সন্ন্যাসীকে দেখে তার কাছে বসে আছেন।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন,—মহীনবাবু ঘরের বারান্দায় একটা খাটিয়ায় শুয়ে থাকতেন। চণ্ডীপ্রসাদবাবু বললেন, ওটা ওঁর কৃচ্ছ্রসাধনের চেষ্টা। মশারি নিতেন না। একটা হালকা তুলোর কম্বল জোর করে তাঁকে দেওয়া হত। কিন্তু আজ তাঁর খাটিয়ার বিছানা এলোমেলো হয়ে পড়েছিল।

তুলোর কম্বলটা পড়েছিল বারান্দার নীচে। শচীনবাবু ট্রেন ধরবার জন্য তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যান। তাই ওটা লক্ষ করেননি। এদিকে তাঁর পিসি সেটা লক্ষ করলেও ভেবেছিলেন, মহীনবাবু রাগ করে তুলোর কম্বল ফেলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে তিনি এই শীতেও ঠান্ডা মেঝেয় শুয়ে থাকতেন।

হালদারমশাই বললেন,—হেভি মিস্ট্রি।

কর্নেল চুপচাপ চা খাওয়ার পর চুরুট-কেস থেকে একটা চুরুট বের করে লাইটার দিয়ে ধরালেন, তারপর ধ্যানস্থ হলেন।

এই সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল দ্রুত সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে সাড়া দিলেন।—বলুন চণ্ডীবাবু...পুকুরপাড়ে রক্ত পাওয়া গেছে? আপনি পুলিশকে চাপ দিলে পুলিশ কলকাতার ডগ স্কোয়াড থেকে শিক্ষিত কুকুর নিয়ে যেতে পারে। ওখানে যে স্যান্ডেলটা পাওয়া গেছে, তা যখন মহীনবাবুর না, তখন খুনেদেরই হতে পারে...ঠিক আছে, আপনি বলুন। যদি পুলিশ ইতস্তত করলে আমাকে জানাবেন। আমি লালবাজারে আমার জানা অফিসারদের সাহায্যে একটা ব্যবস্থা করতে পারব।...আমরা রাতের ট্রেনে যাচ্ছি।

দুই

কোনও অভিযানে বেরুনোর আগে লক্ষ করেছি কর্নেল কতকগুলো কাজ করেন। যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার পুলিশ কর্তাদের জানিয়ে যান। এটা স্বাভাবিক, কারণ খুনি হোক বা অপরাধী হোক, রহস্যের পরদা তুলে তিনি তাকে দেখিয়ে দিতে পারেন। তাই বলে তাকে গ্রেফতারের ক্ষমতা তো তাঁর নেই। তাই পুলিশ ছাড়া তাঁর চলে না। এদিকে আর-একটা সমস্যা, তাঁর নিজের চেহারা এবং বয়স নিয়ে। রহস্যের পেছনে ছোটা মানে গোয়েন্দাগিরি করা। কর্নেল অঙ্ক কষে রহস্য আঁচ করতে পারেন বটে, কিন্তু সব তথ্য জোগাড় করতে একজন চালাক-চতুর অভিজ্ঞ লোক দরকার। সেই জন্যই অনেক সময়ই তিনি প্রাক্তন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার অর্থাৎ হালদারমশাইকে সঙ্গে নেন। আর আমি তো নেহাত সাংবাদিক! কর্নেলের কীর্তিকলাপ রোমাঞ্চকর করে লিখি বটে, কিন্তু কোনও রহস্যময় ঘটনার সূত্র খুঁজে বের করা আমার সাধ্য নয়।

আরও একটা কথা বলে রাখা দরকার, এ-ধরনের অভিযানে বেরুতে হয় বলে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে আমার জন্য একটা ঘর বরাদ্দ আছে। সেখানে পোশাক-আশাক থেকে শুরু করে দাড়ি কাটার ব্লেড, টুথব্রাশ আর পেস্ট সবই থাকে। কাজেই আমার আর সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফেরা হল না। কর্নেল নীচের তলায় আমার গাড়ি রাখার জন্য একটা গ্যারেজও খালি রেখেছেন। একসময় সেখানে তাঁর একটা ল্যান্ড রোভার গাড়ি ছিল। পুরোনো গাড়ির ঝামেলা অনেক, তাই সেটা লোহা-লক্কড়ের দামে বেচে দিয়েছিলেন।

দুপুরে খাওয়ার পর আমার ভাত-ঘুমের অভ্যাস আছে। ড্রইংরুমের একটা ডিভানে যথারীতি শুয়ে পড়েছিলুম! কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো ইজিচেয়ারে বসে চুরুট টানছিলেন। তারপর একবার কানে গিয়েছিল টেলিফোনে চাপাস্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমার ভাত-ঘুম ভেঙে ছিল ষষ্ঠিচরণের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট! দেখলুম কখন আমার গায়ের ওপর কেউ একটা হালকা কম্বল চাপিয়ে দিয়ে গেছে। তার মানে আমার ঘুমটা যাতে ভালো হয়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উঠে বসে ষষ্ঠির হাত থেকে চা নিয়ে বললুম,—আমার গায়ে এই মড়ার কম্বল চাপাল কে?

ষষ্ঠি খি-খি করে হেসে উঠল। বলল,—বাবামশাই আড়াইটেতে বেরিয়ে গেছেন। যাওয়ার সময় উনিই কম্বলটা আপনার গায়ে চাপিয়ে দিয়ে গেছেন। আর-একটা কাজ করেছেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললুম,—তুমি না-বললেও বুঝেছি। আমার প্যান্টের পকেট থেকে গাড়ির চাবি চুরি করে কোথাও উধাও হয়েছেন।

ষষ্ঠি আরও হেসে বলল,—বাবামশাই বলে গেছেন, ঠিক চারটেয় তোর দাদাবাবুকে চা দিবি। আমি তো জানি, আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে বাসিমুখে চা খান। আবার দুপুরে ঘুমুলেও বিছানায় বসে আপনার চা খাওয়ার অভ্যেস আছে।

কথাটা বলে ষষ্ঠিচরণ হন্তদন্ত চলে গেল। বুঝতে পারলুম সে ছাদের বাগানে কাক তাড়াতে যাচ্ছে। কারণ এই শীতের বিকেলে পাশের বাড়ির একটা নিমগাছে কাকেরা ঝগড়া করে। আবার ঝগড়া করতে-করতে ঝাঁক বেঁধে এসে কর্নেলের সাধের বাগানে হামলা করে। সেখানে বিচিত্র প্রজাতির অর্কিড, ক্যাকটাস আর কিম্ভূত-কিমাকার সব বনসাই আছে। ষষ্ঠি হালদারমশাইয়ের পরামর্শে একটা কাকতাড়ুয়া তৈরি করেও কাকের উৎপাত থামাতে পারেননি। এ-হল গিয়ে কলকাতার কাক, কাজেই ষষ্ঠির এখন কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময়।

চা খাওয়ার পর আমি নিজেই কিচেনে গিয়ে চায়ের কাপ-প্লেট রেখে এলুম। তারপর ভাবলুম ছাদের বাগানে ষষ্ঠির যুদ্ধ দেখতে যাব, কিন্তু সেই সময় ডোরবেল বেজে উঠল। কিচেনের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা করিডর দিয়ে হেঁটে সদর দরজায় গেলুম। আইহোল-এ চোখ রেখে দেখলুম, হালদারমশাই এসে গেছেন।

এই দরজায় যে ল্যাচ-কি সিসটেম আছে, তাতে ভেতর থেকে দরজা খোলা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে দরজা খুলতে হলে চাবি চাই। আমি দরজা খুলে দিলে হালদারমশাই সহাস্যে বললেন, —ষষ্ঠি গেলে কই?

বললুম,—ষষ্ঠি এখন ছাদের বাগানে কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

এই দরজা দিয়ে ঢুকলে ডানদিকে ডাক্তারবাবুদের যেমন রোগিদের জন্য ছোট্ট ওয়েটিংরুম থাকে, তেমনি ছোট্ট একটা ঘর আছে। এই ঘর দিয়ে এগিয়ে গেল ড্রইংরুম।

আমার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে ঢুকে হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার গেলেন কই? তিনিও কি কাকের লগে ফাইট করতে গেছেন?

বললুম,—না, আমি যখন ভাত-ঘুম দিচ্ছিলুম তখন উনি আমার গাড়ি চুরি করে নিপাত্তা হয়ে গেছেন।

গোয়েন্দাপ্রবর খিল-খিল করে হেসে সোফায় বসলেন। দেখলুম তিনি একেবারে সেজেগুজেই এসেছেন। গায়ে অবশ্য হাতকাটা সোয়েটার, কিন্তু হাতে ভাঁজ করা একটা জ্যাকেটও আছে। আর আছে তার কাঁধে ঝোলানো একটা পুষ্ট পলিব্যাগ।

বললুম,—কর্নেল বলছিলেন ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যা সাড়ে-ছ'টায়। তবে ডিসেম্বরে সাড়ে-ছ'টা মানে রাত বলাই ভালো।

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন,—হ! তাই দেরি করলাম না।

বলে তিনি কণ্ঠস্বর চেপে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা জয়ন্তবাবু, আপনার কি মনে হয় কালিকাপুরের চাটুজ্যে বাড়িতে এমন কোনও দামি জিনিস আছে, যেটা হাতানোর জন্য অগো কেউ ভয় দ্যাখাইতাসে!

বললুম,—সেটা আপনি সেখানে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করে জেনে নেবেন।

বলে আমি সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দিলুম। কারণ, শীত না পড়লেও অন্ধকার নামতে দেরি করেনি। ওদিকে ততক্ষণে ষষ্ঠিচরণও ছাদ থেকে নেমে এসেছে।

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার আইলে তখন কফি খামু—কি কন?

আমি সায় দেওয়ার আগেই ড্রইংরুম-সংলগ্ন সেই ছোট্ট ওয়েটিং-রুমে কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম,—আমি এসে পড়েছি হালদারমশাই। আর ষষ্ঠিটাও আমাকে করিডরের ওদিক থেকে উঁকি মেরে দেখে ফেলেছে। আমি ভেবেছিলুম চুপিচুপি ঘরে ঢুকে ষষ্ঠিকে চমকে দেব। কিন্তু সে সম্ভবত ছাদের বাগান থেকেই জয়ন্তের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিল।

গোয়েন্দাপ্রবর ফিক করে হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু কইসিলেন আপনি ওনার গাড়ি চুরি করসেন।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হেসে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর আমার গাড়ির চাবিটা বের করে টেবিলে রাখলেন।

জিগ্যেস করলুম,—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এমন জায়গায় গিয়েছিলেন যেখানে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত, কাজেই জিগ্যেস করছি না কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন,—না, তোমাকে নিয়ে গেলে অসুবিধে হত না, কিন্তু তোমার সুনিদ্রা ভাঙাতে চাইনি।

ষষ্ঠিচরণ ট্রেতে কফির পট, দুধ, চিনি, চায়ের পেয়ালা আর এক প্লেট চানাচুর রেখে গেল। কর্নেল বললেন,—হিস-হিস, হুস-হুস—সব নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নাও। হালদারমশাই তো স্পেশাল কফি খান। কাজেই স্বাবলম্বি হওয়াই ভালো। আমরা নিজের-নিজের কফি তৈরি করে নিলুম, হালদারমশাই একটু বেশি দুধ মেশানো কফি অভ্যাস মতো ফুঁ দিয়ে-দিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

আমি বললুম,—আপনি বলছিলেন সাড়ে-ছ'টায় ট্রেন। এখন পাঁচটা বেজে গেছে। অন্তত এক ঘণ্টা আগে বেরুনো উচিত।

কর্নেল আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। তিনি কফি পান করতে করতে বুক পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। তারপর সেটা এক হাতেই খুলে টেবিলে রাখলেন। তার ওপর পেপারওয়েটের মতো আমার গাড়ির চাবিগুলো চাপা দিলেন। লক্ষ করলুম হালদারমশাই গুলি-গুলি চোখে কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছেন। বললুম,—ওই কাগজটা কোথাও আনতে গিয়েছিলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। ওতে কালিকাপুরের চ্যাটার্জি ফ্যামিলির পূর্ব-পুরুষের লুকিয়ে রাখা গুপ্তধনের খবর আছে।

কথাটা শোনামাত্র হালদারমশাই এত জোরে নড়ে বসলেন, যে তাঁর পেয়ালা থেকে খানিকটা কফি ছিটকে তাঁর প্যান্টের ওপর পড়ল। তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন,—কী কইলেন? কী কইলেন?

কর্নেল তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—গুপ্তধনের সন্ধান।

হালদারমশাই আমার দিকে ঘুরে বসে বললেন,—ঠিক এই কথাটাই আমার মাথায় আইজ সারা দিন মাসির মতন ভনভন করত্যাসিল।

আমি হাসি চেপে বললুম,—হালদারমশাই, এ-গুপ্তধনটা কর্নেলকে ফাঁকি দিয়ে আপনি আর আমি দুজনে ভাগাভাগি করে নেব—কি বলেন?

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। তেমনই গম্ভীর মুখে বললেন,—তবে গুপ্তধন সব সময়েই যে ধনরত্ন হবে, এমন কিন্তু নয়। একটু খুব পুরোনো, ধরো পাঁচশো বছরের কোনও সাধারণ জিনিসকেও গুপ্তধন বলা যায়।

বললুম,—আপনার ওই কাগজটা কিন্তু মোটেই পুরোনো নয়। একটা ছোট্ট প্যাডের একটা স্লিপ বলেই মনে হচ্ছে।

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে কফি শেষ করলেন, তারপর চুরুট ধরিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর আতস কাচটা বের করলেন। এরপর তিনি টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে আতস কাচের সাহায্যে কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—হ্যাঁ, এতে গুপ্তধনের সূত্র লেখা আছে বটে।

হালদারমশাই ব্যস্তভাবে বললেন,—কী লেখা আছে কন তো কর্নেলস্যার।

কর্নেল কাগজটা আমার হাতে দিলেন। দেখলুম এটা একটা ছোট্ট প্যাডের স্লিপই বটে। তাতে লেখা আছে :

হালদারমশাই উঁকি মেরে দেখছিলেন। বললেন,—অম্ল, মানে টক। তারপর হং, মং—এগুলিন কী?

কর্নেল বললেন,—যিনি এটা আমাকে দিয়েছেন, তাঁর কাছেই পাঁচশো বছরের বেশি পুরোনো একটা তুলোট কাগজে এগুলো লেখা আছে।

আমি অবাক হয়ে বললুম,—এটা কে আপনাকে দিল, তা বলতে আপত্তি আছে?

কর্নেল বললেন,—তুমি দুপুরে যখন স্নান করছিলে, তখন টেলিফোনে এক ভদ্রলোক তাঁর নাম ঠিকানা দিয়ে আমাকে শিগগির যেতে বলেন। আমি যথেষ্ট সতর্ক হয়েই গিয়েছিলুম, তারপর তাঁর পরিচয় পেয়ে বুঝতে পারলুম ইনি কালিকাপুরের চাটুজ্যে পরিবারেরই এক জ্ঞাতি। কালিকাপুরের চণ্ডীপ্রসাদ সিংহ তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রজীবনের সহপাঠী ছিলেন। চণ্ডীবাবুই তাঁকে ফোন করে সেখানে যা ঘটেছে তা জানিয়েছেন। চণ্ডীবাবু আমার পরিচয় এবং ফোন নম্বর তাঁকে দিয়ে বলেছেন তাঁর কাছে যে অমূল্য প্রাচীন কাগজটা আছে, তা যেন আমাকে তিনি দেন। কিন্তু তাঁর টেলিফোন পেয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলুম তখন তিনি সেই কাগজটা থেকে আমাকে দেবনাগরী লিপিতে লেখা ওই শব্দগুলো টুকে নিলেন। আমি অবশ্য মিলিয়ে দেখে নিয়েছি।

জিগ্যেস করলুম,—ভদ্রলোক কে, কোথায় থাকেন?

কর্নেল বললেন,—তাঁর নাম শরদিন্দু চ্যাটার্জি। থাকেন ভবানীপুরে। তাঁর বাবা থাকতেন কালিকাপুরে। তারপর কলকাতায় আসেন। শরদিন্দুবাবুর নেশা পাখি শিকার করা। আজকাল এসব শিকার নিষিদ্ধ। তবু শীতকালে কালিকাপুরের ওদিকে একটা বিশাল বিলে অনেক দেশি-বিদেশি জলচর পাখি আসে। শরদিন্দুবাবু অভ্যাস ছাড়তে পারেননি। গোপনে বুনো হাঁস শিকার করতে যান। তবে জ্ঞাতিদের বাড়িতে ওঠেন না। তাঁর আশ্রয় চণ্ডীবাবু। হাঁস শিকার করতে পারলে সেদিনই তিনি তাঁর ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। তাঁর যাওয়ার কথা ছিল আজ। কিন্তু একটা কাজে আটকে পড়েছেন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। তাই কোর্টের ছুটি না থাকলে তাঁর কালিকাপুর যাওয়া হয় না।

বললুম,—তাহলে তিনি সেখানে যাচ্ছেন না?

কর্নেল বললেন,—আর কয়েকদিন পরেই তো বড়দিন—পঁচিশে ডিসেম্বর, কাজেই তার আগের দিন তিনি সন্ধ্যার ট্রেনে যাবেন।

হালদারমশাই টান হয়ে শুয়েছিলেন। বললেন,—এই ভদ্রলোকেরে আমার সন্দেহ হইত্যাসে। আইনজীবী হইয়াও তিনি আইন ভঙ্গ করেন।

কর্নেল এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন,—আপনি কি তিনটে দিন অপেক্ষা করে শরদিন্দুবাবুর গতিবিধির দিকে লক্ষ রাখবেন? তারপর না হয় ওঁকে ফলো করেই কালিকাপুরে যাবেন।

হালদারমশাই কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—নাঃ, যখন বারাইয়া পরসি তখন আর কোনও কথা না। তেমন বুসলে আমি কালিকাপুরে থাইক্যা যামু।

এইসব কথাবার্তা হতে-হতে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল। তারপর কর্নেল কাগজটা নিজের পকেটে ভরে বললেন,—জয়ন্ত এই তোমার গাড়ির চাবি আমি আলমারির লকারে রেখে যাব। যাও তুমি রেডি হয়ে নাও। এই সময়টা রাস্তায় বড্ড জ্যাম হয়। হাতে সময় রেখে বেরুনোই ভালো। তা ছাড়া লোকাল ট্রেন। আমার টিকিট কাটার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের দুজনের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করতে হবে।

হালদারমশাই আড়মোড়া দিয়ে সোফায় হেলান দিলেন। কর্নেল তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আর আমি ঢুকলুম আমার জন্য সংরক্ষিত ঘরে। শীতকাল বলে আমার ঘরে বাড়তি জ্যাকেট সোয়েটার, কান-ঢাকা-টুপি—সবই রাখা ছিল। তবে আমার পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের সিক্স রাউন্ডার রিভলভারটা ছিল আমার হ্যান্ড ব্যাগে। ওটা সবসময়েই কর্নেলের উপদেশে আমি সঙ্গে রাখি। একটা বাড়তি ব্যাগে দরকারি জিনিসপত্র পোশাক-আশাক ভরে নিয়ে আমি ড্রইংরুমে এলুম। তারপর এলেন কর্নেল। আর কর্নেলের গলায় দেখলুম যথারীতি বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছে। তাঁর পিঠে আঁটা কিটব্যাগ, আর হাতে একটা পুষ্ট মোটাসোটা ব্যাগ।

বেরুতে যাচ্ছি টেলিফোনটা বাজল। বিরক্ত হয়ে কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। তারপর কাকে কৌতুক করে বললেন,—হ্যাঁ বলি হতেই তো যাচ্ছি দাদা!

হালদারমশাই চমকে উঠে বললেন,—কেডা কী কইল?

কর্নেল বললেন,—ও কিছু না, চলুন।

তিন

সে-রাতে কালিকাপুর স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছেছিল, তখন টের পেয়েছিলুম শীত কাকে বলে! প্রচণ্ড কনকনে শীতের রাতটা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের পরিবেশ তৈরি করেছিল। কারণ, কর্নেলের বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় কেউ হুমকি দিয়েছিল। কাজেই আমি চারদিকে সতর্ক চোখে লক্ষ করছিলুম। কর্নেল অবশ্য নির্বিকার। হালদারমশাই লোকের ভিড় ঠেলে যেতে-যেতে একবার বলেছিলেন,—কী কাণ্ড! কলকাতায় ফ্যান চলত্যাসে, আর এখানেও ফ্যান চলত্যাসে।

এই ধাঁধার জবাব পেলুম একটু ফাঁকায় গিয়ে। নীচের চত্বরে সাইকেলরিকশা, এক্কাগাড়ি, আর বাস—এইসব যানবাহনের ভিড়। হালদারমশাইকে জিগ্যেস করেছিলুম,—কলকাতা আর এখানে ফ্যান চলছে বলছিলেন—ব্যাপারটা কী?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—বুজলেন না, ওখানে চলত্যাসে ইলেকট্রিক ফ্যান আর এখানে চলত্যাসে নেচারের ফ্যান।

এতক্ষণে লক্ষ করেছিলুম কথা বলতে গেলেই মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুচ্ছে। কর্নেল এদিক-ওদিক ঘুরে চণ্ডীবাবুর পাঠানো গাড়ি খুঁজছিলেন। একটু পরেই যাত্রীদের নিয়ে সব যানবাহন চলে গেল, কিন্তু কোনও প্রাইভেট গাড়ি চোখে পড়ল না।

কর্নেল বললেন,—আবার কোনও গণ্ডগোল হয়নি তো? চণ্ডীবাবুর গাড়ি দেখছি না কেন?

হালদারমশাই বললেন,—কর্নেলস্যার, এই শীতে মাটির ভাঁড়ে চা খাইয়া লই। গাড়ি ঠিক আইয়্যা পড়বে।

হালদারমশাই চায়ের দোকানের দিকে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় হর্ন দিতে-দিতে একটা মেরুন রঙের প্রাইভেট গাড়ি এসে আমাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ড্রাইভার নেমে কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল,—পথে একটু দেরি হয়ে গেছে স্যার। বেশি ঠান্ডায় গাড়ির ইঞ্জিন ঠিক মতো কাজ করছিল না। এখন ঠিক হয়ে গেছে, আপনারা উঠে পড়ুন।

কর্নেল সামনের সিটে এবং আমরা দুজনে পেছনের সিটে বসলুম। তারপর ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে স্পিড বাড়াল। জানলার কাচ তোলাই ছিল, তবু কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় জবুথবু হয়ে বসে থাকলুম। রাস্তাটা তত ভালো নয়, তাই ঝাঁকুনির চোটে অস্থির হচ্ছিলুম। দু-ধারে সারবদ্ধ গাছপালা হেডলাইটের আলোয় দেখা যাচ্ছিল। কর্নেল ড্রাইভারের সঙ্গে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু সেদিকে আমার কান ছিল না। কেন যে আমি পুরু জ্যাকেটটা পরে আসিনি! তার বদলে এই হালটা জ্যাকেট আর ভেতরে একটা পাতলা সোয়েটার এখানকার শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। মিনিট পনেরো পরে লক্ষ করলুম, সামনে গাছপালার ফাঁকে গাঢ় কুয়াশার ভেতরে জোনাকির মতো আলো দেখা যাচ্ছে। জনপদের ভেতর ঢুকে শীতের কামড়টা একটু কমে এল। এটা বাজার এলাকা। এত রাত্রে জনমানবহীন হয়ে আছে। তারপর বাঁক নিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে যেখানে পৌঁছুলুম সেদিকটায় রাস্তার আলো নেই। কিন্তু একটা বাড়ির গেটে আলো জ্বলছিল। দারোয়ান গেট খুলে দিল। তারপর লন দিয়ে এগিয়ে গাড়ি পোর্টিকোর তলায় থামল। আমরা নিজের-নিজের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গাড়ি থেকে নামলুম।

ততক্ষণে কর্নেলও নেমেছেন। দেখলুম সিঁড়ির মাথায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে সোয়েটার এবং পরনে প্যান্ট। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রায় কর্নেলের বয়সি। এই ভদ্রলোকের মুখে অবশ্য দাড়ি নেই, তবে দেখার মতো গোঁফ আছে। মাথার চুলও সাদা। তিনি কয়েক ধাপ নেমে এসে কর্নেলের সঙ্গে হ্যান্ডসেক করলেন। তারপর বললেন,—আমি ভাবছিলুম ট্রেন লেট করেছে।

ড্রাইভার গাড়ির ভেতর থেকে বলে উঠল,—না স্যার, পথে ইঞ্জিন গোলমাল করছিল। কালকে একবার গ্যারেজে দেখিয়ে আনতে হবে।

ভদ্রলোক আমাদের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন,—আসুন।

ভেতরে একটা প্রশস্ত ঘর। সেকেলে আসবাবপত্র। এ-ধরনের বনেদি ধনী পরিবারের বাড়ি কর্নেলের সঙ্গগুণে আমার দেখা আছে। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা দরজা দিয়ে করিডরে ঢুকলুম। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা গাঁটগোঁট্টা চেহারার লোক করিডরের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তার চেহারা প্রচণ্ড কালো। সে দু-হাত জোড় করে সামনের দিকে ঝুঁকে বলল,—কর্নেলসাহেবকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। আপনি আসবেন শোনার পর থেকেই আমি শুধু অপেক্ষা করছিলুম। কর্তামশাই আমাকে নন্দ-ড্রাইভারের সঙ্গে স্টেশনে যেতে দিলেন না।

চণ্ডীবাবু কপট ধমক দিয়ে বললেন,—এই কেতো, যাত্রাদলের পার্ট করবি, না সাহেবদের ঘরে নিয়ে যাবি?

সে পাশের একটা ঘরের পরদা সরিয়ে বলল,—সবকিছু রেডি কর্তামশাই। সাহেবরা বসুন, আমি ঠাকুরমশাইকে দেখি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—এক মিনিট। কর্নেলসাহেব এত রাতে কি আর কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—খাব। তবে ডিনারের পরে। কার্তিক, তুমি ঠাকুরমশাইকে কথাটা মনে করিয়ে দিয়ো।

মোটামুটি প্রশস্ত একটা সাজানো-গোছানো ঘরে আমরা ঢুকেছিলুম। দু-ধারে দুটো খাট। একপাশে সোফা। চণ্ডীবাবু কোণের একটা চওড়া টেবিল দেখিয়ে বললেন,—ব্যাগগুলো ওখানে রেখে কর্নেলসাহেব আরাম করে বসুন। আপনার ইজিচেয়ারটা কিন্তু আমি ওপর থেকে আনিয়ে রেখেছি।

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগটা খুলে টেবিলে রাখলেন। তারপর ক্যামেরা এবং বাইনোকুলারটা একপাশে রেখে দিলেন। তিনি ইজিচেয়ারে বসে মাথার টুপিটা খুলে দেওয়ালের একটা ব্র্যাকেটে আটকে দিলেন। তারপর ইজিচেয়ারে বসে চওড়া টাকে হাত বুলোতে থাকলেন।

ততক্ষণে আমরা সোফায় বসেছি। ঘরের ভেতরটা বেশ আরামদায়ক।

চণ্ডীবাবু বললেন,—একটা রুম হিটার আছে, জ্বেলে দেব নাকি?

কর্নেল বললেন,—না মিস্টার রায়চৌধুরী। আমার সঙ্গীদের একটু শীতের আরাম পাওয়া দরকার। কলকাতায় এখনও ফ্যান চালাতে হচ্ছে।

চণ্ডীবাবু সোফার একপাশে বসে বললেন,—উনি আপনার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী, তা বোঝা যাচ্ছে। আর ইনিই সেই প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিস্টার কে কে হালদার। কি? আমি ভুল করিনি তো?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—নাঃ, আপনি ঠিক ধরসেন। তবে একসময় আমি পুলিশ লাইফে অনেক গ্রামে ঘুরসি, কিন্তু আপনাগো এখানে শীত ক্যান?

চণ্ডীবাবু বললেন,—শীত বদলায়নি। আসলে বদলে গেছেন আপনি। কলকাতায় থাকলে মানুষের অনেক অদলবদল ঘটে যায়।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, চাটুজ্যে বাড়ির কেস সম্পর্কে পুলিশ কতদূর এগিয়েছে? আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—লালবাজার থেকে আপনার সুপারিশে পুলিশ একটা কুকুর এনেছিল। সাভেলটা শুঁকিয়ে কুকুরটাকে শুনেছি কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কুকুরটা পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা গলি রাস্তায় গিয়েছিল। তারপর আর সে কোনওদিকে এগোয়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেছি ওই গলির পাশে একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ম্যাটাডোরে বোঝাই করে বাড়ির মালমশলা নিয়ে আসা হচ্ছে। তাই পুলিশের সন্দেহ খুনিরা বা খুনি ওই ম্যাটাডোরে চেপে পালিয়ে গেছে।

হালদারমশাই বলে উঠলেন,—পুলিশ ম্যাটাডোরের ড্রাইভার বা যার বাড়ি হইত্যাসে তাগো জেরা করে নাই?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—জেরা করেছে, কিন্তু কোনও সূত্রই বেরিয়ে আসেনি। অবশ্য এমন হতেই পারে প্রাণের ভয়ে ড্রাইভার মুখ খুলতে চায়নি।

কথাটা বলে তিনি ঘড়ি দেখলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—আপনারা বাথরুমে হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। গরম জলের ব্যবস্থা আছে। আমি দেখি, খাওয়ার ব্যবস্থা কতটা হল।

তিনি বেরুবার আগেই কার্তিক এসে গেল। সে বলল,—সব রেডি স্যার। আপনারা এখনই আসুন। যা শীত পড়েছে খাবার গরম থাকছে না।

নীচের তলায় ডাইনিংরুমে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা গেস্টরুমে ফিরে এলুম। তারপর কার্তিক এসে বলল,—একজনের শোওয়ার ব্যবস্থা পাশের ঘরেই হয়েছে। এই ঘর থেকে যাওয়া যায়। ওই দেখুন দরজা।

হালদারমশাই টেবিল থেকে তাঁর ব্যাগ তুলে নিয়ে একটু হেসে বললেন,—আমি ওই ঘরে যাই।

কর্নেল বললেন,—যান, কিন্তু সাবধান। এ-বাড়িতেও ভূতের উৎপাত আছে। বাইরের দিকে কেউ কড়া নাড়লে যেন দরজা খুলে বেরুবেন না।

কার্তিক হালদারমশাইকে আমাদের ঘরের মাঝের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সে হালদারমশাইকে সব দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে দিয়ে আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেল।

চণ্ডীবাবু পাইপ টানছিলেন। আর কর্নেল অভ্যাসমতো কফি পান করছিলেন। আমি পুরু কম্বলের তলায় ঢুকে পড়েছিলুম। দুজনে চাপা গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলুম না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি।

সেই ঘুম ভেঙেছিল কার্তিকের ডাকে। তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম কর্নেলের নির্দেশ সে পালন করছে। সে আমার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিয়েই বলল,—আমার কর্তামশাইয়ের সঙ্গে কর্নেলসাহেব আর হালদারসাহেব ভোরবেলা বেরিয়ে গেছেন। কিছু দরকার হলে আমি আছি। ওই বেলটা টিপবেন, তাহলেই আমি এসে যাব।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে সাতটা বাজে। উলটোদিকের জানলা খোলা। পরদার ফাঁকে ম্লান রোদের আভা। কার্তিক বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি বেড-টি খাওয়ার পর উলটোদিকের দরজা খুলে দেখলুম, এদিকে টানা বারান্দা। আর নীচে রং-বেরঙের ফুলের গাছ। তখনও রোদের সঙ্গে কুয়াশা মিশে আছে। বাউন্ডারি ওয়ালের উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছিল। পাঁচিলের ধারে সারবদ্ধ গাছ। কিন্তু ঠান্ডায় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো গেল না।

কর্নেলরা যখন ফিরে এলেন, তখন প্রায় ন'টা বাজে। অভ্যাসমতো কর্নেল বললেন,—মর্নিং জয়ন্ত। আশাকরি কোনও অসুবিধে হয়নি?

বললুম,—না। আপনাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আপনারা কি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন?

হালদারমশাই এসেই নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন। কর্নেল কিছু বলার আগে তিনি দ্রুত ফিরে এসে ধপাস করে সোফায় বসে বললেন,—আরে কী কাণ্ড!

কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে টুপি, বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা গলা থেকে খুলে পাশের টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন,—হ্যাঁ কাণ্ডই বটে। তবে একটা কথা আপনাকে বলা দরকার হালদারমশাই। অমন করে যেখানে-সেখানে ফায়ার আর্মস বের করবেন না।

গোয়েন্দাপ্রবর কাঁচুমাচু হেসে বললেন,—হ! উচিত হয় নাই। আসলে আমাগো ভূতের ভয় দেখাইতে চায়—এত সাহস!

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হ্যাঁ। আপনি একসময় পুলিশ অফিসার ছিলেন, আপনার রাগ হওয়ারই কথা। তবে ভাগ্যিস ঢিলগুলো সেইরকম নুড়িপাথর নয়! তাহলে আমাদের চোট লাগত।

জিগ্যেস করলুম,—ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন,—গঙ্গার ধারে বাঁধের পথে আমরা যাচ্ছিলুম। হঠাৎ গাছপালার আড়াল থেকে ঢিল এসে পড়তে শুরু করল। তবে মাটির ঢিল। গঙ্গার ধারের মাটি খুব নরম, তাই ঢিলগুলো ভেঙে যাচ্ছিল। চণ্ডীবাবু ছিলেন আগে। তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। আর হালদারমশাই রিভলভার বের করে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন।

বলে কর্নেল তাঁর অনুকরণ করে শোনালেন,—কোন হালা রে! দিমু মাথার খুলি ঝাঁঝরা কইর‍্যা। শুধু তাই নয়, তিনি বাঁধ থেকে নেমে ঝোপজঙ্গল ভেদ করে ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁকে চণ্ডীবাবুই পেছন থেকে টেনে ধরেছিলেন। আর জায়গাটা কোথায় জানো?

কালিকাপুরের শ্মশান। তাই ওখানে কোনও বসতি নেই। তা ছাড়া, গঙ্গার ভাঙন রোধে বনদপ্তর থেকে বাঁধের নীচে একটা শালবনও গড়ে তোলা হয়েছে।

হালদারমশাই যে মনে-মনে ক্ষুব্ধ তা বুঝতে পারছিলুম। তিনি নস্যির কৌটো বের করলেন। কিন্তু তখনই কার্তিক একটা বিশাল ট্রেতে কফি এবং স্ন্যাক্স এনে রাখল। তার পেছনে এলেন চণ্ডীবাবু।

কার্তিক চলে গেল। আমরা কফি পানে মন দিলুম। একসময় চণ্ডীবাবু হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—মিস্টার হালদারকে আমি যদি না-আটকাতুম, তাহলে উনি নিশ্চয়ই এক রাউন্ড ফায়ার করে অন্তত একটা ভূতকে ধরাশায়ী করতেন।

হালদারমশাই বললেন,—ঠিক কইসেন। একখান গুলি অন্তত একজন ভূতের হাঁটুর নীচে লাগত।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই ঘন কুয়াশার মধ্যে আপনারাও কিন্তু বিপদের আশঙ্কা ছিল।

কর্নেল বললেন,—একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে মিস্টার রায়চৌধুরী। কলকাতা থেকেই কেউ বা কারা আমাদের অনুসরণ করেছে। রাত্রে আমরা গাড়িতে আসায় তারা সুবিধে করতে পারেনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমাদের একটু সতর্ক থাকা ভালো।

হালদারমশাই বললেন,—আর শচীনবাবুও যেমন কেমন বদলাইয়া গেসেন। কলকাতায় ওনাকে মনে হইত্যাসিল খুব সরল মনের মানুষ। কিন্তু এখানে মনে হইল ম্যানো কিছু গোপন করবার চেষ্টা করত্যাসেন।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—আপনি অভিজ্ঞ মানুষ, ঠিকই ধরেছেন। ওই শচীনই আমাকে ওর জ্ঞাতি অ্যাডভোকেট শরদিন্দুবাবুর কাছে রক্ষিত ওদের পূর্বপুরুষের একটা দলিলের কথা বলত। কিন্তু কর্নেলসাহেব যখন জানতে চাইলেন উনি কেন নিজে সেটা শরদিন্দুবাবুর কাছে স্বচক্ষে দেখতে চাননি, তখন শচীন ন্যাকা সেজে বলল ওটা তেমন কিছু নয়। তার বাবা নাকি বলেছে ওটার কোনও মূল্যই নেই।

কর্নেল বলে উঠলেন,—হ্যাঁ, শচীনবাবুর কথাটা আমাকেও অবাক করেছে। আমি যখন ওঁকে সেই কাগজটা দেখিয়ে বললুম, এটা তিনি চেনেন কি না, এবং এও বললুম, এটা তাঁদের সেই পূর্বপুরুষের রক্ষিত কাগজে যা লেখা আছে তার কপি, তখন শচীনবাবু একবার চোখ বুলিয়েই বললেন, এটা বাজে। আসল কাগজটা নাকি শরদিন্দুবাবু আমাকে দেখাননি।

এই সময় কার্তিক পরদার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে বলল,—কর্তামশাই, আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু তখনই তাঁর কফির কাপে প্লেট ঢাকা দিয়ে আসছি বলে দ্রুত চলে গেলেন।

হালদারমশাই চাপাস্বরে বললেন,—আমার ধারণা, চণ্ডীবাবু আমাগো সঙ্গে থাকায় শচীনবাবু হয়তো মন খুইল্যা কথা কইতে পারেন নাই। কর্নেলস্যার যদি আমারে একটা শচীনবাবুর লগে দেখা করতে কন আমি যামু।

কর্নেল বললেন,—যেতে পারেন, কিন্তু খুব বেগতিক না দেখলে যেন রিভলবার বের করবেন না।

একটু পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে বললেন,—থানা থেকে ওসি প্রণবেশবাবু ফোন করেছিলেন। উনি কর্নেলসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন।

চার

ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে চললেন। কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো সামনের সিটে বসলেন। আমি এবং হালদারমশাই ব্যাক সিটে বসলুম। এই এলাকাটা নিরিবিলি নির্জন। ঘন বসতি এলাকায় পৌঁছে হালদারমশাই বলে উঠলেন,—মিস্টার রায়চৌধুরী, আমাকে এখানেই নামাইয়া দেন।

কর্নেল কিছু বললেন না। কিন্তু চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনি কি চাটুজ্যে বাড়ি যেতে চান?

হালদারমশাই বললেন,—হ। আমি একবার নিজের বুদ্ধিতে পা ফালাইয়া দেখতে চাই।

আমি বললুম,—দেখবেন, আড়াল থেকে ভূতের হাতের ইট-পাটকেল যেন না এসে পড়ে।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসি মুখে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। এখন তাঁর মাথায় হনুমান টুপি নেই। গলা-বন্ধ পুরু সোয়েটার আর প্যান্ট পরা ঢ্যাঙা মানুষটি ঠিক পুলিশের ভঙ্গিতেই এগিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন,—যাই বলুন কর্নেলসাহেব, মিঃ হালদার খুব সাহসী মানুষ। পুলিশ জীবনে উনি সম্ভবত আরও জেদি আর দুঃসাহসী ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—ওঁকে নিয়ে একটাই সমস্যা। অনেক সময়েই উনি ভুলে যান যে উনি এখন আর পুলিশ অফিসার নন।

বাজার এলাকা পেরিয়ে বাঁ-দিকের গঙ্গার ধারে এদিকটায় বাঁধের ওপর পিচ রাস্তা করা হয়েছে। সেই রাস্তায় সবরকমের যানবাহন যাতায়াত করছে। আমাদের ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে গঙ্গার ভাঙন রোধ করার জন্য শাল আর শিশু গাছের ঘন জঙ্গল গড়ে তোলা হয়েছে। এদিকটায় ঘরবাড়িগুলো বেশ সাজানো-গোছানো এবং প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে একটা করে ফুলবাগিচা। চণ্ডীবাবু বললেন,—এই দিকটায় নিউ টাউনশিপ গড়ে উঠেছে। এলাকার পয়সাওয়ালা লোকেরা এখানে এসে বাড়ি করেছেন।

কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় পৌঁছলুম। দেখলুম ডান দিকে গঙ্গা পারাপারের ঘাট আর বাঁদিকে সেকাল-একালে মেশানো সব দোতলা পাকা বাড়ি। কর্নেল বললেন,—কালিকাপুরের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু সরকারি অফিসগুলোর অবস্থা দেখছি একইরকম। ওই বাড়িটা সেই ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের অফিস না?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটার পেছনেই থানা। তবে থানার বাড়িটা দোতলা করা হয়েছে এবং অনেক ভোল ফেরানো হয়েছে।

গাড়ি আবার বাঁ-দিকে ঘুরে যেখানে দাঁড়াল, সেখানে সামনা-সামনি একটা গেট। গেটটা খোলাই ছিল। ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়ে একপাশে পার্ক করলেন চণ্ডীবাবু। পুলিশের জিপ আর বেতার ভ্যান দেখে বুঝতে পারলুম, এটাই থানা। গাড়ি থেকে নেমে কর্নেল এবং চণ্ডীবাবু এগিয়ে গেলেন। আমি নেমে গিয়ে চণ্ডীবাবুকে বললুম,—গাড়ি লক করে এলেন না?

চণ্ডীবাবু একটু হেসে বললেন,—আপনি ঠিকই বলেছেন, লক করে আসা উচিত ছিল। ওসি প্রণবেশবাবু নিজেই বলেন,—থানা থেকে চুরির আশঙ্কা বেশি।

একটা ঘরের জানলা দিয়ে দেখলুম, এক ভদ্রলোক সাদা পোশাকে বসে আছেন। চণ্ডীবাবু আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বললেন,—এই দেখুন, আপনার সেই কিংবদন্তিখ্যাত ব্যক্তি।

তখনই বুঝতে পারলুম ইনিই ওসি মিস্টার প্রণবেশ সেন। তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। সকৌতুকে বললেন,—আমি স্বপ্ন দেখছি, না বাস্তব কিছু দেখছি সেটা পরীক্ষা করে নিই।

কর্নেল হাত বাড়িয়ে দিলে তিনি দু-হাতে হাত চেপে ধরে বললেন,—সত্যি আমার জীবন ধন্য হল। আপনার কথা এতকাল উঁচুতলার অফিসারদের মুখে শুনে আসছি, আপনাকে যে স্বচক্ষে দর্শনের সৌভাগ্য হবে কল্পনাও করিনি।

কর্নেল সামনের খালি চেয়ারে বসলেন। তাঁর একপাশে চণ্ডীবাবু অন্যপাশে আমি বসলুম। প্রণবেশবাবু আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—আপনি নিশ্চয়ই সেই খ্যাতনামা সাংবাদিক, জয়ন্ত চৌধুরী? এবার আপনাকে ছুঁয়ে দেখি।

অগত্যা আমাকেও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে হল।

প্রণবেশবাবু বললেন,—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় জয়ন্তবাবুর যা রেপোর্টার্জ বেরোয়, আমার গিন্নি তা খুঁটিয়ে পড়েন।

এইসব এলোমেলো কথাবার্তার পর ওসি মিস্টার সেনের কোয়ার্টার থেকে একজন কনস্টেবল ট্রেতে কফি আর স্ন্যাকস নিয়ে এল। সে মৃদুস্বরে বলল,—মাইজি সাহেবদের সঙ্গে একবার আলাপ করতে চান।

মিস্টার সেন বললেন,—তোমার মাইজিকে অপেক্ষা করতে বলো। কর্নেলসাহেবরা এসেছেন বিশেষ একটা কাজে।

কনস্টেবল সেলাম ঠুকে চলে গেল।

আমার আর কফি পানের ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কাপটা তুলে নিতেই হল। কারণ এই কফি যিনি তৈরি করে পাঠিয়েছেন, সেই ভদ্রমহিলা আমার লেখার ভক্ত। ওসি মিস্টার সেন কফিতে চুমুক দিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—ব্লাড রিপোর্টের সারমর্ম আজ সকালেই টেলিফোনে পেয়ে গেছি। ফরেনসিক এক্সপার্টদের মতে রক্তটা মানুষের নয়।

চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বললেন,—মানুষের রক্ত নয়? তাহলে কীসের রক্ত?

ওসি একটু হেসে বললেন,—কোনও মানবেতর প্রাণীর রক্ত। যে কারণেই হোক, কেউ বা কারা চ্যাটার্জিবাবুদের ভয় দেখাতে চেয়েছে। ভূতের উৎপাতে ওঁরা ভয় পাচ্ছেন না দেখেই সম্ভবত একটা সাংঘাতিক ঘটনা সাজিয়েছে।

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, মহীন কোথায় গেল? না কি সে সত্যিই সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছে, এবং তার ঘনিষ্ঠ কোনো লোককে সে সেকথা জানিয়ে গেছে, এবং তার সূত্রেই চাটুজ্যেদের কোনও শত্রু এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে।

ওসি বললেন,—হ্যাঁ। এ-ধরনের অনেক সিদ্ধান্তে অবশ্য আসা যায়, তবে সবার আগে শচীনবাবু কিংবা তাঁর বাবা যদি আমাদের কাছে কোনও কথা না লুকিয়ে খোলাখুলি বলে দেন, তাহলে আমাদের এগোতে সুবিধে হয়।

এতক্ষণে কর্নেল বললেন,—আপনারা নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই।

ওসি বললেন,—না কর্নেলসাহেব, আমাদের তদন্তের কাজ যথারীতি চলছে।

এই সময়েই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—আজ ভোরে গঙ্গার ধারে, বেড়াতে গিয়ে আপনারা কাদের ঢিল খেয়েছেন! তার মানে—

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমরা কারুর ঢিল খাব কেন? আমাদের সঙ্গী হালদারমশাইয়ের হাবভাব দেখে কাচ্চা-বাচ্চারা পাগল বলে ঢিল ছুঁড়তেই পারে।

তখনই বুঝতে পারলুম, কথাটা বলা আমার উচিত হয়নি। কর্নেল খুব দরকার না হলে কোনও কেসে নিজের হাতের তাস পুলিশকে দেখাতে চান না।

এদিকে কর্নেলের কথা শুনে চণ্ডীবাবু হেসে উঠেছিলেন। আর ওসি প্রণবেশ সেনও হাসতে-হাসতে বললেন,—হালদারমশাই মানে সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোক? যাঁর কথা জয়ন্তবাবুর রেপোর্টাজে পড়েছি। তিনি তো রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর। তো তাঁকে সঙ্গে আনলেন না কেন?

কর্নেল বললেন,—হালদারমশাই এখানকার ঠান্ডায় একেবারে নেতিয়ে গেছেন। তাই শরীর গরম করার জন্য তিনি পায়ে হেঁটে সারা কালিকাপুর ঘুরে দেখতে চান। এতে নাকি তাঁর শরীর আবার গরম হয়ে উঠবে।

প্রণবেশবাবু হেসে উঠলেন। বললেন,—পায়ে হেঁটে কালিকাপুর পুরোটা ঘুরে দেখতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। যাই হোক, এবার একটা সিরিয়াস কথায় আসছি। শচীনবাবু কাল সন্ধ্যায় থানায় এসেছিলেন। উনি বলেছিলেন ওঁর বাবা নাকি কিছুদিন থেকে প্রায়ই বলছেন এই বাড়ির ওপর কোনও কুপিত গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে। বাড়িটা বেচে দিয়ে নিউ টাউনশিপ এলাকায় যাওয়া উচিত। কিন্তু শচীনবাবুর বক্তব্য ওই এলাকায় জমির দাম অনেক বেশি। তা ছাড়া, ঠাকুরবাড়ি ফেলে রেখে অন্য জায়গায় গেলে গৃহদেবতা রুষ্ট হবেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ক'দিন আগে আমি শচীনের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলুম। অহীনকাকা আমার হাত চেপে ধরে বললেন,—চণ্ডী, এই বাড়ি থেকে আমাদের চলে যাওয়া দরকার। তুমি অন্তত একটা ভাড়ার বাড়িও দেখে দাও আমাদের। আজকাল তো কালিকাপুরে অনেক সরকারি অফিস হয়েছে, অনেকে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে শুনেছি।

আমি অহীনকাকুকে বলেছিলুম,—আপনারা তো এখানে ভালোই আছেন। এরকম চারিদিকে মোটামুটি খোলামেলা বাড়ি কোথাও পাবেন না।

তখন অহীনকাকু চাপাস্বরে আমাকে বললেন,—রোজ রাত্রে বিনোদ পাগলার প্রেত এসে হানা দিচ্ছে। ভয় পাবে বলে শচীন বা আমার ভাই মহীনকে কথাটা বলিনি। চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে আরও বললেন,—অহীনকাকু নাকি ঘরের ভেতরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এমনকি তাঁর বোন বাসন্তীও নাকি রাতদুপুরে স্পষ্ট তাকে দেখেছে। মেয়েদের সাহস বেশি, আর বাসন্তীর তো সাহসের সীমা নেই।

ওসি মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ, ওই পাড়ায় ভূতের গল্প জোর রটে গেছে। তারপর হঠাৎ এই হাড়িকাঠে রক্তপাত। আফটার অল সব গ্রামের মানুষ তো! সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দরজা এঁটে বাড়িতে ঢুকে থাকছে। গত একসপ্তাহ ধরে ওই এলাকায় পুলিশ রাউন্ডে গেছে, কিন্তু রাস্তায় কোনও লোকজন দেখতে পায়নি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—মিস্টার সেন, তাহলে এবার ওঠা যাক।

ওসি মুখে কৌতুক ফুটিয়ে বললেন,—আপনি কি সরেজমিনে তদন্ত করতে চাটুজ্যে বাড়ি যাবেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—একবার যেতে ইচ্ছে করছে। কারণ আপনার মুখে যে সূত্রটা পেলুম সেটা গুরুত্বপূর্ণ। রক্তটা মানুষের যে নয়, কোনও জানোয়ারের, ওটা যখন জানা গিয়েছে তখন ভূতের উপদ্রব কিংবা মহীনবাবুর অন্তর্ধান রহস্য অন্যদিক থেকে ভেবে দেখার দরকার আছে।

ওসি প্রণবেশ সেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কর্নেলসাহেব, পুলিশ সুপার আমাকে না বললেও, আমি আপনাকে সবরকমের সাহায্যের জন্য তৈরি থাকব। শুধু একটা অনুরোধ, একবার আপনি

জয়ন্তবাবু এবং মিস্টার হালদারকে আমার গৃহিণীর সামনে উপস্থিত করাবেন। সোজা কথায় বলছি চণ্ডীবাবুসহ আপনাদের তিনজনকে একবার আমার গৃহিণীর হাতের রান্না খেতে হবে।

কর্নেল বললেন,—অবশ্যই। তবে আগে চাটুজ্যে বাড়ির রহস্যটা ফাঁস করতে হবে। আপনার সাহায্যও দরকার হবে। তারপর আপনার নেমন্তন্ন খাওয়া যাবে।

প্রণবেশ সেন আমাদের গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে বিদায় দিলেন। রাস্তায় পৌঁছে আমি বললুম,—ভদ্রলোককে পুলিশ বলে একদমই মনে হল না। অত্যন্ত সরল সাদাসিধে মানুষ।

চণ্ডীবাবু গাড়ির গতি কমিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা হেসে বললেন,—জয়ন্তবাবু, আজ অবধি কালিকাপুরে এই ভদ্রলোকের মতো কোনও অফিসার আসেননি। উনি আসার পর একবছরেই এলাকার দাগি অপরাধীরা কেউ জেলে পচছে আবার কেউ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি এলাকার একজন দাগি অপরাধী কাল্লু মিঞা, সেনসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে-বলতে একেবারে কাঁপড়ে-চোপড়ে—

চণ্ডীবাবু মুখ ফিরিয়ে হাসতে থাকলেন। কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত এতদিন ধরে আমার সঙ্গে ঘুরে অসংখ্য পুলিশ অফিসার দেখেছে। তবু এখনও ও পুলিশ সম্পর্কে অজ্ঞ।

অনেক অলিগলি ঘুরে আমাদের গাড়ি যেখানে দাঁড়াল, সেখানে কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। ডানদিকে একটা আমবাগান আর বাঁ-দিকে একটা পুকুর। পুকুরের পশ্চিমপাড়ে একটা পুরোনো মন্দির। গাড়ি থেকে নেমে বললুম,—আমার ধারণা ওটাই সেই চাটুজ্যে বাড়ির গৃহদেবতার মন্দির।

চণ্ডীবাবু এখানে কিন্তু গাড়ি লক করলেন। ততক্ষণে কর্নেল হনহন করে পুকুরের পাড় দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলুম। মন্দিরের সামনে একটা চত্বর। চত্বরে একটা পশুবলি দেওয়ার হাড়িকাঠ পোঁতা আছে।

হাড়িকাঠে অবশ্য সিঁদুর মাখানো আছে, কিন্তু কোথাও আর রক্তের কোনও চিহ্ন নেই। চণ্ডীবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—রক্ত কালই পুলিশ এসে ধুয়ে ফেলেছে। কিছুটা নমুনা অবশ্য নেওয়া হয়েছিল।

মন্দিরের কোনও দরজা দেখলুম না। তবে একটা শিবলিঙ্গ দেখতে পেলুম। কর্নেল মন্দিরের পেছন দিকে ঘুরে আমার সামনে এলেন। সেই সময়েই এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা পাশের বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন। চণ্ডীবাবু বললেন,—বাসন্তীদি, চিনতে পারছ, এঁরা কে?

ভদ্রমহিলা করজোড়ে নমস্কার করে বললেন,—পেরেছি বইকি! শচীনের মুখে কর্নেলসাহেবের কথা শুনেছি। আপনারা দয়া করে বাড়ির ভেতরে আসুন।

বুঝতে পারলুম এই দরজা দিয়ে মন্দির এবং চত্বরের নীচে পুকুরের ঘাটে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখলুম, একতলা একটা পুরোনো বাড়ি। অন্যপাশে একটা টালির চালের তিনদিক ঘেরা ঘর। ওটা রান্নাঘর।

বাসন্তী দেবী বললেন,—এই সময় আবার শচীন কোথায় বেরুল কে জানে! আপনারা আসুন। শচীনের ঘরেই আপনাদের বসাচ্ছি।

কর্নেল বললেন,—থাক, আমরা বসব না। একটুখানি আপনাদের এই বাড়ি আর পেছন দিকটা ঘুরে দেখব।

কথাটা বলেই কর্নেল হঠাৎ আমাদের অবাক করে রান্নাঘরের পাশে পাঁচিলটার দিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর পাঁচিলের ওপর দিয়ে দু-হাতের সাহায্যে উঁচু হয়ে কী দেখলেন। তারপর ফিরে এসে সহাস্যে বললেন,—দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভূতের মুণ্ডু!

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভূতের মুণ্ডু মানে! কেউ উঁকি দিচ্ছিল?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। কুৎসিত মুখোশ পরা একটা মুখ! আমি তেড়ে যেতেই অদৃশ্য। অগত্যা দৌড়ে গিয়ে দেখতে হল ভূতের চেহারাটা কীরকম। কিন্তু ততক্ষণে ভূতটা পেছনের ওই ভেঙেপড়া বাড়িটার আড়ালে লুকিয়ে গেল।

বাসন্তীদেবী চোখ বড় করে বললেন,—এত সাহস! কর্নেলসাহেব দয়া করে একটু বসুন।

পাঁচ

বাসন্তী দেবীর অনুরোধে কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, যদি আপনার কোনও কথা বলার থাকে, এখানে দাঁড়িয়েই বলতে পারেন।

বাসন্তী দেবী বললেন,—দাদা এখন বাথরুমে আছেন। তা না হলে দাদাই বলতেন। ছোড়দা মহীন প্রায়ই বলত, সে আমাদের পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা এক ঘড়া সোনার মোহর কোথায় আছে তা জানে, কিন্তু সে-কথা সে জানাতে পারবে না। কারণ, এক রাত্রে স্বপ্নে তাকে তার ঠাকুরদা নাকি দেখা দিয়ে বলেছেন, তুই যা জেনেছিস তা যেন অন্যে জানতে না পারে। অন্যকে তুই মোহরের ঘড়ার খবর দিলে মুখে রক্ত উঠে মরবি। তাই আমাদের ঠাকুরবাড়িতে হাড়িকাঠের পাশে রক্ত দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল তাহলে মহীনই হয়তো শচীনকে কথাটা বলে দিয়েছিল। তাই মুখে রক্ত উঠে সে মরেছে। আর শচীন তার লাশটা তুলে কোথাও পুঁতে ফেলেছে।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—কী সর্বনাশ! উনি ওই গোবেচারা শচীনকেই সন্দেহ করে ফেললেন? শচীনের মতো রোগাটে গড়নের লোক তার কাকার লাশ একা ওঠাতে পারে?

বাসন্তী দেবী বিব্রত মুখে বললেন,—না, মানে আমি ভেবেছিলুম শচীনের সঙ্গে তার বন্ধুরাও হয়তো ছিল।

চণ্ডীবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। কর্নেল বললেন,—আপনি কি আপনার বড়দাকে একথা বলেছিলেন? কিংবা কোনও ছলে শচীনকেও এরকম কোনও আভাস দিয়েছিলেন?

বাসন্তী দেবী বললেন,—না, কথাটা আমি কাকেও বলিনি। এমন কথা কি বলা যায়?

কর্নেল বললেন,—তখন আপনার এরকম ধারণা হয়েছিল, এখন আপনার কী ধারণা?

বাসন্তী দেবীর কান্না এসে গেল। আত্মসম্বরণ করে বললেন,—আমার ছোড়দার মতো সন্ন্যাসী সাদাসিধা মানুষকে খুন করার পেছনে আর কী কারণ থাকতে পারে, এবার আপনারাই বলুন। আমার মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই সে দৈবাৎ মুখ ফসকে কোনও দুষ্ট লোককে কথাটা বলে ফেলেছিল। তারপর অভিশাপ লেগে ছোড়দা মুখে রক্ত উঠে মরেছে। তবে আমি কিন্তু আমাদের বাড়ির চারপাশে সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, কোথাও কোনও গর্ত খোঁড়া দেখতে পাইনি। তবে এমনও হতে পারে মোহর ভরতি ঘড়া এর বাইরে কোথাও পোঁতা ছিল।

চণ্ডীবাবু বললেন,—পুলিশ তো এই এলাকা তন্নতন্ন খুঁজেছে, যদি কোথাও মহীনকে পুঁতে রাখা হয় তার খোঁজ মিলবে। কিন্তু তেমন কোনও চিহ্নই তারা পায়নি।

এই সময়েই বারান্দার ওপাশে বাথরুম থেকে এক রুগ্ণ চেহারার ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই বাসন্তী দেবী হন্তদন্ত গিয়ে তাঁকে ধরলেন। বললেন,—সাড়া দিলেই তো আমি যেতুম।

ভদ্রলোকের চেহারায় শচীনবাবুর ছাপ স্পষ্ট। উনি তাহলে শচীনবাবুর বাবা অহীনবাবু। বাসন্তী দেবীর কাঁধে ভর দিয়ে একপা-একপা করে এগিয়ে এসে তিনি ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালেন। বললেন, কারা যেন বসে আছে।

বাসন্তী দেবী বললেন,—চণ্ডীদা এসেছেন। আর তাঁর সঙ্গে কলকাতার সেই কর্নেলসাহেবরা এসেছেন। যাঁদের কাছে শচীন গিয়েছিল।

অহীনবাবু ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। বললেন,—আমার সাদাসিধে সরল ভাইটাকে কারা মেরে ফেলল।

চণ্ডীবাবু উঠে গিয়ে তাঁকে ধরে বললেন,—ঘরে চলুন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার কষ্ট হবে।

চণ্ডীবাবু এবং বাসন্তী দেবী অহীনবাবুকে ঘরে তাঁর বিছানায় শুইয়ে রেখে বাইরে এলেন। সেই সময়েই কর্নেল বাসন্তী দেবীকে বললেন,—একটা কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। শচীনবাবুর একটা পায়ে গণ্ডগোল আছে। আমি লক্ষ করেছি, উনি মোটা ছড়ির সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারেন না।

বাসন্তী দেবী বললেন,—ওঁর বাঁ-পায়ের পাতা জন্ম থেকেই একটু বাঁকা। তাই ছোটবেলা থেকেই খুঁড়িয়ে হাঁটত শচীন। স্কুল যেত একটা মোটাসোটা বেতের ছড়িতে ভর দিয়ে। ছাত্ররা ওকে খোঁড়ামাস্টার বলে আড়ালে ভেংচি কাটত।

চণ্ডীবাবু তখনই হাসতে-হাসতে বললেন,—বেচারা খোঁড়া মাস্টারের ওপর তুমি সন্দেহ করে ভেবেছিলে, সে নাকি তার কাকার লাশ গুম করেছে!

বাসন্তী দেবী জিভ কেটে বললেন,—না-না, মানে ওর দু-একজন বন্ধু আছে, তারা তো ভালো লোক নয়। তুমি তাদের চেনো চণ্ডীদা। কায়েতপাড়ার গোপেন আর ওই যে একচোখা লোকটা—কী যেন নাম। সদগোপপাড়ায় বাড়ি—

চণ্ডীবাবু বললেন,—ভুতুর কথা বলছ?

বাসন্তী দেবী চাপাস্বরে বললেন,—কিছুদিন আগে থেকে গোপেন আর ভুতু ঘনঘন এ-বাড়িতে আসত। শচীনের সঙ্গে আড্ডা দিত। এখন আর আসে না।

কর্নেল বললেন,—পুলিশকে কি আপনি একথা জানিয়েছেন?

বাসন্তীদেবী করজোড়ে চাপাস্বরে বললেন,—মিনতি করে বলছি বাবা, একথা যেন কেউ জানতে না পারে। ওরা দুজনেই খুব বজ্জাত লোক। পুলিশের খাতায় ওদের নাম আছে—তাই না চণ্ডীদা?

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওরকম অনেকের নামই পুলিশের খাতায় আছে। যাই হোক, তুমি আর যেন কারুকে মুখ ফসকে এসব কথা বলে ফেলো না।

চাটুজ্যেবাড়ি থেকে রাস্তার দিকের সদর দরজা দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলুম। তারপর কর্নেল বাড়ির পেছনের দিকটা বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে বললেন,—রাতবিরেতে ভূতেরা অনায়াসে শচীনবাবুদের বাড়ির ছাদে উঠে দাপাদাপি করতে পারে। ঢিলও ছুড়তে পারে।

এরপর আমরা রাস্তার উত্তরদিকে এগিয়ে বাঁ-দিকের সেই পুকুরপাড়ে গেলাম। তার নীচেই চণ্ডীবাবুর গাড়ি আছে। কতকগুলো বাচ্চা ছেলে আমাদের দেখামাত্র ডানদিকে আমবাগানের ভেতর পালিয়ে গেল। বোঝা গেল তারা মোটর গাড়িটা নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলা করছিল। চণ্ডীবাবু গাড়ির লক খুলছেন, এমন সময় কর্নেল বললেন,—একটা অপেক্ষা করুন। আমি পুকুরের পূর্বদিকটা দেখে আসি।

আমি কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। পুকুরপাড়ের নীচে একটা পোড়ো জমি। তার একদিকে বাঁশবন। কর্নেল পোড়ো জমি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, —এদিকটায় বসতি নেই দেখছি!

কোথাও-কোথাও ফসলের খেত, কোথাও আখচাষ করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলুম কর্নেল আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে থেকে দুটো নুড়ি-পাথর কুড়িয়ে নিলেন। বললুম,—কী আশ্চর্য! ভূতের ঢিলগুলো বাড়ির ভেতরে পড়ার কথা। পড়েওছিল। এখানে এই নুড়িগুলো কে রাখল?

কর্নেল তাঁর পিঠে-আঁটা কিটব্যাগের চেন টেনে তার ফাঁক দিয়ে নুড়ি-পাথর তিনটে ভেতরে ঢোকালেন। তারপর চেন টেনে কিটব্যাগের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে বাঁশবনের ভেতরটা একবার দেখে নেওয়ার পর বললেন,—চলো, ফেরা যাক।

তাঁকে অনুসরণ করে বললুম,—ওখানে নুড়ি-পাথর পড়ে থাকাটা খুব রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, রহস্য তো এখন আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

বললুম,—বাসন্তীদেবীকে বলা উচিত ছিল হাড়িকাঠের রক্তটা মানুষের নয়।

কর্নেল মুখ ঘুরিয়ে চোখ কটমট করে বললেন,—মুখটি বুজে থাকবে।

গাড়ির কাছে গেলে চণ্ডীবাবু বললেন,—আপনাকে খুব ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। অমন করে পাঁচিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে কী দেখছিলেন। রক্ত? ওখানেই এক পাটি স্যান্ডেল পাওয়া গেছে।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—আমি দ্বিতীয় পাটি স্যান্ডেলটা খুঁজে দেখছিলুম।

চণ্ডীবাবু গাড়িতে উঠে বললেন,—আর-এক পাটি জুতো নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে ছুঁড়ে ফেলেছে ওরা।

কর্নেল আগের মতো গাড়ির সামনের সিটে বাঁদিকে বসলেন। আমি বসলুম পেছনে। চণ্ডীবাবু স্টার্ট দিয়ে গাড়ির মুখ সবে ঘুরিয়েছেন, এমন সময় আমবাগানের ভেতর থেকে ছুটে আসতে দেখলুম হালদারমশাইকে। তিনি যে এত জোরে ছুটতে পারেন তা দেখার সৌভাগ্য কোনওদিন আমার হয়নি। কর্নেলের কথায় ততক্ষণে চণ্ডীবাবু গাড়ি দাঁড় করিয়েছিলেন। হালদারমশাইয়ের সোয়েটারে এবং প্যান্টের এখানে-ওখানে কাদার ছোপ। উনি হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—আমি কর্নেলসাহেবেরে দেইখ্যাই ছুট দিসিলাম। ওঃ কী কাণ্ড!

আমি দরজা খুলে দিলে তিনি ভেতরে ব্যাক সিটে বসলেন। তারপর পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন।

সামনে থেকে কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি কি কারুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছিলেন হালদারমশাই। আপনার পোশাকে অত কাদার ছোপ কেন?

গোয়েন্দাপ্রবর নোংরা রুমালে নাক মুছে বললেন,—না কর্নেলস্যার, একজনেরে ফলো কইর‍্যা যাইতেছিলাম। আমবাগানের শেষ দিকটার খানিকটা জায়গা ঝোপজঙ্গলে ঢাকা। তার ওধারে একটা বসতি।

চণ্ডীবাবু বললেন,—ওটা জেলেপাড়া।

হালদারমশাই বললেন,—যারে ফলো করসিলাম, সে একখানে খাড়াইয়া যেন কারো লাইগ্যা ওয়েট করত্যাসিল। তারপর একজন আইয়া তারে কইল—খবর কও। তারপর দুইজনে চাপাস্বরে কী কথা হইল আমি শুনি নাই। তাই সাপের মতন উপুড় হইয়া আউগাইয়া যাইতেসিলাম। তখনই পোশাকে কাদা লাগসে। মাটিটা নরম।

কর্নেল বললেন,—তারপর কিছু শুনতে পেলেন?

হালদারমশাই বললেন,—নাঃ! ওরা দুইজনে সেখান থিক্যা উধাও হইয়া গেল।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—আপনি কাকে ফলো করেছিলেন?

হালদারমশাই বললেন,—তারে চিনি না, কিন্তু আমি বাঁশঝাড়ের ভেতরে যখন আর-এক পাটি

জুতা খুঁজত্যাছিলাম, তখনই লোকটারে চোখে পড়সিল। সে শচীনবাবুগো বাড়ির পাঁচিলের বাহির দিয়া আইত্যাসিল। তারপর একখানে খাড়াইয়া ছিল। আমাকে সে কীভাবে ট্যার পাইল কে জানে। সে আমবাগানের ভেতর দিয়া উধাও হইয়া গেল। কাজেই তারে ফলো না কইর‍্যা উপায় ছিল না।

চণ্ডীবাবু জিগ্যেস করলেন,—লোকটার চেহারা কেমন? পরনে কী পোশাক ছিল?

হালদারমশাই বললেন,—লোকটার চেহারা এক্কেরে ভূতের মতন কালো।

আমি না বলে পারলুম না,—ভূতের গায়ের রং কালো, তা কি আপনার পুলিশ লাইফে দেখেছেন?

হালদারমশাই সহাস্যে বললেন,—না ওটা কথার কথা। লোকটার মুখের চেহারা এমনিতেই কুৎসিত। আর একখানা চক্ষু নাই। পরনে যেমন-তেমন একটা ফুলপ্যান্ট, আর সোয়েটার। মাথায় মাফলার জড়ানো ছিল।

চণ্ডীবাবু বলে উঠলেন,—তাহলে বাসন্তীর কথাই ঠিক। ওই লোকটা সেই একচোখে বজ্জাত ভুতু।

গোয়েন্দাপ্রবর হাসতে-হাসতে বললেন,—এক্কেরে মানানসই। ভূতের নাম ভুতু হইলে সে মানুষ-ভূত। হ্যাঁ, যে লোকটা তারে দেখা করতে আইসিল, তার চেহারা ভদ্রলোকের মতন। কিন্তু তার গোঁফখানা দেইখ্যা মনে হইসিল, লোকটা দাগি আসামি। ওই যে কথায় আসে না, শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়! ওইরকম গোঁফ ভদ্রলোক রাখে না।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে, আপনি পুলিশের সামনে যেন মুখ ফসকে এসব কথা বলবেন না।

চণ্ডীবাবু বললেন,—আমার খুব অবাক লাগছে। বাসন্তী তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিল। দ্বিতীয় লোকটার নাম গোপেন। ওর বাবাকে লোকে বলত পোড়াসিংঘি। কারণ, ওর বাবা গোপাল সিংহের মুখের একটা পাশ ছোটবেলায় পুড়ে গিয়েছিল। কেউ-কেউ অবশ্য পোড়া কায়েতও বলত। তার ছেলে গোপেন যে গুণ্ডামি করে বেড়াবে, এমনকি ডাকাত দলেও নাম লেখাবে, এটা কেউ কল্পনা করতেও পারেনি।

কর্নেল বললেন,—আপনারা শচীনবাবুকে এসব কথা যেন বলবেন না। দরকার হলে আমি শচীনবাবুর সঙ্গে কথা বলে ওই লোকদুটোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বতার কারণটা খুঁজে বের করব।

চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুনোর পর হালদারমশাই সোয়েটার এবং প্যান্টের কাদা পরিষ্কার করতে বাথরুমে ঢুকলেন। চণ্ডীবাবু দোতলায় নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। শুধু কার্তিক আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। সে বলল,—সায়েবরা এবার নিশ্চয়ই কফি খাবেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ, এক কাপ কফি পেলে ভালো হয়।

কার্তিক চলে যাওয়ার পর কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—জয়ন্ত, এখন তোমার কী মনে হচ্ছে, আমাকে খুলে বলো।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম,—আমার মনে হচ্ছে, মহীনবাবুকে কোথাও ওই ভুতু আর গোপেন মিলে জোর করে আটকে রেখেছে। তার ওপর অত্যাচার করে পূর্বপুরুষের লুকিয়ে রাখা সোনার মোহর ভর্তি ঘড়া কোথায় আছে, তা জানার জন্যে ওরা চেষ্টা করছে। আর শচীনবাবু সম্ভবত সেই সোনার মোহরের লোভে ওদের ফাঁদে পা দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—তাহলে শচীনবাবু চণ্ডীবাবুর কাছে পরামর্শ চাইতে গিয়েছিলেন কেন? আর যদি বা গেলেন, তিনি চণ্ডীবাবুর মুখে আমার পরিচয় পেয়েই গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন খোঁড়া মানুষ এতটা ঝুঁকি নেবেনই বা কেন?

এই সময়েই চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বললেন,—কফি আসছে। আর যার জন্য কর্নেল সাহেব মনে-মনে অপেক্ষা করছিলেন, সেই শচীনও তার গাবদা মোটা ছড়িটা নিয়ে গেটে ঢুকছে দেখলুম।

কর্নেল বললেন,—বাঃ, সুখবর। তবে আপনি কফি খেয়েই কাজের অছিলায় এ-ঘর থেকে যেন কেটে পড়বেন।

ছয়

শচীনবাবুকে কার্তিক আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে শচীনবাবু নমস্কার করে বললেন,—পিসিমার মুখে শুনলুম আপনারা আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি একটুখানি বাজারের দিকে গিয়েছিলুম। পিসিমার মুখে শুনেই সাইকেলরিকশাতে চেপে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে এলুম। দারোয়ান বললেন, হ্যাঁ, কর্নেলসাহেবরা কিছুক্ষণ আগে ফিরে এসেছেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—বসো শচীন। তোমার জন্যে এক কাপ কফি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শচীনবাবু বললেন,—না কাকাবাবু, এইমাত্র আমি বাজারে চা খেয়ে-খেয়ে মুখ তেতো করে ফেলেছি। আর কিছু খাব না।

চণ্ডীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—ঠিক আছে। তাহলে তোমরা কথাবার্তা বলো। আমার একটা জরুরি কাজ আছে। কাজটা সেরে নিয়ে আবার আসব।

তিনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন,—আপনাদের বাড়িতে যে ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। দিন-দুপুরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে কালো কুচ্ছিত একটা বিদঘুটে মুখ উঁকি দিচ্ছিল। আমি তাড়া করে যেতেই অদৃশ্য হল।

শচীনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন,—কথাটা পিসিমার কাছে শুনে এলুম। আমার মনে হচ্ছে কলকাতা থেকে আপনার মতো খ্যাতিমান রহস্যভেদী সদলবলে এখানে এসে পড়েছেন, তাই ছোটকাকার খুনিরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

হালদারমশাই তাঁর সোয়েটার আর প্যান্টের কাদাগুলো জল দিয়ে আলতোভাবে সাফ করে কফির আসরে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বললেন,—আপনাগো বাড়ির লগে একখান বাঁশঝাড় আছে।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—হ্যাঁ আছে। কিন্তু আপনি কি সেখানে সন্দেহজনক কিছু দেখেছেন?

হালদারমশাই কী বলতে যাচ্ছিলেন, কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন,—ওসব কিছু না। আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

শচীনবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই দেব। আমি যা যতটুকু জানি সব বলব।

কর্নেল বললেন,—গোপেন আর ভুতু নামে দুটো লোক আপনারা কাছে নাকি আড্ডা দিতে আসত।

শচীনবাবু চমকে উঠে বললেন,—পিসিমা বলেছেন? আসলে কী হয়েছে জানেন, ওরা দুজনেই এলাকার নামকরা বজ্জাত। শুধু বজ্জাত বললে ভুল হবে, ওরা না-পারে এমন কাজ নেই। কিন্তু আমার স্কুললাইফে ওরা দুজনেই আমার সহপাঠী ছিল। সেই সূত্রে রাস্তাঘাটে দেখা হলে কথাবার্তা বলেছি। কিন্তু সম্প্রতি কিছুদিন থেকে ওরা একরকম জোর করেই আমার ঘরে ঢুকে আড্ডা দিত। বাধ্য হয়ে পিসিমাকে বলে ওদের চা খাওয়াতে হতো। তারপর ক্রমে-ক্রমে বুঝতে পারলুম, আমার

কাছে ওদের আসার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার ধারণা হয়েছিল সম্ভবত সরল সাদাসিধে সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ আমার কাকা হয়তো কথায়-কথায় ওদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের পূর্বপুরুষের একঘড়া সোনার মোহর কোথায় পোঁতা আছে, তার খবর তাঁর জানা।

কর্নেলসাহেব, এই কথাটা আমার আপনার কাছে যাওয়ার আগেই মাথায় এসেছিল, কারণ হঠাৎ করে পাগলা বিনোদের মড়া দেখা নিয়ে গুজব আর রাতবিরেতে আমাদের বাড়িতে ভুতুড়ে উৎপাত কেন হচ্ছে। আপনার কাছ থেকে ফিরে এসে যখন আমাদের মন্দিরের হাড়িকাঠের কাছে রক্ত দেখতে পেলুম, তখনই বুঝলুম আমার কাকা হয়তো মোহর ভরতি ঘড়াটা কোথায় আছে তা দেখিয়ে দেয়নি বলেই তাকে ভুতু আর গোপেন মিলে খুন করেছে। তারপর বডিটা গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভুতু আর গোপেনের নাম সাহস করে পুলিশকে বলতে পারিনি। ওদের ভালো চেনে, তাই পিসিমাও মুখ বুজে থেকেছে।

হালদারমশাই বললেন,—ওদের মধ্যে একজনের কি একটা চক্ষু নাই?

শচীনবাবু আবার চমকে উঠে বললেন,—ভুতুর একটা চোখ জন্ম থেকেই নেই। কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

আমি বললুম,—আপনি ভুলে গেছেন, উনি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কাজেই উনি এখানে এসেই এখানে-ওখানে ওত পেতে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

কর্নেল বলে উঠলেন,—ভুতু আর গোপেনের না কি ডাকাতের দল আছে?

শচীনবাবু চাপাস্বরে বললেন,—ছিল। থানায় নতুন ওসি আসার পর থেকে এ-এলাকা ছেড়ে ওদের দলের লোকেরা শুনেছি পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভুতু আর গোপেনের একজন শক্ত গার্জেন আছে। তাই তারা এখনও বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ওরা তেমন সাংঘাতিক কাজ করে ফেললে নতুন ওসি ওদের রেহাই দেবেন বলে মনে হয় না।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—সেই প্রভাবশালী গার্জেন কী করেন? তাঁর নাম কী?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—এসব কথা কানে গেলে লোকটা উলটে আমাকেই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেবে।

কর্নেল একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,—আহা, আমি জানতে চাইছি, সে কে? কী করে?

শচীনবাবু এবার ফিসফিস করে বললেন,—তাঁর নাম মনীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। তিনি এই চণ্ডীবাবুদেরই জ্ঞাতি। কিন্তু চণ্ডীবাবুর ঘোর শত্রু। উনি এখানকার একটা রাজনৈতিক দলের নেতা।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। এবার বলুন আপনাদের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি, অ্যাডভোকেট শরদিন্দু চ্যাটার্জির কাছে আপনাদের পূর্বপুরুষের যে দলিলটা আছে, তা কি আপনি কখনও দেখেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—আমি দেখিনি। বাবাকে একবার শরদিন্দু জেঠু ওটা দেখিয়েছিলেন। বাবা কিছু বুঝতে পারেননি। কিন্তু চণ্ডীকাকুর সঙ্গে আমার অ্যাডভোকেট জেঠুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে। ছুটি পেলে শরদিন্দু জেঠু এখানে চলে আসেন। চণ্ডীকাকুর বাড়িতেই ওঠেন। উনি একসময়কার নামকরা শিকারি। এখনও বিলে বুনো হাঁস মারতে আসেন।

কর্নেল এবার পকেট থেকে সেই প্রাচীন তুলোট কাগজে নাগরি লিপিতে লেখা দলিলের কপিটা শচীনবাবুর হাতে দিয়ে বললেন,—এটা আপনার পূর্বপুরুষের সেই দলিলের কপি।

শচীনবাবু কাগজটা কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বললেন,—এটা তো কোনও দলিল নয়, কী সব অং বং হং লেখা আছে। কয়েকটা তীর আঁকা আছে।

কর্নেল বললেন,—এটা দেখে আপনার মাথায় কিছু আসছে না?

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন,—না। বাবাও বলেছিলেন কিছুই মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।

কর্নেল তাঁর হাত থেকে কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে ভাঁজ করে রাখলেন। তারপর বললেন,—ভুতু এবং গোপেনকে আপনি এই কাগজে যা লেখা আছে তার একটা কপি পৌঁছে দিতে পারবেন? না, শুধু পৌঁছে দিলে হবে না, তাদের বলতে হবে, যে-গুপ্তধনের লোভে আপনার কাকুকে খুন করেছে তারা, এই কাগজটা সেই কাকার কাছ থেকে পাওয়া। এতেই গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়া যাবে।

শচীনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন,—এটা যদি সত্যি আমাকে পূর্বপুরুষের লেখা হয়, তাহলে এটা কি ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—হবে। ওদের যা বিদ্যে, তাতে ওরা এটা থেকে কোনও সূত্রই বের করতে পারবে না। কিন্তু ওরা যদি সত্যি গুপ্তধন হাতানোর উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে ভাব জমায়, আর রাত-বিরেতে ভূতুড়ে উৎপাত করে থাকে তাহলে ওরা টোপ গিলবে। অর্থাৎ এটার অর্থ উদ্ধারে কারও সাহায্য নেবে।

শচীনবাবু মাথা নেড়ে বললেন,—না কর্নেলসাহেব, এটা ওদের হাতে দেওয়া ঠিক হবে না। ওরা এটার অর্থ উদ্ধারের জন্যে আমার বা আমার রুগ্ণ বাবার ওপর জুলুম চালাবে। সারাবছর তো পুলিশ আমাদের রক্ষা করবে না।

কর্নেল বললেন,—তাহলে আমাদের যে-কোনও উপায়ে হোক এই টোপটা ওদের গেলাতে হবে। শচীনবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা একটা ফাঁদ। ঠিক আছে, আপনি এ-বেলা ভেবে দেখার সময় নিন, তারপর বিকেলের দিকে কিংবা রাত্রে আমাদের জানিয়ে দেবেন। কিন্তু একটা কথা, এ-নিয়ে আপনার পিসিমা বা বাবার সঙ্গে কক্ষনো আলোচনা করবেন না।

শচীনবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন,—আচ্ছা কর্নেলসাহেব, আমাদের বাড়িতে রাতবিরেতে যে পাথরের নুড়িগুলো ছোঁড়া হয়, সেগুলো তো পাহাড়ি মুলুকের নদীতে পাওয়া যায়। ভুতু বা গোপেন কখনও অতদূরে কোথাও গেছে বলে মনে হয় না। তাহলে ওরা গুগুলো পেল কোথায়?

কর্নেল বললেন,—আপনার কাকার ঘর তো পুলিশ সার্চ করেছে। তাঁর ঘরে কি কোনও সন্দেহজনক জিনিস, কিংবা ধরুন ওরকম নুড়ি-পাথর পাওয়া গেছে?

শচীনবাবু আবার চাপাস্বরে বললেন,—পিসিমা একদিন কাকার ঘর পরিষ্কার করতে ঢুকেছিল। কাকা তাঁর ঘরে কাউকে ঢুকতে দিতেন না। ওঁর ঘরে সব নানারকম শাস্ত্রীয় বই আর একটা মড়ার খুলি—এইসব নানারকমের অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস থাকে। তা একদিন পিসিমা কাকার ঘরে ঢোকার সুযোগ পেয়েছিল। কাকা দরজায় তালা না দিয়ে বাথরুমে ঢুকেছিলেন। পিসিমা ভেতরে উঁকি মেরে বিছানার পাশে তিনটে ওইরকম ডিমালো নুড়ি দেখতে পেয়েছিলেন। উনি ভেবেছিলেন, ভূতের ঢিলগুলো কুড়িয়ে কাকাই বোধহয় ওখানে রেখেছেন। তাই উনি ঢিল তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরের পাশের পাঁচিল গলিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, কর্নেল সেই তিনটে ঢিল আজ কুড়িয়ে পেয়েছেন। কিন্তু কর্নেল যেন কোনও মন্ত্রবলে সেটা টের পেয়েই একবার আমার দিকে চোখ কটমট করে তাকিয়ে নিয়ে তারপর বললেন,—হ্যাঁ আপনার পিসিমার পক্ষে ভূতুড়ে ঢিল দেখে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর কি আপনার কাকা এ-ব্যাপারে কোনও হইচই বাধিয়েছিলেন?

শচীনবাবু বললেন,—না, আপনাকে তো আগেই বলেছি, কাকা সন্ন্যাসীটাইপ মানুষ। খামখেয়ালি। আমরাই বলতুম, কাকার মাথায় ছিট আছে। তা ছাড়া একটু মনভোলা স্বভাবের মানুষও ছিলেন।

কর্নেল বললেন,—এবার একটা কথা। আপনার কাকা কি কখনও তীর্থ করতে গেছেন?

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ। কাকা বছরে অন্তত বার দুই-তিনেক তীর্থ করতে যেতেন। প্রতিবারই আমাদের ভয় হত, উনি হয়তো আর বাড়ি ফিরবেন না। কোনও সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বাস করবেন। কিন্তু কাকা ফিরে আসতেন, তারপর তীর্থের গল্প শোনাতেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন,—ঠিক আছে। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়ে চিন্তাভাবনা করে দেখুন। আমার কথা মতো ওই কাগজের একটা কপি ভুতু আর গোপেনকে দেবেন কি না। এটা কিন্তু খুব জরুরি।

শচীনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর হাতে সেই মোটা লাঠির মতো ছড়িটা ছিল। সেটাতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতেই বেরিয়ে গেলেন।

হালদারমশাই উঠে গিয়ে দরজায় উঁকি মেরে শচীনবাবুর প্রস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ফিরে এলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে বললেন,—আমি এবার শচীনবাবুরে সুযোগ পাইলেই ফলো করুম। ভদ্রলোকেরে আমার আর সরল মানুষ ঠেকত্যাসে না।

জিগ্যেস করলুম,—কেন বলুন তো?

হালদারমশাই বললেন,—সেই একচক্ষু ভুতু আর তার লগে গোপেনেরে আমি কথা কইতে দেখসি। একচক্ষু বজ্জাতটা শচীনবাবুগো বাড়ির পাশ দিয়া বাহির হইয়া হনহন কইর‍্যা আমবাগানের ভেতর দিয়া যাইত্যাসিল। এখন মনে হইত্যাসে বাড়ির পেছন দিকে কোথাও ওই একচক্ষু লোকটা শচীনবাবুর লগে গোপনে পরামর্শ করত্যাসিল। অগো তিনজনের মইধ্যে যোগাযোগ আছে। অরা তিনজনে একখান ত্রিভুজ।

কর্নেল সহাস্যে বললেন,—আপনার এই ত্রিভুজতত্ত্ব উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমি বললুম,—এযাবৎকালে গুপ্তধন নিয়ে কয়েক ডজন রহস্যের সমাধান কর্নেল করেছেন। গুপ্তধন কোথাও পাওয়া যায়নি, তা ঠিক। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে সত্যি-সত্যি চাটুজ্যেবাড়ির কোথাও-না-কোথাও সোনার মোহর ভরতি একটা ঘড়া পোঁতা আছে। ওই কাগজটার মধ্যেই তার সংকেত আছে।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—তোমাকে একটা কপি দেব, তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো গুপ্তধনের জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারো কি না।

চণ্ডীবাবু এতক্ষণে ঘরে ঢুকলেন। হাসতে-হাসতে বললেন,—শচীনের মুখ-চোখ দেখে মনে হল ওকে আপনি ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। আমাকে খুলে কিছু বলল না, শুধু গোমড়া মুখে একটা কথা বলল, ওবেলা সে সন্ধ্যার দিকে কর্নেলসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

কর্নেল বললেন,—আচ্ছা মিস্টার রায়চৌধুরী, শচীনের মুখে শুনলুম, আপনাদের এক জ্ঞাতি মণীন্দ্র রায়চৌধুরী—

চণ্ডীবাবু কর্নেলের কথার ওপর বললেন,—শচীন কি মণি সম্পর্কে কিছু বলছিল?

কর্নেল বললেন,—তিনি নাকি একটা রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা। আপনাদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। একচোখা ভুতু আর গোপেন নাকি তাঁর চ্যালা।

চণ্ডীবাবু বিকৃতমুখে বললেন,—মণি রায়চৌধুরি বংশের কলঙ্ক। আমার ঠাকুরদার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পৌত্র সে। কাজেই রক্তের সম্পর্ক আছে তা বলা যায়ই। কিন্তু তার রাজনৈতিক দল তার

কাজকর্মে খুব অসন্তুষ্ট। তা ছাড়া খুলেই বলি, আমি রাজনীতি করি না, কিন্তু মণি এক-একসময় এমন সব সাংঘাতিক কাজ করে যে তার মা গোপনে এসে আমার সাহায্য চায়। আমার মা বেঁচে নেই, কিন্তু মণির মাকে আমি নিজের মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করি।

এই সময় কার্তিক দরজায় উঁকি মেরে বলল,—ঠাকুরমশাই বাজার থেকে ফিরে বললেন, ভুতো আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।

সাত

ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে শুনেই হালদারমশাই খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন, —আমি ঠিক দেখসিলাম, ওরা দুইজনে কোনও প্ল্যান আঁটতাসে। পুলিশের সোর্স থাকে। তা তো আপনারা জানেন। এই সোর্সই ওগো ধরাইয়া দিসে।

কিন্তু খবরটা শুনে চণ্ডীবাবু তখনই থানায় ফোন করতে গিয়েছিলেন। কর্নেলকে বলেছিলুম, —এবার থানার ওসি ওদের পেটের কথা সব বের করে নেবেন। মাঝখান থেকে আপনি নিজের কৃতিত্ব দেখানোর সুযোগ হারালেন।

কর্নেল মিটিমিটি হসে বলেছিলেন,—জয়ন্ত, তোমাকে বরাবর বলে আসছি ন্যায়শাস্ত্রের অপভাষ তত্ত্বের কথা। ইংরেজিতে যাকে বলে হোয়াট অ্যাপিয়ার্স ইজ নট রিয়েল।

কিছুক্ষণ পরে চণ্ডীবাবু ফিরে এসে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন,—মণির এক আজব কীর্তি। সে-ই পুলিশের কাছে তার দুই বিশ্বস্ত চ্যালার নামে অভিযোগ করেছিল, তারা তার প্রিয় অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে চুরি করে না কি বেচে দিয়েছে। চুরি করার সাক্ষীও আছে। তবে ওসি আমাকে বললেন, কর্নেল সাহেবকে খবরটা দেবেন। কুকুর চুরির ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কর্নেলের একটা মোক্ষম ক্লু হয়ে উঠবে।

কর্নেল সহাস্যে বলেছিলেন—কুকুর চুরির কারণটা আপনাদের বোঝা উচিত।

কথাটা শুনেই চণ্ডীবাবু চমকে উঠে বলেছিলেন,—শচীনদের মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠের কাছে পড়ে থাকা রক্ত পরীক্ষা করে কলকাতার ফোরেনসিক এক্সপার্টরা রায় দিয়েছেন ওগুলো মানুষের রক্ত নয়।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন,—কী কাণ্ড! অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে তাহলে ওই একচক্ষু ভুতু আর গোপেন মন্দিরের সামনে বলি দিয়েছিল। ঠিক কইসি কি না কন কর্নেলসাহেব।

কর্নেল সায় দিয়ে বলেছিলেন,—আপনি ঠিক ধরেছেন হালদারমশাই। রাত্তিরবেলা পথের কুকুর ধরা কঠিন কাজ। তার চেয়ে পোষা কুকুর কোলে তুলে নিয়ে এসে ইচ্ছেমতো তাকে ব্যবহার করা যায়। বেচারা জানত না তাকে ওরা বলি দেবে।

আমি বলেছিলুম,—কুকুর বলি দিয়ে রক্ত ছড়ানোর উদ্দেশ্য কী? কুকুরের বডিটা নিশ্চয়ই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। ফরাক্কার ফিডার ক্যানেলের জলে এখন গঙ্গা বারোমাসই কানায়-কানায় ভরা। স্রোতও তীব্র। কাজেই কুকুরের লাশ এতক্ষণ বহুদূরে পৌঁছে গেছে। কোথাও আটকে গেলে আলাদা কথা।

হালদারমশাই বলেছিলেন,—এতক্ষণ লাশের কিস্যু নাই। শকুনের পাল কুত্তাটা বেবাক খাইয়া ফেলসে।

কেন দুই স্যাঙাত মিলে তাদের গার্জেনের পোষা কুকুর ওখানে বলি দিলো, সেই প্রশ্নের উত্তর আমি কর্নেলের মুখ থেকে আদায় করতে পারিনি। চণ্ডীবাবু বা হালদারমশাইও কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল শচীনবাবুর ছোটকাকা মহীনবাবুকে নিশ্চয়ই ওরা কোথাও আটকে রেখে গুপ্তধনের খোঁজ পেতে চেয়েছিল।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর কর্নেল আমাকে ভাত-ঘুমের সুযোগ দেননি।

ওদিকে হালদারমশাই এবার আরও উত্তেজিত হয়ে গোয়েন্দাগিরি করতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াইটে বাজে। কর্নেল আমাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। তারপর পকেট থেকে সেই অং বং লেখা কাগজটা বের করলেন। তাঁর প্রকাণ্ড ব্যাগটা থেকে একটা প্যাড বের করে বললেন,—এসো, এই সঙ্কেতগুলোর কোনও সমাধান বের করা যায় কি না দেখি। তোমার মাথায় কিছু এলে আমাকে বলবে। জয়ন্ত এটা কোনও হাসির ব্যাপার নয় কিন্তু।

আসলে আমি তাঁর গাম্ভীর্য দেখে হেসে ফেলেছিলুম। প্যাডটা সেন্টার টেবিলে রেখে হাতে একটা ডট পেন নিলেন। তারপর সেই কাগজটা খুলে পাশে রাখলেন।

কর্নেল বললেন,—ধরা যাক মং-টা মন্দির। কারণ অম্লং থেকে শুরু করলে কিছু বোঝা যাবে না। মং-কে যদি মন্দির ধরি, তাহলে পাঁচ হাত এগোতে হবে মন্দিরের উলটো দিকে। সেটা পেছনের দিক হতে পারে, আবার সামনের দিকও হতে পারে। ধরা যাক মন্দিরটা শচীনবাবুদের শিবমন্দির। মন্দিরের পেছনে কিন্তু পাঁচ হাত জায়গা নেই। অতএব পুকুরের দিকে পাঁচ হাত এগিয়ে যাওয়া যাক। তারপর বাঁ-দিকে দশ হাত এগিয়ে গেলুম—কেমন। তারপর পাঁচ হাত পুকুরের দিকে আবার এগুলুম। এরপর সেখান থেকে ডান দিকে দশ হাত এগুনো যাক। সেখানে আমরা পাচ্ছি অম্লং-কে।

বললুম,—আপনি হং মানে হস্ত ধরছেন?

কর্নেল বললেন,—তীরচিহ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে।

বললুম,—বেশ তো, এবার অম্লং-টা কী?

কর্নেল টাকে হাতে বুলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকার পর বললেন,—অম্লং বলতেই একটা স্বাদের কথা আসে। অর্থাৎ টক। এখন টক তো কোনও বস্তু হতে পারে না। একটু ভেবে বলো তো জয়ন্ত, পাড়াগাঁয়ে টক বলতে মনে কী ভেসে ওঠে?

বললুম,—টমাটো।

কর্নেল হাসতে-হাসতে বললেন,—ধরা যাক দলিলটা পাঁচশো বছরের নয়, ওটা হয়তো বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, কিন্তু টমাটো এদেশে এনেছে পর্তুগিজরা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, টমাটো তো স্থায়ী কিছু নয়। চাটুজ্যে বাড়িতে টমাটো চাষ কল্পনা করা যায় না।

আমি বলে উঠলুম,—তাহলে অম্লটা কোনও তেঁতুলগাছ নয় তো?

কর্নেল হেসে উঠলেন,—তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু পাঁচশো কেন দুশো-তিনশো বছরও কোনও তেঁতুলগাছের আয়ু হতে পারে না।

বলে কর্নেল প্যাডের কাগজটা টেনে নিলেন, এবং মূল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকালেন। প্যাডের কাগজটাও ছিঁড়ে নিলেন। কারণ, ওতে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা লেখা হয়েছে। দ্বিতীয় কাগজটা এনে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে অ্যাশট্রেতে ঢোকালেন। তারপর তার ওপর নিভে আসা চুরুটটা ঘষটে অ্যাশট্রেতে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন,—উঠে পড়ো, বেরুনো যাক।

বললুম,—চণ্ডীবাবুকে সঙ্গে নেবেন না?

কর্নেল বললেন,—না। উনি সম্ভবত তোমার মতো ভাত-ঘুম দিচ্ছেন।

দুজন পোশাক বদলে নিলুম। কর্নেলের নির্দেশে প্যান্টের পকেটে আমার অস্ত্রটা ভরে নিলুম। কর্নেল ওপাশের দরজা খুলে বেল টিপে কার্তিককে ডাকলেন। তখনই কার্তিক এসে হাজির হল। কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—তোমার কর্তামশাই কি ঘুমোচ্ছেন?

কার্তিক বলল,—আজ্ঞে না। উনি আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনারা কোথাও যেতে চাইলে আমি যেন ড্রাইভারকে ডেকে দিই।

কর্নেল বললেন,—না, আমরাও তোমার কর্তামশাইয়ের মতো পায়ে হেঁটে বেরুব। তুমি দরজায় তালা লাগিয়ে রাখো।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে কর্নেল দক্ষিণ দিকে হাঁটতে থাকলেন। সেই সময় সামনের দিক থেকে একটা খালি সাইকেলরিকশা আসছিল। রিকশাওয়ালা নিজে থেকেই থেমে গিয়ে বলল,—সাহেবরা যাবেন নাকি?

কর্নেল ঘড়ি দেখে নিয়ে চাপাস্বরে বললেন,—শীতের রোদ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। রিকশা করেই যাওয়া যাক।

রিকশায় চেপে তিনি বললেন,—আমরা যাব চাটুজ্যেমশাইদের বাড়ি।

রিকশাওয়ালা মুখ ঘুরিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল,—যে বাড়িতে মানুষ খুন হয়েছে—

তার কথার ওপর কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। তবে তোমার ভয় নেই, তুমি খুন হবে না।

রিকশাওয়ালা হাসবার চেষ্টা করে বলল,—আজ্ঞে না স্যার। আমি কারুর সাতে-পাঁচে থাকি না, আমাকে কে খুন করবে?

কর্নেল বললেন,—চাটুজ্যেবাড়ির মহীনবাবুও তো শুনেছি কোনও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। সাধু-সন্ন্যাসীর মতো জীবন কাটাতেন। তিনি খুন হলেন কেন?

রিকশাওয়ালা এবার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলল,—সাহেবরা কি ওনাদের আত্মীয়?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। শচীনমাস্টার সম্পর্কে আমার ভাইপো হন।

রিকশাওয়ালা এবার বাঁ-দিকে মোড় নিল। দু-ধারেই ইটের বাড়ি। মাঝে-মাঝে মাটির বাড়ি। এটা গলি রাস্তা। লোক চলাচল খুব কম। রিকশাওলা আপন মনে বলল,—এ-সংসারে মানুষ চেনা বড় কঠিন। ভালোমানুষ কি কখনও খুন হয়?

কর্নেল বললেন,—তাহলে কি তুমি বলতে চাও, মহীনবাবু ভালোমানুষ ছিলেন না?

রিকশাওয়ালা অদ্ভুত শব্দে হাসল। বলল,—ভালোমানুষ হলে কি সে বজ্জাতদের সঙ্গে গাঁজার কলকে টানে?

—কোন বজ্জাতের সঙ্গে উনি গাঁজা খেতেন?

—আপনি চিনবেন না স্যার। দুই বজ্জাতকেই আজ পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। মণি রায়চৌধুরী দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষেছিলেন।

কর্নেল হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমার মনে হল উনি রিকশাওয়ালাকে মনের কথা খুলে বলার সুযোগ দিচ্ছেন। একটু পরে বুঝলুম ঠিক তাই। লোকটা আপনমনে কথা বলতে-বলতে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছে।

—অমন একখানা তাগড়াই কালো রঙের বিলিতি কুকুর ছিল মণিবাবুর। তাকে চুরি করে কোথায় বেচে দিয়ে এসেছে। মণিবাবু কি সহজে ছাড়বেন? এদিকে থানার বড়বাবুও দুঁদে দারোগা। কত দাগি গুঁর ভয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে! কানাভুতু আর গুপে সিংঘিকে কাপড়ে-চোপড়ে করে ছাড়বেন।

অলিগলি ঘুরতে-ঘুরতে রিকশাওয়ালা শর্টকাটেই আমাদের চাটুজ্যেবাড়ির সামনে পৌঁছে দিল।

কর্নেল তার হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন। সে বলল,—আমার কাছে খুচরো তো নেই স্যার।

কর্নেল বললেন,—ঠিক আছে। তোমাকে পুরো টাকাটাই বকশিশ দিলুম।

সে সেলাম করে চলে গেল। বুঝতে পারলুম বিকেল হয়ে আসছে, আলো কমে গেছে। সম্ভবত পাগলা বিনোদের জ্যান্ত মড়ার ভয়েই লোকটা যেন পালিয়ে গেল।

কর্নেল দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দেখলুম শচীনবাবু তাঁর গাবদা ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখে যেন অবাক হলেন। বললেন,—আমি এখনই আপনাদের কাছে যাচ্ছিলুম। ভেতরে আসুন স্যার। আমরা ভেতরে ঢুকলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর চাপাস্বরে বললেন,—ভুতু আর গোপেনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে শুনলুম। তবে আমাদের কেসের ব্যাপারে নয়। ওরা নাকি মণি রায়চৌধুরীর অ্যালসেশিয়ানটাকে চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে।

কর্নেল বললেন,—আপনার পিসিমা কী করছেন?

—পিসিমা বাবার পা টিপে দিচ্ছেন।

—ঠিক আছে। চলুন আমরা একবার মন্দিরের দিকে যাই।

শচীনবাবু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দিকের দরজা খুলে দিলেন। একবার পিছু ফিরে দেখলুম বাসন্তী দেবী বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মন্দিরের সামনে গিয়ে কর্নেল বললেন,—আচ্ছা শচীনবাবু, আপনাদের এই বাড়ির কোথাও কি কোনও বিশাল গাছ ছিল, এমন কথা শুনেছেন?

আমাদের পেছন দিকে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন,—তেঁতুলগাছ? ছোটবেলায় ঠাকমার কাছে শুনতুম, কোন যুগে নাকি কামরূপ কামাক্ষা থেকে এক ডাকিনি একটা তেঁতুলগাছে চড়ে গঙ্গাদর্শনে যাচ্ছিলেন। এ-বাড়ির সীমানায় যেই সে এসেছে, অমনি নাকি সূর্য উঠেছিল। দিনের বেলায় নাকি ডাকিনিদের বাহন গাছ আর উড়তে পারে না। সূর্যের ছটা দেখলেই সেইখানে শিকড় গেঁথে দাঁড়িয়ে যায়।

শচীনবাবু বললেন,—হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। সেই তেঁতুল না কি খাওয়া যেত না। ভাঙলেই রক্ত বেরুত। তবে সেসব নেহাতই বাজে গপ্পো।

ততক্ষণে কর্নেল পিঠের কিট ব্যাগ থেকে একটা গোল ফিতের কৌটো বের করে একদিকটা টেনে আমাকে বললেন,—জয়ন্ত, এই ডগাটা ধরো। মন্দিরের ঠিক মাঝামাঝি বারান্দার গায়ে এটা ধরে থাকো। আঠারো ইঞ্চিতে এক হাত, অতএব পাঁচ বা দশ হাতের হিসেব করতে অসুবিধে নেই।

বলে তিনি পকেট থেকে ভাঁজ করা সেই কাগজটা শচীনবাবুকে দিলেন। শচীনবাবু খুলে দেখে বললেন,—এটা সেই পুরোনো দলিল দেখছি।

এরপর কর্নেলের কাণ্ড দেখে শচীনবাবু আর তাঁর পিসিমা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল তারপর সামনে এক জায়গায় থামলেন। তারপর বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আমাকে বললেন,—এবার ফিতেটা তুমি ওই দাগ দেওয়া জায়গায় ধরে রাখো। তারপর তাঁর যে মাপজোক শুরু হল, তা চণ্ডীবাবুর ঘরে বসে কর্নেল একটা প্যাডের পাতায় লিখে ছিঁড়ে ফেলেছেন। তাঁর মাপজোক শেষ হল যেখানে, সেখানে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিল। পাঁচিলের নীচে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে তিনি দাগ দিলেন।

শচীনবাবু বললেন,—কিছুই তো বুঝতে পারছি না কর্নেলসাহেব।

কর্নেল বললেন—চলুন। বাড়ির ভেতরে এই পাঁচিলের নীচের দিকটা একবার পরীক্ষা করব। জয়ন্ত, তুমি ওই চিহ্নের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে পাঁচিলের ওপর একটা হাত তুলে রাখবে। তাহলে আমি বুঝতে পারব পাঁচিলের ভেতর দিকে ওপাশের চিহ্নটা কোথায় পড়বে।

আমি হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলুম। কর্নেল ভেতরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শচীনবাবু এবং তাঁর পিসিমাও গেলেন। একটু পরে কর্নেল ডাকলেন,—চলে এসো জয়ন্ত। আমার কাজ শেষ।

ভেতরে গিয়ে দেখলুম, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে একটা জবাফুলের ঝোপ। রক্তজবায় ঝোপটা লাল হয়ে আছে।

কর্নেল বললেন,—আশ্চর্য! এখানে দেখছি জবা গাছটার গোড়ায় ঘাসের ভেতরে কয়েকটা নুড়ি-পাথর পড়ে আছে। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য, দেওয়ালের নীচে এই অংশে সিঁদুরের ছোপ।

বাসন্তী দেবী বলে উঠলেন,—মহীনের কীর্তি। প্রায়ই দেখতুম, ওখানে বসে সে করজোড়ে যেন ধ্যান করছে।

কর্নেল বললেন,—এই নুড়িগুলো যেমন আছে, তেমনি পড়ে থাক। আর আপনাদের একটা কথা বলতে চাই। মহীনবাবুকে কেউ খুন করেনি। তিনি কোথাও আছেন। হয়তো তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে, অথবা তিনি নিজেই আত্মগোপন করেছেন।

বাসন্তী দেবী এবং শচীনবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আট

বাসন্তী দেবী এবং শচীনবাবুকে আর কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, —চলো জয়ন্ত, আমাদের এখানকার কাজ শেষ। শচীনবাবু, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আশা করি ভূতের উপদ্রব আর হবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে কর্নেল চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরের পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এই রাস্তাটা সংকীর্ণ এবং ইটের গুঁড়োয় ভরতি। দেখলুম বাঁ-ধারে একটা নতুন বাড়ি উঠছে। সেখানে কেউ নেই। কর্নেল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের আড়ালে আমাকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালেন। নিমগাছটা চাটুজ্যেবাড়ির দেওয়ালের উত্তর-পূর্ব কোণে। সামনে খানিকটা পোড়ো জমি, তার ওপাশে পুরোনো একটা বাড়ি। সেই বাড়ির দিকে তাকিয়ে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন,—একটু লক্ষ রাখো। একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাবে।

কর্নেলের কথা শুনে ভেবেই পেলুম না কখন উনি অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেলেন। এবং সেই ব্যাপারটা আবার যে ঘটবে, তাই বা কী করে বুঝলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। আমি কর্নেলের মতো হাঁটু গেড়ে বসে তাকিয়ে রইলুম। তারপর দেখলুম একটা লোক ওই বাড়িটা থেকে কয়েক পা বেরিয়ে এসে চাটুজ্যেবাড়ির দিকে তাকিয়ে কী দেখল। তারপর আবার সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। দিনের আলো কমে এসেছে, তবু লোকটার চেহারা দেখেই বুঝতে পারলুম সে একজন সাধুবাবা। তার মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, মুখে একরাশ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি। গায়ে একটা গেরুয়া হাফ-হাতা ফতুয়া। পরনে খাটো গেরুয়া লুঙ্গি। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল সম্ভবত সে একজন পাগল। তা না-হলে আমরা তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই অন্তত বার তিনেক ওইভাবে বাড়িটা থেকে বেরুল, আবার যেন কিছু দেখে হন্তদন্ত হয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। তারপর আরও কিছুক্ষণ আমরা বসে রইলুম, কিন্তু সে আর বেরুল না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন। তারপর যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেদিকেই দুজনে ফিরে চললুম। চাটুজ্যেবাড়ির সামনের রাস্তায় পৌঁছে এবার ডানদিক ঘুরে দুজনে এগিয়ে চললুম। এই পথেই রিকশাওয়ালা আমাদের নিয়ে এসেছিল।

কিন্তু পাড়াটা একেবারেই নিঝুম এবং রাস্তাঘাটে কোনও লোক নেই। কর্নেল রিকশাওয়ালার মতো শর্টকাট না-করে সোজা এগিয়ে যাচ্ছিলেন। রাস্তাটায় কবে পিচ দেওয়া হয়েছিল। এখন এখানে-ওখানে পিচ উঠে গেছে। বললুম,—আমরা এ-পথে গিয়ে কোথায় পৌঁছুব?

কর্নেল বললেন,—যেখানে হোক পৌঁছুব, চিন্তু করো না। এবার আমাকে প্রশ্ন করো।

জিগ্যেস করলুম,—ওই সাধুবাবা সম্পর্কে?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ।

বললুম,—আপনি কী করে জানলেন, ওই বাড়িতে এক সাধুবাবা থাকে?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—আজ সকালের দিকে চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলে যখন ভূতের মুখোশ পরা লোকটার দিকে ছুটে গিয়েছিলুম। তখনই আমার চোখে পড়েছিল পোড়ো জমিটার ওখানে ওই সাধুবাবা দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তখন সঙ্গে চণ্ডীবাবু ছিলেন। তাঁর সামনে ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিলুম।

অবাক হয়ে বললুম,—সর্বনাশ, আপনি চণ্ডীবাবুকেও সন্দেহ করেন নাকি?

কর্নেল বললেন,—তুমি তো জানো, খেলতে নেমে কখনও আমি নিজের হাতের তাস কাউকেই দেখাই না। এমনকি তোমাকেও না।

এতক্ষণে চোখে পড়ল কিছুটা দূরে রাস্তার একটা বাঁক থেকে একটা গাড়ি এদিকে আসছে। কর্নেল থমকে দাঁড়িয়ে বললেন,—ওই দ্যাখো চণ্ডীবাবুর নাম করতে-করতেই উনি আমাদের খোঁজে ছুটে আসছেন।

গাড়িটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। চণ্ডীবাবু নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তিনি বললেন,—কর্নেলসাহেবের খোঁজে বেরিয়েছিলুম। একমিনিট, আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিই।

বাঁদিকে একটা গলিরাস্তা ছিল। তিনি সেখান দিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন। তারপর কর্নেল সামনের সিটে এবং আমি ব্যাক সিটে বসলুম। কর্নেল বললেন,—আপনি ছিলেন না, অগত্যা আমি আর জয়ন্ত বেরিয়ে পড়েছিলুম। আমাদের হালদারমশাই কি ফিরেছেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—না। তাঁর জন্য আমি উদ্বেগ বোধ করছি। কানা ভুতু আর গুপে পুলিশের হাজতে। এতে তাদের বন্ধুরা নিশ্চয়ই রাগে ফুঁসছে। দৈবাৎ তাদের পাল্লায় পড়লে মিস্টার হালদার আক্রান্ত হতে পারেন।

কর্নেল বললেন,—আপনি কি ওসি মিস্টার সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করছিলেন?

চণ্ডীবাবু বললেন,—হ্যাঁ। ওরা বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছে মণির কুকুরটাকে ওরা স্বপ্নে বাবা মহাদেবের আদেশ পেয়ে, তাঁর সামনে বলি দিয়েছে। তারপর ধড় আর মুণ্ডু গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে।

কর্নেল জিগ্যেস করলেন,—ওসি কি মণিকে একথা জানিয়েছেন?

চণ্ডীবাবু হাসতে-হাসতে বললেন,—এখনও জানাননি। আমাকেও সতর্ক করে দিয়েছেন। তবে তিনি আপনাকে কথাটা জানাতে বলেছেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাইনে-বাঁয়ে সংকীর্ণ রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে অবশেষে আমরা চণ্ডীবাবুর বাড়ি পৌঁছুলুম। তখন দিনের রোদ প্রায় মুছে গেছে। ঠান্ডাটা বাড়তে শুরু করেছে।

কার্তিক আমাদের ঘরের তালা খুলে দিয়ে বলল,—আপনারা বসুন স্যার। আমি ঠাকুরমশাইকে কফি করতে বলি। আজ ঠান্ডাটা যেন কালকের চেয়ে বেড়ে গেছে।

চণ্ডীবাবু গাড়ি গ্যারেজে রেখে এতক্ষণে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। তারপর সোফায় বসে বললেন,—মিস্টার হালদারের খোঁজে আমি কারুকে পাঠাব নাকি?

কর্নেল বললেন,—থাক। উনি একজন অভিজ্ঞ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। ওঁর কথা ভাববেন না। আপনাকে এবার একটা কথা জিগ্যেস করি। চাটুজ্যেবাড়ির উত্তরে যে নতুন বাড়িটা হচ্ছে, সেখান থেকে কিছুটা দূরে একটা খুব পুরোনো বাড়ি আছে দেখেছি। ওই বাড়িটা কার?

চণ্ডীবাবু বললেন,—বুঝেছি। ওই বাড়িটার মালিক ছিলেন নলিনী বাঁড়ুজ্যে নামের এক ভদ্রলোক। তিনি দুর্গাপুরে ছেলের কাছে চলে যান। যাওয়ার আগে বাড়িটা দেখাশোনার জন্য হরিপদ হাজরা নামে একটা লোকের ওপর দায়িত্ব দিয়ে যান। হরিপদর বাড়ি পাশেই। গতবছর মণি রায়চৌধুরী তার দলের অফিস করবে বলে বাড়িটা দখল করেছিল। খবর পেয়ে নলিনীবাবু তাঁর নামে মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় তাঁর জয় হয়েছিল। কিন্তু মণি হাইকোর্টে আপিল করেছে। হাইকোর্ট ইনজাংশান দিয়ে বলেছে, যতদিন না মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ততদিন ওই বাড়িতে কেউ বাস করতে পারবে না। আসলে নলিনীবাবুর বাড়িটা তাঁর এক জেঠামশাইয়ের তৈরি। তাঁর কাছেই নলিনীবাবু ছোটবেলা থেকে থাকতেন। সমস্যা হল জেঠামশাই উইল করে তাঁকে বাড়িটা দিয়ে যাননি।

এই সময় ঠাকুরমশাই প্রকাণ্ড ট্রে এনে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। দেখলুম কফির সঙ্গে দু-প্লেট পকৌড়া আছে। অতএব শীত সন্ধ্যায় আরাম করে কফি পান শুরু হল। চণ্ডীবাবু কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় কার্তিক এসে খবর দিল, কর্তামশাই আপনার টেলিফোন এসেছে।

চণ্ডীবাবু কফির কাপ-প্লেট হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন।

এই সময়েই কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—চাটুজ্যেবাড়ির পাঁচিলের নীচে জবাগাছের গোড়া খুঁড়লে সত্যিই কি সোনার মোহর ভরতি ঘড়া পাওয়া যাবে?

কর্নেল বললেন,—পাওয়া গেলে অনেক আগেই অন্তত শরদিন্দুবাবু জায়গাটা খুঁড়ে বের করে ফেলতেন। অবশ্য শচীনবাবুরাও তার ভাগ পেতেন।

বললুম,—আপনি ওই সংকেতের জট যেভাবে খুলেছেন, সেই ভাবেই কি অন্য কেউ খুলতে পারেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন,—একজন অন্তত পেরেছিল। সে হল মহীন চাটুজ্যে। কারণ, তুমি সচক্ষে দেখেছ পাঁচিলের নীচের দিকটা সিঁদুর মাখানো আর নুড়ি পড়ে আছে।

অবাক হয়ে বললুম,—কিন্তু মহীনবাবুর হঠাৎ অন্তর্ধান একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে।

কর্নেল বললেন,—জয়ন্ত তুমি বোঝো সবই, তবে বড্ড দেরিতে। তুমি এখনও বুঝতে পারছ না, ওই পাহাড়ি নদীর নুড়িগুলো কে নিয়ে এসেছিল, এবং কে তা রাতবিরেতে বাড়িতে ছুঁড়ে বাড়ির লোকেদের ভয় দেখিয়েছে। এমনকী, ছাদে উঠেও দাপাদাপি করেছে।

এবার চমকে উঠে বললুম,—কী কাণ্ড! তাহলে কি মহীনবাবুই তার বাড়ির লোকেদের ভূতের ভয় দেখাতেন?

কর্নেল বললেন,—আবার কে? তবে এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করত কানা ভুতু আর গুপে সিংঘি। তারা শচীনবাবুর কাছে আড্ডা দিতে এসে আসলে মহীনবাবুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখত। অবশ্য এটা আমার অঙ্ক।

—হঠাৎ আমার চমক জাগল। বললুম,—কর্নেল সেই পুরোনো বাড়িতে যে সাধুবাবাকে দেখলুম, তিনিই মহীনবাবু নন তো?

কর্নেল বলেন,—কিছুক্ষণ পরে আবার আমাদের বেরুতে হবে। মনে-মনে তৈরি থাকো। যাওয়ার সময় থানার ওসি মিস্টার সেন এবং পুলিশ ফোর্স আমাদের সঙ্গে থাকবে।

এই সময় কার্তিক এসে বলল,—কর্তামশাই কর্নেলসাহেবকে ডাকছেন। আপনি এখনই আমার সঙ্গে আসুন।

কর্নেল তখনই দ্রুত উঠে গেলেন। আমি চুপচাপ বসে কর্নেলের অঙ্কটাকে নিজের বুদ্ধিমতো কষে দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু অঙ্কটা বড্ড জটিল। বিশেষ করে মহীনবাবু কেনই বা তাঁদের পূর্বপুরুষের গুপ্তধনের খবর ওই বজ্জাত কানা ভুতু আর গুপে সিংঘিকে দিতে চাইবেন। তা ছাড়া তিনি তো সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো মানুষ। সোনার মোহরে তাঁর লোভ থাকার কথা নয়।

অঙ্কটা কষতে গিয়ে হাল ছেড়ে দিলুম। দেখা যাক কর্নেলের রাতের অভিযান কোথায় গিয়ে পৌঁছায়।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তারপর বললেন,—ওসি প্রণবেশ সেন চণ্ডীবাবুকে ডেকে আমার খবর জিগ্যেস করছিলেন।

বললুম,—তাহলে আপনার প্ল্যান মিস্টার সেনকে জানিয়ে এলেন?

কর্নেল বললেন,—হ্যাঁ। আমার অঙ্ক যদি ঠিক হয়, তাহলে সব রহস্য ফাঁস করে দিয়ে রাত দশটার মধ্যেই ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়তে পারব।

জিগ্যেস করলুম,—চণ্ডীবাবু আমাদের সঙ্গী হবেন তো?

কর্নেল বললেন,—হবেন। তবে উনি আমাদের আগেই বেরিয়ে যাবেন। যেখানে আমরা হানা দেব, উনি তার কাছাকাছি জায়গায় উপস্থিত থাকবেন। যাই হোক, এখন ওসব কথা নয়।

বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে ধ্যানস্থ হলেন।

সময় কাটতে চাইছিল না। কিন্তু আটটা বাজতে চলল, তখনও হালদারমশাইয়ের পাত্তা নেই। আমি কর্নেলকে কথাটা বললুম। কিন্তু তিনি কোনও জবাব দিলেন না।

সাড়ে-আটটার সময় কর্নেলের নির্দেশে হালকা জ্যাকেটটা খুলে পুরু জ্যাকেট পরে নিলুম। তারপর চণ্ডীবাবু এলেন। দেখলুম তিনি ওভারকোট পরেছেন এবং মাথায় টুপি, মুখে পাইপ। বললুম,—মিস্টার রায়চৌধুরীকে যেন শার্লক হোমস বলে মনে হচ্ছে।

তিনি একটু হেসে বললেন,—হোমসসাহেব কি আমার মতো হাতে রাইফেল নিয়ে ঘুরতেন?

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। চণ্ডীবাবু আমাদের থানায় পৌঁছে দিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন। দেখলুম ওসি প্রণবেশ সেন কয়েকজন অফিসারসহ থানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কর্নেল এবং আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন,—চলুন বেরোনো যাক।

রাস্তায় বাতিগুলো কুয়াশায় স্নান হয়ে আছে। নির্জন রাস্তা। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরতে-ঘুরতে এক জায়গায় গাড়ি থেমে গেল। মিস্টার সেন চাপাস্বরে বললেন,—আর দু-মিনিট। তারপরই লোডশেডিং হবে।

বুঝলুম বিদ্যুৎ অফিসকে বলে রেখেছেন মিস্টার সেন।

তারপর ঠিকই লোডশেডিং হল। রাস্তার আলোগুলো নিভে গেল। কুয়াশা-নামা অন্ধকারে বুঝতে পারছিলুম না কোথায় এসেছি। একটু পরেই জায়গাটা চিনতে পারলুম। আমরা চাটুজ্যেবাড়ির মন্দিরের কাছে এসেছি। একদল পুলিশ বাড়িটার চারদিক ঘিরে ফেলল।

এরপর আমরা কয়েকজন মন্দিরের চত্বরে গেলুম। ঠিক তখনই কানে এল দেওয়ালের ওপাশে ঘসঘস করে চাপা শব্দ হচ্ছে। তারপর কানে এল বাড়ির সদর দরজার দিকে কেউ কড়া নাড়ছে।

শচীনবাবুর কণ্ঠস্বর কানে এল এবং টর্চের আলো দেখতে পেলুম। এদিকে কর্নেল আমাকে কাঁধে হাত রেখে দরজার পাশে গুঁড়ি মেরে বসিয়ে দিয়েছেন। অন্যপাশে মিস্টার সেনও বসেছেন।

তারপর হঠাৎ এদিকের দরজাটা খুলে গেল। আবছা দেখলুম একটা লোক বেরিয়ে আসছে। অমনি তার মুখে টর্চের আলো ফেলে ওসি মিস্টার সেন বললেন,—শরদিন্দুবাবু, আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

তারপর একটা ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ততক্ষণে আরও টর্চের আলো জ্বলে উঠেছে। দেখলুম চণ্ডীবাবুর মতোই ওভারকোট পরা এবং মাথায় হনুমান টুপি পরা তাগড়াই চেহারার ভদ্রলোকের হাতদুটো পেছন দিকে টেনে একজন অফিসার হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। তিনি চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, কিন্তু তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে পুলিশ অফিসাররা প্রিজন ভ্যানের দিকে নিয়ে গেলেন।

কর্নেলের পেছনে-পেছনে আমি বাড়িতে ঢুকলুম। তারপর দেখলুম বিকেলে-দেখা সেই সাধুবাবাকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়েছে। কর্নেল জবাগাছটার দিকে টর্চের আলো ফেললেন। সেখানে একটা শাবল পড়ে আছে। খানিকটা জায়গায় মাটি খোঁড়া।

শচীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—কী আশ্চর্য! এই সাধুকেই তো একবার সঙ্গে নিয়ে ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।

আমি অবাক হয়ে কর্নেলকে জিগ্যেস করলুম,—তাহলে আপনি যে বলেছিলেন, ওই সাধুবাবাই মহীনবাবু?

কর্নেল বললেন,—আমার অঙ্কে এই জায়গায় একটু গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু—

বলেই তিনি ওসি মিস্টার সেনকে বললেন,—ওই পুরোনো বাড়িটা পুলিশ ঘিরে রেখেছে তো?

মিস্টার সেন বললেন,—হ্যাঁ। চলুন এবার শিগগির সেখানে যাওয়া যাক।

আমরা পাশের গলি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সেই পোড়ো জমিতে পৌঁছুলুম। ভেতরে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ হচ্ছিল। একজন অফিসারের কাঁধের ধাক্কায় এদিকের দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তারপর ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় দেখলুম হালদারমশাইয়ের সঙ্গে একটা লোকের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে।

হালদারমশাই এবার তাকে ছেড়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে বললেন,—কর্নেলস্যার এই হইল গিয়া ঘরের শত্রু বিভীষণ।

এতক্ষণে চণ্ডীবাবু উলটো দিক থেকে দৌড়ে এসে বললেন,—এ কী! মণি তুমি এখানে কেন? তোমার চ্যালারা কোথায়? বুঝেছি, তুমি এখানে আড়ি পেতে বসে চ্যালাদের চাটুজ্যেবাড়িতে হানা দিতে পাঠিয়েছিলে।

ওসি প্রণবেশ সেনের নির্দেশে পুরু সোয়েটার আর হনুমান টুপি পরা এক ভদ্রলোককে একজন অফিসার বললেন,—আপনি আমাদের সম্মানিত অতিথি। প্লিজ, রাজনীতির ভয় দেখাবেন না। আমাদের সঙ্গে চলুন।

বলে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

চণ্ডীবাবু বললেন,—উঠোনের কোণে বেচারা মহীন লুকিয়ে বসেছিল। তাকে কনস্টেবলরা ধরেছে। চলুন সেখানে যাওয়া যাক।

ভেতর দিকের উঠোনে নেমে দেখলুম, দেখতে শচীনবাবুর মতো চেহারার এক ভদ্রলোক বোবার চোখে তাকিয়ে আছেন। এত শীতেও তাঁর গায়ে একটা গেরুয়া ফতুয়া আর পরনে খাটো ধুতি। তিনি চণ্ডীবাবুর দিকে তাকিয়ে কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন,—আমি অতশত কিছু ভাবিনি। শরদিন্দুদা মাঝে-মাঝে আমাকে ডেকে পাঠাতেন, আর বলতেন মণিবাবুর বাড়ি যাবি আর তিনি যা বলবেন, তাই করবি।

কর্নেল বললেন,—তাই আপনি রাতবিরেতে ঢিল ছুঁড়তেন, আর পাগলা বিনোদের মরা সেজে ভয় দেখাতেন।

শচীনবাবুর কাকা মহীনবাবু হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

কর্নেল বললেন,—চলো জয়ন্ত, আসুন হালদারমশাই, আশাকরি আপনাকে ঘুসি খেতে হয়নি?

হালদারমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—না। আমি দরজায় আস্তে কড়া নাড়সি, আর সে টর্চের আলোয় আমারে দেইখ্যা ঝাঁপাইয়া পড়সে।

সে-রাত্রে চণ্ডীবাবুর বাড়িতে গিয়ে কফি খেতে-খেতে কর্নেলকে জিগ্যেস করেছিলুম, —সোনার মোহর ভরতি ঘড়াটা উদ্ধার করবেন না?

কর্নেল কিছু বলার আগেই চণ্ডীবাবু বললেন,—ওই কাজটা পুলিশের। সত্যি ওখানে সোনার মোহর ভরা ঘড়া পোঁতা আছে কি না তা পুলিশ খুঁজে দেখবে। আইন অনুসারে সত্যি সেটা পাওয়া গেলে তার মালিক হবে দেশের সরকার। কারণ ওটা পুরাসম্পদ।

এবার শেষ কথাটা বলে ফেলি। আমরা কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর চণ্ডীবাবু কর্নেলকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, দশ-বারো ফিট খুঁড়েও ওখানে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে গর্তের একপাশে কিছুটা জায়গা দেখে পুলিশের মনে হয়েছে, ওখানে সত্যি গোলাকার কিছু পোঁতা ছিল, কোন যুগে কেউ হাতিয়ে নিয়েছে।

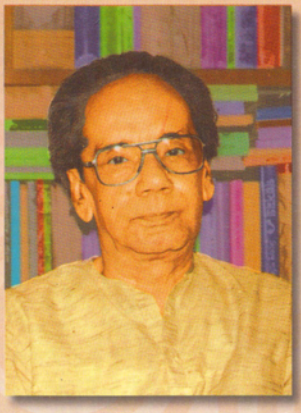

রহস্য কাহিনির নায়ক হিসেবে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বাংলা সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। বয়সে তিনি বৃদ্ধ কিন্তু শরীরে যুবকের শক্তি। নেশা প্রজাপতি-পাখি-ক্যাকটাস-অর্কিড। বাতিক অপরাধ রহস্যের পিছনে ছুটে বেড়ানো। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে লেখা সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটদের জন্য কর্নেলের অজস্র রহস্য গল্প ও উপন্যাস ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল নানা জায়গায়। এবার সেগুলি এক মলাটের মধ্যে এনে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের এই প্রয়াস।